

ସମ୍ବୁଧାରା

ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ୫ ପ୍ରଶ୍ନର ଗାଥା

ବୈଷାଖ — ଆଶ୍ଵିନ, ୧୯୬୫

वर्षानुक्रमिक विवरणरूपी

[illegible]

[illegible]

वर्षानुक्रमिकं चित्रशृङ्खला

[illegible]

প্রাচীন ও আধুনিক
মতে অনুমোদিত



লিলি
বার্লি

খাদ্যপ্রাণযুক্ত
খাদ্য, পথ্য ও পানীয়



লিলি বার্লি মিলস প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪

বঙ্গুধারা

প্রতিষ্ঠাতা বর্ষ • প্রথম খণ্ড • প্রথম সংখ্যা

বিশাখ, ১৩৬৫

❖ সূচীপত্র ❖

বিষয়	পৃষ্ঠা
বা : দীর্ঘ নবম (প্রবন্ধ)—দ্বীপকোমলেন পত্র	১
বিশ্বনাথ গান : উপহার :—বিকৃত্ত্বরণ মুখোপাধ্যায়	৪
বঙ্গভাষা : প্রবন্ধ —শশিভূষণ শাস্ত্রী	১৬
হরীন্দ্র কীর্তনলেখা : কীর্তন-কাহিনী —চ্যক্ৰবর্তী উষ্টাচার	৩০
শোভাযাত্রা : গল্প —তুঙ্গল বাহ	৩৩
ভারতের খনিজ সম্পদ ও উন্নয়ন (প্রবন্ধ —মিহির বসু	৩৯
মনোহর ও প্রেমহারা (উপহার)—মহাশেতা উষ্টাচার	৫২
জ্যোতিষ শিকিম (সচিত্র ভবন কাহিনী)—মিখিলহরন বাহ	৫২
কীর্তনের সাধকতা (গল্প —বিমলেন্দ্রনাথ মল্লিক	৫৬
শরীর ব্যাবসায় : বৈশাখের সচিত্র প্রবন্ধ :—তুঙ্গলীলাস শিখ	৫৯
ভাষা-বিশিষ্টতা : বাক্য : প্রবন্ধ :—চ্যক্ৰবর্তী লাহিড়ী	৬৫
চিত্র-কৌশল : যিঃকলনাথ ঠাকুর—চ্যক্ৰবর্তী উষ্টাচার	৬৭
যেতে যেতে : কবিতা :—হরপ্রসাদ মিত্র	৬৯
সেনাভারত (গল্প)—বাসুদেব মাইতি	৭০
প্রথম বাংলা : ঐতিহাসিক : সচিত্র প্রবন্ধ :—জানা প্রসাদ সরকার	৭৫
ঐতিহাসিক উৎসব : সচিত্র প্রবন্ধ :—শিবপ্রসাদ বিশ্বাস	৭৯
বঙ্গাল সোলাইটি : সচিত্র প্রবন্ধ :—চ্যক্ৰবর্তী উষ্টাচার	৮২
নতুন ইন্ডোরোল : নতুন মণ্ডল : ভবন কাহিনী :—মনোহর বসু	৮৬
এলপের শিক্ষা-ব্যবস্থা (প্রবন্ধ)—ঐক্যবরণ পদা	৯৭
বঙ্গ বোধন (প্রবন্ধ)—ঐক্যবরণ	৯৮
বিজ্ঞান প্রসঙ্গ : মণ্ডল সংগ্রহ মার না—সমরেন্দ্রনাথ সেন	১০০
গৃহস্থালি : আদিম যুগের গৃহস্থালি—পুষ্পল উষ্টাচার	১০৩
নতুন বই : পুস্তক-সমালোচনা : আধুনিক দ্বিতীয় সাহিত্যে বাংলার স্থান—সত্যজিৎ মাইতি	১০৫
মঞ্চ-পর্থা : চিত্রলেখক—পদনাভ	১০৭
বেঙ্গার বেলা—মুদ্রিণ	১১১
শেষ পাতা (সচিত্র বসন্তচন্দ্র)—শিবরাম চক্রবর্তী	১১৪

। দ্বিতীয় বিশ্বনাথ গানের চিত্র এবং ভবনকাহিনী দে, দীপকর বহু ও ভরত মণ্ডলের আলোকচিত্র ।

• প্রচ্ছদ-শিল্পী : অজিত গুপ্ত •

আপনার টিকিট ?

যেঁনে টিকিট চেয়ে টিকিট-পরীক্ষক
তার কর্তব্য কাজই করেন—
এঁচল তার ওপর হানলা করবেন না।
এদেশে বিনা-টিকিটে
যাত্রীর তো অভাব নেই—
সেইজন্মই টিকিট পরীক্ষার প্রয়োজন।
আপনার হয়তো টিকিট আছে,

তবুও, টিকিট দেখতে চাইলে
আপনার তা' দেখানো কর্তব্য।
নমুনা-পরীক্ষার মতো মাঝে মাঝে
ছ' একজনের টিকিট দেখা তাঁর কাজ নয়,
আর, যুগ দেখে আপনার মনের
কথা জেনে নেবার ক্ষমতাও তাঁর নেই।
সুতরাং টিকিট পরীক্ষার সময় আপনাকে
তিনি বার দেবেন কেমন করে ?
হয়তো ঘুমোচ্ছেন, বা, বিজ্ঞান করছেন—
কিন্তু আপনার সুবিধামতো সমস্তের জ্ঞান
অপেক্ষা করতে হ'লে তাঁর পক্ষে যত্নভরে
দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। তাই,
আপনার কাছে টিকিট চাইলে চ'টে উঠবেন না।
অপেক্ষা করার মতো সময় কোথায় তার ?



পূর্ব রেলওয়ে

—ছোট ছোট ভেলেনেমেসেদের জন্য নই—

—নিখিল ভারত মুদ্রণ প্রদর্শনী কোম্পানীর ১৯৭৮ পুরস্কার প্রাপ্ত—

● পৃথিবী আন্তানী ● ১১২

● সাত বামনের দেশে	৩০০	● ময়ূরপঙ্খী নাও	৭৫
● উমনো ঝুমনো	২০০	● কলাবতী	৭৫
● স্বপ্নে পাওয়া দেশ	১৩৭	● গ্যাঙোর গ্যাঙ	৭৫
● বুদ্ধ ভূতুম	৭৫	● মিউ মিউ	৭৫

ইনি কে ?

* শ্রীরামকৃষ্ণ * স্বামী বিবেকানন্দ * বিজ্ঞানাপর * মাইকেল মধুসূদন * রাণী রামমণি
* শ্রীধরবিন্দ * রবীন্দ্রনাথ * নেতাজী সুভাষা। প্রতি বই—৫০ নয়া পয়সা।

উপস্থাস—

বিদ্যায়ক ভট্টাচার্য্যের—মনোময়ী ২০০

জ্ঞানন্দ বাগচীর—চক্ৰবর্তী ৩০০

টেলিগ্রাম—আর্ট ইন্ডিয়ান

আর্ট ইন্ডিয়ান

টেলিফোন—৪৪-৩৪১২

৪৪নং, ৫৫ ইট, কলিকাতা-৬

শাখা : ৬৬১বি, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-২

ক্যাগজের কথা—

স্রাণতন্ত্রের প্রগতির কথা,

জ্ঞান কল্যাণের কথা।

রবীনাথ দত্ত এণ্ড সন্স (প্রাঃ) লিঃ

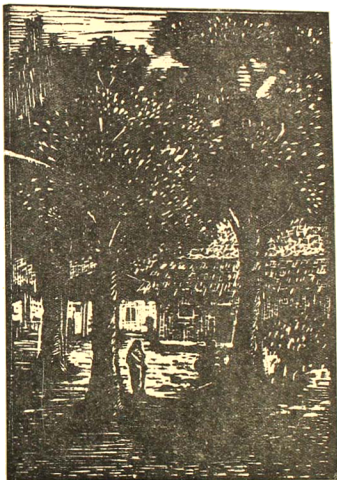
কাগজ, কালি, বোর্ড, লেখন সামগ্রী ও মুদ্রণ সস্তার

“রবীনাথ বিল্ডিংস্”, ৩২বি, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-১

ফোন : ২২-৪২২১ ও ২২-৪২২২; তার : “নোটপেপার”

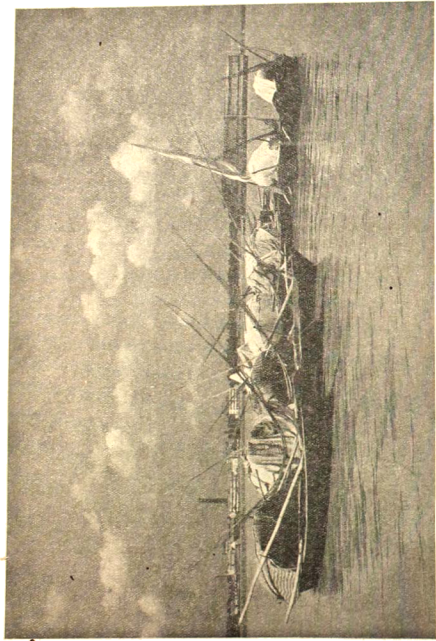
—শাখা—

কলিকাতা, পাটনা, কটক, গোহাটী ও বারানসী



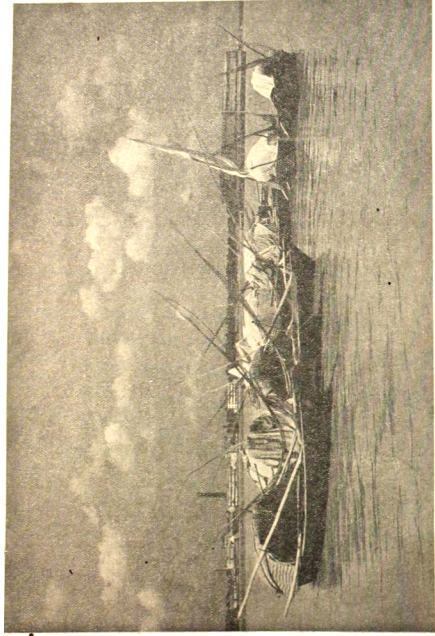
শহর থেকে দূরে

[চিত্রশিল্পী : বিশ্বনাথ দাস]



বিজ্ঞান

[ক্রটি : ভগবতী দে]



বিজ্ঞান

[পৃষ্ঠা : ভগবতী]

রাখেন। ইহার মধ্যে বাঙ্গালী আছেন, বাঙ্গালী হিন্দু আছেন, অপর জাতিও আছেন।

মুশলমানী হিজরী অল্পপাণ্ডা রাখেন এইরূপ লোকের সংখ্যা নিয়ে গিয়া। ইহার কলুটোলা ও ক্যানিং স্ট্রাটে কারবার করেন বেশিরভাগ।

১৯৪৮ — ২২

১৯৪৯ — ২৭

১৯৫০ — ২২

এইবার কলিকাতার ও কলিকাতার বাহিরে মফসলে এই ৩ বৎসরের সমষ্টি করিয়া কোন্ দিনে কত জন নতুনখাতা করেন তাহার হিসাব নিম্নে। যথা :

	কলিকাতার	কলিকাতার বাহিরে
১লা বৈশাখ	২৭,১০৭	১,২২৭
রাম-নবমী	৭,১২৮	৪৮৭
বঙ্গবাহা	১,১২১	৭৬
অক্ষয়-তৃতীয়া	৬৭১	৬১
শেওলালী	৭,০০০	৩৩৬
শ্রদ্ধাঙ্গী শেওলালী	২৪২	৮৮
বিজয়া-দশমী	২১০	৩০
বঙ্গ-পঞ্চমী	১১৭	৯

পশ্চিমা হিন্দুরাই শেওলালীর দিন নতুনখাতা করেন; বাঙ্গালী হিন্দুরা করেন না বলিয়াই জানি। বর পশ্চিমা হিন্দু রাম-নবমীর দিন নতুনখাতা করেন; বাঙ্গালীরাও করেন। কলিকাতার বাহিরেও পশ্চিমা হিন্দুরা চুড়াইয়া পড়িলেও, কলিকাতার বাহিরে এখনও বাঙ্গালী ব্যবসাদারেরা কলিকাতার বেঙ্গলডাঙে 'কোণ-গঙ্গা' হইয়াছেন—সেইরূপ করেন না। যতরাং কলিকাতার ও কলিকাতার বাহিরে কোন্ দিনে কত খাতা রাখা হয় তাহার অল্পপাত পর্যালোচনা করিলে এইরূপের কিছুটা হ্রাশ বা ইমিত পাওরা বাইতে পারে।

নিম্নে আমরা হাজার-করা কলিকাতার ও কলিকাতার বাহিরে কোন্ দিনে কত খাতা রাখা হয় তাহার অল্পপাত লিখান :

	হাজার-করা	
	কলিকাতার	কলিকাতার বাহিরে
১লা বৈশাখ	৪৪১.৭	৩৬৬.৪
রাম-নবমী	১২৭.৪	১৬২.৬
অক্ষয়-তৃতীয়া	১৮.২	২০.০
বৃহৎসপ্তমী	৩.৫	২৪.৪

	কলিকাতার	কলিকাতার বাহিরে
বিজয়া-দশমী	৪.৮	১০.০
বঙ্গ-পঞ্চমী	৩.২	৩.০
শেওলালী	১২২.৯	১২২.৯

বাঙ্গালী হিন্দু যে রাম-নবমীতে নতুনখাতা করে তাহার একটা আশাঙ্ক (estimate) এইভাবে করা গেল। শেওলালীর খাতা ১২২.৯ হইতে মফসলে কমিয়া ১২২.১-এ পাড়ার; সেই হিসাবে রাম-নবমীর খাতা যদি কেবলমাত্র পশ্চিমা-হিন্দুরাই রাখিত, তাহা হইলে উহা ১১৪.৮ হইত। কিন্তু বাঙ্গালী রাম-নবমীতে খাতা রাখে। কলিকাতার কোনো বাঙ্গালী রাম-নবমীতে খাতা রাখে না। পরিত্রা লইলে মফসলে হাজার-করা ১৬২.০-১১৪.৮ = ৪৭.২ জন বাঙ্গালী রাম-নবমীতে খাতা রাখে। ইহা একটি মোটামুটি হিসাব মাত্র।

কলিকাতার বাহিরের হিসাব হইতে যদি আমরা বাঙ্গালী হিন্দু কত জনে কিভাবে খাতা রাখেন তাহার এইরূপ হিসাব করি তো তাহা খুব অসঙ্গত হইবে না।—

১লা বৈশাখ	—	৬১১.৪
রাম-নবমী	—	৪৭.২
অক্ষয়-তৃতীয়া	—	২০.০
বিজয়া-দশমী	—	১০.০
বঙ্গ-পঞ্চমী	—	৩.০
		৭১৭.৬

এই হিসাবে আমরা, মফসলের বাঙ্গালী হিন্দুরা ইংরাজী বছর হিসাবে কোনো খাতা রাখেন না, পরিত্রা লইয়াছি। আমাদের এইরূপ করিবার হেতু দুইটি। প্রথম, মফসলে ইংরাজী বছর হিসাবে খাতা রাখার সংখ্যা কম—শতকরা ১১.০টি।

	মোট ইংরাজীতে খাতা রাখার সংখ্যা	কলিকাতার বাহিরে খাতা রাখার সংখ্যা
১৯৪৮	—	৪,৪২৭
১৯৪৯	—	১,০১৭
১৯৫০	—	৬,১০৪
	১৮,৩৭৮	২,১৪০

আর এইরূপ ইংরাজী বছর হিসাবে খাতা রাখার প্রাচুর্য্য লাভিলি, অলপাইগুড়ি ও আপানসোলে থাকায়, আমরা পরিত্রা লইতে পারি যে, অবাঙ্গালীরাই বেশিরভাগ এইরূপ ভাবে খাতা রাখেন। যতদূর জানা যায়, বাঙ্গালী

হিন্দুরা মফসলে ইংরাজী বছর হিসাবে খাতা রাখেন না, বা রাখিলেও—খুব কম।

এমনকি বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে হাজার-করা ১০০ জন ১লা বৈশাখ নুতনখাতা মন্বরে করেন; রাম-নবমীতে করেন ৬০ জন; আর, অক্ষরতৃতীয়াতে করেন ২৭ জন।

এই অল্পখাত—ইংরাজী ক্রিষ্ণ-কর সরকারকে আশা দেন তাহাদের মধ্যে। ইংরাজী ক্রিষ্ণ-কর সেন না বা দিতে হয় না। এইরূপ বাঙ্গালীদের মধ্যে ১লা বৈশাখ নুতনখাতা মন্বরের অল্পখাত আরও বেশী বলিয়া আমাদের মনে হয়। সেকালে যেকালে “৩৩ ১লা বৈশাখ সন ১৩০০ সাল। ১০০০ প্রগাঢ় কারবার করিতেছি” শিল্পের লেখা মেথিরা আমরা উপরি-উক্ত দিক্‌তে আশিদ্ধাছি। বরাহনগর ও শ্রামবাখার অকালের ৮৪টি কারবারের মধ্যে ২টিতে অক্ষরতৃতীয়া ও ১টিতে রাম-নবমীর দিন ‘নুতনখাতা’ হইয়াছে।

ইংরাজী ১৩০০ সালে সনৎসুখার রাঘ চৌধুরী যখন বাঙ্গালা বিধান-সভার সভ্য ছিলেন তখন ১লা বৈশাখ রাহাতে ছুটির দিন বলিয়া গণ্য হয় তাহার স্তর এক প্রস্তাব আনয়ন করেন। প্রস্তাবের উত্তরে সরকার-পক্ষ হইতে ত্রার বিশিষ্ট-বিহারী শেখ মহাপাশ বলেন যে, সরকার এ বিষয়ে অল্পদখান করিয়া পরে ব্যবস্থা করিবেন। কয়েক বৎসর পরে ১লা বৈশাখ ছুটির দিন বলিয়া ধার্য হইত—এখনও হয়।

১লা বৈশাখই হইতেছে বাঙ্গালীর নববর্ষ।

বাঙ্গালী, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী হিন্দু, সৌরবর্ষ মানিয়া চলেন। সৌরবর্ষের আরম্ভ ১লা বৈশাখ; আক্ষরবর্ষের বাহুবর্ষকালে হিজরীর পরিবর্তে রাজস্বের হিসাবের খাতার এই ১লা বৈশাখ হইতে যে সৌরবর্ষ আরম্ভ হয় তাহাই সন হিসাবে প্রচলিত হয়। তাহার পূর্বেও ১লা বৈশাখ হইতে নুতন বৎসর বাংলায় আরম্ভ হইত। শতাব্দী, বাহা পত্রিকা-কারগণ ও আচার্য-কোণ্ডিভীরা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার আরম্ভও এই ১লা বৈশাখে।

এখন একটি প্রশ্ন মনে জাগে—যদি ১লা বৈশাখেই বাংলায় নুতন বৎসরের আরম্ভ, তাহা হইলে কেন কোনো কোনো বাঙ্গালী হিন্দু রাম-নবমীতে বা অক্ষরতৃতীয়ার নুতনখাতা আরম্ভ করেন? শুধি ধরিয়া বৎসর গণনা করিলে, কোনো কোনো বার এই বছর ৩৬৬ দিনের বেশী, আবার কোনো কোনো বছর ৩৬৫ দিনের কম হয়। ইহাতে বার্ষিক আয়-ব্যয়ের তুলনা-মূলক হিসাবের অসুবিধা হয়। সন ১৩৬৩ সালে ৩০শে বৈশাখ অক্ষরতৃতীয়া ছিল; ১৩৬৪ সালে ১০শে বৈশাখ—বছর

১১ দিন কম। আবার যেকালের গুড়ু যদি ১ টোকা করিয়া লাভ হয়, তাহা হইলে এ বছর ৩৬৭ টোকা লাভ হইল। তাহার পূর্ববৎসর কিন্তু ১১ই বৈশাখ অক্ষরতৃতীয়া হওঁয়, লাভ সমান হারে হইলে, বার্ষিক লাভ ৩৬৭ টোকা হইয়াছিল। এ বছরে আমার ৩ টোকা কম লাভ হয় নাই—কেবলমাত্র হিসাব রাখার ভুল এইরকম কম লাভ মনে হইতেছে মাত্র।

তথাপি কোনো কোনো বাঙ্গালী হিন্দু কেন রাম-নবমীতে বা অক্ষরতৃতীয়ায় ‘নুতনখাতা’ করেন? ধর্ম-বিশ্বাস ইহার সঙ্গতম কারণ হইলেও, সবটা বহে। অক্ষরতৃতীয়ার সত্যমুগের উৎপত্তি; মহাপুণ্য দিন—তথাপি অক্ষরতৃতীয়া অপেক্ষা রাম-নবমীতে ‘নুতনখাতা’ হইবার সংখ্যা বেশী। আমাদের বাংলা-দেশে পাক ও বৈষ্ণবের সংখ্যা মোটামুটি সমান। ‘সুখভাবে আলোচনা করিলে, শাক্তের সংখ্যা বেশী বলিয়া মনে করিবার খেতাব বেতু আছে। আর ইহারও বৈষ্ণব তাহারের অধিক—এই চৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত মতাবলম্বী ও রাধাকৃষ্ণের উপাসক। রামের উপাসক বাংলায় খুব কম। রাধাকৃষ্ণের মূর্তির ও মন্দিরের বৈষ্ণব প্রাচুর্য দেখা যায়, তাহার তুলনায় রামের মূর্তি বা মন্দির নাই বলিলেই চলে। অথচ রাম-নবমীতে ‘নুতনখাতা’ হয় ও তাহার সংখ্যা অক্ষরতৃতীয়ার ‘নুতনখাতা’ অপেক্ষা বেশী। ইহার কারণ আমাদের এইরূপ মনে হয়, অক্ষর ইহা আমাদের অসুখ্য মাত্র, এককালে বাংলাদেশে রামের উপাসনা খুব প্রবল ছিল। আমরা সংখ্যা গণনা করি—রাম, ছই, তিন,....; কোনো কোনো বড় বা শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধাইতে হইলে বলি ‘রামদা’ (কাটাতি-বিশেষ); ‘রাম-ভাগল’ ইত্যাদি। কুড়-প্রভেদের ভাব পাইলে শ্রবণ করি রামকণ। কোনো খাড়াপ কথা শুনিতে বলি ‘রাম বলো’—ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমাদের বাক্যব্যবহার ‘রামের’ প্রচলন বেশী।

ইংরাজ যখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার লেওয়ানী শনদ পাইলেন, তখন হিসাব রাখিতেন বাংলা সাল অতসারে। মাত্রাক ও বোখাইতে ঐখানে প্রচলিত বৎসর হিসাবে হিসাব রাখা হইত। ইহাতে অসুবিধা হইতে থাকে, ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস ১লা মে হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত সরকারী হিসাবের বৎসর করেন। এই ব্যবস্থা ইং ১৮৬৬ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত চলিয়াছিল। ১৮৬৭ সালের হিসাব ১লা মে হইতে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ১১ মাসের হিসাব। তাহার পর হইতে এধাবৎ সরকারী বৎসর ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ করিয়া ৩১শে মার্চ শেষ করা হয়।

॥ বিবিসার্ গান ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(নতুন প্রকাশের পাঁচ দ্বিবার্ষিক বহুসংখ্যক প্রকাশিত আশুটীও এইসকল পুনর্মুদ্রিত হইল। — লন্ডন, ১৮৮৫।)

আজও সবজমিন ঘুরে ঘুরে কোন ফল হোল না।
অশ্রুশীর্ণ ক্রান্তি আর অসমাপ্ত। প্রাইভেট ইষ্টমনি সবকিছু
যুব যে একটা মোহ আছে এমন নয়, বরং তার উল্টুই,
কিছু উপাস্যবরও হো নেই।

হিহ অনেককালি দূর। কাল এইসময় বসল ফেরে,
একজামদার একটা অংশ নিতে গিয়েছিল তাই পথটা
খেয়াল হয়নি। আজ মোড়োতে এসেই আশাতক, গৃহস্থানী
নিয়োগ করবার যা বর্ত বিলেন তার শেষেরটা কানেক মধ্য
বেন পায়েরী হয়ে বসে গেছে, এখনও গ্যাটা গিরগির করে
উঠছে। মনিরে মানিয়েই বলবার অবশ্য চোটা করলেন—
“আর কিছু নয়...বাফার—সেটা অবশি চাকরটাই কহে...
তবে নেহাত যদি কোনদিন গরহাজির হোল...তব না বড়
একটা, তবে...ঐক্যব যদি...”

“তাহলে এটা বাসন-কোসনও হো থাকবে পড়ে?”

ওর বক্তব্যটা পুরোপুরি বেকবার আগে উত্তরটা যে দিবে
ফেলতে পেরেছিল এই সারন নিবে বেঁচে আছে তড়িৎ।
প্রশ্নেই ঐ প্রশ্ন দাঙ, তারপর অবসর মন নিয়ে আরও
পাঁচটা জতগাদ ইষ্টমনির সন্ধান নিরে বেড়ানো, যা যেন
আর উঠতে চাইছে না।

সামনে একটা বিপদ আসছে। বাঁচির উন্নীচু গাভা
দিতে বিকশার অংক—চিহ্নোতেই শরীফটাবেন আরও ভারী
হয়ে আসে। কখনো কি কখনো না এই জাবনার নাকই
আপনি-আপনি যেন একটা বফা হয়ে গেল, পকেটে হাত
দিতে শব্দ-প্রেক্ষাগি বা আছে গুণতে লাগল। বরফার
ছিল না; নিরে বেরিয়েছিল চাআনা, বন করে দেবার কল
তবাব প্রবিসি পান বেতে হয়েছে, বাকি পড়ে আছে পাঁচ
আনা। জানাই। বিকশাটা যে গড়ানের মুখ, গা করে
বেরিয়ে গেল চিহ্নাব করতে-না-করতে, বৈলে ডান্ডলে
হোত।

এক এক সময় বনকেও ছেলে-ওলাতে তব; তাই
গোহরয় পুরল তড়িৎ। চড়াই হৈলে উঠতে লাগল।

একটা বাড়ির বক, বাহাণ ধার থেকেই উঠেছে। মনে
হত বাহাণীর বাড়ি যেন। হ্যা, তাই; ছেলেমেয়েদের
গলা গোনা থাকে। জাত-উটটার, সে গলায় বহল চিনে
নেহা...অত্যাচার যেন সত্যবা চাক-ছাকী, দেখেও নাকি
একবার চোটা করে? তাহলে কি আগে বরফটাও একটা
কিহিয়ে নিরে।

এগিয়ে বাড়িল, নজর পড়ল চড়াই হৈলে একটা বিকশা
উঠে আসছে। ঘুরে বাঁড়াল। প্রশ্ন করল—“হিহ বাবি?”
ঘাবে বিকশাওলা।

“কত দিবি?”

এখান থেকে কিছুই মল আনা। পাছে অগ্রপঞ্চাৎ
চিহ্না এসে পড়ে সেট ভাঙে যেন তড়িৎ চোলে বসল
বিকশাটা; বলল—“চল।”

তারপর অগ্রপঞ্চাৎ চিহ্না করতে লাগল। না, পুঁজি-
ভাঙা আর চলবে না। হাতের মাত্র শতেরোটি টাকা আছে,
তার মধ্যে বাকি ন-পাকের মধ্যে। ঐরা বাড়িতে ছেলে
পড়িয়েছিল, বহীজবাবু, যুব হিসাবী লোক তিনি। চহাৎ
বদলি হয়ে যেতে হোল। আটদিনের ভাড়া বাস দিখে
বাকিটা বাড়িওয়ালাকে দিখে গেছেন, তড়িৎতের সঙ্গে
মোকাবিলা করেই; বাকিটা সে মাসের শেষে দিখে দেবে।
তার পর পুরো ভাড়া দিখে থাকতে পারে-না-পারে সে তার
নিজের জাবনা। সতেরো থেকে দশ গেলে বাকি থাকে
মাত্র। ভতে হাত বিলে আজ বিবিশা-চড়ার আংক
একদিন উপবাসের জুর্গোগে রূপান্তরিত হবে। পকেটে
যে কটা শব্দ আছে, তাইতেই বা হয়।

তবু একবার চোটা করল। বলল—“হ্যাঁয়ে, হিহুহ তো
অত ভাড়া নয়; তবে তুই অত চাইছিস কেন?”

অমু একবার চোটা করা, বৈলে বিকশা ঝাঁচিতে এসে
চড়ল কবে সে, ভাড়ার বহর রাখবে? বিকশাওলা জানাল
—তবু ইউনিয়ান যে হারে দূর শফরে ‘ইস্টিশাল’ হেট
বৈলে দিচ্ছে সেটা চাও করনি। আশায় মনে মনে

হিসাব চলতে লাগল। একই পরে—কথাটা নূর দিয়ে বের করতে যেমন লক্ষ্য-লক্ষ্য করছে। তা এত লক্ষ্যটি বা কিসের? আখা-অঙ্ককার নির্জন পথ; আর বিকশাওলা, সে এমন কিসের সুইম!—তাও রয়েছে উল্টো দিকে মুখ ভিরিয়ে; বসেই কৌশল তড়িং—“তুই বরং এক কাজ কর—ছ’আনার বেখান পর্যন্ত নিয়ে বেতে পারবি সেইখানে দিয়ে আখার নামিয়ে দে। কতখানি হবে?”

বিকশাওলা জানাল—নদীর এপার পর্যন্ত যেতে পারে।

তাহলে তো হিহু আর বেশি দূর থাকে না। বেশ হেঁটে ভটুহু গায়ে বেগলতে পারবে, ততক্ষণ বেশ খানিকটা বিশ্রামও পাবে তো। বলে আখার পুত্রিয় হিসাব করতে লাগল—পকেটে যেটা রয়েছে। এবার লক্ষ্যটা আরও বেশি করে জোপে আসছে, তবু চোখকান মুখে বসেই ফেলল—“তুই বরং এক কাজ কর, চার আনা পর্যন্ত বড়টুহু নিয়ে বেতে পারবি ততটুহু নিয়ে চল।... তোকে বাতিয়ে আর বেশি ঘোরাতে চাই না।”

বিকশাওলা এবার চুপ করে রইল। ওর নীরবতার জন্মেই আরও বেড়ে-গেল লক্ষ্যটা। কী মনে করল গোষ্ঠা? হু’ শাসানো বাতী পেয়েছে তো, পরশা বাঁচাবার জন্তে অর্ধেকেরও বেশি পথ ধেঁটে দিতে চায়! অপ্রতিভ হয়ে অক্সমনক হয়ে গেছে, হু’ন হোল নদীর গড়ানের সাননে এসে; ব্যস্ত হয়েই বলে উঠল—“একি, তুই তো নদীর ধারেই এনে ফেলেচিস! ঠাঁড়া—নাহি।”

ঠাঁড়াল না বিকশাওলা, গড়ানের মুখে বিকশা নামিয়ে দিয়ে বলল—“চল, তুরে হিহুতেই পৌঁছাবা দি।”

আপত্তি করল আখার, কিন্তু তখন বিকশা গড়গড়িয়ে নেমে চলেছে, হাফে মাকে ত্রেকের চাপ দিয়ে সংঘত করে রাখা। এক ধরনের বসিই অল্পতব করছে তড়িং, দেই যে একটা হীন গৈরজের ডাব এসে পড়েছিল, সেটা বাটিয়ে বেওয়ার একটা হুযোগ। একই সরাঙ্গ কণ্ঠেই অবহেলার ডাবে বলল—“তা চল নিয়ে। গরীব মানুষ লোকসানে পড়িস কেন? পুরো ভাড়াই নিয়ে নিস।”

ছোট্ট গাঁকোটা পেরিয়ে বিকশা চড়াইয়ে মাথা তুলল। প্যাডেলে চাপ দিয়ে বিকশাওলা বলল—“দশ আনা দিবি কেনে? চার আনাই দিবি; তুরে পৌঁছাবে হিহু।”

“তা কি হু? গরীব মানুষ আছিস...”

“হ, আছি। গরীব না বোঝে বিদকা টানব কেনে? তা আজ তো গরীখটি নয়। তুর বাপ-মায়ের আশীর্বাদে ভালো রোজগার করলাম—বাড়ি পাঁচ টাকা কামালাম,—চল, তুরে দিয়ে” আদি। উ চার আনাও রাখা দিবি।”

“তা কি হু? তবে নেমে হাট আদি। তোর বেতনতের পরশা...”

চড়াইয়ের মুখে পায়ের চাপে প্যাডেলের চেনটা ধটপট করে পিছলে-পিছলে যাচ্ছে। বিকশাওলা চাপা নিশ্বাসের মধ্যেই বলল—“তুর জন্তে আর আগাদা বেতনত কুখার চোল?”

“তার মানে?”

“ইদিকেই তো আসছিগুরু। বিদকা জন্ম সিন্তে হবে না?”

“জন্ম বেওয়া মানে? তোর নিজের নয়?”

“নিজের কুখা থেকে পাব যে, গরীব মানুষ। আটটা থেকে আটটা বাত। ছ’টাকা ভাড়া, হিহুর আগে অদিল যোবের হুকান, তুরে নামায়ে এসে জন্ম দিয়ে সের্ব—এই তুর বিদকা, এই তুর ভাড়া—কুখাই এখন খালাস।...তু পরশা না দিবি। আজ আমি আর গরীব কুখার?”

হঠাৎ একই অক্সমনক হয়ে গেছে তড়িং, সাক্ষিত্রভাণে বলল—“আজ চল, সে সের্বা যাবে পৌঁছে।”

হঠাৎ একটা নৃতন ভিত্তার কোয়ার এসেছে। এট বিকশাওলা, নামটা বল কুখাই, আজ আটটা থেকে আটটার মধ্যে যাড়ে পাঁচটা টাকা উপার্জন করল! তড়িং, ও-সমগতা পরশা বেওয়াবেই, তাহলে ছ’টাকার ওপরেও আরও হু’গতা। খাধীন বৃত্তি, কাকর গোলাম নয়, কাকর বাতক নয়। কাকর মুখ-প্রত্যক্ষী নয়; বরং উল্টো বলাভতা করবার অধিকার অর্জন করেছে; বলল—চার আনাও এই যাবে। অসক্ত দেবে করণাবলে আরও উলার হু’র উঠল—“উ চার আনাও রাখা দিবি”।

প্রাণী না হয়েও প্রাণীর লক্ষ্য, প্রাণীর হীনতাটা অলপ অলপ করছে তড়িং—তার শাশুই কিন্তু বিকশাওলায় বুকের গোরবটাও নিজের বুক যেন করছে অল্পতব; অতবড় একটা কথা বলতে পারা অমন বরাজ গলায়!

চড়াই-উতরাইয়ের চেউ ভেঙে এগিয়ে চলেছে। পিঠের ওপর একটা ছেঁড়া গেছি; ভালোরকমই ছেঁড়া, তার বড় বড় ফাটলের মধ্যে দিয়ে ওর কাদো কুচকুচে গায়েদ খানিকটা খানিকটা যাচ্ছে দেখা। যাবে ভেঙা পিঠের পাঁজরায় মাসুলুলা চিকচিক করে পাকিয়ে উঠছে। একটা অপরূপ ছক, সারা অক ছুড়ে খাধীন মুক্ত আনন্দের বুতাহুখ। তড়িঙের মনেও লোলা দিচ্ছে, চোপ কেরাভে পারছে না।

গল্প আরম্ভ করে দিল তড়িং, জীবন-মুখে জন্ম এইরকম একজন পুরুষের অন্তরঙ্গতা লাভ করতে ইচ্ছা হচ্ছে।

আদিবাসী, বাড়ি মানচুম জেলায়—পঞ্চকোট শাহাড়
কানে তো তড়িৎ?—তার নীচে মঙ্গলটি বলে একটা
আমের। কিছু ক্ষেত আছে, বেশিটুকুই যমাকনের কাছে
বাঁধা পড়ে গিয়েছিল, তাই বোজগারের ক্ষত্র বেড়িয়ে পড়ে:
মান-ছয়েক হোল। প্রায় সবটুকুই ছাড়িয়ে এনেছে,
বড় ভাই দেখাশোনা করে, তার কাছে টাকা শাঠায়।

“তাহলে কিরে যাবে নাকি এবার?”—তড়িৎ প্রশ্ন
করে।

একটা ছোট চড়াইয়ের মুখে প্যাভেলের ওপর জোরে
চাপ দিল কপাট। গায়ে গুলোটা পাশের শোস্টের
আলোর চকচক করে উঠল; বলল—“না, আর কে যাবে
রে? বোজগার ছাইছে। অধিলবাবুর শারা হুকান করব।
উ-ও তো এমনি রিসকা ঠেলেছে, আজ পনেখোখান।
রিসকার মানিক—কি রিসকা তিনটাকা, হিসাব করে
কেন, না। আর কিরে যাবে কেন?”

অবশ্য হোক যে পাঁচ-সাতশত হাজে এমন নর—
অধিলবাবুর শাঠ্যের কন্ড হয়ে গেছে কখনও কখনও,
তবে কষ্ট রাখে না—কষ্ট হারানো তো; বেজবাব সময়
ওমুঠো টাকা খটুয়াতে রেখে নেয়।—যেমন কম পড়েছে
তেমনি আবার সাড়ে পাঁচটাকার ওপরও উঠে গেছে।
দুই শব্দে সবচেয়ে বেশি কাষিয়েছে বায়ো টাকা।

উৎসাহে মাথা ঘুরিয়ে একটা ভূগিয়েই দেয় কুবাই—
“হী রে, তবে বলছি কি হুক—যারা টাকা—একদিনের
বোজগার—ই হুখান। পারের জোর, আর কিছু না! হু
ভাবিস কি!”

অনেক কিছু ডাবছে তড়িৎ—মুখে একটা অস্তমনন
হাসি, তার অস্তরণে অনেক কথা; তার সবটাই টাকার কথা
নয়—টাকাটা বরং দৌণ, অধিল ঘোষ হয়ে-ওড়াটাও দৌণ।
মুখা কথা, বা সব-কিছুই ওপর—তা মর্যাদা, তা মুক্তি;
পৌরুষকে খীকার করে নিয়ে, অভিনবিত করে নিয়ে,
মেহের সঙ্গে মিডালি করে নিয়ে আবার বিশ্ব অধিধান।
কুবাই যেন মাহুবকে আঙ্গ নিচ্ছের সত্তো চিনিরে দিল।

এর পাশে আজকের সেই অভিজ্ঞতাটা ধরা থাক-না।

ছেলেমেয়েদের বিভ্রাসন করবে, কতবড় লম্বান, কতবড়
মর্যাদার কাজ; লোকটার কিছু বলতে মুখে একটু
‘আটকালা’ না যে, চাকরের অবর্তমানে বুলি বাঁধে করে
বাজার করে আনতে হবে!

কুবাই প্রশ্ন করল—এবার কোন দিকে যেতে হবে?

এতই অস্তমনন ছিল তড়িৎ যে মানিকটা এগিয়ে প্রস্ট।
আর একবার করতে হোল, তড়িৎ উত্তর করল—“কি

বলি?...ও! ঠ্যা...তোকে অতদূর যেতে হবে না।
আমার অধিলবাবুর ওখানেই নিচে চলে।”

কুবাই প্যাভেল খানিরে খুবে চাইল, নিশ্চিত প্রশ্ন
হোল—“অধিল ঘোষের উত্থানে? মিথ্যার ভুট কি
করবি?”

তড়িৎয়ের হাঁপ হোল, এরকম একটা প্রশ্ন হতে পারে।
প্রস্ট ছিল না, তাড়াহাড়িয়ে বা একটা ভূগিয়ে গেল তাই
বলে দিল—“কতা...মানে, একজন অধিল ঘোষকে
কানতাম, দেখব সেই কিনা।”

“ছাড়িয়ে এলুম যে তার গলিটা।”

“কতটা এসেছিল?...তা হোক গে, ফিরে চলে।”

“সিরলে, রিসকা জমা দিয়ে দিতে হবে। টাইম হয়ে
গেল কিনা।”

“তা কিরে দিবি? ভাড়া তোকে পুরোই যোব।”

কুবাই আর কিছু বলল না। রিসকা ঘুরিয়ে নিয়ে
অগ্রসর হোল। বোধহয় মনে মনে ভাবল, ও-চুত খাড়া
থেক তাড়াহাড়ি কোনখানে কেড়ে কেলাই ভালো।

হী

একটা আকাখাঁকা গলির মধ্যে দিয়ে মানিকটা ডেউয়ে
গিয়ে অধিল ঘোষের রিসকার আছা। সামনেটা এরকম
হোলও ডেউয়াটা বেশ ঠাণ্ডা। আর বিয়ে-হাজে কাষগার
একদিকে একটা টানা খোলার চালের ব্যাখা, তার এক-
পাশে একটা ছোট কারখানা, কিছু বেরামতের কাজ হাজে,
খান-তিনেক রিকশা ঠাঁড়িয়েও রয়েছে, বোধ হয় সস্তা
জমা খেওয়া। একজন একরঙা লুসি আর পাঁচাবি পরা
নারংমণী পোক তথারক করে বেড়াচ্ছিল, কুবাই রিকশাটা
সেখে তার দিকে এগিয়ে গেল, তড়িৎকে বলল—“হু-ও
আর।” কাছে গিয়ে খটুয়া থেক হুটো টাকা বের করে
হাতে দিয়ে বলল—“খাবুটি ছুর সাথে কথা বলবেক।”
তড়িৎকেও প্রশ্ন করল—“চেনা আছে তুর?”

খাড় নেড়ে তড়িৎ উত্তর করল—না, নেই। ঠাঁড়িয়েই
রইল। কুবাই অধিল ঘোষকে একটা সেলাম করে চলে
গেল।

“কোন রকম আর আছে আমার সঙ্গে?”—অধিল ঘোষ
প্রশ্ন করল।

তড়িৎয়ের উত্তরটা একটু অগোয়াই হোল; বলল—“না,
তেনব কিছু নয়।...রিসকার আসতে আসতে লোকটার
সঙ্গে আশনার সত্বে অনেক কথা হোল...তাই মনে হোল,
একবার দেখে আদি...”

কয়েক সেকেন্ড উত্তর দিকে নীরবতার পর শেষ বলল—
“টব্ব...আপনি রিকশা ডাডায় বাটান?”

“হ্যাঁ, বাটাই।”—কণাটা বলে একবার তড়িৎক
আগাগোড়া ভালো করে দেখে নিল, তারপর আবার প্রশ্ন
করল—“কেন?”

“তাহলে নিভুহ।”

“আপনি নিজে চালাবেন?”

“হ্যাঁ।”

“লাইসেন্স আছে?”

তড়িৎ একই ধতমত খেয়ে গেল। রিকশা চালাবার
অস্ত্রেও যে লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় এটা জানা ছিল না।
তবে অজ্ঞতাই কু প্রকাশ না করে বলল—“সে তো আপনিই
জোগাড় করে যাবেন।”

“শেখা আছে চালানো? অব্যাস আছে?”

আবার ধতমতই খেয়ে গেল তড়িৎ, উত্তরও একরকম যা
ছুরিয়ে গেল তাই দিয়ে নিল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে মুখের
দিকে—“সাইকেল চালানো জানা আছে ...”

অবিল যোষ এবার হেসে ফেলল; বলল—“তবে আর
কি? সে দুচ্চাকা, এ তো একটা ঢাকা বেশি, পড়বার ভয়
নেই, কি বলেন?...না, অত সহজ নয়। অব্যাস দরকার,
গায়ের জোহও দরকার, বীতিমতো...”

ওর শরীরের ওপর আর একবার দৃষ্টি ফুরিয়ে নিলে
বলল—“তা নহ আছে আপনার বানিকটা, কিম্ব...”

হঠাৎ প্রশ্ন করে বলল—“রাগ করে বাড়ি থেকে
পালিয়ে-টালিয়ে এসেছেন নাকি?”

তড়িৎ কণা ঘুরিয়ে একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে বলল—
“পালিয়ে আসতে বাব কেন?”

“তবে? হঠাৎ রিকশা চালাবার শৌক? পারবেন
কেন? ভদ্রঘরের ছেলে যেন হচ্ছে...”

“আপনিও তো ভদ্রঘরের ছেলেই...”

—বনটা অসোচ্চাল হয়ে রয়েছে বলেই কণাটা কেমন
যেন রুচুভাবে বেরিয়ে পড়ল; তখনই সামলে নিয়ে একটু
অপ্রতিভভাবে হেসেই বলল—“ওহ কাছে জনশায় কিনা,
আপনি নিজের চেষ্টাই এই করেই...যানে, গোড়ার এই
করেই কারবারটা ধাঁড় করিয়েছেন, তাই...”

“আপনি করেন কি? বাড়ি কোথায়?”

প্রথমটা এড়িয়ে দ্বিতীয় প্রশ্নটারই উত্তর দিল তড়িৎ—
“বধূমান জেলায়...একটা গ্রামে।”

“কতদিন এসেছেন এখানে?”

“ছ’মাস।”

“কি করেন?”

এবার একটিমাত্র প্রশ্ন, তাও পূনঃকৃত, আর এড়ানো
গেল না। আর অব্যক্তির প্রশ্ন বাজানোর দিকে গেল-ও না
তড়িৎ, বলে গেল—“পড়ি। সি-এ পাস করে বধূমান
থেকে চলে এসেছি, এখানে নাম লিখিয়েছি এম-এতে।
বাড়ির অবস্থা ভালো নয়তো, ইউশন হয়েছিলেন একটা,
ওদিকেও তাই করে পাস করি। তা উচ্চশিক্ষার হঠাৎ
দমলি হয়ে বাঙালীয় মুখকিলে পড়ে গেছি; তাই—”

“অন্ত টিউশন ধরুন না। একাজ আপনি পারবেন না।”

“পাচ্ছি না বে। এই তো তারই পোজের দূরে দূরে
বাসার কিচ্ছ।”

অবিল যোষ একটু চুপ করে ওপরদিকে চোখ তুলে
চেয়ে রইল, তার পর দৃষ্টি নামিয়ে বলল—“আমার দরকার
ছিল একজন টিউটার, পরবেন?”

তড়িৎ মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।
অবিল যোষ বলল—“হুবিধে করেই তো। কত শেতেন
লেনো?”

ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইল তড়িৎ, যেন প্রশ্ন
কোনদামা হয়ে আর উপার দেহতে পাচ্ছে না। চেয়েই
রইল একটু, তার পর মুখে করেকটা বিকারের রেখা কুটে
উঠল, তার সঙ্গে একটা কঠিনতাও; বলল—“খান, বাট।
...না, ইউশন আমি আর করব না।”

অবিল যোষ বলল—“স্বাম্। ছ’ঘণ্টা করে রিকশা
চালিয়ে পড়বেন কখন, কলজ যাবেন কখন?”

আবার একটু হতভয় হয়ে পড়ল তড়িৎ, প্রশ্ন করলে—
“ছ’ঘণ্টার কম পাওরা যায় না?”

“তার কমে রোজগার হবে কোথা থেকে? সকাল ছটা
থেকে বাগেটা, বাগেটা থেকে ছটা, আবার ছটা থেকে
বাত বাগেটা। বাগেটা ঘণ্টা করেও কেউ কেউ নেয়, যার
পায়ে শক্তি আছে, সে বেশি রোজগার করতে চায়।”

“আমার তো দে-রকম রোজগারের দরকার নেই, পড়ার
খরচটা টালিয়ে নেওয়া, কোনদামে একটু মাপা ভাঁজে
থেকে। যে রকম আশঙ্ক করছি, যদি আপনার ভাড়া
দিয়ে টাকা-পয়সার ঝুঁকো তাহলেই চলে যাবে আমার। এর
জন্তে ধরুন ঘণ্টা হু’আড়াই—মানে আমি যা আশঙ্ক করছি
আর কি; তার জন্তে কত নেবেন আপনি?”

“ঘণ্টা হু’একের জন্তে না-হয় আনা-আঠেইকই দিলেন,
কিম্ব ঐ দুটো টাকা কামাতে অস্ত্রত ঘণ্টা-চারেক সময় তো
লাগবেই, তাও রোজ যে পাবেনই এমন বলা যায় না।”

মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল—“তাঁই, বান্দি,

ও মতলব আশনি চান্ন। বা অথেন তাই স্বপ্ন, টিউশন, আখার এখানে না হয়, অস্ত্র কোথাও, আখিও চোরা দেখতে পারি। ...আখার কথা শুনেছেন, আখার তুমি বোকসার কথাই ছিল উদ্দেশ্য। আপনাত যে পড়াও রয়েছে সঙ্গে, তাও আখার বলছেন এম্-এ।”

তড়িং শুনে ব্যক্তি, কিন্তু ঘন এদিকে ছিল না, আগের কথার ক্ষেত্র ধরেই বলল—“চার ঘণ্টার জন্তেই দিন তাহলে...”

একই অপ্রতিভভাবে হেসে বলল—“চাটা থেকে নরকিষ, স্বপ্ন সাতটার পর, বেশ একই সা-চাকা হয়ে গেলে...”

অখিল ঘোষও হাসল : বলল—“আমি পিত্ত দিনের বেলাই চালান—সারা দিন, গা-চাকা দিয়ে নয়।”

তড়িং সেইরকম লক্ষিতভাবেই হেসে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করল—“দিনের বেলা যে আমার কলেজ...”

উভর পক্ষেই একই ধূপচাপ গেল। তারপর অখিল ঘোষ একই চিন্তা করতে করতে টেনে-টেনে বলল—“ওরকম সময় বেওয়ার একই অমরিতে আছে, যে-টাইম তো, আর চার ঘণ্টার জন্তে বেওয়া আরও অমরিতে, তিনটে নিফুট একরকম ভাগ করা আছে তো...কিন্তু তা হোক, ঘোষ আপনাতো।”

দৃষ্টিতে খানিকটা প্রশংসা নিয়ে তড়িংয়ের মুখের দিকে চেয়ে হইল। তড়িংয়ের দৃষ্টি লক্ষ্যে একই আনত হয়ে ‘পড়ল, তাই পর কিন্তু দুটো বেশ লোক্য করতে চলে পরল শে : বলল—“আপনার দ্বারা জন্ত দস্তাব, আজ খেন বজ্র বেশি নিগ্রাণ হয়ে পড়েছিল, মনে হচ্ছিল রাতি বোধহয় চড়াতেই হোল তাহলে।”

অখিল ঘোষ বলল—“এতে আর দ্বার কি আছে ? পড়তে চাইছেন, এটুই তো সাদি। লাকলে কবাই উচিত। বঃ আরও যদি কিছু করতে পারি যাতে সুবিধা হয় আপনাত...”

“লোড বাড়িয়েছেন ?”

“সে ভর দেই। ব্যবসায়ার বাস্তু্য তো, লোডের বাড়ানাকি দেখি, পেছিয়ে বাব।”

—কথাটা বসে একই হাসল। তড়িংও হেসেই বলল—“তাহলে সাহস করে বলতে পারি, এখন বলছেন বেশি ক্ষতি হবে দেবলে রাজী হবেন না। বলছিলেন, চার ঘণ্টার জন্তেই নোব, কিন্তু যদি কোনদিন তার আগেই ঐ পরলাটা পেয়ে যাই—ঐ হুটো টাকা—তো আমো আগেই কথা দিয়ে বাব বিকশ। ...পড়বার খানিকটা সময় পাওনা বার আর কি...”

অখিল ঘোষকে চিন্তিতভাবে চুপ করে থাকতে দেখে বলল—“অবশ, আপনাত বা পাওনা...”

উভর হোল—“আমি দেই শুটই করছিলাম। মতবড় বঃ দেখাকি বলছেন, আপনিত আবার উল্টেই কথা না দেখান।”

তড়িং একই ধাঁধা বেয়ে গিয়ে বলল—“বুকলাম না তো।”

“পাওনার বেশিই দিতে চাইছেন তো—সে সব দিনে অত পাওনা যে হবেই না।”

হেসে উঠল তড়িং : বলল—“তা বেশ, হিসেবযতো পাওনার চেয়ে কমই নেবেন সেদিন।”

একই বেয়ে বলল—“আমার সাদি কি এ-জন্মে দয়া দিবে আপনাত দয়া পোষ করি ? আপনি আক বা...”

চাপা দিয়ে বিল অখিল ঘোষ : বলল—“আগে দেবুন অত দ্বার ভাব সহিয়ে কিনা। ঐ বিকশাখানা দিন, আহুন আমাত সঙ্গে। চড়ে চালাতে পারবেন না, জ্বাওল খেইই নিয়ে আহুন...হু’দ্যতে।”

তারখানার পাশে টাকা জায়গাটা গ্র্যাকটন করবার জন্তেই ছোড়ে রাখা, একটা বড় চাকার দ্বারা বিকশার চাকার লাগ পড়ে গেছে। উঠে চালাতে গিয়ে কিন্তু তড়িংয়ের মুখ শুকিয়ে গেল, অখিল ঘোষের মুখের দিকে চেয়ে বিভ্র-ভাবে বলল—“এ-যে স্বপ্ননী বোকা একটা, অত জোরে চালার কি করে—এর ওপর আবার লোক নিধে ?”

উভর হোল—“এইজন্তেই তো বলেছিলাম—অত দ্বার বোকা সন্তেই পায়লে হয়। টের শেলেম তো, নেমে আহুন এবার।”

জ্বাওল বশে রাখাও আর হু’চাকার সাইকেলের যতোই চক্র, মনে হয় তিনটে তিন দিকে পাওনা করছে। তড়িং কিন্তু নাগল না। বুকল, জিনিগটা বখন এত চলছে, আর, তার চেয়ে দুর্বল লোককেও বখন হুইনিং চালিয়ে নিয়ে যেতে দেখছে বিভা—তখন ভেতরকার একমাত্র রহস্য নিক্তর অভ্যাস। বেশ, তাই-ই। জ্বাওল-রাতি, আর ঘণ্টাব্যেকের ধরে যেমনত করল, অবশ্য জিরিয়ে জিরিয়ে : আরও করত, একটা উৎসাহের কোয়ার এসে গেছে, অখিল ঘোষই বাগল করল, এটোতেই হাতে পায় বাখা যরবে।

হুটো দিন দিতে হোল বাব, তার পর কবে কবে সহজ হয়ে আগতে লাগল। প্রথমটা নিগ্রাণ্য করলেও, অখিল ঘোষ বালাদ্যা সাহাবাই করল। এখানে বড় হলে বাওচার পর রাজার বের করালো বিকশা, নিজে হইল বিকশা নিয়ে

আগে-আগে। প্রথমে নির্জন রাস্তা, তার পর অশেষাকৃত জনবহুল, তারপর বাজার। চলার নিয়ম-কানুন আয়ত্ত করিয়ে একেবারে শাকা হয়ে লাঠিসেল নেওয়াতে দিন-দুনেচো লাগল। তারপর নিজেই গাড়ি বেধে লেবন তড়িং। ওর প্রথম দিনের সপ্তাহটির হোল অবিল ঘোষ।

বেশ খানিকটা হালকা-ঘন হুঁকুম টাকিকের মধ্যে দিয়ে যোগাল, বাজারে নেবে কিছু কেনাকাটাও করল—কলের বোকারে, বাবারের বোকানে; তারপর কিরে গিরে রিকশা থেকে নেবে বলল—“এবার যা করছি সেটা কিন্তু অল্পভাবে নেবেন না, মোহাট।”

কিছু বুঝে ওঠবার আগেই পকেট থেকে দুটাকা আর একটা নোট বের করে লাড়িয়ে ধরল; বলল—“নিদ।”

তড়িং হুটকিরে গেল একেবারে, যেমনতে বুটা রাস্তা হয়ে উঠেছিলই, তার ওপরও একরকম রক্ত পড়ল ছড়িয়ে—নিম্ভর অশমানেই। অবিল ঘোষ ঠা হাতটা দিঠের ওপর রাখল; বলল—“না, বলেছিই তো অল্পভাবে নিতে পারবেন না। এটা শুভ-বটনি—ওকালতিতে আছে, ডাকারিতে আছে, গরুখ ব্যবসা বলে আমাদেবই না থাকবে না কেন?—এও তো দল-স্বাধী; তার স্বাধী এটা...”

প্রায় একসপ্তই দুটা বিকৃত অস্বস্থতির সংঘাতে—বিশেষ করে বোধহয় এই শেষের কথাটিতে তড়িতের হঠাৎ ঘনে হোল বেন চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসবে, তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে ডান হাতটা বাড়িয়ে বলল—“বিন।”

—মাথাধ ঠেকাল নোটটা, তারপর চঠাৎ মূণ হুলে তর্ক হুলল—“কিছু, এ তো আশনি আমাকেই হুঁবির আনতে গিয়েছিলেন, আমাঃই মার্কে; ডাড়া মোব কি বলে?”

অবিল ঘোষ বিস্ময়ের ডান কর্ণ বলল—“সে কি! বাজারে আমাঃ দরকার ছিল না?—কেনলেন আবার, কল এসব কিনলাম এক গালা!”

“দলিল পাকা করে রাখছেন, তা কে জানত বলুন”—বলে হাসতে হাসতে তড়িং নোটটা পকেটে রাখছিল, অবিল ঘোষ আবার বিস্ময়ের অভিনয় করে বলল—“তা বলে লবটা পকেটই করেন যে। বাঃ, আমাঃ পাওনা আট আনা কে দেবে?”

একটা হাসি উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা।

অবিল ঘোষ নিমন্ত্রণ করে বলল—হাত্রে ওর ওখানেই যেতে হবে আঃ। আগন্তুই করল তড়িং, কোন উপলক্ষ্য তো নেই, মিছামিছি...

বিশিষ্টই হোল অবিল; বলল—“উপলক্ষ্য নেই কি

মশাই! আতে হুললে তো পঙ্কতিভোজ ভেদ একটা, আতে মাধিরেই বা কোব না কেন? কতিপুলে বলেও তো একটা কথা আছে।”

ডিন

অল্পভাবেও সাধায্য করতে লাগল অবিল।

তড়িং যে তার এই নূতন কাজটা প্রচুরত্যা গিরে ঘিরে রাখতে চায় সেটা আগেই টের পেয়েছিল—বলন সে বলে, সাতটার পর পা-ঢাকা হয়ে এলে গাড়ি বের করতে চায়। অবিল একই দম্ব বা বাজাভাবে নিজের কথা বলেছিল,—সে যে কোন সূঠার বালাই না বেধে দিনের বেলাতেই সহরের বুকের ওপর দিবে চালিয়ে নিরে গেছে গাড়ি। তড়িং লক্ষিত হয়ে কথটা হুঁবিরেও নেত।

অবিল কিছু পরে জেবে বেশল ওর পক্ষে নিত্যন্তই স্বাভাবিক এই সূঠা। বসে কল, নূতন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছে, তিনটে পাস দিয়েছে এবং লকটাও সেই পথেই এগিয়ে বাঙা। এর ওপর নিজের নিজের প্রকৃতিও এসব বিষয়ে কাজ করে বড় বেশি, ছেলেরি লাভুক; এমন অবস্থায় ও-বে স্রমকে এতখানি পরম্ব মধালা দিতে পেরেছে আশাতত এই বখেই ওর পক্ষে। বেতাবেই হোক, টুইপনের সোড চেড়েই তো রোজগারের এই পমটা নিলে বেছে। অবিল অল্পভাবেও হুঁবিনা করে দিল ওর।

সূঠাটা নিশ্চয়ই বাঙালী সম্বন্ধেই বেশি। অবিল ওদিকটার সম্ভাবনটা কবিরে নিয়ে এল। অল্প সময়ের মধ্যে নিগমিত রোজগারটুকুও হয়ে গেল ডালো, ও মাসিক ব্যবস্থার একজন বন্ধের জোগাড় করে দিল হাড় লাটটা থেকে আটটা পরম্ব নিয়ে বাবে প্রত্যাহ, আর বঁটা আকাশ থেকে আবার নিয়ে আসা, মাসকাবারে চল্লিশ টাঙ্গা ডাড়া। বলল—চেষ্টাও আছে, এমপর ঐ পথে বেতেই যদি হুঁবিনা-মতো আর একটা জোগাড় করে ফেলতে পারে তো ঐয়া সময়ের মধ্যে ঐ প্রয়োজনীয় ডাড়ার কিছু বেশিই হয়তো এসে বেতে পারে।

ব্যবস্থাইকু অবনিই হোল না, কিছু গজা লাগল অবিলের। বকেমটি অল্প এক রিকশাওলার হাতে ছিল, তার কাছ থেকে নিতে বৈনিক পাওনার থেকে বেশ খানিকটা ছাড়তে হোল অবিলকে। সেেকটা বোধহয়, গড়পড়তা বেশিই কাহিরে নেবে ঐ সময়টার, তবু একটা নিশ্চিত আয়ের ঐয়া বন্ধের ছেড়ে দিতে হোল তো। তড়িতের একটা ব্যক্তিই হুঁবিনা এই হোল যে, সহরের বাইরের দিকে বাঙাচায় বাঙালী বা পরিচিত অল্প কাকর

সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাই আরও এল কমে। একটানা পূর্বের সম্বর, প্রথমটো বেশ কষ্টই হোত, তারপর ক্রমে ক্রমে সেটাই এল সরে। গড়েগঠি বিজাতী, বেশ অবদমণের এবং ভক্ত : সাধারণত একমুঠি ঘান, কোনদিন যদি কাউকে সঙ্গে নিলেন বা বেশি সময় হয়ে গেলেন তো তার ক্ষত নিক্ষেপ হতেই জায়ে পড়ে ঘেন পুথিয়ে। মালকাবাড়ী ব্যবস্থা হ'লেও একবার বলাতেই দিনের দিন জড়টা চুকিয়ে দিতে লাগলেন। বেশ চকতে লাগল। বাধা সম্বোধিত ওপর আর ধানিকটা খাটলে অটু অমনা, দল অনা, কোনদিন বা এক টাকা পর্যন্ত এসে যায়।

বেশ চলা মানে অদূরের অস্বস্তিকতা। কিন্তু অদূরকে তো দেখা যায় না : তা না থাক, কিন্তু এটা তো পাঠ বে অষ্ট ঘান তার একেবারে অবিলম্বে। ঘনটী কৃতজ্ঞতার চান্দন করতে থাকে, কিন্তু প্রকাশের তো উপায় বুঝে পাওয়া যায় না। একদিন বৈক্যযোগে আছটা বেশ ভালো-দুশক চক্কার আবেগের বশেই শ্যাকনার চেয়ে কিছু বেশি দিতে গিয়ে অস্বস্তি হয়ে পড়ছিল। কিন্তু মুক্তি দিক করে রেখেছিল—কেনন অবিলম্বেই দিক করে সেওয়া বন্ধের : ভুলোকে বেদিন দুজনে মিলে যাওয়ার এবং বেশিখন থাকে টাকাতিনের কেন—কিন, বেশি বেওয়ার কথাটা ভুলতেই অবিল এঘন একটা নিষিদ্ধ গভীর ডাব দেখাল যে, একটা মুক্তির কথাও বুঝ দিয়ে বের করতে পারল না তড়িৎ। অস্বস্তি হয়ে পড়ল, যেন একটা অথবা অস্বস্তি দেখাতে গিয়ে অস্বস্তি করে বসেছে। কিন্তু কৃতজ্ঞতা তিনিশটা মনের একটা উত্তাপ, তাকে চেপে রাখা যায় না, চাপা থাকলে অশান্তিরই করে হুটি। সেই ভাবেই চলছিল, এমন সময় একদিন একটা বাগপার হোল।

বেচারী ভুলোকটির ওখানে উপস্থিত হওয়ার সময়টি তড়িৎ ঘড়ির কাটার কাটার ঠিক রেখে যায়, তিনিও একে-বারে প্রস্তুত থাকেন, এ শৌখিনেই গিয়ে রিকশায় ওঠেন। বেশিদিন গিয়ে দেখে—বৈক্যখানায় কয়েকজনের সঙ্গে গল্প করছেন, গারে গেছি, গারে চুটি। ওকে দেখেই চেতরে চলে গেলেন এবং একটু পরে সেই ভাবেই বেশিরে এসে ওর কাছে হাতটা দিয়ে বসলেন—“একটু এদিকে আসুন।”

বারাক্ষা থেকে নেবে একশালি সবুজ ঘাসের লন।

ভক্তিরে কাঁধে সেইরকম ভাবেই হাত দিয়ে বৈক্যখানায় সরজা থেকে একটু আড়ালে নিবে গিয়ে বসলেন—“আজ আমার বাড়ি থেকে হ'লন আতীর এসেছেন, তাঁদের নিয়ে হুপুবোলাই আমি হয়ে এসেছি।...আপনি আপনার প্রাণ্য ভাড়াটা নিন এই।”

তড়িৎ বিদ্রিষ্ট হয়ে বলল—“আপনি বাবেন না, অথচ আমি ভাড়া নোব।”

“আপনার তো কতি হোল।”

“কতি কিসের ? সময়টা তো হাতেই রইল, কানিয়ে নোব আমি।”

“নাও পেতে পারেন ভাড়া...”

“তেননি বেশিও পেয়ে যেতে পারি। সেটা চালের, কথা, কিন্তু না গিরেও ভাড়াটা নেওয়ার তো কোন মুক্তি থাকি না বুঝে।”

ভুলোকে যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন : সেইকাজেই হালকাভাবে একটু হেসে বললেন—“মুক্তি বখেই আছে, আপনি যদি এখন বুঝে না পান। আগেও ওরকম হয়েছে হ'একবার, গিরে গিরেছি ভাড়া, আপনি করিনি।”

তড়িৎ হেসে ফেলল অস্বস্তি মুক্তির : বলল—“তারের উদারতার প্রশসা করছি, কিন্তু অস্বস্তির করতে পারব না, থাক কবনেন। তবে আপনার এই উদারতার জন্যে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ : কিন্তু নিই কি করে বসুন ?”

ভুলোকে আবার বিব্রতভাবে মাথা ঘুরিয়ে চারিদিক চেয়ে নিলেন, তারপর হঠাৎ যেন একটা ভালো মুক্তি পেয়ে গেছেন এইভাবে বললেন—“কেন, এই দেখুন, আপনি একটা পথ তো দিছিদিছিই এসেন, গিরে বাবেন যদি গাড়ি নিয়ে...”

“আমি আসবার সময় গেলে সওয়ারী তুলে নিই, আজ পাঠনি : যাওয়ার সময় চেটা করব, পেয়েও যেতে পারি।...তবু বেশ, আপনি যখন জির করছেন, এই ভাড়াটা আমি নিতে পারি : চার আনা আর চার আনা—আট আনা।”

ভুলোকে একটু হুপ করে হইলেন, ভাড়াটা বেওয়ার জন্যে জান হাতটা গিরিয়ে নিয়েছিলেন, আবার কাঁধে ওপর রেখে বসলেন—“আপনি নিবু সময়টা, আমার অস্বস্তি। আমি বুঝি কেন নিতে চাইছেন না, মনে করছেন অস্বস্তি দেখাছি, অস্বস্তির পছন্দ কেন নেবেন। কিন্তু বিবাস করুন, অস্বস্তি পাটোই বর। আমার আতীরের এটা কঠিন পীড়া, ও সময়ের কাকর মনে এতটুকু নিরাশার ছায়া পর্যন্ত পড়ে এটা আমি চাই না, মনে হয় তাতে ওর অস্বস্তি হবে...”

“কিন্তু আমার তো কোন নিরাশাই নেই এতে...”

“বুঝি।...কিন্তু আমার মনেও এই ভেবে যদি একটা বৃত্তান্তনি...”

গিরে হাতটা একটু বেশি দিলেন, গলাটাও হঠাৎ জারী হয়ে উঠল। তড়িৎ তাড়াহুড়ি হাতটা বাড়িয়ে দিল ;

বলল—“দিন। আমি তাঁর কল্যাণের জন্তে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব।...হয়েই যাবেন ভালোতিনি, ভাববেন না।”

কে কার আত্মর কথা জোর করে বলতে পারে? তবু যখন পূর্ণিমে কথাটা মূহ দিয়ে গেল বেরিয়ে। বেতলও যেন একটা বিবালের মধ্যে থেকেই। রিকশা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল। কোয়ান্ডারিটি, পিও-চালা গ্রায় নির্জন রাস্তার ভগ্ন দিগে আছে আছে চালিয়ে নিয়ে চলল রিকশাটা, কতকটা যেন আগুনি বয়ে যাওয়া, মনটা যে কোথায় উঠে গেছে, কত উচুতে,—দেহের প্রাণসে আবার যেন নিচে নেমে না আসে।...

“ভাড়া বাবে?...”

পাশেই একজন পথিকের প্রশ্ন। সামনে পথটা ঢালু; উত্তর-প্রান্তরে আছে এই ব্লুইড ভাবাবেশটুকু, বায় ঘিলিয়ে, সেইজন্য কিছু না বলে গ্যাডলে একটা চাপ দিয়ে নত্বোরে নেমে গেল তড়িৎ।

কিছু একটা করতে ইচ্ছা করছে, সাধাস্তও হয় তো, কতি নেই—বাহুবের লজ্জটুকুই বা সাধ, কিন্তু এইরকম যেন মনঃ হয়।...সে যে শেষ পূর্ণিমা বিবেকের জিদ ধরে বইল না, নিল ভাড়াটা, এতে চমৎকার একটি আত্মপ্রসঙ্গ অমুভব করছে। এটা ঠিক বেওয়া হোল না তো, ভ্যাগই।... বতুটুকু ভ্যাগ পারল করতে।

কিছু একটা করতে ইচ্ছা করছে, সব লজ হলোই ভালো; যখন একটা বোকা নেমে যায় যেন তাকলে।

কিছু করার ইচ্ছা থেকেই যেন পড়ল—যেটুকু করার পেটুকুও যে করা হয়নি। অবিগম্যতার (এ-সম্বন্ধটা অনেকদিনই পাতিয়ে নিরেছে) এত দয়াব কী প্রতিদান দিতে গেরেছে সে?

কী ভাবেই বা পারবে?...এই চিন্তাটা নিয়েই ‘আজ্ঞে আজ্ঞে এগিয়ে চলল, পারের ঝোর দিতে গিয়ে চিন্তার ঘুরটা না বাধ ছিঁড়ে।...তারপর একসময় যেন হোল উপায় যেন একটা থাকতেও পারে। সহরের এদিকে এসে পড়েছে, হিন্সর পথে। গ্যাডলে চাপ দিল তড়িৎ। সম্বন্ধটা দ্ব্যর্থবীন থেকে একেবারে অতিবিক্ত মূল্যবান হয়ে উঠেছে, আর একমুহূর্তও অশচয় করা চলে না। যাকে যাতে পথিকদের প্রশ্ন ঝালি গাড়ি বেখে—“ভাড়া বাবে?” কাটকে দিল উত্তর, কাটকে বা দিল না; উহু-নীচু হাতার দোল বেতে বেতে একেবারে অবিগম্যতার রিকশার আচ্ছাদ দিয়ে গাড়ি বায়াল। একটা হাতখড়ি রাখে, পথেই, পথের দিকে একবার হাতটা উলটে দেখল, সবসময় যাক চলি পথিনিট নই হয়েছে।

অবিলম্বের বাড়িটা রিকশার আচ্ছাদে পাশ্চাত্য, ডাকা থে জমিটা বরোতে তার অপর দিকে ৯০° বাসের ভগ্ন চরে গেল ঢালায়ে রিকশা কিন্তু বারো-তিনের পেনি বায়নি। যাওয়ার দরকারও হয় না, লাভুক প্রকৃতির বলে চাহও না অথবা মাথামাথি করতে। বারো-তিনের গিয়েছিল তা নিমন্ত্রণ বন্ধ। করবে, এগারের সেই রিকশা-চালানো শুরু করবার দিন, তারপর চট্টা কী পূজা উপলক্ষে। গিয়ে বাড়ী নীচু করে গেছে চলে এসেছে। অবিলম্বের বাড়িতে গর বিপদা যা, একটি বোন, স্ত্রী, হুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। বড় ছেলেটি লামনের বন্ধুর ম্যাট্রিকুলেশন দেবে, ছোট হুটি নীচু ফ্রান্সে পড়ে। এদের মধ্যে অলোশ হয়েচে, খেতে গিয়ে ঠাইয়ে বলবার আল, তারপর রিকশার আচ্ছাদও দেখা হয় মাঝে মাঝে।

আজ গদের বাড়ি বাবে। তার পর—বা তেবে ট্রিক করছে, আর জন্ত ভাড়াভাড়ি এসেছে চুট। আজ তার সুবিধা না শাব, অতদিন হবে, কিন্তু যাবে আজ, আসা-যাওয়াটা আরম্ভ করে দেবে। জড়তাটাকে সহ্যবে, অমুভব করছে এই ট্র’মাস্টে যেন আজ্ঞে আজ্ঞে অনেকটা কবে এসেছে। ও জিনিসটা যেন বইয়ে-মুখ-পোঁজা চাড়াবের সম্পত্তি, পাঁচজননের সঙ্গে মেলামেলা করে যাদের চালাতে হয় তাদের কাছে জমতে পার না।

একটা সুবিধাও হয়ে গেল আজ। অবিল কারখানার নেই, “কোথায় বেরিয়েছে। তাকে রিকশা ক্রিয়ারে দিয়ে ভাড়াটা দিতে হবে। তার ব্যবস্থা অবশ্য হতে পারে, অল্প কয়েকবার হয়েছেও, কিন্তু আজ এই অমুপস্থিতির সুযোগটা কাজে লাগল। রিকশাটা কারখানার যন্ত্রীর কাছে জমা দিয়ে তড়িৎ সোজা অবিলম্বের বাড়িতে গিয়ে উঠল। বারাক্ষর উঠে ডাকল—“অবিলম্ব! বাড়ি আছেন?”

ছেলে-মেয়ে তিনটি বেরিয়ে এল। বড়টি বলল—“বাবা তো বাড়িতে নেই, বেরিয়েছেন।”

“কোথায় গেছেন?...নিরবধন কখন বলে গেছেন?”

“রিকশার পার্টস কিনতে গেছেন।”

“তবেই তো!...একটা কাজ ছিল।”—চিন্তিতভাবে

একবার মাথাটা ঘুরিয়ে নিল চারিদিকে।

ছেলেটি বলল—“বহন না, গেছেন অনেকক্ষণ বাবা। নিগ’গিরই কিরতে পাতেন।”

মেয়েটির সঙ্গে একটু বেশি মেলামেলা আছে, কারখানায় বেশি যায়। এগিয়ে এসে ডান হাতটা ধরে একটা টান দিয়ে বলল—“হ্যাঁ, আহুন। গল্প বলবেন। কখনও তো আসেন না।”

“তোমরা তো পড়ছ এখন।”

“বাবো! দ্বারা পড়ছে তুমিও বাড়ি কেউ আসে না।”

তড়িৎ হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে বাইরের ঘরে এসল।
টিক গল্প নয়, যে ধরনের কথাবার্তা আরম্ভ হয়েছিল সেট
ধরনেরই চলল কিছুক্ষণ। আসলনা কেন তড়িৎকালা?
ওর কথা প্রায়ই হয়—ঠিকানা বদলন, ছেলেটি বড় লাঞ্ছন
...একলা থাকে, ইচ্ছে তো করে নেমস্তর করি মাঝে মাঝে,
কিন্তু বা প্যাতের সঙ্গে বিশেষ থাকে—বেন শান্তি একটা।।।

যেহেতু মোকো, যদিও বড়র চেয়ে বেশ মানিকটা ছোট।
ওই বকে বেশি, একই বেশি অন্তরঙ্গও তো। বড় ভাই
একটা অর্থ নিয়ে পড়ছে, মাঝে মাঝে ছাড় বেকিয়ে চোখ
তুলে খামতে ইসারা করছে বোনকে, তারই যমো ছোটটি
জার বেন থাকতে না গেলে অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলে উঠল—
“আর রতি-দিসিয়া, দিসি...চাকার তড়িৎকালাকে সেই
হিসাব-চালোনো দেখে, হেসে...”

বড় ভাইকে এবার বেশ সোজা হয়ে ছাড় তুলেই চোখের
ইসারা করতে হোল। এই সময় ভেতর থেকে ডাকও পড়ল
ওদের হৃদয়ের—“অলক, কবি—ভেতরে এসো তোমরা,
বা ডাকছেন তোমাদের।”

ওরা চলে যেতে তড়িৎ বড় ছেসেটির দিকে ঘুরে চাইল।
প্রশ্ন করল—“অচ্ছটা শক্ত নাকি বিদল? অনেকক্ষণ থেকে
বলে হয়েছ যে?”

বিদল ছাড় তুলে একই হাসল; বলল—“শক্তই।
সকালবেলা মাস্টারমশাই অনেকক্ষণ চোঁট করলেন।
...দেখছি একই আবার।”

“সেহি।” বলে বাতাতা টেনে নিল তড়িৎ।

এইজন্মে এসেছে আদ। উটটারটি আই—এন্ডির
ছাত্র, কেন যে যনের মতো বর, সোজাছবি না বিগোল
করেও কবে টের পেয়েছিল তড়িৎ; কতকটা ঐ কারণেই
গ্যাংঘুয়েট কেনে অখিল সেবিন তড়িৎকে হুইশনি বেওয়ার
কথা বলেছিল। তড়িৎ টিক করেছে মাঝে মাঝে এইরকম
একটা ছুতানাতা করে এসে বসে ওদিকে যে জটিল হুই
সেটা হৃদয়ে বেওয়ার চোঁট করবে। এই করেই ও
অখিলের ঐতিহ্য জর সাধারণতো পরিশোধ করে করে যাবে;
যতটা পারে। এইজন্মেই আদ বৈশ্বকর্মে যে সময়টুকু বেঁচে
গেল সেটা তো বোঝাবারো দাশালই না, বাকী সময়টুকুও
নিল এই দিকেই টেনে।

বেশ একটু নতুন ধরনের আনন্দ পাচ্ছে। এইসার
থেকে ঐরকম করবে মাঝে মাঝে।

ও অচ্ছটা শেষ করে আরও মোটা হুই করিয়ে নিল।

তার পর আর কোন্ কোন্ পারা বিধয়ে আটকার জিগোস
করে নিয়ে ইয়াকীর গড়াটা দেখছিল, এমন সময় একটা বড়
প্যাংকেট বগলে করে অখিল এসে পৌঁছল।

একই বিমিত হুইটে প্রশ্ন করল—“তড়িৎয়ের আদ এত
সকাল-সকাল বে? শরীর খারাপ নাকি?”

তড়িৎ কারপটা বলল; অবশ্য আসল কারণটা নয়।।।
থঙ্কের কথাটাও নয়।।।টাকাটা আদ অল্প সময়ের মধ্যেই
এল উঠে, তাবল বাড়ি জিরে ছাওয়া বাক তাহলে—বট
নিয়ে বলা যাবে বরং। ওর ভাড়াটালিখে বাবার মতো বলে
আছে।

“কতক্ষণ?”—জিগোস করল অখিল।

“এই আধঘণ্টাটুকু...”

বিদল বলল—“তার চেয়েও বেশি, তিনটে অধ
কমলুম; প্রায় ঘণ্টাখানেক...”

“অত হবে?”—একরকম কথাটা চাপা দেওয়ার অচ্ছ
পকেট থেকে একটা টাকা বের করে বলল—“এই নিন।”

ব্যাপ থেকে আট আনা পরমা বের করতে-করতে
অখিল বলল—“সেখো তো, আর আদই দেবি করে কেলদার
মানি। তা, হুনি তো ওটা কাটকে দিরে চলে বেতে
পারতে।”

বিদলকে বলল—“একটু চা বিরিয়েছিলে কাকাক?...
মনে তো হুইছে না, সে হুই আছে? ...তিনটে অধ কবিরে
নিলুম! ...একটু বসবে তড়িৎ হুনি”—বলে ভেতরে চলে
গেল।

৪৪

উচ্ছেদটা বোধহয় সন্দেহ করে থাকবে অখিল, তবে
কিছু বল না, কেনন যেন মনে হোল, ছেলেমানুষ, পরিবার
থেকে বিচ্ছিন্ন, হয়তো পারিবারিক স্পর্শ চায় একটু, ইকে
দিলে না-আসতে পারে; তাতে এইকু থেকে বক্তিতই করা
হবে।।।...এ অল্পমান যদি নাও হয় সত্য তো, বাতানীও
ছেলে, লং আসে ছাদ, মোলামো করে এটা চারই অখিল।
কিছু বল না ওকে এখনটা। তুঁ বাড়িতে বলে বিল।
তাহপর যখন আসে তিন-চারদিন থেকে সন্ধ্যাে প্রায়
নিঃশব্দভাবে হুঁদিনে এসে ঠাণ্ডাল হাঙ্করি-সেওয়ারটা, তখন
একধিন তুলল কথাটা। বলল—“এ তো হুনি সময় বাঁচিয়ে
বুঝ কালে সাধারণত পথা এক বের করেছে, তড়িৎ, হুঁদিকেই
লোকমান।”

তড়িৎ আদতা-আদতা করে বলল—“লোকমান নয়,

অধিগণ, পুরনোটা। আলোনে হচ্ছে তো, তাতে বরং লাভই হচ্ছে দেখছি।”

মনে মনে একটু নিষ্ঠুর হেসে থাকবে অধিগ; বলল—
“লাভ হয় ভালোই; আমার কথা—পুরনো ঝাড়াতে গিয়ে, ওদিকে নতুন না ফলসে বায় দেখিকে লক্ষ্য রেখে ফেও। এত যেমন করে পড়া...”

আর কিছু বলল না। তবে বাড়িতে বলে দিল—
যেদিন এইভাবে সকাল নগাল এসে বসবে সেদিন যেন ঘুকে ভালো করে চা-জলখাবার খাটয়ে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়—মাঝে, বধুকে বলে দিল যেন বাড়িতে ডেকেই—
—পাঁচের দেন ঠাণ্ডা, টিউটারের মতো বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে নয়। তবে, একদিনেই নয়; সইয়ে সইয়ে, আন্তে আন্তে বাড়ির লোক করে নেওয়ার মতো করে। পাতির হচ্ছে দেখে কুণ্ডায় বাতে আসা বন্ধ করে না দেহ।

তাই হোল; যা পূজার্তনা নিয়েই থাকেন বেশি, কিন্তু স্ত্রী সরোজিনী বেশ বুদ্ধিমতী; কবে থেকে চায়ের সঙ্গে জলযোগের আদরানি হোল, কবে থেকে তাতে একটু আড়ম্বর এসে গেছে, কবে থেকে বাইরের-ডেউরের ব্যবধানটা গেছে ঘুচে, তারপর কবে থেকে নিমন্ত্রণের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে নিমন্ত্রণের ব্যবধানটুকুও গেছে মিটে—কিছুই বেন বুকতেই পারল না তড়িৎ।

তারপর যখন একদিন রবিবারে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ার পর সরোজিনী জানাল, এবার থেকে কি রবিবারে এখানেই থাকবে, তড়িৎ হেসে বলল—“কেন, অস্ত্র বারগুলোই বা কি অপসার করেছে, বৌদি?”

হাসিটা এখন, সরোজিনীর মনে হোল ওর স্ত্রীতির রীতি যেন থা পাড়ে গেছে। একটু কয়েক গিয়ে হেসে বলল—“আমার নেমন্ত্রণ নয়, ভাই, তোমার হাদা বলেছিলেন।...বানে, রবিবারটা কারবারার ছুটি দেন তো, একটু গল্পগল্প করতে পারেন—হয়তো সেইজন্মে।”

স্ত্রীতির, আত্মীয়তার একটা বেরোয়ি চলল, রবিবার তড়িৎ বিশেষের পড়াশুনা নিয়ে আরও বেশি করে লাগল। ওরই মধ্যে অলক আর স্ত্রীতির সঙ্গে গল্প, বেলা; বাতায়ের বকে বসে সরোজিনীর সঙ্গেও গল্প হয়, হয়তো রতিও হইল। অধিলের বায় কাছের গিয়ে বসে তাঁর পূজা থেকে অবকাশ হোল। পূর্ববঙ্গের পরিবার, গ্রিক বাস্তবায়না নয়, গোলামালের আগেরই এলিকে চলে এসেছে, তারপর এখন সব সম্বন্ধ ছিন্ন, বাস্তবায়নারই সাধিন। ঐ হুঃখের কথাই উনি বেশি কন। পুন্সর বাগান, ক্ষেতখাখার, স্যাকজন—কিছুই দেখেই, কাকুর দকেই আর সব্ব হইল না; আত্মীয়-বজন

কে গোখাখ ছড়িয়ে পড়েছে, আর কি দেখা হবে কাকুর সঙ্গে এ-জন্মে? শোনাবার নুতন লোক শেষে আর বলে সুগিয়ে উঠতে পারেন না। সবার সঙ্গে সবার মতোটি হয়ে দিনদিনই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছে পরিবারটির সঙ্গে তড়িৎ।

সরোজিনী বোধহয় আরও চায়। একদিন হাদাখের বাবাক্ষার আশাপ-এসম্বে বলল—“দিমল—কবি—অলক, এদের তো একরকম হচ্ছে, বাস্তবও রয়েছে, তুমিও নিজের মতন করেই বেগচ, ঠাকুরকির বোধহয় ইচ্ছে একটু পড়াশোনা করে...”

রতিও ছিল, স্ত্রীত বলছিল, হুণ্টা হুলে বলল—
“তোমার কানে বরং বলতে গিয়েছিগুহ...”

“দল কথা কানে ধরে বলতে হয়, ঠাকুরসো?...বেশ, বলানি, পড়েই না, এমন সুবিধে রয়েছে...”

একটু ছুপ করে থাকে রতি, তারপর পেচিতে ছাটা চান দিয়ে বলল—“সবের অসুবিধে করে নিজের সুবিধে করে নেওয়া—সে ঠাকুরকির স্ত্রীতে পেখনি; আর তড়িৎনা তো নিজেই চায় এমন, নিজের চরণায় তেল দিন।”

খাশাটা আরো নীচু করে নিয়ে মিটে-মিটে হাসতে লাগল। তড়িৎ সরোজিনীকেই বলল—“অসুবিধের মধ্যেও না-হয় করলাম চোটা, কিছু, হবে কিছু আশা করেন, বৌদি? —দেখছেন তো ওকতড়িৎ?”

রতি স্ত্রীটা খালায় ছুঁড়ে দিয়ে আর একটা লেচি চাকির ওপর টিপে ধরল, অস্ত্র নাচিয়ে বলল—“হা ওল, পড়ার চেয়ে তড়িৎ দেখানো আরও শক্ত। নুইই থাকি তার চেয়ে।”

আর সবার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা, তার পাশে ওর সঙ্গে এই আড়াআড়িও চলছে যমানে। হাস চায়েক গেল কেটে।

বেহারী ডহলোকটিকে পেড়-দটা সময় দিতে হয় তড়িৎকে। ডটা একরকম বাঁধ-ধরা, যদি না সেখানে আটকে গেলেন কোনদিন। এর পর খচাখানেক আরও খাটে, চোটা করে শেষের ডাড়াটা ঘাতে বাসার দিকেই হয়। রিকশা জমা দিয়ে ঘটা-প্রিনেকের মাথায় করে বাড়ি।

সেদিন ওদিক থেকে ফিরে আবার বাইরেরই একটা সওয়ারী শেষে গেল। সবোময় হুঃ থেকে এসেছে, ইজ্ঞা ছিল না বাইরে খাওয়ার, তড়িৎ একটা ঘোটা ডাড়া চেয়ে বলল, আর ডলল। জাখাটা কতকটা নিজন, একটা। খালের মতো বেরিয়ে গেছে, তার হুদিকে নুতন বাড়ির হুঃএকপানা করে উঠতে আরম্ভ হয়েছে, তারই একটিকে

বোম্বের তরাসকে এসেছিলেন, ফিরবেন। কি ভেবে একবার ওপরের দিকে চেয়ে নিয়ে রাজী হয়ে গেলেন ডক্লোকে, উঠে পড়ে বললেন—‘বেশ চলো—একটু ‘তাজা’তাজি।’

একটুইই, বাঙ্গালীদের সাধামতো এড়িয়েই বাথ তড়িং। সপ্তদশী নামিয়ে দেবার সময় ডক্লোকে’র ডবল ভাড়া ফীকার করে তাজা তাজি বেধিয়ে পড়ার কারণটা বুঝল তড়িং। দিনের বেলায় একটা খুব পাতলা মেয়ের আঁতরণ আকাশে তেঁকেছিল, লক্ষ্য বরবার মতো নয়, এখন একটা গুল্লগদীর ডাকে চোখ তুলে দেখল—একটি নক্ষত্রও নেই। তুল দিলে গেছে, উঠেই ছোরে চাপ দিয়ে রিকশা হাঁকিয়ে দিল। ঘুরে, বোম্বের লোকটার ওপর আকোশডরেই একবার বাড়িটার দিকে চেয়ে নিল। ডবল ভাড়ার লোভ দেখিয়ে বিপদে টেনে এনেছিল।

বোম্বের মাইল বেড়কে কি হুরক একভাবে চালিয়ে সহরের প্রায় কাছে এসে পৌঁছেছে,—আকাশ নোঙর দিয়েই বাচ্ছিল—করেক কোটা জল হাতের খোলা আঙুলে পড়ল। ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তবু আরও চাপ দিল প্যাডলে তড়িং, ভ্রান্তের ধানিকটা এসে আশ্রয় লোকটার হোল—রিকশা রেখে কোথায় একটু উঠে পাড়তে পারে। একদিকটা একেবারেই খালি, একদিকে—ডানদিকটায় খোলের বাড়ি—গয়াকা, নেই, দুইয় দোকান, পানের দোকান, ধানিকটা পড়তি জমি—গোক-চাগল বাঁধা। ...না, ভিক্টরেই হোল, ধানিকটা গেছেই জিজে, মরিচা হয়ে বেরিয়ে বাগরই টিক করেছে, আরও গোটা কতক এই ধরনের বাড়ি-ঘর—বাটালের পর একটা কোঠা বাড়ির ব্যাংকা। তড়িং নেমে পড়ল। পাশে রিকশা বেধে উঠে বাচ্ছিল, আরও ফিরল। হুড-চা কেল লিয়েছিল, তুলে দিয়ে সীটের নীচে থেকে কাড়লটা বের করে মুছে দিয়েছিল সীটটা, তারপর সেটা তারই ওপর বিছিয়ে বারান্দার গিয়ে উঠল।

আকাশটা বন্ধুর মতোই ব্যবহার করেছে বলতে হবে। গোট। তিন-চার ছোটো ছোটো পল্লভার তাজা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে এসেছে, খুব ডেয়ারনি। এই বার, ও একটু টাই পেতে বেন নিশ্চিত হয়ে খারাপতনে বাসল।

একটা নৃতন সমস্তার সম্মুখীন হয়ে বেশ একটু চিন্তিত হয়ে উঠল তড়িং। বর্ষা বলে একটা কষ্ট আছে আবার, প্রায় চারমাস, কন-বেনি করে। এখনও বৈশাখই চলছে, বোম্বের নাকানাকি, কিন্তু মনে করিয়ে দিল সন্ধ্যাটা। কি করতে এখন? হাঁচির বর্ষা আবার কখনোই অনেক

এগিয়েই আরম্ভ হয়।...বাটরের দিকে চেয়ে এই কথাই ভাবছিল, বৃষ্টি চেনে অংশতে মনটা অক্ষুণ্ণ হতে উঠল ঘুরে ঘুরে। চিন্তাটা ভদিকের হোলও, একেবারেই সামনের; পেটাকে ছেড়ে কিন্তু একেবারে অতীতে গিয়ে উপস্থিত হোল তড়িং।...বেশ—বর্ষামানের একটি ক্ষুদ্র পাজা-পা, কোনও সময় কোন বজ্রার দামোদরের জল খানিকটা ঘুরে গিয়ে একটা হুঁতী বানিয়ে দিয়েছে, তারই ধারে। জল থাকে না বারোমাস।...হ্যা এখন কি করছেন? বৌদিদির গোদালে সীতাল দেওয়া, প্রাণী জ্বালা, খাপ বাজানো অনেককণ হয়ে গেছে। পাশা প্রায় এদিক-ওদিক ঘুরে এই সময় সামনে একটা মাহুর পেতে রমাকে নিয়ে পড়াতে বসে।...পাশার বদমাশ, বৌদিদির আঁচলখরা একটু। দাঁড়া তো বলে, রমাকে পড়াতে হবে ভালো করে, ওকে তড়িতের ডাইরি ছুরে উঠতে হবে, খাপ না-হয় চাবই হয়ে রইল।...লাদাই নয়, লাশত্যা বহনটা ওদের বংশেই বেশ নিবিড়; বাবা-মাকেও মনে পড়লেই একসঙ্গে মনে পড়ে, একটি শব্দ এসে ডাব দুটি মুখে।...রতিটা বড় চকল...

মহাখানে হঠাৎ রতির কথা খোঁজা থেকে এসে গেল! একটা কোল্লকের হালি ছুটতে বাচ্ছিল তড়িতের মুখে, হঠাৎ মিলিয়ে গেল। এতজ্ঞের রপন উঠল না?...

হ্যা, এই বাড়িতেই; ভদিকবার একটা ঘরে। আর গানও যে! ‘দেশ’ রাগিণীর ধরনটা মনে হচ্ছে বেন। যেদের গলাই। তড়িং উৎসর্গ হয়ে পাড়াল।

গান গাইতে জানে না; সময় পেল কোথায় জীবনে এ-পর্যন্ত? তবে বড় সুরভলা মোটাটুটি চেনে, অর্থাৎ তনলেই বলে দিতে পারে। ওটা হয়েছে বর্ষামানে বেশ দুটো বছর যে-বাড়িতে ছিল সেখান থেকে। বড় বাড়ি, দাস্টার এসে মেয়েদের গান শেখাত, গানের জলপাত হোত মাঝে মাঝে, বিশেষ করে কোন বড় গাইয়ে কি বাজিয়ে যদি এল বাইরে থেকে।...‘দেশ’ রাগিণীটা বড় ভালো লাগে, ওর তো মনে হয় এমনি বর্ষার সঙ্গে বেন মজারের চেয়েও বেশি করে।...এই রকম বর্ষা-মাত, বিশেষ, নিশ্চয়। হয়ে অন্তকার গৃহকোণ আশ্রয় করা, দেখানে হঠাৎ এই সঙ্গীত, তাও সব কিছুই সঙ্গে মিলিয়ে ‘দেশ’—বড় অশ্রুত লাগছে তড়িতের।...আরও অশ্রুত লাগছে—সেটা মাঝে মাঝে—একজন রিকশাওয়ালা তুলিয়ে গেছে স্রের লম্বীতে। মনে হচ্ছে কী বেন একটা হয়ে গেছে জীবনে, বার মতো এই জগৎ থেকে আত্ম আত্ম করে গেছে তড়িং, কবে, কি করে। মনে হচ্ছে আজ বেন

আবার ঘুরে এসে এ তার একটা অনশিতার প্রবেশ। কেমন একটু লম্ফা-লম্ফা করছে যেন।

স্বাগত করে পড়েছি, কখনও গাড়, কখনও স্মিত :
এজ্ঞার ছড়ের চানের মতো...

'সেশ'-এর হ্র গিয়ে পৌঁছেছে গ্রামের বাড়িতে : শাল, বৌশি, মা, রমা, গোলা। শাল বলে—তড়িৎ পত্নক, বত পাবে। শুকে ছেড়ে দিছি। ছেড়ে দিয়েছে তড়িৎ দালাকেও। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করেছে ঐর ওপর কোন চাপ হবে না। সেই বৈদ্যিন তখন বৌশিদির বালা বাঁধা দিয়ে ওর বট-কনার খবর জুগিয়েছেন—আই.এ-তে ভর্তি হবার সময়—সেইদিনই করেছিল প্রতিজ্ঞাটা, অবশ্য প্রতিজ্ঞার কথা জানতে বৈদ্যিন দালাকে, বালার কথা যে টের পেয়েছিল, সে-কথাও নয়।...চালিয়ে যাচ্ছে। বেশ তো চলছে বিজ্ঞানে। পেরে-পেরে, কলেজের খবর চালিয়ে, আনন্দিক বাড়ির ভাড়া দিবে এই চারমাসে চৌগাটা টাকা জমিতেও কেসেছে।...দাদা যদি কখনও টের পায়? শাবে কোথা থেকে?—বাঙালী ডাফাতে যে পরিহার করে চলে এমন করে তার একটা কেহু তো ঐ,—পাছে কোনও হত, কোন হকমে কণাটা কানে উঠে যায় ঠার। অবশ্য তার সম্ভাবনা কই?—কোথার মানপূর আর কোথার বঁচি : তার ওপর দাদাও তো বাড়ি ছেড়ে বেরনো কাকে বলে জানেই না।

দাদার কথা মনে হোল কবাইয়ের বড় ভাইয়ের কথাও মনে পড়ে যায়। বড় ভাই শুদিকে সামলাচ্ছে, ছোট ভাই বেরিয়েছে ব্রহ্মা দেখতে, বাহুব হবে কাঁড় করবে নিজের নিজের পরিবারকে।

'সেশ'-এর খুঁচা বর্ষার রিমঝিমের ওপর হুঁচিৎ হয়ে পড়েছে। গানটা যোকা গেলে বেশ হোত। দিকী গান, মানে খরতে পারে না। একরকম মশ নয়, খরতে পারেনা বলেই মনে হয় তার মনে বা-সব কথা উঠে-নামছে যেন সেইসব বিয়েই ভরা। 'সেশ' গান হলোই—বদি না বাংলা হয়ে শাই হোল মানেটা—তো ওর মনে হয় বেশ অনন্ত বিচ্ছেদ, অনন্ত হতাশা : যেন বহু দূর, সেই দীর্ঘপথে শুধু বৃকের দীর্ঘবাসকে পাঠানো। ডির কোন উপায় নেই আর!

একসময় গানবাজনা সেল বেথে, আজকাল দেখন হয়েছ—সবে এসে আসে আসে মিলিয়ে বাঙরা। বাড়িটা জ্বল হয়ে উঠল গানিকখন। বৃষ্টিটা বেবে গেছে, তবে সন্ধ্যাপ গানিকটা ডেসে আসছে, একজন পুরুষের গলা, ডম্বাট আর ডম্বা : আর মনে হোল দুটি মেয়ের গলা। টিক যোকা থাকে না, তবে মনে হোল, আর গাওরা

না-গাওরা—এই নিজেই হাজে কথা, একজন বলছে—বৃষ্টি ধরে এসেছে, এই সময় সরে পড়াই ভালো। কথার মধ্যেই উঠে পড়ে তিনজনে এগিয়ে আসছে বাইরের দিকে।... পুরুষ বর্তে শোনা বাব—"চাড়াটা ছাড়বে না, স্ত্রী...এই তো হরোড হুং, বিয়ে হোল তো আমাদের বেহেলের গান-বাজনা সব সেল পুছে, একই যে চেটা ক'বে..."

"শব্বি-হাতার তালের মধ্যে কতদিন থাকবে টেকে, মাস্টারমশাই?"—একটা চানি উঠল। তারই মধ্যে বাজকার বিজ্ঞান-বাঁচিটা জ্বল উঠল, কোর খুলে তিনজনে বেরিয়ে এল।

মাস্টারমশাই অর্থাৎ গান-বাজনার মাস্টার নিম্ভদ। তেতরে তববার বোল, সেতারের ইং-টাং চলছে তখনও, তাইতে এই রকমই মনে হয়। মাস-বহনী লোকটি কাচাপাকা চুল, একটু ভারী পরীর, আগেই বেরিয়েছেন, বললেন—"খাং, এই তো বিজ্ঞানও হাজির, আর দেখি করতে হবে না, বৃষ্টিটাও বেমেছে।...বাব-গা রে?"

ওষিকটা টিক রেখে গেছে তড়িৎ, চুলের চাঁটে, গানিকটা লাক-গোজের, হঠাৎ বাঙালী বলে যে তিনে ফেলবেই এমন নয় : বিজ্ঞানও, স্ত্রীরও এদেশী—এই বিশ্বাসটাই তো কাজ করে পোড়ায়।

একটা কুঠা বেলে আসছে :—কিছু না-বাওয়ারও তো কারন নেই। একটা টোক গিলে তড়িৎ বলল—"বাহগা, বাবু। কাছা?"

জায়গাটা বলল একজন মেয়েই। একটু যেন কিভাবে ঘুরে দিকে চাইল, তবে বৃষ্টিটা সরিয়ে নিল শুধু।

"বাহগা।"

ভাড়াটা বাড়িয়েই বলল তড়িৎ, আগের সঙমারীর মতো বাঙা না-বাওর—বাহ হয।

ঐ মেয়েটিই আগন্তি করল—ছ'আনা ভাড়া, একবারে বারো আনা হাঁকলেকেন? বৃষ্টি তো ধরে মেছে।

শ্রামক, ছিপছিপে গড়ন, একই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অপর মেয়েটি বলল—"তা চলুক, আবার যদি বৃষ্টি এসে পড়ে, তখন..."

কপালে সিঁদুর, দুটিটা আগুনিই দিয়ে পড়ল তড়িৎের : মাস্টারমশাইও সম্মত করলেন—"হ্যাঁ, যখন বসতে পারবেনা আর, তখন বেরিয়ে পড়াই ভালো।...বারো আনা নেহি, দশ আনা লোগা, বাও।"

আলো জ্বালছে তড়িৎ, উঠে বসতে-বসতে শ্রামককে মেয়েটি অপরটির দিকে চেয়ে একটু চোখ পাকিয়ে বলল—
"দব ভাড়াটা আক দুই দিবি, স্ত্রী...আমার লজ্জ তো।"

কেউ হাঁ করে ব'লে নেই, ডবল ডাড়া শেওয়ার কিছু ত্যাগ ছিল না—

—একই নীচু গল্যেতেই, তবে এমন কিছু লুকিয়ে-চুরিয়ে বলা নয়; আর বাংলাই তো।

বজ্রবরই ঘন-বসন্তী সহরের মধ্যে দিয়ে রাক্ষা। এদিক সামলে, ওদিকেও কান বেগওয়ার বিশেষ কোন চেষ্টা না করেই তড়িৎ বা জানতে পারল তা এই যে, ওরা দুজনেই এগানকার নিয়মিত ছাত্রী—সুখা বলে মেয়েটির নতুন বিবাহ হয়েছে—এবার বাবে শুভরবাড়ি, বাস্তারমশাইয়ের কাছে বিহার নিতে এসেছিল—সুখানি গানও গায়—(‘সামবণটি আর একই বেন ঘেঁষে গলা নামিয়ে বলল—“তোমার গলা আরও মিষ্টি হয়ে গেছে—কি করে রে?”—) শেখের গানটা, বেটা গোয়ে ওরা উঠে এল, গেয়েছিল এই মেয়েটি, বেটি শ্রাব্য, ছিগছিগে; এতজ্ঞও নিজেই খামিয়েছিল—মেয়েদের কলেজে পড়ে আর—এ ক্লাসে, নাম মল্লী—কোন মতেই বিয়ে করবে না—(বিয়ে আবার বাসলে করে, সব বুটবে-খাটবে?)—গান নিয়ে কাটিয়ে বেবে জীবনটা—মানে, গানের সঙ্গেই বিয়ে আর কি।—এইবার হবে সুখিল, সুখা চলল—কার সঙ্গে যে আসবে এবার থেকে, ডাড়াটাও পড়ে বাবে বৈশি প্রায় ডবল, একলার ঘাড়ের—বজ্রবর সহরের মধ্যে দিয়ে রাক্ষা, না-হয় লক্ষী কেউ না-ই হইল—(তোমার বর এসে এঁকেখানে গাঙ্গু, কান, সব দিক বেশ সামলে যায়: ঈশ, যুগ যুগ ধরে আমরাই গিয়ে শুভরবর করব; মানুষ নয় তো।)---

কথাবার্তার মধ্যেই আরও আশ্চর্য পেল তড়িৎ যে, মল্লী মেয়েটির বাড়ি এখানে নয়, পরের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করছে।

বাক্সের পেরিয়ে একটা পাড়ার মধ্যে খানিকটা প্রবেশ করে তড়িৎকে রিকশা খাষাতে হোল, সুখা নেমে পড়ল।

সন্ধ্যার গোরে। হুলে পরসা বের করে দিতে ছাড়িল, মল্লী বলল—“পারছিস দিতে? তোমার আশ্চর্য তো কম নয়।”

“বেশ, ঠেঁচে গেল আমার”—বলে সুখা ত্যাগাতাড়ি আবার গোয়েটা। বেঁধে নিল। হাতটা একই একই ঝাপছে।

“কাল ঐ সময় আসবি, মল্লী, বেজবর খানিকটা আগেই ...ও বিশেষ করে বসে দিয়েছে তোমার কথা...”

—স্মৃতি কটা বেন বড় চড়া হয়ে হঠাৎ বেঁধে দিয়েছে কে। উত্তর হোল—“বয়ে গেছে আসতে...বড় উপকার করেছেন জোড় ভাঙিয়ে চেনে নিয়ে যে—”

স্মৃতি ঘুরিয়ে চোখ-মুঠো কুমালে চেপে ধরল।

“আসবি...নিচের আসবি...নৈলে...”

হঠাৎ ঘুরে গিয়ে একরকম মুটে-মুটেই পেট ঠেলে লুকে খেল সুখা। ও-ও নিচের নিচের সামলতে পারছে না। আরও খানিকটা গিয়ে একটা সেটগলা দাকারি গোছেই বাড়ির সামনে রিকশা খামিয়ে নেবে পড়ল মল্লী।

গা

তড়িৎ বাসায় ফিরল বেশ একই অজমক হয়েই: গানের হুগটা মনের কোথায় কন-কন করছে, গতি হয়ে পড়েছে বহর। ওইসু অবস্থা কেটে বেতে দেবি হোল না, নিজেই কুকারে রাক্ষার বাবসা করা, পড়া; পরের দিন ঐ কলিনের পর কলেজ। রাতে ইটকির শওরারী কেবলত আবার পর কিছু হঠাৎ মনে হোল ‘দেখ’-এর হুগটা আবার এসেছে ফিরে। হঠাৎই বেন অজমক হয়ে উঠল। আর কিছু নয়, বর্ধমান ডাড়ার পর অনেকদিন এভাবে গান শোনেনি। ‘দেখ’টা আবার বেশি ভালোবাসে তো। ...বাবে না-হয় আজ ওদিকপানেই? অবশ্য ‘দেখ’ই যে হবে এমন কথা নয়; তবে গানেক, আজ্ঞা, ভালো গান শোনা—

কিন্তু...বু বড় একটা ‘কিন্তু’ কোথায় বেন রয়েছে পথ আগলে। আজ তো বুটিও আশ্চর্য্য করছে না; আর বুটি হোলও একটা দিনের রিকশাওলা ঐ সময় ঐ জারগাটিতে দ্যাবে অশেখা করে এই বা কেমন কথা!

গেল না। মুঠো দিন কাটিয়ে দিল, আরও চেষ্টা করে আরও একটা দিন। তার পরদিন ঐদিনের একটা শওরারী গেয়ে বেতে মনকে বোজাল—ওকে তো ডাড়া খাটতেই বেতে হচ্ছে।

বাগওয়ার সময় ঐখানটার একই আতে করে নিয়ে কান গেতে হইল। সেতার হচ্ছে ঠায়া-তবলাব মদে।

কেবরার সময় মনে হোল ঐখানকার হাফাইনুতে কে আটা লাগিয়ে রেখেছে। সেতারের সেট হুগটা এখন হুলছে, বেশ একটা খাতন চলছে বেন। গ্যাডেলে পা আসছে বেনে। কি করে একই শোনা যায়? আজ আবার বাজার লোকচলান বেশ ভালো রকমই, অর্থাৎ বাজারিক বেটা। এগিয়ে বেতে হোল। খানিকটা গিয়ে মনে হোল—একটা উপায় হতে পারে—ঐখানটার খানিকটা দড়িমসি করা—খানিকটা এগিয়ে গেল, আবার রিকশা ঘুরিয়ে খানিকটা গেল পেছিয়ে, কে আর এত লক্ষ্য করে থাকছে যে সেই একটা রিকশা জাহলটিতে নিজে ঢকর? আর ডাড়া-খোজারও তো কতকটা ঐ গম্ভীর।

ঘুরে বানিকটা পেছিয়ে গেছে, সেভায়টা চৌহানে এসে
সমে খেমে গেল। বেশ বানিকটা উজ্বিত গেল তড়িৎ—
সবর ছিল—এর পরে কি হবে?—গান? সেট যেহেতু
গলায়—এশ? ...কালর গলায় কিছু একটা গান
হোক-না...

বাড়ির সামনে দিয়ে আবার ফিরছে, গান বা বাক্য।
তখনও কিছু শুধনি। কবেক প্যাডেল এগিয়ে গেছে,
সেছন থেকে ডাক এসে—“এই রিকশা!”

হাবে না ভাড়া। হাত উঠিয়ে সেটা জানাতে গিয়ে
ফাটাটা খোরতেই পা খেনে আপনিট বেবে গেল তড়িতে।
হাতটাও নিল নাথিয়ে, ঐ বাড়ি থেকেই ডাক। রিকশা
ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

মাস্টারমশাই আর সেট যেহেতু—মন্ত্রী। মাস্টারমশাই
বললেন—“তোমাদের সেদিন যে নিয়ে গিয়েছিল... আজ
কিন্তু মানুষী যেট, তা বলে দিক্তি বাপু।”

যেহেতু কিছু সেট তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তবে সেদিনকার মতোই
কদম্বাক; তখনুি ফিরিয়ে নিয়ে বলল—“আসি তাহলে
মাস্টারমশাই—”

পায়ে হাত দিয়ে প্রশ্ন করে রিকশার এসে বলল।

একটা ছোট বাক্যের মধ্যে দিয়ে বেতে হয়।
বানিকটা এসে মন্ত্রী প্রশ্ন করল—“বাড়ীটা তো জানাই
আছে?”

প্রশ্নটার বিশেষ তাৎপর্য না থাকলেও একটা উদ্দেশ্য
আছে, তাই বাংলাতেই কয়েছে, বেশ বানিকটা
ভেবেচিন্তেই। ছোটগাট এক-আধটা কথা বাঙালীরা
এদেশেরদের সঙ্গে বাংলাতে কয়ও, সে-হিসাবে এমন কিছু
অবাভাবিকও নয়; উত্তর হোল—ই্যা, আছে।

বাংলাতেই দিল উত্তরটা তড়িৎ। দিয়ে কেলল, কিবা
মুখ দিয়ে বেঘিয়ে গেল বলাই ঠিক; অন্তরনয় ছিলই, তার
ওপর রাস্তার ট্রাকটিকা কাটাতে আরও অন্তরনয় হয়ে
পড়েছে।

খিড়ী প্রশ্নটা খুঁজে ঠিক করতে বতাইকু দেবি হোল,
চুপচাপই গেল, ভায়লর মন্ত্রী আবার জিগ্যেস করল—
“সংবের সব রাস্তা আছে চেনা?”

সাবধান হয়ে গেছে তড়িৎ। এমনি হিন্দী ডালো
জানেন না বলে সাধারণত অন্তরনয় ওপরই কাজ চালিয়ে
যায়, একেবারে আরও সাক্ষিত করে উত্তর দিল—“ই,
হু-হু-হু।”

আর একটু খেমে প্রশ্ন হোল—“কতদিন চালাছ
রিকশা?”

“খোড়া রোজ।”

“তবু...”

“চার বাহিনা।”

আর কোন প্রশ্ন হোলনা।...কি বকব একটা অস্বস্তি
বোধ করছে তড়িৎ। রাক্ষসের পরে রাস্তার ধারে একটা
পুকুর, তাইতে পানিকটা ঠাক গেছে, মাঝামাঝি এসে
মন্ত্রী বললে—“একটু ঠাড়াবে।”—তবুওর টোন; অন্তত
বেশ একটু গভীর। বেকটা টিপে ধরে ঘুরে চাইল তড়িৎ।

সেই তীক্ষ্ণ, সঙ্গর দৃষ্টিটা এবার একটু বেশিষণ ঘুরে
ওপর কেল রাবল মন্ত্রী। প্রশ্ন করল—“তুমি হিন্দুস্থানী?...
নেবে ঠাড়িয়েই উত্তর দাও, আর রিকশা চালাতে
হবে না।”

হু-হু-হু। একই অবাভাবাবে কৃচ্চক উঠল তড়িতেও,
কিন্তু কিছু না বলে আত্ম আত্ম নেবে এসে সামনে ঠাড়াল,
বোধহয় আলোর শোকে সেপেই ঠাড় করিয়েছে মন্ত্রী।
একই বে বতবত খেয়ে গিয়েছিল তড়িৎ সে-জাবটা কাটিয়ে
উঠেছে ইতিমধ্যে; প্রশ্ন করল—“কি?”

“তাহলে বাঙালীই লেবছি।”

“ই্যা।”

“রিকশা চালাছো যে?”

“কি হয়েছে তাতে?”

রাগারাগি না হলেও বেশ সোজারকি উত্তর-প্রত্যুত্তর
গেছে। মন্ত্রী বলল—“কি হয়েছে মানে...পুলিসে ছাড়া
ওভার করা যায় তোমারে।”

“রিকশা চালাবার জন্তে? বাঙালীর দিকে আইন
আছে কোন?”

“টিডি-এর বিল্ডে আইন আছে তো। বাঙালী হলে
হিন্দুস্থানী সঙ্গে ডাড়াটে তোলা। বিশেষ করে
মেয়ে-ডাড়াটে।”

“বিশেষ করে মেয়ে-ডাড়াটেই তুলতে যাব কেন?...
আপনিট ডাকলেন।”

“হিন্দুস্থানী জেনে ডেকেছিল।”

“বাঙালী জানলে ডাকতেন না?”

“তা...হয়তো ডাকতাম, ঠিক বাঙালী জানলে।”

“তা হলে বাঙালীর রিকশা-চালানো—অবশ্যগতিকে
যে অস্তর নয় এটা তো মানছেন?”

“তা মানব না কেন? কিন্তু, কথা হচ্ছে এ-প্রবন্ধ
কিসের জন্তে?”

“আপনি ধরে নিয়েছেন প্রবন্ধনা, ওটাও যে
অবশ্যগতিকের জন্তে হতে পারে...”

হাঙ্গা দিয়ে লোক যাচ্ছে, দিগ্ধও, হৃদিষ্ট টাঁকিক পাতলাই
এখানটা। এরা একেবারে শাপ খেঁসে ঠাঁড়িয়েছে,
কথাবার্তাও নিচুও তরুঁ এসে ঠাঁড়িয়েছে, স্বপ্নও চাপা,
লোক জড়ো করবার উদ্দেশ্য বাস্তবই নেই। “তবু হুঁ একজন
মুখে ঘুরিয়ে দেখেই সেল, একটা খালি রিকশাওলা মাথা
ঘুরিয়ে হঠাৎ হার্নের প্যাংক্যাণানিটা বাড়িয়ে দিল খানিকটা।
উত্তরটা পেয়ে মল্লী মুখের দিকে তেড়ে একটু হুপ করে গইল।
হাঙ্গার আগে পিছে দেখে নিল, তার পর সামনে খানিকটা
দূরে একটা বাসি রিকশা আসতে দেখে জমাল বলে ডাড়াটা
বের করে বাড়িয়ে ধবল : বলল—“এই নাও। আমি
যাব না এ-রিকশায়।”

হাঙ্গারটাকে ডাক দিল।

তড়িং বলল—“আপনি যাচ্ছেন না যখন ডাড়া নোব
কেন ?”

মল্লী আন্দাজে কিছুটা ঝাঁপে সঠিরে নিয়ে বলল—
“আচ্ছা, এই অধৈর্যতাও নাও, খানিকটা ডো এসেছি।...
কিছু ধবলসার, আর এছাড়া...”

তড়িংয়ের মুখটা হঠাৎ বড় বেশিরকম ধমধমে হয়ে গেল।
বেশ জিনের গুপুসই বলল—“ও-ও নোব না।...না হয়
মিহুও, কিন্তু বা ভাষা ব্যবহার করছেন আপনি...”

“ভাষার কি লোক হোল আমার !”—একবার যেন
অনিচ্ছাকৃতভাবেই মল্লীর দৃষ্টিটা ওর চেহারাের উপর পড়ে
যুয়ে এল। তড়িং উত্তর করল—“প্রথমত, বেশ ভদ্র নহ।
...এই হুকম, মাঝিও তো আপনাকে আমি না, তার গুপের
ধরনে চোট হোসেও ‘আপনি’ কথাটা ব্যবহার করছি...”

অপর রিকশাটা চড়াই চলে এসে ঠাঁড়িয়েছে, মল্লী ঘুরে
দেখে বলল—“না, ওগা যাও।”

তড়িং প্রশ্ন করল—“কৈ, গেলেন না ?”

“এইতেই থাকি।”

“বড়ি প্রবন্ধনা নেই যেন করেন, তাহলেই চলুন।...
কিন্তু সেও তো আপনাকার মনের ভেতরের কথা ; বাইরে
বেকে আমি তের পাখি করে ?”

রিকশাওয়ালাটা ঠাঁড়িয়েই আছে। মল্লী গলার একটু
অধৈর্যের হুপ বিনিয়োগে বলল—“আচ্ছা, চলুন তো এখন—”

ওগা বাজা করতে রিকশাওয়ালাটাও গ্যাভেলে একটা
চাপ দিল, তার পর একবার মাথাটা ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে
বেশ ক্ষোভে লিখ দিতে দিতে বেরিয়ে গেল।

ডাড়াটা হাতেই ছিল, তবু বাড়ির গেটের সামনে এসে
হাতের তেলোর একবার বিছিরে ওনে নিতে বড় বেশি হতে

লাগল মল্লীর, তারপর যেন হঠাৎ হুঁস হতে আবার অড়ো
করে নিয়ে বাড়িয়ে ধরে বলল—“এই...হুঁ...আমি।”

পাশেই সেলে গ্যাভেলে চাপ দিয়ে বেরিয়ে থাকিল
তড়িং, মল্লী একটু ভেতরে গিয়ে আবার বেরিয়ে এসে ডাক
দিল—“তখন !”

তড়িং বেক চেপে ঘুরে চাইল। প্রশ্ন করল—“আমার
ডাকছেন ?”

“হ্যাঁ।”

কিরে এল তড়িং। মল্লী একটু যেন জড়োসড়ো হয়ে
গেছে, অমত-আমত করে বলল—“একটা। হুগতো। তুল
করেছি।...কিন্তু কথা হচ্ছে বাতালী—বিশেষ করে ভুল্লোলক
...তারের তো রিকশা চালাবার কথা নয়...যানে, চালার
মাতে...”

যেন তড়িরে বলায় আশা ছেড়ে দিচ্ছেই বলে শেষ করল
—“মাক করবেন আপনি।”

“এতে মাক করা-করির কি আছে ?”—একটু হাসল
তড়িং।

“আছে বৈকি, অন্তর্য হয়ে গেছে। ভুল্লোলক বলে
ধরে নিয়েই তো আমার কথাবার্তা সেইভাবে কণ্ডটা উচিত
ছিল। ভাওপন না হয়...যদি দেখতাম...”

“কিন্তু অভদ্র এবং চীট বলে ধরে নেওতাঁই তো স্বাভাবিক
হয়েছে। আমি অন্তর্য কিছু দেখেছি না, মাক করারও কিছু
নেই এতে।”

একটু বিদ্য করেই মল্লী বলল—“না, হয়েছে অন্তর্য।...
আচ্ছা থাক সে-কথা...আমার একটা অনুরোধ...”

গেট আর বাড়ির মাথামনে একটা মাকারি-গোছের
গাগান, তার গাছপালায় কতকটা আড়ালে রয়েছে এরা,
কি ভেবে দেখানে একবার দেখে নিয়ে মল্লী বলল—“একটা
অনুরোধ রাখবেন আমার ? আসবেন আমাদের বাড়িতে ?”

তড়িং একটু বিস্মিত হয়েই বলল—“আসব !...কি
করতে ?...না, আসতে পারব না আমি...”

“আমার জ্যাঁতখানাই—এখানে আমার বিনি অভিত্রাবক
আর কি—বুঝ বুঝি হবেন আপনার সঙ্গে আশাপ কর।
তার কারণ, তাঁর বড় আগদোন—শারীরিক যেনতেনকে
অবজ্ঞা করে আমাদের জাতটা জীবন-বুদ্ধে জমাগড়ই যাচ্ছে
পেছিরে। বগাববই এই দুঃখ তাঁর, এখন আবার বিচারায়
করে এই আলোচনা নিয়েই থাকেন, এই নিয়েই কাগজে
কাগজে প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে—Dignity of
labour...কথাটা আপনি বোধহয় বোঝেন ?...”

একটু অনমনস হয়ে গড়েছিল তড়িং, প্রশ্নটাতে আবার

সচেতন হয়ে উঠে বলল—“ওনি কখনও কখনও...কিন্তু
ও-অহুবেশ করবেন না আশাঃ, আমি ভেতরে বেতে
পারব না। পেটের দ্বারে রিকশা চালাচ্ছি, অতর্কিত উপায়
না থেকে। আদর্শ প্রচার করা তো উদ্দেশ্য নয়।...আচ্ছা,
আমি তাহলে, নমস্কার—”

প্যাডেলে চাপ দিয়েই আবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকটা চেপে
ধরল; বলল—“বৎ! আবার একটা অহুবেশ আপনাকে
রাগতে হবে—আমি যে রিকশা চালাচ্ছি একজন বাঙালী,
এ-কথাটা আপনি প্রকাশ করবেন না—কাজের যাচ্ছেই নয়।
অহুবেশটা রাখবেন আশা করতে পারি?”

মন্ত্রী একটু হুঁচকাবে চেয়ে বলল—“তা রাখব না কেন?
—আপনি যদি চান। কিন্তু...”

তড়িৎ আবার প্যাডেলে চাপ দিবেছিল, বাগা দিয়ে
একটু হেসে বলল—“প্রবন্ধটা। চালিয়ে বেতে সাহায্য করা
হবে, এই তো? তার স্বত্তে এবার আদর্শ কমা চেয়ে
রাখছি। নমস্কার।”

৪৯

এর পর মন্ত্রী হুঁজুচ্ছে। বাঙালীর ছেলে, রিকশা চালায়,
ভয় বশেই মনে হয়, হয়তো একটু-আধটু শিক্ষিতও;
'dignity of labour' বাক্যটা ইচ্ছা করেই ব্যবহার
করেছিল মন্ত্রী, বাগাই করবার স্বত্ত, উত্তর পেল—“ওনি
কখনও কখনও”; সব মিলিয়ে একটা কৌতূহল হওয়া খুবই
স্বাভাবিক; তার ওপর যে অস্বীকৃতির ব্যাপারটাই হচ্ছে
গেল—ছেলেটি তাতে যে দূরত্বের সঙ্গে আত্মমর্জাদার
পরিচয় দিল, তাতে একটা শ্রদ্ধা অহুক্ষ্যা বিদ্রিষ্ট অহুতাপও
আসে; মন্ত্রী হুঁজুকেছিল।

কিন্তু খোঁজা যানে তো—যে রিকশাগুলোর ওপর নম্র
পড়ে, একটু ভালো করে চোখ বুলিয়ে নেওয়া। যিনের
বেগার তড়িৎের রিকশা বেগার না। যারে অত নম্র
রাখাও শক্ত। যারে নিয়মিতভাবে বেগারের যোগ্যও পড়ে
তথু সগ্রাহে ডিনমিন করে গান শিখতে বাওয়া আর আশা।
মন্ত্রী বতটা পারে রাখে দৃষ্টি সজ্জক, কিন্তু বল হয় না।
তারপর ক্রমে ক্রমে বৌকটাও গেল কেটে। একটা নিছক
কৌতূহলই বৈ তো নয়। সামান্য একটু যে অহুভাগ তাই
বা কতদিন থাকে যাবতেন?

গোড়ার গোড়ায় কয়েকদিন স্ট্রাস্ট্রমশাইয়ের কক্ষ থেকে
বেগিয়ে মন্ত্রী বেন অহুভুক্ত প্রত্যাশার হঠাৎ সজাগ হয়ে
উঠেছে—হুঁদিন যে রিকশাটা পাঁচগা দিয়েছিল, আবার
হয়তো পাঁচগা যেতেও পারে; তার পর সে-ভাষটাও গেল

মিটে। আর একটা কথাও তো চিন্তার মধ্যে এসে পড়ে,
—দুঃখ হাক, যেতে যেতে হঠাৎ পড়ু গেল চোখে; ডাক
দেওয়া বাঘেনা তো। সন্তস্ত ব্যাপারটুকু আরে আরে মন
থেকে মিলিয়ে গেল।

মাস-তিনেক বেগিয়ে গেল।

তবু পড়ুত পারত নম্রের; কিন্তু মন্ত্রী বেনন হুঁজুছে
তড়িৎ ওদিকে তেমনি সাধনানে পরিহার করে গেছে।
স্ট্রাস্ট্রমশাইয়ের বাড়ির ও-পথটা চেয়েই পিয়েছে এক-
রকম। যদি বা গেল, ঐপানটায় গিয়ে উঠদিকে দুখ
ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি প্যাডেল করে বেগিয়ে গেছে।
সম্রের স্বত্তদিকে মন্ত্রীর বাড়ির সজ্জার একেবারেই
যায় না।

যে ব্যাপারটুকু হয়ে গেল তার একটু হাক লেগেছেই
মনে। একটা হালকা সাধনাত্ত যে লেগে রয়েছে এটা
না মনে উপায় নেই। ওদিকে কাজটা করে করে একটা
বেগারোতা ভাবও এসে গেছে; একটা তথ সাধনাবিদ।
বেহনতের হোলও অহুত্বয়ের কাজ, হারু-পেশিওলো দূচ
হয়ে উঠেছে; সাধন উপজীবিকা, তার সঙ্গে সাধনার
আনন্দ, তবু একটা হুঁজু কোথায় বেন লেগেই থাকে, মনে
হয় বাঙালী মনলে এই সতাইটুকু নিয়ে ঠাড়াতে না হোলোই
বেন ভালো। ওর আর একটা গুণ, বাঙালী মনলে
জানাজানি হয়ে গেলে কি করে বেন কথাটা মানপুরে পৌছে
যাওয়ার সজ্জাবনা রয়েছে।

অবশ্য মন্ত্রীকে সেদিন বতটা বুকল তাতে হালকা মেয়ে
খলে মনে হয় না; কথাও তো দিল একরকম; তবু তথ হয়
কে জানে, মেয়েই তো,—ভেতরে কতটা হুঁজল, কতটা লম্বু কে
তার বধর রাখে? হয়তো সম্রের চারিঘেই পড়েছে বববট!
বাঙালী মনলে—হয়তো বা এই আকারে যে একটা বাঙালী
হুক পতিমা সেজে রিকশা চালিয়ে বেড়াচ্ছে—প্রবন্ধনা
করে; মুখে মুখে আরও কী ভাবে লাগা-পন্নতি হচ্ছে
খবরটা কে জানে?

সব মিলিয়ে রিকশাটা বেন দীয়ে দীয়ে গৌণও হয়ে
এসেছে ও-জীবনে। স্বত্তস্ত: আর একটা ক্ষেত্রে ওর মনটা
দিন-দিনই কৌতুকে-আনন্দে প্রসারিত হয়ে উঠেছে।
অধিলের বাড়ি নিজে, বিশেষ করে পড়াশোনার দিকটা।
এটাকে অবলম্বন করে ওর ব্রাটিং জীবনযাত্রার একটা বেশ
বড়সোছেই পরিবর্তন এসে গেছে।

অধিলের বাড়িটা ছোটখাট পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট
হলেও একটা অজাব অনেকদিন থেকেই অহুভব পরছে
সবাই; একটা বৈঠকখানা। যখন বাড়িতে হাত দেওয়া

হয়, তখন বেশ দিশার করে পরচপন করতে হইছে, প্রয়োজন মেটে এই গোছের একটা বাড়ি ভুলে ফেলতে হয়েছিল—কাচা উঠান, ইটের শেল, খেলার চাউনি। তারপর আরও আছে পাকা উঠান হয়েছে, বাগাঘর আর তাঁড়ার ছেড়ে বাকী ঘরগুলার খেলার চাল সবিয়ে ছাত্তও দেওয়া হয়েছে। ওরই মধ্যে একটা ঘর ভেতর-বার ছিদ্রিকটী ব্যবহার হয়। এইতেই ছেলে-মেয়েরা পড়ে, কেউ এল-গেল, বসে। চলে যাছিল এককম।

এরপর কারবার খেড়েছে, নানারকম লোকের যা তাহাত হাচ্ছে, একটা আলাদা বৈকুণ্ঠনার প্রয়োজন অনুভব করছে দ্বারা। এখন টাকার সেরকম অনটন নেই, তবে কাজের চাপেই পদবী করে উঠতে পারছিল না অখিল, সম্ভ্রান্ত হাত লাগিয়েছে। খানিকটা উঠেছে ঘরটা।

এইসময় একদিন একটা ব্যাপার হোল। বর্ষাকাল, পালাড়ে পোশের বর্ষা আরও অনিশ্চিত, আতাপ ভালো দেখেই বেরিয়েছিল তড়িং, কিরে এল প্রবল বর্ষা মাঝার কথা। বিকশা-ব্রহ্ম সোকা বাড়িতেই এসে উঠেছিল, মাথা পা হাত না মোছা হোলো সরোজিনী একেবারে বাগাঘরে ঢেকে নিল। বৃষ্টি পড়লেই এখানে ঠাণ্ডা, ভিজোছেও খুব, উত্তরের সম্মনে একটা ছোট্ট হুল দিয়ে বলল—“বোলো।”

উত্তরে চারের কেউলি ঢুকিয়ে দিয়েছে। রতি চা আর চিনির পৌটা এখন সম্মনে রেখে দিয়ে চৌকাত্তে বেস দিয়ে শাড়াল। কথা নেই কান্ডর নুখে, সরোজিনীর নুখটা বেশ গম্ভীর।

কতকটা নিতম্ভতার অবস্থিতুক কাটাবার জুড়েই তড়িং বলল—“খুল জিক্রে গেছি আজ।...হঠাৎ বৃষ্টিটা নামল কিনা?...বামদেও যে কখন...”

রতি প্রশ্ন করল—“বাসায় বাবেন?”

কর্তব্যে একটু ব্যস্ত আছে।

সরোজিনী কেউলি নাথিরে চা ছেড়ে দিল। তাবটার বোধ হচ্ছে বেন কান পেতে রয়েছে উত্তরটা। কী হয়।

তড়িং বলল—“যেতে হবে না?”

সরোজিনী ঘুরে বলল; বলল—“না, বাওরার তো কথাই আসে না এই জুর্ধোগ মাঝার করে, তোমার এ-আলাদা কাজও ছাড়তে হবে, ঠাকুরপো।। কাজ বলব কি আদাড়ে নব বলব তাও তো বুঝতে পারছিনে, অল্প উপার থাকতেও যেমন কারভে পড়ে আছে।...কিন্তু ধরো যদি অল্পখের পড়ে গেলে, বিশেষ-বিড়ুট, কেউ আত্মীয়-বন্ধন কাছে নেই...”

“এর চেয়ে আত্মীয়-বন্ধন আর কোথায় পাব?” —একটা কথা বলতে গেরে বেন বাঁচল তড়িং। সমস্ত ব্যাপারটুকু হাসপাৎ করে দেওয়ার জন্য ছুড়ে দিল—“কটা আত্মীয়-বন্ধন ডেকে একেবারে বেসেলে ঠাই দেয়?”

সরোজিনী চা চাকতে-চাকতে বলল—“তা বেশ তো, এমন আত্মীয়-বন্ধনের কথাও তো পোনা উচিত; চোড়ে লাগ একাকার।”

“আপনি বললেন—যদি অল্পখের পড়ি তো দেখবে কে...”

“তা! অল্পখের না পড়লে চলবে না?”—চাটা হাতে তুলে দিতে দিতে বলল সরোজিনী। রতি টিঙ্গনী করল—“বাঃ, কত আত্মীয়,—পরীক্ষা করতে হবে না ভালো করে?”

চারে চুপক দিয়ে ওর দিকে চোখ তুলে চেয়ে হাসল তড়িং।

অখিল এসে উপস্থিত হোল। কারবারার ছিল, সেখান থেকেই তড়িংকে এদিকে বিকশা নিয়ে আসতে দেখেছে : একটা কাজে আটক ছিল। ওসেই উত্তর প্রশ্ন করল—“খুব জিক্রে গেছ নিতম্ভ?”

সরোজিনী বলল—“বেনি আর কৈ? এখনও নব খেটেনি, বাসার বাবেন বলছেন।”

“সেকি!”—বলে এককম নিউরে উঠল অখিল; বলল—“বাওরার তো কথাই ওঠে না এ-রাসে,—আর পো-টাক লখ—আমি আর একটা কথা টিক করে বেগেছি তড়িং, তোমারও ও-বাসাও ছাড়তে হবে।”

“ও-বাসা ছেড়ে...?” প্রশ্নটা অর্ধেক লখে ছেড়ে দিল তড়িং।

অখিল বলল—“ও-বাসায় আসা। অবশ্য এও জানি ছুদি তাতে বাধী হবে না, হোলো বিকশা ছেড়ে ইঁশনি নিতে বাধী হতে। তবে আমি ভার ব্যবহাও টিক করে বেগেছি। আমার বেশ একটু অংগও বাড়বে থাকান থেকে।”

তড়িং খুব তুলে চাটিল।

“বাইরের ঘরটা তুলছি তো। ওর সঙ্গে আরও দুগুনো ছোট ছোট ঘর জুড়ে—তাঁড়ার আর গাছাঘর—চারিদিকে একটা মেঘাল টেনে আলাদা বাসাই করে দিচ্ছি তোমার। এসে থাকো, চাড়া লাগে। আর আগন্তি থাকতে পারে না।...না, আর ছাতটাও পেটাব না এখন। তাড়া বেনি পড়ে বাবে...”

সরোজিনীকে সাক্ষী মানল—“কি গো!”—

সরোজিনী মাথা নীচু করে তনুচিল, একই মূণ টিপে হেঁপে বলল—“তা বইকি, এমন কি আত্মীয় যে চাড়ব আমরা?”

আম্বলখটা অনেকদিন চালিয়েছিল তড়িৎ। তারপর বড় ঘরটা শেষ হয়ে যখন তাঁড়ার-রাশাঘরের দ্বন্দ্বন খোঁড়া হবে, অধিলকে বলল—“দাদা, আর কত লজ্জা দেবেন ছোট ভাইকে?”

এসে উঠল ঘরটাতে।

ঐ পছন্দই অদৃষ্ট; আর সব ব্যবস্থা নিজের। সব ব্যবস্থা বলতে প্রধানত আহাংয়ের ব্যবস্থা; সেটা আগের মতো কুকারেই চলছে। ঘরটা বড়, ক্যাবিনের পার্টিশন দিয়ে হাত-ধিনেক চওড়া একটা ফালি আলাদা করে দেওয়া হয়েছে, তাতেই তাঁড়ার, তাইতেই কুকারটা পাকনাদায় কাজও করে বায় আপন মনে। এদিকটা তড়িৎয়ের চৌকি পাড়া, একটা টেবিল, দেবদারু কাঠের শেল্ফকে বই, একটা লোহার চেয়ার।—ঘরটি বাড়ি থেকে কি ভেবে একই আলাদা করেই ভেঙেছিল অধিল, হাত-চোয়নের একটা ব্যাঘ্রা দিয়ে মূল বাড়ির সঙ্গে যোগ করা; এতেও পার্থক্যের ভাবটা বজায় রয়ে গেছে।

মিটে আসতে লাগল পার্থক্যটাই। জোর করে আপন হয়ে যেমন যাচ্ছে পড়া হয় না, তেমনই আবার সহজে আপন হয়ে গিয়ে তো ঘুরে পড়ে থাকারও কঠিন। একদিন ও-বাড়ির বাইরের ঘর থেকে ছেলেমেয়েদের পড়ার চৌকিটা এ-ঘরের একপাশে এসে উঠল, টেবিলের পাশে বিঘলের পড়বার চেয়ারটা, তড়িৎয়ের শেল্ফের পাশে, বিঘলের বইয়ের শেল্ফটা এসে হাজির হোল। পড়ার হাঃখটা মিটে গিয়ে ও-ঘরটা খাঁট খাঁট কখনো হয়ে উঠল।

অধিল বলল—“এ-বে উট উৎপত্তি হোল, তড়িৎ। সেখানে যেটুকু সময় পাচ্ছিলে তবু নিজের করে পাচ্ছিলে।”

সেটা অস্বস্তি করে ছেলে দিয়ে সেটা বলতে পারল না তড়িৎ—একই সময় দিয়ে বহি এতগুলিকে নিজের করে পাওয়া যায় তো দিতে হয় না?—মূণ ফুটে কিন্তু বলা যায় না; বলল—“সবই তো নিজেরই হইল, অধিলদা; ও আর কে কেড়ে নেবে?”

অধিল ওর কোন কাজেই বাধা দেব না, হেসে বলল—“বেশ, যেমন বোঝ।”

আর দ্বিধাবোধ-দ্বিধাবোধ নয়, বিঘলকে পড়ানোটা নিয়মিত হয়ে গেল। বকালে ছাত্র-শাস্ত্রাট এলে ওরা বাবান্দার ঘেরিয়ে যায়। তড়িৎ কুকারে বাজা চালিয়ে ভেতরে নিজের বই নিয়ে বসে। সে চলে গেলে, বিঘল

ভেতরে এসে তার চেয়ারটিতে বসে যায়। বাকী সব ভূটি শেষে চলে যায় বাড়ি।

বাড়িতে সেক-খাটা সবাই অস্বস্তি করছিল, সরোজিনী একদিন সেক-খাটা প্রকাশ করেই বলল, হুতোম অধিলের নির্দেশেই—“ঠাহুরপো, আমার শান্তনু মাংস, যা মনে হচ্ছে যদি ভাই, তারপর তোমার যেমন অভিকৃতি। অধিষ্টি আগেও বলা হয়েছে—”

তড়িৎ হেসে বলল—“বলুন।”

“আর হাত পুড়িয়ে এরকম ভাবে কতদিন বাড়ে? চোখের আড়ালে হচ্ছিল, দেখতে হচ্ছিল না, সে এরকম ছিল—”

তড়িৎ যেসেই বলল—“হাত যদি মোড়ে, সে তো বড়ির হাত, বৌদি—”

“বড়িই বা সবটুকু করতে পায় কোথায় সব দিন? দিয়ে বেশে নিজের চালিয়ে দিয়েছে কখন? না-হয় নিজের নামিয়ে নিয়ে বলে গেছে যেতে।—দ্যাক সে কথা, এটা তো অস্বীকার করতে পারো না যে, বিঘলের ভারটা নিজের কাঠেই নিয়েছ এরকম তুলে—”

“অস্বস্তি একটা ভার!”—বলে একই চূপ করে দাঁড় তড়িৎ, তার পর আবার বলল—“তাও কোথায়? মাষ্টার তো এসে পড়াচ্ছেই বইকি।”

“কার পড়ানোটা আসল তা কি আমরা বুঝি ঠাহুরপো? বিঘলও বলে। তাই বলছিলাম যখন নিয়ে ভার তখন পুরোপুরিই নাও-না কেন?”

নিরন্তর ধেবে বলল—“তোমার আপত্তিটা কোথা বোধ হয় আশঙ্ক্য করতে পারি—বসন্তের চাকরিটা যাবে ছেলে পড়িয়ে নিজের পড়া চালাচ্ছে বেচারি। কিন্তু ত কেন? ও যেমন কবি আর অলককে পড়াচ্ছে তেমনি পড়াতে—বই বাড়ছে ওর, বেশি সময় লস্কায়ও তো বিঘল পুরোপুরি তোমার হাতে থাক।”

“একটা আপত্তি না হয় ঐ করে মিটল, কিন্তু আরও তো থাকতে পারে, বৌদি।”

“কি, বলো।”

একই লক্ষিতভাবে চোখ তুলে হাসল তড়িৎ বলল—“পুরো ভার নেওয়া যান উটটারি সবছে এনে ফেলা তো? পড়ার, তার বললে যেতে পার, থাকতে পার। আমি কিন্তু দে-দবন্ধ নিয়ে এ-বাড়িতে আসিনি বৌদি। তার পর, যা শেষেছি তাতে ও-লস্কায়ের সময় লোড নেই আমার। যেমন আছি থাকতে দিন-২ আমার।”

আবার একটু হাসল।

পাত

হুজুমেট একটু মুগ্ধ হয়ে বসল। ঠিক হাঙ্গি নদ, একটি নির্বিড় তটস্থি শব্দে জিনীর সুখানি আসলে করে দিয়েছে, এক সময় দাড়টো একতিকে একটু হেলিয়ে নিয়ে বলল—“কী এমন রাজ্যশক্তি পেয়েছে তুমি, ধন্যবোধের হাতে...বেশ, যেমন লক্ষ্য সেইভাবে থাকো।” আশান ভাবো বলেই দেখে কষ্ট হয়—কৃষ্ণের বা কৃষ্ণ, এক কোণে রয়েছ বলে ঘরের ছাড়া নেই...”

“না বোদি, ঘন-ভাড়া আমি আর দিতে পারব না, অবিরতকে তুমি বলে দিও...”

—এর কথাই বলে দিয়ে এমনভাবে চমকে উঠে কথাটা বলল তুমি, আশ্চর্য্যিত ও ভর দূরে এমন অসুস্থ ধরনের যে, সর্বোচ্চ একটু বিশিষ্টভাবে গোয়েটী নিলখিল করে হেসে উঠল, এর স্মৃতিও একটু গোপন্যে হয়ে গেল—“ওমা, কেন!”

শব্দে নিতে বাজিল, তার আগেই তুমি সেইরকম বিপর ভাবে বলল—“না, বোদি, একে তো দিতে আমার হাত কাপছিল, তার উপর উনি বুঝে এমন বলল করে—একটু হেসে হাতটা বাড়িয়ে ধরলেন যেন—যেন—না বোদি, ভাড়া আমি দিতে পারব না এমনি থেকে...”

এর পর কবে কি করে রাস্তার কুতরাই সম্পূর্ণ হস্তির এলাকায় চলে গেল, তারপর সেখান থেকেও কোথাও অনুশ্রুত হয়ে গেল তার আর কোন হিসাব রাখা হয়নি।

বর্ষের রিকশার কামাটও হয় মাঝে মাঝে। এইরকম দিনে শুধু যে বাইরের সঙ্গে সখ্য ছিল হয় তাই নয়, বাড়ির সঙ্গে যোগাট হয় আরও নির্বিড়। এবার বর্ষাটা পড়েছেও বেশি করে। একবার যদি আরও হোল তো আর বাহ্যেই চায় না; চাওনি, পাওনি, সাওনি—চলেছে তো চলেছেই। দিনের বেলায় যদি-বা একটু ধরন হোল, সন্ধ্যা থেকে তো আর বিদ্যে নেই।

সবই বেশ ক্ষম বলে, তড়িতের ঘরে, কি বাইরের ঘরে, গল্পভর্য্য হয়, কাগজ খোলা চলে। চাপানের সমুদ্রটা শীতল হাওয়ায় রাস্তাঘাটেই কমে ভালো। তড়িৎ অহুযোগ করে—“রিকশাটি বের করতে বাব, অধনি বেন টনক নড়ে আশাশ, একে বন্ধি বলব না পৌঁছি...বুঝ চিলে চিলে হাঙ্গি বো?”

হঠাৎ চোখ কটে বলে—“আমি আশাশের দিকে। অধনি তো ছাড়ব না বল অহুযোগ...”

হয়তো যেতোই ছেড়ে। প্রয়োজন এসেছে কমে, তার উপর বর্ষায় প্রায় নিয়মিত কামাইয়ের ক্ষেত্রে অভ্যাসটাও অনেকখানি শিথিল হয়ে এসেছে; আস্তে আস্তে বোধহয় ছেড়েই যেত, এমন সময় একটা ঘটনার অবস্থাটা আবার পালটে গেল।

বর্ষা শেষ হয়ে গেছে, কার্তিক মাস, পূজার আর অল্পদিনই আছে। এই সময়টা রীতির ‘সিঙ্ক’, চারিদিক থেকে নানারকম লোক এসে পড়ে—স্বাস্থ্যসেবণে, বেড়াতে। বিশেষ করে বাঙালীর জীবনে একটা স্পন্দন আসে, নানারকম আমোদ-অমৃতাঁন, বক্তৃতা প্রভৃতির ধূন পড়ে যায়। তড়িৎ যদি সন্ধান পেল তো বক্তৃতাগুলো বাদ দেয় না।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অ-বাঙালী পাড়ার একটা স্ট্যাণ্ডে রিকশা নিয়ে একটু অগ্নমন্য ভাবে অপেক্ষা করছিল, হুটী বাঙালী ভ্রমলোক একটু হস্তবস্ত হয়ে এসে উপস্থিত হোল; একজন প্রশ্ন করল—“কেয়া যায়গা?—রামকৃষ্ণ মিশন?”

অগ্নমন্য ছিল বলেই তড়িৎ একটু যেন চকিত হয়ে উঠে প্রশ্ন করে ফেলল—“কেয়া স্থায় উহা?”

উত্তর হোল বেশ একটু বিরক্তিশূচক—“খোলে কচু-পোড়া! কেয়া স্থায় উস্বে তোমহারা কেয়া? লেকচার স্থায়, বুঝা? তোম যায়গা কি নেহি বোলো না।”

“নেহি।”—হঠাৎ প্যাডেলে একটা চাপ দিয়ে রিকশাটা রাস্তার দিকে বোলাল।

আর রিকশা নেই। সন্ধ্যাটি একটু অর্ধবর্ষ হয়ে বলল—“বড় ঘেরি হয়ে যাচ্ছে, না হয়...”

প্রথম ভ্রমলোকটি বলল—“বাতি কেয়ায়া দেগা...ডবল...”

“নেহি”—বলে তড়িৎ ততক্ষণে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে; কোরে চালিয়ে দিল রিকশা। নিত, ঘেরি হয়ে যাচ্ছে শুনেই আর নিল না। হুটী আরোহী, আবার হুটীই বেশ ছটপুট।

হালকা গাড়ি খুব কোরে চালিয়ে অগ্নমন্যয়ের

মধ্যেই গেল পৌছে। রিকশাটার তাল লাগিয়ে ভেতরে গিয়ে লোকচার স্তনতে বসে গেল। অষ্টোত্তম থেকে একজন সন্ধ্যাসী কলকাতায় যাওয়ার পথে নেবেছেন, তিনিই হচ্ছেন বক্তা : ভীড় হয়েছে।

বেশ মনোজ্ঞ বলবার ঢং, ভেমনী পাণ্ডিত্য। নিকটাত হয়ে একমনে শুনছিল তড়িং, ধারেরই বসেছিল, একটা বিরতির মুখে হঠাৎ দৃষ্টিটা দূরে মাকামাখি একটা জায়গায় গিয়ে পড়তে সমস্ত শরীরটা যেন ওর হিম হয়ে গেল।

সেই মেয়েটি ; নামটা মনে আছে—মল্লী।

ঠায় ওর দিকে তাকিয়ে আছে মল্লী, বড় বড় চোখদুটো কোঁড়হলে যেন অলসে ; বেশ বোকা যায় তড়িতের মনটা যে পরিমাণ বক্তার দিকে, ওর মনটা সেই পরিমাণ বক্তা থেকে বিচ্ছিন্ন। পাশে একজন গৌরবাস্তি-বৃদ্ধ, মল্লী যেমন তাঁর কাছ ঘেঁসে বসে আছে, বৃদ্ধের আর বাকি থাকে না ইনিই ওর সেই অভিভাবক, জ্যাঠামশাই।

বাঘও নয় ভালুক নয়, কিন্তু যে বিপুল আগ্রহ নিয়ে চেয়েছিল মল্লী তার জন্ত এবং নিশ্চয় এই জ্যাঠামশাই সঙ্গে থাকার জন্তও, প্রথম থাকটা সামলে ওঠার পরও অশ্রুতি কোনমতেই কাটিয়ে উঠতে পারল না তড়িং। চোখ ঘুরিয়ে নিয়েও কয়েকবার আবার দৃষ্টি-বিনিময় হয়ে গেল, বেশ মনে হোল মল্লী ফেরায়নি চোখ। ধারেরই বসে ছিল তড়িং, একসময় আস্তে আস্তে উঠে পড়ল।

খানিকটা গিরে অনিচ্ছাসবেও একবার ঘুরে দেখে, ওরা দুজনেও উঠে দাঁড়িয়েছে।... বেরিয়েও আসছে ভীড়ের পেছন দিয়ে। মল্লী রগ-দুটোর আগুন টিপে এমন একটা ক্রান্ত ভাব মুখে টেনে এনেছে, বেশ বোকা যায় মাথা-ধরা বা মাথা-ঘোরার গুলুহাত করেছে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে। তড়িং যতক্ষণ বাইরে এসে রিকশার তালা খুলছে, ততক্ষণে ওরা দুজনেও বেরিয়ে এসে পাশে দাঁড়াল।

মল্লীই প্রশ্ন করল, হিন্দীতেই—“কেয়ায় বায়গা?”

তড়িং মাথা নিচু করে আলোটা আলছিল, ঘাড়টা তুলল, একটা অকৃত ধরনের দৃষ্টি-বিনিময় হোল দুজনে। গোটাকতক মুহূর্ত বেরিয়ে গেল মাকামান দিয়ে, তারপর আলোটা আলতে-আলতেই তড়িং ছবাব দিল—“বায়গা।”

উঠে বসল দুজনে। তড়িং রিকশাটা ঘুরিয়ে চালিয়ে দিল।

“তোমার মাথাটা ছাড়ল, মা?”—খানিকটা গিরে বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন।

“হ্যাঁ, ছেড়েছে।”

“জেরা জোর কর দেও ভাইয়া।”—

বৃদ্ধের অনুরোধে তড়িং পা চালিয়ে দিল। বৃদ্ধ বলেই চললেন—“বেশ ভীড়।...তা হোক, হবেই ; কিন্তু অত আলোর ছড়াছড়ি কেন এটা আমি বুঝি না। মাকামানে একটা আলো থাকলেই যথেষ্ট, তারপর এমন চমৎকার জোয়ার তো রয়েছেই। এই ধরনের বক্তৃতায় ঠিক উপযোগী হোত পরিবেশটি ; তা নয়, খানিকটা শো (show) এখনও থাকা চাই।...কেমন যেন একপেশে হয়ে পড়ছে না আমাদের জাতীয়-জীবনটা—তোমার কি মনে হয় মল্লী-মা ?—যে ধরনের দিকে এগুবে তার এসম্প্রতিক সেলটা থাকবে না, যে সাহিত্যের দিকে এগুবে তার নীতিজ্ঞানটা জলাঞ্জলি দিতে হবে...এমনটি কিন্তু ছিল না এদেশে আগে...”

বয়সের দোষেই বোধহয় বকেন একটু বেশি। বক্তার বিষয়টাও পড়ল এসে—বিষয়বস্তু, ভঙ্গি, জ্ঞানবত্তা,—আলাপটা কিন্তু একতরফাই প্রায়। তড়িং বৃদ্ধে, মল্লী স্বভাবতই খুব অনমনস্ক, উত্তর দিলে ঘটটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে—“হ্যাঁ—না—তা বইকি—তা ভিন্ন আর কি ?”—হু’একবার টপটা-পাটাও করে ফেলল। বৃদ্ধ সংশয় প্রকাশ পর্যন্ত করলেন—“মাথাটা কি তোমার ভালো করে ছাড়েনি মা এখনও ?”

“ছেড়ে গেছে তো জ্যাঠামশাই। তাবছলান
কী শুল্লর বকুতটা দিলেন স্বামীজি—উঠে আসতে
হোল—এখন আপনোস হচ্ছে।”—বেশ সতর্ক হয়েই
উত্তরটা দিল। ডেই করে রইল ও খানিকটা সতর্ক
এবার। তবে আলাপটা একতরফাই চলল, তারই
মধ্যে রিকশাটা এসে বাড়ির কটকের সামনে
পাড়াল।

বুদ্ধই আগে নামলেন, মনিবাগটা বের করে প্রশ্ন
করলেন—“কেননা লেগা?”

উত্তরের আগে মন্সীর কথা এসে পড়ল। নামতে
যাচ্ছিল, একটু থেমে গিয়ে বলল—“আমি বলছিলাম
এক কাজ করলে হয় না জ্যাঠামশাই? যখন
সকাল-সকাল চলেই আসতে হোল ওখান থেকে,
তখন মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে যদি ঘুরে আসি
একবার? রিকশাটা তো রয়েছেই।”

বুদ্ধ একটু ভেবে নিয়ে বললেন—“তা মন্স কি?
নাথোটা ভালো করে ছেড়েও যার; ঘরের মধ্যে
গুনেটাই তো।”

তড়িৎক প্রশ্ন করলেন—“যায়গা?”

চিহ্নাধারাটা বেশ একটু আতর্ক সৃষ্টি করেছে
চলছিল তড়িতের মনে। মন্সী যে আরও জানতে
চায় ওর সম্বন্ধে এটা বোকা যায়, যেন খুঁজছিলই;
ওর কোতুলকতা মার্কিনীয়ও; হিন্দীতে প্রশ্ন করায়
বিষাদের সঙ্গে ওর প্রতি একটা জ্বাও আসে;
কিন্তু সেই জ্বাও—জ্বাও আসে বলেই আবার
লুকোচুরিটা কেমন যেন ভালো লাগছে না—এ
হিন্দী বলাটাই, তারপর আবার এই একটা ছুতো
করে বেরিয়ে যাওয়াটা।

সোজা বাংলাতেই দিল উত্তরটা—

“আমার আর আপত্তিটা কি বলুন? ভাড়া
পেলেই হোল।”

বুদ্ধনই বিস্মিতভাবে চাইল, মন্সীর বিষয়টা
বুদ্ধের চেয়ে কিছু কম নয়। প্রশ্নটা করলেন অবশ্য
বুদ্ধই—

“তুমি বাঙালী?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“বাঙালী বাঁচিতে কেউ রিকশা চালায়—বানে
শরীরের মেহনৎ করে জীবিকা উপার্জন করে নিজের
—জানতাম না তো আমি!”—বিশ্বয়ের সঙ্গে
প্রশংসায় দুটিটা উচ্চল হয়ে উঠেছে।

মন্সী সুযোগটা ছাড়ল না, যদিও তার দরকার
ছিল না কোন; বলল—“কেউ আপনাকে বলবে তবে
তো জনেবেন জ্যাঠামশাই।”

“হ্যাঁ, তাহো বটেই।—বেশ বেশ, জাতটা
জ্ঞানের মর্দা। তুলে কোথায় যে নেমে গেছে—
সৈনিক জ্ঞানের কথা বলছি—এমনি তো দশটা-পাঁচটা
কলম পিছতে এ-জাতের ছুড়ি নেই—তাহলে তুমি
বাঙালী?”—সেইরকম প্রশংসায়—বিশ্বয়ে চেয়ে
বুটলেন।

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“কি নাম?—কর কি?”

মন্সী কোতুলক উৎকর্ষ হয়ে একটু চুপ করে
রইল মাথাটা নীচু করে, কয়েক সেকেন্ড, তার মধ্যে
উত্তরটা না পেয়ে বুখটা তুলে বলল—“সে-সবের
দরকারটা কি আমাদের জ্যাঠামশাই? বাঙালী,
যে কোন কারণেই দরকার হওয়ায় রিকশা-টানাটাকে
ছোট কাজ মনে করেন না, এই তো যথেষ্ট—”

একটু অপ্রতিভ হয়ে উঠলেন বুদ্ধ; বললেন—
“তাহো বটেই, তাহো বটেই। না, আমি বলছিলাম
—আমেরিকার অনেক ছাত্র কেতে-ফাষ্টারিতে
রোজগার করে নিজের পড়ার খরচ চালিয়ে নেয়,
যদি...”

বোধহয় আশ্চর্যটা খুব কাছাকাছি এসে পড়ার
জন্ত, তড়িত প্রশ্ন করল—“বাবেন কি উনি কোথায়
বলছিলেন?”

“বাবে মা মন্সী? আমি বলছিলাম না-হয়
ছেড়েই গিছে আজ। নেহনৎ হয়েছে, ওখানে ঐ
অবস্থা, তারপর এতটা পথও তো, বোধ হয় একটু
চাটা খেয়ে নিয়ে বাসান্দার বসলেই ভালো হোত,
চা কিংবা সরবৎ...”

উদ্বেগটা বুঝতে পেরি হোল না মল্লীর, আনন্দ-উত্তেজনার গলাটা যেমন কেঁপে যাচ্ছে ঐর। ওরও চেষ্টা যদি আটকাতে পারে তড়িৎকে; একটু হেসে বলল—“আনার আর মেহনৎ কি জাঠানশাই? এতটা পথ রিকশা টেনে নিয়ে এসেও তো চলে যাচ্ছে লোকের।”

বৃদ্ধ তড়িৎের দিকে চেয়ে বললেন—“তা যাচ্ছে বৈকি, তা বলে নেহনৎ কি কম হচ্ছে!...তুমিও না হয় একটু জিরিয়ে চাটা খেয়ে যাও না।”

তড়িৎও হেসেই উত্তর করল—“বেহনৎ—এটা তো আমার অব্যাস। বরং জিরুনো, চা খাওয়া—এইটেই বন অব্যাসের মধ্যে পড়ে, কে আর ডেকে অত খাতির করছে বলুন না? খাটিয়ে ভাড়া দিতেই শুইপাঁই করে।”

এবার সোজাযুক্তি একটু চাপাচাপিই করে বললেন বৃদ্ধ; বললেন—“তবু একটু যাও-ই না হয় বসে, মল্লীর ইচ্ছেটা বোধহয় তাই। আর একবারেই তো একটা অব্যাস হয়ে যায় না।”

একটা মোত হচ্ছেই তড়িৎের; সংসঙ্গ, বিশেষ করে সেখানে তার রুটিটাও অমরোদন পাচ্ছে এরকম করে; তা ভিন্ন মল্লীরও আর একটা দিক দেখছে তো, বিধা সরে গিয়ে কোতুলটা উঠছে জেগে। তবুও চুপ করেই কি বলবে ভাবছিল, তার আগে মল্লীই বলল—“মল্লীর ইচ্ছে-অনিচ্ছের কি আছে এতে বলুন? আসেন উনি, চা ডেলে আপনার সঙ্গে ঠেকেও দোব। তবে চাইবেন কি আসতে? আপনি এখুনি আবার একরাশ প্রশ্ন করে বসবেন—কি নাম, কার ছেলে, কোথায় বাড়ি, কি করেন—যা উনি বোধহয় চান না...”

তড়িৎ হেসে বলল—“নাম আমার তড়িৎকুমার...তড়িৎকুমার মিত্র। বাড়ি বর্ধমান...”

একেবারে হকচকিয়ে গিয়ে মল্লী ওর মুখের দিকে চাইল, পরক্ষণেই সচেতন হয়ে উঠে যেন নতুন কিছু হয়নি এইভাবে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে হেসেই বলল—“তারপর আপনি এখন এই নিয়ে সবার কাছে আলোচনা করবেন...”

তড়িৎই হেসে বলল—“আলোচনার যুগি এমন

কিছু নয় বলেই লক্ষ্য আর আপত্তি।...তাহলে বসতেই বলছেন একটু?” রিকশার মুখটা ঘোরাল।

ফটকটা ভেতানই ছিল, ভিটকিনিটা খুলে পাশা দুটো ঠেলে দিয়ে বললেন—“হ্যাঁ হ্যাঁ, এসো...কি জানো?—কোনটে আলোচনার যুগি কোনটে নয় কিছু কি বলা যায়? এতাহাম সিনকলুন প্রধান বয়সে নিজের জুজি উপার্জন করবার জন্তে কী-না করেছেন?—কোন কাজকেই তো ছোট মনে করেননি। তার পর একসময় তিনিই হলেন কিনা অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট!...নাম শুনেছ বোধহয়?”

তড়িৎ প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। গাড়িবারান্দায় এসে পৌছেছে, রিকশাটা ছেড়ে দিয়ে ঠেঁসের সঙ্গে বারান্দায় উঠতে উঠতে হেসে বলল—“তত বড় কেউ যখন হব তখন তো আলোচনা করে নাম বের করতে হবে না...”

মল্লীও লঘুভাবে হেসেই সমর্থন করল—“ঠিক তো, তখন নাম বের হওয়ার জন্তেই আলোচনা তবে—আলোচনার হিসেব থাকবে না।”

বৃদ্ধ বললেন—“না, আনার বলার উদ্বেগটা হচ্ছে, এই ধরনের ছেলেরাই এগিয়ে যায় জীবন-সংগ্রামে নিজের পথ করে। সবাই অবজ্ঞা যে প্রেসিডেন্ট হচ্ছে এমন নয়...”

মল্লী আরও লঘু করে দিয়ে বলল—“আর প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্তে সবাইকে রিকশা চালাতে হবে এমনও তো নয়।...আপনারা বহুন, আমি চাওয়ার ব্যবস্থাটা করে দিয়ে আসছি এখুনি।”

অনেক রাত পর্যন্ত গল্প হোল। বক্তা প্রায় আগাগোড়াই বৃদ্ধ নিজে। আলোচনাটা প্রধানত বাঙালীর অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে। তড়িৎ বোধহয় প্রধানদিন বলেই আলোচনার বিশেষ যোগ না দিয়ে একরকম নীরব শ্রোতা হয়েই রইল; কতকটা নৃপরিচিতকে বৃদ্ধ যাওয়ার মনোভাব নিয়ে। মল্লীও একরকম নীরবই রইল, তার কারণ তাকে সতর্ক থাকতে হোল বৃদ্ধ অবাকিত প্রশ্ন না করে বসেন হঠাৎ। বার তিন চার কথার মোড় ঘুরিয়েও দিতে হোল তাকে। [ক্রমঃ:]

রূপান্তরায় ঐশ্বর্যবিশ্ব দায়গুণ

বিশ্ববাস্তবের পুণ্যে কথা। একদিন সকালের দিকে পরবর্ত্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি গিয়াছি কবিশেষর কালিদাস রায় মহাশয়ের সঙ্গে। কেলিয়ার পরবর্ত্ত একটি আরাব-কেন্দ্রায় বসিয়া সপক্ষে গড়গড়া টানিতেছেন, দমিত তখন সেটার উপরে কলকে ছিল না, কলকেটি তখনও প্রবৃত্তমান।

কালিদাসবাবুকে দুই হঠাতে দেখিয়াই পরবর্ত্ত বলিলেন,—‘এদে কালিদাস, এদো : তোমরা ত তখন আর আমার তেমন ধব-পতনও নাও না : সেদিন তো ভায়া একেবারে মরতে মরতে বেঁচে গেছি।’

কালিদাসবাবু অশ্রুত কণ্ঠে বলিলেন,—‘সেকি বাবা, কোনও আকৃষ্টিতের নাসি?’

‘আকৃষ্টিতের বাড়া বে : সেট তোমাদের প্রকাত এক অধ্যাপক, আমার ক’রে ডেকে নিয়ে মাল্যস্বনে ছুঁবিত করে কগো বসিয়ে বসিয়ে : তারপরে জান হে—হুট গালে জু বাজড়।’

‘কি বে আপনি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না।’

‘আর বুঝবে কি হে ভায়া,—কেন্দ্রায় এক পরবর্ত্তও আমার মাথায ঢোকে না, সেট কথা যদি কেউ আমাকে ধ’রে বেঁধে সবানে তিন ঘণ্টা ব’সে শোনায তবে ডাকে গালে বাজড় বলব না ত আর কি বলব?’

ঘটনাটি আমি জানিতাম। পাণ্ডিত্যে এবং মনীষায় সর্বজনবিস্তৃত এবং সর্বজনপ্রচেষ্ট জৈনক অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথের একখানি কাব্য-গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন : একটি সাহিত্য-সভা আম্বান করিয়া পরবর্ত্তকে তাহাতে সভাপতিয়ে বরণ করিয়া প্রবন্ধটি অনেকক্ষণ ধরিয়া পড়া হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধটি অন্তর্জন ধরিয়া পঠিতে বে পরবর্ত্ত কি অবশিষ্ট বোধ করিতেছিলেন তাহা তাঁহার একটি তাকিয়া অবগদনে প্রাক্তভাবে ছিঁকুঁ করিবার ভিতরেই পরিবৃত্ত ছিল।

বক্তৃতা বা তথ্যোচ্চারণ প্রতি একটা বিশেষ বিব্রততা পরবর্ত্তের ঐষ্টই বে প্রথম দেখিয়াছি তাহা নয়। আরও হুই—একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আমি তখন স্টাট চার্ট কলেজে বি.এ. পড়ি। শারদীয়া অবকাশের পূর্বে কলেজে একটি শ্রীতি-সম্মিলন অধিষ্ঠিত হইতেছিল, প্রদান-অতিথি পরবর্ত্ত। পরবর্ত্ত প্রদান-অতিথি বসিয়া সভায়

হলে সেদিন ত্রিশসংখ্যেরও জায়গা ছিল না : নির্দিষ্ট সময়ের বহুর্বেই সভাগৃহ একেবারে ঠাসা। তাৎপরে অম্বটান আন্ত হইল, হুইকটি সঙ্গীত এবং বাসন্ত-ভাষণের পরই পরবর্ত্তের বক্তৃতার পালা। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতেই অতদন্ত হুগটি একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল : সভাগৃহের নিছনের বেজিতে বসিয়া অক্ষুটবরে আচমকা সুহু-বিজাল ডাকিয়া-ওঠা ছেলেডলিও তাহাদের হুভাব ছুদিয়া গিয়া চুই ও কণ্ঠকে হুতটা হুতব হুিরবন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে আকিয়ারের ত্রিব অতিথির প্রতি।

পরবর্ত্ত ভাষণ দিতে উঠিয়া বসিলেন,—‘বাবাজীরা, তোমরা আমারে তোমাদের মধ্যে ভেবে কেনেছ, তাতে ভালই লাগছে। আমার জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা—এং বিচিত্র ধরণের : তোমরা নিচ্ছই তার কিছু তখনে চাও। আমি যাক্কে আমার জীবনের সব চেয়ে বড় যে অভিজ্ঞতা তার কথাই তোমাদের কিছু বলছি। সে অভিজ্ঞতাটা হ’ল এট বে, বহন কলম নিয়ে দিগতে বসি তখন আমার মনের কথাগুলো সব হুই, হুই, ক’রে এগিয়ে আসতে থাকে,—আর বহনই বক্তৃতা করতে উঠি তখন আমার মনের কথাগুলো কেবলই হুই, হুই, ক’রে গেদিয়ে যেতে থাকে।’ আর বেশি কথা না বলিয়া পরবর্ত্ত অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

আর একদিন তাহাকে দেখিয়াছি পলিকাতায় আন্তোব কলেজে। তখন আন্তোব কলেজের নতুন বাড়ি হয় নাই : ব্যাচার পূর্ব গানের সেই পুরনো বাড়ি, তাহারই প্রাক্ষণে সরকীপুজার পরে শারবন্ত-সম্মেলন, দিবর ‘ছোটগানের উত্তর ও কুম-বিকাশ’, সভাপতি পরবর্ত্ত। অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রবন্ধপার ও বক্তৃতা চলিতেছে—গবেষণা ও বিশ্লেষণ—কি করিয়া ছোটগানের আসন্ত হইল, শি করিয়া তাহা বাড়িল। তদ্বিহা তদ্বিহা শরতের চক্রটি প্রাক্তিতে ও বিব্রজিত বেন ‘বিমানী-সুহেলি-নাথ’ হইয়া উঠিতেছিল। সেবিদায় একটি বসিক্তন্ত সেই শারবন্ত-বাসরেই একছিদুম তামাক-সাকার একটি গড়গড়া পরবর্ত্তের হাতের কাছে আগাইয়া দিতেই তিনি স্বকির নিঃবাস কেলিয়া নলটি ধরিয়া টানে টানে মুখমণ্ডল সুওলী-পাকানো বক্তৃত্ত হোয়ার হোয়ার বহিরাবিত্ত করিয়া ছুদিত লাগিলেন। সব প্রবন্ধ-বক্তৃতা শেষ হইয়া গেলে

এতবারে সভাপতি হ'ল। গড়গড়ার নলটা নুহ হইতে তুলিয়া তিনি বলিলেন,—‘স্তম্ভরূপায়ণ, আপনারা এতক্ষণ হ'রে যত প্রবন্ধ পাঠ করলেন ও নক্সা করলেন, দস্তি বসলে আমি তার সবটা শুনি নি—আর শুনেও বুঝতে পারি নি। আপনারা বহুলাংশে যে-সব কথা বলেছেন তা সভ্যও হ'তে পারে, বিখ্যাও হ'তে পারে, তার কোনওটাই আমার তেমন আগতি নেই। তবে আমাকে যদি আপনারা জিজ্ঞেস করেন যে কি ক'রে এমন স্তম্ভর ক'রে গল্পগোলা আরম্ভ হ'ল তবে আমি বলব, যখন কোনও লোকের মনে একটি বা কয়েকটি লোকের মূখ চেয়ে উঠতে থাকে তাদের গল্প বলে শুনি করতে মনের মধ্যে বেশ একটা তালিধ আসতে থাকে তখনই সেই লোকটি ভারি স্তম্ভর গল্প তৈরী ক'রে ফেলে—হয় মূখে মূখে—না হয় লিখে লিখে।’

ছোটসন সবচেয়ে পরওস্তের এই উক্তি কতখানি সভ্য বা বিখ্যা সে-আলোচনাটাই এ-প্রশ্নে বড় কথা নয়, বড় কথা ছিল মাহুদ-হিসাবে পরওস্তের ধাতট। পৃথিবীর এইজাতীর লোকগুলি একটা সহজাত ‘রূপায়ণ’ লইয়াই আবিস্কৃত হন। হুই চোখ ভরিয়া বাহা দেখিতেছেন, হুই কান ভরিয়া বাহা শুনিতেছেন তাহাতেই তাঁহাদের মনের এমন গভীর উল্লাস যে, এই সব রূপকাটীরা ছাটিয়া বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ভিতর হইতে নির্গত একটি তথ্য বা তত্ত্ব আবিষ্কার করার জন্য উৎসাহে ঝুটুই হুও নাই—ঐশাণীত বা আগন্তিই যথেষ্ট। তৎকালীন বশিষ্ঠ কলিকাতার ‘রসচক্র’ সাহিত্য-সম্মেলনে বসিয়া তিনি একদিন অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন,—‘দেখ হে, তোমরা ঐ যাকে শাস্ত্র নারী বল, আমি অনেক ভেবে দেখেছি, ওটা আবার মাঝার মধ্যে কিছু গোকেই না,—এমন কি রবীন্দ্রনাথের ‘নহ মাতা নহ কন্ডা নহ নৃপ স্তম্ভরী রূপসী’—এ-কথাটাও আমি ঠিক-ঠিক বুঝতে পারি না; আমি যখন দেখেদের কথা ভাবি তখন দেখি, একটি পানাতরা এলো পুহর, একটি থাক-আগাহার যেরা ভাঙা ঘাট, একবৃণ এটো খাল-বাটি-গ্রাস—সোডার-লিঙ্ক ধরগা কাপড়—শাশ দাঁড়িয়ে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছে ভাটো। একটা বাজা ছেলে—এই রকমের বা হোক কিছু।’

কথাটি খুব লক্ষ্য করিবার মত। কথানির্মীতের ধাতই এমন যে, অশ্রুত চিন্তার ঔদ্যায় বেন অভ্যস্তই নন। কবিতার ক্ষেত্রেও একটা অশ্রুত চিন্তা না হোক, অশ্রুত রহস্ত-ক্রীড়ার আকর্ষণ থাকে। কথানির্মীতের দশ আকর্ষণও কম—তথু ‘রূপের শাখারে আমি ভুবিয়া রহিল’। ডাবন-চিন্তা-

রহস্ত তাঁহাদের মনেও যথেষ্ট আসে—কিন্তু তাহা রূপের শাখ দিয়া বা রূপকে লিখনে ফেলিয়া নয়—সবটুকুই রূপকে লইয়া। তাহাদের বেশ-শোনাতেও রূপ, ভাবনা-চিন্তাতেও রূপ, প্রকাশেও রূপ। ভোট-বড় ভাণ-মঞ্চের জন্য আসে যায় না, তথু রূপ চাই।

পরওস্তের কথা বলিলাম। আর একজন জনপ্রিয় কথানির্মীত কথা বলিতেছি, ইনি বিকৃতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বছর পনেরো পূর্বের কথা; কৃচবিহার সাহিত্য-সভা বহুৎ নিমন্ত্রিত হইয়া একটি সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে সূচবিহার গিয়াছি; সভাপতি বিকৃতিভূষণ, প্রধান-অতিথি আমি। শুধানে আমার একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন; আমি তাঁই একদিন আসে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। বিকৃতিবাহু সভার দিন রূপেরে পৌছিয়াছেন। সাহিত্য-সভার উদ্বোধনকার স্টেশনে গিয়াছেন বিকৃতিবাহুকে স্বাগত জানাইয়া। গাড়ি ধামিলে লেগা গেল মলো কামা-কাপড়-পরা একটি লোক একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কানরা হইতে ব্যহির হইলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই সাহিত্য-সভার সম্পাদক শোকজননয় আগাইয়া গিয়া বলিলেন,—‘আপনি বোধহয় বিকৃতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।’ হাসিয়া আনন্দক বলিলেন,—‘হ্যাঁ; আপনি বোধহয় সাহিত্য-সভার কেউ—’

—আজ্ঞে, সম্পাদক।

—সম্পাদক, বেশ বেশ, নমস্কার। তা কেবন একটা অহুযোগে আপনাকে প্রথমেই জানিয়ে রাখছি, কিছু মনে করবেন না, একটু ভুলো মাহুদ আমি, পরে হইত আবার ভুলে যাব—

সম্পাদক মহাশয়ের সবিনয়ে বলিলেন,—‘না আর মনে করব কি, আপনি বন্দু।’

—এই কেবন বলছিলুম কি, এই কৃচবিহার স্টেশন পার হ'রে গেলেই নাকি কয়েক মাইল পরে ‘রাজা-ভাত-খাওয়া’ নামে একটা জায়গা আছে—যেখন ঐ ‘রাজা-ভাত-খাওয়া’ নাম হবার গলটা কি—ও আমি কাল ব্রাজেই সব শুনে নিরেছি—

—হ্যাঁ, ‘রাজা-ভাত-খাওয়া’ একটা জায়গা আছে—

—ঐশাণীত হইতে মশাই আমাকে একবার পাঠিয়ে দিতে হাও। জানেন, একটু ভিতরে হুঁক ‘গোলে’ সে নাকি অহুগন্ত দ্বিগত গভীর বন, দিনের বেলাতেও অন্ধকার।

—হ্যাঁ, অনেকটা তাই।

—বলেন কি মশাই! তা হ'লে ত কাল সন্ধ্যায় হ'রে ভয়লোকটি বা বললেন তার সবই মতা—বালি

পালসঙ্গ নহ। বনের অনেক ভিতরে ঢুক পড়লে নাকি দুনো হাতীর পাল দেখতে পাওয়া যায় ?

—আমরাও গুনেছি তাই।

—গুনেছেন, অচ্যু গিয়ে দেখেন নি কোনো দিন ?

এত কাছে থাকেন তাও দেখেন নি ? আশ্চর্য ! বাহোন্, ব্যাশাওটা তা হ'লে মিথ্যা ক'রে ?

—না, খবর মিথ্যা নয়।

—হ্যাঁ মশাই, শুধানে কোথায় নাকি একটা গাছে ঘোঁষাছিয়া একশ' বাট্টা মউ-চাক বেঁধে আছে ?

—হ্যাঁ, সেটা ঠিক। তবে ঠিক একশ' বাট্টা কিনা শুনে দেখতে পারি নি, হুং থেকে' দেখে মনে হয়েছে ঐ বক্স সংখ্যারই হবে।

—এটা আপনি নিজে দেখেছেন ?

—হ্যাঁ, এটা আমি নিজেই দেখেছি : বনের মধ্য দিমেই ত রেললাইন চ'লে গেছে, গাড়ি থেকেই এসব দেখা যায়।

—তবে ত মশাই দৃষ্টবিধারে এসে ভালই করছি। গাড়ির ঐ লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে ত খুব ভাল হ'ল না ; ভঁকে আটকাই বা কি ক'রে ! এই আপনাদের সভা-সম্মেলনকোষে তারিখ আর হুংএরদিন পরে থাকলে আমি করতুম কি জানেন, আজকে এই স্টেশন থেকেই কলু ক'রে চলে যেতুম ঐ লোকটার সঙ্গে ; এ তল্লাটে খোঁজ-ববর লোকটা অনেক জানেন,—কাল সায়াহাত আনিও দুনেই নি—ওকেও দুনেতে সিঁই নি, গালি বাসে গল্প গুনেছি—দুনো হাতীর গল্প।

তার পরে হুংএ চোখ দুটিকে চ্যানাড়। করিয়া নিজের বত তিনি আবার বলিতে পারিলেন,—হাতীর হাওলায় ক'রে বড় বড় গাছের ভিতর দিয়ে প্রতিন মাইল এককম এগিয়ে যেতে হবে—

সম্পাদক মহাশয় একই দৃষ্টিভঙ্গিতে বললেন,—‘আজ ত এইমাত্র এসে পৌঁছলেন : এখন চলুন, হান-আহার করুন, বিশ্রাম করুন—তার পরে সব ব্যবস্থা আনবারই ক'রে দেব।’

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা ত বটেই,—চলুন।

বিভূতিবাবু তখনকার রাক-অভিশিলাপা ‘গাঠনবাহু’তে আছেন : আমি আমার বন্ধুর ব্যক্তিগত আছি। বিকাসের দিকে বিভূতিবাবুর সহিত দেখা করিতে গেলাম। দিবা বেধি, ততক্ষণে বিভূতিবাবু সম্পাদক মহাশয়কে কাছে পাঠিয়া ‘দ্বিতীয়বারের মত আবার সেই ‘রাক্স-ভাত-খাওরা’ এবং তত্রস্থ দুনোহাতীর গল্প ছড়িয়া দিয়াছেন এবং গল্পের কাজেই সম্পাদককে মগ্ন করাইয়া রাখতেছেন,—‘ভুলে যাবেন না কিন্তু মশাই,—একই ব্যবস্থা-চ্যাবস্থা তাড়াতাড়িই করবেন !’ আবার দিকে তাকাইয়াও নাহে নাহে

বলিতেছিলেন,—‘শশীবাবু, ঠিক আছেন ত ? বাছেন ত আমায়ের সঙ্গে ?’

আমি হাসিয়া গাড়ি নাড়িয়া একই অস্থল্যাসে সম্মতি জানাইলাম : কারণ, আমার মনে হইতেছিল, বিভূতিবাবুর উদ্দেশ্য-প্রাণুই ইতিমধ্যে হারা অতিক্রম করিতে বসিয়াছে।

আর প্রুই বটী পরে সাহিত্য-সম্মেলন আরম্ভ। বিভূতিবাবুকে দেখিয়া বা তাঁহার কোনো কথা শুনিয়া মনে হইবার কোনো কারণ ছিল না যে, এই সাহিত্য-সম্মেলন সম্বন্ধে তাঁহার বিনুবার কোনও কৌতুহল আছে বা কোনও উৎসব আছে। আমি পূর্বেই ববর হইয়াছি, কাহারা এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য—তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি, কোথায় ক’দিন বরিদা সম্মেলন হইবে, অস্থল্যাসের কি কি অঙ্গ থাকিবে, কি-জাতীর এবং কি-সংখ্যক প্রোতা থাকিবেন—আরও বং-ব্যবস্তার সংবাদ। কিন্তু সভাপতির এখানে আসিয়া অবধি কোনই মাথাব্যথা নাই !—তাঁহার মন পড়িয়া বহিরাছে ‘রাক্স-ভাত-খাওরা’র বন-বাগাড় দুনো হাতীর গল্পে। সভায় বসনা হইবার কিছু পূর্বেও সেই প্রশ্ন আবার তুলিতে আমি বিভূতিবাবুকে শ্যাপের খয়ে ডাকিয়া লইলাম : ‘কিস্কিন্ ক’রিনা বলিলাম,—‘মশাই, করছেন কি ! এরা আমাদের সম্বন্ধে কি ভাববেন বলুন ত দেখি ? আপনি এসে অবধি সেই বন-বাগাড় আর দুনোহাতী বরছেন, এ’রা কি তার সম্মত আমাদেয় পরস্পর-কড়ি খরচ ক’রে ক’লকাতা থেকে নিয়ে এসেছেন ?’

জিত কাছিয়া আকাশ হইতে পড়িবার মত মুষের ডাব করিয়া বিভূতিবাবু আমাকে বলিলেন,—‘তাউ ত শশীবাবু, ব্যাপারটা ত এতবৎ আমার মোটেই খেয়াল হয় নি ! এখন কি করা যায় ?’

আমি জোরিচ চালে বলিলাম,—‘কি আর করা যায় ; এমন সম্মেলনে চলুন, ভাল ক’রে একটা অভিভাষণ দিন ; পরস্পর, তার মধ্যে ভুলেও বেন একবারও ‘রাক্স-ভাত-খাওরা’, বলা-পাহাড়, জহুটী-পাহাড় বা বন-বাগাড়—হাতী-পুঝারের কথা তুলবেন না। আজ কাল হুংদিন সম্মেলন হ’রে থাক—পরন্তু দেখা যাবে’ন।’

—ঠিক ঠিক,—ঠিকই বলছেন আপনি : তাই করা যাবে। ছিঃ ছিঃ, কি ছেলেমারুটী কাওট ক’রে কেদেছি ! তবে কি জানেন, এবিটটা সত্যি দেখবার জারগা। এম্বকের গাছগুলিতে কেমন অগ্নি দেখেছেন ? এ আপনি অস্ত্র কোথাও পাবেন না ব’লে মিছি। বিদ্যাল না হয় আপনি আরন এগিকে আমার সঙ্গে’—যদিয়া তিনি আমাকে ব্যতিরেক বাগানের মধ্যে টানিয়া লইলেন,—‘ঐ দেখুন, ঐ বো গাছটা দেখছেন—আহা-হা, দেখেছেন ওর ঐ উত্তরমুণো ডামটিতে ঐ বো অগ্নিচ্চি—কি ওম ওম

দুল স্ট্রে আছে ওটাতে! চোখ ফেরান যাব না। আপনি এদিকে আসুন—বসিয়া এবার তিনি আমাকে সোজা হাতায় টানিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন; আমি আপত্তি করিলাম না, সত্যই বৈদিকে ডাকাই অর্কিডের ফুলগুলি অপরূপভাবে চোখে পড়িতেছে। তা ছাড়া এগুলির দিকে তাকাইবার আশ্রয় নতুন দুই পাইতেছি; এমন নিশ্চয় মত কৌতুহল ও রূপস্বভাৱ গইয়া পূর্বে কখনও বোধ হয় তাকাইয়া দেখি নাই।

ধানিকল্পণ পরে আমি শাস্তকণ্ঠে বলিলাম,—‘এইবারে আপনি কামা-কাণ্ড ছেড়ে প্রস্থত হয়ে নিন,—আর বেশি সময় নেই।’

—তাই ত! আমার দেখুন একেবারে জুড়ে গেছিলাম।

তিনি হস্তমস্ত হইয়া কাপড়-কাবা ছাড়িতে গেলেন; আমি একা-একা ভাবিতে থাকিলাম,—তুনিয়ার সব রূপ এমন করিয়াই কি ইহাদের মন ভুলাইয়া দিয়াছে!

পাহি-তা-স্মেলনে বক্তৃতা বিকৃতিবান্ তেমন কিছুই করিলেন না। প্রথমে মূখে মূখে হুঁচারিতি কথা বলিলেন; তারপরে শব্দট হইতে বিভিন্ন আকৃতির কয়েকখানি চিত্রকূট বাহির করিলেন, তাহার এখন হইতে সেখান হইতে কিছু কিছু পড়িলেন, সবটার পার্শ্ব উচ্চারণ করা উচ্চারণ নিজের পক্ষেই সম্ভব হইল না; সুতরাং ‘আপনারা সব স্বরীজন, আপনারাঘের কাছে বিশেষ আর কি বলব’—ঐশ্বর্যিত মতে এইজাতীয় ভণিতা করিয়া ভাষণ শেষ করিলেন।

বাঙা-বাঙার পরে হাত দশটার স্মারক গেলাম বিকৃতিবান্ কাছে। তিনিও বাঙা-বাঙা দিখিয়া বাহিরে খোলা হাওয়ার আসিয়া বসিয়াছেন। আরম্ভ করিলেন গল্প—তাঁহার ছেলেবেলার গল্প, তাঁহার প্রথম বাস্তাবি-জীবনের গল্প, প্রথম গল্প-সেবার গল্প—বিহারাঞ্জে তাঁহার চাকুরী-জীবনের গল্প, সেখানে তাঁহার আরম্ভক জীবন, সেখানকার মহত্যাফুল আর পলাশফুল, বাঘ-ভালুক পত-পক্ষী বাহুবল্লভ—সকলের গল্প। অনবগল গল্প—হাত দশটা হইতে টানা একটা পর্যন্ত। বিস্তৃত ভাবে দেখিতেছিলাম, এই লোকটিই আজ সম্ভার কথা বলিতে উঠিয়া যেমন স্বভবত থাইতেছিলেন, একটা কথা বলিয়া যার যার গলা কাড়িতেছিলেন, কথা বেন মূখে যোগাইতেই ছিল না। কিন্তু বসন অমূর্ত চিত্রা নয়—জগতের রূপ আপিল—জীবনের কথা আপিল—তখন একেবারে অজ্ঞান অনবগল! রূপাশ্রয়ী যনের এইত সহজ স্বর্থ।

বক্তৃতার পালা শেষ হইতেই বিকৃতিভূষণ কখন যে কোথা হইতে পালাইলেন আমি টেমও পাইলাম না, বোধহয়

আমাকে টের না পাওয়াইয়াই তাঁহার পালাইবার ইচ্ছা ছিল, এত প্রকৃতি-কলা তাঁহার স্নেহের ভাল লাগে নাই। তুনিয়াশ তিনি ‘বাক-ভাত-বাঙা’, বগা, জয়ন্তী প্রভৃতির দিকে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। আমিও ঐ দিকেই বাহির হইয়া পড়িলাম।

বগা-পাহাড় ঘুরিয়া আমিও জয়ন্তী-পাহাড়ে পৌঁছিলাম। জয়ন্তী হইতে খোঁজা হুঁচানের দিকে রাজা চলিয়া গিয়াছে সেখানে ছোট পাখিও নদীর উপরে একটি পুস আছে। নদীটি আমারের বড় ভাল লাগিল। পাখরের হুড়ির উপর দিয়া তবু তবু বহিয়া থাইতেছে পরস্রোতা নদী—একইয়াই জল। আমি ও আমার সখীদল সেই পুলের পাশ দিয়া নদীতে নাঝিয়া পড়িলাম। পাখরের হুড়ির উপর দিয়া শীতল জলে এক-পা হুঁপা করিয়া উভাইয়া চলিতেছি—জলের প্রোতে পাখের হুঁপানে কলকল শব্দ জাগিতেছে—পানে বিরাট পাহাড়শ্রেণী একাও একাও গাছে ঢাকা। আমারের বেশ পসিগিতেছে। আরও কোতুহলী হইয়া দেখিলাম বহু ক্ষতিকর মত জলে বেশ-শেঁ দেখা যাউতেছে চান্দা-কুড়া মাছের মত ছোট ছোট মাছ। পাহাড়ি নদীতে এ-ধরণের মাছ আমি কখনও দেখি নাই। বিস্তৃত হইয়া হাঁইজলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাছ দেখিতেছি আর ছোট ছোট লাল-নীল সবুজ-হুপ হুড়ি কুড়াইয়া পকেট ভরতি করিতেছি।

হাঁং গাড়ির কথা মনে পড়িয়া গেল, হাতঘড়িতেও চোখ পড়িয়া গেল। তাই ত—গাড়ির সময় ত হইয়া গিয়াছে! এদিকে যে আমার স্টেশন-মাষ্টারের বাড়ি জলখাবারের নিমন্ত্রণ। প্রায় উল্লংঘসে কুচিলাম। স্টেশন-মাষ্টারের বাড়ি গিয়া কোনওকালে হুঁ-একখানি দুচি-ডাক গলার মধ্যে প্রায় তৈলিয়া দিলাম—তাঁর পরে তাড়াহড়ি করিয়া গিয়া গাড়ির একটা কামরায় উঠিয়া বসিলাম। বসিয়া বেশি দূরে পাহাড়ি বন-বাগাড়ের মধ্য দিয়া আর একজন লোকও ইহুদঙ্গ ভাবে চুইয়া আসিতেছেন। কে লোকটি—বিকৃতিবান্ নাকি? কাছে আসিতে দেখিলাম—ইয়া রিক—সেই-যে পরিচিত একগাল হাদি। চাচাইয়া বলিলাম,—‘কোথেকে?’

—‘মহাকালে, ঐ জুপিগ ধরে। অপরূপ নদীবাণ, অপরূপ! ভাল করে দেখাটা হ’ল না—সে বা জিমিস—’

গার্ডসহেব ইতিমধ্যে দিটি বাজাইয়া দিয়াছেন।

—‘বলব আপনারে দুঃ—পরে বলব—কলকাতার দেখা হবে।’—বলিয়াই বিকৃতিভূষণ গাড়িতে চাপিলেন। পাগটা জীবনভর এই রূপের অগ্রহাগে রূপাশ্রয়ী!

রবীন্দ্র জীবনালেখ্য

॥ চারুচন্দ্র ওড়াকার্য ॥

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

যে-আমি স্বপ্নে বসি গোপনচারি,
যে-আমি স্বপ্নে বসি বৃক্ষান্তে নারি,
আমি গানের বাজারে আসি নারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমাকে দখি।
মস্তক মাঝে-বদন মাঝে-
ভূমিতে পড়ি প্রতিনিবেশের ধরে,
যাগে কালের স্বর্গ-মিলন অধরে,
কবিরে পারে না তারে জীবনচরিতে।

তবু তো আমাদের কবিকে খুঁজতে হবে, আর
খুঁজতে হবে তাঁকে তাঁর কথার মধ্যে, তাঁর রচনায়,
তাঁর কাজে।

রবীন্দ্রনাথ সপক্ষে অতুলচন্দ্র গুপ্ত একজায়গার
বসেছেন।—

মানুষের যা-কিছু মহৎ তাঁর পূজা পেয়েছে।
যা-কিছু ছোট, তাঁকে বেদনা দিয়েছে। বিশ্বমানবের
মৈত্রী তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষ অন্তর্ভূতি। সব ঘরে যে
তাঁর ঠাই—সে কেবল তাঁর কাব্যের কল্পনা নয়।
যে-দেশ তাঁর জন্মভূমি, তাঁর অশিক্ষা দারিদ্র্য ও
হর্দশ। কবিকে করেছে কর্মী। তাঁর সমস্ত দৈহিক
ও হীনতা তিনি যেন নিজের বিরাট মহত্ত্ব দিয়ে
লোপ করতে চেয়েছেন। প্রাচীন যেখানে বড়ো,
কোনও নবীন তাঁর মনের স্রোতস্বতীধাক্কে টলাতে
পারেনি; নবীন যেখানে সত্য, কোনও প্রাচীনের
মোহ তা গ্রহণ করতে তাঁকে বাধা নিতে পারেনি।
সমস্ত মানবসত্যতার স্রোতস্বতীর ও মহত্ত্বের তিনি
ছিলেন প্রতীক। একাধারে এই মহাকবি ও
মহামানব বাস্তবে দেখা না দিলে কল্পনায় সম্ভব
হত না।

রবীন্দ্রনাথের জীবনী এক বিরাট মহাকাব্য।
আমরা তার থেকে অল্প কিছু শ্রবণ করি।

ক. বাল্যকাল

বাড়ির আবহাওয়া

বাড়ির যে আবহাওয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের
বাল্যজীবন কেটেছিল তার সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা
করা যায় তাঁর 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' থেকে।
এ-বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথও একটা চমৎকার বর্ণনা
দিয়েছেন। তার থেকে কিছুটা বলি।—

মহাবির বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় সকালে
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈঠক বসত। দ্বিজেন্দ্রনাথ
তখন 'শ্রুতপ্রয়াণ' লিখেছেন—দার্শনিকেরা আসছেন,
পণ্ডিতেরা আসছেন, নিজের নিজের সটকা নিয়ে
আসার জমিয়ে বসেছেন; সাহিত্যের একটা হাওয়া
ব'য়ে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ তখন খুব ছোটো। এ আসরে
তিনি আসতেন না। তিনি উপস্থিত থাকতেন তাঁর
নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বৈঠকে। এ বৈঠকের
চেহারা ছিল অন্তরকমের। এখানে আসতেন তারক
পালিত, কবি বিহারী চক্রবর্তী—আরও অনেকে।
রবীন্দ্রনাথ বয়সে ছোটো হলেও এই বৈঠকে যোগ
দিতেন। বাড়ির মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ এই
বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের
স্ত্রী ছিলেন এই বৈঠকের কর্মী। এখানে চলত গান-
বাজনা, কবিতার পর কবিতা-পাঠ।

বয়সে ছোটো হলেও রবীন্দ্রনাথ এই বৈঠকে গান
করতেন, কবিতা পড়তেন। বঙ্কিমচন্দ্র মাকে নাকে

এই বৈঠকে আসতেন। একবার রবীন্দ্রনাথের 'কালযুগ্ম' নাটকটি তাঁকে আগাগোড়া গান গেয়ে শোনানো হয়।

সে-সময় ইংরেজের পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতির অন্ধ অনুকরণে সমস্ত বাংলাদেশ ভেসে যেতে বসেছিল। ওই প্রবল বহা প্রচণ্ডভাবে বাধা পেল কলকাতার এই ঠাকুরবাড়িতে। ছ-একটা ছোটোখাটো ঘটনা থেকে ব্যাপারটা বুঝা যাবে।

তখন বাংলাদেশে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্যাণ্ট-কোট টাই ছাট পরাটা একটা ক্যাশন হয়ে দাড়িয়েছিল। খুঁতি-চামর প'রে সভা-সমিতিতে যোগ দিতে শিক্ষিত বাঙালি লজ্জাবোধ করত। ঠাকুরবাড়ির একদিনকার ঘটনা এইরকম।—

দ্বিজেন্দ্রনাথের মেজোছেলে অরুণেন্দ্রনাথ একবার চা-বাগান থেকে ফিরে এলেন, একেবারে পুরোদস্তুর সাহেব। প্যাণ্ট-কোট টাই ছাট প'রে একদিন তিনি বাইরে বেরচ্ছেন, পড়ে গেলেন পিড়ার নজরে। হাঁকডাক শুরু হল।—অরু, এই অভব্য বেশে তুমি চলেছ রাস্তায়!

আর একদিনের কথা। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন।—

ইন্সবঙ্গ-সমাজে একটা পাটি হবে, আমাদেরও নেমস্তন্ন। কি সাজে যাওয়া যায়! রবিকাকা বললেন, সব খুঁতি-চামরে চল।—পরলুম খুঁতি-পাঞ্জাবি, পায়ে শুঁড়তোলা চুটি। এখন মোজা না প'রে কি করে ঘাই। চেয়ে দেখি, রবিকাকার পায়ে মোজা। আনি, দাশা, সমরলা ও রবিকাকা রওনা হনুম। কিছু দূর গেছি, দেখি রবিকাকা হঠাৎ এক এক টানে ছ'পায়ের মোজা ছুটো খুলে গাড়ির পাদানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমাদের বললেন, আর মোজা কেন, ও খুলে ফ্যালো, আগাগোড়া দেশী সাজে যেতে হবে।—সেই যে মোজা বর্জন করলুম, আর ধরিনি কখনো। দেখো দিকিনি, এখনও বোধহয় রবিকাকা মোজা পরেন না।

তখন দেশবাসীর মধ্যে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে চিঠিপত্র লেখালেখি চলত ইংরেজিতে। নাতৃত্বাধার লিখলে মনে করা হত লেখকের শিক্ষা-সভ্যতার কন্মতি আছে। বাপ ছেলেকে 'My dear son' বলে চিঠিতে সম্বোধন করত। বাংলাভাষাকে শিক্ষিত সমাজ অন্দরে নেয়েনহলে ঠেলে রেখেছিল। সদরে ব্যবহার হত ইংরেজি।

ঠাকুরবাড়িতে এ বিকৃতি ঘটতে পারেনি। মহর্ষি বেবেশ্রনাথের এক আত্মীয় তাঁকে ইংরেজিতে এক চিঠি লেখেন। মহর্ষি চিঠিখানা না পড়েই লেখককে ফেরত দেন।

ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা নাতৃত্বাধার প্রতি প্রগাঢ় অমুরাগ জন্মেছিল। আর রবীন্দ্রনাথের সে অমুরাগ কয়েকবার আমাদের জাতীয় জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে।

কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করি।—
নাটোরে প্রভিলিয়াল কন্ফারেন্স। সেটা ১৮৯৭ সাল। কন্ফারেন্স আরম্ভ হবে, রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করলেন, কাজকর্ম সব বাংলাতে চোক। অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ছেলের দল বঁলে উঠল, নিশ্চয় নিশ্চয়। নেতাদের সঙ্গে বেশে গেল বিভা। তাঁরা বললেন, যেমন কংগ্রেসে হয়—তেননি এখানেও হবে, সব কিছু ইংরেজিতে। অনেক কথা-কাটাকাটির পর ঠিক হল, একদল বলবে ইংরেজিতে, অপর দল বাংলায়। কিন্তু—যে কেউ ইংরেজিতে আরম্ভ করেন অমনি রব উঠে, বাংলা, বাংলা। শেষ লালমোহন ঘোষ উঠলেন, তাঁর মতো ইংরেজি বক্তৃতা কেউ করতে পারত না। তিনি উঠে বাংলায় বক্তৃতা করলেন। শোন। বার, অপরূপ হয়েছিল তাঁর সেই বাংলা বক্তৃতা।

এর পরের এক ঘটনা। কংগ্রেসের ভিতর তখন ছোটো দল হয়ে গিয়েছে। প্রভিলিয়াল কন্ফারেন্সের সভাপতি-নির্বাচন নিয়ে বিভাট। শেষ হ'ল একমত হয়ে অদলীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সভাপতি স্থির করলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিতাষণ লিখে

নেতাদের একবার দেখিয়ে নেবেন, নেতারা
এইরকম আশা করছিলেন : কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা
করলেন না। অধিবেশন আরম্ভ হল, রবীন্দ্রনাথ
তার অভিভাষণ পাঠ করতে উঠলেন। কিন্তু
একি ! অভিভাষণ যে বাংলায়। দর্শকদের তুচ্ছ
হর্ষধ্বনি ! কিন্তু নেতাদের মধ্যে অনেকে একেবারে
মুগ্ধমন হয়ে পড়লেন। এ সেসময়টা একেবারে
মাটি হল ! তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একজন তো
বলেই ফেললেন, রবীন্দ্রাকুর যে ইংরেজি জানেন না,
তাই বাংলায় অভিভাষণ।

বহুকাল পরের আর এক ঘটনার কথা বলি।
জ্ঞানপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
উপাচার্য হয়েছেন। সনাবর্তন উৎসব হবে।
উৎসবে মন্তিভাষণ দেবার প্রস্তাব নিয়ে তিনি
রবীন্দ্রনাথের কাছে এলেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন,
আমি রাজি আছি, তবে আমি বাংলাতে বলব।
জ্ঞানপ্রসাদ উল্লাসের সঙ্গে সে প্রস্তাব গ্রহণ
করলেন।

রূপ

‘জীবনমুখতি’তে একজায়গায় লিখছেন।—

কোনো একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি থানিয়াছে।
টিকিট-পরীক্ষক আসিয়া আমাদের টিকিট দেখিল।
একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। কী-একটা
সন্দেহ করিল কিন্তু বলিতে সাহস করিল না।
কিছুক্ষণ পরে আর একজন আসিল—উভয়ে
আমাদের গাড়ির দরজার কাছে উসখুস করিয়া
আবার চলিয়া গেল। তৃতীয়বারে বোধহয় খবর
স্টেশনমাস্টার আসিয়া উপস্থিত। আমার হাফ-
টিকিট পরীক্ষা করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল,
এই ছেলেটির বয়স কি বাবো বছরের অধিক নহে ?
পিতা কহিলেন, “না”। তখন আমার বয়স
এগারো। বয়সের চেয়ে নিশ্চয়ই আমার বুদ্ধি

বেশি হইয়াছিল। স্টেশনমাস্টার কহিল ইহার
অল্প পুত্রা ভাড়া দিতে হইবে। আমার পিতার
হুই চক্ষু অলিয়া উঠিল। তিনি বাস্তব হইতে তখন
একখানি নোট বাহির করিয়া দিলেন। ভাড়ার
টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা যখন তাহার
ফিরাইয়া দিতে আসিল তিনি সে টাকা লইয়া
ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহা প্লাটফর্মের পাথরের
মেজের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া কনকন করিয়া ব্যক্তি
উঠিল। স্টেশনমাস্টার অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া
চলিয়া গেল, টাকা বাঁচাইবার জন্য পিতা যে
নিখা কথা বলিবেন এ সন্দেহের ক্ষুদ্রতা তাহার
মাথা টেট করিয়া দিল।

পরিণত বয়সে একদিন তাঁর ওই দিবা মেহ
তাঁকে কি রকম অশান্তির মধ্যে ফেলেছিল
বলি।—

ছোড়াগোকায় আছেন। সকালে গিয়েছি।
বললেন, কাল রাত্তিরে ভারি বিপদে পড়েছিলাম।

—কি হল !

সবচরকে বললুম,—ভ্রনছি, আজকাল আমাদের
দেশী ক্লিম বেশ ভালো হয়েছে, একদিন দেখিয়ে
নিয়ে আয়।

স্থির হল, বাড়ির কাউকে কিছু বলা হবে না,
রাস্তির সাড়ে মটার শো-তে গায়ের কাপড় মুড়ি
দিয়ে যাওয়া, আর তিড় নেই এমন ভায়গার গিয়ে
বসা। সেই নতো টিকিট কিনে আনা হল। চুকলুম
আরম্ভ হওয়ার একটু পরে, অঙ্ককারের মধ্যে
দিয়ে। ছবি চলেছে, হঠাৎ দেখি আলোগুলো সব
অগ্নি উঠল, আর চার-পাঁচজন লোক পর্বীর সামনে
ধাঁড়িয়ে ফুলের মালা হাতে। বহুতা আরম্ভ
হল,—

ভাই-সব, আজ আমাদের কি আনন্দের দিন !
আজ বিশ্বকবি...। কি নিগ্রহ দেখুন !

—করবেন কি। দেখুননা তো লুকোবার নয়।
আর বহুতা, ফুলের মালায় কথা বলছেন, ‘খ্যাতির
বিভূষণ’ কি শুধু লিখেই পার পাবেন।

৩
স্বামী

লিখছেন।—

শরীর এতো বিস্তীর্ণকন্মের ভালো ছিল যে, ইচ্ছা পাল্যবার খোঁক যখন হ্রয়মান করে নিত, তখনও শরীরে কোনো জ্বল্মের জ্বোরেও ব্যানো ঘটতে পারতুম না। জুতো জলে ভিজিয়ে বেড়ালাম সারাদিন, সন্দি হল না। কাটিক মাসে খোলা ছাদে শুয়েছি, মূলজামা গেছে ভিজে, গলার মধ্যে একটু খুসখুসনি কাশিরও সাড়া পাওয়া যায়নি। আর, পেট-কামড়ানি ব'লে ভিতরে ভিতরে বদহজমের যে একটা তাগিদ পাওয়া যায় সেটা বৃষ্টিতে পাইনে পেটে, কেবল দরকার মতো মুখে জানিয়েছি মায়ের কাছে। শুনে মা মনে মনে হাসতেন, একটুও ভাবনা করতেন ব'লে মনে হয়নি। তবু—চাকরকে ভেঁকে বলে দিতেন, মাষ্টারমশাইকে জানিয়ে দে আজ আর পড়াতে হবে না। হাম বা জলবসন্ত কাকে

বলে, আজ পর্যন্ত জানিনে। মায়ে ফোড়া-কাটা ছুরির আঁচড় পড়েনি কোনদিন।

যখন জীবনের শেষ প্রান্তে এসেছেন তখন শরীরটা ভেঙে পড়ল। ছুরির আঁচড়ও একদিন পড়ল।

সকাল থেকে বারেন্দায় টেবিলের পাশে টেবিল পড়ছে, ডাক্তারেরা নানারকমের যন্ত্রপাতি, হরেক রকমের ওষুধের শিশি সাজিয়ে চলেছেন। কবি আড়চোখে সেদিকে একটু চেয়ে সহচরকে বললেন,

—হ্যারে, তুই-যে বললি, সামান্য একটা ব্যাপার, তবে এতোসব কি?

সহচর বললেন, কি জানেন গুরুদেব, সাবধানের মার নেই।

সেই আনন্দময় মহাপুরুষ হাসতে হাসতে বললেন, কিন্তু আমার বড়দাদা বলতেন, মারেরও সাবধান নেই।

এর পর আর সপ্তাহখানেক ছিলেন।

[কথন:]

শোভাযাত্রা

মুন্সীল রায়

ক্রীড়নের চরম আনন্দ এইভাবে আসবে, এ কথা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেন নি উত্তরকালী দেবী। হুট চোখ অন্ধ ক'রে তিনি এইভাবে এইখানে বসে আছেন কতদিন হল, দে-হিসাব রাখা দরকার মনে করেন নি তিনি। কুড়ি বাইশ কিংবা পঁচিশ বছরট নিশ্চয় হবে। এর দু-চার বছর এবিধ কিংবা শুদিক হলও লাভ-লোকসান কিছু নেই তাঁর। লাভ-লোকসানই যদি কিছু নেই তাহলে হিসাবের কি দরকার?

জোব নেই। কিন্তু হুটি কান আছে তাঁর সতেজ আর সজাগ। এইখানে বসে হয়ে বলে থেকে তিনি কখনো শোনেন ইজিবের হাইসল—বড়সপুরের ট্রেন হহ শব্দে এসিয়ে আগছে শালবন্দীর দিকে, কখনো শোনেন পারিষ ডাক—বৃষ্টিতে পাবেন সন্ধ্যা এবার হয়ে এল, কখনো

শোনেন গড়গড়ার গড়গড় শব্দ—ই শব্দ শুনেই দৃষ্টিতে পারেন তাঁর বামী নিচিধ মনে তামাক টানছেন, না, চিন্তিত মনে টানছেন।

এক্সেবারে বুড়ো হয়ে গিয়েছেন হারানদেব। পয়স বা হয়েছে তাতে পশু আর অর্থই হবে হারানদেব কথা। কিন্তু নিজেকে সাহাটা ক্রীড়ন পরিভ্রমের মধ্যে ভুবিয়ে রাখার জল্পেই সব্ববত একেবারে অন্ধ হয়ে যাননি এখনো। এখনো তিনি সোজা খুঁপাই নিয়ে উঁচু হয়ে বসেন ঐ উঠোনে, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে এখনো লাউ-মুমড়োর বিচি, গুঁতে দেন, এখনো জল টেনে এনে ছল দেন তাতে।

চোখ-হুটো নেই ভহকালীর, তবু তিনি সব বসতে পারেন। সামান্য একটু শব্দ শুনেই তিনি আনন্দ পাবে নিতে পারেন সব। সাপাটা দিন খুটখুট আর ঠুঁকঠাক

শবে হারাদন কী যে করেন, অহুমান করতে পারেন
ডুহকালী।

বড় দেখতে ঠেঙ্ক করে ঐ মাদ্রুটাকে ঠাঁও। বড়ই
আগ্রহ হয় ঐর এখনকার চেহারাটা কেনন হচ্ছে তে
জানতে।

কুড়ি বাঁশ কি পঁচিশ বছর তো কম সময় না। যে-
মাদ্রুটায় জীবনের উপর দিয়ে এতগুলো বছর বয়ে চলে
গেল, সে এখন দেখতে কতটা বুড়ো হচ্ছে জানার
কৌতুহল না হবে কেন।

কৌতুহল হবে অবশ্যই, কিন্তু সে-কৌতুহল চরিতার্থ
করবেন ডুহকালী দেবী কী উপায়ে?

যত্ন হয়ে বলে থাকেন তিনি ব্যাঙ্গ্যার কাছে, চোখের
কোণ দিয়ে দু'কি জল নেবে আসে ঠাঁও। ঠাঁও দিয়ে
চোখ মোছেন। আচ্ছ, যে-চোখে কুড়ি নেই যে-চোখে
এই জল পাবে কোথা থেকে?

হারাদনবারুর কথা তিনি ভাবেন, অনেক বলল যে
ঠাঁও হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ সঙ্গে
ডুহকালী দেবী নিজেও যে অনেক বললে গিয়েছেন,
সে চিন্তা দু'কি ঠাঁও নেই।

প্রতিবেশী করণদের ও জানাদের বাড়ির মেয়ে-বোরা
আসে মাকে-মাতাই। যে-মেয়ে-বোরা নয়, বারা আসত
বিশ বাঁশ বা পঁচিশ বছর আগে। এখন বারা আসে
তাদের কবনে চান্দ্রব দেখেননি ডুহকালী। তাদের
গলায় বর কানে তাদের সবচেয়ে মনগড়া ধারণা করে
নিবেছেন মাক্র—তারের চেহারা সবচেয়ে, তাদের আচরণ
সবচেয়ে, তাদের আচরণ সবচেয়ে।

ওরা এখানে আসে আর-কোনো আকর্ষণে নয়।
এ-বাড়িতে কিসের টানে আসবে পাড়াগড়ম? এক
আছেন ব্রহ্ম হারাদন ব্যাক্যাপাধ্যায়, যিনি নিজেকে নিয়েই
নিজে বিভোর, সময়কে মেয়ে-মেয়ে চলা ধীর জীবনের
ধর্ম, সময়ের একটি ক্ষুদ্র ভয়ানক অশ্রব হয়ে গেলে ধীর
বাধ্য আশ্রয় ভেঙে পড়ে; আর আছেন ঐ বুড়ো
ডুহকালী দেবী, তিনি কীভাবে কি বৃত্ত, একই তফাতে
ধাঁড়িয়ে দেখলে বোঝা যায়—ঠাঁও হয়ে থাকেন তিনি
অনড় আর অটল, দেখে যেন হয় তিনি কঠিন পাথরে
তৈরি করীর একটি মূর্তি।

এই দুইজনই অবশ্য অধিবাসী নয় এ-বাড়ির, আরও
একজন আছে—সে হচ্ছে ত্রিনয়নী।

এই তৃতীয় অধিবাসীর ক্ষেত্রে তারা আসতে পারে বাটে,
কিন্তু এ-ও তাদের আকর্ষণ নয়।

কী করে এ তাদের আকর্ষণ হবে? ওরা-সব জামের
মেয়ে, জামের বোন। শহর এরা না দেখেছে এমন নয়,
এরা দেখেছে যেসিনীপুর, দেখেছে পড়গপুর। কিন্তু ও-সব
কি আর শহর? শহরের মধ্যে সেটা যে-শহর, সেই
কলকাতার কতকাল কাটরে এসেছে ডুহকালী দেবীর
ঐ মেথোটি।

জানাদের সেক্ষেত্রেই বো লবনলতা উদ্ভূতের মেয়ে,
সে কলকাতার অনেক কাছের। সেগান থেকেই বো হয়ে
এসেছে এখানে, এইক্ষেত্রে ঐ শহর সবচেয়ে তার ধারণা
অন্তরের চেয়ে একটু বেশি; সে চাপা গলায় বলে, এটা
আহাম্মক। ঐ ছবি ওরা যদি দিয়ে গিয়ে কেলতে পারে
কলকাতার, লুকে নেবে সকলে। এখানে, এই গায়ের
বাড়ির অল সাক্ষিই লাভ কি।

কার কথা বলছে লবনলতা? কিসের কথা? অত্যাচার
মেয়ে-বোরা সবুজ তাকায়। নিম্নত একটা ছবির মত
দরজার গারে সোজা ঠাঁড়ির আছে ত্রিনয়নী। তাকায়
সেই দিকে।

বিকালের এই পড়ন্ত আলোর আটপৌরে সালা কবির
জীতের শাড়িত চমৎকার দেখাচ্ছে ত্রিনয়নীকে—অবিকল
একটা ছবির মত। দরজার ক্রেমে যেন কে ধাঁড়িয়ে
রেখেছে ঐ ছবিটা।

লবল বলল, চাপ।

ওরা তাকাল ঐ দিকে। সেখান, হেসে উঠেছে ঐ ছবি,
নড়ে উঠেছে ছবির একটা হাত, কথা বলে উঠেছে ছবিটা।
এক পা এগিয়ে এসে ত্রিনয়নী বলল, এস ডাই, এস
তোমরা।

এ-অভ্যর্থনার ঘুপি হল তারা, আনন্দিত হল। দু পা
এগিয়ে ব্যাঙ্গ্যার উঠে ঠাঁড়াল তারা ত্রিনয়নীর সামনে।

বয়স কত হয়েছে ত্রিনয়নী, মনে-মনে ব্রহ্ম অহুমান
করার চেষ্টা করে ওরা। আহুতবুড়ো মেয়েদের কি বয়স
ধরা সোজা? বেলাই বয়স হবে নিশ্চয়। সালা দাবধে
দি'বিটা কেনন বোটা হয়ে উঠেছে। ঠাঁওগুলোও
ককককে হলে হবে কি, ওর মধ্যেই তবু যেন দেখা যায়
বয়সের চাপ।

মাদ্রুর বিদ্বিরে ছিল ত্রিনয়নী। ওরা সকলে বলল।
বলে তাকাতো লাগল এদিকে ওদিকে। বিকেল বেয়ে
এসেছে এই মলিকপুরের আকাশে, আচমকা হাওয়ার
রক্তা খুলো উড়ছে অলম্যাবাই গোছে। শালবনী-চেষ্টনে
দু'কি ঠাঁও এসে ধাঁড়িয়েছে, কুতুপী পাখিরে কালো খোঁয়ার
চাপ হেসে উঠেছে আকাশের দিকে।

বাড়িতে এতগুলো মানুষ বে এসেছে, সে দিকে কোনো দেখান নেই হারানবাবু। উঠানের ঐ কোণে লম্বা-গাছের গোড়া আগল করে দিচ্ছেন তিনি এদিকে পিছন দিয়ে বসে।

তিনঘনী গুপের পাশে বসল। এদের সকলের সঙ্গেই পরিচয় আছে তার। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হয়নি কারও সঙ্গেই। তবে কি করে? এরা যে ঘন হয়ে কাছ ঘেঁষে বসতে একই বিধা করে, প্রাপ্ত যুগে কথা বলতে এরা যে একই সংকোচ করে। অনেক কাল সে শহরে কাটিয়ে এসেছে বলেই নয়, তার বাড়তি কারণও আছে, বৃত্তে পায়ে তিনঘনী। সেইজন্তে সেও গায়ে পড়ে বেশি ভাব করার উৎসাহ পায় না।

কিন্তু ওরা আসে। মাকে-মাকেই আসে। ওদের টেনে আনার মত আকর্ষণ আছে এ-বাড়িতে। সে আকর্ষণ হারানবাবু নয়, ভক্তকালীও নয়, তিনঘনীও নয়—সে আকর্ষণ হচ্ছে—কোনো-কোনো টাটানো এ ছবির মিছিল।

এই ছবির কথাই বলছিল লবঙ্গলতা।

তুলি দিয়ে হং দিয়ে আঁকা ছবি নয়—চুঁচু আর লুতো দিয়ে ঐ বর্ণের বাহার তৈরি করেছেন উনি। ঐ-বে বায়াকার এক কোণে পাখরে তৈরি মূর্তির মতন বসে আছেন ঐ মহিলা, এড়পি হচ্ছে ঠগঠি চরম কৃত্তিষ্কের এক-একটি শাখা।

এরই আকর্ষণে মাকে-মাকেই আসে শালঘনীর আর বল্লিকপুত্রের মেয়েরা, এক এক দিন দূরের ঐ মণ্ডলকুণ্ডী গা থেকেও এসে বার অনেক ঘেঁষে-বোঁ।

এক চোখ দিয়ে ছবি দেখে তারা, অন্য চোখে হয়তো তাকায় তিনঘনীর দিকে। তিনঘনীও তাদের কাছে দেখার কিনিম বটেই।

শরীরটাকে কেমন পাক দিয়ে কিলবিলিয়ে উঠে গেছে শাড়িটা কাঁধের উপর। কাপড় পরার কার্যসাই আলাদা। এই গায়ের মধ্যে বসে থাকলে কি এমন কসরৎ করে শাড়ি পরা যায়? হোক-না শাড়িটা সামান্য তাঁতেই, পরার ভঙ্গিতেই শাড়ির কদর বেড়ে দিয়েছে অনেক।

শালঘনী মণ্ডলকুণ্ডী কখনা আর বল্লিকপুত্র—সব গ্রামেই এই বক্যোপাখ্যায়-বাড়ির তাই খুব সুনাম। শহরে থাকার সময় ঐ মেয়েটা অভিনয় করতে নাকি ছায়াছবিতে, সেসব কথা এখন আর ভাবে না এই চার গায়ের মানুষরা। সেসব জ্ঞানজপ দিয়ে সে যখন ঘরের ঘেঁষে ঘরে এসে চুকেছে, তখন সেসব বাণী কথা নিয়ে কথা বলে লাভ নেই কিছু।

কথা বলে কিছু লাভ নেই বটে, কিন্তু ঐ মেয়েটার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাতো যেন লাভ অনেক। তাই ওরা কখনো-কখনো চোখের কিনার দিয়ে চেয়ে দেখে ঐ মূর্।

শাড়া, বড় স্কলর ঐ মূর্টা। বড় শরল, বড় শাখাশ, এবং বড় শাখা। এমন শভাবের মানুষ শহরের মানুষদের জিজ্ঞেস মধ্যে গাঁড়িয়ে অভিনয় করতে পেরেছিল, এটা পড়ত অবাক লাগে এদের।

তা পারবে না কেন, নিশ্চয় পারবে। কার মেয়ে দেখতে হবে তো। ঐ যে নিরীহ আর নম্র মানুষটি চুপচাপ বসে আছে এক ভাবে, কে ভাবতে পারে ঐ মানুষের হাত দিয়ে এমন রকমের মিছিল বেরিয়ে আসতে পারে? বড় কঠিন কাজ এটা, বড়ই সুন্দর। ঐ কাজ করতে করতে ছই চোখ বিলম্বন দিতে হয়েছে ঠগে। চোখ কি সম্ব করতে পারে চোখের ঐ পীড়ন!

শযময় করে এই বাড়ি। তিনটি মানুষের কারও মুখে কোনো রা নেই। বোবার মত বসে থাকে কেউ, কেউ করে বোবার মত চলাকেনা। কোনো সাড়া নেই। কিন্তু হারানবাবু যখন গড়গড়া নিয়ে যেন, যেন হয়, তার গম্ভীর কসরব করে ওঠে যেন জল। কেবল তখনই বোকা বার এ বাড়িতে প্রাণ আছে, প্রাণী আছে।

মানুষের গুপের সঙ্গে বসে তিনঘনী সকলের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে। শুপিকে লম্বাগাছের গোড়া আলগা করে দিচ্ছেন তার বাবা—হারানবাবু বক্যোপাখ্যায়, আর বায়াকার এক কোণে নিবিচার ভাবে বসে আছেন ভক্তকালী দেবী।

লবঙ্গ বসল, এরা এগেছে দুঁচের কাজ দেখতে। উঠে গিয়ে গুপের নিয়ে দেখাই; কি বল ভাই?

তিনঘনী একই হাসল; বলল, তা তো বটেই।

অনুগ্রহাও আরতি আগে দেখেছে, কিন্তু শোভা আর ফুলরা আজ প্রথম এল এখানে। তাদের চোখে কৌতুহল তাই একই বেশ।

ওরা উঠল। ওদের নিয়ে দেখাতে লাগল তিনঘনী। একটা জলা, জলার ওপারে তালগাছ, গাছের পাতার আড়ালে চাঁদ, চাঁদের হালকা ছায়া এসে পড়েছে জলে, এদিকে আর-একটা ছবি—গোহুলির হতে ম্লস হয়ে আছে প্রান্তর ও আকাশ, সেই আকাশে অর্ধচন্দ্রাকারে ভেসে চলেছে এককীক বক; আর এই-বে, কেনিগ হয়ে উঠেছে মল্ল, তার উত্তর ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়েছে কিনারে, বায়ু উপরে কেনার দাগ।

উৎকল হয়ে উঠল জুন্নরা। বলে উঠল, হুঁচের কোড় দিয়ে প্রভো দিয়ে আঁকা, বলেন কি? পুতী গিয়েছিলাম, অবিকল এই জিনিস দেখেছি—মনে হচ্ছে খটো বলে।

দেওয়ালে-দেওয়ালে ঘুরে বেড়াতে লাগল তারা। পরিপাটি করে সাঁজানো হয়েছে ছবিগুলি। ছবি-আঁকার কৃতিত্ব তার মাথের, কিন্তু সাঁজাবার কৃতিত্ব ত্রিনয়নীর।

জুন্নরা আবার বলল, কে সাঁজিয়েছে ছবিগুলো? আপনি নিশ্চয়? বেশ সাঁজিয়েছেন, একদিকে কেবল সমুদ্রের ছবি, একদিকে গুহু আকাশ, একদিকে কেবল প্রান্তর, একদিকে—

বাধা পিল তাকে লবঙ্গতা; বলে উঠল, ছবির সাজ দেখতে এসেছিল নাকি শো?

জুন্নরা হেসে উঠল, তার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিনয়নীও। ঐ হাসিতে যোগ দিল লবঙ্গও। বলল, কদিন থেকে ধরেছে, চল চল চল, দেখে আসি ছবি। নিয়ে এলাম, এখন সের্বিক জোব না দিয়ে সাজের কথা বলা হচ্ছে।

কথটা বলেই একই খনক গেল সে, কলকাতার কাছেই নাকুল সে, হুতরাং এদের থেকে বুদ্ধি একটু বেশিই আছে বলে তার ধাবি আছে, বলল, যে সাঁজিয়েছে সে যে পাশে দাঁড়িয়ে, তার মুখের সামনে কি কথ্যাত করতে আছে? সে লক্ষ্য পায় না?

বলেই সে ত্রিনয়নীর হাত ধরে ফেলে বলল, পি বল ত্রিনয়নীসি?

ত্রিনয়নী লক্ষ্য পেল না। সম্রাতিত ডাবে বলল, মায়ের জিনিস আমি না। সাজালে কে সাজাবে বল।

—তা তো বটেই। আর, একি যা-তা জিনিস! এ যে দুকে করে রাখার মত। যে-জিনিস তৈরি করতে একটা নাকুল বিসর্জন দিল তার চোখ, সে-জিনিস গোছগাছ করে রাখার অন্তে প্রাণ দিতে হবে আমাদের।

গোড়া আর জুন্নরা একদুটো চেয়ে আছে লবঙ্গও মুখের দিকে। ঐ ছবিগুলোর বাহার আছেই, সেটো সঙ্গে তারা বন আজ জানতে পারল কথা-বলার বাহারে লবঙ্গও কন নর।

দেওয়ালের গারে দাঁড়িয়ে ওয়া আলোচনা করতে লাগল নানারকন। এ-জিনিস পাশ পায় না এখানে, এই গায়ের মধ্যে একটা নিরাপা বাড়ির প্রাচীরের আড়ালে এইভাবে পড়ে থাকবে এই জিনিস? এ-জিনিস আগলে রাখবে ত্রিনয়নী আর কতদিন। তার বাবা বুড়ো হয়েছেন বটেই, নিজের বয়সকে কেয়ার করেন না বলে এখনো জেদের বশে জ্যান্ত-বগেছেন নিজেকে। হ্যাঁও একদিন এমন-তেমন

হয়ে যেতে কতক্ষণ? আর তার মা, ঐ ভদ্রকালী দেবী? উনি তো খেতেও মেরে, এবং সত্যিসত্যি একদিন নেই ছাড়ে ব্যাঙগাও বিড়ি নর। তখন?

ত্রিনয়নী বলল, তখন? তখন আমি হয়তো থাকব। আমি বহুদিন থাকব ততদিন—

এগিয়ে দাঁড়াল জুন্নরা। বলল, তা বটে। কিন্তু তার পর?

—একদিন হয়তো আসবে প্রবল বড়, হয়তো নামবে প্রচণ্ড বর্ষা, বহুপাখ্যায়দের এই পলকা বাড়িটা হয়তো লম্বু করতে পারবে না সেই লাগট। দুদিনাং হয়ে যাবে এই গুহু। তখন, যে-মহিলার দৃষ্টি উছ হয়ে গেল ওগুলি একে ফুলতে গিয়ে, অবিকল ঐ ভাবেই কি উছ হয়ে যাবে এই বর্ষের দিচ্ছিল?

দীর্ঘনিশ্বাস কেমন ত্রিনয়নী। বলল, হয়তো।

বাগাঝার কলরব করে উঠেছে গড়লড়ার জল। হারাধনবাহু তামাক চানছেন। আচমকা ঐ দখে এবের কলরব শোনে গেল। হুপ করে দাঁড়িয়ে বইল তারা।

নীচু গলার জুন্নরা বলল, না, ওগুলো নই হতে দিতে নেই। পাশ হবে।

অবাক দৃষ্টি মেলে সে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল ঐ ছবি।

ভদ্রকালী দেবীর কানে দিয়ে পৌঁছে গেছে বুদ্ধি ওদের কথা। শুনেছেন, কিন্তু স্যাড়া দেন নি। এবার জুন্নরার নীচু গলার কথা শুনে তিনি ডাক দিলেন। বললেন, ত্রিনয়নী, শোনো—

মায়ের ডাক শুনে বুদ্ধি চমকই লাগল তার। তত পারে সে মায়ের কাছে গিয়ে নীচু হয়ে বসে বলল, কি মা? গাল বেয়ে জল নেবে এসেছে, চোঁক গিলে তিনি বললেন, কে রে ওয়া?

ত্রিনয়নী একে একে নাম বলল সকলের, একে একে পরিচয় দিতে লাগল তাদের। শুক হয়ে বসে তিনি শুনেতে লাগলেন তাদের নাম।

ওরাও এসে দাঁড়িয়েছে ভদ্রকালীকে ঘিরে। অন্ধ চোখ দিয়ে ওদের বুদ্ধি খেবার চেষ্টা করছেন তিনি। দৃষ্টিহীন চোখ বৃন্দাঙ্কন বুদ্ধি ওদের উপর। কোনো কথা বলছেন না।

হুঁকে দাঁড়িয়ে লবঙ্গ বলল, দেখে সেলাখ। খুব সুন্দর হয়েছে, চমৎকার। আসল কথা, হুতরাং করার ভাণা পাচ্ছি, মাগিমা।

হাত চুলে আদীর্ঘ্য করার মত করলেন ভদ্রকালী। কোনো কথা বললেন না।

বিদায় নিয়ে চলে গেল তারা। বলে গেল, সন্ধ্যা হয়ে এল, আর পেরি করা যাচ্ছে না, আবার এসে আবার দেখে যাবে তারা।

ওদের পায়ের লক্ষ গড়কি-বজ্রার ওপরে মিলিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরে ভদ্রকালী দেবী আবার ডাকলেন, ত্রিনয়নী?

—কি মা?

—আমি ছুঃখী। কিন্তু আবার দুঃখের চেয়ে স্থপ যাক বেশি খসে মনে হচ্ছে, নয়ন।

ত্রিনয়নী একদৃষ্টে চেয়ে রহে রইল মায়ের গায়ের কাছে। সাধনা দেবার কথাই বৃষ্টি খুঁজতে লাগল সে। কেন দুঃখ কিসের দুঃখ বলে এবোধ দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

ভদ্রকালী জিজ্ঞাসা করলেন, কে রে ঐ ঘেরটা?

—কার কথা বলছ মা?

—নীচু গলায় যে বলছিল পাশের কথা।

মায়ের কথা শুনে চমকে উঠল বৃষ্টি ত্রিনয়নী। কোন পাশের কথা কে বলল, চিন্তা করতে লাগল সে।

উত্তর না পেয়ে ভদ্রকালী বললেন, বৃষ্টি কি নে? যে বলছিল, ওগুলো নষ্ট হতে দিতে নেই, ওতে পাশ হয়? কে রে ও?

যদিব নিশাগই বৃষ্টি কেবল ত্রিনয়নী : বলল, ও, এই কথা? ওর নাম ফুল্লরা।

প্রতিশ্রুতি করে উঠলেন ভদ্রকালী দেবী, উচ্চারণ করলেন ঐ নাম—ফুল্লরা।

কেন ওর নাম জানতে চাইলেন, বৃষ্টিতে না পেয়ে ত্রিনয়নী চুপ করে বসে রইল।

ভদ্রকালী জিজ্ঞাসা করলেন, কে ও?

—আমাদের কে-বোন হয়। কাঁপিতে থাকে, পেড়াতে এসেছে।

এরা কথা বলছে, হারাধনবাবু একমনে কলরব বাজিয়ে চলেছেন তাঁর গড়গড়ায়। নিশ্চিত মনে টানছেন নল, না, চিন্তিত মনে—ঐ শব্দে কান পেতে অস্থান করার চেষ্টা করতে লাগলেন ভদ্রকালী দেবী।

এই নিহুতে পরম নিরীহবিরিতে কেটে চলেছে মল্লিকপুত্রের জীবন। কখনো কখনো মণ্ডলকুণ্ডীর তিায়া কথলা-গায়ের কোঁড়কলী ঘেরেয়া এসে এখানে হানা দিয়ে এর নীরবতা শেষ ভেঙে। বলে বলে হুকে গড়ে তারা বাড়ির মধ্যে। বাধা পেওয়া যায় না, বাধা পেওয়া ঠিকও না। দেয়ালে-দেয়ালে চোখ বুলিয়ে বেড়ায় তারা। একটু থমকে ঠাঁড়ায় কখনো, আবার পাল পেয়ে আসে সাগা

গরের ঘেঁকোট। দেখা শেষ হলে চলে যায়। লম্বলম্ব আসে কখনো-কখনো, ফুল্লরাও।

একটু ভাবের পরে চলেছে জীবন। একটু থাকে দেখন পরে চলে শ্রী নদীর স্রোত, সে স্রোতে চেঁউও ছেঁয়ে ওটে না, জগৎরসও বাজে না।

এক এক সময় ত্রিনয়নী ভাবে তার নিজের কথাও। অভিন্ন বর্ণতে মেমেছিল সে, ভেদেছিল ওটাও বৃষ্টি একটা। বিল। শিল্পী মায়ের কল্পা হয়ে শেও শিল্পী হয়ে উঠে, এট ছিল ইচ্ছে। কিন্তু তুল হয়েছিল সে। ও-জিনিষ আড়ালে বলে চটা করার জিনিষ, হাটের জিনিষ নয়, ঘাঠের জিনিষ নয়। তুল করেছিল, সে-তুল সংবাদন পরে নিয়েছে। জীবনে আর বেন অবন তুল করতে না হয়, এই তার ইচ্ছে।

মনের মধ্যে সেই ইচ্ছে নিয়ে সে বসে আছে। এ পেনল ইচ্ছেই নয়, এ তার কাছে প্রতিজ্ঞাও। প্রতিজ্ঞা পালন করে চলেছে সেই প্রতিজ্ঞা।

এই ভাবেই এবানকার জীবন কেটে চলেছে। অগম্যং সেই জীবনের মাকথানে উচ্চর মত আবির্ভূত হল এক আগন্তুক।

চোলা পায়জায়া পরনে, গারে চিলে হাতের পাঁজাবি, বলিষ্ট চেহারা বরাট এক পুত্র।

কেবল এই নিহুত পুত্রটিকে নয়, সারা শালবনীকে চমকে দিয়েছে ওই মায়ুঘটা। স্টেশন থেকে যখন ঐ মায়ুঘটী মল্লিকপুত্রের দিকে রওনা হয়েচে পদতলে তখন তার পিছনে অব্যে উঠেছে ছোটপাটো একটা ভিড়। এই বাড়িতে পৌঁছবার আগেই সারা শালবনীতে ছড়িয়ে গিয়েছে ঐ ধবর।

স্বাভা করছিল লম্বলম্বতা, ধবরটা তার কানে পৌঁছনো-মাত্র হাতের বৃষ্টি ছেলে রোপে আচলে হাত মুহুতে মুহুতে ছুটে বেহিরে এল সে হাজার। কিন্তু শেষতে শেল না কাটকে, কলব দেখল—অহল্যাবাট বোডের রাস্তার ধূলা দমকা বাতাসে এদিক-ওদিক উড়ে বেড়াচ্ছে।

পাশেই শোভা কাঁড়িয়ে, তার দিকে মাড়োচোবে চেয়ে লব্ধ বলল, বৃষ্টিতে পারলে? আমরা সব গায়ের মেয়ে, আমাদের চোখে ধূলা দিয়ে বেন কাটাছিল এত কাল।
কিন্তু শেষের ধূলা উড়িয়ে কে এল গো, শোভা?

মিলমিলিয়ে হেসে উঠল শোভাবানী : বলল, আমাদের মল্লিকপুত্রের নতুন কাষাই এল।

লব্ধও হাসল : বলল, জোগাড় করেছে নাকি চিয়া।
পেগতে-গুনতে নাকি ঠায়ে?

—তাই তো ভুলছি।

সাপড় বললে নিজে সেবি হয়ে গেছে অসুস্থধার।
এতক্ষণে সে এসে পাড়াল ভেঙে পাশে। 'ভা'কাতো লাগল
চাব খায়ে। কিছুই দেখতে পেল না কোথাও।

লবঙ্গ বলল, জতকণ্ডে এলো? সাজ শেষ হল? কিন্তু
শোভাবাহা তো শেষ ছইয়ে গেছে, ভাই।

ঐ আগন্তুকটি বসন স্বচ্ছাণাখ্যাত-পুত্রে বংকার দিতে
পাড়িয়েছে তখন বিনয়নী ছিল উঠোনে। তার বাবার
শিরের কাছে পড়িয়ে যাচ্ছের আলবালে জল সেবার কাজে
তৈরি ছিল। চরিত্র পরজার ঐ স্বচ্ছবস্ত্রকে এবং তার
শিঙনে ছোট-ছোট ভিড় দেখে সে এমিয়ে এসে বংকার
কাছে। জিজ্ঞাসা করল, কাকে হুকছেন?

বিনয়নের মুখের দিকে চেয়ে দ্বিত হেসে বলল ঐ
আগন্তুক, আবাকে চিনবেন না। কিন্তু আমি চিনতে
পেয়েছি আপনাকে। আমি বিনয়নী দেবীর কাছে
এসেছি।

—আহ্নে। ভিতরে আহ্নে। বাবা, বাবা—কোনো,
ইনি এসেছেন।

দুঃশান্তি কেলে রেখে উঠে পাড়ালেন হারাধন বচ্ছা-
ণাখ্যাত। বসে উঠলেন, কে?

—আমার নাম সিদ্ধার্থ।

মূলে-মাথা চাত্রে নমস্কার করলেন হারাধন। বললেন,
আহ্নে।

বরাংকার মোড়া নিয়ে গিয়ে তাঁকে বসাল বিনয়নী।
সমুখে বসল সে। বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করল, কোথা
কোকে এসেছেন জানতে পারলে খুশি চব।

চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে সিদ্ধার্থ। বিনয়নীর প্রশ্ন
তখন একই হাসল সে; বলল, আসছি বাহ্যিক থেকে।
ওখানে এগজিবিশন ছিল। কলকাতার কিরছিলাম।
বড়পুত্রে নৌছে হান হল, কেবের বাই। মালপত্র তাই
ওখানে রেখে চলে এলাম।

একই পেমে বলল, বুকেতে পারলেন না নিশ্চয়। আমার
পরিচয় না দিলে গোকা কঠিনই বটে। বনজার কথা নিশ্চয়
হনে আছে আপনার?

বিনয়নী বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। একশকে অভিনয়
করতাম আমরা। কেনন আছে ও?

—জাদো আছে।

—অভিনয় করছে এখনো?

—হ্যাঁ, করে। যাক-যাকো। আপনার মত অমন
বেঙলায় নয়।

বিনয়নী চিন্তা করতে লাগল। 'ভুললোকটির মুখের
দিকে চেয়ে বলল, তার পর? কি-যেন বলছিলেন?
আপনার পরিচয়ের কথা কি-যেন বলতে বাচ্ছিলেন?

—বলছিলাম, আমি তার ছাত্রপাণ্ড। আমার নাম—
বাধা বিশেষ উল্ল বিনয়নী; বলল, থাক। আর বলতে
হবে না নাম, যথেষ্ট চিনেছি। আপনি তো বনামধর
মাতুল। অতবড় একজন আর্টিস্ট আপনি! আপনার
নাম কে না জানে?

মাথা নীচু করে বসল সিদ্ধার্থ।

একই পরে বলল, আমি এসেছি আপনার মায়ের
হাতের কাজগুলো দেখতে। বনজার কাছে এর কথা
ওনেছি অনেক বার।

—হ্যাঁ। আমার কাছে হয়তো ও ওনেছে।

—আমার ইচ্ছে— সিদ্ধার্থ বলল, ওগুলি নিয়ে গিয়ে
বর করে সাজিয়ে রাখব আর্ট-গ্যালারিতে। আমরা এই
ধরনের কাজ কলেই করছি। অনেক কথা আমরা
আনিবেছি করিধপুত্রের কোরকবি প্রায় থেকে। এসব
নষ্ট হলে দেশের লোকশিল্পের উত্তর নষ্ট হয়।

বিনয়নী এক-কথার কোনো উত্তর দিল না। তার মন
বোম্বাসিত হয়ে উঠতে লাগল পুলকে। এমন একজন
খ্যাতিমান শিল্পী—কেসে আর বিশেষে বার এত নামডাক
—সে কিনা তাদের এই মায়ের বাড়ির খোজ করে দেখতে
এসেছে তার মায়ের হাতের কাজ! জোগাড় করতে
এসেছে সেই সব হুঁচের কাজ!

সবুজ ছবি একে-একে দেখল সিদ্ধার্থ। আর,
ঝিড়কি-পরজার কাছে পাড়িয়ে কৌতুহলী জনতা দেখতে
লাগল সিদ্ধার্থকে।

বিনয়নী তার মায়ের কাছে এসে বলতে লাগল
ঐ ভুললোকটির কথা, তাঁর এখানে আসার হেতুর কথা।
কিন্তু বলার আর কী দরকার। ভুলকানী দেবী ওনেছেন
সব। তিনি কোনো-কিছু উৎসাহই দেখালেন না। শুধু
বললেন, থাক নয়ন, থাক। ও-সব ছুরি যদি আগলে
রাখতে না পার তবে আমি গিয়ে বেন অস্ত্রকে।

—কাকে, যা—কাকে?

কোনো উত্তর দিতে পারলেন না ভুলকানী দেবী।
একই পেমে বললেন, ধুরাকাকে।

ভারতের খনিজ সম্পদ ও উন্নয়ন

মিহির বসু

খনিজ সম্পদে ভারত যে অল্প কোনো দেশের চেয়ে দীন নয়, এ কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। তবে এ কথা ঠিক যে, পৃথিবীর অস্ত্রাশ্রয় সব দেশের মতোই ভারতকে কোনো কোনো খনিজের অল্প অপর বেশের ওপর নির্ভর করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান ভগতে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশকেই কোনো-না-কোনো খনিজের অল্প অল্প বেশের দ্বাৰা ঘেরে থাকতে হয়।

প্রয়োজনীয় খনিজকে আমরা মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি; যেমন—(১) হাতব খনিজ ও (২) অগতব খনিজ। আবার আভ্যন্তরীণ খনিজ প্রয়োজনীয়তা ও গুণত্বের ওপর নির্ভর করে খনিজ হবোর কয়েকটি বিশেষ ভাগ করা যায়; যেমন—পারমাণবিক খনিজ (atomic minerals); জ্বালানী খনিজ—যেমন কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি; তাপ-নিরোধক খনিজ (refractory minerals)—যেমন কাথানাইট, অ্যালুমিনা, ম্যাগনেসাইট প্রভৃতি।

এইসব বিভিন্ন ধরনের খনিজের মধ্যে কোনো-কোনোটিতে ভারতের সমৃদ্ধি নিজের প্রয়োজন মেটানোর পরও বিদেশের চাহিদা মেটাতে পারে। কোনো কোনো খনিজের চাহিদা ভারত বহুসংপূর্ণ, অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনই মেটাতে পারে। আবার যে-সব খনিজের অল্প ভারতকে অপর দেশের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়, তার তালিকাও খুব ছোট নয়। সুতরাং এইদিক থেকে দেখতে গেলে ভারতের খনিজকে

তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং এই প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আছে খাতব ও অগতব খনিজ উভয়ই।

ভারতের খনিজ শিল্পের অবস্থা এখন মোটামুটি এই রকম। তবে আশা করা যায় যে আরো ছোবলার খনিজ-অন্বেষণ, খনিজ কার্যে যোগাতির ব্যবহার (mechanisation) ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে খনিজ কার্য-পরিচালনার দ্বারা ভারত তার প্রতিটি খনিজ শিল্পের ক্ষেত্রে অবদার ভারো উন্নতি দাঁতে পারবে। এই উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতীয় ক্ষুদ্র-সমীক্ষা ও তাত্ত্বীয় খনিজ-সংস্থার সাহায্য অনেকগুণি।

ভারতের খাতব খনিজের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় লৌহ-আকসিকের। বিহারের সিংভূম, উড়িষ্যার কেওজর, বোনাই প্রভৃতি অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশের বাস্তার, গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চল—বিশেষ করে মহীভূমের বাবান্দান পাহাড় প্রভৃতি অঞ্চলগুলি থেকে প্রতিবৎসর প্রচুর লৌহ-আকসিক উৎপন্ন হচ্ছে। তবে বিহার ও উড়িষ্যার খনিজগুলি থেকেই আমাদের শতকরা ৯৫ ভাগ আংশিক উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে আবার সিংভূমের মোটামুটি অকালের আকসিক সম্পদ এখিনার বৃহত্তম রূপে ইতিমধ্যে দৃষ্ট আকর্ষণ করেছে।

ম্যাগনেসিয়াম আকসিক উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে ভারতের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এই আকসিকের প্রধান অংশ উৎপন্ন হয় মধ্য-ভারতে—ভাওয়াল, চিন্দুয়ালা, বালাঘাট, নাপপুর, গবলপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। এ ছাড়াও

শ্রেণী-বিভাগ	হাতব	অগতব
তত্ত্বানি-যোগ্য খনিজ	কক্সাইট, লৌহ ও ম্যাগনেসিয়াম আকসিক, ম্যাগনেসাইট, বেরিল, ইলমেনাইট	ট্যাল (Talc), বালি (amule), গিপসাম (Gypsum); তাপ-নিরোধক খনিজ—কাথানাইট (Kyanite), অম্র (Mica) ইত্যাদি।
বহুসংপূর্ণ খনিজ	ক্রোমাইট, সোনা, পাইরাইট, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি খনিজ	কয়লা, ডোলামাইট, চুনাপাথর, ব্যারাইট, রত ও উপর্য
পরিমিতখণ্ড খনিজ (আমদানীকৃত)	তামা, কয়লা, নিকেল, নীলা, দস্তা, ম্যাটিনাথ, টিন, টাংস্টেন ও মলিবডেনাম আকসিক	পেট্রোলিয়াম, গন্ধক, গ্র্যাফাইট

মহাভের শিল্প ও ডিম্বাগাণ্ডাম, ঘনীভূতের ডিসলক, সিমেন্টা, বেথাইএর ক্রমসিটি, পাঁচমলে প্রভৃতি যান এক হিহর ও উচ্চতার বিভিন্ন অকল থেকে ম্যানানিক আকরিক উৎপন্ন হচ্ছে। আমাদের দেশের প্রয়োজন মিটিয়েও এই আকরিক কুটন, আমেরিকা ও জাপানে বাজায়। বিশ্ব জা হলেও, সম্পদ-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই খনিজের আরো কোমর আরও প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে ম্যানানিক-ব্লক ইম্পাত ও দু-একটি রাসায়নিক ত্রব্য তৈরি ছাড়া ম্যানানিকের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয় না। ম্যানানিকের ব্যবহার বহুবিধ; এদিক দিয়ে আমাদের দেশে এক বিরাট শিল্প-উন্নয়নের পথ খোলা রয়েছে।

ক্রোমিয়ামের প্রধান আকরিক হচ্ছে ক্রোমাইট। বিহারের সিল্ভম, মাদ্রাজের সালেম, উচ্চতার নেভাসাই অকল থেকে যথেষ্ট পরিমাণে ক্রোমাইট উৎপন্ন হচ্ছে। বসিন ইম্পাত ও কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ তৈরির কাজ ছাড়া, ক্রোমাইটের একটা বিরাট অংশ উপদ্রুত শিল্প-পটনের অভাবে ভারতের বাইরে রপ্তানি হচ্ছে। বিশেষ করে রসায়ন-শিল্প (chemical industry) ক্রোমাইটের ব্যবহারের এক বিরাট সম্ভাবনা আমাদের দেশে হয়ে গিয়েছে।

এলুমিনিয়ামের আকরিক Bauxite বা Aluminous laterite সম্পদে ভারত সমৃদ্ধ। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে এই হাজার টন এলুমিনিয়াম উৎপন্ন হয়েছে, বিভিন্ন গতি-বহন প্রকল্পে উৎপাদন অল্পত এর দিনগণ বাজায়। সম্ভাব্য উড়ি-উৎপাদনের সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে এলুমিনিয়াম-শিল্পের উদ্বিগ্ন উজ্জল হয়ে উঠছে। এলুমিনিয়াম-উৎপাদন ছাড়াও ভারতের বক্সাইটকে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, তাপ-নিরোধক ত্রব্য তৈরি, জালনী তৈল শোষন ও উচ্চশ্রেণীর সিমেন্ট তৈরির কাজে লাগানো যেতে পারে। এইসব শিল্পের উদ্বিগ্ন চেয়ে ভারতে বক্সাইট উৎপাদন ও ব্যবহারের কাজ খুব দ্রুত করাই আমাদের লক্ষ্য।

তামার (Copper) যেমন অভাবে আমাদের দেশে, তেমনই অভাবে দস্তা ও সীসা। প্রকৃতপক্ষে ভারতের একমাত্র তামা-উৎপাদন কেন্দ্র সিল্ভমের তামাবনী। দস্তা ও সীসা আকরিক উৎপন্ন হয় রামপুতানার আওতাবে। হুতরাং এইসব খনিজ আরও প্রকৃতি আমাদের আগ্রহ চোঁটা করে যেতে হবে এক-এর সূচনা হবে প্রাচীন ও পরিত্যক্ত খনি-অকলগুলিতে নতুন করে অন্বেষণ চালিয়ে। এই অন্বেষণ-কার্যে ভূ-রাসায়নিক (Geochemical) পদ্ধতির আদ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি।

অখাত খনিজের মধ্যে সর্বশেষ আসে বলতে হয় জালনী খনিজের কথা। কল্যাণ আমাদের দেশের বড় সম্পদ। তার মধ্যে বাংলা ও উচ্চতার বিভিন্ন স্থানেই ভারতের কল্যাণ প্রধান অংশ উৎপন্ন হয়। তা ছাড়াও আছে মধ্যভারত ও দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন কল্যাণ খনি অকলগুলি। আমাদের বিত্তীয় পরিস্থিতির তদারকপে কল্যাণ উৎপাদন বহুলাংশে বাড়ানো হবে, তবে আশা করা যায়, এই উন্নয়নে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের খনি-অকলেই মোর বেগা হবে বেশী। খনি-কার্যের প্রথম অবস্থা অর্ধেকজাতিক ও অপরিপক্ক উৎপাদে কাজ চালানোর আমাদের বহুক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তবে বর্তমানে আর সে-সম্পদের কারণ নেই।

কিছু শ্রেণীবিদগণ তৈল বা গ্যাসের আমাদের দেশে বড় অভাব। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে এক বৈজ্ঞানিক সংস্থা তৈলানুসন্ধানের কাজ চালাচ্ছে। এ ছাড়া সরকার বিশেষ তৈল-কোম্পানির সদস্যগিষ্ঠায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে অন্বেষণ-কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। এঁদের সাফল্যের সঙ্গে জাতীয় অগ্রগতি অনেকখানি বাড়িয়ে আছে।

তাপ-নিরোধক বস্তুগুলি অখাত খনিজ আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। সিল্ভমের ল্যাম্বাক অকলে ক্যানাইট (Kyanite), মাদ্রাজের সালেমের ম্যাননেসাইট, মাদ্রাজ ও পেটাইকেশার আগবেলটন ও আগবেল বসি-অকলের সিলিমেনাইট (Sillimanite) উল্লেখযোগ্য।

অল্পের বাজারে একসময় আমাদের একচেটিয়া ছিল। কিন্তু আজ ক্রটিম অল্প-তৈরি হুক হওয়ার ফলে অল্পের বাজার পড়ে যাচ্ছে। অল্পকে তাই নতুন করে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে হবে।

পদ্মক আমাদের দেশে নেই বললেই হয়। বিহারের বিভিন্ন স্থানে এ নীলগিরিতে পাইরাইট পাওয়া যায়, তবে তা খুব কাজের নয়। অন্ত্যস্ত অখাত খনিজের মধ্যে বিকারীরের ত্রিমূল্যম দেশের বিভিন্ন কাজে লাগানো হচ্ছে, তার মধ্যে সিল্ভার-সার-উৎপাদন একটি।

গ্র্যাফাইটের সম্ভাব্য আমাদের দেশের অনেক স্থানেই পাওয়া গেছে। উচ্চতার কাল্যাহাতি, হুংমপাড়া প্রভৃতি স্থানে ও পাটনা, কোরাপুট, নন্দপুর মেলাব নানা ভাগ্যায় খনিজ গ্র্যাফাইটের সম্ভাব্য মিলেছে। গ্র্যাফাইটের ব্যবহার বহুবিধ; বিশেষ করে উচ্চশ্রেণীর গ্র্যাফাইটকে বহু প্রয়োজনীয় শিল্পে লাগানো যেতে পারে। তা ছাড়া, অধিকতর গ্র্যাফাইটকে শোধিত করে নানা শিল্পের প্রয়োজনে লাগানো সম্ভব।

আবার পারমাণবিক শক্তি-উৎপাদনের ক্ষেত্রেও গ্র্যানাইটের প্রয়োজনীয়তা আছে।

ভারতের 'পারমাণবিক বনিম বা atomic mineral'-এর নাম আলাদা করে বলা উচিত। আমরা পারমাণবিক শক্তির ঔপনিবেশিকতা চাই না—তাকে শক্তির কাজে লাগাতে চাই। দেশের কাছে লাগানোর অন্তে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করার মতো ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, অ্যাক্টিনিয়াম-যুক্ত বিভিন্ন বনিম আমাদের দেশে চড়িয়ে আছে। ইউরেনিয়াম বনিম সম্বন্ধে সব আগে বলতে হয় ত্রিবাঙ্কুরের মোনাঝাইট বাসির কথা—যেখানে সঙ্গতভাবে ইস্যুনাইট প্রভৃতি কয়েকটি ভাট্টা বনিমের সঙ্গে বাসি বাসি মোনাঝাইট ছড়ানো রয়েছে। এতে ইউরেনিয়াম-থোরিয়াম দুই-ই আছে। এ ছাড়া বিহার, রাজপুতানা, মাদ্যাজের নামা স্থানে পারমাণবিক বনিমের সম্বন্ধে বিবেচনা। 'পারমাণবিক শক্তি কমিশন'-এর সাধির আঁক অনেকখানি।

কোনো দেশে বনিম-আবিকারের পরেই তা সাধারণতঃ বিশেষ চালান দেওয়া হুক হয়। তার অঙ্গতম প্রাথমিক কারণ এই যে, আবিস্কৃত বনিমের পূর্ণ সন্ধ্যাবহারের মতো শিল্প তখনই সে দেশে পড়ে ওঠে না। তার পর ঘরে ঘরে শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজন দেখা যায় ও শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেশের বনিমগুলি কাজে লাগানো হয় ও বিশেষ থেকে বনিম-আমগারির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তা ছাড়া, শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে পা কেল সঙ্গে বনিম-উন্নয়নের কাছও চালিয়ে যেতে হয়। আমাদের দেশ এখন বনিম শিল্পের এই যুগের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। তাই বিকে দিকে পড়ে উঠছে বিভিন্ন কলকারখানা ও শিল্পোন্নয়নের এক-একটা প্রাপ্তকল্প। পড়ে উঠছে রাউলকলা, পড়ে-উঠছে ডিমাই, প্রাণ নিয়েছে দুর্গাপুর। এই শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে লগেই তাই বনিম-উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার দ্বারা তাই কোনো কোনো বনিমের উৎপাদন-লক্ষ্য বর্তমান উৎপাদনের কয়েকগুণ। এখনও আমাদের দেশে এমন অনেক বনিম রয়েছে যা আমাদের বিশেষে চালান দিতে হয়, কারণ

সে-সব বনিমের ব্যবহারের উপযুক্ত শিল্প অত্যন্ত আমাদের দেশে পড়ে ওঠেনি। আর আমাদের দেশে শিল্পোন্নয়নের পথে পা বাড়িয়েছি—আমাদের পথ-পরিচয় এখনও অনেক বাকি।

এই বনিম-উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বেশা শিল্পেও নতুন বাড়িছে—আরো বিশদ ও ব্যাপক বনিম-অধ্যয়নের বাড়িছে। আমাদের এখন একমাত্র লক্ষ্য হলো উচিত—সম্পদগুণি। এর জন্য চাই কতখানি অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক-গোষ্ঠী—যার অভাব ভারতে কোনদিনই হবে না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আদ্য অধ্যয়নকারী হল অধ্যয়ন উৎসাহে কাজে লেগেছেন। ভূ-পদার্থিক পদ্ধতিতে (Geophysical methods) দ্বারা ভারতে বিভিন্ন বনিমের অধ্যয়ন চলছে। তবে ভূ-পদার্থিক পদ্ধতি এখন ভারতে প্রচলিত হয়নি। তা ছাড়া, এই অধ্যয়ন-কক্ষে 'drilling methods' যে আরো ব্যাপক-ভাবে চালানো উচিত, আশা করি তা যেরূপেই অস্তিত্ব বাড়িছে তাই দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে।

বনিম-উৎপাদন-কৃষিতে একটা মনোবৃত্ত প্রয়োজন হ'ল বনিম কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগ (mechanisation)। যদিও আমাদের দেশে জনসংখ্যার অল্প বেশের তুলনায় স্থানীয় জনসংখ্যা, তাহলেও mechanisation-এর দ্বারা কাজের গতি দ্রুততর হবে। তবে এইসব যন্ত্রপাতি তৈরি করতে হবে আমাদের দেশে, দেশের ঠাটামাল ব্যবহার করে; এতে বেকার-সমস্যা বহুলাংশে সমাধান হবে।

বনিম-উন্নয়নের এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয়েছে আরো পণ্যবণ্য ও তথ্যগতসম্পদের। অধ্যয়ন-নিরীক্ষণের বনিম কিভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে উৎকর্ষশীল উন্নীত করা যায় বা নিরীক্ষণের বনিমকে কি কি শিল্পে নিয়োগ করা চলতে পারে, আবার আমাদের দেশে অধ্যয়ন বনিম বিবেচনা কি কি নতুন শিল্প পড়ে তোলা যেতে পারে—এসব বিষয়েই হৃদয়িত পরিকল্পনা, পণ্যবণ্য ও তথ্যগতসম্পদের প্রয়োজন আছে। আশা করি, বিভিন্ন পরিকল্পনাকে তপাহিত করে আমরা আমাদের দেশের ভারতকে রূপ দিতে পারব।

মনোহর ও প্রেমতারা

❀ মহাস্বেতা ডটকম ❀

—ক্রাইন! ক্রাইন! ক্রাইন! ছুয়ো নিয়ে
সমন্বরে চেঁচিয়ে উঠল বস্তির ছেলেগুলো।

মানুষটাকে দেখলে সস্তাই চান্নি পায়।
মানুষের বিকৃতি মানুষকে যেমন কোতুকের খোরাক
জোগায়, এমনিই আর কিছুতে নয়। ক্রাইন, ক্রাইন,
ক্রাইন!

মানুষটাকে দেখলে বয়স ঠাণ্ড হুটন।
পয়তাল্লিশ কি পঞ্চাশ কি পঞ্চাশ—যে-কোনো একটা
হতে পারে। কোথায় যেন খেনে গিয়েছে বয়সটা।
মাথার চুল, ঘাড় আর জলকিত পাক ধরেছে
অর অর। রোগে পোড়া তানাতে মুখখানা একদিন
দেখতে কেমন ছিল, সে কথা তার বুড়ীর মুখের শত
ব্যাখ্যানেও আজ আর বোকা যাবেনা। কোনো
নিম্ন কোতুকে কে যেন মুখখানাকে ধারালো
আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করেছে। কপাল, নাক,
একদিকের কান থেকে গলা অবধি চামড়া কুঁচকে
রয়েছে আজও। যতটুকু অক্ষত রয়েছে, সেখানে
চেনড়া যেনন টান-টান, তেমনিই চকচকে দেখতে।
চামড়ার এতখানি লাভণ্য তার চেহারার সঙ্গে সস্তাই
বেনান। আর সবচেয়ে অসঙ্গত তার চোখ-
ছুটি। ঐ চোখ দেখেই নাকি—, বলে তার বুড়ী
যখন গরু কেঁদে বসে তখন ছেলে কাঁধে ভর দিয়ে
লুটিতে পড়ে ধোপাবস্তির নেয়ে-ঝিঁরা।

মনোহরের চোখে একদিন সে কি দেখেছিল,
আজ তার রং-চড়ানো গল্পের জোতার। সে রহস্যের
হৃদিস কোনো কালেও পাবেনা। অতিশয়শক্তি বাদ
দিলেও বলা চলে, চোখে তার একটা অদ্বৃত আকর্ষণ
আছে। মুখের একদিকটা বার বার, কাঁধ থেকে ডান-
হাতখানা বার বার থাকে না—লটপট খায়, হাঁটবার

সময় শরীরটাতে যার অদ্বৃতভাবে কাঁকনি লাগে—
চোখছুটো তার আশ্চর্যকর প্রাপবন্ত। যে-কোনো
বালকের মতোই। বেঁটে কাঁকড়া হুসু নিচে
কালে। অলম্বলে চোখ-ছুটোতে একটা অক্ষরস্থ
আদিন কোতুল। এ মানুষকে যেন মুখে কথা
কইতে চেনা। চোখই তার হয়ে কথা কর।

সকালবেলা কাঁধে বাজারের থলি নিয়ে পথে
বেরায় মনোহর। লাল, সাধা, কালো মোটা মোটা
জোরা-কাটা বিচিত্র কোট আর গোড়ালির কাছে
হুতো-ওঠা বিবর্ণ সবুজ পাণ্টে প'রে। তার
এ পোশাক দেখছে চারবছর ধরে, তবু কালিয়ার
দেশী কুকুরটা তীর প্রতিবাদে ডেকে ওঠে। ত্রস্ত,
হুস্তিত ও ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গীতে হাঁটতে থাকে মনোহর।
কিন্তু পাড়ার ছেলেপিলে এই নিশানার অপেক্ষাতেই
ওং পেতে ছিল। তারা গলির নোড়ে কাতার দিয়ে
দাঁড়ায়। দেখে মনোহরও তাড়াতাড়ি হাঁটে।
ডানহাতটা প্রয়োজনের চেয়ে বেশীই দোলে। পাশ
কাটিয়ে ধাবার সুযোগ সে কোনদিনও পায়না।

—ক্রাইন! ক্রাইন। ক্রাইন! কানে তোলেন।
মনোহর। জোরে জোরে পা চালায়। ছেলেগুলো
তার হাঁটার ভঙ্গী নকল করে আগে পাহে চলে।
বক দেখিয়ে ইতার শব্দ করে মুখে। আদিসের
ছড়া কাটে। তখন ক্ষেপে যায় মনোহর। দাঁড়িয়ে
জন্তর মতো নাক তুলে বিপককে কোন্ দিকে চেপে
ধরবে ঠাণ্ড করে নিয়ে তেড়ে যায়। রাগলে তাকে
আরো অদ্বৃত দেখায়। যদি কাউকে ধরতে পারে,
বেগে বসে আস্তে হু-বা।

পরে বাজার-ফিরতি মনোহর যখন দোকানে

বসে, তখন ছেলের মা-বোন-পিসীরা এসে বুড়াকে গালি দিয়ে যায়। বুড়ী বুড়ার হয়ে তাদের সঙ্গে কণ্ডা করে। আবার দোকানে এসে বুড়াকেও শাসায়। বলে,

—কেন গো, ঐ জানাটি পরবার তোমার কোন দরকার? তোমার জেঞ্জি কি প্যাড়ায় আমি বিগাদ করবো?

চোখ পিটপিট করে বুড়ো। অস্পষ্ট জবাব দেয়। পরে বুড়ী মরে গেলে বয়স থেকে বুড়ি লঞ্জেস নিয়ে সকালের অপরাধী দলের কারুক দেখলে ক্লান্তি হেসে হাতে গুঁজে দেয়। আপোস হ'লে পরে পাড়ায় ছেলগুলো। চোখে চোখে ইঙ্গিত করে নিজেদের মধ্যে। মনোহরকে বলে,

—বুড়ার শুধু গাঙ্গাখুরি কথা! বাঘ খেলাতে তুমি? ঐ বুড়ো হাড়?

মনোহর বোকে এ হলো গল্প শ্রুত করবার বর্ভাই। বুকে চোখ মিটমিট করে। ভাবখানা এই—বড় চালাক তোমরা। তোমাদের চালাকি আমি বুকেছি। ছেলেগুলোও নাছোড়বান্দা। বলে, বাঘের খেলা দেখবি তো হাওড়া-সার্কাসে যা। কী খেলায় নেয়েটা! কোথায় লাগে ভার কাছে...

এসব কথা বললেই যে তেতে উঠবে মনোহর, তা নয়। তবে বেচাকেনা শিকের তুলে রেখে সে বিড়ি ধরায়। বলে, মিছে ক্যাও-ক্যাও করিস না। চেপে যা রে ছোঁড়ার।

দম নিয়ে বলে, বাঘের খেলা আর তোরা কি দেখলি! ব্যাণ্ড বাজছে কমেকম কমেকম—ঠাবুতে মাছুষ—বাগেরে মাছুষের ভীড়! মাখায় মাখায় কালো দেখা যাচ্ছে। সব নিশ্চুপ। চুকলাম যখন বাদশাকে নিয়ে, আরে ফাপরে তার তেজ! এই ঘোড়ার মতো বাঘ। লাল-টকটকে বরণ—হাঁক যখন দিলে, ভয়ে নিশ্বাস পড়েনা মাছুষের। তারপর—!

ব'লে এদিক ওদিক তাকায় মনোহর। বলে,—সার্কাস দেখাতে এয়েছে। যা শুধোঙ্গো হাওড়ার মাছুষকে। হ্যাঁ, লড়াইয়ের বছর দেখিয়েছিল বাঘের

খেলা গোপীনাথটারের দল! মনোহরের নাম তারা জানে। মাষ্টার বললো—মনোহর, বিগড়ে গেছে বাব। গুলী করে খতম করে দাও ম্যাকিন্টোকে ডেকে। আমি বললাম খবদার মাষ্টার, জান নেবার এজিয়ার নেই তোমার—জানটি নিয়ে নেবে? বিগড়ে গেছে জানোয়ার। গোপীনাথটারকে জাখে আর হাঁকার ছাড়। ভয়ে মাষ্টারের হাত-পা কালিয়ে গেছে। সেই বাবকে এক দাবড়ে ঠাণ্ডা করলাম—এক চাবুকে বাঘ চুপ! এমন খেলা বেললে বাদশা যে, রংপুরের পুলিশ-সাবেব সেই নেউনী-সাবেব, এটী অ্যাডো-বড়ো জোড়া গৌফ—বাঘের বড়ো কুকুর পোবে—এক ধমকে যার জেলা ঠাণ্ডা—সে এসে আমাকে অমনি পঞ্চাশটাকা বখশিশ করলে। বললে—সাবাস মনোহর, বাপুকা বেটা তুমি! বাঙালীর মান রাখলে!

গল্পের খেই তেড়ে চটাপট শব্দ হয়। দোকানের স্তরের দিয়েই পোতলায় উঠেছে মি'ড়ি। বুড়ী নানে চটি-পায়ে। তোমার বাঘিনী আসছে গো!—ব'লে পালায় ছেলেগুলো। ছেলেগুলোকে গালি দিতে-দিতেই নানে প্রেমতারা। বলে,—না কি খাটেছে, বাপু ঘানি টানছে, আর দামড়া ছোঁড়াগুলো বগল বাজিয়ে বেড়াচ্ছে! পুলিশে হুঁড়ি দিয়ে ধরে নে' যায় তো বেশ হয়। দিন রাত ক্যাচ-ম্যাচ!

মনোহরের দিকে কটাক ক'রে বলে,—আবার লঞ্জেসগুলো বিলিয়েছে? কেন? পাতবা করতে বলেছি আমি তোমায়?

বুড়ো রাগ করতে জানে। বলে,

—বেশ তো, কাল থেকে তোমার দোকানে তুমিই বোসো গো প্রেমতারা। আমি তোমার হিসেব মাটি করিছি। লোস্কান করিছি তোমার!

সামনে কেউ না থাকলে প্রেমতারাও বুড়ার রাগ জাঙাতে জানে। বলে,

—আমার লোস্কান যে তোমারই লোস্কান গো! তুমি আমি কি ভেদ?

এ কথায় বুড়ো বড় খুশি হয়। তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বলে,

—আজ রাতে বসনি তবে বল ?

—তোমার শুধু হোক হোকানি !

প্রেমভারার কণ্ঠে অকৃত প্রাশ্রয়। আফ্রাদে মনোহর একটু স্থব্র ঝাঁক। বলে,

—বিকেল-বিকেল এক-পো কিনা কিনে আনব। কেমন ?

—হ্যাঁ, এই গরম তাতে আমি রাঁধতে বসে মরি আর তি !

—কেন রে, আমিই ভাজবো এখন। সেই বেশ ঝাল-ঝাল ক'রে ?—পাখি কেটে দিয়ে ?

কিছু রহস্য, কিছুটা বা স্নেহ চোখে নিয়ে তাকিয়ে থাকে প্রেমভারা। বলে,

—ছেলেগুলোর ওপর হুনি অবন ক'রে রাগ কোরো না। পাড়াটা ভালো নয়।

ছেটি ছেলের মধ্যে গোবের সাক্ষাই দেয় মনোহর। বলে,—তা ওরা আমাকে ক্যাপায় তেন বল ?

—হুনি ঐ জানাটি ন; পরলেই পারে।

—হুই বলিস্ তো পরবো না।

প্রেমভারা চোখে-চোখে হাসে। বলে,—না পরলে যে মানায় না।

ছুজেনই হাসে। এসব কথা তাদের অনেকবার বলা-কওয়া হয়েছে। আজও তারা বলছে আর পরেও বলবে,—এমনিধারা একটা পারস্পরিক সনকতো প্রকাশ পায় তাদের হাসিতে।

পদ্মপুত্র পাক দিয়ে চড়ে রাভাটা ঠঠাং সর হয়ে ঢকে গিয়েছে পুবদিকে। এই জায়গাটুকু ধোপা-বস্তি। সাউথ-ক্যালকটা ধোবিখানার মকলদের পত্তি। ধোপার ঘরে পয়সার অভাব নেই। তাই খোলার ঘরগুলো প্রায়ই মোতলা। ব্যাডশাল-কোটের ঘুরন্ধর রাবাবু এই বস্তি থেকে নাসে নাসে মোটা টাকা তোলে।

পাঁচমিশেলী মানুষ নিয়ে গলিটা আশ্চর্যরকম জীবন্ত। ডজলোকদের প্রবেশাধিকার দেয়নি গলিটা। এখানকার বাসিন্দারা আর হাই হোক, জাপ্তবডাবে বাঁচতে জানে। কাঁচা পয়সা রোজগার করে মেয়ে-পুত্রবে। মোড়ের মাসের শোকন থেকে তিনটাকা দেরের মাস হরদম কিনে আঁলে বেঁধে নিয়ে যায়। নতুন ছবি বেতলে, বাচ্চা-কাচ্চা মেয়ে-পুত্র ক'ক বেঁধে 'রুপালী' সিনেমায় গিয়ে বসে ফার্স্টক্লাসের টিকিট কেটে। বিয়ে-সাদিতে রাস্তার এদিক-ওদিক জুড়ে মিছিল বের করে। কাঁধে গ্যাসবাতি নিয়ে সার সার মানুষ যায়। লাল, কালো, সাদা, সোনালী রুমকালে পোশাক প'রে ব্যাওপাটি আসে। হস্ত তুলোর হাঁস বা ময়ূরপঙ্খী নৌকোতে বর-বউ বসে। এমনধারা বিয়ে মাসে এখানে তিন-চারটে হয়। ছট-পুজোর ঠেলাগাড়ির ওপর কলা, বাতাবি, শসা, বাতাসা পাহাড়ের মতো ভূপ ক'রে নিয়ে পয়সা ছড়াতে ছড়াতে কালীঘাটে যায় মেয়েরা রানসীতার গান গাইতে-গাইতে। শেতলা-পুজোর কালীঘাটের পট্টয়াপটিতে অর্ডার যায়। দশহাত আড়-লম্বার প্রতিমা আসে। বারোয়ারী চামায় নমো-নমো ক'রে পুজো দেবে না-কে সন্তুষ্ট করবার ভারটা বুড়ীদেব ওপর ছেড়ে দিয়ে মাভস্বরহা মৌজে ব'সে যায়। রং-টা যখন বেশ ভালো চড়ে তখন—সোহাগীর বাপ মেয়েকে শস্তরবরে পাঠায়না কেন, অথবা সেন-বাড়ির মেয়েকে কে চিঠি-চালাচালি করতে দেখেছে পার্কে—এইসব কথা থেকেই গালাগালি হৈ-হুলা মেগে যায়। মোড়ার বাতলও ছুটে যায় ছুটে-একটা। পাড়ার পাশেই পুলিশ-কাড়ি। স্তরং বেকীলুর গড়ায়না হাসনা। আলাপ-আলোচনা যা হবে তা বজুজনের মতো। মারচোট নিয়ে মূলাকাতে ছিপফেরই আপত্তি। আবার কখনো কখনো ট্রাইসোকোটোর ভারে হিন্দী গজলগানের মাধ্যমে কথা কয়ে ওঠে বিবরবাসী ফিদে। এ ফিদেব বাসা মনে। এর জান্না শরীর-মনের চন্মনানিতে। যখন অস্থির

হয়ে ওঠে কলিকার রক্ত, শুধন কখনো মাকরাতে
গানের কলি ছুটে যায় আধারে—

গমে দিল তুচ্ছকো দিয়া

গমে দিল তুচ্ছকো দিয়া...

অঙ্ককার রাজ্য পা ঘষটে-ঘষটে বাড়ি ফেরে কোনো
বেসামাল বাস-ডাইভার।

ক্ষিদে-ভেঙে স্নেহ-ভালবাসা প্রেম-হিংসা-বাৎসল্য
নীচতা-শর্ততা এইসব জাহ্নব-রুদ্ধিগুলো বেনে বেনে
ঘে-সব মানুষ বাঁচে, তারা হয়তো এইসব গানের
ভেতরে অজ্ঞাত কথা শুনেতে পায়। যাদের কান
নেই তাদের কাছে এ একান্তই চুটকি ও সস্তা।
প্রাণ পায়না তারা এতে।

খোপা-বস্ত্রের নাকামাতি জারগায় তিক বাঁকের
মুখটায় মনোহর আর প্রেমতারার ঘর। খোলার
দোতলায় একখানা বড় ঘরে থাকে ওরা। বারান্দায়
টিনের আড়ালে রাসার জারগা। জলচৌকিতে
বাসন-কোসন, ঘরে খাট-আলনা, দাঁড়ে ময়না,
কোণায় পুরোনো গ্রানোফোন—সাজসাজগুৎ সংসার
বৈধেছে প্রেমতারা। দেয়ালে টাঙানো একখানা
পুরোনো জাপানী মান্নের কিমোনো-পরা পাখা-
হাতে জাপানী মেয়ের ছবিখানা কিকে হয়ে এসেছে।
টিনের রং-চটা তোরণে ক'টা রং-চটা পুরোনো
সাদিন-দিকের পোশাক আর রূপোর মেডেলও
পুরোনো—দেখলেই বোকা যায়। নতুন-পুরোনো
অনেকগুলো ক্যালেন্ডারের ছবিতে দেওয়ালের
ফুটো-কটা বন্ধ। ছোট ছোট জানলা দুটো পুরোনো
শুন্নির কাপড়ের পর্দায় ঢাকা। মুক্খীপায়রার নতো
গেরমানি করে বাঁচে এখানে প্রেমতারা। এত
চ-রং তারই সাজে। নইলে এ-পাড়ার মানুষের
জীবনে এত আত্ম নেই। যা আছে খোলামেলা।
জানা-জান্তি।

পাড়ার মানুষ খাতির করে চলে প্রেমতারাকে।
বলে—এরে ক্বাপরে! বড় শনি-মেয়েমানুষ!

সে কথা সাজে। বড় ধার প্রেমতারার চোখে
মুখে, কথায়। বয়স কোন্-না পয়তালিশ হবে,

একদিনের কটা রঙে এতদিনে বেচেতা পড়ছে।
জিরি-জিরি কৌকড়ানো চুলের ওরা সিঁথিতে পরি-
পাটি বাড়ির মতো হুটি-খোপা। আট-দিকের সস্তা
ছাপের কাপড় ঝুঁচিয়ে পরা, পায়ে চটি—প্রেমতারার
যেন মহারানী। নীল চোখে আভ ও বিজলী-কিলিক।
দরকারমতো ছ-বশটা বাবা পুকুরকে দাবুড়
সায়েরতা করবার যোগ্যতা রাখে প্রেমতারার।

মনোহর নয়, প্রেমতারাই হালটি ধরে আছে
সংসারের। যে হাতে ধরে আছে, সে যে কতখানি
দড়ো হাত—যার অভিজ্ঞতা আছে, সেই জানে
এ তল্লাটে।

নিচের তলায় মনোহারী দোকানটা একাত্তই
বুড়াকে সারাদিন একটা কাজ ধরিয়ে বসিয়ে
রাখবার জেঙ্গে। পাড়ার মানুষই শুধু নয়, মনোহর
নিজেও যেন সেই ভাবনার ভাবনে। যেন এ দোকান
তার তেমন করে না চাললেও হয়। যেন
অনেক-কিছু আছে প্রেমতারার। এ দোকানে বসে
খেলাচ্ছিলে কিছু গাম্বলিতি যদি করেই মনোহর,
ভাতেও কোনো দোষ হবে না। এই ভাবটা তিক
দেখতে পারেনা প্রেমতারার। যখন যেটি করবে,
সেটি বিচক্ষণভাবে না চালাতে পারলে তার রাগ
হয়ে যায়। খাটা-পেন্সিল লেঙ্কেল-বিষ্ট ডাল চিনি
গুলিহুতো। সাবান ধূপকাটি আর চায়ের-পাতা-
প্যাকেটের এ দোকানটা খেকেও মাসে মাসে অসহ্য
একশো টাকা হুলতে চায় প্রেমতারার। বলে,

—দাতব্য তো খুলিনি? ধার দোষ কেন?

বাকি রেখে জিনিস দেওয়া নিয়ে এক এক দিন
তুমুল কাণ্ড বাধে। বুড়ো যত চাঁচায়, বুড়ীর লক
ভীকু গলা তার তিনগুন ওপরে যায়। হুংসিত
গালিগালাজ বিনিময় হয়। তার পর বিনিময়ে বিনিময়ে
কাদে প্রেমতারার। রাগা-ভাতে জল ঢেলে দেয়।
ক্ষিদে মোটে সইতে পাবেনা মনোহর। তাই
বেলা হলে সে-ই অপারগ হয়ে মান ভাঙায়।
কৌস-কৌস করে প্রেমতারার আর কামটা দিয়ে মুখ
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেয়। বলে,

—আচ্ছ আমি টেপসী, বুড়ী ধুন্দী—ইঁড়ের বহা হইছি! আমার আর কদর নেই, না?

হাজার বার ঘটি মানে মনোহর। নাক-কান মলে, মাপ চায়। অনেকগুলো হলফ করে। ওখন প্রেমতার উঠে এসে খেতে বসে। খাওয়া-বাওয়া হলেও মুখের বেধ কাটেনা। পান খেতে ঈষ্টান দাই-বাড়ি যায় প্রেমতার। বলে,

—ও আমার কি বিয়ে-করা স্বামী যে এত কথা শুনব আমি? আমার মতো মানুষ ছিল বলেই-না ত'রে গেল নিসে?

প্রেমতারার কাছে টাকা ধারেনা এমন মানুষ কেউই নেই এ তরাটে। সায় দেয় ঈষ্টান বুড়ী। বলে,—সে কথা আমার তো বলি-ই। তোমার মতো মানুষ নিদি—

এ কথার মুখে-মুখে মনোহরের নিম্নে যদি উঠেই পড়ে, সে সঙ্ক হবেনা প্রেমতারার। তাই সে অজ্ঞ অনেক কথার মুখ বন্ধ করে বলে,

—কি করবে বল ভাই, সাধ ক'রে কাকল পরিচি, এখন কালি বেরলেও কিছু বলা চলবেনা।

এমন ক'গড়া অনেক হয়। অনেক মেটে-ও। কেনে দিক টেনে কথা কইলে সুবিধে হয়, পাড়া প্রতিবেশী তার কুল-কিনারা পায়না।

বিকেল নাগার দেখা যায়, চুল আঁচড়ে ভব্য-সভ্য হ'য়ে সাদা জিনের প্যাট আর গলাবন্ধ কেউ প'রে ছুতো পায় চলছে মনোহর। পাশে পাশে প্রেমতার। চলছে রঙীন নাজ্জাকী কাপড় প'রে—পাউডার বেখে, বোঁপা বেঁধে। হুজনে এমনভাবে গল্প করতে করতে চলছে যে, দেখলে কেউ মনেও করবে না জিনবন্দী আগে একজন আর-একজনকে খুন ক'রে কাঁসি যেতেও অরাজী ছিল না। এখন তাদের বড় ভাব। এখন আর মনোহরকে কেউ ক্যাপায় না। ক্রাউন ব'লে ডাকে না। প্রেমতারাকে সনাই ক'রে সবাই চুপ করে থাকে। প্রেমতার। বলে,

—ঐ কোটাটা না পরলেই পারো। কই, এখন তো কেউ কিছু বলছে না?

মনোহর আর প্রেমতার। ট্রামে চড়ে বেড়াতে যায়। প্রায়দিনই গড়ের মাঠে গিয়ে ব'স থাকে। বাধাম-ভাঙ্গা, ফুচ্কা, আলুকাবলী খায়। কোনদিন বলে,

—চল গো, 'ভিক্টোরিয়া' ঘাই।

এত জায়গায় যায় তারা, কখনো ভুলেও ভিক্টোরিয়ানা যায়না। খাঁচার বাঁধা পশুপাখী দেখতে তাদের ভালো লাগেনা। খাঁচার বাঁধনে বন্দী বাঘ-সিংহের ডাক—তাদের পাড়ায়ও শোনা যায় মাঝরাতে। কখনো ঘুনের ঘোরে সে ডাক শুনে মনোহর হাতের কাপট নেরে ডাকটা না শোনবার চেষ্টা করে। কিন্তু মাঝরাতের নিবৃত ছাড়া যে জানোয়ার ডাকে না, তার ডাকের জোর আছে। সে ডাক মনোহরের কানে পৌছবেই পৌছবে। সে ডাক শুনে এখেনা মনোহর চুমু ক'রে জেগে ওঠে। ভালো লাগেনা তার। মাথাটা শুঁকে দেয় সে প্রেমতারার কাঁধে। শিশুর মতোই সাধনা চায়। ও ডাক শুনে চায়না মনোহর। ও ডাক সে চেনে, জানে, বোঝে। অনেকদিন আগে খোলা জঙ্গলে থাকতো অরণ্যচারী—রাতের রোঁদে বেরিয়ে কখনো ডাকতো সঙ্গিনীকে। আবার কখনো গভীর গর্জনে জানান দিত নিজের অস্তিত্ব। এখন সে-রীবন ভুলে গিয়েছে তারা। ওবু মাঝরাতের নিবৃত বাঁধারে গাছপালা-বোঁওয়া ঠাটা বাতাস নাক ভরে টানতে টানতে আজও তারা ডেকে ওঠে। এ হলো অভ্যাসের ডাক। এতে কোনো কথা নেই। কোনো বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ নেই। খাঁচার বাঁধন অসহ্য হয়েছে বলেই যে তারা ডাকে তা নয়। এমনি করে তারা ডাকতো অনেকদিন আগে। তাদের শৈশবে। কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানাইকা—সুন্দরবন, মহাপ্রদেশ বা গাড়োয়াল অঞ্চলের কথা আজ তাদের আফিমের মৌতাজী মনের কোন্ ভল্লায় তলিয়ে গিয়েছে। কপিল চোখে যদি কিছু থাকে তো সে-ভাষা কোনদিনও বুঝবেনা মানুষ। এখন তারা ডাকে পুরোনো অভ্যাসের বশে। এ ডাক

শুন ছটফট না করলেও পারে মনোহর। তবু তার কেমন-কেমন লাগে। আবার এক এক দিন জানলার ধারে বসে কান পেতে শোনেও মনোহর। শুনতে-শুনতে ঘুম চলে যায়। চুপ করে বসেই থাকে মনোহর—আর খাঁচার বাঘের ডাক শোনে কান পেতে।

দোকান যে একেবারেই সখের জিনিস প্রেমভারার, এ কথা বললেই চটে যাবে সে। যে বলবে, তাকে গালি দেবে। নয়তো সেধে খগড়া করতে বসবে বুড়োর সঙ্গে। তবু এ-কথা নেহাতই হুইলোকার রটনা নয়। অনেক যোগ্যতা রাখে প্রেমভারা। নিজের গুণের তার কম ভরসা নেই।

রাত এগারোটা সাড়ে-এগারোটায় যখন পথঘাট নিখুঁত হয়ে আসে তখন হাতের বিড়ি রাস্তায় কেলে জুতো ঘষতে নিভিয়ে, দ্বারার মণ্ডা সাং করে ঢুকে যায় মানুষ মনোহরের দোকান-ঘরে। জুতো ধুলে রেখে উঠে যায় দোতলায়। সিঁড়ি মচমচ করলে চটে যায় প্রেমভারা।

গুপরের ঘরে মেঝেতে সত্তরফি বিছিয়ে, ঢাকা-দেওয়া লঠন বসিয়ে যা চলে—আইনের চোখে তা নিষিদ্ধ। তিন-তাসের ম্যাজিক জানে প্রেমভারা। একটাকা-দেড়টাকার বাজি থেকেই কি-রাতে তার পঁচিশ ত্রিশ চল্লিশ টাকা কামাই। মরক্তমে বেশীও ওঠে। সূতি-পান খায় প্রেমভারা, আর তীক্ষ্ণ চোখে ছাখে কোনো ফলিবাজি হলো কিনা। বাজি হেরে পয়সা না দিয়ে উঠে পড়লে কোনও সাঙাতকেই পরোয়া করেনা প্রেমভারা। সেতাব, বিদেশী বড়্কা এরা প্রেমভারার হয়ে কলার চেপে বসিয়ে দেয়। বলে,

—আপনার ভুল হয়ে যাচ্ছে দাদা!

চাগিয়া এই যে এমন ভুল বেশীজন করেনা। এখন বাছাই-করা মানুষকে অনেক খোঁজ-তল্লাসি নিয়ে ভবে ঢুকতে দেয় প্রেমভারা। চুনাপট্টির গলিতে পাঁচবছর আগে বড় হৈ-হাঙ্গামা হয়েছিল।

দেশী নদের কারবারী শুকলাল সা প্রেমভারাকে পেঁচিয়ে ফেলবার জন্তে রসিয়াকে পাঠিয়েছিল। রসিয়া কোনরকম গুণানি করবার অনেক আগেই হামা তুললো ভকত। তাকে ঠিকিয়েছে রসিয়া। সন্তোহা টাকা প্রেফ ডবল-নগলা বেশিয়ে নিয়েছে। চাঁচানেচি হৈ-হাঙ্গামা থেকে ছোরা পেঁচিয়ে গেল রসিয়ার বাঁ কবজিতে। পুলিশকে খবর দেবার তালে ছিল শুকলাল। অবস্থা দেখে সেও ঘাবড়ে গেল। সে হামার জেরে বাসা উঠিয়ে দিতে গেলো প্রেমভারাকে। ডাইস-বার্ড সেই থেকে আর পাতেনি প্রেমভারা। মানুষ এনেছে বাছাই করে। বাজি ধরবার নেশা এসব মানুষের রক্তে। নেশার কোনো জাত-বিচার নেই। সে কথা প্রেমভারাই চমৎকার বলে। এমন করে বলে—যেন এ একটা মস্ত জীবন-বর্শন। অনেক অভিজ্ঞতার ফলে যেন এই গভীর তত্ত্ব জেনেছে সে। বলে,

—আমি তো পাপ করছি না গো—ব্যবসা করছি।

মনোহর বলে,—ঐ তিন-তাসট তোক ডোবারে জানলি? জুয়ো বেলাস্ তুই—!

প্রেমভারা তখন আস্তে আস্তে ভালো কথায় এই দর্শনের ব্যাখ্যান করে। বলে,

—নেশাটি কি আমি ধরিয়েছি? নেশা যে মানুষের রক্তে গো! এক এক জনের এক এক নেশা। দেখনি তুনি? বোড়ার নেশায়, নহের নেশায় মানুষ কম পয়সা খোয়া দিচ্ছে? এই পয়সা মানুষ খরচ করবেই করবে। তা আমি ব্যবসা করে ছুঁপয়সা নিলে অর্থন হলো? এই পয়সাটি যে ওরা অস্ত্র জায়গায় খুঁয়ে আসবে। আমার কাছ থেকে বরং সময়ে অসময়ে দুটো টাকা ধারও পায়। বলা, বা স্ত্রীয়া তাই নিই আমি। অর্থন করি না।

প্রেমভারার ধর্ম তার নিজের সুবিধেমতো ঠাণ্ডে চালা। নেশা আছে যখন, তখন তাদের বাজিতে কয়টাকা খোয়া দিক্ মানুষ। সে তো বেচে ডাকছেনা কারকে। তবে সুবিধাবাদী বলেই বাতিল করা চলবেনা প্রেমভারাকে। একটা জায়গায় তার

আশ্চর্য ধর্মবোধ আছে। সতেরো টাকা খোয়া দিয়ে ভক্ত কিরকম হাটহাট করে কৈদেছিল বৌ-বাজার নাম ক'রে, সে-কথা ছুঁতে পারেনা। প্রেমতারা। যার খোয়া দেবার মতো টাকা নেই, তাকে পারতপক্ষে ডাকেনা সে। ঢুকতেই দেয়না। বৌ-বাজার মুখ ছুঁতে হুগুর টাকা নিয়ে জুয়ার আড্ডায় বসে যারা ভাঁড়ে চুনুক দেয়—টাকাটা খোয়া গেলে তারাষ্ট সর্বনাশ দেখে সামনে। সেই বৌ-বাজার নাম ধরেই শোকটা তাদের চাণিয়ে ওঠে। অনেক নীতির বালাই যার নেই, সেই প্রেমতারাষ্ট কোনো এক আশ্চর্য নীতিবোধ থেকে এই ধরনের ছা-পোষা মানুষগুলোকে বাতিল করে দেয় তার লিস্ট থেকে। অবজ্ঞা প্রত্যাখ্যানের ভাষাটা রুচ। কথাগুলো কঠোর। বলে,

—তিনপয়সার কারবাতীর আবার জুয়া খেলে বড়মুগ্ধ হবার সম্ভ। ঐ-যে বলে, কত সাধ যায় রে গৈর, নলের আগায় চুইকি দিতে!

বের-ই করে দেয়না শুধু—দরকার হ'লে বাড়ি গিয়ে বৌ-কে কথা শুনিবে আসে। এমনিধারা মানুষ প্রেমতারা। পাড়ার মানুষ তার কুল পায়না। কালিয়া, ছেদীলাল, নহবৎকে যে হাসি-মহরা ক'রে পান দিয়ে আপ্যায়ন ক'রে ঘরে বসায়—সে-ই যে কেন চরিত্রা আর ছবিলালের বেলায় এমন রুচ হয়ে ওঠে কে তার হদিশ করবে? মনোহর তখন বলে,

—তুই ভাগালি ব'লে কি ও ঘরের টাকা ঘরে নিয়ে যাবে?

—যে ভাগাড়ে ইচ্ছে যাক্না কেন। আমার চোখের সামনে তো নয়।

রোজগার একরকম করেনা প্রেমতারা। তার আরো পক্ষ আছে। বিশেষ বিশেষ দিনে যেদিন মনের দোকান বন্ধ থাকে, অথবা রাত-গভীরে স্বপ্ন কাল্পনিক দরকার পড়ে—হুঁটাকার কায়গায় চারটাকা ফেলালেই তোরঙ্গ খুলে বোতল বের করে দেয়

প্রেমতারা। তার বন্ধের অনেককেই। ঝাড়ুগাঁও-এর ছোটবাড়ির বখাটে ছেলে পাশা থেকে শুরু করে ডাক্তার-বাড়ির পরোয়ান পর্যন্ত সকলেই আসে প্রেমতারার ঘরে। ক্রাইনের কোট গায়ে দিয়ে মনোহর তখন আশ্চর্য কিপ্রগতিতে ওঠা-নামা করে। টাকা গুণে বাজিয়ে, আলোয় দেখে তবে তেরঙ্গ খেলে প্রেমতারা। মাঝে মাঝে রাত ছোটো-আড়াইটের গাড়ি করে আসেন বাহু। প্রজাপতির মতো বেয়েদের রেশমী পাশাকের আভাস বোকা যায়। চাপা গলায় হাসাহাসি হয়। গাড়ি থেকে ভেতরে টানা শিশ শোনা যায় চার বার। চারটে বোতল নিয়ে নেন আসে মনোহর। একনিমিষে গাড়ির পেছনের লাল চোখ আধারে উধাও হয়ে যায় হুহুড়ে কিপ্রতায়। গলির মোড়ে কন্সটেবলের পায়ের মচমচ শব্দও ভয় নেই প্রেমতারার। গৌক চুন্নর দোকান বরাবর এসে কন্সটেবল দাঁড়ায়। তার বখরা হাতে জঁজে দেয় মনোহর। সে চলে যায় টহল দিতে দিতে। আবার নুন্নানু নিন্দুপ হয়ে যায় গলি। সমস্ত কৌ-কৌ। গ্যাস-বাতির নিচে ঘুনোতে-ঘুনোতে বোবা ধ'রে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে ওঠে কুহুরটা।

পাড়ার জীবনে তবু প্রেমতারার অপরিস্রাব্য। অনেক জানে সে। বুদ্ধি আছে তার। সে শুধুই জীবন-সংগ্রাম করেন। জিত-জিতে বেঁচে। সে যে অনেকের চেয়ে দড়ো, তার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। পুরুষরাও তাকে স্বীকার করেছে। প্রেমতারার ছাড়-চিঠি সর্বত্র। শাউড়ী-বৌদের বিরোধে সে মোড়া পেতে ব'সে কুল্লী কলহ মিটিয়ে দেয়। আসন্নগ্রসবা বেয়ে-বৌদের 'শিউনসকল' নিয়ে যায়। টিকিট করে দেখায়। নিজের ছেলেবেয়ে নেই। তবু অনেক জানে প্রেমতারা। তার উপদেশে উপকৃত হয় মানুষ।

এ পাড়ার কিয়েরা বেয়েদের বিয়ে দিয়ে ঘর করতে দিতে চায়না। বেয়ে থাকলে তাদের রোজগার বাড়ে। শহর-বাজারের জীবন জেনে

মেয়েরাও বেশ-গায়ে গিয়ে খালিবে চুনো-পুঁটি ধরে—গোবর-চোপড়া দিয়ে সংসার চালাতে চায়না। শহরের ছেলেদের সেখা বেশ-গায়েই হেটো-মেটো মাছুয়ে মন ওঠেনা তাদের। বাসিনী-কুস্তম-বাস্তাসীদের মধ্যে ঘর-ঘর অশুদ্ধ হলো। ব'লে ছেড়ে আসবার নজর অল্প। এসব ক্ষেত্রেও প্রেমতারা মাথা গলায় নিজের থেকেই। বলে,

—এখানে মেয়েকে খারাপ পথে হাঁটিয়ে পয়সা রোজগার করবি, এতবড় বুকের পাটা কেন তোর ? বে দিইহিস—ছেড়ে দে।

যজ্ঞেন অভিসম্পাত দেয় প্রেমতারা। মেয়েদের বিয়ে হয়েছে যখন, সুখে-দুখে ঘর করুক। বলে,

—বিয়েটা কি একটা যেনন-ভেনন কথা ! কতবড় ধর্মের বাঁধন বল-দিশিনি ?

এই প্রেমতারাকেই অল্প সময়ে দেখা যায় মুক্ত প্রেমের সমর্থনে হয়-কে নয় করতে। ধোপার ছেলে বিরিকলাল আর কিয়ের মেয়ে কদমের ভাব হলো। বিয়ে নিয়ে দু'দলে মারামারি লাগে আর কি ! তখন প্রেমতারাই বুকিয়ে শুনিতে রাজী করলো দুইপক্ষকে। দুইপক্ষ নরাজ দেখে, বিরিককে ঘরে ডেকে নিয়ে বললে,

—রেস্তা ক'রে ভাগিয়ে নিয়ে কালীঘাটে বে করুণে যা। ননোমিল হ'য়েছে যখন, তখন ভয় পাস কেন ? পুরুষ-বাজ্ঞা না ?

দরকার হ'লে নীলচোখে কিলিক দিয়ে হেসে আজও মাতিয়ে দিতে পারে প্রেমতারা। বিরিক বললো,—হিন্তের কথা বলছো বাসী ?

রিজা নয়—বড় নহবতের ট্যান্সি চ'ড়ে বিয়ে করে এলো বিরিক। শেষ অবধি তার না সেই বৌ-ই বরণ করে তুললো ঘরে, আর মনের খুশিতে পুরোনো গ্রামোকাণে কানিকেনে গলার রেকর্ড বাজাতে বসলো প্রেমতারা আর মনোহর : কে নিবি ছল !—কে নিবি ছল !...

টাকার হুঁপস। হারে খুদ নিয়ে টাকা ধার দেয় প্রেমতারা। শোধ দিতে গেরি হ'লে গালি দিতে

যায়। আবার নেয়ে-বৌদের হুপুতের আসরে বসে আদিরস বা হুত-প্রেরের রসালো গল্প-ও সে ডানতে জানে। অনেক হুঁপালা নেয় প্রেমতারা। অনেক রকম শোবে খুঁপে মাছুষ সে। আকর্ষণ কি যে পাড়ার নাস্ত্র ত'র কুল পাখনা ! তা ছাড়া এই বয়সেও যার কাপড়ে চুলে চটিতে এমন পরিপাটি—সে-মেয়েমাছুষের কিনারা পাবে কে ?

সকলের কাছে দুর্ধোখ যে-প্রেমতারা, একজনের কাছে সে ভগ্নের মতো সহজ। মনোহরকে সে সত্যিই ভালবাসে। এই ভালবাসাও তার নিজস্ব চরিত্রের ঢঙে প্রকাশ পায়। সেখা ঝগড়া করে। সেখা মানিনী হয়। আবার অল্প সময় শুধুই নায়-মমতা দেখায়। তার কারণেই একদিন আকিন ধরেছিল মনোহর। সরকারী কস্টোলের দৃশ্য এনে আজও প্রেমতারা তাকে ক্ষীর করে দেয়।

বিকলে মনোহরের সঙ্গে বেরোনো, সে-ও তার একটা প্রয়োজনীয় বিলাস। এইকু নাকি তার চাই-ই।

মনোহরের স্বভাবে এত বৈচিত্র্য নেই। রাগ হ'লে সে সবাইকু নিয়ে কেপে ওঠে। হুঃ হ'লে গোটা মাছুষটার চোখ-মুখ নাক-কান সবই যেন কঁকড়ে যায়। প্রেমতারার প্রতি তার একনিষ্ঠ আত্মগত্যা। সে আত্মগত্যা আবার বেড়াতে বেরবার সময় যেমন প্রকাশ পায়, এমনট আর কখনো নয়। প্রেমতারা সেজেগুজে মেজাজে হাঁটে। মনোহর পালা নিয়ে তুর-তুর করে চলে। তার হাঁটা চলা এমন যে, গীরে হাঁটলেও মনে হয়, জীবজন্তুর মতো দুলুকি চালে যাচ্ছে।

কাঠের হাতল-লাগানো ছাপা কাপড়ের ব্যাগ ত'রে প্রেমতারা আর মনোহর তরকারি মাংস পেরোজ চা চিনি কেনে। হাল্লাবারার কথা তুলতেই প্রেমতারা অবস্র গরম তাতের কথা বলে কামটা দিয়েছিল, তবু কার্যকালে দেখা যায় বুড়োকে সরিয়ে সে-ই বসেছে স্টোভে জ্বলে। পুরোনো স্টোভে পাম্প দিতে দেয়না বুড়োকে। বলে, —...

—এক খুঁতো, মাছুষ, তাতে পুড়ে মরবে যে !

চাকির ওপর পেঁয়াজ আর ধনেপাতা ফুটোতে-
ফুটোতে মনোহর বলে,

—তুই পুড়লে আমার সইবে ?

—সইবে না ?

আনন্দ হ'লে গলাটা ভেঙে কথাগুলো আধখানা
হয়ে দিকিখানা হয়ে অদ্ভুতভাবে লাট খায়
মনোহরের মুখে। বলে,

—তুই কাই বলিস-না কেন, তোর বট আমার
এতটুকু নয় না। জানলি ?

অ্যান্থিনিয়রের কালি-বাধা কড়া চাপিয়ে
মাংসের বড়া ভাজে প্রেমতারা। চোখ ছোট ক'রে
সাইজ দেখে। তার পর বলে,

—তবু তো বে হয়নি।

—কি বললে ?

মনোহরের গলা এখন চমৎকার। সে এখন
কথায়-বার্তায় অনেক প্রভাব চাইছে। কার্পণ্য
করেন: প্রেমতারা। অল্প অল্প হাসে। বলে,

—বেশ কেটে গেল, তাই নয় গো ?

—আমার কি মনে হয় জানিস ? এতটুকু বয়স
হয়নি আমার। সত্যি বলছি। এই তোকে ছুঁয়ে
দিবা ক'রে বলছি।

—উ ? বুড়ী হয়ে গেছি না ?

ছোট পুকারি নতুন আবদার-কাড়ানো গলা
প্রেমতারার।

ছোট সতরকি পেতে বসে দুজন। মাঝখানে
থাকে বোতল গেলাস আর মাংসের ডাক্তারি,
পেঁয়াজ-কুঁটি। একটু একটু ঢেলে খায় মনোহর,
আর চোখে তার নিঠে নিঠে কুয়াশা নামে। এখন
এই বৃহস্পতি, যে মাছুষের চোখে এই বিগতযৌবন
নাগ্নের ছুটোকে কুংসিত লাগবে—বিকৃত লাগবে, সে
নাগ্নের বেশবার চোখ নেই। সে চোখ বসে সুন্দরই
হোক-না কেন, সে-চোখ দেখতে জানেনা। কেননা
এখন দুজনের চোখে দুজনকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

...দুজনের চোখ দুজনকে তারিক করছে। প্রেমতারার

মুখের মেতোতা, চোখের নিচের কোলা মাংস, মোটা
ঠোটে পানের কব কিছুই এখন দেখতে পাচ্ছেনা
মনোহর। সে দেখছে বিশ্ববহুরের প্রেমতারাকে।
গোপীনাথটারের গ্রেট-জুবিলি-মার্কাসের সেরা মেয়ে
প্রেমতারাকে সে দেখছে গোলাপী সাটিনের ঝাঁটো
পোশাকে, মাথায় জরির হাতা ধ'রে তারের ওপর
নাচতে। প্রত্যেকটা সুন্দর ডিজিয়ার পর নিচু হয়ে
অভিবাগন করছে প্রেমতারা। ধবধবে ফরসা মুখ।
নীল চোখটুকু অলঙ্কার করছে। কৌকড়া কৌকড়া
কটা চুলের বেটে বেগীতে চওড়া রিবনের স্থল।
শুধু কি প্রেমতারা ? সেই কলমলে আলো, গোপী-
নাথটারের চওড়া বকের ওপর ককককে মেডেলের
সাজ সে স্পষ্ট দেখতে পায়। কানে শুনে পায়
কম্বনে ব্যাণ্ডের বাজনা। তারই মাঝখানে গম্ভীর
গর্জন শুনে পায় বাদশার গলায়। লোহার খাঁচায়
অধীর হয়ে পায়চারি করছে বাদশা। পিঙ্গল মেহে
কালো ডোরাগুলো চকচক করছে। তার পাশ
দিয়ে ঘুরে যাবার সময়ে খরখরে ঘ্রিতে হাত চেটে
বাচ্ছে বাদশা। বাদশা অধীর হয়ে উঠেছে। এখনি
খাঁচা খুলবে মনোহর। তার পর পুণ্য পায়ের ঢুকবে
বাদশা।

আর প্রেমতারা ? মনোহর যখন এত-কিছু
দেখতে পায়, বিশ্ববহুরের ব্যবধান যখন তার মনে
থাকেনা—তখন নেশা না করেও প্রেমতারার চোখে
রঙ নামে। মনোহরের মুখের এই ক্ষত-বিকৃত দাগ,
পলুপ্রায় ডান হাতখানার অসহায় বিকৃতি, এসব
সে দেখেনা। সে দেখে পঁচিশবহুরের মনোহরকে।
মাঝারি স্তোম ছিপছিপে শরীর। জ্ঞানলা রঙের
সুজী চেহারা। ডাগর-ডাগর চোখে নাঠ-বনের
মায়। বুড়ো হাতী জরীর কপালে সাজ দিয়ে
লাল-টুকটুকে পোশাক পরে ঢুকছে মনোহর।
—‘হেই—হ্রো—হ্রো—সু সু—লাম্।’ —তার
নির্দেশে শুঁড় তুলে সেলান করছে জঙ্গী। তার পর
লোহার বলের ওপর দাঁড়াচ্ছে।

ইলেক্ট্রিক চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে

মনোহর। আগুনের রিক্তের ভেতর দিয়ে লাফিয়ে
যাচ্ছে বাবল।। দর্শকরা ঘন ঘন হাততালি দিচ্ছে।
মনোহরের বুকখানা ফুলে ফুলে উঠছে।

মনোহর আর প্রেমতারা এখন সেই অতীতের
সবটুকু জাঁকজমক দেখছে পতঙ্গপরের মুখে। এই
সবটুকু মিলিয়েই তাদের কাহিনী। এক প্রৌঢ়
মামুষ, আর এক লুপ্ত-যৌবন স্ত্রীলোকের প্রেমের
কথায় কাতকে হয়তো খুশি করা যাবে না। শুনতে
বসলে ক্রান্তি বোধ হবে। কিন্তু এখানেই তো
মনোহর আর প্রেমতারার জীবনের সূত্র নয়।
সমাপ্তিও নয়। এ তাদের জীবনের একটা অধ্যায়
মাত্র। একদিন সে জীবন সূত্র ক'রে আঁজ
তারা নাকপথে এসে পৌঁছেছে। মনোহর আর
প্রেমতারাকে জানতে হলে সেই দিনে ফিরে যেতে
হবে। সেই বিশ-বাইশ বছর আগেকার ছনিয়াতে।
বিশ-বাইশ বছরের ব্যবধান। তবু সেই বৃদ্ধের
আগেকার দিনগুলো যেন একমুগ আগেকার কথা।
একমুগের ধাক্কা পৃথিবীটার বয়স একশো বছর
এগিয়ে গেলো। ছনিয়ার পরিধি হলো ছোট। সেই
বিনগুলোকে তাই বোকানো মুশকিল। আজকের
দিনের কোনো বর্ণনা কোনো উপন্যাসেই সে-দিনটাকে
তেমন করে বোঝানো যাবে না।

হুঃখ-দারিদ্র্য, হতাশা, মৃত্যু—জীবন-সংগ্রামের
এই অধ্যায়গুলির কোনটাতে সেদিনও অমুপস্থিত
নয়। সবই ছিল, তবু তার বাইরেও যেন অস্ত-কিছু
ছিল। স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বেধে আণবিক-
পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে চেয়ে তখনো
পৃথিবী ভয়ঙ্কর নয়। যে-কোনোদিন এই গ্রহ বিলুপ্ত
হয়ে যেতে পারে, এ বোধ ছিলনা ব'লে সেদিনের
নির্বোধ নরনারীর মনে আজকের মতোই রোমান্স
ছিল। পৃথিবীর অনেকাংশই অপরিচিত ছিল
বাকিটুকুর কাছে।

সেদিনকার বঙ্গদেশ তখনো ভঙ্গ নয়। অবিভক্ত
বাংলার দিন সেটা। দেশ বলাতে যে-হবিধানা

মনে পড়তো—তাতে পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্রেরও ঠাই
ছিল। সম্মীপ, হাতিয়া, আশাউড়া, চট্টগ্রাম,
বিক্রমপুর বা রাজসাহী এ মানচিত্রলোকেও নিজের
বলে ভাববার অধিকার ছিল। বিপুলি বলতে
বর্ষার পশুর নৃ-পৃ বৃক, অথবা মাইলের পর মাইল
ছড়ানো ধানক্ষেতকেই মনে পড়তো—যে ধান-
ক্ষেতের ওপর দিয়ে বাতাসে পূজার ঢাকের শব্দ বা
জারিগানের ধূয়া ভেসে আসতো।

মহানগরীতে তখন গ্যাসের বাতি জলতো।
পথের দু'পাশের বকুলগাছে ফুটতো অভ্রম ফুল।
জীবনযাত্রার গতি ছিল আরো ধীর-স্তির। আজকের
তুলনায় একান্তই মন্দাক্রান্ত।

সেই দিন কালের যৌবন হচ্ছে মনোহর আর
প্রেমতারার যৌবন। সেই সময় ধান-পাটের ফসল
তুলে চাষীর হাতে যখন কিছু পয়সা হতো, বাংলায়
শহরে শহরে, গায়ে নম্বলয়ে ঘুরে বেড়াতো গোপী-
মাষ্টারের 'গ্রেট ডুবিলি মার্কাস'। শহরের বেয়ালে
দেয়ালে হুল বানানে পোল্টার পড়তো। ঘোড়ার
গাড়ি চড়ে বাজনা বাজিয়ে হাওবিল বিলি করতো
সাদো ঝাঝো দুই ক্রাইন। মার্কাস-নলের পিছু পিছু
ছোকরাগুলো চলতো। ঘোড়ার গাড়ির সহিসের
মীটে ছেলগুলো উঠতো, আর বকুনি খেতো। হাতি
যাচ্ছে, উট যাচ্ছে, গড়গড়ে মোহার বাঁচায় যাচ্ছে
বাঘ-সিংহ। গরুর গাড়িতে যাচ্ছে তাঁবু, পড়ি-স্কা,
বাঁশ। চারপায়ে ঘুড়-বাঁধা সাদা টাটুর পিঠে
বসে চলতো নীলনয়না হুন্দরী। হাসতো আর
হাওবিল ছড়াতো। মুগ্ধ দর্শক কাতার দিয়ে
গাড়াতো। বলতো,

—কে যায়?...কে যায়?

—প্রেমতারা।

—প্রেমতারা?

● —তারের উপর নাচে, বাঘের হুঁহে মুহু দেয়,
হাড়ির সোলায় ক'প খায়।

এ হলো সেইদিনের গল্প।

[ক্রমশঃ]

শ্রদ্ধাঞ্জলি দিক্‌শি

ত্রিনিখিলরঞ্জন বায়

। শ্রদ্ধাঞ্জলি পদ্য ।

একটা চমকালে: কথা দিয়ে এ কাহিনী শুরু করতে পারলেই ভাল হ'ত। কিন্তু তুমি কি করবার ভেবে আছেন? বা বলব তাই তো: মামুলী। সেই পুরানো শিলিগুড়ি—তার কি-ই বা আছে, যা নিয়ে ইন্দিয়ে-বিনিয়ে বাহারী স্বপ্নের মাত্রপাত তৈরি করা যায়। পুরানো দিনের শিলিগুড়ি ছিল শৈলবিহারী স্নায়ব-হৃদ্যের ছোটো-ছাড়াবিরি সৌন্দর্য। 'গরমি' খেন চুটত না আর পাহার হাওয়ার সুরভতে—তখনই কলকাতার শাহের-বেনেরা লাল লাল লালকি: মুখো হতেন।

সে-সময়ের বাংলা সরকারের গ্রীষ্মকালীন 'হিল-এন্ড-ভ্যাল' ছিল একটা ক্রান্তি-মুক্তি বার্ষিক ঘটনা। রাত আটটার ভিয়ার বেয়ে সাহেব-জুবোকা শিখরলা স্টেপনে গারমি: খেলে বেশে বসতেন। কলকাতার কান্ডার কালা-আবির প্রবেশ-বিচার প্রায় ছিল না বললেই চলে, তাই কলকাতার কান্ডার-গলা দেখাত উদ্ভাস বলে লাগে। সারা স্টেশন-ব্রাউন্ডেরটা লালমুখো আর লালমুখীর সমাগমে লাগে হয়ে উঠত। ইতরজন কাশ-বাতুরা সভ্যের সদাশোভে বিমলীবাতি-কলমল রেণ-কামরা, তালের আবোহী, আর আঙুলি-বহ-খানসামার উত্ত ছোটটি লক্ষ্য করত। একরাত ঘুমের শেষে সাহেব-বেনেরা শিলিগুড়িতে এসে খেতেন ছোটো-ছাড়াবিরি। 'আবার সমুদ্র সমুদ্র এই পথেই আসতেন-যেতেন মহাবাহু বাংলার লাটসাহেব। পুলিশের তৎপরতা, লাটগুডরুন্ডের জ'ক-চমক আর ইতরজনের ভীতিবিহীন ভৌতুহল—এই সব মিলে শিলিগুড়ির পুরানো স্টেশনটাকে সঙ্গরম করে তুলত। সে-সব কি স্মৃতি বা স্মৃতি?

পুরানো শিলিগুড়ির লে-লিন আর নেই! পুরানো স্টেশনটার এখন অদৃশ্য অবস্থা। সে ভৌমূল আর নেই। একটা নতুন শিলিগুড়ি স্টেশন পড়ে উঠেছে—বাখীনতার পরে। এখন আর শিখরলা স্টেপনে লক্ষ্যবোলা গাড়িতে, তেঁপে তার 'শরমিন' ভোগে শিলিগুড়ি পৌঁছবার উপায় নেই। শাক্তিস্থান-হি'হুতানে 'আদমান' 'অমিন' ফারাক। হুই-ক'বাকিরি অস্ত নেই। ভাগ্যভাগিরি পর কতো দিকে কতো আঁটাআঁটাই না হুজুত হু জুছে। মালগের হুজুরির একদম! এখন শিলিগুড়ি যেতে গেলে পাতেরাখা ঘুরে হু'বার গাড়ি বদল ক'রে প্রায় বিশ ঘণ্টা বায়ে সেখানে

পৌঁছতে পারা যায়। আর গাড়ির অবস্থারও তথৈবচ। 'আদাম-লিভের গাড়ির সমুদ্র-শৈলিলা হুখাতি অর্জন করেছে। কলকাতা থেকে স্ক্রিপসিগাট, তার পর গলা। সীমারে হাটী পারাপার করে। চড়াই না আটকালে ওপার বেতে ঘটা হুই। কিন্তু হামেপাই হুফটনা ঘটছে। সাত-আট ঘণ্টা অবধি চরে আটকে পড়ে থাকতে হয়েছে অনেককেই। এমন একটা হুখকর 'ভ্রমি' করবার সুযোগ পেয়েছি 'আদমা' 'বাখীনতা-অর্জনের' পৌলস্তে। সাথে কি আর কবি ছাড়া বৈধেছেন:

"ভাঙেছে প্রেমের ভাঙেছে মেলা
ভবিষ্যৎ ঘরবাড়ি
পাঠের আড়ন ধানের গোলা
কাহনাকান আর খেলগাড়ি।"

আপেক্ষার ন'ঘণ্টার সত্যসিঁ পথ আড়কাল নানান হুখক ঘুরে মাত্র উনিশ ঘণ্টায় শেষ করতে হয়। এ-সব এখনটি হয়েছে লেখ-বিভাগের পৌলস্তে! অথচ যেখান, এই শাক্তিস্থানের কাইরা আর ভারতের কাক নিরিবাসে এক দেশ থেকে আর-এক দেশে উড়ে থাকে। তাদের বেলায় পাসপোর্টে আর ভিসায় কোনো বালাই নাই। বসে ছাফো মালুগের বেলায়।

যানে যানে শিলিগুড়ি পৌঁছলাম-তো যেন বাঁচলাম। ভোর পাঁচটা। ঘুমজরা চোখে একটা 'আচমক' হ'তোই খেরে প্রাচীরের নামলায়। চারিদিক অন্ধকার—কেবল প্রাচীরের হু'চাটাই বাতি তখনো টিমটিম মলছে। বৃষ্টি পড়ছে ক'বস্তম। ভাইরে গিয়ে, সামনে গিহনে সব-কিছু কাপুলা হয়ে গেছে অবিহল বৃষ্টিপ্রায়। বৃষ্টি বাধায় গিয়েই জীপে চড়ে বদলাম কালিঙ্গা-এর পথে। সারা পথেই বৃষ্টি, বৃষ্টি। শিলিগুড়ি-কালিঙ্গা পকাশ মাইল—খালি চড়াই আর চড়াই। পাহাড়ের গা বেটে রাস্তা বের করা হয়েছে। অঙ্গগরের মতো পাহাড়কে বেঁটন ক'রে রাস্তা মলেছে শাকে শাকে। একটিকে মিটেট প্র্যানাইট-প্রাচীর অনেক অনেক উঁচু, নালগের বহু উঁচুর। কিন্তু অপর পার্শ্বই অতল পাহা ১০০।১৫০ ফুট অবধি পতীর। নিচের দিকে শুকালে মাথা বিমতিম করে। রাস্তা সতীর্ণ ও অলসর আকাংক্ষা। একটা গাড়ি কোনমতে মলে। অস্ত দিক থেকে গাড়ি এসে সপাতো একপানে গাড়িরে পথ ছেড়ে দিতে হয়। প্রতি বাকোই

শেষপদে সে অশ্রুধা দূর হ'ল—বীথ কেটে অননিকানের
ব্যবস্থা করে।

ক্রমশঃ আবার ঘনিষে এসে। পথ আর দেখতে পাওয়া
যায় না। কান আসে বরষার কবজরানী গান। পাহাড়ের
শাওলসে সবিত পাহাড়ী-শরীতে কীণ শীশলিখা ঘনায়মান
অন্ধকারে যথোক্তের মতো মিটিমিটি জলছে। গাড়ির
লাইট জ্বলানো হয়েছে—সেই আলোতেই পথ দেখে দেখে
গাড়ি চুটেছে সমুদ্রপানে। পাহাড়ের মাথার উপরে দলে দলে
জ্বর বেহা, আর যেহের কাকে কাকে সহস্র-নকশবতিত
নীলাকানের কণিত আভাব।

দূর পাহাড়ের বনে পেয়ালের কোরাস-সসীত হচ্ছে।
এখানেও দেখছি পেয়াল আছে। এসব পাহাড়ে ভালুক ছাড়া
অল্প কোনো হিংস বা অহিংস চারপায়ে ভয় আছে বলে

ভ্রমিনি। পেয়ালের ঐকতান ভনে ঘনে গড়ল : 'কচি-সংসল'
পবনরামের দল্যমান আবিষ্কারের কথা—বারঙিলিং-এর
পাহাড়ে বর্ধমানের অস্বাভাব্য নাকি সব করে পেয়াল ছেড়ে
দিয়েছিলেন। সেই পবিত্র ঐশ্বরিকবিশেষের উত্তরপুরুষরাই
আজ শিকিমের পাহাড অবনি চুটির পড়েছে—হবেও বা।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে সমুদ্রের দূর পাহাড়ে
অনেকগুলি আলো দেখা গেল। ঐ বৃষ্টি গ্যাংটক—শিকিমের
রাজধানী। এখন আমরা নিরবচ্ছিন্ন উপরের দিকে উঠছি
—গাড়ি চলছে ফুল গিয়ারে (full gear)। ঈশ্বরের প্রকাশ
বাড়ছে বেশ টের পাচ্ছি। আখোলা চলন্ত রীপে হু হু হাওয়া
লাগছে। ওভারকোটটা গায়ে ডাল করে অড়িয়ে নিচ্ছে।
না, গ্যাংটক পৌঁছে চাই আমাদের তখন আর গরম-গরম চা।

[কথন]

জীবনের সার্থকতা

শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ মজুমদার

১
দুপুরবেলা—গৃহিণী ঘুঝাইতেছেন, এই অবসরে নিজস্ব
বৈঠকখানায় বসিয়া বংশবন্স বটখাল 'ঐতরের উপনিষদ'
পড়িতেছেন।

তিনি পড়িতেছিলেন—ঐশ্বর্য প্রকৃতি লোকশাস্ত্রদ্বিগে
স্বতী করিয়া তাঁহাদের অবস্থানের নিমিত্ত একটি গো আনয়ন
করিলেন, কিন্তু লোকশাস্ত্রদ্বিগের উহা অশুদ্ধ হওয়ায় তিনি
একটি অশ আনয়ন করিলেন—কিন্তু অশটিও তাঁহাদের শৃঙ্খল
হইল না, তখন ঐশ্বর্য একটি মহত্বসেই স্বতী করিলে লোক-
শাস্ত্রগণ এই সেই অবস্থান করিয়া তাঁহারা শৃঙ্খল আর আহার
করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন বলিয়া বিভিন্ন ইন্ড্রিগণে
ঐ মহত্বসেই প্রবেশ করিলেন। অতঃপর তাঁহাদের এই
কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া ঐশ্বর্য, যিনি যে ইন্ড্রিগণে প্রবেশ করিয়াছেন,
তাঁহাকে সেই ইন্ড্রিগণের অধিষ্ঠাতৃ-বেত্তা করিয়া বিদ্যা তাঁহাদের
অন্তঃকরনে প্রবেশিতা করিতে উপদেশ দিলেন।...

এই পর্বত গড়িয়া বংশবন্সের চিন্তা উপস্থিত হইল—
হাতের বই শানের টেবিলের উপর রাখিয়া ইচ্ছাচারে লখ্য
হইয়া শুইয়া তিনি চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন—
লোকশাস্ত্রগণ গো-অশ-কেষে প্রবেশ করিতে চাহিলেন না,
অশচ মহত্বসেই প্রবেশ করিলেন কেন? শৃঙ্খল আর

আহার করিয়া তৃপ্ত হইবার মন্ত কি? কিন্তু তাহাই বা
কি করিয়া হয়—আহার বাহ্য প্রধান বাহ্য তাহাই তাহার আর;
গোত্র আর জাব, ঘোড়ার আর চানো—মাগুহের আর ভাত-কট।
লোকশাস্ত্রগণ গো-ক-ঘোড়ার দেহে প্রবেশ করিয়া শৃঙ্খল
পরিমাণ জাব বা চানো পাইলেনই তৃপ্ত হইতেন—নিশ্চয় বাহ্যের
ঝোল-মাশা ভাত কিংবা আসুর মম লিখা কট তাঁহাদের মুখে
চড়িত না। তাহা হইলে তাঁহাদের আশ্রিত্য কারণ কি?
শৃঙ্খল পরিমাণ আর পাইলেন না? কিন্তু তাহাও সত্য নয়,
ঘোড়া দিনে কতটা পরিমাণ চানো বাহ্য তিনি লক্ষ্য ভাবেন না
বটে, কিন্তু ছোটবেলায় বেধিয়াছেন গো-ক অনায়াসে এক ডায়া
জাব খাইয়া আবার মাঠে চরিতে যায়। তবে কি মাগুহ
গো-ক-ঘোড়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব? কিন্তু কোন্ বৃত্তিতে?
গো-ক একশাট শাত—মাগুহের দুইশাট, সেইজন্যই কি?
পরকণ্ঠেই ঘনো হইল গো-কর শিং আছে, হু আছে, ল্যাঙ্গ
আছে—মাগুহের কোনটাও নাই। ঘোড়ার শিং নাই কটে,
কিন্তু দুইশাট শাত আছে। হিলাব-মতো অশপাত পাড়াইল—
মাগুহ এক, গো-ক তিন—ঘোড়াও তিন। তবে?

বংশবন্স বৃত্তিতে পারিলেন—তাঁহার চিন্তা ঠিক পদ
ধরিয়া চলিতেছে না, তিনি উঠিয়া আহার বল লিখা আশিলেন

—পর পর চাটটি সিগারেট শোড়াইয়া বুদ্ধির গোড়ায় বসেই থেঁচো বিলেন—কিন্তু কিছুই হুটল না। তিনি আবার ইতিহাসেরে ভূঁইয়া পড়িলেন ও চিন্তা করিতে করিতে একসময় ঘুমাইয়া পড়িলেন।

বংশীবদন ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া যন্ত্র বেগিলেন—ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া চারিদিকে তপু অন্ধকার—সূর্য নাই চন্দ্র নাই—এমন কি আকাশে একটিলে বিটমিটে ভাঙ্গা পর্বত নাই, সেই দীর্ঘজীব অন্ধকারের মধ্য দিয়া তিনি অনন্ত শূন্য ভাসিয়া বেড়াইতেছেন—মাঝে মাঝে দুই হাত বাড়াইয়া গড়াহুটা বাহ্য হোক একটা কিছু ধরিয়া পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন—কিন্তু সেই অনন্ত-শূন্যে রাশি রাশি অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহাও তাঁহার মনে হইল—সমুদ্রে স্রবতের প্রবল তরঙ্গোচ্ছাল দেখা যাইতেছে, আর তরঙ্গের মতো প্রচণ্ডবেগে তিনি তাহার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার গতির দিক-পরিবর্তনের আশায় তিনি হাত-পা ছুড়িলেন, তাইনে-বায়ে গেলো বাড়িয়া দেখিলেন—কিন্তু কিছুই হইল না—তিনি সেই প্রবল স্রবত-তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। বারকয়েক হাবুডুপ বাইয়া বংশীবদন ভাসিয়া উঠিয়া দেখিলেন তাঁহার নাকে-মুখে মল ঢোকে নাই—জামা-কাপড় পর্বত ভিজে নাই। তখন তিনি বুকিতে পারিলেন সে-সমুদ্র জলের নয়, নদের—পৃথিবীর কোটি কোটি মাগুব, বাঘ সিংহ গোক ঘোড়া একত্র হইয়া তাঁরবরে চাঁৎকার করিতেছে, আর সেই শব্দ বাবুদল ভেদ করিয়া হাউটের মতো বেগে উর্ধ্বে উঠিয়া পরস্পরে ঠোকাতুকি করিয়া প্রচণ্ড তরঙ্গোচ্ছাল সৃষ্টি করিতেছে। বাদ্যক, ভূবিয়া সমস্ত হইয়া ঘরবার ভয় নাই বলিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন—এমন সময় তাঁহার মনে হইল কে যেন তাঁহার পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে—আর তিনি হহ করিয়া সেই তরঙ্গের মধ্যে ডুলাইয়া যাইতেছেন।

বংশীবদন চমকিয়া মাগিয়া উঠিলেন—দেখিলেন গৃহিণী বৈকালিক চা লইয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন। তিনি উঠিয়া বসিলেন—কিন্তু তখনও তাঁহার কানের মধ্যে সেই প্রচণ্ড শব্দোচ্ছাল জুড়ল কলরবে বাধিতে লাগিল। দুই হাতে চোখ মুছিয়া তিনি বুকিতে পারিলেন—বিকাল হইয়াছে, নিত্যকার মতো পানের বাড়ির টিকে-ঝি বাধ্য দিয়া সন্ধ্যা শোড়া কড়া মাঝিতেছে এবং সে বার্ষিকের বাবুদ অপত্যের গজবের কথা চিন্তা না করিয়া এমনভাবে কড়া শোড়ায় ও যে গৃহিণী চোখের মাঝা খাইয়া মূলের বাক্যটি না বসাইয়া এইরকম অসামর্থ্যীয় অপর্যবেক প্রেরণ দিয়া থাকেন—তাঁহাদের উজ্জয়ের

নিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কাংক্ষাক্ষেপে সবে চিন্তা করিয়া চলিয়াছে।

বংশীবদন-গৃহিণী পানের টিপের উপর চা বসিয়া ওঠায় হুটিক করিয়া বলিলেন, “টিকে-ঝির মূখ—বাক্য তো নয়, যেন আগুন।”

বংশীবদন লালাইয়া উঠিলেন—গৃহিণীকে সমুদ্রে দেখিয়া তাঁক সিলিয়া উল্লসিত কর্তব্য সামগ্রীয়া লইয়া মনে মনে বলিলেন—“ইউরেকা!”—অর্থাৎ পাইয়াছি। গৃহিণীর একটি-মাত্র কথাই সমস্ত সমস্তার সমাধানগুলি যেন হুট হেলের নৃত্তি ধরিয়া তাঁহার চোখের সামনে বাচিয়া বেড়াইতে লাগিল, তিনি তাহাদের একে একে ধরিয়া বেঁকে ভুতভাবে বসাইতে আরম্ভ করিলেন। চা খাইতে খাইতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন—বাক্যের সহিত আগুনের সম্পর্ক অতি নিকট, কারণ আগুনের মৃগলবরে অবস্থান করিতেছেন লোকপালসিংগের মধ্যে প্রধাম ও প্রথম স্ত্রী স্ত্রী। শেষ ব্রহ্ম-ব্রতশ্রম—মাগুব ইচ্ছা করিলেই রসনা সফালন করিয়া বস্তু ইচ্ছা বিচিত্র বস্তুদের ব্রহ্ম স্ত্রী করিতে পারে—কিন্তু গোক-ঘোড়া তা পারে না। গোক কেলসার দ্বাখা ও ঘোড়া চিহ্নি করিতে পারে, তাহাও নিজস্ব প্রয়োজনে—এইখানেই গোক-ঘোড়া অপেক্ষা আগুনের শ্রেষ্ঠত্ব। অতএব প্রধাম হইতেছে যে, নিরপূর অনর্থক বাক্যের স্ত্রী করাই আগুনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মোপাসনা। কিন্তু সকলে তাহা পারে না, সেইজন্য তাহাদের পক্ষে ব্রহ্ম-সামগ্রী লাভ করাই শ্রেয়। কিন্তু ব্রহ্ম-সামগ্রীও খুব সহজ নয়—ব্রহ্ম বদন মৃগলবরবিত্ত অধিভাষা উত্তম হইয়া বেগে বাহির হয় তখন কোনো দুর্লভিত্ত লোকই তাহার সামনে স্থির থাকিতে পারে না, পলাইয়া বাটে।

এই পর্বত চিন্তা করিয়া বংশীবদনের মনে নির্বেদ উপস্থিত হইল—হায়, এবারকার মনঃকল্প দুখের দেশ—প্রায় বৃদ্ধ হইয়াছেন কিন্তু কোনদিন বড়তা করিয়া যথেষ্ট ব্রহ্ম-স্রষ্টী করেন নাই। তিনি নিরীহ প্রকৃতির হৃৎকায়, তাঁহার দ্ব্যধে ব্রহ্ম-সামগ্রী-লাভ—তা বড়তা অনিবার্য কিংবা কাশোদাতী গান অনিবার্য—কোনরকমেই হবে নাই।

সেই রাতে গৃহিণী ঘুমাইয়া পড়িলে, বংশীবদন বিদ্যায় বসিয়া চোখ মুছিয়া একমনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—“হে ঈশ্বর, হে ব্রহ্ম, আমার মনঃকল্প সফল করিয়া দাও!” অনেকক্ষণ একমনে ডাকিবার পর গভীর রাতে তিনি অসুতব করিলেন—একটি জ্যোতির্বিদ্য গোলাক শূন্যে গড়াইতে গড়াইতে তাঁহার সামনে আসিয়া থির হইয়া পাড়াইয়া বলিলেন, “বৎস, আমি আসিয়াছি—ভূমি কী চাও?” বংশীবদনের

ভয়-ভয় করিতে লাগিল—সেখিলেন পায়ে কাটা দিচ্ছে—
একবার ডাবিলেন গৃহিণীকে ডাকি, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল
এই স্বযোগ, তিনি হাত-তোড় করিয়া বলিলেন, “প্রভু,
আমার মস্তক হস্ত সার্থক করিয়া দিন।”

“কি বলিলে তোমার মস্তক হস্ত সার্থক হইবে?”

“দে শরণ্যে, আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি পণ্ডই
ব্রহ্ম—আর বসনা সকাশন করিয়া নিরন্তর সেই ব্রহ্মপণ্ডি ও
পর্ণাপ্ত আহার করিয়া সেই ব্রহ্মপণ্ডিকারী রসনাকে তৃপ্ত রাখিতে
পারাই নেশারী মাংসের পক্ষে ভরম ও পদম সার্থকতা।”

“তোমার রসনা আছে—উহা সকাশন করিয়া তুমি তো
ইচ্ছানতো ভীষনের সার্থকতা আনিতে পার।”

“না প্রভু, পারি না—আজই বিকালে নির্জন ছায়ে উঠিয়া
পানের বাড়ির টিকে-বিয়ের অন্ধকরণে সেই হুর ও ভলিতে
ব্রহ্ম পণ্ডি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু পারি নাই।
সে যেন অলীলাক্রমে অনর্গল অস্ত্রি বস্ত্র তেজঃপূর্ণ ব্রহ্ম
হস্ত করতে পারে—আনি যদি সেইরকম পারিতাম, তাহা
হইলে রাত আগিয়া আপনাকে ডাকাডাকি করিবার প্রয়োজন
হইত না।”

“তবে কি তুমি ঐরকম টিকে-কি হইতে চাও? কিন্তু
তুমি পুত্র—এ মনে উহা সম্ভব হইবে না। বিশেষতঃ
টিকে-কি হইলে পর্ণাপ্ত আরও জুটিবে না।”

“কেন প্রভু, টিকে-বিয়েরা তো দেখিয়াছি—বড় কাসি-
ভর্তি ভাত অন্যায়ে খাইয়া কেনে—তবে কি তাহাতেও
তাহাদের রসনার তৃপ্তি হয় না।”

“সেপিতেছি, ‘পর্ণাপ্ত’ কথাটির অর্থ তুমি ঠিকনতো বুঝিতে
পার নাই। ‘পর্ণাপ্ত’ অর্থ যদি পরিমাণ বৃদ্ধাইত, তাহা হইলে
লোকশালগণ মস্তকের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া হস্তির মধ্যে
প্রবেশ করিতেন—তোমাদের আশ্রয়ে কৈদাস কি মুগ্ধকে
বলুন হস্তির কাছেও দেখিতে পারি না। পর্ণাপ্ত মানে
‘বধই’ নয়, পর্ণাপ্ত মানে ‘বিচিত্র’।”

“পর্ণাপ্ত মানে ‘বিচিত্র’।”

“হা বৎস, ‘বিচিত্র’। গোক, গোড়া, হাতি, সিংহের পাখ
নিষ্ঠি, তাহার অস্ত্র নতুন কিছু চাখিয়াও দেখিতে চাহ
না; কিন্তু মাংস একই জিনিস জির জির মশলা-সংযোগে
কত বিচিত্ররকমে রন্ধন করিয়া খায়—একখানি ‘পাকপ্রণালী’
কিনিয়া পড়িয়া দেখিলে, বুঝিতে পারিবে। অতঃপর এই
বৈচিত্র্যের মোটেই লোকশালগণ মাংসের দেখে আশ্রয়
লইয়াছেন।”

“বুঝিতে পারিলাম—জীবন সার্থক করিতে হইলে নিত্য
শোষোষা-কালিয়া কোর্গা-কোষ্টা চমচম-চানাবড়া খাওয়া
প্রয়োজন; কিন্তু প্রভু, এ বৎসে তো ওসব আর দৃশ্য
হইবে না—তাহা হইলে আমার উপায় কি?”

“তুমি প্রায় বৃদ্ধ হইয়াছ—আর মশ কি পনেরোটা বছর
গোপ-কান বৃদ্ধাইতা কোনরকমে কাটাইয়া দাও—পরম্পরে
তোমাকে সামান্য নৈতিক নেতা করিয়া দিব, তাহা হইলেই
তুমি যথেষ্ট রসনা সকাশন করিতে পারিবে।”

“সামান্য নৈতিক নেতা হইয়া যথেষ্ট রসনা সকাশন করিলে,
শিভিনের ভয় থাকিবে না।”

“বিশ্বাস-পভায় দুকিয়া পড়িলে—সেখানে বাহা ইচ্ছা
বলিতে পারিবে, শিভিনের ভয় থাকিবে না।”

“এ ব্যবস্থা মন্দ নয়। কিন্তু পর্ণাপ্ত আর—তাহা কিছল
জুটিবে?”

“ঐযাবার তুমি হাসাইলে, বৎস—নেতারা কিছু উপার্জন
করেন না—ভদ্র তাহাদের মোটর গাড়ি, ট্রেন কাষ্ট্রোলে
ভ্রমণ করেন—ইলেকশনের সময় মোটা মোটা টাকা খরচ
করেন।”

“কি করিয়া?”

ব্যোভির্ঘব গোলক দশ করিয়া নিভিয়া গেল—অর্থাৎ
অন্ত হইলেন—কেবল বহুদূর চইতে গাঁহার হাদির লখ
পোনা বাহিতে লাগিল।



আলংকার
বাজার



মোড়
৪৬
৩৬২৬

লক্ষ্মী ব্রাদার্স
জুয়েলার্স
১, হিন্দুস্থান হাট, বাঙ্গালপুর
২০৮/৮, রাসবিহারী প্রতিমিত (পড়িয়াঘাট জংশ্রন) কলিকাতা

পল্লীর বারশাশা তুলসীদাস সিংহ

। চল্লিশ-৮।

অকস্মিক নহ, ইহুসে নহ, কারখানায় নহ, বাইপোর্টেও নহ—
চলে আছেন একেবারে ঘরের লাগায়। ঘর কিন্তু পাড়াগাঁয়ের
ঘর। আপনায় সে-ঘরটির পূর্বদিকের পুত্রে ইদ চক্ক,
পশ্চিমদিকটা আড়াল করে ঝাড়িয়ে থাকুক ঘন ঝাপতোপ।
অতবড় ঝাপা উঠোনটা এখন—তখন তাতে থাকুক ছোটো
না হলেও, অস্বস্তি: একটা লজনেগাছ—“নটে খটে আড়াইঘা
লজনে বারোবাগ” : নটেপাক পুইপাক আড়াই দিনের মাল,
কিছু লজনে চলবে বারোবাগ : লজনের পাতা ফুল তাঁটা
লবই আপনায় সিঁচীর বোলায় চড়বার বিদ্যত রাখে—আর
থাকুক একটা শেখরা কিংবা আঁজির, আর অচাঞ্চি ছোটো
সেই আয়ের গাছ। বাস, বোধেণ মাসের বোধে এখন
চারদিকটা করতে থাকবে ঝাঁ-ঝাঁ-ঝাঁ, আর সে ঝাঁ-এর
ঝাঁককে যিওণ বাড়িয়ে দেবে আয়ের ঘন পল্লবের আড়ালে
বসে-বাসা ভাকের কা-কা-কা, ঠিক তখনই আপনাকে বসে
পড়তে হবে লাগায় তাঁগা মাটির উপরে। শিখনেই তো
মাঝার তেলে পাক-ধরা খুঁটি রয়েছে—হেলান দিয়ে মিন।
খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে থাকুন হুচাশ। একটু পরেই
তখনতে পাবেন ‘হুক-হুক হুক-হুক’। কোকিল নহ গো—
হুকবলদ। বলদকে আবাহন জানায় কোকিল—কৈশরকে
আবাহন জানায় হুকবলদ। কোকিল তাকে আপনায়
বাগানের আমগাছে—হুকবলদ তাকে আপনায় ঘরের
আমগাছে। ঐ-বে-ঐ উঠানের একপাশে অডাঘড়ি আমগাছ
ছোটো, ওমেরই একটা ভকিরে-বাগরা তালে গর্ত করে বাস করে
সে—ধুককে রোয়ের ঝাঁচে মাঠ-ঘাট এখন বরষার করে কাপে,
হুকবলদ তখন তার আমগাছের ঘরটি থেকে মুখটুকু মাঝ বাঁধ
করে ধুকতে থাকে। ঠোট ছুটি দিকি ইকি আন্ডাজ তাক,
আকস্মিক আড়িয়ে যদি কাছ পর্বত চলে যেতে পারেন তাহলে
সেখানে পাবেন লক ঝিলুটা তার পরিচায় দেখা থাকে, আর
সেখা থাকে দু’টোটির পাশে ছোটো ছোটো গোক। শত বর্ষার
ফলেও যে-কাজল গোঁড়া ঘায় না, সেই কাজল তার দু’চোখে,
আর জানায় এখানে সেখানে দাল-খররা-কালোর একটু-আধটু
গ্যাপেল।

আমি কিন্তু তার টোটির কি জানার রঙের দিকে তাকাতো
বলছি না, পোকের দিকেও না, যে খোপটায় সে ঠোট বার

করে বলে আছে সে-খোপটার দিকেও না—আসলে তাকানোই
চলবে না আপনায়। বসে থাকতে হবে আপনাকে চোখ-ছুটি
বন্ধ করে। চোখ-ছুটি আপনায় বন্ধ থাক, কান আর ঘন
কেন্দ্র খুলে রাখুন। খুলে বেখে একমনে শুধু তনে বান ঐ
‘হুক-হুক হুক-হুক হুক-হুক’। একবার শুভন, দু’বার শুভন,
তিনবার শুভন, চারবার শুভন—শুভন শুভন আর শুভন।
তার পর কই পুকে হাত দিয়ে বলুন সেমি আপনায় ভিতর-
ঘরের খবরটি কি? যেমনভাবে বলেছি ঠিক তেমনি ভাবে
আপনি যদি হুকবলদর তাকটি তনে থাকেন তাহলে মা-কালীর
দিবা করে বলতে পারি, বৈশাখের এই ভরা হুপূরে হুকবলদর
মতো ঐ অতটুকু পাখির সাধারণ একটা তাক চোখদুখন পার
করে বেখে এসেছিল আপনাকে এমন একটি বাক্যে, যে বাক্যের
স্বাক্ষর কাছে আপনায় কিছু একটা বক্তব্য আছে।

কই, চোখ বুজে ভালো করে ভেবে বলুন সেমি—কী সে
বক্তব্য, যা বলতে গিয়ে মনটা কেবলই পাক দিয়ে-দিয়ে উঠেছে
কিছু বলতে পারেননি কিছু?

আমি, আপনায় বক্তব্য কি ছিল তা এখন আর মনে
পড়ছে না আপনায়, ও স্বাক্ষর শীঘ্রইও এখন হাজির হবে
গেলেন শুভন মনের কথাটা মনে ভেলে উঠেছিল, এবং
সঙ্গে সঙ্গে সে-স্বাক্ষর স্বাক্ষর কাছে খুলে বলতেও চেয়েছিলেন
মনের কথাটা—কিন্তু ঐ পূর্ণদই। সে স্বাক্ষর স্বাক্ষর কাছে
কিছু বলতে বাগরা যানোই সে-বাক্য ছেড়ে এ-স্বাক্ষর বাড়িতে
এসে পা-ফেলা। বাস, এখন শতবার চোখ বন্ধ করলেও
আপনি আর বলতে পারবেন না—কী বলবার ভগ্নে আপনায়
মনটা ছুটুকই করে উঠেছিল। আপনিও পারবেন না, আমিও
পারবো না। শব্দশ্রুও পারেননি, বিকৃতকৃষ্ণও পারেননি।

আমায় এই বৈশাখী হুপূরে হুকবলদ নহ, এক
অমা-রাহির ঘন অন্ধকার পরঃপ্রভে এসে বলিয়ে দিয়েছিল
সেই স্বাক্ষর স্বাক্ষর। তারপর মনের কথাটা সে-স্বাক্ষর
স্বাক্ষরকে বলতে গিয়ে সেখান ঝাপা ঘাটটার কাছাকাছি-ই বসে
রকেছেন তিনি—অন্ধে কানের গাড়ি আসার লক্ষ হচ্ছে,
আসোও দেখা থাকে কয়েকটা।

হ্যাঁ গো—আমিও তো গতি্য করেই বলছি, হুকবলদর
তাক আমাকে নিয়ে গেল সেখানে—দিবা আমি তার তাকটির
শিখনে শিখনে শোলায়, গিয়ে ঝাড়ালায় সে-স্বাক্ষর আমি

—তার পর মনে করলাম, রাজ্যের রাজ্যটির কাছে নতুন কথাটা বলি, কিন্তু বলতে গিয়ে দেখি খোনের মতো দেখানোই হয়েছে—আমার মাতার ঘরের মতের শাওয়ার তলে পাক-খরা খুঁটিয়া হেলান দিয়ে চূর্ণচূর্ণ বলে আছি। একটা বেড়ে কাক ঘাড়াটা টেঁকা করে ভাবছে—ছাত্রকালে রাখা মাতের গালনাট্যে মুখ দেখো কি দেখো না।

—বিভূতিভূষণ পর চলছিলেন। পঞ্চদশ লগ্নে চলতে পাখির কিতরিমিতির, বাঁদের কেঁচুচ, তিঁতলার পোছল শোল, কুটির-মাতের ব্যবসা-চুল সবাই ফিলে তাঁকে টেনে এনে হামির করে ফিলে সেই রাজ্যে। কিন্তু রাজ্যের রাজ্যকে খেঁচি কিছু বলতে যাওয়া অসম্মান তিনে দেখলেন, যে পথটি ধরে চলছিলেন সেই পথটির উপরই পড়িয়ে আছেন তিনি। পথের বেঘড়া নয়, বরং বিভূতিভূষণই আমাবিগকে কেবল এইটুকু বলে চিনেন, আসলে বলবার কইবার কিছু নেই—যে পথটি ধরে চলতে সেই পথটি ধরেই চলতে থাকে।

মি বরেন ডাক-পেনার লরকার নেই—ঐ দুম্বর কুকবলস্টিক আমি হাতে বসতে চাই, তাহলে অথচ আলোটা কথা। তাহলে আপনি শাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বলে না থেকে ঘরের মাঝারির কাছে গিয়ে বসুন। ঐ বেতুন যে ঐরাং গোলাবলবের সরঞ্জামটির কাছে বলে বিচালি পাকতো।

পথের বেতন তিনপ্রকার—কটিন, তরল আর বাব্বীর, পাড়ারীর বহুরাও তেমনি তিনপ্রকার—মাঝার, মুনিষ আর উপরি। পাড়ারীরে কাজ করতে তো ঐ চাবের কাজ। আর চাব বলতে আসলে তো ঐ ধান-চাবই। তা এই ধান-চাবের সময় কাজ নিয়ে ধন মারামারি আরম্ভ হয়—বেতন দিয়ে রাখা মাঝারে হুগিরে ওঠেনা, তখন আসে মুনিষ। মুনিষের 'no work—no pay'। কাজের সময় মুনিষ এলো, থাণ্ডা তিন প্রহর কাজ করলে—বাস্, তার হুটি হয়ে গেল। থাণ্ডা দিতে হয় না তাকে—বেতন দিলেই আপনি খালাস। বেতন আবার টাঙ্গা দিয়ে বেওয়া হয় না—আবার দিয়ে বেওয়া হয়। এরা গিয়ে নিয়ে যে বেতন, এ বেতনকে বেতন না বলে বলা হয় 'বেতন'। বেতন বেওয়া নয়, বেতন দেওয়া। তিন প্রহর কাজ করলে মুনিষ, সেজন্তে বেতন গেল সে তিনসের ধান, কোনো কোনো আফসার বা নাডকভিসের-চারসেরও দিলে। ধান দিয়ে বেতন দেওয়ার প্রাচীন রীতিটা এখনও উঠে থাকনি পাড়াবাঁ থেকে। কাজের সময় মুনিষ এসে আপনার কাজ হাসিল করলো বটে, কিন্তু কাজ পরলেই তো কাজের সোজা সাওয়া হয় না,—হাই মুনিষকেও থাণ্ডা করতে হয়।

কাজ বখন আপনার না থাকে, সে বখন অভাবে পড়ে তখন সেই অভাবের সময় তাকে বাইরে রাখতে হয়। কাজ বখন আপনার পড়বে তখন তার থেকে বেরে আপনার খাইয়ে-রাখা থানটা কেটে নেন-না আপনি। মুনিষের ভিতরের মহত্বটুকু হল এই। মুনিষ হল তরল। বখন মুনিষ এক মাঝারেরও আপনার কাজ উদ্ধার হয় না, তখন তাকে পড়ে উপরি। উপরি কারও থাণ্ডা নয়, জীড়ের সময় যে তাকে তাকে, তারই হয়ে কাজ করে সে। বতকল আপনার কাছে বেগে থাকে সে, ততকলই সে আপনার—কাজ শেষ হলে সে আর আপনার কেউ নয়। উপরি হল বাব্বীর। আর বিলি কটিন তার নাম হল মাঝার। কাজ আপনার থাকে আর না থাকে, মাঝার তা জানে না। লারা বছরের ভগ্নেই আপনি যে তাকে চুকিয়ে নিয়েছেন। মাঝার লারা বছর ধরে আপনার ব্যক্তিগত কাজ করবে—সেজন্তে সে বেতন নয়, টাকাই পাবে। আর নির্দিষ্ট মাইনে বা টাকা ছাড়াও বছরে কাপড়-পামড়া বা শাপে দিতে হবে তাকে। মাইনে বলতে তখনকার কালেও টাকা বা কলিকটই বুঝতো। মাইনে থেকেই বেশ হয় মাঝার কথাটার উদ্ভব। তা সে বাই হোক, আবার-প্রাণব কিছা অস্বা-পৌষের কথা খালাস, কিন্তু এই ষেধা মাঝার মাঝারের শোয়াযাবে। গোটা বোনের মাগটা তারা হুঁচি থাকিয়েই পাড়িয়ে যাবে। মাগিককে এ-পড়ির ভয়ে পরগা খবচ করতে হচ্ছে না—গাধা থেকে পুয়াল (বড়) নিয়ে থাকিয়ে গেলেই হচ্ছে। কথাতেই আছে—'কাজ নেই তো চেরা বুয়াও'। 'চেরা বুয়াও' আর 'বিচালি পাকাও' একই কথা।

আপনি এই মাঝারটিকে গিয়ে বলুন, চল—কুকবলস্ট ধরি। দেখবেন সে তৎক্ষণাৎ বিচালি-পাকানো যাবে দক্ষর সেজে হাত দেবে। সেখ থেকে একটা কি ছোট লক লোম ছিঁড়ে নিয়ে ঠাঁস তৈরি করে ফেলবে। হা-তা ঠাঁস নয় বাবা, এ হচ্ছে গরু-পাখারির ঠাঁস—রাখড়াঁস। আপনাকে কিছু করতে হবে না, সেই ঠাঁসটি হাতে নিয়ে উঠে পড়বে আম-পাড়াটা, তার পর কুকবলস্টের খোপটার সামনে ঠাঁসটা মুদিয়ে দিয়ে নেমে পড়বে তাকাতাড়ি। বাস্, এবার আড়ালে দাড়িয়ে মজা দেখুন। মাঝবৎসে পাছে উঠতে গেলে উড়ে পালিয়েছিল বটে কুকবলস্ট, কিন্তু এই হোমের ঝাঁকের মধ্যে কতকল আর থাকতে পারবে সে বাইরে। সুতরাং উড়ে এলো সে, এসে চুকে পড়লো খোপটার। কুকবলস্ট ভিতরে চুকলো অথচ ঠাঁস লাগলো না—জায়ে চিঁচায় কিছু নেই। আপনি এবার আড়াল ছেড়ে সামনে দাড়িয়ে একমুঠো বাসি কি লুলো হুঁড়ে দিন খোপটার দিকে। লুলো-বাসির কলকড়ানি

জনে কৃৎসন কইশই করে বেরিয়ে আসতে চাইবে বাইরে, কিন্তু কইশই করে বেরিয়ে পড়তে যাওয়া মানেই তাকে আটকে যাওয়া। নিঃসময় মধ্যে কাজ হাসিল। কৃৎসন-ভায়া গদায় ঠাণ লাগিয়ে দিবি। ঠোল খাচ্ছে সেখানে—যেদো সেদো সেদো সেদো।

“বাতো! মাস কল ধরে এক মাস মাস,
বতগুলি কল ধরে ততগুলিই কানা।”

কই, ভাতের খেঁচি এই শোলোকটা? পারলেন না। পারলেন না তো, আছেন আমার সঙ্গে। আশবস্তার ঠাণ ছাওয়াটিতে বসে ঐ বায়া ‘পুত-পুত ঠাণ্ডি’ বেলছে, তাদের সামনে ঠাণ্ডির একবার মাত্র উচ্চারণ করে দিল শোলোকটা, দেখবেন বেলায় ঠাণ্ডাই তারা ঠেঁচিয়ে উঠে জবাব দিবে—‘হাণ্ডি, হাণ্ডি, হাণ্ডি’।

হ্যাঁ গো, হাণ্ডি। ‘পুতুরো চাল ভাতে বাড়ে’ বার মধ্যে সেই মাটির হাণ্ডি। আমরা সব পাড়াপারের মানুষ, মাটির হাণ্ডিতেই ভাত রান্না হয় আমাদের। আর লে-হাণ্ডির যোগান দেয় আমাদের কুমোর-ভায়া। কুমোর-ভায়ায় কাছই হচ্ছে হাণ্ডি-পড়া। হাণ্ডি সে গড় আসছে বায়ো মাস তিরিশ কাল ধরে—ছেলের ছেলে, তার ছেলে, তার ছেলে ধরে—কিন্তু বতকাল ধরেই গড় আসছে, সব কালেই তাদের হাণ্ডি-পড়াটি হচ্ছে ‘একমাস মাস’। আর সে মাগটি হল ঐ বৈশাখ মাস। বছরকে যদি গাছ ধরি, আর হাণ্ডিকে যদি কল ধরি—তাদের বারোমাস যে খলটি বছর-গাছে ধরে বা ধরতে পারে সেটি দরতে পারলেও বিধি অপর্যবে একমাস ধরে না। আর ‘বতগুলি কল ধরে ততগুলিই কানা’। সব হাণ্ডিরই কানা (কিনার) আছে (ঐ যে গো, ‘সেরেছ কলসীর কানা, তাই বল কি গ্রেম সেব না’), সুতরাং সব কলগুলিই কানা।

কৃৎসন জ্যোতিকে বিজ্ঞাপা করেছিলাম, তা ঐ একটি মাস হাণ্ডি-গড়া মাস কেন? কৃৎসন জ্যোতী বললে, চোদ্দপুরুষ ধরে ঐ ধরে আসছে। শিবের গাছের শেষ হলোই চাকা-চুবানো বহু রাস্ততে হয় আমাদের। শিবহাসুর যে আমাদের মাটিপালে এসে ওঠেন।

শিবের গাছের শেষ হওয়া মানেই বসন্ত বসন্ত হওয়া। বৈশাখের রোদে এসব ধরে থাকাই যায়—তো বাইরে। শিব-ঠাহুর মধ্য মূশকিলে পড়লেন—বস্তের বাইরে থাকতেই তিনি ভালবাসেন। বাইরে থেকে ভালকে পাতা যায়, কড়কে পাতা যায়, পাখরকে পাতা যায়—কিন্তু ঐ বৈশাখের রোদকে পাতা যায় না। বহু শিবঠাহুরও বৈশাখের রোদের কাছে

হার মানলেন। রোদের আলোয় অধিব হয়ে তিনি পাছতলা ছেড়ে চুক পড়লেন গায়ে। গায়ে এসে সকলের দরই চুকেন, কিন্তু কোথাও আর ঠাণ্ডা ভাঙ্গা পান না। যে ঘরে চুকেন সেই ঘরেই গরম। এ-ঘর ও-ঘর করতে করতে শিব-ঠাহুর শেষে কুমোর-ঘরে চুকলেন। যে ঘরটার বসে কুমোর ঢাকা ঘুরাচ্ছে লে-ঘরটার ঠাণ্ডির ফেললেন তিনি বেশ ঠাণ্ডা—কিন্তু ঠাণ্ডা হলও ঐ-যে বসন্ত করে ঢাকা ঘুরেছে আর কুমোর এবার ওদার করছে, এটি উত্তর লুহ হল না। চাকখর ছেঁচে তিনি চুকলেন মাটি-ঘরে। মাটি-ঘর মানে হাণ্ডি গড়বার ভরে যে ঘরটার মাটি গালা করে রাগা হয় সেই ঘর। ঠাণ্ডা মাটির ঠাণ্ডার ঠাণ্ডা হয়ে আছে ঘরটা, তা ছাড়া নিতিনি। মাটির গালায় মনোই এক-কোক ভরে পড়লেন শিবঠাহুর হার করে। ভরে পর কুমোরকে আতপটিয়া দিলে বললেন, আমি শিবঠাহুর—পরমের চোটে অধিব হয়ে তেনার ঐ ঘরটিতে আমি আশ্রয় নিলাম, ভূমি মনে আমাকে বিরক কোরো না। কুমোর তো আমনে আটকানো, শীতের ঘরে লসরীরে ঈমানাথ এসে বেচে ঠাই নিচ্ছেন! মাটি না হল হাণ্ডি-পড়া অল হলো, কিন্তু হোক অল—ঈমানাথ তো অল হয়ে থাকবেন তার ঘর বাড়ি বৈশাখ মাসটা।

পায়া বৈশাখ মাস শিবঠাহুর কুমোরের মাটি-ঘরে এসে বিস্ময় করেন। এ সময় মাটি-ঘর থেকে মাটি নিয়ে হাণ্ডি-গড়া মানেই শিবঠাহুরকে ঘর থেকে বিদায় করা। কুমোরের হাণ্ডি-গড়া তাই বৈশাখ-মাস-ভর বহু থাকে।

বিজ্ঞাপা করলাম, যেখানে বস কুমোর আছে সব কুমোরই কি হাণ্ডি-গড়া বহু রাখে এ সবটায়?

কৃৎসন জ্যোতী বললে—কুমোর একজাতের নয়, চারপাতের। বাটী, চৌরাটী, বটী আর মগা। বাহুতা-বেলিগুর অকলে ঠাণ্ডিকে দেখতে পাওয়া যায়—ভায়া হচ্ছে বাটী, বর্ধমান ও কলকাতা অকলে বায়া থাকে তারা হল চৌরাটী, পশ্চিম-ফেলের বায়া কুমোর—ঠাণ্ডিকে বলে বটী, আর হাফি-ফেল যে কুমোররা বাস করে তারা হল মগা। ঐ চার কুমোর মধ্যে বাটী আর চৌরাটী-ই হল উচ্চাতের কুমোর—কেবল এরাই ঐ বৈশাখ-মাসের নিয়মটি পালন করে। বটী-মগায়া ঐ-নিয়মটির দায় ধারে না, ওদের মধ্যে এ প্রথাটি নেই।

‘ধরন-গাণা’ বোতেন? বাসুর ফেলে গরমকালে একরকমের হাওয়া বহু বেটাকে বলে লু—ঐ লু-এর পায়ায় গড়ে মানুষকে ঘরে বেঁচে হয় একেবারে। আমাদের বাংলাদেশে লু বহু না বটে, কিন্তু লু-এর পরিবর্তে দুপুর বায়োটা থেকে কিস

দিনটা। শব্দই যে বিশেষ রকমের গরম হাওঘাট বয় পেটিকে
 নু-এর নতি বলা চলে। মাকে মাঝে অল-বৃত্ত যদি না হয়,
 একলাগাড়ে দিনের পর দিন বস করে বেতে হয় এ হাওঘাট,
 —ভাংলো বায়েটা! বেজ বারি মাহুনের। গালে কপালে ঘন
 ফুটতে থাকে হরম, টক তিনিদ ছাড়া মুখে উঠতে
 চায় না অস্ত কোনো বায় : রক্তির মতো হয়ে যায় পরীরটা।
 আর এইই নাম হল 'ধরন-লাগা'। ধরন-লাগার হাত থেকে
 যদি ঝটতে চান তাহলে ক্যানের হাওঘা নয়, কুঙ্গী বরক নয়,
 ভাবের ভগ্ন নয়—পছার ঘুরঘুর হাওঘায় বসে ভিজা-ভাত
 নাকন। ফোড়া-পেঁচাও ভিঝিয়ে খেলে নু-বেমন মাহুণকে
 কাবু করতে পারে না, ভিজা-ভাত খেলে নু-এর নতিও তেমনি
 মাহুণকে কাবু করতে পারে না। ভিজা-ভাত কিন্তু পাখাভাত
 নয়। আধকের ভাত ভলে ভিঝিয়ে রেখে কাল বধন থাকে।
 তখন তা হবে 'পাখাভাত'—আর দুপুরের রাগা-ভাত ভিঝিয়ে
 রেখে সন্ধ্যার বধনও হবে তখন তা হল 'ভিজা-ভাত'। পরমের
 চোটে পরান বতই আইসাই কলক, ভিজা-ভাত পেটে পড়েছে কি
 অটপ ঠাণ্ডা। হতভাঃ গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়াগাঁয়ে
 ডাঙতে হল-গালা হুক হয়ে যায়। প্রথম বেদিন ভাত
 ভিজানো হয় সেদিন কিন্তু তেমন ভালো লাগেনা পেতে।
 যে ভলটায় প্রথম ভাত ভিজানো হল, সেই ভল থেকে বানিকটা
 নিয়ে কাল খেদ ভাত ভিজানো হবে—আসলে মজা ভরবে
 তখন থেকেই। ঐ-যে একটু টক-টক আখান, ঐ আখাখটির
 রূপায় এ-ধেন কীত-রোগা মাহুণটিও এককাড়ি উজাড় করে
 দিয়ে ফের আখার ঘাড় কুলে তাপাবে—অথচ পকবারনের
 সরকার হয়ে ন। গোটারকয়েক কাঁচা পেঁয়াজ (অবত
 গিরী যদি লাফনেটতে বসে পাখাচোখা ছাড়িয়ে যায়) আর
 একডোলা কাঁচা কি পাঁচা পত্র যদি পাই তাহলে দিখি করে
 বলছি দু-খালা উড়িয়ে দিতে পারি। লচা-গোড়া, কাঁচা শশা,
 সবাবের তেল না-হয় বাসই ফিল্ম। সতিয়া কথা বধন শুখন বলতে
 দেব এই—খোদা নিতে দিয়ে মেখেছি টাউনের বাবুয়াও
 অনেকে এই ভিজা-ভাতটি খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করেন। পরীর
 খাওয়া হওবার কোনো প্রসারই নেই, বরং চাট্টি বেই খেতে
 পড়ার মকন পরীর ভালোই হবে—কাবু হয়ে পড়বেন না পরমে।
 আর আগনি তো বনাই একবেলাকার ভিজানো ভাত একটা
 দিমিন্ বাত থাকেন—পরীর যোকেরা যে বায়োমাশ ভিরিপ-
 কাল খ'রে বোজ একবেলা পাখাভাত খেয়ে আসছে, অথচ
 পরীর দেখবেন তাদের বুঁচো হুসীরাটির মতো। ডাক-পুলকের
 একটা কথা আছে—'রাগের ভাতে হাতি মাতে'। তা, যে
 রাগের ভাতে হাতি মাতে—সে ভাত হল এই ভিজা-ভাত।

বৈশাখের ভিজা-ভাত পেট জুড়ায়, আর ভোয়ের ব্যাভাস
 হাড জুড়িয়ে দেয়। বৈশাখের ভোর হল চারটার। ধরন যদি
 না লাগে আগনার, পাগের ডাকডটি যদি থাকে ফাঙনের
 মতোই, তাহলে চারটার সময় উঠবার ক্ষেত্রে অ্যালার্জি বেজে
 ওঠার লক্ষণ হবে না, প্রভাতী সুরেরও প্রয়োজন হবে না।
 ভোয়ের ঠাণ্ডা হাওঘাই ঘুচ্ছে। বিচানা ছেড়ে কাকে এসে
 দেখুন এইই নাম 'শীতল ব্যাভাস বয় জুড়ায় পরীর'। হাওঘা
 খেতে খেতে আমবাখান, গো-বাখান ছাড়িয়ে চলে আখনে
 ঐ-যে-ঐ ছোটোখাটো। একটা শালবন দেখা যাচ্ছে ঐখানে।
 আগনার বেহ শাখ, মন শাখ। প্রকৃতি পাণ্ডা। শাখ দেখমন
 নিয়ে শাখ প্রকৃতির মাঝখানে ঝড়িয়ে থাকুন চুপচাপ। চারপাশ
 আলো করে ফুটে আছে শাবা মাথা বন-জুড়টি। আর দেখুন,
 প্রতিটি বাছই এখন পাতায় ভরা। পাতা-করা বনজগিনে
 কোকিলের হুহ নিমেষেই মিথিয়ে যায়, কিন্তু বৈশাখের হুহ
 নিমেষে লয় হয় না—পাতায় পাতায় লেগে থাকে অনেকক্ষণ।
 ও প্রাক্ষের হুহ পাতার রান্ধার অলিগদি পেরিয়ে বধন
 এ প্রাক্ষে এসে পৌঁছে তখন মনে হয় যেখানটার ঝাড়িয়ে আছি
 সেখানটা মর্ডা নয়—অমরহাতি।

ভোয়ের দিকে কোকিল—রাগের দিকে ফেদী। ফেদী
 ফাঙন-চোতের রাতেও তাকে, তবে তখন তার বৃষ্টি হয়
 'ফেদী ক্যাং চু চু'—এত রাতে এলি কোন্ চেকশালে ভ'।
 আর এখন ফেদীর কাছে কোন্ মানে না। ফাঙন-চোতের
 রাতে প্রেমিকার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত ফেদা অভিমানে-ভরে
 ঘুরে থাকে। বৈশাখে এসে ফেদী আগনার কুল বৃত্তে পেরে
 বুলি বহলায়। মানভবের পর মালিনী শ্রীমতী আগনার
 চোখ-হুটিকে গরনা দিয়ে বলেছিলেন—'আমি যদি মানে
 ছিলাম, নমন কেন চাইলি না রে'—ফেদী আগনার বৃষ্টিটি
 দিয়ে আগনাকেই তেঁড়ায় 'ফেদী'ভোর হয়ে আগুন।

বৈশাখ বড় নিষ্ঠুর। ভোর চারটার এই মিঠিফুলের গন্ধ,
 কোকিলের মিঠি হুহ সে সহিতে পারে না। সকাল সাড়টার
 রোয়ই এলব কেড়ে নেওয়ার সঙ্গে খেলে।

বেশা বাড়লো। যে কাষের মাথু, সে কাষেও লাগলো।
 তবে এখনকার কাজ মাঠে নয়—ঘরে। একমাস বায় মিঠেই
 আগছে আখা, আর সামনে বাড়ী ঝড়িয়ে কল্লেক্স কাল-
 বৈশাখী। বাড়ির ঘরের কাছে কার্যবৈশাখী হল ঘরের গদা,
 আর আগড়ের মুখলখা হল জীবের গদা। এ দু'গায়র
 হাত থেকে বর বাঁচানোর ব্যবস্থা চৈত্রেব শেষে দাবা
 না করছে তারা বৈশাখের আধাআখির মধ্যেই সেয়ে ফেলে।
 পুরনো ঢালকে হুতুন পরবার মতো ক্ষমতা বাসের থাকে না,

ভাঙ্গা বিচাল-হুঁচি পাকিয়ে পুরনো চামকে আচ্ছা করে আঠেপুটে রাখে। তবুও যদি উড়ে দাঁধ জেব কপাল। বাঘের পড় আছে, বা পড় কিনবার মতো পয়সা আছে ভাঙ্গা হুঁচুন করে ঘর ছেয়ে দেব, পুরনো ঝাঁখন কেটে বাতায় বাতায় হুঁচুন ঝাঁখন বেওয়ার ব্যবসা করে। এ কার দারু করে তা'নিকে বলে বাড়িই বা ঘরামি। সবাই এখন ঘরামি খোজে, হুতরাং ঘরামিদের এখন আঘরে চাষের ভিষে ধায়। শুধু আঘার পুরনো ঘর ছাওয়াই নয়, হুঁচুন ঘর তোলাও যে সময় এটা। অল্প সময় মাঠের কাজে মজুররা লেগে থাকে—এখন ভাঙ্গা ঘর সহজলভ্য। সাধারণ মজুরির চাইতে কিছু কমও যে এখন মিলে তা'নিকে। তা ছাড়া কাচমাটির বেওয়ার বৈশাখের রোমে শুকিয়েও দায় ভাড়াভাড়া। ঘর তুলতে যেদি হয় না বেশী।

•

ভাঙ্গার মাঝে যে-সব ছোট ছোট জলাশয়—তিনমিকে পাড়, একমিকে ঝাঁক—ভালো কথায় বা'নিকে বলে তড়াগ, সেইসব তড়াগে বর্ষার জল নাকত অনেক ছোট ছোট মাছ এসে জমে। বৈশাখের প্রথম দিকেই এসব তড়াগের জল এখন শুকিয়ে যায় তখন কাশার আল দিবে ছোট ছোট প্রটে গোটা শুড়াগটাকে ভাগ করে ভোম-বাউরীসের

ফেররা জল হিঁচে মাছ ধরতে লেগে ধায়। বৈশাখের শেষদিকে কিন্তু আর হিঁচনার মতোও জল থাকে না, গোটা বৃষ্টি ছুড়ে পড়ে থাকে কেবল হুঁচি-কাটা কাটার শুকনো গুহ। আর বড় বড় পুহুরের জল—যে জলে স্নান করে সব, ধায়—সে জলও বৈশাখের শেষে একদম কমে যায়। পঁতাই জাল, দুই জাল, পড়ই, চানা ইত্যাদি নামিয়ে মাছ ধরতে মেয়ে পড়ে সবাই। দুই-জালওয়ালী কেবট-ফেরদিক তো টেনে তোলা যায় না। বললেই জবাব—বড় মাছ তো ধরছি না, ছোটো চুনাপুটি ধরবে বেতে পাবো না বাবুরের পুহুর থেকে? প্রথম প্রথম না-হয় ঐ বলেই গার হওয়া গেল; কিন্তু ধাঁয়ের বা পাড়ার বাবুবা বন দেখেন জল একদম কমে গেছে, জলটা সামান্য খেঁটে মিলেই কাশা উঠে পড়ছে উপরে, তখন তারা কচা হুঁচুনকারি করেন—কেশু'বাধু, ভালো কথায় বলছি উঠে বা—নামিল না আর কোনদিন। গোটা পাড়ের স্নান-পাওয়া নির্ভর করছে এই একটা পুহুরের উপরেই। তবুও যদি কথা না গুলি তাহলে টের পাবি।... হুতরাং তেরটে-যেহেবা এরপর থেকে ঝাঁক খুঁজতে থাকে বাত্মা সব কতকজন ঘন সেয়ে উঠে যায়। হুপুহ গড়ানোর পর জলে নামলে আর তো কোনো বাবু আলবেনা ঘাটে। আর, যে বাবু! হুপুহ গড়িয়ে



গেলও নাইতে আসে তারা বাবুই নয়—দু-পাঁচগড়া
কুজা-টিংগি গেলেই ঠাঁও হয়ে ঘাঘ তরা। কিন্তু কালের
কতের পড়ে সন্তিকারের বাবুদিকও মাঝে মাঝে হুপুহ
পড়ানোর পরে খাটো নাহতে হয়। এমনিথারা এক
সন্তিকারের বাবু অবলায় নাইতে এসে দেখলেন, বার বার
বলা সংকে এক কেউ-নাগী দাঁড় করছে। খুন্ ভাল,
বাবুই কেউ নেই। হল ভাব, আর নিয়ে আলা হল
তাকে বাবুবাড়ি পৰ্বণ। সাঝার ব্যবস্থা হল—নাক-উঠানে
গাড়ির স্থায়িক দিকের তাকের থাকতে হবে তাকে আধ-
ঘণ্টা। বাবুশায়ের বিধিযুক্তো কাম করতে হয়েছিল বটে
কেউ-মেয়েটিক—তবে আধঘণ্টা নয়, বাবুশায়ের স্রীটি
নেহাত মেরনাকর বলে আধঘণ্টার পরিবর্তে আধমিনিটেই
খালাস পেয়েছিল।

কিন্তু শুল চক্রির দিলেও, শুল চক্রানোর দুপে বেঘন
চুই-ভাকতি বা অপরায়ের মাত্রা কবেনি, সেইরকম স্থায়ির
দিকে তাকিয়ে থাকার সাতা বরাহ হলেও কেউ-মেয়েটা
বরাবর এ সময়টারে পুতুর নামে—চোকররা গেঁতই ভাল,
চানা নামায়, বাউই মেয়েটা ওগণি ছুড়ায়। এবং তাদের
এই পুতুর নামটাঃ আগের চাইতে এখন বেড়ে গেছে।



পায় দল-বেগুনা

সবাই জানে 'স্থায়ির দিকে তাকিয়ে থাক' বলবার মতো
হিস্ত এখনি আর কোনো বাবুই নেই। পাড়াগায়ে
বাবুই এখন মরছে।

গুলির স্বেচ্ছতে গেলে, আদেককার বাবুদের মনের উপর
কড়া নজর দেওয়াটার নিশ্চা করতে পারা যায় না। এই
হল বহামাঠীর সময়। বসন্ত-কালো যদি একবার চুকতে
পার গাঁয়ে, তাহলে 'বলু মা তারা, গাড়াই কোথা' হয়ে
যাবে যে!

বৈশাখের খা-খা-করা হুপুহ। রোদে কদম্বম করছে
চারদিক। বাইরের দিকে চোখ দেওয়া যায় না। মাটির
ঠাঁও পরটির মধ্যে মাড়রের উপর শুয়ে আগনি এ-পাশ
ও-পাশ করছেন, মটু-পিটুকা কোনো গাছতলায় গাড়িয়ে
কড়ি খেলছে, কথ মাঝে দুলায় বলে 'খুন্-খুন্ গাড়ি নিয়ে
বাক। আর আপনাদের দিরাই! সব কি করছেন ভাবেন?
কড়ি নিয়ে কেউ কেউ দানশচিপ খেলছেন আর কেউ কেউ বা
কাথা আলন নিয়ে নকশা তুলতে লেগে পড়েছেন। মাছ,
হরিণ, লতা, ফুল, পত্র, শাপুক কত রকমারি জিনিসের
সাক্ষাৎ হিলে পল্লীমালাদের তৈরী কাথা-আলনে। আর
কত তুচ্ছ জিনিস দিয়ে এই কাথা! ছিঁড়ে-বাওরা কাপড়ের
উপরে ছিঁড়ে-বাওরা শাড়ির পাড় বসিয়ে সেলাই করে করে
তৈরি হয় অত বড়-বড় সব কাথা। যে হুতো দিয়ে
সেলাই করা হয়, সে হুতোও হিলে ঐ ছিঁড়ে শাড়ির পাড়
থেকেই। যে জিনিস ফেলে দেওয়ার, সেই জিনিসকে
ছড়িয়ে-বাড়িয়েই ঘেয়েটা সব তৈরি করে এমন একটি
অপরূপ জিনিস—বা শুধু সেপে নয়, বিশেষে দিয়েও বুক
দুপুরে গাড়াবার হিস্ত রাখে। কিন্তু হায়রে কপাল!
কাথা-বোনায় দিনগুলো এখন বিস্ময় নিতে বসছে পল্লীর
বেয়েদের কাছ থেকে। শহরে বেয়েরা বই বেছে-বেছে
সোজা-উঠার উপর খোলা রেখে সেলাই-কোড় করেন,
কিন্তু পল্লীর বেয়েরা নিজেরাই এক একটি করে গ্যাটারের
বই—সেই মুতিমান গ্যাটারের বইগুলো এখন বৈশাখী
হুপুহের অবসরে সাংসারিক ছুঃখট্ট নিয়ে দাঁহুতাপ করে—
কাথা তুলতে বসে না। যে কারণে পল্লীর বুক থেকে বিস্ময়
নিবেছে আশ্রয়তলা-বৈষ্ণবানার মজলিস—সেই কারণে কাথা-
বোনো, কড়ি-খেলার দিনগুলোও বিস্ময় নিচ্ছে পল্লী-মালাদের
কাছ থেকে।

“খুদিপুতুর পুশমালা
কে পুতুরে হুপুহবেলা...”

আর-একটু আর-একটু করত-করতে সেবি, এসে পড়েছি উঠানের কোণের আকম্বগাছটার তলায়। আকম্বকুল ফুটে রয়েছে ফলের সঙ্গে সঙ্গে, উচু ডালটাকে হুইয়ে ধরলো দিবি—আমি ডাল থেকে ফুল কাটা ছিঁড়ে নিলাম। আমি যে ডাই—দিবি যে ডাইয়ের বোন। শুইয়ের বোনরা ফুল দিয়ে পূজা করে পুণিাপুহুরের; 'পুণিাপুহুর ব্রত' করে ভাগ্যবতী হয়, ভালো ঘর ভালো বর পায়।

আমলো পুণিাপুহুর ব্রতটা কি গো? রোসের বাঁয়ে গাছপালাটা ঘরে ঘাষ, পুহুর-তোষা শুকিয়ে ঘাষ, ফলকট সেবা দেখে গরীকে গরীতে। বেয়েরা ফলপূর্ণ পুহুরিয়ার ফুলের তৈরি করে তার চার পাড়ে সজীব ভালপালা পুতে কামনা করে—গাছপালায় যেন এমনিথারাই সজীব থাকে, পুহুর-তোষা যেন এমনিথারাই পরিপূর্ণ থাকে—ফলকট যেন না হয় ছেঁপে।

ঐ-বে বিধবা বেয়েরা রান করে গাছের গোড়ায় ফল চাপছে—ও তো গাছকে বাঁচিয়ে রাখারই প্রচেষ্টা যাত্র। তুমি

রোসে শুকিয়ে দরজা—আমি তোমাকে ফলদান করে বাঁচিয়ে রাখছি—অক্ষয় পুণ্যলাভ হচ্ছে তাতে আনন্দ। পুণ্যের মোহ না থাকলে, কে বাবা ফল তেল বেড়াবে রোজ গাছে গাছে!

ফলদানও শুই। গাছের ফল যেন শুকিয়ে না ঘাষ, ফলদানের ফলদাত বাতে গাট সেতর আঁদরা 'ফলদান ব্রত' পালন করি। সারা বৈশাখ মাস ধরে ব্রাহ্মণকে রোজ ফল দান করতে হয়। এ হল নিয়ম।

বৈশাখে আর-একটি অবভ্রপালনীয় নিয়ম হল রোজ সন্ধ্যায় খোল-করতাল সহযোগে হরিনাম গাইতে গাইতে গ্রাম-পরিক্রমা। বৈশাখের প্রথম দিন থেকে এই গ্রাম-পরিক্রমা শুরু হয়—শেষ হয় বৈশাখের সন্ধ্যাশ্রিতে। গায়ে বস্ত্র ঘর আছে—সবাই একে একে পালা করে নিমন্ত্রণ করে হলটিকে। নিমন্ত্রণ করে ছোলা-তিয়া, পাখ-মালু, শশা-হুটি সহযোগে ফল বাঁধানোর ব্যবস্থা করে।

জনমিত্তে স্মৃতিত জিহ্বাটী লেপক করুক গুণীত

ভাগ্য-বিড়ম্বিতা রানী

ত্রিহুপশ্চত্র লাহিড়ী

ইরানের শাহ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ঊষা ত্রিহুপতী রানী সোরিয়ারে ভ্রমণ করেছেন। এই ঘটনা আমাদের চিন্তা এবং কল্পনাকে কতই পৃথিবীর ইতিহাসের আর-একটা অচরণ ঘটনার দিকে টেনে নিয়ে যায়—তা হচ্ছে, সম্রাট নেশোলিয়নের এই স্বার্থেই ঊষা ত্রিহুপতী রোসেমিনকে ভাগ। বিসংবোধের জ্বলে রাষ্ট্রের স্বার্থে সেদিনও নেশোলিয়ন-রাজ-বংশের স্বার্থের প্রয়োজন সেবা দিয়েছিল। নিঃসন্তান রোসেমিনকে ঘিরে নেশোলিয়নের বংশরক্ষার সজাবনা ছিল না। তাই সম্রাট তাঁকে ভ্রমণ করে অস্ত্র পটী গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। পৃথিবীতে রাষ্ট্রের উল্লেসের সঙ্গে সঙ্গে মাহুগ রাষ্ট্রকে তার সমস্ত ঐতিহ্য ব্যাপারের, এমন কি কীবনের উপরও নিরঙ্কুশ কন্যতা সিক্রেট, রাখাও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই রানী রোসেমিনের অস্ত্র বস্ত্রও রাষ্ট্রের প্রতি মাহুগের এই কঠোর পারিষেক ভাগিয়ে দিতে পারেনি।

তারপর বেড়ানত বংশের অস্তিত্ব হয়েছে। এর মধ্যে মাহুগের জীবন ও সমাজ-ব্যবস্থার বহু বৈষম্যিক পরিবর্তন এসেছে। রাষ্ট্রকেই হয়েছে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। সেই সঙ্গে

এসেছে নারীর ভৌতাদিকার আর আইন ও বৈষম্যিক ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে তার সমানাদিকার। তবুও রানী সোরিয়ার এই ভাগ্য-বিপর্ষে কেন্দ্র করে সন্তব হল? আরও কেন তার জীবন পুরুষের প্রয়োজনের জীড়নক? 'নারীর আপন ভাগ্য রয় করিবার' অধিকার আজও কেন ঊষার আঁধার হল না?

বংশরক্ষা অবশ্য সমাজের প্রতি নবনারীর একটা গুরু দায়িত্ব। শুধু মাতাশ্রিতা বা পরিবারের প্রয়োজনে নয়, সমগ্র জাতির প্রয়োজনে—এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকার ধারা বজায় রাখবার জন্য সমগ্র পৃথিবীর প্রয়োজনেও তার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু সমাজে-মহাপুরুষ তো কেবল নারীর একক দায়িত্ব নয়, পুরুষেরও। শাস্ত্রে অবশ্য বলা হয়েছে—'পুরুষে ক্রিয়তে ভাব্য'; কিন্তু সেই হুক্তিতেই বলা চলে : পুরুষে ক্রিয়তে পতিঃ। সন্তানোৎপাদনে অক্ষমতার ভয় ধর্মি বাহীর পক্ষে স্ত্রী-পরিভোগ বিধিত হয়, তবে এতদূর নারীর পক্ষেও স্বামী-পরিভোগ সম্ভব হবে না কেন? এতদূর শাস্ত্র অজ্ঞাত বহুক্ষেত্রে নবনারীর সমানাদিকার স্বীকার না করেও সন্তানোৎপাদনের জন্য নারীর এ অধিকার স্বীকার করে।

তাই রানী পোরিষাও হো আদিভাগ ক'বে অস্ত্র ধারী পরিগ্রহ করতে পারতেন। কিন্তু তাতে যে উদ্দেশ্যটী সিদ্ধ হত না। রাজা—সেন ও রাষ্ট্রের কল্যাণে পতী ত্যাগ করে অস্ত্র পরী গ্রহণ করতে উচিত হইতেন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় তত্বাত্মুখে পতিত হ'লে—ইহান রাষ্ট্রে নানা সমস্তার সৃষ্টি, এমন কি বিপদও হতে পারত। হতে তার ফলে ইহানের বর্তমান রাষ্ট্র-কাঠামো রূপ হয়ে রাজতন্ত্রের স্থানে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হ'তে পারত। হত বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা রূপ হয়ে কম্যুনিষ্টবাদ ও শ্রমের প্রতিষ্ঠিত হবার পথ উন্মুক্ত হত। তার ফল ভাল হত কি মন্দ হত—এ বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও এ-কথা বলা চলে যে, তার ফলে রাষ্ট্র এমন এমতী বিনবাহক পরিবর্তনের মূখে গিয়ে পড়ত, যা ইহানের বর্তমান শাসকগণ এবং হত-যা জনসাধারণ পরিহার করতে চান। তাই রাজাকেই এই অগ্রিম পথ বরণ করে নিতে হয়েচে।

কিন্তু এখানেই এ প্রশ্নের শেষ হল না। এখন প্রশ্ন উঠে—নরনারীর বিবাহ কি কেবল সম্মানোৎপাদনের জন্তই, তার বাইরে এবং উর্ধ্ব নরনারীর প্রেম ও মিলনের কি অস্ত্র তেজও উদ্ভেদ বা পার্থক্য নেই? নরনারীর গুণগম্যের সত্যচরণ এবং আসক্ত-মিলন—রাজে আমতা একত্বাধি বলি 'প্রেম', তার অস্ত্র অবত বিবাহ অপরিহার্য নয়। এর মধ্যে যে আনন্দ আছে, বিবাহের বাইরেও তা ভোগ করা যায়। বরং আনন্দের মতে বিবাহের সেই আনন্দ সীমিত, এমন কি মূল্য হয়। কারণ সেখানে স্বাধীনতা নেই, সেখানে আনন্দ নেই। সন্তীত হাওয়ায় আনন্দ সে, কিন্তু সন্তীত-বিজালয়ের ছায়েক নয়। তাই বলা হইছে—বিবাহ 'প্রেমের সমাপ্তি'। কিন্তু সেই সমাপ্তির মধ্যেই গ্রীক-পুণ্যের কিনিম্বের সত্তা এক নৃতন জীবনের সম্মাননা সূচিত হয়, তা হল—সন্তান। সন্তান-জন্মের জন্ত বিবাহ অত্যাৱশ্যক। অস্ত্র বিবাহের বাইরেও সন্তানের জন্ম অসম্ভব নয়। কিন্তু তবু পাত্রেয় পুত্রিতে নয়, অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক পুত্রিতেও এতদ সন্তান মানব-সমাজের পক্ষে অসহিত।

রাজা যদি জনকল্যাণের জন্তই রানীকে ত্যাগ করে থাকেন, তবে এ কাজে নিশ্চয়ই তাঁর জ্বরব্যবসের সঙ্গে জনকল্যাণ-প্রকৃতির এক প্রবল স্বার্থের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। জ্বরব্যবসের সঙ্গে জনকল্যাণের সংঘাত হলে, কার স্থান হবে আগে? ধরা জ্বরব্যবসকেই অগ্রাধিকার দিতে চান, তাঁরা হত বসবস—কাম কি ছিল রাজা অথবা রানীর রাষ্ট্রের কল্যাণে নিজেদের যদি বেঁচেন? জ্বরব্যবসের সঙ্গে রাষ্ট্রের কল্যাণের ধ্বন এই সংঘাত বেগ্য মিল, তখন তো রাজা সিংহাসন ছেড়ে সাধারণ নাগরিকের জীবন বরণ করে

নিতে পারতেন; ইংলণ্ডের এক রাজা, বর্তমানে ডিউক অব উইন্সটার যেমন করেছেন। কিন্তু তাহলে তিনি হতেন কর্তব্যহী। অষ্ট তাঁর উপর এক রাষ্ট্রের ভার বহন করবার যে গুরুদায়িত্ব জন্ম করেছে—নিজের জ্বরব্যবসের ত্যাগনা তা বহন করতে অস্বীকার করলে, ইতিহাসের বিচারে তিনি রাজপদ থেকে ছাড়া হতেন। রাজচক্রাক্ষেও একদিন নিজের জ্বরব্যবসের সঙ্গে জনকল্যাণের এক নিঃসংশ স্বার্থের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি তাঁর জ্বরব্যবসকে প্রাণান্ত মেননি ব'লেই—তিনি মূগে মূগে মানুষের প্রজ্ঞা আকর্ষণ করেছেন।

জ্বরব্যবসের সঙ্গে জনকল্যাণের এই যে সংঘাত—অনেক নরনারীকেই বৈমম্বিন জীবনে তার সম্মুখীন হতে হয়। ধর্ম ও রাষ্ট্রসাধনা, শিল্প ও সাহিত্য-সৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রকৃতি স্বপ্নমন্ডলক যে-কোনো কাজে ব্রতী মানুষের জীবনে এই সংঘাত প্রায় অনিবার্য। ধর্মওকথা সংসার ত্যাগ করে এই স্বার্থের নিয়ন্ত্রণ করেছেন,—বেশোখাড়া-বিজুপ্রিয়াসের অশ্রুপাণ্ডা তাঁদের নিবৃত্ত করতে পারেনি। পরিশ্রমী দিল্লী ও সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রকর্মীদের কাছে এ-পথ খোলা নেই। তাই তাঁরা প্রায়ই নিজেদের কুর্দার মতো পারিবারিক জীবন থেকে গুটিয়ে এনে এক আত্মসমর্পিত জীবনে যোগ দেন। তাই জ্বরব্যবসের যে প্রাধান্য অস্বাভাবিনী পতী—তাঁর সঙ্গে প্রায়ই বাঘে তাঁদের যম। পৃথিবীর যে-সব মানুষ তাঁদের চিন্তা ও কর্মে পৃথিবীকে সন্মত করেছেন, তাঁদের অনেকের জীবন-সন্ধীনীকেই স্বামীরা ঔদার্যের অস্ত্র বর্ষণে ফেলতে হয়েছে। ওঁরা পরিত্যক্তা হননি বটে—কিন্তু মনের দিক দিয়ে হয়েছেন নির্বাসিতা, রাই থেকেও সহোদর মনোবনবাসিনী।

তবুও রানী পোরিষার দুর্ভাগ্যে আমায়ের মৃত্যুর বেদনার সিক্ত হয়ে ওঠে। সম্রাট নেপোলিয়ন বের্ণার আত্মপ্রাণ-নিক-ভাবে বোসফিনকে ত্যাগ করলে, সে রাজ্ঞেও রানী ফটেন-ক্সো প্রাণাশ্রমে বাস করবার অহুমতি পেয়েছিলেন। সন্তীত রাজ্ঞে বোসফিন সম্রাটের কক্ষে এসে পুড়িয়ে গরুসেন। যে ন্যায়া ও স্বার্থের উপর কাল পর্যন্ত ছিল তাঁর অলপার অধিকার, আজ আইন ও সমাজ তার মধ্যে এক অলপা প্রাণীর গড়ে ভুগছে! বহু-সংগ্রাম-বিজয়ী সম্রাট আজ তাঁর জ্বরব্যবসের কাছে পরাস্ত বরণ করলেন—আইন ও সমাজ-ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে বোসফিনকে বুক টেনে নিলেন।

রানী পোরিষা আজ বসন্ত থেকে বহু দূরে—প্রেমের শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করবার হ্যাগও তাঁর হল না। ঐশ্বর্যের মধ্যে নিঃস্বা, প্রার্থ্যের মধ্যে রিক্তা এই রানী আজ সেইসব অলপা নারীর মধ্যে স্থানপাত করলেন—যাঁরা রাষ্ট্রের স্বার্থে, জন-কল্যাণের প্রয়োজনে এবং শিল্প ও সাহিত্য-সৃষ্টির হৃৎকণ্ঠে বলিপ্রসঙ্গা হয়েছেন।

ছিট-ফাঁটা

• ** চারুচন্দ্র ওট্টাচার্য ** •

দ্বিজেননাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতনে 'বড়দাদা' বললে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিজেননাথকে বুঝাত। দ্বিজেননাথ একজন খ্যাতনামা দার্শনিক ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রের নানা বিষয়ে তাঁর বহু প্রবন্ধ এখনকার এম.এ. পরীক্ষার্থীরা প'ড়ে উপকৃত হয়। তাঁর রচিত 'ব্রহ্ম-প্রয়াণ' বাংলা সাহিত্যে একটি মূল্যবান সম্পদ।

কিন্তু আজ শুধু সেই আপনভোলা মড়াপুরুষকে স্মরণ করব।

১

বিশ্বভারতীর গোড়ার দিকে। একবার স্নান-কুনার লাহিড়ী, দেবেন্দ্রনাথের বহু ও আমি শান্তিনিকেতনে গিয়েছি। আনাদের বহু নেপালচন্দ্র রায় দেখা করতে এলেন। যাবার সময় নেন্দ্র কর গেলেন, পরদিন দুপুরে তাঁর ওখানে আমরা খাব। সময় সন্ধ্যা হো আমি খুব জ্বরবস্ত। বললুম, ঠিক কখন যাবো বলুন, যাবামাত্রই খেতে দিতে হবে। বললেন, আজ্ঞা, এগারটা।

পরদিন এগারটা বাজতে দশমিনিটের সময় আমরা বেরলুম। গুরুপন্থীর কাছাকাছি গিয়েছি, দেখি, নেপালবাবু একখানা চেয়ারে ব'সে খবরের কাগজ পড়ছেন। কাছে যাওয়ায় তিনি আমাদের দিকে একবার চেয়েই ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এলেন, এসে গল্প করতে লাগলেন। খাবার ডাক আর আসে না। নেপালবাবুকে হো আমরা চিনতুম; ঠিক ক'রে নিপুণ, একটা-কিছু গওগোল ক'রে বলতেন। তাঁকে আর লক্ষ্য দিলাম না। বস্তাখানেক পরে খেতে

গিয়ে বসলুম। তখন তিনি বললেন, আপনাদের যে নেন্দ্র কর এসেছি বাড়িতে বলতে একদম ভুলে গেছি; আপনারা আসছেন দেখে মনে পড়ে গেল।

আমরা খুব হাসতে লাগলুম।

তিনি বললেন, হাসছেন কি! তবে শুধুন। একবার বড়দাদা আমাদের ক'জনকে 'নেন্দ্র কর' করেছিলেন। বেলা বাতটা, আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমাদের দেখে বললেন, এই যে আপনারা এসেছেন, ভালোই হয়েছে; আজ সকালে একটা প্রবন্ধ লিখেছি; বসুন, শোনাই।

টীকা-টিপ্পনী দিয়ে প্রবন্ধটি শোনাতে লাগলেন। একটা ঘেঁই বাজল, বললেন, বেলা হয়েছে, আপনাদের স্নান-আহার হো আছে, আর আটকে রাখব না, আজ তাহলে আশুন।

আমরা মুখ চাওয়া-চায়ি করে যে দার বাড়ি ফিরলুম।

নেপালবাবু গল্পটা ক'রে একই জোর পেয়ে বললেন, তবে দেখুন আমি কতো ভালো, আপনাদের দেখে আমার মনে প'ড়ে গেল; বড়দাদার যে তাও পড়ল না।

২

প্রবন্ধ লিখে কাউকে না শোনানো পর্যন্ত দ্বিজেননাথ অস্থির হয়ে পড়তেন।

বিকলে বেরিয়েছেন, পথে দেখলেন, বিধুসেখর শাস্ত্রী ও ক্রিষ্ণনাথ সেন চলেছেন। বললেন, ভালোই হল, আপনাদের সঙ্গে দেখা হল। আজ সন্ধ্যায় আসবেন, একটা প্রবন্ধ শোনাব।

তারা ভিজ্জেন করলেন, গুরুদেবকে ডেকে নিয়ে যাবো ?

—কে ? রবি ? রবি ছেলেনামুখ, সে কি ওসব শক্ত শক্ত কথা বুঝতে পারবে : আপনারা প্রবীণ লোক, আপনারা ঠিক ধরতে পারবেন।

একবার এক প্রবন্ধ লিখে কাউকে না পেয়ে বাড়ির ফিকে সামনে বসিয়ে প্রবন্ধটি আগাগোড়া পড়ে গেলেন।

৩

শীতকালে একটা কোটের উপর আর-একটা কোট পরতেন। এর মধ্যেও একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। উপরের কোটের বোতামগুলি পিঠের দিকে থাকত। বলতেন, এইরকমই ঠিক বিজ্ঞানসম্মত ; সমানভাবে উপর-উপর পরলে, দুই বোতামের ঝাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ভিতরে ঢুকতে পারে। এতে সেটি হবার ষো নেই।

৪

একদিন ভোরে ভগদানন্দ রায়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত।

বসলেন, দেখুন, আপনি বিজ্ঞান পড়ান, আপনি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারবেন। শাস্ত্রনিকেতনে থাকে মাঝে প্রচণ্ড ঝড় হয়, গাছের ডালপালা ভাঙে,

ঘরের চাল উড়ে যায়। আমি লক্ষ্য করেছি কড়ুটা সব সময় পূর্ব-দক্ষিণ কোণ থেকে আসে। বস, আর কিছু করতে হবে না, ওদিকে একটা বড়ো পুকুর কাটান, আর সেই মাটি দিয়ে একটা উঁচু পাঁচিল তৈরি করান ; কড়ু তো বন্ধ হল, সঙ্গে সঙ্গে জলকষ্টও দূর হল। আজ থেকেই আপনারা লেগে যান।

৫

সন্ধ্যাবেলায় এক নেমস্তন্ন-বাড়ি থেকে ঘুরে এসে চাকরকে বলতে আরম্ভ করলেন।—

ভোরা চিরকালই চাকর থেকে যাস কেন, তোদের অমুসন্ধিৎসা নেই বলে।

চাকর মনিবকে চেনে, আর ‘অমুসন্ধিৎসা’ বলতে কি বুঝায় জানে না। মুহু মুহু হাসতে লাগল।

—হাসছিস যে বড়ো ; আমি বিয়েবাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখে এশুন, কড়ার জল চাপানো আছে, লেচি বেলে বেলে তাতে ফেলছে, আর লুচি হচ্ছে। তোরা ভাবিস, যি না হলে লুচি হয় না।—তোদের কোনোদিন উন্নতি হবে না।

চাকরটি শুখনও হাসে। কর্তা এবার চট্টছেন। শেষে চাকর বলল, কর্তা, ওটা জল নয়, যি গ’লে জলের মতো দেখাচ্ছিল।

—খ্যা, কি বললি ! তা হতে পারে, তা হতে পারে। তুই তো অনেক জানিস দেখছি।





ভোজন-পর্ব

ফটো : দীপংকর বসু



মাছ-ধরা

[ফটো : ভারত নাগ]

যেতে যেতে

হরপ্রসাদ মিত্র

একই আলোয় এই-যে নিলীন গাছের সারি—

এক চেতনায় পেরিয়ে যাওয়া, পেরিয়ে যাওয়া !

মহানন্দা পেরিয়ে পেলাম পূনর্ভবা,

এক চেতনায় পেরিয়ে চলা, পেরিয়ে চলা !

যেতে যেতে পড়ছে চোখে প্রতিটি গাছ ।

ভাবছি যদি সময় পেতাম ঝাড়িয়ে যাবার—

হাত ঝুলিয়ে লাগতো অনেক দিন-যানিনীর

গভীর হোয়া একলা থাকার, একলা থাকার !

এই জীবনের শিল্পী যিনি, তাঁকে আমার

প্রশ্ন জানাই ট্যাকসিতে এই যেতে যেতে—

প্রেম বলে যে অশাস্তি হায় প্রাণের আরাম

সে কি প্রাণের চকলতা একলা থেকে ?

হায়রে যারা এই জীবনের হৃৎক ভোলে

নরম বৃকে, ধলুক-ঠোটে, বাহুলতায়—

গাছের মতো একলা তো নয়, একলা তো নয় ।

তাদের চলা নয়তো গভীর নির্জনতায় !

যেতে যেতে নদীর তলে তাঁদের আলোয়

উজ্জ্বলিত রূপ দেখে সেই তাদের কথায়

মনে এলো অস্ত ছবি বর্ষা-বাকুল

তীরের মাটি গলিয়ে নবী ধুয়ে শিকড়—

এক যে ছিল গাছ,—তাকে ম্লল কোথা ভাসায় !

বেনমোহর

বাস্তবসেব মাইতি

‘না হুজুর, ও আমার খাবী নয়।’

‘না হুজুর, ও-ই আমার বিবি।’

‘বরদার, আমাকে তালাক দিয়েছে না?’ আমিনা হুজুর দিয়ে উঠল। যেন বাধিনী।

‘হ্যাঁ, এ কী! আরে কথা বলুন।’ হুজুর খামাতে হাকিম মূণ ভুললেন। তাকালেন বাধিনীর দিকে। কিন্তু তাকাতাই চকু তাঁর দিগে গেল। বহুবীর ডকী আর তাঁর ছোড়া হল না। এ বাধিনী নয়, সাগিনীও নয়।

‘আন্দর, আন্দর একটি মেয়ে!’

একলাসে ঢুকই হাকিম এই লম্বতির ভিন্দুপুটি প্রথমেই ধরলেন। হুজুরের খাওয়া শেষে এইমাত্র তিনি একলাসে এসেছেন। চেতরে বেশই বাসী-বিবাদিনীর বিরোধীয় নব্বির স্পেতে হুক করলেন। বাসী হাটন দেখে বনাবের কতকগুলি ছাপনো প্রতিবাদ ও খাতানার হামিলার সাথে একটি বহুবীর দিয়েছে। প্রথমে সে দাবি করছে যে, সে এই প্রতিবাদ-গুলির রচিত মালিক; কতইই সরকারী রেকর্ডে তার নামই সাবেক বহাল রাখা হোক। বিবাদিনী আমিনা খাতুন দাবি করছে যে, রহিম দেখে তাকে নিকা করার সময় তার সব জমি তাকে বেনমোহর-স্বরে দিয়েছে, কাজেই রহিমের এইসব জমি তার নামে রেকর্ড করা হোক।

নব্বিরও দেখতে দেখতে নীচুসুবেই হাকিম রহিমকে জিজ্ঞেস করলেন,—আমিনা তার স্ত্রী কিনা। কিন্তু রহিমের সবার চেহার আগেরই আমিনা রহিমের স্ত্রীর স্মরণীয় করল। বলে হাকিম তাকালেন তার দিকে—কেমন এমন এই নারী!

‘আন্দর হুজুরী একটি বুঝী। নিটোল পরিপূর্ণ বাহ্য। সুন্দরীতে রূপের কোমল গুণবীতি। রক্ত-লিপিক-কন্ঠিমে তাকে বেশ-আপ মিলে হুজুরী-মেটার ঈর্ষার পাত্রী হওয়ার পক্ষে সে দৃষ্ট। তার করসা তুললতাকে রতিন রাউস ও ধপধপে পাতি ঝাঁটে করে দিগে রয়েছে। বোরকা তো নেই, এমন কি ঘোমটাও নেই। শুধু পাড়ির আঁচলটা আবার উপর দিয়ে ঘুরে চলে গিয়েছে।’

কিছু তার দিক তাকিয়ে থাকায়, আমিনা নিজের সখছে সচেতন হল। ঈর্ষা লজ্জার কপালের উপর পর্দা ঘোমটা একটু টেনে দিল।

ফলে হাকিম মূণ ঘোরালেন রহিমের দিকে।

এক জীবী দীর্ঘ প্রোট ব্যক্তি। কোটরাগত চোখ, উচু চোখাল। ঝাঙা-পাকার দীর্ঘ স্রঙ্গ। ছিন্ন অপরিস্রব শোণাক। কাতর অঙ্গপত্রল চোখ।

‘আগনি আগনার বিবিকে তালাক দিয়েছেন?’ হাকিম শুধলেন রহিমকে।

‘না...না...হুজুর।’ ইতস্ততঃ করে বললো রহিম। গলা তার কেশে উঠলো।

‘কী বললো! মিথ্যা কথা, সার।’ পাল থেকে এক দূরক হাত উঠিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, বহলে প্রায় আমিনার সমান। বলিষ্ঠ লম্বা-চওড়া।

‘আগনি আগার কে?’ হাকিম তার পঠিত্য জানতে চাইলেন।

‘আমি...আমি...’ আদতা-আমতা করে উঠলো দূরকটি, ‘আমি ওদের প্রতিবেদী।’

‘ওই রিহা-ই তো আমার সর্বনাশ করেছে, সার। আমিনাকে হুগলিয়ে নিয়েছে।’ ক্রোধে ছুঁবে রহিম বৈলে উঠলো।

‘মিথ্যা কথা, সার’, রিহা-ই উচ্চভাবে প্রতিবাদ করলো, ‘ও-ই তালাক দিয়েছে। তালাকী মিলন ওই মণে আছে।’ বলে সে হাকিমের টেবিলে রকিত ভিন্দুপুটিগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো। তাকে সমর্থন করলো উপস্থিত আরো কয়েকটি দূরক।

কিন্তু হাকিম তাকালেন আমিনার দিকে। চোখে চোখ পড়তেই আমিনা চোখ নীচু করে ঘাড় হুইয়ে মূণ ঘোরালো অজমিকে।

হাকিম এবার আমিনার ভিন্দুপুটি দেখতে লাগলেন। দেখলেন, মাস-দিনেক আগে রহিম আমিনাকে আইনগতভাবে তালাক দিয়েছে। রহিমের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ‘এই তো আগনি-ই তালাক দিয়েছেন।’

‘তাহলে সব কথা শুধন, সার।’ রহিম তার বাপত্যা জীবন-কাহিনী বলা হুক করল, ‘বহুর সাতক আগে আমার প্রথম বিবি মারা গার। তখন আমিনার সাথে আমার নিকা হয়। ওর বাবা তখন বেঁচে। বেশ আমরা ছিলাম। রিহা-ই আমাদের পাড়ার ছেলে, আমার বাড়িতে বহন তখন বেশ-আদত। ওরা হালাহাদি ঠাট্টা-ইয়ার্কি করত। কিন্তু

তা এতদূর মাঝা ছাড়িয়ে গেল যে, সে-সব কথা বলা যায় না, সার। শেষে একদিন এরের আমি সাবধান করে দিই। ফলে আমিরা আমার সাথে কগড়া করে বাপের বাড়ি চলে গেল। সেও তিনবছর হল। তারপর অনেক মালাসানি করেছি। আর কিছুতেই এলো না। শেষে মেয়েটাকে চাইলাম, তাকেও দিল না। ওই আবারের মধ্যে—হাদিসা, ব'লে সে আমিনার আলম ধরে গাড়িয়ে-থাকা বছর-চারেকের দুটোটে একটি মেয়েকে দেখাল। তার শির-কবরের সেই বাথার টনটন করে উঠল, 'মেয়েটাকে আবার পর করে দিল, সার! দস্তা, আমিনাকে আমি তোলাক বিনি। ওই রিওয়াজ আর তার এইসব ঢোলা। একদিন রাতে আবার বাড়িতে এসে আমাকে বললো,— আমিনাকে তোলাক দিয়ে সে, নইলে ঘরে বন্ধ করে তোর বাড়িতে আত্তন দিয়ে তোকে পুড়িয়ে মারব। আমি গ্রাণের ভয়ে, সার, ওই দলিলে টিপসই দিয়েছি—আমাকে গ্রাণে ধাঁচান, সার!' ব'লে সে মোড়-হাতে হাকিমের কাছে এগিয়ে এল।

কিন্তু তার মুখ থেকে এমন একটা দুর্গন্ধ বেরিয়ে এল যে, হাকিমের বমি এল। তিনি বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'কাছ থেকে সরে যান। গা আর কাপড় থেকে যে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, তাতে আপনার কাছে নাহব খেঁসবে কী করে! ওইদুটাই তো আপনার বিবি আপনার কাছ থেকে লাগিয়েছে।' ব'লে হাকিম পান মুখে দিয়ে আমিনার সেনমোহরটি খুলতে লাগলেন।

টেবিলের উপর সেনমোহরটি বিছিয়ে হাকিম পড়তে শুরু করলেন। হ্যা, এটা রহিম-আমিনার নিকার বেন-মোহর। রহিম নিকার বৌতুকবরণ বহু কু-সম্পত্তি আমিনাকে দিচ্ছে। সেই সম্পত্তির দাগ ও এরিয়া তিনি গুখক একটা কাগজে মোট করলেন। তার পর সেনমোহরটি ভুট্টিয়ে দেখে সেই দাগ ও এরিয়া রেকর্ডের দাগ ও এরিয়ার সঙ্গে মিললেন। মিলিয়ে দেখলেন, একবারে বাস্তবতা ছাড়া বাকী সব অমি রহিম আমিনাকে বৌতুক দিচ্ছে এক তার পরিমাণ হল একর অর্থাৎ তিরিশ দিখ।

হাকিম এবার মুখ তুলে তাকালেন রহিমের দিকে, 'আপনি তো সব অমি আমিনাকে দিচ্ছেন। শুধু বাস্তব-ভিতাটা রেখেছেন, তাও নাকি বিখাবানেক। সব অমি বিবিকে মিলেন কেন?'

'সে সার অনেক কথা', রহিম তার জীবন-নাট্যের আর-এক অঙ্কের গর্পা উন্মোচন করল, 'আমি তো ওকে

সানি করিনি, নিকা করেছি। তার আগে ওর সানি হয়নি, আমিই প্রথম ওকে নিকা করি। তাই ওর বাথা বললো— অর সম্পত্তি মিলে চলবে না। কত বড় ধরে, কত ভালো পায়ে ওর সানি হতে পারে, তা তো জানো—বুঝতে তো পারছ আমিনা দেখতে ভালো, তা ছাড়া শিক্ষিত—'

'শিক্ষিত জানে!' বিষয়ে হাকিম নাহবানে প্রর করলেন।

রহিমের ওভাবে বোঝার আগেই রিয়ার উৎসাহে বলে উঠলো, 'আবারের গ্রামের উচ্চ-প্রাথমিক ইংলিশ থেকে ও সেন্টার পাস করেছে।'

'তাই নাকি।' হাকিম রিয়ারের দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে আবার রহিমের দিকে তাকালেন, 'আপনি কতদূর লেশাশড়া শিখছেন?'

'আমি...আমি তো লেশাশড়া জানি না, সার।' আড়ষ্ট ভঙ্গব দিল রহিম।

হাকিম এবার ওদের দুজনের দরগাঘেরে সই বেললেন। রহিমের দরগাঘাতে রয়েছে টিপসই, আর আমিনার দরগাঘাতে বেশ গোটা গোটা হুন্দের মেরকী ইত্যাকার লেশা : আমিনা বাতুল, শিতা মাতকর মতল, লাং—

'এটা কি আপনার দিতের সেই?' হঠখাড়াটি তুলে ধরে হাকিম মিজেল করলেন আমিনাকে।

'হ্যা।' বেল ঘুটিতে ওভাবে দিল আমিনা, আর তার সে-ওভাবে অহুয়ারও প্রকাশ পেল।

হাকিম কি-বেন ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে রহিমের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'তাহলে দেখতে ভালো আর শিক্ষিত ব'লে সব সম্পত্তি বিবিকে বৌতুক দিচ্ছেন?'

'হ্যা, ছব্ব।' কাতরে ওভাবে দিল রহিম। কণ্ঠ তার ডারি হয়ে এলো।

হ্যা, হাকিম মনে মনে বলে উঠলেন, তিনি ঠিকই ভেবেছেন,—এ সেই আমিম ও অতি পুরাতন বটনার পুনরাবৃত্তি—নারীর স্বপাশিত পুখ-পতনের পুড়ে-মরা। উৎ-ধ্বংস, লচ্চ-ছারখার, চাকবস্ত-আপারকারের পতন—এ তাদেরই আর একটি সংখ্যাবৃদ্ধি মাত্র। 'তাহলে এখন আর কাতাকটি করছেন কেন? তাদের মোহে একদিন বিবির গলায় মালা দিয়ে সুখেছিলেন, এখন গাছের ডালে হুড়ি বেধে কুলে পড়ান।'

'ছব্ব! অমি তো আমি দলল করি।' রহিমের গলা; আরো ডারি হয়ে এলো।

'এবার দলল ছেড়ে যিন।' আরো বিরক্ত হইলেন

হাকিম। কিন্তু হাকিমের বলার পূর্বেই বিরাডের দল একসঙ্গে চৌকিরে উঠল, 'না সার, ও দল বধে না।' আর আমিনা হাবি করল, 'কদম্বা দেখুন, সার।'

এবার হাকিম তাঁর বেঞ্চ-স্কেলকে আসল করলেন মাঠ-বলড়া-চরিশের দল দেবার ভক্ত। ভক্তও বেধা গেল, হাকিমি! বলে সব হাণের ধলকার-রূপে আমিনা বাঁড়নের নাম দেখা।

'এই তো, সব ভনিই তো আমিনা দল করে।' রহিমের দিকে তাকিয়ে হাকিম বলে উঠলেন।

'ও সমস্তই মিথ্যা করে লিখিয়েছে, সার।' কীভাবে কীভাবে রহিম তার কাহিনীর অধিম পর্বের কথা বলা আরম্ভ করল, 'আমিন-সাহেব ফেরি আনাতের গ্রামে ভরিশ করতে যান, ফেরি দকালে এই বিরাডের দল জোরপূর্বক আমাকে আমার ঘরে পুরে তাল্লা দিয়ে আটকিয়ে দেয়।' 'মিথ্যা কথা, ওকে আনাত; তাল্লা-বদ্ধ করে রাখিনি।' বিরাড প্রতিবাদ করে উঠলো।

'খাছন', হাকিম দমক দিয়ে উঠলেন বিরাডকে, 'ওর বক্তব্য ওকে বলতে দিন। আপনার বক্তব্য আপনি পরে বলবেন।'

'তার পর', রহিম বলতে আরম্ভ করলো, 'ওরা নাটে গিয়ে আমার সব ভমিতে আমিনার নাম লিগিয়ে দেয়। হুপুয়ের সময় ওরা আমার ঘর খুলে দেয়। তখন মাঠে গিয়ে শুনি আমিন-সাহেব আমাতের গ্রামের ভরিশ শেষ করে চলে গেছেন। এক কোণ ঘুরে প্রেসিডেন্টের বাড়িতে আমিন-সাহেব থাকতেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি বললেন,—এখন আর কটাকাটি হবে না, হাকিমের কাছে সরখাও কর—এটনটপনে রেকর্ড সংগোধান হয়ে যাবে। তাই আমি সরখাও করছি। ওতে সব কথা লেখা আছে, হুছর।'

'ও সবই মিথ্যা, সার। আমিনা জমি দল করে, আমিনাবাণু তাই আমিনার নাম লিখেছেন। আরো যে ওকে তাল্লা-বদ্ধ করে রেখেছিলাম বা আমিনার নাম লিগিয়ে দিয়েছি—তার কোনো প্রমাণ কোনো সাক্ষী আছে?' বিরাড যখন, রহিমকে তাল্লা-বদ্ধ করে রাখা ও ভমিতে আমিনার নাম দেখা—জুটাই সে আর তার দল করেছে; কিন্তু তাদের বিক্ষেপে সহসা কেউ সাক্ষী হবে না। আর, সাক্ষী-প্রমাণ না-হলে এ অবস্থায় এদের কোর্টে হুকম পাওয়া সম্ভব নয়। তাই সে সাক্ষী-প্রমাণের কথা বলে হাকিমকে তার বক্তব্য বিধান করাবার চেষ্টা করলো।

ওদের ভয়ে কেউ সাক্ষী হবে না, সার!'

'তব কিদের?' হাকিম বিজ্ঞপ্তি করলেন রহিমকে।

'যে সাক্ষী দেবে, তাকে মার-খোর করবে কিংবা তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।'

হাকিম এই অবস্থার গ্রস্তে না গিয়া তাঁর কলমের দিকে এলেন,—'আল্লাহ, জমিতে এ বছর ফল দেনেছেন কে?'

'হামি'

'হামি'

একই সঙ্গে রহিম ও আমিনা হাবি করে উঠল।

'আপনি নিজে?' হাকিম শুধালেন আমিনাকে।

'না, বহুর লগিয়ে।'

'কী ফল দেনেছেন?'

'গম, হুপ, হুছর প্রভৃতি সবধরন। অর্ধের অধির গম আমি কেটে নিয়ে গিয়েছি।'

কেন? কোন্ সময়েরে মাঠে কী কী ফল ফলে, আমিনা তা জানে। জোর করে সে কয়েকদিন আগে রহিমের বোনো গম কেটে নিয়ে গিয়েছে, তথাপি সে স্নেহ মিথ্যাকথা বলে গেল।

'ইহা আলা! যেহেমাছরও এতো মিথ্যাকথা বলতে পারে! ও জোর করে আমার বোনো গম কেটে নিয়ে গিয়েছে, সার। ওই শুওদের সাহায্যে।' রহিম কতকি উঠলো।

'এই সাংগান।' বিরাডের দল হুছার দিল।

'হুপ কলন, চোকাঝেটি করবেন না।' বলে হাকিম হার লিখতে হুক করলেন। লেখা হলে পর অর্ডারটা জমিয়ে দিলেন।

'হাছ আলা! একি হল!' উপরের দিকে তাকিয়ে হাউহাউ করে উঠে রহিম মাথায় হাত নিয়ে বলে পড়ল—'একি করলেন হুছর! সব জমি আমিনার নামে করে দিলেন! খাছ আমি কি করে? অস্বস্ত: পাঁচবিয়া জমি আমার নামে করে যেন, সার!' হাকিমের পা ঝড়িয়ে ধরলো।

'আঃ, একি! পা ছাড়ুন। একি আমার জমি যে, আমি দান করছি। আপনার জমি আপনি নিজে তো বিকিকি দিয়েছেন। এখন আমার এদন জাফামি কেন?'

ততক্ষণ অফিসের অনেক পিওন রহিমকে তুলে বাইরের দিকে নিয়ে চলেছে। তার সঙ্গে আমিনা আর তার দলও বাইরে বেরিয়ে গেল।

তার পর...

তাঁরপর দিনের কাছ শেষ করে হাকিম যেয়েলেন এল্লাস ঘেঁক। অতমান ঘুঁ পন্ডিত আকাপকে রহিম করে তুলেছে। যেদনার সে ঘেঁ পাড়ুর। তারই প্রতিফলন পক্ষেরে সামনের প্রকাণ্ড দীঘিটার আসে। সে জল বেন বহ

হাছাকার, বহু ক্রান্তিত বুকের বক্তৃতা-শোনা।। প্রজ্ঞা-হিতার্থে একলা এক বান্ধবস্ব রাক্ষাস অর্থে তৈরি হয়েছিল এ-দীঘি। দীঘিটার উত্তর পাড়ে প্রাচীন প্রকাণ্ড এক তমালবৃক্ষ। তার গোড়াটি অনেকখানি স্থান ছুড়ে শান-বাধানো। সেই গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে রহিম বসে আছে। তার দুই চোখ দিয়ে সর্ববাস্তবের হাছাকার-অঙ্গ কশোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। আর সেই শান-বাধানো রক্তের একাংশে আমিনা-বিয়াকের হল আসার আগ্যাম্বাদিনের আনন্দের উৎসব-আয়োজনে কোলাহল-মুগের, আনন্দ-ভোজনে মগ্ন।

সব লোক চলে গেছে; অথচ তারা এখনো ছাটনি। হাকিমের মনে একটা সন্দেহ জাগল—‘আপনারা এখানে কী করছেন? এখনো বাড়ি যাননি?’

‘এবার দাব, দার। কালকে রিহাভ-দার সঙ্গে আমিনা-দির নিকা হবে কিনা, তারই হাট-বাজার করতে গেরি হল।’ মহা খুশিতে অব্যবহিত রিহাভের এক শাকরের, ‘মুতীর তরঙ্গ’ যেন তার সর্বাব্যে—আর সে-তরঙ্গ ভেঙে পড়লো অগ্রবের জয়-জ্যোটে। তারাও গুণ্ডরিত হয়ে উঠলো; কিন্তু আমিনা লজ্জার মুখ অস্ত্রদিকে ঘোরালো।

‘আর আপনি কেন বাড়ি যাননি?’ হাকিম তমালেন রহিমকে।

‘আমি... আমি...’ হাউহাউ করে কেঁপে উঠে রহিম আছড়ে পড়ে হাকিমের পা-ছুটো ভড়িয়ে ধরল—‘আমি আর দাব কোথায়, দার! আমার আর কী রইলো—সম্মতি আর তো গম কেটে নিয়েছে, কালকে নিকার পর বাণী জমির ফল সব কেটে নেবে। আমি আর এখানে কিরব না। আপনার বাড়িতে আমাকে চাকর রাখুন, হুম্মর! ছুটি শুখু খেতে-পড়তে দেবেন—’

‘আং, পা ছাড়ুন—’ বলে হাকিম পা থেকে তার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু রহিম এতো ঘোরে পা ভড়িয়ে ধরেছে যে, তিনি তার হাত ছাড়াতে পারলেন না। তখন তিনি চেষ্টা করে তাক দিলেন হাকিমের শিবিরের।

কিন্তু শিবিরে আসার পূর্বেই আর-একটি ঘটনা ঘটে গেল। রহিম-আমিনা নাটকের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য।

আমিনা কণ্ঠস্বর উঠে এসে রহিমের হাত ধরে টান দিল—‘একি করছ! হাকিমের পা ছাড়।’ কণ্ঠে তার আদেশ।

দুহুর্থে পা ছেড়ে দাবিয়ার রহিম নুণ তুলে তাকাল। হঠাৎ যেন কোনো যন্ত্রণায় তার কান্না থেমে গেল। সে বিষম-বিষমিত নেত্রে তাকিয়ে রইলো আমিনার দিকে। আমিনা তার হাত ধরে তাকে তুললো—‘চলো, বাড়ি ফিরে চলো। তোমার সব জমি আমি ফিরিয়ে দেব।’

‘জমি ফিরিয়ে দেবে? জমি ফিরিয়ে দেবে? জমি আমি চাই না, আমিনা। তোমাকে... তুমিও আমার সঙ্গে যাবে চলো। চলো আমিনা, চলো!’ আমিনার হাত ধরে রহিম কাতরে অহনর করলো।

ইতোমধ্যে হাসিনা তার মায়ের পিতৃ পিতৃ এসে তাদের মধ্যে গাড়িয়েছে। অত্যন্ত বিষয়ে সে কেমন বেন হয়ে পিয়েছে। হঠাৎ সে চেষ্টা করে কেঁপে উঠল, ‘মা... মা... বাবা—’ মাঝে সে শিবিরে ভড়িয়ে ধরলো।

রহিম আমিনার হাত ছেড়ে দুহুর্থে হাসিনাকে বুকে তুলে ভড়িয়ে ধরলো,—আমার পেছে হুম্মতে তাকে বিব্রত করে তুললো—‘মাগো! তুমি আমাকে ছেড়ে যাবনি—আমার কাছে ফিরে চল—’

আর, আমিনা! ঝাঁপ দিয়ে নীরবে চোখ মুছতে লাগল।



প্রথম বাংলা দৈনিকপত্র

ড্যানাগ্রসাদ সরকার



কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

জন্ম : ২৪শে ফাল্গুন, ১২১৮

মৃত্যু : ১০ই মার্চ, মনিষায়, ১২৭৪

বাংলাদেশের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকর'। এটি আজ থেকে ১২৭ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে আগস্টের সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। অত্যন্ত বাধ্যবদ্ধ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাবেশিকতার উদ্ভূত হন। এইসময়ে তিনি আত্মরিক্তভাবে উপলব্ধি করেন যে, বাংলায় একটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করা দরকার। সে সময়ে কলকাতায় পাশ্চাত্যের ঠান্ডারবাড়িয়া ছিলেন বিত্তশালী ভদ্রিয়ার। এই পরিবারের যোগেশচন্দ্রনাথের ঠান্ডার কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অগ্রদূত বন্ধু ছিলেন। প্রথমতঃ যোগেশচন্দ্রনাথের অর্থসাহায্যেই বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হয়। যোগেশচন্দ্রনাথের মৃত্যুর (১২৩২ সাল) সঙ্গে সঙ্গেই 'সংবাদ প্রভাকর' বন্ধ হয়। "প্রভাকর করের অনাদররূপ দেখাচ্ছ

ইহেন মন্ত এই প্রভাকর কর প্রকল্প করিয়া কিছুদিন গুপ্তভাবে চলিছিলেন।" চারবছর পত্রিকাটি বন্ধ থাকার পর 'সংবাদ প্রভাকর' ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট আবার প্রকাশিত হল। এই সময় বাণিজ্যিক সাপ্তাহিক থেকে সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হতো। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তিনবছর 'প্রভাকর'কে এইভাবে প্রকাশ করতে লাগলেন। তারপর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন থেকে 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হতে লাগলো। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর প্রথম পৃষ্ঠার উপরে একটি সংকৃত শ্লোক থাকতো :

"সত্যঃ হনুমানঃসংপ্রভাকরঃ সইবৈ সার্কসু সমপ্রভাকরঃ।"

উল্লেখিতাংকং সকলাপ্রভাকরঃ সর্বসংবাদনবপ্রভাকরঃ।" এটি শ্লোক সংস্কৃত-কল্যাণের অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ কর্তৃক রচিত। দৈনিক পত্রিকা হবার পর প্রভাকরের মাসিক মূল্য হয় '১ তত্তাঃ মাসঃ' অর্থাৎ '১ টাকা'। 'সংবাদ প্রভাকর' যে দরনের সংবাদ, মত্বা প্রভৃতি পরিবেশিত হতো—আমাদের সাংবাদিকতা তার থেকে অনেক বেশী দত্বর। আধুনিককালের সংবাদপত্রেই মতো 'সংবাদ প্রভাকর' ছিল না। 'সংবাদ প্রভাকর' বিজ্ঞাপন, সম্পাদকীয়, রিপোর্ট, চুড়া, কবিতা, দেশ-বিদেশের খবর ইত্যাদি থাকতো। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখনী অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং শানিত ছিল। একবার এক ইংরেজের কোর্টের মাঝা নিয়ে তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদকীয় দেখেন। সেটি এখানে উদ্ধৃতি করে দিচ্ছি :

"বৃন্দাবনদ্বীপ ইংলিশম্যান পত্রের সমাচার প্রেষীদ্যো কৌতুকজনক এক ঘটনা লিখিত হইয়াছে, তাহাশেষ এই যে গত সোমবার দিবসে ছোট আদালতের তৃতীয় বিচারপতির সমীপে একজন মিলেটরি সাহেবের বিরুদ্ধে এই তথ্যের মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, ঐ সাহেব বিচারকের সমীপস্থ হওঁত তাহাশেষের কোন কথা উত্থাপন না করিয়া তলবার দ্বারা মহা গোলযোগ আরম্ভ করিলেন, সাহেবের সাহায্যার্থে সন্দর্শন করত সকলেই পর পর কশিত কলমের হইয়াছিলেন, বিচারকেরা পুনঃ পুনঃ প্রবেশ বাক্যদ্বারা তাঁহাকে শান্ত করিতে পারেন নাই, পরিণেবে সায়রান কিং সাহেব আপিয়া বিকট বেশ দারিদ্র্য পূর্বক দুই চারি ধমক দেওয়াতে সাহেব ভীত হইয়া প্রস্থান করিলেন। ছোট আদালতের বিচারকেরা



কবিগায়ক মন্ডিরবাড়ি স্ট্রিট কবির বাসভবন

গবর্নমেন্টের প্রাচীন কর্তৃত্বের হইয়া ঐ অত্যাচারি সাহেবকে অমননি অমননি ছাড়িয়া দিলেন, যদি এতদেষ্টের কোন ব্যক্তি ঐরূপ করিতেন তবে কি হইত বলা যায় না।”

‘সংবাদ প্রভাকর’ অনেক ষোড়শককর ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় :

“‘ওগ হোদে বেগে হলো বিচার বিচার’

ডাক্তার গুডিং সাহেব গোপালচন্দ্র সৈন এবং ভোলানাথ বহু নামক দুইজন মিডিকেল ছাত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিলাত হইতে আগমন করিতেছেন, স্বর্ঘ্য-সুন্দার নামক বিপ্রকুলোদ্ভব ছাত্র বিলাতে রহিলেন, ইষ্টাং এখানে আসিবেন না, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, একটি বিলাতি বিবি বিবাহ করিবেন তবে আসিবেন নাওং যে রহিলেন সেই রহিলেন, বিবিব সহিত বিবাহের কোডে তিনি পাতিঙ্গির বেত পাশপাশে পুষ্পাভূষিত প্রদান পূর্বক উভয়কে লীকিত হইয়াছেন, অল্পপূর্ব ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে পাণববর্জিত দেশে ঐ স্বর্ঘ্যসুন্দার ভ্রমগ্রহণ করেন, ঢাকার কালেজে কিছুদিন ইংরাজী পড়িয়া কলিকাতার আগমন করত টিকিৎসা বিভাগ শিক্ষার নিমিত্ত মিডিকেল কলেজে নিযুক্ত হইলেন, এখানে বহুদিন

ছিলেন ততদিন কিছুই মানিতেন না, সম্পূর্ণ নাস্তিক ছিলেন, গললেপ হইতে বজ্রসূত্র ভাগ করিয়াছিলেন, কোন খণ্ডেও প্রতি বিধান করিতেন না, পরে মিডিকেল কলেজ হইতে গুডিং সাহেবের সঙ্গে বিলাত গমন করেন, সেখানে উত্তমরূপে বিজ্ঞা শিক্ষিতা দুবৃদ্ধিবন্দ্যঃ অবশেষে এই অগাধ বিজ্ঞা প্রকাশ করিলেন, বাহা হউক, খস্ত বিবিলোড, যে ঐষ্টধর্ম, তোমার চমৎকার ওগ, তুমি কিবি পবাস্ত দিগা লোককে যমতে আকর্ষণ করহ।”

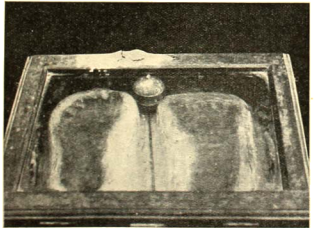
—সংবাদ প্রভাকর, ১০ই ফ্রেব্রুয়ারি, ১৮৮৮ সাল

তখনকার দিনে সংবাদ-পরিবেশনের দ্বারা ছিল অস্তরকমেব। এখানে একটি সংবাদে তুলে দিচ্ছি :

“কেমন আর চুরি করিয়া মাংস খাইবে।

অবগত হওয়া গেল এই কলিকাতা নিবাসী কোন ডায়াগনের ব্রহ্মশাস্ত্র এক বেন সম্মান এক ব্যক্তির একটা ছাগল অপরূপ পূর্বক ছেদন করত রন্ধন করিয়া আহার করণের উজোগ করিতেছিলেন এমন সময়ে বাহার ছাগল সে ব্যক্তি পুলিশের লোক আনাইয়া বেধাইয়া দেয়, পুলিশের লোকেরা তৎক্ষণাৎ খড়্গত্রয়া সম্বলিত তাঁহাকে শ্রীঘরে লইয়া গেল, এ বিবয়ের বিচার বিস্তার নিম্নের ইষ্টাছে তাহা জানিতে পারি নাই।”

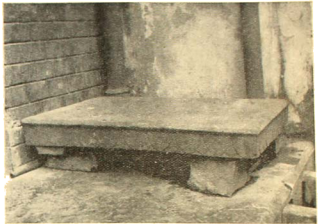
‘সংবাদ প্রভাকর’ লেখকের নামবিহীন অনেক কবিতা প্রকাশিত হতো। অবশ্য তার বেশিরভাগই কবি ঈশ্বরচন্দ্র



শ্রীমদ্রাধা দায়ের চন্দ-চিহ্ন : বর্তমানে ইহা কবির কূহে রাখিত আছে।

প্রণেয় নিজের রচনা। তাঁর কবিতায় এক বিশেষ ধরনের ভাবের প্রকাশ খুঁটেনে। এ ব্যাপারে তাঁর 'বিশিষ্ট প্রকরণ' কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে :

"অনুভব পক্ষী এক পক্ষ তার নাই।
বিশাপক্ষে সেই পক্ষী হাথ সর্ক ঠাই।
হস্ত নাই পদ নাই মুখ নাই তার।
অথচ লোকের করে অস্তর আহার।
আশা নাই বাসনা নাই এ তিন দুখনে।
আশা ছেড়ে বাসা করে মাছের ঘানে
কে বুঝিবে বিপরীত ভাবের আভাস।
আপনি বিনাশ করে আপন নিবাস।
বিহ্বল করিলে বাস মানসের হলে।
প্রতিশ্রুত হাফে মন ছাখের অনলে।
সেই নাই কিন্তু সেহে ধর অগ্নি মনে।
কখনোই ছবঃহতে নাহি যায় রাখা।
মনের বাসায় পানী করিয়া প্রবেশ।
প্রবল সবল তহু তহু করে শেষ।



কবির মজুত পদার্থের সান্নিধ্য

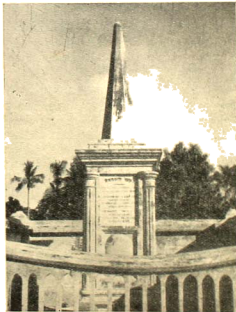
পত্রক্রমে সহঃ ভাবে নানা ব্যক্তিজন।
জ্ঞান বৃদ্ধি খেঁচি বল নষ্ট করে জনে।
আঁখির নিকট পানী অবিরত রয়।
তথ্য সে কোনরূপে দূর নাহি হয়।
হাসিক প্রেমিক জন সেই ভাবে ভাবে।
কোন পক্ষী কিবা নান বৃক্ষ সব ভাবে
পানী বেয়ে।"

এ কবিতাটিতে কবি ঈশ্বর গুপ্ত রূপকর আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর কবিতার মধ্যে অনেকগুলি সে-দুগের ইংরেজ-শাসনকে বাত করে লেখা। এসেছে শীলকৃষ্টি এবং শীলকর্মের অত্যাচারে এখন বাংলায় মাথার ঘর ঘুমিয়ে পড়ছে। তাই তিনি তৎকালীন মহাবাহী ডিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি করে লেগেন—

"তুমি যা কল্পিত, আমরা সব শোষা গুল,
নিখিলি নিঃ বাক্যে..."

এখানে প্রথম বসে-গেয়ে কবিতা লেখেন ঈশ্বরগুপ্ত গুপ্ত। তাঁর উগ্র স্বাভাবিকতা, অনমনীয় দৃঢ়তা, অটুট সংকল্প 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পাতায় পাতায় বাস্তব হেঁচ পেছে।

তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক-কালেক্টর কবিতা-দুখ 'সংবাদ প্রভাকর'-ই চলেতে থাকে। সে-দুগের শীনকল্প মিথ, রাজ' বাধাকাল সেব, বহিঃস্থ চট্টোপাধ্যায়, ভদ্রগোপাল তর্কালঙ্কার, রামকমল সেন, প্রসন্নকুমার মাস্কর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি প্রবীণ ও নবীন কবি, সাহিত্যিক এবং পণ্ডিতেরা 'সংবাদ প্রভাকর'-ে নিঃশব্দে নিঃশব্দে।



কল্যাণীতে কবি ঈশ্বরগুপ্তের মজুত



১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে ১৯১১ সালে 'বঙ্গবাসী'র প্রকাশিত 'বিভিন্ন বঙ্গ ইংরাজ ভাষায়' উপলক্ষে পুস্তক-বিতরণী সভার উদ্বোধনীচক্র দিগে কতিপয় বিদগ্ধী পাঠ করিতেন। (চিত্র (বঙ্গবাসী ইংরেজ) উদ্বোধনীচক্র সভাস্থ (ভারতীয় সভাপতি), উদ্বোধনীচক্র দিগে (কোষাবলী), উদ্বোধনীচক্র সভাপতি (অধ্যাপক-বিভিন্ন সভাপতি), পশ্চিমবঙ্গ ভাষায় বিদগ্ধী সভার উদ্বোধনীচক্র সভাপতি (অধ্যাপক-বিভিন্ন), উদ্বোধনীচক্র সভাপতি (অধ্যাপক), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য উদ্বোধনীচক্র সভাপতি (সভাপতি) ও ডাঃ কলিঙ্গাল বাগ (সভাপতি)-কে দেখা যাইতেছে।

১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি কবি ইন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়। তার পর তার ছোট ভাই রামচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদক হন।

সে-সুপের অনেক ইতিহাস 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পাতার পাতায় স্মরণীয় করা আছে। তাই প্রথম বাংলা

দৈনিক সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকর' বঙ্গোদী-যাত্রির ইতিহাসে গুরুত্ব দিয়ে থাকবে।

এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ 'সংবাদ প্রভাকর'-এর দুইটি পৃষ্ঠার প্রতিমূখ 'ইতিহাস অ্যান্ডোনিগ্রেটের পারদর্শী' কল্যাণী আইজিউ স্মিটস-এর, এবং অধ্যাপক চিত্রাবলী 'বিভিন্ন বঙ্গ ইংরাজ ভাষায়' উপলক্ষে কতিপয় পৌরসভা সভার

স্ট্রাজ্‌নিতসে উৎসব

নিবন্ধসাদ বিশ্বাস

প্রাণে গভবর নাচবর একটা ঘটনা মনে পড়ে। ভিপেথর মাসের শেষ। কদিন পরে ছাবের কানিসে, গাছের ডালে, রক্তার পাশে বরক ভমে উঠছে। বিকেল চারটাখ অন্ধকার হয়ে আসে। কোথায় যাই? বরুবর বোণ রোজই নাচে বান, বাইরের বিমব প্রাণহীন আবহাওয়ার হাত থেকে রেহাই দেতে। সেদিন আমার প্রাণ মোর করেই টেনে নিয়ে চললেন। একদাথে এত লোকের সমাবেশে বাসনার হুড়ে বন্ধ লাগে না। বোস ক্রোরে বেনে পড়ছে। আমি আহি বসে। আমার টেবিল তখনও ভাক—কড়িক মাখন জানাইনি। এগেছি শুধু বেথতে। কে জানতো বোসের মনে ছিল দুর্ভিসন্ধি—ও গিয়ে একটা বেতকে বসন্তে, আমি একা এসেছি, আমার নাচের সখী নেই। বিদেশীর খাতির এখানে বড় বেক, বিশেষ করে গায়ের রং যদি কালো হয়। মেয়েটি এসে আমার আনালো নাচের অহরোধ। প্রত্যাখ্যান-করা ভহতা-বিকল্প। ইয়ানার পাশে সেইদিন থেকেই আলাপ। অর্ধান তখন সব শিখছি, সব কথা প্রকাশ করতেও পারি না—ও ইংরাজী মানে না।

প্রাণে ছোটখাটে। অনেক লোকবৃত্তার অহুঠানে ইয়ানার পাশে গিয়েছি। ও বলতো, “যদি সত্যিকারের লোকনৃত্য বেথতে চাও, তা হলে স্ট্রাজ্‌নিতসে উৎসবে যোগো।” সেই প্রথম এই উৎসবের কথা শুনেছিলাম। কয়েকমাস কেটে গেছে—ইয়ানার ঘিরে হয়ে গেল। ভাগ্যক্রমে উৎসবের সময় ও থাকবে স্ট্রাজ্‌নিতসে ওর পুত্তর-বার্জিতে। আমরন আনিরেছে আমাকে ছুন মাসের শেষ দু’দিন ওখানে উৎসব বেথতে। এর মধ্যে সখী ছুটেছে ভাপলেভাল, মিউজিকাল অ্যাকাডেমির শিক্ষক আর বালাগর ছাত্র।

২০শে ছুন ভাপলেভালের পাশে রওনা হলাম খুব ভোরে প্রাণ থেকে। ট্রেনে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার—তার উপর বড় ভিড়। মোরাজিয়ার কথা দিয়ে চলছি। হু’পাশে সখী কেত, সখী গাছ—ছোট ছোট পাখাড়। কে বলবে যে, শীতকালে এখানে সব-কিছু বরফ ঢেকে যায়। কালো শাককরা গাছের ডালের নীচ ছাড়া যেমিকে চাও—শুধু শাশ। কনো ছেড়ে চললাম।

বিকালে এসে পৌছলাম স্ট্রাজ্‌নিতসে। ছোট শহর, হানও বলা যায়। কাতারে কাতারে লোক এসে ভমেছে। গাড়ির আর মাথবের ভিড়ে পথ-চলাও লায়। চারিদিকে উৎসব হুক হয়ে গেছে। নানা রঙের কাগজের পোস্তার, নিগান—গেটের পর গেট। হং-বেহরঙের বেশভূষার চলেছে ছেলেমেয়ের দল উৎসবে।

এক লোকের এখানে রাত-কাটানোর মাগগা কোথায়? ভাপলেভাল তার ছোট তাঁবু নিয়ে এসেছে। অন্যকে নিয়েই মুখকিল। ইয়ানার পাশেই প্রথম দেখা করার সরকার—তার পর বা-হর ব্যবস্থা সে করবে। ওদের বাসার চললাম। ইয়ানার শাক্তী আগেই জানতেন আমি আগবো। ব্যবস্থা সবই হয়ে আছে। বাড়ি বসে সময় নষ্ট করা চলে না। বিশেষ করে ভাপলেভালের তানিসে তখনই বেজতে হলো।

মত পার্কে তিনটি স্টেজ। গাছের নীচে কুঁড়েঘরের সামনে খোলা স্টেজ, আর চারদিকে বহুবার প্যালেটি। হুমর আলপনার পেংচালগুলি ছাওয়া। পাশে কলার্ট, আর স্টেজের উপর হুক হুকেছে বলে বলে ছেলেমেয়েদের নাচগান। বোহেমিয়া, মোরাজিয়া, সোভাকিয়া থেকে এসেছে নাচের ও গানের দল। এরা পেপাশার নাচিয়ে বা গাইতে নয়। গ্রামের চাষী, কারখানার মজুর, খেটে-খাওয়া মাগের ছুটির দিনের অবসর-বিনোদনের বা উৎসবে



স্ট্রাজ্‌নিতসে উৎসবের পোস্তার

আম্বাচ-আম্বাচের যে রীতি—তারই চলেছে প্রাচীনী। বৎসরের নাচের গোপন—হাতের তৈরী। তার কাকর্ষ্য ও বর্ণবৈচিত্র্য চমক দেওয়ার মতো। বছরে একবার উৎসব, ছেলেমেয়ের প্রত্যঙ্গি হয়ে থাকে এই মিনটার রঙ্গ। অর্কেস্ট্রা না থেমে থেকে চলেছে—দলের পর দল ছেলেমেয়ে বিভিন্ন সাথে বিভিন্ন উল্লীতে স্টেজে আসছে গাইছে নাচছে। গ্যাসারিতে দেখা হয়ে গেল ভারতীয় দূতাবাসের সেক্রেটারি ডেন্‌কটপরণের সাথে। অতি আত্মশ্রম লোক। উৎসব দেখতে এসেছেন অনেকদূর থেকে। তাড়া-তাড়ি আসতে রাজ্যের গার্জিত অতি স্যামান্সর স্বস্ত্র এক ছুটীনার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছেন। টেনে নিয়ে চলেন ক্যাসেলে সখ্যনায়। বাঁধার ইচ্ছে ছিল না— চিপ্‌লোমাইটনের লক ভালো লাগে না। যাক্, নাচের মধ্যে ক্রিস্তোভান হলো, তা ছাড়া একযোগে অর্কেস্ট্রা গুনলাম বসে বসে। তেকোসোডাকিয়ার সরকারী তরক থেকে ধারা ছিলেন তাঁদের সত্য কথাবার্তা হলো। মিথ্যাসা করেন— “ভারতে এমন উৎসব হয় কিনা?” টিক এখনটি হয় কিনা জানিনা। তবে মিনারিত ‘বিশাবলিক ডে’তে স্থাপনাল স্টেডিয়ামে লোকনৃত্যের প্রদর্শনী হয়, তাই উল্লেখ করলাম।

সব দেশেই আছে লোকনৃত্য ও মীতি। তবে অতীতের পর্জি তার অনেক কিছুইই লম্বাশি হয়ে থাকে। এখানে স্টোই হচ্ছে তার উদ্ভাবের; তার পুনরুজ্জীবন বা নবজীবনের কোনো প্রচেষ্টাই বসে ঘরনি। তেকোসোডাকিয়ার গান ভালোবাসে সবাই। তর থেকে বহু পর্বত জীবনের প্রতিটা দিন গানের স্বরে বঁধা।

নামকরা গান-রচয়িতা Erben, Susil, Janacek, Balas-এর শত শত গানে সেই কথাই প্রতীক্ষমান হয়। সহজ হয়ে ছেলে-যুগ-শাড়ানো গান, ছেলেদের খেলার বা নাচের গান থেকে আয়ত্ত করে জটিল স্বরের গানের রচয়িতা এঁরা। বিয়ের গান, উৎসবের গান, ধর্মপন্থী, কাঁড়িয়ার গান, বেস-চারকের গান, ফল-কাটার গান, ফুকের ফল গান, বিচ্ছেদের গান প্রতিটা যুগের ইতিহাসের সাথে সাথে মানুষের শিল্পীমনের বিভিন্ন ভাবের অভিযুক্তি থেকে গেছে। যুগের সাথে সাথে পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু জন্ম ও শিল্পীমনের প্রকাশ সবানই চলেছে। ছেলেমেয়েরা এখনও গ্রীষ্মের সন্ধ্যার ছড়া হয়ে লোকগাথা গায়। তাতরা পাহাড়ের গারে এখনও মেয়েরা ফল কাটতে কাটতে গান গেয়ে সখীয়ে থাকে। আকাশ-বাতাস তাদের নাচের শব্দ এখনও মুগ্ধিত হয়ে ওঠে। Czechoslovak State

Ensemble of Folk Songs and Dances—এঁদের কাজ অতীতের সেই নাচগানকে আবার সজীবিত করা। এমনি আর-একটি দল SLON (Slovak Popular Artistic Ensemble)—এঁদের নাচিয়ে, গাইয়ে, বাজিয়ে। ব্যাটিনাতার Rusovec ক্যাসেলে একতোটে বাস করেন। সেখানে তাঁরা বিভিন্ন নাচ ও গানের মহড়া দিয়ে লোক-সমীত ও নাচকে দিনের পর দিন আয়োজন করে তুলছেন। ভারতেও SLON-এর কয়েকটি প্রদর্শনী হয়েছে। ধারা দেখেছেন তাঁরা বোধহয় মেয়েদের সেই মনোহর বাগরার ঘূর্ণন, ছেলেদের উচ্চায় কুঠার-নাচের দৃশ্য সহজে ভুলবেন না। আর-একটি এমনি লোকের নাম LUCINA।

পার্টিতে এক মহিলা মিথ্যাসা করেন, “তোমাদের দেশে কুনছি নাচের হল নেই?” কি শব্দ বসে? বললাম, “নাচের হল আছে, তবে সেখানে আমাদের নাচের স্থিতি নেই। নাচ আমাদের বর্তমান জীবনের বড় একটি অঙ্গ নয়। উৎসবে আমরা নাচতে বাই না, তবে ভাড়া-করা নাচিয়ের নাচ আমরা দেখতে পাই, সে স্থিতি আছে।” মহিলা তখন প্রশ্ন করলেন, “তবে ছেলেমেয়েদের পরস্পর দেখা বা পরিচয় হয় কোথায়?” অনেক কথা বলতে হয়। সব বলা যায় না।

সন্ধ্যার সাথে সাথে সব-কয়টি স্টেডিয়াম নাচে গানে মুগ্ধ হয়ে উঠেছে। সুস্থিতিসে (মহ) একদিকে যেমন তৃষ্ণা ও ক্রান্তি মিটিয়ে দিচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে গোথের শামনে আনছে আরো আনন্দ ও স্মৃতির ছবি আর গানের অধিরতা। আপসেতাণ, ইয়ানা ও তার বামীর সাথে এক স্টেডিয়াম থেকে স্বস্ত্র স্টেডিয়ামে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সন্ধ্যা হাত এমনি চলবে আর বইবে মদের কোয়ারা। এত স্মৃতি এত আনন্দ বেহ সন্তু করতে পারে না। রাত্ত বায়োটার পর ফল স্টেডিয়ামে নাচগান বন্ধ হলো, তখনই আরম্ভ হলো গতিকারের উদ্ভাস। মত পার্কে প্রতিটা গাছের নীচে বসেছে এক-একটি অর্কেস্ট্রা—বেহালা, সিমান্। একটানা বাজিয়ে চলেছে, আর তাদের শামনে বলে বলে সবাই নেচে গেয়ে অতুলন জীবনীশক্তির বুঝা করার চেষ্টা করছে। শুধু শব্দ কেউ নেই—একটি ছোঁচে ক্রান্ত হয়ে পড়লে, আর একটি জোড় এসে তাদের হান নিচ্ছে। একবারে এড়িয়ে যেতে পারলাম না। তা ছাড়া এই পরিবেশে পরিমিত ও সাবানী মনও সেদিনকার সত্য আনন্দের ছাড়পত্র দিয়ে দিলো।

সাথে চলেছে গান। বেশিরভাগই নাচের ছোট ছোট গান।

বেহালায় সাথে একটি ছেলে গাইছে : “ইহাজোরিনা
পাহাড়ের মাথা থেকে আমি গাই—আর আমার প্রিয়া
পাহাড়ের তলায় বসে শোনে।” তার পরই কল্পনায় : “সে
শুধু শোনে, কিন্তু আমার খর সে ভিনতে পারে না।”

কোথাও যোয়ের গল নাচতে-নাচতে গাইছে : “মা, বা,
আমায় নতুন শোণাক কিনে দাও, আমি বিয়ে করতে চাই।”
অবশেষে গাইছে বা : “তুই এখন বিয়ে করবি কি ? তুই যে
একবারে ছেলেদাছ।”

এক গাছের নিচে হাসির ধূম দেখে গাড়লাম। একদল
মেয়ে গাইছে : “বন্ধু, তুই কিয়ত কর, আমরা গাইবো। ভাবতে
হবে না তোরা, আমরা তোরা শোণাক কিনে দেবো।”

তুই বোনের বার্ষ-প্রণয়ের কাহিনী। গাইছে তারা :
“আমাদের আরও একটি বোন আছে—তাকে কোনো ছেলের
সাথে নিবতে দেবো না।”

অস্থবিধা—চক্ ভাষা ভালো বৃদ্ধি না।

ভাষা না বুজলেও, এই পরিস্থিতি উদাম আনন্দের অং-
গ্রহণের কোনো অস্থবিধা হয় না।

কল্পনায় একটি মেয়ে গাইছে : “আজ নাচের দিন।
আমার কিন্তু কোনো ছেলে-বন্ধু নেই—আমাকে শুধু গাড়ির-
পাড়িয়ে খেতে হবে অতঃ পরে।” আবার প্রতিহিংসায়
জলে উঠছে কেউ : “আমার ছেলে-বন্ধু গ্রিক একটি গুগুগাছের
নতো, কিন্তু সে অস্থিখালী।”

হয়তো এক চাবী রমণীর পান সুনলায় : “আমার বোনের
অনেকদূর চলে গেছে, ঘোরে ছোট। খোড়া গাড়িয়েও তাকে
আর ধরে আনা যাবে না।”

অঙ্গের মেথায় উদাম নেচে ছেলের দল গাইছে : “বেহালা-
বাঁজিয়ে ! তুমি বাজাও বাজাও—তোমাকে আর এক বোতল
মদ দেবো।”

সারটি রাত এমনি কাটলো। শব্দন সেবি সকাল হয়ে
গেছে। অনিচ্ছাসঙ্কিতে চোপ বুঝে আসে। ইহানাদের
বাগায় চললাম। ওর শাওড়ী খাবার তৈরি করে বসে
আছেন। আবার ফিরে এলাম উৎসবে। শ্রীমোহনলাল
পশোপাখ্যার সাথে দেখা। ঐর হীর বাড়ি মোরাভিয়ার।
এদিনকার সকালের বা নাচগান সবই বৃষ্টিয় সিলেন তিনি।
এবিন বেশিরভাগ অস্থগান—আদের দিনের প্রতিবেদিতায়
যে-সংলগ্ন চের প্রমাণিত হয়েছে তাদের নিয়ে।

ছেকোনেভাভিক্সার মধ্যে মোভাকিহাই লোকসঙ্গীত
সবচেয়ে সমৃদ্ধ। এক মোভাক কবি Jan Kollar-এর
প্রকাশিত বই থেকে হু'হাওয়ার গানের সন্ধান পাওয়া যায়—
মাথবের সৈন্যবিন সীখনের স্বপ্ন-পের গান।

ছেলেমেয়েদের দেখলাম সবাই অটুট স্বাস্থ্য। ছেলেরা
গাইছে :

“ও মেয়েরা, তোমরা কি দিবে তোমাদের দুখ পোও
যে, তোমাদের গলে এত লো ?”

“কেন ? বলে।”

“তাও ভালো। যদি তোমাদের মজ্ঞ বা কিনতে হতো,
তাহলে আমার সব পছন্দই ফুরিয়ে যেতো।”

সংতার সব সেনেই আছে। এক ছেলে তার বাঁচবীর
সাথে দেখা করতে থাকে। দেখে, এক কানো দুদী রাঙা
পার হয়ে গেল। এ হৃদয় বড় অমূল্যের লক্ষণ। শেষে
উঠলো সে : “বা বা, তুই সব বা, আমায় রাখায়ে এসেছি
কেন ?”

“...তুমি এখন চলে গেলে, আমি সবজা বন্ধ করে দিলাম,
আকাশ থেকে দিন পড়ছিলো—তোমার আমি কুলতে পারিনি।”
বিরহীর এই কল্পনায়নের হৃদে মনকে মাজ দিয়ে যায়।

শ্রীমন্তিসে হৃদয় লক্ষিণ মোরাভিয়ার। কার্পাতিয়ান
ও মোরাভা নদীর মাঝে এই স্থানটি ও Chersky, Brod,
Brodov থেকেমোভাকিয়ার সবচেয়ে Ethnographical
region। মোভাকিয়ার থেকে এখানে পরে পর লোক এসে
বসবাস করেছে—তারের সাথে সাথে এমনিতে তারের আচা-
ব্যবহার, বেশভূষা, নাচগান। কালের সাথে সাথে
মোরাভিয়ার লোকের সাথে তারের হৃদয়ে সংমিশ্রণ। তাই
এখানকে বলা হয় ‘Moravian Slovakia’।

শ্রীমন্তিসে ক্যাসেলে দেখলাম ‘Folk Art’-এর প্রদর্শনী।
যারের দেওয়ানে কত বর্ণের কত রকমের আলপনার নকশা।
নাচের বেশভূষার কারুকার্য ও বর্ণবৈচিত্র্যে চমকিত হতে হয়।
তা ছাড়া পোরসিগিনের উপর হাতের আঁকা কত হৃদয় হৃদয়
নকশা। দুঃখের কথা, হাজার হাজার লোকসঙ্গীতের কোনো
ইংরেজী অস্থবাস পেলান না।

রবিবার সকাল উৎসবের শেষ। এমনি দুপুরে এখানে
হাজার নাচিয়ে, গাইয়ে, বাঁজিয়েদের মোভাকিয়ার বেগলো।
এ শুধু রঙের খেলা, শব্দের নুহুনা আর আঁকচোলা নাচবের
প্রাণের উদ্দেশ্য। দুদিনে হুটী ডালো কাগলো—ততটা
উৎসাহ করতে পারেনা সেহ। রওনা হলোয় গ্রাণে।
ইহানা ও কাগলোভালা বিলায় জানিয়ে গেল ঠেকেরে।

Nashledanov (বিদায়) ! আশা রাশি আবার যাবে।
এ আনন্দের এক অংগ্রহণ করতে পারলেও সীখন বৈচিত্র্য
আসবে। ট্রেনে ঘুমে চোপ বুঝে আসে—আর চোখের
উপর ভেসে আসে সেই শ্রীমন্তিসের ছেলেমেয়েদের
নাচগান-আনন্দের ছবি একের পর এক।

রয়াল সোসাইটি

চাকচাক্য ভট্টাচার্য

রয়াল সোসাইটি হল গ্রেট ব্রিটেনের প্রাচীনতম বিজ্ঞান-সমিতি। ১৬৬০ সালে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, আর তার অল্প পরেই রাষ্ট্রকীয় সনদ লাভ করে। তখন থেকে আজ অবধি এই সোসাইটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বলিত এক পত্রিকা নিয়মিত-ভাবে প্রকাশ করে চলেছে, আর বিজ্ঞান-জগতে এই পত্রিকার স্থান খুব উচুতে। সোসাইটির আর একটা বড়ো কাজ হল নিয়মিত অধিবেশনে সভ্যদের বিজ্ঞানের নব নব পরীক্ষা দেখানো। এই প্রতিষ্ঠানের কৌলীভ্য সর্বজনস্বীকৃত।

পুরানো কাগজপত্রে পাওয়া যায়, ১৬৭১ সালের ৭ই ডিসেম্বর কেনব্রিজের গণিতের অধ্যাপক আইজ্যাক নিউটনের নাম ওই সোসাইটির সভ্যপদের জন্য প্রস্তাবিত হয়। নিউটন সভ্য নির্বাচিত হলেন। ১৭০৩ সালে তিনি ওই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হলেন। ১৭২৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়; মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বর্তমান নিয়ম অনুসারে সোসাইটির অন্তত ছ'জন সভ্যকে নতুন পদপ্রার্থীর নাম পাঠাতে হবে; তাঁদের মধ্যে অন্তত তিনজনকে বলতে হবে যে ওই পদপ্রার্থীকে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে জানেন। কাউন্সিল প্রতিবছর সেই তালিকা থেকে পঁচিশ জনের নাম ব্যালটে স্থির করে সোসাইটিতে পাঠাবে; চূড়ান্ত নির্বাচন সেখানেই হবে। ভারত যখন ব্রিটেনের অধীনে ছিল তখন ভারত-বাসীকে সভ্য করার কোনো বাধা ছিল না, যদিও ভারতীয়দের ক্ষেত্রে মাপকাঠিটা খুব দীর্ঘ ছিল। মোল বাহল ভারত যখন স্বাধীন হল। ১২৪৭-এর পর দীর্ঘ দশবছর ভারতবাসীর পক্ষে প্রবেশবার রুদ্ধ রইল; শেষে ১২৪৬ সালে কর্তারা বললেন যে, যেহেতু ভারত কমনওয়েলথ-ভুক্ত, অতএব ভারতবাসীর পক্ষে বাধা না রাখলেও চলবে।

সাধারণ সমস্ত ছাড়া বিনোদী সমস্ত ব'লে আর এক শ্রেণীর সমস্ত আছেন, তবে এ পর্যায়ে একেবারে শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী ছাড়া কাউকে নানোনয়ন দেওয়া হয় না। বিনোদী সমস্তের সংখ্যা খুবই কম।

প্রথম ভারতীয় সমস্ত

রয়াল সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সমস্ত হলেন শ্রীনিবাস রামাচন্দ্রন। কিন্তু এখানে একটা কথা আছে। কয়েক বছর আগে রয়াল সোসাইটির কর্তৃপক্ষরা তাঁদের দপ্তরের পুরানো কাগজপত্র হাতড়াতে হাতড়াতে দেখেন যে, একশ বছরেরও বেশী আগে, ১৮৪১ সালে, একজন ভারতীয় পার্সি এডিনিয়ার, এ. কারসেংজি, ওই সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন। তাঁর গবেষণা কি ছিল সঠিক জানা যায় না। সেদিনের কথা এখন আর হিসেবের মধ্যে না ধরলেও চলে।

রামাচন্দ্রনের কথায় আসি। ১৮৮৭ সালে ডিসেম্বর মাসে এক দরিদ্র পরিবারে রামাচন্দ্রন জন্মগ্রহণ করেন। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে তিনি এক-এ ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু গণিত ছাড়া আর কোনও বিষয়ে তাঁর অনুরাগ ছিল না। ফলে এক-এ পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য হলেন।

পাঁচ বছর ধরে একটা চাকুরির ক্ষেত্রে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন, কিন্তু কোথাও কিছু জুটল না। শেষে ১৯১০ সালে মাদ্রাজ শহরে 'হার্ভার ট্রাস্ট' আপিসে নিচু গ্রেডে এক কেরানিগিরি চাকুরি পেলেন। বরাবরই তিনি গণিত সম্বন্ধে আলোচনা করে আসছিলেন, এমন মাদ্রাজ শহরে থাকতে পারার গবেষণার কাজ পুরো উদ্ভমে চলতে থাকল।

১৯১২ সালে হঠাৎ একদিন একটা অসীমাসিত গাণিতিক সমস্যা সম্বন্ধে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ জি. এচ. হার্ডির এক মন্তব্য তাঁর নজরে পড়ল। তিনি তাঁর

নিজের পদ্ধতিতে এই চূরহ সমস্যার সমাধান করে হার্ডিকে এক পত্র লিখলেন। রানামুজনের প্রতিভায় হার্ডি মুগ্ধ হলেন। এখন হার্ডি রানামুজনের বিভিন্ন গবেষণা সম্বন্ধে অগ্রসর হতে থাকলেন। Definite integrals, elliptic functions, আর বিশেষভাবে theory of partitions সম্বন্ধে রানামুজনের গবেষণা দেখে হার্ডি বুঝলেন যে, ওই ব্যক্তি তদানীন্তন কালের একজন বড়ো গণিতজ্ঞ।

হার্ডির চেষ্টায় বিশেষ ব্যক্তি পেয়ে রানামুজন্ ইংলণ্ডে গেলেন। তাঁর মূল্যবান গবেষণা সেখানকার বিশিষ্ট পত্রিকাগুলিতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকল। ১৯১৮ সালে, মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে তিনি রয়াল সোমাইটির সভ্যরূপে নির্বাচিত হলেন।

কিন্তু তখন থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। ভগ্নশাশ্বা নিয়ে ১৯১৯ সালে তিনি স্বদেশে ফিরে এলেন।

১৯২০ সালে, ২৬ এপ্রিল—তেরিশ বছর বয়সে ওই উজ্জ্বল জ্যোতিষ অন্তর্মিত হল।

পরবর্তী সমস্তগণ

দ্বিতীয় ভারতীয় সপ্তাহ হলেন জগদীশচন্দ্র বসু। তার পর নির্বাচিত হলেন,—

মি. ডি. রামন
মেগনাদ সাহা
বীরবল সাহানি
পে. এম. কৃষ্ণান
এম. এস. ভাটনগর
এইচ. জে. ডাংগ
এম. চন্দ্রশেখরম্
অশান্তকর মহলানবিশ
ডি. এন. ওয়াডিহা

এ বছর ওই তালিকায় দুটি নাম যোগ হল; তাঁরা হলেন শিশিরকুমার মিত্র ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ভারতবাসীদের মধ্যে তের জন ওই সম্মানের পদ লাভ করলেন। এই তের জনের মধ্যে পাঁচ জন

আজ পরলোক্যে। তাঁরা হলেন,—শ্রীনিবাস রানা-মুজন্, জগদীশচন্দ্র বসু, বীরবল সাহানি, এম. এস. ভাটনগর ও মেঘনাদ সাহা।

যে মৌলিক গবেষণার ফল এবারে এই দুই বাঙালি-বিজ্ঞানী ওই সম্মানের আসন লাভ করলেন তার অল্প কিছু আভাস দিই।—

শিশিরকুমার মিত্রের গবেষণা

১৮৯৪ সালের নভেম্বর মাস। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রকৃষ্টরাজ্য রায়ের ঘরে জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর নবনির্মিত ছোটো যন্ত্রটি বসালেন। ওই যন্ত্র থেকে বৈজ্ঞানিক তরঙ্গ ছুটল। এর পর একটা ঘর, তার পর আর-একটা ঘর; এই দুই ঘরের দরজা বন্ধ। বৈজ্ঞানিক তরঙ্গ ছুটে বন্ধ দুই ঘর ভেদ করে তৃতীয় ঘরে একটি পিষ্টল ছুড়ল। পৃথিবীতে দিনাতারে সংকেত পাঠাবার সূচনা হল। এর পর জগদীশচন্দ্রের গবেষণা অগ্রদিকে চলে গেল।

কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বহু মনোবী বৈজ্ঞানিক তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা-কার্য চালাতে থাকলেন। মার্কনি যে-সব পরীক্ষা করলেন তা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ আনল। ১৮৯৮ সালে তিনি ১৮ মাইল দূরে সংকেত পাঠালেন। মার্কনি দিন দিন তাঁর যন্ত্রের উন্নতি করতে থাকলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, আটলান্টিকের এপার থেকে ওপার অবধি তিনি সংকেত পাঠাতে পারবেন। বিশেষজ্ঞরা বললেন,—এ হতে পারে না। তাঁরা বললেন,—ইংলণ্ড থেকে যে তরঙ্গ যাত্রা করবে তা তো গোলাকার পৃথিবীর সেখানকার স্পর্শকরূপে মোজা সরলরেখায় চলবে, তা বেকে আমেরিকায় পৌঁছবে কেন? কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল, তা আমেরিকায় পৌঁছল। কিন্তু কেন পৌঁছল তখন তা বুঝা গেল না। কয়েক বছর পরে এর কারণ জানা গেল।

১৯০২ সালে কেনেলি ও হেভিসাইড বললেন যে, বায়ুশূন্যে উপরকার একটি স্তর আছে যা



শিশিরকুমার মিত্র

একটি স্তরের অস্তিত্ব পরীক্ষার প্রমাণ করলেন। এই হেলিসাইড স্তর কত উচ্চে অবস্থিত? পরীক্ষায় বেরল যে, স্তর আছে একটা নয়, দুটো: একটা প্রায় ১০০ কিলোমিটার, দ্বিতীয়টা আনুমানিক ২৫০ কিলোমিটার উচ্চে। ওদের E ও F স্তর বলা হয়। অ্যাপেলটন সন্দেহ করলেন যে, E স্তরের নিচে, পৃথিবী থেকে নোটামুটি ৬০ কিলোমিটার উচ্চে আর একটা স্তর আছে। অ্যাপেলটন কিন্তু ওই স্তরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ পেলেন না।

শিশিরকুমার মিত্র এ-সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা করছিলেন। ১৯৩৫ সালে তিনি জানালেন যে, ৫৭ কিলোমিটার উচ্চে অবস্থিত একটা স্তর থেকে তি নি প্র তি ফ ল ন পেয়েছেন। অ্যাপেলটন ওই পরীক্ষা সমর্থন করলেন, আর ওই স্তরকে D-স্তর নাম দেবার প্রস্তাব করলেন।

শিশিরকুমার মিত্র রচিত *Upper Atmosphere* পুস্তক বিজ্ঞানী মহলে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। সম্প্রতি রুশ-তাবার ওই পুস্তক অনূদিত হয়েছে।

সত্যোন্মোখ বহুর গবেষণা

তাপ, দৃশ্য-আলো, অতি-বেগনি আলো, এক্স-রশ্মি, গামা-রশ্মি সবই তরঙ্গে চলেছে, তরঙ্গের একটা অবিচ্ছিন্নতা একটা ধারা-

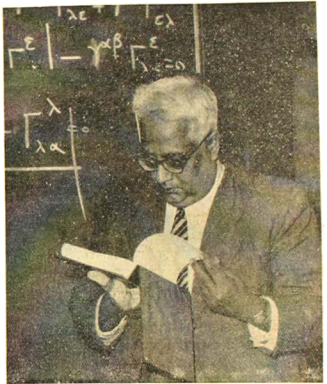
পরিবাহক কলকের মতো কাজ করে; সেই কারণে ইথর-তরঙ্গ সেখানে পৌঁছে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কথা উঠল, ওই স্তর পরিবাহক হবে কেন? হেলিসাইড বললেন যে, সূর্যকিরণ পড়ায় বায়ুর উপাদান থেকে ইলেক্ট্রনের বিচ্যুতি ঘটে, স্তরটি আয়নিত হয়, তার ফলে স্তরটি পরিবাহক হয়ে দাঁড়ায়। এই স্তরকে হেলিসাইড-স্তর বলা হতে লাগল। ব্যাপারটা কিন্তু তখনও অস্বাভাবিক বিষয় হয়ে রইল। ১৯২৫ সালে অ্যাপেলটন ওইরকম

বাহিকতা আছে, বিজ্ঞানীরা আগে এইরকমই মনে করতেন। পূর্ব গরন কালো জিনিস থেকে যে-সব বিকিরণ বেরয় সে-সম্বন্ধে অস্বাভাবিক করতে-করতে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রায় দেখলেন যে, অনেকগুলি ঘটনা তরঙ্গবাদ দিয়ে বীমাংসিত হয় না। প্রায় বললেন, তেজ বিচ্ছিন্নভাবে ঝণ্ডে ঝণ্ডে নির্গত হয়; শক্তি এক এক প্যাকেটে, এক এক বাগিলে বেরিয়ে আসে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো ও নতুন কথা এই যে, শক্তির

একক সব জায়গায় ঠিক নেই, কম্পন-সংখ্যা বেথানে কন, বাঙালিটা সেখানে ছোটো, কম্পন-সংখ্যা বেথানে বেশি বাঙালিটা সেখানে বড়ো। শক্তির ক্ষেত্রে লাল আলোর ক্ষেত্রে যদি ১ ধরা যায়, তবে বেগনি-আলোর পক্ষে ৩টা হবে ২, অতি-বেগনির পক্ষে ৮, এক্স-রশ্মির পক্ষে ৮,০০০, গামা-রশ্মির পক্ষে আর ও বেশি। একটা প্রোটন বা একটা ইলেকট্রন—হ্যাঁ ইলেকট্রন নেই ইথারকণ বা সোনাতোই ইথারকণ, সব জায়গাতেই তারা সমান। কিন্তু এখন শক্তি সম্বন্ধে এক নতুন কল্পনা করা হল, কল্পনা করা হল কম্পন-সংখ্যার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শক্তির এক একটা ক্ষেত্রের পরিমাণ বদলে-বদলে যাচ্ছে। এই সিদ্ধান্তের নাম দেওয়া হল—কোয়ান্টমবাদ। আইনস্টাইন এই কোয়ান্টমবাদ গ্রহণ করলেন, আর বললেন যে, শুধু রশ্মির নির্গমন নয়, রশ্মি যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় তখনও সে বিচ্ছিন্নভাবে, কাটা-কাটা রকমে চলে। ম্যাক্সের গণনা কতকটা ভাঙে-চূরক-সম্বন্ধীয় প্রাচীন সিদ্ধান্তের উপর আর কতকটা এই কোয়ান্টমবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হল।

সত্যোক্তনাথ বসু এক নতুন হিসাব-পদ্ধতি স্থির করলেন : তাতে সম্পূর্ণরূপে কোয়ান্টমবাদ গৃহীত হল। এদিয়ে ম্যাক্সের গণনার কল রক্ষিত হল, অনেক নতুন কথাও এসে গেল। পরে আইনস্টাইন

সত্যোক্তনাথ বসুর এই গণনা-পদ্ধতি দিয়ে খুব বেশি-রকম শৈত্য গ্যাসের ব্যবহার সম্পর্কীয় অনেক ব্যাপারের মীমাংসা করলেন। এট পদ্ধতি বিজ্ঞানীর কাছে 'বসু-আইনস্টাইন পদ্ধতি' বলে পরিগণিত হয়।



সত্যোক্তনাথ বসু

পরে কার্মি ও ভিলাক অল্প রকম পদ্ধতি স্থির করেন ; কতক কতক ব্যাপারে স্টোও কাজে আসে। যে-সকল মৌলিক কণিকা 'বসু-আইনস্টাইন নিয়ম' মেনে চলে, তাদের এখন নাম দেওয়া হয়েছে 'বোসোন'।

নতুন ইয়োরোপ: নতুন মানুষ

মনোজ বসু

[প্রথম প্রকাশিত ১৭]

লাইপজিগ ইয়োরোপের মেলাক্ষেত্র। শুধু ইয়োরোপ কেন, গোটা দুনিয়ার মানুষ মেলায় গিয়ে ছোটো বেচাকেনা করতে। আমাদের ভারতও মাঝে ইদানীং। দুটো রাস্তাপথ কাটাকাটি করেছে, ভাষাগোষ্ঠী হল সেই বোহানায়। অনেক শতাব্দীর পুরানো প্রসিদ্ধ পথ দুটো। এক পথ প্যারি থেকে ফ্রান্সে গিয়ে পোলাণ্ড হয়ে ইউক্রেন-মুখো চলে গেল। আর একটা গেল উত্তর-জার্মানি থেকে ইতালি। শত শত বৎসর ধরে ইয়োরোপের সকল তন্ত্রাটের ব্যাপারি এই দু-পথে আনাগোনা। তীর্থযাত্রীরাও দলে দলে যায়। রাস্তার মোহানায় এই লাইপজিগে দিগ্বি এক ঘাঁটি হয়ে দাড়াল। ব্যাপারিরা মালপত্র নামিয়ে বোড়াগুলোকে ঘাসভল খাওয়ায়, নিছেরা খানাপিনা করে। তীর্থযাত্রীরাও কোন এক চটি বেছে নিয়ে গড়িয়ে পড়ে তার ভিতর। একদিন দু-দিন কাটে এখানে। এ পথের ব্যাপারি আর ওপথের ব্যাপারিতে মোলাকাত। এর কিছু মাল ও কিনে নেয়, ওর কতক মাল এ কেনে। তীর্থযাত্রীরাও এটা-সেটা কেনাকাটা করে।

ইতিহাস যে সময়ে লেখা হল, তার আগে—অনেক আগে থেকে এই ব্যাপার। লাইপজিগের মেলায় অন্য এনি ভাবে। ১০১৫ অব্দে লেখাজোখার মধ্যে প্রথম লিবজি (Libzi) ক্যাসলের নাম পাওয়া যাচ্ছে। ক্যাসলের আওতায় মেলা বসে। জিনিষপত্র যত আনদানি হয়, তার খবরদারি

দায়ব নিয়েছেন ক্যাসলের মালিক। রকমারি মালপত্র জমে এসে মেলায়, আনন্দ-কৃতির হরেক ব্যবস্থা। জমিদার পিছনে থেকে এদেশেও বিস্তর মেলা বসেছে। তেমনি একটা ধরে নিল।

জমিদারের সঙ্গে হাত মেলালেন গির্জা। গির্জার ভারি ভারি মজ্জব হয়, দুঃ-সুখান্তরের ভক্তমল আসে। এর মধ্যে সেরা দুটো বেছে নেওয়া গেল—বসন্তে ইস্টার আর হেমন্তে সেন্ট মাইকেলের মজ্জব। বছরের মধ্যে দু'বার এই লাইপজিগের মেলা। আমাদের দেশে চড়কপুজো চুকবুকে যায়, গাজনের বেলা তবু কতদিন ধরে চলতে থাকে। সেই বৃত্তান্ত।

লাইপজিগের চৌরাস্তায় বিদেশি ব্যাপারি আর জার্মান ব্যাপারিরা মিলেমিশে কিছু ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলল। বারো শতকের ব্যাপার। শহরের এই গোড়াপত্তন। মেলা থেকেই শহর। ঐ তন্ত্রাটে ছোট-বড় বিস্তর জমিদার—অনেক তাদের কৃষিদাস। কৃষিদাস-প্রধার বিলোপ হচ্ছে তখন। তারা এসে লাইপজিগে ছোটো। জনসংখ্যা হুহু করে বেড়ে যায়।

মেলা যাতে দিন-কে-দিন বেঁচে ওঠে, রকমারি আইন সেজস্ত। আইন হল, শহরের পাঁচ মাইলের মধ্যে নতুন মেলা কেউ বসাতে পারবে না। আইন হল, মেলায় জন্ত যে সমস্ত মাল আসবে তার নির্ধারিত আনদানি ও ফেরত পাঠানোর জন্ত বোলদানা দায়ী রইলেন স্থানীয় জমিদার। এমন কি, লড়াই চলছে দুটো দেশের মধ্যে—সেই

শত্রুদেশ থেকেও মেলার জিনিষের স্বচ্ছন্দ চলাচল চলবে। এ হল কত শতাব্দীর আগেকার কথা—এখনকার দিনেও এমন ব্যবস্থা আমরা ভাবতে পারিনে। লাইপজিগ দেখতে দেখতে জনজমাট হয়ে ওঠে। পূর্ব-ইয়োরোপের সঙ্গে ব্যাপার-বাণিজ্যে এই শহরের জুড়ি ছিল না। দেশবিশেষের মানুষ এসে মিলছে। মালপত্রের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের নানা নিরূপন এসে পড়ছে চারিদিক থেকে। মানুষদের মন-জ্ঞানজানি হচ্ছে। তখন শুধুমাত্র বাণিজ্যের ঘাটি নয়, বিরাট সংস্কৃতি-কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। স্থানিভাসিটি হল (১৪০৯), যার নাম জুধনখ্যাত আজকের দিনে।

মেলা, ঐ যা বললাম, বছরের মধ্যে দু-বার। ইস্টার উৎসবের মেলা আর অক্টোবরে সেন্ট মাইকেলের মেলা। জাশুয়ারিতে নববর্ষের মেলাও বসত কিছুকাল। কিন্তু জুং হল না। ব্যাপারিরা বড় বড় গুদাম বানিয়ে নিয়েছে—মেলার অন্তে যা পড়ে থাকে, সেই সমস্ত মাল গুদামজাত করে রেখে যায়। বয়্যাবরি করতে হয় না। পরের মেলার সময় আবার এসে চাবি খোলে।

লড়াইয়ের দরুন হালকিল অনেকবার মেলা বন্ধ হয়ে গেছে। লড়াই মিটে গেলে আবার চালু হয়। দুনিয়াজোড়া লাইপজিগের মেলার নাম, দুনিয়ার লোক মেলায় আসে। টাকা-বসলের বিশেষ রকমের সস্তা দর ঠিক করে দেয় মেলার মানুষের জন্ত, বিশেষ ধরনের ভিসার ব্যবস্থা করে। মানুষ তো এ-জাত ও-জাত করে ছুরি শানাচ্ছে—লাইপজিগের মেলা-ক্ষেত্র যেন ঐ হিংস্র এলাকার বাইরে। সব দেশের মানুষ মিলেমিশে কেনা-বেচা ও স্তুতিকার্তি করে। দুনিয়ার মানুষ হঠাৎ যেন এক পরিবারের হয়ে যায় মেলার ক'টা দিন। আমাদের ভারতও এসে স্টল খোলে এখানে, ভিড়ের ভিতর ভারতের মানুষও ছুটি-পাঁচটি পেয়ে যানেন।

আমরা এসেছি—এখন মেলার সময় নয়। ঘুরে ঘুরে জায়গাটা দেখছি। জায়গা ভাবছেন

দু-দশ বিঘে—ঘর ভাবছেন দশ-বিশটা? ভারি ভারি ইমারত, গুপ্তিত্তে আসবে না। ফাঁকা জায়গা যা দেখছেন, দেখানেও অস্বাভাবিক ঘর উঠে যাবে মেলার সময়টা। বিশাল অট্টালিকায় বারোদেলে অফিস—সীবার্গ সেখানে নিয়ে গেল। কর্তারা খুব খাতির করলেন, একগালা কাগজপত্র ও ছবি দিয়ে দিলেন।

হিটলারের লড়াইয়ের নীতি সারা ইয়োরোপের সর্বনাশ ঘটাল। জর্মনিরও। মেলার বড় বড় ঐতিহাসিক বাড়ি নিশ্চিহ্ন সমাধিত্বপূর্ণ। বোম্বার বোম্বার যেন বাটনা বেটে রেখে গিয়েছিল এই লাইপজিগে। আনেকের হাতে গিয়েছিল শহরটা। জর্মনির বাঁটোদ্বারা হয়ে গেল, তখন সোবিয়তের তাগে পড়ে। অতএব পূর্ব-জর্মনির এলাকার মধ্যে এখন।

লাইপজিগে অভিনয় শেখানোর ইচ্ছা আছে—সে তো শুনেছেন কার্ল-মার্কস-ত্যাগে 'শকুন্তলা' অভিনয়ের কথা যখন হচ্ছিল। লেখা শেখানোর ইচ্ছাও আছে তেমনি, লেখকরা কলম চালানোর কায়দাকানুন শিখে বেরোন যেখান থেকে। মজা লাগে শুনেতে। আমরা লেখক—কোনখানে কিছু না শিখেই কলম ধরেছি। এদেরও গোট-শিলার থেকে এতাবং কেউ কখনো ট্রেনিং নেয়নি—এ বস্তু একেবারে হাল আমলের। চলুন গিয়ে দেখে আসি, শিখে পড়ে যারা এ পথে নামছে তাদের সঙ্গে ফারাকটা বুঝে দেখি।

আগেই খবর হয়ে গেছে, ভারতের পুঙ্খমাত্র লেখকরা সব যাচ্ছেন। হবু-লেখকরা দেখি সারবন্নি সর্ধনার জন্ত দাঁড়িয়ে—ছেলে আছে, বেয়ে আছে, —বয়সে সবাই তরুণ। পরিচয় দিয়ে দিচ্ছে। এখন আর তাদের কি পরিচয়, শুধুমাত্র একটি নাম—দিন আর তাদের কি পরিচয়, শুধুমাত্র একটি নাম—দিন কাটুক, সুনো হও কলম চালিয়ে চালিয়ে, আজকের এই হেলাকেলার নামটি হয়তো সেদিন জগৎ-জানিত হবে।

হলের মধ্যে নিয়ে বসাল। তারপরের ব্যাপার পার্শ্ব-মহাশয়রা জানেন, আমরাও জেনে বসে আছি। কথার খই কোটানো এক এক কাপ চা সামনে নিয়ে। ওরা বলবে, আমরা বলব। বিস্তর দেশে ঘোরাঘুরি করে এ-জিনিষ গা-সওয়া হয়ে গেছে। আগে থেকে কেউ কিছু ভেবে রাখিনে, ভাবনার দরকারও নেই। যেহেতু আমরা ভারতের লেখক, 'টেগোরে'র সম্পর্কে অতএব দু-পাঁচ কথা বলতেই হবে। অতঃপর উঠল ভারতীয় নাটকের কথা। ভারতীয় সাহিত্যের ধারা এবং লেখকের স্বাধীনতা সম্পর্কেও জানতে চায়। ভারত যেন একটুখানি জায়গা, ভাষা যেন তার একটি, ভারতের সাহিত্য যেন ছোট্ট একটু দিরতিরির খাল—সেড় মিনিটে যাঁজলা করক চল ভিটিয়ে দিলে তার চেহারা পাওয়া যাবে। তা আমরাও কিছু শিখাপও নই। বিশেষ-বিভূই চারগা, কতটুকুই বা জানে ওরা ভারতের সম্বন্ধে, এই কথানি ঐমুখে যা-কিছু উচ্চারিত হচ্ছে সে-ই তো নির্ভল কথিবাক্য। যিনেবত একজন আছেন আমাদের মধ্যে—অনর্গল ইংরেজি বলার হাণে তিনি সর্ববিজ্ঞায় বিশারদ। সেই ব্যক্তি ছাড়া ভারতীয় আমরা চারজন, সংখ্যায় অতি অল্প, বক্তৃতা শুনে কণ্টেফটে হাসি চেপে রাখি। মায়াব বেশি হলে হেসে ফেলত কেউ না কেউ। ওরা তৎপত হয়ে শুনছে। তাই দেখে মজা পাওয়া যায় আরও বেশি।

পাশের নেয়েটাকে ক্রিয়াস করি : লেখা শিখছ, তা বইটাই কি পড়ায় তোমাদের ? আমাদের-জাতীয় কিছু আছে যার সূত্র ধরে ধরে সাহিত্য-কর্ম করো ? নানারকম আলোচনায় প্রক্রিয়া খানিকটা পরিষ্কার বল। দু-বছরের কোর্স। লেখা লেখায় না, ভিতটা গড়ে দেয় এই মাত্র। লিখে যাচ্ছে কেউ নেবার বশে, লিখছেও ভাল—তাদের ভিতর থেকে চলে আসে এখানে। ইচ্ছে করলেই আসা যায় না, কর্তারা বাছ-গোছ করে নেন। বড় লাইব্রেরি আছে—যেদিকে ঝাঁক, সেই মতো পড়ন্তনো

করে। জাতীয় ইতিহাস, অর্থনীতি, পুরানো ক্রান্তিকের কিছু কিছু পড়তেই হয়। বাইরের জগতের খোঁজখবর রাখতে হয়। রচনার মধ্যে ভাবার ক্রটি না হয়, সেটাও শেবে। বিষয়বস্ত্ত ভাবনাচিন্তা ও প্রকাশনৈলী একেবারে তোমার নিজের। যে জাত-লেখক, নিজের পথ সে করেই নেবে ; ইনস্টিটিউট দেখে, লক্ষ্যহীন ভাবে এপথে-ওপথে মাথা টুকে না বেড়ায়।

এক ছোকরা লেখককে পাকড়াও করলাম : বলো হে, তোমার নিজের কথাই শোনা যাক্ কিছু।

ছোট্ট এক গ্রাম থেকে এসেছে—অনেক দূরের গ্রাম থেকে। বাপ-মা কুমিহীন চাবী। এই রোগা ভিগভিগে চেহারা দেখছেন, ক্রণ্টে লড়াই করেছি পুরো দুটি বছর। লড়াইয়ের শেষে সুভালাভালি ঘরে ফিরে এলো। ১৯৪৫-এর পর থেকে সমাজ-ব্যবস্থা ক্রত বদলে যাচ্ছে। স্থানিতাসিগিটে পড়ন্ত গেল। নতুন ব্যবস্থার কল্যাণেই হল—নয়তো তার অবস্থার ছেলে আগে ওপথে যেতে পারত না। তারপরে কেরানিগিরি করল এক মিনিষ্ট্রির অধীনে কিছুদিন। লেখার শুরু সেই সময়। কবিতা লেখে, ছোট্ট-চারটে কাগজে ছাপা হয়। লোকে তারিপ করে।

—লিখতেই যদি হয়, তৈরি হয়ে তবে নামা উচিত। দরখাস্ত করে দিলাম ইনস্টিটিউটে। আমাদের ইউনিয়ন সুপারিশ করল। এমনি সব যোগাযোগে জায়গা পেয়ে গেলাম। দু-বছর হয়ে গেল, এবারে শেষ। শিগগিরই বিদায় নিচ্ছি এখান থেকে।

বিস্তর পেয়েছি এবানে। বড় বড় লোকের সঙ্গে পরিচয় হল। জীবনে নতুন আলো পেলাম। একটা ভাবনা সবাই ভাবছে—প্রবীণেরা যেমন, আমরা নতুনেরাও তেমনি—লিখি কাদের জন্য ? কবিতা চাবী বুদ্ধিকীর্ষী কোন দল পার্টকগোষ্ঠি থেকে বাদ থাকবে না। আমরা গোড়ার লেখা, বলতে পারেন, পড়ে গাথা রাজনীতিক শ্লোগান। সে জিনিষ চলল না,

ছুঁলেই না কেউ আনার কবিতার বই। এখন পথ পেয়েছি বনে হয়। নিজের উপলক্ষিই লিখে যাউ আমি—লিখি রসে রাঙিয়ে, ছন্দের আনন্দধ্বনি তুলে...

ঘুরে ঘুরে লাইব্রেরি দেখি। ভারতের মানুষ এসেছি—অতএব ভারতের ঘর রকম বই তুর্কম। হয়েছে, ভাল জায়গায় আলাম। ভাষে রেখে দেখাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ তো আছেই—হালফিলের ঝরা রয়েছে, তার মধ্যে বাঙালি বলতে একমাত্র হুমায়ুন কবির।

লাইপজিগের হাল আমলের এক রাজপথের নাম লেনিন-স্ট্রাসে। সেই পথ ধরে ছুটেছি। নেপোলিয়ান হেরে যান এখানে—১৮১৩ অব্দের সেই বিপুলকার আরক-স্তুম্ব। শহরের বাইরে এসে পড়লাম—হু-থারে ক্ষেতখামার আর গাছপালা। ট্রাম চলেছে গাছের ছায়ায় ছায়ায়। ক্যান্টরির চোঙা, অগুস্তি বেওয়ার যেন আকাশ খুঁড়ে উঠেছে। মাঠের পর মাঠ—নিখাস পড়ে আবার, যেন সেই সেকালের গাঁয়ের পথ ধরে চলেছি। গ্রাম পড়ছে মাঝে মাঝে—টালি-ছাওয়া ঘরবাড়ি, চাল খুঁড়ে চিনি উঠেছে। ছোটখাট গির্জা এদিকে-সেদিকে। মাঠ-ভরা গরু—এই তাগড়া তাগড়া। ভেড়ার পাল—বাচ্চাগুলো পেছনে পড়ে ছিল, খুট-খুট করে ছুটে এসে দল ধরল। পালের পেছনে বড় কুকুর হু-তিনটে, মানুষের সঙ্গে এরাও ভেড়ার পাহারা দিয়ে ফেরে।

লিগনাইটের খনি অকলে যাছি। পুরোপুরি কয়লা হবার আগের অবস্থা—পিট-কয়লা বলে এই যেদিন অবধি মুখ বীকাতাম যার নামে। গাঁ-অকলে পুকুর কাটতে গিয়ে বাদামি রঙের কঠিন মৃত্তিকা এমন অনেক গুঁঠে। কেউ কখনো ভাল করে পরখ করে দেখেছি বে কী বস্তু?

সোনার লোতে ইয়োরোপের কত অঙ্গনসাহসী নাবিক দেশবিশেষে ছুটোছুটি করেছে। বালি খুঁড়েছে

নারিকেল-বেড়া সমুদ্রতটে, পাথর ভেঙেছে। সর্বধ হারিয়ে ঈর্গবেহ ভয়খাত্তা তিথ্যার হয়ে ফিরে এসেছে কত জনে দেশের বন্দরে। ফিরতেই পারেনি আরও কত জন। 'ভাগ্যবান যারা সত্যা সত্যা সোনা পেয়ে গেছে, সেই কতি নাম আঙলে গোণা যায়। এই বিশ-শতকের মানুষও বের হয়েছে সোনার লোতে।

কিন্তু জর্মনির মানুষ স্বপ্নেও কি জানত, সোনা রয়েছে তার নিজের দেশেই? কালো সোনা—সোনালি সোনার চেয়ে অনেক বেশি দামি। ঈং বাদানি রঙ লিগনাইটের, কালো সোনা বলে সোনা করে জর্মনির। এক ইটখোলার মালিক ইটের জন্ত মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এই বস্তু পেয়ে যায়। ১৮৪০। নোরা বস্তু, হাত-পা কাপড়-চোপড় বয়সা হয়ে যায়। অবন আধ-কয়লা মাটিতে ইট হবে না; জ্বালানি হিসাবেও চলবে না। এই ভিঙে-ভিঙে গুঁড়ো জিনিষে তাপ পাওয়া যায় না—শরু শুকনো কয়লা থাকতে কে কিনবে ভূমিাল? ইটখোলার মালিক তবু একটা লাইসেন্স নিয়ে রাখল ঐ বস্তু তোলবার জন্ত। দেখা যাক, যদি কোনদিন কাজে আসে!

আজ এই অপরাহ্নবেলা মাইলের পর মাইল সামনের দিকে তাকিয়ে দেখছি। খনি পাতালের তলে নয়, মাটির অন্ন নিচে। চারিদিক খোলা-মেলা, গর্ত খুঁড়ে নিচে নামতে হয় না। ঢাউস চেহারার অগণ্য যন্ত্রপাতি অকল জুড়ে দাঁড়ি কাটছে। যন্ত্রের হাতাগুলো খাড়া করে তুললে বোঝ করি আকাশে ঠেকে যাবে। দিনরাত্রি চকিবশঘটা খোড়া-খুঁড়ি। খুঁড়ে খুঁড়ে এগোচ্ছে, উপরের বাজে মাটি পিছনে নিয়ে চলে দিচ্ছে—লিগনাইট-তুলে-নেওয়া সেই জায়গা ভরাট হয়ে আসছে আবার। এক-মানুষ হু-মানুষ, কোথাও কোথাও চার-পাঁচ মানুষ সমান বাজে মাটি। তার নিচে আসল বস্তু, বাদামি মাটি—লিগনাইট। ছোট ছোট গুয়াগনে গুড়গুড় আগুয়াজে তুলে চালান হয়ে যাচ্ছে অনতি-দূরে ক্যান্টরির ভিতরে। অবিরাম গাড়ি চলে—

বোকাই গাড়ি বাজে, কিরে আসছে গাড়ি খালি হয়ে। আর এই খনি-পাড়ায় দেখুন নতুন নতুন বালানাকোঠার ইস্পূরী বানিয়েছে। কমিকদের কোয়ার্টার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মেয়েদের স্কৃতিকাগার, বাচ্চাদের নার্সারি, কিংবদন্তিগার্টেন ইত্যাদি। স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে দরজা ব্যবস্থা—শরীরের ব্যবতীয় কলকব্জা নাট-বোটু যেন খুশি পথ ধরে যথোচিত মেরামত করে নিতে পারেন। সংস্কৃতি-ভবন কমিকরা বাড়তি খেতে নিজেরের স্নান গড়েছে—পড়াশুনো নাচ-গান সিনেমা-বিজ্ঞানীয় স্কৃতিকাগার হরেক ব্যবস্থা। এরা সব নিত্যসুখই গাঁয়ের মানুষ—ঘরসামার ছেড়ে ক্যাস্টিরির কাছে এসে জুটেছে। জীবনের রসের ভোগান এমনিতরো আয়োজনের ভিতর দিয়ে অতি অবশ্য চাই। নতুনো আত্মসমর্থন জনমুখ হয়ে উঠবে। সাংস্কৃতিক চর্চার ভিতর দিয়ে এখানে এক বিচিত্র মধুর সমাজ গড়ে উঠেছে। দিবা একটা পাতা—কিছা খুব বড় এক সংসারও বলতে পারেন। পাতা কিছা সংসার যাই হোক, আয়তন অতিরিক্ত রকমের বড়। আট হাজার তিন শ' মণ্ডের। এত মানুষ কাজ করে, ক্যাস্টিরির বহর এই থেকে আন্দাজ করে মিল।

মাত্র শ'হুয়েক বছর পিছিয়ে আসুন। ঘর-বাড়ি নেই এ জায়গায়, মাঠ ভেদ করে পথ চলে গেছে একটা। পথের বোড়ে জলের চৌবাচ্চা। কোচোয়ানরা গাড়ি রেখে এই জায়গায়, বোড়াকে জল খাওয়ার চৌবাচ্চার কাছে নিয়ে। প্যাসেঞ্জাররা নেন পড়ে এদিক-ওদিক পায়চারি করে : কিছু খেয়ে নিতে পারলে ভাল হত। সেই গরজে ক্রমশ এক সরাইখানা ভবন উঠল। সামান্য রাস্তা অগস্টাস—‘বলবান অগস্টাস’ বলত থাকে, টেন্ডারের আট-গ্যালারি ধীর কীভি—রাস্তার গাড়িও সন্ধ্যার পরে অথবা-সবরে দেখা যেত। অগস্টাসের অসংখ্য প্রেমিকা—একটি তার এই তলাটে। রাস্তার বোড়াও এখানে খেমে এই চৌবাচ্চার জল খেয়ে নিত।

সেই জায়গায় আজ এত বড় কাণ্ড। ১৯৫৮ অব্দে ফিটলারের উঠতি মুখে ক্যাস্টিরির পতন। ১৯৫৯-৬১ মধ্যে ঘাবতীয় কলকব্জা বসানো শেষ। তার পরে লড়াই। লড়াইয়ের শেষমুখে বোন। পড়তে লাগল। কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার! বরিশ শ' বোন। পড়েছিল শুধুমাত্র এই এক ক্যাস্টিরিতে। কিছু আর আস্ত রইল না। লড়াই খতম হয়ে যাবার পর সোবিয়তের দখলে এলো। গোড়া থেকে নতুন করে গড়া হল আবার। আগের চেয়ে ঢের ঢের বড় হয়েছে। উৎপাদন ডবল। সাধারণ কমিকদের মাটনে সাড়ে-চারশ' থেকে সাড়ে-পাঁচশ' মার্ক। দক্ষ কমিকদের আটশ' থেকে হাজার। নতুন ইঞ্জিনিয়ারদের ছ-শ' থেকে সত্তর; আঠারো শ' অবধি উঠতে পারে।

ইন্ডিয়া মধ্যে সবচেয়ে বেশি লিগনাইট তোলে এরা, তার পরে আমেরিকা। লিগনাইট নয়, জার্মান বলে ‘সোনা’—কালো সোনা। তাই বটে! শুঁড়ো শুঁড়ো নোংরা কাপার মতন নরম বস্তু বলে একদিন কেউ ছুঁতে চাইত না। ক্যাস্টিরির কলে কেলে চাপ দিয়ে এখন কঠিন ইস্ট বানানো হচ্ছে। সাধারণ জ্বালানি তো বটেই, কিফিং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কলে সবচেয়ে যে ভালো কয়লা—মেটালজিক্যাল কয়লা—তারও কাজ করিয়ে নিচ্ছে। পেট্রোল আদায় করছে এই বস্তু বিশেষ কার্যদায় পুড়িয়ে। আলকাতরা পাচ্ছে। গন্ধক বানাচ্ছে, এবং প্যারাক্সিন ও নানান রকম অ্যাসিড। গাঁয়ে গাঁয়ে বিদ্যুৎশক্তি দেখে এলেন, লিগনাইট পুড়িয়ে ঐ শক্তি বের করে আনেন। পার্গনের কাপড়ে বাহার করে বেড়াচ্ছে বেয়েটা—সে কি অশ্রুও জানে, নোংরা কাবাটে লিগনাইট থেকেই তার শৌখিন কাপড়? মাথা ধরেছে আপনার, খেয়ে ফেলুন লিগনাইটে তৈরি এক বড়ি ওষুধ। গান শুনুন লিগনাইটের প্র্যামোকোন-রেকর্ডে। গায়ে সাবান মালুন, বাতি জ্বালে ঘর আলো করুন—ছুঁতে-ছোঁতে-করে এই লিগনাইট

রয়েছে সকলের মূলে। সোনা বলে, সে আর এমন কি—সোনা কেন ছাৰ এই বস্তুর তুলনায়!

তত্বল জুটে গেছে। লেখক বানানোর টঙ্কে গিয়ে এই যে নানাবিধ বাক্যজাল বিস্তার করলাম, সেই জালে আটক পড়েছে হতভাগ্যের। সকালবেলা নিচে নেমে এসে দেখি কমবয়সি একপাল ছেলেমেয়ে। সমাধির ডেকে নিয়ে একসঙ্গে ত্রেকফাস্টে বসে গেল। ঝাঁকড়া-চুল একটা মেয়ে ও গোটা দুই ছেলে আমার এপাশে-ওপাশে। জ্বালাপ করছে আমারই সঙ্গে। এ অবস্থা একলা আমার নয়—যে ক'জন এসেছি সকলের সঙ্গেই জুটেছে এমনি। লেবে ওরা অল্প-বিস্তর। ইনস্টিটিউটে আনন্দ কাল আমার হরেক গুণাবলীর মধ্যে বইয়ের সংখ্যাও উল্লেখ করেছিলেন। তাই শুনে তাক্ষর হয়ে আছে। বলে, এত বই লিখেছ—কখন লেখো? আমাদের লেখকরা এর মিকি বইও তো লিখে উঠতে পারেন না। আমরা তখন পায় কে, আরও জ্বাক করছি: আমি কোন্ ছাৰ! এমন সব আছেন, বইয়ের গুটিতে ধানের মিকির কাছেও পৌছতে পারলাম না মারা জীবনে। —ওরে বাবা! মতি বলছ? চক্ষুজোড়া একেবারে তাদের মাঝ-কপালে উঠে গেছে।

একটা গাড়ি পেয়েছি একেবারে আমার একলার দস্ত। ঐ তিন ভক্ত আর আমার পাছ ছাড়বে না। গীবার্গ ড্রাইভারের পাশে, আর পিছনে চার জনে বসেছি ঠাসাঠাসি করে। বইয়ের রাজ্য লাইপজিগ। ছাপাখানা বানাল প্রথম এই জায়গায়, যার ফলে অবশ্য ভুবনের আবর্জনাও বিস্তার বেড়ে গেল। কিন্তু সেই বোকার অনেকখানি লাইপজিগ নিজ স্বত্ব নিয়ে নিয়েছে। গোটা একটা পাড়া জুড়ে বই। বই আর বই—হরেক ভাষায় হরেক রীতির বই। লাইপজিগে এসে বইয়ের অগণ্য কারখানা আর দোকানগুলোয় চকোর না দিয়ে কেউ বিরতে পারে না।

একগাৰা বই গাড়িতে চালিয়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে ঘুরছি। কয়েকটা বনেদি অটালিকা—কত রকমের কারুকর্ম—বোনার ঘায়ে নড়বড়ে হয়ে কোন গতিকে খাড়া আছে। সামনে গিয়ে ধাড়িয়ে পড়ি। নিশ্বাসও পড়েছিল হুততে।

মল্লিনী মেয়েটা হেসে উঠল—আঁ, কী ব্যাপার—হাসির কি হল এর মধ্যে? জুঁকুটি দৃষ্টিতে তাকাই।

মেয়েটা বলে, অমন মুখ কাচুমাচু করে পাড়ালে কেন? ভাড়াটাটি দেখলে শুধু, আর যে কত নতুন নতুন গড়ে তুলছে চারিদিকে?

এবং তরুণদের একটি বলল, আমরা ডরাইনে। আবার চক্ষুস্ত হচ্ছি। লড়াই কখনে চাই আমরা, তা বলে ভরপাইনি। ভাড়াভাড়া হবে হয়তো আবার, আমরা মাছি-পিঁপড়ের মতো রব। আমাদের বহা ঘাড়, কত বারই তো হল! নতুনরা এসে আবার সব গোড়া থেকে পত্তন করবে।

এক আশ্চর্য ছাত। নিধুর আক্রোশে মাদুখ নাকক আর ঘরবাড়ি চুরমার করুক, কিন্তু এইসব নিঃশব্দ ছেলেমেয়ের মুখের হাসি মোহবার শক্তি অত্যাচারী নেই। আমরা ডরাই নাকি?—এ কথা শুনেছি এদের কবিদের কবিতায়, রাষ্ট্রকর্তাদের মুখে, দেবরিন নামক চাষীদের গায়ে গেলাম—সেখানেও। কিছুতে এরা মুসড়ে পড়ে না। ভাবলেন, ঠাঙো-ঠাঙো করে ধূলো বানিয়ে দিলাম—পুড়িয়ে জালিয়ে ছাই করে দিলাম—সেই ধূলো ঝেড়ে ছাই উড়িয়ে দুর্ধর্ষ নতুন জীবনেরা মাথা খাড়া করে পাড়ায় আবার।

ইত্যা দেখতে পাই পার্কের পাশে স্থানিমানের মূর্তি। পাকিস্তানের ভিতর আমার জন্মগ্রামে তাই সম্পর্কের একজন হোমিওপ্যাথি মতে ডাক্তারি করেন। শুধু স্থানিমান শুনে তিনি ঠা-ঠা করে উঠতেন—মহাত্মা স্থানিমান। পরম ভক্তিভাবে স্থানিমানের নাম করে শুধুর কৌটা ফেলেন। সকালবেলা, শুনেছি, একটা কাগজে দশবার

মহাত্মা হানিমানের নাম লিখে কাগজ কপালে ঠেকিয়ে তারপরে প্রথম রোষ্টার নাড়িতে আঙুল ছোঁয়ান। কী আশ্চর্য, সেট মহাত্মার বাড়িও এই ভয়ংগয়! মূর্তির নিচে গিয়ে দাঁড়াই। লীবার্গ ক্যামেরা মুখিয়ে আছে।—তোলো দিকি একখানা বেশ কার্যদা করে। ছবি তুলেছি মহাত্মার খানে দাঁড়িয়ে—ঐ ছবি দেখিয়ে কিছু খাতির জমতে পারব আমার দেশস্থ দেশের কাছে।

নিমটা আভকের বড় ভালো। ছই পুণ্যবানের দর্শন হল। অখাপক ওয়েলার আর অখাপক কোরোলা। ওয়েলার আমাদের হোটলে এসেছেন। আশী বছরের উপর বয়স—শালগাছের মতো সমুন্নত বৈত একটু বাকেনি। সত্যতের দিক্‌পাল পণ্ডিত, ভারতচর্চা করেন। ভারতে কোনদিন পা ছোঁয়াননি, কিন্তু প্রাচীন ভারত নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিলেন, তার অঙ্গিসন্ধি কোন কিছুই অবিকিত নেই। ভারতের কয়েকটি লেখক এসে পড়েছে, তাই একেবারে পায়ের হেঁটে চলে এসেছেন। সঙ্গে বকীরসী স্ত্রী। কী লজ্জা, কী লজ্জা! আর এসেছেন তাঁর হিন্দীভাষী সহকারী শান্তিভিকু শাস্ত্রী। সর্বত্র যেনন—ভারতের অর্ধাচীন ভাবাগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র হিন্দীর জন্ত যা-কিছু ব্যবস্থা। হতভাগা বালায় খবর কে রাখে! কিন্তু এসব হল ভিন্ন কথা। শান্তিভিকু সঙ্গে আছেন, তিনিও তো একটা গাড়িটাড়ি ডেকে নিতে পারতেন। অত বড় মানুষ এবং অত বয়সের মানুষটাকে হাঁটিয়ে আনেন কোন বিবেচনায়?

নত মাথায় দাঁড়াই পণ্ডিতের সামনে। পায়ের ধূলা নিতে ইচ্ছে করে। এসেমের রেওয়ার জা নয়—হোটেলের এত মানুষ কি-জানি কি মনে করবে! সাহস হল না।

কোরেলার বাড়ি, আমরাই খবর পাঠিয়েছি, যাব বিকালবেলা। সাহিত্যিক মানুষ, অগাধ পড়াশুনা, এককালে বিপ্লব-ব্যাপারে জড়িত ছিলেন।

মাংসি আমলে অনেক কষ্ট দিয়েছে তাঁকে। দেখা করে নমস্কার জানিয়ে আসব। অনেকটা দূরে শহরের অল্প দিকে থাকেন তিনি, ছোটো গাড়িতে ভাণ হয়ে যান্নি। ড্রাইভার বাগিনের বাসিন্দা—তবে মোতাবিশী লিঙ্কেল আছে, পথখাট সে জেনে বুঝে নিয়েছে। তবু ঘুরে ঘুরে মরছি। ষ্টিক চারটের হাফির হবার কথা—সাত্‌চে-চারটা বাজে, এখনো হদিস পাইনে। কত পাড়ার ঘুরলাম। একটা লাভ হল, লাইপজিগের অলিগলি অনেক দেখা হয়ে গেল।

ওরাও পথ তাকাচ্ছেন—কর্তা, গিহি এবং আর এক মহিলা—বোন সম্পর্কের হবেন তিনি। বুড়োবুড়ি তিন জনেই। আর উকিছু'কি নিচ্ছে বারো-চোদ্দ বছরের বাচ্চা তিনটি। কোরেলার তিন মেয়ে।—এসো, কাছে এসো খুকীরা, কি দেখে অমন করে? সন্ডেচ-ভরা পায়ের তিনজন এসে দাঁড়াল। পাটভাড়া পোষাক পরে সেজেগুজে আছে, মাথায় ফুল-কাটা চৌকো টুপি। তাকিকিত্তানে যে রকম দেখে এসেছি সেবার। সত্টি সত্টি তাই, কোরোলাও মোবিয়েত দেখ বেড়াতে গিয়ে তাকিকিত্তান থেকে টুপি কিনে এনেছেন মেয়েদের জন্ত। ভারতের মানুষ বাড়ি আসছে তো, এমনিথারা সাজ করে বসে আছে। হয়তো বা তাকিকিত্তানের সঙ্গে একই গোত্রের জেবেছে আমাদের। কত কত তারিকি জনেরই ভূগোলের জ্ঞান টনটনে, এরা তবু এক এক কেঁটা বাচ্চা মেয়ে!

কাছে এলো মেয়েরা। ইংরেজি বোকে না, আমরাও বুঝিনে তাদের কথা। শুধুমাত্র মুখের হাসি, হেসে একটুখানি হাত বাড়ালাম। তিন বোনে হঠাৎ ছুটে পালাল।

প্রবীণোচিত আলোচনা চলছে শুখন আমাদের মধ্যে : লক্ষ লক্ষ মানুষ এপার-ওপার চলাচল করে। না হলে দিন চলে না। আর সেজন্য বখেড়ার অস্ত্র নেই। নেতা হয়ে থাকা সব মাথায় ঢুকে আছেন, তাঁদের নিজেদের পারাপার হতে হয় না—

জনসাধারণের মুশকিল ধারণায় আসে না তাঁদের। খবরের কাগজের নাম্বারেরও যদি যাতায়াত থাকত, লোকের হুঃখ কতকটা তবু চাউর হত কাগজে কাগজে। তার উপরে টাকা-পয়সার কড়াকড়ি রয়েছে ছু-খণ্ডের ভিতর। আইনের দর যা-ই হোক, আকাশ-পাতাল ফারাক এপারের আর ওপারের টাকায়। একদল কালোবাজারি আছে, তারা দিবি মুনাফা পিটছে। দুই অংশের মিলমিল হোক, তারা কিছুতে চায় না।

কথাগুলো অবিকল এই। মুখের কথা ছবছ টুকে এনেছি। বলুন তো, কে বলছে কাকে? আমরা বললাম কোরেলাকে? উহ, কোরেলার কথা। অথচ ঠিক এই কথাই একটি অক্ষর অদল-বদল না করে আমরাও বলতে পারি অধ্যাপককে। জার্মানি আর ভারতবর্ষের এক বেদনা।

তিন বোনে আবার দেখা দিল। কেন পানিয়েছিল এবার বুকেতে পারি। চা ইত্যাদি পরিবেশনের ভার নিয়েছে, সেই সব বয়ে বয়ে আনছে। একটু আগে অত নিরীহ আর অমন ভীত, এবারে দেখে নিন প্রতাপ তাদের। জবরদস্তির পরিবেশন। বড়রা তবু স্বাতির-উপারোধ মানেন, 'আর না, আর না' করলে খেমে যান। এরা ক্রমাগত চাপিয়ে যাচ্ছে, কথা বোঝে না, বুঝবার তোয়াক্কাও রাখে না—এদের কেমন করে সামলানো যায়?

চুলোয় থাকবে। কোরেলার কথার জের ধরে আমরা বলছি, সাধারণ মানুষ যদি না চায়, আপনাদের বেশ-বিভাগ স্বার্থপর নেতারা ক'দিন জ্বিয়ে রাখতে পারবেন?

কোরেলা বলেন, তা ঠিক। কিন্তু সাধারণে যে অবস্থা ঠিকমতো বোঝে না। মোটামুটি ষাওয়া-পরটা চললে কেউ বড় কামেলায় আসতে চায় না। হিটলারের সময়েও ঠিক এই। হিটলারকে ক্ষমতার আসন দিয়েছিল জনসাধারণই। সমস্ত ইয়োরোপের

ঐশ্বর্য লুটপাট হয়ে আসছে, অক্ষ আর রক্তের শ্রোত চুড়মুকে—জার্মানির মানুষ সেই সময় খেয়ে-দেয়ে ফেলে ছড়িয়ে খাবার ফুরাতে পারে না। ভাবল, এট অবস্থাই চলবে বৃষ্টি চিরকাল। হিটলার অতএব গীরপয়গবর তাদের কাছে। সাধারণে শুধু অতি-মিকটই দেখে। জার্মান বুদ্ধিজীবী প্রায় সবাই মনে প্রাণে মোজাগিলি। কিন্তু মুশকিল হল, আমরা নিতান্ত মুষ্টিমের।

বললেন, আপনারা এসেছেন এসেছেন, চোখের উপর অবস্থা দেখছেন। দুই তরফের ধরুন কুড়িজন লেখক মজলিসে বসলেন—ভারতীয় লেখক আপনারা মহাত্ম। সমস্তা ভা হলে ভাল করে বুঝবেন, সুনতে পাবেন ছন্দিককার বুদ্ধিজীবীদের কথা। ব্যবস্থা হয় এননিতরো কিছু?

কোরেলার প্রথম যৌবনের বিপ্লব-জীবনের গল্পসর হল। ১৯১৯ অব্দে এই জার্মানি থেকে পায়ে হেঁটে ছ'খানা গোপন চিঠি লেনিনের হাতে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন। মস্তোয় তখন বিষম গৃহযুদ্ধ। এম. এন. রায়ের সঙ্গে দেখা হল মস্তোয়—আমাদের মানবেশ্রনাথ রায়। কোরেলা রায়ের খুব অচুরাগী সেই থেকে। রায় তার পরে দলছাড়া হলেন, কোরেলা কিন্তু তেমনি শ্রদ্ধাপর। এবং ঐ সুবাদে এতকাল বাদে আমরাও বৃদ্ধা অধ্যাপককে নিতান্ত আপন বলে ভাবছি।

কোরেলার নিজের লেখা একখানা ভারিকি জার্মান বই মিলেন আনায়। পরদিন আমি তার প্রতিশোধ নিলাম আমার এক বাংলা বই পাঠিয়ে। আমি পড়ব না তোমার বই, তুমিও পড়বে না আমার। সেই যে শিয়াল আর বকপাখি নাওয়ারত দিল পরম্পরকে—শিয়ালকে মূণ খেতে দিয়েছে বোয়োরের ভিতর যার মধ্যে মুখ ঢোকে না; আর বককে দিয়েছে চিতানো খালায়। তেমনি ব্যাপার।

এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা

ঐতিহাসিক সারা

শিক্ষিতের দ্বারা আর শিক্ষা-ব্যবস্থাই যে একটা আভির্ভাব উন্নতি বা অবনতির পরিচয় দেয় সে-কথা সবশেষেই স্বীকার করবেন। শিক্ষার দিক থেকে ভারতবর্ষ যে এককাল কেবল অবহেলিতই হয়ে এসেছে, এ-কথা বললে সত্যের অপগাণ করা হবে। তবে, এ-কথা বলতে বাধা নেই যে, এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা এককাল কেবল পশ্চ-কেন্দ্রিক-ই ছিল, শিক্ষার দিক থেকে ভারতের গ্রামগুদিকে বড় বেশি উপেক্ষা করা হয়েছে। কলে, বিশ্ববিদ্যালয় হরতো ডিগ্রীর জমকালে। পোশাকে অনেককেই সাজিয়ে-ওড়িয়ে কর্মক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার তুলনায় শিক্ষিতের দ্বারা আধে) বাড়েনি। হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, ইংরেজ রাজত্বের শেষদিকে এদেশের ৬ থেকে ১১ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৪০ জন, ১১ থেকে ১৭ বছরের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১০ জন, আর ১৭ থেকে ২৩ বছরের যুবক-যুবতীদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১ জন শিক্ষালাভের সুযোগ পেত। স্বাধীনতা-লাভের পর অবস্থা যে বদলেছে, তা বলা যায় না। কারণ, ১৯৫১-সালের আদমশুমারির রিপোর্টেই বলা হয়েছে যে, এদেশের মোট জনসংখ্যার ১৯৬ শতাংশ শিক্ষিতের পর্যায়ে পড়ে। অর্থাৎ, ৬৬ কোটি অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ৬ কোটির মতো লোক শিক্ষিত। তার মধ্যেও আবার লাখ ছয় লোক শুধু নামসই করতে পারে! কাজেই, অবস্থাটা ভেবে বেশ ব্যথা মতো। তবে, আগেকার তুলনায় দেশের ছেলেমেয়েরা এখন শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে বেশি। তাই, শিক্ষিতের দ্বারাও ধীরে ধীরে বাড়বে বলে আশা করতে পারা যায়।

এদেশে শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রধান দায়িত্ব স্কুল রয়েছে। রাজ্য-সরকারগুলির উপর। প্রত্যেক রাজ্যেই একজন মন্ত্রীর অধীনে একটি ক'রে শিক্ষা-দপ্তর আছে। সেই দপ্তরের কর্মকর্তা হলেন শিক্ষা-সচিব। এরাইজনকেই তাঁর অধীনে একটি ক'রে শিক্ষা-অধিকারও থাকে, যে শিক্ষা-অধিকারের প্রধান হন শিক্ষা-অধিকর্তা বা ডি.পি.আই.। প্রধানত এই ডি.পি.আই. দায়ত্বই রাজ্যের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা এবং শিক্ষা-সচিব দায়ত্ব উচ্চতর শিক্ষানীতি পরিচালিত হয়। রাজ্যের ক্ষেত্রে দায়িত্বটা রাজ্য-সরকারগুলির উপরে স্কুল থাকলেও, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষানীতি পরিচালনা করেন

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা-দপ্তর-দপ্তর—এতকাল মৌলানা আজাদ খে-দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। কেন্দ্রীয় এই শিক্ষা-দপ্তর থেকে সর্বভারতীয় ডিগ্রিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, ডিকী ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা, কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, বৃত্তিমান ও তহাদি, বৃত্তিমানী ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষার নীতি নির্ধারিত হয়ে আসছে। তাছাড়া, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বাগমতী বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ও এই শিক্ষা-দপ্তরের কর্মসূচী। দেশের আরও কয়েকটি উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় এই দপ্তর থেকে। যেমন—মার্কোলাজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, অ্যানথ্রপোলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, জাতীয় মহাকাঙ্ক্ষনা বা স্প্যানাল আর্কাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারসমূহ।

বর্তমানে ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থা কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত। যেমন—(১) প্রাক-প্রাথমিক বা প্রাক-বৃত্তিমানী (বা নার্সারী) শিক্ষা-ব্যবস্থা; (২) প্রাথমিক বা নিম্ন-বৃত্তিমানী শিক্ষা-ব্যবস্থা; (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা; (৪) কলেজীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং (৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা। প্রাক-প্রাথমিক বা প্রাক-বৃত্তিমানী শিক্ষা-ব্যবস্থা ৩ থেকে ৬ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য। প্রাথমিক বা নিম্ন-বৃত্তিমানী শিক্ষা-ব্যবস্থার পড়াশোনা করে ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা। মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার আবার দুটি স্তর আছে। যেমন—উচ্চ বৃত্তিমানী ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা। প্রথম স্তরের শিক্ষা পাঠ ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সের কিশোর-কিশোরীরা; আর, দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা ১১ থেকে ১৬ বা ১৭ বছর বয়সের কিশোর-কিশোরীদের জন্য। এর পরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। মাধ্যমিক স্তরে আজকাল কারিগরী শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও হয়েছে। তবে, কারিগরী ও বৃত্তিমান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আলাদা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দায়ত্বও হয়ে থাকে। ১৯৪৬-সালে এদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল হু'শাখ সত্তর হাজারের ওপর, আর বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তিমানী শিক্ষায়তন ছিল প্রায় উনত্রিশ হাজার তিনশ'। সরকারী হিসেব থেকে জানা যায় যে, ১৯৫১-সালের মধ্যে ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় সাড়ে তিন লাখ; আর বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তিমানী শিক্ষায়তনের সংখ্যা হবে একশটি

হাক্কারের মতো। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হ'লে নিঃসন্দেহে তা এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতিই ঘটনা করবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করবার মতো। কোনো কোনো রাজ্যে ইন্টারমিডিয়েট কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়ে তার জায়গায় উচ্চ-বিভাগের শিক্ষাকাল বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এক বছর; আর, আর এক বছর যোগ করা হয়েছে ডিগ্রী কোর্সে। অর্থাৎ, হাইস্কুলে থাকবে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। সেই একাদশ শ্রেণিতে ইন্টারমিডিয়েটের প্রথম বছরকার পড়া পড়িয়ে দেওয়া হবে। এই ঘটনের একাদশ-শ্রেণীর হাইস্কুলের নাম দেওয়া হচ্ছে—ম্যাট্রিকার্পাস স্কুল। এই সব স্কুলের ১-ম শ্রেণী পর্যন্ত সাহিত্য, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি একভাবে পড়ে, ছেলেমেয়েরা ২-ম শ্রেণী থেকে ১১-ম শ্রেণী পর্যন্ত নিজেদের ইচ্ছানুসারে সাধারণ অধীত-বিদ্য (বা ইউন্যানিটিক), বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা, বাস্তব-বিদ্যা, কৃষি, শিল্প, গার্হস্থ্য-বিদ্যা (ও শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রে) ইত্যাদি যেকোনো বিষয়ে পড়তে পারবে। এতে করে মাধ্যমিক শিক্ষার পর্দার খেকেই শিক্ষাবীরা নিজেদের কঠি ও ক্ষমতা অনুসারে উন্নতর শিক্ষাএকশরের সুযোগ পাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। পশ্চিমবঙ্গেও ইদানীং বহু 'ম্যাট্রিকার্পাস স্কুল' গড়ে উঠেছে।

ভারত-সরকার এদেশের বিভিন্ন অরের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পুনর্নির্দেশ করতে বেশ-ব কমিনন বা বোর্ড গঠন করেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—সেকেন্ডারী এডুকেশন কমিশন, সেন্ট্রাল এডুকেশন বোর্ড, ইউনিভার্সিটি কমিশন, ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট্‌স কমিশন, ইন্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ড, অল-ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড এবং সেন্ট্রাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড ফর সোশ্যাল এডুকেশন। এই সব কমিশনের ও বোর্ডের সুপারিশ যে সব ক্ষেত্রে গ্রহীত হয়েছে তা নয়; কিন্তু প্রধান সুপারিশগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রহণ করা হয়েছে। ম্যাট্রিকার্পাস স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহীত হয় সেকেন্ডারী এডুকেশন কমিশন বা সুপারিশ-কমিশনের সুপারিশ অনুসারেই। তেমনি ইউনিভার্সিটি শিক্ষার ক্ষেত্রে 'সার্কেট পরিকল্পনা' বা সেন্ট্রাল এডুকেশন বোর্ডের অনুমোদিত পরিকল্পনাগুলিই ভারত-সরকার ঘেন্নে নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষা-মান যাতে উন্নত থাকে, আর্থিক-ব্যবস্থার যাতে কোনো বিপর্যয় না ঘটে, এসব ব্যাপারে 'ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট্‌স কমিশন'-এর বহু সুপারিশই গ্রহীত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আর্থিক সাহায্য দেবার ক্ষমতা

ভারত-সরকার কমিশনের হাতে টাকা দিয়েছেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সরকারকে উপদেশ দেওয়ার জন্য ইংরেজ-আমলেই হুট সরকারী সংস্থা ছিল—(১) সেন্ট্রাল এডুকেশন অ্যান্ড ডাইনমী বোর্ড ও (২) সেন্ট্রাল এডুকেশন হুট। স্বাধীনতা-লাভের পর আরও তিনটি সংস্থা গঠিত হয়েছে—(১) সিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড ডাইনমী বোর্ড বা শারীর-শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ; (২) ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড কমিশন ও (৩) স্ট্যান্ডার্ড বুক ট্রাস্ট। প্রথম সংস্থা শারীর-বিজ্ঞান, খেলাধুলা, শিবির-সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেন এবং যোজনাক্রমে খেলাধুলা ও শিবির-সংগঠন পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় সংস্থা গঠিত হয়েছে 'ইউনেস্কো'র সঙ্গে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে। আর, শেষোক্ত সংস্থার প্রধান কাজ হলো উপযুক্ত নামে যাতে ডাঙা ডাঙা সাহিত্যগ্রন্থ প্রকাশ করা যায় তার ব্যবস্থা করা। ভারত-সরকারের শিক্ষা ও গবেষণা মন্ত্রক আর-একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন বৈদ্যীয় সংস্কৃতির উন্নতি ও প্রসারের জন্য। এই উদ্দেশ্যেই তাঁদের কতগুলোইন প্রতিলিপিত হয়েছে তিনটি সাংস্কৃতিক আকাদেমি, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে—(১) সন্থীত-নাতক আকাদেমি, (২) সাহিত্য আকাদেমি ও (৩) ললিতকলা আকাদেমি।

সারা ভারতে অনুমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রয়েছে এইরকম: বিশ্ববিদ্যালয়—১১টি; শিক্ষা-বোর্ড—১১টি; কলা ও বিজ্ঞান কলেজ—৩ শ'র কিছু বেশি; গবেষণাগার—৩০টি; মুক্তিযুদ্ধ কলেজ—প্রায় তিনশ'; বিশেষ শিক্ষার কলেজ—১০৬টি; মাধ্যমিক বিদ্যালয়—সড়ে সাতাশ হাজারের মতো; প্রাথমিক বিদ্যালয়—প্রায় দু'লাখ চৌব্বি হাজার; প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়—পাঁচশ'র কিছু বেশি; মুক্তিযুদ্ধ বিদ্যালয়—দু'হাজার সড়ে সাত শ'; আর বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—সড়ে সাতচল্লিশ হাজারের উপর।

এখন পঞ্চাবদিক পরিকল্পনা'র শিক্ষার বিভিন্ন খাতে বরচ হয় ১০৯ কোটি টাকা; আর 'দ্বিতীয় পঞ্চাবদিক পরিকল্পনা'র খরচের আনুমানিক পরিমাণ ধার্য হয়েছে ৩৭৭ কোটি টাকা। এখানে আলোচনা করা হাক্‌ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে। সরকারী হিসেব থেকে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের হার গড়ে শতকরা ২৪%। তার মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশি। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের পর্দায়ে পড়েন এমন পুরুষের সংখ্যা শতকরা ৩৪%৭; আর স্ত্রীলোকের সংখ্যা হবে ১২%৭-এর মতো। গতকল্প, অর্থাৎ সরকারী ১৯৭৭-৭৮ সালে এই রাজ্যে শিক্ষার বিভিন্ন খাতে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ ছিল—এগারো কোটি তেরো লক্ষ ঠাইত্রিশ

হাজের টাকা। এর বছরের পুরো ব্যয়-বরাদ্দ এখনও বিধান-সভা থেকে মঞ্জুর করা হয়নি বলে মে-হিসাব এখনো দেওয়া গেল না। 'প্রথম শতাব্দিক' পরিকল্পনা সম্বন্ধে মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১১-শ্রেণী-সমবিত্ত মাটিপার্শ্ব-স-খুল আশিত ৩৫ মোট ৮৬টি; আর ১১-শ্রেণী সমবিত্ত মাটিপার্শ্ব-খুলের সংখ্যা ছিল—১৮৩টি। এর সমগ্র লক্ষ্য এ-বাজো মাধ্যমিক শিক্ষার (৪৫ শ্রেণী থেকে ১০৫ শ্রেণী) ছিল—৩,১৭-টি; আর প্রাথমিক বিদ্যালয় (দুই-শ্রেণী) বিদ্যালয় সমেত—১৫ শ্রেণী থেকে ৪৫ শ্রেণী) ছিল ২৩ হাজারের উপর। ১৯৪৬ সালের হিসাবে জানা যায়, ঐ সমগ্র লক্ষ্য এ-বাজো অমুদোদিত কলা ও বিজ্ঞান কলেজের সংখ্যা ছিল মোট ১৪টি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৪৬-৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির ক্ষমতা মোট ৮৭ কোটি টাকা সরকারী সাহায্য দেওয়া হয় এবং গ্রাম্যকলে ৮৫ শ্রেণী পর্যন্ত বালিকাশেখা শিক্ষা-ব্যবস্থা করা হয় আন্তর্জাতিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর ভিত্তি কমবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার আরও তিনটিনতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করেছেন। এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার কথা আছে—বংধানে, কল্যাণীতে ও দার্জিলিংয়ে। কল্যাণীতে স্থাপিত হবে কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিংয়ে

বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে মাধ্যমিক, আর, বংধানের বিশ্ব-বিদ্যালয় হবে অমুদোদিত-কর্তা। কৃষি ও কারিগরী শিক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গে যে কয়টি অমুদোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বেঙ্গল টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, শ্রীরামপুর; বংধামপুর টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, বেঙ্গল সিগনিক ইন্সটিটিউট, বাংলপুর, দার্জিলিং ও কোচবিহারের শিল্প-বিদ্যালয় ও কালেক্টার; বকৌর চর্মশিল্প প্রতিষ্ঠান, কলিকাতা, এবং কলিকাতা ও পাঁচড়াপাড়ার স্মারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারে পশ্চিমবঙ্গে গত বৎসরের ধরে যেভাবে কাজ চলেছে তা যদি সাধারণতঃ ও শিক্ষা-বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সমালোচনার উপরে পাকতো, তাহলে আজ আর বলবার কিছু থাকতো না। কিন্তু, মোকাবেলাই হোক, এ-বাজোর শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নয়। তাই, সাধারণতঃ ও বিধান-সভায় ন্যাক-মায়েই সমালোচনার অভাব নেই। শিক্ষক ও পাঠ্য গ্রন্থভাণ্ডারের দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে দরখাস্ত বা অনশন দরখাস্ত করতে। এর উপরে আজ যখন দেশি—ভারত-সমাজে শিক্ষক বিলম্বন, পরীক্ষার চলে উত্তমির ত্রুটি, পরীক্ষকের অনন্তকর্তা পরীক্ষার খাড়া নিয়ে কলিকাতার অন্তর্ধান—তখন বনে মনে শ্রমিত হারে ওঠা চড়া গভীরতর থাকে না!

যুগে যুগে সুপরিচিত...



অবশ্যই ভাল থেকেই 'নিম্ব' এর অত্যন্ত দ্রুত গঠন-নিধারক ও প্রতিরোধক গুণাবলী ভারতবাসীর কাছে সুবিদিত। নিম্বের এই সব সহজাত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য নিম্ব টুথ পেস্ট-এ সুবিদিত বর্তমান যুগের এর উপকারিতা অসাধারণ। তা ছাড়া আধুনিক স্ব-বিজ্ঞানসম্মত ধাত ও যন্ত্রের উৎকর্ষশীল যেই উপকরণ-গুলিও নিম্ব টুথ পেস্টে সম্মিলিত আছে, তাহলে এক কোম টুথ পেস্টের সঙ্গে নিম্ব টুথ পেস্টের তুলনাই হয় না।

নিম্ব টুথ পেস্ট

একটি 'ক্যালকেমিকো' অবদান

বর্ষ-বোধন

ক্রিয়ের

“উঃ উঃ দূর রে, ভিকিমিকি দিয়া—” শ্রুতির কুহেলী-
ছাওয়া প্রভাতে সতসাত, শিশু-বাগ-রঞ্জিত বাংলার
পূরনারীরা মলীতীরে ঠাক্কিরে বালাকপের বন্দন-গান
গাইছেন। এমন সময় পূর্বদিগন্ত উদ্ভাসিত করে অশু-
খালীর অত্যাশ্রয় হলো—তারি গাইলেন :

“দূর উঠেছেন, দূর উঠেছেন
ছোটগন্ধার ঘাটে,
এর উঠেছেন অরে

তামার হাঁড়ির বর্ষে।”

ভাতবর্ষ, বজ্রবাল অতিভ্রাসেবের আবির্ভাব ঘটেছে,—বর্ষ-
বিবর্তনের লগ্নে কোটি কোটি বছর ধরেই এমনি অক্লণোদয়
হয়েছে। কিন্তু বিশ্বচরাচরের সঙ্গে বাহুবলের এমন নিগূঢ়
সহজ সহজের ছবি তো দূর বৈশিষ্ট্যে চোখে পড়ে না।

এর পরেই কবি দূরবৈব সাংসারী বাহুবলের মতোই
চাঁদের সঙ্গে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ—তারের কোলে অশ্রুত
সুন্দর সপ্তান সন্তরাহ বসন্ত। আবার কোন দূরকালে
এই বসন্তের সঙ্গে নিদ্রা হলো বহিঃসীম—ব্রতীরা বসন্তকে
উৎসব করে বলছেন :

“কই বাওরে লাউল (বসন্ত)

গামছা মুড়ি দিয়া,

তোমার ঘরে ছেঁটনা হইছে,

বাজনা আনাও গিয়া।

ধোপায় জানাও গিয়া,

পুকত জানাও গিয়া।”

এই বসন্ত বেন বাঙালীর পাড়াপড়ানির মতো একান্ত
ঘরের-মামুল, আপনার জন। তাকে বলছেন :

“আজ বাও, কাল আটাইসা—

নিত্য নিত্য দেখা দিহো,

বছর বছর দেখা দিহো—”

‘বছর বছর দেখা দিহো’—দূর-প্রদক্ষিণ-পথে কোন অব্যাহি
কাল থেকেই তো ‘বছর বছর’ বসন্ত আসে, ফুল কোটে,
পাখি গান গায়, শুকনো পাতা করিয়ে দিয়ে বায়, নূতন
বছরের কন্ড দিয়ে বায়।

সেইরূপে ঘেঁষাঘিনে আসে বহাদিগুণ-সংলগ্নি বিশ্ব।
সেদিন উষাকাল হতেই চলে আগামী বর্ষের আবাহন পর্ব,
জীব জগতের অপসারণ।

প্রথমতঃ দেখা যায়, মানবজাতির পালকিত্রী ভগবতী
গো-মাতার আরাধনার পাশা। গো-মাতা ছুটী ও পুটী
হলেই মানবসম্মানও পুটী হবে, তার বলবীর্ষ বধিত হবে—
এই ছিল সেদিনকার ধারণা। সারা বছর তার সেবা না
হলেও, সেদিন তার সেবার অস্ত্র থাকে না। গো-মালাকে
সুন্দর করে সাজানো হয়, নিকোনো হয়। গো-মাতাকে
নখীতে নিয়ে কান করিয়ে আনা হয়। তার পর ঘোশের
দিনের আবির্ভাব নিয়ে তাকে সাজানো হয়, শিং-এ শিশুর
লগ্নে ভাগা বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর হয় তার পূজা,
যজ্ঞোচ্চারণ, পাঁচকনের নৃত্য গোড়ানো, আর ধূপদান।

‘দূর চর এক মক্কত, এবং সংসারের সব-কিছুই যে
মহাকাশের মধ্যে বিদ্যুত—তার পূজা তো সারা চৈত্রমাস
ধরেই চলেছে,—এই দিনটিতে সম্ভাবনবতী পূরনারীরা নীল-
কর্ষের উপবাস করেছেন। ছেলেদের মধ্যে বেছে নিয়ে
হুটিকে হরণগৌরী-রূপে সাজানো হয়েছে, তামা বাড়িয়ে
বাড়িয়ে দর্শন দিয়ে এসেছে।

তারপর শিশুপুরুষদের জলপূর্ণ ঘট উৎসর্গ করা হয়েছে
—সাক্ষি-ব্রত হয়েছে। বোমেরা ছাউনের কল্যাণ
কামনা করে ছাড়া দিয়ে আবাহন করেছেন,—নৃত্য যে
প্রাণের প্রতীক!

“তু সুদীতই গান নয়, সেই কর্তব্য গান যে-কর্তব্যে
আত্মপ্রকাশ, জীবনকে সকল দিক পূর্ণ করে গানন করা
সেও গান—আপন সংসারের অংশ-প্রভাংশের মধ্যে
সমগ্রতার সামঞ্জস্য স্থাপন করা সেও গানের মতোই।”
এইসব অমূল্যত্ব, পালপাখি, ব্রতে, রামায়ণী গানে, কনি-
গানে, বাতায়, কবকতায়, পাঁচালীতে বাঙালী আত্ম-
প্রকাশের ভাষা পেয়েছিল। সারা জীবনখানিই তার
বাঁশির মতো বাজিয়ে গেছে, নব নব সৃষ্টির আনন্দে তারের
দিন বেটেছে। সেই আনন্দ থেকেও আজ আত্মা বিকিত :
কাল—হাত জোড় করা, হাত পাতা, হাত-নাখাই ছাড়া
হাতের কাক সবই তো আত্মা ভুলেছি,—বর্ষ-বিদ্যাহের
দিনে আত্মাহের যে অতীত গাছের অশ্রু শিকড়ের মতো
সমস্ত সমাজদেহে রূপ সকার করছে ও প্রাণ কোণাঙ্কে তার
হিসেব নিতে হবে বৈকি।

আত্মদেহে ছটা চড়িয়ে পূর্বদিগন্তে বসন নববর্ষ এসে
হাঙ্কির হয়েছে, তখন, “গলা তু-তু-—আকাশে চাই,

—কালপৈশাখী আস্তন করে—কালপৈশাখী আস্তনে পোড়ে—

—আমাদের জীবনও এমনি অবিচারে, অন্যাচারে, হুঃপ-দুর্ধণা ও দারিদ্র্যে পুড়ে। কিন্তু যথেষ্ট না, কারণ সে জানে—

“উপরের পথে গুলি কার বাধি—

ভয় নাই ওরে ভয় নাই!”

অতীতেরে স্মৃতিত বাহুব সকল ব্যথা-বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে অমৃতের আশ্রয় পেয়েছে। এখনও কত নববর্ষই তো এসেছে। কিন্তু প্রচণ্ড অস্থিরতা হৃৎকের সন্ধান পৃথিবী এই বর্ষ-নিবর্তনের ফলেই হয়েছে শান্ত শৈতল, উজ্জ্বল বর্ণনে বাহুতে হয়েছে হৃদয়বৃত্তা। এগেছে মানুষ অবশ্য-জীবনের অঙ্ককার গেরিবে, হার্ষসর্ষভতার বন্ধন ছিন্ন করে বেড়িয়ে এগেছে বিশ্বলোকে,—কেনেছে তারা অমৃতের পুত্র, এই পৃথিবীর সকলই আনন্দময়। জেনেছে বার্ষিক ক্ষুধা এবং পাণের আবর্ত এই নিত্যবিরাজমান মানবের অস্থূলকি থেকে আমাদের বঞ্চিত করে। তারা উপলব্ধি করেছে—আকাশ যদি আনন্দময় না হতো তবে কে জীবনধারণ করতো?

জানা আর করা, জীবনকে শিল্পরূপে গড়ে তোলা তো এক নয়—কর্মক্ষেত্রে জ্ঞান ও বিদ্যাকে প্রয়োগ করিনি বলেই আন্ধ আঘাতের দুর্গতি।

আমাদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে নববর্ষ-উৎসবের কোনো উল্লেখ নেই। পাণ্ডিতে নির্দেশ আছে, প্রতিগৃহে সেন্নিন ধর্মজা রোপণ করতে হবে। এই নির্দেশ যে কতদিনের, এর মূল যে কোথায়—তা জানিনি। সেন্নিন রেখা বায়,

লাগীবাড়িতে ভিড়, ব্যবসায়ীদের গরে আনন্দোৎসব। ভুলবানের নাম করে তাঁরা নৃতন করে হিঙ্গাব গুরু করেন। এই হালধাতা-উৎসবে ধারা বোম্বলান করেন, তাঁদের ব্যবসায়ীদের কিছু লক্ষ্মী দিতে হয়। কোনো দুঃকালে ভারতের আর্থনীতিক ইতিহাসে এইভাবে অর্থ-সংগ্রাহের হয়তো মত একটা মূল্য ছিল। এত হালধাতার উৎসব কোনো কোনো ব্যবসায়ী অক্ষয়-তৃতীয়ার শব্ধ দিয়ে এবং অগ্রহায়ণ মাসেও সম্পন্ন করে থাকেন। ১লা অগ্রহায়ণকে বৎসরের প্রথম দিন ধাধ না করে ১লা বৈশাখকে কেন বছরের প্রথম দিন বলে ধাধ করা হয়েছে, তা জানিনি।

আজিকার এই নববর্ষোৎসব কেবল ব্যবসায়ীদেরই নয়, বাংলার সর্বজনের। হয়তো বা পৃথিবীর আরশেই এত উৎসব গড়ে উঠেছে। বহু দেশের বহু সাধনার ধারা ভারতের সাধনায় এসে মিলেছে—এও চর্যাতো একটি। বা-কিছু মইং, বা কম্যাপকর, বা মুন্সং—তা তো জেন-কাল-পারে সীমিত নয়, হুস্তরাং এত অমূল্য কৈবল কোনো বিশেষ বেশের জড় বিশেষ জাতির জন্ত নয়, এ অমূল্য নববর্ষের। এত দিনটিতে জাতিং লক্ষ্য, ব্যক্তির লক্ষ্য, সমাজের লক্ষ্য পুনর্নির্দিষ্ট হয়—কোথায়, কোন্ পথে গেলে আমাদের অতীত লাভ হবে, তারই পর্যালোচনা ও পুনরহুস্তজ্ঞান হয়,—কি পেয়েছি, কি পাটনি—তার হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে তিতে হয়। আদর্শের আলোক-বহু আঙ্কও কতদূর—কোথায় পড়িয়ে আছি, কতদূর বেতে হবে, কী পাবেব—এই তো আজিকার প্রশ্ন।



দেবী বঙ্গল ডেকারেটর
২২০-চিত্তরঙ্গন এডিনিউ • কলিকাতা - ৬

বিজ্ঞান

মানুষ সহজে মরে না

অনব্রহ্মকুমার সেন

ভ্রমলোকটির বয়স অল্প আদিবাসন হইছিল, তবুও ঘুটপাথে গাড়িতে থাকবার সময় জীবির খাড়া বেয়ে মাথা নাড়িয়া সকলেই হুসিত। সকলে ভয়ানক আশ্চর্য হলেন যখন কামানার লাগ-কাটের বিশপট ছিলেন। বাহ্যিক, মাহুৎ যে যেতে থাকে সেইটাই আশ্চর্য—নইলে এই ভ্রমলোকের অনেক আগেই মাথা ধোয়া উঠিত ছিল। জীবনপথের আদি মাইল পর্যন্ত তিনি কি করে শৌছেছিলেন তখন সকলে সেই বহুস্ত ভেত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কোনো-না-কোনো সময়ে তাঁর একটা-না-একটা সামাজিক অঙ্কন করছিল। তাঁর ব্রাহ্মপ্রসার এত বেশি ছিল যে, রক্ত-চলাচল কংবার পিরাপ্তি পর্যন্ত করিন হয়ে গিয়েছিল। একত্রে তাঁর হাট বা জংংংক বিভণ খটতে হত, আর খটতে খটতে সেটি বেশ খড় হয়ে গিয়েছিল। একদা বন্ধুর আক্রমণে ফুলফুলের বেশ খানিকটা অকলো হয়ে গেছে। প্রাইটল ডিভিড নামে দুঃশয় বা কিশ্নির ওকিন হোগ, তাও তাঁর ছিল, আর ছিল লিভারের গোলমাল। আশ্চর্য যে, ভ্রমলোক পুত্ হয়ে বিজ্ঞানর গুরে থাকতেন না, তিনি মনে করতেন তাঁর মাথা বেশ ভালোই আছে। ব্যাপারটা একবার ভালো করে তলিয়ে নুহ্ন।

বিজ্ঞানীরা এতে আশ্চর্য নন। তাঁরা বলেন, মাহুৎ অত সহজে মরে না। অঞ্চ বেহুঁন, আমায়েয় আদপালে কোটি কোটি রোগ-জীবাণু তো ঘুরে বেড়াচ্ছেই, তাঁর ওপর আছে পথের হুটিনা, আটম বোনা কাটার মাহুৎক রশ্মি, বরোনিয়ি গুখোশিল, ক্যাম্পার, কলোরা এবং আরও কত কি। বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীতে লোকসংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে, তাই ভ্রমলোকও কিছু ব্যত্। এতে ভর পাবার কিছু নেই।

বোগের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শু রোগ-জীবাণুদের মারবার চক্রে মাহুৎয়ের একটা বাহ্যিক ক্ষমতা আছে। সে ক্ষমতা না থাকলে, পৃথিবীতে মাহুৎয়ের বেঁচে থাকা সম্ভব হত না।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হুত যুদ্ধতে পারলেন যে আপনায় গলাটা ফুলফুল করছে, কি হুত সামাত্র একটু জর হয়েচে, নহত গালে দু-একটা ফুলফুটি হয়েচে। এই সব, কিংবা আরো কিছু লক্ষণ দেখে বোকা যেতে পারে যে, শরীরে কোনো জীবাণুর আক্রমণ হয়েচে। আপনায় গলাটা যখন কোলে, বাখা হু, ফুলফুল করে কিখা খরতক হু তখন যুদ্ধতে হুবেসেখানে কোনো রোগ-জীবাণু আক্রমণ করেচে। সেখানে অতিরিক্ত রক্ত ছুটে চলেছে, সেই অতিরিক্ত রক্তকে ঘান দেবার মত্রে গলাটা ফুলেছে। আর সেই রক্তে আছে লিউকোসাইট নামে সালা কণিকা, যাদের কাজ হল জীবাণুদের খেয়ে ফেলা। বিপদের সময় আবার সালা কণিকারা হলে বেড়ে যায়। কিন্তু হল যদি বেশি বাড়তে হু তাহলে হুত আপনায় জর হয়ে যেতে পারে, তাহে মানে সালা কণিকার সঙ্গে জীবাণুর খুব যোবতর যুদ্ধ হুচ্ছে। তবে জর হতে-না-হতেই আপনায় গলাত নালিশ দেহে যেতে পারে। কিন্তু জর হল লাল দিগড়াল, অল্প ব্যবখা এবার নেওয়া মরকার কল শরীর আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছে।

আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করি, “আগনি বিধ খান ?”—আগনি নিচ্ছই প্রতিযাধ করে বলবেন, “না, খাই না।” কিন্তু বিধ আগনি থাকেন—অবস্ত খুব যুদ্ধ পরিমাণে—চা, তামাক, কশি, দিগারেয়ের সঙ্গে, তবুও মরছেন না। আপনায় লিভার আর কিচনিত যে ছোট্ট ল্যাংঘরেটির আছে সেই ল্যাংঘরেটির বিধের খিখাত ভেঙে আপনাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে। আপনায় শরীরে খেলাই হুড আছে, তাহাও অনেক বিধ—যেমন আর্দেনিক, মীসে, রেডিয়াস, মোরিন—এখনি কত রকম বিধ বেখাণুব হুজম করে ফেলে।

শরীরটা যখন হুড থাকে তখন লিভারের সবটা অল কাজ করে না, পাঁচ ভাগের মধ্যে তিন ভাগ বিশ্রাম নেয়। মাহুৎ একটা মাহে ফুলফুলই কাখ চালিয়ে নিচ্ছে, তাহে আ

কিছু করেনি। জংঘরও ধরকারের বেশি শেই বদুত রূপে। আমাদের নরীর থেকে হাত-পা কেটে বাব দিলেও আমতা বেঁচে থাকি, কিন্তু নরীরের ভেতর থেকে অনেক ধরকারী মরণ বাব দিলেও, এবং আরকাল অনেক সময়ে বোঙ্গিকে ঠাটাবার জন্যে বাব দিতে হচ্ছেও—মাহুগ দিবি বেঁচে আছে।

মগধ, থাকে বলে গ্রেন, তার অনেকটাই বাড়তি মরণ। রাজপ্রাসাদের বোঙ্গীর স্টোকে হলে বা মাধার সাংঘাতিক আঘাতে মগধের অনেকটাই অনেকটা হয়ে গেলেও মাহুগ সহস্রের মরণ না। তার মরণশক্তি গোপন গেতে পারে, কথা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এমনকি বুদ্ধিগোপনও হস্তে চলে যেতে পারে—তবুও মাহুগ বেঁচে থাকে। মগধের অস্ত্রাঙ্গ মরণ তখন কাঙ্ক্ষ করে, নরীরের আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলি তারই জোরে চালু থাকে। গত মহাবুদ্ধি কত লৈঙ্গের মাধার অনেকটা অংশই উড়ু গেছে, কিন্তু তারা গ্রাণে করেনি। ভাপানের কাছে ভকিনেওবা মাপে গত মহাবুদ্ধির সময়ে বোমা থেকে ভীর গতিতে বিক্ষিপ্ত টুকরা একজন লেফটেন্যান্টের নরীরের ঠাটকাটাই গ্রাণ উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঠাটা, ঠা হাত তো উড়ে গেলেই, তার ওপর তার দুইয়ের আর মাধার অর্ধেক অংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়। সে কথা বলতে, লিখতে-পড়তে কিছুই পারত না, এমন কি মগধের কথাও বুঝতে পারত না। দু'বছর পরে তার পক্ষাঘাত অনেক কমে গেল, বুদ্ধি আর চিন্তাশক্তি অনেকটা ফিরে এল। সে কিছু-কিছু লিখতে, পড়তে আর কথা বলতে শিখল নতুন করে।

পাকস্থলী তো আরকাল সবটাই কেটে ক্লেসে দেওয়া হয়। অনেকের পাকস্থলীতে ক্যান্সার বা অন্য কোনো সাংঘাতিক ব্যাধির হলে সেটি কেটে ক্লেসে দেওয়াই ডাক্তারবাবুয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন। পাকস্থলীটা কেটে ক্লেসে দিলে, কুৎ-মহ পাকস্থলীর কাজ করে। প্রথম প্রথম মগধ পরিমাণে খন খন খেতে হয়, তারপর ক্রমশঃ মজার হয়ে যায়। কুৎ-মহ বা মগধর থেকে অনেকটা করে মরণ বাব দিতে ডাক্তারবাবুয়া ভয় পানেন না, এমনকি কুৎ-মহ—যেখানে হজম-প্রক্রিয়ার বেশিরভাগটাই সংঘটিত হয়, তারও আদি ভাগ ক্লেসে গিতে তারা ভয় পানেন না। একজন নারিকের শেই গ্যাংগ্রিন আর একজন মহিগার শেই ভীষণ বা হয়েছিল। দুজনেরই কুৎ-মহের পন্থেটা ফুট করে মরণ বাব দেওয়া হয়, থাকে মাত্র দু'ফুট করে। এখন তারা দিবি কাজকর্ম খাওয়া-খাওয়া করছেন, কে বলবে তাদের নাকীভুঁটি কেটে হালকা করে দেওয়া হয়েছে।

একটা চমিত কথা আছে যে, লিভার হত লিন ভাল থাকবে মাহুগ তত লিন ঠাটবে। নরীরের নথো লিভার খুবই ধরকারী। লিভার সেহনদারী সত্য করে, শিত্তরল মরণ করে, হজমের সহায়তা করে, রক্ত থেকে জীবাণুদের পরিবেশে দেয়, থাকে বিসাক্ত পদার্থ নিষ্কাশ করে দেয়, পুতনো রক্ত-কণিকাদের জাতগায় নতুন রক্ত-কণিকাদের জন্মগায় করে দেয়। অথচ এমন একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গের ব্যাধি-আনা ভাবাই কেটে বাব দেওয়া যায়। দু'সত্তাহের নথোই লিভার তার কাটা মাপের গ্রাণ সবটার পরিশুদ্ধক ঠেড়ি করে নিতে পারে। লিভারে কাণামার হলে শতকরা আশি ভাগ পর্যন্ত বাব দেওয়া চলে। ইংরেজি ১৯২২ সালে একজন ক্যান্সার-রোগীর লিভারের অভ্যন্তরীণ অংশই বাব দেওয়া হয়েছিল, সে রোগী এখনও বেঁচে আছে এবং সুস্থ আছে।

নরীরের ভেতরে কোন্ অংশটা ধরকারী নয়? কিছুনিই কি কম? নরীরের রাসায়নিক সমতা বন্ধ করে কিছুনি। প্রতি সাতাশ মিনিট অথবা নরীরের রক্ত পরিষ্কৃত হবার জন্য কিছুনির বদল দিবে বড় কোনো কারণে কিছুনি যদি কাজ বন্ধ করে তাহলেই বিপদ—মৃত্যু তখন ঘনিষে আসে। এই-বে হুটো কিছুনি আশনার নরীরে আছে, যা আশনার হাতের দুইটির নতো গ্রাণ বড় এবং ওখানে এক পোকা আশাভা, তাদের মধ্যে একটি না থাকলেও কাজ চলে বাবে, অপর কিছুনিটি তখন আকারে বড় হয়ে হুটি কিছুনির কাজ একাই চালিয়ে নেবে। এমন লোকের সম্মানে পাওয়া গেছে যারা একটি কিছুনি নিয়েই মনঃগ্রহণ করেছে, অথচ দিবি বেঁচে আছে। কোনো কারণে হুটি কিছুনিই বাব দিলে মাহুগকে বাঁচির রাখা যায়। অসম্ভব কিছুই নয়।

আশনার নরীরের হুটো ফুলফুল থেকে একটি ফুলফুল পুরো বাব দিলে, দুইখণি পুরো বাব দিলে অথবা তলপেটের ভেতরের অনেকগুলি মরণ, এমন কি নারীর সমস্তনোং-পাশনের পক্ষে অপরিসীম সম-কটি মরণ বাব দিলেও মাহুগ সহস্রের না। অবিদ্যাত মনে হলেও বিশ্বাস করতে হবে, কারণ সে-দব বোঙ্গি অপারেশনের পর বেঁচে আছে।

আশনার নরীরের ভেতরে কতগুলি গ্যাং বা গ্রিথ আছে। এদের বলা হয় 'অংকরা গ্রিথ'। এইসব গ্রিথ থেকে খুব সামান্য পরিমাণে রস স্রবিত হয়ে রক্তের সঙ্গে সোহাশুষ্টি মিশে নরীরের অনেক উপকার করে। এইসব গ্যাংগের নাম হল—খাইরবেত, প্যারা-খাইরবেত, অ্যাড্রিনাল,

শিউঠে উঠে—উঠাশি। এই সব ম্যাগেজের কোনো একটি অকোঙা হলে ভারী দুর্ভাগ্য হয়; একজন মহিলাব খাটবোডে ম্যাগেজি বান দিতে হয়, কিন্তু সাজান অশায়েল্যের সময়ে খাটবোডে ম্যাগেজ প্রচার লাগে; খাটবোডে ম্যাগেজ কেটে ফেলেন। তখন হোমিওপ্যাথির নতুন-পুর যোগের গন্ধ ঘেঁষা দেয়। ঘাই হোক, তাকে অতিদিন রুমি উশায়ে তৈরি খাটবোডে ম্যাগেজের রস আর ক্যালসিয়াম ইন্ডেক্সশন দেওয়া হতে লাগল। এইভাবে চলবৎসর চললো। তার পর অল্প মাতালের খাটবোডে গ্রহি মহিলাব গলায় বসিয়ে দেওয়া হল। আর ইন্ডেক্সশন দেওয়ার সবকিছু হল না; শিউঠে উঠে গুরুত্ব পূর্বক বেশি, কিন্তু ক্যালসিয়াম থেকে হোমিওপ্যাথি বোতল ত্যাগ করে দেওয়া হচ্চে।

একটা হাত নেই কি একটা পা নেই এমন বহু লোক আছে, কিন্তু গভীর মহাশয় একজন লোকের দুটা হাত আর দুটা পা বান দিতে হয়, সে এমন রুমি হাত ও পায়েব সাহায্যে ট্রাইব চালায় রুমি চলে করচে, ভীণ চালিয়ে, এমন কি শিকার করচে। তাহা-কুবি হয়ে একজন লোক বিনা অস্ত্রেরে তির্যকি বিন লুহের ভাল ভোগে ভোগে ছিল আর শেষ বারে দিন চল পথস্থ থাকি। সে লোকও বেঁচে গেছে।

পরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮°৬ ডিগ্রী। টেম্পারেচার যদি ১০৮ ডিগ্রী হয়, তাহলে সাধারণ হো হুটেই হয়, বরক ভাবে কারণ উপস্থিত হয়। নিউ ইংল্যান্ডের 'মেমোরিয়াল হাসপাতালে' একশো পাউণ্ড ওজনের একজন মহিলাব দেহের উত্তাপ ১১৮ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল, আর ডিকাগোতে আর একজন মহিলাব দেহের উত্তাপ ১০৮ ডিগ্রীতে নেমে গিয়েছিল। আশ্চর্যভাবে দুজনেরই জীবন রক্ষা পেরেছিল।

ইংল্যান্ডের নিউক্যাসলের একজন দুবতী মাথাব আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। তিনি মোট ১৬২ দিন অজ্ঞান হয়ে ছিলেন এবং সে সময়ে তিনি অশ্রুস্রাব ছিলেন। কিন্তু যুগের

বিষয়, তিনি ঠিক সময়ে জ্ঞান বিবের পান এবং একটি আট পাউণ্ড ওজনের শিশুর ভর্য দেন।

একে একে সবই হো বাহ গেল, তাহলে আর কি বইল! আর কি বাহ গিলে অপমান প্রাণ প্রাণে হয়ে না? সে বিশেষ বিজ্ঞানীরা সঠিক কিছু বলতে খিা বোধ করেন। তারা বলেন, মৃত্যু নির্ভর করে—পর্যায় যে জীবনীশক্তি নিহিত আছে তার ওপর এবং স্বচ্ছপূর্ণ করবার ক্ষমতার ওপর। তবে বিজ্ঞান যে ক্ষতগতিতে এগিয়ে চলেছে আর অশ্রুতাপের শোকার-পাট তৈরি হচ্ছে, তাতে হুটেই জ্ঞানবাহর বিকল্প রুমি জ্ঞানে তৈরি হবে এবং পরমাত্ম আরো কিছুকাল বাড়িয়ে দেওয়া যাবে। বিজ্ঞানীরা আরো একটা গুরুতর কথা বলেন। সেটা হল, মাতালের যদি বাঁচবার ইচ্ছা না থাকে তাহলেই মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে।

কেরিয়ার হুখে একলল মনোবিজ্ঞানী নানাবকম তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তারা বলেন যে, বহু সাহস পৈনিক ভক্তারদের আশ্রয় দেবেও নিঃসঙ্গের ওপর বিশাল হারিয়ে কোলছিল এবং সেইভাবেই তাদের মৃত্যু ঘটেছে। অথচ মারাত্মক বেগে ভুগছে, এমন কি ভক্তারের আশা ছেড়ে দিচ্ছিল যেমন রোমি কেবলমাত্র কোনো একটি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে এমন মৃত্যুও বিরল নয়।

উনিশ বছরের একটি দুবক মারাত্মক ক্যালসিয়াম আক্রান্ত হই—কিন্তু ভক্তারেরা ভেবে শেতেন না, সে কি করে বেঁচে আছে। তার হী তখন অশ্রুস্রাব ছিল আর তার ইচ্ছা ছিল যে, সে যেন পুণ্যব পূর্ণ করে মরে। হলও তাই। যেট তার পুত্র ঘৃণিত হল, সে বললো—এই দুহুর্গতির ভর্য কত হইয়া সহ করে আমি বেঁচে আছি! তার পরই তার জ্ঞান লুপ্ত হল ও অচিরেই মারা গেল। এই পর্যন্ত বেঁচে থাকবার মতো তার জীবনীশক্তি সক্ষিত ছিল।



ক্যালকাটা অপটিক্যাল কোং (প্রাইভেট) লিঃ

ফোন • ৩৫ - ১৭১৭ প্রতিষ্ঠাতা: ডাঃ কার্শিক চন্দ্র বসু গুপ্ত
গ্রাম-ক্যালকাতা • ৪৫নং আম্বার্লি স্ট্রীট • কলিকাতা-৫



আদিম যুগের গৃহস্থালি

পুষ্পবল ভট্টাচার্য

মেঘেরে কর্মস্থল—গৃহস্থালি। আধুনিক মেঘেরা পুরুষের কর্মস্থলেও অংশগ্রহণ করছেন, কিন্তু কোনো পুরুষ গৃহস্থালির কাজে অংশ নিচ্ছেন—এ দৃষ্টান্ত অস্বস্ত্য: এদেশে বিহীন। গৃহিণীরা বহন করেন—‘উদ্যাস্ত সংসারের খাটুনি খাটতে-খাটতে মারা জলাম’—বাড়ির কর্তব্যে পুনে তাদের—‘গৃহস্থালির কাজে আবার পরিভ্রম কি? এ’ত আমাদের মতন সশট-পাঁচটা খাটতে, তবে বুঝতে বাটুনি কাকে বলে?’ পুরুষেরা কোনদিনই গৃহস্থালির কাজকে ‘কাজ’ বলে মনে করেন না, কিন্তু ঋতা এবং তার মাধ্যম করে বেখেঁচেন তাঁরাই জ্ঞানেন এর জন্ত কত হুঙ্কা: কত পরিভ্রম সহ করতে হয় তাঁদের।

তবে এ কথাও ঠিক—আধুনিক যুগের গৃহস্থালির কাজ আদিম যুগের গৃহস্থালির কাজের ভুলনাথ বগেই সহজসাধ্য। আদিম যুগ বলতে আমি মানব-সভ্যতার আদিম যুগের কথাই বলছি। এ সেই যুগ—যখন মহান প্রথম গাভাঙ্কানন করতে শিখেছে পশুর ছলে দিয়ে। একলা-একলা বাস না করে হল বেঁধে ঘাঘর শিকারী-জীবন বাপন করছে। এই যুগের মেঘেরের গৃহস্থালি কিরকম ছিল—জানবার ঠোড়হল হয় আমাদের। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এ সম্বন্ধে বেশ-সব সমাধা সরবরাহ করেছেন, তা থেকে আমরা জানতে পারি—আধুনিক যুগের চাক ও কাজ শিল্প, বস্ত্র-নির্মাণ প্রণালী, চর্ম-শিল্প, মাটির বাপন প্রস্তুত প্রণালী আর এত ধরনের আরো অনেকরকম ‘ইনডাস্ট্রি’ প্রথম আবিষ্কারী আদিম যুগের নারীরা। গৃহস্থালির নানা অয়োজনে নানা সময়ে তাঁরা এইসব শিল্প বা ‘ইনডাস্ট্রি’ আবিষ্কার করেছেন।

একবার কখনা করুন, সেই আদিম যুগের নরনারীর জীবনযাত্রার কথা। বড় বড় মসীকর ও লতাপাতার নিবিড় অরণ্যে চলেছে একদল বিশালকাষ গ্রাছ-পত্রবৎ নরনারী। পুরুষেরা অস্বপ্নর নিয়ে ঘিরে রেখেছে নারী ও শিশুদের, যাতে অতর্কিতে কোনো হিংস্র পশু অথবা শত্রু

তাদের আক্রমণ না করতে পারে। মেঘেরা শুধু যে বেগুনের শিশুকৈই বহন করছে, এ নয়। তাদের লালারেরেবাব্রীত হুবা, বাবার, চামড়ার তাঁবু ইত্যাদি সবই তারা বহন করে নিয়ে চলেছে।

পূর্বনির্দিষ্ট কোনো একস্থানে এসে সশট-পাঁচটা পুরুষেরা কেউ করতে বিশ্রাম, কেউ গিয়েছে শিকারের লন্ডানে—আর নারীরা অস্তিত্ব করেছে তাদের গৃহস্থালির কাজ। কাছে কোনো প্রাকৃতিক গুহা থাকলে, তালাই—নইলে বড় বড় গাছের ডাল ভেঙে মাটিতে খুঁতে তাঁরা উপর ঘাসপাতা বা পশুচর্মের আচ্ছাদন দিয়ে তাঁবু তৈরি করতো মেঘেরা। এই তাঁবু তাদের শিশুদের নীতাতপ থেকে রক্ষা করবে। এখনেই হবে তাদের ভাতাও: সংরক্ষিত পশুমাংস, আহৃত্রিত ফলমূল, নদী বা জলনা থেকে সংরক্ষিত জল সবই থাকবে এই ভাতারে। পশুচর্ম থেকে এই ধরনের তাঁবু মেঘেরা তৈরি করে নিত। পুরুষদের, ছেলে-মেঘেরের, নিজস্বের চর্ম-নির্মিত গাভাবরণ—তা’ও এই মেঘেরা তৈরি করত।

ছাড়ের খুঁচ আর পশুর অঙ্গ অঙ্গ: লতাতর দিয়ে চামড়া সেগাই করে মেঘেরা তৈরি করত জল-বহনের পাত্র, ফলমূল ও শিশুদের বহনোপযোগী বড় বড় থল। তাদের খুঁচ আর তার সঙ্গে কাবহরের বেগা পশুর অঙ্গ অঙ্গ: লতাতরুর খুঁচও মেঘেরা আবিষ্কার করে। কুত পশুর গা থেকে চামড়া ছাড়িয়ে, সেই চামড়া পত্রিকার ক’রে তুলিয়ে, চর্বি বাগিয়ে ঘরন ক’রে নানা কাজের উপযোগী করার আকিঙ্ক উপায়—সবই এই মেঘেরের নিজস্বই আবিষ্কার।

এ যুগে যদিও শিকারের অভাব ছিল না, তবু বশীকাল ও অজ্ঞাত অসময়ের জন্ত আদিম নারীরা বাঁসে তুলিয়ে, ফলমূল সংগ্রহ করে রাখত। আভনের ব্যবহার আদিগার খবার পর মেঘেরা করেন। আভনে মসলে, কখনো ঘোঁরাও তুলিয়ে

মাংস সংরক্ষণ করত। রন্ধনপাত্র আবিষ্কৃত হবার আগে এক অমৃত উপায়ে মাংস রান্নাও এই মেয়েরা। মাটিতে গর্ত করে, তাতে জল ও মাংসের টুকরা রেখে, উপর থেকে জলন্ত পানির বেশত সেট গর্তের ভেতর। এই উপায়ে তারা মাংস নিষ্কৃত করত। এর পর অভিজ্ঞতা বাড়ার কলে এই যুগের মেয়েরাই প্রথম উত্তুন আর মাটির রন্ধনপাত্র প্রস্তুত করে।

পুষ্করেরা শিকার করে যে-সব পশু আনত—তাদের ছাগ-ছাড়ানো, মাংস-কাটা এমন কাজই ছিল মেয়েদের। এই কাজের জন্ত তারা পাখরের তুরি আর মাংস চোঁচে চামড়া পরিষ্কার করবার পাখরের নানা ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করত। পাখরের এই তুরি ও অস্ত্র রহস্যপূর্ণ এই মেয়েরাই তৈরি করে নিত। এ ছাড়াও গৃহস্থালির অন্তর্গত বাসনপত্রও তারা পাখর অবদান মাটি দিয়ে তৈরি করত।

পাখর ছাড়া, পাছের ডাল ও লতাপাতাও গৃহস্থালির নানা কাজে লাগাত মেয়েরা। পাছের সব সর ডাল আর লতার সাহায্যে তারা তৈরি করত পশু রাখবার ডালা। এই ডালার গায়ে মাটি লেপন করে সেগুলিকে এমনই শক্ত করে তুলত যে, হরকালের সময়ে তাতে জল সাঝাও চলত। প্রত্যয়িকেরা আশঙ্ক করেন, হয়তো কোনো সময়ে ডালার উপরের মাটির আবরণ ডালা থেকে আলাদা হয়ে একটি স্বতন্ত্র বাসনের আকার নেয়। এই ঘটনা থেকেই আদিম নারী মাটির বাসন-প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কার করে। পুষ্করেরা চক দিয়ে মাটির বাসন প্রস্তুত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করার আগে মেয়েরাই তাদের গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় বাসন তৈরি করে নিত।

চামড়ার জপ-বাহন পাত্র ছাড়াও বড় বড় তরুনো পাউরের গোলের বাইরে মাটি মাগিয়ে জলপাত্র প্রস্তুত করত আদিম নারী।

দল ও পরিবারের জন্ত ফলমূল ও শস্যবীজ সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত আদিম নারীরা একদিন আবিষ্কার করল পশুরোশন-প্রণালী। এর পর তারা নিজেদের বাসস্থানের

চারদিক প্রয়োজনমতো খুঁড়ে নানা শস্যবীজ, মূল ও ফলের গাছ লাগিয়ে পৃথিবীতে প্রথম চাষ-প্রথা আরম্ভ করে। চাষ করতে আরম্ভ করে আদিম নারী নানাপ্রকার লতাপাতা ও ফলমূলের রোগ-নিবারক ও বৈদিক ঝাড়াবর্ষক তপের আবিষ্কার করে। তারা নানা ধরনের মূল শেখর কুঁরে লেহ-বনের উত্তেজক ও স্নাত্তি-নিবারক পানীয় প্রস্তুত করতে আরম্ভ করে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে, পৃথিবীর প্রথম চিকিৎসক-সম্প্রদায় ছিল আদিম নারীরাই।

পুষ্করেরা শিকার করতে গিয়ে যে-সব জীবিত পশু ও পক্ষীপাখি ধরে আনত, তাদের গালন করত আদিম নারীরাই। যদিও এইসব পশু পুষ্করের সম্পত্তি বলেই গণ্য হত। পশুগালনে নিযুক্ত নারীরাই জাগল ও তেড়ার লোম ব্যবহার করে পশম ও পুনমে প্রস্তুত নানাপ্রকার বস্ত্র-নির্মাণ প্রচলিত করে। পালিত পশুর হৃদয়ের ব্যবহারও তারাষ্ট আরম্ভ করে।

নারী তিরমিনেই দৌকশ্রিয়। তাই আদিম যুগের মেয়েরাও তাদের তৈরী মাটির ও চামড়ার ত্রব্যাদির উপর নানা ধরনের নকশা তৈরি করত। প্রস্তর-যুগের মেয়েদের প্রস্তুত নকশা-আকা যে-সব ত্রব্যাদি পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে তাদের শিল্পী-বনের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই ভাবেই সেই আদিম যুগ থেকে এ পর্যন্ত গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ত্রব্যাদি সংগ্রহ ক'রে, প্রয়োজনমতো নিক্ষেপা নির্মাণ ক'রে নারী তার গৃহস্থালিকে হ্রস্বভর, স্থায়ী ও উপযোগী করে ছেলেছে।

নারী-জাতিকে প্রায়ই গৃহগতপ্রাণা বলে উপহাস করা হয়। কিন্তু গৃহগতপ্রাণা হলেও, তারা অলস নয়। গৃহস্থানিই তাদের বিদ্যাবিহীন কর্মস্থল। পুষ্করের কর্মস্থলে কালের একটা নির্দিষ্ট সময় ও পায়িত্ত্ববিক আছে, কিন্তু বাড়ির গৃহিণীদের বিদ্যাবিহীন কর্মের না আছে নির্দিষ্ট সময়, না বেগুনা হয় তাদের কালের বখাখোপা মূল্য বা মীকুতি। এই প্রথাই চলে আসছে সেই প্রস্তর-যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত।

নতুন বই

। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলায় স্থান ।

[লেখক : শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় । প্রকাশক : শ্রীমদভূবন সাহ্য পত্র পুস্তকালয়,
৩, কলম্বো পোয়ায়, কলিকাতা ১২ । মূল্য : পয়চ তিন টাকা]

হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করার বিপক্ষে যখন ভারতের নানান দিকে প্রবল আলোড়ন চলছে, তখন এই ভাষাটির সাহিত্য-সম্পদ সম্পর্কে জানার আগ্রহ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অবশ্য জানার মধ্যে কী ভুল থাকলে বা ভাষায় সাহিত্য-সম্পদ কী পরিমাণ থাকলে তাকে রাষ্ট্রভাষার শিরোপা দেওয়া যায়, অথবা রাষ্ট্রভাষা হবার যোগ্যতা কী, মানবও কী—সে বিষয় এখানে আমাদের আলোচনার বাইরে।

রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে গ্রিক যখন একটি প্রবল আলোড়ন চলছে, সেই সময় এই বইটি হাতে পেয়ে অগ্রাহ্য নিয়ে পাঠ করলাম, বিশ্রবের সঙ্গে দেখলাম, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় হিন্দী সাহিত্যকে একেবারে পথে বলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর উদ্ধৃতি, তাঁর সূক্তি ও তাঁর তথ্য এমনভাবে পাকা আইন-ব্যবহারীর মতো দিগন্ত বেষ্টনী করে উপায় নেই—হিন্দী সাহিত্য ও সবাদপত্র গড়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের অমুখাবের এবং ব্যাঙ্গালীর চোঁটার পরিণতি রূপে। লেখকের আবেগ কৃত্রিম এই যে, তিনি বাংলা ও হিন্দীর এই যোগাযোগের উৎসমূল পর্যন্ত গিয়েছেন, তিনি দেখিয়েছেন রেলপথের যোগাযোগ, উহু নাটকের ব্যর্থতা ও হিন্দী ভাষার উপর মুসলমানগণের মনোভাব প্রকৃতি কয়েকটি ঐতিহাসিক কারণের জল্প হিন্দী সাহিত্যের লেখকেরা বাংলায় দিকে বলি-হাতে এগিয়েছিলেন।

এক্ষেণে একটি কথা বিনীতভাবে বলা প্রয়োজন মনে করি যে, ব্যক্তিগতভাবে আমি, হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে কি বিপক্ষে, সে প্রশ্ন নিয়ে আগছি না। আমার বলার কথা হ'ল, কেবলমাত্র অমুখাব বা ছাত্র অবলম্বনে রচনা—একটি ভাষার সাহিত্যের গড়ে ওঠার পক্ষে প্রথমতম

উপাদান হলে তা গৌরবের কিন্নর, এবং সেই ভাষা কোনো যুগে সম্মানের দাবি করতে পারে কিন্নর।

লেখক হিন্দী সাহিত্যকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্ব ১৮৯৮-১৮৯৩, দ্বিতীয় পর্ব ১৮৯৩-১৯১৮, এবং তৃতীয় পর্ব ১৯১৮ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। হিন্দী সাহিত্যের প্রথম লেখক ভারতেই হরিশঙ্কর ১৮৯৮ সালে 'বিদ্যাহর'—এর অমুখাব করেন। মুদ্রাদাব্যে তাঁর কিছু সম্পত্তি ছিল। ভারতেই তাঁর অমুখাবীদের বললেন—“বঙ্গভাষার অমুখ রাষ্ট্রভাষার সাহায্যে হিন্দী ভাষার উন্নতি করতে”। এই গেল প্রথম পর্ব।

দ্বিতীয় পর্বেও এই অমুখাব চলতে লাগল এবং ক্রমশঃ কখনও স্বীকৃতি না জানিয়েই। অমুখাবের সু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

“মলিন মুখভ্রম্য ভাগত তোমারি” (“মলিন মুখ ভাগত-মাতা তোমারি”) “ভাগতমাতা” গ্রন্থের একটি সংলাপ :

“সাহেব—রে হুশার হুহু-গুগল—এইজ্ঞাই কি আমবা তোমার জানলান করেছি ? রে নরাদম রাজবিশ্রোহিগণ, মহারানীকে ভাগতে তোমের অমুখার ভয়সকার হোলনা। ওঃ, এমন জানলে কে তোমের লেগাপড়া পেবাতে ?”

অমুখাব :

“সাহেব (তর্জনগর্ভন পূর্বক)—রে হুশার হুহু-গুগল ! ক্যা ইনী হেহু হমনে তুম লোগোকা জান চহু দিয়া হৈ ? রে নরাদম ! মহারানীকে পুকারণে হৈ তুম লোগোকা তনিক ভী ভয় কা সকার নহী হোত ! উহ যদি ঐসাই জানতে তো ক্যা হম তুম লোগো কো লিগনা পড়ন : লিখাত ?”

এ কথাও কোনো লেখক দাবি করেছেন যে, এটি বাংলা-গ্রন্থ ‘ভাগতমাতা’র ভিত্তিতে রচিত। অমুখাব নহে।

ভূতীয় পথে হু-একজন প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব হয়। তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় ঔপন্যাসিক প্রেমচন্দ্রের এবং নাটকের ক্ষেত্রে জয়শংকর প্রসাদের। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে এখনও অসংকিত থেকে গেল। অনূদিত হু-একটি কবিতার উদাহরণ তুলে দিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত লাইন—

“পাগল হইয়া বনে বনে কিরি আগুন গরুর ঘম
কহরীকুগলম...” (উৎসর্গ)

ছায়া-অবলম্বনে (?)

“পাগল হই বৈ অগ্নীহী গছ সে
কহরী কুগল জৈনী...”।

অন্ত একটি উদাহরণ—রবীন্দ্রনাথের ‘উর্ধ্বী’ কবিতা :
“আদিব বসন্তপ্রাতে উর্ধ্বীহিমে মরিত গায়ে
ডানহাতে সুধাপাত্র বিধড়াও লয়ে বাম করে।
তরলিত মহালিঙ্গু...”

ছায়া-অবলম্বনে (?)

“আদিব বসন্ত কা প্রভাত কাল হুন্দর বা।
আই: কুম ডাইনে অনুত বাঁএ” কালকূট।
উচ্চ তরলো সে তরলিত পরোনিধি বা...”।

নাটক ও কবিতা দুপক্ষে আরো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারত, কিন্তু এখানে তা সম্ভব নয়। অবশ্য অন্তর্ধান বা ছায়া অবলম্বনে লেখা সবসময় লোভাবহ নয়। সব লেখককে তিষ্ঠু-না-তিষ্ঠু সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু লোভাবহ সেইখানে, যেখানে ছায়া-অবলম্বনে লেখার মধ্যে লেখকের নিজস্ব কোনো চরিত্র ফুটে ওঠে না, বা কোনো মস্তক ফটি হয় না। হিন্দী ভাষার প্রসার ও হিন্দী সংস্কারগতের পশ্চাতে বাঙালীর প্রচুর অবদান আছে। যখন শাসক সমাজ বা

মূলম্যান সমাজ হিন্দী ভাষাকে সমর্থন করেননি, তখন বাঙালীরাই হিন্দীকে সমর্থন জানিয়েছেন—বাঙালী কবি ডায়ডলজ হিন্দীতে কবিতা লেখার চেষ্টা করেছেন, তারিখিচরণ মিত্র ‘বৈতাল শচীন্দী’ সম্পাদনা করেছেন, রাঙ্গা রামমোহন রায় হিন্দী ভাষাকে সমর্থন করে তাঁর বহু খই হিন্দীতে অন্তর্ধান করেছেন,—বিজ্ঞাপনও, কেশবচন্দ্র সেন, ভূসেব সুধাপাধ্যায় প্রভৃতি প্রান্তঃস্থায়ী ব্যক্তিগণ হিন্দীকে সমর্থন করেছেন, এবং পত্র-পত্রিকাতে লিখেছেন। প্রথম হিন্দী সাময়িকপত্র ‘মুণ্ডী বোলী’ বাঙালীর সম্পাদনার প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় হিন্দী সংবাদপত্র ‘বনংত’ রাঙ্গা রামমোহন রায়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। হিন্দীর প্রথম মহিলা-পত্রিকা ‘হুগুহিনী’ও বাঙালী মহিলার চেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছিল।

অন্তএব এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, হিন্দী সাহিত্যে—বাংলা ভাষা ও বাঙালী একটি অগুণীয়া স্থান জুড়ে আছে। আরকের ভাষার অন্ধের দিনে দে-কথা তুলে বাওয়া উচিত নয়।

অধ্যাপক শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়ের এই গবেষণামূলক গ্রন্থটিকে একটি অসূর্য সম্পদ বলে মনে হয়। অত্যন্ত নিপুণ বিশ্লেষণ ও পরিমিত তথ্যের উল্লেখ—গ্রন্থটির মূল্যবোধি করেছে। লেখক কোথাও তাঁর নিজের মতামত পাঠকের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেননি—তুখু তথ্যের উল্লেখ করে তিনি আড়ালে সরে গেছেন, অর্থাৎ পাঠককে তাঁর নিজের মত গড়ে তোলায় স্বাধীনতা দিয়েছেন। এটি একটি বড়ো সংবেদনের লক্ষণ। খইটি স্থখী সমাজে সমাদৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

প্রমুদমতি হুন্দর।

—হুজুর্গ মাইতি

পরিপাটি মুদ্রণ

জানু

নিখুঁত ব্লক-তৈরির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

॥ কালার স্টুডিও ॥

৪২, মহেন্দ্র গোস্বামী সেন, কলিকাতা ৬

ফোন : ৫৫-৪৬০৭

মঞ্চ-দর্শন

চিত্রলোক

পদ্মনাভ

ডাকহরকরা

প্রযোজনা ও পরিচালনা : অগ্রগামী। স্বরূপোপ : স্বর্গীয় বাপগুপ্ত। কাহিনী : ভায়াসবর বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্র-চিত্রণ : কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, শান্তিবেব ঘোষ, চিত্রাঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাধর বসু, মনি শ্রীবাসী, জহর বায়, শোভা সেন, সারিত্রী চট্টোপাধ্যায়, কমলা অধিকারী ও আরো অনেকে।

গ্রাম-বাংলার সরল চারী বীনবন্ধু দাস। চাষ-আবাদ করেই তার দিন কাটছিল। জমিদারের কৃপায় ছুটলো ডাকহরকরার কাজ। একমাত্র সম্ভাব্য নিতাইচরণের মুখের দিকে তাকিয়ে বীনবন্ধু ডবল বাটুনি খাটে। যাতে ডাকহরকরার কাজ করে, মিনে চালায় লাঠল। ঘীরে ঘীরে তার অবস্থা খিরলো—কমি হোলো, নতুন আউচাল উঠলো। কিন্তু নতুন এক সম্ভা এসে ধাঁড়ালো দীহুর সামনে। পুত্র নিতাই না চাষ চানী হতে, না চাষ ডাকহরকরার কাজ নিতে। তার একমাত্র বধ বেটহুগাড়ির ডাইভার হওয়া। দীহুর হাজার চেটেতেও তার বত খিরলো না। সম্ভা আরো জটিল হোলো বাসিনীর আবির্ভাবে। ভাছ উপলক্ষে নাচবার জন্তে নিতাই তাকে নহর থেকে গ্রামে এনেছিল। বাসিনীর প্রেমে পড়ে নিতাই তাকে চাইলো বিয়ে করতে। কিন্তু বাসিনী গ্রামের হুঁড়ঘরে থাকতে রাজী নয়। নিতাই দীহুর কাছে টাকা চাইলো বোট-ডাইভারের লাইসেন্স করার জন্তে। টাকা নিয়ে মনোমালিন্য হোলো পিতাপুত্রে। নিতাইয়ের মূখ চেয়ে এবং বাসিনীর হাত থেকে তাকে উদ্ধার করবার জন্তে জমি বিক্রি করে টাকা নিয়ে এলো দীহু। কিন্তু নিতাই তখন ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে। সেইদিন রাতেই ডাক নিয়ে বাবার মনর অকোষ হোলো দীহু। মুখে কাপড়-বাঁধা একটি লোক তার ডাকের বসি, বার মর্যো হুঁহাঙ্কার টাকার ইলিগুই আছে, দুই করবার চেটা করলো। কিন্তু দীহু অজ্ঞান

শক্তিতে সেটা হুকে অকোষে রাখায় এবং লোকের সাড়া পাওয়ায়, লোকটী দীহুকে দাড়ির বাড়ি মেয়ে উদ্ধাঙ হোলো। বেহঁস শীতকে নিয়ে আশা হোলো ভাসনাতে। সেতার মান রাখতে সে প্রকাশ করলো তার পুত্র নিতাইচরণটী মেটী অজ্ঞাত আততায়ী। দীহু হুহু হোলো, কিন্তু খিরে শেলো না পূর্বনৈম-দিনের দ্রুত। কেবরানী নিতাই। তার চিন্তাতেই নিতাইয়ের না শেখনিখাস কেললো। শীত বখারীতি ডাকহরকরার কাজ করে আর খোজ করে নিতাইয়ের। অবশেষে একদিন খোজ মিললো। বুকের সময় কাছাকী লম্বর হিসেবে অশরের গ্রাণ বাঁচাতে নিছের গ্রাণ দিয়েছে নিতাই। এই হোলো সংশ্লিষ্ট কাহিনী।

সম্পূর্ণরূপে গ্রাম্য পরিবেশে তোলা 'ডাকহরকরা' ছবিটির মূল সম্পদ নাম-ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়। এমন বদন দ্বিগে তিনি অভিনয় করেছেন যে, মনে হয়, গ্রামের অনিশ্চিত ডাকহরকরা তার সং-কিছু আশ-আকাঙ্ক্ষা, হুহুঃখের পরদা নিয়ে সামনে এসে ধাঁড়িয়েছে মহাহুঁড়িত পাওয়ার আশায়। ঈশানী কালের ভারতীয় ছবিতে এরকম প্রাণঢালা অভিনয় বহুদিন দেখিনি। সমগ্র ছবিটি একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এবং এর অভিনয়ের কাছে অজ্ঞান সহ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় যথেষ্ট জ্ঞান হয়ে গিয়েছে। বাংলা চিত্র-জগতের অনেক কিছু বৈজ্ঞানিক বাস্তব, দার্শনিক শিল্পশক্তি যে একমাত্র বাংলাদেশেই সম্ভব তার প্রমাণ আরো একবার পাওয়া গেল আশ্চর্যকর তরুণ পরিচালক-গোষ্ঠী 'অগ্রগামী'-পরিচালিত এই ছবিটিতে। অভিনয়, কলাকৌশল এবং সঙ্গীতের সুসমবহের ফলে এমন একটি পরিচ্ছন্ন ছবি তৈরি হয়েছে যা চিত্রগমিকদের মন থেকে সহজে বিদ্যুত হবার নয়। প্রায় পুরো ছবিটিই কুঁড়িঘোর বাইরে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে তোলায় কলে কোনোদিকম কৃত্রিমতা হুহু

সহজ পরিবেশকে আড়ষ্ট করতে পারেনি। অভিনয়ের দিক থেকে কালী বক্ষোপাধ্যায়ের পরেই নাথকণ্ডা যেতে পারে শোভা সেন, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, এবং নিতাইয়ের চরিত্রে যে শিল্পীটি অভিনয় করেছেন তাঁর। বাড়ির চুম্বিকার শান্তির ঘর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাহিনীকারের নিজের লেখা পট্টাভিতিগুলির সুপ্রায়োগ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেওয়ার সাহায্যেই সত্যিকারের সত্য-পরিচালক যে দুইশতাব্দীর পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষ প্রশংসার সাধি রাখে। বাংলা চলচ্চিত্রের গত্যুপগতিগততার পথ ছেড়ে যদিও পথক্ষেপে নতুন পথে অভিনয়ের প্রথম কৃতির পদশ্রী সত্যজিৎ রায়ের। নতুন পথের দিশারী তিনি। তাঁর প্রদর্শিত পথে অনেকেই তরুণ হয়েছেন যাত্রা। সুতরাং সমকালীন বাংলা চবিত্তে তাঁর প্রদর্শিত ধারার ছাপ দেখতে পাওয়া বিচিত্র নয়। 'ডাক-হরকরা'ও এর ব্যতিক্রম নয়। 'পথের পাঁচালী'র প্রত্যাব প্রত্যাক্ষভাবে না হোলেও, পরোক্ষভাবে এতে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ-কথা অনস্বীকার্য যে, 'ডাকহরকরা' নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই বিশিষ্টতা অর্জন করতে পারবে। তবে

একটা কথা এখানে না বলে পারছি না। সেটা হোলো এই যে, কতকগুলি অনাবশ্যক অংশ বাদ দিয়ে ছবিটিকে আগে একই স্ফলঙ্গন নিচোলা রূপ দেওয়া যেতো। অথচ 'অগ্রগামী'-গোষ্ঠী তরুণ, এঁদের পূর্ণতা লাভ করতে আরো কিছুদিন লাগবে। তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'ডাকহরকরা'। এই ছবিটির মধ্যেই তরুণতার পরিচালকের। তাঁদের শিল্পপটের স্বাক্ষর হৃদয়ভাবে এঁকে দিয়েছেন। এ কথা মিশ্রাংশে বলা যেতে পারে যে, আগামী দিনের বাঙালী সর্বকোষ এঁদের কাছ থেকে নতুন-কিছুই প্রত্যাশার থাকলে নিরাশ হবেন না। 'ডাকহরকরা'র মধ্যে যে-কিনিসিটি বেশি করে চোখে পড়েছে—সেটি হোলো এর শিল্পী, কলাকুশলী ও সুবতার প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ মনস্তত্ত্ব প্রচেষ্টা। মনস্তত্ত্ব প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণের ফলেই চলচ্চিত্র পূর্ণ শাস্ত্রীয় অর্জন করতে পারে। সেদিক থেকে ছবিটি যে সার্থক, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। সেই সার্থকতাই বাংলা চিত্রঙ্গণতে নতুন সংযোজন হিসেবে 'ডাকহরকরা'কে এনে দেবে বর্ষক-সাধারণের অভিমত। কোনো চিত্র-নির্ধাতা এর বেশি আর কি আশা করতে পারেন?

৷ আ গা রী আ ক র্ষ ৷

গরীবের মেয়ে

বাংলা কথা-সাহিত্যে বেক'জন মহিলা সেখিলা জনশ্রিত্যে অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। অমরুণা দেবী। তাঁর অনেকগুলি রচনাই চিত্রায়িত হয়েছে ইতোপূর্বে। সম্রাতি 'আজ প্রোডাকশন' অমরুণা দেবীর বহুজন-পঠিত সামাজিক উপভাস 'দরীবারের মেয়ে'-কে পর্দার তুলে ধরবার প্রচেষ্টা করছেন। হুঁ কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পরিচালনা ও দরীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন বখাক্সে অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেবেন ছবি বিবাস, আশীষকুমার, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী চক্রবর্তী, বীরাঙ্গ ভট্টাচার্য, জহর দাস, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় শোভা সেন, সবিতা চট্টোপাধ্যায় ও রেণুকা দাস প্রভৃতি শিল্পী।

ঐশ্রীমা

পদ্মপুত্র ঠাঁহুর রসককের পদ্মপ্রকৃতি সাহায্যদিত পুণ্যকালিনী অবদান করে 'রাশি রাসদর্শি'-র্যাত

পরিচালক কালীপ্রসাদ ঘোষ 'ঐশ্রীমা' নামে একগানি ছবি তুলছেন। নাম-চুম্বিকার বেধা বাবে প্রতিভাযশী অভিনেত্রী অমৃততা গুপ্তাকে। অমৃততা চুম্বিকার গুরুদাস বক্ষোপাধ্যায়, কীবেন বহু, ভাওরী দেবী, গাছাড়ী সত্যাল ও অমৃততা জনপ্রিয় শিল্পীদের বেধা বাবে। এই পুণ্যচিত্রের দরীত-পরিচালনা করছেন অমিল বাগচী।

মিতালী

বহুদর্শী প্রযোজক বি.এল. খেবকা 'মিতালী' নামে একটি ছবি তুলবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন বিজন ভট্টাচার্য। পরিচালনা ও সুবয়োজন্যের দায়িত্ব নিয়েছেন বখাক্সে চিত্ত বহু ও নটিকেন্তা ঘোষ। নামক-নামিকার চুম্বিকার উত্তরকুমার ও অমরুণা মুখোপাধ্যায়কে বেধা বাবে। অমৃততা চরিত্রে বাংলা চিত্রশিল্পের জনপ্রিয় শিল্পীদের বেধা বাবে।

বহুত মিনতি

বাংলা চিত্রশিল্পের বর্তমান জনপ্রিয় নট উত্তরকুমারের চিত্র-প্রযোজন-প্রতিষ্ঠান 'আলোছায়া প্রোডাকশন'-এর

পরবর্তী ছবি 'বহুত মিনতি' খ্যাতনামা কাহিনীকার সুবোধ ঘোষের কাহিনী-অবলম্বনে তোলা হবে। ছবিটি পরিচালনা করবেন অক্ষয় কর এবং হরাতোপ করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। প্রধান ভূমিকায় রূপ দেবেন উত্তমকুমার ও প্রচিরা সেন। এসম্বন্ধে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'আলোছায়া প্রোডাকশন'-এর প্রথম ছবি 'হায়ানো হর' জনপ্রিয়তার দিক থেকে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল।

স্বাক্ষরানী থেকে

রূপ-কাহিনীকার নিকোলাই গোগল-এর 'ইলদেইর স্কেনারেল' কাহিনীকে ভিত্তি করে পরিচালক নির্মল মিত্র 'স্বাক্ষরানী থেকে' নামে একখানি ছবি-তোলায় কাজে ব্যস্ত আছেন। এই চিত্রনাট্য রচনা করেছেন কুশল সেন। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেবেন কলী বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কু দে, উৎকল দত্ত ও নবাগতা যজ্ঞলা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পী।

স্বরণ থাকতে পারে যে, কতক বছর আগে 'ইলদেইর স্কেনারেল' ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে ড্যানী কো প্রনাম অর্জন করেছিলেন। 'স্বাক্ষরানী থেকে' কিন্তু বোটেই ইংরেজী ছবির বাংলা সংস্করণ নয়। এটি সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টিতরী এবং আর্থিক নিয়ে তোলা হচ্ছে।

মা লক্ষ্মী

সম্প্রতি ভক্তিবল্লভ ছবি-তোলায় দিকে বেন প্রযোজকদের দৃষ্টি একটু বেশি করে বাড়ে বলে মনে হয়। উপাহরণ—নবাগত প্রযোজক গৌর গোখরাইর প্রযোজিত ছবি 'মা লক্ষ্মী'। কয়েকদিন আগে হরি ভঞ্জে পরিচালনায় ইন্ডুস্ট্রী স্টুডিওতে ছবিগুলির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেবেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বিলাস, হীরাব তট্টাচার্য, শিখারঙ্গী বাগ, জয়ন্তী সেন, নবাগত বত্র এবং দীপ্তি বার প্রভৃতি শিল্পী। সহযোগিতা করবেন কল দাপ্তর।

সঙ্গীত-অভিষ্ঠ

জুয়েলার্স



টি.জি.আড্ডি এণ্ড সন্স

৩২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬



● খুঁচুরো খবর ●

প্রখ্যাত পরিচালক বতাসিং হার 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'র পঞ্চমী অংশটুকু তোলবার আর্থিক ত্রুটিসমূহ শেষ করেছেন। বিহুতিভূষণের অপরূপ চরিত্র-সৃষ্টির পরবর্তী অংশের নাম কেওয়া হয়েছে 'অশুর সংসার'। এটির প্রযোজনা করবেন 'এপিক ফিল্ম'। অশুর চরিত্রের সঙ্গে পরিচালক রায়, শোভিত্র নামে জৈনক ছব্বর্ণন তরুণকে, আবিষ্কার করেছেন। বর্তমানে তিনি অশুর দ্বীপ ভূমিকার সঙ্গে শিল্পী নির্বাচন করতে ব্যস্ত। 'অঙ্গসামর'—এর বাকী কাজ শেষ হোগেই এই ছবির কাজ শুরু হবে বলে প্রকাশ।

দীপক বহু নামে জৈনক নবাবত পরিচালক সুখীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'অন্ত নগর' বইটিকে চিত্রায়িত করবার সিদ্ধান্ত করেছেন। লণ্ডনের প্রবাসী বাঙালী সমাজকে চিত্রিত করে এর কাহিনী রচিত। বাস্তব পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নির্মূলভাবে চিত্ররূপ দেবার সঙ্গে প্রযোজক বহু সত্যিকারের 'অন্ত নগর' অর্থাৎ লণ্ডনে গিয়ে ছবিখানি তুলবেন বলে স্থির করেছেন। নায়কের ভূমিকার উত্তমসুন্দর এবং নায়িকার ভূমিকার জৈনকা বিদেশিনীকে দেখা যাবে। পরিচালকের নির্দেশনের কাজ শেষ হোগেই, প্রযোজক কল্যাণলীনের নিয়ে পাড়ি দেবেন অন্তনগরের উদ্দেশে।

ম্যানিলাতে অস্থিত পাঁচদিনব্যাপী 'ওল্ড চলচ্চিত্র উৎসব'ে ভারতবর্ষ থেকে হুটি বহিন ছবি পাঠানো হয়েছে।

ভারত থেকে একটি কোনো মেহবুবের 'মাধার ইতিহাস', অপরটি ফিল্ম-ভিউসনের তথ্যমূলক ছবি 'বেনারস'। হলিউডের 'অক্সার' পুস্তকার-অধ্বনে অসমর্থ 'মাধার ইতিহাস' এবার 'ওল্ড চলচ্চিত্র উৎসব'ে সাফল্যলাভ করে কিনা দেখা যাক।

আগামী ১৯৬১ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শততম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে ভারত-সরকারের চলচ্চিত্র-বিভাগ একখানি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করার সিদ্ধান্ত করেছেন। কবিত্তর জীবনালেখ্য গ্রিকমতে। চিত্রায়িত করার সঙ্গে একটি উপদেষ্টা-কমিটি গঠন করা হবে। বিশিষ্ট রবীন্দ্রজ্ঞানী ব্যক্তিদের নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হবে এবং সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করবেন ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন।

ওজাহ আলিউদ্দীন খানের জীবনকাহিনী-অবলম্বনে একখানি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি করার পরিকল্পনা করেছেন তাঁর পুত্র আলী আলফর খান। বাংলা এবং হিন্দি ভাষায় পরিকল্পিত এই ছবির কাজ আগামী জুলাই মাস থেকে শুরু হবে বলে প্রকাশ। আলিউদ্দীনের জামাতা রশিদুল ও আলিউদ্দীন পরিবারের অনেকেই এই ছবিতে দেখা যাবে। কোনো জীবিত সম্রাটজের জীবনকাহিনীর চিত্র-রূপায়ণ এ-দেশে বোধহয় এই প্রথম।





মুখচিত্র

ক্রিকেট :

প্রথম টেস্ট-ম্যাচ অসীমায়িতভাবে শেষ হবার পর পর পর বিতীর্থ, তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্টে অফলাভ করে ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দল বাবার-লাভের কৃতির অর্জন করেছে। ইংলেণ্ডের সঙ্গে গত বছরের শেফিল্ডের পর এই কৃতির ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দলকে তব্বিতের আশার মোহাক জেটোবে দে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সমস্ত খেলাগুলির ফলাফল তুলিয়ে দেখলে, ব্যাটসম্যানদের কৃতিত্বই বড় করে চোখে পড়ে। খেলার মাঝে প্রচুর 'সেঞ্চুরি' হয়েছে। তবে ব্যাটেরে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে বিনিময় সফলের নৈপুণ্যকে রান করে দিয়েছেন, তিনি হলেন গ্যারিন্ড সোবার্ণ। গত বিশ্ব-বছর ধরে সেন হার্টন যে রেকর্ড করে এক অদ্বান কীর্তির অধিকারী হিসাবে অবস্থান করছিলেন, সোবার্ণ ৩৬৫ রান করে-সে-রেকর্ড ভেঙে আবার নতুন কীর্তির অধিকারী হবার গৌরব অর্জন করলেন। এ ছাড়াও তিনি চতুর্থ টেস্টের দুটি ইনিংসেই দ্ব্যাক্রমে ১২৫ ও ১১১ রান করে প্রমাণ করে দেন, তিনিও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এর পরই ১৬ ও: ১৩ মি: (দীর্ঘসময়ের রেকর্ড) খেলে ৩৩১ রান করে বিনিময় কৃতির বাক্যের বেগে গেলেন—তিনি হলেন হানিফ মুহম্মদ। নিদারুণ পরিস্থিতির মাঝে একজন সুযোগ্য ব্যাটসম্যানকে কিভাবে অতিশয়িত থাকতে হয়, তার প্রকৃত উদাহরণ হিসেবে সমগ্র ক্রিকেট-বিশ্বের কাছে ইনি অবশ্যই হয়ে রয়েছেন। এ ছাড়া আর ঝাঝা ব্যাটেরে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাঁরা হলেন—এডার্টন উইলস, ফ্রাইড ওয়ালকট, ফার্নান্দো হার্ট ও পাকিস্তানের সৈয়দ আমেদ, ওয়াকিল মাহমুদ ও ইমতিয়াজ। পাঁচটি টেস্টের মধ্যে চারটি টেস্টে ব্যাটসম্যানদের একত্রিত আধিপত্য দেখা গিয়েছে। তবে শেষের টেস্ট-ম্যাচটিতে বোলিংয়ের কৃতির দেখিয়েছেন ফজল মামুদ ও সর্বকনিষ্ঠ

টেস্ট-খেলোয়াড় নাসিদ্ গনি। একমাত্র এই পঞ্চম টেস্ট-ম্যাচটিতেই পাকিস্তান দল ১ ইনিংস ১ রানে জয়লাভ করে। অবশ্য এইটাই এদের সার্থনা যে, একেবারে সব খেলায় এদের পরাজয় বরণ করে বেগে ফিরতে হয়নি। তবুও দুটি দলের মধ্যে যেন আরো কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া উচিত ছিল। এই খেলায় পর এডার্টন উইলস ও ফ্রাইড ওয়ালকট টেস্ট-খেলা থেকে অবসরগ্রহণ করলেন। ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দলের শ্রেষ্ঠ 'আলোউ' ডু-হুইলার বিদ্যায়ের কলে এদের যে দিগন্ত অতি হ'ল, তা পূরণ হতে বহু সময় লাগবে। তবে স্মিথ, সোবার্ণ, হার্ট—এদের দেখে ওয়েস্ট-ইন্ডিজের খেলোয়াড়-সকলের গুণের যথেষ্ট আশা রাখা যায়।

এবার চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টের কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসে পাকিস্তান দল টেস্টে জিতে ৪০৮ রানে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ করলো। প্রত্যুত্তরে ওয়েস্ট-ইন্ডিজ ৪১০ রানে তাদের প্রাথমিক খেলা শেষ করলো। বিতীর্থবাদের খেলায় ৩১৮ রানে ইনিংস শেষ করে পাকিস্তানকে দীতিমতে: বিপর্যয়ের সন্মুখীন হতে হ'ল। জবাবে, ২ উইকেটে ৩১৭ রান করে ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দল 'বাবার' লাভ করলো।

এবার পঞ্চম টেস্ট—গোটা পাকিস্তান দলের একটিমাত্র দলগত কৃতির—সে বিবরণ বলি। ওয়াল মার্চে বিভাজন অব্যাহার মধ্যেই পঞ্চম টেস্ট শুরু হ'ল। কিন্তু এবার আর ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দলের ব্যাটসম্যানরা তাঁদের পূর্ব খেলা অনুযায়ী ঐক্যেতে পারলেন না। ফলে, প্রথম ইনিংসে ২৬৮ রানের বেশী রান তোলা আর সম্ভব হ'ল না। পাকিস্তান দলের কুতী ও খাতেনামা বোলার ফজল মামুদ তাঁর দুর্ভাগ্যাক্রম-প্রচণ্ড ৮০ রানে ৬টি উইকেট দখল করলেন। এর পর পাকিস্তান দল এ-সুযোগগ্রহণে আর তুল না করে পূর্ব পরাজয়গুলির

প্রতিপক্ষের ক্ষয় আশ্রয় চেষ্টা করে ৪২৬ বান হুলগো।
 দ্বিতীয় ইনিংসেও পত চেষ্টা শেষেও ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দল
 ২২৭ রানের বেশী হুলগে সক্ষম হ'ল না। এবারও তাদের
 সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে ষাড়াগেলেন কনিষ্ঠ টেস্ট-
 খেলোয়াড় নাসিমুল গনি। ইনি মাত্র ৬৭ রানে ৬টি উইকেট
 দখল করলেন। ফলে, ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দল ১ ইনিংস ১ রানে
 পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল। এ পরাজয় উইক্‌স ও
 ওয়ালকটের পক্ষে খেলজনক হলেও, কারদার ও
 বান মহম্মদের পক্ষে বৃহত্তর আশ্বাসের বিধে। কারণ,
 অধিনায়ক কারদার ও বান মহম্মদও এই খেলায় পর
 থেকে তাদের টেস্ট-খেলা সমাপ্ত করলেন।

নীচে চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টের সাক্ষিত্র ফলাফল
 দেওয়া হ'ল :

চতুর্থ টেস্ট

পাকিস্তান—প্রথম ইনিংস ৬০৮

(সৈয়দ আবেদ ১৪০, হানিফ মহম্মদ ৭২, ফজল
 মাদ্দু ৩২, ইমতিয়াক আবেদ ৩২, ফোশি শিখ
 ৭৪ রানে ৩ উইকেট, গিব্‌স ৪৬ রানে ২ উইকেট)

— আফ্রিক স্কোর হ'ল :—

পশ্চিম ব্যাংকের আফ্রিক হুয়ানহী, সমাজবাদী
 নেতা ও জননায়ক

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের

বিবিসিগাত পুস্তক ওয়েস্ট-ইন্ডিজের
 বঙ্গোদ্ধাব

আজকের পশ্চিম

৪'৪০

"বিহার জাত নেই একথা সত্য, কিন্তু তাই বলে culture
 হিনিষ্টারও জাত নেই একথা কিছুতেই সত্য নয়।"

শরৎচন্দ্র—দেশ ও সমাজ

—নোমোস্ত নাথ ঠাকুর

২'০০

বোরোবুচ্ছরের ডাক—ইন্দিরা দেবী

২'০০

নাক নিয়ে নাকাল—শিবরাম চক্রবর্তী

২'০০

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

৩০, মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৪-২০৮৬

ওয়েস্ট-ইন্ডিজ—প্রথম ইনিংস ৪১০

(গারফিন্দ মোবারক ১২৫, ওয়ালকট ১৪৫, উইক্‌স
 ৪২, নাসিমুল গনি ১১৬ রানে ৪ উইকেট)

পাকিস্তান—দ্বিতীয় ইনিংস ৩১৮

(ওয়ালিজ মহম্মদ ৮১-আউট ১৭, আলিমুদ্দিন ৬১,
 গিব্‌স ৬০ রানে ৪ উইকেট)

ওয়েস্ট-ইন্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস ৩১৭ (২ উইকেট)

(হাকি ১৪৪, গারফিন্দ মোবারক ১০২, কান্‌হাই ৬২)

ওয়েস্ট-ইন্ডিজ ৮ উইকেটে জয়ী।

পঞ্চম টেস্ট

ওয়েস্ট-ইন্ডিজ—প্রথম ইনিংস ২৩৮

(ফোশি শিখ ৮৬, উইক্‌স ৪১, ওয়ালকট ৪৭, ফজল
 মাদ্দু ৮৩ রানে ৩ উইকেট, নাসিমুল গনি ৪৩ রানে
 ২ উইকেট)

পাকিস্তান—প্রথম ইনিংস ৪২৬

(ওয়ালিজ মহম্মদ ১৮২, সৈয়দ আবেদ ১৭, হানিফ
 ৪৪, টেলার ১০২ রানে ৪ উইকেট, গিব্‌স ১০৮ রানে
 ৪ উইকেট)

ওয়েস্ট-ইন্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস ২২৭

(ওয়ালকট ৬২, কান্‌হাই ৪৩, হাকি ৪৫, নাসিমুল
 গনি ১৭ রানে ৬ উইকেট)

পাকিস্তান ১ ইনিংস ১ রানে জয়ী।

হকি :

লীগ

এবারের হকি-লীগ যতই শেষ হয়ে আসছে, লীগের
 ওপরতলার প্রতিদ্বন্দ্বিতাও তত উত্তেজনামূলক হয়ে উঠছে।
 পনিবার, ১১শে এপ্রিল, ১৯৫৮—লীগের অন্তিম ওজনপূর্ণ
 খেলায় মহামেডান ও মোহনবাগান দল পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বি-
 ত করে, কিন্তু কোনো পক্ষই দোল করতে সক্ষম না হওয়ায়
 খেলাটি অসমাপ্তি অবস্থায় থেকে দায় এবং উত্তেজনা এই
 করে গড়েই নষ্ট হয়ে।

১৪শে এপ্রিল, ১৯৫৮—হুট ওজনপূর্ণ খেলার
 মোহনবাগান কান্টনমেন্টে ৪-১ গোলে এসং অপরাজিত
 মহামেডান ইস্টবেঙ্গলকে ১০০ গোলে পরাজিত করে।
 কান্টনমেন্ট ও ইস্টবেঙ্গল এ-বংশের লীগ-খেলায় এই সর্বপ্রথম
 পরাজিত হ'ল। এর ফলে এখন লীগ-ক্রমের দ্বিতীয় কেবল
 মোহনবাগান ও মহামেডান দল প্রতিদ্বন্দ্বিগত করবে।
 বর্তমানে মোহনবাগান ও মহামেডান উভয় দলই লীগের
 সবচেয়ে বেশী খেলায় সর্বসংখ্যক খাতিয়ে গিয়েছে, এবং লীগ-
 চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য উভয় দলকেই খেলতে হবে।

বাইটন কাপ

বাইটন কাপের তৃতীয় রাউন্ডের খেলা আরম্ভ হয়েছে। টিভিমাধ্যমে কোর অফ টেলিভিশারিং (কিরকী) কল্টমসকে এবং হাক্সম্যান অপ্রত্যাশিতভাবে পোহান স্পোর্টস (বোয়াই)-কে পরাজিত করে কোরাটোর-ফাইনালে উঠেছে। গার্মা-শেল (বোয়াই), পুদিস হার্কাস, শাকাব, সেন্ট্রাল রেলওয়ে, নর্দার্ন রেলওয়ে প্রভৃতি বহিরাগত কয়েকটি শক্তিশালী দল এবং ছবের প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে।

কলিকাতার হকিমেলার ম্যানের নিউসপি সেলে মনে হয়, এবং মনরও বহিরাগত দলটাই বাইটন-কাপে জয়লাভ করবে। এক্ষেত্রে পূর্ণকার বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান ও বোহনবাগান—তাদের পূর্ণ সুনাম বজায় রাখার জন্যে সাধ্যমতো প্রতিযোগিতা করবে, এটাই আমাদের আশা।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

গতবারের বিজয়ী রেলওয়ে দল সবিশেষ কুড়িরের সঙ্গে এবারও বিজয়ী হয়ে 'জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা'র রত্নাবলী-কাপটি লাভ করেছে। ফাইনালে তারা বোয়াই দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। আশ্চর্য, একমাত্র ফাইনাল বাবে পূর্ণকার সমস্ত খেলাগুলিই রেলওয়ে দল একেবারে

জিততে পারেনি। ফাইনালে ওরলান্ডের পক্ষে রেলওয়ে দল পান্ডিয়ালকে ১-১, ৩-০ গোলে, বাসাকে ২-২ ও ১-০ গোলে, উত্তরপ্রদেশকে ১-১, ১-১, ১-১ ও ৪-৪ গোলে এবং বোয়াইকে ১-০ গোলে পরাজিত করে। উত্তরপ্রদেশ এবার কতকটা তাদের হুঁচকোর জুড়ি পরাজিত হয়েছে বলা যায়। কারণ, রেলওয়ে দলের সঙ্গে দ্বিতীয় খেলার সময়ে উত্তরপ্রদেশের আক্রমণ-ভাগেই উৎস বাবুর গিটে এক বরষার উদয় হয়, যার ফলে তিনি পরবর্তী খেলাগুলি আর স্বাভাবিকভাবে খেলতে পারেননি। তা সত্ত্বেও তিনি এবার যে-খেলা দেখিয়েছেন—ব্যক্তিগতভাবে এখনও তিনি ভারতের সেরা খেলোয়াড়ের অঙ্কতম। সেমি-ফাইনাল বিজিত দল হুটের খেলার শাকাব উত্তর-প্রদেশকে পরাজিত করে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

টেনিস :

ডেভিস-কাপে খেলার জন্য তিনজন খেলোয়াড় ভারতীয় দলের পক্ষে নির্বাচন লাভ করেছেন : ঠাঙ্গা হেলেন—নরেশকুমার (অধিনায়ক), আর কৃষ্ণান ও এল. আশতার আলি।

প্রথম দুইদলের খেলায় জয়ী হ'য়ে ভারত পরবর্তী রাউন্ডে ইতালির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার অধিকার লাভ করেছে।

কোন : ২২-৪৬৮৭

এস, মুখার্জী এণ্ড কোং

[কাগজ ও মুদ্রণের কালি বিক্রেতা]

পি. ২২-৪, রাণাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১

শক্তিসেবাসংক :

টিটাগড় পেপার মিল্‌স কোম্পানি লিমিটেড

এবং

হংলি ইক কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড



শেষ পাত



হালুয়া বানাবার সহজ নিয়ম :

মুজিকে একটু ঘিরে ভেজে নিয়ে অল্প আলে সামান্য জল কিম্বা হুধ দিয়ে একটু সেদ্ধ করে মাখো-মাখো হলেই তিনি মিশিয়ে নেড়ে-চেড়ে নামিয়ে নিন। তার সঙ্গে কিছু কিসমিস দিলেই উত্তম হালুয়া হোলো। (উক্তি)

খাবার নিয়ম আবার আরও সহজ।
সোজা হুজি খান !

সংসারাতিজ্ঞা জটনকা লেখিকার মতে—‘প্রীতের উচিত স্বামীর নমনের মতো করে বানিয়ে নেয়া, মানিয়ে নেয়া। অনেক মেয়ে লম্বা স্বামী পছন্দ করে, অনেকে আবার বেঁটেখাটো স্বামীকেই...’



বুকেটি, আর বলতে হবে না। পিটিয়ে লম্বা করে নেয়।

‘পেট্রল-পার্টির উপর বোমা নিক্ষেপ’—
ধবরের হেডলাইন।

একটু বাড়াবাড়ি না? একটা দেশলাই
নিক্ষেপ করলেই যেখানে হয়ে যায়—!

‘এত বে মস্ত পড়িল ভ্রমর
নবমালতীর কানে,
বড় বড় যত পণ্ডিতজন

বুঝিল না তার মানে।’

(কাব্যংশ)

নিভান্তই ভ্রম গুর !

একটি দার্শনিক প্রবন্ধ থেকে :

‘এবারে গার্হস্থ্য আশ্রমের আয়োচনায় আসা
যাক। প্রথমেই প্রেম ভর্তে যে, গৃহী হওয়ার ক্ষণ
বিবাহ করা কি একান্তভাবেই আবশ্যক ?’

নিশ্চয়। গৃহী হতে হলে কারা দ্বারা গৃহীত
(কিন্তু নিগৃহীত) হতেই হবে।

“ছেলেটি নেয়েটিকে বললো, তুমি যদি আমার
বিয়ে না করো তো নিশ্চয় আমি মরে যাবো।
মরবই আমি, এ-কথা তুমি কেনে রাখো।”

(গল্পাংশ)

ছেলেটি তার কথা রেখেছিল। মারা গেছিল
সে—প্রায় বছর ষাটেক বাদে।

সরকারী ফাইলগুলি হচ্ছে হরলিক্সের মতোই।
সর্বদাই ইস্তফারা অস্পষ্ট।...বিশ্বাস করুন বা
না করুন !

মুশিদাবাদের কোথায় নাকি কোনো এক কুপে দেবতার আবির্ভাব হয়েছে। সেট কুপের ভুল পান করে তামাম্ লোকের হাবতীয় আধিব্যাবি দেরে যাচ্ছে বলে প্রচার। নরনারীরা দলে দলে সেট দেবতার (কুপমণ্ডকেশ্বর?) ধানে গিয়ে হত্যা দিয়ে পড়ছে বলে খবর।

আরেকটি অন্ধকূপহতা?

বিজ্ঞাপন : মাগুরা হাটস্কুলের প্রগান-শিক্ষক পদের লগ্ন শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ বি-এ পাস শিক্ষক চাই। বেতন মাসিক ৬০ টাকা মাত্র। —(প্রায় আশী বছর আগেকার ১৮৭৮ সালের পাঁচই আগস্ট তারিখের 'স্টেটস্ম্যান' থেকে উদ্ধৃত)

আশী বছর বাদে আমাদের শিক্ষকদের বরাতে এখনও সেই একই আশীর্বাদ!

জনসাধারণের দাবি-দাওয়া মিটাইবার কী ব্যবস্থা সরকার করিবেন? —একজনের জিজ্ঞাসা।



করবেন বইকি! দাবিয়ে মেওয়ার দাওয়াই নিয়েই করবেন।

হুইডেনের জৈনিক বৈজ্ঞানিক টক ফলকে নিষ্টি করার এক উপায় আবিষ্কার করেছেন বলে প্রকাশ।



পদ্ধতি। আমাদের রেডিয়োটক-গুলির উপর পরীক্ষা করে দেখলে হয়।

ভারতীয় প্রতীকরূপে (জৈনিক প্রাবন্ধিকের মতে) আশোকের সিংহ আদৌ সঠিক হয়নি। সিংহ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক। তার বদলে গণ-হতীর প্রতিনিধি হাতি-ই আমাদের প্রতীক হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু দিলি যে মশাই, আদালত, সে-ই হস্তি-না-পুর!

উচ্চ-রক্তচাপের রুগীর কাছে হুটি মাত্র পথ খোলা : হয়—হাওয়া খেয়ে বাঁচো, নয় খেয়ে হাওয়া হও!

আখের চোক্কা থেকে নিউজ-প্ৰিন্ট-টেরির সরকারী পরীক্ষণা সফল হয়েছে বলে জানা গেল।

এখন, খবর-কাগজগুলি আখেরে যদি সরকারের প্রতি একটুখানি হুমিষ্ট হয়!

“তেনসি: শেষ ধাপে হিলায়িকে টেনে-হিঁচড়ে চড়ায় ফুলেছিল এ-ধাধিকৈবল অসতাই নয়, হাস্যকরও বটে।” — (এক বিলিভী পত্রিকার থেকে উদ্ধৃতি)

আজ্ঞে ঠ্যা. রীতিনৈত্যই হাস্যকর। যাকে বলে, HILARIOUS !

জনৈক পুরাতাত্ত্বিকের মতে রামায়ণের যুগের লম্বা ছিল এখনকার উড়িয়াতেই।

তাঁই তো বলি, আনাদের উৎকলী ঠাকুরের রামায় এত নাহায়া কিসের? সেই লম্বার!

‘সিদ্ধনদের উপত্যকায় প্রাপ্ত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মহিষের প্রাচুর্য দেখা যায়। তাই থেকে মনে হয়, সে-যুগের রাজাদের অর্থনীতিতে মহিষের একটা মুখ্য স্থান ছিল।’ (উদ্ধৃতি)

রাজাদের অর্থনীতিতে মহিষীর স্থান মহিষের চেয়ে কোনো অংশে নূন ছিল না আশা করি।

একজনের চিঠি :

“না’ এই নেতিবাচক শব্দটির রহস্যের উন্মত্তা হয় না। কতদূর পর্যন্ত তার বিস্তার হতে পারে, কতদূর স্রষ্টা তাকে বাড়ানো যায়—তা কি কখনো ভেবে দেখেছেন?”

ঠ্যা, ভেবেচি এবং দেখেচিও। দেখেচি এবং ভেবেচিও। যেমন :

‘আপনার আবেগমগ্ন বখারীতি আমাদের হস্তগত হয়েছে। সেটি আমাদের কাইল-ভুল্ক করিয়া রাখা হইল। আপনার বিশেষ লক্ষ্যতার বিষয়গুলিও আমরা মনে রাখিলাম। আপনার উপযুক্ত পল খালি হইলে বখাসময়ে আপনাকে পত্রদ্বারা জানানো হইবে।’

বোঝারের ‘মহাপান-নিষিদ্ধ’ এলাকায় আবগারী পুলিশের মোটরগাড়ি তল্লাস করে এগারো টিন ভর্তি বিয়ারিশ গ্যালন চোরাই মদ পাওয়া গেছে বলে একটি খবরে প্রকাশ।

‘আব্ গাড়ি-নে ভি চালু হয়।’

জনৈক বামপন্থী নেতার ভাবন থেকে :

“বিশ্ব-বিপ্লবের গোড়াপত্তন হয়েছিল ফরাসী দেশে, তার মূল ছিলেন রুশো। আর সেই বিপ্লবের শেষ অধ্যায় সৃষ্টিত হবে—রচিত হবে—কার দ্বারা? এর সুসমাप्তি কে করবে বলুন তো?”

কে আবার? সেই রুশ!

একজনের শিক্ষাসা :

“বিদেশী বইয়ের নিজের ইচ্ছেমতো তর্জমা করা কি উচিত? মূল বইয়ের আসল বাদ দিয়ে, কিংবা অনেক কেটেচোটে, বদলে—অম্লবাদের নামে সেটা কি একটা অনাসৃষ্টি হয় না?”

তা, একটু বাদাম্ভবাদের সৃষ্টি হয় বইকি!

“অন্তরাজ্য-গঠনের সময় বেলায়ারি ভালুককে মহীশূরের অন্তর্ভুক্ত করার সরকারী সিদ্ধান্ত শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশনের কোনো সমর্থন পায়নি। এটাকে চুরি ছাড়া আর কিছুই তিনি মনে করেননি।” (উদ্ধৃতি)

তা, চুড়ি তো বেলায়ারি-ই হয়ে থাকে—যদু, আমি জানি।

জনৈক মনস্তাত্ত্বিকের মতে, কাউকে সত্যি করে চায় কি চায় না, মেয়েরা তা নিজেরাই নাকি অনেক সময়ে জানে না।

কিন্তু তাই বলে কি তারা আর না-চায় না?

সম্পাদক—শ্রীচন্দ্র ভট্টাচার্য

কে. সি. বহু প্রিণ্ট: ওয়ার্কস, ১১, মহেন্দ্র গোস্বামী সেন, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীক্ষেত্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত
এবং ভৎকর্তৃক ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত

বসুধারা

দ্বিতীয় অর্থ • প্রথম অংশ • দ্বিতীয় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

• সূচীপত্র •

বিষয়	পৃষ্ঠা
অচ্যুত চন্দ্রনাথ সরকার (সচিত্র জীবনী)—যোগেন্দ্র বাগল	১১৭
রবীন্দ্র জীবনলেখা (জীবন-কাহিনী)—চ্যাকচন্দ্র ভট্টাচার্য	১২০
বিক্রমার গুন (উপক্ৰাম)—বিদ্যুতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১২৭
জ্যোতিষ শিকিম (সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী)—নির্মল রত্ন রায়	১৩০
পেট্রোলিংয়ের সম্বন্ধে (সচিত্র প্রবন্ধ)—অধ্যাপক ড. সত্যজিৎপ্রসাদ গুহ	১৩৭
মরণ-প্রতিষেধিকা (গল্প)—ডাক্তার ভট্ট	১৪০
গ্রন্থাবলীর প্রাণী (বিজ্ঞান-প্রবন্ধ)—সলিল বসু	১৪৪
পুরোনো কথা [গিরিশচন্দ্র দে ('বড়ি-গিরিশবাবু') ; বিবহু ও বাতাইপুর]—হেমন্ত	১৪৯
পল্লীর বাবনাত্তা (সচিত্র প্রবন্ধ)—তুলসীদাস সিংহ	১৫১
ছোট্ট-টোটা : চলচ্চিত্র কি চলে ?—চ্যাকচন্দ্র ভট্টাচার্য	১৫২
কৃষ্ণানগর (সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী)—বিকাশকান্তি রায় চৌধুরী	১৫১
আশ্বিন (কবিতা)—সুভাষচন্দ্র মাইতি	১৬০
মোহর ও প্রেমহারা (উপক্ৰাম)—নবাবজা ভট্টাচার্য	১৬৭
অমৃতপা দেবী (সচিত্র জীবনী)—ডাঃ প্রদীপ সরকার	১৭০
পঞ্চাশতাব্দের রথের বেগে (সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী)—নির্মল দত্ত	১৭২
বৈব-প্রাক-টিং (বিজ্ঞান-প্রবন্ধ)—পরিভোজনসুখার চন্দ্র	১৭৮
অলপাইগড়ির গম্ভীরা (প্রবন্ধ)—চিত্তরত্ন দেব	১৮০
সম্বোধ (কবিতা)—সুন্দরকান মলিক	১৮৫
পাখি : উত্তরতিথি (কবিতা)—অদিত্যসুখার	১৮৭
আগ্নেয়িক (কবিতা)—গোপাল ভৌমিক	১৮৭
নতুন ইয়েরোপ : নতুন যাত্রা (ভ্রমণ-কাহিনী)—মোঃ মজিবুল	১৮৮
হাটে হাড়ি-ভাড়া (কাহিনী)—শ্রীমতী : মঞ্জীন্দ্র চক্রবর্তী	১৯২
প্রতিষেধী (গল্প গল্প)—রতন : অম্বন শেখর । অগ্রবাহ : শ্রীচন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র	১৯৩
মনে পড়ে (পুরোনো কথা)—বিমলাচরণ দেব	১৯৯
অন্তরালে (ঐতিহাসিক গল্প)—করবী দত্ত	২০১
কৃষ্ণ-আলম্ব : মালবের আম (সচিত্র প্রবন্ধ)—বতীপ্রমোদ মল্লিকবিদ	২০৭
নতুন বই : পুস্তক-সমালোচনা : অভয়ানন্দল—দ্রুপ্রদায় দিত্ত ; একাত্তি নটক সংকলন—সুভাষচন্দ্র মাইতি	২১০
১৩৬৫-ব বাংলা বই (সচিত্র প্রবন্ধ)—আরতি মেন	২১৭
মঞ্চ-পর্ষা : চিত্রলোক—পদ্মনাভ	২১৯
শিশু-ভূতাপিনীর লালকায় (সচিত্র সংবোধ) ; আরোফান-কোম্পানি কর্তৃক পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও মঞ্জীন্দ্রের সংবোধ (সচিত্র সংবোধ)	২২২
খেলার মেলা (সচিত্র)—মুদ্রিত	২২৪
শেষ পাড়া (সচিত্র রসরচনা)—শিবরাম চক্রবর্তী লিখিত ও বেবতীভূষণ চিত্রিত	২৩০

। বাসন্তী দাস, তপন দাস, স্বামীকান্ত সিং ও অসিত মুখোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র ।

• প্রচ্ছদ-শিল্পী : অমিত গুপ্ত •

রবীন্দ্র-বিষয়ক পুস্তকাবলী		উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক প্রকাশন	
বলাকা-কাব্যপরিক্রমা ৪৯		বাংলা মঙ্গলকাব্যের	
অচার্য্য কিত্তিহোহন সেন শাস্ত্রী		ইতিহাস ১৫৯	
রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমা ৬৯		—সমিতি ১৯৩৬ পরিবর্তিত ১৯৩৮ সংস্করণ—	
ঐত্থশোক সেন		অধ্যাপক ঐত্থশোক সেন	
রবীন্দ্রকাব্যালোক ৫৯		ঐত্থশোক সেন	
অধ্যাপিকা ঐত্থশোক সেন		উত্তর শশিভূষণ বসু	
রবি-পরিক্রমা ২৯		পেশবদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ৩৯	
অধ্যাপক ঐত্থশোক সেন		উত্তর শশিভূষণ বসু	
রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-দর্শন ২১১০		সমকালীন সাহিত্য ৩৯	
উত্তর প্রদাসচৌধুরী		ঐত্থশোক সেন	
রবি-রশ্মি : ১ম ও ২য়		মহাভারতে বিদ্রূপ ও	
চ্যাপ্টেন বসু		গান্ধারী ১১০	
বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ ৩১১০		অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্তী	
ঐত্থশোক সেন		মধুরাংশু ৪১১০	
রবীন্দ্রনাথ—২য় পর্ব ৪৯		—সুখানি ১৯৩৬ সংস্করণ উপলব্ধ—	
(সংস্কৃত নটি)		ঐত্থশোক সেন	
ঐত্থশোক সেন		ছোটদের জন্যে সুখানি ভাল বই	
		রত্নদ্বীপ (Treasure Island বাংলায়) ২১১০	
		ঐত্থশোক সেন	
		যারে বসে খেলো (১৯৩৬ সংস্করণ)	
		ঐত্থশোক সেন	

JUST PUBLISHED!!

CURRENT AFFAIRS—1958

An Outstanding Year-Book

Compiled by A. R. MUKHERJEE

PRICE: Rs. 4/-

HINDU LAW

PAST & PRESENT

By DR. J. D. M. DERRETT

PRICE: Rs. 12/-

A. MUKHERJEE & CO., PRIVATE LIMITED

2, Bankim Chatterjee St. (College Square), Calcutta-12

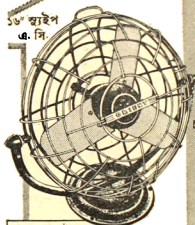
এর বাড়ীর ব্যবস্থাপনা
গর্ব করার মত
কারণ

ওরিয়েন্ট

অল-পারপাস পাখা



১৬" স্ফাইপ
এ. সি.



মূল্য ৭০ টাকা
আবগারী শুধু ৫০ টাকা
স্থানীয় কর অতিরিক্ত



Orient

অল-পারপাস পাখা

আশাতিরিক্ত কাজ দেয়

ওরিয়েন্ট ফেনা বেল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
৬, বোর বিবি লেন, কলিকাতা - ১১

ডিস্ট্রিবিউটর্স : মেসার্স হিন্দুস্থান ডীলার্স লি.,

৪৪, এডমন্ড স্ট্রিট, কলিকাতা।

ফোন : ৩৪ ১০১১ এবং ৩৪-২১০৪

১১

দুর্জয়ব বহুত নতুন কাব্যগ্রন্থ

বিষ্ণু দেব কাব্যগ্রন্থ

যে আশার আলোর অধিক

আলোখ্য

আধুনিক বাংলা ভাষার রচয়িতা দুর্জয়ব বহু নিঃসংশয়ে
বিভিন্ন ঐক্যের অধিকারী। শীমাবর্ণে সীকিত নন বলেই
তিনি জীবনের নতুন দিকদর্শনে ও নতুনতর পথাবলম্বের
আলোকে অগ্রসর। 'যে আশার আলোর অধিক' তার
সাম্প্রতিক কবিতাগ্রন্থের মনোমুগ্ধকর। ২'৪০

বিশিষ্ট প্রগতিশীল কবি বিষ্ণু দেব বৈদ্যে হ'ল ঐতিহ্য ও
আধুনিক জীবনের সংকট-মুক্তির ব্যক্ত সন্ধান। যখনো
ব্যঙ্গ পরীক্ষা-নিরীক্ষার, কখনো সাধারণ শিক্ষা-কৌশলের
বিচিত্র প্রয়োগ পদ্ধতিতে তার কবিকর্মে এক আশ্চর্য সংঘটি
লাভ করেছে—যত প্রকাশিত 'আলোখ্য' তার উজ্জল
নিদর্শন। ২'৪০

১৯৩৩ চাইপাধ্যায়

মনীষ রায়

দীপক জৌহুরী

পথের ধারী (উপন্যাস) ৬'০০

অমিল থেকে মিলে ১'৫০

এই এছের জন্মন (উপন্যাস) ৬'০০

ত্রিকান্ত (নাটক) ২'০০

অন্নদাশঙ্কর রায়

৬'০০

পরিণীতা (নাটক) ১'৫০

পথে প্রবাসে ৩'৫০

জুমারী কল্যাণ (উপন্যাস) ৫'০০

ছোটদের ত্রিকান্ত ২'৫০

কাহিনী কাকন ৩'০০

শয়বিব (উপন্যাস) ৫'৫০

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্য সংকট ২'০০

প্রতিভা বহু

একে তিন তিনে এক ৩'০০

অসমাপিকা (উপন্যাস) ৩'০০

মধ্যরাতের তারা (উপন্যাস) ৩'২৫

যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানবিদ

স্বপ্নোৎসব

খির বিজুরী ৩'০০ জতুগৃহ ৩'৫০

অমল হোম

পৌরাণিক উপাখ্যান ৩'৫০

কমিল ২'৫০

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ ২'৭৫

গল্পোক্তা (উপন্যাস) ৩'০০

মৈত্রেয়ী বহু

পুস্তকালয়

কণিকা বঙ্গোপাধ্যায় ও

অধেবের মেহতাজ ও মাসুদ ২'৫০

বীরেন্দ্র বঙ্গোপাধ্যায়

বিকৃতিহীন বঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প ৩'০০

রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভূমিকা ২'০০

টনসিল (নাটক) ১'৫০

গজলিকা ২'৫০ কচ্ছলী ২'৫০

দুর্জয়ব বহু

পনশার বিয়ে (নাটক) ১'৫০

গজকল ২'৫০

কালিদাসের মেঘদূত ৫'৫০

অলেখা সরকার

হুমুমানের স্বপ্ন ২'৫০

শেষ পাণ্ডুলিপি (উপন্যাস) ৩'২৫

রাহ্মার বই ৪'০০

কুককলি ইত্যাদি গল্প ২'৫০

অভিভা পেন্ড্রন, দুর্জয়ব বহু ও

স্তানাপ্রসাদের কয়েকটি রচনা ২'০০

দুস্তরীমারা ইত্যাদি গল্প ৩'০০

মোমেন্দ্র মির

নগেন্দ্রনাথ মিত্র

নীলতার ইত্যাদি গল্প ৩'০০

বিসর্পিল (উপন্যাস) ৩'০০

অসবর্ণা ২'৫০

স্বাভাবিক বহু

সমগ্র বহু

অপূর্ণতন ডাহড়ী ২'৫০

মহাভারত ১০'০০

পসারিনী ২'৫০

অশ্বিন্দ্রনাথ মিত্র

স্বাময়ণ ৬'৫০

বিমল মিত্র

অপূর্ণতন ডাহড়ী ২'৫০

চলচ্চিত্র (অভিধান) ৬'৫০

অন্তরঙ্গ (উপন্যাস) ৫'৫০

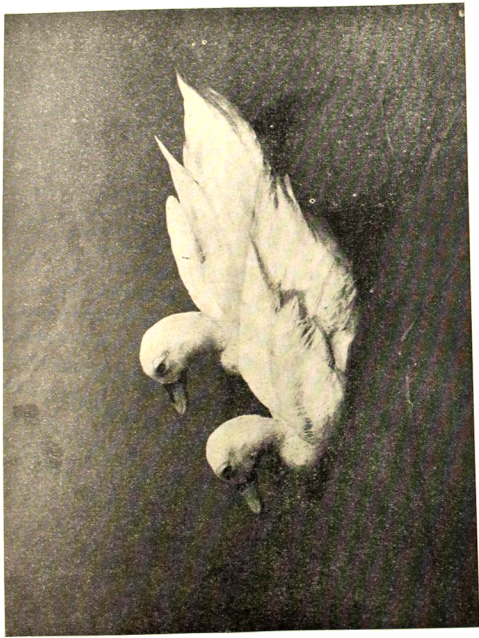
অশ্বিন্দ্রনাথ মিত্র

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চৌধুরী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২



কান্দীরের পথে

[কটো : অসিত মুখোপাধ্যায়]



[कृति : राविकुमार सिंह]



২য় অর্থ, ১ম অধ্য, ২য় সপ্ত

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮

আচার্য যদুনাথ সরকার

[১৮৭০-১৯৪৮]

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

আচার্য যদুনাথ সরকার আর ইহলগতে নাই। ১৮৭০ সনের ১-ই ডিসেম্বর তাঁহার জন্ম, ১৯৪৮ সনের ১৯শে মে তাঁহার প্রয়াণ। যুস্মভাবে হিসাব করিয়া দেখিলে দুত্ৰুয়ালে তাঁহার বয়ঃক্রম হইয়াছিল সাতাশী বৎসর পাঁচ মাস দশ দিন। এই দীর্ঘায়ত জীবন যন্মাদ্ ব্রাহ্মণীজাতির পক্ষে আদৌ কম নহে। গত দুই যুগের মধ্যে কয়েকজন বঙ্গ-মনীষী দীর্ঘ জীবনে বহুতর বিশ্বকর কার সম্পাদন করিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, পতিতপ্রবর যোগেশচন্দ্র একে একে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। অবশিষ্ট ছিলেন আচার্য যদুনাথ; তিনিও দীর্ঘকাল বহুতর কৃতি দ্বারা যাতুত্বমির যুগোচ্ছল করিয়া সত্যেক ও সঙ্গর্গে অনবধায়ে চলিয়া গেলেন।

আচার্য যদুনাথের জন্ম হুং রাজসাহীতে। পিতা রাজকুমার রাজসাহীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ঐ সময়কার প্রগতিশীল ভাবধারায় তিনি উৎকৃষ্ট হইয়াছিলেন। গত শতাব্দীর শ্রুতন দশকে বিভিন্ন জেগার রাজনৈতিক সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজকুমার ছিলেন রাজসাহী এসোসিয়েশনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। তিনি রাজসাহী ব্রাহ্মসমাজের অন্ততম ঠাস্টী ছিলেন। তিনি শিবিরকুমার ঘোষের সম্পর্ক আসিয়া গোড়ীর বৈকল্যধর্মের অহুয়াসী হইয়া উঠেন। বৈকল্য ধর্ম ও সাহিত্যলোচনায় তাঁহার অভিনিবিষ্টতা বালো ও কৈশোরে আচার্য যদুনাথকেও বিশেষ অহুপ্রাণনা জোগায়। তিনি নিজ

‘জীবনাবলী’ বিস্তুতিকালে পিতা রাজকুমারের প্রভাব ও প্রেরণায় কথা লিটভাবে বলিয়া গিয়াছেন।

প্রবেশিকা পর্যন্ত যদুনাথের শিক্ষাকাল, মধ্যে দুই বৎসর বাঙ্গা, রাজসাহীতেই কাটে। এই দুই বৎসর তিনি কলিকাতার হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করেন। তখন তাঁহার বয়স সাত হইতে নয় বৎসর। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজ বেশবস্ত্র সেনকে দেখিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, শিশুর গর্ভায়ে পড়েন বলিয়া, যদুনাথ বেদীর একেবারে সমুখে কথাসের উপর বসিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা-দিবসও গ্রিসি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া আচার্য যদুনাথ কলিকাতার আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে এম-এ ক্লাসে ভর্তি হইলেন। এখানে তিনি একাদিক্রমে ছয় বৎসর অধ্যয়ন করেন। ১৮৯১ সনে ইতিহাসে অনার্স সহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি পান। নিয়মিত ছাত্ররূপে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষাতেও পাস করিলেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্যের পরীক্ষায় ‘record marks’ পাইয়াছিলেন। এই ছয় বৎসর কাল যদুনাথের অনন্তমনা হইয়া হুসন্তুত কলেজ-প্রাণ-গারটির পরিপূর্ণ রূপে সন্ধ্যাবহার করিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ পাণ্ডিত্যের সাহিত্য-অধ্যাপনা; তাঁহার প্রাণে অভিন্ন জ্ঞান-প্ৰহার সফল করে।

১৮৯২, ডিসেম্বর মাসে যদুনাথ এম-এ পরীক্ষার পাস করেন। ইহার ছয় মাসের মধ্যেই ১৮৯৩, জুন মাসে তিনি

বিলম্ব কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মেট্রো-পলিটন (অনুদা, বিজ্ঞানসাগর) কলেজে অধ্যাপনা করেন ১৯১৮-১৯২৮ মার্চ পর্যন্ত। এই কলেজের সঙ্গে পুস্তক-ক-কালেই তিনি (১৯১৭, ডিসেম্বর) 'প্রেরণা'র সংস্করণ কৃতি লাভ করেন। ইহার পর তাঁহার কর্মজীবনের ওপরকটা খোঁজ ফিরিয়া গেল, যদিও অধ্যাপনা-কৃতিই হইল তাঁহার জীবনপথে।

আচার্য বহুনাথ ১৯২৮, জুন মাস হইতে সরকারী শিক্ষা-বিভাগে গৃহীত হইলেন। ঐ সময় হইতে ১৯২৮ সনের আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারী কলেজে ইংরেজী এবং ইতিহাসের অধ্যাপনার পিতৃ-বাঁকিয়া অবসর গ্রহণ করেন। প্রথমে, একবৎসর কাল তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক পদে বৃত্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বার ছুটিমাস কাল (১৯৩১, জুলাই-ডিসেম্বর) এই কলেজে অধ্যাপকতা করেন। ইহা ছাড়া প্রথম হইতে দশম উনিশ বৎসর পর্যন্ত প্রায় একশায়াড়ে পাঠনা কলেজে অধ্যাপকতা করেন। ১৯১৭, আগস্ট হইতে ১৯১৯, জুলাই পর্যন্ত সরকারের অর্থায়িত্বের আচার্য বহুনাথ কালি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ইতিহাসাধ্যাপকের পদে কার্য করেন। ইহার পর ১৯২৬ সনের অক্টোবর পর্যন্ত তিনি কটক প্রাদেশিক কলেজে ইতিহাস ও ইংরেজীর অধ্যাপনা-কার্যে গতি থাকেন। ইহার পর তিনি পুনরায় পাঠনা কলেজে গৃহীত হন। এখান হইতেই ১৯২৬ সনের আগস্ট মাসে তিনি অবসর নেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রভাবে সক্রিয় কর্মজীবন হইতে তাঁহার অবসর ঘটে আরও দুই বৎসর পরে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনোক্তর শিক্ষা-প্রণালীর জটিলবিচারিত কালন ও ইহার পুনর্গঠন সম্বন্ধে বহুনাথের কতকগুলি মৌলিক চিন্তা ঐ সময়ে পরিকল্পনের প্রকাশিত হইয়াছিল। সরকার ইহার যৌক্তিকতা বিবেচনা করিয়া, অধ্যাপক-পদ হইতে অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইন-চ্যান্সেলার বা উপাচার্য পদে নিয়োগ করিলেন। এই পদটি ছিল অবৈতনিক, (সম্প্রতি ইহা বৈতনিক হইয়াছে) এবং বিপুল সম্মানে। বহুনাথ দুইবৎসর কাল (১৯২৮-৩০) এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, অভাবিক বিরোধিতার মধ্যেও, ইহার সংস্কারে মন দিয়াছিলেন।

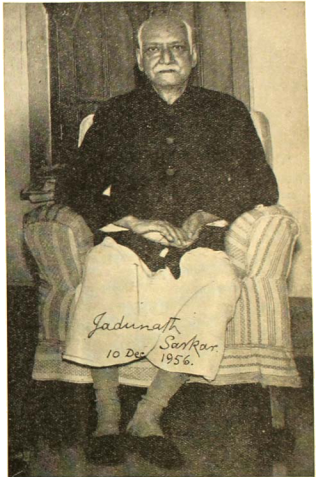
দীর্ঘ অধ্যাপক জীবনের, (কু অধ্যাপক জীবনের কেন, সাধারণভাবেও বটে) একটি মুহূর্তও তিনি অলসভাবে কাটান নাই। অপর্যাপ্ত অধ্যাপনা-কার্যগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন বিষয় অনুশীলনে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করিয়া চলিল। বিবিধ বিচার মধ্যে ইতিহাসকেই তাঁহার আলোচনা-গবেষণার ক্ষেত্র করিয়া লইলেন। সরকারী শিক্ষা-বিভাগে কর্মগ্রহণের পর তাঁহার আর্থিক সাক্ষ্যতাও

বাড়িয়া গেল। তিনি বেংগল আয়শের খোঁজা ধোঁজা ইতিহাসকে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারপূর্বক একেবারে 'কাকিট' ধরাছোঁড়া বস্তুর মধ্যে ভাস্কর্য খটাইলেন। ভারতীয় ইতিহাসের এক বিশেষ যুগ 'মোগল যুগ'। প্রায় তিনশ' বৎসর (১৫০০-১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ) ব্যাপিত এই যুগ বা শাসনের প্রভাব-প্রতিপত্তি। প্রচলিত মুদ্রিত ইতিহাস পুস্তকাদিতে স্বেচ্ছা না থাকিয়া তিনি কাণীভাষা অধ্যয়নান্তর মূল আকর-বস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন পর্তমান শতাব্দীর প্রথমে। এই বিবরণে মুগ্ধিত গিয়া তিনি এক অজ্ঞাত বা বহুজ্ঞাত ধনি বা ভাতারের সন্ধান পাইলেন। তাহা হইল অমুদ্রিত কাণী দলিল-সম্ভাব্য, পু'বিশ্ব, অংক, আরও কত কি। তাহার অন্বেষণের ফল ক্রমে প্রবন্ধ ও পরে পুস্তকে প্রচারিত হইতে লাগিল। সেট সময়েই আচার্য বহুনাথের গবেষণার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করিয়া ভগিনী নিবেদিতা বীর রচনার মধ্যে নৃত্যকর্তে ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। ঐ সময়েই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং বাবানি কল্লের ধান্যক চট্টোপাধ্যায় আচার্য বহুনাথের বিশেষ 'গোড়া' হইয়া পড়েন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল নিবিড়। প্রথমযুগে ধারাতা কবিগুরু কাব্যসাধনাকে বিশ্বদৃষ্টে ধরিয়া দিতে বস্তুপর হন তাঁহারের মধ্যে আচার্য বহুনাথ অন্তর্ভুক্ত।

মোগল যুগের ইতিহাস-গবেষণার ফল ক্রমে আচার্য বহুনাথের 'হিস্টরি অব ওরিয়েন্ট' পুস্তকে বিবৃত হয়। ওরিয়েন্টের পূর্ব ও পরবর্তী শতাব্দীগুলিরও সমালোচনামূলক এবং শাসনবাবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার বহু তথ্যাত্তিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। মোগল যুগের ইতিহাসের তথ্যাবলি মুগ্ধিত গিয়া তিনি যেন অজ্ঞাতসারেই ভাষাতত্ত্ববিৎ ও ইহা পড়িলেন। ইংরেজী, বাংলা, সম্ভবত ততো তাঁহার পূর্বেই অধিগত হইয়াছিল; কাণীভাষাও তিনি সর্বিশেষ যুৎসব হইলেন। আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে মোগল-ইতিহাস আলোচনার প্রবিধি ধারাতা, হিন্দুস্থানী, হিন্দী, পঞ্জাবী, কন্নড়ী প্রকৃতি ভাষাও শিখিয়া লইলেন। মোগলযুগের ভারতবর্ষে শিবাজী মহারাজ তথা মারাঠা-পন্ডিত আচার্য ও অক্সফোর্ড একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তিনি মূল ধারাতা দলিল-সম্ভাব্য এবং আনুমানিক কাণী পত-পতীর ভিত্তিতে প্রাক-শিবাজী, শিবাজী এবং উম্মার-শিবাজী আমলের মারাঠা-পন্ডিত পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-রচনার প্রথম সর্বাঙ্গ হইয়াছিলেন। আর ঐ বিবরণে তাঁহার প্রধান সর্বাঙ্গ হইয়াছিলেন মারাঠা-ইতিহাসিক নগীরাম জি.এস. সরদেবশাই। তিনি এখনও জীবিত, তাঁহার বয়স নব্বই বৎসরের উপর। মোগল যুগের, বিশেষতঃ ওরিয়েন্ট আমলের ইতিহাস পুনর্গঠন করিতে দিয়া

আচার্য যদুনাথ জুঁ অমুদ্রিত ও অপ্রকাশিত সাহিত্য-ভাণ্ডারের উপরই নির্ভর করেন নাই, এতোকটি ঘটনাবলি তিনি গিরায়েছেন, ঘটনার অবস্থান দেখিয়েছেন, এতাক জ্ঞান যাগা ঘটনাগুলির পরিপূর্ণ নির্ণয় করিয়া লইয়াছেন। তিনি এইকল্প উত্তর-ভারতে দীর্ঘকালের মধ্যে যে কতবার পর্যটন করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। দক্ষিণ-ভারতে তিনি অমূল্য গুরুশ্রমের তথ্যসম্ভার করে জ্ঞান করিয়াছিলেন। অমূল্য জ্ঞান-সুখের সঙ্গে অটুট কর্তব্যের মিলন একশ কদাচিৎ দেখা যায়, এ-কারণে তিনি যে কৃতিত্ব অর্জন করিয়া গিয়াছেন, এ যুগে তাহার তুলনা বেলা পুটে কঠিন হইবে। এইসকল অমূল্যজ্ঞান-গবেষণার ফলন বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত ও হস্তলিপিত পুঁথিপত্রের দ্বারা তাঁহার একটি নিজস্ব মূল্যবান গ্রন্থাগারও গড়িয়া উঠিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের সেবারও আচার্য যদুনাথ সদান তৎপর ছিলেন। তাঁহার রচনায় গত পঁয়ষট্টি বৎসর যাবৎ কত পত্র-পত্রিকা সমৃদ্ধ ও ধন হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। 'এবাসী' পত্রিকায় তাঁহার বিস্তর রচনা স্থান পাইয়াছে। ইংরেজী 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতেই তিনি ইহার লেখক ছিলেন। সম্ভ্রান্তি তিনি 'বহুধারা' পত্রিকাখানির বিশেষ অগ্রদূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার মুদ্রণ-পারিপাট্য, রূপসম্পাদনা এবং রচনা-সম্ভার তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। আচার্য যদুনাথের পুঁথি কা করে অপ্রকাশিত রচনাবলী শ্রেণী-বিভাগ করিয়া বিভিন্ন খণ্ডে মুদ্রিত করিলে বাংলা সাহিত্য সমিশ্রের সমৃদ্ধ হইবে। তাঁহার বাংলা গ্রন্থগুলি, বিশেষতঃ 'নিবাকী' অতিপর স্মরণীয়। আচার্য যদুনাথ 'বাকীর সাহিত্য পরিষদের' সভাপতিত্বের ইহার উন্নতি ও সংস্কার প্রয়াসে যত্নবান ছিলেন। ঘরোয়া ও বিদেশে বহুবিষয়বস্তুগামী হইতে তিনি সমান লাভ করিয়াছিলেন। সরকার হইতেও তাঁহার



আচার্য যদুনাথ সরকার

[চিত্র : শ্রীমল্লক দে]

সম্মান মিলিয়াছিল। পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও আঘাত তাঁহাকে সহিতে হইয়াছে বিস্তর। কিন্তু তিনি ছিলেন মূৰ্খের বিপদসুখ, দুঃখে অগ্রহিমন।

আমরা এই পুঁথিবলিহকে শত শত বার প্রশংসা করি।

আচার্য যদুনাথ সরকারের চিত্রাবলি শ্রীকৃষ্ণ বোমণ্ডল দাসের দ্বারা লোকেত প্রাপ্ত। —সম্পাদক, বহুধারা

রবীন্দ্র জীবনালখ্য

॥ চরিত্র ও চর্চা ॥

খ. শাদেশিকতা

১

শাদেশিকতার উল্লেখ

‘জীবনচরিত্রে’ এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন।—

জ্যোতিষাচর উল্লেখ আমাঙ্কের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা শাদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক খোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অঙ্গুলান গ্রহণে আবৃত্ত ছিল। বসন্ত তাহার মধ্যে ঐ গোপনীয়তাটাই একবার উন্মোচিত ছিল।

ঐন্দ্রিয়িক অক্ষয় যে খোড়ো বাড়ির অধিকার করে সভা বসত সেই ঘরে একটা টেবিলের উপরে একটা মজার মাথা থাকত। তার দুই চোপের গর্তে দুটি মোমবাতি জ্বলত। সভার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জ্যোতিষিন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর অধিক ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। স্বাধীনতাবাদী তরুণদের এই প্রতিষ্ঠানের সভা করা হত। অধিক দালচেনি পরে টাড়িয়ে থাকতেন, তাঁর সামনে একটা নম্র-বাক্যের নিচে সভাপদপ্রার্থীকে আশ্বস্ত করতে হত; বাক্য করতে হত বৃদ্ধ-চোরা রক্ত দিয়ে।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের এই সভার সঙ্গে যোগ ছিল। তখন থেকেই দেশবাসীর পরাধীনতা তাঁকে বিচলিত করে।

২

হিন্দুমেলা

লিখছেন।—

আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা লষ্ট হইয়াছিল। নবগোপাল বিদ্য বহাদুর এই মেলায় কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে অশেষ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চোটে সেই গ্রন্থ হব। যেজন্য সেই সদর বিখ্যাত জাতীয় সংস্কার বিলে সবে

ভারতবর্ষের রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্বপ্নান ঐত, দেশভ্রমণের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প-ব্যাপ্য প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।

হিন্দুমেলা আরম্ভ হয় ১৮৬৭ সনে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার আঠার বছর আগে। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই মেলায় কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

বড়লাট লর্ড লিটন বহু কৃষ্ণাঙ্কের ক্ষেত্রে ভারত-বাসীর বিরোধভাজন হয়েছিলেন। তিনি এক দরবারের আয়োজন করলেন। দেশবাসী এই দরবার পণ্ড করবার চেষ্টা করল, কিন্তু কয়েকজন রাজভক্তের ক্ষেত্রে তা আর হতে পারল না। সেই সময় হিন্দু-মেলায় এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বরচিত এই কবিতাটি আবৃত্তি করলেন।—

কিশোর তব গো ভারতের আজি
সংগ্রহ হৃদয় উঠেছে আজি ?
বতরিন বিশ্ব করিয়াছে পান,
কিছুতে জাগেনি এ মহাদেশান,
বহন-মুখলে করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি ?
সুখাধিক হতে হিমাশ্রয় গিরি -
এক তারে কিছু ছিল না গীতা,
আজিকে একটি চরণ-আঘাতে
সমস্ত ভারত ভুলেছে মাথা।

কিশোর রবীন্দ্রনাথ প্রতিবছর এই মেলায় যোগ দিতেন— কবিতা পড়তেন, গান গাইতেন। একবার তা শুনে নবীনচন্দ্র সেন অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে বলেন,—আমি বেলায় একটি অপূর্ণ নব-দুবককে দেখলুম। কালে সে একজন প্রতিভা-সম্পন্ন কবি ও গায়ক হবে।—শুনে অক্ষয় সরকার

বললেন,—কে, রবি ঠাকুর বুঝি, ও ঠাকুরবাড়ির কাঁচানিঠে আঁব।

এর বোল বছর পরে নবীনচন্দ্র সেন বললেন,—
সেনিনকার সেই কাঁচানিঠে আঁব এখন পাক।
ফললি।

৩

শ্রদ্ধাঙ্গী আন্দোলন

এই রকমের একটি কাহিনী আছে।—

এক চিরঞ্জীবী বায়সকে জিজ্ঞাসা করা হয়,
কোন বৃদ্ধটা সবচেয়ে বড়ো ছিল,—গুপ্ত-নিগুপ্তের
যুদ্ধ, রাম-বাবণের যুদ্ধ, না কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ?
বায়স উত্তর দেয়,—তিনি যুদ্ধেই পৃথিবী রক্ত-
সমুদ্রে ভেসে যায়, তবে গুপ্ত-নিগুপ্তের যুদ্ধে
গাছের ডালে বসে মাথা নিচু করে রক্তপান করি,
রাম-বাবণের যুদ্ধে রক্ত ঠোট অর্থাৎ পৌছয়, আর
কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সময় ঠোট উচু করে রাখতে
হয়েছিল।

১৯০৫ সনের স্বদেশী আন্দোলন, ১৯২০ সনের
অসহযোগ আন্দোলন আর ১৯২৯ সনের আইন-
অমান্ত আন্দোলন—তিনটার মধ্যে কোনটা বড়ো
ছিল ? তিনটির সঙ্গেই আমার বিশেষ পরিচয়
থাকায় বলতে পারি, স্বদেশী আন্দোলনকে প্রথম
স্থান দিতে হয়,—আর এই স্বদেশী আন্দোলন
ভবিষ্যতের সকল স্বাধীনতা-আন্দোলনের পথ-
প্রদর্শক। তবে এ গুপ্ত বালাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল।
সমগ্র ভারতের হিসেবে নিলে আইন-অমান্ত
আন্দোলন সবার উপরে উঠে।

১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ সন। ব্রিটিশ সরকারের
আদেশে বাংলাদেশ ছ'খণ্ডে বিভক্ত হল। ওই দিন
বিকলে আপার সাকুলার রোডে ফেডারেশন
হলের ভিত্তি স্থাপিত হল। অষ্টাদশের পর এক
বিরাট জনসমূহ এগিয়ে চলল, রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে
আছেন। সেই দিন রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখলুম,
খুব দূর থেকে।

পায়কদল গান ধরল,—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন হুঁইবে,

মোদের 'ততই বাঁধন হুঁইবে।

ওদের যতই অধি বন্ধ হবে মোদের আঁধি ফুটবে,

ততই মোদের আঁধি ফুটবে।

এ গান শেষ হল, দ্বিতীয় গান আরম্ভ হল,—

বিধি বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিম্যান—

তুমি কি এমনি শক্তিম্যান !

আমাদের ভাড়াগড়া তোমার হাতে এমন অতিমান—

তোমাদের এমনি অতিমান।

গানের শেষটায় যখন এসে পৌছল—

আমাদের শক্তি মেয়ে— তোরাও ঠাট্টা মেয়ে—

বোকা তোরা ভাবি হলেই হুঁবে তরীমান।

তখন কি যে এক উকীপনার কণ্ঠি চল, আভ্যেকের
দিনে তা কল্লো করা কঠিন।

এর কয়েকদিন পরে বাগবাঁজার পদ্মপতি
বনুর বাড়ির বিরাট প্রাঙ্গণে বিজয়া-সম্মিলনী
অমুষ্ঠিত হল। সমস্ত বাংলাদেশের অধঃ প্রাণকে
একসূত্রে বাঁধবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ আহ্বান করলেন।
উপসংহারে বললেন—

আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছাত্রাঙ্গ-নিবিড় গ্রামগুলির
উপরে এতখন যে শাখা আকাশে একাদশের চন্দ্রমা
ছোঁয়াছোঁয়ায় অঙ্কন চালিয়ে নিচ্ছে, সেই নিম্ন গুচিকঠির
সন্ধ্যাকালে তোমাদের সম্মিলিত ছন্দে 'বল্লেখ্যতঃ'
ঐতম্যনি একপ্রান্ত হুঁইতে অন্য প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক
—একবার কংক্রিট করিয়া বিশ্বভবনবাগের কাছে প্রার্থনা
কর—

বাংলার মাটি বাংলার জন

বাংলার বায়ু বাংলার বল

পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,

পুণ্য হউক, যে ভগবান।

রবীন্দ্রনাথের ভাষা, তাঁর কণ্ঠস্বর, গানের সুর
লোক-হৃদয়ে কংকত হতে থাকল। সেদিন রবীন্দ্রনাথ
বাংলাদেশকে নতুন প্রাণ দিলেন।

সে-সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম বলে সেদিনের
স্মৃতি আজও আমাকে বিচলিত করে।

কিন্তু বাংলার এ সম্প্রদায় ভারতের অন্য প্রদেশ
সাজা গিল না।

এই সময় ভারতে এলেন থ্রিস অফ ওএল্‌স।
সেবার কাণীতে কংগ্রেসের অধিবেশন। সভাপতি
ছিলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। কংগ্রেসের প্রথম
প্রস্তাব হল, স্বরাষ্ট্রের অভিনন্দন।

রবীন্দ্রনাথ 'ভাঙারে' লিখলেন,—

এখনকার রাজ্যসনে ঠাহারা যশেন, ঠাহারের ঘোষ
বেনিসিনকার হুচ না; অথচ এখানে রাজস্বভা ঘোষ
অস্বাভবট, যথ্য ভারত-স্বাধীনতা সেক্ষপ নহে। এতেনের
ইংরেজ রাজ্যের রাজত্বকি হাবি করেন; কিন্তু তুগিয়া বান,
সে যথ্য হুশন করিতে গেলে কাছে আসিতে হয়, কেবল
অবশ্যকিৎ রাজত্বকি আসে না। ইংরেজ যথ্যেও
যেহিবে না, হুশনও হিবে না; অথচ রাজত্বকি চাহ;
শেষকালে সেই ভক্তি যথ্যে যখন সবেই জন্মে তখন তর্কী
লগাইয়া, বেক চলাইয়া, তেলে দিয়া ভক্তি আদায় করিতে
অস্বাভব হয়।

রাজপুত্র চলে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ সে সময় বাংলার নিগৃহীতদের উদ্দেশ
ক'রে বললেন,—

বাংলাদেশের বর্মান্তরে হুদেদী আন্দোলনে হুশিত
রাজস্বও বংগদ্বিগকে পুড়িত করিয়াছে, ঠাহারের প্রতি
আমার নিবেদন এই যে, ঠাহারের বেদনা যখন আজ সমস্ত
দেশ হুশদের মধ্যে গ্রহণ করিয়া লটন, তখন এই বেদনা
অনুভূত পণ্ডিত হইয়া ঠাহারদ্বিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে।
রাজস্বের বে-অপমান ঠাহারের উপর নিকিষ্ট হইয়াছিল,
মাত্র তুদিত করণ করণেরে তাহা বহমান্যায় ধারণ করিয়া
ঠাহারের লগাটিকে আজ তুদিত করিয়াছে। অন্য কঠিন
ব্রতনিষ্ঠ বহুত্বদ্বিগ প্রতিনিধি-ধরুণ সেই কহজন এই
হুদেদী অধিশাসকীয় ভক্ত বিধাতা কর্তৃক বিশেষরূপে
নির্বাচিত হইয়াছেন। ঠাহারের জীবন সার্থক।

এর পর রাজনীতিকেরে অগ্রবিল বোবের
আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাগ্রহে বরণ ক'রে
নিরে লিখলেন,—

অগ্রবিল, রবীন্দ্রের সহ নমস্কার।

পাস্তির মাঠে, এখন যেখানে বিভাসাগর কলেজ

হস্টেল, শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হল। অন্য প্রদেশ
থেকে এলেন টিলক, লাক্ষণ্য রায়, ষাণায়ে প্রকৃতি
নেতার। রবীন্দ্রনাথ ওই উৎসবের ক্ষুদ্র কবিতা
রচনা করে বললেন,—

তোষাঘে চিনেছি আমি, চিনেছি চিনেছি যে রাজন,
তুমি মহারাজ।

তব রাজকর লয়ে 'আট কোটি বৎসর নন্দন
পাঁড়াইবে আজ।

রাজহোহ অপরাধে বালগঙ্গাধর টিলক যখন
অভিযুক্ত হলেন, বাংলা থেকে অর্থ সংগ্রহ করে
আমলাতে তাঁর পক্ষ-সমর্থনের ব্যবস্থা করেছিলেন
রবীন্দ্রনাথ।

৪

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি

বোম্বাইতে জাতীয়-কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন
হল। রবীন্দ্রনাথ তখন বোম্বাই-এর কাছাকাছি
ছিলেন। তিনি ওই কংগ্রেসে যোগ দিলেন।
বাঙালি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওই অধিবেশনের
সভাপতি হলেও উপস্থিত বাঙালির সংখ্যা খুবই কম
ছিল। রবীন্দ্রনাথ চুখ ক'রে লিখেছিলেন,—

পৃথিবী ভূড়িয়া বেজেছে বিগাণ

ওনিতে পেরেছ ওই—

সবাই এসেছে লইয়া নিশান

কৈ-রে বাঙালি কৈ?

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় কলকাতায়।
সেই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টিত একটি গান
গেয়েছিলেন। আরও বহুবার কংগ্রেসের অধিবেশনের
ক্ষুদ্র গান রচনা করেছেন। তবে এটা ঠিক,
তখনকার কংগ্রেসের নীতিকে তিনি ভিকারিত ব'লে
মনে করতেন। তাই লিখেছিলেন,—

দিকে কবার বাঁনি কাঁহনির পাশ।

চোখে নাই কার(ও) নীষ,

নিবেদন আর আবেদনের বালা

ব'হে ব'হে নত শির।

আত্মসম্মতি দ্বারা ভিতরের দিক থেকে সেমকে দৃষ্টি করা, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির মূল কথা। এ কথা তিনি বহুবার বহুভাবে বলেছেন। প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির আসন থেকে দেশের যুবকগণকে আহ্বান করলেন,—

ভোমরা যে পার এবং খেলায় পার এক একটি গ্রামের তার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে বাবদ্বাবদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষিক্ষেত্র ও গ্রামের ব্যবহার-সামগ্রী সম্বন্ধে নতুন চেষ্টা প্রবর্তিত কর। এ কার্যে ব্যাতির আশা করিও না; এখন কি গ্রামবাসীর নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা ও অবিরাম বীকার করিতে হইবে। ... যনের মধ্যে কেবল এই একটি মাত্র পথ যে, দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে বাহ্যার হুঃখী তাহাদের হুঃখের ভাগ লইয়া সেই হুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে যত্নবান হইবে।

অশেষী আন্দোলনে তিনি মেতে গেলেন বটে, কিন্তু 'বরকট' ব্যাপারের সঙ্গে নিজেকে জড়িতে চাইলেন না। বললেন,—

আপনার কাছে আমি শাইই বীকার করিতেছি, বাঙালির মধ্যে 'বরকট' শব্দের আন্দোলনে আমি বারংবার মাথা ঠেঁট করিয়াছি। ... এই যে অশেষী উৎসাহের আহ্বান যাতে দেশ একনুহুর্ভে সাদা দিয়াছে, কার্তনের সঙ্গে আড়ি তাহার কারণ হইতে পারে না; জগতে কার্তন এত বড়ো লোক নহে; এই আহ্বান দেশের গুণ্ডুড়ির সিংহদ্বারে আঘাত করিয়াছিল বলিয়াই আজ ইহা এত দ্রুত এমন সমাধার পাইয়াছে। আজ আমরা দেশের কাণ্ড পরিভেদে কেবল পনের উপর ভাগ করিয়া, এই যদি লড়াই হয়, তবে দেশের কাণ্ডের এত বড়ো অবমাননা আর হইতে পারে না।

দেশবাসী তাঁর কথার ধ্বনি হতে পারল না।

এই সময় একদল বাঙালি যুবক রাজনীতির ক্ষেত্রে হিংসাত্মক পথ অবলম্বন করল। রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হলেন। 'পথ ও পাবের' প্রবন্ধ পাঠ করে নিজের অভিমত ব্যক্ত করলেন।

সেই সময় ঐমতী নিরীক্ষণী সরকারকে এক চিঠিতে লিখলেন,—

যাড, ইহা নিশ্চিত বনে গাণিবে, নিজের বা পরিবারের বা দেশের কাছে ধর্মকে লক্ষ্য করিলে, ঐশ্বর কখন

করেন না। যদি মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের জন্তেও পাপকে আশ্রয় করি তবে তাহার প্রাশঙ্কিত করিতেই হইবে। বিদ্যাতার এই নিরর্থক বিতর্কে বিরোধ করা বৃথা। এই ব্যাপারে যে-সকল অপ্রান্তরের বালক ও বিচলিতবুদ্ধি যুবক দগ্ধবীর হইয়াছে তাহাদের জন্ত জগৎ দায়িত্ব না চলেই থাকিতে পারে না—কিন্তু যেন রাগিতে চলেবে, এই দগ্ধ আহ্বানের সকলের দণ্ড—ঐশ্বর আমাদিগকে এই বেদনা দিলেন,—পাথর বেগুন বাতীত পাপ হু হু হইতে পারে না—সহিষ্ণুতার সহিত এ সমস্তই আমাদিগকে বহন করিতে হইবে এবং ধর্মের প্রশস্ততর পথকেই অবলম্বন করিতে হইবে। এই কথা যেন বেধে, নিজের জন্তেই কি, দেশের জন্তেই কি, যা সকলের চেয়ে সত্য তাই একমাত্র সত্য।

অশেষী আন্দোলনের পরে

অশেষী যুগের রবীন্দ্রনাথকে আবার দেখলুম ১৯১৭ সনে।

আমি বেঙ্গালি অন্তরীণ হয়েছেন। প্রতিবাদ-সভা হবে, রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ পড়ুন। টাউন হল ঠিক করা হয়েছে। সভার তিন দিন আগে সরকার ঘোষণা করলেন, সরকারি বা আধা-সরকারি কোনো স্থানে এ সভা হতে পারবে না।

তখন রামমোহন লাইব্রেরির সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট। রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানালুম। রামমোহন লাইব্রেরিতে সভা হল। রবীন্দ্রনাথ 'কর্তার ইচ্ছায় কম' প্রবন্ধ পাঠ করলেন। সিনেপ্রনাথ তাঁর দলবল নিয়ে 'দেশ বেশ নন্দিত করি' গানটা গাইলেন। এখন আমাদের চোঁটা চলল, আরো বড়ো জায়গায় সভা করা। অ্যালফ্রেড থিয়েটার পাওয়া গেল। দেখানে ঐ বড়ো শোনাবার জন্তে সাধারণের মধ্যে যে উদ্ভাদনা দেখেছিলাম, তা তাঁর আগে বা পরে কোনোদিন দেখিনি। অ্যালফ্রেড থিয়েটারের লোহার গেট হুমড়ে ভেঙে গেল, নতাবিক বেঞ্চসেবক কে কোথায় ছিটকে পড়ল। রবীন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, নাটোরের মহারাজা জগদীশপ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজনকে পিছনের দরজা দিয়ে আনতে হল। ভূপেন্দ্রনাথ বসু সভাপতির

আসন গ্রহণ করলেন। এবারে গানের দল আরও বড়ো; নাট্যবির মহারাজা পাখোয়াজ বাজালেন।

ব্রিটিশরাজের দমননীতি দিন দিন প্রচণ্ড রূপ নিতে লাগল, পর্যবসিত হল জালিনওয়ালাবাগু হত্যাকাণ্ডে।

পাঞ্জাবে 'মার্শাল ল' জারি হয়েছে, জালিন-ওয়ালাবাগের কথা কাণ্ডজে বেরতে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু সংবাদটা রবীন্দ্রনাথের কানে এসে পৌঁছল। রবীন্দ্রনাথ ছুঁফুঁট করতে থাকলেন; রাতে ঘুম হয় না। চিঠিতে লিখছেন,—

মাকানের এই প্রতাপ আধি একরকম সহ্যেতে পারি, কিন্তু মহের প্রতাপ আমার আর সহ্য হয় না: এই দুখের তাপ আমার বুকে পাঁজর পুড়িয়ে গিল।

কবি কলকাতায় চলে এলেন। কাউকে কোনও কথা বললেন না। একবার শুধু রানানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। পুত্র রবীন্দ্রনাথকেও কিছু বললেন না। তারপর বড়লাট চেম্‌সফোর্ডকে একখানা চিঠি লিখে পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবাদে 'স্মার' উপাধি প্রত্যাখ্যান করলেন।

কবি নিজেই ওই চিঠির একটা বাংলা অনুবাদ করলেন। পরদিন 'বহুমতী'তে তা প্রকাশিত হল। রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী তখন মৃত্যুশয্যায়। তিনি ওই অনুবাদ পড়ে কবির চরণধূলি নেবার জন্তে ব্যাকুল হলেন। তখন, রামেন্দ্রচন্দ্রের শব্দ্যাপার্ষে কবি উপস্থিত হলেন। রামেন্দ্রচন্দ্র কবিকে মূল পত্রখানি পড়তে অনুরোধ করলেন। কবি পড়লেন। রামেন্দ্রচন্দ্র কবির পদধূলি নিলেন। অল্পক্ষণ আলাপ আলোচনা হল। কবি চলে গেলেন। রামেন্দ্রচন্দ্রের জ্ঞান হারালেন; তাঁর চেতনা আর ফিরে এল না।

হিজলি রাজবন্দী-হত্যার প্রতিবাদে ১৯০১ সনের ২৬শে সেপ্টেম্বর কলকাতার গড়ের মাঠে অক্টোব্রেলোনি মহুর্নেকের তলায় এক বিরাট জনসভা হয়। লক্ষাধিক লোক উপস্থিত ছিল। ভয়বান্ধ

নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সভায় এলেন; বঙ্গগদ্যীর স্বরে বললেন,—

এতবড়ো জনসভার বোণ দেওয়া আমার শরীরের গক্ষে ক্ষতিকর, মনের গক্ষে উত্ত্রাস্ত্রিকজনক: কিন্তু যখন ডাক পড়ল থাকতে পারনুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষকনামধারীরা যাদের কঠোরগণক নরখণ্ডক নিষ্ঠুরতা দ্বারা চিরদিনের মতো নীযব করে দিয়েছে।

বললেন,—

একাজে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য নয়তো রাজার গক্ষে করিন না হতে পারে, কিন্তু বিধিগত অধিকার নিয়ে একাজ যখন যখন স্বয়ং রাজ্যকে বিচার করে তখন তাকে নিষেধ করতে পারে কোন শক্তি। এ কথা ভুললে চলবে না যে, একাজ অস্বহ্য বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের দ্বারি নির্ভর করে।

রাজনীতিকক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী

আমরা গর্ব করে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী যে-কালে এসেছিলেন, আমাদের ছত্রও সেই কালে।

রাজনীতিকক্ষেত্রে এঁদের হৃৎকনের দৃষ্টিভঙ্গি যে পুরোপুরি এক ছিল তা বলা যায় না।

গান্ধীজী বললেন,—তোমরা সকলে চরকা কাট, খন্দর পর,—একবছরের মধ্যে স্বরাজ আসবে।

কবি বললেন,—এ যেন সন্ন্যাসীর মন্ত্রশক্তিতে সোনা ফলাবার আশ্বাস।

তিনি বললেন,—স্বরাজ গ'ড়ে তোলবার ভব বহুবিবৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য ও কালসাধ্য। তাতে ধারা অর্থশাস্ত্রবিৎ তাঁদের ভাবতে হবে, যন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাঁদের খাটতে হবে, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ, রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে ও কর্মে লাগতে হবে।

গান্ধীজী বললেন,—বিসেনী কাপড় অপবিত্র, তা গোড়াও।

কবি বললেন,—কোনও কাপড় পরা বা না-পরার মধ্যে যদি কোনও ভুল থাকে তবে সেটা

অর্ধতরের বা স্বাস্থ্যতয়ের বা সৌন্দর্যতয়ের ভুল ;
এটা ধর্মতয়ের ভুল নয়।

১৯২১ সনে সেপ্টেম্বর মাসে একদিন জোড়া-
সাঁকোর বিচিত্রা-ভবনে এক কক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও
গান্ধীজী অসহযোগ সম্বন্ধে আলোচনায় ব্যাপ্ত।
এনডুজ ছাড়া আর কেউ সেখানে উপস্থিত
ছিলেন না। চার ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলল।
এর কোনো বিবৃতি প্রকাশিত হয়নি। তবে এটা
বুঝা গেল যে, কেউ অপরকে টলাতে পারেননি।

তাদের ছুঁজনের মধ্যে যখন আলোচনা চলছিল
তখন বাইরে এক অশ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। এক
জনতা রবীন্দ্রনাথের মতকে ছেঁয় প্রতিপন্ন করবার
উদ্দেশ্যে বিচিত্রা-ভবনের সামনের প্রাঙ্গণে বিলাতি
কাপড় পোড়াতো আরম্ভ করল।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি লজ্জা পেয়েছিলেন
গান্ধীজী।

ছুঁজেনই ছিলেন মহাপুরুষ। কোনো কোনো
বিষয়ে মতের অমিল থাকলেও কেউ অপরের প্রতি
শ্রদ্ধা হারাননি।

গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলতেন ; আর
গান্ধীজীর মহাত্মাজী নাম তো রবীন্দ্রনাথের দেওয়া।

১৯৩২ সন। যে রবীন্দ্রনাথ একদিন স্বদেশীর
সঙ্গে ‘বয়কট’ জুড়ে দেওয়ায় আপত্তি জানিয়েছিলেন,
যিনি দেশবাসীর বিরাগভাজন হতে হবে জেনেও
হিংসাস্বক পথ বর্জন করবার উপদেশ দিয়েছিলেন,
ব্রিটিশ সরকার সর্বজনবন্দিত মহাত্মাজীকে কারারুদ্ধ
করল যেহেতু তিনি ভগবানকে প্রেম করলেন,—

যাহারা তোমার বিরাটকে শাস্ত্র

নিভাটছে তব আলো—

হুঁ কি তোমার কথা করিরাছ,

হুঁ কি বেসেছ ভালো ?

সত্যভার সংকট। রাধাবোনের চিঠির উত্তর

এল কবির জীবনে শেষ নববর্ষ। জন্মোৎসবের

ভাষণ হল ‘সত্যভার সংকট’। এই অভিনাটকের
শেষের নিকে কবি বললেন,—

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন
ইংরেজকে এই ভারতপাহাড়া ত্যাগ করে যেতে হবে।
কিন্তু কেন ভারতপর্ষকে সে পিতনে ত্যাগ করে যাবে ?
কী লক্ষ্যছাড়া হীনতার আদর্শনাকে। একদিক
মতাকীর শাসনধারা যখন উন্নত হয়ে যাবে, তখন এ কী
বিশ্বীর্ণ পরশধা। হুঁবিবহ নিষ্কলতাকে যখন কহতে থাকবে।
জীবনের এমন আরোহে যখন মন থেকে বিশ্বাস করেছিপুষ
যুবোনের অস্ত্রের সম্পদ এই সত্যভার মানকে। আর
আজ আমের বিবাহের দিনে সে বিশ্বাস একদারে পেউনিদা
হয়েছে।

এর ছ’মাস পরের কথা। কবি অস্থূল, নিজে
হাতে এখন আর লিখতে পারেন না, তিনি বলে যান,
অপরে লিখে নেয়। মিস্ রাধাবোনের নামে এক
ইংরেজ মহিলা ভারতবাসীকে, বিশেষ করে জেহর-
লাল মেহেরকে আক্রমণ করে এক খোলা চিঠি
লিখলেন। জেহরলাল তখন ইংরেজের কারাগারে
অবরুদ্ধ। মিস্ রাধাবোনের চিঠির মূলকথা ছিল
এই।— ভারতবাসী ইংরেজের কাছ থেকে পাশ্চাত্য
শিক্ষা পেয়ে উন্নত হয়েছে, কিন্তু আজ ইংলণ্ডের যুদ্ধে
তারা সহায়তা করছে না,—এ অকৃতজ্ঞতা।

জাতির আয়সম্মানে যখনই আঘাত লেগেছে
রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ দ্বারা প্রকাশ করেছে।

যোগেশ্বরী থেকে অ্যানাসিয়েটেড প্রেস মারফত
রবীন্দ্রনাথ ওই বর্ণিত বাণীর যথোচিত উত্তর দিলেন।
তিনি বললেন,—

মিস্ রাধাবোনের বেশবলীতা আজ যদি ভারতের
পাণীনত-সংগ্রামের মহাহুড়ের যোদ্ধার কর্তৃ গরাপ্রাণীরের
অস্ত্রহাশে লুপ্ত না রাখত তবে উত্তর তিনিই লিঃ এম। কথা
গরে আমাকে দিতে হচ্ছে।

ব্রিটিশ শাসনধারার বহুইচ্ছা পাশ্চাত্য সভ্যতার মহোৎসব
ঐতিহ্যের প্রতীক, ততইচ্ছা হতে আমেরা ব্যক্তিক বহু শিক্ষা
লাভ করেছে। কিন্তু এ কথা না বলে থাকতে পারি
নে, আমাদের মধ্যে ধারা এই শিক্ষা থেকে লাভবান হয়েছে,ন,
আমাদের অনিচ্ছিত করবার সকল রকম সরকারি চেষ্টা

॥ বিশ্বশার গান ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আট

বৃদ্ধের নাম দেবপ্রসন্ন। ঊরু ব্রাহ্মণ, পদ্মবী
লাহেড়ী। পিতৃবন্ধু, তাই থেকেই মল্লীর আঠামশাই,
নয়তো মল্লী কায়স্থকন্যা, ওর পিতা অন্যথ বসু
হাজারীবাগের একটি মহকুমায় ওকালতি করেন।
লেখাপড়ার জন্য কস্তাকে বন্ধুর অতিভাবকবে রেখে
দিয়েছেন।

দেবপ্রসন্নের কর্মজীবনের গোড়ার দিকটা
কেটেছে বৃদ্ধের দিকে। বিলাতে শিক্ষানবিশী শেষ
করে উনি ওদিককার বিভিন্ন অঞ্চলে কাপড়ের কলে
চাকরি করেন—বসে, আহমেদাবাদ, হুয়াট। উত্তর-
জীবনে বাংলাতেই চলে আসেন, মিলের চাকরি
নিয়েই। এখানে এসে একটা ভিনিস তাঁর চোখে
বড় বেশি করে পড়ে; অনেক দেখেছেন, অনেক
শুনেছেন, বাইরে আর সব জাতির মুক্ত, স্বচ্ছন্দ,
সতেজ জীবন-প্রবাহের সঙ্গে বাঙালীর জীবন-প্রবাহের
মধুরতা—বহুক্ষেত্রে তুলতাই—ওঁর মনকে বড়
দীড়িত করে। ওঁর মনের এই বেদনার প্রতিধ্বনি
পান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের লেখায়। তাঁর কমিষ্ঠ
জীবনের সঙ্গেও নিজের জীবনের মিল রয়েছে;
আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, প্রায় শিষ্যত্বই গ্রহণ করে ওঁর
মতোই লেখার মধ্যে দিয়ে, আবার নিজের জীবনের
আদর্শ দিয়েও স্বজাতিকে কর্মজীবনে আর সব
জাতির সমস্তরে তুলে ধরবার ত্রুট গ্রহণ করেন।
সফল হননি, তার নৈরাশ্র্য বহন করে চলেছেন।

আর একটা, হয়তো পড়ার নৈরাশ্র্য বহন করে
রয়েছেন দেবপ্রসন্ন। জীবনে অনেক কিছু মানেননি
এবং সেই না-মানারই অভিব্যক্তি হিসাবে বিলাতেই

একজন গুজরাটী ব্যবসায়ীর কস্তার পাণিগ্রহণ করেন,
সেই শূদ্রেই ব্যব-প্রাপ্তে প্রথম চাকরিও, কিন্তু
ওটাও সফল হতে পারেনি জীবনে। বাংলায় চলে
আসার সঙ্গে বোধহয় এ-বেদনার সঙ্গ ছিল। বয়স
তখন একেবারে উত্তীর্ণ হয়ে যায়নি, কিন্তু আর
বিবাহের দিকে গেলেন না।

রীতিতে এসে রয়েছেন প্রায় বছর সাত হোল।
প্রয়োজন নেই, কর্মজীবন থেকে একটু সকাল-
সকালই অবসর গ্রহণ করলেন, তারপর এট বাড়িটি
কিনে এখানেই রয়ে গেছেন। মল্লী এসে রয়েছে
প্রায় অতদিনই, কনভেন্টে ভর্তি হয়েছিল, এখন
কলেজে এসে উঠেছে।

মল্লীদের সঙ্গে দেবপ্রসন্নের যোগাযোগ নিতান্তই
আকস্মিক। তখন রীতি-হাজারীবাগে বাড়ি কেনা
নিয়ে মাঝে মাঝে যাত্রায়াত করছেন, তারই
একক্ষেপে, কলকাতায় ফেরবার পথে মল্লীর পিতা
বসন্তবাবুর সঙ্গে গাড়িতে সাক্ষাৎ ও আলাপ-
পরিচয়। একজন বাঙালী হাজারীবাগের, শূন্য এক
মহকুমার রোজগারের জন্য বসেছে, সেখানে রেল
নাই, অল্প যান-বাহনেরও বিশেষ সুবিধা হয়নি
তখনও—এতে একেবারে মুগ্ধ করে তোলে
দেবপ্রসন্নকে। বসন্তবাবুরও স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়ে
পড়েন, এবং যাত্রাপথের ঐকান্ত্যেই যে অন্তরঙ্গতা
জন্মায় সেটা দীর্ঘ পরিচয়ের মতোই নিবিড় হয়ে ওঠে।
বসন্তবাবুর বেরিয়েছিলেন হাজারীবাগে কস্তার পড়ার
ব্যবস্থা করতে; বেশ মনোমতো হোল না, তাই
কলকাতাতেই কোন আদায়ের ওখানে থাকলেন,
দেবপ্রসন্ন প্রস্তাব করলেন, যদি ওঁর আপত্তি

না থাকে তো তিনি দায়িত্ব নিতে পারেন। হাতে স্বর্ণ পাওয়া; বসন্তকুমার কথাকে নিয়েই চলেছিলেন কলকাতায়, আর মাতার বাড়িতে না উঠে দেবপ্রসন্নর বাসাতেই গিয়ে উঠলেন। জায়গা হিসাবে হাজারাবাগের চেয়ে রাঁচী ভালো, তবে বাড়িটার ভক্ত দাম চাঞ্চিল বড় বেশি। একলা মানুষ, প্রয়োজন কম, একটু ইতস্ততঃ করছিলেন দেবপ্রসন্ন, ভাবছিলেন সময় নিলেও যদি দরটা একটু কমে, নম্রী থাক। ঠিক হয়ে গেলো আর বিলম্ব করলেন না।

বসন্তকুমার বেশ একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন বৈকি, পরিচয়ের মুখেই একটা ক্ষতি করিয়েই দেওয়া তো। দেবপ্রসন্ন উত্তর দিয়েছিলেন—নিজের জাতের কেউ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে দেখলে সব জাতের লোকই তার যথাসাধ্য করবার চেষ্টে পাশে এসে দাঁড়ায়। ব্যবসাদার জাত নিজেদের পাঁচভনের মধ্যে থেকে একটা পুঁজি করে দেয়; আমরা বাঙালীরা চাই কোনরকমে একমুঠো খেয়ে নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতিটা বজায় রেখে দেয়। তা সেখানে নিজেদের কেউ যখন ঐ একমুঠো খাওয়ার সংস্থান করতে গিয়ে সেই শিক্ষা-সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে, উচিত নয় কি একটু পাশে গিয়ে দাঁড়ানো? অবশ্য জাতিবৈর কথা না ভেবে মানুষ বলেই করা উচিত, করেও ছোকে; তবে সব সময় যদি সম্ভব না হয় তো, ভগবান জাতির পত্তী বেঁধে ক্ষেত্রটা যে করিয়ে দিয়েছেন বুদ্ধি করে, তার সুযোগটা তো নিতেই হয়।

খানিকটা গুরুত্বের সঙ্গে, খানিকটা আবার লঘু করে দিয়ে বলে গিয়েছিলেন দেবপ্রসন্ন। আসল কথা—ঐ যে একটি লোক অদৃষ্টের প্রতিকূলতা না মেনে, শত বাধা-বিঘ্নের মধ্যে নিজের একটা স্থান করে নিচ্ছে, বাড়ি ছেড়ে, স্বজন বিচ্ছিন্ন হয়ে, আগেকার বাঙালীদের মতো—এতেই দেবপ্রসন্নকে লাভের কথা, ক্ষতির কথা, সংক্ষেপে বলতে গেলে নিজের বিকটার কথা একেবারে দিয়েছে ভুলিয়ে।

কমী লোক, কর্মক্ষেত্রটাও এমন ছিল যেখানে প্রতি পদে সূক্ষ্ম বিচার করে চলতে হোত; খুব বেশিরকম প্রাকটিক্যাল না হোলে উপায় ছিল না কিন্তু বাঙালী কেউ বিপন্ন পরিবেশের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে বা করতে যাচ্ছে—সাধারণভাবে জাতিটা করছে না বলেই—এ-দৃষ্টে একেবারে ঠেকে অস্তিত্ব করে ফেলে। ছেলেমানুষের মতোই উন্নতি হয়ে ওঠেন, তাবপ্রবণ এতটা হয়ে পড়েন যে অনেক সময় বিচারের সূক্ষ্মতারও ঘেন অভাব হয়ে পড়ে। সেন্টিমেন্টাল লোকের যা হয়।

যেমন হচ্ছে নলিনাক্ষের ব্যাপারে।

দেবপ্রসন্ন যে জায়গার বাড়ি কিনেছেন সেটা সহরের একটু বাইরের দিকেই পড়ে, যদিও সহর থেকে বেশি দূর বা বিচ্ছিন্ন নয়। জায়গাটা একটু বেশি উচু-নীচু, ভাঙাচোরা। এর জন্ত, একে তো বাড়ি বেশি নেই, তার ওপর যে ক'খানি আছে তাও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ এখানে তেমন-তেমন লোক বাড়ি করেছে, যারা গিয়ে পাঠে গিয়ে থাকতে অভ্যস্তও নয়, আর যাদের এই ধরনের পরিত্যক্ত জমি খানিকটা উপযোগী করে নিয়ে বাড়ি করবার সামর্থ্যও আছে; অবসরপ্রাপ্ত বড় চাকরে, যারা কোয়ার্টারে কোয়ার্টারে কাটিয়ে এসেছে; জমিদার, কি সম্পন্ন ব্যবসায়ী, এই ধরনের মানুষ।

এরই মধ্যে একখানা বাড়ি নলিনাক্ষের।

নলিনাক্ষের পিতা ছিলেন একজন ডাক্তার; বিহার গবর্নমেন্টে চাকরি করেন, এবং শেষের দিকে মিডল সার্জনের পদে উন্নীত হন। শেষের দিকটা বদলি হয়ে ছিলেনও রাঁচীতেই এবং সেই সময়েই বাড়িটা করেন এখানে, ডাক্তার অবসরপ্রাপ্ত হয়ে এখানেই জীবনের বাকিটুকু কাটিয়ে দেন।

নলিনাক্ষ পিতার একমাত্র পুত্রসন্তান। অর্থের অপ্রচুর নেই, সুযোগও প্রচুর, বা করবে খুব বড় আয়তনে করবে এই ধরনের একটা উচ্চাশা বরাবরই পোষণ করে এসেছে এবং প্রথম-প্রথম হয়তো সেটা

উজাশা মনে করায় জন্মই বাপ-মায়ের কাছে প্রভাষও পেয়ে এসেছে। ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হবে, উকীলের ছেলে উকীল, এই সাধারণ নিয়মে ঠিক হোল ডাক্তারিই পড়বে সে। মলিনাক কিন্তু পদবীটাকে আর সবার থেকে বিশিষ্ট করে রাখবার জন্য ঠিক করল, যেখানে আই-এসসি হয়েই ঢোকা যায়, সেখানে এম-এসসি'র তকমা বুকে না করে ঢুকবে না সে। অতদূর পৌছবার পূর্বেই কিন্তু ও নিজের প্রতিটা আবিষ্কার করে ফেলল। ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হবে এটা ভালগাছের ফল ভাল হবে, কিংবা কুইমাছের ছানা কাংলা হতে পারবে না এই ধরনের উদ্ভিদ্ধ বা যৈব নিয়ম। জন্মের দিক দিয়ে কোন উপায় নেই, তাই বলে আর সব দিক দিয়েও যদি মানুষ নিজেকে এইভাবে কড়াকড় করে বেঁধে রাখত তো এতবড় মানব-সভ্যতার দর্শনবী বিকাশটা হোত কি করে?... যদি মানব ছিল শিকারী, সেই উত্তরাধিকারে আজ পর্যন্ত যত মানুষ জন্মেছে সবাই শিকারী-ই হয়ে থাকত না।

বি-এসসিটা একবার ফেল ক'রে দ্বিতীয়বার উজোশি হওয়ার মুখেই মলিনাক জার্মেনী চলে গেল কৃষি সহস্র জ্ঞান সঞ্চয় করে আসতে। তার পর যতদিন পিতা জীবিত ছিলেন এই পথ ধরেই চলেছে; জার্মেনী থেকে ফিরে মোটর-সার্ভিস খুলল একটা, তারপর একটা ওয়ুথের দোকান। পিতা যখন মারা গেলেন, অকালমৃত্যুই হোল একরকম, মলিনাক তখন রাঁচী থেকে কলকাতায় ডিম চালান দিয়ে কলকাতা থেকে ইলিস মাছ আর গলদা চিংড়ি এনে রাঁচীর বাজারে চালু করবার সংকল্প নিয়ে যাত।

পিতা দেখেওনে মৃত্যুর আগে সহরে আরও দুখানি বাড়ি কিনে রেখে যান, যদি আর সব ব্যবসার পর বাড়ি-বেচার ব্যবসা না ধরে ছেলে তো একরকম করে চলে যাবে। ছেলেকে অবিবাহিতই রেখে যেতে হোল, কেননা বিবাহের ব্যাপারেও খুব

বিশিষ্ট কিছু একটা করবার বোঁকে ততদিন পর্যন্ত বিবাহ করা হয়ে ওঠেনি মলিনাকের।

দেবপ্রসন্নর সঙ্গে পরিচয় বহুর ছুই থেকে, মলিনাক যখন মোটর-সার্ভিস গুটিয়ে ফেল ওয়ুথের দোকান চালাচ্ছে। একদিন মল্লীকে সঙ্গে করে বেড়াতে বেরিয়ে হঠাৎ বৃষ্টি নামায় উনি যখন বিপন্ন, মলিনাক মোটরে করে দোকান থেকে বাড়ি আসছিল, ঊর্ধ্বের দুজনকে তুলে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিল। পরিচয় হোল। একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছেলে, বাধা রাখায় না গিয়ে ব্যবসা করছে, প্রথম পরিচয়েই মুগ্ধ করে দিল মলিনাক। আর সবই ভালো ছেলোটার, দুর্বলতাটা কোথায় সেদিকে যে মজর বেতে পারল না দেবপ্রসন্নর তার কারণ সেটি-মেন্টাল মাচবের সেটিমেট যেখানে প্রবল, দৃষ্টি সেখানে অসুস্থতানী হয়ে উঠতে পারে না। পিতা তখন মারা গেছেন, এর পর ওয়ুথের দোকান গুটিয়ে মলিনাক যখন ডিন-মাছের কেব্রে নেন এল, তখনও দেবপ্রসন্নর মহানতে কোন প্রভেদ লক্ষিত হোল না, আভিজাত্যের কথা তুলে সে যে নিম্নস্তরের কাছে বন্ধনদেই বেমে আসতে পারল এতে হয়তো ওর জ্ঞানটা আরও দৃঢ়ই হোল। শুধু বললেন—“ওয়ুথের দোকানটা না তুলে দিয়ে এর সঙ্গে রেখে গেলেই হোত ভালো।”

মলিনাক বলল—“একলা মানুষ ধে, বুঝছেন না? একলা মানুষ বলেই প্রথমটা ভেবেছিলাম, না হয় থাক, দোকান নিয়েই পড়ি থাকি; তারপর খতিয়ে এর ফিউচারটা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। ভালোম পেট চলছে না এমন নয় তো, দেখাই থাক না নেনে পড়ে। হাজারীবাগে এক পাঞ্জাবী আরম্ভ করেছে, কেঁপে উঠেছে বলা চলে, তার মজর রাঁচীর ওপর পড়বার আগেই আমার বাজারটা হাত করে নেওয়া দরকার।”

মল্লী ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা কিছু বোকে না অবশ্য, তবু সাধারণ বিচার-বুদ্ধিতে একটা ঘটকা তো লাগেই। তবে নূতন পরিচয়, সাহায্য-সামানি কিছু

বলত না তখন, নলিনাক চল গেলে দেবপ্রসন্নর কাছে মনেহুটা প্রকাশ করল—“কিন্তু উনি লোকের অভাবের কথা বলছেন, এ-কাজে কি আরও লোকের দরকার নয় জ্যাঠানশাই ? রাঁটী-কলকাতা, হুঁজুয়াগা নিয়ে বাসনা।”

দেবপ্রসন্ন এমনভাবে মুখের দিকে একটু চেয়ে রইলেন যে বেশ বোকা গেল কোন কারণে এদিকটা তিনি ভেবে দেখেননি। বললেন—“তা তো ঠিকই, তবে লোক নিশ্চয় পেয়ে যাবে।”

“তা যাবেন নিশ্চয়, তবে লাভ করবার লোক পাবেন, কি লোকসান করবার লোক পাবেন— একলা মানুষই তো, এতগুলি লোকের ওপর নড়র রাখা—তাও এক জাহাঙ্গীর নয়...”

একটু হাসলেন দেবপ্রসন্ন, বোধ হয় নিজের মূর্তির দুর্বলতাই, তারপর যে কারণে এই সুল কথাগুলি তাঁর নড়র এড়িয়ে গেছে সেই কথাই এসে পড়ল। বললেন—“কি জানো মা, নলিনাক যে মত বড় ঘরের ছেলে হয়েও বাঁধা রাখায় বড় হওয়ার দিকে গেল না, তারপরে আবার আমরা যেটাকে ছোট কাজ বলে মনে করি তাই নিয়েই নেনে পড়ল, তাইতে ও এটা মস্তবড় সংসারের পরিচর দিয়েছে।”

“একটা কাজে লেগে থাকার ধৈর্যের অভাবও তো হতে পারে এটা, জ্যাঠানশাই।”

একটু চুপ করেই রইলেন দেবপ্রসন্ন, যেন নলিনাকের জীবনের গতিটা আগাগোড়া এই প্রথম দেখতে পেলেন; বললেন—“হয়তো তাই, তবে কি জানো ?—প্রত্যেক ব্যাপারেরই ছোটো দিক আছে, আর কিছু না হোক, একটা ভালো আদর্শ তো দাঁড় করাচ্ছে নিজের জাতের সাননে। ওর নিজের কথা ধরলে—হয়তো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে একজায়গায় এসে কারেবী হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারে...”

হঠাৎ চুপ করে একটু যেন বেশি চিন্তাশ্রবণ হয়ে পড়লেন; মধুরভাবে বললেন—“কথাটা কি জানো

মামী ?—সমষ্টির অস্তিত্ব ব্যতির স্ফটিকাইসু দরকার মাঝে মাঝে। ধরা থাক, নলিনাক পাঠল না দাঁড়াতে, ওর এই আত্ম-বলিদানে জাতি হবে উপকৃত, তাদেরও অনেকে পড়বে হয়তো, কিন্তু অল্প যে-ক’জন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে—পারবেই পূর্বগামীদের উদাহরণ দেখে—তারা হয়ে থাকবে একেবারে জাতির মেলনও ...সেদিক দিয়ে যদি স্ফটিকাইসুও হয়ই নলিনাক তো, সে স্ফটিকাইসের একটা মূল্য যে আছেই সেটা অস্বীকার করতে পার ?”

তা করে না মামী, শুধু একটু হেসে বলে—“যদিও সে স্ফটিকাইসুটা ইচ্ছাকৃত নয়...”

ওর জিন্দেই দেবপ্রসন্নর মুখেও একটু হাসি কোটে, ছোঁয়াচ লেগে বোধহয় একটু তর্কের জিনও আসে, হেসেই উত্তর দেন—“নয় হয়তো। তবে প্রকৃতিদেবী—কিবা বিধাতাপুরুষ, যাই বলো, জাতির স্বার্থে ইনডিভিজুয়াল বা ব্যক্তির মূঢ়তা এইভাবে এনে দেন মাঝে মাঝে।”

নয়

তক্তিতের সঙ্গে যখন পরিবারটির পরিচয় হোল শুখন নলিনাক এ-বাড়ির একজন নিয়মিত আগন্তুক। নিয়মিত হওয়ার একটু কারণও হয়েছে ইতিমধ্যে।

ডিম-মাছের পর্বও শেষ হয়ে গেছে, আপাতত নলিনাক কাড়া হাত-পা। এখন, ভবিষ্যতে কি করবে তাই নিয়ে গবেষণা করছে। দেবপ্রসন্নর সঙ্গে আলোচনা হয়, পরামর্শ চায়। মামীও থাকে।

ও আর কিছু যে করবে না ভবিষ্যতে এটা ঘনিষ্ঠতা হওয়ার সঙ্গে একরকম টের পেয়ে গেছেন দেবপ্রসন্ন। কিন্তু তার অস্ত্রে ওঁর কোন নৈরাশ্র বা খেদ নেই। বড়মাছ বাপের একমাত্র ছেলে সে যে এইরকমই দাঁড়াবে এটা একরকম মেনে নিয়েছেন। তাতে নিশ্চিন্তও আছেন এইজন্য যে, দেখে শুনে বৃত্তে পারছেন ওর এবপর আর কিছু না করাটাই শ্রেয়। পিতা ছেলের মতিগতি দেখে এমন পাকারকম ব্যবস্থা করে গেছেন যে, কিছু

করার স্তম্ভ চিন্তাটা মাথায় না ঢুকলে খাওয়া-পরায়
হুঙ্কিতাটাও পড়বে না ঢুকতে।

ছেলেটিকে স্নেহ করেন। এক ঐ অব্যবহিত-
চিত্ত, তা ভিন্ন এদিকে বিশেষ কোন ঘোষ নেই। এর
ওপর বাপ-মায়ের আদর-খাওয়া ছেলের স্বভাবে
যে একটা দুর্বলতা, একটা অসহায়তা বোধ এসে পড়ে
তাতে যেন ওকে আরও কাছে টেনে নেয় মন।
এই কারণেই মল্লীও ভালোই বাসে, ঠিক প্রণয় কিনা
বলা যায় না,—ঐ অসহায় পরনির্ভরশীলের প্রতি
একটা স্নেহ, নিজেস্ব স্বভাবের চট্টলতার ক্ষতে হয়তো।
একটু বিক্রপের ভাব আছে, কিন্তু তাও কল্পনামিশ্রিত ;
কঠোর সমালোচনা নয়।

ওদের বৈঠকটা এখন একরকম নিত্যদিনেরই
ব্যাপার। নিয়মিতভাবে সভা ধরতে গেলে
তিনজন, তার মধ্যে মল্লীর সপ্তাহে তিনদিন প্রায়
ঘটা আড়াইয়েক করে গানের শিক্ষকের কাছেই
কেটে যায়। এ-ছাড়া আজ একজন কাল অসুস্থজন,
এই করে গড়পড়তার চার-পাঁচজন হয়েই যায়।

আলোচনার ধরা-বাঁধা কিছু নেই, যখন যে
কথাটা উঠল, খবরের কাগজ অবলম্বন করে, কোন
পত্রিকা-পুস্তক অবলম্বন করে, বা সহরেরই কোন সম্ভ-
ঘটনা অবলম্বন করে। বাঙালীর জীবনের সমগ্রা
নিয়ে আলোচনাটা কিছু বেশিই হয়। এ-জিনিসটার
সঙ্গে দেবপ্রসন্নর একেবারে বাড়ির যোগ,
ওর জীবনের সাধনাই হোল বাঙালীর কল্যাণ-চিন্তা ;
অন্তের কাছে অতটানা হোলেও জিনিসটা আলোচনার
বিষয় হিসাবে মুখরোচক, ধারা ওটাকে দেবপ্রসন্ন-
বাবুর দুর্বলতা বলেই মনে করেন ওঁরাও অতিথি-
বৎসল গৃহবাসীর দুর্বলতাইকে প্রেঙ্কর দিয়ে যান।
বিরোধিতা করবারও লোক আছে, এখানকার
এক কলেজের প্রফেসর অনিয়ন্ত্রতন। প্রথমত
প্রাদেশিকতা ঋষ্টিশূন্য নয় বলে এর বিরোধিতা
সহজ ; দ্বিতীয়ত আর পাঁচজন যাতে সায় দিচ্ছে
তাতে সায় না দেওয়ায় একটা সহজ বৈশিষ্ট্য অর্জন
করা যায়। অনিয়ন্ত্রতনের বিরোধিতা করার আরও

একটা বড় কারণ আছে ; ব্যক্তি-জীবনে তার মনটা
এক-সেই থেকে তার আচরণ অত্যন্ত প্রাদেশিক-
ভাবাপন্ন।

গান-বাজনাও হয়। স্থপা যখন ছিল তাকে
প্রায়ই ধরে অনিত মল্লী। নাকে নাকে গানের
শিক্ষক অপরেখবাবুকেও ডেকে নিত, আরও পাঁচ-
জনকে নিমন্ত্রণ করে রীতিমতো আসরুই বসিয়ে দিত।
স্থপার বিবাহের পর এদিকটা একটু অবহেলিত।
ঠিক নিজের চাড় করে মল্লী আর কিছু করতে
চায় না। একে সঙ্গীতারা হয়ে মনটা বেশ সড়া দেয়
না, তায় গান-বাজনা বোধে এমন লোকও বিশেষ
নেই এটা গোষ্ঠীর মধ্যে। তবু মলিনাক ফরমাস করে
ব'লে অনিয়ন্ত্রতন ফরমাস করে, এবং অনিয়ন্ত্রতন
ফরমাস করে ব'লে মলিনাক ফরমাস করে ; মল্লী
কখনও কখনও কোন অজুহাত দেখিতে কাটিয়ে দেয়,
কখনও কখনও নিয়ে বসে এসাজটা। গীতবাজ
সংক্লিপ হয়ে এইখানে এসে ঠাঁড়িয়েছে।

এই সময় তড়িং এসে উপস্থিত হোল।

প্রথম দিনটা তিনজনের মধ্যেই গল্পগুচ্ছব আবহ
হইল, কেননা দেবপ্রসন্ন আর মল্লী যে আশ্রমে যাবে
এটা আগে থাকতে জানা, কেউ আর আসেনি
সেদিন। এরপর দিন-দশ-বারো আর এলনা
তড়িং। প্রথম দিনের আলাপে দুজনকেই ভালো
করে চেনবার সুযোগ হোল, আকৃষ্টই হোল এবং
মল্লীর নিবিড়তর পরিচয়ে নিশ্চিন্তও হোল, তবে এই
পরিবেশের মধ্যে এসে পড়া, ওর জীবনের যা গতি,
সে-হিসাবে কল্যাণকর হবে কিনা ঠিক বুঝে উঠতে
পারছিল না, এমন সময় কতকটা আগেকার মতো
আকস্মিকভাবেই আবার একদিন এসে উপস্থিত
হোল।

পুতুলিয়া রোড ধরে বাইরে একজন আরোহী
নিয়ে গিয়েছিল। ক্ষিতছিল খালি গাড়ি নিয়েই,
খানিকটা এসে সহরে ঢোকবার মুখে রাস্তার পাশ
থেকে একজন ডেকে প্রের করল—“সওয়াঁরী
লেগা ?”

প্রশ্নকর্তা নলিনাক্ষ। মোটর বিগড়ে গেছে, ড্রাইভার বনেটটা খুলে পরীক্ষা করছে, তড়িৎ ঘুরে চাইল। মুনিসিপ্যালিটির মধ্যে আসেনি তখনও, আলো নেই, বাঙালী কি কে ঠিক বুঝতে পারল না। বিপন্ন, স্তব্ধতা: অতটা বোধহয় ভাবলও না, উত্তর করল—“লেখা। কাঁহা যাইয়ে গা?”

নলিনাক্ষ পাড়াটার নাম করল।

বেশ একটু চিন্তা করল তড়িৎ, ঘিধা, আকৃষ্ট হলেও ও পরিবেশের মধ্যে আর যাওয়া ঠিক হবে কিনা ওর পক্ষে, তারপর জানাল, ওকে যেতে হবে অস্বস্তিক।

নলিনাক্ষ সামনে পেছনে বেশ ভালো করে একবার দেখে নিল : বলল—“ডবল ভাড়া দেগা।” কতকটা মিনতির তাবই নিশিয়ে বলল—“চলো না।”

তড়িৎ একটু ভেবে নিয়ে বলল—“বেশ, আটাইয়ে।”

নলিনাক্ষর ড্রাইভার বাঙালী, বোধহয় কতকটা দেবপ্রসন্নবাবুরই প্রভাব। তাকে একটা গোস্তর গাড়ি ডেকে নিয়ে মোটরটা বাড়ি নিয়ে যেতে বলে নলিনাক্ষ এসে চেপে বসল।

সমস্ত রাস্তাটা খুবই অস্বস্তিকরভাবে কাটল তড়িৎর। চূর্বঙ্গতা এসে যাচ্ছে যতই এগুচ্ছে, যাবে আরোতীকে নামিয়ে মল্লীদেব বাড়ি?...পাড়ার মধ্যে থানিকটা এসে প্রশ্ন করল—কোন দিকে যেতে হবে, কোন বাড়ি? নলিনাক্ষ একটু ঘেন ভেবে নিল,

তারপর নিজের বাড়ির রাস্তা না বাংলা দেবপ্রসন্ন-বাবুর বাড়ির রাস্তাই ধরতে বলল।...

একটা চাপা ঘিধায় তড়িৎর শরীরটা একটু একটু কাঁপছে। মল্লীদেবের গেটের সামনেই দাঁড় করাশ নলিনাক্ষ। তড়িৎ বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, দশ-বারোদিনের সংযমটা আর ধরে রাখা যায় না। একটু বাড়তি কারণ হয়েছে তার এর মধ্যে; মল্লীদেব এশ্রাজের আওয়াজ ভেসে আসছে।

নলিনাক্ষ ব্যাগ বের করে ভাড়া দিতে গেল ডবল। তড়িৎ মুখের দিকে চোখ তুলে অস্বস্তিকাবে একটু হাসল, স্পষ্ট বাংলায় বলল—“আমি এ-বাড়িতে এলে ভাড়া নিইনা।”

এত বিস্মিত হয়ে গেছে নলিনাক্ষ যে, হাত আলগা হয়ে ব্যাগটা নিচে পড়ে গেল। তুলে নিয়ে যখন উঠে দাঁড়াল, তড়িৎ সেইভাবেই হেসে হাত বাড়িয়ে বলল—“না হয় দিন, তবে ডবল নয়।”

নলিনাক্ষ একটা আট-আনি রেখে দিল, এবার ও একটু একটু কাঁপুচ্ছে, বোধহয় বাকুফুতিই হচ্ছিল না আশ্চর্যে, এতক্ষণ পরে বলল—“আপনি বাঙালী!...একটু দাঁড়াবেন কি দয়া করে?”

কতবড় আবিষ্কার করেছে একবার দেখাতে চায় দেবপ্রসন্নকে, মল্লীকে।

তড়িৎ রিক্‌শার মুখটা ঘুরিয়ে বলল—“দাঁড়াব না। গেটটা একটু খুলে দিন তো, ভেতরেই যাব।”

[ক্রমঃ :]

আলশায়র
বৈচিত্র্য

যোগা
৪৬
৩৬২৬

লক্ষ্মী ব্রাদার্স
জুয়েলার্স
১, তিন্দু স্মার্ট হাউস, বালিগঞ্জ
২০৮/৮, রাসবিহারী ব্রিকফিল্ড (গড়িয়াহাট জংগন) কলিকাতা

শ্রামান্তি দিকিম

তিনিবিলরজন রায়

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

হাত আটটার গ্যাটেক পৌঁছলাম। শরীর অবশ্য—
শীতে জরাজীর্ণ। সেই বেথিয়েছি কোন্ সন্দেশে, পাশে
বার ঘটা-হুঁএর লজ্জা খেয়েছিলাম—আজীবনের তালিমে।
বেথিরভাষা পথই এসেছি তুষ্টি মাঝার নিয়ে। যখন
গ্যাটেক এসে হাজির হ'লাম তখন কুখা ও শীত চুই-ই বেশ
এবল। সরকারী অতিথিশালায় থাকবার ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গই
দিখে ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু অকুস্থলে এসে দেখা গেল
অতিথিশালায় বার তালাবদ্ধ। চৌকিদার অস্থপস্থিত।
অনেকক্ষণ বাইরে ঠাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল। শেষে চৌকিদার-
বৃহিই এসে মুশকিল-আলান করল বাটে, কিন্তু ঘরের ভিতরের
অবস্থা সোচ্চনী। সমস্ত ঘরটা আবর্জনার পূর্ণ। সান্নাঘরের
চুলোটা ভাঙা। অত হাতে কোথার পাই চুলো—আর, কী
ভাবেরই বা আতন ধরিয়ে একটু গরম জল আর জ্বরানল
নির্দেশিত করার কিছু আহার্য প্রস্তুত করি—এই হ'ল
সমস্ত। ঘরে ইলেকট্রিক লাইট আছে। স্টেচবার্ডে একটা
স্নান-পয়েন্টও হুঁমে পাওয়া গেল। কথিবর্মা অধীর বস্ত্র
কোথা হ'তে একটা স্টোভ জোগাড় করে আনলেন, তাই
দে-বারেইনোহাট প্রাপটা বাঁচল। বেশ শীত। কিন্তু সেপ-কবল
হুই-ই সঙ্গে এনেছি—শীতের ডর কি? একটা পাহাড়ের
রিজ-এর (ridge) উপর অতিথিশালা। ঘরের বাইরে এসে
ঠাঁড়লাম। পাহাড়ের ধাকে ধাকে গ্যাটেক শহর নৈশ
আলোকমালায় নিজ অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। চারদিকেই
পাহাড় আর পাহাড়। কুলপক্ষে তিমিরময়ী হাতি—দুই
পাহাড়ের চূড়াগুলি যেন জঘাট অঙ্ককারে মিগ্‌ব্যান্ড
অটলযতন। উপরের আকাশ গোলাটে অঙ্ককার—যে
যেবে সঘাঙ্কর। তিমিরহাতির পূজীভূত অঙ্ককার বিনীর্
করে দুই দুই পাহাড়ী বস্তীর হুঁএকটা আলো মিটিমিটি
করে। দুই পাহাড়ের জল হ'তে শিবাংশের স্তীত্র
একতান শুনা যায়। দিনের আলো নিতে যাওয়ার সাথে-
সাথেই পর্যন্ত জনপথে নিবৃত্তি-হাত নেবে আসে।
শীতের প্রকোপে যে ঘর ঘরে ঝিল বেধে। লোকানপাট,
পথঘাট জনবিরল হয়। বাহুবের কর্মচাকলা খেবে যায়।
বনে হত, আকাশ হ'তে নেমে-আসা এক কালো ছুঁদের
চানরে গ্যাটেক শহরটাই যেন ঢাকা পড়েছে ৯৯ আর
কেনীক্ষণ বাইরে ঠাঁড়িয়ে থাকা সুখের নদ্র। হিম পড়েছে।

শীতে হাড় কাশুনি ধরেছে—হাতহুঁটো যেন অগাধ হতে
আসছে। হুতবাহা ধানে মানে ঘরে কীরে বিছানার আগ্রহ
নেওয়াই শ্রেয়সর।

পরদিন দুই ভোরেই দুই ভেঙে গেল। মাঝার দিকের
বড় কাচের জানালাটা একটা পুরু শর্পর ঢাকা। বিছানায়
ওয়ে-ওয়েটে হাত বাড়িয়ে পরাটা সরিয়ে বাইরের
দেখবার ইচ্ছা। জানালার কাছে সেগে রয়েছে কুখাশার
ঘন আশ্রয়। বাইরের কিছুই দেখা যায় না। অতএব
উঠতে হ'ল। এককালি জাক্কা ঘিরে জানালার কাচ হুঁচে
নিলাম। বজ্র কাচের ভিতর দিয়ে দুই শর্পরতর কেমশীর্
দৃষ্টিগোচর হ'ল। এই সেই কাকনরকল—বদতিম ব সমুদ্রত।





গ্যাটেকের বাজার

সন্ধ্যা স্বর্গস্থ তখনও উপস্থিতির অন্তরালে। চিরতুবার কাননজন্মের গড়েছে উপস্থিতির অকণের বিস্তৃত রক্তিম আলো:কল্পট। কাননজন্মের এই রূপ বেন অশাপবিন্দু হুদারী রূপ! এই সৌন্দর্য-সমূহ সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। দারভিসিং পাহাড়ে আসে দলে দলে বিলাসী মানুষের দল। শবের ক্যামেরা সবে নিয়ে 'টাইগার হিল'-পরিক্রমণ করে। দারভিসিংয়ের পাহাড় সত্য পণ্যের জায় ইতরজনের ভোগ্য। কিন্তু শ্রাবান্ত্রি-নিখের ঘন মেঘাব-জর্জন ডেল করে তপ্তকানন-সদৃশ ঐ যে কাননজন্মের অংশ তু'য়ে ঠাঁড়িয়ে আছে তার নিকট ক্যামেরা-কলাকাল সত্যের বড় একটা হয় না। গ্যাটেক থেকে কাননজন্মের বেশে সদ্যসরি লুটটি চোখে গড়ে তেননটি নাকি আর হুদাপি হয় না। হুদের বিজ্ঞ, গ্যাটেকের শবের পথটকদের ভাঁড় নেই বনসেই চলে। গ্যাটেক শহর থেকে দু'বিকে ছুটি পথ উঠে গেছে। একটি হচ্ছে ঐতিহাসিক তিস্তাতের পথ, আর একটি গেছে কাননজন্মের দিকে। এই কানন-জন্ম-সড়ক ধরেই অভিযানকারীর দল এগিয়ে যায় উজ্জত আকাশচোরা দুয়ারমোদি হিমাত্রির দিকে। অনেকদূর অধি সড়কটা একে বেসে পাহাড়ের পর পাহাড় জিঁড়িয়ে উঠে গেছে। তার পর আর সড়ক নেই। হু:সাহসী অভিযানকারীর দল তখন বন্ধুর তপ্তগুণবিহীন রূপ পথে আরও এগিয়ে চলে; তার পর আসে বরকের গায়া। চিরতুবারের বেশ। এ-পথে মানুষ দু'য়ের কথা—বহুভেতর কীরেও সন্ধান খোঁা প্রদ্র। তবে কার্মিক দুয়ার-দানব (snow-man) নিয়ে গল্প-গবগণার বিরাগ

নেই। হিমবাহ (glaciers) অকল অতিক্রম করে আরো উত্তর উল্লে আরোহণ করতে হবে—দীর পদক্ষেপে অতি সতর্পণে এগিয়ে যেতে হয় অতীর্ণিত লক্ষ্যের দিকে। হু:সাহস-সম্পাতে কাননবর্ষ কাননজন্ম তার বিরাট মহিমার ভূত্বিতে বিভাজমান—এ বেন এক দুনিবার আকর্ষণ এক অপ্রত্যাখ্যানীয় আকর্ষণ: এসো হু:সাহ হু:সাহসিক দল—প্রকৃতির এই উজ্জত দৃশ্যের সন্নিহিত উত্তর দাও! ওই অদৃশ্য, অস্পষ্ট শৃঙ্গদ্বীপে উত্তাপন করে। তোমার অধঃজ্ঞা—প্রকৃতির দাও মানুষের অবিসম্বাদী গ্রহর প্রতিষ্ঠা করে। তাই বার বার ছুটে আসে লগাতের নানা বেশ হু:সাহ হু:সাহ অভিযানকারীর দল এই অদৃশ্যের আকর্ষণে, গ্রহণ করে ওই চ্যালেঞ্জ। বার বার নিজল হয় তাদের প্রয়াস, কিন্তু নিরুত্থম হয়না মাহুয। চিরনি:শব, চিরনীহব ওই হিমালয়ের চূড়াগুলি। এই অপরিদায় নিখর নৈ:শব্যমর জগত্তের সঙ্গিধো মানুষের মনে ঘটে এক অপরূপ ভাবান্তর। পৃথিবীর দুলা-মাটির বহ উল্লে এই একান্ত অনন্তরূপিণী প্রকৃতির সুধামুটি ঠাঁড়িয়ে মানুষ তার নিজ সত্তার বরূপ বৃত্তি উপলব্ধি করতে পারে। তাই ধ্যানধারণা ও নীরব সাধনার পক্ষে হিমালয়াকল এতো অভিজ্ঞেত, এতো সুনিজ্ঞবাহিত।

কবির কথাগুলি কী হৃদয়, কী ভাবগর্ভ! —

—বেখানে গরুছে ধরা

অনন্ত সুমারীত্বত, হিমবহ-পরা,

নি:শব, নি:শব, সর্ব-আভরণহীন;

বেধা দীর্ঘরাত্রিগেবে ফিরে আসে দিন

শব্দপূর্ণ শব্দবিহীন; রাত্রি আসে,

দুয়ারের বেধ নাই, অনন্ত আকাশে

অনিবেষ বেগে থাকে নিশ্চাত্তাহত—”

•

কিছু আর না। এবার বেশা থাক। হিমের রাজ্য এখনও বহু রূপে। আমরা এদেশি বাধা সড়কের শেষ প্রান্তে—এর পর আর মানুষের তৈরী পথ নেই। কিন্তু দূর হু:সাহ হু:সাহারদেবতার হিমশীতল কর্ণশের যেটুকু আভাস পাচ্ছি তাতেই যথেষ্ট। 'ভিগ্‌হুই'-এর সড়ক ধরে জামরা এগিরেই বাচ্চিলাম। এবার হ'ল হ'ল, তাইতো, আমাদের ও-কী নিরুদ্দেশ বাতা! আমরা তো আর কাননজন্ম-কিম্বদন্তিলাবী বীরের দল নই। এ অব্যবহ আশ্বালন আদীক্সের পক্ষে অশোভনীয়। এবার নিচের দিকে ফিরে চললাম। পথ আকাধীকা। প্রতি মোড়েই বিপদের

আশঙ্ক। একটা ঘোড়া ঘুরতেই সামনে সড়ক একটা চালক-
হীন টাট্টা ঘোড়া। আশ্বাসের ক্রোশের আওতাকে চমকে গিয়ে
প্রাণপণে ছুটেতে শুরু করেন। পাহাড়ী টাট্টাগুলি পথ
চলবার সময় পর্বতপ্রাচীরের ধার ঘেঁষে চলে না, কেননা
তাহে শাখতর সম্মুখে বেরের স্বর্ণ লাগবার সম্ভাবনা ঘূর
বেশী। তাহা চলে ঠিক পার্শ্ববর্তী বাঘের ধার ঘেঁষে।
ঘোড়াগুলির অহুত্বিত (horse-sense) ঘূর বেশী, সহজে না
হুকে বাঘে পড়ে না। ঐ টাট্টাটাও ডেমনি ছুটেতে লাগল।
আবার ভয় পাচ্ছে ঐ অলঙ্কারী খাঁটী বাঘে পড়ে প্রাণ
হারায়। আরে আরে কীণ চলছে; ঘোড়াটাও ছুটেছে—
পথ ছাড়ছে না। পথ ছাড়ছেই বা কী করে!

এইভাবে মাইল দুই চলার পর আর একটা দাতা
পাওয়া গেল, ঘোড়াটাও সেই পথ ধরে আশ্বাসের পথ ছেড়ে
দিল। এতক্ষণে বেয়াল হ'ল গ্যাটকে ছেড়ে অনেকদূর
এসে পড়েছি। ডিগ্‌হুই-এর পথ ধরে আরও ধানিকটা
দূর এগিয়ে গেলে পথিপার্শ্বে একটা ইয়েলী ও তিস্তা
জাঘর লেখা নোটবের দিকে নজর পড়ল। ঘোড়াটা
এখানে ঘুঁড়াগ হয়ে গেছে। ঘূর সড়ক হ'তে একটা
শাখ-সড়ক চলে গেছে আর-একটা পাহাড়ের দিকে।
তারই ঘূর এই নোটটি : *Trespassers will be
prosecuted*। কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। শুনলাম একটা
মুখোয়াক কাহিনী। শিক্ষা স্বাক্ষরবিধার বৈবাহিক
সম্বন্ধ চলে তিস্তাতীর সজ্ঞা পরিবারের সহিত। শিক্ষিমের
কোনো স্বাক্ষর বাগের-বাড়ি তিস্তাতে বহুর প্রতিন
বাগন করে বহন করে এলেন তখন ঘোষা গেল তাঁর সূত্র
কোণ ছুড়ে রয়েছে একটা খোকা-স্বেরজ সজ্ঞান। শিক্ষি-
তিস্তাতীর সম্বন্ধে স্বেরজ সজ্ঞান অবৈধ নয়, বিবেচ করে
যদি সে-সজ্ঞান কোনো লামার গুরুসজ্ঞাত হয়। শিক্ষি-
তিস্তাতের সম্বন্ধে লামার খাতির ও সম্মান অত্যধিক।
দালাই লামা ও পাকেন লামা বহন শিক্ষিমের সহ্য দিয়ে
ভারতে আসেন, সে সময় তাঁরা পথের কিয়দংশ ঘোড়ার
পিঠে চড়ে এসেছিলেন। যে পথে দালাই লামার বাহন
চলেছে সেই পথই পবিত্রীকৃত হয়ে গেছে—আর সেই পথের
খুলা হয়েছ পূত বহন। যে ঘোড়ার ঈশ্বরবাহতার দালাই
লামা অসোহন করেছিলেন—ভক্তিনিহন মাহুর সেই
ঘোড়ার চোনা পর্বত পবিত্রজ্ঞানে গমন করেছে। ভক্তির কী
অমৃত পরাকাষ্ঠা।

কিন্তু স্বেরজ গুরুর মৈথতা সামাজিক বীজিত পেলোও,
সেই স্বাক্ষরটি কিন্তু স্বাক্ষরপ্রাপ্ত আর ঠাই পেলেন না।
তাকে সম্মানে নির্ধারিত করা হ'ল। ঘূর ডিগ্‌হুই-সড়কের

নির্জন প্রান্তে। পাহাড় ও জঙ্গলে ঘোরা গ্রহী-বৈষ্টি এক
প্রাণাশ্রমে তরুণি স্বাধীনস্বকিতা ঐ নারী এসক জীবন
বাগন করে আসছেন। ডিগ্‌হুই-সড়ক ধরে আবার গ্যাটকে
কিরে এলাম। বেরিবেছি সেই সাত-সকালে, এখন বেলা
প্রায় পড়ে-পড়ে।

মুঠিণ আমল থেকে আর অবশি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিম
ভারত গভর্নমেন্টের আশ্রয়ান। ভারত গভর্নমেন্টের
পলিটিক্যাল এক্টে বয়েছেন গ্যাটকে, তাঁর মাধ্যমেই
ভারত গভর্নমেন্টের সঙ্গে শিক্ষিম সরকারের যোগাযোগ। ঐ
পলিটিক্যাল এক্টেই আবার তিস্তাতের ভারতীয় রাষ্ট্রত।
আমি বহন গ্যাটকে তখন পলিটিক্যাল এক্টে ঐ এ. বি.
গ্যাট লামা গেছেন।

একদিন লামার পথে বেশ ধানিকটা দূর এগিয়ে গেলাম।
গ্যাটকের অনতিদূরে ইমুচে গোন্দা (বৌদ্ধমন্দির)।
গোন্দার আছে ভগবান বুদ্ধের প্রতিমূর্তি—শিউকরা সাক-
নির্ভিত ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি। গোন্দার লামারা থাকেন এবং
গোন্দার বাবতীর অস্থান লামন করেন। গোন্দাগুলি
আবার ভারী লামাদের ঘূর। দেখলাম কিশোরবয়সী
১১-১২টি শিক্ষার্থী প্রধান লামার কাছে লামাগিরির শিক্ষা-
নবীশী পার্শ্ব গ্রহণ করছে। ইমুচে গোন্দার শিক্ষিম সরকারের
শিক্ষা-বিভাগ ভারী লামাদের সাধারণ শিক্ষার কিছুটা



পথের পথে তিস্তা নারী

ব্যবস্থাও করেছেন। অর্থাৎ লামাগিরি-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে
বেনাপালী ভাষা, অর, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে
সাধারণ শিক্ষাও দেওয়া হচ্ছে। গ্যাটকে-লামা সড়ক ধরেই
দালাই লামা ও পাকেন লামা গ্যাটকে হয়ে ভারতভিত্তি
এসেছিলেন। লামা থেকে গ্যাটকে দীর্ঘ পথ। লামা থেকে

খানিকটা পথ ভীণ বা অল্প কোনো ব্যক্তিক বাসে আসা চলে। কিন্তু তার পর হেঁটে গায়ে হেঁটে অবধা ঘোড়ার গিঁটে চলতে হয়—পথ অতি কর্কশ ও বন্ধুর। মাথাই লামাকেও ঘোড়ার গিঁটে চেঁচ এত পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল। তার পর অবশ্য আবার জীণ চলবে। লাসার পথ ঐতিহাসিক পথ। এই পথেই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির বাণী হিমালয়ের হৃদয়ে প্রাচীর অতিক্রম করে তিস্ততে প্রবেশ করেছিল। এই পথ দিটেই পদব্রজে চলেছিলেন বাঙালী মনীষী অতীশ-দীপকর—

“লাঙালী অতীশ লঙ্কিন দিগি ভূগারে ভববর,

আলিন জ্বানের বীণ তিস্ততে বাঙালী বীণকর।”

তিস্তত-সীমান্তে অতীশ পেড়েছিলেন রাজকীর সহধর্মী,
—অসিত হয়েছিল বাগত-সভাবণ : ‘ও মণিপুরে হু’।
এই পথ-পরিচরমার এসে সেই বিগতদিনের ঐতিহাস যেন
মানসগটে দূর হতে উঠল।

লাসার পথে দুই বৈশীস্বর এগানে লভব হ’ল না। সিকিম ও সিকিমের আশেপাশের পাছাড় গাছপালার ঘনতা, কিন্তু লাসার পথে বড়ই এগিয়ে বাওয়া বার ততই গাছপালাবিহীন হাড়পাঁজর-বের-হওয়া কক্ষ পাহাড় চোখে পড়বে। পথে বেরবার-ই বা কী আছে! কিন্তু অজস্র-অজস্র পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাহাড়ীনের ছোট ছোট বগী—নোংরা, অন্ধকার আর বৈজ্ঞানিক-চিন্তাক্রান্ত। এসব অকস্মে জীবিকানির্ধারণের উপায় বড় হয়। পাহাড়ের গায়ে থাক পেটে বেটে অজস্র চাব হয়—ধান, চুই ও তরিতরকারি। মাঝে মাঝে কমলালেবুর বাগান। দারজিলিং, সিকিম প্রভৃতি অঞ্চল হতে প্রচুর পরিমাণ কমলালেবু চালান হয় কমলাতায়। তিস্তা হ’তে গ্যাটেক আসবার পথে পড়ে বগো বাজার। পাহাড় থেকে টাইঘোড়ার গিঁটে কমলালেবু বোকাই হয়ে বগো বাজারে এসে জমা হয়। আর এখান থেকে বড় বড় আড়তদারেরা কমলালেবু সূঁচিল বোকাই করে চালান দেয়। অনেকগুলো শাসাদো মাড়োয়ারী আড়তদারের আকান্না বেশলায়। কমলালেবুর প্রচুর ব্যবসার স্বেচ্ছাচারটা কাদু দুই নিবিড় কারবারও এরা করে

থাকে। বড়দর অবধি চলে—জীণ টাক ওয়াগন থাকে। ডাংহতের ষিক থেকে কাপড়, তেল, চিনি, লবণ, ময়লা, শৌখিন স্রব্যাদি, ঘোটকগাড়ির বিছির আশে রাশি রাশি জারে ভারে উত্তর দিকে চলেছে। আর উত্তর দিক হতে আসছে ডেড়ার লোম। মোটরবান চলাচল শুরু হওয়া লক্ষ্যে এইসব পাহাড়ী পথের প্রধান বাহন টাইঘোড়া। পথে অনেকগুলি টাইঘোড়ার ক্যারিডানের সঙ্গে দেখা হ’ল। ঘোড়াগুলির গিঁটের হু’পাশে ভারী ভারী বোকা—মুটমুট করে চলেছে অনলস পদক্ষেপে—অসামান্য পরিশ্রমী এই জীব। আমরা পাহাড়ী পথে হু’চার কদম চড়াই উঠতে গিয়ে হাঁপিরে পড়ি, অথচ এই নাত্তিবহু ঘোড়াগুলি অনলসভাবে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে থাকে। ক্যারিডানগুলো তিস্তাতীরাও পথচলার দূর শোকে। ওরা দিনে পনরো থেকে বিশ মাইল অবধি টাইগুলির সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলে।

একটা ঘটনার কথা বলি। একটা মালবোকাই টাক থাকে। মালবোকাই দিয়েছে পর্বতপ্রমাণ—গ্রাও টাক গেডে বেঘনটি হয়েমা বোকা বার। সেই মালের উপর বসে আছে এক দুকাফোখার পশ্চিমা শের। তার মাথার পাগড়ির ডাকে ডাকে প্রচুর আমেরিকান ‘ভলার’—এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে পাচার হচ্ছে মহাদুলা মার্কিনী-মুদ্রা। একটা লোহার পুল পেড়িয়ে বাবার লম্বা উপরের ইম্পাল্টের ত্রয়েন সজোরে আঘাত লাগে সেই শেরীজীর পাগড়ি-সমেত মাথার। আঘাতটা এতই প্রচণ্ড আর মারাত্মকভাবে লেগেছিল যে, তার মাথাটা স্ফুটন হতে নিচে পড়ে যায়। গাড়ির সহযাত্রীরা কেউ লক্ষ্য করেনি। শেরীজীর গতপ্রাণ বস্তুসমূহ বেহাটা ট্রাকের মালের উপর পড়ে ছিল, কিন্তু স-পাগড়ি ছিন্নমুণ্ডটি পড়েছিল শিঙনের রাস্তায়। পাগড়ির ভিতর থেকে বেরিরেছিল হাজার পাঁচক ডলার।

লাসার পথে আর বৈশীস্বর এগোনা হ’ল না। পথ ও পার্শ্ববর্তী পার্বত্য দৃশ্য কমপাই ভতরী অনাকপনীয় হয়ে উঠছে। শৈত্যও কমবধমান; অতএব পশ্চাদপসরণই প্রের। অনেক কটে গাড়ি ঘুরিয়ে আবার গ্যাটেক অভিমুখে যওনা দিলাব। [বন্ধক]

পেট্রোলিয়মের সম্ভানে

অধ্যাপক ডঃ ব্রজেন্দ্রপ্রসাদ গুহ

ভারতে বার্ষিক সভ্যতার এসার হয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু এখনকার মোটরগাড়ি, বিমানপোত, এজিন প্রভৃতি সকল রাসবায় মতো যথেষ্ট পেট্রোলিয়ম এবেশে নেই। বার্ষিক ভারতে পেট্রোলিয়মের একান্ত অভাব। আগাবের ভিত্তিও খনি থেকে ১২৪৩ সাল থেকে ১২৪০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে প্রায় ১৪ লক্ষ ব্যারেল বা পিণা (এক ব্যারেলের পরিমাণ হ'ল ৪২ গ্যালন) তেল পাওয়া গেছে। সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের তুলনায় এই তেল একবারেই নগণ্য, আর বেশের বা অবেশের তার শতকরা হার সাধারণ যেটে এই তেল থেকে, বাকিটা আমদানি করতে হয় বিদেশ থেকে। বর্তমানে তাই ভারতে তেলের উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সকল সভ্যতা স্থানে ব্যাপক অন্বেষণ-কার্য চালানো হচ্ছে।

ভূ-গর্ভে পেট্রোলিয়মের উৎপত্তি হয় কি করে? বিজ্ঞানীদের ধারণা, সৃষ্টির প্রথম কুণ্ডে পৃথিবীর স্থানে স্থানে হরতো নানা জাতের সামুদ্রিক জীবের, যেমন—গ্র্যাটন, ডাই অ্যার্টম প্রভৃতির দেহাবশেষ অগভীর সমুদ্রের তলদেশে জমা হয়। কালক্রমে তার উপর বালি ও শলিমাটির স্তর জমে। হাজার হাজার বছর ধরে সেগুলি ভূ-গর্ভে থেকে অভ্যর্থিক চাপ ও তাপের প্রভাবে শেষ পর্যন্ত পেট্রোলিয়মে রূপান্তরিত হয়েছে। কাজেই যে-সব নিলাস্তরে সমুদ্রের তলদেশের অবস্থার চিকিৎসা করা সেখানে পেট্রোলিয়ম থাকতে পারে বলে অনুমান করা হয়।

তবে পেট্রোলিয়ম সাধারণতঃ বেলেপাথর বা চুন-পাথরের স্তরে সঞ্চিত থাকে। উপরে ও নীচে অপ্রবেশ নিলাস্তর থাকলে পেট্রোলিয়ম উৎপত্তিস্থলেই আটকা থাকে, নতুবা সচিব পাথরের ভেতর দিয়ে বা শক্ত পাথরের কাটল দিয়ে চুইয়ে অন্ত জায়গায় সরে যায়। এইজন্য অনেকক্ষেত্রে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পেট্রোলিয়ম অবস্থানের সব নিদর্শন পাওয়া গেছে, অথচ নলকূপ বসিয়ে তেল পাওয়া যায়নি। তেলের সাথে জল থাকলে পেট্রোলিয়ম জলের উপর ভেসে থাকে, কারণ তেল জলের চেয়ে হালকা। এইসঙ্গে প্রচুর গ্যাসও থাকে সম্ভব। এই গ্যাসের অভ্যর্থিক চাপে উপরের পাথর মাটি সংশ্লিষ্ট প্রভৃতির মতো বেঁকে যায়, আর গ্যাস তেল ইত্যাদি প্রবল চাপের অধীন হয়ে থাকে। কোনো কারণে ভূ-পৃষ্ঠের চাপ অভ্যর্থক প্রবল হ'লে, সচিব বালুকাস্তর দিয়ে

বা নিলাস্তরের কাটল দিয়ে পেট্রোলিয়ম অন্তস্থানে সরে যায়। পরে আবার প্রবিধাযুক্তো নিলাস্তর পেলে সেখানে জমা হয়, নতুবা একেবারে ভূ-পৃষ্ঠে বেরিয়ে আসে। এক্ষণ হ'লে পেট্রোলিয়ম-অবস্থান-ক্ষেত্রে আর পেট্রোলিয়ম-উৎপত্তির কোনো নিদর্শন পাওয়া সম্ভব হয় না।

পেট্রোলিয়ম চিকিৎসা কোষ আছে তা খুঁজে বের করা খুবই কষ্টকর। যে-সব জায়গা আগে সমুদ্রের তলদেশে ছিল বলে নিশ্চিতরূপে প্রমাণ পাওয়া গেছে সেইসব জায়গাতেই সাধারণতঃ অন্বেষণ-কার্য চালানো হয়। পাথরের কাটল দিয়ে মাধ্যম গ্যাস অথবা তেল বেস্তে বেস্তে সেখানে পেট্রোলিয়ম আছে বলে অনুমান করা বেস্তে প্রায়ঃ।

ভূ-বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে 'টর্সন ব্যালান্স' (Torsion balance), 'সিস্মোগ্রাফ' (Seismograph) প্রভৃতি যন্ত্রের মাধ্যমে নানাবিধ পরীক্ষা করে পেট্রোলিয়মের অনুসন্ধান করেন। আজকাল দৃষ্টি বস্তুগতির সাহায্যে এরোপ্লেন থেকে জরিপ-কার্য পরিচালনা করার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। এর ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এবং অল্পায়াসে একটা বিরাট ভূ-খণ্ডের ভূ-ভাষিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। এইভাবে প্রাথমিক অনুসন্ধানের কাজ সম্ভাব্যজনক বলে মনে হ'লে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়, অর্থাৎ তখন স্থানে স্থানে নলকূপ বসিয়ে পরীক্ষা করা হয় মাটির নীচে সত্যি তেল আছে কিনা।

তেলের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হ'লে তবে সেই তেল আয়তনের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণতঃ নিলাস্তরের কূপ ভাঁজের নীচে তেল সঞ্চিত থাকে। তাই চিকিৎসা উপরেই লোহা অথবা কাঁঠ দিয়ে প্রায় ১০০ ফুট উঁচু একটা 'ডেরিক' (derrick) বা কাঠামো তৈরি করে সেখানে 'ড্রিলিং' পদ্ধতিতে নলকূপ বসানো হয়। একজন কূপ ভাঁজের অবস্থান সম্পর্কে অতি নির্ভুল হিসেব করা প্রয়োজন। হিসেবে অতি সযত্নত্ব ল'লেও ভূ-গর্ভের ২-৩ হাজার ফুট নীচ পর্যন্ত যেতে এই ভুলের মাত্রা অনেকগুলি বেস্তে যায়, তার ফলে শেষ পর্যন্ত তৈলবাধী হয়ে পৌঁছানো হয়তো সম্ভব নাও হ'তে পারে। তেলের অল্প নলকূপ বসাবার কাক পানীর জলের নলকূপ বসাবার মতো সহজসাধ্য নয়। তেলের অল্প প্রায়ই ২,০০,০০,০০০ থেকে শুরু করে ২৫,০০,০০,০০০ ফুট গভীর নলকূপ বসাবার প্রয়োজন হয়।

তাই একটা সাধারণ তৈলকূপ বসাবার ব্যবস্থাই ২৪৩০ লক্ষ টাকা হবে পড়ে।

নানারূপ পরীক্ষার তেলের অতিরিক্ত সম্বল একরূপ নিশ্চিত প্রমাণ পেলে তারপর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নলকূপ বসানো হয়। কিন্তু এত হিসেব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যাবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। নানারূপ প্রাকৃতিক কারণে পেট্রোলিয়ামের স্থান-পরিবর্তন হয় বলেই এমনি ঘটে থাকে। নলকূপ-খননকারীরা এতরূপ নিষ্ফল প্রচেষ্টার নাম দিয়েছেন 'ওয়াইল্ড ক্যাটিং' (wild-cattling), এ যেন আকাশের উপর বন-বিড়ালের পিছুনে ছটোছুটি করার শামিল। দেখা গেছে, প্রতি দশটি নলকূপের মধ্যে নয়টিই 'বন-বিড়াল' পর্যায়ে পড়ে। তবে এরূপ নষ্টটি নিষ্ফল প্রচেষ্টার পর যদি একটিমাত্র প্রচেষ্টাও সফল হয় তা হ'লে কোম্পানির সকল লোকগণ অল্পদিনেই সুখি হয়ে যায় এবং তারপর থেকে কোম্পানি মুনাফার হিসাব করতে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, তৈল-বনি দুইই সমরাস-বহল এবং বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ, কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ সেখান থেকে তৈল বেরকোনা বন্ধ হয়ে গেল, বেরিয়ে এল শুধু নোনা জল। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষার কালে হঠাৎ বোঝা গেল যে মাটির নীচে প্রচুর পেট্রোলিয়াম আছে। প্রচুর অর্থব্যয় করে কূপও খনন করা হ'ল। কিন্তু তৈল কোথায়? কূপ থেকে বেরিয়ে এল শুধু বাছ গ্যাস। এই গ্যাস আগানি হিসেবে ব্যবহার করা যায় এক-দু' ঠিক, কিন্তু এ বিষয়ে তো পেট্রোলের কাজ চলে না। এইসব কারণে বোঝা যায় যে, আর্থিক নিক দিয়ে বিচার করলে এ অনেকটা ভুলবোধের মতো, লাভ-লোকসান সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। অল্পসন্ধান থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত একটি বনিকে তৈল-প্রাপ্ত করতে হলে কোটি কোটি টাকার মূলধন নিয়োগ করতে হয়। তা ছাড়া সমস্ত প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা থাকায়, এই মূলধন অপব্যয় করার মতো আর্থিক সামর্থ্য ও বনোবল হই-ই প্রয়োজন হয়।

ভারতে বনিক তেলের ক্ষয় মুশরিকব্রিতভাবে অল্পসন্ধান-কার্য শুরু হয় গত শতাব্দীর শেষভাগে। আগামের লবিমপুর জেলার অন্তর্গত জলপুরের ১৯ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে এবং মার্ঘাটটার ৭ মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত ডিগ্‌ব অঞ্চলে সর্বপ্রথম তেলের সন্ধান পাওয়া গেল এবং নলকূপ বসাবার কার্য শুরু করা হ'ল ১৮৮৮ সালে। কিন্তু ১৯১২ সালের পূর্বে এখান থেকে তৈল-উত্তোলনের কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। এর পর ১৮৯১ সালে এই তৈল-ক্ষেত্র থেকে তৈল-আহরণের দায়িত্ব

গ্রহণ করেন 'আগাম অয়েল কোম্পানি'। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে এখান থেকে তৈল-উত্তোলনের পরিমাণ ছিল দুইই কন্ড, বছরে ১৮ লক্ষ গ্যালানের চেয়ে বেশি নয়। এর পর থেকে অবশ্য এর পরিমাণ কিছু কিছু করে বাড়তে থাকে এবং ১৯০০ সালে এর পরিমাণ ঠাঁড়ায় বছরে প্রায় ৬ কোটি ৫৫ লক্ষ গ্যালান। ১৯১২ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত এই তৈল-ক্ষেত্র থেকে মোট প্রায় ১৫৬ কোটি গ্যালান তৈল পাওয়া গেছে।

১৯০৪ সালে আগাম অয়েল কোম্পানি ডিগ্‌বায়ের ১৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত নাহরকাটিয়া অঞ্চলে একটি নতুন তৈল-ক্ষেত্রের সন্ধান পেয়েছেন। ১৯০৪ সালের মার্চ মাস থেকে এখানে তৈল-উত্তোলন শুরু করা হয়েছে। জু-জুনের ১১, ১১৫ ফুট নীচে অবধি নলকূপ বসানো হয়েছে এবং বর্তমানে এখান থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০,০০০ গ্যালান তৈল পাওয়া যাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, আশ্চর্য্য এইটিই ভারতের গভীরতম তৈল-কূপ। নাহরকাটিয়া থেকে ডিগ্‌ব পর্যন্ত যে রাস্তা আছে, তার পাশ দিয়ে ৮ ইঞ্চি ব্যাসের একটি নল-পথ বা পাইপ-লাইন বসানো হয়েছে। নাহরকাটিয়া বনি থেকে উত্তোলিত যদিও পেট্রোলিয়াম এই নলপথ দিয়ে ডিগ্‌বায়ের শোধনাগারে নিয়ে সেখানেই শোধন করার ব্যবস্থা হয়েছে।

গত কয়েক বছর ব্যতীত ভারত-সরকার আরও নানা কার্যগার পেট্রোলিয়ামের সন্ধান করে কিংছেন। হিমাচল, আগাম, বাংলাদেশ এবং গুজরাটের যে-সব অঞ্চল আগে সমুদ্রের নীচে ছিল হ'লে প্রমাণিত হয়েছে, প্রধানতঃ সেইসব অঞ্চলেই অল্পসন্ধান চালানো হচ্ছে। আগানুবা আগামের একটি পবিত্র ভূমি। সেখানে অধিকাংশবীর বনিকের অবস্থিত কূপ থেকে অধিকতর বাছ গ্যাস বেরায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই গ্যাস পেট্রোলিয়াম-উৎস। এই ভূ-খণ্ডে অল্পসন্ধান শুরু করা হয়েছে।

নেপালের ওখাণ্ডোকা পাহাড়ের কাছে পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। চারটি সম্পদ প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে এই আগানুবা এক' বছরের ক্ষয় করা নিয়েছেন। বিজ্ঞানীদের অল্পসন্ধান, এখন থেকে প্রতিদিন ৫০০ গ্যালান তৈল পাওয়া যাবে।

আগামের যে-সব অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম-খনিরোগ্যবোধী নিলাভের অবস্থিত, সেইসব অঞ্চল দিয়ে ব্যাপক অল্পসন্ধান-কার্য চালানো হয়েছে, পরীক্ষামূলকভাবে অনেক নলকূপও বসানো হয়েছে, কিন্তু হু-হুয়ের বিষয় একটির পর একটি করে সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র ও

মরণ-প্রতিশ্রুতি

ডাক্তার ভট্ট

বাইরের চেহারা দেখে ভুলতে নেই, এ শিক্ষা জীবনে অনেকবারই পেয়েছি। বাজারে লাল-লাল আম দেখে লুচু ছরে কিনে অনেকাংশে, কিন্তু বাড়িতে এসে খেয়ে দেখি জোলা টক, অস্বাদ। কিন্তু সে কথা বাক, আমি এখানে বলছি মানুষের সংকেত।

বাহু সৌন্দর্যের মধ্যে মার্গাত্তর বিকণ্ড বাঁকতে পারে, তাতে মানুষের সর্গাশও হয়ে যেতে পারে। আমার ডাক্তারি জীবনের মধ্যে এ আমি অনেকবারই দেখেছি। বয়ঃ এটাই অধিকাংশ স্থলে দেখেছি যে বাইরে বড় সুন্দর ভিতরে তত অসুন্দর, ভিতর-বাহির দুই-ই সুন্দর এমন দু'ব কমই মানুষ হয়। তা ছাড়া আবার দেখেছি যে সুন্দরের মধ্যেও একজনকে আরে, অর্থাৎ সুন্দর চেহারা দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, এ দেশে বাংলা একবার ধরে তার আর মনুষ্যর বলে কিছুই থাকেনা, বুদ্ধি-বিবেচনা সব-কিছু তার লোপ পেয়ে যায়। এমন ঘটনার কথা আমি অনেক জানি, কিন্তু কেন্দ্র বলা যুলে থাকা যায়না। একটিমাত্র উল্লেখের কথা এখানে বলছি।

স্বর্গীয় মোহাম্মদ মাহুদা ছিল নিজের শরীর সংরক্ষণে বৈজ্ঞানিক পুঁজুপুঁজু। সামান্য যদি একটু নাকে সর্দি হতো, কি গায়ে রুসকুড়ি হতো, কি গালে ত্রণ বা মাগায় ফুঁকি হতো, কি ড্রাম থেকে নামতে গিয়ে হাত-পা একটু চুড়ে গেল, তাহ'লে আর থকা নেই। ডাক্তারখানাতে দুই সেলাই এসে আমাকে আলাতন করবে, একটু কিছু ওষুধ লাগিয়ে দিতে হবে, তাকে আশ্বাস দিয়ে 'দেয়ে যাবে, দেয়ে যাবে' বলতে হবে, যদি ত্যাগিনী ক'রে উড়িয়ে দিতে বাই তাহ'লেই হাসপাতাল অধিবাস ক'রে যাবে। তাকে আমি একটু ভালোবাসতাম, কয়েকটি সেইসুঁ পায়েতাম না।

তার এনি পুঁজুপুঁজু হবার কিছু কারণও ছিল। সে দেখতে বেশ সুকুমার। সেইসুঁ তার শরীর স্নাতক বিদ্য। চেহারাটিকে সে তেমনই সুন্দর ক'রে রাখতে চায়, একটু কিছু কটী হবার সত্যাবস্থা দেখলেই অত্যন্ত উত্তির হয়ে ওঠে। পাছে তার চেহারা খারাপ হয়ে যাবে এই ভয়ে সর্বদা সতর্ক হয়ে থাকে। তা ওর চেহারাটি সত্যই দেখবার মতো। লম্বা শুঁকু হঠাৎ দেহ, গায়ের রঙ সৌরবর্ষ, তার মধ্যে বেশ একটু দাঁড়িও আছে। বুক প্রশস্ত, কোমর তার চুলনার মত, বাহু আকর্ষণবিশিষ্ট। সুখের ভাবটি

সর্বদাই হাসি-হাসি, চোখের চাহনি স্নিগ্ধ ও বুদ্ধিবাহক। দেখলেই মনে হয় যে সাধারণ পাঁচজনের মধ্যে এ-সোকটি নিশ্চয় বিনিষ্ট কেউ একজন। সত্য কথা বলতে কি, আমিও তাকে ভালোবেসেছিলাম ঐ কারণেই। ভালো চেহারার মানুষ আজকাল আর বড়ো চোখে দেখা যায়না। বেস্টসৌন্দর্যের একটা আলাদা মর্যাদা নিশ্চয়ই দিতে হয়।

কিন্তু চেহারাতে যথেষ্ট লালিতা থাকলেও পুরুষোচিত মূঢ়তার ভাবটি তার ছিলনা। গায়ের বাসেশৈলি সবই নরম, পুরুষের কঠিনতা নেই। সুখের ভাবও নরম, দুঃস্থ তেজস্বিতা নেই। বোধ করি এই নারীমূলক কোমল লালিতাকে ঢাকা দেবার ক্ষমতা সে গৌরব রেখেছিল। এতাহেই বাড়ি কামাতো, আর গৌরবটি সবার ছোঁতে রাখতো। সেই গৌরব তাকে মানাতোও ভালো।

বেশচুবাতেও ছিল যথেষ্ট লালিতা। শৌখিন মানুষ, কয়েকটি সব-কিছুই তার নিখুঁত হওয়া চাই। বাহ্যিক-ইকি বহরের মিথি মুত্তির পাড় গায়ের মোছ পঙ্ক মূঢ়তাতে থাকবে, নিচনে আলগাভাবে বাসকোছা বেওয়া, বাতাসে পরনের কাপড়টা কাবুলীকের পা-জামার মতো ফুলে উঠবে। গায়ে মিথি আন্ধির পাঞ্জাবি, কাখে সোনার বোতাম লাগানো। শীতের দিনেও সেই পাঞ্জাবি চলবে, তার নীচে থাকবে উলেন গেঞ্জি, উপরে থাকবে ধবধবে সাদা আলোহান। পারে কাবুলী নাগরা, শৌখিন ধরনের। পকেটে ফুঁফুঁবে সেক্ট-মারনো ক্রমাল, হাতে রিস্টওয়াচ। অফিস যাবার বেশচুবা আবার সস্তরকম। তখন ক্রীম-রঙের চাইনীজ শিষের হাট, দলার বস্তবেরঙের নেবুটা। মাগার কিছু টেরি নেই। একমাথা কোকড়ানো চুল, সব সময়ই তা অবিস্তৃত, ঘোহুঁ ডাতেই ধকে আরো বেশি সুন্দর দেখায়। এতাহেই চুল ঝাটোয়, তার পরে আবার বেগলোকে এসোবেলো অবিস্তৃত ক'রে দেয়।

ওর বাপ-মাকেই জীবিত নেই। অভ্যস্ত আত্মীয়স্বজন কে কোথায় আছে তা জানি। থাকে আত্মদের পাড়ার এক বেশ-বাড়িতে, তেতলায় আলদা একটি ঘর নিয়ে। সে ঘরটি অতি পরিপাটি ক'রে সাজানো, দাবী দাবী আসবাবপত্র সমস্তই ওর নিজের। অর্ধের কোনো অভাব নেই, কারণ সরকারী দপ্তরে কোনো বড়ো অফিসারের নিজস্ব টাইপিস্ট ও স্টেনোগ্রাফারের থাক করে, মোটা

বেতন পায়। সাধেব ওকে খুব পছন্দ করেন, মকবলে কোথাও গেলে ওকে সঙ্গে নিয়ে বান, গরমের সময় প্রতিবন্ধের মিথলা পাঠাতে নিয়ে বান। তখন আরো বেশি অর্থশীল হয়। একা খাটিসের বাহুব, কাজেই ওর আর্থিক অবস্থা খুবই সচ্ছল। কোনোৱকম দেশা বিধো বদধেগাল নেই, এমন কি পান সিগারেট পর্যন্ত খায় না। অল্প কোনো কারণে নর, পান খেলে সাধা ইত্যন্তগুলির সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে বাবে, আর সিগারেট প্রভৃতি খেতে শুরু করলে রোগি কাশো হয়ে বাবে, আত্মলে দাগ ধরবে।

এই স্থায়ী যোগ্য প্রার্থী সন্ধ্যার পরে আমার কাছে এসে বসতো, গল্পগল্প করে আমাকে খুশি রাখবার চেষ্টা করতো। বাঘা ভালো রাখতে হলে, চেহারা সৌন্দর্য অটুট রাখতে হলে একজন ডাক্তারের সংস্পর্শে থাকা খুবই দরকার। সর্বদা বিষয়েই তার কাছ থেকে সাহায্য ও সন্নিহিত পরামর্শ মিলতে পারে। কোন্ রুহতে কোন্ জিনিসটা খাওয়া ভালো, দুধ খাওয়া ভালো না বই খাওয়া ভালো, ঘোলের দুধ খেলে কেমন হয়, প্রত্যহ দুটো করে ডাশিম-বেলানা খেলে গায়েব রঙ আরো খোলে কিনা, গোন্ধ ভোরে উঠে করেকটা করে ডন দিলে কেমন হয়, শীতের সময় মুখের চামড়াতে কীল লাগানো ভালো না মুখের সর লাগানো ভালো, বাঘার চুলে কি দিয়ে শ্যাম্পু করলে চুলের বাঘা ভালো থাকে— ইত্যাদি কত কথাই যে তার জানবার আছে, সবই আমার কাছে যতবার খুশি জিজ্ঞাসা করতে পারে। তা ছাড়া কোনো কিছু অসুখ-বিষহ হয়ে পড়লে আমি তো আছি-ই।

ওর মিষ্ট অস্বাভিক ব্যবহারেও আমার ওকে ভালো লাগেছিল। কোনো কিছু সাতে পাচে নেই, পলিটিশ বা কমিউনিজ্‌ম নিয়ে কোনো অনুসন্ধান চর্চা করেনা, প্যাড়ার গুজব নিয়েও ঘাঁটিঘাটি করতে বায়না। সে শুধু থাকে তার নিজের ভালো। ভালো ভালো বই কিনে পড়, বুক-স্টলে নতুন কিছু বই দেখলেই তৎক্ষণাৎ কিনে ফেলে। পছন্দরই বই হলেই আমাকে তা পড়তে দেয়। মাঝে মাঝে সিনেমা দেখে। সাধেবপ্যাড়ার সিনেমাতে কোনো ভালো বই এলে সাধাসাধনা করে আমাকেও সেখানে টেনে নিয়ে যায়।

সম্প্রতি স্থায়ী হয়ে বসে খুবই ইচ্ছা হলো, ও একটা বিয়ে করে ফেলবে। জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করতে হলে বিয়ে-করাটাই তো বিশেষ দরকার। সংসারে নারীজাতীয় জীবনের কোনো অভাব নেই। কিন্তু তা

নর, ও চার মনোমতো একজন সখিনী থাকবে, একজন অন্তরঙ্গ শাউনার সঙ্গে থাকবে। তাকে নিয়ে একটা জ্যাট ভাড়া করে হু'জনে মিলেমিলে বাস করবে, পরস্পরে পরস্পরকে দুখ শান্তি আর তৃপ্তি দিতে থাকবে। সেই হলো ওর পরবর্তী বরণ জীবনের পুরোপুরি আদর্শ।

এইশকল গল্প মনের কথা স্থায়ী যে আমার কাছে উপনিবে বসতে আরম্ভ করেছিল, তারও কিছু কাহণ ছিল। একটি কলেজে-পড়া মেয়ে মাঝে মাঝে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যেতো। পশ্চিমে একবার বেড়াতে গিয়ে তার বাবার সঙ্গে আমার খুব চমকতা জন্মেছিল। তিনি বিদেশে-বিদেশেই চাকরি করেন। তাঁর ছুই খেয়ে শিরো-পিঠি, বিভা আর প্রভা, তারা হু'জনেই কলকাতার হস্টেলে থেকে কলেজে পড়ে। বড়ো মেয়ে বিভা এম.এ. পড়ছে, সে থাকে এক হস্টেলে, আর ছোটো মেয়ে প্রভা বি.এ. পড়ছে, সে থাকে অল্প হস্টেলে। বিভা থাকে আমার কাছাপাছি, প্রভা থাকে একটু দূরে। তার মধ্যে সেই বিভাই কখনো কখনো আসতো আমার কাছে। মেয়েটি বড়ো মিষ্টি মিত্তক প্রকৃতির। আর তার বাবা আমাকে বলে দিয়েছিলেন ওদের একটু দেখাশোনা করতে। কিন্তু প্রভা অনেকটা গুরুত্রে প্রকৃতির, সে কখনো আমার কাছে আসতেনা। বিভাই কেবল আসতো। এমন কি আমার হাঙ্গামাভালের ল্যাবরেটরিতেও সে হাজির হতো। এমনই বেড়াতে যেতো।

এই বিভার প্রতি স্থায়ীর নজর পড়েছিল। বারে বারে ওর দিকে চাইত। বিভা প্রথমটার এতে বিরক্ত বোধ করত। কিন্তু ক্রমশ দেখলাম সেই বিভাও মাঝে মাঝে ওর দিকে চাইতে শুরু করেছে। এমন করে ওদের মধ্যে একটু ভাবসাব জন্মে উঠেছিল।

বিভা যে এমন কিছু সুকসী তা নয়। বরণ প্রভা ওর চেয়ে বেশভে ডালো। বিভার চেহারাতে কতকগুলি খুঁত ছিল। সে একটু বেশি হকমের স্যাক্সা, গায়েব রঙ রহস্যময় বসতে হয়, চোখালের দিকটা চওড়া, নাক একটু ঢালা, ইত্যাদি। মেয়েটা বিচার করতে বসলে হয়তো তার আরো অনেক খুঁত দেখিবে দিতে পারতো। কিন্তু আমার মনে হয় যৌবনকালে সাধারণত কোনো মেয়েই কেবলো খারাপ হয়না, কিছু-না-কিছু সৌন্দর্যের লক্ষণ তার মধ্যে থাকেই। বিভার নুনের হাশিটি ছিল সবল ও অকৃত্রিম, মনটি যে সাংসাদি তা ওর হাসি কেমনেই বুঝতে পারা যায়। এমন উজ্জলশিক্ষিতা মেয়ে হলেও তার কোনো 'ঢাল' নেই, খুব সাধারণ ভাষাতে সকলের সঙ্গে

সেজা কথা বলে, তার মতে ইংরেজীর কোনো আনবন্ধক দু'কনি থাকেনা। ব্যবহার একেবারেই অনাড়ম্বর ও অস্বাভাবিক। শিক্ষিতা মেয়ের এমনি সরল স্রমিষ্ট ব্যবহারেরই তো অনেক বেশি লাম। তা ছাড়া বিভা মেয়েটির বাবা খুব ভালো, হাড-পায়ের গড়ন একেবারে নিটোল। আমাদের বাংলাদেশে এখন স্বাভাবিকতা ঘেঁষে খুব কমই দেখি, বোধ করি পশ্চিমে ছিল বলেই এখন। প্রজাণ্ড স্বাভাবিকতা, কিন্তু তার গায়ের রঙ কংসা, কাজেই অত্যন্ত বিষয়ে কিছু কোথাকালেক্ত লোকে হুইবোনের মধ্যে তাকে হুঁসরী বলবে।

যদি হোক, হুইবের সঙ্গে বিভার আচরণ দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে হুঁসরী অস্ত্রভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে। বিভা তো আকৃষ্ট হবেনই, হুইবের অমন সুন্দর চেহারা, তার উপর সুলভ্য ধরনধারণ। আর হুইব আকৃষ্ট হচ্ছে বিভার রূপে নয়, গুণে। বুঝতে পেরে আমি সময় থাকতে হুইবকে সাবধান করে দিলাম। বলে দিলাম যে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যে আশ্বাসের সময়ে বিয়ে হওয়ার রীতি নেই, ওর বাবা কিছুতেই রাজী হবেন না। বললাম যে, তোমরা এখন থেকে সাবধান হও, ঘনিষ্ঠতা আর বেশি বাড়তে দিওনা। এ বিয়ে হতে পারেনা।

কিন্তু তখন কে কার কথা শুনেছে। ও জিনিষ একবার বখন শুরু হয়ে যার তখন আর কি ডাকে কোনো ভর দেবিয়ে বানানো বার? আমি অসম্মত হচ্ছি দেখে ওরা আমাকে নুকিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আরম্ভ করল।

হুইব 'ভাই' বলে পরিচয় দিয়ে বিভার হস্টেলে গিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ করতে লাগল। চুটিছাটার দিনে, পনিবারেয় বিকসে ওদের দেখা হতে থাকল ইডেন-গার্ডেনে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, বেস-কোর্সের ধারে, আরো নানা স্থানে। তা আবার নগ্নরঙ একদিন গড়ে গেল। এ ছাড়া দিনেখাতলো তো আছেই, যেদিন খুশি টিকিট কিনে একদলে বসে গিনেমা দেখার বাধা কিছু নেই।

আমি দেখতাম যে আগ্রহের মাঝিটা হুইবের চেয়ে বেশ বিভারই আরো বেশি। এক এক দিন হঠাৎ গিয়ে সে হাজির হতো আবার ল্যাবরেটরিতে। খুঁ-খুঁ একেবারে শুকিয়ে গেছে, অনেক ঘোরাফুরি করে লাজ হলে এসেছে আবার কাছে। আমি তাকে বসাতাম, বোঝাতাম বিয়ে চা আনিবে খাওয়াতাম। বুঝতে পারতাম সবই, কোথাও হয়তো দেখা হবার কথা ছিল, কিন্তু তা হয়নি, অপেক্ষা করে খুঁ খুঁ পেলে হতান হয়ে আবার

কাছে বেগতে এসেছে, যদি কোনো সম্মান মেলে। অথচ খুঁ খুঁ কিছু বলতে পারছেন। বুঝতাম আমি সবই। কিন্তু ওকে এসবতে কোনো কথাই বলতাম না। দেখাতাম যেন কিছুই বুঝিনি। কারণ সে একে আবার প্রায় কল্যাণীনা, তাতে উচ্চশিক্ষিতা, কাজেই এসব বিষয় নিয়ে ওর কাছে কোনো কথা বলতেই আবার সংকোচ বোধ হতো। আমি হুইবকেই খা-কিছু বলেছি, ওকে নয়। হুঁ-একবার যেন হয়েছিল বটে যে, ওর বাপকে লিখে জানান। কিন্তু তাও আর করিনি।

কিন্তু ওরা নিজেরাই শেষ পর্যন্ত তাই করলে। বিভা তার বাপ-মাকে শ্রুতি টিটি লিখে জানালে যে একজনের সঙ্গে তার খুব অন্তরঙ্গতা হয়েছে, তাকেই বিয়ে করতে চায়। বাপ-মা তাতে অস্বস্তি না দিলে সে আশ্চর্যতা করবে। বাপ-মা যদি দেখতে চান তাহলে নেই বন্ধুটিকে তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিতেও পারে, তাকে দেখলেই তাঁরা বুঝবেন যে পারাট খুবই ভালো, কেবল এক বাধা আছে যে সে বৈধ নয়, ব্রাহ্মণের ছেলে। কিন্তু এমন অসম্মত বিবাহ আত্মকাল তো বয়েইট হচ্ছে, ইত্যাদি। এই ছেলেকি প্রতি তার ভালোবাসা জন্মেছে, একে ছাড়া অন্তকে সে কখনই বিয়ে করবে না। একেই সে বিয়ে করতে চায়। স্তত্রায় অস্বস্তি কেওরা হোক।

টিটি বাবার সঙ্গে সঙ্গে যখন হুইবও গিয়ে হাজির হলো বিভার বাপ-মায়ের কাছে। বাহকে বশ করতে সে খুবই ওস্তাদ, আর তাঁরাও অতি ভদ্র। গোঁড়ামি তাঁদের নেই। সাত দিন তাঁদের কাছে থেকে মেয়ের সম্পর্ক কায়েমি করে সে তাঁদের মত করিয়ে নিয়ে এলো।

তার পর ঈশ্বর ওদের বিয়ে হয়ে গেল।

হুইব চমৎকার একটি ল্যাট ডাড়া করলে। ঘর-দোর বনের মতো করে সাজালে। সেইখানে থেকেই হুইব নিজের চাকরি করতে লাগল, আর বিভা তার কলেক্ট গড়তে থাকল। আশ্বাসে কয়েকবার দেখানে চা বাবার নিমন্ত্রণও করলে। আমি গিয়ে দেখলাম ওরা হুঁসনে বেশ আনন্দে আছে।

তার পর থেকে প্রায় হুঁতিন বছর কেটে গেছে। আমি আর ওদের বিশেষ কিছু যোগাযোগ করিনি। ইতিমধ্যে বিভা এম.এ. পাশ করেছে, কোনো এক মেয়ে-দলে শিক্ষকিতার কাজ নিয়েছে। স্বামী-স্ত্রী হুঁসনেই উপার্জন করেছে।

হঠাৎ একদিন ডাকে একখানি টিটি পেয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে পেলাম। বিভা আমাকে লিখেছে :

“শ্রীচরণে,

শেষ প্রণব আপনাকে জানাচ্ছি। কাল থেকে আর মল্লকে কোথাও দেখতে পাবেননা। আপনাকে অনেক বিদ্রুপ করেছি, সে-সব সোম কথা করবেন।”

এমন অকৃত চিঠির বর্ষ আমি কিছুই বুঝলাম না। মনে করলাম যে কাল একবার ওদের ফ্যাটে গিয়ে খোঁজ নেবো, ব্যাপারখানা কি।

কিন্তু তা আর যেতে হলোনা। সেইদিনই ডোর রাতি চারটার সময় সুখীর আদ্যের বাড়িতে এসে ছাশ্রি, হুশাফু ক’রে আদ্যের ঘরের দরজায় দাঁকা মারতে লাগল। দরজা খুলতেই দেখি, তার উদ্দেশ্যের মতো অবস্থা। কথা বলতে পারছেননা; কেবল বলছে—“চলুন চলুন, শিগ’র চলুন, বিভা আর বাচবেনা!” বার বার প্রশ্ন ক’রে বুজলাম, সে কি বলছে।

ভাতাভাঙি গিয়ে তাকে গাড়ি করে হাসপাতালে এনে ফেললাম। তখনও পর্যন্ত সে সম্পূর্ণ অজান হয়ে পড়েনি, অনেকবার জোর ক’রে ডাকলে একই চোখ মেলে চাইছে, আদ্যের চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ছে। চোখের তারা খুব সংকুচিত। নাকির গতি খুবই বদল। লক্ষ্য দেখে বোকা গেল সে আকিম খেয়েছে।

ষ্টব্যাক-পাশ লাগিয়ে তখনই তাকে কয়েকবার বমি করানো হলো, পার্শ্বদ্বারের জল দিয়ে শেট ধোলাই করা হলো, অ্যাস্ট্রোপিন প্রকৃতি ইন্জেকশন দেওয়া হলো। এই সব প্রক্রিয়ার পরে একই বদন জ্ঞান হলো তখন থেকে তাকে জাগিয়ে রাখার পালা, বেন কিছুতে ঘুমিয়ে না পড়ে। চার-পাঁচঘণ্টা এইভাবে চেষ্টা করতে থাকার পরে তখন সে হুহু হলো।

পুলিশের হাফাফা কাটিয়ে দেবার জন্য আদ্যকে একই মিথ্যা বলতে হলো। বলতে হলো যে আমি একটা আকিম-মিশ্রিত মালিশের গুণ্ডা হিরেছিলাম, তাই ও ভুল ক’রে বেয়ে কেলেছিল।

পরের দিন আমি ওদের ফ্যাটে গেলাম। দেখানে সুখীর তখন নেই, সে তার চাকরিতে গেছে। বিভা দেখানে একাই আছে। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এমন ক’রে হঠাৎ আত্মহত্যা করতে বাবার কি কারণ হয়েছিল, বিশেষত ওর মতো এমন বুদ্ধিমত্তী মেয়ের পক্ষে।

সে তখন আদ্যকে এই কথাগুলি বললে—

“হঠাৎ আমি কিছু করিনি, অনেকদিন পর্যন্ত দেখে-দেখে শেষ পর্যন্ত যখন কিছুতেই সন্তু করা গেলনা তখনই

এই কাজ করেছি। আপনি আগাগোড়া সমস্ত কথা শুনুন, তাহ’লেই বুঝতে পারবেন।

“আদ্যের বোন প্রত্যেকে আপনি জানেন তো? সে তারি গুহুরে মেয়ে। আমাকে সে বরাবরই একই হিঁসে করতো। আদ্যকেই সবাই ভালোবাসে, তাকে কেউ ভালোবাসে না, অতঃ আদ্যের চেয়ে সে বেশি হুন্দরী। এই কথা নিয়ে ডিগ্রসিনিই সে মালিশ ক’রে এসেছে।

“আদ্যের বিয়ের পরেই ওকে দেখে তার হিঁসে হলো। আদ্যের মতো মেয়ের এমন হুন্দর স্বামী হবে কেন? সে যেতে যেতে ওর সঙ্গে ডাব জমাতে শুরু করলে। হস্টেল থেকে যখন-তখন আদ্যের বাড়িতে চলে আসে, এমন কি হুঁচার দিন এখানে থেকেও যায়। প্রথম প্রথম আদ্যের সঙ্গে সঙ্গে লেগে থাকে, বেড়াতে বাব, সিনেমা দেখতে যায়। তার পর ক্রমে ওকে বলতে শুরু করলে—“চলুন, আপনার সঙ্গে আজ একলা একই বেড়িয়ে আসি, দিদি বাড়িতেই থাক, দিদির অনেক কাজ রয়েছে।” আমি এতে কোনো আপত্তি করতাম না, বরং খুশি হয়েই যেতে বলতাম। তখন বাতবিকই আদ্যের অনেক কাজ। একে ছুঁলে পড়ানোর চাকরি নিয়েছি, তার উপর সংসারের কাজগুলোও তো আদ্যকে করতে হবে।

“ওরা দুজনে মিলে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতো, সিনেমা দেখতেও যেতো। কিন্তু তাতে যে কিছু অমিটে হচ্ছে এমন কথা আমি ভাবতেই পারিনি। আমি যে এর মধ্যেই পুণ্যনো হয়ে গেছি, ওর যে আদ্যের নতুনদের নেপা লাগছে, এমন কোনো কথা আদ্যের কল্পনাতেও জাগেনি। মনে হরোছে, ওরা একই আমোদ ক’রছে, বরফ।

“কিন্তু ক্রমেই ওরা বাড়াবাড়ি শুরু করলে। প্রভা এলে, আদ্যের নিজের বাড়িতে আদ্যকে বেন চোরের মতো থাকতে হতো। আদ্যের এই একটিমাত্রই শোবার ঘর, পাশেরটা বদলার ঘর। ওকে ঐ ঘরে বিছানা ক’রে দিলে ও গুতে চাইত না, শাকমারে উঠে এসে বলতো ওখানে ঘুম হচ্ছেনা, তোমাদের ঘবে ঐ কৌচের উপর ওয়ে থাকি। সন্ধ্যার পরে ঘর অন্ধকার ক’রে বাটের উপর বসে হুন্দরে গল্প করতো, আলো জালা হলে নিবিধে দিত, বলতো যে অন্ধকারে ঘণ্টা বেশ ঠাণ্ডা থাকে। কি করি, চা তৈরি হলে অন্ধকারেই ওদের চা দিয়ে আসতাম। এমনি আদ্যে কত কি ব্যাপার! সব কথা আপনাকে বলা যাবনা। আমি অবশ্য বুঝতেই পারছিলাম যে একটা কিছু হচ্ছে। হঠাৎ আদ্যের মনে হিঁসে

আগাখার জুড়েই ওরা অমন করছে। ওরুতর কিছু বলে তখনও আমার মনে হয়নি।

“আর হিগেলে আমি কিছুতেই করবোনা। ডাবলায় যে বেবিনা ওরা কতখানি করে। বড়ো জোর একটা মানসিক দুর্বলতা ছাড়া এ আর কিছুই হতে পারেনা। আচ্ছা, তাই হোক। আমি তা সঙ্কল্পে নেবো, তবু হিংসা-বিষম অংশতে যেবোনা। রাগাৱাগি ছোটো-লোখমি করতে চাইনা, সে অতি বিধি জিনিষ। দুদিন পরে প্রভাকে একটা বিয়ে তো করতেই হবে, তখন সবই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু আমি ওদের আচরণের কোনো প্রতিবাদ করছি না দেখে ওরা আরো বেশি নির্লজ্জ নিঃসঙ্কোচ হয়ে উঠল, আমার সামনেই নানারকম হট্টোপাটি করতে শুরু করলে। মনে করলে, আমার বখশ তাতে কিছুই গায়ে লাগছে না, তখন আর বাধা কি আছে।

“কিছুদিন আগে ও আমাকে বললে যে এবার ওকে পুরী যেতে হবে। ওর সাথেই নাকি পুরীতে যাবে, সেখানে তার সঙ্গে থাকতে হবে। আমি ডাবলাম, সে ভালোই হলো, দিনকতক বাইরে একটু ঘুরে আসুক। কাপড়চোপড় সব ওছিরে দিলাম, ও পুরী চলে গেল। সেখানে গিয়ে চিঠিও লিখলে যে নিবিঘে পৌঁছেছে, বেশ ভালো জায়গাতে আছে।

“দিনকতক পরেই কিন্তু ছলে এক বন্ধুর কাছে গুনগাম, সে আমায় বামীকে আর আমার বোনকে পুরীতে একসঙ্গে বেড়াতে দেখেছে। সেও ছুটি নিয়ে পুরী গিয়েছিল, সম্ভ্রান্তি কিরিয়েছে। আমি বললাম, কখনই তা হতে পারেনা, ছুদি নিশ্চর ওর সঙ্গে অস্ত্র কাউকে বেধেছে। সে বললে, কখনই না, আমি বিলক্ষণ তিনি, অনেকবার ওদের দেখেছি, সন্দেহ লাকালানি করে রান করতেও দেখেছি। আমি তখন প্রভার হস্টেলে বসে নিয়ে জানলাম, সত্যি তাই, বাড়ি হ্যাঁজি বলে সে ছুটি নিয়ে চলে গেছে।

“আমি কি আর করতে পারি, চুপ করেই হইলাম। তার পর ওরা পুরী থেকে ফিরে এলো। যেন কোনো কিছুই হয়নি এইভাবে ও আমার সঙ্গে আচরণ করতে লাগল। প্রভার সম্বন্ধে কোনো কথাই বললেনা।

“আমি তখন সোজা হুজি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রভা তোমার সঙ্গে পুরী গিয়েছিল কেন? আর সে-কথা ছুদি আমাকেই বা সুকিরে রাখছে কেন?

“ও ভাতো কি বললে জানেন? বললে যে, ছুদি বখশ জানতেই পেরেছে, তখন আর কিছু দুকোবো না। আমি ওকে ফিরে ফেরছি।

“আমি বললাম, বিয়ে কেহে, তা কেনম করে সস্তর?

“ও বললে, তোমার সঙ্গে যেমন বিয়ে তেমন নয়, এ হলো সিভিল ম্যারেজ। তোমরা দুই বোনই আমার স্ত্রী হলে।

“নির্লজ্জের মতো ঐ কথা বলবার পরেও আমি ওকে কিছুই বললাম না। চুপ করেই রয়ে গেলাম। কিন্তু তার পরে প্রভাও নির্লজ্জের মতো হাসতে হাসতে এসে আমাকে প্রণাম করলে। তখন আর সঙ্কল্প হলোনা।

“তখন আর কি না খেয়ে কি করি বলুন? আমি থাকতেও বখশ ওর অস্ত্র স্ত্রীর দরকার হলো, তখন আর আমার স্বাম কি রইল? অনর্থক আমি বেঁচে থাকবো, আর এইসব নির্লজ্জতা নিতাই আমাকে চোখে দেখতে হবে, ভিরকাল তাই সঙ্কল্পে করতে হবে। তার চেয়ে মরে যাওয়াই কি ভালো নয়!”

বিভার দুখ সমস্ত দুস্তান্ত ওনে আমি ভিত্তি হয়ে গেলাম। তবু জোর করে ওকে বললাম—“একটা কিছু নিশ্চলভার বাহুরে জীবন একেবারে কাঁচ হয়ে যারনা, তার কারণ বড়ই ওরুতর হোক। একটা দিক দিয়ে সার্থকতা না হলেও তোমার জীবনে অস্ত্রকর্মের সার্থকতা আসতে পারে। ছুদি বুদ্ধিমতী, তোমাকে আর বুঝিয়ে কি বলব। কিন্তু হরবার মতলবে আফিম-খাওয়া তোমার উচিত হয়নি। ওর মানে জীবনের যশে হেরে পাসামো।”

সে বললে—“আমিই খেয়ে কিন্তু এক দিক দিয়ে একটা কাজ করেছে। ও বুঝে এখন তার পেরে গেছে। আমার পাবে ধরে কমা চেয়ে বলেছে যে, আমার মনে কখনই আর কষ্ট নেবেনা। আমার কাছে স্বীকার করেছে যে আমাকে ও বর্খার্ট ভালোবাসে, প্রভাকে ফিরে করতে বাধ্য হয়েছিল অস্ত্র কারণে। কিন্তু এখন থেকে প্রভাকে ও সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে রাখবে, আমার সঙ্গে তার সম্পর্কই থাকবেনা। আমার মংসারে সে আর ঢুকতে পারেনা।”

এই ভাবে ওদের একটা মিটমাট হয়ে গেছে ওনে আমি সুখি-ই হলাম। আর কোনো কথা না বলে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

কিন্তু দিন সাতেক পরে এতদিন সন্ধ্যার স্থায়ীচন্দ্র ঠিক তেমনি উজ্জ্বলের মতো ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এসে বস্কির।—“চলুন চলুন, শিগ্গির চলুন, প্রভা আর ধাঁচলোনা!” এবার প্রভা বিব খোঁহেছে।

তাকেও হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। কিন্তু সে খেয়েছে কড়া নির্ভেজাল নাটকীয় অ্যান্ডি। ওদের হস্টেলে

কতীও ঘরে কোনো কারণে এক বোতল নাটকিচ আয়িড রাখা ছিল। সেই বোতলটি সে ছুঁবি করে সরিয়ে রেখেছিল। সময় দূরে তারই খানিকটা গলার ঢেলে দিয়েছে। অধীর প্রতাপ বিকলে অফিস-ফেরতা ওর দিকে দেখা করতে যেতো। সেদিন গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানে যে তার ঘরের দরজা বন্ধ, কোনো সাড়া-শব্দ ছিলোনা। তখন দরজা ভেঙে ফেলা হয়, তার পর দেখা যায় এই কাণ্ড।

মূল থেকে গলা থেকে পেট পর্যন্ত তার আয়িডে পুড়ে গেছে। সে হাঁ করতে পারছেনা, কথা বলতে পারছেনা, কিছু দিলতে পারছেনা। কিন্তু তার জ্ঞান একটুও হারাননি, নির্বাক দৃষ্টিতে সকলের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। স্বহস্তের মুখের দিকে বার বার চাইছে, মনে হয় অত ব্যপার মধ্যেও স্বহস্তের উদ্দেশ্যের মতো ছটকটানি দেখে সে হীড়িম্ব্যেতা উপভোগ করছে।

তাকে বাঁচাবার জন্য অনেক চেষ্টাই করা গেল। নলের দ্বারা গলার মধ্যে দীর্ঘে দীর্ঘে ওসিডিন-অয়েল প্রয়োগ করতে থাকে, দুধের মধ্যে কাঁচা ডিম ওলে কোনো উপায়ে একটু খাওহাবার চেষ্টা করা, আলকালি-জাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করা—কিছুতেই কিছু হলোনা। কিছুই তার গলা দিয়ে নামলোনা। অগতঃ ঐভাবে তিন দিন পর্যন্ত সে ঠেঁচে রইল—সর্বদা জাগ্রত অবস্থায়, আর সর্বদাই চোখ চেয়ে। সেই চোখ দিয়ে একটোটা জলও পড়লনা। তিনদিন পরে সে চেয়ে থাকতে থাকতে মারা গেল।

একা কেন এমন কাজ করেছিল তা অনিনি। তবে এইটুকু বুঝলাম যে, অজ্ঞাত স্বহস্তের প্রতিযোগিতার ব্যর্থ হয়ে শেষকালে সে আত্মহত্যার প্রতিযোগিতার দিগির উপর টোকা দিয়ে চলে গেল।

গ্রন্থান্তরের প্রাণী

সলিল বহু

মাছদের অনেকদিনের আশ-আকাঙ্ক্ষার সার্থকতার সম্ভাবনা নিয়ে ১৯৫৭ সনের ৫ই অক্টোবর পৃথিবীর ইতিহাসে অসিস্থরঙ্গীর হয়ে রইল। ঐ দিন দোড়িয়ে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহকে সফলভাবে উৎক্ষেপ করতে সক্ষম হ'লেন, গ্রন্থান্তর-অভিযানের বা প্রথম পরিক্ষণ। বহুদিন ধরে মাছ বহু দেখেছে, কাব্য লিখেছে গ্রন্থান্তরে বসতির কাহিনী নিয়ে, আর তারই ধারাকে বহন করে বিংশ-শতাব্দীর বিজ্ঞান চলেছে ব্যবহারিক সার্থকতার পথে। তাই আজ সভ্যতাই প্রায় জাগছে—গ্রন্থান্তরে গিয়ে আনরা কি দেখবে, কাকে দেখবে? সেখানেই আকাশে আছে কি বেঘনস্রাব, কবে কবে চমক দেবে কি বিদ্রোহ? প্রত্যহ-তপনের বায়ুর্বে, স্রাব্যের স্বর্গস্বর্বে হোঁচকার তবিত হব কি আশ্বাসদেই মতো কোনো মাছ? এমনি সব নানা প্রশ্ন আজ জড়ি করছে মাছদের মনে, আর তারই সঠিক উত্তরের প্রচেষ্টার তৎপর হয়ে উঠেছে আককের বিজ্ঞান।

গ্রন্থান্তরে প্রাণী আছে কিনা ঐ নিয়ে আলোচনা করার আগে প্রাণ জিনিসটা যে কী, তা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। গত শতাব্দীর প্রথম দিকে বিজ্ঞানীদের

ধারণা ছিল যে, মাছের ও জীবজন্তুর বৃত্তি শুধু প্রাণী নামের বোধ্য, আর এদের দেহজ নিঃসৃত সামগ্রী অজ্ঞাতভাবে প্রস্তুত পদ্য নয়। কিন্তু বিজ্ঞানী ওহলার (Wohler) গবেষণাগারে সংশ্লেষিক (synthetic) উপায়ে ইউরিয়া নামে জীবজন্তুর মূল অংশ প্রস্তুতিতে সক্ষম হ'লেন। পরবর্তী মুগে আচার্ণ জগদীশচন্দ্র বহু ব্যবহারিকভাবে প্রমাণ করলেন যে, জীবজন্তুর মতো উদ্ভিদকুলও প্রাণী নামের সম্পূর্ণ অধিকারী। আজকের দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্যতর এককোষী জীবগু থেকে আরম্ভ করে প্রতিভাশালী মাছের অবধি সকলেই প্রাণী-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আজকের বিজ্ঞানীরা বলছেন যে—‘জীবিত’ কথাটা সম্পূর্ণ অর্থহীন, কারণ জীবিত ও জড়ের মধ্যে কোনো সঠিক সীমারেখা নেই। চাকলা, বাসপ্রবাস প্রভৃতিকে সাধারণভাবে জীবনের লক্ষণ বলে ধরা হ'লেও, এমন অনেক জীবিত কোষ আছে, যার মধ্যে এসবের বিশেষ কোনো চিহ্ন নেই। বিজ্ঞানী ছাগলডেন ও বার্নেলের মতে, শক্তির রূপান্তর ঘটতে দক্ষ্য এমন কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্থায়ী প্রক্রিয়াকেই ‘জীবন’ বলা যেতে পারে।

এইতো গেল জীবনের সংজ্ঞার ব্যাপার। জীবনের পরিবেশ সহজেও প্রায় সেই একই কথা বলা চলে, অর্থাৎ

কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। সাধারণভাবে বলা হয় যে, বেশী উষ্ণতা ও বেশী শৈত্যে জীবনের পরিসমাপ্তি অনিবার্য। কিন্তু ক্যাম্‌টেকা উপাশীশের আয়েমিসির অকলে এক বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ জন্মাতো দেখা গেছে। সেখানকার জমির উষ্ণতা প্রায় ৮২° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। অত উষ্ণতার কোনো জীবিত সামগ্রী থাকার সম্ভব নয়, তাই মহানারীর সমগ্র জেগজীবাণু অংশের অল্প অল্প স্রুতিয়ে খড়বোই বিধি। নিম্ন উষ্ণতার ঠিক বিশেষ কোনো সীমারেখা নেই। ০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের চেয়ে ০° ডিগ্রী নিম্ন-উষ্ণতা-সম্পন্ন মেরু অকলে কয়েক রকমের উদ্ভিদ জন্মায়। তা ছাড়া সাইবেরিয়া অকলে বরফের তলায় চাপ-পড়া ৫,০০০ বছরের পুরানো আগ্নেয়গুহীতে দ্রুত ডিঙি মাছের রক্ত-বিজ্ঞানীরা গবেষণা-জাতের প্রধান তত্ত্ব যে জীবনশঙ্কন দিয়েছেন তাই নয়, তার থেকে একজন পর্যন্ত করিয়েছেন। উষ্ণতা ছাড়া চাপও জীবনের একটা বিশেষ প্যাডিপার্বিক অবস্থা। আমাদের নাব্যার উপর প্রতি দাঁটকিতে সাড়ে সাতসের বাতাসের চাপ সব সময়ে রয়েছে। এই চাপ বাতাসে বা কমলে অবস্থি অসুস্থত ঘটি, খুব বেশী পরিবর্তনে দ্রুত পর্যন্ত হয়। কিন্তু সমুদ্রে ১ মাইল নীচে, যেখানে প্রতি বর্গইঞ্চিতে চাপের পরিমাণ ১,০০০ দেয়, সেখানে কিন্তু বিশেষ জাতের সামুদ্রিক প্রাণী অন্যায়নে খিচর্য করে বেড়ায়। অর্থাৎ অত পর্যন্ত চাপে মানুষ বাঁচতে পারেনা সত্তা কথা, তা বলে প্রাণী থাকবেনা এমন তো কোনো কথা নেই।

এবার প্রশ্ন্যারপের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিবরণগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। পৃথিবীর প্রাণী-বাসোপযোগী বায়ুগলে আছে প্রধানতঃ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস। দ্রুতি গ্যাসেরই প্রয়োজন খুব বেশী। নাইট্রোজেন হ'ল প্রাণিক প্রোটিনের প্রধান অংশ, বাতাসের নাইট্রোজেন বিশেষ প্রাকৃতিক প্রভাবে নাইট্রেট রূপে উদ্ভিদের মাধ্যমে জীবদেহে প্রবেশ করে। অক্সিজেন গ্যাস হ'ল পৃথিবীর সমস্ত দহন-প্রক্রিয়ার মূল কারণ। প্রাণীর শরীরের মধ্যে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় বায়ুপ্রবাসের ফলে, তা সম্ভব হয় অক্সিজেনের ক্ষেত্রে। উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানুষ নির্বিশেষে সকলেই বায়ুগলে অক্সিজেন গ্রহণ করে আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড আবার উদ্ভিদ-জীবদের পক্ষে অপরিহার্য, কারণ সূর্যকিরণ প্রভাবে পাতার ক্রোয়োক্লিনের সাহায্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলের সংমিশ্রণে উদ্ভিদ তার বাতাস তৈরি করে নেয়। এই প্রক্রিয়ার নামকোটো-সিন্থেসিস (Photo-synthesis), আর এই প্রক্রিয়ার অক্সিজেন গ্যাস ছাড়া পান। উদ্ভিদ-ছাড়া এই প্রক্রিয়া অল্প জীবজগতে সম্ভব নয়। এইভাবে উদ্ভিদ-মূলের সাহায্যে বাতাসের অক্সিজেন-সামান্য বহুর্য থাকে। প্রাণী-জীবনের ক্ষেত্রে জলেরও বিশেষ প্রয়োজন; তন্তু তৃষ্ণা-নিবারণ

নয়, বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও নাট। পুরুষ ও নারীর জৈব বীজের মধ্যেই যে তন্তু জলের আদিক্য তা নয়, কয়েকটি প্রাণীর—যেমন মাছ, ব্যাং প্রভৃতির জৈব বীজ-সম্বলন ঘটে জলের মাধ্যমেই। বংশবৃদ্ধি ছাড়া জীবের আবির্ভাব নিরর্থক, তাই জলের প্রয়োজন অবতর্যকারী। তা ছাড়া পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব জলের মধ্যেই, আর উগবানেরও দশাবতার-বন্দনা স্তব্ধ জগতের মস্ত-অবতার দিয়েই।

মৌরজগতের এই-উপগ্রহাদির অবস্থা সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা যাক। সূর্য-তারকাকে ঘিরে শরপাতীত কাল থেকে সর্বসময়ে নাট এই ঘুরে চলেছে—যথাক্রমে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন আর প্লুটো। বৃহৎ হ'ল সূর্যের সবচেয়ে কাছে, আর শেষ সীমানা পাহারা দিচ্ছে প্লুটো। বর্তমানে অবশ্য কেউ কেউ বলাছেন—প্লুটোটা আসলে সূর্যের এই নয়, মেগনুনের উপগ্রহ। মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষপথের মাঝবানের কক্ষপথে সূর্যকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করছে কয়েক হাজার ছোট ছোট গ্রহিক্যপুঞ্জ, কোনো বিশেষ প্রাকৃতিক ব্যাপনশতঃ সবগুলো বিশে একটা গ্রহসত্তি সম্ভব হয়নি। বুধ, শুক্র ও মঙ্গলকে প্লুটো ছাড়া আর সব গ্রহকেই এক বা একাধিক উপগ্রহ আছে। পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপগ্রহ একটা, আর সেটা হ'ল আমাদের চিরপরিচিত আসল চাঁদ, পৃথিবী থেকে দূরত্ব ২,৩২,০০০ মাইল। কোনো গ্রহ বা উপগ্রহের বায়ুমণ্ডল নির্ভর করে তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও উষ্ণতার উপর। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি খুব কম হ'লে কোনো গ্যাস-সমষ্টিকেই ধরে রাখা যায় না, আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটা সাধারণতঃ নির্ভর করে আয়তনের উপর। এবার যদি উষ্ণতা বেশী হয়, তা হ'লে গ্যাস-অণুর গতিও হয় বেশী, ফলে পরিমিত আবহাওয়া-সৃষ্টিও সম্ভব হয় না। পৃথিবীর যে পরিমাণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, তার আওতার বাইরে যেতে হ'লে সেক্ষেত্রে ৭ মাইল গতি হওয়া দরকার। আর পৃথিবীর বা উষ্ণতা, তা ঘিরে পৃথিবীকে ঘিরে একটা ৩০-৪০০ মাইল গভীর বায়ুগল গড়ে উঠেছে, যার মূল অংশ হ'ল নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। অল্পাংশ গ্যাসগুলোকে ধরে রাখা যায়নি কিছুটা মাধ্যাকর্ষণ ও কিছুটা উষ্ণতার ক্ষেত্রে। অবশ্য গোড়ার দিকে পৃথিবীর বায়ুগলে অক্সিজেন গ্যাস খুব বিশেষ ছিল না, উদ্ভিদের আবির্ভাবের পরে সেটা বেশীমানায় বেগা দিয়েছে। চাঁদের আয়তন পৃথিবীর ১/৮ ভাগ; তার অবস্থা পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে সেখানে কোনো বায়ুগলের অস্তিত্ব নেই। তার ফলে মহাকাশের উন্মাদাঙ্গি সহাসরি একবারে চাঁদের মাটিতে দিয়ে অবিরত আঘাত হানছে, পৃথিবীর বায়ুগলের সংস্পর্শে যে-সবের বেশিরভাগই ধ্বংস হ'য়ে যায়। বায়ুগলের অভাবে সেখানে উষ্ণতার তারতম্যও হয় খুবই বেশী, সূর্যের আলো সেখানে পড়ে

সেখানে প্রায় ফুটন্ত জলের উষ্ণতা আর আলো মনে গেলোই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। এইরকম অবস্থায় আমাদের জানা প্রাণের আবির্ভাব ও অবস্থান সন্দেহ নহে। তাই বিজ্ঞানীরা স্থির নিশ্চিত যে চাঁদে প্রাণী নেই। অস্ত্রান্ত গ্রহগুলোর উপগ্রহ-সমষ্টির অবস্থা আমাদের চাঁদেরই মতো, তাই সেখানেও নিঃসন্দেহে কোনো প্রাণী নেই।

সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ হ'ল বুধ, তাই তার উষ্ণতাও সবচেয়ে বেশী, প্রায় ৪০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এই গ্রহের গড়ন পৃথিবীর ১/৫ ভাগ, তার ফলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও কম। এছাড়া কিস্ত সূর্যের দিকে এক বুধ কিরিয়ে আছে সবদিক দিয়ে, ফলে শেগিকে যেমন প্রচণ্ড গরম, উত্তোষিতও তেমনি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। এর চারপাশে একটা বায়ুশূন্য আছে অবশ্য, তবে তার সংযুক্তি এখনও সঠিক ধরা যায়নি। উল্লেখ্য এখানে মারে মারে বায়ুশূন্য মধ্যস্থলে নিশ্চিত হ'তে দেখা গেছে। এছাড়া প্রাণী-বসবাসের বধ্যবৎ বোয়া নয়। বুধের পরই হ'ল শুক্র, যাকে বলে পৃথিবীর 'দ্বন্দ্ব বোন', তার পর পৃথিবী, এবং তারপরই হ'ল রহস্যময় মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথ। শুক্র ও মঙ্গল নিয়ে বিশদ আলোচনা করার আগে অস্ত্রান্ত গ্রহালোকের পথের নেওড়া থাক। মঙ্গল ও বুধশক্তির মধ্যে ৩৪,০০,০০,০০০ মাইল দূরত্ব কক্ষপথে আছে অসংখ্য ছোট ছোট গ্রহিক-সমষ্টি, বার সঠিক সংখ্যা এখনও নির্ণীত হয়নি। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মেটো, প্লেটার ব্যাস প্রায় ৪২৫ মাইল, অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি খুবই কম, ফলে কোনো আবহাওয়া সৃষ্টি হয়নি, আর প্রাণের সম্ভাবনা সেখানে অব্যবহার। এই গ্রহিকান্ত্রালোর পরেই হ'ল দানবগ্রহ বুধশক্তি, বার ব্যাস প্রায় ১০ হাজার মাইল, আরওনে পৃথিবীর চেয়ে তেরোশো গুণ বড়ো। এর প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বেগ কাটিয়ে বেগোতে হ'লে সেকেন্ডে ৩৮ মাইল গতি হওয়া দরকার। ফলে গ্রহটির চারপাশে প্রায় ৬,০০০ মাইল পুরু একটা বায়ুস্তর আছে আর এই বায়ুস্তরের মধ্যে অনেক ভারী ভারী গ্যাস আছে। অহুসন্ধান অ্যামোনিয়া, মিথেন প্রভৃতির মতো দানবোৎপাদী গ্যাসের সম্মানও পাওয়া গেছে। বহুবিধত বায়ুস্তরের প্রচণ্ড চাপে গ্রহপৃষ্ঠের বেশিরভাগ গ্যাসই আছে তরল অবস্থায়। এই বিধাক্ত পরিবেশে প্রাণের ক্ষুদ্র সম্ভাব্য নব নিশ্চয়ই। বুধশক্তির পরেই হ'ল চক্রেপতিত শনিগ্রহের কক্ষ। আকারে বুধশক্তির পরেই এর বান, কিন্তু এই আকারের ভুলনার এর গড়ন তত বেশী নয়, কারণ এর ঘনত্ব কম। এই গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি স্বর্গোত্তে সেকেন্ডে ২৩ মাইল গতিবেগ দরকার। বহুবিধত একটা বায়ুশূন্য রয়েছে গ্রহটিকে ঘিরে, তার মধ্যে অনেক ভারী গ্যাস আছে; প্রচণ্ড চাপে গ্রহপৃষ্ঠে বিভিন্ন তরল গ্যাসের সমুদ্র বিস্তার। প্রাণের সম্ভাবনা সেখানে দ্রুত হ'ল।

তারপরও কক্ষলোয় বধ্যক্রমে ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। প্লুটো গ্রহটির এতদূরে অবস্থিতির জন্য তার সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ধরনই আশঙ্কিত জ্ঞান রাখা যায়নি, তবে সেখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ইউরেনাস ও নেপচুনের আদতন প্রায় সমান, মাধ্যাকর্ষণ-বিজ্ঞানী গতিবেগ সেকেন্ডে বধ্যক্রমে ১৪ মাইল ও ১৫ মাইল। প্লুটো গ্রহেরই তাপমাত্রা ০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের অনেক নীচে। ইউরেনাসের একটা প্রায় ৬,০০০ মাইল উঁচু আর নেপচুনের ৩,০০০ মাইল উঁচু বায়ুশূন্য আছে। গ্রহ দুটি সম্বন্ধে এখনও অনেক কিছু জানতে পারি, তবে এটা ঠিক যে এখানে কোনো প্রাণের সম্ভাব্য নেই।

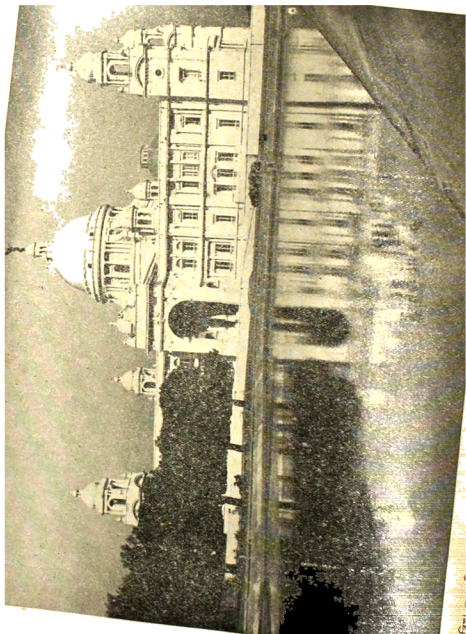
এবারে আলোচনা করা যাক পৃথিবীর সমুদ্রায় সূর্যপ্রদক্ষিণকারী দ্বিতীয় গ্রহ শুক্র সম্বন্ধে। গ্রহটিকে বলা হয় পৃথিবীর দ্বন্দ্ব বোন। কারণ আকারে এটি প্রায় পৃথিবীরই সমান; এর ব্যাস ৭,৭০০ মাইল আর পৃথিবীর ৮,০০০ মাইল, এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাইরে যেতে হ'লে এরোজন সেকেন্ডে ৬৫ মাইল গতি আর পৃথিবীর ৭১ মাইল; সূর্য-পরিভ্রমণ এর সময় লাগে ২২৫ দিন আর পৃথিবীর ৩৬৫ দিন। গ্রহটির চারপাশে ঘন বায়ুস্তর আছে আর আছে ঘন মেঘের আবরণ। এই মেঘের জন্তে গ্রহটির পৃষ্ঠদেশ ভালো ক'রে পর্যবেক্ষণ করা আশঙ্ক হতে হয়নি। আয়তন ও মাধ্যাকর্ষণের ভিত্তিতে এর বায়ুস্তরের সংযুক্তি পৃথিবীরই অল্পদূর হ'তে পারত, কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের প্রায় তিন কোটি মাইল কাছে থাকায়, সূর্যের আলোর প্রতিফলন হয় খুবই বেশী, তাই আমাদের পৃথিবীর উষ্ণতার চেয়ে এখানকার উষ্ণতা বেশী, ফলে বায়ুশূন্যের সংযুক্তি এপ্রকর হ'তে পারেনি। পৃথিবীর আকাশে এইটাই সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখি আমরা, কখনও 'সন্ধ্যাতারা' রূপে আবার বা কখনও 'শুকতারা' রূপে। বিজ্ঞানীরা অহুসন্ধান ক'রে যেখাে পরিমাণে স্ত্রিভ্রমণের সম্ভাব্য এখানে পাননি, কিন্তু কার্বন-ডাই-অক্সাইডের প্রাচুর্য এখানে বেশী। তাই বেগে আশঙ্কিত করা যায়, পৃষ্ঠায় পরিমাণে উষ্ণরূপে এখানে নেই। তা ছাড়া জলীয় বাষ্পের পরিমাণ এখানকার মেঘে খুব বিশেষ ধরা পড়েনি, অর্থাৎ জলেরও এখানে প্রাচুর্য নেই। অহুসন্ধান থেকে মনে হয় যে, এখানকার মেঘ সৃষ্টি হয় ভাসমান হুস্ম ধূমিকতার সমষ্টি থেকে, অর্থাৎ নিরন্তর জড় ও ঘূর্ণিবাফা এখানে লেগেই আছে। মেঘের এশার থেকে উষ্ণতার যে পরিমাণ করা গেছে, তাতে দেখা গেছে এখানকার দিনের উষ্ণতা ৬৪° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড আর রাত্রে ১৮° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এক কথায় বলা চলে যে, কোটি-কোটি বছর আগে পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা বেরকম ছিল, আশঙ্কিত ও অপ্রকৃতির অবস্থা কতকটা সেইরকম। সেখানে যদি এখনও পৃথিবী প্রাণের আবির্ভাব না হ'লে থাকে তবে

করেকশো বছরের মধ্যেই হুত উদ্ভিদ ও জ্যান্মিয়ার অভিশার দেখানো স্ক হ'তে চলছে।

এবার হুতম্বর বঙ্গপ্রান্তে সন্ধ্যা আলোচনা করা যাক। এর ব্যাস ৪,২১৪ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর অধঃকেন্দ্রে গেলে কিছু বেশী। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কঠোর হ'লে সেখান থেকে ৩২ মাইল গতি হরকার আর ২৫-পরিষ্কার সময় লাগে ৩১১ দিন। বর্গালী বিশেষ করে এখনিকার বায়ুত্বের অগ্নিকেন্দ্র, কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর জলীয় বাষ্পের সন্ধান পাওয়া গেছে, আর তাই থেকেই এখনিকার উদ্ভিদের অবস্থিতি সন্ধ্যা নিশ্চিত ধারণা করা গেছে। এখনিকার বাতাসের চাপ পৃথিবীর চাপের এক-বিশমাংশ মাত্র। জল এবং জলীয় বাষ্পের সন্ধান পাওয়া গেলেও, পৃথিবীর মতো ঐ অংশ জলাভূত নয়, শতভাগ এখনিকার আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত শুষ্ক। পঞ্জি-দ্বারা দুইবনের পাতার গ্রন্থপুষ্ঠ সন্ধ্যা অনেক কিছুই জানা গেছে। পৃথিবীর মতো এখনিকার পৃষ্ঠদেশে পর্বতের প্রাচুর্য নেই, তবে হু-একটা পাহাড় যে নেই একথা বলা চলে না, কিন্তু নগণ্যপ্রাক হিমালয়ের সন্ধান দেখানো পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রন্থপুষ্ঠের আট ভাগের পাঁচভাগ অংশ বঙ্গাল-প্রান্তের আর এই প্রান্তের কোনো পরিবর্তন হয় না সবসময়ে। অল্পমান করা হই, এখানে দক্ষিণে-বঙ্গোপসাগর বঙ্গোপসাগর পাতবর্ণনার-সমবর্তিত থাকারের স্তর। আট ভাগের বাকী তিনভাগ হ'ল নীলসাগরের স্তর, কিন্তু এই স্তরের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে বছরের বিভিন্ন সময়ে স্তর-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। প্রথমদিকে বিজ্ঞানীরা এটাকে সুবিশুদ্ধ জলগণি বলেই মনে করেছিলেন, কিন্তু তা যদি হ'ত তাহ'লে দর্শনদ্বির তীর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যেত। কিন্তু তা হয় না। বর্তমানে স্থির সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ঐ অঞ্চলটা আসলে উদ্ভিদ-সমৃদ্ধ। শাল-উজানী-আলো-চৈতন্য কিশোর উপর বহু ছবি ফুগে এবং পৃথিবীর উদ্ভিদেরও ঐ পর্যায়ের ছবির সঙ্গে তুলনা করে এই উদ্ভিদ-অবস্থিতির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে। বহুবিস্তৃত জলরাশির সন্ধান না গেলেও গ্রহের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে বরফের আচ্ছাদনের সন্ধান পাওয়া গেছে। এরপর স্তর-পরিবর্তনটা সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায় মেরু-অঞ্চলেই। ঐতকালে বরফাচ্ছাদনের বিস্তৃতি বিবৃ-অঞ্চলের প্রায় অর্ধেকটা অবধি বিস্তৃত হয়ে পড়ে, আবার গরমের সময় কমেই থাকে। দক্ষিণ গোলার্ধে গরমের সময়ে সব বরফই গলে যায়, কিন্তু উত্তর গোলার্ধে কিছুটা বরফের স্তর সারা বছরই বিজ্ঞান। তবে মরালের সাধারণ উচ্চতা পৃথিবীর চেয়ে কম, গরমকালেই বিবৃ-অঞ্চলে উচ্চতা

৩০-৩১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড মতো হয়। উদ্ভিদের অবস্থিতি সন্ধ্যা স্থিরনিশ্চিত হ'লেও, উচ্চতর প্রাণী দেখানো আছে কিনা সে সন্ধ্যা কোনো স্থিতিস্থিতি সিদ্ধান্ত আজ পর্যন্ত করা যায়নি। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীর জ্যোতিষিণ Giovanni Schiaparelli এহাণ্ডারে সূর্য জালের মতো বিস্তৃত নালা-জাতীয় রেখার সন্ধান পান। তারপর লাওয়েল ও অস্ত্রান্ত বিজ্ঞানীরাও গত ৩০ বছর ধরে এই নিয়ে গবেষণা করছেন। তারা দাবি করেন যে, এই নালা-সূর্য রেখাগুলো আসলে বুদ্ধিমান জীব কৃত বিরাট বিরাট খাল; এই খালগুলো ২৪০ থেকে ৩,৪০০ মাইল লম্বা আর ২০ থেকে ২০০ মাইল চওড়া। বঙ্গপ্রান্তে জলের অভাবের ক্ষেত্রে মেরু-অঞ্চল থেকে এইসব খাল কেটে গলিত বরফের জলকে বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেক বলেন, বঙ্গপ্রান্তের অধিবাসীরা পৃথিবীর বায়ুত্বের চেয়ে হুততা ও উচ্চত, তারা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত করে বায়ু করে আর সেইসব গবেষণা বাতাস, আর্দ্রতা এবং উজ্জ্বল থাকা এখানে তার ব্যবস্থা তারা করেছে। আধুনিক অনেক বিজ্ঞানী অবশ্য মরালের খালগুলোর সন্ধ্যা পূর্ণোক্ত সিদ্ধান্ত মানতে রাজী নন। তারা বলেন, খাল-সূর্য কল্পিতগুলো আছে সত্যি, তবে তাদের জ্যান্মিতিক নির্মূলতা প্রমাণ হয়নি, তা ছাড়া সেগুলো কৃত্রিম না হ'লে প্রাকৃতিক সৃষ্টিও হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এটা ঠিক যে, মরালে বুদ্ধিমান জীবের অবস্থিতির সম্ভাবনা খুবই প্রবল। তবে মরালের প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে মনে হয় যে, এটি একটি ধ্বংসাত্মক গ্রহ—কোটি কোটি বছর পরে আমাদের পৃথিবীরও এই অবস্থা দাঁড়াবে।

এ তো গেল শুধু সৌরমণ্ডলের গ্রহসমষ্টির কথা। এখানকার মতো গ্রহের মধ্যে একটি গ্রহে প্রাণী আছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি, আর বাকী ক্রটিতেও গ্রাণের আবির্ভাব ও অবস্থান খুবই সম্ভব। আধুনিক 'বিশ্বদর্শী মতবাদ' থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেকটি তারারই গ্রহসমষ্টি থাকা সম্ভব। বিরাট মহাকাশের সমস্ত নীহারিকা-দণ্ডলীতে প্রায় কোটি কোটি তারা আছে। তাহলে মহাকাশে গ্রহের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে অসংখ্য কোটি কোটি, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কয়েক কোটি গ্রহে বুদ্ধিমান জীব বাস করে, আর তার মধ্যে হয়তো কয়েক দশকের জীবকে ঠিক পৃথিবীর বায়ুত্বের মতো দেখতে। তা যদি হয়, তাহলে নিশ্চয়ই কয়েকশো গ্রহের বুদ্ধিমান জীব আমাদেরই মতো জীবন বাপন করে।





ঝড় এলো

[ফটো : তপন দাস]

পুরোনো কথা

যশবন্ত

গিরিশচন্দ্র বে ('ঘড়ি-গিরিশবাবু')

গিরিশবাবু জেম্স মরে কোম্পানির দোকানে ঘড়ি-ঘোরাঘরের কার্য করিতেন। খুব ভালো কাগির ছিলেন; যেকবেবর একটি পুরাতন সোনার ঘড়ি কিছুতেই ঠিক সময় দিতেছিল না, অনেকবার জেম্স মরে কোম্পানি ও অন্তত সাহেব-কোম্পানিকে দিয়া ঘোরাঘর ও সময় রেগলেট করা হইল—কিন্তু কিছুতেই ঠিক সময় দেয় না। তখন ঘড়িটি বিলাতে ঘোরাঘরের জন্য পাঠানো হইল; বিলাত হইতে ঘোরাঘর হইয়া আসিবার পরও সময় ঠিক-ঠিক দিতে পারিল না। ঘড়ির বালিক ভুগে করিয়া বলিলেন যে, হানুমানহাণ্ডর এই ঘড়ি আবারকে আসার করিয়া দিয়াছেন—ইহা জানিতেই হইবে। অতঃপর ঘড়ি ঠিক সময় কিছুতেই দিতেছে না। গিরিশবাবু ঘড়িট বেরিয়া বলিলেন যে, আসনি যদি এই ঘড়ি কিন্ত মরে কোম্পানিতে পুনরায় ঘোরাঘর জন্ত পাঠান তো, ঘড়িটি ঠিক করিয়া দিতে পারি। ঘড়িটি পাঠানো হইলে, গিরিশবাবু সাহেবকে বলিলেন যে—ঘড়ির ক্যাচটি (catch) আলগা হইয়া গিয়াছে, ইহার আকারটি এইভাবে (বলিয়া, ছবি আঁকিয়া দেখাইয়া দিলেন) পরিবর্তন করিলে ঘড়িটি ঠিক-ঠিক চলিতে পারে। এবং সেইমতো করিয়া দিলেন। সাহেব ইহার জন্য গিরিশবাবুকে অনেক প্রশংসা করিলেন ও পুরস্কার দিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে হুইজারদ্যাও থেকে এক ঘড়ি-বিক্রেতা সাহেব বাংলাদেশে বাহাতে কম দামের তাঁহার দেশে প্রস্তুত ঘড়ির খুব কাটুটি হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে আইসেন। তিনি গিরিশবাবুর এইরূপ ঘড়ির ক্যাচ-পরিবর্তনের বিবরণ শুনিয়া ও গিরিশবাবুর সহিত আলাপ করিলেন। বলিলেন যে, দেশে বাইরা গিরিশবাবুর উদ্ভাবিত পরিবর্তন তাঁহারের ঘড়িতে দিবেন—ইহাতে ঘড়ি ভালো চলিবে ও ঠিক-ঠিক সময় রাখিবে। এই ভঙ্গলোক গিরিশবাবুকে তাঁহার উদ্ভাবিত পরিবর্তনের জন্য একটি সোনার ঘড়ি উপহার দেন। এখন হুইজারদ্যাওর পোনার ঘড়িতে এই গিরিশবাবুর উদ্ভাবিত পরিবর্তন আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য করজন ব্যঙালী তাহার খবর রাখি? গিরিশবাবু প্রায় ৩০ বছর হইল বাহা গিয়াছেন; তাঁহার বাড়ি পুরাতন সিটি কলেজের নিকট ছিল।

গিরিশবাবুর পাচবার সখ ছিল। তিনি এমন একজোড়া লতা পাখরা জোড় পাওয়াইয়া পাওয়াইয়া (by selection) পুষ্টি করিয়াছিলেন যে, ইহাদের মাথা উটগায়ে মাটিতে প্রায় ঢেঁকিত। ডিজা ছোলা-মটর না খাওয়াইয়া বিশেষ খাতিতে পালিত না। ইহাদের বেহ সোনা, কেলমার ডানা দুইটি মিশ্রমিশ্র কালো। এইরূপ মাথা-উটানো লতা পাখরা আমরা অন্তরঙ্গ দেখি নাই।

গিরিশবাবু আমাদের বাড়িতে বড়দিন করিতে আসিতেন। এক দোঁড়া বেওয়া আসিতেন ও আমাদের দিতেন। আসিয়াই বৈরকপানের বড় কল-ঘড়িটি নামাইয়া কল খুলিয়া ফেলিতেন। ঘড়ির কল দেখিবার জন্য আমরা তাঁহারকে ঘিরিয়া বসিতাম—ঘড়ির কলকলকার হাত দিতে বাতন করিলেও আমরা হাত দিতাম। কখনও হাত হইতে কলকল পড়িয়া ছিটুকাইয়া বাইত। গিরিশবাবু বিজ্ঞানস: করিতেন—কোনদিকে ছিটুকাইয়াছে বলিয়া মনে হইতোছে? আমরা, বেশিকৈ পড়িয়াছে বলিয়া মনে করিতাম, তিনি তাহার বিপরীত দিকে খুঁজিতে বলিতেন; এবং সেই দিকেই কলকল পাওয়া বাইত। যে দিকে হাতরাইবে তাহার উট দিকে খুঁজিবে। আমরা তাঁহারে 'ঘড়ি-গিরিশবাবু' বলিতাম।

বিবহুত্ব ও বাকইপূর

স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক উভয় ভাবেই বাকইপূর যেরূপে হইতে পারে তাহার বিবরণ করা করিয়াছেন, অনেক পৃষ্ঠক তাহা দেখিতে আইসেন। এইসব পৃষ্ঠকদের দেখানোনি আমরা 'স্বর্গদূত' পিতামহের কোরগরে' বলিয়া কোরগরে ইহা দেখিতে গিয়াছিলাম—কিন্তু বেশিতে পাই নাই।

অনেকদিন হইতে একটা কথা শুনিয়া আসিতেছি যে, বহুদূতবাবু তাঁহার 'বিবহুত্ব' যে নগেন্দ্র দত্তর প্রাসাদের ও বেহেন্দ্র দত্তর বাগানবাড়ির বর্ণনা করিয়াছেন উহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক নহে। তিনি উহা জেলা ২৪-পরগনার অন্তর্গত বাকইপূরের বিখ্যাত রায়চৌধুরী জমিদারবাবুদের প্রাসাদ ও বাগান দেখিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই কথাটির মূলে কতইহু সত্যতা পড়া আছে তাহা নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিব।

‘বিবস্তক’ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ইংরাজী ১৮৭০ সালে : ইহার পূর্বে বাংলা ১২৭০ সালের ‘বঙ্গবর্ষণ’ দ্বারা বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত হয় : বস্তিকবাসুর বয়স তখন ৩৪ বৎসর : যদি তিনি বাকুইপুরের রায়চৌধুরী-বাড়ি দেখিয়া ‘বিবস্তকের’ বর্ণনা দিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি ১৮৭০ সালের পূর্বে দেখিয়াছিলেন ইহা আশ্চর্যের সেনাইতে হইবে।

বাকুইপুর ১৮২৪ হইতে ১৮২৮ পর্যন্ত ২৪-পর্যন্ত জেলায় সন্নিবিষ্ট ছিল। ১৮২৮ হইতে সন্নিবিষ্ট আলিপুরে উঠিয়া আইসে এবং তৎপরিণতিতে আছে। হার মনোমোহন চক্রবর্তী বাহাদুর প্রণীত *Summary of the Changes in the Jurisdictions of Districts in Bengal 1757-1916* পুস্তিকা ১৯১৮ সালে বাংলা-সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। আমরা ঐ তথ্য উহা হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। ১৮৪৮ হইতে ১৮৮০ পর্যন্ত বাকুইপুর সাব-ডিভিশন থাকে ; এখনও বাকুইপুরে নুনসেই আছে। বস্তিকবাসু ১৮৩৪ সালের ৪ই মার্চ হইতে ঐ সালের ২৪শে অক্টোবর পর্যন্ত বাকুইপুরে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হিসাবে কাজ করেন। অন্তর্যং বাকুইপুরের জমিদার-বাটী দেখিবার সুযোগ ও সুবিধা তাঁহার ছিল।

১৮৬৪ সালের ১ই মার্চ তারিখের ‘কলিকাতা সেক্রেট’ আমরা নিয়ে উদ্ধৃত নিবন্ধি বা Notificationটি দেখিতে পাই। হদ্য :

"The 5th March 1864—Raboo Bankim Chunder Chatterjee, Dey, Magistrate and Dey, Collector, to the charge of the Sub-Division of Baripore, and to exercise the full powers of a Magistrate in the 24 Pargannas."

ইং ১৮৬৪ সালের ১ই নভেম্বর তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকর’ প্রকাশিত ‘বাকুইপুর পরিবর্তন’ শীর্ষক পত্রে জনৈক প্রভাকরশরীর বস্তিকবাসুর কার্যকলাপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার এইরূপ উল্লেখ আছে :

“সৌভাগ্যক্রমে বাকুইপুরের এলাকাবাসিগণ শ্রীমত বাবু বস্তিকবাসু চট্টোপাধ্যায়কে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট পাইয়াছেন। বাবু বস্তিকবাসু শিক্ষা বিষয়ে আশাবাসিগণের বেক্ষণ প্রজ্ঞা ও সম্মানানন্দ, বিচার বিষয়েও গবর্ণমেন্টের এবং প্রজাগণের সেইরূপ প্রশংসাজনক। ইনি চতুর্নিধি কার্য করেন। ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটী সালেক্টর, দলিলের

রেজিস্টার ও স্ট্যাম্পের সংগ্রহাধ্যক্ষ। বাবু বস্তিকবাসু অভিমানের মতক পদার্পণ করিয়া যথায়োধ্যা ব্যক্তিগণের পঠিত যথায়োধ্যা সম্ভাষণ ও শাস্তিাদিক কষ্টক্রে কষ্ট বোধ না করিয়া পঠিত অবকাশতেও বিচারকাহা সম্ভালন করেন। কাড়িকী পুণিমাতে বাকুইপুরে যে রাসবাসা হই, তাহাতে অসংখ্য জনতার মধ্যস্থলে তিনি পদতলে পরিভ্রমণ করিয়া শান্তি-স্থাপন ও অস্ত্রার বিধের তদন্ত করিয়াছেন। বাক্যাবিধিগণী কর্তব্যতা পক্ষেও ইহার নিকটে অনেক বিচারক পরাজ হন। অতএব বস্তিকবাসু সকল বিষয়েই প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্র।”

সর্বভারতীয় প্রথম রেজিস্ট্রেশন আইন (১৮৬৪ সালের ১৮নং আইন) দ্বারা হুড়লাট-কাউন্সিলে ১৮৬৪ সালের ২৪শে মার্চ : কিন্তু কার্যকরী হয় ইং ১৮৬৪ সালের ১লা জাহুয়ারি হইতে। এই আইন চালু করিবার প্রাথমিক সমস্ত কার্যসম্ম বস্তিকবাসুকে করিতে হয়। ঐ অঞ্চলের একটি পুরাতন দলিলে বস্তিকবাসুর ইংরাজী নামের দেখিয়াছি : কিন্তু এই নামের কাহা-ই যে সাহিত্য-সম্রাট বস্তিকবাসু তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই।

আলিপুর জজ-কোর্টের বনীয়ান উকিল বাবু শশীভূষণ রায়চৌধুরী মহাশয় বাকুইপুরে রায়চৌধুরী বংশের সন্তান। তাঁহার বয়স এক্ষণে ৭৫-এর উপর। তিনি বলেন যে, বস্তিকবাসু তাঁহারের বাড়িতে কয়েকবার গিয়াছিলেন একথা তিনি তাঁহার বনীয় পিতাতাতার মহাশয়ের মুখে বহুবার শুনিয়াছেন। তবে কবে গিয়াছিলেন—বাকুইপুরে হাকিম থাকাকালে কিংবা তাহার পরে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না।

বস্তিকবাসু ‘বিবস্তকে’ যে সময়ের ঘটনা বিবৃত করিতেছেন তখন বিভাগায়র মহাশয়ের চৌধুর ১৮৪৬ সালের ১৫নং বিবাহ-বিবাহ আইন দ্বারা হইয়াছে ও দুই-একটি বিবাহ-বিবাহ হইয়াছে ও হইতেছে। সমাজে তুহল আন্দোলন চলিতেছে। সূর্যবস্তুর শরন-শশিরে ১৯১০ সনং সিধি : এই তারিখ বাংলা ১২৬০ দাল ও ইংরাজী ১৮৬৫ সালের সন্ধান। বঙ্গালী কবিষায়ের বাড়িতে তাঁহার শরন-কক্ষে বাংলায় শরন-তারিখ না দিখিয়া সহং লেখা হইল কেন ? সাধারণ বঙ্গালী এরফার তাঁহার বইতে প্রকাশের বৎসর বাংলা সনে দিতে ন : কোনো কোনো পঠিত শকাব্দ দিতে ন। বিভাগায়র মহাশয় তাঁহার পুস্তকে সহং ব্যবহার করিতে ন। বিভাগায়র মহাশয়ের প্রভাব নগর ২৪ ও সূর্যবস্তুর উপর কতক বিচার করিয়াছিল ইহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে

বহিমবাবু ছোট্ট একটি ইমিত দিলেন যে, তাঁহাতেই শয়ন-
ক্ষিৰ-প্রতিষ্ঠার বৎসর ১৯১০ স্বৰ্ণ। বিদ্যা কুশলকিনীকে
যদি কেহ বিবাহ করেন তাহা নগেন্দ্ৰর পক্ষেই সম্ভব—তিনি
বিজ্ঞানসাগর মহাশয়ের স্ত্রী ও প্রভাবের অধীন।

নগেন্দ্ৰর বংশ ইংরাজী শিক্ষার দিক্‌তি। তাঁহার পিতা
কমলনগিকে বিষ্ণু টেম্পল নামী এক মহিলাকে বিয়া
হুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। বাংলার মহললে জমিদার-
বাড়িতে কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল? ১৮৪৯ সালে
বাক্সইপুরে এক গিৰ্জা প্রতিষ্ঠিত হয়—গিৰ্জার পাথরী-সাহেব
ও অন্তান্ত আত্মবিক্রম সাহেব-মেম থাকিত। নগেন্দ্ৰর
পিতা সহজেই অল্পবয়সে কল্যানে হুশিক্ষিত করিবার
লোক বেহায়াহেব পাইলেন।

বাক্সইপুর জমিদারদের পুরাতন বাড়ি ও বাগানবাড়ি
(যেখানে এখন বংশবৃদ্ধির সহিত দ্বারচৌধুরী বংশের
এক শাখা বসবাস করেন) তাহাও বেহিয়া বহিমবাবুর
বর্ণনা পাঠ করিলে এই বর্ণনার কোনো অসঙ্গতি দেখা
যায় না।

বহিমবাবু যে বাক্সইপুরের দ্বারচৌধুরী বাড়ি বেহিয়া
'বহিমবাবু' লেনে তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি বয়োবৃদ্ধ ছোট ছোট
ইমিতের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। তবে কেহ
যেন মনে না করেন, দ্বারচৌধুরী বংশের কাহাকেও ইমিত
করিয়া বহিমবাবু নগেন্দ্ৰ দত্ত ও বেবেজ দত্তর চরিত্র সৃষ্টি
করিয়াছেন।

বাক্সইপুরের দ্বারচৌধুরীরা হরিপলাশ দত্তের বংশধর;
জাতিতে কাব্ৰ, শাণ্ডিয়া গোত্র। তাঁহারা রাজপুত্র হইতে

বাক্সইপুরে আসিয়া আশ্বিন ২৪০৩-৩০ বৎসর আগে বসবাস
আরম্ভ করেন। এই বংশের এক শাখায় বেবেজ ও অপর
এক শাখায় নগেন্দ্ৰ আছেন। বহিমবাবু যখন বাক্সইপুরে
ছিলেন, তখন ইহারা জমিদার থাকিলেও—শিশু। তবে
ইহারা ইং ১৮৭২ সালের পূর্বে যে জমিদার ছিলেন তাহা
নিঃসন্দেহ।

ইহাদের যে বাগানবাড়ির কথা বলিরাছি তাহা পূর্বে
নীলকূটি ছিল। নীলকূটি বেশ হইলে, প্রিন্স দ্বারকানাথ
ঠাহুর জয় করেন। তাঁহার সেনা হইলে, আশ্বিন
১৮৪৪ সালে দ্বারচৌধুরীরা ইহা জয় করেন। ইহা প্রায়
১০ বিঘা বিস্তৃত। দ্বারচৌধুরীদের পুরাতন বাড়ির ঝড়তির
পরে এক বহুবিস্তৃত আমবাগান আছে। এই আমবাগানের
পরে সরকারী রাস্তা; রাস্তার অপর পারে এই বাগানবাড়ি।
দুর্ভবুরী যে গাড়ি ইঁকাইতে গিয়া সবর রাস্তায়
পড়িয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব।

বেবেজ দেবীপুরে থাকেন; নগেন্দ্ৰ গোবিন্দপুরে
থাকেন। বাক্সইপুর হইতে কিছুদূরে রাজপুর নামের
গোবিন্দপুর গ্রাম আছে; আবার দেবীপুর-গড়গড়িয়া
বলিয়া জয়নগর নামের একটি বৃহৎ গ্রাম আছে।
গোবিন্দপুর ও দেবীপুর নাম সম্পূর্ণ কাল্মিক নাম নহে।
তবে কেহ যেন মনে না করেন যে, বাক্সইপুরের দ্বারচৌধুরী
বংশের কোনো কোনো ব্যক্তিকে ইমিত করিয়া তিনি
'বহিমবাবু'র বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। চরিত্রগুলি
সম্পূর্ণ কাল্মিক। কেবলমাত্র পটভূমি বাক্সইপুরের
দ্বারচৌধুরীদের বাটী ইত্যাদি লইয়া অস্তিত।

পল্লীর ব্যৱস্থা

ভুলসীদাস সিংহ

অপুকে খুঁজিয়া। পল্লীসেবার আশ্রয়লায় পেলাম
না, ভাড়াঘের শিখরকোটের তলাতেও নেই। শাশুরী
মাথাটা ডাঁশ-ডাঁশা আমে ভর্তি হয়ে রয়েছে, কিন্তু তলায়
অপু নেই। পাক্ষের জামতলায় এসে দেখি একটা খেড়ে
চাপল উপর দিকে মুখটা তুলে জাম চিবাচ্ছে। ঘাড়
তুলে দেখলাম, মগডালের একটা গুহুঁটের উপর বসে আধ-
পাকা জামগুলো হাফলেন মতো গিলছে, অপু নয়—
বাউরীদের ডালা।

অপুকে পেলাম না—অথচ অপুকে আবার চাই-ই।
তবে কি সে দূরগার সঙ্গে খেঁজু হুঁড়ি বেড়াচ্ছে? খেঁজু-
তলায় এসে দেখি কী খেঁজু-ই না হয়েছে গাছগুলোতে—
থাকে বলে একেবারে হাড়মুড়ে। হু-একটা করে লালও
হয়েছে ওর মধ্যে, কিন্তু পাকা নয়। একপল্লা জল
না হলে পাকবে কোথা থেকে? কাকিল চোড়ারা ঐ ঝাড়া
কাগিগুলোকেই কেটে এনে বাড়িতে ডিকা ভাঙাড়া জড়িয়ে
তুলে রাখছে। ডাঁশা খেঁজু পাকা হচ্ছে তাতে বটে, কিন্তু

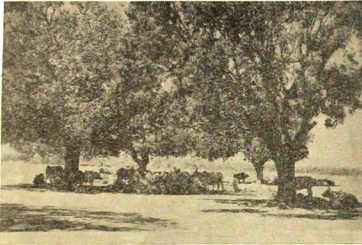
হ্রদের আল কি আর তোলে পাওয়া যায়? জল হয়ে থাক
এবুনি একশশলা—সবত বেজুরগাছ আছে সবগুলোর মাথা
লাল হয়ে যাচ্ছে একদিনের মধ্যেই। আর জল যদি
না পড়ে তবে ঐ অমন লুক্কর ছটপুট বেজুর তকিরে-তকিরে
তরতে থাকবে। তলার গিরে দেখবেন, শুকনো বীড়িতে
ডরে আছে তলাটা—আর পাল-কে-পাল শূন্যের বীড়িগুলো
মুখে পুরে কটর-কটর করে চিবাবে।

আশনারা বলবেন গল্প, কিন্তু সত্যি করে বলছি পঞ্চাশ
শালের দুর্ভিক্ষটার সময় ডোম-বাউরা-মুচি আদি গরীব
জাতের ঘেয়েছেলেপেরা বেজুরগাছের তলার তলার ঘুরেছে।

বেড়াচ্ছে বাউরীদের গবা। ব্যাং—জাড়-ব্যাং দু'জোড় ও।
গরমের চোটে অস্থির-হওয়া বেচারা জাড়-ব্যাংরা যে ঠাণ্ডা
পালাপাতের তলার লুক্কিরে বাঁচবে তারও উদ্যোগ নেই।
টুকি-ব্যাং নয়—জাড়-ব্যাং, আর শোয়া করে মাংস আছে
যে এক-একটার গায়ে! আর সে মাংসটা বাউরীদের মুখে
মিষ্টি লাগে যে বুঝে।

হাবার মতো ঠাঁড়িয়ে ঠাঁড়িয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ গবার
হাতের ঐ খেঁচাটা বেন আমার হুকে এসে বিধলো—
অপু কৈ?

চুটলাম বাগানের দিকে দূর করে। বাগানে এসে



মৈত্রের দৃশ্য

বখনই যান, যে সময়েই যান বেজুর-তলায়—তুকনো বীড়ি
পড়ে আছে দেখবেনই। ক্ষুধার দাপটে বখন অস্থির হয়েছি
সব, তখন ঐ বীড়ি মুখে পুরে শূন্যের মতো। টিবিয়ছে
কটর-কটর। আর গরীবই বা বলি কেন—সেই বখন একবার
হুপরি খুব আঁকা হয়ে গেল তখন ভালোবাসুরাও তো সব
লুক্কিরে-চুবিরে বেজুরবীড়ি কোগাড় করেছে। বেজুর-
বীড়িকে ঝাঁতি দিয়ে হুপুতির মতো কেটে পানের সঙ্গে
খান না আশনি—কেন জানিছে আপনি বেজুরবীড়ি দিয়ে
পান খাচ্ছেন, না হুপুরি দিয়ে পান খাচ্ছেন?

বেজুরতলা ছাড়িয়ে ধগড়ের পাড়ে এসে দেখি হাতে
ইয়া লম্বা একটা খোঁচা নিয়ে খালের মধ্যে খোঁচা ঘেরে

দেখি একটা গরুও টাঁকায় নেই—সব এসে বসে পড়েছে
গাছতলায়। ঠাণ্ডা আঁবের ছায়ায় বসে বসে একমনে
জাবর কাটছে সব। দূতের দিকে তাকিয়ে দেখি খোঁয়া—
তখু খোঁয়া, গাছপালা মাঠবাট সব-কিছু খেবে খোঁয়া
উঠছে। বাগানের পথ ধরে ভিতরের দিকে বানিকটা
এগিরে আসতেই দেখলাম নামোশাড়ার ভলু, আমাষের
শশাঙ্কবা, নাগিতদের আতুল, আর ডোমদের সৈরা
বাগান ছাড়িয়ে হনহন করে এগিরে যাচ্ছে। শৈয়ার
কোমরের কাটারিটা বেধে তুরলাম তালকোব খেতে যাচ্ছে
ওমা। গাছ-তড়ি ভাল হয়েছে। কচি কচি তাদের
কচি কচি শাস খেতে কি মিষ্টি। শৈরা গাছে উঠতে জানে

—গাছে উঠে তালের কাঁচি কাটবে সে। কাটাশেন হলে ছায়াভরা একটা গাছতলা বেগে বসে পড়বে সব। গায়ে-ঘরের তালগাছে উঠে তাল কাটলে গালিগালাজ বেশ মাসিকরা, কিন্তু গায়ের বাইরের গাছ থেকে তাল কেটে বেলে বকাবকি করতে আসে না কেউ। বড় দিগ্গি বিনিন ঐ তালবাঁচি। একটায় মন জরে না। একটা বেলে বসে হয় আর-একটা বাই। আর একটা বেলে বসে হয় আর একটা বাই। মোতে মোতে পেট-ভর্তি তালবাঁচি বেগে বারা বোকা তারা পেট-কাষড়ানিতে মরে-বারা চালাক তারা ঘরে এসে এক খাবচা সুরের গুড় খেয়ে নেয়। তালের পেটে গুড় খেয়ে নিলে তাল সঙ্গে সঙ্গে হজম হয়ে যায়। ঐ হল গুর শোখন।

দেহিক দিয়ে ভহলোক হল জাম। বত বৃষ্টি, বতক্ষণ বৃষ্টি পেট হৈলে জাম খান—কিছু করবার পরকার হবে না। পেটে অল্প কিছুর বহন গণ যদি থাকে তবে তা-ব্রহ্ম সব কারচা হয়ে যাবে একেবারে। গরমের চোটে হজমশক্তি হুসে গেছে আবারের, কিন্তু আবারের যিনি বা তিনি এই গুঘোটি গরমের মধ্যে লুকিয়ে থেকে জাম পাকাতেন। তাল নয়—জাম খান, বত বৃষ্টি জাম খান।

আমবাগানে শুণু আম-জামই নয়—আম-জামের সঙ্গে কাঁঠাল রয়েছে, বেল রয়েছে, নিম আছে, পাশাপাশি আড়ও রয়েছে গোটা মুয়েক। কৈলাঁধে সেবে এসে সোঁকে তেল নিবেন—এখন নয়। এখন বরং গুই থেকে দু-একটা তুলে নিয়ে গিয়ে বেশন দিয়ে ডাঝা করিয়ে খান। তোকা লাগবে। আঁকড় ফলগুলো পেতে কালো হয়ে গেছে—বরে পড়বে এবার সব। কাকের বাগের কিছু না থাকলেও বেল থাকলে আবারের বাগের কিছু আছে। সূঁচি ফুলে বাক, লছার ছুরকবে হাওরাটা বইতে হুক করুক—তখন উঠোনে বাহুর পেতে বহন, আর গিটীকে অর্ডার কখন বেলেয় সবকটটা নিয়ে আসতে। পুষ্টি বাড়ানোর ক্ষেত্রে হুখের পরেই বেশন ডিমের স্থান, হজমশক্তি বাড়াতো জামের পরেই তেমনি বেলেয় স্থান।

গোটা বাগানটা হাওরালাশ—অপুকে শেলায় না। অপু আমতলায় নেই, জামতলায় নেই, কাঁঠালতলায় নেই, নিমতলা-বেলতলাতেও নেই। অপু তবে কোথায়।

ভেবেছিলাম যিনের বেলায় অপুকে অপু হা বাহ হতে ধের না, বাড়ির মধ্যে রেখে শিকল ছুঁলে বেই। রোক চলে গেলে লছার হাওরাটা বেলে শিকল খুঁসে যায়—অপু আর পই তখন হাওরা বেতে বেতে একবারে কালসদীঘি পর্বত চলে আসে। এসে বসে পড়ে হুটতে

ধাখাঘাটেই উপরে। পই নয়, অপু তার ডাগর-ডাগর চোখ-মুঠো দিয়ে গিলতে থাকে চকুচক গুটুগুতোকে। সেই ভেবে দেখিন কালসদীঘির ঘাটে এসে বসেছিলাম। লছা হয়ে গেল—কুখুরে হাওরাটাও বেগে এল আড় আড়। বিপদা বোঝবার অভ্যাসমতো লছারান দেরে উঠে গেল। এখানে-ওখানে অনেকই এসে বসে পড়ল একে একে হাওরা খাওবার জন্যে। নীচের চাঁদটা অনেক উপরে উঠে এল। চোখ তুলে দেখলাম ঠাক এখন আর একটা নয়—হুটো। একটা উপরে—একটা নীচে, একটা আপানে—একটা জলে। হুটোই হাসছে। ভালো করে দেখলাম, অনেকক্ষণ ধরে কান পেতে রইলাম—কিন্তু কৈ অপু হাণির শব্দ কানে এল না।

বাগান থেকে বেরিয়ে বানিক দূর এগিয়ে আসতেই চোখে পড়ল একমুঠো হলুদ। হ্যাঁসো, হলুদ—কাটা হলুদ। শব্দাল ফুলের হাট বৈশাখের বসে বটে—কৈলাঁধে এসে তার হলুদে-হলুদে ফুলগুলো লগা লগা হলুদ হয়ে ফুলতে থাকে, কিন্তু তবুও গুই মধ্যে দু-চারটেই তগায় লগা ফুলের সঙ্গে ফুলের খোপাও হাওরার সঙ্গে বোল বার দেখবেন। কে বলবে আবারের বাড়ির এই শব্দ-ই হলেন পছলোচন। দংড়ত কাখে আবারের এই শব্দালকেই বলা হয়েছে ‘কর্কিকার’। ঐ যে লগা লগা গুটুগুতো ফুলতে দেখছেন, ও হল শব্দালের ফল। শেক্রে গেলে এলের গায়ের রঙটা বহন মা-কাঁলীর গায়ের রঙের মতো হয়ে যাবে তখন পেড়ে আহ্ন গোটাচককে গাছ থেকে। এনে, শব্দাল-নয় শাঁপটা হুঁরে বেলে দিয়ে গায়ে গোছার শিক তাতিয়ে হুটো করে নিন গোটা আটেক। বাস, আড়গাঁপি হয়ে গেল। হুঁ দিন—বাজছে দেখবেন। এর কচি কচি পাতাগুলো দিয়েও অল্প আর-একরকমের শাঁপি তৈরি হয়। এবার ফুল কোটার সময় এর ডালে ডালে বহন কচি পাতা গজায় তখন সেই কচি পাতা থেকে তুলে নিন একটা। পান-চেহার মতো এর শাকবানের গিহাটা ডিরে দিয়ে ঝুকো হুটো হুটিক থেকে ঝুটোটি-টি ভাবে হুটো কাঠির মধ্যে জড়িয়ে নেন। এশর শাকবানে দুখ রেখে হুঁ ঘেন একই জোরে করে—দেখবেন বাজছে কেমন ‘কে বৃ বৃ, কে বৃ বৃ’। শব্দাল-পাতার বাঁচি কি বলে জানেন—

“জব্বব্বাটিতে কে কেব কে
শাউড়ী-বৌয়ে কে কেব কে”।

শাবনের দিকে দুখ ফুলে ডাকাতেই বুকা ধু করে উঠল। জেঁড়ল না। হ্যাঁ-হ্যাঁ—ঐ তো জেঁড়ল। ঐ যে হুখের দিকে হঠাৎ পান্যপাত-বড়হুটো-কাটাঁকাটা নিয়ে

একরকমের কড় কঠাঁৎ ঘুরতে ঘুরতে ছুটে আসে—ঐ হল 'টেক্সল'। 'টেক্সল' কড় নয়—ছূত। হুপুর ছাড়া ছুতরা যায় হয় না—তা সে হাত-হুপুরই হোক, আর তর্তি-হুপুরই হোক। ঘূতি-কড় নয়, ভর-হুপুরের সমন্বিত। সব টেক্সল হয়ে পেরিয়ে যায়। কিন্তু টেক্সল উঠবার সময় হুক পুতু নিয়ে নিলে টেক্সলে কিছুই করতে পারে না।... ঠক করে আমি ছোট হয়ে গেলাম। ছোট হয়ে গিয়ে সেপি এঁততো অশু—এই তো গো অশু! জ্যোতের ভর-হুপুরে টেক্সল উঠতে দেখে পলাশ-তলার পাড়িয়ে দ্বু করে যে হুক পুতু নিচ্ছে সে তো আমি নয়—'অশু'। আন-আট-টেক্সল অশু।

আপনার বাড়ির উঠানে আমগাছ তো আছে হুটো। একবার বাঁকির দেখুন না! ডালগলোর দিকে—কী হয়ে গেছে। বাঁকিরে এঁচোড়শাব্দিক তো পাঁচ কুটীতে হচ্ছে না এখনে এসে, হুতরা এ গাছ হুটোর মগডালেও যেমন হুগছে পাকা-আধপাকা আনের খোলা—নীচু ডালেও তেমনি হুগছে পাকা-আধপাকা আনের খোলা। আপনার বাড়িতে অশু-হুগী আছে জানি এবং গোটা হুপুর সিঁহুরকাটো, পলাশ, জুরনি, কঁলাতি, ছুতাড়ির তলার তলার ঘুরে বেড়াগেও ডালের পেট ভরে না সে-কথাও স্বীকার করছি, কিন্তু তবু উপায় নেই বাছানদের। এটাই হু একটা টিল দিবা: হাতখানেক একটা কলি—তা সে কাক ডাড়াতেই হোক, বা বিড়াল ডাড়াতেই হোক—হাতে জুগেছে কি বাড়ির মেয়ে-বোরা হাঁ-হাঁ করে উঠবে একসঙ্গে—'গোটা বোর মাথার নিয়ে এ-গাছতলা ও-গাছতলা টো-টো করে বেড়াচ্ছিল, তাতেও পেট ভরছে না ডালের! হুটো পাকা গলে হুগতে পাবোনা নাকি ডালের আলার!'

হুতরা গাছপাকা আম গালে হুগবেনই আপনার বাড়ির মেয়ে-বোরা। গাছে আম একলসেই সব পেকে যায় না! একে একে ঝাঁকের ঝাঁক ঝাঁলাহ—ঝাঁকের ঝাঁক পাবে। ধরুন, আপনার বাড়ির ভিতরের গাছ হুটোতে আম পাকতে শুরু নিয়েছে। আপনি বাঁকিরে বেরিয়ে গেছেন কিবা ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে বাহুরের উপর তরে নাক ডাকছেন। বাড়ির মেয়ে-বোরা কেউ এ-খাতিয়ার, কেউ ও-খাতিয়ার যা এলিয়ে পড়ে আছে। চোখ সকলেরই বন্ধ। নাকই বা ডাকে না, নতুবা সব লক্ষ্য স্থান দেখবেন।

হুতরা একসময় উঠানের দিক থেকে দশ এসো—'হু—শু'। বাস, চোখ খুলে গেল সব একই সঙ্গে। বোলা বছরের মেয়ে আলনা হুটোলা হুতবুত করে, বেক-বো

ছোট-বো হুটোলা হুতবুত করে, বুকী কর্তায়া হুটো এস লক্ষ করতে করতে। হুপুরের খোলা সেগে পড়েছে খাত একটা, কিন্তু তাকে পেতে চায় আনেকজনই। জ্যোতের ভরা হুপুরের এই সেম-সাইডের দৃশ্য অবশ্যই—কোথার এবং উপভোগের জিনিষ। 'অম্বা বহ কুতীত'—বেদব্যাক, হুতরা যত দুখী কলম কলম কিন্তু আমি যদি সেট সঙ্গে বাড়ির উঠানের একপাশে গোটা হুটো দেখি আয়ের চায়া লাগাতেও হুগবেন না।

বাড়ির বা বাড়ির আশপাশের আয়ের উপর কড়া মজার রাখুন—ওগুলো সব আপনা থেকে গাছপাকা হয়ে পড়ুক। আর বাইরের বা বাগানের আমগুলো ভড়ের সময় গিয়ে হুড়িরে আছেন হুড়ি তর্তি করে। হুপুরের লম্বটায় না-দুধিরে বাড়ির মেয়ে-বোরা সিঁহুই নিয়ে ছাল ছাড়াতে বহুক আমগলোর। বেগলো হেঁচা গেছে সেগলোর আমচুর হোক, আর বেগলো: আম আছে সেগলোর আচার হোক। কিছুক বহ—সিঁহুই। সদুস্ত্রে বেগলো থাকে সেগলো কিছুক, কিন্তু পুতুরে যে হু'খোল-ওয়ালদিক বেলে, ওরা সিঁহুই। আনের ছাল হুগবার জন্মেই বিখাতা বোহ হয় ওদের জন্ম দিয়েছেন। হান করতে বাওরার সময় পুতুর থেকে হুগল আছেন হু-চারটে সিঁহুই—এনে উঠানের চোদে কেলে দেন। বটীখানেকের মধ্যেই দেখবেন সেগলো হাঁ হয়ে গেছে। ভিতরের মাংসপিওটা থেকে হুটো খোল হুগাশে নেতিয়ে পড়েছে। মাংস-পিওটা থেকে খোল হুটো আলোখা করে নিন। ওতপূর বাটন-বাটা নিলের উপর খোলাগলোর তলাটা ঘরে গোল হুটো করে নিন। বাস, এই হবে গোল সিঁহুক। গোল হুটোটাকে আয়ের গারে লাগিয়ে স্পেশাল টিপুনি দিয়ে ঘরলোই চেবু-হু-হু চেবু-হু-হু ছাল উঠে আসবে গোটা-গোটা। অত-অত আম ছাড়াতে ছাড়াতে দেখবেন বেলা বতম। আপনি আর করবেন কি—আপনি তো আর গাছে উঠে পেড়ে আনেননি হুড়ি-হুড়ি আম, বিখাতা কালবৈশাখী হয়ে হিঁড়ে কেলেনেন।

কালবৈশাখী মানে 'কালবৈশাখী'—বৈশাখে তাকে মানায় না। বৈশাখে সে পার কি? গরীব হলে-বাগদারী অপোক্ত হু'চারটে খোড়া ঘর, গতবছরের পুরনো হু-চারটে পাখির বাসা, কাঁচা কাঁচা বানিকগুলো আর-আম, আর লম্বা লম্বা কতকগুলো ডালগাছ। কালবৈশাখীকে সব-চাইতে ভক্তি করে দেখবেন ডালগাছ। বড়ের সময় তারা সেকেকো সেকেকো সেলাম হুঁকে কালবৈশাখীকে। সে হিসাবে কালবৈশাখী বোলো-আনা পুণিয়ে নেও জ্যোতিতে।

আম পেকেছে, আম পেকেছে, বেল পেকেছে, ঝকড় কল পেকেছে—ও যদি না এসে এসব কেড়ে দেয় তবে ঝাড়বে কে? আর লক্ষ্য করে দেখবেন বৈশাখের চাঁদেতে কৈলাসেই তার বাপটটা বেশী হয়। আম-জামের কথা আলাদা—পতলাধারা পর্বত জৈষ্ঠের দাপটে শড়ে প্রাণ হারায়। কড় কেমে থাক, গাছের পাতার ধরধরানি বন্ধ হোক, তারপর গাছের গোড়ার আশের হুড়িটা বেগে বাগানটা ঘুরে দেখুন-না একবার। একটা-না-একটা মধে-পড়ে-থাকা বনা শালিক কিবা ফেলা চোখে পড়বেই আপনায়। কাক মহা অনিষ্টকারী এবং মহা চালাক কাক-ই যখন কোড়ে কাক হলে তখন তা'দিকে দেখে আপনোপাস লাগে আমোদের। “আমি যদি পাখি হইতাম—সাত-সন্ধ্যা পাড়ি দিতাম—” কিন্তু বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে নয়।

গাছপাটার রাশিও কান্নাকাটি পড়ে বাওহার সময় এটা। কবি ভাগ্যে যে এসময় মড়মড়িয়ে ভুলে পড়া লেখা আছে কে জানে! দেখে বলবেন সাথ্য কি আপনায়। শোক-লাগা হাড়-দুখদুখে গাছগুলো—বেগুলো বৈশাখ শেষেই যে না ভাবছিলেন, সেগুলো বৈশাখের জ্যৈষ্ঠের শেষেও বিধি পাড়িয়ে আছে বাড়া-বাড়া। অথচ পাকাপাক্য মোটা মোটা বিহারা গারোরানসের মতো শক্ত ধাতের বিশাল মরীচকদের অনেকে ধরাশায়ী হয়ে পড়ল। এতে আমাদের তেমন কিছু এসে যায় না বলা চলে না। বাড়িতে ছেলপুলে আছে আপনায়, কড় উঠলে বাগানে তারা বৌড়বেই—তা ছাড়া আপনি হয়তো হো গা বেকে কিরছেন—পথে কড় সেলেন, বৌড়ানোড়ি করে তখন এসে আপনি আশ্রয় নিলেন কোনো একটা গাছতলায়। যে গাছতলাটার এসে ঠাঁড়ালেন আপনি, হয়তো সেইটাই পড়ে গেল মড়মড় করে। এ-সব ক্ষেত্রে খবর বচন আপনায়-আমায় কাজে লাগলেও লাগতে পারে ধানিকটা। কোন্ গাছটা কোন্ ধাতের, কোন্টা কত শক্ত তা জানাবার ক্ষমতা আমাদের বলাহীন—

“আম মড়মড় তৈল্ল ডিমড়
বড় দূরা আশন দূরা”।

এই ধরন শুকনো একখানা তিনদিনের বাসী কটি। এটায় একটু চাপ সেন—সবে লক্ষ মড়মড় করে ওঁড়ো হয়ে যাবে। আশের ধাত হল ঠিক তাই। বিশেষ একটু চাপ পেলেই মড়মড় করে ভেঙে পড়তে পারে সে। আর এই ধরন আটার বদলে কল-মরদা দিয়ে তৈরী একখানা কটি। একটু—হাত নয়, ঠাত দিয়ে ছিঁড়তে গেলেও

মহা ছিঁড়ে না। এ ভাতী ডিমড়। তৈল্লপাছের ধাত হল এই ধাত। বড় বা বটগাছ হল দূরা বা লোহার মতো শক্ত। আর আশন হল দূরা। আপনাতাই কল আশ থেকে রসটি বার করে নিলে পর যে ছিঁড়েটি থেকে বার সেটির নামই হল দূরা। আশের দূরা। আশের দূরা যেমন অলস, আশনও তেমনি অলস।

স্বতরাং এই বুকে গাছতলা পছন্দ করবেন।

ঘোমটার ডিতর দুই মুকিরে দুই ঠাড়িয়ে ঠাড়িয়ে ফিক্‌ফিক্‌ করে হাসছে—ও কে গো? আশার—আশাচ। চাষের ক্ষেত্রে যাদের বলদ দিনবার থাকে তারা এই জৈষ্ঠেই হাট থেকে পিনে নেয়। তারা বাবুলোক, গুপ্তরসার ক্ষেত্রে কোথার হাট কোথার বাট করে বেড়াতে পারেন না, তাদের ক্ষেত্রে আছে ডাইসায়েবরা। মুলদান গরু-বাবসাটী যদিও বাল “ডাইসায়েব” তারা সব এসময় বাবুদের পরজায় পরজায় খুচ্ছে, বলদ দেখিয়ে পছন্দ করিয়ে বিক্রি করে বাচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্য করে নেবেন ডাইসায়েবদের কাছ থেকে বলদ কিনে দ্বী হতে পারে না কোনো। বাবু-ই। দিনবার সময় হাজার-রকম ভাবে পরব করে ঠাঁত বেগে, গোয়াল ফেড়ে, শিরদাড়া টিপে, নাড়লে গাড়িতে ছুটেও খাঁজ বলদ কিনতে পারেনা অনেকেরই। ডাইসায়েবরা সব নাকি বাবু জানে—বতখণ তারা বলদের কাছে কাছে থাকে ততক্ষণ তাদের বলদরাও হরিণটির মতো হয়ে থাকে। তারাও চলে গেল—হরিণরাও বলাই হয়ে গেল। এই গলদটার দিকে লক্ষ্য করেই বলদ কেনার ক্ষেত্রে ডাকশুক্রব গোটা দুই নির্দেশ জারী করে গেছেন। তার একটা হল—“চিন্‌ না-চিন্‌ খিঁচি-খলা দেখে কিন”। বলদ কিনতে গিয়ে কোন্ বলদটা কিনবে, কোন্টা কিনবে না—কোন্টা ভালো হবে, কোন্টা মন্দ হবে তা যদি ঠিক করতে না পারা যায় তাহলে ডাকশুক্রব সব ছেড়ে ‘খিঁচি-খলা’ বেখে বলদ কিনতে বলছেন। খিঁচি-খলার খিঁচি মানে হল খিঁচি-কড়ি—ঐ যে গো, যে কড়িগুলোকে বিয়ের বহুধারার সময় পরজায় পাশে হলধে জাকড়ার উপর গোবার দিয়ে পুতে দেওয়া হয় বা লক্ষীর হাঁড়িতে যে কড়িগুলো থাকে, ঐ হল খিঁচি-কড়ি। আর খলা শব্দটির মানে হল সাধা। (খলা বাছুরের নাম খলনী)। তাহলে খিঁচি-খলা অর্থাৎ খিঁচি-কড়ির মতো সাধা। যে বলদের পায়ে রঙা খিঁচি-কড়ি মত সাধা সেই বলদই হল খাঁচী কাজের বলদ। খিঁচীর নির্দেশটি হল—“টুক বলদ, আপান জমি। না গুণে কি, বাপ গুণে পুত”।



হরিদাস

বলরের ঘেঁষাঘেঁষে শেষ হয়েচে বেগানে এবং পোজের আরম্ভ হয়েছে বেগনে থেকে—ঐশানটার নাম হল 'টিকু'। এই টিকুর উপর হাত দেওয়াবার যে-সব বলস ডিড়ি-ডিড়ি করে উঠে, তারিকেই বলে 'টিকু-বলদা'। ডাক-পুকুরের মতে টিকু-বলদারা হল খুব কাকের বলদ।

তা তো হল, কিন্তু এদিকে আগলটাই যে ঝাকা। জলবৈ? হুয়ার জল নেই, পুহুর জল নেই—জোবা তুলিয়ে গেছে। আঙ্গ পেরিয়ে গেলে মনে হচ্ছে কাল জল হবে—কাল পেরিয়ে গেলে মনে হচ্ছে কাল ঠিক হবেই। শুকনো গড়ের মতো হয়ে আছে আকাশের রঙটা—ও-আকাশের কাছ থেকে কখনো জল পাওয়া যায়? অথচ জল চাই-ই। মাছ বলছে জল দাও, গরু-বাছুরা বলছে জল দাও, পাখীরা বলছে জল দাও। কালবৈশাখীর কড়ে উড়ে পড়া বড়হুটো ছলে খুলে বাসা বাঁধছে পাখীরা—এ-বে তাদের বাসা-বাঁধার সময়। কেউ কেউ বাসা বাঁধা শেষ করে কেলেছে, কারও কারও বা ডিম-পাড়াও হয়ে গেছে। ডিমগুলো ফুটে বাচ্চা বেহিরা আসবে বখন, তখন সে বাচ্চাগুলো ধাবে কি! জল পড়লেই শুকনো কাটাখোঁটো ভাঙা-ডহর কচি হাসে ছেঁয়ে ধাবে—কচি নাচতে আরম্ভ

কবে তার ভিতরে ভিতরে। খাস গজাবে—খাসের ভিতর ঢড়ি জমাবে, তবে তো বা-পাখীরা তাদের বাচ্চাদিকে খাইয়ে পাঁচাবে। কির না, জল নেই। আকাশটা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে।

মাছব পাখী গরু-বাছুর সবাই এখন চাউক। সকলের মনের কথাটাই এখন ঐ এক কথা—জল, জল চাই!

পায়ে পায়ে হরিবাগরের মুখ লেগে গেছে। খাসের যেমন সাধা—কেউ করছে অইমপ্রহর, কেউ করছে চমিন-এহর, কেউ কেউ বা লক্ষ করছে সৈন্দ-মাসলের। সবই অসুখাখী অবিশেষে তাঁকে নাম ধরে ডাকতে থাকলে খুঁচু লুপে ডাকাবেনই তিনি।

আমি দেখে-সে-বী ধারা আছেন তাঁদেরও পুজো দেখাও চলছে। হুদরাসিনী, বরষাবুড়ী, বাঁকাবুড়ী, রপবুড়ী—যে পায়ে যিনি আছেন, সেট ঠেলে মহুই (কীহতোগ) পাচ্ছেন। কিন্তু কারও আঙুলেই আর আকাশের দৃকটা চেরা যাচ্ছে না। এদিকে সময় তো আর কারও জন্তে অপেক্ষা করবে না। বোহিখী আরম্ভ হয়ে গেছে। বোহিখী ছাড়লেই বীজ ছড়াতো হয় বাঠে। বোহিখী ছাড়ার পর মিহিই যে পুণ্যদিনটিতে মার্টে গিয়ে প্রথম বীজ ছড়াতো হয়, সে-দিনটির নাম হল বীজপুণ্য। বীজপুণ্য অর্থাৎ বীজ ছড়ানোর পুণ্যদিন। কোনো কোনো অঞ্চলে এ-দিনটিকে কেন্দ্র করে উলসব চলে হাতিমাতো। ছোলে-ছোকরার হল মাগকোচা ঘেঁরে হাতে এক-একটা লাঠি নিয়ে মার্টে চলে যায়। প্রথম লাঠল দেওয়ার দরুন মার্টের মধ্যে যে ঢোলাগুলো খুঁচু করে—সেগুলোর মাথার সমাধম লাঠি বসায় তারা। নাচতে থাকে ঢোলাগুলোর মাথায়। বসে ঢোলাগুলো হয়ে পড়ে খুলে। তখন সেই খুলে-মাটির উপর প্রথম বীজ ছড়ানো হয়। নিয়ম হল, জল এদিনে হতেই হবে একপশলা। গল্প জ্যোতা বলছিলেন, সে দিন কি আর আছে যে বাবা! যেমন হয়েচে তেওঁ ঠেঁ বাবা—তখনই হয়েছে হাওয়াঝাড়া ছুঁ। মাছবের কাণ্ডকারখানা ঘেঁরে সেবতারাও সব খুঁচু থাকিয়েছেন। এই যে অসুখিই হচ্ছে,—বোহিখী ছাড়বো-ছাড়বো করছে, অথচ একইকরো ঘেঁয়ের সেবা নেই জাকালেশে—তখনকার দিন হলে হতে শোত কি এখনটা?

বলদাম,—কি বকম?

—সেদিনের মতো মাছব আছে এখন কেউ? আছে কারও বিহত—পারের নড় খুলে শিবঠাকুরের মাথায় মাথতে?

বাঁকিয়ে ছিলাম। বসে পড়ে বলদাম,—খুঁচু বলুন।

গপু কোঠা বললেন,—তোরা তখন সব এই-ই-ই-ই-ই।
 ঐ যে আশপড়লায় শিবঠাকুরকে দেখছিল—গাভা বড়
 ধরে ধোপ-জল খাচ্ছেন যিনি এখন—ঐ শিবঠাকুরকে
 পূজা করতেন তখন বাবা জান্‌কীদাস। সে-বছর অবনি
 জ্যৈষ্ঠ শেষ হতে চলেছে তবু মেঘের দেখা নেই আকাশে।
 গোটা গা মিলে মছই মিলে শিবঠাকুরকে। কিন্তু না,
 মেঘের দেখা মিললো না তবুও। গাঁয়ের মধ্যায়া তখন
 এলে ধরলে জান্‌কীদাসকে—কি গো, কি রকম শিবঠাকুর
 তোমার, গোটা গাঁটকে মরতে হবে না কি? আর পাঁচটা
 সাধুর মতো সাধারণ সাধু নন জান্‌কীদাস—গাঁয়ে কতবার
 মহামায়া হয়েছিলে, কিন্তু সেই জান্‌কীদাস এসে পা গিয়েছেন
 গাঁয়ে শুধুই কোথায় গেছে মহামায়া, কোথায় গেছে
 অকালকল্যাণ। পাঁচগাঁয়ের লোক তাঁর ছেলে—এক গাঁয়ে
 বাকতে পারতেন না তাই তিনি। আজ এ-গাঁয়ে, তো
 কাল ও-গাঁয়ে, তো পরও হৈ গাঁয়ে—কিন্তু যেখানেই থাকুন,
 ঐ শিবঠাকুরটিকে বোজা পূজা করা চাই-ই তাঁর। মধ্যায়া
 সেই জান্‌কীদাসকে এসে কড়াকড়ি-রকম-ভাবে ধরতেই
 জান্‌কীদাস বিশেষ-রকম-ভাবে পূজা করতে বললেন শিব-
 ঠাকুরকে। পূজা করা, মছই ভোগ দেওয়া শেষ করে
 পর বললেন মধ্যায়াগকে, বিকালের দিকে গল ঠিক পড়বেই
 দেখো। সবাই জানে জান্‌কীদাসের কথা কোনদিন মিথ্যা
 হয় না। কিন্তু গুপ্ত গড়িয়ে গেল, বিকেলও বাব-বাব
 করছে, অথচ আকাশে মেঘের পাতা নেই। মধ্যায়া
 কাছাকাছি এসে ঠাঁড়তেই জান্‌কীদাস পশ্চিম আকাশটার
 দিকে ধানিকন্দ তাকিয়ে থেকে চুকে পড়লেন ভিতরে।
 ভিতরে চুকে খুব করে গালাগাল আরম্ভ করলেন শিব-
 ঠাকুরকে। একবার কয়ে ভিতরে ঢোকেন, আর একবার
 করে বেহিরা এসে পশ্চিম-আকাশটার দিকে তাকান।
 তাতেও যখন কাজ হল না, তখন পা থেকে বড়ম একটা
 খুলে নিয়ে ঠাকুরকী ঠুকতে আরম্ভ করলেন শিবলিঙ্গের
 মাথায়। এবার কাজ হল। দেখতে দেখতে কালোজামের
 মতো মেঘ একটা উঠে পড়ল পশ্চিম আকাশে। একই
 পরেই সে কী জল।

যনটা বলে উঠলো—‘গাঁজা’—মুখে বলতে বাজিয়ার,
 তোমার বেখেলে? গপু কোঠা তার আঙ্গাই উপসহার
 সারলেন,—এ তো সকলেই ঠাঁড়িয়ে ঠাঁড়িয়ে দেখেছে।
 আর বেগিনের দাহ্য এখনও জোঁ গাঁয়ে রয়েছে
 হু-একজন।

জ্যৈষ্ঠবাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিটিই হল দশহারা।

দশহারা—অর্থাৎ কিনা দশশাপহারা। এ তিথিটিতে গঙ্গাস্নান
 করলে দশবিধ পাপ ক্ষয় হয়ে যায় :

“শুক্লপক্ষের দশমী জ্যৈষ্ঠে যানি যিকোত্তম
 হরতে দশপাপানি তদ্ব্যাক্ষণক্যত্রোচ্যতে ॥”

কিন্তু—অতি ছাড়াও যেমন দশমী আছে—দশহারা
 ছাড়াও তেমনি আবার মহাদশহারা আছে। বাসটি হল
 জ্যৈষ্ঠ, পক্ষটি হল শুক্লপক্ষ, বাসটি হল মঙ্গলবার, তিথিটি
 হল দশমী : আর এ দশমী তিথিটির সঙ্গে হজা নক্ষত্র
 পুঙ্ক হয়ে গেল, বাস, তবেই হয়ে গেল তা মহাদশহারা।
 একজন্মের নয়, দশজন্মের দশবিধ পাপ ক্ষয় হয়ে যায়—
 যদি এই মহাদশহারার কেউ গঙ্গাস্নান করে।

দশহারার দিন জল পড়বেই আকাশ থেকে—এ হল
 নিয়ম। আর দশহারার দিন বে-জলটি পড়ে আকাশ
 থেকে, তা কি করে পড়ে জানেন? শাপের বিধ বুঝে নিতে।
 বর্ষা আসছে যে—শাপের উপদ্রব আরম্ভ হবে যে—কিন্তু
 হাজার উপদ্রব করুক শাপেরা, দশহারার জল তাদের
 সব বিধ বুঝে রাখবে আগে থেকেই।

দশহারা পূজা—য-গঙ্গার পূজা। যেখানে গঙ্গা নেই
 সেখানে গঙ্গাকে স্মরণ করে যে-কোনো নদীতে বাবা ভূবাসেই
 গঙ্গার ভূত দেওয়া হয়। যেখানে নদীও নেই সেখানে গুহুরে
 ছুঁ লাগে। জল যানে শুঁ নায়েবেই নয়, গঙ্গাও বটে।

নদীতে বা গুহুরে ছুঁ দেওয়া ছাড়া অন্তরকম আর-
 একটি অমুঠান প্রতিপালিত হয় এ-দিনটিতে বহু কাংগায়।
 দশহারার জোর হতে-না-হতেই পত্নীর প্রতিটি ঘরের
 বাইরের দেওয়াল ঘিরে গোবরের গভী বা লাগ কেটে
 দেওয়া হয়। ও হল ম-মনসার গভী। ববার জল
 শেষে শাপেরা গর্ত ছেড়ে বাইরে আসবে বটে, কিন্তু সমতা
 থাকবে না তাহের এই গভী অতিক্রম করে ঘরের ভিতরে
 হুকবার—এই হল পত্নীবাসীর দৃঢ় বিশ্বাস। বাইরে
 দেওয়াল ঘিরে গোবরের-গভী-দেওয়া ছাড়া ম-মনসার
 পূজা ঘিরে বেলেটুকু-কলের একটু করে টুকরো গিলে
 খেতে হয় এ-দিনে। কেলেটুকু জল বসনাসিক্তকর নয়,
 যত-টুকুও অর্চনীয় নয়, বাবেও তিক্ত : কিন্তু নিয়ম—
 নিয়ম। গোটা গোটা চিবিঘে যেতে হচ্ছেনা তো—বছরের
 মধ্যে একটা দিন একটা টুকরো হাত চোখ বুজে গিলে
 দিতেই হবে ছেলে-ছোকরা মেয়ে-বুড়ো সকলকেই।
 স্ততঃ বৈশ বসন্তে পাঠা যাচ্ছে এ-কলটি হল সপ্তবিধের
 প্রতিষেধক। বসন্ত হওয়ার আগে যেমন টিকে নিয়ে নিতে
 হয়, তেমনি শাপ বেরোবার আগে কেলেটুকু খেয়ে
 নিতে হয়।

যে ঘানের মঙ্গলবারগুলিতে মঙ্গলবার পালন করলে ঋষিধেবতাদের আদেশ কণ্যাৎ হয়, সে বাগটি হল এই জ্যোতিষ। হাজার কাক গড়ে থাক, মঙ্গলবারের সকালটি হলোই কেবলমাত্র আপনাদের গিরা আপনাকে একবার চা-টি খাইয়ে দিতে পারলেই বেন বাচেন। চারের কাপ-গেলাস খুঁড়ে-খুঁড়েই গিরাঘানের দুখ থেকে কেবলমাত্র আপনাদের বেরিয়ে আসছে—‘এই ফেটা, বাসানে বা শীত্রে। কাঠাল-পাতা নিয়ে আর। হেঁড়া-কাটা বেন না হয়—দেখে নিল ঠিক করে। যত্ন, তুই তুয়োতলা থেকে বেড়ে বেড়ে, হুঁ হুঁলে আন একসোছ’।

হুঁ-কাঠালপাতা হুঁ-বের সামনে এসে হাজির হলোই মঙ্গলবারের খালা সাজাতে বসেন গিরাঘা। মঙ্গল পেঁটারী আলাদা—আর মঙ্গলবারের খালা আলাদা। পেঁটারীর মধ্যে থাকবে কড়ি ১৬টি, বপুবি ১৬টি, হতকী ১৬টি, লং ১৬টি, এলোচ ১৬টি, শেতা, শিঁহুর-কোঁটা, কাঞ্চলপাতা ইত্যাদি। আর খালায় থাকবে ১৬টি কাঠালপাতা, ১৬টি বৎ, ১৬টি মটর-কলাই, ১৬টি জুলনীপাতা, ১৬টি আতপচাল। আর থাকবে ত্রিটি কাঠালপাতা দিয়ে তৈরি পানের দিলি। বিনিমুদ্রির একটি হাঁকুরের, অল্পট্র ত্রিতিনীর। হাঁকুরের বিনিমুদ্রির মধ্যে একগোছা হুঁ হুঁকে কেওরা হবে। কাঠাল-পাতার পরিবর্তে কেউ কেউ আবার কলাপাতা দিয়েও পান তৈরি করে।

বোসে-আনা মঙ্গল যাতে হয় সেইজন্মেই বোধ হয়

মঙ্গলবারের খালায় বা পেঁটারীতে যা থাকে সব বোসোটি করে থাকে।

খালা সাজানো হলো পুরুতর্ভাকুর এসে খালা নিয়ে গিয়ে পুজো করে গেলেন। পুজো হয়ে গেলে গর কলাত করতে পায় ত্রিতিনীরা। ঐ-দিনটিতে ভাত বন্ধ। মুড়ি, চিড়ে, আমপাকা, জামপাকা, বেলপাকা, জুটিপাকা ইত্যাদি খেয়ে থাকতে হবে মেরেবিকে। বাস, তাহলেই মঙ্গলবার পালন করা হয়ে গেল।

মঙ্গলবার ছাড়া হুটি-হুল-কল-শব্দের কাবনার বহুধারা-ত্রয়ের অহুটান করে মেঝেটা এই জ্যোতিষে। কিন্তু কই, বহুধারা-ত্রয়ের ত্রিতিনীকে তো চোখে পড়ছে না!

তবে ঐ-সব হল ছোটখাট ব্রত। ইচ্ছা করলে গরীব-বড়লোক যে-কোনো বাড়ির মেঝেটাই করতে পারে ঐ-সব। কিন্তু এগুলি ছাড়া যে একটি মহা সর্বনেশে ব্রত রয়েছে, যা এই জ্যোতিষেই অন্তর্ভুক্ত হয়—তা হল সানিভী-ব্রত। এ অতি কঠোর ব্রত বলেই মানে-মানে একে বিদায় করে দিচ্ছে মেঝেটা পাড়ার কাছে। স্বীকার করি, এ ব্রত করলে মরে-বাওরা স্বানীও কের আবার বড়পুত্রে গিয়ে দ্বিগুণ কেলবে, কিন্তু তাই বলে সব-কিছুর সীমা আছে তো একটা। ব্রত করতে গিয়ে মারা গড়বার দাবিল হল—সে আবার কেমন ভাবে!

বহুর হুঁ আপগেও সানিভী-ব্রত করতে দেখেছি মেরেবিকে, কিন্তু এখন আর কই চোখে পড়ছে না কাউকে।



জৈন-বিবি-৪৩২২

ডা. বিপ্লব ডেকারের

২২০-চিত্তরঞ্জন এভিনিউ • কলিকাতা - ৬

ছিট-ফাঁটা

• ** চারুচন্দ্র ওট্টাচার্য ** •

চলচ্চিত্র কি চলে ?

চলচ্চিত্র যে কোনো দিন দেখেনি তাকে চলচ্চিত্র কি, বোঝান যায় না।

সেই রকম অবস্থা হয়েছিল আমার একদিন, গেল শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে বা এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে, ঠিক মনে নেই। গড়ের মাঠে তাঁবু ঝাটিয়ে প্রথম বায়োস্কোপ দেখান হল তা দেখলুম; তার পর দেখলুম স্টার থিয়েটারে। প্রথমে অমৃতলাল বসুর একটা ছোটো প্রহসনের অভিনয় হয়, তারপর পনর-কুড়ি মিনিট বায়োস্কোপ চলে। লোকে লোকারণ্য। গুনলুম পেছন থেকে ভালো দেখায়; আমরা তো থিয়েটারে আট আনা সিনেটর খসেদে; আমাদের সুবিধে হয়ে গেল।—

একজন কাফি তরমুজ খাচ্ছে; খেতে গেলে মুখ যেমন নড়ে সেইরকম নড়ছে; তরমুজের ফালিটা ক্রমশ কমতে কমতে একেবারে ফুরিয়ে গেল। একজন লোক পুলের উপর থেকে জলে ঝাঁপ দিল, কি আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে জল ছিটকে উঠল! আরও কত কি!

বাড়িতে এসে মা-কে গল্প করতে লাগলুম। তিনি শুধু বলেন,—তা কি কখন হয়! তাঁকে একদিন দেখিয়ে নিয়ে এলুম। তখন তিনি স্বীকার করলেন।

তেপায়ার উপর একটা বড়ো বায় বসিয়ে একজন লোক হাঁকতে থাকে—কাশী, গয়া, ঝাখো, আগ্রার তাজ ঝাখো—। ছেলেমেয়েরা লোকটার হাতে একটা করে পয়সা দিয়ে বায়ের কুটোর মধ্যে দিয়ে ভাকাহ, ঝাখে কাশী, গয়া,

তাজের ছবি। লোকটা বিভিন্ন ছবি বদলে বদলে দেয়।

গেল শতাব্দীর শেষের ভাগে পাম্চাত্য দেশের ছোটো ছেলেমেয়েরা এই রকমের বায়ের মধ্যে দিয়ে বোড়া দৌড়ছে, মাছুষ জলে সাঁতার দিচ্ছে, নেমসাহেব নাচছে—এই রকমের সব ছবি দেখত। এই ধরনের ছবির উদ্ভাবক ছিলেন এডিসন। একটা বোড়া দৌড়ছে; ছবিতে এ অশুভৃতি কি ক'রে দেওয়া যেতে পারে? যেমন দৌড়ছে, পর পর বিভিন্ন ভঙ্গিতে একটা কটাগ্রাফি ফিল্মে তার ছবি তোলা হল। এবার দৃষ্টির সামনে ছবিটা টেনে গেলে অশুভৃতি হবে একটা চলন্ত বোড়ার।

সব তো ঠিক হল; কিন্তু যে-ছবি ক্রমাগত চলেছে, যাকে একমুহূর্তের জ্ঞাতোও স্থিরভাবে দেখতেন, তার অশুভৃতি তো কাপসা হতে বাধ্য। তাই হত। কাপসা হত বলে ওই রকমের চলচ্চিত্র বয়স্কদের কাছে সম্মান পায়নি। শুধু ছেলে-বহলেই ওই ছবি চাপু ছিল।

ফ্রান্সিস জেনকিন্স নামে এক ব্যক্তি ছিলেন এক আপিসের টাইপিস্ট। ও কাভটা ছিল তাঁর জীবিকার অবলম্বন; কিন্তু তাঁর বাতিক ছিল চলচ্চিত্র তৈরি করা।

চলচ্চিত্র দেখতে কাপসা হবে, এ কোনো কালের কথা নয়; একে স্পষ্ট করতে হবে; কিন্তু কি ক'রে—জেনকিন্স তাতে থাকেন। যে ছবি চোখের সামনে একটুক্ষণও পাড়িয়ে নেই, চলে যাচ্ছে, তার অশুভৃতি কখনও স্পষ্ট হতে পারে না। তিনি ঠিক করলেন, পর পর বিভিন্ন ভঙ্গির যে-ছবি তোলা

হয়েছে তার প্রত্যেকটিকে অল্প সময়ের জন্য চোখের সামনে অচল বেশ দেখতে হবে, তারপর তাকে সরিয়ে পরের ভঙ্গির ছবি আনতে হবে। অথচ ব্যাপারটাকে ঘটাতে হবে খুব তাড়াতাড়ি; তাড়াতাড়ি না হলে চলার অঙ্গুহুতি আসবে না। ছবি যখন দেখব, স্থির ছবিই দেখব, চলন্ত ছবি দেখব না।

এই রকমের এক প্রোজেক্টর তৈরি করতে তিনি মন দিলেন। কয়েক মাস পরীক্ষার পর এক যন্ত্র বাড়া হল। যে ফিল্মে ছবি তোলা হল তার একধারে প্রতিটি ছবির পাশে একটি ক'রে গর্ত কাটা হয়েছে। এদিকে যে চাকার ফিল্ম জড়ানো তাতে সারি সারি দাঁত আছে, দাঁতগুলি ফিল্মের গর্তের মধ্যে ঠিক যায়। জড়ানো ফিল্মকে একটা বৈজ্ঞানিক মোটর খুলে চলেছে। ফিল্মের গর্তের মধ্যে চাকার দাঁত এসে পড়ল, সেকেন্ডের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের জন্য ছবি থেমে গেল, এই সময় আমরা ছবিকে দেখছি। তারপর যেই চলে যাচ্ছে আলো বন্ধ হচ্ছে; পরের ছবি এসে দাঁড়াল, এখন ছবি আলোকিত হল, আমরা পরের ভঙ্গিমার ছবি দেখলুম। ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি চলেছে, কাজে কাজেই আমাদের চলন্ত ছবির অঙ্গুহুতি আসছে। অথচ যখন দেখছি—স্থির ছবি দেখছি, স্থতরাং ছবি আর কাপসা ঠেকছে না।

এই রকম যন্ত্র প্রস্তুত করতে জেনকিন্সকে খুব বেগ পেতে হল। শেষ অবধি যন্ত্র তৈরি হল। পর্দার উপর পরিষ্কার ছবি পড়ল। জেনকিন্সের অনেক ধরক হল, বন্ধুবান্ধব দেখে তারিক করল, কিন্তু পয়সা আসে কই ?

সেই সময়, ১৮৯৫ সাল, এক জায়গায় এক বড়ো প্রদর্শনী হচ্ছিল। জেনকিন্স ও তাঁর বন্ধু হু'জনে মিলে প্রদর্শনীতে একটা ঘর ভাড়া নিলেন। ঘরটি বেশ ক'রে সাজান হল; অনেকগুলি চেয়ার পাতি হল; সামনে পর্দা; তার উপর ছবি পড়বে;

বেশ বড়ো ছবি হবে। একজন লোক বাঁধল, দে বাইরে চোঁচাতে লাগল,—পর্দার উপর বড়ো বড়ো ছবি—বোড়া সৌজছে, মহিলা নাচছে, আরও কত কি। আহুন, দেখে যান। বাইরে বড়ো বড়ো অঙ্করে প্ল্যাকার্ড—‘চলচ্চিত্র’।

লোকে পাশ দিয়ে চলে যায়, কেউ ভিতরে ঢোকে না। বলাবলি করে,—পর্দার উপর ছবি নাচছে, জোজরের দল।

চার-পাঁচদিন চলে গেল, কেউ ভিতরে প্রবেশ করল না।

জেনকিন্স ও তাঁর বন্ধু ভাবলেন, কথা দিয়ে ব্যাপারটা বোঝান যাবে না। কোনো রকমে লোকদের দেখাতে হবে। তাঁরা বাইরে এসে দাঁড়ালেন; সামনে দিয়ে যে যায় তাকে বলেন,—আপনি নিশ্চয় খুব ক্লান্ত হয়েছেন, আপনি ভিতরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিন, এর জন্যে পয়সা কিছু দিতে হবে না। এ কথাও কেউ বিশ্বাস করে না, নিশ্চয় এদের কোন মতলব আছে; হাঁথুখ তো এরকম সঙ্গীত হয় না।

শেষে দুজন বৃদ্ধা ভিতরে ঢুকলেন, আরও একজন, আরও একজন। পাঁচ-ছ'জন যেই জমা হল, অবনি জেনকিন্স টপ্ ক'রে আলো নিবিয়ে পর্দার উপর ছবি কেলেতে লাগলেন। বৃদ্ধারা ভো অবাঙ্। তাঁরা বাইরে এসে গল্প করতে লাগলেন; আর একদল এল; আরও একটা বড়ো দল। হু'দিন বহ লোক এসে দেখে গেল; চার দিকে একটা সাড়া পড়ে গেল।

এইবার জেনকিন্স কোপ বুকে কোপ বসালেন। টিকিটের দান হল। কাতারে কাতারে লোক আসতে লাগল। প্রদর্শনীতে শুধু এঁদেরই কথা। প্রদর্শনী শেষ হল।

একদিন এসেছিলেন এডিসন। তিনি জেনকিন্সের কাছ থেকে ছবির স্বর কিনে নিলেন। তারপর এডিসনের হাতে নান। দিকে এর উন্নতি হতে থাকল।

কুশীনগর

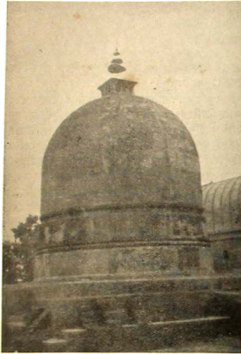
বিকাশকান্তি রায় চৌধুরী

সোমবপুর থেকে কুশীনগর—গাছের ছায়-ঢাকা শোকা শীত-বাঁধানো সড়ক বেয়ে চলে সরকারী বাস। আড়াই হাজার বছর আগের জাভাচোরা স্বতি আর ঐতিহাসিক সাক্ষীরা সরকারী কোম্বলের তক্তবা এঁটে বেন হাতছানি নিয়ে ডাকছে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের। এই সেদিন পর্যন্তও কুশীনগর ছিল দিনের বেলায় জনহীন আর রাতের আধারে সবায়ের সন্ত সুমভাটা ছায়-বাহুরের গেণ্ডা-বেলার সংরক্ষিত শহর। সেদিন ছিল কালের বন, কেয়ার কাড় আর মারি ভুড়ে কুশের কলপ। লাল ধানের অগোছালো এগিয়ে-পড়া উগার দোল খেতো লাল-নীল পানী, লম্বা ছিল আর সড়ল। দ্বিতিকের দেশের উশোশী বাহুরের বুকে উঠিয়ে-বাফা পাঙ্করা কাঠির মতো বাটির কুশের ধাক থেকে বাফা-বার-করা ইট। বড় বড় আদমগাছগুলো গারে বোল খেত বাঘনীলতা কিংবা গুচ্ছে গুচ্ছে কুটে থাকতো মালতী-ফুলেরা। অশোক-কুশের গারে এঁটে বসে ছিল বিমোহ পুরু শ্রাওলা আর এখানে ওখানে সম্বিয়ে-ওঠা ধন-বিশিষ্ট অশ্ব-বটের চারা। কুশীনগরে সেদিন ছিল নিরাতমতা, বৈত নয়; ছিল অলস মধ্যাক, মহাতাপনের প্রশান্ত ধ্যান-গাভীর্ষ।

আজ সেখানে দেশী-বিদেশীরা ভীড় জমে বছরের আর ঐতিমাসে; আসে ইউরোপের ছাত্রদল, আমেরিকা থেকে পর্যটক। ইউরোপের অরুণভিৎসা আর আমেরিকার আড়ম্বরের সাথে পাশাপাশি বাস করে এনিয়ার সরলতা। আসে চট্টগটে বড়ারের জাপানী, বেটে-বাঙরা বাহুরের চওড়া বুকে নিয়ে চীনে-ভাই, আসে বর্বা-মুসকের হাঙ্গমদী বরিয়েয়ে, সিংহলের চতুর্দাননার সাথে স্যামের গভীর ধূম বিনিময় করে হাসি। দিকিধ-ভূটানের কাটখোটা ভক্তদের সাথে হাত মিগিয়ে চলে নেপালী ভ্রোয়ান। বাহুরের ভীড়ের সাথে ভীড় করে গজিয়ে উঠেছে রাজার হুশারে সারিবধী পাফা কোকানবর। শ্রুশশনা) মধ্যবিত্তের পাফা বাড়ি উকি দেয় গাছের ধাক, বাফা উঠিয়ে কেউ-বা পালা দিতেও ছাড়ে না। বাস এসে বাসে ধাকের মোড় ঘুরে। ধারে গর্ভিত শির উঠু করে ধাঁড়ির আছে বাইশো বছরের বৃদ্ধ কুশ। হিউয়েন সাং-এর মতে এর গভন করেছিলেন রাজনি অশোক ঐষ্টকালের হুশো উন্নপকণে বছর আগে। এর নাম 'মহাপরিব্রিধণ কুশ'। ভগবান বুডের মহাপরিব্রিধণের

স্থানকে চিহ্নিত করে এই স্বতি—ঐতিহাসিক সাক্ষী। কিন্তু কোথায় এর বাধক? সেহে সোলচর্চের ভাঙ্ক নেই। বাধার চলে কলপ লাগিয়ে ধৌর্গতার মেটে রং ঢেকে শ'রে আছে দেবিকের সাজ। হুশে-আলতা ওঠে কুটে উঠেছে হাদি, প্রাচীনতার আবরণ খসিয়ে বৌবনের লাখখা উঠেছে উপরে। হুশুরের অপোকচক-গাঙ্কিত বিলান হুহতো সেধিন ছিল না। না থাকে, না থাক। খাটী ইতিহাসের নকীর না থাক, এর অবস্থিতিতে বেড়েছে ভূশ, অখচ বোমানান হুহনি সে-হুগের ভাঙ্করের গোখে কিংবা স্থাপত্যের বাপকাঠিতে। ভগবান বুডের সবরকার নির্ভেঙ্কাল ইতিহাস নেই, নেই প্রামাণ্য বলিল-বজাঝক, যা আছে তা মহাবানবের সশর্কে মানবোচিত আভিরজন। তখনকার দেশী ইতিহাসের চাইতে বরং প্রামাণ্য বলিল আছে বিদেশীর লেখার—চীনা-পর্যটক হিউয়েন সাং-এর বিবরণীতে। সেখানে বুডের কুহাযান চিহ্নিত করা হয়েছে শহরের উত্তর-পশ্চিমে হিরণ্যবতী নদীর অপর পারে। সেখানে সে-হুগে ছিল বিরাট বিহার-বলির আর আশ্রম। বলিয়ে ছিল কুহায পূর্বদুর্গের তলীতে অধপারিত বুদ্ধমূর্তি, তারই দক্ষিণ পার্শ্বে মোকার্ত আনক, বামে মালিকা আর মধ্যস্থলে হুভদ্রা। মালিকার মূর্তি নীচু হয়ে হু'হাতে স্পর্শ করে আছে মারি, হুভদ্রার চোখদুটি বেন নিবদ্ধ রয়েছে বুডের বিশাল মূর্তির উপরে। একে তখন বলা হতো 'মহা কুনওয়ার কা কট' বা কুত রাককুহারের সবাধি। হিউয়েন সাং-এর লেখার তখনকার শহর ছিল সারমধা থেকে একশো মালো মাইল পূবে। ষ্ট্রেকহের হু'শো বছর আগে থেকে একটানা সতেরো-শো বছর ধরে নির্মিত হয়েছে কত শত কুশ, মঠ আর বিহার। 'মহা কুনওয়ার' বা কুত রাককুহের বিশলে মূর্তিটির অবস্থিতি ছিল কুশ থেকে চারশো গজ দূরে। বোধিবৃক্ষতলে ধ্যানময় বুডের প্রশান্ত তলীট কুশাধিত করা হয়েছে এই প্রশর-প্রতিকৃতিতে।

বৈবর্ধ্য, প্রশ্র আর উচ্চতা নিয়ে অশোককুশের আয়তন গিয়ে ধাঁড়ার একটা বিরাট অকে। অস্তের বিরাটর ধরা আর লেখনীতে, কিন্তু যে বিরাটের আভাস ওর মহিনমর ভবিষ্যৎ, তাকে তো ধরা যাবনা অস্তের বিলাব মিগিয়ে। বাহুরের আরম্ভাণ্ডা শুধু তার কিছুটাতে হুহতো হাতড়ে পাখ উললিহির কোঠার। নির্জন সজ্জার ওয় হুশুরের একোটে



অশোকপুণ্ড (পিঠের থেকে খুঁটিত অশোকচিত্র)

দেখা পাহিত প্রত্নতত্ত্ব-প্রতীকের পরতলে দীপ জ্বলে নতজাহ্নু
ধরে বসে ভিক্ষু সন্ন্যাসীরা। সংস্কারের হুরে সমাহিত আত্মা
কেগে ভরে সিনা জানিনা—কিন্তু বাহুরে অমর আত্মা
হুরে শ্রুতি নিলিখে অচঞ্চল আউড়ে চলে—

“ধর্ম্য পরণং গচ্ছামি,
সংযম পরণং গচ্ছামি,
বুদ্ধং পরণং গচ্ছামি।”

এই স্তম্ভকে চারিদিক দিয়ে ছিল সেদিন তিস্তাবের
আশ্রম ঘর ও বিহার, প্রত্নতত্ত্বের উৎকর্ষ ভগ্নাঙ্গত বুদ্ধের
অমৃতবাণী। মাটি খুঁড়ে বেরিয়েছে ভগ্ন প্রকোষ্ঠ, সারিযক্ষী
প্রকোষ্ঠের বিলান-করা দালান, মোদাই-করা রেলিং—খোঁজ
হুপের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শনও রয়েছে প্রচুর।
সারমন্ডলের মতো এখানে হিউজিয়াস নেই, নেই সবভরস্কিত
বিভিন্ন কার্কাশ। তবুও চারিদিকের নকশার ভগ্নস্থলের
মে ছবিটি ফুটে আছে তাকে শিল্পী আর সাধারণ মানুষ দুইয়ে

মিলেই ভোগ করে—ভালবাসে তার এই বে-আক্রে রূপ।
বুপের গ্রাম মুখোমুখি ঠাড়িয়ে রাজ্য-সরকারের বিরাট
ধর্মশালা, আরো এগিয়ে আধ-বিহার, পেছনে চীনা বৌদ্ধ-
মন্দির। আরো একটু এগিয়ে সরকারের সম্রাট ব্যক্তিগতের
জল অতিথিশালা। বী-হাটে একেই পর এক উঁচু টিপি।
গাছ না থাক, আগাছা আছে অনেক। কিন্তু নগর তো
একদিন সজীবি ছিল এখানে।

সোমবা বিলের পশ্চিমদিকে নগর কাশিরা থেকে মোট
একমাইল পথ হচ্ছে ‘দেবীস্থান’—লোকের বলে ‘রত্নর টিলা’।
সবারই ধারণা, বৌদ্ধ ইতিহাসের ‘সম্মতি পুণ্ড’ এখানে মাটির
নীচে প্রোথিত হয়েছে। হিউজেন সাং-এর বিবরণীতে একে
চিহ্নিত করা হয়েছে খাল্লাসাজবংশের রাজ্যাভিষেক-স্থল
বলে। হবেও বা। ‘বুদ্ধবজ্র বিহার’ তো এখানেই নির্মিত
হয়েছিল খাল্লাসাজবংশের আশ্রুস্থলে।

‘মহা কুনগুহার কা কটু’ আর ‘রত্নর টিলা’র মাকানাকি
জায়গাটা হচ্ছে অনিচ্ছা গ্রাম। চতুষ্কোণ এই উচ্চ ভূমি-
খণ্ডটিতে এখনও দেখা যায় বাটির নীচেকার ভগ্নাংশের।
সত্ত্ববত: খাল্লাসাজবংশের প্রাসাদ ছিল এখানটাতে।
তখনকার শহরের কেন্দ্রস্থল ছিল এটা।

আরো কিছুটা দূরে ‘ভীষণভাত’ বা ‘ভয়ঙ্কর স্থান’।
এখানকার অনেকগুলি টিপি খুঁড়ে পাওয়া গেছে বাটির
তৈরী ভ্রম্যভারত। বাটির এই শিল্পকাজগুলির পায়ে দেখা
আছে তাঁদের নাম, বাংলা বুদ্ধের মহাপরিণির্বাণের সময় দেশ-
বিশেষ থেকে এসে এই শেষ অমৃতানন্ডিতে দীপ
জালিয়েছিলেন।

সরকারী অতিথিশালার সদর ফটকের ভদ্রীতা বর্ষার
প্যাগোডা ধাঁচে তৈরী। বর্ষাবের ভাঙো লাগারই কথা।
কিন্তু অতিথিশালায় ভিলখারদের স্থান নেই। হিমালয়ের
চড়াই ডিঙিয়ে কান্ডার মল্ল আর হুন্ডর পারাবার সেগিয়ে
বুদ্ধজয়ন্তীতে এসেছেন শুভকল। তার পরে সরকারী
কর্মচারীরা তো আছেনই। বাটার-বাইকটাতে গেস দিয়ে
ভাবছিলাম কি করা যায়। সম্বন্ধে এসে হাত ধরলেন
একই আগের চেনা সেই বর্ষা বাছবী। ঘর বেশলি, দরকার
কি বরের—আমার কাছে থাকো। ‘হুদি আমি বহৎ প্রেম’—
না গেলে শুনবেইনা সে। নিঃসঙ্কোচে বাইকটাতে চেপে
বসলো বাছবী। থাকতে হলো—হা নাছোড়বান্দা বেয়েটি।
জু একবে বাস নয়। ‘হুদি আমি বহৎ প্রেম’ এখন—তার
ভাষা অধিকার আছে একলা আমার বাইকের পেছনের
সীটটিতে চেপে বসে আমার সঙ্গে কদ্দমা ভ্রমণ করবার।
বাছবীর বাবা বলেন, আমার দেশে চলো। ওর মা বলেন,

আমার ঘরে থাকো—বহৎ প্রেম মিলবে। বাক্যটা আমার উত্তরের প্রতীক্ষা চোখে পড়বে নতুন। হৃদয়ী তরুণী কুমারী-জনমের প্রেমের চাইতে পথের প্রেম কি কিছু কম যায়? তাই যেতে পারলুম না, তবু যাব বলে প্রতিজ্ঞা দিই যে বিধায় নিতে হলে। বাক্যটির লাজনয় প্রথম মুখস্থিত নেমে এলো শান্তির কালো মেঘের ঢায়া—কল্পিত গল্পটি

হাতে চেপে সে মুখ ফিরিয়ে নিলে, চোখের কোণে যে দু-জোটা জল টলটল করছিল—তা যড়িয়ে এলো গরু গরু।

মোটর-বাটকটার মোটা মোটা চাক-চকো: যেন চুটে চলেছে ঘরার কোনো এক শহরের লগ্নে—পাচ-বাথানে। বাক্যের কোণে দু'ঘণ্টা ওয়া প্রতিশ্রুতি করছে—‘তুমি আমি বহৎ প্রেম!’

আশীর্বাদ

বুদ্ধজয় মাইতি

কালো অন্ধকার এসে এ পথের সব তৃণ আঙ্গ ঢেকে দিল :
অথচ দিনের শেষে রোদগুলি যেখানেতে খেলা করেছিল
সূর্য নেভার আগে, বিকেলের অশেষক পারিদের সাথে,
সেখানে এখন শান্তি, অলস বিজ্ঞান তার ধূসর ছায়াতে।

এমন নির্জন স্থর কে বিহাল এখানে তৃণ ও মাটিতে
শরবনে ছেয়ে-থাক। অঙ্গুরের ছায়াশীল জলাভূমিটিতে !
সে এক মহৎ শিল্পী, এই মাটি জল তার শ্রমের ভাষা,
আলো অন্ধকার দিয়ে ভরে দেয় কতো ছবি দেখার পিপাসা !

আমার উঠানে আঙ্গ সেই শিল্পী পাঠায়েছে পত্রলেখা তার
সেবদার শিমুলের বসন্তের চোখ-মেলা নতুন পাতার।
বলেছে সে, ‘এসো তুমি, আমি আছি প্রতিদিন দূর প্রতীক্ষায়
তোমার জীবন গান স্থর পাবে নির্জনের আকাশ ব্যাখ্যায়’।

বিজ্ঞান বিছিয়ে রাখা এই মাঠে পাতা হ’ল রাত্রির আসন ;
বুকিনি কখন থেকে আশীর্বাদ হয়ে গেছে তারি নিমন্ত্রণ।

মনোহর ও প্রেমতারা

❀ মহাশ্বেতা ডাট্টাচার্য ❀

১২১

শ্রেষ্ঠ জুবিলী সার্কাসের সবটুকু কৃতিত্ব কিন্তু গোপীমাস্টারের নয়। বাঙালী শরীরচর্চায় পিড়িয়ে পড়ে আছে, বাঙালী ভীত এই অপবাদ খড়বার জন্যে বাট বছর আগে থেকেই উঠে পড়ে লেগেছিল। বাংলাদেশের ছেলেরা। জামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যখন পথ দেখালেন—বাঙালীর সার্কাস গড়লেন—অনেকেই মনে হলো এ একটা কাজ। করলেও হয়।

গোটেবাবু তাঁদেরই একজন। ভাড়াচোরা বিপ্লবী দলের কয়েকটি ছেলে নিয়ে বনছগলিতে গড়লেন বেঙ্গল সার্কাস। গোপীনাথকে সেই দলেরই একজন। গোপীনাথকে যে কি চোখে দেখলেন তিনি! সার্কাসটি তার হাতে তুলে দিয়ে গেলেন। দোশীর চেহারা চমৎকার। আর একটু লম্বা হলে একেবারে নিখুঁত বলা চলতো। সম্ভবতঃ তারই আকর্ষণে কোহিনুর সার্কাসের মালিকের বোন জুয়েল পালিয়ে এসে বিয়ে করলো গোপীনাথকে। জুয়েল কোহিনুরের মতো অনেক নরম আছে। ট্রাপিঙ্ক-কুইন চামেলীর তিনপুত্র কাটালা সার্কাসে। তার বুড়ী শাওড়ী আজ ছেল-বোয়ের রোজগারে হাত-ভরা বালা-চুড়ি প'রে বসে বসে তাস পেটে তাঁবুতে আর চামেলীর বাজা হুটোকে দেখে শোনে। সে জুয়েলের কথা আঙও বলে। বিজ্ঞাৎ-এর মতো হুন্দরী ছিলো জুয়েল। তেমনি ছিলো তার ভেজ। পাঁচহাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে এসেছিলো সে। গোপীমাস্টারের এই সার্কাস বলতে গেলে তার হাতে গড়া। এত করেও ভোগ করতে পারেনি জুয়েল। ট্রাপিঙ্ক যখন দুসতো জুয়েল গোলাপি সাটিনের

জামা পরে, দেখলে তাক লেগে যেতো। এমন ভাগিা মেয়েটার, মনোমিল হলো গোপীনাথ বাণ্ডামাস্টার ছোকরার সঙ্গে। ভালবেসে আরো বেপরোয়া হলো জুয়েল। বেশী কাচন্দা করে লাক মারতে গিয়ে নেটের ওপর বেকায়দায় পড়লো। সেটা প্রথম শো। দ্বিতীয় শো অবধি রইলোনা। মাথা আর ঘাড়ের রং হিঁড়ে কাটোয়ার হাসপাতালে মারা গেল জুয়েল। গঙ্গার ধারে কবর হলো। গঙ্গা-কে গঙ্গা, গোর-কে গোর।

চামেলী বলে—তারপর কি করলো মাস্টার ?

বুড়ী গঙ্গীর হয়ে যায়। বলে,—মালিকের কথায় কাজ কি তোরা বো? রাউটিতে যা।

—রাউটি নেইকো আজ।

—আলাসুনি বো!

চামেলী হাসে। বুড়ী না-ই বললো। কে না জানে, বো মরতে নিশ্চিত হলো মাস্টার? হুন্দরী বোয়ের করে মাস্টারের নরম ভয় ছিলো। ব্যাও-মাস্টার ছোকরার সম্পর্কে হিসেটো জানান দিতেও ভয় পেতো সে। তারপর থেকে মাস্টারও মূর্তি করতে শিখেছে। তবে মালিকের সম্পর্কে এসব কথা ভাবতে নেই।

আজ জুবিলী সার্কাসের রম-রনারম অবস্থা।

তাগড়া বুকখানা ফুলিয়ে গোপীমাস্টার বলে,

—দেড়ুশা বাঙালীকে খাওয়াছি পরাঙ্কি, সোন্কা কথা নয়।

পর্ব করতে পারে বাটে। ছোটখাটো একখানা সহর টেনে চলেছে গোপীমাস্টার। তাঁরু সে-ই কত বড়ো রে, ওপরে চাইলে মাথা ঘুরে যায়। দড়ি-মড়া, কাছি, রশি সেই কোন্-না পঞ্চাশ মণ হবে!

গ্যালারী, তক্তাপাশ, মোটির-সাইকেল চালাবার মরণ-ক্রোম, সাইকেল, যন্ত্রপাতি, সাজসজ্জা, হাতি, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, কালো বাঘ, ছাগল, বাদর, কুকুর, উট—কি আছে, কি নেই। তাঁবুতে বসে থলিকা হরমম কল চালাচ্ছে। উট খাবে নিনপাতা, ছোলা। হাতি দিনের বেলা খাবে চাল-বিচালি, রাতে খাবে আটার কুটি, ঘি। বাঘ-সিংহের কল্লো খুড়ি-বোকাই মাংস আসছে। ওদিকে রাউটির সময় হলো। রাউটি মানে প্র্যাকটিস। তাঁবুতে ঝাঁক। গ্যালারীর সামনে ঝাঁড়িয়েছে গোশীমাস্টার। রাউটি দিচ্ছে মেয়েরা, একচাকার সাইকেলে বোঁ বোঁ করে ঘুরছে হাতে হাত ধরে। বারের খেলা যারা দেখাবে, সেই সব ছেলেরা ঝাঁড়িয়ে আছে। এরা সরলসেই তারা ঢুকবে। সাত থেকে দশবছরের দশ-বারোটা ছেলেমেয়েকে নোয়ান কেলতে দেখাচ্ছে কেউ। 'বোনলেন্স' আর 'শীকক' এই হলো সার্কাসের ছেলেমেয়ের অ-আ-ক-ব।

উট, হাতি, ঘোড়া নিয়ে শহরের পথে বেরিয়ে পড়েছে কীপার। ভালুককে দীর্ঘিতে নাওড়াচ্ছে কেউ। বাচ্চা ভালুক। জল ছোটোছে হুঁতিতে। বড় বড় হোম-পাইপ এনে বাঘ-সিংহের খাঁচা বোলাই হচ্ছে জল ঢেলে।

এতগুলো মানুষের রাস্তা হচ্ছে বেশানে, সেখানে তাঁবুতে সাত-আটজন চাকর পলদধর্ম হচ্ছে। আবার যারা ক্যামিলি নিয়ে আছে, তাদের হার হার তাঁবুতে রাস্তার ব্যবস্থা। তাঁবুতে থেকে এসের এমনি হয়েছে যে, চারসেরালের মধ্যে ঘুম আসে না মোটে। বলে,—হাপ্‌সে উঠি গো। অব্যাস নেই কিনা! চানেলীর ছেলেমেয়ে বলে,—মা, ঘরে শুতে কেমন লাগে গো? ভালের গরম ওঠেনা?

এরই মধ্যে মেয়েরা নেয়ে নিচ্ছে। জল ধরছে। রত্নী কপড়-জামা মেলে দিচ্ছে তাঁবুর দড়িতে। হাঁস-মুরগী ঘুরে বেড়াচ্ছে আশপাশ দিয়ে।

এই লেমান জীবনের মালিক গোশীনাথ। গর্ব সে করতে পারে বৈকি। স্ত্রীস্বতই গর্ব করতে পারে।

শ্রমজাতি এই সার্কাসে এসেছে আট বছর আগে। তারও আগে ছিলো গোমেন্স-সারয়ের সার্কাসে। সংমা ঘরে আসতে কুটকুটে পাঁচবছরের মেয়েকে সার্কাস-দলে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো বাপ। নোয়ান-বোনলেন্স—নোয়ান-শীকক! রিং-মাস্টারের হাতে চাবুক। ছোট পাঁচবছরের শরীরকে কষ্ট করে ঝাঁকানো, নোয়ানো, জুমড়ে ফেলা। ভোরবেলা একমুঠো খুড়ি খেয়ে রাউটিতে এসে পেটের ভেতরটা কেমন জ্বলতো, বিশবছরের শ্রমজাতির সে কথা আজও মনে পড়ে। ঠিকমতো পারলে পরে রিং-মাস্টারই নিয়ে যেতো তাকে টিকিনখানায়। চা বিছুট কেক খাওয়াত। বলতো,—ভোর চোখে চোখ রেখে দেখেছি, তর নেই ভোর। একদিন নান করবি তুই, দেখিস?

ভয়ের পরীক্ষা হলো তার সাতবছর বয়সে। গোমেন্স-সারয়ের সার্কাসে বর্নবাবু বেশতো খেলাটি। চিং হয়ে শুতো বর্নবাবু। তার পায়ের ওপর টুল খাটিয়ে খাটিয়ে উঠু করে, তারও ওপরে একটা পিঁপে শোয়ানো। সেই পিঁপের ভেতর থেকে বেরতো শ্রমজাতি। সেই পিঁপের ওপরে শীকক, নোয়ান, বোনলেন্স দেখাতো। যারা দেখতো তাদের পায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠতো। খেলা শেষ হয়ে গেলেও তার ভয় যেতানা। রাতে নিজের ছোট খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমের মধ্যেও মনে হতো তাকে তুলে কারা টেলে দিচ্ছে ওপরের দিকে। কতো ওপরে তার দিশা বেই। নিচের দিকে চাওরা যায় না। গা দিগদিগ করে। মনে হয় এই জীবনের শেষ দিন। টাপার মতো সে-ও যদি মরে যায়? টাপা পিঁপের থেকে বেরুতে গিয়ে পড়ে গেল বলেই-না শ্রমজাতি প্রোমোশন পেলো পিঁপের খেলায়? নয় বছরের কালো মেয়েটার মালা সাড়িনের পোশাকে রক্তের দাগগুলো কোনোদিন তুলবে শ্রমজাতি? মনে হতো, আর ভয়ে কাঁদতো সে। তবে সে-কাল কেউ শুনতোনা। সার্কাসের মেয়েরা কাঁদলে সে-কাল কেউ শোনেনা। তাদের চোখের জলও কেউ

মুছিয়ে দেয় না। সার্কাসের নেয়েদের শক্ত হতে হয়।

আট থেকে কুড়ি বছরে পৌছাবার পথটা অল্পরকম, সার্কাসের মেয়ের জীবনে। বয়সটা অমনি-অমনি আসে না। দান দিতে হয়। দান আদায় করলো বিভিন্ন মানুষ। দান দিয়ে দিয়ে বড় হলো প্রেমতারা। বয়স যেনন 'ভরে উঠলো, তেমনি নিজের দানও বৃদ্ধিতে শিখলো প্রেমতারা।

তিন সার্কাস ঘুরে তবে গোপীনাথের সার্কাস। এখন প্রেমতারাকে চেনেনা জানেনা কে? সিংগল-হুইল, তারের খেলা, লায়ন-কুইন, ইস্টার্ন সাইকেল, সিংগল আর ডবল ইস্টার্ন, রাইফেল নিয়ে বেগুন কাটানো, ক্যালাল ট্রাপিড, পালটি—একলা অনন বারোটা নম্বর দেখাতে পারে প্রেমতারা। নাগিয়ার সঙ্গে টেকা দিয়ে বাঘের খেলা দেখাতে পারে। গোপী দেয় না। দলের ভেতর শত্রু বাড়িয়ে লাভ কি? প্রেমতারার বিষয়ে বড় মনোযোগী গোপীনাথ। সব জানে প্রেমতারা। জেনেওনে তার পায়া ভারী হয়েছে। চলে হেলেহুলে। কথা বলে গুমোর করে। যেন রাই গরবী। যেন মা-বাপের দিশা ছাড়া সার্কাসের বেয়ে নয়—এমন একজন, যার অনেক আছে।

মনোহর এ সার্কাসে ঢুকলো নম্বর হয়ে। সার্কাস তখন রংপুরে। টাউন হ্রাবের মাঠে তাঁবু পড়েছে। একটা সমস্তার সময়। গোপীনাথের একটা বাঘ কিনেছে। তাকে বিগড়ে দিয়েছে নাগিয়া। আরো একজোড়া সিংহ আর সিংহী আসছে আকুলি ব্রাদার্সের কাছ থেকে। তিনহাজার টাকায় একজোড়া সিংহ আর সিংহী কেনা হয়েছে। একেবারে বাচ্চা। এখন একটি মানুষ চাই, যে আদরবধ করে পালবে এসের। আদর বিনা মরেই যাবে।

মনোহর এলো সায়েবের সাটিফিকেট নিয়ে।

পঁচিশবছরের ত্যাগভরা জীবন ছিলে ডোরাকাটা গেঞ্জি আর নীল খালসী-প্যাণ্ট পরে যখন এল,

সায়েবের সাটিফিকেট দেখে এককথায় গোপীনাথের তাকে চাকরি দিল। সাটিফিকেটটা ময়লা হয়েছে হাতের তেলে। তবু পড়া চলে। মাইনে পকাশ। কাজের নান ভাঁকালো—লায়ন-টোনার।

নতুন মানুষ এলো কাজে। শুনে, আগেই এলো নাগিয়া। বেঁটে, কালো, কোঁকড়া-চুলো নাগিয়া। রুক্ষ আর অভভভাবে খোঁচা মারলো পাঁজরে। বললো,—কোথাকার আমদানি? বলি জেল-ফেরত নাকি? কয়েদীর জামা পরেছিস কেন?

—আই, আই নাগিয়া—শুধুমুখ লাগছে। কেন? যা শুধোবে আনাকে শুধোও।

সামলাতে গিয়ে মনোহরের ওপরেই খাঙ্গা হয়ে উঠলো গোপীনাথের। বললো,

—যাও ওদিকে। বললান সব দেখে শুনে নাওগে।—সাথো!

একমহর জোকার সাথো নিয়ে গেল মনোহরকে। প্যাকিং-বান্স টেনে বসলো নাগিয়া। বললো,

—কি মতলব? কই করে নতুন মানুষ?

নাগিয়ার কুটিল চোখের সামনে অমহায় গোপীনাথ। মুখে সে-ভাবে প্রকাশ না করে হাসলো। বললো,

—সস্তায় পেলান। বাঘ-সিংহগুলো দেখবে।

চোখে চোখে চেয়ে নাগিয়া স্থর ভাঁজলো। বললো,—আচ্ছা?

—তোনার খেলা তোমারই থাকলো।

—বলছো!

ব'লে উঠে পড়লো নাগিয়া। বললো,—জুন মাসের হিসেব বানাও। টাকা চাই।

বেরিয়ে গেল নাগিয়া। নাগিয়াকে কেন যে ভয় করে গোপীনাথ। শুধু নাগিয়া বলে নয়, ভয়ের একটা ভূত তার মনে আছে। বেশ শক্ত ধাতের কোনো মানুষ দেখলেই সেই ভূতটা মাথা কাড়া দিয়ে উঠতে থাকে তার মনে। প্রয়োজনমতো কড়া হতে পারে না গোপীনাথ। ভয় পায়। অথচ কিসের যে ভয় তার, বোঝাতে পারবে না সে। নাগিয়াকে

ভয় পায় স্পষ্টই। এড়িয়ে চলে। পারতপক্ষে ঘাটায় না। গোপীনাথের ঘত দাপট তা শুধু তার দয়ার ওপর নির্ভর থাকেই। সেই কনজেরী মানুষগুলোর ওপর। দুর্বল আর অসহায় মানুষকে খুঁচিয়ে গোপীনাথ নিজের কাপুরুষ বিবেকের শাসন থেকে বাঁচে।* এদিক থেকে তার আর নাগিয়ার বিল আছে। নাগিয়ার সঙ্গে মিতালি হওয়াই উচিত ছিলো। কিন্তু সম্পর্কটা খিঁচড়ে গিয়েছে।

এখন নাগিয়া বেরিয়ে যেতেই সে দাঁতবুখ খিঁচিয়ে হিন্স হয়ে উঠল।—আই হারান ৭০ গাথা কোথাকার... চায়ের কাপটা নিয়ে যা—

রাগাঘরের ছোকরা হারান কাঁপতে কাঁপতে এলো। কাপ-ডিল ছুটে ভেঙে তার চাকরি ত্রিশত্ব অবস্থায় খুলছে।... হ'নিয়ার মা—ব'লে এমন হুমকি দিলো গোপীনাথ, যে হাত থেকে কাপটা পড়ে যেতো হারাণের। কাপটা সে ভাঙুক, এই চায় গোপীনাথ। তা হ'লেই হারাণকে বরখাস্ত করা সহজ হবে। এই জ্ঞানটাই ইদানিং বাঁচাচ্ছে হারাণকে। কানি মেরে কাপটা বাঁচিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

নাগিয়াকে চায়শো ঢাকা নগদ দিতে হবে, এই ভেবেই বিরক্ত গোপীনাথ হিসেবের খাতা খুললো। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে একটা হাসির হবরা শোনা গেল। পাঁচমিলশী শব্দ। তারই মধ্যে একটা কাঁচানিঠে গলার হাসি পাখির শিসের মতো লহরে লহরে কাঁপতে কাঁপতে খাস থেকে চড়ায় উঠে ভেঙে পড়লো। বেরিয়ে এলো গোপীনাথ।

সার্কাদের মানুষগুলির কঠোর জ্রমের জীবন। এমন হাসির খোরাক তাদের নিত্যা জোটে না। গোপীনাথের ঠাঁয় থেকে বেরিয়ে নাগিয়া মনোহরের খোঁজে যায়। বাঘের বাঁচার সামনে গিয়ে হঠাৎ দরজাটা খুলে দেয়। ভয় দেখাতে গিয়ে নিজেই বিপাকে পড়লো। দরজা গেল খুলে। বাঘ বেঁকবার আগেই নাগিয়া ছুটলো দড়িদড় টপকে। কৌতূহলে বাঘও তারই পিছনে ছুটলো। ঠাঁয় দড়ি বাঁধবার শালের খুঁটি বেয়ে তড়বড়িয়ে উঠে গেল

নাগিয়া। মনোহর সকলের সঙ্গে নাগিয়ার বিপদে হেসে পুন হলো। তারপর এক হাঁকার দিতে অভ্যাসের বসে বাঘ আবার এসে ঢুকলো বাঁচার। তখন নেমে এলো নাগিয়া। কিন্তু নাগিয়ার ওপর মানুষগুলোর অনেকদিনের রাগ পোষা আছে। গোপীনাথের পেটোয়া মানুষ নাগিয়া এতদিন নানা হলছুতোয় খুঁচিয়েছে মানুষগুলোকে। আজ নাগিয়াকে নাগেহাল হতে দেখে সবাই খুশী হলো। হাসলো সমস্তের। প্রেমভারার হাসি আর ধামতে চায় না। গজরাতে গজরাতে নাগিয়া গেল নিজের ঘরে। প্রেমভারা বললো,

—বাঘ বশ করতে শিখলে কোথায় ?

—আমি যে বাঘ পুষি।

আর একপললা হাসলো প্রেমভারা। বললো, —দেখা যাবে। ঐ বাঘের বাঘিনী আমি। সম্ভোবেলা দেখো।

সম্ভোবেলা কেন ? সকালে দেখতেই বা মন্দ কি ? উগ্র স্বরসা রঙ। স্বাস্থ্যের তেজে টান-টান চামড়া। নীলচোখে বিদ্যুৎ। যেন চড়া রোসে কেউ ইস্পাতের ছুরি খেলিয়ে নিল একখানা। চেরা সিঁথির হুঁপাশে কুলে উঠেছে ক্লিপে খাঁটা ক্লক চুল। জংলা ছাপের শাড়ি পরনে। কেমন হেলে-হলে চলে গেল মানুষ। নিজের ঠমকে নিজেই ভরা-ভরা।

আবার তখন দেখা গেল ছই হাতে দুটো বালতি তরে নিয়ে যাচ্ছে চাঁচের বেড়ার ঘরে। কাঁধে গামছা-কাপড়। ভরা বালতির জল চলকাচ্ছে না। হেঁটে যাচ্ছে যেন পা পড়ছে না মাটিতে।

মনোহরের গিঠে হাত রেখে সাধো ভাঙা কাঁদকঁদে গলায় বলে,

—তোমার কাজ তুমি দেখ। পরকে দেখবার দরকার কি ?

—দেখবার মানুষ যে।

খোঁলা গলাতেই বলে মনোহর। দেখতে মন্দর, তাই তারিফ করেছে। দোষ করেছে কিছু ?

—নাগিয়া দেখবে খেলার সময় তাঁবুতে। আর দেখবে মাস্টার। তোমার আমার দেখতে মনো। তবু ঠাণ্ডা মাহুয ভালো। জিজ্ঞেসাবাদ করে, খোঁজ-তালাস নেয়। মাস্টারের মতো নয়।

—মাস্টার মাহুয কেমন ?

জবাব না দিয়ে হঠাৎ সাননে থেকে একগোছা দড়ি তুলে নিয়ে—এই, এই ছুনহর !—বলতে বলতে লাটি-খাওয়া ঘুড়ির মতো ছটকে বেরিয়ে গেল একনম্বর। পেছনে পাড়িয়ে গোপীমাস্টার।

মনোহর নাথায় গোপীমাস্টারের চেয়ে একহাত লম্বা হবে। মুখোমুখি পাড়িয়ে সে হাসলো মাস্টারের দিকে চেয়ে।

নতুন বহাল মাহুযের সামনে গোপীমাস্টার জ্বরগন্ত মালিক। ব্যক্তিবিহীন গলাটা অকারণ কড়া ক'রে বললো,

—মাস্টার কেমন মাহুয, সে খোঁজ পরে করবে। নিজের কাজ দেখে বুঝে নিয়েছ ?

চরিত্রে ব্যক্তির নেই বলেই হয়তো গলাটা রুদ্ধ রক্ত না করে পারেনা মাস্টার। দুইনম্বর জোকার বৃষ্টি তাকে এড়িয়ে চলবে বলেই বাঘের খাঁচার ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। তাকে বিশ্রী একটা গালি দিয়ে ডাকলো মাস্টার। বললো,—নিয়ে যা ! নতুন মাহুয।

লায়ন-টেনার মনোহর, কিন্তু গোপীমাস্টারের মিঃ রাণাকে পোষ মানাবার কিছু নেই। ছোট খাঁচার রাতদিন কাটিয়ে রাণার বৃকের পাকড়া গোণা যায়। বিবর্ণ ফুল-পড়া চামড়া। মাহুযের নিরস্তর সাহচর্যে মাহুযের যে পরিচয় পেয়েছে রাণা, সেটা নির্বোধ ও নিষ্ঠুর। মাহুযকে পত্তর চেয়ে অনেকাংশে হীন জেনে রাণার চোখে একটা নিরুৎসুক স্মিয়-পড়া চাহনি।

রাণা ছাড়া আর একটা বাঘ আছে। এরা গোপীমাস্টারের কোনো সমস্তা নয়। মনোহরকে এদের জন্তে না রাখলেও চলতো। মাস্টার বললো,

—তোমাকে এনেছি বাদশার জন্তে। বাদশাকে খেলাবে নাগিয়া। কিন্তু নাগিয়া পোষ মানাতে পারে না। বাদশা বিগড়ে যায় ওকে দেখলেই। হাজার টাকা দিয়ে কিনেছি। বাদশাকে তুমি দেখবে মনোহর—

মুখোমুখি পাড়ালো মনোহর। খাঁচার সামনের দিকে বসে আছে কাত হয়ে, মাথা ঈষৎ তুলে। তিনবছরের ভাঙ্গা জ্ঞানোয়ার। বায়ুশোপ-কোম্পানির সায়েবের কাছ থেকে হাতবল হয়ে মবে এসেছে দার্কাসে। এখনো চামড়া সতেজ। পিন্সল সবুজ চোখের ভাড়া এখনো আফ্রিনের মৌত্যাতে সজ্জ হয়ে কুঁচকে যাতনি। জয়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকার-স্বরূপ সে জঙ্গল, নদী, পাহাড় ও আকাশের বিস্তীর্ণ একখানা মালিকানা পেয়েছিলো। সেইখান থেকে তাকে এনে এই স্বল্পপরিসর করেদে রেখেছে ঘাড়া, সে-মাহুযের ওপর তার কোনো আস্থা নেই। তার চোখে অনাস্থা আর ভাঙ্কিয়া। তবু সে ভাঙ্কিলোর দৃষ্টিতেও রাজকীয় মর্যাদা পরিপূর্ণ। মনোহর পাড়ালো খাঁচার সামনে। চোখে চোখে বাধা পড়ে সে মুক্ত হয়ে গেলো। তারিফ ক'রে বললো,

—আহা-হা ! চমৎকার।

কষ্টে পাশ ফিরল বাদশা। মাথাটা আন্তে নামিয়ে ছুই ধাবার ওপর রাখলো। আর তখন চোখে পড়লো বিশ্রী একটা লাল ঘা। বাড়ের কাছ থেকে সামনের ডান পারের ওপরের ভাঁজ অবধি নেমেছে। দেখে মনোহর বললো,—ইশ্ ! কেমন করে কাটলো ?

—ঐ নাগিয়া শা— ! বলে গালি দিয়ে মাটিতে থুথু কেলো নাগিয়ার সম্পর্কে আবার কষ্ট মন্তব্য করলো গোপীমাস্টার। বললো,

—ও-ই কাঁটা-তারের চাবুক মেরে ঘা করেছে।

—ভবে আর তাকে মানবে কেন তোমার বাঘ ? মারতে আছে কখনো ?

—একেই মানতে হবে তোমার। আমার

লোস্কান হয়ে যাচ্ছে। খেলাচ্ছে না বলে তো খাওয়া কামাই দিচ্ছে না বাঘ ?

মনোহর বললো,—বাঘ আমি মানিয়ে দোব। কিন্তু খাঁচা আমার বড় ক'রে দিতে হবে, মাস্টার। চওড়া হবে, লম্বা হবে। হু-হাত গা খেলিয়ে ঘুরে আসবে জানোয়ার। মাথার ওপরে কেমন হুকছে দেখছেন ? গরম হচ্ছেনা ওর ?

—প্রথমেই ঘে অনেক টাকার কথা বলছেন তুমি ?

—টাকার কথা বলোনা গো মাস্টারকে। টাকা খরচা করতে মাস্টার ভারী নারাজ।

প্রেমভারার কথা শুনে ডুকুটি করলো মাস্টার। বললো,—তুমি এখানে কেন ? সব কথাই কথা বল কেন প্রেমভারা ?

স্নান করে টিয়াপাখী-রঙের কাপড় পরেছে প্রেমভারা। চুলে রিবন বেঁধেছে। মুখে সাপা করে পাউডার মেখে ভুঙ্কর মাখখানে আলগা টিপ পরেছে। বেশ ঠাণ্ডা ভাব। এক কথা শুনেই চলে যাবার মতো ছটফট নয়। মাস্টারকে উপেক্ষা করে সে মনোহরের দিকে চেয়ে হাসল।

মাস্টারকে কিছু বলতে না দিয়ে মনোহর-ই মিষ্টি ক'রে হাসল। বললো,—উনি তো ঠিক কথাই বলছেন। তবে কি, খরচাটার দরকার আছে। হাজার টাকার জানোয়ার এমন দশ-বিশহাজার টাকা বেলা দেখিয়ে তুলবে। তার ঘরের জন্তে পঁচিশটা টাকা খরচ করবেনা ? সায়েব বলতো—

সকাল থেকে এই সায়েবের কথা তিন-চারবার শুনলো মাস্টার। এখন তাড়াতাড়ি খামাল মনোহরকে। বললো,

—ছুতোর ডেকে কুরান করে দোব। ঘর তুমি বানিয়ে নাও। আর দেখ যদি সায়েবের করতে পারো বাঘশাকে। এই কুড়িদিন বাঘে গোরাবাচ্চারে কলেক্টর মাঠে তাঁবু ফেলব। এক মাস চলেবে খেলা।

—দেবো।

এমনি ক'রে কাছে বহাল হলো মনোহর। লায়ন-টেমার মনোহর। জুবিলী পার্কসের বাঘ-সিংহের স্বহীন মালিক। মালিক কিসে ? না ওয়ির-ভদ্রকর করবে, ডলাই-মলাই করবে, জুপুর টাইমে খাঁচার ছাদ খড় চাপা দিয়ে ঠাণ্ডা করবে, খেলা অভ্যাস করবে। সকাল থেকে মালিকানা ভুঙ্ক মনোহরের, সন্ধ্যা অবধি। খেলা দেখাবার মালিক নাগিয়া। তখন আর মনোহরের কোনো কাজ নেই। তাঁবুর ভেতরে খাঁচা ঠেলে আনবার পর খাঁচার বোর খুলে দিয়ে পাশে পাড়াবে, সে-ও মনোহর। তার সেই খালসী প্যাঙ্ক, আর ডোরা-কাটা গেজি পরে। তারপরের তিন ঘণ্টার রাজা নাগিয়া। রাজা গোপীমাস্টার। সাটিন আর জরির জামা পরে, বুক বেডেলের মালা হুলিয়ে ব্যাণ্ডের তালে তালে বাদশা-রাণাকে নিয়ে খেলা দেখাবে তারা। আরবী-ঘোড়া বাহাঘুরের পিঠে পাড়িয়ে কসরত দেখাবে গোপীমাস্টার। দুইজনের খেলার কৌলুখকে স্নান ক'রে চুকবে প্রেমভারা। সাটিনের আঁটো পোশাক, জরির ছাতা জরির রিবনে তিন-ঘণ্টার রানী প্রেমভারা। নাগিয়া, গোপীনাথ আর প্রেমভারার মধ্যে ব্যাণ্ড বাজবে, মানুষ হাততালি দেবে, দুই জোকার সাথো-জাথো ভাঁড়ামো করবে। ডিগবাজি খেতে খেতে ঘুরবে। এসব সময় মনোহর কিছু করবে না। সে শুধু দেখবে পাশে পাড়িয়ে। সে শুধু সাহায্য করবে। নাগিয়ার খেলা হ'লে বাঘকে ঢুকিয়ে নেবে। ভক্সী হাতির পিঠে প্রেমভারা যখন আসবে তখন পায়ের কাছে লোহার বল গড়িয়ে আনবে। সে ট্রাপিঙ্কের দোলনা খাটায়ে। তাকে মাটিতে পাড় করিয়ে রেখে নাগিয়া আর প্রেমভারা উঠে বাঘে ছলতে ছলতে সেই ওপরে। তাঁবুর শীষের কাছে, মানুষের নাগালের বাইরে হেসে হেসে তারা কতো রকমের খেলা দেখাবে। কানাত-ভরা মানুষের সঙ্গে মনোহরও তাকিয়ে থাকবে ওপরে। এই তার কাজ। সে শুধু মাটিতে পা রেখে আকাশের দিকে চেয়ে থাকবে। এই

বাজনা, আলো, হাততালি আর উত্তেজনার ভগ্ন তার জন্মে নয়।

তিন ঘণ্টা কেটে গেলে আবার মালিকানা ফিরে পাবে মনোহর। খাঁচার আধারে ফিরেও বাঘের গরগরানি থামতে চায়না। অস্ত্রাসমত্তো ল্যাজ আছড়ে বাণা চায় আফিম। তখন বাঘের খাঁচায় জল দেবে মনোহর। খাঁচা আনবে খোলা আকাশের নিচে। বাগকে দেবে আফিম। বুড়ো হাতি জলকে বালতি-বালতি তল খাওয়াবে। কানের পিঠের একটা ঘা শুকোতে চাইছেনা জলদী। বুড়ো হয়ে গিয়েছে সে। বয়স এখন জরুর একটা নিষ্প্রিত গন্ধ জলদীর শরীর থেকে বেরোয়। চোখের কোলে কেবলই পিঁচুটি পড়ে। পিঠে বেয়ে উঠে নলন লাগাবে মনোহর জলদীকে বসিয়ে। চোখের কোণ পুঁছবে। শেকল পরিয়ে-পরিয়ে ঘা হয়েছিলো জলদীর পায়ের। ঘা সারিয়েছে মনোহর। শেকল বদলে দড়ির ব্যবস্থা করেছে।

এইসব সে বতরুল করবে ততক্ষণই সবচেয়ে বড়ো খাঁচাটা থেকে অসন্তুষ্টির একটা গরগরে আগুয়াজ উঠতে থাকবে। সব হ'লে পরে দেখানে যাবে মনোহর। খাঁচার দরোজা খুলে বাদশার গলার নিচে হাত দেবে। হুড়ুহুড়ি দেবে। আধো আধারে বাদশার চোখের মণি জ্বলজ্বল করে। তা দেখে ভয় পায়না মনোহর। বাদশার বিশ্বাস অর্জন করতে তার সময় লেগেছে। মানুষজনের সামনে নয়। রাতের আধারে বাদশার খাঁচার সাননে বার বার ফিরে ফিরে এসেছে মনোহর। অন্ধকারের গায়ে গা নিষিয়ে ভাব করেছে বাদশার সঙ্গে। বাদশার ভয় আর অবিশ্বাস ভাঙতে সময় লেগেছে। ইলেক্ট্রিক চাবুক দেখলে মাথা নিচু করেছে বাদশা। আবার চাবুক সরালেই গরগরিয়ে উঠেছে। বাদশাকে ভালবাসবার ইচ্ছে মনোহরের। তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেছে নাগিয়া। জোকার সাথো টিকিটকি দিয়েছে। তাজমহল-আকা গিট পরে স্কুটো কাঁচের দ্বলে বিলিক দিয়ে প্রেমতারা বলেছে,

—ও তোনার কাজ নয়। সে-সব মানুষ অল্প জাডের।

একদিন মরিয়া হয়ে মনোহর চাবুক কেলেই চুকলো বাদশার খাঁচায়। জাঘোকে বললো,

—যদি এমন-তেনন বুকিস্ তো মাস্টারকে ডাকবি, নইলে নয়। মোটে ভয় খাবি না। খাঁচার পাশে গুঁড়ি মেরে থাকবি চাবুক নিয়ে। চাইব তবে দিবি।

ঘাটা বেড়ে বেড়ে জ্বর হয়েছিলো বাদশার। মনোহর সাহস করে চুকলো খাঁচায়। এই পনেরো দিন ধরে এই একটা মানুষ তাকে খাবার দিচ্ছে, জল দিচ্ছে। বাদশা চিনেছে মানুষটাকে। এ যে তাকে বিশ্বাস করে, ভয় করে না—সে কথাটা বুকেছে। বুকে গরগর করলো এখন। খাবা তুলল না। খুঁকতে খুঁকতে পাশ ফিরল।

ভয়কে জ্বর করলো মনোহর। কি ক'রে কি হ'লো কেউ জানে না। সার্কাসের মানুষ অবাধ হয়ে- হয়ে দেখলো গরগর। সন্তা হয়েছে। খাঁচার দরজা খুলে মনোহর ঢুকে বাদশার গলার নিচের ঘায়ে ওষু লাগাচ্ছে মোটা ক'রে। ঘড়ঘড় করছে বাদশা। তবে তার চেয়ে বেশী দুঃসহে না।

আর সকলের সঙ্গে গোপীনাথও দেখতে এসেছিলো। দেখে, ভয়ে ভেতরটা তার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। উৎক্লম মনোহর যখন হাসতে হাসতে এলো, বললো,—মাস্টার পেয়েছি। এবার সাতদিনের মধ্যে তোনার বাদশা তাঁবুতে হবে।—তখন অল্প কথায় তাকে বিদায় করলো গোপীনাথ। মনোহরকেও ভয় করেছে তার।

ঘা সারতে-না-সারতে নতুন খাঁচা এলো। খাঁচা কাড়কাড় দিয়ে সাক করে খড় বিছিয়ে একদিন গৃহপ্রবেশ হলো বাদশার। পুরোনো খাঁচা সামনে এনে দরজা তুলে ধরতে নতুন খাঁচার ঢুকলো বাদশা। এ খাঁচায় জায়গা বেশী। চলাফেরা করা যায়। মাথার ওপরে জালি-কাটা মোটা জাল। রোদ এসে গায়ে লাগে। মনের খুশিতে হাঁকার দিলো বাদশা।

যতক্ষণ সবাই হাসিমুখে দাঁড়িয়ে দেখছিলো মনোহরের কাণ্ডবাত, ততক্ষণ প্রেমতারা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলো। এতদিন ধরে শুধু দেখছে প্রেমতারা। তাকে দেখেও যে দেখেনা, যে মাল্লবের চোখে তারিফ ফোটেনা। প্রেমতারার জোলু দেখে, তার সঙ্গে সেধে কথা বল মান খোয়ায়নি প্রেমতারা। তবে তার নীল চোখ টান করে দেখেছে নজর ক'রে, কেমন সকলের মধ্যে থেকেও স্বাধীন চলাফেরা মানুষটার। কেমন ক'রে দুই জোয়ান হাতের সেবাঘরে সে বনের বাঘটাকে বল করলো। দেখলো, কেমন কাঙড়া ভালবাসে মনোহর। যা করে, কৃতি ক'রে করে। তাকে দিয়ে যে অস্ত্রায় খাটিয়ে নিচ্ছে গোপীনাথটার, সে বোধ যেন মনোহরের নেই।

আজ আর চুপ করে রইলোনা প্রেমতারা। তার পাশে দাঁড়িয়ে কটা রসের কথা বলছিলো নাগিয়া। বলছিলো,

—আমি তুমি পালিয়ে যাবে। মাস্টার বড় বেইমান। টাকা নিয়ে আমি তুমি দল বানাবে। তোমাকে আমি সাজা সোনার চুড়ি দেব প্রেমতারা!

এরকম কথা নাগিয়া রোজই বলে। প্রেমতারার রোজই শোনে। আজ আর শুনল না। শুনতে-শুনতেই নাগিয়ার অস্তিত্ব একেবারে ঝেড়ে কেলে দিয়ে এগিয়ে গেল। মনোহরের মুখোমুখি দাঁড়াল। বললো,

—চল মনোহর, চা খাই।

নিজের তাঁবুতে স্পিরিট-ল্যাম্প জ্বালে নিজের পেয়ালায় চা ক'রে মনোহরকে দিলো প্রেমতারা। মনোহর মুখ হয়ে বললো,

—আজ খুব কোনদিকে উঠলো প্রেমতারা?

মিষ্টি হাসলো প্রেমতারা। বললো, *

—আজ যে তোমার বাদশা নতুন ঘরে এলো গো! নতুন ঘরবসত হলে মিষ্টি খাওয়াতে হয়না মানুষকে?

—তবে আমিই মিষ্টি খাওয়াব।

প্রেমতারা দেখছিল মানুষটাকে। বললো,

—জানি যে তোমার ছিঁড়ে গেছে, মনোহর। ছেঁড়া জামা পরে তাঁবুতে বেওনা তুমি। বাস্টারকে বলতে পারো না?

—বলছে, মাস্টার পেলেন কিনে নিতে। এমন একখানা জামা লেখিছি না?—এই সবুজ রঙ, চওড়া কলার, একেবারে ফাস্‌ফ্রাস!

এ কথাটা বলা উচিত কি না-উচিত একবার ভাবলো প্রেমতারা। তার পর বললো,

—পঞ্চাশ টাকা মাইনে দেবে, জামা কিনতে হবে নিজেকে? কেন, টাকা তুমি বাড়াতো বলতে পারো না?

—সার্কাসে টাকা কোথায় প্রেমতারা? লস খাচ্ছে না মাস্টার?

গোপীনাথ তাকে বা বুকিয়েছে তাই সরল বিশ্বাসে বলে মনোহর। প্রেমতারার বিস্মিত হয়। বলে,

—কিরকম সোব মানুষ তুমি? এই না শুনি কত মিলিটারী গুলে খেয়েছো? আমিই বলবো, দেখো।

গোপীনাথকে কথা বলবার অস্ত্র কাঁদনা প্রেমতারার। চেয়ারের হাতলে বসে মাস্টারের চুলে আঙুল চালিয়ে প্রেমতারার বললো,

—তোমার ঐ মানুষটিকে জামা কিনে দাও মাস্টার! ছেঁড়া গেজি পরে তাঁবুতে ঢোকে—আমাদেরই যে লক্ষ্যের কথা।

প্রেমতারার বললে গোপীনাথ সব করতে পারে। সেদিনই বিকেলে মনোহরকে ডাকলো গোপীনাথ। বাস্তু খুলে একপ্রস্থ নতুন পোশাক বের করে দিল।

সেদিন সন্ধ্যায় জাপানী ছাতা হাতে তারের ওপর নাচতে নাচতে যখন ঢুকলো প্রেমতারা, নিচ থেকে নতুন মানুষ তাকে অতর্কিত জানালো। দেখে খেলার কীকই চোখে তারিফ করলো প্রেমতারা। লাল-হুকটুকু আটো গেজি আর নতুন সবুজ প্যাণ্ট।

গেঞ্জির বৃকে স্বতন্ত্র আঁকা ফুলপাতা। নতুন পোশাকে নতুন দেখাচ্ছে মনোহরকে।

এমনি করে ছবিদী সাক্ষাৎ তিড়ে গেল মনোহর। ঘর পালিয়ে চা-বাগানে কাজ করেছে মনোহর। নিলিটারী সায়েবের চাকর হয়ে চিতাবাঘ পুষেছে। জাহাজে সন্দরবন থেকে চাটগাঁ গিয়েছে খালানীর কাজ নিয়ে। চাটগাঁ থেকে তাকে এনেছিলো এক সায়েব। জীবজন্তু ধরে চালান দেবার ব্যবসা তার। জীবজন্তু সম্পর্কে মনোহরের অশ্চর্য মনস্তঃ দেশে অনেক বিখ্যেছিল সে।—চিকিৎসা, চ্যু করার নিয়ম—এই সব। বড়ো একখানা সার্টিফিকেট লিখে নিয়েছিলো যাবার সময়। সেই সার্টিফিকেটের জোরেই এখানে চাকরি পেলো মনোহর।

তবে ঐ কথা। নফর হয়েই বইলো। নাগিয়ার সাতাবা করতে গিয়ে ট্রাপিঞ্জের খেলা শিখলো অনেক কষ্ট করে। বাদশাকে নিয়ে নতুন খেলা বের করলো। গোপীনাথটার তাকে কোনদিনও সুযোগ দেবেনা সে জানে। তাই একলাই তাঁবুতে সোল খায় মনোহর। হারাণ আর সাপো-জাদো দেখে তারিফ করে। প্রেমতারা দেখে। তারিফ করে না। ছি-ছি করে। বলে,

—তুমি কি পুতুর নামহু? পকাশ টাকা দিয়ে তোমাকে নফর খাটাচ্ছে নাস্টার, তাই তুমি মেনে নিচ্ছো? কেন? ভর পাও কেন? যাও, বলতে পারোনা—আমায় নাইনে বাড়িয়ে দাও? বলতে পারোনা, নফর হয়ে থাকব না আমি—আমায় খেলা দেখাতে দাও?

এসব কথা শুনেও শোনেনা মনোহর। ই্যা, এখনো নফর মনোহর। প্রেমতারার সঙ্গে সমানে-সমানে খেলা দেখাবার কথা সে ভাবতে পারে না। আশমানে গিয়ে তারা হয়ে ফুটে থাকিও তার চেয়ে সহজ কখনো। গোপীনাথ তার সে-সব দাবি মানবে না।

তবু মনোহর স্থখী। স্থখ তার পচিবছরের জোহান শরীরের প্রতিটি চলাকোষায় পরিফুট। প্রেমতারার বকুনি শুয়ে আনন্দ তার বেড়ে যায়। বেশুরো গলার আভেবাজে গান গেয়ে ওঠে,

—“শামুসেরকা কালো ঘোড়া ছুঁই ছায়।...”

বালতি হাতে ছুটে ছুটে কাজ করে। তার এক স্থখ বাঘশা। বাদশার সঙ্গে দোস্তিতে তার আনন্দ। আর-এক স্থখ প্রেমতারার। প্রেমতারাকে দেখে তার আনন্দ। মেখেই সে খুশী।

তার বেশী কিছু চায়না মনোহর। [কথনঃ]



ক্যালকাটা অপটিক্যাল কোং (প্রাইভেট) লিঃ

ফোন • ৩৫ - ১৭১৭ প্রতিষ্ঠাতা: ডাঃ কার্তিক চন্দ্র বসু এমবি
গ্রায়-কালসপটিকো • ৪৫ নং আম্বদ্বার্ড স্ট্রীট • কলিকাতা - ৫

অনুরূপা দেবী

ভ্রামা প্রসাদ সরকার

একনিষ্ঠ সাধনার দলে শক্তিমান রচনা বিধে যে কয়েক মহিলা-সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, অনুরূপা দেবী নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে গভীর জীবনবোধ, সংস্কৃতি ও একটি স্বাচ্ছন্দ্য পিত্ত-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার এই জনপ্রিয় লেখিকা অনুরূপা দেবী গত ৬ই বৈশাখ, ১৩৩৪-র সকালে এ-জগতের যাত্রা সত্যিই অন্তরঙ্গভাবে চলে গেছেন। তাঁর কৃত্যেতে আমরা এক আশ্রয়স্থানের বিয়োগব্যথা অনুভব করছি।

১৯৮১ সালের ২৪শে ডান্ডা অনুরূপার জন্ম হয় শহর কোলকাতার। তাঁর পিতা সুকৃষ্ণদেব মুখোপাধ্যায় ও মাতা ধরানুসারী দেবী আশ্বিনী পিতামহী ছিলেন। তাঁদের বাড়িতে সাহিত্যিক পরিবেশ ছিল। ছেলেবেলা থেকেই অনুরূপা সংস্কৃত ও বাংলা কাব্য-সাহিত্য চর্চা করতেন। পিতামহ কৃষ্ণদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব তাঁর জীবনে অপরিণীত। মাতামহ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কোলকাতার আধুনিক নাট্যসমাজের প্রবর্তক। ছেলেবেলায় অনুরূপা ছিলেন চক্কা। তাঁর প্রথম রচনার পিছনে এক কৌতুককর ঘটনা জড়িয়ে আছে। তখন সবে তাঁর দিদির বিয়ে হয়েছে। স্বস্তরবাড়ি থেকে গড়ে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন দিদি। অনুরূপা ডাবনার গড়েন। এই চিঠির জবাবও তো পড়ে দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু পিছু হট্টেন না অনুরূপা। আট বছরের মেয়ে 'কল্যাণী'-এর এক সংকৃত গল্প বাংলার অনুবাদ করে পাঠালেন দিদির কাছে। এই হলো অনুরূপা দেবীর প্রথম বাংলা রচনা। 'রাধী দেবী' ছদ্মনামে লেখা তাঁর প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প 'কৃষ্ণলীল পুরকার প্রতিযোগিতা'র সফলনে মুদ্রিত হয়। কৃষ্ণলীল-পুরকার তাঁর সাহিত্যিক মনকে সাহস দিল—তিনি নতুন কিছু লিখবার ভরসা পেলেন।

বাংলা ১৯১১ সালের ১৩ই কাছন অনুরূপা বালি-উত্তরশাড়া শ্রীনিবারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয়-স্বত্রে আবদ্ধ হন। শিবরনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে অনুরূপা যান বক্স-করপুরে। এই বক্স-করপুরেই তাঁর সাহিত্য-রচনা চলতে থাকে। তাঁর বিখ্যাত

উপন্যাসগুলি তিনি বক্স-করপুরেই রচনা করেন। শিবরনাথ অনুরূপার সাহিত্য-সাধনার কোনদিন প্রতিশূল হননি, বরং আত্মশূল্য করে এসেছেন বহাবধ। শিবরনাথ শান্ত, অস্বাভিক এবং মধুর স্বভাবের ছিলেন। বক্স-করপুরে অনুরূপার সঙ্গে আলাপ হয় রবীন্দ্রনাথের কন্যা মাদুলীলতার। অনুরূপার অসুখ ব্যবহার মাদুলীলতার মন জয় করলো। উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টার ফল: বক্স-করপুরে গড়ে ওঠে 'চ্যাপম্যান গার্লস স্কুল'। নীর্থবিন এই বিদ্যালয়-পরিচালনার সঙ্গে তাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নারীশিক্ষা-প্রচারণার পথে এটি অনুরূপার প্রথম পরীক্ষণ।

কুমার লেখিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভই অনুরূপার জীবনের একমাত্র কাম্য ছিল না। তিনি সমাজ-সংস্কারকও ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে তিনি সংস্কারক মন



অনুরূপা দেবী

নিজে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন চরিত্র। এবং আশ্চর্য শফলতাও লাভ করেছেন। নিজের আদর্শকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন অমরুণা, কিন্তু কোথাও কোনো চরিত্র বা কাহিনী এতটুকু অস্বাভাবিক হবে ও—নি। এইভাবে তিনি আপন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছেন। শক্তিময় শিল্পী না হলে এ ধরনের সফলতা-লাভ হুজুর।

বাংলা সাহিত্যের অনেক লেখক-লেখিকা যখন বিদেশী সাহিত্যিকদের ব্যর্থ অমরুণ করে যৌন-আবেগ-মূলক গল্প দিচ্ছেন, অমরুণা দেবী কর্তারভাষায় তখন তাঁদের সমালোচনা করেছেন। এইদম 'পারডাউজ' লেখক-লেখিকারা চিরকাল অমরুণার খুণার পাত্র। একান্ত সভায় চলন্ত প্রতিবাদ করেছেন অমরুণা দেবী। যে-কোনো স্তম্ভিন, বুদ্ধিদম্বর মানুষের এই ধরনের শাণীনতা-বিহীন সাহিত্যসৃষ্টির বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত বলে মনে করতেই অমরুণা দেবী।

আদর্শবাদী অমরুণা ছিলেন শঠভাষী। অনেক অগ্রিয় কথা প্রকাশ্যে বলতে তিনি এতটুকু বিধা বোধ করেননি। যে আওপত্য নিয়ে তিনি কয়েছিলেন—তার রচিত সাহিত্যে সেই সুর ধনিত হচ্ছে।

বিভিন্ন নারী-আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ছিলেন। সমাজে নারীর প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে পিছিয়ে যাননি অমরুণা দেবী।

মহাভারতের বাক্যকালীন বিহারের বিখ্যাত কুমিকল্প (১৯০৪ ইটকের ১৫ই জাহুয়ারি) তার বাড়ি ভেতে দেয়। তিনি আশ্চর্যভাবে এই ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে বেঁচে যান। তবে তার এক গোঁরা এই দুর্ঘটনার নিহত হয়।

এই ঘটনার পর তিনি ফিরে আসেন কোলকাতা। কোলকাতার এসে তার সমাজ-সংস্কারক মন ছুটকট করে উঠলো। তিনি ভাবলেন, কিছু করা সরকার—নতুন কিছু করা সরকার। 'নারীকল্যাণ আশ্রম', 'বায়ীশীঠ', 'হিন্দু মহিলাশ্রম' ও 'অমরুণা বাসিকা বিজালয়'-এর প্রতিষ্ঠা হলো। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই সংগঠনগুলির সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগজাগ্রিতী বর্ণনক' ও 'ভূবনমোহিনী বর্ণনক' দিয়ে সম্মানিত করেন অমরুণা দেবীকে। বাংলার বিভিন্ন সংগঠন তাঁকে নানা উপাধিতে ভূষিত করেন।

সে-সুগের 'ভারতী' পত্রিকার অনেকগুলি গল্প ও উপস্তান লেখেন অমরুণা দেবী। বাংলাবেলের বিভিন্ন গল্প-পত্রিকার তার রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বাঙালী মহিলা-সাহিত্যিকদের মধ্যে অমরুণা দেবীর মতো এতখানি সম্মান আর কেউ বোধ হয় পাননি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'শীলা অধ্যাপিকা'র সম্মান দিয়েছিলেন।

অমরুণা দেবীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী: পোস্তপুত্র, মহানিশা, মা, মন্ত্রপতি, জ্যোতিহার, বাসুদত্তা, উত্তরায়ণ, পৃথগাঙ্গা, চক্রে, সর্গাঙ্গী, বিবর্তন, বিধাত্রি, হারানো বাতা, গরীবের চেয়ে, সোনার বনি, জিবেশী, বামগড়, জোয়ার-ভাটা, প্রাণের পরশ, শবের সাই, রাতা শাখা, চিত্রবীণ, ধুমুরী, উষা, বিহারণ্যা, কুমারিগড়, নাটা চলুই, বর্ষচক, সাহিত্যে নারী, সাহিত্য ও সমাজ, বিচারপতি, উত্তরাধিকার পর ও ব্যতিক্রম্য বাসলে।

আলাদাভাবে শ্রীমতী উপর্য উপর্য কনক পুট



পঞ্চপাণ্ডবের রথের যেষে

নির্মল দত্ত

চলেছি পল্লব-স্বপ্নভোর রাজ্যের গবে।

বাস এসে দামল—পঞ্চপাণ্ডবের রথের যেষে
মহাবলীপুত্র-এ।

চািরিকটা একবার ভালো করে তাকিয়ে নিই। শত্টিই
চোখ বেন ছুঁড়িয়ে দাি। নিগমপ্রসারিত নীল সমুদ্রবধা
আর সবুজ তরুস্বাক্ষি অর্ধ নৌকর স্বটি করে ছলেছে।
আর এই তরুস্বাক্ষির কাঁকে ঠাঁকে উঁকি দিচ্ছে স্থপতি-শিল্পের
দল।

এততো কিছু আগে পক্ষীতীরের পুণ্য অর্জন করে
এগেছি। কিন্তু এখানে এসে মনে হচ্ছে, সে পুণ্যে বেন মন
ডরেনি। মন ভরল এখানে এসে। সেগি বেন সর না।
কৃতপায়ে এগিয়ে চলি—প্রথ পর্বতগাত্রে খোদিত মূর্তি-
শ্রেণীর আকর্ষণে। মনে পড়ে পল্লব-রাজ্য প্রথম নরসিংহ-
বর্ষণের কথা। ঝার নাম থেকে জারগার নাম হয়েছে—
মহাবলীপুত্র। নরসিংহবর্ষণের উপাধি ছিল 'মামর' বা
'মহামর', তার থেকে মামরপুত্র অথবা মহামরপুত্র।
তার থেকে উৎপত্তি মহাবলীপুত্র।

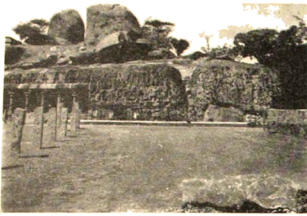
তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে পল্লবদের আধিপত্য হয়েছিল
এবং কাকিতে ছিল তাঁদের রাজধানী। এই পল্লবদের দ্বারা
হিন্দু-সংস্কৃতির প্রসারলাভ ঘটে। শুু তাই
নয়, ভারতের বাইরেও পল্লব-মুদ্রার সংরক্ষিত
ছড়িয়ে পড়বার বিশেষ সাহায্য করে
মহাবলীপুত্র বন্ধর। একদিন এখানে কত
মাহুকের কোলাহল, সৈন্ত-সিপাইয়ের হুঙ্-
নিবাস, রাজ্য-যত্নীকের আনানোনায সব
জারগাটা মুগ্ধরিত হয়ে ছিল। দলে দলে
মুসাহসিক ভারতীয় সওদাগরেরা পণ্য-
বোঝাই জাহাজ ডািপিয়েছে জলে—পৌঁচেছে
সিংহল, মালয়, দববীপের বন্ধরে বন্ধরে।
কিন্তু আজ? আজ পুরাকালের সেই
জংসপুত্রী বেন শুু শেদিবের সেই সাক্ষ্যকে
বহন করে চলেছে, মাহুকের মনের পাতায়
পাতায়—সেই সত্তর শতাব্দীর থেকে শুরু
করে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত। পল্লবরাজ
মহেন্দ্রবর্ষণ থেকে তাঁর পুত্র নরসিংহবর্ষণ,
তার পর নন্দীবর্ষণ পর্যন্ত। বেন স্থপতি-

শিল্পের বেলা বসল এখানে মহাবলীপুত্র-এর দিকে দিকে।
বৌদ্ধধর্মের পরাজয় ঘটল শৈবধর্মের কাছে। শৈবধর্ম-
প্রেশের পর রাজ্য মহেন্দ্রবর্ষণের শুরু হ'ল শিবমন্দির-নির্মাণ-
করা। রাজ্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল স্বাক্ষির-স্বাপত্য-শিল্পের
প্রতিষ্ঠাতা রূপে। তা পূর্ণাঙ্গ হ'য়ে উঠল তাঁর চেয়ে
খ্যাতিমান রাজ্য নরসিংহবর্ষণের আমলে। স্থপতি-শিল্পের
পূর্ব বিকাশ দেখা দিল তাঁরই সময়ে।

পঞ্চ চলতে চলতে সর্বাঙ্গে মুষ্ট পড়ে দীপাধার বা
আলোকস্বত, আর এখানে পর্বতগাত্রে খোদিত মূর্ত্যাবলীর
প্রতি। আলোকস্বতের নীচেই মহিমমদিনী-মণ্ডপ। এই
মণ্ডপ বা গুহাটি পর্বতগাত্রে একটি বড় গুহা-বিশেষ। এরই
শেওদাগরগাত্রে খোদিত আছে তিনটি মূর্তি—মহিমমদিনী,
পার্বতীশরযেশ্বর (শিবসুর্গী) ও রত্ননাথ (বিষ্ণু)। অনেক
একে বসুপুত্রীও বলে থাকেন। ৩০০ থেকে ৩২০ খ্রীষ্টাব্দের
মধ্যে নির্মিত এই মণ্ডপ নরসিংহবর্ষণের কৃতিত্বের পরিচয়
দেয়। তা ছাড়া এই দীপাধার দ্বারের সমুদ্রের দিকটিকে
তেখাত পঞ্চ—কাকির বন্ধরের গব। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত
চলেছিল প্রাচীন দীপাধারের কাজ। তারপর অদ্যত তৈরি
হয়েছে একালের নতুন আলোকস্বতটি।



মহাবলীপুত্র-এ প্রাচীন দীপাধার। আর নীচেই পাণ্ডাগাত্রে মহেন্দ্র মহিমমদিনী-মণ্ডপ



বিশ্বনাথ-এর ভাট ও মন্দির

দিকে। ধানিকটা বেঁটে এসে উপস্থিত হই সৈকত-মন্দিরের (the shore temple) মাথানে। সন্মুখের জলের ধার ঘেঁষে উঠে এসেছে যেন এ মন্দির। নীল সন্মুখের টেটে আচ্ছাদিত পড়ছে মন্দিরের পাদদেশে—যেন দেবতার কাছে সন্মুখের আচ্ছাদিতবেশন। অসুখ সে পুস্ত। পরব-রাত রাক্ষসিদের আমলে তৈরি হয়েছিল এই মন্দির (৩৭৪ খ্রিঃ)। এককালে এখানে ছিল সাতটি বড় বড় মন্দির। এইজন্তে একে বলা হ'ত 'সপ্তমন্দির' (Seven Pagodas)। আর দুটি শীর্ষ দ্বারা দেখা যায়। সবই হয়েছে সন্মুখের জলে বিলীন। এটুকুও ঢাকা পড়েছিল সন্মুখের বাস্তুবানিতে। বাস্তু প্রকৃতি অপসারিত করে ১৯৪০-৪৫ সাল থেকে

মহিবলিনী-মণ্ডপের ধর্ম-মন্দির আর-একটি মণ্ডপ। সেখানে খোদিত আছে—শ্রীকৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন-উত্তোলনের দৃশ্য। শ্রীকৃষ্ণ বঁচাত ধরে ছুলে ধরেছেন গিরিগোবর্ধনকে। তার নীচে ঠাঁড়িয়ে গোপ আর গোপিনীরা। ইতঃ ছুলেছেন বড়। তাই গোপ আর গোপিনীদের কক্ষকক্ষে গিরিগোবর্ধনকে মাথায় ওপর ছুলে তাদের বড় থেকে বলা করছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। পর্বতগগরে খোদিত এই দৃশ্য শুধু প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শনই নয়—যুগে যুগে ভক্তদের স্কার করে ভগবানের মর্ত্যস্থিতে আগমনের কাহিনী। এরই পাশে অম্বুনের তপস্বীর দৃশ্য। মহাভারতের কাহিনী থেকে এই দৃশ্যের অবতারণা। আর একটিকে হচ্ছে গঙ্গাবতরণ। তন্ত্রধর্মকে অমূল্য করে আর্কটুবিতে নেমে আসছেন গঙ্গা কপিলমুনির পাশে জংলপ্রান্ত সগরবংশের বটীহাজার ছেলের উজ্জ্বলের জন্তে। পথে জন্মমুনি বহুভূমি প্রাপ্তি করার অনুরোধ গঙ্গার সব জল পান করে নেন মুনিস্বর। অবশেষে তন্ত্রধর্মের তবে ভুট্ট হ'বে সেই জলধারাকে মুক্তি দেন তিনি নিজের জন্ম বিবীর্ণ করে। মহাবলীপুত্র হ'বে রেখেছে সেই উপাখ্যানটিকে পর্বতের গারে। প্রাচীন এই শিল্পনৈপুণ্য ধর্মকে আঙও মুদ্র করে।

এ ছাড়া এদিকে আছে আরও কয়েকটি গুহা ও ভট্টাঙ্গি—গণেশ-মণ্ডপ, বামদেব-গুহা, বিত্তীয় বরাহ-গুহা, ত্রিভুজ-গুহা প্রকৃতি। শ্রীকৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন-উত্তোলন-গুহার সন্মুখের পথ ধরে এদিয়ে গেলেছি সোজা সন্মুখের

মন্দিরটি বস্তু হচ্ছ সরকারী তত্ত্বাবধানে। মন্দিরের প্রস্তর আর বস্তুটি আরও উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের ভেতর বিরাট শিবলিঙ্গ : ধানিকটা তার ভিতর। স্থানীয় অধিবাসীরা বলেন, মূলমন্দির নাকি ভেঙে দিয়েছিল তা। শিবলিঙ্গের শেড়নের বেওড়ালে খোদিত পার্বতীশরবৎসরের মূর্তি। আর আছে বিনয়—অনন্তদমন শারিত। জনহীন প্রান্তরে দেবতাকুল যেন আঙও করছেন মর্তের মাহুকের জন্তে কল্যাণ-কামনা। কিন্তু মাহুকের কি পুষ্টি আছে সেদিকে ?

সৈকতমন্দির ছাড়িয়ে বিপরীত দিকে এদিয়ে এসে পৌঁছাই পক্ষপাতের রথের এলাকা। মহাবলীপুত্র-এর মন্দির, মণ্ডপ, গুহা-সবই পাথর থেকে তৈরি। বিভিন্ন নির্মাণ-শ্রেণী অস্থায়ী চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে সবগুলোর—(১) এক-প্রস্তর-স্তম্ভ অর্থাৎ দুই পাথরের অর্ধ কেটে তৈরী এক একটি স্তম্ভ বা মন্দির ; (২) গুহা-ভিত্ত অর্থাৎ প্রস্তরগারে খোদিত করে তৈরী মণ্ডপাঙ্গি ; (৩) খণ্ড পাথরের তৈরী মন্দিরাঙ্গি ; ও (৪) পাছাড়াগারে খোদিত পুস্তাঙ্গি।

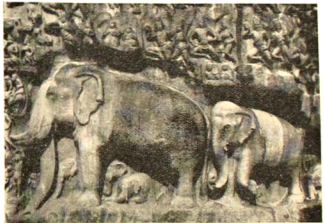
মহাবলীপুত্র-এ সমগ্র মন্দির, গুহা, মণ্ডপাঙ্গি সেবে এই নির্মাণ-শ্রেণীভাগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর প্রথম শ্রেণীতে পড়ে এই পক্ষপাতের রথ। বাকী তিন শ্রেণীতে পূর্বাঙ্গ মণ্ডপ, মন্দির, গুহা-সবই। পক্ষপাতের রথের ভূমিতে এসে প্রত্যয় যাণা নত করি অথবা সেই শির-সন্মুখের উদ্দেশ্যে। এ শুধু পক্ষপাতকে প্রস্তাবতর্পণ নয়,

ভারতের স্থাপত্য-শিল্পকে অমর করে রাখা। পাণ্ডব-জ্ঞাতা আর তাঁদের পত্নীর নামে পাঁচটি রথ—ধর্মরাজ, ভীষ্ম, অর্জুন, দ্রৌপদী আর নকুল-সহদেব রথ। পাঁচটি রথের নির্মাণ-কৌশলের মাঝে কিছু পার্থক্যও আছে, নামও আছে বিভিন্ন রত্ন—মহেন্দ্রপদ্ধতি, মামলপদ্ধতি ও রাজসিংহ-পদ্ধতি। জানা যায়, প্রধানতঃ তিনজন পল্লবরাজ্যের আমলে এই রথগুলি নির্মিত হয়েছিল খ'লে নির্মাণপদ্ধতির নামকরণও করা হয়েছে সেইসব রাজাদের নামে। মহেন্দ্র-বর্ষণ ও নরসিংহবর্ষণের আমলে এক-প্রস্তর-স্তম্ভ বা মণ্ডপাদি নির্মিত হ'তে থাকে। কিন্তু রাজসিংহের আমলে এক-প্রস্তর থেকে রথাদি তৈরি বন্ধ হ'য়ে আসে এবং নির্মাণ-কালকারণও পূর্বের চেয়ে নিকটতর দেখা দেয়।

পদ্মশালার রথের মধ্যে 'ধর্মরাজ রথ'-ই সর্বদক্ষিণে। ড্রাবিড়ীয় আকারে নির্মিত ও তিনস্তম্ভ-বিশিষ্ট এই রথটি নির্মিত হয়েছিল প্রথম নরসিংহবর্ষণের আমলে, অর্থাৎ প্রায় ৬০০ থেকে ৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। রথটি দেখতে বানিকটা পিরামিড-রচনের। কিন্তু আকারে চতুষ্কোণবিশিষ্ট। এই ভিত্তিগত বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি খোদিত। দেবদেবীর মূর্তির মাঝে নরসিংহবর্ষণের নিজেরও মূর্তি আছে। ধর্মরাজ-রথের পরেই ভীষ্মরথ। মামল-ধরনে নির্মিত এই ভিত্তি সমকোণী চতুর্ভুজের মতো ও উপবিভাগ চালাথরের মতো। চারদিকে চারটি খাম আছে, কিন্তু কোনো মূর্তি খোদিত নেই। ভীষ্মরথের পরেই চোখে পড়ে অর্জুন-রথকে। অর্জুন-রথ বানিকটা ধর্মরাজ-রথের মতোই দেখতে। এই রথে যে-মূর্তি খোদিত আছে, তার মধ্যে নকীর ওপর আচ্ছন্ন শিব, ঐশ্বর্যভের ওপর ইন্দ্র, গরুড়ের ওপর বিষ্ণু প্রধান। এই রথের পেছনেই রয়েছে নকীর একটি অশ্বশাস্ত্র মূর্তি। অর্জুন-রথের পরেই যে রথটি রয়েছে, সেটি হল দ্রৌপদী-রথ। ত্রীকোণা ঈর্ষ্যময়ের মতো তৈরী এই রথটির সম্মুখের দিকে দু'শাশে দুজন রয়েছে দ্বারপালিকা। এই রথটির সম্মুখে একটি পাথরের সিংহ-মূর্তি

ও আর একই আগে একটি হাতির মূর্তি। এই রথগুলির বিশালত্ব দিকে রয়েছে নকুল-সহদেব-রথ। এতে কোনো মূর্তি খোদিত নেই। এই হল পদ্মশালার রথের মোটামুটি পরিচয়।

পল্লবদের স্থাপত্য-শিল্পের রাজ্যে এসে ভ'রে উঠেছে যন—প্রাচীন ভারতের এই শিল্প-শৌর্যের জন্তে দখল মনে হচ্ছে নিজেকে। এবার দ্বিগুণ বেড়েছে। বাস ছাড়ার সময় হবে এল—এটাই শেষ শাস। রাতে থাকবার ব্যবস্থা আছে—ডাকখাণ্ডেশ্বর, নিবেদনশকে মাথা গোঁজার চোটেলাও আছে একটি। কিন্তু থাকবার ইচ্ছা নেই। সময় সংক্ষেপ। ক্ষতপায়ে তাই পথ চলি। চলতে চলতে খামস্তম্ভ ও হয় মাঝে মাঝে—সবের দীর্ঘ-পর্যবেক্ষণ-কারিগীর জন্তে। আশুনিচ: তরুণী' হ'লে কি হবে—তবু তো মোটামুটি অবলা



মায়াকৌশল-এই পদমস্তকে খোদিত হস্তী

নামের অধ্যাত্ম! শেষ হয় পাথর-চলা পথ। উঠে যদি থাকে। বিদ্যার নেহে গাইড তার যথাপ্রাপ্য নিবে। বিদ্যার জানাই—মাত্রাক থেকে ৩৪ মাইল আর পলকীতীর্থ থেকে ১১ মাইল দূরের পল্লবদের স্থাপত্যের রাজ্য মহাবলীপুত্রমুখ—একবার তাকিয়ে নিই পেছন দিকে।

যাত্রী থোকায় নিরে বাপটুও যেন সেই বিদ্যারের পায়ের পা মিলিয়েছে।

জৈব-গ্রাক্টিং

শ্রীপরিভোযকুমার চন্দ্র

গাছের একটা ডাল কেটে কেলে সেটা যে ঘরে যাবে এটা ভাবাই স্বাভাবিক,—কিন্তু আসলে ঠিক তা হয় না; কারণ তাই যদি হতো, তবে ভালো কাজের ফল বা ফুলের উৎকর্ষতা বন্ধার রাখার উদ্দেশ্যে বহুকাল ধরে যে কলম-বাঁধার রীতি প্রচলিত আছে সেটা কোনো-কিন্তু সম্ভব হতো না।

গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন-করা একটা ডাল অল্প গাছে লাগিয়ে দিলে সেটা যখন ঐচে থাকে এবং এক সময়ে বেনামুখ্য ছুঁড় যাবে, তখন জীবদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন-করা কোনো অল্প অল্প জীবদেহে লাগিয়ে দিলে, গাছে কলম-বাঁধার নিয়ম অনুযায়ী সেটাই বা জোড়া লাগবে না কেন?—এই প্রশ্নের সমাধান-প্রচেষ্টা থেকেই জীবদেহেও কলম-বাঁধা-পদ্ধতির উদ্ভব হোয়ছে বলে মনে হয়। গাছে কলম-বাঁধাকে ইংরেজিতে গ্রাফ্টিং (grafting) বলে। ভারতী অল্পকরণে করা হয় বলেই গোবর্ধন জীবদেহের কলম-বাঁধাকেও গ্রাক্টিং বলা হোয়ে থাকে।

কানো-চোপ তুলে কেলে, রোগগ্রস্ত দেহবস্ত্র—বগা, ছপটিও, কুসড়াল ইত্যাদি নিমূল করে, আকস্মিক ছুঁটনার দিনই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে বাদ দিয়ে সমুদ্রত বা জীবিত দেহ থেকে প্রয়োজনীয় বস বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে সেইসব জায়গার বসিয়ে দেওয়া, আগুন পুড়ে বা অল্প কারণে বিকৃত প্রাকৃত স্থানের ঝুঁ ছাড়িয়ে তুলে কেলে সেই গেহেরই বা অল্প গেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থান থেকে সমমাপের ঝুঁ নিয়ে সেখানে ছুড়ে দেওয়া প্রকৃতি অপ্রতিক্ষংসাবিদ্ধা-নিপারবলের যে-সব বিশ্বকর কার্যকলাপের বিবরণ সংবাদ-পত্রে আক্ষর্য প্রায়ই প্রকাশিত হয়, তা এই বিশেষ অপ্রতিক্ষংসাবিভার জন্তই সম্ভব হোচ্ছে।

দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ বা অংশ অল্প গেহে ছুড়ে দিলে সেটা ধরে না দিয়ে কি করে মূলদেহের অকীচুত হোয়ে যাবে, অনেকের মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর কঠিন হোলোও বতব্ব সত্য সত্য ভাবে তা বোঝাবার চেষ্টা করা হোলো।

এটা প্রমাণিত হোয়ছে যে, দেহ থেকে কতিত কোনো অংশ বহুতাত অবস্থার রাখলেও, কিছু সময় সেটা ঐচে থাকতে পারে। বিভিন্ন আয়তি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন নানাপ্রকার কোষ (cell) দিয়েই জীবদেহ গঠিত।

যে-কোনো প্রকার কোষের সমষ্টিকে বলা হয় ‘কলা’ (tissue)। জীবদেহে আহার করে মূখ্যত এইসব কোষ তথা কলার গুণি বজায়। বাতের সঙ্গে পৃথীত নানাবিধ বৌদিক রাসায়নিক পদার্থ পরিপাকের ফলে ময়ল সাধারণে পরিণত হয় এবং রক্তের মাধ্যমে দেহের নর্ভর বিতরিত হয়। এই খাজ-সাধারণের বেশিরভাগ অংশটাই দেহের বহুবিধ প্রয়োজন মেটাতে ব্যত হোয়ে গেলেও, স্বাভাবিক অবস্থার দেহের কোষসমূহের মধ্যে কিছু-না-কিছু নানার সক্তি থাকে, যার জন্তই অননয় সত্ত্ব জীবদেহে কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারে। সাপ, ব্যাঙ প্রকৃতি অহরক্ষণচিত (cold-blooded) জীবের ঐতবাসীন ঐতবজ অবস্থা (hibernation) অর্থাৎ সাপা ঐতকালব্যাপী নিশ্রাজ্ঞরতা বিনা থাকে বেঁচে থাকার প্রক্ট উপায়রূপ।

দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো কলাংশ আগাতস্কৃতিতে বৃত্ত বলে মনে হোলোও, কোষসমূহে সক্তি এই খতের জন্তই কিছু সময় বেঁচে থাকে—তবে তা কতদূর, সেটা নির্ভর করে প্রথমতঃ কোষসমূহে সক্তি থাকের পরিমাণের ওপর, দ্বিতীয়তঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর, এবং তৃতীয়তঃ তৎকালীন আবহাওয়ার ওপর। কতিত কলাংশের প্রধান শরু হোলো গচনকারী ‘বীজাণু’। নোহা বীজাণুহুই স্থানে কতিত অংশ রাখলে সেটা বত শ্রু পচে যাবে, অংশকাকৃত পরিচ্ছন্ন অবস্থার রাখলে তা ততোটা ভাড়াভাড়া হুবে না। তবে বাতাসে বত করে বীজাণু নর্ভর ভেসে বেড়ায়, তাই বিজ্ঞানসম্মতভাবে না বেগে অল্প বেতাবেই বা বতো ডালোডাবেই রাখা হোক না কেন, বাহ্যাহিত বীজাণুর আক্রমণে কতিত অংশ একসময়ে পচে যাবেই। এইসব বীজাণুর সক্রিয়তা আবার অনেকটা নির্ভর করে আবহাওয়ার ওপর। ঐতকালে ঠাণ্ডার জন্ত এসের সক্রিয়তা বেশ এতই বহর থাকে, কিন্তু ঐয়কালে ঠিক এর বিপরীত হয়। এই কারণেই গরমকালে সব-কিছুই ভাড়াভাড়া পচে যায়। কিন্তু যদি নির্বীজ (aseptic) অবস্থার হুই ও নীরোগ দেহ থেকে কেটে নিয়ে কোনো কলাংশ নির্বীজ ও অহরূপ অবস্থার রাখা হুই এবং দেহে সংযুক্ত-থাকাকালে যে ধরনের খাজ সেতো, যদি সেই ধরনের খাজ দিয়ে গাওয়া হয়, তবে সেটা অনেকদিন ধরে বেঁচে তো থাকবেই, এমনকি দেহে সংযুক্ত-থাকাকালীন

অবস্থার মতো এই কতিত কলাংশের কোলের সংযোগবুদ্ধিও হয়।

যে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন করে কলাংশকে এইভাবে বাঁচিয়ে রাখার প্রক্রিয়াকে টেরাকোটে 'লিউ কালচার' (liano culture) বলে। বাংলাভাষায় একে 'কলাকৃতি' (liano = কলা; culture = কৃতি) বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে কলাকৃতি আকাল সহজসাধ্য হোলেনও, এর প্রথম অনুশীলন শুরু হয় ১৭ বছর আগে, সেই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। সেই বছরে ডব্লু. রুস (W. Roux) নামে একজন বিজ্ঞানী মূরগী-শাবকের মস্তিষ্কের বিশেষ একটি অংশ থেকে ছোট একটি টুকরো কেটে নিয়ে ঈষৎ উষ্ণ লবণজলে রেখে সেটাকে কিছুদিন বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এর পরে আরও অনেকেই বিভিন্ন প্রকৃতির কলাংশ নিয়ে নানাবিধ গবেষণা করে কলাকৃতিতে সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেও, আর. জি. হ্যারিসন-ই (R. G. Harrison) কলাকৃতির উদ্ভাবক বলে বিদিত। ১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে হ্যারিসন একটি ডেক-ড্রপের বিশেষ একটি দ্রাব্যস্তর টুকরো কেটে নিয়ে ডেক থেকে সংগ্রহীত লিম্ফ (lymph) রেখে সেটির কোষসমূহের বৃদ্ধি হোতে দেখেন।

এইবারে জীবসঙ্গে গ্রাফি সম্বন্ধে আলোচনা করা হোলো। জীবিত বা সম্ভবত জীবসঙ্গে থেকে নির্বীজ অবস্থার কেটে-নেওয়া অংশ যদি অন্য কোনো বস্তুে ছুঁতে পেরে হয় এবং অক্সিজেনযুক্ত কত সেরে না যাওয়া পর্যন্ত তা নির্বীজ অবস্থার রাখা হয়, তবে একসময়ে সেটা নতুন বস্তুে জোড়া লেগে যাবে। কলাকৃতি করবার কালে, অর্থাৎ জীবসঙ্গে থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থার রাখাকালে কলাংশের গুটির স্তম্ভ উপযুক্ত খাওয়ার যে যোগান বিতে হয়, কতিত অংশ অন্য জীবসঙ্গে লাগিয়ে দেবার পর তা করবার ব্যবহার হয় না। কতিত অংশটুকু প্রথমটিকে নিজের মধ্যে সঞ্চিত থাকা থেকেই তার প্রয়োজন মেটায়। ইতিমধ্যে কতিত অংশে ও মূলগেহে নতুন শিরা, ধমনী, নার্ভ প্রভৃতির শাখা-প্রাণা গড়িয়ে পরপরের অংশে প্রবেশ করে এবং এইভাবে সংযোজিত অংশটুকু মূলসেহের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে মূলসেহের অঙ্গীভূত হোয়ে যায়।

পাক্সডায়েশে জীবসঙ্গে গ্রাফি করার চেষ্টা অনেক-দিন আগের শুরু হোলেনও, প্রথম মহাসুফের সময় (১১১৪-১১১৮) থেকেই অপ্রতিকিৎসাবিচার এই বিশেষ বিভাগটি চিকিৎসা-সঙ্গতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। বর্তমানকালে এই অপ্রতিকিৎসাবিচার উৎকর্ষতা নিম্নের

সত্তা। বিজ্ঞানীদের অল্পকৃত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে না হোলেনও, আশাযের বেশে বহুকাল আগেই এই গ্রাফি-এর প্রচলন হোয়েছিল, তবে সেটা এমনকর মতো অসংস্কারের স্তম্ভ নহ। জীবিত একটি এফ্রোডাইটের স্বেহ সম্ভবত ধো-বসনের পা সেটে নিয়ে ছুঁতে গিয়ে পক্ষপদী বৃষপট্টের কথাই বলছি। প্রাকৃতিক স্তম্ভের সাতিকম হিসাবে সই কোনো একটি পক্ষপদী বৃষ বেবে বহুকাল আগে কারও হরতো সেটিকে উপলব্ধ করে ব্যাবসায়ে নামবার প্রেরণা হোলো। মতাসেহের যাহন বৃষ, তাই সে সেই বৃষটির চারটি পা ছাড়াও অতিরিক্ত পক্ষন পদটির অবস্থিত খোদ মহাসেহের আশীর্বাদী বলে প্রচার করে অল্পলোকের ধর্মাত্মতার সংযোগ নিয়ে তাদের মাথার হাত বুলিয়ে নতুন একটা যোজ্ঞায়ের পথ সৃষ্টি করে। নতুন ব্যাবসায়ে তার এই সফলতা দেখে আরও অনেকে এইরকম সহজাত পক্ষপদী বৃষ আবিষ্কার করে সেজনিকে বিশ্বনাথ, পশুনাথ, ভোশানাথ প্রভৃতি নাম দিয়ে তাদের নীলকণ্ঠ মহাসেহের প্রতিনিধি বলে প্রচার করে পূর্ববর্তীর প্রদর্শিত পথ অল্পসংগ করে এই ব্যাবসায়ে জাঁকিয়ে তোলো। তারও পরে যখন সহজাত পক্ষপদী বৃষের অনটন ঘটলো তখন উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনার ফলস্বরূপ অস্ত্রের সাহায্যে নকল পক্ষপদী বৃষের সৃষ্টি হোলো। গোমা-কমায়ের তৈরী সামান্য সোহার ছুরির সাহায্যে এবং বীজব্যারক (antiseptic) কোনো গুধের সাহায্য না নিয়ে হুজু ছাই ও কাঁচকরার গুঁড়ো ব্যবহার করেই চরুশরী একটি বৃষের অধে আর-একটি পা ছুঁতে সেটিকে পক্ষপদীতে রূপান্তরিত করা কম পারদর্শিতার কথা নহ। এই প্রথা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক হোলেনও, এবং অধিকাংশ কেব্রেই উদ্দেশ্য সফল না হোলেনও, পাক্সডায়েশে গ্রাফি-পদ্ধতির প্রচলন হবার বহু আগেই এ দেশের এক শ্রেণীর লোকের এই বিধা যে করায়ত্ত ছিল সেটা নিশ্চয়ই গর্বের বিষয়।

অসংস্কারের পরিবর্তে বিজ্ঞানসম্মত এই গ্রাফি-বিভাগটিকে অনেকে ব্যবসায়ের কাজেও লাগিয়ে থাকেন। ডব্লু. ফ্র্যাঙ্কলিন (W. Franklin) নামে জর্মন আমেরিকান জীববিৎ কণ্টক সই এক-মুখী-বৃষ এই ধামখেয়ালের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কয়েক বছর আগে তিনি একটি এফ্রোডাইটের স্তম্ভদ্বিনেই, তার শূন্যস্থর হর্ট (horn buds) নির্দিষ্ট স্থান থেকে হুলে নিয়ে মাথার ঠিক মাঝখানে গায়ে-গায়ে লাগিয়ে রোপণ করে এমন একটি এক-মুখী জীবের সৃষ্টি করেছিলেন, সেটিকে বৃটিশের রাজকীয় চিকিৎসিত কল্পনাপ্রসূত এক-মুখী অস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

কিছুকাল আগে 'অনুভবাকার পত্রিকা'র সোভিয়েট রাশিয়ার একজন বামপন্থাধীন অস্বাভাবিকতার উপরি-উক্ত এক-পৃষ্ঠী ক্রমের চেয়েও অধিক একটি কথোপকথন বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। তা থেকে জানা গিয়েছিল যে, তিনি একটি কৃত্রিমের মাথাব পাশে আর-একটি মাথা বসিয়ে দিয়েছেন, যেটি আবার সহজাত মাথাটির মতো সব-কিছুই করতে পারে। খবরের কাগজে বখান প্রকাশিত তখন নিম্নলিখিত বিবরণযোগ্য। তবু কেন যেন, একটি কৃত্রিমের গাড়ে সমক্রিয়াশীল আর-একটি মাথা-সৃষ্টির কথা, কিছুতেই বিশ্বাস করতে মন চায় না। একটি মাথার পাশে আর-একটি মাথা এমনি ছুড়ে বেঁটা শক্ত কাজ নয়, কিন্তু সেটিকে শৈত্যক মাথাটির মতো কর্মক্ষম করা অসম্ভব বলেই মনে হয়, কারণ তা করতে গেলে নতুন মাথাটিকে হুল দেহের বেরুহও (vertebral column), স্নায়ুকাণ্ড (spinal chord), বাসনালী, শ্রোণনালী প্রভৃতি অনেক কিছুই সঙ্গে সংযোজিত করতে হবে। এসব করা সম্ভব কি? কিন্তু যদি সত্যই সম্ভব হোয়ে থাকে, অর্থাৎ যদি সংবাদটি বর্ণ্যাই

সত্য হয়, তবে হয়তো কোনদিন গুনতে পাওয়া যাবে যে, কোনো এক বামপন্থাধীন অস্বাভাবিক বাস্তবের মাথা কেটে দেখানো একটা হাতির মাথা ছুড়ে পুরাণোক্ত গণেশঠাকুরের মতো আধুনিক এক গণেশ সৃষ্টি করেছেন। তবে পুরাণের গণেশ ছিলেন দেবতা, তাই তিনি ইচ্ছাপ্রাপ্তি ব্যাধি বা মন্ত্রবলে তাঁর দেহের আকার বাড়িয়েই হোক বা হাতির মাথাটাকে ছোট করেই হোক—সেটিকে তাঁর দেহের মাথা অস্থায়ী মানানসই করে নিয়েছিলেন। কিন্তু জাবনা এই যে, একান্তই যদি কেউ এমন একটি আধুনিক গণেশ তৈরি করেন—তবে সে তার পাঁচ ছুট, কি বড়কোর ছ'ছুট লম্বা দেহে অত্যন্ত হাতির মাথা সামলাবে কেমন করে? পুরাণোক্ত গণেশের মতো তার তে আর ইচ্ছাপ্রাপ্তি বা মন্ত্রবল থাকবে না। সেক্ষেত্রে বোধহয় আধুনিক-গণেশ-সৃষ্টিকারীই বৈজ্ঞানিক মন্ত্রবলে হাতির মাথাটা বাস্তবের বাড়ের মাথা অস্থায়ী মানানসই করে যাবেন। পোষার ওপর পোষকারির বেডোবে পাখা দেওয়া চলছে তাতে এটাও সম্ভব হোলে আশ্চর্যের ব্যাপার হবে না।

জলপাইগুড়ির গম্বীরা

চিত্তরঞ্জন বেধ

জলপাইগুড়ির পল্লী অঞ্চলে বেধা বার চৈত-সাক্ষাতির চার-পাঁচদিন আগে স্থানীয় জনসাধারণ মাঠে এসে সববেত হয়—এখানে তাদের সঙ্গে আসে শিবমূর্তি, পুরোহিত, ঢাকী-চুলী ইত্যাদি।

এই শিবমূর্তি তারা স্থাপনা করে কোনো এক শুভদিন বেধে। এই শিবমূর্তি এবং শিব-স্থাপনার উৎসবকেই এই অঞ্চলে আখ্যা দিয়েছে 'গম্বীরা ঠাঁকুর' ও 'গম্বীরা উৎসব'।

শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠার পর একমল লোক থাকে, তারা প্রতিবছরই এই উৎসবকে অবলম্বন করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে নৃত্যসহযোগে গান-বাজনা করে থাকে। এই গানকেই এ অঞ্চলে বলে 'গম্বীরা গান'। এই শিবমূর্তি-প্রতিষ্ঠার সময় এই গায়ক-দলও সেখানে উপস্থিত থাকে। পুরোহিত-ঠাঁকুর পুজো শেষ করে স্থাপিত ঘট থেকে জল ছিটিয়ে দেন এইসব গায়কদের মাথায়। তারাত্তর দেবমূর্তি ও পুরোহিতকে এখানে করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গাইবার সজ্জা বের হয়ে পড়ে। এইসঙ্গে বাজনা থাকে ঢাক এবং কাদি।

এ গান শিব-প্রতিষ্ঠার পর যে দিন থেকে খুশী গাইতে পারে, তাতে কোনো রোষ নেই। কিন্তু চৈত-সাক্ষাতির দিনই এ-সম্প্রদায়িক গানের শেষ। এর পর আর নতুন বছর না আসা পর্যন্ত কেউই এ-গান গাইতে পারে না। তাতে নাকি গম্বীরা-ঠাঁকুর সোব ধরেন—এইরকমই চলিত প্রবাদ।

গম্বীরা-ঠাঁকুর (শিবমূর্তি)-প্রতিষ্ঠার পর সাক্ষাতি পর্যন্ত ব্যাধি ঘুরে ঘুরে এ গান গেয়ে থাকে, তাদের এই সময়মধ্যে স্থান করা অথবা পোশাক বদলানো নিষেধ। মাছ, মাংস, শিঁয়াজ ও রসুন—এক কথায়, সকল দ্রব্য আবিধ ও উত্তেজক বস্তু খাওয়া বন্ধ। এই সময় এদের খাটবস্ত্র হ'ল মুখ কলা প্রভৃতি, সেই সঙ্গে ঠাঁকুরের (গম্বীরা) প্রসাদী পাঁকা ও সিঁড়ি। এই গায়ক-দলের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের নীল-সত্যাঙ্গীসের এবং পশ্চিমবঙ্গের গাজন-সরাসীসের বেশ থাকিগা-কাঁচা কাঁচা যায়।

গম্বীরা-গানে শুধু যে শিব-বিষয়ক গানই হয়, তা নয়। এ সম্পর্কে কোনো বাধাধারা নিষেধও কিছু নেই। এক কথায়,

সবরকম গানই চলে। তবে অধিকাংশ গানের মধ্যেই আশিরদশের আধিক্য বড় বেশীভাষার পরিলক্ষিত হয়।

যেন করা থাকে, একটি বুড়ী ঘেঁষে বেন আবেশ করে বলছে তার বিধিবাক্যে—“দিদিমা, আমার মাথ-আলাদের দিন চলে যাচ্ছে। আমার জন্ত আর দই-চিড়ে রেখোন। (দই ও চিড়া এ অঞ্চলের দুই প্রিয়ভাত), আমার জন্ত চালের ভঁড়া করে। (কারণ বুড়া-বুড়ীরা চিড়ার মতো নক্ত ত্রিনিস খেতে পারে না, তাই তাহা চালের ভঁড়া খায়)। আমি তাই খাওয়া আরও করব, কারণ আমার মাথ-আলাদের দিন আর থাকছে না। আর, তা ছাড়া দিদিমা, এই বাড়িতে বরষা অবিধ্যাহিত হুবক রয়েছে, সে গ্রীষ্ম একদিন আমাকে নিয়ে পাগিয়ে যাবে। কারণ, সে এখনই আমাকে দেখছে তখনই তুমি হাসছে :

ও বোর আবেগে (দিদিমা),

হাউসের (সাধের) দিন বোর যাচ্ছে গো বয়া।

না থাও আবে। দই-চুড়া,

করেক আবে চাউলের ভড়া।

আবে। বাড়িতে চোগেরা (বুবক) আছে—

বেসার (বখনই) দেখে, সেসার (তখনই) হাসে,

তুন দিন (কোন দিন) বামোকে (আধারে)

ধরিয়। যাবে।”

কখনও বা শোনা যায়, টাকার লোডে গড়ে কোনো একটি অন্নবরসী ঘেঁষে এক বিয়ে দেওয়া হয়েছে এক বুড়ার সঙ্গে (জলপাইগুড়ির প্রাচ্যকূলে এখনও বিয়ের সময় ঘেঁষে রাই পণ পেয়ে থাকে)। নব-বিবাহিতা বৃদ্ধি তাই আবেশের সঙ্গে বলতে শুরু করছে—“মা, তুমি বে-টাকা পণ নিয়ে আমাকে বিয়ে দিলে, ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে এখন ঝাঁটায় বাড়ি বারি। তুমি পুঁথিবীতে কি আর এই বুড়ো ছাড়া আর কোনো লোক পেলেন না, বাক্যে জামাই করতে পারতে? বাগো, তুমি শেখটার আমার কিনা একটা বুড়ো-হাবড়ার সাথে বিয়ে দিলে। তুমি কি আমার এখনই বুড়ী মনে করছ মাকি? যেখানে বিয়ে দিয়েছ, সেখানে কনে-বউ বা নতুন-বউ বলে ডাকবার কেউ নেই। সবাই আমার ডাকে, কোটিনা-বুড়িমা বলে। তুমিই বল বাগো, আমাকে কি পুঁথ বুড়া বলে মনে করছ? আমাকে বুড়াদের মতন সব সময়ই এই বুড়ার জন্ত পান-রুগারি ছেঁচতে হচ্ছে, কারণ ওই বুড়ো-খিনসে যে সবলময়ই পান মূষ দিয়ে তিঝুতে থাকে। এই করডে-করডেই তো আমার সারাটা জীবন চলে যাবে। তাই বলছি বাগো, তোমার আবেশের কপালে ঝাঁটা বারি। :

তোমার টাকা খাই। তোমার মৃত্তক বাড়িগি ভাগেও

তোমার পে আই।

এখন বেগালেন আরেই (জামাই)

আর মুলুকত বরগে পালেন নাই।

ও আই টাকার সোডে বুড়া দিলেন,

আর মুলুকত বর নাই পালেন—

মোক কি সবাই পে গে বুড়ি আই।

লগায় কছে জেঁঠাই-বুড়ী,

কাহো কছে বুড়ি আই বুড়ি আই—

নদারী (নতুন বউ) কবার গে মানখি নাই।

ও আই (মা) সাজি বুড়ি ওগাপান

বুড়া বরষে কেদেলান

ওয়া (হুগারি) চুবাইতে (ছেঁচিতে বা কাটতে)

যাবে জান।”

এ গানের উল্লেখটিও শোনা যায়। টাকার সোডে কোনো একটি বরষা ঘেঁষের সঙ্গে একটি অন্নবরসী ছেলের বিয়ে দিয়েছে তার বাপ-মা। যেহেতু তাই আবেশের সঙ্গে বলছে—“আমার মন মূষে ভেঙে গড়ছে। চোগের সাধনে সব ঝাঁকা করছে। আমার বাবা ও মা শেখটার কিনা আমার বিয়ে দিল এক নাবালকের সঙ্গে!” বাগে যেহেতু বলতে শুরু করে—“আমার বাবা, মা ও পায়ার লোকেরা মরুক। যে ঘটক এই বিয়ে দিয়েছে তাকে মরলে বাঘে ধরে খাস। আমার বাবা-মাকে খবর দাও, তাহা বেন একটা গরু কিনে পাগিয়ে দেয়। সেই গরুর মূষ খেয়ে তাদের নাবালক জামাই বেন তাড়াতাড়ি হুবক হয়ে উঠতে পারে :

ও বোন বোর কাকয়ে

সেবিয়া পাথারে।

বাশ-মুয়ে বোক বেচেরা বাসেক

নাবালক ভাডারে।

বাশ মরুক, বাও মরুক রে,

মরুক পায়ার লোক,

কাড়েরা (ঘটক) মরাক—বামে খাউক

নিমুয়া পাথারে।

বাশ-মাওক জানাও বরব বে,

কিনিয়া পেরাউক গাই,

তাহার মূষ থায়া মাহুপ হউক

নাবালক জামাই।”

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, গম্বীরা-গানের অধিকাংশই এই ধরনের গান। তবে সাম্প্রতিক কালে এদের ভিতরও

স্বাক্ষরিত চিত্রনা দেখা দিতেছে। তাই ভাবাও বলতে শুরু করেচে—

“হামরা (আমরা) কখনো কখনো শুনেছি তোমরা—

চাষী মানবী লাগ-পড়া নাই নিবি,

জোয়ারা হলো শহর কলকাতাবাসী

•

হামরা হলো চাষী মানবী,

যেই বুলাইচ সেই বুলাছি—

আঁতড়াচে জোটার পালা,

খায়েচা দিহু কাচা কলা।”

অনেকে বলেন, গমীয়া হ'ল গমীয়া শব্দেরই পরিবর্তিত রূপ। বহুতরু জলপাইগুড়ির গমী-অক্ষরের অধিবাসীরা মুক্তাক্ষর বড় একটা উচ্চারণ করে না, সেইহেতু গমীয়া শব্দকেই গমীয়া বা গমীয়া বলে থাকে। অতঃপর কাহণ্ড মতে, ‘গমীয়া’ শব্দ গমীয়া শব্দের চাইতে পুরাতন। এসব গবেষণার বিষয়। বসন্ত, মালপতের গমীয়া, পশ্চিমবঙ্গের গাজন উৎসব, পূর্ববঙ্গের নীলপুজো ও অম্বুঠান এবং জলপাইগুড়ির গমীয়া-পুজোর রীতি-নীতি সব মিলিয়ে দেখলে, এ-কটি যে একই জিনিস এ-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ থাকে না। সুতরাং এ-সবকটিই যে এক কথার চৈত্র-উৎসবেরই আঞ্চলিক নাম মাত্র—এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

গমীয়ার ঐতিহাস্য নিয়ে আলোচনা করলে বসন্তের জানা দায়, তাতে দেখা যায়, বৌদ্ধযুগ অবসানের পর হিন্দুধর্ম বহন আবার মাথা উঁচু করে ঠাঁড়াতে শুরু করল তখন এই নিবপুজো এবং এই নিবমুর্তিই সম্ভবত সর্বপ্রথম এই নবগঠিত হিন্দু-সমাজে দেবতা বলে স্বীকৃত হলেন। এই নিবপুজো ও উৎসবই পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলায় রূপ নিল গমীয়া, জলপাইগুড়িতে গমীয়া, পশ্চিমবঙ্গে গাজন ও পূর্ববঙ্গে নীলপুজো রূপে। উজ্জ্বল একেই বলে সাধাযাত্রা।

পূর্বের উল্লেখ করেছি, গমীয়া কথটির উৎপত্তি নিয়ে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। তবে অধিকাংশেরই মত ‘গমীয়া’ কথা থেকে গমীয়া এবং ‘গমীয়া’ কথারই অঙ্গভাষণ গমীয়া বা গমীয়া। কাহণ্ড কাহণ্ড মতে গমীয়ার অর্থে শিব। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন ‘গম্ভ’ বলে। কাহণ্ড কাহণ্ড মতে এ হ'ল গমীয়ার-নামক একরকম গাছের নাম। বিহারে এ গাছকেই বলে গাম্ভার। দাশিক লজ বা কবিকল্পশের চরীতে ও বৈষ্ণবগ্রন্থে গমীয়ার অর্থে ‘দেবগৃহ’। কিন্তু কোনটি

যে সঠিক তথ্য, এ সম্পর্কে এখনও স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তবে গমীয়া বা গমীয়া যে শিবপুজো ছাড়া আর কিছু নয়, এ কথা ঠিক। পণ্ডিতগণ বলেন—গমীয়া, গমীয়া, গাজন ও নীলের শিব পুরাণোক্ত শিব মন, ইনি বুদ্ধমূর্তিরই মূসংকৃত রূপ মাত্র। হিন্দুধর্মের নবজাগরণের সময় বুদ্ধমূর্তি শিবমূর্তিতে এবং আত্মমূর্তি ভগবতীরূপে, সেই সঙ্গে বৌদ্ধ সাংঘতি ও পালমার্গিক কথায়ই শৈবধর্মের রূপ নিতে শুরু করল।

পাল-বাক্ষরের প্রতিষ্ঠার সময় এসেই ধর্মবিগ্রহ উপস্থিত হলেন এবং ত্র্যম্বকধর্মের বোড়াধির কলে বৌদ্ধধর্মের অবলম্বনকালে শৈবধর্ম দ্বীপে দ্বীপে প্রাধান্য লাভ করে। ফলে বৌদ্ধ-তাত্ত্বিকতা ও শৈব-তাত্ত্বিকতার ভিতর দেখা দিল মিশ্রতা। কালক্রমে মূলদ্বানদের হিন্দু-বৈশাল-ধ্বংস ও হিন্দুদের ধর্মাস্তরগ্রহণের মধ্যে হিন্দুধর্ম আচরিত ধর্মরূপে নীচজান-ভোগ্য হয়ে পড়ল। এইসময়কার প্রতিষ্ঠিত সমাজে যে শিবের উৎসব করত, তাকেই পরে অকল-বিশেষে নাম বেঁধেচা হয়েছে গমীয়া, গমীয়া, নীল ও গাজন উৎসব বলে।

বঙ্গাল দেশের সময় হিন্দু-সমাজ যখন আবার নতুনভাবে গড়ে উঠল, তখন থেকেই শিবের গাজন, গমীয়া, গমীয়া ও নীলপুজো হিন্দুদের আচরিত উৎসবের মধ্যে গণ্য হতে লাগল। তবে এই উৎসবে গৌড়-কবির, নাগর, বাহুব, ঠাঁই, বাহুবংশী, বাগুদী, নমঃপুত্র প্রভৃতি জাতিরই উৎসবের আধিক্য দেখা যেত। কালক্রমে এই উৎসব শস্য সমাজকেও প্রভাবিত করতে লাগল।

শু বাল্যের নর, তিস্তের লামাদের ভিতরও এই ধরনের অম্বুঠান করতে দেখা যায় এবং তিস্তাতী সাহিত্যেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। রামাই পণ্ডিত বর্ণিত উৎসবের সম্বন্ধে এর বেশ মিল পাওয়া যায়। এ ছাড়া ছুরোপ, আফ্রিকা, ব্যাবিলন, গ্রীস ও মিসর দেশেও যে এইরকম উৎসব হ'ত তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। গ্রীস দেশে একে বলত ‘কলিমোত্রিক’ উৎসব। বেক্স-সেবের পুত্র প্রাচ্য-ল-সেবের সময় এই ধরনের উৎসবে হাতীর পাশে শিবলিঙ্গ শোভা পেত, এমন সংবাদও পাওয়া গেছে। পুরানো রোমান ধর্মে ‘তৈলার-সেবতা’কে এমিয়া মাইনরের ফিট্টাইটগণ পুজো করত। এই দেবতার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের কৃত্ত ও শিবের মিল রয়েছে। এই দেবতার বাহনও হ'ল ঘূষ। ক্রাফট অফলে এই ধরনের বৃহমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মিসর দেশেও আদারিস-দেবতা ও বৃহ-বাহনের যে উৎসব হ'ত, সেগুলিও

টিক গম্বীরা-উৎসবেরই মতো। স্বতরাং গম্বীরা-উৎসব যে হুঁশ-গজিয়ে-ওঠে। একটা নতুন কিছু নয়, এ কথাই প্রমাণিত হয়। তা ছাড়া মহাভারতে শিবপূজা ও উৎসবের বেসব বিবরণ দেখতে পাওয়া যায় তাতেও গম্বীর কথা মনে করিয়ে দেয়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ও হিউ-এন-সং-এর দিবসবৃত্তেও এর উল্লেখ দেখা যায়। হীরা বেসব ভারতে আসেন তখন এখানে বৌদ্ধ-ভাস্কর্য-মূলক বেসব উৎসব ও শোভাযাত্রা দেখেছিলেন, তা থেকে গম্বীরা ও গম্বীরা উৎসবের রূপবিবর্তনের একটা ইতিহাস বুঝলে পাওয়া যায়।

তবে নীল, গাজন, গম্বীরা ও গম্বীরা এক জিনিস হলেও, আঞ্চলিক জলবায়ু, দিচ্চা-ধীচ্চা, জটি ও সংক্ৰান্তি অল্পসারে প্রভেদকটিই থাকার বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ।

পূর্ববঙ্গের নীল আর পশ্চিমবঙ্গের গাজনের গানের আদিকালেই হ'ল হর-গৌরীর গার্হস্থ্য সংবাদ নিয়ে। এইই মধ্যে বড়ইলু সত্তর শিব-হর্গকে নিয়েই রস-বসিকতা হয়ে থাকে, বাইরের অস্ত্র কোনো বিপর বড় একটা চুসবার ছুরছত পায় না। কিন্তু গম্বীরা ও গম্বীরা গানের বোম্বাং এর উটোটিই দেখা যায়। শিবপূজা ও অহুর্দীনইলু চার অঞ্চলে একই রকমের, এ বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু

গম্বীরা ও গম্বীরা গানের ভিতর গম্বীরা-গানে লোক-কবিতা শিল্পকে উপলব্ধ্য করে তাবের গোটা বছরের হুশ-হুশ, অভাব-অভিযোগ, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অনাচার-হীনীতির কথা গুলু করে থাকে। কলতঃ, মালপঙ্কেই গম্বীরা বরংবরই একই রাজনীতি-ঘেঁষা। শিবহীনু এখানে উপলব্ধ্য যাত্র। তাই এর ভিতর শিব-বিষয়ক গান ছাড়াও, সাধারণ কৃষান-ঘরের হুশ-হুশের কথা, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ক গানেরও সন্ধান মেলে প্রচুর পরিমাণে। জলশাইগড়ের গম্বীরা আবার আরো একই অন্তরকম। এরও পূজা-পছত্টিইলু অপর তিনটি উৎসবের মতো হ'লেও, ঈতগুলি সম্পূর্ণই নতুন ধরনের। এর ভিতর শিব-সংক্রান্ত কোনো কথাই অনেক সন্ধ্যা থাকে না। এমন কি, গম্বীর মতো শিবকে উপলব্ধ্য করেও বলবার দরকার নেই। তাই গম্বীরা-গানের ভিতর প্রায় সন্ধ্যাকম গানেরই আবির্ভাব দেখা যায়। এইটেই বোধ হয় পূর্বোক্ত ঈতগুলির মধ্যে সব-চাইতে বড় পার্থক্য।

কিন্তু গানের ভিতর সত পার্থক্যই থাকু-না কেন, এর পূজা-পছতি ও অহুর্দীনগুলি বিচার করলে পরিচায় বোঝা যায়—নীল, গাজন, গম্বীরা আর গম্বীরা মূলতঃ একই উৎসব এবং এ-সবকটিই মূলপ্রায় বৌদ্ধ-সংক্ৰান্তিরই শেষ চিহ্ন।



সত্য

ঐহিকজীবন বলিক

জাতি ঘন অসংখ্য হারায় মনের বল,
বস্তু ফোঁসে হয় সে উজ্জ্বল ।
সবেই এবং সনাই বেধে দোষ,
কারণে ও অকারণে দোষ,—
অশান্তি ও অনাচারের পথ ভাবে সরল ।

কতি করার বলি লয়ে তাহার আফালন,
মুশুখলা ডাঙাই তাহার পন ।
করতে পূজাপূজার ব্যতিক্রম,
উৎসাহ দেয় তাদের অসংখ্য,
‘অষ্টাবক্র’ রহে করি আত্মসংগোপন ।

অশ্রুভক্তি অমৃত যে—রাখেনা সন্ধান
ঐক্যে বীর্য অভিমান ।
তুষ্টিতে ধীর তুষ্ট এই ত্বন—
তাঁহার কথা শরেনা তার মন,
কঃস আনে তাদের বিকল ব্যাকুল অভিধান ।

বড় হতে চাই যে বলি সংঘম সন্তোষ—
শিব যে শাস্ত শিব যে আশুতোষ ।
সিদ্ধি লাগি গুপ্তা যে চাই
সেখানে নাই প্রগল্ভতার ঠাই
সাক্ষ্য কি দিতে পারে হিংসা ও আফোস ?

শান্তি : উত্তরতিরিশ

অসিতকুমার

কবরের বৃকে সবুজ ঘাসের
সহজ শান্তি নিতে
মুঠো মুঠো ছাই হু-হাতে ছড়াই
কুয়াশার শব হু-পারে মাড়াই—
অবশেষে আসি অথাক প্রবাসী
বিকেলের পৃথিবীতে ।

এই নির্জনে কাকনে কাকনে
হলুদ মৃত্যু জমা ।
ধোঁয়ার ময়াল পাকে পাকে ঘোরে
মাটির কাটল ডাকায় হাঁ-ক’রে
কেবল ঘাসের সবুজ শীষেরা
আনন্দে মনোহরা ।

এখানে একার পৃথিবী দেখার
তরুর অবকাশে,
মৃতির শিয়রে শান্ত পাথর ।
আকাশ অন্ধ । মাটি অকতির ।
গুধু বিষয়, কাঁপে প্রাণায়
কবরের ঘাসে ঘাসে ।

আপেক্ষিক গোপাল ভৌমিক

হায়, উষ্মতা নেহাৎ আপেক্ষিক :
হিমালয়ে উঠে আমি গেছি শীতে
সমতলে আমি হয়েছিও পবাতিক,
মরুবালুকার মুখ গুঁজে থেকে
হারিয়ে ফেলেছি দিক ।
পারিনি আশ্বর্য্য করাতে
অথচ ভেবেছি ঠিক
বিপদ কাটিয়ে যাব চলে নির্ভীক ।

বুঝি সব কিছু, গণনাও নির্ভুল
গণিত এবং জ্যোতিষের অভিমতে ;
তবের শেষে তবু থেকে যায় মূল
আপেক্ষিকতা কে যে নির্ণয় করে !
বাবের মতন চোখ ভুলে চাই
হরিণের মন নিয়ে,
তুমি তাই দেখে পালাও সন্ধ্যায় :
বোকাবো কি ছাই দিয়ে
চাইনি তোমার রক্তমাংস
চেয়েছি বরং মন :
এ-দেহ যখন বিস্ত্রোহ করে
ক্লময়ের শিহরণ
অঙ্ক আবেগে তবু দেয় মাথাচাড়া—
লোকে ভুল বোঝে দেখে আমি দিশাহারা ।

দেহ আর মন এক সমতলবাসী
না হলে মকা-কান্ধী
উপাস্ত যার তার মত থাকে ভয় ;
ভুল থেকে তার শূলে চড়া
কিছু বিশ্বয়কর নয় ।
চড়াই এবং উৎরাই
তাই বার বার পায় হয়ে
সমতাবিহীন এ জীবন কাটে ভয়ে ।



‘পূর্বপ্রকাশিতের পর’

লাইপজিগের শেষ দিন। খুব পাক-চকোর দিচ্ছি, ভক্তদল জুটবার আগেই বেরিয়ে পাড়ছি। বই-পাড়টা ঘুরে বাই একবার। কাল এসেছিলাম, বইও কিনেছি হু-চাৰখানা—তাতে পিপাসা মেটে না। আজও অনেক বই নেড়েচেড়ে দেখি। নিতে সাধ যায়, কিন্তু অর্থাতাব। বই কিনিনি, কিন্তু কাঁচা জুটি গেল হুই প্রাণী—একটা ছেলে, একটা মেয়ে। ঐ সব প্রকাশক তরকের। বলে, বেড়াই তোমাদের সঙ্গে; দেখিয়ে উনিয় দেবো, গল্পগল্প হবে। লেখক নিয়ে ওদের ঘরকন্না—লেখক শুনে কি জানি দূর উঠলে উঠল বোধ হয়।

এক মিউজিয়ামে (Grassi Museum) গেলান। পুরানো জায়গা। ভিতরে এত বস্তু, বাইরে থেকে কিছু আন্দাজ পাবেন না। নানান দেশ নিয়ে বই সাঙিয়ে রেখেছে একটা ভাণ্ডার—তার মধ্যে ভারত সম্পর্কে একখানা পোয়ে গেলান। শাশ্বত ভারত (Immortal India)—ছবিতে ছবিতে ঠাসা অ্যালবাম। কাছে দিঠে পোসিলেনের কারখানা—অতএব পোসিলেন-সংগ্রহ কিছু তারিকি রকমের হবেই। পোসিলেনের বিরাট কাউন্সিল দেখলাম, ১৭৫০ অব্দে বানানো। ১৭৮০ অব্দের কাঠের আসবাবপত্রের। কনে বাপের বাড়ি থেকে বড় ছাপ-বাগ নিয়ে আসত, কাঠের উপরে অতি সুন্দর কারুকার্য। সেই কনেরা বুদ্ধি হয়ে কবে বাড়ির নিচে গেছে—বিয়ের বৌতুক শওরবাড়ি থেকে ছুড়িয়ে এনে মিউজিয়ামে রেখে

দিয়েছে। আমার দেশেও ঠিক এমনি বস্তু বৌতুক দিত, আমার ঠাকুরমার বৌতুকের বাগ দেখেছি শৈশবকালে। এত সমুহ আর এত পূর্বতের পার হলে কি হবে, মানুষের জীভীনীতে দেখতে পাই প্রায় এক রকমের। আমাদের সেকালের পালপার্বণ আমোদ-উৎসবের গল্প বলে বান, দেখবেন বারো আনাই মিলে যাচ্ছে ভূমের সঙ্গে। তামার টেবিল, তামার উপর বহুবেরঙের নিনা-করা—এক রাজার শখের বস্তু ছিল এটা, ১৮০৮ অব্দে তৈরি। ১৭৬৫ অব্দের সোকা—ককমকানি কিছু বাড়াবাড়ি রকমের, তা নইলে ধরে নিতে পারতাম, কোন হালের কারিগর বানিয়েছে।

মধ্যযুগের ইয়োরোপের এক-আধ ফালি হঠাৎ চোখের সুস্থে উদয় হয়। সেকালের খাসা এক চেহারা আন্দাজে আসে। মজা পাই। প্রাগ শহরে যেমন দেখে এসেছি সোনার গলি। এক রাজা দেশবিশেষের আলকেনিস্টারর আহ্বান করে এনেছিলেন সোনা বানাবার জন্ত। গলিটার ঘরে ঘরে তারা সোনা বানাত। স্নুস স্নুসে কুঁহরি, সেকলে হস্তপাতি। গলির শেষে প্রাচীন কারাকক। অঙ্ককার পাতালপুরী, লঠন ধরে সতর্ক পা ফেলে ফেলে নিচে নামবেন। নদীজল সেয়ালের গা ধরে ছলছল করে বয়ে যাচ্ছে, এক পাশের ঘুগলি দিয়ে জল দেখা যায়। ডিটেকটিভ উপস্থানে যে ধরনের বর্ণনা পড়ি। কিহা ধকন, পোল্যাণ্ডে ওয়ারশ শহর থেকে শতক মাইল দূরে গিজার পাশে সেকলে বাজারখোলা। দূর

গ্রামের ব্যাপারিরা বোড়ার-টানা গাড়ি বোঝাই করে মাল এনে ঢালছে। রাত্রি কাটাতে সরাইখানায়, অথবা গাছতলায় গনগনে আগুন জ্বলে। হালের সভ্যতার উগ্র আলোর মননপানির আড়ালে পুরানো জীবনযাত্রা আছে এমনি সারা ইয়োরোপের এখানে-সেখানে ছড়িয়ে।

লাইপজিগের যুদ্ধের উপরেও তেমনি বস্তু—এক অতি-পুরানো সেলার (Auerbachs Keller)। বাংলা নাম কি মিই—পাতালের পানশালা? ঠিক হল না, এই বস্তু নেই তো এদেশে। লাইপজিগে এসে এইখানে ঢুকবেন অতি-অবস্থা, এবং নিদেন পক্ষে এক কাপ কফি নিয়ে বসবেন কোন এক টেবিলে। যত্নভর বসে গেলেই হল না, তৎপূর্বে টাঁকের অবস্থা বিবেচনা করে নেবেন। রাস্তার সমতলে কোন এক ঘরে বসবেন তো কফি প্রায় বাজার-চলিত দামে মিলবে। যত পাতালে নামবেন, ঘর যত সঁজাতগৈতে এবং আসবাব যত মলিন, কফির দাম তত চড়া। নেমে যাচ্ছি আমরা—উট্টোমুখে—দোতলা, তেতলা, তার পরে চৌতলা। সেকালের সাদামাঠা ভারী ভারী বাড়া চেয়ার, মোটাসোটা ওজনদার টেবিল। কত শতাব্দী হয়ে গেল, পাখরের মতো এক জায়গায় অনড় হয়ে রয়েছে। বিদ্যুতের বাতি জ্বলছে, অতএব আলোর অসুবিধা নেই এখন এই যুগে। তবু সেই আর্জি অঙ্ককার রহস্যময় সেলারের খোপে খোপে সবাই পানপাত্র নিয়ে বসে গেছেন—আমোদ-ফুটিই নয় শুধু, দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যের বড় বড় আলোচনা—সেদিনের সেই চিত্র পরিষ্কার দেখতে পাই।

হুয়ের উপর খেলে যে দাম হত, হিসাব করে দেখলাম, তার ডবল পড়ে গেল এই জায়গায়। তবু কিন্তু অনেক মুনাফা। খেলায় কোথায় জানেন—গ্যেটে যে খোপটায় বসে যেতেন, খেতে খেতে যেখানে মনের মধ্যে ফাউন্টের কল্পনা এসে গেল। শুধু গ্যেটে নয়, বিসমার্ক নেপোলিওঁ এবং আরও বিস্তর তা-বড় ব্যক্তি বসে গেছেন এই অঙ্ককূপের তলে।

খোপে খোপে তাঁদের নাম লেখা। প্রেমিকরাও এসে জুটতেন। প্রেমপত্র আসত গোপন ঠিকানায়। তেমনি অনেক প্রেমের চিঠি যেমন বাধিয়ে খোপে খোপে টাঙিয়ে রেখেছে ছবির মতন। শতাব্দী পার হয়ে গেল, সেই সব ইতিহাসের মানুষের গোপন অস্থিরের খবর প্রকাশের কি বাধা এই একালের কাছে? দেয়াল-ভরা সেকালের ফ্রোকো ছবি। অভিনব পরিবেশ—হঠাৎ যেন সেকালের মানুষ হয়ে যাই।

বড় বড় দিকপালেরা রাত জেগে কৃতিফাতি করে সকালবেলা দুগুদু দুয়েনে বেরাঞ্ছন—দেখতে দৃষ্টিকটু লাগে, লোকের কাছে টঙ্কতানি হয়। তার ক্ষত্রেও উত্তম ব্যবস্থা। সেলারের লাগোয়া বড় রাস্তা—সেই রাস্তার নিচে দিয়ে হুড়ু। সেলারের সর্বনিম্ন তলা দিয়ে হুড়ুপথে রাস্তা পার হয়ে গিয়ে ফুটপাথের ওদিকের এক বড় বাড়িতে ঢোক। যেত। সেখানে সাক্ষ্যকাই হয়ে ধোপধস্ত পোশাক পরে নিরীহ ভালমানুষ প্রকাণ্ড ফটক দিয়ে বেরিয়ে পড়ুন, কেউ কিছু টের পাবে না। সেই ব্যবস্থা চলে এসেছে। হুড়ুপথ নির্ধৃত ছিল এট সেদিন অবধি। লড়াইয়ের সময় সামনের রাস্তার উপর বোমা পড়ে পুকুর হয়ে যায়। নিচের হুড়ুপথ চুরমার হয়ে গেল। এখন রাস্তা নেরামত হয়েছে, কিন্তু গোপন হুড়ুপথ ভরাট হয়ে গেছে; চলাচলের উপায় নেই। হুড়ুপথের মুখটার মোটা গরাদের দরজা—দরজার ভারী তালা কুলিয়ে পথ পাকাপাকি বন্ধ করে দিয়েছে।

রওনা এবারে বালিন মুখে। দেখবার অনেক বাকি থেকে গেল। কিন্তু তিনটে দিনে—চূপচাপ ধাঁড়াইনি এক মুহূর্ত—এর বেশি আর হয় না। তন্নিভ্রা তুলে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েছি। গাড়ি ধামিয়ে পথের উপরের আরও হু-একটা বস্তু দেখে নেবো।

যেমন জর্মন-লাইব্রেরি। ওয়েলার পণ্ডিত-মশায় বলেছিলেন, জর্মন জাতের সকলের বড়

দৌরব হল জর্মন-লাইব্রেরি। বসুন তো, ঐ মাহুঘের মুখে এ-হেন উক্তির পর এক নজর না দেখে যাওয়া যায়? হুনিয়ার ঘেখানে যে জনন বই ছাপা হয়েছে, তার অন্তত একটি খণ্ড আছে এখানে। মাটির নিচেও ঘর—তা ছাড়া একতলা, দোতলা ও তেতলা। তিন শ' কন্নচারি। বইয়ের সংখ্যা পঁচিশ লাখ। ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করছে ঘরে ঘরে—নিঃশব্দ, একটা আলপিন কেলে দিলেও বোধকরি আওয়াজ পাবেন। পা টিপে টিপে আমরা সম্ভরণে এঘর-ওঘর করছি। তিনতলায় মিউজিয়াম—সেটা বন্ধ আছে আজকে, সেখানে যেতে পারলাম না। দোতলাতেও বিস্তর নজর সংগ্রহ। অক্ষরের জন্ম—বাপে বাপে কেনন তার চেহারা পালটাচ্ছে, এক থেকে অনেক হচ্ছে। বিশ্ব-লিপির আগে অক্ষরের কি চেহারা ছিল, ঐ লিপিতে পৌঁছল কোন্ অক্ষরকে। ছাপা বইয়ের বিভিন্ন পর্যায়—মুদ্রণ কেনন করে বীরে বীরে নিখুঁত শিল্পকর্ম হয়ে দাঁড়াল। ছাপাখানার মডেল—সেই গোড়ার আনন্দ থেকে। নানান দেশের লিপি-সংগ্রহ। চীনের চিত্রলিপি, তালপাতায় লেখা ভারতের পুঁথি। কোরিয়া ও জাপানের পুরানো পাণ্ডুলিপি। হাতে লেখা শাহনামা। এবং পুঁথিপত্র শুধু নয়, প্রাচীন পাদুরে নৃত্তিও বিস্তর।

তার পরে শহরের শেষ। পত্রঘন গাছপালা, নিষ্টি-নিষ্টি ছায়া। কলকাকলী আসছে—পাখির? বাগানের মধ্যে আজ অপরাহ্নে কত পাখি জমেছে গো।

গাড়ি চুকে পড়ল বাগানে। পত্নীরাণী আপনারা বস্ত্রের মধ্যে কালেক্টরে হয়তো দেখেছেন। আজকে জাগ্রত চোখ মেলে এই দেখুন। জনপদের মধ্যে আনন্দ থাকে টুকরো-টুকরো ছড়ানো—এখানে-ওখানে, এবাড়ি-ওবাড়ি। সব আনন্দ একটা জায়গায় এসে জমেছে। আনন্দের হাট—রবিবারটা দেখছি হাটবার ওঘরে।

জায়গাটার নাম আভেনসি (Avensee), বার মানে হল হুম্বর সবুজ লেক। ছোট লেক কেন্দ্র করে নতবড় বাগান। শহরের প্রান্তসীমায় মনোরম সবুজ জায়গা। সব সোশ্যালিস্ট দেশেই ছেলেমেয়েদের পায়োনিয়র-দল—আমোদ-উল্লাসের ভিতর দিয়ে জীবন গড়ে তোলবার স্বাক্ষর আয়োজন। এ-রাজ্যেও তেমনি, দল গড়েছে। পায়োনিয়র ছেলেমেয়েরা জনে এসে এখানে। তাদের আয়োজন, কর্তব্যাক্তি ডারাই। আপনি-আমি আসব এখানে দর্শকমাত্র হয়ে। পরমা কেলে টকি কিনে খেতে পারি—তারাই পোকানদার। টিকিট কিনে রেলগাড়িতে চড়তে পারি—তাদের গাড়ি, শুধুমাত্র ডাইভারটি ছাড়া আর সবকিছু কাজে তারা করছে। বালখিলা টিকিটবাবু টিকিট দেয়, চেকারবাবু গেট আটকে টিকিট দেখে, স্টেশনবাবু নিশান ফুলে গাড়ি ছাড়ার হুকুম দেয়, গার্ডবাবু হুইশল বাজিয়ে ডাকা করে গাড়ির উপর উঠে যায়। ঠিক যে-রকমটি হতে হয়, খুঁত পাবেন না। যা দেখছি, বড়-রেলগাড়ির কাজে লাগিয়ে দিলেও ঠিক চলিয়ে বাবে। লেকের জলেও ভাবি হয়েছে। ঝাঁপাচ্ছে, সঁতার কাটছে। মোটরলঞ্চ চালাচ্ছেও ছোটরা, নৌকো বাইছে। ছোট-বড় কত সব নৌকো! চিত হয়ে শুয়ে ঐ দেখুন হু-হাতে গাড়ি বাইছে একজন। তারকি ছেলেমেয়েরাও আসে। সঁতারের পোশাকের নামে-মাত্র বসনে বিস্তর নেয়ে। এসেছে এসব গ্রাস্দের মধ্যে আসে না, নিভাস্ত সাধারণ ব্যাপার—নজর ফুলেও কেউ দেখবে না। আমাদের দেশ হলে প্রবীণদের নির্ধাৎ পতন ও মূর্ছ।

বড়রাও বিস্তর জমেছেন। গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ। গাছের ছায়ায় এখানে-ওখানে গাড়ি রেখেছে। মা-বাপ ও মাস্টারমশায়রা ছোটদের সুপারিশ করে এসেছেন তাদের রাজ্যে। হু-এক আঁজলা ছেলেমি ছিটিয়ে বয়সের পকতা একটু সবুজ করে নেবেন বলে। এসে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। কিংবা এইটুকু এইটুকু ছেলেমেয়ের বীরব দেখেন

লোকের কিনারে হাঁ করে দাঁড়িয়ে। কেউ তাঁদের ডাকে না, একজায়গায় কোন খাতির নেই। খাতির কেন হবে বলুন! ক্ষমতা আছে শিশুদের মতন—হাসতে পারেন অমন খিলখিল করে, নাচতে পারেন, ছুটতে পারেন? কিসে বড় বলেন তবে তাঁরা—বয়সে? কিন্তু বয়সের বিচার এই এলাকার ভিতর নয়। এখানে এসেই ছোট্ট এতটুকু হয়ে যেতে হবে।

রেলগাড়ি যাচ্ছে লাইনের উপর দিয়ে। শিক-শিক, শিকশিক। কত মানুষ নিয়ে যাচ্ছে। এই একটা চলে গেল, আবার দেখ আসে ওই। শিক-শিক, শিকশিক। লোক-সনেত এত বড় পার্কটা বেড় দিয়ে রেললাইন। খোলা গাড়ি—গাড়ির মানুষরা বেসে চৌকিয়ে রুমাল উড়িয়ে উল্লাস ছড়াতে ছড়াতে যায়। হেন অবস্থায় শিষ্ট সভ্য হয়ে কতক্ষণ থাকা চলে বলুন? আমরাও চড়ে রেলগাড়িতে। সে বড় কম হাস্যাম্বা নয়—যেখানে সেখানে রেলগাড়ি থামে না, সেই মূল-স্টেশন অবধি যেতে হবে। বেশ খানিকটা দূর। অনেক যাচ্ছে, আমরা পিছু নিয়েছি। বারো-বছরে টিকিটবাবু টিকিট মিলেন, চেক হল সেই টিকিট। সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি প্লাটফরমে। শিকশিক শিকশিক—আসছে গো, ঐ আসে রেলগাড়ি। গার্ডবাবু নেমে এসে স্টেশনবাবুর সঙ্গে বোলাকাত করলেন কি-একটু। নিশান উড়ল। আমরা চলেছি—দেখুন, চলেছি এই যে! শিকশিক, শিকশিক। প্রবীণ বিচক্ষণ মানুষটি আর নই। অনেক কাল আগে এক দূর অতি-দূর গাঁয়ে কিশোর বয়সটা কেলে এসেছিলান, হাজার হাজার ফ্রোশ দূরে জর্মনি দেশে সেই বস্ত্র আঙ্কে কিরে পেয়েছি।

আর নয়। বেলা পড়ে আসে, ছুটুক এবারে যেটির। হু-পাশে দিগ্‌ব্যাপ্ত মাঠ। ফসল ফলেছে, নতুন চারাও লাগিয়েছে কোথাও। ঘন সবুজ সারা অঞ্চল। দূরে দূরে গ্রাম দেখা যায়—ক্যান্টারি

চোঙা কিংবা গির্জার চূড়া। অথবা আকাশভেনী কোন প্রাচীন ক্যাসল। ইঙ্কলের কাল থেকে সাংহাই বইয়ে ছবি দেখছি, এবারে সেই সমস্ত চোখের উপর। রাস্তা কী চমৎকার! ঢালাচ্ছেও নরীয়া হয়ে। ঘণ্টায় সত্তর-আশী মাইল নিতান্তই নগ্নি এদের কাছে। যেখানে হু-রাস্তায় কাটাকাটি, সেখানে পুল বানিয়েছে—একটা রাস্তা। অস্ত্রের মাথার উপর দিয়ে আড়াআড়ি চলে গেল। লোকে ষোল আনা পথের নিয়ম মেনে চলে। এত জোরে চালিয়েও দুর্ঘটনা তাই বড় একটা শোনা যায় না। রবিবার—ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়বার দিন আঙ্কে। সাইকেল ও মোটর-সাইকেলে চেপেই বা কত লোক এতদূর এসেছে, সাইকেল রাস্তার ধারে কেলে ঘাসের উপর গড়াগড়ি দিচ্ছে। আমাদের ছুটো গাড়ি তীরের নতো ছুটছে দেখে—চেনা নেই জানা নেই—হাত নেড়ে অভিনন্দন জানায়।

গাড়িতে রেডিও, ড্রাইভার রেডিও চালিয়ে দিল। স্মৃতিবাক্ত হোকরা, রাস্তায় বেঙ্কলেই গানে পেরে যায় তাকে। গাড়ির যত বেগ বাড়়ে স্মৃতি বেড়ে যায় ততই, ওস্তাদের মতন মাথা হলিয়ে স্ট্রিয়ারিং-চাকার উপর তাল বেয়। এমনি ভারি ভক্ত, হেসে ছাড়া কথা বলে না। আমি বসি সামনের সিটে তার পাশে, চারিদিক দেখে দেখে অবিরত কলম চালাই। সকৌতুক বারম্বার সে আড়চোখে তাকায়। পার্যবিহারী বলেই নেকনজর যেন আমার উপরে অধিক।

চারটি মেয়ে বিবর বেগে রুমাল নাড়ছে আমাদের দিকে, আর চৌচাচ্ছে। বিদেশি বলে টের পেয়েছে বৃষ্টি? ভিন দেশের মানুষের বড় খাতির, বিশেষ করে ভারতের আমরা এই কালো মানুষ। রাস্তার ঠিক উল্টো দিকে ফসল-ভরা গমের ক্ষেতে আর এক জোড়া—বোতল থেকে গ্রাসে বিয়ার জেলে খাচ্ছে বোধ হয়। বিয়ার অতি সাধারণ পানীয়, সাদা জল এ-সব দেশে প্রায় অচল, তৃষ্ণা পেলে লোকে বিয়ার খায়। মেয়েরা তত

বেশি খায় না—নিনারেল ওয়াটার, আপেল-রস খায় অনেক। চ্যা স্কেরের উপর প্রকাণ্ড ঝাঁড় দিয়ে বিধে টানিয়ে নিচ্ছে ঐ ঝাঁড়ের চেয়ে প্রকাণ্ডের এক মেয়ে—আজ্ঞে হ্যাঁ, মেঘমাছের চাষী। পিছনে একজন বিধে-টানা লাইনের ভিতর বীজ দিতে দিতে আসছে। ঝাঁড়ের চাষ এই প্রথম দেখলাম। মেটির বিগড়ে গেছে কানের মাশপেথ। ওয়াগনে যন্ত্রপাতি ও মিথ্রি এসে নেহামত করছে।

লৌবার্ণ সহসা বলে ওঠে, রেখো—রেখো। বায় ঘুরতে হবে এবারে।

কেন, কি ব্যাপার? বায়ের গাঁয়ে এক সাহিত্যিক থাকে, তার বাড়টা ঘুরে ঘাই চলে। বড় খুশি হবে। লৌবার্ণের বন্ধ লোক। অস্ট্রেলিয়ান পরিচয়, কি-একটা কাজ করত সেখানে। চাকরি-বাকরি ছেড়ে দেশে ফিরে এসে পুরোপুরি লেখা নিয়ে আছে এখন।

লৌবার্ণ বলে, চলে। তাকে বলে রেখেছি, ফিরতি পথে হোনারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো।

নিত্যন্ত গ্রাম জায়গা, শুধু কিন্তু স্কেন্ড-খামারের পাশে পাশে পাকা রাস্তা। পিচ সেওয়া না হলেও ইটে বাধানো। মোটর চলাচল করে। গৈয়ো চাষীদের মোটর-ট্রাক—মোটর মুড়ি-মুড়কির শানিল হয়ে উঠছে দিন-কে-দিন। লৌবার্ণ পথ ঠিক করতে পারেনি। এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় ঘুরে ঘরছি। নেমে পড়ে একে তাকে জিজ্ঞাসা করে। আনারদের ভাল—পাড়াগাঁয়ের অভিসন্ধি দেখতে দেখতে বাই। আমাদের দেশের পল্লীও মোটামুটি এবনি। এখানে অতিবাস্তায় ছিনছান, এবং মাছুবজনের পোশাক পারিপাতি—এই যা তফাৎ চোখে লাগে।

অবশেষে বাড়ির বোঁজ হল। ছোটখাট বাগানের প্রান্তে টালি-ছাওয়া বাংলা প্যাটার্নের ঘর ক'খানা। এবনি সব পাড়গাঁয়ে বাগান ছাড়া গাড়া-বাড়ি বড় একটা দেখিনে।

লেখকমশায় বাড়ি নেই, বউঠাকরুর সঙ্গে

দেখা হল। কোমরে ভোয়ালে ভড়িয়ে বাড়ি চুকবার পথের ঘাস ইটিছিলেন তিনি। মোটর থামতে চকিত হয়ে তাকালেন। লৌবার্ণের সঙ্গে পুরানো চেনা—উল্লাসে চোঁচিয়ে উঠলেন তাকে দেখে। আমরাও নামছি। ইতিমধ্যে ভোয়ালে ও খুপরি ফেলে ছুটে এলেন রাস্তা অবধি। এত দূর থেকে এলে, কিন্তু বাড়ির মালিক যে নেই! কাল রাত্রি এবং আজ সমস্ত সকাল বসে বসে একটা গল্প শেষ করলেন। একা গিল্লিকে শুনিতে মুখ হল না। লোক খেয়ে বাড়িনে ছুটেছেন—গুণীদের পড়ে শুনিতে কোন এক কাগজে গছিয়ে আসবার জন্য।

লৌবার্ণ চুকচুক করে : ইস, সময় জানিয়ে চিঠি লিখে আসতান যদি!

বেশ হাসিখুশি বউঠাকরুন। বয়সও বেশি নয়, একটি ছেলের মা। সেই ছেলে গপথপ করে বারাতায় বেড়িয়ে এলো। গভীর স্নেহে বাচ্চার দিকে তাকিয়ে শ্রীমতী বলেন, ওই দেখুন, ছোটকর্তা ডাকছেন আপনাদের। বলুন এবারে, চুকবেন না—ফিরে চলে যাবেন। দেখেন কি, দিগগজ লেখক হবেন উনিও। হাতের কাছে কলম পেলেই কাগজে বৌচাখুঁচি করেন। উঃ, আমার কী জালা—এক লেখক নিয়ে হিমসিম, আবার একটি উদয় হচ্ছেন।

জালায় চোটে হেসে উঠলেন। হাত এড়ান যায় না : ঘরে উঠে এক কাপ কফি খেয়ে যান অন্তত। লিখবার ঘর, আয়তনে বড় ছোট। দেয়াল ইটের নয়, কাঁঠের নয়—মালুম হচ্ছে বইয়ের। বই ছাড়া একটা ইকি জায়গা কীকা নেই। কত রকম কায়দায় বই রাখা যায়, দেখে আশ্চর্য গিয়ে। সোজা, কাত, কোণাকুণি, আড়াআড়ি। সারা দেয়ালে ফুলারনি তো ছোট টেবিলের পনেরো আনা জুড়ে বই। শ্রীমতী হাসতে হাসতে অনুযোগ করছেন : ছোটো ভালমন্দ কথা বলব, তারও কি ক্রসং আছে? কাজকর্ম না থাকে তো বই নিয়ে বসল। চোখ চাকল বই সামনে পুঁলে, আমার যাতে নজরে না আসে। ভেবেছিলাম, ছেলেটা বড় হলে তার

সঙ্গে কথার কোয়ারা ছোটাব। বা গতিক, সে-ও বাপের পথ নিয়ে নেবে।

রাস্তায় পড়েছি আবার। ক্ষেতখামার ছাড়িয়ে এসে জঙ্গল। পরিষ্কার পাইন-বন, গাছের পোড়ার নিকটায় ডালপালা ছাঁটা। কত মানুষ আড্ডা দিচ্ছে; মোটর এনেও ঢুকিয়েছে জঙ্গলের মধ্যে। জঙ্গল এরা ভারি ঘরে রাখে, গাছপালা যাতে বাড়তে পারে। জঙ্গল বড় সম্পদ দেশের। জঙ্গলের ধারে লেক, যেমন ঐ একটা দেখে এলান লাইপজিগে। এই বাসন্তী অপরাহ্নে, জল পেয়েছে তো গৈরিকবরণ মেঘেপুরুষের হরোড়। রাস্তার পাশে পাশে নয়ানজুলি দেখা যাচ্ছে ঠিক আমার নিজের গ্রামের মতো। শালুক ফুটেছে। আর এক রকমের গুঁড়ি-গুঁড়ি সাদা ফুল—জলের উপরটা ধবধবে সাদা হয়ে গেছে একেবারে। খরস্রোত নদী পার হলো একটা—নদীর দু-কূল ছুঁয়ে ফসলের ক্ষেত। আবার এক লেক, আর অগণ্য মানুষ। এলু নদী পার হচ্ছি—নদী অনেক চওড়া এখানে। পুল ভেঙে দিয়েছিল—অর্ধেকটা বানিয়ে কাজ চালানোর মতন করেছে, বাকি অর্ধেক বানিয়ে আসছে ওদিক থেকে। নদীর ধারে ফ্যাক্টরি। জলস্রোত গেলেই পাশে ফ্যাক্টরি বানিয়ে বসেছে, এই এক কাণ্ড দেখছি এদের। জমনি কত বড় নিরোক্ত দেশ, এই গ্রাম-যাত্রায় সেটা আরও ভাল মালুম হল। অদূরে অনেক চোড়া দেখতে পাচ্ছি, বড় বড় ফ্যাক্টরি। কোন এক নারী জারগা—ভাইটেনবার্গ (Wittenberg)—ডান দিকে রাস্তা বেরিয়ে গেল, মোড়ের মাথায় নাম লেখা আছে। সন্ধ্যা হবো-হবো—আরও কবে ঘোড় দিয়েছি আমরা। বুপসি-বুপসি গাছ দু-পাশে, হলদে ফুলে পাতা দেখবার জো নেই। হলুদ-গুঁড়ো গাদা গাদা রেখে দিয়েছে যেন, তুঁই দেখতে দিচ্ছে না। কত মেয়ে কত পুরুষ রাস্তার ধারে গাড়ি রেখে এসব হলুদ-ভলায় গল্প-গুজব করছে। বালিন থেকেই

এসেছে হয়তো, ছুটির দিনে বাট-সত্তর নাইল গ্রাফের মধ্যে আনে না। সূর্য ডোবে পাইন-বনের আড়ালে। এমনি দূরের দেশে পাইন-বনের মধ্যে সন্ধ্যা-হওয়া আর ঘটবে না জীবনে। কী-ই বা ঘটবে, বকনাই শুধু জীবনের বাকি মেয়াদটুকু—আবার গায়ের বিলে সূর্য-ডোবাও দেখব আর কোন দিন?

সব মানুষকে যেন এখন গতির নেশায় পেয়েছে। ভর-সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার নেশা। আনাদের আগ-পিছে আরও বিস্তর মোটর—গা করে কাটিয়ে যায় একবার, আবার পিছিয়ে পড়ে। তরুন ড্রাইভার হার মানবার মানুষ নয়—বিসেশি ব্রিগিড চড্ডনার ক'টি নিয়ে গাড়ি ছাত্ত-ছাত্ত হয়ে যায়, সে-ও বীকার। গগলস-পরা মেয়ে চালকের পিছনে বসে চালকের হু-কাঁখে হাত দুটি বেলে উদ্ধার বেগে ছুটেছে। এরই মধ্যে সহসা এক স্থিরচিত্র। গাছতলার ঘাসের উপর সতরঙ্গি পেতে তরুণী বই পড়ে শোনাচ্ছে, হুই গালে হাত রেখে মুগ্ধ হয়ে শুনছে ছেলেরা। পড়া শুনছে অথবা মুগ্ধ হয়ে দেখছে পড়া। পুল ভেঙে দিয়েছে একটা মাথার উপরের, সেটা আর মেরামত করেনি, আড়াআড়ি রাস্তাটা বাতিল। আরও একটা দেখতে পাচ্ছি জমনি। আরও, আরও। বালিনের কাছাকাছি এসেছি অতএব, লড়াইয়ের আক্রোশের উগ্রতর চেহারা।

উঃ, গাড়ির বেগ অসম্ভব রকম বাড়িয়েছে, যেন উড়ে চলেছে সকলকে পিছনে ফেলে। রাস্তার বড় একটা বাঁক। ঘন জঙ্গল দু-পাশে। দেখতে দেখতে মাঠ এলো। একটা পুলের খানিকটা কেটে দিয়েছে যেন—জমনি ফুলছে, মেরামত হয়নি। ফুল দোলাচ্ছে আমাদের দিকে কয়েকটা মেয়ে, খিলখিল করে হেসে এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। এক মাঠে গরু ও ঘোড়া চরছে বিস্তর। ঘোড়ার রঙের রকমকের আছে, কিন্তু প্রতিটি গরু সাদা-কালোয় মেশানো।

অল্পশ্র উইলো-গাছের নিচে দিয়ে যাচ্ছি। গ্রাম—অর্থাৎ আমাদের আশা-শহর জারগা।

লাঠি হাতে ঠাসের পাল তাড়িয়ে চলেছে বড়ি। আর এক বড়ি ছাগলের গলার দড়ি ধরে টানছে। দেবশিত্তর মতো কুটকুটে বাচ্চারা খেলা করছে পথের ধারে।

বালিনে ঢুকে পড়লাম আজ আট-নিনের-দিন। রাস্তার ধারে ধারে মরচে-ধরা পুরানো লোহালকড়।

পাহাড় প্রমাণ। ভাঙা ঘরবাড়ি থেকে উদ্ধার করে এনে গালা বিচ্ছে। লীবার্গ ঝাঁপিকে হাত দেখায় : ঐ যে ঝোঁড়াখুঁড়ি করছে, এখানে বিদ্যেদারক জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। টেলিফোনের কথাবার্তা চুরি করে শোনবার জুজ নানান কলকল্লা বসিয়েছিল। কী মুখে রয়েছে তবু বোক!

[ক্রমশঃ]



হাটে হাড়ি-ভাঙা

[শিল্পী : বঙ্গীন্দ্র চক্রবর্তী]

প্রতিদ্বন্দ্বী

[৩য় গম]

রচনা : আশুভন শেকত্ । অম্ববাদ : ত্রিকুঞ্জে চন্দ্র

সেপ্টেম্বরের রাত, নটা বেয়ে গেছে। জেঘমটভোর মেডিকেল অফিসার ডাক্তার কিরিলভের একমাত্র পুত্র এনড্রি— বছর ছ'বেক বয়স—এইমাত্র নানা গেল, নানা গেল ভিন্‌বিরিয়া রোগে।

ছোট বাটটা ধরে হাঁটু মুড় কল আছে ডাক্তারের স্ত্রী। এমন সময় দরজের বেলটা জোরে বেজে উঠলো।

রোগটা ভিন্‌বিরিয়া। তাই লোকজনদের বাড়ী থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিরিলভের গারে ফুলহাতা শাট, ওপরে চাপানো ওয়েস্ট-কেট, কোর্টের বোতামগুলো খোলা। খেলের আওরাজ তখন ডাক্তার এগিরে বাহ খোলা দরজার দিকে। চোখ তখনও ডেজা, হাতের লেগে আছে কার্খলিকের সাপ। হলদট্টা অঙ্ককার, ঐ অঙ্ককারের মধ্যেই ডাক্তার একটা লোককে ধরে ঢুকতে দেখে—গলায় লাল মাক্‌লার, চওড়া মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

“ডাক্তারবাবু কি বাড়ী আছেন?”

“আমিই ডাক্তার, কি দরকার আপনার?”

লোকটা আশ্চর্য হয়ে বলে, “বাৎ! ঈজলাম, আপনার দেখা পাব ভাবতেই পারিনি। অঙ্ককারের মধ্যে হাতুড় ডাক্তারের হাতটা ধরে জোরে চাপ দিতে দিতে বলে, “আপনার বেমা শেষে বড় খুশী হলো। এখা আগেও আপনি আমাকে দেখেছেন, মনে আছে নিশ্চয়? আমার নাম এবোবিন, মুচেক্স—এ গ্রীষ্মকালে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। আপনাকে শেষে ঝটাম। বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। এখুনি চলুন, বাইরে গাড়ী ধাড়িয়ে আছে, দখা করে আহুন।”

গলার আওরাজ ও হাবডাবে লোকটাকে খুব বিচলিত মনে হয়। হাঁপাতে হাঁপাতে কথা বলছে, যেন একটা বিপদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে কোনরকমে পালিয়ে এসেছে ও। ছোট ছেলেরা ভয় পেয়ে বেরকম ভাঙা-ভাঙা কথা বলে, লোকটাও সেইরকম কথা বলতে আরম্ভ করে। কবেরডাগই অবান্তর কথা, কাজের কথা বুঝে কন।

লোকটা বলে চলে—“আমি ভয় পেয়েছিলাম, ভয়েছিলাম আপনাকে বাড়ীতে পাব না। সারা পথটা ভাবতে ভাবতে এসেছি। ভগবানের যোগাই, মাথাটা পরে চলে আহুন।

পাণ্ডিনিকি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। আপনি তাকে ধরেন। কিছুক্ষণ গল্প করে আমার চা খেতে বাই। এমন সময় আমার স্ত্রী কুকর ওপর হাত ছুটো রেখে হঠাৎ বিকট গীংকার করে চেয়ারের ওপর এগিরে পড়ে। আমবা হুজনে ওকে ধরে ছিটানোর গুইয়ে দিই। অ্যামোনিয়া দিয়ে রগ ছুটো ঘষে দিই, মূপে ছিটিয়ে দিই অল। কিন্তু সে মড়ার মতো গুয়ে থাকে। আমি ভয় পাছি ডাক্তারবাবু, রোগটা বোধহয় ‘ম্যাহুরিঙ্গন’। ওর বাবাও ঐ রোগে নারা গেছেন। আপনি এখুনি চলুন!”

কিরিলভ কথা না বলে চুপ করে গেলেন।

পাণ্ডিনিকি ও বস্ত্রমণ্ডারের কথা তুলে এবোবিন বেই কিরিলভের হাতটা ধরতে বাবে, ডাক্তার চকিতে পিছিয়ে এসে কেটে কেটে বলে, “মান কয়নেন, আপনার বাড়ীতে যেতে পারছি না, পাঁচ মিনিট আগে আমার ছেলোটা মারা গেছে।”

এক-পা পিছিয়ে এসে এবোবিন বলে, “না? সস্তা যাবেন না! হায় ভগবান, কী অসময়েই না এসে পড়েছি! কী দহুত আচর্ষ মিল দেখুন। বিশেষ পড়ে আমি ছুটে এসেছি আপনার কাছে, অথচ এদিকে আপনারও বিপর।”

দরজার হাতলটা ধরে এবোবিন ধাড়িয়ে আছে। মাথাটা হেল পড়েছে সামনে। মনে মনে হততো ভাবছে—ওলে বাব, না আমার বা বলার আছে তা কলব।

কিরিলভের শাটের হাতাটা ধরে ও বলে চলে—“গুহুন, আপনার বিপদের কথা আমি বুঝতে পারছি। টপরই আনেন, এই অসময়ে আপনার কাছে আলতে বাধ্য হয়েছি। আমি কী করতে পারি বসুন? কোথায়-বা আমি যাব? আপনি ছাড়া এখানে আর কোনো ডাক্তার নেই। ভগবানের যোগাই, আহুন! আমার মতে আপনাকে ডাক্তারি না।”

ঘরের মধ্যে কোনরকম শব্দ শোনা যায় না। কিরিলভ এবোবিনের দিকে পিছন কিয়ে গাড়ায়। কোনো কথা না বলে ‘আছে’ আর ‘হলদর’ বোকে বেরিয়ে যায়।

বৈঠকখানার এসে টেবিলের ওপর মোটা বইটার দিকে তাকিয়ে থাকে কিরিলভ। কোনো বিষয়ে তার উৎসাহ নেই, কিছুতেই নেই আর আগ্রহ। একজন লোক যে তারই

প্রতীকায় হৃদয়ের অশ্রুতা করছে, এ কথা যেন সে ভুলেই গেছে। অন্ধকারে দরজার চৌকাঠটা ঝিক করতে পারে না, সাবধানে পা ফেলে ফেলে ভাকার পড়বার ধরে চলে যায়। যেন সে কোনো অজানা বাড়ীতে এসে পড়েছে।

ঘরের শোষণ ও শব্দবহর হইয়ের ওপর আলো এসে পড়েছে। কার্ধাসিক ও ইথারের কড়া গন্ধ জেলে আসছে আশ-খোলা দরজা দিয়ে। টেবিলের কাছে একটা চেয়ারে বসে পড়ে ভাকার। বইগুলোর বিশেষ কিছুকণ ডাকিয়ে দেখে, পরে শোবার ঘরে চলে যায়।

দুপাকার বোতল, বাস ও জার চড়িয়ে আছে ঘরটার মধ্যে। ওইই মধ্যে একটা টুলের ওপর ঘোষবাতি জ্বালা। রেজেকের ওপর বড় মাথোটা ঘরটাকে আলো করে তুলেছে। ঝিক জানলার নিচে বাটতে পড়ে আছে ছেসেটা—চোখ-হুটা খোলা। চোখে মুখে হুট বয়েছে বিষয়ের ভাব। চোখ-হুটা কালো হয়ে উঠেছে, যীরে যীরে বালু খাচ্ছে কোটরের মধ্যে। বিছানার একপাশে ছেসেতে ধরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে না, চান্ডের ঢাকা হার মুখে। কী গভীর মনস্তা মার ঐ নিম্নলি নিম্নের ঠাকা পরীর ও হাতে-হুটার মধ্যে। অবশেষে জ্ঞান সেই হুঁকে পেরেছে তার হুখ, তার শাখি! তাইতো পরীরের সব শক্তি দিয়ে যা ব্যগ্রভাবে ছেসেতে ঝিকড়ে ধরে পড়ে আছে বিছানার ওপর।

তখন, হেঁচা কাপড়ের টুকরো, জলের বাতিল, মেজের ওপর জন্ম-বাফা জল, এখানে-সেখানে ছুটানো জ্বাণ ও চামড়, চুনও জলের সাধা বোতল, এমন কি ঘরের বাতালের মধ্যেও একটা হুগভীর শাখি বিরাট করছে।

হাত-হুটা পা-জামার পকেট পুরে ভাকার হীর পাশে এসে বিছানা। মাথাটা হেসিয়ে ছেসের দিকে একদুট্টে তাকিয়ে থাকে। উলানী ভাকারের হাড়ির ওপর চক্চক্ করতে করতে ফোটা চোখের জল। যেন হয়, কিছুটা আগে যেন কেসেছে ভাকার।

হুটায় কথা যেন পড়লই মাথারের যেন যে জ্ঞান ও বিদ্যার চাফা জ্ঞান, শোবার ঘরের আবহাওয়ার মধ্যে সে-রকম কিছু দেখা যায় না। যার মেহের তখি, যাবার যুগের ঐক্যের মধ্যে ঐ বিষয় নীরবতারও একটা সৌন্দর্য আছে। মাথারের যুগের এই সৌন্দর্য সহজে বোকা যায় না, বর্ণনা করা আরো দুঃস্থ হবে ওঠে।

কিরিল্ড ও তার শ্রী দুইনই দীর্ঘ, কান্ডা ওষের কেনে সেছে। যৌবন যেন হয়ে এসেছে দুইনের। ছেলের যুটায়

সঙ্গে সঙ্গেই ওষের সন্তান-সন্তান ভিরকালের জন্তে যেন হয়ে সেল। ভাকারের যদন চুখামিন, চুলে পাক ধরতে আরম্ভ করেছে। শ্রী বোঙ্গা, যদন পয়সিন। এন্ট্রি শুধু একঘায়ে পূর্ণ নয়, শেষ সন্তানও বটে।

ভাকারের যদন হীর যতো অতটা নরম নয়। যুগের কট্টে তেড়ে পড়েনি ভাকার। হীর পাশে কিছুকণ হাড়ির ভাকার শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এবারের পাটা সাবধানে কেসে ছোট করের মধ্যে চলে আসে। আশখানা ঘর জুড়ে দেখানে হছেছে একটা লোকা। ওখান থেকে ঢোকে রান্নাঘরে। উঠন ও হাঁদুনীর বিছানার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। পরে মাথাটা নীচু করে ছোট দরজাটা পেরিয়ে চলে আসে হলঘরে।

দরজার হাতল ধরে হাড়ির আছে এখানে। ভাকারকে দেখে বলে, "একটিবার দ্বা করে চানুন!"

সখিং ফিরে আসে ভাকারের; বলে, "আমি তো বলেছি যেতে পারব না।"

হাতখানা হাতলারের ওপর রেখে এখানেই বলে চলে— "আমি পাথর নই, ভাকারবাবু। আপনায় মনের অবস্থা আমি বুঝি, আপনায় জন্তে সত্যিই আমি দুঃখিত। আমি আমার জন্তে আপনাকে ডাকছি না। আমার শ্রী যরতে বলেছে, যদি তার চাঁকায় জন্মভেন, যদি তার যুগের চেহারা দেখাভেন, তাহলে আমার এই গীড়গীড়ির কারণ বুঝতে পারতেন। হাংরে কপাল, আমি যেন করেছিলাম আপনি বুঝি কামা বদলাতে সেতেন। মোহাই ভাকারবাবু, আর সময় নষ্ট করবেন না। দ্বা করে চানুন, এই অগ্রবোধটা হানুন।"

দরবার ঘরে বেতে বেতে ভাকার উত্তর দেয়, "হাপ ককু, আপনায় দ্বা যেতে পারছি না।"

সেতেন বেতে বেতে এখানেই ভাকারের শাটের হাতটা ধরে বলে, "বিদ্য বিদ্যে পড়েছি, অথবা আপনাকে বিরক্ত করতে আসিনি। আমার শ্রীকে বিচান, ব্যক্তিগত জ্ঞান-জুগের তেরে এই জীবন অনেক কড়া। মানবতার মোহাই, আপনি আনন।"

কিরিল্ড বলে, "মানবতা...মানবতা তো হু'মুখে শাখিত অগ্রবিশেষ। ঐ মানবতার মোহাই দিয়ে আপনাকেও অগ্রবোধ করছি, আমাকে আর যেতে বলবেন না। বিদ্যে ককন, আমি আর বিদ্যতে পারছি না। মানবতার মোহাই দিয়ে আপনি আমাকে উত্তেজিত করতে চাইছেন, কিন্তু সত্যি বলছি এই অবস্থায় আমি কোনো কামেই লাদবনা।" এক পা

পিছিয়ে এসে হাত নেড়ে বলে, “না, না—হুতা করে আমাকে আর অহুরোণ করবেন না। আইনের খাত্তিরে আমি আপনার সঙ্গে যেতে বাধ্য, আশনিও আমাকে হাত ধরে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারেন। বেশ, তাই করুন। আমি কোনো কাজেই লাগব না। কথা বলতে আর পারছি না, আমাকে কথা করুন।”

এবেগিনের বর আবেগে কঁপে ওঠে। দরলপ্রগতি এবেগিনের কথাগুলো মোটেই প্রতিবন্ধুর নহ—মোটো মোটো হানো ঝাঁপা, অথবা অলম্বারে ভর্তি। নিজের বিশেষ কথা ডাক্তারকে বোঝাবার জন্যে সে আগ্রাণ চেষ্টা করে। কথাগুলো যে ডাক্তারের মনের অবস্থার সঙ্গে ঝাপ খায়ে না, এ খেয়ালই এবেগিনের নেই।

কথার মাধ্যমে প্রেমিক ও প্রেমিকা নিজেদের হৃদয়টা না ভালো করে বুঝতে পারে, তার থেকে অনেক বেশী বোঝবার অবদান পায় তাদের মধ্যে। যুক্তব্যক্তির মধ্যে আবেগময়ী বাস্তি প্রকাশ করবার সময় আমাদের খোঁজা থাকেনা এই কতটুকু মূল্য আছে, তাই বাইরের লোকদের কাছে মর্যপন্থী হলেও, স্বামীদ্বারা স্ত্রী বা পিতৃদ্বারা সন্তানের কাছে কথাগুলো ঠাণ্ডা, তুচ্ছ বলে মনে হয়।

কিরিলভ্, চুপ করে গাড়িয়ে শোনে। এবেগিন্ ডাক্তারের মহৎ পেশা ও স্বার্থত্যাগের কথা তুলতেই কিরিলভ্, মিলেস কিয়ে, “বু বুর কি ?”

“মাত্র দু-তিন মাইল হবে। আমার ঘোড়া দু’টো ডায়ে। কথা মিথি, এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনারকে ছেড়ে দেবো—মাত্র এক ঘণ্টা।”

কিরুলভ্ চুপ করে গাড়িয়ে থেকে ডাক্তার বলে, “বেশ, চলুন।”

পড়বার ঘরে ডাডাডাড়ি চলে এসে ডাক্তার নিজেকে সামলে নেয়। কিছু পরেই গোলাকী কোটটা গায়ে চাপিয়ে বেরিরে আসে। ডাক্তারকে আগন্ত দেখে এবেগিন্ চুপচুপে হয়ে ওঠে। এসোমেনো পলকেনে ডাক্তারের পাশে চলতে চলতে কোটটা ধরে ডাক্তারকে সাহায্য করে।

বাইরে অন্ধকার হ’লেও হলঘরের মধ্যে অতটা গাঢ় নয়। সামনে মোমালো ডাক্তারের দীর্ঘমুখ, পাশে ছোট ছোট বাড়ি, ঝাঁক নাক ঐ আলোছায়ায় মধ্যে স্পষ্ট দেখা থাকে। এবেগিনের মূণ শুকনো, মাথার বড় টুপি। সামা মাকলালের সামনেটা দেখা থাকে, পিছনের অংশটা ঢাকা পড়েছে হুনের নিচে।

গাড়ীর ভেতর ডাক্তারের পাশে বসে এবেগিন্ বলতে

আরম্ভ করে, “আমাকে বিশপ করুন, আমরা এপুনি পৌছে যাব। আপনার কাছে সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ। লুকা, গাড়ী ইকোও—হুত ছোরে পার।”

গাড়ী ছোরে চলতে আরম্ভ করে। প্রথমেই পড়ে হাসপাতালের সামনে ডাঙা বাড়ীর সারি। বাগানের ডানমিকের এবং হাসপাতালের ওপর-তলার গোলা তুলনা পিরে আলো আসছে। অন্ধকারের মধ্যে বাড়ীগুলোকে আঁধা দেখা যায়, আলোর ঘোলাটে কাচগুলো চোখে পড়ে। গাড়ীটা চলছে অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে। ব্যাঙের চাতার ঠাণ্ডাশৈতে গড় ভেসে আসছে, আর ভেসে আসছে পাতার ধ্বংস আভাষ। গাড়ীর চাকার শেষে কাকগুলো ভেসে ওঠে, ভয় পেয়ে বিকট চীৎকার জুড়ে বেধ—বেন ডাক্তারের ছেলের মৃত্যুর এবং এবেগিনের স্ত্রীর অস্থির বর ওরা জানতে পেরেছে। মাঝে মাঝে একটা-দুটো গাছ ও ছোট ছোট কোণ দেখা যায়, আর দেখা যায় পুরুত্বের মনের ওপর অস্পষ্ট কালো-কালো ছায়া। গাড়ীটা জমে পথের পাশ এসে পড়ে। ডাক্তার কর্তৃপক্ষনি কীণ হয়ে আসে, শেষ পর্যন্ত একবারে মিলিয়ে যায়।

এবেগিন্ ও কিরিলভ্ চুপ করে বসে থাকে। প্রথমে কথা বলে এবেগিন্, “কী অশুভ সেদুন! আপনার মনের হারাবার পূর্বসূর্য পর্ব জানতে পারি না—ওদের কতখানি ভালোবাসি আমরা।”

মোটো পার হবার সময় গাড়ীটা ধীরে ধীরে চলতে থাকে। কিরিলভ্, হঠাৎ নেড়ে বসে, মনের পাশে সে বেন সঁজাগ হয়ে উঠলো। “দেখুন, আমাকে ফিরে যেতে দিন”, বিনবভাবে বলে ডাক্তার, “স্ত্রী একা আছে, একজনকে তার কাছে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েই আমার আসলো।”

কোনো লাড়া পাওয়া যায় না এবেগিনের কাছ থেকে। পথে ছড়ানো পাথরে লাড়া বেগে গাড়ীটা হুলতে থাকে। ধীরে বেলাজুমির ওপর এসে গাড়ীটা দোঁকা হয়ে চলতে আরম্ভ করে। হঠাৎ কিরিলভ্, চকল হয়ে ওঠে, চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। তারার কীণ আলোর পেছনের কাপুদা পথ ও তারের ছোট ছোট গাছগুলো অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে থাকে। তাইনে পড়ে রয়েছে স্বপ্নপ্রসারী সবলভূমি। দূরে—হস্ততা ঘাসের চাপড়ার ওপর—কীণ আলো এসে পড়েছে। ঠা-মিকে কোণে ভর্তি পাহাড়ের সারি। তারই ওপর আঁখানা লাল টাস বিহ হয়ে গাড়িয়ে আছে, গাড়িয়ে আছে লুশা ও ছোট ছোট ছোঁড়া মেঘের মধ্যে।

প্রকৃতির সবখানাই ছড়িয়ে আছে—বোপ, পোক, হতাশার

চাফা : যে-দিকেরই দৃষ্টি পড়ে, সেইদিকেরই দেখা যায় অনন্ত অসীম অশ্রুকারের গম্বীর। কিরিলভ্, এবোগিন্, এমন কি আশখানা চাপও ঐ গম্বীরের দ্বারা থেকে বেহাই পায়নি।

বাঁজীর কাছে গাভীটা বসেই এগিয়ে আসে এবোগিন্ তবুই অধঃস্থ হয়ে ওঠে। হঠাৎ সে লাগিয়ে উঠে গাভীটারে দিকে তাকায়।

চোরা-কাটা কানভালের পশায় ঢাকা ছবির মতো ব্যাংকার সামনে গাভীটা এসে গাঁড়ায়। এবোগিন্ তেতলার তালবার আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে, ক্রান্ত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াস শোনা যায়।

চারিদিক নিম্নম্। কান খাড়া করে আছে এবোগিন্। কোনরকম শব্দ না শোনে আশঙ্ক হয়ে বলে, “চিন্তার কোনো কারণ নেই, কিছুই তো শোনা যাচ্ছে না।”

চারিদিক নিম্নম্, সারা বাতীটা বেনে ঘুনিয়ে আছে। হলগের মতো অগ্নিতে একটা তোরগো আসে। এতক্ষণ ভাকার ও এবোগিন্ অশ্রুকারের মধ্যে ছিলো, এখন আলোর মধ্যে এসে দুজনে পরস্পরকে দেখতে পেলো। চ্যাঙা ভাকারের কাঁধ হঠাৎ সামনের দিকে হুঁকে পড়ছে, আশুখান্ হয়ে পড়ছে গাভীর বেশ—সব মিলিয়ে ভাকারকে মোটেই ভালো লাগেছে না। নিয়োগের মতো মোটা টোটা, ছুঁতোসো ঠংকা মাক, নিতক চাউনি। বকনা স’বে স’বে জীবনের প্রতি এসেছে অবশ্য। ভাকারকে দেখে কিছুতেই বিব্রাণ হয় না যে—ঐ লোকটার স্ত্রী আছে, ছেলের গল্পে কাঁদতেও পারে ঐ লোকটা। এবোগিন্কে বেশতে ঠিক উঠে—থেকে, মোটা, বাঘটা বড়ো। আধুনিক বেশভূষার সম্বন্ধে এবোগিন্কে বৃদ্ধব বলা চলে। গায়ে আটসাঁট গোপাকী কোট, চমকে-বলনে আভিষেকের ছাপ ফুটে ওঠে। পুঙ্খবহ মতো বৃক চিহ্নিয়ে চলে, পুঙ্খালী ভাবে ফুটে ওঠে কথাবার্তা। কিন্তু একটা মূহুর্তের মধ্যে গাভীর বদলে। মাফলার গহিরে মাথার চুলগুলো ঠিক করতে করতে বহন পে কথা কল তখন তার হাত মেয়েলী হর ফুটে ওঠে।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে এবোগিন্ বলে চলে—“কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, কোনো শব্দও শুনি না। আশা করছি...”

এবোগিন্ ভাকারকে সঙ্গে করে হলগের মতো ঘিরে বড় ঘরটার চলে আসে। সেখানে কোণে দাঁড় বড় একটা শিয়ানো, কঁকিরটে বোয়ালো আলোর কাড় সালা কাপড় দিয়ে ঢাকা। ঘর থেকে বৈঠকখানায় চলে আসে তারা, অশ্রু সাধনো ঘরটা—কিকে গোলাপী রঙের আলো জ্বলেছে ঘরের মধ্যে।

“ভাকারবাবু, একটু আলো ককন, এক মিনিটের মধ্যেই ঘিরে আসছি। আপনার আলার বহরটা তাদের জানিয়ে দাি। এক মিনিট, দাঁড় আর আলো।”

ঘরের মধ্যে কিরিলভ্, একা। অশ্রুনা বাতী, দামী কিনিশপন—কিছুই তার মনের ওপর ছাপ ফেলতে পারে না। হাতলওলা চোখে বলে আত্মলোর কাঁধিকের দাগ দেখে। গাঢ় লালরঙের ভাকটা এবং মেলেকেগটার দিকে একটুখানি চেয়ে ঘড়ির দিকে তাকালে, মরা বেকডেটার ওপর চোখ পড়ে—এবোগিনের মতোই মোটা ছটপুট বেকডেটা।

সারা বাতীটা নিম্নম্ হয়ে আছে। ঘুরে অক একটা ঘর থেকে কে বেন ভোরে টেঁচিয়ে ওঠে—“আ।” আলমারির কাঁচের পান্নার ঠংক্ আওয়াস শোনা যায়। আলার সব নিম্নম্ হয়ে আসে। পাঁচমিনিট হয়ে গেল এবোগিনের দেখা নেই। কিরিলভ্ হুঁকে পড়ে নিম্নের দাঁড় হুঁতো দেখে। যে সরাসরি এবোগিন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, সেই সরাসরি দিকে চোখ বেলে তাকায়।

ঘরজার কাছেই এবোগিন্ গাঁড়িয়ে আছে। কিছু আগে যে-লোকটা এ ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে এ-মাছন সে-নাছন নয়। সমস্ত শরীর ধবধব করে কাঁপছে, চোখে-মুখে বেরনার ছায়া।

ভোরে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে ঘরের মাঝখানে এসে গাঁড়ায়। সামনের দিকে হুঁকে হাত-জুটা মূঠো করে ঠংকার করে ওঠে—“ঠকিয়েছে, আমার স্ত্রী আমাকে ঠকিয়েছে! সে পালিয়েছে, সমস্তই ভান—লোক-বেশনো অশ্রু। গাঢ়নিম্নের সঙ্গে পালাবার অগ্নেই সে আমাকে গহিরে বসে।”

হলগত হয়ে সে ভাকারের কাছে এগিয়ে আসে। সালা হাত জুটা ভাকারের মুখের সামনে নেড়ে চেঁচাতে থাকে, “আমাকে ত্যাগ করেছে, আমাকে প্রত্যাখ্য করেছে! যে ভগবান, যে ঈশ্বর, সব মিথ্যা। এ নোরা মূহুর্তি করা কেন? কেন এই আলকন্দী? আমি তার কী কতি করছি, কেন সে এভাবে পালিয়ে গেল?”

ঘরটার এবিক থেকে ওঠিয়ে সে এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়। চোখের অল গালের ওপর গড়িয়ে পড়ে।

কিরিলভ্ গাঁড়িয়ে ওঠে। এবোগিনের দিকে তাকিয়ে মিজেস করে, “কণী কোথায়?”

“কণী! কণী!” এবোগিন্ ঠংকার করে বলে, “আমার স্ত্রীর রোগ দাবি, সে কলটা। ঠাং—ঠাং, আমার স্ত্রী কলটা।

এতোদিন ঐ বোকা ঠাণ্ড লম্পটটার লগে পাল্লাবার হুংগাম খুঁজছিলো। তাই সে আমাকে আপনায় কাছে পাঠিয়ে তার পাল্লাবার পথ সন্ধান করে নিচ্ছে। এর চেয়ে সে মরে গেলে ভালো হতো। আমি কুলতে পারব না...না না, কখনই না।"

"মাশ ককন, এলব কথা আমাকে শোনচ্ছেন কেন? আমার ছেলে মাঝা গেছে, তার যা একা বাড়ীতে আছে। ডিন-ডিনটে হাত আঘাত বুঝতে পারিনি—অথচ এখানে এসে কী দেখছি! ঠাট্টা-মকরা করা হচ্ছে আমার সঙ্গে? খুলে বলুন সব, কিছুই হুজুতে পারছি না।"

এবাগিন্‌ হুজু খুলে কাপড়ের টুকরোগুলো মাটিতে ছুড়ে কেনে দেয়। পা দিয়ে টুকরোগুলো মাড়তে থাকে, যেন একটা শোকাবোকে ঘেরে কেলতে চায় এবাগিন্‌।

হুজুর সামনে হাত নেড়ে এবাগিন্‌ বলে চলে—"কিছুই লক্ষ্য করিনি, কিছুই হুজুতে পারিনি আগে থেকে। যোজ যোজ কেন সে আসে, আগে কোনদিনই চিন্তা করিনি। আরও যে বাড়ী নিয়ে এসেছে তাও বোঝাল করিনি। গাড়ী কেন? আমি চোখ বুজেই ছিলাম, কিছুই লক্ষ্য করিনি। হ্যাঁ...হ্যাঁ...আমি এতোদিন চোখ বুজে ছিলাম।"

ডাক্তার বলে ওঠে, "এলব বলার মানে কী? আমি কিছুই হুজুতে পারছি না। বাপদর মনে হচ্ছে, ব্যক্তিগত বিশেষ আর পুণার কথা এগুলো। জীবনে এরকম কথা আগে কখনো শুনি নি।"

ডাক্তার নিজেকে অশ্রুমানিত বোধ করে। কথা বলতে পারে না, দিশপার হয়ে চেঁচাবে এলিয়ে বলে।

"...তা হ'লে তুমি আমাকে ভালোবাসনা। তুমি অপর পুরুষকে ভালোবাস। বেশ, ভালো কথা। কিন্তু এ প্রস্তাবনা কেন? কেন এই গুণা, স্বভাব চ্যাবুরি!" কাপতে কাপতে এবাগিন্‌ বলে, "কেন, কিসের ভয়ে এমন করলে? তোমার কি কতি করেছি আমি?" বিরিলাভের কাছে এলিয়ে এসে বলে, "আমার এই হুঁজোগোহু সাক্ষী আপনি, কিছুই আপনায় কাছে পুঁকোব না। আমি আপনার কাছে লম্বা করে বসছি, ঐ মেয়েমাছটাকে আমি ভালোবাসতাম, পূজা করতাম, তার দাগ হয়ে ছিলাম। তার হয়ে লোকজনদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি, কাঁধে ইতলা নিয়েছি, গান-গাওটা চেড়েছি, কী করিনি তার ভয়ে? নিজের মা-বোনের ভয়ে বা কোনদিন করিনি, তার ভয়ে তাও করেছি। তার কাছ থেকে প্রতিবাসে কিছুই প্রত্যাশা করিনি, হবে কেন এই গুণা প্রত্যাশা?...খনি আমাকে ভালোবাসতে না পেয়েই

থাক, সে কথা জানালেনা কেন আমাকে? তুমি তো আমার মনের কথা জানতে..."

এবাগিনের চোখ দিয়ে তল পড়িয়ে পড়ে, দায়্য দেহটা কেঁপে ওঠে। বুকটা হাত-হুটা গিরে চেপে ধরে সবলভাবে মনের সব কথা বলে যায়। কথাকলো বলে বুকটা হালকা ঘনে হয়, নিম্নেয়ে কিছুটা হুহু বোথ করে। আরো একখটা যদি সে অনর্গল বাক বেতে পারতো, হুতো বুকটা একখবারেই খালি হতো। কিছুটা হুহু বোথ করতো নিম্নেয়ে। কে জানে!

একটু পের ধরে ডাক্তার যদি মন দিয়ে কথাগুলো শুনতো, এবাগিন্‌ হুতো কিছুটা শায়না পেতো, অথবা বোকার মতো হা-তা বলে যেতো না।

তা হ'লে না। এবাগিনের কথা-বলার সময় ডাক্তার হঠাৎ হয়ে পড়ে। বেশ বুজতে পারা যায় যে, সে ভুটে উঠেছে। একটা হুকটা স্ত্রীলোকের কটো—সরল, শান্ত প্রকৃতির স্বভাব—সামনে ধরে এবাগিন্‌ ডাক্তারকে জিজ্ঞাস করে, "এই মেয়েমাছটা যে নিম্নেয়ে কথা বলতে পারে, কটো দেখে কি সে-কথা বিশ্বাস করা যায়?"

প্রর তম ডাক্তার পিড়িরে উঠে বলে, "আমাকে এলব কথা কেন বলছেন? আমার কাছে ওগুণার কোনো দৃশ্য নেই, শুভত চাইনা আপনায় ওগুণ বখা।" টেবিলের ওপর গাশড় ঘের ডাক্তার বলে চলে—"আপনার এই তুচ্ছ কথায় আমার কোনো প্রয়োজন নেই, হুতোয় বাক ওগুণ বখা। এইলব দৃশ্য আমার কাছে ওটাতে আর সাহস করবেন না।"

ডাক্তারের মুখে এলব শুনে এবাগিন্‌ দু'পা পিড়িরে এসে পিড়ায়।

ডাক্তার বলে চলে—"কিভাবে আপনি আমাকে এখানে এনেছেন? ভালো বুজছেন আপনি যিরে করেছেন। আপনার পারিবারিক বিষয় নিয়ে আপনি যা ইচ্ছে তাই ককন, আমার সঙ্গে ওর কী সন্ধান? এই কাপারে আমি কী করতে পারি? আমার শক্তিই থাকতে দিন। অভিন্ন করতে চান ককন, কিন্তু কোনদিন সাহস করবেন না মাহবকে এইভাবে ছোট করতে। তারের লক্ষন যদি না দিতে পারেন, সঙ্গে মাহন তারের কাছ থেকে।"

"মাশ করবেন, কিন্তু এলব কথার মানে কী?" জিজ্ঞাস করে এবাগিন্‌।

"এর মানে? এর মানে, মাহবের সঙ্গে এভাবে ইংরোমি করা হীনতা—অজহতা। আমি একজন ডাক্তার, আপনি ডাক্তার ও প্রতিকর—যারা মাঝে আপনাদের সঙ্গে ভিত্তে

পারেনি—নীচের তলার লোক ভাবেন। আপনায় খরগা নিয়ে আপনি খান্নন, কিন্তু অপরকে ছোট করবার অধিকার আপনায় নেই। মনে রাখবেন কথাটা।”

“এদব কথা বলার মানে?” রাগে এবোগিন্ কাপতে থাকে।

টেবিলের ওপর ঘুসি ঘের ডাক্তার চীৎকার করে ওঠে, “মানে? কিছুই বুঝতে পারছেন না, না? আমার বিশদ ভেনেও আপনায় ব্যতিক্রমের কথা শোনাবার অন্তেই কি অন্যকে এখানে এনেছেন? বিশদগ্রন্থ লোকের সঙ্গে তামাশা করবার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে?”

এবোগিন্ সংহত হয়ে বলে, “আপনি নিম্নের পাগল হয়ে গেছেন। আপনায় শরীরে কি দর-মাছা নেই? সত্যি আমি স্থবী নই।”

মাক সিঁকিয়ে ডাক্তার উত্তর করে, “স্থবী নই! যেহাট আপনাকে, ও কতটা আর বলবেন না, আপনায় ঘুমে ও কথা মামার না।”

এবোগিন্ চাট উঠে বলে, “বোহাই মশাই, চুপ করুন। আপনায় কথাগুলো আঙনের গোমার মতো এসে লাগছে আমার গায়ে। বুঝতে পারছেন কি?”

এবোগিন্ তাড়াতাড়ি পা-জামায় গরুট থেকে নোটের তাজা বের করে। টেবিলের ওপর চাপড় ঘেরে দুখানা নোট রেখে বলে, “এই নিম্ন আপনায় টাকা।” তার সারা দেহটা কাপতে থাকে রাগে।

যেহে ওপর নোট-দুখানা ছুড়ে দিয়ে ডাক্তার উত্তর করে, “আবার টাকার সেব্যক দেখানো হচ্ছে! ঘুপ দিয়ে অশনানের শোধ বিতে চান?”

এবোগিন্ ও ডাক্তার সামান্য-সামনি ঠাকিয়ে পরস্পরকে বা-তা বলতে থাকে। দুজনায় কেহই হঠাৎ অতটা অত্যাচার নয়। বিশদের মধ্যে গড়ে মাত্র দুবারপর, রাগী ও নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে, বোকার মতো বা-তা করে বসে। সাধারণতঃ বনে হয়, বিশদের মধ্যে গড়ে মাত্র দুবারপর ভালো করে বোকাবার অবসর পায়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় ঠিক উল্টোটা। তাই এবোগিন্ ও ডাক্তার দুজনেই পরস্পরকে কুল বোঝে। এক অপরকে অনর্গদ কটু কথা বলে চলে।

ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে ওঠে; বলে, “দয়া করে আমার কেয়ার ব্যবস্থা করুন।”

এবোগিন্ জোরে জোরে ছাউনেল বাঁধায়, কোনো লাভ পাওয়া যায় না। বেলটা আবার বাজায় এবং রাগে ওটা ঘেরের ওপর ছুড়ে ফেলে দেয়। কার্পেটের ওপর গড়িয়ে দাঁবার সময় তাপা আঙরায় বেঁধে বেলটা খেঁচে। ডাক্তার এসে সাধনে ঠাড়াই।

ঘুসি পাকিয়ে তার দিকে তেড়ে যায় এবোগিন্; চীৎকার করে বলে, “কোন চুলোয় ছিলে হতভাগা? পানী কোথাকার! ঈশপির হাও, দিয়ে বনো, ডাক্তারবাবু অন্তে গাড়ী যায় কর্তে। আমার অন্তেও গাড়ী দ্রুতত বনো।”

ডাক্তারটা ঘুরে ঠাড়াতেই এবোগিন্ আরম্ভ করে—“ঠাড়াও, শোনো—সব ক’টাকেই ভাড়াব! নিমকহারাঘরের আর বাড়ীতে রাখতে চাই না। নতুন লোক রাখব, শূয়ার কোথাকার!”

এবোগিন্ ও ডাক্তার গাড়ীর অন্তে অগেল করে। এবোগিন্ হঠাৎ অশা পারচারি করতে থাকে, হঠাৎ কোনো মন্তলব আঁচড়ে বনে বনে। আর, ডাক্তার এক-হাতে টেবিলটা ধরে চুপ করে ঠাকিয়ে আছে।

বাড়ী কেয়ার দশ গাড়ীতে বসেও ডাক্তারের রাগ নড়ে না।

লাল আখানা টাব ঢাকা পড়ছে পাহাড়ের পেছনে। তারাবের দ্বির আছে টুকরো-টুকরো ছোঁড়া কেয়ার দল। পেছন থেকে ভেসে আসে ডাক্তার দশ। এবোগিনের ঘোড়ার গাড়ী কিরিগডের গাড়ীটাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। গাড়ীর দু’পাশে লাল আলো জ্বলে।

গাড়ীতে বসে সারা পথটা ডাক্তার ভাবতে থাকে—ভাবতে থাকে তার স্ত্রী বা এন্ড্রির কথা নয়, এবোগিন্ ও ঐ বাড়ীর লোকজনদের কথা—এবোগিনের স্ত্রী ও পানুটিনথির কথা। হতই ভাবে ততই তার মন গুণায় বিবিরে ওঠে,—ওহে অন্তে ডাক্তার দুঃখ বোধ করে।

মনর চলে যাবে। কিরিলভের দুঃখের শেষ হবে। কিন্তু মাত্রদের প্রতি এতভাবড়া কুল খরগা কখনো দূর হবে না, এই অন্তায় মনোভাব ডাক্তারের বনে আশ্রয় বহন করছে থাকবে।

মনে পড়ে

ত্রিবিমলাচরণ দেব

টিলক-বর্ণন

১৮৯৯ কি ১৯০০ সালে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের হেড-অফিস বিন্দিরপুরের সন্নিকট গার্ডেনরীচে আসে। ঐ উপলক্ষে বহু মাজারী, মরাঠী ও কিছু পার্শ্ব ভ্রমলোক আসেন এবং বিন্দিরপুর অঞ্চল তাহাতে ভর্তি হইয়া যায়। সেই সময় ঐ সমস্ত ভ্রমলোকের মধ্যে কতকের সহিত আমাদের পরিচয় হয়, এবং তাহা সৌহার্দ্যে দাঁড়ায়। ইহার আর এক কারণ, উহাদের ছেলেরা স্কুলে আমাদের সহপাঠী হয়। এই অবস্থায় পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া-আসা, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণাদিও হইত।

মরাঠা ভ্রমলোকগুলি কতক দেশস্থ ও কতক কোঙ্কণস্থ (বা তিতপাবন) ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহাদের একটি রূপ ছিল, তাহার নাম যতদূর মনে পড়িতেছে ছিল ‘মহারাত্রী রূপ’। একদিন দুইটি মরাঠা ভ্রমলোক আসিয়া বলিলেন যে, সেইদিন বিকালে তাহাদের রূপে টিলক-মহারাজ আসিবেন, এবং আমাকে যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি তখন কলেজের ছাত্র। বিকালে রূপে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ঘরটি খুব বড় নহে—যতদূর মনে পড়ে ১৫ ফুট x ১২ ফুট হইবে। তখন টিলক-মহারাজ আসিয়া পৌছিয়াছেন। মেজেতে সতরঙ্গি পাতা, তাহার উপর সকলে বসিয়া আছে। আমি গিয়া বসিবার পর রূপের একজন সভ্য আমাকে টিলক-মহারাজের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। তাহার সহিত দুই-চারিটি কথা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, তাহার সন্মানে ভিত্তি ধরু বাবশহরে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কারণ তখন তিনি বিশ্ববিক্রম, এবং ব্রাহ্মণ হইলেও, অগ্নিযজ্ঞের প্রতীক বলিয়া তাঁহাকে যে পূজা করা হইত, বলা বাহুল্য।

তাঁহার বিভাবতার কথা যথেষ্টই শুনিয়াছিলাম ও পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে একটি ধারণা আজও জ্বলিতে পারি নাই। তাঁহার তীক্ষ্ণতা যেন মুখ-চোখ দিয়া সূঁটিয়া বাহির হইতেছিল। যেন বহু facet-যুক্ত একটি হীরা কেহ সূঁথকিরণে নাড়াচাড়া করিতেছে। চিবুক কঠোর দৃঢ়তাব্যক্ত। এ পর্যন্ত টিলক-মহারাজের যতগুলি ফোটো বা ছবি দেখিয়াছি, সে-সবই ‘মৃত’ বলিয়া মনে হইয়াছে। সেক্সপার ফুরণ আজ পর্যন্ত আর কাহাতেও দেখি নাই।

তাঁহার সঙ্গে আরও তিনজন ছিলেন—খাপার্দে, ডাক্তার মুন্সে ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। মুন্সে ও খাপার্দে এই দুইজনের বেশ একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম—টিলকের উপযুক্ত সঙ্গী বলিয়া মনে হইল। কিন্তু গান্ধী যেভাবে পঙ্কজির শেষে শাস্ত্রভাবে বসিয়া ছিলেন, তাহাতে টিলক-মহারাজের সম্বন্ধে নগণ্যতার ভাব পরিস্ফুট বলিয়া বেশ মনে হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল—a farthing rush-light before the midday sun। পরে টিলক-মহারাজের তিরোভাবের পর গান্ধীর অভ্যুত্থান হইলে, এই দৃষ্ট mixed feeling-এর সহিত মনে হইয়াছিল।

এখানে একটি কথা—সাধারণতঃ টিলক-মহারাজের নাম বাংলায় ‘তিলক’ লেখা হয়। ইহা একান্ত ভুল। আমি তাঁহার স্বাক্ষর দেখিয়াছি। উহা হইল ‘টিলক’। এখানে ‘ল’ হইল বৈদিক ‘ল’ (যাহা ‘অগ্নিযজ্ঞ’তে আছে)। ইহা লেখে বাংলা ‘ড’কে পাশ ফিরাইয়া মধ্যস্থল হইতে উপর-দিকে একটা খোঁচা দিয়া মাত্রার সহিত যুক্ত করিয়া। ইহার উচ্চারণ ‘ড’ ও ‘ল’ এই দুই মিশ্রিত।

Beginning of the end

১৯০৫ সাল। ‘বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন’ আরম্ভ হইয়াছে। বাগবাড়ারের পদ্মপতি বহুর বাটীতে পুকার উঠানে সভা। লোক সব ঘেন ভাড়িয়া পড়িয়াছে। আমি কলেজে পড়ি। গিয়াছি। অনেক সতীর্থ উপস্থিত। আমার সহিত আমার ৮২ বৎসর বয়স পিতামহ সেই সভায় উপস্থিত। সভার কার্য আরম্ভ হইল। তাহার গাভীর্থ আড়ও তুলি নাই। ‘আবেদন নিবেদন’ নহে—দৃঢ় ভাব। সভায় উপস্থিত দুইজনের কথা বিশেষভাবে মনে আছে :—রবীন্দ্রনাথ—তিনি পাঠ করিলেন তাহার নূতন লিখিত এবং বর্তমানে বিখ্যাত ‘সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান’ : আর বিপিন পাণ্ডা—তাহার স্বভাবসিদ্ধ একত্বী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। সভা ভাঙিল। ঠাকুরদাস-নাতি ভিড়ের মধ্যে বাহির হইলান। মুশকিল হইল। কে জানে কেন,

ট্রাম বন্ধ। ঘোড়ার গাড়ি অপ্রাপ্য। বলা বাহুল্য, বাস তখনও জন্মায় নাই। আমরা দুইজনে দক্ষিণ-মুখে হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। ৮২ বৎসরের বৃদ্ধ, ও যুবক আমি,—যদি রাস্তায় একখানি ঠিকা-গাড়ির সাফাং পাই। সাফাং পাইলান একখানি পার্জি-ক্রাস ভাড়াটিয়া গাড়ির ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পৌছবার পর। সেই গাড়িখানি ভাড়া করিয়া খিমিরপুরের বাটীতে পৌছাই।

সভা হইতে বাহির হইয়াছি, পিতামহ আমাকে বলিলেন, “আমি ‘beginning of the end’ দেখিয়া গেলাম। তোরা ‘end’ দেখবি।” আর বলিলেন—“যা দেখছি, ইংরেজ যাবার আগে তোদের হাতে খোলামকুচি দিয়ে যাবে।” এই কথা মনে হয়েছিল যখন World War I-এর সময় ইংরাজ একটাকার নোট বাহির করিল।

উপরোক্ত দুইটি কথাই ফলিয়াছে।

পরিপাটি মুদ্রণ

ভাস্কর

নিখুঁত ব্লক-তৈরির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

॥ কালার স্টুডিও ॥

৪২, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

ফোন : ৫৫-৪৬০৭

অন্তরালে

করবী দত্ত

পশ্চিম আকাশের কোণে কালো মেঘ ভবিষ্য উঠিছেছিল।
অন্তরামী সূর্যের শেষ দৃশ্য-একটি রশ্মিচুটো রক্তবর্ণ অশ্রুস্রবের
মধ্য হইতে বাহিরে আদিবার মিথ্যা প্রয়াস করিতেছিল।
ক্রমে তাহারদের কীর্ণাঘমান আলোক কীর্ণতর হইতে হইতে
অন্তর হইয়া গেল। সমগ্র আকাশ ভূঁড়িয়া কালো মেঘের
যেনা বসিয়া গেল। শুকনু শুকনু গর্জনে কানিয়া উঠিল
পৃথিবী-বধুর চিত্ত, অভিধারিকার হৃদয় আর নগরীর পথ-
বিশবে বিচরণবীণ প্রমোদ-বিসাদীয়ায় বন। কণে কণে
বিজ্ঞান-চক্ষুর তীব্র আলোকে বনে হইতে লাগিল মেঘগুলি
বুঝি মাঝবের আশ্রয় দেখিবা পশু বিকশিত করিবা সরষে
হাঙ্গাধাঙ্গি আরম্ভ করিবা বিরাড়ে।

স্বপ্না বিতল-হৃদয়িত পুণ্যলতাসোজিত অলিন্দে পাড়াইয়া
আকাশে মেঘের ঘনঘটা নিরীক্স করিতেছিলেন এক পশু-
কোরকবর্ণা আরক্তাকী হৃশোভনা তরী। তাহার কটিতে
জ্বরিত চুম্বিকচিহ্নিত নীলাবরী, রক্তবর্ণ কল্লিকা, চিত্রিত খেত-
দুল্লের উত্তরীয়া। কর্ণে কুকবকের অবতঃস, কণ্ঠে নব-
ময়িকার মালা, হস্তে একগুচ্ছ জাতিপুশ। উদয় হইয়া
তিনি মেঘের সমারোহ দেখিতেছিলেন এক মাতে মাতে
ব্যাহুল্যনেয়ে নিয়ে রাখণখে চলমান পৃথিবীমুখ্যে লক্ষ্য
করিতেছিলেন।

কিৎকাল পরে এচও উদ্ভাষ কটিকা আসিয়া নগরীর
কর্কটকল কীর্ণমধ্যাে ব্যাহত করিয়া দিল। দ্বাদশ সমগ্র
পৃথিবী যেন অবজ্ঞাসিত হইয়া গেল। এই সময় একটি
একবর্ণবৈধা ক্রমবরত শিল্পকোড়ে এক চকলনক্সা ঘনো-
রম্যকী তরুণী আসিয়া অলিন্দে গড়াঘমানা হৃদয়কে সন্ধান
করিয়া কহিল, 'দেবি, ঐক কক্ষমণ্যে প্রবেশ করন।
দেখিতেছেন না দুলিমাতে সমগ্র আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া
গিয়াছে? হৃদয়কে কোড়ে লটন—ব্রহ্মপুত্রের শবে ভীত
হইয়া কঁদিতেছে। আমি ব্যতায়ন ও ঘরনকল বহু করি।'
তাহার কণ্ঠবের আশ্রয় ও ব্যাহুল্যতা করিয়া পড়িতেছিল।

তরী রূপকী কক্ষাত্তর্যের প্রবেশ করিয়া শিল্পটিকে অশরীর
নিকট হইতে লইয়া আশ্রয় কোড়ে বসাইলেন। অন্তঃপর
স্বপ্ন হাসিয়া বলিলেন, 'তুই এত ভয় পাইতেছিস কেন বসু
দেবি যতকি? ভীতনে কখনো কটিকা-ব্রহ্মপুত্র দেখিস
নাই নাকি?'

নতরিকা প্রকৃত্তর হাসিয়া বলিল, 'দেখিবা না কেন?
তবে এইরকম কটিকা বহুকাল হয় নাই,—প্রথম গ্রীষ্মে এরূপ
মেঘ আকাশে তো বহুকাল ধাবন হয় না। এ বারের
বর্ণাভূত বর্ণে কক্ষাইবে বনে হইতেছে।'

একটু ধামিয়া পুনরায় বলিল, 'আগনি এত অনগ্রমনা
হইয়া অলিন্দে পাড়াইয়াছিলেন যে, কক্ষমণ্য হইতে কয়েকবার
প্রাক্লাম, তুলিলেনই না। প্রকৃত্তর্যকে আগনিট আগ
কালিগানের রক্ত তরু-ভাবনা করিতেছেন, সেটিটি আমার
উপর তাই চাপাইবার চেষ্টা করিতেছেন, না?'

হৃদয়ী ক্রমিক কোপসহকারে তরুণী তুলিয়া বলিলেন,
'তোরা গির দিন ডারি স্মরণ হইতেছে দেখি! আরপুত্রটি
আদ্যনা লিখা তোমার কাটা মাথাটি চিবাঁইতেছে
আর কি!'

নতরিকা স্মৃতি বার হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'কাহার
মাথা চিবাঁইতেছেন তাহা কি আর না জানে কেউ!
ভারতবর্ষের অধীশ্বর পরন উত্তারক বৈশ্যনাথ মহারাজ
বিজ্ঞানবিদ্যার সভাকবি কালিদাস—তাহারই প্রিয়তমা বিদূষী
তাঁরা রাজকল্যা বিজ্ঞাবতীর—তাই না?'

কালিদাসভাষা সকেপে বলিলেন, 'তুই ধামিবি কিনা
বসু? না হইলে, আমার সমুখ হইতে উঠিয়া যা।'

নতরিকা হাসি ধামাইয়া বলিল, 'আচ্ছা আচ্ছা, এই
ধামিলাম। কিন্তু সত্য করিয়া বলুন, দেবি, আর কালিদাস
আমরায় আবেশের দাস কিনা? আমরায় অহমতি ভিন্ন
তিনি তো কাব্য-রচনাই করেন না—তা আমরায় রক্ত কোনো
কর্ণ!'

বিজ্ঞাবতীর গঠাপরে একটু সঙ্গর হাসি দেখা দিল।
বলিলেন, 'তাহা সত্য। আমার কাছে অপমানিত হইয়াই
তো তিনি কাব্য-রচনার প্রবৃত্ত হন। একদিন রাগ করিয়া
কক্ষারককে বলিয়া ছিলাম। কবি আসিয়া ধারে করাঘাত
করিয়া বলিলেন,—ধার খোল, একটি বিশেষ কথা আছে।
রাগ পড়িল আমি ধার তুলিয়া দিলাম। কিন্তু আমার
সর্ত ছিল যে ওই চারটি কথা—একটি বিশেষ কথা আছে—
উহাদের দ্বারা আরম্ভ করিয়া চারখানি কাব্য আমাকে উপহার
দিতে হইবে।' বলিতে বলিতে আনন্দ-আবেশে কবি-
প্রেষণীর নন্দনর দৃষ্টি বিফল হইয়া উঠিল।

মহত্বিকা একাগ্র হইয়া উনিতেছিল। বিভাবতী বাহিতে বলিল, 'তাহার পর ?'

বিভাবতী যেন তাহার প্রসে যন্ত্রের খোর কাটাইয়া উঠিলেন। যোগদায় তাহার বিগতদিনের সুখস্বপ্নাধিনি মনে পড়িয়া গিয়াছিল। বলিলেন, 'তাহার পরই তো বই হইল 'সুমনাসম্বৎসর'-কাব্য। সুমনাসম্বৎসরের কবির পটী বলিয়া আনি আত্ম গর্ব অশুভ করি।'

একটু দীর্ঘের ব্যক্তিগত পুনরাবলম্বিলেন, 'কিন্তু কবির নিকট হইতে আমি যে আরও মহৎ কাব্য আশা করি। আমিও তো আমার বাকী কবিতা উপহার পাইলাম না—কবি যেন সে-প্রতিভতির কথা মনেতেই যদি রাখেন। অসম্ভব কবির যেন বড় উদ্যোগে পেরিতেছি। অসম্ভব আর আমার অভিমান ভাঙাইবার জন্য কত ব্যস্ত হইয়া ওঠেন, কত চেষ্টা করেন—এবার যেন গ্রাহ্যই নাই। রাজসভা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেনও কত বিলম্ব। আমার বড় ভয় হয়। কি হইয়াছে কি জানি।'

মহত্বিকা আশ্বাস দিয়া কি যেন বলিতে বাইতেছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে পূর্বের ব্যক্তির কটাক্ষনি গুণা গেল। মহত্বিকা সোকাইল আর উদ্ভূত কথার উদ্দেশ্যে। কিছুক্ষণ পরই সে লিখিয়া আসিল। তাহার বিরত চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন বিভাবতী। মহত্বিকার দুই চক্ষু বিদ্যুৎ-আলংকার বিদ্যুৎ-হইয়া উঠিয়াছে, বিরক্ত অলসচুর্ণগুলি গ্রন্থনভাবে উড়িতেছে, কর্ণের পূর্ণাবকাশে মুলিয়া গিয়াছে। চিত্রিত স্নেহকল রাঙিতে লুটাইতেছে। 'কি, ব্যাঘ্রার কী, মহত্বিকা? এ-রকম উদ্ভাবের মতো দেখাইতেছে কেন তোকে?' সন্ধিরে বিভ্রান্তা করিলেন বিভাবতী।

হাশপাতে হাশপাতে বলিল মহত্বিকা, 'সেবণাম মহারাজ যার: আগনার সহিত দেবা কবির কল্প আনিয়াছেন।'

চমকিতা হইলেন বিভাবতী। অমুট কণ্ঠে বলিলেন, 'সেবণাম মহারাজ আমার সহিত দেবা করিতে আনিয়াছেন! কিন্তু কেন? আর্ঘ্যপুত্রের কোনো অক্ষম হয় নাই তো?'

মহত্বিকা বলিল, 'কেন আনিয়াছেন তাহা তো বুদ্ধিতে পারিলাম না। বলিলেন—আগনার সহিত সাক্ষাৎ করা একান্ত প্রয়োজন তাই আনিয়াছেন। লতাগুহে তাহাকে কথোচিত আচার্য্যনাট্যব্যবহার বলাইয়াছি। এখন শির চন্দ্র।'

বিভাবতী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'চন্দ্র।' কিন্তু পরক্ষণেই নিজের বেশভূষার প্রতি চুপ্তিপাত করিয়া ধাঁড়াইয়া পড়িলেন। নিখিত পুরুষ গর্বে শোভাইয়া সিংহ মহাকবি কালিদাসের বিদ্যুৎ দ্রিগ প্রদায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কলকলঙ্গলঙ্গ

আলুলাহিত কেশকলাপ মুহূর্তমধ্যে শিরোপরি চূড়াকারে বহন করিলেন। সুশাব্যার হইতো মালতীর মালা লইয়া কবীরেতে জড়াইলেন। কণ্ঠ নবমল্লিকার প্রবাসিত মালা, কর্ণে শিরোরের অঘতঙ্গ। শোভারেণু বহিষা সুমমণ্ডলে পাঙ্কজী আনয়ন করিলেন। সুমুখরোপে চিত্রিত করিলেন মুখাবরণ। ললাটে আঁকিলেন চন্দ্রের অলকা-তিলক। ভট্টাচার্য্য রচিত করিলেন তাহুলরণে। অলতকশোভিত পশরণার পরিলেন নুপুর। হর্ষণে কলকাল আগনার প্রতিবিম্ব দীক্ষণ করিয়া স্নান অঘর্ষণে মুখের উপর টাংিয়া গিলেন। তাহার পর চক্চক বকে লীলাক্ষমল হস্তে চলিলেন রাজসম্পর্শনে।

লতাগুহের বিভ্রামণালয়ে সেবণাম মহারাজ বিক্রমাবিত্য চক্রবেশে দুইজন অমাত্যের সহিত অগেগা করিতেছিলেন। বিভাবতী তাহার প্রবেশ করিয়া নতমাত্র হইয়া মূঢ়করে প্রণিপাত করিলেন। বিক্রমাবিত্যের চক্রবেশ থাকি সর্বত্র চিত্রিত কই হইল না বিভাবতী। নৃপতিগণের হইয়াবাক্যক সেহাবরবই তাহারে চক্রবেশব্যবহারে প্রতিবদ্ধকতা করিয়া থাকে চিরদিন।

মহারাজ বিক্রমাবিত্য প্রণতা বিভাবতীর উদ্দেশে বলিলেন, 'বহি! উদান বকন, আরে! বিশেষ একটি কারণে আমাকে বহ: আগনার নিকট আনিতে হইল। আমার আগমনে আর্ঘ্য কি বুঝি আচরণবিভা হইয়াছেন?'

বিভাবতী করজোড়ে ধাঁড়াইয়া বলিলেন, 'পরম ভট্টাচার্য্য সেবণাম মহারাজ, আমার অপরায় লইবেন না—আমি লতাই আচরণ হইয়াছি।'

মহারাজ বৃহৎ হাসিয়া বলিলেন, 'আগনার উৎসর্গের নিয়মন করিতেছি। মহাকবি কালিদাস অমু লতাকবি নহেন, আমার শ্রির বসন্তও বটে। কিন্তু তিনি আমাকে নিম্নবিত্তভাবেই রাজসভায় অগ্রগণিত হইতেছেন। অথচ চরমুখে সংবাস পাইলাম যে, তিনি গৃহেও অবস্থান করেন না। তিনি কি নৃতন কোনো কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন? সেইজন্যই কি রাজসভায় আগমন করেন না?'

বিভাবতীর মুখমণ্ডল মুহূর্তমধ্যে স্নেহবর্ণ ধারণ করিল। কলিতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, 'রাজসভায় যান না আর্ঘ্যপুত্র? কিন্তু তিনি তো রোজই নির্বিধি সময়ে রাজসভায় উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হইয়া বহির্গমন করেন!'

বিক্রমাবিত্য বলিলেন, 'আর্ঘ্যে, কিছু মনে করিবেন না—আগনি কি তাহাকে রাজসভায় বৈশিষ্ট্যে বসনা লগ্নে বিদ্ব

গ্রন্থ করেন না? কবি অন্ততবাণী নহেন বলিভাই আমার ধারণা।'

এই প্রশ্ন বিভাবতী অস্বাভাব্য হইলেন। তাঁহার পাত্রের দূর্ভাগ্যের অর্কপালের দ্বারা রক্তিম হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের ভিত্তি বলিলেন, 'না, কবি অন্ততবাণী নহেন। তাঁহার সহিত আমার রাজসভা লক্ষ্যে কোনো আলোচনা হয় নাই, তাহার কারণ কয়েকদিন ধাবৎ বলহ ইত্যাদি আমি তাঁহার সহিত ব্যাকসাংশ বর্জন করিয়াছি।'

বিক্রমাসিতা হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, 'কবি তাহা হইলে আপনার নিকট কিছু গোপন করিবার সুযোগটা বেশ কার্যে লাগাইতেছেন বেশিভেদি। কিন্তু আর্যে, এবার তো আপনারকে অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। কবি এই সময়টাতে কি করেন তাহা আপনারকে জানিয়া লইতেই হইবে। কবির প্রতিভার ক্ষুণ্ণের সহায়িকা যে আপনিই, আর্যে! কবির উপর যে আমার অনেক আশা। কেবলমাত্র কুমারসম্ভব রচনা করিয়া লক্ষ্য হইলে চলিবে না তো কবির। তাহাকে কিয়া আরও মনঃ কিছু আরও বৃহৎ কিছু সঙ্গী করাইতে হইবে। কবির কাব্যগাথার সহিত আপনার আমার সকলের নাম যুগপ্ৰস্তুত ব্যাখ্যা ভাবতে সীমিত পাইবে। গোভদাসি, আপনিই একমাত্র কবিকে উৎসাহ করিতে পারেন। আপনার উপরই তাই কবির সঙ্গীর প্রেরণা বোধগম্যর ভাব বিলাস।'

বিভাবতী নতমস্তকে বৃত্তকরে বলিলেন, 'মহারাজের আদেশ শিরোধার্য।'

অতঃপর সেবশাশ মহারাজ অমাত্যগণের বিহার লইলেন। বিভাবতী সভাগৃহ হইতে আপন কক্ষে প্রত্যাগমন করিয়া কপোলে করতলাশ্রয়পূর্বক চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

একদা পরে গৃহের বাহিরে কটাধনি হইল। বিভাবতীর চিন্তাভাল ছিন্ন হইল। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'ওই বহির্বাণের কটাধনি হইতেছে, বোধহয় আর্যপুত্র আসিলেন। যদিভ্রম কোথায় গেল, ষাঃ খুসিভেদে না কেন?'

মহরিকা বলিল, 'আপনি ব্যস্ত হইবেন না, আমি দেখিতেছি।' এই বলিয়া সে কক্ষ হইতে নিজান্ত হইল।

বিভাবতী পক্ষাৎ হইতে মহরিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মহরিকে, মহারাজ এখানে আসিয়াছিলেন, তাহা বেন বলি না আর্যপুত্রকে।'

যাহ উল্লেক করিয়া বিল মহরিকা। প্রবেশ করিলেন এক অভিলাবধাবৃত্ত যুগল যক্তি। তবে তাঁহার কোষ পট্টবাগ,

কর্ণে উৎপলপত্রের কর্ণিকা, কর্ণে কুমলসির মালা, হস্তে একটি রেশমীবস্ত্র আচ্ছাদিত তালীপত্রের পুঁথি। দেহের দিব্যকাস্তি, চম্ভর মেঘেন বিলাস, অস্তের চাকগড় হইতে অনাবাসে বলা বাহ যে ইনি একজন কবি। মহরিকা বলিল, 'আর্থে কালিলাস, মদল তো?' কালিলাস লভ্যবদনে উত্তর দিলেন, 'লভ্যই বদল, লবি মহরিকে! তোমার সখির সূনল তো? কুমার বোধহয় নিশ্চিত হইয়াছে এতক্ষণে?'

মহরিকা হাসি চাপিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, কুমার দিব্যপাশে নিশ্চিত হইয়াছে। তবে সখির সূনল নহে।'

চমকিত হইয়া কালিলাস বলিলেন, 'কি হইয়াছে অ্যা? আমাকে ববর পাঠাইলে না কেন? রাষ্ট্রহইত্বকে সংবাদ দিয়াছে তো? হুয়াং কি হইল কি, অ্যা!'' ক্রতপনে অশ্বপুত্রের দিকে গমন করিতে লাগিলেন তিনি।

তাঁহার পক্ষাতে বাইতে বাইতে প্রাণপণ জেঁয়ার হাত লমম করিয়া বলিল মহরিকা, 'না না, আপনি অতীত হইবেন না, আর্যে! সখির অশ্ব হব নাই কোনো। আপনার কিস্তিতে বেশি দেখিয়া রাগিয়া আছেন।'

'সখির নিঃশাল সেলিয়া কালিলাস বলিলেন, 'তাহাই বল। এমন ভয় পাওরাইয়া সিদ্ধাছিল, মহরিক!'

'সখির সহিত কতদিন হইল ব্যাকসাংশ বন্ধ করিয়াছেন, আর্য! আর কিছু তার নির্দোষ করিলেন না। সখির অভিমান ভাঙাইবার চেষ্টা করবেন যদি আজ, তাহা হইলে লক্ষ্যই অভিমান ত্যাগ করিবেন। কারণ লবি বেশ উৎসুক হইয়া আছেন। বৃত্তিলেন?' বলিয়া হাসিতে হাসিতে মহরিকা অন্তর কার্যবাগদানে গমন করিল।

সহাস্রবলে কালিলাস প্রিয়ার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, ব্যাণার বিশেষ স্থিতির নহে। উজ্জল একটিমাত্র লীপ অস্তিত্বে কক্ষে। তাহারই আলোকে প্রিয়ার মুখে প্রত্যাক করিলেন আবারের প্রথম দিবসের সরলললন-ভুল্য গাভী। দূরে গর্ভে তাঁহার পুত্র দিব্যলাহ যুগাইতেছে। কাগ্রত বাকি অপেক্ষা দূরত্ব লোকটিই বর্তমানে বিরাম ভাবিয়া কবি সেইমিবেই ধাবিত হইলেন। বহিম দৃষ্টপাতে তাহা লক্ষ্য করিয়া বিভাবতী বলিলেন, 'যে ছানিরা আছে, তাহার সহিত কথা বলা যায় না বোধহয়! নাকি কবির নিশ্চিত-বনের সহিতই আলোশ করিতে আসবাসেন!'

সহাস্র কালিলাস বিভাবতীর কাছে আসিয়া বলিলেন। বিভাবতী যে আসে কথা বলিয়াছেন এই আনন্দেই অশ্বহারা তিনি। বিভাবতীর হাত-দুইখানি ধরিয়া বলিলেন, 'হাগ

পড়িয়েছে বিজা ? মিথ্যা! এ-কদিন কই পাইলে, আমাকেও বাখা দিলে ।’

বিজাবতী খাতির তোড়ে মাথা রাখিয়া মধুর হাসিয়া বলিলেন, ‘সত্যই, কি-এ বৃত্তিরাংণ হইয়াছিল আমার ! আমাকে কমা কর আঁপুত্ৰ ।’

কালিদাস আপন বও হইতে কুম্ভকলির মালাখানি খুলিয়া বিজাবতীর কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন । বলিলেন, ‘দোষ তো তোমার একাই নহে জিরে, আমারও তো অগ্রাং হইয়াছে তোমাকে বাখ-সেওয়া ।’

পত্রাকারকতৃপ্য হৃৎযন্ত্রা কালিদাসের ওঠাংরে ঢাশা দিয়া বলিলেন বিজাবতী, ‘ও-কথা ব্যাক, আঁপুত্ৰ । তুমি একথা বলিলে আমার শাপ হইবে বে ।’ কুম্ভকলির মালাটি নাড়াচাড়া করিয়া বলিলেন, ‘মালাটি তো বড় হৃৎকর গাঁথা হইয়াছে ! কে দিল তোমাকে ? নিশ্চয় কুম্ভারগল্পবের কোনো নুদ পাঠক ।’

কালিদাস লক্ষিতজার হাসিয়া বলিলেন, ‘টিকই পরিচাচ্ছ, বিজা । মালাটি আর ভট্টাটিকা সেবপ্রভা আমাকে উপহার দিয়াছেন ।’

‘ভট্টাটিকা সেবপ্রভা ? তিনি কে ?’ বিস্ময় করিয়া পড়ে বিজাবতীর কণ্ঠ ।

কালিদাস বলিলেন, ‘অহো, তোমাকে বলিতে ভুল হইয়া দিয়াছে—বলিবই বা কি করিয়া ! তুমি তো কথাই বল নাই আমার সহিত একছদিন । সেবপ্রভা মহাশয় বিরুমানিত্যের রাজসভার এক বিদ্বী পাটিকা । তিনি হুং-রামকণ্ঠা । পত্রারি মহাশয় ঠাংর কওংর নুদ হইয়া ঠাংকে রাজসভার আঁনিয়া সভাপাটিকার পরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । সেবপ্রভা আমার কুম্ভারগল্পক-কাব্যকে রাণ-রাগিনীর হৃৎ বেঁধিতেছেন । শ্রুই রাজসভার কুম্ভারগল্প গান শুনাইবেন । সেদিন তোমার ব্যতসভার লইয়া হাইব । হাইবে তো বিজা ?’

বিজাবতীর প্রহুং নৃৎকমলে ক্রমশঃ চায়া পড়িতেছিল । গজীংকণ্ঠে বলিলেন, ‘তা ন-হুং হাইব । কিন্তু আঁপুত্ৰ, আমার প্রহের সত্য উত্তর বাও তো, একক্ষণ ছিলে কোথায় ? রাজসভার বাও নাই তাহা আমি ভালোজুসই আমি ।’

কালিদাস হাসিলেন । ঠাংর সরল হাসি সেবিজাও বিজাবতীর লুৎকহ খুলিল না । কালিদাস বলিলেন, ‘শিপ্রার তীরে লতাঝিতানের চায়াং বদিয়াছিলাম । সেবপ্রভা ঠাংর ললিত কণ্ঠে হুং-তাল-লক-সমযিত কুম্ভারগল্প গান শুনাইতেছিলেন ।’

বিজাবতী সরিয়া বলিলেন । কুম্ভকলি-সদৃশ সন্তোষা

অংর কংগন করিয়া বলিলেন, ‘তা মালা কেন ! গলায় মালা না পরাইলে বুঝি সন্তো আসে না ?’

আপনভোলা কবি কথার আঘাত বৃত্তিতে না পারিয়া বলিলেন, ‘তা কেন হইবে ? সেবপ্রভার উজানে কুম্ভকলির হুংগুর সনাতো । তাই মালা গাঁথিয়া আনিয়াছিলেন ।’

বিজাবতী অহো বটিন কণ্ঠে কলিলেন, ‘কটিকার সময় নদীতীরে কি করিয়া রহিলে বল মেদি !’

কালিদাস সশ্কেতুকে বলিলেন, ‘অহো, সে ভারি মজা হইয়াছে । সেই কুম্ভ কটিকার মনবত্তা সেবিয়া ভীতা হইয়া মেবজবা তো আমাকে ওড়াইয়াই ধরিলেন—হ্যা, কিন্তু বলিলে ? না ? তবে প্রবণ কর । তাহার পর কটিকা খামিলে বলিল কি তান ? এই মেঘের উড়িয়া-চলিয়া-বাওয়া মেবিয়া বৃত্তি মনে হয়, ওই মেঘ যেন কাহার প্রহের বাঁধি লইয়া বহুদূর মেগ হইতে আনিতোড়ে, হাইবে আরও দূর মেগে কোন এক বিরহিণী মাঝিকার কাছে ! এ মেঘের বিহরে একখানি বর্গার কাব্য লিখিয়া ফেলুন, কবি । আমি বিলিাম, তা মন নহে কল্পনাটি, কিন্তু প্রকৃত বিরহ না হইলে বিরহের কাব্য লিখি কেমন করিয়া ? বলিল, তাভাংকে শিলালাসে পাঠাইয়া দিন-না কেন । আমি বিলিাম, তা সর্বশাপ, পুহিতকে চাটিয়া একটি দিনও থাকি নাই—পারিব না, অসম্ভব । কাহা-রজন্যর পুহিৎ পত্রসাংরে উপস্থিত হইব । তখন বলিল কি তনিবে ? বলিল, তাহা হইলে আমি কোনও দূর মেগে চলিয়া হাই । আপন আমাকে বিরহিণী নাটিকা করিয়া কাব্য লিখিবেন, কোন ? আমি শ্রামিয়া সেবিলাম, তা লোখা চল বটে । তাই উহাকে বদিয়াছি কোথাও বিশেষ-অম্মণ হাইবার অগ্র । উহার অগ্র বিরহ-বোখ করিব বটে !’

আপনমনে বলিয়া যাঁতেছেন কালিদাস, মতুবা পুহিতীর নৃৎপানে লক্ষ্য করিলে ঠাংর অপরাজা চুকাইয়া উঠিত । বিজাবতী সব শুনিয়া বলিলেন, ‘হ ।’

অপরাল নিচুত থাকিয়া সদস্য বিজাবতী ঠাংর অপরপ নৃৎখানি কালিদাসের হৃৎের সঠিকটে আনিয়া দীর্ঘায়তনেতে একটি বিশাল কটাক হানিয়া বলিলেন, ‘বদনীটা কি আমার অপেক্ষা বদনী ?’

কালিদাস খবরত হাইকা উত্তর পিটে গিয়া বিদগ্ন হাইকা কপিতে লাগিলেন । পরে সামমাইয়া উঠিয়া বলিলেন, ‘না, তোমার মতো মনবত্তা নহে সে । তা হইং এ প্রর করিলে কেন ?’

হৃৎর হৃৎের এক অশূঁ তরী করিয়া মধুর রহস্যময় হাসি

হাসিলেন বিদ্যাবতী। অনন্তর কালিদাসকে অন্তঃশশী
চিত্তা-সাগরে ডালাইয়া বন্ধ হইতে নিষ্কাশ্য হইয়া গেলেন।

পরদিন প্রভাতে। তখনও অস্ত্রমালী পূর্ণাকাশে দেখা
দেন নাই। তবে তাঁহার আগমন-সংবাদ পূর্বদিকস্থের তোরণ-
খাণ্ডে রক্তিমাত্মক প্রতিভাসিত হইতেছিল। সূত্র একটি অল্প
তুলিয়া কবি কালিদাস চক্ষুর্দলন করিয়া লম্বাঘাট উঠিয়া
বসিলেন।

মহরিকা প্রবেশ করিয়া কহিল, 'স্বর্গ, হস্ত-মুখ প্রকাশন
করিয়া লটন। তোমার ও পানীয় আনিতেছি।'

আহারকালে দিব্যায়স্ককে না দেখিয়া কালিদাস মহরিকাকে
আদেশ দিলেন পুত্রকে আনয়ন করিবার জন্য।

মহরিকা কিছুকাল অধোবদনে থাকিয়া অঙ্গুলের অভ্যন্তর
হইতে একটি সূত্র দিগি বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে দিল।

স্বর্গ হইয়া কালিদাস পত্র পাঠ করিলেন :

‘স্বর্গপুত্র,

মনে আছে নিচরই, একদা তুমি আমাকে চারখানি কাব্য
উপহার দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে। কিন্তু তুমি যাত্র
একখানি কাব্য আমাকে বিদ্যাহ।

রাজকন্যা হইয়াও আমি তোমার প্রেমের লক্ষ্য ছিলেব।
কখনো তোমাকে তুচ্ছ রমণীয় ভাব ব্রত ও অলম্বারের মত
জ্ঞানাতন করি নাই। কারণ আমি জানিতাম যে, আমি হাথা
পাইব তাহা শতবাদিক্যগণিত অলম্বারের চ্যুতি রান করিয়া
দিবে। কিন্তু সেবিলাস, ছিন্নবস্ত্র আর পুশ্যাদায়রই আমার
ললাটলিপি। তাহার মত অবত কোত নাই। কোত
আমার উপহারগুলির মত।

আমি শিলালয়ে গমন করিলাম। ছুই মাসের মধ্যে যদি
আমাকে একখানি কাব্য উপহার দিতে না পার তবে কানিখো
বিদ্যাবতী মরিয়াছে।

নিবেদনমণ্ডিত
বিদ্যাবতী

পুনরপি—যদি না পার, তবে সেই বন্দীটার সহিত বেধার
খুশী হইয়ো।’

কালিদাস ভক্তিত বিন্দবে নির্বাক হইয়া রহিলেন। তাহার
পর ঘরে ঘরে বেশ পরিবর্তন করিয়া বিরাম্যমিত্যের নিকট
গমন করিলেন। ‘আত্মপাশত গুনিয়া বিরাম্যমিত্য বসিলেন,
‘তা তোমার মন তো এখন উত্তলা হইয়া রহিল, কবি। চলে,

আমার সহিত রামসিঁরি-পর্বতে বেড়াইতে। সেখানে বলিয়া
বিরহের দাবলাহে তুমি নিচরই কাব্য-রচনার প্রেরণা লাভ
করিতে পারিবে। কিন্তু, বন্দীর কথা কি বলিলে বিরাম্য
না তো?’

কালিদাস খুসিয়া বসিলেন সব। শুনিয়া বিরাম্যমিত্য
মুহ হাসিলেন। বসিলেন, ‘কবিভাষণ এ সম্বন্ধে যদি সত্য
হইত তাহা হইলে তোমাদের দ্বাধাই হটক না কেন, আমি
অন্ততঃ ‘অন্ত পাইতাম।’

কালিদাস নিজস্ব দৃষ্টিতে তাকাইতে বসিলেন, ‘সেবপ্রবা
বন্ধিনী নহে, বেদ্যায় আমার সহিত উচ্ছিন্ননীতে আনিয়াছে।
কি মন্ত, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার না কবি?’ বলিয়া রান
হাসিলেন মহারাজ বিরাম্যমিত্য।

বিষয়-বিশ্কাষিত নমনময় মুক্তি করিয়া পতীরকণ্ঠে
বসিলেন কালিদাস, ‘বুঝিয়াছি, মহারাজ। বিরহের কাব্য
সেবপ্রবার তাই বুঝি এত প্রিয়।’

রামসিঁরি-সাহস্রেশে পুশ্যমিত্যে মরমা হৃৎগৃহে আগমন
করিলেন মহারাজ বিরাম্যমিত্য। সঙ্গে অনাত্যবর্ণ, পরিষদ-
বুল এবং প্রিয়বস্ত্র কবি কালিদাস।

ঐশ্বের প্রধর বিনগুলি চলিয়া গায় আপন চক্ৰীয়ার
আবর্তনায়। বর্গ আসে। মনোহারিতী তত্বারীয় বৃক্ষের
নিভবন্ধনি বাসিয়া উঠে বনে-প্রান্তরে। রাজ্য প্রত্যহই
জিজ্ঞাসা করেন কবিকে—‘কি? কাব্যের কতম?’ কালিদাস
মন্তক কত্বন করিয়া অবাধ বেন—‘বধ্যপূর্বম্ তথাশরম্’
মহারাজ।’

ক্রমে আসিল মাধারের সজল-জনন-পতীর প্রথম দিবস।
কিতী-মুখরিত বনবারে রাত্রিতে গগন বিদীর্ণ করিয়া নামে বধ্য
পর্বতের সাহস্রেশে। ‘অনন্ত লাপে মহারাজ বিরাম্যমিত্যের।
কাঁথিয়া উঠে কবির অন্তর একখানি প্রিয়মুখরমণে। মনে
পড়িয়া যায় দুঃখের প্রিয়মনের কথা, মনে পড়ে সতীত-মুখর
উচ্ছিন্নিনী, মনে পড়ে বৃত্যচকল বিলাস-গৃহ। আর বুঝি
মানসপটে উকি দেয় আর-একটি বরণ মুখ—বাহার সময়
দীঘনটাই এক বিরাট বিরহের কাব্য।

কাব্য! রাজার চাই বর্গার কাব্য। কাব্য! বিদ্যাবতীর
উপহার। সেবপ্রবার অহরোহ। কবির চেতনার ভাগিদ,
প্রতিভার প্রকাশ! মেঘকমল আকাশের পানে তাকাইয়া
কবির চক্ষু সজল হইয়া উঠে। নিজেই ওঁহার মনে হয়
নির্বাসিত কবীর মতো।

মনে হয়, ঐ মেঘগুলি বৃত্তি তাঁহারই মতো সচেতন দ্বাধু।

উহার্য্য নৃকি প্রকাশী বিরহীর হৃৎ—গ্রিহ্যাব কাছে লইয়া যায়
মিলনের আশাশ-বাণী ! ঐ দূরে—বহুদূরে নিগ্রাতটবর্তিনী
উজ্জ্বলিনী ছাড়াইয়া বহুদূরে, বহুদূরে তপ্যারে কেন তাঁহার
পূর্বজন্মের প্রেমণী অশ্রুকা করিতেছে—সেই তবী তামা
নিখরঙ্গনা পকবিধাংগ্যাকীর উদ্দেশে কবি প্রেরণ করেন
কাব্যের মলিত-বিলাসী নব-মেঘদূত !

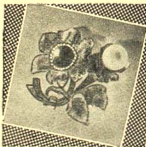
মেঘদূতের কবিকে অভিনন্দন জানাইলেন বিভাবতী ।
পঠিতপ্রাণ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মেঘদূতের দরিতে

উন্নতি মহাভাষ্য বিরূপাবিত্য লবঙ্গ রাজ্য ব্যাশিয়া মেঘদূত-
উদ্দেশ্য স্বক করিয়া দিলেন ।

কবি ও বিভাবতীর মান-অভিমানের পালা যথু মিলনে
সমাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু তবুও কোনো কোনো বর্ণনামুখরিত
প্রাবণী রাক্ষিতে বনন উল্লুত বাতায়নগবে শিকর-কণা আদিয়া
পড়ে মুখে, মাথায়, দেহাবচ্চবে—তখন মহলা দুই ভাঙিয়া
দখ্যায় বসিয়া নিহিত কবির সৌম্যকটি মুখপানে ডাকাইয়া
বিভাবতীর মনে হয়—তাঁহারই বিরহ কি কবিকে ‘মেঘদূত’
প্রেরণ করিবার প্রেরণা দিয়াছিল ? কি আনি !

সঙ্গবীর-অভিঙ

জুয়লাস



টি.সি.আড্ডি এণ্ড সন্স

৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬



কৃষ্ণি প্রদম্ব

মালদহের আম

ঐযতীশ্রনাথ মহলানবিশ

মালদহ জেলা ফজলি আমের জন্ম বিখ্যাত। কিন্তু ফজলি আম ছাড়া আরও ভালো ভালো জাতের আম এই জেলায় জন্মে। সাধারণতঃ এইসব আম শিরশাপাতি, গোপালজোগ ইত্যাদি নামে পরিচিত। এই দুই জাতের আম ফজলি আমের তুলনায় আগেই পাকে। তবে এইসব আমের উৎপাদন খুব বেশী হয় না। তা ছাড়া এইসব আম দূরপাশেও পাঠানো চলে না। কেননা গাড়িতে বেশিদূরের পথ বেতে এইসব আম খারাপ হয়ে যায়। এইজন্য এইসব আমের বেশিরভাগই স্থানীয় চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে দু-এক বৃষ্টি যে এদিকে-ওদিকে না পাঠানো হয় তা নয়। যাকে-যাকে এইসব আমের ২৫ বৃষ্টি কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে পাঠানো হয়ে থাকে। এই আম খুব মরম, বেতে খুবই মিষ্টি এবং এতে একটুও অম্ল নাই। এই আমের মরমত্ব খুবই স্পষ্ট। আম উঠবার মাসখানেকের মধ্যেই সব আম ফুরিয়ে যায়। সাধারণতঃ জুন মাসের প্রথমেরই মরমত্ব আরম্ভ হয় এবং আগ শেষ হতে-না-হতেই সব আম শেষ হয়ে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে ফজলি আমের গুরুত্ব খুব বেশী। ফজলি আম স্বয়ং জাতের আছে। এইসব জাতের কতকগুলি ডাক্তার মাসে পাকে। সাধারণতঃ এইগুলি ‘বারিনে আম’ নামে পরিচিত। এই আম খুব ভালো। না হলেও, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে এর একটা গুরুত্ব আছে। এই আম বখন ওঠে তখন অল্প আম যায় ফুরিয়ে। কাজেই এই আম বিক্রি করে আম-চাহিদা বেশ দু-পয়সা রোজগার করবার সুযোগ পায়। ফজলি আমের বতগুলি জাত আছে, তার মধ্যে ‘সুরবা ফজলি’ সবচেয়ে ভাল। এই জাতের আম অন্যান্য জাতের ফজলি আমের তুলনায় আকারে কিছু ছোট, কিন্তু মিষ্টত্বের দিক থেকে এই আম ফজলির দেয়া।

ফজলি আম সাধারণতঃ খুব বড় আকারের হয়। কিছু কিছু আম গুলানে প্রায় হই দেড় পর্যন্ত হতে দেখা যায়। এইসব আম দূরের পথে পাঠানো চলে, তাতে নষ্ট

হবার কোনো ভয় থাকে না। এমন কি, ৪১৩ দিনের দূরের পথেও এইসব আম পাঠানো হয়ে থাকে, এবং যে-সব বাজারে এইসব আমের চালান যায়, সেখানে অনাহারসে এর বেগাকেনা চলতে পারে। আম খুঁট হবার পরই গাড়িতে করে কলকাতার বা অন্যান্য জায়গায় চালান দেওয়া হয়। গাড়ির ভিতর গরমে আম নরম হয়ে ওঠার সেরকম ভালো ব্যবস্থা থাকে না। কিন্তু গাছ-পালা ফজলি আম বেতে খুব ভালো। অনেক ব্যবসায়ীর এই আমেই পছন্দ করেন। অন্যান্য নানী আমের তুলনায় এই আমের ৩৩ কিছু কম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, দেশ ভাগ হবার আগে এই ফজলি আম পূর্ববঙ্গে চালান যেত। সেখানে আম খোলা নৌকার দারি ক’রে লাভিয়ে চালান করা হত। পরে রাজ্যের আলো-বাতালে আম বেশ ভালোভাবে পেকে যেতো। কলকাতার ক্ষেতগণ কিন্তু ঠিক এইরকম আম পান না। কেননা এখন চালান আসে রেলের ক’রে, কাজেই নৌকার আমের তুলনায় রেলের চালানী আম স্বভাবতঃই যথেষ্ট একটু নিম্নই হয়ে থাকে। এইজন্য ফজলি আম কলকাতায় খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। দেশ ভাগ হবার আগে এই আম কলকাতায় খুব সামান্য পরিমাণে চালান আসত।

কতদিন থেকে যে মালদহের ফজলি আমের চাহ হচ্ছে তা বলা যায় না। তবে অনেক আমের বাগান যে খুবই পুরোনো তাতে সন্দেহ করবার কোনো অবকাশ নেই। সাধারণতঃ বলা হয়, দেশ থেকে বেই নীলের চাহ উঠে গেল তখন থেকেই ফজলি আমের চাহ আরম্ভ হয়েছে। যে-সব জমিতে নীলের চাহ করা হতো সে-সব জমিতে গড়ে উঠলো আমের চাহ এবং তার পর দীর্ঘ দীর্ঘ গড়ে উঠল আমের ব্যবসা। এইসব আমের গাছ তোলবার জন্য প্রায় ১৫ সামান্যই হোল। অথচ বাগান গড়ে ওঠার ব্যয়বাহার মালিকেরা বেশ দু-পয়সা পেতে লাগলেন।

মালদহে আজকাল এমন অনেক বাগানের মালিক আছেন—ঐযতীর বাগানে যে কত আম গাছ আছে

তা তাঁরা বলতে পারেন না। অনেক বাগান খুবই বড়। বড় বাগান থেকে বছরে ২৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা তোলা যায়, অল্প দাঁড়ার যদি-তাঁলো হয় : গাছে দুইতাল এলে অনেক সময় বাগান বিক্রি করে দেওয়া হয় এবং তার পর থেকে আম পাকা পর্যন্ত প্রায়ই ২১০ জন ব্যবসায়ীদের হাতে বাগান বদল হয়ে যায়।

মালদহের গরীব লোকেরা আমের সময় বেশ দু-পয়সা গোজগার করে থাকে। তারা বেচাকেনার কাজে নানাবিধ ভাবে সহায়তা করে। কলে তাদের এই সময় দু-পয়সা হয়। কেউ কেউ গাছ থেকে আম পাড়ে, কেউ কেউ বা গরুর হাড়ি করে খুবতী হেলস্টেশনে আম নিয়ে যায়। আমার কেউ কেউ বা আম-প্যাশিং-এর কাজে নিযুক্ত থাকে। অনেক ছেয়েরা আমদী বা আচার তৈরির কাজ করে। এইভাবে প্রায় মাস-তিনেক ধরে তারা নানা ভাবে নানা কাজে নিযুক্ত থাকে।

১৯৬৭ সালে আগস্ট মাসের পর থেকে মালদহে আমের ব্যবসারে বন্ধ তৈরি হয়। পূর্ববঙ্গে মালদহ-আমের বড় বাজার ছিল। এই সময় থেকে পূর্ববঙ্গে

মাল চালান দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। মালদহে কানিকী ও মহানন্দা নদীর তীরে আমের বেশিরভাগ বাগান ছিল। বর্ষার সময় এইসব নদী দিয়ে খুব সহজেই নৌকা বাতাবাত করতে পারে। কাজেই নৌকা করে এইসব নদীর তীরবর্তী স্থানে এবং পূর্ববঙ্গে আম চালান দেওয়া হতো। বেশ ভাগ হবার আগে কী পরিমাণ আম এইভাবে চালান যেত তা সঠিকভাবে নির্ণয় করার কোনো উপায়ান নাই। তবে বিভিন্ন জন্ত উদ্ভূত মাসের ২১০ ভাগ যে এইভাবে চালান দেওয়া হতো তা মোটামুটিভাবে বলা চলে। বেশ ভাগ হবার সময় মালদহের কিছু অংশ দিয়ে পড়েছে পাকিস্তানের জেতন, কাজেই কিছু আমের বাগান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে মালদহে যে কতগুলি আমের উৎপাদন হয় তার সংখ্যা হবে মোটামুটি ৫ কোটি থেকে ৭ কোটি। তবে আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্ত এই উৎপাদন কিছু কমেইনি হয়ে থাকে। বেশ ভাগ হবার পরেও পাকিস্তানে মালদহ থেকে কিছু আম চালান যেত, কিন্তু ১৯৪৯ সাল থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সেই সময় থেকে আর পাকিস্তানে চালান দেওয়া সম্ভবপর



মালদহের আমবাগান

হয়নি। এই অবস্থা পরিহার করার জন্য ভারত ইউনিয়নে বাজার গড়ে তোলবার চেষ্টা করা হয় এবং সেইজন্য কলকাতায় বেশী করে মাল চালান দেওয়া হতে থাকে। কিন্তু আগেই বলেছি, কলকাতায় মালদহের আমের ভালো চাহিদা ছিল না। ভারতের সব জায়গা থেকে কলকাতায় আম আমদানি হয়। এর মধ্যে ল্যাংড়া আমই কলকাতার প্রধানতম বেশী পছন্দ করেন। কাজেই ল্যাংড়া আমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ফজলি আম বিক্রি অসম্ভব। তবু ফজলি আমের হ্রাশ আছে এই যে, জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ল্যাংড়া আমের আমদানি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ফজলি আম তখনও বাজারে আসতে থাকে। কাজেই কলকাতায় সুনির্বাচন, ২৫ পরগনা প্রভৃতি জায়গা থেকে বহন আম আমদানি হতে থাকে তখন ফজলি আমের আমদানি হয় না। কিন্তু ফজলি আম বহন আমদানি হয় তখন কিছু সময় মাত্র ল্যাংড়া আম বাজারে থাকে। ল্যাংড়া আমের দর কিছু বেশি সেইজন্য সব লোকের পক্ষে কেনা তা সম্ভবপর হয় না। ফজলির দর কিছু কম সেইজন্য সাধারণ মধ্যবিত্ত লোক তা কিনতে পারেন। তা ছাড়া গত কয়েক বছর থেকে ল্যাংড়া আমের আমদানি বেশ কমে গিয়েছে।

ইদানিং কলকাতায় ফজলি আমের আমদানি বেশি হচ্ছে এবং এর চাহিদাও বাড়ছে। কলকাতায় এখন

ফজলি আমের বাজার বেশ গড়ে উঠেছে এই কথা বলা চলে। মরশুমে প্রায় ৭৮ ওয়গন আম কলকাতায় বাজারে আমদানি হয়। এইসব আম বিহারের হাজমহল স্টেশন থেকে কলকাতায় পাঠানো হয়। বিহারের কয়লা-খনি অঞ্চলে মালদহ থেকে অনেক আম পাঠানো হয় এবং লেখানেও ফজলি আমের বেশ চাহিদা আছে। মালদহ শহর থেকে আম চালান দেওয়া হয় সাধারণতঃ মালদহ কোর্ট, পুরাতন মালদহ এবং হরিশ্চন্দ্রপুর রেলস্টেশন থেকে। এইসব স্টেশন থেকে সাধারণতঃ উত্তরবঙ্গ, আসামে এবং বিহারের কোনো কোনো জায়গায় মাল চালান দেওয়া হয়। সব আম চালান দিতে প্রায় ৪ হাজার রেল-ওয়গনের দরকার হয়। আমের উৎপাদন কেন্দ্র থেকে রেলস্টেশন পর্যন্ত নিয়ে আসাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। গ্রামের মধ্যে অনেক জায়গায় ভালো বাস্তা নেই, আর বাও বা আছে তাও বর্ষাকালে হুর্দ্ব হয়ে পড়ে। দেশ ভাগ হবার আগে কিছু কোনো হ্রাশ বা থাকলেও, তখন নৌকা করে মাল বেশ চালান দেওয়া যেত। এখন তো আর সেই উপায় নাই, কাজেই গো-গাড়ি করে সব মাল রেলস্টেশন পর্যন্ত নিয়ে আসতে হয়। বছরে আম বিক্রি করে মালদহে ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় হয়। কাজেই অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে মালদহ জেলার পক্ষে এটা খুব কম কথা নয়।



নতুন বই

। অভয়ানন্দ ।

[বিজ্ঞান-মহা-কর্তৃক রচিত । উইজ্ঞান-মহা-কর্তৃক সম্পাদিত । প্রকাশক : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । মুদ্রা : লাত টাকা]

চাউগী-নোয়া-খাদি-খিস্তা অকলের তিনখানি পুঁবির বলে অভয়ানন্দ সন্থে নতুন আলোচনা পোনা গেল। চৌম্বল্যকায়ের সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক মুহুদায়ের ১০৮০ বছর পরে, ১০৪১ খ্রীষ্টাব্দে চৌম্বায়ের উপত্যকা-মিশ্রিত ভাষায় কবি বিজ্ঞান্য তাঁর এই কাব্য রচনা করেন। তিনি যে রামচন্দ্র, বৈষ্ণবভাবু, স্বাক্ষর সম্বন্ধ-পচেন, মৌলিকতাম্ব কবি ছিলেন—সম্পাদক উইজ্ঞান আলতোস দাস মহাপর এই দিকান্ত জানিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যের অস্বাভাবিক পবেক আচার উইজ্ঞান মহাপর শেনের তবাবধানে রচিত এবং প্রবীণ পণ্ডিত উইজ্ঞান মহাপর পণ্ডিত ও উইজ্ঞান মহাপর শহীদুল্লাহ কর্তৃক পরীক্ষিত এই পবেক-মহাপর উপাধিগোষ্ঠা-মহাপর বাগ-বিজ্ঞান্য নিশ্চয়োচন। উইজ্ঞান আলতোস দাস এ-অকলের অবিকারী অলোচক; তাঁর দীর্ঘ ভূমিকার মধ্যে তিনি কবি ও কাব্য-পরিচয় সম্পর্কে আভাষা নানা তথ্য সরবরাহ করেছেন। সাধারণভাবে মঙ্গলকায়ের পরিচিতিস্বত্রে তিনি জানিয়েছেন যে “মঙ্গলকায়ের মূল হুই অবিকারের উপর বিশ্বাসের জর এবং জীবনবোধ বা মানবতাবোধ। এই দুইটি পরস্পর অসম্পূর্ণ নহে।” এবং—“রাজনৈতিক মঙ্গলকায়ের কথা দিলে বস্তুতঃ বাংলা মঙ্গলকায়গুলিকে বরফ ধর্ম-মোলাহলেরই ইতিহাস বলিতে হয়।” তিনি আরো বলেছেন—“মুহুদায়ের কাব্যে এবং মাধ্যমচর্চের চৌম্বল্যে এই শাসন—সংগ্রাম তথ্য ধর্মমোলাহল অনেকটা বিমিত। ...দায়েরবের কাব্যে এই সপ্তমুদ্রী বা অবিকারী সীমিতাবেও দেখা যেন নাই।” তাঁর ভাষা ও ব্যাখ্যানভঙ্গির ভণে আলোচনা মূদ্রই মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে। “অভয়ানন্দ”-কাব্য সন্থে তিনি যেমন প্রণামের কথা লিখেছেন, তাকে তাঁর আত্মবিশ্ব মঙ্গলকায়-প্রতিভাই পরিচয় স্মৃতি উঠেছে। বইয়ের মূদ্রা উইজ্ঞান মহাপর সেন জানিয়েছেন—“বিজ্ঞান

মহাপরের অভয়ানন্দ কায়ের নাম পর্যন্ত জানা ছিল না। মূদ্রা পতাকীর এই রচনারি অবিকারী প্রধান আলতোস দাসেরই কীর্তি...ক-আবিকার পুঁবি সম্পাদন করিয়া প্রকাশের কার্যে আলতোস হুইপ্রদা দাস্ত্রী এবং মঙ্গলরজন দাস মহাপরেরই অঙ্গুগামী।” এসব মন্তব্য আসে অসম্পূর্ণ নহ। আচার্য সেন মহাপর তাঁর মূদ্রা-ব্যাখ্যায় ভণে উইজ্ঞান দাসের এই উল্লেখযোগ্য অবিকারের বিষয়ে অস্বীকৃত সমাদর প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু এইমাত্রীয় অবিকার সন্থে, বিশেষত পাঞ্জাতিং বোয়্য সম্পাদক-সমাজের কাছে বাংলা সাহিত্যের একাদেশ অঙ্গুগামী পার্থক্যেরও কিছু নিবেদন আছে। পুরোনো রচনার ঐতিহাসিক মূল্য এক জিনিস,—সাহিত্যিক মূল্য অত্র জিনিস। বর্তমানের সঙ্গে অত্রীতের বিচার-পদ্ধতির পার্থক্যের সত্যও স্বীকার্য। মঙ্গলকায় বে-মূদ্রের মঙ্গল, সেই অতিক্রান্ত অধ্যায়ের ধর্মবিশ্বাস, লোকচার, জনমত, ভাবাধীতি, বাস্তবচিহ্ন ইত্যাদি আত্মবিশ্বিক ব্যাপার সন্থে সম্পাদকরা ইতিপূর্বে আমাদের অনেক মূদ্রাবান তথ্য জানিয়েছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক উৎকর্ষ-বিচারের দায়িত্বের কথাও বিশেষভাবে বিবেচ্য। মুহুদায়ের কাব্য সন্থে মুহুদায়বাবু নিকে যেমন বলেছেন—“বিজ্ঞান নতুন নয়, পরিচয়নাও অভিনব নয়। শুধু চরিত্র-ভিগ্নে, ঘটনার নাটকীয়তা-মূদ্রণ এবং স্মৃতি-সময় বাস্তবমূদ্রির আলোকে কাব্যটির অসাধারণ উৎকর্ষ দৃষ্টি পাইয়াছে।” (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; পৃ: ৩৩৭; প্রথম ৪০)। “অভয়ানন্দ”-কায়ের অঙ্গুগামী কোনো উৎকর্ষ আছে কিনা,—মঙ্গলকায় সন্থে ঐতিহাসিক মহিমাবোধ-মুদ্রা, সাহিত্যিক উৎকর্ষ-নিশাঙ্গ আধুনিক পাইকের মনে সেইটিই হোলো এতৎ-সম্পর্কিত প্রধান জিজ্ঞাসা।

বিজ্ঞান মহাপরের পূর্ণগামী এমিত চৌম্বল্যকায়-

রচয়িতাদের মধ্যে আদি কবি মানিক দত্তের পরে বিজ্ঞ মাধব, মাধবাচার্য ও মুহুম্মদ আলী এই ক'টি নাম বিশেষ অধরীয়। কাব্যের নাম-ভণিতার মাধবাচার্য তাঁর রচনাকে 'সামলচরিত' বলে গেছেন একাধিকবার। হুজুতো বিনি বিজ্ঞ মাধব, তিনিই মাধবাচার্য। হুম্মাবাবানু বলেছেন—“মাধব-আগাধ বা 'বিজ্ঞ' মাধবের চৌমুদ্রল” : আদি-গ্রন্থ দীনেশচন্দ্র সেনের 'বহুভাষা ও সাহিত্য' থেকেই মাধবাচার্য নামটি প্রসিদ্ধ এক চৌমুদ্রলকারের নাম হিসেবে নিশ্চিত-সম্মানে জনশ্রুতি লাভ করেছে; হুম্মাবাবানু আরো বলেছেন—“গন্যমঙ্গল কাব্য-রচয়িতা বিজ্ঞ-মাধব চৌমুদ্রল-রচয়িতার অথবা কুমুমঙ্গল-রচয়িতার সহিত অভিন্ন কিনা বলা হুজুহ” : বঙ্গলকাব্যের অন্ততম গবেষক অধ্যাপক শ্রীমাত্তোষ ভট্টাচার্য মাধবাচার্য-কে পুরোপুরি বাস্তব করে চৌমুদ্রলকার হিসেবে মাধব-কেই (বিজ্ঞ মাধব, মাধবানন্দ, বিজ্ঞ মাধবাচ ভণিতার প্রচলিত) স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেসব বাদ-প্রতিবাদেও কথা এখানে অব্যাহত : মাধব ও মুহুম্মদের রচনার যেসব সাহিত্যিক গুণ আগেই দেখা গেছে, পঞ্চাশ-বাঁট বছর পরের কোনো কবির রচনার ততোধিক কিছু পাওয়া পেল কিনা, সেটাই এখন বিচার। গুণী সম্পাদক ও অধ্যাপক-সমাজের কাছে সেইটাই একালের বিশেষ নিবেদন। অন্তরা, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিশেষ কাব্যসাধার বিশেষ কোনো রচনা লক্ষ্যে পক্ষপাতিত্বের পরিচয় ব্যক্তিগত মূল্যমোহেই নানান্তর।

প্রাচীনদের প্রতি যোগ্য থাকটাই যথেষ্ট নয়; সত্যিকার সাহিত্যগুণের অঙ্গসম্মান দরকার। তথাকথিত

মাধবাচার্যের সঙ্গে রামদেবের কাব্য-পরিচয়নার অনেক সাদৃশ্য আছে। সে শাস্ত্রের কৈফিয়তসূত্রে উভয় দাদ জানিয়েছেন—“শরৎপরগণত পূর্ববন্দীঃ আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া মাধবাচার্য ও রামদেব তাঁহাদের কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া উভয় আখ্যান-কাব্যের কাঠামো এক। কিন্তু তথ্যসম্বোধনা, বাস্তব-নিপুণতা, লৌকিক বর্ণনা, নাটকীয়ভাবস্বজন এসবতঃ রামদেবের কবিত্বশক্তির মাধবাচার্যের কাব্যের সহিত দ্বন্দ্ব : গিভিততা আদিগা পড়িরাছে।” দাদ-মহাপ্রবর এই মন্তব্য দীর্ঘ বিস্ময়ংকর এবং আশ্চর্য মাত্র সমর্থিত হয়েছে বলে মনে হয়। এ-বিষয়ে আরো নিরপেক্ষ সাহিত্যচিন্তার অবকাশ আছে। অনেক কথার মধ্যে তিনি বলেছেন—“খুদার অস্তরে (-র ?) বাধাব্যঞ্জক বর্ণনা মাধবাচার্যের কাব্যে expressive, আর রামদেবের কাব্যে suggestive—এখানেই রামদেবের কবিত্বশক্তি।” আশেপাশে উৎকর্ষপ্রচারের এই ধরনের আন্তরিকতা তাঁর ভূমিকার ছুটে-ছুটে বিস্তারন। এসব কথা আরো বিশদভাবে করে দেখা দরকার।

অভয়াবস্থার প্রেহেলিকা আলোচনাসূত্রে তিনি তাঁর অঙ্গসম্মান হুজুহ-পরিচয় নিয়েছেন : ‘পরিশিষ্ট’ আশিট এবং ‘শম্ভটিকা’ অশিটও মূল্যবান : গবেষকের পক্ষে আবশ্যিক নানা গুণের সম্বন্ধে তাঁর এ-গ্রন্থ বিশেষ প্রশংসার দাবি করে। সেই ভঙ্গ্যভাঙেই এসবতঃ চিন্তনীয় হু-একটি কথা জানিয়ে রাখা গেল।

হুম্মাবাবানু

। একাঙ্ক নাটক সংকলন ।

[একাঙ্ক : শ্রীকালচন্দ্র দাস, প্রব. ২২।১ কংগ্রেসি স্ট্রিট, কলিকাতা ১। দূ. : তিন টাকা]

ষোড়শটি একাঙ্ক নাটক নিয়ে এই সংকলন : (১) নবময়-অগ্নিধি, (২) দৈনন্দিন-অবশেষ হাসপাত, (৩) শম্ভটিকা-গোপিকানার দায় চৌমুদ্রী, (৪) শতাব্দীর স্বপ্ন-আগন্তুক, (৫) এক পশলা বৃষ্টি-ধনঞ্জয় বৈরাগী, (৬) বৃহৎ-কিঞ্চিৎ বৈরাগী।

একাঙ্ক নাটক সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলা সাহিত্যের এই নাটক-সাধারিত্ব এখনও পুষ্টিসাধন হয়নি। কথা-সাহিত্য যে হুলনার আল এগিয়ে যাচ্ছে—নাট্য-সাহিত্য সেই হুলনার পেছিয়ে

হয়েছে। অথচ এই নাট্য-সাহিত্যের আবেদনের গভীরতা আছে—আমরা নাটকের দৃষ্টকাব্যও বলি।

নাট্য-সাহিত্যের এই অপরিপুষ্টির কারণ অবশ্যই আছে। পার্শ্বসমাজ যে-ভাবে উপভাস বা ছোটগল্প গলাধঃকরণ করে (এখনকি সে উপভাস বা ছোটগল্প যদি একেবারে পার্শ্বব্যাপ্য নাও হয়) যে-ভাবে নাটক গড়েন না। পার্শ্বের চাহিদা বা শ্রাব্যতার নাটকের উপাসনও ব্যাহত হচ্ছে। ছবিলা দিগন্তে গিয়ে শ্রীঅমরীন্দ্র চৌমুদ্রী নাটকের এই প্রবন্ধের কারণ সম্পর্কে বলেছেন—“পূর্বাঙ্ক নাটকগুলি

মাত্রার মানসিক বিকলতা বেশ দিতে পারে কিনা, তা বিবেচ্য। এইখানেই নাটকের সবচেয়ে দুর্বল স্থান।

এর পরের উল্লেখযোগ্য নাটক হ'ল—‘এক পদ্মা বৃষ্টি’ (লেখক—খনজিৎ বৈরাগী)। একটি সুন্দর পারিবারিক চিত্র। বিধাতা হলেও সখ্যা ভালবাসে খোঁসাকে। কিন্তু সখ্যক স্ব সমর খোঁসার কানে-কানে বলচে—সখ্যা তার বিধাতা। নিশ্চয়ন এই নিরবচ্ছিন্ন প্রচারের ফলে ক্রান্ত, বিধাতা। কিন্তু একটি ছোট্ট আঘাতের পর আবার মা ও ছেলের মিলন—এই নাটকটির বড়ো কথা। লেখক নিপুণ শিল্পী—তার মধ্যে টেটিয়ে কিছু বলার প্রয়াস নেই, অথচ যা বলেন তা বনকে ছুঁয়ে যায়। এই নাটকটিও সত্যি ভালো লেগেছে। ঘটনার নিটোল গাঁথুনি, সুন্দর সংলাপ সত্যি প্রশংসার্হ।

‘দৈনন্দিন’ ও ‘দুন্দুভ’ ইতি সাংখ্যিক নাটক। একটি হ'ল বহি-জীবনকে নিয়ে (‘দৈনন্দিন’), অপরটি হ'ল এক অশুভক মহিলাকে নিয়ে। উভয় নাটকটি ঘোঁটাছুটি ভালো।

এই সংকলনের সবচেয়ে দুর্বল রচনা হ'ল—‘শতাব্দীর বহর’ (লেখক—‘আগন্তুক’)। সংলাপের মধ্যে বক্তৃতার ঢা, অতি-নাটকীয়তা এবং বড় বড় জ্ঞানোপদেশ দেবার চেষ্টা আছে। বস্তুতঃ কোনোটাতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য নহে। নাটকটি অশ্রুহীন হলেও ভীষণ।

‘কলিকতা: বিয়েটার সেটার’-এর বাংলায় ‘একাত্তর নাট্য-প্রতিবেশিতা’র এই একাত্তরটি পুস্তকত হয়েছে। নাটকের এই অল্পমাত্রা দিনে বিয়েটার-সেটারের এইরূপ চেষ্টা একতাই প্রশংসার কাঁচি রয়েছে।

সুখান্ত দাশ

ফোন : ২২-৪৬৮৭

এস, মুখার্জী এন্ড কোং

[কাগজ ও মুদ্রণের কালি বিক্রেতা]

পি. ২২-৪, ব্রাহ্মবাজার ষ্ট্রাট, কলিকাতা ১

প্রতিলিপিকার :

টিটাগড় পেপার মিল্‌স কোম্পানি লিমিটেড

এবং

হুগলি ইক কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড

১৩৬৪-র বাংলা বই

আরতি সেন

তেরোশ' চৌধুরী সনের বাংলা বইয়ের পর্যালোচনা করতে বসলে যে-ক্রিমিটা প্রথমেই মনে পড়ে তা হোল, দেশের দুই-তিন ভাগ লোকের অক্ষমতা ও নিরক্ষরতার বতই শোহাই লাড়া থাক না কেন, গতবছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে বাংলা সাহিত্যের নিরীক্ষা-পরীক্ষা যেমন বেড়ে গিয়েছে, বাংলা বইয়ের প্রচাৰ ও প্রসারও তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে বহুল পরিমাণে। আদিক সৌন্দর্য বর্ধনা লাভ করেছে কল্যাণ-নৈপুণ্যে। পুস্তক-প্রকাশন-ক্ষেত্রে নতুন ব্যবসায়ীরা আগমন হয়েছে কম নয়। কল্যাণ তার অববব উঠেছে বেগে। নানা বিষয়ে এসেছে বৈচিত্র্য, উৎসাহ ও উজ্জীর্ণতা। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যেও পড়ছে তার সাজ। কিছুদিন পূর্বেও যে বই ছাপতে যে ব্যবসায়ীরা: ইতস্ততঃ করতেন, আজ তাঁরা বিনা ধ্বংস চক্রা নামের বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য-সংকলন বা স্মারিগরী-বিষয়ে পুস্তক প্রকাশে ততী হয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি জনসাধারণের অনুগ্রহ কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে তার বাণকায়ী আক উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০শে বৈশাখ 'কবিতা' উপন্যাসে গ্রন্থ-পার্শ্বের যে আয়োজন হয়ে থাকে, 'বিশ্বভারতী'র সামনে ক্রেতাদের ভীড় ধ্বংস। সরকারী সাহায্যাহুত্ব্য তো আছেই, সরকারী তরফ থেকে বিভিন্ন সাহিত্য-সংগঠনিক নিয়মিত সাহায্যপান, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির পাঠ্যপার গড়ে তুলতে সহায়তা করা, ভোলায় ফেলায় কেন্দ্রীয় পাঠ্যপার-প্রতিষ্ঠান মধ্যে বাংলা বইয়ের প্রসারের পরিচরও নিহিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে পাণ্ডা গেল না, সরকারী পুস্তকালয় ছাড়াও তেরোশ' চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর প্রেত বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে গত ২০শে এপ্রিল, ১৯৭১ সালে ৬টি বেসরকারী পুস্তকালয়-দানের কথা ঘোষিত হয়। বাংলার লক্ষপ্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতি ও সাময়িক পরিস্থিতি এ বিষয়ে অগ্রণী হন। 'অনুভব-বাজার পত্রিকা', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'দুগ্ধসত্ত্ব', 'বৈশ', 'মৌচাক' ও 'উত্তোরণ' বাংলার লোকসময়ের উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত হাল্কা ও পাঁচপ' টাকার ছোট পুস্তকালয়-দানের প্রতিশ্রুতি দেন। 'অনুভববাজার পত্রিকা' ও 'দুগ্ধসত্ত্ব'-এর তরফ থেকে 'নিপিরকুমার' ও 'মতিলাল' পুস্তকালয় ৩টি এবার পেয়েছেন শ্রীহরিচরণ বক্ষ্যাপাধ্যায় ('বকীর নক্ষত্র' নামক 'সরগীর অভিমানে-এই রচনার সত্ত্ব') এবং শ্রীপরদিকু

বক্ষ্যাপাধ্যায় (ছোট-গল্প-রচনার 'নৈপুণ্যের সত্ত্ব')। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'আনন্দ'-পুস্তকালয় পেয়েছেন প্রবীণ কথানিষ্ঠী শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় আর 'বৈশ'-পুস্তকালয় লাভ করেছেন নবীন কথ্য-সাহিত্যিক শ্রীসমরেশ বসু ('গদ্য' উপন্যাসের সত্ত্ব)। 'মৌচাক'-এর তরফ থেকে শিশু ও বিশেষ সাহিত্যের সত্ত্ব বে পুস্তকালয় প্রাপ্ত হয়েছে, তা লাভ করেছেন প্রবীণ শিশু-সাহিত্যিক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার দাস বহাণের তাঁর জীবনভর সাহিত্য-সাহায্য সত্ত্ব। আর 'উত্তোরণ' পুস্তকালয় পেওলা হয়েছে কবি নীলেন্দ্র চক্রবর্তী ও কবি সত্যজি মুখোপাধ্যায়কে। এ থেকেই বাংলা সাহিত্য ও বাংলা বইয়ের প্রতি সরকার ও বেসরকারী মহলের আগ্রহ ও উৎসাহ প্রেরণা বিশেষ করে লক্ষ্য করবার এটা নিশ্চয় হুয়ের কথা: আশার কথাও। বহিত-কল্লের বাংলা বইয়ের তালিকায় শুধু গল্প, উপন্যাস, কবিতা, জগৎকাহিনীই নয়, আছে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব বিদ্যক গুরু-তথ্য-মূলক প্রবন্ধ-পুস্তক, অস্থবাস, আত্মকীর্ষনী, অভিধান, গাইড-বুক, হস্তাণ্য পুস্তকন এছাড়া পুনর্মুদ্রণ ইত্যাদি পাঁচদিশারী বই। বাংলা বইয়ের সীমা শুধু আর কথ্য-সাহিত্যের গভীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, পরিধি তার প্রসারিত হয়েছে বাংলার মনন ও চিন্তাধর্মগতের নতুন নতুন দিকে।

কবিতা

প্রথমে কবিতার কথাই ধরা যাক। সেবা বাংলা বই হিসেবে এবার সাহিত্য-আকাশনি পুস্তকালয়ের সম্মান লাভ করেছে শ্রীপ্রমোদ বিহের 'সাগর থেকে কেতা' কাব্য-গ্রন্থখানি। 'সাগর থেকে কেতা' ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের রবীন্দ্র-পুস্তকালয়ের গৌরবও অর্জন করেছে। 'গ্রন্থমা'র কবি শ্রীপ্রমোদ বিহর শুধু কবিতা নয়, এভাবেই কুমলী কথানিষ্ঠী ও ঔপন্যাসিক। রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা সাহিত্যে শ্রীপ্রমোদ বিহের রচনা-বৈশিষ্ট্য অনবীকার্য। 'কল্লোল'-মুসের অধিগঠিততার মধ্যে তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু হলেও, প্রেমেনবাবুর কবিতায় বিশ্বসাহিত্য এক প্রসঙ্গতার দূর অন্তর্গত। সে-সুগ্ধে বিহেরী মানসের অন্তর্জালা বহুদী তাঁর কবি-চিত্তের লক্ষ্য শাস্ত বেদনার সত্যি রূপায়িত হয়েছিল বৃষ্টি। 'সাগর থেকে কেতা' বসিও তেরোশ'

“শীতের হাওয়া; বরষা, জোরে বরষা,

তুমি জো মও মও, নিরব মও

বাস্তব বেগবতী বেগন রে :

প্রোথাক বংশন বেঁধে না

বেহেতু পশনি মেলে না

বসিও নিঃশ্বাসে শমন রে।”

হাত ধল হুংতেজী :

“Blow, blow, thou winter wind

Thou art not so unkind,

As man's ingratitude ;

Thy tooth is not so keen

Because thou art not seen

Although thy breath be rude.”

রমা-রচনা

আলোচ্য বছরে রমা-রচনা-রচনার কিছুটা বৃদ্ধি তাঁটা পাচ্ছি। এককালে বাঙালী পাইকের নিকট রমা-রচনা অত্যন্ত সম্মানের দাজ করেছিল। ফলে ছোট্ট-বড়ো-মাকারি সবধরনের লেখকই এতদ্বারা রচনা-সত্যারে সাক্ষরে চলেছিলেন বৃদ্ধি রমা-রচনার বরণডালা। ভালো রচনা মাত্রই রমা। হালকা মেয়ের স্তম্ভ আচ্ছন্নবে ইচ্ছাধুর সাতরঙা বর্ণালীর ছোপ! কিন্তু রমণীর রচনা-মাত্রই কি রমা-রচনা? তা কি শুধু মরগুণী ফুল? গেল বছরে তবু সৈয়দ মুক্তবাবা আলী (‘ফুলছায়া’), শ্রীপাথ (‘আজব নগরী’), বিনয় ঘোষ (‘কালপেঁচার বৈঠকে’) প্রমুখ পত্রিকার লেখকরা রমা-রচনার ভাঙা হাট সাজাবার চেষ্টা করেছেন।

ভ্রমণ-কাহিনী

বাংলা সাহিত্যের যে নিকটায় ভ্রমণ-কাহিনী অব্যাহত হয়েছে, সে কোনো তার ভ্রমণ-সাহিত্য। তার ‘অমল ধবল পালে বন্ধ জুড় হাওয়া’ এখনও বৃদ্ধি পেয়ে আছে। বাঙালী ভ্রমণকাহিনী আলি ভ্রমণপ্রিয় নব, ভ্রমণগুইও। চোখ আছে তার বেশবার : যুগের ভাষা আছে তার বলবাহ। স্বাক্ষর বামদোহন থেকে অতি ছাড়া বাঙালী মুসাকিবদের লেখার হয়েছে তারই প্রত্যক্ষ পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের কথা : ‘পথের প্রান্তে আমার ভীর্ণ নর, পথের হৃদয়ে আছে ঘোর বেলাল’। বাংলা আধুনিক ভ্রমণ-কাহিনীতে তারই ভূমণী প্রমাণ পাওয়া যায়। নিছক প্রাকৃতিক দৃশ্য-বর্ণনা বা বিশেষের টেট-সুত্রকির বিশদ বিবরণ বা তথ্য

পথালোচনার বাংলা ভ্রমণ-কাহিনী গভীরতম নয়। পাইকের কঠির বেগন হয়েছে আর পরিবর্তন, পথ-চলার পটভূমিরও হয়েছে তেমনটি। ভাষা বানান বেঁধেছে তার অক্ষবৃত্ত : স্বচ্ছ সত্যশীল। নবীন-প্রবীণ, এমন কি লেখা বার পেশা নয় এমন অনেক পথিকই তাঁকের ভ্রমণকথা শুনিযেছেন আলোচ্য বছরে। তাঁদের মধ্যে যমোজ বহু (‘সোবিয়তের বেশে দেখে’), দক্ষিণায়তন বহু (‘বিশেষ বিকৃতি’), বিবলচন্দ্র সিং (‘কান্টার-ভ্রমণ’), রাধী চন্দ্র (‘হিমাত্রি’), বগেন্দ্র মিত্র ও রাধেন্দ্র বৈশম্য (‘রূপবহু ভ্রমণ’), তরুণ ভাস্করী (‘বঙ্গ-প্রান্তর’), ত্রিভিটা দেবী (‘অনেক সাগর পেরিয়ে’), নিবিলয়জন তার (‘আপন দেশ’), কালীপথ বিশ্বাস (‘নতুন জাপান’) প্রভৃতি অনেকে আছেন। বাংলা ভ্রমণকথার ভাষা নিয়ে নিরীক্ষা-পরীক্ষার আর এক অত্যাশ্চর্য প্রচেষ্টা দক্ষিণ বহুর ‘বিশেষ বিকৃতি’। বাঙালীর চোখে ধনকুবের মার্কিন ভ্রমণের নতুন আলোচ্য। ভ্রমণের আনন্দ পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে তথ্য ও গৌণ সমাবেশের অগুণ্ড প্রকাশ : আমেরিকায় তিনি শুধু চোখ দিয়ে দেখেননি, বেবেছেন মন বিকৃত। কালীপথ বিশ্বাসের ‘নতুন জাপান’ও হিরোশিমার পরের আজকের জাপানকে কেন্দ্র করে তথ্যপূর্ণ বিবরণ। তবে ছাড়াই কি চারবিন কোনো এক দেশ ও রাষ্ট্র চতুর নিয়ে এসেই অমনি সয় একখানি ভ্রমণকাহিনী কেঁদে বসার রেওয়াজ যত কম হয়, আশা করি, ততই কম।

সাহিত্য-সংস্কৃতি

সাহিত্য-সংস্কৃতি, জীবনী ও সমালোচনামূলক গ্রন্থের সংখ্যাও অল্প নয় আলোচ্য বছরে। উনিশ শতকে বাংলা গল্পের স্রষ্টা ও ক্রমবিবর্তনের পর থেকে আজকের তার পরিণতির মিনের স্বজন-বাণী, আশা-আশঙ্কের অগুণ্ড আলোকচ্ছটা, বৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যের প্রাণধর্মী পরিপূর্ণ হয়েছে বিশৃঙ্খলিত বাংলা সাহিত্যের এই বিকে। আচার্য ক্ষিত্রবোহন সেন (‘চিহ্নর বহু’), দৃষ্টিপ্রকাশ মুখোপাধ্যায় (‘বক্তা’), রবীন্দ্রনাথ বসু (‘হুলা ও কালপুত্র’), অমোঘিতলাল বসুমদার (‘বাংলার নবদুর্গ’), হরপ্রসাদ মিত্র (‘কবিতার বিভিন্ন রূপ’), নারায়ণ চৌধুরী (‘সমকালীন সাহিত্য’), বিবলচন্দ্র সিং (‘সাহিত্যপার্যের ভূমিকা’), বিনয় ঘোষ (‘নিজামাবাদ ও বাঙালী সত্য’), জগদীশ ভট্টাচার্য (‘সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ’), সুনোভন সরকার (‘সম্রাট ও ইতিহাস’), অরবিন্দ শোকার (‘রবীন্দ্রবাসন’), গোপাল হালদার,

বাংলা: অল্পবয়স-সাহিত্য ও এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য।
বিশেষ সাহিত্যের অল্প-নবল অস্থান ছাড়া কোনো
জাতীয় সাহিত্য পূর্ণতা অর্জন করতে পারে বলে জানা
নেই। হালে বাংলাতে বহু গ্রন্থের অল্পবয়স প্রকাশিত
হচ্ছে। কোনো কোনো বিশেষী শুল্ক ও সাংস্কৃতিক
প্রতিদান ও বিধেয় বস্তুর চেষ্টেছেন। এবং এঁদের
শৈলীতেই অতি অল্পবয়সী অনুভূতি বিশেষী বইয়ে আজ
কণেক-স্ট্রীটের দুটপা প্রাচ্য চাপিয়ে ওঁর উপক্রম।
এটা অল্প বয়সের কথা। বাংলা ভাষায় বিশেষ বইয়ের
বহু অল্পবয়সী হয় ততই ভালো। তবে যোগ্য লেখকের
সার্থক সৃষ্টির দিকে একই নজর রাখা প্রয়োজন কিনা
স্বীকৃতি বিবেচনা করে দেখবেন।

গল্প-উপন্যাস

বাংলা বইয়ের প্রকাশিত তালিকার গল্প-উপন্যাসের
সংখ্যাটি চিরকাল প্রাচ্য লাভ করে থাকে। আলোচ্য
বছরেও তার খুব ব্যতিক্রম ঘটেনি। এসব অধিকাংশ
গল্প-উপন্যাসের মাদ্রি বিবহ-বহু: নিম্ন ও মধ্যবিত্ত
জীবনব্যয়, তার পাশাপাশি ইতিহাস, জাতীয়
আন্দোলন, কলকারখানার শ্রমিক-মালিকদের সংঘর্ষ-সংঘাত
বা সমাজতান্ত্রিক বিধের অস্তিত্বও কিছু কিছু হচ্ছে।
নাগরিক জীবনের চট্টল প্রেমের কাহিনী তো আছেই।
সংঘর্ষ বহু: কল-শিল্পীদের হাতে সাহিত্যের এই প্রধান
শিক নিম্ন-মূল্যের পরিপূর্ণতার প্রকাশ। তবে নতুন
লেখকদের চাইতে প্রবীণরাই এখনও আসল রেখেছেন
জমি:। এখনও সেই তারাপদর ('মাথা'), অমরদাস
(‘বহু ও ক্রীমতী’), বনকুল ('অমরগামিনী'), বিজু-
তীর্থ মুখোপাধ্যায় ('পদ্মক'), পরশুরাম ('আনন্দীবাঈ
ইত্যাদি গল্প'), সরোজকুমার ('ভিবি-বল'), নারায়ণ
গোপাধ্যায় ('অসিধার'), নরেন্দ্র মিত্র ('অক্ষক',
'মিশ্রগণ'), মনোজ বহু (‘বৃষ্টি, বৃষ্টি’, প্রতিভা বহু
(‘মধ্যরাত্রে তার’), শীলা মজুমদার ('চীন লর্ডন'),
আশা-পূর্ণা দেবী ('উন্মোচন'), মহাশেতা ভট্টাচার্য ('নৌ'),
স্বরাজেন মুখোপাধ্যায় ('স্বপ্নতোরণ'), বঙ্গাল জৌহুরী
(‘বীণের নানা টিগার’, ‘অনো আসেনি’), সুশীল জানা
(‘সিবিবির কাহিনী’), বিমল কহ ('পেঙাল—২য় খণ্ড'),
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ('নিহক মাহু'), সমরেশ বহু
(‘গঙ্গা’, ‘তুকা’), আত্মতোর মুখোপাধ্যায়, নবেন্দ্র ঘোষ,
আবুল কালাম সাবহানী ('শাহের বাহু'), অমরেন্দ্র ঘোষ
(‘তোপনভরা এ বস্ত্র’), সতীনাথ ভাট্টা ('সংকট'),
পরিমল গোস্বামী, অজিত কুমার বহু (অ. ক. ব.),

মহীন্দ্রনাথগোহায়ে, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ('মাধুত'), অশীষ
গোহায়ে, প্রাপ্তবয়সী ঘটক ('মুঠো-মুঠো কুদাশা'), 'অবদুত'
সৃষ্টি বন্দ্যোপাধ্যায় ('পদসংস্কারে বাংলা বইয়ের
বহুভাষা এবং বহুভাষা। তখন কথা-সাহিত্যিক প্রচুর
হাচের ('পদ-পার্বতী') নিকট ভাবীকালের বাংলা সাহিত্য
অনেক কিছুই আশা করে।

বাংলার বিশেষ ও শিশু সাহিত্যের বহুভাষাও বহুভাষা
নানা বইয়ের ডালার ডালার সাজিয়ে তুলেছেন বহুভাষা
শিশু-সাহিত্যিকরা, তাদের মধ্যে শীলা মজুমদার ('হলদে
পাখির পালক'), সুশীল জানা ও ('গোলায় মধু'), পরিমল
গোস্বামী ('হুলের মেয়েগা'), সুশীল জানা ('গল্পবহু
ভারত'), প্রমোদ মিত্র ('গল্প আর গল্প'), বনকুল
(‘করী’), আশা দেবী ('লাল তারা নীল তার'),
বিজু-তীর্থ মুখোপাধ্যায় ('হেসে বাত'), হুজুর মুখোপাধ্যায়
(‘হেসে-বিশেষের রূপকথা’), রূপকথা ('অল্পবয়সী অতিমান')
হুজুরকান্তি ঘোষ ('আবু বিচিত্র কাহিনী') বিশেষ করে
উল্লেখ করব।

বাংলা নাটক এসেছে যে প্রজন্ম প্রথমে মনে আসে সে,
হোল—বাংলা নাট্য-সাহিত্য কোন্ পথে? এ কথা অবশ্য
অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলা নাটকের সবকিছুর
আজ শুধু তার বর্ষকৃত। শেখারদী বহুভাষা ও চলচ্চিত্র
প্রতিষ্ঠানগুলির জড়ই নাটক প্রধানত: লিখিত, বহু
ভেটি হয়ে থাকে। বর্ষকৃতসাধারণের রুচি ও মনো-
সাহনই তার প্রধান লক্ষ্য। হুজুর, নাটকের বহুভাষা
সাহিত্য ও শিশু-বোধ কিছুটা তাতে ব্যাহত হতে বাধ্য
হইকি। মৌলিক নাটক-রচনার ভার শুধু মৌলিক নাট্যগণ
বা তাদের হাদন-ধোর লেখকদের হাতে ছেড়ে দিলে
শেখারদী হুজুর আশা কম। প্রকৃত দরদী ও মূল্য
সাহিত্যিকদের এদিকে নজর দিতে হবে। জাতীয়
সরকারকেও আরও অধিকমাত্রার সক্রিয় ও সচেতন হতে
হবে। তা হোলে তাতে শুধু একটামাত্র 'শেখার পাঁচালী'
(‘হোলই বা তা চলচ্চিত্র!') নয়, এমনি আরও বহু সার্থক
সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে—এ কথা বলা চলে আরও করে।

তেরোশাণ জৌহুরী মনে প্রকাশিত বাংলা বই-এর
মোটামুটি একটা দারার হাদন নেবার চেষ্টা করা হয়েছে
এ আলোচনায়। বাংলা গ্রন্থকর্মের ও গল্পতামারি বহু।
হুজুর আলোচ্য বছরে প্রকাশিত কোনো কোনো
উল্লেখযোগ্য বই-এর হুজুর উল্লেখ করাই হয়নি। মোট
আলাদানত-প্রস্তুত এবং অনতিপ্রস্তুত।

● মঞ্চ-দর্শ ●

চিত্রলোক

পদনাত

ঐশ্রীমা

প্রযোজন্য : নারায়ণ ফিল্ম প্রোডাকশন্স। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : কালীপ্রসাদ ঘোষ। স্রষ্টাঃ : অনিল বাগচী। চরিত্র-চিত্রণ : অম্বুতা গুপ্তা, গুরুদাস বক্যোপাধ্যায়, সাহায়েী সান্নাণ, মনিলা, সর্বস্ব, প্রণতি, ভারতী, চায়া, জীবন বহু, নীতিন মুখোপাধ্যায়, ঐশ্বরীবালা, রাজলক্ষী এবং আরো অনেকে।

“তোমাকে ছেড়ে চলে যাবো কি গো? হুমি আর আমি কি আশাযা? বাইরেই বেহ-জুতো আশাযা—চেতরে হুমিও যে-আশা, আমিও সেই আশা।”—বলেছিলেন ঠাকুর ঐশ্বরীসামন্তক সারসামণির শব্দকুল প্রসঙ্গ অব্যব। সারসামণি ছিলেন ঠাকুরের শক্তি—নিজের সমস্ত শক্তিকে তিনি পরমশূদ্ধের সত্যের মধ্যে বিলীন করে দিয়েছিলেন। তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর ঐশ্বরীমাকে পৃথক করে দেখা সত্য নয়। মহাপুরুষের সর্ধদমিণী সারসামণির এই কাহিনী এমন মিষ্টার সঙ্গে হুলে ধরা হয়েছে ছবিটিতে যে, দেখতে বেসতে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে উজ্জ্বলিত হয় মনে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, মহাপুরুষের পুণ্যজীবন নিয়ে এ পর্বত যতোগুলি ছবি তোলা হয়েছে, তার মধ্যে ‘ঐশ্রীমা’ স্পষ্টে বাস্তবিক।

সারসামণির বিবাহ থেকে স্বামীই দেহত্যাগ পর্বন্তই ছবিটিতে দেখানো হয়েছে। সাধারণ গ্রামের মেয়ে। অক্ষর-পরিচয়হীন। কেমন করে তিনি পরমপুরুষের অল্পপ্রণয়র অমুপ্রাণিত হলেন, এবং জননী না হয়েও হলেন জগন্মমনী, তারই উক্তিঃসঙ্গত্ব অনবদ্য কাহিনী চিত্রায়িত হয়েছে ছবিটিতে। ঠাকুর গ্রামকৃষ্ণের বাণী, যা তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন মণিমুক্তোর যতো, এমনভাবে পরিবেশন করা হয়েছে, যা কোনো জায়গায় নীরস কথাই বোকা হয়ে ওঠেনি। কাহিনীর নাটকীয় মুহূর্তে ঠাকুরের বাণী মল্লভালে

পরিবেশন করার ফলে অতিসাধারণ দর্শকের কাছেও রামকৃষ্ণলীলার সার্থক রূপটি ধরা পড়েছে। এইখানেই ছবিখানি বসন্তীর্ণ হয়েছে।

সহজ সাধারণ ভাবে পরমাশ্রদ্ধা বশ্যতির জীবন-কাহিনী হুলে ধরা হয়েছে। ফলে, সাধারণের গণ্ডী ছাড়িয়ে অসাধারণের পর্বায়ে অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েছে ছবিখানি। কতকগুলি জায়গায় ঘটনাবলী ঐক্য বিচ্ছিন্ন বলে মনে হলেও, সব মিলিয়ে যা পাওয়া যায় তা অনিচ্ছিন্ন আনন্দলোকের অংশবিশেষ। ঐতিহাসিক অনেকগুলি চরিত্র উপস্থাপিত করা হয়েছে, যেগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাহিনীর অংশ নয় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তার ভুলে কাহিনী ব্যাচত হয়নি একটুও। সব মিলিয়ে ‘ঐশ্রীমা’ ছবিটির মধ্যে এমন একটা তিক্ত পাণ্ডুর ঘাথ ঘরে আবেশন সর্বমুগের এবং সর্ধ-কালের। এই আবেশন অতি সহজেই মনকে নাড়া দেয়—অতি সহজেই স্পর্শ করে সাংবেদনশীল মনকে। সংসারের দিনগত শাসনকার্যের চিরচরিত্র প্রথার বাইরে এক ভাবলোকের সন্ধান এই চবির মধ্যে স্পষ্টিত্ব।

নাম-ভূমিকাঃ অম্বুতা গুপ্তার স্বতন্ত্র অভিনয় সত্যত ঐর শিল্পী-জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এমনভাবে তিনি নিজেকে ঢেলে দিয়েছেন সারসামণির চরিত্রে যা অসুখ প্রণয়র দাবি রাখে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের চরিত্রে গুরুদাস বক্যোপাধ্যায় অনবদ্য। ঐর অভিনয় দেখে মনে হয়, এই চরিত্রটি ঐর একমাত্র সার্থক কীর্তি। সত্যত কোনো ঐশ্বরী শক্তিই হলেও তিনি চরিত্রটিকে সূত্রে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কাহিনীর পার্শ্বচরিত্রগুলি, বিশেষ করে সারসামণির কৈশোরকালের চরিত্রটি সু-অভিনীত। সঙ্গীতাংশ ছবির ভাববীজী রূপটি বক্ষার রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। নেপথ্য-সঙ্গীতগুলি স্বীকৃত হয়েছে। কলাকৌশলের অজ্ঞাত দিক

প্রাণসমীহ কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে। পূর্বমুদ্রণে
দম্পতি হাকুর শ্রীধরচন্দ্র ও শ্রীশ্রীমাদের এমন সার্থক

চিত্রকাহিনী পরিবেশন করার ক্ষেত্রে পরিচালক কালীপ্রসাদ
যোষ অকৃত প্রশংসা অর্জন করবেন সম্ভব চিত্রদর্শকের।

। আ গা মী আ ক ঈ ণ ।

উত্তরায়ণ

বোম্বাইয়ের প্রমোজকরা বাংলা ছবি করার দিকে মন
দিয়েছেন এবার। এর আগে কয়েকখানি ছবি তোলা
হয়েছে বোম্বাইয়ের প্রমোজকদের দ্বারা। বর্তমানে
কিশোরকুমার হুগ্গেছেন 'গুরুচরিত্র' নামে একখানি ছবি।
সম্প্রতি 'ভগ্নানকার' শ্রী শিকচাঁদ ভাদ্রাশ্রমের কাহিনী-
অংশধরে 'উত্তরায়ণ' নামে একখানি বাংলা ছবি তোলায়
দিকান্ত যোগ্য করেছেন। ছবিখানির পরিচালনা ও
প্রযুক্তির দায়িত্ব নিয়েছেন কান্তিক চট্টোপাধ্যায় ও
হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে দেখা যাবে
উত্তমকুমার, হুচিরা সেন, কিশোরকুমার, মালা সিং এবং
অজিত বহু বাঙালী শিল্পীকে। ছবিখানি সম্পূর্ণ বোম্বাইতে
তোলা হবে। আর্থিক কাজ শুরু হয়েছে।

শীপ ছেলে বাই

অসিত সেনের পরিচালনায় 'শীপ ছেলে বাই' নামে
একখানি নতুন ছবির সংকেত সম্প্রতি স্পষ্ট হয়েছে
'ক্যালকাটা হুডিটোন স্টুডিও'তে। এর বিভিন্ন চরিত্র
রূপায়িত করবেন বসন্ত চৌধুরী, হুচিরা সেন, নবিতা সিং,
শাহাভী সাদুল, কাজরী ওহ প্রভৃতি শিল্পী। সঙ্গীত-
পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্তকুমার এবং নেপথ্যে
কণ্ঠ দেবেন লতা মগনকার, মালা দে এবং হেমন্তকুমার
সহ। ছবির কাজ ইতোমধ্যেই অনেকখানি এগিয়ে
গিয়েছে বলে জানা গেল।

কাত্তার-কত্তা

'স্টাইকমল' ছবিতে বাস্তবায়িত নাম করার কিছুকাল
পরে চিত্রক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়ে সংসার-আশ্রমে প্রবেশ
করেছিলেন কাবেদী বসু ওরফে চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু
রূপালী পর্দার হুনিয়ার আকর্ষণে তিনি আবার বিয়ে
আগেছেন 'বহুবিভক্ত' আগামী আকর্ষণ 'কাত্তার-কত্তা' ছবির
নাট্যকার। ছবিখানির মূল বিষয়বস্তু বয়ঃপ্রাপ্তের
নামকরা একজন নারী-পত্নীর, যাকে বহিন-হরের সঙ্গে
তুলনা করা হয়, রোমাঞ্চকর কীটকাহিনীতে। খুব সম্ভবত

এ ধরনের বাংলা ছবি এই প্রথম তোলা হবে। ছবিখানি
পরিচালনা করবেন নীরেদ শাহিড়ী। সম্পূর্ণ চুক্তিসিপি
এখনো ঠিক হয়নি। 'বহুবিভক্ত' অন্ততম তর্কায়
গৌরাক্ষপ্রসাদ বসু এর চিত্রনাট্য রচনা করতে ব্যস্ত এখন।

নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে

'অবশ্য'-'বিবচিত্র উপরি-উক্ত নামে একখানি হাসির ছবি
তোলা হবে প্রমোজক বি এন্স. থেকার তত্ত্বাবধানে।
প্রধানত ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করেই ছবিখানি
তোলা হবে। চুক্তিসিপিগে থাকবেন মালা চলচ্চিত্রের
অধিপানে কৌতুক-শিল্পী। ছবিখানির আর্থিক কাজ সংকেত
শুরু হয়েছে। এখনো পরিচালক এবং সঙ্গীত-পরিচালকের
নির্বাচন সমাপ্ত হয়নি বলে জানা গেল।

অপাত্তক্ষেত্র

'রূপালী শিকচাঁদ'-এর 'অপাত্তক্ষেত্র' ছবিখানির কাজ
'চিত্রভাষা' নামে একটি কলাকূশলী গোষ্ঠীর পরিচালনার
'ক্যালকাটা হুডিটোন স্টুডিও'তে শুরু হয়েছে। সমাজের
গতীর বাইরে যে-সব লোক গণ্য ও অবহেলা সহ্য করে দিন
কটায়, সমাজে ব্যাধি অপাত্তক্ষেত্র, তাদের ভিত্তি করেই এর
কাহিনী রচনা করেছেন বিশ্বমল্ল ঘোষ। সঙ্গীত-
পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সত্যেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। চরিত্র-
চিত্রণে কতকগুলি নতুন মুখের সঙ্গে বাংলা-ছবির জনপ্রিয়
শিল্পীদেরও দেখা যাবে।

হায় টাকা

'লোকচিত্র' নামে একটি নবগঠিত প্রতিষ্ঠান 'হায় টাকা'
নাম দিয়ে হাসির ছবি তোলায় দিকান্ত যোগ্য করেছেন।
পঞ্চমতি চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ছবিখানির আর্থিক
কাজ শুরু হয়েছে। এর কাহিনী নিয়েছেন উদয়চন্দ্র
নাগ। প্রধান চুক্তিকার থাকবেন বর্তমানের সর্বজনপ্রিয়
কৌতুক-শিল্পী ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। গত পর্চিশে বৈশাখ
'কো-অপারেটিভ স্টুডিও'তে বিশিষ্ট অতিথিবর্গের
উপস্থিতিতে ছবিখানির সংকেত সম্পূর্ণ হয়েছে। নিয়মিত
চিত্রগ্রহণ খুব শীঘ্রই শুরু হবে বলে আশা।

। পুঁচ রো খ ব র ।

স্বপ্নরূপে চলচ্চিত্র-উৎসব 'ডেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-প্রতিযোগিতা'র ভারতীয় ছবি হিসেবে 'অগ্রগামী'-পরিচালিত 'ডাকহরকরা' নির্বাচিত হয়েছে। এসময় উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই প্রতিযোগিতাতে 'গোল্ডেন দায়ন অব স্টেট মার্ক' অর্জন করে সত্যজিৎ রায় বিশ্বের দরবারে বাংলা ছবির মান বাড়িয়েছেন। স্বপ্ন গ্রাম-বাংলার ছবি 'ডাকহরকরা'র অবদানও কম নয়। অতএব আশা করা অসম্ভব হবে না যে, 'ডাকহরকরা' ডেনিসে ভারতের চলচ্চিত্র-বিশ্বের গৌরব বাড়ানো সম্ভব হবে।

ইংলণ্ডের এডিনবরা শহরে আসার 'বিশ্ব চলচ্চিত্র-সম্মেলনে' বোম্ব দেবার ক্ষেত্রে পৃথিবীর প্রতিটি দেশকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই সম্মেলন অহরহিত হবে আগামী ২৪শে আগস্ট থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর। ভারতবর্ষও অসম্ভব দেশের সঙ্গে তার চলচ্চিত্র-বৃষ্টি এই প্রতিযোগিতার উপস্থিত করবে। সম্ভ্রুতি লগনে 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' ছবি-দুটির সাক্ষরকল্প প্রদর্শনের পর অনেকেই ভারতীয় ছবি সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করছেন। এদেশ থেকে কোন্ কোন্ ছবি যাবে তা এখনো পর্যন্ত স্থির হয়নি। তবে আশা করা যায়, খুব শিগগিরই তা ঠিক হবে এবং উল্লেখযোগ্য কোনো একটি বাংলা ছবিকে তালিকার মধ্যে দেখা যাবে।

নিউ ইয়র্কের খ্যাতনামা চিত্র-প্রদর্শকেরা 'মৌন আবেদন' না থাকার ক্ষেত্রে 'পথের পাঁচালী' ছবিতিকে আমেরিকার কোনো ছবিঘরে মুক্তিসাজের হযোগ দিতে নাবাল্ব ছিলেন। বাই বোক, শেষ পর্যন্ত কয়েকজন গুণী বোকের অসাম্মত চেষ্টার ফলে ছবিটি অবশেষে প্রথম ভারতীয় ছবি হিসেবে নিউ ইয়র্কের একটি সম্ভ্রুত ছবিঘরে আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে। 'পথের পাঁচালী'র প্রদর্শনী শেষ হলে 'অপরাজিত' ছবিটিও দেখানো হবে এই ছবিঘরে। এই দুটি ছবির প্রদর্শনীর ব্যাপারে মার্কিন চিত্র-পরিবেশকদের উদ্বাসিততার ফলে মুক্তবাটে ভুল বাধ-প্রতিবাদের কড় উঠেছিল এবং ইতোমধ্যেই বহু লোক ছবি-দুটির সম্বন্ধে

বিশেষভাবে আগ্রহাবিত হয়েছেন। 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিত'র ব্যবসায়িক সাফল্যের উপর আমেরিকার ভারতীয় ছবির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বললে অসম্ভব করা হবে না।

চেকোস্লোভাকিয়া সম্ভ্রুতি ভারতীয় ছবি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করছে। এখনকার চিত্র-পরিবেশকরা কয়েকজন ভারতীয় প্রযোজকদের সঙ্গে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চেকোস্লোভাকিয়ার ভারতীয় ছবির প্রদর্শনী বাতে ইহ তার ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন। একটি ববরে প্রকাশ যে, 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' এবং 'পরশপাখর' এই ছবি তিনটি সম্ভ্রুত খুব শিগগিরই ভবনশে দেখানো হবে।

কাচা কিশোর অচায়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পকে যে সংকটের শব্দহীন হতে হয়েছে, তার হাত থেকে বাঁচাবার ক্ষেত্রে এদেশে কাচা-ফিল্ম-তৈরির কারখানা-স্থাপনের কথা সরকার এবং চলচ্চিত্র-শিল্পগতিরা বিশেষভাবে চিন্তা করছেন। এই কারখানা ভারতের কোন্ রাজ্যে স্থাপন করা হলে তা নিয়ে জোর আলোপ-আলোচনা চলেছে। কারখানাটি মহীশূর রাজ্যে স্থাপন করার ক্ষেত্রে মহীশূরের শিল্পগতি এবং রাজ্য-প্রতিনিধিরা এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। পরিকল্পনাতিকে মহীশূর-রাজ্যের পঞ্চাবিদ্যুত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তও করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে মহীশূরে হুঁকোটি টোকা বাধ করে কাচা ফিল্ম তৈরি করার কারখানা স্থাপন করা হবে।

ভারতীয় চলচ্চিত্র-বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত 'সো' 'আথে বাবা হাত' বালিনের আসন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-প্রতিযোগিতার প্রেরণের ক্ষেত্রে নির্বাচিত হয়েছে। ছবিখানির প্রযোজক-পরিচালক অভিনেতা দ্ব্যস্তায্য বর্তমানে ছবিত্বিতে কার্যনি ভাষায় সাক-টাইটেল বোম্ব করার কাজে ব্যস্ত। বেশা স্বাক, ভারতীয় চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ-দশম-পাণ্ডা ছবি বালিন-উৎসবে কী সম্মান অর্জন করে।

শিশু-নৃত্যশিল্পীর সাক্ষাৎ

‘দেশী সংস্কৃত-সমাজ’ কর্তৃক আয়োজিত হাওয়াবিশ প্রতিযোগিতায় শিশু-নৃত্যশিল্পী কুমকুম বক্সোপাধ্যায় বিশেষ লাভসমিত্য প্রদর্শন করিয়া স্বর্ণ-সমাজের প্রদত্ত অঙ্কন করেছেন।

লাভ করেছে। ইতিপূর্বে দ্বারী-স্মৃতি-প্রতিযোগিতা, ভারতীয় সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা, পশ্চিমবঙ্গ শিশু-উৎসব, পশ্চিমবঙ্গ সুব-উৎসব প্রভৃতি অঙ্গুষ্ঠানে কুমকুমের নৃত্য উপকণ্ঠে বিশেষভাবে হুত্ব করে। এ ছাড়া আনুষ্ঠানিক



কুমকুমের একটি বিশেষ পরিচয় কুমকুম বক্সোপাধ্যায়

পঞ্চমবর্ষীয়া কুমকুম আশুনিপ, স্বকাকলি ও লোকনৃত্যে প্রথম ও মণিপুরী নৃত্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী বিবেচিত হওয়ায়, ‘স্বর্ন-স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ’

অভিনন্দে কুমকুমের নৈশুণ্য উল্লেখযোগ্য। কুমকুম ‘চালা মণিমেলা’য় মণিমেলায়। হাওয়াবিশ শিল্পক শ্রীমোহনকুমার বিশ্বাসের নিকট সে নৃত্য শিক্ষা করেছে।

—

গ্রামোফোন-কোম্পানি কর্তৃক পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও সম্প্রদায়ের সম্বর্ধনা

ভারত-সরকার-আয়োজিত জ্ঞান-প্রত্যাগত ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিিনিবন্ধনীর নেতা বিবিশিষ্টাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত রবিশঙ্কর, শ্রীমতী দময়ন্তী বোস, আল্লারাধা এবং

হরিহর রাও-কে গ্রামোফোন-কোম্পানি গত ১ই মে, শুক্রবার সন্ধ্যায় ২০, হাঙ্গা সঙ্কোচ রোড, আলিপুরে এক সম্বর্ধনা সভায় সার্বজনীন অভিনন্দন জানান করেন।

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিবার্গের বিকট জ্ঞাপনের অভিজ্ঞতা-বর্ণনাপ্রদর্শে পণ্ডিত বহিঃস্থর বসেন,—উদাহরণ জ্ঞাপনে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করিয়াছেন। উদাহরণ টোকিও, কিওটো, কোবে, ওসাকা, নারা, নাগোয়া, হিগোশিমা, হাকোডেট, আশাহিগাওরা, সাপোরো এবং হানামাকি ভ্রমণ করেন। স্বর্গ ভারতীয় শিল্পীদের বিশেষ আন্তরিকভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। জ্ঞাপনের সঙ্গীতে ভারতীয় কুশানী, গণকলী এবং শিবরঞ্জনী বাগের আভাস পাওয়া যায়। উদাহরণের প্রাচীন বসবস 'লোহ' এবং অশোকাস্থিত নতুন বসবস 'কাবুকি' বিয়েটারে সকল চুম্বিকার পুরুষেরাই অবতীর্ণ হন। অপরগকে অত্যধিক 'টাকারাজ্জ' বিয়েটারে সকল চুম্বিকার বেশ নারী-অভিনেত্রীরাই অভিনয় করেন। পাকাতোর যাদুতীর শ্রেষ্ঠ বস জ্ঞাপন অতি আকর্ষণভাবে গ্রহণ করিয়াও, গার্ডিয়া জীবনে জ্ঞাপনীরা উদাহরণের প্রাচীন ঐতিহ্য পজার রাখিয়াছেন। জ্ঞাপনে সঙ্গীতের সঠিত তুলনায় ভারতীয় সঙ্গীত হয়তো অধিকতর শিল্পযুক্ত এবং সুস্থ মনে হয়, তবে জ্ঞাপনীরা রূপের পূজারী। ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদের উদাহরণ তাই অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই সম্বর্ধন করিয়াছেন। স্বর্গভৈ ভারতীয় শিল্পীদের অসুস্থতান অকুঠ প্রবংসা অর্জন করিয়াছে।

এম্বোয়েন-কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার মি: জে. ই. জর্জ পণ্ডিত বহিঃস্থর ও সম্ভ্রদাহের জ্ঞাপন-ভ্রমণে সফলতার অস্ত বিশেষ সম্বর্ধনা জানান।



সম্বর্ধনা-পজার বহিঃস্থর, মি. কে. সেন (বেকডি-পণ্ডিতালক), মি. কে. চাট্টাচি (এম্বোয়েন-কোম্পানির সম্বর্ধনী অধিকর্তা), মি: মালেক (বেকডি-প্রতিনিধি)



খেেলার মেলা



স্থিতি

হকি :

এ-বারের মতো কোলকাতার 'হকি মনুজম' ১৯৫৮-র পাঁচ থেকে ষাণ্মাসীতি দিবার নিয়েছে। গত তিনবছরের অপরাধিত লীগ-চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান দল এ-বারও তাদের পূর্ব সুনাম অক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ মর্যাদা বহুরের মতো এ-বছরেও মোহনবাগান দল অপরাধিত অবস্থায় লীগ-বিজয়ে সক্ষম হয়েছে, এবং শুধুমাত্র লীগ-বিজয়ী হয়েই পাঁচ হরনি, উপরন্তু বাইটন-দশেও তারা নিয়েছে। এ-কঠোর যে প্রশংসনীয় সাফল্যের পরিচয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই, বরং এতে তারা অসুষ্ঠ অভিনন্দন পাবে। কিন্তু একটি কথা,—মোহনবাগান গত কয়েকবছরের মধ্যে বিশিষ্ট খেলোয়াড় বলতে তেমন কোনো খেলোয়াড়ই আনলানি করেনি এবং এ-বারে দল-বিশেষও যে এরা খুব একটা শক্তিশালী দল ছিল, তাও নয়। তা সত্ত্বেও এরা সাফল্যের পথে বিশেষ কোনো বাধারই সন্মুখীন হয়নি। একমাত্র দলগত বোকাপড়ার মাধ্যমেই কি এ-সাফল্যকে কবায়ন করা সম্ভব হয়েছে? তাই বা কি করে সম্ভব? কারণ, মোহনবাগান দলের প্রধান প্রধান খেলোয়াড়দের মধ্যে কয়েকজন তাদের খেলার বয়সের কোনো পেরোতে চলেছেন এবং কয়েকজন পূর্বযাতি অসুস্থ্যায়ী মোটেই খেলতে পারছেন না। সুতরাং এর থেকেই বোকা যায়, কোলকাতার হকি-খেলায় যান আক কোথায় গিয়ে ঠাঁড়িয়েছে। তবে এর ক্ষত স্থানীয় দলগুলির কাউকেই কোনরকম সোবারোস করা যায় না। কারণ, আমাদের দেশে দলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কয়েকটি দাত বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে লীগমত থাকে। এর ফলে কৃতী খেলোয়াড়দের খেলার পূর্ণ বিকাশ ঘটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। দৈনিক দিবে নিগুস্তা শক্তিক্তান

যবেই অগ্রগামী, এবং সেইজন্যই আক তাদের সঙ্গে ভারতীয়দের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে ব্যবধান ছিল তা কমশই কমে আসছে। কিন্তু এখনও হর্তা-কর্তারা আশঙ্কিত হওয়া পূবে থাকুক, বরং অতীত অবলম্বন করে আগামী ভবিষ্যৎকে অধিকতর সাফল্যের চোখে দেখতে শুরু করেছেন। বাই হোক, ব্যক্তিগতভাবে এ-বারে কেই-ই খুব একটা নৈশুণ্য দেখাতে পারেননি। কিন্তু এ-বারেই কৃতী খেলোয়াড়দের কাছ থেকে অধিকতর ক্রীড়ানৈশুণ্য আশা করা গিয়েছিল, কারণ এশিয়া-ক্রীড়ায় যোগদানের ক্ষত তখন ভারতীয় দল-গঠনের আয়োজন চলছিল। বাই হোক, শেল অবদি ইম্মন বাংলা থেকে চাল পেয়েছেন। একজন দেশমুখু (ইন্টবেশল) ও অপরাধন ক্রিডিয়ান (কার্ভমুস)। এর মধ্যে ক্রিডিয়ান ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। আশা করি, তিনি তাঁর নিজের সম্মান অংকশই অক্ষর রাখার চেষ্টা করবেন।

আবার লীগের আলোচনাও করে আসি। লীগে মোহনবাগানের পরেই আছে মহামেডান দল। গতবছরের বাইটন-বিজিত মহামেডান দল দুকরীম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর অবশেষে বাধ্য হয়ে হানাদ-আপ বীকার করেছে। লীগ-টেবিলের সমস্ত খেলা শেষ হয়ে যাবার পর দেখা যায়, মোহনবাগান ও মহামেডান দুজনেই সম্মান পরেই লাভ করেছে। সুতরাং চ্যাম্পিয়নশিপের ক্ষত দ্রুতি দলকে আবার খেলতে হয় এবং সেই খেলার প্রথমোক্ত দলটি ১-০ গোলে জয়লাভ করে ছ'বার অপরাধিত অবস্থায় মোট ৭ বার লীগ-চ্যাম্পিয়ন হবার পৌরব অর্জন করে। অসম্ভবক গোলাটি করেন গেরায়া শিং। মহামেডান শোটিং দলের পরের নাম যথাক্রমে কার্ভমুস ও গতবছরের বাইটন-বিজয়ী ইন্টবেশল দল। এই ব্যাডনামা দলটি এবার না-লীগে,

না-শীকে কোনো একেই বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেনি। অবশু দল হিসেবে ইস্টবেঙ্গল খুব খাৰাপ দল ছিল, এক-কথা বলা যায় না। তা সত্ত্বেও দলটি যে কেন উপযুক্ত প্রতিযোগিতা দেখাতে পারলো না, তার কারণ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

নীচে এ-বারের চূড়ান্ত লীগ-টেবিল দেওয়া হলো :

	খে:	অঃ	ডু	পঃ	সঃ	বি:	পঃ
মোহনবাগান	১৮	১৪	৪	০	৪২	৪	৩২
মঃ স্পোর্টিং	১৮	১৪	২	১	৩৪	৪	৩২
কাস্টম্‌স	১৮	১১	৬	২	৩০	১৪	২৬
ইস্টবেঙ্গল	১৮	৯	৬	৩	৩৬	৩	২৪
পঃ বঃ পুলিশ	১৮	৯	৪	৪	৩০	১৬	২২
ক্রীডার	১৮	৮	৬	৪	১৮	১১	২২
পোর্ট কমিউনার	১৮	৪	৯	৪	৯	১৪	১৯
রাজস্থান	১৮	৯	-	২	১৩	১১	১৮
কেন্দ্রবিরিয়াল	১৮	৬	৬	৬	১৪	১৩	১৮
এবিরিয়াল	১৮	৬	৪	১	১০	১১	১৮
রেনার্স	১৮	৬	৪	১	১৩	৩০	১১
পাঃ স্পোর্টস	১৮	৪	৮	৬	১২	১৪	১৬
ভবানীপুর	১৮	৪	৪	৮	৮	৩০	১৪
মেগারাথ	১৮	৪	১	১	১১	৩২	১৪
উষাজী	১৮	৪	১	১	১	১৮	১৪
পুলিশ	১৮	৩	৮	১	১৬	২১	১৪
তালডলা	১৮	৪	৪	২	৮	২৪	১৩
অরোরা	১৮	০	৪	১৩	২	২৪	৪
বি. জি. গ্রেন	১৮	১	০	১১	৩	২১	২

বাইটন কাপ

১৯৪২ সালের পর দীর্ঘ পাঁচবছর বাঘে কিংকি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর দলটিকে ১০০ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান দল আবার বাইটন-বিজয়ের পৌডাগ্য অর্জন করেছে। অবশু ১৯৪২-র বাইটনের সঙ্গে আজকের বাইটনের মহালাগে পার্থক্য ঘটেছে। ১৯৪২ সালে মোহনবাগানের যে দলগত শক্তির প্রাবল্য অজ্ঞাত দলকে চূর্ণ করে দিয়েছিলো, আজকের মোহনবাগান সে-দিনের মোহনবাগানের ছায়া নয়। অবশু এ-বারেও মোহনবাগান দল 'কি-মুহুট'-লাভের গৌরব অর্জন করেছে। ভারতের অল্পতম শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা 'বাইটন' সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা থেকে আজ এক সাধারণ স্থানীয় প্রতিযোগিতার এসে ঈড়িয়েছে। বাইরের বহু শক্তিশালী দলগুলির মধ্যে প্রায় কোনো শক্তিশালী দলই এবার

যোগদান করেনি। যে হু-একটি ওঠই মধ্যে যোগদান করেছিলো, তাদের অধিকাংশ খাতিয়ানা বেলায়াদুয়া এশিয়ান-গেমস-নির্ধাচনীর লজ্জা দলের সঙ্গে এসে পৌছননি। স্তত্রায় একে সাধারণ স্থানীয় প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কি বলবো? দেখানে প্রতিযোগিতামূলক হকি-বেলা প্রয়োজনের তুলনায় অধিক, সেখানে বাইটনের মতো এইরকম একটি বিখ্যাত প্রতিযোগিতাও যদি প্রাণহীন-ভাবে অস্বস্তিত হয়, তবে এর পরিণাম যে কত ভয়ানক, সেটা অন্ততঃ ভারতীয় হকি-কেন্দ্রাঙ্কনের কর্মকর্তাদের থেকে উচিত নয় কি? এর পরেও বাংলাদেশে ক্রমশঃ তুল আশাবারিঃ-এর যে মনুয়া দেখা যাচ্ছে তাতে করে মনে হয়, বর্তমানে বাইরের হা-ও হু-একটি দল আসছে, ভবিষ্যতে তা-ও আসবে কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এর আশু প্রতিকারের জন্য কর্মকর্তাদের অস্বপ্নেও করি। বাই হোক, কাইনালে বেলা খুব উচ্চতর না-হোলেন্ড, বোটাটুটি ভালোর পর্যায়ে বেলা যেতে পারে। তবে শেখরিনকার বেলাটি যেন বজ্জ নিশ্রাণ বলে বোধ হচ্ছিল। কাইনালে ছুটি দলের চারটি বেলায়াদু ব্যক্তিগতভাবে উচ্চতর বেলা খেয়েছিলেন। তাঁরা হলেন, মোহনবাগানের ধরমশাল ও কিংকি দলের পিটার্স, মাহুবেল ও ক্রুফুটি। এর মধ্যে ধরমশাল নিঃসন্দেহে সেদিন মার্চের দেতা বেলায়াদু ছিলেন। বিজিত দলের পিটার্স বাবুর অল্প-পছন্দিতে এশিয়ান-গেমসে যোগদানকারী ভারতীয় দলে স্থানলাভ করেছেন। বেলাটির জয়যুচক গোলটি করেন মোহনবাগান দলের সেকার-করোয়ার্ড গুজ। গোলটি হয় বিতর্কমূলক পেনাল্টি বুলির ফলে। আন্দা করি, আগামী-বারে এর কিছুটা পরিবর্তন দেখতে পাব।

নীচে মোহনবাগান ও কিংকি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর কিভাবে কাইনালে উঠেছে তাই দেওয়া হলো :

মোহনবাগান : কাশালপুরকে ৬-০ গোলে, লাল-বাগের বিজ্ঞে ওরাক-ওরার ক'রে, রাজস্থানকে ৪-৩ গোলে, মহামেডান স্পোর্টিংকে ২-১ গোলে পরাজিত করে কাইনালে ওঠে।

কিংকি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর : কাস্টমসকে ৩-১ গোলে, সেন্টাল রেলকে ৩-০, ১-০ গোলে, রেনার্সকে ৬-০ গোলে পরাজিত করে কাইনালে ওঠে।

ফুটবল :

হকি-মরমুম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রীড়ামোদীরা ফুটবলের বেলায় যেতে উঠেছেন। কিন্তু এখন থেকেই বড়

দলগুলি যে খেলা দেখাচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে কীড়াযোগীদের মেনে: কঠিনত যেনী সম্বন্ধ নেবে না। অবশ্য তার প্রধান সাহায্যকারী হচ্ছে—লীগের ওঠা—নাচা বস্ত্রের নিমিত্ত আই.এল.এ.-র নতুন আইন। বর্তমান চাকলা বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা—সব ওপরতলার সীমাবদ্ধ থাকবে। এখন ডিভিশনের মীচএল দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ—কোনো ডিভিশনের কোনো খেলাই আর কোনো আকর্ষণ থাকবে না। অবশ্য এর প্রতিপক্ষের ক্ষমতা বহু বিশিষ্ট কীড়াযোগী হোকই আবেশন করে থাকেন, কিন্তু তাতে কোনো হুমকি বসে যাবে হয় না। বই হোক, গভবাদের লীগ-ডাব্লিউন মহামোডান স্কোটিং লল এবার বেশ একই অস্থিধার পড়েছে, কারণ তাদের অস্ত্রতম পলী তরঙ্গ আবেশ হোসেন যোহনবাগানে যোগদান করেছেন এবং ওমর এলিয়ান-গেম্বে খেলার ক্ষমতা পাকিস্তানের জাতীয় বলে মনোনীত হয়েছেন। এই সফে ইটাবেল ললও হালানকে নিয়ে একই মূল্য পড়েছে। লল-গাইনে বাক্সান বরাবরেই ওয়ালা। কিন্তু সেদিকটা কহা আর এসের ভাগ্যে ঘটে ওঠে না। তবুও দেখা যাক, ব্যঙ্গহস্তনিয়ম,

একাল সিং, জার্নেল সিং প্রভৃতির দ্বারা খ্যানতমো খেলোয়াড়দের নিয়ে এরা কি করে! জনপ্রিয় যোহন-বাগান দ্রাব—আর, দুপাজী (মাজিউন), আবেশ হোসেন (মহা: স্পোর্টিং), ডেকটেন (রাজস্থান), জি. বর্ধা (উত্তর-প্রদেশ) ও রমন (রাজস্থান) কে নিয়ে লীগে ও শীর্ষে কতখানি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ডাবী খেলার ফলাফলে ওপর। অস্ত্রতম দলগুলি বহাবধ।

এলিয়ান গেম্বে :

বিশ্ব-অলিম্পিকের আদর্শ অনুপ্রাণিত এলিয়ান-গেম্বের তৃতীয় অস্থিত আঙ্গ অস্থিত হতে চলেছে। বিশ্ব-অলিম্পিকের অস্থিততা করলও, এলিয়ান দ্বিতীয় দ্বিতীয়ের তৃতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার কৃতি বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনো দেশের তুলনার কোনো আবেশ কমতি নেই। দ্বিতীয় মহামোডেন পর হুমকত জ্ঞান ক্রমশই লগদিত দিয়ে উঠতি করে চলেছে, বিশেষ করে খেলাধুলার ক্ষেত্রে। ১৯৮১ সালে মহামোডীতে প্রথম এলিয়ান-গেম্বে জ্ঞানকে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলো, তাতে কীড়াযোগীরা খুললও বিশিষ্ট ও মূহ হয়েছিলো। তুমার সাফল্যের ফলাফল নিয়েই জ্ঞান সম্বন্ধ নব, উপরন্তু আঙ্গ তাহা পরিচালনার ক্ষেত্রেও পেছিয়ে থাকতে বাছী নব। তাই এবারের এলিয়ান-গেম্বে ২৯শে মে টোকিওতেই অস্থিত হচ্ছে। এলিয়ান-গেম্বে কীড়াগোষ্ঠীর দিক দিয়ে দেখতে গেলে জ্ঞানানের পরেই ভারতের জ্ঞান। কিন্তু দ্বিতীয় এলিয়ান-গেম্বে জ্ঞানালার ১৯৮৭ সালে জ্ঞানানের কাছে তো বটেই, উপরন্তু পাকিস্তানের কাছেও ভারত প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রান হয়ে দিয়েছিলো। আখালগুদ-এ ৪টি বর্ষ-পদক ও সাত্যে ১টি স্বার ব্রো-পদক নিয়েই সেবার ভারতকে সম্বন্ধ থাকতে হয়েছিলো। সে জ্ঞানালার ১৯৮১-র ফলাফলে ভারত পেয়েছিলো ১৪টি বর্ষ-পদক। বই হোক, এবারের নির্বাচন দেখে, জ্ঞানালার সেই ফলাফল ফলাফলের যে আর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ, ইতিহাসে ভারতের প্রের্ষ সম্বন্ধ কোনো দ্বিতীয় থাকতে পারে না। তবুও সঙ্গ-নিউক্লিয়াও-কেহত পাকিস্তান এখনও সাফল্যের আলোয় তলমলিয়ে আছে—তাই তাহা যে এবার ভারতের বিরুদ্ধে তীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ফুটবলেও ভারত চীন ও ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে প্রশংসনীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলেই মনে হয়। এবারের ভারতীয় ফুটবলের

ডিসপোজাল ও নতুন দ্রব্যাদি

স্ত্রাও শেপার, ওয়েব এক্সেট ও পাউচ, পশরী ও হুতীর কীচেস, লোগার ট্রে, বোড়ার চড়ার উপযোগী সরঞ্জাম, বাই সাইকেলের রকমারি অংশ (একসেসরী), ছোট খাট, ড্রইংরুমের চেয়ার-টেবিল, তাঁবু, টারপলিন ইত্যাদি।

আর্থি সারথাস ফোর্স

১/১, গ্যালিক ট্রাট, কলিকাতা ৩

টেলিফোন : ৫৫-৫৫৮৮



১৯৪৮ বাংলার প্রথম বিভাগের 'ক্যালকাটা হকি-সীপ'-বিজয়ী বোম্বেয়ানরা

নেতৃত্বের ভার পড়েছে হাফসারাবাদের আজিজের ওপর, কেবা বাক, তিনি কতটা সাফল্যের ভাষে বইতে পারেন। ভলি-বলেও ভারত এশিয়ার বাদ অল্পবয়সী খুব দেখিয়ে নেই। সে-বিষয়ে অতীতের ফলাফলই সাক্ষ্য দেবে। স্বতন্ত্রা-এ-বিষয়ে কাপানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও কয়েক উঠবে। তবে এর থেকেও বহিঃ-এ ভারতের আরও বেশী চাপ। ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বাংলাদেশ, হরি সিং ও মুকর রাও। কিছুদিন আগেই আমরা ত্রয়ে অঙ্গীকৃত 'লক্ষি-পূর্ব এশিয়া ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা'র এদের কৃতিত্বের পরিচয় পেয়েছি। তবে এমিক দিয়ে আরও দু-একসময়ে পাঠ্যের উচিত ছিল। অ্যাথলেটিক্স-এবার ভারতের শক্তি অস্ত্রার ব্যতীর থেকে অনেকাংশে সলল। এবার কয়েকটি বিভাগ সম্বন্ধে আমরা একেবারে নিশ্চিত থাকতে পারি। অবশ্য, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলাও কিছু যায় না। কিন্তু তাহলেও ৪০০ ও ২০০-মিটারে বিলবা সিং, ম্যারথনে গুলজারা সিং, হাই-জাম্পে অজিত সিং, ৮০০-মিটারে মোহন সিং, ডিস্কাস ও শটপাট-নিক্ষেপে পরমুহন সিং ও মহিলা বর্ক-নিক্ষেপকাহিনী এদিকাবেশ ডেভেনপোর্ট আমদের প্রধান ভরসা। এর পরেই হাতা ক্রিকেটের ট্রায়া হলেন—মারিয়া রায় দমহাজার মিটার পৌড়ে, মহিলা সিং হপ-স্টেপ অ্যাণ্ড জাম্প। ও ছাড়া ৪০০-মিটার রিলে-রেসেও ভারতের কল্যাণ কতকটা হুমকিত। বাই হোক, এই কথা বলেই শেষ করি—বে খেলাধুলার মাধ্যমে গড়ে ওঠে শ্রীতি ও বুদ্ধি, সেই খেলাধুলার মাধ্যমেই যেন সবত দেশের আত্মত্তরী হঃপ্রমিতিক গোলাধোগ হুং হুং ফিরে আসে পাতি।

এর পর ভারতের পক্ষে ব্যাং বে-বিভাগে নির্বাচিত হয়েছেন সেই অল্পমরে তাঁদের নাম দেওয়া হোলো:

২. হকি।

গোলরক্ক—সি. সেনগুপ্ত (বাংলা) এবং এম. লক্ষণ (সার্ভিসেস); ফুল-ব্যাং—মহম্মদ ইয়াসূব (বেলগেয়েজ), বকসি সিং (পাঞ্জাব), বালকিষং সিং (বেলগেয়েজ) এবং গুর্জতিং সিং (পাঞ্জাব); হাক্ক-ব্যাং—এম. ডবলিউ. ক্রিচান (বাংলা), খরমিকার পাল রত্ন (উত্তরপ্রদেশ), গুগলেশং সিং (পাতিয়ালা) এবং অগজিং সিং (উত্তর-প্রদেশ); ক্যোয়ার্ড—এ. ডবলিউ. কালেব (উত্তর-প্রদেশ), পিটার্স (সার্ভিসেস), গুরুদেব সিং (পাঞ্জাব), বলবীর সিং (সিনিয়র) [পাঞ্জাব], বলবীর সিং (জুনিয়র) [বেলগেয়েজ], উদয় সিং (পাঞ্জাব) এবং এন. আর. চবন (বোম্বাই)।

৩. ফুটবল।

গোলরক্ক—আর. বন্ধুজি (সেনাবল) ও এম. নারায়ণ (বোম্বাই); ফুল-ব্যাং—আজিজুদ্দিন (হাফসারাবাদ), লতিফ (বোম্বাই) ও সালাব (বাংলা); হাক্ক-ব্যাং—কেমসিয়া (বাংলা), বীর বাহাদুর (বাংলা), আমেদ হোসেন (বাংলা), নূরমহম্মদ (হাফসারাবাদ) ও নিখিল নন্দী (বাংলা); ক্যোয়ার্ড—প্রবীণ ব্যানার্জী (বাংলা), চুনী গোস্বামী (বাংলা), কানন (হাফসারাবাদ), সামোদরন (বাংলা), রহমতুল্লা (বাংলা), বলরায় (বাংলা) ও পবিত্র (বোম্বাই)।

ইহা ব্যতীত শ্রী টি. সোম (বাংলা) ও শ্রী এন. মহাপাত্র (উড়িষা) যথাক্রমে দলের কোচ ও ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

৪. অ্যাথলেটিক্স।

পুরুষ

নিম্নে নির্বাচিত অ্যাথলিটদের নাম দেওয়া হোলো:

ড্রিট, এন. উসমানী (উত্তরপ্রদেশ) ও অগদেব সিং (পাঞ্জাব) ৪০০-মিটারে দৌড়-দৌড়।

পরমুহন সিং (সার্ভিসেস)—শটপাট ও ডিস্কাস;

কেশব সিং (পাঞ্জাব)—শটপাট।

অজিত সিং (পাঞ্জাব) ও অরজিং সিং (পাঞ্জাব)—হাই-জাম্প।

বিলবা সিং (সার্ভিসেস)—২০০-মিটার, ৪০০-মিটার ও ৪×৪০০-মিটার রিলে।

মহিম্বক সিং (সার্ভিসেস)—হপ-স্টেপ অ্যাণ্ড জাম্প এবং ব্রড-জাম্প।

সোহন সিং (সার্ভিসেস) ও বাবু সিং (পাঞ্জাব)—৮০০-মিটার।

পান সিং (সার্ভিসেস)—৩,০০০-মিটার স্টিনপুচে।

মারিয়া রায় ও মৃতিহার সিং—১০,০০০-মিটার দৌড়।

দলজিং সিং, এ. সিলভেরা ও মে. বি. যোসেফ—৪×৪০০-মিটার রিলে (পুরুষ)।

বলকার সিং—ডিস্কাস।

গুলজারা সিং—ম্যারথন দৌড়।

রায়বেহের—ব্রড-জাম্প।

সি. এম. মুখিয়া—ডেকাবলন।

মহিলা

ই. জে. ডেভেনপোর্ট, স্টিকি ডি'ব্রকা, মেট্রী ব্রাউন, মেট্রী গীলা রায়, ডাওলেট পিটার্স।

আজ রবিবার মাথা ঘসতে ভুলাবেন না

মন সাফল্য অর্জ্যমানচিত মুকুর বেশের অধিকারিণী হতে কে না চায়? কিন্তু পর জিনিয়ের যত
এর শিষ্টানুও দরকার সম্ভব নয়। সন্ধ্যাবে এদিকনি ভাঙো করে মাথা ঘসা কর্তার অগোজ্ঞ দায়িত্ব

আপনার চুল ভালো রাখতে হলে দু'লো, মলো বা খুস্কী যাতে করতে না পারে সেদিকে
সতর্ক নীতি মাথা সর্গাতে দরকার। মাথা ত্যার পর চুল ঘবন তরিয়ে থাকে তখন ক্ষতঃ

দশমিনিট ধরে জ্বালাতন করেন। জ্বালাতনের ফলর গন্ধ

তম্ আপনার মনে সংগা একটা। যখনক অমুচুড়িত জগিত্যে রাখবেন।

সেই সঙ্গে সংসারের মানা কমেয়ার যথো আপনার মনের শুদ্ধতা অমু রাখলে।

জ্বাক্স



সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লি:

জ্বালাতন হাউস, ৩৯, চিত্রবন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

১১১, আর্দেবন ট্রাট, মাদ্রাস-১





শেষ পাত



ফুল কুটে ওঠে আর কাটা উঠেই ফোটে ।

‘কতকগুলি বেয়ে স্বভাবতই সদয় প্রকৃতির ;
আর কতকগুলি তা নয় । তারা শুধুই হুমকী ।’
প্রকৃতিই তাদের প্রতি সদয় ।

নার্সদের এক গানের জলসায় গেছলাম । হায়,
হৃঃপের সহিত বলতে হয়, সব নার্স-ই নাইটিংগেল
নয় !

কুনাদুনের এক মানুষ-সেঁকো বাঘ একটি
রেডিয়ে-গার্ডকে বাগে পেয়েও ছেড়ে দিয়ে চলে
গিয়েছে বলে জানা গেল ।



রেডি (ও)-উইটের জন্তেই বেঁচে গেছে বেয়েটি ।
বাঘটিকে সে গান শোনাতে চেয়েছিল ।

জৈনক পত্রদাতা :

‘পশুরামের সঙ্গে আপনার লেখার তুলনা-
বিচারে...’

পরশুরামের সঙ্গে আমার কোনো তুলনাই হতে
পারে না । তিনি সর্বকালের জ্যোতিষ্ক আর আমি
এই মুহূর্তের উৎস । আমি শুধুই আত্ম-রাম,
তিনি কাল-রাম তো বটেই, পরশুরামও ।

একজননের প্রশ্ন :

‘কবিতা আবার ছন্দ ছাড়া হতে পারে নাকি ?’
জীবনের মতো কবিতাও ছন্দছাড়া হতে পারে ।
জীবনেরই তো প্রতিচ্ছবি তা ?

হালের এই মিলিটারী আমলে পাকিস্তানে
কারণ সোনাধান নিরাপদ নয় । এমন কি, বাঘের
গাত সোনা-বাঁধানো, তাঁরা ভয়ে নাকি ভালো করে
হাসতেও পারছেন না ।

কমিউনিস্ট পার্টির এক বইয়ের দোকান থেকে
পাঁচহাজার টাকার বইপত্র লুট হয়েছে বলে খবর ।
এমনি করেই তো কমিউনিজম ছড়ায় !

‘মেয়েরা হাসি দিয়েই কাজ হাসিল করে ।’
‘আহ, কান না দিয়েই অনেক কথা শোনায় ।’

‘ঘরে বলে টাকা কড়ন ।’ —বিজ্ঞাপন ।

করা যায় মশাই, জানি । কিন্তু তা চালাতে
গেলেই ক্যাসাদ ।

ডাক্তারদের কি করে গীয়ে গীয়ে পাঠানো যায়,
ভারতের স্বাধীনতার কাছে সেই এক সমস্তা।



নার্সদের আগে পাঠান, মশাই! তাহলেই
গ্রামগুলি আগের চেয়ে চের সুগম হবে।

বিছে নেড়েদের কোনরে থাকে, জানাচ্ছেন
জৈনক অলঙ্কারতাত্ত্বিক।

বিছে আবার কানড়ে থাকে। কিন্তু কোথেকে
এসে কানড়ায় তা জানা গেল এখন।

মহম্মদ দারাসের মতে বনিজ সম্পদের অভাবই
পাকিস্তানের এই অর্থনৈতিক দুর্গতির জন্তে দায়ী।

‘বড়ই হুঃসংবাহ দারা(স্)!’

একছনের চিঠি :

‘জৈনক শব্দতাত্ত্বিক বিশেষ গবেষণা করে
জানিয়েছেন যে, “ব্যপদেশ” কথাটির মানে হচ্ছে
“ছল”, কিন্তু তিনি তার কোনো উদাহরণ দেননি।’

উদাহরণ চান? যথা, বাংলাদেশ।

‘আরে বান, তেঁতুলে বান।’ — প্রবাস
কাঁঠালে আঠা, তেঁতুলপিড়িতে আটা।

—অপবাস

‘মহাকাল কারও কথায় কান দেয়না।’
মহা কাল কিনা? সেইজন্তেই।

সম্প্রতি এক মজুরীর সঙ্গে এক মিল-মালিকের
বিবাহের খবর পাওয়া গেল।

এই মিলন উৎপাদন-বৃদ্ধির সহায়ক হবে আশা
করা যায়।

একটি জিজ্ঞাসা :

‘বলতে পারেন, বাবার হাসের দল কোথেকে
আসে আর কোথায় যায়?’



কারও পেটে যায় কিনা তা বলতে পারি না
তবে কোথেকে আসে জানি।...ভিমের থেকে।

দেশীয় নৃপতিরা, ভূমৈক ঐতিহাসিকের মতে,
কুমতার নেশায় বৃন্দ হয়ে ছিলেন। ক্রমে আরো
বাড়তে গিয়ে শেষটায়—

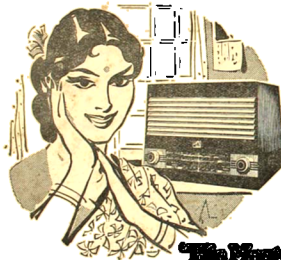
বৃন্দ হয়ে গেলেন ?

চ্যাংকাট্টের কমিউনিস্ট-ভীমকে বধনই স্বীকার
করেন না। একেবারে শিকার করতে চান।

‘পূনিরাম বোস থেকে সুভাষচন্দ্র বোস—ভারতের
স্বাধীনতা-সংগ্রামের সম্পূর্ণ এক অধ্যায়।’ (উদ্ধৃতি)
বোস-বোসেই ভারত পাড়তে শিখলো !

‘অনেক লেখক আছেন বীরা গড়ে, এমনকি
পাড়েও বেশ ভারি কিছু লিখে থাকেন। তাঁদের
লেখা হচ্ছে ধ্রুপদী।’ (উদ্ধৃতি)

অনেকের আবার লেখাটাই খোঁজ।



A Proud Possession

এই রেডিওতে যে সকল জন দ্বারা ব্যবহার,
যেমন—বিভিন্নমাত্রা, বৃহৎ কাঠামো এবং
মনোহর গায়ন। এ সবই “হিট, হার্টস”
হলে, রেডিওতে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়।

মডেল ৫২৬৬—এ. সি.
অবঃ সি. সি. যেনই হয়, এ-জালত,
৩-৪০০০ হার্ট, বৃহৎ কাঠামো
হলে, ১-১/২” লাইট স্ট্রীকিং ও কন্ট্রোল
আধুনিক কার্ভিং বৃত্ত।

মূল্য ৩৭৫/- মাত্র।

এ. সি. ও হার্ট হার্টস রেডিওতে পাওয়া যায়।

The Hi-Fi Sound

OVER 50 YEARS SOUND EXPERIENCE IN INDIA

BUY FROM AUTHORIZED H.M.V. RADIO DEALERS ONLY



The Hi-Fi Sound

RAJAH S.C.A.

সম্পাদক—প্রিয়ান্বিতা ভট্টাচার্য

কে. সি. বহু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১, মহেশ সোমসী লেন, বলিকাতা ৬ হইতে প্রিন্টিং-মাস্টার রাব কল্লু মুখি
এবং সংকলক ৪২, কমলাকান্ট্রি স্ট্রীট, বলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত

বঙ্গুধারা

দ্বিতীয় বর্ষ • প্রথম অংশ • তৃতীয় সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩৬৫

• সূচীপত্র •

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাম্প্রতিক বাংলা নাটক (প্রবন্ধ)—আবুতোব ভট্টাচার্য	২৩০
জীবনবাণী (কবিতা)—দিলীপকুমার রায়	২৩২
তবীহ জীবনালেখ্য (জীবন-কাহিনী)—চাকর ভট্টাচার্য	২৩৭
ত্রিকণার গান (উপগ্রহ)—বিক্রিতকৃত্তবর্ণ মৃণোপাধ্যায়	২৪৪
বর্ণাভিমান (প্রবন্ধ)—দিলীপকুমার রায়	২৪৬
স্বাধাতি শিবিয় (সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী)—মিথিলরতন রায়	২৪৭
অনকল্যাণে পরমাৎ-পক্তি (প্রবন্ধ)—চিত্তরতন দাশগুপ্ত	২৪৯
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের একটি দিক (প্রবন্ধ)—মল্লিকা মল্লিক	২৫০
শরীর বারনাভা (প্রবন্ধ)—তৃদলীলাল সিংহ	২৫৬
কঃশিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (সচিত্র প্রবন্ধ)—শ্রীবিধর দত্ত	২৬০
মনোহর ও প্রেমভাষা (উপগ্রহ)—মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	২৭৮
স্বাধীন-স্বাধীন্য (ঐতিহাসিক গল্প)—শিবানী ঘোষ	২৮৭
নারী-স্বাধীন্য শিবনাথ শাস্ত্রী (জীবনালেখ্য)—অবন্তী দেবী	২৯৭
হিট-কোটা : অঃবঃ বেলা—চাকর ভট্টাচার্য	২৯৯
ছোট প্রাণিক (গল্প)—কালীন্দ্র ভট্টাচার্য	৩০৩
লোহা-উপভাস্তির পুষা-পদম ও লোকসংগীত (সচিত্র প্রবন্ধ)—প্রবোধকুমার ভৌমিক	৩০৮
অগস্ত্যের রথ (সচিত্র প্রবন্ধ)—মনীষাশাল গোস্বামী	৩১৬
হুই 'বিভ্রলান' (প্রবন্ধ)—শ্রীঃরমা ভট্টাচার্য	৩১৭
"আছে গরু, না বয় হাল" (প্রবন্ধ)—কালীচরণ ঘোষ	৩১৯
ওগারিন (গল্প)—বাহুবল্লভ মাইতি	৩২১
মনে পড়ে : তবী (পুরোনো কথা)—বিমলাচরণ ঘোষ	৩২৩
প্যাণ্ডীচাঁদ বিষয় : বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যে (সচিত্র প্রবন্ধ)—বিশ্বেন্দ্রলাল দত্ত	৩২৬
পশ্চিমবঙ্গ-পত্রিকা : হংগলি—মনোজিৎ বসু	৩৩০
অন্তরু কই :	
বাউল ধর্ম ও বাউল সাহিত্য ('বাউল বাউল ও বাউল গান'-প্রবন্ধ-বিশেষক সমালোচনা)—নীহাররতন	৩৩৭
রায় ; পুস্তক-সমালোচনা : পুস্তকোত্তম বরীকুমার—দুর্ভাষা মাইতি ;	
বিবাহিত প্রেম—শ্রীমতী বাণী দেবী ; তৃকা—শ্রীবিধর দত্ত	
সক-পার্থী : চিত্রলোক (সচিত্র)—পদ্মনাভ	
বেলায় মেলা—সুধিষ্ণি	
শেষ পাতা (সচিত্র রচনা)—শিবরাম চক্রবর্তী নিষিদ্ধ ও রেবতীকৃত্তবর্ণ চিত্রিত	
। বি নির্দল এবং রতন দাশগুপ্ত কর্তৃক সূত্রিত আলোকচিত্র ।	
• প্রচ্ছদ-শিল্পী : অমিত গুপ্ত •	

‘বন্ধুধারা’র নিয়মাবলী

প্রাথমিকদের সম্পর্কে

বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৫ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে স্থানীয় লাইন ডাকঘরের উত্তরসহ আমাদের জানাইতে হইবে। নং৫২ উক্ত সংখ্যা বিনামূল্যে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। গ্রিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে বাংলা মাসের ২৫শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে। চিঠিপত্রে এবং মনি-অর্ডার-রূপে গ্রাহক-নথের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১ টাকা। গ্রাহক হইলে চাহার হার—বার্ষিক (সত্ৰক) ১২ টাকা এবং বাৎসরিক (সত্ৰক) ৯ টাকা। ডিঃ পিঃ বোগে পত্রিকার গ্রাহক হইলে গ্রাহকদেরই ডিঃ পিঃ খরচ বহন করিতে হয়। মনি-অর্ডার বোগে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হইলে এট অতিরিক্ত খরচ আর দিতে হয় না। ভারতের বাইরে পত্রিকার চাহার হার পরবোগে জাকবা।

রচনাকার সম্পর্কে

রচনার নকল রাধিচা কাগজের একপৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরের রচনা পাঠাইতে হইবে। উহা হাতাইবার দাখিল অন্তরা গ্রহণ করি না। রচনার সঙ্গে উপযুক্ত ডাকমাণ্ডল না থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না। ইহার সহিত লেখকের নাম ও গ্রিকানা থাকা আবশ্যক, নচেৎ রচনা গ্রাহ হইবে না।

পত্রিকার দেহা প্রকাশ করা বা না-করা সম্পাদকের বিবেচনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

বার্ষিক চিঠিপত্র এবং টাকা-পয়সা নিয়মিত গ্রিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কর্মকর্তার ও অফিস-উদ্দেশ্যের সম্পর্কে

কমপক্ষে ১০ কপি করিয়া পত্রিকা লইতে হইবে। অবিলম্বে সংখ্যা ফেরত লওয়া হয় না।

এক্সপ্লিকিট-কমিশন : প্রতি সংখ্যার চার আনা অর্থাৎ ২৫ নয়া পয়সা (সত্ৰকরা ২৫ টাকা হিসাবনে)।

এক্সপ্লিকিট সম্পর্কে বিধি নিয়মাবলীর দ্রষ্ট পত্র লিখিতে হইবে।

কার্য্যালয়—বন্ধুধারা, ৪২, বর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

আমিন, ১৯৬৪ মাসের ‘বন্ধুধারা’র প্রকাশিত

মহাস্বাস্থ্যতা ভট্টাচার্য

‘সমুদ্র-কী তীর’

বর্ধিত আকারে আগামী জাৰণ মাসে পুস্তকাকারে বাহির হইতেছে।

বন্ধুধারা প্রকাশনী

৪২, বর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। ফোন : ৩৪-১১০০

ভূদেব চৌধুরী
বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ৮-৫.
(১ম পর্যায়)

ভূদেব চৌধুরী
বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ৮-৫.
(২য় পর্যায়)

অধ্যাপক সোমেন বসু
বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী ৩

অধ্যাপক বীরেন্দ্র ঠাকুর
বাংলা উচ্চারণ-কোষ ৩

অধ্যাপক বীরেন্দ্র ঠাকুর
জগদানন্দের পদাবলী ২-৫.

ডাঃ শশধর দত্ত
পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস ৩-৫.

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী ৩

তারাকরণ সিকদার
ভদ্রার্জুন (নাটক) ২১

সেন ও দাস
অর্থশাস্ত্র পরিচয় ২

(২য় সংস্করণ)

BOOKLAND PRIVATE LTD.

1, SANKAR GHOSH LANE, CALCUTTA 6

BRANCHES : ALLAHABAD & PATNA



অর্শপিলিন

অর্শের আশ্রয় ঔষধ

দেখা গিয়াছে যেসব ক্ষেত্রে কোন ঔষধেই স্থায়ী উপকার হয় নাট, তখন অর্শপিলিন ট্যাবলেট (সেবনের গুচ্ছ) ও অর্শপিলিন মলম (বাহ্য প্রয়োগের গুচ্ছ) একত্রে ব্যবহারে বহু রোগী আরোগ্য হইয়াছেন। ট্যাবলেট ও মলম একত্রে বা স্বতন্ত্র পাওয়া যায়।

রিউমেস্ক

বাত ব্যাধির

নির্ভরযোগ্য ঔষধ

নানারূপ মালিস ইত্যাদির দ্বারা বাত গুটীল আকার ধারণ করে। রিউমেস্ক ট্যাবলেট সেবনে বাত যে প্রকারেরই হউক অল্প দিনেই মূল হইতে আরোগ্য করে। সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ঔষধ।

ডিসেন্টোন

অমানুষ রোগে

অস্ত্রের সমস্ত আন ও ক্রন্দ পহিত্যার করিয়া, সমস্ত বীজাণু ধ্বংস করিয়া, অল্পকাল মধ্যে করিতে ডিসেন্টোনে মাত্র দুই দিনই সময় লাগে।

পেনল

তীব্র বেদনায়

ভীবনসংশয়রূপ বেদনায় আত উপশম এই ঔষধের বৈশিষ্ট্য। ইহা মাথা ধরার ঔষধ নহে।

টাণ্ডামেনম

সকল প্রকার চর্মরোগে

বহু দুল্যাবান ও পরীক্ষিত ভেবজ অস্রিষ্ট হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত এই মলম ক্ষতস্থান শীতল করে। ঘা, কার্কসুল, একজিনা ইত্যাদিতে ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মলম।

উপরের সমস্ত ঔষধগুলি বায়োকেমিক প্রণালীতে প্রস্তুত।

চলিত্যার স্টকিস্ট :—বি. কে. পাল এণ্ড কোং—২২ ফিল্ড স্ট্রিট

দি ইস্ট এণ্ড মেডিক্যাল হল—শিলালঙ্গ বটবাজার সংলগ্ন

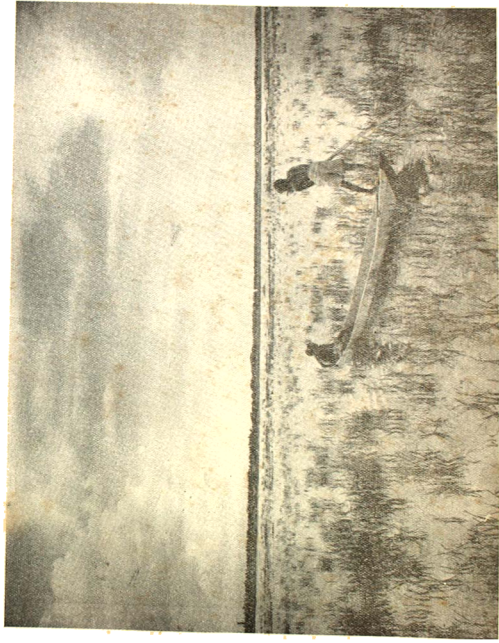
দি পপুলার ড্রাগ হাউস—দামবাজার পাশে

—কলিকাতার সমস্ত ডাক্তারখানায় পাইবেন—

দি পোটেনসিয়াল থেরাপিউটিক কোং

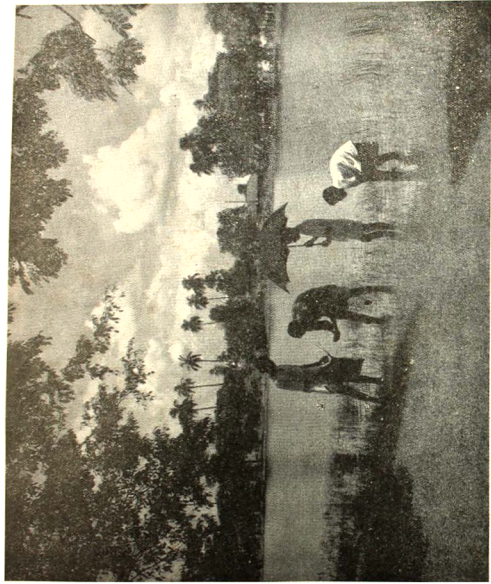
২১৭-সি, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন

কলিকাতা-৬



৩য় ফল আর ফল

[কটো : বি নিম্ন]



दाहि-धरा।

[फोटो : इन्दिरा गणेश]



২৯ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় স

আশ্বিন, ১৩৬৫

সাম্প্রতিক বাংলা নাটক

অধ্যাপক ঐমাক্তোভ তট্টাচার্য

আধুনিক বাংলা নাটক-রচনার প্রথম যুগে ইহা'র মধ্যে যে কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তব জীবন-বোধের বিকাশ দেখা গিয়াছিল, তাহা ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ধরিতা যদি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিতে পারিত, তবে বাংলা নাট্য-সাহিত্যে অংক বস্তুর পরিচয় লাভ করিত। ইহা'র প্রথম যুগ অবসান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতায় যে সাধারণ রসিকের প্রতিষ্ঠা হইল, তাহাই তখন হইতে বাংলা নাটক-রচনা নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল। তাহার ফলেই বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয় যেমন স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করিতেছিল, বাংলা নাটকের পক্ষে তাহা সম্ভব হইল না। ব্যবসায়ী রসিকগণ বাংলা নাটক-রচনা নিয়ন্ত্রিত করিবার ফলে ইহা'র মধ্যে অস্বাভাবিকতার মধ্যেই বৈচিত্র্যের অভাব দেখা দিল। সে-যুগে পুরাণ, নানা রোমান্টিক কাহিনী এবং ঐতিহাসিক ইহা'র ভিত্তি হইল, বাস্তবের প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব জীবনের কোনও পরিচয় তাহা'র মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিল না। একথা সত্য, বাংলা নাটক-রচনা'র মধ্যযুগে সামাজিক নাটকও রচিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটিই আদর্শমূলক ছিল, বাস্তব সত্যমূলক ছিল না। বিশেষতঃ বাহ্যিক পৌরাণিক, রোমান্টিক ও ঐতিহাসিক নাটক-রচনা'র মধ্যে মধ্যে প্রাথমিক সামাজিক নাটক রচনা করিতেন, তাহা'র সামাজিক নাটক-রচনা'র পৌরাণিক, রোমান্টিক এবং ঐতিহাসিক নাটক-রচনা'র সংস্কার ও আকর্ষণ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। তাহার ফলে তাহা'র সামাজিক নাটক বাংলা'র

সমাজ-জীবনের বাস্তব পরিচয় প্রকাশ করিতে পারিত না। বাংলা'র প্রথম যুগেই উচ্চাঙ্গের নাটক রচিত হইতে পারে নাই, ইহা'র প্রধান কারণই এই যে, বাংলা কণ্ঠ-সাহিত্যে অর্থাৎ উপস্থাপন এবং ছোট গল্প যে বাস্তব-জীবন-রূপ, বাংলা নাটক তেমন নহে। বাংলা সাহিত্যে যখন প্রবীজনাগের ছোট গল্পগুলির ভিতর দিয়া বাস্তব জীবনের এক অল্প বিশ-পরিচয় অভিযুক্তি লাভ করিতেছিল, সেই সময় বাংলা নাটক-রচনা'র স্বপ্নবিলাসিতা'র যুগ চলিতেছিল—অস্বাভাবিকতার আধিপত্যে পার্থক্য নাটক-রচনা'র অন্তর্ভুক্ত করিতেছিল। এমন কি, যে প্রবীজনাগ তাহা'র ছোট গল্প এবং উপস্থাপন রচনা'র ভিতর দিয়া বাস্তব জীবন-বোধের এমন পার্থক্য রূপায়ণ দেখাইতে পারিলেন, তিনিও নাটক-রচনা'র ভিতর দিয়া তাহা'র সেই ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারিলেন না। যদিও প্রবীজনাগের সঙ্গে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের দ্বারা কোনও বেগ নাই, তথাপি তাহা'র নাটকও তাহা'র বিশিষ্ট কবিধর্মের অধীন হইয়া পড়িয়া প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবন হইতে দূরবর্তী হইয়া পড়িল। ইত্যং দেখা যাইতেছে, যে বাস্তব জীবন-বোধ সাহিত্যের প্রত্যেক বিষয়েই ভিত্তি, পার্থক্য ধরিয়া বাংলা'র নাটক তাহা'র সঙ্গে কোনও বেগ স্থাপন করিতে পারে নাই। উল্লিখিত পতাকীর বাংলা নাটক প্রধানতঃ সমাজ-সংস্কারের দাবি'র প্রকাশ করিয়া তাহা'র বাস্তব জীবন-বোধ-প্রত্যক্ষের বাস্তব হইয়াছিল, বিশেষ পতাকীর প্রথম দশকের বাংলা নাটক বাংলা'র বদেহী অংকোদ্ভবের সুশ্রুত-বস্ত্র হইয়া

ইতিহাসিদ্ধি, তাৎপর্য ভাষ্য-বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত তাহা ঐতিহাসিক বোঝাফের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বাকী প্রচার করিয়াছিল। কিন্তু বিভাগের পরে (post-partition) মুগ্ধ ইহার এই সকল প্রেরণা অক্ষত পুত্র হইয়া বহুবার কলে ইহার মধ্যে নূতন বিষয়-বস্তু অঙ্গুল্যমানের প্রকৃতি দেখা দিয়াছে। এই সকল নূতন বিষয়-বস্তুর মধ্যে এখনকাল পর্যন্ত বাংলা নাটকে ব্যবহৃত কোন উপকরণ যে থাকিতে পারে না, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। এই সকল নূতন বিষয়-বস্তু কি, কি ভাবে ইহারের ব্যবহার করিতে পারিলে বাংলা নাটকের স্বার্থ পুষিলাভ হইতে পারে, তাহাই এখনে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

বাংলা কথ্য-সাহিত্যের প্ৰত্যেক ছইতেই দেখা যায় যে, বাঙ্গালীর সুনিবিড় পারিবারিক জীবনের ভিত্তির উপর বাহ্যি রচিত হইয়াছে, তাহার সর্বকথা লাভ করিয়াছে। পাক্কা ভাষিত মতো বাঙ্গালী পুরুষের বহিদুর্দী জীবন বলিতে কিছু নাই বলিলেই চলে। বাঙ্গালীর যে জীবন একান্ত পরিবার-কেন্দ্রিক তাহার মধ্যেই বাংলা বস্তুযৌ সাহিত্যের স্বার্থ রস এবং মানুষের বিকাশ দেখা যায়। স্বতন্ত্রভাবে চোটে গল্প এবং পরজন্মের সামাজিক উপভাস-জনিত তাহার প্রকার। বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের মধ্যে নারীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সেইজন্য বাংলার সার্বিক সামাজিক উপভাস হাতে স্ত্রী-চরিত্র-প্রধান। পরজন্মের মধ্যে যে স্ত্রী-চরিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, ইহার অর্থ যদি এই হয়, যে, পুঁতিনি স্ত্রীভাষি সম্পর্কে বিশেষ দ্রব প্রকাশ করিয়াছেন, তবে সাহিত্য হিসাবে পরজন্মের উপভাসের কোন দোষ নাই। কিন্তু পরজন্ম-সাহিত্য যে অদ্ব্য তাহা সবলই বীক্যর কবিতেন। সুতরাং ইহার কারণ এই যে পরজন্ম ইহার উপভাসে বাঙ্গালী নারীর বর্ণনা ছানট নির্দেশ করিতে পারিয়াছেন। বাংলার কথ্য-সাহিত্য যেমন স্ত্রী-চরিত্র-প্রধান, বাংলা নাটকও যদি বর্ণনাই বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন-চিত্র সার্বিকভাবে ছায়ায়িত করিবার প্রয়াস পাইত, তবে তাহাতে স্ত্রী-চরিত্রকে প্রাধান্য দিতে হইত। পরজন্মের উপভাসে নারায়ণী ও বিপ্লবী যেমন বাহ-স্বাদকে নিশ্চিত করিয়া বিরা নিজেদের ব্যক্তিগত ভাষার হইয়া বোঝা করিতেছে, বাংলার কোনও নাটকে এই প্রকার স্ত্রী-চরিত্র প্রাধান্য লাভ করিতে দেখা যায় না। উনবিংশ শতাব্দী হইতেই নাটক সম্পর্কে আশাবের একটি সত্যের বহুল হইয়া দিয়াছে যে—নাটক হইলেই হু, বচন, হু-সাহসিক বর্ন, আকস্মিক দুর্ঘটনা

ইত্যাদি ইহাতে স্থান পাইতে হইবে। অথচ স্ত্রী-চরিত্র-প্রধান বাঙ্গালীর পারিবারিক কিংবা সামাজিক জীবনে এই সকল ঘটনার স্থান নিতান্ত সীমাবদ্ধ। সেইজন্য এখানে বাংলা নাটকের মধ্যে বাঙ্গালীর জীবন যেমন পূর্ণাঙ্গ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই, তেমনই ইহার বস্তুযৌতাও বন্ধা পায় নাই। বলা বাহুল্য, অধুনিক বাংলা কথ্য-সাহিত্যের মধ্যে এই সকল অব্যবহ পথিকল্পনা স্থান পায় নাই বলিয়াই ইহার মধ্যেই সাহিত্য-কবির সর্বাধিক সার্থকতা দেখা দিয়াছে।

প্রথমদিকের অনেকট রচনা বাদ দিলে, বাহীনতা-লাভের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটক বাঙ্গালী-জীবনের সঙ্গে কোনপ্রকার যোগ বন্ধা না করিয়াই রচিত হইয়া আসিয়াছে। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, রসমন্দের মধ্যে ইহা সাময়িকভাবে যে উত্তমমানই সৃষ্টি করত না কেন, ইহা যাহা বাংলা নাট্য-সাহিত্যের পরিপূর্তি হয় নাই। কিন্তু বাহীনতা-লাভের পর অর্থাৎ বিভাগোত্তর মুগ্ধই এই অবস্থার অক্ষত পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। এই মুগ্ধ পৌরাণিক কিংবা অব্যবহ কল্পনাপ্রসী বোঝাটিক নাটক একেবারেই মৃত হইয়া গিয়াছে। অথচ বিদগত শতাব্দীর শেষভাগে পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকই বাঙ্গালী সর্বকথের নিষ্ঠ সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। সর্বপ্রথম যখনই আন্দোলনের মুগ্ধই এই ধারাটি ব্যাহত হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা কোনমতে আরও কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। একদিন পৌরাণিক নাটক-রচনার ভিতর দিয়াই বাংলার একজন সর্বাঙ্গেকা জনপ্রিয় নাট্যকারের প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল, কিন্তু যখনই আন্দোলনের সময় হইতেই বাঙ্গালী যে এক প্রত্যক সাগ্রহের সন্ধান হইল, তাহার ফলেই তাহার মন হইতে সকল অব্যবহ কল্পনা দূর হইয়া গেল। ইহার পর হইতে পৌরাণিক নাটক আর ভক্তি কিংবা ধর্মবোধ প্রচারের বাহন হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিল না, বরং অনেক সময় রাজনৈতিক চৈতন্যের বাহন-বহন হইয়া রহিল। কিন্তু তাহাও বিভাগোত্তর মুগ্ধ সম্পূর্ণ মৃত হইয়া গেল। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের মধ্যমুগে বাঙ্গালী যে বিষয়-বস্তু ভিত্তি করিয়া তাহার নাট্য-রচনাকে বান দিক দিয়া স্ত্রীতকার করিয়া ছুঁইয়াছিল, তাহা যিশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আসিয়া বাংলা নাট্য-রচনার ক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃত হইয়া গেল। ইহার একটি প্রবল এই হইল যে, বাঙ্গালী নাট্যকারের যে দৃষ্টি একদিন অব্যবহ কল্পনাপ্রসী হইবার ফলে নাটক-রচনার অগ্রগতির পথি করিয়াছিল, তাহা আজ

দূর হইয়া গেল। সুতরাং বাংলা নাটক-রচনার একটি প্রধান বাধা আজ আর নাই।

যশোমী আশোলানের সময় হইতেই এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক যোযালা বাঙ্গালী নাট্যকারদিগের রচনার লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক গৌণ চিত্তি-রচনা মাত্র ব্যবহৃত হইত এবং তাহার উপর রচনার আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইত। ইহাদের প্রধানতঃ দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—প্রথমতঃ, ঐতিহাসিকের মধ্য হইতে বাঙ্গালী বীর বৈশাখবোধক চরিত্রের অহুসন্ধান এবং দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু-মুসলমান ঈশ্বরের বাণী-প্রচার। এমন কি, ঐতিহাসিক যোযালাগণকে স্বার্থ বীর এবং দেশপ্রেমিক বলিয়া নির্দেশও করে নাই, কেবলমাত্র রচনার বলে এই সকল নাটকের মধ্যে তাহাদিগকেও বীর চরিত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। সেইজন্য ইহারা যেমন ঐতিহাসিকের চরিত্রও হয় নাই, তেমনই বাস্তব বাস্তব-চরিত্র-রূপেও বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। অথচ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার প্রায় মধ্যভাগে বঙ্গ-বিভাগের সময় পর্যন্ত এই শ্রেণীর নাটক-রচনা বাঙ্গালী নাট্যকার-দিগের অল্পতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। বিভাগোত্তর যুগে এই শ্রেণীর নাটক-রচনার প্রেমা বাঙ্গালী নাট্যকারদিগের মধ্যে আকর্ষণিকভাবে দৃঢ় হইয়া গিয়াছে। কারণ, স্বাধীনতা-লাভের পর ইহাদের আর কোন দুল্য নাই। একান্ত উদ্দেশ্যবদ্ধ রচনা ছিল বলিয়া উদ্দেশ্যনিষ্ঠির সঙ্গে সবেই ইহাদের সকল দুল্য দূর হইয়া গিয়াছে। অল্পতম ইহাদের উদ্দেশ্য যে সকল দিক দিয়াই সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে; কারণ, যে প্রেরণা সামগ্রিকভাবে জাতির অন্তর হইতে আসে না, নাটকের মধ্য দিয়া তাহা প্রচার করিলেই যে তাহা সমগ্র জাতি গ্রহণ করিবে, তাহাও হইতে পারে না। প্রায় অধঃশতাব্দী ব্যবৎ বাংলা নাট্যকার-গণিত ঐতিহাসিক যোযালাগুলি হিন্দু-মুসলমান মিলনের বাণী নানা ভাবে প্রচার করিয়াছে; এই বাণী যে জাতির অন্তরের বাণী ছিল না, তাহাও-বিভাগের কলমে তাহা মুক্তিতে পারা গিয়াছে। সুতরাং জাতির জীবনের পক্ষে বাহা সত্য নহে, বাঙ্গালী নাট্যকারগণ প্রায় অধঃশতাব্দীকাল তাহাই কর্তন করিয়াছেন। সুতরাং বাংলা নাটক-রচনার স্বার্থ্য্য এই দিক হইতেও যে আসিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা বাইতে পারে না। বার হইক, ভারত-বিভাগ দ্বারা হিন্দু-মুসলমান বিলাসের স্বয় আকর্ষণিকভাবে দূর হইয়া বহিবার ফলে বাংলা নাট্যকারদিগের মধ্যে এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক যোযালা-রচনার দ্বারাও আকর্ষণিকভাবে

দৃঢ় হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাধীনতা-লাভ যেমন আকর্ষণিক হইয়াছে, বাঙ্গালী নাট্যকারদিগের মধ্যে এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক যোযালা-রচনার দ্বারা তেমনই আকর্ষণিকভাবেই দৃঢ় হইয়াছে—সুতরাং সেবা বাইতেছে, এই শ্রেণীর নাটকগুলি বাস্তব ও পারিবারিক জীবনের স্বার্থ অশেখা একটি জাতীয় আদর্শ লক্ষ্য করিয়া রচিত হইত। সেইজন্য জাতির প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে ইহাদের কোনও সোগ ছিল না। বিভাগোত্তর যুগে এই শ্রেণীর নাটক-রচনার দ্বারা দৃঢ় হইয়া বাইবার সঙ্গে বাংলা নাট্য-রচনা এই একটি প্রচীর আদর্শের দ্বারা হইতে পরিচালিত পাইল। সুতরাং সেবা বাইতেছে, স্বাধীনতা-লাভের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাট্য-রচনা বাস্তব-জীবন-বিশুদ্ধি যে প্রধান দুইটি দ্বারা অগ্রদূত করিয়া অগ্রদূত হইতেন, তাহাদের উভয়েই বিভাগোত্তর যুগে সম্পূর্ণ দৃঢ় হইয়া গিয়াছে। যে বাস্তব-বিশুদ্ধিতা বাঙ্গালী নাট্যকারদিগকে এককাল পর্যন্ত লাভ পথের নির্দেশ দিয়াছে, তাহা আজ তাহাদের সমুদ্রে নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বিভাগোত্তর যুগ বাংলা নাটক-রচনার পক্ষে যে নানা দিক দিয়া অগ্রদূত পরিবেশের গতি করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঐতিহ্যমোটে তাহা প্রমাণ নানা দিক দিয়া প্রকাশ পাইতেছে।

অন্ততঃ সেবা সেল, বাংলা নাট্য-রচনার ক্ষেত্রে পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, যোযালা নাটক ইত্যাদি প্রত্যেকেরই দৃঢ় অবস্থান হইয়াছে। যোযালাকাল এই শ্রেণীর নাটকের প্রভাব-বর্ধনই যে বাংলা নাট্য-সাহিত্য স্বার্থ্য্য বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই, সে স্বার্থ্য্যও পূর্বে বলিয়াছি। সুতরাং এই সকল অন্তরায় যদি দূর হইয়া গিয়া থাকে, তবে বাংলা নাটক-রচনার এখন আর কি বাধা থাকিতে পারে?

পূর্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালীর সুবিবিধ পারিবারিক-জীবন-ভিত্তিক রচনাই কথা-পাঠিত্যের স্বার্থ্য্যকর। অন্ততঃ কারণ হইয়াছে। বাঙ্গালীর আধুনিক উপজাতি অশেখা যে ছোট গল্প অধিকতর আকর্ষণীয় হইতে হইয়াছে, ইহার প্রধান কারণ, ছোট গল্পের পরিচিত পরিচয়ের মধ্যে জীবনের মতোমতো রচনা-নিবিড়তা বিস্তৃত হইয়া পড়িতে পারে না। সেইজন্য কুশলী শিল্পীর হস্তিতে তাহাই অনন্ত রচনা-লাভ করে। উপজাতির মধ্যে এক একটি সামগ্রিক জীবনের পরিচয় প্রকাশ পায় বলিয়া বিস্তৃত পরিচয়ের মধ্যে তাহাদের নিবিড়তা স্বার্থ্য্যকর কথা কঠিন হইয়া পড়ে। জীবনের মতোমতো পরিচয়ে সামগ্রিক জীবনই নাইবে লক্ষ্য বলিয়া ইহার

মধ্যেও রস-নিবিড়তা বলা যায় না। কিন্তু একান্ত-ভাবে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন ভিত্তি করিয়া লইলে এবং এক একটি বিশিষ্ট পরিবারের বাস্তব স্বভাবকে ধরে নাট্যকাহিনী একান্তভাবে সীমায়িত রাখিতে পারিলে ইহার রস-নিবিড়তা সূত্র হইবার কথা নহে। কিন্তু সাম্প্রতিক বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন বহির্গতনা স্বাভাবিক বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। বিভাগ্যন্তর যুগে ইহার যে পারিবারিক জীবন সত্য ছিল, তাহা যে আজ সত্য নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্বাভাবিকের ছোট গল্পগুলির রস-নিবিড়তা বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের একটি হ্রদ্বির অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। পরচন্দ্রের সামাজিক উপভাসগুলিও এক একটি বৌদ্ধ পরিবারের রস-পরিচয়ের সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু বিভাগ্যন্তর যুগে স্বাভাবিকের ছোট গল্পের সেই অনায়াস-তোগা বীর-মরণোন্মত্ত সমাজ-জীবনও যেমন আর নাই, পরচন্দ্রের সামাজিক উপভাস-বর্ণিত বাঙ্গালীর বৌদ্ধ পরিবারও আর দেখা যায় না। নাগরিক ও শিল্পকেন্দ্রিক জীবনের প্রসাধনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য জন্মেই আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়িতেছে। স্নানিবিদ্য পারিবারিক জীবনের ভিত্তির উপর রচিত এতকাল কথা-সাহিত্যের যে সার্থকতা দেখা গিয়াছিল, তাহা আজ বিচ্ছিন্নের অঙ্গসন্ধান করিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার ফলে সাম্প্রতিক কালে রচিত উপভাসের সেই সার্থকতা আর বড় দেখা দািতেছে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পারিবারিক জীবনও আজ যে নূতন রূপ লাভ করিয়াছে, তাহার মধ্যেও নাটকীয় উপকরণের অভাব আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না; বরং একদিক দিয়া দেখিতে গেলে সেই উপকরণ আরও শক্তিশালী হইয়াছে।

স্বাধীনতা-লাভের পূর্ববর্তী যুগে পারিবারিক জীবনে নারীর স্থান সীমাবদ্ধ ছিল; অল্প স্টেই নিম্নেই সীমার মধ্যেই নারী তাহার শক্তির পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহার কর্তব্য মাত্র জননী, মাতা ও কন্যার মধ্যেই সীমায়িত ছিল। বিভাগ্যন্তর যুগে নারী পরিবারের বহুস্তর বহির্ভুক্ত কর্তব্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। পরিবারের জীবিকা-অর্থনের সঙ্গীতাক্ষণে সে পিতা ও পুত্রের দায়িত্বও পালন করিতেছে। স্ত্রীরা নাটক যদি একান্তভাবে আজ পরিবার-ভিত্তিকও হয়, তথাপি যে পারিবারিক জীবনের পরিচয় আমরা স্বাভাবিক-পরচন্দ্রের সাহিত্যে পাইমাছি, সেই পরিবারের পরিচয় সাম্প্রতিক কালের নাটকে পাইতে পারি না। জননী, মাতা ও কন্যাক্ষণে নারীর প্রাধাত্য কেবলমাত্র তাহার পরিবারের মধ্যে, কিন্তু সাম্প্রতিক

কালে তাহার যে পরিচয় একান্ত পাইতেছে, তাহা তাহাকে পারিবারিক জীবনের বাহিরে লইয়া গিয়াও ক্রমবৃত্তর সংশ্রমে লিপ্ত করিতেছে। বৌদ্ধ-পরিবার-এক ভাবিয়া পরিবার ফলে এবং নারীকে জীবিকার অর্থবশে অস্বাভাবিক ত্যাগ করিয়া বহির্গতে কর্তব্যে সন্ধান বহিরে হইবার জন্য বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের নিবিড়তা বিনষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সেইজন্য আমাদের দেশের সনাতন আদর্শ অনুসরণ করিয়া পরিবার-ভিত্তিক নাটক রচিত হওয়া আজ আর সম্ভব হইতেছে না। নারী-চরিত্রের মধ্যে যে গুণটি আজ বিকাশ লাভ করিতেছে, তাহা পুরুষের গুণ—নারীর যে নিম্নেই গুণ তাহার বৈশিষ্ট্য, প্রীতি, মাতা, স্বমতা ও চরিত্র-স্বাধীনতার মধ্যে সীমায়িত, বহির্গতে জীবিকা-সন্ধান নারীর মধ্যে সেই সকল গুণ বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পাইতে পারে না। বাংলার বৌদ্ধ-পরিবার-ভুক্ত নারীর মধ্যে সহস্রভুক্তি, সহযোগিতা, স্বার্থত্যাগ, সেবা ও ভক্তি যেসকল গুণ স্বভাবতঃই বিকাশ লাভ করিয়া থাকে, আত্মকেন্দ্রিক পরিবারের মধ্যে তাহা সম্ভব হইতে পারে না, বরং তাহার পরিবারেই সেখানে কোমল স্বার্থপরতা দেখা দেয়। যে সমাজের নারী একদিন একাধিক সপত্নী লইয়াও সংসার করিয়াছে, সেই সমাজেরই নারী আজ নিজস্ব নিকটাত্মী স্বামী, পুত্র-পাত্নী, ভাণ্ডার-দেবরকে লইয়াও সংসার মনে সংসার করিতে পারে না—সংসারে সে নিজেকে, তাহার স্বামী ও পুত্রকর্তা স্বামীত্ব-কর্তৃত্ব হান হইয়াছে। এই স্বামীত্ব এত বিচ্ছিন্ন করিয়া বলিবার কারণ এই যে, বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তনই দেখা দিল, নারী এখনও ইহার প্রদান চরিত্র। বাংলা সামাজিক নাটকের মধ্যে তাহার স্বামীত্ব স্বাধীনভাবে নির্ণয় করিতে না পারিলে ইহার বস্তুগততা বলা যায় না—ফলে ইহার কাহিনী শক্তিশালী এবং চরিত্রগুণ জীবন্ত হইতে পারে না। সাম্প্রতিক বাংলার সমাজের নারী একান্ত স্বার্থপরতা-বশতঃ তাহার পরিবারকে বহিরে আত্মকেন্দ্রিক ও সীমায়িত করিয়া-লুক্কান না কেন, সে এখনও ইহার সর্বমুখী কর্মী। তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই পরিবারের জীবন। বৌদ্ধ পরিবারের নারী তাহার সেহ, প্রীতি, দায়িত্ব ও স্বার্থ দ্বারা একদিন বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনকে সৌন্দর্য ও কল্যাণে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল, নারীর সেই বিভিন্ন শক্তি আজ সংহত হইয়া আত্মহীন হইয়াছে—আত্মসংহত আজ তাহা নিয়োজিত হইতেছে। তাহারই একই স্বাক্ষর আত্মবোধের ভিতর দিয়াই তাহার জীবনের বস্তুত্ব হ্রাস হইয়া উঠিয়াছে হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের মধ্যে

নারী-চরিত্রের এই দিকটি যে খুব শূন্য হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা নহে। একটি কথা বীণার করিতেই হয় যে, যদিও এই কথার ব্যতীতের মধ্যে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের আদর্শের বিপুল পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাপি নারী-চরিত্রের নূতন দিকগুলি নাটকের মধ্যে এখনও তেমন শূন্য হইয়া উঠে নাই। বাঙ্গালী নারী-চরিত্র-সম্পর্কিত সনাতন ধারণা আশ্রয় এখনও পরিচায়ক করিতে পারিতেছি না। তাহার ফলেই বাংলা নাটকের নারী-চরিত্র তেমন সজ্জাশালী হইয়া উঠিতে পারিতেছে না।

একদিক দিয়া নারী-চরিত্র সম্পর্কে সনাতন সংস্কার যেমন আশ্রয় পরিচায়ক করিতে পারি নাই, এ কথা যেমন সত্য, অপরদিক দিয়া আবার পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবের ফলে নারী-চরিত্রকে বাঙ্গালীর সমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অব্যক্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে প্রয়াস দেখিতে পাাইতেছি, তাহাও সত্য। বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তনই দেখা দিক, তাহা ইহার নিজস্ব ধারা অনুসরণ করিয়াই যে পরিবর্তিত হইতেছে, তাহাও স্বীকার্য। অর্থাৎ আঙ্গিকার ক্রীতদাসপ্রথা যাবতিন দেশে দিয়া বেড়াইবে আশ্চর্য্যবৃত্ত হইয়া পাশ্চাত্য জীবনকে স্বীকার করিয়া লইল, বাঙ্গালী পাশ্চাত্য সভ্যতা ধারা সেভাবে প্রভাবিত হয় নাই—সে তাহার নিজস্ব ঐতিহ্যের ভিত্তির উপরই এখনও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হুতরাং বাঙ্গালী নারী ইংরেজ মহিলাধর্ম পরিণত হয় নাই। তাহার শিক্ষা-দীক্ষা ধ্যান-ধারণা এখনও মূলতঃ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের গূঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। হুতরাং ইংল্যান্ডের *The Doll's House*-এর 'নোরা'কে বাংলার সমাজে পাইব না। এখনও চরিত্র যে আধুনিক বাংলার সমাজে একেবারেই থাকিতে পারে না, তাহা নহে; কিন্তু তাহা এখনও বাঙ্গালীর স্বভাবের ব্যতিক্রম হইবে, হুতরাং তাহাকে বাংলা নাটকের নারীকথা হইবে না। সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের মধ্যে বাঙ্গালীর এই ঐতিহ্যপূর্ণ সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের ধারাকেও কোন কোন সময় অবীকার করিয়া পাশ্চাত্য সমাজ-জীবনের আদর্শকে আধুনিক এবং ঐতিহ্যকে অবলম্বন করিতে গিয়া বাংলা নাটক বাঙ্গালীর স্বাভাব্য জীবন হইতে বহুদূরতী হইয়া পড়িয়াছিল, অথবা পাশ্চাত্য সমাজ-জীবনকে অজ্ঞভাবে অনুকরণ করিয়া ইহা পুনরায় বাঙ্গালীর নিজস্ব জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার আপদা দেখা দিয়াছে। সাম্প্রতিক কালে শৌণ্ডিক ও ঐতিহাসিক

নাটক-রচনার পরিবর্তে সামাজিক নাটক রচিত হইতেছে সত্য, কিন্তু সেই সমাজ বলি বাঙ্গালীর সমাজের বর্ষা রূপ না হয়, তবে তাহার ভিতর দিয়াও সার্থক বাংলা নাটক কোনদিনই রচিত হইতে পারিবে না; ইহার ভিতর দিয়া যে চরিত্রগুলি রূপ পায়, তাহারা যদি বাঙ্গালী না হইয়া বিদেশীয়-ভাবাপন্ন হয়, তবে বাংলা ভাষায় রচিত হইলেও তাহাদিগকে বাংলা নাটক কি কল্পিয়া বলিতে পারি? সাম্প্রতিক বাংলা নাট্যকারদিগের মধ্যে এই বিষয়ে অবিকৃতর দৃষ্টিহীনবোধ জন্মিলে বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ আশাএম বলিয়া মনে হইতে পারে।

বাংলা নাটকের স্বাধীন বিকাশের আর একটি বাধা সাম্প্রতিক কালে দুই হইয়া দিয়াছে—তাঁহা, ইহার উপর ব্যবসায়ী রসনকের প্রভাব; কেবলমাত্র প্রভাবই নহে, বাংলা নাট্য-সাহিত্যের স্বাধীন রূপে ব্যবসায়ী রসনকগুলি বাংলা নাটক-রচনা নিয়ন্ত্রিত করিত। তাহার ফলে বাংলা সাহিত্যের স্বাভাব্য বিভাগের মতো বাংলা নাটকের স্বাধীন বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া দিয়াছিল। ব্যবসায়ী রসনক কর্তৃক সে-মুগে বাংলা নাটক-রচনা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবার ফলে ইহার মধ্যে নিত্যমাত্র ঐতিহাসিক একটি ধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল। এতোক ব্যবসায়ী রসনকের বিনীত অভিনেতৃগোষ্ঠীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই প্রথানতঃ সে-মুগে নাটক রচিত হইত। সে মূগের প্রায় সকল নাট্যকারই রসনকের পরিচালক ছিলেন। তাঁহাদের রচিত নাটকই অভিনীত হইবার সুযোগ লাভ করিত এবং রসনকের শব্দে বেসকল নাট্যকারের কোন সম্পর্কও ছিল না, তাহারাও তাঁহাদেরই আদর্শে নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। সে মূগে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আত্মবিশ্বাস আর কোনও নাট্যকারেরই ছিল না। সেইজন্য ব্যবসায়ী রসনকে অভিনীত নাটকই সকলেরই অহুকরীয় ছিল। দৌখীন রসনকগুলিও সেদিন কলিকাতার ব্যবসায়ী রসনকগুলির অহুকরণ করিয়া তাহাতে অভিনীত নাটকেরই অভিন্ন করিত। এই অহুকরণের দ্বা-বিধা নূতন নাটক-রচনার প্রেরণা যেমন প্রকাশ পাইবার সুযোগ পাইত না, তেমনই কোন উচ্চ অভিনয়-রূপ প্রকাশ পাইবারও উপায় থাকিত না। সাম্প্রতিক কালে এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। কিছুকাল ব্যবসায়ী রসনকের বাহিরেও 'নাট্য আন্দোলন' নামক একটি সংগঠিত আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া সাধারণ নাট্যআন্দোলনদিগের ভিতরে সত্যসুপারিততা হইতে পরিচালন পাইবার একটি প্রেরণা দেখা দিয়াছে। কতকগুলি

শক্তিশালী সৌধীন নাট্য-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়া তাহাদের অভিনয়-কৌশল দ্বারা সাধারণ দর্শককে মুগ্ধ করিতেছে। ইহার ফলে দেখা বাইতেছে, অভিনয়ের প্রতিভা কেবলমাত্র বাবসারী রঙ্গমঞ্চগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে—তাহাদের বাহিরে যে উচ্চাঙ্গ অভিনয়-উপলব্ধি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অনেক সময় বাবসারী রঙ্গমঞ্চেও ঘূর্ণিত। এই সকল সৌধীন নাট্য-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নতুন নতুন যুগোপযোগী নাটক রচিত হইয়া অভিনীত হইতেছে—বাংলা নাটকের পুরাতন ধারাটি ইহার মধ্যে হইতে সম্পূর্ণ পরিভ্রাণ করা হইয়াছে। এতদিন বাবসারী রঙ্গমঞ্চে সকল বিষয়ে অগ্রগণ্য করিবার যে প্রবৃত্তি দেখা দিয়াছিল, তাহা আজ পরিভ্রাণ করিবার ফলে স্বাধীন নাটক-রচনা করিবার প্রেরণা এবং বৈশিষ্ট্য অভিনয়-উপলব্ধি বিকাশ দেখা বাইতেছে। সাম্প্রতিক কালের বাবসারী রঙ্গমঞ্চগুলি উন্নয়ন পতাকীর বাংলা রঙ্গমঞ্চগুলির মতো নতুন নতুন নাটক পরিবেশন করিবার পরিচেষ্টে স্তব্ধকাল ব্যবৎ একই নাটক পরিবেশন করিয়া তাহাদের ব্যবসায়ের দিক হইতে লাভবান হইতেছে। পূর্বে দর্শক-সংখ্যা ছিল অল্প, সেইজন্য নতুন নতুন নাটক তাহাদের সমুখে উপস্থিত করিতে না পারিলে তাহাদিগকে রঙ্গমঞ্চে শিক আকর্ষণ করা সম্ভব হইত না, সেইজন্য বাবসারীর দিক হইতেই নতুন নাটক রচনা করিবার প্রেরণা আসিত। কিন্তু এখন রঙ্গমঞ্চে দর্শকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, স্তব্ধতা একই নাটকের অভিনয় পত পত রাত্রি নিবিধানে চলিয়া বাইতে পারে। রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষও সেই স্বেচ্ছা পূর্ণাভাষ্য গ্রহণ করিয়া নতুন নতুন নাটক পরিবেশন করিবার ব্যয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছেন। সেইজন্য নতুন নাটক-রচনার প্রেরণা আজ আর রঙ্গালয়গুলির ভিতর হইতে আসে না, বরং সৌধীন নাট্যসম্প্রদায় এবং সাধারণ নাট্যাধ্যাপনিকের নিকট হইতেই আসে। তাহার ফলে সাম্প্রতিক কালে বাবসারী রঙ্গালয়ের বৈচিত্র্যহীন আদর্শের প্রভাব-মুক্ত হইয়া স্বাধীন নাটক-রচনার প্রয়াস বেশা বাইতেছে। এই প্রয়াসের ভিতর হইতেই সার্থক বাংলা নাটক-রচনাও যে একদিন সম্ভব হইবে তাহাও বৃষ্টিতে পান্না বাইতেছে।

সাম্প্রতিক বাংলা নাটক বাঙ্গালীর অত্যন্ত জীবনের সঙ্গে যোগ যাপন করিয়া লইবার প্রয়াস পাইতেছে। যে কল্পনা ও ভাব-বিদ্যাসিদ্ধি অত্যন্ত পক্ষ বাংলা নাটকের অগ্রগতির পথে বাধা দিয়া আসিয়াছে, তাহা দূর হইয়া গিয়া আজ এক মুকুটন বাস্তব জীবন-বোধ বাংলা নাটকের উপজীব্য হইয়াছে। প্রায় একশত বৎসর পর বাংলা

নাটক আজ ইহার নিজের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। স্তব্ধতা বাংলা নাট্য-সাহিত্যের নবমুগের অন্ধগোড়র আসর হইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে করা বাইতে পারে।

কিন্তু নাটক-রচনার যে স্বেচ্ছাশ্রী আজ আমাদের উপস্থিত হইত না কেন, তাহার কতদূর সমাপ্ত হইতেছে এখন তাহাটী আলোচনা করিয়া দেখিতে হয়। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আজ বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহা দ্বারা ইহার ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের স্বেচ্ছাশ্রী নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের মধ্যে ইহার কথা কি কিছুই থাকিবে না? উন্নয়ন পতাকীতে বাঙ্গালীর সমাজের কতকগুলি সমস্যা ছিল, আজ তাহা নাই। উন্নয়ন পতাকীর সামাজিক সমস্যাগুলি লইয়া রচিত নাটক সম্পর্কেও আমাদের সকল উৎসাহ দূর হইয়াছে। আজ যে বাংলার সমাজ-জীবনে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহাও সমাজের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করিতে না, এ কথা সত্য। স্তব্ধতা একান্তভাবে তাহাই অবলম্বন করিয়া রচিত নাটকের কোনদিনই স্বাধীন মূল্য হইবে না। সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের মধ্যে মধ্যবিত্ত সমাজের অর্থ-সঙ্কট, ধনী ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য লইয়া বহু ইত্যাদির কথা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই সাময়িক সঙ্কটের মধ্যেও মানুষের যে একটি শাখা বন আছে, তাহার সন্ধানের প্রয়াস দূর আরই দেখিতে পাওয়া বাইতেছে। নানা সঙ্কটের মধ্যেও মানুষের মনের নানা ভাবে বিকাশ হইয়া থাকে; যখন-সমাজ কোন কালেই যে একেবারে সম্পূর্ণ সঙ্কট-মুক্ত হইতে পারে, তাহা নহে। তবে এই সঙ্কটের প্রকার-ভেদ হইতে পারে যাত্রা। সঙ্কটের ভিতর দ্বিধাই আশ্রয় যে বিকাশ হইয়া থাকে, তাহার মধ্যেই স্বার্থ নাটকীর গুণের সন্ধান পাওয়া যায়। স্তব্ধতাও বর্তমান সমাজের অর্থনৈতিক সঙ্কটের পটভূমিকা নয়—নারী চিন্তের যে বিকাশ দেখা দিতে পারে, তাহা উল্লেখ্য নাটকের অবলম্বন হইবার যোগ্য। কিন্তু এই অর্থনৈতিক সমস্যা এবং তৎসম্পর্কিত বিশেষ কোন রাজনৈতিক যত্নবাহ প্রচার বহি নাট্য-রচনার উদ্দেশ্য হয়, তবে নাটক মাঝেরই পিন্ন-মহিমা ক্ষয় হয়। সাম্প্রতিক বাংলা নাটকে এই ভ্রুটি কিছু কিছু দেখা দিয়াছে। কিন্তু বাহ্যিক এই ভ্রুটির অঙ্গ সর্বাঙ্গীন নাট্য-শক্তি কলি করিতে চাহেন, তাহাদের ঐ পথ পরিভ্রাণ ভিন্ন উপায় নাই। আর সাময়িক প্রয়োজনীয়তার দ্বারা যদি নাটক-রচনার প্রেরণা কেহ অস্বত্ব করেন, তবে তাহার কথা বতর।

সাম্প্রতিক কালে রচিত বাংলা নাটকের সংলাপে যে ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা পূর্ববর্তী কালের কৃত্রিমতা হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়াছে। পূর্বে যে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক কিংবা তাহাদেরই প্রভাব-জাত সামাজিক নাটক রচিত হইত, তাহাদের মধ্যে ব্যবহৃত ভাষা যে নিত্যস্থ কৃত্রিম ছিল, তাহা সকলেই অস্বত্ব করিয়াছেন। তবে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের ভাষার কৃত্রিমতা দূর করিয়া পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের ভাষার রসস্বত্বের যে-কতখানি ব্যাঘাত দূরীভূত করে, তাহা নীলবন্ধুর মতো নাট্যকারের উচ্চশ্রেণীর চরিত্র-সম্পর্কে ব্যবহৃত ভাষা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। বিভাগোত্তর যুগের পূর্ণ পর্যন্ত ও বাহ্যিক সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাদের ব্যবহৃত ভাষাও সমসাময়িক

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের ভাষার প্রভাবের ফলে বহুলাংশে কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে যেমন বাংলা নাটক বাঙ্গালী জীবনের নিকটবর্তী হইতেছে, তেমনই ইহার ভাষাও পর্যায়ক্রমে পরিণত হইতেছে। কারণ, তাহাই নাট্যীয় চরিত্রের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ করিতে পারে। তাহা যদি অকৃত্রিম না হয়, তবে চরিত্রগুলি অকৃত্রিম হইতে পারে না। সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের মধ্যে এই একটি প্রধান ভূমির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার ভাষার মধ্যে আর কৃত্রিমতা নাই। বাস্তব জীবনের রূপাংগণে এই ভাষার উপযোগিতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাংলা নাটকের ভাষা বাংলা নাট্য-শাস্ত্রের মধ্যস্থ হইতেই নিত্যস্থ কাব্যধর্মী হইয়া ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে ইহা এই কাব্যধর্মী হইতে বহুলাংশে মুক্ত হইয়া সার্বক নাটক-রচনার উপযোগিতা লাভ করিয়াছে।

জীবনবাণী

ত্রিবিলাপকৃত্যার রায়

নামের তোমার বিলিয়ে প্রসাদ গাইব প্রাণের জয়।

আনন্দময়! মরণ তো নয় তোমার পরিচয়।

রূপের সীমা, আশার আলো

প্রেমের অভয় বাসব ভালো,

মিলনকে আঁজ করব বরণ—বিরহ নয় নয়।

আনন্দময়! মরণ তো নয় তোমার পরিচয়।

তুমি আছ তাই তো আছি, জোগাও তুমি মন,
তাই তো গানে গানে আমার জীবন ভরপুর।

অকল্পণ তো নয় করুণা,

তোমার রঙেই নীল বয়না,

তোমার আশিস-আতায় শুভদৃষ্টি-বিনিময়।

আনন্দময়! মরণ তো নয় তোমার পরিচয়।

যাবার গান তো ঢের গেয়েছি অক্ষ-অভিসারী :

“এপার মায়া—নিরে চলে। ওপারে কাণ্ডারী!”

আজকে এল হঠাৎ-দিশা :

মিটল যুগান্তরের তৃষা

শরণ নিয়ে ত্রিচণে—শুনি ত্বনময় :

“আনন্দময়! মরণ তো নয় তোমার পরিচয়।”

রবীন্দ্র জীবনালেখ্য

॥ চরিত্র ও চর্চা ॥

গ. রচনাবলী

১

সাহিত্য-সাধনা

এক চিত্রিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

“আমি বাস্তবিক ভাবে শুনিনে কোনোটা আমার আসল কাজ। এক-এক সময় মনে হয় আমি ছোটোগল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন পাবিনে— লেখবার সময় তখনও পাওয়া যায়। এক-এক সময় মনে হয়, আমার মাথা এখন অনেকগুলো ভাবের উল্লসে ছুটছে বা পিক কবিতার বাস্ক করবার যোগ্য নয়, সেগুলো ভাষায় প্রকৃতি নানা আকারে প্রকাশ করে বেলে দেওয়া ভালো। বোধ হয় তাতে তলতল আছে, অনেকটা আছে। এক-এক সময় সামাজিক বিষয় নিয়ে আমাদের লোকের লোকের সঙ্গে কথাড়া করা খুব সবকার, মনে আর কেউ করতে না এখন কাজেই আমাকে এই অভিন্ন কথাটা গ্রহণ করতে হয়— আমার এক-এক সময় মনে হয়, সব ছোটো-গল্প ছাড়া, পুঁদীরা আপনার চরিত্র আমনি বেশে দেবে এমন; মিল করে চুক গেছে ছোটো ছোটো কবিতা লেখটা আমার বেশ আসে, সব কোড়ে-কুড়ে দিয়ে আপনার মনে আপনার কোণে সেই গভীর কথা থাক। নিউজের মধ্যে আমি কোনোদিকেরই নিরাশ করতে চাইনে— কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং যেহেতু ‘দীর্ঘ-কোট’ কোনোটি পরিপূর্ণভাবে আমার আসতে চব না। লেন্সটাতে পৃথিবীর সবচেয়ে উপকার হবে সত্যতা-কর্তব্যজ্ঞানে সেকথা ভাববার প্রকার নেই, কিন্তু কোনোটা আমি সবচেয়ে ভালো করতে পারি—সেটাই হচ্ছে বিচার।

“আমার বুদ্ধিতে হতাশা আসে তাতে তো বোধ হয়, কবিতায়েই আমার সবচেয়ে বেশি অধিকার। কিন্তু আমার স্থানল বিবরণী ও নবোন্মেষের সর্বত্র আপনার বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয়, এই কাজেই যদি সেগে থাকা যায় তা হলে তো বন্ধ চর না; আমার যখন একটা-কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি

মেশা চেপে যায় যে মনে হয় যে, চাই-কী, এটাতোও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আমার যখন ‘দাদাবিহার’ কিংবা ‘শিকার ছেলেদের’ নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয়, এই হচ্ছে জীবনের সার্থক কাজ। আমার লক্ষ্যের মাথা খেয়ে দাঁড়া কথা যদি বলতে হয় তবে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ যে চিরশিখা বলে একটা দিগা আছে, তাব প্রতিষ্ঠা আমি সর্বদা হতাশ-প্রশ্নের মূর্ছ দৃষ্টিপাত করে বাকি।

“একলা কবিতা নিয়ে থাকি আমার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধা—বোধ হয় যেন উনিই আমাকে সবচেয়ে বেশি খণ্ডা দিয়েছেন; আমার ছেলেবেলাকার, আমার বহুপালের অল্প গল্প সন্নিবিষ্ট।”

“এ চিত্রি মধ্যবয়সের লেখা। এর উপর যোগ হল শব্দতত্ত্ব, যে-সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার গভীরতা পণ্ডিতদের নির্ভাক করে দিল, যোগ হল ধর্মের ব্যাখ্যান যা তত্ত্বজ্ঞানের চিত্র জয় করল। গানের সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় ছ হাজারে। এ-সম্বন্ধে দ্বিতীয় স্থান হল পান্ডিত্য দেশের এক গুণীর; তাঁর রচিত গানের সংখ্যা হল ছ ম; আর ওই তত্ত্বলোক শুধু গানই রচনা করেছেন, আর-কিছু করেননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের রচিত ছ হাজার গানের প্রত্যেকটিতে মূহ যোজনা করলেন। তিনি কয়েক হাজার চিত্রি লিখেছেন; সে-সবও সাহিত্যের উচ্চ পর্যায়ে পড়ে।

সব মিলিয়ে যা দাঁড়াল তা একজন লোকের রচনা বলে পরবর্তী যুগ বিশ্বাস করবে না। এ-যুগের লোকও করতে না, যদি না তারা চোখের উপর এসব দেখত।

কিন্তু কেবল কি আদর্শতন।

যে বহর বয়সে বইলেখা আরম্ভ হল। সাহিত্য-সাধনা তার আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছে।

আশী বছর বয়স অবধি সেই সাধনা সমানভাবে চলিল। যে সৃষ্টি হল তার চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন একুশ। রমেশচন্দ্র বস্তের কস্তার বিবাহ। সভায় রমেশচন্দ্র বহ্নিন-চন্দ্রের গলায় মালা পরাতে যাচ্ছেন, এমন সময় রবীন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত হলেন। বহ্নিমঠের ডাড়াডাড়ি সে-মালা। রবীন্দ্রনাথের গলায় দিয়ে বললেন, এ-মালা এইরূপ; রমেশ, তুমি 'সন্ধ্যা-সংগীত' পড়েছ ?

পশ্চিম বছর বয়সে মাঘোৎসবের জন্তু কয়েকটি গান রচনা করলেন; তাদের মধ্যে 'নয়ন তোমায় পায় না দেখিতে' 'সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি' প্রভৃতি সুপরিচিত। একদিন মহর্ষি পুত্রের কণ্ঠে গানগুলি শুনলেন। বললেন, দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানত ও সাহিত্যের কদর বুঝত তবে কবিকে তারা পুষ্কার দিত। তার যখন সম্ভাবনা নেই তখন আমাকেই সে-কাজ করতে হবে।

ব'লে, একখানা পাঁচ শ টাকার চেক দিলেন।

২

রচনার গতি

চন্দ্রনাথ বসু এক চিঠিতে লিখেছেন—

'কপিকা' ছাড়িতে না ছাড়িতে 'কথা' অ'লিগ.—'কথা' দিয়া তুমি আমার হাত হইতে 'কপিকা' কাড়িয়া লইবে—'কপিকা'র ভোগ তো আমাকে পূর্ণ করিতে দিলে না। এমনি করিয়া 'কল্পনা' দিয়া 'কথা' কাড়িয়া লইয়াছিনে—আমার ভোগে আমার বাধা দিয়াছিলে। এবার 'কপিকা'র চমকিত করিয়াছ। আমার ভোগে বিবাসী হইয়াছ। আমি স্বতঃ, স্বতঃ তোমার সঙ্গে পরিচয় উঠিতেছি না, সিঁছাইবা গড়িতেছি—কিন্তু তোমার গতি দেখিবা চমকিত হইতেছি—ও গতি যথার্থ বিশ্বাসের গতি—যেমন দ্রুত তেমন উজ্জ্বল তেমন স্বন্দর। ও গতি এখানকার নয়, উর্দ্ধদেশের, মহাকাশের।

২

এর পূর্বের ও পরের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি।—

বয়স তখন তের। জ্যোতির্বিজ্ঞানার্থ 'সেরোজিনী' নাটক রচনা করেছেন; বই ছাণা হচ্ছে। রামসর্বশ্ব পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানার্থ গ্রন্থ লেখেন। একদিন রামসর্বশ্ব পণ্ডিত খুব জোরে জোরে পড়ছেন, পাশের ঘর থেকে বালক রবীন্দ্রনাথ শুনছেন। রাজপুত্র মহিলারা চিতায় প্রবেশ করবে একটা দৃশ্য ছিল। সেটা ছিল গল্প লেখা। সেই জায়গাটা পড়া হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ থাকতে পারলেন না, ঘরে ঢুকে পড়ে বললেন—

—এখানে পড়া ছাড়া আর কিছুতে জেদ চলে না।

—তা ঠিক, কিন্তু আর সময় কই ?

—আজ্ঞা, দেখছি।

ব'লে চলে গেলেন, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে এই গানটি রচনা করে আনলেন—

জন্ম জন্ম চিতা, দিগন্ত দিগন্ত; পরাধ পণ্ডিত
কিৎবালা।

জন্ম জন্ম চিতার আগুন, ছুড়াবে এগনি
প্রাণের আগুন।

শোনা রে বন, শোনা রে তোর, যে জালা রুদে
আলাপি হবে

সাক্ষী হলেন সেবতা তার, এর প্রতিফল
ছুটিতে হবে।

এই রকম মোট আঠারো লাইন।

এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে।—

১৯২৫ সন। চিত্তরঞ্জন দাশ মারা গেছেন।

তার একখানা ছবি নিয়ে বিধানচন্দ্র রায় কবির কাছে এলেন। বললেন—

—এর উপর একটা কবিতা লিখে দিন।

—সত্যায়, এ তো প্রেলুডেশন করা নয়, কাগজ খরচে আর চট্টাট করে লেখা হয়ে গেল।

—বেশ, আমি অপেক্ষা করছি।

কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ছবির উপর সেই অপূর্ণ কবিতাটি লেখা হল—

এনেছিলে সাথে করে বৃত্ত্যাতীত প্রাণ,
যরণে তাহাই ছুঁই করি গেলে দান।

এর অনেক বছর পরে। এক পঁচিশ বৈশাখ।
কবি কালিঙ্গা-এ আছেন। সেদিন তিনি এক
কবিতা পড়বেন, অল-ইন্ডিয়া রেডিও তা প্রচার
করবে। ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা দু-একদিন আগে
গিয়ে সেখানে সব ব্যবস্থা করেছেন। কবি
'জম্মিন' কবিতাটি লিখলেন। তার শেষ চার লাইন
ছিল এই—

জীবনের স্মৃতিদীপে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি
সেই কটি ব্যক্তি দিয়ে রচিত তোমার সন্ধ্যারতি—
সমুদ্রের তটের সন্ধ্যা, দিনাঙ্কের শেষ পদে
হবে মোর মোর সীমা; দুহিতা তোমার পদতলে।

নির্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট আগে কবি উঠলেন,
ঘরপাতি যে ঘরে ছিল সেই ঘরের দিকে চললেন।
যারা গা দিয়ে ব্যাঙ্কেন, সহচর বললেন, গুরুদেব,
এই নাগকেশবের চারটা বোধ হয় বেঁচে যাবে।

নাগকেশব কবির বিশেষ প্রিয়; চারা-গাছটার
কাছে একটু পাড়ালেন।

পকেট থেকে কাগজ-কলম বেরল। 'জম্মিন'
কবিতাটিতে আর চার লাইন বোগ করে দিলেন।—

আর হবে পশ্চাতে আশা, নাগকেশবের চারা
ফুল হার ধরে নাহি, আর হবে বেয়াতরীহার
এপারের ভালোবাসা, বিরহস্মৃতির অভিযানে
ক্রান্ত হয়ে, হারিয়েছে কিভাবে সে পশ্চাতের পানে।

রবীন্দ্রনাথের বিবিধ রচনার বহু সমালোচনা
হয়েছে; অনেকগুলি বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এখানে
সাধারণভাবে কিছু বলা হচ্ছে।—

৩

কবিতা ও গান

অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলছেন।—

উদয়চকলের সোপা মানুষ রবীন্দ্রনাথকে জানবে
ইতিহাসের সন্মুখ পৃষ্ঠায়, কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের
অন্তঃকরণ স্পর্শ তারা পাবে তাঁর কাব্যে, সেজন্য আমরা
গোবেছি। আজ হতে বংশত বর্ষ পরে তাদের বসন্ত-
বিনও রবীন্দ্রনাথের বসন্ত-গানে ধনিত হবে, তাদের
আবারও সঙ্গল মেঘের ঊপর তাঁর বর্ষা-কাব্যের নীল

অঙ্কন নেমে আসবে। প্রেমণী নদীর নমন অঙ্গর তাঁর
কাব্যের মধুতে মধুবে হবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তারা
নিরাশাও উৎসাহ, শোকে সাধনা পাবে। সেই অনাগত-
কালের সম্মুখীনের আশাওর অভিব্যক্তি জানাশি।
রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পার্শ্বে তাদের আনন্দই এর প্রত্যাবি-
ধান।

অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের কবিতা
সম্বন্ধে একজারগায় বলেছেন, জীবনের সকল রস,
সকল অভিজ্ঞতার এমন অবাধ এমন আশ্চর্য প্রকাশ
জগতে আর কবির মধ্যে দেখা গিয়েছে।

স্মৃতি-কবিতার কথা ধরলে এটা স্থানিষ্ঠতভাবে
বলা যায় যে, পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো কবি
আধ্যাত্মিক ও ভাগবত কবিতা এরকম নিপুণতার
সঙ্গে রচনা করেননি।

থাকে চন্দ্রতপন আরতি করে, কবি সেই বিশ্ব-
শরণের বন্দনা করলেন। 'সেই জ্যোতির্ময় কখনও
দুয়ার ভেঙে প্রবেশ করল, কখনও

নিউলিলায় পাশে পাশে বসারুলের রাশে রাশে
শিখির-ডোকা ঘাসে ঘাসে অরুণরাসা; চরণ ফেলে

তাঁর নয়ন-ভুলানো এল।

আমি যে চাই-ই। কবিকে না হলে
ক্রিষ্টবনেশ্বরের প্রেম যে নিজে হত।

কবি যে তাঁর ভালোবাসার ধনকে ক্ষণে ক্ষণে
হারালেছেন সে কেবল তাঁকে নতুন করে পাবেন
বলে।

তাঁর আগমনে আকাশ আলোয় ভরে উঠল,
ফুল হল স্তম্ভাল ধরা।

গুধু বাণী নয়, কবি নিজের প্রাণের মধ্যে তাঁর
পরম কামনা করছেন।

কবি অভিযোগ করছেন, কবির হৃৎক বইতে
হৃৎক মরে বঁধু কেন এলেন।

কবি শান্তি চাইছেন না, নিজের হৃৎক-ভাবনা
নিজের মধ্যেই থাক, লীলাময় গুধু তাঁর অশান্তির
দোলার মাকে বহন, তিনি বোলা দেবেন।

কবির সঙ্গে মিলন লাগি অস্বাভাবিক যে কতদিন থেকে আসছেন, তাঁর চন্দ্রসূর্য্য তাঁকে কোথায় ঢেকে রাখবে ?

তাঁর আসন-কাছে সুবোধ ছেলে ক'জন আছে, তিনি যে অবোধ জনে কোল দিয়েছেন, তাই তো কবি তাঁর চোলা।

কবি ভয় দেখিয়ে বলছেন—

ধাক্কা না তোমার লক্ষ্যগ্রহণায়,

তাদের হাতে আছো আমার লাগ।

সইবে না সে, সইবে না সে,

টানতে আমার হবে শাপে,

একলা ভূমি, আমি একলা হলে।

তাঁকে যে রথ থেকে ধুলার পথে নামতেই হবে ;
নেমে—

স্বপ্নবাস্তব আমার সাথে

চলবে হেঁটে হেঁটে।

আর ভূমি নাই বা এলে ? এড়িয়ে যেতে তো পারবে না !

অন্তরেতে নাই কি ভূমি,

সামনে আমার নাই বলে ?

বলছেন—

আছে সে নবনতারায় আলোকধারায়

তাঁই না হারায়,

ওগো, তাই দেখি তার বেধায় সেবার

তাকাই আমি বেদিক গানে ।

কবি তো তাঁর মোহনরূপে ভুলে থাকবেন না—

জানি না কি খরখ নাচে

নাচে গো ওই চরণস্থলে ।

তিনি জানাচ্ছেন—

বাক্যবোলায় কতরবে

বন্ধন-ভোর ছিন্ন হবে ।

ছিন্ন হবে, ছিন্ন হবে ।

মুক্ত আমি মুক্তভাবে,

বন্দী করে কে আধারে ।

যাই চলে যাই অন্ধকারে

যতী বাজায় সন্ধ্যা হবে ।

সেই বিরাটকে কোন্ কবি এইরকম বিচিত্র-ভাবে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেছে, জীবন ও স্বচ্ছন্দকে কে এমন এক ক'রে দেখেছে ।

হিন্দুস্থানী গানে কথা হল হরের আধেয় মাত্র। রবীন্দ্রসংগীতে কথা কাব্যের রূপ নিয়ে উচ্চতরে উঠে গেল ; কথা ও শব্দ অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলে গিয়ে গানগুলি কাব্যধর্মী হল। তাঁর রচিত গানে শব্দ বাদ দিয়েও কবিতার মতো ক'রে ছন্দে পড়া যায় ; শ্রোতার কণ্ঠে কবিতার মতো বোলে ওঠে ।

তু জন বড়ো সাহিত্যিকের মধ্যে একদিনকার কথোপকথন উদ্ধৃত করছি। এটা একটা পত্রিকায় বেরিয়েছিল।—

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : আচ্ছা, বল তো, আবাহের ভারতবর্ষের সকল কবির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান কি, অর্থাৎ প্রথম বিত্তীয় ভূতীর চতুর্থ থেকে অষ্টম ক'রে পতনতম পর্যন্ত এক শ হারনের মধ্যে কোন্ স্থানটি তিনি অধিকার করে যাচ্ছেন ?

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : কতিন প্রথম, শরৎ, ঠিক করতে পারছি নে। ভূমি দশম প্রকৃতি তখন উত্তরও ভূমি নিশ্চয় জানো। তুমিই বলো, রবীন্দ্রনাথের স্থান কি ? শরৎ : বিত্তীয়। আবাহ : রবীন্দ্রনাথ যদি বিত্তীয় হন, তা হলে প্রথম কে তা বল ।

উপেন্দ্র : এ প্রশ্ন আরও কতিন ঠেকছে। এর উত্তরও ভূমি দাও ।

শরৎ : প্রথম, বেদব্যাস ।

উপেন্দ্র : বাস্তবিক কি ?

শরৎ : অনেক নীচে, অনেক নীচে। এদের হ'জনের অনেক নীচে ।

উপেন্দ্র : কালিদাস ?

শরৎ : কালিদাসও অনেক নীচে। প্রথম থেকে বিত্তীয় যে দ্বয়, বিত্তীয় থেকে ভূতীয় দ্বয় তার কয়েকশত বেশি ।

রবীন্দ্রনাথ অনেক গান রচনা করেন তদানীন্তন ঘটনাকে উপলক্ষ করে। কয়েকটার ইতিহাস এই।—

১৮৮৬ সনের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হল। রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন—

আনন্দের মিলেছি আজ মাঝের ভাঙে ।
খসে হলে পাথর বতন ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে ?

১৯০৫ সন, ১৬ অক্টোবর, ৩০ আশ্বিন । ব্রিটিশ সরকার সনগ্র বাঙালি জাতির প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে বাংলাদেশকে দু'খণ্ডে ভাগ করল । বাঙালিও পণ করল, এ বিভাগ সে নীরবে মেনে নেবে না । ওই দিনটাকে অস্বপ্নীয় করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ এই ইচ্ছাহার প্রকাশ করলেন ।—

আগামী ৩০ আশ্বিন বাংলাদেশ আইন দ্বারা বিভক্ত হইবে । কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করে নাই তাহাই স্মরণ ও প্রকাশ করিবার জন্যে সেই দিনকে আমরা বাঙালির হৃদয়-বন্ধনের দিন করিয়া পরম্পরের হাতে হস্তিপ্রাণবর্ধের সূতা বঁধিয়া দিবা ।

ওই দিন সকালে রবীন্দ্রনাথ খালি পায়ে এক বিরাট শোভাযাত্রার সামনে থেকে গঙ্গারদ্বারে গেলেন । গায়কদল এই উপলক্ষে রচিত তাঁর এই গান গাইতে গাইতে চলল—

বাংলার মাটি বাংলার জল

বাংলার বায়ু বাংলার ফল

পূণ্য হউক, পূণ্য হউক, পূণ্য হউক,

যে ভগবান !

১৯১১ সনে জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, সেই উপলক্ষে রচিত গানটি তো স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত—

অনগণহন-অধিনায়ক জব হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা ।

বতীনের দাসের অনশন চলেছে । কবি বিচলিত ।
শেষে একদিন তাঁর মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছল ।

সেই সময় কবি 'উপভা'র মনোভা দিচ্ছিলেন । সেই হারাতে লাগলেন । শেষে উঠে চলে গেলেন । সেই রাত্রেই এই গানটি রচনা করলেন—

সখিই তাঁর বহুই তব কোথায়

হে ভৈরব, শক্তি দাতা, ভক্তপানে চাহো ।

১৯৩৯ সন ।

নতুন করে 'ডাকঘর' নাটকের অভিনয় হবে । কবির শরীর স্তেজে পড়েছে । কয়েকটা গান জুড়ে দিলেন । 'সমুখে শান্তি পারাবার' একটি ।

কবি বললেন, যদিও এটা অমলের মৃত্যুর গান, তা হোক, আমার মৃত্যুতে তোমরা এটাকে কাছে লাগাতে পারবে ।

'ডাকঘর'-এর অভিনয় আর হল না, কিন্তু তাঁর আক্ষেপে ওই গানটি গাওয়া হল ।

ওই বছর ।

শান্তিদেব বোধ কবির কাছে গিয়ে বললেন—

—পঁচিশে বোম্বের একটা গান লিখে দিন ।

—আমার কন্ঠমন্দিরের গান আমি লিখব ! যতদেব বল ।

—কন্ঠমন্দিরের কবিতা লিখতে পারেন, আর গান লিখতে যত দোষ !

—আচ্ছা, কন্ঠমন্দিরের কবিতাগুলো নিয়ে আর ।

'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটির একটা অংশ অদল-বদল করে গান তৈরি হল—

যে নৃতন,

দেখা দিক আবহাওয়া জ্বলন্ত প্রথম শুভক্ষণ ।

[অঙ্গণ :]

॥ বিশ্বাসার গান ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৮৮

রিকশা চালাবার একেবারে মোড়ার দিকে, যখন নিজের জাতি-পরিচয় ঢাকবার চেষ্টাটা খুব বেশি, তড়িং নিজের পোষাকটাও সেইরকম করে নিয়েছিল; পায়ে মোটর-টায়ারের সস্তা চম্বল, হাক-প্যান্ট, সস্তা ছিটের হাক-শাট, মাথায় গাকীটুপি। কয়েকমাস যেতে সন্ধ্যাচটা কিছু করে আসতে পোষাকেরও সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিবর্তন ঘটে, তারপর মল্লীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর আরও একটু স্পষ্ট হয় সেটা, শেষে দেবপ্রসন্নর সঙ্গে ওরকম খোলাখুলি আলাপ হওয়ার পর ওর পোষাকে এখন আর রিকশা-চালকের বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই বলতে গেলে। ভাবটা, খানিকটা যখন জানাজানিই হয়ে গেল তখন আর ঢাকবার চেষ্টা করা কেন? হয়তো আরও একটা কারণ আছে; আগে ছিল শুধু নিজের মনের জোর, যাতে সাধারণের মতের বিরুদ্ধে ওকে নিজের বিশ্বাসে দৃঢ় করে রেখেছিল। দেবপ্রসন্নবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের পর ওর এই বৃত্তিটা একটা মর্যাদা লাভ করল। তাতে স্বজাতি-সন্ধ্যাচটা একেবারেই না গেলেও, কতকটা বেপরোয়াভাবে গেলই এসে, একেবারে ছদ্মবেশের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই একটা সন্ধ্যাচ এসে পড়ল যেন।

হয়তো আরও একটু কারণ ছিল মনের অতলে কোথাও প্রজ্বল, যার খবর ও নিজেই পায়নি,—ও চায়না আর ঘনিষ্ঠতা বাড়তে, তবু যদিই নেহাৎ অতর্কিতে আবার ওদের সঙ্গে হয়ে যায় দেখা করনও...এই অর্ধমলিন প্যান্ট, হাক-শাট, টায়ারের জুতা—এগুলো থাকা কি এতই প্রয়োজনীয় হবে?

এখন ওর পোষাক পায়ে চাই শ্য, দুটি মালকোচা এঁটে পরা, হাক-শাটও খুব সস্তা ছিটের নয়। পরিচয় ঢাকবার দিকে দুইল রাত্রি আর মাথায় গাকীটুপি; এতে যতটা হয়।

তড়িং যতক্ষণে রিকশার আলোটা নিবুবে, তখন মলিনাক এগিয়েই গিয়েছিল, চৌকান্তে পাড়িয়েই বললো—“আজ আমার সঙ্গে কে আন্দাজ করুন তো মল্লীদেবী...”

এমন সময় তড়িং গিয়ে পড়ল। দেবপ্রসন্ন একটু হ্র-কৃত্তিক করে বললেন—“তড়িং না! তোমার রিকশা?...”

“আছে”—একটু হেসে তড়িং হুজনকে নমস্কার করল, তারপর টুপিটা মাথা থেকে নানিয়ে মুঠোয় গুটিয়ে নিতে নিতে এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসল। নিশ্চয় পোষাকের পরিবর্তনেই দেবপ্রসন্নর মুখটায় একটু নৈরাস্তের ছায়া পড়েছিল, সেটা সরে গিয়ে দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কতকটা ইচ্ছা করেই একটা ভালো কুশল-চেয়ার দেখিয়ে বললেন—“বোস এঁটের আরাম করে...অনেকদিন আসনি এদিকে। এলে রিকশা নিয়েই?”

এখানে পরিচিত দেবে মলিনাক আরও বিস্মিত হয়ে একবার ওঁর মুখের দিকে একবার তড়িতের মুখের দিকে তাকাত্মিল; বললো—“আনি তো ওঁর রিকশাতেই এলাম। রাস্তায় মোটর বিগড়ে এক বিভ্রাট। ওরিকে রিকশা-চলাচলও তো কম, রাত হয়ে আসছে; কি করব ভাবছি, এমন সময় ওঁর রিকশাটা দেখতে পেলাম। আসতেই চান না; আর বাঙালী সে-কথা তো এখানে এসে ভাগলেন।

...এখন দেখছি আপনারদের চেনা।...আপনিও চান্নাতেন নিশ্চয় মন্সীরেবী : কিন্তু কই আনাকে বলেননি তো এ-সহরে একজন বাঙালী রিকশা-ড্রাইভার আছেন—”

অনেকখানি বকে গেল। প্রথম পরিচয় করে দেওয়ার ঘোঁরবটা ওর ভাগ্যে না জুটলেও, বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, অস্বস্তি আঁজকের যোগাযোগটুকু তো তার জন্তাই।

মন্সী তেঁসে চুপ করেই রইল। আসলে ও-ই চেষ্টা করে করে সতর্ক থেকে দেবপ্রসন্নর মুখ দিয়ে প্রকাশ পেতে স্বেচ্ছা কথটা, ভেতরে ভেতরে এমন চকল হয়ে পড়েছে যে কথার জোগাচ্ছে না। উত্তরটা দিল তড়িৎ। নলিনাকের শেষের কথটা যে একটু খাপছাড়া হয়ে পড়েছিল সেইটাই উদ্দেশ্য করে বললো—“সবুবার কথা বলেই প্রকাশ করেননি নিশ্চয়। এ তো একজন বাঙালীর ডেপুটী কমিশনার হয়ে আসা নয়।”

“মানি তো বলি তার চেয়েও বড় কথা। ডেপুটী কমিশনার তো দু'দশ বছর অন্তর একটা করে আসছেই বাঙালী, আই-সি-এস কি আই-এ-এস এরও অভাব নেই, এলে-গেলে যথারীতি তাদের পার্টিও দিচ্ছি আমরা—বাঙালী বলেই; কিন্তু দৈনিক অমকে তার মর্যাদা নিয়ে যারা বাঙালী জাতটাকে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে...”

বাধা পড়ল। ছন্দ প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। নমস্কার করে আসন গ্রহণ করতে করতে—“কৈ ?...” বলে একজন কি বলতে যাচ্ছিলেন, নলিনাক বললো—“আপনারদের সঙ্গে এঁর পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন তড়িৎ... তড়িৎ...”

একবার মন্সীর মুখের দিকে একবার দেবপ্রসন্নর মুখের দিকে চাইল। দেবপ্রসন্ন বোধহয় ভুলে গিয়ে থাকবেন পদবীটা, মন্সী—ব্যাপারটা হঠাৎ এতদূর এগিয়ে বাওয়ার ধ্বনত খেয়েই নির্বাক হয়ে গেছে, তড়িৎই জুগিয়ে দিল—“তড়িৎ মিত্র।”

“তড়িৎ মিত্র।...রিকশা চালাচ্ছেন আজকাল, এই সহরেই!”

বেশে-চেহারায় ছন্দকে অবসরপ্রাপ্ত বড় চাক্রে বলেই মনে হয়। নলিনাক যে-ভাবে কথটা বললো তাতে যেন বেশ একটি ঢালোজের ডাব আছে, যেন জেনেগুনই বড় চাকরির ওপরে তড়িৎের এই ছোট বৃত্তটাকে তুলে ধরে তার মহিমাটা বাড়িয়ে দিল, এই প্রথম সুযোগটুকু হাতে পেয়েই। ঘরের হাওয়াটা কিরকম হয়ে গেছে, কথা কইলেন ওদেরই একজন, তড়িৎকে কতকটা যেন ঘটা করেছে হাত তুলে নমস্কার করে বললেন—“বাঃ, বড় মুখের কথা। কত দিন ধরে চালাচ্ছেন?”

“তা প্রায়...”

ওর উত্তর শেষ হওয়ার আগেই ভদ্রলোক মুখটা মন্সীর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন—“কই না, তোমার বাজনা নীরব যে?”

একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মোড় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্তেই মন্সী একটু হেসে এপ্রান্তটা তুলে নিতে যাচ্ছিল, নলিনাকই আবার বাধা দিল। ভদ্রলোকের অবস্থার ভাবটা ও মোটেই বরদাস্ত করতে পারেনি; বললো—“গানের চেয়ে আমরা ভালো একটা টপিক্ পেয়ে গেলাম তো আজ—আজ আর থিয়েরী নয়, তড়িৎবাবু হলেন প্রত্যক্ষ উদাহরণ আমাদের মর্যাদার—তাই সেই আলোচনাই চলছিল, এমন সময় আপনারা এসে পড়লেন...”

ভদ্রলোক হেসে বললেন—“তাহলে তাই চলুক না। রিকশা টানলুম না বলে টানার মর্যাদা, অর্থাৎ দৈনিক জীবনের মর্যাদা যে না-বুঝি এমন নয় তো...”

একটু ঠেস দিয়ে কিন্তু তখনই আবার হালকা করে দিলেন মন্তব্যটা; বললেন—“বরং বেশি করেই বুঝি—এই যেখন না, শুধু কলম শিবে আর চেয়ার ঘামিয়ে—আমি অবস্টিনেট ডাইবিটস ক্লাব, ডাক্তারে হাল ছেড়ে দিয়েছে, ওর হাই ব্রাড-প্রোসার—অবসর-জীবনে শুধু মেস বাড়িয়ে বাওয়া ভিন্ন আর কাজ নেই...”

হাত ছুটো চিত্তিয়ে তুল শরীরের দিকে চাইতে একটা হাসি উঠল। আলোচনার দিক পরিবর্তন করবার ক্ষেত্রেই আবার প্রশ্ন করলেন—“তা আপনি আর কি করেন? মানে...”

তড়িৎ হেসেই বলল—“বাঃ, আপনাবাই তো বললেন রিকশা-টানার চেয়ে বড় কাজ আর কিছুই নেই।”

হাসির ওপর কথাটা পড়ায় এবার বেশ জোরেই হাসি উঠল। বেশ সহজ পথেই আলোচনাটা চলত, কিন্তু আবার বাধা পড়ল। শুধু বাধাই নয়, এমন হোল যে, আলোচনাটা একেবারে বিতর্কের কোঠায় গিয়ে পড়ল।

অমিয়রতন এমে উপস্থিত হোল, সঙ্গে আরও তিন জন, হাত ছুটো কপালে তুলে সবাইকে একটা এজমালি নমস্তার জ্ঞানিয়ে বললো—“বাঃ, কৈ গান কোথায় মল্লীদেবীর? সেরি হয়ে বাচ্ছে মনে করে হনহন করে চলে আসছি আমরা...”

নলিনাক্ষ আবার আগেকার কথাই বললো—

“গানের চেয়ে একটা বড় জিনিস আজ পেয়েছি আমরা, অমিয়রতনবাবু। গান আপনি খেমে গেছে বলতে পারা যায়।”

তড়িৎ কিছু বলতে যাচ্ছিল; ওর পক্ষেই সবচেয়ে অসম্ভবিকর তো, তার আগেই অমিয়রতন বেশ ঝাঁক-টোনেই বললো—“গানের মতন স্বর্গীয় জিনিসকে আসর থেকে তাড়ায় তাকেও উৎকৃষ্ট বলতে হবে? তা বেশ, বস্তুটাই কি জানতে বাধা আছে কি?”

“সাক্ষাৎ ডিগনিটি অফ লেবার। তড়িৎবাবু— এই সহরেই থাকেন।” হাতটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল নলিনাক্ষ।

অমিয়রতন বললো—“রাঁচীতে থাকা খুবই জম-সাধা স্বীকার করি—পদে-পদেই চড়াই-ওংরাই, কিন্তু তাকে তো ডিগনিটি অফ লেবার বলা যায় না।”

“রিকশা চালান—নিজে—আপনাদের এই চড়াই-ওংরাই অগ্রায় করে।”

অমিয়রতন ঘাড়টা কिरিয়ে চাইল তড়িৎের দিকে। অসম্ভবিত্তে চুপ করে বসে আছে, আরও কেউ যেন কোন কথা এনে এ-প্রসঙ্গ চাপা দিতে পারছে না, ঘরটা নিস্তক। যানিসটা কৌতূহলী হয়ে একটা অদৃষ্ট কিছু দেখবার নজর করে দেখে নিয়ে অমিয়রতন মুখটা ঘুরিয়ে নিল : বললো—“এ! ...তা আমি কিন্তু সায় দিতে পারলান না তোমার কথায়। বেহনতের কাজ আরও অনেক আছে। একেবারে নীচে নেমে গিয়ে রিকশা চালাতে হবে, কি মুটেগিরি করতে হবে, কি ব্যবসার দিকে গিয়ে মাছ বেচতে হবে, পান বেচতে হবে—এটা আমি বিশ্বাস করি না। আর এটা যেন নিতান্ত একটা শো-ও (show-ও) হয়ে হয়ে, ঘটা করে লোক দেখানো। তা ভিন্ন আর একটা কথা আছে।”

“ওনি...”

মুখটা ধমধমে হয়ে গেছে নলিনাক্ষর, তবে তর্কের গন্ধ পেয়ে যানিসটা খুশিও ভেতরে ভেতরে, প্রসঙ্গটা তো চাপাই পরে যাচ্ছিল। প্রশ্ন নিয়ে চেয়ে রইল।

অমিয়রতন বললো—“এখানকার লোকের অসুযোগ, আমরা এনের সব জায়গা দখল করে মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছি—ওকালতি, ডাক্তারি, বড় বড় চাকরি, কিছু বড় বড় ব্যবসাও : অবস্থাটা ভাইতে বা পাড়িয়েছে মনে-প্রাণে তা অস্বস্ত করছি আমরা। এর ওপর আবার ওদের গায়ের জোরের কাজ থেকে হঠাতে গেলে, যাতে নাকি ওরা বিশেষ করে দক্ষ...”

“আগে এই কথাটারই জবাব দিই পাড়াও—

বাধা দিয়ে আরম্ভ করল নলিনাক্ষ—

“হতদিন অস্ত্রকর্ম কাজের ক্ষেত্রে ওরা শিক্ষা পায়নি বা নেয়নি, এগোয়নি সেনিকে, ততদিন গায়ের জোরের কাজেই শুধু দক্ষ এ-কথাটা হয়তো বলা চলত। এখন বলা ওদের পক্ষে অপমানকর। দ্বিতীয় কথা—ক্ষমী নিয়ে ঈর্ষা-বিদ্বেষ সেটা উচ্চস্তরে যে-পরিমাণে আছে, নীচুস্তরে সে পরিমাণে নেই।

বাঙালী উকিল হয়ে কি ডাক্তার হয়ে, কি একটা বড় চাকরে হয়ে এখানকার উকিল, ডাক্তার কি বড় চাকরের চক্কশুল হতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে, গায়ে খেটে ছ'পয়সা রোজগার করলে কিন্তু সেটা হয় না—”

“হবে না কেন? আমি তো দে-কথাই বলছিলাম। এক্ষেত্রে বাঙালীরা এখনও প্রবেশ করেনি বলে হয়নি। করলে, বাঙালী রিকশাওয়ালা এখনকার রিকশাওয়ালা, বাঙালী কুলীতে এখনকার কুলীতে ঐরকমই অস্বীকৃত অবস্থা পড়াবে...”

সেবগ্রসরবাবু যোগ না দিয়ে পারলেন না। বললেন—“আমি আশা করি, পাড়াবে না। আমার জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যারা, আমরা থাকে ছোট কাচ বলি, তাই নিয়ে থাকে, তাদের মন তত সংকীর্ণ নয়। একটা রেবারেবি থাকবেই, সেটা তো নিজের ভাতের মধ্যেই রয়েছে সর্বত্র, কিন্তু থাকে বলা যায় বিভাতীয় ঘেব-হিংসা সেটা বড় একটা থাকেনা দেখেছি। একে তো যা উপার্জন সেটা তখন দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো নয়, তা ছাড়া লজ্জা করে দেখেছি, থেকে যায় স্পোর্টিং স্পিরিট—প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একটা উপারতর ভাব সেটা, যারা শরীর খাটিয়ে খায় তাদের মধ্যে বেশি—এরা ঘেটাকে বলে ‘খুলে ময়দান’ অর্থাৎ ‘ওপন কম্পিটিশন’, সেখানে কাকুর বাধা নেই; তারপর যে পারলে নিজের করে নিতে।”

একটু চুপচাপ গেল; অনিয়রতন উত্তর পুঁজছে।

তার আগে নলিনাক বললো—“যদি থাকেও কিছু, সেটাকে ঘোরালো করে তোলবার অস্ত্র নেই ওদের হাতে। বুদ্ধিজীবীদের হাতে খবরের কাগজ রয়েছে, আইনসভা রয়েছে...”

নবাগতদের একজন একটু হেসে বললেন—“এক কথাই বলুন না, মাথায় বুদ্ধি রয়েছে, ঐটিই যে ঘত সর্বনাশের মূল।” তড়িতের দিকে চেয়ে বললেন—“আপনি ভালোই করেছেন এই বুদ্ধির এলাকা থেকে সরে এসে।”

অথবা একটা খোঁচা, তড়িৎ কিন্তু হেসেই বললো—“বুদ্ধিমানের কাজ করেছে বলুন।”

একটা বেশ হাসি উঠল। তড়িতের ইচ্ছাই ছিল এই অবাকিত প্রসঙ্গটা বললে ফেলা—তাকে কেন্দ্র করেই সেটা উঠেছে, কিন্তু হাতে পারল না।

সেবগ্রসর একটু আশ্বস্ত হয়ে চিন্তা করছিলেন, নিজের যুক্তিটা টেনেই বললেন—“আর যদি আমার আন্দাজটা নাই ঠিক হয়, অত স্পোর্টিং স্পিরিট না-ই থাকে ওদের মধ্যে, তবু এগিয়ে আসতে হবে নীচু থেকে উঁচু পর্যন্ত উপার্জনের সব ক্ষেত্রে। নীচুর দিকে কেউ আসছে না বলেই ওদিকটা ভর্তি করা বেশী দরকার। একটা জাত মাত্র কিছু বুদ্ধিজীবী নিয়ে টেঁকে থাকতে পারে না, তার মাথাটা যথাস্থানেই থাক, কিন্তু সেটা ভুলে ধরে রাখবার ক্ষমতা মেকনগের দরকার, শ্রমজীবী হোল আতির সেই মেকনগও। বাঙালীর সেই মেকনগ ভেঙে পড়ছে—পড়ছে বলাই ঠিক।”

অনিয়রতনও পূর্বের একটা কথা টেনে নিয়ে এল: বললো—“শ্রমজীবী যে ক্ষান্তের মেকনগ এ-কথা অস্বীকার করব কেন? আমি বলছিলাম—যারা মেকনগ তারাই মেকনগ হয়ে থাকে সেটাই শোভা পায়, কেননা তারা তাতেই অভ্যস্ত। ভ্রমঘরের ছেলেরা যখন সে ভূমিকার নামে তখন সেটা যেন হয় একটা শো—লোক-দেখানো কিছু একটা—কতকটা বিলাত থেকে কেয়ার পথে জাহাজেই ধুতি-চামড় প'রে নামা।...তড়িৎবাবু রাগ করবেন না, তর্কের খাতিরে বলতে হোল।...কেমন যেন বেমানান হয় না?”

তড়িৎ বললো—“বাঃ, একটা শো মিড্ডি, দর্শকদের কে কি বলাছে তাতে রাগ করলে চলবে কেন?”

কের একটা হাসি উঠল। কিন্তু হাওয়াটা মোটেই পরিষ্কার হতে পারছে না। নলিনাক হাট পথেই থাকে, তবু—ইউরোপ-কেরত বলে কোথা দিরে কথাটা লাগলই, একটু চুপ করে রইল, তারপর বললো—“বেমানান কোনখানটার? স্বাস্থ্য-পেশীতে

উনি তাদের কাকুর পাশে যেমন বেনানান নন, তেমনি এই তো আপনার পাশেই বসে রয়েছেন— কুশন-চেয়ারেই ১০০টা, ঠর চেয়ে কেউ যে বেশি মানানসই এখানে, এমন তো বোধ হচ্ছে না আমার।”

একেবারে উৎকট রকম ব্যক্তিগত কটাক্ষ; পক্ষ অবলম্বন করেছে ভেবে ঠিক ভাল রাখতে না পেরে তড়িৎকণে বিস্তীর্ণকম জড়িয়ে ফেলেছে, সবাই যেন কি করবে ভেবে উঠতে পারছে না। মমীর অবস্থার আরও খারাপ, উত্তরোত্তর ব্যাপারটা এত জটিল হয়ে উঠছে যে, কিছু একটা ছুতো ক’রে উঠে পড়বে তারও ঝাঁক পাচ্ছে না।

ওকে বাঁচালেন দেবপ্রসন্নই। উনি সেই রকম আত্মস্থ। সব কথা হৃদয় কানেও যাচ্ছে না, অসঙ্গতি-অভিভাষা কোথায় এসে পড়েছে সে-দিকে খেয়াল তো নেই-ই। অমিয়রতনের একটা কথা ধরেই চিন্তা করছিলেন, কতকটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বললেন—“যারা নীচের স্তরে রয়েছেন, পুরুষায়ক্রমে কায়িক অর্থে অভ্যস্ত, তারা যে ওপরে উঠে আসতে পারবে না, এ কথাটা এ যুগে অচল। তবু হুঁজি হিসাবে মূল্য আছে বৈকি কথাটার—বিশেষ করে এ যুগটা যখন শ্রম-মর্যাদারই যুগ। তবে বাংলার সামাজিক ইতিহাসটা যেন জগৎ-ছাড়া; শ্রমজীবী সম্প্রদায় অলস-অকর্মণ্য হয়ে জাতিকে একেবারে ধ্বংসের মুখে এনে ফেলেছে। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় এইরকম সংকটকালে ঘাদের—সংস্কারবশেই আমরা অধিকারী নয় বলি, তাদের এগিয়ে এসে আদর্শ সৃষ্টি করতে হয়—যেদের পরতে হয় সৈনিকের বর্ম। এই জগ্গেই কবি, রাষ্ট্রপতি এঁদের লাঙল ধরে উদাহরণ সৃষ্টি করতে হয় সবার সামনে।...তড়িতের কথায় আসা যাক, কোন প্রয়োজনের বশেই ও এ-কাজটায় হাত দিয়েছে কিনা জানা নেই আমার। তবে একটা আদর্শ যে সৃষ্টি করেছে এতে কোন সন্দেহই নেই। আর আদর্শ সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্য নিয়েই যদি হাত

না দিয়ে থাকে তো, সে তো আরও ভালো; আদর্শ সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্য থাকলে তার সঙ্গে তো একটা ‘বাহবা’র প্রত্যাবাস্য থাকে...”

অনেকটা হালকা হয়েছে, মমী আর কৃপণগণটা হাতছাড়া না করে উঠে পড়ল; বললো—“চা’টা দেরি করছে কেন দেখি।”

একটু পরে আবার গরম বিতর্কের মধ্যেই গরম চা আর শিঙাড়া এসে পড়ল। ইতিমধ্যে আরও দুজন ভ্রমলোক এসে পড়েছিলেন। চা পর্ব ছাড়িয়েও যখন জোর তর্ক চলছে, তারই মধ্যে আস্তে আস্তে আসর খালি হয়ে এল। ক্রমে আরও ত্রিমিত হয়ে এল আসর; একসময় অমিয়রতনও গেল উঠে, শুখন আর বিতর্ক নয়, তিনজনেরই একমত, একতরফা আলোচনা চলল কিছুক্ষণ; বিবরণ স্ববলেও গেল।

নলিনাক্ষ উঠতে গেলে তড়িৎও উঠে পড়তে যাচ্ছিল, মমী বললো—“আপনি বসুন।...যেয়েই যাবেন একেবারে।”

তড়িৎ বললো—“অনেক রাত হয়ে গেছে, আরও যাবে।”

“দেই জগ্গেই বলছি।”

“যেতেই দিন”—অমুরোধের দৃষ্টিতে ঝড় কাৎ করে চাইল তড়িৎ।

দেবপ্রসন্ন বললেন—“আর কিছু না হোক, আজ আসরটা জমেছিল খুব। একেবারে ছুটিতে পড়ে যাবে।”

তড়িৎ একটু হেসে বসতে বসতে আবার দাঁড়িয়ে উঠে বললো—“আপনাকে তাহলে পৌছে দিয়ে আসি নলিনাক্ষাবা।”

নলিনাক্ষ প্রবল আপত্তি করে উঠল—“না না, সেকি, পৌছতে যাবেন কেন?”

“বাই না। এত উৎসাহ দিয়ে একেবারে দ্রমিয়ে দিচ্ছেন যে, কিছু উপার্জনও তো হতে পারে।”

সবার হাসির মধ্যেই নলিনাক্ষ বিদায় নিল।

তিনিজন বাইরে বসে গল্প করছিল; বাগানের মাঝখানে খানিকটা গোল ঘাস-ভূমি আছে। একসময় পাচকাঁকুর জিগ্যেস করতে এল—খাবারের ব্যবস্থা করবে কিনা।

দেবপ্রসন্ন উঠে পড়লেন : বললেন—“তোমরা বোম্বা একটু, আমি আমার ইন্‌হুলিন ইনজেকশনটা নিয়ে নিশে। খেতে আমাদের এইখানেই নাও ঠাকুর, বেশ জোয়ালা আছে।”

ভেতরে চলে গেলেন। মন্ত্রী একটু যেন মনমরাই হয়েছিল গল্পগুচ্ছের মধ্যে; বললো—“আজ বুকে পারলাম কেন আপনি নিজেরের জাতের কাছ থেকে আত্মগোপন করে থাকতে চান, তড়িৎবাবু। কী যে কুৎসিত কাণ্ডটা হোল—এখন আপসোস হচ্ছে কেন আপনাকে আগেই ছেড়ে দিইনি।”

তড়িৎ বললো—“আমারও আপসোস হচ্ছে। তবে নিজের জন্তে মোটেই নয়, আপনাদের খানিকটা সঙ্গীতিকর অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটল।”

“নয় কেন নিজের জন্তে? সত্যিই আমরা যে কতটা লক্ষিত আপনাদের কাছে! জ্যাঠামশাইও নিশ্চয়। অবচ তিনি এত ধুঁসী! দেখতেই পাচ্ছেন সেটা। অথচ আপনাকে যে আসতে বলব মাঝে-মাঝে সে মুখ রইল না আমাদের।”

“তাতে বাধা নেই, মন্ত্রীদেবী। অর্থাৎ আসতে বলায়। আসার সামলবার ক্ষমতাও আছে আমার;

আজই না হয় প্রথম দিন বলে পারলাম না ভেমন। কিন্তু...”

“কিন্তু কি?—আসবেন—নিশ্চয়।”

“বলছিলাম—আমি এলেই তো আপনার গান বন্ধ হয়ে যাবে?...”

“আপনি গান-বাজনা জানেন নাকি!...ভালো লাগে?”

“অন্তত ততটুকু জানি যাতে বন্ধ হয়ে গেলে খারাপ লাগে। আমি গেট থেকেই চলে যাচ্ছিলাম। আপনার এশ্রয়ের স্থর শুনেই ঠর কাছে পরিচয়টা দিয়ে ভেতরে চলে এলাম...”

এ-আপসোস রাতে আর যেন ঠাই পাচ্ছেনা। মন্ত্রী, একবার অনিশ্চিতভাবে মাথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললো—“আজ যে বড় রাত হয়ে পড়ল...”

ভাবটা, তবুও যদি তড়িৎ চায় তো, এনে ফেল এশ্রাহটা। সেরকম কিছু ইঙ্গিত না পেয়ে বললো—

“কিন্তু টের পেলেন কি করে আমারই বাজনা? অস্ত কেউও তো হতে পারত...” সামলে নিয়ে বললো—

“অবশ্য তাতে শোনার আর ডফাত কি হোত?...”

শেষ কথাটা কানে গেল না তড়িৎের। ওর মন চলে গেছে সেই বর্ষা-মেঘের রাতে; অবিজ্ঞানত ধারাপাতের সঙ্গে সেই রাগিনী দেশ...

ইন্‌হুলিন ইনজেকশন নিয়ে দেবপ্রসন্ন বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। তড়িৎ বললো—“তার ইতিহাস আর একদিন শুনবেন।” [ক্রমশ:]



বর্ণাভিমান দিলীপকুমার দাস

ব্যক্তিগতভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে এক সমাজদ্বয়ের লোক অপর এক সমাজদ্বয়ের অত্যন্ত বৈষম্যমূলক আচরণের দ্বারা নির্ধাতিত হয়েছে, ইতিহাসে এমন নজিরের অভাব নেই। বর্তমানকালেও দক্ষিণ আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রাচ্যে বর্ণবৈষম্যমূলক এরা উক্ত অকর্তৃত্বাত্মক ধারণাকেই বহন করে চলেছে।

কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণ আমেরিকার বেসেতারদের অস্ত্র সংরক্ষিত পিটলসক হাট্টুলে, বুক্সারাস্টের হস্তীরা কোটের সিঁড়িতে অসুখায়ী, কয়েকটি নিম্নোচ্চ ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা নিয়ে ভীষণ গোপনযোগ দেখা দিয়েছিল। নিম্নোচ্চ ছাত্রছাত্রীদের ঐ ফুলে ভর্তি করা সম্পর্কে আপত্তি ওঠার প্রধান কারণ হ'ল নিম্নোচ্চ ছেলেমেয়েদের গায়ের রঙ কালো এবং সেসব ছাত্রদের বেতাক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একত্রে পড়াশুনো করতে দেওয়া যেতে পারে না। অসুখয় হুজির ভিত্তিতে দক্ষিণ আমেরিকাতেও ধর্মবিশ্বাসের সর্বক্ষেত্রে অসেতাকাররা বেসেতারদের সঙ্গে সমান অধিকারভোগে বঞ্চিত হয়েছেন এবং অসুখয় ওঠার বেসেতারদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হচ্ছে। সর্বজনসমক্ষে উৎকট সমাজরূপে প্রতিষ্ঠিত না হলেও, বুটেনেও গায়ের রঙের অস্ত্র অসেতাকারদের যে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় সেটা মোটেই প্রীতিকর নয়।

উক্ত বেশগুলিতে অসেতাকারদের উৎপীড়ন ও বঞ্চনার সমর্থনে কোথাও আছে অসিদ্ধিত সামাজিক অনুশাসন ও রাষ্ট্রের অব্যাহিত নীতিবলতা, আবার কোথাও আছে রাষ্ট্রাধিকারিত কঠোর বিধান ও তার পশ্চাদমুখী অসুখয় সামাজিক ব্যবস্থা। সর্বক্ষেত্রেই অসেতাকারদের বিভিন্ন উপায়ে নিপুণীভূত করবার অস্ত্র তাঁদের গায়ের রঙ যে স্বীকৃতি পেয়েছে, মানুষ হিসেবে তাঁদের অস্ত্র সেই স্বীকৃতি প্রাপ্তি।

বর্ণাভিমান জাতিগত উৎকর্ষমূলক সংস্কারের সঙ্গে সংঘর্ষে। কোনো অনায়াসসাধ্য উপায়ে মানুষের জাতিবিচার করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পরিসংখিত সকলপ্রকার পার্থক্যকে জাতিগত উৎকর্ষ বা অপসর্গের নির্ণায়ক বলে কল্পনা করবার যে জাতিতত্ত্বীয় রীতি আছে, বর্ণসর্গের প্রত্যয়েও ঐ রীতি প্রযুক্ত হয়েছে গারবর্গের বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে।

বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর বহুগত যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেগুলি উজ্জ্বল হয়েছে

অভিব্যক্তির দ্বারা। জাতিগত উৎকর্ষ বা অপসর্গের সঙ্গে অপসর্গিত হয়ে। সেনেটের থেকে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর উচ্চ সম্পর্কে যে-সব তথ্যাবি পাওয়া যায় এবং তৎসমুখী মানুষের 'জাতি'র যে সংজ্ঞার নিরূপণ করা হয়ে থাকে তাতে জাতিগত উৎকর্ষমূলক সংস্কারের সমর্থনে জৈববৈজ্ঞানিক সমস্ত কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানীরা জাতিগত উৎকর্ষের কথা অস্বীকার করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কয়েকটি জাতিতে বিভক্ত করলেও, জাতিগত পার্থক্যের দ্বারা কোনও জাতির অথবা সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গুণগত চূড়ান্তরূপে নির্ণীত হতে পারে না।

ধর্মবিশ্বাসের একটি অঙ্গতম বৈশিষ্ট্য হ'ল বৈচিত্র্য। মানুষের ক্ষেত্রেও ঐ বৈচিত্র্য ব্যক্ত হয়েছে মানুষের যে পার্থক্য আছে তার দ্বারা বিশেষ। যদিও এই পার্থক্য নিত্যন্তই ব্যতিক্রমিক, তাহলেও অনেক সময়ে একে মনে করে গোপন সামনে ফুলে খসে পড়ে যায় বলে বৈজ্ঞান্য ও বিজ্ঞানের সংকেত বলে, যেমন কর: হয়েছে মানুষের ক্ষেত্রে ও অসেতাকারদের মধ্যে। পার্থক্য আছে বলেই একজন অপসর্গের প্রতি বিরুদ্ধতাবোধ হয়ে ওঠে না। যদি তাই হ'ত তাহলে সর্গকারদের সঙ্গে বর্গকারদের কিংবা মূলকারদের সঙ্গে সর্গকারদের অথবা অসুখয় পার্থক্যবিধি ব্যক্তিদের মধ্যে বিরোধের আর অস্ত্র থাকত না, এবং যে সমস্ত দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কে যে সহনশীলতা আছে সেটাও কখনও দেখা দিত না।

বৈষম্যমূলক আচরণ করবার স্থির উদ্দেশ্য থাকলেই সকলপ্রকার পার্থক্যের প্রতি সংশ্লিষ্ট কৃষ্ণর পক্ষে ও, আত্মপ্রত্যয় বজায় রেখে, নিষেধের সঙ্গে অপসর্গের পার্থক্যগুলিকে খণ্ডিত বলে মনে করবার চেষ্টা করা হয়। এই ধরনের উদ্দেশ্য, যার লক্ষ্য হ'ল বৈষম্যমূলক আচরণ, অপসর্গতার নামে অভিহিত হয়ে থাকে। অপসর্গস্বারা অসুখয় বৈষম্যমূলক আচরণের দ্বারা যে নামাঙ্কিত অবিহিত কাজে মানসিক প্রতিবন্ধের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কারণ, কোনোপ্রকার চূড়ান্ত করলে তৎক্ষণিৎ বিবেকের পীড়ন থেকে মুক্তি পড়ে ও ঐ কাজ হুজিরূপে বলে কল্পনা করবার অস্ত্র হুজিভাষ্য নামক যে মানসিক প্রক্রিয়া অবলম্বন

করা হয়ে থাকে সেটা অনেকখানি সহজ হয়ে উঠতে পারে অপর্যায়ের সহায়তঃ পেলে। অব্যাক্তীয় কোনও কাজ করতে হ'লে যে কোনও মানুষ স্বাভাবিক অবস্থার বিরত হয়ে, কিন্তু অপর্যায়ের অপর্যায়নে অভিকৃত হন নিজে অনেকটা বিখ্যাতীম চিন্তেই সে ঐ কাজ করতে পারবে।

অতীতে অবেতকারদের শোষণ ও দমন করার জন্য যেতকাররা যে সমস্ত অবিরতি আচরণ করেছিলেন, সেগুলির পক্ষে দাবী হিসেবে নিজাদের উৎকর্ষ সম্বন্ধে যে অতিক্রমের অবতারণা তাঁদের করতে হয়েছিল, তারই উপর ভিত্তি করে আধুনিক কালের বর্ণগত তথা জাতিগত অপর্যায় প্রচলিত হয়েছে। এই পরিস্থিতির সূত্রপাত হয়েছে ইউরোপীয় শক্তিবর্গে অতিক্রমের উপনিবেশ স্থাপন, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার ও সমুদ্রপথে প্রভীচা থেকে ভারতবর্ষে বাতরায়ত সফর করার পর থেকে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে মানবোচিত্রের বিভিন্ন পর্বাব্দে বিভিন্ন সমাজে স্বাভাবিক গরিবাবোধের অস্তিত্ব থাকলেও সেটা মূলতঃ নিবন্ধ ছিল ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক মন্ডির মধ্যে। দত্তগণের অমূলক বংশগত কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত সোজাতামূলক গরিবাবোধ এবং তদুত্তর সংস্কার ও আত্মমসিক বর্ণগত অপর্যায়ের তখন প্রচলিত ছিল না। প্রথম দিকে যখন ইউরোপীয় সভ্যসংস্কৃতির কেবলমাত্র বাণিজ্যিক প্রাণ উদ্বেগেই বিভিন্ন দেশে উপনীত হয়েছিলেন তখনও তাঁদের আগর-আচরণে কোনোপ্রকার জাতিগত সঙ্কটভাৱ দেখা দেয়নি। কিন্তু যোড়শ শতাব্দী থেকে সাম্রাজ্যবাদী ধার্ম এবং ধনতন্ত্রের ক্রমিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আধিপত্যের বোধ ও দুর্ভাবার প্রোভজন উক্ত সহজ সমাজের সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটাল।

নব্যবিজ্ঞান আফ্রিকা ও পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ইচ্ছা, তদ্যাক ও তুল্য আশাবাদের কারণে নিয়োগ করা হয়েছিল আফ্রিকা থেকে আনীত ক্রীতদাসদের। ঐ দেশগুলিতে ক্রীতদাস-সংস্কারের জন্য বিপুল আকারে দাস-বাসার গড়ে উঠেছিল; ১৬০০ থেকে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ১০০-৩০০ লক্ষ ক্রীতদাস আফ্রিকানি করা হয়েছিল। দাস-বাসাদারীর পদ্ধতিগত হিসেবে ও দাস-দাসিকদের দুর্ভাব-অবস্থার উপকরণ হিসেবে তখন নিগ্রোদের যেতকারদের হাতে চরম লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ করতে হ'ত। এর পর নিগ্রো ক্রীতদাসদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ও দাস-বাসাদারীর উচ্ছেদের জন্য যখন দাবি উঠেছিল তখন নিজেদের মুক্ততার দাবী হিসেবে ও দুর্ভাবার পথ বাটে অব্যাহতি থাকে সেই উদ্দেশ্যে ঐ

দাবির প্রত্যুত্তরে দাস-দাসিক ও দাস-বাসাদারীদের পক্ষ থেকে এই কথাই সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছিল যে, নিগ্রোরা হ'ল অস-মানুষ—মানুষের জ্ঞান বর্ধন পোষক বোঝা ওরা নয়। অপর দিকে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের কাছে পরাভূত দেশগুলির অবেতকার অধিবাসীদের পদমান্তর রাখবার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে কৃত সকলপ্রকার নিগ্রোহেত সমর্থনে মুক্তি হিসেবে বলা হয়েছিল অবেতকারদের 'মানুষ' কল্পনার জন্য যেতকারদের স্বাভাবিক দাবিদের কথা। এই সমস্ত মুক্তির বৈজ্ঞানিক সার্থকতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও হয়েছিল এবং এর ফলে ভারতবর্ষের অভিব্যক্তিবাদকে বিকৃত করে উদ্ভূত হয়েছিল সামাজিক ভারতবর্ষবাদ। প্রাকৃতিক নির্বাচনে জীবসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতার ডাব দ্বারা সেয়ে সংযোগিতার ডাব মুক্তি পাবার সম্ভাবনা আছে—ভারতবর্ষের অভিব্যক্তিবাদের এই অংশটুকু গ্রহণ করে সামাজিক ভারতবর্ষবাদে সংযোগ ও সংঘর্ষের বিষয়েই স্পষ্ট করে বলা হ'ল যেতকারদের হিংস্রতাকে মানবসমাজে একটা স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে গণ্য করার জন্য। উদ্ভবতন্ত্রের সংযোগে যেতকাররা স্বাধীন হয়েছেন, অতএব প্রাকৃতিক নির্বাচনে এরাই যোগ্যতম, বিকৃত অভিব্যক্তিবাদে এই ছদ্ম আবারদের অন্তরালে থেকে যেতকাররা তাঁদের সকলপ্রকার গবিত কাজ জ্ঞান-সংগত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন।

এইভাবে সামাজিক কালের ইতিহাসে, মানুষের সামাজিক বিকাশের এক বিশেষ চর্চা, বদলপিত্ত যেত-কাররা তাঁদের উগ্র লোভ চরিতার্থ করার জন্য, কোনোপ্রকার জৈব প্রতিক্রমিক আধারগততা না থাকা সত্ত্বেও অবেতকারদের অগ্রগতির করে ভুলবার কুমতলবে তাঁদের (অবেতকারদের) সম্বন্ধে মান-বর্ধন-সাধককারী যে-সব অতিক্রমের অবতারণা করেছিলেন সেগুলি আজও একটা চিরগত প্রশ্ন হিসেবে ও অপর্যায়-রূপে যেতকার-সমাজ প্রচলিত আছে।

এক সম্ভাব্য সম্পর্কে অপর সম্ভাব্যের সম্ভাব্যতার উপরও অপর্যায়ের প্রবর্তন ও প্রচলন অনেকটা নির্ভর করে। পরম্পরকে জানবার ও বোঝবার চেষ্টা না থাকলে অথবা প্রয়োজন না হ'লে বিভিন্ন সম্ভাব্য সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত হয় ও অপর্যায়-পরিণতির পথ প্রশস্ত করে তোলে। প্রচলিত কিংবদন্তীগুলি বিভিন্ন প্রকারের হ'তে পারে এবং এগুলি বহুলাংশে অজ্ঞাতপ্রবৃত্ত ও ভুল ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। কোনও এক সম্ভাব্য সম্পর্কে যদি অপর এক সম্ভাব্যের

মধ্যে কতজন কিংবদন্তী প্রচলিত থাকে তাহ'লে বার্ষ-
সংগঠিত পক্ষ থেকে, ঐ ধারণাগুলির ভিত্তিতে, যেমত
সম্ভবপায়ে প্রথমেই সম্ভবপায়ে বিরুদ্ধে অপসারণের
কার্যকলাপে উত্তেজিত করে ছুলাতে বিশেষ বেগ দেয়।
এ অজ্ঞাতকালে প্রব্র যিরে স্টোকে অপসারণের
আশ্রয়স্থল করে ছুলাবার চেষ্টা; নজির হাজারীভিষ্মে
ঘটেই আছে। সেই চেষ্টাই হাঙ্গল অবৈধতা ও হাঙ্গল
স্বাভিক্রান্তে বর্ণ-বৈধব্যমূলক প্রথাকে জীয়ে রাখবার জন্য
কার্যকরী হয়েছে।

অসমগত্ৱৰ মানুহেৰে কোনও সহজতে বৈশিষ্ট্য নহ, এই উপপত্তি প্ৰধানতঃ নিৰ্ভৰ কৰে বে-পৰিবেশেৰে ৰখা মানুহ বাস কৰে তাৰ উপৰ। অসমগত্ৱৰমূলক শিক্ষা না পোলে নিজদেহে কাৰ্যকলাপে কৰণও অসমগত্ৱেৰে প্ৰভাৱ লক্ষ্য কৰা হয় না। দক্ষিণ আফ্ৰিকা বা দক্ষিণ আমেৰিকাৰ ল্ভাৱ সমাজ-বান্ধৱ বৈশিষ্ট্য জীৱনেৰে নিৰত অভিজ্ঞতা থেকে যদি কোনও হেতকাৰ শিশুৰ এই বোধ জন্মে যে গায়েৰে বস্ত্ৰেৰে সজ্জ তাৰ অগাধ অধিকাৰ বাহেৰে অৰেত-কাৰণেৰে অৰজা কৰহাৰ, তাহ'লে, তাৰ মানসগত্ৱৰ বিবেচনা কোনও পৰিৱেশত ঘটাব হুহোণ দেখা না দিলে, এই শিশুৰ মনোৰে ও ডবিষ্ট জীৱনেও লক্ষপ্ৰকাৰ আচাৰ-আচৰণে উক্তি প্ৰভাৱেৰে প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত কৰা। অসমপণে, 'তীৰ' বৰিবেহেমূলক অবস্থাৰ ৰখা আফ্ৰিকাৰীক সৌধেৰে গুণে বৰ্ণিত অসমগত্ৱেৰে মিলিতা থেকে মুক্ত থাকও সন্তান।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সুরাহার আদায় থাকলে এবং উৎসাহ-মুগ্ধিত হলে যারূপের বনের জটিল গহবরে গভীর প্রতিজ্ঞা দেখা দেয় তাকে স্বেচ্ছায় প্রণয়িত করবার জন্য প্রয়োজন হয় স্বয়ং ব্যক্তির। কারও ব্যক্তিগত গঠনে আশাশঙ্ক্য থাকলে প্রায়শই তিনি অসফল হন তাঁর উৎসাহ হিন্তের ক্ষোভে প্রণয়িত করতে এবং তাঁর মনোভাব হয়ে ওঠে আত্মবিশ্বাস, কোনও কিছুর প্রতি আশাও হেনে অবশ্য আত্মশ্রম প্রকাশ করে তিনি তখন তাঁর মনের আগুন ঘেঁষাতে চান। এইরূপ অবস্থার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতীকী হিসেবে অশপাঙ্ক্য মনের সহবর্তী হয়ে উঠতে পারে।

অনেক নবর সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থার দরুন দৈনন্দিন জীবনের বিমূর্ততা থেকে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে অসন্তোষ বৈশা দিতে পারে। অসন্তোষ ঘটবার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবার জন্য এক প্রকারে স্বার্থপরতা লোক মানুষের মনের উপরিতক প্রবণতার সহায়তায় অসন্তোষের বোকাআল দেতে জনসমাজের এক অংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে চেষ্টা করেন এবং জনসাধারণকে সামাজিক-রূপে বিভ্রান্ত করে।

যাৱা পৰিচালিত হ'ৱে বে-কোনোপ্ৰকাৰ সন্দেহ বা অসংগতবস্তুক কাৰ্যসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ যিহেঁতু যোগ্য কৰিব নোৱাৰে। এইদৰে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ সৰ্বোচ্চ সোণাৰ কাৰ্ভোকাৰণেৰে নিৰ্ভৰতাৰ দৰবাৰ এৰা অসম্ভৱিক নহ'ব, এবং এই কাৰণেই ঐ দেশে ব্যৱসায়িকো বন্দ্যৰ সম্বন্ধে কিংবা অৰ্থনৈতিক শৃংখৰৰে নিয়ন্ত্ৰণ-বিধেয়তা তীব্ৰতা বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়। 'ইংৰাজ ৰেভলুছন'ৰ পাৰ্ৱৰ্তীকৰ জিৱিৰ তুলেই দক্ষিণ আমেৰিকাতে বৰ্ণবিষয়বস্তুক আঁতৰিহালিব পৰাওঁৱৰে ব্যৱস্থাতা হ'ল।

কৰ্মসংস্থানৰে অশ্ৰাৱণেৰে সম্বন্ধ দেখেহে বুটেনেও খেতকাৰ্য্য হানীৰ অশ্বেতসাধনেৰে সৰ্বোচ্চ প্ৰতিবেশিতব্যৱস্থাৰ গণিতীয়া লব্ধক কৰে। ইংৰাজে বিজ্ঞেয় হামলা কৰেচেন।

যে সমাজ বা রাষ্ট্ৰবাসিন্দাৰ অসংগতবস্তুক কাৰ্যসূচীত অন্তৰ্ভুক্তি প্ৰয়োজিত হ'বৰ সম্বন্ধেৰে আয়োজন আছে, সেই ব্যৱস্থাৰ অধীনত শিশু বা বয়স্ক যে কোনও ব্যক্তি সামাজিক বা রাষ্ট্ৰিক অস্থানসকলক অভ্যবসিক ব'লে মনে কৰে।

অসংগতবস্তুৰে অসংগতবস্তুত অতি সৰহকৈ শিশু হ'লে পাৰে

শৈশবের অধঃ আনন্দবয় অভিজ্ঞতা এবং পরবর্তী
জীবনে বীর অস্তিত্ব, সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তার
অভাব ঘটলে মানুষ হ্রস্ব ব্যক্তিহীনশ্য হ'তে পারে না।
এবং তার আচরণ-ব্যবহারে অসহিষ্ণুতা দেখা দেয়,
যে অর্থোক্তিক কার্যকলাপে আসক্ত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ
পরিবেশের কারণেই মানুষের বৃদ্ধিকার ঘটতে পারে এবং
সেই অবস্থায় তার শকে অশশংকার-বিহীন হওয়া অসম্ভব
নয়।

বর্ষাভিযানী বেতকারদের কার্যকাণ্ডে তাঁদের ব্রহ্ম ব্যক্তিগতহীনভাৱেই পৰিচয় লাভৱা যায়। এজন্ত আধুনিক কাণ্ডৰ জাতিবিধেয় ও বৰ্ণসত অংশকাৰেৰে তথাগামি অধ্যয়ন কৰে সমাজ-বিজানীয়া এই নিকাৰে উপনীত হইছেন যে, কোনও স্বাভাবিক বৈজ্ঞান্যেৰ জন্ত বেতকাৰেৱা আবেতকাৰেৰ অৱজ্ঞান বশে মনে কৰে ন, মানব-সম্বন্ধেই বিস্তীৰ্ণা ঘটনৈ পৰিচয়ে সমাজিক ও ৰাজ্যিক ব্যবহাৰেই বেতকাৰেৰে ব্ৰহ্ম কৰণেই এই মানবত-বিকৃত আচৰণে।

সমাজ-বিজ্ঞানীরা অশা পোষণ করেন যে, উদার
সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্ণভিমানের স্তায়
মানসিক বিকার খেতকারের মন থেকে দূর করা যেতে
পারবে এবং জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের স্বার্থ
যথাযথ প্রতিষ্ঠার দ্বারা সকল মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও
অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে।

ভাষান্ত্রিক সিকিম

শ্রীনিধিরঞ্জন রায়

[পূর্বপ্রবন্ধের পর]

হিমালয়ের কোলে ভারতের সীমান্ত সিকিম-রাজ্য। চোটে রাজ্য, কিন্তু রাজ্য ও রাজ্যগণের মহিমা বড়ো কম নয়। সামরিক শিক হিটেও সিকিমের অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সিকিমের একদিকে তুতান রাজ্য, আর একদিকে নেপাল। সিকিম আবার ভারত-ত্বিকারের মধ্যবর্তী 'বাল্ক' (buffer) রাজ্য। রাজ্যের আয়তন ত্রিকোণাক ২,৮০০ বর্গমাইল, আর জনসংখ্যা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মাত্র। রাজ্যের ঘোট রাজ্য প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। রাজ্যের শাসন-বিধানে রাজ্যের স্থান সবার উপরে—তবে সেটা মধ্যস্ত: আনুষ্ঠানিক। বাস্তবক্ষেত্রে শাসন-পরিচালনার সর্বোচ্চ দায়িত্ব বেগওয়ানসংঘের। শ্রী এন. কে. কুম্বজী, আই.সি-এফ হচ্ছেন বর্তমান বেগওয়ান। শিল্প-অঙ্গের লোক, বঙ্গল এমনও তরুণ, সদালাপী ও সদাভাষ্যের পুরুষ। বেগওয়ানজীর দল্লত দত্তের গিরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম—প্রায় দু'ঘণ্টা শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে নানা আলোচনা চলল। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-পরিচালনা সম্বন্ধে কুম্বজীর দৃষ্টি বোঝাল।

গ্যাংটক পথের আছেন ভারত-গভর্নমেন্টের পলিটিক্যাল এক্সট। পলিটিক্যাল এক্সট্রিণি অফিস থেকেই আছেন। ইনি অস্ত্রের ত্বিকারে হালাই লামার দ্বারাও ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। পরগানার যে-কোনো ব্যাপারেই সিকিম সরকারকে পলিটিক্যাল এক্সট্রের মাধ্যমে ভারত-গভর্নমেন্টের সঙ্গে পরামর্শ ও আলোচনা করিতে হয়। বৈদেশিক ব্যাপারে সিকিম সরকার পুরোপুরি ভারত-গভর্নমেন্টের প্রভাবাধীন। আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে সিকিম সরকার অনেকটা স্বাধীন। বেগওয়ানজী অল্প ভারত-সরকারেরই স্বার্থী চাহুরে, এখানে ডেশুটেশনে রয়েছেন। বেগওয়ান ছাড়া আছে একটা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল। একজন চীফ সেক্রেটারি এবং দুইজন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর নিয়ে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠিত। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর নিযুক্ত করেন মহারাজা নিজে। বেগওয়ানজী হচ্ছেন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভাপতি। শাসন-ব্যবহার বেগওয়ানজী হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী (ক্যান্সেলার)। ১৯৫১ কি '৫২ সনে সিকিমে একটা

সামরিক গণ-অভ্যুত্থান (coup d'etat) হয়েছিল। নেতৃত্বান্বিত করেছিল লোক মহারাজাকে বাধ্য করেছিলেন এক 'জনশ্রি' মন্ত্রীসভা গঠন করতে। তৎকালীন জনশ্রি নেতারা সিনকয়েরের ক্ষমতা মহারাজাকে কোণঠাণা করে শাসন-কর্তৃক দখল করে নিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে ভারত-সরকারের কাছে খবর গেল। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এসে বঙ্গালম্বরে গ্যাংটক রাজ্যের উপস্থিত হল। জনশ্রি মন্ত্রীসভার আনুষ্ঠানিক হুজিরে এল। মন্ত্রীরা পদচ্যুত হলেন। তৎবধি এক মনোনীত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মহারাজাকে শাসন-পরিচালনার সাহায্য করে আসছে। বঙ্গালম্বিকের দল্লত মহারাজা শাসন-ব্যাপারে নিজে দৃষ্টি সক্রিয় আশে গ্রহণ না করে মহারাজকুমারের উপরেই রাজ্য-কার্যের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। মহারাজকুমার বঙ্গল তরুণ, কর্মী ও শক্তির দক্ষিণমুখ-বঙ্গল। মহারাজকুমারের সম্মতি পত্রাবিরোধ হয়েছিল। এখনও বিতর্কিত দায়-পরিগ্রহ করেননি।

সিকিমের মহারাজা হিজ হাইনেস জার টাঙ্গি নামগ্যাম্বেল, কে-সি-এস-আই চল্লিশ বৎসরের অধিককাল রাজত্ব করে আসছেন। তাঁর রাজত্বের প্রথমবিক্রেই বাংলার তত্বানীক্সন লাটবাহাদুর লর্ড বোনাক্সে সিকিম-পরিগ্রহণে এসেছিলেন। হিমালয়কালে ব্রহ্মকালে পর্বতের সাহস্রমণে নিরাঙ্কল বঙ্গপাত হয়। সেই ঘটনার স্মৃতিই লর্ড বোনাক্সের ব্রহ্ম-গ্রন্থের নামকরণ হয়: *The Land of Thunderbolts*। মহারাজের বঙ্গল চৌধুরী বঙ্গল। কীলকার ও স্বর্গাকৃতি। শুভলাভ মহারাজের সম্বন্ধজন নাকি অত্যন্ত প্রায়। কোনো অমুঠানে মহারাজা নিজে উপস্থিত থাকলে কাটাং কাটাং সম্বন্ধতো অমুঠানের কার্যস্থী তরু করতে হয়। ভারত-গভর্নমেন্টের জনকরক উচ্চপদস্থ প্রতিনিধি একবার কোনো এক ক্ষত্রী বিষয়ে সিকিম-সরকারের সহিত আলোচনা করার ক্ষমতা এসেছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে মহারাজা এসেন আলোচনা-সভায়। আরও অনেক এসেছেন। কিন্তু ভারতীয় প্রতিনিধি-দলের মাঝে তখনও এসে পৌঁছননি। বেগওয়ানজী প্রথম কখনো—মিনিট-কয়েক অপেক্ষা করা যেতে পারে। কিন্তু হিজ-হাইনেস নামাক। কাজেই

নায়কে চাড়াই আগোচনা শুরু করতে হ'ল। এমিতর ঘট্টনা আরও ঘটছে। গ্যাটকের সরকারী মহল তাই সময়-বিধির খুব প্রাধান্য, বিশেষ খে-স্বত্রে মহারাজার উপস্থিতি থাকবার কথা।

আগে থেকে মহারাজার প্রাইভেট লেকটারি ও এ-ডি-ক্য-এই (aide-de-camp) সঙ্গে যোগাযোগ করে রাজপন্থনের একটা সময় নির্দিষ্ট করা গেল। সকাল দশটার সাফাং। নির্দিষ্ট সময়ের বেশ একটু আগেই প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে গিয়ে উপস্থিত হলো। গ্যাটক শহরের একদায়ে একটা পাহাড়ের উপর মহারাজার প্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের প্রধান প্রবেশদ্বারেই সজ্জিত সশস্ত্র গ্রহী। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে ঢুকবার মুখে গ্রহী স-বেছনেই বন্ধুত্ব ঘাড়ে ভুলে অভিযান জ্ঞান করল। এই অপ্রত্যাশিত সৌজন্যের জন্য অবশ্য দিলাম না। বুকলাম আশাব্যবহার সম্ভাব্য-পূর্ণ হতেই গ্রহীর জান। ভিতরে ঢুক ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি তখনও দশটা বাজতে হুড়ি মিনিট বাকি। এই সময়ই কি করে কাটাট? প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের একদিকে বিখ্যাত রাজ-গোন্দা। অগত্যা রাজ-গোন্দা দেখতে গেলাম। গোন্দা-পুষ্টি কাঠের তৈরী। ভিতরে ঢুকলাম। একটা প্রশস্ত কক্ষ। এক-পার্শ্বে বেদী। বেদীর উপর নানা কারুকাঁথার আসনে ধানী বুদ্ধের মূর্তি। মূর্তির সম্মুখে সারি সারি দীপ আলো। মূর্তির সম্মুখে থেকেই বসে ভক্তেরা ধ্যান করে, ভগবান বুদ্ধকে জানার প্রণতি। কক্ষ প্রবেশ করলে চোখে পড়ল এক মহত্ব-প্রতিমূর্তি বীরাসনে নিশ্চল নিশ্চল। শুনেছি সিদ্ধপুরুষেরা যখন সর্বাধিক হন তখন তাঁদের দেহের আনন্দ-লক্ষণ পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন ঘটত পরমহংস বাবরুদেবের। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার নাকি ঠাকুরকে সর্বাধিক অবস্থার পরীক্ষা করে দেখেছিলেন—ঠাকুরের চঞ্চলশব্দ ও নাকীর গতি সম্পূর্ণ ভ্রম—জীবনের কোনো লক্ষণই ডাক্তারী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। কোনো অবজ্ঞা-মনো-গোচর অতীতির লোকে সৌভাগ্যের পরমোদয় ঠাকুরের সত্তা একান্ত বিলীন হয়ে গিয়েছে। সাধা কি ডাক্তারী বিজ্ঞা এ পরম বহুস্তরের অবজ্ঞার উদ্ভাটন করে! বর্তমান গোন্দা-কক্ষে ছিলো, বাহ বাহ সেই স্বাপ্নেৎ প্রতিমূর্তি লক্ষ্য করছিলাম। এক-কি সত্যিকারের কোনো ধ্যানবস্ত্র বাহু, না অবিকল বাহুবস্ত্র প্রতিমূর্তি? বাহ বাহ হলে এই প্রশ্নই জাগছিল। বাহুবস্ত্র হলে এতদক্ষণ নিশ্চলক-বিকারিত চক্ষু চেয়ে থাকে সম্ভব কি? চোখের

পাতার বিস্ময়ের কক্ষন নাই! আর জীবন্ত বাহুবস্ত্র না হলে এতো নিশ্চল অবিকল মহত্ব-প্রতিমূর্তি হতে পারে কি? মাথার চুল, চোখের পল্লব, চোখের মণি, হাত-পা-চামড়া অদ্বৈত—কোথাও এতটুকু খুঁত নেই। অনেকক্ষণ পরে সব লক্ষণের নিরসন হল। মূর্তির অধ-প্রত্যয়ে সাদা জেগে উঠল। কোড়ম্বাণিত মুক্ত-করম্বাণি নিখিল হয়ে এল। মুখমণ্ডলের শৈলীগুলি স্পষ্ট ও বৃহৎ হস্তরেখাও উদ্ভাসিত হল। বুকলাম এতদক্ষণে এর ধ্যান ভাঙল। ইনি হচ্ছেন রাজ-গোন্দার প্রধান সাম্য। তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বুদ্ধকে অভিযান জানালাম। তিনিও এত অভিযান করলেন। এই সৌম্যদর্শন প্রৌচ লামার চেহারাও মতো বেশ একটা আকর্ষণীয় উপস্থান আছে। দেখলেই প্রকার উত্তর হয়। লামা তাঁর নিজ ভাষায় আমার উদ্দেশ্যে কি বললেন—বিকৃ-বিশিষ্ট পিতৃই আমি বুদ্ধকে পারলাম না। শেখারীর মাধ্যমে পবিত্রতা কথোপকথন হল। তিনি আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। পরিচয় পেয়ে সম্মোহ প্রকাশ করলেন। আমি তাঁর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ চাইলাম। নবজন্ম-বিনিময়ের পর বিদায় নিলাম।

এদিকে রাজপন্থনের সময় এসে গিয়েছে। গোন্দা হতে বেরিয়ে দেখি প্রাঙ্গণের জলপ্রপাত প্রাসাদের বাহ্যিকার মহোদয় ও তাঁর সহোদরী ভাইয়ে। তখন দাঁটার কাটাঘর দশটা। বুকলাম মহারাজা আশাব্যবহার জন্মই অপেক্ষা করছেন। অরিংপরে এগিয়ে গেলাম। নিকিমের শিল্প-অবিকর্তা শ্রীমৎসরজন যোগ আমার সাথে ছিলেন। তিনিই এগিয়ে গিয়ে মহারাজের কাছে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আগে থেকেই একদা হাক (ওড়না) সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলাম। এগিয়ে গিয়ে হু-হাতে স্বাক্ষরনা মহারাজার হাতে দিতেই, মহারাজা হু-হাতে খোঁচনা গ্রহণ করে আমার প্রত্যর্পণ করলেন। এ হচ্ছে নিকিমের এক বিশিষ্ট সৌজন্য-রীতি। সম্মানিত ব্যক্তিকে হাক উপহার দিতে হয়। তবে এক মহারাজা ছাড়া আর-সকলে সে হাক গ্রহণ করেন, মহারাজা ওটা কিরিয়ে দেন। মহারাজা সার টাসি নামগায়েল বেশ ইংরাজী বলেন, কাজেই আলাপাতির কোনো অসুবিধা হয়নি। রাজ-প্রাসাদের হুসজ্জিত বৈঠকখানায় এল বসলাম। পরিচয়কর ও আহার নিয়ে এল। চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে কথাও বর্তমান গলতে লাগল। শিবিরের বিগত দিনের কথা ও কর্তব্য উন্নয়ন-পরিচয়না নিয়েই বেশী কথা হ'ল। মহারাজা নিজেকে একজন চিত্রশিল্পী—ছবি একে অবসর সময় বাপন করেন।

ভারতীয় চিত্র ও ইউরোপীয় চিত্রকলায় মূল পার্থক্য সম্বন্ধে একই আলোচনা হ'ল। বলা বাহুল্য, চিত্রকলায় জ্ঞান অধ্যায় অসংখ্য। স্বতন্ত্র সম্বন্ধে সত্যতঃ সন্দেহ নিক্ষেপ অজ্ঞতা থেকে তাৎপর্য চেষ্টা করলাম, বানিকটী মঞ্চলও হয়েছিল। তারপর মহারাষ্ট্র আবার একটা বড় রকমের খোঁজ বা সম্বন্ধের মনে করে নিজের স্টুডিওতে নিয়ে গেলেন। তাঁর বেশিরভাগ ছবিই হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ। আর সব ছবিই সপ্তপেটী। হিমালয়ের নানা দৃশ্য। স্টুডিওটি নাতিদূর। দেওয়াল-ভিত্তি মহারাষ্ট্রের সংস্কৃতি প্রবেশ-ব্যাধি ছবি। ঘনঘন ছবি-আকার নানা সরঞ্জাম। খুব বহুসংখ্যের ছবির পর ছবি তিনি দেখাতে লাগলেন। কয়েকটি ছবি বেশ ভালোই লাগল। মহারাষ্ট্রা বিশেষী বিশেষজ্ঞ দেখে চিত্রবিজ্ঞা শিখোচ্ছেন বললেন। মিস্ট্র জীবনধর্মের পক্ষে একটা মক্কা উপায় নয়। মহারাষ্ট্রের জীবন পুষ্টি মিস্ট্র। একমাত্র পুষ্টি, বরেন

ভক্ষণ—তার নামে কর্তব্যজ্ঞতা। পুষ্টিবৃষ্টিও নাট। রাজবাড়ির পরিচরক-পরিচারিকারা সর্বদাই রাজসংসর্গ হতে সজ্জনস্বচক পূর্বক বজায় রাখতে সচেষ্ট। মহারাষ্ট্রের সখী আর কেউ নেই। সদালাপী ও অধ্যাতিক প্রৌঢ় ব্যক্তির সখীবিহীন জীবনে চিত্রকলাই এমন একমাত্র সখী। তদা যার, যৌবনে মহারাষ্ট্রের হৃদয়লভি সূচ্যটি অর্জন করেছিল। পরে একবার কঠিন পীড়ার আক্রান্ত হয়ে হারজিসিং-এর কোনো বাতালী ডাক্তারের বহু ও চিকিৎসার আরোগ্য লাভ করেন। সেই ডাক্তারের উপস্থেপেই আক আয় স্নান-শর্শ পর্বত করেন না।

রাজপ্রাসাদ হতে বেরিয়ে এলাম প্রায় বায়েটায়া। মহারাষ্ট্রের অসুস্থতিক্ষে এসবকে ঘটা তোলা হল।

শিখিম রাজ্যের নিজস্ব আর্থিক সংস্থান খুব বেশী কিছু নয়। রাজস্ব আদায় হয় প্রায় পাশাপাশি টাকা। শিখিমের গঠনমূলক উন্নতি প্রচুর ব্যয়সাধ্যক। ভারত-গভর্নমেন্ট এগিয়ে এসেছেন সাহায্যকল্পে। সাতবৎসর-মেঘাবী এক উন্নয়ন-পন্থিকল্পনা শিখিম স্বরবার গ্রহণ করেছেন। তাতে শিল্পোন্নতি, শিক্ষা-বিস্তার, নতুন পন্থা-নির্মাণ, কৃষির উন্নয়ন ইত্যাদি বহুপ্রকারের গঠনাত্মক কাজের বীজ আছে। কাক তরুণ হয়েছে। শিখিমভিত্তি থেকে যে পথে আমরা এলাম সে-রাস্তা একদিকে গ্যাংটক হয়ে চলে গিয়েছে লাসাথ দিকে। ইয়াংটুক অবধি জীপ বাস, তার পরে অবশ্য পারদল চাড়া চলা যায় না। আবার অন্তর্দিকে ডিগ্গুই হয়ে কাকনজল্লার দিকে অনেকদূর অবধি রাস্তা গেছে। উভয় পন্থাই তৈরি করেছেন ভারত-গভর্নমেন্ট, এবং তার রক্ষণ ও সাংরক্ষণ করে আসছেন ভারত-সরকার।

শিক্ষার কথা বলি। গ্যাংটক পন্থার হাইস্কুল আছে দুটি। একটি ছেলেরের, অপরটি মেয়েদের। দুটি স্কুলই দেখতে গিয়েছিলাম। মেয়েদের স্কুলটির প্রধানা শিক্ষিকা মিস্ প্যাটার্ণন। খাটা বিলাতী যেমনসাহেব। বিশ বৎসরের অধিককাল এসম্মে শিক্ষার কাজে নিযুক্ত আছেন। দশটি শ্রাণ—একবারে এখন স্ট্রী হতে দশব স্ট্রী পর্বত। শিল্পবাস পশ্চিমবঙ্গের বাধ্যদিক শিক্ষা-পর্বতের অরসোদিত। কাইতাল পর্বীকণ্ড পশ্চিমবঙ্গের বাধ্যদিক শিক্ষা-পর্বত কর্তৃক গৃহীত হয়। হাইস্কুলে পক্ষ স্ট্রী পর্বত তিনতী অবধা বেশালী ভাবার বাধ্যবে ছেলেরেরেরা পড়তে গিয়ে, কিন্তু বইস্ট্রী হতে ভাষা-বাধ্যর হচ্ছে ইংরাজী। তার কারণ, তিনতী এবং বেশালী ভাবার বৈজ্ঞ—গ্যাংটুক-এর একান্ত অভাব। শিখিমের রাজবাস



শিখিম-আদায় সহ দেখক (ডান দিকে)

বৈদ্যিক যুগে ডাক্তারের সঙ্গে আবহ। কমসাধ্যায় অধিকাংশই নেপালী-ভাষী। সাকী এবং সিকিমী-ভাষী। সিকিমী-ভাষা তিব্বতী-ভাষারই অন্যতর,—হরক ডাক্তারী। নেপালী-ভাষার হরক হেবনাগরী। নেপালীতে অল্পবিস্তর বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু আছে। সম্ভ্রতি নেপালী সাহিত্যের অল্পবিস্তর কিছু কিছু হচ্ছে। ভারত-গভর্নমেন্ট ও পশ্চিমবঙ্গ-গভর্নমেন্ট এ-বিধের নেপালী সাহিত্যগ্রন্থকে নানা ভাবে সাহায্য ও উৎসাহ দিচ্ছেন। সিকিমী বা তিব্বতী ভাষার সাহিত্য বলতে বিশ্বের কিছু নেই; বাও আছে তা সবই বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত। সিকিম সরকারের শিক্ষা-বিভাগ সম্ভ্রতি ব্যবস্থাবাদী সিকিমী ছাত্রদের পুস্তক প্রকাশ করেছে। সিকিমের নেপালী-ভাষী কমসাধ্যায় হিন্দু। সিকিমী-ভাষীরা বৌদ্ধ। পূজাপাঠ, সামাজিক আচার-উৎসব সবই ধর্মগ্রন্থ। গোক্ষণ গোক্ষণে প্রাচীর-চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। চিত্রাবলী বুদ্ধের দেহ মৌলিক-সংক্রান্ত। পাহারা ধর্মপালক আধুনিক হিসেবে চিত্র-বিভাগও কিছু কিছু লিখে থাকে। গোছাই-করা কাঠের নানা আসবাবের সিকিমের স্থানীয় শিল্প। গ্যাসটেক একটি টেকনিক্যাল স্কুল আছে। তার অধ্যাপক একজন বাঙালী মহিলা। টেকনিক্যাল স্কুলে চিত্র-শিল্প, কাঠের কাজ ও কার্পেট-বস্ত্র শেখানো হয়। মেয়েদের স্কুলেও শিল্প-শিক্ষা কিছু কিছু ব্যবস্থা আছে বৈশিষ্ট্য। ছেলের স্কুলেও আছে। যে-স্কুলের প্রধানী শিক্ষিকা প্রত্যেক ক্লাসেই নিজে গেলেন। মেয়েরা তিব্বতী, নেপালী, সিকিমী আর হুঁচুং-ভাষার ভাষী। ভাষাতত্ত্বের মেয়েরা ভারত-গভর্নমেন্টের স্থানীয় কর্মচারীদের কন্যা বা আত্মীয়। প্রায় প্রত্যেক প্রেসেই মেয়েদের সঙ্গে ইংরেজীতে কিছু কথোপকথন করা যায়। মেয়েদের বেশ চটপটে ও সম্ভ্রতি বলতে যেন হয়।

নব প্রেরণ মেয়েদের শিক্ষা করা: What's the most important scientific discovery of the present time?

উত্তর: The Satellite Moon.

প্র: Has that been given any special name?

উত্তর: Sputnik.

একই বিশিষ্ট হওয়া। দার তিন-চারদিন পূর্বে বাণিয়া হুটে এই বুদ্ধাচারী নানা প্রকাশিত হয়েছে। এতো নব প্রেরণ সিকিমের স্থানের পাহাড়ী ছাত্রীরা সে-সবার পেয়ে গেছে, আর এতো চটপটে জ্ঞান বিল তাতে বেশ আনন্দিত ও আশ্চর্যবিত হবার বৈধি। সঙ্গে সঙ্গে

আর একটা কিসিসও নজরে পড়ল। সেটা হচ্ছে—প্রেরণে প্রেরণে সেখানে আধুনিক চিত্র-তারকার চবি। সিন্ধ্যাটাপ্রদেহ এর কারণ কিছায়া করা তিনি বললেন: "Why, I don't see any objection to having these pictures of graceful girls." চাঁকা নিম্নোক্ত। আধুনিক সময়ে যে-একপ্রেরণ লোক সাধারণের সর্বাধিক কৌতুহল জাগিয়ে তোলে, তাহা হচ্ছে সিনেমার অভিনেতা ও অভিনেত্রী। কলকাতার বাজার ঘড়ার লম্বা ঘড়া আধ-মাইল লম্বা কীট বিয়ে বৃত্তি-পালন, কীট-ক্রীড়া অগ্রাহ্য করে হাজারে হাজারে যত্ন সিনেমার-টিকিটের প্রতীক্ষা কাটিয়ে থাকে, এতো প্রতিদিনের ঘটনা। প্রাণ-হোটেলের সামনে অভিনেত্রী-কর্ণবিন্দুর তীক্ষ্ণ বানদ্বন্দ্ব-চলচল দেখে যায়, পুলিশ কী-হুনে গ্যাস ছেড়ে অবস্থা জনতাকে ছত্রস্ত করতে বাধ্য হয়—একজন ঘটনাও ঘটে। তবে সিকিম স্কুলের ছাত্রীরাই বা কী ঘোষ করল? স্কুল-ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রকাশিত সিনেমার-অভিনেত্রীদের ছবি টাঙিয়ে তাদের সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়েছে মাত্র। 'স্টুডেন্ট' আর সিনেমার-অভিনেত্রী উভয়েরই আধুনিকতার অঙ্গুর্য্য দৃষ্ট।

সিকিমের শিক্ষা-বিভাগের কর্মী একজন বাঙালী—ঐশ্বর্য্যেশ্বর ঘোষ। ঐশ্বর্য্য ঘোষ এবং ঘোষজায়া উভয়েই অতি অধিক ও অতিদ্রবংসল। তাঁদের আত্মপ্রকাশের প্রবেশ ঘটেছিল। ঘোষজায়া নানা সুখানুসার বাজা করে পাওয়াছেন। সিকিমের শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে ঘোষজায়াসহের সঙ্গে বহু আলোচনা-আলোচনা হ'ল। সুখাত তাঁর চোটা ও উত্তোলেই সিকিমের কয়েকটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিক্ষার এবং সমাজ-শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ঐশ্বর্য্য ঘোষ অনেককাল অধিক বেতন দিয়ে কয়েকজন বাঙালী শিক্ষককেও বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করেছেন।

সিকিম সরকারের নানা বিভাগে ভাষাতত্ত্বের কর্মচারীরা সম্ভ্রতি বহুতর অগ্রদূত নহ। স্বয়ং দেওয়ান ভাষাতত্ত্ব, তা ছাড়া বিভাগীয় অধিকর্তার অনেকটা ভাষাতত্ত্ব, এদের মধ্যে পাঠ্যবই সম্ভ্রতি বৈধি। আর বলা হচ্ছে, যে বিভাগের উচ্চতর কর্মী যে-জাতের, সেই বিভাগে সেই জাতের লোকই দখল্য বৈধি। অধিকর্তা-মহাশয় বিষয়ে জাত-ভাষীদের বিয়ে বিভাগীভূত করে সুলভে সর্বস্বই সম্ভ্রতি। এ-বিষয়ে পাঠ্যবইয়ের ছবি নেই। সিকিমের বাজার (Works and Buildings) এবং বিদ্যুৎ (Electricity) বিভাগ পাঠ্যবইয়ের প্রায় একচেটিয়া, বেহেছ চাক ইন্ডিয়ানদের পাঠ্যবই। আরও হুঁ-একটি বিভাগ রয়েছে বোটাটুটি এ কথা বলা

যেতে পারে। আর এতে কারও কোনো আপত্তিও বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটছে বাঙালীর বেলায়। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-চন্দ্র ট্রেনিংপ্রাপ্ত বাঙালী শিক্ষক বৃন্দাবালী বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করেছিলেন, আর তখনই 'গেল' গেল, সব গেল—শিক্ষা-বিভাগ বাঙালীর একচেটিয়া হয়ে গেল—এই সব উল। আর এই সব উল অ-বাঙালী ভারতীয় মহল হতে। এ ব্যাপারটা কেবল যে সিকিমের ঘটনা তা নয়, সর্ব-ভারতের পরিপ্রেক্ষিতেও বোধ হয় কথাটা বানিকটা সত্য। বাঙালীর প্রতি বিষয়ে ও বিদ্বেষতা যেন কতকটা সর্বজনীন। প্রতিবেশী বিহার, আসাম, উড়িষ্যা এরা তো আছেই—মাদ্রাসার, পাঠ্যাবলী ও নব্বিশীয়াও বাঙালী-বিষয়ে বড় কম দান না। বাঙালীকে কোণঠাসা করতে সবাই যেন বদ্ধপরিকর। পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল বাঙালীদের পুনর্বাসন ব্যাপারেই এর বেশ পরিচয় লাগে। যারা ভারত আর যে স্বাধীনতার হুম-সুবিধা ভোগ করছে সে-স্বাধীনতা-অর্জন বাঙালীর সংগ্রাম, হুম-বরণ ও ভাষণের কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু কোন অপরাধে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের আজ এই শোচনীয় অবস্থা,— নিম্ন বাসভূমি অর্থাৎ পাকিস্তানে তারা কীতলাস-বহন, আর ভারতে তারা অব্যক্তি। ভারত-বিভাগের ভিত্তিতেই আবারও স্বাধীনতা। আর দেশ-বিভাগ-জনিত যতো হুম সবই বাঙালীর। বেশ আছে আবারও বিহারী, মাদ্রাসার, হিন্দুস্থানী ভাষার। দেশ-বিভাগ-সম্বৃত হুম-ক্রেপ ওদের বেশাটাই লুপ্ত করেনি, অথচ স্বাধীনতার সবটুকু হুম তাঁদেরই ভোগ্য। চাফুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, গলাবাজি, চালবাজি সব-কিছুতেই এঁদের সাঁহের ভাগ।

বাঙালীরও যথেষ্ট দোষ আছে। বাঙালী ঠকাবদ্ধ নয়। বাঙালী মায়াবদ্ধ স্বজাতি-বৈরী। সিকিমের শিক্ষা-অধিকর্তা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র হুম করে আবার বলেছিলেন: কয়েকটি বাঙালীকে শিক্ষা-বিভাগে চাফুরি দিয়ে একটিকে তিনি অ-বাঙালী ভারতীয়দের অস্বীকৃতি-ভাজন হলেন। আবার অন্যটিকে সেই বাঙালী সন্তোষীরাই ঠিক বিচ্ছেদ নানা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তাঁকেই অপবদন করবার চেষ্টা করল। কার্যতঃ বৈশাল্য, চার-পাঁচের মাত্র বাঙালী পরিবার আছে—তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্তির একান্ত অভাব। পাগলেই। একে অপরের অনিষ্ট করবার সুযোগ বড় একটা হাড় না। এ-যেন অজ্ঞত বনোবুজি যে-কোনো সবাজ বা সম্ভ্রান্তরকে পকেট কড়কড়ন ও অহিতকর। সর্বভারতীয় প্রতিবেশিতার টিকে থাকতে

হলে বাঙালীকে সংগ্রহে হুটো জিনিসের উপর জোর দিতে হবে: একটা হচ্ছে বাঙালী-প্রীতি। এ-দ্বারা অ-বাঙালীর প্রতি অ-প্রীতি বুঝায় না। আর বিভীষিকা হচ্ছে হানীর মনে বন্ধা করা, অর্থাৎ খোঁজা বেতাকে মর্ষণসাহায্য। পিত্ত, বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতী প্রত্যেককেই এ-ইটি বিষয়ে অনুপ্রাণিত করে তোলা শিক্ষার একটি বড় উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

সিকিম থেকে ফেরবার দিন এসে গেল। এবানকার যে-সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার কথা তাঁদের সবার সাথেই দেখা হল। সবাই যুব আত্মবিক্রতার সঙ্গেই আলোচনা-আলোচনা করলেন। চীফ-সেক্রেটারি ইন্ডোরা, শিক্ষা-সচিব (Executive Councillor for Education) শ্রীকান্তরাজ প্রধান, ভারতীয় দূতাবাসের উচ্চতর কর্মচারীগণ সবাইই সঙ্গে দেখা করলেন। শ্রীকান্তরাজ প্রধান তাঁর বাসভবনে চা-পানের আয়োজন করালেন। শ্রীযুক্ত প্রধান ও প্রধান-কর্তা বহুবেলা চা ও আহার পরিবেশন করে আপ্যায়িত করলেন। স্বর্গীয় মূল, পোশাক-ব্য-করটি আছে তঃও পরিদর্শন করা শেষ হল।

শিক্ষার প্রসার জাতীয় উন্নতির অপরিহার্য মর্ড। সিকিমের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ও ধর্মভিত্তিক সামাজিক কার্যে। এ-হুটো জিনিসকে বহা-বোণা মর্ষণ দিয়েই এ-দেশের জন্ত নতুন শিক্ষা-পরিবর্তনা বচনা করা আবশ্যক। বর্তমান পরিস্থিতিতে সিকিমের শিক্ষা-প্রসায়ে সবার চাইতে বড় প্রয়োজন হচ্ছে কর্মী ও শিক্ষকের। শিক্ষা-অধিকর্তা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-চন্দ্রের আবার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

সেদিন গ্যাটক ছেড়ে ভারতভূমিতে যখন হাংরিছি। পথে পড়ল ঘাটেখারা। চারদিকে পাহাড়-খোঁজা ছোট জায়গা। একটা ছোট পাহাড়ী নদী ঢল ঢল নুতো কেনোদ্বাল হুলে খববেগে ছুটে চলেছে। ঘাটেখারা একটা ছোট বীশের মতো, একটা পাহাড়ী নদী এর তিনদিক বেঁধে করে রয়েছে। চারদিকে পাহাড়ের 'সামলিমা', তারই বাতমানে পানিকটা স্রাব সমতলভূমি—আর দেখানোই একটা পাঠ্যশালা। সিকিমের শিক্ষা-প্রসার পরিচরনায় নতুন নতুন পাঠ্যশালা স্থাপন করা হচ্ছে। ঘাটেখারা পাঠ্যশালাটি তারি অন্ততঃ। এখানে কিছুক্ষণের জন্ত বাসলাব। পাঠ্যশালা-দুটো টেউ-বেলায় চিনে চাওয়া, আর পাকা বেগের ঘর। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এরই মধ্যে বেশ হয়েছে। ঘাটেখারার আশেপাশে বড় বড় একটা নেই।

তবে ছেলে-মেয়েরা আগে কোথেকে? এরা আগে পৃথিবীর বতী থেকে। পাহাড়ের অনেক উঁচুতে জুম চাষ হয়। ঝাক-কাটা চাষকেও বোঝা যায়, সেইখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বতীও আছে। ছেলেমেয়েরা ঐসকল বতী হ'তে পাঠশালায় আসে। দৈনিক চড়াই-উৎড়াইয়ের বেহনত বড় কম নয়।

পাঠশালা-গৃহের সংলগ্ন প্রধানশিক্ষকের বাসা। প্রধান-শিক্ষকের স্ত্রীও শিক্ষিকা। দুজনে একত্র কাজ করেন। অম্বর। আগে সংবাদ দিয়ে বাইনি। যখন পৌছলাম তখন বেলা প্রায় তিনটা—শিক্ষক-দম্পতি ব্যস্ত হয়ে উঠিলেন আমাদের একই চা-বাগানবার কক্ষ। পাঠশালায় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দোভারী যাবকত কিছু কিছু কথাবার্তা চলিতে লাগল। প্রধানশিক্ষক ব্যাটিকুলেট ও শিক্ষকপ্রাপ্ত: তাঁর সঙ্গে ইংরাজীতেই কথাবার্তা হতে লাগল। ইতোমধ্যেই শিক্ষক-গৃহিণী চায়ের জোগাড় করে কেলেছেন। ঠিকের থাকবার ঘরটিতে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বড় ভালো লাগল এঁদের অস্বাভিক ও আন্তরিক ব্যবহার। অতি অল্পসময়ের ক্ষণেই এগেছি, কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই আমাকে তাঁরা তাঁদের

আপনার জন করে নিয়েছেন—নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যৎ অঙ্গপটে ব্যক্ত করলেন। প্রধানশিক্ষক-মহাশয়ের আরো পড়াশুনা করবার ইচ্ছা। তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছা শিল্পকার্ণে যুগ ভালো ট্রেনিং নেবার। এঁদের বয়স অল্প—আমি এঁদের যৌথিক উৎসাহ দিলাম। এঁদের যেতন স্বা, কিন্তু রুচি অতি উত্তম। পাঠশালা-গৃহটির চারপাশে নিজহাতে ফুলের বাগান লাগিয়েছেন। নিজেদের থাকবার ও রান্নার ঘরটি—অতি পরিষ্কার ও পরিশাট সাজানো-গুছানো। তখন-তখনি বাগান থেকে প্রচুর গাঁদাফুল তুলে মালা গাঁথেন আমাদের সম্বন্ধনা করা হ'ল। বড় খুশি হ'লান এঁদের ব্যবহারে।

শিচ্ছেন পড়ে রইল ঘাটেঘাটা। শিচ্ছেন পড়ে রইল শিকিরের ডাঘ বৈগল্লেশী। এগিরে চলেছি কানিশ্পত্তের দিকে। ক্রমে ভাবসী সাত্রির স্বচ্ছকারে চূড়িক চেয়ে গেল। বিশ্বভূদবের এক গভীর প্রশান্তি। এই নিরবস্থির বৈঃশব্দকে খেন আরো নিবিড়তর করে তুলেছে পতনশীল কবীর বরকরানি আর গতিক্রান্ত জীৎ-গাড়িটার একটানো গোষ্ঠানি।

জনকল্যাণে পরমাণু-শক্তি

ঐতিহ্যবাহিন দাশগুপ্ত, এম্. এস্.-সি.

গত মহাযুদ্ধের শেষভাগ থেকে আণবিক যুগ শুরু হয়েছে বলা যেতে পারে। তখন থেকেই বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করেছেন যে, কি করে পরমাণুর বুকের ভিতর পুকারো। অপরিসিত শক্তিকে জনকল্যাণে প্রয়োগ করা যায়। আজ তাঁরা এ-বিষয়ে বশেষে অগ্রসর হয়েছেন এবং আমেরিকা, ইংলণ্ড, রাশিয়া, কানাডা প্রভৃতি রাষ্ট্র এই অমিত পারমাণবিক শক্তিকে শিল্পক্ষেত্রে, চিকিৎসাশাশ্রয়ে, কৃষিকার্ষে, উচ্চতর মৌলিক গবেষণা প্রভৃতিয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে বশে কিছু সাফল্যলাভ করেছেন। ভারতবর্ষও এ-বিষয়ে একেবারে পিছিয়ে নেই। ভারতবর্ষে পরমাণু-শক্তি আহরণের উপযোগী সদ্য প্রচুর পরিমাণে বিজ্ঞান ঝাকার, ভারতের পক্ষে পরমাণু-শক্তি প্রয়োগের সম্ভাবনাও বেশী। এ কথা সম্ভাব্য উপপদ্ধতি করে ভারত-সরকার 'আণবিক শক্তি কমিশন' (Atomic Energy Commission) স্থাপন করেছেন, যার পুরোধা হলেন বিশিষ্ট পদার্থবিদ ডাঃ হোমি জে. ভালা।

এই কবিশনের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে একটি আণবিক 'রিঅ্যাক্টর' স্থাপিত হয়েছে। কি করে ক্ষুদ্র পরমাণুর বুকে এত শক্তি সঞ্চিত হোল এবং কি ভাবে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভব তা বুঝতে গেলে, আগে পদার্থের গঠনভঙ্গ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

পদার্থের গঠনভঙ্গ

এ বিশ্বে যা-কিছু পদার্থ দেখতে পাওয়া যায় তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু-পরমাণু দ্বারা গঠিত। পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ যেটা স্বাধীনভাবে (free state) থাকতে সক্ষম, বিজ্ঞানী তার নাম দিয়েছেন অণু (Molecule)। এই অণু ক্ষুদ্রতর পরমাণু বা Atom দ্বারা তৈরী। পরমাণু স্বাধীন-ভাবে থাকতে সক্ষম। পদার্থগঠনের এই পরমাণুদ্বা হুপ্রাচীন রাগাণবিক জন ভাগটনের অবধান। তাঁর মতে পরমাণু সবচাইতে ক্ষুদ্রতম—একে আর ভেঙে ছোট করা

সম্ভব নয় এবং এই পরমাণুর সমষ্টির ফলে অণু এবং তাদের সমষ্টির ফলেই পদার্থের আয়তনকাশ। এই পরমাণু আকারে অতিশয় ক্ষুদ্র তা বলা নিশ্চয়োক্তন। একটা উদাহরণ হিসেবে এ কথা আরো পঠিকার হবে। একটি ছোট্ট শিনের মাথায় যে ক্ষুদ্র কলবিজ্ঞ সঞ্চিত হতে পারে তাহ তিত্তর পরমাণুর সংখ্যা প্রায় $10^{21} \times 10^{24}$ টি এবং এই পরমাণুগুলো পর পর সাজিয়ে একটি পিকল তৈরি করলে, তা দিয়ে পৃথিবীকে লক্ষ লক্ষ বার বেঁধে করা যাবে। বিজ্ঞানীরা ব্যবহার্য পদার্থকে হ্রস্বকম ভাবে ভাগ করেছেন—যৌগিক ও যৌগিক। যে পদার্থ একইরকম পরমাণু দিয়ে তৈরি—যেমন হাইড্রোজেন, তামা, পোনা ইত্যাদি—তাদের বলা হয় যৌগিক পদার্থ অথবা যৌল। আর যে পদার্থের ভিতরে একের অধিক রকমের পরমাণু বর্তমান—যথা জল, লবণ, কাঁচ ইত্যাদি—তাদের বলা হয় যৌগিক পদার্থ। রাসায়নিকেরা সমস্ত পদার্থ বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে পৃথিবীতে মোট ২২ রকমের যৌল আছে এবং এই যৌলের বিভিন্ন সম্মিশ্রণে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সোদা, কাঁচা বসতে গেলে, বসিও এই গিঁথে হাকারো রকমের পদার্থ বেধতে পাওয়া যায়, তাহলেও একের তৈরির মূল প্রায় ২২ রকমের যৌল। এই ২২ রকমের যৌলের পারমাণবিক ওজন এবং রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক গুণাবলী হিসাবে থাকিয়ে একটি ছক তৈরি করেন বিশিষ্ট রসায়নবিদ বেনেডিক্ট। এই ছকের সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করেছে হাইড্রোজেন গ্যাস ও সর্বশেষ স্থানে আছে ইউরেনিয়াম। কাজেই হাইড্রোজেন পারমাণবিক ওজনে সবচেয়ে হালকা এবং ইউরেনিয়াম সবচেয়ে ভারী। তা ছাড়া, ছকে বিভিন্ন যৌলের স্থান হিসেবে তাদের এক একটি করে সংখ্যাও দেওয়া হয়েছে—তাদের বলা হয় পারমাণবিক সংখ্যা। যথা, হাইড্রোজেনের স্থান ১নং—অতঃপর হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যাও '১'। এই অস্থাবারী ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা '৯২'। ১৯১২ সালে বিজ্ঞানী টমসন এক গ্রন্থে আবিষ্কার করলেন। তিনি দেখালেন যে, কোনো একটি যৌলের পারমাণবিক ওজন আলাদা হতে পারে। এই ধরনের পদার্থকে বলা হোল 'সমস্থানিক' (Isotopes)। অর্থাৎ সমস্থানিক ও মূল যৌল একই ধরনের পদার্থ—তাদের প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক গুণাবলী বহু একরকম। কিন্তু তাদের পারমাণবিক ওজন আলাদা। মূল যৌল থেকে তার সমস্থানিককে আলাদা করা দুই সহজসাধ্য নয়।

পারমাণবিক গঠন

এবার পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে, পরমাণুই পদার্থের ক্ষুদ্রতম অণু—একে আর ছোট করে ভাঙা সম্ভব নয়। কিন্তু ১৮৯৭ সালে মার্স জে. জে. টমসন, জুঁকস ও পেনার্ড তাঁদের গবেষণার ফলে দেখতে পেলেন যে, পরমাণুর চাইতেও ক্ষুদ্রতর কণিকা বর্তমান। একটি পরমাণুকে ভেঙে তাঁরা যে ক্ষুদ্রতর কণিকা পেলেন—সেখা গেল সেই কণিকাটি ঋণতড়িৎসম্পন্ন। সেইজন্য এই কণিকার নাম দেওয়া হোল 'ইলেক্ট্রন'। একটি গোটা পরমাণু শুধু ইলেক্ট্রন দিয়ে তৈরি হতে পারে না—কারণ তাহলে পরমাণুটি বিদ্যুৎসম্পন্ন হওয়া উচিত। কিন্তু একটি পূর্ণ পরমাণু সর্বদা নিরুদ্বিগ্ন। সুতরাং পরমাণুতে এখন পরিমাণ ধনতড়িৎ বিজ্ঞান বা ইলেক্ট্রন বা ইলেক্ট্রনগুলির ঋণতড়িৎের সমান। বিজ্ঞানী লর্ড রাদারফোর্ড দেখালেন যে বাস্তবিকই পরমাণুতে ঐ পরিমাণ ধনতড়িৎ আছে। পরমাণু-গঠনের যে আধুনিক চিত্র আমরা পাই তা মূলতঃ রাদারফোর্ডেরই অবদান। তিনি পরমাণুর গঠনকে সৌরজগতের গঠনের সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়েছেন যে, প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থিত আছে ধনতড়িৎ—যার নাম দেওয়া হয়েছে 'কেন্দ্রিক' (Nucleus) এবং এই কেন্দ্রিকের চতুর্দিক বেঁধে করে ঘুরে বেড়ানো ইলেক্ট্রন। ইলেক্ট্রন অত্যন্ত হালকা বলে বিজ্ঞানীরা বলেন যে পরমাণুর মোট ওজনের প্রায় সবটাই কেন্দ্রীভূত। বিভিন্ন যৌগের পরমাণুর ইলেক্ট্রন-সংখ্যা বিভিন্ন এবং এই ইলেক্ট্রন-সংখ্যা ও তাদের অবস্থানের উপর যৌলের রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক গুণাবলী নির্ভর করে। আগেই বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক যৌগের একটি করে পারমাণবিক সংখ্যা আছে। এই সংখ্যা আর কিছুই নয়—পরমাণুর মোট ইলেক্ট্রন-সংখ্যা। যথা: হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা '১'—সুতরাং হাইড্রোজেন-পরমাণুর হাত একটি ইলেক্ট্রন। তেমনি সর্বাপেক্ষা ভারী যৌগ ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা '৯২'—অর্থাৎ ইউরেনিয়াম পরমাণুর মোট ৯২টি ইলেক্ট্রন আছে। এর কিছুকাল পরে সমস্থানিকের নর্দম-প্রদানী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা অস্বস্ত করলেন যে, কেন্দ্রিক শুধু ধনতড়িৎ-সম্পন্ন ভর (mass) হলে চলতে না—সেখানে এখন আর একটি কণার উপস্থিতি প্রয়োজন যার ভর থাকবে কিন্তু কোনো তড়িৎ থাকবে না। বিজ্ঞানীরা আগ্রহে চোঁচের 'নিউট্রন' নামে এই ধরনের এক কণিকা আবিষ্কার হোল। সুতরাং বর্তমানে পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা

যে ধারণা তাতে প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থিত আছে ধনতড়িৎ-প্রবাহ 'প্রোটন' ও নিউট্রন 'নিউট্রন' এবং এই কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে সতত ঘূর্ণায়মান আছে ইলেকট্রন কণিকা। প্রোটন ও নিউট্রনের গুরুত্ব বা ভর প্রায় সমান এবং এদের দ্বয়ের মোট ভর গোটা পরমাণুর ভরের প্রায় সমান—কারণ ইলেকট্রন এতই হালকা যে, তাদের মোট ভর অতি নগণ্য।

তেজস্ক্রিয়া ও পরমাণু-শক্তির প্রথম ইঙ্গিত

১৮৯৬ সালে ফরাসী পদার্থবিদ হেনরি ব্যাকারেল আবিষ্কার করলেন পদার্থের তেজস্ক্রিয়া। তিনি দেখতে পেলেন যে, ভারী মৌল ইউরেনিয়াম আপনা থেকে অনবরত শক্তিশালী রশ্মি বিকিরণ করে এবং এর ফলে ক্রমাগত মৌলের রূপান্তর হয়ে চলেছে। দীর্ঘকাল পরে মৌলটি সাধারণ সীসা-য় পরিণত হচ্ছে। পদার্থের এই স্বতন্ত্র তেজ-বিকিরণকে বিজ্ঞানীরা বলেন তেজস্ক্রিয়া (Radio-activity)। ইউরেনিয়াম থেকে যে রশ্মি বিকিরিত হয় তাকে বৈজ্ঞানিক বিশেষণ করে দেখা গেল যে, তাতে তিনপ্রকারের রশ্মি বর্তমান—

(১) আলফা কণা—এগুলি দনতড়িৎবাহী অপেক্ষাকৃত ভারী কণিকা।

(২) বিটা কণা—এগুলি ঋণতড়িৎবাহী খুব হালকা কণিকা। প্রকৃতপক্ষে এগুলি ইলেকট্রন ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৩) গামা রশ্মি—এগুলি কোনো কণিকা নয় বা তড়িৎ-বাহীও নয়। এরা আলোর মতো তরঙ্গসম্পন্ন রশ্মি।

এই তিনপ্রকার রশ্মিই পদার্থভেদে করার ক্ষমতা রাখে—অর্থাৎ যথেষ্ট শক্তিশালী, এবং এদের ভিতর গামা রশ্মি সবচেয়ে শক্তিশালী। পরে অধ্যয়ন করে দেখা গেল যে, পদার্থের এই তেজস্ক্রিয়া শুধু ইউরেনিয়ামেই সীমাবদ্ধ নয়—প্রায় সব ভারী মৌলই তেজস্ক্রিয়। এই সম্পর্কে ১৯১৮ সালে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মাদাম কুরী কর্তৃক 'রেডিয়াম'-আবিষ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রেডিয়াম ইউরেনিয়ামের চাইতে অনেকগুণ বেশী তেজস্ক্রিয়। পদার্থের তেজস্ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে দিয়ে লর্ড রাডারফোর্ড বলেছেন যে, ভারী মৌলে তেজস্ক্রিয়া সীমাবদ্ধ থাকবার কারণ আছে। মৌল ভারী হওয়া মানে তার কেন্দ্রকে অধিক-সংখ্যক প্রোটন ও নিউট্রন বর্তমান। তার ফলে কেন্দ্র-গঠন অস্বাভাবী হয়ে পড়ে এবং কেন্দ্রের ভাঙন হয়। এই ভাঙনের ফলে পরমাণু থেকে শক্তিসম্পন্ন আলফা, বিটা

অথবা গামা রশ্মি আয়ত্ৰকাশ করে। যে মুহূর্তে কেন্দ্রিক ভেঙে পড়ে তখনই পরমাণুর প্রকৃতিও বদলে যায় অর্থাৎ মৌলের রূপান্তর হয়। এই রূপান্তর চলতে থাকে যতদূর পর্যন্ত কেন্দ্র-গঠন স্বাভাবিক পথে না আসে। কাজেই এ কথা বিজ্ঞানী মুক্তে পারলেন যে, তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে শক্তির নির্গম হয় তা পরমাণু-কেন্দ্রিক ভাঙনের ফলশ্রুতি। কিন্তু এই ভাঙন তো বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তাই বিজ্ঞানী চিন্তা করলেন যে, কোনরকমে যদি কেন্দ্রিক-ভাঙন ও তার নিয়ন্ত্রণ বাইরে থেকে করা যায় তাহলে প্রচুর শক্তির সৃষ্টি সম্ভব। এই ঘটনা থেকে বিজ্ঞানী পরমাণু-শক্তির প্রথম ইঙ্গিত পেলেন।

কেন্দ্রিক-বিভাজন ও পরমাণু-শক্তি

বাইরে থেকে পরমাণু-কেন্দ্রিক ভাঙকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিজ্ঞানীরা চেষ্টা আর এক ধাপ অগ্রসর হোল। ১৯৩৪ সালে বরন মাদাম কুরী কর্তৃক জোঁসেফ ও তার স্বামী ফ্রেডারিক জোলিওট আবিষ্কার করলেন 'কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া'। তারা দেখতে পেলেন যে—বোরোনে, অ্যান্টিমনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি হালকা পদার্থ থেকেই সাধারণতঃ তেজস্ক্রিয় নয়—তাদের যদি আলফা কণা দ্বারা জোরে আঘাত করা যায়, তাহলে তারা কিছুকালের জন্য তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানী-বহলে বিশেষ চাকল্যের সৃষ্টি হোল—কারণ তারা দেখতে পেলেন যে এই প্রক্রিয়ার দ্বারা সাধারণ মৌলকে ইচ্ছামতো তেজস্ক্রিয় করে শক্তি সৃষ্টি করা যেতে পারে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে সাধারণ তেজস্ক্রিয়ই হোক, কি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়ই হোক—এসব প্রক্রিয়াতে যেটুকু শক্তির উৎস হয় তা এত অল্প যে, তার ব্যবহারিক প্রয়োগ-সম্ভাবনা খুব সামান্য। শক্তি যোগ্যতার একক অনুযায়ী তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ প্রায় ১০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট (MeV)। এর ফলে যদিও বিজ্ঞানীরা একটি ভ্রমোৎসাহ হয়ে পড়লেন, তবুও এ কথা নিঃসন্দেহ যে, এই ঘটনা পরমাণু-শক্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীর মনে বেশ স্বাভাবিক চিন্তা বোধে গেল। অবশেষে ১৯৩৯ সালে আবিষ্কৃত হোল পরমাণু-কেন্দ্রিক বিভাজন (fission); আবিষ্কার—কার্বান-বিজ্ঞানীরা হান ও স্ট্রাসমান। তারা দেখলেন যে, ভারী মৌল ইউরেনিয়াম পরমাণু-কেন্দ্রিককে যদি নিউট্রন দিয়ে জোরে আঘাত করা যায় তাহলে কেন্দ্রিকটি প্রায় সমান হ'তালে ভাগ হয়ে যায়—প্রত্যেকটি ভাগ একটি সাধারণ পরমাণুর কেন্দ্রের সমান। আরো বিশদেণ করে দেখা গেল যে, ইউরেনিয়াম

বিভাজনের ফলে যে দুই অংশ পাওয়া যায় তাগা সাধারণ মৌল 'ক-ইসটম' ও 'বেরিগিয়াম' ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সঙ্গে যে পরিমাণ শক্তির উৎস তেজঃ তা এককটির শক্তির পাচ ২০০ গুণের বেশী। হিসাব করে দেখা গেছে যে, ১ পাউন্ড ইউরেনিয়াম যে পারমাণবিক শক্তি সৃষ্টি করতে পারে, তা প্রায় ১,০০০ টন কয়লার শক্তির সমান। তবুও ১ পাউন্ড ইউরেনিয়ামের ভিতর যে কোটি-কোটি পরমাণু আছে তাহলে সংকটীয় কেন্দ্রিকের বিভাজন হয় না। তা যদি হোত, তাহলে শক্তির পরিমাণ আরো ১,০০০ গুণ বেশী হোত। পরমাণু-কেন্দ্রিক বিভাজনের ফলে এই যে অসংখ্য শক্তির উৎস হয় তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন লোকস্তুতিত বিনবিখ্যাত দার্শনিক-বিজ্ঞানী অধ্যাপক আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর 'ভর ও শক্তির তুল্যমূল্যতা' (Equivalence of Mass and Energy) নামক প্রতিপাদ্য দ্বারা। সে যাই হোক, এই বিভাজন আবিষ্কারের পর বিজ্ঞান-জগতে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হোল এবং বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে এই নিষে কাক হুক হোল। এইসব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হোল তাহলে বলাই প্রধান হচ্ছে এই যে—(১) এতোক কেন্দ্রিক-বিভাজনের ফলে একটি করে নিউট্রন উৎপন্ন হয়, যেটা পার্থক্যবী কেন্দ্রিকের বিভাজন ঘটাতে পারে। (২) এইভাবে যদি পর পর বিভাজন ঘটে অর্থাৎ একটি মুখল-প্রক্রিয়া সৃষ্টি করা যায় তাহলে দ্রুতগতিতে বহুসংখ্যক কেন্দ্রিকের বিভাজন হবে; (৩) এই মুখল-প্রক্রিয়ার ফলে যে অমিত শক্তির সৃষ্টি হবে তা প্রচণ্ড তাপ ও চাপ সৃষ্টি করবে; এবং (৪) ইউরেনিয়াম বিভাজনের ফলে প্রায় দুইটি সাধারণ মৌলের তেজস্ক্রিয় সমস্ত-নিষ্কর (Radio-active isotopes) সৃষ্টি হয়।

পরমাণু-শক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ

অমিত পরমাণু-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে গত বহুদুর্ভাগ্যে জনস্বার্থী আণবিক মোমার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আজ এই বিরাট শক্তিকে জনকল্যাণের পথে নিয়োগ করে সমস্ত বিশ্বের মানবজীবনে এক প্রভু-অধ্যায়ের সূচনা করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর বা আশীর্বাদ-অর্থৎ জনসেবা—তা চরিতার্থ হতে চলেছে। যে বিভিন্ন উপায়ে এই পরমাণু-শক্তিকে জনকল্যাণের পথে নিয়োগ করা হতে পারে তা হচ্ছে নিম্নরূপ :

(১) শক্তি-উৎপাদনকারী কেন্দ্র (Power-plant) হিসাবে :—যন্ত্রের বৈদ্যুতিক জীপনে প্রচুড় শক্তির

প্রয়োজন। যন্ত্রের এই শক্তি আহরণ করে মূলতঃ কয়লা থেকে। কিন্তু আণবিক শক্তি থেকে তার চাহিদা যেখানে পূরণে কয়লা-বরত বেঁচে যাবে। যন্ত্র-শিল্প-ক্ষেত্রে এবং বৈদ্যুতিক জীপনের উপযোগী শক্তি-সরবরাহে পরমাণু নিয়োগ করতে যে ব্যবস্থার প্রয়োজন তাকে শক্তির জালক 'রিঅ্যাক্টর' বা 'পাইপ' বলে। এই ধরনের প্রথম 'পাইপ' স্থাপিত হয় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪২ সালে এবং এর শক্তির পরিমাণ ছিল মাত্র ২০০ ওয়াট। পরে এ্যাবগন-গবেষণাগারে যে 'পাইপ' স্থাপিত হয় তা ৩০০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন। আমেরিকার টেনেসি প্রদেশের ক্লিফটন শহরে ১৯৪৩ সালে ১,০০০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন ও ১৯৪৪ সালে ওয়াশিংটনের ক্ল্যাওকোর্ড শহরে বহুসংখ্যক কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন 'পাইপ' স্থাপিত হয়। ইংলণ্ডের হারথলেসে যে আণবিক 'পাইপ' স্থাপিত হয়েছে তার শক্তি-ঘাটা পূরণের উচ্চতার কাজ চলেছে এবং এর ফলে প্রতি সপ্তাহে ৩০ টন কয়লা-বরত বেঁচে যাচ্ছে। এইজন্য আরো ব্যাপকভাবে শক্তি সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে পরমাণুকে নিয়োগ করার ক্ষমতা যে অসংখ্য জটিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য খুঁটিনাটি কল্যাণকর প্রয়োজন তা মেদিন সম্ভব হবে, সেদিন শক্তি আহরণের ক্ষমতা বা গেইটের বহুগুণ-বেহু বিশ্ববাসীর মুক্তিলাভ হবে। সেদিন—নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পৃথিবীর অর্থনৈতিক চেহারা সম্পূর্ণ বদলে যাবে।

(২) শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ :—আণবিক 'পাইপ' থেকে প্রচুর পরিমাণ তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক পাওয়া যায় তাকে শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগের স্বার্থে সভাবনা দেখা গেছে। যেমন রেডিও-রোগিয়ার (রোগিয়ারের তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক) ও জিক সালফাইড মিশ্রণের ফলে একটি স্থায়ী উজ্জল পেট তৈরি করা হয়েছে বা ঘড়ির কাঁটার জাল্যালে অন্ধকারে দেখা যাবে। তা ছাড়া, এই পদার্থগুলি থেকে যে রশ্মি বিকিরিত হয় তা কাজে লাগিয়ে বায়ু থেকে বিদ্যুৎ-বিদ্যুৎ (Static electricity) তৈরি করা হয়, যাতে করে বিদ্যুৎ-হলক (spark) সৃষ্টিতে পারে। এই রশ্মিকে খাতব চাঁচের খুঁত ধরবার ক্ষমতা বা খাতব পাত কতটা পুরু হবে তা নিরূপণের ক্ষমতা বা কোনো খাতব পরীক্ষার ঘর্ষণশক্তি (friction) কতটা তা পরিমাপের ক্ষমতা প্রয়োগ করা হচ্ছে।

(৩) চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রয়োগ :—আণবিক 'পাইপ' থেকে সংগৃহীত তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক নিষ্পন্ন পদার্থের চিকিৎসা-পাথে যে বিশেষ সৃষ্টি করেছে তা সম্ভবন পদার্থীতে অসুস্থ-বস্তুর আবিষ্কার চিকিৎসাশাস্ত্রে যে বিশেষ এনেছিল

তার সঙ্গে তুলনীয়। চিকিৎসকগণ তেজস্ক্রিয় সম্বন্ধনিককে এমন একটি হাতিয়ার-রূপে ব্যবহার করেছেন, যা দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তব ও মনোরমের বিভিন্ন ক্রিয়া অতি সহজে অনুধাবন করতে পারছেন। বিজ্ঞানীর ভাষায় এদের বলা হয় তেজস্ক্রিয় ‘মস্কানী’ (Tracer)। এই মস্কানীর দ্বারা টিউমার, ক্যান্সার, মিসিলিগ প্রভৃতি বহু ভ্রূষাণোগ্য রোগের সূচিক্রিয়াময় ব্যবস্থা হয়েছে। কল্ডকাস, মোডিগাম, সোহা, ক্যালসিয়াম, সোশ্ব এবং আয়োডিন প্রভৃতি মৌলকে তেজস্ক্রিয় মস্কানীতে পরিণত করে এই সমস্ত কাজ করা হয়। ফেরা গেছে যে, চর্বিরোগের পক্ষে রেডিও-কল্ডকাস, গভীর ক্যান্সার রোগে রেডিও-সোশ্ব ও কোবাল্ট, ষাটবয়েজ প্রায়োরোগে রেডিও-আয়োডিন, মিসিলিগ রোগে রেডিও-মিসডাৰ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছে।

(৩) জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ :—জীববিজ্ঞান ক্ষেত্রেও এই ‘তেজস্ক্রিয় মস্কানী’ অদ্বুতপূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছে। জীববিজ্ঞানী এর সাহায্যে মানুষের দেহে অ্যালকোহল, অ্যামিনো-অ্যাসিড, অ্যাক্টিভিক (ব্যাক-প্রতিরোধক), জীবাবু, যক্ষকোষ, কার্গোহাইড্রেটস, এন্ডোইমস, চর্বি, হর্মোনস, পেনিসিলিন, প্রোটিন, স্টার্চ,

পলসক-ডাগলস, ডিটামিন প্রভৃতি বহুবিধ রোগের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করেছেন। মানুষের দেহের অস্থিমজ্জা, রক্ত, পাত ও অন্ত্রের অংশ প্রতিদিন ব্যবহৃত হয় এবং থাকারি থেকে তাদের ক্ষতিসূচক হয়। এটি প্রক্রিয়া এত স্থল যে, বাস্তবিক মূহ দেহের বিভিন্ন অংশের বিকৃতির বিকৃতি হয় না। এই স্থল ও নিয়ন্ত্রক সে-প্রণালীর রচনা জীব-বিজ্ঞানী এই মস্কানীর সাহায্যে উদ্ঘাটন করেছেন। ডিজিটালিস, মফিন, মিকোটিন, অ্যাক্টোমিন প্রভৃতি দেহে ক্রিয়ায় কাজ করে এবং মানুষের দেহে ক্রিয়ায় তাদের গ্রহণ ও বর্জন পথে, জীববিজ্ঞান এই মস্কানীর সাহায্যে তা পর্যবেক্ষণ করেছেন। গ্যাক্সালা সূচকি থেকে নক্তি সংগ্রহ করে নিক দেহে, কার্গোহাইড্রেটস, প্রোটিন ও চর্বি সংগ্রহ করে কার্বন-ডায়ক্সাইড ও জল থেকে। যুক্তরাজ্যের এই বিভিন্ন প্রণালী বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছেন রেডিও-কার্বন ব্যবহার করে। তা ছাড়া কৃষিক্ষেত্রে রেডিও-কল্ডকাস প্রয়োগ করে মাটির কার্বনগুণ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে এবং কৃষিকর্মের প্রকৃতি উন্নতি সাধিত হয়েছে।

এইভাবে বিজ্ঞানী তাদের সম্ভবত চেষ্টার পরমাপু-শক্তিকে জনকল্যাণের বিভিন্ন দিকে প্রয়োগ করে এক সূক্ষ্মাঙ্গী বিশ্ব-গঠনের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যের একটি দিক

মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়

শাক্যতা ভাবধারা বাঙালী আশন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অধিকারসে পরিণত করতে পেরেছিল বসন্ত উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার প্রাণশক্তি প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল। আশাবাদের মধ্যস্থিত জীবনের এবং সাহিত্যের আদর্শ বিচলিত হয়ে আধুনিক চিন্তা ও ভাবের প্রাবল্য দেখা দিল শাক্যতা সভ্যতা ও সংস্কৃতি-বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে। সে ভাববস্তুর বাঙালী ভালোমন্দ বিচার না করেই যে নিজেকে ভাবিয়ে দিতে চেষ্টাছিল তাকে আর পক্ষে কি? কিন্তু বাঙালী চরিত্রে আছে বিপরীত গুণের একই সমাবেশ, তার কলেই এতটুকু উজ্জ্বল কোয়ার সামলে নিয়ে সে স্থির হতে পেরেছিল, তারকেন্দ্র থেকে চূড় হয়ে পড়েছিল। বাঙালীর জীবন সত্য হল, এবং এই সত্যের পরম কলরূপ আদর্শ সেলাম নবজাগ্রত চেতনা—ব্যক্তিব্যক্ত্য ও মানবতা।

আমরা কি হারিয়েছি জানিনে, কিন্তু পেয়েছি যা তার গুরুত্ব সমধিক। মধ্যযুগের কাব্য-সাহিত্যের পাশে আধুনিক সাহিত্য পাঠ্য করলেই প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তে পাওয়া যায়। যা ঘটে তার কার্যকারিতা নিশ্চয় থাকে। এ কথা সত্য, বনন সে-যুগের সামাজিক জীবনের সন্ধান নিই তখন আর অজ্ঞাত থাকে না। বহি বিবেশের অপরিসীম ভাবস্রোত বাঙলার ঘাটে না এগে শৌছাত, তবে আদর্শ হস্ত সেই নিরুপায় মঙ্গলদান সেবে, অদ্বত কেবতার রোমে মৃত হয়ে তাঁদের বন্ধন-বীত রচনা করে আশাও স্বার্থকালে কাটাতাম। মধ্যযুগের সাক্ষী বঙ্গমন্ডলে ভাববিশ্বায়নের স্রবণ ছিল না, তাই কল্লনাশক্তিও যুক্তগতিভাবে অক্ষ ছিল; প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণে ভবে ভীত হয়ে যে কেবতার কৃপা তিকা করতে হত, তাঁর কৃপা হস্তত ছিল, কিন্তু মহৎ চোখে পড়ে না। এইজন্যই

মহাদুগের সাহিত্যে ব্যক্তির অস্তিত্ব। কোনো চরিত্রের মধ্যেই স্বাধীন চিন্তা, ইচ্ছা ও কর্মশক্তির প্রকাশ দেখতে পাইনে। দেবতার নামে তারা নিজের চিত্ত বশ করেছে। সে যুগের কবির কষ্ট মানুষ দেবতার হাতে কীড়নক। মানবতার পরাজয় চিরেই দে-মুগের কবির কবির উপাস্য হয়ে কবেছিলেন। এই পৃথিবীর ছন্দ-বন্দ—মানুষের চিন্তে বা অসুত হয়ে ওঠে, তা মহাদুগের কবিকে মুগ করেছিল নিশ্চয়, কিন্তু ধর্মসংস্কারের শৃঙ্খল এড়িয়ে যাবার মতো শক্তি তাঁদের ছিল না। কেবল বললকায়ো নয়, বৈক্যন পরিত্যাগ মানুষের ব্যক্তির পূর্ণ মূল্য দিতে সাহস করেননি। তাই রাস্যাক্সের স্বেচ্ছাচীত প্রেমের কল্পনায় কবি রূপ-শোণিত বর্ণনাকারে বসতে পারলেন না। বাহ্য হলেন মিথ্যের ভাব-প্রতিমা। সামাজিক অস্থান্যন ও ধর্ম-সংস্কারের পীড়নে চরিত্রের তিক্যপার অগুণ্ট ষেকে গেল।

উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে এই উপেক্ষিত মানবরূপ
তার স্বাভাবিক কামিনা-পুশনা দিয়ে সাজা দিয়ে উঠল। দেহ-দেবতার বার্ষ প্জারিত দেখানে অল্প আগিয়েছে এবং ব্যক্তির আবির্ভাব ও কবি-রূপের উচ্চ স্পর্শ দিয়েই সাহিত্য অধুনিক হয়ে উঠেছে। রবণের সর্বস্বাভা বিস্তার, হীরা, বেটিং, প্রভাব, সৌক্যগালের নিরাশাস বার্ষতার এই মানব-রূপের বহুই প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে ব্যক্তির প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল তৎকালীন সমাজ-বিশেষ। নৃতন যুগের ইংরেজী শিক্ষা ও আদর্শ প্রভাটের প্রথম জীবনাবরণের সন্ধান দিল। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সর্ব মানব-রূপের নিরাবরণ শক্তি ও সৌন্দর্যের পরম বিকাশ ঘটেছে—সেখানে জীবনের দুঃখ স্বীকৃত, কোনো রমণীর আবেগে আবৃত্ত করে আত্মপ্রবন্ধনা নেই; মানুষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, তার রূপের আকৃতি ভোগে, যোগে, সম্পদে, অধিকার-প্জায় হালাসার করে ওঠে, কিন্তু বিশ্ববিধির নিয়মে তার চরিতার্থতা নেই। এই বাধা রয়েছে তার প্রকৃতিতে, সমাজে, এমন নি নিজের অন্তরে মধ্যে। প্রকৃতির সঙ্গে বৃত্তিস্তির ও সামাজিক নিবৃত্তির অথবা স্বীতির কোনো মানব-রূপের বন্দ ও বাধার মানুষের অন্তরকেন্দ্র বন্দ বিন্দবী বন্ধের পরিণত হয়, তখনই সেই শক্তি-অশক্তির সংঘর্ষে মানবচরিত্র ভাঙার হয়ে ওঠে। জীবনকে, তার বিভিন্ন সন্ধাননাকে কামনার হতে আকর্ষণ করে রেখেছে হুতোপীয় সাহিত্য। মানুষের জীবনকে এমন করে দেখা আনাদেব সাহিত্যে ছিল না।

বাঙলা সাহিত্যে জীবনের এই সংকট-রূপ চুটে উঠল

‘মেঘনাদবধ কাব্যে’ রবণ জীবনকে ভোগ করতে চায়। পুত্রবক্তা, সংসার, আত্মীয়-পরিজন নিয়ে বাঁচতে চায়, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত কৈবপ্রভতির অমোঘ ত্যাগনার রূপবিশ লম্বর আবির্ভাব হুগুটনা ঘনিয়ে তুলল। প্রকৃতির অনাবরণ দানি আনন্দ সামাজিক বৃত্তি দিয়ে মানতে পারিলে, কিন্তু স্বাধীকার কবরও উপায় নেই। সামাজিক নিবৃত্তিই প্রকৃতিকে সাংঘত করে, বৃহত্তর জীবনকে গড়ে তুলবার ক্ষম আত্মরক্ষার্থে এই সাংঘতি সাংঘ ও কৃত্রিম নির্মাণ করেছে। এই ধর্ম মানবচরিত্রকে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সৌন্দর্যে আচ্ছাদিত করে বতখানি পর্যাণী করে তুলতে পারে রামচন্দ্র তার মৃত্ত প্রভীক। ভাগবতব চিরকাল লঙ্কার নগণির ও মুগ এই চরিত্রের বহুই। কিন্তু মেঘনাদ-বধের কবি প্রকৃতির এই বন্ধনকে স্বীকার করে নেননি, এমন কি, মানুষের এই সংঘের চেটেকে অশক্তির হুগুটনা বলে অবজ্ঞা করেছেন। তাই স্বাধীকার বহু রামচন্দ্র মনুস্বননের হাতে বেধপ্রবল, আশঙ্কার স্বীক, নীতিধর্মের একান্ত পরবশ বিবর্ণ চরিত্র। কিন্তু রবণ-চরিত্রের বেধপরবশতা হুগুটতার লক্ষণ নয়, বরং বেহেই তাকে শক্তিতে প্রবুধ করেছে। বেহ বহুত্বেরই স্বাক্ষ। রামের ভ্রাতা স্বেচ্ছাচীত রবণ-চরিত্রকে কাপুরুষ করেনি, কেনেছে ছন্দবদান মানুষ। সন্তুস্তুবিশোগ-বিহু পতীকে সাধনা দিয়ে রবণ বলেছে—

“রাম এবে, রক্ষসুলোভাশি !

আন্য ধোহা প্রতি বিধি ! তবে যে বাঁচিছি

এখনও সে শেষ প্রতিবিধিসংগিতে

হুতা তার !...

জীবনধর্মের এই বিপত্তিমুখী আঘাতে কৃত-বিকৃত রবণের চরিত্র। রামের সঙ্গে বৃদ্ধ নয়, দু-দু রণক্ষেত্রে তার পরাজিত চরিত্র। বেহ এবং কামনা এই দুই প্রকৃতির প্রচণ্ড বন্দ ও পরিশেষে অপরিণীত বন্দে। রবণ-চরিত্রকে জীবন বন্ধে।

মেঘনাদ-বধের রবণ-চরিত্র-পরিচয়নার এই বিশিষ্ট ভঙ্গী ইতঃপূর্বে আবার সাহিত্যে ছিল না, কারণ মানুষের খিচিট ছন্দ-বহুত্বকে বৃদ্ধার চেটী এবং তা প্রকাশ করার সাহস কবিরে ছিল না। রবণের মধ্যে কবি মনুস্বন বোধ হয় নিজেকেই নিবিড় করে উপস্থিতি করেছিলেন। মনুস্বননের ব্যক্তিগত জীবন-পার্শ্বেই কানা হার বে, তার সমগ্র জীবন হুনিবার গতির ত্যাগায় কেনন করে অবদ্য চকল হয়ে উঠেছিল, কেনন করে তিনি বেহমনের আবেগে বহির্জীবনের বহুৎ আকর্ষণে পুহের নিবৃত্তিতা, হাতার বেহ, খিটার স্বীক, সমাজকে নির্ভর সব ত্যাগ করে বাইরে চুটেছিলেন। বে বহুত্বের পরম বিশ্বশক্তি কবিকে আবেগে আচ্ছাদ্য

ক'রে অনিচ্ছিত হুঃসাহসের যত্নসহজে তরী ভাঙাতে আকর্ষণ করেছিল, কবি মধুসূদন তারই রূপ বচনা করেছেন ব্যবগ-চরিত্রে। সে কোনো ভাবের প্রতীক মাত্র নয়। কবি-হৃদয়ের স্পর্শে যাহ্নবের আদিম কামনা অনিবার্য ভীষণ-গভীর জয়ন্তত হুলেছে হাবণের মধ্যে।

কবি মধুসূদনের যত্নশাখ বেমন কুটেছে হাবণের মধ্যে, তিনি নিজেকে যুগগচ্ছিকদের বাঙালী সমাজ-বন্ধন-বিচ্ছাতির প্রতীক। তঁর মধুসূদন নন, সে হুগের অনেক নবাবাবা-ই প্রচলিত সমাজধর্মকে উপেক্ষা করে চলে এসেছিলেন। বাঙালীদেশে এই যে বিগ্রহ জাতীয় জীবনে ঘটেছিল, আসলে তা জাতির অন্তর্ভুক্তদের গভীরতর ভাববিগ্রহের বাহ্যিক নাট্যালীলা। হুঃসাহসী জীবন-নিষ্ঠা যখন আঘাতের প্রেরণা কোণাল, তখন যাহ্নবই হল সাহিত্যের পরম বিদ্য। যাহ্নবের প্রবৃত্তি, যাহ্নবের হৃদয়বস্তা তার শক্তি; যাহ্নবের দেহমনের হাডাবিক আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা আর কিছু বড় থইল না। এই যাহ্নবের হৃদয়নীতির কাছে সমাজনীতি, ধর্মনীতি বিধাশ্রয় হল; যে কল্পিত সৈবশক্তির কাছে মানবধর্ম নির্জিত হয়েছিল, এবার বাঙালীর চিত্তক্ষেত্র থেকে তা নদ্যে উৎপাটিত হল। যেমনদেব-কাব্যে অর্পিতবার বেলাভূমিতে যে বিপর্যয় বেয়েছিল তা আসলে প্রাচীনকালের ও প্রতীচের চেতনার সংগ্রাম বাঙালী চিত্তভূমিতে, বাঙালী সমাজ-জীবনে।

এই আভন নিয়ে খেলা করতে গিয়ে কবি নিজেকে নির্বন হয়ে উঠলেন। প্রাচীন সমাজ ও জীবনের সমস্ত মধুই তিনি বিন্ধত হলে। তাই যে রামচন্দ্রের ত্যাগ, সংযম, কর্তব্যনিষ্ঠার অন্তর্ভুক্তি মহিমা ভারতীয় চিত্তশপটে আঁকা আছে, তার মধ্যে কোনো মহত্ব কবি খুঁজে পেলেন না। অশান্ত মানবহৃদয় অপেক্ষা শান্ত কল্যাণ-অভিমুখী চেতনা

বোধহয় মধুসূদনকে মুগ্ধ করতে পারেনি; এই নীতিকে হুঃসাহসের নামান্তর বলেই মনে করেছেন। এই বিদ্রোহী আত্মশ্রদ্ধা প্রতিভা, যেখানে ব্যক্তিরূপের জয় নেই, যেখানে ভোগের আশ্রিত নেই—সেখানে নতশিত হতে পারেনি। হাবণের আত্মশক্তির ডুকায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যে অনন্ত শিশুশা, অপরচিত্ত অশেষ—কোনো মহিমাশ্রদ্ধা সঞ্চার, কোনো বস্তির বাগী সোনাতে পারেনি। তাই দেখি, হাবণ-চরিত্রের অন্ধ সর্বস্বাসী শক্তি ঘটিয়েছে বিশ্রান্তিকর-ট্র্যাকেরি।

কোণার যেন বেদনা বাজল। সমাজ, দেশ, পিতা-মাতার যেহ সর্বশ্রুত্যাগের অপরিশোধ বাধা। জনক-জননী যেহ কি মধুসূদন সম্পূর্ণ বিন্ধত হয়েছিলেন? হতে পারেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বহুসমাজের নব প্রতিবাদের অন্তর্ভুক্তি যে রক্ত নিঃস্র হৃদয়ের বাধার কঙ্কধারা বয়ে চলেছিল, তা আঘাতের চোখে পড়ে না।

আবার বাঙালী আত্মহ হল। আবার আঘাত ফিরেছি, অবগাহন করেছি চিরপ্রবাহিত ভারতীয় জাগ্রতবীর তপঃপূত ব্যাধিয়ার। জীবনের নিরাশ্রয় বিষয় পরিণতি কোনো শাসনার বাগী বহন করে না। ভোগ এবং ভোগের অপূর্ণতা থেকে সমাজ-সংসারে, হৃদয়ে যে আভন জলে গঠে, সেই অধিশ্রম নির্বাণিত হব ত্যাগের ধারা; তাই বস্তির মধ্যে দেখি হুঃসাহসের কল্যাণের কাছে ব্যক্তি নিজেকে উৎসর্গ করতে চায়। জানি—হৃদয়নীতি যানে না কোনো ব্যত, কিন্তু হুঃসাহসের অতীত হবার বাসনাও তার নিজের। এই মহৎ উৎস থেকে আপন শুভবুদ্ধিকে, শিববুদ্ধিকে, বনবিতাকে আগিয়ে তুলে যাহ্নব উত্তাল উচ্ছ্বল হৃদয়বেগকে শান্ত ক'রে সংবত করে, সমগ্র ক'রে ব্যক্তি ও ব্যক্তি-উত্তর হুঃসাহস কল্যাণকে প্রদান করে।



পল্লীর বারশস্তা

তুলসীদাস সিংহ

বর্ষা হল ঠিক ঠি খোঁচটার মূখ-ঢাকা মূলবৎ। কাছে সে আসবেই, কিন্তু প্রথম প্রথম তাকে আসতে দেখে মনে হয়, আসে আসে—তবু আসে না। হু-একবার আসা হয়ে থাক, লক্ষ্যটা: বাটুকি তার একটু। তখন দেখবেন স্ত্রীর আসার ক্ষেত্রে আপনি এমন হাঁ করে বসে আছেন তাকে আসতে দেখেই তখন আপনার মূখ থেকে বেগিয়ে পড়বে—‘আর পারি না বাপু—দিন নেই রাত নেই কেবল ঐ জল, জল আর জল। প্রাণটা পত্তন প্যাণ্যপ্যাচিরে উঠলো গা!’

কোনটা সুন্দর বসুন দেখি? তার ঐ আসার পথটির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকটা, না তাকে আসতে দেখে বিরক্ত হওয়াটা। আশাচর্য্য আরও হতে-না-হতেই যদি আকাশে মেঘ ভেঙ্গে উঠতো এখা: যেখানা মেঘ হয়ে ভেঙ্গে ওঠারবার জল হয়ে করে পড়তো তাহলে পেতেন কি মেঘদূতকে—পেতেন কি খনা-ডাকপুরুষকে?

হুতরা: আমি বলি কি বরষাকে আসতে না দেখে আপনি দুঃ করে ভরসা হারান। আপনার ভরসা হারানোর উপরেই নির্ভর করছে—মেঘদূতের বেঁচে থাকা—নির্ভর করছে খনা-ডাকপুরুষের বেঁচে থাকা।

আপনি কিরূপী প্রেমিক—বর্ষার আকাশে মেঘ ভেঙ্গে না ওঠার ক্ষেত্রে আপনি মনের বধরটা প্রেমিকার কাছে পার্যতে পারছেন না। আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি—আপনি কানিলাসের নামে এক্সপ্রেস ডাকে চিঠি ছেড়ে দেন একটা। আর আপনি কৃপাণ—আপনাকে বলি, আপনি হু-হাঁটুর ভিতর থেকে মুঠো একবার ছুঁদুন, ঐ দেখুন আপনার সামনে ঠাঁড়িয়ে বন। আর ডাকপুরুষ কি বলছেন আপনারকে।

ভরসা-হারা কৃপাণদিকে ভরসা দিতে এগিয়ে এগেছেন তিনি, তিনি এক মূলকামিনী পল্লীবালা। কৃপাণরা যাতে ভরসা না হারায় সেজন্তে বর্ষা আসার বহু আগে থাকতেই বচনের মাধ্যমে তিনি বর্ষার পূর্ণাভাব দিয়ে বলছেন—

“চৈতে বরষা—বৈশাখে বড়পাণর।

জ্যোত্রে তারা ফুটে—তবে জানবি বর্ষা বাটে।”

চৈতে বরষার অর্ধাং চৈতমাসে এখন রোধ দিয়ে যে বাইরের দিকে ডাকলো মনে হবে সব যেন বরষার করে কাঁপছে। বৈশাখে দুঃ করে বড়পাণর হবে। জ্যোত্রে মাসে

আকাশটি থাকবে পরিষ্কার—রাত্রি গোটা আকাশ ভরে তারা ফুটে উঠবে। এই যদি হয় তাহলে স্থির কোনো বর্ষা ঠিক হবেই।

দ্বিতীয়ত:—“পৌষে গরমি, বৈশাখে জাড়া।

প্রথম আবারে ভরবে গাড়া।”

পৌষমাসে যদি গরম করে আর বৈশাখে শীত-শীত করে তাহলে কেনে নাও আবারের প্রথম দিকেই গাড়া অর্ধাং খাল বিল নালা ভোঝা সব জলে ভরে উঠবে।

তৃতীয়ত:—“বৎসরের প্রথম ঈশানে বর।

সে বৎসর বর্ষা হবে খনায় কথ।”

বৎসরের প্রথম অর্ধাং বৈশাখে যদি ঈশান কোণ থেকে ব্যতান বইতে থাকে তবে বুঝতে হবে সে-বৎসর হু-বর্ষা হবে।

বর্ষার মতো ডাকপুরুষও বর্ষার পূর্ণাভাব দিয়ে বলছেন—

“চৈতে ছেরানি, বৈশাখে জাড়া।

প্রথম জ্যোত্রে ভরবে গাড়া।

ডাক বলে এ তিনি বাধী।

আবারে প্রাণ নাটকো পানি।”

আমার মনে হয় হিন্দী ‘হারা’—বার অর্ধ হল সখু—থেকেই বাংলা ‘ছেরানি’ শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। চলতি গৈরো কথার এই ছেরানি শব্দটির বহুল প্রচলন আছে। ধানের ভাড় বরন সখু হয়ে লক্ষ্য করতে থাকে তখন তাকে বলে ধান-ছেরানো। চৈতমাসের রোদ বিখ্যাত রোদ—এ রোদে বাটির সব খাল মরে যায়। কিন্তু যদি আবার চৈতমাসে জল হয়ে যায় কয়েক পশলা, তাহলে খুঁটতে ডাল সখু খাদে ডাবে ওঠে। চৈতমাসের এমনিধারা সখু খাদে দিলে তাকিয়েই বোধ হয় বলা হচ্ছে—‘চৈতে ছেরানি’। শীতকে গৈরো কথার বলা হয় ‘জাড়’। ‘বৈশাখে জাড়া’ মানে বৈশাখমাসে যদি শীত করে। গর্ত বা খালকে গ্রাম্য চলতি কথায় বলা হয় ‘গাড়া’। এ থেকে উপরের হুটী লাইনের অর্থ পাঁড়াজে—চৈতমাসে যাঠে যাঠে যদি সখু খাদে বোলা বলে, জ্যোত্রে প্রথম দিকে এখন জল হয় যাতে খাল গর্ত সব ভরে যায় বলে, তাহলে বুঝতে হবে আশাচর্য্য-প্রাণে জল হয়ে না।

কৈশা-বৈজ্ঞানিকের কথা ছেড়ে দেন, পূর্বাভানের কথাও ছাড়ান—এবার ধরুন আখ্যায় এল এবং আখ্যায়ের আকাশে মেঘের দেখা মিললো। নানা রকমের মেঘ এসে ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশময়। কিন্তু সব মেঘই তো আর মেঘ নয়—সব মেঘ থেকেই জল পড়ে না। আকাশে মেঘ ভাসতে দেখে বন্য বলছেন—

“কোদালো কুড়ারা! মেঘের গা,
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা।
বলগে চাবীকে বাঁধতে আল,
আজ না হয়ত হবে কাল।”

আকাশের গারে যে মেঘগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে সেগুলো যদি কেটে কেটে যায় অর্থাৎ ছানা ছিঁটে বাতায় মতো হয় এবং কেটে-বাওয়া টুকরোগুলো দেখে মনে হয় যে বেন গোটা মেঘটাকে কোদাল আর কুড়াল দিয়ে ছুঁপিয়ে দিয়েছে, সেই সঙ্গে থাকে মাঝে ‘বা’ অর্থাৎ বাতাসের (বাতাস থেকে চলতিববার এসেছে ‘বাও’, বখা—বাও পাওয়া, বাও লাগা। এই বাও থেকে ‘ও’-কে আবার তাকিয়ে দিয়েছেন বন্য।) তাহলে চাবীরা সব জমির আল বেঁধে রাখুক—জল আজ যদি না হয়, কাল ঠিক হবেই।

এবার ধরুন মেঘ থেকে বর্ষণ শুরু হল। বর্ষণ শুরু হল বটে, কিন্তু তা নিয়মিত নয়। একদিন একশলা জল হয়ে গেল ভো, পাঁচ-ছ’দিন আর হল না। এর নাম হল ‘ওকো’। বন্য বলছেন—“দিনে জল হারে তাসা। এই দেখবে ওকোর ধাতা।” বিনের বেলায় জল হচ্ছে আর রাত্রে আকাশময় তাসা ফুটে উঠছে—তাহলে বুঝতে হবে বর্ষাটা এখনও ওকনোতে-ওকনোতেই কেটে যাবে।

একটু-আধটু জল হওয়ার পর বর্ষার আকাশে প্রায়ই রামধনু দেখা দেয়। এই রামধনুকে দেখিয়েও বন্য বলছেন—

“পশিমে ধনু: নিত্য ধবা।
পূবে ধনু: বর্ষে কড়া।”

পশ্চিম আকাশে পশি রামধনু ওঠে তাহলে বুঝতে হবে এবারের বর্ষাটা ওকনো-ওকনো ডাবেই কেটে যাবে। আর পূব আকাশে যদি রামধনু দেখা যায় তাহলে কড়া বর্ষণ হবে।

আখ্যায় মানে মাঝে মাঝে চাঁদকে দিয়ে একটি বৃত্তরেখা ভেসে ওঠে। এ-রেখাটি কখনও চাঁদের কাছ থেকে দূরে থাকে, কখনও বা কাছাকাছি থাকে। এ হল চাঁদের সভা। এই সভাকে দেখেও বন্য বলছেন—

“পূব সভা নিকট জল।
নিকট সভা রসাতল।”

সভার মধ্যে থাকে তারা।

জল ঢালবে দুইলক্ষাংক।”

অর্থাৎ চাঁদের কাছ থেকে সভাটি বা বৃত্তরেখাটি যদি দূরে থাকে তাহলে বুঝতে হবে জলের আর দেখি নেই—জল এবার হল বসে। সভাটি দূরে না হবে যদি কাছে হয় তাহলে বুঝতে হবে ধরা রসাতলে যাবে। কিন্তু সভার মাঝখানে যদি তারা থেকে যায় দু-একটা, তাহলে দুইলক্ষাংক জল পড়বে।

বর্ষার দিনে আকাশ সাধারণত: মেঘাচ্ছন্নই থাকে। ওঠবার সময় বা ছুঁববার সময় সব দিন সূর্যকে দেখতে পাওয়া যায় না। এই দেখতে পাওয়া-না-পাওয়া থেকেও বন্য বলছেন—

“সাঁঝ চক্চকু সকাল যোর।
তবে জানবি বাজী-ভোর।”

বিকালের দিকে সান্য বিকাল হরতো আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো, সূর্যের শাস্তা পাওয়া দেয় না। কিন্তু ছুঁববার সময় মেঘা গেল সূর্য্যাস্তার দিগি বলমল বলমল করে ছুঁবছেন। সঙ্গে সাঁঝের আকাশটি চক্চকে হয়ে উঠলো। এমনিধারা চক্চকে সন্ধ্যাকালটিকে দেখেই বন্য বলছেন—“সাঁঝ চক্চকু”। সন্ধ্যাকালটি যদি হয়ে যায় চক্চকে ঝক্‌ঝকে, আর সূর্য্যি ওঠবার সময়টিতে পূর্বের আকাশ মেঘের দৌলতে ঘোরাহল হয়ে ওঠে, তাহলে ধরে নিতে হবে ‘বাজী ভোর’। বাজী শেষ হতে ভোর গড়াবে। দাবা-বেলা ভায়া বেয়ড়া বেলা। এ বেলায় খেলোয়াড়দিকে বেলা-বৃত্ত অবস্থায় যদি বলা যায় ‘ভোমার ছেলেকে সাপে কেটেছে’ তবে উত্তর আসে ‘কার সাপ’। দু-পক্ষের দুটি-ই যদি আবার হয়ে যায় উনিশ-নিশ তাহলে তো কথাই নেই। সকালে বসলে উঠতে লাগবে ভোর। সকাল গড়িয়ে হুপুর হল—দাবার ছকটিকে গুটি-সম্মত ঢাকিয়ে রেখে পাওয়া সারলেন দুজন, রাত্রে খের ঢাকিয়ে রেখে রাত্রে খাবার বেলেন, তারপর সেই খনন ভোর হব-হব হল তখন হরতো বাজী বাত হল। এই অবস্থারটি সবে দুগলনা করেই বন্য বলছেন ‘বাজী ভোর’। ‘সাঁঝ চক্চকু সকাল যোর’ হলে বুঝতে হবে বর্ষা অমতে এবার ‘বাজী ভোর’ হয়ে যাবে, অর্থাৎ সেই স্রাবণের দেখ-নাগদ্য হরতো ইতি নামবে।

তা সে বাই হোক—বনার বা ডাকগুরুদের বচনগুলো আচ্ছকের দিনে মিসুক বা না-মিসুক, বর্ষা তাড়াতাড়িই আহুক কিবা বেশি করেই আহুক—বারা চালাক চাবী ভায়া

মাথার হাত দিয়ে বসে থাকে না। বেশী না হলেও, একটু-আধটু জল ছয়ট আবারের প্রথম দিকে। তখন তারা বসে না। খোক, ডাড়া জমি বা বাইর জমিতে ধানের পরিবর্তে পাণ্ডারের বীজ ছড়ায়। পাণ্ডা দেখতে ধানের মতো হলেও, এটি ধান নয়—এক জাতের ঘাস। ধানের মতোই লম্বা হয় আর কলো দান-সেড়েকের মতোই। আবারের প্রথম দিকে এর বীজ ছড়িয়ে দিতে পারলে, এগুলো থেকে ওঠে প্রাণের গোড়ার দিকের। এগুলি তখন কেটে নিয়ে সেই জমিতেই ফের ধানের চারা বসানো যেতে পারে। পাণ্ডারের বীজগুলো গোলা-গোলা—দেখতে অনেকটা পাণ্ডারের মতো। এর ভাত বা গ্যারেল মুখোশ হয় বু। এর ভাত এক মুগাচা যে, রসেইকে পাণ্ডারনো চলে। পাণ্ডারের যে বড় হয় সে-বড়ও ধানের বড়ের চাইতে অনেক বেশী পচল করে গর-ঘোবরা। চাষের সময়টার বড়ের চান পড়ে অমিকালে চাষীরাই। পাণ্ডারের বড় এ-সময় তাদের বড়ের অভাব পূরণ করতে পারে। এর বীজ-ছড়ানোর সময় একটা মাত্র চাব দিয়ে ছড়িয়ে দিলেই হচ্ছে। পুঁততে হবে না, নিড়ান-উড়ানোর দরকার হবে না, কোনরকমে একবার ছড়িয়ে দিলেই পাণ্ডা আপন-আপনি বড় হয়ে—জলাবে, কলবে, পাকবে।

•

“গলা গেল ঘর তো লাঠল জুলে ধর”। মুনিষ-মাকারদের লাঠল জুলে ধরার মাল হল এই আবার মাল। তৈর, বৈশাখ, ঐশ্যী বাছাননরা সব পারের উপর পা রেখে ধেরেছে—এখন হয়ে আসলে তার শোধ দিতে হবে। জল হল, জমির ‘বতর’ হল—সে-বতর তো আর তোমার ক্ষেতে বসে থাকবে না। বতর থাকতে-থাকতে জমিতে চাব দেওয়া গেলে নিতে হবে তোমারদিকে। জমির মালিকরা তাই খুব কড়া হয়ে সেগে থাকে এ-সময় মুনিষ-মাকারদের পিছনে। তারা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাল বা লাঠল বেরিয়ে পড়ল মার্চে, ঘর চুকবে ফের সেই সন্ধ্যা হলে পর। জলখাবার সময় হলে, জলখাবার আসবে মার্চে—মার্চে বসেই জলখাওয়া সারতে হবে চাষীদিকে, মার্চের সঙ্গেই তিকিরে নিতে হবে মুড়ির গাঁট, খান সারতে হবে কাছাকাছি কোনো ডোবার বা পুঁহুর, ভাত খাওয়ার সময় হলে কেবল ভাত আসবে। মুড়ির মতো ভাতও খেবে নিতে হবে জমির আলে বসেই। গলা বা মালিক বলে আছেন আলের উপরেই—মাঝে যে একটু আলগা হিবে তার উপাও নেই। কিন্তু জমির মালিকরা তো আর আলের উপর বসে ভাত-মুড়ি ধায় না—ও-সব খাওয়ার

ক্ষেত্রে বাড়িতে চলে আসতে হয় তারদিকে। আর সেই সুযোগেই মুনিষ-মাকাররা লাঠল জুলে ধরে।

ধানের জমিতে চাব দিতে হয় সাধারণতঃ চার বার। খুব টিপে লাঠল ধরলে এই চারবারের ক্ষেত্রে যদি তিনবার চাব দেওয়া হয়, তাহলে তাতে ঐ চার চাব দেওয়ারই কাজ হয়ে যায়। যাদের নিজস্ব জমি এবং দিকেই চাষী তারা তাই করে। কিন্তু যে চাষীরা মজুরীর পরিবর্তে মালিকদের হয়ে লাঠল চালাতে যায়, তারা লাঠল চালাবার সময় ঠাকি দেয়। খুব জোরকম করে টিপে ধরে চল্লিশখটা লাঠল চালাতে গেলে কষ্ট হয় চাষীরা। গা-গতর ব্যথা টনটনিতে ওঠে। তাই গলা বা মালিকরা যখন কাছে কাছে থাকে তখন একটু টিপে ধরে বটে, কিন্তু গলায় ঘর গেলেই তারা লাঠল জুলে ধরে, অর্থাৎ টিপে না ধরে আলগাভাবে বোঁটাটা ধরে যাচ্ছে মাত্র। এরই নাম হল লাঠল-জুলে-ধরা।

তবে ইঁা—মাটিও আবার সেরকম আছে। আলগা মাটি হলে টিপে লাঠল ধরতে কষ্ট নেই তখন। কিন্তু চাষীরা যার হয়ে যার কেবল ঐ এঁটেল মাটির বেলাতেই। চাষীদের মধ্যেই একটা কথা আছে—

“কাজ নাই যে মাথা আবার এঁটেল-মাটির চাষকে।

কাড়ার মতো গভীর আবার শোলের মতো ভাসছে।”

কাঁকড়ারা সব এতদিন ঘুমিয়ে ছিল মাটির মধ্যে। বর্ষার লাড়া শেষেই মাটি কেটে বেরিয়ে পড়েছে। জমিতে চাব দেওয়ার সময় লাঠলের ডগার, মইয়ের উপর ঠেঁটে পড়ে কেউ কেউ—কেউ কেউ আবার মাছুষ-গরুর পায়ের নখ গেলে ক্ষেতময় ছোট্টাছুটি করে ধরে। এ সময় দেখবেন গলায় আর একা আলছেন না, গলার সঙ্গে গলার ছেলেও আসছে। কাঁকড়ি চাই যে তাহের। কাঁকড়া বলছি আবার—কাঁকড়ি—কাঁকড়া নয়, ক্ষেত-কাঁকড়ি। কাঁকড়ারা থাকে পুঁহুর—কালো কালো দেখতে, ইঁদা-ইঁদা, ষাড়া-ছোটো-ডাঙার বেশে ছটপুট। এদিকে দেখলে ছেলের ব্যবসারও পিছু হটে। কাঁকড়ি কিন্তু ছোট—শাড়াগোলাও ছোট—তবে ধরতে গেলে লম্বিনের মতো ষাড়া হয়ে ওঠে এদের দাড়াগুলো। মাঠ থেকে ছেলেরা এদিকে ধরে বাড়ি নিয়ে আসে—বাড়িতে এনে ষাড়া-ছোটোতে মতো বেঁধে চানচানি আরম্ভ করে। আর কথাতাই আছে—

“খাঁ কাঁকড়ি ছেলের বন”।

থাক, ঐ-বে চাষীরা জমিতে লাঠল চালাচ্ছে—যাদের মুগগুলো এখন শুকনো-শুকনো দেখছেন—ঐ শুকনো খুঁ আবারের মাঝামাঝিতে এনে দেখছেন রসাল হয়ে গেছে।

বর্গা তো এই আরম্ভ হয়েছে—তখনো মাটিতে এই পড়ছে
প্রথম ঢাল। বর্গটা কেঁপে আতঙ্ক, অঙ্গনা হয়ে থাক
মাটিটা, লক্ষ্যকিরে উঠুক মাঠে মাঠে ধানের কচি
বীজভাণ্ডা, মাঝদিন ধরে কাঁকের পর কাঁক জল আতঙ্ক আর
থাক—তখন দেখবেন তাদের মজরাটা আর গলাধের দিকে
নেই—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হয়ে হয়ে ঢালা বগালেও
তাদের কোমর ধরে যাচ্ছে না। বমকম কুটিপড়ার তাগের
সঙ্গে ডাল রেখে তাদের গলা দিয়ে বধিরে আদছে গান—
অগবেষ সীতিমালা। হাত-পা গুটিয়ে গান নয়—কাজ
করতে করতে গান। মানে খুঁজতে যাবেন না কিন্তু
এ-সব গানের—বর্গার বাহা গান গায় তাদের গানের
বেশ ভালো মানে আছে বটে, কিন্তু তা ভোতা হয়ে বুজতে
পারা যায় না। বুজতে গেলে স্রোতা নয়, গায়ক হতে
হবে। কুমকির গানের মানে চান—কুমকি হোন তবে,
কুটির গানের মানে চান—কুটি হয়ে কবে গড়ন, ব্যাঙের
গানের মানে চান—ব্যাঙ হোন, কড়ি—এর গানের মানে
চান—কড়ি হয়ে লাকান।

ঐ দেখুন, বর্গার জল পেয়ে লক্ষ্যকিরে-ভর্তা মালের
ডগায় ডগায় কড়িখা নেচে বেড়াচ্ছে। তাদের অত
নাচানাটিটা কিসের জ্বলে বহন দেখি? না নাচলে যে
গান হবে না—ডানার চট্টানি—ই যে তাদের গান।
ঐ দেখুন গঙ্গা-কড়ি গাইছে চেতুর্ভু কেউ কেউ কেউ,
গঙ্গা-কড়ি গাইছে ভবুর্ভু ভট্ট, কঙ্গ-কড়ি গাইছে তিড়ি-
তিড়ি-তিড়ি, পাতি-কড়ি গাইছে তিড়ুর্ভু-তিড়ি।

বাড় কোথান—ঐ শুধু ব্যাঙরা সব গান গাইছে।
ইরি-ব্যাঙ গাইছে—ম্যাক্ ম্যাক্ ম্যাক্ ম্যাক্, ছাপলে-
ব্যাঙ গাইছে—ম্যা-ম্যা-ম্যা-ম্যা, কাঠ-ব্যাঙ গাইছে—
কবুর্ভু কঁ কঁ কঁ, কাড়-ব্যাঙ গাইছে—ক-ক-ক।

বার্তের আল ধরে চন্দ্র—বেশুন আলভাণ্ডো গান
গাইছে। কেউ গাইছে—হড়্ হড়্ হড়্ হড়্, কেউ
গাইছে—হো হো হো হো, কেউ-বা গাইছে—কিঁ কুঁ
কিঁ কুঁ কুঁ।

গাছপাটার দিকে ডাকান—ভহুন পেখানেও কাহা
একটানা গান ধরে বসে আছে : ঝাঁ-ঝাঁ-ঝাঁ-ঝাঁ—
ঝিঁ-ই-ই-ই-ই-রি-রি-রি-রি। আবার অছকার নামলে
বেশে যাবেন ঐ গায়করাই পাছের মাথার মাথার ডালা-ডালা
আকাখটাকে টেনে বাহিরে বেশে ঐ একই গান সেবে
হাত কাবার করছে।

আর যখন বর্গা এদের সকলের সঙ্গেই গলা বিশিষ্টে
ধিরে কখনো গাইছে—কিঁ কিঁ কিঁ কিঁ, কখনো গাইছে

—কর কর কর কর, কখনো গাইছে—হড়্ হড়্ হড়্ হড়্,
কখনো-বা স্তম্ভ পর্যন্ত গলা জ্বলে ধরে বসে থাকছে—
কে-এ-এ-এ-এ।

*

‘পাহুল’ বোকেন? ‘ইতরানি’ বোকেন? ‘পাখানি’
বোকেন? আচ্ছা, ওসব না বুঝুন, ‘শিপিীদিকা’ পাখা রাঁপে
মরিবার ‘তবে’—এ কথাটার অর্থ তো আপনার আবার
কাছে জলের মতো পরিষ্কার। পাখা শুঁ শিপিীদিকা নয়,
আর ছুটি শিপিীদিকা রাঁপে এই বর্গার সময়টার। তাদের
একজন হল উবুই—অন্য জন হল বাছ।

উই থেকে উবুই। বর্গার জল পড়লে ঐ-বে একটা
দোখা-দোখা গছ উঠতে থাকে মাটি থেকে—ঐ গছটা
উবুইয়ের কাছে মনের মতো। বাতাল হয়ে ভরে তারা
এই গছটা পেলে—মাটির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে
বাতলাসি করতে গিয়ে জলের সঙ্গে লটপটে হয়ে মরে।
বাতা বেরিয়েই ওড়া বেশ, তারা মরে এসে আনন্দের বাড়ির
মধ্যে। সন্ধ্যা ঘনিরে আতঙ্ক, জলে উঠুক বাড়িতে বাড়িতে
আলো—দেখবেন তারা বলে বলে মরতে এসেছে। কাঁকের
কাঁক উবুয়ের পাছার গড়ে আপনাকে তখন সরে পড়তে
হবে আলো ছেড়ে—অস্থির হয়ে উঠতে হবে আপনাকে
তাদের আলার।

আর ঐ দেখুন বাছজলের কেমন পাহুল বেঁধেছে!
এটুকু জলের মধ্যে পড়ে-পড়ে বাঁধি বাঁধি এতদিন
সব—বর্গার জল পড়তেই, প্রথম ঢাল নেমে আসতেই
ধড়ে প্রাণ এস তাদের। তারপর যখন নামতে লাগল
ঢলের পর ঢাল তখন পাহুল বেঁধে গেল তাদের—আজ্ঞার
আটপানা হয়ে আট দিকে ছুটোছুটি করতে গিয়ে মরতে
আরম্ভ করলো সব। জল-ডাকার জান হারিয়ে ঢলের
গতি ধরে পুকুর ছেড়ে উজান বাইতে গুঁক করলো বাহুর।
‘উঠেউঠে-উঠেই এক কাঁধি’ যাতে হয় সেমাজে আছেন
বক-ঘামা—তাকে এড়িয়ে এসে আছে পলুই, যুৎ-জাল,
চাপ-জাল, কড়কে, কড়কে, আপনি-আমি।

‘লোখাপড়া করিয়ে মরিবে হুঃখে—মৎস্ত মরিবে খাইবে
হুঃখে’ পৃথটির যিনি কর্তা তিনি নির্ভাৎ আশাচ যোগেই
এই পৃথটি ঘটনা করে ফেলেছিলেন। অজস্রদয় মৎস্ত
মারতে গেলে অগ্নিবিক্র হুয়া শেতে হুঃ, কিন্তু বর্গার সময়
আপনি হুঃ বাহুন, আপনায় আটবহরের ছেলে খেঁকি-ই
হুঃখে মৎস্ত মেরে গেলে।

এখন কি, বাড়ির পূবে যদি ঝাঁপ চরবার বাবরা থাকে
তাহলে দেখবেন চ্যাং-গডুইরা ক্রিয়কিরে জলের শিবে

কিন্তু ব্যাটরীয়া কি বলে জানেন? ওরা বলে, আষাঢ়ী পোকারদিকে টেনে আনে আষাঢ়ী ঠাঁরুয়। আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহে যেদিন হল আমাদের অম্বুবাচী উৎসব—সেদিন হল ওদের আষাঢ়ী উৎসব। সমারোহের সঙ্গে ওরা ওদিন আষাঢ়ী ঠাঁরুয়ের পূজা দেয়। নিম্নেরাই পুরুত সঙ্গে পূজা দেয় আষাঢ়ী ঠাঁরুয়ের, শ্রমের বলি দেয়—তার পর দজ্জা হলে খুব করে মদ খায় আর সুতি করে। খুব সুতি বলতে এরা বোঝে নাচনী-নাচানো। আষাঢ়ী পূজার বিকালে নাকড়া পিটাবে, রাধল বাক্সাবে—সেই সঙ্গে নাচনী নাচতে থাকবে—তাহলেই হল এসের খুব সুতি। কিন্তু নাচনী-নাচানোটি বেশ খরচার ব্যাপার বলে সব বছর টাকা দিয়ে নাচনী আনতে পারেনা সব। তা সে হাই হোক, এরা বাবি করে, আষাঢ়ী পূজা বতকন না এরা করছে ততকন আষাঢ়ী পোকারা বার হন না।

আজ্ঞা, বাটি আষাঢ়ের কে বলুন দেখি? বাটি আমাদের মা—আমাদের বাড়ির আজুর মেয়ে গো। আর পাঁচটা বেয়ের মতো এ-মেয়েও কম আছে, বালা আছে, কৈশোর আছে, বৌবন আছে, পূর্ণবস্থা আছে। প্রথম পশলা জল পড়তেই বাটির পুনর্জন্ম হল। বিত্তীয় পশলা জল পড়লো অর্থাৎ বাটি শৈশবাবস্থা অতিক্রম করলো, তৃতীয় পশলা জল পড়লো অর্থাৎ বাটি কৈশোরে পা দিল, চতুর্থ পশলা বৃষ্টি হওয়া মানেই বাটি-মায়ের কৈশোর দশা অতিক্রম করে বৌবনে পা-কেওয়া। বাটি-মা এবার হলেন মা হওয়ার উপদ্রুত। ঘরের সঙ্গে বিলিখে থেলার, বাটি-মা রজস্রা হলেন। আষাঢ়ের সাত তারিখের আগেই তিন-চার পশলা বৃষ্টি হবে বাটা। স্রুতবাং পূর্ণপূর্ণবস্থা দ্বির করে দিয়ে গেছেন আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহের শেষ দিনটিই হল শ্রীমায়ের রজস্রা হওয়ার দিন। আষাঢ়ের সাত-তারিখটিকে তাই আমরা অম্বুবাচী বলে গালন করে আসছি।

যেয়ে-মুড়ো সবাই জানে অম্বুবাচীর দিন জল হবেই এবং সে জল এখন জল হবে বাতে সাতপুর-বাটি ভিজবে। এ দিন থেকে আরম্ভ করে পর পর তিনটি দিন বাটি-মা অগুজা হয়ে উঠেন বলে বিধবা মেয়েরা বা ব্রাহ্মণেরা বাটির হোওয়া-লাগা কোনো বাত মুখে ভুলেন না। এ তিনদিন এমন খাবার খেয়ে থাকেন ওরা যে-খাবারগুলির সঙ্গে

বাটির কোনো সংশ্পর্শ ঘটেনি। উছন তো বাটিরই জিনিস—তাকে ভাত চড়াতে হয়, হুংরাং এ তিনদিন ভাত নয়। মুড়ি, চিড়ে ইত্যাদি খাবারই হল এ তিনদিনের খাদ্য—তাও আবার এ খাবারগুলিকে শিকের তুলে রাখতে হবে এবং বাওয়ার সম্বয় বালাটি বাটিতে নামানো চলবে না। কার্যের শিক্তি বা চৌকির উপর রেখে খেতে হলে এ তিনদিন।

অম্বুবাচীকে পাড়ারগায়ের মানুষ কি বলে জানেন? আষাবত্তী। ঐ যে আক—ঐ আদা সেবে তারা জানে আষাবত্তীতে খুব করে আম খেতে হবে। অম্বুবাচীতে আম যে খুব খেতে হয় এ বাটি কথা। তবে শু আম নয়, হুংরার সঙ্গে আম। অম্বুবাচীর সময় হুংরার সঙ্গে আম খেলে নাকি সাপের ভয় থাকে না। পূর্ববঙ্গে তাই বোধ হয় এ-সময় হুং-আম খাওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে।

শ্রাব্দ যখনতে গেলে এ তিনদিন বাটিতে হাত লাগানো নিষিদ্ধ। যদি কোনো চারী এ-সময় জ্বিহতে লাগল নামায বা বীজ চড়াই তবে সে-বীজ থেকে নে শস্ত জন্মাবে তা খাওয়া চওালের হাতে খাওয়ারই সামিল হবে। এবং যে চারী লাগল নামাযে তাকে কুবিধাপক বলে একটি নরকে চতুর্দশ কাল বাস করতে হবে। শু আমের জমি নয়—জলও আছে। অম্বুবাচীর অম্বু তো জল-ই। অম্বু-বাচীর তিনদিন জলের মধ্যে কক-পুখু-কেলা অকর্তব্য, পৌচকিয়া করাও অকর্তব্য। যদি কেউ তা করে তবে তার ব্রহ্মহত্যার পাপ করা হবে—এই হল শ্রাব্দের নির্দেশ।

রথ—ইয়া, রথ—রথ চলবে এই আষাঢ়। কিন্তু তা পাড়ারগায় চল না, চল শহরে। কোনো কেন গাঁয়ে রথ হু-একখানা চল বটে, তবে তা উল্লেখযোগ্য নয়। পাড়ারগায়ের মানুষদিকে চিরকাল রথ দেখতে যেতে হয় গাঁ ছেড়ে। তা যদি না হ'ত, তবে আমরা 'হল বুড়োর রথ দেখা' পেতাম না—আর পেতাম না—

“আমরা রথ দেখতে যাবো
আমরা হলু কোথা যাবো?
তোদের হলু-মাথা গা
তোরা রথ দেখতে যা”



শিক্ষার তাৎপর্য

শিক্ষার তাৎপর্য হচ্ছে প্রধানতঃ চরিত্র পঠন, দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান অর্জন, তৃতীয়তঃ চিন্তার উৎকর্ষতা সাধন যার দ্বারা জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়। আপনি যদি এই তিনটি সম্মানের অধিকারী হ'ন, তাহলে আর কিছু থাক বা না থাক ব্যক্তি যা কিছু সম্বন্ধেই আপনি গড়ে নিতে পারবেন। সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করবার সময় কেবলমাত্র যে বড় বড় পণ্ডিতগণই আনাকে আকৃষ্ট করে তা নয়, তার চেয়েও বেশী আনন্দ আকর্ষণ করে মানুষ বিশেষতঃ তরুণ সম্প্রদায়।



আমি জানি না ভবিষ্যৎ কংশখরের কি ভাবে চলবে। কিন্তু যদি আমার উপদেশ চাওয়া হয় তবে আমি তাদের স্মরণ করতে বলবো যে চারিত্রিক উৎকর্ষতা ছাড়া কোন দেশেরই মানুষ উন্নতি করতে পারে না।

জহরলাল নেহেরু

(কলিকাতা ছাত্র সমাজের নিকট

বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত)

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা উন্নয়ন

	১৯৪৭	১৯৪৮
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১০,৭৭২	২৪,৪০৪
বিশ্ব মুনিবাগি বিদ্যালয়ের সংখ্যা	—	৭০৭
বিশ্ব উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা		
(উচ্চ মুনিবাগি বিদ্যালয় সহ)	২০৪	১,৬২০
উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৭৬১	১,৬৮৭
কলেজের সংখ্যা	৬১	১০০
শিক্ষা বিভাগ বিদ্যালয় ও কলেজের সংখ্যা	৯০	১৬২
প্রাপ্ত বয়সের শিক্ষা-কেন্দ্রের সংখ্যা	৪১২	৫,৭০৭
সরকারি শিক্ষা ব্যয় যাতে ১৯৪৭ সালে ২.২৭ কোটি টাকা ব্যয় হোক ১৯৪৮ সালে ১২,০৮,১৮,০০০ টাকা শিক্ষা ব্যয় ব্যয় হুঁচি করা হলেও যাতে অপর্যাপ্ত অর্থায়িত থাকে। এই কালে শুধু শিক্ষা ব্যয়ই পরিচালনা ও শিক্ষা বিভাগের জন্য হিচাই		

গল্প উঠবে

সোনার বাংলা

অন্যদিক থেকে আসবে পূর্ববঙ্গের মুক্ততার স্বপ্ন

কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

ঐতিহাসিক সারা

অনেকে এখনও মনে করেন, যাদের বি-এ, এম্-এ পাস করবার ব্যর্থতা নেই, তাহলেই ছোট্ট টেকনিক্যাল স্কুল-কলেজে পড়বার জন্তে। কিন্তু, প্রয়োজন-কেন্দ্রে হাতুড়ি-বাটাশি ধরতে হ'লেও, কারিগরী-বিজ্ঞানটা বেহাতে হাতুড়ি বিজ্ঞান নয়। যাক টেকনিক্যাল বা ডোকেমেন্টাল ট্রেনিং নিতে যায়, তাদেরও বি-এ, এম্-এ পড়বারে স্কুলনার কম বাধা থায্যেতে হয় না। হয়তো বা বেশিই মাঝাতে হয়। কারণ, অ্যাকাডেমিক শিক্ষার্থীদের বাধা থায্যেতে হ'লেও, তাদের মাঝার মাঝ পায়ে পড়ে না। কিন্তু, টেকনিক্যাল বা ডোকেমেন্টাল শিক্ষার্থীদের তো হায়েশাই মাঝার যানে পা তিকে থাকে!

কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা এদেশে অনেক আগে থেকেই আছে। কিন্তু বেশ সাধীন হবার পর সেই শিক্ষার ক্ষেত্রটা যেন দিনে দিনে আরও প্রসারিত হচ্ছে। লক্ষণটা স্পষ্টতই বৈধি। পঞ্চাবিধ পরিচরনার ধৌলতে বৈশেষ আজ সৃষ্টির পথে এগিয়ে যেতে চাইছে, সে-সেপে তো আল স্পষ্ট ও শিক্তি কারিগরদেরই বেশি প্রয়োজন। চাকুরির বাজারে তাই তো। আল দেখতে পাই শুভারসিয়ার, কোরম্যান, সুশারডাইকার, এক্সিমেন্টর, ডাকটম্যান, ইঞ্জিনিয়ার—এদেরই বত দর ও কর।

কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে চালু থাকলেও, বহুদিন পর্যন্ত তা কেবল অর্থোপেডাই হয়ে এসেছে। বলতে গেলে উন্নতিশীল শতকের শেখাথেই, অর্থাৎ ১৮৪৯ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশে সংপ্রথম কারিগরী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাও হয়েছিল ইংরেজদের নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে। নইলে, এত জারগা থাকতে ঐ-রকম শিক্ষাব্যবস্থা সংপ্রথম তখনকার কোর্ট-উইনিয়নেই চালু হবে কেন? পরে অবশ্য কোর্ট-উইনিয়নের সেই টেকনিক্যাল কলেজটি স্থানান্তরিত হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে। তারপর সোজা শিবপুরে, একেবারে সঙ্গা শেরিখে। অর্থাৎ, এখনকার শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-ই হলো সেকালের সেই কারিগরী-বিজ্ঞান প্রথম শিক্ষানিকেতন। যদিও অনেক মনে করেন, বাংলাদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাত হয় ১৮৭০ অবদে অনেক আগে, অর্থাৎ ১৮৪১ সালে, যখন হিন্দু কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

শিক্ষা দেবার জন্তে একটি অধ্যাপক-পদের সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু, ঠান্ডের দায়বা গ্রিক নয়। কারণ, পর সৃষ্টি করা হ'লেও সে-সময় অলংকৃত করবার জন্তে অনেক চেষ্টা করেও উপযুক্ত কাউকে পাওয়া যায়নি।

শিবপুরের এই কারিগরী শিক্ষার জনটির বর্তমান নাম—বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। বোটারিক্যাল গার্ডেনের পূর্বদিকে, গঙ্গার উত্তর তীরে যেনে প্রায় ১২১ একর পরিমাণ জায়গা ছুড়ে এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগ অবস্থিত। ১৮৭৬ সালের নভেম্বর মাসে এর যখন সূচনা হয়েছিল, তখন এর নাম ছিল 'কলেজ অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং'। তারপর ১৮৭৮ সালে প্রেসিডেন্সি-কলেজের অন্তর্ভুক্ত বিভাগ-রূপে এর রূপান্তর। সংগে ১৮৮০ সালে শিবপুরের পুরোনো 'বিশ্বদল কলেজ'-এর বাড়িতে এর পাঠ্যশালিক পত্তন।

আগেই বলেছি, ইংরেজদের প্রয়োজনের তাগিদেই এর সূচনা হয়েছিল। কথাটা যে মিথ্যা নয়, তা সরকারী নথির পটিলেই টের পাওয়া যায়। তখনকার সরকারী পূর্ণ-বিভাগের জন্ত ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন। কার্জেই বহু-কর্তব্য গ্রিক করলেন, কলেজ বসাতে হবে। প্রায় উঠতেই পাস হয়ে গেল। ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত কিন্তু কেবল 'সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং'-ই পড়ানো হতো শিবপুরের কলেজে। সেই সঙ্গে মেকানিক্যাল অ্যাগ্রিকাল্চারেরও শিক্ষা দেওয়া হতো। উপযুক্ত-মাধ্যম শিক্ষার্থী মেলে। ১৮৮০ সালে আরও নতুন সৃষ্টি বিভাগ খোলা হয়। একটি হ'লো কৃষিবিজ্ঞান-বিভাগ, অপরটি কৃষি-বিষয়ক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। তারপর ১৯০৭ সালে খোলা হ'লো বোটর-মেকানিক বিভাগ; আর, ১৯১০ সালে রক্তনির্মাণ-শিক্ষা-বিভাগ। এই পাঠ্যগুলি অবশ্য এখন আর শিবপুর কলেজের সঙ্গে যুক্ত নয়। এই কলেজের ডিগ্রী-কোর্সে বৈ-বিভাগগুলি এখন চলছে তা হ'লো—সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, অরকিটেকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং। আর পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতকোত্তর কোর্সে রয়েছে টাউন অ্যান্ড রিজিওগ্রাফ প্র্যানিং, স্নাতক অরকিটেকচার ও মাস্টার অব ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা। ১৯৪৫ সালে তদানীন্তন বাংলা-সরকার এই



৩১

কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (শিবপুর, হাওড়া)

কলেজের উন্নতিবিধানের জন্ত বিশেষ ব্যয়বান্ধ হইয়াছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁদের পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী হওয়ার ফলেই কলেজটির আজ এত উন্নতি ও প্রসার। বর্তমানে এট কলেজের ছাত্রসংখ্যা কম ক'রে দাতব্য'। আর প্রতিবছর প্রায় দেড়শ জন শিক্ষার্থী এই কলেজ থেকে বের হইলেন উচ্চশ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে।

এর পরেই নামে করতে হয় 'বাহুবল্লভ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ'-এর। এই কলেজের গোড়াপত্তন হয় ১১-৭ সালে। সরকারী ও বেসরকারী পুঁজীপোষকতার কলেজটির যে প্রচুত উন্নতি সাধিত হয়েছে সে-কথা বলাই বাহুল্য।

তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গে আরও একটি উল্লেখযোগ্য কারিগরী শিক্ষানিকেতন রয়েছে খড়গপুরের কাছে হিজলীতে। অর্থাৎ, 'ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি'। এট শিক্ষানিকেতনটি পরিচালনা করছেন ভারত-সরকার। প্রধানত পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরার শিক্ষার্থীদের জন্মেই এর প্রতিষ্ঠা। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই কলেজের তিনি স্থাপন করেন। ইতিমধ্যেই এই কারিগরী কলেজের খ্যাতি দাখ্য ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে।

একুত্তশকে এদেশে কারিগরী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ক'রে উপলব্ধি করা যাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে এই শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্পর্ক বিশেষ ঘনিষ্ঠ। দ্বিতীয় শতাব্দিক পরিকল্পনাও দেশের শিল্পোন্নতির ওপরেই বেখানে দৃষ্টান্তে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যেখানে তো যুদ্ধকালীন টেকনিক-শিক্ষান চাই। স্বতঃ আর বিশেষ কারিগর-ইঞ্জিনিয়ারদের ওপর নির্ভর করা যাবে? সেটা যেমন ব্যয়সাশ্রমিক, তেমনি লক্ষ্যরও ব্যাপার। এইসব কথা চিন্তা করেই কারিগরী-শিক্ষার কেন্দ্র জন্ম সম্ভবায়িত করা হচ্ছে এ-দেশে। সুবের কথা, শিক্ষার্থীরও অভাব হচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গে উচ্চতর কারিগরী-শিক্ষানিকেতন রয়েছে তিনটি—শিবপুরে, বাহুবল্লভে আর খড়গপুরে। আর একটি 'পুর'-এও অমূল্য শিক্ষানিকেতন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আছে। সেটি হ'লো দ্বর্গাপুর। ডিপ্লোমা-কোর্স-এর ব্যবস্থা রয়েছে আরও আটটি শিক্ষাকেন্দ্রে। সেগুলি হ'লো—(১) মহা-শাহাখানিক বিজয়টাব ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, বর্ধমান; (২) কুমদগোপাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট, বিষ্ণুপুর, বাঁহুড়া; (৩) বাহুবল্লভ পলিটেকনিক,

ব্যবস্থার : (৪) হুগলি ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, হুগলি ; (৫) জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, জলপাইগুড়ি ; (৬) রায়চুরু-খিগন শিল্পকল, বেগুড়ি ; (৭) বিশ্রামপাশ পালচৌধুরী ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, কলকাতা : এবং (৮) শ্রীহরিকৃষ্ণ শিল্পবিদ্যালয়, সিউড়ি।

এ ছাড়া, ১৯৫৭ সালে আরও চারটি কারিগরী-শিক্ষালয় স্থাপনের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। এগুলি গড়ে উঠছে বেপদগরিয়া, বহরমপুর, পুরনিহা ও বাড়গ্রামে। আশা করা হচ্ছে, এ বছরের শেষের দিকে এইসব বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ শেষ হ'বে যাবে। প্রতিবছর কম ক'রে দেড়শ-জান ক'রে শিক্ষার্থী ভর্তি হ'তে পারবে এইসব টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউটে। আগে যে আটটি শিক্ষানিকেতনের কথা বলা হয়েছে, সেগুলিতেও বাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানো যাব যে-যাবস্থাও নাকি হচ্ছে। সরকারী হিসাব থেকে জানা যায়, আগেকার আটটি ও নতুন চারটি—মোট এই দশটি কারিগরী-বিদ্যালয়ে বছরে প্রায় ২,১৬০ জন ছাত্রের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে।

এক এক নিয়ে এক এক সরকারের টেকনিশিয়ান ও ইঞ্জিনিয়ার সরকার। খনিজ-শিল্প এসেলেবর একটা বৃহৎ

ও সভ্যবনানুগ শিল্প। কয়লাই, খনিজ-শিল্পেও আমাংয়ের অনেক ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিশিয়ান সরকার। বিদ্যুত ও বড়লপুংয়ের কলেজে 'মাইনিং'-এর ডিপ্লোম-কোর্স চালু আছে অনেকদিন থেকেই। মাইনিং-এর ডিপ্লোম-কোর্স শিক্ষা দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে আরও দুটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা চলছে। এর একটি খোলা হবে আসানসোল পলিটেকনিক্‌—যেখানে আগে থেকেই মেকানিক্যাল ও ও ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগে খোলায় আছে ডিপ্লোম-কোর্স চালু আছে। অন্য কেন্দ্রটি গড়ে ওঠবার কথা অণ্ডালের কাছাকাছি কোনো এক জায়গায়।

উদ্যোগ ছেলেমেয়েদের মধ্যে এখন অনেক আছে, যারা কার্বকরী কোনো-না-কোনো শিল্পশিক্ষার সুযোগ পেতে চায় : সরকারও চান তাদের ঐভাবে শিখিয়ে-পড়িয়ে কর্মজীবনে পুনর্দায়ন লাভ করবার প্রয়োগ ক'রে দিতে। সেই উদ্দেশ্যে কারিগরী-বিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান বিতরণের জন্য এই রাজ্যে এ পর্যন্ত আটটি পলিটেকনিক খোলা হয়েছে। একাধারে যান্ত্রিক-বিজ্ঞান ও কৃষিশিল্প-বিজ্ঞান অধ্যয়নের ব্যবস্থা রয়েছে এইসব শিক্ষাকেন্দ্রে। শিক্ষাকালও বেশিদিনের নয়, একবছর মাত্র। এই আটটি শিক্ষাকেন্দ্রের



হিউসান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (কলকাতা)

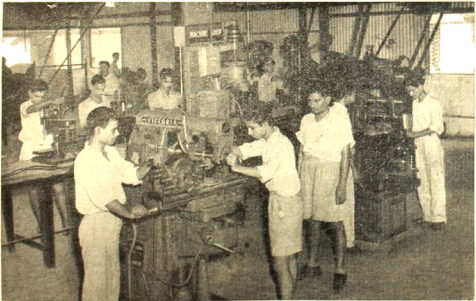
নাম হ'লো—(১) বিশেষ পলিটেকনিক; (২) বামবপুর্ন পলিটেকনিক; (৩) আলানশোল (হাটকা) পলিটেকনিক; (৪) হুগলি পলিটেকনিক; (৫) রামকৃষ্ণ-মিশন শিল্পমন্দির, বেলুড়; (৬) হুগলি ইন্সটিটিউট অব্ টেকনোলজি; (৭) কলকাতা গুড়ি পলিটেকনিক; ও (৮) দক্ষিণ পলিটেকনিক।

স্বীকার করতে বাধ্য নেই যে, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আজকাল গড়াপোনার আগ্রহ আগেকার তুলনায় অনেক কম। বিশেষ করে আকাজেবিক কোর্সের ক্ষেত্রে। গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য আর তেমন করে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করে না। পড়তে হবে, তাই পড়ে। পাস-ও করে ব্যর বহাতমোরে, কিংবা নোট-বুকের সৌন্দর্যে। বাঘের ভাগ্যে তাও নেই, তারা কেবল শিক্ষালাভের বাবুহু খায়। অথচ, খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এই ধরনের ছাত্রগণ কারিগরী-শিক্ষার সুযোগ পেলে দীর্ঘমত্রে দক্ষতা দেখাতে পারতো। এই উদ্দেশ্যেই 'অ'ডক'ল নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় 'জুনিয়র টেকনিক্যাল কোর্স'-এরও একটা ব্যবস্থা হয়েছে। ইংল্যান্ডের আর্টস ক্লাস পার হ'লে তবে এই কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়।

'সিনিয়র-বেসিক-কাম্-জুনিয়র-টেকনিক্যাল স্কুল' এইভাবেই গড়ে উঠছে পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায়। জুনিয়র টেকনিক্যাল কোর্সে শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা বোধকরি হয়েছে হুড়ার 'রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম'-এ, আর বর্ধমান-শেলার কলানথগ্রামের শিক্ষানিকেতনে। স্বকরবন এলাকার বাগসী-তে যে শিক্ষালায়ট গড়ে উঠছে সেটিও এমিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হবে ব'লে অনেকে আশা করছেন।

কারিগরী-বিজ্ঞান মধ্যে মৃত্তক-বিজ্ঞা বা ক্রিটিং টেকনোলজি-ও একটি। এদেশের ছাত্রাখানাগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষাগ্রন্থ কম্পোজিটার, মেশিনম্যান, গ্রুপ-সীডার, বাইণ্ডার, ইন্সপারভাইজার এদেরই বিশেষ অভাব। এই অভাব পূরণ করবার উদ্দেশ্যেই সমাজিক বামবপুর্ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'স্কুল অব্ ক্রিটিং টেকনোলজি'। সরকারী সাহায্য ছাড়া, এই স্কুল কলিকাতার মুহাক্কর-প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকেও নানারকম সাহায্য পাচ্ছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়ছে উল্লেখ্যতর।

এই প্রসঙ্গেই এসে পড়ে আরও দুটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কথা। একটি হ'লো কলিকাতার কারিগরী



আশানুসারের দাবী কারিগরী-শিক্ষায় হাতে-কলমে শিক্ষা-প্রদান শিক্ষার্থীরা ।

বিজ্ঞান, অল্পট ক্যাডাশাডায়। কলিকাতার কারিগরী বিজ্ঞানঘরটি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। এর সাহায্যে বহন করছেন একটি পরিচালকবৃন্দ। এই রাজ্যের অসুযোগিত ইঞ্জিনিয়ারিং ও শিল্প-কারখানায় নিযুক্ত শিক্ষা-নবিশদের পুঁথিগত শিক্ষা দেওয়া হয় এই বিজ্ঞানঘরে। বিজ্ঞানঘরটি চলছে ছাত্রদের বেতনে, আর কলিকাতা পোর্ট-কমিশনার, কলিকাতা কর্পোরেশন ও কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নকৃত। আর, ঘাটতির টাকাটা পূরণ করছেন রাজ্য-সরকার। তাই, আজও এই শিক্ষাকেন্দ্রটি টিকে আছে, বন্ধ হ'য়ে যায়নি। ক্যাডাশাডায় কারিগরী-বিজ্ঞানঘরটি চালাচ্ছেন রাজ্য-সরকার ও রেলওয়ে-বিভাগের এডিনিমিষ্টের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি। রেলওয়ের টেকনিক্যাল বিভাগের শিক্ষানবিশদের পুঁথিগত শিক্ষা দেওয়া হয় এখানে। প্রধানত রাজ্য-সরকারের আর্থিক সাহায্যেই এই শিক্ষাকেন্দ্রটি চলছে।

এখানে আসা যাক বৃত্তিমূলক শিক্ষার এসম্মে। সাধারণত বাপ-পিতামহের কাছ থেকেই ছেলেমেয়েরা পেশাগত বা বৃত্তিমূলক শিক্ষায় তালিম পেতে থাকে। তাই সেখা ঘর তত্ত্বাবধের ছেলে হয় তত্ত্বাবধ, স্ত্রী-বধূয়ের ছেলে পারিবারিক দ্বয়ের কৃপার সূত্রে ছাড়া আরে অল্পকিছু বেন ধন্যতাই চায় না। কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রেই এরা উপযুক্ত শিক্ষায় অভাবে পিছিয়ে থাকে। বৃত্তিমূলক উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার সুযোগ পেয়ে এরা যাতে আরও উন্নতিলাভ করতে

পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এ-দেশের বহু জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নানাপ্রকারের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হ'লো বহরমপুর ও শ্রীরামপুরের টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, বাহরমপুরের পঞ্চল সিংহনিক ইন্সটিটিউট, গাজিপুরের শিল্প-বিজ্ঞান ও কারখানা, কোচবিহারের শিল্পবিজ্ঞান ও কারখানা, আর কলিকাতার বকী চর্মশিল্প-প্রতিষ্ঠান। পারিবারিক দ্বয়ে ছাড়াও, অনেক আত্মকাল এইজাতীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষা-গ্রহণে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন। বাঙালীর পক্ষে এটা আশার লক্ষণ। আর কিছু না-হোক, এইভাবে যদি কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা দেশের যুগেন্দ্রস্বায়কে আকর্ষণ করতে পারে, তাহলে অনাবশ্যক কেরানীগিরির খোঁজটা অন্তত ক'মে আসবে।

ভারতবর্ষের ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিসিয়ানদের তবিশ্রমে যে উজ্জ্বল সে-দিয়ে আরে সন্তোষের অবকাশ নেই। দেশের কাজে এঁদের কর্মোদ্যম আরে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। বিবেশেও আত্মকাল ভাণ্ডারী ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিসিয়ানদের ডাক পড়ছে। কিছুকাল আগে সুদান গভর্নমেন্ট এ-দেশ থেকে বহু ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিসিয়ান নিয়ে গেছেন। মিশর ও ইথিওপিয়াতেও গেছেন আরে করেজন। এর পরে যদি ইকোডীন, ব্রুক, ইকোনেশিয় এতৃতি পূর্ণ-এশিয়ার দেশগুলি থেকে এ-দেশের টেকনিসিয়ান ও ইঞ্জিনিয়ারদের আহ্বান আসে, তাহ'লেও আশঙ্ক্যে কিছু থাকবে না।



মনোহর ও প্রেমতারা

❀ মহাশ্বেতা ঙ্টোচার্ণ ❀

১৩।

গোপীনাথের ডানহাত হচ্ছে ম্যানেজার কেটেবাবু।
এটো গোটা সার্কাসটি চালাবার পেছনে তার মাথাটি
নিরন্তর খাটছে। এ সত্তরে শো হতে-না-হতে অস্ত
সত্তরে গিয়ে চিকিৎসা করা, এ তারই কাজ। এক
জায়গা থেকে অল্প জায়গায় যাবার স্বকিথানা কম
নয়। যেন একটা ভগৎ-ই চললো শেকড়-বাকড়
উপড়ে নিয়ে। খরচও বেশ। ছুইহাজার টাকা।
কাছাকাছি পথ হলো তো—হাতি, ঘোড়া, উট অমন
টোটেও চলে যাবে। নড়তো গাড়ী, ঘোড়া, লরীর
ব্যবস্থা করতে হবে। কেটেবাবু দড় মাছুষ। স্মরেন
শীল মেস ম্যানেজারকে যেমন রান্নার ব্যবস্থা
বুঝিয়ে দিতে পারে, তেমনই সরকার হয় তো ছু-কলন
পত্র লিখে ছাপিয়ে হাওবিল বিলি করতেও
পারে। 'ওন গো মহরবাসী হ্রেট জুবিলির কথা'
পত্রটি তারই রচনা। আকুলি-ব্রাদার্সের সঙ্গে
লেন-দেন করে জন্ত-ভানোয়ার আনে সে-ই। কোন্
বয়সের ভক্ত কি বাবে, তার আচার আচরণ
কেনন—এসব তার নখদর্পণে। সে-ই তুল করলো।
মনোহরকে দেখে ভরসা পেয়ে সিংহ-জোড়া
আনালো গোপীনাথ। দেখা গেল এর দুটোই
সিংহী—একটাও সিংহ নয়। গোপীনাথটারের
মাথায় বাজ পড়লো। কেটেবাবুর সঙ্গে বকাককা
হলো শানিক। তারপর আকুলি-ব্রাদার্স সিংহের
অর্ডার গেলো। তামিা ভালো গোপীনাথের। খাস
আফ্রিকার সিংহ এসো তিনমাসের। সিংহের জ্ঞকে
নতুন খাঁচা হয়েছে মনোহরের করনাসে। লোহার
জালের তেতর থেকেই গর্জে উঠলো সিংহ।

বাচ্চা সিংহ। দুখ-পাঁউরটি খাটয়ে বড় কর্তে

হবে। যত আত্তির দরকার। চারটে চাকর রয়েছে
হুকুম সামলাবে। কিছু স্বকি নেবে কে ?

মাসীকে ডাকে। চামেলীর খাতড়ী সকলের
মাসী। এসে কোমরে হাত দিয়ে ঠাড়াইলো।
বললো,—আমরা তো বাচ্চাবেলায় পুঁথি। ঠাা
মাস্টার, তুমি সেই বাচ্চা ছেলে, মনে নেইকো
আমাদের গোলাপবালার কথা ? বলি ঠাা তারা,
চামেলীর কুকুর নিয়ে ত্তো আদিখোতা করে মরিস !
এই বা ত্তোর কুকুরের চেয়ে বড় কিসে ? আসলে
ত্তোরা মেয়েগুলো যেন কেনন ! আমার কোমরে
নেইকো জোর। নইলে—!

প্রেমতারা বললো,—আমিই পুঁথবো।—পুঁথবো,
পালিবো। নাজ করাবো। হলো ত্তো ?

ব'লে মনোহরের দিকে চাইল।

সেই থেকে ভাগ্যভাগি হয়ে গেল। সিংহের
নাম হলো শব্বর। সিংহী-জোড়ার নাম হলো বেগম
আর শা'জানী। প্রেমতারার তাঁবুতে শোয় শব্বর।
ক্যাম্পখাটের পাশে খোঁটায় শিকল-বাঁধা থাকে।
সকালে প্রেমতারার পায়ের কাছে বল নিয়ে
লোকালুকি খেলে। শেখার প্রেমতারা—লাই
ডাউন ! সিই ডাউন ! অন মাই ব্যাক !—এই
খেলাটাই পছন্দ শব্বরের। প্রেমতারার পিঠে থাবা
দিয়ে উঠে বিজী খরখরে জিতে ঘাড় চেটে দেয়।
ওদিকে তাঁবুতে ঘণ্টা বাজে। বাচ্চা ছেলেমেয়ের
ধলটা—'দিদি ! ঝাউটিতে চলো।' ব'লে
ডাকতে ডাকতে চলে যায়। শাড়ী-জানা রেখে রঙীন
পেছী আর খাটো জাড়িয়া পরে চলে যায় প্রেমতারা।
চামেলীর দ্বানী শবী একচাকার সাইকেল নিয়ে
তত্তক্ষণে তাঁবুতে ঘুরপাক খাচ্ছে, লটকাচ্ছে, ডিগবাঁজি

খাচ্ছে। বাজা বেয়ে কুমুর পিণের খেলা প্রাকৃতিস করছে। ক্রাইনদের সব জ্ঞানতে হয়। তারা সার্কাসের এক অপরিহার্য অঙ্গ। সকলের সব খেলার সঙ্গে তারা ঠেকা দেয়। অ্যান্ড্রিডেট সামলায়। ক্রাইন চারজনই এখন কুমুর কাছ দাঁড়ায়। কুমুরের ভয় ভাড়িয়ে দিতে হবে। তারপর না কুমুর একটার পর একটা নখর দেখাবে নির্ভয়ে?

আজকের রাউটিতে গোপীমাস্টারকে আর কেট-বাবুকে যেন গম্ভীর দেখা গেল। মাথা নিচু করে পাশে দাঁড়িয়ে আছে বিমল। লিভিং-ফাউন্টেন। বাগতি-ভরা জল খাবে বিমল। কাঁচা লাল-নীল মাছ জ্যাস্ত খাবে কুড়িটা। তারপর সেই জল আর নাছ উপরে দেবে কাঁচের বাটিতে। কের মাছ খেলা করে বেড়াবে। সাধারণতঃ হাসিখুসী থাকে বিমল। আজ তার মুখে মেঘ নেমেছে। কেটবাবু সকলের প্রিয়। স্বভাবটি তার অমায়িক। সে-ও যেন চুরির দায়ে ধরা পড়েছে। হলো কি সব?

শশী সাইকেল যোরাতে যোরাতে এসে কানে কানে বলে গেল—বাপার গুরুতরো। চোর ধরছে গোপীনাথ।

বিশটা মেয়ে সাইকেলে ঘুরছে। তারই মধ্যে চামেলী চোখ রাঙালো শশীকে। তুচ্ছ তুলে শাসন করলো। শশী মানল না। আবার বললো,—সাবধান থেকে, তারা। চোরের বড় উপভব।

—তুমি বড়কে সাবধানে রাখো।

—বউয়ের আমি আছি। তোমার ভয় বেশী।

শশীর ওপর রাগ করা সম্ভব নয়। শশী খেরালী, ক্যাপাটে, কুতিবাজ। ট্রাপিজ-মাস্টার রাজুক-ও তো মেরীকে বিয়ে করেছে। দুজনে ডিনশো টাকা কামাচ্ছে। রাজুক কোনদিনও শশীর মতো খুসী নয়। চামেলীর বাঁচা নাক, সরু চোখ। চব্বিশ-বছরেই হুটি বাজা হয়েছে তার। তারাও হ'বছর বামে পীকক আর নোরান সুর করবে। শশী কিন্তু ভারি খুসী। সর্বদা হাসিঠাট্টায় মশগুল। এদিকে গুলী ছেলে। সার্কাস-জগতেই তার নাম রয়েছে

সাইকেল-খেলায়। বৌকে ছুটানী, নেপালী বলে ক্যাপায়। বাঁকা দাঁড়িতে সিঁহুর আর পুট পায়ের ওপর টেনে কাশো। ইজের পরে বৌ যখন রাউটিতে নামে, তখন গর্ভও করে শশী। প্রেমভারাকে বলে,—তুই তো কটা রঙের গর্বে গেলি! বলি, আমার বৌয়ের মতো দেখতে তোকে?

—বে দিছলো কে?

সেও এক মজার কথা। দশবছরের প্রেমভারা গোপীমাস্টারকে বলেছিলো,—চামেলীদিদি এখন আসবেনা। শশীদাদা তার খোঁপায় পাখীকাটা গুঞ্জে দিচ্ছে।

গোপীমাস্টার শুনে ঘটনাক্রমেই গ্রেপ্তার করলো আসানী। কুড়িবছরের শশী আর চৌদ্দবছরের চামেলীকে জেতা করতে, চামেলী গানলো লজ্জা পেয়ে। গোপীনাথ রায় দিলো বিয়ে করুক শশী।

সার্কাসের মধ্যেই বিয়ে। এ তাঁবু থেকে ও তাঁবু। শশীর মা গয়না দিয়ে বৌ মাজিয়ে আনলো। সেই থেকে শশীদের সঙ্গে প্রেমভারার ভাব বেশী।

রাউটি শেষ হতে চামেলী বলে,—আজ আমার ঘরে বাবি, জানলি তারা? নেদ-বাবুকে বলে আয়। মা ডেকেছে তোকে।

চামেলী আর শশীর তাঁবু হলো 'ফার্মিলি তাঁবু'। প্র্যাটসেরে বিছানা গোটাণো। সাইকেল, কঙ্গান, জুতো ছড়ানো ইতস্ততঃ। আজকের বাঁধা ঘর কাল গুটাবে শশী। তবু তাঁবুতে ক্যালেন্ডার টাঙানো। চামেলী আর শশীর বিয়ের ছবি ছোট টেবিলে রাখা। পেছনে রাসার কুঠরী।

শুধু খাওয়ার নেমস্কর নয়। কথা আছে। গুরুতর কথা। চামেলীর সঙ্গে হাতে হাতে প্রেমভারা রাসাটা এগিয়ে নেয়। মাংস ভাজে। চাল খোর। ঘাসের ওপর তেরপল কৈলে দিয়ে খাবার জারগা হয়।

বাণী চুকলে রাজকের তাঁবুতে ছেলে-মেয়ে পৌঁছে দিয়ে আসে চামেলী। বলে,—তাতে বেকতে দিসনি, মেরী।

কিবে এসে বলে,—যেহেটা বড় হচ্ছে আর বৃদ্ধি বাড়ছে! কথাতো কানাকানি করে দেবার একজন! মাস্টারকে বলে দেবে।

—তো কি হবে? মাথা কেটে নেবে মাস্টার?

চোখ সক্র করে পানের ডগায় চুন খাখ প্রেমভারা। মাসী বলে,—মাস্টারকে ভয় করিসনে তাসিতো! তাকে ডাকলাম, তারা। ছোটো কথা কইতে হবে। কাজ আছে তোর। লিভিং-কাউটেন বিনল পার্শী-সার্কাসে যেতে চাইছে। মেহেরান-সাদেবের সঙ্গে কথা হয়েছে। সেটিতে বাগড়া নিতে হবে।

প্রেমভারা বলে,—সে মেহেরান আর গোষ্ঠী-মাস্টার বুকবে অখন। তোমার আবার কি সো নামো? যার গুড়ে নিঠি বেনী সেই মাছি ধরবে। রাখতে চায় তো টাকা বেনী দিক্না কেন গোষ্ঠীমাস্টার?

—ভুধু তো তাই নয়। এদিকে কিরণকে যে ভাসিয়ে যাক্ বিনল?

চিরকাল পঠ কথা কয়েছে চামেলী। আজও কাটা-কাটা বলে,—আকাশ থেকে পড়লি যে তারা? কিছুই জানিসনে? বলি, মন তোর কোথায় ছিল?

—সিংহ পুষতে নেশা লেগেছে।

সকীর গলা নিচু। চোখ হাসছে। গলায় কোনো ঠাট্টা নেই। মাসী এসব কথা কানে নেয়না। বলে,—তোরা হালুকে কথা তুলিসনে। সকল সময় বইকেরা কাটিসনে বো। তারা, মাস্টারকে বলে হোক আর কা করে হোক, তুই বিবলকে রাখ। কিরণ মরে যাবে।

—আজ রাউটিতে তো আসেনি কিরণ?

—গতর তুলতে ক্যামতা আছে? কাল মারেনি মাস্টার? রাতের বেলা কিছু শুনিসনি কো?

এত কাণ্ড কিরণকে নিয়ে? কিরণ হলো মাস্টারের গ্রাইভেট লোক। এ এক আশ্চর্য রীতি সার্কাসের ছনিয়ায়। গোটা সার্কাসটাই মালিকের।

তবু তারা আলাদা একটা ছোটখাটো দল রিজার্ভে রাখে। অনেক সময় এই বিভিন্ন কীবনের গতিপথে কিছু ছেলে-মেয়ে এসে পড়ে যারা সত্যিই বেওয়ারিশ। আবার কাজকে বেঙ্কায় দিয়ে যায় বাপ-মা। বেডলাম, এ কথা তারা বলে না। আবার, কিনলাম এ-কথাও শোনা যায় না। ক'থানা নোট হাতবদল হয়। বাপ-মা চোখের জল মুছে ভাবে যাহোক ছুটি খেতে পাবে। ঘরে গিয়ে দু-দিন গড়াগড়ি ক'রে মাটিতে বুক ড'লে কেঁদে নেয়। আবার কাজে লেগে যায়। গোড়ার কারণটা মর্মান্তিকভাবে সত্যি। কিবে, পেটের জ্বালা। এ জ্বালা জ্বলছে রাবণের চিত্রার মতো অনির্বাণ। পৃথিবীতে ছোট-বড় অনেক কাজ-ই এই জ্বালার কারণে ঘটছে। 'কিদের আঙনে জ্বল এ কাজ করিছি'—এ কথা বললে আর কিছু বলবার নেই। পাপ-পুণ্যের কথাও ছোট হয়ে যায়।

এমনি সব ছেলেমেয়েদের নিয়ে সার্কাসের মালিক 'রিজার্ভ দল' বানায়। এসব ছেলেমেয়েরা শৌক থেকে বাঘের বেলা সবই অদ্বিষ্টর শেষে। যদি কেউ কাজ ছেড়ে পালায়, এদের দিয়ে যে-কোনো কাজ চলে যাবে। মালিক এদের আগলে রাখে। বলে—'আমার ক্যামিলির মানুষ'। এরাও মালিককে বাবা অথবা দাদা ডাকে। দলের সবায়ের সঙ্গে মেমনা। মালিক যখন টাকা জমা দিতে যায় সহরের ব্যাংকে, তখন এরা তাঁর থেকে বেরোয়না। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলে,—জানি না, মাস্টারবাবু জানে। সার্কাসের মানুষ মালিকের অসাক্ষাতে এদের খোঁচায়। নিষ্ঠুর বিক্রমে বলে,—এং, বন্ধ লাট এয়েচেন! নিজে জানেনা কো, মাস্টার জানে। কেন, ভুবে ভুবে জল খেতে জানেনা? আমরা খবর রাখিনা? স্ত্রীকা মাজছেন!

এরা আলাদা। এদের সম্মান আলাদা। মাস্টারের পিছু পিছু ঘোরে, মাস্টারের হুকুম-মতো এদের চলাফেরা, শোয়া-বসা। এইজন্তে সার্কাসের

মানুষ একের হিংসে করে। আর তলে তলে বিভেদ-বিরোধের একটা চোরা খাল বইয়ে দিয়ে মনের স্রুখে মালিকানা ফলায় মাস্টার। এদের তরক থেকে কোনো অব্যাহতা ধটলে তার প্রতিশোধ বড় নির্মম হয়।

এত কথা তুলে বেণরোয়া হলো কিরণ। বোলবছরের মেয়ে। চোখ নিচু করে চলে। ছনিয়াতে কেউ নেই তার। বড় ভীতু মেয়ে। ট্রান্সিয়ে দোল খেতে আঙ ও তার বুক কাঁপে। বলে,— আমি মরে যাব দিদি, আমার বড় ভয় করে।

তার ওপর গোপীমাস্টারের একটা রাগ আছে। দেখতে স্রুবিধের নয়। খেলাতেও ভেমন নয়। তবে বিপদকালে ঠেলে চালিয়ে দিতে পারে।

সে মেয়ের এত সাহস হলো কি করে? প্রেমভারা ভেবে অবাক হলো। বিমলের খেলাটিও দানী। তার কদর আছে গোপীর কাছে। রাতে বালতি-বালতি জ্বল থাকে বিমল। তাই সারাদিন জ্বলবিনু শায়না। তার খেলায় বড় কড়াকড়ি। খায় যা ঐ রাত-বারোটার পর। এখন থেকে ওখানে চলার সময়ে, যখন শো থাকেনা। গোপী তাকে খুব খাতির করে। বলে,—যা মন নেয়, যা বিমল।

কেঁটবাবুও ধাওয়ায়। বলে,—কত পরসায় খাবি, খা। মাছ, মিষ্টি, সন্দেশ, মাংস। বর্ট করতে আমি পক্ষাৎ নেই।

বিমলের চেহারা আছে। রোজগার আছে। সার্কাসের যে-কোনো মেয়েই খুসী হয়ে বিয়ে করবে বিমলকে। প্রেমের গতিবিধি একান্ত জটিল। নইলে এ প্রেম হওয়ার কোনো কথা ছিলনা।

প্রেম-ই দুঃসাহসী করেছে কিরণকে। অনেক রাতে চুপি চুপি উঠে গিয়েছে বিমলের তাঁবুতে। মাসী বলে,

—বিমলকে আর কিরণকে ধরিয়ে দিয়েছে নাগিয়া। কিরণকে কাল রাত দুটোয় কিরণে দেখে যা মেয়েছে মাস্টার, কি বলব। আজ বিমল বলেছে

চলে যাবো অম্ম সার্কাসে। ওদিকে মেয়েটার কি হবে? ভেসে যাবে?

প্রেমভারা অবাক হয়েছে বলেই আবার ও প্রশ্ন করে অবুকের মতো,—এখন আর তুলবেনা কিরণ? কেঁদে-কেটে নয় উত্তরা হলো। পরে মেনে নেবেনা? নাকি তা অসম্ভব?

—ভেসে যাবে লো, ভেসে যাবে। কিরণ যে একেবারে মরেছে!

প্রেমভারা আরো অবাক—এত সাহস হলো কিরণের? ঐ তো পাটের পুতুল, টুকি দিলে মুসড়ে পড়ে। অনেক দেখেছেন অভিজ্ঞ হয়েছে মাসী। বলে,—দেখ তারা, ভীতু মানুষ যখন সাহসী হয় না, তার আর কোনো বাহ-বিচের থাকেনা—ভয় সে একেবারেই হারায়।

প্রেমভারা উঠলো। কোঁকড়া চুলের রাশ টেনে-টেনে জাপানী বোপা বাঁধলো। কাপড় পরলো গুছিয়ে। ছোট ফুল-কাটা আয়নার মুখ দেখে বললো,

—মাসী, ঘটকেনী পাকা হলে কিন্তু বিয়েয় চাই।

পেছন করে ছেলেকে গুধে দিচ্ছিল চামেলী।

বললো,—তোমার বখশিশ আমার হাতে আছে। অত গর্হ করেনি।

—তোর সতীন হতে ডাকিসনি, চামেলীদিদি।

বয়ে গেছে আমার।

—ওলো, বর্টে যাযি।

দুজনই হাসলো।

এটি তাদের পুরোনো রসিকতা। তার পর বেরুলো প্রেমভারা।

দুপুর-রোদ বিলিক দিচ্ছে। মাস্টারের তাঁবুতে পদা ফেলা। মাস্টার খাতাপতর দেখছিলেন। পায়ের কাছে বসে মুখ দেখলো প্রেমভারা। এখন বেশ হাসিখুসী। বললো,—একটা দরবার করতে এলাম মাস্টার।

—কিসের দরবার? আজি আগেই মঞ্জুর করলাম আমি।

—রাখতে তুমি, মারতেও সেই তুমি-ই।
আমানের তো অপর কেউ নেই। কথাটি ভয়ে বলি
না নির্ভয়ে বলি মাস্টার ?

—তোমার গলায় নহুন কথা ? প্রেমতারা
অবাক করলে তুমি। কত রঙ্গই জানো।

কৌতুক ছেড়ে আন্তরিক মিনতিতে গোপীরা পা
চোপে ধরলো প্রেমতারা। —দুটো চান মরে যায়
মাস্টার—বিমলকে তুমি যেতে দিয়েনা।

উঠে বসে মাস্টার। ঘাসে হাঁটু গেড়ে বসেছে
প্রেমতারা। ছুঁতে খুব কাছাকাছি। প্রেমতারার
মুখ তার মুখের বড় কাছে। মাস্টার চোখে চোখে
তাকিয়ে থাকে। বলে,—বিমলের ভয়ে তোমার
মাথাব্যথা কেন ?

গলা নিরুতাপ। তবু প্রেমতারা বোকে
তলে তলে চটেছে মাস্টার। ভয় করে। তবু
বলে,—কিরণ মরে বাবে মাস্টার।

—কিরণের নাম আমার কাছে কোরোনা
প্রেমতারা। পথের কুকুরকে নাই দিলে এমনি
করেই মাঝায় ওঠে।

—মাস্টার, তবু তোমার মানতে হবে। ওদেরকে
বে দিতে হবে।

—বে দিতে হবে ?

গোপীনাথের শরীরের সান্নিধ্যে প্রেমতারাও
গরম হয়ে উঠেছে। এ বড় জীবন জ্বালা। বুনো,
বর্বর রক্ত কিছুতে শানন মানেনা। ভাঙা-ভাঙা
বসা গলায় প্রেমতারা বলে,

—না দিলে কলঙ্ক হবে আমাদের। কিরণ তো
আর একা নেই মাস্টার ?

মেয়েদের কলঙ্কের কথা। নির্লজ্জ হয়েই বলে
প্রেমতারা। নইলে উপায় কি ? গোপীমাস্টার
এবার বোকে। বলে,—অ!

কিছুক্ষণ চুপচাপ। গোপীনাথ সামলে গিয়েছে
বড় জোর। প্রেমতারা বোকে গোপীনাথ ব্যবসার
বিকটা ভাবছে। উদ্‌কানি দিয়ে স্ত্রাকার মতো
সহজভাবে বলে,

—বিমলই যে বেশী নেনকহারাম গো! খেলাটি
নিয়ে চলে যাবি ? মায়ের দয়া হলো যখন করিৎপুরে,
তখন তুমি বে কত করলে ? এমনি করেই কি
ভোগে ? আর মেয়েটাকে ধামিয়ে এখন অস্ত্র দলে
যাবি। কেজ্জা যা হবে হোক আমাদের, কেমন ?
না মাস্টার, সার্কাসকে ভালবেসেছি নিজের মতো।
এত অশৈলী ক্যানো সহিতে পারিন।

এসব কথায় মনে মনে খুসী গোপীনাথ। কিন্তু
খুসী প্রকাশ করতে চায়না। পাছে পায়াতারী
হয় প্রেমতারার। গলাটা অনাবশ্যক মোটা করে
বলে,

—তুমি এসো প্রেমতারা। যা-হয় করবো এখন
আমি আর কেউ। বলে গেলে, শুনে রাখলান।
নেমা বিচারই হবে।

—বাঁচালে মাস্টার। মনটা যেন কেমন
হজিলো। বলি, বাই, পা ধ'রে কেঁদে পড়িগে।
মাস্টার টেলবেনা কো।

যত খুসী গোপীনাথ, গলা তত ভারী। —এবার
তুমি এসো প্রেমতারা। দুপুরবেলা আসা তোমার
উচিত হয়নাকো।

—আর ভুল করবোনা গো। দোষ হয়ে
গিয়েছে।

—কেটকে একবার ডেকে দে যোগো।

হাসতে হাসতে কেটবাবুর তাঁবুতে গেল
প্রেমতারা। কেটবাবুর ক্যানিলি-তানু। মেয়ে কোলে
'মিলন-মন্দির' পড়ছিলো বো। মেয়েদের মধ্যে
লেখাপড়া-জানা বো। তার কদর অনেক। প্রেমতারা
বসলো। —কেটবাবু কই বৌদি ?

—নাইতে গেছে। বাসো।

—বস্বনি। একবারটি ডেকেছে মাস্টার।
তাঁবুতে এলে পাঠিয়ে দিয়ে। এত দেহিতে চান ?

—ঘোড়ার ডান্ডারের কাছে গেছলো। গরম
পড়েছে। কেমন যেন করছে ঘোড়া।

—সেই সায়েবের ঘোড়া ?

—হ্যাঁ গো। কুকুরে কামড়েছিলো বলেই না

পকাশটাকায় ঘোড়া দিয়ে নিলো সায়েব। আমলে
ক্ষেপে বাবে বলে ভয় ছিলো সায়েবের।

—নেওয়া উচিত হয়নি কো।

—বলবে কে বলো?

কেটাবুর তাঁবু থেকে বেরিয়ে নিজের তাঁবুতে
চলতে কি মনে হলো প্রেমতারার, মনোহরের
তাঁবুতে ঢুকলো। মনে কিছু ছিলো না, শুধু চোখে
দেখতে একটা বাসনা হলো। কিন্তু ঘরে নেই
মনোহর। কোথায় গেছে এই ভরছপুরে?

তার তাঁবুর পাশেই মেয়েদের ঘর। কিরণ,
মীরা, গোলাপ, কুহুং থাকে। তার পাশের ঘরে
আন্তন নেভাবার বালতি, মট, বা পেইট এইসব
থাকে। সে ঘরে কার সঙ্গে কথা কইছে মনোহর?
উকি দিয়ে দেখে অবাক হলো প্রেমতারা।
এ মানুষের কি সবই আশ্চর্য? নাকি ছনিয়ার
নিয়ম সে বোঝেনা, মনেনা?

আঁচল দাঁতে কামড়ে বড়িমড়ার ওপরে বসে
আছে কিরণ। তার পায়ে ওষুধ দিচ্ছে মনোহর।
তুলো দিয়ে মলম লাগাচ্ছে আন্তে আন্তে। ছোট
ছোট কথায় সাধনা দিচ্ছে। আবার হুঃখও করছে।
—হুঃ কোরোনা বোন, বলে মানুষের রাগ, রাগলে
মানুষ হয় বাধ। মানুষ কি স্ববশে ছিলো? মনের
ঝালে করেছে এরকম। কালি হয়ে গিয়েছে অন্ধ,
ঝাঁ? রক্ত ফেটে বেরিয়েছে।

মাস্টার শান্তি দিয়েছে কিরণকে। আর
ভরছপুরে তাকেই ভোয়াজ করছে মনোহর। বাজে
বেকাস কথা দুটো-একটা উঠলে মনোহরকেই কমা
করবেনা মাস্টার। কিরণ-ই যে আরো মার খাবেনা
তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আর এই মানুষই বা
কি রকম? কবে কিরণ তার বোন হলো! কবে
এত নিকট হলো মনোহর? সে ছাড়া অন্য মেয়ের
সঙ্গেও মনোহর এমনি সহজে কথা কয়? কণিকের
জন্তে যেন হিংসে হলো প্রেমতারার। তারপরই
দেখে নিলো বাইরেটা। কয়ছোড়া চোখ আর
কান আছে, শুধু পরের দোষ দেখে, পরের কথা

শোনে। তার পরের বিপদ ঘটতে তৈরী। গোপী-
মাস্টারের তারা বিশ্বাসী লোক। এদের কথা ভেবে
বাক্য হলো প্রেমতারা। বললো,

—মনোহর!

—কেন গো প্রেমতারা?

—ওষুধ আমি দিছি, তুমি যাও।

—এতক্ষণ দেখবার সময় হলো? মেয়েটা
যে মরে যায়। তোমরা সব কি!

—তুমি বুঝবেনা। এখন যাও দেখি? একজন
দেখলে আবার দশ কথা উঠবে। আমি নে যাছি
কিরণকে।

—পিঠেও মলনটুকু দিয়ে।

প্রেমতারা দেখতেই নরন-নরন, গায়ে তার অনেক
জোরে। কিরণকে নিয়ে নিজের তাঁবুতে বিছানায়
শেয়াল। পিঠে আর পায়ে মেরেছে মাস্টার।
জামা খুলতে লম্বা দাগগুলো নজরে পড়লো। ওষুধ
দিলো প্রেমতারা। বললো,—অলে নাকি রে?

—ভেমন নয়, দিদি।

—কেনন আছিস এখন?

—মনের ভিতরটা পোড়ায় দিদি। ছতাসে
পোড়ায়।

—মাস্টারকে আমি বলেছি, কিরণ। আমকের
দিনটা চাখু।

—সে তো থাকবে না, দিদি।

—দেখা যাবে। চলে যাওয়া অমনি সস্তা, না?

—কি জানি! আমার খালি ভয় লাগে।
ভরসা পাইনা।

তার পর শুকনো চোঁটটা চাটে কিরণ। বলে,—
একটু জল মি দিবার পার। পিপাসা লাগছে।

—তোমর ছর এসেছে কিরণ?

—অইব-ও বা।

পাঁউরটি আর কনডেন্সড-মিল্ক খেতে দেয়
প্রেমতারা। জল দেয়। বিনা প্রতিবাদে খেয়ে
পাশ কিয়ে তাঁবুর দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে কিরণ।
বলে,—মনোহর মানুষটা ভালো।

প্রেমভারার মধ্যস্থতায় কাজ হলো। বিমলকে ডেকে ধমক দিলো কেঠেবাবু। বললো,—ম্যাজিস্ট্রেট-সারেং, শারোয়া সবাই সার্কাস দেখতে আসে। বিমলকে তারের কাছে ধরিয়ে দেবে, যদি রাজী না হয় বিমল। কিরণকে বিয়ে করতে হবে।

গোপীমাস্টার বললো,—বিয়ে করবে না? আমার এই ছুই হাতে কেঁড়ে ফেলে নেবো। আমার সার্কাসের মেয়ে নিয়ে বন্ধ্যায়েসি?

বিয়ে করতে কবুল খেলো বিমল। মাইনের টাকা জমিয়েছিলো কী মতলবে কে জানে। সেই টাকা থেকে খাওয়াতে হবে সার্কাসকে।

বিমল চলে গেলে পরে ঘাসে থুথু ফেলে গোপীমাস্টার বিতৃষ্ণা ভাষির করলো। বললো,—বড় চাল চালতে গিয়েছিলো। কেঁসে গেল। এখন কোথায় মাঝি যা!

কেঠেবাবু বললো,—তুমিও যেমন! এমনিধারা ফ্যানিলি-ব্যবস্থা কোথায় পাবে? ও তোমার পার্মেন্ট হয়ে গেলো ঘরে নাও।

দেহিনকার 'শো' বড় চমৎকার জমলো। পাঁচটার সময় যখন নেয়েরা রং-পাউডার মাখছে, রিবন বাঁধছে, তাঁবুতে চেয়ার-সতরফির ব্যবস্থা ঠিক—ব্যাগনাস্টার বাজনা ঠিক করছে,—কথাটি ছড়িয়ে গেল। বিমল বিয়ে করবে কিরণকে। আসছে সপ্তাহে-শান্তাহারে বাবে পাণি। শান্তাহার গজ জাগো। টাকা-পয়সার ছড়াছড়ি সেখানে। সেখানে হাবার আগলই বিয়ে হবে। এ বিয়ে ঘটালো প্রেমভারা।

প্রেমভারার কথা এত মানে গোপীনাথ? এমন একটা ব্যাপারেও তার কথা রাখল? নারকল-হলে সপসপে চূলে বেণী বেঁধে, ঝাঁক সিঁথিতে মিঁছুর দিতে দিতে চামেলী তার শান্তকীকে বললো,

—দেখিসু এখন মা, মাস্টার বে করে নেবে প্রেমভারাকে।

বৌয়ের কস্টুমের পেছনে হুক লাগাচ্ছিলো মাসী। মুখে একটা অবিশ্বাসের শব্দ করলো। চামেলী আয়নার পেছে ঠোটে রং লাগাতে লাগাতে বললো,—ছুই বিশ্বাস গেলিনা তো?

—তুই বড় কানা, বো।

—কেন?

—প্রেমভারার চোখে মাস্টার নেইকো।

—তুই জানলি কি করে?

—চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর সার্কাসে রইছি না?

মামুস দেখে মনটি জ্ঞানতে পারি।

শান্তকী-বো। কিন্তু এই যাবাবর জীবনের নিরন্তর নৈকট্যের ফলে সম্বন্ধটা বন্ধুর মতো দাঁড়িয়েছে। চামেলী তাই বললো,—হ্যাঁ। উনি সব জ্ঞানেন। বিধেতা!

—মাইকেল নে যা বো। শশীকে পাঠিয়ে দে। 'জুতো জুতো' করে চ্যাচাচ্ছিলো, এই তো ছেলের জুতো!

—ডেকে দিচ্ছি। কিরণের ঘরে একবারটি বাসু না! অর এয়েছে।

চামেলী চলে গেলে পরে তাঁবুটা ব্যবস্থা করে রাখতে রাখতে মাসী আবার হাসলো। চামেলী বড় হাবা। আবার ভাবলো, আনার ঐ হাবাই ভালো।

খেলার ঝাঁকে ঝাঁকে প্রেমভারা অনেকবার দেখলো মনোহরের দিকে। কাজের মতো কাজ করেছে প্রেমভারা। তার একটু স্বীকৃতি কই মনোহরের চোখে মুখে? ট্রাণ্ডিঙের খেলার আগে নাপিয়া বললো,

—খেলাতে আজ মন নেই প্রেমভারা? মনোহর দেখছে না? ওকে ডাকবে আমি? দেখতে বলবে?

—নাগিয়া।

—মন কোথায় গেল প্রেমভারা?

আজকে লাল-টুকটুক সাটিনের আঁটে কস্টুম।

মাথায় চওড়া জরির প্রজাপতি। টুকটুকে ঠোট।
ধবধবে রং। যেন পরী। নড়ির ভালের পাশে
দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে। নড়ির মই নেনে এলো
গায়ের কাছে। মইয়ে পা দিয়ে নাগিয়া বললো,

—তুমি কিরণের চেয়ে অনেক খাপসুরং,
প্রেমতারা। তোমাকে গোপী ছাড়বেনা।

নীলচোখে ঠাণ্ডা চাউনি হেনে জবাব না দিয়ে
উঠতে লাগলো প্রেমতারা। কথা কয়ে চটিয়ে
দিতে চায় নাগিয়া? প্রেমতারা চটেবে না। এতটুকু
বিনাস্ত হলে মৃত্যু অবধারিত। জুলিয়া কোহেনের
সুন্দর শরীরটার সেই অসহায় ভঙ্গীর কথা কে না
মনে রেখেছে?

কিন্তু তুলে যায়নি মনোহর। প্রেমতারাকে
সেদিন দেখে তার মনটা যেন কেমন হয়ে গেল।
সেজেঞ্জে নিজের তাঁবু থেকে সাইকেল নিয়ে যখন
এলো প্রেমতারা, দেখে মনোহরের মনটাই খরাপ
হলো। এমন রূপ যার, এমন গুণ যার, সে যে
তার সঙ্গে কথা কয় এই তো ভাগিয়া। কিন্তু
কতদিন আর এমন ভালো লাগে? নরক মনোহর।
কতজনের নিচে তার ঠাই। পঁচিশ বছরের তাগড়া
শরীরে রক্ত টগবগ করে। মনে হয় কত কি করতে
পারে মনোহর, যদি একটু সুযোগ পায়। প্রেম-
তারার সঙ্গে কী খেলা দেখায় নাগিয়া? সে যদি
সুযোগ পায়? তবে যে কি করে মনোহর।

মনের হুণ্ডে সেদিন রাতে বাদশার খাচার
সামনে গিয়ে বসে রইলো মনোহর। বিড়বিড়
করে আবোল-তাবোল বকলো,—তাকে এত করে
ভালো রাখছি বাদশা, এত করে খেলার কথা ভাবি।
কিন্তু কি লাভ বল? তাকেও শুধু চোখে দেখারই
একিয়ার আমার। তার বেশী অধিকার তো
নেই। ভালো লাগেনা রে বাদশা, শুধু চোখে
দেখতে আর ভালো লাগেনা।

—তুমি পুরুষমানুষ নও।

চম্কে মাথা তুলে মনোহর। বাদশা গরগর

করে ওঠে। তাঁবুর নড়িনড়া খুঁটিতে বেঁধে পোতা।
গরম কালের রাত। তাঁবুর মাথায় বাতি জ্বলে,
তাতেই আলো হয়েছে সানান্ত। এই আলো-
আধারিতে কখন এসে দাঁড়িয়েছে প্রেমতারা।
জংলা-ছাপের কাপড় লেপটে রয়েছে গায়ে।
কোকড়া চুল টেনে তুলে খোঁপা-বাঁধা। সাবান,
পাড়িয়ার আর হেলের গন্ধ ছাপিয়েও একটা
অস্তরকম গন্ধ তার গায়ে। পাড়ায় মনোহর। খালি
গা। গোড়ালি থেকে গুটোনো প্যান্ট। সমস্ত
গা দিয়ে শরীর দিয়ে এই মাটি রাত বাস সব-কিছুর
সঙ্গে যেন রাহুঘটা এক। কোনো লুকাছাপা
নেই। কাঁকড়া চুল কপালের ওপর পড়েছে।
গায়ে ঘান চিকচিক করছে। মনোহর বলে,

—এই কথা শোনাতে এসেছে প্রেমতারা?

—তোমার শিরদাঁড়া নেই।

—রূপের পরবে অত কথা শোনাচ্ছ প্রেমতারা?

—অমন করে মুখ বুঁজে থাকলে কেউ কারকে
দেখেনা মনোহর।

—আমি কিরণকে ওষুধ দিলে দোষ হয়!
আর এই যে তুমি এয়েছ? আমার সঙ্গে কথা
কইছ? এতেও দোষ আছে প্রেমতারা। আমি
নরক। তুমি প্রেমতারা। আমার সঙ্গে কথা
কোয়না।

মনোহরের কাছে দাঁড়িয়ে এখন যে প্রেমতারা,
তার ভঙ্গীতে কিন্তু দেমাক ঠাট নেই। শরীরের
ত্বেখাগুলি ভেঙে-ভেঙে পড়েছে। হুটো 'শো'
দেখিয়ে শরীর-মনে ক্রান্ত এক সার্কাসের মেয়ে।
হেলান দেয় প্রেমতারা। মুখখানা আড়াল করে।
গলার স্বরটিও কোমল ক্রান্ত। সার্কাসের মেয়েরা
বুঁধি এইসব ক্রান্তি কুিয়ে নিয়ে বেড়ায়? তাদের
মনের হৃদিশ পাওয়া যায়না। তাদের কথায় নালিক
ওঠে-বসে। তাদের আলোরা তাঁবু। রঙীন-রঙীন
শাড়ী। তাদের ঠাই আলোর তলায়, বাজনার
মধো, হাততালির কড়-ওঠা তাঁবুতে। তাদেরই
একজন প্রেমতারা। অতঃ কেমন সংসারের মেয়ের

নতাই অসহায় মেয়েলী ভাব। সার্কাসের মেয়ে
চ'লে বুকি তার ছুটো জীবন থাকে? মনোহরের
গলায় কথা সরে না। প্রেমতার বল,

—হতদিন জোয়ান আছি, শুধু ততদিন কদর
আছে আমার। বুকতে পারোনা?

—তুমি এই কথা বলছ?

—তুমি যদি নকর হয়েই থাকতে চাও
মনোহর, কেউ তোমায় পুছবেনা। নিজেকে
অমন সস্তা ভাবো কেন? এত সহজে খুশি থাকো
কেন?

—আমি বললেই মানবে মাস্টার?

—বলে দেখেছ?

—না।

ছকনে মুখোমুখী। পঁচিশবছরের বাধ-পোষা
জোয়ান আর কুড়িবছরের সার্কাসের মেয়ে। রক্ত
কেনিয়ে কেপে ওঠে স্বরীরে। বাদশার সবুজ চোখে
ঝিলিক দেয়। তাঁর আলোয় মনে হয় প্রেম-
তারার নীলচোখ যেন তাকেও লক্ষ্য দিয়ে কিলিক
দিলো। তিরস্কার আর ফুগার ছুরি প্রেমতারার
গলায়। —মাস্টারকে ভয় পাও? ভীতু মানুষ
আমি দেখতে পারিনা, মনোহর।

দড়িদড়া টপ্কে চলে গেল প্রেমতার। বাদশার
বাঁচায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো মনোহর, আর
অনেক দূর থেকে নাগিয়ার কালো মুখখানা তার
তাঁবুর জানলা থেকে সরে গেল।

বিমল-কিরণের বিয়ে পৰ্ব্বন্ত মানতে রাজী
গোপীনাথ। কিন্তু নকর মনোহরের আশ্পর্শ দেখে
সে চটে লাল হয়ে গেলো। খেলা দেখাতে দিতে
হবে? নকর হয়ে আর রইবেনা মনোহর? সে
স্বপ্নোপ যদি না দেয় গোপীনাথ, তো মানুষ
বেখে নিক্ সে। চলে বাবে মনোহর।

—এখন কোনো কথা শুনতে পারবো না।

মনোহরকে এক কথার বিদায় দিলো গোপীনাথ।
ক'দিন থেকে লক্ষ্য করছে সে, ছইফটানি কেড়েছে

মনোহরের। মনোহরের পান, ফুটি আর চন্মনে
ভাব দেখলে যে তারিক কুটো প্রেমতারার চোখে,
তা দেখেও হিংসের অবধি ছিলোনা গোপীনাথের।
কিন্তু তারপর থেকে আরো ব্যাথা লাগছে। কোনো
অভিযোগ ছিলোনা মনোহরের। খুব খুশি থাকতো
সে। নকর হয়ে এসেছে মনোহর। নকর হয়েই
খুশি ছিলো সে। তাকে এমন করে ছইফটে হতে
শেখাল কে? আজ মনোহরের পা আর মাটিতে
থাকতে চায়না। শুষ্টে ধোলা খেতে চায়। জরির
জানা পরে বাদশাকে খেলাতে চায়। দেখে দেখে
মরবে অলছে গোপীনাথ।

কেষ্টাবু বলে,—গেলে আর এমনটি
পাবেনা। নয় দেখাতই খেলা? নাগিয়া। তো
উড়লো বলে। ও আমি ভাবেই টের পাচ্ছি।

—তুই বুকবিনা কেষ্ট।

পেনসিল চিবোচ্ছে গোপীনাথ। বেরিয়ে গেল
কেষ্ট। কেষ্ট তার কথা বুকবেনা।

আসলে, বড় খ-বিবোধী চরিত্রের মানুষ এই
গোপীনাথ। মনোহরকে খেলা দেখাতে দিতে তার
আপত্তি নেই। যদি প্রস্তাবটা আসে গোপীনাথের
দিক থেকে। মনোহর নিজে বললো কেন? কেন
প্রেমতার মনোহরের কথা এমন করে ভাবে?
রিং-এ মনোহরকে না দেখলে প্রেমতারার চোখে
আলো কোটেনা। মনোহরেরও দিশা নেই।
প্রেমতারার দিকে এমনভাবে ঘাড়টি ঘুরিয়ে
চেয়ে রয়েছে অষ্টপ্রহর, যেন আশ্চর্য কিছু
দেখছে।

গোপীনাথের মধ্যের এইসব জটিল সংবাত্তের
কথা কেষ্ট কি বুকে? কাকে কি বলবে সে?
তাকে কিছুটা জানতেন তার গুরু। বলতেন—
মনটাকে ছোট করিস না। আত্মাকে উন্নত কর।
সব মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন।

বললে কি হবে। অস্ত মানুষের মধ্যে যৌবন,
ভেজ, প্রেম দেখলে তার বুকটা যে অলে তার
নিরসন কি? বিশেষ করে প্রেমতার।

মনোহর আজ মাথা তুলে ঢুকলো তার ঠাবুতে। বললো,—আমি আর নফর হয়ে রইবনাকো! মাস্টার।

তুই নিজে বলবি কেন? আমি মালিক, আমি তোকে ব্যবস্থা করে দেবো। তুই খুশি হয়ে স্বীকার

করবি। পচিশবছরের তেজে তুই মাথা-কাড়া দিস কেন?

এতেই চটেছে গোপীনাথ। গোপীনাথ কি জানেনা মনোহরের পেছনে কাক নীলচোখের উস্কানি আছে? [ক্রমণ:]

রাঠোর-রাজকুমারী

শিবানী ঘোষ

রাজপুত-রাজ অজিত সিং একাকী পাগড়ারি করছেন আপন কক্ষে। তাঁর চোখে মুখে লেগে রয়েছে অসাধারণ গাভীরের ছাপ, লম্বাটে পড়েছে হস্তিয়ার রেখা। হাথ, শেখ পর্যন্ত তিনি পরাজিত হলেন যোগল-সম্রাট কাককশাষারের কাছে। তাঁকে বাধ্য হয়ে করতে হ'ল সন্ধি—যার একটি সর্ত্ত অরণ করতে বি-বি ক'রে উঠছে তাঁর স্বর্গাধ।

—বাবা, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

অজিত সিং ফিরে দেখলেন তাঁর অষ্টাদশবর্ষীয় রাজকুমারী রায় ইন্ড কুনওয়ার এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর পিছনে। যেহেতু মুখের পানে চেয়ে রাজপুত-রাজ বললেন—হাঁ বা, বোসো, একটা কথা আছে।

রাজকুমারী গিয়ে বললেন নিকটবর্তী গালচের একপার্শ্বে। অজিত সিং আর একবার ফিরে দেখেন যেহেতু মুখের পানে। এতটুকু বয়স থেকে কোলে পিঠে মাছ-ব-করা এই মেয়ে। কত হুমকি ছিল ছেলেবেলায়। এখন হ'য়ে উঠেছে শান্ত ধীর। সেই নিজের হাতে গড়ে-তোলা ঘেরেকে আজ বিসিয়ে দিতে হবে পরকে। গুণ বিসিয়ে দেওয়া নয়, তা'র জাত-ধর্ম সব-কিছু নিঃশেষে জলাঞ্জলি দিয়ে তাকে ভাসিয়ে দিতে হবে অকুল পাথারে। হাথ, কী নিষ্ঠুর বিধিধিনি! ভাবতে ভাবতে জাপনা হ'য়ে ওঠে রাঠোর-রাজের হুই চক্ক।

—বাবা?

—হা!

—কি হয়েছে? আপনি কিবছেন কেন?

—না বা, কাঁদিনি। বড় নিষ্ঠুর এই ছব্ব। প্রাণভ'রে কাকবায়ও আর তার অবকাশ নেই।

পিতার চক্ক জল দেখে রাজকুমারী'র চোখ-চুটিও হ'য়ে ওঠে বাশাচ্ছন্ন। সে অত্যন্ত ব্যথিতা হ'য়ে বলে—শিতা, কি হয়েছে বলুন? আনাবের ওপর কি কোনো বিপদ ঘনিয়ে এসেছে?

অজিত সিং হাত দিয়ে চোখ-চুটি মুছে বলেন—হ্যাঁ, বিপদ—চরম বিপদ আজ ঘনিয়ে এসেছে আমাদের ওপর। আজ আমি পরাজিত হ'য়েছি যোগল-সম্রাটের কাছে। তাঁর সাথে আমাকে করতে হয়েছে সন্ধি।

রাজকুমারী শিতাকে সাধনা দিয়ে বলেন—বাবা, এতে এমন কি বিপদ হল? রাজপুত-রাজারা যোগলের ক'ছে এর আগেও তো কতবার পরাজিত হয়েছেন, কতবার সন্ধি করেছেন। কিন্তু তারপরও তো তাঁরা আবার জয়ী হয়েছেন।

অজিত সিং বলেন—না বা, শুধু যদি মুছে পরাজিত হ'তাম অথবা শুধু যদি সন্ধি করতে হ'ত, তবে তাতে আমি কিছুদূর হুঃখিত হতাম না। কিন্তু আজ যোগল-সম্রাটের সন্ধির প্রস্তাবে যে একটি সর্ত্ত তিনি আমার নৃণ বিধে বের ক'রে নিলেন, তা পালন করতেই আমি ভয়ে শিউরে উঠছি।

রাজকুমারী ব্যস্ত হয়ে বলেন—কি সেই সর্ত্ত, শিতা?

একটা সীর্ণধাশ বেলে অজিত সিং বলেন—সেই সর্ত্ত হচ্ছে—সম্রাট কাককশাষারের সাথে দিতে হবে তোষা'র বিবাহ।

—ব্যা!—সহসা চমকে ওঠে রাজকুমারী। দুহুড়তই বেন তার জিব সিরে আটকে বাথ টাকুয়ায়। যে মুসলমানকে সে তপা করে এসেছে চিরকাল, আজ সেই মুসলমান গ্রহণ করবে তার পানি?

অজিত সিং বলেন—বিত্ত মা, আমি ছিঁব করছি এতড়ু নিষ্ঠুর আচরণ হ'তে দেখে না তোমার ওপর। আমি এই ওরফে হ'তে পাড়িয়ে হঠাৎ এখানে। যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে ততক্ষণ আমি কিছুতেই হতে দেখো না এলিনি। তারপর তারা আমাকে হত্যা করে যা খুশী করে করবে।

হঠাৎ পিতাকে সরুটকমক পরিস্থিতিতে পাঁড়াতে দেখে ভয়ে শিউরে ওঠে রাজকুমারী। সে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলে—না পিতা, আপনি যে সর্ব পাশন করায়-কথা দিয়ে এসেছেন তার অস্ত্রবা করবেন না। রাজপুত্র বা কথার খেলাপ করেনও করে না। আপনি নির্ভাবনা যোগল-সম্রাটের সহিত আমার বিবাহ দিন। মুসলমানের আমি বুঝা করি সত্য কথা, কিন্তু পিতা, এর আগেও তো আমারের মাতা-মাতামহীরা ব্যাধ হয়েছেন মুসলমান পত্নির সংধর্মণী হ'তে। কাজেই আমিও স্বাক্ষর করতে পারব তাঁদের পদাঙ্ক-অনুসরণ।

—কুমারী!

—বাবা?

—আর মা, আমার হুক আর!— বলে কতাকে হুক জড়িয়ে ধরে অন্ধরে কাঁদতে থাকেন রাজপুত্র-রাজ।

এমন সময় ভূত এসে জ্ঞানাপ যোগল-সম্রাটের মন্ত্রী হোসেন আলি খাঁ বসে রয়েছেন তাঁদের প্রতীক্ষায়।

—চল বন্ধি!— বলে অজিত সিং কতাকে বললেন— বাও মা, বাবার সঙ্গে প্রবৃত্তি হয়ে নাও।

রাজকুমারী ধীরে ধীরে চলে গেলেন আপন কক্ষে। গিয়ে, গব্যাকপথে তাকিয়ে দেখেন রাজপুত্রানার বিশাল প্রান্তরের পানে। এই রাজপুত্রানার ঘেরেরা মুসলমানের হাত থেকে গ্রাণ পাঁচানোর ক্ষমতা কতবার জ্বরতন্ত্র অবলম্বন করে প্রাণ দিয়েছে জলন্ত অগ্নিকূণে। আর রাজপুত্রানী হয়ে সেই মুসলমানের সন্ধর্মণী হ'তে আজ তাকে যেতে হবে হৃদয় বিদ্রীতে! এক এক বার তার হৃদয়ে হয় বিকলান করে। কিন্তু পরমুহূর্তে মনে পড়ে যায় শক্তির সর্ব ভর হওয়ার শিখ্যাবানী প্রমাণিত হবেন পিতা।

রাজকুমারীর সহচরী পাত্রা এসে পাঁড়ার তাঁর পানে। এতক্ষণ সে সবই অনেছে পিতাপুত্রীয় কথা। তাই তাত্রও চোখ-ব্রহ্ম হয়ে উঠেছে ব্যঙ্গাচ্ছন্ন। বিশেষ করে রাজকুমারীকে হারাতে হবে কেনে কামার রক্ত হয়ে আসে তার কণ্ঠ। রাজকুমারী বললেন—পাত্রা, আমার জিনিস-পত্রগুলো একই গুছিয়ে দে।

—গিয়েছি, কুমারী!

—বেশ, এগুলো এখার শিবিকায় ভুলে দেবার ব্যবস্থা কর।

পাঁড়িয়ে থাকে পাত্রা। আজ তার পাঁজরা টেলে বেগিরে আসছে কামা। কামার আবেগে সে বলে—কুমারী, একটা কথা বলবো?

—বল।

—আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো।

—কোথায়?

—ভূমি বেখানে থাক।

রাজকুমারী অবাক হয়ে বলেন—সে কি পাঠা! রাজপুত্রানী হয়ে তুমি মাঝি যোগল-হারেবে? আমি মাঝি পিতার প্রতিশ্রুতি পাশন করতে, তুমি মাঝি কোন্ প্রাণে?

কেঁপে ওঠে পাঠা। বলে—রাজকুমারী, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। তোমার অনুটে যা পড়েছে আদারও তাই যুক।

রাজকুমারী বলেন—বেশ, তবে তাই চল। যদি যদি, দুজনেই একসঙ্গে মরবো।

অবশেষে প্রবৃত্ত হয়ে গেল সব-কিছু। রাজকুমারী পাত্রাকে নিয়ে গিয়ে উঠলেন শিবিকায়। তারপর সেই শিবিকা হোসেন আলি খাঁর তত্ত্বাবধানে বিরাট শোভাযাত্রার সহিত এগিয়ে চললো দিল্লী অভিমুখে।

যোগল-হারেবে একটি কক্ষ পাত্রাকে নিয়ে বসে রয়েছেন রাজকুমারী। গব্যাক-পথে দেখা যাচ্ছে মূলমূল করে প্রবাহিত হয়ে চলেছে মৃত্যু। কত শাস্ত্র তার গতি, কত মন্থর তার প্রবাহ। আর মাত্র সাতটা দিন। তারপর তিনি হয়ে যাবেন যোগল-সম্রাজ্ঞী। তাঁর মনে পড়ে রাজপুত্রানার মূল প্রান্তর। সেই প্রান্তরের মূলো-বাগিতে গড়া তাঁর দেহ মুসলমানের হাতে ধপে দিতে আর মাত্র সাতটা দিন বাকি।

এমন সময় কুর্নিশ জানিয়ে এসে পাঁড়াল যোগল-হারেবের এক দাসী।

রাজকুমারী মূহু চলে গাইলেন তার পানে।

দাসীষ্ট বললো—সম্রাট আপনার সাথে একবার দেখা করতে চান—উপস্থিত তিনি এখানে আসতে পারেন কি?

রাজকুমারী ধীর করে বলেন—পারেন।

কুর্নিশ জানিয়ে চলে গেল দাসী। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন সম্রাট হাকিমশাহার। এসেই তিনি উপবেশন করলেন রাজকুমারীর খানিকটা শুকাত। মূহূর্তের ক্ষণ তাঁদের চাষি-দুহর ঘটলো মিলন। পাঠা

অবশ্য হয়ে চেয়ে দেখে সম্রাট ও রাজকুমারীর মূখের পানে। হৃৎকেন্দ্রেই এত রূপ যে, দেখে বিস্মিত হ'তে হয়।

কাককশাখার পললেন—একটি বিশেষ কথা জিজ্ঞাস্য করতে এলাম, রাঠোর-কুমারী। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আর সাতদিন পরেই ঘটবে আমাদের বিবাহ। তা আমাদের সমাজের রীতি অনুসারে বিবাহের পূর্ণদিন 'হেনা-বকী' নামক এক অস্থান হয়। সেই অস্থানে হেনা-ফুলের নির্বাণ দিয়ে আকর্ষণ করে বেড়া হবে আমার হাত-পা। এই অস্থানে আপনার কোনো আশ্রয় আছে কি?

রাজকুমারী বলেন—এখানে আমার আশ্রয় দাম কতটুকুই বা।

কাককশাখার বলেন—না না, রাজকুমারী, আপনি এখানে নিজেকে বসিনী মান করবেন না। আপনারই নির্দেশে পরিচালিত হবে বিবাহের ব্যবতীয় অস্থান। কাজেই আপনার আশ্রয় দাম আমার নিশ্চয়ই দেবে।

রাজকুমারী বলেন—যদি বলি, সমগ্র বিবাহ-অস্থানেই রয়েছে আমার আশ্রয়?

রাঠোর-রাজকুমারীর কথা শুনে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলেন ডারভ-সম্রাট কাককশাখার। ডারভর বললেন—তা যদি থাকে, তাও আমি পালন করবো। এমন কি, যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো মেবারে। বা হোক, থাকে রয়েছে আর মাত্র সাতটা দিন। ইতিমধ্যে আপনি ঘনবির করে দেখুন কি করবেন। ডারভর আশ্রয় জানালেই আমি তার ব্যবস্থা করে দেবো।—বলেন কুমারীর পানে একবার প্রশান্ত মুষ্টি হেনে বাইরে চলে গেলেন সম্রাট।

রাজকুমারী ও পাভা উভয়েই তাঁর পানে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণের জন্য।

তিনি চলে যেতে পাভা বললো—রাজকুমারী, যোগল-সম্রাটের কথা লোকের মুখে শুনে তাঁর সম্বন্ধে যে ধারণা আমাদের হয়েছিল, তাঁর কথাবার্তা শুনে তো তাঁকে সে-রকম সাংঘাতিক মনে হ'ল না?

রাজকুমারী একটা দীর্ঘশ্বাস কেসে বলেন—হ্যাঁ, আমিও দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

পাভা বলে—সম্রাটের মধ্যে দেখলাম রয়েছে ঠিক রাজপুত্রের মতো শৌর্য। আজ্ঞা কুমারী, উনি কি কোনো রাজকুমারীর গর্ভজাত সন্তান?

রাজকুমারী বলেন—অনেকি আশ্রয়-ওষাধের এক হিন্দু-বংশীর গর্ভজাত সন্তান এই সম্রাট।

পাভা বলে—আমায়ও তাঁর মনে হয়, কুমারী। দেখে কিছুই রক্ত না থাকলে এমন কথা কেউ বলতে পারতো না। তা, কি স্থির করলে কুমারী? দেখে কি হবে?

কুমারী বলেন—যোগল-হারের থেকে দেখে কিরে দেখে দেশবাসী কি আর আমাদের ঘরে তুলে নেবে? চিন্তনের নিদ্রা বড় করে। সেই দিশ থেকে আমি প্রজ্ঞা করি সুসন্ধানের, এবং তাদের স্বার্থকে।

—তবে কি ভরত-সম্রাটের মহিরাই হবে?

—এবং কিছু স্থির করিনি, পাভা।

সেদিন তাঁদের কথাবলন সারা হ'ল সেইখানেই।

এরপর কেটে গেছে দিন-চতুর্দশ। ইতিমধ্যে দুপুরোণ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন সম্রাট কাককশাখার। দেশের হাকিম-বক্তি কেউই পারল না কিছু করতে। অবশেষে এল ইংরেজ ডাক্তার স্বামিন্দ্র। তিনি এসে বললেন অস্ত্রোপচার করা প্রয়োজন। কিন্তু তাতে আশ্রয় জানালেন সম্রাট। তিনি বললেন, যদি অস্ত্র দিও-এর কথা তাঁকে বিবাহ করতে রাজী হন তবেই তিনি রাজী হবেন আত্মোণ্য হ'তে। নচেৎ কোনো প্রয়োজন নেই তাঁর অস্ত্রোপচারের।

কথাটা যোগল-হারের থেকে শুনে পাভা ছুটে আসে রাজকুমারীর কাছে। তাঁকে দেখে কুমারী দীর্ঘ কঠে জিজ্ঞাস্য করেন—সম্রাট কেনম আছেন পাভা?

পাভা বলে—ভালো নয়। তা—একটা কথা বলব কুমারী?

—কি কথা, পাভা?

—আমি বলি কি, সম্রাটকে বিবাহ করবার ভূমি মত পাও। না হলে, তিনি বোধ করি আর বাঁচবেন না। ইংরেজ ডাক্তার এসেছেন—কি তিনি তাঁকে কিছুতেই চিকিৎসা করতে দেখেন না। বলেছেন রাঠোর-রাজকুমারী যদি তাঁকে বিবাহ করতে রাজী হন তবে তিনি বাঁচতে রাজী আছেন, নচেৎ নয়।

এমন সময় সেই ঘরে ছুটে আসেন সম্রাট কাককশাখারের প্রথম মহিরা কক্করীয়া বেগম। তিনি এসে রাজকুমারীর হাত-ছুটো ধরে বলেন—সম্রাটকে বিবাহ করবার শ্রম মত কথা, বোন! না হলে তিনি আর বাঁচবেন না! সন্তান বলে আমারে বুঝা কোতো না। আমি যে কী বস্তু তা বিয়ে হলেই জানতে পারবে। চলো ভাই, আর দেরি কোরো না। একটবার তাঁকে দিয়ে বলবে—ভূমি তাঁর মহিরা হ'তে রাজী আছি।

৬ককটিকা বেগমের মুখের পানে একবার মুদ্রিত
তাকিবে যেখন রাজকুমারী, তার পর বলেন—চলুন
মি—

বেগম-সংস্রব রাজকুমারীকে নিয়ে গিয়ে হাজির করেন
মহাউচ সন্মুখে। ফারুকশাহার একবার চেয়ে দেখলেন
ঐদেব মুখের পানে। রাজকুমারী হিরণ্মিত্রে তাঁর পানে
তাকিবে বলেন—আমি আপনার সহধর্মিণী হতে রাজী
নহি, আপনি আরোগ্য হয়ে উঠুন, জাহাপনা!

কুমারীর কথা শুনে আনন্বে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে
ডারত-সন্ন্যাসীর মূহমুগ্ধ। তিনি হামিটনের পানে
কিরে বললেন—এবার আখ্যাকে আযোগ্য করে ছেদন
ডাক্তার, এর বিনিময়ে আপনি বা চাইবেন আমি আপনাকে
ধেনো।

এগিয়ে এগেল ডাক্তার হামিটন। তখন রাঠোর-
রাজকুমারীকে নিয়ে ৬ককটিকা বেগম চলে আসেন
অন্তঃপুরে আপন কক্ষে।

শারী-ব্রাতা শিবনাথ শাস্ত্রী অবতী নেবী

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি
তাহার নতুন পণ্ডিত ঘরকানার বিজ্ঞানমণ্ডলের গৃহে (চল্লিশ
পদগনার অন্তর্গত চাক্ষুণ্ডিকাতা গ্রামে) জন্মগ্রহণ করেন
এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার ২৬ নম্বর
বিভিন্ন স্ট্রীটের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। ইহার বেশ
চল্লিশ পদগনার অন্তর্গত মজলিশপুর গ্রামে। ইহার পিতার
নাম হরানন্দ ভট্টাচার্য (বিজ্ঞানাগর); মাতার নাম
মোলকনদি দেবী; ইহারা বৈদিক ব্রাহ্মণ-বংশ। তৎকালে
পুত্রবাহুকে যজ্ঞন-বজ্রন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা কার্য করিতেন,
২৫ টোল-চতুষ্পাশী স্থাপন করিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান
করিতেন।

এই মহাপুরুষের মহৎ জীবনের মহত্ব, তাহার গভীর
ভাববৈচিত্র্য, অসাধারণ প্রতিভা, মহোদ্যায় প্রাণ, অকপট
প্রগাঢ় প্রেম, আত্মোৎসর্গ ও আত্মবিলোপের সম্যক চিত্র
আপনাদের সম্মুখে ধরিবার মতো যোগ্যতা আবার নাই।
তাঁহার সম্বন্ধে দর্শনশাস্ত্রের প্রবন্ধ হইতে কয়েক পঙ্কতি
উদ্ধৃত করিতেছি : “যে চুনিতে তিনি জীবনকে প্রতিষ্ঠিত
করিয়াছিলেন, তাহা। নানবপ্রেরের রূপে কোমল ও স্নান,ল,
আর যে আত্মা তিনি তাহাকে বিতীর্ণ করিয়াছিলেন,
তাহা। সত্যের জ্যোতিতে দীপ্যমান ও কল্যাণের শক্তি-
প্রবাহে সম্বরীত।” এই নানবপ্রেরের রূপে কোমল ও
স্নান,ল জীবনটির নারীস্বাভাবের কল্যাণের জন্য দানের কথা
অনেকে কিন্তু কিছু জানেন, কিন্তু সমাজ-পরিভ্রান্ত নারী ও
বাগিকাগণকে নিজ গৃহে, নিজ পরিবারে নিজের সম্মান-

তুল্য দেখে পালন করিয়া তাহাদিগকে সমাজে যে সম্মান
ও মর্যাদা দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহায়াই কয়েকটি
দৃষ্টান্ত দিতেছি :

১। ঢাকা শহরে একটি পণ্ডিতা নারীর লক্ষ্মীবিন নামে
একটি কন্যা ছিল। তাহার মাতা তাহাকে একটি বালিকা-
বিদ্যালয়ে পড়িতে দিয়াছিল। ঐ স্থলে একজন সংস্রব
খ্রীষ্টান শিক্ষকিণী ও সাধুচরিত্র ব্রাহ্ম শিক্ষকের সংস্রবে
আসিয়া তাহার প্রাণে সাধুতার বাসনা জাগ্রত হয়, এবং
তাহার মাতা যে-জীবন বাপন করিত তাহার প্রতি দৃশ্য
কল্পে। ১৮৮৪ বৎসরের সন্মর্মে সে মাতার ইচ্ছায় বিবাহ
অনেক সংগ্রাম করিয়া ঢাকার উৎসাহী ব্রাহ্ম নবকান্ত
চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে গলাইদা কলিকাতায় আসে। কিছু
কেনেও ব্রাহ্ম পরিবারে তাহার আশ্রয় না হওয়ায়, নবকান্ত-
বাবু নিবনব্দের গৃহে (শিবনাথ তখন কলিকাতার দক্ষিণে
১৮৮৪ মাইল দূরবর্তী হরিনাভিতে বাস করিতেন) তাহাকে
লইয়া বান। লক্ষ্মীবিনী ইহার গৃহে চার বৎসর কল্যা-
নিবিশেষে প্রতিপালিতা হইয়াছিল; পরে একজন উৎসাহী
ব্রাহ্মদ্রব্যক ইহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হ্রঃস্বের বিবর,
বিবাহের একবৎসর পরেই লক্ষ্মীবিনীর কন্যা হই। লক্ষ্মীবিনীর
একজন ব্রাহ্মদ্রব্যকে (গোরালপাড়া নিবাসী আনন্দচন্দ্র
সেন) লিখিত পত্রের কিয়ৎংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

আমি শিবনাথবাবুর পরিবারে আসিয়াছি। ইহাষের
ভালবাসায় আমি সব হ্রঃ কষ্ট ভুলিয়া গিয়াছি। শিবনাথ-
বাবুর সততার আমি অনেক সময় ভাবি তিনি বাহুব না

দেখা।...আমাকে ঠিক নিষেধ করায় ভাষা ভালবাসেন।
হেমের লেখাপড়ার জন্ত তাঁদের যেমন বর, আমার জন্তও
তদ্রূপ বর করেন। একবার কোনো এক ব্রাহ্ম-বাড়ি হইতে
তাঁহাদের লগ্নিবাগের নিমন্ত্রণ হই, কিন্তু তাঁহারা আমাকে
তাঁহাদের সঙ্গে লইতে নিষেধ করিয়া বাওরাজে, শিবনাথ-
বাগু কাহাকেও সে-বাড়ি হইতে বেন নাই, নিষেধও
সে-কার্ণে যোগ বেন নাই। এতদ্বারা যথুলোকের আশ্রয়ে
থাকিতে পারিলে আমি আর কোনো দ্রব চাই নাই।”

২। একবার একটি অসহায় বিধবা তাহার একটি
বালিকা-কন্যাকে লইয়া (এই বালিকা তাঁহার স্বামীর
ওঁরসঙ্গাত নহে) শাস্ত্রীমহাশয়ের শরণাগত হন। শাস্ত্রী-
মহাশয় ইহাদের বক্ষণাবেক্ষণের ভার লন। মেয়েটির
সেবাশ্রয়প্রাপ্ত প্রকৃতি দেখিয়া তাহাকে নার্সিং পড়াইয়া ন্যায়ের
কাজে বসাইয়া বেন। এই বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জীবন-
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাকে একখানি নোটবুকে একটি
কবিতা লিখিয়া উপহার দিয়াছিলেন। সেই কবিতাটি
এখানে উদ্ধৃত করিলাম।—

“শিখিল জীবন-পথ; অতি সাধবানে
যেহো বৎসে। বৈশ্ব-বর্ষে আশ্রয় আশ্রয়
বিবেক আলোক হতে দেখ কোনখানে
কোন গর্ত লুকাইয়া আছে পথোপরি;
সত্যকে কেশিহো পথ; কৃষ্ণের গানে
ভুলিহো না, চাইবো-সেবের ধানধী
ভাবিয়া পড়োনা কণে—মরিহোনা প্রাণে।
বিকুলে যেহো চিত্ত দগা দূর করি,
নিগুণি ছর্দিন মাঝে, সশর আশ্রয়ে
ধরে থেক সে-চরণ ভরিবে সলায়ে।”

এই কবিতা ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে শরণাগতগন করেন।

৩। আর একটি এইরূপ বিধবার একটি কন্যা ইহার
পরিবারে পালিত হইয়াছিলেন। ইনি অতি সংভাব্য ও
পাঠে ইহার পাত্ৰ অগ্রগণ্য ছিল। বহু চেষ্টা ও সংগ্রাম
করিয়া শতমহাশয়ের ইহাকে ডাক্তারি পড়াইয়াছিলেন।
ইহার প্রকৃতি সং ছিল, তদুপরি শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রভাব ও
তাঁহার পরিবারের আবেশনে বর্মিত হইয়া ইনি নিজগুণে
পরবর্তীকালে সর্বত্র সকলের প্রজ্ঞা ও সম্মানের পাত্রী
হইয়াছিলেন। ইহার দশ-বৎসে আকস্মিক হইয়া তৎকালীন
শিক্ষিত উপায়প্রাণ কোনো কোনো ব্রাহ্মযুবক ইহাকে বিবাহ
করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি তাহাতে সম্মত হন
নাই—পবিত্র স্বামী-জীবন বাপন করিয়া সিদ্ধাছেন।

ডাক্তার হইয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে কার্য করিয়াছিলেন।
চিকিৎসকের কার্যে ইনি বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন
এবং সহ দরিদ্র পরিবারের অভাব-মোচনে ও তাহাদের
শিক্ষার জন্ত অকাতরে অর্থদান করিতেন। শতমহাশয়কে
তিনি যে ভক্তি-প্রজ্ঞা করিতেন, তাহা তাঁহার নিষেধ সম্বন্ধ-
বিপের অশেষা কিছু কম ছিল না। তিনি ইহার জন্ত
কিছু করিতে পারিলে, নিজকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করিতেন;
এই পরিবারে-স্বপ্ন-স্বপ্ন রোগ-শোক সংগ্রামে তাঁহার প্রাণ-
ত্যাগ সহ্যহুতির দৃঢ় চেতনের উপর ভাসিতছে। এই
পুণ্য-জীবনটির পবিত্র স্মৃতিতে প্রাণ উৎসলিত, চক্ষু অশ্রু-
সঙ্গল হইয়া উঠিতেছে। ইনি অস্থান ২০-২২ বৎসর পূর্বে
পরলোকগমন করিয়াছেন।

এই পরিবারে শতমহাশয়ের নিজ সম্বন্ধগণের
সহিত সংগলজাত বহু বন্ধুজ্ঞা ও বহু অসহায় নিরাশ্রয়া
প্রাণিনী বিধবা, কুমারী কন্যা সমভাবে পালিত হইয়াছেন।
ধনী, হরিদ্র, সাধারণ ও সম্ভ্রান্ত উচ্চ-নীচ সকলেই সমান
ব্যবহার পাইয়াছেন। এখানে বলা প্রয়োজন বোধ
করিতেছি যে, আমার জ্যেষ্ঠ-পাতৃজীতাম্বুদীন প্রায়মহী
সেবার মাতৃসেব ইহার মধ্যে থাকিয়া নীরবে কী অপূর্ণ
বাৎসল্য-রসে ইহািমদের জীবনকে সিক্ত রাখিত। শুনিয়াছি,
এইপ্রকার বক্ষ-সম্পর্ক-হীনা ২৩টি মেয়েকে তিনি পালন
করিয়াছিলেন। ইহাদের প্রতি তাঁহার মাতৃসেব এত
প্রবণ ছিল যে, আমার জ্যেষ্ঠা নন্দিনী হেমলতা সরকার
বালিকা-বয়সে তাঁহার জননীকে বলিয়াছিলেন—“মা,
বীণাশ্রীট বলেছেন—অপরকে নিজের মতো ভালবাসো
(Love thy neighbour as thy self), তিনি নিজের চেয়ে
অল্পকে বেশী ভালবাসার কথা বলেন নাই। তুমি কিন্তু মা,
আমাদের চেয়ে এদের বেশী ভালবাস।” ইহাতে প্রায়মহী
সেবার আশ্বতোলা মাতৃপ্রাণের পরিচয় হৃদয় পাওয়া
যাইতেছে।

তৎকালে দেশের নারীজ্ঞাতীর উন্নতির জন্ত বহু মহামনা
ব্যক্তির প্রাণ কাটিয়াছিল ও অনেকের প্রাণশয় চেষ্টায়
দেশে নারীর স্বতন্ত্রতার উন্নতির পথ যে খুলিয়াছিল, সেই
মহামনা ব্যক্তিমুখের নাম দেশের ইতিহাসে স্বাক্ষর
লিপিত থাকিবে—শিবনাথ ইহার অগ্রদূতদের মধ্যে
অন্ততম ছিলেন সত্য। কিন্তু নারীজ্ঞাতীর প্রতি তাঁহার যে
অসাধারণ প্রজ্ঞা ছিল, নারীপ্রকৃতিতে তাঁহার যে গভীর
বিশ্বাস ছিল—তাঁহার বহু পরিচয় তিনি জীবনে দিয়া
দিয়াছেন। নারীকে তিনি কী অপূর্ণ পরিচয় দেখিতেন

এতদে নিঃশব্দ-বহন-সাঁহাৰে এতিহ কণ্ঠে পঙ্কজ-কবিতা
উদ্ধৃত করিলাম :—

ভগবৎ-প্রেমে প্রেমিকা-নারীর চৰি অকিঞ্চিৎ গিয়া জিনি
লিখিয়াছেন—

- ১। নারী প্রেমে যে প্রেমানন্ড হায় রে শড়িলে
কি হয় জানেনা তাহা এ গোড়া সংসার,
হনির্মল অকল্যাণে ভাহু বিখাজিলে
অতি উৎগিরণ যথা, নারী সে প্রকার
নিজ প্রেমে সেই প্রেম বাবেক ধরিলে
বিজ্ঞারে পুণ্যার জ্যোতি হইবে অছকার।
কিন্তু রে সে জ্যোতিরাশি মধুরতামর
শরমে পবিত্র করে ছুড়ায় স্তম্ভ।
- ২। উন্মিত বিকারে যোগে জন্মভে যজ্ঞার
তার যদি হঠাৎবর কেহ দেবে চাহ,
আমি যদি দুঃক্ষে লভ্য নারী এ প্রকার
পারিব পাশের কালি লগ্নেদি হাওয়া
লগ্নেদি লগ্নেদি লগ্নেদি হাওয়া
নারী যদি পাও হেন, গিয়ে তার পায়ে
আপনারে কেলে রাখ সন্তোঃ বাতাসে
উন্মিত বিকার যোগে লগ্নেদি হাওয়া
- ৩। বাজহাসী পদ-বান, নির্ভল বলিলে
ভাব রে কোনল অর যথা ভেসে যায়,

ভেমতি যে নারী-বহন পুণ্যার অনিলে
বিকারি প্রেমের পাখি খেলিয়ে বেড়াই
হেঁচি প্রতিবির তার বৈদ্য অলি।
সে হাত যদি রে! কবি একবার পাখ
তবে বুঝি সিংহাসনে বসিয়ে তাহারে
নবকূলে দেবী বলে পূজিবারে পারে।

আমাদের দেশ আজ স্বাধীন। মহামানব দিবনাথের
ভাষায় 'স্বাধীন' এই কথার অর্থ, জাতীয় স্বাধীনতা।
তিনিই বলে 'স্বাধীন' হইলে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া এটি স্মৃতি
এবং উৎসাহের উপসংহার করি।—

ভগিনি! ধর্মের তবু এটি মার জানি
সত্য যদি তাই পাব, সত্যের জ্যোতিতে
আনন্দে করিব বাস; সত্যে ছোট মানি
সমগ্র জগৎ বন উজ্জ্বলি গ্রীষ্মে
নিহোজিত, সত্যে অন্ধে বঁচিবে পথনি;
সত্যে পূজ, সত্যে বহু লক্ষ্য নিবারণিত;
সত্যালোক পায় যেই সেই 'ত' স্বাধীন
নবশক্তি নব আশা কুটে দিন দিন।

প্রার্থনা: করি, ভগিনীপদ সকলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত
জীবনে এই সত্যালোকে পদে পদে অগ্রসর হইয়া স্বাধীন
দেশের প্রকৃত স্বাধীন-লানে সজাগ হউন।



ক্যালকাটা অপটিক্যাল কোং (প্রাইভেট) লিঃ

বেঙ্গল - ৩৫ - ১৭১৭ প্রতীকিতা: ডাঃ কার্তিক চন্দ্র বসু
গ্রাম-কালক্যাটকো • ৪৫ নং আনুসার্ট ষ্ট্রীট • কলিকাতা-৯

ছোট-খোঁট

• ** চারুচন্দ্র ওট্টোচার্য ** •

অঙ্কের খেলা

১

যে কোনো একটা সংখ্যা মনে কর। তাকে দ্বিগুণ কর। যা হল তাতে 10 যোগ কর। যা পাড়াল তাকে 2 দিয়ে ভাগ কর। ভাগফল যা হল তার থেকে যে-সংখ্যা তুমি মনে করেছিলে তা বিয়োগ কর : বিয়োগফল কত হল আমি বলে দিতে পারি।

বিয়োগফল হবে 5।

কেন 5 হবে দেখিয়ে দিচ্ছি।

ধর, তুমি মনে করেছিলে x ।

দ্বিগুণ করলে হল $2x$ ।

তাতে 10 যোগ করলে পাড়াল

$$2x + 10।$$

একে অর্ধেক করলে হল

$$x + 5।$$

তুমি মনে করেছিলে x । $x + 5$ থেকে x বিয়োগ করলে বিয়োগফল হল 5। এই বিয়োগফলে x নেই। সুতরাং x যাই হোক না কেন, বিয়োগফল সব সময়ই x হবে।

অঙ্কের এ-সব খেলা একসঙ্গে ক্লাসের অনেককে দেখাত নেই। এক এক জনকে আলাদা ভেঁকে দেখাবে। একসঙ্গে সকলকে ভেঁকে বললে সকলেই একই উত্তর দেবে, তখন রহস্যটা সহজে বরা পড়ে যাবে।

আর একটা হেঁয়ালি।

খাতা-পেনসিল লও। তিন বিভিন্ন অঙ্কের যে কোনো সংখ্যা লিখ। তলায় সংখ্যাটি উল্টে লেখ। অর্থাৎ, শতকের ঘরে যে অঙ্ক ছিল সেটা এখন এককের ঘরে যাবে, দশকেরটা দশকের ঘরেই থাকবে, আর এককেরটা শতকের ঘরে যাবে। এইবার বড়োটি থেকে ছোটোটি বিয়োগ কর। বিয়োগফল যেটা হল, তার তলায় এই সংখ্যাটি উল্টে লিখ। এবার এই দুই সংখ্যা যোগ কর।

তোমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাস করব না : যোগফল কত হল বলে দিচ্ছি।

যোগফল হবে 1089।

কেন এমন হবে তুমি ভাবছ। বীজগণিতের একটা হিসেব থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে, যে-সংখ্যাই তুমি মনে কর না কেন, ওই শেষ ফল হবে 1089।

মনে কর, x , y ও z তিনটি অঙ্ক। শতকের ঘরে আছে x , দশকের ঘরে y , আর এককের ঘরে z । এই সংখ্যাটির মান হল,—

$$100x + 10y + z।$$

উল্টে রাখলে যে সংখ্যাটি হবে তার মান পাড়াবে,—

$$100z + 10y + x।$$

মনে করা যাক, z অপেক্ষা x বড়ো।

$$100x + 10y + z \text{ থেকে}$$

$$100z + 10y + x \text{ বিয়োগ কর।}$$

বিয়োগফল পাড়াল

$$100(x - z - 1) + 90 + (10 + z - x)।$$

একে উল্টে রাখলে যে সংখ্যা হবে তার মান হল

$$100(10 + z - x) + 90 + (x - z - 1)$$

এখন এই সংখ্যা দুটি যোগ কর।

যোগফল হবে ১০৪০।

দেখা যাচ্ছে, বিয়োগের সময় y বাদ গেছে ;

আর শেষকালে যোগের সময় x ও z বাদ গেল।

শেষ অবধি x, y, z কেউ-ই রইল না।

সুতরাং x, y, z যাই হোক না কেন, অর্থাৎ

তিন অঙ্কের যে সংখ্যাই মনে কর না কেন, শেষকল

দাঁড়াবে ১০৪০।

ছোট ঙালিকা

কালীপদ চট্টোপাধ্যায়

একসঙ্গে অনেক জায়গা থেকে ভোজের নিমন্ত্রণ পেলে দুশপিলে পড়তে হয়। উপর তো একটা, অথচ এক কাহন্যাত্রেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হলে অস্বস্ত দেড় পেট বোঝাই করতেই হবে।

একদিনে হার চার কাহন্য থেকে নিমন্ত্রণ পাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার আছে। আমার বে-বছর বিয়ে হল, সেই বছরের কথা। বিয়ে হয়েছিল কান্দনে, তার পর ঠিক গিয়ে বৈশাখ মাসের দউনা।

বৃহত্তরশাইএর নিজস্ব বাড়িই ছিল—পাড়ারগাঁ-এলাকার। তিন ঘরের পিঠে পিঠে সে-বাড়ি দুইয়েছেন, চতুর্থ কক্ষকে গলায় তুলিয়ে, হুট পুর আর দুইটির পরিবার ঘড়ে ক'রে আমাদের শাশুর গায়ে ডাড়া-বাড়িতে বাসা নিয়েছেন। চান্দনি-কল কলকাতার উপকণ্ঠে বাসা নিয়ে সুবিধাই হল। কয়েকই বৃহত্তরগৃহে আমার বেড়ানোটা ঘন-ঘনই হয়। সেখানে আকর্ষণও এতল। বোড়ুই ছোট-ঙালিকা। কবি গেরেছেন—“ভেবে ভেবে সেগাম ক'রে ডালিকা, সবচেয়ে হৃদয়র ছোট-ঙালিকা”।

আগের ববিবার সন্ধ্যায় শালী-শালাদের বেড়াতে নিয়ে এসেছিলাম আনালের বাড়িতে। মাজে এখন পৌঁছিয়ে দিলাম, ঙালিকা আদরগ জানাল, “জামাইবাবু, আগামী রোববার মাজে আপনি আবারের এখানে যাবেন—আমার সঙ্গে ব'সে। আসা চাই—চাই—চাই-ই কিছু”।

সোনকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে বাড়ি ফিরে এলাম।

সেই সন্ধ্যার শুকুবার পড়েছে বিয়ের তারিখ। চাকরিচাঁদী পাড়াকলেকা শুকুবার বিয়ের তারিখ পাবার জন্তে শাবা বছর অপেক্ষা করতে রাজী। ববিবার পড়বে বউভাত। দোক-খাওয়ারানোর সুবিধা।

সেই শুকুবার সন্ধ্যায় শিশুহুতো ডাইএর বিয়েতে ববিবারী বেতে হল। ববিবার বউভাতের নিমন্ত্রণেও যেতেই হবে। বাবা বড়ো হয়েছেন, অতএব তার প্রতিনিধি হয়েও বেতে হবে আমাকে। তা নইলে শিশিমা যে কী কাণ্ড বাধাবেন তা অভাবনীয়।

এদিকে, পাড়ায় ছেডমাস্টার-মশাইএর ছেলের বিয়ে হয়েছে ৬ইদিন, এবং তার বউভাত ৬ই ববিবারে। যেতেই হবে দেখানে। তিরিশ বছর তিনি ছেডমাস্টারি করছেন আমাদের ইছুলে। এ অধবঙ ম্যাট্রিক পান করেছে তাঁরই পায়ের ধুলো নিয়ে।

গ্রামের মধ্যে হুনীল আমার অন্তরর বন্ধু। তার বিয়ে হয়েছে ৬ই শুকুবার আর বউভাতও ৬ই ববিবার। একে তো বাস-ছই আগেই আমার বিয়ে হয়ে গেছে ব'লে তার অভিমান হয়েছে, তার ওপর শিশুহুতো ডাইএর বিয়ের দরুন তার বিয়েতে ববিবার বেতে পারিনি; অতঃপর যদি বউভাতও না বেতে পারি...

এই বিয়ের শুকুবার সন্ধ্যাবেলা আমার ঙালিকা এসেছিল আমাদের বাড়িতে বেড়াতে। চারদিকে বিয়ে হচ্ছে দেখে বোধহয় ঘরে বন টি'কতে চায়নি। এম সে তার দিদির কাছে শুনেতে শেরেছে ববিবারে আমার আরও তিন কাহন্যায় নিমন্ত্রণের সংবাদ। সে চিঠি শিগে রেখে গেছে—“জামাইবাবু, ববিবার যতক্ষণ আপনি না যান্ছেন, ততক্ষণ আমি আপনার পথ চেয়ে ব'সে থাকব, যেন রান্ধনন-”।

ববিবার সকালেই হাজির হলাম শিশিমা'র বাড়ি। কলকাতায়। তারি সুশি হলেন। জু তিনি কেন, সকলেই।

হুপুহুসে। বহাদুরিতি রাস্তার বিশেষ ঘটা হল না।
বিশেষ ব্যক্তি বলতে যাচ্ছে কোল। আসল হুথ—নতুন
বউমার পরিবেশন-করা পারবে। নতুন বউ লক্ষী—
পারবে খ'নেছিল ডানো, তারই ফলে আহারে একটু
মাত্রাধিক। ঘ'টে গেল।

বিকলে শিশিমায়ে লম্বা প্রাণম ক'রে আমার দুঃখস্বার
কথা নিবেদন করলো।" শুনেই হাউমাউ ছুড়ে বলেন।
অনেক কষ্টে ঠাণ্ডা করা গেল: "মাগল লম্বা বউভাত।
সেই বউএর হাতের ভাত-ই যখন পরম পরিভোবে খেয়ে
গেলাম, তার গুণর বনশ্রুতির মূর্তি পেলাম না খ'লে হুথ
নেই, শিশিমা। তোমারও গুথ করা উচিত নয়।
আর-একদিন এসে বউএর হাতের রাস্তা খেসেই আফসোস
বিটে যাবে।"

অক্লান্ত শিশিমায়ে, এবং সপলেট, কী কষ্টে যে বৃষ্টি
মানিয়ে এলাম, সে শুধু আমিই জানি। গোঁজা শিশালতা
স্টেশনে এসে ট্রেন খ'রে চ'লে এলাম বাড়ি। তখন
লক্ষ্য হুথ-হুথ।

যখন ক'রে নিজের বিরুদ্ধে পাওয়া বেশী জামা,
মুগা-পাড় মুক্তি, জানাই-জুতো খ'রে 'দুর্গা' বলে বেরিয়ে
পড়লাম।

হেডমাস্টার-মশাইএর বাড়িতে পৌঁছানো-মায়ের দেবি,
বুধ একবারে অগ্রিম! লাক্ষ্যে। দুই বক্তৃতা বুরছে।
"হাস্যকথার বিনে আমার ছুটিয়েছে, বাবা। এবিকে
দুটি-বেলা শুক হবে গেছে—লোক বসিয়ে দিলে হুথ—
ওবিকে মরার ব্যাটা এখনও পান্ডো পৌঁছিয়ে দিলে না!
ছুবি একুনি একবার..."

"নিচরই। আলনি কিছু ভাববেন না, স্ত্রী।" ব'লে
উপহারের শাড়ি খগলে নিয়েই ছুটলাম। বানিকদর
গিছেই দেবি, ভূরীর কাঁধে হুল পেতে যেতে পান্ডো
আসছেন।

কিরে দিবে, এখনেই বউ-বেগা সন্ধান করলাম।
সেখান থেকে বেরোতেই আমার মাস্টারমশাইএর সামনে,
"এই-বে বাবা! আরে, জুতো-জামা ছাড়—জামাই সেজে
থাকলে লক্ষীই না—যাগতি হাতে করতে হবে।"

"নিচরই, স্ত্রী। সে কি আর বলতে হবে।" ব'লে
একবিকে গা-ঢাকা দিলাম।

বাড়িতে সীমাবদ্ধ জায়গা, তার মধ্যে তাঁর কয়েকখ
সিঁদুর গিলি করছে। বাটবার জন্তে লবাই এক-পারে
বাড়ি। তার মধ্যে মাস্টারমশাই উগ্রভিত্তে চরকি-গা

খেরে বেড়াচ্ছেন। এলোপাড়াড়ি হুথ হুথ। তাঁর
ছেলের সঙ্গে দেখা হতে, পিপরভাবে বললো, "কাজের লোক
কম্বাতে না পারলে যে কিছু কাজই হবে না—এ কথাটা
বাবাকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না, ভাই।"

বললাম, "কিন্তু তেবে না, আমি সেগছি। তুমি
ওকিক সেগগে।"

ওকিক শুনে সে কোন্ দিকে গেল, নে-ই জানে। আমি
দেখলাম, এই ছুটগোলের মধ্যেই স'রে পড়া নিয়ামদ।
পেলাম কি পেলাম না, তার খোজ এখানে কেউ
নেবে না।

বাড়ির পেছন দিক থেকে মাস্টারমশাইএর হুথার এস।
আমি সামনের দিকে ছুটলাম। স্লোকা একেবারে রাঙার।
তারপর গলি। বড় রাস্তার চেনা লোকের অভাব নেই।
ধরা শ'ড়ে গেলেই দুশকিল। কেউ বিখাল করবে না
যে, এরই মধ্যে খেয়ে বেরিয়েছি শুকবাড়ি খেতে।

গলি শেষ হয়েচে গম্বার ধারে। ঠাঁতা হাওয়ায় গা
ছুঁড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যেই গারে আমার বিরের জামা
ডিঙে উঠেছিল। জামা ওকিরে, গা ছুঁড়িয়ে নেওয়া যাক।
বেগাটার গিরে, চোবের টর্ট নেরে-নেরে ভালো ক'রে দেখে
নিখে, ক্রমাল পেতে বললাম। পাটকলের শেট-খড়িতে,
তনি, আটটা বাকছে। উঠে পড়লাম।

গম্বার ধারে জলো পথ খ'রেই গিরে উঠলাম দক্ষিণ-
পাড়ার রাস্তায়। আলোর নিচে ঠেড়িয়ে জুতোর তলা সেখে
নিলাম। একটু ঘোরা হয়ে গেছে, ওগান থেকে সুনীলের
বাড়ি আধবন্দীর কম নয়। চললাম। গম্বার হাওয়া পেয়ে
এরই মধ্যে পেটের ভিতর পুস্ততা ডাক ছাড়তে শুরু
করেছে।

সুনীলের বাড়ি চুকতে বাড়ি, বেশি, আমার বক্তৃতা-লকটি
খেরে বেরোছে। হেসে বললো, "জামাইসানু, আমাদের
বাড়ি যাবেন না?"

বললাম, "নিচরই হাথ—ছোড়দিকে যোনা।"

সে চ'লে গেল। নিচিন্ত হলাম, যাক, ছোট-গল্পিকাকে
খবরটি দিরে দেওয়া হল যে, আমি নিচরই তার প্রতীক্ষা
সকল করব। এখন সুনীলের বাড়ি থেকে ছাড়া পেতে ইংব
বিলম্ব লকটি নেই। বেশি বেশি করাও চলবে না—
পেটের ভিতর অসুস্থ-দেবতা ডিগবাড়ি খাচ্ছেন।

বউকে কে-ঘরে বসানো হয়েচে, আগেই চ'লে দেলাম
দে-ঘরে। কী ভাগ্য যে সুনীলের দেখা নেই! কোথায়
গেছে, কাউকে জিজ্ঞেসও করলাম না। বউএর ঘরে শূন্যপদ

করানত স্ত্রীলোকের দিদি আক্রমণ করলেন, “এতক্ষণে তোমার সম্বন্ধ হল, ভাই?”

বললাম, “নিচে এসেছি অনেকক্ষণ। তার আগে হাস্টারমশাইএর বাড়ি হয়ে আসতে হল। তার আগে, ধরুন, শিশিরার বাড়ি...”

“আর আমাদের বাড়ি বুঝি...” তিনি গাল জড়িয়ে ফুলে উঠল। তাকাতাড়ি বললাম, “আ হা! ও-বাড়ি তো আমার নিজের বাড়ি।”

“সে তো বাটেই।” দিদি বললেন, “থাক, হুমি এসেছি, ঝাচলে, ভাই। এই নাও খাতা, এই নাও পেনসিল, এইখানে বোসো—যে যা লেবে, নামটি লিখো...”

আমার তো চক্ষুস্থির! বললাম, “আমি তো সকলকে চিনি না!”

দিদি বললেন, “এই বাটু, হইল তোমার নাম। আমাদের আত্মীয়-বন্ধন সবাইকে ও চেনে, আর, তোমাদের বন্ধুত্বও সবাইকে তো হুমি চেনে।”

এমন বিপাকে বাসব পড়ে! আমি চাইছি অবিলম্বে ধারণা কটাতো, আর উনি আমার অনির্ণিত কালের জন্তে খায়ে বন্ধন ফেলে পালাচ্ছেন! বললাম, “কিন্তু আপনি যাচ্ছেন কোথায়?”

তিনি হাচ্ছেন ওদিকে। “বেসিক না লেব, সেদিকেই গোলমাল, ভাই। আমার কি একটুকু নিয়ে বসে থাকবার জো আছে?” বলতে বলতে অস্বাভাবিক! মহা হজ্জ, বজ্রবাড়িতে! সেবেছি, সকলের স্বরকার ওদিকে! সেই ওদিক যে কৌমুদিক, তা আমি আজ পর্যন্ত ঠিক করতে পারলাম না।

বললাম, “বেশ্ন, এই যেমনহলে আমি...”

কিন্তু তিনি ততক্ষণ আমার কথা-পৌছনোর সীমার বাইরে চলে গেছেন।

নিরুপায়! কর্ণ লিখে চলেছি: শ্রীনকুল বোবের পুথিগী—বাড়ি ১, নীল, ঢাকাট বৃষ্টি... শ্রীনবনাথ ভব—অপরূপী পিতলের ফুলদারি ১...

সাধবের তাকে টাইম-পিস, তাতে নটা বেজে গেছে। পেটের ভিতর যে কী হচ্ছে, সে শুধু আমি টের পাচ্ছি!

হঠাৎ স্ত্রীলোকের আবির্ভাব। আকাত হওয়ার আগেই আক্রমণ করলাম, “কী চাই! নেমস্তর যেতে আসা হল?”

সে বললো, “আজ্ঞে হ্যাঁ। কলকাতা থেকে। মেসোমশাই হুট ধরেছেন—তাকে নিয়ে আসতে হল পায়ে ধরে দেখে। সঙ্গে বাসিনা ইত্যাদি। বাসলবে বোটর-হুটনা!”

স্ত্রীলোকের নববস্ত্রের দিকে আড়চোখে তাকাল—বোটর-হুটনার সংবাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার জন্তে।

খাতা-পেনসিল তার হাতে দিয়ে বললাম, “একবার হেঁরা দেবি, উভকে আমার উপহারটা এখনও দেখা হইনি।”

বউএর হাতে আমার উপহারটা দিয়ে বললাম, “শরিলে পরে হবে, এখন বিনাম-শরিলেই নবস্তর।”

প্রতিনিবস্তর জানিয়ে দিলি হাসল বউ। একবার মনে হল, স্মৃতিশক্তি-মিলনে আজ আর না-ই বা গেলো। হঠাৎ কলকাতা থেকে সন্ত-আগত। হাসিনা-কম্পানির প্রবেশ—লক্ষ স্ত্রীলোকের দিদি। আড়চোখে চেয়ে দেখি, স্ত্রীলোক খাতা-পেনসিল নিয়ে ‘ধরে-লক্ষণ’ হয়ে গাড়িয়ে আছে! আমি যেন হাসিনা-গররহকে লক্ষ্য করে দেবার জন্তে দুই সাধবানে ওপাশ কেটে চলে এলাম দরজার; তারপর আর কোনদিকে না তাকিয়ে বাইরে—এবং সোজা নিচে।

বাড়ির দরজার কাছে এসে উকিছুঁকি ঘরোয়া এদিক-ওদিক-সামনে-পেছনে, হঠাৎ দেখি, তিন গাড়ি এসে থামল। স্ত্রীলোকের বস্তুরবাড়ির লোকজন।

নিম্নে অত্যাশ্চর্য্যের সোপানে পড়ে গেল।

এই হুজু। আমি বেহিঁয়ে এসে ঝাঁপিক কাটলাম। সোজা গেলো হুজু। হুট-কম সবচেয়ে বাড়বাৎসর। কিন্তু, পেছনে বিপর! পাঁচ-পাঁচ করে পা চাটানিয়ে বিলাষ।

কটা বাজে? বেলায় হল, নিজের হাতেই তো গড়ি আছে—আমার নিজের বিয়ের গড়ি—“ওআল-ই-মু-না।”

যাচ্ছে-নটা বেজে গেছে!

হুজুবাৎসরের দরজার গিয়ে বসন কড়ার কড়ার জললাম, তখন পৌঁনে বশটা। কর্তা নিজেই নোর খুলে দিলেন; বললেন, “এসো, বাবা।”

প্রণাম করলাম। হসিক লোক। তিন ঘেরে পার ক’বে, এক ঘেরে গালাব ক’বেও এখনও তাকিয়ে বাননি। পৌঁকের আড়ালে হাসির আভাস জাগিয়ে ভাবলেন, “কমল! হুমি হেরে গেলে।”

বায়াকা থেকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কমল অর্ধে আমার ছোট-স্মৃতিশক্তি এবং তার স্ত্রীলোক বেতে বসেছেন। কবল শুধু পাখবের হুজির মতো চেয়ে হইল। শাওকীরও তববস্থা হেরেছিলে একমুহুর্তের জন্তে; কিন্তু তিনি সামলে নিলেন। উঠে পাঁচাবার জন্তে সবে বালায় ভর দিয়েছেন, আমি বাধা দিলাম, “আপনি উঠছেন কেন? আমি ঘরে এসেছি। কিন্তু নে-কথাটা না জানিয়ে গেলে হরতো তাকবান পড়বেন, তাই এলাম। স্ত্রীলোক কিছুতেই ছাড়লে না। কী করব, বদু!”

“সে তো বাটেই, বাবা।” শাওকী বললেন, “আমরাও এতক্ষণ অপেক্ষা করে করে সেই কবাই তেবেছি। বোকা এসে বললে কিনা যে—”

তালিকা বললে, “আপনি কোথাকে কী বলে দিয়েছিলেন?”

বললাম, “কোথাকে বলেছি, আমি নিশ্চয়ই যাব—ছোড়কির বেলা—তা, আমি কি আনি নি?”

এদিকের ঘরে এসে বললাম, অবিলম্বে তালিকাও এল। শেষে বলল একবারে। কথা দিয়ে কথা রাখতে পারিনি—তার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে তা রাখতে পারিনি—এমন স্বেচছা কি হাতছাড়া করে কোনো তালিকা? নতুনতরক বললাম, “সমস্যা হচ্ছে, স্বীকার করছি। তবু যদি কথা করতে না পার, তবে ত্যাক্স-জামাইবাবু করে দাও।”

হঠাৎ একটা মূল্যবান প্রশ্ন করে বলল, “গেরে এসেছেন তো—পান খাননি কেন?”

বললাম, “বিরেবাড়ির সরকারী পান আমি বাইনে। পান তো এনিই বড় একটা বাইনে আমি। তবে ফুরি-ভোজের পরে একটা হাল ভালো হয়। দুনি ভালো করে একটা পান সেজে দাও, আর, জলও দিয়ে এক গেলান। খেতে ব’লে আমি জল বাইনে, জান তো। তার ওপর বিরেবাড়ির জল!”

তাকে কথা দিলাম, পরের বিবাহেরও যদি এমন কোনো অকাটা নিয়ন্ত্রণের পশুপদ না পড়ি, তা হলে নিশ্চয়ই আসব—তার দিকটিকে সবে নিয়ে আসব।

টলতে টলতে এসে যখন বাড়িতে পৌঁছোলাম, তখন হাত প্রায় এগারোটা। যা এবং তার বহুখাতা পুরুষাট থেকে ঘরে আসছেন—মাঝ-বাগনের বোকা নিয়ে।

যা জিজ্ঞাস করলেন, “শাত্তী কী খাওছিলেন জামাইকে?”

বললাম, “স্নানলের বাড়িতে খেতেই হল, যা। ওরা কিছুতেই ছাড়লে না।”

“তা কখনও ছাড়ে!” মা যত্নব্যব করলেন।

আমার অবস্থা তখন অবদীর্ঘ। গাঁড়িতে পারছিলাম। গেটের ভেতর যে কী হচ্ছে...

আমাদের দম্পতির পোষার ব্যবস্থা তখন খাবার-ঘরে। আলার বিয়েতে বাবা গমন-করনা কম নিয়েছেন, নগদ টাকা নিয়েছেন বেশি। তা থেকে আগেই টাকা হুলে রেখেছেন—ঘোড়সার আমার জন্মে নতুন একটা ঘর করতে। সে-ঘর বতখিন না উঠেছে, ততখিন খাবার-ঘরই ছিল আমাদের অস্থায়ী ঘরশালা। সে-ঘরের ভেতর দিয়ে যেতে হয় পেছনের রজন-বুধিতে। মাকের দরকার পাল্লা নেই।

যু বলিশে মাথা দিয়েই দুধিয়ে পড়লেন। আমার

দুই আসবে কেন? পেট থেকে তখন বেন নাড়ি-গোড়া গন্ধ উঠছে।

নিঃশেষে উঠে এলাম—বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে। চোখের দৃষ্টিতেও মার্কারীজ জোড়ি কোটাখার চোটা করলাম। আলো আলগে বই জেগে যাবে। জানালার-জুটোর পথে বাইরের আলোর সাহায্য লাভেরা ব্যর্থ।

হাতড়ে দেখি, বাড়ির তলায় ভাত আছে চাটখানি। সেই আনন্দে বোধকর একই অলসক হয়ে পড়েছিলাম। খালো হাত দিতেই স্নান করে আওয়াঃ! নিঃশব্দ বন্ধ করে বসে রইলাম। এদিকে বাবার-ঘরের পথায় বিন-বিনিস আওয়াঃ উঠে যথেকে গেল! শাড়ির পশুপদ নক। বই জেগে গেছে! উঠেই বলেছে হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছে, আমি বিছানার নেই। এবার টেচিরে উঠেই, করনা!

ভান্ডি খে, ও-ঘর থেকে যা কি খাবার অথবা একসঙ্গে হুমনেরই আতঙ্কিত জিজ্ঞাসা পানিত হচ্ছে না।

বরাবর থেকে ভাড়াভাড়ি খাবার-ঘরে চ’লে আসতে দিয়েই দরজার ঘরকে ঈড়ালম। চারমুখি দেখলেই ঈমতী চিংকর করে উঠতে পারেন, চৈতন্য হারিয়ে পানেন, তা ছাড়া আরও যে কী হতে বা করতে পানেন কে জানে। দরজা থেকেই দুই জানা গলার বলে উঠলাম, “এই? ভয় নেই। আমি।”

“তুমি!” দশাবির ভেতর থেকে ওকনো কঠে কন্দিত প্রশ্ন।

তখন আর আলো আলগে বাধা কী? কাছে এসে বললাম, “ভাল-কাল কিছু নেই? ভাত আছে কেখেছি।”

হ্রী যুখে কথা নেই। চোখে বিপুল নিশ্চয়।

বললাম, “আগে আমার খেতে হাও। না ঘেয়ে কিছু বলতে পারি এমন ক্ষমতা নেই। বিখাল করো, আমি কিছু বাইনি, কোথাও বাইনি, বিদেয় পেট জলে যাচ্ছে।”

দশাবরী ভাত বেড়ে দিলেন। ভালও একই ছিল, এবং ওই গরমে তখনও বরণ্য হয়ে যাইনি। আগও সৌভাগ্য, ডালের মধ্যে একটা ভাজ-লকাও ছিল। বললাম, “বাইরে একই নজর রাখো। যা যদি জেগে যান—আর যদি আড়াল থেকে দেখে ফেলেন। ন-হয় আলো নিভিয়ে হাওনা।”

আলো জালাই রইল। তিনি বাইরে নজর রাখলেন। আহায্যন্তে আলো নিভিয়ে বিছানার উঠলাম।

সব কথা সবিজ্ঞায়ে বিশ্বত করলাম। কতখানো সব জনলেন ঈমতী, তার পর বললেন, “শালী নিয়ে যে-রকম বেতে উঠেছে, আরও কী আছে বহাতে, তাহা না।”

লোহা-উপজাতির পূজা-পরব ও লোকসংগীত

অধ্যাপক ত্রিপ্রবোধকুমার ভৌমিক

মাহুগ মাহেই আনন্দে পূর্ণকিত হয়—সেই পূর্ণকেষর বহিঃপ্রকাশ ছয় নৃত্য-ঐতে, ছন্দে ও সুরে। আদিবাসীর ত্বব্যার-হুগের সেই শৌন-হুঁল বস্তুকেন্দ্রিক মাহুগের মনে যে সোনা ছিল, পরের হুগে সম্পদের প্রাচুর্যে নতুন অর্থনৈতিক পরিবেশে তার অবদান ঘটেনি, বরং বিভিন্ন পিকে রূপান্তরিত হয়েছে। মাহুগের জীবনযাত্রা আজ বতাই বিভিন্ন হোম-না কেন, তার চিন্তের অনাবিগ প্রশান্তি-ই নৃত্য-ঐতের বিকাশকে সাবলীল করে তুলেছে। কেবল প্রাচুর্যের উদ্ভাসনার মাহুগের মনে সংস্কৃতির অকার আশ্রয়ি; কর্ণের সঙ্গলতার জন্তে নানা দেব-দেবীর কল্পনা, পক্ষির আন্যায়োনায় ইকিত বাস্তবতাকে সুরে পরিণত পূজা-অর্চনাকে এক আত্মনৈতিক স্বীকৃতি দান করেছে। তাই কৃতকার্যতার শপথ পূজা-পরব, নৃত্য-ঐত এক বাস্তব হুঁলিয়ার অভিনব বিকাশ। মাহুগের বৈশিষ্ট্য জীবনযাত্রার ধারা বিভিন্ন হলে, তার দেব-দেবী শক্তি-উপাসনা বিভিন্ন রকমের হবে সন্দেহ নাই। এ ছাড়া বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশ, বৃত্তিস্থিতির উদ্বেগ, নানা ভাব ও ভাষার সমাবেশ—মাহুগের আন্দোল-আজ্ঞার, ব্রত-উপাসনা, যাগ-যজ্ঞকে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করে তোলে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্তবকেন্দ্রিক পূজা-তর্পণ-উৎসর্গ আর লোহাও বা সমগ্রগত উৎসব সামগ্রিক পর্যায়ে রক্ত সঞ্চিত হয়। তাই মাহুগের সমাজে দেখতে পাওয়া যায় নানাবিধ পূজা, পরব, ব্রত-ঐত, শক্তিস্থির অভিনব পরিকল্পনা। বেঙা-নেঙা-শাওয়ার

এক নীরব স্বীকৃতিতে বিভিন্ন বস্তুনিষ্ঠের উৎসর্গ মানব-মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার এক অনাবিগ ভাষার বিকাশ। হুগের দিনের ব্যর্থতা, হুগের মিনের হুগেরতা পূজা-পরব বা ভক্তি-বিশ্বাসকে গভীর করে তোলে মাহুগ।

পক্ষিমহাংগার বেদিনীপুর জেলায় সোম-জাতির বাস। মতাবহুত্ব (criminal tribe) জাতি বলে তাদের ধরা হয়। এরা বিকৃত বাংলাভাষায় কথা বলে। তাদের অতীতদিনের জীবনযাত্রা ছিল কলমুল-স্বাধরণ ও শওপকী-শিকার। শাল-মহুগার কোলে পাহাড়ী মটির দেশে দলবদ্ধভাবে ছিল তাদের বাস। কালের পরিবর্তনে, বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিবেশ ও অত্যন্ত সমস্যারের সাথে বেলাবেশার লোহাদের সহজ জীবনযাত্রার গতি সেল পাঠে। তাদের নানাবিধ ক্ষুণ্ণ-উপাসনার সাথে বিভিন্ন সমাজের দেব-দেবী আসন পেতে যদলেন—নানা ভাষা ও ভাষার সমন্বয়ে নানা পূজা-পরবও স্বীকৃতি লাভ করল।

ছুত-ওত বা নানা শক্তিতে এসের বিশ্বাস। এইসব শক্তির বা দেবদেবীর, এমন কি, পূর্বপুরুষের আশ্রয় সন্ততি ক'রে পারিবারিক বা সামাজিক মঙ্গলকামনার তারা অভ্যস্ত। উপাসনার ভাষা অতি সহজ—নিছক কথা-বলার মতো। একাগ্রচিত্তে মনের দাবিগুলি নিবেদন করে মাহুগ। শীতলা-পূজার দেহেই (এসের সমস্যারের পুরোহিত) মাহুগল্যকে স্বাক্ষর আচ্ছাদন জানাও, ভক্তিচিত্তে ছর করে করে বলে—

“তোমার পূজা দিছি, বা, তুমি সন্তই হও—যেন কোনো অসুখ বিপদ (বায়াপ) না হয়। তোমার বলির জন্ত পাঠা দোব, হুই দোব। তোমার ডাক্তার আবার বাওদাব। অগাণার, ডাকিনী, হুগিনী, জগিনী, চালতা-হুগিয়া, মোহা-গড়িয়া (শীতলার অহুচর ও জগিনী) সবাইকে পূজা দোব। কীরডোঙ্গ দোব। বী পুড়ে গাঁয়ের অবশল হুই তাক্কাব। বহুদাতা, ধরমদেবতা, গাঁয়ের গরাম সবাইকে আজ ভোগ দিছি; তুমি সন্তই হও, যেন বাজাঝাকাতা ছেলেপুলের অহুচর না হয়।”

এ বেন ভাষাবিক্র প্রতিক্রান্তি আদ্যাবের, বেঙা-নেঙা অহুচরদের এক বাস্তব অভিব্যক্তি। এখনভাবে নানা



অতীত-পাতি—শিকারীর বেশ ছবির সোনা

দেব-দেবী বা শক্তির উপাসনার ঘনের স্বাভাবিক দাবি জানানো হইয়াছে।

শোণাদেবের অনেকরকম পূজা-পরব আছে। এতোক পূজাতে দেহেরী পূজকের স্বাক্ষর করে; ইন্দ্রকার মূর্তী, হাঁস বা ছাগল বলি দেয়। এদের সাহায্য করার জন্য ছড়িদার আছে। এতোক দেব-দেবীর বা প্রেতশক্তির ক্ষমতা বিভিন্ন ও সীমাবদ্ধ। যেমন শ্রীতলা—ইনি সঙ্কোচক ব্যাধির দায়িক। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি কঠিন সংক্রামক ব্যাধি এর শোণালের উপর নির্ভর করে। আসলে এইসব ব্যাধির বিধিত নিরাময়ের পথ না জানার ভুল বা আক্রান্তের হার খুব বেশী হয়। বৎসরে হু'বার বেশ ঘটা করে পূজা হয় সমষ্টিগতভাবে—অনেকটা সর্বজনীন পূজার মতো। আবার রোগের প্রাচুর্যের উপর পূজার ঘটা ও সংখ্যা নির্ভর করে। দেবীর আশ্বিনা এর প্রত্যেক গ্রামে আছে, তাকে এরা মাড়ো (মণ্ডপ?) বলে। প্রতিমা নেই। অনেক সময় বাসাকর দিয়ে কাগজের উপর বা-বেগুনের কার্যনিক মূর্তি আঁকা হয়।

চতী :- ইনি কঠিন কীর্ণকারী (chronic) কঠিন ব্যাধির দায়িক। অনেক সময় ঘনের হিংস্র রক্ত বা বিষের সাপ এর কোপমূর্তিতে শোণাদেবের ছাড়া ও আতঙ্কিত করে। বছরে হু'বার পূজা হয়। নানাবসন্ত বলির ব্যবস্থা ছাড়া এর জন্য মাটির খোঁজা বা হাতী উৎসর্গ করা হয়। বৈদিনীপুরের কোনো কোনো লোক-গ্রামে, বিশেষ করে শিকরেণ ঘনের শিতলকাটি গ্রামে গুণাপূজার দিন ২০-৩০-৪০ বৈদী পাঁচ-বলি দিতে দেখা যায়।

বড়ার বা গরাম :- ইনি জলদের দেবতা। কীর্ণকার, লোমশ শরীর; হাতে কখনও বা ত্রিশূল, কখনও বা চাটী। গভীর হাতে ঠিকঠাক লক্ষ করে কাঠ ও কাটেন। শরৎ-বিশেবে বাড়ের শিটে চেপে ঘুরে বেড়ান। গ্রামের সর্বাঙ্গীণ বয়লের জন্য অনেকবার এর পূজা বা বলির ব্যবস্থা করতে হয়।

মুসিনী :- শ্রীতলায় গরুচর। নোয়া পশুদান প্রভৃতিতে এর বাস। বড়কের সময় ভুত ব্যক্তিরের আত্মা এর জিন্মায় থাকে। মানারকমে লোক জনদের ইনি ভয় দেখান—অনবরত কায়া পরিবর্তন করে থাকেন। কেউ কেউ বলেন, হাটীশে পর্বত এর ঘনের বিস্তৃতি। গ্রামের গরুরোপে লাল-ইকটুক জ্বিত বের করে হারের মাঝ দিয়ে ইনি বাজায়ত করেন। বাচ্চা ছেলেরের রক্ত খেতে ইনি ভাল-বাসেন। ফলে, ছোট ছেলেরেরের নিরাপত্তার জন্য এর উপাশনা বা ছুটির প্রয়োজন।

মনসা :- সাগের দেবী। শোণা-সাপুড়েরা কচি পারহা বলিদের এর স্রীতির জন্মে।

এইরকম করে কচি দেব-দেবীর পূজাকে কেন্দ্র করে উৎসব হয়। এ ছাড়া আরও কয়েকটি পরব আছে।

বাগেল পরব :- বর্ষার পর নতুন চাষাগাছ পোতার সময় অথবা জল থেকে নতুন কোনো ফসল-সংগ্রহের সময় 'বাগেল পরব' হয়। ঐদিকে বড়ারের পূজা হয়। হারের মাঝে কীর তৈরি করে বড়ারের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়; গ্রামবাসীরা এসেই পায়।

বান্দনা পরব :- বান্দনা পরবে সব শোণাদের যোগ দিতে দেখা যায় না। যেখানে বহাতো, কোড়া প্রভৃতি সম্রাণদের লোক বেশী, সেখানেই শোণাদের এই পরবে যোগ দিতে দেখা যায়। কাতিক মাসের অমাবস্তার রাতে পরবের উদ্দেশ্যে হয়। তিনদিন ধরে পরব চলে। এ হল গরু বা গো-দেবতার পূজা। প্রথম দিন হল জাগান বা বন্দনা (awaking or welcoming), দ্বিতীয় দিন হল চুয়ান বা পূজন (kissing বা worshipping), আর তৃতীয় দিন হল নাচন (dancing)। বিভিন্ন অধ্যায়ের বিভিন্ন গান আছে গো-দেবতাকে কেন্দ্র করে—মাহুরের অর্ধনৈতিক জীবনের নানা সমস্যার ইঙ্গিত আছে প্রমোদনের মাধ্যমে।

বর্-হিন্দুলের দেবদেবী কোথাও কোথাও শ্রমীপূজা, বনি-পূজা ইত্যাদি অগ্রহায়ণ মাসে হয়। এইসব পূজা বা পরবে আমোদ-আজাদের হাট বসে—নানারকম সমবেত-সংগীত হয়,—গ্রামের কানিরাতে উৎসবের ঘটায় মুছে দিতে চায়।

লোকসংগীত :- এরা বিকৃত বা-শাভাষ্য কথা বলে।



শোণা-রকী—করী, মাহুরে



লোহারের চাপে বাঁধিত বন্দনা-গান

বাংলা লোকসংস্কৃতির একমুখি এদের মাঝে বেঁচে আছে—বাংলাভাবকে স্ফুট করে রেখেছে। দীর্ঘকালের ব্যবধানে বহু জাতি-উপজাতির সংস্পর্শে এসে কোনদিন এরা নিজেদের ভাষা হারিয়েছে আর বাংলাভাবকে মাত্রভাষা বলে বরণ করেছে। ইতিহাসের অসোজরে যে পরিবর্তন ঘটিছে তার মাঝে দিতে এমন কিছুই নেই, কেবল লোকজার বা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক নিশানা ছাড়া। হয়ত নিজস্বগত উন্নতি করে জোড়ার এক অঙ্গপূর্ণে বাংলাভাব-ভাবীর সংস্পর্শে তাদের রীতি-নীতিক্রমে বরণ করা—জীবন-সংগ্রামের একমাত্র অবলম্বন হয়ে পড়িয়েছিল, তাই নীরবে বাংলাভাবকে তারা নিজ ভাষাভাষে গ্রহণ করেছিল।

সে ঘটি যোক-না কেন, এদের সংস্কৃতিতে পুরুষেরাই অংশ গ্রহণ করে থাকে। বাতহরের মধ্যে ‘চাওল’—এক বিরাট ধর্মীয় মন্তো; চাগলের চামড়া দিয়ে তৈরী ধাঁসের বিল দিয়ে কার্যের কার্যমোতে আটকানো। গানের পূর্বে চামড়াকে ঝড়ের আগুন তড়িতির নেওড়া হয় সুর-সৌন্দর্য ঠিক রাখার জন্য। এতোক গানের বিরতিতে আগুন-জ্বালায় ব্যবস্থা আছে। দু-একটা বিশেষ পরবে বা গানে মাগল ব্যবহার করা হয় : যেমন—কাঠিন্যচ বা ব্রহ্মর গান ও বান্দনা-পরবে। গানের সঙ্গে নাচের ব্যবস্থা আছে। তবে প্রার্থনা-গীতে (invoking song) নাচ হয় না।

সংস্কৃতির প্রকার-ভেদ আছে : ঘোঁট চাহভাগে ভাগ করা যেতে পারে :—(১) প্রার্থনা-গীতি বা বন্দনা-গান (praying or invoking song), (২) বারিষাণি গান : নানা সাহিনীর নারক-নারিকাদের বারষাণের জীবনের ধার।

তাদের মনের দুঃখ-দুঃখের অভিব্যক্তি, কষ্ট-পরিবর্তনের সাথে মনের পরিবর্তনের এক অবিস্মৃত বোগস্বত্রের কাহিনী। বেশিরভাগ গান ও সি বি র হে ব পুরে সঙ্কল্প, প্রেমের অভিব্যক্তির দীর্ঘ প্রতীকার নৈতিক প্রতিবাদ—এক উচ্ছল স্বাক্ষর। (৩) ব্রহ্মর গান : ব্রহ্মর হ'ল কৃষ্ণের গোষ্ঠীলগ্ন গান। ব্রহ্মর বৈষ্ণব-সংগীত। এই গানে চাওল বাকানো হয় না। গানের এক পদ্ধতি মাতঙ্গর-গোছের একজন গায়। তখন অভ্যন্তরীণ দুঃখ ধরে। অনেক সময় গানের সাথে কাঠিন্যচের ব্যবস্থা আছে। (৪) নানাবিধ গান :

এই গানের মধ্যে বান্দনা-পরবের গানগুলিকে ধরা যায়। কোথাও বা স্মার-সংগীত, কোথাও বা আধুনিক কীর্তন বা সিনেমার দু-একটা গান বিকৃত হয়ে গাওয়া হয়। কোথাও ‘জু-হানের গান’ চাপু হয়েছে। দু-একটা গ্রামে হারমোনিয়ম-যোগে বাজা বা নাটকের প্রচলনও লক্ষ্য করা গেছে।

বন্দনা-গান

‘বন্দনা বন্দনা মূই যা—

বন্দনা বন্দনা মূই যা।

এভাবে বন্দনা করি, এভাবে বন্দনা করি
জয় যা শ্রীভালা,

বন্দনা বন্দনা মূই যা—।

তায়গরে বন্দনা করি শ্রীভালা-মুগিনী,
তায়গরে বন্দনা করি বসন্ত কুমারী,
তায়গরে বন্দনা করি বিলম্বিতা বুড়ী,
তায়গরে বন্দনা করি ওলাউঠা বুড়ী,
তায়গরে বন্দনা করি ছাঁদন বাঁচন,
তায়গরে বন্দনা করি বুড়ায় বড়ায়,
তায়গরে বন্দনা করি বেড়াবাল কস্তা,
বন্ধিনেতে বন্ধি আমি জয় জয়গায়,
পন্ধিনেতে বন্ধি আমি জয় যা বন্দনা,
যোমপড়ী যোমবেশ পলায় মৃত্যুবালা,
উভয়েতে বন্ধি আমি জয় কালিঘাটা,

পূর্ববেতে বন্ধি আছি জয় সূৰ্য্যচন্দ্র,
ডায়েনরে বন্ধি আছি জয় মা ভদ্রাণী,
নাচাশপগড়ে বন্ধি আছি জয় মা ব্রজাণী।
বন্ধনা বন্ধনা হুই যা—।

প্রার্থনা-গীত

[গণেশ-বন্ধনা]

কিবা বন্ধিতে পানি—অজ্ঞান হে, নম নম গণেশ বন্ধি।
সর্ব দেবতা অঙ্গে পূজা উত্ত ভূধর
তৃপা করি আসবর হে গণেশ্বর,
হু অতে মূৰ্ছজন, কি বন্ধিবা তব চরণ
ভবিষ্য পঙ্কনাথ বতন বতন বতন হে
নম নম গণেশ বন্ধি।

চাষি বাঘ শোভা দিবা হচ্ছে শৈত্য
অন্ধকূলে অন্ধকূ শোভা বিশে ঘাঘাশি।
ঠুয় বদন তোর কি কিবা পাঠ্যস্বর
অঙ্গে বিশে ছুর হু দিপথে ছুর বতন বতন হে
নম নম গণেশ বন্ধি।

বন্ধকে চুড়া ছুর বন্ধনামের আকার।
ভনি পঙ্কনাথ হে নম নম গণেশ বন্ধি।

বারমাসি গান

১। লগিতার বারমাসি : বিধবস্তু শবরের কজা লগিতা
বনের ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। পিতার আছে নীলবাথন—
জাগ্রত বেবতা। সেই দেবতাকে ছলে নেবার অস্ত পুরীর
হাফা ইজ্জতের প্রধানমন্ত্রী বিভাগপতি এলেন। লগিতার
সঙ্গে প্রায় করে সোপনে নীলবাথনের হস্তিবে হাবার পথ
জানলেন। কিছুদিন পরে সম্বন্ধ বুকে বিভাগপতি নিজের
বাড়ি চললেন—বনের ঘাটে বনেই থাকল—বিরাহের অঙ্গার
চোখের জলে তার দিবস-নিশি কাটে—

হায়েতে হাথবী কলম মধুনাথ গমন গো
সখি মধুরায় গমন—
দশদিকে অন্ধকার আরো বিধে বন গো লগিতে—
কে হরিয়া নিল ঘোড়ের প্রাণনাথে গো লগিতে।

ফাঙনে বিভগ হুগ চিত্তে উঠে রোল,
মোদকে গোবিন্দ নাই কে লজ্জাবে কোস গো,
গো লগিতে—
কে হরিয়া নিল ঘোড়ের প্রাণনাথে গো লগিতে।

চৈতে চাককী পাখি নিম্ন-বন্ধিবে,
কুহ কুহ রব করে, পদাণ বিনের গো লগিতে—
কে হরিয়া নিল ঘোড়ের প্রাণনাথে গো লগিতে।

দৈশাথে বোনের ভাগ অগ্নি পুড়ে যায়
তা হতে অধিক ভাগ কাহ্ন ছেড়ে যায় গো লগিতে—
কে হরিয়া নিল ঘোড়ের প্রাণনাথে গো লগিতে।

জ্যোত্রেতে যদুনার জলে বেলাত বনমালী,
ফাঘ অগ্নি দিত কল অজগি অজগি গো লগিতে—
কে হরিয়া নিল ঘোড়ের প্রাণনাথে গো লগিতে।

আবাফে নুতন মেঘ করয়ে গর্জন,
দিনে দিনে বয়ে বয়ে শেলব বৌবন গো লগিতে—
কে হরিয়া নিল ঘোড়ের প্রাণনাথে গো লগিতে।

পদ্যবনে ঘন বহিরা না শুকাল চুল,
আমি নারী বিরহিণী হুইছি আবুল গো লগিতে—
কে হরিয়া নিল ঘোড়ের প্রাণনাথে গো লগিতে।

ভাঘরেতে ভর। নবী হুসল পাখার,
আমি নারী বিরহিণী না জানি পাতার গো লগিতে—
কে হরিয়া নিল ঘোড়ের প্রাণনাথে গো লগিতে।

আখিনে অধিক-পূজা সর্বদেব হুপি,
যার ঘরে কাহ্ন নাই কাহ্নছে বিবানি গো লগিতে—
কে হরিয়া নিল ঘোড়ের প্রাণনাথে গো লগিতে।

কাঠিকে কানিয়া দমন করেছিল হরি,
হুটল চম্পকতা, কি জ্বলন্ত মাধুরী গো লগিতে—
কে হরিয়া নিল ঘোড়ের প্রাণনাথে গো লগিতে।

মাইসরে হিমের জন্ম তহু কাশে শীতে,
দমন-শয্যা ডিম্বের বাহ কাঠিতে কাঠিতে গো লগিতে—
কে হরিয়া নিল ঘোড়ের প্রাণনাথে গো লগিতে।

পৌষে পাঠ্যলোম পত্র পকানকের বাড়ি,
পৌষ গেলে মাঘ আসবে, আসবে গুণমণি গো লগিতে—
কে হরিয়া নিল ঘোড়ের প্রাণনাথে গো লগিতে।

—হুয়ত কোনো এক পক্ষ:নক এই গানের শেষক।

২। হাঘের বারমাসি : হামাঘশের হামচন্দ্রের
বনবালের কাহিনী। হাম, সীতা ও লক্ষ্মণ পক্ষবতী বনে
কি ভাবে দিন কাটিয়েছেন, এ হ'ল তার ছবি :

সতে পঁচে সখি মিলে বসিয়া নিরলে
ও রাম বসিয়া নিরলে—
এক শীতল হুংখের কথা কহেন ধীরে ধীরে ।

প্রথম চৈতন্তে রাম কাননে প্রবেশ,
ও রাম কাননে প্রবেশ—
শিরে জটা ধরেন রাম সন্ন্যাসীর বেশ ।
গাছের কুল গাছের ফল আনিলা লক্ষণ,
সে ফল হইতে রাম করিলা বর্জন ।

আটলা বৈশাখ মাস অলঙ্ক অনল—
ও রাম অলঙ্ক অনল—
চলে বাইতে পুড়ে রামের চরণ-কমল
আচ্ছাদন দিতে রামের মস্তক-উপরে ।

কোঠাতে বডেক হুংখ পাউল্য কাননে,
আগো সেই হুংখের কথা সনে মন্তক-পর্যাণে ।

আটলা আষাঢ় মাস বহিষার সময়,
ও রাম বহিষার সময়—
ব্যস্ত-ব্যস্তী হুলে বাঁধবী লক্ষণ ।
দগনে বরষে জল—বরষে জলধর,
ভিজিতে ভিজিতে রাম বার তরুতল ।

পরাবনে শাও গো লক্ষণ বাঁধিতে কুটির,
ও রাম বাঁধিতে কুটির—
রামসীতা কুটির ভিতর, লক্ষণ বাহির ।
লক্ষণের হুংখ দেখি খিক গ্রাণ কাটে—
ও রাম খিক গ্রাণ কাটে ।
ধীরে ধীরে উঠে রাম গহন কাননে, গহন কাননে ।

ভানবে ছপন-জালা সইতে নাহি ঘরে,
ও রাম সইতে নাহি ঘরে—
হালল কঠোর পাশা—রক্ত বহে ধীরে
আচ্ছাদন দিতে রামের মস্তক-উপরে ।

আখিনে অধিকা-পূজা এ তিন ভুবনে,
ও রাম এ তিন ভুবনে,—
বন্ধি-সেবা করেন রাম গহন কাননে,
একটিতে পুঙ্খেন রাম আতপ-চাল ফলা,
একটিতে পুঙ্খেন রাম স্বর্ধৎ-বালা ।

কার্তিকে কুটির ছাড়ি যান অস্ত্র বনে,
ও রাম যান অস্ত্র বনে—

দারাদিনে বেধা নাই কলঙ্গের সনে ।
দারাদিনের পর কল মিলে দুই-চারি—
আগো রামসীতা ফল খায়, না খায় লক্ষণ,
সেদিন হইতে রম্মধনি রইলেন উপবাসে ।

আইল আশ্রাণ দাদ বাঁধিরে আপন,
ও রাম বাঁধিরে আপন—
নতুন অর খেতে প্রভুর সাধ গেল ঘন ।

গৌণে প্রলয় শীত দনাথ হতাপ,
আগো দিবাগর হইতে এবার আইলা ব্যতাপ ;
কানী বাবো, গর্য বাবো আর বাবো বৃন্দাবন,
আগো বাবো বৃন্দাবন,
সকল তীর্থের ফল হারয়ে ছুলনী ।

দাঘের মকর-বাড়া পক্ষীর তিথি,
ও রাম পক্ষীর তিথি—
একটিতে পুঙ্খেন রাম বেবী সরবতী ।

কাঙনে হুংখের কথা সইতে নাহি ঘরে,
ও রাম সইতে নাহি ঘরে—
আগো সীতাকীর্তি বাহমান্তা কইন বা কাহায়ে ॥

৩। শীতল বারবাদি : লক্ষ্য রাক্ষা রাখণ সীতাকে
ছরণ করে নিয়ে গেছেন । সীতা অশোকবনে আছেন—
রামের কথা ভাবছেন—অনর্গল কানছেন—

মাঘ মাসে বেন কুশাসন চিরে,
কুটিল মাধবী বসন্ত ঘিরে গো বসন্ত ঘিরে ।
গ্রাণ কাণে বেন না মানে চিত্তর—
একাকিনী ঘোরা রহিব কত ।
অশোকের বনে কত কাণ সীতা
ঐরাম বিনে গো ঐরাম বিনে ॥

কালুগন মাসে ডাকে কুইলি,
হার রাম জয় রাম ঐরাম বসি গো ঐরাম বসি ।
ঐরাম বসে আছি গো পড়ে
এই ছিল দুর্দশা আমার কপালে ।
অশোকের বনে কত কাণ সীতা
ঐরাম বিনে গো ঐরাম বিনে ॥

চৈত্রকো মাসে চাতক পাখি,
আতঙ্ক হয়েছে চলনা দেখি ।

জন্মিয়া জাহান কেননা মরল
ডাবিতে ডাবিতে পরাণ গেল গো পরাণ গেল ।
অশোকের বনে কত কাঁদ সীতা
ঐশ্য বিনে গো ঐশ্য বিনে ॥

বৈশাখ মাসে উঠিলো তাল
জানকীর তু' না বাঁচে ছয় ।
হেঁচি মিরে অধে গয়েছে ঘাষ
ঘোর প্রাণনাথ ঐয়ে হিম ।
অশোকের বনে কত কাঁদ সীতা
ঐশ্য বিনে গো ঐশ্য বিনে ॥

কৈঠক মাসে গ্রীষ্মকো কালে,
আম কি পনস পাকিলো ডালে ।
আম কি পনস সরিলা আমি
কবে ধেবেন, প্রভু ধাইবেন বসি গো বাইবেন বসি ।
অশোকের বনে কত কাঁদ সীতা
ঐশ্য বিনে গো ঐশ্য বিনে ॥

আষাঢ় মাসে লইতন বেথে
কাহিনীর ঘন আবাস স্বাক্ষকে আগো ।
নবদল খেবে বেঁধিয়া নয়নে
ঐশ্যলক্ষণে হইল যনে গো—হইল যনে ।
অশোকের বনে কত কাঁদ সীতা
ঐশ্য বিনে গো ঐশ্য বিনে ॥

শ্রাবণ মাসে সগিতাধারা
ঘন ঘন বৃষ্টি নাইক বরা ।
আমার প্রতি নাথ হয়েছেন হারা
সোনাবি শরীর জীয়েছে ধরা গো—জীয়েছে ধরা ।
অশোকের বনে কত কাঁদ সীতা
ঐশ্য বিনে গো ঐশ্য বিনে ॥

ভাদ্র মাসে পাকিলো তাল
ঘোর প্রাণনাথে ঘটনা কল ।
ঘোর প্রাণনাথ থাকিতেন ঘরে—
নানা কল দিভেন হুবর্ণ-মাসে গো হুবর্ণ-মাসে ।
অশোকের বনে কত কাঁদ সীতা
ঐশ্য বিনে গো ঐশ্য বিনে ॥

আশ্বিন মাসে অইবী তিথি
সাগর বেঁধে রাম পূজেন পার্বতী ।

রাবণ বধে রাম হয়েছেন গজা,
দিভীয়ে রাম করিবেন রাজা গো—করিবেন রাজা ।
অশোকের বনে কত কাঁদ সীতা
ঐশ্য বিনে গো ঐশ্য বিনে ॥

কর্তিক মাসে দুমধুনি বাজে,
রাম-প্রবণের সংগ্রাম সাজে গো—সংগ্রাম সাজে ।
কাতরে পড়িল বিক্রম দাস,
সীতার পূর্ব হ'ল এই দশমাস ।
অশোকের বনে কত কাঁদ সীতা
ঐশ্য বিনে গো ঐশ্য বিনে ॥

৪। মধুর বারমাসি : মধুরাতে ঐক্ককের সখি থেকে
গেছে । ঐক্কক মধুরা ছেড়ে বৃন্দাবনে গেছেন । বিরহিণী
ঐক্ককের প্রতীকার—

নাথ আমারে ছেড়ে হইল গিরে দেশান্তরে,
বৈশাখে বসন্ত-জ্বালা, ছেড়ে গেল ডিবনকাল
আমরা নারী হই অবলা,
কেমন করে হইব ঘরে ;
নাথ আমারে ছেড়ে হইল গিরে দেশান্তরে ।

কৈঠকেতে যদুনার কলে, ডেকেছিল রাখা ব'লে,
শাড়ীর না আঁচল ধবে,
কতই না ঠান্ডাত ঘোরে ;
নাথ আমারে ছেড়ে হইল গিরে দেশান্তরে ।

আষাঢ়ে হুকুল কল, পর ভাসে টলটল,
হত যদি গাছের কল,
অতানি আমত ঘরে ;
নাথ আমারে ছেড়ে হইল গিরে দেশান্তরে ।

শ্রাবণে হয় বরিকা, রাম-চাড়া হলেন সীতা,
আমার বাকী কে বা ছিল,
আমার পতি নিল হরে ;
নাথ আমারে ছেড়ে হইল গিরে দেশান্তরে ।

ভাদ্রে জাবি কিমানি নিয়নের নীবে ডানি,
আমি নারী হই দশনী,
কেমন করে হইব ঘরে ;
নাথ আমারে ছেড়ে হইল গিরে দেশান্তরে ।

আমি অনেক মাগে বহু হইল পরবাসে,
আমি নারী হই অবলা,
কেনমন করে রইব ঘরে ;
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিরে দেশান্তরে ।

অম্মাণেতে নতুন ধান, ঘরে ঘোচাবে ধান ;
কাল বেঁধেছি রত্নির ধান
যজ্ঞ রত্না ধারণ করে ;
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিরে দেশান্তরে ।

পৌষে পরব স্থনী, বহু হলেন পরবানী,
আমার বাপী কে বা ছিল,
আমার পতি নিল হরে ;
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিরে দেশান্তরে ।

মাঘেতে দান-বসন্ত দুর্গাইল মনে আন্ত,
আমার কান্ত এলনা ঘরে ;
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিরে দেশান্তরে ।

ফাল্গুনে কাঙরঃ খেলি ডেকেছিল রাধা বলি,
বাট-পালক ত্যজ করি
কার পতিকে আনবে ঘরে ;
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিরে দেশান্তরে ।

চৈত্রিতে চক-বান্দা, দুর্গাইল মনের আন্ত,
আমার কান্ত এলনা ঘরে ;
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিরে দেশান্তরে ।

৪। একটী বিকৃত স্তাম্বা-সংকীত । এটি চাতল নিয়ে
বারমাসি গানের স্রবে গাইবার চেষ্টা করা হয়েছে—

স্তাম্বা তোয় চরণে কে দিল রে ফুল,
রক্তস্রবা সারি সারি পায়েতে নুপুর ।
আতশ-চাল ফুলসী দিয়ে
তারে ধূপধূনা দিয়ে
কীজা হুখে করি মাঘের সেবা গো—
বলু মা স্তাম্বা কেবা দিল তোরে ফুল ।

ফাক ডাকে ক-ক বেতাল বেহলার মা
বেহলার কি হবে উপায় গো ।

বলু মা স্তাম্বা কেবা দিল তোরে ফুল ।
ছোট গাছের ছোট ফল, বড় গাছের বড় ফল,

বেল গাছে ধবে শুধু বেল গো—
বলু মা স্তাম্বা কেবা দিল তোরে ফুল ।

এ ছাড়া বন্ধন-পরবে বহু গান আছে। কেবলমাত্র
কয়েকটি গান দেওয়া হল—

জাগনি-এর গান

[১]

ভাই রে কাগে মা লক্ষ্মী, জাগে মা ভগবতী
আর জাগে অমাবস্তার রাতি—
আর জাগে গো প্রতিশব দেবদারিনী
পাঁচপুতার চন্দ্রখেলয় গাই ।
ভাই রে, এক আপিসে বাবা ধনে-বংশে বাড়বে,
আর আপিসে মশ ভাই—
তোরেই জন্তে বাবা অতি না ভাগ্য রে
জনমে জনমে হুখে ভাতে রই ।

[২]

এত্র-উত্তরের মাধ্যমে গানটি । কৃষির কথা, হুখ-গুঃখের
কথা বলা হচ্ছে ।

এর :

কোনহ ফুলে মালীন্ অড়ন শিখন রে—
কোনহ ফুলে ডক্ষণ ।
কোনহ ফুলে মালীন্ খোপায়া চিকন রে—
কোনহ ফুলে রাখিল সংসার ।

উত্তর :

কাপাস-ফুলে মালীন্ অড়ন শিখন রে—
ধানের ফুলের ডক্ষণ ।
তিল-সরিষার ফুলে খোপায়া চিকন রে—
সিন্দুর-ফুলে রাখিল সংসার ।

ফুলমাসানের মালী এখানে জবাব দিয়েছে। কাপাস-
ফুলে কাশড়-চোপড় হয়, ধানের ফুলের ডক্ষণ অর্থাৎ ধান
খাণ্ডা হয়, আর তিল-সরিষা হল তৈলবীজ—তাতে তেল
হয় এবং সিন্দুর-ফুলে মানে স্ত্রীলোকের স্বামী, স্বামী বেঁচে
থাকলে সংসার উজ্জ্বল হয় ।

নাচন-এর গান

ভাই রে, কোনহি ফুলরে কোনহি চাঁচরে
কোনহি কার্টে করি ঠককা,

আর অক্ষণ বনে খিড়ি উল্লস লতা গো
নবধনে বাঁধিব জোত।
সেই না জোতে বাঁধিব কপিলাস-পুতে—
রাখি দেব ব্যাগাশেরি নাম।

এইদিন গল্পকে নাচানো হয় ঢাক-ঢোল-মোল বাদ্যি-
পুঞ্জের পরিধি। ঈরকা হ'ল কাঠের ঘটা, গল্পের গদ্য-
ব্যংগে। আর জোত মানে হুড়ি। কপিলাস-পুত মানে
গাই-বাছুর; বাগাল মানে বাগাল। অর্থাৎ কে এমন
অন্ধর হুড়ি তৈরি করে গাই-বাছুর বেঁধেছে?

এখনকার অনেক গান আছে। তবে এইসব গান
পার্বত্যতা মহাতো, কোড়া প্রকৃতি সজ্জাদায়ের বিকট হতে
পেখা, কেননা এ পর্বটি গো-কেন্দ্রিক এবং কৃষি-কেন্দ্রিক।

পর্বালোচনা: এই সেল ঘোঁটামুটি লোখাবের করেকটি
গান। প্রার্থনা বা বন্ধনা গানে এদের বকীয়াতা বেশী
নজরে পড়ে। তাদের সাংস্কৃতিকে জাগরুক দেব-দেবী,
ভূত-প্রেত-আসিদ্ধ, অগ্নিগণের প্রভাবশালী স্থানীয়
দেব-দেবী চারিত্রিক ত্বর্ধনীয়তার অঙ্গন হয়ে আছে, আর
এই অঙ্গ এত ঘটা করে পূজা-পর্ব-ভাঁড়ের অভিধকে
বীকায় সবার এ বেন এক বাতাবিক পহা।

বারমাসি গান বাগোঁজাবার এক সম্পদ। কেবল

'সোণা' এই অত্যাশ-জাতির মধ্যে এ প্রচলিত নয়,
বরং সাধারণিক বর্ণাশ্রম হুপ্রতিষ্ঠিত। পঞ্চদশ হ'তে সপ্তদশ
শতাব্দীর মধ্যে বৃহত্তর বাগোঁজ এই গানের প্রসার
হয়েছিল। বৃষ্টি-বা এ গানের কবি এই সজ্জাদায়ের লোক।
হুত অরণ্যচাটী লোণা-শব্দগণ ঐ সময় বাতালীনের
খুব সারিঘো আসে—বিশাল হিন্দুধর্মের মধ্যে নিকোলের
প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত। নানা রাজনৈতিক অবস্থার কথা
আলোচনা করলে লোখাবের হুর্দল হুওয়ার নজির মিলে
—হুত নিজ-সত্তা (integrity) হারিয়ে বাতালী-
হিন্দু (?) হবার এক তীব্র প্রেরণা আসে। বার পরিণাম
এই সংস্কৃতির সেন-সেন। এরই মাঝে তাদের বিদ্যমান
সমাজের সাংস্কৃতিক নিশানাগুলি (cultural traits)
একবারে মুছে যায়নি। তাই আদিবাসী-জীবনধারার
মধ্যেও দেখি বাংলা গানের এত মধুরতা।

নিছক চিত্র-বিনোদনের তালিগে যে সংগীত হুটি
হয়েছে তা নয়। এক সফলতার ইশিত নিয়ে পূর্ণতালাভের
আশায় মানুষের ঐক্সজালিক মন সংগীত-রচনা-য় হুত প্রমুদ
হয়েছে। অর্থনৈতিক পরিবেশের মাঝে প্রয়োজনের
তারতম্যে সংগীতের ধরনও বিভিন্ন হয়েছে। তাই
সংগীতের মাঝে দেখি এক সাংস্কৃতিক নিশানা—পরিবেশের
তাগিদের এক হুর্দ ছবি, মৃত্যু ও হুয়ের মধুর অংকার।



দিন বেঙ্গল ডেকরেটর
২২০-চিপুরঞ্জন এভিনিউ • কলিকাতা-৬



জগন্নাথের রথ ঐনুনীগোপাল গোস্বামী

অবতীর রাজা ইন্দ্রহায়। স্বর্গবাণজাত, ব্রহ্মার অংকন
পঙ্কমপুঙ্খ নামে খ্যাত এই নরপতি ছিলেন পরম বিকৃতকৃত।

সেদিন চলছে পূজার্নমা—পুৰোহিত মন্দিরে পূজায় রত,
মৈবজ্ঞ, ষোড়শগণ সব সমাগত। পূজা হ'ল শেষ, রাজা
ভক্তিপদগলকণ্ঠে সমবেত সকলকে কৃতান্তলিপুটে বিভ্রাস
করলেন—“জ্ঞানেন, কোথায় সেই উত্তম ক্ষেত্র, যেখানে সাক্ষাৎ
জগন্নাথসেবকে এই চর্যচন্দ্রাধারা সর্পন করা যায়?”

উত্তর দিলেন বহুতীর্থগামী ষড়লি নামে এক তপস্বী—
“মহারাজ, ভারতের বিখ্যাত গুরুসেনে সন্ধিন লম্বুদের তীরে
ঐশুকযোন্তম নামে উত্তম ক্ষেত্র।” কিন্তু উত্তর দিয়েই তিনি
হলেন অন্তর্হিত।

রাজা ভাবলেন—তাই তো, এই পুষ্কযোন্তম ক্ষেত্রই তো
বঙ্গবাসীর উপযুক্ত ঠাই। কিন্তু কে পারবে সেই ক্ষেত্রের
সন্ধান দিত? দ্বির হ'ল পুৰোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভাগতি
নেবেন এই কাজের ভার।

বিভাগতি বেরোলেন বাড়ি থেকে। অনেকদিন গেল,
অনেক বেশ ঘুরলেন তিনি, শেষপর্যন্ত এসে পৌঁছালেন সেই
গুরুসেনে। কিন্তু একেবারে কোথায় কি আছে, কিছুই তো
ভায় জানা নেই। ভগবানের নাম করতে করতে পামনের
পথে তিনি এগিয়ে চললেন, আর খানিকদূর গিয়েই সেখান
ঝীলাচল পর্বত। উঠলেন তিনি পাহাড়ের ওপর; কিন্তু কই,
কোথায় তো কিছু দেখা যায় না। মন পড়লো ভেঙে।

কিন্তু একটা মুহূর্ত মাত্র। সীমাহ বঁাধা সেই মুহূর্তে নে
অশীম বলে মনে হয়। তত্ক্ষাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন বিভাগতি।
মনে হয়, তাঁর অন্তরের বাসনা যেন এক নবতম রূপে বেধা
মিরেছে। জগৎকর্ণনের যে কামনা নিয়ে এতদিন ছিলেন তিনি
হৃদয় তপস্রায় নিমগ্ন, অন্তরের অন্তরতম গুহায় প্রাণের যে
রহস্যময় সেবতাকে তিনি কখনও পড়েছেন, কখনও ভেঙেছেন
—সেই পরাণ-সেবতা আর ধরা দিয়েছে কোনো সীমাবদ্ধ
থানে নয়, নিখিল বিধে! কিন্তু মুহূর্ত...মুহূর্তই মাত্র।

জেগে ওঠেন বিভাগতি। দ্রুত উন্নতি পদক্ষেপে আবার
ওঠেন পাহাড়ে, লহসা শোনে লোকজনের কলকোলানল,
আনন্দে উৎসাহ হয়ে ওঠে তাঁর হৃদয়।

ছুটে চলেন বিভাগতি সেই পথ লক্ষ্য করে, আর সাক্ষ্যসেই
মেঘেন এক কলি—পবনবধের বাসস্থান।

বৃদ্ধ শবরপতি। নাম তার বিবাহবহ। শরমাদরে
গ্রহণ করলো বিভাগতিকে। বিভাগতিও বিবাহবহকে পেয়ে
হেন আকাংক্ষার চাঁদ হাতে পেলেন।

সব কথা বলে বললেন বিভাগতি। শবরপতি শুনে,
সব শুনে শব্দীর চিন্তায় নিমগ্ন হ'ল। এতদিন সে লোকহৃৎ
ভেঙেছে যে, তাদের বেশে আসবেন এক রাজা—নাম তাঁর
ইন্দ্রহায়, আর তিনিই প্রকাশ করবেন ঐশ্বর্যগাথাসেবের

সেবা। বিবাহস্থ তো তা বিধান করিনি। কিন্তু সেই জনপন্ডিতই যে আর সত্য হ'তে চলেছে? যে ঠাহুরকে সে প্রাণের অধিক ভালবেলে এতদিন মননভাবে সেবা করে এসেছে, আজ কি সত্য-সত্যই ভাঙে হারাতে হবে!

কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা রোধ করবে কে? বিজ্ঞপতিকে সে বললো—“স্থিরবর! আপনি স্থির হয়ে আপন গ্রন্থ ককন। আপনি আমার অতিথি। আগে আপনার সেবা করা আমার কর্তব্য। কেননা আপনিও আমার ভগবান।”

রাণী হ'লেন না বিজ্ঞপতি। তিনি বললেন—“ভগবানের সাক্ষাৎ-দর্শন না পেলে আমি মল গ্রন্থ ককবোনা, এই আমার প্রতিজ্ঞা।”

বিবাহস্থ আর কি করবে, নিয়ে চললো বিজ্ঞপতির হাতে ধরে পাহাড়ের ওপর—এক সর্বীপ পথ ধরে।

বিজ্ঞপতি উঠলেন পাহাড়ে। দেখেন এক হুণ্ড সেখানে। নাব তার চৌধি। তারই পূর্বাঙ্গণে তিনি বৈশাখ পেলেন এক মহৎ অক্ষর বটবৃক্ষ। আর এই দুইয়ের মধ্যে নিহুতর অজস্রের তিনি দর্শন পেলেন সাক্ষাৎ নীলমাদব ত্রিঈশ্বরপ্রাণ-দেবকে।

সেখেন কেন তাঁর আর ভক্তি হয়না! সাধাবিন গেল এই ভাবে। সত্য:এল। বিবাহবহুর ভাকে তাঁর চরক ডাঙলো। ধীরে ধীরে বিবাহবহুর সঙ্গে নাথলেন তিনি পাহাড়ের নীচে। সেই রাতে বিবাহবহুর আতিথ্য গ্রহণ করে হরিগুণগানে কাটিয়ে মিলেন। তার পর ফিরলেন আরো।

বিজ্ঞপতি দেশে ফিরে ইন্দ্রহাের কাছে সব কথা নিবেদন করলেন। ইন্দ্রহা ভাবলেন—আর কি,—সন্ধান বধন পাওয়া গেছে তখন সেই উত্তর ক্ষেত্রে বাল করাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ। ভালো দিন সেখেন তিনি তৈরি হলেন যাত্রার যন্ত্র। এখন সবই সেখানে এসে উপস্থিত হলেন মহাি রাহণ।

নাথ ভললেন সব কথা। তখন তিনিও ইন্দ্রহাের সঙ্গে যাত্রা করলেন।

ইন্দ্রহা এসেন পুরোষোত্তম ক্ষেত্রে। কিন্তু নীলমাদব তখন আর দরলোকে নেই, স্বর্গবালুকা আরুত হ'বে পাভাল-মন্দিরে গমন করেছেন। ইন্দ্রহাের তখন বা অবস্থা তা আর ভাবার বর্ণনা করা যায় না। তিনি চৈতন্যশূন্য হয়ে মাটিতে দৃষ্টি পড়লেন।

অনেক চেষ্টার রাজার জানি কিরলো। এই সময় আশলশাশী হল—“মহারাজ, তুমি চিন্তা কোরোনা, আমি শিই তোবার দলপনপে গমন করবো।”

রাজা কিছু আশ্বত হলেন বটে, কিন্তু স্মৃ তাঁর মন

যােনো। এই সময় দলো আর একটি ঘটনা। সোচরন এসে ধর মিল—“মহারাজ, বদামসুত্রের কুল একটি মহাবৃক্ষ দুই হয়েছে, এর অগ্রভাগ আছে স্মুত্রের মধ্যে নিমজ্জিত আর এর মূলদেশ জলকলোলে নাথিত হয়ে ভাসতে ভাসতে এসে বেগেছে একেবারে আমাদের হান-গৃহের সন্ধে।”

নাথর বললেন—“মহারাজ, আপনার কপাল ভলো। আপনি আগে যে শেতবীপবাসী অবাধ বিশ্বনুতি বিকুকে দর্শন করেছেন, তাইই অকস্মাতুত রোম অসিত হয়ে তরুতপী হয়েছেন।”

এই সময় সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন শত্রহতে এক বৃক্ষ পুরুষ। সঙ্গে-সঙ্গেই হ'ল আকাশবাশী—“ভগবান শ্বঃ বীর প্রভিমূর্তির বিধ্ব বিচার করতঃ গুপ্ত মহাবেলীতে অবতীর্ণ হ'লেন। তোমরা পক্ষণ সিংস বেলীগৃহ উত্তমভাণে আচ্ছাদিত করে রাখো। আর ঐ-বে শত্রহতে বৃক্ষ পুরুষ, তাঁকে ঘরের মধ্যে গ্রবেশ করতে দিয়ে ঘর রক্ত করো।”

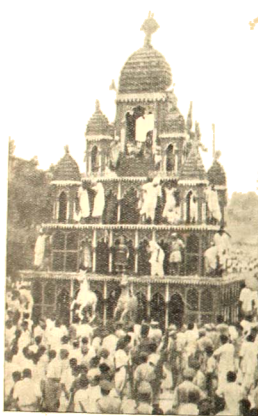
সেনিন থেকে তাই ভগবান দ্বাক্ষরমূর্তি পরিগ্রহ করে অধির্ভূত হলেন র্তৃপাথে—ঈশ্বরকৃপাত্মম ক্ষেত্রে। প্রতিভেত আছে, এই দাক্ষ-রক্তকে উপাধনা করলে আশ্বজানিবোহিত বাস্তবও মুক্তি হয়।

ইন্দ্রহা দাক্ষর বিগ্রহ তৈরি করালেন, দ্বানির তৈরি করালেন। দাক্ষর ভগবান ইন্দ্রহাের বদাম-প্রসঙ্গে রথযাত্রাি বিবিধ উৎসবের কথাও জ্ঞাপন করলেন। সেদিন থেকে তাই রথযাত্রার প্রচলন।

সে ধারা আজও বয়ে চলেছে। দ্বানশমাসে বিকুর দ্বানশযাত্রার মধ্যে রথযাত্রাও একটি। কারেই রথযাত্রা আর্ষজাতির প্রাচীনতম ধর্মোৎসবের অন্ততম উৎসব।

কিন্তু পাকাত্য পণ্ডিতগণ তা বীকার করলেন না। মনিয়র উইলিয়ম্‌ল, কানিংহাম, কারভলন, হপকিন্স, হাটার প্রভৃতি পাকাত্য পণ্ডিত এবং তরীরা রাশেজ্জাল মিত্রের হতে বুদ্ধসেবের সময় থেকেই এংগে রথযাত্রার প্রচলন। বুদ্ধসেবের জয়োৎসব উপলক্ষে বৌদ্ধসাধারণ যে রথযাত্রার প্রবর্তন করেন, তা থেকেই ভারতীয় রথযাত্রার উৎপত্তি।

ব্রহ্ম, নায়ক, কূর্প, পদ, ভবিষ্য, ব্রহ্ম প্রভৃতি পুরাণ এবং কপিল-সংহিতা, বিকুরহস্ত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে জগদ্বাংসেবের উল্লেখ আছে। পুরাণের অনেক অংশ গ্রন্থিত বলে ধরে নিলেও, যে-সব অংশে জগদ্বাংসেবের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে তা যে গ্রন্থিত নয়, তা পুরাণবিত্ত পণ্ডিতগণের মতে, নিবেদিতঃ ব্রহ্ম-পুরাণের ‘উৎকলগণ’ নামে যে গ্রন্থ ইন্দ্রহা-রাজার উপাখ্যান বিবরণভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা অতি প্রাচীন গ্রন্থ।



গঙ্গা-মেলায় মাথের (ঐরাবত) রথ

[ছবি : বোনা তৌলী]

পুরাণের দুগ ও বৌদ্ধদুগের আসনে বসেই ধরা হয়। কাজেই বুদ্ধদেবের জন্মদিনে বে-রথযাত্রার উৎসব করা হ'ত, তা থেকেই যে বর্তমান রথযাত্রার উৎপত্তি, তা স্বীকার করবার কোনো সম্ভব কারণ নেই।

অন্য বৌদ্ধদুগ ও বে-রথযাত্রার প্রচলন ছিল এবং রথ বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত করে যে উৎসব করা হ'ত, তা ফা-হিয়ানের বিবরণ থেকেই জানা যায়। তাই ব'লে রথযাত্রার প্রচলন যে বৌদ্ধদুগেরই নষ্ট, তা হলে ভুলবার কোনো কারণ নেই। শুধু বৌদ্ধদের কথাই বা বলি কেন, একসময়ে ভারতে দৌর, শাক, বৈশ্ব, মৈন প্রভৃতি সকলেরই উৎসব-বিশেষ

রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হ'ত। কৃষি ও ভবিষ্য পুরাণে ভাঙ্গ-মাসে যথেষ্ট রথযাত্রা, মন্ত্র ও একত্র পুরাণে চৈত্র-মাসে শিবের রথযাত্রা, জৈমিন্যেরে মার্গশীর্ষে চাতুর্মাস্তের শিব পার্বনাথ ও মহাবীরের রথযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়। ইউরোপেও রথযাত্রার প্রচলন আছে। আমেরিকাতে মিসিসিপি নদীতে রথযাত্রার অনুষ্ঠান হয়। এই সম্বন্ধে Madame Henrietta Caraciolo-র গ্রন্থে (*Memoirs of Henrietta Caraciolo*, p. 21) বিস্তারিত আলোচনা আছে। কাজেই বুদ্ধদেবের জন্মদিনের উৎসব উপলক্ষে রথযাত্রার উৎপত্তি বলে যে মতবাদ, তার দুলে কোনো সত্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

পূর্ণ ও ভবিষ্য পুরাণের মতে কাক্তিকমাসে আরও একটি রথযাত্রার বিধি আছে। চাতুর্মাস্তের শেষে 'উষান'-এর পর কাক্তিকী শুক্লা-ষাটমীর রাত্রে বিজুকে রথ স্থাপন করে উৎসব করতে হয়। 'জবিয়োক্ত্য'-এর মতে পূর্বকালে প্রজ্ঞাপ প্রথমে এই রথযাত্রার উৎসব করেন। বর্তমানে এ উৎসবের প্রচলন বৈষ্ণবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, আর

“মহাভারত সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুতান-বুতা।

ভক্তাঃ রথৈ সমারোপ্য রামঃ বাঃ ভুত্বা নহঃ”

অর্থাৎ ঈশ্বরগম্যাবসের রথযাত্রার অনুষ্ঠানই সর্বত্র সমলিক। এই উৎসব সমগ্র হিন্দুর জাতীয় উৎসব।

এই উৎসবের প্রবর্তক মহারাষ্ট্র ইন্দ্রজয় রথ তৈরি করেন তিনবানি। একবানি জগন্নাথের, দ্বিতীযবানি বলরামের এবং তৃতীযবানি হুতহার। সবচেয়ে বড় ১৬ চাকার রথবানি জগন্নাথের, দ্বিতীয় ১৫ চাকার রথবানি বলরামের এবং তৃতীয় ১২ চাকার রথবানি হুতহার। তিনবানি মধ্যে তিনটি পৃথক পৃথক চিহ্ন। জগন্নাথের রথ গজকুম্ব-চিহ্নিত, বলরামের রথ তাল-

পত্র বা লাঙ্গল-চিহ্নিত, আর হুতহার রথের চিহ্ন গজকুম্ব। প্রীতকরে এই নিয়ম আমল পালন করা হয়।

উৎসবের দিন বিগ্রহস্বরকে রথ ভুলে বাঁধা করানো হয়। এই বাঁধা-উৎসবকে অনেকে 'পা-বিজয়' বলে অভিহিত করেন। এই মতের দ্বারা সন্দেহ তাঁরা বলেন যে, অসৌক্য কর্তৃক কলিঙ্গ-বিজয়ের পর প্রীতকরে বৌদ্ধধর্মের প্রাকল্য দেখা দায়, আর ঈশটপূর্ব দ্বিতীয় শতকে মহাভান-জ্ঞান নাগার্জুন সমগ্র উৎকলদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন করেন। ফলে জগন্নাথের মূর্তিরও বধাক্রমে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ নাম ধারণ করে এবং এই বুদ্ধজয় জগন্নাথের রথোৎসব করা হয় বুদ্ধ-পূর্ণিমা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে এইভাবে। তার পর তৃতীয় ঈশ্টাশে হিন্দুগণা পাণ্ডু কর্তৃক খ্রীস্টের পুনরায় হিন্দুধর্ম প্রবর্তিত হয়। সেদিন থেকে আবার আরম্ভ হয় হিন্দু-বিদ্যোদ্যমের রথযাত্রার উৎসব। এইষষ্ঠ অগ্নিপ্রাণসেবের যাত্রা-উৎসবকে পাণ্ডু-বিদ্যের নামে অভিহিত করা হয়।

কিন্তু একথা যুক্তিসঙ্গত নয়। বিগ্রহরথ এই সময় রথে আরোহণ করে গুটিচা-বাড়ি যাত্রা করে। পাণ্ডু-বিদ্যের বহুপূর্বে অর্থাৎ ইন্দ্রজ্যেষ্ঠ কর্তৃক রথযাত্রার প্রথম প্রবর্তনের সময়ই গুটিচা-বাড়ি-গমনের বিধিও প্রবর্তিত হয়েছে। বিধি আছে যে, যাত্রার পর গুটিচা নামক ঘনোদর মণ্ডপে দেবরথকে সন্নিবেশিত করতে হয়—“মণ্ডপে বাগদেবদান্ গুটিচাশ্যো মনোহরে”।

‘গুটিচা গেরোটমারে’ গুটিচার ব্যাখ্যা করা হয়েছে: ‘the word may be connected with Goondicha musha, a tree-rat or squirrel or with Goondicha Pralipada, the stick festival of the Deccan and may thus signify the log house.’ দেবরথের গুটিচা-মণ্ডপে স্থাপন বহন প্রাচীন বিধি, তখন এ মণ্ডপও কোনো দ্বারা নেই।

অনেকের মতে অগ্নিপ্রাণসেব রথারোহণের পর সপ্তাহকাল যে বেষীতে অবস্থান করেন, তা ইন্দ্রজ্যেষ্ঠ-মহিষী গুটিচাদেবী নির্ধারণ করে খেদ বলে এর নাম হয়েছে—‘গুটিচা’।

দুইটি কারণে এ কথাও যুক্তিহীন। প্রথমতঃ, ইন্দ্রজ্যেষ্ঠ গুটিচা নামে কোনো মহিষীর নাম কোনো প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ইন্দ্রজ্যেষ্ঠ মহিষীসের একজনের নামবাছা জানা যায়, তিনি হচ্ছেন ‘নামাবতী’—কৌমাণ্ড-আচার কহা। অথচ নরধ, রথ প্রভৃতি প্রাচীন পুরাণে এই গুটিচা-বাড়ির উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়তঃ, ভগবৎ-নির্দেশেই যে গুটিচা-বাড়ি-অবস্থানের নিয়ম প্রবর্তিত হয় তাও কন-পুরাণে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ইন্দ্রজ্যেষ্ঠক বরদান-প্রসঙ্গে ভগবান বিষ্ণু সেই হিন্দু-জীর্ণ-জীয়ে সপ্তাহকাল গুটিচা-বাড়িতে অবস্থানের কথা স্পষ্টই বলেছেন—

“বিকুর্জীৰ্ণকটে তপিন্ সপ্তাহানি ধনান্বনঃ।

জিতেন পূজা যথ্য রাত্তে ব্রহ্মমতঃ সমাধিপৎ।

তত্তীৰ্ণজীয়ে সাত্রেণ দক্ষিণি প্রতিবৎসরম্।

সৰ্গতীৰ্ণানি তথ্যাক হস্তান্তি যবি তিষ্ঠতি।”

এইষট্ঠই আষাঢ়ের শুক্ল-মিথীয়ার প্রাতে ইন্দ্রজ্যেষ্ঠ-সরোবরে বৌদধানাস্তর গ্ৰন্থাবধি সপ্তমপূৰ্ণক ভগবানের স্ত্রীভিষর্ক ‘বন-সাগরণ’-ব্রত-গ্রহণের বিধি।

গুটিচা-বাড়িতে অবস্থানের পর পুনর্বাড়া-উৎসব। অষ্টম দিবসে রক্তরথক পুনরায় দক্ষিণাভিমুখী করে বহু, দালা, পতাকা ও চামরাগি যাত্রা সজ্জিত করতে হয় এবং নবম দিবসে রথযাত্রোপলি পূর্ববৎ অধিষ্ঠিত করে ভগবান বিষ্ণুর দক্ষিণাভিমুখী বে-বাড়া তারই নাম পুনর্বাড়া-উৎসব। ভগবানের নিম্ন মন্দির থেকে গুটিচা-বহাদেশীতে যাত্রা এবং সেখানে থেকে পুনরায় যে নিম্ন-মন্দিরে প্রবেশ, এই উভয় কার্য একই উৎসব বলে পুরাবিদ পণ্ডিতগণ এই রথযাত্রাকে ‘নবদিশান্তিকা যাত্রা’ বলে থাকেন—

যাত্রা প্রবেশৌ দেবস্ত এক এবোৎসবো বতঃ।

পুরাবিদো বহুস্ত্যতাঃ যাত্রাঃ নবদিশান্তিকা যাত্রা।

—উৎসবতঃ, ৩৩।১

এই রথযাত্রা অকল্পনীয়। এর পূর্ব-যাত্রা এক অল্প, গুটিচা-মণ্ডপে অবস্থান দ্বিতীয় অল্প এবং পুনর্বাড়া এর তৃতীয় অল্প।

এই যাত্রা আশ্ব ও কর চলেছে। আশ্ব ও ভারতের নগরে নগরে, করা গ্রামে গ্রামে রথযাত্রার যে ব্যাপক উৎসব, তা এই ইন্দ্রজ্যেষ্ঠ-প্রবর্তিত অগ্নিপ্রাণের রথযাত্রারই উৎসব। অতঃ পুরীতে অগ্নিপ্রাণের রথযাত্রাই ভারতের প্রধান রথ-যাত্রা। সেখানে আশ্ব ও হাতিবর্ধনিধিলেবে অগ্নিপ্রাণসেব সকল মাংসের ঠাহুর। উৎসবের দিন সকলেই রথের দড়ি স্পর্শ করে অগ্নিপ্রাণের স্পর্শ-পুণ্য লাভের আশিকারী। সে যে কাঙালের ঠাহুর অগ্নিপ্রাণ।

পুরীর রথ প্রধান হলেও, অল্প সব কাষগাতেও ছোট-বড় অনেক রথ হবে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ হুগলি রেলার মাংশের রথেরও খুব নাম। অনন্তলি এই যে, কবানন্দ রথচারী নামে জনৈক ভক্ত মাংশে অগ্নিপ্রাণ-মূর্তি স্থাপন করেন ও রথযাত্রার প্রবর্তন করেন। এর পর তিনি এর সেবার ভার অর্পণ করেন কমলাকান্ত শিল্পাশী-এর ওপর। মতান্তরে, কমলাকান্ত শিল্পাশী নিজেই এই সেবা প্রকাশ করেন। বাই হোক, এখানকার রথই আশ্ব ‘মাংশের রথ’ নামে খ্যাত।

আষাঢ় মাস, শুক্ল মিতীয়া—হিন্দুর বাড়ি সেদিন অগ্নিপ্রাণসেবের উদ্দেশে গঙ্গা ও পশ্চিমবঙ্গের স্রক শরয়াস্ত্রের বিশেষ ভোগ। ছোট-বড় অনেকের ঘরেই আছে রথ,—কার্টের রথ, গিটলের রথ। এই রথে শালগ্রাম অথবা প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে অধিষ্ঠিত করে পুরীর অথকরণে রথ টানা হয়। কেউ-বা আবার ঝাঁপ-কাঠি দিয়ে প্রতিবিহ্বর নতুন রথ তৈরি করে শব্দের সঙ্গে উৎসব করে। ছোটখাটো মেলা বলে, আশোপাশের লোক ভিড় করে আসে। কত রকমের

বেলনা, তেলভাড়া পাণ্ডু-মুগি ও কিছু কিছু মনিহারী ফিলিপারও বিক্রি হয়। এইরকম কত কি! কিছু এগবই সেই পুরীর রথোদ্ধারই দৃষ্টি বহন করে এনেছে।

এই সেই ভক্তকৃত্যমনি মহাশয় ইচ্ছাস্বা-প্রচলিত, গুণাই

পর্যাপ্ত-সেবতা অগ্ন্যধঃসেবের তথ্যোদ্ধার উৎসব, প্রেমময় এবং সুন্দর—প্রেম-সৌন্দর্যের অপূর্ণ ফিলিপ-ক্ষেত্র—এমন পুরাতনীর জীর্ণতার মনিনত্যাগ্রাণ্ড হয়ে শুধু অগ্ন্যধঃ পর্যবেদিত হয়েছো মায়।

হুই 'বিপ্রদাস'

শ্রীমতা ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্ত্তমানের উপজ্ঞানের হুই বিপ্রদাস হুই নিঃসঙ্গ চরিত্র।

উপজ্ঞান-সাহিত্যের একটি গুণ হ'ল সংসারের বিভিন্ন চরিত্রদের পার্থক্য-সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কষ্টে সব চরিত্রই সার্থক হয় না, আবার সব চরিত্রই বাস্তবজন-সম্পন্নও হয় না, সেইজন্যে সাধারণের কাছে সব চরিত্রই সমান প্রতিফলিত হয় না। সমানভাবে আকৃষ্টও করে না। আবার অনেক চরিত্রকে আমরা এমনভাবে পাই, যারা বাস্তবে সত্যিই সঙ্গম কিনা বিচার করার চেয়ে মনে হয়, বাস্তবে সঙ্গম হ'লে, চরিত্রগুলির প্রতি বই পড়ে যেভাবে অ'কুটে হুই'ছি, বাস্তবেও তাতে ঘটিতি পড়ত না।

আমাদের সাহিত্য-জগতের হুই দ্বিকৃপালের স্তই দুটি চরিত্র এমন ভাবেই মনকে আকৃষ্ট করে, অথচ তাদের বেলায় আর নিঃসঙ্গতা। আমাদের মনে এই ধারণাই জাগিয়ে তোলে যে, মানুষের এই নিত্যকালের আহার-বিহারের প্রাচুর্য ও মানুষের জীবনের সবটুকু ঠাক ভরাতে সক্ষম নয়।

রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপজ্ঞানের বিপ্রদাস-চরিত্র আর পরবর্ত্তমানের 'বিপ্রদাস' উপজ্ঞানের বিপ্রদাস-চরিত্র বেন কতকটা এক মূর্ত্তে বাঁধা।

এই দুটি চরিত্র-সৃষ্টির কালও প্রায় সমসাময়িক, একের সৃষ্টির মধ্যে আর বছর করেকের ব্যবধান দেখাতে পাই। রবীন্দ্রনাথ বিপ্রদাসের সৃষ্টি করেছিলেন ১৩৩৪-৩৫ সালের মধ্যে, আর পরবর্ত্তমানের বিপ্রদাসের সৃষ্টিকাল হ'ল ১৩৩৬-৩৭ সালের মধ্যে। (দুটি ভিন্ন পত্রিকার আঙ্গিক ও পূর্ণাঙ্গ আকারে), অর্থাৎ এটা দেখা যাচ্ছে যে, এদের সৃষ্টিকালের মধ্যে আর বছর করেকের ব্যবধান। এটা হুইত অস্বাভাবিক। চলে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিপ্রদাসের বেলাবে ব্যতিক্রম টেনেছিলেন তার মধ্যে বিপ্রদাসের একাকীহুটাই একটা হয়ে পড়ে, তার পরিণতি শুঁ নিঃপেনে করে যাওবার

মধ্যেই বলে অস্বাভাবিক। কিন্তু পরবর্ত্তমানের যোগাযোগ সেই কয় হওয়ার উল্লেখ একটা নিত্যসত্যের আনন্দ-সম্মানের বাসনা ছিল, তাই তাঁর বিপ্রদাসের কাছে যখন সংসারের আকর্ষণ শেষ হয়ে গেল, তখন সে গেল তীর্থজগৎ—সে-তীর্থ থেকে তার আর ফেরার এত কোনদিনও উঠতে পারে না।

এই হুই চরিত্রের পরিণতি ঘাই হোক না কেন, একের মধ্যে কোথায় বেন একটা সুস্থ ফিলিপ-পুঁজে পাওয়া যায়। হুইনেই প্রাচীন অভিজ্ঞাত জমিদার-পরিবারের সন্তান, হুইনেইই চেহারা ঔপজ্ঞাসিকের বেলাবে চিত্রিত করেছেন, তার মধ্যেও একটা মাঝেস্থ পুঁজে পাওয়া যায়—হুইনেইই ব্রহ্মপুত্র আকৃতি। হুইনেইই কর্তব্যবোধ প্রবল, হুইনের মধ্যেই স্নেহ-প্রাচুর্য। অথচ বেন অহুতব করতে পারি, সব থেকেও এই চরিত্র-দুটি আন্তর দিক থেকে কোথায় বেন রিক্ত।

'যোগাযোগ'-এর বিপ্রদাস কহিকু জমিদার-পরিবারের প্রতিষ্ঠা—তার মধ্যে জমিদারী চালের আভিনয় নেই, আছে শুঁ কর্তব্যপালনের জন্তে পিতৃপুরুষের জমিদারি বজায় রাখা। তার কনিষ্ঠ নিজেদের অবস্থা বোঝে না, সে শুঁ বোঝে নিজেদের। তাই সে জমিদারি বিক্রি করে টাকা পার্টিতে বলে তার একার প্রয়োজন খেঁচোতে। আর বিপ্রদাস শুঁ কর্তব্য পালন করে বার নিরাসক্ত চিতে, তার কাছে তার নিজের বলে আছে শুঁ সাহিত্য আর কলার সাধনা, বাকী সবই তার পরিবারের কাছে উৎসর্গীকৃত।

মানুষ—সংসার, আপন সংসার বলতে বা বোঝে, সেই স্ত্রী-পুত্রের বন্ধন রবীন্দ্রনাথের বিপ্রদাসের ছিল না। তার বিবাহ স্থির হয়েছিল, কিন্তু কখন বিবাহের পূর্বদেই মারা যায়; পরে দেখা যায়, তার বিবাহ-স্বানীয় দুঃখের ভোগস্ব

হ'তে দেখি আছে। শুধু দিগাহেরই নয়, তার সারা জীবনেই বোধহয় একটা ভোগাধারের ইতিহাস। অস্তিত্ব: আশ্রয় তাকে যেখানে পেয়েছি তাতে এখন থেকে শেষ পর্যন্তই পেয়েছি একান্ত কর্তব্যপরায়ণ, শান্ত অথচ অত্যন্ত দীপ-শিখার মতোই দীপ্যমান রূপ। সে শুধু পরিবারের সম্মান আর কর্তব্যের প্রতি অক্লান্ত। যেন কুন্দিণীর প্রতি স্নেহ তার অসীম—তাকে তাই মধুসূদনের হাতে বিতে ছিল তার প্রচণ্ড বিধা; কিন্তু কুন্দিণীর স্নেহে আর নিরুদ্বেগ অবস্থাত্তরে সে বাধ্য হ'ল মহাজন মধুসূদনের হাতে শির বোনটিকে দিতে। কিন্তু অবস্থা যাঁই হোক না কেন, তার সম্মানবোধ শেষ পর্যন্ত অবিকল: তাই কুন্দিণী যখন তার কাছে বিবাহের পর এল এবং কিছুদিন পর ঘিরেও যেতে চাইল, তখন সে কিছুই বলেনি। কিন্তু যখন মধুসূদন তার স্ত্রীর অস্তিত্বকে একরকম স্বীকার করেই বিধবা জাতবৃত্ত ভ্রাম্যর সঙ্গে অশোভন সম্বন্ধে লিপ্ত হ'ল তখন রূপের বোকা মাথার নিরে অসত্য বিশ্লেষণে হুঁকি নিয়েও বিপ্রদাস বলতে গিয়েছিল,—“কুন্দি, এখানেই তোরা যথ মনে করে থাকতে পারবি? ও বাড়িতে তোরা বাঙরা চলবে না।”

এই বিপ্রদাস সম্মানস্বাক্ষর জন্ত ব্যস্ত কোনাে বিশ্লককেই বিপল বলে মনেনি। পরে বোনকে অসম্মান থেকে বাঁচাতে তার স্বামীর সাহায্যেই তাকে আপন ঘরে আশ্রয় জানিয়েছিল। কাণ্ডদাকে পরে বলেছিল—“সর্বনাশকে আমরা কোনকালে ভয় করিনে, ভয় করি অসম্মানকে।”

মুহুর যখন বাবিরুখে বাঙরা ছাড়া গাভার রইল না, তখন সে তার দামাকে যখন বললে, “ওহা কিছু তোমাকে বিশ্বে কেবলবার চেষ্টা করবে।” বিপ্রদাস জবাব দিল, “ওহা বা করতে পারে তা কথা শেষ হলেই আমার উপর ওদের ক্ষমতাও শেষ হবে। তখনই আমি হব স্বামী। তাকে দুই বিপল বলছিল কেন?”

তাই এই মুহুরে যখন হস্তব্যাধি নিয়ে গেল, বিপ্রদাস যা কল্পনা করেছিল সেই বোধে আর সে সংসারের কোথাও বুঁকে পেল না, তার ভালো-মন্দ বোধ সব-কিছুই উপভোগের শেষ ছুঁতে মিলিয়ে গেছে। তবু সেখা সেল তাকে নিরাসক্ত, নিঃসং, বিকৃত অবস্থায়। কাণ্ড জিজ্ঞেস করলে,—বাইরের দিকে এ জানালাটা বন্ধ করে দেব কি? রোন্ধন আসছে। বিপ্রদাস হাত নেড়ে জানালে, দরকার নেই। চমকুট্টা ওঘরে ওঘরে কেঁপে উঠল। দার সংসারের কাছে চাইবার কিছু নেই, কিন্তু তার কাছে সংসারের ধাবি আছে অজ্ঞান।

পরশচন্দ্রের উপভোগের বিপ্রদাস জীবন আত্ম করছিল

বিবাতার বেহেজ্জাধার, সে বহুদিন জানতে পালেনি যে সে মাতৃহীন। কিন্তু জানলেও, তার চরিত্রের কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলে ধরা যায়নি। সে জমিদারির সর্বস্বত্ব কর্তা, তাকে লোকের ভয় করত কিন্তু তার পক্ষে কোনো অস্ত্রায় সম্ব করা বা অস্ত্রায় কর্তার কোনাে সুযোগ ছিল না। তার চরিত্র ছিল দৃঢ়, কর্তব্যবানিষ্ট। সে বিবাহিত, পুত্রের শিতা: কিন্তু সব সত্ত্বেও তার চরিত্রের মধ্যে একানীততা বেশ পরিপূর্ণ। তার স্ত্রী তাকে জানে পরিবারের মধ্যে প্রেমস্থানীয়, কিন্তু নারীত্ব স্বামী হিসাবে। তাকে ভালবাসত রিকট, কিন্তু সে যে অস্ত্রায়ের উপরে, সে একটা অনন্তসাধারণ চরিত্র, সে কথা তার স্ত্রী উপলব্ধি করেনি, কোনদিন সেভাবে জানেওনি। তাই সে স্ত্রী ছিল, কিন্তু স্বামীর চরিত্রের মর্গগাথিকা ছিল না। তাই বিপ্রদাস গৃহভাগ্য স্বত্বতে উত্তোষ হ'ল, তবুও স্বীকার করল না তার অস্ত্রায় হয়েছে: সতী তাকে স্বীকার করতে বললে, “হয়, হয়, হয়—একটা অস্ত্রায় সকলেরই হয়। বল না ভেবে থাকতে।” বিপ্রদাস স্ত্রীর মুখে প্রতি একমুহুরে স্তম্ভিতা পরিচয় করিল, “হয়—অমর অস্ত্রায় হয় না সতী।” এই সতী শুধু স্ত্রী, সে বিপ্রদাস-চরিত্রের গহনে এসেবার উপযুক্ত উপাধানে গঠিত নয়। তার স্বামীর প্রতি কর্তব্য প্রজ্ঞা করা, ভালবাসা: তেমনি তার স্বত্ব কর্তব্যও রয়েছে সংসারের মঙ্গলমঙ্গলের প্রতি। কিন্তু সে পরিবারের প্রতি কর্তব্য স্বামী থাকলেই তবেই: তাই তার স্বামী যখন গৃহভাগ্য করে, তখন তাকেও তার অস্থগামিনী হতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে অংশেই বন্ধনা বুকেছিল, সেই বিপ্রদাস-চরিত্রের মহিমা বুকে তাকে প্রজ্ঞা করা সতী-চরিত্রের সাধ্য নয়। তাই বিপ্রদাস বিবাহিত হতেও স্ববিশ্রবাসের বিপ্রদাসের মতোই একক।

পরশচন্দ্রের বিপ্রদাস যখন সংসারে ছিল তখন সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের দায়ই তার ছিল, কিন্তু যখন সে গৃহভাগ্য করল তখন সংসারের কোনাে-কিছুর দিকেই তাকাল না। আসলে বিপ্রদাসের মনে সংসারের প্রতি শূন্য ছিল কখনই। সে জমিদারি দেখত, সংসারের সমস্ত কর্তব্যই পালন করত, কিন্তু সে সাধারণ জমিদার ছিল না, তার সমস্ত কাব্যকর্মে অস্ত্রায়ালে ছিল একটা তপস্জনিত চিত্তবৃত্তি। সে তাই সমস্ত কাব্যকর্মে অস্ত্রায়ালে জ্ঞান-আহরণে উন্নত হয়ে থাকত। তার গ্রন্থাগার তার প্রমাণ। এই সবচে বিপ্রদাসের বৈদ্যার তাই ফিল্মস বলছে, বন্দনার লাইব্রেরী দেখে বিশ্বাস কখন—বে, “শুড়েন এবং পড়চেন। আলমারি বন্ধ নয়, কোন একটা বই খুলে দেখুন না, তার পড়ার চিহ্ন হয়ত চোখে পড়বে।” বন্দনা—“এত

সময় পান কখন? দিন-রাত তপু এইই করেন নাকি?" বিজ্ঞানসম্মত কথার পরল যে কখন যে বিজ্ঞানসম্মত পড়াশোনা করবার সময় পায় তার চরিত্রের সঙ্গে আশঙ্ক পাশনি। সাধারণতঃ তার প্রজ্ঞা আর তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে বন্ধনের মতোই ধরা দিয়েছিল। প্রতিক্রিয়া থেকে বিজ্ঞানসম্মত চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য নাকের পড়ে। তার বোঝা অচল হাজারি হাজার, সহজ হবার যে একটা আশঙ্ক কৌশল তাও বিজ্ঞানসম্মত চরিত্রের গুণবৎ থেকে কম আশঙ্কীয় নয়।

মনে হয়, বিজ্ঞানসম্মত চরিত্রের মূলে একটা সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধা ছিল, একটা বৈরাগ্যের স্বর তার চরিত্রের মধ্যে প্রথম থেকেই বিরাজিত। তাই শূন্যতার সঙ্গে বিবাদ না ঘটলেই, বিজ্ঞানসম্মত মনে হয় সংসারের জালে বেশিদিন ধরা পড়ে থাকত না। সংসার-ভাগ্যের ভ্রমোগ যখন অতিক্রান্ত হতো, তখন তার পক্ষে তাই গৃহত্যাগ করা বৃহৎ সহজতাই হয়েছিল। সত্যের সূচী তাকে দিল মুক্তির স্থান। যে-মুক্তি সে চেয়েছিল হৃদয় মনেপ্রাণে, কিন্তু কর্তব্যজ্ঞানে বা সে সত্যের সূচীর পূর্ণ পথই পায়নি। অল্প সংসারী প্রকৃতির মানুষ হলে শ্রী-বিয়োগে শ্রী গ্রহণ করে বা তার স্থানে কাউকে বসাতে না পারলে পুত্রকে ঘিরে অন্যভাবে সে সংসারের নিজের স্থান খুঁজে নিতে পারার চেষ্টা করে। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত চরিত্রের মানুষ দখ, সত্যকে তাই সে অন্যভাবে আশ্রয় ঘিরে দখ-মুক্তির পথ খুঁজেছিল। আসলে সংসার তার কোনদিনই ভালো লাগেনি। যখন বিবাহ করেছিল তখন নিজের চরিত্র বৈশিষ্ট্য হৃদয় তার নিজের কাছেই হৃদয় ছিল। আর যখন তার পরিপূটন ঘটল তখন তার মুক্তি-চাওয়া প্রাণটা ছটফট করেই গেছে, বতহীন বা আশনি ঘটন-অপ্রত্যাশিত তা তার কাছে ধরা দিয়েছে।

বিজ্ঞানসম্মত গৃহত্যাগের কিছুদিন আগেই বিজ্ঞানসম্মত বগেছিল, “আজ আমি আছি, কিন্তু এমন তো ঘটেছে পারে আর আমি নেই।” বিজ্ঞানসম্মত বলেছিল, “...আপনি নেই,—কোথাও নেই এ আমি ভাবতে পারিনি।” বিজ্ঞানসম্মত উত্তর দিয়েছিল, “সংসারে সবই ঘটে যে, এমন কি অসম্ভবও। এই কথাটা ভাবতে যারা ভয় পায় তারা নিজেকেই ঠাকর, আবার এমনও হতে পারে আমি স্ফাট, আবার ছুটল দরকার, তবু দিখিনি ছুটে?”

তার এই উক্তিই হলো একটা বৈরাগ্যের স্বর ধনিত হতে দেখি। আবার দ্ব্যর্থবোধক এহু আগে একবার বলতে দেখি—“ধর, যদি আবার কখন স্ফাট হয়—হতেও তো পারে, তখন কি আবার ক্ষেত্র ছুটি লক্ষ্য পাবে না? বলতে কি বিশিষ্ট আবার বণের কলঙ্ক?”

এ কথাটার বৈরাগ্যের স্বর না থাকলেও, এ কথার মধ্যে

বিজ্ঞানসম্মত মনের মধ্যে একটা বেন অসম্ভবেরও সন্ধ্যাভাষ্য: ঘটায় একটা আশ্রয় বেন পাঁজা দিচ্ছে সর্গল, একবারই মনে হয়। পরে আশ্রয় দেখি যে, ভীষণতর সঙ্গে বিবাহেই বিজ্ঞানসম্মত তার সব-কিছুর হাবি ছাড়া। কিন্তু উপজ্ঞানসম্মত এই বিবাহের কোনো সুরে পাওনা যায় না। আগে একবার বিজ্ঞানসম্মত শূন্যতারে কাছাকাছি করেছিল বোনের মূহ চেয়ে। শূন্যতারের জমিদারি, ঐশ্বর্য, কারবার সবই অতল তল থেকে বন্ধা পেয়েছিল বিজ্ঞানসম্মতের কপাৎ। কিন্তু এইজন্মেই কি বিজ্ঞানসম্মত জেগের কথা ভেবেছিল তা জানা যায় না, আবার বিবাহের সুর কি তাও জানা যায় না; তবুও বিজ্ঞানসম্মতের সহজ উক্তিভেদেই বেন একটা একাকীত্বের স্বর বাজছে, তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই হল একাকীত্ব, তাই বোধহয় ঔপন্যাসিক তার বহু কথাই তার না, শ্রী বা পরিবারে অল্প যখনদের কাছে অল্পকি রেখেছেন, তেমনি মুক্তি পাঠকবেরও তার বিরাগের হৃদয়টি সজেই পরিচিত করেছেন কিন্তু কাছাকাছি উপজ্ঞানসম্মতের। বিজ্ঞানসম্মত-চরিত্রকে বন্ধনা বা বিজ্ঞানসম্মত কতকটা বুকেছিল, কিন্তু সেইসব তার অংশ-বিশেষ; সত্যি তার চরিত্রকে আরেক ভাবে দেখেছিল, দ্ব্যর্থবোধক তাই আরেকভাবে দেখেছেন। সবচেয়ে কাছেই তার চরিত্র বেন আশ্রয়—কতকটা করে ধরা দিয়েছে। পাঠক তাকে সহজভাবে হৃদয় পায়, কিন্তু তার মধ্যেও একটা ‘কিন্তু’ থেকে যায়: তার জ্ঞান-অজ্ঞান বোধের মূল সূত্র, কি নিয়ে শূন্যতারের সঙ্গে বিবাদ হ’ল, আর কি স্রবোধেই বা সে গৃহত্যাগ করল এমন হঠাৎ—সেই প্রকৃতি পাঠকের কাছে অল্পকি রেখে লেখক উপজ্ঞানসম্মত করেছেন।

শেষে, আশ্রয় তাকে দেখি তীর্থযাত্রীরাগে, যে তীর্থ থেকে ফেরবার কল্পনাও সে করেনি।

দুই ঔপন্যাসিকের দুটি চরিত্র বাস্তব সংসারের প্রতি এমনই নিরাসক্ত ভাবেই শেষ হয়। বরীজনাথ তাঁর বিজ্ঞানসম্মত সংসারের মধ্যেই নিশ্চয় উপায় করে উপজ্ঞানসম্মত শেষ করেননি। পরন্তুও বিজ্ঞানসম্মতের সেই রূপ বেন সহ্য করতে না পেরেই তাকে সংসারের উল্লে ‘অনুভূতিহীন আনন্দলোভের স্থান খিঁচে পুছছাড়া তীর্থযাত্রী করে উপজ্ঞানসম্মত সমাপ্তি-বোধটা টেনেছেন। বরীজনাথ তাই তাঁর বিজ্ঞানসম্মতকে স্তবনা করে এক নির্জন ঘরে রেখে শেষ করেছেন উপজ্ঞানসম্মত, আর পরন্তুও তাঁর বিজ্ঞানসম্মতকে জীবনের শেষপ্রান্তে পশ্চাদ্ধাবিত ইঙ্গিত দিয়েছেন তীর্থের পথে।

দুই চরিত্রই বেন সংসারের উল্লে একটা নিঃশব্দতার স্বরে বসিত। দুটি জীবন বেন একই রাসের দুটি ভিন্ন সঙ্গীত হার; একই রাসেই বসে, কিন্তু বিজ্ঞান-প্রতিভা ও প্রকাশশক্তি কিছু আলাদা।

“আছে গরু, না বয় হাল”

কালীচরণ ঘোষ

গান্ড-সম্রাট-সম্মানকল্পে বহু পথের কথা বহু লোকে বসিরাছেন এবং বলিতেছেন। আজ কোনওরূপে দেখিবারে প্রাণশাসী ধর্মীয়া রাশিবার ছোট উপায় লক্ষ্যে কিছু উল্লেখ করিতে আশ্রয় ও বাসনা হইয়াছে।

প্রথম—খাত পরিস্থিতি লক্ষ্যে সকলেই একটা আশঙ্কার কথা বলিতেছেন এবং সরকারী অভয়বাণী প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও মৈত্রী মাসে কোথাও কোথাও চলিত টাকা দিয়া এক মণ চাউল পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। আশ্রয়ের প্রধান-দৃষ্টি বহাশয় দিবার বদিকা ব্যাভোগ্যপালনের যে ব্যবস্থা নিরাশ্রয়, তাহা কয়েক মাস পূর্বে ‘বহাশায়ী’র পুঠার পড়িয়াছি বদিকা মনে হয়। ধনী লোকের বড় কম্পাউ ও বা প্রাচীর-বহাশায়ী বাগান এ লব্ধ বাড়ির শোভা-বৃদ্ধি এবং মালিকের ধনসম্পদের প্রচারের মত বেলিয়া রাখা সমীচীন নহে। তিনি সেখানে বাগিচার উপযোগী বড় গাছ লাগাইতে বসিরাছেন।

আশ্রয় মনে হয়, যে সকল পত্র ডাডাডাডি বস মিডে পারে তাহাই রোপণ করা বাঞ্ছনীয়। বড় গাছ অর্থাৎ আম, আম, আমকল, লিচু, বেল, কাঠাল, পেয়ারা প্রভৃতি ফল দিবার মত কয়েক বৎসর সময় লইবে। এসকল গাছের ফলটি গ্রহণের পরমাণে না অসিলে সেসে আরো অনাবৃষ্টি দেখা দিবে। তাহাতে বৎসরের কালের মধ্যে ফল পাওয়া চাই তাহার চেষ্টা করা অবশ্যকর্তব্য। সে কারণে প্রত্যাভাজন প্রাণদায়ী ডাঃ বিধানচন্দ্র বায় বহাশায়ের মত কিছু পরিবর্তন করিয়া লইলে ভালো হয়।

প্রকৃতপক্ষে কয়জন ধনীকে এই মতগ্রহণে সন্তুষ্ট করা হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাহাদের অভাব নাই এবং বড় টাকার দাম হউক আর ক্রয় করিতে অসুবিধা হইবে না বদিকা বিখ্যাত আছে, তাহারা এই প্রভাব বাতুলের উক্তি বদিকা উদ্দেশ্য করিবেন। আর তাহাদের অভাব ঘনাইয়া উঠিয়াছে, সূচ টাকা বরকার, তাহারা বাগানে বা উঠানের কতকাংশে বাড়ি বা শোকানন্দ করিয়া ভাড়া হইতে টাকা উপার্জননের চেষ্টা করিবেন। তাহারা ফল-উৎপাদনের অনিশ্চিত পথে হাইতে বিধা বোধ করিবেন। বিশেষতঃ

এইসকল জমির মালিকের প্রায় সকলেরই ফল উৎপাদন করিবার কঠি বা কঠিক শক্তি কোনটাই নাই।

যদি এমন কোনও ‘বোকা’ লোক থাকেন যে তাহাদের লব্ধ বাগিচা চাষের ‘কেত’এ পরিণত করিতে প্রস্তুত, তাহাদের এই কথা বলিতে হু, তাহা সবার সন্নিবে তাহাই মনে রোপণ করা হয়। বৃষ্টি-চাষের সময় উত্তীর্ণ হইয়া হাইতেছে, সুতরাং মত কোনো পত্র বসন করা উচিত। এমন সকল-প্রকার শিম, কড়াই, ড্যাডল, লাউ-কুমড়া-র সমস্ত আদিয়াছে। গম, ধব, যোয়ার, বাজরা, রাশি, কুম্ভী প্রভৃতি গুণিত রোপণের কাল বৃদ্ধি লইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। যাদের চাষে গাছের গোড়ার জল জমিয়া থাকা সরকার, কিন্তু গম প্রভৃতির কোনটার চাষে তাহা লাগে না। তাহারা এসকল চাষ জুজ্ব বদিকা মনে করিবেন, তাহারা অন্ততঃ ডাঃ বায়ের পরামর্শমতে আম, লিচু, পেয়ারা লাগাইতে পারেন।

পেঁপে ও কলা গাছকে দ্রুত পথের দেওয়া প্রয়োজন। সামান্য বয় লইলে বৎসর হইতে দেড় বৎসরে ফল দিবে; পেঁপে শ্রাব ও আগে ফলিবে। সুতরাং আর বাহাতে আশ্রয় থাক, বাগানে লাগাইবার পক্ষে কাঁচকলা, ডেম্বের, কাঁটালি, কালিবা প্রভৃতি কলাগাছ বড় উপযোগী। চাটম, ঠাণা, মঠদান, সিঁকাপুরী প্রভৃতি কলাগাছ অশেফাকৃত স্থায়ী গাছ এবং অধিক মাত্রার পরিচর্যার প্রয়োজন। প্রথম শ্রেণীর কলাগাছ হইতে মোটা কাটিতে তত দ্রুত লাগিবে না, খোড় পাওয়া হইবে প্রচুর। দ্বিতীয় শ্রেণীর কলা কেহ মোচার মত রোপণ করে না।

কিন্তু আসল কথা হইতেছে, আসোচ্য বিষয় নিতান্ত ‘আকাশ-মুম্ব’ পর্যায়ে উন্নীত করা হইতে পারে। একটি ঘটনা দ্বারা এসকল ‘চাষী’র অসুবিধার কথা বিবৃত করা থাক।

সবের চাষী দ্বির করিলেন বামিকটা জমিতে বৃষ্টি লাগাইবেন। তিনি সরকারী ইচ্ছার প্রভৃতি নিষিদ্ধ পাঠে করিয়া থাকেন, সরকারী প্রচেষ্টার ‘কমলী’-প্রদর্শনী (প্রদর্শন নর) ও অজ্ঞাত প্রদর্শনী-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বা প্রচেষ্টা, এমন কি ‘কৃষিপণ্ডিত’ প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণও পাঠ করিয়া থাকেন। গতবৎসর সে ডব্রলোক এক

ভেলা-কৃষিক্ষেত্রে জ্ঞানন করিলেন যে, তাঁহার প্রচেষ্টার কতকগুলি গাছ ভালোই হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে মূল আদিত্তেছে, ফল ধরে না; যেমন লুচা, বেগুন, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি। আর কল ধরিতরৈ, কিন্তু পরিষ্কৃত হয় না—পড়িয়া যায়; যেমন পেঁপে।

উত্তরঃ। দেখুন, গাছগুলোর ভেত্রে বেশী হিংস্রতা, তাইতে ফল ধরে না। ভেত্রে কমলেই আশ্রমি ফল ধরবে।

প্রঃ। কিন্তু গাছ যে খুব তেজী এমন মনে করার কারণ নেই। আমি গাছ তে: চিনি; বোধ হয় মাটির সোণ, কি অন্ত কারণে এরকম হচ্ছে।

উঃ। তবে আপনিই তো কারণ ধরে তুলেছেন। একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন; শুধরন (সেব) সাপোধান সময় হ'য়ে পড়বে।

প্রঃ। আচ্ছা, সে তো হ'লো, কিন্তু—পেঁপেগাছটার কি হ'লো ?

উঃ। ওর তলার খনিজটা রাসায়নিক সার দিয়ে দিন। সারের সোডা ফিরে আশ্রমি হাতখামেক তলাতে গোল ক'রে ছুঁইকি আশ্রমি গর্ত করুন। এক হ'তে দু' চাষের চামচ সার (আয়োনিয়াম সাল্ফেট) নিয়ে শুঁড়ো খুবখুবে মাটির সঙ্গে মেশান। সেইগুলো গর্তের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে প্রচুর জল ঢালুন, এবং পাশের মাটি দিয়ে গর্তটা মুছিয়ে দিন। কেবলমাত্র আর শেণ কয়ে ধাবে না। প্রচুর জলবে, আর সাইন্স বড় হবে।

বলিতে লক্ষ্যে নাই, ভুলোকেব কোনটাই সফল হয় নাই। ভুলোকে সমস্ত ব্যয় বহন করিবার প্রতিশ্রুতি বিধাও কৃষি-বিভাগের অভিজাত কর্মচারীকে চাষের ক্ষেত্রে তাঁহার পাদস্পর্শে ধস্ত করাইতে পারেন নাই।

এ বংশের কথা। এ ভুলোকে নিশ্চয়ই পাগল, অথবা দলকের কৃষ্ণি ছিল। আবার ভেলা-কৃষি-অফিসের সহিত যোগাযোগ করিলেন।

প্রঃ। সার (মশাই), কিন্তু তুট্টার বীজ সিতে পারেন ?
উত্তরঃ। তুট্টা!!! এ বছর কবে সময় (season) চলে গেছে, এখন তুট্টার বীজ কি করবেন ?

প্রঃ। এযার দুই হ'তে দেবি হচ্ছে, সব চাইই নাবী হবে। আপনি আমায় কিছু বিক্রি করুন, লোক পাঠিয়ে যিচ্ছি (কথাটা টেলিফোন-যোগে চলছে)।

উঃ। যা হয় না, আপনি করতে চাইলেই হবে ? প্রকৃতি (nature) কি আপনার হাতের তাঁরোয়ার ? এ বছর অন্ত চাষে মন দিন। অথবা পরলা আর সময় নষ্ট করবেন না।

(বোধ হয়, বলার ইচ্ছা ছিল—‘আমার এ মূল্য সময়ের আর অপচয় করবেন না’।)

প্রঃ। অল্প চাষ নঃস্থ করবোশন। আপাততঃ আপনার ওখানে নমুনাধরণ (sample) কিছু যদি পড়ে থাকে, আমার লোককে সেবেন, আমি—

উঃ। স্যাম্পল (sample)-টা আপল দেওয়া হয় না, কিনে নিতে হয়।

প্রঃ। আমার মূল দ্বয়েন না, আমার কথা শেন করতে তেননি। আমি আগেই তো বলেছি, বীজ কিনতে চাই। এখন নমুনার কথা বলার উদ্দেশ্য—আপনার তাঁড়ার (more) থেকে যিক্রির পর যদি কিছু পড়ে থাকে তাহাই কিছু কিনতে চাই।

উঃ। (বিহবৃত্তরে) না! না! সে সব—কিছু হয় না। আপনি কালিঙ্গাড়ে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট সীড মাল্টিপলিকেশন কার্বে’ (West Bengal Government Seed Multiplication Farm) লিখে দিন P.P.F.-তে বীজ পাঠিয়ে দিতে।

অফিসারের সহায় শরীর। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া গিলেন—পি-পি-পি কর্বাং পোস্টাল পার্সেল প্যাকেট (Postal Parcel Packet)।

ভুলোকে নিত্য নাজোড়বালা। তিনি বলিলেন—“ভেলা-অফিসে বীজ পাওতা যায় না, তবে চাইত সাহায্য কিছুশে হ'তে পারে ? আমার সপ্তমগরী অফিস, নিগের টেলিফোন আছে; বাড়িতে টেলিফোন আছে, আপনার কাছে পাঠিবার মতো লোক আছে। নিজের সামান্য পরলা আছে; নিজের চাষের শক্তি আছে। সবচেয়ে বড় ভিনিল আছে চাষে কতি। আমার মতো লোক যদি কোনো সাহায্য না পায়, তবে দুঃশরীর চাইবী আপনারদের কাছে কি প্রত্যাশা করতে পারে ?”

উঃ। আপনাকে বা বলছি, তাই করুন। বামে কথা বললে চাষ হবে না, কথাই বাড়বে।

প্রঃ। আপনি একবার হরা করে এসে ভবি বা চাষের ক্রটি যদি মেবিরে ধান—

ওপারে টেলিফোন-রিভিভার রাবিয়া দেওয়ার শব্দ পাওতা পেল। কথা অসম্ভব রহিল।

পাগলের কাণ্ড; তৎকালীন কালিঙ্গাড়ে চিঠি দেন যে তুট্টার বীজ চাই। যা সময় পড়ে আনিতে পাঠিলে টাকা পাঠাইয়া দিব। সে-পত্রের উত্তর আসে নাই। বীজ সরকারী কেজে বাফিভেছে (misapplied); কবে কাহার কতটা কালে লাগিবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

বাকী ঘটনাটা এইরূপ হওয়া অসম্ভব হতো নাই, বরং পরম স্বাভাবিক বলিয়া মনে করা হইতে পারে।

কালিঙ্গও প্রেরিত চিঠির তারিখ, ৭৮৯, ১ মে ১২৪৮। কোনও উত্তর নাই।

২৯:৫ তারিখের চিঠি—অফিসারকে লিখিত: “আমি কুটারে বীজ পাঠাইবার জন্য ১:৫ তারিখে যে পত্র লিখিছি, তাহার আরও উত্তর পাওয়া যায় নাই। কত টাকা পাঠাইতে হইবে দয়া করিয়া লম্বা জানাইবেন। বীজ-বপনের কাল উত্তীর্ণ হইয়া বাইতেছে।”

কোনও উত্তর নাই। ১:১৬ তারিখে তৃতীয় পত্র গেল। ২২:৬, কালিঙ্গও হইতে: “রিসিডিং অ্যাট্টোর্নস” (মনোযোগ দেওয়া হইতেছে)।

২৭ তারিখে: “কোনও উত্তর বাবীর পাই নাই। কিছু বরাদ্দিত হইলে বিশেষ বর্ণিত হইব।”

২৩:৭, কালিঙ্গও: চেষ্টা হইতেছে। হাতে বহু-বড় কাজ রহিয়াছে। বৎসকালে (in due course) আপনার বিবরণ হাত দেওয়া হইবে।”

১৭:৮, “কয়েক দিনই হইয়া গিয়াছে; বীজ আর আবার প্রেরণ নাই। পার্সেল আসিলে ক্ষেত্র দিতে হইবে।”

৩১:৮, কালিঙ্গও: “আপনার ১৭:৮ তারিখের পত্র। আপনার সাবান্ন মনে না পাঠাইতে হইলে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।”

বৃষ্টিমানে এক বন্ধু বলিলেন—“কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে পারেন যে, এ বৎসর বীজ পাইলে তাহা আপনার আগামী বৎসর চাষের কালে (season) কামে লাগিতে পারিত। এবারের অর্ডার নাকচ (cancel) করিয়া আগামী বৎসরে নূতন অর্ডার দিলে তাহা পাইতে আট মাস হইতে এক বৎসর লাগিয়া বাইতে পারে।”

সুতরাং পত্র দেওয়া হইল না। বীজ আর আসে নাই।

এখন স্মৃতি চাষ চলিতেছে; মর্ত্ত বস্তুতা তাহার সহিত পারা দিতেছে। এ সৌধীন চাষ যোগে হইবে। অন্যদ্বারে ইংলণ্ড ত্যাগ করিবার পর ক্ষম্মেই অক্ষরীকে প্রচুর ছাড়া-পের পাওয়া গাইবে সম্ভব নাই।

অন্ন-উৎপাদন সম্বন্ধে এক উদাহরণ দেওয়া গেল। চাষ করিবার ইচ্ছা থাকিলে বাহাতে লোকে বাহা কিছু হউক উৎপাদন করিতে পারে, তাহার লম্বা উপায় করিয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। যে লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ভয়াবহ। কিন্তু বাহুকের চেষ্টা বাহাতে রূপগ্রহণে সুবিধা-সংযোগ পায়, তাহার ব্যবহার বেন কোনও ক্রটি ও গলম না থাকে।

সাধের জাতীয় প্রচেষ্টা এবং তাহার ফলের পরিচয় দেওয়া হইল। প্রকৃত চাষী সরকারী সাহায্য কতটা তাহা উদাহরণই জানেন। তৃত্বারা চাষ করিবেনই; সরকারী কর্মচারী অপেক্ষা উদ্বোধনের জ্ঞান বেশী হওয়াই সম্ভব। তাহা ছাড়া চাষ উদ্বোধনের দায়। সাহায্য পাওয়া গেলে বা না গেলেও উদ্বোধন চাষ করিবেন। বাহারা নূতন ক্ষেত্রে নূতন চাষ সাহায্যে একমুঠিও বাড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টিত, উদ্বোধনের সাহায্য অধিক প্রয়োজন।

অথবা কি পাড়াইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। চাষের সাহায্য না হউক, সাহায্য একটা চাকুরি পাইয়া গেলেও, লোকের দুঃখ-কষ্ট-অভাবের লাঘব হইয়া থাকে। নানা ভাবে লোককে শিক্ষা, সাহায্য, শেচ, জ্ঞান প্রভৃতির দ্বারা পারে পাড়াইবার সাহায্য করা হইতেছে; লক্ষ লইয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচনা করিবার অবসর নাই। চাকুরি পাইবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্যে পুঠি—রাজ্য-সরকারের স্ব-বিভাগের কর্ম-বিনিয়োগ পাণ্ডা কাজ করিতেছে। এ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনে যেমনল প্রসঙ্গ আসে তাহার কয়েকটি আলোচনা করা গাইবে। এখানেও মূর্ত্তে প্রাসাদ-গঠনের মতো অস্বল্প কোনো চেষ্টা হইতেছে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা সরকার।

এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ (Employment Exchange)-গুলির যে কার তাহাতে বেকার লোকের নাম পঞ্জীকৃত করিয়া দেখানে লোক প্রয়োজন দেখানে পাঠা-বস্তুর হইতে নাম পাঠাইয়া দিলেই চুকিয়া যায়।

প্রথম কথা, যে পরিমাণ লোক প্রতিদিন বেকারের খাতায় নাম লেখাইবার জন্য ঘুরিতেছে, যে প্রাশ্রণ পরিষদে গত্যের নাম উঠাইতে লক্ষ্য হয়, তাহার তুলনায় কত জন চাকুরি পাইয়া থাকে তাহার যে-বিলাস মাকে মাকে প্রকাশিত হয়—তাহাতে উৎসাহিত হইবার কোনও কারণ পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে বালায়, বিশেষতঃ কলিকাতা ও উপকণ্ঠে কয়েকটি নাম-বেছেলগারি অফিস হওয়াতে বেকারের এই কঠোর কতকটা লাঘব হইয়াছে; কিন্তু বাহা আছে তাহা নিতান্ত ‘কাটা ঘায়ে হুনের ছিটের মতো। কে কবে চাকুরি পাইবে তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু প্রতি দুইমাস অল্পর তাৎপর্যের নূতন করিয়া নাম লিখাইতে হয়। দু’মাস চলিয়া গেলে বহু দাস্য নাম পোহাইলে আবার নূতন করিয়া নাম লেখানো যায় না।

বাংলায় বড় বেকার, প্রকৃতপক্ষে তাহার পতকরা পাঁচজনও এখানে নাম লেখাইতে আসে না। দুঃ-দুঃখের

হইতে কেবল আসা সম্ভব নয়। এ প্রতিষ্ঠান কর্ম-সংস্থানের সুযোগের পক্ষে উপযোগী নয় মনে করিয়া শিক্ষিত চিত্তাঙ্গিল লোক প্রতিষ্ঠানের ধারণা ঘাড়াই না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিসংখ্যান-বিভাগ যে সামান্য অঙ্গলস্বান-কার্য করিয়াছিল, তাহাতে প্রস্তুত চিত্ত কতকটা পরিষ্কৃত হয়।

এন্ট্রান্স-এন্ট্রান্স নতুন লোক নিয়োগের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে না। যেখানে কোনও গল খালি থাকায় সুব্যবস্থা ইচ্ছার নিকট পৌঁছাইয়া যেওয়া হয়, সেখানে তাহারা ('চিহ্নগুপ্তের') নথিপত্র খাঁটিয়া কয়েকটি উপযোগী-বিবেচিত লোকের নাম পাঠাইয়া দেয়। এই কামের সাহায্যে বেতার-সমস্ত-সংস্থানের চেষ্টা হইতেছে বিভিন্ন লোকের মনে প্রচণ্ড খাবী সৃষ্টি করা হইতেছে মাত্র।

বাহার বা যে প্রতিষ্ঠানের নতুন লোক নিয়োগ প্রয়োজন তাঁহাদের আশা-আলোচনা, ব্যক্তিগত সংযোগ বা বিজ্ঞাপন-মাধ্যমে সে-লোক সংগ্রহ করিয়া লইতে পারেন। 'এন্ট্রান্স'র ব্যতীত আরিখ অগ্রযাত্রী বেতন নাম লেখা আছে, অবশ্য 'গণকর্মবিভাগ'ঃ, সেই হিসাবে পর পর গুচ্ছে গুচ্ছে নাম পাঠাইয়া দেওয়া হয়। স্বার্থ মিথিলাযোগ্য লোকটির নাম পত্র পৌঁছিতে বিবাক্ত বা প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছা হইয়া পড়েন। অতঃ পরিশ্রম-সাহায্যে বাহাদের পাওরা যায়, তাহার মধ্য হইতে নির্বাচন-পর্যন্ত স্তির লক্ষ্য হইয়া থাকে। বাহাদের নাম একবার নির্বাচনের অন্ত পাঠানো হইল, তাহারা একটা চান্স (chance) পাঠিয়া মিটাচ্ছে। হুতরাং বিতীহবার সে-নাম আবার খাড়া হইতে বাছিয়া পাঠাইতে কত যোগ বহুর লাগিয়ে তাহা কেহ নিকিত বলিতে পারে না, কারণ একই বিভাগে বহু লক্ষ (লক্ষ) লোকের নাম পরে পরে অমা হইয়া বাইতেছে।

কল কিছুই হয় না সেবিদ্য হু'মাণ অমর নাম নতুন করিয়া কানিয়া লইবার কথা অনেকেরই উপেক্ষা। কল, তাহার নাম আবার পঠীকৃত করিতে গেলে বহু পিছনে পড়িয়া যায়।

এইসকল এন্ট্রান্সের অন্ত যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তাহাতে অসম্মান করা যায়, এক্ষণি বেতারের চাকুরি-সংস্থান করিতে বছরে ১৫০ হইতে ১,০০০ বা ততোধিক টাকা ব্যয় পড়িয়া যায়। অফিস ও অফিসারদের অন্ত বড় বরঙ। বাহাদের লোক সরকার তাহারা লোক-নির্বাচনের ব্যয় করিতে প্রস্তুত এবং তাহাদের কলও উচিত; আর 'চাকুরি-সংস্থান প্রতিষ্ঠানের' ব্যয় সরকারের উপর চ্যাম্বল হইয়া আঘাত করা

হয়; সাবা ভারতে বাৎসরিক ১ কোটি টাকার অধিক ব্যয় হইবে। পরিচায়ক বিজ্ঞাপন-সাহায্যে লোক সংগ্রহ করিতে হইতো একজনদের অন্ত গড়ে পঞ্চাশ হইতে দুশো টাকাই যথেষ্ট।

এন্ট্রান্স-এন্ট্রান্সের ভাঙ্গা বিক নিম্নেই আছে, তাহা না হইলে অনেক সভা মেনে এরূপ প্রতিষ্ঠানের অধিক থাকিত না। সে বিচারে এখানে কাজ নাই। নতুন লোক নিয়োগের অন্ত কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি পাওয়া চাই। শিল্প, লক্ষ্যপ্রকার পণ্যের উৎপাদন-সৃষ্টি—তৎসংক্রান্ত ব্যবসা-ব্যবস্থা, নতুন নতুন শিল্প প্রকৃতির আবির্ভাব ইত্যাদি কর্মক্ষেত্র-বিভাগের সাহায্যে অধিকতর লোকনিয়োগ সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্বীকৃতি-উপাঙ্গনের সুযোগ সৃষ্টি পাইলে লোকের বেতারের সৃষ্টিবে। সে-সকল ক্ষেত্রে আইন, ট্যাক্স, পরীক্ষা, পরিবর্তন প্রকৃতি মিলাইয়া যে অবস্থা ধাঁড়াইয়াছে, তাহাতে উহা সঙ্কচিত হইয়া পড়িতেছে। নতুন পথের সম্ভাবনা, নতুন কর্মক্ষেত্র-স্থাপন—বর্তমানে তাহার প্রসার না হইলে লোকের কর্মসংস্থান হইতে পারে না। সেজন্য অবস্থার কতগুলি চাকুরি-সংস্থান-ক্ষেত্র ও পাখা সৃষ্টি করিয়া লোককে যদি বেতার-সংস্থানের পথ বলা হয়, তাহা হইলে চাব-সংক্রান্ত কল সরকারী কর্মসংস্থান হইয়া সাহায্য করে, তাহার অধিক ক্ষমতা এখানেও আশা করা যায় না। নতুন পথের উত্তর বা পুরাতন পথ মূর্ত হইলে একজন লোক কাজ পাইবে তাহা বিজ্ঞাপন বা 'এন্ট্রান্স' যে-সাহায্যেই হউক। সরকার এবং জনসাধারণ একথা মনে মনে না করেন যে, বেতারের দূর করিবার অন্ত 'এন্ট্রান্স' কোনও একটা প্রকৃতি পথ।

আরও নানা ক্ষেত্রে লোকের গুণ-সাধনের বা সাফাং সাহায্য করিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাহার অপিকার-ফলেই সাধু উদ্বেগ লইয়া প্রতিষ্ঠানগুলি স্তির হইবার পর একবারে গ্রাণধীন অবস্থায় জড়বৎ পড়িয়া আছে। অগ্র-উৎপাদন এবং অগ্র জর করিবার পক্ষিসংকর, স্বর্বাং চাকুরি প্রকৃতির ক্ষেত্রে যদি কোনও বোঝানিল থাকে, তাহা হইলে অপরাধের যে-কোনও বিষয় লোকে উপেক্ষা করিলেও এখানে নিরাপার তিরক্ততা অধিক বাস্তব্য বিচলিত হইয়া উঠে।

অবস্থা আন্তর্য বাহিরে চলিয়া বাইবার সকল লক্ষ্য প্রকাশ পাইতেছে। বাহাতে ইহার সুযোগ লইয়া সাময়িকি-ক্ষেত্রে অস্বাভি-সরীর সুযোগ না থাকে তাহার বিকল জনগোণ দিবার সময় উপস্থিত। যে উদ্বেগে এইসকল সরকারী

বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে এবং বাহার ভবন কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে, তাহা বাহাতে নিম্ন-সকল হয়, তাহাই সকলের কাম্য হওয়া উচিত। কাম্য বা সপিষ্কার পরে যে ভবন, ফল—তাহা যদি সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়া যায়, তবেই সকল

সিক বন্ধা পাইতে পারে। কার্যক্রমে দেখা বাইতেছে যে, সরকারী ব্যবস্থা বহুতর রূপে পরিণত করিয়াছে, কিন্তু তাহা ক্রমবিকাশ বলদের মতো, বাহা হাল টানে না, মাত্র মালিকের এক বাহিত সম্পত্তির অধিকারের পৌরবধান করে।

গুয়ারিশ

বামুদেব বাইতি

‘না—না হুজুর! ও আমার মা নয়—আমার মা নয়!’
জোড়ো-হাতে ছেলেটি কঁপে কঁপে বলে উঠল। কায়ের
কঠোর তার থেকে থেকে রোখে উঠেছে। একপ্রকার পথের
আতঙ্কিত সে। এক আসন্ন সর্বনাশের সম্ভাবনায় সে বিবর্ণ।
মুখে তার সে-ভাব স্পষ্ট।

‘না হুজুর, এ আমার ও মা, ওরও মা।’ শব্দ থেকে তার
চোখে বছর পাঁচেকের ছোট একটি ছেলে বলে উঠল। কঠোর
তার বলিষ্ঠ, প্রত্যহ-ব্যাক্ত ঐচ্ছার।

‘না—না হুজুর! ও আমার মা নয়, আমার মা নয়!’
আমার মা-বাণ কেউ নাই।’ বশক আরও শব্দ হবার
চেষ্টা করল নবীর। কিন্তু মূপে তার আতঙ্ক আরও পরিষ্কৃত।
হাত-জোড়ো করে তেমনি সে ঠাঁড়িয়ে রইল। হাকিমের
কাছে তার ব্যাখ্যা প্রার্থনা—এই রেকর্ডটির সে একমাত্র
স্বাধিকারী, রেকর্ডের প্রচার একমাত্র গুয়ারিশ। কাছেই
শুধু তার একার নামই এই রেকর্ডে বসবে।

পৈষর কোথেকে কেটে গেল। আন্নার নামে শপথ করে
ঠেড়িয়ে উঠল, ‘ইহা আন্না! কী মিথ্যাবাদী রে!’ এবং
সঙ্গে সঙ্গে নবীরের দিকে তেড়ে গেল, ‘এই মিথ্যাক, তোর
জিব বলে থাকে, তুই মোক্কে যাবি।’

‘এই চুপ!’ রেজিনিউ-অফিসার বশক দিলেন পৈষরকে,
‘এখানে এভাবে গালাগালি বিলে অধিমান হবে। স্থানিক
এটা কোর্ট?’ পৈষরের উত্তরে তিনি থামতে চাইলেন।

কিন্তু পৈষর থামবার পাত্ত নয়। সে আত্মে আত্মে বললে,
‘দার, ও যে মিথ্য। কথা—’

‘আবার!’ হেকে উঠলেন হাকিম।

এবার ভরুক কথার নাকই যেনে গেল পৈষর।

কলে রেজিনিউ-অফিসার বহুবাণটি আবার পড়তে
লাগলেন। মনে মনে। ‘তু দি কানবাই ছাহেব বরাবর...’

রেজিনিউ-অফিসারের ঠোঁটে হাসির রেখা খেল গেল।
‘কাহনগো স্যাহেব’ এই কথাটি দরখাস্তগুলিতে কত ভাবে যে
লেখা হচ্ছে, তার টিক-টিকানা নেই। এই বহুবাণে এটা
আবার সম্পূর্ণ নতুন। ‘...কালীবাড়ী মোড়ের নং নং পরচা
আবদুল হাইয়ের হইতেছে। তেনার ইস্তকাল হওয়ার
তেনার গুয়ারিশ তেনার পুত্র নবীর ও তেনার স্ত্রী গোলাচহারা
বিবি হইতেছে।’ অতএব হুজুরের কাছে নিবেদন যে
আমাদের মূলমন্ত্রন করায়ের মোতাবেক ঐ সম্পত্তির
তুই আনা আশের হুকুম আদি। নবীরের সঙ্গে আমার নাম
ঐ পরচায় রেকর্ড করিতে আজ্ঞা হয়...।’ এক ব্যাখ্যা
কালির নীচে লেখা—টিপসহি গোলাচহারা বিবি।

সাহেব এবার তাকালেন বিবির দিকে। গোলাচহারা
বিবি!

এ-বিবি সে-বিবি নয়। কল্পস্রোতের কিংবা বেগম-
মহলের সোমাক-ফুইকারিষ্ট সে-বিবি নয়...। এ-বিবির
চেহারায গোলাচহারা নামান্তরম নিরূপণ কোথাও নেই।
নোহা-ই ঈর্ষ-কুকোয়া দীর্ঘাধী এক প্রৌঢ়। মলিন বসে
ঘোমটা টেনে ধরেন এক কোণে ঠাঁড়িয়ে রয়েছেন। অতি
সাধারণ এক নারী।

এই নারীই এই বিষয়ের পাত্রী।

‘আপনি এই বহুবাণ করছেন?’ জিজ্ঞেস করলেন
হাকিম।

ঘোমটার আড়ালে মাথা হুইয়ে সমস্ত আনাল মেয়েটি।
সে-ই বহুবাণটি করেছে।

‘এই টিপ-নই আপনার?’

আবার মাথা নেড়ে সমস্ত আনাল মেয়েটি।

‘টিক আপনার তো? তেরে দেখুন।’

‘হ্যাঁ, আমার।’ অশ্রুত কথার দিল গোলাচহারা বিবি।

হাকিম এবার হাকিমী ডিক্টিংনার হাওয়াই চাড়লেন।
 ত্রিক অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কেনেছেন, এই বিবাসী পত্রগুলি
 দুলত: ভাল সেই ও ভাল টিপ-সইয়ের। 'পেয়ারবাই, ওর
 আত্মলের টিপ-সই নিয়ে এটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন তো।
 যদি না মিলে, পুলিশে সংবাদ দিন, বেধে নিয়ে যাক।'

হোসে একবারে খাটি ওখু পড়ে গেল। থোমটোর
 কণ্ঠে গোলচেহারা বোঁটু মুখ দেখা গেল, তা একেবারে
 পাণ্ডুরূপ হয়ে গিয়েছে। বলির পাঠির মতো কাপড়-
 কাপড়ে সে বলশে, 'হুজু, এ টিপ-সই আমার নয়। সরখাত
 আমি দিইনি, সৈয়ব গিয়েছে।' সে সত্যাকথা বলতো সত্যই;
 কিন্তু শুধু নিজেকে বাঁচাবার জন্য নিজের রক্তের সম্মানকে
 বিপদে ফেলে একটুও কাতর হল না।

কিন্তু পুত্রও ধাঁচতে চায়। মাকে বিপদে ফেলতে সেও
 একটু কাতর হল না। অগ্নের সঙ্গে সবেই যাবার দেহের
 সঙ্গে তার বেহের যোগ বে ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। 'না হুজু,
 ও-ই সরখাত গিয়েছে, ওর কথাগুলো সেবে দিয়েছি। আমাকে
 পুলিশে ধরিয়ে তেবন না, সার।' কোড়ো-হাতে কাতর
 নরমে সে তাকিরে হটল হাকিমের দিকে। সে বারেকের
 ভক্ত ও 'মা' কথাটা আর উচ্চারণ করল না।

'নবীর আগনার কে হয়—তলে?' হাকিম তপালেন
 গোলচেহারা হিটিক।

হুজুটে সে বীকারোক্তিক করল।

এব: মৃত্যু সঙ্গে নবীর কী বেনে বলতে চাইল; কিন্তু
 হাকিমের হৃদয়ে থেমে গেল।

'আগনি আবদুল হাইয়ের সম্পত্তির হুকুমার?'

মাথা চুইয়ে দাবি জানাল গোলচেহারা।

'আবদুল হাই আগনার কে?'

এবার অত্যধিক দুঃ ফেরাল সে এবং থোমটা আর একটু
 টেনে দিল; কিন্তু কোনো কথা বললো না।

কিন্তু কথা বলতে এগিয়ে এসে সৈয়ব, জবাব দিল, 'আবদুল
 হাই ওর ভগ্নে, সার।'

'না সার, কানের বয় ওর ভগ্নে।' প্রায় এককক্ষ
 হেঁটের উঠল নবীর।

এতক্ষণ পর্যন্ত একরকম চলছিল। এবারে বিপদে পড়ে
 গেলেন হাকিম। ওর সত্যিকারের স্বামীই বা কে, পুত্রই বা
 কে! তবে এই বিবাদের একটা স্তর বেনে তিনি বেধতে
 পেলেন। যদিও এর অর্থনিহিত হক কোনো পক্ষই উৎখাটিত
 করবে না। কাজেই তিনি তৃতীর পক্ষের দরখ নিলেন।

উপস্থিত গ্রামস্থানীদের কাছে এসে ব্যাপারটা তিনি

জানতে চাইলেন। তারাও এসেছে তাদের নাম রেকর্ড
 করতে। তাদের মধ্যে মোড়ল-গোছের মতক বৃদ্ধ এগিয়ে
 এসে বললো, 'সার, এসেছ দুজনের কথাই ঠিক। আবদুল
 হাইয়ের সাথে প্রথমে গোলচেহারা বিবির সাদি হয়েছিল।
 ব্যাবোব আবদুল হাইং মারা যায়। তখন ওদের ছেলে এই
 নবীর বছর পাঁচেকের হবে। নবীরক ছেড়ে শালিরে
 গোলচেহারা কানের বস্ত্রের দর করতে যায়। কানেরের
 সাথে ওর নিকা হয়। কানের ও গোলচেহারাের ছেলে হল
 সৈয়ব।'

'ও', ব্যাপারটা জরুরি করলেন হাকিম, 'কানের বেঁচে
 আছে?'

'না, গতবছর মারা গেছে।'

'মুসলমান আইনে গোলচেহারা তো আবদুলের সম্পত্তিতে
 হু'আনা অংশ পাবে। তবে নবীর তাকে মা বলতে
 স্বীকার করছে কেন?'

'না বলে স্বীকার করলে ওর সঙ্গে ওর মারও নাম রেকর্ডে
 বসে যাবে। আর ওর মার নাম বললে, কালেক্টই সৈয়ব
 নবীরের অধিতে জোর করে ফসল কাটবে। তাই সৈয়ব
 নাম বলতে চাইছে, নবীর বাণ্য দিচ্ছে।'

'সৈয়বের অধিতেও তো গোলচেহারাের নাম বলবে; যদি
 সৈয়ব নবীরের অধিতে ফসল কাটে, নবীরও সৈয়বের অধিতে
 ফসল কাটবে। কাজেই তো শোধ-বোধ হয়ে যাবে।'

'না, তা হবে না, সার। গোলচেহারা খাকে সৈয়বের
 কাছে। কামাই যাবার হু'আনা অংশের ভক্ত সৈয়ব নবীরের
 অধি দলন করবে এবং ফসল কাটবে।'

'ও:!' এককক্ষ ব্যাপারটা বেনে পরিহার হল হাকিমের।

'আজ্ঞা, সৈয়বই বা এই সামান্য অমির ভক্ত এখন করছে কেন?
 এরা তো পশরার ভাই-ভাই।'

'সার, আমাদের মুসলমানের মুখপুটেও যে ভাগ পায়।
 দার যেখানে হুকু আছে, এক্ষবিলুও হুকু সে ছেড়ে দেবে না।
 এইজন্যই তো আমাদের মধ্যে এতো মাথাঘাতি, কাটাফাটি।
 আবদুলের জমিতে গোলচেহারাের অংশ বললে কালই একটা
 খুনোখুনি ঘটবে।'

'খ্যা।' বিষয়ে ঠাকুরক উঠলেন হাকিম, 'সে কী?'

'কালেক্টই সৈয়ব লাঠি-লড়কি নিয়ে খান কাটতে যাবে।'

'এইটুকু বাঁচা আবাব খুনোখুনি করবে কী?'

'বাঁচা সাপেরই তো বিধ বেধী, সার।' হাদিমুখে জবাব
 দিল মোড়ল।

ভক্ত জাব্বানের মতো কোড়ো-হাতে এককক্ষ থাকিলেন

ছিল নবীর, ভীত শব্দাকুল চিত্রে। এখানে সে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল, 'ও আমাকে কেটে ফেলবে সার, মার মাম বলায়েন না।' বলে সে হঠাৎ বলে পড়ে হাকিমের পা ভড়িয়ে দরল, 'আমাকে বাঁচান, সার!' ভীষন ও সম্প্রতি হকার আকুল আবেদন তার চোখে মূগে।

'আ! একি করছিল? পা ছাড়া?' বিরক্ত হলেও কিসের একটা। সবাবলনার হাকিম তাকে আর কিছু বললেন না। তিনি নিজে নবীরের হাত ছাড়িয়ে দিলেন। তারপর সাধনার হয়ে বললেন, 'কাঁদিল না। ও তোমার মা নয় তো, বেশ, ওর মাম বলাব না।'

'না সার, ও-ই আমার মা।' চোখ মুড়তে মুড়তে কী যেন ছেবে হঠাৎ বলে বলল নবীর।

এবার বিম্বিত হল সবাই। আর হাকিম বিম্ব-বিম্বারিত নেড়ে তাকালেন নবীরের দিকে।

'ত্যা সার, ও-ই আমার মা, আমার মতো হতভাগ্য কেউ নাই। আমার হৃৎকের কথা স্মার করে শুভন, সার।' বলে সে চলছিল চোখে তার বকিত ভীষনের কাহিনী বিবৃত করল:

'বাগড়ানের মরার কদিন পরে মা আমাকে ছেড়ে পালায়। ছ'দিন আমি কেঁদে কেঁদে কাটাই। একমুঠো কিছু খেতে পাইনি। কে আছে যে খেতে দেবে? তাইশর আমোদের পাড়ায় হাকী-সাহেব আমার কঠ দেখে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। সেই থেকে আমি তার বাড়িতে থাকি। তার বাড়ির গল চরাভাম, কাগ্ন করতাম। হাকী-সাহেব আমায় ভবি দেখাশোনা করত, গমিয়ারের খালানা আগাত। গভবহর আমার এই ভবিতে ঘর তুলে দিল, তারপর আমার মাদি দিয়ে বললো,—এবার কুই তোর ঘরে যা, বংসার কসু, আমার বাড়িতে আর থাকতে হবে না। গত রমজানের সময় হাকী-সাহেবের ইন্তেকাল হল।' চোখ মুছে নিয়ে আবার সে আরম্ভ করল, 'আর ও-ই আমার মা। এয়ে তো দেখা হয়। কোনদিন আমাকে ছেলে বলে ডাকেনি, একদিনও আমাকে ডেকে বাওরাখিনি। পথে দেখা হলে 'মা বলে ডেকেছি, বা কবা না বলে খুব দুখিয়ে চলে

যেত, তাজাতাকি আমার কাছ থেকে পালিয়ে যেত। আর হাকী-সাহেব মাই তাই আমার গরুর, আমার ভমির ভাগ নিতে এসেছে, হার আলা।' উপর দিকে তাকিয়ে সে ঈর্দগাস ঢাকল, 'সার, সামান্য তো ভবি, আমি চাই না। লইটাই মার নামে লিখে দিন। এসল ছেড়ে আমি চলে যাব। গভর আছে বপন, যেখানে হোক পেটে পাব।' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে বাবার গল্প শে পাড়াল।

আর এদিকে আর-একটা ঘটনা ঘটে গেল।

'না...না, নবীর ঘাসু না, বসুনা রে!' আকুল ক্রম্বে গোপাডেহায বিবি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'লতি আমি তোমার মা নয় রে, মা নয়! হচ্ছুর ওকে সব ভমির দিয়ে দিন। আমি ওর মা নয়।' ঝাঁচলে চোখের জল মুছে আবার হুক করল, 'ধদি ওর মা হতাম, তাহলে কেন আমি ওকে পুরে বলে ডাকিনি, কেন আমি ওকে বুক তুলে নিইনি।' খেমে আবার সে চোখ মুছল এবং কী যেন ভাবল, 'আমি যে হতভাগী, আমার অভিশাপ আছে আমার উপর। তাই তোকে রাতার দেখতে শেলে বুক দেবার গল্প আকুল হয়ে উঠতাম, শুভন ভরে পালিয়ে যেতাম। লৈংবের বাগড়ানের বাগ্ন ছিল,—হুই যদি নবীরকে বেটা বলে ডাকিস্, তাকে আমি ভালক দিয়ে রেব। ভালাকের ভবে, শুধু ভালাকের ভবে নিজের পেটের হেলেকে আমি বেটা বলে ডাকতে পারিনি।' খেমে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল সে। এক চরম মাকদিকতার এই হতভাগ্য জননী তার অভিশপ্ত মাতা-ভীষনের বেদনাময় কতকে উদ্ঘাটিত করল।

সারা ঘর বিম্বরে ছেয়ে গেল। সবাই নিস্তব্ধ নিস্তপ, কিন্তু চেতনা স্পষ্ট হবার মতো অবস্থা নবীরের—সে হঠাৎ অবভাবিক রকমে চেঁচিয়ে উঠল, 'মা—মা গো!' বলে সে ছুটে দিয়ে মাকে ভড়িয়ে দরল। মার মুখের দিকে চেয়ে আকুল কঠে অহনয় করল, 'মা গো! কিরে চল আমায় কাছে, কিরে চল!'

আর হতভাগ্য জননী তার হতভাগ্য পুত্রকে বুক চেপে চোখের জলে ভেসে গেল। লজ্জা-সহম-মাক্র তার কোথায় উলিয়ে গেল! তুলে গেল স্থান-কাল।

মনে পড়ে

ত্রিবিলাচরণ দেব

ত্রয়ো

বাংলায় রুটিন-শাসন-শোষণ-বিরোধী অভ্য-
শানের মুখে যে তিনটি 'মানুষ'কে দেখিগাছিলাম,
তাঁহাদের কথা আজ বলিতেছি। কোনও 'হাউল'
বা 'লেজুড' বা 'উপ'-নাম দিব না। এইগুলি
অনেক সময় বস্তুতঃ বিপরীতার্থবাচী। বলিলেই
মনে পড়ে 'শিশুপালবধ', সর্গ ১৫, শ্লোক ১৭।
কৌতূহলী পাঠক দেখিয়া লইবেন।

প্রথম 'মানুষ'—'ডন সোসাইটি'র সতীশ
মুখুজো। তাঁহার সারিধা পাইবার সৌভাগ্য হইয়া-
ছিল; কিন্তু বারকতক নাত্র। তাঁহার শাস্ত্র সৌম্য
মুষ্টি, ঈষৎ বিধঃ ভাব আজও চোখের সামনে
দেখিতেছি। তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার কথাবার্তা
শুনিয়া চলিয়া আসিবার সময় মনে হইত যে, বেশ
কিছু জ্ঞাতব্য লাভ করিয়া চলিলাম। একদিনের
কথা বলি। তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বেশ আরম্ভ
হইয়াছে। আমি বি. এ. ক্লাসে পড়ি। তিনি
বলিলেন মানবের সমস্ত সত্তার ফ্রিয়া তিন ভাগে
ভাগ করা যায়—Knowing, Feeling, Will-
ing (মনে পড়িল আমাদের পাঠ্য ছিল Sully's
Psychology—তাঁহার তিনটি প্রকরণ যথাক্রমে
উক্ত তিনটি)। তিনি বলিলেন, খুব শাস্ত্র সমাহিত
চিত্তে না থাকিলে Knowing অর্থাৎ জ্ঞাতব্য
বিবয়ের বধ্যাধ উপলব্ধি হইতে পারে না। যদি
চিত্ত কোনও রূপে বা পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হয়,
তাহা হইলে অবস্থার বধ্যাধ উপলব্ধি অসম্ভব।
এই উপলব্ধির পর আসিবেই Feeling, অর্থাৎ
'ভাব'। যাহা আমি উপলব্ধি করিলাম তাহা
আমার পক্ষে প্রিয় বা অপ্রিয়, বাঞ্ছনীয় বা অবাঞ্ছনীয়
ইত্যাদি। এই ভাবই তৎক্ষণাৎ কর্মপ্রবৃত্তি আনিয়া
দেয়। ইহাই Willing, অর্থাৎ উপলব্ধ বস্তু বা

অবস্থা প্রিয় হইলে তাহাকে স্বাক্ষরী করা বা তাহার
পুনরাগমনের ব্যবস্থা করা; অপ্রিয় হইলে, তাহার
শেষ করা বা পুনরাবৃত্তি-নিরোধ সম্বন্ধে চেষ্টা করা।
এ অবস্থায় যদি 'ভাব' প্রবল হয়, ভাবের আভিষা
হয়, তাহা হইলে সমস্ত সত্তাকে অবসর করিয়া দেয়,
বোধশক্তিকে ও কর্মশক্তিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া
দেয়। এষ্টরূপ ভাবাভিষা বা ভাবপ্রবণতা কর্মের
ও কর্মশক্তির পরিপন্থী। দেখা যায়, যেখানেই
ব্যক্তির বা ব্যক্তিরই হউক, বা সমাজ বা সমষ্টির
হউক—ভাবাভিষা, ভাবপ্রবণতা বা ভাবালুতা বেশী,
সেখানেই উহার পরিমাণানুসারে মানুষ অকর্ম্ম
হইয়া যায়, সারাক্ষণ যেন বেশার আবিষ্ট হইয়া
ভাবের স্বপ্নরাজ্যে বাস করে। কোনওরূপ কার্য
করিতে চাহে না, কারণ তাহা হইলে এই 'ভাব-
রাজ্য' হাক্সা খাইয়া ভাঙিয়া পড়িবে।

আমার মনে হইল এই কথা দ্বারা সতীশ
মুখুজো আমাদের বাঙালী জাতির প্রধান দোষ
চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। আমি
বুঝিলাম তিনি বলিতে চাহেন যে, শাস্ত্র সমাহিত
মনে নিজের আভ্যন্তরিক ও বাহিরের পারিপার্শ্বিক
অবস্থা দেখিয়া ঠিক-ঠিক উপলব্ধি করে, তাহাতে
তোমার মনে কোনও-না-কোনও প্রকার ভাবের
উৎপত্তি অবশ্যজ্ঞাবহী। কিন্তু ঐ ভাবকে এত প্রবল
হইতে দিয়ে না, যাহাতে সে তোমার ঘাড় ভুঁতের
মতো চাপিয়া ধরে। ভাবগ্রস্ত হইয়া কর্মশক্তি
হারাইয়ো না। ভাবগ্রস্ত হইলে বিবিধিগ্ন জ্ঞানশূন্য
হইয়া পড়িবে। তাহা নানা অনর্থের মূল। এই
কথাগুলি আমার মনে দৃঢ় রেখাপাত করিয়াছিল,
সেইজন্য আজ পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশী পরে ইহা
মনে পড়িতেছে।

দ্বিতীয় 'মানুষ'—সুরেন বাবুজো। ইহাকে

যশেট দেখিয়াছি এবং বক্তৃতাও কিছু শুনিয়াছি। কিন্তু ইহার সহিত সাক্ষাৎ-সান্নিধ্য পাই নাই এবং পাইবার চেষ্টাও করি নাই। তাহার একটি কারণ, আমার নিকট খবর পৌঁছিয়াছিল যে একটি ছাত্র-শ্রেণীর লোক তাহার একান্ত 'ভক্ত' হইয়া পাড়িয়াছে এবং সর্বক্ষণ উহার সঙ্গে সঙ্গে একান্ত দাস্তভাবের সহিত থাকে। উহাকে প্রথমে 'Shadow of Surendra Nath' আখ্যা দিয়া পরে আসল ব্যাপার জানানি হইলে উহা পাড়ায় 'Shadowing Surendra Nath'। এই লোকটির জন্তই সুরেন বান্দ্যজ্যের সহিত সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা দমন করি।

সুরেন বান্দ্যজ্যের তখন আখ্যা ছিল 'Uncrowned King of Bengal'। বস্তুতঃ একদিন প্রাতে দেশে শুদ্ধ লোক শোকে মুহুমান হইয়া পড়িল—খবরের কাগজে Banner headline দেখা গেল—'Surendra Nath Banerjee killed in motor accident'। সত্যই বজ্রবজ্র রোডে একখানি মোটর উল্টাইয়া গিয়া তাহার আরোহী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন্ত দগ্ধ হইয়া মারা যান। পরে যখন খবর বাহির হইল যে, এই সুরেন্দ্রনাথ একজন পাট-ব্যবসায়ী, তখন দেশের লোক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। এ ঘটনা আমার বেশ মনে আছে।

এইখানে বলি—সুরেন বান্দ্যজ্য যখন তাহার জীবনের শেষপ্রান্তে ইংরাজের চাকরি স্বীকার করিলেন তখন তিনি অনেকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। লোকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, SURRENDER Nor has become Sir Surrender। আর Browning-এর বিখ্যাত কবিতা *The Lost Leader* খবরের কাগজে প্লেবের সহিত উদ্ধৃত হইল।

সবই ঠিক, কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, সুরেন বান্দ্যজ্যই আমাদের জাতির ও দেশের অগ্রগতির পুরোধ। তিনিই আদর্শ করেন ইংরাজ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অবশ্য

প্রথম-প্রথম 'অবেদন ও নিবেদনের থালা'। পরে যাহা অবশ্যস্বাভাবী হইল। লোকে বৃষ্টিল বাবকে কুঁড়োজালি দেখাইলে বা খেল-করতাল শুনাইলে বা তাহাকে ক্রায়ের তর্ক বুঝাইলে কোনও কাজ হয় না।

সুরেন বান্দ্যজ্যও উহা বৃত্তিয়া উপায় স্থির করিতে লাগিলেন কি করিয়া ইংরাজকে এরূপ স্থলে আবাস্ত করা যায়, যাহাতে সে শক্তিশীন হইয়া পড়িবে। তিনি বহুবিধ ছিলেন। কাজেই তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে, ইংলণ্ডের রাজ্য তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালে যখন আমেরিকায় ইংরাজ ঐপনিবেশিক-দের সঙ্গে ইংলণ্ডের বিরোধ বাধে, তখন তাহারা ইংলণ্ডকে দ্রুত করিয়াছিল ইংলণ্ডে প্রস্তুত পণ্য বর্জন করিয়া। আর একটা ঐরূপ কথা তিনি জানিতেন বলিয়া মনে করি। কিন্তু সাধারণ্যে উহা সরূপ জানিত নহে বলিয়া সংক্ষেপে বলিতেছি। ব্রিটিশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে Lesage নামে একজন ফরাসী ঐপন্যাসিক *Gil Blas* নামে একটি উপন্যাস লেখেন। আমার বোধ হয় উহা সাধারণ্যে খুব পরিচিত নয়। উহাতে প্রায়শ্চৈই একটি গল্প আছে। ঐ গল্প সংক্ষেপে এইরূপ—দুইজন ছাত্র রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে ক্রান্ত হইয়া গরু-ছাগল প্রকৃতির জন্ত জলাধারে হাড়মুখ ধুইয়া বিজ্ঞান কার। তখন একজন দেখে যে, জলাধারের নিকট বিস্তৃত একটি প্রস্তরখণ্ডে কি লেখা আছে। তখন সে তাহার সঙ্গীকে অগাধিয়া যাইতে বলিয়া পরে সেই প্রস্তর-খণ্ডের উপর দেখাটি চল দিয়া ধুইয়া দেখে যে, উহাতে লেখা আছে—ইহার নিয়ে প্রোথিত আছে Pedro Garcias-এর আত্মা। কবরের উপর পাথরে খোদা থাকে যে—এখানে প্রোথিত আছে অমুকের দেহ। সে ভাবিল, এ বেশ মজার কথা। দেখকেই প্রোথিত করে, আত্মাকে প্রোথিত করা কখনও শুনি নাই। এই ভাবিয়া সে পাথরখানি উপড়াইয়া ফেলিল। তখন দেখিল, পাথরের নিম্নে প্রোথিত একইাড়ি স্বর্ণমুদ্রা। এই স্বর্ণমুদ্রাগুলিই Pedro Garcias-এর আত্মা। ইংরাজও এইরূপ।

দোকানদারের জাত। টাকাই ইহার আশা। ইহাতে যদি যা দেওয়া যায়, ইংরাজ কাবু হইবে। এই সমস্ত ভাবিয়া সুরেন বাহুবোঝা বিলাতি-বর্জন ওরফে ‘বয়কট’ প্রস্তাব করেন। এখন মনে করিলে বিশ্বয় বোধ হয় যে, ভারতের তৎকালীন নেতারা প্রত্যেকে (একজন ছাড়া) ইহার বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন— কারণ তাঁহাদের আশঙ্কা ছিল যে, তাহা হইলে ইংরাজ ক্ষেপিয়া যাইবে (এ আশঙ্কা যে অমূলক নহে, ইহা শীঘ্রই প্রমাণ হইয়া যায়)। এই ‘একজন’—টিলক। ইনি সুরেন বাহুবোঝার প্রস্তাব সমর্থন করেন। এই বয়কটের ফল এখন সর্বজন-বিস্তৃত। এ বিষয়ে বেশী বলার প্রয়োজন নাই। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়াই টিলকের সহকর্মী গোখলে বলিয়াছিলেন—“What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow”। হুর্ভাগ্যের বিষয় এই কানেই আবার শুনিতে হইল—Bengal knows only to weep! এইজন্যই সুরেন বাহুবোঝা আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া আমি মনে করি।

তৃতীয় ‘মামুষ’ হইতেছেন অরবিন্দ ঘোষ। ইহার সহিত আমার সাক্ষাৎ কয়েকবার হইয়াছিল ৬ককুমার মিত্রের বাটীতে। তাঁহার সন্মুখ ব্যবহার তুলিব না। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল “বিদূষ ইব পাবকঃ” “বিধুমোহয়িবিব জলন্”। আমার বড় ভালো লাগিয়াছিল। দেশের, তথা জাতির চুইদেব, তাঁহার উদ্দিষ্ট কর্মে বাধা পড়িল। তাহাতে তিনিও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে তিনি ‘ঐশ্বরবিন্দ’ হইলেন।

এই ত্রয়ী, অর্থাৎ সতীশ মুখোজা, সুরেন বাহুবোঝা ও অরবিন্দ ঘোষ—এই তিনের মধ্যে একটি সন্তানগত সাদৃশ্য আমি দেখিতে পাই—রজোগুণের স্বর্ণপুত্র ধারা তিনজনই ওতাপ্রোতভাবে জড়িত ও গ্রথিত। প্রত্যেকেই বুকিয়াছিলেন যে, রজোগুণ অবলম্বন ব্যতীত জাতির ও দেশের কোনও আশা নাই। এই রজোগুণই তমোগুণের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমাদিগকে তমঃ হইতে উপরে টানিয়া তুলিবে ও সবগুণের নিকে লইয়া যাইবে। তমোগুণের অচল মূঢ়তা ও সবগুণের শাস্ত্ব স্বৈর্য হঠাৎ দেখিলে একই জিনিস বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রজোগুণের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও আঘাতে ইহাদের পার্থক্য পরিষ্কার বুঝা যাইবে এবং তমোগুণ হইতে পরিত্রাণ সম্ভব হইবে। এজন্য রজোগুণ সর্বপ্রথমে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহা আশ্রয় অবশ্য অবশ্য আবশ্যক। এই কথা এই ত্রয়ীর প্রত্যেকের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছি।

পরে অরবিন্দ ঘোষ ‘ঐশ্বরবিন্দ’ হইলেন। ‘ঐশ্বরবিন্দ’ অসংখ্য ভক্তের নিকট করজোড়ে কমা প্রার্থনা করিয়া বলি যে, অরবিন্দ ঘোষের স্মৃতি ও ‘ঐশ্বরবিন্দ’ের জন্ম আমার দেশের ও জাতির হুর্ভাগ্য। আমার কাছে অরবিন্দ ঘোষের উজ্জল দীপ্তমূর্তি বিধুম অগ্নির দ্বায় আভাও পকাশাধিক বৎসরের পরও শোভা পাইতেছে এবং ‘ঐশ্বরবিন্দ’ আমার কাছে smug মাত্র। আমার এই মত প্রকাশের জন্য কেহ যদি আমাকে গালি দেন, আমি নাচায়। আমি যাহা ঠিক বলিয়া মনে করি, আবশ্যক বোধ করিলে, তাহা আমার প্রকাশের অধিকার আছে এই বিশ্বাসে ইহা লিখিলাম।

প্যারীচাঁদ মিত্র : বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যে

অধ্যাপক জীবিতেন্দ্রলাল নাথ, এম. এ.

সাম্প্রতিক কালে বাঙালী শিক্ষিত ও সাহিত্যিক মহলে প্যারীচাঁদ মিত্র শুধু যাত্রা 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর অল্পই 'স্বরণীয় হ'বে আছেন। কিন্তু এই অসামান্যকর্মী পুস্তকসিংহ বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে অবিস্মরণীয় কীর্তি রেখে গেছেন তার খবর আজ অনেকেই রাখেন না। সে সবকিছু কিছুটা আলোকপাত করাই বর্তমান প্রত্যয়ের প্রধান লক্ষ্য।

ইংরেজীতে থাকে বলে 'dynamic personality', প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন সে-রকম একটা 'dynamic personality'। এখন প্রকৃতিচক্রে প্রস্তুত প্রতিভা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিরল। প্রতিভার ধর্মই হলো জগৎ ও জীবনের নৃতন ও অনাবিলম্বিত ক্ষেত্রে সার্বকভাবে পদচারণা। দেহজ প্রতিভাবান ব্যক্তি জীবনে যা পেয়েছেন তাকে পক্ষান্তে ফেলে জীবনে যা অপ্রাপ্য, যা হৃদয় তার পক্ষান্তে চিরকাল খাবিত হয়েছেন। আবার হৃদয় যখন নিকটবর্তী হবেছে তখন আবার তাঁর বক্তা সুরু হয়েচে— 'for fresh fields and pastures anew'। প্যারীচাঁদের জীবনে এ সত্য বিভাবে বাস্তব রূপ পেয়েছিল তাই আমাদের আলোচ্য।

১১।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে—মিনটা কেমন দাবে, সকালবেলাতেই তা টের পাওয়া যায় ('Morning shows the day')। প্যারীচাঁদ যখন হিন্দু-কলেজের ছাত্র (১ই জুলাই, ১৮২৭)।^১ তখন তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার প্রথম লক্ষণ দেখা গেল। অল্পপাত্রেরে যখন তাঁর অশারদীপিতা, সাহিত্যে তেমনি গভীর অন্বেষণ তাঁর শিক্ষকের বিম্বিত করলো। অতের শিক্ষক টাইলর-মাহেব অল্পপাত্রেরে তাঁর অনগ্রসরতা দেখেও তাঁকে আশ্চর্যকভাবে ডালোবাসলেন এবং উৎসাহিত করলেন।^২ এ উৎসাহ প্যারীচাঁদের শিক্ষা-জীবনে কার্যকরী হলো। প্যারীচাঁদ যখন হিন্দু-কলেজের ছাত্র তখন হুশিয়ার-কোটের জজ প্রসিড-মাহেব

প্রতিযোগিতাবল্লব একটি প্রবন্ধ রচনার জন্য ছাত্রদের মধ্য হ'তে একটি লেখা আহ্বান করেন। "প্যারীচাঁদ এই প্রবন্ধ লেখেন, বাক্য দিগম্বর হিতও প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু প্যারীচাঁদ অলপাত করেন, পুরস্কার পান।"^৩ প্যারীচাঁদের রচনা-পত্র ও পাণ্ডিত্য ছাত্র ও শিক্ষক মহলে বীজিত হলো।

হিন্দু-কলেজে প্যারীচাঁদ কত বৎসর পড়েছিলেন তা সঠিক জানা যায় না। তবে মনোী চিত্রোক্তিও প্রতীতি ব্যাভিনাথ অধ্যাপকের অধ্যাপনা যে তাঁর মানস-বিকাশে সহায়তা করেছিল তা খুবই সন্দেহ।^৪



প্যারীচাঁদ মিত্র

^১ সাহিত্য সাধক চরিত্রমালা, ২য় খণ্ড, প্যারীচাঁদ মিত্র—স্বল্পভাবাপন্ন অধ্যাপক। পৃঃ ৩

^২ স্বল্পভাবাপন্ন লেখক—হরিদাসেন সুখপাধ্যায়। পৃঃ ২৭৭

^৩ স্বল্পভাবাপন্ন লেখক—হরিদাসেন সুখপাধ্যায়। পৃঃ ২৭৭

^৪ সাহিত্য সাধক চরিত্রমালা, ২য় খণ্ড, প্যারীচাঁদ মিত্র—স্বল্পভাবাপন্ন অধ্যাপক। পৃঃ ৩

প্যারীচাঁদ যখন হিন্দু-কলেজের ছাত্র তখন তিনি জনসাধারণের ইংরাজী শিক্ষার জন্য নিজ বাড়িতে একটি অর্ধ-ইন্দিক স্কুল খোলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিরের *On the Progress of Education in Bengal—Transaction of the Bengal Social Science Association, Vol. I, 1867*-এ এ কথার উল্লেখ আছে। প্যারীচাঁদের মন ছাত্রাবস্থাতেই বিভ্রাৎ মদ্য-সচেতন হ'য়ে উঠেছিল, এ ঘটনাই তাঁর প্রবোধ।

১২৪

এর পর আরও হাশো বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদের কর্মজীবন। ১৮৩৪ খালের ডিসেম্বর মাসে প্যারীচাঁদ কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হলেন। এখানকার চাকরি তাঁর জ্ঞানার্জননের পক্ষে খুবই সহায়ক হলো। অল্প সময়ের মধ্যেই অস্বাস্থ্য কর্মজীবন ও সত্যতা গুণে তিনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সে-এখানকার সেক্রেটারি ও লাইব্রেরিয়ানের পদে উন্নীত হলেন। তখন তাঁর মাসিক বেতন হলো একশো টাকা। তৎকালে যে-কোনো দক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এ মাসিক আয় উপেক্ষীয় ছিলো না। কিন্তু উচ্চ-স্বাস্থ্য প্যারীচাঁদ এ ধরারাম্য আয়ে সম্মত থাকতে পারতেন না। শীঘ্রই চাকুরি ছেড়ে তিনি স্বাধীন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। এখানকার কর্ম ত্যাগ করলেও এখানকার-কর্তৃপক্ষ তাঁর অকৃত্রিম এখানকার-সেবার জন্য তাঁকে অবৈতনিক কিউরেটর এবং লাইব্রেরির-ও গিলের সমস্ত নিয়োগিত করেন। এ সম্মান চাকুরি-জীবনে প্যারীচাঁদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর সন্দেহ নেই।

ভাবগুরুত্ব ও অস্বাস্থ্য দৃষ্টিভঙ্গী আশ্বাসের দোষের অনেক সাহিত্যিকের জীবনে বিকলতা এনেছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু প্যারীচাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেজন্য স্বাধীন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বেশেও জীবনে তিনি সফলতা অর্জন করলেন। লন্ডনের দক্ষিণে তাঁর জীবনে এসে গিলো প্রাচুর্য। ক্যালকাটা পাব্লিক লাইব্রেরির সাহ-লাইব্রেরিয়ান থাকার অবস্থায়ও তিনি তারিফের শ্রেষ্ঠ ও কালচাঁদ চক্রবর্তীর সঙ্গে আশীশার রূপে আমদানি-কর্ত্তান ব্যবসায়ের লিপ্ত ছিলেন। চাকুরি ছাড়ার পরে তাঁর আশীশারের বৃত্তা হ'লে প্যারীচাঁদ স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে থাকেন এবং অস্বাস্থ্য পরিশ্রম ও সত্যতাগুণে প্রচুর বিত্তের অধিকারী হন। সমসাময়িক ইংরাজ ব্যবসায়ীরাও তাঁর সত্যতার জন্য তাঁকে অত্যন্ত প্রভা করতেন। একে ইন্টার্ন হোটেল কোম্পানি প্রভৃতি কয়েকটি বিখ্যাত বিনিময় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও কয়েকটি

চাকোম্পানি তাঁকে বোর্ডের সদস্যরূপে মনোনীত করেন।

এ অস্বাস্থ্যকরী পুষ্টিবের অসাধারণ কর্মক্ষমতা ও সত্যতার কথা ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়লো সরকারী ও শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে। তৎকালীন বড়লোক ডাংলহোমি পুলিশ-সংস্থার উচ্চেষ্টে বে কমিশন বসান—বহু ইংরাজ ও দেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে তিনি সে কমিশনে সাক্ষ্য দেন। সেই বৃষ্টি শাস্ত্রাচার্যদের সমুদ্বিগ্ন হুগে সরকারী পুলিশের অপরোধ বর্ণনা করে প্যারীচাঁদ নিভীকভাবে বে সাক্ষ্য দেন তা সকলেরই প্রশংসা অর্জন করে। তাঁর এই সত্য-উদ্ঘাটনের ফলে অনেক পুলিশের চাকরি পর্যন্ত যায়।

প্যারীচাঁদের বুদ্ধি কত সুবধার ছিল, মিথ্যে কত গভীর ছিল, এবং ব্যক্তিগত কত প্রবল ছিল তা বোঝাবার জন্যই তাঁর এই বিস্তৃত কর্মজীবনের কাহিনীর অবতারণা। তাঁর প্রতিভার ছিল পরশপাথরের অসৌন্দর্য নক্তি—যা স্পষ্ট করেছেন, তাই সোনা হ'য়ে গেছে।

১০৫

জনসাধারণের ইংরাজী শিক্ষার জন্য ছাত্রজীবনে নিজ গৃহে প্যারীচাঁদ অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করে যে সমাজচেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন সে-সমাজচেতনা নানা দায়ের বিকশিত হ'য়ে উঠলো তাঁর পরিণত বয়সে। তৎকালে কলকাতার যে-সমস্ত সামাজিক সাহা ছিলো তাদের সঙ্গে প্যারীচাঁদের কোনো-না-কোনো বন্ধন যোগাযোগ ছিলো :

“প্যারীচাঁদ বেখুন সোসাইটির সেক্রেটারী, প্যারীচাঁদ জীব-নির্ভরতা নিবারণী সভার সভ্য, প্যারীচাঁদ বেঙ্গল সোসাইটি সারেল এশোসিয়েশনের অবৈতনিক সেক্রেটারী, প্যারীচাঁদ কৃষি-সভার সেক্রেটারী; প্যারীচাঁদ বৃষ্টিপ ইতিহাস এশোসিয়েশনের আদি সভ্য”।^১ বৃষ্টিপ ইতিহাস এশোসিয়েশনের বন্ধন ছিল বৃষ্টিপ ইতিহাস সোসাইটি তখন প্যারীচাঁদ ছিলেন তার সেক্রেটারি। প্যারীচাঁদ সাধারণ জ্ঞানোপাধিকার সভার মুখ-সম্পাদক, এবং তত্ত্বাবোধিনী সভার সভ্য। “এ ছাড়া প্যারীচাঁদ বেঙ্গল প্রাইজ-সং-কবিতার সেক্রেটারী, প্যারীচাঁদ ডিষ্ট্রিক্ট চেম্বারেল সোসাইটির এবং কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির সভ্য। ১৮৬৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী হইতে ১৮৭০ সালের ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত প্যারীচাঁদ বেঙ্গল কাউন্সিলের সভ্য

^১ কলকাতা সংবাদ—হরিমান মুখোপাধ্যায়। পৃ: ২৭৮

ছিলেন। এই সময়ে তিনি ব্যবসায়িক সভায় জীব-নির্ভরতা নিবারণ উদ্দেশ্যে দুইখানি বিল লেখ করেন। ইহা এক্ষণে ১৮৮৭ সালের প্রথম এবং তৃতীয় আইন নামে অভিহিত। প্যারীচাঁদ অনাবাসি বেকিটের, প্যারীচাঁদ জার্মি অল্‌ দি শিল :—প্যারীচাঁদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য।”^১

শুধু সাধারণিক সংস্থা পরিচালনা বা সাধারণিক উন্নতি-মূলক বক্তৃতা দেওয়া প্যারীচাঁদের সমাজসেবতার একমাত্র পরিচয় বলা বলা চলে না। সমসাময়িক সাধারণিক সংস্থা নিয়ে তিনি অগ্রাঙ্কভাবে লেখনী-চালনা ও আন্দোলন করে চলেছিলেন এ সময়ে। ‘কলিকাতা রিভিউ’ নামক দৈনন্দিন্যকার একখানি বিখ্যাত ইংরেজী পত্রে প্যারীচাঁদ জমিদার ও প্রজা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এ প্রবন্ধে জমিদার-প্রজার সম্বন্ধ নিয়ে তিনি যে কত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন, তার প্রমাণ হলো—“বিলিতে এ প্রবন্ধ দৃষ্টই মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। পার্লামেন্টের কক্ষ সভ্যত্বও এই প্রবন্ধের কথা উঠে।”^২ ‘কলিকাতা রিভিউ’তে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলি গভীর পাঠিতা, গবেষণা ও চিন্তামূলকতার পরিচায়ক।

প্যারীচাঁদের মানসপ্রগতি কত বহুমুখী ছিলো, তাঁর কৃষি-সম্পর্কীয় জ্ঞানের পরিচয় হতেই তা আদর্য জানতে পারি। ১৮৪৭ সালে তিনি একিলাচলাবেল ও হট্ট-কালচায়েল সোসাইটি অফ ইতিহাস সম্বন্ধ নির্ধারিত হন। এ প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি দেশীয় লোকের মধ্যে জ্ঞান-প্রচারণার ক্ষমতা ছর বণ্ডে ‘ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ’ সম্পাদনা করেন (১৮৫৩-৫৬ সনে প্রকাশিত)। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ ‘কৃষিপার্স’ নামক পুস্তকখানি এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে *Agriculture in Bengal* নামক ঔর বিখ্যাত কৃষিবিষয়ক গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। কৃষি সম্বন্ধে তাঁর গভীর পাঠিত্যের বীজতিবরণ প্যারীচাঁদকে ১৮৫৭ থেকে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত *Agriculture and Horticultural Society*-র মহকরী সভাপতির সম্মানজনক পদে নির্ধারিত করা হয়। “১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এ প্রতিষ্ঠানে অনাবাসি বেকার নিযুক্ত হন; এ সম্মান বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম লাভ করেন।”^৩

প্যারীচাঁদের জীবনের এই বিস্তৃত পরিচয় হ’তে এ-সম্পর্কীয় পত্র হরে ওঠে, প্যারীচাঁদ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতা বিশিষ্ট ব্যক্তির অধিকারী ছিলেন না, তিনি ছিলেন বেন একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান (institution)। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালী সংস্কৃতি কত বিভিন্ন বিষয়ে অবলম্বন করে বিচিত্র দ্বারা আত্মপ্রকাশ করেছিলো—চিত্রা ও কর্মবীর প্যারীচাঁদের জীবন-সাপনা হ’তে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

১০১

প্যারীচাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টি-প্রয়াসও তাঁর বিচিত্রদর্শী কর্মধারার মতো বহুমুখী। তাঁর এক্ষেপত্রীর রচনার সৃষ্টি-প্রয়াস মূখ্য, আর এক প্রেমীর রচনাত্তে দে-মুগের সংস্কার-প্রচেষ্টা ও জ্ঞানচর্চায় পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন অধিকাংশ সাহিত্যসৌখ্যের মতো তিনি সমসাময়িক সাংবাদিক-পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বহু রাধানাথ নিকমারের সহযোগিতায় জনসাধারণ ও মহিলাদের উপযোগী ‘মাসিক পত্র’ নামক একখানি ক্ষুদ্রকার পত্রিকা সম্পাদনা করেন। নানা কারণে পত্রিকাখানি বাংলা সাহিত্যে অসংখ্য—দে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। এ মাসিকপত্র প্রকাশের পূর্বেই প্যারীচাঁদ ‘ইং বেলগদেশ’ মূল্যের ‘জ্ঞানার্থেব’ ও ‘বেগল শেক্ষেট্টের’ পত্রিকার পরিচালনা বাশায়ে বেষ্টে সাহায্য করেছিলেন। এই উভয় পত্রিকাতেই প্যারীচাঁদের জ্ঞানচর্চামূলক বহু রচনা প্রকাশিত হয়।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদের বিশিষ্ট কীর্তি ‘মাসিক পত্র’-সম্পাদনা। এ ক্ষুদ্রকার পত্রিকাখানির সম্পাদনার প্যারীচাঁদ যে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন তা ছিলো দেগালে একান্ত স্পষ্ট। ইতোপূর্বে মনোবী বিশ্লেষণের বাঙালী বীলোকদের মধ্যে শিক্ষাবিজ্ঞানে যে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিরাছিলেন, প্যারীচাঁদের প্রথম তার চাইতেও দুঃসাহসিক। এর কারণ, অনিশ্চিত বীলোকদের মধ্যে শিক্ষা-বিজ্ঞানের ছিলো বিশ্লেষণের সাংস্কার-প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য, আর অশিক্ষিত বীলোক ও জনসাধারণের মধ্যে সাহিত্য-পার্টের অনুরাগ-সংকরই ছিলো প্যারীচাঁদের ‘মাসিক পত্র’-প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য। এ ছাড়া পত্রিকাখানি দে-মুগের উচ্চ-বোজির সংস্কৃত ভাষারীতিতে বর্ণন করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষারীতিতে রচিত হতো। বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকমাত্রই জানেন প্যারীচাঁদের এই জীবন্ত ও গতিশীল ভাষাবোধ-প্রচেষ্টা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে স্রষ্টব্যপ্রায়ী কলপ্রয় হয়েছিলো। ‘মাসিক পত্রের’

^১ কলকাতার লেখক—বহিঃস্থানে সূচনাগত। পৃ: ২৭১

^২ কলকাতার লেখক— ২ ১ পৃ: ২৭১

^৩ লাহিড়ী সায়ক চরিত্রাল, ২৪ বঙ্গ-প্যারীচাঁদ মিত্র, পৃ: ১০

প্রত্যেক সংখ্যার আভ্যন্তরে এই পত্রিকা একাংশের উদ্দেশ্যে মুদ্রিত থাকতো এভাবে :

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের ক্ষমতা ছাপা হইতেছে। যে ভাষায় আখ্যাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচিত হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাহাদিগের নিষিদ্ধ এ পত্রিকা দেখা হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহার মূল্য এক আনা।"

এই 'মাসিক পত্রের' আঁহ ছিল পুণ বঙ্গদেশ—কেউ কেউ মনে করেন তিন বৎসর^১। ব্রজেনবাবুর মতে তার বৎসর (১৮৮৪-১৮৮৫)। কিন্তু কালটাই সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচারের পক্ষে বড় কথা নয়,—যদি দুইটুকী ও প্রচারিতকীতে স্বতন্ত্র থাকে তাহলে বঙ্গদেশের মধ্যেও কোনো বিশিষ্ট সাহিত্য-পত্রিকা সাহিত্য-জগতে জনস্বাক্ষর ঘটতে পারে—যেমন ঘটিয়েছিল পরবর্তীকালে 'সবুজ পত্র'। 'মাসিক পত্রিক' পার্শ্বে দেখা যায়, তবু এ পত্রিকার প্রাকৃত প্রকাশ-দীতি নয়, এ পত্রিকার প্রকাশিত সম্পাদকের সাংসারমুক্ত ও ও প্রান্ত্রিঙ্গ দুইটুকীও সমসাময়িক বঙ্গদেশী সাহিত্য-দেবীর দের্যার সমালোচনার পরতে পরিণত হয়েছিলো। সদস্যময়িক অন্তরঙ্গ সাহিত্যদেবী ঈশ্বর গুপ্ত যদিও প্যারীচাঁদের প্রান্ত্রিঙ্গ বহুবারেও সম্বন্ধ করেন না, তথাপি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩-শে নভেম্বরে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্যারীচাঁদের প্রতি 'দুন্দর'-লিখিত কঠিন সমালোচনাকে দ্বিকৃত করেন :

"...মাসিক পত্রিকা লেখকেরা এতদেবীর কতিপয় প্রণীত প্রকার প্রতিভুল অনেক অভিজ্ঞার লিখিয়াছেন, ঐ পুস্তক বহন সাধারণ বালকগণ ও মহিলাগণের পার্শ্ব প্রকাশ হইতেছে, তখন তাহাতে একবারে সাহেবী অভিমত সকল ব্যক্ত করা উচিত হয় না একথা অভিজ্ঞের ধর্ম্য বটে, কিন্তু ঐ পত্রিকা লেখকদিগের সকলেই সাহেবী বৈজ্ঞানিক ও তাহাদিগের লেখ্যাতও সাহেবী গন্ধ আছে, তাহার বিরুদ্ধে 'দুন্দর' প্রকাশকের একেবারে কইন্ডির ভাণ্ডার খুলিয়া বসি উচিত হয় না..."।"

'মাসিক পত্রিকা'র প্রকাশিত প্যারীচাঁদের বহুভাষ্যের বিরুদ্ধে 'দুন্দর'-সম্পাদক ও 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক

ঈশ্বর গুপ্তের প্রধান অভিযোগ এই যে—এই পত্রিকায় সম্পাদকীয় ও অন্যান্য রচনা পাশ্চাত্য-ভাষাগতী, অতএব সাধারণ বালক ও মহিলাগণের পার্শ্বে অপ্রযুক্ত।

বাহ্যবিক্রম 'মাসিক পত্রিকা'র সংযোগলি পড়লে দেখা যায়, এ পত্রিকার সরল ও সরল রচনার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যের মুক্তিবাদী ও সাংসারমুক্ত ভাবপ্রবাহ বেশ অগ্নিবল্য বাঙালীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার ক্ষমতা পুষ্টোপুষ্ট আছে। সে ভাবের মধ্যে সোজাঝুঁজি উপদেশ দেবার মূল্যতা নেই, আছে পার্শ্ব-পারিবার সঙ্গে গল্পকাহের অন্তরঙ্গ আনন্দের যোগ। সাংসারিক বাঙালী নারীর মনে মুক্তিবাদ ও সাংসার-মুক্তি জাগাবার ক্ষমতা কথাকার প্যারীচাঁদ আল্পর নিয়েছেন মনোময় গল্পের। প্রবন্ধের গোড়াতাই দৃষ্টব্য করা হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের সাধারণ পার্শ্ব প্যারীচাঁদকে কেবলমাত্র 'আলোচকের' মূল্য দেওয়া কল্যাণ বলেই জানেন; কিন্তু 'মাসিক পত্রের' সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী ও অন্তঃপুরের নারীর উদ্দেশ্যে লিখিত ছোট ছোট কাহিনীগুলি পড়লে, প্যারীচাঁদ তাঁর সাহিত্যিক রচনার সর্বত্রই যে শিল্প-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন—এ কথা স্বীকার করতে সক্ষম হবেন না। অবশ্য সে শিল্প অত্যন্ত অপরিশ্রুত—বাংলা সাহিত্যে প্রথম ব্রতীর শিল্পরচনা প্রকাশ—একথাও আশ্চর্যের তোলা উচিত নয়; উপাধেয়শব্দগুণ, ১৮৮৫ সালের ১৫ই মে 'মাসিক পত্রিকা'র প্রকাশিত—'ঐশ্বরী মনোমোহিনী দেবীর বিবাহ বিবাহ করিবার আগতি মুখিয়া যায়' নামক প্রথম প্রস্তাব পঠনীয়।

এ কাহিনীতে দেখা যায়, বিধবা মনোমোহিনী তার প্রেমিক ব্রজনাথ চক্রবর্তীর নিকট হতে বিবাহের প্রস্তাব-মুক্ত একবারি পত্র পেয়েছে। সেই "পত্র পার্শ্ব করিয়া মনোমোহিনীর সকল শরীর শিথিলতা উঠে, পরে স্থির হইলে মনে ভাবেন—আমি কি বিগড়ে পড়িলাম। ব্রজনাথ কেন আমাকে এমন পত্র লিখিলেন, তাঁর তো ইচ্ছা নয় আমার মন হ্রস্ব, অথচ বিবাহ করিলে আমি তো পাপপ্রাপ্ত হইয়া পঁড়াইব, ইহা অপেক্ষা মন আর কি হইতে পারে।"

এর পরে দেখা যায় প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে মনোমোহিনীর অন্তর কত-বিস্তৃত হয়ে উঠেছে। একবিক্রে তার বর্তমান প্রেমিক ব্রজনাথের আকর্ষণ, আর একবিক্রে তার মৃত স্বামী ভোগানার্থের ক্ষুধা ও হিন্দু-বিধবার সন্তান। এই টানা-পোড়েনে মনোমোহিনীর চিত্ত যে ক্ষীণ ভ্রমেছে তার চিত্র শিল্পী প্যারীচাঁদ অঙ্কিত করেছেন উজ্জ্বল রেখায় :

"এই প্রতিভা করিয়া মনোমোহিনী কতক কাল যৌনভাবে থাকেন। পরে ব্রজনাথের পত্রখানি পড়েন,

^১ He (Radhanath Sirdar) conducted with me a monthly magazine called "Maalik Patrika" for about three years.—A Biographical Sketch of David Hare (p. 39)—Peary Chand Mitra

পড়িয়া আবার বিবাহের দিকে মন যায়। এইরূপে দুইদা হইয়া কখন কখন, কখন গভীর হইয়া থাকেন, কখন বা কাঁঠোয়ালি হায়েন, কখন বলেন, বিবাহ করিব, কখন বলেন, না, বিবাহ করিব না, বিত্তীয় বিবাহে যথা পাশ। এই প্রকারে বিবাহের কথা উল্টু পালাটু করিয়া দেখিতে দেখিতে রাহি হইয়াই হইয়া বাজ...দিনা আহারে মনমোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে শূন্য করিতে যান, গুটীয়া কোড় হাতে পরমেশ্বরের দিকটু অরাধনা করেন—‘পরমেশ্বর, আমি অমলা নারী, আমার ধর্ম্মার্থ বোধ নাই, আমার স্বপ্ন মুখঃ তোমার হাতে, ছুনি বাহা করিবে তাহাই ছুইবেক, তোমার বাহা ইচ্ছা তাহা হইক, কেবল আমার ধর্ম্ম বজায় রাখিও। দেখিও যেন পরকাল নষ্ট না হয়।’

—মাসিক পত্রিকা, ১ নং ১১, পৃ: ১১৭

এ পর্যন্ত মনমোহিনীর কাহিনী খুবই ব্যস্তব্যস্ত—জীবন : মনমোহিনীর অন্তরের বিধার বেদনা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে; কিন্তু কাহিনীর শেষে প্যারীচাঁদ স্বপ্ন ও অলৌকিকের সমাবেশ করে মনমোহিনীর জীবন-সমস্যা-সমস্যাদানের গ্রন্থকে শেষেছেন। কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে দেখা যায়, মনমোহিনীর মৃত্যু বাতা নিঃশ্রিতা মনমোহিনীকে নির্দেশ দিচ্ছেন ব্রহ্মনাথকে খাবী হিসেবে গ্রন্থে করবার ক্ষমতা। স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীর পক্ষে বিত্তীয় বাবী গ্রহণ করা পাণের কাজ নয়। পাণের কাজ নয় এমনকি যে, স্বামী কর্তব্য থাকতে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হবেনা বলেই সকল স্ত্রী অস্বীকারবদ্ধ হয়, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরে এ অস্বীকার আর পালনীয় নয়। বিত্তীয়তঃ, স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রী তার অস্তিত্ব-বিভো বিত্তীয়তার বিবাহ করলে তাতে মৃত স্বামী ক্ষুধ হ’তে পারে না, কারণ মৃত্যুর পরে মাংস ছাড়া মৃত্যুরী হ’য়ে যায়—তার ঈর্ষা, হিংসা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম প্রভৃতি কোনো প্রযুক্তিই থাকে না।

এ কাহিনীতে প্যারীচাঁদের ব্যক্তিগত ও দৃষ্টিভঙ্গী সখ্যে প্রকাশিত। বিষয় লক্ষ্যবিশিষ্ট। প্রথমতঃ, এ গল্পের ভাষা পড়ে মনে হয়, বাংলা ভাষা ক্রমশঃ সজীব প্রাণের পার্শ্বে গতিশীল হ’য়ে উঠছে, যে গতিশীলতা ইতোপূর্বে কোনো বাঙালী লেখকের লেখায় দেখা যায়নি। বিত্তীয়তঃ, বাঙালী হিন্দু-বিধবার জীবন-সমস্যা-সমস্যাদানের ইঙ্গিত দেবার ক্ষমতা প্যারীচাঁদ কাহিনীর ব্যয় দিয়ে সৃষ্টিবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। বাঙালী বিধবার জীবন-সমস্যা-সমস্যাদানের সৃষ্টিবাদ অবশ্য বিভাগ্যগণের রচনারও ছিলো; কিন্তু সে আশোচর্য্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ—শিক্ষিত লোকের উদ্দেশ্যেই লিখিত। আর প্যারীচাঁদের সৃষ্টিবাদের আবেদন সরল-স্বচ্ছ কাহিনীর

মাধ্যমে অর্ধ-শিক্ষিতা নারীর মনেও। এ কাহিনী পড়ে একজন অল্পশিক্ষিতা বিধবা নারীও অতি সহজে তার জীবন-সমস্যা-সমস্যাদানের ইঙ্গিত দেখতে পারা। দেহজ বাঙালী বিধবার জীবন-সমস্যা-সমস্যাদানের বিভাগ্যগণের যদি প্রত্যেক হয়, প্যারীচাঁদ অন্তরঃ—বহিঃ সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টার দিক দিয়ে উত্তরের দৃষ্টিভঙ্গী প্রগতিশীল।

১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ সালের ‘মাসিক পত্রিকা’র বেণা যায়, প্যারীচাঁদ আর একটি কাহিনীর মাধ্যমে বিধবা-বিবাহ সমর্থন করবার প্রয়াস পেতেছেন। কাহিনীটির নাম : ‘হিন্দুবিধবার বিধবা-বিবাহের কথা। শুনিয়া ইংরেজদিগের বিবীয়া যথো নলে’। এ কাহিনীটি বীরহরি ও বিবী হাকিম নামক দুটি কাল্পনিক চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে রূপ লাভ করেছে। এ কাহিনীতেও দেখা যায়, কাল্পনিক বিবী হাকিম স্ত্রীলোকের বিধবা-বিবাহ সমর্থন করছেন নিয়মিত বুদ্ধিতে :

‘বিবাহ বিবাহ হইলে যে স্ত্রী-স্বামী সম্পর্ক হয়, তাহা পরকালে থাকে না, তাহার কারণ সেখানে আমরা এ দেহ লটকা থাকি। সেখানে এ দেহ নাই, সেখানে স্ত্রী-পুরুষেরও প্রভেদ নাই, সুতরাং এমন স্থানে বিবাহ কেবলমাত্র খোঁড়া হয় না। এইজন্য ইহকালে স্ত্রীলোকের দুই তিনবার বিবাহ হইলে তাহার পরকালের ক্ষতি হয় না।’

—মাসিক পত্রিকা, ১ নং ১১, ১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬, পৃ: ১৭

এ বিষয় কাহিনীতে দেখা যায় গল্পকার প্যারীচাঁদ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে পান্ডিত্য বুদ্ধিবাদী মতবাদ সমকালীন বাঙালী নারীর মনে সঞ্চারিত করে দেখান চেষ্টা করছেন।

তদুপরি সমকালীন সমাজের উল্লেখযোগ্য বিধবা-বিবাহ সমস্যা নিয়ে নয়, প্যারীচাঁদ পান্ডিত্য বিবাহিত নারীর পত্নীত্বের আশ্রয় (ঐক্য) : ‘স্বামী কহেন হইয়া সেপান্ডর হইলে তব পত্নীও মুখঃ স্বামী কহেন বিবাহ তাহার হয়ে যান’—‘মাসিক পত্রিকা’, ১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬, ১ নং ১১, পৃ: ১১; ‘পান্ডিত্য মাতার বুদ্ধিমত্তা’—‘মাসিক পত্রিকা’, —ঐ, পৃ: ১১; ‘পান্ডিত্য মেয়েদের সাহসিকতা’—‘পার্টা বৈশেষের মেয়েরা বড় সাহসী’—‘মাসিক পত্রিকা’, বাল্য ৩ নং ১১। ১২ই জুন, ১৮৮৭ সাল) প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ স্তম্ভ স্তম্ভ কাহিনী ‘মাসিক পত্রিকা’র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত করে বহুদিনের অজানতার অন্তরকার নিমজ্জিত বোহাগের বাঙালী নারীকে আধুনিক পান্ডিত্য জীবন-চেতনার উদ্বেগিত করবার চেষ্টা করেন।

কেবল অল্পশিক্ষিত বাঙালী নারীকে নয়, সমসাময়িক

সাধারণ-শিক্ষিত পুরুষকেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেশাত্মক কাহিনীর মাধ্যমে প্যারীচাঁদ নিতীক ও কর্মচক্রে পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের সন্ধান দেবার চেষ্টা করেন।

পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের পরিচয় দেবার জন্য ১৮৭১ সালের 'মাসিক পত্রে' পুণ্ডার প্যারীচাঁদ যে একটি পৌনঃপুনর কাহিনীর অবতারণা করেছেন তা এখানে উদ্ধার করবার প্রোক্ত সংগ্রহ করতে পারলাম না :

একজন জাহাজি গোয়ার কথা

একবার একজন ডহলোক একজন জাহাজি গোয়ারকে ভাণ্ডিয়া ভিজ্ঞাপা করেন : বল দেখি তোর বাপ কোথায় মরে ?

জাহাজি গোরা উত্তর দেয় : মহাশয়, তিনি আমার মতন জাহাজের কর্ম করিতেন, সমুদ্রে জাহাজ ডোবাতে মরিয়া যান।

ডহলোক : তোর ঠাকুরমা কি করিয়া মরে।

জাহাজি গোরা : মহাশয়, তিনিও জাহাজে কর্ম করিতেন, তিনি জাহাজে করে সমুদ্রে গিয়েছেন, এমন সময়ে সমুদ্রে ভুবিয়া মা'রা যান।

জাহাজি গোয়ার উত্তর শুনিয়া ডহলোক বলেন,— তোর হুই পুত্ব সমুদ্রে ভুবিয়া মরিয়াছে, তোর কি জাহাজের কর্ম করিতে ভয় হয় না।

জাহাজি গোরা : মহাশয়, ভয় করে কি করিব। আপনি যদি অনুমতি দেন, আপনাতে হুই একটা কথা ভিজ্ঞাপা করি, মহাশয় আপনার ঠাকুরের কোথায় কাল হয়।

ডহলোক : তিনি ঘরে থাকেন, ব্যাঘাম হয়, বিছানায় শুইয়া মরেন।

জাহাজি গোরা : মহাশয়, আপনার পিতামহ কোথায় মরেন।

ডহলোক : তিনিও বাড়ীতে থাকেন, পীড়া হয়, বিছানায় শুইয়া মরেন।

এই সকল কথা শুনিয়া জাহাজি গোরা কহে,—মহাশয়, আপনার হুই পুত্ব বিছানায় শুইয়া মরেন, আপনার কি বিছানায় শুইতে ভয় করে না।

—মাসিক পত্রিকা : ১০৫ আখ্য, ১২০০ : ১৪ মূল, ১৮৭১

এ সমস্ত ছোট ছোট ও সরস কাহিনীর মাধ্যমে প্যারীচাঁদ তাঁর কর্মবল জীবনের মধ্যেও পাশ্চাত্য জীবনের আদর্শ বাঙালীর অন্তঃপুরে পৌঁছিয়ে দেবার যে অঙ্গার প্রয়াস শেষেছিলেন তা ভাবতেও আজ আমাদের বিস্ময় লাগে। এ সমস্ত রচনার প্যারীচাঁদের সত্যের-প্রচেষ্টা

প্রাধান্য লাভ করায় তেমন সঠিকমanner হয়ে ওঠেনি, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

প্যারীচাঁদের যুগান্তকারী উপন্যাস 'আলোলের গয়ের হুলাল' ও এ 'মাসিক পত্রে' পুণ্ডার প্রকাশিত হয়। এ পুস্তকখানি বহু আদোচিত বলে বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হলো না।

। . .

সমসাময়িক রুজ্জার বাঙালী জীবনে পাশ্চাত্য জীবনের মূক্ত হাওয়া প্রবাহিত করে দেবার চেষ্টা করলেও, জীবন ও সাহিত্য—এই উভয় ক্ষেত্রেই প্যারীচাঁদ সামগ্রিকভাবে সাধনা করে গেছেন। সে পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণ করলে, আমাদের সংস্কৃত বাঙালী জীবনে ভাবমুক্তি ঘটতে পারে, সাহিত্যের মাধ্যমে সে সমস্ত ভাবধারা বাঙালীর মস্তিষ্কার জীবনে প্রবাহিত করে দেবার ক্ষমতা প্যারীচাঁদ অপ্রাপ্য চেষ্টা করতেন ; আবার পাশ্চাত্য জীবনের আদর্শ গ্রহণ করবার প্রভাবে সমসাময়িক বাঙালী জীবনে যে সমস্ত গ্রানি এসেছিল, বাঙালীকে সে গ্রানিমুক্ত করতেও তাঁর চেষ্টার বিরাম ছিলো না।

প্যারীচাঁদের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মহা খাওয়া বড় দার, জাতি রাখার কি উপায়' (প্রকাশ—ইং ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ)। "পতঙ্গের অঙ্গরুদ্ধ করকট গল্পের সাহায্যে ইহাতে মাতলামি ও মাতলামি সজ্ঞাত 'বকামির' বহু প্রদর্শিত হইয়াছে"। (হুইবা : সাহিত্য সাধক চরিত্রমালা, ২য় খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা, প্যারীচাঁদ মিশ্র—ব্রহ্মস্রোতঃ বন্দ্যোপাধ্যায়) : এ গ্রন্থ প্রকাশিত : সংস্করণমূলক।

'মাসিক পত্রে' পুণ্ডার প্যারীচাঁদ বাঙালী নারীকে যেমন পাশ্চাত্য জীবনের সংস্কারহীন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়াস শেষেছিলেন, তেমনই আবার জ্ঞতি-স্বত্ব-পূরণাদির সংকট বচন উদ্ধার করে এবং পাশ্চাত্য মনীষীদের জীবন-কাহিনী আলোচনা করে আদর্শ-জীবন সম্বন্ধে অবহিত করবার চেষ্টাও করেছিলেন।

এ ছাড়া বাঙালী নারীর সমুদ্রে সর্বাঙ্গিক জীবনের আদর্শ স্থাপন করবার জন্য প্যারীচাঁদ 'এতদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা' (ইং ১৮৮৮) ; 'আধ্যাত্মিক' (ইং ১৮৮০) ; 'বামাতোষিণী' (ইং ১৮৮১) এবং আরো কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এসেস্ট্রীর বাহুবল পামনে সেবার মত জীবনের আদর্শ স্থাপন করবার জন্য প্যারীচাঁদ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ভেড়িৎ হোয়ারে জীবনচরিত' নামক স্মৃতিচরিত্র জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেন।

প্যারীচাঁদের জীবন যে শুধুমাত্র ইহলোকের চিন্তা

বিরত ছিলো তা কোনমতে বলা চলে না। তাঁর জীবনের গতি ধরাই ধুলিতে যেমন আবর্তিত হয়েছে, তেমনই আমাদের ইতিহাসসৃষ্টির উপলব্ধি অবশিত রহস্যময় জগতেরও সন্ধান করেছে। তাঁর 'সীতাহার' (১৮৮১), 'বৎসিকিৎ' (১৮৮৪) এবং 'অরুণী' (১৮৮১) সেই অধ্যাত্মজগতে মানস-অন্বেষণই ইচ্ছাশাস। এ গ্রন্থগুলি শাস্ত্রের যে, প্যারীচাঁদ ছিলেন একটি সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের (complete personality) অধিকারী। তাঁর চিন্তাধারা প্রধানতঃ ইহুদীয় হ'লেও অধ্যাত্মজগৎ-বিশ্ব ছিলো না।

এ সময় আলোচনা হ'তে একথাটা স্পষ্ট হবে যে, বাঙালী সংস্কৃতির যে বিভিন্ন ধারা উদ্ভবিত শতাব্দীর প্রথম পাঁচ দশকে শিল্পে প্রবাহিত হ'লি, প্যারীচাঁদের অসামান্য প্রতিভাশূর্ণতা তা স্রোতোধার হয়ে উঠছিলো। অশচ্য তাঁর ব্যক্তিত্বের এমন একটা দিক সর্বসত্য ছিল যা তাঁকে সকলের নিকট শ্রদ্ধা করে তুলতো। তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গিয়ে 'বঙ্গভাষার লেখক'-রচয়িতা হরিমোহন মুখোপাধ্যায় লম্বতভাবেই সম্ব্যক্ত করেছেন—“প্যারীচাঁদ যেমন রসিক, তেমনই ভাবুক। তিনি হ্যাপিটেন, হ্যাপাইটেন; ডাবিটেন, ডাবাইটেন। শক্তি বস্তুতই অপরিসর। সর্বীতেও তাঁহার অস্থায়ণ খুবই ছিল।”^১

এ প্রত্যয়ের প্রত্যয়েই সম্ব্যক্ত করা হয়েছে—প্যারীচাঁদ ছিলেন dynamic personality-র অধিকারী। তাঁর বিভিন্ন জীবন কর্ম হ'তে কর্মজীবন, ভাব হ'তে ভাবাজীবন, নিত্য নিরন্ত পরিচর্যা করে সত্যের অন্বেষণ করেছে। যে কর্মজীবনের প্রায়শঃ অসামান্য এবং ক্রমবিকাশ যেনের সন্ধানসাধনের শিক্ষাদানে ও আনন্দ-বিদানে, সে জীবনের পরিণতিতে যে অমৃত কিছু সংগঠিত হবে তা অস্বাভাবিক একেবারে অসম্ভাবিক নয়। বাস্তবক্ষেত্রে হয়েছিলও তাই। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রিয় স্ত্রী দুর্ভাগ্যে পর তাঁর জীবনে একটি নতুন অধ্যায় খুলে গেল। তাঁর স্ত্রী বামাকালী তুং যে তাঁর জীবনসঙ্গিনী ছিলেন তা নয়, তাঁর সাহিত্য-সঙ্গিনীও ছিলেন। “প্রকাশ—ঈহারই হয়ে প্যারীচাঁদ 'আলোচন'

ঘরের দুলাল' রচনা করেন।”^২ এটো শ্রিতম পত্নী-বিরোধে প্যারীচাঁদ অন্তরে দুই অর্ধাৎ পান এবং তখন থেকে প্রেততত্ত্ব (spiritualism)-আলোচনায় তিনি গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহু সংবাদ-পত্রে তিনি প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন।^৩ প্রথম জীবনের মৃত্যুপূজার বিশ্বাসকে ত্যাগ করে তিনি ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মবাদী হয়ে ওঠেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিউ ইয়র্কের বিশ্বমন্দির্যাল-সোসাইটির কorespondent ফেলো নির্বাচিত হন। বোম্বাইতেও এ সোসাইটির একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং সে-কেন্দ্র হতে Theosophist নামক যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়, প্যারীচাঁদ সে-পত্রিকায় ভগবৎতত্ত্ব নিয়ে অনেক রচনা প্রকাশিত করেন। তারপর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার Theosophical Society গঠিত হ'লে প্যারীচাঁদ তার সভাপতি নির্বাচিত হন। বৃহৎকাল পর্যন্ত তিনি এ সোসাইটির সভাপতি ছিলেন।

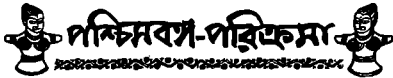
প্রেততত্ত্ব ও ইহবৃত্তের আলোচনা করে প্যারীচাঁদ তাঁর পত্নীবিরোধ-মুখ্য কিছুটা ভুলেছিলেন সংকটে তেই, কিন্তু নিরন্তর পরিচর্যা ও শোকের বেলায় তাঁর পত্নীর একেবারে ভেঙে পড়লো। ১৮৮৩ সালের ১৩শে নভেম্বর বাংলাদেশের এই প্রতিভাবান পুঙ্খ মুহুর্যুপে পতিত হন।

উদ্ভবিত শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালীর ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবনকে অবলম্বন করে বাঙালী সংস্কৃতি কি ভাবে দীর্ঘে দীর্ঘে বিকশিত হয়ে উঠছিলো তা দেখাবার জন্যই অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী প্যারীচাঁদের বিস্তৃত জীবন-কাহিনীর অবতারণা। আশা করি, এ আলোচনা আলোচ্য বিষয়ের ওপর কিছুটা আলোকপাত করতে সক্ষম হবে।

^১ বঙ্গভাষার লেখক—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। পৃ: ২২০

^২ যেমন-১৩শে Spirituallist, ১৪শে Banner of Light, ১৫শে Theosophist। এসকল পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধের অধিকাংশই তাঁর The Spiritual Slaves Leaves গ্রন্থ হ'ল প্রেরিত।
উল্লেখ : বাহিনীসদস্য চরিত্রমালা, ২য় বর্ষ, পৃ: ১২, প্যারীচাঁদ মিত্র
—ব্রহ্মজীবন কল্যাণিকা।

^৩ বঙ্গভাষার লেখক—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। পৃ: ২২০



হুগলি

মনোজিৎ বসু

ইটর ১৩-শ শতাব্দী পর্যন্ত হুগলি জেলায় হিন্দু রাজারা যে রাজত্ব করে গিয়েছিলেন তার অনেক নথিই আছে। ৬ষ্ঠীয়া জাতির উৎকীর্ণ খে-সব তাম্রলিপি পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায়, ১২-শ শতাব্দীতে বর্তমান গোঘাট থানার অন্তর্গত মাঝারান ভট্টনক হিন্দু রাজা গুড় বা হুগলি তৈরি করিতে রাজত্ব করেছিলেন। উক্তির পর-বংশীয় রাজা চোটগুড়র কাছে তিনি পরাজিত হন। সেই মাঝারান পরে গুড়-মাঝারান নামে পরিচিত হয়। গুড়-মাঝারান এলাকায় এখনও সেই প্রাচীন গুড়ের ধ্বংসাবশেষ কিছু-না-কিছু চোখে পড়ে। তাড়াতাড়ি, হিরেবীর জাকর-খা-মসজিদ ও গোরস্থান এবং 'গুড়'র ধ্বংসপ্রায় পাথরের মসজিদও হিন্দু রাজত্বের স্মৃতি-শিখরের কথা বহন করিয়ে দেয়। পোস্তবা খানার অন্তর্গত হসনান ও হারবাসিনীতে যে-সব পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলির বেশির ভাগই হিন্দুগুণের। মহানামা এক সময় পশ্চিমবঙ্গ, অর্থাৎ রাঢ় অঙ্গলের রাঢ়শাসী ছিল—এইরকম অন্তরান একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ, এখানে এখনও হিন্দুগুণের কীর্তিচিহ্ন কিছু-না-কিছু টিকে রয়েছে। অনেকের মতে রাজা চক্রবর্ত্ত মহানামার একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। গুড়ের বাগান ব'লে যার পরিচয়, গভীর ধ্বংসের মধ্যে তার ধ্বংসাবশেষ এখনও একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়েছে। পুরাকীর্তি হিসেবে মহানামার ভট্টবর শিবমন্দির সহজেই সবলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লোকপ্রবাদ এই যে, এই মন্দিরটি রাজা চক্রবর্ত্তের আমলেই তৈরি হয়। মহানামার কাছেই দ্বারবাসিনী। এখানেও এক সময় হিন্দু রাজারা যে রাজত্ব করে গিয়েছেন তার সাক্ষ্য দিচ্ছে বড় বড় কয়েকটি দীঘি, দ্বারবাসিনী দেবীর মন্দির প্রভৃতি। মহানামা ও দ্বারবাসিনীতে ধ্বংস-কার্যে চালিয়ে হিন্দুগুণের যে-সব ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা হয়েছে, তার মধ্যে পশ্চিম দিনাজপুরের বাগদত্তের ধ্বংসাবশেষের বিশেষ মিল আছে। একই আকারের ও একই শ্রেণীর ইট পাওয়া গেছে হু'আরগার।

প্রাচীর-নির্মাণের পদ্ধতিও একই ধরনের। মহানামার 'জানাই-জালাল'-এর সঙ্গে বাগদত্তের 'উদাহরণ-জালাল'-এরও বেশ একটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, হুগলি জেলা ১৩-শ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু রাজাদের অধীনেই ছিল। ১১২২ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজী বাংলায় আগ্রহণ করলেও, সে-আক্রমণের তেউ হুগলি পর্যন্ত পৌঁছায়নি। অবশ্য, ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময় এই জেলার উত্তরাংশ যে মুসলমানদের অধিকারে চলে যায়, তার সাক্ষ্য বহন করতে হিরেবীর জাকর-খা-মসজিদ ও তার সমাধি। প্রথম হিরেবী ও পরে সপ্তগ্রামই হয় মুসলমান শাসনকর্তাদের সদর-কর্তৃস্থল। সপ্তগ্রামে তাদের একটা টাকশাল ছিল। সেই টাকশালে তৈরি সবচেয়ে পুরানো যে-মুদ্রা পাওয়া গেছে তার তারিখ ১৩২২ খ্রীষ্টাব্দের।

হুগলি জেলার ইতিহাসে সপ্তগ্রাম বিশেষ একটি অধ্যায়। এই অধ্যায়ের সঙ্গে মিলিয়ে রয়েছে অতীত যুগের বহু বিচিত্র কাহিনী। হিন্দু রাজাদের আমলে সপ্তগ্রাম ছিল একটি তীর্থস্থান; আর, ইংরেজ-রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত এর প্রতিষ্ঠা ছিল বাংলাদেশের সমুদ্র একটি বন্দর হিসেবে। নৌড়ের স্থলতানবর অধীনে সপ্তগ্রাম ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থানীয় শাসনকর্তাদের সদর-কর্তৃস্থল ছিল। একজন ক'রে সুবেদার থাকতেন সপ্তগ্রামে। হুসেন শাহের আমলে ইসমাইল খানী নামে তার এক সৈন্যস্যাক মাঝারানের হুগলি অধিকার করে। ফলে, তখনকার হুগলি জেলার প্রায় সবটাই চ'লে যায় হুসেন শাহের রাজত্বের অধীনে। ১৬-শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে অবিরাম খুজবিগ্রহ চলে, তার ফলে সবই হুগলি জেলা বা তার অংশ-বিশেষ কখনও চ'লে যায় আকগান সর্দারদের অধীনে, কখনও বা মোগল-সৈন্যদের। পরে অবশ্য রাজা নারসিংহের হস্তক্ষেপের ফলে শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু, বাদশাহ-বন্দর হিসেবে

সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও জৌলুপ আর থাকে না। আর, ভদ্রকে তখন হুগলি পড়ে উঠতে থাকে বাণিজ্য-বন্দর হিসেবে, বিশেষ করে পোতুগীজ বণিকৃষের সময় থেকে।

হুগলি বা ডাঙ্গিচরীর তীরে তীরে সে-সব আশ্রয় বিদেশী বণিকেরা তাদের উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়াস পাই, তার মধ্যে সপ্তগ্রাম, হুগলি ও চন্দ্রনগরই প্রধান। এইসব বিদেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যে সবপ্রথম এসেছিল পোতুগীজেরা। আর, বাই বাই করে তারা এমনও পথও একেধারে ঘাটি থাকড়ে পড়ে আছে ভারতের পশ্চিম উপকূলে। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে পোতুগীজেরা সম্রাট আকবরের সনদ নিয়ে হুগলিতে এসে স্থিতি স্থাপন করে। তার আগেই অবশ্য তারা সাতগাঁও মাটিতে পা দিয়েছিল রাবেলোর নেতৃত্বে বিশেষ একটা উদ্ভেদ নিয়ে। পোতুগীজ জলনবাসের অভ্যাসে সেকালের বাংলাদেশের সাহুদ্রিক-বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। পোর্টের স্থানতাবের হুগ্গে বহু জলজন্তু সে-সময় দূর পড়ে এবং বন্দীকরণ আটক থাকে বহুদিন পর্যন্ত। রাবেলো এসেছিল পোর্টের দরবারে সেইসব বন্দীর মুক্তি দাবি জানাতে। ১৫৮৩ পরাবার শেষ দিকে বংশোদ্ভূত একবারে চেহে নিয়েছিল পোতুগীজের বাণিজ্য-ভরসীতে। সাতগাঁও ছিল তাদের প্রধান ঘাঁটি। তাদের বড় বড় আহাজগুলি অবশ্য সাতগাঁও পর্যন্ত আসতে পারত না, সেগুলি নোড়র করত ব্যাতোড় বা বর্তমান হাওড়ায়। আর, বিভিন্ন পণ্যে যোকাই ছোট ছোট আহাজগুলি এসে ডিড় করত সাতগাঁও বন্দরে। পরে অবশ্য হুগলিই হয় তাদের প্রধান ঘাঁটি। শাহজাহান যখন দিল্লীর মনসে বসেননি, তখন পোতুগীজ বণিকৃষের বহু অভ্যাসের কাহিনী তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছায়। তিনি নিজেও বাংলায় এসে স্থানীয় লোকের উপর পোতুগীজের নানারকম অভ্যাসের প্রত্যক্ষ করে যান। তারপর, সম্রাট হয়েই তিনি পোতুগীজের হমন করতে স্বেচ্ছাবর কামেশ ঋর নেতৃত্বে একফল মৌগল সৈন্যকে পাঠিয়ে যেন হুগলিতে। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে বিয়াট এক সঙ্গ্রামের পর হুগলির পোতুগীজ-দুর্গ অবরুদ্ধ হয়, এবং প্রায় হাজার চারেক পোতুগীজ বন্দী হয় মৌগল সৈন্যদের হাতে। বন্দীদের পাঠিয়ে বেওয়া হয় আগ্রায়। কিন্তু, আরও বহু পোতুগীজ হয় গালিয়ে আহাজকা করে, নড়তে নিজেদের আহাজে আগুন লাগিয়ে হত্যাযন্ত্র করে নেয়। এই সময় মৌগল সৈন্যদের আক্রমণ পোতুগীজদের তৈরি ব্যাঙ্কল-শীর্ষা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। বলতে গেলে, এই সময় থেকেই বাংলাদেশে

পোতুগীজদের প্রাধান্য লোপ পায়; আর সপ্তগ্রাম থেকে মুসলমান শালনকর্তাদের সমর-পালায় স্থানান্তরিত হয় হুগলিতে।

এর পর বহুদিন পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় একশো বছর, হুগলি জেলার ইতিহাসে দূর্ব বেনি অশান্তির উল্লেখ নেই। এই একশো বছরের মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্য বিশেষ উন্নতিলাভ করে। পোতুগীজদের বাসপাণ-বাণিজ্য প্রায়ে বন্ধ হ'য়ে গেলেও, অগ্রগত বিদেশী বণিকের আবির্ভাব ঘটে এই সময়ের মধ্যে। হুগলির তীরে তীরে পড়ে গঠে ইংরেজ, কবানী, ওলন্দাজ, ইতালীয়, দিল্লিমার প্রভৃতি শাস্ত্রাভ্য বণিকদের ঘাঁটি। ইতিমধ্যে অবশ্য দু'বার জেলার আভ্যন্তরীণ শান্তি ব্যাহত হয়েছিল। ১৬৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মৌগল সৈন্যদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই বাধে। ফলে, হুগলি থেকে ইংরেজের স্থিতি সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। এই ঘটনার প্রায় দশ বছর পরে, যেদিনপূর্বের এক জমিদার শুভা সিং যখন রহিম খাঁ নামে উড়িষ্যার মঠক আফগান সর্গের সঙ্গে শোভি পাতিয়ে বিদ্রোহ করে গঠেন, তখন শুধু হুগলি জেলাতেই নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গেই একটা বিশৃঙ্খলার ভাব দেখা দেয়। শুভা সিং-রহিম খাঁর মল এই সময় শুধু বখানাই অধিকার করে না, হুগলি জেলাতেও তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। পরে অবশ্য নবাবী সৈন্যরা এই বিদ্রোহ দমন করে ফেলে শান্তি নিহিয়ে আনে; কিন্তু, এই বিদ্রোহের ফলে বাংলাদেশে শালনাত্মিক অনেক পরিবর্তন ঘটে যায়।

মুর্শিদকুলি ঋর আমলে বাংলাদেশ ১৩টি চাক্ষুর বিভক্ত ছিল। সেই ব্যবস্থায় হুগলি জেলা চ'লে যায় হুইট চাক্ষুর অধীনে—হুগলি বা সাতগাঁও, আর বর্ধমান চাক্ষুর। রাজস্ব-আদায়ের দিক্তিতে পরে আরও পরিবর্তন ঘেবা গেষ; এবং তারই কল উত্তর হয় শালুগ ও জায়গীর প্রথা। এই ভাবে বর্ধমানের বড় বড় জমিদার, আর মঙ্গলঘাট, আদুঙ্গা ও মহম্মদ আমিনপুরের ছোটখাট জমিদারদের অধীনে চ'লে যায় হুগলি জেলা। এইসব ছোট-বড় জমিদারই নানারকমের জায়গ ও বাছনা আদায় করে নবাব-সরকারে তা সম্মা দিতেন। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় একশো বছর হুগলি জেলা মঠক কোজবার বা মিলিটারী গভর্নরের শালনাবীনে ছিল।

এর পরে দেখা দেয় বর্ধিহ দৈশাখা। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত পতিয়ে নেতৃত্ব মারাত্ম সৈন্যরা হুগলি-দুর্গ অধিকার করে নেয়। কিন্তু, পরের বছরই কাটোয়ার দুত্ব আলিবন্দী ঋর কাছে ভারত পতিতের হয় পরামর্শ। আর, সেইসঙ্গে হুগলিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নবাবী শালন। মারাত্ম সৈন্যরা

ভখন হগলি ছেড়ে বিকুপুৰে গালিয়ে যায়। কিন্তু, হগলিৰ ভাগো চমক বিপৰক কোৱে ১৭৭৭ ইষ্টাৰ্বে। যোগদ সৈন্যসকল বিকুপুৰ পুৱানো ৰাগেৰ কাল মেটোৱে গিয়ে ইংৰেজ সৈন্যৰা হঠাৎ এদিন হগলি আক্ৰমণ কৰে বসে। তাৰা শুৰু হগলি-দুৰ্গ ও চন্মনগৰেৰ ফোৱী কোৱা মমিকৰ ক'ৱেই কাৰু হয় না, হগলিৰ ফোৱনাৰেৰ বাবতীৰ সন্মতি অধিকাৰ কৰে, এৰং হগলি ও তাৰ আশেপাশেৰ গ্ৰামভূমিত লুটতৰা চািলিয়ে সকলকে সন্তৰ ক'ৱে তোলে। এখন বেথানে হগলিৰ কালেক্টেৰ-হুটি, সে-সময় ঐখানেই ছিল হগলি-দুৰ্গ। ১৭৭৭ ইষ্টাৰ্বেৰ ছন মাসে ঘটলো পলাশিৰ যুদ্ধ; আৰ, সেইদৰে সাজা বাংলাদেশেৰ তথাই পেল কলে। বাংলাদেশ চ'লে গেল কিসেই শাসনেৰ অধীন। বণিতোৱা নাম ক'ৱে বেইংৱেল কোম্পানি খুঁচ হ'লে এ-পেৰে এদিন এংলিছ, তাৰাই শাসকেৰ বেৰ খ'ৱে তখন ক'লে হ'ৱে বেৰ হ'লো।

বৰ্ধমান-চাক্কা থেকে হগলি বিচ্ছিন্ন হ'লে আসে ১৮২২ ইষ্টাৰ্বে। ঐ বছৰ ১লা মে হগলিতে ঘনিষ্ঠ হয় একটি বহুত কালেক্টেৰট। আৰ, বহুত মেলা-মজৰে পদ স্তম্ভ হয় তাৰ চাৰ বছৰ পৰে। ১৮৪২ ইষ্টাৰ্বে হগলি মেলাৰ ঘাৰিষ্টেট ও কালেক্টেৰেৰ পদ হুটি এক হ'ৱে যায়। হগলি মেলাৰ হুটি বহুতম ঘনিষ্ঠ হয় ১৮৪৪ ইষ্টাৰ্বে—তাৰ একটি ছোৱাটো বা ঐগ্ৰামপুৰ, অগ্ৰটি কীৰপাই। বৰ্তমান হগলি মেলাৰ বে সীমানা আমাৰা দেখতে পাই, তাৰ পূৰ্বপাত হয় ১৮৭২ ইষ্টাৰ্বেৰ কোনো এক সময়।

হগলি মেলাৰ বৰ্তমান আয়তন ১,৪০৬'২ বৰ্গমাইল। ফ্ৰান্সী-চন্মনগৰ পশ্চিমবঙ্গেৰ অষ্টৰ্চক হওৱা, এৰং হগলি মেলাৰ অধীনে আশাৰ আয়তনটো বেলেহে এই ভাবে। এখন চাৰটি বহুতম বিতৰু হ'ৱেছে এই মেলা—(১) হগলি নগৰ; (২) ঐগ্ৰামপুৰ; (৩) চন্মনগৰ; ও (৪) আৱানবাগ। আগেকাৰ ঐগ্ৰামপুৰ বহুতম আয়তন এখন আৰ সেই। কাৰণ, ঐগ্ৰামপুৰ বহুতমৰ ভৰেৰ, হৰিপাল, তাৰকেৰ ও সিন্ধুৰ থানা আৰ চন্মনগৰ নিৰেই এখন চন্মনগৰ বহুতম। নগৰ বহুতমৰ বহুতম চাৰটি থানা—হুঁচু, ধনেশালি, মোলুবা, মগৰা, বলাগু ও পাছুয়া। ঐগ্ৰামপুৰ বহুতমৰ থানা এখন চাৰটি—ঐগ্ৰামপুৰ, উত্তৰপাড়া, চকীপাড়া ও মকীপাড়া। আৱানবাগ বহুতমতেও চাৰটি—আৱানবাগ, পুৰুয়া, গোঘাট ও থানাকুল। হগলি মেলাৰ গ্ৰামেৰ সংখ্যা ১,২০৬, আৰ পহুৰ ১২টি। পহুৰ বহুতম হুঁচু, বাণকোড়, ঐগ্ৰামপুৰ, ভৰেৰ, বিঘড়া, বৈথবাটি, উত্তৰপাড়া, কোতাৰ, কোৱাৰ, চাপানি, আৱানবাগ ও চন্মনগৰ। ১২৪১ ইষ্টাৰ্বেৰ

লোকগণনা অহাৰে যে হিসেব পাওৱা গেছে, সেই হিসেবে হগলি মেলাৰ মোট লোকসংখ্যা—১৬ লক্ষ ৪ হাজাৰেৰ কিছু বেছি। তাৰ মধ্যে পুৰুষেৰ সংখ্যা ৮,৪২,১৪০; আৰ স্ত্ৰীলোকেৰ সংখ্যা ৭,৫২,৭৮১। মোট লোকসংখ্যাৰ গ্ৰাৱ তিনভাগই গ্ৰামেৰ বাসিনা। বৰ্ণশাস্ত্ৰাৰ অহাৰে এই মেলাৰ বহুতম গ্ৰাৱ ১০ লক্ষ ২২ হাজাৰ হিন্দু, দুপলমান হুঁলাশেৰ কিছু বেছি, ঐদৈনে গ্ৰাৱ সাড়ে নহ হাজাৰ। বিভিন্ন বৰ্ণাবলীৰ আদিবাসীদেৰ সংখ্যা হ'বে ৭৭ হাজাৰেৰ কিছু বেছি। ১২৪১ ইষ্টাৰ্বে থেকে ১২৪১ ইষ্টাৰ্বে, এই পদ বছৰেৰ মধ্যে হগলি মেলাৰ (চন্মনগৰ বাদে) লোকসংখ্যা বেলেহে এক লাখ ছিয়াত্তৰ হাজাৰেৰ উপৰ। এই মেলাৰ উত্তৰে বৰ্ধমান মেলা, পূৰ্বে হগলি নদী, দক্ষিণে হাওড়া মেলা, আৰ পশ্চিমে মেহিনীপুৰ, বাঁহুড়া ও বৰ্ধমান মেলাৰ অংশ-বিশেষ।

'হগলি' নামটো যে কোথা থেকে এলো, সে-সম্পৰ্কে সঠিক কোনো বিবৰণ পাওৱা যায় না। অনেকৰ অহমান 'হোগল্লা' কথা থেকেই 'হগলি' নামেৰ উৎপত্তি। কাৰণ, একসময় এখানে নাকি প্ৰচুৰ হোগল্লা-বন ছিল। কেউ কেউ আৱাৰ বলেন, হোগল্লীমেলা ভাৱেৰ পোলাগতক বলতে 'গোলিন'। 'হো-গোলিন' কৈছ, তাই হোগল্লী বা হগলি নাম আশাটোও বিচিত্র নহে। কিন্তু, সঠিক কোনো মজিৰ নাই এ-সম্পৰ্কে। সে বাই হোক, পশ্চিমবঙ্গেৰ এই মেলাটি নানা কাৰণে গ্ৰসিষ্ট হ'ৱে আছে ভাৱতবৰ্ণেৰ ইতিহাসে। বাংলাদেশেৰ সাহিত্যিক বাসিন্দা, বিভিন্ন বিদেশি বণিকৰ আগমন ও কুটি-স্থাপন, বাংলাদেশেৰ প্ৰথম ছাপাখানাৰ প্ৰতিষ্ঠা, প্ৰথম সংবাদ-পত্ৰ প্ৰকাশ, কবি ভাৱতবৰ্ণ, ৱাৰা ৱাৰাৰোহন ৱা, হান্না মহম্মদ মহলীন, ঐগ্ৰাকক পৰমহংস, সাহিত্যচাৰ্য পৰচয়ত্ৰ প্ৰভৃতি বহু জানী, গুপ্তী ও বনীবীৰ আবিৰ্ভাব—এই সব কাৰণেই হগলি মেলাৰ গ্ৰসিষ্টি। বিভিন্ন বিশেষ সম্প্ৰদায়েৰ আগমনে এই মেলাৰ সংস্কৃতিও যুগে যুগে প্ৰভাৱবিত্ত হ'ৱেছে। এখনও ৱ'ৱে গেছে তাৰেৰ বহু শক্তি এখনকাৰ মাটিতে।

হগলি মেলাৰ জমি বেণ উৰা। বেথানেই সেচৰ ভাগো বাবদ আছে, সেথানেই ভাগো কল কলে। তিনটি বহু নহ-নদী প্ৰবাহিত হ'ৱেছে এই মেলায়—হগলি বা ভাগিৱতী, হাৰোদ ও বাৰকেৰ। ছোটখাটো আৰও কয়েকটি নদী মেলাৰ মাটিকে সল ক'ৱে তুলেছে। তাৰেৰ মধ্যে নাম কৰতে হয় বেহলা, কান, কুতী, সৰবতী, কৌশিকী, বিয়া, কান্ধল, কান-বাৰোদ, ঘাঘাৰি, বেদিয়া বা সাৱিত্ৰী, হুওবতী, কান-বাৰকেৰ, পহুৱা, হুহুহু, আমোদ ও

ভারাহুদি। এর অনেকগুলিই অবশ্য আর ঠিক নদী বলে পরিচিত নয়, নদী-গৌরব হারিয়ে নেহাত ভাল-এর পর্যবেক্ষণে শেয়েছে এরা। যেমন কুতী। অনেক এমন কুতী না বলে মগরা-পালই বলে। সে বাই হোক, এইসব জল-প্রায় চাষবাগের যে বিশেষ সুবিধে হয়েছে তাতে কুল নেই। উর্বরতার দিক থেকে এই জেলার জমিকে তাই প্রধানত চারভাগে ভাগ করা হয়—(ক) হুগলি নদী থেকে কুতী নদীর পর্য্যন্ত অঞ্চল; (খ) কুতী নদী থেকে হাঘোবর নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এলাকা; (গ) হাঘোবর নদ থেকে ভারুকেশ্বর নদ পর্য্যন্ত ভূভাগ; আর, (ঘ) ভারুকেশ্বর নদের পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল। একমাত্র গোষ্ঠাখা খানা বাসে মিলে জেলার আর সব অঞ্চলই সমতল। গোখাট খানার বেশির ভাগ অঞ্চলই কচরময়, এবং বাঁহুড়া জেলার মতো উঁচুনিচু টিলা-জমিতে পূর্ণ। মগরা ও পাণ্ডুয়া বেলেমাটির যেমন প্রাধান্য, তেমনই কামারহুঁহর কাছাকাছি রয়েছে হুহু বাণুকণাপূর্ণ বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ। এ-জেলার খাবারী জমির পরিমাণ সাড়ে পাঁচলক্ষ একরেরও বেশি। কিন্তু, পণ্ডিত জমির পরিমাণও বড় কম নয়। প্রায় সাড়ে সাত লক্ষের একর জমি চাষের উপযুক্ত হ'লেও পণ্ডিত অবস্থায় প'ড়ে আছে। তাছাড়া, চাষের অসুপযুক্ত পণ্ডিত জমিও রয়েছে চার হাজার একরের বেশি। এর উপরে অন্যাবারী প্রচুর জমি রয়েছে গ্রাম সাড়ে হ'জাখার একর। এ-জেলার প্রধান খাদ্যশস্য ধান। বোকা, আউশ ও আমন সব-রকমের ধানের চাষই হয় এখানে। আপে আউশ ধান হ'তো প্রচুর পরিমাণ। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে আউশ ধানের জমিতে পাটচাষ শুরু হ'ওয়ায়, আউশ ধানের ফলন কমে গেছে অনেকখানি। আমন ধান থেকে যে-সব সূচ চাল এ-জেলার উৎপাদিত হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ভূপশাল, সীতাশাল, রুখকলুদী, বাঁকুড়, বাধলানি প্রভৃতি। ধানের পরেই এ-জেলার প্রধান কৃষিশস্য হ'লো পাট। প্রতি বিঘার সাধারণত তিন থেকে ছ'মণ ক'রে পাট হয় এ-জেলার জমিতে। সেওড়াহুদি এ-জেলার পাট-ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। পাটশক্তের মধ্যে চালের পরেই এ-জেলার সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয়—ভাল। গ্রাম-এলাকার উঁচু জমিতে, এবং চর-এলাকার অল্পবিস্তর ভিঙ্গি, ভিঙ্গ, বাই, গরিয়া প্রভৃতির চাষও হ'য়ে থাকে। তাছাড়া, আখ ও ভাটাকের চাষও হয় কিছু কিছু। তবে, পানের চাষ হয় প্রচুর; আর, আলুর তরুও এ-জেলার বিশেষ খ্যাতি আছে। সরকতী, বেহলা, কানা, কানা-শাখোবর প্রভৃতি নং-নদীর পুরানো প্রবাহ-পথে এবং বিশেষ ক'রে ভারুকেশ্বর ধানার আলুর চাষ হয় সবচেয়ে

বেশি। আলুর উৎপাদন-প্রতিযোগিতায় এই জেলা ১৯২২-২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। তাছাড়া, এ-জেলার হয়েছে বিশ্বের সব-বি-বাগান ও ফলের বাগান। এগুনিকার হরেকরকম তরিতরকারি ও ফলমূল মিষ্টা চালানি ঘাষ কলিকাতা ও তার আশেপাশের হাট-বাছারে। আছহুত ও কাঁঠাল-পাছের কোপেড়া এ-জেলার গ্রাম সবখানেই যেতে পাওয়া যায়। বিশেষ ক'রে সমর মহলুয়া; চুঁচুড়া, চন্দ্রনগর, পোন্দুবা, মগরা ও বলাগড় থানায় বহু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আমের বাগান আছে। এ-সব জায়গার সতী, হিমলাগর, চাটুজো, বোখাই, পায়রাহুদি প্রভৃতি বিখ্যাত আম পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় চালান যায়।

চুঁচুড়ায় যে কৃষি-পবেষণা-কেন্দ্রটি রয়েছে—পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-ব্যবস্থার তার বিশেষ একটি মূলা আছে। এই পবেষণা-কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে; ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পবেষণা-কেন্দ্রটি ইতিহাস কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চের আওতায় পবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। তারপর থেকে পবেষণা-কেন্দ্রটি তদানীন্তন বাংলা-সরকারের কর্তৃত্বাধীন এসে পড়ে। বর্তমানে এটি পরিচালিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কৃষি-বিভাগ থেকে। এখানে প্রধান-ভাবে পবেষণা করা হয় কিভাবে বিভিন্ন পদ্ধতির ফলন বাড়ানো সম্ভব, এবং কি ক'রেই বা আউশ, আমন ও বোকা ধান থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্য উৎপাদন করা যায়। তাছাড়া, একটি কৃষি-বিদ্যালয়ও রয়েছে চুঁচুড়ায়। প্রতিবছর প্রায় ৮০ জন ছাত্রকে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা রয়েছে এই বিদ্যালয়ে।

লামোদর-উপত্যকা-পরিবহনের ফলে, হুগলি জেলার বিস্তৃত এলাকা সেতের দিক থেকে যে বিশেষ উপকৃত হবে লোক-বা বলাই বাহুল্য। ইতিমধ্যে যে-সব সেতু-বাগ কাটা হয়েছে, তার প্রত্যেক রকম দেখা গিয়েছে দলদলানি, পাণ্ডুয়া, পোন্দুবা, ভারুকেশ্বর, হরিপাল, সিন্ধুর, চণ্ডীতলা, অঙ্গীশাড়া প্রভৃতি এলাকায়। আরোবহা মহকুমার বিভিন্ন এলাকাও এইসব সেতু-বাগ থেকে কৃষি-বিষয়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছে। অনেকগুলি বাথ ও বাংলার সঞ্চার-মাধ্যমও হয়েছে গত কয়েক বছরের মধ্যে। তাছাড়া, ছোটখাটো অনেকগুলি সেতু-পরিবহনের মাধ্যমে এই জেলার পাটশক্তের ফলনও বেড়েছে আপেক্ষিক তুলনায় অনেক বেশি।

বৃহদায়তন-শিল্পের দিক থেকে হুগলি জেলার বিশেষ একটা পরিচর আছে। পুরানো দিনের শিল্প-বাণিজ্যের কথা ছেড়ে দিলেও, আধুনিক কালে এই জেলার যে-সব বড় বড় শিল্প-সংস্থা প'ড়ে উঠেছে—যেদের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে তার একটা

দুলা আছে বৈকি। এই জেলার ঈশ্বরানপুরেই ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম 'পেপার মিল' বা কাগজ-তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়। কিন্তু, আর্থিক সফলতা না-হওয়ায় এই কাগজ-কলটি বন্ধ হ'য়ে যায় ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের শেষার্শ্বে। মিল বন্ধ হ'লো বটে, কিন্তু কাগজ-তৈরি বন্ধ হ'লো না। কৃষ্ণীন্দ্র-শিল্পের আশ্রয়ে কাগজ তৈরি হ'তে লাগলো পাবনা, লক্ষ্যগ্রাম ও বালি-কোথানগুণ্ডে। ঈশ্বরানপুর-নির হিসাবে আশ আশ কাগজ-শিল্প হুগলি জেলার আর্থিক সৃষ্টির স্থল। না-ক'লেও, ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে ত্রি-কোণিতে যে 'টিজ পেপার মিল'-টি স্থাপিত হয়, পশ্চিমবঙ্গের কাগজ-শিল্পের ক্ষেত্রে তা উল্লেখযোগ্য। হুগলি জেলার প্রথম চটকল বা 'ছোট মিল' স্থাপিত হয় ১৯-শ শতকের মধ্যার্শ্বে। তারপর একে একে আরও কয়েকটি চটকলের পত্তন হয় ভাগীরথীর তীরে। যেমন—ইতিহাস ছোট মিল, চোপদানি ছোট মিল, তি-ঈশ্বরানপুর ছোটমিল, হেপ্টিস ছোট মিল প্রভৃতি। বর্তমানে কম ক'রে বিশটি চটকল চালু আছে হুগলি জেলায়। প্রত্যহ সড়ে প্রায় বাট হাজার লোক কাজ করে এইসব কলে। বরশিল্পেও হুগলি জেলার একটা খ্যাতি আছে বহুদিন থেকে। ১৯-শ শতকের একেবারে শেষার্শ্বে ঈশ্বরানপুরেই বাংলাদেশের সর্বপ্রথম কাগজের মিল স্থাপিত হয়। বর্তমানে কম ক'রে লাগতিরিজি প্রবীণ কাগজের কল চালু আছে এই জেলায়। আর, প্রত্যহ সড়ে প্রায় লাখে চ'হাজার লোক কাজ করে এইসব কল কারখানায়। তাছাড়া, ২৮টি চালের কল, একটি সিন্দেট ও চুনের কারখানা, একটি রেশম-উৎপাদনের কারখানা ও একটি মোটরগাড়ি-তৈরির আধুনিক প্রতিষ্ঠান চালু আছে এই জেলায়। শেষোক্ত এই কারখানাটির নাম 'হিন্দুস্তান মোটর ওয়ার্কস'। উত্তরপাড়ার যে এলাকায় এটি রয়েছে, সেই এলাকার নামই হ'য়ে গেছে 'হিন্দু-মোটর'। ছোটখাটো আরও নানাবিধ কল-কারখানা ছড়িয়ে আছে জেলার বিভিন্ন ভাগে।

যিশেই বহুবিধা ধন শান্তরী, হুগলি, চন্দননগর প্রভৃতি এলাকায় তাদের খাঁটি তৈরি করেছিল, তখন থেকেই এ-জেলার কৃষ্ণীন্দ্র-শিল্পের খ্যাতি। ফার্দীরা এসে অধিরে কলহিল ঈশ্বরানপুর ও চন্দননগরে। ফলে, ঈশ্বরানপুর ও চন্দননগরের বিশেষ একটা অংশ বহুদিন পর্যন্ত ফরাঙ্গীজা নামেই পরিচিত হ'য়ে পড়ে। এই ফরাঙ্গীজার মুক্তি-পাড়ি একদম বহন-নৈপুণ্যে শুধু যে বাংলাদেশেই সমার লাভ করেছিলো তা নয়, অনেকের কাছে চলেছিল—বিহার, উত্তর-প্রদেশ, এমন কি বোম্বাই পর্যন্ত এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল

সেকালে। ফরাঙ্গীজার মুক্তি-পাড়ি পরা দেকালের যেন একটা বিমানিতা ছিল। হুগলি জেলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই কিছু-না-কিছু তাঁতের কাপড়-চোপড় তৈরি হ'য়ে থাকে। তাঁতবস্ত্র-বহনের প্রধান কেন্দ্রগুলি রয়েছে ধনেশালি, ঠাটীখালা, বড়না, ঈশ্বরানপুর, হরিশাল, যারহাটা, কৈকালী, মদনপুর, বরসানি, ঐটপুং, বাবলহাট, ফরাঙ্গীজা, কলসে, খানাহুল-কলসপুর ও মারাগুণ্ডে। ঈশ্বরানপুরে যে কেন্দ্রীয় বহন-বিভাগটি রয়েছে যেনের তাঁতবস্ত্র-বহনের মন-উন্নয়নের ক্ষেত্রে ও এই সম্পর্কে কারিগরী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, তার সহায়তাও বড় কম নয়। এখানে বিভাগ-চালিত তাঁতের কলাকৌশলের সঙ্গে যুক্তগতিত তাঁতে বিভিন্ন রেশমী কাপড়-চোপড় তৈরি করার শিক্ষা দেওয়া হয়। তাছাড়া, তাঁতশিল্প সম্পর্কে বিস্তৃত সবেকার ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে। পোনা ঘাস, নবানী আদ্যে, এমন কি তার পরও, হুগলি জেলার বিশেষ কয়েকটি শাখায় প্রচুর পরিমাণে রেশমী কাপড়-চোপড় তৈরি হ'তো। কিন্তু, এখন আর সে কারবার নেই। শুধু বহনগর এলাকায় কোটা-মাতীরা একরকমের মোটা রেশমী কাপড় বা কিছুটা তৈরি হয়। ফরাঙ্গীজা-নির হিসাবে আর-একটি কারবার বেশ ব্যাপকভাবেই পড়ে উঠেছে এই জেলায়। সেটি হলো ইট। হুগলির পশ্চিম তীরে বাগবোড় থেকে বালি পর্যন্ত বিস্তার ইটখোলা দেখতে পাবেন গ্রাও ট্রাঙ্ক রোড হ'য়ে এগিয়ে গেলেই। তার মধ্যে সবারে কোত্তর-এর ইট-ই নাকি সবচেয়ে ভালো। এ-জেলার অজ্ঞাত গ্রামীণ-শিল্পের মধ্যে রয়েছে হড়ি-মড়া, শিতল-কাপার তিলিশপ, গুড়, কাঠের আসবাবপত্র, মাড়র প্রভৃতি। উন্নত প্রবীণ কাঠের আসবাবপত্রের ক্ষুদ্র চন্দননগর, কেঁটা ও চুঁচুড়ার একটা খ্যাতি আছে। তেমনি, ধৈতির খ্যাতি কাগার বাসন-কোষদের ক্ষুদ্র। চণ্ডীলা ও ধনেশালি শানার কয়েকটি গ্রামে প্রধানত মৃদলমান মেহেরা-যে-সব হুগলি তৈরি ক'রে থাকেন, এ-জেলার গ্রামীণ-শিল্পের ক্ষেত্রে তারও একটা বিশেষ স্থান আছে।

ইংরেজদের আধিপত্য-বিচারের পর থেকেই যে এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার আবল পরিবর্তন ঘটে, ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এককিৎ কলিকাতার মোট উইলিয়াম কলেজ, অগ্রদিক ঈশ্বরানপুরের পাবি-সাংহেরা ১৯-শ শতকের গোড়ার দিকে এসেই শিক্ষা-বিচারে যেন উঠে-পড়ে লাগেন। অবত, রাফা বাবাহোদ, ইংরাজ বিদ্যালয় গ্রন্থ বৈদ্য মনীষী, পণ্ডিত ও শাখাশক্তির অজ্ঞাত পরিপ্রণব রয়েছে এই ব্যাপারে। হুগলি জেলার দখলের প্রাচীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

হ'লো হুঁচুড়ার হুগলি মহলীন কলেজ, শ্রীরামপুর কলেজ, আর উত্তরগাড়া কলেজ। হুগলি মহলীন কলেজ ১৮৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দের কোনো এক সময় বর্তমান কলেজ-বাড়িতেই স্থাপিত হয়। বাড়িটি অবশ্য অনেক আগের তৈরি হয়েছিল মহারাজ সিংহার ঈশ্বরভায়া। এক সময় কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের পরেই প্রাণত ছিল এই হুগলি মহলীন-কলেজের। প্রাচীন গ্রন্থাদির সংগ্রহশালা হিসাবে এই কলেজের গ্রন্থাগারটিও বিশেষ মূল্যবান। উত্তরগাড়ার থনামতল কমিটার অধ্যক্ষ মুশোণাখ্যায় ও তাঁর পুত্র রাজা পেশারীমোহনের চেষ্টাতেই স্থাপিত হয় উত্তরগাড়া কলেজ। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজা পেশারীমোহনই কলেজটি চালায়ে যান। শ্রীরামপুর কলেজ প্রাচীরে চিহ্নের রয়েছে তিনজন পর্ষদস্যব্দের অস্তিত্ব চেষ্টা। তাঁরা হলেন উইলিয়ম কেরি, যোগেশ মার্শম্যান ও উইলিয়ম গুয়ার্ড। কলেজ-বাড়িটি তৈরি হয় ১৯-শতকের দ্বিতীয় দশকে। কলেজের গ্রন্থাগারটিও অনেকদিনকার। কেরি-মার্শম্যান-গুয়ার্ডের অনেক পুঁজিচিহ্ন আছেও রয়েছে এই কলেজে। যেমন, তাঁদের বক্তৃতামক ও চোয়ার, কেরির জ্যাক, বাইবেলের অলুবাথ, এবং ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেলের রাজা এই কলেজ চালাবার মন্ত্র যে সমষ্টি সেনা সেইটি। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা শ্রীরামপুর অধিকার করলেও, কলেজটি থেকে যায় সেকালের ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের হাতেই। এই মেলায় যে-সব স্কুল রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে পুরানো হ'লো হুগলি-ব্রাক-স্কুল। তথানীকেন মেলা-মন্ত্র স্থিতি-নাহেব ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক টোল ও মন্তব্য-মাত্রাঙ্গা রয়েছে এই মেলায়। টোলগুলির মধ্যে হুঁচুড়ার 'বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন থনামতল শিক্ষাবিদ ও প্রবন্ধকার কুমারচন্দ্র মুশোণাখ্যায়। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব থেকে জানা যায়, এই মেলায় প্রতি বৎসর হাজার লোকের মধ্যে শাক্করের পথেরে পড়েন ২,৫৬৬ জন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা ছিল প্রতি বৎসর হাজারে ২,৩২১ জন; অর্থাৎ, বৎসর বহুরে প্রতি বৎসর হাজার লোকের মধ্যে শাক্করের সংখ্যা বেড়েছে যার ১৫% বড়োনে হুগলি মেলায় উক্তের শাক্কর মন্ত্র কলেজ রয়েছে সাতটি—হুঁচুড়ার হুগলি মহলীন কলেজ ও হুগলি উইলিয়ম কলেজ; শ্রীরামপুর কলেজ; উত্তরগাড়া কলেজ; চন্দ্রনগর কলেজ; ইটানুয়ার বিদ্যাসাগর মধ্যবিদ্যালয়; আর, আরামবাগের বৈদ্যকী মধ্যবিদ্যালয়। তাছাড়া, একাধক-শ্রেণী-সমবিত্ত দাম্ভিগার্পাল বা বড়-উদ্ভেদ-সাক্ক হাইস্কুল-রয়েছে

১৫টি, একাধক-শ্রেণী-সমবিত্ত সাধারণ হাইস্কুল ৪টি, ১০-ম-শ্রেণী-সমবিত্ত হাইস্কুল ১০৪টি, জুনিয়র হাইস্কুল ১০৪টি, জুনিয়র বৈদিক সমবিত্ত প্রাইমারী স্কুল বেচ হাজারের উপর, এবং আরও নানারকনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। বেশ বারীম হুয়ার পর হুগলিতে একটি বি-টি কলেজও স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যাংকলের সার্ভে ইন্সটিটিউট ও হুগলির ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি। বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে রিডা (শ্রীরামপুর)-র উইলিয়ম স্কুল, হুঁচুড়ার স্কি-বিদ্যালয়, এবং চন্দ্রনগরের চন্দ্রনগর স্কুল অব আর্টসও নাম করতে হয়। নিরক্ষরতা দূর করার উদ্দেশ্যে এই মেলায় বেশ কয়েকটি বহু-শিক্ষাকেন্দ্রও খোলা হয়েছে গত কয়েক বছরের মধ্যে।

শিক্ষার প্রসংগেই এসে পড়ে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাদির কথা। কারণ, শিক ও সাক্কতির ক্ষেত্রে এদের মূল্য অপরিসীম। হুগলি মেলায় সবচেয়ে প্রাচীন ও বড় গ্রন্থাগার হ'লো উত্তরগাড়া ও চন্দ্রনগরের লাইব্রেরি। উত্তরগাড়ার গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। তারপরের বহু প্রাচীন ও মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে এখানে। সবকিছু মুশোণাখ্যায়ের আর একটি অক্ষয় কীর্তি এই গ্রন্থাগার। চন্দ্রনগরের গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাতা হলেন হুদায পালিত। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারটি চন্দ্রনগরের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক-সংস্থা 'নৃত্যগোপাল্য স্কটি-মন্দির'-এর সূত্রে মুক্ত। এখানেও রয়েছে বহু প্রাচীন ও মূল্যবান গ্রন্থ। উল্লেখযোগ্য অস্ত্র গ্রন্থাগার রয়েছে হুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, কোমর, বংশবেড় ও বৈদ্যবাড়িতে।

শিক্ষিত ব্যক্তিমন্ড্রেই এ কথা জানেন যে, গ্রন্থাদি ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা-প্রকাশে হুগলি মেলাই এগুণে অগ্রণী। কারণ, হুগলিতেই প্রতিষ্ঠিত হয় এদেশের প্রথম ছাপাখানা, আর, হুগলি থেকেই বের হয় প্রথম ছাপা বাংলা-বই। প্রথম বাংলা সাংবাদ-পত্রও আত্মপ্রকাশ করে এই মেলা থেকে। হুগলিতে প্রথম যে ছাপাখানাটি স্থাপিত হয় ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, তার প্রতিষ্ঠাতা হ'লেন ইন্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানির এক প্রাক্তন কর্মচারী। নাম—চার্লস উইলকিন্স। এই ছাপাখানা থেকেই ছেপে বের হয় ছাপাহেড়-নাহেবের লেখা বাংলা ব্যাকরণ, অর্থাৎ *A Grammar of the Bengali Language*। সম্পূর্ণ দেশেই হরকেই ছাপা হরছিল বইখানা। এই দেশেই হরক-বৈদ্যের কৃত্তিবর্ষ উইলকিন্স-নাহেবের। বলা বাহুল্য, এই হরক তিনি তৈরি করেছিলেন কাঠ খোদাই করে। তাঁর কাছে হরকের আদর্শ ছিল প্রাচীন বাংলা পুঁথির অক্ষর, ও

জটিল স্থলী হাতের লেখা। এ-বাণীতে তিনি বড়া গ্রামের পকানন করকারের কাছে খেচ ও খেচ সাহায্য ও সহযোগিতা পেরেছিলেন। পরে, এই পকানন করকার নিজে যে বাংলা-বঙ্গ তৈরি করেন তা উইলকিন্স-লাহোরের রুতিমুখ ও চাঁপের দ্বারা। এই গ্রন্থে শ্রীরামপুরের 'ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস'-এর কথাও বসতে হয়। কারণ, এদেশের মুদ্রা-হস্ত ইতিহাসে এই চাপাখানাটির বিশেষ একটা স্থান আছে। উইলিয়ম ওয়াড ও চার্লস উইলকিন্সের সহযোগিতায় শ্রীরামপুরে এই চাপাখানাটি স্থাপন করেন উইলিয়ম কেরি। তিনি 'মিউ টেস্টামেন্ট'-এর যে বাংলা অনুবাদ করেছিলেন, এই চাপাখানা থেকে সেটি ছেপে বের হয় ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। তেরি-সাহেব নিজের চোখের সাক্ষ্য ও বাংলা বেশ ভালো করেই শিখেছিলেন। তবু তিনি বাইবেলের অনুবাদ করতে গিয়ে 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-চরিত্রা রামরায় বহুর সাহায্য নিতেও কৃত্যবোধ করেন নাই। সেই বাংলা বাইবেলের ভাষা দ্বন্দ্বত এমনকার পাঠকদের কাছে অস্বস্তি তৈর্যে, কিন্তু সেকালে এরকম ভাষাই ছিল সর্বজনকোষ্য সহজ বাংলা ভাষা। যেমন—

"যদি কোনও মনুষ্যের মনুষ্য কহা কর, তবে তোমার মনের স্বামী পিতা তোমার মনের কহা করিলে। কিন্তু যদি তোমার মনুষ্যের মনুষ্য না কহা, তবে তোমার মনের পিতা তোমার মনের মনুষ্যও কহা করিলে না।"

রামরায় বহুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-ও শ্রীরামপুরের এই 'ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস' থেকে ছেপে বের হয়। প্রকৃতপক্ষে এই বইখানিই এদেশে ছাপা প্রথম বাংলা গল্প-গ্রন্থ। বর্তমানে

হগলি জেলার ঘোটাঘুটি ভালো ছাপাখানা রয়েছে প্রায় ৪৭টি। তার মধ্যে সার মনুহুমাথ রয়েছে ১৩টি; চন্দ্রনগর মনুহুমাথ ১৪টি; শ্রীরামপুর মনুহুমাথ ১৭টি; আর, ২টি রয়েছে আরামবাগ মনুহুমাথ।

বাংলাভাষার প্রকাশিত সর্বপ্রথম মাসিকপত্রের নাম 'মিগ্‌লর্ন' এবং সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র হলো 'সমাচার-দর্পণ'। এ দু'খানি কাগজই বের হয় শ্রীরামপুরের মিশনারীদের উত্থোগে। 'মিগ্‌লর্ন' বের হয় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে; এবং সেই বছরের মে মাসে আন্তঃপ্রকাশ করে 'সমাচার-দর্পণ'। 'মিগ্‌লর্ন'-এর সম্পাদক ছিলেন উইলিয়ম কেরি; আর, খোদা মার্ম্যান ছিলেন 'সমাচার-দর্পণ'-এর সম্পাদক। দ্বন্দ্বত খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারই এ দুটি পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু, যেশ-বিশেষের সাহায্য ও নানা বিঘ্নে রচিত প্রবন্ধাদিও ছাপা হ'তো 'সমাচার-দর্পণ'-এ। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলছিল এই কাগজটি। সেকালে হগলি ও শ্রীরামপুর থেকে আর যে-সব সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে নাম করতে হয়—'বেঙ্গল গেজেট', 'ক্রেও অফ ইতিহাস', 'গভর্নমেন্ট গেজেট', 'আখবাবে শ্রীরামপুর', 'জানালগোষা', 'সংবাদ-দর্পণ', 'এডুকেশন গেজেট', 'জানালগোষা', 'সত্যপ্রবীণ', 'সমাচার-চক্রিকা' প্রভৃতির। বর্তমানে এই জেলা থেকে যে-সব সংবাদ-পত্র বা সাময়িক পত্রিকা বের হয়, তার মধ্যে 'চুঁচুড়া বার্তাবাহ', 'শ্রীরামপুর সমাচার', 'গলীভাট', 'সমাচার', 'আখবাবগোষা কবা', 'নবসঙ্গ', 'নবপ্রবাহ', 'নববিধান', 'নির্বাণ', 'জেলার কথা' প্রভৃতির নাম করা যায়। [কথন:]

পরিপাটী মুদ্রণ

আমরা

নিখুঁত ব্লক-তৈরির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

॥ কালার স্টুডিও ॥

৪২, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

ফোন : ৫৫-৪৬০৭



বাউল ধর্ম ও বাউল সাহিত্য

নীহাররঞ্জন রায়

রবীন্দ্রনাথের স্বল্পাণে একান্ত আধুনিক, শিক্ত ও নবরূপী বাউলী ও বাউল গান ও বাউল ধর্মের পরিচয় 'জানেন'; আর, বাংলার মানুষ হইয়াছেন শরীয়াতে, বাংলার গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে বাউলের পরিচয় ঘনিষ্ঠ, তাহার বাউলধর্ম ও বাউলসম্প্রদায়ের ধর্মও কিছু কিছু বাউল, বস্তু অশ্লীল ভাবেই হউক। তিব্বাটীরা এই বাউল বৈষ্ণব ও বাউল ফকিররা তাহাদের হাতে একতারা, বা কোমরে তুলি, বা কাঁখে কুলানো 'ওষু, তবি' বা বগলে সাঝিলা লইয়া, তাহাদের বিভিন্ন শোখা ও তাহাদের একান্ত ভাবময় কথাবার্তা ও আচার-আচরণ লইয়া বহুখালযাযং গ্রামনির্ভর ভূমিনির্ভর বাঁশালী জীবনের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া আছে। আর অল্প নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাঙালীর এই গ্রাম্যসমাজ ভাষিয়া পড়িতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাউল-সম্প্রদায়ও ক্রমশঃ কীৰ্ত্তমান হইতে হইতে প্রায় বিস্তুতির সীমায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছে; আর দুই-তিন দশকের মধ্যে হরতৌ একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া থাকিবে। তবু, অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইহাদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-আচরণ, ইহাদের বিভিন্ন গান ও ইহাদের জীবনযাত্রা গ্রামা ও নাগর উভয় সমাজের বাঙালী জীবনকেই সমৃদ্ধ করিয়াছে, বাঙালীর স্বপ্নকল্পনাকে একটি নতুন রূপের সন্ধান দিয়াছে, সে-রূপ রবীন্দ্রনাথের মত মনীষাকেও উৎসৃষ্ট করিয়াছিল।

বস্তুত, বাউলের সঙ্গে শিক্ত বাঙালীর কৌতুকে রবীন্দ্রনাথই উদ্বিগ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়াই, তাঁহার আশ্রয়ে অশ্রুপ্রাপিত হইয়াই কেহ কেহ বাউল গান সংগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন, কেহ কেহ বা বাউলধর্মের ঘনিষ্ঠতর পরিচয়লাভের ক্ষমতা ক্রৈস্ত হিঁসেন। এইসব চেষ্টার ফলে গান কিছু সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম ও সম্প্রদায়টি সঙ্কে বাহ্য কিছু জানা

দিয়াছিল তাহা তবু পরিমাণে বহু নয়, তথ্যাসিত্তেও বহুলাংশে হয় ভুল, না হয় অসম্পূর্ণ। বাউল ধর্ম ওকথাগনার ধর্ম, তাহাদের ধর্মীয় ক্রিয়া-প্রকরণের অভ্যাস লোকচক্ষুর আগোচরে; তাহাদের কোনো শাস্ত্রগ্রন্থ নাই; তাহাদের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার প্রকরণ ও ব্যাখ্যা সবচেই তাহাদের গানের মধ্যস্থিই ব্যক্ত। সে-গানের একান্ত লৌকিক অর্থের আড়ালে সাধনার গভীরতর ইঙ্গিত ও উদ্দেশ্য লুকাইত। প্রধানত এই কারণেই, এবং সমাজের অপেক্ষাকৃত নীচের তলার এই সম্প্রদায়ের চলাচল চলিয়া শিক্ত বাঙালী ও অনিশ্চিত অস্বীকৃত বাঙালী উভয়েই ইহাদের ধর্মবিশ্বাস ও আচরণ সম্বন্ধে আশঙ্কিত ও কতকটা অজ্ঞ। গান বাহ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহাও সর্বত্র মূল্যের সমান রক্ষা করিয়া চলে নাই।

কিছুদিন ধাবৎ বাঙালীর সংস্কৃতি ও বাঙালীর সামগ্রিক জীবনের ঘনিষ্ঠতর পরিচয়লাভের একটা গভীর ইচ্ছা দেখা দিয়াছে। সেই ইচ্ছার ফলস্বরূপ গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙালী জীবনের নানা দিক সম্বন্ধে কয়েকখানি স্তুতিস্তিত ও স্থলিত গবেষণা-গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। সন্ত্রস্ত অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' নিবন্ধনাব্যয় একখানি স্তুতগ্রন্থ গ্রন্থ (১৪০ + ৪২২ + ১৮০ + ৬০০ পৃষ্ঠা; ১২খানা কটো ও রেখাচিত্র; ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা ১২; ২৫ টাকা) রচনা করিয়া বাঙালীর হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থ বাঙালীর সামগ্রিক জীবন ও সংস্কৃতির একটি বিশেষ বিবেক তথ্যবহুল, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা ও বিশ্লেষণ। এই আলোচনা ও বিশ্লেষণের ফলে বাউল ধর্ম ও সম্প্রদায় এবং বাউল গান ও বাউল জীবন সম্বন্ধে যে-জ্ঞান পরিবেশন করা হইয়াছে, তাহা অতুলনীয়। ইতিপূর্বে এ-বিষয়ে এমন কেচোটা আর হয় নাই, এমন অভিনিবেশ

আর দেখা যায় নাই। এ-প্রকার প্রতি আমরা প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

এই গ্রন্থ রচনা করিতে গিয়া উপেক্ষাবাক্যে প্রায় বিংশ বৎসর পুরাতন গভীর নিষ্ঠা ও স্বকণ্ঠের পরিশ্রমে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে ইচ্ছাছে, নানা বাউল-সম্মেলন ও পটীগীতি-সমাবেশে গিনের পর গিন উপস্থিত হইতে ইচ্ছাছে, বাউলদের গুঢ় সাধনার অন্তরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছাছে তাহাদের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তার জীবন হইয়া, এবং অত্যন্ত অধিনিবেশে বাউল গান শুনিয়া-শুনিয়া লিখিয়া লইতে ইচ্ছাছে। কিন্তু তথ্যসংগ্রহেই এই গ্রন্থ স্তব্ধ নয়; সেই পর্বতপ্রমাণ তথ্য তাহাকে বিশ্লেষণ করিতে ইচ্ছাছে ভারতীয় ও বঙ্গীয় অতীত ধর্মসাধনার এবং স্বর্গাধর্মসাধনার আলোকে; সামাজিক নীতি ও আদর্শ, দ্রাব্য সাধনার আদর্শের উর্ধ্বে উঠিয়া বাউল-সাধনার মর্ম তাহাকে পৌছিতে ইচ্ছাছে। এই স্তব্ধতা ও স্বকণ্ঠের কারণে প্রথম ও দ্বিতীয়, পটীগীতি ও অঙ্গলিচ্ছন্দ বর্তমান প্রয়োজন হইলো, ততধর্মনিষ্ঠ প্রয়োজন হইলো ক্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তাহা না হইলে এ গ্রন্থ-রচনা সম্ভবই হইত না।

দ্বিতীয় হইতামাত্র বাক্য। প্রথমভাগে আছে বাউল শব্দের উৎপত্তি ও তাৎপর্য, বাউল কাহারা, বাউলগান কথায় অশ্রু-প্রবাহ, বাউলগানের রচয়িতা, বাউলগানের রূপ ও

সাহিত্যিক দৃশ্য, বাউলশব্দের আবির্ভাব ও বাউলগানের রচনাশৈলী, বাউলশব্দের উৎপত্তি ও স্থান, বাউলশব্দের উপাধান, বাউলশব্দের সাধনা, তত্ত্বসাধনা ও বাউলসাধনা, স্বর্গাধর্ম ও বাউলশব্দ এবং উত্তর-ভারতের সম্মেলন ও বাংলার বাউল-সম্মেলন প্রভৃতি সম্বন্ধে বিপর্যায়ালোচনা ও বিশ্লেষণ। দ্বিতীয়ভাগে আছে অশ্রু-প্রবাহের ব্যাখ্যানার্থে বাউলগান-রচয়িতাদের জীবনপরিচয় ও বাউলগানের সংগ্রহ। কবির লালন শাহ, পদ্মশোচন বা পোশো, চট্টক গোলাই, বাহুবিশু, চট্টা গোলাই, বদীশ, রামাভাষ্য, কবির শাহ শাহ, হাউড় গোলাই, গোলাই গোলায়, অরফান শাহ, চট্টাশাহ গোলাই, অনন্ত গোলাই প্রভৃতির পরিচয়ে এই ভাগটি সমৃদ্ধ। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই পরিচয় শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে এ-পন্থায় অজ্ঞাত ছিল। পাঁচভাগের উপর বাউলগান উপগ্রন্থাবলি নির্বাচনে স্থান পাইয়াছে, অর্ধশতকোটি ও ঠাকুরাণীসহা রামশাহী, রংপুর, ঢাকা, শ্রীহট্ট, বৈষ্ণবসিংহ, নবীয়া, বীরভূম, বাহুড়া, মেঘনীবপুর, বর্ধমান, চম্পিনগরগণা, বনোহর, করিমপুর, সুনির্ভাব্য প্রভৃতি নানা জেলায় গীত ও প্রত্ন গান এই সংগ্রহে বিস্তৃত। যাহোটি রেণা ও কটোড়ির এবং স্বকণ্ঠের কাগজে পরিচ্ছন্ন ছাপা ও বাধাই এই গ্রন্থটির মর্যাদার উপকৃত্তই হইবে।

অন্তঃপরিচয় সম্বন্ধে সচেষ্ট বাঙ্গালীসমাজেরই ইচ্ছা।

শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়িয়া দেখা উচিত বলিয়া মনে করি।

। পূর্ববর্তমান রবীন্দ্রনাথ ।

[লেখক : অমল হোম। প্রকাশক : এম. সি. সরকার আন্ড সন্স আইডেট লিডিংস]

[দ্বিতীয় সংস্করণ : মূল : ২ টাকা ১০ নব্য প্যাস]

কী বিপুল আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে এই বইটি নিঃশেষে পাঠ করি, তা প্রকাশ করা কঠিন। সাহিত্যের বাহ্যিক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বহু বই আছে, লেখকের মধ্যে বহু পণ্ডিত ব্যক্তিও আছেন; কিন্তু তাঁদের লেখার মধ্যে সাহিত্যের 'অ্যানাটমি' যে ভুলনার বড়ো হাযে দেখা বিরুদ্ধে, রবীন্দ্রনাথের অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁর পরিপূর্ণ জীবনবোধ, দেখাবে দেখা যায়নি। কীভিন্ন চেহেরে যে যাহুয় হিসেবে রবীন্দ্রনাথ মনঃ, এই প্রাচ্যভারতের গৃহে, কোনো লেখকই উচ্ছলভাবে আশোকপাত করতে পারেননি। কোথাও তাঁকে অতিমানবীয় করে তুলে দেওয়া হচ্ছে—যেখানে আছে সাধারণ মানুষের দৃষ্টির দূরত্ব। বস্তুতঃ, এই অতিমানবীয় গোশাক পরিবে রবীন্দ্রনাথকে আমরা লড়াই করে এসেছি। প্রচ্ছদ

শ্রীত্ব অমল হোম রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসার যারো আসনে বসিয়ে আমদের সামনে থেকে পড়া সরিয়ে নিয়েছেন। সেই অনাকৃত আসনে থেকে যাহুয় রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ রূপটি আমরা দেখতে পেলাম। বাংলা সাহিত্যের সত্যিকারের পাঠক, বর্তমান বাঙালী সমাজ এবং তাঁদের উত্তরপুরুষ শ্রীত্ব হোমের কাছে ভিন্নমনি গুণী থাকবে।

আলোচ্য গ্রন্থটি কয়েকটি প্রকৃষ্ণের সন্ধান এবং প্রকৃষ্ণগুলির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থেকে পরিপূর্ণ যাহুয় রবীন্দ্রনাথের একটি সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই পরিপূর্ণতা এসেছে সেখানে, যেখানে তিনি "দুর্লভিত যাহুয়ের পাশে এসে থাকিয়েছেন, যেখানে তিনি কর্তব্যে প্রতিষ্ঠা, নিশা-আখ্যোতে আশ্রয় এবং প্রেমের গীত"। কত প্রিয়জনদের স্মৃতির দূখ

তিনি সারা জীবন ব্যয় নিয়ে বেড়িয়েছেন, এবং তাই এই "দুঃখের আধার" রচিতে তিনি লেখছেন—বৃত্তার নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আধারে"। ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে বৃত্তার এই যে মীমাংসা—এই বিকট লেখক আশ্বাসের দানকে তুলে ধরেছেন। চল্লিশ বছরের মধ্যে তাঁর চারটি শিশুসন্তানের বৃত্তা ও পত্নীবিয়োগ তাঁকে গভীর আঘাত দিয়েছে, কবি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে যাহূর রবীন্দ্রনাথ দুঃখ-বেদনার কত যে সমৃদ্ধ, হৃৎকণ্ঠটি চিঠির উদ্ভুতি দিয়ে প্রসূত হোয় তা আশ্বাসের সেরিয়াছেন। আবার নিম্ন-আঘাতেও তাঁর সংঘর্ষ অদ্বাদশ। এককালে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে অসীল বলে রব উঠেছিল, তাঁকে ব্যঙ্গ করা হয়েছিল, আঘাত করা হয়েছিল নানা ভাবে। কিন্তু তিনি সব লক্ষ্য করেছেন। তাঁর একটি চিঠির উদ্ভুতি সিই—“জীবনের কত স্বক্টি-নিমিত্ত, কত সম্মান-অর্থমানের মধ্য দিয়ে আশ্রয় পলানের পায়ে এগে চেকেছি—সত্ত্ব হেটোকে অত্যন্ত বড় এক: কঠিন-ও ছন্দস্ব বলে ঘনে হয়েচে, সে সমস্তই ছায়ায় মতো হয়ে গেছে—এবনি করে একদিন সমস্ত বাস-বিবাহের বাইরে ভেসে চলে যাবে।”

কেবল নিঃস্বের দুঃখ নয়, অতিসামান্য যাহূরের দুঃখ তাঁর সাহিত্যে কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, লেখক নিপুণভাবে তা আশ্বাসের কাছে উপস্থাপিত করেছেন ‘কোরানী রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথকে এককালে মার্কিন কবিরেডা ‘বুর্জোয়া’ কবি বলে তাঁর সাহিত্যের প্রাচীর আঘাতন করেছিলেন। সেই প্রাচীরভাঙার চীৎকার অবশ্য টেকেনি। এই গ্রন্থটি ১৩৪৮ সালের একটি ভাষণ। গ্রিক সেই চীৎকারের কালে এই গ্রন্থটির অসামান্য প্রেরণাশীলতা ছিল এবং আশ্রয় আচ্ছ, কারণ রবীন্দ্রনাথ যে যাহূরের কবি, মতবাদের কবি নন—সেই দিকে দৃষ্টি দেবার দিন এখনও শুকই হয়নি, শেষ হওয়া তো ঘুরের কথা।

আলোচ্য গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হ'ল ‘মাসিয়ানগ্রন্থাবলি হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের চিঠি’। লেখক ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসের একটি গোপন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আশ্বাসের লক্ষণে উপস্থাপিত করেছেন। পাতাখের দুঃসংসার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘নাইট’ উপাধি কিরিয়ে দিয়েছিলেন, দেশবাসী এইটুকুই জানে। কিন্তু কী সেই জলদ পটভূমি, কী পতীর মর্যবেদনা, কোন্ হত্যা সেদিন কবিকে উদ্বাহ করে তুলেছিল—সে-কব ক'জন মানে? ক'জন মানে, বলাচটকে লেখা চিঠির ভাষা একটু মনন করার অহরোধ করার ফলে রবীন্দ্রনাথ এগুকের দিকে এমন ক'রে তাকিয়েছিলেন যা

তিনি জীবনে তুলতে পারবেন না কোনদিন। এগুকের ভাষণ—“Such a look as I had never seen in the eyes of Garudov before or after it” শুধু উপাধি-বর্জন নয়—প্রতিবাদ-সত্যার আঘাতনের চোটা, পাতীজীর সঙ্গে পাতাব-সম্বন্ধে যাবার চোটা, ইংরেজ ‘নাইট’ উপাধি প্রত্যাহার ও তাঁর চিঠির প্রতিক্রিয়া, অমৃতসর কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথের প্রতি উপস্থাপনা—সবগুলি অতি মূল্যবান ইতিহাসিক ঘটনা প্রক্ষেপে প্রসূত হোয় আশ্বাসের আনিয়েছেন অমৃত পশ্চিমাদী কিন্তু চিত্রশিল্পী ভাষায়। প্রবন্ধটি পড়তে-পড়তে সেই অতীত দুঃখ কির রেতে হয়—যে-দুঃখ রবীন্দ্রনাথের মস্ত মস্ত বুক ত'রে ওঠে, আবার তাঁর প্রতি উপস্থাপন মস্ত পতীর বেদনা জেগে ওঠে। দেশবাসী সেদিন এই কবিকে উপস্থাপিত করতে পারেনি, তাই নির্বাক ছিল। পরবর্ত্তে এই অসীম মানের কথা বৃত্তে পেয়েছিলেন; বলেছিলেন—“কেনের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন করে শেলোম রবীবাবুকে। এবার একাই তিনি আশ্বাসের মূখ রেখেছেন।” এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রবন্ধকার প্রসূত হোয় এই বিবৃতি কালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাই তাঁর বিবরণ যেমন সত্য, তেমনই সীল।

সামগ্রিক দিক থেকে বইটি যে অতি মূল্যবান, মর্যস্পর্শী, ভাষার নিপুণ শিল্প-নির্মিত—সে সন্দেহ দূরকর্মে প্রশংসা না করে উপায় নাই। কিন্তু গ্রন্থটির মধ্যে যা আশ্বাস ভালো লাগেনি তাও বিনীতভাবে উল্লেখ করতে চাই।

(১) প্রবন্ধগুলি যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাষণের অংশগণন, তবু, গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার কালে সাংবাদিক বৃত্তির অংশটুকু বাস বিলে যা সেই অংশটুকুকে প্রবন্ধ-সাহিত্যে রূপান্তরিত করলে বেগুয় ভালো হ'ত। এটি আধিক্যগত ক্রটি বলে আমার মনে হয়েছে। (২) প্রথম সংস্করণের অভিমতগুলি নানাব্যবহার মতো গ্রন্থটির নানা পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। ‘অনেকে ভালো বলেছে’ এই প্রচারের মধ্যে একধরনের বীনতা থাকে—যা বাস্তবে চলে আসছে। কিন্তু এই বীনতা কোনো ভালো বই পড়ার ক্ষেত্রে অদৃশ্য লাগে। (৩) ‘সাম্প্রতিক রবীন্দ্র-সমালোচনা’ প্রবন্ধটিতে কোনো বিষয়ের প্রতিবাদ-কালে লেখকের উপর যে আক্রমণ ও অপমান বর্ষণ করা হয়েছে, তা সম্বন্ধে অগ্রয়োজনীয় ছিল। ধার সাহিত্য নিয়ে ও ধার জীবন নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে—তিনি কিন্তু ক'য় করেছিলেন, লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর প্রতিপক্ষকে, এ কথা লেখক পূর্বেই বলেছেন। কোনো

বিদেশ একমত না-হওয়া অজ্ঞান নয় এবং যতভেদের ক্ষেত্রে প্রতিবাদও প্রয়োজন, কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়ের দৃষ্টান্তের থেকে বাস্তবিক যতদূর সম্ভব দূরে রাখাই কর্তব্য।

‘পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ’ পাঠ করে বেটুকু আমার ভালো লাগেনি তা সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি। শ্রীযুত হোম রবীন্দ্রনাথ দখল বলায় একজন যোগ্যতম অধিকারী। তাঁর

ভাওয়ারে সঙ্গ্য তিনি যদি একাই জীবনে ভোগ করেন তবে তিনি বৃহত্তর রবীন্দ্র-পাঠ্যহারাণী পাঠক-সমাজকে বঞ্চিত করবেন। আমরা পাঠকেরা তাঁর কাছ থেকে আরও বেশি আশা করি। এবং সেই আশার অংশাতে ‘পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ’ একটি অতি ক্ষুদ্র আয়োজন যাত্র।

স্বকৃত্যর স্বাধীন

■ বিবাহিত প্রেম ।

[রচনা : মারী সৌশল্-এর অমৃত্য : করনা জার । প্রকাশক : আর্ট আরও সেন্টার্স পাবলিশার্স, লন্ডনব্রুস হাউস, কলিফোর্নিয়া ১২ ।
৪৫৫ চার্টার টাকো]

মারী সৌশল্-এর বিখ্যাত বই *Married Love*-এর এই সহস্র ও সুরল অমৃত্য-গ্রন্থখানি বিবাহিত নরনারীর কাছে বিশেষ সমাদ্র লাভ করিবে, এ-কথা অনায়াসেই বলা যায়। কারণ, মারী সৌশল্-এর গবেষণায় স্পষ্টপ্রসূত এই বইখানি নরনারীর মনস্তত্ত্ব ও বৌদ্ধবীচন সম্পর্কে বৈশিষ্ট্যময় তত্ত্ব ও জ্ঞানার্হ সন্ধান দেয়, তাছাড়া বিবাহিত জীবন সুখময় করিয়া তোলা সহস্রতর হওয়ারই সম্ভাব্য। অজ্ঞতার ফলে বেগানে

এমনদের বহু বিবাহিত জীবনই সুখময় হয় না, সেগানে এই-জাতীয় গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। বৈহারা মূল গ্রন্থখানি পড়িবার সুযোগ পান নাই, অথবা ইংরেজি হইতে বাংলায় গকে তব ও তথ্যের আদ্যাদন সম্ভবপর নয়, তাহাযের গকে কল্পনা বাহু অনুদিত আলোচ্য গ্রন্থখানি অবতর পঠনীয়।

গ্রন্থখানির বিভিন্ন সংস্করণ বাহির হইয়াছে—সুখের কাগজে চমৎকার ছাপা ও সন্মোদন গ্রন্থন। —স্বপ্নীক বসু

■ তুলকা ।

[অনুবাদিকা : করনা জার । প্রকাশক : আর্ট আরও সেন্টার্স পাবলিশার্স, লন্ডনব্রুস হাউস, কলিফোর্নিয়া ১২ ।
সাইন্স—১ স্ট্রিট : পুস্তা-সংখ্যা ১৪০০ । ৪৫৫ চার্টার টাকো]

ধর্মবিশিষ্ট ফরাসী লেখিকা ফ্রান্সোয়া সার্গ-র *Donjour Triadene* উপন্যাসের অনুবাদ-গ্রন্থ এই ‘তুলকা’। অষ্টাদশী শতাব্দী ফ্রান্সোয়া সার্গ-র এই হ’লো প্রথম বই, এবং, এই বই ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সন্ধান—‘Grand Prix des Critique’ লাভ করেছে অনায়াসে। ফ্রান্স, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে বইখানির কাঙ্ক্ষিত ও হৃৎকোষ দৃষ্টি। এক ফরাসী-সংস্করণই নাকি বিক্রি হয়েছে পাঁচালকের উপর। বইখানির ইংরেজি-সংস্করণও বেরিয়েছে, এবং ‘তুলকা’ সেই ইংরেজি-সংস্করণেরই অনুবাদ ব’লে মনে হয়। ইংরেজি-সংস্করণখানি আমার পছন্দার স্রোতঃ হইয়াছিল। বলতে বাধ্য নই যে, বিশ্বব্যবস্থার অভিনবত্বের চেষ্টাও লেখিকার বর্ণনাত্মকী আমায় কবে মুগ্ধ করিয়াছিল। ফরাসী দেশের পরিবেশে এ-রকমের কাহিনী হয়তো বাস্তব। কিন্তু বড় বেশি ভুল বাস্তব। এক কন্যাতত্ত্ব

বিশদীক ব্যক্তি, তাঁর দুই বাছনী, এবং স্বর্গভা পত্নীর এক সন্ত-প্রত্যাপগতা মেয়ের কথা নিয়েই এই উপন্যাস। কাহিনীটি বর্ণনা করা হয়েছে সেই মেয়ের মুখে দিয়েই। অবাক হ’তে হয় মেয়েটির সত্য-কথনের নির্ভীকতা দেখে। সে যখনযিক, তাঁর পিতাও তাই। পিতা ও পুত্রীর মধ্যে মনের দিলটা তাই বেশি। ফলে, দু’মনের কাছে দু’মনের জীবনের কোনো রহস্যই মনে আর জানতে থাকি থাকে না। চোখের সামনে ঘেরে লক্ষ্য করছে তার বিশদীক পিতা, যিনি এতদিন বিবাহ-বন্ধনের খোর বিকসে ছিলেন, তিনিই কেমন যৌবনে নারীর প্রেমে আত্মসমর্পণ করছেন। এই নিয়ে তার চিন্তা ও কল্পনা। প্রেম সম্পর্কে তার নিজেরও একটা পত্নীর অহুত্ব আছে। তাই সে কল্পনা নিতে পারে কেন তাঁর বাবা চলি পছন্দ বয়সে আর নিঃসঙ্গ থাকতে চান না,

কিংবা হয়তো 'ঐশ্বৰ্য্যভুক্তি' নিৰ্দেশিত ভাৱৰ আগে এ তাৰ শেৰ 'সংস্কাৰ'। এট নিউ সে তাৰ বাৰাৰ সূত্ৰ খোলাপুলি অনেক আলোচনাও কৰেছে। যেন-আলোচনা এদেশৰ কোনো পিতা-পুত্ৰৰ মনো কথনও সম্ভৱ কিনা জানি না। লেখিকৱে এই আশংকা সত্তা-কথন পাশ্চাত্য দেশৰ লাইকৰ্ণৰে কাছে নিঃসন্দেহে অভিমুখিত হ'বে, কিন্তু এদেশৰ লাইকৰ্ণৰ বহি অকৃত্য লাভ: না পেন তাহ'লে তেনেৰে সোৰ সেওহা হাৰে না। বাস্তৱ বহই কেননা কঠোৰ সত্ৰ হ'লে

সেবা দিক, সাহিত্যে সৰসমত তাৰ আমদানি কৰা চলে ন', মন্ত্ৰ কৰাও বাঞ্ছনীয় নয়। তাৰে একথা স্বীকাৰ কৰতেই হ'বে যে, জাতিগোৰ: সাৰ্ব স্বত্ব মনস্তত্ব-বিজ্ঞানে বে নিপুণতা সেবিবোজন তা প্রশংসনীয়।

বইখনিৰ চাপা, কাগজ ও বিন্দুই প্ৰথম দেৱীৰ: কিন্তু বহুকে ভাৱেণে প্ৰশংসাশোভনে কিছু গাণিত্যিত আছে। প্ৰজ্ঞাটি হৃদয়।

সংক্ষিপ্ত পৰ্য্য



QUALITY
SPEED
SERVICE

BHARAT
DYERS &
DRY CLEANERS

Phone: 33-6111

30-31, KALAKAR STREET
CALCUTTA-7
Branch:

118, Mahatma Gandhi Rd.
CALCUTTA-7

Branch:
71, Amherst St.
CALCUTTA-1

মঞ্চ-দর্শন

চিত্রলোক

পদ্মনাভ

কালমাটি

প্রয়োজনা : 'টান্ ফিল্মস'-এর পক্ষে 'তা'র বর্নন।
পরিচালনা : তপন সিংহ। সমীক্ষা-পরিচালনা : ববিন্দ্রবর।
কাহিনী : রমাপল চৌধুরী। চিত্র-নিয়ন্ত্রণ : অরুণভট্ট।
মুখ্যপাশায্য, অসিতবরণ, তপতী ঘোষ, মানসী সোম,
অরুণভট্ট, জীবন বসু, জহর দাস, ভাহু বন্দ্যোপাধ্যায়,
অমিল চট্টোপাধ্যায়, ছবি নাগ, বৃন্দা উট্টাগাও এবং আরো
অন্যের।

কালো মাটি আর কালো মানুষ। কালো কলার
খনিতে কাজ করলেও নর তাদের কালো নয় ঘোটেই।
মুগ্ধ শব্দ অসহ্যর তাদের জীবনযাত্রা। ধরিত্রীর গর্ভ
থেকে কল্যা ভুলে দিনাতিপাত করে এই মানুষগুলি।
মধ্যাহ্নে প্যারিসমিত পেলে হুতা পান ক'রে মনের ক্ষুধা
মোটায়ে। স্বামী-স্ত্রী একটি সঙ্গে পাশাপাশি কাজ করে
বসিতে। সঙ্গে নিয়ে আসে সেলোমেরদেব। কিন্তু
বাতের সংহ মজর দিতে পারে না তাদের দিকে।
ভুক্তির কালো মানুষেরা ধুলোয় দুটোর অনাদর আর
অবহেলায়। সারাপিনের কাজের শেষে ঘরে এলে ছেলে-
মেয়েরা পায় মাক্রোফ, পায় শিতার আঁধার।

এরিক ক্রেই সিন ক টে এই মানুষগুলির, যারা সভ্যতার
অগ্রগতির হরাহিত বহুত জীবনশ্রান্ত করে। গনিহ
মালিকের মনে ভক্তির উদয় হোলো। তাঁরা চাইলেন
অবহেলিত শিতার জন্তে শিতা-রক্ষাগার গড়ে তুলতে।
পরিচালনা-মতো কাজ হোলো, কলকাতা থেকে এসেই শিতা-
রক্ষা-বিবেচনায় অসিকারী। সবই হোলো, কিন্তু বাহের
মঙ্গলের জন্তে এই এটোটা তাদেরই দেখা পাওয়া গেল না।
কালো মাটির কালো মানুষেরা এখনে তাদের সম্মানের
ভুলে দিতে চাইলো না অপরের হাতে। অবশেষে
অসিকারী আবার শিতাও হোলো। তাদের কলকাকলীতে
ভরে উঠলো শিতা-রক্ষাগার।

কিন্তু মানুষের মন বড়ো বিচিত্র জিনিস। যে
অসিকারী সহজ সরল ব্যবহারে সকলেই সহজভাবে তাকে
গ্রহণ করে, অপর তাকেই স্বাধীনতার অধিকারে না পেয়ে
হয় উদ্বিগ্ন, সন্তোষ আর অবিচারের লালনপালনের ফলে
নাশা হুলে ঠাণ্ডার কুচক্র। অথবা গোবারণ করা হয়
নির্দোষীর উপর। শেষ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে যাদের কোল বালি
করে চলে যায় একটি কটি প্রাণ। স্ক্রিনেই শেষ হয় একটি
মহীকরের ডবিক্ত। সম্মান-বিরোধের হ্রাসই বেধনাকে
তুলবার জন্তে সম্মানহীন করে যেতে চায় আগেকার
জীবনে, ছেড়ে যেতে চায় কালোমাটির মায়া। কিন্তু
কালো মাটি আর কালো মানুষদের মায়া কাটালেও কটি
শিতার হাতের ঘুরো থেকে ছাড়ানো যায় না ধন্দ-পড়া
হাচল। কি এত অশেষ বাধনে যেন ঝাড়া পড়ে যায় সম্মান-
সম্মানবিরোধ-বিধুরা জননী। শেষ পর্যন্ত সে থেকেই যায়।
একটি সম্মানকে হারিয়ে বহু সম্মানের জননী হয়েছে সে।
আর তা ছাড়া কালো মাটির কালো মানুষেরাও অসহ্য
হয়ে ক্ষা চায় তাদের ভুলের জন্তে।

প্রাকৃতিক পরিবেশে ছবিটির অনেকখানি তোলা।
সেইজন্তে চিত্রগ্রহণ জীবন্ত হয়ে কুটে উঠেছে পর্দার গায়ে।
চিত্রনাট্য সুনির্দিষ্ট হওয়ার ফলে কাহিনী এবং লালন
ছবির গতিকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।
প্রথমদিকে যেভাবে কলার খনির কাজকর্ম বনির
ভিতরের এবং বাইরের দৃশ্যের মধ্যে বিদে ভুলে ধরা হয়েছিল
জাতে ডুম্বেটোরী ছবির আলপাওয়া যায়। কিন্তু হ্রাসের
বিষয়, শেখরিকের অতি-নাট্যকীরতার সঙ্গে সমতা বজায়
থাকেনি।

ছবিটির প্রতিটি চিত্রই অত্যন্ত সরল দিয়ে স্ক্রিনে
তোলা হয়েছে। বিশেষ করে অরুণভট্ট এবং অসিতবরণ
অভিনয়ের মধ্যে বেরকম সংঘর্ষ দেখিয়েছেন তা বহুকাল

কোনো বাংলা-ছবিতে চোখে পড়েনি। সব দিলিবে 'কাল্যাদাট' ছবিটি অস্ত্রাত আর পাঁচটা ছবির মতো নয়। এর একটা মানবিক আবেদন আছে, যা 'সর্গস্থলের ও সর্বকালের। সেইখানেই এই ছবির সার্থকতা। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার এক অসাধারণ প্রতিচ্ছবি এর

মধ্যে স্পষ্ট। কল্যাণদীপা ভালোই কাজ করেছেন, বিশেষ করে আদ্যোক্তিক ও নন্দ্যগ্রহণের কাজ খুবই ভালো হয়েছে। তবে একান্ত দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে বাধ্য যে, রবিশঙ্করের দর্শিত-পরিচালনার মধ্যে রবিশঙ্কর-স্বলত মুনীন্দ্রনার কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি।

মুকোচুরি

প্রযোজনা : 'কিশোর ফিল্ম'-এর সঙ্গে কিশোরকুমার।
কাহিনী, সংলাপ ও চিত্রনাট্য : রূপক। সঙ্গীত-পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা : কমল মজুমদার।
চিত্রিত-চিত্রণ : বাংলা সিন্ধা, অনীতা গুহ, কিশোরকুমার, অমূলকুমার, বিপিন গুপ্ত, রাজলক্ষী, নবেন্দ্র সোম, মৃণালি চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ সেন, অসিত সেন, কেই মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেক।

'মুকোচুরি' কেবল-হাসির ছবি। তবে হাসিটা কাত্তরুর দিয়ে নয়, হাস্যাতিক ভাবেই। হুই বহল ভাইকে নিয়ে ক'হিনী। প্রথমদর্শনেই নাহিকার সঙ্গে প্রেম, মধ্যে ছাড়াছাড়ি, মন-কথাকদি এবং শেষে বিলন। একেবারে বাঁধা ছকে ফেলা। সেইকতে কাহিনীর গুরুত্ব নেই। কাহিনীর জন্তে ছবি নয়, ছবির জন্তে কাহিনী। ফলে, কাহিনী কোনো জায়গায় বেথাপাত করে না মনে। গানের সুখ এবং আবহ-সঙ্গীত হাসির ছবির বথাবথ বর্ধনা দক্ষ করেছে।

অভিনয়ের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য কিশোরকুমার। তিনি একাই টেনে নিয়ে গিয়েছেন আগাগোড়া ছবি। অবশ্য তাঁকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ছবিটি। কয়েক জায়গায় সংলাপ বেশ খালাসে হুওয়ার ফলে বেশ উপভোগ্য হয়েছে কয়েকটি দৃশ্য। একশকে হুটি চিত্রিত-অভিনয়ে কিশোরকুমারের মুনীন্দ্রনা প্রমত্তা পাবার দাবি রাখে।

প্রধান স্ত্রী-চিত্রিত-হুটিতে খালা সিন্ধা এবং অনীতা গুহ সংলগ্ন অভিনয় করেছেন।

ছবিতিকে এককথায় বোঝাই-মার্গ। বাংলা-ছবি বলা যেতে পারে। কারণ কতকগুলি জায়গায় বোঝাই-ছবির প্রভাব বেশ স্পষ্ট। সেটা খুব সম্ভবত বোঝাইতে ছবিটি তৈরি হওয়ার ফলে। একটা কথা অনবীর্ষ যে, ছবিটি শেষ পর্যন্ত দর্শককে আকৃষ্ট করে রাখে। একতিমাত্র আপত্তির কারণ এই যে, অজিত চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে বোঝাই-এর দর্শিত-পরিচালকদের উপর যে কটাক করা হয়েছে তা শিটাচারের মাত্র ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে গানের সুখ-বেগুনা আঁচার-অচরণে শতীনদেব বর্ধনকে অতুলন করার ফলে। কোনো গুটিকে নিয়ে এ-ধরনের রসিকতা হাস্যাতিক সৌজন্যবোধের সীমাবেধা অতিক্রম করেছে।

'মুকোচুরি'র কল্যাণদীপের অস্ত্রাত দিক ভালোই হয়েছে বলা চলে। পরিচালনার ক্ষেত্রে নবাগত পরিচালক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে চ্যাপ রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন। প্রযোজনার ক্ষেত্রে কিশোরকুমারের এই প্রথম পদপাত। এবং এতে তিনি সক্ষম হয়েছেন বললে অস্ত্রাত করা হবে না। তাঁকে ধন্যবাদ, এইজন্ত যে, অধিকাংশ হাসির ছবির মতো হাসির ছবি করতে গিয়ে হাস্যকর ছবি করেননি।

। আ গা মী আ ক র্ ষ ব ।

ইন্দ্রাবী

বাংলাদেশের মজতব খ্যাতিমান কথাসিরা অচিত্রাকুমার সেনগুপ্তের কাহিনী-অবলম্বনে এইচ. এন্. সি. প্রোডাকশন 'ইন্দ্রাবী' নামে একশানি ছবি তুলছেন। ছবিখানির পরিচালনা ও সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে

বথাকবে নীরনে লাহিড়ী ও নটিকতা ঘোষের উপর। মূল ছবিকা হুটি রূপায়িত করবেন উজ্জয়কুমার ও হুচিত্রা সেন। অস্ত্রাত ছবিকার রূপ বেবেন ছবি বিশ্বাস, পাখাড়ী সান্তাল, নবিতা সিংহ, জীবনে বস্ত্র, অপরূপ দেবী, চত্রাবতী, তপতী ঘোষ এবং আরো অনেক নামকরা শিল্পী। নেপথ্য

। খুচরো খবর ।

ইংলেণ্ড এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় ছবিয় প্রচার বাড়াবার প্রচেষ্টায় সশ্রমের 'এনিয়ান ফিল্ম সোসাইটি' আন্তর্বিষয়ভাবে আন্তর্বিয়োগ করেছে। কিছুকাল পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে লণ্ডনে 'ভারতীয় চলচ্চিত্র সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হওয়ার ফলে ওদেশে ভারতীয় ছবির চাহিদা অনেক বেড়ে গিয়েছে। সম্ভ্রুতি এই প্রতিষ্ঠানটি আমেরিকা ও জার্মানিতেও অস্বরূপ চলচ্চিত্র-সপ্তাহ উদ্‌যাপনের আয়োজন করছে বলে জানা গিয়েছে। আগামী বছরের প্রথমদিকে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক, ওয়ানিটন ও লন্ড্র এন্ডেলস নগরে 'ভারতীয় চলচ্চিত্র সপ্তাহ' উদ্‌যাপনের তোড়জোড় চলছে বর্তমানে। আগামী বছরের কোনো এক সময় জার্মানিতেও 'ভারতীয় চলচ্চিত্র সপ্তাহ' উদ্‌যাপন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। যে সময় ছবি ওদেশের দর্শকদের কাছে উপভোগ্য হবে, সেই ধরনের ছবিই ভারত থেকে নির্বাচন করে দেখানো হবে চলচ্চিত্র-সপ্তাহের অস্থায়নগণিতে। বিশেষে ভারতীয় ছবির চাহিদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় 'এনিয়ান ফিল্ম সোসাইটি'র শুভ প্রচেষ্টা সার্থক হোক এই কামনা করি।

ভারতবর্ষে কাঁচা ফিল্ম তৈরি করার কারখানা নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারত সরকার যে পরিকল্পনা করেছেন তাতে সহযোগিতা করতে উদ্বোধিত হয়েছে পূর্ণ-জার্মানি। বর্তমানে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা-আলোচনা চলছে বলে প্রকাশ। বিশ্বজুড়ে জানা গিয়েছে যে, পূর্ণ-জার্মানি সরকার কাঁচা ফিল্ম তৈরি করার কারখানায় ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ-সমিতি এবং যন্ত্রপাতি-নির্মাণে সহযোগিতা করছে সম্মত হয়েছেন। এ ছাড়া ভারতীয় কৃষীদের জার্মান বিশেষজ্ঞদের স্বাধীনে শিক্ষাদানের একটি পরিকল্পনাও তীক্ষ্ণ অগ্রবোধন করেছেন। ভারতের তৃতীয় বায়িক পরিকল্পনায় গুরুত্বই কাঁচা ফিল্ম তৈরি করার কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা কার্যকরী করার দিক্‌তে গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যতরিলম্বই ভারত ও পূর্ণ-জার্মানির মধ্যে এই বিষয়ে একটি চুক্তি সম্পাদিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ভারতীয় ছবির সম্মাননা উপলব্ধি করে ভারত সরকার একটি 'লেন্ডিং-বন্ডানি উন্নয়ন কমিটি' গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন। ক্ষেত্রীয় দায়িত্ব-পন্থর, ক্ষেত্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তর এবং চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত হবে। বিশেষে ভারতীয় চলচ্চিত্রের বন্ডানি বাড়িয়ে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রচেষ্টাকে কি ভাবে কার্যকরী করা যায়, তার উপায়-নির্ধারণই হবে এই কমিটির মূখ্য উদ্দেশ্য।

ভারত সরকারের চলচ্চিত্র-দপ্তর শিল্পের উপযোগী এক-রীলের একটি রঙিন কাউন্-ছবি তৈরি করার কাজ সম্ভ্রুতি শেষ করেছেন বলে জানা গেল। জাতকের ক:হিনী অবলম্বন করে কাউন্-ছবিতি তোলা হয়েছে। ১৯৪৬ সালে পরীক্ষামূলকভাবে চলচ্চিত্র-দপ্তরের কাউন্-বিভাগটি খোলা হয়। এটি গড়ে তুলতে বিশেষ বিশেষজ্ঞ ও কলা-কৃষীদের সক্রিয় সহযোগিতা বিশেষ কার্যকরী হয়। বর্তমানে পনেরো জন ভারতীয় চিত্রশিল্পী এবং কয়েকজন কলাকৃষীরা কাউন্-ছবির নির্মাণ পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাগ্রস্ত করেছেন। কিছুকালের মধ্যেই চলচ্চিত্র-দপ্তর নিয়মিতভাবে কাউন্-ছবি নির্মাণের কাজ শুরু করবেন।

সম্ভ্রুতি বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্প-মণ্ডলিত কলাকৃষীদের প্রতিষ্ঠান 'সিনে টেকনিশিয়াল অব বেঙ্গল'-এর পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি-দল গতিময়বদের প্রথমতী আবহুস মাভারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকার প্রদমে কলা-কৃষীদের অভ্যাস-অভিযোগের প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা-আলোচনা হয়। প্রতিনিধি-দল স্টুডিওগলিতে 'কারখানা আইন' চালু করার উপর কোর দেন। প্রতিনিধি-দলের নেতৃত্ব করেন 'কলাকৃষী সমিতি'র সভাপতি প্রবুল রায়। প্রকাশ যে, প্রথমতী কলাকৃষীদের অভ্যাস-অভিযোগের প্রতিকার করার ক্ষেত্রে চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এসম্মত বলা যেতে পারে যে, কলকাতার স্টুডিওগলির অন্যায়র গোপ করার ক্ষেত্রে 'কলাকৃষী সমিতি' কিছুকাল বায়ং আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।



সুবিষ্টিত

ফুটবল :

■ ফুটবল-লীগ ■

কোলকাতার ফুটবল দুইদশ গতিতে এগিয়ে চলেছে। সিন্টি লীগের কিছু খেলা তক হয়েছে। খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুরোমোহাৎ রয়েছে, তা খেলার ফলাফলের মাধ্যমে প্রমাণ হচ্ছে। কিছু খেলার মধ্যে মাগেজার সেটক আর দু'য়ে পাওবা থাকে না। বিশেষতঃ দ্বিতীয় দর্শকরা ঘাসের ক্ষত ব্যাঙ্গল আশ্রয় অনেকা করছিলেন। সেই এশিয়ান-গেমস-কেন্দ্রত খেলায়ও ব্যক্তিগতভাবে হ-একজন ছাড়া আর কেউই মোটে সুবিধে করতে পারছেন না। তার মধ্যে সবচেয়ে হতাশাজনক খেলাইন মোহনবাগান লগের চুনী গোখামী ও অমেন হোসেন। যান হয়, মোহনবাগানের হকপডালের সকে নিজেই দ্বিকমতা খাপ বাটবে নিতে তাঁর বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। রাজধানীর মাঝোবনেরও প্রায় ঠিকের মতোই অবস্থা। তবে সিন্টি লীগের খেলায় যান হয় ঠিকের কিছুটা পরিবর্তন ঘটবে।

এর মধ্যে লীগের বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ খেলা হয়ে গেল। তার মধ্যে একটি মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল। এ খেলায় মোহনবাগান দল ১-০ গোলে জয়লাভ করে। জটিলত গোলাটি করেন শৈলেন মাস্ত্রা-কিকের সাহায্যে। তাঁর সে-কিক সত্যিই অশূর্ষ হয়েছিল। আরেকটি মহামেজান বনাম ইস্টবেঙ্গল, এ খেলাতেও মহামেজান দলই জয়লাভ করে লীগের একটি দুর্ভাগ্য ব্যাপ্তি অতিক্রম করে। মোহনবাগান বনাম রাজধানীর খেলাটি অস্বাভাবিকভাবে শেষ হয়। ঘাই হোক, লীগে এক মহামেজান বাবে কোনো গুরুত্ব বিবেচন সুবিধে করে উঠতে পারছে না। তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন অবস্থা ইস্টবেঙ্গলের। মোহনবাগান দলও খুব নিরাশ্রয় নেই। অস্ত্রান্ত সব দল ব্যাধব। লীগের

ওপরের মোহনবাগান, মহামেজান ও ইস্টবেঙ্গল খেলায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে রয়েছে।

ব্যাডমিন্টন :

■ টমাস কাপ ■

দশবৎসর পরে ব্যাডমিন্টন-রাজ্যে একাদিশতা করার পর এবারই প্রথম মালয়কে ইন্ডোনেশিয়া কাছে পরাজয় দীকার করতে হয়। ইন্ডোনেশিয়া মালয়ের কাছে দু'দিনের খেলায় ১-০ ম্যাচে অগ্রগামী হয়। এই খেলায় ইন্ডোনেশিয়ার পক্ষে তান জো হক ও ফেরি সনেভিল (অধিনায়ক) বিশেষ কৃদিকা গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় ফলাফল দেওয়া হোলো :

প্রথম দিনের খেলা

দিকলস : ফেরি সনেভিল (ইন্ডোনেশিয়া) ১৫/১২, ১৫/১০ পরস্প্রে এডি চুং-কে (মালয়) এবং তান জো হক (ইন্ডোনেশিয়া) ১৮/১০, ১৫/১০ পরস্প্রে তে কিউ সান-কে (মালয়) পরাস্থিত করেন।

জাবলস : তান কিন গোহান ও লু কিং কিং (ইন্ডোনেশিয়া) ১৫/১৫, ১৫/১০ পরস্প্রে জনি দিয়া ও লিম সা হপ-কে (মালয়) এবং এডি চুং ও উই তেক হক (মালয়) ১৮/১৫, ১৫/১০ পরস্প্রে সনেভিল ও তান জো হক-কে (ইন্ডোনেশিয়া) পরাস্থিত করেন।

প্রথম দিনের খেলায় ইন্ডোনেশিয়া ৩-১ ম্যাচে অগ্রগামী হয়।

দ্বিতীয় দিনের খেলা

দিকলস : তান জো হক (ইন্ডোনেশিয়া) ১৫/১১, ১৫/১০ পরস্প্রে এডি চুং-কে (মালয়), ফেরি সনেভিল (ইন্ডোনেশিয়া) ১৮/১০, ১৫/১০ ও ১৮/১০ পরস্প্রে তে কিউ

লান-কে (হালধ) এবং এডি ইলুফ (ইকোনেশিয়া) ৩১১৪, ১৪১১, ১৪১৮ পরেইটে আবহাওয়া পিকার-কে (হালধ) পরাজিত করেন।

ভাবলম্ : এডি চু-ও উই তেক হুক (হালধ) ১৩১৪ ও ১৪১৮ পরেইটে লু কিম বিয়ে ও তান কিন গোয়াকে (তৃতীয় সেটে ইকোনেশিয়া-জুটি পরাম্বর স্বীকার-করে) এবং ছনি হিয়া ও লিম সে হু (হালধ) ১৪১১, ১৪১১ পরেইটে ফেরি পনেডিল ও তান জো হুক-কে (ইকোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

এশিয়ান গেম্‌স :

টোকিওতে অধিষ্ঠিত তৃতীয় এশিয়া ক্রীড়াই ন'বিন ব্যাপী অষ্ট্রেলের সমাপ্তি ঘটেছে বিরাট লালস্বের মধ্য দিয়ে। সন্ত দু'বারের মতো এবারও জাপান নিজেই লালস্বের মাধ্যমে সব দেশের পুরোভাগে বাখতে সক্ষম হয়েছে। অ্যাংলোসিউন মাজ দু-একটি বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়েই এশিয়ান রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে। আর বেশিরভাগই জাপানী প্রতিযোগীদের কৃতিত্বে তা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া গীতায়ে ৪০০ মিটার ক্রিস্টায়েল সলি ইয়াসামাকো ৭ মিনিট ২৩.২ সেকেন্ড ও ৪ × ১০০ মিটার মেডলে রিলেটে জাপান দল ১৭.২ সেকেন্ডে যে বিশ্ব-রেকর্ড করে, এশিয়া-ক্রীড়াক্ষেত্রে সে শুধুমাত্র অল্পতর কৃতিত্বের স্বাক্ষর হয়ে থাকবে তাই নয়, উপরন্তু বিশ্ব-ক্রীড়াক্ষেত্রে এশিয়া আঙ্গ কতখানি অগ্রগামী তাই দেখবার বিষয়। এবারের এশিয়া-ক্রীড়াতেও ভারত কোনো বিশেষ ছুটিকা গ্রহণ করতে পারেনি।

ভারতের শকে এবারের সবচেয়ে লক্ষ্যবস্তু কমাল হুসেই হকিতে রোপাশবক-লাভ। গত ৬টি অলিম্পিকের বিজয়ী ভারত গুট তিরিশ বছর পরে বিশ্বের ক্রীড়াক্ষেত্রে যে একাধিপত্য করে আসছিল, আর তার অবশ্যন ঘটেছে। হকিও পাকিস্তান বা অন্য কোনো রাষ্ট্র ভারতকে পরাজিত করতে পারেনি, গোলের গড়শক্ততা হিসাবেই ভারতকে বিজয়ী হান বেছে নিতে হয়েছে। শুধুও বলতে বাধ্য নেই যে, পাকিস্তানের সঙ্গে বর্তমানে ভারতের আর খুব সামান্যই পার্থক্য আছে। কর্কটক্রান্তির শিকার ভূমি এ বিশেষ ঘটনা উদ্ভিত ছিল, এবং ঘটতেছে। কারণ জলবায়বোধ-অলিম্পিকে পাকিস্তানের কাছে যার ১০০ গোলো জয়লাভ করেও আবারের ক্রীড়া-জগতের কর্তৃপক্ষের একবিংশুও বিচলিত হতে দেখা যায়নি, বরং টোকিও-ব্যাঙ্কর আগে অতীতের পরে পবিত্র হয়ে উঠেছে প্রচুর মতোকি করতে শোনা গিয়েছিল।

অবশ্য আর আর উারা যে দু'যোগ পাচ্ছেন না, কিন্তু তবুও উাদের কৃত সারাদিক সব তুল-কৃতি ঢাকবার জন্য এখন প্রচুর অজ্ঞাত দেখাচ্ছেন। যে যে অজ্ঞাতগুনি উারা দেখাচ্ছেন সেগুলি হোলো : (১) তুল আশ্চর্য্যাকি, (২) মাঠ খেলার সম্পূর্ণ অযোগ্য, (৩) গোলের গড়শক্ততা যেচালিশমান-শিশু নির্ধারিত হবে, এ উারা আগে জানতেন না। ১ম ও ২য় কারণে যে অসুবিধা, স্বীকার করলাম তা অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে অসুবিধা শুধু কি ভারতীয়রাই ভোগ করেছিল ? আর কোনো দেশ করেনি ? এই কারণে যে কোন দৃষ্টিতে উারা বলছেন যে উারাও জানেন। বিশ্বের অন্যতম বিরাট প্রতিযোগিতার সব-কিছু নিয়ম-কাহনের পুঁতিনটি পূর্বে উাদের জেমে নেওয়া উচিত ছিল। তার ওপরেও উারা বলছেন যে, যদি এ নিয়ম আমাদের জানা থাকতো তাহলে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে কিছুতেই হু করতাম না। তাহলে কি পরে নেই যে, এ কলাকল ভারতীয় খেলোয়াড়দের ইজ্জত ? অগ্রাণ চেষ্টাই বা উারা করেননি কেন ? অতএব বস্তু মনে হয়, খেলার গোল-সংখ্যাটাকে ভারতীয় হল কোনো গুরুত্বই দেখনি। কোথায় মতো অতি সাধারণ গিম ভারতীয় দলের স্বল্প-বাহ্য ভেদ ক'রে কেনন ক'রে একখানা গোল দেখে তাও এক আশ্চর্য ব্যাপার। ভারতের মল-নির্ধারনের ব্যাপারেও এক সারাদিক তুল দেখা যায়। ভারতের খ্যাতিমান লেক্ট-ইন উদ্যম নিকে যে কেন পরেরাও-লাইন থেকে সেণ্টার-হাফের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হোলো এর কারণও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এর ফলে পরেরাও-লাইন তো হুই কতিগ্রস্ত হোলোই, এবং স্বল্প-ভাগও যে সমানভাবে কতিগ্রস্ত হোলো, বলাই বাহুল্য। কারণ পরেরাও-লাইনের সিং (বড়)-এর সঙ্গে উদ্যমের স্বল্প-দিলের তৈরী কিনিমেন। এবান থেকে আসল দেকো-হাফের খেলোয়াড় মুগ্ধমিৎ নিকে শুধু শুধু নির্ধারিত করে কিই বা যাওয়া হোলো কেন ? এর থেকে স্তম্ভাসকে সেণ্টার-হাফ খেলো মনে হয় অনেক ভালো বল বেধা শিতে পারতো। বাই হোক, এতেও যদি ভারতীয় হকি-কোডেরেণ ভবিষ্যতের জন্য সাধন না হয়, তবে আগামী রোম-অলিম্পিকেও যে পাকিস্তান বিজয়ী সমান লাভ করবে এ একেবারে সত্য।

হুটকলে প্রথমে এশিয়ান গেমের চালিশমান ও অলিম্পিকের চতুর্ধ স্থানানিকারী ভারত টোকিওতেও চতুর্ধ স্থান লাভ করেছে। এ অসাক্ষা তাদের স্বল্প, তাদের কিসে একথা বলা চলে না। কারণ ভারত আশার অতিরিক্ত ফলই দেখিয়েছে। খেলার পূর্বে বাছাই-দল হিসাবে ভারতের স্থান ছিল পঞ্চম। টোকিওতে ভারত

মোট ৪টি খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তার মধ্যে লীগের প্রচার ভারত খেলোয়াড় ৪টি ম্যাচ এবং কোয়ার্টার-ফাইনাল ও সেমি-ফাইনাল মত-আউট প্রথম খেলোয়াড় ৪টি ম্যাচ। অবশেষে ফুটবল ফানেল তত্ত্ব ইন্সপেকশনার সঙ্গে পঞ্চম ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। গ্রুপ-লীগের প্রথম খেলার বর্ষকে ০-২ গোলে পরাজিত করে ইন্সপেকশনার কয়ে ২-১ গোলে পরাজিত হয়ে ভারত গ্রুপ-চ্যাম্পিয়ন হয়। পরে কোয়ার্টার-ফাইনালের খেলায় পাকিস্তানী হাংকং ০-২ গোলে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে কোরিয়ার সঙ্গে খেলার অধিকার অর্জন করে এবং কোরিয়ার কাছে ৩-১ গোলে পরাজিত হয়ে ইন্সপেকশনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১-১ গোলে পরাজিত হয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ভারতের পক্ষে বলতে গেলে, ভারতীয় দল সবচেয়ে বেশি হাংকং ১০ মিনিট করে খেলতে অভ্যস্ত। কিন্তু ওখানে ভারতকে প্রতি খেলাই ১০ মিনিট ধরে খেলতে হয়েছে। এমন কি, হাংকং-এর সঙ্গে বেসেবার ভারত জলাভাস করে, বেসেবার মীমাংসা হয়েছে পুরো ১২০ মিনিটে। অতএব ভারতীয় খেলোয়াড়দের ঐহিক অবস্থা যে কি হতে পারে তা সহজেই অসম্ভব। এ ছাড়াও ভারত যে মোট পাঁচটি খেলা খেলোয়াড় তাই তাদের খেলতে হয়েছে ১ দিনের মধ্যে। ভারতীয় দলের কোচ স্ট্রিকেল্ডের কোন নিয়মই বলেছেন যে, পঞ্চম দিনে ইন্সপেকশনার সঙ্গে খেলার ভারতীয় খেলোয়াড়রা অসহ্য ঝড় নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এ ছাড়াও হোশানদের আগে ভারতীয় দল প্রয়োজন অস্বাভাবী উপযুক্ত অস্থানীয়দের হযোগও পাননি। দক্ষ কোচের অধীনে উপযুক্ত অস্থানীয়দের সঙ্গে ভারত যদি ২০ মিনিট খেলার উপযোগী হয় নিয়ে খেলতে পারতো তবে কল্যাণ অস্ত্রগ্রহ হতে পারতো। এই হোক, ভারতীয় দল অস্বাভাবিকভাবে নিয়ে যে প্রাণসমীহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তার মন্ত তাদের আত্মরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে কর্মকর্তাদের সন্নিবেশ অগ্ররোধ জানাই—তব্বিন্তে এদের সর্বকর্ম হযোগ-সুখি দিতে। অস্ত্র অস্ত্রীতে এ-ধরনের বহু অগ্ররোধই এঁরা উপেক্ষা করেছেন, দেখা যাক এবার এঁদের কী অভিজ্ঞতা হয়।

১৯৪৮-র এশিয়ান-চ্যাম্পিয়ন ভারত এবার ভদ্রবলে স্বাক্ষর ফুটবল ফানেল অধিকার করেছে। মোট চারটি খেলার ভারতকে যোগদান করতে হয়। তার মধ্যে ভারত দুটি খেলায় জয়ী হয় ও দুটি খেলায় পরাজিত হয়। এর মধ্যে ইরানের কাছে ভারতের পরাজয় সত্যই বিশ্বজনক—যদিও এই খেলায় ভারত পাকিস্তানী আশাধারের বিরুদ্ধে সর্বকারী

ভাবে পঞ্চাতিবছরের অভিজ্ঞতা আনে। কিন্তু এই খেলার জয়ী হলেও, ভারতের স্বর্ণপদক পায়ার কোনো আশাই ছিল না। কারণ স্বর্ণপদক-অধিকারী জাপান সহজেই ভারতকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে। ভদ্রবলে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। একটি—আফগানিস্তান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতি দলে ৩ জন খেলোয়াড় নিয়ে, অপরটি—৩ জন খেলোয়াড় নিয়ে। এর মধ্যে ভারত প্রথমটিতে যোগদান করেনি।

দ্বিতীয়ের ১০টি স্বর্ণপদকের মধ্যে ভারতের প্রতিনিধিত্ব একটিও পাননি। এর মধ্যে ওয়েস্টার-ওয়েস্টের স্বর্ণনাথন প্রথম রাউন্ডেই তাপানের জোনিরা অসুস্থির কাছে পরাজিত পরাজিত হয়। এ ছাড়া লাইট-ওয়েস্টের স্বর্ণের রাও ব্রো-পদক লাভ করেন এবং ফিল্ড-ওয়েস্টের হরি সিং রৌপ্যপদক লাভ করেন। এতেও বিচারকের সিদ্ধান্ত ভারতের বিপক্ষেই যায়। এর ফলে ভারতীয় দ্বিতীয়োচ্চ-দলের ম্যানেজার উইং-কম্বাওয়ার সত্যনাথন আশাধারি-এর তীব্র সমালোচনা করেন, এবং এও বলেন যে—প্রাক্তন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন নিরাই ও ব্রজেন দ্বিতীয়োচ্চ-বিপর্যয়দলের মতে ভারতীয় দ্বিতীয়োচ্চের হরি সিং ও স্বর্ণের রাও পরাজিত হননি, বরং জয়ী হয়েছিলেন। দাক্ষ্য-চূড়ান্তের কথা। তবে যে-বিচারের উপর খেলার সব-কিছু নির্ভর করে, সেই বিচারই যদি ভুল হয় তবে সেখানে কোনদিনই উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা পড়ে উঠতে পারে না। এদিক দিয়ে এশিয়ান-পেক্সের উচ্চোচ্চের যেন ভালোভাবেই নতর দেওয়া উচিত ছিল।

বিজ্ঞানীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা শেষ হোলো, এবার ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা আসি।

অ্যাংলোলিঙ্গ ভারতের কল্যাণ মোটেই হতাশাজনক হয়নি। অ্যাংলোলিঙ্গ ভারত ৪টি স্বর্ণপদক, ২টি রৌপ্যপদক আর ২টি ব্রো-পদক লাভ করেছে। ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়ে ফিলদা সিং নিষেধে এশিয়ান সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাসমী দৌড়বার হিসাবে প্রমাণিত করেছে। এর আগে ১৯৪১ সালে সেটি পিউটা ১০০ ও ২০০ মিটারে জলাভাস করে অস্ত্রগ্রহ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। এ ছাড়া ৪০০ মিটার রিলেতে শেখ চক্রে ৪৬২ সেকেন্ডে ৪০০ মিটার দৌড়ে ফিলদা এক প্রাণসমীহ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে ফিলদার সময় কথাক্রমে ২১'৬ ও ৪৬'৬ সে। হপ-স্টেপ অ্যাও ম্যাস্পে নতুন এশিয়ান রেকর্ড (৪১ স্ক. ২২ ইঞ্চি) করে বাহিন্যের সিং স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। ভদ্রবলে-নিষেধে ভারতীয়

এশিয়ান রেকর্ডের অধিকারী ও ভারতীয় অ্যাথলেটিক ক্লবের অধিনায়ক পরহামন সিং প্রথম হতে পারেননি। অবশ্য ভারতই এ পদক লাভ করেছে এবং ভারতের পক্ষে এ পদক লাভে সহায়তা করেছেন ভারতের অল্পতম প্রতিনিধি বলাকার সিং। কিন্তু তিনি পরহামনের ভারতীয় রেকর্ড (১৬০ ফুট ৬'৪ ইঞ্চি) ভাঙতে পারেননি—বশিষ্ঠ তিনি নতুন এশিয়ান রেকর্ড করেছেন। তাঁর দূরত্ব হোলো ১৭৬ ফুট ৪½ ইঞ্চি। এতে পরহামন তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন। শোহায গোলা-নির্দেশে ব্যানিলার বিদ্যুতী পরহামন এবারও নতুন এশিয়ান রেকর্ড করে ইংল্যান্ড প্রথম স্থান অধিকার করে বর্ণপদকের অধিকারী হয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর দূরত্ব হোলো ৪৯ ফুট ৪ ইঞ্চি। এ ছাড়া ৮০০ মিটার দৌড়ে, ৩,০০০ মিটার স্টিম্প-জেনে, ১০,০০০ মিটার দৌড়ে, ১১০ মিটার হার্ডল-রেলে, ৪০০ মিটার হার্ডলে, উচ্চ-লম্বনে, দীর্ঘ-লম্বনে, ডেকাবলনে, ৪ × ৪০০ মিটার রিলে-রেলে ও ব্যাডমিন্টন-দৌড়ে ভারতের পুরুষ-প্রতিনিধিরা কোনো স্থান দখল করতে পারেননি। এর মধ্যে আশরা নকচেয়ে বেশী আশা পোষণ করেছিলেন উচ্চ-লম্বনে অজিত সিং ও ব্যাডমিন্টন ওলম্বার সিং-এর ক্ষেত্রে। কিন্তু অজিত সিং আমাদের সম্পূর্ণ হতাশ করেছেন। আর ওলম্বারার ক্ষেত্রে তাঁর ভূতাপ্যই তাঁর বিজয়ের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে পড়িয়েছিল। ভারতের আতীত ক্রীড়াপটানে ওলম্বারার যে বিশ্বকর্ম ভূত্বকের নমুনা দেখিয়েছিলেন, তার কলে ক্রীড়াবোলায় তাঁর জয়ের সম্ভব এককর্ম নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু টেকিওতে লোড়ানোর সময়ে তিনি একবার পড়ে গিয়েছিলেন এবং ঘটনক পুলিশ তাঁকে উঠতে সাহায্য করার তিনি প্রতিযোগিতা থেকে বাতিল হয়ে যান। তা না হ'লে, পড়ে গেলেও তিনি চতুর্থ স্থান দখল করতে পারতেন। ৪ × ৪০০ মিটার রিলে-রেলেও

ভারত প্রতিযোগিতায় নাকচ হয়ে যায়। কারণ ভারতের প্রথম প্রতিযোগী বি. যোসেফ নিম্নস্থ লাইন ছাড়িয়ে বেটন বদল করেছিলেন।

মহিলা-প্রতিযোগীদের ভাগ্যে কোনো বর্ণপদক-লাভ ঘটে ওঠেনি। ২০০ মিটার দৌড়ে স্টেডি ডি'মুন্ডা হিটে নতুন এশিয়ান রেকর্ড (২৭'৮ সে.) করেও হাইনালে দ্বিতীয় হয়েছেন। বর্ণা-নির্দেশে এলিজাবেথ জেডেনসোর্ট বোশা-পদক পেয়েছেন। আর, ৪ × ১০০ মিটার রিলে-রেলে ভারতীয় হল ব্রোচ-পদক পেয়েছে।

নীচে কোন্ দল ক'টি পদক পেয়েছে, সেওরা হোলো :

পদকের খতিয়ান			
	বর্ণ	বোশা	ব্রোচ
জাপান	৬৭	৪১	৩০
ফিলিপাইন	৮	১২	২১
দ. কোরিয়া	৮	৭	১২
ইরান	৭	১৪	১১
মলয়েশিয়া	৬	১১	১৭
পাকিস্তান	৬	১১	৯
ভারত	৫	৪	৩
ভিয়েতনাম	২	০	৪
বর্মা	১	২	১
সিংগাপুর	১	১	১
সিংহল	১	০	১
থাইল্যান্ড	০	১	৩
হংকং	০	১	১
ইন্দোনেশিয়া	০	০	৪
মালয়	০	০	৩
ইসরাইল	০	০	২



শেষ পাত



✓ 'দার্শনিক অধ্যাপকের স্ত্রী মনোবা প্রথমে ওর কলেজের ছাত্রী ছিল। পরির মতো দেখতে ছিল মনোবা। নেড়টির মেধা দেখে অধ্যাপক একদিন তাকে বললেন তাঁর বাড়িতে এসে দর্শন পড়তে। তার পর...' (গল্পাংশ)

তারপর যা হয়ে থাকে। প্রথম দর্শনেই প্রেম! (উদ্ধৃতি)

পরি-দর্শনও ছিল কিনা!

✓ শরৎচন্দ্র এক নাগিতের কথা বলতেন, যে ভোতা কুরে দাড়ি কামাতে ওতাদ ছিল। এমন কি, দাড়িতে ভালো করে জল না বুলিয়েই সে কামাতে



পারত। আপত্তি করলে বলত, এটুকু তো। এ আপনার নয়নজলেই সেয়ে নেব।

এমন নাগিতের কুরে দণ্ডবৎ!

'কালো বা বাবানী রঙের মানুষেরা সাদা চামড়ার চেয়ে কিছু কম সুন্দর নয়।'

—মাদামোঁরায়েল পল মসিয়ে
একটা (বা) দানী কথা, রসিয়ে বলা!

'কৃষ্টিবান বিধ্বংসনের আসরে যেতে স্বভাবতই অনেকের ভয় করে।' (উদ্ধৃতি)

পাছে বিধ্বংস হয়ে মরতে হয়?

গল্পার জনসভায় দশকুট উঁচু বহুতা-মকের পাশে তাঁর এক বিরাট ফোটা স্থাপিত মেখে, সেটি স্বহস্তে সরিয়ে দেবার সময় পতিভক্তী সবিম্বয়ে প্রসন্ন করেন—তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকতে তাঁর আবার ফোটা কেন?

একরকমের গয়াকৃত্যও বলতে পারেন!

একজনের জিজ্ঞাসা: 'বেশি টাকা পেলে আপনি কী করেন?'

প্রয়োজনের অতিরিক্ত পেলে প্রিয়জনের বোঁজে বেকই। তার পর অচিরে নিজেই অতি রিক্ত হয়ে পড়ি!

একজনের জিজ্ঞাসা:

'বাগবাজারের নবীন ময়রা নামজাদা ম্পজ রসগোল্লার জনক বলে জানি। কিন্তু লেডি ক্যানিং-এর নামাঙ্কসারে বিশ্বাত লেডিকেনি নামক ময়েস রিষ্টিট কার আবিষ্কার তা আপনি বলতে পারেন?'
লর্ড ময়রা নয়তো?

কলকাতার কোনো হোটেলের প্রত্যেক অতিথিকে রোজ সকালে মাগনা খবর-কাগজ দেয়া



হয়। যাতে হুনিয়ার হালচাল জেনে বেচারার খাওয়া-দাওয়ার রুচি একেবারে চলে যায় ?

‘কংগ্রেস রামরাজ্যে অনবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা জানতে পারেননি।’ —শ্রীঅজয় ঘোষ
কিন্তু হুমুমানদের রাজত্ব তো বাধা দিচ্ছেন না ?

‘কৃষ্ণ-প্রবাসে বলে যে—যাকে মারতে পারো না, তাকে চুমার দ্বারা বাগাও।’ —শ্রীজুশ্চেত
কিন্তু চুমার মধ্যেও মার রয়েছে তো !

‘কিশোর মুক্তবান্ধু-সেবন সমিতির এবারকার কানী-অভিযানে শিবির অহুঘারী প্রত্যেক দলের নামকরণ হয়। কাকের হুবিধার জন্মে ছেলেমেয়েরা নিজেদের ভেতর থেকে দলপতি (মুখ্যমন্ত্রী) ঠিক করে, তার পরে অস্ত্র সব মন্ত্রীও, যেমন—বাচ্চ, কুটি, খেলাধুলা ইত্যাদিরও মন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে থাকে।’

—রিপোর্ট

এদের ভেতর খাণ্ডমন্ত্রীর স্বতাবতই প্র ফুল হবার কথা !

“রাজ্যপূনর্গঠনিক নয়পতনের কালে বেবে শহর কার দখলে যাবে তাই নিয়ে মচারাপ্টা, মৌরাপ্টা আর গুর্জরাপ্টা যোদ্ধার বিতণ্ডা বেধেছিল।”

(উদ্ধৃতি)

রাপ্টে রাপ্টে লড়াই তো !

স্পেনের এক প্রবর্তীমূল্য কুড়িবছর পত্র-বিনিময়ের পর সম্প্রতি নিয়ে করেছে। বিয়ের আগের তাদের প্রেমপত্রের ওজন হচ্ছে দু’টন।

বিরহে ছবয় টনটন করলে প্রেমের চিঠি টনটনেই হয়।

অনৈক সাংবাদিকের মতে সারা ভারতে সবত্বত তেরোটি রাজনীতিক দল আছে।

দল তেরোটা কিন্তু কৌদল সতেরোটা।

একজনের চিঠি :

‘গেলস যদি সাবান-ভলে ধুয়ে না পরিকার



হয় তো, তাকে সাফ করার আর কোনো কায়দা কি আপনার জানা আছে ?

ভেঙে সাফ করতে পারেন।

৭০-বছরী পীর মতীন সাহের এক সপ্তদশী তরুণীর পাণিপীড়নে মতি হয়েছিল, কিন্তু করাচীর বেগম-সমাজ থেকে পাড়িয়ে বাধা দেয়ার বিয়েটা পণ্ড হয়েছিল।

পীর এর টং-প্রত্যয়ে বাধা ?

প্রকাশ যে, সৌন্দর্যরানীরূপে পুরস্কৃত অষ্টাদশী



কুনারী ঘোড়ান সিম্পসন ব্যক্তিগত জীবনে কসাইয়ের কাজ করে থাকেন।

কোন্ রূপসীটি করে না নশাই ?

‘সেই-যোনাকরা কোন্ আর্টিস্ট তাঁর বাড়িঘরের দেয়াল-দরজায় ছবি এঁকে শেষপর্যন্ত সব আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গেলেন, আমাদের মটুও ঠিক তাঁর মতোই একটা চক নিয়ে পাড়াময় দরজা-দেয়ালে ভিন্নবিভিন্ন এঁকে রেখেছে। বামুন্ হাতি ঘোড়া উল্লুক—জানা-না-জানা কতো কী জানোয়ার। মনে হচ্ছে, বেড়ে উঠে মটুও একজন বড় আর্টিস্ট না হয়ে যায় না।’ —এক মায়ের চিঠি

কিন্তু শেষপর্যন্ত যদি পাড়া আলিয়ে যায় ?

‘রোজই কলের জল লইয়া বস্তির পড়শীদের মধ্যে বিবাদ বাধে।’ (গল্পাংশ)

ক ল হ তো এইজন্মেই বলে।

সময়-বিশেষজ্ঞদের মতে অচিরেই এমন এক দিন আসন্ন নাকি যখন বড় বড় যুদ্ধগুলি সমুদ্রে, স্থল-পথে বা আকাশে না হয়ে মহাশূন্যে সংঘটিত হবে। আর মহাশূন্যের আবিপাত্য-লাভই হবে বৃহৎ শক্তি-গুলির কামা।

আর শূন্যের অন্ধ শেষফল গাড়াবে সেই শূন্যই

‘বস্তার জল আদালত-প্রাপ্ত পেরিয়ে বিচার-কক্ষে প্রবেশ করে। মামলার নথিপত্র সমুদয় ভাসিয়ে নিয়ে যায়।’ —ববর

যাক, অনেক মামলার কয়দলা !

সম্পাদক—শ্রীচাক্র চট্টাচার্য

কে. পি. বহু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ১১, মহেন্দ্র শোখারী সেন, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীকেশনাথ রায় কর্তৃক মুদ্রিত
এবং ডাককর্তৃক ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত

বঙ্গুধারা

দ্বিতীয় বর্ষ • প্রথম অংশ • চতুর্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

• সূচীপত্র •

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুগ্ধনাথক বিদ্যাসাগর (প্রবন্ধ)—বিঃলক্ষণালাল দাশ	৩৫৩
রবীন্দ্র জীবনালেখ্য (জীবন-কাহিনী)—চাক্ষুস ভট্টাচার্য	৩৬২
রিকণার গান (উপগ্রাস)—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৩৬২
'মৌল্য' গ্রাম ও রক্তিশী মেঘী (প্রবন্ধ)—বতীপ্রমোহন দত্ত	৩৭৪
বাংলায় নব্যজাগরণের কথা (প্রবন্ধ)—যোগেশচন্দ্র বাগল	৩৭৮
মনোহর ও প্রেমভারা (উপগ্রাস)—মহাশেতা ভট্টাচার্য	৩৮৫
লৌকিক মেঘী মনসা (প্রবন্ধ)—চিত্তরঞ্জন দেব	৩৯৩
সরকারী চাকরি (আত্মকাহিনী)—ডাক্তার ভট্ট	৪০১
পল্লীর বারমাতা (সচিত্র প্রবন্ধ)—তুলসীলাল সিংহ	৪০৬
লেবাননের পথে (সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী)—সুন্দরেন ঘোষ	৪১৪
পণ্ডিত রবিশঙ্কর চৌধুরী (সচিত্র জীবন-কাহিনী)—আশীষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪২১
বাঘিনী (গল্প)—শক্তিপদ বাগচী	৪২৩
কবিগুরুর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ (কাহিনী)—সারদাশঙ্কর পণ্ডিত	৪২৯
পদগ্রন্থ (কবিতা)—কালীকিশোর সেনগুপ্ত	৪৩০
নতুন ইয়োরোপ : নতুন যাত্রা (ভ্রমণ-কাহিনী)—মনোজ বহু	৪৩১
চেনা ঘুম : দিল্লী ঘেল (গল্প)—মৌদীন দেব	৪৪০
ছোট্ট-কোটা : সরল জীবনযাত্রা ও উচ্চশিক্ষা—চাক্ষুস ভট্টাচার্য	৪৪৫
বিববাতী (আত্মজীবনিক লংবার)—শ্রীবরব্রহ্ম মিত্র	৪৪৭
পশ্চিমবঙ্গ-পত্রিকাদ্বয় : হুগলি (সচিত্র)—মঃনাথিং বহু	৪৫৩
নতুন বই :	
পৃথক-সমালোচনা : বাংলা দলীন—বারেনচন্দ্র শর্মাচার্য ; The Press, Publications and Copyright Laws of India—বতীপ্রমোহন দত্ত	৪৬০
রুক-পার্থী : চিত্রলোক—পদ্রনাভ	৪৬২
বাল্মীকি—বেবতীভূষণ	৪৬৪
খেলায় খেলা—সুনিতির	৪৬৫
শেষ পাতা (সচিত্র রশ্মরচনা)—নিবরাম চক্রবর্তী লিখিত ও বেবতীভূষণ চিত্রিত	৪৬৮

চিত্র : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

আলোকচিত্র : হুগলি—ভবত নাগ

• প্রচ্ছদ-শিল্পী : অজিত গুপ্ত •

‘বসুধারা’র নিয়মাবলী

গ্রাহকদের সম্পর্কে

বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৪ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে লইয়া ডাকঘরের উত্তরগত আমদার জানাইতে হইবে। নচেৎ উক্ত সংখ্যা বিনামূল্যে দেওয়া আমদারের পক্ষে সম্ভব নয়। গ্রিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে বাংলা মাসের ২৪শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে। চিঠিপত্রে এবং মনি-অর্ডার-রূপে গ্রাহক-নবতের উত্তর থাকা প্রয়োজন।

প্রতি সংখ্যার দূর্য ১৮ টাকা। গ্রাহক হইলে চাঁদার হার—বার্ষিক (পত্রিক) ১২ টাকা এবং বাৎসরিক (পত্রিক) ৬৮ টাকা। ডি: পি: যোগে পত্রিকার গ্রাহক হইলে গ্রাহকদেরই ডি: পি: বরচ বহন করিতে হয়। মনি-অর্ডার যোগে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হইলে এই অনতিরিক্ত বরচ আর দিতে হয় না। ভারতের বাইরে পত্রিকার চাঁদার হার সমযোগে জ্ঞাতব্য।

রচনার সম্পর্কে

রচনার নকল রাখিয়া কাগজের একপৃষ্ঠার পত্রিকার হস্তাক্ষরের রচনা পাঠাইতে হইবে। উহা হারাইবার দায়িত্ব আমদার গ্রহণ করি না। রচনার সঙ্গে উপযুক্ত ডাকমান্ডল না থাকিলে অবনোদিত রচনা কেবল দেওয়া হয় না। ইহার সহিত লেখকের নাম ও গ্রিকানা থাকা আবশ্যিক, নচেৎ রচনা গ্রাহ্য হইবে না।

পত্রিকার লেখা প্রকাশ করা বা না-করা সম্পাদকের বিবেচনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ঘবতীষ চিঠিপত্র এবং টাকা-পয়সা নিম্নলিখিত গ্রিকানায় পাঠাইতে হইবে।

অক্ষরগুলি ও ভেদ-সংকেতের সম্পর্কে

কদমকে ১০ কপি করিয়া পত্রিকা লইতে হইবে। অবিক্রীত সংখ্যা কেবল লওয়া হয় না।
এক্সপ্লি-কমিশন : প্রতি সংখ্যার চার আনা অর্থাৎ ২৪ নয়া পয়সা (শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে)।
এক্সপ্লি সম্পর্কে বিশদ নিয়মাবলীর ক্ষুদ্র পত্র লিখিতে হইবে।

কার্যাবলি—বসুধারা, ৩২, বর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

কোন : ২২-৪৬৮৭

এস, মুখার্জী এণ্ড কোং

[কাগজ ও মুদ্রণের কালি বিক্রেতা]

পি. ২২-৪, রাণাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১

পরিচালক :

টিটাস্‌মুদ্র প্যাপার মিল্‌স কোম্পানি লিমিটেড

এবং

হুগলি ইক কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড





৳ ক্রম : ১২৪ আদিত্য, ১২২৭ পাল

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[রত্না : ১০-ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮ সাল

“বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য মাহুদ । বিজ্ঞানাগর বীর !
 বীরদিগ্‌হের সিংহশিত । বীরে দুগুণ্ডীর ।
 তোমার লাগি অস্ত্র আকণ্ড করে নিরস্তর,
 কীৰ্ত্তিধন মূর্তি তোমার কাগে প্রাণের “শর ।”

—সংগ্রহকারী দ্বন্দ্ব



২য় বর্ষ, ১ম অঙ্ক, ৪র্থ পর্বা

প্রাক্কণ, ১৩৬৪

যুগ্মায়ক বিভাগাগর

অধ্যাপক ত্রিদিভজলাল নাথ, এম. এ.

১১১

আধুনিক সংস্কৃতি ও সাহিত্যের দীর্ঘ-বিসর্গিত পথের কথা।
আদি আন্তে, অস্ত্র নেই!...

হুহেলিকার অস্পষ্টতার ঢাকা সে ছায়াচ্ছন্ন পথে যাবগে
হাতা করেছিলেন এক সফল বাহুব উনবিংশ শতাব্দীর
প্রথমার্ধে। প্রতিভাসীপ্ত তাঁর লগাট, হাতে উজ্জল বীশনিখা।
সে হাতীর নাম রাখলেছেন রায়। সংস্কৃতির সাগর-সকলের
দিকে দ্বাদ্বাপথে তাঁর সঙ্গী হলেন আরো অনেক তীর্থগণিক।
কলরবে মুগ্ধিত হল পায়ে-চলার লখন্যামি। হঠাৎ একদিন
যেমে গেল ক্রান্ত পথিকের অগ্রগতি!

কিন্তু বীশ নিভলনা; বীশনিখাও রইল অগ্নানে। সে বীশ
হাতে বাহুমোহনের পদচিহ্ন অশ্রুসরণ করে এগিয়ে গেলেন তাঁর
সুযোগ্য শিকার মহিষ দেবেপ্রসাদ।

সংস্কৃতির সাগর-সকলের দিকে দ্বাদ্বাপথে তাঁর সঙ্গী হলেন
আরো অনেক তীর্থগণিক। পূর্ব দিকে প্রসারিত সে-পথের
বেথা।

সে পথের ৩৭৭ ছড়িয়ে পড়লো শাক্তান্ত্য আকাশের
উজ্জল আলোকছটা দেবেপ্রসাদেরই অস্ত্রতম সঙ্গী অক্ষয়-
কুমারের সাপনাতে। তীর্থপথের বেথা স্পষ্টতর হয়ে উঠল।
দুষ্টির আচ্ছন্নতা গেল আরো ক্ষেতে।

সে দুষ্টির আলোকে তীর্থগণিকেরা দেখতে পেলেন সংস্কৃতির
পদা-বহুনা সঙ্গম ঘন অতি নিকটে। কিন্তু সংস্কৃতি-সকলের
কলকলনিবন্ধ প্রবাহ-ই তাঁদের দৃষ্টবিস্ত্রম খট্টয়েছিল। আসলে
পূর্ব ও পশ্চিম আকাশের মিশ্রিত আলোকে গীতাত্মল
সংস্কৃতির সাগর-সকল এখনও অনেক দূরে। সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি

দিয়ে দৃষ্টিগোচ্রে অবস্থিত সংস্কৃতির সে সাগর-সকলের ধরে
বিকার সেবেপ্রসাদেরই সহস্রাত্মী আর একজন তীর্থগণিক।

বিসর্গিত পথের একপার্শ্বে ঠাড়িয়ে তিনি হাতীর
এ মিছিল দেখেছেন। কখনও তাঁদের সঙ্গে পানিকটা
এগোচ্ছেন, কখনো বা থমকে দাঁড়িয়েছেন। উন্নত লগাটে
তাঁর হুগডীর চিহ্নার বেথা।

অহুতব করছেন এ পথিক নব নব, দৃষ্টিগোচ্রে অবস্থিত
সংস্কৃতির সাগর-সকলে পৌছাতে হলে আগে চাই তীর্থগণিকের
নব অপর্যন্তের নক্তি, সম্পূর্ণ বহু সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি, আর
সাহিত্যীন দীর্ঘপথ চলবার তত্ত্ব বেহে অপরিবর্তিত বল।

'নাথমাজা বলহীনের লগাট'—বল চাড়া'মাংস আত্ম
হবে কি করে? সে বল লগাডের তত্ত্ব প্রথমে চাই মুক্তজানের
চর্চা, যে জান এনে দেবে চিত্তে বাহ্যাবোধ। এ বাহ্যাবোধের
কলেই 'আত্মকে' নব বেগে উঠবে নিত্য নব আত্মলগাডের
চৌকী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সে বিভিন্ন তাব ও কর্ণার্নই
জীবনপথের পথিককে পৌছিয়ে বেবে সংস্কৃতির উদার সাগর-
সকলে।

সে তীর্থগণিক আরো অহুতব করলেন, সংস্কৃতি-১৫৫র
নামে সংস্কৃতি-কিলাস দিয়ে লক্ষ্যে পৌছানো বাধেনা। তার
তত্ত্ব চাই অস্ত্রার কর্ণোভব। জানের আলোকে দৃষ্টি হদি
বহু না হয়, তা হলে সংস্কৃতির বিসর্গিত ও হুগ্ন পথে নাহুল
লেবে কি করে? আর সীমাতের দৃষ্টিমের পুঙ্খ হদি এ নিক।
পার, তাতেও চলবেনা—এ দ্ব্যবস্থার পথে 'আত্মার সক্তি'রী
সংস্কারমুক্ত নারী হদি সাহচর্য দেয়, তা হলে পুঙ্খ চিত্তে পাবে
বল, তার দ্বাদ্বাপথ হবে হুগ্নম। সেতত্ত্ব নারীর চিত্তেও

জানের নির্মল আয়োগ্য চ্যুতিয়ে দিতে হবে। দূর ক'রে দিতে হবে নারীর জীবনের পথ থেকে লক্ষ্য রকমের বাধা—সমাজের অব্যবহিত নিষ্ঠুর অত্যাচার, সংস্কারের দুর্বল ধ্রুপদ। তবে ভো বহুগুণাকরব্যাপী অন্ধ-পূরে মুখমিলাতী বাঁচার শাবী হয়ে উঠবে মুক্তকণ্ঠ বনবিহঙ্গী—মুহুরের বাঙালী জাতির জীবন ভোগে উঠবে মৃচ্ছিক রাসদ্বীপ!

উদ্ভট দ্বিধা হয়ে পেল। এবার লক্ষ্য পৌছাবার আয়োজন। দৃঢ়সংকল্পে তখন অগ্রসর হলেন সে উন্নত-লগ্নাট প্রতিক্রিয়ায়। দুবক আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির সঞ্চার-কর্ম অতিদ্রুত উদ্বিগ্ন-পড়াটুকু চতুর্থ ধপড়ে। এ-ঐশ্বর্যিকের নাম পূণ্যস্রোত ঈশ্বরোক্ত-পদ।

১২১

পূর্বপূরী রামনাথন বা সমসাময়িক কালের দেবেশ্বনাথের মতো আভিভাষ্য গোঁড়ব নেই; সমকালীন 'ইন্ডা বেসল'সের মতো পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনের নিম্নগ্রন্থাঙ্গী সমুদ্রকণ্ঠ তরীও ভাঙ্গাননি তিনি: সমগ্ধের মধ্যে আছে তাঁর উত্তরাধিকারহূরে প্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় কুনীন ব্রাহ্মণের প্রবল ভেষজবিতা, প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যার অস্বাধ অধিকার, প্রতিমূল পণ্ডিত বিদ্যে সাংগ্ৰহণ করে তরী হবার উদ্বল কামনা, চরিত্রিকের তনুজোড়ের প্রতি সঙ্গাশ্রিত দৃষ্টি, আর মস্তাব্যাজ্ঞর অনগ্রসর বাহুরের তরু তাঁর উদার স্বভাবের সহজ সমরোপাণ—ই-রাষ্ট্রীতে থাকে বলে 'হিউম্যানিজম'।

এ দুলন নিয়ে বিদ্যাসাগর রাণিরে পড়লেন সমকালীন সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষা আন্দোলনের কিছু তরঙ্গের মধ্যে। রামনাথন বা দেবেশ্বনাথের মতো প্রচুর অবকাশ বা স্বাধীনতা প্রথম কর্মজীবনে তাঁর ছিলনা, বাংলাদেশে যে নতুন চতুর্বিম্বী স্বাধিক্রমের ক্রমে ক্রমে সমাজের মধ্যে মাথা উচিয়ে উঠছে, তারই প্রকৌ বিদ্যাসাগর—অন্য-সংস্থানের জন্ত প্রথমে লালদীঘির পাশে কোর্ট-উইলিয়ম কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক (সেরেজাদার পণ্ডিত), তার পর গোলদীঘির সংস্কৃত-কলেজের প্রথমে অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ, এবং আরো পরে অধ্যক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে কুলসমূহের ইন্সপেক্টরের কাশ।

কোর্ট-উইলিয়মে কাম করবার সময়ও (১৮৪১) দেখা যায়, বিদ্যাসাগরের 'তমু হুটি অম পুটি কট্টি প্রাণ' বাঁচিয়ে রাখবার অন্তে লালদীঘির প্রয়াস,—যাইনের ৪০টি টাকার মধ্যে ২৫টি টাকা পিতামাতা ও পরিবারবর্গের জরুরপাথের জন্তে বাঁচাতে পাঠিয়ে বাকী ১৫ টাকার নিয়ে বৌবাজারের

বাজারজাতা, ২ জন লোকের বাইবরজা প্রকৃতি ক'রে পরমার অভাবে চলছে বৌবাজার থেকে লালদীঘির পাশে রাইটার বিধি: পঞ্চদশ হেটে কলেজ বাড়ো। কিন্তু যে অবস্থা জান-সুখা বিদ্যালয়-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য—জীবনের এত কষ্টসাধনার মধ্যেও সে প্রকৃতি এখনও তাঁর মনে সজীব। কোর্ট-উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনার অবকাশে নিয়েই চেষ্টায় উৎকর্ষ হিন্দী ও ইংরাজী লেখা ও পড়া দুইই শিখেছিলেন বিদ্যাসাগর। যে পরহিতৈষণা পরবর্তীকালে তাঁর চরিত্রে গৌরব দান করেছে, তার প্রারম্ভও হয় এ সময়। তাঁর বৌবাজারের বাসা ছিল, একই সঙ্গে তাঁর বাসস্থান ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রস্থল। এখানেই দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তিনি ইংরাজী শিখা করেন: 'এখানেই ব্রাহ্মকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (রাষ্ট্রক স্ববেশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা) সংস্কৃত পড়তে গিয়ে তিনি প্রাচীন পদ্ধতিতে সংস্কৃত পড়ার দৃষ্টান্ত উপলব্ধি করেন—বার মলে পরবর্তীকালে সহজ উপায়ে সংস্কৃত শিক্ষার মত তিনি রচনা করেন 'উপক্রমবিকা' ও 'হ্যাকার কোম্পানী'।" এ সময় প্রচলিত দুই-ধরার সমাজ ও শিক্ষার সংস্কারকামনা বিদ্যাসাগরের মনে নিশ্চয়ই আগ্রহে; ইতোপূর্বে ছাত্রজীবনেই তিনি স্বকাম্যমান বাঙালী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবীন ও প্রাচীনের প্রবল দ্বন্দ্ব বচস্ক দেখেছেন; তাঁর কর্মজীবনে সে-দ্বন্দ্ব তখন: নিঃস্বপ্ন হয়ে এসেও, একেবারে জ্বলিত হয়নি।^১ কিন্তু যে অধ্যাবিত জীবনের দুপুর ছায়ায় তাঁর জীবন তখন প্রবহমান, সে সময় সমাজ বা শিক্ষার সংস্কারের বড় বড় সমস্যা মাথার এলোও তা সমাধান করবার মতো সময় বা সুযোগ তাঁর ছিল কোথায়?

সময় বা সুযোগ না থাকার কারণ—১৮৪১ থেকে ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ দশবছর বিদ্যাসাগর অসন্তুষ্ট চেষ্টা ও সাধনা দিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের মত নিঃস্বপ্নে পড়ে তোলাবার কাছে ব্যস্ত। এ সময়টার মধ্যে বিদ্যাসাগর একটানা চার বছর কোর্ট-উইলিয়ম কলেজের সেরেজাদারের কাছ, তারপর তিন মাস সংস্কৃত-কলেজের সহকারী সম্পাদকের কাছ, তারপর

^১ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ২য় খণ্ড—বিনয় ঘোষ। পৃ: ২৩৬-২৩৭

^২ রামকৃষ্ণ লাখিতী ও তৎকালীন কলকাতা—নিবন্ধাণ শাস্ত্রী। পৃ: ১৮২-১২০

^৩ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ২য় খণ্ড—বিনয় ঘোষ। পৃ: ২৩২

একবছর নয়নাশ কোট্ট-উইলিয়ম কলেজের হেড-মাস্টার ও কোষাধ্যক্ষের কাজ করেন। তারপর ১৮৭০-৭১ এই ডিসেম্বর তিনি সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপক, এবং তার একমাস পরেই (১৮৭১, ২২শে আগস্ট) সে কলেজের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন।^১

সেদিনের কলকাতার নবোদ্ভিত বিতর্কালীন সম্মতে যে-কোনো জনহিতকর কাজে হাত দিতে হলে পদবর্ধনের সরকার, অর্থেরও সরকার—সারিত্রের সূত্র নিরন্তর সংগ্রাম করে বিভাগপত্রের মনে নিচ্চই এ বোধ জেগেছিল। তাই সে-যুগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ সরকারী কলেজের অধ্যক্ষের পদ এক অধ্যক্ষজীবনের শেষের দিকে সম্ভাবনময় বৃদ্ধিমূহের পরিপূর্ণকর কাজ শেষে হ্রত তিনি কিছুটা আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলেন। কিন্তু ‘দৃশ্যহীনদের সোনা করবার’ কাজে ধীর জীবন উৎসর্গীকৃত, তাঁর যে ‘সঞ্চিত মনে উদ্ভত অবলো’ থাকবে সে তো বাতাবিধ। ১৮৭১ থেকে ১৮৮৮ পর্যন্ত এ সাতবৎসর কাল তিনি কলেজের অধ্যক্ষতা ও বিভাগ-সমূহের পরিচালনার কাজে নিজেই ব্যাপৃত রেখে, সে একচ্ছত্র বৃষ্টি-অধিকারের যুগেও, শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষাবিভাগের কার্যে যে স্বাধীন কর্মোচ্ছ্বাসের পরিচয় দিয়েছিলেন তা আজকের যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাত্রয়ের জীবনেও দূর্বল। কিন্তু শিক্ষাবিভাগ ও সংস্কারমূলক জনহিতকর কাজ করতে গিয়ে যখনই তিনি বাধা পেলেন তৎকালীন রক্ষণশীল সরকার থেকে, তখনই তিনি সোচ্চারিত বেতনের উচ্চশাসন ত্যাগ করতে একবৃহত্তম বিধা করেননি।

সে-যুগের পক্ষে এতবড় সম্ভাবনময় চাকরি বিনা বিদ্যার ত্যাগ করা বিভাগপত্রের অনমনীয় ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক লক্ষ্যে নেই। তাঁর সে প্রবল ব্যক্তিত্ব সে-যুগের অধিকাংশ যেকোনো হীন বাঙালীর আত্মমধ্যাঙ্গাধীনতা আচ্ছন্ন করিয়া লয়নে যে একটা বিরাট আবেগের সঞ্চার দিয়েছিল তাও খুঁজি সক্ষম। এভাবে সরকারী চাকরি-জীবনের আকর্ষক পরিমাপটির পর বিভাগপত্র এসে ধাঁড়ালেন বৃহত্তর সমাধ-জীবনের প্রশস্ত ক্ষেত্রে। এর পর দৃক হল বিভাগপত্রের কর্মজীবনের দীর্ঘতম পর্ব, যা ব্যাপ্ত হয়ে আছে স্বর্গীয় ব্রহ্ম বহুর (১৮৭২ থেকে ১৮৯১ সাল)—তাঁর তৃত্বাকাল পর্যন্ত। কিন্তু তাঁর সমাধ-সংস্কার-প্রচেষ্টার পরিচয় নেওয়ার আগে আত্মিক শিক্ষাত্রয়ী বিভাগপত্রের মানব-বাহ্যিক্যাবোধের অন্ততম নির্ধন

শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষাপ্রচারণের কিছুটা পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন।

১০১

পাশাপাশি জুটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। বাংলাবাসের তৎকালীন অন্ততম সংস্কৃতির কেন্দ্র। একটিতে চলছে ইরাণী সাহিত্য ও পাশ্চাত্য দৃতিবিভাগ (লব্ধ, হিউম, মিল, বেয়ার প্রভৃতির) অবাধ আলোচনা, আর একটিতে সংস্কৃত ব্যাকরণ (মুদ্রাবোধ), সংস্কৃত অলঙ্কার (সাহিত্যবর্ণন, কাব্যপ্রকাশ, রঙ্গমাস্ত্রের), সংস্কৃত কাব্য-নাটক (রঘুবংশ, কুব্জসম্ভব, মেঘদূত, কীরাত্যাহ্ননীধ, শিশুপালবধ, নৈমঘটচিত ইত্যাদি), বেদান্ত, নৃতি (মিতাক্ষর, মায়ভাগ, মন্তকমীমাংসা ইত্যাদি), জ্যোতিষ (লীলাবতী, ঐতর্যমণিত প্রভৃতি) এবং দ্বিষ্টোপেতা ইরাণী-চর্চা। এই বিভাগের ছাত্র অধিকাংশই তৎকালীন কলকাতার বিত্তবান ও প্রগতিশীল হিন্দু-পরিবারের আদরের ছাত্রলোভা; আর এক বিভাগের ছাত্র রক্ষণশীল উচ্চবাসের সন্তানলোভা। এক বিভাগের চারতর দৃষ্টি পশ্চিমবাসিক, আর এক বিভাগের ছাত্রের দৃষ্টি পূর্ববাসিক। একমলের মনোভাব—‘A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia’, আর একমলের মনোভাব ‘ব্যাংনে সবই আছে’র মতো। একমল বলছিলেন—‘If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism’, আর একমলের মনোভাব—সন্ন্যাস হিন্দুধর্মই একমাত্র সত্য। একমলের কাছে ইউরোপীয় গোপাল-পরিচ্ছদ পরিধান, হুজাপান (এককালে বেঙ্গালপুত্রিও), নিষিদ্ধ-মাংস-ভোজন প্রগতিশীলতার প্রধান লক্ষণ; আর একমলের কাছে এ সমস্তের সম্পূর্ণ বিবরণ এড়ানোই সংস্কৃতির অন্ততম চিহ্ন। এত বিপরীতধর্মী শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শ বাংলাদেশে আর কোন্‌দিন বোধহয় দেখা যাবনি।

হিন্দু-কলেজে ছাত্রাবস্থায় রাষ্ট্রীয় কুলীনবংশের পরিচয় সঞ্চার বিভাগপত্র কলকাতার সংস্কৃতিক্ষেত্রে এ ভাববিস্তার নিচ্চই শেষ থাকবেন; কিন্তু এ ভাবাবলোচন তাঁর মনে কী প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা জানবার উপায় নেই। কোনো প্রতিক্রিয়া হলেও, বড়বাড়ারের সে অচ্ছত্রাচ্ছন্ন ঘরবাড়ী ঈশ্বরভক্তের সৌধিকে মন দিয়ে সমগাময়িক আবেশনে সঞ্চিত কোনো অংশ গ্রহণ করবার সময় বা সুযোগ ছিল না। জানভাগপত্র ঈশ্বরভক্তের জ্ঞানমূহুরে সত্তরপই ছিল এ সময় প্রধনি কাশ। তারপর ছাত্রজীবনে সাফল্যের পর কোট-

^১ বিভাগপত্র ও বাঙালী সমাধ, ২য় খণ্ড—বিনয় থেকে।

উইলিয়ম কলেজ তিনি যে শুধু চাকরি করতেন তা নয়, কর্মের অবসরে কোট-উইলিয়ম কলেজ বসে একশিক তিনি নতুন বাংলা-সাহিত্য-নির্মাণের প্রয়াণ শেষেচেন, আর একদিক ঊর ইউরোপীয় বক্তৃকের সাহায্যে ইউরোপীয় ভাষা-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন তার প্রমাণ আছে। এ ইউরোপীয় ভাষার ব্যুৎপত্তি ঊর স্পর্শকাতর মনের সামনে নিশ্চয়ই খুলে দিয়েছিল ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের অজাত রাজ্য। ঊর যুগ্মগোচন চিত্রে সেগেছিল এ যুগের চোরা। এ যুগ-শিকাকে আমাদের সৌন্দর্য শিকার প্রাচীন খাজার সঙ্গে মিলিয়ে বাংলাী চিত্রকে ঊর সঙ্কতিত গন্ধ-মধুনা-সকল কি করে পৌছিয়ে দেওয়া যায়, এ চিন্তা এ সময় ঊর মনে ভোগেছিল—এ অজ্ঞান একেবারে অহেতুক মনে হয় না। অবশেষে বহুসংকীর্ণ জ্ঞান এল, যখন বিজ্ঞানাগর সঙ্কত-কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি। তখন থেকে সেগে সেলেন তিনি যুগ্মগোচরী শিক্ষা-সংস্কারের কারে।

ইংরাপূর্ব মাদেসিতির কোট-উইলিয়ম কলেজের শাসন-মুখ্যতার সঙ্গে পরিচিত হইতেচেন বিজ্ঞানাগর; তাই সর্বপ্রথমে সঙ্কত কলেজের গ্রন্থ নিয়ম-মুখলা ঊর কাছে অলঙ্ মনে হল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ছাত্র ও শিক্ষকদের কঠোর নিয়ন্ত্রণবর্তী কর তুললেন। প্রতি অষ্টমী ও প্রতিপদে কলেজ-চুটির বন্দে ইংরাভী কুলের নত্যা প্রতি প্রবিচার চুটির দিন পার্ণ হল। এর মধ্যেও আমরা বিজ্ঞানাগরের আধুনিক মনের পরিচয় পাই। কলেজ ছাত্র-নির্বাচন ব্যাপারে যে বর্ষ বৈধম্য প্রচলিত ছিল, 'ইউরোপীয়' বিজ্ঞানাগরের কাছে তা মনে হল বহুদূরী বর্ষের প্রথার নত্যা। সময় সেগের মধ্যে প্রাচ্য-বিজ্ঞার আদর্শে ওই একটি মাত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান; তার দ্বারও যদি অগ্রাধিকারের নিকট বন্ধ থাকে, তা-হলে সেগে শিক্ষা-বিজ্ঞানের আশা কোথায়? তাই তিনি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কাছগের নিকট, এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সফল জাতির নিকট সঙ্কত-কলেজের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিলেন।

শিক্ষালভের উচ্চতম দশার্কেও বিজ্ঞানাগরের দৃষ্টিভবী ছিল অত্যন্ত বাধ্যবন্দী। সে শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সমাজ-জীবনের উচ্চতম মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে না, সে শিক্ষার দ্বারা কতগামি—এ প্রশ্ন এ সময় বিজ্ঞানাগরের মনে আগলো, যখন তিনি দেখলেন সঙ্কত-কলেজের উচ্চতম উপাধিভবী ছাত্রকে সরকারী উচ্চতম পদ (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) কেওয়া হয় না, অথবা হিন্দু-কলেজ ও কলকাতা-

মহাসাধ উত্তীর্ণ ছাত্রদের সে-পদ দেওয়া হয়। এ নিয়ে আরম্ভ হল বিজ্ঞানাগরের অস্বস্তি চেষ্টা। সে চেষ্টা অবশেষে ফলবর্তী হল। তদানীন্তন সরকার বিজ্ঞানাগরের দৃষ্টির দ্বারা যুগে শেষ পর্যন্ত সঙ্কত-কলেজের ছাত্রদেরও পাসন-বিভাগে উচ্চতর পদে (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) নিযুক্ত করতে সীকৃত হলেন।

দ্বার শাগর ছাত্রকে বিজ্ঞানাগর। কিন্তু যে মধ্য ছাত্র-সমাজকে নিহন-মুখ্যতার পরিণতী ক'রে তোলে, সে মধ্য ঊর কাছে অর্থীন। সংকত-কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮২৬ সন থেকেই সংকত-কলেজের ছাত্রদের শিক্ষার মন্ত্র কোনো বেতন লাগতো না। এতে ছাত্রেরা ইচ্ছামতো কলেজে দ্বাওয়া-আসা করতো। এ শৃঙ্খলাহীনতা দূর করার জন্তে নিয়মবর্তী বিজ্ঞানাগর ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রদের ছুটাকা এবং ১৮৭৪ সন থেকে এক টাকা ক'রে দ্বাৰ্য করলেন। এতে ইঙ্গিত ফল ফলো। ছাত্রেরা নিয়মাবর্তী হইতে কলেজে দ্বাওয়া-আসা করতে লাগলো। শুধু ছাত্র নয়, শিক্ষকদের মধ্যেও দেখানো তিনি পৈশাচী কেলেসে, কঠোর হইতে সে পিথিততা দৃষ্টিভবী ক'রে সঙ্কত-কলেজকে অস্বস্তি ইংরাধ-পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নত্যা আধুনিক ক'রে তুললেন।

বিজ্ঞানাগরের হুই ও হুশূল নিয়মাবর্তী সঙ্কত-কলেজের কাছ লাগতে লাগলো। এদার তিনি আভাস্তরীণ শিক্ষা-সংস্কারে মন দিলেন। যে 'মুদ্রবোধ ব্যাকরণ' আদিত করতে বিজ্ঞানাগর নিজে অনেক চোখের মল কেলেসে, পাঠ্যক্রম বেশ সে বোপসেবের 'মুদ্রবোধ'-পাঠ তিনি তুলে দিলেন। সে আভাস্তরীণ প্রবর্তিত করলেন তিনি বাংলায় সেবা স্মৃতিত 'সঙ্কত ব্যাকরণের উপক্রমবিকা' ও 'ব্যাকরণ কোষী'। সঙ্কত কাব্য ও পদ্ব হ'তে সুনির্বাচিত অংশ নিয়ে তৈরী 'গ্রন্থপাঠ'ও ছাত্রদের পাঠ্য করা হল। এতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রদের কাছে সঙ্কত-শিক্ষার পথ স্পষ্ট হল। সেকালের সঙ্কত-শিক্ষার পক্ষে এ যে কতঘোড়া সংস্কার তা আদ্যকের শিক্ষাবর্তীসের পক্ষে অহতব করা অত্যন্ত শক্ত।

এর পর আরম্ভ হল কলেজের ইংরাভী শিক্ষা-সংস্কার। ইংরাভী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানাগর পক্ষপাতী ছিলেন আধুনিক Direct Method-এর। তাই সঙ্কতের মাধ্যমে লাতিনাচারের 'লীমাবর্তী' ও 'বীজগণিত' শিক্ষার স্থানে তিনি ইংরাভী মাধ্যমে গণিত-শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। ইংরাভী শিক্ষা আগে ছিল ঐতিহ্য, বিজ্ঞানাগর ইংরাভীকে একটি আর্থিক শিক্ষার বিষয় হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিলেন। ইংরাভী ও

ইংরাজীর মাধ্যমে অর্থ-শিক্ষার তত্ত্ব উপস্থাপন করেন শিক্ষকও নিযুক্ত হনেন।^১

বিজ্ঞানাগর স্থান গাঁর গ্রাম সংস্কৃত-কলেজের শিক্ষার্থীদের নিজেই শিক্ষাদর্শে গড়ে তুলবার কাজে বাস্তব, সে সময় (১৮৫০ সনে) শিক্ষা-পরিষদের আয়তনে কানী সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ব্যালেন্টাইন এলেন সংস্কৃত-কলেজের কার্যাবলী পরিদর্শন করতেন। কলেজের কার্যক্রম পরিদর্শন করে ডাঃ ব্যালেন্টাইন সংস্কৃত-কলেজ প্রচলিত শিক্ষাকে আরো কার্যকরী করে তুলতে হলে কি কি উপায় অবলম্বন করা দরকার সে-সম্পর্কে শিক্ষা-পরিষদের নিকট একটি বিস্তৃত রিপোর্ট দেন। শিক্ষা-পরিষদ সে-রিপোর্ট বিজ্ঞানাগরের নিকট পাঠিয়ে দিলে, বিজ্ঞানাগর ব্যালেন্টাইনের শিক্ষা-সংস্কার সংক্রান্ত সমস্ত মতাবলম্বিত সমর্থন করতেন না পেয়ে যে-সমালোচনা শিক্ষা-পরিষদের নিকট পাঠিয়ে দেন—সেখানি, এবং ইতোপূর্বে ১৮৫০ সালে সংস্কৃত-কলেজের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী ও বিধিব্যবস্থা সংস্কারের তত্ত্ব শিক্ষা-পরিষদের নিকট প্রেরিত বিস্তৃত রিপোর্টখানি “বাংলা-দেশের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে ছুটি দৃষ্টান্তকারী মনিলক্ষণে গণ্য হবার যোগ্য।”^২ এ দুখানি রিপোর্টে বিজ্ঞানাগর শিক্ষা-সংস্কার সম্পর্কে যে সমস্ত মতাবলম্বিত নির্ভীকভাবে ব্যক্ত করেন, তা ছিল সে-দুগ্‌গের দৃষ্টিতে অত্যন্ত অগ্রসর।^৩ প্রথম রিপোর্টে তিনি প্রচলিত সংস্কৃত-শিক্ষার আলার আল বর্ধন করে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শে সংস্কৃত-কলেজের শিক্ষাকে উন্নীত করতে উপদেশ দেন। ব্যালেন্টাইনের রিপোর্টের উত্তরে বোম্বাই ও সাংঘা যে ব্রাহ্ম দর্শন—উপর এ নির্ভীক উপলব্ধি বিজ্ঞানাগর সে-দুগ্‌গের প্রাচীনপন্থী সনাতনের মধ্যে বাস করেও প্রকাশ করতে বিধা করেননি। তারপর ডাঃ ব্যালেন্টাইন বোম্বাইর সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনের মায়ত্ত্ব অগ্রহণ করবার ক্ষমতা অর্জনের তত্ত্ব সংস্কৃত-কলেজের ছাত্রদের যেখানে

বার্ষিকের Inquiry পড়তে উপদেশ দিচ্ছেন, সে ভাষণেই বিজ্ঞানাগর শিক্ষা-পরিষদকে পরামর্শ দিচ্ছেন সংস্কৃত-কলেজে ‘খাটি’ পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে। তা হলে বিজ্ঞানাগরের মতে সংস্কৃত-কলেজের ছাত্ররা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক বিচার করে সত্যতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। ব্যালেন্টাইনের প্রস্তাবিত শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে ছিল প্রাচীনপন্থী সংস্কৃত পণ্ডিতদের মনস্তত্ত্বের চেষ্টা। বিজ্ঞানাগর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিক্ষকেই পাশ্চাত্য ‘কিমোগ্রাফট’ ব্যালেন্টাইনের এ অপচেষ্টা-প্রবৃত্তিকে ধরে ফেলেন, এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সে-অপচেষ্টাকে বাধা দেন। সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি দিয়ে বিজ্ঞানাগর দেখতে পেরেছিলেন, বাংলাদেশে প্রাচীনপন্থীদের দৃষ্টি অধিনীত প্রায়ঃ। কর্ম ও ভাবচক্র বিশেষ ইংরাজদের সম্পর্কে এসে নতুন দুগ্‌গতত্ত্বা ক্ষেপে উঠতে সেনের দিকে দিকে; অতএব শিক্ষার ক্ষেত্রেও অগ্রসর প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বসে থাকলে চলবে না—বেশক নতুন আদর্শে জাগ্রত হলে, শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন কর্মগত্যা অবলম্বন করতে হবে।

ব্যালেন্টাইনের রিপোর্টের উত্তরে বিজ্ঞানাগর এ সম্পর্কে শিক্ষা-পরিষদকে বলেন :

“বাংলা দেশে যেখানে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, সেইখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব কমিয়া আদিতছে। দেখা যাইতেছে, বাংলার অধিবাসীরা শিক্ষাসত্যের তত্ত্ব অস্তান্ত ব্যগ্র। দেশীয় পণ্ডিতদের মনস্তত্ত্ব না করিয়াও আমরা কি কঠিনত পাঠি, তাহা দেশের বিভিন্ন স্থানে তুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাই আমাদের দেখাইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার—ইহাই এখন আমাদের প্রয়োজন। আমাদের কতগুলি বাংলা তুল স্থাপন করিতে হইবে, এইসব স্থানের তত্ত্ব প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাগ্রন বিস্তারের কতগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে হইবে, শিক্ষকের বাহিরস্বর্ণ কার্যভার গ্রহণ করিতে পারে, এমন একমল লোক সৃষ্টি করিতে হইবে; তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল। বাস্তবভাবে সম্পূর্ণ স্বপন, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্য যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের সুসাধারণের কল হইতে মুক্তি,—শিক্ষকের এই গুণগুলি থাকা চাই। এই দরবের দরকারী লোক গড়িয়া তোলাই আমার উদ্দেশ্য—আমার সঙ্কল্প। ইহার তত্ত্ব আমাদের সংস্কৃত কলেজের সমস্ত পণ্ডিত নিয়োজিত হইবে।”^৪

^১ প্রসঙ্গসূচক অধিকারী—ইংরাজীর অধ্যাপক, শ্রীনাথ দাস—দণ্ডিতের অধ্যাপক। এইখা—সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড : ইবরচ্চ বিজ্ঞানাগর—ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ৩২

^২ বিজ্ঞানাগর ও বাঙালী সমাজ, ১ম খণ্ড—বিশ্ব বোধ। পৃঃ ৬০-৭০

^৩ এ দুখানি মনিলক্ষণে মধ্যে শিক্ষা-সম্পর্কে বিজ্ঞানাগরের যে আধুনিক মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তার নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীমুক্ত বোধ ‘বিজ্ঞানাগর ও বাঙালী সমাজ (১ম খণ্ড)’ গ্রন্থের ৬৫ হতে ৮২ পৃষ্ঠায়।

^৪ সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড : ইবরচ্চ বিজ্ঞানাগর—ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ৩৮-৩৯

এইই সঙ্গে বিভাগাগরের এ আশ্রয়শ্রী ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে অগ্র-প্রবণা দিয়েছিল সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপক থাকাকালীন নরীশ বুল, বাংলাদেশের চারটি মেলায় মডেল বুল ও বাংলা পাঠশালা স্থাপন এবং নিজে পাঠ্যপুস্তক রচনা করে এবং অল্প পণ্ডিতদের রচনায় উৎসাহিত করে বাংলাদেশে জনশিক্ষার পথ হ্রাস করে দিয়ে। যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি এতদিন ছিল নগরকেন্দ্রিক, বিভাগাগরের অসংখ্য বিজ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তা প্রসারিত হতে থাকল বাংলাদেশের দিকে দিগন্তে। এ জনশিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোজিত হল।

বাংলাদেশের অসংখ্য অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মাত্র তিন-চার মাসের শিক্ষার বহুবিস্তৃত ধারাকে প্রবাহিত করে দিতে গিয়ে এ চিন্তা বিভাগাগরের যখন হঠাৎ স্বাভাবিক : অবিজ্ঞা এবং কৃষিকার্যে ক্ষমতা নারীজাতির নমস্কার ও যদি উবার শিক্ষার সামগ্রিক উন্মোচিত করে না তোলা যায়, তা হলে দেশের মারাত্মক সাংস্কৃতিক-বিকাশের আশা প্রত্যাশিত। সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপক করবার সময়ট বিভাগাগরের শ্রী-শিক্ষা-বিজ্ঞানের চেষ্টা বাংলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বিভাগাগরের শ্রী-শিক্ষা-বিজ্ঞান প্রচেষ্টার দুটো দৃষ্টান্ত ছর লক্ষ্য করা যাবে। প্রথমতঃ, নারীশিক্ষা-পরিদৃষ্ট ওয়াটার বীটন সাহেবের সহকর্মী হিসেবে 'বীটন নারী-বিজ্ঞান'-এর মারকতে পলকাতায় নারীশিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী সাহায্যে বাংলাদেশের অধ্যাপকরা প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে ব্যাপকভাবে শ্রী-শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রয়াস। বলকাতায় বা গ্রামে শ্রী-শিক্ষা বিজ্ঞান করতে গিয়ে নানা দিক থেকে বিভাগাগরের সাহায্য বাণী ছিল অনেক, তথাপি তাঁর উদ্যম প্রাণাবেগের সামনে সমস্ত বাধা ভূষণ হতো ভেঙ্গে গিয়েছিল সেদিন। এই 'বীটন নারীশিক্ষা-বিজ্ঞান'কে কেন্দ্র করে ক্রমে ক্রমে নারীশিক্ষার বিকাশ হয় বলকাতা শহরে, এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে উত্তরকালে একটা নবজীবনের স্পন্দন অঙ্কিত হয়—ইতিহাসের পাতা এটা অঙ্গুলন করেন তাঁরা সকলেই এ বরষা জানেন। শ্রী-শিক্ষা-বিজ্ঞানের বিভাগাগর প্রাথমিক আশ্রয়শ্রী হলেও, 'বীটন নারী-বিজ্ঞান'-সংলগ্ন নরীশ বুলের মাধ্যমে বাঙালী শিক্ষা বৈরি করার অসংখ্য সম্পর্কে বিভাগাগরের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী আবারো বিদ্যমান করে। এ প্রসঙ্গে তাঁর স্বল্প কিন্তু কার্যকরিতার সঙ্গে তাঁর মতবোলে হয়, এবং ১৮৭২ সনে বাংলায় ছোটমোট সাত চরম ক্যাম্পেইল এখন বীটন-বিজ্ঞান-সংলগ্ন নরীশ বুলটি ভুলে দিতে আসেন দিলেন তখন সকলেই বুঝতে

পারেন যে, নরীশ বুলের ধর্মগ্রন্থদীন শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্ব নারী-শিক্ষা বৈরি করা যে অসম্ভব, বিভাগাগরের এ অগ্রযাত্রা ছিল সম্পূর্ণ সত্য। সরকারী সহযোগিতার বিভাগাগর ১৮৭৭-৭৮ সনে আস থেকে ১৮৮৮ সনের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে অল্পতঃপক্ষে ৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যার ছাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় ১,৩০০। ১৮৭৭ সনের শিশুশ্রী-বিজ্ঞানের সঙ্গে সরকারের আর্থিক বিশৃঙ্খল উপস্থিত হওয়ায়, সরকার বিভাগাগর-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়গুলিকে আর্থিক সাহায্য দিতে অস্বীকৃত হল। এতে বিভাগাগরের আরও শ্রী-শিক্ষা-প্রচারা কার্যে বাধার সৃষ্টি হল। এদিকে তদানীন্তন ভিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে বিভাগাগর কলেজের ৪০০ টাকা বেতনের অধ্যাপকপদে ইস্তফা দিলেন। চারমাস থেকে সকল বাধাবিপত্তি ঘেন বছরে করে বিভাগাগরের এ মহৎ প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিতে উদ্ভট হল। কিন্তু বিভাগাগর হমলেন না। নিজের চেষ্টায় 'নারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাঙার' খুলে তিনি বেঙ্গলকারী টাওয়ার বিভাগাগরগুলিকে সাহায্য করতে লাগলেন। সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপক থাকাকালীন মাত্র আট বছরের মধ্যে বাংলাদেশের শ্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভাগাগর যে আলোকিত উপস্থিত করেছিলেন, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক-বিকাশের ইতিহাসে তা অমরীয় হয়ে থাকবে। বস্তুতঃ, শ্রী-শিক্ষা-বিজ্ঞানে বিভাগাগর সেদিন যদি তাঁর সমস্ত প্রয়াসকে নিয়োজিত না করতেন, তা হলে আধুনিক সংস্কৃতির বহুদূরী অগ্রগতি যে সম্ভব হতনা তা বলাই বাহুল্য। বিভাগাগরের এ মানবতা-বাহী শ্রী-শিক্ষা-আন্দোলনই পরবর্তীকালে বিকাশ লাভ করেছে শ্রী-জাতিক ব্যক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার আন্দোলনে ; আর আধুনিক ব্যক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠিত নারীর সমাজ-জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার দলেই বিচিত্রতরী আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি সর্ববল পনের মতো বিকশিত হয়ে ভারতীয় তথা পৃথিবীর চর্চাসম্পন্ন জাতিদের মধ্যে বাঙালীকে একটা বর্ষাধার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু এ প্রশ্ন এখনে আলোচ্য নয়।

সরকারী সহযোগিতা ব্যাপকভাবে শ্রী-শিক্ষা-প্রচারা-কার্যে আকর্ষণভাবে থাকা এলেও, আজীবন শিক্ষারতী বিভাগাগর তাঁর কর্মজীবনের শেষ ভরবেও এদেশের শিক্ষা-আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপকপদ ত্যাগ করলেও, বইয়ের বাধ্য হতে তখন বিভাগাগরের আর প্রচুর (যাশিক প্রায় তিন-চারহাজার টাকা)। ক্রমে ক্রমে সেই সক্রিয় অর্থ দিয়ে বাস্তবজগতে বাসের জন্য বাড়ী

কিনেলে, নিজেদের জ্ঞানচর্চার দ্রষ্টা দেখি-বিদ্যেই মূল্যবান বই
কিমে নিজেদের গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। কিন্তু এতেও
শিক্ষাব্রতী বিজ্ঞানগণের তৃষ্ণা হ্রাস, সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র
অধ্যাপকদের পরিচালনায় তিনি ১৮৭৩ সনে মেট্রোপলিটান-
কলেজ স্থাপন করলেন। ১৮৭২ সনে এ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের
অধস্ততি পেয়ে ফার্স্ট-গ্রেড কলেজে পরিণত হল, এবং
১৮৮১ সনে এ কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষার প্রেরিত ছাত্ররা
বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করল। সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র লোকস্বাভা
পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানের অগাম্য সাক্ষ্য মেখে এসমিতে
তৎকালীন শাসক ইংরেজদের যেমন বিশ্বাসের স্রষ্টা হয়েছিল,
তেমনি বাঙালীদের আস্থাপ্রত্যয়ও গেল শতভাগে বেড়ে।
জাতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এ মেট্রোপলিটান-
কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং সার্থকভাবে কার্য-পরিচালনা একটি
স্বর্গীয় অধ্যায় সম্বোধ নেই।

১৪১

সমাজ-চিন্তা-নিরপেক্ষ শিক্ষা মাতৃবের মনে স্রষ্টা করে
সংস্কৃতির নামে সংস্কৃতিবিলাস—সে শিক্ষা করে মাতৃবের মনকে
শূন্য প্রাণহীন। পারিশ্রমিক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এ ধরনের
বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজেদের চারদিকে একটা স্থূহ ভাবমণ্ডল
তৈরি করে অসংকৃত আত্মপ্রসার লাভ করে। ইংরাজীতে
এ শ্রেণীর সংস্কৃতিবিলাসীদের বলা হয় 'dilettante'।
গৌড়াপ্যায় বিবাহ—সংস্কৃতির কেন্দ্র বিজ্ঞানগণের 'dilettante'
ছিলেন না, যেমন ছিলেন না উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে
আরো অনেক চিন্তামানক মনীষী। এ সমাজ-চিন্তাশ্রিত
শিক্ষাই এ যুগের চিন্তানায়কদের প্রেরণা দিয়েছিল বিচিত্রধনী
সংস্কৃতি-নির্মাণে—যে সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপ দেখি আমরা
সে-যুগের সাহিত্য-প্রচেষ্টায়, সমাজ ও ধর্ম সংস্কারে এবং
কিছুটা রাষ্ট্রচেষ্টায়।

এ সমাজ-চিন্তাই স্বভাবতঃ মানবদয়ী বিজ্ঞানগণকে
জীবন-মধ্যাহ্নে টেনে আনলো সমসাময়িক সমাজ-সংস্কারের
বিমূর্ত কেন্দ্র।

বিজ্ঞানগণের যে সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টা সে-যুগের
দুঃখে-দুঃখা সম্পন্ন বাঙালী সমাজে বিক্ষোভের তরঙ্গ
তুলেছিল, তার মধ্যে প্রধান হল—বিবাহ-বিবাহের মধ্য
প্রচলন, এবং বহু-বিবাহ ও বালাবিবাহ প্রথার উচ্ছেদ।

কৌলীভপ্রথার বিদ্যমান ছিল থাকিয়েছিল এবং :
বিকৌলীভপ্রতীন তথাকথিত স্থানী ব্রাহ্মণেরা একাধিক বিবাহ
করে নিজেদের জীবিকার পথ হুগ্ন করতো, নিজেদের স্বাভ

বংশকৌলীভ রক্ষা করবার জন্য কতগুলি পিতারা আত্মবর্ষণ-
জ্ঞানহীন এবং অনেক সময় প্রাণ স্থানী বরের কাছে বালিকা-
কস্তার বিবাহ দিতেন এবং তার অবজ্ঞায়ী পরিণতি যেসকল
বাল্যবৈধবা এবং সমাজের মধ্যে নানা ব্যতিক্রমের স্রষ্টা।

এ সমাজ-বিপর্যী প্রথার বিরুদ্ধে বিপ্লবাত পৃষ্ঠীভূত হয়ে
উঠেছিল স্বাববোধনের সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টার এবং ইয়-
বেশসকলের সর্বপ্রকার হুঃসংস্কারের বিরুদ্ধে যাত্রো-যোষণার
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হ'তে চতুর্থ দশক পর্যন্ত।
এ বিমূর্ত ভাববোধন ছাত্রাবস্থায় ও প্রধান কর্মজীবনে
বিজ্ঞানগণের যোগেছিল; কিন্তু বিত-কৌলীভ ও সামাজিক
বিশিষ্ট মধ্যনা বা স্বাভাবিক বিজ্ঞানগণের পত্রিকার পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে
আলোচনা করা ছাড়া (১৭৭৬ শকের কাছের সংখ্যায়
'তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা'র 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত
কিনা এইবিষয়ক প্রস্তাব' শ্রেণী) তেমন কোনো সক্রিয়
কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারেননি। সংস্কৃত-কলেজের সমসাময়িক
অধ্যাপকের পদ লাভ করবার পর বিজ্ঞানগণের সে উদ্দেশিত
ব্যয়োগ পেলেন। ইতোমধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে
প্রগতিশীল একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীও সমাজের মধ্যে গড়ে
উঠেছে। বিজ্ঞানগণের সে প্রগতিশীল চরমসাময়িকের অগ্রদূত
লাভ করে ১৮৫৫ সনের ১১ অক্টোবর 'বিধবা বিবাহ আইন'
প্রবর্তনের দ্রষ্টা সর্বকারের কাছে আবেদন করেন।
সর্বকারের সে আবেদনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৮৫৬ সালে
'বিধবা বিবাহ আইন' সিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু
বিজ্ঞানগণের জানতেন, শুধু আইন প্রণয়ন করে আর্য-লাভ
সম্ভব নয়। তাই নিজে উচ্চাশ্রিত হয়ে নিজের পুত্রের এবং
আরও কয়েকজন যুৎস্কের বিবাহ-বিবাহ দেন। এভাবে
বহু-দুঃখ-সিক্ত অন্তঃসমাজের বৃদ্ধ বিজ্ঞানগণের যে প্রচণ্ড
আঘাত হেনেছিল, তার ফলে সংস্কারাত্ত হিন্দু অসাময়িকের
ভিত্তিমূল পর্যন্ত নড়ে উঠেছিলো সেদিন। "১৮৫৫-৫৬-৫৭
সালে তাঁর এইমত সামাজিক ক্রিয়ার যে প্রতিক্রিয়া হই—
বাংলাদেশের ইতিহাসে, তার আগে বা পরে, আর কোন
ব্যক্তির কর্মের ফলে তা হয়েচে বলে মনে হয় না।"
গুহাশ্রয়ী জীবের চোখে তাঁর আলোয় বসন্ত বহন লাগে তখন

^১ সে আবেদনপত্রে বিজ্ঞানগণের ব্যতীত আরও ৯৮৬ জন
আবেদনকারীর স্বাক্ষর ছিল। শ্রেণী : বিজ্ঞানগণ ও
বাঙালী সমাজ, ১ম খণ্ড—বির যোষ। পৃ: ১২১

^২ বিজ্ঞানগণ ও বাঙালী সমাজ, ১ম খণ্ড—বির যোষ।
পৃ: ১২০

এরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতিক্রিয়া ঘাই হোক—আলোকের দূত ধীরে, তাঁরা আলোক বিকীর্ণ করে দায়েই। বিজ্ঞানগণের জীৱনের 'সর্বপ্রগতি সংকল্প'। এভাবে সঞ্চিত হল, আর প্রচণ্ড স্বাভাবিক সংঘাত-বিশুদ্ধ তৎকালীন বাঙ্গালীর চেতনা ক্রমশঃ তেজে উঠতে লাগলো এবং নতুন জীবন, নতুন সংস্কৃতির প্রত্যাশা। প্রবল আশাবাদী বিজ্ঞানগণ সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য সাফল্য উৎসাহিত হলেন। অতঃপর সমাজের অপর দুইকণ্ঠ—'বহু-বিবাহ' গ্রহিত করবার ভ্রম ১৮৪৫ সনে এবং ১৮৬৯ সনে দু'বার সরকারের কাছে আবেদন করলেন। এ প্রচেষ্টার বিজ্ঞানগণ ব্যর্থ হলেন। বার্ষ হুগো, তৎকালীন অধ্যক্ষোক্ত বাঙ্গালীর অপর দু'ত সঙ্ঘাতের নীতর অধ্যকার দূর করবার ভ্রম বিজ্ঞানগণ সেদিন যে আলোকোজ্জ্বল জীবন জ্ঞেয়ছিলেন, যে বীশই পথ সেবিবেছিল উত্তরবাহুরের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন পথেরবা অহসন্ধান করতে। বিজ্ঞানগণের সামাজিক সংস্কারের প্রচেষ্টার দৃশ্য হল এখানে।

১১।

বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞানগণের রচনার দৃশ্য বহু-আলোচিত, অতএব সংক্ষেপে এ সম্পর্কে আলোচনা করে বিজ্ঞানগণ-প্রসঙ্গ শেষ করব।

সাহিত্যে একপ্রকার লেখক দেখা যায়, যারা সৃষ্টি-কল্পনা-রীতি ইত্যাদি সবেও প্রচুর লেখেন ব্যাতির লোভে, আর-এক প্রকার লেখক সৃষ্টি-কল্পনা থাকে সবেও সৃষ্টিমূলক রচনা না করে দিকা ও জ্ঞানমূলক রচনাও আত্মনিয়োগ করেন তাঁতির বুদ্ধির কল্যাণরূপে উদ্ভূত হয়ে। সামাজিক অনেক কবাবিন্দী সংকল্পে যদি প্রথম বহুধা প্রবেশ হয়, তা হলে যেমত বহুধা, প্রতিভার লেখক বিজ্ঞানগণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নত।

বিবাহ-বিবাহের শাস্তিহীনতা এবং বহু-বিবাহের অপরাধীহীনতা প্রমাণ করে প্রত্যেক রচনা করবার পর তৎকালীন পণ্ডিতেরা বিজ্ঞানগণকে অত্যন্ত হীনভাবে রচনার মাধ্যমে আক্রমণ করেন।

এ সময় আক্রমণের উত্তরে বিজ্ঞানগণ বেনারসীতে 'অতি অজ্ঞ হইল', 'আবার অতি অজ্ঞ হইল', 'ব্রহ্মবিদ্যা', 'রূপগীতা' প্রভৃতি কয়েকখানি হাত ও বাহরসাহিত্য 'বই

লেখেন। এ সময় বইয়ের ভেতর বিজ্ঞানগণের যে নির্দল বসবোধ এবং গতিশীল ভাষা-সৃষ্টি-কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায় তাতে সন্দেহভাবের অস্থান করা চলে যে, বিজ্ঞানগণ যদি পাঠ্যপুস্তক-রচনার সময় কোন না করে সৃষ্টিমূলক রচনাও আত্মনিয়োগ করতেন, তা হলে বাংলা-সাহিত্যে বহুধারী বিজ্ঞানগণের সময় থেকেই বহু ধারার সম্ভাবনা ছিল। ছাত্র-জীৱনেও বিজ্ঞানগণের বসবোধ যে কত প্রগতি ছিল—তাঁর সাহিত্যাদ্যাপ্ত-দুরদিক জগৎগোলাল তৎকালকারের নির্দেশে সত্যতীর উদ্দেশে তাঁর বসাবোধ স্নো-রচনাও তার প্রমাণ। তাঁর প্রথম অধ্যায় 'বেতাল-বিশংখতি' পাঠ করলে মনে হয়, বিজ্ঞানগণ তাঁর সাহিত্য-জীৱনের প্রথম দু'তেই গতিশীল গল্প-রচনাও বেশ নিপুণ ছিলেন। তাঁর বিবাহ-বিবাহ-বিসংখতি বাহীন রচনাওসিঙে আবেগময় প্রবল। 'সীতার বনবাস', 'পদ্মশা' অধ্যায়-হলেও, তার মধ্যে বিজ্ঞানগণের চিত্রবহী রচনা-কল্পনা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সৃষ্টিকারের উপযোগী এত 'কল্পনা' সবেও বিজ্ঞানগণ ব্যাতির প্রয়োজন ছেঁচে চারপাঠ্য পুস্তক ('বেতাল-বিশংখতি, বোধোদয়, বর্ণগরিচ, পদ্মশা, কথামালা প্রভৃতি'), অথবা দেশী ও বিদেশী বিষয় অবলম্বনে। জানিমূলক রচনা-কার্যে (যেমন—'তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত) তাঁর স্বাধীন সাহিত্য-জীৱন অতিবাহিত করতে গেলেন কেন, সে-কথা মনে ওঠা স্বাভাবিক।

দিকা-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে যেমন লোক-হিতৈষণা, তেমনি সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রেও এ লোকহিতৈষণা বিজ্ঞানগণকে অপ্রাপ্তি করেছিল দিকা ও জানিমূলক সাহিত্য-রচনা। এ প্রেরণাবলেই সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতি ও ভিন্নপ্রকৃতির অধিকারী হয়েও বিজ্ঞানগণ সেবেশ্রমাণ ও অক্ষতহুমায়কে স্বাধীন বোধোদয়র 'তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা' প্রকাশে (১৮৫০-১৮৫২) অকৃত সাহায্য করতে বিধা করেনি। শুধু 'তত্ত্বাবোধিনী'র প্রবন্ধ-নির্বাচনে মন, অনেক সময় সম্পাদক অক্ষতহুমায়ের রচনা পরিমার্জিত করে দিয়ে, আবার কোনো সময় নিজে বহু জানিমূলক রচনা লিখে তিনি

* মোকটি এই :

শ্রী কচুদী মতিচূর শোভিত

জিলেশি সন্দেশ দ্বারা বিদ্যাজিহ্ন।

প্রভাঃ প্রদানের কল্যাণমায়ুঃ

সংস্কৃতি সা স্বজ্ঞা নিরন্তরঃ।

প্রভাঃ : বিজ্ঞানগণ ও বাঙ্গালী সমাজ, ২৪ বর্ষ—বিনয় ঘোষ। পৃঃ ১৩৩

* প্রভাঃ পদ্মচন্দ্রক' লিখিত বিবাহ-বিবাহ সম্পর্কে বিজ্ঞানগণের পত্রের একাংশ।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সুবৃদ্ধি অল্প আশ্রয় চেষ্টা করতেন। এত কর্তব্যাকতার মধ্যে তিনি একবৎসর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন।^১ তিনি এ কথা উপলব্ধি করেছিলেন—ওকথপূর্ণ বিষয় নিয়ে রচিত এ পত্রিকাগানি সমসাময়িক বাংলাদেশে জানবিজ্ঞানে ও গণ-সাহিত্যের মেজাজ-পরিবর্তনে যথেষ্ট সহায়তা করবে। দাওয়াবদলকে বিজ্ঞানাগর ও অক্ষয়কুমার মল্লের অন্তর্গত চৌধুর 'তত্ত্ববোধিনী'র পত্রীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সে বিস্তৃত সীমা ও আলোচনা হ'ত, তা সমসাময়িক বাংলা-সাহিত্য-পাঠ-বিদগ্ন ইং বৈদেশিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম করেনি।^২ বিজ্ঞানাগরের ত্রাণদীপী মাল্লকৃষ্ণ না পেলেন একা অক্ষয়কুমারের শব্দে বাংলা গণের হান উঠলেন এত অল্পবয়সের মধ্যে সম্ভব হ'ত না, তা বলাই বাহুল্য। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রসঙ্গে বেবেশ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের নামের সঙ্গে বিজ্ঞানাগরের নামও একসঙ্গে উচ্চারিত হওয়া উচিত। বেবেশ্রনাথের মতো বিজ্ঞানাগরও অক্ষয়কুমারের একজন প্রধান পূর্বদাপক ছিলেন। বস্তুতঃ এ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'ই ছিল মানবজাতিবাসী বিজ্ঞানাগরের নিকট তত্ত্ববোধিনী-সভার বেগ বেগার অপ্রত্যয় আকর্ষণ।

মূল-পাঠ্য পুস্তক রচনা করতে গিয়ে এ-কথা বিজ্ঞানাগরের মনে হওয়া বাতাবিক—পাঠ্যপুস্তকের যাবতগে শিক্ষা দিয়ে যদি পাঠক-সম্প্রদায় তৈরি করা না যায়, তা হলে উজ্জ্বল

^১ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশিত সম্পাদকের নাম-তালিকায বেগা বাহু—বিজ্ঞানাগর ১৭৭৮ শকে (১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে) উক্ত পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

^২ এ সম্পর্কে ইং-বেবেশ্রনাথের অন্ততম কৃতী পুস্তক রাগগোপাল ঘোষের উদ্ধৃতিপূর্ণ বাস্য শব্দগীঃ—'রামভট্ট! রামভট্ট! বাংলা ভাষায় গভীর ভাবের রচনা কেবল হ'ত—এই বৈশিষ্ট্য—বলিয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিতে ছিলেন।

অর্থাৎ : রামভট্ট সাহিত্য ও তৎকালীন বঙ্গমাঙ্গ—শিবনাথ শাস্ত্রী। পৃঃ ১৮১

রস-সাহিত্য উপভোগ করবে কে? সেজন্যই যুগ সম্ভব বিজ্ঞানাগরের এ পাঠ্যপুস্তক-রচনার অল্প প্রাণান্তকর প্রয়াস। নিম্নো-ন্নন থাক লবেও শিষ্ট-যতী-কর্মে সম্পূর্ণতঃ তিনি মায়ানিয়োগ করেননি, যদিও এ কথা অনবীকার্য—পরবর্তী শিল্পরচায়ের তিনিই অন্ততম গঠা। বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞানাগরের স্থানিধি বান হল এখানে।

বাংলারীতে সর্বপ্রথম চুম্বোশ্রম ও কলারৈশ্র্যের অবতারণায় বাংলা গভীরীতে বিজ্ঞানাগরের হাতে অকস্মাৎ বিরূপ প্রসামিত হয়েছিল, সে প্রসঙ্গও বহু আলোচিত। অতএব সে সম্পর্কেও আর বাগ্মিত্বের প্রয়োজন নেই। শুধু এ কথা বস্তুতঃ করাই এ আলোচনার পরিলম্পিত ঘটানো যেতে পারে—সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষের অল্প দুগোপদ্যবী যে সংস্কারের প্রয়োজন ছিল, বিজ্ঞানাগর নিষ্ঠার সঙ্গে সে-কাষে আত্মনিয়োগ করেছিলেন; তাঁর জীবকালেই তাঁর উত্তরদ্বীকের হাতে বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ হয়েছিল—তা কখনই সম্ভব হ'ত না, যদি না তিনি ঐসের অল্প সাহিত্যস্রষ্টার উপযোগী ভাষা সৃষ্টি করতেন।

১০১

বাংলাদেশের সংস্কৃতির দ্বারা ধারা অল্পবয়সে করেন তাঁরা নিশ্চয়ই এ কথাটা স্বীকার করবেন যে, যে মানবমুখিনতা আধুনিক সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য—তাঁর প্রায়ঃ বিজ্ঞানাগরের জীবন-বিজ্ঞানায়। যদিও তাঁর রচনাঃ এমন কোনো স্বধার উল্লেখ নেই, তথাপি বিজ্ঞানাগর গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাসের মতো বলতে পারতেন—'Man is the measure of all things'। কোনো আত্মজ্ঞানিক দর্শন নহ, কোনো বিশিষ্ট সমাজ নহ, কোনো আদর্শ মতবাদ নহ—তাঁর কাছে সব-কিছুর একমাত্র মানবও হল মাহুষ। বিজ্ঞানাগরের উদার দ্বন্দ্বের অহংকৃত এ গভীর মানবতাবোধই যুগবর্ষের প্রেরণার সহস্র দ্বারায় বিকাশ লাভ ক'রে সৃষ্টি করেছে আধুনিক শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির।

রবীন্দ্র জীবনালেখ্য

॥ চরম ওষ্ঠাচর ॥

৭. রচনাবলী

উপভাস

রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সের লেখা হল—(বো-
ঠাকুরানীর হাট ও রাত্ৰি)। এর পর বেহুল—
চোখের বালি। এই উপভাসখানি উপভাস লেখার
ধারাকে একেবারে বদলে দিল। এতদিন উপভাসের
প্রধান বিষয় ছিল ঘটনা, এখন তা দাঁড়াল পাত্র-
পাত্রীর মনের বিশ্লেষণে— গল্পভাগ সানান্ত, ওই
বিশ্লেষণে যতটুকু সাহায্য করে মাত্র ততটুকু।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একবার এক বক্তৃতায়
বলেছিলেন—

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক
প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির একটা নতুন
আলো এসে যেন চোখে পড়ল। সেইসময়ের মেই গভীর
ও হৃদয় আনন্দের ক্ষতি আমি কোনোদিন ভুলব না।
কোনো কিছু যে এমন করে বলা যায়, অশ্রুতের সন্ধান
হৃদয়ে নিজের মনটাকে যে পাঠ্য এমন চোপ দিয়ে
সেখতে পার, এর পূর্বে কখনো যথেষ্ট জাবিনি। এতে
দিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা
পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া
যায়, এ কথা সত্য নয়। ওই তো বন্ধকবন্ধে শাস্তা, তার
নয়। বিবেচনা ততকাল সম্পন্ন সেদিন আমারই হাতে
শৌছে গিলেন তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া
যাবে কোথায়?

এর পর নবপরিচয় 'বঙ্গবর্ধনে' রবীন্দ্রনাথের
নৌকাডুবি বেরতে থাকল। আমি তখন হিন্দু-
হস্টেলে থাকি। সত্যীন্দ্র শশী সৌদাই-এর সঙ্গে
একদিন শুধু হাতাহাতি থাকি। সে-মাসের পত্রিকা
এল, শশী চোঁচিয়ে পড়তে লাগল, আমরা ৮।১০ জন
তবু। পড়া শেষ করে শশী বিজ্ঞেস করল,—

বল, এখন রমেশের কি করা উচিত। সব চুপচাপ।
আমি শেষে বললুম, আর কি করবে, এখন
কমলাকে নিয়ে ঘরসংসার করুক, লাঠা চুক যাক।
তুখু শশী নয়, আরও অনেকে আমাকে এই মারে তো
এই মারে।

এটা ১৯০৩ সনের কথা, রবীন্দ্রনাথকে তখনও
সেমিনি।

১৯৪০ সনের একদিন রবীন্দ্রনাথকে ওই
ঘটনাটা বলছিলুম। হাসলেন। কিছুক্ষণ চুপ
করে থেকে বললেন, নৌকাডুবি আমার বড়ো
কাঁচা লেখা।

—কেন এ কথা বলছেন?

—কমলা রমেশকে ভালোবাসে; কিন্তু যেই
সে শুনল, অজানা অচেনা আর একজন লোক তার
স্বামী অননি সেই ভালোবাসা একেবারে ছিন্ন হয়ে
গেল—এরকমটা হয় না।

—কিন্তু একটি হিন্দু মেয়ের কাছে প্রেমের
চেয়ে স্বামিবোধকে বড়ো করে আপনি ঠিকই
করেছেন।

চুপ করে রইলেন।

মাস দুই পরে পক্ষম বণ্ড রচনাবলীর ভূমিকা
লিখে পাঠাবার জন্য জানিয়েছি। লেখা এল।
দেখলুম, 'নৌকাডুবি'র ভূমিকায় রয়েছে—

স্বামীর সম্বন্ধে নিত্যতা নিয়ে যে-সংস্কার আমাদের
দেশের সাধারণ মেরুদের মনে আছে তার মূল এতো
গভীর কিনা যেতে অজান-জানিত প্রথম ভালোবাসার
কালকে দিকঘেরে সঙ্গে সে ভিন্ন করতে পারে। কিন্তু
এ-নব প্রেমের সর্বজনীন উত্তর সম্ভব নয়।

সেদিন ধুঁড়তা প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথকে এক
প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তর পাবনা বুকও প্রশ্নটা
করেছিলুম। বললুম—

—আপনার মতে আপনার কোন উপজ্ঞাস শ্রেষ্ঠ?

—লেখক বলে, না, পাঠক বলে। আপনার মতটা কি শুনি।

মুখে না বলে একটা গ্লিপে আনি লিখলুম—‘ঘরে-বাইরে’।

গ্লিপখানা তাঁর হাতে দিলুম।

একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। মুখে একটা হাসি দেখলুম। মনে হল, আবার উত্তর তাঁর মনঃপূত হয়েছে।

তখুঁ বললেন, একটি অস্ট্রিয়ান মেয়ে ‘ঘরে-বাইরে’ পড়ে আমাকে একখানা চিঠি লিখেছে। চিঠিখানা পড়বেন। একদিন চিঠিখানা পড়েছিলাম। তারপাড়া চিঠির একটা লাইন আজও মনে আছে—
We are all daughters of Bimala।

নৌকাদুবি ও ঘরে-বাইরের মাঝখানে রচিত হয় তাঁর বৃহত্তম উপজ্ঞাস ‘গোরা’। অনেক সমালোচকের মতে ‘গোরা’ই রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ উপজ্ঞাস।

একজন বলছেন, ‘গোরা’ মহাকাব্যের প্রসার ও গভীরতা লইয়া বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং আজ পর্যন্ত একমাত্র আধুনিক উপজ্ঞাস।

এরপর অনেকদিন তিনি উপজ্ঞাস লেখেননি। তারপর দেখা দিল ‘যোগাযোগ’ ও ‘শেখের কবিতা’। এখন গল্পের মধ্যে ফুটে উঠল কাব্য-রস। তার মাধ্যমে পাঠককে মুগ্ধ করল।

ছোটগল্প

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আগে কেউ ছোটগল্প লেখেননি। পাশ্চাত্য দেশে মোপাসাঁ চেকত প্রভৃতি ছোটগল্পের রাজা। রবীন্দ্রনাথের অনেক ছোটগল্প তাঁদের গল্পকে ছাড়িয়ে গেছে।

কাব্যে রবীন্দ্রনাথ উর্ধ্বলোকে উঠে গিয়েছেন,

কিন্তু ছোটগল্পে তিনি আমাদের অতিপরিচিত বাংলার পল্লীতে বিচরণ করলেন।

নীহাররঞ্জন রায় লিখছেন—

রবীন্দ্রনাথের বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সংকীর্ণ ও অস্বাভাবিক বহির্বিচারের দৃষ্টি হইতে বৃষ্টি হইয়া লইয়া জীবনের তলদেশে যে নিহিত স্বরূপ তাই তাহা আমাদের দেখাইয়া দিলেন। সেবিলাস—সেখানে ঘরের কোণে, নদীর ঘাটে, লহরী তুল্য পরিচিত স্থানে ও অবস্থানে কত সহস্র তুল্য ঘটনা ঘুঁড়িয়া উৎপলক করিয়া আমাদের জীবনে বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা অবিরত সঞ্চিত হইতেছে, অসংখ্য ক্ষুদ্র পিকোডে আচ্ছাদিত হইতেছে। আমাদের দৈনন্দিন কার্যের মধ্যে দেখানো অপরূপ মনুষ্য হৃদয়ীর ভাবরসে বিহত হইয়া আছে। আমাদের বৈচিত্র্যবিশীল বাহিরের জীবন দেখানো বৈচিত্র্যে ভরপুর, আবেগে ঝলস, সেখানে তাহার কোনও বৈজ্ঞানিক নাই, কোনও অভাব নাই। রবীন্দ্রনাথ তাহার কবিতার অপরূপ হৃদয়ীর সহঃসৃষ্টি ও স্বাভাবিক দৃষ্টি দিয়া আমাদের জীবনের ওই নিহিত গোপন প্রবাহটি আবিষ্কার করিয়া তাহাকে আপন ভাবে ও ধরনায়, রূপে ও রসে আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। আমরা একটি নূতন অগণ ও জীবনের সম্মান পাইয়া বিন্দু বিশ্বকে চাতিয়া বহিলাম।

রবীন্দ্রনাথ একটা কবিতায় লিখেছেন—

তোমরা কেউ পারবে না গো

পারবে না ফুল ফোটাতে।

বতই বল বতই কর,

বতই তাহে ফুলে ধর,

বাগ্ন হয়ে বকনী-দিন

আঘাত কর ফোটাতে—

তোমরা কেউ পারবে না গো

পারবে না ফুল ফোটাতে।

ফুল আপনা হতে ফুটলেও ফুলবায়ু তার সাহায্য করে। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন—

No other Indian province could produce a Rabindranath. No Indian vernacular except Bengali could supply material for his art creations.

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের পক্ষে কথাটা খুবই

সত্য। বাংলাদেশে জন্মেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ ছোটোগল্প লিখতে পেরেছিলেন। আর এই রচনায় তিনি ঈশ্বরচন্দ্র, মাইকেল, বঙ্কিমের ভাষা টেনে না এনে এক নতুন ভাষা সৃষ্টি করলেন।

প্রথম চৌধুরী এক জায়গায় বলেছেন—

রবীন্দ্রনাথের ভাষা অমর। অমর্য অঙ্ক জাতসারে
অথবা অল্পতসারে তাঁর ভাষা থেকেই নিষ্কৃত-নিষ্কৃত
সাহিত্যিক ভাষা গড়ে তুলেছি। রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক
ও সৃষ্ট শব্দ-বুঝি থেকে আধা-নিষ্ক-মিস্ক বুঝির ঘটে
হতখানি ধরে ততখানি জল আহরণ করেছি।

এই সৃষ্টির প্রথম বিকাশ হল ছোটোগল্পে।

নাটক

বৃন্দাবনের ক্লাসের ছেলেরা ‘ডাকঘর’ অভিনয়
করত; বৃন্দু তা দেখে এসে গল্প করতে থাকত।
আমি তাকে কাছে ডেকে বলতুম—‘ডাকঘর’-এর
গল্পটি আমায় বল তো।

সে বলে যেতে লাগল।—

অমল বলে একটি ছেলেকে তার পিসেমশায়
ছেলের মতো করে লালনপালন করছে। অমল
অসম্মত, কবিরাজ বলেছে, বাইরের রোদ-হাওয়া
লাগলে তার রোগ কঠিন হবে। অমল জানলার
দ্বারে বসে থাকে, সামনের বাতায় দিয়ে ডাকহরকরা,
দইওয়াল, প্রহরী, ছেলের দল, লম্বী-মালিনীর মেয়ে—
এরা সব চলে যায়, অমলের সঙ্গে ছুটী-চারটে
কথা বলে। অমলের মন ওই ঘর ছেড়ে দূরে যাবার
জন্মে ছট্‌ফট করে। শেষে এক রাতে রাজকবিরাজ
এল। অমল বোধ হয় মারা গেল।

—নাটকে তো ভালো রকমের দ্রষ্ট থাকবে।
তুমি যা বললে ওকি একটা দ্রষ্ট!

—সত্যি দায়, তুমি ঠিকই বলেছ। দ্রষ্ট বলে
ওতে কিছু নেই। তবে আমাদের স্কুলের ছেলেরা
ভালো অভিনয় করেছিল, তাই মোটের উপর
জিনিসটা ভালো লেগেছিল।

—আচ্ছা, অনেক নাটকের অভিনয় তো তুমি
দেখেছ। সেসব নাটকে ঘটনার পর ঘটনা চলেছে;
নাটকের পাত্র-পাত্রীদের অস্তুরে নানারকম দৃশ্য দেখা
দিয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের চিত্তও অভিভূত হচ্ছে;
নাটকের পরিণতি কি ঘটবে দর্শক বুঝতে পারছে না।

—দায়, কথাটা আর একটু বুঝিয়ে বল।

—বেশ। রবীন্দ্রনাথের আর একখানি নাটক
ধর। ‘বিসর্জন’। এ তো তুমি পড়েছ।

—পড়েছি, এর অভিনয়ও দেখেছি।

—আচ্ছা। রঘুপতির সংস্কার পশুবলি ভিন্ন
দেবী প্রসন্ন হবেন না; বলিদানকে রঘুপতি ধর্মের
একটি অঙ্গ বলে মনে করেন। অন্তর্দিকে গোবিন্দ-
বাণিকা বলেন—

অমহার জীবরক্ত নহে জননী
পূজা।

এই বিরোধের মাঝে কবি আনলেন
জয়সিংহকে। জয়সিংহ রঘুপতির শিষ্য। আজন্ম
সে পশুবলি দেখে এসেছে, এতে কোনও দোষ আছে
বলে সে মনে করে না। একদিন অপর্ণা বলে
একটি তিথারিনী মেয়ের ছাগশিশুকে বলি দেওয়া
হল; অপর্ণার ক্রন্দন জয়সিংহকে বিচলিত করল।
অপর্ণা জয়সিংহকে মন্দির থেকে চলে আসতে বলে,
রঘুপতি তাকে ধরে রাখতে এই ঘন্টার মধ্যে
জয়সিংহ পড়ল। জয়সিংহের শেষ পরিণতি হল
আত্মবিসর্জনে। পুত্রসম শিষ্যের মৃত্যুতে রঘুপতি
বুঝল বিশ্বমাতার পূজা প্রেম দিয়েই হয়।

মনের এই রকম ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টিয়ে তোলাই
হল নাটকের কাজ। এই রকম নাটক-রচনার
রাজা হলেন শেক্সপিয়ার। রবীন্দ্রনাথ এই রকমের
তিনখানি নাটক লিখলেন—রাজা ও রানী, মালিনী
ও বিসর্জন। ‘বিসর্জন’ সহস্রে বলা যায় যে এখানি
শেক্সপিয়ারের যে-কোনো নাটকের পাশে ধাঁড়াতে
পারে।

এর পর রবীন্দ্রনাথ নাটক লেখার পদ্ধতি
একবারে বদলে ফেললেন।

এখন কি দাঁড়াল ?

কথাটা একটু গোড়া থেকে বলি।—

গত শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপে একরকম নাটক দেখা দিল যা একেবারে অস্তরকমের। মেট্রেলিক ইয়েট্রম প্রভৃতি কয়েকজন নাট্যকার এই রকম নাটক প্রবর্তন করলেন। এইসব নাটকে সংসারের ঘটনাজ্ঞাত নেই, মানবমনের ঘাত-প্রতিঘাত নেই। এই বস্তুজগতের পিছনে ইন্দ্রিয়ের অতীত একটি জগৎ আছে; সে-জগতের রহস্য আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে ধরতে পারিনি। মনের অন্ততলে তা ধরা পড়ে। কতকগুলি সংকেতের সাহায্যে তাকে সামনে ধরা হল এইসব নাটকের কাজ।

—নাহ, কথাটা ঠিক বুঝলুম না। তুমি ওই ডাকঘর নাটকটা ধরে ব্যাপারটা আর-একটু ভালো করে বুঝিয়ে দাও।

—বলি। বিশ্বরাজ্যেশ্বর মানবাত্মার সঙ্গে মিলতে চাইছেন। জগতে যত-কিছু প্রেম ও ভালোবাসা, রং ও আলো, সুখ ও গান আছে—সবই ওই রাজার ডাকঘরে চিঠি। রাজা সেই চিঠি পাঠিয়ে মানুষের মনকে ডাকছেন সেই হৃৎকের পথে।

—‘ডাকঘর’ ছাড়া আর কোনো সাংকেতিক নাটক তিনি লিখেছেন ?

—অনেকগুলি। কয়েকখানির নাম করি,—অচলায়তন, রাজা, ফাঙ্কনি, মুক্তধারা, রক্তকরবী।

—রবীন্দ্রনাথের আগে আমাদের দেশে আর কেউ কি সাংকেতিক নাটক রচনা করেছেন ?

—সাংকেতিক নাটক কবির একান্ত নিজস্ব দান। এ ধরনের নাটক রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কেউ লেখেননি, পরেও নয়। ভবিষ্যতে কেউ লিখবেন কিনা জানিনি।

—কিন্তু, দায়, এ রকমের নাটক তো সাধারণ রক্তমাংসে অভিনীত হয় না, সাধারণে বিশেষ পছন্দ করে না।

—তুমি যা বলেছ ঠিকই। তবে হালে দু-একটার অভিনয় হচ্ছে।

তা হোক বা নাই হোক, নতুন শিল্পরীতির প্রবর্তনের জগৎ সৃষ্টি রস পরিবেশনের জগৎ এই নাটকগুলি বাংলা সাহিত্যে চিরন্তন সম্পদ হয়ে থাকবে।

পাশ্চাত্যদেশে অনেক জায়গায় রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি সাংকেতিক নাটক সেই সেই স্থানের ভাষায় অনূদিত হয়ে অভিনীত হচ্ছে। একটা ঘটনা বলি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে যে রাতে প্যারিসে প্রথম বোমা পড়ল ঠিক সেই সময় সেখানকার রেডিও থেকে রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ প্রচারিত হচ্ছিল।

তা হলে কি দাঁড়াল ? রবীন্দ্রনাথ বস্তুধর্মী নাটক লিখলেন, সাংকেতিক নাটক লিখলেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। নাটকে তাঁর এক অবদান হল—গীতি-নাট্য। আরও আছে। চিরকুমার সভা, শেখরকা প্রভৃতি নাটকে ও হাতকৌতুক, বাঙ্গ-কৌতুকে ছোটো ছোটো নাট্যিকায় তিনি বিশুদ্ধ হাতরসের কোয়ারা ছুটিয়ে দিলেন। ‘শোণবোধ’-এ ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের উপর তীব্র বিজ্ঞপব্যাপ বর্ণন করলেন।

১. ধর্ম

স্টার থিয়েটারে ‘চিরকুমার সভা’র অভিনয় হচ্ছে; রবীন্দ্রনাথ দেখতে এসেছেন। অভিনয় বেশ জমে উঠেছে, এক বিরতির সময় স্টার কাছে গিয়ে বললুম—কি হিরাট-বকুতা লিখছেন, এই রকমের আরও হুঁচকারানা নাটক দিন।

—তা এখনও পারি, আমার মন তো তাই চায়, নিন না আমাকে ওই নিক থেকে ছাড়িয়ে ?

—আপনার মন কি যে চায় আর কি যে চায় না, তা তো বুঝতে পারলুম না।

কাব্যে, গানে, শাস্ত্রনিকেতন মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশমালায়, ধর্ম-সংকীর্ণ বিবিধ প্রবন্ধে, ‘মাতৃশ্রবণ ধর্ম’ বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ যেসব দার্শনিক অমূল্যদান

করেছেন তাকে তাঁকে দার্শনিক বলে ধারা দাবি করেন, তাঁদের সে দাবি তো অগ্রাহ্য করা যায় না। আর রবীন্দ্রনাথ যাতে হাত দেন তা যে সোনা হয়ে ওঠে। তাই তো যে-বক্তৃতানাল। দেবার ক্ষমতা পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় দার্শনিকদের ডাক পড়ে, তারই ক্ষমতা নিমন্ত্রণ এল রবীন্দ্রনাথের।

তার দার্শনিক তত্ত্বের মূল কথাটা এইভাবে বলা যায়—সকল দেশ, সকল কাল, সকল মন, সকল বস্তু পরিব্রাজ্য হয়ে এক শক্তি লীলা করছেন। এই লীলাখেলার মূখ আছে, মূখ আছে, হাসি আছে, কাঁসা আছে, বন্ধন আছে, মুক্তি আছে, ক্রম আছে, স্রুতা আছে, আর এইসবকে জড়িয়ে আছে এক অপূরণ অনন্দ।

এই অনন্দর খেলায়

যেথা: দিলি তাঁরই মেলায়

এই মূখ-মুখের জীবন যোজের

তাঁরই খেলার অঙ্গী।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম কি? তিনি বলছেন—

অন্যায়ন অঁকারে তবু আকারে কেনো শূন্যিত-
লো। ধর্ম সে তো নয়! সেই ধর্মকে জীবনের মর্মকোষ
থেকে বিচ্ছিন্ন করে উন্মুক্ত করে স্থির করে ঠাঁড়
ক দিয়ে দেখা ও জানা আমার পক্ষে অসম্ভব—কিন্তু অসম
শক্তি ও মৌলধরমভোগ যে সেই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য
বা উপদান নয়, এ কথা নিশ্চয় জানি। আমি স্বীকার
করি অনেক-কোষে বসিমানি চুতানি জ্বলন্তে এবং অনেক
প্রান্তি অভিশপ্তি—যি সেই অনেক মূখকে বর্জন করা
অনন্দ নয়, মূখকে আচ্ছাদ্য করা অনন্দ। সেই
অনন্দের যে মঙ্গলরূপ তা অবরূপকে অতিক্রম করেছে,
তাকে ভাঙা করে নয়; তার যে স্বপ্ন অশেষরূপ তা
সমস্ত বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে চলে, তাকে
অস্বীকার করে নয়।

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো

সেই তো তোমার আলো।

সকল ক্রম-বিরোধ-মাকে কাছত যে ভালো

সেই তো তোমার ভালো।—

আমার ঘটনার মধ্যে যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব থাকে তো
তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই
পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ-উপলব্ধিই ধর্মবোধ, যে প্রেমের

একদিকে ঐশ্বর্য, আর-এক দিকে অশেষত; একদিকে বিচ্ছেদ,
আর-এক দিকে মিলন; একদিকে বন্ধন, আর-এক দিকে
মুক্তি। যাঁর মধ্যে শক্তি এবং মৌলধর্ম, রূপ এবং রস,
সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; যাঁর বিবর্তকে স্বীকার
করেই বিবর্তকে সত্যভাবে অতিক্রম করে, এবং বিবর্তের
অতীতকে স্বীকার করেই বিবর্তকে সত্যভাবে গ্রহণ করে;
যা মুক্তের মধ্যেও শাস্তকে মানে, মনের মধ্যেও কল্যাণকে
জানে এবং বিচ্ছিন্নের মধ্যেও এক-এক পূজা করে। আমার
ধর্ম যে আগমনীর গান গায়, সে এই—

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছে কোণাতির্ঘন,

তোমারি হউক জয়।

তিমির-বিসার উষ্মার অন্তর্য,

তোমারি হউক জয়।

৮

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ জীবনে কয়েক হাজার চিঠি
লিখেছেন।

সামান্য চিঠি কত বিচিত্রভাবে নিজেকে ব্যক্ত
করবার বাহন হতে পারে তার অল্পশ্রম নিদর্শন
পাওয়া যায় তাঁর লেখা চিঠিতে। একদিকে
বেদনাও হৃদয়ের সাধনা-প্রার্থনার উত্তরে শান্তিবাক্য,
অন্যদিকে খুব লঘুরসের চিঠি। কিছু কিছু উদ্ধৃত
করি।

মৃত্যুপথযাত্রী বিগতভয় রজনীকান্ত সেনকে
লিখেছেন—

শেখিন আপনার যোগসম্মার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার
একটি কোণাতির্ঘন প্রকাশ কেশিকা আনিয়াছি। শরীর
তাহাকে আপনার অধিবাংস হাফুশেই বিদ্যা চারিদিকে
বেটন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্ধী করিতে পারিতেছে
না, ইহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। শরীর হার
মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাক্রম করিতে পারে নাই:
পৃথিবীর সমস্ত আয়ব ও আশা ধূসিমাং হইয়াছে, কিন্তু
চুম্বার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ধ্রুপ করিতে পারে নাই।
কার্য্য বতাই পুড়িতেছে অগ্নি ততো বেশি করিয়াই
জ্বলিতেছে। ইশ্বর বাঁহাকে রিক্ত করেন তাহাকে কেমন
গভীর ভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন আজ আপনার
জীবন-সংগীতে তাহাই ধনিত হইতেছে ও আপনার
ভাষা-সংগীতে তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।

কয়েকখানা রসরসের চিঠি—

১৮২০ সাল। নিম্নের লেখা বই পাঠাপুস্তক
করবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু বই এসে পৌছোছে না,
সেই প্রসঙ্গে জমিদারি থেকে ত্রীকে লিখছেন—

একদল উকিল আর ছুঁলের মাস্তুর এসেছিল।
আমার বই ছুঁলে ঢালাবার জন্তে কবাবার্তা করে রেখেছি,
কেনল বই আর শাচ্ছিনে। কষ্ট, আকণ্ড তো বই এসে
পৌছল না। ভালো পেন্সোভেই কেনেছ; 'বাক্যি'
বে-খানা আমার কাছে ছিল সেইটেই ইন্সপেক্টরের হাতে
দিয়েছি। আমার ইন্সপেক্টরের গলা চেড়ে গেছে ব'লে
তাকে হোমিওপ্যাথি ঔষধও দিয়েছি, এতে অনেক কল
হতে পারে, তার গলাভাঙা না সারলেও মনটা প্রশম
থাকছে। দেখছ, ব'লে ব'লে কত উপার্জনের উপায়
করছি। সকালে উঠেই বই লিখতে বসেছি, তাতে কত
টাকা হবে একবার ভেবে দেখ। ছাপাবার সম্বন্ধ বহু
না উঠুক, নিম্নের দশ-পঁচিশ টাকাও উঠবে। এটরকম
উঠে পড়ে লাগলে তবে টাকা হয়। তোমরা তো কেবল
বহু কত জান—এক শয়দা ঘরে আনতে পার ?

মফসল থেকে ত্রীকে বি পাঠিয়েছেন, ত্রীর কাছে
থেকে পাওয়া চিঠিতে সে-সম্বন্ধে কোনো কথা নেই
দেখে লিখছেন—

আচ্ছা, আমি যে তোমাকে এই সাহাজ্যপুত্রের সম্বন্ধ
গোরালাব খবর মধন ক'রে উৎকৃষ্ট বাখনমাগা ঘেঁষে দেবার
জন্তে পাঠিয়ে দিগ্ধ, তৎসম্বন্ধে কোনোরকম উল্লেখবার
বে করলে না তার কারণ কি বল দেখি। আমি দেখছি
অজস্র উপহার পেয়ে পেয়ে তোমার কৃতজ্ঞতা-বৃত্তিটা
কবেই অশ্লীল হয়ে আসছে। প্রতিমানে নিয়মিত পনেরো
দশ ক'রে বি পাওয়া তোমার এমনি স্বাভাবিক মনে
হয়ে গেছে বেন বিবের পূর্ব থেকে তোমার সঙ্গে আমার
এই রকম কথা নির্দিষ্ট ছিল।

'চোখের বাগি' লিখছেন। কিছুদিন বন্ধ ছিল,
আবার ধরেছেন। বন্ধুকে চিঠি লিখছেন—

... বিনোদিনীর খবর ভালো। সোলেমাণে বিন-
কতক তার কাছ থেকে ছুটি নিতে হয়েছিল, গতকল্য
থেকে আবার নিয়মিত হাজিরি দিচ্ছি।—পরের এ
অংশই বই ছবি প্রকাশ কর তাহলে আমার সম্বন্ধে
বিভিন্ন আর একটি উপজ্ঞান ব্যক্তি হওয়া বিচিত্র নয়।

সেই বন্ধুকে আর-এক পাত্রে লিখছেন—

অনেকদিন বেচে কলকাতা ছেড়ে বাগানে বাবার
জন্তে ছুটুপট করছি, কিন্তু একেবারে বিফল।

ইচ্ছা, সম্বন্ধ উপস্থান-সমবে নিম্ন পাণের নাস্তি !
পায়ে শিকি, মন উড়ুউড়ু, একি বৈবের শান্তি !

যে কেউ তাঁকে চিঠি লিখত, উত্তর পেতে বিলম্ব
হত না। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের ছিল
অগ্রাধিকার। তাদিগকে লেখা কয়েকখানা চিঠির
কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি।

তখন শিল্প-এ আছেন। হুটি ছোটো মেয়ের
চিঠি পেলেন। তাদের আবদার, কবি যেন তাদের
চিঠির উত্তর দেন, আর তা যেন হয় পত্র।

বসে গেলেন লিখতে। দীর্ঘ এক কবিতা
লেখা হল। শেষের কয়েক লাইন এইরকম
ছিল—

জান্না দিয়ে বৃত্তিতে গা ভেজে যদি ভিক্ষুক তো,
তুলেই গেলাম লিখতে নাটক আছি আমি নিদুঃ।
মনকে ভাসি 'হে আশ্বাশ', চুটুক তোমার কবিতা,
ছোটো হুটি মেয়ের কাছে ছুটুক রবির রবিত।

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন
ফণীন্দ্রনাথ অধিকারী। তাঁর এক কন্যা, বয়স প্রায়
দশ বছর, তার সঙ্গে বহু চিঠি লেখালেখি চলল।
একখানা চিঠিতে লিখছেন—

তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছো, 'রবিন্দ্রনাথ' না ব'লে
আমাকে আর-একটা কোনো নামে সম্বোধন করতে
পারো কিনা? মহাভারতের সময়ে মায়ূরের এক-
একজনের দশ-বিশটা ক'রে নাম থাকতো, আর যেটা পছন্দ
বেছে নিতে পারতো। কিবা যে চুকে যেটা হৃদয়ে
গাঢ়িয়ে দিতো। অত্বেন বত নাম বে ছিল, তা
অত্বেনকে বোধহয় নামটা মুখ্য করার মতো মুখ্য করতে
হতো। আমার বে আকাশের বিতাটি আছেন, তাঁরও
নামের অভাব নেই। যদি তাঁর হুটো-একটা নাম ধার
ক'রে নিতে চাও, তাহলে বোধহয় তাঁর বিশেষ কিছু
লোকদান হবে না। কিন্তু যখন আমার নামকরণ হয়,
তখন কেউ আমার সম্বন্ধে নেহনি,—কিন্তু হঠাৎ যদি
তোমার 'মার্ত্ত' নামটাই পছন্দ হয়, তাহলে কিন্তু আমি

আপত্তি করবো। 'ভাস্কর' নামটা যদিচ হুশাব্য নয়, তবু ওটা আমি একবার নিয়েই গ্রহণ করেছিলাম। আর এক হাতে পাখে, যদি 'কবিদাস' বলে। নামটা গ্রিক সমস্ত হোক বা না হোক, ওটা আমার নিজের কাকের সঙ্গে ঘেলে—

এক-বে ছিল যদি,
সে গুণের যথো কবি।

কবির বয়স এখন বেশি। ছ'বছরের একটি ছেলে তাকে লিখল—

হে কবি, তোমার সহস্রপাঠ আমি পড়েছি। আমি বড়ো চলে তোমার দেখতে শাস্ত্রনিকেতনে আসব।

কেরত তাকে উত্তর গেল—

আমার ছোটো বন্ধুটি, তুমি যখন আমার সহস্রপাঠ পড়েছ তখনই তোমার সঙ্গে আমার কানোকানি হয়ে গেছে। তুমি বড়ো হলে আমার দেখতে আসবে বলেছ।

তাহলে একই ভাড়াভাড়ি কব, বিলম্বে দেখা নাও হতে পারে।

কবির বয়স যখন সমস্ত পূর্ণ ছিল তখন দেশবাসী এক বিরাট জনসভায় তাকে অভিনন্দিত করে। যে-মানপত্র দেওয়া হয় তার এক জায়গায় ছিল— অস্ত্রদেশের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি অনেক, তোমার হাত দিয়ে দিয়েছিও অনেক।

রবীন্দ্রনাথের গল্প ও পল্প রচনাকে একত্র ক'রে অখণ্ডভাবে বিচার করলে তাকে এক নতুন মহাভারত বলা যেতে পারে। এই নতুন মহাভারতে নতুন ক'রে ভারতবর্ষের মহাবীর উপলব্ধি করতে, রূপ দিতে চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্র-রচনা ধরে রয়েছে ভারতবর্ষের অক্ষয় সুধাপাত্র। [ক্রমশঃ]



॥ বিবশার গান ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

এবারে।

আবার দিন সাতেক যাওয়া বন্ধ রাখল তড়িৎ।
পরিচর্যা ঘনিষ্ঠতর হয়ে ভালোই লাগছে, কিন্তু আর
কোন দিক দিয়ে তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না। গেলে
বিলম্ব হয়ে যাবেই খানিকটা। এদের সবারই চেষ্টা
যাতে তড়িৎ ক্ষণেকের জ্বলও মনে না করে সেদিন
এক কোন দুর্ঘটনার ভয় ছাড়া অল্প কোনও রকম
অশুবিধায় পড়েছিল কেউ, কিন্তু তবুও, অথবা
সেইজন্ম আরও বেশি করেই যেন কুপ্তি হয়ে রয়েছে
তড়িৎ। সব চেয়ে নিরুৎসাহ করছে সেদিন তাকে
কেন্দ্র করে নলিনাক্ষ-প্রিয়রতনের সেই বিতর্ক—
যেমন অর্থহীন, তেমনই মাত্রাহীন। আবার সেই
অমুরাগ-বিরাগের পুষ্পগুটি আর অগ্নিসৃষ্টির মধ্যে
দাঁড়তে না হচ্ছে কৃতি না হচ্ছে সাহস।

গেল না যে তার ফল কিন্তু ভালোই হোল।
এই যে আশঙ্কা, এটা অনেক পরিমাণে গেল কমে।

সেদিন তর্কটা তর্কের কোঁকেই খানিকটা
হাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল হয়তো; কিন্তু তড়িৎের
প্রতি নলিনাক্ষের প্রশংসার মনোভাব, তাকে নিয়ে
একধরনের বীরপূজাই ধরা যাক—এর মধ্যে কোন
কুশ্রীভা ছিল না। সেইজন্মই তড়িৎ যে আসছে না
এর জন্ম মন্ত্রী আর দেবপ্রসন্নর চেয়ে সে কম উদ্বিগ্ন
ছিল না, যদিও এ-কথাটা মানতেই হয় যে তিনজনের
উদ্বেগের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকবেই।
মন্ত্রী অবশ্য নিজের মনোভাবটা চেপে রইল।
দেবপ্রসন্ন কবারই বললেন—“আর আসে না যে ?
...ছোট কাজ না মনে করে যে করছে এটা ভালো,
তবে আবার বিপদ-আপদও আছে এসব কাজে।”

একদিন বললেন—“কোথায় থাকে তাও যে
জানা নেই, নৈলে খবরটা নিলে হোত।”

তিনজনেই ছিলেন সন্ধ্যার সময় বাগানে বসে,
নলিনাক্ষ বলল—“সেটা বের করা শক্ত নয় : বলুন
না, কালই বেরুটা করে বেরিয়ে পড়ো...”

মন্ত্রী বলে উঠল—“অমন কাজ করবেন না।”
একটু অস্বমনস্ক ছিল বলে মন্ত্রীর কণ্ঠে উবেগটা
অতিরিক্ত হয়েই কূটে উঠল।

নলিনাক্ষের সঙ্গে দেবপ্রসন্নও প্রশ্ন করে
উঠলেন—“কেন ?”

মন্ত্রী মানলে নিয়েছে এর মধ্যে, গলা সহজ করে
নিয়ে বলল—“আপনাকে তো বলেছিই জ্যাঠামশাই,
তড়িৎবাবু মনে হয় যেন পছন্দ করেন না যে ঠেকে
নিয়ে কেউ বেশিরকম ব্যস্ত-ব্যাকুল হয়ে পড়ে।
একটু যেন বেশি লজ্জায় পড়ে যান দেখেছি, আর...”

নলিনাক্ষ মুখের পানে চেয়ে হঠাৎ একটু হেসে
চুপ করে গেল।

নলিনাক্ষ কথাটা এগিয়ে দিল—“আর ?...”
“ঠেকে মাঝখানে করে আপনাদের যে তর্ক—
নীতিমতে। ক্ষমড়াই বলি, ওটা যে ঠর মুখেরোচক
হয়নি সেটা আমি সেইদিনই টের পেয়েছিলাম।”

“ওর সবুজে আমি সেটা অমূল্যব করি, ওর এই
সং-সাহস নিয়ে আমার যা শ্রদ্ধা ওর প্রতি সেটা
বলব না ?”—একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করল
নলিনাক্ষ।

মন্ত্রী আর একটু স্পষ্ট করেই হেসে বলল—
“ঐ তো হয়েছে বিপদ, প্রিয়রতনবাবুও তো ঐ কথাই
বলবেন—আমি ওর সবুজে যা ভাবি, ওর কাজ

দেখলে ঠর প্রতি যে অশ্রদ্ধা আমার সেটা প্রকাশ করে বলব না?—মত নিয়েই তো ঝগড়া, একেই তো বলে রাজার রাজ্য লড়াই, উলুখড়ের প্রাণ যায় মাকখান থেকে।”

বলতে বলতে হাসিটা আরও বেড়েই গেল।

এর পর একদিন তড়িং এসে উপস্থিত হোল।

সেও এল যেন তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা খানিকটা বাঁচিয়েই। আজ হাওয়াটা একটু ঠাণ্ডা, দেবপ্রসন্ন ভেতরেই ছিলেন, বাগানে বসে ছিল শুধু নলিনাক আর মন্নি।

সন্ধ্যা উৎরে গেছে, এমন সময় একখানি রিকশা এসে ফটকের বাটরে দাঁড়াল। দুজনেই ঘুরে দেখল তড়িং নামছে।

কিন্তু তার রিকশা নয়। আরোহী হয়ে এসেছে সে। ভাড়া দিয়ে রিকশাটাকে বিদায় করে এসে একখানা চেয়ারে বসল।

নলিনাকই প্রশ্ন করল—“আপনি ভাড়া করে এলেন তড়িংবাবু? আপনার নিজেরটা?”

তড়িং বলল—“নিজেরটাও নিজে উঠে বসলে আসতাম কি করে?”

বোধহয় অসুস্থিক মন ছিল বলেই নলিনাক ধরতে পারল না যে রহস্যচ্ছলে বলছে কথটা। তড়িং: একটু মূঢ়ভাবেই চেয়ে রইল। মন্নি হেসে বলল—“উনি বোধহয় বলছেন তাহলে টেনে আনত কে?”

চিহ্নটা কল্পনা করে নলিনাকও একটু হেসে উঠল; রহস্যচ্ছলেই সমর্থন করে বলল—“তা বটে, সীটের ওপর হাত-পা গুটিয়ে বসেই থাকতে হোত তো।...কিন্তু আমি বলছিলাম এরকম লোকমান দিয়ে ক’দিন আসবেন, একে তো আসতেই চান না দেখছি।...ক’দিন পরে এলেন মন্নিদেবী,—দশ-এগারো দিন হয়ে গেল না?”

তড়িংই উত্তর দিল; বলল—“ষাটদিন। শ্রুতির চক্রে দেখেন বলেই এগারোদিন বলে মনে

হয়েছে। আমিও সেই কথাই ভাবলাম নলিনাক-বাবু—এরকম জায়গায়, রোজগার করার পর বাকি সময়টুকু হেলাফেলা করে দেওয়া, তাতে মন যেন সায় দেয় না। এর পর হয়তো আবার আসবও রিকশা সঙ্গে করে; আজ কিন্তু এইরকমই মনে হোল, একটা ভাড়া করেই চলে এলাম।”

একটু চকিত হয়ে উঠে বলল—“এই দেখুন, লাভ-লোকসানের কথায় আসল কথাটাই ভুলে গেলাম। দেবপ্রসন্নবাবুকে দেখছি না; ভালো আছেন তো?”

মন্নি বলল—“আছেন ভালোই। হাওয়াটা একটু ঠাণ্ডা বলে আর বেরোননি। চলুন না, ভেতরেই বাওয়া বাক।...রোজই আপনার নাম করেন।”

কথটা বড় ভালো লেগেছিল বলে ঘরে প্রবেশ করতে-করতেই বলল—“তড়িংবাবু এসেছেন জ্যাঠামশাই। আজ উনি আমাদের এখানেই এসেছেন—আলাদা রিকশা ভাড়া করে।”

ইন্নিচেয়ারে হেলান দিয়ে একটা কাগজ পড়ছিলেন দেবপ্রসন্ন, সোজা হয়ে বসে বললেন—“এমো তড়িং, বোসো। ক’দিন আসনি, ভালো ছিলে তো?—বিশেষ করে আমাদের এখানেই এসেছ, তাহলে তো বিশেষ করে তোমার খাতির করা বরকার। তা আমাদের তো...”

মন্নির দিকে চাইলেন। মন্নির মনে একটা কথা বেশি করেই এসেছে, তড়িং আসা থেকেই। কিন্তু প্রকাশ করার উপায় নেই, একটু কুণ্ঠিতভাবে হেসে বলল—“আপনার যে শিবের সংসার দেটা তো ঠর জানাই...”

দেবপ্রসন্ন হেসে উঠলেন; বললেন—“ভালো; কিছু বখান নেই শুধন কাটান্ দেওয়ার ভাবটা অস্বস্ত থাক বরকার।...এই তো হয়েছে।...”

হঠাৎ মনে পড়ে যেতে বলে উঠলেন—“কেন, শিবের সংসারে আর কিছু না থাক, বীণাপাণির বীণটা তো রয়েছে, না।...তড়িং, মন্নি-মার এতাজ শোননি নিশ্চয়?”

তড়িং বলল—“মনে হচ্ছে সেদিন যেন তারই ব্যবস্থা ছিল...”

মলিনাক্ষর মনে পড়ে গেল মল্লীর কথাটা। সেদিনকার রানিটা এই সুযোগে যতটুকু পারে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য একটু হেসে বলল—“তা যেনম তার্কের ঝড়ের মধ্যে পড়ে গেলেন...প্রিয়-রতনের ঘত বেয়াড়া...”

তড়িং বাধা দিয়ে বলল—“আমার তো মনে হয় উনি ঝাটালেন, নৈলে আপনি যেসকল আরম্ভ করেছিলেন, প্রাশংসার একটানা স্রোতে কোথায় যে ভেসে যেতাম।...মল্লীদেবী, আরম্ভ করুন তাহলে দয়া করে একটু শীগগির, আজ উনি আবার একলা রয়েছেন...”

হাসি উঠল একটা, তারই মধ্যে মল্লী এপ্রাজ্ঞতা নামিয়ে এনে সুর বাধতে আরম্ভ করল।

বারো

রাত হয়ে গেল অনেকখানি। একসময় দেবপ্রসন্ন বিদায় নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

শেষ হ'লে মল্লী এপ্রাজ্ঞতা কোল থেকে নামিয়ে নিতে যখন চোখ তুলে দেখার ক্রসত হোল, তড়িং দেখল দেয়াল-ঘড়িটার দশটা বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। তৃপ্তি আর প্রাশংসার সঙ্গে এই কথাটুকু মিশিয়ে মল্লীর দিকে চেয়ে একটু স্নান হেসে বলল—“বড় দূরে থাকি।”

মলিনাক্ষ বলল—“তাহলে আর-একটা হোক-না মল্লীদেবী। একদিনে যতখানি পেয়ে যান তড়িংবাবু।”

তড়িং উঠেই পড়ল; বলল—“না, এবার ঘাই, অনেকখানি রাত হয়ে গেল, আমার আবার অনেকটা দূর।”

মল্লীকে বলল—“বেয়ারাকে বলবেন একটা রিকশা ডেকে জানতে।”

মলিনাক্ষ বলল—“কেন, আমার মোটর তো রয়েছে। বাসাটাও দেখা থাকবে; আপনি ক'দিন

না আসাতে আমরা তাবনাড়ই পড়ে গিয়েছিলাম, বিশেষ করে দেবপ্রসন্নবাবু তো খুবই। না মল্লী-দেবী?”

তড়িতের সঙ্গে একবার দৃষ্টি-বিনিময় হয়ে মল্লী একটু অস্থমনস্থ হয়ে পড়েছিল, অল্প চকিত হয়ে উঠে বলল—“জ্যা?...হ্যাঁ, জিগ্যেস করছিলেন তো।... তাহলে পাঠাবনা রিকশার জন্যে তড়িংবাবু?”

একটু বিমূঢ়ভাবেই চেয়ে রইল তড়িতের দিকে, আপত্তিটা যে কোথায়, তড়িং যে গোপন রাখতে চায় ওর ঠিকানা সেটা মাত্র ওরা দুজনই বুঝছে তো। তড়িং-ও প্রত্যাখ্যান করবার স্তম্ভসত্ত্ব একটা ছুতো খুঁজে পাচ্ছে না, টেনে টেনে বলল—“জ্যা—পাঠাবেন না?...”

তারপর মাঝানাক্ষি একটা মনে পড়ে গেল; বলল—“ধাক না, যদি না পায় তখন ওঁর বোটর তো আছেই।”

বাটের বাইরে এ যেন ভহতার ভেবাজ্জেরি পড়ে গেছে। মলিনাক্ষ সেইরকমই ভাবছে, অর্থাৎ এত রাতে তাকে কষ্ট দিতে চায়না তড়িং, খানিকটা পেট্রোল অপব্যয়ও তো। বলল-ও সেই কথাটা একটু হেসে—“আপনি যদি নিতাস্ত সন্ডোচ মনে করেন মস্তবড় একটা উপকার নিতে হচ্ছে এই ভেবে, তাহলে আর কি করা যাবে?—দেখে আনুক।”

তড়িং লজ্জিত হয়ে পড়ল; বলল—“না না, সন্ডোচ কিসের? আপনি ও-কথা বলছেন কেন? বললাম তো, না পায়, আপনার শরণাপন্নই তো হতেই হবে।”

“এ অকলে এত রাতে রিকশা পাওয়া দূর, অন্তত সেই ঘেরি হয়ে যাবে বা ভয় করছেন।... বেশ, তাহলে আমার কথাই থাক, একটা গং হয়ে যাক শুভক্ষণ।”

সুর কেটে গেছে; কি করে এড়ানো যায় তার জন্যে ভেতরে ভেতরে চিন্তাও করছিল মল্লী; বলল—“বাঃ, এ গররাজীর আসরে আমিই বা

একটা রাজী হতে যাই কেন?—তবে মনে হয় যেন একটা সমাধান হতে আপনাদের হৃদয়ের মধ্যে।”

“কি বলুন।” হৃদয়েই বলে উঠল।

“বেহিয়ে পড়ুন মোটরেই, তারপর কাছে দূরে যেখানেই রিকশা পান উনি নেমে গেলেই হবে।”

তড়িং বলে উঠল—“চমৎকার!”...

নলিনাক্ষকে প্রণাম করল—“কি বলেন আপনি?”

নলিনাক্ষ একটু যেন কি ভাবছিল, অল্প হেসেই বলল—“ভালোই তো। মনোদেবীর সমাধান যখন, ভালো না হয়ে যায়?”

মন্ত্রী ওর মুখের দিকে চাইল, বিশেষ করে যেন হাসিটুকু লক্ষ্য করত। বলল—“এতবড় যখন কমমিনেটে দিলেন একটা, প্রতিদানে আমি কি করি?—অগতির গতি এক কাপ করে চা হয়ে যাক না হয় ততক্ষণ। আর মিনিট কয়েক দেরি হয়ে গেলে ক্ষতি হবে তড়িৎবাবু?”

সেরি করাচ্ছে নিজের উল্লেখই মন্ত্রী। আবার একটু চিন্তার সময় নিচ্ছে। নলিনাক্ষের হাসিতে কিছু একটা লেগে থাকবে। ও থেকে থেকে একসময় বড় ছেলেমানুষ হয়ে পড়ে; সীমাজ্ঞান থাকে না, বিশেষ করে ভালো-করা ভালো-হওয়ার কোঁচ চাপলে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে তো এই ইতিহাসই।

যতক্ষণ চা-খাওয়া শেষ হোল ততক্ষণে মন্ত্রীও একটা ঠিক করে ফেলেছে। ওরা টেবিলে কাপ রেখে দিয়ে ওঁরবার উদ্ভোগ করছে—বলল—“একটা কথা, আমারও নিয়ে যাবেন?”

হৃদয়েই বিস্ত্রিত আনন্দে চাইল ওর দিকে, নলিনাক্ষ সেইভাবেই প্রণাম করল—“আপনিও যাবেন।”

“নিয়ে গেলেই যাই। লোভ হয় তো; চমৎকার জোৎস্নাটি, হাওয়াটাও বেশ ঠাণ্ডা।”

“এতে জিগ্যাস করবার কি আছে? চলুন চলুন।”

“তাহলে জ্যাঠামশাইকে একবার বলে আসি।”

যেতে যেতে দূরে হেসে বলল—“জিগ্যাস

করলাম এই জন্তে যে পুরুষের শাস্ত্রে আবার ‘পণি নারী বিবজিতা’ই তো বিধান।”

রাতটি সত্যিই বড় চমৎকার, বাইরে যেন আরও। যেন তিনজনেরই মত এক হয়ে গিয়ে গাড়িটাকে বেশ আন্তে-আন্তেই চালিয়ে নিয়ে চলল নলিনাক্ষ, সব পরিবেশ নিয়ে যেন চেখে চেখে চলেছে পথটা। মন্ত্রী সমাধানটা করে দেওয়ার পর ওরা কেউই তাড়াহুড়া করেনি, তাতে রাত্রি আরও একটু এগিয়েছে, পথ আরও নির্জন হয়ে উঠেছে, তিনজনের সান্নিধ্যটা যেন আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে।

একটা রিকশা পাওয়া গিয়েছিল গোড়ার দিকেই; সে যেতে চাইল না অত দূর।

তড়িং বলল—“ডবল ভাড়া পেলে হয়তো যায়, জিগ্যাস করব?”

চলতি মোটর থেকেই প্রশ্ন করা হয়েছিল লোকটাকে, নলিনাক্ষ এগিয়েই গেল, যেন কথাটা কানে যায়নি। আর প্রশ্ন করা হোল না। মন্ত্রী শুধু একটু মুখ ঘুরিয়ে হাসল।

আরও বেশ অনেকখানি গিয়ে একটা চৌমাথায় এসে খানতিনেক রিকশা পাওয়া গেল। তড়িং গলা বাড়িয়ে জিগ্যাস করল, উত্তরও পেল—যাবে, কিন্তু মোটর দাঁড় করাবার কোন লক্ষণ দেখল না। যখন একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল তখন আবার মোটর থানিকটা এগিয়ে গেছে। প্রশ্নের উত্তরে নলিনাক্ষ বলল—“তখন ডবল দিতে চাইলেন, এখন এ-টুকুর জন্তে আবার ভাড়া দিতে চাইছেন। মনে হয় পরমা বেশি হয়েছে, কিন্তু বন্ধুত্ববেরা তো অথবা খরচ করতে দিতে পারে না।”

তড়িং একটু ভাবাচাচকি খেয়ে চুপ করে গেছে; একবার মন্ত্রীর দিকে চাইতে ভাখে তার মুখটা ওদিকে ঘোরানো। নলিনাক্ষই বলল—“বেশ, মন্ত্রী-দেবীর গুণর ছেড়ে দিই আমরা; উনি যা বলেন।... তবে উচিত নয় বলা, এই লোকসানের ভয়ে আমার অনেক ব্যবসা বন্ধ করিয়েছেন তো ওঁরা হৃদয়ে।”

এই কুট-চলই যে দেবে নলিনাক্ষ, ওর হাসিতে সেটা তখনই সন্দেহ করেছিল মল্লী; তাই সঙ্গও নিয়েছে। বলল—“আমি কেন এর মধ্যে পড়তে থেলোম? আমার মোটরও নয়, বাড়ি পৌছবার তাড়া—সেও আমার নয়। আমি বেরিয়েছি মোটর চড়ে বেড়াতে, বরং যত বেশি চড়া হয় ততই লাভ আমার।”

হুঁগালে হাসি নিয়ে আবার মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

এগিয়ে চলল মোটর। সহরের ভেতরে এসে পড়েছে ওরা। নলিনাক্ষ মোটরের গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। কথা বিশেষ নেই কাকর। তড়িৎ যেন হাল ছেড়ে দিয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ; উপায়ই বা কি?...ভাষটা যেন এই যে, গোপন করা বরাবর যখন চলবে না, আজই হয়ে বাক শেষ। শ্রীতির অত্যাচারই তো।

বরং চুপ করে থাক। অবস্থিকরই বোধ হচ্ছে : ওরা দুজনেই কী ভাববে, যেন সত্যই রাগ করে বসে আছে গুল হয়ে।

বাজারটা ছাড়িয়েছে, বেশ একটু হেসেই বলল—“তাহলে থামাবেনই না? কিডন্যাপ (kidnap) করা হচ্ছে কিন্তু আমায়। সামনেই পুলিশ-স্টেশন...এখনও বুঝুন।”

মল্লী-ই জবাব দিল : বলল—“কিডন্যাপ করে যখন বাড়ি পৌছেই দিতে থাকি তখন আপনার মাথলা টেকবে না...”

সঙ্গে-সঙ্গেই গাটা একটু গুটীয়ে নিয়ে বলে উঠল—“আজ্ঞা বলুন তো, আপনাদেরও কি বড্ড বেশি গরম বোধ হচ্ছে?”

সহসা ওর ভাবান্তর দেখে দুজনেই ঘুরে চাইল; বলল—“না তো!”

নলিনাক্ষ ব্রেক-ও চেপে দিল।

“আমার যেন হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল; আর কতটা দূর?”

—বলতে-বলতেই মাথাটা সামনের সীটে ছুটীয়ে নিল।

বাকি পথটুকু রিকশা করে আসতে আসতে ব্যাপারটুকু নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করেছিল বৈকি তড়িৎ; মল্লীকে তো চিনছে একটু একটু করে। অবশ্য একবারে সুনিশ্চিত হওয়া যায় না, খানিকটা সন্দেহ লেগেই থাকে—হয়তো বাজার দিয়ে আসবার সময় সত্যিই গরম লেগে গিয়ে থাকবে একটু, তারই ভ্রের ছিল ওটা।

সন্দেহটা আর খানিকটা কাটল পরদিন।

একটা উদ্বেগ লেগে রয়েছে, সকাল-সকালই গেল। বাইরের লানে চেয়ার দিয়ে গেছে বেয়ারা। মল্লী একলাই রয়েছে, একটা ছোট টেবিল-ত্রপে ফুল তুলছে।

নমস্কার করে উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করল তড়িৎ—“কেমন আছেন?”

মল্লী প্রশ্নটা যেন বুকেই পারল না, তার পর ঝুতুলে বলল—“ও, কালকের সেই মাথা-ঘোরার কথা বলছেন?...সেটা বাজার পেরুতে-না-পেরুতেই চলে গেল; আশ্চর্য!...বহুন, জ্যাঠানখাইকে ডেকে আনি।”

ঠোঁট একটা হাসি উঠেছিল, সেটাকে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ভেতরে চলে গেল। [কথন :]

‘মৌলা’ গ্রাম ও রক্তিমী দেবী

ঐযতীন্দ্রমোহন দত্ত

‘শশিমবসের সাক্ষিত্তি’ নামক পুস্তকের ভ্রম গ্রন্থকার ঐদৃক বিন্দু দেখে এই বংশের রক্তিমী পুত্রবার পাইছিলেন। তিনি বহু গ্রাম ঘুরিয়া বহু পরিভ্রমে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন—এতদু উপহার মতান্তর মূল্যবান বলিয়া মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন যে :

“পশ্চিমবঙ্গের যে সব অঞ্চলে রক্তিমী দেবীর পূজার ধবর দেখেছি, তার অধিকাংশই বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায়। তার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল, রক্তিমী দেবীর পূজা এখনও যে সব গ্রামে অচলিত হয়, সেই সব গ্রামের নামেরও কোন পার্শ্ব্য নেই। সব গ্রামেরই প্রায় একই নাম। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বর্ধমান জেলার দূর বহুব্রাহ্ম একটি গ্রামে রক্তিমী দেবীর পূজা হয়। সেই গ্রামের নাম ‘মৌলা’। মেদিনীপুর জেলায় চক্ৰকনি খানার এক রক্তিমী দেবী আছেন। যে গ্রামে তিনি আছেন, তার নামও ‘মৌলা’। বিনপুর ধানায় এক রক্তিমী দেবী আছেন, গ্রামের নাম ‘মৌলা’। নন্দীগ্রাম ধানায় একটি ‘মৌলা’ গ্রাম আছে, সেখানেও রক্তিমী দেবী আছেন। এক নামের একাধিক গ্রাম বাংলাদেশে অনেক আছে। একাধিক মৌলা নামে গ্রাম থাকাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু আশ্চর্য হল, মৌলা নামের গ্রামের সঙ্গে রক্তিমী দেবীর অসংসারের সম্পর্ক। হতভাগ্য মৌলা নামের সঙ্গে রক্তিমী দেবীর কোন ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ নেই, এমন কথা বলতে সাহস হয় না। এরকম ‘কোরিলেশন’ (correlation) বসনও অসম্ভব হয় না, হতে পারে না। তাহলে, ‘মৌলা’ নামের সঙ্গে রক্তিমীর যে যোগাযোগ দেখা যায়, তার ঐতিহাসিক মূল কোথায়?” (৬৯ পৃষ্ঠা)

“কিন্তু সেই ‘মৌলা’ গ্রামের রহস্যের উৎস কোথায়? শোনা যায়, দিগন্ত নহলিয়ার কাছে এক পাহাড়ে রক্তিমী দেবী নাকি বিরাট করতেন। তখন দেবীর সন্মানে নরবলি দেওয়া হত। দেবী নিজেই নরহত্যা করতেন। হিম্মোল-ভোড়ী মৌজার নহলিয়া নামে গ্রাম আছে। সেখানে বহু উপকায়্য পরিবারের বাস আছে। জনশ্রুতি হল, উপায়্য আগ নরবলির উপাসনা, অর্থাৎ মাতল যোগান দিতেন। ‘মহলিয়া’ থেকেই ‘মৌলা’ নাম হয়েছে বলে হয়। রক্তিমী দেবীর পূজার প্রসার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এই অঞ্চল থেকে।

বিশ্বকর হল, রক্তিমী দেবীর পূজার কেন্দ্রগুলির নাম হয়েছে মহলিয়ার অধিকরণে ‘মৌলা’। পশ্চিমবঙ্গে মৌলা নামের সঙ্গে রক্তিমী দেবীর পূজার ‘কোরিলেশনের’ এ ছাড়া অন্য কোন তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না। ‘ভিকিউজনের’ এ এক বিচির দৃষ্টান্ত। ঐতিহাসিক-কেন্দ্রের ভৌগোলিক নামের পর্বত বিস্তার (diffusion) হয়েছে।

“বর্ধমানে একটি এবং মেদিনীপুরে তিনটি মৌলা গ্রামের অস্তিত্বের খোঁজ পেরেছি। প্রত্যেকটিতে রক্তিমী দেবীর পূজা হয়। ‘কালিকামহলে’ও এই মৌলা গ্রামের নাম পাওয়া যায় রক্তিমী দেবীর সঙ্গে—

মৌলার রক্তিমী বন্দো ছোড় করি গানি।

ভাওয়ারহাটে বন্দিলাঃ সাবিত্রী গোপানি।”

৩৭২ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন :

“উল্লেখযোগ্য হল, মৌলা গ্রামে রক্তিমী দেবীর শায়বীর ও কালী পূজার বিশেষ পূজার ব্যবস্থা থাকলেও, সবচেয়ে বিরাটাকারে পূজা ও উৎসব হয় মকর-সংক্রান্তিতে। এসব আয়্যায় অনেক রক্তিমীকে ভৈরবী বলিয়া ধারণা করেন। বোকা বাহ, ভাঙ্গা পুরোহিত বনদেবী ও আদিবাসীদের ফলন-শক্তির অন্ততম আদিদেবী রক্তিমীকে গোষ্ঠাস্তর করবার চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ পার্শ্ব্য হয়নি।”

বিনয়বাবু বহু গ্রাম ঘুরিয়া বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, এতদু তিনি আমাদের দত্তবাহার্য। এ বিষয়ে উপায়্য পথিকৃষ্টের (pioneer-এর) সম্মান গ্রাণ্য। কিন্তু উপায়্য মতান্তর ও সিদ্ধান্তসমূহ আমাদের মনে হয় বড়ই ভাড়াভাঙি নয় ও অসম্পূর্ণ তথ্যের বুনিয়ে বেরিয়াছেন। বিনয়বাবুর সিদ্ধান্ত ২টি :—(১) ‘মৌলা’ নামের সহিত রক্তিমীদেবীর ‘কোরিলেশন’; (২) মহলিয়া গ্রাম হইতে রক্তিমীদেবীর পূজার প্রসার হওয়ায়, গ্রামের নামও ‘মহলিয়া’ থেকে ‘মৌলা’য় পরিণত হইয়াছে।

তিনি যে তথ্যসমূহ পরিবেশন করিয়াছেন তাহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্তে সহজে আসা যায় না। আমরা গত ১৩৬০ সালের কাছন মাসের ‘প্রবাসী’তে ‘পরী দেবদেবী’ প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে :

আমরা মোকাদ্দিস হইতে পশ্চিমবঙ্গ নিয়মিত-মতো
নাম পাইয়াছি। যথা :

গ্রামের নাম	সংখ্যা
মহলিয়া	— ১টি
মহলি	— ১০টি
মহলাড়া (রা)	— ৬টি
মহলা	— ৪টি
মৌলি	— ১টি
রত্নীপুর	— ১টি

এইবার মেলাধারী হিসাবে উপরিউক্ত ২০টি গ্রামের
অবস্থান দিব :

মেদিনীপুর জেলা

মহলিয়া	— ১, থানা	যেকিনীপুর
মহলি	— ২, -	আমবনী
"	— ৪, -	গোপীধরপুর
"	— ২, -	সাকরেল
"	— ১, -	নয়াগ্রাম
রত্নীপুর	— ১, থানা	নবীগ্রাম

বীরভূম জেলা

মহলি	১, থানা	বোলপুর
মহলা	১, -	"
"	১, -	সিউড়ি
"	২, -	মহুরেশ্বর
মহলাড়া (রা)	১, -	ধাইখিলা
"	১, -	বোলপুর

বর্ধমান জেলা

মহলা	১, থানা	কেতুগ্রাম
মহলাড়া (রা)	১, -	গঙ্গদি

চব্বিশ-পরগনা জেলা

মৌলি	১, থানা	হাড়ায়া
------	---------	----------

বর্ধমান কেতুগ্রামের 'মহলা' রেভিনিউ-সার্ভের সময়
মৌলা বসিয়া পরিচিত ছিল।

শব্দ-সালুত হইতে যেন হয় যে, এই নামগুলি পরস্পরের
প্রতি সম্পর্কিত। কোনটির অবস্থানে কোন নামটি হইয়াছে

বা কোন মূল শব্দে কোন প্রত্যয় কি ভাবে যুক্ত হইয়াছে
তাঁহা ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলিতে পারেন।

বিনম্রবাহুর কবিত-মতো 'কোহিলেশন' থাকিলে, এইমত
নামের রচিনীশ্বরী বা রচিনীর পরিবর্তিত বা অপর নামের
দেবী থাকিলে। এ সংক্ষেপে তথ্য-সংগ্রহ দরকার। আমরা
অনিয়াছি যে, চল্লিশ-পরগনার মৌলি গ্রামে রচিনী বা
কল্যাণেশ্বরী বা রচিনী বা বাহনীর বলিয়া কোন দেবী নাই।

মুহূনরায় কবিকল্পের চরীমমল কাব্যে কালকেশ্বর
চৌত্রিশাত্বে আছে :

"রত্ন হয়ে রত্নচিহ্ন রত্নবধে রত।

রতন দিয়া রত্নরূপ করাইলা হত।

রাজা মনে রত্ন কৈহু রক্ষা নাই আর।

রচিনী করহ রক্ষা তবে দে উদ্ধার।"

গ্রিকরেন সেন মহাশয় তাঁহার পূর্বাচ গ্রন্থে বাংলা-
সাহিত্য হইতে আরও কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তিনি
লিখিয়াছেন যে, ধর্মবাক্যের ১৭৭ সর্গে কানাড়ার বিবাহ
উপলক্ষ আছে :

"রচিনী উরিলা রণে রুপিয়া-লোচনা" (১২০-সংখ্যক
লাইন)

"It may be noted in passing that she is
there equated to Basali as well."

উহার ভাগরণ পালার আছে :

"তার রক্তে পৃথিব রচিনী ভহকালী" (৪০৮-সংখ্যক
লাইন)

কানাড়ার চৌত্রিশাতে আছে :

"রক্ত রক্ত রচিনী রচিনী রমণাথে।

রণ রণ রবে উরি রাধ মনকুয়ে।"

কালিকামন্ডলের সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত
সংস্করণের ৮ম পৃষ্ঠায় আছে :

"মৌলে রচিনী বনো মোড় করি পানি।

তাওয়ারহাটে বন্দি লও সাবিত্রী গোমানি।"

(এইটি বিনম্রবাহু উদ্ধৃত করিয়াছেন।)

ইহার পাশ্চাত্য হইতে জানা যায় যে, বিভিন্ন পুথিতে
মৌলা, ঘাটশিলা, পাটকা ও তেজুয়ার সহিত 'রচিনী' এই
নাম যুক্ত।

ইহার ১২৭ পৃষ্ঠায় আছে :

"রচিনী পুদিনী নুওমানিনী

তোমারে পাখ হরিবধে।"...

বিজ্ঞা বলিতেছেন :

“লগীপণ বল বাণী ঐ আইলা মানিনি
বলে বিজ্ঞা নৃপতিনকিনী,
হইল উত্তর বেলা যোর কার্ণে কর হেলা
কবে আমি পুণ্ডি ব রক্তিশী” (৫৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয়রজনবাবু লিপিব্যছেন যে, কালিকাপুরাণে ও বায়হীতরে রক্তিশীর ধ্যান আছে। কালিকাপুরাণে রক্তিশী-সেবীর ধ্যান থাকিলে, তাহা বহুদিনের। ব্রাহ্মণ-পুরোহিত বনসেবী ও আদিবাসীদের ফলন-শক্তির অগ্রস্তম আদিসেবী রক্তিশীকে গোবাত্তর কত্রিবার চেষ্টা করিয়াও সার্থক হননি—এই উক্তির দৃশ্য থাকে না। বিনয়বাবু কোথায় পাঠলেন যে, রক্তিশী আদিবাসীদের ফলন-শক্তির অগ্রস্তম আদিসেবী? এ বিষয়ে তাঁহার উপবৃক্ষ প্রামাণ্য তথ্য সরবরাহ করা উচিত ছিল।

‘রক্ত’ কথায় মানে বাংলায়—দ্রব, তপণ, নীচ, মন্দ। উক্তিয়ায় ‘রক্ত’ মানে শাপল। রক্তের সহিত রক্তিশীর সম্বন্ধ অল্প বলিয়া মনে হয়। রক্তিশী হইতে ভাষার অবশ্যে বা উচ্চারণের দোষে লোকমুখে ‘রক্তিশী’ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে ভাষাতত্ত্ববিদগণ যদি তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করেন তো ভালো হব।

বর্তমানে জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয় যে, সিংহুম জেলার ধলভূম পরগণায় পশ্চিমে রক্তিশীসেবীর প্রসার নাই। ধলভূম পরগণা বাঙালী-অধ্যুষিত; ইংরাজী ১৮০০ সাল অবধি মেন্দীনীপুর জেলার অন্তর্গত ছিল। ধলভূমের রাজারা ইংরাজ সরকারের আশ্রয় ১৭৭০ সালে যে কল্লতি দেন তাহা

বাংলাভাষায়। মূল কল্লতি, রাজ্য-পুনর্গঠন কনিশনের সময়, সিংহুম বা মানভূম কলেইকিতে কৃতিত্ব পাওগা ধায় নাই। ১০ বৎসর আগে এক মাঝারি ইংরাজ আবেদন নগদা দাখিল হয়—ভাড়া হইতে জানিতে পারি যে, রাজারা বাংলায় কল্লতি দিয়াছিলেন।

আইন-ই-আকবরীতে ধলভূমকে ধলভূম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং ধলভূম সরকার মাঝারিদের অধর্গত। ধলভূমে বিভিন্ন-ভাষা-ভাষীদের শতকরা হিসাবে নিয়ে দিলাম :

	শতকরা			
	বাংলা	হিন্দী	উড়িয়া	বো
১৮২১	৫৮.৮	১.০	২১.১	১.০
১৮৫১	৫০.০	১.০	১১.০	১.০
১৯০১	৩১.৭	১২.৫	১১.০	১.২
১৯৫১	৩.৮	২১.৩	২১.১	২.০

আমসেনপুরের টাটার কারখানায় ব্যাংকিংর লোক আগমনের ফলে বাংলা-ভাষা-ভাষীদের অগ্রগতি কমিয়া গাইতেছে; পূর্বে এই অগ্রগতি আরো বেশী ছিল।

ধলভূম বাংলার অধিভুক্ত একাংশ। এটিটি বলিয়ার মত উপর-উক্তি তথ্যাদি দিলাম।

রক্তিশীসেবীর আগমন সিংহুমের মহলিয়া হইতে না হইয়া পশ্চিমবাংলার কোনো বৌলা বা তৎসদৃশ নামের গ্রাম হইতেও হইতে পারে। এ বিষয়ে বিশেষ তথ্য ও তথ্যের বিশ্লেষণের অভাবে কোনো কথা বলা সঙ্গত হইবে না।

রক্তিশী হিন্দুর দেবী বলিয়া বহুদিন হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।



বাংলার নবজাগরণের কথা

ঐয়োগেন্দ্রচন্দ্র বাগল

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণের দৃঢ়চাকাল নির্দেশ করিয়াছেন ১৮২৪ সন হইতে ১৮৪৪ সনের মধ্যেই বিবেচিত বর্ষ। এইরূপ তিনি হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানকাল নির্দেশ করিয়াছেন—১৮১১-৮০ এই ৭০ বৎসর। 'হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান' কথাটি খাড়া পরবর্তী লেখকেরা অনেকেই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এ কথাটির বদলে ভারত-সংস্কৃতি তথা ভারত-ধর্মের পুনরুত্থান বলিলেই মনে করি ঠিক হয়। আর ইহা শুধু উক্ত ৭০ বৎসরের মতঃ ১৮৮৫ হইতে ১৮৮৫ সন পর্যন্ত এই বিংশ বৎসরের মধ্যে ইহা সংঘটিত হইয়াছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী-কবিত পূর্বাঙ্ক হুঁড়ি বৎসর যেন রেনেসাঁসের দৃঢ়চাকাল, এই হুঁড়ি বৎসর (১৮৮৫-৮৫) তেমনি রেনেসাঁস বা নবজাগরণের বিকাশের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দ্বার। আমাদের জাতীয় জীবন যে একটি সম্যক পরিপূর্ণতার দিকে চলিয়াছে তাহার আভাস আমরা পাই এই বিবেচিত বৎসরের মধ্যে। এই বিষয়টি এখানে বলা যাইবে।

ষষ্ঠ দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জাতীয় কল্যাণদৃষ্টক মনো বিস্ময়ের কথা পূর্বপ্রদক্ষে আলোচনা করিয়াছি। এই সময়কার কথা আলোচনা করিতে বসিয়া ইতিহাসকারগণ যতঃই প্রাথমিক এবং প্রাথমিক-মতো প্রাথমিক কেশবচন্দ্র সেনের কথা প্রচণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ গত দশকে যেমন পণ্ডিত উপেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাসাগর, এই দশ দশকে তেমনি ভারতীয় সমাজে কেশবচন্দ্র ছিলেন মণিমানি। প্রাথমিক-মতোকে কেন্দ্র করিয়া বিবিধ ভবিষ্যতের উদ্ভাষণ হুক হয় এই দশকে, তাহার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সংযোগ ঘটে নিতাইই স্বাভাবিক ভাবে। কিন্তু ইহা ব্যতীত আরো কোন কোন প্রতিষ্ঠান এই সময়ে আবির্ভূত হয়, বাহার সঙ্গেও কেশবচন্দ্র মিলিত হইলেন। প্যারীচরণ সরকার ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ব্রাহ্মান-নিবাসী সভা স্থাপন করেন। ব্রাহ্মান শিক্ষিত সমাজের একটি ঘোরতর পাশ, আবার শিক্ষিত সমাজের অন্ধকরণে সাধারণ লোকেরা ইহাতে অজ্ঞাত হইয়া পড়িতেছিল। এই পাশ সমাজ-বৈরকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে উক্ত হয়। কলিকাতায় শিক্ষিত সমাজে কিন্তু, এইখানেই

ব্রাহ্মানদের দুলে সংঘবদ্ধভাবে হুঁঠাখাত করা প্রযোজন হইল। এইমতই প্যারীচরণ সরকারের এই উদ্ভাষণ। এই সভার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মতো দে-দুগের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও যুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ববর্ণকে ইউনিভার্সিয়ান শাস্ত্রী ভাণ এবং রাজ্য রাধাকান্ত সেন ব্রাহ্মান-বিস্মৃতি নিরোধকরূপে উদ্ভাষী হইয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতায় সংঘবদ্ধ প্রযোজন এই প্রথম। এই বর্ণকে বেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুও ব্রাহ্মান-নিবাসী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া কতকটা কৃতকার্য হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র কলিকাতা ও ময়মনসের এই দ্বাভি-লগ্ন্যাপকর উদ্ভাষণকে একটি ব্যাপক ও সার্বিক রূপ দিয়াছিলেন সমগ্র দেশকে 'ভারত-সংসার সভা'র কর্মস্থলীর অঙ্গভুক্ত করিয়া। এ বিষয়ে বহাৎসানে উল্লিখিত হইবে।

উক্ত 'ভারত-সংসার সভা' কথাটি হইতে বর্ষ দশকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। ভারতবর্ষের তিনটি প্রধান প্রাদেশিক নগর—কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাসে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ববর্ণকেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতাকে ঠিক প্রাদেশিক প্রধান নগরী বলা চলে না। কারণ ইহা তখন সমগ্র ভারতের রাজধানী। বাহা হউক, এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ভারত-বর্ষের সমগ্র অংশেরই উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করিত। একই প্রকারে শিক্ষার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ভাব-মিলনের সুবিধা হইল। কেশবচন্দ্র ১৮৬৭ সনে দক্ষিণ-ভারত এবং ১৮৬৭ সনে উত্তর-ভারতে পরিভ্রমণ করেন। এই সকল ভ্রমণের উদ্দেশ্য মূলতঃ ধর্মদূলক হইলেও, ঐ ঐ অঞ্চলের শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থাও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইল না। বিভিন্ন বিদ্যে ঐ ঐ অঞ্চলবাসী নিমিত্ত হইয়া পরস্পরের বিদ্যাবৃদ্ধি ও কর্মপন্থার সমন্বয়ে যে ভারতবর্ষের স্বার্থ উন্নতি সাধিত হইতে পারে, এ-কথা বস্তুতঃ মনে হয়, আধুনিক যুগে কেশবচন্দ্রই সর্বপ্রথম উচ্চারণ করেন। এই ধ্যানের জাতীয়তাবাদ্যক ভাবনার ভিত্তিতেই তিনি ধর্ম ও সাংসারিক কার্যকলা পরিচালনা করিয়া ছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, ভারত-সংসার সভা প্রকৃতি তৎপ্রচলিত নাম হইতে ভারতীয়তাবোধই দৃষ্টিত

হইতেছে। এই ভারতীয়তাবোধ সপ্তম দশকের সর্ববিধ রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকে নিগূহিত করে। ইতিহাস নীপ, ইতিহাস আনোসিনিশেন—ঐ সময়কার এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও উক্তরূপ নিবিদ-ভারতীয় ধারণা আচ্ছন্নকরণ করিতেছিল। এই ভাবনাকে বহুদূর পরিব্যাপ্ত করিবার জন্য বহু দশকেই কিছু প্রচেষ্টা হুক হয়। কেন্দ্রবৎ ১৮৮৬ সনে বেথুন গোলাইটিতে প্রথম একটি বক্তৃতায় প্রস্তাব করিলেন যে, ভারতবর্ষের উন্নতি-প্রসাধনে বেথুন গোলাইটিকেই বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রী ও নেতৃবৃন্দের একটি প্রকট মিলন-ক্ষেত্র রূপে গড়িয়া তোলা কর্তব্য। এ সময় সমগ্রভাষাই একটি উজ্জ্বলের মতো। হইল কলিকাতায়, দ্বাদশ সমগ্র জাতির মিলন-ক্ষেত্র বহিরাই প্রথমে পরিচালিত হয়।

সত্য কথি, কেন্দ্রবৎসর অত্যধিক ঐক্য-প্রীতিই এককল কেন্দ্র-বিরোধী ব্যক্তিকে এইরূপ একটি মিলন-ক্ষেত্র রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ করে, আর এই কারণে ইহার নামও বেঙা হইয়াছিল ‘হিন্দুমেলা’। কিন্তু ঐ সময়কার সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া ‘হিন্দুমেলা’র উদ্ভব যে আকস্মিক নয়, এবং কোন-বিধুর নিছক প্রতিবাদেই ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়া নাই—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। একই ধরনের ইংরেজী শিক্ষার বলে নব্যশিক্ষিতেরা পাকাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির একান্ত অস্থায়ী হইয়া পড়ে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সংস্কৃত বিজ্ঞানিকার বহুল প্রচার তখন পর্যন্তও হয় নাই। তখন ক্ষেত্রে শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে সামাজ্য-বোধের উন্নয়ন হ্রদ্বর্ণপারহত। একপ্রকারের জাতীয়তাবোধই তাহাদের মধ্যে দেখা বাইতেছিল বটে, কিন্তু তাহাকে জাতীয়তাবোধ না বলিয়া ‘দেশ-বোধ’ বলাই মুক্তিরূপ। এইরূপ বিপৎ-পানী ক্ষণাত্তক্ষণে ব্যাহত করিবার নিমিত্তই যেদিনীপুরে ‘জাতীয় পৌরবেঙ্কা সভারষ্ট সভা’র আবির্ভাব। যননী রাজনারায়ণ বসু ইহার প্রতিষ্ঠাতা। যদেন্দ্রের আচার-আচরণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য—এককথায় জাতীয় ভাবাদর্শের পূর্ণকল্লীকর ও পুনঃপ্রকাশ ইহার উদ্দেশ্য। রাজনারায়ণ ইহার বিবরণ আন্তর্জগিতে বিখ্যাত। এই সভার কার্য-কলাপের নিরিখে তিনি একখানি ইংরেজী অল্পদীপনর রচনা করিয়া প্রচার করিলেন। এই অল্পদীপনপ্রবন্ধটির ইংরেজী নাম—*A Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal*।

ইহার সার কথাটি ‘তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা’র আধিন ১৭৮৮ বর্ষ (সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬) সংখ্যায় এইরূপ বহিহৃত হইয়াছে :

“হিন্দু ব্যায়াম, হিন্দু সঙ্গীত, হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র এবং সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অধ্যয়ন, বস্ত্র পরাণ, বাঙ্গালী পণ্য ব্যবহার করিয়া আমাদিগের কল্যাণকরনের জাতির বিত্তশক্তি সম্পাদন, যাবতী ভাষায় পরস্পর পরস্পর এবং বাঙ্গালী সভ্যতায় বাঙ্গালী বক্তৃতা করা, হুজুরানামি যদেন্দ্রের অন্তিমিকর প্রথা বাহ্যতে প্রচলিত না হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা, হিন্দু শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সমাজসংস্কার কার্য সম্পাদন করা, যদেন্দ্রের হস্তশাস্ত্রকল রক্ষা করা, নবজাগরণ প্রণামাদি যদেন্দ্রের শিষ্টাচারে চালন করা, যদেন্দ্রের স্মৃতিতে পরিচ্ছন্ন-পরিধান ও আহ্বারকার্য-সম্পাদন পরিচালনা করা, যেই ভাষায় নাটকাদি অভিনয় করা ইত্যাদি বিবিধ বিষয় আলোচিত হইল।”

রাজনারায়ণ-পরিব্যক্ত এই ভাবাদর্শ কর্তে রূপায়িত করিবার সার্থক প্রচেষ্টা হয় নবজাগরণ যিহ-প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বা জাতীয় মেলায় দ্বারা। ১৮৮৭ সন হইতে ১৮৮৯ সন নাগাদ এই মেলা প্রতিবৎসর অর্গঠিত হইত। ভারতবর্ষের জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃত এবং প্রাদেশিক সাহিত্য বাংলা, যদেন্দ্র শিল্প, যদেন্দ্রের শিক্ষা, ব্যায়ামাংশলিন, জাতীয় ভাষায় লিখিত রচনাবলী, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় নাটক, জাতীয় সভায় বাগ্ম্যে সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনা প্রভৃতি নানা বিষয়ে হিন্দুমেলা সে-বৃগে প্রায় চতুর্দশ বর্ষব্যাপী শিক্ষিত সাধারণের মনে অশূন্য প্রেরণা বিখ্যাত। তদন্তর দ্বারা দ্বাং—সকল উন্নতির আকর, সর্বোপায়ের রাস্তায় স্বাধীনতার কথাও হিন্দুমেলায় দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৮৮) কবি ও নাট্যকার মনোমোহন বসু নিঃস্ব বক্তৃতায় প্রথম উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনের ঐক্য রচিত সভ্যোক্তনাম ঠাকুরের জাতীয় সঙ্গীত ‘মিলে সবে ভারত-লগন, একমন একপ্রাণ, পাও ভারতের যশোগান’ ইত্যাদি সঙ্গীতটি জাতীয় জীবনে বের স্বপ্নদীপক করিতেছিল। হিন্দু বা জাতীয় মেলা এই সময়কার অমরীকরন যে কি গভীর মাত্রা আগাইয়াছিল, বিভিন্ন স্মৃতির স্মৃতিকথা হইতে তাহা এ-বৃগেও আমরা ব্যাখ্যাই অধ্যবন করিতে পারি। রাজনারায়ণ বসু, সভ্যোক্তনাম ঠাকুর, মনোমোহন বসু, জ্যোতিষিক্তনাম ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, অমৃতলাল বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিগণ হিন্দুমেলায় কার্যকরতায় কথা নানা ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। বাঙ্গালীর মনোমোহনও এই মেলা-এক আলোড়ন উপস্থিত করে; পূর্ণাঙ্গাধীনের বীর্ষবতার আলোচনা এবং

* ইংরেজী অল্পদীপনর রচনায় দেখক ‘জাতীয়তায় অমর’ পৃষ্ঠা ৩ (পৃ. ১০২-১০৩) সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

সমকালীন কোন কোন পুস্তক-প্রণেতার বোধভার কথা বাংলাভাষার চিত্রে নথ্যভরমার উল্লেখ করিতে থাকে। কেবলমাত্র সংস্কৃতের বহল পঠন-পঠন এবং বাংলা ভাষা-সাহিত্যে মৌলিক পুস্তক-প্রবন্ধ-নাটকাদি রচনাও এই মেলা যত্নবশীলের বিশেষভাবে উৎসাহিত করিল।

সংস্কৃত পঠন-পঠন তথা সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের অগ্রদূত সশরৎ এখানে বিদ্যে করিয়া গিয়া। সংস্কৃত ভিতরে যে অল্প রচনাটি নিহিত ছিল তাহা বিভাগের মহাপন্থের সংস্কৃত-কলেজ পুনর্গঠন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে জ্ঞানিক-এবং অল্পরূপে শিক্ষার বিষয় বলিয়া ধর্ম হইবার পূর্বে জনসাধারণের নিকট তাহা একরূপ অপরিচিতই ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য রত্নাভিষাবিষ্কারের মধ্য-উন্নতি-পথ-প্রদর্শক একটি স্তোত্র যখন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগার এই দুর্গাঙ্গকারী আবিষ্কারটিকে সৌভাগ্যের সহজলভ্য করিয়া দিলেন সংস্কৃত-কলেজের সংস্কার সাধন করিয়া। সংস্কৃত সাহিত্য-পর্ণনাধির অমূল্য কীর্তন করিতে গিয়া সমকালীন পণ্ডিত-প্রধানদের হৃদ-স্বাভার তথা নব নব ভাব-প্রবণে পরামুগ্ধতা বুদ্ধির আশ্রয় তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এতাদৃশ সঞ্চারনা সাধও সংস্কৃত সাহিত্যে বিদ্যুৎ উজ্জ্বল জ্ঞান-বিজ্ঞান কথা সাধারণের অবগতির নিমিত্ত সহজবোধ্য পুস্তক-সংকলন ও ব্যাকরণ-রচনাও প্রস্তুত হইলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌভাগ্য সংস্কৃত পঠন-পঠন দেশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি ছিল সমগ্র উত্তর-ভারত—শেখার হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অমৃত্যুর পর তখনই সংস্কৃত প্রকাশনাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার মধ্যে আসে। সত্য বটে, এমনকালের তুলনায় দেশ-বিশেষে অতি অল্পসংখ্যক লোকই উচ্চশিক্ষা পাইত, তথাপি পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা ও সাহিত্য অগ্রদূত পুর্বে ব্যাপক হইয়া পড়ে। ইহার কলে বাংলা ভাষা-সাহিত্য নিরতিশয় সহজ হইতে থাকে। উত্তর-ভারতের অগ্রাগ্র ভাষা, যেমন দিল্লী, বাংলাবা আর্সে কখনও স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন-কালে হইতে বাংলার তেজস্বী বা আগ্রহ ছিল বহির্দৃষ্টি; সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন যেহেতু তাহা হইতে লাগিল অগ্রদূত। এই মৌলিক বিদ্যার চিত্র আশ্চর্যকর লোকেরা তখন দৃষ্টি দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু বাংলা মন্ত্রপুতির মধ্যে সমগ্র জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এ-বিষয়টির আলোচনা অপরিহার্য।

সংস্কৃত সাহিত্যের আবিষ্কারের কলে ভারতবাসীর একটি

পূর্ণ পরিচয়সাধিতও অমূল্য সমর্থ হই। কিন্তু এ বিষয়ের আলোচনার পূর্বে এ সম্বন্ধের অল্প কোন কোন ভাবধারা ও কর্মপ্রচেষ্টার স্মৃতিও আদ্যের লক্ষ্য কবিরার সম্বন্ধে। যদ্যপি সংস্কৃতের মাধ্যমিক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ কেবল দেশের অপরিমিত কর্মগতির আভাল আভায়া পাইয়াছিল। সমসাময়িক ব্যক্তিগণের রচনা বা পুস্তিক-কথা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র এই দশকে শুধু ভাষা নিষ্ঠামান সেবারাত্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই শুধু নহে, নব্য-শিক্ষা-প্রাপ্ত বাঙালী যুব-সম্প্রদায়ের যমোদুসেরও তিনি এক নির্দিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছেন। তাহার দীর্ঘজীবন-বিষয়ে বক্তৃতা ও অগ্রাগ্র সংস্কারমূলক কার্য-কলাপ প্রাচীনদের, এমনকি যমোদুসের ব্রাহ্মণ-বংশীয়েরও বিরক্তির উল্লেখ করিয়াছিল। কেহ কেহ এ-কথাও বলেন যে, কেবলমাত্র পশ্চিম-দুর্গা যমোদুসের প্রতিক্রিয়া-বরণ হিন্দুধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল। এই সময়ের অবস্থা বিবেচনা করিলে এ ধরনের উত্তির মধ্যে যে থাকিবার সত্য রহিয়াছে তাহাও স্বীকার করা যায় না। তবে ব্রাহ্মণসমাজ সংস্কৃত-কলে কেবলমাত্রের বিভিন্ন কার্য, যেমন—ভারতবাসীর ব্রাহ্মণসমাজ প্রতিষ্ঠা (১৮৬৬) এবং ভারতবাসীর ব্রাহ্মণ-নির্মাণ (১৮৬৮-৬৯), এবং ব্রাহ্মণ-প্রচারকালে বার বার উত্তর ও পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণ ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে নতুন সংস্কৃত-শক্তির উল্লেখ করিয়াছিল। ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে কেবলমাত্রের গভীর প্রবেশ তাহার বাস্তব-পন্থিক অপরূপ মাদুরী-বিত্ত করিয়া দিল। কি ইংরেজী-শিক্ষিত কি বাংলাভাষী সকলেই তাহার ইংরেজী-বাংলা বক্তৃতায় ঐ মূলে বিমোহিত হয়। অগ্রাগ্র প্রবাস, কেবলমাত্রের বাংলা বক্তৃতা শুনিতে বহির্মুখ কলিকাতা অবস্থানকালে নিরন্তর ঘাইতেন। নিখিল-ভারতীয় ভিত্তিতে কেবলমাত্রের কর্মপ্রচেষ্টা পরিচালিত হইলেও, ইহা সত্যিকার বসন্ত হয় তাহার লিখিত-প্রবণের পর হইতে। তিনি যখনে কিরিয়াই সেবারাণ কর্মীদের সহায়তায় ভারত-সংস্কার সভা (২রা ডিসেম্বর, ১৮৭০) স্থাপন করিলেন। এতদিন শুধু ব্রাহ্মণসমাজ-সংস্কার এবং ব্রাহ্মণ-প্রচারই কেবলমাত্র প্রস্তুত ছিলেন, এই সময় হইতে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতবাসী যাহারাই সেবার এই সভার মাধ্যমে আত্মনিয়োগ করিলেন। শ্রীশিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, বহু শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা, সুলভ সাহিত্য-প্রচার, দায়ক প্রবোধ ব্যবহার-নিষেধণ, দীন-দরিদ্র-আত্মরূপ সাহায্য-দান প্রভৃতি নানা বিধেই প্রকাশ চলিতে থাকে। জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই ভারত-সংস্কার সভার সভ্য বা সদস্য। আবার জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সবার নিমিত্তই এই সভা।

বাংলাদেশেও বর্ণক্ষেত্র হইলেও 'আদর্শ' ছিল সর্বভারতীয়; আর এই ভিত্তি দিয়া এই সভা হইল পরবর্তী কালের শ্রাণনাম। কংগ্রেসের একটি প্রকৃত বীজ। কিন্তু ভাতীয় ভাবান্বিতের নিক হইতে ইংরাজ যে অভাব বা ত্রুটি, তাহা পূর্ণ করিয়াছিল হিন্দুজাতি।

অবশ্য, এই 'হিন্দু' নামটি হইতে আধুনিক কালের কোন কোন লোকক একটি সংকীর্ণ মনোভাবের সন্ধান পাইয়াছেন। বিভিন্ন-সম্প্রদায়ী হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যভাববৃদ্ধি এবং আত্মনির্ভরবোধ-উদ্বেগ হিন্দুজাতির 'আদর্শ' বা উদ্দেশ্য; কিন্তু ইহা দ্বারা সমগ্র ভারতীয় লোক-সমগ্রই বৃত্ত বা উপকার-সাধনে লক্ষ্য ছিল। স্বদেশীয় শিল্প, স্বদেশীয় সাহিত্য, স্বদেশীয় সংস্কৃতির শালন-পোষণ এবং উন্নতি-সাধন কি শুধু সম্প্রদায় বা প্রতীকগত, না সমগ্রগত? এ কারণে ইহা কোনক্রমেই 'সংকীর্ণ' ছিল না। হিন্দুজাতির নিয়ামক সভা ছিল 'শ্রাণনাম সোদাঃসিটি' বা জাতীয় সভা। এই সভায় ১৮৭২ সনের ১৪ই সেপ্টেম্বর মনবী রামনারায়ণ বহু 'হিন্দুধর্মের প্রেরণা'-বিষয়ক একটি বক্তৃতা দান করেন। এই বৃণাঙ্ককারী বক্তৃতা লইয়া সে-পূর্ণেও যেমন সমালোচনা হইয়াছিল, এ-পূর্ণেও যেমিবেছি কোন কোন লোক সমালোচনা করিতেছেন। সম্প্রতি একজন লোক এই বক্তৃতাটিকে 'সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয়' বলিতেও চাচ্ছেন নাই। এ কারণে এখানে বক্তৃতাটি লক্ষ্যে দৃষ্টি-ভার কণা বলা প্রয়োজন বোধ করি। 'হিন্দুধর্মের প্রেরণা' দ্বারা প্রথমে আমাদের বুঝা আবশ্যক—কোন ধর্মের প্রেরণা? ভারতবর্ষের উপনিষদ-ভিত্তিক ধর্মকেই লোক এখানে হিন্দুধর্ম বলিতেছেন। এই উপনিষদিক ধর্ম দেশ-কাল-পাত্র ভাবনা দ্বারা আশে সীমিত নহে; ইহা সর্বকালের, সর্বকালের এবং সর্বলোকের। রাজা রামমোহন রায় মহৎসৌখ্য পাত্র এবং ঈশীয় পাত্র মননের পর ভারতবর্ষের উপনিষদের মধ্যেই সকল ধর্ম ও সকল শাস্ত্রের সার লাভ করিয়াছিলেন। আর এইজন্যই তিনি ব্রাহ্মণমন্ত্রের দলিলে জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়ী ধর্ম-নির্দেশণে উপনিষদিক ধর্মসম্বন্ধ প্রতীকার কথা বলিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বহুর 'হিন্দুধর্মের প্রেরণা' ছিল এই পাত্র ভাবতত্ত্বের প্রেরণা। আর এই কারণেই বহুজন্যে ভারতবর্ষকে বলিয়াছেন 'ভারতভূমি'। হিন্দুজাতির নিয়ামক 'জাতীয় সভা'র প্রথম হইয়াছিল বলিয়াই কি 'হিন্দুধর্মের প্রেরণা' সন্যাস-মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে? এইরূপ অবাচ্য উক্তি হুং মনের পরিচয় দিতেছে না, মিথ্যাশ্রয়। হিন্দুধর্মের সার উপনিষদে ধর্মবিষয়ে উচ্চতম চিন্তা বিস্তৃত, একারণ ইহা

বিষয়ভূমি ধর্ম। বিভিন্ন ধর্মভাবী পণ্ডিতবর্গ নানা গবেষণার ফলে এই সার সভা উপলব্ধি এবং প্রকাশ করিয়াছেন। এইখানেই ভারতভাবের পরিচয়। বহুজন্যেও বহুজন্যেও ভারতভূমি বলিয়া উক্তির এইখানেই সার্থকতা। উপবাসের সঙ্গে মানবের, মানবের জীবনের এবং মানবের পরম্পরের সম্পর্ক লক্ষ্যে বৃণে বৃণে নানা সমালোচনা-গবেষণা হইয়াছে, এখনও সমালোচনা-গবেষণার অম্ব নাই। আর এতদূপ অবিরত আলোচনা-গবেষণার ফলে বহুবিধ নূতন নূতন চিন্তা আমাদের মনকে আলোকিত করিতেছে। তথাপি পণ্ডিতগণ একথা বীকার করিয়া থাকেন যে, হিন্দুধর্মের মূল বে-উপনিষদ তাহাতেই বিষয়ভূমিনতার আদর্শ মুগ্ধকট।

রামনারায়ণ বহুর এই বক্তৃতাটিকে চিন্তাবীর মনীষীপ্রেরণ বহিঃস্বপ্ন অমবস্ত ভাষায় অভিনবিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতের মন নব ভাবনা ধর্ম মানাদিককে নানা নিক হইতে দূরীভূত করিয়াছিল ও আমরা সকলোকেই নিঃস্বপ্নের পিতৃ করিতেছিল। তখন এইরূপ একটি বক্তৃতা সভায় সমাদায়িক-দের মনে এক ভীষণ দাক্ষিণ্য বিদ্যুৎ ছিল। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরে চলি গেল বহুর মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারলাভ ঘটয়াছে, পাকাত্য ভাবধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত লক্ষ্যে প্রায় দ্বারা ভারতীয় উন্নতি-সাধনে অনেকই তৎপর। কিন্তু ততদিন না সংস্কৃত বিদ্যা সাধারণের সহজলভ্য হইয়াছে ততদিন এই নব-ভাবনা আনাদিকের উদ্ভূত করার চেয়ে উৎসাহই করিয়াছিল বৈশি। সংস্কৃত শিক্ষার জনিক বিত্তারের ফলে আমরা অতি দীর্ঘে আশ্রয় হইতেছিলাম। কাজেই রাজনারায়ণ বহুর বক্তৃতাতে কেউ কেউ যে বিরূপ হইয়াছিলেন তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। বাংলার নবজাগৃতির ইতিহাসে 'হিন্দুধর্মের প্রেরণা' বক্তৃতাটি পিতৃ-ধর্ম-বর্ষণ হইয়া আছে। এই সময় হইতে আমাদের চিন্তার যে যেদিক ঘুরিল তাহা ক্রমশঃ জাতিক ভাবনার নিক হইতে বহিঃস্বপ্নী না করিয়া আত্মস্বপ্নী করিয়া তোলে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৭০-৮০ এই দশ বৎসরকে 'হিন্দুধর্মের অত্যাখ্যাত' কাল আখ্যা দিয়াছেন। এখানে তিনি 'হিন্দু' কথাটি অতি সংকীর্ণ অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন। 'হিন্দুধর্মের অত্যাখ্যাত'—এর পরিবর্তে 'ভারতবর্ষের অত্যাখ্যাত' বলিলেই অধিকতর সঙ্গত হইত মনে হয়। রামমোহন রায়ের জাতি-ভাবনা যেবেজনাথ ঠাকুর হইতে কেনবদন্ত পেন পণ্ডিত অমল-বদল হইয়া একটি তথাকথিত হিন্দু-ব্যতিক্রম রূপ পরিগ্রহ করে। হিন্দুধর্মের সর্বজনীনতা তথা বিশ্বজনীনতা কেনব-পন্থীরা যেন বহু দশকের সেবে এবং সপ্তম দশকের

প্রথমে দর্শনের মধ্যেই 'মানিতে' চাহিতেন না। অর্থাৎ প্রাচ্যের প্রগতিশীল চিন্তা ও কর্ম দ্বারা নবান্বিত বাঙালীরা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইতেছিল। কিন্তু 'বিশ্বধর্মের প্রেক্ষতা' আদিগা এতাদৃশ চিন্তা ও কর্মই এক ভীষণ দ্বারা হিল। নবান্বিতদের আত্মপরীক্ষার নিধি হইলেন। বাংলার নবজাগৃতির সিক হইতে ইহা সত্যই শুভ লক্ষণ।

ইহার পূর্বেও কিন্তু কোন কোন বাঙালী মনোবী শাস্ত্রাত্মক-ভাষণে নবান্বিত বাঙালী সমাজকে স্বকীয়তা তথা করিয়া আত্ম হইবার নির্দেশ দিতেছিলেন। রাজনারায়ণের সতীর্থ ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'শিক্ষা-চর্চা'র 'আত্মবিবেচনা'র পর দগ্ধাংগ বিত্তের বিবরণে আলোচনা দ্বারা সচেতন করিতে থাকেন। কেশবচন্দ্রের অগ্রদূত উদয়চন্দ্র ব্রাহ্মসমাজ হইতেই শিশুসুন্দার খোদ নিজ 'অনুভবতার পত্রিকা'র অগ্রদূত বাঙালী জাতিকে আত্মনির্ভর হইতে উপদেশ দিতেছিলেন। কিন্তু ইহাতেও শাস্ত্রাত্মক বা স্বকীয়ভাবে যেমন পূর্ন বাহির উদ্ভূত পারিল না। এই অর্থাৎ দুই করিলেন বিভিন্ন প্রচেষ্টা দ্বারা ও বা স্বকীয়ভাবে। বিভিন্ন প্রচেষ্টা করিলেন: বিবিধ-প্রকারের প্রথম প্রাক্কট; শাস্ত্রাত্মক সাহিত্য-ধর্মে হৃদয়িত। শুধু হৃদয়িত বলিলেই যথেষ্ট হইবে না, শুকালীন নব-প্রচারিত কোমল-ধর্ম দ্বারাও তিনি লক্ষ্যে প্রভাবিত। ব্যক্তিগতভাবে সংস্কৃতবিশিষ্ট ১৮৬১ করিয়া তাহার আরও বেশ শাস্ত্রাত্মক-বিদ্যাসমৃদ্ধিক পরিণোদনের আদ্য করিলে হইতেও ব্যত। তাহার প্রথম উপগ্রাম 'জর্জননধিনী' ব্যতির হইবারাই বাঙালী-সমাজে চমক লাগাইয়া দিয়াছিল। বর্ষ ১৮৬৩ তাহার তিনবার উপগ্রাম প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহার চিন্তা যে শুধু উপগ্রাম-রচনার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, বাঙালীর সাহিত্য-সংস্কৃতির মূল অংশদ্বারাও যে তিনি রত হইয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি বক্তৃতা হইতে তাহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। বাংলার লোকসাহিত্য এবং লোকসমাজ সম্বন্ধে পাতীগণ ইতিপূর্বে সভা-সমিতিতে এবং প্রবন্ধাবির মাধ্যমে আলোচনা করিয়াছেন। বস্তু দুই মনে হয়, বাঙালীস্বের মধ্যে বিভিন্নই প্রথম এইখনি আলোচনার প্রচুর হন। তিনি শুকালীন উচ্চতম শিক্ষা লাভ করিয়া অশিক্ষিত বা নিম্নতম জনসমষ্টিকেও বুঝেন নাই। সাধারণ লোকের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচলনের নিমিত্ত রাক্ষসের হইতে বাধ্যদ্বারা অর্থ ব্যয়িত হওয়া একান্ত আবশ্যিক, এই মত তিনি পোষণ করিতেন আর এই উদ্দেশ্যে তিনি সেননীও পরিচালনা করিতে লাগিলেন। সাধারণ অশিক্ষিতের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে ইহা প্রচারের

যে আয়োজন ইতিপূর্বে হইয়াছিল, বিভিন্ন প্রকারে সেই প্রচারিত সাহিত্যকে আত্ম সাহিত্য বলিতে পারেন নাই, তথাপি এই আয়োজন-ব্যবস্থাকে তিনি প্রথমেই করিতে ক্রটি করেন নাই। সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-প্রচার, সাধারণের জ্ঞানবর্ধক এবং চিত্তব্রজ সাহিত্য-প্রকাশ এবং সাধারণের অগ্রদূত পাণ্ডিত্য, আত্মিক-প্রবোধ ও বিবিধ সাংস্কৃতিক আয়োজন প্রভৃতির আলোচনা-গবেষণার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি লক্ষ্যে রাখেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন এই মত, ইহা সর্বদেবীর বা সর্বদেবীর নিমিত্ত; আবার বঙ্গীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন নিমিত্ত নহে, সাধারণ লোকের সাহিত্য-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন এবং বাংলা ও সংস্কৃতের পর পুনঃপ্রচারের দ্বারাও ইহাকে সার্থক করিতে হইবে। বিভিন্ন প্রচেষ্টা উদ্ভাবন হইবার পরেই সমস্ত যোগদান করিলেন, পরস্পরকে চিনিত মানিতে হইতে পারিলেই তবে কাজী উদ্ভতির ভিত্তি রচিত হইবে। এই দিক দিয়া বিভিন্ন প্রচেষ্টা বাংলার নবজাগৃতির ইতিহাসে পৃথক হইয়া যাহেন। বিভিন্ন প্রচেষ্টা 'বঙ্গধর্ম' প্রকাশ (বৈশাখ, ১৮৭১ বঙ্গাব্দ) একটি পণ্ডিত জাকার ফল। ভারতবর্ষের হিতবাহীরা (ইহাদের মধ্যে উদ্ভাবনীও ছিলেন বিজয়) পূর্বে বহু সভা-সমিতি স্থাপন করিয়া অগ্রদূতের হিতচিন্তার রত হইয়াছিলেন, তাহাদের কোন-কোনটির বাংলা মুদ্রণও ছিল; কিন্তু ব্যক্তিগত কারণেই এইসবের ক্ষেত্র ছিল সীমিত। 'বঙ্গধর্ম' এই লীলা অতিক্রম করিয়া জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়-নির্ভরবে সমগ্র চিন্তাশীল ব্যক্তিরই এক মিলন-ক্ষেত্র রচনা করিল। আর ইহাতে আলোচনার বিষয় হইল জাতির কল্যাণের সন্ধিক্ষেত্র। 'বঙ্গধর্ম' যুদ্ধের বাঙালীর নিমিত্ত পণ্ডিত দ্বারা দিল। বিজয় ক্ষেত্র বস্তু বিচিত্র, 'বঙ্গধর্ম' বিভিন্ন বিশালসুদূরে আলোচনা দ্বক হইল সমস্তব্যাপে অর্থাৎ হই পরিবেশে। আমার মনে হয়, 'বঙ্গধর্ম'কে একটি স্থবির সৌধের সঙ্গে তুলনা করা হইতে পারে। এই সৌধ বিভিন্ন জানের প্রকোটে ভরা। চাষি দ্বারা এক-একটি প্রকোষ্ঠ বৃন্দ, বেশিবেশ কোথাও প্রাচীন সাহিত্য যেমন সংস্কৃত, কোথাও বাংলা সাহিত্য, কোথাও ইতিহাস, কোথাও ধর্ম, কোথাও বিজ্ঞান। 'বঙ্গধর্ম' এইরকম বিভিন্ন বিজ্ঞান ভাণ্ডার আশ্রয়ের সন্ধিক্ষেত্র দ্বারা দিল। বিভিন্ন প্রচেষ্টার নেতৃত্বে উদ্ভাবনী-প্রচেষ্টা আদিগা বাংলার মাধ্যমে এ-সমস্ত বিজ্ঞান পরিবেশে অগ্রদূত হইলেন। বঙ্গভারতীয় এই ঐশ্বর্যময় যুদ্ধে স্বকীয় রচনাও তদীয় অনবদ্য ও অনবদ্যবীর ভাষা

বিবৃত করিয়াছেন। এই সকল ঔপন্যাসিকের দৃষ্টদৃষ্টিতে
 ছিলেন বহিঃসত্ত্ব। প্রথম দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবনা
 তাহার চিন্তাধারাকে নিবিড়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল।
 নব্ব্ব-১৪৫০ খ্রীঃ একদা বিক্রান্তীত তাহাকে কলকাতা ভাবে
 ঢালিয়া ক্রমশঃ স্বদেশের উন্নতির সহায় করিয়া তুলিয়াছিলেন।
 কিন্তু এ বিষয় এখানে বলিব না। বহিঃসত্ত্ব স্বদেশীয়
 উত্তমভূমিক চিন্তাধারার মধ্যে যে নতুন আদর্শ গঠন
 করেন তাহা তদনুযায়ী পরিবর্তিত ও অঙ্গভূত আদর্শ হইতে
 কি ব্যাপ্তিতে কি পূজীভূতায় সকল দিক দিয়াই চিল অভিনব।
 তিনি 'ব্রাহ্মণ ও খুর' প্রবন্ধে ব্রাহ্মণ-ধর্মের ঐতিহাসিকতার
 কথা ভীষণ ভাষায় বর্ণনা করেন। রামা কৈবর্ত ও হামিম
 সেপের দুঃস্বপ্নের কথা অমন করিয়া পূর্বে কেহ যোগ্যে বল
 নাই। আবার যেখানে তাহার দ্বারা নরপত নিরাসনই
 মনের ঐশ্বর্য্য হই নাই সেখানে তিনি সেপের ঐশ্বর্য্য
 ইচ্ছাছে এ কথা কোনমতেই মানিবেন না। কোয়ে-
 র্পনের মানব-কল্যাণ নতবাং তিনি নানা প্রবন্ধে ব্যক্ত
 করিয়াছেন। ভগবৎস্বল তথাকথিত সমাজ-নেতা ও
 বহুলোকদের উপর কণাঘাত করিতেও তিনি ছাড়েন নাই।
 এত প্রগতিভীষন নতবাং যেখানে, সেখানেও কিন্তু ঐ
 তথাকথিত সমাজ-সংস্কারক বা ধর্ম-সংস্কারকদের অধ্বংসী
 কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেও কাতর হন নাই।
 যে উন্নতিবাদ বা প্রগতিভীষক চিন্তা পূর্বকায় পাকান বংসর
 দ্বাং ব্রাহ্ম নেতাদের বা ভগবৎস্বলদের একান্ত বিমুগ্ধ ছিল,
 সপ্তম দশকে বহিঃসত্ত্বের ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয়-ভিত্তিক
 নবীন নতবাংসের সমুদ্রে অভিনব কণা হইয়া দাঁড়াইল।
 আচার্য্যগদ্য হিন্দু না হইয়াও বহিঃসত্ত্ব ও তত্ত্ববৃত্তী
 প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু; পণ্ডিত দিব্যনাথ শাস্ত্রী হইত
 এ কারণে পূর্বদৃষ্ট উক্তি করিয়াছিলেন। সপ্রতি একজন
 লোক উক্তি করিয়াছেন যে, বহিঃসত্ত্বের চিন্তা ভট্ট পাকাইতে
 পাকাইতে জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। বহিঃসত্ত্বের অমন বহু
 চিন্তাধারার প্রতি এরূপ উক্তি বর্ণনা তো নহেই, উৎকটমূলক ও
 বলা বাইতে পারে। বাংলার নব্যগদ্যের বহিঃসত্ত্বের যে
 অংশিময় মৌলিক দান রহিয়াছে তাহা কালের দানমণ্ডে
 বাচাই হইয়া গিয়াছে। কাহারও কট্টক বা উৎকটমূলক
 ইঙ্গিতে আতি বিস্তার হইবে না।

এই সময় 'ভাতি-বৈর' বা 'ভাতি-বৈরিতা' কথাটির বড়
 চল হয়। প্রথমে হরিনন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পঞ্জিকাট'
 এক পরে ভূসেব মুখোপাধ্যায় 'নিকা-বর্ণন' ও শিশিরকুমার
 ঘোষ 'অনুতবাংগার পঞ্জিকা' এই বিষয়ের আলোচনার লিপ্ত

হন। ঐহারা প্রত্যেকেই শাসক-শাসিতের স্বতন্ত্রিত
 ফুলসর দিকেই তেঁই করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
 বহিঃসত্ত্ব কিন্তু এই স্বতন্ত্রিত ভিত্তিতে কথিয়া বহিঃসত্ত্ব,
 আমাদের ভিত্তিকার, স্বতন্ত্র শাসক-শাসিতের স্বতন্ত্র
 না হইয়া দায় না। উন্নত প্রতিপক্ষের সমস্তই হইতে এই স্বতন্ত্র
 আদর্শমূলক উদ্ভূত করিবে। প্রতিযোগিতা না থাকিলে
 উন্নতি প্রাপ্তি হয় না। বহিঃসত্ত্বের এরূপ আদর্শ
 ভাতি-বৈরিতাকে নৈরাশ্রের বঙ্গের আশার স্রোতক বহিয়া
 সুখী-সমাধি গ্রহণ করিলেন। ইহার ফল কি তাত্ত্বিকীতি,
 কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি শিল্পকলা নানা দিকেই আদ্য
 যেন প্রগতিশীল হইয়া উঠিল। ইহাদের প্রত্যেকটি বিষয়ের
 আলোচনাযেই এক-একখানি পৃথি রচিত হইতে পারে।
 যেনেগান বা নব্যগতি যে আতির ভিত্তিকে সমগ্রভাবেই
 সন্ধি করিয়া তোলে, আদর্শমূলক নহে—এই কথাই
 এখানে বলিতে চাই। স্বতন্ত্রিত আদর্শমূলক নতুন দায়
 রচিত হইল। নব্যসত্ত্বের দায় সাহিত্যে স্বতন্ত্র হইয়া
 দায় দিল। কাব্যে, গানে, নাটকে, উপন্যাসে, প্রবন্ধ ও
 দ্বীপনী-সাহিত্যে এক অভিনব যুগের আবির্ভাব রচিত
 হইল। 'বহুসত্ত্ব'র কথা একটু আগে বানিকট্য বিদ্যভাষেই
 বলিয়াছি। কিন্তু ইহা ব্যতীত আরো বহু পর-পত্রিকার
 আবির্ভাব হইল এই সময়ে। নব্যগতির একটি প্রধান দায়
 —আদর্শমূলক প্রতি উদ্যোগ না হইয়া তহা আলো
 হুইই তৎপর হয়; আবার নিম্নের বাহা কিছু ভালো তহা
 গাল-গোষণ এবং স্বতন্ত্রের উত্তম বাহা তাহা সন্ধি
 গ্রহণ ও স্বতন্ত্র এই ব্যাপারটি আদর্শমূলক উৎসাহিত করে।
 ব্যক্তিগত এই সময়ে, সপ্তম দশকের প্রথমার্ধে বহু দায়
 তাহাই হইয়াছিল। এই যুগের সাময়িক সাহিত্য পাঠ করিলে
 ইহা সমস্ত স্বতন্ত্র হইতে পারে। বিজ্ঞানের দিকে ও
 এখন আমাদের দৃষ্টি বিশেষ করিয়া পড়িল। শেট জেনিয়ারি
 ও প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানের গবেষণার স্থান হইল
 এই দশকে। কিন্তু তাহা দুখাতঃ অধ্যাপকগণের মধ্যেই
 নিবদ্ধ ছিল। তথাপি এই পরীক্ষণ ও গবেষণাকারের দ্বারা
 কোন কোন বাঙালী সন্তান—যেমন আচার্য্য ভগদীপচন্দ্র বহু,
 প্রথমদায় বহু, আচার্য্য প্রহরচন্দ্র দায়—সন্ধিগত অগ্রগতি
 হইয়াছিলেন তাহা পরে আমরা জানিতে পারি। কিন্তু
 ভারতবাসীদের দ্বারা বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষণ ও আলোচনা-
 গবেষণার স্বতন্ত্র আয়োজন আরম্ভ হইল এ-যুগে। তাঃ স্বতন্ত্র-
 গাল সরকার বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার
 নিমিত্ত 'ইতিহাস আলোচনামূলক স্বতন্ত্র দি কালুটিভেন অফ

মনোহর ও প্রেমতারা

❀ মহাশ্বেতা জট্টাচার্য ❀

১৯১

গোপীনাথটার দল এলো শান্তাহার। এক ঠাই থেকে যখন অস্ত্র আসে সার্কাস, সে চোখে দেখতেও এক শোভা। একখানা জনপদ চলেছে যেন ঠাইনাড়া হয়ে। সে সময়কার ভাড়াহাড়া, হৈ-হাঙ্গামা, ঠাকডাকই বা কতো! সার্কাসের মানুষদের বড় রুটিন ধরে বাচতে হয়। এমনিধারা কড়াকড়ির দোসর কোঁজী জীবন। এখানেও অনেকটা তেমনিই।

মনটা ধরাপ ছিলো মনোহরের। প্রেমতারার সঙ্গে তার কথা বন্ধ। তাকে দেখেও ছাখেনা প্রেমতারার। অথচ তাকে বাদ দিলে তো এগুিনাতে চলেনা। বাড়ি পেতে দায় নিয়ে নিয়ে গোপীনাথের সার্কাসে মনোহর ক্রাউনদের মতোই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বড়ো ক্রাউন সুকুলবাবু বলে,—বোকা, যত বাড়ি নিবি, তত বোকা বাড়বে। বুকিসনা কেন?—ইদানীং সুকুলবাবুর চোখেও পড়েছে প্রেমতারার ব্যবহার। আগে আগে মনোহরের ওপর তার নজরটা সকলের মতো সুকুলবাবুও দেখেছিলো। আবার কি হলো কে জানে! মনোহরের হাত থেকে দড়ি ধরে নিয়ে দোলনায় ওঠে প্রেমতারার। একটার পর আর-একটা সাইকেল, সে-ও ঐ মনোহরই এগিয়ে দেয়। শুধু প্রেমতারার চোখে আর সে-আলো কলকে ওঠেনা। মনোহর ভাবে—খেলা দেখাবার মালিক নই। আমাকে কেন পুঁছবে প্রেমতারার!

শান্তাহারে নেনে নওগাঁ-বাগুনপাড়ার দিকে উজিয়ে এসে ক্যাম্প করতে তিন-চারদিন কাটলো। এ যাত্রাটা অনেকের অনেক কারণে বনে রইলো।

আসবার আগে আগেই বিমল আর কিরণের

বিয়ে চলো। সার্কাসের মানুষই গায়ে পড়ে ঘর সাজিয়ে দিলো বিছানাপত্র, একখানা ডেক্‌চি, দুখানা থালা, একটা গেলাস, আর আয়না-চিকনি, তেল সাবান কিছুরই অপ্রতুল বটলো না। প্রেমতারার তার সাধের টিয়াপাখি-রঙের শাড়ীটি দিয়ে দিলো কিরণকে। গোপীনাথ একটা সোনার হার আর দুইগাছি কলি দিয়ে সকলকে আশীর্বাদ করলো। কৃতজ্ঞতায় অভিভূত কিরণ কথা কইতেই পারলেনা। শুধু এ-কথা কেউ একবারও ভাবলেনা এক প্রেমতারার ছাড়া, যে কিরণের কৃতজ্ঞতাটা কতখানি অর্থহীন। মাস্টারের রিভার্ড-নলের মেয়ে কিরণ। কোন কালও অস্ত্র আর্টিস্টদের যুগ্মি নাইনে পায়নি। পেটে খেয়েছে, গায়ে পরেছে, আর সানাত্ত ক্রটি-বিচ্ছাতির ক্ষেত্রে বহুনি আর নার খেয়েছে। গোপীনাথ তাকে যে এমনি করে আজীবন ঠকিয়েছে, এতে যেন কোন অস্ত্রায়ই হয়নি। এ বড় চমৎকার খেলা। দুনিয়া-ভোর চলছে। গতরে খেটে উপার্জন করলে টাকা। কিন্তু যখন হাতে পেল, তখন তোনাকে বর্থে যেতে হবে। গলে পড়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। কিরণের ভাবগতিক দেখে তাই দুঃখই হলো প্রেমতারার। মমতাও হলো এই ভেবে যে, একখানা রঙীন কাপড়, একশিনি তেল—এসব যার স্বপ্নের কামনা ছিলো, সেই কিরণ আজ একজনের ঘরনী। একখানি তাঁবুর গৃহিণী। আর-একজনের কথা মনে হলো প্রেমতারার। সে মানুষের চাহিদা কম। নিজের কথা জোর গলায় জানান দিতে সাহস পায়না সে। তাকে দেখেই তো মনে শূন্য নেই প্রেমতারার। সহর বদল হলো। নতুন ক্যাম্প পড়লো। এখন অবসর আছে কিছু। কিন্তু অবসরে

থেকেও সুখ নেই। তার নিজের ঔষুতে তাপানী
মাছেরের চিক ফেলা। ক্যাম্পাটে মিনারি-মাকা
সুখ্‌নি। সে বিহানায় শুয়েও চোখে সুখ নেই
এতটুকু। মনোহর পুরুষনাহুখ। অথচ তার সে আলা
নেই, অস্বস্তি নেই। চূর্ণাণ্যকে সৌভাগ্য করে তুলতে
ইচ্ছে নেই। দেখে গা জলে যায় প্রেমতারার।
সে কি কারুকে রেয়াৎ করে? মাসীকে শুনিয়ে
দিয়েছে সেদিন,—বুকে মাসী? কাদার ভালের
মতো পুরুষনাহুখ চোখে দেখতে পারিনে কো।
জাঘা কথা কইব হ্যা—গা খানো জলে যায়।

মাসী ছোট করে বলছে,—তাত্তে তোর কি
তারা?

প্রেমতারার জবাব দেয়নি।

সেজগৎকে নীলনয়নী মাস্টারের সঙ্গে রাউটি দিয়ে
বেড়ায়; আর দেখে দেখে মরমে জলে মরে মনোহর।
ক্যাম্পের এক কোনায় দণ্ডিতভার আড়ালে
শাড়ির চারটে বোতল আঙুলে নাচার সুকুলবাবু।
বুড়ো সুকুলবাবুর মুখখানা ধবলের দাগে বিস্ত্রি।
রাতের বেলা তার হা-মাথা মুখ, বিস্ত্রি একটা
আলগা নাক, আর কিছুত গতিবিধি দেখে নাহুখ
হেসে গড়ায়। দিনমানে সেই মুখ-ই অস্তরকম।
দেখতে কুস্তি অথচ তরু করেন। হা-মারিহোর ছাপ
সুকুলবাবুর মুখে পষ্ট করে লেখা রয়েছে। জীবন-
সংগ্রাম যে সুকুলবাবুর কাছে কি হা-মহ, সে-কথা
মুখখানা দেখলেই ধরা পড়ে। কখনো কেউ হাসতে
দেখেনি সুকুলবাবুকে। যে নাহুখটা রাতের বেলা
হাকার নাহুখকে হাসায়, দিনমানে তার মুখে
হাসি দেখা যায় না। খাপারটা অতিক্রম করেছে
মনোহরকে। সুকুলবাবুর হাঁপানির রোগ আছে।
ফাটা হুসহুস সর্বদা গাই-গাই করে ডাকে।
বোতল নাচাতে-নাচাতে নিশাস নিতে বাতাস পায়না
সুকুলবাবু। মুখ হাঁ করে ঘাই বেরে নিশাস নেয়।
মনোহর বলে,—আপনি একটু বঁসে ঘান সুকুলবা।
বেশ্ট নিয়ে নিন।

গাই-গাই গলায় সুকুলবাবু বলে,—রাউটিতে
রেস্টের কথা বলছিস? তাকে নিকলে দেবে
মাস্টার।

সত্যিকারের রেস্টের সময় বলে,—মেয়েছেলের
কথা ভেবে মন খারাপ করিসনি মনোহর। ওরা ঐ
রকম। শুধু খেপাতে জানে। খুশী হতে দেখেছিস
কখনো ওদের? স্নেহ লাগে-নাও করবে। কাপড়-
জানা, টাকা-পয়সা সর্ব্ব্ব চোলে যে না কেন তুই।
মোটে খুশী হবে না। নেমকহারাম।

আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকে মনোহর। এত
বোকে সুকুলবাবু? বুড়ো বিড়ি খায় আর বলে,—
আমি পেটে না খেয়ে পাইপয়মাটি পরিবারকে
পাঠাই। ছেলে-মেয়ে বে করে সংসারী হয়েছে।
পরিবার তাদের নে' আছে। আমাকে গেলেপরে
তিনদিন তিঠোতে দেয়না ঘরে। সার্কাসের মাছকে
ঘোরা করে ওর। আমার অমুখকে ঘোরা করে।
অথচ ছোয়াচে তো নয়। বল তুই? তেমন হ'লে
মাস্টার আমার রাখতো? তিন লাখ-মেয়ে খেসিয়ে
দিতো না? সে কথা বোকাবোকে? বুকলি মনোহর,
মেয়ে জাতের ওপর আমার ঘোরা ধরে গিয়েছে।
এই যাঃ! একটা বোতল ভাঙলি তো?

মনোহরের হাত থেকে পড়ে গ্যালাগির বোঝিতে
ঠোকা লেগে সবুজ কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে পড়েছে।
সুকুলবাবু বলে,—মরুৎগে যাক। আনার হাতেও
অমনি হতো।

রাউটিতে প্রেমতারাকে গাথে মনোহর চুরি
ক'রে। ছোট রতীন গেঞ্জি আর বেঁটে জাডিয়া পরা
নিটোল দেহ। সবগুলো চুল বৈধীতে বাঁধা।
একচাকা, হুঁচাকা, তিনচাকা সাইকেলে ডবল-
ইন্টার্ন খেলে এতিনা দিয়ে। শশীর পার্টনার হয়ে।
শশীর কাঁধে হাত দিয়ে নিচু হয়ে জুতো পরে।
নাগিয়া, রাজুক বা বিমলের সামান্য কথাতে টেটিয়ে
হাসে। শোনে মনোহর। সুকুলবাবু তাও দেখে।
বলে,—গুনিসনি। তাকে তাতাচ্ছে। ওরা কি
গাফা মনের কদর বোকে? হিংসে জাগাচ্ছে।

মনোহর অবাক। সুকুলবাবু গালি দেয়,—তুই ভাষা-গঙ্গারান। কেন—বেগম, শাজাদী আর মস্তারকে দেখিসনি?

বাঘ-সিংহের সঙ্গে বাঘের কি তুলনা চলে? গম্ভীর হয়ে যায় মনোহর। বলে,—জীবজন্তু, জানলেন সুকুলদা, মানুষের চে' তারা অনেক ভালো।

রাউটে শেষ হ'লে মনোহর চলে যায় বাদশার খাঁড়ায়। খাঁড়া ধোয়া হয়নি কেন, বা মাংসের ভাগ কম পড়লো কেন, এইসব কথা নিয়ে চীৎকার ক'রে কগড়া করে। ম্যানেজার কেঁটবাবু অবাক হয়ে বলে,—তুই একেবারে বন্ধ উদ্দাম হলি মনোহর? কলঙ্কে কেটে মরবি যে—

তীব্রতে বসে মাছ কুটতে-কুটতে চামেলী বলে,—বাদ-বাঘ ক'রে মস্তাঘটা পাগল হলো!

তার শাণ্ডড়ী লম্বা বাটে আর বলে,—তুই চুপ কর বো। তুই কিছু বু্কিস না।

ভটিকে গোপীনাথের তীব্রতে ব'সে রঙ্গধারি করতে-করতেই প্রেমভারা মনোহরের চাঁচামিচি আর বাদশার গর্জন শুনেতে পায়। চা-এর পেয়াল দেয় মাস্টারকে। মাস্টার বলে,—চা-এ চিনি দিলেনা?

—এই-যে দিই।— প্রেমভারা অসহজ ভাবটা কাটায়। বলে,—আমার ক'মাসের টাকা ব্যাকি মাস্টার?

—তুই মাসের।

—দিয়ে।

—নিশ্চয়।

—বালা গড়াব। কানপাশ কিনব। গলায় শেল-হার পরবার সখ গিয়েছে, কিনব একগাছ।

—এত মাজগোড়ের কি আছে পো প্রেমভারা?

—ক' মনে নেয় করে নেব মাস্টার। ওরকম চিমটি কেটে বৈচে কি হবে বলো?

প্রেমভারা চলে গেলেপরেও তার এসেলে

গছে ভারী বাতাস নাক ভরে নিয়ে চিৎ হয়ে থাকে মাস্টার।

মস্তবড়ো গজ জায়গা শাস্তাহার। তর্রাটে নানডাক রয়েছে। ধনবেচা পয়সা টাঁকে নিয়ে জবজবে ক'রে তেল বেখে চাবীরা এসে লাইন দেয়। বো-ছেলেমেয়ে নিয়ে চেয়ারে ব'সে সার্কাস ভাখে। বাহবা দেয় নাগিয়াকে দেখে। সুকুলবাবু অঙ্গভঙ্গী দেখে লুটিয়ে লুটিয়ে হাসে। বুকের ওপর গাড়ী তোলে গোপীনাথ। সোহার রড বেঁকিয়ে ফেল। প্রেমভারা ঢোকে টুকটুকে লাল পোশাকে। সাইকেল চড়ে মেয়েরা ঢোকে—পাক খেয়ে নেয় এরিনাতে। বিমল তিরিশটা কাঁচা বাছ জায় গিলে যায়। একবালতি ছল খায়। আবার সমস্তটা উগরে দেয়। কাঁচের বাটিতে সেই বাছ লাফায়। দেখে তাম্বব মানে মানুষ। সার্কাসের মানুষরা অমনিধারা। চোখে দেখে তাদের মনের কথা ধরা যায় না। সেখে যারা বাহবা দেয়, তারা কোনমতেও বুঝতে পারেনা যে, ঐ পাহাড়ের-মতো-শরীর গোপীনাথের মনের ভেতরটা হিংসের জ্বলছে। ট্রাপিডের ওপরে যে পরীর মতো সুন্দর মেয়ে দোল খাচ্ছে—তার মনে একতিল সুখ নেই। দর্শকরা জানেনা, তীব্রতে বসে ম্যানেজার বো-কে হ'বেলা শোনায়ে,—শাস্তাহারে এসে পয়সা মিলছে বাটে, তবু পাটির অবস্থা খুব মজীন।

হঠাৎ টালমটাল হয়ে গেল সব-কিছু। কড়টা তুললো নাগিয়া।

কেঁটবাবু সব-কিছুই জানতো। অন্ততঃ আঁচ করেছিলো। তবু এতখানি আশা করেনি।

রংপুরে জুবিলী-সার্কাস উঠতে-না-উঠতে রঙ্গধারীর সার্কাসপাটি বুকি হলো। বন্দোবস্ত করতে মালদালী ম্যানেজার এসেছিলো। তারতবার্ধে সার্কাসপাটিতে সবচেয়ে বেশী রয়েছে অঙ্ক ও ডানিলের মানুষ। তাদের সার্কাসপাটি-ও অগ্নিনি। দেশের মানুষ পেয়ে নাগিয়া কথাবার্তা কইছিলো রঙ্গধারীর ম্যানেজারের সঙ্গে। দেখেও যেন ভাখেনি

কেউ। এরকম অভ্যাস নাগিয়ার বরাবর-ই আছে। অল্প কাল বেলা মাস্টার খুব কড়া। কিন্তু নাগিয়ার বেলা সে কোন দোষ-ই চাচ্ছেনা। সেখানেই কথা পাকাপাকি করেছিলো নাগিয়া।

কন্ট্রাস্ট নাগিয়ার সঙ্গে। এক বছরের কন্ট্রাস্ট। ফুরোলে নতুন ক'রে কন্ট্রাস্ট হয়। নাগিয়ার সঙ্গে কন্ট্রাস্টের তারিখ বে ফুরিয়েছে, সে খেয়ালও ছিলনা কান্নর।

হঠাৎ ক'রে নাগিয়ার প্রস্তাবটা তাই বিস্ময় করে দিলো গোপীনাথকে। রঙ্গধামী-সার্কাসে একশো টাকা বেশী মাইনে দিচ্ছে নাগিয়াকে। তাই সে চলে যেতে চায় ?

বিপদ বুঝে গোপীনাথ আর কেঁটাবা চোখে আঁধার দেখলো। এ যেন পেছনে ছুরি-মায়া। বেতের টেবিল ভতি কাপ, ডিম, খাতাপত্র, আয়না, ফুলদানি সব ঠেলে দিয়ে পাড়ালো মাস্টার। টকটকে লাল হয়ে গেল ফরসা মুখ। বললো,—পোস্টার পড়ে গিয়েছে। শো হয়ে গিয়েছে চারদিন। এখন এ কথা বলবার মান ?

—আনি চলে যাবে।

—তুমি যেতে পারোনা।

—কন্ট্রাস্ট-এর তারিখ চলে গিয়েছে। তখন তুমি কেন হাঁস করলেনা মাস্টার ?

নাগিয়ার মুখবানা বে কতখানি কুংসিত, তা যেন এতদিন তাকিয়ে দেখেনি গোপীনাথ। দেখে নিফল ক্রোধে মাথাটা জলতে লাগলো। তবু গলাটা সংবত করলো। বললো,—শাস্তাহার-সীজনটা হয়ে যাক। আমিও একটা মাহুঘ দেখে নিই।

—আমাকে পরশু যেতে হবে। রমন তার করেছে।

—তুমি শাস্তাহার বুকিং-এর আগে বললেনা কেন ?

কথা না কয়ে শিস দিলো নাগিয়া। নিঃসন্দেহে খুব মজা লাগছে তার। বললো,—ঠিক একমাসের টাকা বাকি রয়েছে আমার। কবে মাস্টার ?

স্কেপে উঠে নাগিয়ার শার্টের কলার ধরে টুটিটা কাঁকালো মাস্টার। বললো,—চোটানি করছো বেইমান শা—, তোমাকে আমি ঝেঁড়ে ফেলে দেবো !

নিবাস বন্ধ হয়ে নাগিয়া মরেই যেতো মেদিন, যদি না কেঁটাবা ছাড়িয়ে দিতো তাকে। চাঁচাতে মুরু করলো নাগিয়া তাঁবুর বাইরে পাড়িয়ে,—আই উইল সী ইউ মাস্টার। দেখে নেবে আমি। আমার নাম নাগিয়া। টাকা দিয়ে দাও আনাকে। স্টেশানে দিয়ে থাকব আমি।

অনেকদিন নাগিয়াকে ভয় করে-কবে চলেছে মাস্টার। রাউটি, খাবার তাঁবু—সব সময় নাগিয়া স্মৃতিয়ে নিয়েছে। এই নাগিয়াকে খুশী রাখতে গিয়ে সমস্ত পাটির বিশ্বাস খুইয়েছে একদিন গোপীনাথ। আজ সেই পোকা সাপ-ই ফিরে তাকে ছোবল দিলো। রাগে দিশাহারা হলো গোপীনাথ। তাঁবুর সামনে বেরিয়ে এলো সে-ও। তার সে চণ্ডমূর্তি দেখে প্রমাদ গণলো সবাই।

—নিকালো হি'রাসে বেইমান !

এমন এক হাঁকার দিলো মাস্টার যে, দূরে বাঁচার বায়-সিংহগুলো নড়েচড়ে উঠলো। এতদিন সকলের ওপর দাপট দেখিয়ে আজ নাগিয়ার এক কথায় হার স্বীকার করতে বাধ্যলো। টাকা দেয়া-নেয়া নয়। হারজিতের প্রশ্ন এসে গিয়েছে। সে বললো,—এক কথায় চলে যাবে ? নই সো ইন্ডি মাস্টার। আবার টাকা দাও।

—কিসের টাকা ?

—হোয়াট ? আমার পাওনা টাকা।

—দেবনা টাকা। কেস্ কন্গা—যা। শুকুলবাবু ! উল্লাস !

নিজের নাম যে উল্লাসচরণ বেরা, তা যেন ভুলেই গিয়েছিলো ক্রাউন সাহেব। হোঁচট খেয়ে এসে পাড়ালো সামনে। মাস্টার বললো,—ওর ঘাবড়ায় জিনিসপত্র বের ক'রে দাও গে যাও। শুকুলবাবু আপনিও যান। কল্‌ম চেক করে নিন গে

চেঁচিয়ে গালি দিতে দিতে চলে গেল নাগিয়া। কেঁঠেবাবু গোপীনাথকে বললো,—কিছু টাকা নিয়ে দিলে পারতিসু গোপী। তোর সই-করা কনট্রাক্ট রয়েছে।

—হা মন নেয় করুক্কে। দোবনা টাকা। কম করিছি শালার জন্তে ?

—তবু।

—তুই ভয় খাসনি কেঁঠ। অমন পায়রার কল্কে নিয়ে আর পার্টি চালাতে হয় না। করবে কি ?

—মনোহরকে চান্স দিলে হয় না ?

—দোব। সাতদিন তো এলেন বুঝতে যাবে। সাতদিন কি করি বল দিখিনি ?

—তুই ঠেকা দে।

—পারি না। হাপসে যাই। বেশী নম্বর আর করতে পারিনা।

—তবু।

—তাই করতে হবে। তুই মনোহরের সঙ্গে কথা ক'।

কেঁঠেবাবুর সঙ্গে অনেকদিনের বন্ধু গোপীনাথের। মনের কথা কইতে মানা নেই। চোখে চোখে চেয়ে হাসতে লাগলো কেঁঠ। বললো,—প্রেমভারার মনটিও শান্তি হবে। বড় ভাবতে শুরু করেছিলো।

গভীর হলো গোপীনাথ। বললো,—এ কথা বলি কেন ?

—এমনি। তবে মনোহর মানুষটা ভালো।

এমনি করে সার্কাসে বহাল হলো মনোহর। মাইনে হলো একশো। টিনের চেয়ারে মনোহরকে বসিয়ে কথাবার্তা কইলো গোপীনাথ। আর্টিস্টের সঙ্গে কথা বলে-কয়ে নিতে হয়। মাইনে ঠিক হতে কাগজে লেখাপড়া হলো। যদি কোন দ্বর্ধটনা ঘটে, তার জন্তে দায়ী একলা মনোহর। মাস্টারের কোন দাবির নেই। এই খতে হাপ দিলো মনোহর। এই কথাটি ভালো করে বুঝিয়ে দিলো কেঁঠেবাবু।

সার্কাসের মানুষ মৃত্যু নিয়ে নিত্য খেলা করে। মরণকে তারা ভয় করেনা। তার কারণ এই নয় যে, সার্কাসের মানুষ খুব নির্ভীক বা তারা মতো বাহাদুর। মরণের ভয় করলে চলেনা তাদের। সে ভয়ের শেষে কোন ভরসা দেবার মানুষ নেই। তাই তারা ভয় করে না। মনোহরের মতো যাত্রাই সার্কাসে খেলতে আসে, তারা প্রত্যেক দিনই মৃত্যুর সঙ্গে মূলাকাং করছে। ট্রাপিজ খেলতে-খেলতে হিসেবে এতটুকু ভুল করেছিলো মাস্টারের বৌ জুয়েল। গোয়ানিজ বাণ্ড-মাস্টারকে ভালবেসে বেপরোয়া হয়েছিলো। নেটের ওপর ঝাঁপ দেবার সময়ে সুন্দর শরীরটি বেকায়দায় হলে পড়েছিলো। শেষ হয়ে গেলো খেলা! এমনি করে ট্রাপিজ, সাইকেল, মোটর-জাম্প, মরণ-গ্লাব—কি খেলায় কি রাউটিতে সার্কাসের মানুষকে মরণ নিয়ে লোকোফ্রিক করতে হয়। তবে সে খেলা জন্মে ওঠে, তবে দর্শকরা হাততালি দেয়। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ঘুরে ঘুরে আসে আর্টিস্ট, তবে সে মেডেল পায়, প্রশংসা পায়। দর্শকরা এত কথা বোকে কি ? বোকেনা। সার্কাসের মানুষের মুখের হাসি, পোশাকের বাহার—এই শুধু দেখে দর্শকরা। এক এক দিন এক এক আর্টিস্ট বুঝতে পারে। যেমন বুঝেছিলো গোপীনাথের পুরোনো দলের আয়রন-ম্যান অনন্ত দত্ত। সাধা পাঁচা বলি দিয়ে বিপ্লবী দলে ঢুকেছিলো অনন্তবাবু ছোটবেলা। পরে শরীরচর্চা করতে করতে বাঙালী সার্কাসে ঢুক গেল। বুকের ওপর হাতি তুলতো। চারমণ বারুফেল ঝুটাতো। বাঙালী ছেলের কৃতিত্ব দেখে বাঙালী দর্শকের বুক দশহাত হতো। ইংরেজ দর্শকরা মুখে বাহবা দিতো। মনে প্রমাণ গণতো। সার্কাস-দলের পেছনে লাগাতো তিকটিকি। মাস্টারের পরিভার মনে পড়ে করিমপুরে চাঁদমারির মাঠে স্বদেশী মেলা হচ্ছে। বুকে মা-কালীর ছবি কুলিয়ে মুহুমুদাস যাত্রার আসরে নাচবেন কেনে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসেছে। গোপীর বয়স তখন চোদ্দবছর। শহরে জোর গুজব—পুলিশে

মুকুন্দদাসের ব্যাক্রা বন্ধ করে দেবে। গোপী সকলের নেকনজরে ছিলো। সেদিন সকাল থেকে যেখ ভরনোহে। গুরু-গুরু মেঘা ডাকছে। গোষ্ঠীবাবু সার্কাস-মাস্টার। গোপীকে সোনার চোখে দেখতেন। তাঁর ঘরে বসে আছে গোপী। অনন্তবাবু ঢুকলো। সাতাশবছরের জেয়ান। কালো রং। বাবরী চুল। পাগোড়ের মতো শরীর। বললো,—গোষ্ঠদা, আমি আজ নামবোনা।

—কেন? শরীর খারাপ করেছে?

—অ্যাড এরিনায় নামলে আমি আর ফিরবোনা। আমার মন জানাচ্ছে।

—ভয় পেয়েছিস অনন্ত?

—ভয় নয়। নিশ্চয় জানলাম।

—মুঠ হতে একঘণ্টা বাকি। এখন এ কি বলছিস অনন্ত?

অনন্তবাবু আর গোষ্ঠদাস্টারের মধ্যে কথা হলো। গোপীকে বের করে দোর বন্ধ করলো অনন্ত। অনেক কথা হলো। বেরিয়ে এসে অনন্তবাবু ড্রেস করতে গেলো। বাঘচাল-ছাপা জাভিরা পরে গায়ে ভদ্র মেয়ে গুরুদেবের ছবিকে নমস্কার করলো। হাসতে হাসতে অনন্তবাবু গোষ্ঠবাবুকে বললো,—আমার সোনার বেডেল ক'টা, আর তোমার কাছে যে দুইশো টাকা রেখেছি সব কালেক্টরির স্ট্রাক মদন পালিতকে পৌছিয়ে দিয়ে। গোষ্ঠদা! ওরা চাটগাঁর অস্ত্র টাকা তুলছে। চাটগাঁ-এ অনেক টাকার দরকার হবে।

—চুপ কর অনন্ত। বাঃবেল তুলিসনি আজ। মনটা ঠিক নেই এখন।

আসরে নেবে অনন্ত দত্ত সেদিন অপূর্ব খেলা দেখালো। হাতি তুললো। মোটির কুখলো। দাঁতে কানড়ে মানুষ-বোকাই বেঞ্চ তুললো। তারপর আনলো বাঃবেল। দুই মণ থেকে শুরু করে। চারমণ অবধি তোলে। সেদিন সাড়ে চারমণ অবধি তুলবে বলে ঘোষণা করলো। পদ্মগমে এনি। দুইহাজার দর্শক। গোষ্ঠদাস্টার হানা

করতে পারলোনা। সকলের মুক্ত চোখের সামনে সমস্ত রেকর্ড ভেঙে বাঙালী ছেলে অনন্ত দত্ত সাড়ে চারমণ বাঃবেল তুললো। বললো,—বেগুন, বাঙালী কান থেকে পিছিয়ে রয়েছে?

লাল-ভেলভেট-নোড়া চোয়ারগুলো ভর্তি শুধুই সায়েব আর নেন। সময়টা খারাপ। সব চাটগাঁর জালালাবাদ পাহাড়ে স্বর্ষ সেন, নির্মল সেন, অবিকা চক্রবর্তীর লড়ায়ের খবর চাপু হয়েছে। টেগরার নাম ফিরছে মুখে মুখে। 'বাঙালী' এই কথা শুনে আর অনন্ত দত্তর দিকে চেয়ে সাহেবদের মুখ লাল হলো। অনন্ত দত্ত বাঃবেল তুলে দাঁড়িয়ে রইলো পুরো তিরিশ সেকেন্ড। মুখে অহ-অহ হাসি। হাততালির কড়। তারপর প্রথমে পড়লো বাঃবেল। হাত থেকে বৃকে। সেখান থেকে মাটিতে। তারপর পড়লো অনন্ত দত্ত। নাক দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত বেরুলো হ-হ করে। শেষ হয়ে গেল একখান। সাতাশবছরের জীবন! বাঙালী-জাতির গৌরব।

এইসব মানুষের সাহচর্য পেয়েও গোপীনাথ মনোপ্রাণে বাড়তে পারেনি। সেহটা বাড়লো। প্রবৃত্তিগুলোও বাড়লো। কিন্তু এইসব মানুষের মহাব নিজের মধ্যে নেবার যোগ্যতা তার হ'লো না কখনও।

মনোহরকে গোপীনাথ তাই ব্যবসাগত দিকটা বোঝালো। বললো,—সার্কাসের মানুষের ইনসিগর হয়না। কোম্পানিও কোন স্কি নেয়না। বৃকে-শুনেই আসবে তুমি।

টিপ-ছাপ দিলো মনোহর। সে মনোহরচন্দ্র দাস, যশোর জেলার কিনাইদ-নিবাসী স্বর্গত রাইচরণ দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বয়স ছাব্বিশ। নিজে টিপ-ছাপ দিয়ে কবুল খাচ্ছে যে, এটো জুবিলী সার্কাসে আর্টিস্ট থাকাকালীন কোনরূপ দুর্ঘটনার জখম হলে বা মৃত্যু ঘটলে সার্কাস-কোম্পানি তার অস্ত্র দাতী হবে না।

সইসাবুঘ মিটলে পরে চামেলীর তাঁবু। আজ

আর অনধিকারীর মতো ধীরে ধীরে নয়। গলা সংযত করে অল্প অল্প কথা নয়। চামেলীর বাচ্চাদের আদর করতে করতে, শশীকে উঁচু গলায় ডেকে ঢুকলো মনোহর। বললো,—মিষ্টি নিয়ে আসি? গেলাম মাসী। কি খাবে বলো? মিষ্টি নিয়ে আসি?

ময়লা রঙীন কাপড়খানা ভারী শরীরে গোছ করে টেনেটেনে উঠে এলো মাসী। বললো,—তুমি কেন খাওয়াবে মিষ্টি? আগে আমার ঘরে মিষ্টিমুখ করা? বলি অ বো?

শশী বললো,—মিষ্টি খায় কচি ছেলে।

শশীর ইঙ্গিত বুঝে মনোহর হাসলো। বললে,—মে তোমার আমার হবে'খন শশীদা। রাজুক এনে দেবে। চোদ্দ আনা দুই বোতল। এখানে যা ফাস্ট্রাস নদীর ধার দেখে এইছি না? সেখানে বসবো। সুকুলদাকে নে যাব।

মনোহরের পদোন্নতিতে সকলেই খুশী হলো। সার্কাসে এমনটি সবসময় ঘটনা। চামেলীর ঔরুতে একদিন টি-পার্টী হলো। পাঁচটায় খেলা শুরু। চারটায় সেক্ষেত্রে বঃ মেবে এলো সবাই। টাইট-পরা ছেলেমেয়েদের মাঝখানে মাসীর শাড়ীটা নেহাত বে-মানান বোধ হলো। কিরণ আনলো নিমকি। সুকুলবাবু খাওয়াগো সন্দেহ। যে যার মতো খেয়ে নিয়ে ছুটে ঔরুতে চলে গেলো।

প্রেমতারার এলোনা। যে দেখলে সবচেয়ে খুশী হতো মনোহর, সে-ই রইলো আড়ালে। চামেলী রেগে বললো,—দর বাড়াক্কে। গরবী! অংখার হয়েছে। আজ আর শাশুড়ী-বোয়ে বিবাহ হলোনা। কি বুঝলো তা মাসী-ই জানে। চামেলীর কথার কোন প্রতিবাদ করলোনা। বললো,—যে যার মতো থাকুকনা কেন বো, তোর দরকার কি?

সোপীনাথেরও চোখে লাগলো। কদিন আগেও মনোহরের সম্পর্কে প্রেমতারার বাড়াবাড়িটা ছিলো চোখে লাগবার মতো। চলতে কিরতে চোখে চোখে চেয়ে হাসি, সময় খুঁজে নিয়ে তাঁবুর দড়ি ধরে কাং হয়ে পাড়িয়ে শব্দরা করা।

সময়ে অসময়ে মনোহরকে উস্কানি দেওয়া। অথচ যখন মনোহর সত্যিই অস্টিগ্ট হলো তখন সকলেই ছুই-এক কথা কইলো, শুধু প্রেমতারাই রইলো চুপচাপ। এমন চুপচাপ, যে দেখেও রাখেনা মনোহরকে। অতবড় একটা মানুষ যেন চোখেই পড়েনা তার। চামেলীর মতো অল্প মানুষেরও চটলো। প্রেমতারার কাছে নানা ভাবে স্বামী সার্কাসের মানুষ। টাকা ধার নিতে, ওষুধ নিতে, বি-আচার-পাপর নিতে, মাস্টারকে দুটো কথা কইতে। আবার মনোহরও তাদের প্রিয়।

অসময়ে মনোহর রোগে সেবা করে, সহরবাজার থেকে জিনিস এনে দেয়, প্রাণ দিয়ে খাটে দরকার হ'লে। শুধু মিষ্টি কথাতেই হুট মনোহর। তার বেশী কিছু চায়না। তাই তার ওপর সকলেই খুশী। প্রেমতারার সম্পর্কে তাই শো-এর ঝাঁকে ঝাঁকে ছেলেমেয়েরা কথা চালাচালি করলো। একটাকার সাইকেল চড়ে, রঙীন প্রজাপতি সেজে ঘনবন করে ঘুরতে ঘুরতে বুলি, মীরা, গীতা, চিত্রা, চন্দন, ময়না এইসব মেয়েরা পরিমল, ননী, শশী, প্রসাদ, বাশী এইসব ছেলেদের দিকে চেয়ে চোখে চোখে বললো—এতদিনে প্রেমতারার বশ মানলো। হেরে গেল মনোহরের কাছে।

বেলা দেখাতে-দেখাতেই দর্শকদের দিকে চেয়ে বার বার হাসতে হয়। মাথায় গোঁজা কাগজের ফুল নাচিয়ে হেসে মেয়েরা রাউণ্ড থেকে বেরিয়ে যায়। তখন মাথো-জাথো ছুই ক্রাউন উল্টে-উল্টে দর্শকদের হাসাতে হাসাতে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে,—কেখানে বাটারে এতো-না দেখার ভান, সেখানেই মরেছে মার্কাস-কুইন।

প্রেমতারার সিংহ শব্দর এখন বাধ্য হয়েছে। হাতির পিঠে ওঠে শব্দর। তার ওপর ছাতা হাতে বসে প্রেমতারার। হাতি এরিদা ঘোরে আর নিচে পাড়িয়ে মনোহর রিং-কন্ট্রোল করে। তবু কোন কথা হয়না।

ভেতরে ভেতরে কি টানা-পোড়েন চলছে সে-কথা প্রকাশ পেতে হয়তো তেরি হতো। বাইরের এই লুকোচুরির ভাবটা বেশ কিছুদিন ধরে চলতো। কিন্তু হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটলো। তাতেই নাড়াচাড়া পড়লো।

কেষ্টবাবুর আরবী ঘোড়া কেপে গেলো। দেশী ঘোড়া নয়। অস্ট্রেলিয়ান ওয়েলার। হাজারের নিচে ধান নয়। সায়েবের কাছে থাকতেই পাগলা কুকুর কামড়িয়েছিলো। অনেকদিন কোন উপদ্রব করেনি। কেষ্টবাবু সস্তায় কিনেছিলো সার্কাসে। এবার অশ্রুপন্ন গোলমাল চলছিলো অনেকদিন। সকালের দিকে বাণপাটী নতুন সুর তুলছে। রাউটি চলছে পুরোনো। হঠাৎ কেপে গেল আরবী। ছোকরা সহিসকে এক চাঁট মেরে কেলে দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে ক্যানটিনের তাঁবুর সব-কিছু উলটিয়ে ত্যাগ করে নেচে বেড়াতে লাগলো। কুরে ধুলো উড়ছে, নাক মুখ দিয়ে কেনা পড়ছে, চোখের চাহনি ভয়ানক। যে দ্বার মতো এরিনার ভেতরে এলো ছন্দুড় করে। বাক্সা সহিসটার সাহস আন্দর্ভ। পায়েব মাংস কুলে পড়ছে। রক্ত পড়ছে কবরুর ক'রে। তবু হোঁচাই খেতে খেতে এলো ছুটে।—মাস্টার! মাস্টার! আরবী পাগল হয়ে গেল মাস্টার।

নিজের তাঁবু থেকে রিভলবার নিয়ে ছুটতে-ছুটতে এলো গোপীনাথ। প্রথম গুলীটা চামড়া ছিঁড়ে নিয়ে গেলো। দ্বিতীয় গুলী লাগলো কানের নিচে। ধ্বসে পড়লো আরবীর চমৎকার সেইটা।

আত্মাই নবীতি চমৎকার। ছোট, খরশ্রোত, নির্ভল জল। তার তুইপাশে চালু ঘাসের জমি। ধনী কোতদার গোলমিঞার কাছ থেকে দশহাত জমি খরিদ করলো গোপীনাথ। কবর দিলো আরবীকে। এমনিতে খেলা দেখাতে-দেখাতে যদি বৃদ্ধো হতো আরবী, তবে তাকে ছেড়ে দিতো মাস্টার। চ'রে

খেতো। অথবা না খেয়ে মরতো। কাজ কুরিয়ে গেলে আবার কে কার বোঝে রাখে!

ভাগ্যে পাগলা কুকুর কামড়েছিল আরবীকে! মরে বেঁচে গেল আরবী।

সার্কাসে আরবী-ও ছিলো একজন আর্টিস্ট। তার অভাবটা সকলেরই কম-বেশী মনে হলো। সহিস-ছোকরার যে জখমটা দেখা গিয়েছিলো পায়ে, তার চেয়ে অনেক মারাত্মক চোট লেগেছিলো তলপেটে। সকালবেলাই হাসপাতালে ভাঙে নিয়ে যায় কেষ্টবাবু। ভেতরে রক্তপাত হয়ে ছেলোটা মারা গেলো রাত দশটায়। ছোকরা ডাক্তার বার বার মাথা নাড়লো। উপযুক্ত সরঞ্জাম, ওষুধ সব-কিছুরই অভাব। এমন কি বরফ পর্যন্ত মিললোনা একটুটি। কেষ্টবাবুর মনটা নয়ম। মাহুঘের কষ্ট দেখতে পারেনা। তাই মনোহরকে সঙ্গে নিয়েছিলো। দুজনকে সান্নী রেখে অ-চিকিৎসার মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো ছোকরা সহিস কালু-ঘরাখীর চোদবছরের জান।

তবু শো হলো। সার্কাসে এমনই হয়। যারা দেখছে তারা বৃক্ষে পারেনা। আজও তারা বৃক্সলোনা যে, বলের মাহুঘ আর ঘোড়ার এইরকম আকর্ষক মৃত্যুতে মনটা ধারণ করেছে আর্টিস্টদের। বৃক্সলোনা যে লাগুন-মাস্টার মনোহরের চোখে বার বার কালু-ঘরাখীর মুখখানা ভেসে উঠছে। সেইজন্তেই একবার বে-সামান হলো মনোহর। আগুনের রিং-এ লাফাতে গিয়ে আঁচ লাগলো গায়ে, আর গর্জে উঠলো বাগশ। প্রেমভারা নিচু গলার বললো,—খররবার! সামলে!

সামলে নিলো মনোহর।

সেদিন রাতে বাঘশাকে দেখেজনে, জখ্মীর খবরদারি শেষ ক'রে মনোহর বাইরেই আনলো তার খাটিয়া। গড়িগড়া জড়িয়ে শালকাঠের খুঁটিটা উঠেছে আকাশপানে। তার গায়ে ঠেস দিয়ে ব'সে বিড়ি ধরালো মনোহর।

প্রেমমত্তারা এলো সেখানে। চোখ তুলে দেখলো মনোহর। এখন সাণা পাঁতলা কাপড়, চুলে উচু করে খোঁপা বাঁধা—ছিন্নছিন্ন।

নানা কারণে মনটা ভালো নেই আজ। জীবনের চলমান ছন্দটাকে পরোয়া না করেই মৃত্যু এসে দেখা দিয়ে গিয়েছে। বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছে জীবন কতো অনিত্য। এইসব নানা ভাবনার ভাষি হয়ে আছে মনোহরের মন। প্রেমমত্তারার সঙ্গে এতদিনের মনকষাকষির কথা তার মনে পড়লোনা। তার বন্ধুমানুষ একজন এসেছে, এই মনে হলো তার। বললো,—বোসো।

বসলো প্রেমমত্তারা। বিড়িটা ঘাসের ওপর ফেলে পা দিয়ে পিষে দিয়ে মনোহর বলে উঠলো,—ধূতোর-কিসের টান? কার জন্তে বলো? এই সকালবেলা খেল বেড়াচ্ছিল, এখন ডাখোঁগে লাশ-কাটা ঘর কয়ল-চাপা পড়ে আছে। বুঝিয়ে গেল খেলা! আরে, এই যদি বেলার রকম হয়,

তবে আর কিসের জন্তে ছেঁড়া কথা নিয়ে টানটানি করি? ভাবলে পাবে, বুলে গো প্রেমমত্তারা, ঘেঁষা এসে যায় কারবাতে, অ্যা! বলো সত্যি কিনা?

জবাব দেয় না প্রেমমত্তারা। মনোহরের কড়া-পড়া বাঁ-হাতখানা নিজের হাতে টেনে নেয়। হুজনেই চুপ করে থাকে। ছোট কথা বোকাপড়াটা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের অনেক-কিছুর দাম যেমন একদিকে কমে তেমনি বেড়ে যায় অন্যদিকে। গভীর অস্থিরবাসী এক সত্য ছাড়া অন্য কিছু যেন চোখে পড়েনা। লঘুভাবে বাঁচতে যেন ইচ্ছে করছেন। আজ জীবনের এই বিশাল ও মহান পরিচয় জানবার জন্তে যেন আজকের এই মর্যস্তর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিলো। সম্ভব মনে বসে রইলো ওরা দুজন। সব চুপচাপ। শরতের শিশির ফরছে। সে-শব্দও যেন শোনায় কান পাঁতলে।

[কন্স:]

লৌকিক দেবী মনসা

চিত্তরঞ্জন দেব

পুরাণোক্ত দেব-দেবী ছাড়াও বাংলা তথা ভারতের সর্বত্রই কিছু কিছু লৌকিক দেব-দেবীর কাহিনী, গান ও গাথা ছড়িয়ে আছে। সম্রাটের উপর এইসব দেব-দেবীর প্রভাব পুরাণোক্ত দেব-দেবীর চাইতে কোনো অংশে কম তো নয়ই, বরং এঁদের প্রাধান্য অনেক সময় পুরাণোক্ত দেব-দেবীর চাইতে অনেক বেশী বলেই মনে হয়। লৌকিক দেব-দেবীর মধ্যে সর্বদেবী মনসার স্থান বোধহয় সর্বোচ্চে।

এইসব লৌকিক দেব-দেবীর কাহিনীর সঙ্গে এমন কতকগুলি অলৌকিক বাস্তবদর্শী বিষয় যুক্ত থাকে, যে কারণে এইসব দেব-দেবীরা পুরাণোক্ত দেব-দেবীর চাইতেও সাধারণ লোকের কাছে অতিমাত্রায় আশ্রয় বলে প্রমাণিত হন।

উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা চলে মেদিনীপুর জেলার একটি কাহিনী:

কোনো এক গ্রামে একটি কীলোক দান ভানছিল চৌকিঘর বসে। কাছেই বসে ছিল তার নব্বোল বছরের ছেলে। এদিকে চৌকিঘরের কাটল থেকে একটি গোখরো লাশ বশা বের করে ক্রমাগত ছেলেটিকে ধ্বংস করবার অস্ত্র ছোঁবল হারবার চোঁটা করছিল। কিন্তু মাঝখানে চৌকির ব্যবধান থাকায় লাশটির আক্রমণ প্রতিবারই ব্যাহত হচ্ছিল। এই সময় দূর থেকে এক প্রতিবেশী ঘটনাটা লক্ষ্য করে ছেলেটিকে তখনকার মতো উদ্ধার করে। বাড়ির লোকেরা সব বলাবলি করতে থাকে, লাশটি কোনো কারণে ছেলেটির উপর স্থিতি হয়েছে—প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না। বাহুরে ছেলেটিকে বুঝ সাবধানে রাখবার ব্যবস্থা হল। সাধারণত ছেলেটিকে নিয়ে তার মা ঘুমোল উঠানের মাঝে চৌকি পেতে। উপরে টাঙানো হল মশারি। তার চৌকির চারদিকে জেগে

কড়া পাখাডার রইল বাড়ির সব লোকজন। হাত ভোর পর্যন্ত কোনই ঘুপটনা ঘটল না। ভোজের দিকে আখার দিকে হুহু এসে, উপস্থিত লোকেরা বিশপ কেটে গেছে ডেবে একটু সময়ের জন্য অল্পমনস্ক হয়েছে, কিংবা উঠি-উঠি করছে—ছেলের মা-ও বাসী শয্যা ত্যাগ করে বাড়ির ভিতর গেছে—আর ঠিক সেই মুহুর্তে চৌচিরে উঠল ছেলেটি। চাঁদরকার তুলে সবলে এগিয়ে এল মশারির কাছে। বেবল, একটি কালো গোংগো সাপ দুটে বেরিয়ে আসছে মশারির মধ্য থেকে। এর কিছুক্ষণ পরেই ছেলেটি মারা যায়।

এর সঙ্গে মনসানসলের কাহিনীর বেশ একটা যোগস্বয় আবিষ্কার করা যায়। লকিনবরের দূতর দূতের পিছনেও বাস্তবে ঠিক এই ধরনের কোনো কাহিনীর অস্তিত্ব থাকে কিছুদূরই আশ্চর্য নয়।

আর একটি কাহিনী ঘটে পূর্ববঙ্গের করিমপুর জেলায়। কোনো একটা লোক ব্রহ্মাণ্ডি হয়ে মনসার ঘট পেলেন। লোকটি মহাভক্তিস্বরূপের প্রতিদিন মনসার পূজা করেন : এর অতি মনসারের মধ্যেই সামান্য অবস্থা থেকে বেশ সজ্জল অবস্থায় এসে পৌঁছন। মনসার জন্ত বাড়ির ভিতর তৈরি করা হল ছোট একটি টিনের ছাউনি-মেঝে মণ্ডপঘর। দূঃ-দুরাশ্রয় থেকে লোক আসতে লাগল পূজা দিতে। কলতঃ, প্রণামী বাকলও বেশ কিছু টাকা সংগৃহীত হল মনসার নামে। বাড়ির গৃহস্থ সে-টাকা নিজের কাছেই মনসার নামে আলাদা একটি বাস্তব রেখে রাখেন। ইচ্ছে—আরও কিছু টাকা সংগৃহীত হলে মনসার জন্ত একটি মন্দির তৈরি করে দেবেন। এর মধ্যে একদিন দশ মাইল দূর থেকে তাঁর আনাই এসে বেড়াতে। কথায় কথায় সে বলে কেলসো, তার বাড়ির কাছাকাছিই একটা ভালো ধানী মনি আছে, হুশো টাকা হলে কেনা যায়। তবে তখন তার হাতে টাকা নেই, শতরমলাই যদি হুশো টাকা ধার দেন তাহলে ঠিক একমাসের মধ্যেই সে টাকাটা পরিশোধ করে দেবে। শতর বললেন, আবার তো অত টাকা আশ্রিতঃ হাতে নেই, তবে ১০-মনসার কিছু টাকা আছে—তাঁর মন্দির বানাব বলে রেখে দিচ্ছে, তুমি যদি ঠিক একমাসের মধ্যেই টাকাটা পরিশোধ করতে পার তাহলে ধার আদায় নিয়ে তোমার দিতে পারি।

আনাই শিক্তি দ্বন্দ্ব। ৩-সব স্বাভাবিকী পক্ষে মোটেই বিশ্বাসী নয় ; ভাল, শতররই টাকা, তবে ঠিকমতো কেরত শাবার জন্তই এই পক্ষের অবতারণা। তবু কাল উত্তরের

জন্ত সে কথার প্রতিবাদ না করে সেই সর্বোচ্চ হুশো টাকা ধার নিয়ে দেশে রওনা হল।

অনেক দূরের পথ। হাটা-পথ। আনাই একটানা হেটে চলেছে। মাইল পাচেক ধাবার পর একটু জিরিয়ে নেবার জন্ত বলল এক গাছতলায়। হঠাৎ দিছনে কোল-কোল শব্দ শুনেই তাকিয়ে দেখে—বেশ বড় কালো-বগের গোংগো সাপ (চন্ডি কথায় 'মাতঙ্গাণ')।

আনাই তো সাপ দেখেই গিল এক চিংকার। সাপটিও সেই অবসরে কোথায় বেন পাঙ্গিয়ে গেল।

বাড়ি এসে এ-টাকা বা সাপের কথা কিছুই প্রকাশ করল না হীর কাছে। হঠাৎ মাকরাতে ঘরের বেড়ার গাথ বেন কিসের কণ্ঠস্ব শব্দ। শব্দ শুনেই দড়মড় করে উঠে বসল আনাই। আলো আলসে কিছুই দেখা যায় না। সে রাতে আর কিছুই ঘটল না। কিন্তু এই রকম চলতে লাগল প্রায় স্রোম স্রোমেই। শেরটার আনাই একদিন সব কথা খুলে বললো তাঁর হীর কাছে। হী তো খটনা শুনেই মাথা ঘামা! বলে, বাও, একুনি কেরত দিয়ে এসো ও-টাকা, কাম নেই আমাদের জমির।

কিন্তু টাকা কেরত দেবার তখন কোনো উপায়-ই নেই। সে-টাকা দিয়ে একদিনে জমি কেনা হয় গেছে।

একমাসের আর বেশি বাকী নেই। কদিন হল রাতে আর সে-রকম টাকো উৎপাত পোনা যায় না। আনাই ভাবল, হাক, আপস গেছে। এখন ঘরে-বুহে টাকাটা দিলেই চলবে। দেহতে দেহতে একমাস চলে গেল। হঠাৎ একদিন রাতে ধোয়ান্টি ঘুমতে গেছে আনাই। ভোর হয়েছ; জী শয্যা ত্যাগ করে ঘরের কামকর্ষ করছে। বেলা দুপুর হয়। ডেকেছ, খামি হযত কোনো কাছে ভোরেই বেরিয়ে গেছে। কাছে ব্যত থাকার এদিকে আদম্বার আর কুসন্ত পায়নি। হঠাৎ কি কাছে এ-ধরে এসে রেখে তখনও শাশির কোলা রয়েছে। খামি তখনও ঘুমচ্ছে। শাশির উঠিয়ে গা ধরে তেলা দিতেই চকু ফির। একবারে নীল হয়ে গেছে পোটা শরীরটা। একবারে লজ কাঠি!

রোঝা ডাকা হল। কাড়কুক, তুতাতুক শিহুরই বাকী হইল না। কিন্তু নাঃ, সব শেষ! রোঝা বললো, এক ভালো করা রোমার বাবা বহু-ধন্যরিতও হাত নেই। একবারে অটনাগে যা দিচ্ছে—বেশছেন না আট আশপাশ কামকর্ষ সাপ ?

এদিকে আনাইকে টাকা ধার দেবার পর থেকেই নাকি

বস্ত্রমণাই যেখানে-সেখানে সাপের বাজা দেখতে শুক
করিলেন। মনে মনে ভাবেন, কাছটা ভালো করেননি। মা-
মনসার কাছে কথা চান—‘হা, হা হবার তা হচ্ছে, ঠিক
একমালের মতোই তোমার টাকার দ্বিরিখে বেব।’

একমাস কেটে গেল। বস্ত্রও নানা স্বকোটে তুলে
গেলেম টাকার কথা। সেদিন রাতে স্বামিনিয়ে ঘুমতে গেছেন
বস্ত্রমণাই, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমছে পাঁচবছরের এক নাতনী।

ভোর হয়। নাতনী বিছানো ছেড়ে উঠে চলে গেছে
বাইরে খেলা করতে। বেলা হলে ঠাকুরা বললেন, হাও বিদা,
হাওকে তেজ নিয়ে এগো তো? এখনও ঘুম থেকে উঠছে না
কেন—অস্থক-বিস্থক কিন্তু করল না তো?

নাতনী এসে ভাকে, হাঃ, হা হাঃ!

সাতা দেই।

নাতনী গিয়ে খবর দিল—হাঃ উঠছে না, কথাও
বলছে না।

খবর শুনে ঠাকুরা ব্যস্ত হয়ে ঘরে এসে দেখেন, ঠিক
দেখাবে রাতে ঘুমিয়েছিলেন সেইভাবেই ঘুমিয়ে রয়েছেন।
মরে কাঠ হয়ে পড়ে রয়েছেন! বুড়ি তো মা-মনসার বেগে
ধনী ছিলেন। চেলেঙ্গা সাধামতো রোজা-খড়ি আলাল ছুর
বাঁ থেকে। তিনদিন মজা রেখে বেগবা হল। কিন্তু সবাইর
মুখেই এক কথা—‘মার আক্রোশ পড়ছিল, কোনো কারণে
তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এবার আর নিজার দেই। দেখছো
না—মাখার, গলাধ, দিঠে, কোমরে, পাখ, হাতে প্রায়
আটখণ্ড মাংসখার কাছড়াইছে—এ সব মা-মনসার অষ্টবহ
(অষ্টাপুত্র মনসার পুত্রগণ) এসেছিল একত্রে। সব
মা-মনসার বাবা মহাশয়ের এলো একে বাঁচাতে পারলেন না।’

সাপের এই ধরনের প্রতিহিংসা-প্রকাশের পদ্ধতি ও
কাহিনী প্রচুর শোনা যায়। বাংলার সর্বত্রই এ ধরনের
অগাধ কাহিনী ছড়িয়ে আছে। তা ছাড়া মনসার দ্বারা
ঐশ্বর্যলাভের কাহিনীও কিন্তু কিছু শোনা যায়। শোনা
যায়, ঠাকুরার এক আটখরের স্বত-চিকিৎসকগণও নাকি এই-
রকমই কি একটা মনসা-প্রদত্ত গুণ ব্রহ্মদেশে পেয়েছিলেন,
যার বৌলভেই নাকি তাঁদের এত বিষয়-বৈভব।

এ ছাড়া অনেক শোনা এবং বাজ-সাপের কাহিনীও
শোনা যায়।

কোনো এক বাড়িতে মনসার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল।
রোমাই দেবীর পূজা হয়। পূজার শেষে পূজারী-ঠাকুর
দুটি কানো পাখরের বাড়িতে ছাঁড়ি দ্বণ ও কলা এনে
মনসার কাছে নিবেদন করে ডাক দিতেন—‘আজের আমায়

কালচাঁপ-গোরাচাঁপ!’ আর সঙ্গে সঙ্গে দেবী-প্রতিমার
কাঠাঘোর তলা থেকে বেরিয়ে আসত একটি শেতবর্ণের,
অশ্রুটি ক্রকবর্ণের গোখরো শাপ। তারো দু’পাশ দিয়ে এসে
বে হার নির্দিষ্ট বাড়িতে রাখা দ্বণ ও কলা বেগে আবার
ফিরে যেত বে-বার মাংসপায়।

সাপুড়িয়া বা বেগ-বেগুনীদের সর্প-শ্রুতিও অনেকটা
এই রকমের। যেসে বা সাপুড়িয়া তাদের সাপকে আবার
ক’রে গলাধ ধারণ করে তার একান্ত স্নেহভরে মতোই।
তাদের কাছেও এই ধরনের বহু কাহিনী শোনা যায়।
মনসামঙ্গল-কাব্য বা পাঁচালী রচনার সঙ্গে সেগুলিও কম
সদ্বাহক নয়।

সুতরাং ভব থেকেই তত্ত্ব তথা পূজার প্রচলন, এ বিষয়ে
আর সন্দেহ নেই। এ কথা সত্য বলে মনে নিলে, হিংসা-
ক্রোধী সর্পের স্বস্ত সর্পদেবী মনসা, বাংলার উৎপাতের স্বস্ত
ধ্বনিগায়, বনস্ত মহামারীর স্বস্ত ঈশ্বর-ঠাকুরানীর পূজা।
বা এই রকমের দেব-দেবীই আমাদের সমাজের সঙ্গে দৃঢ়
হয়ে আছেন। তবে এইসব দৌকিক দেব-দেবীর মধ্যে
শ্রী-দেবতার সংখ্যাই সমৃদ্ধ।

বাংলাদেশে সর্পবহুল, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ তো বটেই।
কালোই এখানে সর্পদেবী মনসার প্রতাপটা একটু বেশী
মানোই থাকবে এ আর আশ্চর্য কি? পূর্ববঙ্গে শ্রাবণ-
সংক্রান্তিতে করে মনসা-পূজা, ত্রৈলোক্য বৈশাখ মাসেও
কোথাও কোথাও মনসা-পূজা হয়ে থাকে। এ সকলে
শ্রাবণে যে মনসা-পূজা হয়, তাই নাম দিয়েছে গুণ্ডালী
পূজা। কেউ কেউ একে মাখ্যা দিয়েছেন ভূত-পূজা
বলে। এর কারণও আছে। সর্বত্রই মনসা-পূজা উপলক্ষে
পাঁচালী, পালাগান ইত্যাদি হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে
এসবের পরিবর্তে দেখা যায় মেকাচার। পূজার পর বলি-
বেগবা ছাপদুও নিয়ে ছুর হস্তায়েই শুক হয়, মন পরে
পুঙ্খবোঝা করে মাতলাদি। এসব দেখেই বোধহয় উপরি-উক্ত
মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ। বীজভূমেরই এক মাংসপায়
ভাইমাসেও মনসা-পূজা হয়ে থাকে। কোথাও কোথাও
কলেঙ্গা বনস্ত প্রকৃতি মহামারীর সনধ্য ঈশ্বর-ঠাকুরানীর
সঙ্গে মনসা-দেবীর পূজা হতে দেখা যায়। বাঁজুড়ার দেখা
যায় সনধ্যার দিন মনসার পূজা করতে। বাংলার বাইরে
দক্ষিণাফ্রিকা, বিশেষ করে নাগপুর—নাগপকর্ষিত মনসা-
পূজা পূর্ববঙ্গের মতোই একটা অবতরনগরী পূজা হয়ে
থাকছে। পূর্ববঙ্গেও কোনো কোনো অঞ্চলে যেসবের
ঐ নাগপকর্ষীর মনে ব্রত করতে দেখা যায়।

এর পূর্বা-পশ্চিমে ও মূর্তিও নানা রকমের। এক পূর্বদিকই এই নানা রকমের মূর্তি ও ঘণ্টার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। কুমারেরা মনসা-ঘট বলে একরকমের বিশেষ ধরনের ঘটও প্রস্তুত করে গুই উপাসক। বহির্গাম জেলার যে-সব মূর্তি ও ঘট দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে দেখা যায় মনসার চাকখানি হাতে, কুটুং-হাঙ্গেশ্বরী। উপরের দুই হাতে ছুটি বর্ণশিখ, মাথার সাপের মূর্তি। ঘটগুলিও বিভিন্ন ধরনের। এগুলির পেটটি মোটা, তার উপরটি আছে আছে সৰু হাতে হাতে উঠে শেষপ্রান্তে গিয়ে মাথার ছড়ানো। অনেকটা মাটির মতো, তবে উপরটি কলসীর মূর্ধার মতো ছড়ানো। ঘণ্টার দুখণ্ডিও একটি ঢাকনি দিয়ে ঢাকা। এই ঢাকনির আকৃতিও অনেকটা মূর্ধার মতো, তাতেও বর্ণ অঙ্কিত। ঘণ্টার নমুণে ভাগে প্রায় সঠি। মুছেই রয়েছে নব্য-পরিষ্কার মনসা-দেবীর মূখাবয়ব। দু'পাশে ছুটি বিবধর বর্ণ। কোনো কোনো ঘট অনেকটা বেতুলের মতো, নিচটা সৰু, পেটটা মোটা, উপরটা আগের মতোই একটু ছড়ানো—যায়ে মনসার আকৃতি। করিমপুর অঞ্চলে যে-সব মনসা-ঘট দেখা যায় তার মধ্যে কতকগুলি আছে যাতে কোনো চিত্র নেই। কিন্তু কতকগুলি আকারে একটু বড়। সেখানে তেতবর্ণের। ঘণ্টার নমুণে মনসার মুখাবয়ব, দু'পাশে ছুটি বিবধর বর্ণ পৃথকভাবে বুদ্ধ করা। মহামন্দির ও বংশাবরে যে-সব ঘট পাওয়া যায়, তার ভিতর দেখা যায় অন্যান্য একত্রে রক্তচন্দ্র, মাংসখানের দলটি একটু বড় ধরনের। ঘণ্টার উপরভাগটি অর্থাৎ ঢাকনিটি অনেকটা মূর্ধার মতো, তাও সর্পাকৃতি। চরিত-পরগনার কোনো কোনো অঞ্চলে দেখা যায়, চারিপাশে সাপ গ্রিক দুর্গাপ্রতিমার মাথার ঢালটিরের মতো—মাক্তখানে দেবী মনসা।

মূর্তি বা ঘট পূজা ছাড়াও, বাংলায় মনসা-কাটা গাছ এবং নন্দীমন্ডার গাছ পূজা করতে দেখা যায়। এ গাছের পাতাগুলো গ্রিক সাপের ফলার মতো। পাতার চারিদিকে অংশে বড় বড় কাটা। অনেক মাগধারী ওই গাছগুলিকে মনসার আকৃতি তৈরি পূজা করা হয়।

কোনো কোনো গ্রাম্যের জীবন্ত সাপও পূজা পেয়ে থাকে। সাপের বাটিতে করে দুখ-কলা রেখে দেওয়া হয় সাপের গাছ হিসাবে। সাপও নির্দিষ্ট সময়ে এসে দুখ-কলা খেয়ে যায়। বাড়ির কোনো সোঁক সামান্য-সামান্য গুললেও, তাকে কিছুই বলে না, পাশ কাটিয়ে চলে যায়। এও এক আশ্চর্য ব্যাপার।

কবীত বেগে আদিবাসীদের ভিতর উইটসির উপর

'মকমার' উদ্দেশ্যে পূজা করে। অনেক বলেন, এই মকমার-ই মনসা-মানে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে সর্প বা অস্ত্র কোনো কেব-দেবীর মূর্তি নেই, এখানে দেবী অস্ত্র। তবে তিনি যে সর্পদেবী, এ কথা জানা গেছে অধুনা-মানের ফলে। মনীষ্যে 'মকমার' নামে এক অধন্যারী ও অর্ধসর্পাকৃতি মূর্তির স্থান পাওয়া যায়। অনেকটা নাসকমায়ের কর্তৃত্ব মূর্তির অধরূপ। ময়ূরভক্ত স্টেটে থিওসেনব্রী নামে এক সর্পদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তার দুখানি হাত। দু'হাতেই দুটি সর্পশিখ, মাথার সিঁহনেও চরাকারে বিরাট এক সাপ—দেবী ধ্যানমগ্ন। শোনা যায়, এশিয়ার একটা পুরানো মাতির মধ্যে 'এলা' নামে অর্ধসর্পদেবীর পূজা হত। তাকেও মনসার সঙ্গে তুলনা করা চলে। সিংহলেও সর্পপূজা প্রচলিত। তারপর বহু রকমের মুখোপ-মূর্তির মধ্যে সর্পদেবের মুখোপ-মূর্তিটি অস্ত্রতম।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ভব থেকেই উক্তি, এবং এরই পরিণতি হল পূজা। বেদ বা পুরাণে মনসা-দেবীর কথা না থাকলেও, বেদ-পরবর্তী কালে কি ভাবে যে এই মনসা-দেবী বিষ্ণু-সম্বন্ধের তত্ত্ব শোটা ভাবতবর্গের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করলেন, এ সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট গবেষণার অবকাশ আছে। মনসা-মন্ডলের কাহিনী, পাঁচালী, রঘুনন্দী, ভাগবত, ক'পাল ও বেদে-বেদোন্মেষের গান ও কাহিনীগুলি ভালো করে অধ্যয়ন করলে এ কথাই প্রমাণিত হয়—মনসা-দেবী পূর্বে অনার্য দেবী ছিলেন, পরে আর্যগণের সঙ্গে অনার্যদের রক্তের সংমিশ্রণে ও সামাজিক রীতিনীতির বহু আদান-প্রদানের ফলে মনসা-দেবীও আর্যদামের দেবভাবগণ বীভূত হলেন।

পশ্চিমবঙ্গের মত আর্যদামে নারী-বেবতার কোনো স্থান ছিল না। মহেশ্বরাগত্যা ও হরম্মার আবিষ্কারের ফলে জানা যায়, প্রাক-ঐবিক যুগে যাক্তকার পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। মনসার রূপ-পরিকল্পনার ভিতর অনাধর্মসম্মত যাক্তা-পূজা বা শক্তি-পূজারই বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

আর্যগণ যখন ভারতে আগমন করলেন তখন তাঁরা প্রথম বগতি স্থাপন করলেন উত্তর-ভারতে। বাংলা, আসাম ও বাক্ষিপাতা তখনও আদিবাসী-অধুষিত। আর্যগণের যে-সব অঞ্চলে খুব-বেশি বিস্তারলাভ করতে পারেনি—বিশেষ করে হাইদের দিক থেকে কোনো কোনো বিষয়ে নবধন পরিগ্রহ করলেও, ভিতরকার সৌন্দর্য ধর্মের ভিতর প্রাচীনতম সংস্কারগুলি ঝুট-ই থেকে গেল।

মহাভারতের মূলে সর্প-বেবতাকে পূজ্য বলেই উল্লিখিত

হচ্ছে, তাই মহাভারতে নারায়ণ বাহুষ্কির কথা শোনা যায়। কিন্তু বাংলাদেশে ও বাসিন্দাদের প্রায় সর্বত্রই সর্পদেবী নারী ভাবেই পূজিতা হয়ে থাকেন।

কারণ কারণে মতে মনসাদেবী হলেন আত্মদেবী কেশবকারণের মাতা। আত্মদেব মিত্রবর্নের কামবাসনাভূতা সর্পরাজী মনসার সঙ্গে পর্বতবাসিনী কুমারী বিবিদ্যার ও সিদ্ধলাহ পুত্রের সংযোগের ফলে নাতানী কারণের মনসা সৃষ্টি হয়েছে। মনসার এক নাম 'বিষহরি'। যুব সত্ত্বত সংস্কৃত শব্দ 'বিষহরিকা' শব্দেরই উৎপত্তির মাত্র। মহাভারতের এক ছাণ্ডাল বিষহরি শব্দটি আত্মিক-উপাখ্যানের এক কারণ বিবিদ্যার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ঐষ্টীয় ধারণা শতক পর্যন্তও, কি তার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত সর্পদেবী মনসার সন্ধান পাওয়া যায় না। এর পরিবর্তে পূর্ব-ভারতীয় মহাভারত বা তাম্রিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ভাসুলী' নামক এক দেবীর নাম পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণের মতে এই 'ভাসুলী' দেবীর সঙ্গে বাংলার 'বিষহরি' বা মনসাদেবীর বেশ সাদৃশ্য আছে। ১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দে একটি কাব্যে মনসাদেবীকে 'ভাসুলী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতের অনেক পরে-সংগ্রহ গ্রন্থে বর্ণিত হয় তখন থেকেই মনে হয় এই সর্পদেবী হিন্দুধর্মে, বিশেষ করে আর্থসমাজে প্রবেশের অন্তর্যমিত্র। প্রাচীন ও বধ্য ধর্মের বাংলার শৈবধর্মের প্রভাব-বশতঃ মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখা যায় যে, মনসা শিবের কস্তুরসে বর্ণিত হয়েছে:

"বাগুদে, মহাসেব আমার [মনসার] বাপ,
চন্দ্র [বীর্য] পুঁল পদগায়ে,
পদপাত গলে দিয়ে নামিল পাতালে,
পাতালে চুম্বি আর বাহকী পাইয়া
আমায় করল জীবন সকার।"

কিন্তু সংস্কৃত উপপুরাণগুলিতে দেখা যায় তিনি নাগকস্তা কস্তপ কর্তৃক সৃষ্ট বলেই উল্লিখিত।

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথমেই পদ্মার (মনসার) জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনাকালে দেখতে পাই—পদ্মা যখন পার্শ্বদেশে গড়তে যায় তখনই অস্ত্রান্ত পদ্মারাজ্য তাকে ছাড়িয়া (আরম্ভ) বলে উপহাস করছে:

"একদিন আচম্ভিত হস্তখণ্ডি গড়িল ফুঁতে—
পদ্মা বলে, 'মা কুড়াইয়া ধাও',
মনসা-বচনে সবে বলে কই হইবা,
'মাতা পিতা নাহি তোমার আত্মস-অধিবা—
কেবা তুলিয়া দিবে তোমার হাতের বড়ি'।"

পদ্মা তখন কাসতে কাসতে দিয়ে হাবির নাগমাতা বাহুষ্কির কাছে:

"ও বয়াল রে আত্মা বলিয়া পদ্মার মিল গালি
ও তার বিষহরি দেবী তখন কান্ধিতে লাগিল।
কান্ধিতে কান্ধিতে গেল বাহকীর হানে
দেবী আবার সতী কেসে মইল সহরে।"

আর্থ বালকগণের পাঠ্যপুস্তকে অনার্থ বালকগণের শিক্ষা-গ্রহণ যে কতখানি কঠিন ব্যাপার ছিল তা কি আর কারণে জানতে পারি? তাহা মনসা-মহাভারত থেকে বহু কাব্য এবং উপকথারই এর প্রমাণ বেলে। আত্ম ও কি সাদা চামড়া আর কালো চামড়া একই বিভাগে, একই রেজো'র'র খেতে বলতে পারে? এ তো 'সত্যতার হিমালয়' বেশের কথা। বিশ পতাকীর শেষের এসেও যদি এই দৃষ্টই আত্মদের দেখতে হয়, তাহলে অগ্রমান করা কঠিন নয়, আর্থগণের ভারতে আত্মপতা বিভাগের পর অনার্থ দেব-দেবীকে সহজে তাঁরা গ্রহণ করেননি।

কিন্তু শুধু সমাজ গ্রহণ করলেই তো কার ফুল না—চটী, চুর্ণী, কালী, শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু যেমনি সকলের কাছে পূজ্য পান, সেইভাবে যদি সকলের কাছে আদৃত ও পুজিত না হওয়া যায়, তাহলে লাভ কি হল আর্থসমাজে প্রবেশাত্মিকের লাভ করে?

পরিভ্রমণ বলেন, টানের সঙ্গে মনসার বিবাহ মূলতঃ অনার্থদেবী মনসার হিন্দুসমাজে তথা আর্থসমাজে প্রতিষ্ঠা-লাভের সংগ্রামের-ই সংকেত মাত্র। চিরদিনই কোনো নতুন ব্যক্তির সমাজে বা আদরে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হলে কোনো প্রখ্যাত ব্যক্তির হৃদয়গ্রহণ ছাড়া হয় না। টানদাগার শিবভক্ত—শৈবধর্ম তথা আর্থসমাজের প্রতিমিথি। তিনি যদি তাঁর পূজ্য প্রদান করেন—তাহলেই তাঁর প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাই তিনি চাহকে এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা দিয়েও প্রাণে মারলেন না। কারণ, তিনি প্রাণে জানেন, টান যদি মরেই যান তাহলে কে আর তাঁর পূজ্য প্রচার করবেন? হুতরা: তাঁর আর আর্থসমাজের মধ্যে প্রচারলাভের কোনো হযোগই থাকবে না। তাই:

"বেউলা বলে পিতা [টানদাগার] তুমি মোর কথা ধর
মর্ত্যলোকে তুমি দেবী মনসার পূজা কর।
এত গুনি টান কেন বলে আক্ষেপ,
যে হতে পৃথিবীদ্বি শিব মূলপানি,
সেই হাতে কেনে পুজিব হুই চাঁওমুচি কাণী?
আকাশ হইতে দেববাণী তখন বৃষ্টি হয়,
বায়ু হতে পুজা সম্রাট নিশ্চয়।

এত স্তম্ভি টান ধেরে বাম হতে নিল পুষ্পাভিনি,
আকাশ হতে পুষ্পবৃষ্টি ফিরে এসো নকলি।”

কারও কারও হাতে মনসামঙ্গল কাব্য দুলত; শৈব ও শাক্তের স্বপ্ন চাড়া আর কিছুই নয়। টানসদাগর শৈব-ধর্মেরই ধ্বজাধারী, সমাজের তথা দেশের বাঁশ, শরম ধামিক—কাজেই “পুষ্টি”র সমাজে প্রবেশ করবার ছাড়পত্র তাঁর কাছে খোঁজেই আগে নেবার প্রয়োজন হয়ে বৈকি। বৌদ্ধমুগ্ধ অবস্থানের পর বৌদ্ধ-তাত্ত্বিকতা শৈব-তাত্ত্বিকতার ভিত্তির আচ্ছাদ্যপান করল। দেব, দিল শৈবধর্মের। বৌদ্ধ আচার-অঙ্গমানেও সঙ্গে সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিল শৈবধর্মের অঙ্গরূপে। অনেক বসন্ত, দিবস্ফুটি বৃদ্ধবৃষ্টিরই হাস-হাস্ত রূপ এবং আচ্ছাদ্য-বৃষ্টিও সঙ্গে সঙ্গে ভগবতী রূপে পরিণতি হতে লাগল। সমাজে পুরোপ্রতিভার প্রতীকিত হল শৈবধর্ম। এর পর অনাগ্রগণের সঙ্গে আনগণের বিবার নিশ্চয়ি হল, দুইয়ের ভিতর বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হল, আশ্রমও অনাগ্রগণের কোনো কোনো আচার-অঙ্গমানে নিম্নোক্তের ভিতর চুকিয়ে নিতে চেষ্টা গেল। সমাজে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হয়ে এল শাক্তপন্থীরা। সংঘাত অমিথ্যার হতে উঠল। শেখটার পাকুর কাছে শৈবের পরাক্রম প্রকাশ করতে হল। সমাজেও দীর্ঘে দীর্ঘে প্রতিষ্ঠা পেলে শাক্ত ধর্ম। টানসদাগর ও মনসার বিবাহও দুলত শাক্ত ও শৈবেরই স্বপ্ন। মনসার স্বপ্ন অর্থে শাক্তপন্থীদেরই স্বপ্ন। শাশ্বতীকার ও স্ত্রীতাকারের দল তাঁদের ক্ষমতা ও সাধাশক্তি অদম্যারে রচনা করে গেছেন এই মেঘী-মাধাম্বাই। এঁদের ভিতর বরননসিংহের কানা হরিদন্তের মনসামঙ্গল কাব্যই বোধহয় সর্বপ্রথম রচিত হয়। কারও কারও হাতে পরবর্তী গবেষণায় স্থির হয়—বিগ্রহাস শিখারাই-এর রচিত মনসামঙ্গল কাব্য এর চাইতেও পুরাতন। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও তর্কের অবকাশ আছে। মনসামঙ্গল কাব্যের শেষ রচয়িতা দত্তবুর্ঘ মনে হয় বহিলালের বিজয় গুপ্ত।

কিন্তু এই প্রশ্নে একটি কথা আমাদের মনে রাখা সরকার, মনসামেঘী নৌকাকি নৌকাই হলেও, এঁর কাব্য-রচয়িতাগণ কেউই সোক-কবি নন—এঁরা প্রত্যেকেই বেশ কিছু পরিমাণে শিক্ষিত ছিলেন। তাই তাঁদের কাব্য সম্পর্কে এ প্রশ্নে আবহা বিশেষ কিছু আলোচনা করব না। তবে মনসামঙ্গলের কাহিনী সর্বত্র একই : মনসার অদ্বৈতত্ব, ঠাণ ও মনসার বিবাহ, লম্বিন্দরের প্রাপ্তবিরোধ, মনসা কর্তৃক লম্বিন্দরের পুনর্মজ্জাত, বর্তমানকে মনসার পূজা-প্রচার।

এইবার আমরা বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে এ সম্পর্কে যে-সব গীতি ও গাথার প্রচলন আছে সে-বিষয়ে কিছু আলোচনা করব।

পূর্ব-বাংলা মনের দেশ। নৌকাই এখানকার একমাত্র যানবাহন। দূরে দূরে এক-একখানা বাড়ি টুক মেনে সাগরের বুকে ছোট ছোট এক একটি বীথ। হাতের আধারে ওইশব গৃহস্থবাড়ি থেকে আলো অগ্নি উঠলে মনে হয়, বুদ্ধি-বা এক-একটি বাড়িঘর (light-house)। জিন্দগীরে বাড়ি-বাড়িয়ার দিক হারিয়ে কোলো, ঐ আলো দেখেই তারা এসে পৌঁছয় এক বাড়ির ঘাটে। আবেগের গহেলা থেকেই এইশব বাড়িতে থাকিতে পোনা যায় বিমদগন্তের অথবা বাইশারী মনসামঙ্গল পড়তে :

“জগের সাগরী প্রিয়া শাহের কুমারী।

মুখে নিম্না বাও তব বুকে হৈলো চুরি।

... ..

বিয়ে ঘোর প্রাণ যায় না বেশ উঠিয়া।

থাকিতে না দেখে মনে না পাবে কাঁদিয়া।”...

আর আসে বেলে-বেলেনীরা। তারাও এই শ্রাবণ মাস পড়তে-না-পড়তেই বলে বলে নৌকা করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাফির হয় সাগরখোলা বেধাতে। বাড়ির অনেক দূর থেকেই তারা হাঁক ছাড়ে—‘লাপ খালা কাগধেন নাহি, বড় বড় খালো (ভালো) খালো জাতি (গোখো), মৈয়া শুক্কু, কালনাগিনী, শম্বুড় সাপ—খালো খালো সাপের খালা—’।

গৃহস্থের আশ্রানে বেলেদীরা নৌকা থেকে নেমে বাড়ির উঠানে এসে সাপের সূঁচি মাথা থেকে নামিয়ে বেখেই দূর ভাঁড়তে থাকে, পরে আস্তে আস্তে কাঁপির ডালাটা খুলে ধরতেই তা থেকে ভেসে করে মাথা উঠে করে গাড়া বিঘট আকৃতির এক গোখরো সাপ। বেলেদী হাতের কৌশলে সাপটিকে মাটিতে নামিয়ে দিতেই, সে কথা মেনে লোকা হয়ে গাড়া। বেলেদী মাটিতে দাঁত দিয়ে চাপড় মারতে মারতে গান শুরু করে :

এই না শাবণ মাসে ঘন বৃষ্টি পড়,

(হারে) কামন কইয়া থাকবে লো আমি

অচ্ছার ঘরে।

(আর) সোনার বরণ ন’খাইরে আমার

বরণ হইলো কালো,

কিন সাগে কদিল তারে

তাই আমারে বসো

(বিধি কি হইলো)।

(আবার) কাঁইল হইয়াছে নবাইর বিয়া (লো)

খালী হইল বিয়া

(হারে) কামন কইয়া যাব লো আমি
মালী শাকু দিয়া
(রে যিদি কি হইলো) ।
(আর) কইল হইখাছে বেউলার বিয়া (লো)
বাইস্তার সিন্ধু দিয়া
(হারে) কামন কইয়া যাব লো আমি
বাইস্তা শাকু দিয়া
(রে যিদি কি হইলো) ॥

আকস্মিক প্রবাহ অহসারে লবিন্মবের মৃত্যু জনলে, তার পুনর্জন্মও প্রসূতে হয়। তা না হলে অমঙ্গল হয়। তাই লখাইর মৃত্যু জনবার পর বধন গৃহলক্ষীরা বামনা ধরে—‘লখাই জীয়াও বাইস্তানী’। তখন বেবেনীরা কুলবধুরে অহরোধে আবার আর-একটি সাণ বের করেই তার মূপের কাছে হাত ঘূরিবে-ঘুরিয়ে বলতে থাকে—‘বা-বা-বা, বসিন্দারে (কপথকে) বা, গাইটে (টাঁকে) লখা পুইয়া বে না ঘাঘ, তার চক্ষু উপড়াইয়া বা—’ বলতে বলতে একবার চারদিক চেয়ে নিয়ে আবার ছর টেনে-টেনে বলতে থাকে :

(হারে) বে না বরে বাঁচরে আবার

ভোলা মহেশ্বর,
সেইও বরে বাঁচরে আবার
সোনার লবিন্মব ।
শুলপাদি শিব ত্রুণা কৈলাসেতে বাস,
মনসা ভাসের পাশ রহেন যারযাশ ।
মনসাদেবীর লয়া লবিন্মব পাশ গ্রাণ,
সপ্তভিঙ্গা মধুকর পাইয়া চান্দর
দেবীর গণ গান ।

এইসব বেবেনীদের সঙ্গে বামনা বলতে বিশেষ কিছুই থাকে না। তাদের গলার ছর আর শূব-বালায় জলীয় হাওয়াই এক অনবদ্য দুয়ের সঙ্গ করে। কিন্তু এই একই সময় পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে, বিশেষ করে কাটোয়া, ঘেসিনীপুর অঞ্চলে দেখা যায় বেবে-বেবেনীরা ঝাঁপান গান সোনাতে খালে। তারাও এইভাবেই গানের ঝাঁপি মাঝার নিয়ে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে সাপ্তবঙ্গা দেখার আর গায় গান। এই সময় এদের সঙ্গে বামনাও থাকে ভূমড়ী গীতি এবং কোনো কোনো অঞ্চলে বিষম-চাকী নামক একপ্রকারের কাঠের চাকার চামড়ার-ছাউনি-সেওয়া বাজায়। এদ্বয় গানের বিষয়বস্তুও পূর্ববর্তী বেবেনীদের মতোই চাঁদ-মনসার বিবাহ, লখাই-বেউলার কাহিনী।

কলেনাগিনী এগে লবিন্মবকে বঃনন করে চলে দাযার পর
বেহলা হুক করে বিলাপ :

“বেউলা কেবোনা, কেবোনা (রে)
কঃলে নখাঃ শাযেবা ।
নোহার খাঁটীর, নোহার পাটীর
নোহার বাসরঘর
বেউলা কেবোনা রে— !—

লাকণ-সংক্রান্তিতে হয় মনসা-পুজো। এই দিন পাচালী-পাট ছাড়াও পূর্ববঙ্গে সোনা বাঘ রথানী এবং ভাসান পালাগান। পশ্চিমবঙ্গের অপিকাংগ আরুণাখ ‘ভাসান’ এবং উত্তরবঙ্গের ব্রহ্মপাইকটি অঞ্চলে সোনা বাঘ ‘বিষহরি’ পালাগান। বিষহরির সবকটির-ই একই। এই চাঁদ-বেউলাকে নিয়ে রচিত কাহিনী বালায় এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পড়ে নানা ভাবেই গীত হয়ে থাকে। এ ছাড়া এই মনসা-পুজোর গিন মানচুম অঞ্চলেও বেশ পুনরায় লক্ষ্য করা যায়। মানচুমের দরবারা উৎসবের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য পুনরায় হয় এই পুজোয়। এইদিন গৃহদেবী শাকু রাত জেগে মা-মনসাকে তুষ্ট রাখবার জন্য গ্রহের গ্রহের ইন্দ্র-পাহরা প্রভৃতি বলি দেয়। কখনও বা বেশ ছর তান লয় সহযোগে গান করে দেবীর সম্মুখে। এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভাসান এবং পূর্ববঙ্গের রথানী গানের ব্যবস্থা বিশেষ পাওয়া যায়। পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত অঞ্চলে অবশ্য এইদিন দেবীর সম্মুখে জাগবলি দেবার প্রথা আছে।

মানচুমের মনসা-পুজো উপলক্ষে গৃহদেবী যে গান গায় তার বিবরণও একই, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। লখাইর মৃত্যুর পর বেউলার ক্রন্দন-কণ্ঠটিই বোপ হয় এ-গানের সর্বাপেক্ষা করণ অংশ। বেউলা মৃত্যুবানী কোলে নিয়ে হুক করেছে বিলাপ :

আমি কেন এলাম নোহার বাসরে,
আসিয়ে হারাইলাম বর লবিন্মব ।

খেদে কহে চিত্তামণি
বামাখও কপালিনী
দংশিল কালদুহসিনী
প্রাণ গেল রে ।

আমি কেন এলাম নোহার বাসরে ॥

টিক এই একই দ্বিদিন পরিবেশন করেছে পূর্ববঙ্গের রথানী গায়ক :

লবিন্মবকে কালীঘনাৎ দঃনন করেছে। বিধে তায় সোনার

বর্ণ কালি হয়ে গেছে। শব্দের মতো। কোমল মল হয়ে
উঠেছে শক্ত কাঠ। বেউলা তাগে আর চোখের জল মোছে।
চোখের জল মোছে আর কাঁদে। হুক করে বিনাশ :

ওগো জীবন থাকতে কেন ডাক দিলেনা

ওগো প্রাণনাথ !

ওগো হৃদয়ে আমার প্রভু মইল

কেন ডাক দিলেনা।

ভাগ্যে ওগো, ভাগ্যে তোমরা,

ওগো কেন নিভা হাও।

বিস্মিতে চলিয়া পড়িল গো

তোমরা কেন ভাগ্যেনা।

বিস্মিতে চলিয়া নবিল চন্দ্রকের বাহা

কেন দেখা দিলেনা।

বেউলা বলে শব্দর শাস্ত্রী

তোমরা সবাই ভাগ্যে।

বেউলা বলে চন্দ্র স্বর্ণ

তোমরা ভাগ্যে।

বেউলা বলে দিম রাহি

তোমরা ভাগ্যে।

বেউলা বলে অভাগিনী

প্রভুর কানড়াল কেন শাণে।

হৃদয়ে খলিয়া বেউলার

বাড়ি কুয়ার ধনি,

যর হাতে শোনে সেনকা সাউকালী।

পন্ডিতমহেশ্বর ভাসান-পাথকপণ এই জিনিসটিই তাদের
পানির মাধ্যমে হৃদির তুলসার চোঁটা করেছ অস্ত্রভাষে :

সোনার লব্ধির মোর

গেল গো ছাড়িয়া,

কেমনে রাখিব প্রাণ

ধৈর্য ধরিয়া।

ভাগ ভাগ প্রাণপতি

আগ গো এখন,

তোমার বিহনে আশ

বিকল জীবন।

প্রাণের তুল্য লব্ধির

তোমারে রাখিতে নারিছ

ধৈর্য লোহার ঘর।

সোনার অস্ত্রতে হার

না সহ তুলতায়,

কেমনে দখিল তার

কাল বিহ্বল—

(ও লব্ধির)।

(ওগো) বিনামধ্যে বহু পড়ে

না উঠিতে বড়,

সাতালী-পর্বতে এলো

মনগর চর

(ও লব্ধির)।

(ওগো) আমার চক্ষেতে আঁধি চরত সাগর

অনল নেড়েনা তার অনল গো অস্তর

(ও লব্ধির)।

মনসাম্বলের কাহিনী আর লোক-সংগীতের ঝাঁপান,
রহানী, ভাসান বা বেবে-বেসেনীদের গান, বিষহরি-পালার
বিবরণ এক হলেও, মনসাম্বল কাব্য লোকসংগীত নয়, যদিও
মনসাম্বলী লৌকিক সৌন্দর্য্য এই কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।
তবে এ কথা নিশ্চয়ই বলা চলে, এই নানা-আত্মীয় লোকসংগীত,
আকস্মিক বহু অদ্বিতীয় রোমহর্ষক সর্গ-বিবরণ কাহিনী মনসাম্বল
কাব্য-রচনার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল এবং মনসাম্বল-
রচনাভাগ এই লোকসংগীত থেকেই তাদের কাব্যের উপাসন
সংগ্রহ করেছিলেন। সে দিক থেকে এইসব লোকসংগীত
'মনসাম্বল' থেকে অনেক পুরাতন, এ কথা নিশ্চয়ই বলা
চলে।

প্রবন্ধের গোড়াতেই উল্লিখিত হয়েছে—মনসাম্বলী
আর্থসৌন্দর্য্য নয়। নানা ঘটনার ব্যাখ্যায় তিনি আর্থসৌন্দর্য্য
স্থান লাভ করেছেন। এর শিল্পের মূলতঃ ভ্রম-ভীতি, এবং সেই
নখে সখে কতকগুলি অলৌকিক কাহিনী বুদ্ধ হওগার
সহজ সরল লোকের মনে তাঁর প্রভাববিচার খুবই সহজ হবে
উঠেছিল।

সরকারী চাকরি

ডাক্তার ভট্ট

মিশ্রিত মনে কয়েক বছর পরে সরকারী হাসপাতালের চাকরিতে বেশ করছিলাম, আর বাইরে প্র্যাকটিসও কিছু মনে উঠেছিল। নিযা চলে বাড়িছিল, এমন সময় বিনা মেয়ে বন্ধাঘাত। হঠাৎ দৃষ্টান্ত পরোয়ানার মতো এসে হাজির হলো আমার বয়সির হৃদয়। সাত দিনের মধ্যে কলকাতা ছেড়ে সুদূর বারানতের মেডিকেল অফিসার হয়ে চলে যেতে হবে। তখন বারানতও আমার কাছে সুদূর বৈকি। মাথাখ হাত দিয়ে বসে পড়লাম। সরকারী চাকরিতে অবত বয়সি হওয়াটাই নিম্ন, চাকুরে মাত্রই তাতে অভ্যস্ত। কিন্তু ওতে ডাক্তারদের বতখানি বিশ্রয় হয় ততখানি অস্ত কারও নয়। চেনা ডাক্তারকেই লোকে ডাকে, অচেনা ডাক্তারকে কেউ ডাকে চায়না, কিন্তু ডাক্তার হিসাবে একটু চেনা হতে-না-হতে তাদের এক স্থান ছেড়ে অস্ত স্থানে চলে যেতে হয়। অচল প্র্যাকটিসের চেষ্টা তাদের সর্বত্রই করতে হয়, বাধা নামাত্র মাইনেটুয়েটে পেট ভরেনা।

কিন্তু এতকালের বাধা চাকরিটাও হুট করে ছেড়ে দিতে পারিনা। প্র্যাকটিসের ব্যস্ত ততটা বেশী নেই। অল্পত্যা তদ্বিত্তা বেঁধে বেতে হলো সেই বারানতে। একাই সেলাম দেখেনে। মনে করলাম ডাবনা কি, আমার সঙ্গে মোটর-গাড়ি রয়েছে, কলকাতা থেকে মাত্র ব্যতো মাইল পথ, কোনো ঠাকৈ ধনম খুনি কলকাতায় আসা-যাওয়া করতে পারবে।

সেখানে গিয়ে বেধি, দুই রকমের কাজ। ইন্ডোর এবং আউট-ডোর হাসপাতাল দেখা, আর সরকারী মেলখানার হুশারিক্টেঞ্চেটের কাজ করা।

খুব ভোরে উঠেই যেতে হয় মেলখানাতে। আমি গেলে জব সেখানকার সারাদিনের ব্যবস্থা থির হবে। কাউকে মেল থেকে খালাস দিতে হবে, কাউকে ভর্তি করতে হবে, কাউকে পরিব্রবের রেহাই দিতে হবে, ব্যকে কি খেতে বেওয়া হচ্ছে তা বেখতে হবে—ইত্যাদি। তা ছাড়া ওর মধ্যে কোনো রোগী থাকলে তাকে দেখতে হবে, কোনো অপারেশন থাকলে তা করতে হবে, এবং আরো অনেক রকমের কাজ বা ডাক্তারির অন্তর্গত নয়। দুই ঘণ্টার কমে সে-কাজগুলি শেষ করা জেভোনা।

সেখান থেকে সরাসরি চলে আসতে হতো হাসপাতালে।

সেখানে ইতিমধ্যেই বহু রোগীর ভিড় মনে দেখে, তারা আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

প্রত্যাহ সকালে প্রায় একশো-বেচশো রোগী এসে কততো। তারা আগতো চারিশানের অনেক দুখ-দুখ গ্রাম থেকে। ম্যালেরিয়া-প্রধান বেশ, এখানে প্রায় বারোমাসই ম্যালেরিয়া লেগে আছে, ব্যকে ব্যকে তার প্রকাশ বেশ বেড়ে ওঠে, ব্যকে ব্যকে কমে। বিছর রকমের ম্যালেরিয়া সেখানে কো ব্যা। কোনোটা খাণছাড়া রকমের, কোনোটা খাণা-যুক্ত, কোনোটা ক্রমিক, কোনোটা আবার অরবিহীন ও ছন্দবেই। ম্যালেরিয়া ছাড়াও আরো তিন রকমের রোগ সাধারণত দেখা যায়। পেটের রোগ, আমাশা; হস্তের রোগ, অ্যানিদিয়া; কৃকর রোগ, দক্ষিণাশি, ইংপানি। এইগুলোই আসে বেশির ভাগ।

সেই শরীয়াবানী রোগীদের দেখতে আমার ভারি ভালো লাগত। তাদের মধ্যে আমি কত রকমের বৈচিত্র্য দেখতাম। রোগের বৈচিত্র্য নয়, ব্যাবগল্লিরই বৈচিত্র্য, তাদের আচরণের নানা বৈচিত্র্য। এরা কলকাতার রোগীদের মতো নয়, তাদের থেকে এদের অনেক তদাং। কলকাতার রোগীদের মধ্যে অনেক অলিতা, প্রায়ই তাদের বেহের রোগের সঙ্গে বনের রোগ ব্যকে বেশামেশি। প্রায়ই তারা নিজেদের রোগ নিজেহাই ব্যখলে দেয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে ব্যাবহার করা খুব কঠিন হয়, সেখানে খুবই দত্তর্ক হয়ে কাজ করতে হয়। এখানে তেমন কিছু মটলতার ব্যাপার নেই, কিন্তু এদের মধ্যে আছে সরল ও মিথ্যে অভ্যাস। এরা নিজেদের রোগের কথা ঠিকভাবে বলতেই জানেনা, এলোমেলো ভাবে বা মনে আসে তাই বলতে থাকে, তার ভিতর থেকে আসল কথাটি খুঁজে নিতে হয়। তাতে একটু সময় নষ্ট হয় বটে, কিন্তু আমোদ হয়, আর অতিজ্ঞতা হয়।

একজন এসে বললে—“আমায় খিমে নেই, বেতে কঠি নেই, পেট মদমম ব্যকে, জিভে থা—” ইত্যাদি।

আমি তার পেটে হাত দিয়ে দেখলাম, মস্ত একটি পিলে।

বিজ্ঞাস করলাম—“ব্যকে ব্যকে জর হচ্ছে কি?”

সে বললে—“জর হলে তো কাপুনি ধরবে, লেপ-কাখা মুড়ি দিতে হবে। ঠেক তেমন কিছু হয়নি। অর-টর বুকিন।

বাবু। তবে চান করতে গেলে তেনে গা একটু নিরুশ্রী করে, তাই চান করা ছেড়ে দিবেছি। আর আমায়ের ধীরে নেই কারও বাবু। আমায়ের ধীরে মাসেলি নাই।”

কিন্তু নাভিতে হাত গিরে দেখলাম, তখনও বেশ আর হরছে। মাসেলিদি। আরই তার আল রোগ, কিন্তু আরের কথাটাই সে অধীকার করে গেল।

আর একজন এসে বললে—“বাবু, আর হচ্ছে, ওখু ফিন।” গামড়াই সে একটি দিদি বেঁধে এনেছে। সোজাছমি আরের ওখু চাইছে। আমার কিন্তু ভাবতে না হয়।

—“কৈ, তোমার ভিত সেবি?” দুই বেঁকে সে ভিত বের করেও দেখালে।

—“সরে এসো, তোমার নাড়িটা একবার সেবি।”

আমার উদ্ভ্রম এবার নুকে নিয়ে সে বললে—“আজ্ঞে, আর তো আমার নথ, আমার ঘরের খেদোলেকের। তেনাকে এখানে আনা যাবে না, তাই আমি নিজেই এসেছি। তেনার আরের ওখুটা আমাকে দিতে হকুম করে দিল। তেনার নান শিশু—আবুদী।”

অর্থাৎ তার ঘৃষের বিবরণ তখনই তার শ্রীকে ওখু দিতে হবে। অথচ গল্প নাভিতে করেও অনেক রোগীকে আনা হয়। গাতি থেকে নামবার তাগের শক্তি থাকেনা, আমাকেই উঠে বসতে হয় গাড়ির কাছে, সেখানেই রোগীকে পরীক্ষা করে এসে ওখুদের ব্যবস্থা করতে হয়।

এখানে আমি সূচ নিয়ে গিয়েছিলাম আমার নিজের মাইক্রোস্কোপ। দাবী জার্মান আধুনিক মাইক্রোস্কোপ। সেগানকার হাসপাতালে মাইক্রোস্কোপ নেই। অথচ ঠিকভাবে তিকিৎসা করতে ধলে রক্তাবির পরীক্ষার জন্য একটি মাইক্রোস্কোপ থাকা নিতান্তই দরকার, নইলে অনেক সময় আনাচ্ছে তিল চুঁততে হয়, এটা না-লাগে তো ওটা। তেমনভাবে কাজ করতে আমি অভ্যস্ত নই, বাগে-বাগে ঠেকে। তাই যেখানেই কোনো সন্দেহস্থল, সেখানেই আমি রোগীকে আশাশ্রম করে বসিয়ে রাখতাম। সাধারণ রোগীদের ভিত্তি কবে গেলে তখন সেই অশেষক্ষম রোগীদের নিয়ে পড়তাম। তাদের রক্তাবি নিয়ে তখনই পরীক্ষা করতে লেগে যেতাম। পরীক্ষার ফল দেখে তবে ওখুদের ব্যবস্থা করতাম। এতে অথচ বখটে সময় লাগতো, বেলা প্রায় একটা-দুটো বেজে যেতো। কন্সট্রাক্ট, ড্রাগার ও অন্যান্য কর্মচারীরা ভাতের বিরক্ত হতো, কারণ তাদেরও অন্তর্যক্ষ পর্যন্ত আটক থাকতে হতো। কিন্তু এতে কাজ হতো খুব ভালো। কয়েকটি রোগী অনেক কাল থেকে ওখু নিয়ে থাকে, কিছুতে তাদের

আর ছাড়েনা। পরীক্ষা করে দেখলাম সেগুলি ম্যালেরিয়া নথ, কালোজর। আমি কালোজরের ইন্সপেকশন তাদের দস্ত কিনিরে আনালাম, হাসপাতালে তা ছিলনা। কন্সট্রাক্টার হললে, এখানে কালোজর হয় বলে কখনো ভুলিনি। সে বিবাসই করতে চান। কিন্তু কয়েকটি ইন্সপেকশন দিতেই তারা আরোগ্য হয়ে গেল।

হাসপাতালের আউট-ডোরের ক্রমণ রোগীদের সাংখ্যা আরো বেশি বাড়তে লাগলো। সরকারী ডাক্তারঘরের ওখুয়ে রোগ লারে এটা লোক কমই বিবাস করতো, সে বিবাসে ক্রমণ লোকের মনে আপত্তি লাগল।

ইতিমধ্যে জেলখানাতে টাইফয়েড রোগ দেখা দিল। একটি সন্তোরা-আঠায়ে বছর বয়সের কিশোর কন্যেটী টাইফয়েড আর আক্রান্ত হলো। সপ্ততি সে ঘেসে ভর্তি হয়েছিল, ঐখানেই কোথাও তথবিলেব টাকা চুরির অপরাধে তার ছয় মাসের জন্য সশ্রম কারাবাসের হকুম হয়েছিল।

আমি সন্মত হয়ে উঠলাম। জেলখানার খাণ্ডগানীরাশি লম্বা খুব কডাকচি ব্যবস্থা করে বেশলাম, কয়েকী ও প্রহরী প্রভৃতি সকলকেই টাইফয়েড-ভ্যাক্সিন দিয়ে দিলাম। আর রোগীকে একটা আলাদা কুইকিতে রেখে দুজন মেট-কয়েকীকে তার সেবার নিযুক্ত করলাম। তাদের অস্ত্র কোনোই কাশ থাকবেনা, একজন রাতে আর একজন দিনে রোগীর সেবা করবে।

অস্ত্রের কেমন করে টাইফয়েডের পরিচর্যা করতে হয় সে বিষয়ে ঐ দুজনকে কিছু শিক্ষা দিয়ে দিলাম। বলা বাহুল্য, তারা ওর কিছুই বুঝতোনা, আমি যেমন যেমন বল বিতায় হুহু তাই করে যেতো। কিন্তু সাক্ষর তাদের নিখুঁত নিয়মাবলিভিত্তি আর অসূচ সেবাশ্রমখণ্ডতা। পছরের শিক্ষিত বস্ত সব বুদ্ধিমান শুশ্রূষাকারীদের চেয়ে তারা অনেক ভালো। এ কাজে বেশি বুদ্ধিমান হওয়ার সোব এই যে, অনেক সময়ই তারা নিজেদের বুদ্ধি বাটাতে ধায়, ডাক্তারের নির্দেশের উপর নিজের কৌশলমতি চালাতে ধায়। তাতেই তারা সব নষ্ট করে, রোগ বিগড়ে গেলে ডাক্তার খুঁজেও পায়না যে কোথায় ফোন ক্রটি হলো। কিন্তু এখানে তার কিছুমাত্র সজাবনা রইলনা।

উপিক্যাল থেকে টাইফয়েড-জ্বাখ আনিরে আমি রোগীকে কেবল তাই দিইয়ে তিকিৎসা করতে থাকলাম।

রোগীও খুব মিরীহ, আর আমার খুব বাধা ছিল। প্রত্যাহ চার বার করে তার পা-মাথা দুইয়ে সেধো হতো।

নিয়মিত ভরল পথা ও হুকোণ চাড়া তাকে কিছুই দেওয়া হতেনা। কিন্তু কোনো কিছুতেই সে আশ্রয় করতেনা।

কিন্তু তার ধারণা হয়েছিল সে আর বাঁচবেনা, নিশ্চয় এবার মরে যাবে। তাই আমাকে একদিন কাছে ডেকে সে তার বেশ বক্তব্যগুলি শুনিবে দিয়েছিল। যারে যারে আমাকে বল দিয়েছিল যে, সে মাথা খাবার পর তার মা বধন লাগ নিতে আগবে, তখন খেদ তাকে সব কথাগুলি আমি বলি।

সে আমাকে বললে—“গতি আমি চোর নই, হুকুর। মরবার সময় মিছেকথা বলছি না, সত্যিই আমি যোকানের তরফল থেকে এক পথলাও নিইনি। আমি পরিবের ছেলে, চিরকাল গরিব-ই থাকবো আমি। সংসারে আমি আর আবার না, এ ছাড়া কেউই নেই, বা বোরগার করতান তাতেই বেশ চলে বেজে। না-হুকুর টাকা নিয়ে আমার কি লাভ আছে বন্দু। অনেকদিন থেকেই যোকানে চাকরি করছি, মনিব আমাকে খুব বিখাল করতো। সব-কিছুই আমার হাতে, টাকাকড়িও আমার হাতে। কিন্তু মনিবের ছেলেটা ভাবি দ। বয়েষালে টাকা নষ্ট করে ব'লে মনিব আমাকে দাখনা ক'রে দিয়েছিল, তাকে খেদ এক পথলাও না দিই। সে চাইলেও কিছু সিঁড়ানা, তাই আমার উপর তার ভাগ ছিল। একদিন তবিলের চাবি কোথায় হারিয়ে পেল, খুঁজে পেলানাম। পরের দিন খুঁজে পেয়ে তবিল মিলিয়ে দেখলাম হু'শো টাকা কম। মনিবকে তখনই সে কথা বললাম। মনিবের ছেলে বললে, তুই নিশ্চয় চুরি করেছিল। আমি 'না' বলতেই সে বললে, বোলু যেবি তোরা পাটরা। একটা ছোটো পাটরা ছিল, সে খোলাই পড়ে থাকতো। সেটা খুলেই কিন্তু তার ভিতর থেকে একশো টাকার নোট খেরিয়ে পড়ল। তখন সে বললে, একশো রেখেছিল আর একশো ধরচ করেছিল, দিবে সে সেই টাকা। কিন্তু আমি চিরকালই গরিব, কোথায় পাবো অন্ত টাকা ? তখন ওরা আমাকে পুলিশে থিয়ে দিলে, পাটরা আর টাকা দেখানে জমা ক'রে দিলে। আমাকে জব্ব করবার ভংগ সে নিজেই এই কাজটি করেছিল। কিন্তু আদালতে তা শুনে কেন, চোর ব'লে আমাকে জেলে পাঠিয়ে দিলে। কিন্তু আমি চোর নই, হুকুর। আবার মা হাড়তা এখন খেতে পাচ্ছেনা, কে আর তাকে খেতে দেবে। আদমা খুইই গরিব হুকুর, খুইই গরিব। কিন্তু মা খেদ আমার স্বপ্ননা না মনে করে যে, আমি চুরি করেছিলাম।”

কিন্তু মরবার ভয় প্রস্তুত থাক সবেও রোদ্দিত আবেগ্য

হয়ে উঠলো। খুই মনের অথা সে সম্পূর্ণ খুই হয়ে উঠলো।

আর একটি আহত লোককে পুলিশ ধরে নিয়ে এলো, তাকে অত্যন্ত আহত বেখে আমি হাসপাতালে রাখলাম। তার কাছে চল্লিশ ঘণ্টার জব্ব পুলিশ পাঠরা রইল। সে একজন ডাকাত, ডাকাতি করতে গিয়ে পূর্ব চোট পেয়ে অধম হয়ে পড়ে, তাই সেই অবস্থাতে থাকা পড়ে যায়। অল্প খাওয়া তার সঙ্গে ছিল সবাই পাগিয়ে যায়। হাতে পায়ে খাড়ে মাথার সে কাটারির অনেক দা বেছেছে। ক্ষতগুলি অত্যন্ত গভীর—সেলাই ক'রে দিলেও, আর সাধ্যমতো প্রতিরোধক ব্যবস্থা করলেও তার পাঁচবার কোনো আশা ছিলনা।

কিন্তু লোকটার চেহারা বেখে ডাকাত বলে মনেই হয়না। সে যে চাকতি করবার মতো—অসমসাহসিক পিতৃ করতে পারে, এ-কথা তাকে লেখে কোনোমতে বিশ্বাসই করা যায়না। পাড়ারগে চাষাকৃত্যে যেমন হয়ে থাকে, ঠিক তেমনিই দেখতে। হাত-পাগুলো লক লক, পেটটি বেশ ভার, হুকুর পাঁচড়াগুলো বেধিয়ে পড়েছে, ঘাট সামনের দিকে বোঁকানো, উজ্জতার পাঁচ ফুটার চেয়ে দুই-এক ইঞ্চির বেশি হয়না। এই কাঠামো নিয়ে ও ডাকাতি করবে! কিন্তু পুলিশের কাছে ভুললাম, ও আগে কয়েকবার পরা পড়ে জেল খেটেছে। তবুও দল খেঁধে ডাকাতি করতো, ধরতে পারা যেতেনা, এবার অধম হয়ে থাকা পড়ে গেছে। ডাকাতি করাই ওর পেশা। ওই নাকি সর্গার।

একটা ভিনিস ওর মধ্যে বেগতে পেলার বা অসামারণ। ওর মনে কোনো ভয় নেই, সেহের কটকে কোনো গ্রাছ নেই। অতোগুলো জব্ব নিয়েও ও কোনো কাহরোজি করেনা। জব্বের মধ্যে হাত দিলে কিংবা থোঁচাখুঁচি করলেও চুপ ক'রে থাকে। এমন ধরনের কই-বল্লাগতো দেখতে হবে বলই নিজেই যেন প্রস্তুত ক'রে নিজেছে। ও খেদ কোনো মারাত্মক মাজেজকার করতে ইচ্ছা করেই নেমেছিল, তার পক্ষে এগুলি হলো আত্মরক্ষিক, তাই নিখাতন থেকে কৃত্য পর্বন সব-কিছুর অন্তেই ও প্রস্তুত। তাই সর্বাঙ্গই থাকতে পারে দ্বির অবিচল হয়ে, কোমোরকম ডাবগ্রকাল নেই। ডাকাতি করতে-করতে ডাকারেরা যেমন ভাবলেন-বর্জিত হবে নিশুং হয়ে থাকতে অত্যন্ত হয়ে পড়ে, ডাকাতি করতে-করতে ওরও বোধ হয় তেমনি এই অবিচলতার ভাবটি এসেছে।

অবিচলতার নির্ধন ওর আরো একটি বৈশল্য।

পুলিসের অনেক কৌশল আর অনেক কলনামে সবও নিজের অস্ত্র সজ্জার কারও মাঝে সে বললেন। বোধ করি, সব থাকলে হাজার মিথ্যেন সবও তা বলতেন। এর ভয়ে ও প্রভুত ছিল। শ্রীই বলে দিলে, আমাকে ধরছে এখন, আমাকে বত পাগো পাশি হাও, আর কারও নাম আমি বলব না। এই আমার এক কথা।

সেপটিক হয়ে প্রবল হয়ে ভয়েকমিনের মধ্যেই সে মাঝা গেল।

আজ্ঞা এক কামাতে পড়েছিলাম এক খুনের বাপার নিয়ে। একটি বৌকে খুন করেছে তার পাভুতী। বৌ ছিল অন্ধসহা। তার বামী দিয়েছিল মাঠে কাজ করতে, বাড়িতে ছিল কেবল পাভুতী আর বৌ। বৌকে ঐ অন্ধসহায়েই বাগাবাগা করতে হয়, পাভুতী আপন খেয়ালে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে। পেশিন পাভুতী বাড়ি এসে বৌকে ডাক ডাকতে বলে। বৌ তাতে বিলম্ব করতে থাকে। পাভুতীর বোধ করি খুব খিদে পেয়েছিল, কিংবা সে কারোই হোক, তার খুব রাগ হয়ে যায়। বৌ দ্ব্যস্তো কিছু কিছু কথাও জানিয়ে থাকবে। তার পর সে এখন ডাকের বালা নিয়ে আসছিল, তখন পাভুতী তাকে কোনো ডারি ভিনিসের দ্বারা মাথার এক দ্বা আঘাত করে। বৌ দরজার কাছে পড়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। ছেলে বাড়ি ফিরে এসে ভাণ্ডে এই ব্যাখ্যার। সে পুলিশে খবর দিয়ে বলে যে, বৌকে যা খুন করেছে। কিন্তু পাভুতী বলে, তা-না, বৌ চৌকাঠে মাথা ঠুক পড়ে গিয়ে আলনিই মারা গেছে।

পুলিস বৌটির লাশ এনে হাতির কয়লা পোস্টমর্টেমের ক্ষেত্র, আর পাভুতীকে ছেলে ভরে রাখল। দুতমহ পোস্টমর্টেম করে দেখলেন, মাথার উপরকার ব্রহ্মাসূর কাছে পুলিশ হাডু কেটে গিয়ে ব্রেনে আঘাত পোনেছিল, তাতেই সে তৎক্ষণাৎ মারাছে। পোস্টমর্টনটিও সূত।

এমন অবস্থা কোনো ডারি রকমের লোহার ভিনিসের আঘাত চাড়া হতে পারে না। পড়ে গিয়ে মাথা-কাটা হতেই পারে না, তাতে মাথার উপর দিকে চোট লাগবে কেন ক'রে? বেরোছে নিশ্চয়ই। তবে খুন করার উদ্দেশ্যে মারতনি, বেরোছে হঠাৎ রাসের কপে।

পাভুতীটিকে দেখলাম বেশমানার মধ্যে। ভয়ে ডাবনায় উৎসে সে মনে পাগলের মতো হয়ে গেছে। কখন কি কলছে তার কিছুই ঠিক নেই, আর কথাই কথাই হাট-হাট ক'রে কেনে উঠছে। কিছু জিজ্ঞাসা করলেই সে বলে—“কি যে

হলো, কি যে করলাম, তার কিছুই জানিনে, বাবা। আমার মাথার কোনো ঠিক ছিলো। আমার মাঝে মাঝে এমন হয়ে যায় বাবা, মাথার কোনো ঠিক থাকেনা। কিন্তু আমি কিছুই করিনি, বাবা। বৌটা বড় বদ ছিল, আমাকে কখন ক'রে আমার গর্বনাশ ক'রে দিয়ে চলে গেল। কেমন ক'রে যে ঘরলো তা কিছুই জানিনা বাবা। আমার কি তোমরা ঠান্ডি মিতে এনেছ? আমিও তাহলে মরে যাবো? আমার ছেলেটাকে তাহলে কে দেখবে বাবা? আমার তোমরা কোনোভাবেই বাঁচিয়ে হাও বাবা, মরতে আমার বড়ো ভয় করছে। তোমাদের বাড়িবাড়ি হোক, হুটীকে ঘেরে কি লাভ হবে?”

আমরা কত রকমের আবোল-তাবোল কথা সে বলতে থাকে।

সে অত্যন্ত বোকা। আর বোকা বলেই বলমেজাজী, অশ্রু জীহুও তেমনি। সকল বিষয়েই সন্মত ও সমস্তির অভাব। তাকে দেখে আমার মাঝা হলো। পোস্টমর্টেম-রিপোর্ট আমি মন্ববা দিয়ে দিলাম যে, এটি অ্যান্ড্রিওট-বুড়াও হতে পারে। বৌটা তো মোছই, এই হতভাগিনী পাভুতীটা যদি হেঁচে যায় তো ঠিক থাক।

আদালতে বাকালে আমাকে সাক্ষী দিতে হলো। সরকারী পক্ষের উকিল আমাকে একটি লোহার লম্বা ডাঙা দেখালেন। সেটা সত্তরত দরজার হুচকো-ভগ্ন বাথহার করা হতো। আমাকে প্রশ্ন করা হলো—“সুত মেরেটির মাথার আঘাত লম্বাছে আপনি যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তা কি এই লোহার ডাঙার আঘাতে হলেছে বলে আপনার মনে হয়না?”

আমি বললাম—“সে-কথা নিশ্চয় ক'রে আমি বলতে পারিনা। ওর মাথাও হতে পারে, মাথার আকস্মিক ভাবেও ঐ আঘাত হতে পারে।”

বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন—“মাথার উপরদিকে কেমন ক'রে তা হবে?”

আমি বললাম—“দরজার মাথার চৌকাঠ যদি মাথায়ের হৈর্জেরা চেয়ে নীচু হয়, আর সে কথা না মেনে কিংবা ভুলে গিয়ে কেউ যদি ছুটে সেই দরজা পার হতে যায়, তাহলে মাথার ঐ দরজাতে খুব গুরুতর আঘাতও লেগে যেতে পারে। লানিয়ে পার হতে গেলে তা আরো গুরুতর হতে পারে।”

এই বলে প্রমাণকরণ আমি নিজের মাথাটা দেখিয়ে দিলাম। আমার মাথার ঠিক ঐরূপ দায়সার্যেই একটা ক্ষতের চিহ্ন ছিল। ছেলেবেলাতে একবার চৌকাঠ লাগতে

গিয়ে আশাত সেপে সেখানটা অনেকখানি কেটে যায়, তার পর থেকে বাগটা হয়েই গেছে।

পরে সাহসেতে সাকী সিতে গিয়েও আমি ঐ কথা বলেছিলাম। হুতরাঃ ওটা খুন না আকস্মিক মৃত্যু তার কোনো সীমানাঃ হলেনা। তা ছাড়া, আশাত যে বাস্তবিকই করা হয়েছে সে-বিপদে সাকীও কেউ ছিলনা। অপরাধ সাব্যস্ত না হওয়াতে যেহেতু বালাপ শেষে গেল।

এমনি একরকম ভাবে যদিও বাগসতের চাকরি বন্ধাব রেখে নিজের কাজ করে হাছিলাম, তবু কিছুকাল পরে আর তাও সম্ভব হলোনা। যিনি তখন সেখানকার হাকিম ছিলেন তিনি আমার পিছুতে লাগলেন।

ওখানে বিকালের পর থেকে আমার কোনোই কাজ থাকতোনা। বিকালে একবার ডাকারখানাটা ঘুরে আসতাম যাত্র, কোনোরকম এক-মাথটি রোগী থাকতো, কোনোরকম কেউই আসতোনা। সন্ধ্যার পর থেকে আর কিছুই করবার নেই, কেবল ঘরে বসে থাক। আমি তাই সন্ধ্যা হলেই নিজের ঘোঁটের কলকাতার চলে আসতাম। যাত্রে আশ খন্টার পথ, ঘোরে পাড়ি চালিয়ে হুড়ি মিনিটেও আসা যায়। এখানে এসে আমি একবার বাড়ি ঘুরে আসতাম, নিজের ডাকারখানাতে খন্টা-হুই বসতাম। দ্বারা আমার হাতের রোগী ছিল, অর্থাৎ অনেকদিন পর্যন্ত যাবের দারাবাহিক ভাবে চিকিৎসার সরকার, তাবের বলে নিতাম সন্ধ্যার পর আসতে। তাবের দেখাশোনা করে আমার সেই রাত্রি ব্যায়গতে ফিরে যেতাম। হুতরাঃ এতে ওখানকার কাজের কোনোই ক্ষতি হতোনা, আর এটি কারও নম্বরে পড়বারও কথা নয়। সন্ধ্যার পরে আমি দ্বানীধ রোগী দেখতেও যেতে পারি। নাত্রে যাত্রে দুই-একদিন কলকাতায় আসা বাব নিতাম, সেই দুই-একদিন ওখানকার অফিসারদের ক্লাবে গিয়ে আজ্ঞা নিতাম, তাতে সকলে সন্ধ্যার পরও আমাকে সেখানে কোনো-কোনো দিন দেখতে যেতো।

এ নিয়ে কোনো গণগোল হবার কথা নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে বহুতম-হাকিমের ছেলেবেলায় হলো ছোটো একটি কোড়া। আমাকে তিনি ভেৎক পাঠালেন। আমি গিয়ে ছুটির ঘুম নিয়ে কোড়াটি পেলে খুঁঁ বের করে ব্যাওজ বেখে মিলাম। পরের দিন আমার ব্যাওজ বাঁধতে গিয়ে সেখানে বহুতম অপেক্ষা করে বলে থাকতে হলো। প্রায় এক ঘণ্টা পরে হাকিম উপর থেকে নেমে এলেন ছেলেকে নিয়ে। আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। তার উপর দেখলাম

কোড়াটি প্রায় তক্তিরে এসেছে, আর ফিণে কিছু করবার নেই। আমি তাই বললাম যে, কাল থেকে আর ব্যাওজ বাঁধতে হবেনা, একটু বলম লাগিয়ে যেনে। হাকিম বললেন—তা হোক, আরো দুদিন ব্যাওজ বাঁধা দরকার। আমি বললাম—তাহলে ছেলেকে ডাকারখানাতে পাঠিয়ে দেবেন, সেখানেই থেঁপে দেবো। তিনি বেনে বিরক্ত হলেন। তার পরের দিন আর হাকিমের বাড়িতে গেলোনা। তিনিও ছেলেকে আর ডাকারখানাতে পাঠালেন না। আমি তাবলাম চমকো সেহেই গেছে।

কিন্তু মকমলের আনলাতহের জটিল রাত্রপ্যাচ লম্বা কিছুই আমি জানতাম না। সেখানে বহুতম-হাকিম হলেন সর্বশক্তিমান দেবতার মতো, তাঁকে খোশামোদ করে রীতিমতো জুই হাতিতে হয়, নতুবা তোমার লম্বা বিপদ। জুই না থাকলেই তিনি তোমার পিছু লাগবেন। অতএব ডাকার প্রকৃতি ছোটোখাটো কর্মচারীদের উচিত, কারণে এবং ফিরা কারণে তাঁর বাড়িতে হাকিমরা দেওয়া, নানা উপায়ে তাঁকে প্রসন্ন রাখা। আমি তাঃ কোনোরকম জো করিই-না, উপরন্তু আমি আমার ঘোঁটের চড়ে বেড়াই, তাও তাঁর নম্বরে পড়েছে। হুতরাঃ আমি তাঁর চকুশূল হয়ে উঠলাম।

ওখন তিনি তলে তলে আমার ছিন্ন অহলদ্বান করতে লাগলেন। তাঁর গুপ্তচরের কোনো অভাব নেই। সাইকেল-পিওন তাঁর বিজয় আছে, তাবাই তাঁর গুপ্তচর। প্রায়ই সেখানায় তারা সাইকেলে চড়ে আমার বাসার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে। ওখন ওতে কিছুই লম্বাই হতোনা। কিন্তু তারা সর্বশক্তিমান রাখছিল, ঘোঁটের চড়ে আমি কখন তোমায় বাই।

হতুইই জানবার ছিল তা বেনে নিয়ে দ্বানীধ হাকিম আমাদের হেট-অফিসে আমার বিক্রেত এক লম্বা রিপোর্ট দাখিল করলেন। তাতে তিনি লিখলেন যে, আমি সেলখানার কাছে অত্যন্ত গাফিলতি করছি। তোম সন্ধ্যা স্টেশন ছেড়ে কলকাতায় চলে বাই, দ্বারা রাত অহুপস্থিত থেকে পরের দিন সকালে ফিরি, সেই কারণে অনেক বিলম্ব সেলখানার ফটক খোলা হয়—ইত্যাদি। এমন দ্বানীধবিহীন লোককে ওখানে দাখা উচিত নয়।

হেড-অফিস থেকে আমাকে ভেৎক পাঠালে। সেখানে যেতেই ঐ রিপোর্টটি আমাকে দেখিয়ে বেড়া-সাহেব ঘুম রাগ করতে লাগলেন। আমি যদিও বললাম, ওর সমস্তই মিথ্যা। কথা, আমি তা প্রমাণ করে দিতে পারি। কিন্তু তিনি

কোনো কথাই শুনলেন না : বললেন—তোমাাকে মেলিনীপুর
বাসি করলাম।

অগত্যা তখন বাধ্য হয়ে চাকরিতে ইচ্ছা ক্রিতে হলো।
ঘরের কাজের প্রাকটিক ছেড়ে অত দূরে গিয়ে চাকরি করা
আমার পক্ষে অসম্ভব। এতদিন কোনোপক্ষেই এই নৌকাতে
পা দিয়ে চলছিলাম, কিন্তু আর তা চলানো না।

আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি, এক্ষণে বারাসতের সর্বত্র ঘটে
গেল। কেউ কেউ আমাকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাতে এসে,
কেউ বা হুং করলেন, কেউ আনিচ্ করলেন।

তখন একদিন মহকুমা-হাকিমটি শয়ঃ আমার বাসাতে
এসে হাজির হলেন। বুকের ভাষ অত্যন্ত অসামিক, অত্যন্ত
মহাওক্তিপূর্ণ। বললেন—“তুমি পণ্ডিত আমার কষ্ট হচ্ছে,

কাজও পরামর্শ না নিয়ে হঠাৎ এমন একটা অবিরতনার কাজ
ক’রে বললেন ? এতদিনের চাকরি, বাধা শেনপন রয়েছে,
এ চাকরি কি ছাড়তে আছে ? হলেই বা যদি, আবার
দুদিন পরে কলকাতাতেই নিরন্তর পারতেন, আমি ব’লে-ক’রে
চৌকী ক’রে তার ব্যবস্থা করতে পারতাম। আপনি
রোজগ্ননশনী করিছো নিম্ন, আমার পরামর্শ ভুলন। আমি
আপনার ভালোর অন্তরেই বসছি।”

আমি বললাম—“অনেক ধন্যবাদ। কষ্ট ক’রে আমার
বাগায় পণ্ডিত এসেছেন সং পরামর্শ দিতে। কিন্তু এ-চাকরি
আমি ছেড়েই দিলাম, এই একটা হুযোগ দিলে গেল।
যাদের প্রাকটিক আছে তাদের চাকরি করা শোষণ না, আর
তা করাও উচিত নয়।”

পল্লীর বারমাস্তা

তুলসীদাস সিংহ

। শব্দ ।

মেঘরা তো তখন অত উপরে ছিল না—ছিল নীচে,
একবারে নীচে। শোভা হয়ে গাভালে শিঙে লাগতো।
বুড়ী ঘরে হয়ে উঠেন ঝাঁট দেয়, কোমর ধরে গেলে
এক এক বার শোভা হয়ে গাভার। আতঃ হতবার গাভার
ততবারই মেঘগুলো ঠিকাস-ঠিকাস শিঙে লাগে। রেগেমেগে
বুড়ী মারলে এক ঝাঁটা মেঘের গায়ে। বাস, সেই যে মেঘরা
উপরে উঠে গেল আর নামলো না। কখনো না।

কিন্তু সত্যিই কি তাই ? সত্যিই কি মেঘরা আর নেমে
আসে না ? আসে, আসে। আবারের মেঘরা না হয় যেহ নয়,
শিঙে-লড়াই করতে করতে তারা নামে এবং নামতে নামতেই
আঘাটটি কেটে যায়। কিন্তু প্রাণ-আকাশের দিকে ডাকিয়ে
দেখবেন মেঘরা সব মেঘে এসেছে আবাদ-গাছের মাঝার,
তালগাছের পাতার, দূরবনের ছায়ায়। আরো কত বল বেঁধে
ছুটে আসছে নাববার ক্ষতে।

উপরের দিকে যখন তাকাই—পেঁদা তুলোর মতো চাপ-
চাপ মেঘগুলো দার ধৈর্যে যখন ছুটেতে থাকে, তখন মনে পড়ে
যায় আমার লালদিকি। লালদিকি কলতো—অ যদি, তাও
যানি না—ওরা হচ্ছে ভোম বেতে। হৈ—হৈ ঘাঘ,—
বেথতাম বেথতাম ভোম-বাওরা। বর্ষার জলে গোঁড়া

করকের নীল পাহাড়টা অতদূর থেকেও শুষ্ট বেধা থাকে—
মেঘরা সেপে বসেছে ওর হুড়াটাতে। কতকগুলো আবার
চুতো তিরিয়ে নেমে এসেছে পাহাড়টার কৃক। চোখ বুজে
পালপাতা থাকে সব।

তার পর কতদিন কেটে গেছে। আকস্মিক গম্বিয়েছে
একই-আধটু। বুকে কেলোছি মেঘরা মাহুৎ নয়, তাদের মুখ
নেই, হাত-পা নেই, ভোম-বাবারও ধরকার হয়না তাদের।
প্রাকৃতিক নিরুদ্দেশই তারা আকাশের উপর ভেদে ওঠে—
প্রাকৃতিক নিরুদ্দেশই তাদের কৃক অস জমে। লালদিকির কথা
ভেবে বাহা হয়—পেঁদা হালা বেধে !

কিন্তু ঐ সঙ্গে কষ্ট করে মনে পড়ে দার মহাকবি
কালিদাসকে। আমার লালদিকি না হয় হায়া, কিন্তু
কালিদাস ? তিনি তো পণ্ডিত, তিনি তো মহাকবি।
অন্তবড় জানী পণ্ডিত হয়ে তিনি কোন্ কল্যাণ বর্ষার মেঘক
মাহুৎ ভাবলেন ? লালদিকির মেঘরা ভোম খেতে দার
পাহাড়ে, কিন্তু মহাকবির মেঘরা যে প্রেমিক-প্রেমিকার হুঃ
দূর করবার অন্তে দূত মাঝে। লালদিকির মেঘরা বার্ষণ্য—
নিখের শেটটির অন্তরে ছুটে ; মহাকবির মেঘরা পরের
অন্তে ছুটে বেড়ায়। এইমাত্র শুভকাত। লালদিকি হালা—
মহাকবি মহা হালা।

বর্ষধুমুখ প্রাচীন-অশ্রুপাশে ভেসে-পাশ-পরা খুঁটিয়া
হোলান দিয়ে এই হাথাসের কথাই ভাবছিলাম। ভাবতে-
ভাবতে ঘন হল, কই দেখি-না একবার জেবে, আমি একটি
হাথা—মহা হাথা। এই আমি যেমন মাথ—কুঠি গাছপালা
পাহাড়-পর্বত বেধ লম্বাই তেমনি এক-একটি করে নতুন।
তখন মেধি ছিন্নিখাটা অন্তরকম হয়ে গেল। ঐ তো শ্রী
মেঘতে পাখি মেঘরা সব হাত-পা হুলান্ত-হুলান্তে ঘুমে জোখে
খুঁশি পাউতার মেঘে ভোম পেতে চলছে পাহাড়ের
বাড়িতে। আর ভোম পেয়ে পেট ভরে বাবার পর তারা
ঘন হাসছে, তখন তাদের সেই হাসিগুলো কুঠির কোঁটা হয়ে
করে পড়ছে সরসর করে। মেঘদিকে নিম্নরণ জানাচ্ছে
পাহাড়েরা—মেঘের হাসিগুলোকে নিম্নরণ জানাচ্ছে
গালাহিরা, লামহিরা ভাইয়েরা—

“আর কুঠি কৈশে—মুচি দিব বেশে”।

কুঠিরা আলছে এবং আসতে-আসতে আকাশ বাতাস উঠানে
গাছপালা থাকে সামনে পাছে বাড়ির ধরে ধলবল করে
হাসছে। এ ঘরের ছাঁচ থেকে ঐ হাথাসের ছাঁচ পর্বত
কাপড় শুকতে বেওয়ার তারটা টাঙানো রয়েছে—পড়ের চাল
বের হীরের টুকরোরা কণ-কণ কাঁপ দিচ্ছে ঐ তারটার
শিঠে। তারপর সবু-সবু করে ছুটে শিঠ বেরে ‘বলহলে বাহ’,
‘বোঁড়া বাহ’ ‘খরিশ বাহ’—তারটাও বিবি উপুড় হয়ে
তর-তরে শুকুড়ি দিচ্ছে আর কৈশে কৈশে ভাব দিচ্ছে—
‘মায়া আছে ডর নেই—মায়া আছে ডর নেই’। শুকুড়ি
সেওয়া শেষ করে এ-গ্রাডের কোঁটার ও-গ্রাডের কোঁটাগুলোর
সঙ্গে জড়াঝড়ি করে লুটিয়ে পড়ছে উঠানের কূপে। তারপর
বে-বোঁড়। সাপের মতো একে একে ছুটছে সব বিড়কীর
পুকুরটার দিকে।

দূর তুলশাম। চোখ পড়ল উঠানের আয়পাছ-তুটার
দিকে। মেধি, কুঠিরা মাচছে পাতায় পাতায়—টুপ-টাপ
কুপ-কাপ। এখানে বসন্তাল থেকে লালিয়ে পড়ছে পাতার
উপরে, তার পর বোঁটাটার কাছে পা হুলিয়ে বসে থাকছে
অলক্ষণ, তারপর আপনা থেকেই সবুজ করে মাটিতে পা
দিয়েই বে-বোঁড় বিড়কীর দিকে।

পাশেই ছাতাটা ছিল—চুই করে টেনে নিয়ে কুঠির পিছনে-
পিছনে আখিও ছুটলান বিড়কীর দিকে। বিড়কীর পুকুরপাড়ে
এসে মেধি—ওমা! এ যে পানির আদর। জাইতো বলি
কোঁটারা অত ছুটছিল কেন! নীচে নোঁহা-বা ছুটে এসেছে
জারা মেধি চুপচাপ বসে পড়ছে আসর বাঁকিয়ে। আর
আকাশপথে বেয়ে তাদের মাথামে মাচছে মাচছে নেমে পড়ছে

কুঠি-নজিরা। তাদের পায়ে রয়েছে নুপুর—সব হচ্ছে তা থেকে
টুপ-টাপ টুপ-টাপ। কেউ কেউ কোরে তাল টুকছে—
কম-কম কম-কম। নানা ঘে সহযোগে ঐকতান ধরেছে
জেকেরা। আদ-হা জেকেরা নহ—গাছুরা—বর সাহুরা।
পাড়ের গলা-কোড় থেকে মাকে মাকে লাবান দিয়ে উঠে
ভাষ-ভাষেরা। মনটাকে আর একটু একাধ করলাম,
কান-তুটাকে ভালোভাবে খাড়া করলাম—তখন মেধি
কানে ভেসে এল টাংরার গমগমনি—গম-গম করে বর
বোঝাচ্ছে তারাও। পুঁঠিরা ভারী চিলবিলে—তারা কেবল
লাফাচ্ছে আর হুঁকরনি দিচ্ছে।

আমিও মোতাবের একজন ডেরে হঠাৎ হুঁকরনি করে
উঠলাম, হরি হরি বল—বোঝা। কিন্তু খাড়া সেরাতে গিয়েই
সব পড় হয়ে গেল। ঐ-বে দক্ষিণ দিকের পাড়ায় পেরুর
কাঁচু আর মালার পরশুর গলা বাড়িয়ে ধরে গাড়িয়ে পাড়ে,
ওঘেই ভিতর থেকে গামছা মাথায় পলুই হাতে নেমে এল
গেঁদু মাশিত। বকের মতো অতি সন্তর্পণে পা তুলে তুলে
এসে গাড়াল মলের ধারে। তারপর হঠাৎ এক সময় পদ
হল ‘ওবাং’, এবং চোখ-তুটো জগর জাগর করে কেবলম
পলুইয়ের ভিতর থেকে টেনে বার করে আনলো সে ইয়া-এক
পলুই—ভলগেটায় কে কেন বানিকটা হলুদ মাগিরে
দিয়েছে। সে করে খাড়াটা তিরিয়ে পশ্চিম দিকে ঘুরে
বললাম। মেধি ও-কোণে একটা ধবধবে বক এক-পা তুলে
গাড়িয়ে গাড়িয়ে ভিজছে। ঠিক নে একটি ছবি। কিন্তু
ছবি এক সময় মড়ে উঠল—পা তুলে-তুলে বানিকটা গিয়ে
বু করে এক বাবলা মারতেই চবির হুঁটোটির মাকে চাপা
পড়ল একটা চেনা-পুঁঠি। ক-ক-ক করতে করতে ছবি
উড়ে গেল। চোখ-তুটো বন্ধ করে দক্ষিণ দিকে ঘুরে বললাম
—চেয়ে পড়ল অলক্ষণ জড়াঝড়ি কোল-ব্যাং। আর তার
অলক্ষণ পরেই কানে ভেসে এল—খা-খা-খা। সাপে
যাং ধরেছে, এবং আমি যেমনটা বসে আছি ঠিক তার
হাত-পাশেই পুঁঠি।

অখাং প্রাচীন্দরগীতলে। হাথা হয়ে গিয়ে আপনা-
আপনি উঠে পড়ছিলাম উপরে—হঠাৎ পড় লোভান নীচে—
একবারে নীচে। মতোর কাছার উপর ভর দিয়ে গাড়তে-
গাড়তে অতন্ত করলাম কে কেন আমার ভিতরটায় বসে
খুঁশিয়ে খুঁশিয়ে কাঁপছেন। তার হুঁচোখ বেয়ে গাড়িয়ে
পড়ছে প্রাচীরের ধারা। তারপর সেপলম এ তো মলধারা
নহ, এ তো সারা নহ—এ যে কালি! চামড়ার চোখ দিয়ে
দেখা এ ছিন্নিখাটাকে তিনি ঢেকে দিতে চাইছেন ওঁর

ঐ চুড়োলের কানি দিয়ে। মর্জোর বুক টেনে নামাতে চাইছেন কর্ণকে, পড়তে চাইছেন আলো। একটা। রাজ্য। হিংসার নড়—প্রেমের রাজ্য। হা বা হয়ে গিয়ে বেলান, ফিলা এসে এ-রাজ্যের প্রেমকে গ্রাস করতে চাইলে, কবে পাড়াকে শুধু মাথায় নহ—বানর, কাঠবিড়ালী, চটাতুপাখী, শিলা, পাখাড়। মর্জোরের মতো এ রাজ্যের রাহুপালা-সরযবেরও কাণ্ডহু। প্রবোধন-বোধে পাখরও শোলায় মতো কলে ভাঙ্গত। আনিকবির চোখের জল নিয়ে গড়া এ রাজ্য—এক মহা ভাঙ্কর রাজ্য!

কোথায় কে-না-কে এক বন্ধ প্রিয়ার কাছ থেকে দূরে দিধান লগ ভোগ করছে মার কবেক মনের মন্ত—তাও লু হু না মারকবির! চোখে বেগা রাজ্যের বিরহী বন্ধকে সাধনা দিতে ছুটে গেল তাঁর চোখের জল দিয়ে গড়া সেই রাজ্যের একশও মেঘ—যে রাজ্যের লগা একটা পলুপাখী মা হয়ে মার্জোরের ছেলেকে লালন-পালন করে, লতাগুলো মার্জোরকে কেবলকি বগুরবাড়ী বাবার সময় ভড়িয়ে পরে, হরিণগুলো মার্জোরের মতো দুখ নাহিরে কপে, বায়গুলো মার্জোরের বাজার সঙ্গে বেলা করে। সালা চোখ দিয়ে বেলা রাজ্যের সঙ্গে এ-রাজ্যের বিল নেই একটুও।

বার্গে হু ল মেমে এসেছে মর্জোর মাটিতে—তা থেকে কলতে কল। হিংসা বেশ প্রেম বিরহ আলো আধার দিয়ে গড়া মর্জোর বুক বেগে এসেছে কর্ণ। ঘাটেছে বর্গ-মর্জোর এক অশূর সবরহ। এ রাজ্যের মেঘ তো শুধু মেঘ নহ—মেঘবৃত্ত। সালা চোখে বেলা 'মেঘ'—সামা চোখে প্রেমের চপমা চড়িয়ে বেললে 'মেঘবৃত্ত'। আমার চোখে মেঘ—হাবার চোখে মেঘবৃত্ত।

যে না আমার হা বা করে!

•

সোনার সাগর দেখছেন? সোনার সাগরের বুক সোনালী ডেউগুলো কেমন করে আছাড়-কাছাড় যায় দেখছেন?

সকালের জলে ভেঙা দ্বিমেলা হাওগাতি বন হুহু করে বইতে থাকে, পৃথিবীকূর হু-হু চোখ নিয়ে পূব আকাশে কলে হাই তোলে। তখন চলে আসুন ঘর ছেড়ে—এসে দাঁড়ান সোনার সাগর-তীরে। পথ বলতে তো এখন আর কিছুই নেই—নব্বু ঘাসে ঢেক পেছে লবঘাট, হুহুগা চলাতে পেলোই এখন "লগতে হু রে দুধী কোমল"। তারপর আছে হুহুগা—হাইর কাশড বই হুহু, বক্ষা নেই তাদের হাত থেকে, হুপারের লোমগুলোতে ভড়িয়ে পড়বে লব। তা আমি

বলি কি, "লগতে পেলোই" এখন "লগতে হু রে দুধী কোমল" এবং সেই সঙ্গে বেতে হু হুহুগা হু কাটানি—তখন সোলা শবে চলে লাভ কি। শব ছেড়ে বিপবেই আসুন। কোপ-কাড়ের ভিতর দিয়েই আসুন। ঐ বেধু নানার-পাছগালাতে কেমন ছোট ছোট ফুল ফুটে আছে। কি মিঠি তাদের গন্ধ! ওদিকে কি দেখছেন? নানা ও আনুহ নহ—ঘড়মৌড়া। নানার-পাছটাতে শেঠিয়ে ওর লতাটা বৈ হুহুগা লব্বর উঠে গেছে—বার্গে বার্গে হুহুগে ফলের খোপা। দেখতে গ্রিক আনুহের মতো। পায়ের হটা লাল নয়, লবুত—এই বা। ঘড়মৌড়া ঘোড়ার মতো মৌকে, কিন্তু ভিত্তপন্নর মৌক অল। আনুহ কোড়ের মাথা লব্বর লতিয়ে গিয়ে কাঁক মেঘে যায়। তারপর হুহু বন কোটে, সালা হয়ে যায় কোড়ের মাথাটা। ফল এখন মৌলে তখন মনে হয় হুহুগা-পাছে হুহুগা ফলছে। আনুহে বটপাছের জলায় ভিনটা পাখর নিয়ে উঠন বৈরি করে ভিত্তপন্নর বাঁচি জেমে পথেছেন কখনো? দেখছেন কেমন শব ওঠে হুহুগ-হুহুগ? কোপের ভিতর দিয়ে হাটছেন বটে, কিন্তু সাধনা! আপনার পারে মাথা মুখে ঐ-বে মাদারের ভাঙ্কগুলো হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে থাকে, ওগুলোয় সবু পাতার মধ্যে লুকিয়ে থেকে লাউঙা সাপগুলো সেল যায়। লুককে লাউগাছের জলায় মতো লু লু সাপগুলো সবু পাতার সঙ্গে মিলে থাকে একেবারে। আর ওরা নাকি "লব্বর শব ছেড়ে গিয়ে চু-চুটি যায়"।

মাঝর ঝাঁকু ঘড়মৌড়া-ভিত্তপন্নর ভিতর দিয়ে চলতে-চলাতে ঐ বাগানটার লুক খানু একটু। গন্ধ পাচ্ছেন? ভক্ভক গন্ধ? এ গন্ধটি হল হুহুগা-ফলের। হুহুগা-ফল হল বরবার রানী। পলাপ, করত, চাকলতা, চিললতা, ঝাঁকুদের মাথা পা ঢাক দিয়ে থাকে হুহুগা—পাশ দিয়ে শেরিয়ে সেলেও কেউ তার দিকে দুখ তুলে ডাকার না। কিন্তু বেই আসে বধা তাই হুহুগা হয়ে ওঠে একশোর এক। গা-ভর্তি খোপা খোপা ধবধবে ফুলগুলো দুখ থেকেও চোখে পড়ে—আর তার ঐ কুবুরে গম্বাতি ভিলা বাতাসের সঙ্গে মিলে দিবিদায় যায় হু।

বাগান চাড়িয়ে পানিকুবুর এসেই পাচ্ছেন পোচর। আহা-হা, ঐ-বে হুহুগ করে উড়ে গেল—ওটা কি লব্বন সেপি? ও হল একরকমের পাখী—টুটিপাখী। মরা কি জানেন? মেঘ ভাঙতে দেখলেই ওরা পা-জুটা উত্তরের দিকে তুলে পড়ে থাকে। মেঘগুলো যদি পড়ে যায় তবে ঐ-বে পা তোলা আছে—আইকে বাবে। তা সে বাই হোক আর আগাবেন না—এখান থেকেই সেদু পল-বোধরা

একমনে চরছে কেমন। হাস এখন মরে গাথ তখন
গক-মোহনের নম্বর থাকে গোচরে নয়, গোচরের আশে-
পাশের কোণেপাড়ে। কিন্তু এখন তারা মাটি থেকে মুখ
ভোলে না। কচি কচি বাসন্তীশা যে রলগোলা! গক-মোহরা
থাকে বাগ-মুখে, আর তদিকে হারা চরাব সেই রাখালরা
থাকে গানে-মুখে। 'ভাঙালী গান' অর্থাৎ ভালো কথাই থাকে
বলা হয়েছে 'রাখালী গান', তা এই সম্বন্ধেই রাখালদের
মুখ দিয়ে ভর ভর করে বেরোয়। মূলে বোধহয় শ্রাবণের
ধারা। কাছে গেল লক্ষ্যই পড়ে যাবে ওরা। হুতরাং
এখান থেকেই শুধু। ঐ রেখুন হাতের পাঁচনবাড়িটা
মাটিতে গেলে দিচ্ছে কেউ কেউ, ডান পা-টা প্যাঁচানো
আছে পাঁচনবাড়িটার গায়ে, ট্রেটটা রাখা আছে পাঁচন-
বাড়িটার মাথার উপরে—আর গলা দিয়ে দিগ্বি বেরিয়ে
আসছে স্পেকাল হরের ভাঙালী গান—

"বাংলা গায়ে পান-মুশারি,
বগে ধরে ছাতা—
কি বলা না মিটা।"

কেউ হাঁকছে—

"রত্ননী শোহায়ে গেল কাগো না—
তুও নাগর হুত এল না!"

অবত এতলো বেছে বেছে বললাম। এরকম দু-একটাই
বা ডক্লোকেবর কানে ঢোকানো চলে, নইলে অধিকাংশই
অপ্রাণ, অক্লীল।

বনবন অল যদি নাযায়, তবে তো গলা স্তম্ভ ছেড়ে
অন্তরে উঠে গাথ—

"বিরাইকে [বেহাইকে] মায়েছে [বেয়েছে]
কাড়তে [মোরে]

বিরাই পড়ে আছে—

ও বিরাই পড়ে আছে ধবাগড়ার লালতে [লালাতে]
বিরাইকে মায়েছে কাড়তে।"

না, আর বেশী দূর নয়। পোচর সেখানে বনিকটা
এলে ডাইনে-খায়ে বাড় খোঁরালেই চোখে পড়বে আপন্যার
সোনার সাগর। সাগর—কিন্তু কেমন ঝাঁপ সাগর।
আলের ফ্রেম দিয়ে টুকরো-টুকরো স্বপ্নে তাসিকে বেঁধে
রাখা হয়েছে—তাদের কৃষ্ণের উপর দিয়ে বাতাস ধবন
বইছে শুধু ও-প্রান্ত থেকে এ-প্রান্ত পর্যন্ত ঢেউ খেলে বাছে,
ঢেউয়ের পর ঢেউ আগছে আর আগছে। দৃশ্য হচ্ছে কেমন
সন্-সন্ সন্-সন্। সকালের মিঠা রোদটি গেয়ে ঢেউগুলো

হাসছে কেমন সোনার মতো। ঐ হল বীজধান, অর্থাৎ
কচি ধানের চারা। মাটি-মাথের আত্মে ডুলানী। আমরা
থাকে বলাছি সোনার ঢেউ, মাটি-মাথের কাছে তাই হল
আত্মে ডুলানীদের হাথা-মেওণা। আর ঐ-বে সন্-সন্ দৃশ্য,
ও হল শুই বেরেডলোর বদলন হালি। কামিন অর্থাৎ
চাবী-বোরা চারাগুলোকে মাটি-মাথের দৃক থেকে কূলে নিয়ে
চাবীদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছে—চাবীরা বীজতলা থেকে
তদিক দিয়ে গিয়ে সার সার খাড়া করে দিচ্ছে পাট-করা
ক্ষেতে। এই-বে পাশাপাশি সব চাবী আর চাবী-বোদের
বীজ-ডোলা আর বীজ-পোতা কাছ চলছে, এর মধ্যে
আলস রূপ কোনটি জানেন? ভদের পান। এখন পান
নয়—আড়াআড়ি পান। চাবী-বোরা পানের কলি দিয়ে
প্রথ ডুলবে—চাবীরা পানের ক্ষেত থেকে পানের মধ্যে তার
উত্তর দেবে। কিন্তু বুড়ো চাবীডাইটি একটা নিখাস
ছেড়ে বললে,—'হু-ডীওণো এখন বোবা হয়ে গেছে, বাবু—
ছোঁকরাগুলো কুকুণে সে দম নেই। ভর পাওনের এই
বনবন হল—আমাদের কালে ক্ষেত-বাইন গমগম করতো,
গা-গড়ের বাধা মানুষই হত না, বাবু।

ভর-প্রাকণেই চাবীদের ভরা কাছ। সকাল থেকে
সন্ধ্যা পর্যন্ত চলছে এখন কেবল ঐ রোঙা-পোতা। যেমন
করেই হোক প্রাকণের মধ্যে এ-কাছ শেষ করতে হবে
তাসিকে। ঝাঁকের গোড়াই বীজ কূলে, সে-বীজ আবারেই
রোঙা চলে কটে—সকাল সকাল চাবের কাছ বতম হয়ে
থায়; কিন্তু আবারের রোঙা নামের ভেত্রে রোঙা।
রোঙা-পোতার উপদ্রুক সময় প্রাণ। এ লম্বা বনা
বে চরম কথাটি বলেছেন—

"আবারে রোঙন নামকে।
প্রাকণে রোঙন নামকে।
ভাসের রোঙন বীজকে।
আমিনে রোঙন কিসকে।"

আবারে বে চারাগুলোকে রোঙা বা লাগানো হয়,
ভারা খুব জাড়াডাড়া করে বেড়ে ওঠে—কাড় কাটে স্তেমনি
বিরাট। যে দেখবে সেই বলবে—'আচ্ছা ধানটা হচ্ছে
বাবু—কার ধান হে?' কিন্তু এই-বে 'আচ্ছা ধান'—এই
আচ্ছা-ধানটি খুব করে বেড়ে ওঠার বলে জাড়ে-আমিনের
কইকা বা দৃশ্য হাওণা নইতে পারে না। কোমর-ডাড়া
হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে। আর ধানগাছের অকালে শোওণা
যানোই চিরকালের মতো শোওণা। বনা তাই বনিকতা
করে বলেছেন—আবারে বে ধান রোঙা হয়, তা থেকে নাম

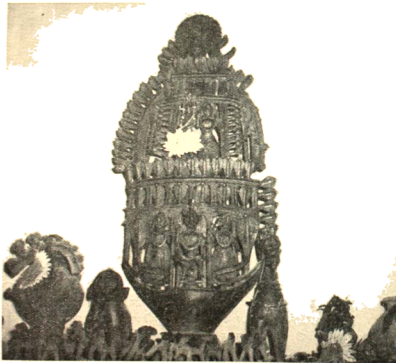
হয় খুব কিস্তি খান হয় না। 'শ্রাবণে রোঙন খানকে' অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে যে চান্দা রোঙা হয় তাতে খান কলে বোল-আনাই। খানের লগ্নেই শ্রাবণের খান। 'ভাদরে রোঙন বীজকে' অর্থাৎ চান্দা তৈবির ভাদ্রে যে পরিমাণ বীজখান মাঠে ছড়ানো হয়েছিল, সেই পরিমাণ খান-ই ভাদরের রোঙা খান থেকে পাওয়া যায়—তার বেশি নয়। 'আদিনে রোঙন কিসকে' অর্থাৎ আদিন মাসে আর কইছো কিস্তি ভাদ্রে বাবা!

•

"ওজাসের মরি শেষ রাত্রে" কথাটা ভারী দামী কথা। ঐশ্বর্য-আদি শুভ্রাও এ-নিয়মটি কড়া-পাওয যেনে চলে লেগেছেন। বৈশাখ বধন আসে তখন হালি ছোকরার মতো মুর ভাঁজতে ভাঁজতে আসে—আমরাও কুই কাই করে কাটিয়ে চিই। কিন্তু তৈষ্ঠ বধন আসে তখন বেকায়

জামাইটির মতো আসে; এসেই বলে, "হাড় খাবো তোরা মাস খাবো, হাড়ে বাঁধি বাঁধাবো" এবং কথা রেখে পর যায়। তেমনি আবার বধন আসে, ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে-হাসতে আসে—আমরা ভাবি, ও-হাসি হাসি নয়—মুক্তো! কিন্তু শ্রাবণে এসে ঐ মুক্তোগুলোই বাণ হয়ে যায়। কাম-মনোবাক্যে তখন আঘাতিকে আর্থনা করতে হয়—হে বধা, তুমি নিপাত হাও।

এই-বে আম চারদিন ধরে বাগলা আরম্ভ হয়েছে—গরু-মাগুরের কি দশা হয়েছে দেখছেন! আপনি তো মশাই পাগলো মাহুদ—গোথালের মাচাষ ছ'মাসের কাঠ তুলে রেখেছেন, বাড়িতে চাল আছে, তাল আছে, হুন্ড আছে, তেল আছে। হুন্ডর বাগলাটি শেষে কুমড়া-বীচি-ভাজা, ছোল-ভাজা, কুমড়-বীচি-ভাজা দিয়ে হরিমটর চিহ্নে-জ্বন—গিহীরা উজনে মোল-দিশ চড়িয়েছেন।



বেঙ্গল-প্রাচীর সহ গোড়া-মাটির প্রাচীর ফল-পুষ্টি

[কটা : হুন্ড-মুন্ডার দিশ]

নোল-সিদ্ধ জানেন তো? পাননি নাকি কখনো! মহাশয়কে চুল্লি দেখায় বলা হয় 'মোলা'। কাজেই যথেষ্ট মহা-চুল্লি খনন করে তখন তা কুড়িয়ে এনে রোসে শুকিয়ে রাখা হয়। তারপর এই বর্গার সমস্তটাই এতলোর লম্বাবহার করা হয়। কাঁই বা ভেঁকুল-বীড়ি গরম খোলায় ভেজে উপরের কালো ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে মহাশয় লম্বা খেনানো হয়। তারপর পিতলের হাড়িতে পুরে। চমিনকটা ধরে সিদ্ধ করে নিয়ে খেতে হয়। টাটকার চাইতে বাগী মহা-সিদ্ধ সৈ বা খোল দিয়ে বাবলার সময় খেতে ভোলা লাগে। তবে সিদ্ধ করার হাফা বা খুব বেশী—কাঠখড়ও পুড়ে অনেক। শরীরে বাহুবল্য তাই করে কি, একজন সিদ্ধ করলে গোটা পাড়াকে দিয়ে পরে যায়। অল্প ব্যক্তিতে এখন হবে তখন সেও আবার দিয়ে যাবে। বর্গার সমস্তটাই শরীরে বাহুবল্যের খাটুনি খুব বাড়বে—সকাল থেকে লম্বা পর্বত রোসে-জলে থেকে সবানো পরিভ্রম করতে হয়। শরীরে যেন আর বইতে চায় না। মহা-সিদ্ধ নেতিয়ে পড়া-শরীরকে চাপা করে তোলে। তাই এই হল মহা-সিদ্ধ খাওয়ার গ্রন্থত সময়। শুধু আবার মাত্র নই, চাবীরা বন্দ-মিকও গোটা বলা ধরে খাঁটারে (ধান+ছড়া+চালসিদ্ধ) লম্বা মহা-মিশ্রিয়ে খাওয়ায়।

তা সে বাই হোক—বলছিলাম কি, বাগদা এলে আগনি বড়মাত্রা, আগনার মজা—কিন্তু যাকিবে দিন এনে দিন খেতে হয় তাদের কঠোর আর সীমা থাকে না। ইটময় লগ্ন করবার মতো মজতে থাকে তারা: মরে বাই চাবতা—একটু রোস ধাও, ধানভস্মা শুকিয়ে নি' একবার। আর গক-ছাগলগুলো গোয়ালের বেড়ার ধাঁক দিয়ে মুগ বার করে গাড়িয়ে-গাড়িয়ে ধাঁপে। বেচারারা পালে খেতে পাননি আর তিন দিন। মালিকরা দু-এক ভাল আগুন কি আম লামনে কলে মিছে—তাই খেয়েই দিন কাটাতে হচ্ছে।

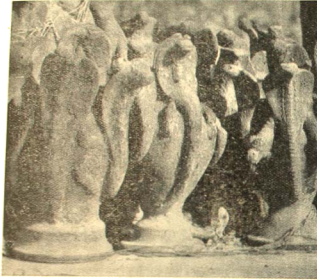
আচ্ছা, সারাদিন তো ঘোর করে আছে—ওর মধ্যে বেলা গেল বুঝি কি করে বসুন বেবি? বিঙা-চুল বেশ। বিঙা-চুল হল বর্গার খড়ি। ঠিক লম্বাটাই হবো-হবোর সময়ই বিঙা-চুলেরা মুটে ওঠে এবং মুটেই বলে দেয়—বেলা গেল, লম্বা হল।

বিঙা-চুল মুটেলে ঘেরেরা কলসি কাখে বেবিরে পড়ক—আগনি পাচ্চাবি করতে করতে চলে আসুন বাগানটা পর্যন্ত। এবং একটু-আধটু ঘোরাঘোরের পরই বাড়ি ফিরুন। ফেরার পথে ধানের মাথায় গাড়িয়ে বেধুন বেগি—খোঁয়া না? প্রতিটি বাড়ির চাল ভেল করে খোঁয়া বেরিয়ে আসছে না? তবু নেই, ও হল বলা ভাড়াবোর ব্যবস্থা। বর্গার সময় খুব বেশী মজা হয়—কিন্তু গোয়ালে বা ঘরে ঘোড়ান-পুড়ার খোঁয়া দিলে মজার মজ-বাড়ি ছেড়ে পালায়। আর পালাবার সময় বাড়ির বাইরের বরফাধ জমায়েত হয়ে দেখবেন কী মজার মন-উল্লাস-করা গান করে। ও হল বাড়ির গান।



হাতি গোটা-ওগী শৌভিক কলস

[মুটে: অতিক্রম]



মনসার জ্যটন খণ্ড

তুলসে আশনার-আমারও মনে হবে গোটা-কলন নিয়ে
বেহিমে পড়ি।

“আমরা হেলার নাগেরে বেলাই, নাগেরি মাথায নাচি”
কথাটা ভারী মনর কথা; কিন্তু এই বর্ষার হুঁমাল আমাদের
শাপের ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকতে হয়। পথে সাপ, ঘাটে সাপ,
মাঠে সাপ, ঝোপেঝাড় সাপ, উঠানে সাপ, ভাতের হাড়ির
পানে সাপ, উপর থেকে যে মল পড়ছে দে-মলের মধ্যেও
সাপ। মানে, সাপেরই রাজত্ব। পল্লীর মাগুরা তাই এখন
নাচের প’ড়ে মাকে ডাকে। সাপের দেবতা বা-মনশাকে
এনে ধরে বলায়। বাকী লম্বাটা বা কোথায ছিলেন জানেন ?
কীরাই নদীর কুলে।

“মাকে আনতে বাবা গো কীরাই নদীর কুল,
মায়ের হাতে দিব লাল জবা, চরণে দিব ফুল।”

জাপন এবং ভাষা এই দু’বাসেই সাপের উপহাস চরণে ওঠে।
তাই এই দুটি বাসের সংক্রান্তিতেই আমরা মায়ের পূজার
ব্যবস্থা করে মাকে সন্তোষ রাখার প্রয়াস পাই।

কিন্তু দেবী মনসার কথা বলতে গিয়ে প্রকৃতই একটা
জিনিস দেখে ভারী গোলমালে পড়ে থাকি। দেবী মনসার

বাহন তো হাতি-ঘোড়া নহ—সাপ।
তিনি যা ধরে আছেন তা সাপ, যা
প’রে আছেন তা সাপ, যার উপর বসে
আছেন তাও সাপ, তাঁর সম্মুখে
যে ঘটটি ফিরেছি তাও তো সর্পময়।
সর্বোপরি তাঁকে যে আমরা ডাকছি
তাঁর কারণও ঐ সাপ। এই সাপের
রাজ্য হাতি-ঘোড়ার চুকলো কোন
মাহলে!

ভারত শুধু মহামানবের সাগর-
তীর-ই নহ, মহাসেবতার সাগরতীরও
হটে। এবানের মাগুরের মাঝেও
যেমন ফটেছে বহর সংমিশ্রণ, মাগুরের
দেবতার মাঝেও তেমনি ফটেছে বহর
সংমিশ্রণ। অথচ কেউ কারও সঙ্গে
মিশে হারিয়ে নেলেনি নিজে কে।
সিদ্ধুর মাঝে বিন্দুর বৈশিষ্ট্যটি ঠিক
বদায় আছে। গোটা ভারতকে ছেড়ে
বাংলাকে ধরে বলি—বাংলার আদিম
অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার, ধর্ম-
রীতির সঙ্গে এককালে হুন্ডা আর্থ বা উজ্জবর্ণের হিন্দুদের

[কটা : অধিত দিব

সামাজিক আচার-ব্যবহার, ধর্ম, ধ্যান-ধারণার সংমিশ্রণ
ঘটেছে। ফলে অন্ত্যস্ত অনেক কিছুর মতো আদিম
অধিবাসীদের দেবদেবীরাও অনেক সংকুত হয়ে আর্থ দেব-
দেবীদের মলভূক্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু মলভূক্ত হলেও আদিম
দেবতার আদিম রূপটি হারিয়ে যায়নি। ছুটি রূপই
পাণাপাণি বাড়ী আছে। আদিম রূপটিও আছে, সংকুত
রূপটিও আছে। যুলে আছে উজ্জবর্ণের রঙিনগত বৈশিষ্ট্য।
দেবীদেবীদের বিভিন্ন মূর্তি-কল্পনা হুন্ডা আর্থদের। অলভ্য
আদিম অধিবাসীরা টোটেম বা হাতি-ঘোড়া দেবতা ছাড়া
দেবতার অস্ত্র কোনো রূপ কল্পনায় আনতে পারেনি। পশু-
দেবতা, কচ্ছপদেবতা, কুকুদেবতা, ব্যাঘ্রদেবতা, সর্পদেবতা—সব
দেবতাকেই তারা পূজা দিচ্ছে—একমাত্র ঐ হাতি-ঘোড়ার
মাধ্যমেই। দেবতা বাসেই তাদের কাছে হাতি-ঘোড়া।
লৌকিক দিব আমাদের হাতে বৈদিক দিব হয়ে মথির-মথো
স্থান পেয়েছেন কটে, কিন্তু তাঁর লৌকিক রূপটি লুপ্ত হয়ে
যায়নি আজও। শিবের পাশে ভৈরব হাতি-ঘোড়া রূপে
গাছতলাতেই পড়ে আছেন। এমন কি, শোলমিছা কালী
হাতি-ঘোড়া রূপে নিরঞ্জনের হিন্দুর হাতে পূজা নিচ্ছেন এও

দেখছি। মনসার ক্ষেত্রেও তাই। হস্তা অর্ধ-হিন্দুয়া আদিম অবিবাসীদের সর্পসেবতাকে যখন নিচ্ছেদের দলে টেনেছেন তখন যুগ্মী দেবী করে নিয়ে টেনেছেন—এদিকে তাঁর আদিম রূপটি হাতি-ঘোড়া হয়ে আশ্রয় রবে গেছে। সাপের রাশে হাতি-ঘোড়া চুক খাকার ভিতরের রহস্তটি আবার মনে হয় এই-ই।

আর একটা কথা—মানব অবিবাসীদের হাতি-ঘোড়া-রূপী মনসা আর্ধ-হিন্দুর কল্পনার মাধ্যমে হৃদয় মূর্তি পরিগ্রহ করেছেন একদিনেই নয়—ক্রমে ক্রমে। এ ক্রমবিকাশের ধারাটি অশ্লিষ্টাঙ্গন করলে এখনও চোখে পড়ছে। কয়েকটি প্রাচীন পোড়ামাটির মনসা-মূর্তি পেয়েছি যেগুলি একক। একা মনসার রূপ পরিগ্রহ করে ধাঁড়িয়ে আছেন, পানে বেহুলা বা লম্বিন্সর সেই। একগাথা সাপের মধ্যেই মনসা সর্পহস্তে মণ্ডাঘমানা অথবা উপবিষ্টা—চালটা সাপের মণা নিয়ে তৈরী। পরবর্তীকালে সেই একই পোড়ামাটির মনসার পানে বেহুলা ও লম্বিন্সর এসে ধাঁড়িয়েছেন এবং চাল উপরের দিকে কয়েকটি করে বেড়ে গেছে। এরকম এক-বৃক উচ্চ মূর্তিও চোখে পড়ছে। ক্রমে এই পোড়ামাটির মূর্তিরাও কৌলীক হারিয়েছেন। সড়ে উঠেছে দেবী মনসার হৃদয়-মূর্তি আধুনিক রূপ। এবং এ রূপে দেবী মনসা ঘোড়াশাপচায়ে পূজা পাচ্ছেন—মিষ্টাভান কুলীন ব্রাহ্মণ বৈদিক যন্ত্র সহযোগে তাঁর পূজা করছেন। দেবীর উদ্দেশে যজ্ঞাহুিতে ধ্বারীতি সবিধপূজ-বৃত্তাহুতিও পড়ছে। আবার এর মধ্যেও বড় কথা—হাতি-ঘোড়া-রূপী মনসা হাতি-ঘোড়া-রূপে থেকেও অনেক আয়তায় ব্রাহ্মণের হাতে পূজা পাচ্ছেন। নৌকিক দিব হাতি-ঘোড়া-রূপে ভৈরব নামে যেমন পূজিত হন, তেমনি নৌকিক মনসা হাতি-ঘোড়া-রূপে বরষাবুড়ী নামে পূজা পাচ্ছেন। বরষাবুড়ী বরষাবেরই বুড়ী এবং বরষাব্রাহ্মী বরষাব তাঁর পূজা করছেন। কিন্তু বরষাবের পরিবর্তে এখন তাঁর পূজা করছেন ব্রাহ্মণ। পশ্চিমের বীজময় যেমন 'গাং'—দলপশকে উদ্দেশ করে যেমন উচ্চারণ করা হয় 'গাং গাংগায় নমঃ',

তেমনি বরষাবুড়ীর উদ্দেশেও বীজময় সহযোগে উচ্চারণ করা হয় 'গাং বরষাবুড়ী ঘেঁষা নমঃ'।

হস্তাঃ আর্ধ-সংস্কৃতি যেখানে ঘোল-খানা বিজ্ঞানলাভ করেছে সেখানে বরষাবুড়ী অচিরেই মনসার মধ্যে লীন হয়ে যাবেন, এমন অশ্রুমান করা বোধ হয় অসম্ভব হবে না। বরষাবুড়ী হস্ততা এখার তাঁর সেই আদিম রূপটি নিয়ে গেঁচে থাকবেন শুধুমাত্র আদিম অবিবাসী-অদ্যুত পন্নীর গাছতলায়-গাছতলায়। লক্ষ্য করলেও দেখেছি, হাতি-ঘোড়া-রূপী মনসা দিন দিন যেন বিলার নিতে আরম্ভ করেছেন হস্ততা পন্নীর বৃক থেকে। হৃৎবহুর আগে যেখানে হাতি-ঘোড়া দেখেছি, সেখানে এখন দেখছি হাতি-ঘোড়ার পরিবর্তে মনসার যুগ্মী রূপ। হাতি-ঘোড়ামিকে ভগ্নার খালে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।

অল্প সংখ্যামিকাযেহু পষাবুড়ী-খানের হাতি-ঘোড়ামিকে প্রয়োজনের ব্যতিরেকেই করতবৎসর অন্তর অন্তর বলে বেলে দিতে হয়। এই সংখ্যামিকা ঘটে মানসিক বা মানস্তের মৌলন্তে। "ঘোড়া পাঁচা দিব না, ঘোড়া ঢাক দিব না" বলে যেমন মানত করা হয়—তেমনি আবার "ঘোড়া হাতি-ঘোড়া দিব না" বলেও মানত করা হয়। আর মাঘের এমনি মাহাঘ্য যে, মানত করলে মা বকলে গুনবেন-ই। এবং মানত করলাব, মনসামনা পূর্ণ হল, তারপর মাকে হেঁকে বিলাস—সে মা মা-মনসা নয়।

দেবী মনসা ভারী আগ্রস্ত দেবতা। হাতি-ঘোড়ার মাধ্যমেই হোক আর হৃদয়-মূর্তির মাধ্যমেই হোক, পূজা দেওয়া হয় তাঁকে ঘোল-খানা ভক্তি সহকারেই। কোনো-ক্ষেত্রেই পূজার রূটি ঘটনা একটুও। তবে আমি বলি কি, মনসাপূজার বিশেষ একটি রূপ যদি দেখতে চান—তবে মনসার নত, বরষাবুড়ীর খানে এসে গাঁড়ান। এবং শ্রাবণে নয়, ভাদ্র-সংক্রান্তির মতো অশ্লিষ্টাঙ্গন করুন। শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে মনসাপূজা হয় কটে, কিন্তু মনসাপূজার মূদ লাগে আসলে ভাদ্র-সংক্রান্তিতেই।



**আলম্ভার
চিহ্ন**

ম্যান
৪৬
৩৬২৬

লক্ষ্মী ব্রাদার্স
জুয়েলার্স
১, হিন্দুস্থান মার্ট, বালিগঞ্জ
২০৮/৮, চান্দবিহারী গ্রিনিউ (পল্লীমার্গে) কলিকাতা

লেবাননের পথে

কুমারেন ঘোষ

আকর্ষণ, এর মরুপ্রাচীরে এত আত্মীয়-বন্ধন-বন্ধুকে দেখতে পাবো এমনদে বিস্ময়-মুহূর্ত—ভাষান্তরে পারিনি। বয়ানগর, কানিপুর, পার্স-লার্কস, বালিগুজ, মাক-কলকাতার ধারা আসবার সবাই এগে উপস্থিত বিলাস-সম্ভাষণ জানাতে। তাঁদের বেধে প্রীতি ভালবাসা, আমার হাতে তাঁদের-সেওয়া পুষ্পকঙ্কর মতোই বিকশিত, পুষ্পমালোর মতোই মনোরম। দৃষ্টিশীলতাই হতো, তাই কাছেই মাতৃকলের অতি কাছে গেলেও এতদিন অপেক্ষা বেধে এসেছি। আর দুয়ের পথে বাম্বার কালে দুই বোকে দেখলাম তাঁদের স্মৃতি, দেখা গেল তাঁদের আত্মরিক্ততা। হাতের বইখানা চোখের খুব কাছে ধরলে গড়া বাধ না—তাঁই বুকি একটু হুঁরে ধরাই নিম্ন।

বাংলায় সন্ধ্যা এসে। লোহার নিষ্ঠুর বেলিঃয়ের ওপারে ওরা গাড়িতে। কাস্টমসের চেকিং হ'য়ে গেছে, আমি বেলিঃয়ের এপারে। ওপারে ওদের স্পেসে গেলে কাছে বেতেই বাধা পেশান এক অভিনায়কের কাছ থেকে। স্নায়, ওখিকে যাবেন না। কাস্টমস-চেকিং হবার পর বেলিঃয়ের কাছে বাম্বার নিয়ম নহ।

টিকিট তো। কাস্টমসে যল এসেছি, বোম্বাইনী কিছু সন্ধ্যা নেই। বেলিঃয়ের কাছে গিয়ে লে-ওরেনের কিছু তো নিয়ে পকেটে ভরা রাখ। কামেই হুঁরে থাকাই নিম্ন। তাছাড়া নির্দেশ এঁদের মানতেই হবে, কারণ এখন আমি এঁদের; বেলিঃয়ের ওপারে অতি-অপন ধারা গাড়িতে—তারা আর দুয়ের। অস্থিরের অল্প বন্ধন যদিও আমি আপনজনের কাছে থাকা, তবু বাস্তবের ঐ লোহার বেলিঃটাই আর বেন বেলি বাস্তব, বেলি বর্তন।

বিলাট চাতালে BOAC-র Argosy প্রেনখানা হু'পাখা মেনে গাড়িয়ে। অস্ত্রাঙ্গ যাত্রীদের সঙ্গে উঠলাম গেনে। দুই চেরে দেখলাম বেলিঃয়ের দিকে। না, আর দেখা যায় না। ওরা জনতার সঙ্গে মিশে একশা হ'য়ে গেছেন। মাহুদের লবাক্ষেপ মিশে গেছেন। এখন নিকট থেকে দুই স'রে গিরে হুঁকে নিকট করবার পালা। এখন আমার বহুইং-বুটকন্। দেখলাম, আমার সীটের পাশেই ব'লে এক চীনা ভ্রমলোক।

মিঃ চেন আমার হুঁর পথের প্রথম আশাশী।

পাইলটের হতে বাম্বার বন্ধ ধরবার বাম্বার আলো-বিজলিত : লুবান নিম্নে, কোম্বারের বেলিঃ থাখে।

যেনের স্টার্ড এগে আলো-বিজলিত উলার গাড়িয়ে বড়তার ভর্তীতে জানালো : আমরা ঈশ্বর উড়লো। উড়লো ওটার ২১৪ মাইল বেগে ১৭,০০০ ফুট উপর দিয়ে। কবাজী পৌছলো সাড়ে চার ঘটীর পর। লোকটা বেন ভাল-ভাত খাওয়ার মতো নিশ্চিন্ত-গলায় ব'লে গেল। তা আর বলবে না কেন ? রোজ দিনে-রোজ ঐ কন্ডই করচে। কিন্তু বুকটা আমার বড়ানু করে উঠলো শৈতুক প্রাণের মায়ায়। মম ঘরবীর মুখখানা মনে পড়লো। দেখা থাক, ওর শিখির সিঁদুর, হাতের নোয়ার জোর ! আমার কি !

মেন গরিরে চললো খানিকটা। গাভালো একটা ঠাকা জায়গায়। লসে লসে শুক হ'লো ইজিনের জীঘ গর্জন। সারা যেনটা হুঁর কাপতে লাগলো। বাম্বাশুর্বে অস্থির চাকলা ! বুকি আমারই মতো। একটু পরেই শুক হ'লো চলা। হঠাৎ সেপি পাছের মাথার উপরে উঠে গেছি ; বাড়িগুলো বেগনার মতো, বাস্তবগুলো বেন দিলে।

ভারতের পৃথক্টি ত্যাগ করলাম। বেলো তখন পাচটা। শনির শেষ। ভার মাপ। আর মিনটা ছিল নাকি অগ্রহা, বাম্বার ভরা বাম্বা-মিন !

আমি চলছি একলা, নিঃশব্দ। কোনো দলের ডক্কা ঠাটো নেই আমার বুক। কানোর আম্বায়ে আম্বিত নই আমি। অস্ত্র কাতোর ভ্রমের জোরে লগুনের রূপ দেখতে বাড়িরে থাখা নিম্নে। ছককাটা পথে আমার বাম্বা নহ। বাম্বা বেখায় ইচ্ছে ; বাম্বা বেখায় ইচ্ছে, চললো যে পথে আমার ইচ্ছে, দেখলো বা আমার বুন, আলো করলো যার সঙ্গে আমার গ্রাণ চার। বাম্বার। বন্ধনহীন, সংকেট-বিহীন, নতুন ভবনুরে। স্তর-সংসার ছেড়ে বিশ্বাসের স্ফেতে বেরিবেছি। আমার বড় গরিরে—আমি ভারতবাণী। বাম্বার ভারতের একমুখ আমি। শাস্ত্রিময় ভারতীয় আমি, চলছি বিশ্বের পরিচয় দিতে, বিশ্বের পরিচয় দিতে। তা যদি থলো, আমি ভারতের প্রতিনিধি।

বাম্বারের গলায় তেরটা শৈতকের মতো প্রেনখানা ভারত-আকাশে উত্তর-পশ্চিম কোনারকোনি উড়চে। জানলা দিয়ে দেখা থাকে পশ্চিম আকাশে ভূমুহু হুঁর লাল আভা।

সে আভার ফ্যাকাশে হবার নাম নেই। সূর্য বেন ডুবেও ডুবচে না। আমরা আকাশে বহু উঠতে, নৃত্য! চোপ নীচু ক'রে দেখছি, ঐ তো সূর্য।

সাবনের চেয়ারে পেছনের পকেটে টাইম-টেবল, ম্যাপ, ছুর্টনার হাওড়া-আশা পরবার নির্দেশ-পত্রিকা। অলস হাতে সেটাই বাহ ক'রে গড়া গেল; মন দিয়ে নয়, আসতো মনে। কারণ, কে না জানে, হাওড়াই-আহাভ যদি বিগড়ে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে মাঝতে থাকে মাটির দিকে, তখন হাওড়া-আশা পরবার আগে মাটির গায়েই পড়তে হবে আচ্ছড়ে। ওটা মন বোকাবার ব্যাপার হ'লেই মনে হ'লো, কাজেই মনোযোগ দেবার দরকার কি? রেখে নিলাম সেখানে। টাইম-টেবলখানা বাহ ক'রে ওটাটে লাগলাম তার পাতা। কয়টা পৌছক্তি বাত ম'টাধ।

কয়েক বটা পরেই আবাত দরকার মাথার আলো-বিজ্ঞাপনী মনে উঠলো। বৃশ্ণান নিবেশ; কোমরের বেট ধাখো। অর্থাৎ কয়টা কাছে।

বাইরে অন্ধকার। জানলা দিয়ে দেখলাম নীচের মাটিতে তারার মেলা। সহরের আলো নিচ্ছই। পাকিস্তানের রাজধানী—ভারতের বিজিহ অংগ। আমাদের প্রতিবেশী অঞ্চত বেশি রেখাযেবি এনেই লসে। স্তরের কান-ভাঙানিতে ভায়ে ভায়ে বগড়া।

পেনের লম্ব গেচে বগলে। নামচে। জানা আছে, এই অযোগ্যতির সময়েই চালকের সংঘম ও দিক্কার চরম পরীক্ষা। অন্তর্ধার অধঃপতন অবতস্তাবী এবং রুমমকের পতন ও দুর্ভাগ্য বসলে জীবন-মার্যমকের এ পতনের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু। জানা ছিল তাই, না জানার ভান ক'রে অস্ত্র কথার বান নিলাম মনে। হঠাৎ মনে হ'লো—'বন্ধ' (ঠক নয়) লম্ব, নামাত্ত ঝাঁকানি, পরে গড়ানির গড়-গড় অহভব। বাক, চাকা ঠেকচে, চাকা গড়িয়ে চলচে মাটি নিচে। জীবনধের ঢাকাও জুহ'লে অচল হ'লো না। এ-বাক্য ঝাটোখা। পাখিভাবী মাটি বে কস্ত্রিকর—বোকা গেল অস্বস্তিকর নৃত্য থেকে মাটিতে নামবার পর। হোস্টেলের নির্দেশে ঘড়ির কাটা আনতে হ'লো দু'কটা পেড়িয়ে।

গতি থেকে বটা দুই কেটে নিয়ে একটু এলিয়ে-মেলিয়ে বগা গেল BOAC-র কয়টা কেস্ট-হাউসে।

হেভের টেবিলের ওপায়ে আর দু'খানা চেয়ারে ব'সে এক বিরাট মোটা ভুজলোক, আর একটি বহিলা। আশাপ্রসন্ন মনে যি: মহাপুরিয়া নিজেই। ভুজলোক কাপড়ের ব্যবহারী। সবিনী হজেন বিলেদ অধপূরিয়া। গাজেন

হুইজারল্যাণ্ডের মুদ্রিগ। কারণ, মেন: অবত কারণ যে হুশ্পট, তা তাঁর বৈধিক আকৃতি থেকেই বোকা গেল। এবং এমন যে একটি বরষপু নৃত্যভার আশাদেরই সংযাজী ছিলেন, তা নহর পেড়নি মাগে। এখন জানতে পেরে একটু চিন্তিত হ'লোম বৈধিক। তবে ভরসা: বাগে কেই মায়ে কে ?

ভুজলোক নাকি মুদ্রিগ থেকে আশাপ্রসন্ন পেয়েচেন, সেখানে গিয়ে পড়তে পারলেই একটা গতি তাঁর হবেই। অর্থনাশ হবে বটে, কিন্তু মেননাশও নিশ্চিত। আরো পোনা গেল, মিসেস অধপূরিয়ারও নাকি পেটের বোগ। মুদ্রিগে গিয়ে সেটাও লাবাংর ইচ্ছা। হাজের, যদি ভাত-কাপড়ের অস্ত্রেই অর্থোপার্জনের প্রয়োজন—তবে এ'রা হবেরেন রীতিমতো বার্ধ। অর্থ পেয়েচেন, কিন্তু ভাত হজব কথবার পক্তি পাননি মিসেস; আর, কাপড় গুড়িয়ে পরবার মতো বেহ পাননি মিস্টার। তবী মিসেসের পাগে বিরাট মিস্টারটি বহিও যেমানন, তবু দু'কনেরই হাদি-হাদি ভাব দেখে বোকা গেল, পরস্পরের মন কিন্তু জানানো।

যোর অন্ধকারে সের শুক হ'লো হাওড়ার ভাসা। এবার দু'খোবার পালা। পেনের আলোভলো কহিয়ে নরব করে আনা হ'লো ভিতরটা। পা থেকে খুলে কেললাম জুহো-ভোডা, ভিলে কয়লাম নেকটাই।

পেনের পর্গনের সঙ্গে থেকে থেকে ভাল দিয়ে নানিকা-গর্জন করছিল কয়েকটি ঘাই। ডিরমিজার সম্ভাবনার গা ঘেঁষে থেকে থেকে এক কাঁকে খানিকটা দু'মিয়ে নেওধ্য সতিাই রীতিমতো স্বাভাবিক লক্ষণ।

রাত চারটেয় ঘুম ডাঙলো। মনে হ'লো নীচের নামতি। ঠিক-ই। আলো-বিজ্ঞাপনী ফের বেট-বন্ধী হ'তে নির্দেশ দিতে। ভাড়াভক্তি মুক্তো পরলাম, টাই বেধে নিলাম গলায়, বেট বেধে নিলাম কোমরে।

বেড়ানি। পায়ত্র-উপশাগরের জীরে একটি সহর, অন্ধকারের বোরখা ঢাকা। মুক্তো-ব্যবসায়ীদের তীর্থস্থান। হাওড়া-আহাভের মন মেনার পায়শাল্য।

পায়ত্র-উপশাগরের কিনারায় এই ভল-আগা ছোট ছোট বীণাবলীর সমগ্রিক এমিক-এমিক মাগলে মাগফল হ'বে প্রায় ২১০ বর্গমাইল। মোকসংখ্যা একলক্ষের কিছু বেশি। বেড়ারনের মানামা বীণটিতে সরকারী আচ্ছা। সেখানেই বিরাট করেন সেখ এবং বৃত্তি প্রতিনিধি। দেশটার আরও হুইয়েরই প্রাধান্ত বেশি; ইরানী সিরিয়ান হজে সংখ্যালঘু

সম্ভ্রান্ত। আরহসেনের পাণ্ডোঁ বা রাজ্য, কাণ্ডেই আরহসেনের ভোর-দুন্দুই বেশি, মাড়িভাঙাও তাই আরহসী।

আন্তাইবা কানের লেশ প্রলম্বমান বিন্ আহ্মেধ মাল্ ধানি-ই বেহরিনের বর্তমান হইকর্তা। হর্তাকর্তা নামে, কাজের কাজী কিন্তু রুটপ প্রতিমিদি। গঠার আডাল থেকেই তিনি নাজেন কলকাতা এবং বেশ নাজেন পুতুল-নাচ। তাই সেনের বিচার-বিভাগই ঐ কুটিল কবলে; পুলিশ-পরিচালনাও হয় চমক ইংলও-পুরের ইসিতে। তবে দেশের আইনটা ইংরেজী নয়, বাণ মূলমণী পরিচয়ী।

শেপটা একটুখানি হ'লে হবে কি, সম্পদের ঘনি একটি। মাটির তলার তেল, জলের তলার মুকো। এমন মধু বেধানে, সেখানে ইষ্-মার্কিন মাছি এসে ভস্কুন্ করবে, আকর্ষণের কি? তাই তেল-কারখানাগুলো সবই ইষ্-মার্কিনের হাতে। তারা হাতে হাত শিশিরে বেহরিনের সম্পদ বেহাত করবার তালে আছে। পনের তেল নিরে নিঃসের চরকাও তেল মিছেই, আবার এত তেলানি যে, পনের চরকাও তেল বেহার আগ্রহও বাড়তে বিন-কে-দিন। তেল বেচে মিষ্টাররা সিদ্ধুক ভরচে ঐবধ, মুকোর মালা গ'রে সৌন্দর্য বাড়তে বিশেষরা। বেহরিনের ইষ্-মার্কিনের এফেন পোরাবাত্তো দেখে সম্পত্তি সেশবাগীরা হব তুলেচে : বেহরিন চাড়ে।

তবে রাগটা ইংরেজের উপরেই বেশি। কারণ মার্কিনরা দেখানে কেবল মাটির তলার তেল নিরেই ব্যত, কিন্তু ইষ্-প্রভুরা মাটির তলার তেল তো মিছেই, উপরন্তু বেহরিনের শাদন-চরকাতেও তেল দিতে চাড়ে না। তবে দেখানো ইংরেজ তার চিপসিচিট 'স্ব-মারী' চাল এখানেও চলেচে। দাশা বাঘিরে দিয়েছিল আরব আর ইরানীদের মধ্য।

তবে রাজনীতির চাকার ঘোঁড়গাড়ির মতো স্টেয়ারিং নেই; তাই কখন যে কোন দিকে ঘুরে যায়, বলা কঠিন। কাণ্ডেই বেহরিনের রাজনৈতিক চাকাও সম্পত্তি ঘুরে পেচে। বার্ষে যা পড়ার ইষ্-মার্কিন মিছেরাই ঠাণ্ডা-লড়াইয়ে নেতৃত্বে। ইংরেজরা বেহরিনের চক্ৰকুল হুয়েচে সেবে মার্কিনরা তাদের চোখে-মুখে কবপনব বুলিরে দিচ্ছে। ইচ্ছেটা, পরে তাদের বাঘার হাত কুলাবার। এদিকে বেহরিন-মার্কিনের প্রেমালান মেখে (কারণ সম্পত্তি বেহরিন-মিউইর্ক—একটা রেভিভো-টেলিফোনও খোলা হয়েছে) ইংরেজ চটে মাল। তাই মার্কিন-গ্রেমিক পেঞ্চ শিকের তেলবার চোঁথ আছে ইংরেজ। তাদের আশা, সেথকে হঠাতে পারলে মার্কিনদের গ্রেম করবার সখ হয়ে বেবিরে।

তবে সবই অনিশ্চিতের ব্যাপার। বেহরিনের

রাজনৈতিক চাকা কোনদিকে কি ভাবে ঘুরে যায় কে জানে! স্টেয়ারিং তো নেই!

সেনের শিঁড়ি বেধে নামতে গিয়ে ঘন্কে গাডালায়। আগনের হলকা ছুটেচে যেন। পনপনে পয়ন হাওরা। 'আগনের পরশমণি চোঁথও প্রাণে'—মাকী ঘুরে পান তুনেটি এই কানে; কিন্তু আগনের সরল-হাওরার চোঁথার গায়ে লাগতেই বেধ বোকা গেল, ব্যাপারটা স্বপ্নগ্রন নয়। ডাড়াডাড়াি এরর-পোটের অফিসে ঢুক পড়া গেল। তপ্ত বাতুর। অগ্নি-বাহু জানিনে কী হযগাং পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচে এই হাতির অন্ধকারে আরব-হক্কুমির চারিদিকে। আমরা গ'রে এলান তার সাবনে থেকে, আগ্রহ নিলাম এয়ার-পোটের অফিসে। চা-বিহুট খেয়ে বদলায় বাগানে। কয়েকটা কুতপ্রায় একমাহুব সমান গাছ, কতকগুলো ফুলের গাছ এলোমনেসো গাড়িরে আছে কাণার মধ্যে। পাশের কলে বেলে-মাটি কাটা করা। কুতপ্রায় মধ্যে দশ সত্ত্বের হাফ আয়োজন। হুর্জিকের মাঝে রুগো-রসে-ডোরা অর্থশালীর সুবি বাচবার প্রহসন।

খানিক পরে আমরা বাহু-নিঃশ্রিত সেনে বদবার অহমতি পেয়ে বাচলাম। ফুলে ফেললাম কোট। অলহু। খড়ি পেছিরে দেওয়া হলো আরো এককটা।

চোখে নেই ঘূষ। সেন উড়লো আকাশে। আকাশ কাফাশে। নীচের পাগু-উপশাগরের এককানি নীল জলখেবা। যেন ব্রুদ। পার হ'য়েই শিরিয়ার মক্কুমি। বিশাল, বিস্তৃত। স্বচ্ছ বায়ু-সুস্থ। সেন হঠাৎ-বেধে-বাওরা চেউ। চেউয়ের পরে চেউ। অপূর্ব, ভীষণ। চোখে পড়লো হেলের পাইপ। লম্বাখি পাতা। যেন লম্বা খানিকটা তার। লম্বা কলার চারিদিক। নীমাহীন। নীচের মক্কর কক্কু, উপরে আকাশের বিস্তৃত। নীল-দিনলের অপূর্ব সমীপ। হৃৎ উঠলো। বিশ্বের এক স্তূভাংগ ভ'রে কেল কুশালী আলোয়। রুগো গলতে লাগলো আকাশে মাটিতে। সেনের এম্মিনিয়-পাখার পড়লো হৃৎের কিরণ, চোখে এসে লাগলো তার ভীতুতা। চোপ ফিরিয়ে নিলাম।

হোস্টেল দিয়ে গেল একগ্রাস সরবতী লেবুর রস। আহা, এটাই যেন দরকার ছিল এগময়ে। গলাখকরন করা গেল। একটু পরেই এলো বেককাটা।

এবার বেকটা। লেবাননের রানখানী। আর কটা ছই

যেহি। হোষ্টেল দিয়ে গেল কান্টনমেন্ট আশ্রমে আর
এক চৈনিক ভক্তলোককে।

আমার পাশের মি: চেনকে বললাম: আমার সঙ্গে ঐ
চীনা ভক্তলোকও বেরুতে নামবে দেখি।

বাগা দিল চেন: ও চীনা নয়।

—তবে?

—জাপানী।

—ও, চেংহাং বেগে বৃত্তে পারিনি।

অগ্রসর হ'লাম।

চেন বললো: দেখতো না, ওর সঙ্গে কথা বলচি।

বললাম: তাইতো!

বাথরুমে গেলাম। ফ্রিচি জাপানী ভক্তলোকের পাশ
সিঁধে, ভক্তলোক আমাকে তার পাশের বালি সীটে বসতে
বললো। বিদায়িত হ'য়েই বললাম। লক্ষ্য করলাম চেনের
দিকে। চেন চেয়ে আছে বাইরের দিকে।

জাপানী হিগোস করলো: তুমিও তো বেরুতে
নামচো?

আমার স্বপ্ন-লেখাও লক্ষ্য করতে পে।

—হ্যাঁ। তুমিও তো?

—হ্যাঁ। সেখান থেকে বাঁধা বাঁধায়ে।

—সেখানে কি?

—একদ্বিধন হচ্ছে, জাপানী প্যাভিলিয়ন কাঁধের তার
পড়েছে। তুমিও যাচ্ছে নাকি সেখানে?

বললাম: বাবার ইচ্ছে আছে।

কার্ড বিনিময় হ'লো। জাপানীর নাম—নাকাটা।

বললো: কলকাতা থেকে আসতো তো?

—হ্যাঁ। তুমি?

—টোকিও থেকে। ঐ চীনা ভক্তলোক?

—উনিও কলকাতা থেকে।

—তোমার বন্ধু বৃত্তি?

—এই সেনেই আলাপ। আচ্ছা, উঠি, থ্যাঁ?

—আচ্ছা।

ভাড়াভাড়ি উঠে চেনের পাশে এসে বসলাম। চেন
বোধহয় দেখতে পায়নি আমি ঐ জাপানীর সঙ্গে কথা
বলছিলাম। কিন্তু চমক ভাগলো—চেন এখন জানলার দিকে
সেয়েই হিগোস করলো: ঐ জাপানীটি কি বলছিল
তোমার?

ধতমত পেতে হ'লো: এমন কিছু নয়। এই পরিচয়।

—আমার সবচেয়ে কিছু বলছিল?

স্নেহ বললাম: না-তো।

চেন আর কিছু বললো না। আমিও থমকিয়ে
আবহাওয়াটা কাটাবার ভজ্ঞে সিঁড়িয়ার দরজার পৌরষের
বিষয় অবতারণা করলাম। চীন আর জাপানের কেন,
কারো মন-কথাকথির মধ্যেই জাহত পারতগকে থাকতে চাই
না। তবু ভড়িয়ে গেলি। শেষে 'ঐ গ্রামো কী রকম পাশি'
ব'লে সিঁড়িয়ারে খেলিয়ে যাচ্চো। অর্থাৎ শক্তাফল চীন
এবং ভারতের চেন আর আমিও সিঁড়িয়ার বিশেষ আলোচনা
ক'রে একটা সরল আবহাওয়ার সৃষ্টি করলাম। গগনসের
মধ্যে দিয়ে জাপানী আমাদের লক্ষ্য করতে লাগলো হয়তো,
লক্ষ্য করলাম না দেখি। আর চীন-ই তো আমাদের
পাশে, জাপান আর একই দূরে। ও দূরেই থাক বসে।

প্রায় ঘোড়ো কটার একটা বিরাট হাওড়াই লান মেয়ে
আকাশ থেকে পুথ ক'রে পড়া গেল উত্তর দিকগ্রামে লম্বুরের
তীর-সেঁধা একটা ছোট্ট রাস্তা—বেরুতে।

সেপটা দেখতে ছোটখাটো বটে, কিন্তু বয়েল অনেক।
আর বংশে এখন অনেক, তখন এর নাথার উপর ঘিরে কড়-
কাপটা ব'য়ে গেছে নিশ্চয়ই: (সম্প্রতি আবার কড় দিচ্ছে
সেখা!)

তা আশেপাশের সব বিক্রাংয়েরই পদস্পর্শের শিহরণ
ও আলোচন অগ্রসর করতে হচ্ছে সেবানন্দকে। মিশর,
আর্মেনিয়া, আঙ্গেরিয়া, গারুজ, হাইতি, গ্রীন, রোম, আরব,
তুর্ক, হাল আমলে জাপান, ইংলও—সবাই এসেই একবার এই
সেবানন্দের বয়স গ্রাফে পাত পেড়ে পেতে, কেউ বা পেড়েও
বসে। লোক পেতে পেল তত চাই। ভুলেও। তাই
সেখা দিচ্ছে বর্ণনাকর। আচ্ছ তাই সেবানন্দ পূর্ব-পশ্চিমের
দিলন-মথির।

ধর্মও প্রাণের দুটি। একদল সিঁড়িয়ার দায়। তাদের
ধর্মের কল পশ্চিমী বাতাসে নড়ে। আর একদল মসজিদে
দায়, পশ্চিমের দিকে মুখ ক'রে নাবাখ গড়ে বটে—কিন্তু
মনটা থাকে পূর্ব মন্ডার দিকে।

সেবানন্দের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি পূর্ব-পশ্চিমের দ্বিমুখ্য।
ধর্ম ভক্ততা মন বৈ, বক্তা ব্যবসারে। ব্যবসায় বৃত্তিতে
জারি পাকা। আর সেপটাও কৌলীক বেড়ে গেছে
সম্প্রতি। আরব-মুসলমান হাট এই সেবানন্দ। আশে-
পাশের দেশের লোক ভড়া হয় সেবানন্দের ঘাটে। ইরানের
তেলের পাইপ এই রাস্তাটারই শেট ভেদ করে বন্ধের
গিরে খেমেছে। উপরন্তু হালে হাওড়াই-আহাছের একটা



সেখানদের পাইন বন

অতি-আবহুক ভিন্নতার আধা এই বেকট । প্রাচ্য-সত্যতার বেশ দৃষ্টিকণাটুকু এই বেকটের পাশোলে মুছে কেলে লোকে এখন থেকেই পা বাড়ায় পাক্কাভ্য সভ্যতার দিকে ।

কাজেই এবেশে উট আর নাকিনী মোটর এক পথেই চলে; মসজিদ আর নাইট-ক্লাব পাশাপাশিই আছে; বোরখা আর খাট-পরা মেয়েরা চলে হাত-ধরাধরি করে ।

কাষ্টনদের সীল-মোহরের চাপ নিয়ে বেড়া তিড়িবে পার হ'বে গেল নাকাটা । হাবার সমর কোষর বেকিরে অভিযানও জানিয়ে গেল । ছাপানী ডহতা বিধ-বিস্তৃত ।

এবার আবার পালা । কান্টোনের প্রথম অফিসারের সামনে বেলে খরলায় আবার পাল্পার্ট-খারা । ভিন-চারটি সুসুন্দর অফিসার । বাটারফাই গোল, পোলান্দী হু, বাঘাঘী হুল, বাঘাঘী নরনতারা । থাকি শোণাক; ডাতে বেস্ট-বাধা আর ব্যাম-লাগানো । ব্যামে পাছের প্রতীক ঝাঁক—শিরার গাছ । সেখানদের সরকারী প্রতীক । ঢোক ভাঙিয়ে সেখানির মুত্রা কিছু নিলাব, নিলাব কিছুটা বেশ-দর্শনী হিলাবে ।

পটখট করে কাছে এসো এক তরুণী । কপনবনী । গোণাকে

খাঁটা ব্যাতি; মেয়ে বৃত্তগান, হাঙরাই-তরুণী ইনি । মাথায় ঝাকানো ক্যাপ । মুখে প্রাচ্য সাবল্য । কিন্তু মেমলাহেবী গোণাকে ব্রেক কাঠ-কাঠ ভাবে । এই তরুণীই হলি মুসলমানী শালোয়ার আর ওড়না প'রে কাশল-নমনে এসে বলতো— 'এসো হে বিদেশী, এসো আমার দেশে'—তো রীতিমত আরব্য-রজনীর একটি রোমাঞ্চকর অধ্যায় হ'তো তাহলে ! কিন্তু সে বিন আর নেই, আরব মেয়েরা এখানে পাইন-পরা রীতিমতো মেঘ, আরব পুরুষরা আদখাফা-ওড়না ছাড়া খাট-পরা রীতিমতো সা'ব । আরব্য-রজনী যেমন ইংরেজীতে অস্বাভাবিক; এরাও । মোব নেই, মণ্ড-লাগরের ওপারের পাক্কাভ্য হাঙরা এপারে আলতে বেশীলপ লাগে না । এরা তাই নামে 'সাকবাক', 'জোবেদী', 'ব্যয়দিল',—গোণাকে 'জেন', 'জেনী', 'ভরোবী' ।

কাষ্টন-খরে চকু ঘেরে 'টিক ছা'ব চিহ্ন দিতেই একটি খাট-পরা বুঝ ভুলে গিলো সেটা হাঙরাই-মোটরে । ইচ্ছিতে বললো তুমিও ওঠো । উঠে বসলাম । একমাত্র প্যাসেজার আমি । বুঝটি ড্রাইভারের শীটে বললো ।

ভান দিকে পাইন বন । অদৃশ্য লগা পাছের ভানের মাথায় পাতার ছাটা । নিচোটা তকতকে পরিচায় । ফরে

ত দিন। ষা মিক নীল সূত্ৰ, নীল আকাশেৰ লগে বেলানো মধ্য-সাগৰ। মাৰ্শ্ববানেৰ পীচ-সেঙা চকচকে পথ দিহে পা-পা ক'ৰে চুটতে স্টেশন-ওঁহাগন। আমেৰিকান-স্টাৰ-মাৰ্ক। বোলাপী ডাইভাৰটি একমনে চানিয়ে বাজে গাড়ি।

বললাম ইংৰাজীতে : জোমাৰেৰ বেণটি তো চমৎকাৰ।
 গাড় না কিৰিয়েই বললো : নো এলে। পাৰ্গে হু
 ক'লে ?

বললাম : পেতি পেতি। একটু একটু।

কিছ ভাতে চলোনা ভাব জমানো। কাজেই হুশ
 কৰলাম। হঠাৎ মনে পড়লো, কলকাতা থেকে কেনা লড়াই-
 আমলেৰ একখানা আৱৰী-কথৰ কেতাব আছে স্টাটফেলে।
 অৱত লেখানা আম্ৰিকান-আৱৰ ভাষাৰ। বাৰ কৰলাম
 দেখানো। পাতা উটে দিগোলা কৰলাম : আশ্চৰ্যমিক ?
 নাম কি ?

লোকটা অৱাক হ'লো। গাড় ফিৰিয়ে দেখলো আৱাকে।
 আমি বইখানা তায় নাকৈৰ সামনে ধৰে দেখালোম। ডাইভাৰ
 হাসলো : ইজ্জি হিবিক ইজ্জিফিয়ান।

আমি বললাম : ইজ্জি মি ঘোৰ। আ-না হিলি।
 ঘোৰ আৱাৰ নাম, ডৱেটীঘ আমি।

হিবিক বললো : মূলি। ডালো।

আৱাৰ 'চুপচাপ। গাড়ি ফাঁকা ৰাস্তা পাৰ হ'ৱে
 সহৰেৰ মধ্য চুকতে। হাল-ক্যাপানেৰ বাডি এমিক-ওমিকে
 অনেকটা আৱাৰা জুড়ে দাড়িহে। সহৰেৰ আৱো কাছে এপিয়ে
 বাডি জমেই। সৰু পথ। পৱিকাৰ। লোক-চলাচল বেচে
 গেচে। অনেকৰই পৰনে সাহেবী পোশাক। জোৱে
 ইটচে সুবাই। মেৱেৰাও। বোকাৰেৰ সাহি। সামানো।
 কতক গলিতে কাঁচোৰ মানলা। আৱৰী ভাষাৰ সাইন-বোৰ্ড।
 পড়া দাৰ। দেখে বাওৱা শুহু।

হঠাৎ এলে পড়লান একটা ঘোৱাৰে। মাৰ্শ্ববানে একটা
 টাওৱাৰ। আৱাৰ ঘড়ি। চাৱিফিকে অলৈৰ বেড়া। তাকে
 দিহে আছে কেৰামি-কগা পাছেৰ সাহি। ঘোৱাৰেৰ
 চাৱিবাৰে বড় বড় হাল-ক্যাপানেৰ বাডি।

কথা-বইখানাৰ পাতা ওলটাতে লাগলাম : আশ্চৰ্যমিক ?
 কি এটা ?

—মাশ্ব হ'ল' এতোৱাল।

আৱ একটা বাডি সেবিহে বললো : পাৰ্গাৰেহু।

এ-গলি-সে-গলি পাৰ হ'ৱে পড়লাম আৱ একটা ফাঁকা
 জাঘগাহ। তেৰি ঠনঠন ক'ৱে একানি টান চলচে। গাড়ি



পাৰ্লামেন্ট (বেৰুট)

গাড়ির বেগ এক অভিনয়ের সামনে। তখনকার বড় বড় কীট। সাইন-বোর্ডে দেখা PAA। কুলাম BAC-র কর্তব্য শেষ হয়েছে, অতএব এবার সমাল আমাকে PAA-তে তেলিতারি দেবার ব্যবস্থা। পুত্রবাং পা বাড়ানোয় গাড়ির বাইরে। হ্যাটকেল জুট। বার ক'রে হিফিক টুকিয়ে দিলো PAA অভিনয়ের মধ্যে। আমি তখনো হুটপাথে। হিফিক কড়ের মতো বেরিয়ে এলো বাইরে। বললো: কিস্ গ্লাস-আ! বিলাস!

'থ্যাংক ইউ' বলবার ভয়ে কথা-বইয়ের পাতা ওপ্টাবারও সময় দিলো না, হাওরা-গাড়িতে স্টাট দিয়ে বেরে ফেল গেল!

'PAA' কীভাবে প্রবাহ হিকে পা বাড়িয়েছি, হঠাৎ যেপি একটি কিশোরী ক'টা-বালতি হাতে আমার দিকে অবাধ হয়ে বেরিয়ে। সে দেখে—এ কে রে বাবা! কালো-কালো সোললস লোকটি? কোথা থেকে এলো? আকাশ থেকে পড়লো নাকি? তা আকাশ থেকেই পড়েছি তো! আমি দেখলাম—অশুভ দৃশ্যের এক মকরজ্ঞা, দুসে-আলতা হু। আঙুরের মতো ট্রোট, আগেলের মতো গাল। মল্লা বরীন খামরা পরা, গায়ে জ্বরির কাম-করা ছেঁচা জামা। মাথায় টুপি। নরুনের রূপ নিয়ে তপকরা গাড়িরে আছে লরল আপি-হুট আমার উপর রেখে। ভাগ্য-ভাগ্য চোখ-জুড়িতে নীরব ভাষা: কে তুমি যে বিদেশী—এলোতো এই বেশে! হঠাৎ একটি লোক এসে দমক দিলো তাকে: কাজ কর্। কী বেরছিল্ হী করে! পত্র ভেঙে পেল তার। PAA-র ভব্ব কীচের সামনের হুটপাথে বাড়ি চালাতে লাগলো সে। হুটপাথটা নোংরা হয়ে আছে। ডি: ডি:, এলো বজাল! বাড়ব মজিনার সেবা দেলাম।

PAA-র কর্তব্যসীতিকে হাওরা-টিকিট দেখাতেই বললো: টিক আছে। বললাম, আমার হ্যাটকেল জুট। তোমার হেফাজতে রাখো; আর পারো তো, বলে পাও কোনো হোটেলের নাম-টিকানা। অবজ কোনো পেরতপোখা হোটেল, লাইট-বেলমি হোটেল নয়। কিন্তু তা বললে হবে

কেন? একে স্নেহের বন্দন আমি, তার উপর PAA-র ভাবি প্যালেঞ্জার, আমার পদার্থের ভয়ে কার্পেট-পাতা বেতাই প্রবৃত্ত। ক'বেই ভুললো আমার কথাকে যেক কথাই কখাই ভেবে নিলেন; ভেবে নিলেন, হুতোতা ওটি বড়শোকের বিষয় বচন।

ভুললো একটা হোটেল-লিফ্ট বার ক'রে নিলেন, এবং সেটিতে চোখ বুন্দিরে বর্ণনীর হার দেখে কুলাম ওগুলি আমাদের কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেল, গ্রেট ইন্টার্ন বা স্পেশাল-এর লয়গোরে। অতএব প্রবেশ নিলে। আমার চাই হারিসন বোতের আদর্শ-বোতি: হাউল বা হুটি-হোটেল। শুধু তাই নয়, বড় হোটেল বিলিতি কারণ আর পরম আমার পাওনা ধাবে বটে, তবে এদের কাশলা-কাহনের বিষয়ে থাকতে হবে অজ্ঞ। সাহেবরা বাংলাদেশে আসে, থাকে চৌরকীর গ্র্যাণ্ড-হোটেল। থাকতো যদি হারিসন বোতের বেশে, তবেই তো জানতে পারতো বাঙালীপনা। রবিবারের সকালে লুন্দি শ'রে গেছি গারে 'দাশ, একটা বিডি' ব'লে, তার খবর চৌকিতে খেঁকে ব'লে-আজ্ঞা জমানো এবং হুন্দি ও চারের প্রাধ কখা বেলা একটা পর্যন্ত—এলব গ্র্যাণ্ড-হোটেল চলে না। আমার সোমবারের সকালে উঠোনের চৌবাচ্চায় বায়োরাহী তান সেয়ে, লপাল ঘোলো ভাল ভাত আর নাড়ের কল খেয়ে, মা-কালীর পটের সামনে একটু গাড়িরে নিম্নের কান ম'লে 'হুগলা-বিহরি' ব'লে পড়ি-মরি ক'রে বাস-বাড়ার হুটে-বাড়ায়—চৌরকী এলাকার হোটলে বহনাতীত ব্যাপার। সাহেবরা তাই বাংলাদেশের পদবাট পাড়িঘোড়া খেতে পায়, বাঙালীকে দেখতে পায় না।

টিক করলাম, বিত্ত সেবানীত কাশনার হোটেল ধাবো। বরচাও কম হবে, অভিজ্ঞতাও বাড়বে। তাই ভুললোককে বললাম না হোটেল রিয়ার্ড করতে। ভাটের মাথায় জিগেস করলাম: পেতে পারি এই লিফ্টটা?

—ইবেল তার।

—থ্যাংক ইউ।

আর কথাটি নয়। লিফ্টটা পকেটের ক'রে বেরিয়ে পড়লাম রাখার।

পণ্ডিত রবিশঙ্কর চৌধুরী

আশীষকর সুখোপাধ্যায়

“লগনের বিখ্যাত ‘উইগমোর হলে’ সেতার বাজাবার সময় প্রতিরুত্তেই মনে হয়েছিল শ্রোতাদের মনে এ-বাঝনা দাপ কাটবে তো? পাশ্চাত্য সঙ্গীতের পাশে ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের দ্বারা কত হবেনা তো? এইসব নানান প্রশ্নের ভিত্তে একটা অজানা ভয় দেখা দিয়েছিল মনে। কিন্তু যখন বাজাতে আরম্ভ করেছি তখন সেখেনি শ্রোতাদের চোখে জল। বাণা-বাণী সঙ্গীত-সমালোচকদের চোখেও জল। তখন পূর্বে বুক ফুলে উঠেছিল। তেবেছি, এ তো আমার পাঠ্য নয়—এ আমার গুরুদেব ও আমার সেতের প্রতিটি ভাষ্যতথ্যাদীর শ্রোগা। আমি শুধু তাদের নিমিত্ত মাত্র।”—আমারও পূর্বে বুক ফুলে উঠেছিল, যখন রবিশঙ্কর তাঁর গুরুদেবের বিতরণ-সকলের অভিজ্ঞতা আমাকে বসেছিলেন।

আগান সফর শেষ করে এবার যখন কলকাতার ‘নিউ এম্পায়ার হলে’ রবিশঙ্কর বাজাতে এসেছিলেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্ব-সেধ করেছি। জানতে চেয়েছি তাঁর শিল্পী-জীবনের কাহিনী এবং উপলব্ধি করিতে চেয়েছি তাঁর সঙ্গীতবহুল জীবনকে। জীবনের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা আমার তিনি বলেছেন। তখনই তখনই কখনও অবাক হয়েছি, কখনও রোমাঞ্চিত হয়েছি, আর কখনও-বা ভেবেছি একি সম্ভব? অবশ্য এ সম্ভবের পেছনে জীবনের অনেক বৈধা, অনেক চেষ্টা, অনেক পরিশ্রম থাকে করতে হয়েছে।

১৯২০ সালের ১ই এপ্রিল বেনারস শহরে রবিশঙ্করের জন্ম হয়। পিতা স্রামশ্রমর চৌধুরীরা ইচ্ছা ছিল রবিকে ডবিত্তে একজন আর্থিক শিল্পীত্বের পক্ষে তোলবার। মাতা হেমামিনী দেবীর আশীর্বাদও কম ছিল না। অবশ্যই ছেলের মতো রবিশঙ্করের ফুলে থাওরা-আলা চকলা। কান্দির ‘বাঙালীচোলা হাইকুলে’ চতুর্থ শ্রেণীতে তিনি ভর্তি হলেন। এই সময় রবিশঙ্করের বড়শা উমদশঙ্করের সত্যদলের বেশ নাম ছড়িয়ে পড়েছে। একথেরে পড়াশুনো মীরদ বলে মনে হ’ল তাঁর। ভুলে গড়লেন রবিশঙ্কর তাঁর বড়শার নামের পাঠিতে। তখন মাত্র ম’বছর বয়স তাঁর। সুযোগ হ’ল হঠাৎ। শাপনগারের ডাক এলো এঁদের। নাচ মেখিয়ে রবিশঙ্কর বিশেষে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করলেন। অবশ্য তিনি প্যারিস

হেডকোয়ার্টারে কিছুদিন অধ্যয়ন করলেন, তবে বিশেষে মন বসলো না এঁর। তাই ছাড়লেন বিশেষ। পাড়ি দিলেন বসেবে।

কিরলেন কলকাতায়। এই প্রথম তিনি এখানে এসেন। এই সময় তিমিরবঙ্গের বাড়িতে সঙ্গীতের রেওরাজ হ’ল পুৰামাত্রায়। তিমিরবঙ্গের তাইপো অমিরকান্ত ভট্টাচার্য সেইসময় তালো সেতার বাজাতেন। একদিন এঁর বাজনা শুনে রবিশঙ্কর খুব আকৃষ্ট হলেন সেতারের প্রতি। অবশ্য বড়শার পাঠিতে বাঁকি, এম্বাজ, শরাদ, তবলা প্রভৃতি থর তিনি বাজাতে শিখেছিলেন। স্বতরাং বিভিন্ন ধরনের লং চোটাবলা থেকে পরিচয় এঁর হয়েছিল।

রবিশঙ্কর সেতার শিখরেন বলে মনধ করেছেন—এমন সময় কথাকবির প্রসিদ্ধ পদ্যরচনাধারী হলেন এঁদের পাঠিতে।



রবিনডরের হৃদ-কেওযা চবি 'অপরাজিত' এবার সেগো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান। 'কাবুলিওয়াল' ছবিতো তিনি সেলেন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-পরিচালক হিসেবে খ্যাতি। এ ছাড়া 'পঞ্চম পাঁচালী', 'গরমপাখর', 'কালান্ধাতি', 'নাগিনীকঙ্কার কাহিনী' প্রভৃতি ছবিগুলির মধ্যেও সঙ্গীত-কন্ঠি একটা সম্পূর্ণ প্রাণ পেয়েছে। এ ছাড়া বিশেষেও রবিনডর কিছু ছবির হৃদ দিয়ে প্রকৃত খ্যাতি অর্জন করেছেন। যেমন—কানাজার 'চেয়ারী টেল', 'হুইডেনের টেকনিকলার চবি 'ভাঙ্গল সাগর' ও 'বি হুট অ্যাও মি আবারো'। যদি বিশেষের এই ছবিগুলি

আমাদের দেশে হুজিলাত করে তাহলে আমরাও দত্ত হৃদ ওঁর সঙ্গীতের হৃদ শুনে।

বর্তমানে ভারত-সরকার বিশেষ দাঃকৃতিক-দল পাঠানোর যে ব্যবস্থা করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। কারণ এতে ভারতের সঙ্গে দেশ-বিশেষের যে ভালবাসার বন্ধন গড়ে উঠছে, তাতে হৃদর ভবিষ্যতে শান্তি ও মৈত্রীর সেতু তিরতিন অটুট থাকবে। তা ছাড়া ভারতের প্রতিভাবান শিল্পীরাও তাঁদের সাধনার সত্যিকারের প্রতিভার পরিচয় দিতে সক্ষম হবেন।

বাঘিনী

শক্তিপদ রাজগুরু

দশর রাজ্য থেকে এগিয়ে গিয়ে বনে লুকেছে লাল বুনো কাকরাটির একফালি রাজ্য, হু'শাণে ধান-বন। বর্ষার ঝল ঝমে গাঠ এবেলার তো, ও-বেলাতেই কোঁপরা মাটি সব ঝল টেনে নেয়। গেকরা-ঝড়ের জিহ্বা পলিটুই সরের মতো সেগে থাকে কড়াই-এর দুখ শেষ হয়ে যাবার পর। লাল শাড়ীর হু'শাণে ঘন সবুজ পাড়ের মতো ঠাঁলবুনান বন—আপেপাশে দূরবিস্তৃত উঠে নেমে গেছে শালবন—গিনগিন করছে ছোট-বড় কৈর-মহুগাগাছের ডিড়, দূর থেকে গাছ আর চেলা ধায় না, সমষ্টগত জললটাই চোখে পড়ে; রাজ্যটা একেইক বন ছাড়িয়ে এসে বড় রাজ্যায় উঠছে—হু'চায়জন লোক দিন-বেলাবেলি হাডায়াত করে, হু'একটা খাঙ্গীরাই বাল পা-পা শব্দে বের হয়ে যায়—যেন বনের সীমানা থেকে লাগিয়ে খাঙতে চায় তারা কিশের আভঃঃ।

—কারি কেটেছিল তুই?

লোকটা মহলা দুর্গন্ধ-ওঠা গামছাখানা মাথা থেকে খুলে হাওয়া করছে, ডাণগা গরমে যেবে নেয়ে উঠেছে কালো পরীর; গামছার হাওয়ায় বাতাস কতটুই পায়—সেই জানে, 'বনহু'তে ভরে ওঠে খোড়ো চালাটা। ছোকরা রেজার কমল সরকার বলে শুটে,—আই, গামছাখানা নাবা বাপু, যদি আসছে।

দখল পেয়ে লোকটা অপ্রতিভ হয়ে থামে।

কয়েট-গাও গুলন হুটাং আবিষ্কার করছে লোকটা

লা হাতে বনের ওলিক ঘোরাপূরি করছে; ওরা হুপ করে থাকে—কোণ পড়তে বেশি; তা হলেই গিয়ে হাতেমাতো ধরবে। বনে হাত দেবার কোনো আইন নেই।' একটি গাছ কাটা তো দূরের কথা।

—সাগু সিন্দু মাঝনা?

বনের আড়াল থেকে হুঁদি মেঝে গিড়ে পড়েছে মনো তেলী।

—গাছ কাটলন হুখা?

—সে কথা অসিগে দিয়ে বলে।

হুজিমান বা আলল কাছের এলে কেউ এর পর উড়ভাচ্য করে না। অসিগে গেলেই আবার হাফায়া। 'তার চেয়ে টা'ক থেকে সিকি আগুলি বা হোক বজামতো দিয়ে কাম হামিল করে চলে যায় বামাণ-সমত। কিন্তু এ লোকটা আফিসই এসেছে ওদের সঙ্গে। বলে ওঠে—'হুডোলের দুটে। ষাট খুজতে আইছিলাম বাবু, একা লোক গাছে কেটে নিয়ে যাবো কি করে? বলেন? এই লালীন গাছ।' কথাটা হুজি-যোগ্য। কমল সরকার ওর দিকে চেয়ে থাকে; কয়েট-গাও মনো তেলী চোখ টেপে—অর্থাৎ মোচড় মাকন, না হুয় আপনি দাইরে ধান, 'যাটার কাছে দা-হোক কিছু হাডাই। কমল ও-ইদিত ঠিক বোঝে না। খুজতেও চাখনি। লোকটাকে ধমক দিয়ে শুটে,—সাগু, কোনদিন আর এসব কোরোনা। নিয়ে হাও ওভলোও।

লোকটা অবাক হয়ে গেছে—হুটে। শাল-রোলা কেটেছে,

তাও শিরে দিল তাকে। আশুপাতে থাকে গ্রন্থ-উপহন ছুই কয়েকটি গড়ি।

মনো হেন্দী আর নতুন হাজরা এদেশী লোক। এগনি খাঁকি হাকপাট আর হাকপাট উঠেছে পায়ে। তার আগে ঘনমহুর, না হয় ভাগে চাল কততো। এই পদগৌরবে একটু কমতা আহির করতে চাই, কিন্তু রেজারবানু ছোঁকরা মাহব, হুঁটা পদমা নেহার দিক্তি এখনও শেখনি। কাহাতিক বনবাসে কাটানো হায় বিনা কাউও!

—ঘাটা! আবার আগবে কিছ। এমনি করে বিনা গাতিতে যেতে দিলেন স্ত্রী!

—এবার আর ছাড়া হবে না— কমল বলে ওঠে।

এতবড় বন; গালপদ বোকাই। হুঁসে গড়ে থাকে চিত্রবাহ, বনদুরার। কোথাও কোথাও পুরোনো গাল-কপন। বনের ভিতর কে কি করছে—তার সবর হাথতে বয়ে গেছে গুপ্তের। বন পাহারা সেবার চেয়ে হুঁটা পদমায় সহ্যানে চোঁ-চোঁ করে তারা। ভূমনি চোর-কাটাটাইএর দল ঝাঁক ঝাঁক আনুক—এই তো তারা চায়। বনের লম্বী।

কমল কবকে বনের চাকরিতে চুকলেই অন্ধক ঝাঁপ পড় পড়িয়ে। লোকে বলে বনবাগ—একরকম তাই-ই। গাঁড়ী পহর দেখে তেইশ মাইল দূরে অন্ধকার বনের থাকে নেমে সিন মাইল হাঁটা-পথ—তবই এই কয়মতলি বন-অশি। অশি বলাল একে মথীলা বেওয়া হবে। মাটির ঘর, ঘরের চাউনি। চারিশাশে খানিকটা ভাঙা ঘোটা শালকাঠ পুতে বেড়া বেওয়া হলেই ছিটকে-মালা অন্ধ-বানোয়ার আটকাবার ওস্ত—তাও ভেঙে পড়ছে দু-এক মাথার।

লোকালর বলতে ভিন কোণ দূরে হাট; দূরে দূরে দু চাবলর গাঁওভালের বাস। ওখানে মেলে দু'একটা ভিম, দুবই, না হয় লাউ। দেশবার লোণ নেই—দুজন কয়েক-গাউং রথছে আর থানকরেক গ্রিম-লোকের আশ্রয়কার ওস্ত।

কয়মতলির বন এখনও হুঁচাত। এই হুঁসে ডালু-ক বাকা পাড়ে। ছোট্ট করণার ধারে ওৎ পেরে থাকে ছা-বা-কা-সমত বাবাঙ্ক নাগেবরী চিত্রবাহ বিকারের আশা। নেতাক বন চলে গেছে মধুরভঞ্জনর দিক, আহিম অন্ধমো লুকিয়ে থাকে ফেল-গ্যালানো মাসি ভাকাত। রাতের অন্ধকারে দল ধৈয়ে তারা বের হু—আট-কণ কোশ পথ ৩-৭-৭ নিয়ে জাকতি হ'লে দির এসে আবার আশ্রয় নেব নিরাপন করাযো। হু'একজনকে দেখেছে কেউ কেউ—কিন্তু তারা থকা-দোষার বাইরে।

কৈলাশের তামাটে হোথ লাল ভাঞ্জর হাভাভো শিখার নাচন-কোঁচন ছুঁচ্ছে, কোভাপড়া হোথ। মায়ে ভিহে বার দিকিটা। ষাঁড়িয়ে বেছে জুগি কাটাচ্ছে কমল। ঘোনো ভেন্দী পদগুণ করে—একটু তাকেও বাবেনা! পাঁচজন হুনিম লাসিয়ে পদনো জন বদলেই বা দেখেছে কে? কী ক্যাগার জাপো দিকি?

মনো হেন্দী এদিক ওদিক চাইছে। ওদিকে গাঁওভাল যেকননের মাতে কাহও দিকে চেয়ে রয়েছে।

নতুন হাজরা সাব দেখে—মাইরি, পেয়াল-পেয়া কবলে ই ভাবে করবো মাই শাল্য! হু'ভাল কাঠ বিক্রি করবো তার ঘো নাই, শুকো মাইনেতে বনবাসে থাকতে হলে—মাহুলের টাকরা দিরে তাত নিগতে হেথ, হুস্তোর!

নতুন বন তৈরি হচ্ছে। হুস্তোরের ভগ্ন সব বন গেছে। ব্রহ্মপাত বাজাতে মাটির কর কথবার ওস্তই বনের বাড়-বাড়নের দিকে নম্বর বিলছে সরকার। হু'নো ভাড়া ঝাঁকা কোথাও রাখা হবে না। শিরীষ-মালক বো গাছেই চাড়া লাগানো হচ্ছে। নয়ানজুগি কেটে ধাপগাছও পুঁজছে তারা। মহা-গাছের নীচে বলে হাঁকাচ্ছে কমল। নীচে দিরে একটা করণা বয়ে চলেছে। হু'পাশে তার ছায়াখন বিকরমতা, আটাড়ি-লতার জল। এদিকে ওদিকে মিশকানো পাড়া ফেলে রয়েছে হুস্তে-পাছতলো—এই লুক মাটি থেকে এসে ঝাঁকী-পাকি ওয়া মাহেরণ করে আশ্রয়ভাবে।

—এই লো বাহু!

“আচল থেকে বের করে দেয় তার শামনে একগাধা লাগটুকুকে টেক পাকা। কি নাম ওর জানে না—যজুরের দলে বাটতে আনছে ক'দিন ওই মাঝি-বড়ী ছেকে। গজট হাথকে ছুটো পদমা বের করে দিতে বাবে—হেলে ফেলে ঘেঁটে।

—গাছের ফল কটে, তিলাই পাড়ছি। হ দেব! পদমা কেনে দিবি?

ওপাশে যজুর কৈদ-গাছটার ডাল ছেয়ে এসেছে লাল কলর ভিত্তি—সুদূর পাড়া ঢেকে গেছে। পড়ন্ত বোলা নির্জন বনসীমায় নিঠে করণার ধারে নতুন এক পরিবেশ। এ চোখে বনকে মাশে সে বেন কেবেরি।

ঘেঁটেটা এসিয়ে দিরে আবার কুচি বইছে সহম সাবলীল গজিতে। শাদা কাপড়বারা ষাঁট করে পড়া—মাঝিওলো পক পাথুরে মাটি কুদিয়ে চলেছে।

খিট লাপে—পাকা ষ্টেমওলো ডারিয়ে-ডারিয়ে চিনু-ক কমল।

কোশলে হুতুলে কেবল পা,
আউড়ি বাউড়ি নিজে বা,
থেকে থেকে হান্ধে বা,
হাওসে বস্ত্র—বাঁশোলে হাল—
আজ না হুই, হবক্ কাল।

ভাকপুলকের কথা। কৈয়ারের শেষ। ভেতর-ভটা আতাপ-
শীষার কুঁচো-কুঁচো মেঘ করে করে উঠে সেজে—
এলোবলো বাঁশাল পাছের কুঁটি গলে নাহলে বন-তখন—
কৈব-কলঙলো নিঃশেষ হয়ে গেছে, হুবিং দেছে শিখাল
কল, বহুবার তালে খন বহু পাত্তার রূপে বোকা বোকা
কল এসেছে।

বর্ষা আসছে। কনের মাটি-পাছ-আকাশ-বাতালে তারই
সমত। বৈকালে দুই বনের মাঝার মাঝার কালো মেঘ
গুরুগরূন গঠে—আতঙ্কিত করে তোলে বনহুবি।

হঠাৎ নহুড় হামরা ঢালাঘর থেকে বের করে লুপ্তিগরা
অবস্থাতেই ছুটেতে থাকে। হুততো কোনো শিকার দেখেছে
—একই কথা মারবে, তাই হাতের কাষ কেলে মনো
ভেলীও ছুটেছে; প্যাটের বোতাল লাগাঘর সময় নেই,
একহাতে ঘুরে করে কোষকটা গলে পৌঁছেছে। ঘুরে চক্কাই-এর
আকাশ-তোলে ছায়াঘুরির মতো করেকলন লোক দারি ধেয়ে
চলেছে মাঝার তাযের কুঁটি—ভকনো ঠাট্টি-কাঠের লতা
ভাড়া। বর্ষার আসে কিছু জালানি হুড়িরে লকর করছে
ভাড়া। বন-বাউল ভকনো কুঁটি-কাঠে—কোনো নামই-ধুর
নেই। আশাছা পরিহার করা হয় মাত্র—পাছের বাক-বাউল
আসে,—সেই সব হুড়িরে নিয়ে চলেছে।

কিন্তু কলেক্ট-পার্টা ছাড়বে কেন? বীর ক্রিয়মে দিয়ে
কল পাড়াল—আহাই!

শ্যামনের বৃত্তার মাঝা থেকে এক বটকাঘর বোকাটা কেলে
দিয়ে গল রেঘর করছে নহুড় হামরা। শিল্প শিল্প দিয়ে
কুটেছে মনো ভেলী, হুট করে প্যাটটা জ্বলও ধরা গুয়েছে।
হাঝাছে কোল-কোল করে।

—ছুটা কাঁটি লিছি, বাবা!

—সরকারী হুহু, ছুটা-পাছটাও বাইরে গাবে না।

এদিয়ে আসে সেই মেয়েটা—মাইরি! ভবে রেতের
বেলার গাকী করে গার বি।

—বড় ট্যাংক-ট্যাংক কথা তোর। চলুবিগি আশিলে।

মনো ভেলী গর হাতটা ধরে কেলে-গল করে। মেয়েটার
সিঁথ চেয়ে থাকে।

—বর্ষার দিন হুইটি খান ভাশাবো নাই? লিলমই-বা
ছুটা কাটি—

—আও! আট আনা করে মাথাপিছু লাগবে।

—ছেতে বে!

সারি সরে পাড়াল মনো ভেলীর কাছ হতে।

কল হাটে নিবেছিল, কিমতি গলে প্রতপোল কেলে
পাড়াল।

—চুরি করে কাঠ নিয়ে পালাচ্ছে, তার।

নহুড় এদিয়ে আসে।

মনো ভেলী এদিয়ে এল। এক হাতে একটা বোকা
আটকাল, অপর হাতে প্যাটের হুট। আছ চ পা—রোম-ভটি
হুকে ঘাঘ করছে। কল পাণ্ডারটা তাখে ভাসো করে।

—ছেতে লাও গুয়ের, কিই-বা নিয়েছে!

আকাশ থেকে পড়ে মনো, নহুড় হামরা—হুমনেই
দুপরায়ে আশমাইল খুল ভেঙে বৌড়েছে—শেষমেঘ এরাই
হুয়ে!

—সেকি তার, শিন্দুগরা কাঠ নিয়ে গাবে, গায়ে খবর
গেলে বন আর থাকবে? বিবাক লাফ করে মেঘে।

এদিয়ে এসেছে সারী—সেই মাঝার মেয়েটা। ঘেমে
মেঘে উঠেছে সারা পা। বোটা কাণ্ডখানা পুচ্ছ মেঘে এটে
বসেছে, মাঝার বিড়ে-পাকানো একটা ছোট গামছা।

—জাখ, তুই-ই জাখ বাবু, কি লিছি বাটে!

ভেতে খুঁড়ে কিরাছে হাট থেকে, রোমে পাড়াঘর কলতা
নেই কলনের। কল গঠে,—খেতে লাও গুয়ের।

নহুড় হামরা, মনো ভেলী চুপ করে পাড়িয়ে রইল—
গুয়ের চোখের মাঝে বিয়ে বোকাভলো মাঝার ভুলে নিয়ে
চলে গেল ভাড়া।

—একই গরে মে বাবা!

বৃত্তার মাঝাতেই বোকাটা ভুলে গিতে চল নহুড়কে।
সেই ছিটকে কেলেছিল বোকাটা। মাঝার সময় একটা
হুচকি মেলে গেল সারী—ওই মেয়েটা মেয়েটা—বারালো
হুবিং মতো হাসি। পা জালা করে নহুড়ের। খুঁ কেলে
আবার সেই খুঁ চাটছে ভাড়া।

মনো ভেলীকেই পোনায়,—কিগো, কাল আসবে না কি?
ভিতি-বিরক্ত হয়ে কিরলো ঢালাঘরে। উনোনের ভাত
ধরে মেছে ইতিমত। গরূন করে গঠে মনো ভেলী,
অশমানে কেন জলছে:

—ভাতের পাড়িটা নামিয়ে মাঝার কল মেলে যে নহুড়কে।
ও ভাত-ই গাবো নাই।

মনে মনে ভাবছে মনো তেলী সেই সামান্য ঘেরোটার হাট-আলানো হাদি—অকারণেই চকল করে ফুলেছে তাকে। একলা এলে তাকে আটকাতে যেতাম সে নিশ্চয়ই।

বধা বেয়েছে বনপ্রান্তরে। আকাশ মেটে করছে সারাংশলার সজিত বেনার গ্রানি। নখানছলি ডরে উঠেছে। পন-পন নড়ছে বনের গাছ—সজ-সাগানো গাণ-বিক-সেজন গাছের চারার টুপ-টুপ দল করছে। জনমানবহীন বনের সীমানার এরা বসে আছে কলস; বড়ের চাল গড়িয়ে কবের চল নামছে। সামনের ঝাঙ্কা তাইগাতে চরছে বন-পালানো হুটো বুর; মাকে মাকে শেখন মেলছে, আবার লখা ঠোঁট বার করে চলমান কী প্রাণীর দিকে এগিয়ে চলেছে। বন থেকে ভেসে আসছে হু-একটা কেউটে, শাহাটী চিত্তির বাকা; ওদের ভোক্ত সেগেছে। শিয়াললোর গাঢ় গর্ত চুরে গেছে—এসে ছুটেছে উঁচু ভাঙার মধ্যে। রাতের অন্ধকার কেশে ওঠে। ফুল-বন্য বনে ভেসে আসছে কলসের। চিতাবাথ ভালুক সব আশ্রয়-হারা ছুরে বনে বনে গর্তে বেজাক্কে।

—বাইরে থাকবেন না বাবু!—মনো তেলী হুঁশিয়ার করে দেয়। ফুল-ভাঙ্গা বাথ এদিক ওদিক ঘুরছে, তাদের ডাক উঠেছে বনের ওদিকে।

বনরক্তের অতল আদিনি অন্ধকারে রাঙাবের সূত বসতি কোথায় হারিয়ে গেছে!

ডাকটা ঘুরে সেরে বনের বাইরে। কমল বিছানায় শুয়ে বসে আছে। লম্বা বনকুনিতে রাতের অন্ধকারে কোনো আদিনি হিংস্র আভা ভেগে উঠেছে—আকাশে বাতাসে ওর হুড়ুর পররাধানা। আকাশ-নাটী কাণিয়ে দেথ তাকছে।

হুটী-খামা লকাল। সজ-গোয়া গাছে পাভায় গিনি-পলা রোপ—সোনালী আভা আদনে। সেই রাতের বীভৎস রূপ তার হারিয়ে গেছে—হাসিতে কলমল করছে অরণ্যানী। বনের এক কোণে হঠাৎ নরর মাটিতে পল্লব গাড়ীর ঢাকার লাগ দেবে একটু অঝাক হর কমল। কয়েকখানা গাড়ী বন থেকে বের হয়ে গেছে, ভিয়ে মাটিতে আঁড়া রয়েছে সেই লুটনকারীঘের কাহিনী। কয়েকটা বড় শালগাছ মাটি-সই করে কান্ডা কেটে নিয়ে গেছে, শালের পাত-পাছালির ফুকে ওদের নিহুর পদচিহ্ন আঁকা। হুটীর রাতেরই কান শেখ করে গেছে।

হুশ করে কি ভাবছে কমল।

আদিনি-বরের বারান্দার সেই ঘেরোটাকে—যেবে এগিয়ে আসে, হাতে তার একটা আটকো-লতা-বোনো ছোট চূপড়িতে কতকগুলো কাঁচান-হুড়কি ছাড়া। ঘেরোতে নামানো করেকটা হুটীর ডিন।

—কতকে?

ঘেরোটা চতুর। জানে এই ভূখণ্ডে হাটে কেউ থাকে না।

—চার পর্যন্তা যোজা সে কেষ্টে এগুলো?

ভিয়ের মকন পরগা কটা হাতে নিয়ে ছাতুর চূপড়িটা এগিয়ে ধরে।

—সে তুই।

বন থেকে লাংহীত, বরার চল পেয়ে মাটি হাকে মাকে কেটে ওঠে, তারই নীচে ওই গোলাকার শালারগুলো ঝাঁক-বলী থাকে—পরবে গিরে হাঁথলে লাগে মন্য নয়।

—থাক। এতেই হবে।

বের হয়ে বারান্দার আগতেই ওর হাত থেকে ছাতুর চূপড়িটা পশু করে ধরে কেনে নকুড়।

—ধিয়ে বা।

নকুড়ের বাই-বাই রথ। কিছু পাওবা চাই-ই।

মনো তেলী ওর দিকে হা করে চেয়ে আছে। ছাতুর চেয়ে ছাতুর মালিকের দিকেই লোভটা তার বেশী। নিটোল পুচ্ছ পড়ন—বথায় লুভন শালগাছের মতো নমনীয় জামলিমা ওর সারা দেহে ছিরে রয়েছে।

—না! কেনে হু? হুঁড়ে লেগা কেরে, বনে ঢেক রইছে।— বাধা দেবে ঘেরোটা।

নকুড় ওর হাত ঘুচড়ে ছুড়িটা কেড়ে নেয়; ঘেরোটাও ছাড়বে না। খতাবাধিতে ওর হাত থেকে ছিটুকে পড়ল ছুড়িটা—কাণড়চোপড় বেসামাল হয়ে যায়; মনো তেলি এগিয়ে আগছে হিংস্র পত্তর মতো। হঠাৎ গালেই এক চড় থেবে থমকে ঝাঙাল সে। সারী বিভ্রাসের মতো রাগের চোটে ফুলছে। কমল বের হয়ে আগতে কাণড়চোপড় ট্রিক করে উঠানে নেমে এল সে। মনো গালে হাত বোলাতে বোলাতে ওদিকে চল গেল—নকুড় হেট হয়ে ছাতুরতো ফুটোছে উত্তনও।

কমল কোনো কথা বললো না, ওদের দিকে চেয়ে থাকে; অস্থান করে, কি একটা বড় করে গেছে। ঘেরোটা বনের ভিতর গিরে এগিয়ে গেছে অনেক দূরে।

মনো তেলীর দারা শরীরে একটা অশঙ্ক উত্তননা। বনে বনে ঘুরছে অকারণেই। বার বার মনে পড়ে সেই

সতের-দশন ঘেঁষেটার কথা। ওর কাশো গায়ের হিম্মতল
নয়ম চোঁহা।

কখনওগির যনে মিঠেহলের স্বর্গার পাশেই ওকে সেখেছে
কয়েকবার। সেই থেকেই কেমন বেহাশ হয়ে আছে সে—
চোঁঠা করে আশছে ওকে হাত কববার।

—স্বাঠি নিবি?... মনো তেলৌর বৃকে ঢেঁকির পাচ
পড়ছে।

চোলাকাঠ করে রেখে গেছে মহাঅনরা। সেই গালা
থেকেই কতকগুলো কাঠ ঝাটি পেঁখে দেয়। শাঠী অবাক
হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

ছায়ামণ যটপাছের নীচে ছিটিয়ে আছে টুকটুকে
যটকলগুলো। বোনো ওর হাতবানো ধরে ফেলে। হাসছে
যেহেঁটা।

—ছাড়া কেনে? লাগছে হাতটোয়। বোকাটা বনের
বাইরে করে দিতে হবেক কিছুক।

মনোর কাছে এ অতি সামান্য কথা, তবু কেবল ওই
নকুড়ক; বাটা পরলা-শিগাচ। বাগের কাছ থেকেও
পয়সা চাইবে।

—সোব।

মনো ওর হাতের স্পর্শে কাঁপছে বকী জানোয়ারের
মতো। মনোলে ওকে বৃকে চেপে ধরতে যায়। গাভার
কাঁক দিয়ে আলোর জালবোনো—এককালি আলো পড়ছে
মনোর ঘুঁখে।

মনোর প্রান্তলীমায় কাঠের বোকাটা নাড়িয়ে দিয়ে তার
দাম উড়ল করত চায়।

—বা! কেউ দেখে ফেলাবেক। কাল আসবে।

বোকাটা সহজেই মাথাধ তুলে নিয়ে চলে গেল।

মনোকে খেলিয়ে বেড়িয়েছে। পরদিনও এগেছিল।
বখারিত্তি একবাক্য কাঠ নিয়ে মনোর হাতে কামড়ে দিয়ে
পালিয়েছিল—স্বরের মতো ধার ও-ধাতে। হাসিটা তাই এত
দারালো বোধহয়।

আজ? আজও তেমনি করেই সরে গেছে মনোর
আড়ালে। মনোর সারা দেহমনে অশঙ্ক জালা—বারে বার
মনে পড়ে সেই মেয়েটাকেই। কি যেন বাঘিনী মায়াধ
তাকে উতলা করে তুলেছে এই মেয়েটা।

মন্ডার পরই আবার হুক হুক সেই ডাক। স্মৃতিত
পড়টা মনে মনে ফিরছে। বোনো-কি-অলা ঝাঝারে শব্দটা

কনের মাথাধ কাঁপছে। ভেগে আছে কনল। ড্যাক থেকে
ডবল-বারেল কলককে নতুন বন্ধুটো। তুলে কয়েকটা
একমথর টোটা পকটে নিয়ে বের হয়ে এল। তাকটা
শোনা যায় বহু দূরে। বোধহয় বাঘিনী—মেটিং-সিজন
আসছে—বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাই চকল হয়ে।

ভেগে আছে মনো—নকুড় ওকিকে নাক ডাকাচ্ছে মাথার
বালিশটা হুঁহাতে ধরে। তেলটিটে বালিশটায় ওপর খুব
যারা ওর। কে জানে বাড়তি-রোজগার-করা মোটগুলো
ওর ভিতরেই পুরে রাখে কিনা! মনোর ঘুম আসে না।
শাঠীর নিটোল দেহবল্লী—করীপাথরের বরণ আহুত-পায়ের
বাহুলগুলো ভেলে ওঠে চোখের সামনে। একথার শেখচোঁটা
সে করবে।

হাং দরজার চৌকার শব্দ। চমক ওঠে।

বেব হয়ে এসে কনলকে দেখে অবাক হয়।

—তেরি হয়ে নাও এখুনিই।

টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। পো-পো বাতাস বইছে। ঘুরে
লালভাঙার মাথার বিদ্যায় হানছে ওক-ওক গর্দনে।

চমক ওঠে: স্ত্রার, নেক-ওটা বাঘ। চোড় খুঁজছে।

—চলো না, গাছাল দিতে হবে। এই সময় ওকে মারা
নহয়।

নকুড় চোপ মুছ বের হয়ে এল। বাঘলার হাতে ঘুম
ছেড়ে পাছে উঠে বসতে হবে বাঘের আশায়। মাল শিগড়ের
কামড়ে পরান বাবে আর কি—তারপর গাছের খোঁড়লে
শাপও থাকতে পারে, কে জানে বাঘের কোথাও ছুঁতে
কিনা! কথাধ বলে—‘শাপের লেখা—বাঘের লেখা’; বহাতে
ছুঁতেই বিপদ।

—বাঘ থাকুক, স্ত্রার। মনে বাঘ থাকা ভালো। ওই
তরুই কাঠ ছুরি করতে আসবেনো কেউ।

কমল এ হুংগা ছাড়তে রাবী নয়। বহনিনের
আশা। একটা বাঘ মেরেছিল বন্ডার মনে, আবার যদি
শাপড়া যায়।

—দরকার থেকে কিছু টাকাও তো পাবে। বড়
উৎপাত করছে জানোয়ারটা।

—টাকা!—নকুড় তাবছে কথাটা। যদি কিছু ছুঁতে
যায়।—চলুন।

টাকার গন্ধ পেয়ে নকুড় রাবী হয়ে যায়। মনো তেলী
এদব কামেলার মধ্যে যেতে নারায়। মনে মনে তার
অন্ত ভিত্তার ঘোয়ার চলছে।

কিন্তু মনো একা আশি-ঘর থাকতে রহ শায়। যেতে

হয় তাকে অনিচ্ছা হবেও। গল্পগল্প করতে থাকে বিদ্বান্নার চামকানান। প্যাট-শাটের উপর চাপিয়ে।

শন-শন বইছে হাওয়া। থেকে থেকে কাশি-ঢালা আকাশ বদল ঘেঁষে বিছায়। একটা শব্দ ভেসে আসে। উৎকর্ষ হয়ে শোনে নতুন। মনো গাভের ভাসের সঙ্গে চাষের দিয়ে কবে গৈঁষে বলে আছে। পাতা গড়িয়ে হুটুপ করে ঠাণ্ডা জল করছে গায়ে। আবার ঠাক দিয়ে পিঠের জিত্তর ঢোকে। বাবা-ভাড়া শাল টে-ই-পি-পেডগুলো ভালো-ভালো ঘুরে বেঁড়াচ্ছে—আদা করছে সর্বাক ওদের কামড়ে।

আবার ডাকটা শোনা যায়। কেঁপে উঠছে বনের পাতাগুলো।

—‘বাবু!... ডাকটা এদিয়ে আসছে এইমিকে। কোতো হাওয়া ঘেঁষে ডাক বিশপেছে। ঠাঁপেছে ঠক্ঠক্ করে মনো। বিরাট বেহ ডরে মল্লভদ হয়ে গেছে। হুহাতে ডালটা ভাঙুটে ধরছে। নতুন দিশাব করছে—নিমেনপাক চলিচ টাকা বকশিচ গায়েই, চামকানান না-হোক বিপ-পটিচ টাকা। তার ভাগে গোটা পটিচ পড়বে। কির হয়ে আছে সে টর্ট হাতে।

খবুশ শব্দ। আঁথকে ওঠে মনো—হাঁড়ির মতো ঘুণ থেকে একটা অশুট আর্টনাস ভেসে উঠে—বু-বু-...

কলল বন্ধক তুলে তৈরি হয়েচে। এ অভিজ্ঞতা তার আছে। বাতাসে বাতাসে ওদের গাভের বোটকা পদ্ধ আপে ভেসে আসে, সারা গায়ে জোনাকির আগুন জ্বালা—অন্ধকারে নীল তীর ছাতিমথ হুটো জলজ চোখ। কিন্তু ডাকটাই শোনা যায় নীচে—ভিক্রে বাতাসে তখনও ভেসে রয়েছে বনহুড়িচ ফুলের দিঠে হুবাস। কোনো বোঁটকা গন্ধও নেই—গোনাকিও জ্বলনা ভর গায়ে। একটু বিখিত হয় সে।

এককলক তীর সন্ধানী আলোর উজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে বনের বুক। ওক-ওক শব্দে বেঘ ডাকচে—চম্কে ওঠে কলল। কোণায় যায়!

মোনার চোখ-হুটো জলে ওঠে—ওরা লাক দিঠে পড়েছে গাছ থেকে। চামরের ধান খুঁজে মনো তেনী লাক দিঠে নেদে নৌচেছে। বন-কাপানো একটা আর্ত চীৎকার। মনো আবদ্ধ অন্ধকারে ভাঙুটে ধরছে ছায়াবৃত্তিকে। চম্কে ওঠে সে।

নরম উক শব্দ। এতকাল এরই ধপ্প বেধে এসেছে সে। তার পুঁঠীকৃত আতঙ্ক—উজায় লালসায় কেটে পড়ে।

—হুই!

কামড়ে ধরছে যেহেটা ওর হাতে। মোনার শিরায় শিরায় কি এক দুর্বার চেতনা—দিয়ে বেলাতে চাষ ওই যেহেটাকে।

টর্টের আলোতে লরে বিভ্রাল মনো। তখনও হাঁকাছে উত্তেজনার আবেগে। নতুন এদিয়ে এসে যেহেটার দ্বায়ে এক চড় করে বেঘ—পটিচ টাকা বরষাক হয়ে গেছে তার। তারই উজল তুলছে চড়িয়ে। বামাল যেহেটা মজ কালো হাঁড়ির ভেতর ভালপাতা পুখে, তার মধ্যে ঘুণ লুকিয়ে চীৎকার করছে বনবধ—কেঁপে উঠছে বন। বাঘের আতঙ্কে কেঁপে উঠেছিল কলল। পার্ভগাও।

হঠাৎ ওদিকের বনে একটা ‘মানন হুক হয়ে গেছে। কান্না শালাছে বন থেকে; গল্প গাড়ীগুলো আখবোকাই হচ্ছে—পকগুলোকে নড়ি তুলে দিঠেই তারাও লাক-কাঁপ করে বন থেকে সোজা নৌচ ফিরাচ্ছে। রাতের অন্ধকারে বাঘের ভয় বেধিয়ে ওরা চোরা-কাটাই হুক করেছে। কবেক দিন থেকেই হুক হয়েছিল উপহব।

গল্প-গাড়ী ক’খানা নিয়ে সারীকে বেঁধে এনে হামির করছে আশিসের বারান্নাখ। জলে কাপার জিমে গেছে শোলাক-আশাক। নতুন গল্পগল্প করছে। গাড়ী-গল্প আর ওই মাণ্ডীটাকে নিয়ে এক ক্যাপান। তার চেয়ে লোক-গুলোকে ধরতে পারলে আসতো কিছু নগণ।

—কান্না বন কাটছিল?

কমলের কথার অংঘ ঘেঁষে যেহেটা,—মানি না।

উঠে বলে কলল,—সকর দিঠে বলবি এইবার।

মনো পাহারা দিঠে ওকে।

মনো কেলীর দিকে চেয়ে হাসছে যেহেটা। উদগ্র ঘোঁষন তার কেটে পড়ছে। একটা কলাই-করা গেলানো চা খাচ্ছে মনো। সারা হাতে কেঁপে কেটেছে।

—টুকুনে চা দিঠো গা—যেহেটা সহজ ভাবেই বলে ওঠে।

মনো ওর দিকে ফিরে চাইতে আর ভয় পায়; আপেকার বেধা সেই নেশা-লাগানো যেহেটাকে আঁধ ভয় করে সে। দুর্বার ওর সাহস—কেমনি বলিঠ ওর বেহ-মন—হাসছে সে ওর দিকে চেয়ে, ধারালো সে হাসি। গর্জন করে ওঠে মনো—হুণ করু হুড়ি!

সরে গেল মনো ওর কাছ থেকে।

বিলম্বিত করে হেসে গড়িয়ে পড়ে যেহেটা। ভরাইছো না কি গো? বাঘ লই—মাছল বাট।

কবিগুরু সহিত প্রথম সাক্ষাৎ

ঐশ্বরদায়রজন পণ্ডিত

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ আর সেদিনের সেই ছোট ঘটনাটি আজও আমার মনে পড়ে। বেশী করে মনে পড়ে তাঁর আবির্ভাব-দিনে।

১৩০২ সালের কথা। তখন আমার বয়স চৌদ্দবৎসর। ঐ বৎসরে পুজোর আগে আমার শিক্বেব ৭নলিনীরজন পণ্ডিত 'শরতের ফুল' নাম নিয়ে একখানি পুখা-বার্মিকী প্রকাশের আয়োজন করছিলেন। শরৎচন্দ্র, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, মহুড়াগা দেবী প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত লেখক-লেখিকার রচনা সংগ্রহ করা হয়ে গেছে। মুদ্রিত হ'ল রবীন্দ্রনাথের লেখা-সংগ্রহ। তাঁর লেখা কিছুতেই পাওয়া যাক্ছিল না। এ বিষয়ে ৭নলিনীল মুখোপাধ্যায় পর্বত হার বাললেন। তার কারণ, সে সব কবিগুরু শরীর বিশেষ ভালো থাক্ছিল না। তাঁর আগের লেখা বা দু-একটি ছিল—'নাসিক বহুবতী', 'প্রবাসী' তা আগেই সংগ্রহ করে নিয়েছিল। রবীন্দ্র-রচনা নূতন হয়ে 'শরতের ফুল' আয়ত্ত্বকাল করে, এ ইচ্ছে বাধাও একেবারেই ছিল না।

তাই শেষ চেষ্টার মধ্যে একদিন সকালে বাবা আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরকানো ঠাকুর সেনে কবিগুরু বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। ভিতরে একতলায় দক্ষিণ দিকের বারান্দায় উঠে একটি ঘরে আমরা প্রবেশ করলুম। বেশলুম, কোঠে একমন সৌম্যমুখি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে আছেন।

বাবা বললেন,—সারদা, প্রণাম করো, ইনি ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তোমার স্বা-কাকা।

প্রণাম করলুম। তিনি আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। কবিগুরু সঙ্গে বেগা করবার আগেই স্বা-কাকার যে স্বেচ্ছা-সেদিন লাভ করলুম তার তুলনা মেলে না। তারপর তাঁর স্বেচ্ছা-আকর্ষণে কত ছুটির দুপুর তাঁর সঙ্গে গল্প করে কাটিয়েছি—সে পরিচয় দিতে সঁসে বতর রচনার পত্রি হয়। পরে তা লেখবার ইচ্ছে হইল।

বাবা বললেন,—স্বা-বাবা, আর গুরুদেবের অন্তরঃ একটা কবিতা চাই। তা না নিয়ে কিছুতে নড়িছি এই বাড়ী থেকে।

স্বা-কাকা হাসলেন; বললেন,—সে কর্ম তোমার ঘর।

হবে না, আমার ঘরও হবে না। বরং একে পাঠিয়ে যাও।

এই বলে আমাকে সেখানে দিলেন।

স্বা-কাকার কথামতো বাহির-বান্দার সিঁড়ি বেয়ে জানহাতি বোতলার একটি ঘরে ঢুকলুম। এখনও বেণ মনে পড়ে, সে-ঘরের দক্ষিণ দিকের বেওয়ালে ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের খুব বড় একটি অফেল-পেন্টিং ছবি।

ঘরে ঢুকেই বেশলুম, রবীন্দ্রনাথ একটি কোঠে ধ্যানবর হয়ে বসে আছেন। তাঁর সেই আদর্শ মূর্তির রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তাঁকে বোঝবার মতো বয়স ও শক্তি সেদিন আমার ছিল না। কিন্তু সেদিনের সেই প্রভা ও বিদ্য-পরিপূর্ণ আনন্দ-আবেগটাই মাঝি আমারও মহুড়া করি।

প্রণাম করলুম। তিনি বলতে বললেন।

পরিচয় দিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলা উচিত তখন তা জানতুম না। তাই বিনা ভূমিকায় 'শরতের ফুল'-এর কথা জানিয়ে কবিতা চাইলুম।

কবি বললেন,—আমার লেখা বা ছিল সব অল্প কাগজে বেওয়া হয়ে গেছে। হাতে আর একটি কবিতাও নেই।

শিঙমলড ধারণা নিয়ে সেদিন অনেক কথাই বলেছিলুম। সব আর মনে নেই। যা মনে আছে তাই লিখছি।

বললুম,—আপনি তো খুব বড় কবি। ইচ্ছে করলে এখনি লিখে দিতে পারেন। তাই লিখে বিন না।

তিনি হাসলেন; বললেন,—আমার শরীর ভালো নেই, তাই অল্প সময় পারলেও, এখন পারি না।

এখন হ'লে কবির এই কথাতেই চলে আসতুম। কিন্তু তখন ছিল অল্প ভাব। তাই আরো ভোর করে বললুম,—কোনো কথা নড়ি না, এখনি লিখে দিতে হবে কবিতা।

কবি হাসলেন। তার পর কাগজ কলম নিয়ে তখন লিখলেন—

"ওসো শেকালি,

সবুজ ছায়ার আঁধারে তুই

জালিস্ মৌশালি।

আমার তারা আকাশ থেকে
তপের দিগি দিগি এঁকে,
কালের 'গরে খরে ঘরে
আধর রূপালি ।
ওলো পেতালি ।

হকের বস: পৃষ্ঠ ঝাঙল
হটল পাভা সে
আমার গোপন কানন-বীড়িঃ
বিবল বাতাসে ।
সারাই দিন বাটে বাটে
নানা কাজে স্বেদ কাটে,

সন্ধ্যাবেলায় বাজে ডোমার
ককণ কুপালি,
ওলো পেতালি ।”

কবিতা-লেখা শেষ করে কবিতার নাম দিলেন—‘পরভের
কুল’ ।

কবিতা নিয়ে নিচে নেমে এসুহ । বাবা খুব খুশী হলেন,
সবচেয়ে খুশী হলেন সুবীজনাথ । বললেন,—ছেলে তো নয়,
কাবলীওচালা !

কবিতার প্রথম সাফল্যের সঙ্গে এই ছোট্ট ঘটনার স্মৃতি
আবার জীবনে অক্ষয় হয়ে আছে ।

পণপ্রথা

ঐকালীকির সেনগুপ্ত

বরকর্তা বলে—‘শোনো, কস্তার বিবাহে দিছি পণ,
পুত্রের বিবাহে মোর তাই মাত্র করিব গ্রহণ ।’
বন্ধু তার তত্ত্বতরে মকৌতুকে বলে—‘শোনো বলি,
তত্বের লয়েছে মোর স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা-ভরা থলি—
তাই ব’লে বলিবে কি আমিও কাহারো ঘরে গিয়া
সঞ্চিত সম্বল তার সিঁধ কাটি আনিব লুটিয়া ?’



নতুন ইয়ারোপ: নতুন মানুষ

মনোজ বসু

(পূর্বসংস্করণের পর)

দূর অকালে ঘোরাঘুরির দায় ঘুল। আর এখন একটা-দুটো কাছাকাছি জায়গায়। বালিনের খাঁটি ছাড়তে হবে না, বালিন থেকেই যাতায়াত চলবে। কাল পটাসভামে যাচ্ছি। তার পরে পোল্যান্ড-নীমাছের এক গায়ে যাব সমবায়ের চাষবাস দেখতে—সোবিয়েতের কোলখোজের কায়দায় গড়ে তুলছে। জর্মনি ছাড়বার সময় হয়ে আসে। এর পর কোন দিকে?

পোল্যান্ডের ডাক এসেছে, পোলিশ লেখক-সমিতি দাওয়াত পাঠিয়েছেন। কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ার কি খবর? তারা যে নড়ে বসে না। খবরাখবর নেওয়া হচ্ছে, তবির-তল্লাস হচ্ছে সদলে ওদের দূতাবাসে গিয়ে।

ভালমানুষ পাঠক অবাক হচ্ছেন। ‘নেমস্তুর করে, নেমস্তুর করে’—বলে কাতরানি। ডেকে পাঠায়, তখন যেয়ো দেখানে; না ডাকলে গুড়গুড় করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে। নেমস্তুর আদায়ের ছেলেও তবির—কী মুশকিল!

যতদিন ঘরের কোণের নিরীহ মানুষটি ছিলাম, আমিও ঠিক ঐ ভাবতাম। দেখে দেখে লিখছি। জৈনিক তবির-সম্রাটের কাজকর্ম দেখে বিবাক্তান প্রাপ্তি হয়েছে। লেখক হিসাবে বিশ্বখ্যাত—নিদেন পক্ষে, স্বদেশখ্যাত হবেন তো পৃথক প্রণালী আছে। ছাড়া কলম চালিয়ে সে-কাজ হয় না। খ্যাতি ও পুরস্কারের জগৎ ভাল করে দেখাই একমাত্র বস্তু নয়। এমন কি প্রাধান বস্তুও নয়। ভাল লেখেন

তো তার ফলে কিছু সুবিধা হবে তবিরের পক্ষে। কিন্তু মন লিখলেই যে গোলায় গেলেন, মেটা কিছু নয়। দোহাই ধর্ম, আমি শুধু এসেশের উপর চোখ ঠারছি নে। নিজের দেশকে ভাল দেওয়ার অধিকার নিশ্চয়ই আছে নিজের বউকে ঠেঙানোর নতো। কিন্তু সারা দুনিয়া জুড়েই ঐ এক রীতি। ‘সত্যমেব জয়তে’ এটা হল এক নম্বরের বাগ্মী। ঐ বকম ভেদে বৃষ্টি সত্যসেবীরা ঘরের মধ্যে নিশ্চিন্ত থাকবেন, স্বরস্বরের পক্ষে প্রতিযোগিতা কন হবে—এই হল আসল উদ্দেশ্য।

যাকগে, এত ব্যাগডম-বাগডম বকলাম বিষম মনোহুঃখে। এত করেও চেক লেখক-সমিতির সাড়া মেলে না। পুনশ্চ এক লম্বা টেলিগ্রাম। বার মর্ন হল, কী সুযোগ হলার হারাইতেছ তাহা তোমরা জান না। দরজার গোড়ায় সিঁগ গল্ লেখক-ফুল। ভারত হইতে এত পথ চলিয়া আসিয়াছি, এখন অল্পবয়স ছাড়িলেই আমাদিগকে দেশের অন্তরে লইয়া তুলিতে পার।...

বালিনে ফিরে এসে এবার উঠেছি, হোটেল এডলনে নয়, সরকারি অতিথিশালায়। জায়গা ছিল না বলে আগের বার হোটেলের ঘেতে হয়েছিল। স্বকথকে নতুন বাড়ি, ঠিক সামনে লন, লনের এদিকে সেদিকে ফুল ফুটে আছে। চেনা জায়গা, আগের এসেছি এই উল্লাটে—সেই যেদিন রেডিও-য় বলতে এলাম। লন হয়েছে গোয়েবলসের ভাঙা বাড়ি ও অফিসের রাবিন সরিয়ে। মনে পড়ছে এবার? এত বড়বেরঙের বাহারের ফুল—কিন্তু যে বাড়ির উপর

ফুটেছে, তার পরতে পরতে মানুষের রক্ত। আমার ঘরের ঠিক সামান্যসামনি রাস্তাটা পার হয়ে হিটলারের চ্যানসেরি। সোজা হুজি-সেই অবধি নজর চলে যায়, এডলন হোটেলের মতন ঘাড় ফিবিয় দেখতে হয় না। ঘাড় কেঁরাবেন তো চেয়ে দেখুন আর এক দাঁত বের-করা দৈত্যাকার অটালিকা—গোয়েবিরের জাঁকজমকের অফিস। কোন নিয়তি আমার এনে ফেলল ভুবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পাড়ার মধ্যে—কয়েকটা বাড়ির এদিকে-সেদিকে ঘুরে বরি। চ্যানসেরির পিছনে অনতিদূর থেকেই পশ্চিম-বালিন। সেদিক থেকে রাতে আলোর বিজ্ঞাপন চমক দেয়। তারি জৌলস।

চ্যানসেরির জায়গাটায় লীবার্গকে টানতে টানতে নিয়ে চললান। মার্ট, জমল। বড় বড় কংক্রিটের চাই পাহাড়ের মতন উঁচু হয়ে আছে। কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা, তারের ভিতরে গুঁড়ি মেরে আমরা চুপন চুপে পড়েছি ভিতরে। পথ-চলতি লোকে কেনন চোখে তাকাচ্ছে—আমাদের পাগল-টাগল ঠাণ্ডাল নাকি! লীবার্গ দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, আমি সতর্কপে চলেছি ভাড়াচুরার ভিতরে। সাপে খায় না বাঘ লাক্ষিরে হুঁটি চেপে ধরে, কে জানে? মাটির নিচে হিটলারের ঘর বানিয়েছিল, ছাত ধসে পড়ে খানাখন্দ হয়ে রয়েছে। উইলোগাছ একটা বাকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক এই জায়গার উপর—এই বারো-তেরো বছরে বড়সড় হয়েছে—কাঁকড়া-চুল শোকাঁতুরা নারীর মতন। হুড়ঙ্গ দেবতে পাই পাভালের দিকে, কতদূর গিয়েছে জানিনে। হয়তো বা হিটলারের দেহ পড়ে রয়েছে ভাড়াচুরার মধ্যে কোথাও, অন্ধকারের ওলা থেকে হস্তার উঠবে, এগিরো না—ববদবার।

আর কী আশ্চর্য, বলাহেও আমাকে ঠিক তাই : দাঁড়াও ওখানটা—এগিরো না। অন্ধকার হুড়ঙ্গের কেউ নয়, লীবার্গ দূর থেকে হাঁক দিয়ে বলছে। ক্যানেরা তাক করেছে, আমার ছবি তুলে নেবে এই জায়গায়।

সকাল সাড়ে-নটায় পটাসডাম রওনা হলাম। সবাই নয়—আমি, বাও এবং বাও-পত্নী উমা। এবং মুকলি ও দোভাষি হয়ে যাচ্ছে লীবার্গ। অতএব একটা গাড়ি—বড় গাড়িটা নিয়েছি। গান-পামলা হাদি-মুখ সেই ডাইভার। পোশাক-আশাক আমাদের চেয়ে অনেক ভালো—চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি তো থাকবেই কাজের গরজে। সিগারেট খায় ঘন ঘন। চকোলেট কিনে তাকেও দেওয়া হয়, ক্ষুধিতে সে একসঙ্গে সব মুখে পুরে দেয়। লাইপলিগে সেই যে পায়োনীরদের সবুজ-লোক দেখতে গেলাম—রেস্তোরীর বসবার জায়গা পাইনে, লোক কিলবিল করছে, দেখি, ওরা ছুই ডাইভার বাইরে থেকে চোয়ার তুলে এনে বসিয়ে দিচ্ছে আমাদের জন্ত। এ কাজ ওদের নয়, হুকুম করলে বিগড়ে যেত, ভালবেসে এবং ভারতীয় লেখক বলেই কষ্ট করল। কোন এক জায়গায় বাব, পথ ঠাহর হচ্ছে না, গাড়ির খোপ থেকে চাউস এক ম্যাপ বের করে আঙুল বুলিয়ে কিছুক্ষণ নিরিখ করে দেখে নেয়। তারপরে ম্যাপ ভাঁজ করে তুলে রেখে দিল বেশরোয়া চালিয়ে—আপনি মরুন আর গাড়ি চুরবার হোক। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে যেন পাগল হয়ে যায়, স্পীডোমিটারের কাঁটা শেষ মুখে পড়ে লহমার ভিতর। কোন রাস্তা কোন দিকে গেছে, কোন জায়গা কত কিলোমিটার দূরে—মোড়ে মোড়ে সবিস্তারে লেখা। হঠাৎ বা সবলে ব্রেক কবে ডাইভার গাড়ি ধানিয়ে দিয়ে উত্তম রূপে পড়ে মুখে নিয়ে আবার ছুটিয়ে দিল। হোটেল-রেস্তোরীর এতাবৎ আমরা যেখানটায় বসি, ছুই ডাইভার তার পাশের টেবিলে বসে আসলাম। হয়ে। আজকে সে একা মানুষ—পটাসডামের হোটেল-এক টেবিলে মিলে মিশে খানায় বসলাম।

পটাসডাম চিনতে পারলেন না? সকালে প্রথম-মহাযুদ্ধের আমলে কাইজার প্রত্নরা বালিনে থাকতেন না, পটাসডামে বাঁটি ছিল। আর এই আমলে দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের পরে তিন শক্তিতে ছুটিপত্র

হল এই জায়গার বসে। সোবিয়ত আমেরিকা আর ইংলণ্ড। স্ট্যালিন ষ্ট্রুমান আর চার্চিল মালোপাঙ্গ নিয়ে এসে বিবিধ শলাপারামর্শ অস্ত্রে এই জায়গার এক বাড়িতে বসে সই করলেন।

বালিন থেকে পটাসডাম দূর বেশি নয়, মাইল পঁচিশের ভিতর। কিন্তু যেতে হবে প্রায় ডবল। পশ্চিম-বালিন হুঁড়ে সোজাশুজি পথ—কিন্তু ভিন্ন এলাকা। হওয়ার দকন সে পথে বিস্তর বায়নাক। তাই পশ্চিম-বালিন এড়িয়ে ঘুরে ঘুরে এদের পূব-রাজ্যের ভিতর দিয়ে যেতে হয়।

বালিনের পুরানো পথ। কতবার আসা-যাওয়া হল, গোটা পথ মুখস্থ। তবু যখনই যাই, হাছাকার ওঠে বৃকের ভিতরে। মাগধ কী করেছে মাগধের! এখনও দেখছি, অট্টালিকার ইউ-রাবিশ গাড়ি বোকাই করে নিয়ে যাচ্ছে। বড় বড় লোহার কড়ি বেঝছে, কাজকর্ম-করা দরজা-জানলা, ভাঙচোরা অপক্লপ ভাস্কর্য। ক্ষণে ক্ষণে রেলের পুলের নিচে দিয়ে যাচ্ছি, বিজ্ঞাতের রেল গুমগুম করে ছুটে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে। মাটির নিচে দিয়েও যাচ্ছে। রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ দেখবেন রেলিঙে ঘেরা তিন মিক, বোলা মিকটায় সিঁড়ি নেমে গেছে পাতালের দিকে, পাশে মোটা হরফে ইউ (U) লেখা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান—মাটির নিচে স্টেশন। স্ত্রী নদী বইছে দাপের মতো একেবেরে নানান দিকে ডালপালা ছড়িয়ে। নদীর যে কতগুলো পুল, গোপাশুগতি নেই। এমনি গোটা ছই পুল ছাড়িয়ে চলে এলাম শহরের এক নির্জন এলাকায়। শহর কে বলবে, জঙ্গল। এই পূব অঞ্চলটায় ভিড় দেখতে পেলাম না কখনো। বিস্তর গাছপালা, গাছের তলায় ছায়া-ভরা রামপথ। পাথরের বোওয়া, হঠাৎ খেরাল হল, সেই পথ পিচের আবরণে মন্থণ ভেল-চোয়ানো হয়ে গেছে। মজানো বাগান ডাইনে, উষ্টো দিকে খেলার মাঠ। বাগানের মস্ত বড় সাদা রঙের গেট, গেটের উপর রুশীয় অক্ষরের নাম। ভিতরে অনেক দূর অবধি

টান। রাস্তা গেছে। রাস্তার শেষ স্মৃতিমন্দিরে। সোবিয়তের অনেক সৈন্য বালিনে প্রাণ দিয়েছিল, তাদের সমাধি। সর্বকণের পাহারা দরজায়। ঢুকতে বাধা নেই, যে কেউ ঘুরে দেখে সম্মান জানিয়ে এসে।

স্মৃতিমন্দির ছাড়িয়ে চলেছি। কত দূর চলে গেলাম। জঙ্গল। এ বর্ণনা আগেও শুনেছেন—শহর ছাড়িয়ে গিয়ে অনতিদূরে দস্তুরমতো জঙ্গল তো বটেই, শহরের ভিতরেও ঘন জঙ্গল এঁটে আছে। জঙ্গলের ভিতর ছোট ছোট ছবির মতন বাড়ি। তারপর এলো ক্যান্ট্রি-পাড়া। নদীর কিনারা ঘরে ক্যান্ট্রির পর ক্যান্ট্রি। মাইলের পর মাইল। ক্যান্ট্রির একদিকে নদী, আর একদিকে রেলরাস্তা। সমস্ত চুরনার হয়ে গিয়েছিল, পনেরো আনা আবার নতুন করে চালু করেছে।

ক্যান্ট্রি-পাড়া বাঁয়ে রেখে ছুটছি। কসলের ক্ষেত। ঘন-মন্ড মাঠ একদিকে, ভিন্নদিকে ঘর-বাড়ি। আগল কেলে রাস্তা বন্ধ করা—তাতে লেখা রয়েছে—‘ধামো’। পাসপোর্ট-ডিস। তিনা হুকুমনামা দেখান। বার কুড়িক আমাদের এই আগল পেকনো হয়ে গেছে। প্রথম দিন বড় রাগ হয়েছিল—কী কড়াকড়ি রে বাবা! কাউকে বিশ্বাস করে না—নিজের দেশের মাগধ চলাচল করবে, তা-ও কোটোগ্রাফ-সাঁটা হুকুমনামা দেখিয়ে? এখন করণা হয়। কী বিশ্বের আবহাওয়ার থাকে যে মাগধগুলো! আমাদেরও আছে, কিন্তু এর সিকির সিকি নয়।

বর্ডার-পুলিশ সেলাম হুঁকে পাসপোর্টের জন্ত হাত বাড়ায়। পুলিশ হয়েও বিনয়ী। বয়সে ছেলোমাগধ। তারিকি টুপি পরলে কি হয়, টুপিতে বয়স চাকেনি। ভিসা পড়ে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফোটোগ্রাফের সঙ্গে মাগধ মিলিয়ে দেখে, পুনশ্চ আর এক বীর্ঘ সেলাম দিয়ে ইসারা করে। আগল খুলে দেয় একজন ওদিকে। চলে যাও এবারে, আর বাধা নেই।

এবোড়োম অল্পে। সেদিকে খেলায় না, পটাসডামের পথে নেমে পড়েছি। ভেড়ার পাল নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। গাড়ি আটকে রইল। যাকে হো যাকেই। পালের মাথায় হুটো কুতুর এবং রাখাল। আপাত-মুহুর্ত পোশাক খাটো রাখালের—ককমকে পোশাক নয়, পুরানো হয়ে রং ফ্যাকাশে হয়েছে। কখনো মাঠ আসছে, কখনো জঙ্গল, কখনো বা গ্রাম। এত ঘোরাঘুরি করে এলাম জমনির মফস্বলে—গ্রাম ও শহরের চেহারা প্রায় এক রকমের। ভাল রাস্তা, সহজলভ্য বিদ্যুৎ-শক্তি, যানবাহনের ভাল ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্ন স্থলর সাজগোজ সনস্ত মানুষের। আর এসব জায়গা হল বাগিনের একেবারে কাছে, আরও ভাল ভে। হবেই।

হাভেল নদী। নদী পার হয়ে পটাসডামে ঢুকে মনের মধ্যে আর্দ্রানাদ ওঠে। আমোদের গ্রাম-অঞ্চলে মাটি কাটার সময় গর্তের ভিতর এক একটা চিবি রেখে দেয়। বোকা ব্যার কতটা উচু ছিল এখানে, মাটির পরিমাণ হিসাবে আসে। এ-ও তেমনি। শহর চুপীকৃত, তার ভিতরে খাড়া রয়ে গেছে এটা-ওটা। আততায়ী যেন আঙুল তুলে শিশুর গর্জনে শাসাচ্ছে : ঐ রকম ছিল আগে, আর এই করেছে—আসবে আর লাগতে ? গ্রীক-পদ্ধতির মোটা মোটা ধাম—কলকাতার সিনেট-হলের মতন—আধধান, সিকিধান হয়ে হুঁয়ে গড়াচ্ছে। অগুণতি মূর্তির হাঙ-পা-মুণ্ড মাঠ ভরে ছড়িয়ে আছে—মৈস্তদল যেন তারো, লড়াইয়ে কচু-কটা কবে দিয়ে চলে গেছে। বিরটি স্মৃতিস্তম্ভ বানিয়েছিল কারা রণবিজয়ের ব্যাপারে। বনের উল্লাস, ভেবেছিল, পাথরে চিরকীবী করে রাখবে। বেধে ঘান এবার এসে। চূড়া ভেঙে পড়েছে। নিচের দিকে সাধা পাথরে বিস্তার লেখাকোষা ছিল—এখন যে অল্পবয়স রয়েছে, তার মানে বোকা ব্যার। ট্রাম চলছে, কিন্তু খালি গাড়ি। পথেও মানুষজন সামান্য। এই তেরোটা বছর কী

খাটনিটাই খাটছে গোটা জাত ধরে, লড়াইয়ের চেহারা তবু ঢাকা দিতে পারল না।

অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে পৌঁচেছি অবশেষে মানস সৌচির (Sans Souci) তোরণে। ফরাসি নাম, মানে করলে পাড়াবে অ-শোক, শোচনা-বিহীন। ভুবনের কোন শোক-দুখে তোরণ হুঁড়ে ঐ বিরটি অট্টালিকা ও পার্কের এলাকার ভিতর পৌঁছেবে না, ছিল অতিপ্রায়।

তেরো শ' একর জায়গা। এখন বোধকরি এদিকে সেদিকে আরও কিছু বেড়েছে। ঢুকে পড়ে শিশাহারা হয়ে যেতে হয়। শতাব্দীর প্রাচীন মহা-বৃক্ষেরা। বিশাল বিপুল ওক, লাল বাকলের পাইন, আকাশ-ছোওয়া ফার—আর সুপসি-সুপসি উইলো। কত কড় মাথার উপর দিয়ে গেছে, কত রাতের জ্যোৎস্না গায়ের উপর পড়ে ছুঁন করেছে। মাথায় মাথায় এঁটে যেন এক-ছাত হয়ে আছে। সূর্য উকিছুঁকি দেয় উপর থেকে, একফালি রোদ কদাচিৎ বা তলায় পড়ে যায় কোন এক ছিন্নপথে।

কত মূর্তি, ছোটখাট কত বেউল, কত কুছবন—গণে শেষ হয় না। বড় বড় রাস্তা, তার এদিকে সেদিকে শতেক গলিঘুঁজি। গোলকর্ষাধার মতো ঘুরে ঘরবেন। রবিবারের দিন মোটামুটি হাজার তিনেক মানুষ দেখতে আসে। তা মোটে চোখেই পড়ে না। পার্ক যেন গ্রাস করে বসে থাকে মানুষগুলো। এখানে দু-জন ওখানে পাঁচজন, এই মত্রে। কী বৃহৎ ব্যাপার, বৃক্ষ দিন এবারে।

গাড়ি তোরণের বাইরে রেখেছে। সারবন্দি বনম্পতির নিচে দিয়ে চলেছি। ডালে ডাল ঠেকিয়ে হাত ধরাধরি করে দাড়িয়ে আছে মহাকালের প্রহরীরা। কবে দু-ন বছর আগে উদ্ভান বানাল, সেই থেকে এখনো প্রতিটি দিন মানুষ খাটছে। লড়াইয়ের সময় বড় ভয়ের সেই কয়েকটা মাস ছাড়া একটা বেলা আজও কামাই হয়নি। আকাশ-ছোওয়া গাছ, তারও উপরের ডালপালা ছাটাই হচ্ছে মই লাগিয়ে। বাগানের মালি

আড়াই ম'। এ-গাছ হাটাই করছে, ও-গাছে জল দিচ্ছে, ওদিকে কুলমুছ চারা নিয়ে বসছে। বড় বড় হাটাইয়ের অগ্নে শান দিচ্ছে অনেক মিলে।

জুধুনায় পুরানো বস্তুর প্ররক্ষণ নয়, নতুন নতুন কাজও চলেছে। এই দুই শতকের যত নাম-করা শিল্পী, প্রায় সকলের কিছু না কিছু হাত পড়েছে এখানে। পুরানো কাজকর্ম ঘোল আনা বাঁচিয়ে রাখা—সে-ও খুব শক্ত কাজ। পুরানো ছবির উপর সাবধানে তুলি ব্লাতে হয়। বায়ু-পাথরের মূর্তি কাঠের স্ক্রেনে ঢাকা দিয়ে রাখতে হয় শীতকালে, হিমে নরহতা কালীঘর্ষ হয়ে যাবে। গোটা অট্টালিকা কাঠে মুড়ে রাখা চলে না, শীতের অন্তে বসন্ত এসে গেলে তোলপাড় লেগে যায়। ঘবাবাঝা সাফ-সাফাই চলে, অগণ্য মাহুখ খাটে। আমরা এসে পড়েছি তেমন একটা দিনে, সেই নয়দানবীর কাণ্ড চোখের উপর দেখছি।

ডাইনে বাঁক নিয়ে আরও অনেকখানি পথ গিয়ে মূল-প্রাসাদ। হাঁ, গড়েছে বটে একটা জিনিস। ছনিয়র মাহুখ দেখবার জন্য বেয়ে আসে, সেটা অকারণ নয়। প্রাশিয়র রাজা ফ্রেডারিক ছা ব্রেটের ঐশ্ব্যবাস। উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ সবুজ গাছপালার ভিতর সোনা হেন কিকনিক করে। বাড়িটা আসল বস্তু—বাড়ির নামে ক্রমশ গোটা বাগানের অ-শোক নামকরণ।

অনেক উচুর উপর অট্টালিকা। চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে। ধানিক উঠে গিয়ে সমতল। কোথাও জলাধার। কোনখানে হট-হাউস—কাচের ঘরে গাছপালা বড় হচ্ছে। কিংবা ফোয়ারা—করকর করে জল ছটকে পড়ছে। জল এত উচুতে ওঠে যে সেই অবধি ভাঁকাতে গেলে ঘাড় স্বেঙে যাওয়া অসম্ভব নয়। আবার চলল সিঁড়ি। আবার সমতল। এমনি ছয় দফা। ছয় দফা সিঁড়ি বেয়ে উঠে চব্বই পেয়ে গেলেন। ইউ-ক্লবের ঝাড়—পিরামিডের আকারে হাটাই করেছে। তার সামনে বারোটা গ্রীক দেবদেবীর মূর্তি। পাথর ফেটে যেন

রূপ আর লালসা বেরিয়ে আসছে। করাসি সম্রাট পঞ্চদশ-লুই মূর্তিগুলো ফ্রেডারিককে উপহার দিয়েছিলেন। সোনার রঙের সূর্যমূর্তি। প্রাসাদের পিছন দিককার উঠান ঘিরে অর্ধচন্দ্রাকার দালান; রোনক রীতিতে তৈরি।

ফ্রেডারিক বনালেন এই বাড়ি ১৭৭৪-৭৭ অব্দে। করাসি সংস্কৃতির ডক্ত তিনি। গুরু ভলভেয়ার—ডাকে আহ্বান করে এনে এই বাড়িতে রেখেছিলেন। করাসিতে কথাবার্তা বলতেন সব সময়। ভলভেয়ার বললেন, তোনার নিজ ভাষা জর্মন বলো না শুনি। ফ্রেডারিক জবাব দিলেন, জর্মন ভক্তলোকে বলে নাকি? সে হল আস্তাবলের সহিসের ভাষা। দেখলানও বটে তাই। ফ্রেডারিকের লাইব্রেরি-ভরা বিস্তর করাসি বই। এবং লাতিন ও গ্রীক ক্লাসিক্যাল বই। জর্মন বই একখানাও নেই।

প্রাসাদের দরজা খুলবে আর খানিক পরে। টিকিট করে ভিতরে যেতে হয়। অনেক মাহুখ গাড়িরে আছে জানলার সামনে। আমাদের আলাদা বনোবস্তু—টিকিটের লাইনে গাঁড়াতে হবে না। আগেভাগে ঢুকিয়ে দেবে—ভিড়ের মধ্যে জুং হয় না বলে আলাদা করে দেখিয়ে বুঝিয়ে দেবে। ততক্ষণ কি করি? ঘোরাঘুরি করা যাক উঠানে। নানা জায়গা থেকে আরও বিস্তর এসেছে, ইঙ্কলের ছেলেমেয়ের বড় একটা দল। একটা ফটকে মেরে হাসছে আমাদের আগুুল দিয়ে দেখিয়ে। কথা না বুঝি, বিক্রপ করছে সেটা বোকা যায়। বেশে-বেশে এত ঘোরাঘুরি করছি, ব্যঙ্গের হাসি প্রথম এই দেখছি জর্মনিতে—একটি মেয়ের মুখে।

সামনের উঠানে প্রাসাদের হৃদিকে ছোটো কঁাকা লোহার চালা। কতকটা খাঁচার মতো। সবুজ লতানে-গাছে ঢাকা উপরটা। ছোটখাট প্রাসাদ আর একটা ওদিকে, চূড়ায় ঈশলপাখী। সামনে বিশাল নেপচুনের মূর্তি। খিয়েটার হত এখানে—

বড় হল। সেকালের রাজরাজভাড়া নেই, সভাসদ ও অস্থঃপরিচারক ভিড় করে না। একালের রামাশ্রাম আমরা ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেখছি।

প্রাসাদে ঢুকবার সময় হল এতক্ষণে, দরজা খুলে দিয়েছে। সকলের আগে আমরা ভারতীয় তিনজন, এবং লীবার্ণ। কয়েকটা ঘর দেখানো হয়ে গেলে তারপর সকলকে ছাড়বে। বরাবর আগে আগে থাকব, আমাদের কাছে ভিড় জমাট হবে না।

জায়গাটা ছিল পাহাড়। পাহাড়ের মাথা কেটে চৌরস করে তার উপর অট্টালিকা বানাল। অনেক দূর অবধি বাতে নজরে আসে। চারিপাশে বহুবাণু উড়ান, এখানে-ওখানে পাহাড়ের ঢিবি। পিছন দিকে দেখতে পাচ্ছি পাহাড় ও অরণ্য একটানা চলে গেছে। মনোরম জায়গা বেছেছে, সস্তি সস্তি নন কেড়ে নেয়। পার্ক হবার আগে জায়গার যে চেহারা ছিল, একটা ছবিতে তাই আঁকা রয়েছে। ফ্রেডারিক গোড়ায় নিজ হাতে মোটামুটি এক নক্সা বানালেন : বড় ইন্ডিনিয়ানরা পুরো নক্সা বানাল সেই ছকের উপরে। ছোটাই রাখা আছে।

ছাতের দিকে চেয়ে অবাক হই। কী ছবি ! কুলের দেবী স্কল ও শিশুদের নিয়ে সাত্রা ছাত ভরে আছেন। নিত্যন্ত হালকিলের ছবি বলে মনে হয়, শিল্পী যেন এইমাত্র কাজ শেষ করে তুলি রেখে উঠে গেছেন। অথচ চিত্রকরের নাম রয়েছে—হার্পার পিলেক্স, ইংরেজ শিল্পী। তারিখ—১৭৪৬ অব্দ। ঘরের মেজে আসল মার্বেলের। ধানের মার্বেল নকল—কোনখানে জোড় নেই, তাই দেখে ধরা যায়। গ্রীক দেবী মার্বেলের আহা-মরি মূর্তি—এ-বস্ত্র ও পক্ষশ-শুইয়ের উপহার। ছবির গ্যালারি একটা ঘরে—ঘর ছোট, ছবি ও মূর্তিতে ঠাসা। পশ্চাই—এই ধ্বংস খুঁড়ে অপকল্প ভাস্কর্যমূর্তি বেরিয়েছিল, তার অনেক নিয়ে এসেছে। ফ্রেডারিকের প্রাণিতামহ ও প্রাণিতামহীর ছবি। খুব বড় এক ছবিতে ফ্রেডারিক ডিউক-অব-ইয়র্ককে সতর্কনা

করছেন। বড় বড় ঝাড় স্কলছে বাড়িময়—উৎকৃষ্ট ফরাসি ফুটালে তৈরি। ফ্রেডারিক কুকুর বড় ভাল বাসতেন, তার এক অতি-প্রিয় কুকুরের ছবি।

লাইব্রেরি। হু-হাকার বই—হু-খ বছরের পুরানো, কিন্তু বাধাই স্বকমক করেছে। আর ঐ বা বলেছি, জর্মন বই এর মধ্যে একখানাও নেই। হোমার, আপলো, আরিস্তটল ও দক্রেতিসের মূর্তি। সঙ্গীত, জ্যোতিষিতা ইত্যাদিও মূর্তি গড়ে রূপ দিয়েছে।

ফ্রেডারিকের শোবার ঘর। কার্টের মেজে। চেয়ারে বসে কাজ করতে করতে মারা যান তিনি (১৭৭৪)—সেই গদি-আঁটা চেয়ার। সম্রাটের তেল-রঙা ছবি চেয়ারের ঠিক উপরটায়। সম্রাট ও দুই প্রিয় কুকুরের ব্রোঞ্জমূর্তি। মস্ত বড় বড়ি—সেই আমল থেকে ঠিক চলেছে, ঘটা-বিনিট-সেকেন্ড শুধু নয়, দিন-মাস-বছর পাণ্ডা যায় ঘড়িতে। ছাতের গায়ে জ্যোতিষিক নবগ্রহ-আঁকা।

বাছনার ঘর। আশোয় আসবাবে ছবিতে নির্খুঁত ভাবে সাজানো। হু-পাশে বাড়িদান, মাঝে বাজনার স্টাণ্ড। তার উপর ফুটবিশি শোয়ানো, সম্রাট নিজে সেটি বাজাতেন। অতি বৃহৎ আয়না—আরনার মুখোমুখি কাচের জানলা। জানলার ওধারে বাড়ির সামনেটা আয়নার বিধিত হয়েছে। ঘরের ভিতর থেকে সম্রাট বাইরের সবকিছু দেখতে পেতেন। ঘড়ির পুরো ঘটা হল, পাখির অতি-নিষ্টি কাকলীর মতো অনেককাল ধরে বাজতে লাগল।

বসবার ঘর, অভ্যাগতেরা যেখানটা বসে অপেক্ষা করতেন। নামজাদা ফরাসি শিল্পীদের আঁকা ছবি। একটা ছবি দেখছি—তরুণী নাতনি প্রেমপত্র লিখছে, চশমা চোখে বুড়ো ঠাকুরদা সকেটুকে ডাকাডাকি করছে, তরুণীর সাদা নেই। ভারি চমৎকার।

খাবার ঘর। টেবিল ছিল ডিবাকার—সে টেবিল এখন নেই, মেজের উপরে চিত্রকর্ম বেখে টেবিলের চেহারা পাণ্ডা যায়। পোসিলেন বানানো শুধন সরে শুক্ন হয়েছে হাইসেনের

কারখানায়—সেই অমল ধবল বাসনপত্র এখানেও। অভিজিদের থাকবার ঘর। লড়াইয়ের কয়েক বছরে দেখাশোনার অভাবে খারাপ হয়ে গিয়েছিল, ১২৫০ থেকে নতুন বাং ফলিয়ে কাড়পোছ করে আবার আগেকার চেহারা খুলেছে।

ভলভেয়ার যে ঘরটায় থাকতেন। তাঁর সোফা-চেয়ার। বেরালময় অগণা পাখির ছবি। ইশপের গল্পের নানা ছবি কার্পেটে তুলে চেয়ারের সিটে বসিয়ে দিয়েছে। কঙ্কপ লাঠি কানড়ে ধরেছে, ছই পাখি লাঠির হু-প্রান্ত টোটে নিয়ে উড়ছে। ময়ূরের পাখা ধারণ করেছে মুরগি। এমনি কত।

পটাসডামের এই জায়গায় বোমা পড়েনি ভাগ্যিস। রুশ সৈন্য শহরে ঢুকে পড়ল। সোজানুজি এইখান দিয়ে এগোবার কথা। কিন্তু শিল্পরসিক কে-একজন জেনারেল সোজা পথ বাতিল করে দিলেন। এই তর্রাতে একটি সৈন্য আসবেনা, ঘুরপথে বাবে। হাঙ্গামা বেশি, খরচও অনেক। কিন্তু অ-শোক পার্ক অটুট রয়ে গেল, গাছের ছোট ডালটিও ভাঙা পড়েনি। সেই ডামাডোলের সময় পাহারা মোতায়েন করেছিল পার্কে ঢোকবার প্রতিটি মুখে। বাজো লোক ঢুকে পড়ে জিনিসপত্র পাছে নয়-হয় করে দেখে।

ঐরাবাস দেখে শুনে বাগানে নামলাম। আরও বিস্তর দেখবার আছে—ছোটবড় অনেক ক্যাসল, অসংখ্য শিল্পকর্ম। একটা বড় দল আসছে ওদিকটা সাজ করে। মুখোবুপি পড়লাম। চেহারা ও পোশাকে মালুম হয়, যাবের হামেসাই দেখে থাকি সে বহনের মানুষ নয়। আমাদের দিকে কোড়াক-চোখে তাকালে, দৃষ্টিতে সারলা।

লীবার্গ এগিয়ে আলাপ করে। সত্যি তাই, এরা সব গাঁয়ের মানুষ। শ' চারেক হাইল দূরের গ্রাম থেকে এসেছে। প্রথম এলো এই তর্রাতে। জাত্যাংশে আলাদা—সরব, কর্মমির এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। আমাদের দেখে খুব যেন মজা পেয়ে যায়। শহর দেখতে এসে এই বস্ত্র উপরি ভুটল।

অনেক পাহাড় ও সমুদ্র পার হয়ে-আসা মানুষ—লেখক-মানুষ এতগুলি।

পাড়াগায়ের হলে কি হবে, ক্যামেরা আছে সঙ্গে। যা ভাঙে, ছবি তুলে নিচ্ছে। ক্যামেরার জায়গা কর্মনি—জলের দরের ফিল্ম। ছবি নেওয়া ওনের কাছে ভাল-ভাতের শামিল। আমাদের মধ্যে নেয়ে আছেন উমা রাও—ঠাকে ঘিরে এসে পাড়ার ও-দলের কর্মব্যসি নেয়েগুলো। ক্লিক-ক্লিক—বিস্তর ছবি তুলছে।

আমরা হতভব হয়ে আছি ক্যামেরার এলাকার বাইরে। ও-দলের কয়েকজন, এবং আমি ও রাও। এক প্রোটা বলেন, বা-রে আমাদের ছবি হবে না? ব্যঙ্গ হয়েছে বলে বাতিল? এলো, লাইনবন্দি হয়ে পাড়াই।

লীবার্গ হাসতে হাসতে কথা বুঝিয়ে দিল : পাড়াতে বলছে ওদের সঙ্গে।

তাই পাড়িয়েছি। প্রোটা তাড়া দিয়ে ওঠেন : এই বুঝি? এক মিটার ঝাঁক। গায়ে গায়ে এসে, হাত ধরে। হাত ধরাধরি করে ছবি তুলব ভারত আর কর্মনি।

তখন হাত ধরা শুধু নয়, হাতে হাতে শৃঙ্খলিত হয়ে পাড়িয়েছি। ছবি উঠল। কটা মিনিটের দেখা তাদের সঙ্গে! কে তারা, কোথায় ঘরবাড়ি জানিনে, কোনদিন আর দেখা হবেনা। গাঁয়ের স্বল্পশিক্ষিত লোক—‘ভারত’ নামটাই প্রথম হয়তো আজ কানে গেল। মানুষ—সবাই মানুষ আমরা—শুধুমাত্র এই পরিচয়। মানুষের উপর মানুষের টান দেখে অবাক হয়ে যাই। কোন এক সময় হয়তো বড় একা মনে হচ্ছে নিজেদের, অবদান আসছে, মুহূর্তে তুল ভেঙে যায়—দেখতে পেলাম, অনেক মানুষের একজন আমি। হুনিয়ার পাশে পাশে কতবার এমনি ঘটনা ঘটেছে।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে চায়ের পিপাসা লাগল। এই তো মুশকিল। ডাগন-হাউস ছাড়া চা দিলবে না। সেটা আবার কোন কারাগা? হাঁটন

—বেশ খানিকটা হাঁটতে হবে। বাগানের সীমানার বাইরে চীনা প্যাটার্নের বাড়ি। মন্দের ভাল, হেঁটে হেঁটে ও মুড়া অববি দেখা হয়ে গেল। ঘন গাছপালা, মাঝে মাঝে কাশবন। কাশবন ফুঁড়ে মস্ত এক শিঙেল হরিণ মাথা তুলে ডাকিয়ে দেখছে। ঘবাক কাণ্ড, দেশটা জমনি বলে হরিণও কি মিষ্টিটারি? তিলেক ভয় পায় না, যেমন-ক-তমনি দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গেলেও ভয় পায় না—ও হরি, তোতে বানানো মহিষের আকারের শিঙেল। হরিণের সঙ্গে আঁমানেরও ছবি তুলে নিল।

বাগান থেকে বেরিয়ে ছায়া-ঢাকা ছোট রাস্তায় কয়েক পা গিয়ে উণ্টো দিকের হুঁড়িপথে নামলাম। সে পথ উচু হয়ে ক্রমশ উঠেছে এক টিলার মাথায়। নিখি-মজুর লাগিয়ে পথটার সিঁড়ি বানিয়ে দিচ্ছে। পুরানো কালের কোন নৌবিন মাছধ এখানে বাড়ি বানিয়েছিলেন। ধানভুলোর মাথায় যেন ফুলের বাড়ি, ফুলের বাড়ির ভিতরে সত্তর্পণে কড়িকাঠ ঢাক।। নেয়ালে কত বকনের কাজ—তারবস্ত্র বাজাচ্ছে বাজকর, কেউ-বা শিঙা বাজাচ্ছে। বাজপাখি হাতে এক শিকারি। সেসব মাছধ কোথায় কোঁত হয়ে গেছেন। এখন চা-খানা। আরানের জায়গা। ঘরে বা বারান্দায় বসে পড়ুন, অথবা উঠানে গাছের তলায়। কিংবা বড় বড় ছাতা, তার নিচে।

চা অন্তে পুনশ্চ বাগানের ভিতরে। দেখার শেষ নেই, একটা দিনে নমো-নমো করেও দেখা হয় না। হুপুর গড়িয়ে গেছে। ইতি করা যাক এবারে। কিন্তু আর এক জায়গা তো দেখতেই হবে। দ্বিতীয়-মহামুখ বতন হয়ে গেলে বিজয়ী তিন জাতি জমনির বুকের উপর যে বাড়িতে যে ঘরে বসে চুক্তিপত্রে সই করেছিলেন। সেই পাট চুকিয়ে খানাপিনা সেরে হাভেল মণী পার হয়ে বার্লিন-মুখে পাড়ি দেওয়া হবে।

এটাও বাগানবাড়ি, বিশাল কম্পাউণ্ড, একেবারে নদীর উপরে। ১৯৪৭ অব্দে পোটো জর্মনি

জাত কত আশায় বাড়িটার দিকে ডাকিয়ে ছিল। কতজনই মুখে সেই এক গল্প শুনি। দেশে দেশে আক্রমণ চালিয়েছিল নাৎসিরা—হত্যা, লুণ্ঠন ও হিংসায় পাতকে হার বানিয়েছিল। নাৎসিরা করেছিল এইসব—পোটো জর্মনিজাতির নামে এ কলঙ্ক ওরা মেনে নেবে না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত হল সমগ্র জাতির উপর দিয়ে। পেটে অন্ন নেই, বস্তির ঘরবাড়ি নেই, ভবিষ্যতের এক কপিকা আলো নেই চোখের সামনে—সে একদিন গিয়েছে। বিজয়ী নেতারা এই বাড়িতে এসে জমায়েত হলেন। জর্মনিজাতি আর কোনদিন লড়াইয়ের পথে না গিয়ে সংভাবে বেঁচেবর্তে থাকবে, এমনি ব্যবস্থার কথা শোনা গেল। চুক্তি হয়ে যাবার পরেও সকলের সেই ধারণা। অচিরেই কিন্তু প্রকাশ পেয়ে গেল, গণগোল কর্তাদের ভিতরেই। প্রবল শত্রুর সামনে এক হয়ে লড়েছিলেন, লড়াই অন্তে এখন নিজেদের মধ্যে অসি শানাজেন। হুটো দল হয়ে গেল—আমেরিকা ব্রিটিশ আর ফরাসি একদিকে, সোভিয়েত আলাদা। এক জর্মনি দুই জর্মনি হয়ে গেল উভয় দলের এলাকা হিসাবে। দিনের প্রতিটি মুহূর্তে হরেক সমস্তা মনে করিয়ে দেয়, একটা দেশের মাথায় কোপ মেরে দু-খণ্ড করা হয়েছে। মহাপাপ নাৎসিদের, জাত ঘরে তার মহাপ্রায়শ্চিত্ত চলছে। সেই কাণ্ড ঘটে এই বাড়িতে—ঐ সমস্ত ঘরের ভিতর।

ফ্রাউন-গ্রিন্সের বাড়ি, ১৯৪৫ অববি এখানে তিনি কাটিয়ে গেছেন। ফ্রাউন-গ্রিন্স বলা ঠিক হচ্ছে না—প্রথম-মহামুখের সঙ্গে সঙ্গে কাইজার-তত্ত্ব বতন—অতএব বলা উচিত কাইজারের ছেলে। নাৎসি আমলে কাইজার-পুত্র এখানে থাকতেন। এখন পশ্চিম-জর্মনিতে। তাঁর যেটা লাইব্রেরি-ঘর, চার্চিলের দলটা সেখানে আসতেন। নিয়েছিল। খানায়ের ছিল দলের সেক্রেটারির অফিস। সেসব দিনের বিস্তার কোটো—টোকবার মুখে যে বারান্দা, বিশেষ করে সেখানে ফুলিয়ে রেখেছে। স্ট্যালিন

ও টুমানেরও পরামর্শদাতা অনেক ছিল। সোবিয়ত-মঙ্গল যাবতীয় খানাপিনা নদীর ওপারে। পল্টন-ত্রিজে নদী বেঁধে ফেলেছিল, বাতায়ানের হাঙ্গামা ছিল না।

ক্রাইন-প্রিন্সের বউয়ের আজব খেলা—জাহাজের উপর বসবাসের শখ। বারো মাস জাহাজে থাকে চলে না, তাই বাড়ির মধ্যেই এক কায়দা বের করেছিল। বউঠাকরনের ঘরগুলো জাহাজি প্যাটার্নের—কাবিন ডেক সি'ডি রেগিং, এমন কি ধোঁয়া বেরুনের চোঙা অবধি। নিচের তলায় মেটবের ভটভট আওয়াজ করত—আওয়াজ করে জাহাজের ইঞ্জিন চলছে, এই আর কি! পরমা থাকলে কত কি করা যায়—আমরা তো মশায় মাথার উপরে এতটুকু আচ্ছাদন নিয়ে উঠে পারিনে পরমার অভাবে।

কম্পাউণ্ড বড় বড় গাছ, ঝুপসি জঙ্গল আর উল্লেখ্যীয় লতা ঘাস। ওঁরা ঘরে ঘুরছেন, টুক করে আনি এক কাকে বাইরে বেরিয়েছি। গলিপথ এদিকে সেদিকে। পাখি ডাকছে, নদীর

হাওয়া বয়ে যাচ্ছে ঘাসের উপর ঢেঁট তুলে। ঘড়-ঘড় আওয়াজ তুলে বাক ঘুরে বোড়ার-টানা গাড়ি ইটের কুচি নিয়ে আসছে, পথে ঢালবে। আর এক বাক দেখি, একঝোড়া তরুণ-তরুণী গায়ে গায়ে জড়িয়ে ঘুরছে।

পটাসডানের পথে পথে চার প্রাণী সেদিন হা-অন্ন হা-অন্ন করে ঘুরেছি। হোটেল খুঁজে বেড়াই, কিন্তু কোথায়? কি কারণে জানিনে, কতকগুলো হোটেল আজ বন্ধ। আর কতক স্থপূরের পাট সেয়ে বাসন-কোসন তুলে ফেলেছে। শহরের এপাড়া এপাড়া চাষ বেড়াচ্ছি। ফণে ফণে গাড়ি ঘানিয়ে দৌবার্গ নেমে গিয়ে হোটেলের খবর জিজ্ঞাসা করে। খবর কেনে গাড়ি হাঁকিয়ে দেয় সেইমুখো। ঘণ্টা সেড়ে ক যোরাঘুরির পরে এক হোটেল অবশেষে সময় হলেন। ফরমাস চলেবে না, অর্ডার মতন বানিয়ে দেবার লোক নেই। কাড়ার খুঁজে যা নিলবে, শুধু সেই ক'টি বস্ত্র।

তথ্যস্ব।

['আগ'নী সংখ্যায় সমাপ্য]

॥ ❖ ॥

সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য

মকং শরণং ব্রজঃ

স্বং সর্ব পাপভয়ে

ক্ষয়িষ্যমি মা শুচঃ॥

॥ ❖ ॥



॥ ❖ ॥

সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য

মামেকং শরণং ব্রজঃ

অহং স্বাং সর্ব পাপো

ক্ষয়িষ্যমি মা শুচঃ॥

॥ ❖ ॥

এরূপে এত গৌরব পূর্ব প্রতীকার পাশে

সুলেখা ফাউন্টেনপেন কলি



চেনা

—মৌরীন সেন—



মুখ

দ্বিতীয় মেল

অধুমান মিথো নহ। বেশ বুকগাম সহযাত্রী আমি'কে
উজ্জ্বলপেত্র একজন সরকাণী কণ্ঠস্বরী বলে তুল কবেছেন।

পরিচয় দিতেই একটি অংক তন ভুলোক। একটি
'তবে' বলেই, বাকী কথাতলে সেপনামে মিলে খেলেন
চটপট।

—টিকিট কবায় সময় বেবেছিলাম, কিনালের অংক
সেজেটারি মি: কে. কে. রায়েব সঙ্গে এক কামরায় চলেছি
আমি?

বুকেত পাবি, গুণগোলটা হয়েচে এবানই। সহযাত্রীকে
জানাই,—টিকিট বেবেছিলেন আপনি। সেব মুকুটে তিনি
মাঝে স্থগিত বেবেছেন। তাঁব টিকিট দেহেত দিখে আমার
রিভার্জেশনে হায়েচে।

ভুলোক'ক মাত্রাজী। তবু ইংরাজী উজ্জ্বলপেদেদি সেই
ভজার-গণর-শেরক-সৌকা নেই। চানটুন কম, অর্থাৎ
'বোব' বা 'চাইট' শব্দ 'বোবা' বা 'হাইট' হ'ল না।
সমস্তির একাশতকীটাও হুপাশে মাথা হুলিয়ে নব। আমি
বাজাদী, দেবি চমৎকার কথা বলছেন ভুলোক আমার
সঙ্গে বালায়।

পরিচয় জানাম তাবপর। নাম কে. পি. আয়েকার।
ইন্সটিটিউটাল ফরেস্ট সার্ভিস। সুড এড্রিকালচারাল
অর্গেনাইজেশনের নিয়মে সিগনি কালচারাল স্টাডি টুয়ে
গিবেছিলেন যোবে। এখন দ্বিতী হ'বে কাকের 'তাসিদে
চলেছেন কলকাতায়।

চেইট আউগিট বহুবাটল চেচার। বয়সের তুলনার
মুখখানা কচি কচি। ভেতবে বহু আছে বলে মনে হয়।
সংযত সংযত। শুধু মাথার তুলগুলো তাঁবে নহ। দিখির
বর্জার-সাইন জেহেচুবে তুলগুলি মাথার গণর নাসা-ভাল
করছে। বেগতে একই বেঘাড়া, কিন্তু লম্বটা মিলিয়ে
বেঘানান নহ।

আমার কিন্তু ভালোই লাগছিল ভুলোককে। অনেক
জত কথা বলেন। টোটে লেগে-বা'কা দুই তাসিটি অন্তরের
সম্পদের পরিচায়ক নকীর। ইলক গুচোনো কথা, আর সেই
সঙ্গে হামেশাই 'আরে বাবা'র ব্যবহার মল লাগছিল না।

আমার পরিচয় শুনে কেমন যেন একটু সমে গেলেন মনে
হল ভুলোক। অপর্যবে প্রথম বর্ষ অজায়েই বেবিখে এস
টোটে থেকে—'অ'। পাশে-রাখা সাইক্লোপ্টাইল-করা একটি
পত্রিকা তুলে নিয়ে অ ইংকে কোনো এক অত্যাশংকী
সংবাদেব মধ্যে যেন হুবে গেলেন তাবপর।

এতে আমি অভায়। প্রথম প্রথম বিস্তৃত বোধ করেছি।
নিজেকে ভয়ানক চোট মনে হয়েচে। অস্বস্তিতে ভবে
উঠেচে মন।

দব থেকে আমাকে আসতে দেখে বলতে তমনি—
এই বে, ব্যাটা অ'খার আপচে। বে ভুলোকের বেঁকে
গেছি, আলোনিভিবে বিখে পোতলার জানালা থেকে তিনিই
জানিয়েছেন—পরিমলবাবু আনুল থেকে যেয়েননি।
'তাবপর দিনের বেলায় গেছি, মুচিক হেসে শিশুসহ
জানিয়েচে—বাবা বাড়ী নেইকো। বুকেচি, পরিমলবাবু
বাড়ীতেই আছেন, তবু হাদতে হয়েছে আমাকে।
পরিমলবাবুর ছেলেবেলা বলেছি—মিরকে কি বলবে
বলোতো?

—তুমি তো বালাখানার মৌলবী-সাহেব।— কথাটি
বলেই চুটে ভিতরে চলে গেছে বালকটি। বাবারই চেলে,
তবে লজলে শিশু। বুকগাম, ডামাক বাবর পরিমলবাবুর
কাছে কিছু অর্থ পাওনা আছে বালাখানার কোন-এক
মৌলবী-সাহেবের।

শু পরিমলবাবুই নহ। এরকম বহু বাবুর সংস্পর্কে
বহু ঘটনার ঘটকালি ক'রে হাড় কাপি হয়েছে আমার।
কিছু মনে আছে, কিছু গেছি তুলে।

চুরি না ক'রে, চুরির দায়ে থরা গড়া অভ্যাস হয়ে গেছে আমার। তাই আরেকবার-সাতবেশের স্ববর্ণের দাড়া আমাকে কিছুমাত্র বিচলিত করে না। কানে কুলো, গিঠে কুলো আমার। আমার লক্ষ্য কিসের ? পরিচয় দিতে গিয়ে, 'করেন কি' প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নকর্তার চোখের ওপর চোখ রেখেই আঁক আঁতে বসি—ইনসিওরেল।—অত্যন্ত সন্ত্রস্তভাবে ট্রটে প্রবেশনাও হাসি টেনে।

কাগজ থেকে চোখ তুলে মি: আরেকবার কিছু অল্প এসব পাড়েন। বলেন—দিল্লীতে আলোড়ন পড়ে গেছে... বার্ষিক ট্রটো এসেছেন রাজধানীতে...জি, আই. পি. আর জি. আই. পি.—এঁদের ক্ষত রেনে প্যাসেজ পাওয়া মুশকিল।...নেহরুর ঘরেন-পলিসিটে একটা হাঙ্গল পরিবর্তন আগবে।

বেশ বৃষ্টি, আমার পরিচয়ের মি: আরেকবার কিছুটা বিরত হয়েছেন।

ট্রেন একটা স্টেশনে এসে থামল। অনেক রাত। বাইরে কনকনে ঝাঁপ। বাতাসের দাঁত বেঁধেছে বেন।

কল টেনে দুমোতে চোটে করছেন মি: আরেকবার।
সিগারেট পুড়ে গেল হ'আন্তুস,—যু আবার আসেনা ট্রেনে। অস্বস্তি অবসর। কলকাটা বহু দূরে। তাইছিলাম বিচ্ছিন্ন হুকমো-হুকমো, এলোবেলো, পুরোনো কথা।

আমার বেশ পূর্ববন্ধ—গাবরা। সৈন্য, বৈশ্যের আর যৌবনের সে নিত্যবন্ধ জীবনকানিনি আর যে-কোনো দশজনের মতো। স্বাক্ষরে গল্প বসি বা হু, কিন্তু কিছুমাত্র নাটক নেই ত্যাগে।

আমার বাবা। বাবার কোনো কর্তব্য ছিল না সংসারে। কর্তব্য-অকর্তব্য সবই তিনি শিতার শিতার চরণে সমর্পণ করে বসেছিলেন। 'কইববার চাইছিলাম লবট কিছ কটরল্যাম না'—এই বৈধিচ্ছিন্ন বীতরাগ এনেছিল তাঁর জীবনে। তবে সংসারে তাঁর আর কিছু না থাকলেও ছিল অভাব। বাবা অর্থোদার বোগ উপলক্ষে সকাহানে এসেছিলেন কলকাতায়। তা ছাড়া জীবনেও তিনি বেশের বাইরে থাননি। নিঃস্বপ্ন বংশ সবচেয়ে উচ্চ ধারণা ছিল বড়টা, ঐক্য ততটাই ছিল ছুত আর পুণিসে ভয়।

স্বাক্ষর ছেলে স্বাক্ষর বায় ছায়েথারে। বাবা ছিলেন নিরাপত্তা ধরনের একদমুতের বাহুব। তাই যাকে হতে হয়েছিল কিছুটা বাধ্যবাধী। সংসার শাসন করতে দক্ষ হতে হয়েছিল তাঁকে। অসাধারণ ব্যক্তি ছিল তাঁর

চেহারা, কথাবার্তাও। এরকমটি সচরাচর চোখে পড়ে না। গাবর যৌকুম নবর ছিল, স্টেটু বা তাঁর নিজের থেকে অতেনে দার দিতে পারতেন তাঁকে। আমার সামান্য সাক্ষাৎকৃতও প্রধানতঃ তাঁরই ব্যক্তিরে।

বেশের স্থল থেকে পাস করে কলকাতার কলেজে পড়তে আসার অধ্যায়টি আমার শরৎ বনে আছে। মাঘের শাড়ীর পাড় দিয়ে নতরকিতে জড়ানো সেই বিদ্বান। আর লাল-গোলাপ-ফুল-মার্কা সবুজ টিনের ব্রটকেস দিয়ে শিয়ালদহ আশা, আমি জীবনেও ভুলবো না। তারপর শিয়ালদহ থেকে ভবানীপুরে তিন-নবর বাসে চড়ে, শেওড়ালের গছে বসি করতে-করতে হানী বস্তরী সেন।

শ্রীকৃত কোদায়নাং লাহিড়ী, এম-এ, বি-এল,—পাথরের ওপর নাম খোদাই করা সোতলা বাড়ীর সামনে এসে অতঃকাক্য বলসেন,—এই বাড়ীতেই তোমাকে থাকতে হবে।

থেকে গোলাম লাহিড়ী-মশায়ের বাড়ীতে। সিঁড়ির ওলায় কালসু স্বাক্ষর ছিল, সেইখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা হল। ইলেকট্রিক লাইটের বেন হুইচ-বোর্ড ছিল একদিকের দেয়ালে। মিটার-বায়ের ওপরে একটি ছোট লাল বড়ার মাথা আঁকা থাকবার শিঁছনে সেদিন কোনো হুইচই খুঁজে পাইনি।

লাহিড়ী-মশায়ের বাড়ীর হুট ছেলেবেলা আমার গড়াতে হ'ত। তা ছাড়া এটা সেটা কুটকব্যবসেও আমাকে তালিল করতে হত কাল-সেছো। হুপুরে কলেজ।

কোনো দিন বাড়ী ছেড়ে কোথাও থাকিনি। ডরানক অবস্থিমা হ'ত প্রথম প্রথম। অতি সামান্য একখানা পোস্তকার্ডের ক্ষত কি পরিমাণ যে কাতর হয়ে পড়তাম তখন।

লাহিড়ী-মশায়ের ব্রী ছিলেন কিছুটা ঝাঁকালো প্রকৃতির ব্রীসোক। তাঁর ডাঙরার সারা সংসারটি কেঁপে কেঁপে উঠত মাঝে মাঝে। হাত-পা বেঁধে জলে কেল না গিলেও, এ বাড়ীতে বিয়ে দিয়ে তাঁর বাবা বে নিতান্তই মাটি-বাওরা কাক করেছেন, সে-কথা গলা খাটিয়ে সর্বসাধারণের কাছে জাহির করতে কিছুমাত্র বিধা করতেন না তিনি। লাহিড়ী-মশায় কোটী সন্তোষ করতেন তনুভূম বাঘের মতো, কিন্তু কখনো অব্যব দিতে তদিনি কোনদিন তাঁর ব্রী মূখোদুবি। তুু বেষতাম, ঘরে আগুন লাগলে বেঘিরে আসতেন হুটে। —গাবরা শ'রে বাতাকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দ্রুত পাচরী করছেন আর জিভ চিবোচ্ছেন। ঝাঁত-চাপা অসুট দম্বা তনে বৃষ্টি, লাহিড়ী-মশায়ও তাঁর বস্তরের মতোই মাটি খেয়েছেন।

সামান্যতঃ, আশ্রিত বলে বেশ খানিকটা হুয়ে বেবেই কথারোটা বলতেন তিনি। আবার কখনো, কখনো আপন হয়ে গেছেন আবার সঙ্গে। কাপড়-আঁখা খোঁপাবাড়ী না দিয়ে, নিজে হাতে গেছে নেওয়ার মধ্যে যে বাবেই নৈতিক বলের পরিচয় আছে, এ কথা তিনি আমাকে প্রাণে শোনান। আর ছাত্রজীবনের তাঁর সেই অস্বস্তি পরিভ্রমের সিকি ভাগও যে আমাকে মতো হাল আমলের ছেলেদের দ্বারা সত্তর নয়, সে কথা তিনি হালপ করে বলতে পারতেন।

তবু আমি লাহিড়ী-মশাইকে আমার অন্তরের নমস্কার জানাই। নমস্কার জানাই এই কথা মনে করে যে, কতদিন এই শ্রম-বিশ্রামে কলকাতার তিনিই আমাকে প্রথম আশ্রয় দিয়েছিলেন কথা করে।

কলকাতার আমার কিছু আত্মীয় ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শিববানও ছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু কোনো আশ্রয়, —সামান্য কোনো ভরসা দিতে চেয়েছেন কেউ, এতকম আমার শ্রমে আসে না। উপরন্তু কলিকতের স্বেচ্ছাবী পড়াশোনা বন্ধ রেখে কলকতজ্ঞার মধ্যে চুকে পড়বার মহানুভব পরামর্শ দিয়ে আমাকে বন্ধ করতে চেয়েছেন অনেক। আজ আমি তাঁদেরও নমস্কার জানাই।

হুজু আমি আগে থেকেই, অনেক বার। নিজেকে কিন্তু সবচেয়ে বেশী হুজু বনে করি, যখন দেখি বিশ্বাসযোগ্য আমি এক—নিভাসই এক। জীবনের সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি, সব সমস্ত ও জটিলতার সামনে আমি এক।

পাস করলাম। জড়ি হলাম বি-এ ক্লাসে। তার পর ডক্টর কতগুলি ঘটনা ঘটে গেল। আমার দিদি বিধবা হলেন। লাহিড়ী-মশায়ের আশ্রয় খোঁজতে হল। বন্ধু রণেনের বাড়ীতে একরকম জোর করেই চুকতে হল আমাকে। ভদ্রিকো হিটলার অন্তর্কিতে শোণ্যও আক্রমণ করে বসল। পরীক্ষার হুমাস আগে বেশ থেকে তার সেলাম—বাবার অবস্থা খারাপ; সফর চলে এগো।

বাবার সঙ্গে আমার কোথা হবনি। গিয়ে সেদি দার বিয়ের বর্ষপের গহনা, এককোড়া বালা বাঁধা দেবার পাতক থেকে বহু আগেই তিনি আমাকে পরিচালন দিয়ে গেছেন।

দলে দলে পরে শুনি, শরীফটা খারাপ লাগতেই মাকে বদল এক দ্বার জল দিতে। তার পর জল দেখে সেই-যে তরে গেলেন, সেই খোঁষাই হয় বাবার অস্তিত্ব নথ্য।

করবরই আশ্রয়দানী লোক,—সম্মান অক্ষর রেশেই চলে যান বাবা।

বাবা চলে গেলেন, কিন্তু আমাকে আবার কিংবা আলতো হল কলকাতাতেই। রণেনের অসুস্থতায় নিত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরীক্ষা দিলাম। ডারে এমনিতেই কাটতে না, যাবেও কাটল না—কেন করলাম।

রণেনের বাসা আমাকে একটি চাকরি জুটিয়ে দিলেন এক বীমা-অফিসে। মাইনে পরিশ্রম টাকা। বেঁচে সেলাম হুদিনে।

বাসের প্রথমে মাইনে হাতে পেয়ে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম রণেনের বাবাকে। প্রণাম দিলেন না উত্তরোত্তর। মনে আছে, বলেছিলেন—নিজেকে প্রণাম করো।

এইখানেই আমার গাঙ্গুলী-সাহেবের সঙ্গে পরিচয়।

শ্রীকৃত ও. কে. গাঙ্গুলী—সত্যি বদামত পুরুষ। গোটা বীমা-কোম্পানীর একবার কর্তাব্য। অক্ষর থেকে মহীকৃষ্ণ, কোম্পানী তাঁর নিজ হাতে গড়া। চাকরি হবার কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন ডাক পড়ল আমার। ডরে তরে দেখা করতে সেলাম। বীমার অফিস-রুম, সেক্রেটারিয়েটে টেবিলের সামনে একা বসে আছেন গাঙ্গুলী-সাহেব।

বসতে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন,—দীনেন-বাহুর কাছে তোমার কথা শুনেছি। (দীনেনবাহু রণেনের বাবা)। চাকরি বন্ধ করো; কিন্তু আমি তোমাকে একটা এজেন্সি নিতে বলব। ভালো একজন অর্গেনাইজারের হাতে দেব তোমাকে—কেহারা আছে—বলতে কইতে পাগো—আমার মনে হয় প্রচুর কাজ তুমি কোম্পানীকে দিতে পারবে। একবার কাজ চুকলেই সেখানে প্রচুর আনন্দ।...আমি বিশ্বাস করি তোমার এতে উন্নতি হবে।

শিবাসে বিশ্বাস আসে। নিলাম এজেন্সি গাঙ্গুলী সাহেবের কথায়।

প্রথমটা পাঁচজনের কাছে বিস্তারিত আর ঠাট্টাই জুটেছে বেশী। পরিচিত লোক হওয়া করেছেন সবচেয়ে। বীর্ণ হুঁসদের মধ্যে সামান্য অক্ষর একটি কাজও জোগাড় করতে পারিনি আমি।

গাঙ্গুলী-সাহেব আমার ডেকে পাঠালেন একদিন। তেমননি উৎসাহ দিয়ে বললেন,—কাজকর্ম দিতে পারছ না? খুব হতাশ হয়ে পড়ছ, কেন? প্রথমে এরকম হয়-ই। দিনে অন্ততঃ হুটী নতুন হুঁসের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করবে, কথা কব-বলবে, আর নিজের স্বীকৃতি একা

করবে...। জানবে, এটাও পুরোপুরি একটা আর্ট। কবি যে সিন্ধিগারিটি নিয়ে কবিতা লেখে, দিল্লী থাকে চবি—তোমাকেও তোমার কৃতিকে সেটভাবে গ্রহণ করতে হবে। ভরসা হারিয়েনো, তোমার হবে।—তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে।

বদি বেলে তো এট বিষয়েই বক্তৃতা দিবে। খিলদ উৎসাহে আবার কর্ণ হুক। ক্রান্ত দেখে সারাদিনের ব্যর্থতা পকেটে নিয়ে রাতে বসন বিছানার বাই, পাকুণী-সাহেবের কথা মনে জানি : ভরসা হারিয়েনো,—তোমার হবে।—তোমার ওপরে আমার বিশ্বাস আছে।

আলবাহ হবে। নইলে আমি ঝাঁড়ব কোথায় ?

ডুবানীপুর থেকে শ্রীমানী-বাক্সার, পায়ে হেঁটে দিনের পর দিন একই লোকের পেছনে ছুটেছি। ধর্মতলার স্রাণালের ফিতে গেছে আলগা হয়ে। ঐতে কাপতে-কাপতে রাতে বাড়ী ফিরেছি।

যুগ নেই চোখে। বেশ থেকে বায়ের সমস্তাণ্ণ পর উড়ির করেছে গ্রাণমন। এলোবেলো চিন্তা। রাতে ভাবায় সব স্বপ্ন। বিছানা-বাগিন ঘামে ভিজে সব একাকার হয়ে গেছে।

আমিও কেমন যেন হুর্দ্ব হয়ে উঠেছি তখন।...একটা কাক হল এক কেরানীসাবুর কাক্কে। সামান্য প্রিয়াম, তাই কমিশনও পাই বৎসায়াক। তবু কি খুশিই যে হই সে-দিন। পরে আবেদ্যাবায়ের শান্তিলাল শেঠিয়ার কাক্কে ছয় অঙ্কের মোতনীর কাক করেও এত আনন্দ পাইনি।

দীর্ঘকাল পার হয়ে গেছে তারপর। তবু আমার নয়, সারা হুনিয়ার কত পরিবর্তন হয়েছে।—যুদ্ধ গেছে, হুতিক গেছে মোটা বেশটার ওপর, বিস্কোভ উঠেছে নতবে শহরে, বেশ খাবান হয়েছে, কিয় সে-পটভূমির কোথায়ও আমি নিজেকে খুঁজে পাই না। যে প্রচণ্ড প্রতিবেশ নিয়ে আল এই দিল্লী-বেল ছুটে চলছে, গ্রিক তেমনি লুকপাতহীন ছুটে চলার আশায়ও বিভাব নেই। সীম-ই-জিন পতি পার কাঁজ কলার দাপটে,—আমি ছুটে চলছি ‘পরদা করো’র হুর্দ্ব প্রেরণায়।

আজ আমার বয়স ষাটতিন। সাদার অ্যাভিস্তার ঘামে রেখে স্টেট-বাল বেগানে ঝাঁক স্নেহ, তার মুখই আমার বাড়ী। ইনসিওরেন্স-কগতের নতুন কবীরা-আজ আমার কাহিনী জনে তাদের কৃতিকে গেলে লাকার ভরসা পায়।

তাতে কিছুটা—সর থাকে—অতিকৃতি, অতিভবীও থাকে কিছুটা। তা থাকে।

আমার আত্মীয়বন্ধন আমার মাদিক রোজগারের যে কাহিনী বলে বেড়াই, সেটা নিতান্তই সুদিশ-কাণিরে বাড়ানো। গ্রিক-গ্রিক কামাই যে কত ছব, তার সঠিক হিসেব নেই আমার। শুধু কোম্পানী ডিক্টাই সেভেনের ইনকার ট্যাগ অফিসার যে দলতে পারবেন না, সে-কথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

মি: আয়েবায়ের সঙ্গে আমার আলাপ কমল পরদিন। সকালের বাটা আলোতে বেগলায় আমার ব্যাপসার দিক দিয়ে তিনি মোটেই মোতনীর পাত নয়। তবু কইকে আমি কম প্রোজেনীয় বলে মনে করি না। কি হুত্রে তার কথাই কেন ভাগ্যের হুদিশ মেলে কে জানে ? —হুর্দ্ব টাঙ্গার অবতো-বেথতো পাতুয়ে পব বেয়ে এনেও এয়ার-কতিশাও সেদু-কামরার হুদিশ মেলা বিচিত্র কি ?

মি: আয়েবায়ের বেগলায় একজন হুঁলে অফিসার। ধরাধা ছক-কাটা জীবন। লাল ফিতের গোগের বড় বেশী শক্ত করে রাখা। তিন শো পটিলে কর্ম হুক, সাতাশ শো পকাশে শেষ। শকার বছর বয়সে চাকুরি-জীবনের অনিবার্য পরিসমাপ্তি। দুকলীর কোর থাকলে, ইন সি ইকায়েন্ট অফ নাবলিক সার্ভিস, সেভাধুন বা দিল্লীতে অবশেষে বজ্জকে পুনর্বহাল হতে পারবেন। নচেৎ সাকী-বিহের মাদিক পাঁচ শো টাকা পেন্সন নিয়েই ফিরে যাবেন দেশে। তার পর হাতি-খেদা বা বজ্জ-সংরক্ষণের ওপর সঠিক কাহিনী শিখবেন হয়তো স্টেটল্যাবনে। পুরোনো চাল ভাতে বেড়ে ঝাড়ি কাপাবেন আরও কোথাও কোথাও।

মাহুয়ের বনের হুর্দ্ব কোভ, সোভ আর আকশোবে গ্রিকমতন হুর্দ্বহুতি দিতে পারলে মোকটিকে আবার কেশিরে তোলা যায়। অ্যাপার কাজই তো পরম্পাশর সংগ্রহ করা, তো সে কেশিরে না কেন ? তবে অপারেশন-টেবিলে যে নিপুণতার সঙ্গে সার্জন রোগীর দেহে অগ্রোণচার করেন, এতে অনেকটা সেই নিপুণতার প্রকাশ করে। সামান্য বেতাল হলে ওদিকে রোগী দাবা যায়,—এদিকে আমার কৌতুহল একচুল বেহুতো হলে ম্যান:সে টার্ন পড়ে। অপারেশন-টেবিলে বদি সার্জনের লাসে ছ’মিনিট থেকে ছ’ঘণ্টা, আমার লাসে চার গজ থেকে চারশো মাইল। ঘণ্টার কাটা ঘড়ির ডায়ালটিকে প্রায় র্গয়কর ডিক্রী আবর্তন করে এল।

মি: আরেকবারের কোড নিভাতই নৃত্য। অভিমানটি মোটেই বোটা ধাগের নয়। কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই তাঁর। তবু ন্যায়ের ভাবে খানিকটা বেন বলতে চান, বেশের টেকনিশিয়ান বা 'নো হাউ' লোকগুলো বেন দামার বাড়ীতে সব বিধবা বোন। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারদের দাপটে কোনো আত্মগার কোনো কিছুই করবার নেই। বিভাজিত 'অ্যাকরেস্টেশন স্ট্রিম' কেন যে আই.পি.এস. সেক্রেটারির অহমোপনের অপেক্ষা রাখবে, তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না। হুই আর হুই যোগ করলে পাঁচ শুধু বললেই হবে না, যোগ-ফলটার নির্ভুল বস্তুত্ব আবার চেঁচিয়ে জানান দিতে হবে সর্বত্র।

অতিশয় সত্য কথা। এ প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করবার সুযোগ হয়নি, কিন্তু অভিযোগ গুনছি প্রচুর। এ বেন জানো রেডিওলজিক্সকে দিয়ে রেডিও ঘোষাঘত করানো। তেগুটি কমিশনার বদলি হয়ে আত্মন চীফ কমিশনার হয়ে, এমন কি তিনি পুনর্বাণন-বস্ত্রের নির্দেশিত হলেও কতি নেই। কিন্তু এবল বেগে ৬ এও দাপটে তেগুটি আর এ.পি. ভাড়া না করে এসে আরেকবার-সাহেবকে শাল-গ্র্যাফেশনের জারগার 'ক্যাসিয়া সাইমা' রোগের প্রশস্তি ভেবে দেখতে বলে ফাটলে নোট বিলে বধেই উদ্যোগের কারণ আছে বৈকি ?

এ সমস্ত আত্ম গুণ এ দেশের নয়,—সর্বত্র আজ এট একই সমস্ত। এ শুধু আরেকবার-সাহেবের হুং নয়, ভারতের সমস্ত সরকারী টেকনিক্যাল অফিসারদের মনের কথা।

ভয়ানক ক্ষত কথা বলেন মি: আরেকবার। পরে আন্যেও বেশি আর এড়াতেই চাইছেন না। বটে বা খাতাপত্রের মধ্যে টুকে পড়বার কোনো চেষ্টাই করেন না তিনি।

অনেক কথা হয়েছিল পরে। কথাএসময়ে বললেন, তাঁর ছেলে সিংহল থেকে বজ্রবজ্র বদলি হয়েছে। বিশেষে একটি পেট্রোল কোম্পানীতে কাজ করে সে। দিফ্-ট-হুইটনার ত্রী অনেকদিন আগেই মারা গেছেন।

আমি আমার ব্যবসার কথাটি বাঁচিয়ে সব কথাতেই যোগ বিচ্ছিন্ন। তবু এইটুকু বন হচ্ছিল, দিল্লী থেকে, কলকাতা—বীর্ঘ এই ক্রান্তিকর পথযাত্রা কি একেবারেই বুঝা

যাবে ? আরেকবার-সাহেব হঠাৎ একেবারে জানান না দিয়ে শোকা প্রকাশ করলেন,—আজ্ঞা, মি: সেন, শতাব্দেব টাক। মাসিক শ্রমিভাবে কতটা রিস্ক, কতটা করা যাবে ? —এই এখন, টাকাতা কততে দিয়ে ঠাড়া ?

আসে আগে এইরকম অবস্থার চোখমুগের ভাবই আমার হয়ে উঠত অক্লান্ত। ব্যাগের জীপ-কাবারে চান পড়ত সম্মে সম্মে। মুহুর্তে খুলে ব'সতাম নামতারা বই : প্রশ্ন করতাম—হোস-লাইফ না এগাওমেট ? বয়স কত ? বিশ্ববন্ধের এগাওমেট কতন স্তর,—লোকের এইটাই বৈশিষ্ট্য করে। রিস্ক, কতটা করতে চান তো উইদাউট-এন্টিট-ই করতে বলব আপনাকে। আজ আমি একটু ভিন্ন পথে ইটি। এক গাল হেসে বলি, অবাক করলেন স্তর। এ পরেণে আবার ইলিওর করবেন কি ?

উচ্চকণ্ঠে হেসে ভরেন আরেকবার-সাহেব। ইচ্ছাকৃত আবার হাসির পর্যাটিক আমি আর-এক ধাপ ওপরে তুলে দিই। আরেকবার-সাহেব বলেন,—ছেলের জন্ম বলছিলাম। প্রশ্নের জন্য বিই মাত্র, কিন্তু তাতে কিছুমাত্র আগ্রহ দেখাই না।

তার পর কত কথা হয়েছে। কিন্তু ইলিওরের কথা ছুটিনি। শেষের দিকে কথাবার্তা তাঁর বিশেষ-শ্রবণেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রচুর প্রশংসা করছিলেন ওদেশের। তবে তাতে রাজনৈতিক গুণ্ডিতকারী কথা ছিল না। দে-বেশের লোকের কথাও খুব বেশী হয়নি। ছিল শুধু বনের কথা।

বন দেশের অশ্রু সঙ্গম সন্দেহ নেই ; কিন্তু আরেকবার-সাহেবের কথার মনে হচ্ছিল দে-বেশে বন ছাড়া আর কিছু নেই।

•

হাঙড়া স্টেশনে আরেকবার-সাহেবের গাড়ী অপেক্ষায় ছিল। ওর দৌড় রাগবিহারী আভিহ্যার কমল-ভিলায় নয়, গ্রেট-ইস্টার্ন হোটালে। আমার ডাট তেজুও গাড়ী নিয়ে এসেছিল স্টেশনে। গাড়ীতে ভরঁবার সময় মি: আরেকবার বললেন,—আসছেন কিন্তু আমার ওখানে।

মনে ভাবি, সেবা করব কোথায় ? বজ্রবজ্র, না গ্রেট-ইস্টার্ন ? পরে ভাবব সং-কথা।

—পকেট শূন্য। দিগারেট কুড়িয়ে সেজে অনেককণ। কুলা দিয়ের করে গাড়ীতে উঠি আমি। তেজুকে বলি, দেখি-তোমার একটি চক্রবিনার।

ছিট-চ্যাটা

• * * চারুচন্দ্র ওট্টাচার্য * * •

সরল জীবনযাত্রা ও উচ্চচিন্তা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বয়স যখন সত্তর বছর পূর্ণ হল তখন তাঁর দেশবাসী এক বিরাট সভায় তাঁকে অভিনন্দিত করেন। এই উপলক্ষে তাঁকে একখানি স্মারকগ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়। বহু মনীষী তাঁদের লেখা দেন।

মহাত্মা গান্ধী তখন যারবেলা জেলে। সেখান থেকে তিনি লেখেন।—

Acharya Ray I had the privilege of knowing for the first time when Gokhale was his next-door neighbour in 1901 and I was undergoing tutelage under the latter. It was difficult to believe that the man in simple Indian dress and wearing simpler manners could possibly be the great scientist and professor he even then was. And it took my breath away when I heard that out of his princely salary he kept only a few rupees for himself and the rest he devoted to public uses and particularly for helping poor students....

Y. C. P.

24. 5. 32

M. K. Gandhi

১৯০১ সালে আচার্যদেবকে প্রথম দেখলুম। প্রেসিডেন্সি কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছি। কটিনে দেখলুম প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমাদের ক্লাসে বসবেন। প্রথম দিনের ক্লাস। ছুটতে ছুটতে গিয়ে গ্যালারিতে এসে বসলুম। ছিটের ঘণ্টা পড়ল; বেয়ারা এসে বেক্সেটের দিয়ে গেল। দেবি, বেয়ারার গায়ে চৌখুপি ছিটের হুতির একটা কোট। একবার প্রবেশ করলেন আচার্যদেব। দেখি, তাঁর

গায়ে অবিকল সেই ধরনের এক কোট। এটা কেমন করে হল তিক বুঝলাম না।

বিকলে প্রায়কটিকাল ক্লাসে ডিনসট্রের স্থপীযাবৃত্তে কথাটা জিজ্ঞেস করলুম। তিনি বললেন,—একটা ঘান কিনে চারটে কোট করান, দুটো বেয়ারাটাকে দিয়েছেন, দুটো নিজেকে পরেন।

ওই সময় আর একটা ঘটনার কথা শুনে-ছিলাম।

বোম্বাইএর এক বিশিষ্ট ধনী প্রথম কলকাতায় আসেন। কলকাতায় উঠেই বহু স্থান দেখবার পর তাঁর ইচ্ছা হল একবার সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দর্শনলাভ করেন। তিনি খবর নিয়ে জানলেন যে, ৯১ নম্বর আপার সার্কুলার রোডে যে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস' আছে, তারই সোতলার ঘরে অধ্যাপক থাকেন। তিনি চলে এলেন, এসে বেঙ্গল কেমিক্যালের দরওয়ানের হাতে তাঁর নামের কার্ড দিলেন। দরওয়ান বলল,—কার্ড দরকার হবে না, আপনি ওই সিঁড়ি দিয়ে মোজা সোতলার ঘরে যান, তিনি সেই ঘরেই আছেন।

তত্কালেক গেলেন, কিন্তু তখনই ফিরে এসে দরওয়ানকে বললেন,—ও ঘরে একজন দপ্তরী বই জুড়ছে দেখলুম, আর তো কেউ নেই।

আচার্যদেবের পরনে ছিল একখানা লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি—একখানা বই-এর পাতা ছিঁড়ে গেছিল, তিনি তখন তাই জুড়ছিলেন।

এই গ্রন্থে আচার্য ভগদীশচন্দ্র বসু লিখছেন ।—

The association of plain living and high thinking is always very rare ; in addition to these there is in Sir P. C. Ray the element of vigorous action which knows no rest. The combination of such qualities in a single individual is indeed rare in any country, and there can be no higher example for the young generation to emulate than the life of this great teacher.

গুপ্ত বিজ্ঞান নয়, সাহিত্যও চিরদিন আচার্য প্রকৃষ্ণচন্দ্র রায়ের high thinking-এর সাক্ষ্য বহন করবে। তাঁর plain living সম্বন্ধে আর কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করি ।—

চৈত্র্য মাস, সকাল থেকে গুমট করে রয়েছে : সতীশ মিত্র এল ; এসে বলল,—আমি আচার্য প্রকৃষ্ণচন্দ্র রায়কে কোনোদিন কাছে থেকে দেখিনি, তাঁর কাছে নিয়ে চলুন।

বেরলুম হুঁজনে। তখন তিনি থাকেন সায়ের্স কলেজের দেওলার দক্ষিণ দিকের এক ঘরে। তিনি ঘরেই ছিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। ঘর থেকে বেরলুম।

বাইরে এসে সতীশ বলল,—ওঁর ঘরে পাখা নেই দেখলুম। আমি আজ হুপুয়ে ওঁর ঘরে একখানা পাখা টাঙিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

—দাঁড়াও, ওঁর অমুমতিটা নিই।

আবার হুঁজনে ঘরে ঢুকলুম। সতীশের প্রস্তাবটা বললুম। গুম ক'রে আমার পিঠের

উপর একটা কিল পড়ল। দরজাটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন,—এটা কোন্ দিক ?

—কেন, দক্ষিণ দিক।

—তবে ?

এই 'তবে' কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে হুপ করে রইলুম। বললেন,

—প্রচুর হাঁওয়া আসে ঘরে, পাখার কোনো দরকার নেই।

হতবাক হয়ে যে যার বাড়ি ফিরলুম।

আমাদের দেশের বাড়িতে একদিন ছিলেন। ফেরবার সময় জলখাবার দেওয়া হয়েছে। একখানা চন্দ্রপুলির একটুখানি ভেঙে নিয়ে মুখে দিয়ে বললেন,—এগুলো সব বেঁধে দাও, নিয়ে যাবো ; সকালে ছেলেগুলো আসে, খুব আমোদ ক'রে খাবে।

সকালে তাঁর নিজের আহাৰ্য থাকত সাধারণত মিরাপ-মাখা মুড়ি। একদিন হুপুয়েলয়া গিয়ে দেখি, কুকারে তাঁর জন্তে রান্না হচ্ছে—ভাত, ময়ূরডাল ও আলুসিদ্ধ।

এই খাওয়া ; আর পরার কথা আগে বলেছি। এই খাওয়া-পরার জন্তে কয়েকটা টাকাই যথেষ্ট। আর বাকি, মহাস্বামী বা বলেছেন,—*devoted to public uses and particularly for helping poor students*।

১৮৬১ সাল জাতির ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ওই বছর পঁচিশে বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ, আর সতরই শ্রাবণ প্রকৃষ্ণচন্দ্র।

বিশ্ববাস্তব

ঐক্যবন্ধু মিত্র

সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকার পারমাণবিক অস্ত্র-সম্বন্ধ এবং আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবনের কালে পৃথিবী আর বাস্তবের ভূপে পরিণত হয়ে আছে। কোনপ্রকারে অস্ত্রবিষয়গে হল এমন বিস্তারিত ঘটবে, যার ফলে হয়তো গোটা মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতিরই অবসান ঘটবে। এইরূপ ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখে উভয় রাষ্ট্রের নেতৃত্বকে অচেতন মনে করারও কোনো কারণ নেই। স্বস্তর তাঁদের বক্তৃতাগুলি পড়ে মনে হয় যে তাঁরা এ-সম্মুখে পুরোপুরি সচেতন এবং সেইজন্যে পারমাণবিক যোদ্ধাগুলার পথে বিশ্বদুঃখ নিবারণ ও শান্তিহরণের কথাও তাঁরা বলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রই চার দিকের শর্তে শান্তি স্থাপন করতে। ফলে আশংকা আর হয় না। এই অবস্থায় মহাবিশ্ববাসী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ব্যাঙা বৎসর যেতে না যেতেই আবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইতিপূর্বে কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও হুয়েন্সাল নিয়ে এইসব বিশ্বদুঃখ ব্যথার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। হুয়ের বিষয়, সে সব বিরোধের বাহ্যে একটা সন্ধান হলে সেহে।

অতি সম্ভ্রান্তি বিশ্বদুঃখের নবমত আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল আরব জগতে গত ১৫ই জুলাই স্বাধীনরাষ্ট্র সেবানমে ৪,০০০ মার্কিন নৌসৈন্যের অবতরণ নিয়ে। এমনও বিশ্বদুঃখের আশঙ্কা পুরোপুরি কেটে গেছে বলা চলে না—তবে যাকিন সৌসেনার অবতরণে সোভিয়েট রাশিয়া প্রথমে যেভাবে ক্ষেপে উঠেছিল তাতে মনে হয়েছিল যে-কোনো মুহূর্তে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। কয়েকদিনে ঘটনার গতি অন্তরকম মোড় নেওয়ার এবং সোভিয়েট রাশিয়া কিছুটা দীর্ঘ নীতি অবলম্বন করার মনে হয় যে আশংক্যের পথেই হয়তো এ সম্মুখও কাটিয়ে গুঁটা যাবে। সেবানমে আমেরিকার নৌসেনা অবতরণের পিছনে একটা বিরাট পটভূমিকা আছে। সে পটভূমিকা না জানা থাকলে সেবানমে ও ইরাকের আক্রমণ ঘটনাগুলি ঘটছে এবং যা নিয়ে সারা দুনিয়া তোলপাড় হচ্ছে তার পুরো অর্থোবহন হবেনা।

আফ্রিকার উত্তরায়নবর্তী আলজেরিয়া, মরক্কো, টিউনিশিয়া, মিসর, ইরান প্রভৃতি দেশ এবং তাদের সন্মিল আরব জগতের ইরাক, সেবানমে, সিরিয়া, সৌদি আরব,

জর্ডান প্রভৃতি রাজ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে স্ট্রুটন, ক্রাল প্রভৃতি শাস্তাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দীর্ঘাক্ষরে পরিণত হয়েছিল। বিশেষ করে আরব জগতের তেল না হলে শাস্তাত্য শক্তিগুলির অচল অবস্থা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে উল্লিখিত সাম্রাজ্যগুলির প্রায় সর্বত্রই তীব্র জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছে এবং তারা স্বাধীন হবার চেষ্টা করেছে। ঘটনাক্রমে পড়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে এইসব রাজ্যের প্রায় অধিকাংশকেই স্বাধীনতা দিতে হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা দিতে ব্যর্থ হলেও, তারা চেয়েছে রাজ্যগুলিকে নিজেদের প্রভাব-বৃত্তের মধ্যে রাখতে। তা না পারলে বাণিজ্যিক বাণ্যের হানি হবে এবং বিশেষ করে তৈলসম্পদ থাকে হাতছাড়া হয়ে। এই বাণ্যিকার প্রতিরোধে বহু প্রকারে আগে স্বাধীন মিসর যখন জারসম্মতভাবে তার নিজের রাজ্যের অন্তর্গত হুয়েন্সাল জাতীয়করণের প্রচেষ্টা পেয়েছিল তখন একযোগে ইরাক-জর্ডান শক্তির কাঁপিয়ে পড়েছিল মিসরের উপর। একদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক ভীতিপ্রদর্শন ও অন্যদিকে তাদের বড় অংশীদার যাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্রিয়তার ফলে তারা অশক্ত পেরক্ষা করতে পারেনি। হুয়েন্সালে বিজয়ের ফলে মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসের আরব জগতে একা ও মুক্তির প্রতীক হয়ে ঠাঁড়িয়েছেন এবং তাঁর মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। নাসেরের নেতৃত্বের সময় আরব জগৎ যদি ঐক্যবদ্ধ ও পশ্চিম-বিরোধী হয়ে ওঠে তাহলে সম্ভব বিশ্ব শেখা দেখে এবং সোভিয়েট রাশিয়া সেবানমে যাঁটা গাড়ার হুযোগ পাবে—এ সম্মুখ যাকিন যুক্তরাষ্ট্র উপলব্ধি করতে পেরেছে, এবং পেয়েছে বলেই প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার আরব জগতের স্বাধীন সাম্রাজ্যগুলিকে সাহায্যদানের ‘আইক নীতি’ প্রবর্তন করেছেন। এই নীতি অল্পমাত্রে তারা যাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থসাহায্য তো পাবেই—পরশাক্ষ-কর্তৃক আক্রমণ হলে যাকিন সামরিক সাহায্যও তাদের দেওয়া হবে। এই যাকিন নীতির ফলে আরব জগৎ হয়ে পড়েছে বিভা-বিভক্ত। আরব জগতের সিরিয়া ও ইয়েমেন যেমন নাসের-সদর্শক, তেমনিই আবার আমেরিকার হাতে গড়া ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল, আরব-সাম্রাজ্য ইরাক ও জর্ডান এবং সেবানমে শাস্তাত্য শক্তিবর্গ তথা আমেরিকার সদর্শক।

ইরাক ভ্রম্যে মার্কিন পুঁজিশাসকৃত্যে গঠিত বাণেশা-চুক্তি সংস্থার অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে যখন প্রেসিডেন্ট ন্যাসনের নেতৃত্বে সিরিয়া ও মিসরের সংযুক্ত রিপাবলিক গঠিত হয়, তার পরে পরেই ইরাকের রাজা ফীসাহ ফয়সল ও কর্তাদের রাজ্য হলেন (বাকিগত জীবনে এরা দুজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়) নিজদেশের রাজ্য হ্রাট একত্রিত করে 'আরব ফেডারেশন' গঠন করেন। এ বাবদ্যে যে উভয় রাজ্যের আরব প্রজাসাধারণের মনঃপূত হয়নি, পরবর্তী ঘটনাবলী তাইই ইঙ্গিত বহন করে।

লেবাননে বিস্ত্রোহ

পূর্ব-ভূমধ্যসাগরতীরবর্তী স্বাধীন প্রজাতন্ত্র লেবাননের আয়তন ১০,৬০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১৪ লক্ষের সামান্য বেশি। লোকসংখ্যার অর্ধেক ইহুদীন ও অর্ধেক মুসলমান ও ক্রমঃ হরির রাজ্য বলে এখানে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ লেগেই আছে। জীবিকার অভাবে এ পর্যন্ত আর ১০ লক্ষ লেবাননবাসী আমেরিকা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে দ্বারী বসবাসের অন্তে চলে গেছে। রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক নিয়মাবলীসারে প্রেসিডেন্ট কাবিল সারুঁ ইরান, প্রধানমন্ত্রী মুসলমান। বলা বাহুল্য, লেবানন আমেরিকা তথা পাকিস্তানের গুরুপুত্রাভিষ্ট। পার্লামেন্টের সদস্য-সংখ্যা ৬৪ জন। প্রেসিডেন্ট সারুঁকে অঙ্গসারণের ক্ষমতা গত মে মাস থেকে বিস্ত্রোহী দল বিস্ত্রোহ ঘোষণা করেছেন। পৃথুহুছে এ পর্যন্ত প্রাণ হুই ইরাকের নরনারী নিহত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট সারুঁ বিস্ত্রোহ-দমনে অঙ্গসারণ হয়ে স্বাভাবিকভাবেই সমিতিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের সাহায্য চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানও সরেক্ষমিমে অবস্থা তদন্ত করে পৃথুহুহুকের বরুণ সযছে রিপোর্ট ধোবার অন্তে একটি পর্ববেক্ষক প্রতিনিধির দল পাঠিয়েছিলেন। সেই প্রতিনিধি-বলের অন্ততম ছিলেন জারজীর সদস্য জিরাফের বয়াল। লেবানন পর্ববেক্ষকের অভিযোগ ছিল যে, এটা নিছক পৃথুহুহু নহ—এর পিছনে প্রেসিডেন্ট ন্যাসনের মিসর-সিরিয়া ইটনিয়নের উদ্ভাবনী আছেই, লেবানন-সাগর সিরিয়া থেকে বৈষ্ণবেশক ও সৈন্তস্বা এসেও বিস্ত্রোহীদের সাহায্য করেছে। হুতরায় লেবাননে শান্তিরক্ষার ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানকে পুদিনী সাহায্য প্রদানের আবধন জানানো হয়েছিল। কিন্তু পর্ববেক্ষক দল সরেক্ষমিমে তদন্ত করে ফুলাই মায়ের প্রথমে রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি-জেনারেল জ্বাঘারীকের কাছে যে রিপোর্ট দেন তাতে দেখা যায় যে—তাঁরা এটিকে নিছক

পৃথুহুহু বলেই মনে করেন, এবং একটি স্বাধীন-রাজ্যের আত্মস্বরূপ বাণ্যারে বাহিরের হস্তক্ষেপ অভিপ্রায় বলে মনে করেন না। লেবাননের বিস্ত্রোহীদিগ সিরিয়া বা অন্ত কোনো পররাষ্ট্র থেকে কোনপ্রকার সাহায্য পাচ্ছে, এ ভয়ও তাঁরা স্বীকার করেন। রিপোর্ট একদিকে যেমন রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের বিচারাধীন ছিল, অপরদিকে তেমনিই বিস্ত্রোহের প্রকাশও কমে আসছিল। বিস্ত্রোহী দল ও সরকারপক্ষের মধ্যে এইরকম একটা রহা হয়েছিল বলে প্রকাশ যে, আসন্ন প্রেসিডেন্ট-নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট সারুঁ আর নির্বাচনপ্রার্থী হবেন না। এই বীমালোর মধ্যে ও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের পর্ববেক্ষকদলের প্রতিদ্বন্দ্বি রিপোর্ট সযেও গত ১৪ই জুলাই প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ঘোষণা করে বসলেন যে, প্রেসিডেন্ট সারুঁর কাছে থেকে ক্ষমতা অহুগোষ পেয়ে লেবাননের স্বাধীনতা ও সাংহতি রক্ষার ক্ষমতা এবং লেবানন-স্থিত মার্কিন অধিবাসীদের ধনপ্রাণ রক্ষার ক্ষমতা ৫,০০০ মার্কিন নৌসেনাকে লেবাননে পাঠানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তিনি ঘোষণা করলেন যে, সৈন্তবলকে হুছ কথতে পাঠানো হয়নি এবং রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের বাহিনী লেবাননে পাঠানো হলেই আমেরিকা তার সৈন্তবল সরিয়ে নেবে। অহুগপভাবে মার্কিন হুছরাষ্ট্রকে অহুসরণ করে বুটেনও কর্তাদের রাজ্য হসনের অহুগোষে জর্জানে সৈন্ত প্রেরণ করেছে। আমেরিকা ও বুটেনের এই আকক্ষিক হুছহুলভ সৈন্ত-সঙ্ঘোনের হেতু কি? তার হেতু বুঝতে গেলে আরব-রাজ্যের অন্ত একটি, অতৃতপূর্ব না হলেও, অতি আকক্ষিক ঘটনার উন্মেষ করতে হয়। সেটি হল, সৈন্তপ্রেরণের মাত্র একদিন পূর্বে আমেরিকা ও বুটেনের মিতরাষ্ট্র তথা বাগদাদ-পূর্বের অন্ততম শুভ ইরাক সরকারের পতন। ইরাকে সামগ্রিক অত্যাধানেই আমেরিকাকে এভাবে লেবাননে ক্ষমত সৈন্তপ্রেরণে প্রোবোচিত করেছে—সে বিধরে দংশন নেই।

ইরাকে সামরিক অত্যাধান

১৪ই জুলাই বাগদাদে যে নাটকীয় ঘটনা ঘটে, তার পূর্ব বিবরণ আশঙ্কও প্রকাশিত হয়নি। সেখনি বাগদাদ থেকে অকক্ষাৎ ঘোষণা করা হয় যে, বিস্ত্রোহী সামরিক অধিনায়কের হাতে ইরাকের ২৩ বৎসর বয়স রাজা ফীসাহ ফয়সল, মুব্বাক আবদুল ইলা এবং ইরাকের নৌসেনাপতি হিসেবে পরিচিত ১০ বৎসর বয়স প্রধানমন্ত্রী হুরি এস সৈয়দ নিহত হয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইরাকে রাজতন্ত্রের

অবদান ঘটবে প্রকৃতই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নতুন প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন ব্রিগেডিয়ার আবদুল করিম কাসিম। তিনজন সমস্ত সম্বন্ধিত যে 'রাষ্ট্রপতি পরিষদ' গঠন করা হয়েছে তার প্রেসিডেন্ট হয়েছেন জেনারেল নজিব এল হাবিবা, এবং আর দুজন সমস্ত হলেন সৈয়দ মহম্মদ বাবুদি আল খুলা এবং সৈয়দ মোশা আল নকসাবাদী। নিহত প্রধানমন্ত্রী হুসি সৈয়দ যে ইতিহাসগত বা রাষ্ট্রপতি-পাঠি ভেঙে দিয়েছিলেন, বুঝা ছিলেন তার সভাপতি। বলা বাহুল্য, ইরাকের এই আকস্মিক সামরিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে পূর্ব-পশ্চিমের কোনো রাষ্ট্রই মানসিক দিক থেকে তৈরি ছিল না। অসীম রক্তক্ষয় এবং দুটেন তথা পাকিস্তানের বহু হুসি সৈয়দের দীর্ঘদিনের প্রধানমন্ত্রীর সমর ইরাকের জনগণ নানা ভাবে নিশ্চিন্ত হয়েছিল সত্য, তবে এ ধরনের আকস্মিক সামরিক অভ্যুত্থান কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। ঐরা এ অভ্যুত্থানের পিছনে ছিলেন, সেই তরুণ সামরিক অফিসাররা নাসেরের সমর্থক। সুতরাং এ ঘটনার পাকিস্তানি পশ্চিমবর্গ তথা আমেরিকার আতঙ্কিত হবারই কথা।

এই ঘটনার যে বিষয় প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, দুটেনার দিন রাজা ফয়জল, প্রধানমন্ত্রী হুসি সৈয়দ ও মুহাম্মদ আবদুল ইলার সদলপলে তুরন্ত বাগদাদ-চুক্তির সমস্ত-রাষ্ট্রগুলির শীর্ষ-সম্মেলনে যোগদানের ক্ষেত্রে ত্বরিত যাবার কথা। তাঁদের মালপত্র পূর্বাঙ্কেই বিমানযাত্রিতে পৌঁছেছিল এবং তীরাণ্ড বিমানবন্দরে যাবার ক্ষেত্রে প্রেরিত হচ্ছিলেন। এমন সময় ঘটল সামরিক অফিসারদের অভ্যুত্থান, এবং বিরাটী অফিসারদের হাতে তীরা নিহত হলেন। ইরাক আরব জগতের একটি বড় রাজ্য—আরবতন ১,১২,০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৪১ লক্ষের কিছু বেশি। দৈন্য-সম্পদের ক্ষেত্রে ইরাক বহু প্রসিদ্ধ। পেট্রল-উৎপাদনে আরব জগতে সৌদি আরব ও কুওয়েটের পরেই ইরাকের স্থান। 'ইরাক পেট্রোল কোম্পানি'-র পাইপ লাইন সেবানদন পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯৬৬ সালে ইরাক উৎপন্ন পেট্রলের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টন। ইরাক সরকার উৎপন্ন তৈল বাবদ শতকরা ৪০ টাকা ছাড়লি পান। কিছুকাল পূর্বে ইরাক সরকার জনগণের উন্নতির ক্ষেত্রে বীধ-নির্বাণ, পথঘাট-তৈরি, পুষ্ক-নির্বাণ প্রকৃতি সম্পর্কিত দীর্ঘদায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও ইরাকের শাসনব্যবস্থা রাজতন্ত্রের অধীনে স্বাধীন ছিল এবং বলে জনসাধারণের মধ্যে ছিল ব্যাপক অপিশা ও দারিদ্র্য।

প্রধানমন্ত্রী হুসি সৈয়দের শাসনকালে ইরাক দাঙ্গাধামাণ্ডা ও উচ্ছৃঙ্খলতা লেগেই ছিল। তবু বৈদেশিক আকর্ষণিকভাবে ইরাকের রাজতন্ত্রের অবদান হল, তা ইতিহাসে অবিস্মৃত ব্যাপার।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বাগদাদ-চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ইরাক যেকোনো জর্ডানের সঙ্গে আরব ফেডারেশন গঠন করেছিল। জনমত যে এ-সিদ্ধান্তের অগ্রদূত ছিল না, ১৯৫৬ জুলাইয়ের ঘটনা তাই প্রতিপন্ন করে। প্রধানমন্ত্রী হুসি সৈয়দ যে ইরাকে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার অস্তিত্ব গাণেননি—এ প্রায় স্বজ্ঞানবিহীন ব্যাপার। গত যে মাসে ইরাকে যে সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল তাতে শতকরা ১০ জন ভোটটি নির্বাচিত হয়েছিল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। কোনো গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার এই ধরনের ব্যাপার লভ্য নয়। ইরাকী প্রধান-মন্ত্রী গুপ্তচরের দ্বারা এমনভাবে বেশ ছেয়ে ফেলাছিলেন যে, তাঁর পাকিস্তানসমর্থক ও প্রেসিডেন্ট নাসের-বিরোধী কর্মনীতির বিরুদ্ধে কাহণ কোনো রাষ্ট্রীয় বাস্তব ব্যক্তির উপায় ছিল না। প্রচলিত শাসনব্যবস্থার পিছনে জন-সমর্থন না থাকলে তার পরিণতি কি হয় তাঁর বহু প্রমাণ ইতিহাস ঘটিয়ে পাওয়া যায়। ইরাকের ১৯৫৬ জুলাইয়ের ঘটনাবলী এই সত্য আর্যার নতুন করে জনগণের সামনে তুলে ধরেছে। অবশ্য ১৯৫৬ জুলাইয়ের সামরিক অভ্যুত্থানের পিছনে জনগণের কোনো হাত ছিল না। তবে এর পিছনে ইরাকী জনগণের নীরব সমর্থন আছে এ নিশ্চিত প্রতীতি না থাকলে ইরাকের সামরিক বাহিনীর একাংশ এভাবে রাজা ও প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করে শাসনব্যবস্থা হাতে তুলে নেবার বাহ্য শেত না। তাদের এ কার্যের সামান্যতম প্রতিবাদও যে ইরাকের জনসমাজ করেনি—তার থেকে প্রমাণিত হয় যে, হুসি সৈয়দের শাসনের পিছনে গণসমর্থন ছিল না।

লেবাননে মার্কিন হস্তক্ষেপের পর

১৯৫৬ জুলাই তারিখে ইরাকের এই সামরিক অভ্যুত্থানটিকে লেবাননে মার্কিন হস্তক্ষেপ অব্যবহিত করেছিল। প্রেসিডেন্ট নাসের তথা সোভিয়েট অগ্রগতি রোধের আত্মপ্রাণে মার্কিন মুক্তরাষ্ট্র এভাবে লেবাননে নো-ইন্টারভেনশন কয়েছিল। কিন্তু কূটনৈতিক দিক থেকে তার এ কাজটি যে ডামো হয়নি, পরবর্তী ঘটনাবলী তাই প্রতিপন্ন করেছে। অনেক আশঙ্কা করেছিল যে, এই মার্কিন হস্তক্ষেপের ফলে সোভিয়েট রাশিয়াও সম্ভব রূপে আসবে এবং পরস্পরী বিশ্ববৃদ্ধির হত্যা হবে। তা অবশ্য হয়নি এবং

ঘটনার গতি যেভাবে চলছে তাতে মনে হয় যে, এ ব্যাপারে বিশ্ববৃহত্তর আশঙ্কা গাঢ়িয়ে গিয়াছে। পরবর্ত্তে এই অবস্থিত হৃদক্ষেপ যে ভালো নয়, সে সম্বন্ধে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারও সন্দেহন ছিলেন। তানাইলে সেখানে সৈন্ত-অবতরণ-সম্পাদিত যোষণার মধ্যেই তিনি এ কথা বলতেন না যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ করার কোনো উদ্দেশ্য নেই এবং সম্মিলিত রাষ্ট্রপ্রতিনিধি সেখানেই সংঘটিত ও স্বাধীনতা রক্ষার হাতিয়ার গ্রহণ করলেই মার্কিন সৈন্ত সরিয়ে নেওয়া হবে। বহিঃরোপ, আইজেনহাওয়ারের এই যোষণার পরে পরেই সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী নিকিতা খ্রুশ্চেভ, একটি যোষণার অবিলম্বে সেখানে থেকে মার্কিন সৈন্ত সরিয়ে নেবার হাবি জানান। সেখানেই মার্কিন হৃদক্ষেপের ফলে বিশ্বশান্তি যে বিঘিত হতে পারে, সে-কথা তিনি বিশ্ববাসীদের জানিয়ে দেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, এ ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়া সর্বদা সতর্ক। প্রথম করে নিজেই হয়ে যাবে থাকবে না। শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে সোভিয়েট প্রতিনিধির আবেদন যে হুগলভাসম্মত নয় সে-কথা খুবিয়ে দেবার ক্ষেত্রে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী একথাও জানিয়ে দেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার হাতে আত্মসমরক্ষণের ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নিষ্পেক্ষ ভূভিত্তিক সৈন্ত সরিয়ে নেবে না—সোভিয়েট রাশিয়ার তা জানা ছিল বলেই, ককেশাস অঞ্চলে এবং ইরান-সোভিয়েট সীমান্তে অবিলম্বে সোভিয়েট সমরসৈন্য মহড়াই আদেশ দেওয়া হয়। এইসব তোড়জোড় দেখে অনেকেইই আশঙ্কা হয়েছিল যে যখন তখন লড়াই বেগে বেতে পারে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তনৈ সামরিক কার্যকলাপ অন্ততঃ সীমাবদ্ধ রাখার এবং সম্মিলিত রাষ্ট্রপ্রতিনিধির মাধ্যমে সন্ধিই এগিয়ে শান্তি স্থাপনের ইচ্ছা আপন করার এবং সোভিয়েট রাশিয়ার আশ্বাসে নীমাংসার পক্ষপাতী হওয়ার পরিচিতি এ পর্যন্ত অধিকতর অনবতির দিকে বেতে পারেনি। তাহলেও উভয়পক্ষের অনবনীর মনোভাবের ফলে এ পর্যন্ত কোনো শান্তির দূর পূর্বে শান্তি ঘটিবে এবং অচল অবস্থা পূর্ববৎ স্থায়ী হয়েই থাকবে।

আলোচ্য ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট নাসেরও খুবই সুরমণিতা ও শান্তিপ্রিয়তার পরিচয় এ পর্যন্ত দিয়েছেন। ইরাক ও সেখানেই বর্তমানবাসীর সদর তিনি যুদ্ধোত্তীর্ণতার প্রেসিডেন্ট টিটারের সঙ্গে আলোচনায় বসে ছিলেন। আর-জমতে আলোড়নের সন্ধ্যা পরেই তিনি গোপনে বহুতালি এবং সেখানে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। প্রকাশ যে, তিনি সোভিয়েট রাশিয়াকে বলেছেন যে, বর্তমান অবস্থার আর-জমতের ব্যাপারে সোভিয়েট হৃদক্ষেপ চাইবে নয়—প্রয়োজন হলে তিনি নব্বই সোভিয়েট সাহায্য চাইবেন। ইত্যদসরে প্রেসিডেন্ট

নাসেরের ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক, সোভিয়েট রাশিয়া, চীন প্রভৃতি কয়েকটি কমানিস্ট রাষ্ট্র এবং ভারত সহ কয়েকটি অকমানিস্ট রাষ্ট্র ইরাকের নতুন প্রজাতান্ত্রিক গমনমতেই স্বীকৃতি দিয়েছে। বাগদাদ-চুক্তি-ভুক্ত যুক্তনৈ, জুজহ এবং পাকিস্তানও নতুন ইরাকী প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। হুদিন আগে হোক, পরে হোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ইরাক স্বকায়েকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমেরিকা ও যুক্তনৈ যদি তার সামরিক কার্যকলাপ সেখানে ও জর্ডানের মধ্যে সামরিকভাবে নিষ্পেক্ষ রাখে এবং কোনপ্রকারে নতুন ইরাক প্রজাতন্ত্রকে না খাটায়, তাহলে বিশ্ববৃহৎ বাগার কোনো আশঙ্কা আপাতত নেই বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

শান্তি স্থাপনের প্রয়াস

আপাতত বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানেও তথা আর-জমত থেকে ইরাক-মার্কিন সৈন্ত-অন্যসারের প্রর ও শান্তি স্থাপনের প্রয়াস। বলা বাহুল্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যথা যাতে রাখা রাখার মতো যে কাণ্ড সেখানেই করে বলেছে, তাতে বিশ্বের সম্মুখে তার মর্যাদা তো বৃদ্ধি পাবেইনি—বরং বর্তমানে সম্মানে তার পত্নাধঃপদারশের প্রকৃতিই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরবর্ত্তে এই সমস্ত হৃদক্ষেপ—বিশেষতঃ রাষ্ট্রপ্রতিনিধির প্রস্তাব অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে—বিশ্বের জনমতের সর্বদর্শিতা পাবেই না, যে রাষ্ট্রের সংঘটিত ও ঐক্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমেরিকা এ কাজ করেছে সেখানেও তার এ কাজ তাকে অগ্রির করে তুলবে বলে মনে করার যথেষ্ট আছে। এতে প্রেসিডেন্ট কামিল মারু হয়তো ব্যতির নিষাঙ্গ কলে বাচতে পারেন, কিন্তু তার বিরুদ্ধে আম সেখানেই যে অধিকাংশ রাষ্ট্রনৈতিক দল সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে তারা কখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ অহেতুক হৃদক্ষেপ ভালো চোখে দেখবে না। মার্কিন সৈন্তবল অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে বিশাখা পড়ে বিস্তারী দল বিস্তারী বহু রাখার সিদ্ধান্ত করেছিল। কিন্তু তার পর কয়েকদিন বেতে-না-বেতেই বিস্তারী নেতা সায়েব মালুম যোষণা করেছেন যে অবিলম্বে বিশেষ সৈন্ত দেবার বাটী ত্যাগ না করলে তাঁরা স্বকায়েপক্ষের সঙ্গে কোনো আপস আলোচনা করবেন না, আগর প্রেসিডেন্ট-নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করবেন না এবং প্রবোজন হলে তাঁরা বিক্ষুব্ধ রাষ্ট্রীয় সশস্ত্রা গঠন করবেন। প্রেসিডেন্ট মারু যে সেখানেই জনগণের আস্থা হারিয়েছেন এ প্রায় স্বীকৃত সত্য। তাঁর সর্বদর্শিতা মার্কিন সৈন্ত প্রেরণ করার অর্থ হল সেখানেই রাষ্ট্রীয় চোখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে হওয়া।

সেখানেই এই ঘটনার মধ্যস্থতার হাতিয়ার আবার বহুদলীয় এসে পড়েছে ভারতের উপর। সেখানেই মার্কিন হৃদক্ষেপের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট আইজেন-

হাওয়ার ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঐনেহরুকে নিমিত্ত একটি ব্যক্তিগত পত্রে এ বিষয়ে মার্কিন স্ট্রিটজি ব্যাণ্ডা করে জানান। ঐনেহরু প্রায় দুগুণ আরও অনেকগুলি পর পান। পরবর্তীভাবে বহুখো ছিলেন প্রেসিডেন্ট ন্যাসের ও যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট বার্গাল টিটো। শান্তিহাপনের প্রভাবে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভ কেনেডার ২২শে জুলাই তারিখে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট আইজেন-হাওয়ার, মিঃ ব্যাকবিগান, ঐনেহরু ও কেনায়েল ও গলের মধ্যে শীর্ষ-সম্মেলনের যে প্রস্তাব করেন, সেই প্রস্তাবে তিনিও প্রধানমন্ত্রী ঐনেহরুকে একটি ব্যক্তিগত পত্র লেখেন। তদুত্তরে ভারতের শঙ্ক শেখ ঐনেহরু হৃদয়ভাষে জানান যে, বিবৃদ্ধ হওয়ার অর্থ সমগ্র মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাওয়া। তিনি সাধারণভাবে শীর্ষ-সম্মেলনের এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং বৈঠকে যোগদানের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন; সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুক্তি ও আমেরিকাকে অবিলম্বে লেবানন ও জর্ডান থেকে সৈন্য অপসারণের অনুরোধ জানান। রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি-জেনারেল মিঃ ডাগ হ্যাংয়ারলীও পত্র লেখান যে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ অব্যাহতি বলে ঘোষণা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিং এ ব্যাপারে গৌ ধরে আছে যে, রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে পুলিশ বাহিনী লেবাননে না পাওয়া পর্যন্ত তারা লেবানন থেকে সৈন্য অপসারণ করলে না। লেবাননে আমেরিকার সামরিক শক্তি-প্রদর্শন যে কত হান্ধবক হয়ে উঠিবে—যদি যুক্তিগতের সাধারণতঃ ‘নিউক্লিয়ার কনফেঞ্চ’-এর সাধারণতঃ প্রথম নীচের সাধারণ থেকে তা বোঝা যায়: “কয়েকদিনের মধ্যে চুম্বকাসারের পূর্ণাঙ্গন যুদ্ধকাহায়ে ডুবি হয়ে গেছে এবং এগ্রেসনের আকাশ ভরে গেছে। আমেরিকার যে অতি দ্রুত সর্বশক্তি পরিচালনার সাধারণ আছে, এ ভাটই ভাটিগ্রহ বিধর্ন। এটা অব্যত কিং হান্ধবকও বটে। লেবাননে যে বিরাট শক্তি নিয়োগ করা হয়েছে এবং তার মূল আছে যে ছয় বিহোহ—এ প্রুটির মধ্যে বৈষম্য এত বেশি যে, তাতে হাফেক্রক করে। ... আমেরিকানরা ভাবের বন্ধুদের ভাব বেশি দিয়ে সৃষ্টি করে দিচ্ছে। লেবাননব্যাগীরা অস্বস্তি বোধ করছে। আমেরিকানরা সে বেলে ভাবেরই একত্রে সোয়ী করা হবে।”

লেবানন নিয়ে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শীর্ষ-সম্মেলনের প্রস্তাব ঐনেহরুর সমর্থন ও সাধারণভাবে কেনায়েল ও গলের সমর্থন পেলেও, ইক-মার্কিন শক্তির সমর্থন পায়নি। বিবখ্যর্ভা, সাধারণতঃ শক্তি প্রবৃতি এর আলোচনার ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে যে শীর্ষ-সম্মেলনের প্রস্তাব উল্লেখিত তাও ইক-মার্কিন সমর্থন লাভ করেনি। ইলোয়াও ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নারকণ সাধারণভাবে যে শীর্ষ-সম্মেলনের বিরোধী তা নন—তবে এরা চান যে

এইজাতীয় সম্মেলন রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের আওতায় অধুগিত হোক। রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানে ইক-মার্কিন কর্মনীতির সমর্থক রাষ্ট্রগুলির সংখ্যাধিক্য আছে বলে সোভিয়েট রাশিয়া আবার রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের আওতাধীন এজাতীয় সম্মেলন অস্বীকারের বিরোধী। লেবানন থেকে মার্কিন সৈন্য-অপসারণের এর নিয়ে বর্তমানে নিরাপত্তা-পরিষদে সে অংশে অবস্থার সঠি হয়েছে তাতে এই প্রতিষ্ঠানের সার্বভা আবার নুতন করে প্রমাণিত হয়েছে। এদিকে সোভিয়েট রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের আওতাধীন রাষ্ট্রের দলে এই প্রতিষ্ঠানটি কোনো কাজই করতে পারছে না। লেবানন প্রসঙ্গ নিয়ে সম্মতি নিরাপত্তা-পরিষদের সম্মুখে তিনটি প্রস্তাব এসেছিল—প্রথমটি, লেবানন ও জর্ডান থেকে অবিলম্বে মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের দাবি মার্কিন সোভিয়েট প্রস্তাব; দ্বিতীয়টি, লেবাননে আন্তর্জাতিক পুলিশ-বাহিনী প্রেরণের মার্কিন প্রস্তাব; এবং তৃতীয়টি, লেবাননে মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতির কলে, পুনরায় বোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত, রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের পর্যবেক্ষকগণের কাছ বন্ধ রাখার সুইডিশ প্রস্তাব। বলা বাহুল্য, এ তিনটি প্রস্তাবের কোনটিই কার্যকর হতে পারেনি। সোভিয়েট প্রস্তাব ইক-মার্কিন বিরোধিতার কলে ভোটাধিক্য লাভ হয় গেছে, মার্কিন প্রস্তাব ভোটাধিক্যে, গৃহীত হলেও সোভিয়েট ভেটো-প্রয়োগে অকার্যকর হয়ে গেছে এবং সুইডিশ প্রস্তাব ভোটাধিক্যে লাভ হয় গেছে। অতঃপর উত্তরপক্ষের মধ্যে বীরাগোহ ক্ষেত্রে জ্ঞান লেবানন-সম্পর্কিত যে সংশোধিত প্রস্তাব এনেছিল তাও সোভিয়েট ভেটো-প্রয়োগে ব্যর্থ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের চেষ্টা করছে বলে প্রকাশ।

সর্বশেষ পরিস্থিতি

গত ২২শে জুলাই সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী নতুন বৃহৎ পক্ষজির শীর্ষ-সম্মেলন অস্বীকারের প্রস্তাব করায়, জ্ঞান্য করা গিয়াছিল যে শীর্ষই এখনকার একটি সম্মেলন অস্বীকৃত হবে এবং তাতে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে যে গুরুতর পরিস্থিতির উদয় হয়েছে তার কিছুটা উপশম হবে। হুঃবের বিষয়, ইক-মার্কিন শক্তির টানবাহানার কলে এপর্যন্ত এই সম্মেলন অস্বীকার পর্যন্ত কেবলো দ্বিঃ সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারেনি। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী স্টা ভাবায় জানিয়েছেন যে, এই পক্ষজির সম্মেলন অস্বীকৃত হলে, তিনি নিউ ইয়র্ক সহ পৃথিবীর যে কোনো স্থানে নিজে গিয়ে সম্মেলনে যোগ দিতে প্রস্তুত। এ বিষয়ে গত ১লা আগস্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভকে যে পত্র লিখেছেন তাতে দেখা যায় যে, তিনি প্রত্যাহিত

পক্ষপত্তির সম্মেলনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং নিরাপত্তা-পরিষদের সমস্তদের এক শীর্ণ-সম্মেলনের প্রস্তাব অগ্রহণ করেন। তিনি বলেছেন যে, ১২ই আগস্ট এই সম্মেলন অগ্রহীনের ব্যবস্থা করার জন্তে তিনি নিরাপত্তা-পরিষদের মার্কিন প্রতিনিধিকে নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি এ কথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, নিউ ইয়র্ক বা মধ্যোচ্চা জন্তর এ সম্মেলন অগ্রহীত হলে তিনি এতৎ ব্যক্তিগত-ভাবে যোগ দিতে প্রস্তুত। বলা বাহুল্য, মার্কিন হুঙ্কারের এ প্রস্তাবের পিছনে স্টুটেনেরও পূর্ণ সমর্থন আছে। অপরপক্ষে জেনারেল ও গল এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নন। তিনি নিরাপত্তা-পরিষদের বাইরে শীর্ণ-সম্মেলন অগ্রহীনের পক্ষপাতী এবং সে সম্মেলন ১২ই আগস্ট তারিখে অগ্রহীত হোক এই তাঁর ইচ্ছা।

নবতম ষ্টক-মার্কিন প্রস্তাব সম্বন্ধে সোভিয়েট সনোভার এখনও জানা যায়নি। তবে এ প্রস্তাব সম্বন্ধে সোভিয়েট অগ্রহণ করেন পাবে না। সোভিয়েট রাশিয়া এ বিষয়ে একাধিকবার যে বক্তব্য আপন করছে তাতে দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত সম্মেলনের পাঁচটি দেশের মধ্যে ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্স একত্রিতাবলী হলেও, সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী এ-সম্মেলনে অত্র কোনো কমিউনিষ্ট দেশের প্রতিনিধির দাবি করেননি—দাবি করেছিলেন নিরপেক্ষ দেশ ও জাতিসমূহের প্রতিনিধিরূপে ভারতের অংশগ্রহণ। সর্বশেষ ষ্টক-মার্কিন প্রস্তাবে নিরাপত্তা-পরিষদের শীর্ণ-সম্মেলন থেকে ভারতকে বাদ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ অবস্থায় প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের নতুন প্রস্তাব সোভিয়েট অগ্রহণ করেন পাবে কিনা সন্দেহের বিষয়। মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবের সোভিয়েট প্রত্যাখ্যান যে এখনও পাওয়া যায়নি তার কারণ গত ৩১শে জুলাই থেকে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুচেভ ও চীন সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট বাও পে-তুং, শিঙিং-এ গোপন সলাপসার্ষ করছিলেন। চারদিন সলাপসার্ষের পর ৩১ আগস্ট তাঁরা বে সম্মিলিত ঘোষণা করেছেন তাতে দেখা যায় যে, তাঁরা সমগ্র বিশ্বে শান্তি-সংরক্ষণের প্রস্তুতি পূর্ববেশন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কোনো দেশের জনগণ কোনো সামাজিক এবং রাজনৈতিক পদ্ধতি গ্রহণ করবে সে-বিচারের ভার তাদের উপরই ছেড়ে দিতে হবে। তাঁরা অবিলম্বে জর্ডান ও লেবানন থেকে যুক্তি ও মার্কিন সৈন্তের অপসারণ দাবি করেছেন এবং যুক্তি পেশ করার জন্তে পুনরায় পক্ষপাতী নিষেধের আস্থা পুনর্মাপন

করেছেন। তবু যদি হুঙ্কারে তাহলে বিশ্বের শান্তিকামী জনগণ যে সম্বন্ধিত্তে সে-হুঙ্কার প্রতিরোধ করবে—এ কথাও নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেছেন।

ইতাল্যের লেবানন ও ইরাকের ঘটনাবলীরও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের বিশেষ দৃষ্ট মতঃ যবার্ট মার্কিন গত কয়েকদিন ধাবৎ লেবাননে সরকারপক্ষ এবং বিদ্রোহীপক্ষের মধ্যে একটা বোতাপাড়ার প্রয়াস পাছিলেন। তাঁর এই প্রয়াসের ফলে গত ৩১শে জুলাই লেবাননে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট কামিল সামুর স্থলে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে লেবাননের প্রধান সেনাপতি জেনারেল হুদাদ শেহাব। তিনি নিজে যেরোসালেমিট খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অধিকাংশ বিদ্রোহীর আত্মভাজন বলে প্রকাশ। তাঁর এই নির্বাচনের ফলে লেবাননে বিদ্রোহের অবস্থান হবে বলে অনেকে আশা প্রকাশ করেছেন। প্রেসিডেন্ট সামুর কার্যকাল আছে ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তার পূর্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের অভিজ্ঞার নাকি তাঁর নেই। অপরপক্ষে বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ দাবি করছেন যে, ১২ই আগস্টের মধ্যে তাঁকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। বিদ্রোহীয়েন মধ্যে বাহা চরমপন্থী, তাঁদের সহায়সাহী কার্যকলাপ মার্কিন সৈন্তের উপস্থিতিতেও বন্ধ হয়নি। সম্ভ্রান্তি লেবাননের প্রধানমন্ত্রী মিঃ সানি সোলুকে হত্যার জন্তে যে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল তাতেই চরমপন্থীদের আশ-বিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। লেবানন থেকে মার্কিন সৈন্ত অপসারণ সম্বন্ধে মার্কিন রাষ্ট্রনেতারা বলাতেন যে সেখানে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের পুলিশ-বাহিনী গেলেই তাঁরা সৈন্ত সরিয়ে আনবেন। বর্তমানে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর তাঁরা বলছেন যে, লেবাননের নতুন গভর্নমেন্টে সৈন্তাপসারণের দাবি করলেই তাঁরা সৈন্ত সরিয়ে নেবেন। ইতাল্যের আবার লেবাননে মার্কিন সৈন্তের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে—৪,০০০ থেকে বর্তমানে সৈন্তসংখ্যা পাঁড়িয়েছে ১৩,০০০।

ইরাকের নতুন সাধারণতন্ত্র ইতাল্যের বাগদাদ-হুজি-ভুক্ত গ্রাঃ নকল রাষ্ট্রের শীর্ষস্ত লাভ করার জর্ডানের রাজ্য ঘনেন ঘোষণা করেছেন যে, ইরাক ও জর্ডানের ইউনিয়নের অবসান হয়েছে। নতুন ইরাকী সরকারের মতিগতি অগ্রহণাবনের জন্তে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের বিশেষ দৃষ্ট মতঃ মার্কিন বাগদাদে গেছেন সলাপসার্ষ করতে।



হুগলি

মনোজিৎ বসু

[বর্তমানের পর]

জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে, এই জেলায় হুগলি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলি নাকি একসময় খুবই স্বাস্থ্যকর ছিল। কিন্তু, ঐ-সব অঞ্চলে যখন থেকে কলকারখানা স্থাপিত হয় ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তখন থেকেই জনস্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বহু গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক-কালে চিকিৎসা-ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রশার হওয়ায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেক নেই, কিন্তু বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর বিভিন্ন বোগ মাথা-চাড়া দিতে গুঠে। এটা অবশ্য বাংলাদেশের সব জায়গা সম্পর্কেই প্রযোজ্য। হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও অন্যান্য চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আগেকার তুলনায় অনেক বেড়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু, প্রয়োজনের তুলনায় এখনও তা যথেষ্ট নহা। চুঁচুড়া, ঈদামপুর, উত্তরপাড়া, চন্দ্রনগর, আরামবাগ ও তারকেশ্বর সরকারী হাসপাতাল রয়েছে। তাছাড়া, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও বিভিন্ন শ্রেণীর চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান রয়েছে জেলার বিভিন্ন জায়গায়। সমগ্রটি শিল্পের ভারত-সরকার একটি 'চিকিৎসা-গবেষণাগার ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র' স্থাপন করেছেন। এখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষার্থীরা এসে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে শিক্ষা ও গবেষণা করে থাকেন। যত্ন-বিকৃত রোগীদের জন্য মানস্কৃত্তে একটি বিশেষ হাসপাতালও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাম্প্রতিক-কালে। তাছাড়া, এই জেলায় চারটি বহুকক্ষার নয়টি জামাখান চিকিৎসা-কেন্দ্রও চালু আছে। এই চিকিৎসা-কেন্দ্রগুলি ঘুরে ঘুরে জেলার সর্বত্র বিনামূল্যে চিকিৎসা করে বেড়ায়। পল্লী-এলাকার এ-বাং এ-কুশলী স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু আছে সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের পরিচালনায়।

হুগলি জেলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সড়ক হ'লো প্রাণ-প্রাণ-রোড। বেশির ভাগ শহরই পড়েছে এই সড়কের ধারে। স্বাধীনতা-লাভের পর মজুন নতুন রাজধানী তৈরি হয়েছে অনেকগুলি। তার মধ্যে কলিকাতা-

প্রাকেশ্বর সড়কটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, কলিকাতা থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত মে-রেলশাখাটি ছিল সেই পথে এখন বৈজ্ঞানিক ট্রেনও যাওয়া-আসা করছে। আগে আরামবাগ মহকুমার বাতাবতের বিশেষ অর্থবিদ্যা ছিল। এখন অনেকগুলি ভালো রাজা হওয়ায় দে-অর্থবিদ্যা অনেকটা হ্রাস হয়েছে। হুগলি জেলার জেলাধিকারের অধীনে রাজা আছে একচাক্ষুস হুগলি নদীর তীরে। এই জেলার প্রথম কর্তব্য দিয়ে থাকতেন জল খুব বেশি অর্থবিদ্যাভোগ করতেন হয় না এখন। কারণ, ডাকবাংলো আছে অনেক জায়গাতেই। যেমন আছে আরামবাগে, চণ্ডীতলায়, হরিপালে, অক্ষীপাড়া, পানাকুলে, মাদ্যপুরে, কামারপুত্রে, পুরহাডায়, ডাক্তারপুরে, স্বরূপ চৌধুরায়, ধনেশালিতে, পুইনানে আর ইকুদায়। তাছাড়া, পাড়া ও পুইনানে আছে ইলেক্ট্রন-বাংলো, ধনেশালিতে আছে ফেট-হাউস, আর স্যাকিট-হাউস রয়েছে চুঁচুড়ায়।

ব্যবস্থাপনামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে হুগলি জেলাতেই বোর্ডটির সবচেয়ে বেশি মিউনিসিপ্যালিটি আছে। বহুটি মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে জেলার বিভিন্ন শহরে; অর্থাৎ চুঁচুড়ায়, ঈদামপুরে, চন্দ্রনগরে, উত্তরপাড়ায়, কোতরাং-এ, কোমরাং, রিহড়ায়, বৈকুণ্ঠপুরে, চাঁদমালায়, ভাটপুত্রে, ঈদামপুরে, আর আরামবাগে। প্রত্যেকটি মিউনিসিপ্যালি এলাকায় এখন গুলের জল ও বৈজ্ঞানিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। আরামবাগ ছাড়া আর সব মিউনিসিপ্যালি শহরই হুগলি নদীর তীরে। বহু উদ্যোগ নরনারী এসব শহরে ও তার আশেপাশে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হুগলি জেলার উদ্যোগ শাখায় হয়েছে প্রায় হেঁচ লাখ। সরকার থেকে মোট আঁসারটি আশ্রয়-শিবির খোলা হয়েছে এ-জেলার; আর ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে ঐ-সব আশ্রয়-শিবিরে অবস্থানকারী উদ্যোগের সংখ্যা হয়ে প্রায় চল্লিশ হাজার। এ-পর্যন্ত ৪,২১০-টি উদ্যোগ-পরিবারকে বাসোপযোগী জমি মিলি

করা হইবেই সম্ভব। এষ্ট জেলায় কৃষিক্ষেত্রী উদ্বাস্ত-উপনিবেশ গড়ে উঠেছে একটি, আর অপরিক্ষেত্রী উদ্বাস্ত-উপনিবেশের সংখ্যা হ'লো ৩৭। অগ্রান্ত শ্রেণীর উদ্বাস্তদের নিয়ে আরও দুটি উপনিবেশ গড়ে উঠেছে সম্ভ্রান্ত। কিন্তু, এখনও বহু উদ্বাস্ত আর্থিক সুন্দর্যমান-লাভ করতে পারেননি। বেশ-বে-সরকারী উদ্বাস্ত-উপনিবেশ এই জেলায় স্থাপিত হইবে, সেগুলির মধ্যে নাম করা যায় চারটি। সেগুলি হ'লো—নবগ্রাম কো-অপারেটিভ কলোনি; ডাঃবর বামরুক-দালাল শরী কলোনি; পাণ্ডা বিবেকানন্দ কলোনি; আর, বলাগড়ের মিলনগড় কলোনি।

হুগলি জেলার বিভিন্ন কারাগার কম করে প্রায় তিনশ' হাট বেস নিয়মিত। সেগুলির মধ্যে নানা কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে শেওড়াফুলি, সিঙ্গুর, চাঁপাডাঙ্গা, ধনেশানি, লক্ষ্যে, মগরা, চুঁচুকা, মাঝাপুর, জিরাট, কাজীপাড়া, নিখালা, চণ্ডীতলা, পাণ্ডা ও পোশুর হাট। 'ডাঃডাক্তার, প্রতিবছর প্রায় ১৭৭টি মেলা বসে এই জেলায়। এইসব মেলায় মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মেলা হ'লো মাহেশ্বরের গ্রন্থের মেলা। একমাস ধরে চলে এই মেলা। বহুবিদ-চন্দ্রের 'প্রাধান্য' উপস্থাপনও এর উল্লেখ আছে। অস্ত্রান্ত প্রসিদ্ধ মেলা হ'লো—ভারতেশ্বরের নিবরাতি ও চড়ক-গাজনের মেলা, চন্দ্রনগরের প্রবর্তক-সন্ধ্যার অক্ষরতুতীয়া মেলা; আর জগদ্ধাত্রী-মেলা, চুঁচুকার মহরম ও হওবরের মেলা, কুপুগা বা জাঙ্গীপাড়ার পীরের মেলা, মানকু ও খানকুগ-কুন্দনগরের রাসের মেলা, বলাগড় ও ধনেশানির লোহাঘাতের মেলা, মগরা-নিখাটের সৌধ-সংকান্তির মেলা, আর কামারপুত্রের তুতির-খাল মেলা। পল্লীবাংলার চিরন্তন সাংস্কৃতিক রূপটি ছুটে গুটে এইসব জনসমাবেশে। লোকান-পাট, গান-বাজনা, বস্ত্রা-কণ্ঠকতা, কবির গড়াই, গ্রাম্য নার্কি ও ব্যক্তিগত কিছুই বাধ যায় না। হাস-আবেগ সিনেমাও প্রসার হওয়ায়, তার ছোঁয়াচ দিয়ে সেগেছে ছোটখাট শহরে ও গ্রামে। পশ্চিমবাংলার অস্ত্রান্ত রেলার মধ্যে হুগলি জেলাভাগও সিনেমা-হাউস আছে। কম করে ২০টি তো হবেই। এক চন্দ্রনগর ও ঐরাবপুরেই আছে তিনটি করে।

প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এই হুগলি জেলা। স্বতন্ত্র পৃথাকীতি ছড়িয়ে আছে জেলার এখানে-ওখানে। এখানকার বহু জাংগার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বহু স্মৃতিই অস্তিত। সপ্তগ্রামের কথা পোড়াতোড় উল্লেখ করছি। সপ্তগ্রাম বা সাতপা নামে এর একটি প্রসিদ্ধি ছিল হিন্দু

ও মুসলমান রাজত্বের। বাংলা ভাষা ভারতের প্রধান ব্যাকরণ্যাক্ত ছিল এই জাংগা। বর্তমানে নগর্য একটি পল্লী-অঞ্চলে পরিণত হয়েছে ঐতিহাসিক সপ্তগ্রাম বা সাতপা। প্রাচীন কীর্তির মধ্যে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৈরি একটি মসজিদ ও কয়েকটি কবর রয়েছে এইখানে। মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায়, কাশিখান ভূদেব তাঁরবতী আবুল নগর-দিবাসী সৈয়দ ককন্দিবের পুত্র সৈয়দ জাহাঙ্গীর হুসেন এই মসজিদটি তৈরি করান। সপ্তগ্রাম একটি বৈকুণ্ঠ-তীর্থও বটে। এখানে হাদ্দ-গোপালের অস্ত্রতম শ্রীমৎ উদ্বাস্ত দত্ত ঠাকুরের জিলাট রয়েছে। প্রতিবছর অগ্রহায়ণ মাসে এখানে একটি বৈকুণ্ঠ-মহোৎসবের অষ্টাদশ হ'য়ে থাকে।

গো-ঘাট খানার গুরু-মাকরণে সেলে এখনও কিছু কিছু পুরানো জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার প্রাচীন একটি রাজপ্রাসাদের লালকুশ দেখলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এই রাজপ্রাসাদ বা গড়ের প্রাচীর ছিল চার-পাঁচ মাইল বিস্তৃত, এবং জাংগার জাংগার এখনও এর উচ্চতা লক্ষ্য করা যায় বিশ থেকে তিন হুট পর্যন্ত। লুপ্তপ্রায় এই দুর্গমূল দিয়ে ব'য়ে চলেছে আমোদর নদী। আবুল ককল তাঁর 'সাইন-ই-আকবরী'তে লিখে গেছেন যে, মাকরণের অস্ত্রত হানিমা নামে এক জাংগার নার্কি হীরে পাওয়া যেত। মাকরণে পরম্পরাধার লেখা কয়েকটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। তাঁর একটিতে খোদাই করা আছে এই কয়েকটি কথা—'বিদ্যাতর জমিন কুলাডর দান'। অর্থাৎ, সেকালে এখানে এক বিদ্যা জমির বাৎসরিক রাজস্ব ছিল মাত্র এক কুলা দান!

হাওড়া স্টেশন থেকে মাইল উত্তরিশ গেলেই বঙ্গা। হুগলি জেলার এটি একটি ব্যবসায়-প্রধান কারখানা। এখান থেকে কিছু দূরে—মহানার আর ঘরবাসিনী। প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই বলেছি এ হুটি জাংগার কথা। মহানারের লুপ্তপ্রায় চন্দ্রকান্তর গড়, জটবরনাথ মহোদয়ের পুরানো মন্দির, বসিগুপা, জাহাং-জাহাং প্রভৃতি দেখবার জিনিস। জনস্রুতি এই যে, ঘরবাসিনী নার্কি একসময় গোপ-রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখানকার ঘরবাসিনী দেবীর মন্দির, সাত-সাতনের দীঘি, কীংকুণ্ড, শাংবহন সরোবর পুরানো দিনের স্মৃতিই বহন করে গেলেছে।

হুগলি জেলার আর একটি প্রাচীন কারখানা হ'লো পাণ্ডা। বালসর জেলার গোড়ের কাছে আর-একটি পাণ্ডা আছে। কেউ কেউ বলেন, গোড়ের সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পাণ্ডার নাম অস্থায়েরই হুগলি-জেলার পাণ্ডার

নাম হয়েছে। কিন্তু অনেকের মতে চুবিশ্রেষ্ঠরাজ পাণ্ডুরামের নাম থেকেই এসেছে এই পাণ্ডুরাম নাম। আর-একদল বলেন অস্ত্র কথা। তাঁরা বলেন, বুদ্ধদেবের এক পুত্রভাত-পুত্র পাণ্ডুরাম। ত্রিবেণীর কাছে ভাস্করী-ভীমে দে-ব্রাহ্মণ্য এসে বাস করেন, সেইখানেই গড়ে ওঠে এক রাজ্য। পরে নাকি তাঁর নাম অস্ত্রসারেই দে-ব্রাহ্মণ্যের রাজধানীর নাম হয় পাণ্ডুরাম বা পাণ্ডুরা। সে বাই হোক, পাণ্ডুরাতে যে একসময় হিন্দু রাজারা রাজ্য করতেন ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। ১৪৭৮-৮০ খ্রীষ্টাব্দে মগো কোনো এক সময় পৌড়ের হুগলতান শহর-উদ্দীন উইলফ শাহ পাণ্ডুরা জয় করেন। দে-সময় পাণ্ডুরাতে বহু মন্দির ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল এক মূৰ্খমন্দির। মূলধাম-রাজ্যে নাকি সেই মন্দিরকেই এক মন্দিরপে পরিণত করা হয়। সেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে। স্থানীয় লোকেরা বলে—“বাইশধুওরাজ্য।” একই ঘুরফিরে দেখলেই এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আশান্বয় নজরে পড়বে হিন্দু-মন্দিরের কতকগুলি শিলাস্তম্ভ। এখানকার এক প্রাচীর-গায়ে উৎকর্ষ এক লিপি থেকে জানা যায়, ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে লাল কুম্ভার নাম নামে এক হিন্দু এই মন্দিরপে সংস্কার করেন। পাণ্ডুরাতে একটি প্রাচীন মিনার-ও আশান্বয় নজরে পড়বে। প্রায় ১২১ ফিট উঁচু এই মিনারটি দেখতে গোলাকার, উপরদিকে ক্রমশ সরু হয়ে উঠেছে। এর ভিতর-দিককার দেওয়ালে রয়েছে বীনার কাজ। কেউ বলেন, ‘পেঁড়োর শীর্ষ’ নামে প্রসিদ্ধ শাহ মুকী-উদ্দিন এই মিনারটি তৈরি করিয়েছিলেন। আর্য্য কেউ বলেন, হিন্দু রাজাদের আমলেই এটি তৈরি হয়েছিল; আর, দে-সময় এটি ছিল এক বিষ্ণুমন্দির। পূর্ণেজ শীর্ষ-সাহেবের সময় এ-অঞ্চলে জনপ্রতিষ্ঠিত। এখানকার শীর্ষ-পুন্সুওটিও প্রসিদ্ধ। প্রতিবছর পৌষ মাসে এখানে একটি বড় মেলা বলে। একসময় নাকি পাণ্ডুরাতে পাতলা ধরনের একরকম মজবুত কাগজ তৈরি হতো।

ত্রিবেণী একটি তীর্থস্থান। প্রয়াগে যেমন গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনে, হুগলির এই ত্রিবেণীতে তেমনই তাগা মিলনে। এই কারণে বহু প্রাচীন। ১২-শ শতাব্দীতে রচিত কবি মোহরী ‘পবনভট্ট’-বাবো এর উল্লেখ আছে। কবিকল্প মুহূৰ্ণবাবের ‘চৌধুরী’ আছে—“বায়দিকে হানিগর, দক্ষিণে ত্রিবেণী। বাজীরে কোলাহলে কিছুই না গনি।” বৈষ্ণবকবি ব্রহ্মদাস দ্বারা ‘চৈতন্যভাগবতে’-ও আছে—“সেই সত্ত্বগ্রামে আছে সত্ত্বচরিত্র স্থান। লগতে বিবিত সে ত্রিবেণীঘাট নাম।” বলা বাহুল্য, সত্ত্বগ্রামের সঙ্গে

ত্রিবেণীর সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ। সেকালে সন্তুগ্রামী জাহাঙ্গির সন্তুগ্রামে বাবার গর্বে ত্রিবেণীতে নেঙের করত। ১৮-শ শতাব্দী পর্যন্ত ত্রিবেণী ছিল এদেশের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। কিন্তু সময় গতি পরিবর্তিত হওয়ার ফলেই এ-জায়গার আশ্রয় ক্রমশ কম যে আসতে থাকে। সংস্কৃত-শিক্ষার অন্ততম কেন্দ্র হিসাবে ত্রিবেণীর খ্যাতি ছিল একসময়। মূলধাম-আমলেও ত্রিবেণী যে বিদ্যেবন মনে ছিল—ইতিহাসিক উক্তির যথেষ্ট মজবুত প্রমাণ দে-ব্রাহ্মণ্যের মন্দির করেছেন তাঁর ‘বাংলাদেশের ইতিহাস’ গ্রন্থে। ত্রিবেণীতে প্রাচীন ব্রহ্মা স্থানগুলির মধ্যে পড়ে—পাঁচ-গুরুগুণা। জাহাঙ্গির বা মন্দির, উজ্জ্বলরাজ মুহূৰ্ণদেব হরিচন্দ্রন নিমিত্ত স্থানঘাটের ধ্বংসাবশেষ, বৌদ্ধধর্মের মন্দির প্রভৃতি। মনহা, ব্যাক্তি, মন্দিরসংক্রান্ত, বাণীপুঁথিমা প্রভৃতি উপলক্ষে এখনও ত্রিবেণীতে বহু বাজীর সমাগম হয়ে থাকে। ত্রিবেণীর কাছে খাঘাটি গ্রামে ‘ডাকঘাটে কানী’ নামে একটি প্রাচীন কানীমন্দিরও দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাঙের জলনে থেকে ত্রিবেণীর দূরত্ব মাত্র পাঁচ মাইল।

হুগলি-সদর-মহকুমার বলাগড় থানার একটি প্রাচীন গ্রাম হ’লো গুপ্তিপাড়ার—ব্যাঙের জলনে থেকে মাইল বাইশ। এখানে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে। তার মধ্যে চৈতন্যদেব, রাধাবরদ, ব্রহ্মাবরদ, কৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরই উল্লেখযোগ্য। কালক্রমের দিক থেকে মগেরে মন্দির মন্দির বোধকরি ব্রহ্মাবরদ-মন্দির। লাল ইট দিয়ে তৈরি এই মন্দিরের দেওয়ালে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি বেমন উৎকর্ষ আছে, তেমন আছে থানার-মহাভারতের বহু উপাখ্যানের প্রতিচ্ছবি। শেওড়ামন্দির জমিদার হরিচন্দ্র রাইচৌধুরী এই মন্দিরটি তৈরি করিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। ‘গুপ্তিপাড়ার মঠ’ নামেই এর সবদিক পরিচয়। চৈতন্যদেবের মন্দিরটি আকারে সবচেয়ে ছোট হ’লেও, এর সঙ্গে বাঁকুড়ার কোড়-বাগার আশ্রয়শিল্পের বেশ একটা মিল আছে। রাধাবরদের মন্দিরটিও আশ্রয়শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। রাস ও লোল উপলক্ষে গুপ্তিপাড়ার বিশেষ উৎসবের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সংস্কৃত-শিক্ষার অন্ততম কেন্দ্র হিসাবেও গুপ্তিপাড়ার প্রতিষ্ঠা ছিল একসময়। বাংলাদেশের সর্বজনীন বা বায়োরাবী পুজার প্রচলন নাকি সবপ্রথম এই গুপ্তিপাড়াতেই হয়—১১২- খ্রীষ্টাব্দে। বলাগড় পঞ্চমুখী-আশ্রয়ন একটি চৌধুরীর আছে। বলাগড়পাশী নামেই এর প্রতিষ্ঠা। এই মন্দিরের কারুকাজও দেখবার মতো। এখানকার রাধাশোভিনী-মন্দিরও অন্ততম দর্শনীয় স্থান।



ইংরেজ আমলের স্মারিক স্থাপত্য—বর্তমানে হুঁচড়া সদর হস্তর

বাংলাদেশ বা বঙ্গবাসী হুগলি জেলার আর-একটি প্রাচীন স্থান। গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড ধরে মোটরে, অথবা বায়েল কামেন থেকে বারহাতিয়া পূর্ণ রেলপথে এখানে বাওয়া যায়। বায়েল থেকে বাংলাবড়ের দূরত্ব মাত্র তিন মাইল। এখানকার রাজচৌধুরী জমিদার-বংশ খুবই প্রাচীন। রাধেশ্বর রাজচৌধুরী ছিলেন এই বংশের আদিপুরুষ। সম্রাট ঔরংজেবের কাছ থেকে তিনি 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। বাংলাবড়ের রাজবাড়ি গড়-খেঁটিত। সেই গড়ের মধ্যেই রয়েছে কয়েকটি মন্দির, যার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো হংলেশ্বরী-মন্দির। এর সম্মুখ মন্দির বাংলাবংশে আর নাই। মন্দিরটি ছয়তলা ও তেরোটি চুড়া সমন্বিত : উচ্চতার ৭০ ফুট। এই মন্দিরের স্থাপত্যশিল্পের সঙ্গে রাজাশায়ী মন্দির-স্থাপত্যের বেশ মিল আছে। বাংলাবড়ের রাজা বুদ্ধিৎ দেব এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু, তিনি এই মন্দিরটি সম্পূর্ণ করিয়ে যেতে পারেননি। তাঁর স্ত্রী জানী শঙ্করীদেবীর উত্তোষেই মন্দির-নির্মাণের কাজ শেষ হয় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে। মন্দিরে অধিষ্ঠিত হংলেশ্বরী-দেবীমূর্তিটি নিম্নকর্তে তৈরি, বর্ষ বীল। আর, শবরূপী শিবের নাভিস্থলের উপরে বসে রয়েছেন

দেবী হংলেশ্বরী। মন্দিরের সমুখ-দিককার বারান্দার কারুকাজ-করা বারোটি বিলনে আছে। বাংলাবড়তে আরও অনেক মন্দির আছে। সবচেয়ে প্রাচীন বাহুবংশ-মন্দির নির্মিত হয় ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে। এই মন্দিরের ছাদে রয়েছে একটি বড় গম্বুজ; আর, সমুখ-দিককার প্রাচীরের গায়ে উৎকীর্ণ রয়েছে পৌরাণিক বহু উপাখ্যান। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় অত্যন্ত কৈশ্র হিংলেশ্বর বংশবাসীর একসময় প্রতিষ্ঠা ছিল।

শবর-শবর হুঁচড়া-হুগলির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পুরানো আমলের বহু স্মৃতি। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে পোড়শীজগা মোগল-সৈন্যদের হাতে পরাজিত হ'লে, এখানকার বাগিচা-ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করে ওলন্দাজ বণিকেরা। ওলন্দাজেরা অবশ্য ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই সম্রাট জাহাঙ্গীরের দলব দ্বিগে এখানে ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। সেকালে হুঁচড়া ছিল 'সরকার সাতগাঁ'-র অন্তর্গত 'আবলা'-পরগনার অর্ধাৎ একটি গ্রাম। 'কুলিহাটা' নামে ছিল এর পরিচয়। পরে নাম হয় 'ধরমপুর'। হুঁচড়া নামটি যে গ্রিক হবে থেকে এবং কি ভাবে হলো সে-বিষয়ে সঠিক কোনো হাশিম পাওয়া যায় না। অনেকে অনুমান

করেন, গুলশাক্ষরী এই-আরগার নাম দিয়েছিল 'চিনগ্রা'। আর, তা থেকেই অঙ্গগ্রন্থ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে 'চুঁচুড়া'। ১৮-শ শতাব্দীর শেষার্শ্বে গুলশাক্ষরী এখানে 'ফোর্ট গ্যাস্টেভিস' নামে একটি দুর্গ তৈরি করে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা চুঁচুড়া অধিকার করে সেই দুর্গ ভেঙে ফেলে, এবং তৈরি করে বিরাট একটা মিলিটারী ব্যারাক, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের কোনো সময়। এই ব্যারাককে হাজার-বানেক সৈন্য অনাবাসেই একসঙ্গে বাস করতে পারতো। সম্ভবতো। এটাই বাংলাদেশের দীর্ঘতম অট্টালিকা। বর্তমানে এই ব্যারাক-বাড়িতেই রয়েছে বর্ধমান-বিভাগের কমিশনারের অফিস, এবং হুগলির ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের দপ্তর ও আবাসভা। চুঁচুড়ার অস্তিত্ব ভ্রষ্টবোধ মধ্যে রয়েছে ১৩২১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি আর্চেনিয়ান গির্জা, ১৮-শ শতকের মাকামারি তৈরি একটি গুলশাক্ষ গির্জা, এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রোমান-ক্যাথলিকদের একটি গির্জা। আর রয়েছে—হুগলি মহম্মন কলেজ ও এওবর-জীউর মন্দির। সাহিত্যস্রোতি বহিঃমস্ত ছিলেন মহম্মন কলেজের অস্তিত্ব ছাড়া। চুঁচুড়া শহরের এক মাইলের মধ্যেই হুগলি শহর। হুগলির ঐতিহাসিক এপ্রিভি সম্পদ গোড়াতেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানেই রয়েছে হাজী মহম্মদ মহম্মনের মসজিদ ইমামবাড়া। স্থাপত্যশিল্পের দিক থেকে এই বিরাট অট্টালিকাটি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর গম্বুজ প্রাণ আশি কুট উঁচু। কোয়ারনের বহু মোক উৎকর্ষ রয়েছে ইমামবাড়ার বেওম্বালে বেওম্বালে। যত্নবোধ সময় এখানে বড় একটা মেলা পড়ে।

হুগলি-শহরের এক মাইলের মধ্যেই ব্যাঙেল। ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দে পোতুগীজরা এখানে একটি দিভা স্থাপন করে। অনেকের মতে, এই দিভাটিই বাংলা-দেশের আদি গির্জা। স্থাপত্যশিল্পের চমৎকার নিদর্শন এটি। বালক বীণ ও বাতা মেঘীর মূর্তি রয়েছে গির্জার মধ্যে। বৃহৎবিগ্রহে এই দিভা বার বার ভেঙে পড়ে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় মোগল-পোতুগীজের যুদ্ধের সময়। দা জুল নামে জনৈক পানবি ১৮-শ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতবর্ষ ও সিংহলের খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে গির্জাটির সংস্কার-সাধন করেন, এবং ছারিয়ে-বাঙা মূর্তিগুলির পুনরুদ্ধার করেন। ব্যাঙেল-স্টেশনের পশ্চিমে প্রায় হু'মাইল দূরে দেবানন্দপুর গ্রাম।

বাংলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রী ও সাহিত্যস্রোতীদের কাছে এটি একটি তীর্থস্থান। কারণ, ভারতগার ভারতচন্দ্রের অস্থায়ী বাসগার ছিল এই গ্রামে; আর, সাহিত্যচর্চা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান এই দেবানন্দপুর। সম্ভ্রান্তি এখানে যে 'শরৎ স্মৃতিমন্দির'টি নির্মিত হয়েছে, প্রত্যেক বছর সেখানে শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে সাহিত্য-সভা বসে ও বহু সাহিত্যিকের সমাগম হয়।

ভগলি তথা বাংলাদেশের ইতিহাসে খ্রীসামপুর একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই খ্রীসামপুরের কাছে আমরা বহু ভাবে দ্বন্দ্বী। দে-দশ কণের কথা এই প্রবন্ধের মস্তর উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বহু বিশেষী সম্ভ্রাধ, বিশেষ করে মিশনারীরা আশিষ্টতা করে গেছেন। তার মধ্যে দিনেমার ও ইংরেজ-ই প্রধান। এখানকার ত্রৈয্য স্থানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—খ্রীষ্টানদের সমাধিক্ষেত্র, খ্রীসামপুর বসেল, সেন্ট ওয়াল্ড গির্জা, চ্যাপার প্রাচীন শ্রীতলা-মন্দির, বরতপুত্রের রাধাবল্লভ-মন্দির প্রভৃতি। সমাধিক্ষেত্রে রয়েছে কেরি, মার্শমান ও ওয়ার্ডের সমাধি, অর্থাৎ যে তিনজন মিশনারীর কাছে আমরা শিক্ষা ও সাহিত্যের দিক থেকে বিশেষ দ্বন্দ্বী। বরতপুত্রের রাধা-বল্লভের বিগ্রহটি ভাঙাশিল্পের চমৎকার এক নিদর্শন।



হুগলি ইমামবাড়া

এই জেলার অন্তর্গত জায়গার কেবলই যতো আরও বহু জিনিষ রয়েছে। যেমন—তারেকমন্ডের মন্দির ও শিখপুকুর, খানাবুলের ঘাটের দিঘ, চণ্ডীতলায় চণ্ডী, কোকিলের ছাদপ শিবমন্দির, জেজুরের রানীচা-পুকুর, বৈষ্ণবজীর ভট্টকালী, ভৈরবেরেৎ স্বয়মুণ্ডিক, পেড়ড়াহুদির নিম্নাবিলী কালীমন্দির ও ইতালীর খাগতারাতিতে নির্মিত উত্তরপাড়ার প্রাচীন জয়াসার। আর সেই সঙ্গে বলতে হয় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চন্দ্রনগরের কথা। শাংরা বালাদেশ এখন ইংরেজ-শাসনের অধীন, তখন সেই বাংলাদেশেরই অন্তর্গত চন্দ্রনগর ফরাসী-শাসনের অধীনে রচনা করে চলেছিল স্বতন্ত্র এক ঐতিহ্য। চন্দ্রনগর নামের প্রথম উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২১-এ নভেম্বর মার্টিন সেলাক্ ও শেলু-এর স্বাক্ষর-করা প্রদানকার ইতিহাসকে লেখা একখানা চিঠিতে। কলিকাতা মহানগরী যেনে হুদানটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নিয়ে গড়ে উঠেছিল, সেটিরকম চন্দ্রনগর শহরও গড়ে ওঠে বোঝা-কিষণপুর, বলিখানী ও গোয়ালপাড়া এই তিনটি গ্রাম নিয়ে। চন্দ্রনগর নামের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক করে কিছু জানা যায় না। কেউ বলেন, চন্দ্রনগর থেকে চন্দ্রন-গর; আবার কেউ বলেন, চন্দ্র-কারের নাম থেকেই চন্দ্রনগর নামের উৎপত্তি। চন্দ্রনগর শহরের কোল ঘেঁষে হগলি বা ভাটবরী অনেকটা প্রকলার মতোই বেঁকে গেছে। সেই হিসেবে একশব্দে চন্দ্রনগর নাম থাকা সম্ভব। আবার, সেকালে এখান থেকে যে প্রচুর পরিমাণে চন্দ্রন-কারী রত্নানি হ'তো, তাইও প্রমাণ আছে ইতিহাসের পাতায়। কারেই চন্দ্রন-কারের দ্বারগা হিসেবে এই জায়গার নাম চন্দ্রনগর হওয়াও সম্ভব। ফরাসীরা সর্বপ্রথম চন্দ্রনগরে তথা বাংলাদেশে আসে ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে। সে-বছর ফরাসী-অধিনায়ক দ্বন্দ্রে তখনকার বাংলার নবাব ইব্রাহিম খাঁর অসুস্থতি নিয়ে চন্দ্রনগর শহরের উক্তদেশে ভাগদাঙার একটি কুঠি তৈরি করান। বছর তিনেক পরে সেই কুঠি ছোটখাটো একটা গড়ে পরিণত হয়। কিন্তু, ফরাসীরা এ-সময় হয় ওগলকাদের দ্বারা বিচ্যুতিত হয়, নয়তো নিজেরাই নানা অসুবিধা দেখে চন্দ্রনগর ত্যাগ করে। কিন্তু ফরাসীরা ব্যবসায়িকভাবে আবার এ-জায়গার আসে ১১-শ শতকের শেষার্ধ্বে। সে-সময় তাদের অধিনায়ক ছিলেন সেলাক্। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ফরাসী-চন্দ্রনগরের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৭৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রনগর-শহর বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে পরিণত দ্বারা বেষ্টিত হয়। সেকালে

নিম্নে ও ব্যবসায়ের চন্দ্রনগর বাংলাদেশের সমস্ত বৈদেশিক উপনিবেশের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছিল। সে-সময় বঙ্গোয়া, চীন, শেত, পারস্য, তিস্ত, জেজো প্রভৃতির সঙ্গে ছিল এর বাণিজ্যিক সম্বন্ধ। এমন কি, কলিকাতার চেয়েও বড় ব্যবসায়-কেন্দ্র ছিল চন্দ্রনগর। সেকালে কুঠিরনিম্নে বিশ্বব্রহ্মের উন্নতি করেছিল এই জায়গা, বিশেষ করে উন্নতিশিল্পে। বহু বিখ্যাত ও কৃতী বাঙালীর জন্মি বহন করছে এই চন্দ্রনগর। রায়গোপাল ভাটচন্দ্রের কবিত্রিভাট্টা বিকাশপাণ্ডের সুযোগ পেয়েছিল এখান থেকেই। ভূষেনচন্দ্রের কর্মজীবনের স্বরূপত হই এখানে। জায়ন্তের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসেও চন্দ্রনগরের বিশেষ একটা স্থান আছে। কারণ, সেই স্বদেশী যুগে বিদ্রোহী কর্মীদের একটা প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল ফরাসী-চন্দ্রনগর। বিদ্রোহী-নেতা বিতালার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এখানকার প্রবর্তক-সম্ম দ্বারিহিত। বিদ্রোহী-কর্মী নরেন এখানকার অধিবাসী, শহীদ কানাইলাল জয়দেবের জন্ম এখানে, আর দাসবিহারী বহু এখানেই চারজীবন অতিবাহিত করেন। জায়ন্তবর্ষ স্বাধীন হবার পরেই চন্দ্রনগরের অধিবাসীরা ফরাসী-শাসনের অবসান-কামনার শুরু করেন এক মুক্তি-আন্দোলন। সেব পর্যন্ত, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে ফরাসী-সরকার চন্দ্রনগরকে ভারত-সরকারের হাতে ফরাসী স্বাধীনতা করেন। কিন্তু আইন-সম্মত হওয়ার পরেও কাজটি সম্পূর্ণ হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি, এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল চন্দ্রনগরের ফরাসী কর্তৃত্ব ভারত-সরকারের হাতে দেবার চুক্তি ফরাসী কাজী-পরিষদ বা পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ঐ বছরের ৩০-এ জুন ভারত-সরকারের একজন প্রতিনিধি চন্দ্রনগরের শাসনভার গ্রহণ করেন। তার পর, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর চন্দ্রনগর আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর, সেই সঙ্গে শ্রীহরপুর মহকুমার চারটি থানা সমেত চন্দ্রনগর শহরকে নিয়ে হগলি জেলার অধীনে গঠিত হয় চন্দ্রনগর-মহকুমা। এখানকার পুরাতত্ত্বের মধ্যে দর্শনীয় হলো মন্ডলালের মন্দির, বোড়াইচটী, শশলুকা ও ভূষেনবরী দেবীর মন্দির, তাতিং-ধানার বাগানে ওলন্দাজ-গির্জার ক্ষণোদ্যম, গঙ্গার তীরে কনভেন্ট-সলের গির্জা ও দামদীঘি। ভূপ্রে কসেজ, চন্দ্রনগর-গ্রন্থাগার, আর নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরও এখানকার তিনটি ভূটীয়া স্থান।

বালাদেশের বহু কৃতী সন্তান ও দেশবন্দেয়া পুঙ্খ কল্পগ্রহণ করেছেন হগলি জেলায়। আদ্যাব্যাপ মহকুমায়

খানাকুল খান। থেকে মাইল দুই দূরে কান্দা-খারকেশ্বর নদের
এপারে ককনগর, ওপারে রাধানগর। এই রাধানগরেই
১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে অশ্বগ্রহণ করেন রাজা রামমোহন দাস।
ভূরহুট গ্রামে আবির্ভূত হয়েছিলেন রায়গুণাকর কবি
ভারতচন্দ্র দাস। আর, দানবীর হাকী মহেশ্বর মহশীও
অশ্বগ্রহণ করেন এই জেলার সদর হুঁচুড়া-নগরে, ১৭৩০
খ্রীষ্টাব্দে। গুণাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ
হ'য়ে আছে আরামবাগ মহকুমার এক বৃহৎ পল্লী কামার-
পুকুর। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর যে-সময় অশ্বগ্রহণ
করেন সেই ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে বীরসিংহ গ্রামও নাকি হুগলি
জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী শ্রীমা
সারদামণির জন্মস্থলে জহরদেবাটীও ছিল হুগলি জেলার
অধীন। অত্যন্ত যে-সব কৃতী সন্তান এই জেলায়
জন্মগ্রহণ করে এর গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, তাঁদের মধ্যে
সহজেই মনে পড়ে—পণ্ডিত ভগদাস তর্কপঞ্চানন (ত্রিবেণী),
দানবীর সৌদী পেন (বাণি), কবিদ্বয় রামনিধি দাস
(শাওরা), বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র (পানিশেওলা),
'অঙ্গোলের গরের হুলাল'-রচয়িতা গ্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে
টেকচাঁদ ঠাকুর (পানিশেওলা), সাহিত্যিক অশ্বচন্দ্র
দরকার (হুঁচুড়া), 'সত্য প্রমথচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(উত্তরপাড়া), 'সত্য তারকনাথ পালিত (অমরপুর),
হুগলিপ্রাণ মল্লিক (সিঁহুর), বিচারপতি সৈয়দ আখির
আলী (হুঁচুড়া), 'সত্য বেৎপ্রাণ সর্বাধিকারী (বানাকুল-
ককনগর), বিখ্যাত বক্তা ও ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক প্রতাপচন্দ্র
মজুমদার (বানবেড়ে), রাজা দিগম্বর মিত্র (কোয়গর),
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল দরকার ও বিখ্যাত বাম্বী রামমোহন
বোষ (বাঘাটি), ডাক্তার হুগলিচন্দ্র সর্বাধিকারী (ভূরহুট-
বামনপাড়া), বিচারপতি দারকানাথ মিত্র (আগুনসি),
জরকৃষ্ণ মণ্ডোপাধ্যায় ও শেরশীমোহন মণ্ডোপাধ্যায় (উত্তর-
পাড়া), শেখবেতা ভূপেন্দ্রনাথ বসু (বানাকুল-ককনগর),



বামনকুন্ডের এই পল্লীতেই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয়।
কান্দা-খার এই হুজীরে সত্যের-স্মরণ হ'য়ে আসে।

সাহিত্যিক ও সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু (বৈকাল), কবি
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (গুলিটা), সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের
নিবচন বেৎ ও পলিভূষণ চট্টোপাধ্যায় (কোয়গর), সাহিত্যিক
প্রভাতকুমার মণ্ডোপাধ্যায় (গুপ্তিপাড়া), ব্রহ্মবাহুব
উপাধ্যায় (খতান), সাহিত্যচর্চা শব্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(দেবানন্দপুর), কলিকাতা ও চক্কননগরের ইতিহাস-
রচয়িতা হরিহর শেঠী (চক্কননগর) প্রকৃতির নাম। তাছাড়া,
বক্সিজন্ডের সৈতুক বাসুদান হ'লো এই জেলার শেখদু গ্রাম,
আওতাধ মণ্ডোপাধ্যায়ের সৈতুক বাসুদুই যেমন জিহাট।

পরিপাটি মুদ্রণ

আর

নিখুঁত ব্রহ্ম-তৈরির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

॥ কালার স্টুডিও ॥

৪২, মহেন্দ্র দোবাশী লেন, কলিকাতা ৩

ফোন : ৫৫-৪৬০৭



। বাঘা বতীন ।

[লেখক : শতীনন্দন রায়শাহা । প্রকাশক : দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান আলোয়ামেন্ট প্রাইভেট কোম্পানি লিমিটেড, ১০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ । মূল্য : দুটাকা দশমো অর্থাৎ ১।০০]

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার জীবন ক্ষুণ্ণতার মতো চিরকাল প্রোঞ্চল হয়ে থাকলে, বাঘা বতীন তাঁদের অঙ্গতম। বংগালী বিপ্লবী-বীর বতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-ই বাঙালীর কাছে তাঁর সাহস ও শৌর্ষের জন্য 'বাঘা বতীন' নামে পরিচিত। ১৯১৫ সালের ১ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় বিপ্লবের এই বহুনায়েক হয়ে ছত্রিশবর্ষ বয়সে বেহরকা করেছেন। বাংলার প্রথম যখন বিপ্লবের রক্তক্ষয় হুটে উঠল, সেই রক্তক্ষয় দেশ-মাতৃকার পুত্রের অর্ঘ্য দেবার দীক্ষা নিয়েছিলেন বতীন্দ্রনাথ। ইংরেজী ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৫ সাল এবং বিশেষভাবে ১৯১০ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত বতীন্দ্রনাথ সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক নেতা হিসেবে কাজ করেন। তাঁর সংগঠন-কর্মজাতা ছিল অনন্তসাম্যবাদ; বহির্ভারতের বিশ্বব্যাপী এক বিরাট বৈপ্লবিক এজেন্ডা গড়ে তুলে ভারতকে বিদেশীর শৃঙ্খলমুক্ত করবার জন্য তিনি যা করেছেন, তা অতুলনীয় এবং স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁর নাম অনিশ্চরিত হবার ব্যোধ্য। বতীন্দ্রনাথের পূর্বে ইংরেজশক্তির বিরুদ্ধে সমুদ্র-বৃহৎ এমনভাবে আর কেহ অগ্রসর হন নাই। উড়িষ্যা-বালেশ্বরের নিকটবর্তী বুড়ীবালায় নবীর তীরে বতীন্দ্রনাথ ইংরেজ-বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি হুছে যে সংগ্রাম-কৌশল দেখিয়ে গেছেন, তা বুড়ীবালায়ের তীরকে ভারতের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছে। একবিধে তিনশত হাতিকেশ-বাহী সৈন্য আর অস্ত্রবিকে ধরাশিরা করলে রাইচাঁও বেড়া। তাঁরা পালানোর পরতেন : কিন্তু অসমসাহসী বতীন্দ্রনাথ এই হুছে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করলেন; তাই বুড়ীবালায়ের তীরে নির্ধাণের পূর্বে নিজেকে আঙতির সমিধরূপে গঠন করলেন তিনি। মুক্তি-সংগ্রামের এই হুছে প্রেরণা দিয়েছিল সমগ্র জাতিকে, এবং পরবর্তীকালের সকল বিপ্লবীকেও। এই বিপ্লব-জ্ঞান জীবন উপভাসের মতোই চিত্তাকর্ষক, মহান ও

কৌতূহলপ্রণ। লেখক বর পরিচয় করে নানা ভাবে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। বিশেষ করে, মাতুলুল থেকে একই বংশের লজ্জান হওবার, বতীন্দ্রনাথের বালাজীবনের ও পারিবারিক জীবনের ঘটনাপঞ্জী সংগ্রহ করা লেখকের গুরুত্বপূর্ণ সাধনা হয়েছিল। লেখক নিজের বিপ্লবী বংশধরসেবী ছিলেন; তাঁর ত্রিশবর্ষব্যাপী 'বংশী জীবন' লেখক বর বিপ্লবীর সংশ্লিষ্ট ও সাক্ষিগত করেছেন। 'বাঘা বতীন'-সম্পাদনার তাঁর এই ত্রিশবর্ষের অভিজ্ঞতাও কাজ দিয়েছে। বতীন্দ্রনাথের বালাজীবনের অনেক ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী, এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের গ্রন্থ সকলেই লেখকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। লেখক বতীন্দ্রনাথের বালা ও কৈশোর জীবনের যে-সকল ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন, তাহা বতীন্দ্রনাথের বিপ্লবী-জীবনের ঘটনাবলী ও কাহিনী অপেক্ষা কম মহিমান্বিত নহে। এই গ্রন্থে বতীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষের পরিচয় থেকে আরম্ভ করে তাঁর সমগ্র জীবনের কথা অতি স্বন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন গ্রন্থকার। বালাকাল, কৈশোর, যৌবন, কল্যাণ জীবন, বিপ্লব-দীক্ষা, বীর বাঙালিকর, বিপ্লবী জীবন, ও বুড়ীবালায়ের তীরে নামক আটটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

লেখক শতীনন্দনমুখোপাধ্যায় 'বাঘা বতীন' শুধু বতীন্দ্রনাথের জীবনকথা নয়,—বাংলার তথা ভারতের বিপ্লব-যুগের এক যমোদয় আলোচনা করেন তিনি বাঙালীর মহা উপকার করেছেন। তাঁর রচনা সরসতা ও সাবলীলতার সার্থক হয়ে উঠেছে। গ্রন্থবানিতে তিনখানি আলোকচিত্র রয়েছে—একখানি বতীন্দ্রনাথের যৌবনের, দ্বিতীয়খানি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও তদ্বিনী-সহ, তৃতীয়খানি বালায় হাঙ্গামাতালে অস্ত্রধারণে।

ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট স্বন্দর। বাংলার ঘরে ঘরে 'বাঘা বতীন' তরুণ-তরুণীদের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবে—নিঃসংশয়।

—ঈশ্বরকান্ত শর্মা

The Press, Publications and Copyright Laws of India

[Author : P. K. Sen, LL. B. Publisher : M. C. Sarkar & Sons Private Ltd. :
14, Bankim Chatterjee Street, Calcutta 12. Pages : 131. Price : 3'00]

স্বাধীনতা-লাভের পর হইতে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র সম্বন্ধে বহু নতুন নতুন আইন হইয়াছে এবং পূর্বকার আইনের বহু সংশোধন হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইসব আইনের সংশোধিত আকারের সরকারী ছাপা বই পাওয়া যায় না। হেক্টিংস স্ট্রীটে সরকারী বইয়ের সেকানে বাইলে একটিমাত্র কথা শুনিতে পাওয়া যায়—১৫ দিন বাবে আসিবে; দিল্লী থেকে বই এখনও আসে নাই। স্মৃতি নতুন কপিরাইট আইন অথবা কপিরাইটের ক্লক বা নিয়মাবলী প্রস্তুত হইল। কলিকাতায় আসিল যাত্র ১০ বারি কপি। কোনো কোনো ভাগ্যবান কিনিতে পারিলেন—বিশিষ্টাঙ্গ অমাবসের মতো হতভাগ্যদের হলে পড়িলেন। কপিরাইট তো ছোট কথা, এমন যে 'হিন্দু উত্তরাধিকার আইন' পাস হইল—বাহার কল ছেলে-মেয়েতে বাসের বিবাহ পাইবে—সেই আইন-পুস্তকও, আইন বলবৎ হইবার মাস দুই পরে কলিকাতার সরকারী বিরূপশালায় আসিল। পশ্চিমবঙ্গ রাইসেলিং বোর্ডের কোনো সদস্য 'Indian Electricity Rules, 1956' ছয় মাস ধরিয়া ভেটী করিয়াও কিনিতে পারেন নাই। ইহার হিন্দী অর্থবাণ পাওয়া যায়; তাহাও আবার এমন চমৎকার ভাষায় লিখিত যে, তাহার দ্বি-বোকা হিন্দী-ভাষা-ভাবীদের পক্ষেও দুঃসাধ্য; অ-হিন্দী-ভাষা-ভাবীদের কথা ছাড়িয়া লিখায়।

প্রকাশক কতকগুলি ছাপাখানা, প্রকাশন সংক্রান্ত আইন ও নিয়মাবলী ছাপাইয়া জনসাধারণের পক্ষে উপকার করিয়াছেন। এক্ষেত্রে অনেকগুলি আইন পাওয়া যায় এবং সুবিধা হইয়াছে। আসাচো বইখানিতে নিম্নলিখিত আইন-কানুনগুলি পাওয়া যায় :

1. Press and Registration of Books Act, 25 of 1867
2. Registration of Newspapers (Central Rules)

3. Parliamentary Proceedings (Protection of Publication, Act, 24 of 1956
4. Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Act, 27 of 1951
5. Newspapers (Price and Page) Act, 45 of 1956
6. Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 45 of 1955
7. —Do— Rules
8. Prize Competitions Act, 42 of 1955
9. Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 21 of 1954
10. —Do— Rules
11. Young Persons (Harmful Publications) Act, 93 of 1956
12. Copyright Act, 14 of 1957

আমাদের মতে আরও দুই-একটি আইন ও কতিপয় আইনের আবশ্যকীয় বিধানসমূহ (extracts) দিলে বইখানি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইত। যেমন—পশ্চিমবঙ্গের Undesirable Advertisements (Control) Act, 29 of 1948 ও Rules, Indian Post Office Act-এর কয়েকটি ধারা—বাহ্যতে, কি করিলে আর মাতুলে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রাদি পাঠানো যায়—ইত্যাদি।

বইখানির ছাপা পরিবার। বঙ্গবন্ধু মেমোরি, তাহাতে আইনের বিধানসমূহের মধ্যে কোনো ছাপার ত্রুটি পাই নাই। প্রকাশক যদি আইনের সংশোধনগুলি ও বিভিন্ন আইন অঙ্গসারে প্রচারিত নিয়মাবলী ও Notificationগুলি—যেমন—Copyright Rulesগুলি ক্রোড়পত্র হিসাবে মধ্যে মধ্যে ছাপেন তাহা জনসাধারণের বহু উপকার হয়।

ঈশ্বরকৃষ্ণদাস রায়

মঞ্চ-দর্শা

চিত্রলোক

পঞ্চনাত

ও আমার দেশের মাটি

প্রযোজনা: মুভিটেক-এর লকে অপরেশ লাহিড়ী ও সংগোষ্ঠার মাঝে। কাহিনী: কলী সরকার। সঙ্গীত-পরিচালনা: অপরেশ লাহিড়ী। চিত্রনাট্য: সাধুলাল ও পরিচালনা: পবিত্রকুমার। চরিত্র-চিত্রণ: জীবনকুমার, ছবি বিশাল, পাহাড়ী পাল্লাল, রবীন্দ্র মজুমদার, রসরাজ চক্রবর্তী, শীলক মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ডি. জি., মানসী সেন, পদ্মা দেবী, অপরূপা দেবী, নমিতা সিংহ, শিল্পা সাহা এবং আরো অনেকে।

কোনো দেশের ও জাতির প্রাণসংশয় হচ্ছে তার লোকসংগীত। এই লোকসংগীতকে বাঁচিয়ে রাখা পল্লীর মনুষ্যেরা। যে কোনো আন্দোলন-উৎসবকে উন্নয়ন-সুপ্রতিষ্ঠা করে তুলবার ক্ষমতা সব সময়েই এরোজন হয় লোকসংগীতের। পৃথিবীর সব দেশেই আছে লোকসংগীতের প্রচলন, এবং একই মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে সব দেশের লোকসংগীতের মধ্যে একটি মূলগত ঐক্যের স্রব জন্মিত হচ্ছে। এই ধারা আত্মকেন্দ্রের দ্বিধার তথাকথিত আন্তর্জাতিক সম্মতি ও শান্তির বাণী চমক-নিবাহিত হবার বহুকাল আগে থেকে চলে আসছে। সব দেশেরই যেমনতী মানুষেরা তাদের শ্রম লাভ্য করবার প্রচেষ্টার গান গায়। সব দেশেই রয়েছে মূবশাভানী গান গেয়ে দুই ডেকে আনে অশান্ত বোকোর চোখে। সব দেশেই পালা-গার্বনে সবেলক গানে দশা মিলিয়ে ঘের সবকোষ জনবগলী। তাই ভগ্না নগীর মাঝির গলায় প্রতিজ্ঞা হতে দেখা যায় গ্রাম-বাংলার ভাঙিবাণী স্রব। আর এই লোকসংগীতের মধ্য দিয়েই উচ্চাঙ্গ-সংগীতের আদি মহত্ত্বের সম্মান পাওয়া যায়।

‘ও আমার দেশের মাটি’ ছবিটির কাহিনীসূত্রও বাঁধা হয়েছে উপরিউক্ত অর্থজিৎসাকে ভিত্তি করে। শহরের নামকরা গায়ের অল্প তার গুরুদেবের কাছে মার্গ-সংগীতের

সাধনা করতে করতে পথপরিষ্কারের এক বাড়লের মুখে সেই সূর্যই প্রতিজ্ঞা হতে দেখে অবাক হোলো। তার পর গুরুদেবের প্রেরণায় পে বাহা করলো গ্রাম-পরিষ্কার লোকসংগীতের মধ্যে মার্গ-সংগীতের উৎস খুঁজে বার করতে। পছন্দমতো সে সংগ্রহ করলো বহু লোকসংগীত, যা বহুকাল ধরে আউল বাড়ল এবং কেন্দ্রের চাবী আর নগীর মাঝিরা গেয়ে আসছে। ছায়া-ঘেরা শান্তি-অনিবিত্ত এক গ্রাম তাকে মায়ার বাঁধনে বাঁধলো। গ্রামের বোড়াল তাকে দিলো আশ্রয়। বোড়ালের ভাইবো পল্লর মিটি গলা তখন অল্প বিমোহিত হোলো। ইতোমধ্যেই গ্রামের লোকদের কাছে গায়ক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে অল্প। গানেরই মধ্য দিয়ে সে আর পল্লর কাছাকাছি এলো হুজনে। এক আছড়ালা মুহূর্তে আকাশের ঠাঁয়ে আর নগীর জলকে সাক্ষী রেখে পল্লরকে গানের রেকর্ড করবার প্রতিজ্ঞা দিলো অল্প। কিন্তু নিয়তির বিধানে তা কাজে পরিণত করার সুযোগ তার হোলো না। গ্রামীণ রাজনীতির কুটিল আবর্ত থেকে মুক্তি পেতে আর পল্লরকে লোকসংগীত হাত থেকে রক্ষা করতে গ্রাম ছাড়তে হোলো তাকে। তারপর মাটিকীর ঘটনার মধ্য দিয়ে আবার পল্লর সঙ্গে বিলন হোলো তার। পল্লর দিয়ে গেলে তার শৈশবে-হারিয়ে-বাওয়া পিতাকে।

ছবিটিতে লোকসংগীতের গুণের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বহু নামকরা নেপথ্য-সংগীতের গায়ক-গায়িকার সঙ্গীত কণ্ঠসংগীত এটি অসম্ভব। কৃত্রিম প্রাকৃতিক স্রবের পারিশ্রমিক থেকে মুক্ত এই ছবিটির মধ্যে গ্রাম-বাংলার নিখুঁত রূপটি কৃষ্টি উঠেছে। এর অল্প আলোকচিত্রকর প্রশংসার দাবি করতে পারেন। বহিঃসুন্দ-প্রধান ছবিটি আরো উপভোগ্য হোতো, যদি এর কাহিনীর উপর কিছুটা অন্তত গুরু দেওয়া হোতো। কাহিনীর অসামঞ্জস্য এবং

অবশ্যবতার হাত থেকে রেহাট পেলে ছবিখানি বাংলা-চিত্রকর্ষকের উল্লেখযোগ্য সম্পদ হোতো। কিন্তু সঙ্গীতের উপর অতি প্রাধান্য দেওয়ার ফলে রশোভী হওয়ার সহজ সুযোগ হারিয়েছে 'ও আমার দেশের মাটি'। আর এ ছবির বিরুদ্ধে সব থেকে বড়ো অভিযোগ এই যে, ভূগোল হাজারিকা পরিচালিত অসমীয়া 'এয়া বাটর গুৱা' ছবির সুষ্পষ্ট ছাপ এতে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তার প্রমাণও এখানে কাহিনীর বৈশিষ্ট্য এতে অস্পষ্ট।

কণ্ঠজন নবাগত শিল্পীর সহজ স্বাভাবিক অভিনয় এ ছবির স্বার্থে বাড়িয়েছে। প্রাণের বিষয়, নারক চরিত্রে জীবনমুখার আড়টতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

নারিকার ভূমিকায় মানসী সোম তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সুষ্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। সোমসংগীতের আসল স্বপ্নটি হুটিয়ে তোলার যে-প্রচেষ্টা এই ছবির নির্মাতারা করেছেন তা দক্ষলতা অর্জন করেছে। এবং এই প্রচেষ্টা দর্পক-সাধারণের অভিনয়কে লাভ করবে। কলাকৌশলের বিভিন্ন বিকল্পগুলি যথেষ্ট নির্ভর্য সবে সম্পন্ন করা হয়েছে। কাহিনীর শ্রেষ্ঠ ছবিটিতে হুগরিফুট স্বাক্ষরও, সঙ্গীত গানগুলির ক্ষেত্রে একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তিদাত করতে সক্ষম হয়েছে। লোকসংগীতকে গ্রামীণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে তুলে ধরবার যে প্রচেষ্টা ছবিটিতে দেখা গিয়েছে, তা পরমাংশে সফল হয়েছে বললে অস্বাভাবিক হবে না।

৪. আ গা মী আ ক র্ ধ ন ৪

অভিশাপ

নবাগত এম. সি. প্রোডাকশনের প্রথম ছবি 'অভিশাপ' বর্তমান সমাজ-জীবনের বিভিন্ন সমস্যা এবং সমাধানের উপর নতুন আলোকপাত করবে বলে প্রকাশ। ছবিখানির কাহিনী, চিত্রনাট্য এবং সংলাপ রচনা করেছেন ফাহুদী মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা ও সুবোধোক্তার ভার নিয়েছেন স্বপ্নাক্ষরে বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেবেন মঞ্জু দে, বিকাশ রায়, কাহ্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, জ্যোতি সেন, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, সীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পী।

বালক রানকুক

'সাদেক রামপ্রসাদ' তুলে ধারা নাম করেছিলেন, সেট প্রযোজনা-প্রতিষ্ঠান 'পুণ্যচিত্র' ঐরামকৃষ্ণের নৈশবের কাহিনী অবলম্বন করে একখানি ছবি তুলছেন। 'বালক রামকৃষ্ণ' ছবিখানির নাম, এবং পরিচালকের নাম বশী আশ। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করবেন সৌদামপ্রসাদ বসু এবং সঙ্গীত পরিচালনা করবেন সত্যোম মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে দেখা যাবে মলিনা দেবী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, ডাহরজী দেবী, পদ্মা দেবী, পাখাড়ী সান্তাল, শিশির বিত্র প্রভৃতি শিল্পীকে। পরমপুত্র রামকৃষ্ণের জীবনী নিয়ে বতোগুলি ছবি তোলা হয়েছে, 'বালক রামকৃষ্ণ' সেগুলি থেকে ভিন্নতর হবে বলে আশা করা যায়।

কণ্ঠহার

মহাপীর বিখ্যাত ছোটোগল্প 'নেককেশ' অবলম্বন করে বাংলা ছবি তুলছেন দিলীপ নাগ। প্রযোজনা ও পরিচালনা দুইই হারিহরচন্দ্র বসু করবেন তিনি। ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ছবিখানির মূল আকর্ষণ হবে—এর প্রধান হুটি চরিত্রে হুজিরা সেন ও উত্তমকুমারের অভিনয়। বিভিন্ন চরিত্রে দেখা যাবে বাংলা চিত্রকর্ষকের জনপ্রিয় শিল্পী-গোষ্ঠীকে। রঙ্গকালের মধ্যেই ছবিখানির কাজ শুরু হবে বলে প্রকাশ।

রাণুর কথামালা

বিষয় বলিক প্রোডাকশনের প্রথম ছবি বিদ্যুতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'রাণুর কথামালা' অবলম্বন করে তোলা হবে। ছবিখানির তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন সত্যজিৎ রায়, এবং তাঁরই পূর্বতন সহকারী শৈলেন বসু নিয়েছেন পরিচালনার ভার। প্রধান চরিত্রে রূপ দেবেন উত্তম-কুমার। নারিকার চরিত্র হুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে জটনকা নবাগতকে সুযোগ দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

নাবিক

প্রোব্রজ মিট্রের কাহিনী অবলম্বন করে বীরেন চন্দ্র প্রোডাকশন 'নাবিক' নামে একখানি ছবি তুলবার সিদ্ধান্ত করেছে। 'উত্তরায়ণ' নামের আড়ালে একটি কলারূপী গোষ্ঠী পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। প্রধান ভূমিকায় উত্তমকুমার এবং তাঁর বিপরীতে বোম্বাইয়ের কোনো অভিনেত্রীকে দেখা যাবে।



—কোথায় চলতিছেন ভিডিওগি?

—‘বিশ্ব-গ্রামীণ মহিলা-সম্মেলনে’ যোগ দিতে,—সে তোরা দুকবিনা:

খেলার মেলা



স্থিতির

ফুটবল :

ফুটবল লীগ প্রায় শেষ হতে চলছে। এই বৎসরের মতো তীব্র ত্রিদিনীয় প্রতিযোগিতা—লীগের গত করেক বৎসরের মধ্যে দেখা যায়নি। এবার লীগ-বিজয়ের আশায় মোহনবাগান, ইস্টার্ন রেলওয়ে শোর্টস ও ইস্টবেঙ্গল খুব জোরে প্রতিযোগিতা করছে। এখন পর্যন্ত বতব্বর মনে হয়, রেলওয়ের শোর্টস দলেরই লীগ-বিজয়ের আশা সবচেয়ে বেশী, কারণ তারা এ পর্যন্ত মাত্র ১ গবেট হারিয়েছে। তারপরই হয়েছে মোহনবাগানের হান।

৩১শে জুলাই, ১৯৮৮ তারিখের বেলায় মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলকে ২-১ গোলে পরাজিত করে। এর ফলে ইস্টবেঙ্গল দলের লীগ-চ্যাম্পিয়ন বা রানার্স-আপ হওয়ার আশা তিরোহিত হয়েছে। এই খেলাটি দুর্বল ক্রীড়া-পরিচালনার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যেভাবে রেকফার্ড মোহনবাগানের বিপক্ষে গোলটির সিদ্ধান্ত করেন তা খুবই বিস্ময়কর। মোহনবাগানের একজন পিয়ার্স খেলোয়াড়কে পেলার পর সিজার্স করা, তিনি বলেন,—Indirect free-kick ছিল বলে, তিনি গোলকীপায়কে বলটি ধরতে পারেন করেন। কিন্তু বল গোলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে 'indirect' কথা 'direct' কিং হয়ে গেল, তা কেউ টের-ও পেল না। সে পালকে কভিল করার ক্ষমতা সূত্রান্ত হওয়া মর্মেই বার করে দেওয়া হয়। অনেকের মতে, এটা লম্বা পাশে গুরু দত্ত দেওয়া হয়েছে। বাই বোকে, বলকাতার রেকফার্ড-এ উন্নতি না হলে, খেলার উন্নতি হওয়া শূন্য।

এই ত্রিদিনীয় প্রতিযোগিতায় যদি কেহ মনে করেন যে, বলকাতার ফুটবল-মানের উন্নতি হয়েছে, তবে তাঁরা ভুল করবেন। কারণ খেলার মান যে কোথায় নেমেছে ও নাযবে, তা চিন্তা করে শঙ্কিত হতে হয়। একবার

রেলওয়ে শোর্টস ও নব্যগত ইক্সটার্নাল চাড়া অন্তর্ভুক্ত ফলে উন্নতি তরুণ খেলোয়াড় আর বিশেষ চোখে পড়ে না। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দলে খাড়া ভালো খেলোয়াড়, তাঁরা বেশিরভাগই প্রবীণ। মোহনবাগানের রমন ও ডেভিটন এং ইস্টবেঙ্গলের ধনরাজ ও আবেদের কোরেই, তারা লীগের এই অবস্থায় দাঁকতে পেরেছে। আমরা সবাই জানি যে, এই চারজন খেলোয়াড়দের খেলা অনেকদিন পড়ে গেছে। কিন্তু এখনও যদি তাঁরা তরুণদের অপেক্ষা ভালো খেলেন, তবে এ কথাই মনে হয় যে, আমাদের তরুণ খাড়া ফুটবলের ভবিষ্যৎ, তাঁদের খেলার মান কোথায়! এই ভাবে আরও কিছুদিন চললে বলকাতার ফুটবল এমন জ্বরে নাযবে যে, খেলা হয়ত বন্ধ করে দিতে হতে পারে। কিন্তু এটি পিছরে বিশেষ কারণ নব্বর নেই। আই.এফ.এ.-র বাজেটে ফুটবল-শিক্ষার ব্যাচে কোনো টাকা বরাদ্দ নেই। প্রায় সমস্ত ক্লাবগুলির খেলায় এই একই কথা বাটে। জানি না, তবে তাঁদের এই অসুবিধি হবে, না, শেষ পর্যন্ত সরকারকে এর ভার নিতে হবে। আমাদের আশায় আশায় অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া আর উপায়ই বাকি ৭

টেনিস :

। উইমলডেন টেনিস প্রতিযোগিতা ।

এই বৎসর উইমলডেন টেনিস-প্রতিযোগিতার পুরুষদের দ্বিদিনের ফাইনালে অ্যানলি ফ্লোর (গতবৎসরের ফাইনালে পরাজিত) তাঁরই বয়সভাগী নিল জেক্সট্রে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন। গত কয়েকবৎসর ধরে টেনিসে যে অস্ট্রেলিয়ার আধিপত্য বৃদ্ধি হয়েছে, তা পুরোপুরিই চলছে এবং অল্প ভবিষ্যতে তা আরও বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। মেজম্যান, ব্যাক্সগ্রেগার,

বেঙ্গল ও বেঙ্গল প্রদেশের হয়ে বাঙালী সবেও অস্ট্রেলিয়ার এই প্রতিপত্তি সত্যই বিস্ময়কর। এ থেকে স্পষ্টই বুঝা যায়, তাঁরা প্রতিবেশের নতুন নতুন খেলোয়াড় তাঁরি করতে সক্ষম হচ্ছেন। এটা প্রত্যেক দেশেরই শিক্ষণীয়।

মহিলাদের দিকগুলির কাইনালে গতবারের বিজয়ী নিয়ো-মহিলা দ্বি-আগুণি গিবসন এবারও বিজয়ী হন। তিনি মহিলাদের ডাবলসে ব্রেজিলের দ্বি-ওম, বুঝানোর সহিত, মিলেস ডুপল্ট ও দ্বি-ডানিয়ারকে পরাজিত করে বিদ্রুপ লাভ করেন। কিন্তু মিষ্টি ডাবলস কাইনালে গিবসন ও নিবেলসন দুই অস্ট্রেলিয়ার আগ, চট ও দ্বি-কলানের কাছে পরাজিত হন।

পুরুষদের ডাবলস কাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত দুই কুপার ও ফ্রেন্সের হুইটমেন ডেভিডসন ও স্মিথের কাছে পরাজিত হন।

এবার ভারতের কৃষ্ণান ও নরেশকুমার বেশ ভালোই খেলেছেন। তাঁরা ডাবলস-এর কোয়ার্টার-কাইনালে এবারের বিজয়ী দুই ডেভিডসন ও স্মিথের নিকট তাঁর প্রতিযোগিতা করে পরাজিত হন। দিকগুলি কৃষ্ণান ও বাইরে ইলভের কোয়ার্টার-এর কাছে পরাজিত হন। কৃষ্ণানের খেলার বেশ উন্নতি হয়েছে। কিন্তু বিশেষ শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের মধ্যে গণ্য হ'তে হলে তাঁর তাঁর 'সার্ভিস' করার ক্ষমতা। দুর্বল সার্ভিসের জন্যই কৃষ্ণান বহু খেলার পরাজিত হন। তাঁর সার্ভিসের তীব্রতা বাড়তে পারলে অল্প ভবিষ্যতে কৃষ্ণান পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হতে পারবেন, তাতে সন্দেহ নেই। ভারতের অল্পাঙ্গ খেলোয়াড়রা কেউ বিশেষ সূচিন্দা করতে পারেননি।

ক্রিকেট :

১ টেস্ট খেলা

৩য় টেস্ট ম্যাচে ইংলও নিউজিল্যান্ডকে এক ইনিংসে ও ১১ রানে হারিয়ে 'রাবার' লাভ করেছে। লক ও লেকারের শিন-বোলিং-এর নুখে নিউজিল্যান্ড দলকে খুবই অসুবিধার পড়তে হয়। লক ও লেকার ব্যাকসে ১৭ রানে ১১টি, ও ৪৪ রানে ৮টি উইকেট লাভ করেন। ইংলও দল পর পর তিনটি টেস্ট-ম্যাচে হারিয়ে 'রাবার' লাভ করল। ২য় ইংলও-দলের নুখে দুর্বল নিউজিল্যান্ড-দল তুপের হাডো ডেসে বাঙ্কে প্রত্যেকবার। কি বোলিং কি ব্যাটिंग কোনোদিক দিয়ে এই দুই দলের তুলনাই হয় না।

নিম্নে খেলার ফলাফল দেওয়া হল :

নিউজিল্যান্ড : প্রথম ইনিংস—৬৭ (বিলার—২৬, লেকার—১৭ রানে ৭, লক—১৪ রানে ৪)। দ্বিতীয় ইনিংস—১২২ (ব্যাটসম্যান—৬২, লক—২১ রানে ৭, লেকার—২৭ রানে ৩)।

ইংলও : প্রথম ইনিংস—২ উইকেট : ৩৭ ডিঃ (বিলটন—১০ নট-আউট, পিটার মে ১৩ নট-আউট)

৪র্থ টেস্ট : পূর্ববর্তী তিনটি টেস্টের মতোই এবারও নিউজিল্যান্ড ১ ইনিংসে ও ১৩ রানে পরাজিত হয়েছে। এই খেলার টনি লক তাঁর টেস্ট-খেলার ইতিহাসে শততম উইকেট লাভ করার কৃতির অর্জন করলেন। পিটার মে আগের টেস্টের মতো এবারও শতাত্মিক রান করেছেন।

নিম্নে খেলার ফলাফল দেওয়া হলো :

নিউজিল্যান্ড : প্রথম ইনিংস—২৬৭ (সার্ভিস—৪১, ব্যাটসম্যান—৩৯, সার্ভিস—২০, স্ট্রি—৪৫, ইয়ান—৬৭ রানে ৩, স্টোয়ার ১১ রানে ৪)।

দ্বিতীয় ইনিংস—৮৫ (সার্ভিস—২৮, লক—৩৭ রানে ৭)

ইংলও : প্রথম ইনিংস—১ উইকেট : ৩৩ ডিঃ (রিচার্ডসন—১৪, ওয়াটসন—৬৩, বে—১১, ব্যাটসম্যান ৮৬ রানে ৩, ডিড ৫৭ রানে ৩)।

২ ওয়েস্ট-ইন্ডিজের ভারত সফর

ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দল এখনও ইতিহাসে ভারত-সমরে আসবে। ওয়েস্ট প্রথমে দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হন, কিন্তু পরে তাঁর অক্ষমতাও মন্ত আলোকপ্রায়ক অধিনায়ক করা হয়। ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দল ১৫,০০০ পাউণ্ড দাবি করেছিল, কিন্তু পরে কমিয়ে ১,০০০ পাউণ্ড ঠিক হয়। কিন্তু হঠাৎ বম্বয় পাওয়া গেল পেন্সিয়ার বাবাধীন, সোবার্ণ, হার্ট ও শিখ এই চারজন খেলোয়াড় আসতে পারবেন না।

কমনওয়েলথ গেম্‌স :

সবোম্মার কাডিয়ে কমনওয়েলথ গেম্‌স শেষ হ'লো। এই বৎসর ইংলও ২২টি কর্পস লাভ করে প্রথম ও অস্ট্রেলিয়ার ২৭টি কর্পস লাভ করে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। এই প্রতিযোগিতার দশটি বিশ্ব-রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের পক্ষে এই প্রতিযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, একমাত্র হকি ছাড়া এশিয়ার বাহিরে কোনো প্রতিযোগিতায় ভারত কোনদিন কোনো কর্পস লাভ করেনি। এবারে বিলবা সি ৪০-গজ দৌড়ে রেকর্ড-সময়ে প্রথম হয়েছেন। তাঁর এই অস্বাভাবিক দক্ষ

ভারতবাসী গৌরব বোধ করবে সন্দেহ নেই। ভারতের পক্ষে দ্বিতীয় বর্ণপদক পেয়েছেন হেডিওয়েট-কৃষ্ণীর দীপাবার। ভারতের আর-একজন কৃষ্ণীর লজ্জাকাজ পাণ্ডে ওয়েটস-ওয়েটে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে তৌগ্যপদক লাভ করেছেন। কিন্তু এই তিনজন ছাড়া অল্প সং প্রতিযোগী বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। 'এশিয়া ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা'র দ্বারা পদক পেয়েছিলেন, তাঁরা যেন অনেক স্থলে কাইনাল পর্বত উঠতে পারেননি। তাঁরা যে এর চেয়ে বিশেষ ভালো ফল দেখাতে পারবেন না, তা যাবার আগেই অনেকে ধারণা করেছিলেন। ভারতীয় মনে গুলজারা সিং-এর নাম না দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। যদিও তিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ এশিয়ান-গেম্‌সে পড়ে গিয়েছিলেন, তবুও তাঁর কাছ থেকে এবারে আরো ভালো ফল আশা অবশ্য করেছিল। কারণ তিনি

ভারতের একমাত্র ক্রীড়াবিৎ যিনি বিশ্ব-বেকর্ডের এত কাছাকাছি আসতে সক্ষম হয়েছেন। এর বরস হয়েছে, হয়ত ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতায় আর যোগদান করতে পারবেন না—তাকে এই শেষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা বখনই উচিত হয়নি। ভারতের যে দুইজন মল্লবার ব্যাডিকে গিয়েছিলেন, উভয়েই পদক লাভ করেছেন। আমাদের মনে হয়, আরও কয়েকজনকে পাঠালে, আরো ভালো ফল পাওয়া যেত। ভারতের নৃত্যবোদ্ধা হরি সিং হয়ত একটি পদক পেতেন, কিন্তু লড়াইয়ের পূর্বে ডাক্তারী পরীক্ষা তিনি পাস করতে না পারায় প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হয়। মহিলাদের মধ্যে কেহই সুবিধা করতে পারেননি। আশা করা যায় যে, এই প্রতিযোগিতায় যোগদান ভারতের উন্নয়ন ক্রীড়াবিদদের ভবিষ্যতে উত্তির পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে।



টি. সি. আড্ডি এণ্ড সন্স
সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠাতা হুয়েনাম
৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট • কলিকাতা-৬



শেষ পাত



‘ভারতীয় ব্যবসায়ীর ওপরে চারখার থেকে টাক্সো।। কেবল তার বোয়ের ওপরেই এখনো কোনো টাক্সো ধরা হয়নি।’ —ঐহোনি নোদী
বহুবিধ টাক্সদের থেকে বত-ই বাত? কী বরবাত!

অধ্যাপক জারি ম্যাস-এর মতে, আজকে যারা পৃথিবীতে জন্মেছে তাদের অনেকেরই হয়তো একদিন চন্দ্রলোকে পা বাড়াবার সৌভাগ্য হবে।

কী আশ্চর্য, তাদের অনেকে এখন থেকেই চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে মশাই!

‘নামের দাম কতোটুকু?’ (এক অটোগ্রাফের দ্বারা ঐ প্রবোধ সাক্ষাৎ)

প্রবোধ-দান মাত্র!

নেতাদের মুখ চাঁদের মতো হলো, তাদের



চোখ হচ্ছে স্বর্ঘের জ্বায়। সবার প্রতিই সমান প্রথম দৃষ্টি!

‘প্যাশনেট ইলোপমেন্ট থেকে মুর ক’রে শতাধিক উপস্থাসের জনক সার ম্যাকেনজি কম্পটন সম্প্রতি তাঁর অর্থশতাক্ষীবাণী লেখক-জীবনের সুবর্ণ-জয়ন্তী পালন করলেন। প্রথম যৌবনে তিনি ক্যাপ্রি-তে থাকতেন।’ (উদ্ধৃতি)

ক্যাপ্রিসাস লেখক বটে!

ভারতের সঙ্গে কৌদল করতে আর নিজেদের ভেতর দল গড়তে, জনৈক সাংবাদিকের মতে, পাকিস্তানী নেতাদের হাতে ছুটি মাত্র হাতিয়ার— কাম্বীর আর কাটা-খাল।

‘ছুটি বই লেজ বোর নাহি রে!’

‘তীনের কনিউনিস্টরা হিরোইন (Heroin)-এর চাব করছে বলে একটা শুভব। কি ভগ্ন করছে কে জানে!’

হিরোইন? হীরোদের জন্মেই?

টাটা আয়রন ও স্টীল কোম্পানি এখন থেকে তাঁদের শ্রমিকদের সঙ্গে মঙ্গলগিতায় শিল্প ও কলকারখানা চালোবার যুগান্তকারী এক নতুন চুক্তি সম্পাদন করেছেন বলে জানা গেল।

এখন, আর সব শিল্পপতিদের যদি চোখ টাটায়!

‘কেরা শব্দের অর্থ নারিকেল। কেরালা-র মানে হচ্ছে নারিকেলের দেশ।’

ও, সেই কারণেই সেখানে রাজনীতির এত কেরামতি!

তিমিমাছের পরনাম্বু কতো, বিজ্ঞানীরা এখনো
তা ঠিক জানতে পারেননি। সেচাঙ্গপাশিক বয়সের
একটা হিসেব আছে বটে, কিন্তু তিমির বেলায় সেটা
নাকি খাটছে না। তিমির কর্ণপটের স্বরবিস্তার
মেখে তার কান ধরে বয়স বার করার একটা চেষ্টা
এখন চলাচ্ছে বলে প্রকাশ।

‘তুমি যে তিমিরে, তুমি সেই তিমিরে।’

জনৈক ছুনিয়া-পর্ঘটকের বিবেচনায়, প্রাচ্যের
ছোট ছোট দেশগুলি এখন বামপন্থী নেতৃত্বের প্রতি
নির্ভরশীল। নিজেদের দুঃখ-বেদনা দূর করার জন্য
তারা বামপন্থীদের ওপরেই নাকি ভরসা করে রয়েছে।

‘লিটলস ওরিয়েন্টাল বাম’?

‘একবারের সম্মেলনে জয়প্রকাশনারায়ণ ও
রামনমোহর লোহিয়া দুজনে নিলে স্থির করেন যে,
সোশিয়ালিস্ট প্রতিষ্ঠার জন্য একাধিক পার্টি রাখার
চেয়ে একটি পার্টি থাকাই ভালো।’ (উদ্ধৃতি)



ভালো তো বটেই, কিন্তু চূড়ামণির নিয়েই
যতো গোল বে। পার্টির চূড়ায় money নিয়ে কে
থাকবেন তাই নিয়েই গোলের চূড়ান্ত!

জনৈক সাংবাদিকের নভে কংগ্রেস-সরকারকে
কাবু করতে পারে, বামপন্থীদের ভেতর এমন কোনো
নেতা দেখা যায় না। জনসংগ্রাম পরিচালনা করবে
এমন জেনারেল কে আছে!—এই প্রশ্নই তিনি
আমাদের সামনে তুলেছেন।



কেন, জেনারেল স্টাইক?

জোনপুর জেলার রাজনী গ্রামে একদল লোক
একটা নিমগাছ কাটতে গেলে তাদের সঙ্গে
গ্রামবাসীদের বিরোধ বাধে। সেই সংঘর্ষে মাতঙ্গন
লোক মারা পড়েছে বলে খবর।

নি ম ত ল া র হোয়াচ?

জনান্তিকে শোনা:

‘রাজবাড়িতে আমি রাজার হালে থাকতাম
জানিস?’

‘রাজার হালে? মানে, রাজার বলদ ছিলিস্
বুঝি?’

‘চিরদিন ধরে মানুষ পরের মুখে কাল খেয়ে আসছে। তুই তাদের স্বভাব।’

আবার নিষ্টি খেতে হলেও, কী মূল্য, তাও খেতে হয় সেট পরের মুখেই।

‘শামুকের চোকহাঞ্জার দাঁত আছে’

—বিচিত্র বার্তা

সবফল দিয়েই বৃশি সে মাটি কামড়ে থাকে ?
তা-ই এজতে পারে না।

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী বিবেচনায় ট্রেনের কামরার বাড়তি ভিড় কমানোর কোনোই উপায় এখন দেখা যাচ্ছে না।

বিনা টিকিটের যাত্রীরা কি আর বিনা গাড়িতে যাবে ?

‘প্রথম দর্শনেই যে প্রেম, তার ওপর ঠিক আস্তা রাখা যায় না।’

তা ঠিক। আরেকবার ভালো করে তাকাতো হয় বটকি !

একজনের চিঠি :

‘যারা হিংস্রপ্রকৃতির লোক, নিজের কাজ হুজোবার জন্য তারা সাধুতার ভান করে। ভালেম্যাত্তির ভেক ধরে থাকে।’

ঠিক, সাপের কাজ-ই হচ্ছে ভেক ধরা।

‘তাল পড়িছা চিপ করে, না, চিপ করিয়া তাল পড়ে—এটরকমের আরেকটি জাতির কুট প্রায় আপনি বলতে পারেন ?’

এর জায় ? এই যেমন ধরুন, আদর করে মাথা খায়, না, মাথা খেয়ে আদর করে ?



ক্যালকাটা অপটিক্যাল কোং (প্রাইভেট) লিঃ

ফোন - ৩৫ - ১৭১৭ প্রতিষ্ঠাতা: ডাঃ কার্তিক চন্দ্র বসু এমবি
গ্রান্ড-ক্যালকাতাকো • ৪৫ নং ডায়মন্ড স্ট্রীট • কলিকাতা - ৯

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ডক্টর

কে. পি. বহু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১, মহেন্দ্র গোস্বামী সেন, কলিকাতা ৬ হাইওয়ে ব্রিকওয়ান্থ রাস্তা কটক মুহুরিত
এবং গুরুত্ব ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হাইওয়ে প্রকাশিত

বসুধারা

দ্বিতীয় বর্ষ • প্রথম অঙ্ক • পঞ্চম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৬৫

• সূচীপত্র •

বিষয়	পৃষ্ঠা
অননী সারসামি (জীবন-কাহিনী)—স্বপ্না বসু	৪১১
রবীন্দ্র জীবনালেখ্য (জীবন-কাহিনী)—চাকচাক ডাটাচার্জ	৪১২
বিকশার গান (উপন্যাস)—বিকৃতকৃত্য মুখোপাধ্যায়	৪১৮
অবরনারের তুবারক্রে (সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী)—অজিতকুমার শ্রীবাসী	৪২৪
দক্ষিণ আফ্রিকা য়-বিদ্যেবের বরণ : বক্রীকরণ নীতি (প্রবন্ধ)—স্বাভাবিক মুখোপাধ্যায়	৪৩৪
মনোহর ও প্রেমভাষা (উপন্যাস)—মহাশেতা ডাটাচার্জ	৪৩৭
মহাভূগের বিদ্যাম্বিল ভলটেয়ার (জীবন-কাহিনী)—কুশেননাথ মুখোপাধ্যায়	৪৪৪
তিন অধ্যায় (গল্প)—মানবেন্দ্র গাল	৪২০
গভীর বারমাত্রা : ভাষে (সচিত্র প্রবন্ধ)—তুলসীদাস সিংহ	৪২৬
রাভা হাভাই (কবিতা)—হরপ্রসাদ মিত্র	৪৩৩
মনে পড়ে (পুরোনো কথা)—বিনলাচরণ দেব	৪৩৪
ফিটে-ফেটা : অ্যাটম বোমা বনাম হাইড্রোজেন বোমা—চাকচাক ডাটাচার্জ	৪৩৭
কেন মধুসূদন মহাকবি নন ? (প্রবন্ধ)—ঈশাংশু মৈত্র	৪৪১
চন্দ্র-সংবোধ (প্রবন্ধ)—গঙ্গিলা বসু	৪৪৬
বাংলার প্রাচীন ঘনিষ (সচিত্র প্রবন্ধ)—মহীতোষ বিশ্বাস	৪৪৭
দ্রব্র রাতি (গল্প)—পঙ্কজন চট্টোপাধ্যায়	৪৪৮
নতুন ইয়োজোণ : নতুন মাহুয (ভ্রমণ-কাহিনী)—মনোজ বসু	৪৪৯
চেনা মুখ : পেশা ও বেষা (জীবন-চিত্র)—শৌরীন সেন	৪৫৩
শরৎচন্দ্রের 'বজ্রো' হিরণ্ময়ী দেবী (সচিত্র জীবনালেখ্য)—মণীন্দ্র চক্রবর্তী	৪৬৩
নতুন বই :	
পুতক-সবাসোচনা : ইংলণ্ডের ভাষেয়ী—ঐবিশ্বকণ্ঠ দত্ত ; মধুরে মধুর—কল্যাণকুমার	
দাণ্ডপু ; প্রেমের গল্প—কল্যাণকুমার দাণ্ডপু ; উপল উপকুল—মহাশেতা	
ডাটাচার্জ ; রত্ন-সংঘেত—জ্যোতী	৪৭৩
মুক-পর্থা : চিত্রলোক (সচিত্র)—দত্তনাত	৪৭৩
ব্যক্তচিত্র—রবীন্দ্রকৃত্য	৪৭৪
বেলায় বেলা (সচিত্র)—মুদিত	৪৮২
শেষ পাতা (সচিত্র রসালো)—শিবরাম চক্রবর্তী স্মিত ও রবীন্দ্রকৃত্য চিত্রিত	৪৮৮

• প্রাক্কম-শিরী : অজিত গুপ্ত •

‘বন্ধুধারা’র নিয়মাবলী

প্রাথমিকতমক সম্পর্কে

বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৫ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে সন্ধান লইয়া ডাকঘরের উত্তরলহু আমাদের জানাইতে হইবে। নচেৎ উক্ত সংখ্যা বিনামূল্যে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। টিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে বাংলা মাসের ২৫শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে। চিঠিপত্রে এবং মনি-অর্ডার-দ্বারা গ্রাহক-নয়নের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১ টাকা। গ্রাহক হইলে চাঁদার হার—বার্ষিক (সভাক) ১২ টাকা এবং মাসিক (সভাক) ১ টাকা। ভিঃ পিঃ বোধে পত্রিকার গ্রাহক হইলে গ্রাহকদেরই ভিঃ পিঃ খরচ বহন করিতে হয়। মনি-অর্ডার বোধে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হইলে এই অতিরিক্ত খরচ আর দিতে হয় না। ভারতের বাইরে পত্রিকার চাঁদার হার পরবোধে জ্ঞাতব্য।

রচনার নকল সম্পর্কে

রচনার নকল রাখিয়া কাগজের একশতাংশ পরিষ্কার হস্তাক্ষরের রচনা পাঠাইতে হইবে। উহা হারাইবার দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করি না। রচনার সঙ্গে উপযুক্ত ডাকমাণ্ডল না থাকিলে অমনোনীত রচনা কেবল দেওয়া হয় না। ইহার সহিত লেখকের নাম ও ঠিকানা থাকা আবশ্যক, নচেৎ রচনা গ্রাহ্য হইবে না।

পত্রিকার লেখা প্রকাশ করা বা না-করা সম্পাদকের বিবেচনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

যাবতীয় চিঠিপত্র এবং টাকা-পয়সা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

অন্যতমক ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে

কমপক্ষে ১০ কপি করিয়া পত্রিকা লইতে হইবে। অবিক্রীত সংখ্যা কেবল লওয়া হয় না।

এমেলি-কমিশন : প্রতি সংখ্যার চার আনা অর্থাৎ ২৫ নয়া পয়সা (নতকরা ২৫ টাকা হিনাবে)।

এমেলি সম্পর্কে বিপর্যয় নিয়মাবলীর ক্ষেত্র পর নিখিতে হইবে।

কার্যখান—বন্ধুধারা, ৪২, বর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

পরিপাটী মুদ্রণ

আমরা

নিখুঁত ব্রহ্ম-তৈরির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

॥ কালার স্টুডিও ॥

৪২, মহেন্দ্র পোস্তামী লেন, কলিকাতা ৬

কোমঃ ৪৫-৪৬০৭

নতুন পরিকল্পনায় ও অভিনব অঙ্গসজ্জায়

শাস্ত্রদ

বহুধারা

: শাস্ত্র-সংখ্যার সজ্জা-বৈচিত্র্য :

তিনটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

প্রমত্ত মিত্র • চুপি চুপি আসে

লীলা মজুমদার • বাঁপতাল

বিমল মিত্র • নফর সংকীর্তন

রসরচনা

প্রাচীন কথা

পরশুরাম

লক্ষ্যকরণ

যাযাবর

‘দৃষ্টিপাত’-এর অবিস্মরণীয় লেখকের একটি বিশেষ রচনা

স্বর্গাট শাৰেবের গৃহভ্যাগ

শংকর

‘কত অজানার’ লেখক শংকরের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের পটভূমিকায়
এক অভিনব বড় গল্প

বিশেষ রচনা

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

নীহাররঞ্জন রায়

অন্নদাশঙ্কর রায়

বনমূল

শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়

পরিমল গোস্বামী

শিবরাম চক্রবর্তী

গৌরকিশোর ঘোষ (রূপবর্মা)

অ.কৃ.ব. প্রভৃতি

ছোট গল্প

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

সন্তোষকুমার ঘোষ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি

কবিতা

অজিত দত্ত

মুভাষ মুখোপাধ্যায়

নন্দীন্দ্র রায়

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি

প্রমত্ত ও অঙ্গসজ্জা

অজিত গুপ্ত

আগামী ১লা অক্টোবর, ১৯৪৮, ‘আগ্নি-সংখ্যা’ ‘বহুধারা’ শিরসে ‘বহুধারা’ রূপে প্রকাশিত হইবে।

আবেগে প্রকাশিত হয়েছে

ঐ

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের যমুনা-কী-তীর

“এখনও সে বাঁশী বাজে যমুনার তীরে—

এখনও প্রেমের খেলা

সারাদিন সারাবেলা,

এখনও কীদিছে রাধা চক্ৰবর্তীকে”...

উপজ্ঞান । মূল্য : তিন টাকা

হুগ্লিরেও সুবোধনি রাধা। বৃন্দাবন ছড়িয়ে আছে মাহুঘের মনে। যত মন তত বৃন্দাবন, তত বাঁশী—তত শ্রীমাদিকা। প্রেমিকপ্রাণের লীলাকমল মানদলোকের শ্রীমদুদার নিমিত্তই বিকশিত হবে আকোশিত, হিল্লোলিত হচ্ছে। যে জানে সে জানে, মন তার বাঁশীর পূকার ভুলে কাঁদে। আর যে জানে না—তার ভুলে কাঁদে শ্রীমদুদা,—‘যমুনা-কী-তীর’।

এই রচন, এই পিণ্ডাধা থেকেই তথ্য নিয়েছে কত গট কত কাব্য কত গান, কত কত শ্রীমদাদিকের দলিতকমার।

অন্তরে সেই চাতক-পিণ্ডাধা ছিল বলেই বোয়ারদের আনন্ড ধরা নেয় রাজকমলা ইন্দুমতীর শ্রেণ্যে কবরের আচ্ছাদনে। কিন্তু কিশোর-প্রেমে সুখি-বা বৌধনের অভিসংগাত থাকে। ... যে কড় এলো—বিপথত হ’লো সে হৃদয়ের নীড়। কিন্তু যে কড় ভেঙে দিল কিশোর-প্রাণের ডীক ভালবাসার ধর, সেই কড়ই আনন্ডের কীবনে নিয়ে এলো বাহারবাঁকে। বক্তাবে উর্দ্বী, জাতে স্রিয়া, কমলহীরের মতোই আশন ক্রান্তিতে উজ্জল বাহারবাঁক। উত্তরোল হ’লো প্রেমযমুনা—প্রেমের আগরের বৃন্দাবন—‘যমুনা-কী-তীর’।

বাহারের প্রেমে পাগল হ’লো আনন্ড। ভুলে গেল সব, বিস্মৃত হ’লো তার কর্তব্য। মাতালম্বোতে গ্যা ডানিকে চলতে-চলতে একদিন আনন্ডের মনে হ’লো গান গাইবার বধ্যা ছিল তার, কণ্ঠে তার হৃদ দিয়ে গাটিয়েছিলেন প্রাণ। এও আর-এক কড়—আর-এক প্রেম—শ্রীমদুদার আর এক আচ্ছাদন।

সেইদিনই শিল্পী নেমে এলো গথে। ‘যমুনা-কী-তীর’-সম্বন্ধে ব্যক্তিক আনন্ড আর তার মর্যসহচরী বাহার। ব্যাধা স্রুত হ’লো, কিন্তু কোথায় তার সমাধি? সেই বেদনা-মধুর কাহিনীর সার্থক আলেখ্য এই ‘যমুনা-কী-তীর’।

প্রকাশের অপেক্ষায়

মঞ্জীন্দ্র চক্ৰবর্তীর

★ দরদী শরৎচন্দ্র ★

=সাহিত্যচর্চা শরৎচন্দ্রের বৈচিত্র্যময় কীবনের আলেখ্য (যেহকটি অপ্রকাশিত চিত্র সংবলিত) =

বহুধারা প্রকাশনী

৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা ৬

প্রাণে প্রকাশিত হয়েছে

ঐ

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

যমুনা-কী-তীর

“এখনও সে বাঁশী বাজে যমুনার তীরে—

এখনও প্রেমের খেলা

সারাদিন সারাবেলা,

এখনও কাঁদছে রাধা স্বপ্নরুতীরে”...

সুবিধেও বুঝেওনি রাধা। বুঝাবেন ছড়িয়ে আছে মাহুগের মনে। মত মন তত বৃন্দাবন, তত বাঁশী—তত শ্রীমাদিকা।

প্রেমিকপ্রাণের লীলাকমল মানসলোকের শ্রীযমুনায নিবৃত্তই

বিকশিত হয়ে আকোশিত, হিরোলিত হচ্ছে। যে জানে সে জানে, মন তার বাঁশীর পুকার তুলে কাণে। আর যে জানে না—তার ভক্ত কাণে শ্রীযমুনা.—‘যমুনা-কী-তীর’।

এই রচন, এই শিলাসা থেকেই জন্ম নিয়েছে কত গীত কত কাব্য কত গান, কত কত শ্রীতঙ্গাবিকের গণিতকথার।

অন্তরে সেই চাতক-পিলাসা ছিল বসেই বেনারসের আনন্দ ধরা দেয় রাজকন্যা ইন্সুযতীর সঙ্গের হৃদয়ের আনন্দে। কিন্তু কিশোর-প্রণয়ে বৃত্তি-বা যৌবনের অভিসম্পাত থাকে। ... যে বড় এলো—বিগত হ’লো সে হৃদয়ে নীড়। কিন্তু যে বড় ভেঙে গেল কিশোর-প্রাণের তীক ভালবাসার ঘর, সেই বড়ই আনন্দের জীবনে নিয়ে এলো বাহারবাইকে। বতাবে উর্বশী, জাতে প্রিয়া, কমলহীরের মতোই আপন হৃদিতে উজ্জল বাহারবাই। উভয়োল হ’লো প্রেমযমুনা—প্রণয়ের আগের বৃন্দাবন—‘যমুনা-কী-তীর’।

বাহারের প্রণয়ে পাগল হ’লো আনন্দ। ভুলে গেল সব, বিস্মৃত হ’লো তার কর্তব্য। মাতালমোতে গা ভাঙ্গিয়ে চলতে-চলতে একদিন আনন্দের মনে হ’লো গান গাইবার কথা ছিল তার, কণ্ঠে তার স্বর দিয়ে পাঠিয়েছিলেন প্রভা। এও আর-এক বড়-আর-এক প্রেম—শ্রীযমুনার আর এক আনন্দ।

সেইদিনই শিল্পী মেয়ে এলো পথে। ‘যমুনা-কী-তীর’-সম্মানে ব্যক্তি আনন্দ আর তার বর্ষসহচরী বাহার। দারু দূর হ’লো, কিন্তু কোথায় তার সন্ধানি? সেই বেমনা-বধূ কাহিনীর সার্বিক আলেখ্য এই ‘যমুনা-কী-তীর’।

প্রকাশের অপেক্ষায়

শীল চক্রবর্তীর

★ দরদী শরৎচন্দ্র ★

==সাহিত্যচার্য শরৎচন্দ্রের বৈচিত্র্যময় জীবনের আলেখ্য (অপরূপ প্রকাশিত চিত্র সংবলিত) ==

বহুধারা প্রকাশনী

৪২, বর্ন ওয়াশিং ট্রিট, কলিকাতা ৬

তবুজিজ্ঞাসু মনের অস্থগতিস্থল্য ও অকুণ্ঠিত মিরে মরুজনাথ এগেছেন ঠাকুরের কাছে—জিজ্ঞাসা করেন—“আগনি কি দেখেছেন ঈশ্বরকে?” ঐশ্রীঠাকুর অত্যন্ত সহজভাবে অবলোক্যক্ৰমে উত্তর দিলেন—“হ্যাঁরে দেখেছি বৈকি। এই যেমন তোকে দেখছি, তেমনিই ঠাকুর দেখা দায়, এই যেমন তোরা সত্য কথা বলছিস তেমনিই তাঁর সত্যও কথা বলা যায়। তুমি যদি দেখতে চাস তোকেও দেখাতে পারি।” নরজনাথ বহুবার বহু লোককে এই প্রস্তাব করেছিলেন—উত্তর কি হতে পারে তাও তাঁর জানা হয়ে গিয়েছিল। তিনি জীবনে এই প্রথম তাঁর প্রস্তাব এত সহজ উত্তর পেলেন। তিনি তো এই উত্তরের মন্ত প্রবৃত্ত ছিলেন না। ঐশ্রীঠাকুরের এই সহজ বাক্য উত্তরে নরজনাথ অভিভূত হলেন, আগনিবের কিম্বদন্তি হতবাক হয়ে তিচ্ছা করলেন—“কোনু বিশ্বাসের বলে, কোনু অহংকৃতির জিহ্বিতে তিনি এত সহজ কথা এমন মুক্ত কর্তে বলতে পারছেন? মানুষের প্রজ্ঞাসূত্রী কত বজ্র হলে, অহংকৃত কত গভীর হলে মানুষ এত গভীর কথা এমন সহজ বাক্যবাক্যে বলতে পারে!” তাহলে তাহলে নরজনাথ মনে নিজের অভিভবও কুলে পেলেন—মগনের বস্তুপুত্রও তাসের সীমামেধা হারিয়ে ফেলল। সেদিন বিকালের দস্তা নরজনাথ বাড়ী ফিরেছিলেন। বিশ শতাব্দীর ইতিহাসে এ ছুটি মানুষের বিদানের কাহিনী বিশ্বের সবিস্ময়কর ঘটনাবলির মধ্যে অন্তর্গত। প্রেমে সেবতা মাতঙ্গ হই—ওক শিষ্টেতে হলেন দীন—সেহাতীত ছুটি মনের অপূর্ণ মিলন।

ঐশ্রীঠাকুরের সহিত নরনের সাক্ষাতের পর আরও কিছুকাল অতিবাহিত হল। একদিন ঐশ্রীঠাকুরের করে অনেকেই বসে আছেন—অনেক বৈক্য গঠিতও এসেছেন—মরন প্রকৃতি তক্ত শিঙগণও আছেন। আসোচনা সেছিল বৈক্য ধর্ম সম্বন্ধে। ঠাকুর বৈক্যবর্ণের লক্ষণ ব্যাখ্যা করছিলেন—বৈক্য পূজন, নামে জটি ও জীবে বহা। “জীবে বহা” কথাটি উচ্চারণ করেই তিনি স্বস্ত, সমাধি হয়ে পেলেন। বহুশব্দ পরে সমাধি ভাঙ্গে তিনি বলে উঠলেন—“জীবে বহা! জীবে বহা করার তুমি কে?” সেখানে উপস্থিত ছিলেন অনেকেই, কিন্তু একমাত্র নরজনাথই বুঝলেন ঐশ্রীঠাকুরের উক্তির তাৎপৰ্য—তাই তিনি লিখলেন—

“বহুগে সম্বন্ধে বোঝায়,

হাট্টি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

জীবে প্রেম করে বেই জন

সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।”

দর্পের নৃশল ব্যাখ্যা ঐসূর বিরে পেলেন—প্রতি মানুষের

মধ্যে আছে সেই একই পরমাছার অংশ। সুতরাং বিশ্ব-জ্ঞানে জীবেই দেখাই মানুষের প্রেই ধর্ম। নরজনাথ নরজনাথের সেবাক্টেই হয় উল্লেখ্যের প্রেই পূজা। আরও তিনি বলে পেলেন—“বত হত তত পম”। পম আমায়ের বাহাই হউক না কেন, লক্ষ্য আমায়ের একই। সেই পরমাছার সন্ধান ও আত্মোপলব্ধির সাধনা। আর ইহাই তারতের দর্শনশাস্ত্র—ভারতাস্ত্রার কথা।

এই আত্মোপলব্ধির সাধনায়, ঐশ্বরসন্ধানের পথে লোক-শাস্ত্র চিরদিনই নারীকে পরিহার করেছে অস্বরণ্য বলে। মানুষের সৃষ্টির সাধনায় বিজ্ঞানের হয়ে শাক্যকুমার গৌতম পরিত্যাগ করেছিলেন নিঈশ্বরগমে মিত্রিতা মনোপার্যকে, সন্ধ্যাসের মৌরব প্রচারের উদ্দেশ্যে ঐশ্রীচৈতন্য ত্যাগ করেছিলেন স্বাধীনগতপ্রাণা বিকৃতপ্রাণকে। যেকালেসের ধর্মওক বীণও উপদেশ দিয়েছিলেন নারীসম-বর্তমানে। কিন্তু আত্মগত ব্রহ্মচারী, সর্বত্যাগী সন্ধ্যাসী ঐশ্বরামৃতক বেকায় পতীরূপে নারীকে পার্শ্ব দ্বান ফিরেছিলেন। জীবনের প্রত্যেক সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি এই প্রমাণই করে গিয়েছেন যে, নারী সাধনার অস্বরণ্য কিংবা নরদের দ্বার নহে। সত্যই তো প্রতি মানুষের মধ্যেই যদি সেই পরমাছারই অংশ বিরাজমান থাকে তবে মানুষে মানুষে ভেদ কোথায়? দেখো তো আত্মা নহে—আত্মার তো নিশানিহিত ভেদ নাই! নারীকে এত বড় দৌরবন্দন আর কেহ করেন নাই—সেহেতু অবলম্বন করে সেহাতীত হওয়ার এমন সাধনাও কেহ করেন নাই। মনে যদি বিশ্বাস্যও দেখেবাথ ভ্রমায়, তাহলে সৈবিক ব্রহ্মচর্যের যে কোন মূল্যই থাকে না। ঐশ্রীঠাকুর জীবনের চরম আত্মপরীকার উদ্দেশ্যেই একদিন নিজের নিকৃত শরন-ককে একশয্যায় বরণ করে নিলেন অষ্টাদশী তরুণী গণীকে। একশয্যাতে রাখির পর রাখি বাস করেও সেবহুঁচির সামান্যতম লক্ষণও তাঁর মনে সেবা দিল না।

তার সেই শেষ সাধনাকে সম্পূর্ণ করবার মন্ত ঐশ্রীঠাকুর মনে মনে এক অপূরণ পূজার কল্পনা করলেন। কালীপূজার রাক্ষিত তিনি পূজা করলেন তাঁরই পত্নী সারথামণিকে মগ্নস্নাতার প্রতীক, মহাপণ্ডিত আধার রূপে। কারণ সকল নারীই যে তাঁর নিকট মগ্নস্নাতার অংশবিশিষ্ট। কালীপূজার দিন প্রভাত হতেই পূজার আয়োজন ও প্রস্তুতি চলতে থাকে। সন্ধ্যাবেলা অননী সারথামণিকে নহবৎ হতে ঐশ্রীঠাকুরের শরনককে দিয়ে আসা হল। যন্ত্রুত বারি শিঙন করে পূজারী যেতাকো ধ্বারাণি অভিষিক্ত করলেন; আশিষন-শীখা আদন বসিরে ধ্বারাণি যত উচ্চারণপূর্বক সেবতাকে বরণ

সেখেন কান্না, সাধুসার, অশ্রুপ লাবণ্যময়ী একটি বালিকা দুই হাতে তাঁর কণ্ঠ বেঁধে করে বসছেন—“এই আমি তোমার কাছে এলাম।” রান্না প্রাণান্তকর হইবে এমনই একটি নিখুঁত অভিজ্ঞতা। এর পরই রান্না সাধুসারের জন্ম—১২৬০ সালের ৬ই পৌষের এক শুক্লাষ্টমী। দরিদ্রের সংসার কিয়ৎ জেদেই অভাব ছিল না। তার উপরে বাড়ীর প্রথম সন্তান তিনি। কিন্তু শিশুবয়স হাতের তিনি একক, নিঃশব্দ ও সমাহিত। বেলাধুসার চাকর্যের পরিবেশ থেকে বহুব্রহ্মের চিত্তে সঞ্চিত হইয়া চোড়ি মেরে পারল। বহুর মধ্যে থাকলেও তাঁকে চেনা যেত অন্তঃসাহায্যর বলে।

একটি একটি করে কেটে দেল পাঁচটি বৎসর। পাঁচ বৎসরের ছোট্ট মেয়ে সাধুসা বেহুতলায় বেদান্তর ছেঁচে এলেন স্বভাববাহীর জগৎস্রব। কিন্তু ছোট্ট বলে আবার তিনি কিরে গেলেন জগৎস্রববাহীতে শিতামাতার কোলে। গল্পের বিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে—ভূবে গেলেন তাঁর শাশুরায়। বাড়ির তলায় বীণ রইল অক্ষরোপসমের মহাশয়ের প্রতীকায়।

মাতা অহুয়া—দঃসারের সব রাস্তা বালিকা সাধুসারদিকে করত হই। ছোট্ট মেয়ে ডাকের হাঁড়ি নামাতে পারেন না, শিতা সাহায্য করেন। দুপুঙ্খবলা বনে পড়ে ‘মুনিবরা’ পেতে কাশ করছে। সাধুসারনি মাতার মেয়ে শুভ মুচি নিয়ে কেতে চলে বান—ধাঁড়িয়ে থেকে তারের পাইরে বাড়ী কিরে আসেন। গোয়ালে গরুগুলি আছে—তারা সাধুসারদিকে দেখলেই জেত ৬ঠে হাসা বলে—বনে হই ফে বলে—“মালো, যেতে নে।” ছোট্ট মেয়ে সাধুসারনি উত্তর দেন লম্বেই; তত্বনি বেজির পড়ন কাছে হাতে। এককূষ বলে ধাঁড়িয়ে তিনি তাঁর ভাবলী-বলীর জন্ত দলদল সংগ্রহ করে আসেন—পন্ন বনে ডাকের যেতে দেন। দুপুঙ্খবলা বাড়ীর সন্মুখে পাইরে তাঁর বাওঁদার অবসর। কিন্তু বিভ্রাম নাই—আবার তত্বনি বাগান থেকে তুলে পেড়ে এনে ছোট্ট ছোট্ট আঙুল দিয়ে সেই তুলে থেকে পোতে ভেঁতী করেন। ছোট্ট ভাই-বোনদের তদারকও তাঁকেই করত হই—কারণ তিনি যে বিদ্বি। ভাইবোনদের এই তদারক তিনি সার্বভৌমই করতেন। ছোট্ট ভাইটির সঙ্গে যাবে যাবে পাঠশালায় গিয়ে বসেন। লেখাপড়া দেখার বড় সখ নায়েব, কিন্তু লক্ষ্যই তিনি মুখ মুটে সে কথা বলতে পারেন না।

এই সময়ে একদিন কোথা থেকে এল পঞ্চপাল—কেতভরা পত্র সব কেটে নষ্ট করে দিয়ে গেল। ছোট্ট সাধুসারনি প্রতিবেশিনী মেয়েদের সঙ্গে কেতে গিয়ে খুঁটে খুঁটে পত্রকণা সংগ্রহ করেন। হাতের নাকি একটুই অমের অভাবে শুকিয়ে

যত্নে থাকে। সাধুসা দেখা দিল দুর্ভিক্ষের কতাল ছায়া। দলে দলে শূণ্যভূতর মাংস এসে তাঁদের গৃহের সম্মুখে সমবেত হল। রামচন্দ্র মহাশয়ের খান বের করে গিলেন। সেই খানে চাল হল; বাল দিলেন একমাত্র সাধুসা বাড়ীতে বাড়ীর সকলের অন্নই বিচুড়ি হবে এক। সেই বিচুড়ি দেওয়া হবে অমৃত্যু স্বধার্ত্তগণকেও। এক এক দিন এই লোক আপত্ত যে, বরাদ্দ বিচুড়িতে ফুলাত না—আবার হাঁড়ি চাপানো হত। পন্ন গরম বিচুড়ি তাঁদের পাতে চেলে দেওয়া হত। তাদের খেতে সুবিধা হবে বলে বালিকা সাধুসারনি ছোট্ট ছোট্ট হাতে ছুটি পাখা নিয়ে হাওরা করেন। ছোট্ট বালিকার কি অসুখ হাতের।

নিজের ছোট্ট আবেষ্টনীর মধ্যে বাংলার পটীভীবনের প্রতিদিনের স্বহৃদ্বঃ, হাসিকাতার মধ্যে বালিকা সাধুসারনির বিন কেটে যায়। কোথায় দক্ষিণেশ্বরে দগার তীরে কোন কঠোর সাধনের অম্ববশে তাঁম স্বামী কত-বিকৃত হচ্ছেন তার কোন ধারণাই তাঁর কল্পনাতেও জাগে না।

বিরের পর সাধুসার বহলে সাধুসারনি স্বামীর একটুখানি সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। সেবার ডায়ে ইন্সপেক্টর স্যার এসেছিলেন জগৎস্রববাহীতে। জগৎ সাধুসা বাড়ী অবেশণ করে ছোট্ট স্বামীমাকে আবিষ্কার করেন—পত্রকূলে ছোট্ট স্বামীমারি পর্ববন্দনা করেন। বালিকা সাধুসারনি বিম্বিতা-চকিতা। তিনি এই অসুত সন্তানদের কোনই অর্থ খুঁজে পান না। কেবল তাঁর মনের কোণে থেকে যায় এক অপূর্ণ বিষয়।

তারপর কেটে যায় দীর্ঘ দুইটি বৎসর। বালিকা সাধুসারনি এখন ত্রয়োদশী কিশোরী। সেই সময়ে তিনি একবার এলেন কাহারুপুত্রে স্বভাববাহীতে—কিন্তু দেখা হল না স্বামীর সঙ্গে। লক্ষ্যবিন্দু কিশোরী গ্রাম্যবধু উৎকর্ণ হয়ে শোনেন যে কোথায় তাঁর স্বামীর সম্বন্ধ কি আলোচনা করছেন। বা শোনেন কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না। অত্নে তাঁর জেগে ওঠে অগার কৌতূহল, কিন্তু বাইরে তাঁর কোন প্রকাশ নাই। বাড়ির তলায় যে বীণ ছিল দ্বন্দ্ব, একটু একটু ক’রে তার মধ্যে দেখা দেয় স্বামীর—পন্ন। সেবার সেক্ষণে কাহারুপুত্রে থেকে সাধুসারনি কিরে গেলেন জগৎস্রববাহীতে।

কিছুদিন পরই সংবাদ এল স্বামী এসেছেন—সাধুসারদিকে ছেতে হবে কাহারুপুত্রে। তখন তিনি চতুর্দশী কিশোরী। প্রকৃতপক্ষে স্বামীর সঙ্গে এই তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ—প্রথম পরিচয়। সন্ধ্যানী স্বামী হয়তো তাঁকে দেখেই বিরণ হবেন। উৎকর্ণ-ব্যাঙুল অত্নে সাধুসারনি এলেন কাহারুপুত্রে।

কশিত ভীক তরুণী-বৃক্ষে ঐশ্রীঠাকুরের সহস্র আশ্রয়িতার একেবারে কাছে টেনে নিলেন। যয়, সত্যাস, হীকার কোন কথাই তিনি বললেন না, যদিও তিনি তখন বহু অবৈতহাসী ওক তোতাখুদীর নিকট হতে পেয়েছেন সত্যাসে হীকা—বিদ্যাপুত্রীতে প্রত্যক্ষ করেছেন এই বিরাট স্তম্ভের অশ্বদানী বহুসকল। পরের কথা বাকি কিছু আছে সকলই সেই রত্নের বরণ—ব্রতারা নারী-পুংসবে তের কেন? ঐশ্রীঠাকুরের পরম করে সারস্বতিনীকে শিখিয়েন কি করে সংসারের প্রতিটি কর্তব্য হস্তভাবে করতে হয়; কি করে অতিথিকে বর করতে হয়, এমনকি কি করে প্রাণীদের সন্তুষ্ট প্রস্তুত করতে হয়। ক্ষুধাতিক্ষুধ কর্তব্য একের পর এক একান্ত সত্যস-অভিজ্ঞতার মতোই তিনি সারস্বতিনীকে শিখিয়েছিলেন। ক্রমে বাহিরের দায়িত্ব থেকে অন্তরের দায়িত্ব তিনি তাঁকে সমাগ করে তোলেন। সেই বিখিতা তরুণীর অন্তরে এক নূতন পৃথিবীর ছবি জেগে ওঠে। পূজার আয়োজ্য মতো তিনি তাঁর জন্মক সেই বেষতার পাথে নিবেদন করেন। সাতসাল পরে ঐশ্রীমন্তক ফিরে গেলেও বক্ষিপথের। বাহিরের পৃথিবী দেখল যাবী তাঁকে ত্যাগ করে গিয়েছেন। কিন্তু অন্তরের দিকে তাকিয়ে সারস্বতিনী দেখলেন যাবী তাঁর অন্তর জুড়ে আছেন। তিনি আবার ভরসাঘাটতে ফিরে এলেন। সোচ্চকুর অন্তরালে নিঃশব্দে সেই বিবাহপ্রবেশে স্পর্শে জেগে ওঠে সেই অনিশ্চিত গ্রাম্য তরুণীর অন্তরে এক অস্তিত্ব নারীত্ব বা একধিন যোগ্যত্ব স্বত্বতা ও সংখ্যার এবং নারীহুলভ সকল নীমাঘম্মতাক ভূচ্ করে সন্মানে ভগবতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের আখ্যার পরমভাষীর রূপ নিঃশব্দে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল।

সাতসাল পরে শিশুসুহে ফিরে সারস্বতিনী আত্মীয়-প্রতিবেশিনীদের পড়াশুনাভিত্তিক প্রণে বিবর্ত হয়ে ওঠেন। প্রতিবেশিনীগণও তাঁদের অভিজ্ঞতামতো কোন সন্ততর না পেয়ে সত্যস্বত্বি জ্ঞানান—“আহা, শাংলার বউ কিনা, তাই যাবী কী বহু বৃত্তল না।” সারস্বতিনী কাহাকেও কিছু বলতে পারলেন না—কিন্তু যাবীর নিম্নাধ মন তাঁর বেদনাতুর হয়ে উঠে। অকণ্ঠে যাবী-নিম্না তনবার ডরে পথেঘাটে হয়ে হওঁতা কিংবা প্রতিবেশিনীদের বাতী হাওঁতাও বহু করে য়িলেন। ক্রমে তাঁর মন অষ্টগ্রহের চিত্রাতেই ভুবে গেল। কিন্তু ক্রমেই যাবীর অধর্মন অসহ হয়ে ওঠে। কিন্তু হু হুটে লজ্জার কাউকেই তিনি কিছু বলতে পারেন না।

ক্রমে আরও তিনটি বৎসর কেটে গেল। তিনি অহভব করেন, কি এক ভীত আকর্ষণ বেন তাঁকে বক্ষিপথের দিকে টানছে। অসহ হয়ে ওঠে সেই প্রতীকা—ভাবেন, বাহুয় তো

তীর্থে যার বেবলর্ন—তিনিও যাবের বক্ষিপথের তীর্থে, তাঁর সেবতার কাছে।

অন্তরের ব্যাকুলতা ভগবান বৃত্তন—হুবাগ এল। সেই বৎসর হাজরী পূর্নিমার মানব্রাতা উপলক্ষে প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণের সঙ্গে, পিতা রামচন্দ্র কস্তার জন্মের ব্যাহুলতা বৃত্ততে গের, বহু সন্তজা হাতা করলেন বক্ষিপথের উৎসব। পথের পরিপ্রমে ও স্নাত্বিত সারস্বতিনী অহুহ হয়ে গরলেন। পিতা রামচন্দ্র কস্তাকে নিয়ে এক চটিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। সারস্বতিনী অরে অট্টেস্তপ্রায়। অন্তরে আচ্ছন্নতার মধ্যেই জননী সারস্বতিনী বেন বশ কেখন অসহন শাবকাশরী এক রমণী তাঁর পাথে মধ্যম কল্যাণকর্ষ বৃত্তিয়ে য়িলেন। তাঁর স্নেহকোষল স্পর্শে যাবের সকল বরণার অবসান হল। পরদিন সন্ধ্যায় পিতাপুত্রী শৌচালেন বক্ষিপথের। অন্তরের আকর্ষণ ডক্ত এসেছেন ভগবানের কাছে—ভগবান তাই তক্ত হয়ে য়িলেন তাঁর মান। ঐশ্রীঠাকুরের বারই যাবের ভক্ত বস্ত্র এক শয্যা রচনা করা হয়, কারণ তিনি যে পীড়িতা। সন্দের ঠাকুর তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন—নিম্নের হাতে যোগিনীর সেবা করেন। মা হু হু হয়ে তাঁকে পাঠিয়ে বেওতা হল নহবতে ঐশ্রীঠাকুরের জননী চরমধীর কাছে। এতদিনে তিনি বুঝে য়েলেন তাঁর যোগা যান—কর্তব্যের সন্ধান।

নারীভাবনের সুদূরত্বের পরিচয় তিনি কামারপুহুরে সাতসালের শিকার যাবীর কাছে পেয়েছিলেন। কোন্ শাখনার যাবী তাঁর আকোষস্পর্গ করেছেন তার বরণ তখনও তিনি হযতো হবার উপলভি করেন নাই। কিন্তু অন্তরের সহজাত প্রেমধর্মে এটাই তিনি বুঝেছিলেন যে, যাবীর সাধনার পথে সাহায্য করাই তাঁর ব্রত। যে পথে তাঁর যাবী হাতা করেছেন সে-পথে বিশ্বাস্য বিশ্বও বেন তাঁর দিক থেকে না আসে। কিন্তু সে যে কতবড় দায়িত্ব, হযতো সেখিন তিনি তাহা উপলভি করতেও পারেন নাই। কিন্তু নীরবে নিঃশব্দে অশকালের ভক্তও নিঃশব্দে সাধনে না এনেই তিনি ঐশ্রীঠাকুরের মহাভাবনকে সম্পূর্ণ হতে সহায়তা করেছিলেন। এই সময়ই সারস্বতিনীকে একধিন নিভুতে গেয়ে ঐশ্রীঠাকুর য়িজ্ঞাসা করেছিলেন—“কি গো, কি য়নে করে এনে? আমাকে সংসারের পথে টেনে আনতে?” ইষ্টসেবতার দিকে তাকিয়ে সারস্বতিনী উত্তর য়িলেন—“না—আমি এনেছি তোমার ইষ্টপথেই তোমাকে সাহায্য করতে।” তার বৈশী কোন অধিকার তিনি চান নাই—এমন কি সেবার অধিকারকুইও নহে। বহুতুই অধিকার য়েজ্জার ঠাকুর তাঁকে য়িয়েছিলেন, তিনি তাতেই ছিলেন পরিতৃপ্ত। প্রাণের স্নেহে

চেয়ে বেওয়ার্ষ অশ্বপা আশনা থেকে পাওয়াই যে চরম পাওয়া
সারথ্যমণি অশ্বরের ঘেঁষে তা উপলব্ধি করেছিলেন। নিশ্চয়
ছায়ায় মতো সেই বিরাট জীবনের অস্তরালে তিনি নিজেকে
সম্পূর্ণ অবশুণ করে দিলেন—ঠাকুরের ইচ্ছার নিকট তিনি
নিজেই সমর্পণ করলেন। দিনের বেলা নব্বতে থাকেন,
রাত্রিতে ঠাকুরের ঘরে আসেন—একই শয্যাতে শয়ন করেন
—শয়ন করেন কিন্তু ঘুম হয় না। বেহের এত কাছে
হয়েছেন যে বাত্ব, তিনি কি এই পৃথিবীর বাত্ব? তিনি কেন
চলে গিয়েছেন কোন অস্ত্রশোকে। পাছে অজান্তে কোন
অগ্রাঘ করে ফেলেন সেই ভয়ে নিতাইনি বিষয়ে তিনি জেগে
থাকেন সারা রাত্রি। ভোর হয়, কাক ডাকে—তিনি কিরে
যান নব্বতে। এই নিষাড়ায়ে যাবার পর যান বেগে ঘাঘ—
একদম্পাতে রাত্রির পর রাত্রি বাগ করেও ঐশীঠাকুরের ঘনে
সেহেবাধ ভাগল না। সাধনার তিনি শিফিল্যেত করলেন—
বিশ্বের সকল নারীই আশ তাঁর নিকট মল্লভার প্রার্থীক।
৩৪ গিরোহেন, তিনি সকল দেহবোধের উত্তে নিছরে মনকে
তুল ধরতে গেরেছিলেন—সেই মহাপুরুষের সাধনাকে সকল
হতে সহ্যেতা করেছিলেন। স্বামীর সাধনপথে সহায়তা
করবার যে ত্রস্ত তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাহাও সম্পূর্ণ হল।

সকল সনত সঙ্গারের লবি উপেক্ষা করে সামন্ত ধাত্রা
করলেন পরপারের উৎসবে। সত্যবিধা ভ্রাতাশুকরী কঠোর
সারিহো নাবালক সন্তানদের নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে পড়লেন।
পিতার মৃত্যুসংবাদে সারথ্যমণি কিরে এসেন জয়দামবাগীতে
অসহায় গোষ্ঠার্তা জনবীর পার্শ্বে। গ্রামের বাদুঘোষা
সমতিসম্পন্ন—সামান্যরী তাঁদের ধানভানার কাছ নিলেন।
সারথ্যমণিও মাতা সামান্যরীর সঙ্গে একান্তভাবে ধান
ভানতে বলেন—যাবার সঙ্গে যাগা পেতে নেন সঙ্গারের
সকল বোকা।

এই যোগেই আবার তিনি কামারপুত্র এবং দক্ষিণেশ্বরেও
যুগে আসেন। জয়দামবাগীর তিনি কত্কা—বিধবা, ধরিঃ
মাতার একমাত্র অবলম্বন। কামারপুত্রে তিনি বধু—সেই
সংসারেরও দাবি আছে তাঁর উপর। দক্ষিণেশ্বর তাঁর তীর্থ।
এক কেন্দ্রে থেকে আর এক কেন্দ্রে যুগে বেড়ান সারথ্যমণি।
কিন্তু মন পড়ে থাকে দক্ষিণেশ্বরে—তাঁর তীর্থে। তীর্থদেবতার
আল্লানের প্রার্থীকার তিনি থাকেন। কারণ তীর্থদেবতার
অনুগ্রহ না হলে তীর্থকর্ষন হয় না।

সেবার প্রায় দেড় বৎসর সারথ্যমণি কামাপুত্রে আছেন
—যাত্র সঙ্গারের নিত্যকাষে। সঙ্গারের সকল কর্তব্যই
তিনি করেন নিষ্ঠার সঙ্গে। কিন্তু মন তাঁর ব্যাকুল হয়ে উঠেছে

বেবর্ণনের অস্ত। যোগে এল—গ্রামের প্রতিবেশিনীদের
সঙ্গে ঐশীঠাকুরের ভ্রাতৃপুত্র নিবগান ও ভ্রাতৃপুত্রী লক্ষীপু
গন্যমান উপলক্ষে তিনি দক্ষিণেশ্বরের উৎসবে ধাত্রা করলেন।
কিন্তু সারথ্যমণির স্ত্রীর চরণ সঙ্গিনীদের সহিত সমান তালে
চলতে পারে না—কসমই শিথিলে পড়েন তিনি। অপরকে
বিরত করতে জানতেন না বলেই সঙ্গিনীদের হলেন এগিয়ে
যেতে। তিনি শিথিলে পড়তে পড়তে সমস্তই হয়ে পড়লেন।
রাত্রির অন্ধকার চারদিক ঘিরে বেলল। সেই নির্জন অন্ধকার
প্রাঙ্গণে তিনি একাকিনী নারী। এল এক দীর্ঘাঙ্কতি ভীমমূর্তি
ভাকাত—হাতে বালা, মাথায় ঝাঁকড়া লম্বা চুল। সে গর্জন
করে উঠল—“কে তুই?” সারথ্যমণি বলেন—“বাবা, আমি
পথ হারিয়ে ফেলেছি, সঙ্গিনীরা এগিয়ে গিয়েছে। তোমার
জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাষ্ট্র প্রানমণির বাসীবাগীতে থাকেন,
তাঁর কাছেই যাকি, বাবা।” সারথ্যমণির এই বক্তব্য
যাত্রাবিকৃত্য অক্ষয়বক্তারী বিভলিত হয়ে ওঠে—জানি না
কোন যত্নে প্রত্যয়ে হস্তের উত্তম হও শিথিল হয়ে আসে।
নিশ্চয় এক নারী এসে পুরুষের পাশে পড়ায়। সারথ্যমণি
এগিয়ে এসে সহম আশ্রয়িতার পরমাখীরের সত্যে তাঁর
হাতখানা ধরে বলেন—“আমি তোমার ঘের, বা...আমার
নাম সারথ্য। উঃ, কি বিপদেই পড়েছিলাম! জাগিস বাবা
আর ভুগি এসে পড়ল!” নিমেষে কি যেন এক অঘটন ঘটে
গেল। হুড়িয়ে পাওয়া কত্কায়েই ভাকাত ও ভাকাত-শরীর
মন ভরে উঠল। ভাকাত করতে এসে তাঁর নিজের মনই
হারিয়ে গেল—জরী হল যাবার নিঃসন্ধ্যা আশ্রয়বিবেদন,
ভরহীন আশ্রয়বিবাস।

সারথ্যমণি এবার এসে দক্ষিণেশ্বরে নব্বৎ-যাত্র উঠলেন।
দক্ষিণেশ্বর তখন ঐশীঠাকুরের ভক্ত শিষ্যের আশা-বাণীয়া
মুখর হয়ে উঠেছে। নব্বৎয়ের বারাদায় যাবার চটাইয়ের
বেড়া—সেই বেড়ার মধ্যে ছোট্ট একটু ছিন্ন করে নিয়ে
সারথ্যমণি আকুল অস্তরে চেয়ে দেখেন ভক্তপরিবৃত্ত আনন্দ-
বলম্ব তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে। রাত্রিতে সোয়াংগার যাবি-
প্রাণ প্রাণিত হয়—চারদিক দীর্ঘ নিবৃত্ত। জননী
সারথ্যমণি তাঁদের দিকে তাকিয়ে কত্কায়েত বলেন—“তোমার
এ সোয়াংগার সত্যে আমার অস্তর নির্বল করে ধাও!” পথার
দ্বিক্ষকে চাদের প্রতিবিম্ব ঘেরে কেঁবে কেঁবে ভলবানের কাছে
তিনি প্রার্থনা করেন—“চামেও কলক আছে, কিন্তু আমার
মন যেন কোন দাগ না থাকে প্রভু!”

ঐশীঠাকুরের এত কাছে আছেন সারথ্যমণি—নব্বৎ থেকে
ঠাকুরের অস্তর দৃষ্য করতাই বা—বিশ হাত। কিন্তু তবুও

সিনায়ে তিনি একটিবারও ঠাকুরের সেবা পেতেন না। এমনভাবে হুতাশও পেতে যায়। সীতাকে তিনি তাঁর নির্মিহি কাগ করত বান—এটাই চকপতা নাই, আশেপ নাই—নাই কোন অভিশাপ। একনিষ্ঠভাবে যে কাষের ভার পেয়েছেন তাহাই তিনি করে চলেন নীরবে। একটিবার ঐশ্রীমাহাত্ম্য দেখবার ক্ষমত মনটি ব্যাহুল হয়ে উঠিলেও তিনি সে প্রার্থনাইহুও ঘুণ হুটে প্রকাশ করতে পারেন না। তিনি নিষেধ মনেই সাধনা দিতেন—“মন, এমন কি ভাঙ্গা ভুই করেছিল যে, প্রতিদিন ঐর বর্ণন পাবি।” পরিপূর্ণ প্রেমের থাকে পরিপূর্ণ ধৈর্য—সার বার ধৈর্য আছে সেই পারে অপেক্ষা করে থাকতে। না আবার প্রেমবরশিষ্ট, ধৈর্যের প্রতিমূর্তি।

নব্ব্ব-বর বৈদ্যে বারো হুট, প্রবে মাত্র বন হুট। ছোট্ট একটি বনবা—অন্তমনত হয়ে ঘর ছুকেতে পেলেনই মাথা ঝুঁক বাধ। সেই ঘরের দ্বারী বাসিন্দা দুজন—সদৌহিহি আর মা-জননী। তার উপর শিড়ারের মধ্যে ২১০ ঘন প্রতিদিনই স্নানিত পঙ্কিধবরে থেকে বান। তাঁদের শোবার ব্যবস্থাও হয় ঐ ছোট্ট ঘরটির মধ্যেই। তার মধ্যেই আবার রান্নাবান্না-মিনিসপা-ভাঙার। মাটিতে ধরে না, দেহস্ত মাথার উপরে নিকের সারি সারি মাঝালো। তার মধ্যেই থাকে ঠাকুরের ক্ষত্র পিঠিমাছ—নাথার উপরে কলকল করে। সারথ্যমণি যারির অঙ্ককায়েই হান সমাপন করে নব্ব্বতে এসে প্রবেশ করেন পাছে লোকজন উঠে গড়লে তাঁদের সামনে তাঁকে পড়তে হয়।

ক্রমশ: দিন বত বাড়তে যাবের কাষও ততই বেড়ে চলে। ঐশ্রীমাহাত্ম্যের ভক্তের সংখ্যা, শ্রমকের সংখ্যা যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সারথ্যমণিই যাকে সন্মানের সেবার আয়োজনে ব্যস্ত থাকতে হয়। ঐশ্রীমাহাত্ম্যের নিজস্বের পাঠিয়ে সেন নব্ব্ব-বর যাবের কাছে—নিজা নৃতন করমাস—পান-সাজা থেকে প্রতিটি শিষের ক্ষত্র বসায়ি খাবার প্রস্তুত করা। পাট প্রাণিয়ে সেন ঠাকুর—না। অবগর-মুহুর্তে শিষে তৈরী করেন শিষ-বিষয়ের ক্ষত্র খাবার রাখা হলে বসে। কলকাতা থেকে বহু ভক্ত এসেছেন—এমনই তাঁদের ক্ষত্র বিড়ি চাই। নরেন এসেছেন—মায়ে থাকেন। রাজা হয়ে গিয়েছে কিন্তু তাঁর ক্ষত্র খোটা কটি ও ঘন ভাল হবে। সন্ধ্যার সময় এসে হাম দন্ত ও রাখাল—বরেন গেল উত্তর বেন নিজানো না হয়, তাঁদের ক্ষত্র ভাত করতে হবে। বিরক্তি নাই, স্নানি নাই, প্রেম নাই—সেবারশিষ্ট আনন্দবরী জননী সন্মানের ক্ষত্র নিরলস কর্ত করে চলেছেন।

সবার উপরে আছে একটি নিত্তর প্রতিটি না-চাওয়া প্রয়োজন মিটানো—ঠাকুরের সেবা করা। মাতা বেনন সন্মানের সকল প্রয়োজন নৃতন, তেমনই করে জননী সারথ্যমণি দ্ব্যতেন ঠাকুরের কখন কি প্রয়োজন। সল ভাবে নর সেই শিত ভোলামনাথকে তিনি অসার মাহুরেহে থিরে রাখেন। কখনও শিতর মতো কুলিয়ে তাঁকে খাওগাতে হয়—কখনও ভাত কম বোঝাবে বলে চেপে চেপে ভাত সানিয়ে দিতে হয়—বরাধ দুখের বেশি খাওগাতে হলে তাঁকে ঘন করে সেই পরিমাণে আনতে হয়। অসুখ প্রেমের সারথ্যমণি তত্ত্ব হয়ে বান ঐশ্রীমাহাত্ম্যের সেবার। তাঁর সঙ্গা এবং অভিব্যও বেন বিপুল হয়ে গিয়েছিল তাঁর ইস্টসেবতার মাত্র। কখনও কখনও সেই ছোট্ট নব্ব্ব-বর থেকেই তিনি দেখতে পেতেন তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে, ভনতে পেতেন তাঁর কথা। প্রেমই শেষ মাহুরকে এই তৃতীয় নরেন, প্রাণের অতিরিক্ত প্রবণবক্তি, স্পর্শের অতীত অধুতুতি।

নিষেধে প্রকাশ করবার কোন চেষ্টাই মারের কথা ছিল না। এই আত্মসোপনতার শক্তি কুলের শৌরভের মতোই ছিল তাঁর স্বভাবধর্ম। বহদিন পূর্ণ নব্ব্বতে তাঁর অভিব্য লগ্নে কোন সংসারই কাহারও মানা ছিল না। এমনই ছিলেন তিনি গোপনচাবিগী। তিনি তো ছিলেন ঐশ্রীমাহাত্ম্যের ছায়াবাস—হুতাশ তাঁর বস্ত্র অভিব্য কোথায়? কিন্তু তথাপি লোকচন্দ্রব অস্ত্রালো বীরে বীরে বলিষ্ঠ, বস্ত্র, অসুখ এক ব্যক্তিগ তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছিল। থাকে জীবনের যাত্রাপথে সহধর্মিণী বলে গ্রহণ করেছিলেন—বীরে বীরে ধর্মের পথেও ঠাকুর তাঁকে বিক্ষা ও শীকা দ্বারা সত্যকারের সহধর্মিণীকরণেই গড়ে তুললেন। সন্মানের শত কর্মের মধ্যেও জননী সারথ্যমণি ধ্যানালোকে নর হয়ে বেতেন। কিন্তু সেজন্য একদিনও সংসারের কর্তব্যের আঙ্গানে মাদ্রা গিতে তাঁর বিনুয়াজও বিলম্ব হয় নাই। কত বিনিষ্ট হজরী যাবের ধ্যান-সমাধিতে কেটে গিয়েছে, তার সন্ধানও কেহ রাখে নাই। এমনি কারেই ঐশ্রীমাহাত্ম্য অর্থ ভবিষ্যতের ক্ষত্র সকল দিক থেকেই তাঁকে গড়ে তুলেছিলেন।

ক্ষত্র হলেই বহু—ইহাই সন্মানের সাধারণ নিয়ম। শরীরেইও ধর্ম আছে। সকলের শাপ গ্রহণ করে ঐশ্রীমাহাত্ম্য অহু হলে গল্পলেন—গলায় কত। চিকিৎসা চলতে থাকে। কিন্তু উপদেষ্টের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে ঐশ্রীমাহাত্ম্যকে নিয়ে আসা হয়। ঐশ্রীমাহাত্ম্য আসেন ঠাকুরের সেবার ক্ষত্র। সহধর্মী গুণভাইয়ের নিয়ে নরেন অস্ত্র গুণর সেবা করে চলেছেন। বিদ্যাসের ছায়া

ঘনিষে আসে—সকলেই ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। একদিন এই অবস্থাতেই লীলায় ঠাকুর নাকে ডেকে বলেন—“এক শুধু আমারই দায় ? তোমারও দায়। আমি আর কি করছি ?... যোনাক এর চেয়ে তের বেশী করতে হবে।” নীহারে নতমস্তকে সারশাবনি সেই শব্দের বীজার করে নিলেন।

১২২০ সালের ২১শে শ্রাবণ ঈশ্রীঠাকুর জুবে গেলেন বঙ্গসম্মানিতে। মাঘের বঙ্গ তখন মার তেত্রিশ বলসর। পৃথিবীর হৃদয় ঠাকুরের মরসেহের এখানেই হল সমাপ্তি। যা কেবল উঠলেন শিক্ত মস্তকে—“আমার মা-কালী কোথাও গেলো !” ঠাকুর নাই—তুংসহ জালা মায়ের বুক। মনে হয় যেন কেহ কোথাও নাই—কোথাও শান্তি নাই। হঠাৎ এই অবস্থার না যেন স্রুতে গেলেন অস্তুরে অস্তুরবেতায় কথা—“কেন গো ! আমি কি কোথাও গেছি ? এই যেমন এদের ওঘর।” যা খুলে ফেলতে চেয়েছিলেন সন্তক আভরণ—স্বপ্নতে উচ্চত হলেন হাতের দ্বারা। ঠাকুর সপতীরে অবস্থিত হলে মায়ের হাতখানা যেন ফেললেন—আবার সেই কথা—“আমি কি কোথাও গেছি গো ? এ শুধু এক ঘর থেকে আর এক ঘর বাঁচায়।” মাঘের হাতের বালা হাতেই হইল—মননী যে আমার চিরসখা।

[৭]

ঈশ্রীঠাকুরের অস্থানে মননী সারশাবনির যে অস্থান জালা তার তো উপলব্ধ হয় না। মাঘের বেদনায় ব্যাকুল হয়ে ডক্তবুদ্ব এসে মিনতি জানান তীর্থপট্টনে বাবার অঙ্গ—তীর্থ-পরিভ্রমণেই ফিরে আসবে মনের প্রণামি। তাঁরা বুকেছিলেন ঈশ্রীঠাকুরের শুধু দেহেই অবগন হতেছে—তার জাখায়া হার গিয়েছে ঈশ্রীমায়ের কীবনে। ঈশ্রীঠাকুর যে অদম্পূর্তা রেখে গিয়েছেন, তার পরিণামাপ্তি হবে মায়ের সাধনায়। ঠাকুরের অদম্পূর্ত কার্যের পূর্ততা এক নূরু সন্ধানসের মস্তই যে মায়ের প্রয়োজন।

সন্ধানের মিনতি না ব্যগ্রই করতে পারেন না। মরমণবাটী, কামারপুত্র, মল্লিকগণের ঠাকুর আছেন বাটে, কিন্তু তাঁরই বিভিন্ন প্রকাশ বরোহে যে বিভিন্ন তীর্থে। আর এ তো ঈশ্রীঠাকুর মিষেই কল গিয়েছেন। কাম্পিপুরের বাগান-বাড়ীতে ঈশ্রীঠাকুরের অস্তিন অবস্থা। শ্যামাপাণ্ডে তক্ত শিক্তগণ বুক প্রভণ শোকতার নিয়ে প্রতীকী করছে এক অব্যাহিত বিবাহকপের। নরেনও শান্তির আছেন শুদ্ধ হয়ে। সহ্য তাঁর অস্তুরের অস্তুরে চিত্ত। জাগল—“অনেকেই তো বলেন ঈশ্রীঠাকুর ভগবানের অবতার। কিন্তু তিনি তো নিজের মূখে

কখনও সে কথা বলেন নাই” মস্তই করে। আর এই অস্তিম সময়ে যদি তিনি একবার বলতেন ধর্মস্থাপনের মস্ত যিনি মূগে মূগে ধর্মীতে অবতরণ করেন, তিনিই এসেছিলেন এবার ঈশ্রীমহাক্ষপ—তাহলেই বৃত্ততায় উনি সত্যই ভগবানের অবতার।” ঠিক সেই চরম শব্দিকণ ঈশ্রীঠাকুর চোখ মেলে চাইলেন নরেনের দিকে—অভিমান ও বেদনা করে পড়লো তাঁর কণ্ঠ—“নরেন, এখনও তোমার মনে সংশয়, এখনও বিধা ? ওরে সত্যি বলছি—এই বাবা, যে ঠিক—সেই এইবার একচেহে রামকাক। তবে তোমার বেদনায় মিক দিয়ে নয়।” ইহাই ঈশ্রীঠাকুরের অস্তিম বাণী। স্তম্ভিত হলেন নরেন—অস্থায়ী নারায়ণ না হলে কে মানতে পারে এমন করে মনের গোপন কথা ? মনোহের হল অবগান। বিয়ের পর এলে গাভালেন এক নবীন সন্ন্যাসী—যাযী বিবেকানন্দ তাঁর নাম।

সন্ধানের আগুহে মননী সারশাবনি চললেন তীর্থে—মসে শ্রিয় ডক্তবুদ্ব ; ইচ্ছা—গাভা বংশধরটি কাটিয়ে আসবেন বুঝাবনে। বাতায় গবে নামলেন বিদ্যনাথ-অম্পূর্ণার কাম্পিতে। কাম্পি থেকে গেলেন অমোঘ্যার। সরস্বতীর তীরে ঈশ্রীমহাক্ষে মল্লিক। মাঘের মনে হয় প্রতিটি স্থানই যেন অতি পরিচিত—মা মূগে মূগে জুবে যচ্ছেন সম্মানিতে। এখানে মা সকলকে মস্তই রক্ষণ করে বাঁচালেন—যেন সীতার পুনরাবির্ভাব। আর শুধু পুনরাবির্ভাবই বা কেন—মননী সারশাবনিই যে রাক্ষসিষ্ট সীতা। আর এ কথা তো আমার মনেছি মায়ের উক্তি থেকেই। যা তাঁর দাম্পিত্যের তীর্থপরিভ্রমণকালে রামেশ্বরে শিবের পূজা দিতে গিয়ে সম্মানিত হয়ে গিয়েছিলেন। সেই ভাবমূখেই তিনি বলেছিলেন—“বেদমতি রেখে গিয়েছিলাম, তেমনটিই তো আছে।” এই রামেশ্বরের শিবের একটি ইতিহাস আছে। কথিত হয় যে, রাক্ষসবীরের পর সন্তু অতিক্রম করে এসে ঈশ্রীমহাক্ষ সীতার সহ এই শিবমূর্ত্তির পূজা করেছিলেন। তাই এ মল্লিকের পূজা দিতে গিয়ে মাঘের মনে সেই স্মৃতিই মেলে উঠছিল। মাঘের পার্শ্বে ছিলেন যোগীন্দ্র—যা। তিনি বলে উঠলেন—“মা গো, কি বললে যা ?” মা যেন মল্লিকের দিকের পেনেয়ে ; বললেন—“যা যোগীন্দ্র, কিন্তু নয়।” যা তো কখনও নিজের মস্ত প্রকাশ করতে চান নাই। ঈশ্রীঠাকুরও বলেছিলেন—“ও রূপ লুকিয়ে এসেছে।” সত্যই তাই। কিন্তু তাহলেও যিনি সীতা তিনিই রাধা, আর তিনিই যে সারশা।

অমোঘ্য থেকে যা এলেন বুঝাবনে—যেখানে ঈশ্রীক আর ঈশ্রাবিকা বিভাশীলার ময় আছেন। ঈশ্রীকের অদম্পনে ঈশ্রাবিকার বিহবে স্মৃতি বুক ঘরে বিরহিষ্ট ঈশ্রাবিকার

হৃদিতই বা এলেন বুঝাবেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আত্মল হয়ে কেয়েছিলেন শ্রীমাদিকা। ঠাকুর নাই—সেও এক সর্বগ্রামী অভাব—দুঃসহ ব্যতন। সেই বুকভরা বেদনা নিয়েই যা এসেছিলেন বুঝাবেন। একটি বৎসর যা এখানেইইইইইইই। বহুদূর তীরে তীরে শ্রীকৃষ্ণের লীলাধরী। সব দেখতে দেখতে যা নিঃশব্দে হারিয়ে কেলতেন—তার ঘন চলে যেত কোন কবীতায় লোকে।

বুঝান থেকে যা সেলেন হরিষায়ে। হরিষায় থেকে অতপূর, পুতুর তীর্থ হয়ে তিনি এলেন প্রয়াগে। এখানে সবমে যা তার মাথার চুল কেটে বিলপন লেবেন স্থির করেছিলেন। এখানেও শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দেখা দিয়ে যাকে বলেছিলেন—ওগো, বিধবা তুমি নও, তুমি যে চিরসখা, চিরাহুতী, সতীশ্রী। ঠার অভাবে তোমার বৈধবা সে তো এধর ওধর—অথ্য একটি চোকাঠের ব্যবধায় মায়। চুল তুমি কেটো না।” মায়ের চুল কাটা হল না।

জীর্ণ-পরিষ্কৃত মায়ের সমাপ্ত হল। কিন্তু মনের আগুন জো নিতে না; মনের আশা জো কমে না। বতরিন ঠাকুর ছিলেন ততদিনই ছিল তার জীবনের সার্থকতা। ঠাকুর যে ছিলেন তার কাছ। কাছের অভাবে ছাষার অস্তিত্ব কোথায়? বিধবায়ের মনে হয় শূন্য—বিকৃতায় ভরা।

জননী সারদামণি কামারপুত্রে কিয়ে এলেন। এখানে প্রায়ই যা ১০১২ বৎসরের একটি কিশোরী সন্ন্যাসিনীকে দেখতে পেতেন। যা ভেবে পেতেন না—কেন, কোথা হতে এই কিশোরী সন্ন্যাসিনীর আগমন। মনে হয় শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বিরহে মায়ের মনে যে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল, এ তারই বহিঃপ্রকাশ। এই সময়ই এলেন এক সন্ন্যাসী—আতালে ইঙ্গিত করে গোলেন পতঙ্গা ব্যবহার জন্ত। উমা শব্দের জন্তও এই পতঙ্গা সাধন করেছিলেন। পতঙ্গার অর্থ চর্তুর্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে বসতে হয়, ময়কোপরি থাকেন জগদ্ব্যর্থ—পঞ্চম হতাপন। সন্ততিবিলক্যাসী যা এই অগ্নি-সাধনা করলেন। গায়ের বর্ণ তার খোর ক্রম হয়ে গেল। কিন্তু পতঙ্গার অবশানে সেই সন্ন্যাসীকে আর বেধা গেল না। কিশোরী সন্ন্যাসিনীও মায়ের পেয়েই কীলান হয়ে সেলেন। উমা উমারই হলেন নীন।

ধর্মিকবায়ের অবস্থানকালে সকলের কথা শুনে শুনে মায়ের মনে কি ভাব বেগেছিল। তিনি অতি সহজভাবেই একদিন শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে বলে কেললেন—“কি গো! আমায়ের কি একটি ছেলেপুলে হবে না? তাহলে সংসারজর্মে থাকবে কি করে?” শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বুকেছিলেন এ ঠিক মায়ের নিষেধ কথা নহে।

তিনি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—“একটি কি গো! এত ছেলেমেয়ে হবে যে, ‘মা’ তাকে পাগল হয়ে থাকে।” এইবার আরম্ভ হল মায়ের সেই জীবন। সংসারে তাণ্ডিত বেদনাগুলি মায়ের এসে বলে বলে উপস্থিত হয় মায়ের পদপ্রান্তে মাতৃস্নেহের রসস্রাব লাভের আশায়। জননী সারদামণি ছিলেন আত্মসম-নির্বিষয়ে সকলের ‘মা’—যে এসেছে সেই পান করেছে তার মেহরস্রাব; তাণ্ডিত জন পেকেছে শান্তি, পতিত হয়েছে উদ্ধার। চতুঃপ্রবর গিরীণ যোষ একবার যাকে ভিজ্ঞাসা করেছিলেন—“মাগো, তুমি কেমন না?” জননী সারদামণি উত্তর দিয়েছিলেন—“আমি সত্যি মা, কথার কথা মা নয়, সত্যাকারের জননী।”

সারদামণি কেবল চতুঃজননী, সংগজননী ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্বজননী। আমার এমন একজন ধর্মপ্রাণ ভক্তিম্যান ব্যক্তির সহিত পরিচয়ের দোড়াগা হয়েছি যিনি তার ১৫১৬ বৎসর বয়সই মায়ের রূপ লাভ করেছিলেন, যিনি আশ্রয় মাতৃভাষায় বিভোর হয়ে মায়ের মনে; এই সেদিনও যিনি আত্মল হয়ে ছুটে গিয়েছেন বুঝাবেন; বলে গিয়েছেন—“বুঝাবেনর কৃতে কৃতে আমি রাধারাসীকে বুঝব; আর নাই যে আমার রাধারাসী।” তিনিই বলেছেন—“যা ছিলেন কল্যাণদরী কল্যাণভূমিগী আমার পূর্বাগিনী জননী আমাকে যে কাছের কথা বসতে হুঁতাতা হন নাই, যা কিন্তু হুঁতাতা হয়েছেন, বলেছেন—“বাছার আমার কত হবে।” এমনই ছিল তার কোমল অহঃকরণ, সন্তানের জন্ত এত মমতা।” গররায়-বাগীতে কত ডাক আসতেন তার আনির্বাণ ভিকার জন্ত। তিনি তাঁদের জন্ত বহুকে সদয় রতন করেছেন, তাঁদের উজ্জ্বল পরিচায় করেছেন, পুণীকৃত উজ্জ্বল বাসন পূরুঘাট থেকে কোষ এনেছেন। কোম স্রাস্তি ছিল না—হুঁতাতা ছিল না। কেহ ভিজ্ঞাসা করলে বলতেন—“আমি যে মা গো! মায়ের ছেলের করবেনা তো, কে করবে?” শৈশবে মাতৃস্নেহের যে ভ্রপ ছোট সায়ানবিকিত, তারই এক বরণা রূপ ফেলায় আমার। তার কৈশোরে ও বৌবনে; বার্ধক্যেও আমার মেঘি সেই মাতৃস্নেহের জমবিষয়েরই এক আশ্রয় প্রকাশ।

বিকৃপূর সৈগনে যা বলে আসছেন। পাড়ীর দেখা নাই। সম্পূর্ণ অপরিস্রুত, পতিমা-কুলী-স্নেহের একটি দোকে হঠাৎ যাকে দেখেই আত্মল হয়ে কৈম উঠল। মায়ের ছুটি পা জড়িয়ে ধরে সে বলল—“তু বৌরী জানকী, তুকে মায় নে কিন্তু মিনো বেঁ খোঁখো থা, ইত্বে তোম তু কাঁধা বী।—কতদিন থেকে তোকে খুঁজে বেড়াছি মা, এতদিন তুই কোথায় ছিলি?” জননী সারদামণি সবমে তার ময়কে কল্যাণদ্ব

হুগিরে কেন—ঘাড়েরে নিবিড় হয়ে ধরেন; বলেন—“একটি ফুল নিয়ে যায় তুমি।” ফুল নিয়ে এল সে। মা ফুলটি গ্রহণ করে তাকে ইষ্টময় দিলেন। এই ছিলেন জননী সারসামনি—পান নাই, কাল নাই, পাত্র নাই—বহন তখন, সময়ে অসময়ে ময় ছিলেছেন অগণিত আকুল মানুষকে—স্বাধি ছিল না মায়ের। স্বাধুদুগুণ্টে উঠে গভীর রাত্রি পঞ্চম তিনি ছিলেন স্রাবিবিহীন, নিরলস। কত মাৎসর্য উৎসার করেছেন তিনি। কেহ এসে বলছে—“আমাকে পথ চিনিহে লাভ, তুমি বলল, অচ্ছাই ময় দাও।” মা তাই নিষেছেন। কেহ বলছে—“তুমি সকল কারকের কারণ, তুমি ত্রিগুণ জালা ছড়িয়ে দাও।” মা তাই করেছেন। জননী সারসামনি ছিলেন মহাতীর্থের চিহ্নটি প্রতীক। অগণিত মাতৃহ এলছে—প্রথম করেছ—সকল প্রাণির পূর্ণিত্ব নিয়ে তাতা পাখি আনন্দোৎসব চলবে বুঝে ফিরেছে। সত্যই জননী সারসামনি ছিলেন ভগবান্নী, জগৎকারিণী অগম্যায়ী।

৫: ১৫ করে দড়িত তিনটা বাঘে—শেখরাবেরে তিনটা। মা শয্যাভ্যাগ করে উঠে পড়েন—বিছানাতে কসেই অশ করেন চুটো পর্বত—সন্ধানের কল্যাণ-কামনা। তারপর দেখা যেত বাঘার তরকারী নিয়ে কুটতে বসেছেন মা। যেদিন বড় ভক্ত-সানাগ, শীকড়িলাই সন্ধানের আগমন—সেই প্রয়োজনযুক্ত তরকারী খেটী এক রাগার তদারক করাও ছিল মায়ের কাজ। তিনি বসন্তের মধ্যে—অত্র সব ভক্ত মেয়েরা বসন্তের মাকে বেঁধে করে। সে সময়টুকুও কত মমুর। কত মেহবারিবর্ণ, কত হৃদয়বের গল্প। মায়ের শরীর এখন দুঃ ছিল, তখন বাগনই বা যেক্ষেত্রে কত। ঠাকুরের ফুল তোলা—খেটোও ছিল মায়ের কাজ। ফুল তুলতে-তুলতেই মন ঠার চলে যেত কোন বগলোকে। কম করেও একশতটি পান মা সাজতেন তাঁর সন্ধানের ভক্ত। গন্ধিগেবেরেও ছিল এই পান সাজা।

সকাল ৮টা-৯টা। মাকে আর পাওগা যেত না। তিনি তখন ঠাকুরঘরে পূজারতা সদাধিময়া। সেখানে তখন কেবল তিনি আর তাঁর ইষ্টমবতা। ঠাকুরঘর থেকে বের হলে শীকার পর্ব। তারপর একই জল-নিশি মুখে নিয়ে মা রামাঘর চুকতেন। ঈশ্রীদুহ আর ঠার ইষ্টমবী ভবতীশীর তোপের জঙ্গ কত হয়ে কত রকমের হাঙ্গা করতেন—কত তার উপকরণ! বেলা ১২টা-১টা পর্বত মা থাকতেন রামাঘরে। ঠাকুরকে জ্যেপ নিবেদন করে, সকলকে বাইরে মাথের বধন অবশর হস্ত তখন কো প্রায় ২টা-২৫টা। বেলা গড়িয়ে পড়ছে। মায়ের শরীর অস্থ—সকলেই অথবোগ

তুলেছেন কেন এত বেগার খাওগা? কিন্তু অমপূর্ণি জননী কি করে সকলকে না বাইরে অর তুলবেন মুখে? তারপর দু-এক ঘন্টা বিশ্রাম। কিন্তু তখনও দেখা যাচ্ছে ঠার পাতলা ট্রোট হুটি নরছে। তখনও তিনি সন্ধানের কল্যাণকামনার অশ করে চলেছেন। বিকালে কাপড় কেটে, ঠাকুরদের জলদাবার দিয়ে চালে বা বাগাআধ এসে বসতেন, কিন্তু তখনও তুলে যেতেন দ্যানতরুত্তোর। তারপর রাত্রি নকটর ঠাকুরকে খাওগানো, পোয়ানো—পথপ্রান্তে জ্যেপ বসে থাকা। বিব-চরার বধন হুগিরে অর, তখন মা ভুতে যেতেন। কিন্তু তখনও মায়ের ট্রোট নরছে—কল্যাণকামনার শেষ নাই!

এর মধ্যেই মা আরও তীর্থে যুর আসেন; জহরামঘটী, কামারপুহুর, কলকাতা তো আছেই। কিন্তু মায়ের কর্মব্যারার কোন ব্যক্তিময়ী দেখা যায় না কোন কারে। এত রক্তসাপানে মা অস্থ হয়ে পড়লেন। অর আর চাড়ে না, কত চিকিৎসা—সেবার কোন ক্রটি নাই। কিন্তু মেহের জালায় তো উপশম হয় না। আসর যিক্ষেবের আগতায় সকলেরই মন জারাকার, বেরানুহুর। ভক্ত অমপূর্ণি মা মাকে দেখতে এসেছেন। কিন্তু ভিতরে খাওগা নিবেপ বলে তিনি সরজায় ঠাড়িয়ে আছেন। ৪টাং পান দিয়ে তাকে কেহতে পের মা ইশারা করে কাছে ডাকলেন। অমপূর্ণি মা কাছে গিরেই আক্ল ক্রন্দন তেও পড়লেন; বালেন—“মাগো, আমাঙ্গের কি হয়ে মা?” কল্যাণশিপি মা অতি কীণ কঠে তাকে অভয় দিবে বললেন—“ভয় কি? তুমি ঠাকুরকে দেখেছ, তোমার আবার ভয় কিসের! তবে একটি কথা বলি—যদি শান্তি চাও মা, কারও শোষ দেখো না, শোষ দেখেই নিজে; অগৎক আগনার করে নিতে দেখো। কেউ পর নয়, মা; অগৎ তোমার।” ইহাই ঈশ্রীদায়ের শেষ বাণী। মা যে কত বড় শিকা মিরে গেলেন, এই ছোট একটি কথায় মাঝে—“কারও শোষ দেখো না, শোষ দেখেই নিজে।”—অসতে পাণ্ডি পাবার ইহাই একমাত্র পথ। সত্যই তো—অস্ত্রের শোষ বেরবার, অস্ত্রের আচরণের বিচার করবার আমি কে? আমার নিজেরই যে ক্রটির অভ্য নাই। অস্ত্রের ছিট খুঁজতে গেলে ছিটের অভাব হয় না। কিন্তু সেই ক্রটির কথা আলোচনা করতে গিয়ে যে ভক্তবের অঙ্গই আবাবের মনটা ছোট হয়ে যায়। আর কাহারও ছিট খোঁজার অর্থই হল—তার বিরুদ্ধে মনের মধ্যে বিরপতার স্রী। কারণ বিরপতা না আগলে ছিট খুঁজবার প্রকৃতি আগলে না। সেই বিরপতার তরুণ যে অস্ত্রের অভ্যকণ্ড আঘাত করে—তার মনেও বিরপাত পুটি হয়। কিন্তু কেন এই বিরপাত, কেন

এই বিরূপতা? যশে কেবল কখনই বাড়ায়—শান্তি তো আসে না।

ক্রমে এগিয়ে আসে বিবাহের মহাসময়। বিদ্যাহের তিনদিন আগে থেকেই স্ত্রীমা বড় একটা কথা বলতেন না। সর্বদাই আস্থায়। কেহ তাঁর মনকে মাটির গুঁথিবার মাঝায় আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলেও তিনি বিরক্ত হতেন। বীরে বীরে মায়ের দৃশ্য বাক্যেরাও হয়ে পেল। ১০২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ যমলবার রাত্রি দেড়টার সময় করেকথার বীর্ণনিঃশ্বাস ফেলে তিনি মহাসময়ান্তে নিম্ন হইলেন।

মহাপুরুষের বাণী কখনও হারায় না। ঠাহুর স্ত্রীমাক্ষর

বাণীও হারায় নাই; মায়ের বাণীও হারায় নাই। ভারতের নারী, বিশ্বের নারীকে অননী সায়দামনি নিঃস্বের অীবনের আলোকে দিয়ে গেছেন পুঙ্খ নুঙ্খ ইতি—সেবার পথ, কল্যাণের পথ। আশ্রয় নারীর পথ হতেই প্রার্থনা জানাই তাঁর চরণে—“মাগো, যে পথ তুমি দেখিয়েছ সে-পথেই বেন চলতে পারি সার্বজনীন ধরে, সেবার আশ্রমে কল্যাণের আদর্শ বেন নিঃস্বের অীবনকে পড়ে ভুলতে পারি—এই আশীর্বাদই তুমি করো না?”

মম স্ত্রীমাক্ষর!

মম মা অননী!



রবীন্দ্র জীবনালেখ্য

॥ চারুচন্দ্র ওট্টাচার্য ॥

ঘ. শিল্পী রবীন্দ্রনাথ

১
স্বতন্ত্র

কবি বলেছিলেন—

যেখানে বীণা শুধু বীণা সে বসবাস। কিন্তু যেখানে বীণার সংগীত উঠে, সেখানে বীণার পিছনে ওত্থাদজি আছেন। আমাদের জীবনের মধ্যে যখন সংগীত বাজে তখন নিজেকে ভুলে বাই। আমাদের জীবনযাত্রের ওত্থাদজিদেরই বেগতে পাই। তখন হুব আদ্যের অস্তিত্ব করে না, অতি আমাদের প্রতিষ্ঠা করে দেয় না, তখন ওত্থাদজির আনন্দের মধ্যে আমাদের জীবনের শেষ অর্পণ দেবতে পাই। সেইটে দেবতে পাওয়াই মুক্তি।

কবির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সুনির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যেত যখন গানের প্রেরণা আসত।

শান্তিদেব ঘোষ লিখছেন—

কথা ও হৃদের বিলনে যে রূপটি গড়া হল তাতেই তিনি পুঁজি। অনেক সময় হুরগুলি যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে আসে তেমনই আবার কাজ শেষ হয়ে গেলেই তাঁর মন থেকে চলে যায়। গান রচনার সময় হুরগুলি যে ছবির প্রচলিত শব্দসমূহের আশে ছাড়াও নতুন। তা নিয়ে তিনি কোনোদিন সন্তুষ্ট নন, এবং শোধন করার প্রয়োজনও বোধ করেননি। কত মধ্যযুগে, যুগের মধ্যে সহসা এক হুরের ক্ষুদ্র তাঁর মস্তিষ্কে আঘাত করেছে— কোথার ভেদে গেছে নিশ্চয়। সেই হুরটি পাওয়া হুরকে বাস্তবে ছবিতো বতর্কণ না ধরে রাখতে পেরেছেন, ততক্ষণ তাঁর আর সোয়ান্তি নেই। যদি কোনো কারণে সে-হুর হারিয়ে গেল, তবে তার জন্তে কী তীব্র বেদনাই না মনে জাগেছে।

তাঁর রচিত প্রায় দু'হাজার গানের প্রত্যেকটিতে নিজে হুর বসিয়েছেন।

হিন্দুস্থানী গানের কথা সুরের আধার মাত্র।

বেশিরভাগ হিন্দুস্থানী গানে কথার বিশেষ কোনো মূল্য নেই, ভাবের কোনো গভীরতা নেই। হুরঘটা ধরে একটা গান চলল, সুরের ঐশ্বর্যে ও গাত্তর্যে আমরা ধমকম করতে লাগল, কিন্তু যে-কথাকলি আশ্রয় করে সুর প্রকাশ পেল তাঁর মানে হয়ত এই, কানাই আমার কলসির বিঁড়ে চুরি করেছে। রবীন্দ্র-সংগীতে কথা ও ভাব এক উচ্চ পর্যায়ে উঠল, আর তাঁর সঙ্গে অসঙ্গিতাবে মিলল সুর। হরকে গৌরী থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তা যেমন হয় নিরাক্রম, সেই রকম কাঁঠোর হবে যদি রবীন্দ্রনাথের গানের কথাতে তাঁর নির্দিষ্ট সুর থেকে পৃথক করা যায়। রবীন্দ্রনাথের রচিত গানে তাঁর স্বাধীন সুর ছাড়া অন্য সুর যদি বসান যায় তবে তা হবে মাত্রান্তর, অন্তরিক অপর কবির কথার উপর রবীন্দ্রনাথের সুর সংযোগ করলে তা হবে বিভ্রম। রবীন্দ্র-সংগীত এমন অখণ্ড রূপ নিয়ে আমাদের চিত্তকে উদ্বেলিত করে যে তাকে তখন বিশ্লেষণ করার শক্তি আমরা হারাই।

রবীন্দ্রনাথ অমর হয়ে থাকবেন তাঁর গানের জন্তে, আর কিছুই জন্তে না হোক।

'ছেলেবেলা'তে লিখছেন—

যখন আমার কিছু বয়স হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড়ো ওত্থাদ এসে বসলেন বহুতট। একটা মন্ত ভুল করলেন, বেশ ধরলেন, আমাকে গান শোখাবেনই; সেই জন্তে গান শোখাই হল না। কিছু কিছু সংগে করেছিলাম পুঁজির চুরি।

কিন্তু তাতেই পুঁজি বেশ ভারী হল।

যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করলেন তখন প্রথম প্রথম রচনা করলেন ব্রহ্মসংগীত। তাতে হিন্দুস্থানী গানের কাঁঠোয় বজায় রেখে হিন্দুস্থানী

কথার বদলে বাংলা কথা বসিয়ে যেতে থাকলেন। পরের যুগে মিশ্রণ আরম্ভ হইল, বাহারের সঙ্গে মিশ্রণ মন্ডার। তৈরবীর সঙ্গে খাখা, বেহারের সঙ্গে কেদারা। সমালোচকদের এতেই যোরতর আপত্তি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একটা সুরের সঙ্গে অস্ত্র কোনো বেখান্না সুর বসাননি যাতে ক'রে সংগীতটা অজ্ঞাব্য হয়ে উঠে। সংগীত-বিজ্ঞার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, যুগে যুগে বড়ো বড়ো গুস্তাদরা এই রকম মিশ্রণ করেছেন, আর সব সময় যে শুদ্ধভাবে করেছেন তা নয়। রবীন্দ্রনাথ এ যুগে না হয় শুদ্ধভাবে কিছু কিছু মিশ্রণ করে সংগীতকে অধিকতর মনোহর করলেন।

ধূর্তীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলছেন—

রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সংগীত-ধারার বিপক্ষে হাওয়া হুবে থাকুক, সেই ধারাকেই বেশী সঙ্গীতের স্পর্শে ও ব্যক্তিগত ভাবের স্পর্শে এনে নতুন জীবন দিয়েছেন। শ্রদ্ধা সহকারে দেখলে, ইতিহাসকে খাতিরে করলে, সংগীতকে ভালোবাসলে, বসিক হলে অব্যবহৃতকথা বা ধিলে হুত দেখা যাবে যে, কবির স্থান সংগীতে শূন্যে। নতুনকে অপরিচিত হলে অবজ্ঞা না করলে অনেক সময় দেখা যায় যে, সেটি পুরাতনের রূপান্তর, পুরাতনেরই বিকাশ। সনাতনকে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, তার মধ্যে অনেক সময় নতুন জীবনের আভাস রয়েছে।

২

গায়ক রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। মনে আছে, বাল্যকালে গাঁবাসুল দিয়া ঘর শাজাহাঁ মাথোৎসবের অঙ্গকরণে আঘরা খেলা করিতাম। সে-বেলায় অঙ্গকরণের আর আর সমস্ত অঙ্গই একেবারে অর্থাহীন ছিল, কিন্তু গানটা ঝাঁকি ছিল না। এই বেলায় হুল দিয়া সাকানো একটি টেবিলের উপরে বসিয়া আমি উচ্চকণ্ঠে 'বেসিলে তোমার সেই অঙ্গুল প্রেম-আননে' গান গাহিতেছি বেশ মনে পড়ে।

আর এক জায়গায় বলছেন—

আখ্যায়ের বাড়ির বন্ধু ঐক্যগান্ধী দিনরাত গানের মধ্যে ডুবিয়া থাকতেন। তিনি তো গান শোনাতে না, গান দিতে, কখন তুলে নিতাম আনতে পারতুম না।

অস্ত্র বলছেন—

ছেলেবেলা থেকে ভালো হিন্দুস্থানী গান শুনে আসছি বলে তার মনুষ্য ও বাণ্য সমস্ত মন ঘিরে বীকার করি। ভালো হিন্দুস্থানী গান আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করে।

রবীন্দ্রনাথ দুগায়ক ছিলেন, তাঁর কণ্ঠস্বরের তুলনা ছিল না। রবীন্দ্র-সংগীত একেবারে মিনিমিনে, এ কথা স্বীকার বলেন, নিচ্ছয়ই তাঁরা কেউ রবীন্দ্রনাথের বা দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠে গান শোনেননি।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের উদ্বোধন হল রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের গান দিয়ে। বৃহৎ বণ্ডলের একটি আসনও শূন্য ছিল না; আর প্রত্যেক লোক নিজ নিজ আসনে বসে মুগ্ধভাবে তাঁর গান শুনেছিল। মাইক তখনও ওঠেনি।

একসময় তাঁর পাশে কোনো সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়া হুকের হয়েছিল। সভায় তাঁকে সেখালে লোকেরা উৎসুধ করত। সভার সভাপতি ভাড়াভাড়ি সভার কাজ শেষ করে রবীন্দ্রনাথকে গাইবার জন্য অনুরোধ করতেন। তাঁর গান চলতে থাকত।

সেকালের একটা ঘটনার উল্লেখ করি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে যুবক রবীন্দ্রনাথ এক প্রবন্ধ পড়লেন। প্রবন্ধ শেষ করে রবীন্দ্রনাথ যেই বসলেন তার দিক থেকে রব উঠল—গান, গান। রবীন্দ্রনাথ উঠে দাড়িয়ে হাতজোড় করে বসলেন—আজ আমি বড়ই ক্লান্ত, আজ আমাকে কমা করুন।

কে তা শোনে, সেই রব—গান, গান।

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—না হে, রবি, এরা ছাড়বে না, পারো তো একটা গান।

রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে বসে রইলেন; তারপর ধরলেন—

আমার বোলো না গাহিতে বোলো না।

একি জু হাঙ্গিবেলা, প্রমোদের মেলা, জু মিছে কথা হলনা ? এ যে মনের জল, হৃদয়ের হাস, কলঙ্কের কথা

বহিষ্কৃত আশ,

এ যে বুক-কাটা হুবে ওমরিছে বুক গভীর মনোবেদনা।

একি জু হাঙ্গিবেলা, প্রমোদের মেলা, জু মিছে কথা হলনা ?

রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকে ঠাকুরদা বলে একটি চরিত্র দেখা যায়। এই ঠাকুরদা হলেন মুক্ত-আত্মা। স্টেজের উপর রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে—গানে, নাচে, কথায় ওই চরিত্রকে রূপায়িত করেছেন। আজও অনেকের তা স্মরণে আসে।

‘শারদোৎসব’-এ ছেলের দল নিয়ে দাদাঠাকুর শরৎের আনন্দের সঙ্গে নিজেই আনন্দ মিশিয়ে দিয়ে একেবারে বেতে উঠেছেন। ‘ডাকঘর’-এ ফকিরের বেশে, ‘অচলায়তন’-এ দাদাঠাকুর রূপে, ‘মুক্তধারা’-র ধনভর্য বৈরাগী রূপে, ‘কান্তনী’-তে বাউল রূপে তাঁকে দেখি। আজও যেন চোখের উপর ভাসছে, ওই বর্ষীয়ান জ্ঞানবৃদ্ধ তপস্বী স্টেজের উপর একতারা হাতে করে নাচতে নাচতে গাইছেন—

হাসিগজা হীরাগজা হোলো তালে,
কপে ছপে ভালোদল তালে তালে,
নাচে ধম নাচে বুলু পাছে পাছে
তাতা বৈধে তাতা বৈধে তাতা বৈধে।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে নৃত্তি, নাচে বহু।
সে তরঙ্গে হুটী রঙ্গে পাছে পাছে,
তাতা বৈধে তাতা বৈধে তাতা বৈধে।

১৯৩২ সন, সেপ্টেম্বর মাস। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে। হঠাৎ সংবাদ এল, মহাত্মাজী সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রতিবাদে আত্মত্যাগ অনশন-ব্রত গ্রহণ করবেন। কবি মহাত্মাজীকে টেলিগ্রাম করলেন—

Our sorrowing hearts will follow your sublime penance with reverence and love!

অন্তরিক থেকে মহাত্মাজীর টেলিগ্রাম এল—

Have always experienced God's mercy. Very early this morning I wrote seeking your blessing if you could approve action and behold I have it in abundance in your message just received!

রবীন্দ্রনাথ মন্থিয়ে উপাসনা করলেন। আশ্রম-বাসী সকলে উপবাসী রইলেন। মহাত্মাজী সম্বন্ধে কবির উৎসাহ বাড়তে লাগল। তিনি হির থাকতে পারলেন না। পূনা যাত্রা করলেন।

ওদিকে যীমান্দার সংবাদ এসে পৌঁছল। এখন মহাত্মাজী গুর উপবাস ভাঙবেন। রাজা-পোপালাচারি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই পাটেল, জয়নাথ কৃষ্ণক, মহাদেব দেশাই, সরোজিনী নাইডু, কমলা নেহেরু প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথও পৌঁছে গেছেন। গোলাসে কমলাসেবুর রস, তাই পান করে মহাত্মাজী উপবাস ভঙ্গ করবেন। মহাত্মাজী রবীন্দ্রনাথকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করলেন। রবীন্দ্রনাথ গাইলেন—

জীবন বধন শুকায়ে যায় কল্পনাধার এলো।
সকল মাধুরী শুকায়ে যায়, ঈতহুবারনে এলো।
কর্ম বধন প্রবল আগার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার
কলহপ্রায়ে হে জীবনবধন, শান্তচরণে এলো।
মহাদেব দেশাই বললেন—এই গানটি বাপুজীর বিশেষ প্রিয়।

অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ

শুধু ‘দাদাঠাকুর’-এর মতো টাইপ-পার্টে বে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা নয়, রঙ্গমঞ্চে বে রূপ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন দর্শকগণকে সমানভাবে মুগ্ধ করেছেন।

বয়স তখন হোল, প্রধান অভিনয় করলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘এমন কর্ম আর করব না’ প্রহসনে অলৌকিকবাবু হুমিকায় অবতীর্ণ হলেন। এর পর আর কয়েকটা নাটকে অভিনয় করেন, কিন্তু সে সব অভিনয় প্রায়ই বাড়ির লোক ও বন্ধুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

১৮৮১ সনে ‘বিষজ্ঞান’-সমক্ষে বাস্তবিক-প্রতিভা অভিনীত হয়, রবীন্দ্রনাথ বাস্তবিকের অংশ গ্রহণ করেন। সেদিন দর্শকগণের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

‘কালদুগ্ধায়’ অভ্যুদয়, ‘বৈকুণ্ঠের ষাড়া’র কেদারের হুমিকা নেন।

‘বিসর্জনে’ কখন হচ্ছেন রত্নপতি আবার এক এক সময় জয়সিংহ।

‘তপস্বী’তে বিক্রম। যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি অভিনয়।

তার একদিনকার অভিনয়ের কথা বলি।

বিসর্জনীর অভিনয় হবে এম্পায়ার থিয়েটারে। ওর এখনকার নাম হল রঞ্জি। রবীন্দ্রনাথ জয়সিংহ। ৬২ বছরের বৃদ্ধকে যুবক জয়সিংহ রূপে দেখে মুগ্ধ হইলুম। অভিনয় দেখে সোজা বাড়ি ফিরলুম। পরদিন সকালে জোড়াসাঁকোয় গেছি, একতলায় রথীবাবুর সঙ্গে দেখা। দেখামাত্র রথীবাবু বললেন—কাল সব খুব বেঁচে গেছি।

—কেন, ব্যাপারখানা কি ?

—সে কি, আপনি তো কাল গিয়েছিলেন, কিছু বুঝতে পারেননি ?

—না, তো !

—উপরে বাবার কাছে গিয়ে সব শুনুন।

উপরে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, কাল কি হয়েছিল ?

—আপনি কোন্ রো-তে বসেছিলেন ?

—সাত আট রো পিছনে।

—তাহলে সেখান থেকেও কিছু বুঝতে পারেননি ! ব্যাপারটা কি হল শুনুন। জয়সিংহ ও অপর্ণা কথা বলছে, চেয়ে দেখি ভিতরে আগুন জ্বলছে। রাগু^১ তো পালাবে। পালালেই একটা বিশৃঙ্খলা, দর্শকরা ছুটে পালাবার চেষ্টা করবে, আগুনের জ্বলে না হোক, ঠেলাঠেলিতে লোক মারা পড়বে ; তা ছাড়া দেখছি আগুন নেবাবার জ্বলে ভিতরকার লোকেরা খুবই চেষ্টা করছে, দমকলের আওয়াজও কানে এল। রাগুর হাতটা খুব জোরে ধরে আগুনের দিকে তাকে পিছু ক’রে দাড় করিয়ে আমি ব’লে যেতে থাকলুম। আমার বলা শেষ হল, এবার—রাগু বলবে, কিন্তু দেখি স্তার মুখ দিয়ে কথা বেরচ্ছে না। কি করি, আমিই বলে যেতে থাকলুম।

এম্‌টার চুপচাপ ধাড়িয়ে। ছ’সাত মিনিট বলবার পর আগুন নিবল, আমরা ভিতরে চলে গেলুম। এসব আপনাতা কিছুই বুঝতে পারেননি ?

—যোট্টেই না।

—বই-এ নেই এসব কথা বলতে থাকলুম, আপনাতা ধরতে পারলেন না ?

—আনো নয়। কিন্তু ছ’সাত মিনিটে তো অনেক কথা বলতে হয়। ভিতরে আগুন জ্বলছে, যাকে বলছেন সে পালাতে ব্যস্ত, এই অবস্থায় জয়সিংহের উপযোগী কথা অমিত্রাকর ছন্দে শ্রুগিয়ে যেতে থাকলেন !

—আরে শশয়, এ তো আমারই লেখা। বই, এ আর শব্দ কি ?

ভাবতে লাগলুম—এ আর শব্দ কি !

আজও তাবি—এ আর শব্দ কি !

আমার নিজের অভিনয় দেখার কথা বলি।

১৮৯৪ সনে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রথম অভিনয় দেখি। অভিনয়ের আগে একজন লোক এসে কয়েকটি ফুটলাইট জ্বলে দিয়ে গেল ; ছবার কনসার্ট বাজল ; তারপর অভিনয় আরম্ভ হল। যোলারে জড়ানো অরণ্য, রাজপ্রাসাদ এইসব দিন একটু একটু করে খুলে খুলে নামছে। দেখে মুগ্ধ হয়ে যাইছি।

সেই আরম্ভ হল ; তখন থেকে আজ অবধি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ও তার বাইরে বহু অভিনয় দেখে আসছি। এর মধ্যে কোন্ অভিনয় আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে, বলতে হ’লে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে বাইরে যেতে হবে।

১৯১৭ সালে জোড়াসাঁকোতে বিচিত্রাবনে ডাকঘর-এর যে অভিনয় হয়, আজও অবধি আমার কাছে কোনো অভিনয়ই তার ধারেও পৌঁছতে পারেনি।

বোতলার হলে এক চালাঘর তৈরি হয়েছে। রঙ্গ-মঞ্চ-নির্মাণে, অভিনেতৃবর্গের রূপসম্মান গগনেন্দ্রনাথ,

^১ বর্তমানে গতি রাগু হুগ্গি

অবনীন্দ্রনাথ, মন্দলাল তাঁদের সমস্ত কিছু চলে গিয়েছেন। বইতে গান ছিল না, কয়েকটি গান জুড়ে দেওয়া হয়েছে, সুর ধরেছেন মিনেন্দ্রনাথ। অভিনয়ে ছিলেন—

রবীন্দ্রনাথ	ঐকুৎসা
গগনেন্দ্রনাথ	শিবেশ্বরাই
অবনীন্দ্রনাথ	বোড়ল
রবীন্দ্রনাথ	চাক্ষুঃবিদ্যাক
অসিত হালদার	স্টেডমাল

বিশ্বকর ছিল বালক আশামুকুলের অমলের অভিনয়। চল্লিশ বছর চলে গিয়েছে, সেদিনকার সেই অভিনয় আজও আমার চোখের উপর ভাসছে। এগারো রাত্রি অভিনয় হয়, ন'রাত্রি অভিনয় দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

একদিন দর্শকগণের মধ্যে ছিলেন—অ্যানি বেসান্ট, বালগঙ্গাধর টিলক, লাজপৎ রায়, মদনমোহন মালবীড়, মহাত্মা গান্ধী। অভিনয় শেষ হল, মহাত্মা আর ওঠেন না; শুক হয়ে বসে—চোখ দিয়ে টুন্টস করে জল পড়ছে।

চিত্র-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে কেবল সাধারণ লোক নয়, সাধারণ চিত্র-শিল্পীও রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিকে তার যথার্থ মূল্য দেয় না। এর মূলে এই কথাটা আছে যে, পাশ্চাত্যদেশের শিল্প-পদ্ধতির প্রকৃষ্ট জ্ঞান না থাকলে রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রকে বুঝে উঠা কঠিন।

যানিনী রায় 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লিখেছেন—

রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখে বাগ্যপন্থক আলোচনা এখনও হয়নি। সে কাজ করতে হলে ইউরোপীয় শিল্প দেখে ওয়াক্সপিস্তাল ব্যক্তির প্রয়োজন। মতধীন তা না হচ্ছে, ততধীন অস্বচ্ছন্দ এবং অকারণ বিরূপতা এই ছবি-এর মধ্যে শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে বোঝা যেতে হবে।

এর পূর্বে এক প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের

শিল্পীত্বের বিশদ আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রে সব সময় বৃহৎকৈ প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন, তাঁর কল্পনার বিরাট স্বভাবকে বিশ্বকর। রবীন্দ্রনাথের সবলতার জন্তে, তাঁর ছন্দবোধের জন্তে তাঁর অঙ্কিত চিত্র উচ্চ স্থান অধিকার করেছে।

এই প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ শয্যাশায়ী। এই প্রবন্ধ পড়ে তিনি যানিনী রায়কে লেখেন—

আজ হৃদয়কাল ভাবার সাধনা করে এসেছি, সেই ভাবার ব্যবহারে আমার অধিকার হয়েছে এ আমার বন জানে এবং এই নিয়ে আমি কখনো কোনো মিথ্যা করিনি। কিন্তু আমার ছবির বুলি আমাকে ঠাকি হচ্ছে কিনা আমি জানিনে। সেই জন্তে তোমাদের দ্বারা ওগীর সাক্ষ্য আমার পক্ষে পরম আবশ্যকীয়। যখন প্যারিসের আর্টিস্টরা আমাকে অভিনন্দন করেছিলেন তখন আমি বিম্বিত হয়েছিলাম এবং কোম্পানি আমার কৃতির তা আমি শাই বুঝতে পারিনি।

রাশিয়ারেও তাঁর অঙ্কিত ছবির এক প্রদর্শনী হয়। রাশিয়ার শীর্ষস্থানীয় চিত্র-শিল্পীরা হলে ঢুকেই বলে উঠলেন—একি, আমাদের অঙ্কন-পদ্ধতি আপনি কোথায় পেলেন?

ছন্দোক্ত রবীন্দ্রনাথ

ধ্বনিশিল্পের প্রধান অঙ্গ হল সংগীতে সুর ও কাব্যে ছন্দ। রবীন্দ্র-সংগীতের অভিনবতা আমাদের চিত্তকে অয় করেছে, অন্তরিকে বিচিত্র অপব্রতন হুল দিয়ে তিনি তাঁর কাব্যকে রূপায়িত করলেন। দুই-ই এক শিল্প-প্রতিভার অভিব্যক্তি। রবীন্দ্র-প্রাকৃৎসে সুর ঐশ্বর্যশালী ছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ছন্দের মৈত্রী ছিল অত্যন্ত বেশি, তার শক্তি ছিল ক্ষীণ।

রবীন্দ্রনাথ যখন কাব্যরচনা আরম্ভ করলেন তখন যে ছন্দ তিনি পেলেন তাকে অকরবৃত্ত বলা যায়, আর তাও ঠিকমতো পড়ে উঠেনি, তার

মূলতঃ আবিষ্কৃত হয়নি। এই ছন্দের কৃত্রিমতা ও অপূর্ণতা তাঁকে শীড়া দিল। তিনি ছন্দে ধনিমাত্রা আবিষ্কার করে এক যুগান্তর আনলেন, বাংলা কাব্যকে অক্ষর-গুনতির বন্ধনপাশ থেকে মুক্তি দিলেন।

পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ আরও এগিয়ে গেলেন; কাব্যকে রূপের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে গল্প-কবিতা রচনা করলেন; আর ঠিক একই সময় তিনি রূপ-রেখাহীন চিত্রশিল্প-রচনায় আকৃষ্ট হলেন। ছুই-ই রূপাতীত সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। এ সৃষ্টি এত উৎসর্গে উঠে গেল যে, সাধারণ মানুষ তার নাগাল পেল না।

প্রবোধচন্দ্র সেন একসময় বলেছিলেন—

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার প্রতি যুগলং দৃষ্টি স্থাপন করলে এ কথা ভেবে বিস্মিত হতে হয়, কত বিচিত্র ও অদ্বিপ্রান্ত তাঁর ভাব ও রূপ সৃষ্টিঃ প্রবাহ এবং কবিকীর্ণনের

সেই প্রথম অভ্যাসের থেকে আরে পর্বন্ত সমগ্র জীবনব্যাপী নব নব ছন্দ, সংগীত, ভাব ও রূপ রচনার সাধনা তাঁর কত বিপুল, কত অজস্র ও অবিরাম। তাঁর এই সমগ্র জীবন-ব্যাপী অকৃত্রিম রূপস্বল্পনের মহোৎসবের আনন্দে যোগ দেবার ক্ষেত্রে আর আমরা তাঁরই ছন্দে ও ভাবায় সকলক্ষে সাধর আনয়ন করছি।

উষ্ম-ববি যে রাতা বহু রাতায়ে

পূর্ণাচলে দিখেছে যুব ভাঙাথে—

অস্তরবি সে রাতারসে রসিল,

চির-প্রাণের বিজয়-বাণী ঘোষিল,

অরুণ-বীণা যে স্বর নিগু বদিল

সম্মুখালে সে স্বর উঠে ঘনিহা—

নীচব নিশ্চিন্তিনীর বুকে নিশিল ধনি ধনিহা।

আহরে তোরা আহরে তোরা আহরে

বাধন-হারা রঙের ধারা ঐ-যে ব'হে বারহে ॥

[বহনঃ]



॥ বিশ্বাস গান ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ভেরো

তড়িৎকে গাড়ি করে বাসায় পৌঁছে দেওয়ার মধ্যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল নলিনাকের : সে একে একটু একলা পেতে চায়। মন্মীর চালে যখন উদ্দেশ্যটা কঁটে গেল, তখন একটু মনেই গিয়েছিল প্রথমটা, তবে মন্মী রয়েছেও তো সঙ্গে, ও ভাবটা কেটে যেতে দেরি হয়নি এমন।

নলিনাকের বাগিচা-অভিযানটা ওপর থেকে ধাপে ধাপে গলদা চিড়ি পর্যন্ত নেনে এসে একচোট থেমে গিয়েছিল, তড়িৎের মধ্যে উপযুক্ত সহ-যোগিতার সম্ভাবনা দেখে আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে চাইছে।

ছেলেটি সত্যি বড়বরের আদরে দুলাল : তাতে ওর চরিত্রে অনেকগুলি দুর্বলতা এসে পড়েছে, কিন্তু সে তালিকার মধ্যে কোনরকম সংকীর্ণতা নেই, কোন ভগ্নানি নেই। খেয়ালের পথ ধরে এগুনো। অভ্যাস, প্রভার পেয়েছে, এগিয়ে গেছে ; বাধা পায়নি, সেজন্য যেমন কোন সংকোচের প্রয়োজন হয়নি, তেমনি কোন মিথ্যার আশ্রয়ও নিতে হয়নি। সব মিশিয়ে ওর চরিত্রটি একদিক দিয়ে দুর্বল হলেও মোটের ওপর নিতান্তই স্বচ্ছ, ভেতরে-বাইরে এক।

ওর ব্যবসার কথাটাই ধরা থাকে। বড়মাসুখী খেলা-খুঁশি, নিশ্চয় একটা মুক্তাই, কিন্তু আন্তরিকতার অভাব নেই কোন। যেমন বড় ব্যবসায় নয়, তেমনি ছোট ব্যবসাতেও নয় ; উভয় ক্ষেত্রেই মনের পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে নেমে পড়েছে।

এই সময় ওর পরিচয় হোল দেবপ্রসন্নর সঙ্গে, যেটাকে সবাই ছোট কাজ বলে এসেছে তার প্রতি

ওর পক্ষপাতিব দেখে, ও নিজের কাজের ভালো জায়গায় একটা সমর্থন পেল। এর দ্বারা ওর চরিত্রে এই একটা পরিবর্তন এসে গেল যে, ও বিশেষ করেই যেন নিচুর শিকের কাজগুলার ওপর বেশি করেই শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে উঠল।

এরপর তড়িৎের সঙ্গে পরিচয় হতে এই শ্রদ্ধাটা স্বভাবত তার ওপর গিয়ে পড়ল। তড়িৎ হয়ে উঠল ওর হিরো (Hero), যে ক্ষুদ্র সন্ধ্যা, ক্ষুদ্র লজ্জা-মান বিসর্জন দিয়ে কর্ম-মাত্রকেই তুলে ধরেছে তার স্বকীয় মহিমায়। দেবপ্রসন্নর মধ্যে যে-বিশ্বাসটা ধিরোয় হয়ে দেখা দিয়েছিল সেটা তড়িৎের মধ্যে যেন সাংকার হয়ে উঠেছে। শ্রদ্ধার সঙ্গে কিংবা এসেছে একটা ভরসা, এতদিন একলাই ছিল, এবার তড়িৎকে টেনে নিয়ে আর একবার নব উচ্চমে নেমে পড়বে।

যখন এশ্রয় বাজছিল, ওদের কথাবার্তা হচ্ছিল, নলিনাক নিজের চিন্তা নিয়ে ছিল। একবার একান্তে পাওয়া দরকার তড়িৎকে। আসে কম, স্তব্ধতা শূন্যযোগও কম, কি করা যায় ? পৌঁছে দেওয়ার সুযোগটা হাতে পেয়ে আর ছাড়ল না। মন্মী অল্প একটা ভয়ে সেটা বানচাল করে দিল।

কিন্তু শূন্যযোগের অভাব হোল না, বিশেষ করে দেবপ্রসন্নবাবুর বাড়িতে তড়িৎের গতিবিধি ক্রমেই বেড়ে যাওয়ায়। একদিন এখানেই দুজনের দেখা হোল যখন মন্মী দেবপ্রসন্ন কেউই বাড়ি নেই, একটি সন্ধ্যা-টি-পার্টিতে দূরে বেরিয়ে গেছেন। নলিনাক তুলল কথাটা—করবে কোনো কাজ দুজনে মিলে ? টাকার জন্য ভাবতে হবে না, সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ ওর।

আপত্তি ছিল না তড়িতের। মানুষ হয়ে পাড়াবার জন্য বাড়ি থেকে সংকল্প করে বেরিয়েছে, বাঙালীর ছেলে, স্বাভাবিক জ্ঞানম্পূর্ণ। আছে, কঠিন ওপর অশ্রু আছে, কিন্তু এম-এ পাস না করলে যে সেখানে পৌঁছানো যাবে না, এমন কোন মোহ ছিল না। মানুষ হয়ে ওঠার মূলে অর্থ যে একটা মস্তবড় সহায় একথাটাও বোকে; আপত্তি ছিল না। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করে যখন জানতে পারল যে নলিনাক্ষের কোঁকটা শুধু নৌচুর দিকে এবং গলদ। চিড়ি পর্যন্ত ওদিকে পথ বন্ধ হওয়ার রিকশা নিয়েই কিছু করতে চায়, তখন তাকে ছুঃখের সঙ্গে বিরত হতে হোল।

বিরত হোল কয়েকটা কারণে। প্রথমত নলিনাক্ষকে চিনতে পেরেছে সে। নীচ ব্যবসা নিয়ে অস্বস্তির সঙ্গে একটা ভাবাগুতাও আছে ওর, তার ওপর বেবেপ্রসন্নর ডিগ-নিউ-অব-লেবার, মল্লীর মুখে আবার তার প্রতিধ্বনি; তবিশ্রুতে বড় ব্যবসার পথ বন্ধ হয়ে যাবেই নলিনাক্ষের।

কিন্তু তার জন্যও ততটা নয়। রিকশা নিয়েই বেশ একটা কিছু করা যায়, খানিকটা অভিজ্ঞতাও হয়েছে ওর, কিন্তু তাতে তো মস্তবড় বাধা। সেই কথাটা, একেবারে নাম ধাম না দিয়ে হোক, অনেকটা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিল তড়িৎ। বলল ওর আপত্তি ছিল না, কিন্তু রিকশা নিয়ে বড় কিছু করতে গেলে এমন একজননের স্বার্থে আঘাত দেওয়ার সম্ভাবনা আছে, যার কাছে জীবনের অনেক কিছুই জন্মই অদী সে।

ও-প্রসঙ্গটা এইখানেই আপাতত শেষ হয়ে গেল। নলিনাক্ষ নিরাশ হোল, কিন্তু সংকল্প তার অটুট রইল। তড়িৎকে জানিয়ে দিল তার ছাড়ান নেই; রিকশা হোল না, আরও অনেক উপায় আছে ব্যবসার, সে ভাবছে।

চৌধ

কিছুদিন আসা বন্ধ রইল তড়িতের। কলেজে একটা বছর শেষ হয়ে গেল; বর্ষ বার্ষিক জেগীতে

যাওয়ার পূর্বে একটা পরীক্ষা আছে, তার প্রস্তুতির জন্য বইখাতা নিয়ে ভালো করে একটু বসতে হোল। টুইশন করে পড়াশুনা করা, এই করেই চালিয়ে এসেছে বরাবর; রিকশাও বন্ধ রাখতে হোল, যাওয়া-আসাও।

প্রায় মাস দেড়েক পরে, পরীক্ষাটা চূকে গেলে একদিন সম্ভার পর এসে উপস্থিত হোল। ভাষে দেবপ্রসন্ন, মল্লী, নলিনাক্ষ তো আছেই, অতিরিক্ত আরও দুজন উপস্থিত রয়েছে। তার মধ্যে একজনকে চিনতে বেশি হোল না তড়িতের, মল্লীর বাড়বী স্মৃতি, এবং বাকি একজনকেও আন্দাজে বুঝে নিল—স্মৃতিপার স্বামী নিশ্চয়।

নলিনাক্ষ আর মল্লী স্পষ্টই উৎক্লষ হয়ে উঠল, কথার জড়াঝড়ি করে বলে উঠল—“এই যে আপনি ...বাঃ, কোথায় ছিলেন এতদিন? ...বরষাও দিতে হয় একটা...এতদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই, ভাবনার কথা তো! ...”

দেবপ্রসন্নও হয়েছে, খুশীর চেয়ে উৎক্লষই বলা ঠিক, তবে স্বভাবতই সংযত, তড়িৎ হাসতে হাসতে একটা চেয়ারে বসলে বললেন—“রোগীও হয়ে গেছে দেখছি; বাইরে কোথাও গিয়েছিলে নাকি?”

তড়িৎ বলল—“না, ছিলাম এখানেই। অল্প একটা কাজ নিয়ে পড়েছিলাম; ছিলাম তো ভালোই। আপনারা কেমন...?”

নলিনাক্ষ বাধা দিয়ে একটু শঙ্কিতভাবেই ত্রু কুণ্ডিত করে প্রশ্ন করে উঠল—“অল্প কাজ নিয়ে ...আর আপনার রিকশা? ...ছেড়ে দিলেন নাকি?”

স্মৃতিপার আর তার স্বামীর দিকে চেয়ে বলল—“এঁরই কথা হচ্ছিল সেদিন...তড়িৎবাবু।”

ওরা আন্দাজ করেইছিল, নমস্কার করল। ওদের প্রতিশ্রুতির করে তড়িৎ হেসে নলিনাক্ষকে বলল—“আমি ছাড়তে চাইলেও রিকশা ছাড়বে কেন? ...জানেন তো সেই—কমলী নেহি ছোড়তি।”

হেসে কথাটা বলে মল্লীর দিকে দৃষ্টি ফেরাতে গিয়ে দেখে দাঁতে নখ খুঁটে খুঁটে যেন একটু

হুতুহলী হয়েই স্তূপার স্বামীর দিকে আড়চোখে চেয়ে রয়েছে, তড়িতের সঙ্গে চোখাচোখি হতে একটু যেন নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল—
“অন্ধদিকের পরিচয়টাও আপনাকে দিয়ে দিই তড়িৎবাবু, এ আমার বন্ধু স্তূপা আর উনি হচ্ছেন...”

একটু হেসে বলল—“বোধহয় আশ্রাজ্জই করতে পারছেন... স্তূপার নতুন বিয়ে হয়েছে, শব্দহবাড়ি থেকে এই প্রথম এল।... আর, হ্যাঁ, ঠিক কথা।...”

হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় উৎসাহের সঙ্গে কি বলতে যাচ্ছিল, ওর কথার গায়েই দেবপ্রসন্নর কথাটা এসে পড়ল—

“আর আমাদের অস্থূপের পরিচয় একটু বিশেষ করে দিতে হয়, তোমার সঙ্গে ওর একটা মন্তব্য মিল আছে তড়িৎ। শ্রমের মর্যাদাই বলা, বা তার সঙ্গে যা এসে পড়ে, সাম্যবাদই বলা—আমরা আরাম-চেয়ারে বসে তার খিয়েরী আওড়াই মাত্র—তোমরা জীবনে তা সার্থক করে তুলছ... অস্থূপরা হচ্ছে একটা কারখানার মালিক—লোহালকড়ের বেশ মাঝারি বকনের কারখানা, কিন্তু সেখানে কে মজুর কে মালিক কিছু বুঝে ওঠবার জো নেই। ওর বাপ সত্যেন আমার বন্ধু, হাতুড়ি পেটা থেকে আরম্ভ করে কারখানার মালিক হয়ে উঠল—ফ্রেডিট এইখানে যে, মালিক মনে গ্রাণে সেই হাতুড়ি-পেটাই ময়ে গেল।... ছেলেও যে সেইভাবেই তৈরি সেটা দেখেই আশ্রাজ্জ করতে পারছ নিশ্চয়...”

আগেই নম্বর পড়েছিল তড়িতের,—শব্দ বাঁধুনির একটু অবাঙালী-মূলভ ক্রম চেহারা, মাথার সমান করে ছাঁটা চুল, বেশভূষার ভ্যাবা আছে, বাহুল্য নেই—আগেই নম্বর পড়েছিল, ভবু—দেবপ্রসন্নর কথার আর একবার চকিতে নম্বর বুলিয়ে নিল। অস্থূপ লক্ষিত হয়ে বলল—“আর নিজের কৃতিবটী একেবারে লুকিয়ে রাখা অব্যাস জ্যাঠামশাইয়ের... উনি না হলে বাবাকে যে চিরকাল হাতুড়ি পিটতেই হোত সেটা আর...”

দেবপ্রসন্ন হেসে চাপাই দিলেন কথাটা; বললেন—
“আমার কৃতিব, ভক্তসন্তান হয়েও হাতুড়ি পিটছে দেখে একটু নম্বর গিয়ে পড়েছিল—এই তুমি রিকশা চালান, পড়তে বাধ্য তো নম্বর?—তা তোমায় কি এমন রাজা করে দিয়েছি বলা...”

তড়িৎ উত্তর করল—“সাম্যবাসে যে রাজা নেই, নৈলে নিশ্চয় করতে।”

একটা হাসি উঠল, দেবপ্রসন্ন তারই মধ্যে বলে চললেন—“আমার কৃতিব অবশ্য আছে—ঘটকালিতে। স্তূপার বাবা যখন পাতের মস্তান দিতে বললেন, আমি বললাম—হাতুড়ি-পেটার ছেলের হাতে দিতে পারবেন?”

অল্প যে হাসি উঠল তার মধ্যে অস্থূপের দিকে চেয়ে বললেন—“রাগ কোরোনা বাবাজি, মতেন এখন আবার আমার বেহাই তো...”

অস্থূপ হেসে বলল—“বাবা, ওটা আমাদের কৌলীন্তের পন্থী, আপনায়ই মেওয়া...”

আবার একটা হাসি উঠল, তার মধ্যে দেবপ্রসন্ন হঠাৎ পক্ষীর হয়ে বলে উঠলেন—“কিন্তু এক কথা—তোমার জিগ্যেস করতেই ভুলে যাচ্ছিলাম অস্থূপ, স্তূপা-মার গানের ব্যাঘাত হচ্ছেনা তো? তার ওপর হাতুড়ির তাল দিলে চলবে না বাপু...”

হাসির গায়ে হাসি এসে পড়েছে; মল্লী বলল—
“সে আমি আগেই বোঝ নিজেছি, সেরকম হলে ডাঙিয়ে নিতাম না স্তূপাকে?... ক্লাসিকাল তো আছেই—বাড়িতে মাষ্টার আসেন, তার ওপর কীর্তনের জন্তে আলাপা বন্দোবস্ত হয়েছে।”

যেন নিজের ব্যবস্থার সাক্ষ্যেই দেবপ্রসন্নর চোখ দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল; বললেন—“সত্যি নাকি? তাহলে তো স্তনতে হবে—কীর্তন বাংলার নিজের জিনিষ, কতদিন যে শোনা হয়নি। একদিন তাহলে...”

মল্লী বলে উঠল—“এই দেখুন, আমিও কথার কথার আপনায় মত্তন ভুলে যাচ্ছিলাম। স্তূপার গান শোনবার পূর্ব চনৎকার একটা ব্যবস্থার কথা

ভেবেছি জ্যাঠানবাই—তড়িংবাবুর অচাব ছিল, তিনিও তো এসে গেছেন। অমৃণবাবুর রাঁটা নতুন তো—ঠিক করছি গোটাকতক টিপ দোব—হডল, দশমধারা, জোনহা, হাজারিবাগ রোড, কাছের পিঠের জায়গাগুলোতে তো বটেই—শুধু বাওয়া-আসা নয়, রীতিনীতি পিকনিক—সেখানো—খাওয়া-দাওয়া।...সেখানেই সুপার...”

সুপা বলে উঠল—“বা-রে, বেশ মজা তো! ওরা ঘুরে ফিরে টহল দিয়ে বেড়াবেন—পিকনিক করবেন—সুপা, তুই বসে বসে কেমন গাইতে থাক!”

মন্ডরে মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে থেকে এমন করে হঠাৎ বলে উঠল যে, সবাই হেসে উঠল আবার একচোট।

মাস দেড়েকের বিরতিতে অত্যাস খানিকটা ছেড়ে গেছে, তার ওপর রাত জেগে পড়াশুনা করার বেহনতে সভাই অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে, তড়িং নিজের রিকশা নিয়ে আসেনি, একটা ভাড়া করেছে। এসেছে। কারণটা অবশ্য জানাল না, তবে ভাড়াভাড়া উঠে পড়তে চাইল, খানিকটা হেঁটে গিয়ে, তবে রিকশা পাবে। বাবা দিল নলিনাক্ষ, পাশেই বসে ছিল, ও যেমন একটু অস্থমনশ্ব হয়ে বসে থাকে, একরকম ধরেই বসিয়ে রেখে বলল—“না, বয়ন, এতদিন পরে এলেন; আমিও যাব, কাজ আছে একটু; কাছারির কাছে নানিয়ে দোব, সেখান থেকে রিকশা করে চলে যাবেন আপনি। স্তপ্যদেবীর একটা গান হোক, পরে আবার যখন হয়, হবে; আপনি তো শোনেননি।”

তড়িংয়ের নজরটা মন্ডর দিকে বেন আপনাই গিয়ে পড়ল। যেমন মাথা নিচু করে একটু কুঁচকে শুনছিল, ওর মনে হোল দুজনের মধ্যে বেন একটা বোকাপড়া হয়েছে, যদি-পৌঁছে দেওয়ার দরকার হয় তো এইভাবে ঠিকানা জানার সম্ভাবনাটা এড়িয়ে যাবে। ওর কথা শেষ হলে

মন্ডর মুখ তুলে প্রশ্নও করল—“আপনার বুঝি বিলেট রোডে সেই তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে হবে?”

স্তপ্যপাকে অবশ্য গাওয়ানো গেল না, স্বত্তরবাড়ি থেকে ফিরে একেবারেই প্রথম দিন, বরও সঙ্গে; মন্ডর একটা বাজনার পর বৈঠকটা শেষ হোল।

নলিনাক্ষ তড়িংকে নিজের পাশেই বসিয়ে নিল। স্টার্ট দিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে বলল—“একটা কথা আছে তড়িংবাবু, তাই আমিও উঠে এলাম। থাকগে রিকশা, আনুন মহয়া ধরি...”

তড়িং একটু বিমূঢ়ভাবেই ঘুরে ঘুরে দিকে চাইল। সোজা রাস্তা, মোটরটাকে স্পীডে ছেড়ে দিয়ে নলিনাক্ষ বলে চলল—

“মন্ডরদেবীর পিকনিকে বাওয়ার কথায় আমার হাঁ করে ওদিককার ছবিটা বেন চোখের সামনে ফুটে উঠল—উঃ, কী মহয়া গাছ! চলুন, নিশ্চয় চলুন, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। আমার তো আপনোসে নিজের হাত কানড়াতে ইচ্ছে করছে। ব্যবসার এত বিরতি একটা সম্ভাবনা রয়েছে পাড়ে, আর আমি কিনা মোটরে-ওষুধ-মাছে মিহিমিহি সময়টা বরবাদ করলাম! থাকগে, একান্ত পাড়ে গিয়াছিলাম, না ছিল সামলাবার কেউ না ছিল পরামর্শ দেওয়ার কেউ—এবার তো তা নয়। চলুন দেখে এসে দুজনে বিলে একটা স্বীম খাড়া করে ফেলি—দানন দিয়ে সারা। তন্নাতটার মহয়া নিজের হাতে নিয়ে নি’—মার্কেটের কথা বলচেন?—আপনাকে খুঁজতে হবে না—নিজেরাই সব খুঁজে এসে কনট্রাক্ট করে যাবে—পড়তে পাবে না।... উঃ, কী আপনোসটা যে হচ্ছে!...”

নৈমেরে।

হডলর ডাকবাংলোর বারান্দা থেকে নেমেই প্রায় অর্ধকৃতাকারে খানিকটা খোলা জায়গা। সমতল। এর ধারে গিয়ে দাঁড়ালে ক্রান্ত গাটা ছনছন করে ওঠে। ধাপে ধাপে নয়, একেবারে সোজা নেমে গেছে পাহাড়টা।

একটা চেয়ার নামিয়ে নিয়ে এসে বসেছে তড়িৎ। একলাই। আর সবাই বাংলার মধ্যে ঘুরছে। একরকম রাত থাকতেই ওরা বেরিয়ে পড়েছিল; স্নান, সমস্ত দিনটা এখানেই কাটাবে, সন্ধ্যারও খানিকটা; জ্যোৎস্নাপক্ষ, ফিরবে আকাশে চাঁদ স্পষ্ট হয়ে উঠলে।

এ-কাঁবার কবিও মন্ত্রী-ই। মন্ত্রী অবশ্য নিজেকে আড়ালেই রেখেছে: বলেছে—সুপাকে ঘেরখন লোকের হাতে দিয়েছি আমরা, একটু নোলায়েন করে না নিয়ে এলে চলবে কেন?

দলটি মন্দ নয়, মেয়ে পুরুষে সাতজন। চাকরটাকে বাদ দিয়ে। দুখানা মোটর এসেছে, তার মধ্যে একটা স্টেশন-কার। করেকটা জিনিস রাতেই রাখা করে রাখা হয়েছিল, দু'একটা এখানেই হবে, বাসনপত্র সঙ্গে এসেছে।

দেবপ্রসন্ন অবশ্য আসেননি। বাড়তির মধ্যে এসেছে প্রিয়রতন আর তার বোন অতসী।

আজকের মতো একটা আনন্দ-উৎসব তড়িতের জীবনে আর আসেনি। সকালে মোটরে চড়ে দীর্ঘ বোল মাইল পথ অতিক্রমণ, সহর পাতলা হয়ে এসে বিরাট মুক্তির মধ্যে এসে পড়ল ওরা। দুধারের জনি ডেউয়ের মতো ওঠানানা করতে করতে একেবারে সেই বিগড়ে গিয়ে মিলিয়ে গেছে, মোটরের গতিবেগে একটা আপেক্ষিক গতি লাভ করে সত্যিকার ডেউয়ের মতোই নাকে নাকে বেন ছলে-ছলে ও উঠছে সেগুলো। দূরে কাছে ছাড়া ছাড়া পাহাড়, কুম, ধূসর; একেবারে দূরেরগুলা শ্রেষ্ঠ-বহু; ছোট-বড় টানা টানা গাছ নীলরেখায় বিকল্প হয়ে রয়েছে; ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে। সামনের ঐ পাহাড়ই নাকি ওদের গন্তব্য; ঐ পাহাড় পেরিয়ে নাকি পুন্ড্রিয়ার এলাকা।

দূরে-কাছে গ্রাম, অনেকখানি তলাতে তলাতে। আদিবাসীদের গ্রাম, সাঁওতাল, ওরাও, আরও কারা সব। পথে থাকতেই মূর্খোবদ্য হোল, সুপ্রোখিত আচল পার্বত্য জীবনের ওপর প্রভাতের আলো

এসে পড়ল।...বাংলার বাইরে এসে এ-অকালের এ-দুশ্র যেন প্রথম দেখল তড়িৎ। আজ এতদিন হোল রাঁচীতে এসেছে, কিন্তু রাঁচীর মধ্যে ছোট-নাগপুর কি আছে? বাড়ি-গাড়ির ভীড়ে কোথায় যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। যদি বা থাকেও কিছু তো রিকশা চালিয়ে কি চোখে পড়ে তা?

মেয়েদের গাড়িটা সামনে, খানিকটা দূরে; মাঝে মাঝে ওদের মুক্তকণ্ঠের হাসি-আলাপ উজ্জ্বলিত হয়ে ভেসে আসছে। এ গাড়িতে তড়িতের পাশেই বসেছে নলিনাক্ষ; গ্রামে হোক, প্রান্তরে হোক, মহুয়া গাছ এসে পড়লেই হাতটা ধরছে চেপে তড়িতের—“দেখচেন কি ব্যাপার?...লক্ষ্য করে যাবেন।”

আজ নিঃসন্দোহ নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যে পেয়ে নলিনাক্ষকেও যেন নতুনভাবে পেল। ওর চেহারায় স্বভাবে যে একটা ধনীদলালের ভাব মাখানো আছে তা এমনই আকৃষ্ট করে মনটাকে, এর ওপর আছে ওর ঐ ব্যবসার কোঁক, তাও যতসব আশাড়ে জিনিস নিয়ে। প্রথম প্রথম তড়িৎ সহজ বিশ্বাসে খানিকটা প্রশংসার সঙ্গেই নিয়েছিল, তারপর দেখেছে এটা ওর একটা দুর্বলতা, যার ভ্রুতে সবাই একচি স্মিতমণ্ডিত প্রশ্রয়ের সঙ্গেই বেধে ওকে। আজ ছবার ছুজনের মন্তব্যে কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল তড়িতের কাছে। একবার প্রিয়রতনের; মহুয়া কথাটা ওর কানেও গিয়ে থাকবে, তড়িৎ আর নলিনাক্ষকে একজায়গার গল্প করতে দেখে বলল—“আজ নলিন বুকি মহুয়া-মাতাল? তা বোচারি তড়িৎবাবুকে কেন টানা?” একবার ওরা দুজন খানিকটা ঘুরে এলে মন্ত্রী তড়িৎকে একান্তে পেয়ে একটু হেসে, একটু আলাতন হয়ে বলল—“মহুয়া-মহুয়া ক'রে আপনাকে ঘুরিয়ে মারছেন তো? না বাপু, একদিকে জ্যাঠামশাই, একদিকে উনি—এই দুই পাগলের মধ্যে পড়ে আমিও পাগল হয়ে যাব। আর আপনিও রিকশা ছাড়ুন তড়িৎবাবু, আপনাকে পেয়ে ওদের মনে নতুন করে জোরার এসেছে।”

দিনটা আরও উপভোগ্য হয়েছে এইজন্মে যে সবার মন যেন এক স্থরে বাঁধা। একটা তুল ভাঙল আজ, প্রিয়রত্নকে সেদিনের তর্কে যেন প্রতিকূল মনে হয়েছিল, আজ হৃদয় দেখে উঠে আসতে-আসতে ওকে ডেকে নিয়ে পাশে একটা পাথরের ওপর বসল, হৃদয় নিয়েই হুঁ একটা এদিক-ওদিক কথা হওয়ার পর একটু অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলে উঠল—“আপনার কাছে আমার একটা অ্যাপোলজি (apology) চাইবার আছে, ডিঙিবাবু...”

ডিঙি বিশিষ্টভাবে ঘুরে চাইলে বলল—“সেদিন আমাদের দুজনের তর্ক শুনে কি মনে করলেন জানিনা, কিন্তু ডিগনিটি-অব-লোবার সম্বন্ধে আমি দেবপ্রসন্নবাবুর সঙ্গে একেবারেই একমত, তার মানে নলিনের সঙ্গেও। ওটা আমাদের দেশে—বাংলা-দেশের কথাই বলছি—দিন দিন যে কত বরকার হয়ে পড়ছে তা নেহাত অন্ধ না হলে তো আর বুঝতে বাকি থাকে না। এই থেকে লিভিং এক্সম্পল (living example) বলে আপনার প্রতিঃ...”

মুখ তুলে একটু হেসে চেয়ে বাধা দিল ডিঙি। প্রিয়রত্নও হেসে বলল—“তাহলে এমন তর্ক করছিলাম কেন?...ও একটা রোগে দাঁড়িয়ে গেছে—ওরও, আমারও। কলেজের ডিবেটে আমরা দুজনে বরাবর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াইতাম—তর্কে পরস্পরকে হারাবার জন্তে কোমর বেঁধে।...ও হতভাগা একদিনও ডিগনিটি-অব-লোবারের বিপক্ষে বলে না যে, তাহলে দেখিয়ে দিই মজাটা...”

হাসতে লাগল।

অম্বপকে প্রথমে রুদ্ধ মনে হয়েছিল, সেদিন দেবপ্রসন্নবাবুর বৈঠকখানায় ঘেরকম চুপ করে বসে ছিল। আজ দেখল ওর মতো সরস মন বলের মধ্যে বোধ হয় আর কারুরই নয়, সম্বন্ধ ধরে ও একা একদিকে আর সবাই একদিকে, তবু সমানে সবার মোহাড়া নিয়ে গেল; আর সরস হাস্য-পরিহাসে—ঘোরা-ফেরা, খাওয়া-বসা সব-কিছুইই মধ্যেই আজকের অভিযানটিকে প্রাণবন্ত করে রাখল।

বেশ রুচিসম্মত শ্রিত্ত পরিহাস, একটা তার কানে লেগে রয়েছে এখনও। মন্ত্রী যখন বলল—“হুপাকে যেমন লোকের হাত দিয়েছি আমরা, জ্যোৎস্নায় একটু মোলায়েম করে না নিলে চলবে কেন?”—অম্বপ উত্তর করল—“আপনার কাছে পেয়েও যদি মোলায়েম না হয়ে থাকি মনে হয় তাহলে চাঁদের জ্যোৎস্নায় কিছু করতে পারবে আশা করেন? আমি তো দেখছি—পদমধ্যে পড়ে আছে তার কথাগুলো।”

—কথাটা বলল ওদের তিনজনের ওপরই বিশেষ করে নৃষ্টি বুলিয়ে।

সকালের কোঁকে একচোট খুব ঘুরে ফিরে বেড়াল সবাই। হৃদয়প্রপাত দেখতে পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে গেল। ঘোরা-ফেরায় এঁটেই শেষ, তখন ওঠা-নামায়, নতুন-নতুন দেখে বেড়ানোর উত্তেজনায় একটা ক্রান্তি এসে পড়েছে। দলটাও গেল ভেঙে। চাকরটা উমুন ছেলেছে, চা খাওয়া হয়ে গেলে মেয়েরা রান্নার কাজে লেগে গেল, এরা চারজন একটু ছড়িয়ে পড়ল। বাংলোর পেছনেই একটি মন্দির, ডিঙি তার দাওয়ায় গিয়ে বসে ছিল, নলিনাক এসে বসল। হুঁ একটা অদ্ভুত কথা পর বলল—“মল্লীদেবী নিশ্চয় তখন আপনাকে ব্যবসার সম্বন্ধেই কিছু বলছিলেন।...ওর ধারণা আমি সারা জীবনটাই লোকসান দিয়ে যাব; মানুষ যে হারতে-হারতেই ক্ষেতে তার নতুন অভিজ্ঞতা থেকে, এটা ওকে কোনমতেই বোকাতে পারলাম না...”

ওর প্রসঙ্গ উঠলে নলিনাক কখনও বলে মন্ত্রী, কখনও মল্লীদেবী।

রোদে ২ং ধরেছে, অপরাহ্ন আসছে নেমে। ডিঙি চুপ করে আছে বসে। সমস্ত দিনটি—এখন পর্যন্ত যতটা কাটল—তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে রঙে-রসে উঠছে জেগে; কোথাও গাঢ়, কোথাও হরতো ফিকা, কিন্তু সমস্তইই রঙীন। এটা স্মৃতি, বহদিনই জমা থাকবে মনে। এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

মনটা গিয়ে পড়ছে সামনে, পাশে। যতদূর দৃষ্টি যায় একটা বিরাট গম্বর, তার আরম্ভটা দেখতে পাচ্ছে না, তবে যেখানে বসে আছে তার হাত কয়েক পরেই এই পাহাড়েরই মূলে নিম্ভর। ডাইনে বায়ে—মাথায় মাথায় বোধহয় মাইল হুঁসাতের ব্যবধান রেখে ছোটো পাহাড়ের শ্রেণী সমান্তরালে একেবারে প্রায় সেই দিক্চক্র পর্বত সোজা চলে গেছে। ওখিকেও, একেবারে দিক্চক্র ঘেঁষেই আর একটা পাহাড়ের শ্রেণী আড়াআড়ি ভাবে, মনে হয় যেন এ-ছটাকে স্পর্শ করেছে হুঁদিকে বেরিয়ে গেছে। চারিদিকে উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই বিরাট গম্বীরের এই উপত্যকার শীর্ষদেশে একদিকে বসে আছে তড়িৎ, হুড়কর এই জায়গাটাও তো একটা পাহাড়েরই ওপরে। ওর পাশেই মন্দির আর বালোটার গা ঘেঁষে খরস্রোতা সুবর্ণরেখা যাচ্ছে বয়ে। বেশি চওড়া নয়, গভীরতা জো নেই বললেই হয়—যেখানে জল নেই, এঝড়ে-খেবড়ে। পাথর—যেন একখানা প্রকাণ্ড আভাঙ্গা পাহাড়ের চাইয়ের ওপর দিয়ে—নিজের তীব্র স্রোতে সেটাকে ঘষে ঘষে, কুরে কুরে বয়ে চলেছে সুবর্ণরেখা—তার পর, পাহাড়ী মেয়ে হঠাৎ নতুন ষেয়ালেই যেন ঐ বিরাট গম্বীর লক্ষ্য করে দিয়েছে ঝাঁপ।...নীচে গিয়ে তো দেখল সকালে, কী উন্নত উল্লাস সে, কী প্রচণ্ড অট্টহাস! কবিকল্পন সবাইকেই রেখেছিল নৌন করে।

আবার ঐ দেখা যাচ্ছে সেই পার্বত্যকন্ডাক—বহু নীচে, বহু-বহু দূরে, উপত্যকার মাঝখান দিয়ে একটি নীল, শীর্ণ, সপিল রেখা—কোথাও প্রকট, কোথাও লুপ্ত; এত দূর থেকে স্রোতাবেগ দৃষ্টিগোচর নয় বলে মনে হয় যেন দূরত্ব মেয়ে ক্রান্ত হয়ে পড়েছে এলিয়ে।

ওরই কিনারায়, বিরাট গম্বীরটার একেবারে নীচে, খানিকটা ব্যবধান রেখে খানতিনেক কুটীর; একটি পরিবার, কিংবা হয়তো একখানি গ্রামই, এত উঁচু থেকে দেখাচ্ছে যেন খেলাঘর। তারপর

আবার গ্রাম চোখে পড়ে ঐ নীচু থেকে একেবারে ঝাঁপকের ঐ পাহাড়ের মাথায় একজারগায়, কন করে ধরলেও ও-গ্রানটা থেকে সোজা পথে মাইল চারেক দূরে তো বটেই। ঐরকম তিন-চারখানি ঘর লি-লি করছে; একটি ঘরের গা থেকে পড়ন্ত রোদ পড়েছে ত্রিকরে।

দেখায় একসঙ্গেই এত বিচিত্রতা, এমন একটা বিরাট অশ্রুহুতি—তড়িতের অভিজ্ঞতার এই প্রথম। সবচেয়ে অতিক্রান্ত করেছে সামনের ঐ বিপুল শূন্যতা। মনে হচ্ছে চতুর্দিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা ঐ গম্বীরটা শূন্যতা দিয়ে যেন পূর্ণ করা রয়েছে।...একটি কি পাখি তড়িতের দৃষ্টির নীচে এই শূন্যতা সাংঘের এক পাহাড় থেকে অশ্রু পাহাড়ের দিকে চলেছে।

কোনো শব্দ নেই, এক হুড়কর ছাড়া। কোনো বিরতি নেই, বৈচিত্র্য নেই বলে ওটাও যেন একটা স্তম্ভতাই; এই মহানৈঃশব্দের মধ্যে যাচ্ছে হারিয়ে। সুবর্ণরেখা যেন ঐ অতলে কোথায় লুপ্ত হয়ে গেল।

একটা ধমধমে ভাব আচ্ছন্ন করে কেলছে মনটাকে। শব্দহীন, অন্তলম্পর্শ বিপুলায়ত একটা কিসের সামনা-সামনি হয়ে নিজেকে বড় ক্ষুদ্র বড় অসহায় বোধ হচ্ছে। জীবনের অসুস্থত্ব পষ বেয়ে আসা; মানপুর-বর্ধমান...কত বিচিত্র সুখ...কিন্তু সব যেন ছেড়ে-ছেড়ে যাচ্ছে কেন? বড় নিঃসঙ্গ, কেউ এসে পাশে ধাঁড়াক, হাত ধরুক।

পেছনে, ডাকবালোর দরজার কাছ থেকে প্রশ্ন হোল—“বাঃ, আর আপনি ঘুমাননি?”

ঘুরে ছাথে চৌকাঠের স্কেমের মাঝখানে ওর মাথার ওপর দিয়ে সামনে দৃষ্টি কেলে মল্লী দাড়িয়ে আছে। এগিয়ে এসে বারান্দার কিনারায় দাঁড়ির মাথার ধাড়িয়ে বলল—“অবিশ্রি ঘুমুতে পারবেন না যে, সেটা আমার আন্দাজ করে নেওয়া উচিত ছিল।”

তড়িৎ অল্প হেসে ক্র-ছোটো হুঙ্কিত করে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে চাইল।

মল্লী বলল—“বেমন লুকিয়ে গান-শোনা অব্যাস...”

“গান!...গান কোথায়?”—বেশ বিস্মিতভাবেই চাইল তড়িৎ। একটু অপ্রতিভও, সত্যি কেউ গাইছিল নাকি শুদিকে মেয়েদের ঘরে নীচু গলায়?

মল্লী একটু হাসতে হাসতে নেমে এল।

“না, ঠিক সে-গান নয়। মানে...”

নেমে এসে চেয়ারের পাশে একটু তক্ষাত হয়ে দাঁড়াল। মুখের ভাবটা বদলে গেছে। বলল—
“কিরকম গম্ভীর, কিরকম ধমধমে দেখছেন?...
কী যে মনে হয় যেন কৃষ্ণ উঠতেই পারা যায় না—
ভয়—না—আনন্দ—না...”

তড়িৎ প্রশ্ন করল—“বসবেন? চেয়ার এনে দি’
একটা।”

“না-না—চেয়ার আনতে হবে না। তা কির,
ওরে বাবা! আমি বেশিকণ এখানে বসতে পারি
কখনও!—মাথা ঘোর...”

একটা যেন ঘোর থেকে জেগে উঠেছে। ইঠাৎ
যে ভাবাবেগটুকু এসে পড়েছিল সেটা সামলে নিল
কোনরকমে, তারপর বলল—“আর, এবার তো
গান-বাজনারই আপনাদের প্রোগ্রামে, বাই দেখিগে।
দেরি হয়ে বাবে ফিরতে নৈলে।”

পৃষ্ঠভঙ্গই দিল। সিঁড়ির মাধ্যম একবার ঘুরে
দাঁড়িয়ে বলল—“মাক করবেন, ডিসটার্ব করে দিলাম
মাকখান থেকে।”

আল্লেহুভাবেই বসে রইল তড়িৎ।...একটা
সঙ্গীত-ই বৈকি—মৌন, এক মহাসঙ্গীত-ই—মল্লী
ঠিকই ধরেছে...আর মল্লী ভিন্ন এমন একটা কথা কে
বলতে পারত? একটা কথাতাই যেন নিঃসঙ্গতাটুকু
ঘুটিয়ে দিয়ে গেল—বিপুল পৃথিবীতে একজনও যে
তোমায় চিনেছে, তোমায় বোঝে—এ-ই তো
নিঃসঙ্গতার অবসান। [ক্রমঃ]

অমরনাথের তুয়ারক্ষেত্রে

ঐকজিতকুমার ঐমানী

কোলাহাই দিব্যাহ থেকে পহলদামে ফিরে সরকারী
লোকদের চেঁচা দিতে তললাখ। অমরনাথ-বাজার পথ
কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়ে ও বৃদ্ধদের
যেতে ব্যর্থ করা হচ্ছে। সরকারী তাদের ক্ষয় কোনো
দায়িত্ব নেবেনা। কয়েকদিন আগে কুসু-উপত্যকার ধবের
কাগজে দেখেছিলাম, অমরনাথের পথে এ-বছর অধিরাম
ভুয়ারপাত ও বৃষ্টির ক্ষয় পথ হ্রগ্ন হয়ে উঠেছে। দেখন্ত
সরকারী থেকে উপস্থিত অমরনাথ-বাজার নিষেধজাতি
হয়েছে। তবে আকাশ পরিষ্কার হয়ে বৃষ্টিপাতটা কয়েকদিন
বন্ধ থাকলেই পথ হ্রগ্ন হবার সম্ভাবনা। বহু কুসী পথ-
তৈরির কাজে লেগে গেছে।

কোলাহাই পথে আমাদের তিনদিনের সাধী
যোড়াওমলা গণিধিকাকে এ-বাজার আশ পাওয়া বাবে না।
তার টিকার তার তাকে অল্প এক বড় বড়ল জুটিয়ে নিয়েছে।
গণিধিকাকে গেলে অজানা পথের দুর্ভাবনার হাত থেকে
অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম। আজকের দিনটা

কাটলেই কাল সকাল থেকে সরকারী তদ্বাবধানে
অমরনাথের পথে সকল তীর্থযাত্রী বেরিয়ে পড়বে। তাই
বিশ্রাম না নিয়ে ‘ডি-দি’ দপ্তরে মালবাহকের ব্যংহার
ক্ষয় বেতে হ’ল। প্রতি কুসীর তিরিশ সের মাল নেয়ার
কথা। কিন্তু কুসীরা হুড়ি দেয়র বেশী মাল নিতে রাজী
নয়। বহু পড়ে পথ নাকি খুব ‘খতরনক’ হয়ে আছে।
মাত্র মাইল খোলো পথ শেষনাগ পর্যন্ত যোড়া বেতে পারবে
বলে ঠিক হয়েছে। আমাদের চ’বছর মাল বহতে
খান আটেক কয়ল, কোট, চাদর, ইপ্পী, এগনকার ডাড়া-পরা
তাঁব, বর্ণাতি আর হাঙ্গার কয়েকটি জিনিসপত্র। পনেরো
টাকা হিসাবে তিনটি কুসী ঠিক করে নিলাম।

কোলাহাই বাবার আগে কান্দীরা খালসা-হোটেলের
বে ঘরে থেকে গিয়েছিলাম, আবার সেই ঘরেই আশ্রয়
জুটেছে। পহলদামের অতি সুন্দর জায়গার এই কান্দীরা
খালসা-হোটেল। মোতলায় আমাদের ঘর। ঘরের
বাহ্যিকার বদলে অসুস্থ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চোখে পড়ে।

দূরের ছুয়াবস্ত্র পর্বতচূড়াগুলি তব্ধাবৃত্তি হয়ে হৃদিকে খুঁজে গেছে। নীচে সবুজ মাঠের ওপর বাতীসেব ছোট ছোট লাল ঠাণ্ডাগুলির দাক দিয়ে একটি পথেরকা ঢাল গেছে কোলাহাট-হিমবাহের দিকে। আর জান দিক দিয়ে বেকে গেছে অমরনাথের পথ। ব্যাংকার বসে লিভার নদী আর শেবনাগ নদীর সঙ্গম সম্বন্ধ-সৌন্দর্য দেখে বেনে আসে যেটে না। লিভার নদীর উৎসগতি কোলাহাট হিমবাহ থেকে, আর শেবনাগ নদীর উৎস শেবনাগ ত্রুণ। পহলগামে এসে দুই ধারা এক হয়েছে। মাঠের এক প্রান্তে গোদীপয়র-মন্দিরের আশেপাশে সাধু-সন্ন্যাসীর ভীড়ে সবুজ মাঠটা গেলুয়া হয়ে উঠেছে। নবার আগে আত্মনা পড়েছে 'অমরনাথের ছড়ি'র। একটি বড় সাঁদা ছাত্তর তলার সবুজ ও লাল কাপড়ে মোড়া হুট ছড়ি। একটি পয়র ও অপরটি পার্বত্যের প্রতীক। এহি সঙ্গে হুটি রূপার আনা-পেঁটা আড়াআড়ি করে ছড়ির সঙ্গে বাধা হয়েছে। লনাম্বী সন্ন্যাসী আত্মতা চালিত এই ছড়ি বেরিয়েছে শ্রীনগর থেকে হুটিগাথে। শ্রীনগর থেকে বাট হাইল দূরে পাহাড়ের কোলে পহলগাম উপত্যকারি (১,২০০ ফুট) প্রান্তিক সৌন্দর্য কান্দীয়ের বোধকরি সব থেকে বড় আকর্ষণ।

সন্ধ্যা পর্বত ঘরের সামনে বারাক্ষর বলে নদীর উদ্ভব তরঙ্গ, দূরের ছুয়াবস্ত্র পাহাড় আর সবুজ মাঠে গেলুয়া-সাধু বেঁধেছিল। বড় বড় হুনি জেলে বলেছেন সাঁদু। সন্ধ্যার পর শাখ, ডম্বক, শিঙা প্রকৃতি বেছে উঠতে নেমে এলাহ মাঠে, যেখানে 'ছড়ি' পড়েছে। তখন পুঁথি থেকে অমরনাথের রাহাওয়া ব্যাখ্যা করে পোনানো হচ্ছে। আরতির শেষে সাধুয়া দূরে দূরে জ্বপাঠ ভক্ত করলেন। ব্যাকুল পূর্ণাবলীর ঠান্ডাঠান্ডি ভীড়। আশিও দর্শক তাদের মধ্যে ঢেবে ঢেবে বেধি তাঁদের। পুণ্য হুনিবে। কোন্ তাকনার এই হুঁপেলে হুটে এসেছে এয়া তাও ঠিক উপলব্ধি করতে পারিনে। হুয়ত ওষের গোখে আবার এলাশা এধনি অকুত। ওনতে ওনতে যনের মধ্যে ভেদে উঠল বছর তিনেক আগে গাড়েগালে গমোজীর মন্দিরে সন্ধ্যার পর এই পরিবেশে ও ঠিক এই একই ধারার আরতির পর ম-গম্বার ছব।

বীয়ে বীয়ে পিছনে কখন এখানশীর্ষ টাচ উঠে পহলগামের পরিবেশের পট পরিবর্তন করেছে খোলাস হুনি। পাহাড়ী পতিবেশে জ্যোৎস্নার সেই অঙ্গপূর্ণ শোভা বনে দগ্ধাবনের জাহ্নু নিয়ে আরাধার সামনে বর্ণপরিণে হাসছে। ঠাণ্ডার ঝড়িয়ে কখন: শীতের কপন ধরতে,

বাতের ঝাঙড়া-ঝাঙড়া সেয়ে স্বপ্ন ঘরে এসে চুকলাম তখন আর চোখ তাকিয়ে থাকি সত্ত্ব হাম্বিল না।

পরদিন সকালে মালপত্র ঝাঙড়া করে হুদীনের ভেঁড়ে দিয়ে, আত্মরক্ত একটি হোকারে চাঙা-জলখাবার খেয়ে বগ্ননা হলাম। হাত আঁঠিয়ে লম্বা-১৬৬৬ একটি ছোলাদারী ঠানু ও চ'খানা বর্ণাভিতে একটি হুদীর লক্কে বেশ ভার হয়ে পড়ল। তার সঙ্গে আবার তিনটি ঠানু বাটাংবার লাঠি। মাঠের বাতীসেব ঠানু ও সাধু-সন্ন্যাসীদের ভীড় থাকা হয়ে গেছে। 'অমরনাথের ছড়ি' বেরিয়ে গেছে সকলের আগে হারি প্রায় চারটের সময়। উত্তর-পূর্ব দিকে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে গ্রাম্য সমতল পথ চলে গেছে বহুধর পর্বত। আত্মহাট বোধহয় সকালের দিকের শেষ বাতী। এর পর থাকি হল বেহেবে ঝাঙড়া-ঝাঙড়া সেয়ে বেলো করে। তবে বেলো নট। এহি মধ্যে প্রায় ত্রোহ পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে। সর্বাংগে কনকজব হয়ে উঠেছে। রোয়ের অঙ্গ কষ্ট হলোও, ঠাণ্ডা বাতাস থাকার গাছের ছায়ায় অল্প বিশ্রামেই পরীর শীতল হয়ে যায়। হাইল ন'রেক পথ। সাতো তিন ঘণ্টার মধ্যে একটি পুল সেহিয়ে এসে পৌঁছলাম চন্দনবাড়ীতে (১,২০০ ফুট)। বী-বিক থেকে একটি পার্বত্য নদীর উৎস জলপ্রবাহ এসে বিশ্রামে শেবনাগ নদীর সঙ্গে। সমতল জায়গা বেছে বাতীঘরের সারি সারি ঠানু পড়েছে। আত্মের দিন ও হারিহুঁর মতো ঠানু থাকিয়ে বিশ্রাম।

বেশলাস কয়েকটি বোকালাপাটও বলে গেছে। এতব্যক বছরে বাতীঘরে সবে বোকালাপাট, হালপাতাল, পোস্ট-অকিস, এমন কি সমস্ত পুণিগ পর্বত বার। ওনলাম, এবার বোকালাপাটেই হুঁব কম এবং পোস্ট-অকিসের ব্যবস্থা করা সত্ত্ব হুনি হুঁবগের জঙ্গ। এক ছেলের বুল্ল্যামোকে অমরনাথ-তীর্থে বেরিয়ে এক বুল্ল্যার অঙ্গ ছেলেটি এহি মধ্যে যোড়া থেকে পড়ে হাত ভেঙে একটি হুঁপটনা ঘটিয়েছে। ঘোচানার পড়েছেন বুল্ল্য। পুণ্য আগে না ছেলে আগে।

ঝাঙড়া-ঝাঙড়া সেয়ে আবার বেরিয়ে যানেকই পরের বিশ্রামস্থান শেবনাগ বা বাহুয়ান পৌঁছতে পারত। কিন্তু তা কেউ বড় একটা বাহ না। সবলেই বাহ 'অমরনাথের ছড়ি'র পিছন পিছন। অবশ্য জনকতক সাধু এহি মধ্যে দর্শন সেয়ে করে এসেছেন। কি করে সত্ত্ব হল সেটাই বিশ্বাস আবারের। অমরনাথের পূর্ণ ছুয়াবস্ত্র দর্শনের দিন প্রাবলী পুণিয়ার। এখনও তার তিন দিন বাকী। চন্দনবাড়ীর ছোট জায়গাইহুও ভারী সন্ধ্যা। সামনে শেবনাগ নদী বরফাচ্ছ। একদিক কটিল ধরে ওতে

পড়েছে। সেই ভাঙা বরফের তলা দিয়ে শেখনাগ নদীর অসহিষ্ণু জলধারা বেগিবে আসছে। পাশেই 'চড়ি' পড়েছে। 'চড়ি'র বোহাগের সঙ্গে আশাশ হ'ল। আশাদের ভ্রমণের নেশার কথা কিছুটা তিনি কোনো হাতীর মুখে শুনে থাকলেন। আশাশ করে খুব খুশী হলেন, এবং আশাশও খুব আশঙ্ক পেলাম। কেন জানিনা আশাদের নাম-টিকানাটা তিনি একটি খাতার লিখে নিলেন। 'চড়ি'র প্রবল-প্রতাপ কর্ণধার—বোহাগ। ভালো লাগলো। মাহুখটিকে। আরো ভালো লাগলো এইজন্ত যে, একবারও মনে আশাদের পুণ্যের সোড আগাতে চেষ্টা করলেন না তিনি।

কুলীসের চাপে-চাপে পেছ করতে বলে আমরা নদীতে স্নান করতে গেলাম। এবল প্রোড আর পাথরের সংঘর্ষে জল বড় চোখে গড়্‌ন না, কেবল কেনা। সামনে উঁচু থেকে নদী নেমে এসে পাশ দিয়ে বেকে চলে গেছে। জলের দিকে কিছুক্ষণ তাকালে মাথা ঘুরে যায়। প্রথম বোসে ঠাণ্ডা বরফ জলে স্নান করার পর খুব আশাম বোধ হ'ল। স্নান-বাণ্ডা শেষে তাঁবু মধ্যে বিশ্রাম নিঃশ্রিয়াম—একদল গোকের ডোলনাথের কোত্রপারী হ'তে শুনে বেগিয়ে এলাম। ডোলনাথের আকর্ষণে নয়। কোত্রের আকর্ষণেও নয়। ভোগের টানে। আশাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে লাইন করে সাধু-সন্ন্যাসীদের পাড়া পড়েছে। খাবার বেণ্ডা হচ্ছে এবং তাঁর সঙ্গে সকলে নিলে গারে চলেছেন ডোলনাথের জয়গান। কুণ্ডর বড় তাঁরখাতী হল ও ছোট ছোট আরও কয়েকটি বাতালী তাঁরখাতী হল মিলে বাতালী হাতীসখ্যা বেসই হয়ে হচ্ছে। কিন্তু আশার গোবে এরা শুধু তাঁরখাতীই নয়। আমি বৈঠিয়ে এলেছি আশারই ডিকরের এক অপরিসৃষ্টতার দৈন্ত যোগাতে। বিদ্যাকার গড়া এই এতবড় দ্বিত্তির মধ্যে নিকোকেই আবিষ্কার করতে। এরাও তো প্রায় তাই। জীবনের সীমিত গণ্ডিতে বিশ্বাস নেই এতদেবও। হোক এদের পথ ডির, তবু এরা সগোত্র আশার। সত্যীর্ষ।

সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন তাঁবু ভঙিয়ে পথে বেরলাম তখন সোলা অনেক। সামনেই বরফাচ্ছর শেখনাগ নদী। তারই ওপর দিয়ে পেরিয়ে নদীর ধার দিয়ে পথ এসে শেখ হয়েচে পিত্তবাটির চড়াইয়ের নীচে। অমরনাথের পথে পিত্তবাটির চড়াই বিষম খাড়াইয়ের জর বিষাক্ত। কয়েক পা অন্ধর পাহাড় কেটে একেবঁকে সিঁড়ির মতো সোকা হাজার বেড়েক ফুট উঁচুতে উঠে গেছে। নীচ থেকে ওপরের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে ওঠার সম্ভাবনা। ওপরের দিকে না তাকিয়ে পথের দিকে চেয়ে সিঁড়ি বেয়ে

ওঠার মতো অতি ধীরে সাবধানে পথ চলা আর বিশ্রাম নেওয়া ও পুনরায় পথ চলা হচ্ছে দুখিমানের কাজ। পাহাড়ের পথে চলতে চলতে দৌড়তাপে ও পথভ্রমে মন যখন ভেঙে পড়তে চায়, তখন একই গাছের ছায়ায় বিশ্রাম ও সমরমতো একই আহার ফুটলে নতুন উদ্বল আবার পথ চলতে কষ্ট হয় না। খোচা আমরা নিইনি, কিন্তু খোচার হাতীদের পিত্তবাটি চড়াইয়ে ওঠা দেখছি। দেখছি খোচার পাতের দিক, খোচার-চড়া হাতীদের শরীর ও মুখের অবস্থা। ইচ্ছামতো তারা না পারে বামতে, না বিশ্রাম নিতে। খোচার পিছন দিকে হেলে প'ড়ে ধম আটকে চোখ বুঁজে বসে থাকে। তাদের দেখে আমরা ভয় পেয়েছি। চড়াইয়ের ওপরে একে একে সকলে উঠে আসে আর এক-একটা জায়গা আমার ক'রে শরীর ঢেলে দেয়। গাড়োয়ালে যখনজীর অতি দুর্গম পথে কোনো হাতী বেখানে আশা করতে পারে না, সেখানেও চারের সোকান দেখছি। এখানে কয়েক মাইলের মধ্যে এমন একটি চারের সোকান নেই যে, হাতীদের তুকা বেটে ও শরীরে জোর পায়। অপর আর একটা জিনিস—মাইল-শোন্ট। বা মাহুখকে ঠেঁধে ধরতে সাহায্য করে। কিন্তু এমন একটা মাইল-শোন্টও নেই হাতে হাতী বুকতে পারে কত মাইল এসেছে আর কত মাইল তাকে এগোতে চাবে। পিত্তবাটি থেকে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে একটি সজ পথের রেখা চলে এসেছে বিশ্রামস্থান জয়শালে। পথটি অতি ধীরে নীচের দিকে নেমে এসেছে বলে সমতল মনে হয়। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে জমাট-বাঁধা বরফ কেটে তৈরি করা পথ দিয়ে চলে আসতে হয়। অনেক জায়গায় শেখনাগ নদীর গতিপথ বরফাচ্ছর হয়ে ঢেকে আছে এবং তার নীচ দিয়ে নদী বয়ে চলেছে।

জয়শালে একটি পাশাখীর অদ্বারী সোকানে চা ও পুরি খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে আবার এগোতে থাকি। পথের ধার ঘেঁষে সতীর্ষ পথ কিছুটা এগিয়ে একটি করণা গায়ে বেধে পথ ঘুরে ঘুরে বাঁকের ওপর একটি কাঠের পুল পেরিয়ে চলে গেছে দেখা যায়। স্বপনার জলে দুলব একটি হামধু তৈরি হয়েছে। ক্রক ডাঙা পাহাড়ের গা বেয়ে খোচার-চড়া হাতীদল সারি দিয়ে একেবঁকে দ্বিত্তি আড়ালে মিলিয়ে দিয়ে। পাহাড়ের পিছন দিয়ে ঘুরে আবার বাঁকের ওপর দিয়ে ক্রমশ উঁচুতে উঠে চলেছে। নীচ থেকে বড় ভালো লাগে দেখতে। ফেরার পথে, এখানে গাড়ির 'ইউনাইটেড নেশনাল'-এর এক সাধুবকে ছবি তোলায় সময় বলতে শুনেছি—How lovely!—বার সাতী হয়ে চলেছে আমাদের

কোলাহাট হিব্রুদের শব্দগ্রন্থক ও মালবারী মোড়ার চালক গনিমিঞা। আশাদের দেখা পেয়ে গনিমিঞার যেন আনন্দ, তেমন এ-পথে আমাদের সারী হ'তে না পারায় তার দুঃখ। কোলাহ'টের পথে আকস্মিক বেষে এসেছি গনিমিঞার ছোট সাংসার ও তার একটি ছেলেকে। বছর-তিনেক বয়সের ছোট ছোটটি কেমন অবশীলাক্রমে উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে এক বিরাট কাঠের বোঝা দিয়ে বেঁধে নামিয়ে নিয়ে এল। দুই হরতিলিয়াম তাদের সততার ও ভালবাসায়। তার মুখে আমাদের মুখে যেন আরো বাড়ি। তার ছেলেদের নামে সামান্য অর্থ দিতেই গনিমিঞা দুই হয়ে ওঠে।

চড়াই-পথে পুনের ওপর হাঁড়িয়ে, কুয়াশার মতো অলের উড়ে-দামা! স্মৃতিতে রোদে-গোড়া শরীটটাকে ভিঙ্গিয়ে ঠাণ্ডা করে নিই। উঁচু থেকে পাহাড়ের ঘ'ঃঃ দিয়ে একটি পার্বত্য জলধারা উকান গতিতে পুনের নীচ দিয়ে নেমে গেছে। এখন থেকে মাইল তিনেক শব্দ কম্প উঠে একসময় এসে পৌঁছাই শেবনাগে। চারিশাশে চিরজুবারাবৃত পর্বতশ্রেণীর হিমবাহ-বিগলিত জলধারা নেমে এসে জমা হচ্ছে এক বিরাট জলাশয়ে। এরই নাম শেবনাগ হ্রদ। এর জল একটি পথে বেরিয়ে গেছে শেবনাগ নদী নাম নিয়ে। পরিষ্কার নীল হঃঃ জলের। তাতে সাদা বাঁদের মতো ইকরো পরক ভাসছে। হ্রদের প্রায় পাঁচশো ফুট ওপর দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে মাইল-খানেক শব্দ দিয়ে পৌঁছেছে বাহুবানে। পাহাড়ের গায়ে জঘাট-বাঁধা বরকের ওপর দিয়ে শেবনাগ হ্রদের শিখন দিকে এসে, পথের ধারে কুলীর অপেক্ষার বসে পড়ি।

শাখনের জুবারাবৃত পর্বতের ওপর রোদ পাড়ে চুড়াগুলি গুমকুম্ব করছে। বহুকাল ধরে মুনরানে প্রকৃতির নিস্পন্দ-শে'জা ঝেঁতে থাকি। এ ধোঁয়ার ত্রুটি কখনও মিটেবে না। বছর থেকে বাতীকের উঠে আসতে এবং আশাদের শিখন দিয়ে চলে বেতে দেখছি। স্বাভাবিক স্মৃতির বেন শেব নেই। এক বহুলা ভবনবিলা মোড়ার চড়ক শিখন দিয়ে বাবার সময় বলে উঠলেন—“হ্যাঁ বাবা, এ পথে যদি আসতেই হয়, তো তোমাদের বরেন। মোড়ার বলে আছি—ইচ্ছে করলে সবই দেখতে পাই, কিন্তু কিছুই দেখার ইচ্ছে নেই। কোনরকমে বাবা অমরনাথের ল্পন পেলেই এ-ঘরেনে বসেই।” তখন আনন্দ হ'ল। বিদ্যাসও হ'ল, আমাদের আসাটা ব্যর্থ হয়নি। অমরনাথ শিব, কিন্তু অমরনাথ তো দুঃখও। এই হৃদয়ের মধ্যেই তো বসে আছি। এই হৃদয়ের বিকেই এগোচ্ছি। এই পাহাড়, এই নদী, এই আকাশ, এই

বাতাস হৃদয়কে ঘুরে আছে যখন—নিবন্ধও ঘিরে আছে নিবন্ধ।

মকীশানেরের ওপর রোদে বলে থেকেও কুলীকের দেখা পাওনা গেল না। প্রায় পাঁচশো ফুট নীচে শেবনাগের হিমজলে কয়েকটি উল্লস সাধুদের স্থান করতে দেখে, আমাদেরও স্থানের ইচ্ছে চাড়িয়ে উঠল। সোজা নীচে নেমে এলাম পান-পা করে। জুবার-গলা ঠাণ্ডা জলে স্থান করব তখন, বেঁটে খুলকাই এক সাধু ঠাঁঠা করে বললেন—‘বাতাশী সোণ কোঁরা স্থান করগা হামসোণ দেখগা।’ ইচ্ছাটাই তাদের কথার জবাবের সঙ্গে আম-কাপড় খুলে কেবল জাখিয়া পরে যখন সত্যিই স্থানের জন্ত হাতে পায়ে জল সইয়ে, হাতে করে জল তুলে বাখার দিতে থাকি তখন অস্বস্থি হ'তে দেখে সেই খুলকাই প্রধান সাধুটি তাঁর দোটাটি আমাদের দিতে বললেন। কয়েকজন সাধু সেই হিমশীতল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্থান করলেন। আমরাও পাছে ঝাঁপিয়ে পড়ি, সাধুটি তাই ব্যর্থ করে দিলেন। এত ঠাণ্ডা জল আমরা নাকি সহ্য করতে পারব না। অল্প-বয়সে তিনি এই হ্রদের নাকস্থান পর্বত দিয়েছিলেন দাঁতার কেটে। স্থান ঘেরে ওপরে উঠে আসার সময় সাধুদের কথার মধ্যে তখন বাতালীনের সম্মুখে সাধুদের অস্বস্থল মন্তব্য শোনা গেল।

শেবনাগের শিখনে একটা বাঁক ঘুরেই বাহুবান। বরফাচ্ছ একটি নদী শেরিয়ে উঠে এলাম বাহুবানের বানিকটা সমতলস্থিতিতে। হ'শাশ-শোলা হ্রদের মতো একটি টিনের চালার ভিতর নানান সাধু-কটিরের ভাঁড়। আশেপাশে চারিদিকে বাতীসের তাঁবু পড়েছে। আমাদের তাঁবু গড়ল ছোট একটি বাংলা-ঘরের পাশে। শেবনাগ হ্রদে স্থান করার সময় বোধ হ'ব প্রথম ছিল। ইতিমধ্যে আকাশ হয়ে উঠেছে ঘা কাঠের মতো। ক্রমশ কাপসা হয়ে বেয়ে ঢেকে দিয়ে চুহিন-ঠাণ্ডা হাওড়ার সঙ্গে ও'ড়ি-ও'ড়ি হুটি নেবে এল। তখনই অমরনাথের পথে বাহুবান এক ভরফর জায়গা। আকাশের অবস্থা দেখে তাঁবু বাড়িয়ে, কিছু কাঁই কিনে এনে চালে ভালো চাপিয়ে দিয়ে বাকীহুঁক কুলীর ভরফার ছোড়ে দিয়ে কাগতে কাগতে তাঁবুর ভিতর ঢুক পড়ি। আমাদের কুলী-তিনটির মধ্যে একটি এককভাবে বাবু আর হুঁড় বলে কীকিয়াঙ্কও, অপর একটি তাইই সাকরেশ। তৃতীয়টির আকৃতি অতি কলাকার। মুখে একে বসন্তের গভীর লাগ, তার একটি চোখ কানা। কানা চোখটি সাদা হয়ে গেলে বেরিয়ে এনেছে বাইরের দিকে। সোজাতেই একে দেখে মনটা

বিরূপ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কমল এর স্বাভাবিকতা ও শাব্যবাহারে আশ্রয় মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। নাম মাহাত্ম্য যিঞা। একে গুড়ি-গুড়ি মুষ্টি, তার হাওয়ার জোর এত প্রবল— তাতে চাল ডাল দেখ করা সম্ভব হবে না। ভাবছিলাম পানী সেজুটুই তাঁবুর ভিতরেই দারুন কিনা। মাহাত্ম্য যিঞা তখন একটি বর্ষাতি আড়াল দিয়ে বাটরে ঠাণ্ডা কনকনের মধ্যে ঠাড়িয়ে রাখা শেষ করে একসময় ডেস্কটি-মুগ্ধ দিয়ে তাঁবুর মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল। ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে একঘেয়ে মুষ্টি। এদিকে স্বামী আসারও বিরাম নেই।

সন্ধ্যার সময় একবার সময় কিছু মুড়ি দিয়ে বেরলায় বাইরের অবস্থা দেখতে। চারিদিক কুহাশায় অস্পষ্ট হয়ে আছে। পর্বতচূড়াগুলির ওপর নতুন করে বরফ জমে রক্তমুগ্ধ সাগর হয়ে উঠেছে। তাঁবুর ভিতরেই রাজা-শাওয়ার কাজ আরছে সবাই। টিনের চালটির ভিতর একটি বড় আগুনের চারপাশে সাধু-সন্ন্যাসীরা ঘিরে বসে আছেন। কুলীরা ঘিরে ধরেছে তহলিলদারকে ব্যাপান ও কবলের জন্ত। হাতে করে মাইক নিয়ে ঘুরে ঘুরে কালকের ভীষণ 'খতরনক' পথের কথা বলে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। সকালে আকাশের অবস্থা ভালো না হ'লে কোনো স্বামী এখান থেকে এগোবে না। অসলু ঠাণ্ডার কাপড়ে-কাপড়ে আবার ঢুকে পড়লাম তাঁবুর মধ্যে। আশাদের ছোট তাঁবুতে অমরনাথের কুলী ভিনট ও বাইরের আরও একটি কুলী এসে ঢুকে পড়েছে। বলার কিছুই নেই। সব-কিছু জড়িয়ে কোনরকমে একই গড়িয়ে পড়বার জায়গা থাকলেই বাতাইকুর মতো বধটে।

ঘুম ভাঙল এক কাতর চীৎকারে। স্বামী তখন প্রায় চারটে। ভীষণ ঠাণ্ডার রাজে ভালো ঘুম হয়নি। চীৎকারের কারণ জানবার জন্ত অন্ধকারে বাইরের মাহাত্ম্য ঠাণ্ডা বেরতে সাহস হ'ল না। আল আলো ফুটে উঠলে তাঁবুর বাইরে আসি। রাজে কাঁকা জাহাঙ্গীর একটি সাধুকে পাতলা প্রান্তিকের একটি বর্ষাতি মুড়ি দিয়ে গুরে থাকতে দেখেছিলাম। স্বামী গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা লক্ষ করতে না পেরে চীৎকার করতে আরম্ভ করে-ছিলেন। রাজে যে হুর্বাণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, সকালে আর তার চিহ্নমাত্র নেই। কী প্রশম প্রশান্ত রূপ আশ্রয় বাহুদানের। পরিষ্কার মীল আকাশে হালকা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। আশ্রয়ও তাঁবু গুটিয়ে সকলের সঙ্গে স্বামী পুর করলাম। তুষার-গলিত বিরাট একটি জলের খরগা বেয়ে এসে

বরফাচ্ছন্ন নদীর গহবরের ভিতরে ঢুকে পড়ছে। তারই পিছন দিয়ে একটি সরু পথের রেখা সোজা উঠে গেছে মহাভদ্রনাথ-দিল্লিসড়টের দিকে। মহাভদ্রনাথ-দিল্লিসড়টের ওপারে (১৪,২০০ ফুট) এসে এ-পথের প্রথমতা চোখে পড়ে। এখানে পথ অনেকটা সমতল হয়ে গেছে। কিন্তু বত্বর চোপ বার একেবারে তুষারক্ষেত্র। তারই মাঝ দিয়ে অসংখ্য স্বামীর একটি কালো রেখা চলছে শিপাহীর সারির মতো। বরফের ওপর দিয়ে পথ চলতে পা পিচলে বাচ্ছে। অতি সাবধানে পায়ের দিকে তাকিয়ে একের পর এক পিছন-পিছন বাবা অমরনাথের নাম স্মরণ করতে-করতে ধীরে ধীরে সকলেই এগিয়ে চলেছে। কোনো হুর্বাণ বা শক্তির স্বামী দেখলে এগিয়ে বা শিঁহিরে মাই। সাহস দিয়ে হাত বাড়িয়ে বিই একই সাহায্যের জন্ত। এখানে সকলেই স্বামী আশ্রয়। কোথায় যেন একটা নদীর বোগ ঘটে গেছে। আশ্রয় তৃতীয় দিনের চরম পরীক্ষার কৃতকার্ণ হতেই হবে। স্বামীর দ্বিতীয় দিনে শিপাহীর উত্তম চড়াই ও বাহুদানে স্বামী কাটানোর মুষ্টি ভয়ঙ্কর পরীক্ষা দিতেই বহু স্বামীকে কিয়ে যেতে হয়েছে। ঐহর্বাণের পরীক্ষার যে হেরে বাবে, সে কিয়ে বাবে। আশ্রয় তীর্থ করতে আসিনি। কিন্তু এই হুর্বাণে এসে কেউ মিরে দাক এ-ও চাইনে। এখানে হু-একজনের হার যেন সকলের হার।

হুর্বাণের জন্ত এ বছরে সরকার থেকে ভাণ্ডা-চলা বন্ধ করে দিয়েছে। পায়ে-হাঁটা স্বামীদের সবচেয়ে অসুবিধা হয়েছে খোড়াওয়ালাদের জন্ত। প্রায় সব স্বামী চলছে





হাওলা-পাহাড়ের বন্যপ্রাণ

ঘোড়ার, গাভে-হাঁটার সংখ্যা নাথাকত। একে বিপদসঙ্কুল পথ, তার ঘোড়াগাভারের 'চোউল' 'হোউল' চীৎকারে আগ্রহ সংবোধন হুত গিয়ে রাজীর হরে ভট্টে ব্যতিব্যস্ত ও বিরক্ত। বরফ বেটে যেটুকু পথ তৈরি করা হয়েছে, সেটুকুও ঘোড়া চলে ভেঙে গর্ত হয়ে গেছে অনেক জায়গায়। কাটা বরফের দেওয়াল ঘেঁবে পাড়ালে, ঘোড়ার গা ঘেঁবে খাতা দিয়ে থাকে—অপর পাশে পাথরের দ্বারে পাড়ালেও, অসাবধানের অল্প হেলা লাগলেই বরফের ওপর দিয়ে কোথায় যে তলিরে যেতে হবে ঠিক নেই। এই অসুবিধার জন্তেই প্রথমে পেশনাগের আগে বাবার স্ক্রু মসোরা হয়নি ঘোড়া-গাভারের। একঘেরে মাইল-চারেক বরফের ওপর দিয়ে পথ চলতে সকল রাজী বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। পাঁড়িয়ে বিজ্ঞান নেবার জায়গা এ নয়। রোদের তাপে বরফ-গলে-বাওয়া কোনো এক উচ্চ জায়গার পাঁড়িরে বিজ্ঞান নেব, কিন্তু পরগুণ উচুতে উঠতে বোটাই রাজী নয়।

একসময় আসে নাবার পাল।। এঁকে বঁকে বরফ-কাটা পথ নেমে গেছে বহু নীচে। চড়াই-পথে ওঠার সময় দুকে দালগ্রামের বেশ কষ্ট হচ্ছিল। উৎরাইয়ে নাবার সময় হয় পারের কষ্ট, এবং পেটাই বিপজ্জনক। এসব ক্ষেত্রে পারে-হাঁটা রাজীদের একবারে সহায়ক হাতের লাঠি। লাঠি ছাড়া পথ চলা অসম্ভব। দুতো-মোক্কা বরফে ভিক্ষে পারের ভঙ্গা অশাঙ্ক হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে বাই। কেড়েহুড়ে উঠে, ভয়ের কিছু না থাকায়, ছুটতে গিয়ে আবারও পড়ি। উঠেও পড়ি। পড়ছে সবাই, তবে যেখানে ভয়ের কিছু নেই সেখানেই ডাড়া-তাড়ির চেঁচা চলছে, সেখানে পড়ছে বেশী। ছুবার-অভিযান শেষ করে নীচে নেমে একটি পার্বত্য নদীর পাশে পাথর আশ্রয় করে বসি। তুলার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।... হুই শাহাড়ের দাল দিয়ে আরও মাইল ছুই চলে পথ এলে শেষ হয়েছে পকতরশী নদীর ধারে। বন্যপ্রাণ থেকে নদীর

ওপারে বাড়ীঘরের তাঁবু চোখে পড়ছে। আজকের মাইল-নয়েক পথ চলতে শরীর এত পরিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে যে, শেষের পথটুকু যেন বড় দীর্ঘ মনে হচ্ছে।

পকতরঙ্গী নদী পেরিয়ে ওপারে পৌঁছতেই তখনাম, একজন বাড়ীর চুত্চা-সংবাদ। আশাঘের দলের এক বন্ধুর গতিভিত্তি কয়েকজন বাড়ীর সঙ্গে আরও কয়েকজন গুজরাটী পুঙ্ক-দল মিলিত হয়ে একসঙ্গে আসতে ধেবেছিল। সামনে গিয়ে দেখি তৃত্যৎসই সেই গুজরাটী দলের দুর্দশন বান্ধবান একটি যুবক—এ পথের সমস্ত হুর্গততা কাটিয়ে, বাবা অমরনাথ বর্শন মাত্র চার মাইল ব্যবধানে এনেও, পদম কাননা পূর্ণতা লাভ করল না। ঘোড়ার চড়ার আঘাত অভ্যস্ত নই। সেই অনভ্যস্ততার, শিলাধা না নিয়ে একটানা ঘোড়ার চ'ড়ে, বুক পিঠ ও কোমরের ব্যাধি অভিশব কষ্ট স্বল্প করেও কোনরকমে চোপ খুঁজে ঘোড়ার ওপর পড়ে থেকে বাড়ায়লে পৌঁছবার চেষ্টার এই পরিশ্রুতি। আগে থেকেই বুকের কষ্ট হচ্ছে বুকভেদ শেষেও বুকটী এই ভয়ঙ্কর পথে একটানা ঘোড়ার চড়ার কষ্ট অগ্রাঙ্ক করে এসে পৌঁছে, ঘোড়া থেকে নেবেই চোপ খুঁজল। অমরনাথ দেখা আর হ'ল না। কিন্তু আবার মন কি জানি কেন একবারও বলাচ্ছে না—‘হ'ল না’। বাড়ীপথে এ ছেঁহ যেন বহির ছেল।

বিতর্কী বাস্তুটের এক কোল ঘেঁষে পকতরঙ্গী নদীর জলধারা বয়ে চলেছে। নদীর উঁচু পাড়ে তাঁবু বাড়ীর রাহাধ ব্যবস্থা হজিল। হাসপাতালের স্ট্রুচার নিয়ে কয়েকজন লোক এসে ঝাঁড়াল আমাঘের তাঁবুর পাশের একটি তাঁবুতে। এক শুভ্রমহিলা হঠাৎ পেটের ব্যাধি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে চুত্চা এসে তারও সমস্ত কষ্ট নিরাময় করে দিয়ে গেল। আঘাতা দেখলারা—বারিচ দেখা। পথের হুর্গততা নই, এই দেখাই যেন আমাঘের প্রাঙ্গ বিবুচতা আনলে চলার পথে।

বেলা প্রায় তিনটের সময় নদীর হিমশীতল জলে ছান ও স্নেহ চাল-ডাল দিয়ে আহার সেয়ে, চাশাচূষি দিয়ে তাঁবুর ভিতর থেকে নদীর জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। নদীর গতি না থাকলে তার সৌন্দর্যের গটে বিস্মৃতি। বাহুঘের জীবনের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা বলা চলে। যানের পর দিন চিরাগ্রহিত একঘেরে জীবনযাত্রা জাহাঘের মনকে গতিবিহীন করে তোলে। তখন এই গতি-বিহীন জীবনকে আকর্ষণ করতে থাকে বেশজঘন বা তীর্ণ-ব্রযণের নেশা। অবস্ত আর্থিক পরিবেশভিত্তি ও কটিভেদে তার প্রভেদ হ'তে পারে। বিভিন্ন জাহাঘার বিভিন্ন রাহি

কাটিয়ে মনের আনন্দে ঘুরতে ঘুরতে আজ সতেরো দিনের রাহি কাটাচ্ছি এই পকতরঙ্গীতে। মানসিক ক্রান্তি বা অবসার এমনও আসেনি। কিন্তু আনন্দের স্রুতি নৃত্যতে হঠাৎ সব উল্লীপনা গিয়ে মনটা বড় বিবল হয়ে উঠল।

প্রায় আটটার সময় তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে বেদি পূর্ণাক্রাশে চতুর্দশির চান উঠেছে। পকতরঙ্গী নদীর স্রোতের দিকে পশ্চিমপ্রান্তে দুই পাছাড়ের মাঝে পথ-স্থবের দূসর আভা তখনও বিলায়নি। কুলীদের ব্যাণানের চালের জল উঁচুতে পথের ওপর তহমিলদানের তাঁবুর খোঁজে দেহতে হ'ল। পহলগাম থেকে দেখছি, তহমিলদানের লোকেরা বাড়ীঘের স্থ-স্থবিধার জল সব সময় ঘুরে ঘুরে বাড়ীঘের খোঁজবব নিচ্ছেন। বাহুঘের তুলনায় কিছু কম হ'লেও এখানেও বেশ কখনও হ'ল। কুলীদের চালের ব্যবস্থা করে দেবার সময় একটি সোকানে মূল্য (কটি) তৈরি করতে দেখে, হাতের আহারের মতো কিছু কিনে নিয়ে আবার তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। চাদের আশোর প্রকৃতির এক মাঝামাঝ পরিবেশ স্রুতি হ'য়েছে। আকাশে তারার মেলা আর নীচে পকতরঙ্গী নদীর জল জ্যোৎস্নার স্রুতিভার কিলমিল করছে।

যুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে দুজন কুলীকে রাত্রা করার জল রেখে, উৎসাহী কুলী মাঝামাঝি দিককে সঙ্গে নিয়ে বেতলাম। তখন সকাল প্রায় ছ'টা। আজকের পথ যুব সর্কী, তার বরকাজ। কাল রাত্রে ঘোষণা হ'য়েছে, ভোর চারটে থেকে ছ'টা পর্যন্ত বেতল ঘোড়ার-চড়া বাড়ীরা বাবে। ছ'টার পর পায়ে-হাঁটা বাড়ীমল বেহলে, কোনো ঘোড়া যেতে দেখেও হ'বে না। পকতরঙ্গী নদীর তীর ঘের উত্তর-পশ্চিমমুখো বাসিন্দা পথ দিয়ে, একে-বেকে ডান পাশের মেট-পাথরের পাছাড়ের গারে ঘেঁষে বাড়ীকই সর্কী পথ উঠে গেছে। মাইলপনেক চড়াই ডাঙর পর পূ-মুখো পথ ঘুরে ক্রমশ নীচে নেমে এসে পৌঁছেতে অমরগঙ্গা নদীর ধারে। সর্কী চড়াই-পথে বরক জমে না থাকার অনেকটা ভাবনা কেটে বাহ। বরক পড়ে একই পথ ধলে গোসেই বাড়ীঘের পথ-চলা হয়ে উঠত হুঃসাধ্য। দুই পাছাড়ের মাঝ দিগে ভূমায়াক্ত মাইলধানের পথ এগোতেই ঝাঁকিয়ে দুই পাছাড়ের গারে একটি বিরাট গল্লর চোখে পড়ল। ঘূ থেকে পাছাড়ের গারে একটি বড় পাথরাঘ পেশের মতো দেখায়। পান দিয়ে অমরগঙ্গা নদী বয়ে চলেছে। কখনও চোখে পড়ে, কখনও তুবারের ভিতর ঢুকে পড়ে। বাড়ীঘের দেখাশেনি আমরাও কোনরকমে সেই হিমশীতল জলে ছান



অমরনাথের তুহারলিঙ্গ

সেতে ফেলি। বেলা তখন দবে আটটা। এরই মধ্যে বেশিভাগ হাতী তাঁদের অমরনাথ দর্শন সেবে মনের আনন্দে নতুন উৎসাহে ক্রিয়ার চালছেন। অবাক লাগল, তাঁদের ফেরার তাড়া দর্শনের তাড়ার থেকে কম নয়।

অমরনাথের রাতি বাটানোর মতো কোনো আশ্রয় নেই। গুহার পাশে হু-একটা গর্ত আছে, সেখানে রাতি কাটানো চলে। তাতে কঠিন কলমও কোনো সাধু-সন্ন্যাসী হয়তো রাতি কাটিয়ে বসে। কোনো সাধারণ তীর্থযাত্রী এখানে রাতি কাটার না। আমরা চুই তেতে গুহামুখের কাছে উঠে আসি। বৈর্যে এবে উচ্চারণ এই বিরাট গল্লরটি প্রায় একশো পঞ্চাশ ফুট। গুহায় সামনে সোহার বেলি দিয়ে ঘেরা দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুক পড়ি।

১৯৭১ সালের ১-ই আগস্ট। শ্রাবণী পূর্ণিমা। অমরনাথের পূর্ণ তুহারলিঙ্গ দর্শনের একমাত্র দিন। বাড়ী-দলের জটলায় একটা চাপা আওয়াজ গুহার ভিতর ভেসে বেড়াচ্ছে। গুহার শেষে ভানদিকের কোণে এক বিরাট তুহারলিঙ্গ। সরকারী লোকেরের কাছে গুনি, গত ত্রিশ বছরের মধ্যে এত বিরাট আকার দেখা যায়নি। আশ্চর্য আট ফুটেরও বেশি উঁচু হয়ে প্রায় গুহার মাথার গিয়ে ঝুঁকছে। শোনা যায়, গুরুপক্ষে অমরনাথের

তুহারলিঙ্গটির আকার পূর্ণিমা় দিন পর্যন্ত কমণ বাড়তে থাকে, এবং কৃষ্ণপাক্ষের সঙ্গে সঙ্গে কমণ কমেতে থাকে। কেবল শ্রাবণী পূর্ণিমা়র দিনে এই তুহারলিঙ্গটি একটি পূর্ণ লিঙ্গাকারে পরিণত হয়। চন্দ্রকলার ড্রাস-বুদ্ধির সঙ্গে অমরনাথের তুহারলিঙ্গের ড্রাস-বুদ্ধির হয়তো কিছুটা মিল থাকতে পারে। কিন্তু আজকের এই বিরাট আকার দেখে মনে হয় এটি একটি গুরুপক্ষে সম্ভব হয়নি। বেশ কয়েক মাসে আজকের এই আকার ধারণ করেছে। এই গল্লরটি সম্বন্ধে কিংবদন্তী শোনা যায় যে, এক পাহাড়ী মূলমানে তার পালিত মেঘের খোঁজে বেগিরে প্রায় সেকুণো বছর আগে এই গল্লরটি ও ভিতরের তুহারলিঙ্গটি প্রথম আবিষ্কার করে।

পাশাপাশি আরও কয়েকটি তুহারলিঙ্গ জন্ম আছে। শেবনাগ, পার্বতী ও গাশে নীচের দিকের তুহারলিঙ্গ গণেশ নামে পরিচিত। গণেশের ছোট তুলুটি নাকি আসল অমরনাথ। এই নিয়ে পাণ্ডেশের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে বেশশায়। হঠাৎ করেকজন বাড়ীর ওকনে—তাদের দৃষ্টির সঙ্গে ও বাড়ানো হাতের সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে দেখি, একটি পার্বা গুহামুখ থেকে উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। নানিক পরে আবার দুটি পার্বাক্ষে পাশাপাশি বলে থাকতে দেখি। বুকের দিকটা সাধা ধরবে, পিছন দিকটা পূর্ণর হস্তের মনে হয়। বেশ হুসর বড় বড় পাশরা হুট। শিব ও পার্বতীর প্রতীক নাকি। অমরনাথ, পার্বতী ও গণেশের তুহারলিঙ্গগুলির সামনে বাড়ীরা তাদের পূজার সামগ্রী—কাপড়, শুকনো ফল ও ধাতুস্রব্য এনে ঢালছে। গুহার ওপর থেকে বড় বড় ঠাণ্ডাফলের ফোটা পড়ছে মাথা, গাড়ে, শিরে। মেঝের বরফ-জলে খালি পা ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে আসছে। বরফের ওপর পা চলতে ও গুহার মধ্যে কাজে লাগতে পারে বলে আগে থেকে সকলেই বড়ের ছুতো কিনে সঙ্গে করে নিয়ে এয়েছিল। কিন্তু পরে আটকানোর মতো সময় ও হ্রবোগ আর ঘটে ওঠেনি। এক সাধু গুহার একপাশে পাহাড়ের গা খুঁড়ে-খুঁড়ে সাদা ছুরের মতো ভাঙ্গ অমরনাথের 'বিভূতি' বলে বাড়ীদের কপালে লাগিয়ে দিচ্ছেন। সকলে কিছু সংগ্রহ করে নিয়েছে—ঘরে ফিরে আত্মীয়-বন্ধনদের কপালে এই 'বিভূতি' লাগাবে বলে। অমরনাথের এবং আশেপাশের অনেকগুলি পাহাড় বড়ি-পাথরের। সেইসব স্থানের আদ্যের প্রতিফলনে গুহার ভিতরটা বেশ আলোকিত হয়ে থাকে।

একসময় দেখি আশাধের হুদী মাজব বিজ্ঞা কখন পিছনে এসে ঝাঁকিয়ে আছে। অমরনাথের বাড়ী নিয়ে আগেও

সে অনেকবার এসেছে ঐ পকতরম্বী পর্বত। আমাদের সঙ্গে এবার সে অমরনাথ দর্শন করবে, আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিল। গুহাঘরো বাড়ীদের ভীড় ক্রমশঃ কমে এসেছে দেখে আমরাও বেরিয়ে আসি। কি ভাবে যে একঘণ্টার ওপর সময় কেটে গেছে বোলায় হয়নি। জীবনের স্মরণীয় সময়টুকু এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় কেন? তবু দুঃখ নেই। চোখ ভরেছে, মন ভরেছে। যেন হয়, এই মধুর স্মৃতি নিয়ে জীবনের শেষদিন পর্বত বেঁচে থাকতে পারব। মাইল উন্নতিশ পথ চলতে চারদিন ধরে প্রতিটি মূহুর্তে বিপদের ভয় সঞ্চিত থাকার আশ সমাপ্তি ঘটল।

এবার কেগার পালা। অমরনাথ-গুহার পাশ দিয়ে আরও এগিয়ে যাওয়া যায়। কিছু তাঁরখাতীয়া আর তার প্রয়োজন যেন করে না। অবশ্য তার স্বস্তি বিশেষ প্রস্তুতিও দরকার। এ পথ কোকিলা-গিরিসমুদ্র হয়ে লাডাক-এর দিকে চলে গেছে। জমাট-রঙা বরফের ওপর দিয়ে নাগতে নাগতে একসময় দেখি ছুটতে আরম্ভ করেছি। ঠিক তাল রেখে ছুটতে পারলে লাগেও ভালো। মন আমাদের আনন্দে ভরে উঠেছে। এ পথে আসতে যে কোনরকম কষ্ট পেতে হয়েছে আর মনেই হয় না। ছুটতে-ছুটতে ভাবি, দেখাই থাক কত আনন্দ সময়ের মধ্যে পকতরম্বীতে পৌঁছতে পারি। আমাদের কেগার তাড়ায় ছোটো নদ। মনের আনন্দে। এক ঘটায় কিছু বেশী সময়ের মধ্যে এসেও পড়ি। বেলা তখন লবে এগারোটা।

প্রায় সকল বাড়ীগুলোকে নেবে যেতে দেখে আমরাও তাড়াতাড়ি যাওয়া-নাওয়া সেরে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বেরিয়ে পড়ি বাহুবানের উদ্দেশ্যে। চিরহুয়ারাবৃত মহাওলাস-গিরিপঙ্কটের কাছে আসতেই হঠাৎ আকাশ অন্ধকার করে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি নামল। বাহুবানের দিকে আকাশ ক্রমশ ঘোর হয়ে উঠেছে। কেবল বরফের সমুদ্র ছাড়া কোথাও একটা বড় পাথর বা পাহাড়ের শীর্ষ নেই, যেখানে আলম নেওয়া চলে। এতটা পথ দিয়ে যাওয়াও চলে না। কুমীর কাছ থেকে বর্গাতিগুলি বায় করে চাপিয়ে নিয়ে চড়াই-পথে ধীরে ধীরে উঠতে থাকি। যেন মনে ভাবি, অমরনাথ-গুহা থেকে বেরিয়ে মনের আনন্দে একবার বলে উঠেছিলাম—‘এবার মরতে সাক্ষী আছি’। এ-বৃষ্টি তারই হুচলা নাকি! বাহুবান যে কী ভয়ঙ্কর জায়গা তার পরিচয় আগেই পেয়েছি। অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে এই প্রথম মনে ভয় জাগে ওঠে। যে-কোনো মুহুর্তে ভূধার-স্রুৎ বেগা বিতে পারে। অমরা যে কত ভীতু ও দুর্বল তাই চূপচাপ উপলব্ধি করছিলাম। যাক, বানিকবনের মধ্যে বৃষ্টি

যায়ল। হস্তম্বর দেবতারা হিমালয়ের এই অশ্রমলি ছপের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল। দাঁড়িয়ে-এর পৈলপুথীতে। গতকাল ও আজকের সময়টুকুর মধ্যে সূর্যের ডাণ্ডে প্রচুর বরফ শ’লে ঘাটি বেগা বিরেকে এবং সেই বরফ জলে ও বাঙিতে মিশে পথ ভরানক পিছল হয়ে উঠেছে। আগের চেয়ে অতি ধীরে সতর্ক হয়ে পথ চলতে হচ্ছে।

বাহুবান এসে পৌঁছলার বেলা চারটের মধ্যে। বাহুবানে আবার রাতি কাটাতে নেই হাতী নেই। চলে এলাব জমপাল। বেলা শেষ হ’তে তখনও অনেক বাকী দেখে চলতে থাকি চন্দনবাড়ীর পথে। পিতৃবাঙির চড়াইয়ের ওপর এসে খিজ্রামের অল্প বখন বঙ্গলার তখন বিকাল লাগে। সেট ছোট ছোট আকাখা বুঝকাটা একেবারে বাড়াই পথ দিয়ে নেমে এসে জমলের ভিতর দিয়ে বখন চন্দনবাড়ীতে এসে ঝাঁড়লায় তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে। বড়ি দেখলার ঠিক পাটটো। অপরিণীত স্ত্রীতে স্ত্রীর ভেত্রে পড়ছে। হাঁটু ও পায়ের সমস্ত ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। রাস্তা করার বা সোঁকান থেকে বাবার বিনে আনার ইচ্ছেও নেই। সন্ধ্যের সন্ধ্যি শুকনো পাউরুটির শেষটুকু চিবিয়ে, জল খেয়ে গুয়ে পড়লাম তাঁবু বাড়িয়ে।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে বসে আছি। কুমীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রমশঃ যোগ উঠে পথ-চলা কষ্টকর হয়ে পড়বে। কুমীর-মহাবাহুয়া চোখ বগড়াতে-বগড়াতে ঘুম থেকে উঠে এসেন তখন লাডাক বেজে গেছে। কালকের পরিপ্রবেশ কথা চিন্তা করে চূপচাপ থাকি। শেখনাগ নদীর ওপর পুল পেরিয়ে পহলগামে পৌঁছবার সময় হঠাৎ পথের ধারে বিরাট বিরাট কড়াইয়ে তৈরি-করা আদুর তরকারি, পুরি ও মাংসপো তেপে এবং বিরাট উছনে আরও তৈরি হতে দেখে ভাবলাম, এত বড় সোঁকান হল কেন? কুমার্ত বাড়ীঘের আহার করিয়ে হয়েছে পরলা রোজগাঘের চোঁটা চোঁবে, পাশ কাটিয়ে চলে গাছলাম। একটা লোক উঠে এসে হাতজোড় করে মাথনে এসে ঝাঁড়াল—‘আহ্ন, অমরনাথের প্রসাদ নিয়ে যান’—ব’লে আমাদের বসিয়ে পেট ভরে পুরি-মাংসপো খাইয়ে বিল। হুতলা, পুণ্যাবী তাঁরখাতীদের সেবার উদ্দেশ্যে এটি খোলা হয়েছে। বাড়ীঘের সেবা করে তৃপ্তি দিয়ে এরাও কিছু হুকল অর্জন করুক, এই কামনাই করেছিলাম বাবা অমরনাথের কাছে।

পহলগামে পৌঁছে বিমিট বশেকের মধ্যে শ্রীনগরের একটা বাস ছাড়বে তখন ডাড়া-করা তাঁবু ইত্যাদি বেরত

দিয়ে কুশীসের খুশী করে বাসে উঠে বসলাম। জনশ্রুত পহলগাম আজ কেমন শ্রীহীন হয়ে পড়ছে। মনের মধ্যে বেশ একটা আনন্দের স্রব ভেসে বেড়াচ্ছিল। বাস মানিকটা পথ এগোতেই তেমনি ঘনটা বিরক্ত হয়ে উঠল আটজন মাতোরাগী হুবকবে বাবহারে। বত আনুনিব হিন্দী গান আছে তাই এক কপি করে অতি উৎকট হয়ে মেয়েদের লম্বা করে গেয়ে চলেছিল। বাসের সামনের আসনের ছুটি লাফোরে চার সঙ্ক করতে না পেরে উত্তেজিত হয়ে কণ্ঠে উঠল। দু'বকুলি বোঝার এই স্রবোগ হুঁজছিল। তারপর বচসা, চিৎকার, দুখ-খারাপ থেকে হাতাহাতি হবার জোগাড় বাসের মধ্যে। হিমালয়ের বিরাট পরিবেশের মধ্যে তীর্থ-পট্টন করার পর এই! হঠাৎ বেন একটা বেছালা চুকপটন ঘটে গেল। সন্দের শেষ সীমার আশ্রয় এলে পৌছেছিলাম। কিন্তু ড্রাইভার-সাহেব গাড়ী থামিয়ে নেমে আসতে নিশ্চিন্ত ঘটল।

শ্রীনগরের কেন্দ্রস্থল স্লিয়ার নদীর ওপর প্রথম সেতু আদিরা-কদলের কাছে একটি হোটলে আশ্রয় নিলাম।

অমরনাথ-বারার আসে করেকদিন হাউস-বোট কাটিয়ে গেছি। শ্রীনগরের ত্রৈলোচরী বস্ত্রগুলির মধ্যে কেবল যোগল-উজানগুলি দেখার বাকী ছিল। উজানগুলি দেখার উত্তম দিন হ'ল রবিবার। আজ সেই রবিবার। বার মাত্র কাল অত্যধিক কষ্টে সঙ্ক করে একটানা হাইল চলিণ অতি পূর্ণমণ্ডল হয়েই নেবে এসেছি।

পতকাল পনিবার প্রাণকীর্ণ পুনিবার দিন বারা অমরনাথ-দর্শনের জন্য চলেছিল, তারা আজ রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীনগরে নিখাধ্যগ, চন্দ্রমাসাহী প্রকৃতি উজানগুলি দেখে ভাল ভ্রমের ছোট নৌকো 'শিকার' নিয়ে, মূল চুলে, কাককাক-করা ডাকিয়ার ঠেস দিয়ে হাওয়া খেয়ে খুবে বেড়াচ্ছে—এটা আশ্রয় নিজেসাই বিখাস করতে পারি না। তাই ধারে ধারে বনে পড়ছে এখানকার লোকদের কয়েকটি কথা—‘আপলোগ গুন্ডাতক গিটা!’

মুদ্রিত আলোকচিত্রগুলি দেখক ও তীর্যক সম্বোধী ইন্দ্রজ্ঞানবান হির কষ্টক সূত্র

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিভেদের স্বরূপ : স্বতন্ত্রীকরণ নীতি

অধ্যাপক শ্রীম্হাঃভবিমল মুখোপাধ্যায়

১৯৪৬ সালে ভারত সরকার জাতিগণের নিকট অভিযোগ করেন যে, দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকার আইন করিয়া যে সমস্ত ভারতীয় দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে এবং বাহারা দক্ষিণ আফ্রিকায় ই মাপকি তাহাদের স্থায়ীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বসবাস করিবার অধিকার সন্নিহিত করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে যে আইন পাস করা হয়, তাহাতে প্রবাসী ভারতীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবসা-পরিবহন কলেক্সন ইউরোপীয় প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। এই আইন সাধারণতঃ ‘বন্ডি আইন’ (Ghetto Act বা Asiatic Land Tenure and Indian Representation Act) নামে পরিচিত।

দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের ক্রমশঃ এবং ভারতীয় বিদেয় বা তাহাদের উপর অভিযোগের নূতন কথা নয়। প্রবাসী ভারতীয়দের বার্ষিক এবং মর্যাদা স্বকার মন্তই মহাশয় পানীর প্রথম সত্যগ্রহ আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল (১৯০৭-১৪)।

ভারত সরকারের অভিযোগের উত্তরে দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্তা তাহার খরোয়া ব্যাপার এবং জাতিসম্ম এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকারী নন।

বাসী এবং প্রতিনিধীর বর্তমান গুনিয়া ১৯৪৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ (General Assembly) সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রবাসী ভারতীয়-সম্প্রদায়ের প্রতি দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের নীতি এই সরকার এবং ভারত সরকারের মধ্যে চুক্তিতে বীজিত এবং জাতিসংঘের সম্মুখে ঘোষিত আন্তর্জাতিক দায়িত্বশালনের প্রতিশ্রুতি হওয়া উচিত নয়। সচিবের সরকারের এই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা বি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন সে-সম্বন্ধে পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে তদাধিদগকে রিপোর্ট দাখিল করিতে অহরোধ করা হইল।

‘চোরা না গোনে ধরেন কাহিনী’—দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকার জাতিসংঘের নির্দেশ অমান্য করিয়াছেন। জাতিসংঘ এবং

ভারত সরকার বার বার চেষ্টা করিয়াও দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারকে সন্তোষজনক নীতিমালায় সম্মত করিতে পারেন নাই। এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী বিভিন্ন জাতি এবং তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য জাতিসংঘ যে কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন, দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকার তাহার সহিত কোন প্রকার সহযোগিতা করেন নাই।

১৯৪৮ সালে সম্মেলন নির্বাচনে অল্পকাল করিয়া 'জাতীয় দল' (National Party) দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষ লাভ করে। এই দলের নেতা ডাক্তার ডি. এফ. মালান (Dr. D. F. Malan) প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াই একটি বেতার-ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি বলেন যে, তিনি সর্বপ্রকার 'অ্যাপার্টাইড' (Apartheid) বা জাতি-বতরীকরণ নীতি কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবেন। এই নীতি অনুসারেই দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী প্রত্যেক জাতির জন্য পৃথক পৃথক বাস এবং ব্যবসা-স্থান, বিদ্যালয় প্রভৃতির ব্যবস্থা হইতেছে। এই নীতির সূচক বলা হয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় শান্তি অম্লস্ব রাবিবার জন্যই ইহার অধিবাসী বিভিন্ন জাতি-গণকে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখা প্রয়োজন।

ডাঃ এ. বি. জুমা (Dr. A. B. Xuma) দক্ষিণ আফ্রিকার অগ্রগত বর্ণিত বাঙালি নেতা। তিনি বলেন যে, বেতার-সম্মেলনের অবৈতনিক ভিত্তি-ই বতরীকরণ-নীতির মূল কারণ। বেতারগণের মনে অবৈতনিক সম্মেলনগুলি সম্বন্ধে ভীতির উৎস্রক করিয়া সেই ভীতিকে চিরস্থায়ী করিবার জন্যই বতরীকরণের ধূসা উদ্দেশ্য হইয়াছে। ডাঃ জুমা বলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত মেলামেলা করিবার সুযোগ পাইলে বেতারগণ বৃদ্ধিতে পারিবে যে, অবৈতনিক-কারেরাও রক্তমাংসে গড়া মানুষ। এই বোধ বেত-প্রাধাত্যের ভিত্তিমূল ধলাইয়া দিবে।

১৯৪৮ সালে বিবিধ 'গ্রুপ এরিয়াস অ্যাক্ট' (Group Areas Act) অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীগণকে বেত, কৃষ্ণ এবং 'অজ্ঞাত' এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। সরকার এই আইনের বলে বিভিন্ন শ্রেণীর বসবাস এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য পৃথক পৃথক অঞ্চল নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন। এগুলিকে 'গ্রুপ এরিয়া' (Group Area) বলা হইবে। কোনো 'গ্রুপ এরিয়া' যে সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট, একমাত্র সেই সম্প্রদায়ের জন্যই তাহাতে থাকিবার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার অধিকার থাকিবে না। এক শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট 'গ্রুপ এরিয়া'তে অন্য শ্রেণীর বাসিন্দার সন্নিবিষ্ট থাকিলে, তাহার হস্তার পর প্রত্যেক শ্রেণীর কাহারও

নির্দিষ্ট বিক্রম করিতে হইবে। কোনো অঞ্চল শ্রেণী-বিশেষের জন্য 'গ্রুপ এরিয়া' বলিয়া ঘোষিত হইবার একবৎসর পর সরকারী অর্থমন্ত্রী ব্যতীত অন্যর শ্রেণীর কোনো ব্যক্তিকে অধিবাসিবেও সেখানে থাকিতে দেওয়া হইবে না। বাড়ীর চাকর, বোকারের কর্মচারী এবং জাতি-অভ্যাগতের প্রতি এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

১৯৪৯ সালের 'বতি আইন' (Ghetto Act) ভারতীয়-দিককে ভোটের অধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। 'গ্রুপ এরিয়া' আইনে এই অধিকার হরণ করা হইয়াছে।

সরকার বলেন যে, 'গ্রুপ এরিয়া' আইন বেতার এবং অবৈতনিক নিয়মে সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীর প্রতিই প্রযোজ্য। হতভাগ্য সরকারের বিক্ষেপে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ভিত্তিহীন। আসলে কিন্তু এই আইনের বলে অবৈতনিক সম্প্রদায়গণকে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হইতে বহুদূরে নিষ্কৃত, অথবৎ এবং উপশ্লিষ্ট এলাকায় সরাইয়া দেওয়া হইবে। ফলে ভারতীয় সম্প্রদায়ই সবচেয়ে বেশী বিপদে পড়িবে। যে সমস্ত ভ্রমাদ্য কারণে বিশেষ কৌশল এবং শিক্ষার প্রয়োজন, সরকারী আইনের বলে কোনো ভারতীয় শ্রমিকের জাহা পাওয়ার উপায় নাই। সাধারণ মানুষের কাজ যাত্র তাহারাই করিতে পারে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যই ভারতীয় সম্প্রদায়ের জীবিকার প্রধান উপায়। চারবান, মোহাম্মদাবাদি এবং কেশটাইনের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র-গুলিতে বহু ভারতীয় ব্যবসায়ীর চালু এবং লাভজনক কারবার আছে। এই সমস্ত কেন্দ্রের কতকগুলিকে ইতিমধ্যেই ইউরোপীয় 'গ্রুপ এরিয়া' বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। মোহাম্মদাবাদের ভারতীয়গণের জন্য নির্দিষ্ট 'গ্রুপ এরিয়া' সেনাসিয়া (Lanassia) মোহাম্মদাবাদ হইতে ২২ মাইল দূরে। ভারতীয় ব্যবসায়ীগণকে বোকা-শাট, বাড়ীঘর ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া সেনাসিয়াতে চলিয়া যাইতে হইবে। ফলে তাহারা নিজেরা গুরুতর অর্থনৈতিক বিপদের মধ্যে পড়িবেন। তাহাদের নিজের এবং তাহাদের কর্মচারীগণের জীবিকার্থনের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। 'গ্রুপ এরিয়া' আইন কার্যে পরিণত হইলে একমাত্র মোহাম্মদাবাদে ২৪,০০০ লোক বাস্কাইয়া হইবে। ১,৩০০ ভারতীয় ও চীনা ব্যবসায়ী—চীনাগণের সংখ্যা বৃদ্ধিবে—প্রায় আদি লক্ষ পাউণ্ড মূল্যবের চালু কারবার নষ্ট হইবে। ভারতবাসী ভারতীয়গণের ক্ষতির পরিমাণ আরও অনেক বেশী হইবে। ইহাতে বিনষ্ট হইবার কিছু নাই। জাতীয় দলের (National Party) ১৯৪৮ সালের নির্বাচনী ইচ্ছাচারে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে ভারতীয়গণ

পরশেই এবং তাহাবিধকে দক্ষিণ-আফ্রিকা সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না। সুতরাং দত্ত বেশী সংখ্যক লম্বা ভাঙ্গাপিকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেওয়াই জাতীয়-স্বার্থে স্বতন্ত্র প্রণয়ন লক্ষ্য।*

সরকার বলেন বিভিন্ন সমুদ্রাধারের 'সমানতালে উন্নতি'ই (progress along parallel lines) উদ্দেশ্যের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যের কথা কতটা সত্য এবং আনুমানিক—দুইয়ের সাহায্যে স্থিতিয়ার চেষ্টা করা যাক। ১৯৫০ সালে 'গ্রুপ এরিয়া' আইন প্রণয়নের পর সরকার প্রিন্সিপিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এফ. আর. টমলিনসনের (F. R. Tomlinson) নেতৃত্বে আফ্রিকা-বৈশ্ববিধের ভিত্তি সংরক্ষিত এলাকায় (Bantu locations) সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন লক্ষ্যে প্রচেষ্টা এবং স্থানীয় কৃষিয়ার ভিত্তি একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। কমিশন সরকারী পন্থীকরণ নীতির অঙ্গভূক্তিতে প্রকাশ করেন। কমিশনের রিপোর্টে দলবৎসরে মোট ১০৫,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া আফ্রিকা-বৈশ্ববিধের ভিত্তি সংরক্ষিত এলাকাগুলির সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনের স্থানীয় করা হইয়াছিল। সরকার এই স্থানীয় সনাক্তির অগ্রাধিকার করিয়াছেন। সম্ভব আনুমানিক।

আজ পর্যন্ত 'গ্রুপ এরিয়া' আইনটিকে মোট পাঁচবার সংশোধন করা হইয়াছে। প্রত্যেক সংশোধনের পর এই আইন পূর্বদেশকা বেশী পরিমাণে অ-বেতার্যে ব্যর্থের প্রতিফল হইয়াছে। বেতার্য এবং অ-বেতার্য সমুদ্রাধারটিকে পরস্পর বিভিন্ন রাষ্ট্রবিধার ভিত্তি 'গ্রুপ এরিয়া' আইন ভিন্ন আরও কয়েকটি আইন গুলি করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি আইনের (The Prohibition of Mixed Marriages Act, 1949) বলে বেতার্য এবং অ-বেতার্যবিধের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ এবং আইনকে অসিদ্ধ। বেতার্য-বেতার্য বিবাহে পৌরোহিত্য অর্পণও সম্ভবী অপরাধ। আর একটি আইন (The Immorality Amendment Act, 1950) অহুসারে বেতার্য এবং অ-বেতার্যের মধ্যে যৌন-সম্পর্ক অবৈধ।

১৯৫০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার 'সামান্য দমন আইন' (The Suppression of Communism Act, 1950)

বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনে বিচার-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অসীম করত্যা কেবল হইয়াছে। তিনি যে-কোনো ব্যক্তি, সংস্থা, পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকাকে সামান্যতম খোঁজা করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে উদ্ভার মতামতই চূড়ান্ত। উদ্ভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো আপিল চলে না। বিচার-সচিব যে-কোনো ব্যক্তিকে সামান্যতম খোঁজা খোঁজা করিলে তাহার পক্ষে সরকারী চাকরির বস্তু চিত্রকালের ভিত্তি বদ্ধ হইয়া যায়। সে কোনো ট্রেড-ইউনিয়নের সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি পক্ষে নির্ধারিত হইতে পারে না। বিচার-সচিব যে-কোনো সভা-সমিতি বদ্ধ করিয়া দিতে এবং যে-কোনো ব্যক্তির গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। বিচার-সচিবের মতে সম্ভবতঃ ব্যক্তি দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক না হইলে তিনি (বিচার-সচিব) তাহাকে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বাহির করিয়া দিতে পারেন। সরকারের মতে বাহ্যিক দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিশেষ এবং বিরোধ পত্রি করে, সামান্য-দমন আইনের বলে তাহারও সম্ভব। এই বিধান অহুসারে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারই সর্বপ্রথম ঘটিত হওয়া উচিত। উদ্ভাবের নীতি এবং কার্যকলাপের ফলেই ইউরোপীয় এবং অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ বিয়ের পর দিন আগর হইয়া উঠিতেছে।

১৯৫০ সালের আর একটি আইন (The Population Registration Act, 1950) অহুসারে যৌন বংশের বা তাহার বেশী বংশের প্রত্যেক আফ্রিকাবাসীকেই সরকারী পরিচয়-পত্র সত্ত্ব লইয়া চলানো করিতে হয়। এই পরিচয়-পত্রে পরিচয়ীর নাম, বয়স, জাতি এবং চেহারাের বর্ণনা থাকে। পুলিশ চাহিয়াবাস এই পরিচয়-পত্র দেখাইতে হয়।

১৯৫০ সালে জাতীয়-দল কর্তৃক শাসনভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই প্রথম এবং পূর্ণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ শ্যুমান (Mr. Shooman) ঘোষণা করেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন সমুদ্রাধারের প্রমিতগণ একই ট্রেড-ইউনিয়নের সভ্য হইতে পারিবে না এবং সে সম্বন্ধে ইউনিয়নের সভ্যগণ একই সমুদ্রাধারকে, সে সম্বন্ধে ইউনিয়ন তুলিয়া দেওয়া হইবে। মিঃ শ্যুমান আরও বলেন যে, আফ্রিকা-বৈশ্ববিধকে ভবিষ্যতে কোনো কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হইবে না। ১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রীর স্বতন্ত্রের একটি পরামর্শনায় আফ্রিকা-বৈশ্ব সরকারী কর্তব্যবিধিকার বহুধা করা তাহাদের আরম্ভের বেতার্য নিরোধের হুমকি দেওয়া হয়। শিক্ষা, শিল্প এবং বিজ্ঞান মন্ত্রী মিঃ ভিলগোয়েন (Mr. J. H. Vilgoeren) দক্ষিণ আফ্রিকার প্রণয়ন গতিভুক্ত

* "The National Party holds the view that the Indians are a foreign and outlandish element which is unassimilable. They can never become part of the country....The Party accepts as a basis of its policy the re-patriation of as many Indians as possible."

সংঘের (The South African Association for Arts) কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দেন যে, সত্য সর্বদা এবং সর্বক্ষেত্রে স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অগ্রসরণ না করিলে সরকারী অর্থসাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

‘বান্টু শিক্ষা আইন, ১৯৫৩’ (The Bantu Education Act, 1953)-এ সরকারকে বান্টু অর্থায়ন আফ্রিকা-সেইশিয়ানের শিক্ষার ব্যাপারে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন ঐক্যমত মিশ্র পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি সরকারী শিক্ষানীতি অগ্রসরণ না করিলে সরকার বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইবে। ১৯৫৩ সালের আর একটি আইন (The Separate Amenities Act, 1953) বান-বাহন প্রভৃতিতে স্বতন্ত্রীকরণ ব্যবস্থাকে আইনসম্মত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই ১৯৫৩ সালেই বিবিধ ‘সাপেক্ষ নিয়ন্ত্রণ আইনের’ (The Public Safety Act, 1953) বলে কয়েকটি সরকার যে-কোনো সমগ্র জনগণীকে অথবা যোগ্য কবিয়া ব্যবস্থা-পরিষদের বিনা অধমজিতে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন।

কোনো সরকারী আইন বাস্তব বা সংশোধন করিবার আন্দোলন দক্ষিণ আফ্রিকার সত্তাবিধিতে হস্তক্ষেপে অসম্ভব। বিভিন্নরাজ্যীয় অধিবাসীগণ কে কি কাজ করিবে—প্রম এবং পূর্ণ মন্ত্রী তাহা নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে বিশেষ বিশেষ কাজ বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের অঙ্গ সংরক্ষিত রাখিতে পারেন। ১৯৫৬ সালের একটি আইনে বলা হয় যে কোনো নবগঠিত ট্রেড-ইউনিয়নের সমস্ত সদস্য একই সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলে সেই ইউনিয়নকে সরকারী অস্বীকৃতি দেওয়া হইবে না। সরকারের অস্বীকৃতিতে যে সমস্ত ইউনিয়ন ইউরোপীয় ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্য আছে, তাহাদের ইউরোপীয় সম্প্রদায়কে কেবলমাত্র ইউরোপীয়-বিশেষ অঙ্গ পৃথক ইউনিয়ন গঠন করিতে প্ররোচনা দেওয়া হইয়াছে।

১৯৫১ সালে বর্ণস্বরূপ (Cape Coloured) = ভোটসম্প্রদায়-বিশেষ ইউরোপীয় ভোটসম্প্রদায়বিশেষ সহিত একসঙ্গে ভোট দেওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের অঙ্গ স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি এই উদ্দেশ্যে বিবিধ আইনটিকে (The Separate Registration of Voters Act, 1951) যে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন। সরকার নূতন একটি আইন করিয়া সংবিধান-সংস্কার

বিষয়ে স্বতন্ত্রীকরণ কোর্টের হৃদয় বৃত্তান্ত দেওয়ার ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। স্বতন্ত্রীকরণ সরকারের এই চেষ্টা বা অগ্রসরণে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সরকার মিলিলেন। অনেক কারাগারের পর অবশেষে ১৯৫৬ সালে বর্ণস্বরূপ ভোটসম্প্রদায়ের অঙ্গ পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা কার্যে হইয়াছে। তবিত্ত্বকে ইংরাজি কেবলমাত্র ইউরোপীয় প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারিবেন।

সরকার আইনের বলে শিক্ষার ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে পার্লামেন্ট আইনের বদলা উপস্থিত করা হইয়াছে। এই প্রত্যয়ে ভারতীয় এবং আফ্রিকা-সেইশিয়ানের অঙ্গ পৃথক পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মোট নয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সাতটির সরকারী অ-বেতন শিক্ষার্থীর নিকট কল্প। যে দুইটিতে তাহাদের প্রবেশাধিকার আছে, সেই দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়েও তবিত্ত্বকে অ-বেতন ছাত্র ভর্তি করিতে পারিবে না। এই প্রত্যয়ে দেশের প্রবল প্রতিবাদের কণ্ঠ উঠিয়াছে। কিন্তু ‘উপায়সমূহেই মূর্খগণ প্রকোপায় না শাস্ত্র’।

স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে দক্ষিণ-আফ্রিকা রাষ্ট্রসৌম্যের ভিত্তি-প্রস্তর বলা হইতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার রেল, হাওড়াই মাছাছে, মোটরবাস এবং ট্রামে, বোয়াল্ডের মাঠে, রেল-স্টেশনের প্রান্তিকর্ষে, ডাক এবং তার-স্বরে স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ প্রয়োগ করা হইতেছে। ইহার ধর্ম্মবিশ্ব-গুলিতে সারা এবং কালার একসঙ্গে উপাসনা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ক্রমাগত দুঃখভাগ এবং নির্বাচনের ফলে দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয় এবং কৃষ্ণাঙ্গপন ক্রমেই একত্রায়িত হইতেছে। সরকারও ভেদমীতির সাহায্যে এই সংহতি নষ্ট করিবার অঙ্গ উত্তীর্ণ-পরিচা লসিয়াছেন। ১৯৭১ সালের জাহুয়ারি মাসে ভারবান শহরে কৃষ্ণাঙ্গপন ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে যে সম্ভবত অক্রমণ চালায়, তাহার পিছনে যে সরকারী ইঙ্গিত ছিল একথা মনে করিবার কষ্টে কারণ আছে। এই দালা সম্বন্ধে তবিত্ত্ব করিবার অঙ্গ নিবৃত্ত কথিননও—ইহার সমস্তগণ সকলেই যেতান—হাওয়ার অঙ্গ সরকারী না হইলেও ইউরোপীয়বিশেষ হাওয়ার অধিকার করিতে পারেন নাই। ইউরোপীয়বিশেষ অধ্যা কেহ কেহ যে কৃষ্ণাঙ্গপনকে ভারতীয়-বিশেষ বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, কথিননের ত্রিণাটে তাহা খোলাবুলিতেই বীকার করা হইয়াছে। দালা আন্তর হইয়া গেলে ভারবানের প্রকৃত বাস্তব যেতানবিশেষ নৃত্য এবং অসম্পূর্ণ আনন্দপ্রকাশের সংবাদ কথি-কল্পনা নয়।

• ইহার আমাদের দেশের ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে; ইহারের ধর্ম্মনীতি ইউরোপীয় ও আফ্রিকা-সেইশিয়ান বৃত্ত প্রবাহিত।

গত কয়েক বৎসরে দক্ষিণ আফ্রিকার চক্ষাকণণ বার বার লজ্জা-হানাদ করিয়াছে। এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ জন-প্রতিরোধী অসন্তোষের বাহ্য প্রকাশ।

১৯০২ সালের ২৬শে জুন দক্ষিণ আফ্রিকার চক্ষাকণণ এবং ভারতীয়গণ একত্রে সশস্ত্র নীতির প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন আরম্ভ করেন। বহু ভারতীয়, চক্ষাকণণ এবং কয়েকজন বেতাজ এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাগার বা অরণ্যে পড়িত হন। বড়শার ব্যক্তিদিগের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর পুত্র কর্ণাট মণিলাল গান্ধী এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন গভর্নর-জেনারেল লার পার্টিক ডানকানের (Sir Patrick Duncan) পুত্র মিঃ পার্টিক ডানকানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মণিলালের ১০ পাউণ্ড চরিমানা, অন্যদের ১০ দিনের কারাগারের এবং ডানকানের ১০০ পাউণ্ড চরিমানা, অন্যদের ১০০ দিনের কারাগারের বহুম হইয়া উঠেছে। ভারতীয় বরণ করেন। ১৯০২ সালের আন্দোলন কিছুদিন পরে আপন হইতেই থামিয়া য়ে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার অসন্তোষ সম্প্রদায় তখনেই বিদ্রোহ হইয়া উঠিতেছে। বেতাজ সম্প্রদায়ের মূর্ত একটি অংশে ইহাদের প্রতি

সহ্যদুতিছিল। এদিকে বেতাজ সম্প্রদায়ের দুইটি শাখা ইংরেজ এবং বৃহৎশিগের সাম্প্রদায়িক সম্পর্কও খুব প্রতিকূল হইয়াছে। তলে দক্ষিণ আফ্রিকা দিনের পর দিন ঘোর লড়াইয়ের মধ্যে ছুটিয়া চলিতেছে।

আফ্রিকার ভাগরণ সমস্যারন্থিক ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা। ডেপার বাওলদ-এর কথা—আফ্রিকার ২০ কোটি মানুষ আর দুগুনিহার অবদানে ভাবিয়া উঠিতেছে। নিরোখিত আফ্রিকা নড়িয়া-চড়িয়া নিরোখকের প্রাথমিক চরিত্র। দূর করিতেছে। ১০ আগ্রত আফ্রিকার মানবিক অধিকার অধীকার করিলে বিশ্বনাথির পথ যুগ্ম হইবে না।

"The momentous fact about South Africa is that 200 million people are waking up. After a long night the sleeper is stirring, blinking away his drowsiness, and stretching his limbs with all the eager, impatient spirit of a youth approaching manhood." —The New Dimensions of Peace (Lenant Edition, p. 187)



বঙ্গল ডেকার্টার
২২৩-চিপুরপ্তন এডিনিউ • কলিকাতা ৬

মাহুঘর ও প্রেমতারা

❖ মহাশ্বেতা গুপ্তাচার্য ❖

১৭১

সান্তাহারের অধ্যায়টা নানা কারণে জীবলী সার্কাস মনে রাখবে। কেননা সার্কাসটাকে চলে সাজাতে তৎপর হলো গোপীনাথ। কতদূরে ছড়িয়ে জাল ফেলেছিলো সে, কে জানে। জাল গুটোতে অনেক নতুন মুখ দেখা গেল। সুকুলবাবু নানা কাজের কাজী। তিনদিন ভুব মেরে থেকে চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ফিরলো। ছয় থেকে দশ অবধি তাদের বয়স। স্ত্রাম, পটল ছোটো ছেলে। আর শিউলী, জুলি দুই মেয়ে। ভারী হলো গোপীনাথের রিজার্ভ দল। এরা এককথায় বে-ওয়ারিশ ছেলেমেয়ে। মা বাপ এদের স্বীকার করেনি, অথবা রোজগারের ক্ষম্ভে ঠেলে দিয়েছে পথে। নইলে সার্কাসে কে দেয় ছেলেমেয়ে? গোপীনাথের দলের খাওয়া-পরা, ব্যবহার-বন্দোবস্তের সুখাম আছে সার্কাস-ছনিয়াতে। তাই এখানে আসতে এদের আপত্তি হলোনা। সকলেই যে উৎসাহে তা নয়। তবে একটা-ছোটো ডালো আর্টিস্ট তৈরী হলেই শ্রম সার্থক। কত কথাই তো চালু আছে সার্কাস সম্পর্কে। ছোট ছেলেমেয়েদের যে শ্রম ক'রে শিখতে হয় খেলা, দেখলে সাধারণ মানুষ শিউরে উঠবে। খেলা শেখবার সময়ে জুলাচুক হলে চাবুক চলবে। উপোসী রেখে দেবে পুরোদিন। কিন্তু কঠোর না হলেও চলেনা। মাস্টার বলে,

—শিখবার সময়ে কমা করলে শত্রুর কাজ করা হবে। এতটুকু এমিক ওমিক হ'লে রগ ছিঁড়ে জখম হয়ে হয় মরবে, নয় খুঁতো হয়ে থাকবে জখমভোর, তখন?

অসস্তা পেশার সঙ্গে সার্কাসের তুলনা হয়না।

সার্কাসের মানুষের একটি খেলা শিখতে পানেনো বছর লাগে। অথচ খেলাটি দেখায় সে বড়জোর সাত-আট বছর। যৌবনের সময়টি। যৌবনও গেলো, খেলাও ফুরোল। শরীর আর তেমন অন্যায়সে নমনীয় হইলো না। শিথিল হ'তে শুরু করলো মাংসপেশী। বরস হ'লেই যে আর্টিস্ট বসে যাবে তা নয়। তবে পড়তে শুরু করবে। আর উঠবেনা খেলা। তখন বড় সার্কাস ছেড়ে মাঝারী সার্কাস; তার থেকে রাস্তার ধারে তাঁবু খাটিয়ে খেলা; তার পরে চড়ক-রাসে মেলার মরমুম খুঁজে-খুঁজে ছেড়া কাপড়ের পাল খাটিয়ে দুই-আনার টিকিটে খেলা দেখানো; এ-ই তাদের পরিণতি। তারপর বে-ওয়ারিশ মাহুঘ হয়ে পথে ঘাটে মরা। এ-ই হলো নিরানন্দের জন্মের কপাল। সার্কাসের মানুষের অনেক সমস্যা। তারা আর ঘরদোরের কাজ করতে পারেনা। ছকবাধা জীবন ভালো লাগেনা। ইট-পাথরের ঘরদোরের হাঁপিয়ে ওঠে। যৌবনের সময়টুকু কাজে রেখে তার পরে কই করে বাতিল করে দিলো বলে সার্কাসের মানুষ ক্ষোভ করেনা। কেননা যারা দর্শক তারা শুধু অল্পবয়সের আর্টিস্ট চায়। তাজা তাজা মুখ দেখতে চায়। সার্কাসের মানুষের পেনশনের বয়স চল্লিশ না হ'তেই আসে।

রিজার্ভ দল বাড়িয়ে মাস্টার দল বাঁধলো। ওদিকে নতুন খেলা কিনলো। রতিলালের কাছ থেকে। খেলা যে নতুন তা নয়। তবে এ সার্কাসে এই প্রথম। মাঝুলী খেলা বলে এতদিন কোঁক করেনি মাস্টার। তিন ছোবার খেলা। লাঠির মাধ্যম বলব্যায়িং। তার সঙ্গে বৌ-বৌ করে ঘুরছে

তিনটে ছোরা। এক ধাক্কা লাগিট। তেঁলে নিয়ে ভরে পড়বে নাহুব। ছোরা তিনটে এসে ছুইদিকের কাঁধ আর নাখা ঘেঁষে পড়বে মাটিতে গেঁথে। নিশ্চিত মৃত্যু নিয়ে খেলা। এবার রতিলালকে নিভেই খবর করে আনালা গোপীনাথ। রতিলালের বাপ উৎসব, আর দাদা গোপাল, দুজনেই মরেছে এই খেলায়। তার মেজদাদার ডান চোখটা শেষ হয়ে গিয়েছে। ভয় ছিলো রতিলালের। তাই পালিয়ে গিয়েছিলো অস্ত্র ছোট দলে। বোতল নাচাতো, রুমালের ন্যায়িক করতো। তার ওপর টাঁক ছিলো নাস্টারের। কথাবার্তা করে এরিনাতে এলো রতিলাল। বালি বিছিয়ে গুলু করলো প্র্যাক্টিস কাঠের ছোরা নিয়ে। ছুড়িয়ে দিতে গিয়ে হারান বললো,

—রতিনা, এসে পড়লে শেষ অবধি ?

—চূপ যা হারান।

টেটে টিপে মুখ সিঁটকে প্র্যাক্টিস করে রতিলাল। আসলে তাকে পেয়ে বসেছে মৃত্যুভয়। বাপ-দাদার কথা সে তুলতে পারেনি কোনদিন। প্র্যাক্টিসের ছোরা কাঠের। তবু কাঠের ছোরাই রতিলালের চোখে ধারালো। ইম্পাতের মতো কলকাজে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে গোপীনাথ কেঁঠাবাবুকে বললো,

—রতিলালের কল্জে-টা ভয়ে কমজোরা হয়ে গিয়েছে রে! ওকে ছুঁ বন্দোবস্ত করে দিস বিকল থেকে।

—হ্যাঃ— বঁলে ভাঙ্ছিলো আনালা কেঁঠাবাবু। বললো,—ও ভিরকাল ঐরকম। এত ভয়, তো এল কেন ?

হাসতে লাগলো গোপীনাথ। বললো,—সেধে এসেছে, তাই না যে কেঁঠা? সাধুবানের দল থেকে মেয়ে ভাগিয়ে বিয়ে করেছিলো। ছুটো বাচ্চা হয়েছে। তাদের রেখেছে দাদা' ইংলিশবাগানে। পেট চলেনা। টাকার বজ্র দরকার। আমিও তাকে ছিলাম। কব্জা করিছি।

—সীতু! মাছুষকে নামালি গোপী? ভালো করলিনা। যদি এমন তেমন হয় ?

—একমাসের মধ্যে নানাবনা। দেখিস তদিনে ভয় ভাঙবে। আর ওকে দিয়ে আমি ভাগার-ধু। করাব। শিউলী নেয়েটা ডাঁটো আছে।

—ধুস! পচা খেলা। বোর্ডে মেয়ে পাড়ালো আর চোখ বেঁধে ছোরা ছুড়লো। এ খেলা তো হরদম দেখে নাহুব।

—তবু মোটা খেলা ক'টা রাখতে হয়। জানলি রে কেঁঠা? চাষাভূবার ধানের টাক। যদি তুলতে চাও, তো মোটা নব্ব ক'টা চাই।

—জা বটে।

—মরণ-স্রোতের জন্তে নতুন মাছুষ জাখ-তুই কেঁঠা। ও লালবাবু আর বৌদ্বিদিন নয়। যে মদ ধরেছে।

—ওতেই তো মরবে।

—সেবার আলবেট সায়েবের কি হলো মনে নেই ?

—আলবেট-ই তো লালবাবুর গুলু কিনা! হাতে ক'রে সব শিখিয়ে গিয়েছে। এত রোজগার করেছে একসময় আলবেট, অথচ মরলো জাখোখে চ্যারিটি-ওয়ার্ডে।

—লালবাবুকেও হুতে ধরেছে। সাইকেল হাভহাড়া করতে-না-করতে বোতল চাই। হাত কাঁপে, মুখচোখ ফুলেছে—এবার এককি একটা অ্যান্ড্রিডেট করে না বসে!

শিস দিতে লাগলো কেঁঠাবাবু। বললো,—কোহিনুর-কোম্পানির রবার্ট ছোকরাকে ডাকলেই আসে।

—বাডালী ছেলে জাখ ?

—হবে খ'নি।

গোপীনাথের বালো তার গুলু তাকে বা বা শিখিয়েছিলেন তার একটি অহুশাসনও সে মানতে পারেনি জীবনে। শুধু বদশ-প্রীতিটা সে ভালেনি। তার গুলু পোঁঠমাষ্টার আর অনন্তবাবু সকালে

যোগাসন প্রাণায়াম শেষ করি কাঁচা দুধ খেতেন। তাঁদের যা কথাবার্তা হতো সেই সময়ে। মাস্টার বলতেন,—সব জায়গা থেকে ধাক্কা খেতে খেতে আজ বাঙালীর এমন অবস্থা হয়েছে। বাঙালীও নিজের দেশের মানুষকে ঠাই দিতে চায় না। তাইতো এত লক্ষ্মীছাড়া হাল বাঙালীর!

অনন্তবাবুর রক্ত গরম। তাই তর্কের কথা তুলতো। বলতো,—দেশ নানে কি শুধু বাংলাদেশ?

গোর্টমাস্টার অল্প অল্প হাসতেন। বলতেন,

—আগে ঘরের মা-কে ভালোবাসবি, নিজের পেটে যে ঠাই দিয়েছে তাকে ভালোবাসবি। তবে না বাইরের দিকে তাকাবি? তাদের শুধু কথাই কায়দা!

সেই মানুষের মহৎ আদর্শবাদের কিছুটা অহু-শাসন আজও গোপীর মনে কাজ করে। পাকানো-চোরা বোতলের গোলাম লালবাবুর নামে লাল কালির ঢারা পড়লো বটে, তবে আরো কোনো অন্ধনা অচেনা বাঙালীছেলের অয়ের দিশা হলো। আর একজনের ভাগ্য ফিরলো।

কেঁটাবাবু খলিফার উবুতে চলতে চলতে ঘাখে স্কুলবাবু, সাখো আর মাসী শুনছে। লালবাবু হারমোনিয়ম বাজাচ্ছে। তার মনে হলো এই মানুষটার সম্পর্কেই আলোচনা করছিলো সে গোপীর সঙ্গে। লালবাবু জানেওনা যে তার দিন ফুরিয়ে এলো এই সার্কাসে। মনে হলো মানুষের কপাল নিয়ে খেলে গোপীনাথ। গোপীনাথ মহাশক্তিমান, ঘেন ভগবান।

—বেহাগ বাজাজি কেঁটাবাবু, শুনে যাও।—
ঠেঁচিয়ে ডাকলো লালবাবু।

মাথা নাড়লো কেঁটাবাবু। বেহাগ বাজানো বেরিয়ে যাবে তোমার। এখন যত পারো বাজিয়ে নাও।

গোপীনাথের সার্কাসে ওদিকে বাঘের খেলা বড় জমে উঠলো। ব্যাণ্ডমাস্টার সেইসময়ই বিলিভী

বাজনা বাজায় কন্ঠনিয়ে। সকালে ছাওবিল বিলি হয় জোতদারের নোবের গাড়ী চড়ে। সন্কেবেলা ফসলের টাক। টাঁকে নিয়ে সার্কাসের মুকিবরা এসে পড়ে। বো-ছেলেমেয়ে নিয়ে গরুর গাড়ী চড়ে চলে আসে। তাঁবুর মাননে গোলমিঞার জমিতে ষটগাছের তলায় কাঠ ছোলে রান্না চড়ায়। আউসের চাষ দিতে ক'মাস যে কষ্ট গিয়েছে চাবীর। এখন হাত খুলে খরচ করতে বেশ লাগে। নিরাপদ, নিদারুণ, উদ্ভব, ওক্সিসি, বসির সেখ-রা গল্পহাট জায়গার শুদ্ধ উচ্চারণ টেনে জোরে জোরে বলে,

—জ্বেলপি, অসগোলা খায়্যা যা যতো পারিস। আজ কাল হু'দিনে চার টিপ খেলা জাখ। হ্যাঁ, খরো কস্তে পেছপাও হবনা।

সারান্নি বাঘ দেখতে চেষ্টা করে তারা আর সারান্নিই তাড়া খায়। সন্কেবেলা আট আনার টিকিট কিনে দর্পভরে ঢুক পড়ে। দরওয়ানকে বলে,—এখন আর ইকিরে দিতে পারবা না। টিকিট কাটা চুকছি, হ্যাঁ।

বাঘের খেলা শুরু হবার আগে আল্গা নাক আর ঢোলা মালায়ার পরে স্কুলবাবু বোতল নাচায় আর চাঁচাম,

—বারোবছরের ছেলের ঘাড়ে আশীবছরের মাথা! কখনো সম্ভব হয়? সোনার পাথরবাটি! কখনো সম্ভব হয়? দেখে যান! দেখে যান!

সাখো-জাখো আব'হালা-মরজিনা সেজে নাচ-গান করতে করতে ঢোকে—“আয় বিবি তুই বেগম হবি খোয়াব দেখেছি!”...

তারপর ব্যাণ্ড কিরকম রুদ্দবাস উত্তেজনার সৃষ্টি করে। বাজনার লজ শুনেই দর্শকের বুক কেমন-কেমন করে। মেয়েপুরুষ বিফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। মা গো, না জানি কি হবে! ড্রাম বাজে। কোনো বোকা খ্রীলোক হু'পিয়ে ওঠে,

—তখনই জানি গো, সর্বনাশা কাও হবে! আমার যে বুক পাথর পিটতে লেগেছে, বল তার কি নির্ভরসা করি।

—চুপ যা, চুপ যা ! চারিপাল থেকে প্রতিবাদ ওঠে।

গড়গড় করে সার সার খাঁচা ঢোকে। আগে আগে বাঘছাল-ছাপা ছোট ভাঙিয়া প'রে ঢোকে মনোহর। তার হাত ধ'রে জরির মাটো জামা প'রে আসে প্রেমতারা। সকলকে ঘুরে ঘুরে অভিবাদন করে। সঙ্গে সঙ্গে ঢোকে ভদ্রী—বুড়ো হাতী। হাতী পা মুড়ে বসে। শব্বরের খাঁচার দরজা খুলে যায়। প্রেমতারা হাঁকে,—শব্বর! আপ, আপ! লাফিয়ে হাতীর পিঠে ওঠে শব্বর। মনোহর টুল ধরে। তাতে পা দিয়ে শব্বরের পিঠে ওঠে প্রেমতারা। হাতী এরিমা ঘোরে। তারপর মনোহরের হাত ধ'রে শব্বর ভদ্রীতে নেমে পড়ে প্রেমতারা।

দুই সিংহী এক সিংহ নিলে পিরামিড করে। পিঠে ওঠে প্রেমতারা। ক্রমাল উড়িয়ে হাসে। নামতে-না-নামতে শব্বর আবার ওঠে প্রেমতারার ঘাড়। ধনক দিতেই পারে মুখ ঘষে শুয়ে পড়ে।

তারপরে বড় খাঁচাটার দরজা খুলে যায়। রাজকীয় ভদ্রীতে নামে বাদশা। এদিকে এদিকে চেয়ে গর্জন করে। গমগম ক'রে ওঠে ডাবুটা। ব্যাঙের শব্দ চাপা পড়ে যায়। বাঘের খেলার সময়ে মনোহরের হাতে এরিমা। তার নির্দেশে বাঘ হার্ডল পেরিয়ে লাফায়। চেয়ারে বসে, ছাগলকে পিঠে নেয়। প্রেমতারার পিঠে দাঁড়ায়। এ সব মানুষী নথর। তার পরে আসে আঙনের রিং। একটার পর একটা আঙনের রিং লাফায় বাদশা। রক্তধ্বাস জনতা নিশ্বাস ফেলে। ব্যাঙ বাজো নতুন শব্দে। আনন্দে বাদশা ডেকে ডেকে ওঠে আর এরিমা ঘুরে আসে মনোহরে সঙ্গে। তারপর সবচেয়ে রোমহর্ষক খেলা। বাঘের মুখে মাথা দেয় প্রেমতারা। বৌবাঁধা ছোট্ট শব্বর মাথাটি বাদশার মুখে যখন ঢুকতে থাকে, ডাবু থেকে এতটুকু শব্দ শোনা যায়না। মনোহরের বুক কাঁপে, গলায় ভালু শুকিয়ে ওঠে—যদি কোনো একটা

দুর্ঘটনা ঘটে? এক সেকেন্ড-ও নয়। আবার মাথাটা বের করে আনে প্রেমতারা। এরিমাটা বিরে প্রজাপতির মতোই হাসক। নৃত্যক্ষেত্রে অভিবাদন করে। মানুষ হাততালি দেয়।

হুসনর পড়েছে গোপীনাথের সার্কাসের। তাই টাকা এলো বানের মুখে তলের মতো। শনি-রবিতে দুটো ক'রে শো হলো। ভালুক, উট আর ঘোড়ার মানুষী নথরকে কানা করে দিলো মনোহরের বাঘ-সিংহের খেলা। এবার অনেক কিছুই ঘটলো যা জ্বিনী সার্কাসের মানুষ আগে কখনো দেখেনি। বোনাস দেবার নিয়ম নেই। তবু গোপীনাথ সকলকে একমাসের মাইনে উপগ্রি দিলো। লালবাবুর চাকরি যে-কোনদিন চলে যাবে। তবু লালবাবুকেও বক্ষিত করলোনা। দুটির অল্প দরবার ক'রে ক'রে একসময় হযরান হয়েছে বুড়ো শুল্কবাবু। কি মনে ক'রে তাকেও ছুটি দিলো গোপীনাথ। একসঙ্গে দুইমাসের ছুটি। অর্থাৎ হ'য়ে চেয়ে রইলো শুল্কবাবু। বললো,

—মাস্টার, ছাড়িয়ে দিচ্ছ না তো?

—না না।

অনেকদিন হেসে অভ্যাস নেই। তাই হাসবার চেষ্টা করতে গিয়ে শুল্কবাবুর মুখখানা এমন আশ্চর্য দেখালো বেকচুরে যে, তাকাতো পারলোনা গোপীনাথ। সাই-সাই গলায় কথা কইতে গিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরুল কষ্টে। শুল্কবাবু বললো,

—তাহ'লে আজই চলে যাই কি বেলো? হাসপাতালে দেখিয়ে ওষুধপত্র খাই, ক'টা দিন শুয়ে বসে থাকি, ভালো হ'য়ে ঘাব খ'ন।

সব বৈধেই দিয়ে মনোহর সঙ্গে স্টেশনে পেল। নর্থ-বেঙ্গল এক্সপ্রেস-এর পার্ড্রাসে সতরফি পেতে বসলো শুল্কবাবু। বললো,

—ঘরে যদি ভিত্তিতে দেয়, তো রইব। নয়, ধ'রে ক'রে হাসপাতালে ঘাব, কি বলিস মনোহর?

—যা ভালো হয় করবে সুকুলদা। ফিরে এসে তাড়াতাড়ি।

—নিশ্চয়। আসবার সময় গোলমালে কইতে পারলনা মাস্টার, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, না এলে পরে অনুবিধে পড়ে যাবে গোপী। সব নথর-গুলোতেই ঠেকা দিতে হয় তো? তোরা কি বুঝি কত দায়ির আমার?

নিজেই নিজের ওপর মূল্য আরোপ করে মনোহরের কাছ থেকে ভরসা চায় সুকুলবাবু। গোপীর যদি তাকে দরকার না থাকে, তো সুকুলবাবুর জীবনের মানোটা একনিমিষে ফুরিয়ে যাবে। আবার বললো,

—সার্কাস ছেড়ে থাকতে ভালো লাগেনা রে, মনোহর! রোজগার করি, তাতেই ব'লে ঘরের মাথুঘের মন পাওয়া যায় না।

—রোজগার বন্ধ হ'লে মোটে পুঁছবেনা বলে? বসে গেলে তো ভারী মুশকিল তোমার সুকুলদা?

—বসবো কেন?—খাঁক করে উঠলো সুকুলবাবু। বললো,—এতবড় কথাটা তুই বললি মনোহর?

নিজের বনের নিরন্তর আতঙ্কের কথাটা বলে কেলেছে মনোহর। তাই সুকুলবাবুর চোখে ভয়। মনোহর অনেকদূর বোকে। মমতায় বলে,

—মুখা সোঁয়ার, কি বলতে কি বলিছি, কিছু মনে নিওনা সুকুলদা। কুর্ভিমনে চলে যাও। সেরে সুরে কাঁ করে চলে এসো।

ট্রেন চলতে শুরু করে। মনোহর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে। বলে,

—তুমি চলে এলে বোতলের নথরটা শিখবো, সুকুলদা।

সুকুলবাবুর কথা বোকা যায়না। দুইরঙা আলো মনোহরের মুখে কলকে গার্ডায়েবের গাড়ীটা চলে যায় দূরে।

বড় তাঁবুর বাইরের দড়িদড়ার জটা ধরে দাঁড়িয়ে

গল্প করে প্রেমতারা। রাত না হ'লে সময় হয়না তার। মনোহর বলে,

—রোজ যেনন বাদশার মুখে তুমি মাথা দাও, আনার কেমন যেন ভয় করে, প্রেমতারা।

—আনার ভয় করে না।

—কেন?

—তুমি রয়েছ না?

প্রেমতারার কৌকড়া চুলের ওপর আন্তে আঙুল বোলায় মনোহর। গা যেন শিরশির করে। এই শরতের শিশির লাগলে যেমন হিম-হিম কাঁপুনি, তেমন নয়। কেনন-যেন রক্ত চনমন করে। বলে,

—এমনিধারা লুকাচুরি করে আমার ভালো লাগেনা, প্রেমতারা।

—তবে?

সাদা দাঁত একটু মিলিক দেয়। নিশেষে হাসছে প্রেমতারা। মনোহর একটু নিচু হয়। বলে,

—দাঁড়াওনা, এমনি তো আর চিরকাল রইবনা। ব্যবস্থা করবোই।

—কি ব্যবস্থা?

আরো হাসছে প্রেমতারা। মনোহর বলে,

—কেইবাবুকে ব'লে কামিলি-তাঁবু নোব। বিয়ে বসবো আমরা।

—দূর!

ঠাট্টা করে বলে মনোহর। প্রেমতারাও ঠাট্টা করেই জবাব দিতে চায়। কিন্তু গলাটা তার কেমন কঁপে যায়। মনোহরের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে তার শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। দড়িদড়ার কঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যেতে চায় প্রেমতারা। একমুহূর্তে তার পথ আটকে দাঁড়ায় মনোহর। বলে,

—কেন, বিলম্ব পারে আর আমি পারিনা?

যাবার পথ নেই। দুজনে দুজনের খুবই কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। সাবান-ঘষা কক্ষচুল উড়ে মনোহরের মুখে পড়ছে। শরতের হিমও ঘামছে মনোহর। মনোহরের এত কাছে দাঁড়িয়ে খুব-ই অসহায় বোধ করছে প্রেমতারা।

—প্রেমভারা !

এত কাছে দাঁড়িয়েও নিজেকে শাসন করলো প্রেমভারা। মুখ তুলে বললো,

—মনোহর, লুকোচুরি কে করতে চায় ? তবে এখন যদি নিজ-খ্যাতে করে বসো কিছু, তাতে ক'রে মাস্টার কিন্তু সহিবেনা।

—কি করবে মাস্টার ?

ছেলেবাহুরের মতো সাহস মনোহরের গলায়। প্রেমভারা বলে,—যেদিন কিছু করবো, সেদিন আর কাককে ভয় করবোনা। জানিয়ে শুনিয়ে। ধর্মব্রত। আজ-ই কি দিন বয়ে যাবে তোমার ?

অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানের কথা শুনিয়ে দিয়ে পা কেল চলে প্রেমভারা। বলে,

—তুনি এমন কথা বলো যে, ভরে আমার যেন দিশা টলে যায়, মনোহর।

—ভয় ! কেন, ভরসা পাওনা ?

দড়ির জাল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় প্রেমভারা। চোখ টান-টান ক'রে দেখে। চুর্বোবা রহস্তে চিকচিক করে চোখ। ঠোঁটের হাসি যেন খাপে-ঢাকা ছুরির রূপালী আভাসসুঁই। বলে,

—আমার ভরসার মানুষ হ'তে সাধ হয়েছে ? খুব যে !

—কেন বৃকে পাটা নেই ?

—আছে ?

আন্তরিক আবেগের মুখে মনোহর স্থানকাল ভুলে যায়। প্রেমভারার কাঁধে হাত রেখে বলে,

—তোর মুখ দেখলে আমি বৃকে অনেক ভরসা পাই, কোনো ভয় থাকেনা প্রেমভারা, তুই বিশ্বাস বা ! আমার বুকখানা, বল-তো চিরে কেঁড়ে দেখাই। যেদিন থেকে তোকে চোকে দেখিছি !

পুরুষের এক-ই রূপ দেখেছে প্রেমভারা। তার। মনের কারবারেও চূড়ান্ত হিসেবী। দিতে চায়না। খালি নিতে জানে। এতদিনে অস্ত্র কথা শোনে প্রেমভারা। এই কথাই পুরুষের মুখে শুনে

চেয়েছিল সে। আজ সেই কথাই শোনে। শুনে যেন বিশ্বাস হয়না। মনোহরের মুখে হাত টাপা দেয়। বলে,

—চুপ, মনোহর ! চুপ যা !

সে-হাত আর নামাতে দেয়না মনোহর। কাছে টেনে নিজের ঘামে ভেজা বৃকের কাছে প্রেমভারার মুখখানা ধ'রে বলে,

—করবোনা চুপ ! তোর শাসন আমি মানি না।

হুজনের গলাই নিচু। কথার চেয়ে বৃকের খড়াসু-খড়াসু শব্দ যেন শোনা যায় বেশী।

প্রেমভারা একটু একটু কাঁদে। নিজের চোখের জলের লোণা খাদ জিতে লাগলে আবার অবাক-ও হয়। ভাঙা গলায় কিসকিস ক'রে বলে,

—আমায় ছেড়ে দে মনোহর ! তোর ছুটি পায়ের ধরি। তোর পায়ের তলায় থাকবো, ছেড়ে দে।

—মাথায় করে রাখব।

—ছেড়ে দে !

তার দুই হাতের মধ্যে প্রেমভারা। এ কি কম আশ্চর্যের কথা ! কেমন যেন ক্ষেপে ওঠে মনোহর। ভয় পায় প্রেমভারা। কান্নাভরা ভাঙাগলায় বলে,

—কলঙ্ক দিয়ে তাড়িয়ে দেবে আমাকে—সকালে মুখ দেখাতে পারবনা। তুই আমার এমন লস্কর ?

ছেড়ে দে মনোহর। নিজেকে সামলাতে একটু টলে যায় প্রেমভারা। ঝাঁচল লুটোর মাটিতে। খাঁচার ভেতরে থেকে বে-ছুর্তে পিঙ্গল কপিশ চোখের বুঝাবার কথা, তারা জলে উঠলো হিংসের। মনোহর আর প্রেমভারার মন স্পর্শ করলো বাদশাকে। প্রেমভারার সারিঘাটাকে হিংসে করে অস্থির বাদশা গর্জন করে উঠলো। চম্কে উঠলো প্রেমভারা।

আবশ্যকের সেই ডাকে ঘুম ভেঙে যায় তাঁবুর মানুষদের। বাদশা বার বার ডাকে। পেটটা টেনে নিয়ে আবার ঘুম ছেড়ে দেয়। গর্জে-গর্জে ডাকে।

[কথন :]

মধ্যযুগের বিদ্যাজ্জিহ্ব ভলটেরার

ঐত্বেপন্থনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন গ্রীসের সোফোক্লিস-রচনা-লেখক ইউরিপিডিসের স্মৃতির পর কিলেমন বলেছিলেন, “আমি যদি নিশ্চিত জানতাম যে কৃত্রিমের ও চেতনা আছে তাহ’লে আমি আশ্চর্য্যতা করে ইউরিপিডিসের সাথে দেখা করতাম।” কিলেমন যদি মধ্যযুগ পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন তাহ’লে তিনি ভলটেরারের মতো ইউরিপিডিসকে দেখতে পেতেন। তিনি বর্তমান যুগ পর্যন্ত বেঁচে থাকলে বার্নার্ড শ-এর মতো ইউরিপিডিস ও ভলটেরার উভয়কেই দেখতে পেতেন।

ভলটেরারের আদল নাম ছিল ক্রালিগ-মারি-অকটেট। তিনি ভলটেরারের চিত্রনাম নিয়ে সাহিত্য-চর্চা করতে আরম্ভ করেন এবং পরে এই নামেই অগ্নিবিশ্যাস্ত হন। ভলটেরার ১৬২৭ সালের ২১শে নভেম্বর অগ্নিগ্রহণ করেন প্যারিসের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। তাঁর বয়স সাত বছর বয়স তখন তাঁর মা বাবা বান। তাঁর বাবা ছিলেন আদালতের একজন সাহায্য দলিল-লেখক। তিনি কয়েকটো তাঁর ছেলেকে প্যারিসের এক মেসেইট ফুলে পড়ান। এখানে ভলটেরার ১৭১১ সাল পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু তিনি সর্বদাই প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির নিন্দা করতই অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর বাবার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তাঁর ছেলে আইন পড়ে আদালতের বড় উকিল হব। ভলটেরার আইন পড়লেন বটে, কিন্তু আইন-ব্যবসা পছন্দ করলেন না। তাঁর বাবা মনে করলেন ছেলেটা গোলায় বাবার পথে পা বাড়িয়েছে। ভলটেরার বেছে নিলেন সাহিত্য-চর্চাকে নিজের জীবনের ব্রত হিসাবে। তাঁর বাবা মনে করলেন সাহিত্য-চর্চা একটা পেপাই হ’তে পারে না। তাই ১৭১১ সালের আগস্ট মাসে এ নিয়ে পিতাপুত্রের যোঝাঝড় বিরোধ বাধল।

ভলটেরার ঈশাই প্যারিসের মজিদজীবীরের সাথে পরিচয় করে নিলেন এবং কয়েকটি রস-রচনা ও কবিতা লিখে কেলসেন। তাতে তাঁর বেশ কিছু খ্যাতি হ’লো; অখ্যাতিও কিছু কম হ’লো না, কারণ ফ্রান্সের তখনকার শাসনকর্তার বিরুদ্ধে সোফোক্লিস রচনা লিখে ওকে ব্যাটাইলো ছ’মাস কারা-গরাদে ভোগ করতে হয়েছিল। কার্যমুক্তির পর তাঁর প্রথম বিয়োগাশ নাটক ওডীপ (Oedipe) বেলে। নাটকটি শাসনোন্নয়ন সাধে প্যারিসের রক্তকক অভিনীত হ’লো ১৭১৮ সালে।

১৭২২ সালে ভলটেরার গুপ্ত স্বাভাবিক কালে নানা স্বানে শ্রবণ করতে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁকে ক্রেনেলন বেতে হ’য়েছিল এবং সেখান থেকে বান ফেগে। এই শ্রবণের মতো তিনি ‘লা হেনরিবেত’ নামে একখানি স্বাভাবিক নথ্যাকথা লিখতে আরম্ভ করেন। সেখানি বন ১৭২৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হ’লো তখন তাঁর খ্যাতি দেখতে দেখতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তখনকার মনীষীরা একবাক্যে নীকার করলেন ভলটেরার প্রতিভা হোমান ও ডার্বিলের সমকক্ষ।

১৭২৬ সালের শেষভাগে একটি শোচনীয় ঘটনাও তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায়ের পরিণামান্তি ঘটলো। রোহান নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাঁকে অশ্রমাস্ত্রক কথা বলায় ভলটেরার তাঁর স্বভাববিশিষ্ট তীক্ষ্ণভাষায় ত্যার তবাব দেন। তাতে রোহান বান চটে। কিছুদিন পরে ভলটেরার বন একজন সন্ত্রাস্ত ভলসোকের সাথে একত্রে মধ্যাহ্নভোজন করছিলেন তখন রোহানের অচ্যুতেরা তাঁকে বাইরে থেকে এনে বোমাঘাতে অধ্বস্তিত করতে লাগল। কেউই ভলটেরারের পক্ষ অবলম্বন করতে এদিকে এলো না। রোহান শুধু ঠাণ্ডিবে দেখতে লাগলেন। এর তিন মাস পরে ভলটেরার রোহানকে হত্যা করে আত্মীয় করলেন। হত্যা হবার নির্দিষ্ট তিন সপ্তাহ-বেলা ভলটেরারকে গ্রেপ্তার করা হ’লো।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ভলটেরারের প্রতিভাকে কিছুতেই সঙ্ক করতে পারলেন না। ফলে তাঁকে পুনরায় মেলে বেতে হ’লো। তিনি বিজ্ঞানবাদের মত ব্যাটাইলো নিঃসারিত হ’লেন। কার্যমুক্তির পর ভলটেরার আর ফ্রান্সে থাক। নিরাপদ মনে করলেন না। রাষ্ট্র ও ধর্মক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আশোবহীন সংগ্রাম চালাবার পক্ষে ইংলণ্ডকে বেছে নিলেন তাঁর উপস্থিত খ্যাতি ভলে। তাঁরই অগ্ররোমে ফ্রান্সের কর্তৃপক্ষ তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন ইংলণ্ডে। সেখানে তিনি ১৭২৬ থেকে ১৭২৯ সাল পর্যন্ত তিনবছর ছিলেন। এই সময় তিনি লিখিলেন ‘দার্শনিক চিঠি’ (Philosophic Letters)। কন্যারী সরকার ফ্রান্সে তাঁর প্রচার নিষিদ্ধ করে দিলেন।

ঈর্ষ তিনবছর কাল ইংলণ্ডে অবস্থান ভলটেরারের ভবিষ্যৎ জীবনের উপর সত্যীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রথমতঃ, অশ্রমাস্ত্রক ও হস্তশ্রমক প্রচারের কথা লোকের কুলে বেতে

একজন পুস্তক-প্রকাশকের হাতে পড়ে। তিনি লেখাটি *The Diatriba of Dr. Akasia* নামে পুস্তকাকারে ছেপে হালাওে বের করলেন। পাঠকসমাজ বইখানি পড়ে খুব হুধ্যাতি করতে লাগল। এতে মহাপুণ্ডরিক ইন্স পেলেন আরো চটে। তিনি রাজসদস্যবরে ভীষণভাবে ভগবতগীতার বিরুদ্ধে গড়ঘর করতে লাগলেন। তিনি ক্রমাগত রাজ্যের মনকে বিভ্রান্ত করে তুলে ভগবতগীতারক অতীত করে তুললেন।

১৭৪৩ সালের মার্চ মাসে ভগবতগীতার প্রসিদ্ধার রাজসদস্যবরে ভাগ করতে বাধ্য হলেন। তিনি তাঁর ভাইকি শ্রীমতী তেনিসের সাথে ক্রানফোর্টে কিছুকালের জন্য বাস করতে লাগলেন। কিন্তু সেখানেও ক্ষেত্রবিরেকের নরহতা তাঁদের অগ্রসরণ করলো। তিনি তাঁদের গ্রেপ্তার করিয়ে এনে তাঁদের উপর অশাস্ত্রবিক অভ্যাসচার করলেন। ক্ষেত্রবিরেকের সৈন্যেরা শ্রীমতী তেনিসকে নিয়ে সীমানা পার করে দিল। ভগবতগীতার ১৭৪৩ সালের ৭ই জুলাই ক্রানফোর্ট ত্যাগ করে অসহিষ্ণুভাবে বেরিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেখান থেকে তিনি ১৭৪৩ সালের ২৫ই জুলাই শ্রীমতী তেনিসকে দিখলেন :

“তিনি-চারবছর পার হ’য়ে গেল, কিন্তু আমার চোখে কেউ একটোটা জল বেধতে পারনি। মনে মনে আমার একটা গর্ভ ছিল যে, আমার চোখ তিরকালের জন্য রুদ্ধ হ’য়ে থাকার পূর্বে এ দুর্বলতা কখনই দেখাবে না। কাল কাউন্ট কি কাউন্টারের সেক্রেটারি লক্ষ্য করলো আমার চোখ জলে ভ’রে গেছে। বর্তমান আমার ও তোমার অসহন্যিতি আমাকে বরণা দিচ্ছিল। তোমার দুর্দশার নিষ্ঠুর ভীষণতা ভীতিশূন্য হয়ে উঠেছিল যখন তুমি ছিলে কাছে। তোমার বৈধ, তোমার সাহস আমার মনে বল এনে দিয়েছিল। কিন্তু তোমার চলে যাওয়ার পরে আমি অবলম্বনশূন্য হ’য়ে পড়লাম। সময় সময় আমার মনে হতে লাগল এ যদি একটা স্বপ্ন, যেন এসব ঘটছে সিরাজুদের ভাইয়েনিসিয়ারের রাজকালে।

“আমি মনে মনে ভাবি এ কি কখনো হাত হ’তে পারে ? প্যারিসের একজন ডক্সবিলো রাজ্যের ছাড়পত্র নিয়ে এসেছেন বোকাতে, বৈদগ্ধ্যা তাঁকে ধরে ক্রানফোর্টের প্রকান্ত রাজসদস্যবরে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে চকলো, কোনোরকম বিচার না করেই তাঁকে খুঁজে দিল মেলে! কোনো দাসী বা পরিচালিকার সাহায্য তাঁকে দেওয়া হ’লো না। শুধু চারজন সঙ্গীদবায়ী সৈন্ত তাঁর দরবার পাহারা বিত্তে লাগলো। শেষ পর্যন্ত কিনা তাৎপরি স্বর্যের একজন নরপত্নর সাথে তাঁকে রানিবাশন করতে বাধ্য করা হ’লো।

যখন লা ত্রিন ভিসিয়ারকে কারাকন্দ করা হয় তখন তো তাঁকে স্বাতন্ত্র্যের সাথে একাধী থাকতে দেওয়া হয়নি! এ বর্ষের অশিষ্টতার তুলনা মেলে না ?

“কি তোমার অপরাধ ? শত গুণে মাইল দৌড়ে তুমি তোমার শিষ্টত্বশূন্য মনুষ্য স্বাকাককে দেখতে এসেছিলে। এটা নিশ্চয়ই প্রশিয়ার রাজ্যের পক্ষে কলঙ্কের কথা যে তাঁরই নামে তাঁরই একজন মন্ত্রী দ্বারা অশ্লীলিত এতবড় অনাচারের এমনও কতিপূর্ণ দেওয়া হয়নি।

“অতিরিক্ত দুঃখ আমাকে ভাঙা দিয়েছিল। আমাকে গ্রেপ্তার করা হ’লো সেই কবিতার বইখানি আশ্রয় করবার জন্য, যেখানি রাজা আমাকে বিশেষ অগ্রহ সহিয়ে উপহার দিয়েছিলেন। সে পুস্তকখানি হুড়নার আমারও কিছু হাত ছিল। সেটা তিনি আমাকে পুস্তকায় নিয়েছিলেন রাজ্য-অগ্রহের নির্ধনবরণ। এটা যে তিনি ফিরিয়ে নিতে চান তা আমাকে জানালেই বশেষ হ’তো। এর অন্তে জনশ্রুতি উত্তম শিশালার্ত একজন কৃষ্ণক গ্রেপ্তার করার কোনো কারণই ছিল না। তাঁর হাতের দরদ থাকতে পারে যে দীর্ঘ বোল বংসর বাবৎ আমাকে অগ্রহ সহিয়ে তিনি আমার বিশ্বাস ভঙ্গিয়েছেন যে, আমি তাঁর প্রিয়শাস্য। বৃদ্ধ-বয়সে তিনি আমাকে বসন্তচ্যুত করেছেন,—দুই বংসর ধরে আমি বিশ্বভ্রমেরে তাঁর সেবা করেছি, তাঁর প্রতিভাকে উজ্জ্বল করে তোলাবার জন্য সাহায্য করেছি, কখনই কষ্টবা-চ্যুত হই নাই; ওথাপি তিনি একটা তুচ্ছ সাহিত্যিক বিভর্জমূলক বিষয়কে অবলম্বন করে সৈন্ত পাঠিয়ে দিলেন তাঁর কবিতার বইখানি আশ্রয় করবার জন্যে। আশা করি তিনি শ্রীমতী তাঁর কুল বৃত্তে পারবেন, বৃত্তে পারবেন আমার নর তাঁকে প্রভাবিত করেছে। গ্রহকার বা হাতের পক্ষে আমার শেষদীনের দিনগুলি বিভ্রান্ত করে তোলা উচিত হয়নি। আর তিনি কোথায় উৎস হ’য়েছেন, কিন্তু পরে হরত তাঁর বুদ্ধি অগ্রহ হ’তে পারে। কিন্তু তখন তাঁর তোমার উপর অশ্লীলিত এই শাসনিক অভ্যাসের প্রায়শ্চিত্ত কি থাকবে ? তাঁর সৈন্তসম বহুবাচিত আচরণের প্রত্যবহতা নিশ্চয়ই একদিন বেধ-সেনাপতি নিশ্চিহ্ন করে যাবেন।

“তোমার নামে কবেকখানি চিঠি এখানে এসেছে। তার মধ্যে একখানি চিঠি শ্রীমতী কংটনের লেখা। চিঠির স্বয় সন্তোষজনক নয়। তিনি ধরে নিয়েছেন আমি একজন প্রশিয়ার। তিনি যদি মনে করে থাকেন গত ১৬ বংসর ধাবৎ আমি প্রশিয়ার রাজ্যের অপরিমিত অগ্রহ লাভ

করে আসছি তব অভিযোগ লতা। কিন্তু তিনি যদি মনে করে থাকেন সেই কারণে আমি প্রশ্রিয়র প্রভা হয়ে গেছি এবং মুহূর্তের ভয় কবানী নাগরিকের ত্যাগ করেছি তাহ'লে তিনি ভুল করেছেন। প্রশ্রিয়র রাজা এমন কোনো প্রজাব্যবস্থার কাছে করেননি। তিনি শুধু রাজপরিবারের চাষিটি আমার হাতে অর্পণ করেন এবং সাথে সাথে একটি কবিতা লিখে বাধ্য করে যেন যে এই সমান নিত্যপুত্রই আমার। এই দুইটি মানই আমি তাঁকে বিভিন্ন দিনে এসেছি। এই সমান লাভ করবার সময় আমাকে কোনো পণ্য গ্রহণ করতে হয়নি, দায়িত্বভার বহন করতে হয়নি, নাগরিকত্ব পরিবর্তন করতে হয়নি। সমান লাভ করার অর্থ নাগরিকত্ব গ্রহণ নয়।

"...প্রশ্রিয়র রাজা আমার শত্রুর রাজ্য প্রত্যাহারিত হয়ে ও ক্রোধান্ড হয়ে বোধহয় কবানী-রাজকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলেছেন। কিন্তু আমার বিবাস আছে যে, তাঁর রাজপরিবার ও জনদের মহাব একদিন-না-একদিন প্রকাশ পাবেই। সেদিন তিনি কবানী-রাজকে আমার ভাবনের অবশিষ্ট নিমণ্ডলি খাবেন কাটাবার অস্থবতি বিতে নিত্যপুত্রই অঙ্গগোপন করবেন। সেদিন তাঁর মনে হবে তিনি একদিন আমার শত্রু ছিলেন, তাঁর কাছে কিছু প্রত্যাশা না করেও আমার চেয়ে ভালো লিপ্তে তাঁকে আমি শিবিরেছি। সেদিন তিনি তাঁর নিজ শ্রেষ্ঠত্ব সন্তুষ্ট থাকবেন, একজন বিদ্যেক্ষেপীক পিতৃন করতে উত্তম হবেন না,—যে বিদ্যেক্ষে তাঁকে শিকার দিচ্ছে, কখনো প্রভা ও সমান ঘেঁষেছে।

"তাঁর নামে দেশের চিঠি আমার বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি যে তাঁর লেখা তা আমি মনে করি না। একজন সাধারণ ব্যক্তির সাথে এইরকম অশ্লীল আচরণ করার পক্ষে তিনি অনেক উদার। উদার ও শিশুতার রীতি অস্বাভাবী একজন রাজার পক্ষে কি লেখা উচিত তা তিনি ভালোভাবেই জানেন। সত্যতা ও কল্যাণ তাঁর মনস্তত্ব গুণ। সংঘর্ষভাবিত ও বহাভব রাজা চতুর্থ ফেরির এই ভুল ছিল। তিনি হঠকাঠী ও ক্রোধী ছিলেন, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তিনি নিজেবে সন্তুষ্ট করতে পারতেন। ক্রোধ কল্যাণের ক্ষয় তাঁর উপর প্রভুত্ব করত, কিন্তু নানবত্যা ছিল তাঁর জীবনের সাধ।

"মেসের জেনিস, তুমি মনে করো তোমার বৃদ্ধ কাকা অথবা স্মিত পিতা এই কথাগুলি তোমাকে দিচ্ছে। তুমি যদি দুই শরীরে এখানে আসতে পার তবে মনে কতকটা

শান্তি পাবে। তোমার ডাই ও বোনকে আমার ভালবাসা দিচ্ছি। বিদায়! রাজা ও জনসাধারণের অজ্ঞাতে করে তোমার কোলে মাথা রেখে চেঁচা বৃদ্ধের পারব।"

কবানী-ফেরের নাগরিক অধিকার না পেয়ে খেলেন খেলক ও ভলটেয়ারকে বেরিয়ে পড়ত হ'লে। কিন্তু কোথার থাকেন তিনি? ক্রোধ তাঁর পক্ষে নিরাপত্তা স্থান নয়। বিশ্বাসযোগ্য তাঁর রাজ্যের আধাংশ নেই। তিনি একা,—একথায়েই একা! এইভাবে উত্তেজিতভাবে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। অবশেষে তিনি মেনেভার নিকটে কিছুকাল কাটিয়ে ফার্নেতে একখানি ছোটো কুঠার করে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন। এই সময় তিনি তাঁর লেখনীকে প্রাথমিকভাবে পরিচালনা করতে লাগলেন মগতের অভ্যাসের-অভিচারের বিরুদ্ধে, নির্দমনভাবে আখ্যাত করতে লাগলেন রাষ্ট্র ও ধর্মের গোড়ামিকে। এখানে তিনি লিখলেন তাঁর বিখ্যাত রচনাসা 'ক্যান্ডাইড' (Candide)। কিন্তু বছর ফার্নেতে বাস করবার পর একদিন বিজয়গরী তাঁর স্বপ্নভূমি গ্যারিসে প্রবেশ করলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই ১৭৭৮ সালে ৮৪ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

বৃদ্ধবয়সে ভলটেয়ার হয়েছিলেন অধিষ্ঠানপর কথাল মাত্র। তাঁর দীর্ঘ নালিকা ও অত্যাশ্চর্য চক্ষু কপালের উপর চড়িয়ে-পড়া হুলের তিজর দিয়ে উকি বিত। খেলাধুলা বা ব্যায়াম তিনি জীবনে কখনো করেননি। পানাহারেও তিনি ছিলেন খুব সংযমী। দেশের মধ্যে তিনি শুধু কবি পান করতে অভ্যস্ত ছিলেন। নারীর প্রতি আকর্ষণও ছিল তাঁর অন্যতম আধ্যাত্মিক। এক কথায় তিনি ছিলেন মস্তিস্ক-সর্বধ। একবার বয়স্কের প্রতি অস্বাভাবিক ছাড়া অন্য কোনো শিল্পের প্রতি তিনি জীবনে কখনো আগ্রহ দেখাননি। সাহিত্য ও সংলাপ ছিল তাঁর কীকনের একমাত্র উপাত্ত সেবতা। অস্বাভাবিক অবস্থায় তিনি ছিলেন দুঃস্থ বড়োবয়। উপকারী আশ্রিতবয় উপর তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার। সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের দ্বারা প্রদীপিত লোকদের মস্ত তিনি আত্মীয় অজ্ঞাতভাবে সজাই করে গেছেন।

'ক্যান্ডাইড' ভলটেয়ারের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতরসাত্মক উপজ্ঞান। তাঁর বিবরণ্যে হচ্ছে মগতের চিরন্তন ক্ষণস্থায়ী। এই বিবরণ্যকে অবলম্বন করে তিনি যে হাতরসের বস্তু করতেছেন সে-হাসি কথাস্থতরঙ্গ অভ্যাসচারীর পুত্র দ্বারী কলমেরেণা অধিত করে দিচ্ছে। তাঁর মূল মাস্ক ও নালিক সন্তোষ এই কথাস্থতের জালা মর্মে মর্মে অস্বত্ব করেছিলেন কলম

ঊষা ডলটোয়ারকে জীবনে স্বর্ষির নিখাস বেলতে সেননি। রাজশক্তির যথেষ্টাচারের বিকৃত বিশ্রুণ করার হুঁকার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়, কোনো উত্তপনই কর্মচারীকে অগমান করার অপর্যাপ্তে তিনি বৈরতঃও হতিত হন, অকস্মেৎ নিম্নের অমহুনি প্যাবিল থেকে পথই নির্ধারিত হন। স্থান থেকে স্থানান্তরে তিনি ঘুরেছেন কপর্দকপুত্ৰভাবে। তিনি জানতেন হুঃপূর্ণ কি জিনিষ। তিনি বুঝছিলেন এই হুঃই হচ্ছে জগতের সর্বজনীন ও চিরন্তন সত্য। এর হাত থেকে কোনো জীবেরই পরিত্রাণের উপায় নেই। স্মৃতিকর্তা এমনই এক হুঃপূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করেছেন যেখানে প্রত্যেক জীবকেই একমিন-না-একমিন হুঃপানেই বহু হতে হবে।

জগতের প্রাচীন গুণিগণ ও সংসারকে হুঃ-গহন বলে একবাচ্যে স্বীকার করে গেছেন। কামনা-বাসনার দ্বারা আচ্ছিত হুঃে মায়াযুগ জীব পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্মগ্রহণ করে। জন্মগ্রহণ করলেই হুঃখের নিমিত্তে আবদ্ধ হয়ে তাকে নিশ্চেষ্ট হতে হবে এবং পুনঃ পুনঃ জন্মকৃত্যাক্ষণ চক্রে আবর্তিত হতে হবে। কি ভাবে এই হুঃখের নিষ্কৃতি হতে পারে ও কি ভাবে জন্মকৃত্যাক্ষণ হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে, সেই পথ বাহ্যতে দিয়ে ভাবতীর্থ গুণিগণ বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি করেছেন।

ডলটোয়ার গ্রন্থ তুলসেন—“ভগবান যদি মঙ্গলময় ও ও সর্বশক্তিমান, তবে তিনি কি এর চেয়ে ভালো জগৎ সৃষ্টি করতে পারতেন না? যদি পারতেন তাহলে কিলে তাঁকে বাধা মিলে? যদি তাঁর অদ্যাপি ছিল তাহলে কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি মঙ্গলময় ও সর্বশক্তিমান? বাস্তবিক আমাদের কি তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারি? যদি বা পারি, তবুও আবহা কি করে বৃত্তে তিনি আমাদের হুঃপূর্ণশায় উপাধীন নন?”

এই সকল প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে তাঁর মনে জেগেছিল যখন ১৭৮৯ সালের ভূমিকম্পে লিসাব অধিকাংশ ধ্বংস হয়ে গেল ও লিসবনের ৫০ হাজার লোক মারা গেল। নিজের জীবনে হুঃবকটের অভিজ্ঞতা তাঁর মধ্যে হয়েছিল, কিন্তু ব্যাপকভাবে জনসাধারণের এই অস্বাভাবিক হুঃপূর্ণশায় সূত্র তাঁর মনকে বিচলিত করে তুললো। তিনি ‘লিসবনের ধ্বংসের উপর কবিতা’ (Poem on the Disaster of Lisbon) লিখলেন।

এই সময় লিবনিজের দার্শনিক মতবাদ বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। খ্রীষ্টীয় মতবাদকেই লিবনিজ নতুন দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। ভালোমন্ড কেহে নেবার স্বাধীনতা যে জগতে

আমাদের আছে সেখানে মনকে একেবারে নিশ্চিন্তভাবে রাখ দেওয়া চলে না। কারোই সেখানে মন নেই সেখানে ভালোও নেই। আমাদের এই ভালোমন্ড যেখানে জগৎ স্বাধীন জীবপুত্র জগতের চেয়ে চেয়ে ভালো। মানবমনের পরীক্ষা হয় ভালোমন্ড কেহে নেবার স্বাধীনতার মধ্যে, হুঃ-মঙ্গলময় মধ্যে হয় তার পূর্ণতা। খ্রীষ্টীয় মতবাদ ও লিবনিজের দার্শনিক মতবাদ উভয়েই আগাবাসী। উভয় মতবাদই জগতের এমন ব্যাখ্যা দেয় যে আমাদের মনে বহুই আশা জেগে ওঠে। আশা হয় যে, জটী মঙ্গলময় এবং তিনি মঙ্গলময় জগৎই সৃষ্টি করেছেন। যদি আমরা কোনো উপায়ে জগৎসীমার বাইরে চলে যেতে পারতাম তবে বৃত্তে পারতাম এ জগৎ কত মঙ্গলময়।

এই মতবাদের বিকৃত ডলটোয়ারের কোনো স্বপ্ন ছিল না। তিনি চটে গিয়েছিলেন এই মতবাদের অপর্যাপ্তের উপর। লিবনিজের শিল্পী তাঁর মতবাদকে চেহেতুরে এক নিকট ধরনের মতবাদ খাড়া করেছিল। তামা লিসবনের হুঃপূর্ণগ্রন্থ লোকমুখে ব্যাক্তি—“ভগবান মঙ্গলের জগৎই এই ভূমিকম্পে পাঠিয়েছেন। যুগ লোকমুখের উত্তরাধিকারীরা এখন প্রচুর ঐশ্বর্যে অধঃপন্ন হয়ে, রাজনিষ্ঠার নৃতন পথ পড়বার ক্ষমতা লাভমান হয়ে, বস্ত্রপত্ৰা ধ্বংসপূর্ণ থেকে বৃত্তময় খের মোটা হয়ে; এই হচ্ছে প্রাকৃতিক কাণ্ডের ব্যাভাবিক পরিণতি। কারোই কোনো অঙ্গমলের জট উদ্বিগ্ন হবার আবশ্যক নেই। সবই বিশ্বের মঙ্গলের জট।”

লিসবনের ভূমিকম্পের ধ্বংসশায় ডাবহতার তুলনা দেওয়া যেতে পারে শুধু এই মতবাদের ক্ষেত্রে। ডলটোয়ার এত চটে গেলেন যে, বেকলের বিবৃতির মতো “তিনি ট্রোট নাচাতে লাগলেন, তিনি গাত বের করতে লাগলেন, তিনি শরীরের হুঁশ নাড়াতে লাগলেন, তিনি অশ্রু নির্যাস করতে লাগলেন, তিনি নাসিকা ফুটিত করতে লাগলেন, তিনি জিত বার করতে লাগলেন”।

আমরা এই বিজ্ঞপকারী ট্রোট ফুলিয়েছেন জনসাধারণের অজ্ঞতা ও হুঃ-তার ক্ষেত্রে, ধাত বের করেছেন দার্শনিক গণ্ডিত্বের নিবৃত্তিয়ার, শরীর ফুলিয়েছেন সামাজিক অদ্যাপ্তে, অশ্রু নির্যাস করেছেন রাজশক্তির অদ্যাপ্তের দিকে, নাসিকা ফুটিত করেছেন ধর্মের পৌত্তল্যমিতে, জিত বের করেছেন স্বতন্ত্রতার শিল্পজ্ঞানের অভাব দেখে। তাই স্বীকৃতি-কালে জগতে কোথাও তাঁর স্থান হয়নি।

বৃত্তার পথ বিব তাঁকে জন্ম-নিঃসাহসে অধিষ্ঠিত করে বাহ্যোচ্চিৎ সন্মানে স্থিতি করেছে।

তিন অধ্যায়

মানবেন্দ্র পাল

এমনি নিকসেগ হালকা মেঘলা ছপুর এসেই কপালে খুবই কম মেলে। একে ছুটির দিন মুক্তিমেত, তার ওপর সব ছুটির ছপুরই একে নিয়ে এমনি অক্ষারণ বেড়ানোর স্থযোগ মেলেনা।

এ নিয়ে অভিমানের স্বরে কল্যাণ কিছু বললে বাসবী হেসে উঠার দেখে—তুমি এখানে বড়ো হেসেমাংসে। বোকা না কেন, আমরা সবই শিক্ষিত আর মজান হইন, তবু মিহল-সাপ সেটিনেট এখনো একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারিনি। বাড়িতে আমাদের অবাধ স্বাধীনতা বিরোধে বলেই প্রতি পদে আমাদের হিসেব করে চলতে হয়।

কল্যাণ এর চব্বাং দেখনা। নাথা নিচু করে হাঁটে। বাসবী কটাক্ষে হেসে কল্যাণের পানে তাকায়। ইচ্ছে করেই যেন কাটা ঘায়ে দুজনের ছিটে দেয়। —এই যে তুমি কতবার বলছে তোমার সন্তে নক্সিগরের বেড়োতে বাবার ভুলে। কিন্তু আমি যেতে পারিনি। এর ভুলে সব দুঃখও তুমি মিথ্যা বাপ করেছ। এমনকি সেবার তো আমার চিঠির অব্যবহি সিনেনা। নাথ কি আর বলি ছেসেমাংসে!

কল্যাণ ক্ষুব্ধ হ'বে বললে—বুথে তোমার শাপন হয়েছ। এবার থা করে একটু থামবে?

বাসবী হেসে বললে—আজ্ঞা, এই চুপ করলাম।

দুজনে কিছুকণ চুপসাপ এগিয়ে চলল। বেলা তিনটে হবে। আর রবিবারের এক মেঘলা ছপুর। কোথায় যে থাকে তার ঠিক নেই। শুধু অক্ষারণ ঘেঁটে বেড়াবে। এটা কল্যাণের খেয়াল। বাসবী বেশ মজা পায়। অদূর এই বাহুধটা। তাও আজকের আদ্যা-নির্বাচন কিংকম? না, উস্টোজিতির খালের পান দিয়ে যে স্নানচাটা চল গেছে নানিকন্তমার হ্রিয়ে।

বাসবী এতেও অবাক হয়েছিল।

—সেব পর্বত এইখানে!

কল্যাণ বলেছিল—হ্যাঁ, এই আকস্মিক দুপুরবেলায় কিংকম লাসে দেখিনি এর আগে।

—নাথ! আজ্ঞা লোকের পায়ের পড়ছি।

দুখে যদিও একটু বিতর্কতার ভাব প্রকাশ করে তবু বাসবী মনে মনে গুনিই হয়।

চলেছে দুজনে পাশাপাশি কান্ডাকাছি। কখনো কল্যাণ কথাই মূবর। সে কথা শুনেতে শুনেতে বাসবীর মূবের হঠক বলদায়। কখনো বা বাসবী মূবর। তার কৌতুকে কল্যাণ লক্ষিত বালকের মতো মীরবে পথ হাঁটে। পথচারীরা যে বাহ তরাই একবার করে তীর কটাক্ষ হেনে দায়। কত কল্পনা করে তারা। সে কল্পনা ঈশ্বার বিবে মর্জিত।

আজ এই রবিবারের দুপুরটা ওদের দুজনের কাছেই বহু প্রত্যাশায়। দুজনেই উজ্জল। বেশচুখা খুব ভয়ভালো কিছু না হলেও নিতান্ত মলিন নয়। কল্যাণ ডেকেছে সন্ত শীয়ে কাটা আদির পাঞ্জাবি আর মুতি। পালে গলায় পাউডারের প্রলেপ। পায়ের ত্রায়েলটার ওপর আদাই পালিশ চলেছে। দুহুই টানছে প্রোড্রেক।

বাসবীও সেকেছে। সে সাজ উৎকট নয়। ছাইজের একখানা শাশি শাড়ি পরছে সন্ত কোমর দিয়ে। জোনাট-করা শেণশা ওপর জুমেছে বিভিন্ন ঠাটা। সে আর পাউডার পালিশ-করা মুখে মুটে উঠেছে বিবু বিবু থাম। ঠাঁ থেকে ফুলছে চামড়ার একটা চেন-চেনা হাত-ব্যাগ।

মানিকবলার মোড়ে পৌছে কথা হল, ওরা বাবে আরও দূরে বেড়াতে।

—আজই!

—হ্যাঁ, আজই।

বাসবী একটু কিন্তু-কিন্তু করছিল। কল্যাণ প্রবল মিথ দরলে। বললে—সোহাই তোমার, একটু নির্ভা আনন্দ করব তাতে বাধা মিওনা।

বাসবী বললে—তুমি বোকা, আমি ডাবছি মন্ত কথা। তোমার বেড়াতে যাওয়া মানে তো নয় নিউ আলিপুর রোড, না হু হুজুনে? কিন্তু কত গেরি হবে বুঝতে পারছ তো? বাড়িতে বলা নেই জেরে সব অনর্থ করবে।

কল্যাণ কী ভেবে বললে—ঠিক আছে; ট্যাক্সি করব।

—ট্যাক্সি করবে!

বাসবী যেন একটু চমকে উঠল। পরকণ্ঠেই সামলে নিয়ে হেসে বললে—খুব বড়লোক হয়েছ, না?

কল্যাণ তার উত্তর না দিয়ে গভীরভাবে বললে—এসো, এই কাকোটর ঢোকা থাক। আগে একটু গলা ভেজানো দরকার।

গুণ গলা ভিঙল না, পেটও ভয়ল। মশলা মুখে ফেলে
কল্যাণ ধন বিলটা মোঁহার ভগ্নে উঠিল, বাসবী ভাড়াভাড়া
হাত-ম্যাগের চেনটা টানতে টানতে বললে—ওটা আমিই
সিই ?

—খারবাস। একটা আঙ্গুরবের হাদি হেসে কল্যাণ
নিছেই টাকটা দিয়ে দিলে।

বাইরে এসে বললে হেসে—মাইনে শেরেছ বৃষ্টি ?

বাসবী তুমি ক্রোধে তুচ্ছ কঁচকে বললে—তার মানে ?
তোমার কি ধারণা, আমি বিনা পয়সায় বাটী ?

—না, তা নয়। তবে তোমার মূল দরজা তুমিই যেন
একবার কী বলছিলেন না ?

লজিত হয়ে বাসবী বললে—ও হ্যাঁ, সে ঐ একবার।
একটা গণ্ডগোলের ভগ্নে মাইনে দিতে চেয়ে হয়েছিল।

বেবি-ট্যান্ডি একটা পাল করছিল এই সময়ে। কল্যাণ
হাত নেড়ে তাকল—ট্যান্ডি—

কিন্তু তার আগেই বাসবী আর্দ্রবরে ঠেঁচিয়ে উঠল—কী
সর্বনাশ ! তাহা ঐ দিক।

সর্বনাশের লক্ষণই ষটে। সবুজ উত্তর আর পশ্চিম
আকাশ কখন বে কালো মেঘে ছেয়ে গেছে টের শারনি কেউ।
বাতাস বমকে সিরেছে। চিলচিলো নামছে বৃষ্ণাক
বেতে, বেতে। একুনি বোধ হয় বড়ও উঠতে পারে।

সতরে বাসবী তাকালো কল্যাণের পানে।

—না-না লম্বাটি, কিরে চলো। আঁজ আর বাওয়া
হয় না।

কল্যাণের মূন্টা সজীর হয়ে গেল।

—রাগ করলে ?

—না, রাগ নয়। মেঘ দেখে তো আমি খুশিই
হয়েছিলাম। দুখনে ডেজা বেত মনের আনন্দে।

বাসবী তবু হাদির কোরান্না ছিটিয়ে বললে—তাহলে আর
বাড়ি চুকতে হবেনা আমার। তোমার মতো তো আর এমন
বাড়িখুলে ছমছাড়া মেসের লোক নই। কী স্বাধীন তোমরা—
কী বুঝেই না আছ ! সেপলে হিলে হয়।

কল্যাণ হেসে বললে—বেশ তো, আমার এ স্নেহের
অর্থেক যত্নে তো দাবি করতে পার।

এ কথাব বাসবীর মুখে উত্তর ভোগালো না। মূন্টা
লজ্জার লাল হয়ে উঠল।

—ঐ ট্যান্ডি এসে পড়ছে। কী করবে,—ছেড়ে যাও।

—কবে তাহলে আমার বেড়াতে যেতে পারব ?

বাসবী একটু ভেবে চাণা গলায় বললে—কাল।

—কাল ! কল্যাণ যেন খুশি হয়ে উঠল।

—কাল অবধিই হবে না ? তোমার মূল—

—একটু ভাড়াভাড়া বিয়ের। তুমিও অকল থেকে
আগে চুটি নিও।

—মিঠি করব কোথায় ?

—এই মাদিকতলায়, ঘড়ির নীচে। ঠিক পাচটা।

ড্রাইভার হর্ন বাজালো এবার।

—নাও, ওঠো।

বাসবী যেন একটু অবাক হল।

—চলো, তোমার বাড়ি পৌছে দিই।

ভেতরে ঢুকে গনিতে গা এলিয়ে দিয়ে বাসবী বললে—
এগুলো তোমার বাজে বরচ।

কল্যাণ একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে—না। তোমার
ভগ্নে আমার থাকিছু বরচ তা বাজে নয়। আমার টাকা
সাবধ।

গাড়ি চুটেই লাগল। কল্যাণের ও-কম্বার পর বাসবী
অনেকক্ষণ আর কথা বলতে পারেনি। বহনুদ্বের মতো গুচ্ছ
হয়ে ছিল। শেষে বাড়ির কাছ আসবার আগেই বাসবী
ব্যস্ত হয়ে বললে—এখানেই আমার নামিয়ে যাও।

গাড়ি গাড়াল। নামবার সময় বাসবী হেসে মূণ লাল
করে বললে—আমার মতো বৌ হলে...এসব বাজে বরচ
একবারে বাড়িল করে দিতাম।

কল্যাণ গাড়ি থেকে নামল না। মুখ বাড়িয়ে চকিতে
হেসে বললে—তোমার কথাটার ব্যাকরণের মূল থেকে গেল
অনেক। আর বাই পড়াও, মেয়েদের যেন সাহিত্য পড়তে
বেওনা।

—আজ্ঞা মশাই ! ব'লে সহায় কটাঁকে বাসবী জুত চলে
গেল বাড়ির দিকে।

১২।

অম্বুদে গিয়েই কল্যাণ ট্যান্ডি ছেড়ে দিল। এখান থেকে
তার বেশ বেশির নয়। তবু অতদূর গেল না। বায়ে বায়ে
চোখ পড়ছিল মিটারের দিকে। লাকিয়ে লাগিয়ে উঠছে অন্ধ
—দু আনা—দু আনা—দু আনা—!

না, আর থাক। এইখানেই নামা থাক।

ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ট্যান্ডি ছেড়ে দিল কল্যাণ। এখন ?
মেনে কিভাবে ? না, এত সন্ধ্যা সন্ধ্যা মেনে ফেলা চলবে
না। তার চেয়ে বদা থাক এই জ্বরকেপ পারবে। বেশ তাঁতা
যাতি। পকেট থেকে কামাল বের করে কল্যাণ বলল মাঠে।

দিগারেট খেতে হবে একটা। পকেটে হাত দিতেই উঠেছিল গোভেন্দ্রক। চমকে উঠেছিল, না, ভটা এখন নহ। বে ক'টা আছে সেগুলো হবে কাপ। আচ্ছ এখন চারখিনিয়া,—এক পরবার একটা। একটু বেশি কড়া। তা হোক, বেশাওয়ারের কাছে কড়াই ভালো।

কতক্ষণ কেটে গেল। কুঠি তো হলেই না, দেখে সরে গেল। শুধু শিরে গেল একতলক ঠাণ্ডা বাতাস। হুঁরে কোথাও কুঠি হয়েছে।

ক্রমে শব্দ হল। আলো জ্বলল। কত জন মাঠ থেকে বাড়ি চলে গেল—কত নতুন হল এল মাঠে বেড়াতে। কিন্তু কল্যাণের ভরষার কিছুমাত্র তাকানো নেই। এখন তার মেলে মেলা হবে না। পরীর রান্না। সমস্ত দুপুরটা উত্তরজনার মধ্যে টো-টো করছে। এখন আর পরীর বইছে না, চোখ ঘের টোরে আসছে। কিন্তু—কিন্তু শুধু কল্যাণের এখন মেলে বাওয়া হবেনা।

একতরফে ঘেসের বাবুয়া একে একে নিচ্ছে। কেউ হাতখুঁষ বুজছে—কেউ গান করছে—কেউ-বা হাতাফরের মতোকার ঠিকিরে ঠাকুরকে ভাবিণি নিচ্ছে।

এসের কথা মনে হলেই কল্যাণের হাসি পায়। কিন্তু তবু এসেও ভাব করে চলেতে হয়—সময় সময় এড়িয়ে থাকতে হয়।

অতঃপরে একসময়ে মেলে ফিরে আসতে হল কল্যাণকে। হাত ধপটা বেগে গেছে। বাবুয়া নিশ্চয়ই বাওয়া-বাওয়া দেরে নিষেধ হবে বিল দিচ্ছেন।

কিন্তু না, চোরের মতো সতর্কপণে ঘেসের সিঁড়িতে পা দিতেই চমকে উঠল। বেজার গুণ্ডাগোল। চোঁচোমুখী—উত্তেজিত কোথ! কার ভণ্ডার এত সব গাদিবিগণ?

কল্যাণ হুঁসল, আচ্ছ এক-বোলা হাঁড়ি চলেছিল। ঘ্যান্ঘ্যান ঘলে শিচ্ছে, টাকা নেই।

টাকা নেই!

অ্যাডভান্স তো সবাই দিচ্ছে।

না, জন-পাটেক করেছে। পাঁট-সেমেট আর কল্যাণ বাগটীর জমা পুত্র। একটি পয়সাও জমা যেমনি। গ্রাম প্রতিমাসেই এইরকম। এ-মাসে অস্ত্রোতা ভাই ওর বোনানিধি পুরো টাকা যেমনি।

কোথায় কল্যাণবাবু? হাঁক-ডাক চোঁচোমুখি।

কী পেয়েছেন উনি? বাড়ি না আড্ডাখানা? পরের পরবার যেতে খুব মজা না? এসিকে স্টীমলট্রী থেকে কাশড় কাচাবার সময় তো পরবার অত্যাধ হয় না!

কে একজন বললে, ভুললোকেবর ছেলে, না-হয় একবার ডিকলটার হয়েছে। তা বলে—

—একবার? অতি উৎসাহে ঝটক মজা উত্তেজি হবে বর থেকে টোনে আনলে মেসের বাতা। বদ-খুঁ ক পাভা উঠে চলে।

—এই—এই বেবুন। এক-আখবার নয়, প্রতিবার এমনি। এটা কি মাযার বাড়ি?

—কী করে মশাই টাকা নিয়ে? ভালো অভিনেই কে কাশ করে।

ক্রোড় একজন চিঁড়ে ভিলোতে ভিলোতে বললেন গভী ভাবে,—বলসের মোহ মশাই, বলসের মোহ। Tomarrick unimpaired life! এ-বয়েসে ছেলেদের হাতে ঝাঁটা পক্ষ পড়লে কি আর রক্ত আছে? এমিকে বেবুন পে, বাড়ি, হস্ততা বাণ-মাযের পরনে কাশড় ছুটছে না। এমিকে ছেলের কোমরে হুখারকাইন হুতি, ভাও আবার স্টী লট্রীতে কাচানো।

সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল কল্যাণ বাগটী। যা নিচু করে সব শুনেছিল। কিন্তু বাণ-মাযের কথাই কোঁপে উঠল পরীষ। সেমিকে তার কর্তব্যের ত্রুটি নেই প্রতি পক্ষা তারিখে মাইনে পাবার সব বকেই প্রয়োজনে চেয়ে বরং কিছু বেশি টাকাই পাঠিয়েছে কল্যাণ। ক্রোড় বোনটা আবার তার গান শিচ্ছে মাস্টারের কাছে। আদবা করে বলেছিল বোন। বাবা 'না' বলতে পারেনি।

তবে স্টীমলট্রী টাকা? গোভেন্দ্রক? তার ব্যবস্থা করেছে কল্যাণ, নিজে টিফিন না খেবে। বরন কিসে পেরেছে এমনি মাসকাবারের চুক্তিতে চেনা চানে বোকাব থেকে ছ'শরদা কানের ভুঁটা চোয়ের দিকারের নং বাসি পাউডার-মিক্স চা কল্যাণ করণ করেছে।

শুধু হুসিরে উঠতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত এ এক-একটা কিশেব কিশেব সিনের দ্বায়ে ঘেসের অ্যাডভান্সে টাকার হাত পড়েছে। তখন ভেবেছে, এখন তো বরড কটি তারপর মাস পড়লে ঘেসের ডিকল শোধ দেবে। কি সে-বোনা কোনোবারই শোধ হয়না। বোনা বেড়ে চলে।

কিন্তু এখানে আর এমনি করে ঠাকুরি থেকে লা নেই। অপর্যায়ী বরন তখন অপর্যায়ের ভায়ে ছুয়ে বাক চলেবেনা। সে অপর্যায় চ্যামেজ করে বুক ফুলিয়ে ঠাটা ভালো। কী আর এমন অপর্যায়! টাকা আদাশ যেমনি আদাশ যেমনি, পরে সেবে। বাড়ি-বকেয়া সব শোধ কা দেবে আদ-ক'টাকিন পর মাইনে শেবে।

কল্যাণ ফুট পায়ে সিঁড়ি অতিক্রম করে ওপরে উঠতে লাগল। তখনও বাবুৱা জটলা করছেন। হঠাৎ কল্যাণকে দেখে তাঁরা দ্বন্দ্ব হয়ে পেলেন। অশ্রাব্যী তো সাধনে—হাতের মুঠোয়। কিন্তু সাধনে কেউ কথা বলতে পারেন না। কল্যাণ বাগটী এগিয়ে চলল নিষেধ করার দিকে—বাবুৱা ত্ত হুঁচক চুকলেন যে-বার করে।

একটা দারুণ বিষের ওপর সমস্ত মন লুপ্ত করে উঠে এসেছিল কল্যাণ। প্রস্তুত ছিল নানারকম হীন মন্থবোর দ্বন্দ্ব। কিন্তু কেউ তাকে কিছু বললে না। নির্ঝিন্নই এসে চুকল নিষেধ করে। আসোটা ছালল। চারিত্রিক অশোভনো। এখানে দুটিটা চাড়া—ওখানে জামাটা হুলছে, গামছা লুটোছে মেঝেতে। নিষেধ ওপর দিবার এল। তাহল কল্যাণ, এ গোজাখিলের ভীষন মেন আর বওবা যায় না। বলে পড়ল বিদ্বানার ওপর—মহা গায়র আছ কেন হঠাৎ আরও বেশি মল্লয়া মনে হল। কতদিন যে কাটা হয়নি। বাগিনটা টেনে নিল কোলের ওপর। তেলের ফোঁপ ধরেছে ব্যালিশের ওয়াড়ে। সেই তেলের জ্বল ৪৫ মিনিটে বন্ধ হবে ব্যালিশের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা ছারপোকা।

চমকে উঠল কল্যাণ। দুটো আঙুল বাড়িয়েছিল টিপে ঘেঁষে কেলবার দ্বন্দ্ব। কিন্তু মারলে না। একটা তো নয়, অমন কত ছারপোকা বাসা বেঁধে আছে তার এই চৌকির ঠাঁকে ঠাঁতে। একটা মাঝে তো সকলের হাত থেকে মুক্তি নেই। ছেড়ে দিলে ছারপোকাটাকে।

মাথাটা তিনতিন করছে কল্যাণের। সার্বাধিন পরিচয় দিয়েছে, তার ওপর যেসে চুকই যে-সব কথা কানে এসেছে, সে-কেন আর ধরছে না মন থেকে। এর চেয়ে ঢের ভালো হত যদি তারার তার সাথে সামনা-সামনি বগড়া করত। উত্তেজনার মধ্যে বা-বোকে একটা কিছু হয়ে যেত। কিন্তু তা তো হল না। ওরা মরে গেল। দুইয়ের ওপর হরোয়া বড় করে নিল। ওরা বললে, কল্যাণ বাগটী পরের পড়লার যায়। ওরা বললে, টাকা ওড়াই। বললে, বাগ-মাকে কেউ-পরতে দেখনা।

আবার কানের দ্রুপার পরম হয়ে উঠছে কল্যাণ বাগটীর।

এত বড়ো বদনায়! কল্যাণ বাগটী পরের পরলার যায়! কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, ট্যা ভাই। প্রতি খালে বাকি টাকা কমে উঠেছে—ভারী হয়ে উঠেছে ডিবে ঠাঁবার হতো।

আবার একটা চারবিনার ধরালে।

কবে মুক্তি পাবে? এ-স্তব্ধতা কবে ছিঁড়ে যেবিবে আসতে পারবে?

কল্যাণ বাগটী মনে মনে হিসেব করলে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। বছরে পাঁচ টাকা ইন্ডিকেন্ট। মোড় ছুশো টাকা পর্যন্ত।

একটা ধীরে ধীরে কল্যাণ বাগটী। ধান-বাড়ছে জিনিষপত্রের। চাল দুইশা, তেল দুইশা, টান-বাসের ডাড়া বাড়ছে। নয়া পয়সার সুবিধের লোভ দেখিয়ে খাম-পোষ্টকার্ডেরও দাম বাড়ল, শুধু বাড়ল না তার মাইনে। বাগারে হলিঙ্গ নেই—নিমির ছোটো ছোটোটা কত রান্ধা কিনতে গিয়ে হাঘের কথা শুনে গেছিয়ে আসতে হয়েছে।

আর ভাবতে পারে না।

হাত বেড়ে চলে। আচ্ছ অনাহার। বাবুৱা যে বা পেরেছে বোকান থেকে আনিবে নিয়ে বেয়েছে। কেবল খাওয়া হয়নি কল্যাণ বাগটীর। খাওয়া হবেও না আচ্ছ।

হ্যা, তবু এই দুর্দিনে এই মাইনেইই থাকড়েই থাকে বেঁচে থাকতে হবে—না-বাবকে ঠাঁচাতে হবে, ছোটো বোনটা—যে পরমাখামায়ে গান লিখেছে তার একটা বিয়ে দিতে হবে। আর—

বাসবী?

দলটা শুকিয়ে এসেছিল। একই ঠাঁটা ঘল। বিদ্বানাকে থেকে উঠে পেলো গিরে গেল জল গড়তে। কিন্তু শূন্য কলদী। চাকরে জল গিরে থাকনি।

একটা দ্বন্দ্ব হাসি মুটে উঠল কল্যাণের মুখে। পরাজয়কে কোনোদিনই সে মেনে নেয়নি। আচ্ছও নেবে না। বন্ধ হবে আলো নির্ভিয়ে লখা হয়ে শুয়ে পড়ল বিদ্বানার।

আম্বকের দিনে সে ছিল দারুণ—এ রবিবার তার দারুণ। বাসবী ছিল তার পাশে—তার সকল ভালবাসা—সকল আত্মরিকতা গিয়ে। যদি সে ভালবাসা সত্য হয় তবে আর কি ভয়?

মনে মনে ভাবলে কল্যাণ, আর চলনা নয়। কালই ওকে বলবে তার সব কথা—বলবে এই আবার সত্য ভয়।

। দিন ।

বাসবী বাড়ি ফিরল বিকেল থাকতে থাকতেই। মনটা তার মুণ্ডিতে ভরা ছিল। 'কল্যাণ' নামটা একই পুরনো, তা হোক, তবু বড়ো দিষ্ট। যেমন দিষ্ট ওর মনটা। দরজের ভরসা লাগে ঐ দিষ্ট মুখে ভীষণ হেসে কেটে কেটে ও বদন কথা বলে খোঁচা বোয়ার করে।

—‘মেয়েদের যেন সাহিত্য পড়তে বেওনা।’

কেন? না, কথা বলতে গিয়ে কোথায় একটুই হাফজের তুল হয়ে গিয়েছিল। ‘মহি! মহি! কতবড়ো ভাটপাড়ার পড়িত এলেন আশায়!’

আকস্মিক হুল, ঠিক এ উত্তরটা তো মাথায় আসেনি তখন।

প্রেন্টীটের মোড় থেকে বড়ো লেনটা পার হয়ে এল বাই-লেনটার ওপর। এখানেই ঐ কোণের একতলাটার ওরা ভাড়া থাকে।

দরজা বন্ধ ছিল। কড়া নাড়ল বাসবী।

—বাই! ভিতর থেকে কর্তব্যর ডেসে এস।

দরজা খুলে দিলে বাসবীর বৌদি।

—ইস! খেদে নেবে উঠেছ বে?

বাসবী কনাল দিয়ে দুখ দুহুতে দুহুতে বললে—বা ওমেট!

বৌদি বিস্তারিত তান করে বললে—তোমারও গরম লাগে!

বাসবী বললে—বাঃ রে! গরমকালে গরম লাগবে না? বৌদি হেসে বললে—কী জানি বাপু, বাঘের গরম লাগে তাকের তো আর ছুটির দিনে এই হুপুগে অমন বেড়াতে যেতে দেখি না।

বাসবী অশ্লিস্কর বললে—আচ্ছা আবার রোগ কোথায়? কেবলনা আকাশের অবস্থাটা? জল এল বলে।

—হ্যাঁ, মিলে তো নেবটাকে চমকে? আর বৃষ্টি হচ্ছে!

বাসবী হেসে বললে—আচ্ছা সেকালে মাথ খোঁচা তুমি!

বৌদি কিন্তু হাসল না। বললে—কী করব তাই বলে।

লেখাপড়া বেশি শিখতে পারিনি; বন্ধুদের বেয়ে, বয়েসেও তোমার চেয়ে বড়ো। সবদিক দিয়েই পুরোপুরি সেকলে হয়ে আছি।

কথাটা বৌদি এভাবে বে নেবে বাসবী ভাবতে পারিনি। একটু অপ্রতিভ হয়ে পরীক্শণটা লম্বু করবার অন্তে তাড়াতাড়ি কাঁধ থেকে চানড়ার হাত-চ্যাপটা নিয়ে বৌদির কাঁধে হুগিয়ে দিয়ে হেসে বললে—বেবি বেবি, বাঃ!

বৌদি লজ্জার দুখ লাগ করে ব্যানটা স্বেদে দিয়ে পালিয়ে গেল ঘরে।

বাসবীও গুনগুন করে গান করতে করতে স্নিগ্ধর ঘরে গিয়ে চুকল।

এ ঘর চুকই সবচেয়ে আসে তার চোখে পড়ে যাবের এলাফ-করা কোটেটা, লাগপাড় শাড়ি নিয়ে ঘেরা

অবগুঠন—কপালে লাগ-টকটকে বড়ো একটা সিঁদুরের কোটা। হস্তবর্ণ শিখির দিকে তাকালে মনে হয় সতীষের স্পর্শই যেন জলছে। সব বিনিয়ে হঠাৎ ঐ ছবির পানে তাকালে মাথামটকে জীবন্ত বলেই ভুল হয়।

আচ্ছা এই অপরাহ্নের আলোয় এক নতুন অনমনে বিভোর হয়ে বাসবী দেখতে লাগল মাকে। তার যেন আর হঠাৎ মনে হল—অমনি লাগপাড় শাড়ি না পরলে, শিখি ডবের অমন সিঁদুর না ঢেলে দিলে মেয়েদের জীবন পরিপূর্ণ হয়না।

বাসবী দেখছিল একমনে। হঠাৎ এমনি সময়ে পাশের ঘরে থেকে বৌদির ছোটো ছেলোটা কেঁধে উঠল। দিকেটে কুগছে, তার ওপর জর হয়েছিল। বৌদি ভোলাবার চেষ্টা করছে কিন্তু কাণ্ড খাচ্ছে না। বাসবী সে-অবস্থাতেই চুকল বৌদির ঘরে।

—উঃ, কী গরম! ক্যানটা কোথা গেল বৌদি?

বৌদি চুপ করে হাত-পাখা নিয়ে ছেলেকে বাতাস করতে লাগল।

এমনি সময়ের চড়ির শব্দ পোনা গেল। বাসবী মেঘল বাবা আসছেন। ব্যাচ হয়ে তিনি এগিয়ে আসছেন। হাতে তার টেবিল-ক্যানটা।

—দাড়াই—দাড়াই—

বাসবী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ক্যানটা নিলে নিজের হাতে। বৌদির টেবিলের ওপর রেখে মাগুটা লাগিয়ে দিলে। ক্যান খুলতে লাগল।

—হ্যাঃ!

কম শিঙর কাছা খেয়ে গেল। মাঘের বুক দুখ রেখে জ্বাছ চোখ আবার ঘুরে চলে এস।

—জাখো শিকি, এই গরমে ক্যানটা তুমি আবার ঘরে গিয়ে এসেছিলে বোঁহা! আমি মুহুন্দিলাম, একটুই টের পাইনি।

বোঁহা কোনো উত্তর দিলে না।

—জরটা একই কয়েদে?

বোঁহা মাথা নাড়ল।

বাসবী গিয়ে একবার শিশুর স্পর্শ করে জর অহুত্ব করল।

—না, জর এখনো বেশ আছে।

বাসবীর বাবা বললেন—ও কিছু না। সেয়ে বাবে। এবার তো লটারির টিকিটে আমার দাড়তাইয়ের নাম বিয়েছি। যদি কোনোদিকবে কাণ্ট-গ্রাইজটা লেগে যায় বুকহিস বাসী—

এই পৰ্ব্বত বলেই মেঘের দিকে ভালো করে তাকিয়েই চমকে উঠলেন—কোথা গিয়েছিলি এই দুপুরে ?

—এক বছর বাড়ি বেড়াতে।

—টিউপনিতে বাসনি ? ও, আজ বুঝি রবিবার।

বাসবী স্বপ্নকাল মুখ নিচু করলে। তার পর কেমন বিপর দৃষ্টিতে তাকালো বাবার দিকে।

—কী রে ! অমন করে তাকিয়ে আছিস যে ?

—টিউপনি তো আর করিনা।

—সে কী !

—হ্যা, গত সপ্তাহ থেকে ছেড়ে দিয়েছি।

হতভম্বের মতো বাসবীর বাবা শুধু একটিমাত্র প্রশ্ন করলেন,—কেন ?

বাসবী ভেঁমনি হুটাই বললে—আর একটি মেয়েকে দিয়েছি, বাবা। তুমি খুব আতর্ষ হচ্ছ আর রাগেছ—কিন্তু তাকে যদি তুমি দেখতে তাহলে তুমিও বলতে টিউপনিটা ওকে দিয়ে দেবার জগ্গে। বেচারি রমা !

বাসবীর বাবা আর ঠাড়ালেন না। আঙে আঙে গটির পদ করতে করতে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

বাসবীও আর ঠাড়ালেনা এ ঘরে। আজ বড় ভ্রমোৎপন্ন। নিজের ঘরটিতে এসে আশমুখা একটা পাড়ি পরে শীতলস্নেহে মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। হাত-পাখাটাও নেই ঘরে। বোধ হয় বৌদি নিয়ে গিয়েছে। মনে করে কালই একটা পাখা কিনে আনতে হবে।

ঠাণ্ডা মেঝেটা বেশ লাগছিল। উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল বাসবী। চুড়ান্ত শান্তির দিকে ভাস্কর্য্য। তারই ওপর রেখেছে মাথা। চোখ বৃন্দ আগছিল দুঃখের।

কিন্তু না, একটুক্ষণও চুপ করে বিভ্রাট করবার উপায় নেই। রক্ত নখর চিন্তা !—কত পোনাকথার পুনরাবৃত্তি ! কিং—

বৌদির ছেনেটা আবার ঝাঁকতে শুরু করেছে। একটু থামছে আবার ঝাঁকছে।

এমনি সময় তাক পড়ল বাসবীর।

—বাই। বসে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল। কাশড়টা সংহত করে নিয়ে চলে এল বাবার ঘরে।

—তাকু ?

—হ্যা, বোস। বাসবীর বেন কেমন লাগল বাবার গলাটা।

ভালো মেয়েটির মতো ও বলল বাবার কাছে। শিঠে হাত বুলিয়ে ছোটো মেয়েটির মতো আবার করতে করতে বাসবীর বাবা বললেন—মন দিয়ে কামকর্ষ্য করো, মা। টাকা উপায় করতেই হবে। মুহূব্বরাম পেড়ে তো।—

‘লক্ষী থাকিলে মান সকল সংসারে।’

লক্ষী বাম হলে ডাই কেমনা আসরে ?

এ সংসারে এখন তুমিই তরশা মা !

বলতে বলতে প্রৌঢ়ের কণ্ঠস্বর ধরে এল। তবু বলে চললেন—তোমার লাশ তো কত আপা নিয়ে ঘোঁরন আয়ত্ত্ব করেছিল। কিন্তু কী হল ? চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি। আজ পৰ্ব্বত একটা ভ্রমখোড়ের চাকরি ছোটোতে পায়ল না। আর তুমি—একি, চলে যাচ্ছে কেন ?

—মাথাটা বড় ধরেছে, বাবা।

—মাথা ধরেছে ! বাসবীর বাবা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—এই ঘাণো মিকি ! শুধু শুধু হঠাৎ মাথা ধরল কেন ?

এমন তো আগে ঘরত না ! বাসি—ও বাসি—

বাসবী ভতরকণে ফিরে এসেছে নিজের ঘরে।

বুড়ি হলনা আজ। শুধু ঠাণ্ডা এক এক কলক বাতাস বইছে মাঝে মাঝে। অস্বস্তির হয়ে এসেছে কলকাতার আকাশ। এবনি হচ্ছে হবে। বাসবী আনিলাটা খুলে দিলে ভালো করে। ঐ যে বাই-লেনটা গিয়ে মিলেছে বড়ো বাতায়। তারও ওদিকে এই একটু আগে পাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল কল্যাণ বাবাটা। সে পথ বেন এখন মনে হচ্ছে অনেক দূর—সে ঘটনাও মনে হচ্ছে বেন অনেক দূর আগে। আর সে বাহুবলী—সেও কি কোনো দূর ভগবতের ?

শাসনের ঘর থেকে কণ্ঠ ছেনেটা আবার কেঁদে উঠছে, ওদিকের ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে বাবার হাঁকো-টানোর একঘেয়ে শব্দ। বা-না—ভালো লাগেনা, ভালো লাগেনা এশব্দ ! এর চেয়ে তের ভালো—

চকিতে ছানলা থেকে ফিরে এসে অতের আলো জালিয়ে বেষ বাসবী। মারের এনসার্ক-করা কেটেটা বেন সেই আলোর সিঁদু হাসিতে সমুচ্ছল হয়ে উঠল।

বাসবীর হঠাৎ মনে হল—আজ্ঞা কল্যাণের কি মা আছে ?

পল্লীর বারশাশা

তুলসীদাস সিংহ

। জন্ম ।

গাভী খুব বড় তাঁরা 'মাহ' জামদ—এ এসে দীর্ঘবাণ ছাউন 'শুক মন্দির মোহ' ব'লে,—গাভী খুব বড় না হলেও বড়, তাঁরা আত্মসান করেন 'ভাসের' রাধার ভাণ্ডারও খালি হয়ে যায়'। হুতরাঃ ভাত এগেই আমি ছোট হয়ে যাই। ছোট হয়ে গিলে সেবি শ্রুততার লেপ নেই কোথাও—সব কানায় কানায় ভরা। পুহুর ভোবা কানায় কানায় ভলে ভরা, ভল শালুক-পাত্র ভরা, মাঠ লকলকে সবুজ ধানে ভরা, মাঠের আল ভাঙা গাং ঘাট গাঢ় সবুজ ঘাণে ভরা, ঘাস শিশিরে ভরা, আকাশ নীলে ভরা, নদী 'ভাসরের ভরা নদী', নদীর হুঁতীর কাপড়সে ভরা, আর দিনগুলো পরিষ্কার রোসে ভরা। মানে বোল কড়া পূর্ণ।

চকল খালিকা নয়—আবগামদী বোড়শী। প্রকৃতিরাই ভাসের এসে বোলগ পা দিলেন। বোড়শীর এখন 'ফুলে ও কদলে কানামাটি ভলে বসবল করে লাবণী'। প্রকৃতিরাইয়ের মেয়ে মাটি-না এখন মাকবলসী, মাটি-নার খেয়ে ধান—ধানেরা এখন প্রকৃতিরাইর মতোই বোড়শী।

তারপর ঘরে ঢুক সেবি বোড়শী একটি নয়—অনেকগুলি। তারা সব বাটনা-বাটা শিলটাকে ঘিরে হো-হো করে হেসে লুটিয়ে পড়ছে আর মেহেদী লাগাচ্ছে হাতে। মেহেদী ধানেন না? মেহেদী হল একরকমের গাছ—এর পাতাগুলো পজা বড়, হৃদুপাছের কচি পু, গানের বোটা, গাপড়ী বাকের আর হ'কের মনের লগে বেটে বড়ি দেওয়ার মতো বী-হাতের তালুতে লাগাব মেহেরা। শুকিয়ে যাওয়ার পর বড়িগুলো কেসে দেওয়া হয় হাতে থেকে—তারের ছোপটা লেগে থাকে হাতে গোল গোল হয়ে। ভাসমান-ভর হাতে মেহেদী লাগালে ভাইদের পরনাম্বা বাড়ে। বেকেরা যেমন মেহেদী লাগাচ্ছে, আমিও তেবনি লাগাই—আবারও হাতটা গোল গোল লাল ছোপে ভরে উঠুক তা কিন্তু চলেবে না। বেটুছেলেদিকে মেহেদী লাগাতে নেই—গাণে কামড়ালে বিধ নাথবে না পা থেকে।

মাঠে আছে এখন চ্যাং। বর্ষার জল গড়লে কইরা যেমন পুহুর ছেড় ভাঙায় হাওয়া খেয়ে বেড়ায়—শিশির পড়তে আবার করলে চ্যাং মাছেরা তেবনি শিশির-ভরা ঘাসের উপর

ঘিরে পুহুর ছেড় মাঠে এসে পড়ে। মাঠের এই চ্যাংদিকে বড়শী ঘিরে ধরতে কী আনন্দ—কত মজা! ধানপাছের গায়ে শিশির বতকণ লেগে থাকে, মাঠের শিশির বতকণ না যোবে তবে নেই ততকণ পর্যন্ত চ্যাংরা খুব চ্যাংদ্রি করে। বড়শীতে চোপ গেছে ধানপাছের গোড়ায় মাজাতে থাকলে চুইছু করে ছুটে এসে চোপ দিলে এবং চোপ দিলে ধান আবার চুইছু করে ছুটেতে খাং তখন শিসুদ্রি করে ওঠে হাতটা—আরাম লাগে খুব। একটুকণ আরামটা উপভোগ করে হুঁহাত তুলে মারো ঘাই। ধান-কোড় ছেড়ে চ্যাং-বাবাধী কসুকসু করে উঠে পড়বে মাথার উপরে এবং ভাস-লাগা হুঁবলভর মতো মাথার উপরে গোল থাকে—সোলো-সোলো গোল-সোলো। কিন্তু রোয়টা ক্রমশঃ বেড়ে ধন খাটি ভাসরের যোম হয়ে যাবে (ভাসরের যোমে বরষামাইরা পালায়) তখন আর চোপ থাকবে না চ্যাং মাছেরা—বড়শী নাচিবে নাচিবে হাতে ব্যাধ ঘরে গেলেও না। হুতরাঃ চ্যাং বাছ ধরতে গেলেই ভোরে উঠে মাঠে আসতে হয় এক বাহা একবার আসে ভোরা বার বার না এসে পারে না।

মাঠে আছে চ্যাং—ভোবায় আছে তেবনি হালিশোনা। আবাচে ভোবায় ভোবায় মাছের বে ডিন কেনা হয়েছিল তা থেকে মাছ হয়েছে এখন একটুকণ আখড়টাক করে। এদেরই বারোঘাঘি নাম হালিশোনা। হালিশোনারা একনখরের পেটুক—ভালিশফটা কেবল বাই-বাই চিহ্ন। কলে কুপতে হয় কেট-ভাণগদিকে। ধনই যান, দেখবেন কেট-ভাণা ভোবায় পাড়ে বলে টাকুতে খুতো পাকাচ্ছে। তবে হ্যা, শেট বড় বালাই। জলধাবার সময় হলে, ভাত খাওয়ার সময় হলে ভোবা ছেড়ে উঠতেই হয় তাকে—আর ঠিক সেই ঠাকে ফুঁকে উঠে পড়লো গাছে, কককে বলে পড়লো ছিপ নিয়ে। চোপটি কি বাড়তি। চোপের গন্ধ গেলে আকাশে ছাংগোকার মতো ছুটে আসে হালিশোনারা এবং বলে বলে অকালদুহু বরষ করে কককের হাতে। জল খেয়ে বা ভাত খেয়ে কেট-ভাণা কখন কিভাবে তা ধানবার মতো পাছে উঠে আছে কইকে—বখালমখে নে শিসু নিয়ে উঠবে 'হ—স'।

কোপেরাড়ে আছে ছাছু বা ছাচা। ছাচা পরতেও কোটে। তবে বর্ষার ছাচারা বিনশন না দেখে বার হয়,

দরতের ছাত্তা বা শিখি খুলে আগে দেখে নেয় অষ্টমী লেগেছে কিনা, তার পর তার হয় এই বা তথ্যত। পূর্ণিমার ছাত্তা অষ্টমী ছাত্তা কেটে না, তাই এদের নাম বেগুয়া হচ্ছে—অষ্টমী ছাত্তা বা অষ্টমী ছাত্তা। তাহে আছে মহারতী, বাধারতী—আগিনে আছে মহারতী। মহারতীর পর ছাত্তাটিকে আর দেখতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু সবচাইতে বড় তালতলায়। তালপাকা গরুছে যে এখন চলিগকটা। তালপাঠা, তালের বড়া, তালচুড়ি, তালখাল্লা, তালপুয়া—আহা হা, নাম করলেও ভিত্তি জড়িয়ে যায়! তালতলা থেকে তাল চুড়িয়ে আনা আর এক বড়। মাছ-পুয়া যেমন একটা বেগা, তাল চুড়ানোও তেমনি একটা বেগা। বাড়ীতে আবার লম্বা তাল চুড়িয়ে রাখা আছে আনি এবং কেউ এসে চাইলে তা থেকে পাচটা দিয়েও দিতে পারি—কিন্তু তালতলার পান দিয়ে বেতে বেতে হঠাৎ পক্ষ উঠুক ‘ধড়, ধড়, পড়, ধড়, হু’—অমনি ছুটেতে হবে আমাকে হড়বড় করে। পরিত্যক্ত বেগতে পাচ্ছি আমি ছাত্তা আমেগাশে দ্বিতীয় কেউ নেই, কিন্তু তত্বও ছুটেতে হবে। বলের মধ্যে একমাত্র হসিক ফল হল পাকা তাল, যাকে পেতে হলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পেঁচো-পাচুবার-নিরীশেবে সকলকেই ছুটেতে হয়। তার বাড়ীতে লম্বা। আছে তাকেও ছুটেতে হয়—তার বাড়ীতে একটাও নেই তাকেও ছুটেতে হয়। এক কইকে মজা করে তালতলার দিকে বড় বকমের একটা ডিল ছুঁড়ে ফিলেও ছুটেতে হয়, পানের বাড়ীর কেউ দুই করে কপাট বন্ধ করলেও ছুটেতে হয়—দিনেও ছুটেতে হয়, রাত্রেও ছুটেতে হয়।

কথাতেই আছে ‘ভালবের ভরা পুহু’। কানার কানার ভরা পুহুরের জল হয়ে উঠেছে এখন মিশকালো। আর সেই মিশকালোর বৃথ আলো করে ছোট উঠেছে শালুক। শালুক ফুলের হাসি মাঝের হাসি নয়—কোড়ীর হাসি। ও হাসিতে ছেলে-মুড়া সবাই কুলে। আন করতে নাহলেই মনে হয় শান্ত্রিবে ছুটা ফুলে আনি। কিন্তু বহা পেরো একজন আছেন যে—তার কথা যেন হলোই বৃকটা কেঁপে ওঠে। পেরোটি হলেন ইচ্ছাঠাকুর। ইচ্ছাঠাকুর কলমেবতা—গভীর মনে তাঁর আবাস। শালুক ফুল ফুলবার ভক্তে গভীর মনে গেলো বাহ্যকে সোহার শিকল দিয়ে টেনে ডুবিয়ে তারতে হাঁসি ওত্থান। এমনিধারা শিকল ছুঁতে বাহ্যক টেনে তোষাবানব বহু নীরব অলোকের আনা আছে। আবার কেবা একজন বাহ্যক (বহু পরেবো আগে) ইচ্ছাঠাকুর ডুবিয়ে মেয়েছে। ভাষ্যবাসে গোরাপল্লী বা ভববতী-

পূজার প্রধান যে ফুলটি চাই-ই, সেটি হল শালুক ফুল। ছেলেবেলায় নিয়ে নিয়ে লোকটি শালুক ফুল ফুলবার ভক্ত এক পুহুরে এসে হামির হয়েছিল। এ পুহুরে যে ইচ্ছা আছে তা লোকটির জানা ছিল না। গোছা গোছা শালুক ফুল বেবে সে নেবে পড়ল জলে—ছেলেটি বইল পাড়ে গাড়িয়ে। ফুলওলা বরে টানতে গিয়ে লোকটি গভীর মনে পড়ে গেল হঠাৎ, এবং তার পা ছুটা শালুকের তাঁটার অড়ানো গেল। সূচ্য লম্বা সে তাঁৎকার আরম্ভ করলো—ওরে মশায় রে, ইচ্ছা শিকল দিয়ে ধেনে কেনেছে রে! কাছাকাছি কেউ ছিল না যে তাঁৎকার শুনে ছুটে আসবে। পাড়ে গাড়িয়ে থাকা ছেলেটি একেবারে ছেলেমানুষ ছিল না সত্যি, কিন্তু বাবার মূখে ইচ্ছাঠাকুরের নাম শুনে তার বাহ্যজ্ঞান লোপ পেরে গিয়েছিল। নান্না ঘাবার পর লোকটিকে শালুক-কোড় থেকে বারো টেনে তুলেছিল তারা পত বিজার নিয়ে বলেছিল ছেলেটিকে, ‘কেন তুই ছুঁয়ে দিতে পারলি না? কালুজী ফুল ছুঁতে ফিলেই তো পেতে যেতে তোরা বাবা। তুই-ই তোরা বাবাকে ধেরেছিল।’

প্রতিটি বিপদেই কেহ অব্যাহতির যেমন উপায় আছে—ইচ্ছার কল থেকে উদ্ধার পাওয়ারও তেমনি উপায় আছে। ইচ্ছাতে কাউকে ধরছে এমন অবস্থার ক্ষেত্রে যদি ছুটে এসে কাশচ বা পানচা ছুঁতে ছুঁতে দেয় বিপন্ন লোকটিকে তাহলে লোকটি বেঁচে যাবে। দ্বিতীয়-বাঁজির হোঁচাচ লাললে ইচ্ছার শিকল অকস্মাৎ হয়ে যায়। ইচ্ছার কল থেকে এভাবে রক্ষা পাওয়ার কথাও শুনেছি। এ ঘটনাটিও হালের নয়, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ আসকার। এবং অজান্তে আনন্দ লংবান, সেই থেকে ইচ্ছাঠাকুর কাউকে টেনে ডুবিয়েছেন এমন কথা শুনেও পাইনি। পল্লীর লালশর ছোট ইচ্ছা বোম্ব হয় এমন সম্ভবানী হয়েছিল। যে পুহুরের জল তখন মিশকালো ছিল, এখন সেই পুহুরের জলই বাহো মাস বোলাটে হয়ে রয়েছে। যে পুহুরের এ-পাড়ে গাড়িয়ে ও-পাড়ের বাহ্যক বাহুর মনে হয়েছিল, সেই পুহুরের এ-পাড়ে গাড়িয়ে ও-পাড়ের বাহ্যক এমন বাহুর বলেই জিনতে পারা যায়। ইচ্ছাঠাকুরের মহাপ্রদানের কারণ এইখানেই। পল্লীর পুহুরে-পুহুরে আবার সেদিনের মতো শালুক ছুটুক পত ছুটুক—জল হাং বাক মিশকালো, দেখবেন ইচ্ছা কেন এসে নেবে গড়েছেন পুহুরে পুহুরে।

ইচ্ছা বিখ্যা নয়, সত্যিই। বুঝ উঠে কোনো পাছে যদি আশানি উঠেন, দেখবেন আশনার বা শিরণির করছে। যেন হবে কেউ কেন আশনাকে নীচের দিকে টানছে। গভীর মনেরও গ্রীক অমনি একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। নাক ডুবে যায় যেখানে, গভীর মনের সীমা আরম্ভ সেখানে থেকেই।

এই সীমার এল পিড়ালে বেধেবন, কে বনে আপনাকে আসের শিক টানছে—আপনি না টানলেও আপনার শরীরটা হুঁকে পড়ছে আপনার শিক। বাস, ঐ হল হাঁড়াতীহুরের টান। এ টানে আপনি যদি হঠাৎ পড়ে যান, অর্থাৎ কোমর-জলে ঢলতে-ঢলতে হঠাৎ যদি বাল খাকার লখন শীতাব-জলে পড়ে যান—এক পড়তে পড়তে শালুক-চাঁটার জড়িয়ে ধরে আপনার হাত-পা, তবে ঐ অত নরম ভাঁটাতপলা ভাঁটা না থেকে হয়ে উঠবে শিকল। এ অবস্থার পড়ে বত বেশী চটুকেই করবেন তত বেশী করে বত সব ভাঁটা আপনাকে জড়িয়ে ধরবে। হাত-পা-বঁধা অবস্থার শাঁড়ার কাটিতে না গেলে জল বেয়ে বেয়ে মরতে হবে একা লোকে বসবে হাঁড়াতীহুরে ডুবিয়ে দেবেছে আপনাকে। কিন্তু কেউ যদি এসে হুঁকে কেল আপনাকে তাহলে কেঁচে ধাবেন আপনি। নিয়ম হল—কেউ এসে বুক-মল পর্বত নেমে একটা কাপড় বা গামছা ছুঁতে দিবে আপনার শিক, আপনি তার একটা প্রান্ত ধরে কেলবেন—অপর প্রান্তটা ধরে টানবে উদ্ধারকারী ব্যক্তিটি। উদ্ধারকারীর টানে শালুক-ভাঁটাতপলা হয় উপড়ে আসবে, না হয় ছিঁচে যাবে—এক আপনি মুক্তি পেয়ে যাবেন হাঁড়ার হাত থেকে।

তা সে যাই হোক, শালুক তো হাঁটুজলেও কোটে—গভীর জলেও শালুক তুলতে যাবেন কেন? হাঁড়া গভীর জলেই থাকে, হাঁটু জলে তো আর থাকে না। হাঁটুজলে নেমেই শালুক তুলবেন।

•

‘যাত্রা নামে তেরো পর্বত’ কালতে যা যেকার তা আসলে শুক হয় এই ভাবে থেকেই। দিদিমার মতে ভাতের মাখানি-বইই উপর বেগে বত পরবকে মাখানি নিয়ে নীচে নামে। একা ভাতেরই সত পর্বত—মনন বই, কুলন, জম্মাইনী, নখোংসব, রাণাইনী, সোয়ালপুজা, মনসাপুজা, ভাদুপুজা, বিশ্বকর্মা পুজা, অরুজন। পর্বত, পর্বত আর পর্বত!

মনন থেকে হচ্ছে মাখানি। কাঠের তৈরী যে মনন-বগুটি বা মাখানি-কাঠিটি নিয়ে হা যোল মনরা হয় সেই বগুটির পুজা করা হয় এই মননবগীর সিলটিতে। কুল-সোওরা হুহিতার কাছ, যোল মনরাও মেয়েদের কাছ—হুতরাং মননবগুটির পুজা করে ঐ মেয়েরাই। কোনো বাবুনের ক্ষেত্র পুস্করখাটে গিরে বগুটির পুজা করে। পুজার উপকরণ বি, শুভ, সিন্দুর, মই ও কলাই। পুজো শেষ হলে মেয়েরা সকলে নিলে বগুটিকে ধরে জলে ভাসিয়ে দেয়, আর বগুটির পায়ে যে পুজো জড়ানো থাকে তা বাবীর ফুলেমেয়েদের হাতে হাতে পরিবে বেঙো হয়।

ভাতমাসে হাঁড়ার ভাঁটার খালি হয়ে যায়, এ কথা ঠিক—‘হা অর’ ‘হা অর’ সব গুটে পরী থেকে; কিন্তু আর এক শিক কথা বার কলপামতী বা হুতরাং ধারণ করে পরীর মাছবদের সাহায্যে এসে ঝড়িয়েছেন। গরু নয়—ভগবতী—না ভগবতী। বর্ষার শূন্য ঘাস-পাড়া খেয়ে হুপুট হয়ে গুটে ভগবতীরা—জন দুখে ভরে গুটে। হুতরাং হুতাছড়ি পড়ে যায় তাহলে। হুতরাং হাঁড়ার ভাঁটার খালি হলেও আমরা যদি না—এইচ থাকি। (অবত এমন আর সে-দুগ নেই। কেন নেই, সে-কথা বলতে গেলে এ প্রবন্ধে আটবে না।) দুখ প্রচুর পরিমাণে হলে শর মই বা খোলের তথা মননবগীর প্রাণ গুটে। মননবগীর সিনে মেয়েরা তাই পুজার মাধ্যমে মননবগুটিকে কৃতজ্ঞতা জানায়—তিনি যেন বরাবর সন্তুষ্ট থাকেন, ঘরে যেন হুতরাং অভাব কোমনিব না হয়।

মননবগুটিকে করা হয় মননবগীর পুজা, বৃথাওঁয়ীর সিন করা হয় বর ভগবতীপুজা বা সোয়ালপুজা। সোয়ালকে এ সিন বেশি করে শালুক তুল দিবে লাগানো হয়, গোম্বা গোম্বা পরিবে বেঙো হয় শালুক তুলার মালা। তারপর খোদাময়ে পুস্তকতীহুর এসে গোম্বার গোড়ায় খট পেতে ভগবতীর পুজা করেন। আর মমার কথা কি জানেন—পরীর সাধারণ মাছবরা ভগবতী বলতে সব গরুকেই বোকে। তাহলে কাছে কলও ভগবতী—রাঙাও ভগবতী। হুতরাং ভগবতীর পুজা বা সোয়ালপুজার সিন সব গরুই পুজা পায়। মলন-পাড়ী-নিবিধেবে প্রতিটি গরুকেই ডায়ে পুজো করার সার্থকতাও জড়িয়ে দেখলে পরিচায় কৃত্য যায়। ডরা ভাত্রে গাভীরা হুত দান ক’রে আবাদিগকে বাঁচায়—আর বলদরা সারা বছরের বাঁচার পথটি তৈরী করে দিবে এই সবে একটু ঠাক ছেলেছে। সারা বর্ষা সকাল-সন্ধ্যা-ভর পাখরে কাষায় লাগে টেনে টেনে হাড় বেরিয়ে গেছে বেচারাদের। সোঝা হয়ে হাঁড়াত্তে পারছে না, চার পা তুলে চলতে পারছে না। আমরা কি আশাবহ! তাহলে প্রতি আঘরা কৃতজ্ঞতা জানাবো না? তাহলে পুজা করবো না? মাছবের সেবতা তরাই—মাছবকে বারা বাঁচিয়ে রাখে। শতপুজা, কৃষ্ণপুজা, অরু-পুজা প্রভৃতি মাছবের পুজা। হুতরাং, অরুজন, অসতা কোনো সন্ধ্যা এসব পুজার প্রবর্তন করেছে এ কথা ভাবতে গেলে বিষয় জাগে।

•

এরপরই তুলছি দেবী মনসার কথা। মনসাপুজা প্রাক্ষণও হয়, ভাত্রেও হয়। তবে ভাত্রে পুজাটা ভালো জেনে এইমতেই যে, তখন চায়ের কাছ শেষ হয়ে যায়—

চাষের চিহ্নটা মাথা থেকে নেমে বাঁওয়ার কলে মিলিত হয়ে দিলতে পারে নবাই একজামগার। আর সারা রাত ধরে প্রতিটি সন্ধ্যা ঘনি ভরে না উঠলো সন্মিলিত কর্তের মনসামল গানে, তবে সে মনসামল তো একবারের মাসার মনসামল গো। যা মগুপ এসে উঠবে সেই সংকলিত, কিন্তু তাঁর আগমনের হুটি সেসে থাকবে পোটা ভাষামলটার পরে—

“মাকে আনতে বাবো গো কীরাই নীর কুল—

মায়ের হাতে দিব লালজবা, চরণে দিব কুল।”

ভাষার সংকলিত সন্ধ্যার বেগে পাওয়া যায়, মাকে আনতে বাবো গো বললেই আনতে বাঁওয়া যায় না। তার আগে মায়ের আসলে পাওয়া চাই। (যেই মনসার আদিত্যর গরুরূপী। একমাস হাতী-ঘোড়াই হল গরুরূপী। একেই আনি গরুরূপীর পূজার-ই বিবরণ মঠে।)

বারি আনতে বাঁওয়া বানাই মাকে আনতে বাঁওয়া। ভক্ত বা দ্বিগামীরা বারি আনতে বাঁওয়ার ভক্ত প্রভুত—গরুরূপীর সামনে হাঁটু গেড়ে হাত মোড় করে বসে পড়েছেন সব। প্রধান দ্বিগামীর চোখে ছিল—“মা যা” বলে চাঁককার করে উঠেছেন তিনি মাঝে মাঝে।

পলা বাটো করে একজন দ্বিগামীকে বিজ্ঞাপ্য করলাম—
মা কি কথা বলে আসেন যিবেন? দ্বিগামী বললে—না, তা কি সম্ভব—অন্তরেই তা অহতব কথা বলে। কোনো ক্রটি মঠেই বাইরে—তাই মাঝে দিলে না।

দুইটিতে বুনে ছড়ানো হচ্ছে মঠে মঠে, বুনের খোঁয়া অক্ষর হয়ে উঠেছে গানটা। খোঁয়ার হুণীয়া মধ্যে দিয়ে ভগবৎ সিঁদুর-মাখানো হাতী-ঘোড়াগুলোর দিকে যখন ডাকছি তখন ভক্তের দেখাচ্ছে তাৎপিক। এমনিবারা ভাষাল পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ দু’হাত কুল নাচতে নাচতে ছুটে এসে নাগিত-বুঁটী। গরুরূপীর সামনে হুঁ করে পড়ে গিয়ে পড়িয়ে বেড়াতে লাগলো। দু’হাত দিয়ে মাটি খাপড়ানো বুঁটী, মাথা মেলাচ্ছে ঘন ঘন—চেহারটা হয়ে গেছে ছবিতে বেধা রাক্ষসীর মতো। অর্থাৎ গরুরূপী ভর করেছেন নাগিত-বুঁটীর উপর। তার দৃশ্য নিয়ে তিনি বঝলেন—কি ক্রটি মঠে। পুস্তকাক্ষর বুঁটীর খড়টা চেপে ধরলেন—চেপে ধরে বিজ্ঞাপ্য করতে লাগলেন,—কুল মা, বল—কি অপরাধ হয়েছে? খানিকক্ষণ পর বুঁটী কিছুটা শান্ত হয়ে ভড়িত কর্তে ক্রটির কথা বললে। এবং উত্তরে ‘অমর ক্রটি আর কখনো হবে না, এবারের মতো আপ করে’ বলে কথা চাওয়ার পর বুঁটী শান্ত হল।

দ্বিগামী এবার শাটবে দেবীকে প্রণাম করে বারি আনবার ভক্ত বেগিরে পড়লেন। অন্তা পিছনে পিছনে চললো। গ্রামস্থ কোনো বড় পুত্র থেকে বারি আনা হবে,—ঐ পুত্রই হল কীরাই নীর। বিঘমচাকী আর ঢাকের শব্দে গমগম করে উঠলো পল্লীপথ এবং ঐ বিঘমচাকী আর ঢাকের আওয়াজকেও ছাড়িয়ে ডাকতে লাগলো আগমনীর হর—

“মাকে আনতে বাবো গো কীরাই নীর কুল...”

কীর্তন গান যেমন তার সখিবিবরণী বিশিষ্ট হুটির ভক্ত অমরব পাভ করেছে, মনসামলও তেমনি তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হুগরিয়ার অমর হয়ে আছে। বিঘমচাকীর আওয়াজ আর মনসামলের হর দুটিতে এক হয়ে যখন কানে ঢোকে তখন মনে হয় অক্ষরকার ঝাঁপি ছেড়ে সাতহাত বৃষ্টি হুগিয়ে আনিও নাচি।

পূর্বঘাট পর্যন্ত এসে অন্তা থেকে যায়। ঘাটের কোল বেঁচে ঐ-বে গোল-গোল গোবরের মাড়ুলী মেওয়া রয়েছে তার উপর মাঝিবে রাধা হল পূজার উপকরণ, ঘট, আর সাপের ঝাঁপি। ঢাকের বাজ থেকে গিয়ে এবার শুধু বাজতে লাগলো বিঘমচাকী, চললো মনসামল। এবং শুইই যশো একসময় বৃষ্টিপথ পর্যন্ত নেমে ডুবানো হল মনসার বারি। ঘাটের উপর মলপূর্ণ ঘটিকে রেখে ঘষাটীতি পূজা করা হল। পূজাশেষে প্রত্যাবর্তন।

আগে আগে চলছে ঢাক, মাকথানে ঘট, ঘটের পিছনে বিঘমচাকী-ওলাল, সবাই পিছনে চলছে নিছিল। কিন্তু মা কৈ? ঐ তো ঐ ঘট—ঘটের মধ্যেই তো মা ভর করে রয়েছেন। ঐ তো তাঁকে চামর দিয়ে বাতাল করতে করতে নিয়ে বাঁওয়া হচ্ছে, বাংলার উপর চলছে ঘিরের প্রাণী। অসম্ভব।

মা যে সাপের দেবতা। ঘটের সঙ্গে ঝাঁপিতে পোয়া যে সাপগুলোর পূজা করা হয়, ঐ সাপগুলোর মধ্যেই মা তাহলে ভর করে চলছেন। অসম্ভব।

“একে মা মনসা তার আবার বুনের গন্ধ”—তাহলে ঐ যে বুনের বলা থেকে খোঁয়ার হুণী উঠছে, ঐ হুণীয়া আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে মা মগুপ চলছেন। মনটা বললে, অসম্ভব।

আহ-হা, ঐ তো মা! ঐ যে বুনের খলাটা বানানো রয়েছে মাটির মাধ্যম। ঐ মাটির সঙ্গেই মা বিশেষ রয়েছেন।

মাথার উপরে প্রথমে চাপানো হয়েছে একতাল মাটি—



মাঝের দল সহ স্বর্ণাশ্রমের কী ওলা

[ক্রীড়া : অতিথি দ্বিতীয়]

মাটির উপরে খুঁতে দেওয়া হয়েছে খলাটা। খলাটার উপর আঙুর জলাচ্ছ হাট্ট হাট্ট করে। একজন পালে থেকে দুটো দুটো খুলে ছুঁড়ে দিচ্ছে খলাটার আঙুরে। দেহেটির বুট্টী নীচের দিকে, হাতছুটি ছোড় করা, বিড়বিড় করে কিছু বলছে বোধহয় মনে মনে। ঐ অবস্থায় পুতুরখাট থেকে কেতে হবে তাকে মাঘের ধান পর্বত। সে-বে না। তার ছেলের শিরে যে বম এসে ঝাঁকিয়েছিল। ঐ হা-টি তখন মাঘের কাছে বানত করে, ছেলেকে আবার বাঁচিয়ে লাও মা—ছেলেটা খেতে উঠলে মাঘায় আঙুর নিয়ে খুলে পোড়াবো। না বঙ্গাবুটী ছেলেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। হা-টি তাই এখন তার মানত শোধ করছে।

হ্যাঁ, এই হল মা—সত্যিকারের ছেলের মা। সারা পথ ঐ মাঘের উপর আমি নম্র রেখে চলছি। মাঘায় আঙুর মাঝে মাঝে উড়ে পড়ে থাকে যেহেতু ঝাঁপে, হাতে, পায়ে—কিন্তু কৈ, ছোড় হাত তো কাক হবে সেলসা একটি মাঘের কন্তেও। পুতুরখাট থেকে বন্দামগণ কতটা আর ? হাত নেড়ে নেড়ে এসে হল বিনিট লাগে। কিন্তু বন্দার বারি

নিরে আসতে গেলে হল বিনিটের পরিবর্তে লাগে একখটা। এবং এই একখটার পথ যেহেতু একভাবেই অভিন্ন করলো।

মতগে হট্টাশ্রমের পর বধ্যাকলে পুত্ৰ হল বঙ্গাবুটী, তারপর এসে সেই ফুলপচার সময়টি। মানত করার ধূম পড়ে গেল একেবারে। নিয়ম হল—মানতকারী মানতের বিষয়বস্তুটা পুত্ৰ-ঠাকুরকে বুঝিয়ে দিবে এবং পুত্ৰঠাকুর সেইমতো মানতের কথাটা শুনিবে দিবেন পষরাবুটীকে। কথাটা মা বকানে জ্ঞানেন কিনা তা জানবার আগে ফুল চড়ানো হবে হাতী-খোড়ার মাথায়। প্রথমে এক ঝাঙ্কা ফুল চড়িয়ে দিবে সেরেও হুয়েক ঝাঙ্কা করবেন পুত্ৰঠাকুর—তা থেকে গোটাফরেক আপনা-আপনি বরি পড়ে যায় তাহলে বুকতে হবে বা কথাটা বকানে জ্ঞানেন—মনঝামনা পূর্ণ হবে। না পড়লে, পুত্ৰঠাকুর আর এক ঝাঙ্কা চড়াবেন, তাবপর আরো এক ঝাঙ্কা, আরো এক ঝাঙ্কা, আরো এক ঝাঙ্কা। শেষে দেখা

গেল হাতী-খোড়ার মাথায় হাতখানেক উঁচু ফুলের ডব উঠে গেছে অথচ ফুল পড়লো না। এক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে পুত্ৰঠাকুর ঐ থেকেই চারটি ফুল নিয়ে মানতকারীর ঝাচলায় কলে দিবে বলেন, কোনো চিন্তা নেই,—মা নিচ্চই ভালো করবেন। মানতকারী ভক্তি সহকারে ফুল নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে ঝাচলে ধাঁধেন বটে, কিন্তু মনটা তাঁর কেঁয়ে ওঠে, হায় আমি কি অপরাধ করলাম মাঘের কাছে—আমার কপালে ফুল পড়লো না!

সবশেষে বলিলাম। এক্ষেত্রে আমিও আধুনিক সব মা-ই এক।

পুত্ৰের পর যে-কোনো একদিন বার হয় ঝাঁপান। ঝাঁপান পুত্ৰের অঙ্গ নয়, এ হল ওজায় বা দাপের ওজায়ের বৃদ্ধ। ঝাঁপানে ঢুকে কে কত বড় ওজায় তাই পরিচয় দেয়। হুতরাং ছুটি হল একমাত্রার না হলে ঝাঁপান হবে না। হু'খিক থেকে ছুটি হল বেরিয়ে এল—হাতে, মুখে, বুক, গোটা পায়ে লাল ঝড়িয়ে ওজায়ের পরাম্পর পরাম্পরকে লক্ষ্য করে গালিগালাব করতে লাগলো—ভবেই না ঝাঁপান। ওজায়ের যদি একগুণ গাল দেয়, চোলায় গাল দেয় তার হাজার গুণ।

অসীল অম্রাবা সে-সব সালাপাল। এমনই এক ছোয়ালো
রকমের ঝাঁপান বেধেতে বেঁধিয়ে এসে দেখি—লোকে
লোকাত্যা, তাইই যথো ভিত্তি তৈল করতগুলো মাথায় একটা
সাঝানো গো-পাড়ীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পাড়ীর উপরে
ওড়ান একবোকা সাগকে গলায় জড়িয়ে ধাঁড়িয়ে আছে,
সাকরেন্দ্রা অননন্দক পাশে থেকে গালাগাল দিচ্ছে,
হাঁকাহাঁকি করছে—‘আর ঐ গোলার মধ্যেই বাজছে বিঘম-
ঢাকী—‘চাপক ডিঙি—’। শুনলাম ঐ বুড়ো একজন পূর্ব
উৎসবের ওড়ান—অন্ত দলের ওড়ান ঝাঁপান হার করতে
সাশ পাশি আর। এ দলটির হৈ-হুয়া তাই এমন চলে
উঠেছে। ধাঁড়িয়ে ধাঁড়িয়ে কাণ্ডকারখানা বেধছিলাম—
সাকরেন্দ্রা সাপ নিয়ে কেউ চোট খাচ্ছে হাতে, কেউ জিতে,
কেউ বুক—সাপগুলো বুকছে হুতোর মতো। ওরই মধ্যে
হঠাৎ একজন একটা ঝাঁপি তুলে ধরে বলতে লাগলো—ঝাঁপির
মধ্যে এই যে সাপটি আছে, যদি কেউ এর চোট (ছোবল)
থোত পারেন তবে আমাদের ওড়ান হার বীকার করবেন
তার কাছে। আমাদের ওড়ান তার আসে নিজের হাতে চোট
খাইয়ে বেধিয়ে দিচ্ছেন। আছেন কেউ, এগিয়ে আনুন।
অর্থাৎ চ্যালেঞ্জ। বুকটা ঝাঁপতে লাগলো ধড়ধড় করে,
নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু না—কেউ তো
এগিয়ে এল না জীড়ের ভিত্তর থেকে। বুড়ো এবার ঝাঁপি
থেকে সাপটাকে তুলে ধরে বললে, তাহলে আমিই চোট
খাইয়ে বেধিয়ে দিই। উঃ, সে কি ভয়ঙ্কর সাপ! যেমন
লম্বা, তেমন মোটা-মোটা, তেমনি রাশি। বুখা ধরে হাতের
কাছে নিয়ে যেতেই ছোবল মারলে সে
চটাক করে। এখানে ধাঁড়িয়েই কানে
এল ‘চ—হু’। সম্বরে মন উজ্জ্বল
করতে আনন্দ করলো সাকরেন্দ্রা, আর
এক-একটা নিমের ভাল নিয়ে হুকতে
লাগলো বুড়ার গায়ে।

ঝাঁপান শেষ হওয়ার পর বুড়োকে
এসে ধরেছিলাম। একসাথে একগালা
প্রেরণ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে
রইলাম। বুড়ো ভালোমহু—এক
এক পূর্ব প্রেরণই উত্তর দিলে আমার।
হা-হাতটা তুলে ধরতেই খেবলাম
হাতের মাগ একটু বসেছে বটে, কিন্তু
চামড়া একটুও কাটেনি। বুড়ো
বললে, আসলে এইটুই হল কাটা।

সাপ চোট মারবে কিন্তু চামড়া কাটবেনা। আর চামড়া
যদি একটু কেটেও যায় তাতেও ক্ষতি নেই—মোচড দিতে
না পারলেই হল। সাপের মুখের দু’পাশে দুটো বিবখলি আছে
জানেন তো—সাপের খাড়াটা ধরবার সময় ঐ খলি দুটো বেশ
করে চেপে ধরে রাখি, এবং চোট দেওয়ার পর মোচড দিতে
হাতে না লাগে তার ব্যবস্থা করি। মোচড দেওয়া মানেই তো
বিবখলি থেকে বিল ঢেলে দেওয়া। সাপের খাড়াটা ধরে বেধে
চোট খাওয়ানো হয় এবং চোট মারার সঙ্গে সঙ্গেই খাড়াটা
তুলে নেওয়া হয় উপরদিকে। অবশ্য সাবধানের মার নেই।
ধকন, ওরই মধ্যে যদি এক-আধটু বিল পড়ে যায় হাতের উপর,
তাহলে সেটা অসে পূর্ব কেলবার মস্তেই চোট খাওয়ানোর
পর আমরা পাড়ী থেকে নেমে আসি—তারপর চলে আসি
কোনো পুহুরে। পুহুরের অসে আছা করে ধুয়ে নিই হাতটা,
হাত যদি একটু কেশরকম অসে যায় তাহলে ঐ জায়গাটা দুধ
দিয়ে শুখে নিই অর্থাৎ চুষকমার করি। সবায় মূল হল সাশ।
সাশ এক সেই সঙ্গে এক-আধটু চর্চা থাকলে সকলেই
এ কাজ করতে পারে।

ঐ একটি সাপ ছাড়া বাকী যে সাপগুলো নিয়ে গলায়
জড়ানো হয়, হাতে জিতে চোট খাওয়ানো হয়—ওগুলো সবই
বিবখলি-জাড়া সাপ। ওদের বিবখলিগুলো কেটে নেওয়া হয়
আগে। অবশ্য কামড়ালে সাপে বেশই, চামড়াও কাটে,
রক্তও বার হয়, গোটা গা জ্বালাও করে। নিমের জং
সহ্যে নিতে হয় তা। ঝাঁপানে উঠে সাপ নিয়ে খেলা
সেখাবার সময় ওড়ানদের গালে বিঘ-প্রতিবেধক শিকড়বাকড



ঝাঁপানে ওড়ান ওতা

[কটা: তুলসীলাল দিা]

গোটা থাকে। কোনক্রমে এক-আধটু বিৎ থেকে সেলে ওতেই কাজ হবে বায়।

সবশেষে বুড়া বললে—কিন্তু ভানেনই তো ‘শাপের ওকা সাপে মরে’। শাপের সঙ্গে বেলা করতে বাওয়া মানেই কালের সঙ্গে বেলা করতে বাওয়া। ভাবী সাবখানে থাকতে হয়—প্রতি পানে মেজাজ বুঝে চলেতে হয় ওদের। একই কুল হয়ে গেলেই সর্বনাশ। তখন আর মন্ত্রতন্ত্রও কুলোবে না, জড়িষ্মিতও কুলোবে না। সবই মায়ের ইচ্ছা।

•

সবশেষে এবার নার করছি ভাদ্রাশ্বির। ভাদ্রা দেখী নয়—মানবী। কাশীপুর-রাজের একমাত্র মেয়ে ভদ্রালী-ই হল ‘ভাদ্র’। প্রজাদের দুঃখে রূপগুণে অতুলনীয় ভাদ্রাশ্বির চোখ দিয়ে জল পড়ে, দুঃখীদের উপর তার কল্পা শতধারায় বর্ষিত হয়। সুতরাং ভদ্রালী এটা রাজ্যই হলালী নয়—রাজ্যের পরায় দুঃখী অন্যথ আতুর সকলেরই সাপের দুলালী, নয়নের মণি। সেই ভদ্রালী বা ভাদ্রাশ্বির ইচ্ছা একদিন রাজ্যকে কামিয়ে, প্রাচলিক ঈর্ষিদের অকালে মারা দেল। কাশীপুর-রাজ ভাদ্রাশ্বির মৃত্যুতিথি উপলক্ষ্য করে ভাদ্র-উৎসবের প্রবর্তন করলেন। রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রজারাও নাচ গান বাজনা, আনন্দ-আল্লাহের মাধ্যমে ভাদ্রার মৃত্যুপূজা করে যেতে লাগলো। একে আদর্শও করছে। এই হল ভদ্রালী বা ভাদ্রপূজা।

কিন্তু ভদ্রালীর কথা ভাবতে গিয়ে কোনমতেই আমি বুঝে উঠতে পারি না—প্রিয়জনের মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্য করে কি ভাবে মাতব্ব আনন্দ করে, নাচগান করে সারা মাস ধরে। মৃত্যুতিথি উপলক্ষ্য করে এতটা ব্যাভাব্যিক কি সম্ভব? প্রাচীন ভাদ্রগানের কয়েকটি লাইন হল—

✓ “জল কামাকম কাম।

হুখের ভাদ্রে ভাদ্র এল

সব দুঃখ ভেঙ্গে গেল—

বরষ পরে হরষ ভরে

ঘর পরামগম গম।”

ভদ্রালীর মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্য করে যদি ভাদ্রপূজার প্রচলন হয়ে থাকে, তবে ভাদ্র ‘হুখের ভাদ্র’ হল কি করে? ভাদ্রে ভাদ্র এল—না, গেল? ‘বরষ পরে হরষ ভরে ঘর পরামগম গম’ না ‘ঘর কামাকম কাম’?

আমি পড়িত নই সুতরাং পঠিতরা হৃদি এ আঘাতটা না পড়েন তাহলে আমি ভবে ভবে বলি—ভাদ্র রাজ্যের দুলালীই বটে, কিন্তু এ দুলালী রাজ্যের জন্তে কীল না—বাউরী বাগদী হাড়ী তোষ চণাল প্রজাদের জন্তে কীল। ভাদ্র-মাসেই রাজ্যের দুলালী রাজ্যের ভাঙার খালি করে গালিয়ে যায় বটে এবং রাজ্যেরা সেদিন উৎসব না করে ‘হার হার’ করেন। কিন্তু প্রজারা উৎসব করে—বারষ ভাড়া যে দু’চোখ দিয়ে দেখে তাদের বড় সাপের দুলালী বোলয় না মিলে, রূপ ভার ফেটে পড়ছে গা থেকে—রূপের আলোয় স্বলমল করছে এবার গোটা ভাদ্রমাসটা। বরষ পরে ভাদ্রকে বোড়শী রূপে দেখে তাদের বুকে ভরসা ধীয়ে—দুঃখ মূঢ়্যতে আর দেখী নেই।

সারা মাস ধরে প্রজাদের বাড়ীতে এমনি আনন্দোৎসব আর একবার চলে—তা হল ‘টুহ উৎসব’। চৈত্র থেকে বৈশাখ চৈত্রালী, ভাদ্র থেকে ভৈরবী হয়েচে ভদ্রালী। ভদ্রালী থেকে ভাদ্রালী বা ভাদ্র।

টুহর সঙ্গে ভাদ্রর বেশ একটা মিল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—দেখলেই মনে হয় উভয়ের সম্পর্কটা অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কাশীপুর-রাজের একমাত্র মেয়ে ভাদ্রাশ্বিরই জন্মেছিল বলে ভাদ্র নাম ভদ্রালী হওয়া বাস্তবিক এবং এই ভদ্রালীকে ভাদ্র ধরলে, ভাদ্র-উৎসব টুহ-উৎসবের মতো প্রাচীন উৎসবের পর্যায়ে পড়বে না। কিন্তু ভদ্রালী থেকে ভাদ্র না ধরে যদি ভাদ্র থেকে ভাদ্র ধরি—তাহলে টুহ আর ভাদ্র হয়ে পড়বে একবরষী।

ভাদ্র উৎসব এমন একটি বিচিত্র লোকোৎসব যে, এর খেঁই খুঁজে পাওয়া কঠিন। গানের মানে ধরে ধরে এর উৎস-সন্ধানও সম্ভব নয়। টুহগান তবু একটা পথ ধরে চলে, কিন্তু ভাদ্রগানের ধারাবাহিক কোনো পথ নেই। যে-কোনো বিষয়কে উপলক্ষ্য করেই ভাদ্রগান বর্জিত হয়ে থাকে। এবং বহুরে বহুরে গানগুলির রূপও বদলে যায়। প্রাচীন ভাদ্র-গানগুলির সঙ্গে বর্তমানের ভাদ্রগানের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর এই অগাধিচ্ছুরি দৌলতেই ভাদ্রর আদ্যিন রূপটি সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে মহাজনদের পথ অনুসরণ করাই বিধেয়। সুতরাং আমিও ভাদ্রর মিকে আদ্যিন ব্যক্তিরে পেয়ে বলি—“অর্ধেক মানবী ভূমি, অর্ধেক করুণা।”

রাস্তা হারাই

হরপ্রসাদ মিত্র

পাকা বাড়িটার দালানে, দেয়ালে
পথেতে, পিচেতে, পাথরে, ইটেতে
এপাড়া-ওপাড়া ঘোর সে ; ঘুরেই—
ছড়া বেঁধে যায় তুম্বু হুরেই ।

কারণ, কেবলই কাছের কুকুর—
লোভের, কোভের, নানান্ রিপূর
হাজারে লক্ষে কোটিতে তারাই

ঘেউ ঘেউ করে—

রাস্তা হারাই !

সোনালী রোদেতে গভীর হুখেতে

বে-দোলা গাছের শীর্ষপাতায়—

সেই অপক্লপ অপরাহ্নের প্রহর

অস্র দোলা বে জাগায় !

যদিও রক্ত, মাংস, মেদ,
পিত্ত ও গ্ৰীহা, মজ্জা, শ্বেদ—
বিল্লম্বণের স্বভাবে আমরা

রূপে রূপে ঢালা অনেক খেদ !

হাজারে, লক্ষে, কোটিতে তারাই

ঘেউ ঘেউ করে—

রাস্তা হারাই !

কোনো কোনো ক্ষণ গভীর, গহন,

কোনো প্রহর বা ক্রন্দয়হীন—

কোথাও নিবিড় ছায়াবীণি ঘেরা,

কোথাও অগৎ বৃক্ষহীন ।

শাশ্বত যে, সে আছে, আছে, সেই—

তারই নানা রূপ, নানান্ দিন ।

হাজারে, লক্ষে, কোটিতে তারাই

ঘেউ ঘেউ করে—

রাস্তা হারাই !

মনে পড়ে বিমলাচরণ দেব

Brother of Allah

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (World War I) শেষ হইতে না হইতে সান্থীগণ (Allies) জার্মান, অস্ট্রিয়ান ও তুর্কী সাম্রাজ্যের সম্মুখীন নাশ করিয়া ত্রাতাদের তত্ত্বাবধানে হইতে কতকগুলি দুর্বল বলেবিল্য Succession States সৃষ্টি করিতে ব্যস্ত হইলেন। তখন ১৯১৮-১৯ সালে কুর্দস্টাতিকে লইয়া একটি বিরতি সমস্ত আবির্ভূত হইল। ইহারা অতিমাত্রায় স্বাধীনতাপ্রিয় এবং তৎক্ষণাত্ অসমসাহসী যোদ্ধা। তখন ইহাদের একজন নেতা বলিয়াছিলেন—“আমরা সান্থীগণের সহিত আলোপ-আলোচনার দ্বারা আমাদের সমস্ত সমাধানের চেষ্টা করিব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি ঐক্যে কাজ না হয়, তাহা হইলে—We shall appeal to the Brother of Allah”—অর্থাৎ তাহাদের শেষ সহস্র Brother of Allah। আল্লা যে অনন্ত সর্বশক্তিমান তাহা ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করে। কিন্তু কুর্দদের মতে আল্লার একটি ভাই আছেন। তিনি আল্লার ভাই। কাজে কাজেই তিনি আল্লার সঙ্গে সমান হইতে পারেন না। তাহা হইলেও তাহার শক্তি নেহাত কম নয়। এই ভাইটি হইলেন কুর্দের রাইফল। কুর্দের শেষ সহস্র এই রাইফল।

‘নিলিন্দ পঞ্ছো’ মনে পড়িয়া গেল। মন ১৯০৬-৭ সালে গিয়া কিরিয়া আসিল।

ঐক রাজা নিলিন্দ (Menander)। তাহার রাজ্য ছিল পশ্চিম পাক্ষাবে। তিনি ভিক্টর নাগসেনের সহিত কথা কহিতেছেন। নিলিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—“সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতি কাহার?” নাগসেন কহিলেন—“মনের।” নিলিন্দ কহিলেন—

“কড়ের নহে কি?” নাগসেন কহিলেন—“না। আপনি কোথায় জন্তগ্রহণ করিয়াছিলেন?” নিলিন্দ উত্তর দিলেন—“গ্রীসের অমুক স্থানে অমুকের বাটীতে।” তখন নিলিন্দ কহিলেন—“মহারাজ, আপনার মন গ্রীসের সেই স্থানে ও সেই বাটীতে গিয়া ফিরিয়া আসিল।” নিলিন্দ মানদনে কহিলেন—“সাধু, সাধু!” তাই বলিতেছিলেন—মন ১৯০৬-৭ সালে গিয়া কিরিয়া আসিল।

বাঙালীর ছেলে বুকিল—আবেদন-নিবেদনে, জ্বায়ের তর্কে, প্রেম বিলাইয়া হইবে না। মার দেওয়া সরকার। বলা সহজ। প্রবলপরাক্রান্ত ইংরাজ সরকার। সৈন্যসামন্ত, পুলিশ, অস্ত্রশস্ত্র সবই ইংরাজের। ছেলেরে কিছুই নাই। সুবিধার নথো তখনও অস্ত্র-আইন (Arms Act) খুব কঠোর-ভাবে প্রযুক্ত হয় নাই। তাই রিভলবার, পিস্তল, কার্তুজ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অল্প চেষ্টায় পাওয়া যাইত। এইরূপে সংগৃহীত সামান্য ‘অস্ত্রশস্ত্র’ লইয়া বিলাতী পণ্য ‘বয়কট’ সংযোগে ইংরাজের সহিত প্রত্যক্ষ বিরোধে বাঙালীর ছেলে প্রবৃত্ত হইল।

অর্থাৎ বাঙালীর ছেলে ভিক্টরগতি ত্যাগ করিল, দাস্ত্যতা ত্যাগ করিল, প্রেম বিলানো ত্যাগ করিল। অবলম্বন করিল নিছক সহিংস পন্থা, appeal করিল সরাসরি Brother of Allah-র নিকট। কারণ সে পরিষ্কার বুকিল “নাস্ত: পন্থা বিজ্ঞতেহ্যনায়”।

শয়তানের বড় ভাই

ইংরাজের সাম্রাজ্য তাহার বোকানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই বোকান গেলেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার

সাম্রাজ্য যাইবে, ইহা ইংরাজ খুব বুঝিয়াছিল। বিশ্বপ্রসিদ্ধ প্রবাসবাক্য তখন ছিল—India is England's fenced-in private market। সেই private market ও, তাহার সহিত, তাহার সাম্রাজ্য বিপর। তাহা ছাড়া বাঙালীর ছেলে ইংরাজকে বলিতেছে—‘তোকে মারিয়া তাড়াইব’। কি আশ্চর্য!

এ অবস্থায় আশ্চর্য নহে ‘বনিয়া’ ইংরাজকে পিয়া খেল, যাহাকে বলে ‘seeing red’। অত্র-আইন কড়াকড়ি করিল। উম্মাদের মতো ফৌজদারী আইন ‘সংশোধন’ আরম্ভ করিল এবং দমননীতি ব্যাপক-ভাবে প্রয়োগ করিতে লাগিল। এই দমননীতি যাহাতে পূর্ণভাবে সফল হয় সেজন্য তাহার Criminal Incubation (খুঁড়ি, Investigation) Department ভালো করিয়া খাড়া করিল। কুখ্যাত ফেলগাটা জালিয়াতকে পরম সমাদরে সরকারী চাকুরি দিল ‘Rasagolla letter’, ‘Thakur letter’ প্রভৃতি সৃষ্টি করিবার জন্য। দুঃখের বিষয়, সব ধরা পড়িয়া গেল। ইহাদের আধ্যাত্মিক বাশধরণগণ উন্নতি-সাধন করিয়া এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে যাহাতে জালিয়াতি ধরা শস্ত, প্রায় অসম্ভব। এই নূতন প্রথা পাকিস্তানে Gurmani Case-এ সেদিন প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া খবরের কাগজে দেখিয়াছি। এ দেশে এখনও প্রকাশ পায় নাই।

ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম ‘টিকটিকি পুলিশ’। ইহার টিকটিকির মতো দেওয়ালে, আনাচে কানাচে, অলঙ্কিতে থাকিয়া সন্দেহভাজন (বা ‘বলি’রূপে উদ্ভিষ্ট) ব্যক্তিদের কার্যকলাপ গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া দমনের ব্যবস্থা করে।

চতুস্পদ জন্তু বিশেষ যেমন মলমূত্রাদি অমেঘ্য পদার্থপূর্ণ পথে নাসিকা পর্ষন্ত ডুবাইয়া তাহার ঈপ্সিত বস্তু খুঁজিয়া বেড়ায়, সেইরূপ এই সময়ে ইংরাজ ও তাহার পুলিশ খোঁজ করিতে লাগিল পাড়ায় পাড়ায় কোথায় আছে বাউরুলে, লেখাপড়া-

ছাড়া, চারিত্রিক দৌর্বল্যবৃত্ত ছেলে-ছোকরা। হইলও Seek and thou shalt find। ঐরূপ ছেলে-ছোকরা সংখ্যার মল মিলিল না।

এই সময় বরাবরের একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে—আমাদের পরিচিত একটি ভ্রমলোক বহু বৎসর বিলাতে থাকিয়া উচ্চশিক্ষিত হইয়া দেশে ফেরেন। তাহার উচ্চশিক্ষার জন্ত বহুপ্রকার লোকের সহিত তাহাকে মিশিতে হইত। একদিন আসিয়া বলিলেন—“ওহে, পাঁচকড়ি [পাঁচকড়ি বাল্যোপাখ্যায়, ‘নারক’-এক সম্পাদক] কি বলে জানো? বলে যে সে লেকটেন্যান্ট গভর্নর (তখন Baker)-এর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল। Baker বলে যে ইংরাজ ‘স্বদেশী’কে ভয় করে না। দেশের নাড়ীর উপর ইংরাজের আঙুল আছে। যাহা কিছু হইতেছে সবই জানিতে পারিতেছে। Our hopes are centred on the impecunious relations and dependents of our suspects.” কি সর্বনেশে এবং কত সত্য কথা, তখনকার প্রোগ্রাম, মোকদ্দমা, internment প্রভৃতি সমস্তে যাহারা জানেন তাহারা বলিতে পারিবেন।

ইংরাজ যে কত বড় মনস্তত্ত্ববিদ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। রামবাবু তাহার অসহায় ভাটু-শুয় বা ভাগিনেয়কে মস্তান-নিবিশেষে ভরণ্যপোষণ পালন করিতেছেন, বা কোনও নিঃসম্পর্কীয় লোকের কাজকর্মের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাহার অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন, খুঁজিয়া খুঁজিয়া C.I.D. ইহাদের আবিষ্কার ও গ্রাস করিল। ইহারাই Secret service money পাইয়া রামবাবু ও তাহার পুত্রদের বিরুদ্ধে সত্য, আংশিক সত্য বা সম্পূর্ণ কাল্পনিক কথা সি.আই.ডি.-কে জানানইতেছে। আরও, পাড়ার ছেলে, যে শিশুকাল হইতে তোমার বাড়ীতে আসিতেছে, এবং আজও বড় হইয়া অবাধে ঘরের ছেলের মতো আসিতেছে, সেও Secret service money খাইয়া তোমার বাড়ীতে plant-ing করিতেছে।

হতভূত দেখা গিয়াছে আর্থিক অনটন এবং Secret service money পাইয়া স্বাচ্ছন্দ্য ইহার প্রকট ও বিকট রূপ। এই প্রকার ছেলে-ছোকরা নোটামুটি ছুই জেঞ্জীর; এক জেঞ্জী—ভ্রমবংশের হতভাগা ছেলে। আর এক জেঞ্জী—যাহাদের আমরা ‘স্বরজু’ বলিতাম, অর্থাৎ যাহাদের উপরের ধোঁজ পাওয়া যায় না এবং যদি বা কোনও ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, তাহা ‘অনির্বচনীয়’।

এই দুই জেঞ্জীর ছেলে-ছোকরা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে ‘তা’ দিয়া পুত্রা এবং ভয়ানক criminal-এ পরিণত করিত বলিয়া C.I.D.-কে বলা হইত Criminal Incubation Department। এই দুই জেঞ্জীর মধ্যে দ্বিতীয় জেঞ্জী (স্বরজু) হইতেই পটুতম লোকেরা আসিত। তাহার একটি কারণ যে, এইরূপ নীচ ও ভুল্য কর্মে তাহাদের কোনও প্রকার হানিবোধ সম্ভব ছিল না এবং ভ্রমবংশীয় ও শিক্ষিত ছেলাদের উপর ভীষণ আক্রমণ ছিল।

এই দুই জেঞ্জীর মধ্যে মনস্তত্ত্বগত একটি সাদৃশ্য ছিল—যাহাকে inferiority complex বলে। রাম শ্রাবের নিকট মাথা তুলিয়া কথা কহিতে পারে না। কারণ হয়তো—শ্রাম আভিজাত্যে, ধনে বা বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ, বা শ্রাবের নিকট রাম বহুপ্রকারে (হয়তো পুরুষাত্মকরূপে) উপকার পাইয়াছে, বা শ্রাবের ছেলেরা ভালোভাবে লেখাপড়া করিতেছে। ইহাতে রামের পুত্র মনে ভারি কষ্ট পায়। কাজেই তাহার চেষ্টা কি করিয়া শ্রামকে খাটো করিবে বা বিপদগ্রস্ত কতিগ্রস্ত করিবে। বদেদী আন্দোলনের সময় এইরূপ ‘দাদতোলা’ কাজের সুবিধা এবং তাহাতে অর্থপ্রাপ্তি বেক্রম হইয়াছিল, অতীত সময়ে ছাড়া অন্য কোনও সময়ে সেক্রম বোধহয় হয় নাই। এই কারণেই তখন লোকের মনে দ্বির ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে C.I.D. report হইতে discount বাহ বেওয়া উচিত অন্ততঃ শতকরা ১০ ভাগ, এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে শতকরা ২০ ভাগ। (কিন্তু

বিলম্বীয়া C.I.D.-র লোকদের সম্পর্কে অর্থাৎ তাহাদের উৎপত্তি, পারিবারিক ও পারিণামিক অবস্থা ও ক্রিয়াপদ্ধতি সম্বন্ধে যে খবর রাখিত, তাহা তুল হওয়া সম্ভব ছিল না, বলিলে অত্যাধিক বোধহয় হইবে না। কারণ ঐ সমস্ত খবরের মাধ্যমের উপর নির্ভর করিত বিলম্বীদের কার্যক্রমের অব্যাবহিত এবং তাহাদের নিজেদের ও দলের নিরাপত্তা।)

এখানে একটি সভ্য ঘটনা উপাহরণরূপে বলি—Denham নামে C.I.D.-র একজন পদস্থ লোক আমাকে বলে—“Do you think we are prosecuting you for Zid?” আমি উত্তর দিই—“That’s not for me to say. But you are prosecuting me on the basis of certain information given to you by your informers. Are you quite sure that no part of it was given to you to pay off old scores against me?” উত্তরটা বোধহয় অপ্রত্যাশিত হইয়াছিল, কারণ লোকটা বেশ ধতমত হাইয়া গেল এবং আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

হালিও পায় চুঃখও হয় বখন দেখি যে এই দ্বিতীয় অর্থাৎ ‘স্বরজু’ জেঞ্জীর কোনও কোনও লোক প্রচুর Secret service money ব্যবহারে দল পাকাইয়া aristocrat হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই aristocrat হওয়ারটা কিন্তু চৈনিক পদ্ধতিতে। চীন-বাসিত্ববিশিষ্ট দেশে কেহ যদি রাজাত্মগ্রহে উন্নীত হয়, তাহা হইলে সেই অল্পসারে মর্যাদা পায় তাহার বংশধরগণ। কিন্তু চীনে নাকি ঠিক উল্টা—অর্থাৎ কেহ উন্নীত হইলে তাহার পূর্বপুরুষগণ উন্নীত এবং সে নিজে সেই উন্নীত পূর্বপুরুষদের বংশধর বলিয়া বিবেচিত হইত। এখানেও এই aristocrat-দের হীন বা ‘আবিকৃত’ পূর্বপুরুষগণকে উন্নীত করিবার চেষ্টা হইতেছে। সহায়—আত্মসাৎকৃত প্রচুর Secret service money। তখন শুনিতাম যে ইংরাজ নিজ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এমন কেপিয়া

গিয়াছিল যে প্রচুর Secret service money (অর্থাৎ আমাদেরই টাকা) বে-দরদ বে-হিসাব খরচ করিত আমাদেরই দেশের ছেলে-ছোকরাগিকে নৈতিক অধঃপাতে নিবার জন্য, এবং Accountant General, Auditor General-এর সে সম্বন্ধে—অর্থাৎ কত টাকা কোথায় গেল কিছু বলিবার অধিকার ছিল না।

এই সম্পর্কেই একটি কথা মনে পড়িতেছে। ‘বাবা যতীন’ নামে সর্বজনপরিচিত এবং পূজ্য যতীন মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষমূর্তি এখন আজাদ-হিন্দ-বাগে প্রতিষ্ঠা হয়, তখন সেখানে যাইতে অস্বস্তি হইয়াছিল। কিন্তু যাই নাই, কারণ ভাবিলাম হয়তো কোনও স্বয়ম্ভূ aristocrat-কে দেখিব খন্দরে কুণ্ডিত বিরাজমান এবং তাঁহার বক্তৃতাগুলি, যে তিনি দেশের ও দেশের জন্য নিজ অনুলা সময় (প্রাণ নহে) বিসর্জন দিয়াছেন এবং আরও দিতে প্রস্তুত আছেন, তখন আমার পক্ষে বৈধ রাখা শক্ত হইবে। মনে পড়িবে—What you are speaks so loud that I cannot hear what you say।

এই সময় সি.আই.ডি.-র আর একটি কাজ—যে সমস্ত পাড়া সি.আই.ডি. ভাষায় ‘গরম পাড়া’ ছিল, সেখানে সমস্ত দিন এবং রাত্রি দশটা-এগারোটা পর্যন্ত নানাপ্রকার ফেরিওয়ালা একের পর এক পাঠানো। ‘গরম বাড়ী’র দরজার সামনে অনেকজন হাঁকা। বিক্রয় কত হইত বোকা শক্ত নহে।

এই সময়েই আরম্ভ হয় আর একটি সর্ধনেশে ধাড়া—মূল-কলেজের ছেলেদের সি.আই.ডি.-তে ভর্তি করা। এক্ষণ হইয়াছে—ছেলেকে পুলিশ ধরিল, বাপ বেচারী ছুটোছুটি করিয়া মরে। শেষে একজন সি.আই.ডি.-র লোক সহানুভূতি অনুভব করিয়া বাপকে বলিল—“আমরা কি করিব? আপনার ছেলের best friend তাহার বিরুদ্ধে খবর দিয়াছে।” এই best friend হয়তো এই জম্মলোকের বাড়ীতে প্রায় আসে এবং তাঁহার স্ত্রী নিজ পুত্রকে ও এই ছোকরাকে একসঙ্গে বসাইয়া খাওয়ান। ক্রমে

অল্প অল্প স্থানেও এই ধাড়া ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এইজন্য তখন লোকে বলিত যে ‘করিংকর’ হিসাবে তৎকালীন রাশিয়ার সম্রাটের সি.আই.ডি. Okhrana-র পরই ইংরাজের ভারতীয় সি.আই.ডি.-র স্থান।

এইরূপে এই ব্রিটিশ ইন্টিয়ান সি.আই.ডি. ও তাহার Secret service money তখন দেশে যে পরিমাণ ক্ষত ও গভীর নৈতিক অবনতি আনিয়া দিয়াছিল, তাহাতে তাহাকে ‘ময়তানের বড় ভাই’ বলিলে তাহার অসম্মান বা অত্যাধিক হইবে না।

তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে এইপ্রকার দেশভ্রোহিতা, জাতিভ্রোহিতা অ-স্বাভাবিক unnatural? মোটেই নহে। তখন তাহা কিছু হয়, তাহার মধ্যে অপ্রিয় বেশ কিছু থাকে, অপ্রিয় ব্যক্তিগত ভাবে বা জাতিগত ভাবে। অপ্রিয়ই হউক বা প্রিয়ই হউক, কিছুই অ-স্বাভাবিক নহে। প্রতি জিনিসটি প্রাকৃতিক নিয়মামুসারে হয় এবং তাহা ভিন্ন কিছুই হয় না। এক্ষণ ‘unnatural’ প্রকৃতি একান্ত ভ্রান্ত কথা।

একটু প্রদীপন করিলে দেখা যায় যে সমাজ-ব্যবস্থা কিছুদিন চলিবার পর আবর্জনাপূর্ণ হইয়া পড়ে ও তক্ষণ বার্থতা ও নানাপ্রকার অকল্যাণের কারণ হয়। তখনই যুগান্তর হওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধি হয় এবং পুরাতন ও বার্থ যুগের স্থলে নূতন ও সার্থক যুগের প্রতিষ্ঠার জন্য এক মহানানবের আবির্ভাব হয়। তিনি এই যুগান্তরের একান্ত আবশ্যকতারূপে সত্য উপলব্ধি করেন এবং তাহার সঙ্গে ইহাও উপলব্ধি করেন যে পুরাতন যুগ, রানিপূর্ণ ও বার্থ হইলেও, সহজে ছাড়িবে না; এবং নূতন যুগ প্রেমের দ্বারা আনা যাইবে না, তক্ষণ বল একান্ত প্রয়োজন। মনে পড়ে মহাবাক্য “তন্মাদাহর্ষণং সত্যাদোগীযঃ” এবং এক মহানানবের বচন Force is the midwife of progress delivering the old pregnant with the new. তখন তিনি ঐ সত্যের উপলব্ধি ও বলের দ্বারা দীপ্ত হইয়া নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হন।

কিন্তু এমনই প্রাকৃতিক নিয়ম, এই নীপুন্ত্রির আবির্ভাব হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীচ অন্ধকারের আবির্ভাব হয়। এই কথাই এদেশের পশ্চিমাকালে কহাবৎরূপে প্রচলিত—“চিরাগ কা নীচে অন্ধার”। ইহাদেরই সাহায্যে বার্ষিক সার্বভূমি-আনয়নে বাধা দিবার চেষ্টা করে এবং এই অবস্থায় নানাপ্রকার অব্যাহতীয় ব্যক্তি এই বাধা দেওয়ার কার্যে যোগ দেয়। যেনন দেখা গিয়াছিল রাশিয়ান সম্রাটের আমলে Okhrana-তে এবং তৎপরে Soviet-এর প্রথম আমলে নান-পরিবর্তনে Cheka-তে (যাহা ক্রমে ক্রমে নান-পরিবর্তনে হইয়াছে NKVD ও বর্তমানে MVD)। এই Cheka সম্বন্ধে একখানি সম্প্রতি প্রকাশিত পুস্তক (Wolin and Slusser—*Soviet Secret Police*) হইতে উদ্ধার করি—“A high-ranking Chekist, Martin Latsis, later complained that ‘work in the Cheka, conducted in an atmosphere of physical coercion, attracts corrupt and outright criminal elements which, profiting from their position as Cheka agents, blackmail and extort, filling their own pockets....However honest a man is, however crystal clear his heart, work in the Cheka, which is carried on with almost unlimited rights and under conditions greatly affecting the nervous system, begins to tell. Few escape the effect of the conditions under which they work.’” ব্রিটিশ ইন্ট্রিয়ান সি.আই.ডি.-তে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল বলিয়া বনে হয় না। কিন্তু ইহা অনবীকার্য যে রাষ্ট্রশক্তি চালনা করিতে হইলে চর একান্ত আবশ্যিক। রাজা ‘চ্যারলস্’, বাহা কিছু দেখেন বা শুনে চরর চক্ষুঃস্রোত দ্বারা। অতঃপায়ে যে ইঙ্গও চর পাঠাইয়াছিলেন সরমাকে পশিদিগের মধ্যে। এখন

এই চর যদি পিত্তন হয়, অর্থাৎ স্বাধাধভাবে লোকের দোষগুণ জ্ঞাপন করে, তাহা হইলেই মঙ্গল। কিন্তু যুগান্তরের সময় বিরোধ-বিপর্যয়ের মুখে পিত্তন ক্রমে সূচক হইয়া পাড়ায় : স্বার্থাত-দেবাদ হইয়া, টাকার কল্প বিবেকবুদ্ধি হারা হইয়া, অন্ধবিস্তার অতিরিক্ত বা একেবারে কল্পিত ‘রিপোর্ট’ দাখিল করিয়া সত্যকে গোপন বা বিকৃত করিয়া লোককে বিভ্রান্ত ও বিপন্ন করে। তখন নানাপ্রকার অনর্থের সৃষ্টি হয় এবং সমগ্র জাতি ও দেশ ভীষণ সংকট ও বিপদের সম্মুখীন হয়।

ব্যক্তিগত ভাবে ও জাতিগত ভাবে ‘গায়ে লাগিয়াছে’ বলিয়াই এত কথা তীব্রভাবে বলিলাম। কিন্তু নিজেই আশ্চর্য হই যে, শাস্ত্র-ব-শু চিন্তে এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিলে বেশ উপলব্ধি হয় যে এই মহানানব ও সূচক বস্তুতঃপক্ষে নিলা-প্রশংসার অতীত। এই আলো ও অন্ধকার, এই মহান মহা-মানব ও ঘৃণ্য সূচক উভয়েই অনন্ত, অজর, অ-কারণ, সর্বপরিচূ ‘কাল’-এর যমজ সন্তান। প্রথমের সঙ্গে-সঙ্গেই দ্বিতীয়ের আবির্ভাব অবশ্যস্বাভাবী ও অবারীয়ায়।

তাহা বোধহয় স্থানে স্থানে তীব্র ও তিক্ত হইয়াছে। কিন্তু উপায় নাই। বরূপ অমৃতব করিয়াছি সেইরূপ লিখিয়াছি। এই সম্পর্কে মনে পড়িতেছে যে অনেকদিন পূর্বে আমার একটি প্রস্তেয় চিন্তাশীল বন্ধুর নিকট কোনও ‘দেশ’-বিখ্যাত লোকের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তীব্রভাবে বলি, তখন তিনি নীরব ছিলেন। তখন পছন্দ করেন নাই। কিছুকাল পরে ঐ লোকের ‘ক্রিয়াকলাপ’-এর বিষয়র ফল প্রকট হইলে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি তীব্রতর তিক্ততর ভাষা প্রয়োগ করিলে তাহা অস্তায় বা অসঙ্গত হইত না। আরও বলি “করি মাত্র স্বরূপবর্ধন”। আমার বর্ণিত ঘটনাগুলির কোনও অংশ অসত্য বা রঞ্জিত নহে।

উদ্য : গত আশাঢ় সংখ্যা ‘বহুধারা’র ৩২২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলাম (column)-এর ২৪-সংখ্যক পঙ্ক্তিতে ‘smug’ ছাপা হইয়াছে : উহা smug হইবে।

ছোট-খোঁট

• ** চারুচন্দ্র ওট্টোচার্য ** •

আটম বোমা বনাম হাইড্রোজেন বোমা

এই তিনটে কথা সকলেই জানে—

(ক) আটম বোমা খুব ক্ষমতালালী ;

(খ) হাইড্রোজেন বোমা তার চেয়েও বেশি
শক্তিশালী ;

(গ) হু-এর মূলে আছে আণবিক শক্তি ।

কিন্তু আটমীয় শক্তি সৃষ্টি পায় ছোটোতে
হু'রকমে । প্রথমটায় শক্তি পাওয়া যায় আটম
ডাঙার ফলে, দ্বিতীয়টায় শক্তি মেলে আটম ছুড়ে
যাওয়ায় । আর একটা বড়ো কথা আছে । আটম
বোমার সাহায্য না পেলে হাইড্রোজেন বোমা
ফাটে না । অবশ্য ফাটানো যেতে পারে যদি ওই
হাইড্রোজেন বোমাকে সূর্যের অভ্যন্তরে নিয়ে
যাওয়া যায় । সূর্যের অভ্যন্তরে, তার মানে ?
বলছি সে কথা ।

আগে আটম বোমা আবিষ্কৃত হল, পরে দেখা
দিয়েছে হাইড্রোজেন বোমা । কিন্তু হাইড্রোজেন
বোমার তবু বিজ্ঞানী ভেদেছিল আটম বোমা তৈরি
হবার আগে । সূর্যে যে প্রচণ্ড উষ্ণতা, তা কন্ডাচ্ছে
কি করে ? আগে অনেক রকম চর্চনা করনা
হয়েছিল, শেষ অবধি বিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্তে এসে যে,
সেখানে হাইড্রোজেন-হাইড্রোজেন আটম মিলে
গিয়ে হিলিয়াম আটমের সৃষ্টি হচ্ছে, তারই ফলে ওই
প্রচণ্ড উত্তাপ । সূর্য যা পারছে, পৃথিবীতে মানুষ তা
পারবে না কেন, ওই হাইড্রোজেন-হাইড্রোজেন
মিলিয়ে হিলিয়াম করা । পারতে পারে যদি
সেখানকার উষ্ণতা ও চাপ মানুষ পৃথিবীতে সৃষ্টি
করতে পারে । এতদিন সে পারেনি । কিন্তু
হিরোসিমাতে যেদিন আটম বোমা পড়ল সেদিন

বিজ্ঞানী দেখল, সূর্যে যে তাপ ও চাপ এই বিস্তারণে
তা দেখা দিল ।

এখন আটম বোমার কথায় আসা যাক ।
আটম বোমার মূলে আছে অনেকগুলি আবিষ্কার ।
প্রথম, আটম অবিভাজ্য নয় ; দ্বিতীয়, কয়েক
প্রকারের আটম আপনা-আপনি ফাটেছে ; তৃতীয়,
পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে । এখন এই
তিনটি বিষয় একে একে আলোচনা করা যাক ।

গেল শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিবিধ রাসায়নিক
প্রক্রিয়া নীমাঃসা করত আটম ও মলিকিউলের
কল্পনা করা হল । একটি মৌলিক পদার্থ বহুসংখ্যক
আটমের সমষ্টি, ওইসব আটম ছবছ এক, তারাই
হল ওই মৌলিক পদার্থটির শেষ অবস্থা, তাদের
আর ভাঙা যায় না । এর পর দেখা গেল আটমরা
কল্পনা নয়, তারা বাস্তব পদার্থ ; অতি ক্ষুদ্র হলেও
তাদের আয়তন আছে, তাদের ভর আছে ।
সে আয়তন ও ভর নিরূপিত হল । গেল শতাব্দীর
শেষভাগ অবধি বিভিন্ন রকমের আটম বিশ্বের মূল
উপাদান বলে পরিগণিত হল ।

এর পর দেখা দিল ডে. জে. টমসনের পরীক্ষা ।
এই পরীক্ষায় পাওয়া গেল ইলেকট্রন । সবচেয়ে
হালকা যে হাইড্রোজেন আটম, দেখা গেল, একটি
ইলেকট্রনের ভর তারও প্রায় দুইভাগের ভাগের এক
ভাগ । আরও আশ্চর্যের বিষয় এই, হরেকরকম
পদার্থের আটম তো রয়েছে, কিন্তু যে আটম থেকে
পাওয়া যাক না কেন, ইলেকট্রনরা সব সমান ।
আটমকে আর অবিভাজ্য বলা চলল না । এই
সময়কার এক কৌতুককর গল্প আছে । লর্ড

কেলভিনকে তাঁর এক ছাত্র জিজ্ঞাসা করে—আপনি কি শুনেছেন অ্যাটমকে ভাঙা হয়েছে। কেলভিন উত্তর করলেন—অ্যাটম ভাঙা, অসম্ভব! ঐক্য ভাষায় অ্যাটম নামে হল যা ভাঙা যায় না। উদ্ভূত ছাত্র বলে কেলস, ঐক্য জানার বিপরীত।

দেখা গেল, ইলেকট্রন নেগেটিভ-তড়িৎযুক্ত। এখন কথা উঠল, একটা গোটা অ্যাটম তড়িৎহীন, ওর একটা অংশ হল ইলেকট্রন, ইলেকট্রন নেগেটিভ-তড়িৎযুক্ত, সুতরাং অ্যাটমের অগ্র একটা অংশ ধাক্কা খাবে যা পজিটিভ-তড়িৎযুক্ত। বিবিধ পরীক্ষা হতে ইলেকট্রন ছাড়া অ্যাটমের আর দ্বিতীয় পদার্থের সম্ভাবনা মিলল। একটা অ্যাটমের চিত্র এই রকম পাড়াল। কেন্দ্রে আছে নিউট্রন ও প্রোটন, এদের বেঠেন করে ঘুরছে ইলেকট্রন। নানা প্রক্রিয়ায় একটা অ্যাটম থেকে তার বাইরের ইলেকট্রন ভাঙান যায়। কিন্তু কেন্দ্রকটি অটুট, তাকে ভাঙা যায় না। একটি সোনা-অ্যাটমের কেন্দ্রকে যতগুলি নিউট্রন প্রোটন আছে, সীসা-অ্যাটমের কেন্দ্রকে তাদের সংখ্যা ভিন্ন। আর যেহেতু কেন্দ্রক ভাঙা যায় না, তাই সোনা চিরদিন সোনা, আর সীসা বরাবরই সীসা।

মামুষ ভাঙতে পারল না, কিন্তু প্রকৃতিতে কয়েকটি অ্যাটমের কেন্দ্রক আপনা হতে ফাটছে; যেনন ধরা যাক—ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম। এই ভাঙনের ফলে তেজ নির্গত হচ্ছে, এক অ্যাটম অগ্র অ্যাটমে পরিবর্তিত হচ্ছে।

এখন প্রকৃতিতে যেটা হচ্ছে, বিজ্ঞানী বলল, আমরা যন্ত্র সাহায্যে তাই করব—কেন্দ্রক ভাঙব, এক পদার্থকে অগ্র পদার্থে পরিণত করব। ছটরা হিসেবে অতি ক্ষুদ্র অণু প্রচণ্ড বেগবান কণিকা নিতে হবে। শেষ অবধি সে ব্যবহার করল নিউট্রন, আর তার উদ্ভাবিত যন্ত্র সাহায্যে তাকে বেগবান করল।

গোড়ায় আমরা যে তিনটি কথা ধরেছিলাম এবার তার শেষটায় আসা যাক। অ্যাটমীয় শক্তি। পদার্থ অবিনশ্বর, তার ভ্রাসও নেই রুদ্ধও নেই, বহুদিন থেকে বিজ্ঞান এই মতবাদ গ্রহণ করে আসছিল।

আইনস্টাইন বললেন, কথাটার একটু পরিবর্তন করতে হবে। তিনি বললেন, পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়; নির্দিষ্ট পরিমাণ পদার্থের বিলোপে কি পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হয় আইনস্টাইন তারও একটা হিসেব দিলেন। প্রচণ্ড এ শক্তি।

এখন বিজ্ঞানী ২৩৫-অ্যাটমীয় ওজনের ইউরেনিয়াম নিল; বেগবান নিউট্রন এসে তাকে আঘাত করল; ইউরেনিয়াম ভাঙল; কিন্তু এই ভাঙনে কিছুটা পদার্থ লোপ পেল; ফলে প্রকৃত পরিমাণ শক্তি মূর্ত হয়ে দেখা দিল। ২৩৫-ইউরেনিয়ামের পরিবর্তে ওই ২৩৫-ইউরেনিয়াম সাহায্যে প্রাপ্ত ধ্রুটোনিয়ামও ব্যবহার করা চলে। যা হোক, অ্যাটম বোমার মূল কথা হল এই। কথাটা সোজা, কিন্তু কাজটা মোটেই সোজা নয়। প্রথম, নিউট্রন রূপ ছটরা পেতে হবে; দ্বিতীয়, তাকে বেগবান করতে হবে; তারপর ২৩৫-ইউরেনিয়াম থেকে ২৩৫-ইউরেনিয়াম পৃথক করে কেলতে হবে; সে এক বিশেষ কঠিনসা ব্যাপার। তবে একটা সুবিধার কথা আছে। ভাঙলে, নতুন নিউট্রন জন্মায়, এই রকম ধারাবাহিক চলতে থাকে; সুতরাং মাছের তেলে মাছ ভাজা হয়। যা হোক, যে বিস্ফোরণ হল তাতে উষ্ণতা ওঠে কয়েক কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে, সূর্যের ভিতরকার উষ্ণতার চেয়েও বেশি; চাপও সেখানকার মতো।

এইবার বিজ্ঞানী দেখল যে ওই উষ্ণতা ও চাপের গায়ে ও অ্যাটমীয় ওজনের (২৩৫-এর মিলিয়েও চলতে পারে) হাইড্রোজেন থাকে, তবে সেই হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়; এখানেও পদার্থের বিলোপে শক্তির প্রকাশ হয়। সুতরাং হাইড্রোজেন বোমাকে কাজ করাতে হলে তার পাশে অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ ঘটতে হবে।

হাইড্রোজেন বোমার প্রচণ্ডতার কথা ভেবে পৃথিবীবাসী আতঙ্কিত হয়েছে; চিন্তা করছে কি করে এই মারণাস্ত্র তৈরি বন্ধ করানো যায়। কিন্তু যে অগ্র কয়েকটি জাতি এগিয়ে গিয়েছে তারা অপরের হিতবাক্য শুনবে কেন?

কেন মধুসূদন মহাকবি নন ?

ডক্টর শীতান্ত মৈত্র, এম.এ., ডি.কি.স.

মহাকাব্যের বা মহাকবির মতন কি এ নিয়ে তর্কাতর্কি অনেক হয়েছে এবং হচ্ছে করলে এখনও করা যেতে পারে। কিন্তু বাংলা নিয়ে বিবাদ করে কোন লাভ নেই, কেননা বাংলা নির্ণয় করা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের কাজ, এবং তাঁরা সেই সংজ্ঞার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ করে তাঁদের সিদ্ধান্তে পৌঁছান। সে সিদ্ধান্ত ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। সাহিত্য বা কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্তই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ত নব্বই বরং একান্ত ব্যক্তিনির্ভর। সাহিত্য হ'ল সত্ত্বস্ব স্বরূপ-সংযমী। তাই সংজ্ঞা মিলিয়ে এখানে মূল্য নিরূপণ অসম্ভব। সংস্কৃত সাহিত্যের অলম্ব্য-সর্বস্বতার দৃশ্যে এবং কেবল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহলে এখনও কোন কাব্যের উৎকর্ষগণকর্মের বিচার পরিপূর্ণ হত এবং হয় অলম্ব্য-বিচারে। ঠিক ঠিক অলম্ব্যের প্রয়োগ হলোই তাকে কাব্য বলতে হত। বাক্য: অলম্ব্যতঃ কাব্যঃ— এই মনোভাষ্যেই পরিচায়ক। আনন্দবর্ধনের ধর্মবিধায় এই বহিরঙ্গ-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে সার্বক প্রতীতি। ধর্মবিধার মূল কথা হ'ল এই যে, ত্রুটি বিধি মানলেই রস সৃষ্টি হয় না; বিধি ছাড়া এখন কিছু চাই বা নকসে নাড়া দেবে। অতএব ক্ষুদ্রমনের তর্কাবিত্ত মহাকাব্য মেঘনাদবধ-এর আলোচনা করতে গিয়ে বিধির বা নিয়মের কথা তোলা একেবারেই অগ্রাসঙ্গিক মনে করি। তা ছাড়া এ কথা বাংলাবেশের যে কোন বি. এ. পাস করা ছেলে জানে যে মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যের আঙ্গিক সম্পর্কে একেবারে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি স্বাক্ষরায়ণ বহুকে, গ্রন্থ সম্পূর্ণ করার আগেই, গিখেছিলেন, "I think I have constructed the poem on the most rigid principles and even a French critic would not find fault with me." অবশ্য এখানে স্মরণীয়, তিনি পটনির্ভিত্ত প্রতীচাকেই অঙ্গসরণ করেছেন, আমাদের স্বাভাব্য মহাকাব্য বা ত্রুটিগণকে অঙ্গসরণ করেন নি। কি বিচারে, কি মাধব-নির্বাচন, কোন বিষয়েই তিনি আমাদের সৌন্দর্য ধারা গ্রহণ করেননি। অতএব আঙ্গিক বিচার থাক। রামায়ণ এবং মহাকাব্যত যে ভারতীয় মর্যাদা এখনও ব্যোমে আছে সে কি ভার আঙ্গিকের সৌন্দর্যের জন্য? যে কারণে আমরা এখনও রামায়ণ-মহাকাব্যতে আনন্দ পাই (ছাঁপের বিষয় কৃত্তিবাস এক কবিরামের মাধ্যমে),

যে কারণে এখনও হোমার এবং দান্টে অম্ব্যবাসে পড়ি, সেই কারণে কি আমরা এখনও মেঘনাদবধ কাব্য পড়ি? অর্থাৎ মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য আমাদের মনে কি তেমন ব্যাপক সাড়া জাগায়, যেমন জাণে কালীদাসের অথবা মেঘনাদবধ পড়লে বা রাক্ষসের বোসের মূল্যহাবাসে রামায়ণ পড়লে? এ কথা ঠিক যে সমসাময়িকের কাছে থেকে মধুসূদন নিখা পেয়েছিলেন, স্থগাতি পেয়েছিলেন প্রচুরতর। সেরকম স্থগাতি আজকের কোন কবি আলা ত করতেই পারেন না, এমন কি রবীন্দ্রনাথও পারেনি। সে স্থগাতি কিন্তু মূলত মহাকাব্য রচনার অঙ্গ নয়—সে স্থগাতি আঙ্গিক বিষয় চর্চিত। সেই বিষয় আজকে আর নেই। কেউ যদি তবের কথা ভুলে বলেন যে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মহাকাব্যের মৃত্যু হয়; তাই বাংলার মনঃগণের দৃশ্য কীভাবে সেই প্রথম অঙ্গলান আজ আর আমাদের কাছে তেমন ঈর্ষিত নয়; তাহলে বলব যে এ কথাটা মিছক তবই। কেননা মিলটন না পড়লেও আমরা আজও হোমার এবং দান্টে পড়ি, ব্যাঙ্গ-বাস্তবিক ত কথাই নেই। মহাকাব্য ইউরোপে মিলটনের পরে আরও একজন সৃষ্টি করেছেন— অবশ্য পদ্যাহুগতিক এপিকের কর্মে নয়, কিন্তু এপিকের মতনই ক্যান্টনায়—তিনি গোটো। আমাদের বেলে মধুসূদনের পরেও অনেক স্টো হয়েছে। কিন্তু না মধুসূদন, না হেমচন্দ্র, না নবীনচন্দ্র কেউই সত্যিকারের বহু কাব্য রচনা করতে পারেননি।

মেঘনাদবধ কেন মহাকাব্য নয়, এ বিচার আজ সাহল করে করতে হবে। মধুসূদন আমাদের গৌরব। তিনি নৃত্য আঙ্গিক ও নৃত্য রূপকল্পের (form) প্রবর্তক। তিনি বাংলাভাষায় নব-প্রাণ সঞ্চার করেছেন। ঈশ্বর বলেন মধুসূদন বাংলা জানতেন না বা মধুসূদনের ব্যাতি বাংলা-সাহিত্যে 'দুর্গরতম কুল্যকার' তাঁরা মেঘনাদবধের সৌন্দর্য বোঝা ত মূলের কথা, 'বুড়া শালিক' বা 'একেই কি বলে সভ্যতা'ও হয়ত পড়েননি। বাংলাভাষায় তৎসম ও তৎস্ব নামের এবং এদের সঙ্গে দেশজ নামের মিশ্রণ সাহিত্যিক প্রয়োগে কী রূপ নেবে তার প্রথম পঞ্চদর্শক মধুসূদন (অবশ্য বিভাগগণের অগ্নিশোণা ও ন বীকার করে)। বাংলাভাষায়

দুই ইপ্সন প্রথম তিনিই সেন। বোহাননা কাব্যে এই স্মৃতিস্তম্ভ জাচার প্রকাশকমতঃ চূড়ায় প্রকাশ। বেহনাগধ কাব্যে নাম-ব্যতীত এবং স্নান-কারের হানে হানে অস্তিপ্রয়োগ আর তৎসম লক্ষ-বাহন্য সেখা ঠাট্টা এতদিন পরে বাঙালীকে বোকাতে আসেন মধুসূদন বাংলা জানতেন না, কিন্তু তাঁরা মিঃজা জানেন, তাঁরা বাঙালীর কুপার পাত্র, প্রচার পাত্র নন। তাঁরা এ কথা কুলে যান যে ভাষার হৃদয় কমতা আবিষ্কারের পোষ মধুসূদন কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্রাজান হাতিয়েছেন যেমনসং কাব্যে, কিন্তু কোন কবি যাকে মাঝে মাত্রাজান হারান না? শেক্সপীর ত হারাতেনই, মিলটনও। তবু মধুসূদনের এই ভারসাম্য হারানোর পিছনে কোন *tour de force* নেই। তিনি রাজস্বাধ্যক্ষক লিখেছেন, "The thoughts and images bring out words with themselves,—words that I never thought I knew. Here is a mystery for you." এ কথা অবিচল করার মূখ্যসংস্কৃতের কি কারণ আছে?

মধুসূদন এত করেছেন : চরুপদ্যের এক অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তন করেছেন; প্রথম সত্যিকারের লিঙ্গিক লিখেছেন; পরকাব্যের শুরু করেছেন : প্রথম সার্থক প্রহসন লিখেছেন : প্রথম পৌরাণিক নাটক লিখেছেন, *tragedy*-ও। তবু তিনি মহাকাব্য লিখতে পারেননি। মহাকবি তিনি নন।

তার প্রথম কারণ, যে বাস্তবতা বা *realism* তিনি প্রহসন রীতিতে বেনে নিয়েছেন, এমন কি বীরাদনা কাব্যের প্রচলিত রসকল্পের (*conventional pattern*) মধ্যেও যে আবেগের যাবতী ধরা পড়েছে, বেহনাগধ কাব্যের হানে হানে ছাড়া, সে *realism*, এ নর সর্বের কাব্যের মধ্যে যেন অস্বীকৃত। জামল আর্চর্ড মাগে যে, যে Pope-এর কাব্যকে তিনি হুগা করতেন, সেই Pope-এর 'রা' ঐ ধারার কাব্যের *poetic diction*-কে তিনি আসল অস্বভাবের এবং আসল আবেগের পরিপূর্ণ পরিবর্ত বা বিক্ষম বলে গড়ে নিয়েছেন। অথচ Pope-এর *poetic diction*-এর সূত্রে মধুসূদনের স্বাভাবিকতা-পার্শ্ব্য আছে। Pope-এর স্তম্ভিতা ও বার্ণনা, Pope-এর আবেগপূর্ণ নিকটাত্ম ভাষা মধুসূদনের নর, কেননা Pope-এর হুগ ইংরেজী রেনেসাঁয়ের পরে আর মধুসূদন বাঙালীর রেনেসাঁয়ের শুরু। এই কাব্যবাণী বা *Poetic diction* বাকরণ কামিগান-পরবর্তী অসংসার-সর্বসংস্কৃত কবিতাও মধুসূদনকে প্রচুর প্রভাবিত করেছেন। এক প্রতীচ্যের মহৎ কবিতার মধ্যে হোমার বা হাতে মধুসূদনের আর্শ নন; আর্শ সেই ঐশ্বর্য প্রথম শতাব্দীর রোমক কবি ভার্জিল, ধার ভাষার

চিহ্নপতা ও বৈদ্যুতাই আমাদের আগে টানেন। হোমারের পরে শান্তকৌই প্রতীচ্যের স্তম্ভে মহাকবি বলা হয় এবং এই দুইজনেরই *realism* বিষয়ক। জীহ্বনের সূত্র ভগতি এমন ক'রে চোখের সামনে তুলে ধরার ক্ষমতার অধিকারী মধুসূদন ছিলেন না। এই *realism* শুধু যে তাঁদের চরিত্র-চিত্রণেই প্রকাশ পেত তা নয়,—প্রতি-বর্ণনা, ঘটনা-বর্ণনা, কথোপকথন, এমন কি একটি অসংসার-প্রয়োগে পর্যন্ত প্রকট হ'য়ে উঠত। এদের কবিত্বমূল্য ছিল বাস্তব-কেন্দ্রিক, স্ব-জ্ঞান থেকেই তা উৎসারিত হ'ত। এ কথা বাস্তবিক এবং ব্যাপ সন্দেহে বোধ হয় আরও বেশী ক'রে প্রযোজ্য। একটা উদাহরণ নিম্নেই কথটা স্পষ্ট হবে।

মহাভারতের বিঘটি-পর্বের শেষে ভীমকে পর্বত শাস্তি ও সচ্ছিকারী দেখে হুগিতা হৌগনী যে ভরীতে বা বললেন ক্রুদ্ধক, তা শুধু হৌগনী-চরিত্রাহরণই নয়, তা বর্ণনার বাস্তবতায় বেন আমাদের প্রত্যক হয়। অথচ এই হৌগনীকে কামিগান বহল পরিমাণে সেকালের বাঙালী গৃহস্বামী বানাতে কহর করেননি। কিন্তু ব্যাঙ্গক একবার তখন। পার্শ্ব ইত্যাদিকে বিচ্ছিন্নে একত্রেকার হৌগনী আবার বলছেন :

ইচ্ছাকৃত মৃদল-হাস্যঃ কুঞ্জিনাগ্রঃ স্বপ্ননম্।

স্বনীসমলিতাশারী সর্বগন্ধাবিসাভিতম্।

সর্বলক্ষণসম্পন্নঃ মহাত্মজগবদনম্।

কেশপক্ষঃ বরারোহা গৃহ বাসেন শাবিনা।

পত্নীকী পুণ্ডরীকাকম্পিত্যঃ গন্ধগামিনী।

অস্ত্রপূর্ণেক্ষণা কৃষ্ণা কৃষ্ণাঃ বচনময়ীং।

অথচ পুণ্ডরীকাক হৃদ্যশানকসৌভূতঃ।

সর্বভাঃ সর্বকার্ণেযু গরযাঃ সচ্ছিকিত্তা।

এখানে হৌগনী কি বলছেন তা শুনবার আগেই, বা হাত দিয়ে তিনি ঘোরকালো চুলের গুচ্ছ কেমন ক'রে ধ'রে কুঙ্কর লক্ষণ এসে-বাড়ালেন, সেই চিত্রটি শুধু আমাদের মূহ করে না, আমরা অথক হয়ে ভাবি যে ঐ ভরী হৌগনীই বোপা এবং ঐ ভরীতে না ঠাড়ালে বেন আমরা ঠিক হৌগনীকেই পেতাম না। যে হৌগনীকে বেন একা সেন-ময়ত্রণ বলেছিলেন, 'তোমার পাশে অস্ত্র গ্রীসোকসের বানরী বলে মনে হয়' এবং যে অস্ত্রময় হৌগনী এক ধাক্কা ধরানীক করেছিলেন, যিনি প্রচলিত হস্তাশ্রয়মুক্তা, তাঁর মহাত্মজগদগুণ কুঞ্জিনাগ্র কেশলক্ষণ ঐ-হাতে ধরার যে কি অর্থ তা একমুহুর্তে আমাদের সামনে চক্ষু গঠে। কিন্তু ব্যাপ কত সংজ্ঞাব্য। তিনি চরণে তিনি হৌগনীকে বর্ণনা করেছেন এবং সেইটাই বর্ণনা করেছেন বেটুই এই

বিশেষ উপলক্ষ্যে বিশেষ অর্থবান। হুঃশাসনকরোক্ত সেই ক্ষণ তিনি স্বামীদের শ্রবণ করিতে দিচ্ছেন। 'অন্ত কবি হলে শ্রৌণীকই পুরো বর্ণনা করতেন কিন্তু ঐ কেশগুচ্ছটাই হস্ত বাহু প'ড়ে যেত কিংবা বাহু না পড়লেও কেশের ঐ বিশেষ বিভ্রাণভঙ্গী তাঁর কল্পনাতে আসতই না।' অর্থবা এমনও হতে পারত যে ঐ কেশের বর্ণনাতেই শক্তির পর শক্তি সেপে যেত। ব্যাঙ্গের অর্থবৃষ্টি মিত্রাষণ সূত্রতর কবিতে সম্ভব নয়।

মধুসূদন চিত্রাঙ্গনার পোকে বর্ণনা করেছেন প্রথম সর্গে। সেই বর্ণনার কেশগুলি, অঙ্গকার-প্রাকৃতির মতই শুধু হস্তকর নয়, অতিভাবের কলে একবারে বাস্তবতা-বঞ্চিত। শোকের প্রকাশ যে-বে অহভাবের সাহায্যে ঘটে মধুসূদন সবগুলিই প্রাণাণ করেছেন কিন্তু শ্রৌণীক শুধু ঐ কেশগুচ্ছ বা করেছ, চিত্রাঙ্গনার চোখের অলংকারের আশ্রয় করে বিভ্রাণ উন্নয়ী কেশমাল্যে তা করতে পারেনি। মধুসূদন পোকেব বাস্তব রূপটিকে আয়ত্ত করতে পারেননি। বর্ণনাটি এই :

ব্রহ্মস্বরীর রূপে শোল্লি চৌদিকে
বানাহুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশাস প্রলয়বায়ু; অস্ত্রবানিধারা
আশার; জীত-বস্ত্র হাফাকার রব !

অবত বলতে বাচ্ছ কিন্তু না বলেও পারছি না যে চিত্রাঙ্গনার শোক-বর্ণনায় যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ছবি মধুসূদন এঁকেছেন, Pope সেই ছবি এঁকেছেন তাঁর ব্যঙ্গ-কবিতা 'Rape of the Lock'-এর মাফিক। Belinda-র একগুচ্ছ চুল চুরি ঘাঘর উপলক্ষ্যে। দুটি আর উদ্ধার করলাম না।

আর একটি উদাহরণ Homer-এর *Iliad* থেকে। Hector-এর মৃত্যু হয়েছে অহমান করে তাঁর স্ত্রী Andromache ইষ-এর প্রাচীরে উঠে দুঃস্বপ্ন নিরীক্ষণ করতে-করতে হঠাৎ Achilles-এর রথ-বাঁধা দ্বাশ্য লুপ্তিৎ Hector-কে সেকতে পেরেছেন : 'And saw them dragging her husband in front of the town—the powerful horses were hauling him along at an easy canter towards the Achæan ships. The world went black as night before Andromache's eyes. She lost her senses and fell backward to the ground, dropping the whole of her gay head-dress from her head, the coronet, the cap, the plaited snood and the veil that golden Aphrodite gave her

on the day when Hector of the flashing helmet, having paid a princely dowry for his bride, came to fetch her from Eëtion's house.' হেকটরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই Andromache-র সব শেষ হল। তাই পৃথিবী হল অন্ধকার এবং 'শ'ড়ে যেতেই আপনা-আপনি গা থেকে সব আভরণ খুলে প'ড়ে গেল। Homer অতিপরায়ণি ব্যবহার ত করেন নি, বরং অতি সাধারণ প্রাকৃত কথা বলেছেন। সে শোক আঘাতের বৃক্ক গিরে লেগেছে। মধুসূদন কিন্তু এত আত্মলগ্নও তা পারলেন না। এর কারণ শুধু অলংকার-প্রিয়তা নয়; মহাকাব্যে poetic diction বা কাব্য-বাণী ব্যবহার করা সম্পর্কে কোন তাত্ত্বিক রিগ্রাউ নয়; এর কারণ কথার বা বাণীর সৌন্দর্য প্রাণের আবিস্কার করে তার মোহের কাছে আত্মসমর্পণ। বালায় রেনেসাঁদের সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা নব্যবিদ্যুত বাস্তবী অকণ্ঠস্বর মূঢ় মধুসূদন জীবনের বাস্তব সত্য রূপায়ণের ক্ষমতা অর্জন করার আগেই কবিজীবন শেষ করে নিলেন। তাঁর আত্ম দীর্ঘতর হলেও তিনি আর কিছু করতে পারতেন না।

তাই ঠাঁকে বর্ণনার ক্ষেত্রে সব সময় ছব পূর্ণগামীরে কাছে ধার করতে হয়েছে, নতন একই কথা বিভিন্ন প্রসঙ্গে বার বার বলতে হয়েছে। অথচ এই কাব্যে ঠাঁকে যে প্রাকৃত-অপ্রাকৃত বহু ঘটনার বিবরণ দিতে হবে, সেগুলিকে জীবন্ত করে তুলতে হবে, এ বেগ তাঁর নিশ্চয়ই ছিল। ৭ম সর্গে একবার ঠাঁকে যুদ্ধের বর্ণনা করতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। বীররস যে তাঁর আগবে না তা তিনি জানতেন। তা সবেও করতে হল, কেননা মহাকাব্যে বীররস একবারে থাকবে না এটাও ঠিক কথা নয়। এমন কি মিলটনেও আছে। কিন্তু দাঁত-তে নেই। কিন্তু মহাকবিবিশ্বত কল্পনার প্রসার থাকলে এবং সেই কল্পনা বাস্তববাস্তবী হলে অসম্ভব বা অতিপ্রাকৃত বস্ত্র কিংবা ঘটনাও যে শুধু বিবৃত নয়, সার্থক অনুভূত হবার সক্তি করতে পারে তার নিদর্শন বাস্তবীকিতে প্রচুর থাকলেও মধুসূদনের এই সপ্তম সর্গে একবারেই নেই। মধুসূদন যেন করতে হবে বাসেই করছেন, কোন বাস্তব আবেগ থেকেও নয়, বাস্তবজ্ঞানের বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেও নয়। প্রতিমিথ্যাসাহ্যে রূপায়ণের মূঢ় করেই হবে কিছ এদিকে তখন যে ইচ্ছাকৃতের ভিত্তি প্রস্তুত হচ্ছে। তাই মূঢ় হল হতে এবং পতিতশেলও বিধল কিছ কারণে কিছু এল সেল না। অথচ হৃদয়ানের সমুদ্র-লঙ্ঘনের মতো অতিপ্রাকৃত ঘটনারও বাস্তবী বা বর্ণনা

করেছেন তা পড়লে এখনও পা নিউরে ওঠে। দেখানো
অনুভূত আর বিভ্রান্ত রসের অসুখ মিশ্রণ ঘটতেছে। এই
বর্ণনার বাস্তবিক realism ভাঙে এমন বস্তুনিষ্ঠ করেছে
যে আমরা যেন সমগ্র ঘটনাটি প্রত্যক্ষবৎ দেখছি। হুয়ানের
সমুদ্রস্রোতের মধ্যে বাস্তবতা নেই, বাস্তবতা আছে তাকে
বীকার করে দিয়ে, সেই লজ্জা-ব্যাগারেজ এমন বৈজ্ঞানিক
নিষ্ঠার সঙ্গে পুখাতিপুখ বর্ণনার বাস্তব পাঠকের বিশ্বাস এবং
তল উঠিক না হয়ে যায় না। সব বর্ণনাক্রমে উদ্ধার করা
সম্ভব নয়; শুধু উপক্রমটুকু এখানে উদ্ধার করা যায়—
তবু সেই আশটুকু যেখানে হুয়ান লজ্জার পূর্বকণে নিজের
সেই স্মৃতি করছেন :

‘মহেঞ্জদগরতে এসে হুয়ান কৃতান্তি হ’য়ে সূর্য, ইন্দ্র
ও ভূতপুত্র বন্দনা করলেন এবং পূর্বাঙ্গ হয়ে অম্বলতা
বহু পলকসংখ্যক অর্চনা ক’রে পূর্বকালে (সোনারের সময়)
সমুদ্রের প্রায় স্মৃতি হতে লাগলেন। তাঁর বাহ ও চরণের
নিপীড়নে পর্বত বিভ্রান্ত হয়ে মর্ত্য-মাতঙ্গের প্রায় ভগ্নাবস্থা
করতে লাগল। কৃত্যচ্যুত পুণ্যরাশিতে পর্বত পুণ্যবন হল,
বিশাল শিলাদকল হসিত হ’য়ে পাঁতে সেল, তদ্ব্যবহিত
প্রাণিদগ্ন বিকৃতদ্বয়ের চিংকার ক’রে উঠল, বস্তুকাঠিকিত
কপাধার সর্পগন্ধল মনল উৎকার ক’রে শিলা মংগন করতে
লাগল। ... হুয়ান তাঁর সোমাক্ষর স্মৃতিতে লাস্যল আকালন
করতে লাগলেন, যেন মহাপর্শ নিয়ে গলক খেলা করছেন।
তিনি বিশাল ক্রুরদ্বার পর্বতে ভর দিয়ে কঠিনেপ, চরণ ও
কর্ণ সংকুচিত করলেন এবং প্রাণবাহু বোধ ক’রে বানরদের
কলসেন ...। ... বাস্তবগণ যেমন সীর্ণপল্লবীর অহুগমন
করে, শৈলভঙ্গ যেমন স্রাবার সঙ্গে যায়, সেইভঙ্গ পর্বতের
সারবান বৃক্ষকল উৎপাটিত হ’য়ে হুয়ানের সঙ্গে ধাবিত
হল এবং পুশ বিকীরণ ক’রে ক্রমশ সাগরকলে গড়তে
লাগল। আকাশে প্রসারিত তাঁর দুই বাহু যেন সিরিশুখ
কলে নির্গত গজদুখ সর্প, তিনি যেন পিশাচ হয়ে উর্মিময়
যদাগাগর ও আকাশ পান করছেন। তাঁর দিলল চক্ষু
বিভ্রান্তের প্রায় উজ্জল, মুখ ও নাসিকা সাদ্যসুখের প্রায়
ভারবর্ষ, লাস্যল ইন্দ্রকোষের প্রায় উল্লেসে উজ্জ্বল। তাঁর
বাহুসে আবদ্ধ বাহু বেগের প্রায় সর্গল করতে লাগল।
তাঁর পতিপদ্যের নিরঙ্ক জলরাশি উল্লেসের প্রায় তদ্ব্যবহিত
হল। ...’

স্রাবশেষের বহু মধ্যের স্ফাটবাসেও এ বর্ণনার
ambiguity পরিস্ফুট, তার সঙ্গে এই realism-ও।
সমুদ্রস্রোতের কল্পনার এ প্রকৃতিই নয়। সমগ্র সপ্তম সর্গের

যে কোন স্থান উদ্ধার করলেই এ কথাই বাধ্যতী প্রমাণিত
হবে। মাত্রে মাত্রে এক-আংটা লাইন বা উপমা একটু
যেন ক্লিকি গিরে যায় : যেমন :

‘সোনিয়া স্রাবস্রোত সীর্ণপল্লবী,
‘ভীষণ স্রাবস্রোত’

অথবা

‘চামুণ্ডার হাসিরানিসমূহ হাসিল
সৌম্যমিনী, ...’

এত মহাকাব্যে হয় না।

✓ বস্তুনিষ্ঠ না হবার দলে, শুধু ঘটনা বা নিগূর্ণ-বর্ণনার মত,
চরিত্র-চিত্রণেও সমুদ্রস্রোত একেবারে ব্যর্থ হয়েছেন। যেমননা,
প্রমীলা, লক্ষ্য, রাম, বিভীষণ, সীতা, শরমা, রাবণ—কেউ-ই
স্বাভাব্য উজ্জল ত নয়ই; কারও বিশেষ কোন ভগ্নরোপা
আছে কিনা সন্দেহ—এক যেমননা, রাবণ ও প্রমীলার
ছাড়া। তাও সে ভগ্নরোপা এত সাধারণ যে বৈশিষ্ট্য
কিছুই প্রকট হয়নি। কেউ যদি একবার হোমারের ইউলিসেস,
অ্যাকিলিস, হেকটর বা প্রিামের কথা ভেবে নিয়ে
সমুদ্রস্রোত আনেন তিনি নিরাশ হবেন। চিত্রাবল্য শোকে
রাবণকে বলছেন তিনি রাবণের আশ্রমে বীরবাহকে তেমননি
ক’রে রেখেছিলেন, ‘তরুর কোঠারে রাখে শাবকে যেমতি।
পাখী।’ আবার মোক্ষদীর শোকাভ হলে কেন ক’রে
রাবণের কাছে আসছেন? ‘শিত্তপুত্র নীড় ঘেরি ধ্বা।
আকুলা কপোতী, দায়।’ মোক্ষদীর মুখে কোন কথা
যেমননি সমুদ্রস্রোত : বর্ণনার চিত্রাবল্যের কথাটি ব্যবহার
করেছেন। অর্থাৎ চিত্রাবল্য এবং মোক্ষদীর দুজনেই যা।
তাঁরা ব্যক্তি হিসেবে কেমন এ কথা কাল অপরূপ সমুদ্রস্রোতের
হল না। রাবণ একবার সমুদ্রে বাস করেছিলেন বটে, কিন্তু
তিনি যে রাবণ, তিনি যে আকমণের প্রতিরোধের দৈবধিন
পরিভ্রমণ করছেন, রাবণহলত মধ্যম আশ্রয়গ্রহণ ত করছেনই,
নতর দুর্বলতা সোপান জানবার ভ্রমে শুভচরিত্রস্রোতের সঙ্গে
সোপান পর্যায় করছেন এবং শেষ পর্বত প্রতিদিন আকাম্যনিতে
শিশিষ্ট হচ্ছেন—এই যে রাবণ—সমুদ্রস্রোতের মাহু রাবণ, তাঁর
চরিত্রের কোন স্পষ্ট চিত্রণ এই মহাকাব্যে নেই। প্রমীলার
লজ্জাক্রোশের ঘটনাটি তাৎপদ্যে অহুগমনে রচিত হয়েছে বলে
কোন যোগ নেই, কিন্তু ঘটনার চমৎকারিত্বের মাধ্যমে কিছু
প্রমীলার চরিত্র স্পষ্ট নয়। তিনি এমন বিশেষ কিছু
করছেন না যাতে তাঁকেই শুধু পাওয়া যায়। এবং লজ্জা-
ক্রোশের পরে তাঁর চরিত্রের যেটুকু বিশেষত্বও বা স্মৃতি
হয়েছিল তার কিছুমাত্রও বইল না। কেউ যদি বলেন এখানে

মধুসূদন বাঙ্গালী নারীর জীবনের অন্ধ:পুরাণীয় ব্যর্থতা দেখিয়েছেন, তাহলে বলতে হবে ভাও হয়নি। কেননা সে ব্যর্থতাবোধ প্রবীণতার সেই। অন্ধ বাস্তবিকের সাম্রাজ্যে প্রতিটি চরিত্র অন্ধত্ব—এমন কি সূর্য্যব এবং বাসির চারিত্রিক পার্থক্য পর্যন্ত বাস্তবিকের হাতে স্পষ্ট তদ্ব্যবহিত হয়েছে।

মধুসূদনের এই যে বহুনিষ্ঠার অভাব—এই একটি যে কারণ আগে উল্লেখ করা হয়েছে তার চেয়েও বড় কারণ হল এই যে, সংস্কৃতমুখর বাঙ্গালীর নবজাগরণের মুখে যে ভাবগরিমণ্ডল মধুসূদনের যতো প্রচণ্ড প্রতিভাবান কবির মনে সৃষ্ট হয়েছিল সেই ভাবগরিমণ্ডলকে সম্পূর্ণ খারাপ করতে পারে এমন কোন বৃহৎ ঐতিহাসিক কি পৌরাণিক চরিত্র অথবা ঘটনা কবি অংশদান করে পেলেন না। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনেও সেরকম কিছু ছিলই না, পুরাণ-ঐতিহ্যের মধ্যেও মধুসূদন কিছু খুঁজে পেলেন না। পুরাতন জীবনধারাকে অস্বীকার করে নিজের পৌরবে বিবাসী যে নতুন মানবগুণা বাংলায় জীবনে আবির্ভূত হচ্ছিল, তার প্রথম প্রকাশ স্বাক্ষরমোহনে এবং পরিত প্রকাশ বিদ্যাসাগরে, সেই জীবনকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে হল যে objective co-relative বা বহির্বিব প্রত্যয়ান তার সন্ধান যে মধুসূদন করেননি তা নয়। কখনও তিনি মূলদানকের মোহনরূপের কাহিনী অবলম্বন করে লিখবেন মনে করতেন, কখনও বা বিশ্বাসিকের লড়াবিষয় কাহিনী নিয়ে। মহাত্মারস্তর আশানবাসার মধ্যেও তিনি অংশদান করতে ছাটেননি। স্বাক্ষরমোহনের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে

অনেক আলোচনা করেছেন। চোখের সামনে বাংলার রেনেসাঁসের প্রতীক বিদ্যাসাগরের জীবনেও কর্ণের মহৎ সম্ভাবনা, এবং তার বেমনামের পরিণতি লক্ষ্য করেছেন; কিন্তু জীবনোন্নয়নের সেই মহৎ প্রচেষ্টার এবং তার অসমাপ্ত ব্যর্থতার বেননার ধারক কোন ঐতিহাসিক কি পৌরাণিক চরিত্র না পেরে মধুসূদন স্বাক্ষরকে মোহন বানিয়ে ফেঁটা করলেন ঘটে, কিন্তু বিশ্বদান ছাড়া সেখানে এবং একালে কেউ তাঁকে গ্রহণ করেনি। তার কারণও লুকিয়ে রয়েছে মধুসূদনের দুর্গমতার দুর্গমতার মধ্যে। এ কথা ঠিক যে জাতীয় জীবনের যে দাঁতকে তিনি উপলব্ধি করছিলেন, তা জাতীয় জীবনে তখন সচ অধ্বনিত এবং আঘাত আনি নবজাগরণের সেই অন্ধুর বাঙ্গালীর জীবনে মহীকর্মে পরিণত হতে পারেনি। বাংলার নবজাগরণ জীবনের চেয়ে ব্যর্থতাজেই মহতর। মধুসূদনের কবিসৃষ্টির কাছে এই ব্যর্থতার পূর্ণ রূপ ধরা পড়েছিল, কিন্তু হোমার বা মিলটন তাঁদের ভাষ্যলোককে পূর্ববিকশিত করবার ক্ষমতা যে কাহিনী হাতের কাছে পেরেছিলেন, মধুসূদন তা না পাওয়ার তাঁর মহাকাব্যের হৃদয় পুরীতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল না।

তাই মধুসূদনের প্রতিভাকে মহাকাব্যের প্রতিভা না বলে মোহিতমোহন মধুসূদনের প্রমুখ সমালোচকেরা গীতিগুণিতা (Lyrio genius) বলতে চেষ্টা করেন। স্বাক্ষরমোহন এবং বিশেষ করে বীরাক্ষরমোহন কাব্য পড়লে এক যেখানে যেখানে যেমনসকল কাব্যে তিনি সার্থক হয়েছেন সেগুলি পর্যালোচনা করলে, এ কথা না বলে উপায় নেই যে মধুসূদন বা গীতিগুণিতাই মধুসূদন সার্থকতম।



চন্দ্র-সংবাদ

সলিল বসু

এক সময়ে আমরা শুধু পৃথিবীর একটা চাঁদকেই চিন্তন, কিছু আন্ধকের বিজ্ঞানের কল্যাণে পৃথিবীকে ঘিরে কয়েকটা নকল চাঁদ পরিক্রমা শুরু ক'রেছে। বিজ্ঞান-উন্নত দেশের কর্মীরা বলেছেন যে এমনি আরও অনেক চাঁদ তাঁরা পৃথিবীর চারপাশে ঘোরাবেন। অবশ্য এই নকল চাঁদ খালিচোখে সচরাচর দেখা যাবে না, বিজ্ঞান-বৈজ্ঞানিকদের যন্ত্রাদির মাধ্যমেই তাকে দেখা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছে আন্ধও শুধু পরিচিত ঐ বাঁধভাঙা হালি ভরা পুরানো চাঁদ—আমাদের জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের, অনেক মিলন-বিচ্ছেদের সাক্ষী। কিন্তু আন্ধকের দিনের বিজ্ঞান এতদূরবে অতিমানবের স্বপ্নকে সার্থকতার দোরদোড়ার নিয়ে এগোচ্ছে, তাই আমাদের যৌক্তিক নিতে হবে অন্ধ-স্বপ্ন গ্রহের চাঁদগুলি কেমন, অন্ধ কোনো গ্রহে বসতি স্থাপনের সব আমাদের চাঁদের মতো এমনি কোনো মিতা পাওয়া যাবে কি ?

জ্যোতির্বিদ্যার রাজ্যে অস্থানীয় পৃথিবীর নাম বেবন গ্রহ, তেমনি চাঁদের নাম উপগ্রহ। সূর্যকে ঘিরে যাঁদের পরিক্রমা তাদের নাম গ্রহ, আর এই গ্রহগুলিকে ঘিরে পরিক্রমণকারী জ্যোতিষ্কগুলির নাম উপগ্রহ। সূর্যের নব্বটা গ্রহের মধ্যে বুধ, শুক্র ও মৃগীর কোনো উপগ্রহ নেই আর বাকী ছট্টিটা গ্রহের এক বা একাধিক উপগ্রহ আছে। সূর্যের সবচেয়ে কাছের উপগ্রহ-শুক্ল গ্রহ হ'ল পৃথিবী, তার উপগ্রহ আর একটা; তারপর মঙ্গল-গ্রহের দুটো, বুধপ্লানের এগারোটা, শনির নয়টা, ইউরেনাসের চারটে আর নেপচুনের একটা। এর মধ্যে আবার শনি-গ্রহের উপগ্রহ ছাড়াও তিনটে উজ্জ্বল বলর-মতো জ্যোতিষ্ক আছে। বর্তমানে অবশ্য প্রমাণ হয়েছে যে, এটা আসলে ঠিক বলর নয়, স্ফটিকিত উপগ্রহাণুগুলি সূর্যের বাক্যর বলয়ের মতো বেবায়। হুগ গ্রহের সঙ্গে উপগ্রহগুলির ওজননের অনেক তারতম্য আছে, আর এই তারতম্যের অস্থানীয় $\frac{1}{8,000}$ থেকে $\frac{1}{1,000,000}$ পর্যন্ত পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের ব্যতিক্রম শুধু পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের বেলায়, চাঁদের ওজন পৃথিবীর ওজনের $\frac{2}{11}$ অংশ। এর কারণ বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছেন যে, সত্যতঃ গ্রহের

উপগ্রহগুলির সৃষ্টি যে-প্রক্রিয়ার হয়েছে, আমাদের চাঁদের সৃষ্টি সেভাবে হয়নি। সাধারণভাবে গ্রহগুলির সূর্য-দিক ও উপগ্রহগুলির সূর্য-দিক প্রায় সমান, অর্থাৎ যেমন পৃথিবীর সূর্য-গতি পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে আর চাঁদেরও সূর্য-দিক পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে। তার ফলে স্থির সূর্য পৃথিবীর আকাশে পূর্ব দিকে উঠে পশ্চিম দিকে অস্ত যায় আর সূর্যনিস্ত চাঁদও পূর্ব দিকে উঠে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়।

উপগ্রহগুলির সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে অনেকরকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে। হুগ সূর্য ও গ্রহগুলির আকর্ষণ ও ওজন অস্থানীয়ের সঙ্গে গ্রহ ও তাদের উপগ্রহগুলির আকর্ষণ ও ওজনের অস্থানীয়ের অনেক সামান্য আছে। তাই বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে, গ্রহগুলির সৃষ্টি বেভাবে হয়েছে, উপগ্রহগুলিও ঠিক সেইভাবে তৈরি হয়েছে, তবে আমাদের চাঁদ এ থেকে ব্যতিক্রম আগেই বলা হয়েছে। বিস্মৃতি (tidal) মতবাদে আগন্তুক কোনো এক বড় তারার আকর্ষণের ফলে সূর্যের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অংশটি কালক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে বিভিন্ন গ্রহের সৃষ্টি করেছে। এই মতবাদের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, গ্রহসৃষ্টির প্রথমদিকে সূর্যের আকর্ষণে বহুগুণিত অংশীভুক্ত তরল গ্রহগুলি থেকে কিছু কিছু খণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, আর এইগুলি মাধ্যাকর্ষণের সাধারণ সূত্রে গ্রহগুলির চারপাশেই উপগ্রহ হয়ে ঘুরতে আরম্ভ করে। বিশ্বসৃষ্টির অতি আধুনিক বিজ্ঞান-মতবাদ হ'ল অস্তরকম। তাঁরা বলেন, সৃষ্টির আদিমুগে বিশচরাচরে ছড়ানো ছিল বিরাট বিস্তৃত গ্যাসমণ্ডলী, আর তার মধ্যে উজ্জ্বল বিস্মৃতি ছিল সূর্য। কালে এই গ্যাসমণ্ডলী সঙ্কুচিত হয়ে সূর্য ও সত্যতঃ তারার সৃষ্টি করেছে; আর সূর্যের অংশটি অংশটি বেধে তৈরি হয়েছে গ্রহসমষ্টি। এইভাবে বহন সৃষ্টি চলছিল কখনকোনো কোনো অংশটি-ব্যাধী সূর্যের তার নিকটবর্তী বহুগুণ বৃহত্তর কোনো গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের আওতার মধ্যে পড়ে যায় আর উপগ্রহ হিসেবে তার চারপাশে ঘুরতে আরম্ভ করে। শনি-গ্রহের বলর সম্বন্ধেও গবেষণা হয়েছে। বহু হুগ আগে গ্রহটির কোনো একটা উপগ্রহ মাধ্যাকর্ষণের

বেশী সীমার মধ্যে পড়ে যায় আর গ্রহচার দিকে এদিকে যেতে থাকে। এই অবস্থার কোনো একটা পর্যায়ের মূল উপগ্রহটি বহু বৃত্ত-বিশিষ্ট হয়ে পড়ে এবং সেই অবস্থাতেই গ্রহ-পরিক্রমা শুরু হয়। অনেক বসেন, কয়েক কোটি বছর পরে পৃথিবীর চারদিকও ঐ রকম অবস্থা ধাঁড়াবে।

এহ ও তাদের উগ্রগ্রহগুলির গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনার দেখা যায়, তাদের দুর্নি-দিক প্রায় একই, তবে দু-একটা গ্রহের দু-একটা উপগ্রহ মূল-গ্রহের গতির বিপরীত দিকে ঘোরে। এর কারণ অসুস্থস্থান ক'রে দেখা গেছে যে, কোনো বড় আকারের গ্রহের পক্ষে অন্য গ্রহের উপগ্রহকে বা কোনো স্থায়ী গ্রহাণুগুণকে নিজের বাধ্যাকর্ষণ ক্রিয়াকর্ষণ ক'রে নেওয়া খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়। বাস্তবিকপক্ষে বৃহত্তর বৃহৎশক্তি ও পনি-গ্রহেরই এইরকম বিপরীতমুখী উপগ্রহ আছে। আর এইভাবে যে উপগ্রহ সৃষ্টি হয়, সেগুলির বিপরীত গতি হওয়া অব্যাহতকি নয়। এই সূত্রের ভিত্তিতে বিজ্ঞানী সিচলস্টন বলেন যে, সূর্যো-গ্রহটা মূলতঃ নেপচুনের হাতিবে-বাওয়া উপগ্রহ। নেপচুনের নাকি এক সময়ে সূর্যো উপগ্রহ ছিল, আর তাদের গতিমুখও ছিল গ্রহটির মতো। কিন্তু উপগ্রহ ছুঁই কক্ষপথ এমন ছিল যে, তাদের মধ্যে প্রচণ্ড আকর্ষণ-বিকর্ষণ চলতই, আর একবার এক প্রচণ্ড সংঘাতে একটি উপগ্রহ বাধ্যাকর্ষণ আওতার বাইরে ছিটকে পড়ে আর সৃষ্টি হয় সূর্যো-গ্রহ। আর বাকী উপগ্রহটির গতি বিপরীত হয়ে যায়, আর আজও এমনি বিপরীত পরিক্রমা চলছে। সৃষ্টির আদিমুগে সারা মহাবিশ্ব ছুড়ে এমনি অনেক নাকি আকর্ষণ, বিকর্ষণ, অশস্যগ, অশহরণ হয়ে গেছে।

এবার পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা যাক। চাঁদ সম্বন্ধে যে-ব্যাপারচারের সঙ্গে আমরা বিশেষ পরিচিত, সেটা হ'ল কলার ডান্স-বৃত্তি। আমরা সকলেই জানি যে, চাঁদের নিজস্ব আলো নেই; যে আলো আমরা দেখি সেটা আসলে সূর্যের আলোর প্রতিফলন। প্রসঙ্গত এটাও জেনে রাখা দরকার যে, চাঁদ সব সময়ই এক পিঠি ঘুরিয়ে রেখেছে পৃথিবীর দিকে, অপর পিঠি কোনো দৃশ্যবিনেই দেখা যায়নি, আর যাবেও না। কেন এমন হয়েছে, ঐ নিয়েও পরে আলোচনা করা হবে। প্রতিদিনই সূর্য চাঁদের ঠিক অর্ধেকটা আলোকিত ক'রে রাখে। কিন্তু চাঁদ পৃথিবীকে প্রায় আটশা দিনে একবার ঘুরে আসে, তাই চাঁদের আলোকিত অংশের সবটা প্রতি রাতে আমাদের চোখে পড়ে না। বেইহু আলোকিত অংশ আমরা দেখতে পাই, তার পরিবর্তন হয় চাঁদ ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে, তাই আমাদের

চোখে পড়ে কলার ডান্স-বৃত্তি। যেদিন চাঁদ ও সূর্য পৃথিবীর একই দিকে পুরোপৃথিবীভাবে থাকে, সেদিন চাঁদের আলোকিত অংশের পুরোটাই থাকে সূর্যের দিকে আর পৃথিবীর ভাগে পড়ে পুরো অন্ধকার দিকটা, তাই আমাদের কাছে সেদিন অদৃশ্য। এই দিনের চৌদ্দদিন পরে চাঁদ ঘুরতে-ঘুরতে একেবারে বিপরীত দিকে চলে যায়, অর্থাৎ পৃথিবীর একদিকে থাকে সূর্য আর তার ঠিক বিপরীত দিকে থাকে চাঁদ। এই অবস্থার চাঁদের আলোকিত অংশের পুরোটাই থাকে পৃথিবীর দিকে—আর আমরা দেখি পুরো গোল চাঁদ, মধুকরা পূর্ণিমার রাত। এর পর আবার কলার ডান্স হ'তে আরম্ভ হয়, আর সমাপ্তি হয় অদৃশ্যতায়; এমনি করেই চলছে পরিক্রমা খুব-খুবান্তর ধরে। একটা ব্যাপার হওয়াটা সন্দেহ করার আছে যে, আমরা যেদিন দেখি বাকী চাঁদ আকাশে, সেদিনও বাকী অংশটা অদৃশ্য দেখা যায়। এর কারণ হ'ল যে, চাঁদের হতে পৃথিবীর উপর থেকেও সূর্যের আলোর প্রতিফলন হয় আর এই প্রতিফলিত আলোই চাঁদের উপর পড়ে অন্ধকার অংশটাকেও আবছা আলোকিত করে রাখে। এই হ'ল চাঁদের সবচেয়ে পরিচিত ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

এবার কেবা বাক চাঁদের প্রাকৃতিক অবস্থাটা কেমন। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব প্রায় ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল। চাঁদের ব্যাস ২,১০০ মাইল আর আয়তন-৬জনও পৃথিবীর চেয়ে অনেক কম, তাই পৃথিবীর বাধ্যাকর্ষণ-শক্তি চাঁদের ঐ শক্তির চেয়ে ৬ জন বেশী। চাঁদের পৃষ্ঠদেশ অত্যন্ত অসমান। সেখানে অনেক বড় বড় বাগ ও উঁচু-উঁচু পাথাড় দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীদের মতে এই পাথাড়গুলি সম্ভবতঃ একসময় সবই আগ্নেয়গিরি ছিল, অবশ্য আজকে এগুলি সবই মৃত। পৃথিবীর আগ্নেয়গিরির যেমন আগ্নেয় (crater) আছে, চাঁদের মধ্যেও এ-জাতীয় সব ব্যাপার দেখা যায়। পৃথিবীতে ৩৭ মাইল ব্যাস-এর বেশী বড় আগ্নেয় দেখা যায় না, কিন্তু চাঁদের বেলায় সাধারণ মাপই হল প্রায় ৪০০ মাইল, এমন কি ১০ মাইল ব্যাসের আগ্নেয়ও দু-একটা আছে। এইজাতীয় গহ্বরগুলি সাধারণতঃ সোলাকৃতি আর পরিধিটা সীমানাঙ্ক হয়েছে সমতলভূমি থেকে ৪০০ মাইল উঁচু পর্বত-জাতীয় প্রাকৃতিক দ্বন্দ্বাবলীতে। এমন কি, এইসব গহ্বরের মধ্যে থেকে উঁচু-উঁচু পর্বতশৃঙ্গও থাকে যাকে মাথা উঁচু করে আছে। এইজাতীয় গহ্বরের সৃষ্টির কারণ নিয়ে অনেকরকম বৈজ্ঞানিক মতবার প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন

বে, টানের কোনো। বাহুঘণ না থাকায়, পৃষ্ঠদেশেই সরাসরি উদ্ভাসপাত হয়ে চলেছে অবিরত, আর তাইই বলে এইসব গল্পের সৃষ্টি। আবার আর এক বস্তু এই যে, পৃথিবীর আদিমুগে ঠাক ছিল তরল অবস্থায়, কঠিনীভূত হবার সময় গ্যাস নির্গত হয়ে গেছে অভ্যন্তর থেকে, আর তাইই পরিণতি হ'ল এই গল্পের সৃষ্টি। গল্পের চাড়া চক্রপুষ্ঠে আরও একটা উল্লেখযোগ্য দৃশ্যের হ'ল—বহুবিকৃত অসদৃশদকৃষ্ণ-সদৃশ দান, বেঙলিকে বলে 'মারিয়া' (Maria)। প্রথমদিকে বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন, এইগুলি সূরি বড় বড় সূর্য, তাই এগুলির এইরকম নামকরণ হয়েছিল। বর্তমানে দেখা গেছে যে এগুলি আসলে গ্যাসের-সমষ্টিত সমস্তসকলের, আর টানের বৃহত্তর আংশ ছুড়েই এর বিকৃতি। আয়োনিয়ির অসংখ্যপাতের লাভা থেকেই নাকি এগুলির সৃষ্টি। তাই অসংখ্যকৃত নিরুচ্চিতিতেই এগুলি বিকৃত হয়ে পড়েছে এবং সালে স্রমটি বেঁধে গেছে। যারিয়ার অভ্যন্তরে সালে আর্যগুণি আসলে লাভার মত আসে। প্রতিফলন-পদ্ধতি ভুলই সৃষ্টি হয়েছে। তবে একটা বিশ্বকর ব্যাপার হ'ল যে, কোনো কোনো যারিয়ার মধ্যে থেকে মল আসে। বিশ্বকর হতে দেখা গেছে, কিন্তু এর কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য আরও দৃঢ় যারিনি। জল ও হাওয়ার প্রভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠে স্রষ্টাভবন ও সর্পের চলেছে অবিরত, কিন্তু টানের মধ্যে জল ও হাওয়া না থাকায়, এর পৃষ্ঠদেশে বহুদিন একরকম হয়ে গেছে, পরিবর্তন বিশেষ পদ্ধতি হয়নি।

এখন টানের পঠন-উপাদানের বিষয় খোঁজ নেওয়া যাক। কোনো জ্যোতিষের যদি নিজস্ব আসে থাকে, তবে সেই আসার বর্ণনাটি বিশ্লেষণ করে তার পঠন-জটিলতা সম্বন্ধে জানতে পারা যেতে পারে। কিন্তু টানের নিজস্ব আসা না থাকায়, তার বেলা ও ব্যবস্থা নিশ্চয় অসল। তাই চক্রপুষ্ঠের তাপপ্রবণ ও বিদ্যুৎ-এর উপর ভিত্তি করে অঙ্গুদান করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে—সেখানকার বৈদ্যুতিকতা জায়গার হা বালো, আর পতিত সূর্য্যালোকের গড় হার ১ শতাংশ প্রতিফলন হয়, সবচেয়ে উচ্চল আংশের প্রতিফলনও ১০ শতাংশের বেশী নয়। কণ-বিজ্ঞানী স্রীমতী রাভলোতা প্রমাণ করেছেন যে, ঐচ্ছিকতার সামান্য তরঙ্গত থাকলেও, চক্রপুষ্ঠে পুরোটাটাই একই রকম। ট্রান্সমিটারের সঙ্গে হুজ বস্তু লাগিয়ে চক্রপুষ্ঠের উচ্চতা, ত্রাণ-বৃত্তি পরিমাপ করা হয়েছে। দেখা গেছে, যে অঞ্চল সূর্যকিরণ লম্বভাবে পড়ে সেখানকার উচ্চতা প্রায় ১০.০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড আর সূর্যালোকের পড়ই সে-উচ্চতা

বাড়ায় ১০.১০ ডিগ্রী, আর যে-অঞ্চলে হারি সেখানকার উচ্চতার তাৎপর্য পরিমাপ থেকেই সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য বসব পাওয়া যায়। চক্রপুষ্ঠের সময় পৃথিবী ঠাণ্ডা ও সূর্যের দায়বাহনে পড়ে সূর্যের আলোকে কিছুসংশের অন্তে আড়াল করে দেয়। কিন্তু এই অল্পসংশের মধ্যেই টানের উচ্চতা বেশ কমে যায়। এই তাপ-ত্রাণ-বৃত্তি থেকে প্রমাণ হয়েছে যে, চক্রপুষ্ঠে পাশা সচিব (porus) পদার্থের সমন্বয়ে তৈরী। আধুনিক যন্ত্রিও-জ্যোতিষবিজ্ঞান সাহায্যে টানের যন্ত্রিও-তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এই তরঙ্গ স্রু পৃষ্ঠদেশ থেকেই আসে না, কিছুটা অভ্যন্তর থেকেও আসে। তাই থেকেও প্রমাণ হয় যে পৃষ্ঠদেশে কঠিন গাথুরে পদার্থের না, পরন্তু ঠাণ্ডা সচিব পদার্থেরই। অঙ্গুদান করে দেখা গেছে যে, এই পদার্থটির স্রুটি হয়েছে অবিরত উদ্ভাসপাতের বলে। আরোই বলা হয়েছে, টানের কোনো বাহুঘণ না থাকায় উদ্ভাসপাত হয় সরাসরি চক্রপুষ্ঠের উপর। এই প্রচণ্ড সংঘাতে যে উচ্চতা সৃষ্টি হয়, তাতে যে তরু উচ্চাপিওর কিছু আংশই গ্যাসীয় আকার ধারণ করে তা হয়, ঘর্ষিত চক্রপুষ্ঠের কিছুটাও গ্যাসীভূত হয়ে যায়। তারপর এই গ্যাস ঘনীভূত হয়েই সৃষ্টি করে সচিব পৃষ্ঠদেশ। এই হ'ল আধুনিক বিজ্ঞান-গবেষণার সিদ্ধান্ত।

এর হ'ল—টানের স্রুটি হ'ল কি করে? আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলছেন, টানের স্রুটি হয়েছে পৃথিবী থেকে একটা বিরাট অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পাওয়ায়। এই বিচ্ছেদটা ঘটেছিল স্রুটির প্রথম স্রুৎ, যখন পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে সবমাত্র ঘনীভূত হ'তে শুরু করেছে আর পৃথিবী ছুড়ে বসন চলেছে স্রুটি ও মাসের প্রলয়নাম। এই বস্তুবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানীরা অনেক স্রুতি ব্যাড়া করেছেন। পৃথিবীর পঠন-ভবিষ্যৎ কথায় দৃঢ় যাক। চক্রপুষ্ঠের উপরেই স্রুতির ৩০ থেকে ৬০ মাইল হ'ল গ্রানাইটের স্রুতি, যার ঘনত্ব (density) ২.৭; তার নীচে হল কয়েক হাজার মাইল গভীর আয়োনিয়া-প্রধান ব্যাগার্ড (Basalt)-স্রুতি, আর তার নীচেই সৌর ও অভ্যন্তর ভারী পণ্ডিত অস্ত্রবসন, যা স্রুতি ঘনত্ব-সম্পন্ন। পৃথিবীর সম্পূর্ণ তরল অবস্থার সময়েই যদি ঠাণ্ডা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে স্রুতির স্রুতির পঠন একই হওয়া বাতাবিক। কিন্তু যদি কিছুটা ঘনীভবনের পর এই বিচ্ছেদটা হয়ে থাকে, তা হ'লে উপরেই স্রুতির স্রুতি থেকেই হয়েছে, অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন অংশ গ্রানাইটের ও ব্যাগার্ডের পরিমাণই সেখানে বেশী, তরল ভারী পদার্থের কিছু বহিও থাকে থাকে তা অতি সামান্য। বাতাবিক-পক্ষে পৃথিবীর গড় ঘনত্ব হ'ল ৫.৫ আর টানের বেলায় এটা

৩'৩, অর্থাৎ পৃথিবীর ঘনীভবন স্রুজ হবার গোড়ার দিকে
 ঠাঁয়ের বিচ্ছিন্ন হবার সম্ভাবনা। ঘটবার এতে বেশী জোয়ারো
 হয়। এখন কথা হ'ল—ঠাঁর যদি পৃথিবীর তরল অবস্থাতেই
 বিচ্ছিন্ন হ'ত তা হ'লে পৃথিবীপৃষ্ঠে তার কোনো চিহ্নই
 হরতো। থাকত না, কারণ বিচ্ছিন্ন ঠাঁকটা অল্প জায়গার তরল
 পদার্থ বিভিন্ন ভাগেই হয়ে যেত। কিন্তু এখনই দেখা গেল যে,
 ঘনীভবন স্রুজ হবার পর এই বিচ্ছেদটা হয়েছে। তা হ'লে
 নিশ্চয়ই একটা বড় গল্লর-যতো পৃথিবীপৃষ্ঠে ঠাঁকা
 বাড়াবিক। বাড়াবিকশব্দে এমনি একটা বড় গল্লর হ'ল—
 প্রশান্ত মহাসাগর, বার আকাশটা অনেকটা গোলাকৃতি
 আর আরতনও মূল পৃথিবীপৃষ্ঠের এক-তৃতীয়াংশ।
 তা ছাড়া ভূতরবিদ্য। প্রমাণ করেছেন যে, পৃথিবীর স্থলভাগ
 এবং বিভিন্ন সাগরতলের গঠন-ভূমিয়ার মধ্যে পৃথিবীপৃষ্ঠের
 ভিন্নরকম স্তরই রয়েছে। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের বেলায়
 দেখা গেছে যে, সেখানে গ্রানাইট-স্তর একেবারে নেই আর
 বাসাল্ট-স্তরও অল্প জায়গার তুলনায় অনেকটা কম—যেন
 মহাপৃষ্ঠের কোনো এক অস্পষ্ট হাত পৃথিবীর মুখ থেকে
 এক ঝাঝা অঁপে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এইসব থেকে
 বিজ্ঞানীরা নিশ্চলভাবে প্রমাণ করেছেন যে, পৃথিবী-সৃষ্টির
 ৫০০ কি ১,০০০ বছর পরে পৃষ্ঠের কোনো এক সাংঘাতিক
 আলোড়নের ফলে ঠাঁয়ের স্রষ্টা হয়েছে পৃথিবীকে উপড়েই,
 আর তারই ছেড়ে-যাওয়া অংশে বিসাক করছে হুসর প্রশান্ত
 মহাসাগরের স্তানলিমা।

এখন কথা হচ্ছে—ঠাঁর কেন অভিমান করে পৃথিবীর
 দিকে এক মুখ ঘুরিয়ে আছে। ঠাঁর যখন পৃথিবী থেকে
 বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখন হুটোয় কোনটাই পুরোপূরি
 ঘনীভূত হয়নি। যেহেতু পৃথিবীর আকার বড়, তাই
 সাধারণতঃ পৃথিবীর নিয়মে ঠাঁর পৃথিবীকে ঘুরে চললো আর সেই
 সঙ্গে নিজের অক্ষরেখার চারদিকেও ঘুরতে লাগল। কিন্তু
 পৃথিবীর প্রবল আকর্ষণে ঠাঁয়ের ঝল-কটনি বেধে পদার্থ-
 সমূহের প্রচণ্ড উত্তান-কতন চললো। অবশ্য ঠাঁয়ের আকর্ষণে
 পৃথিবীভেতও প্রণয় চলছিল, কিন্তু পৃথিবীর আরতন অনেক
 বেশী হ'লে প্রলয়ঙ্কর ঘটনা ঠাঁদেরই জীবনব্যাকার পরিবর্তন
 আনল বেশী। প্রচণ্ড জোয়ার-ভাটার বর্ধক-জনিত শক্তিতে
 ঠাঁয়ের আকর্ষণ গতি কমতে লাগল, আর কয়েক হাজার কি
 কয়েক লাখ বছরের মধ্যে সেটা একেবারে শেষেই গেল।
 এই কারণেই ঠাঁর আজও পৃথিবীর দিকে তবু এক মুখ ঘুরিয়ে
 হয়েছে। ঠিক এইভাবেই সূর্যের নিকটতম মুখ-গ্রহও

সূর্যের দিকে এক মুখ কিরিয়ে ঘুরে চলেছে। প্রশ্ন হচ্ছে—
 পৃথিবীর আকর্ষণে যদি ঠাঁয়ের গতিতে এতদূর পরিবর্তন
 এসে থাকে, ঠাঁয়ের আকর্ষণের ক্ষেত্রে কি পৃথিবীর গতিতে
 কিছুটা পরিবর্তন আসবে না? বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্ন নিয়ে
 গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, ঠাঁয়ের আকর্ষণ-জনিত
 উত্তান-কতনে পৃথিবীর আকর্ষণ গতি অনেক করে গেছে,
 এমনকি বর্তমানের জোয়ার-ভাটার প্রভাবেও পৃথিবীর
 দিনের সময় আজও প্রতি একসপ্ত বছরে এক সেকেন্ড করে
 বেড়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞান-উন্নত মানুষ ঠাঁয়ে গিয়ে নামসার পরিকল্পনা
 করছে, তাই ঠাঁয়ের দেশের বিশদ মানচিত্রও প্রস্তুত হয়েছে
 এবং বিভিন্ন পর্বত ও বাবের নামকরণ পর্যন্ত হয়েছে।
 ঠাঁয়ের বে-দিকটা আমরা কেবল পাঠ না, সেটা অবশ্য
 দেখতে-পাওয়। দিকের চেয়ে যুব বেশী পার্থক্যের হবে হ'লে
 মনে হয় না, তবুও সেদিকের খবর পাবার ক্ষেত্রে ঠাঁয়ের
 চারদিকে নকল ঠাঁর যোঝানো হবে। ঠাঁয়ের বিদ্যুৎ-মুখলে
 নামা চলবে না, কারণ সেখানের উষ্ণতা যুগেই বেশী।
 যে-কোনো সমতল জায়গাতেও নামা হবে না, কারণ প্রচণ্ড
 উচ্চাবর্ণ চলছে সেখানে। হুতরাং একটা নির্দোষ জায়গা
 দরকার, আর এরকম জায়গা পাওয়া গেছে। জায়গাটির
 নাম কেওরা হয়েছে 'সাইনাস বোরিন'—যেক-মুখল থেকে
 প্রায় ৬৫০ মাইল দক্ষিণে। জায়গাটি বোটাটুটি সমতল, তবে
 উচ্চাশাত থেকে আড়াল দেবার বতো ছোট ছোট পাহাড়ও
 আশেপাশে আছে; তা ছাড়া এখানকার উষ্ণতা দিনের
 বেলায় ৪০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। ঠাঁয়ের সাধারণ পরিবেশ
 আর রকেট-বাতীর জীবন নাকি কিছুটা বিরক্তিকর
 আর একঘেয়ে, তাই সম্ভ্রান্তি মার্কিন বিজ্ঞানীরা বলেছেন
 যে—ঠাঁয়ে নেবে গবেষণা চালানোর পক্ষে মহিলা-বিজ্ঞানীই
 নাকি স্রুতিবে, কারণ মেয়েদের সাধারণ প্রকৃতি ঐক্যাতীর
 জীবনধারণে ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশী অভ্যস্ত। কথাটা
 কতখান কার্যকরী, সেটা আগামী কয়েকবছরের মধ্যেই দেখা
 যাবে। বালাবেশের কবি-গায়কদের অনেকেই 'নরেন
 বোর যুগ আসে না, কার বা পথ চেয়ে—ওগো ঠাঁয়ের
 মেয়ে'; কিন্তু ঠাঁর থেকে সন্তা কোনো মেয়ে আজও
 আসেনি; তবে পৃথিবীর মেয়ের ঠাঁর বাবার দিন আজ
 সমাস্ত। আমাধের ছেলেমেয়েরা না হোক, নারি-নারতীরা
 নিশ্চয়ই তাবের 'মুচলিমা' বাপন করতে বাবে সন্তিকারের
 ঠাঁয়ে। আজকের বিজ্ঞান তারই সম্ভাবনার মুখ।

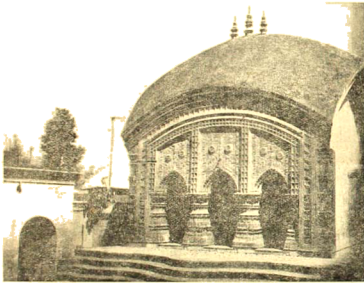
বাংলার প্রাচীন মন্দির

মহীতোষ বিদ্যাস

কোলকাতা: দূরে থেকে অধিকা-কালনা ৪১ মাইল পথ। ভাগীরথী-তীরে এই অধিকার কত পুণ্যস্থতি ছড়িয়ে রয়েছে এর মাটিতে। এ স্থান বৈষ্ণব ভক্তগণের এক পবিত্র তীর্থস্থান। মহাপ্রভু নীচৈতঃপেবের একটি লীলাক্ষেত্র এই অধিকা মগরী। বৈষ্ণবকৃডামনি ডাক গৌরীদাস পতিতের সঙ্গে মিলন-কথা

—সে সময় পত পত মুখলমান নামান শড়তেন এই মন্দিরের চত্বরে।

এই ভগ্ন মন্দিরের কিছু মুখেই রয়েছে কয়েকটি মন্দির। অধিকা-কালনার চারদিকেই আছে মন্দির—ছোট-বড় কত রকমের। এর মধ্যে অনন্ত-বাহুদেব মন্দির, লালাজীর



অধিকা-কালনার সিংহবাহী-মন্দির

কৃষ্ণদাস-বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। ভাগীরথী-তীরে আশে মহাপ্রভুর দাক্ষ্যুতি মন্দিরে পুণ্য হচ্ছে। এই মন্দিরই মহাপ্রভু ঐতৈতঃপেবের প্রথম মূর্তি বসায় হই। ডাক গৌরীদাস ঠাকুর প্রভুর নির্দেশে দাক্ষ্যুতিমিত মূর্তি করে পূজা করতে আরম্ভ করেন।

এখানে রয়েছে মূলস্থান আমলের কোয়ার আর মন্দিরের ভগ্নভূপ। মন্দিরের বিলাসের যে অংশ আজও বর্তমান, তা দেখে বোঝা যায় এর অপূর্ণ গঠনশক্তির কথা। বাংলার মূলস্থান স্নানকালে স্নানকার দাক্ষ্যুতি এই অধিকা-কালনার

মন্দির, বেটল, কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির, গোপালজীর মন্দির, সিংহবাহীর মন্দির ও একশত আটটি শিবের মন্দিরের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব মন্দিরের গঠনশক্তি বিভিন্ন রূপ। মন্দিরের চত্বরে ঘুরতে ঘুরতে যন প্রচণ্ড ভরে ওঠে এইসব মন্দিরের স্তম্ভিকারী গ্রাম্য কাহিনিগল্পের কথা মনে করে। এ কথা পুরানো হ'লেও কলা দায় যে, তখনকার সেই গ্রাম্য পরিবেশে গ্রামের সমাজ-জীবনের কথা যদি স্থির মনে চিন্তা করা যায়, তবে দেখা যাবে—সকল মাহতের মুখে অজস্র-ব্যবস্থা বা মাহতের কর্মজীবনের একটা হৃৎ উশান উদ্ভাবনই

ছিল সমাজের বিচক্ষণ মাহতমের চিন্তা। গ্রামকে কেন্দ্র করেই একতালে গড়ে উঠেছে এইসব অসুৰ্ভ মন্দির, চলন হয়েছে পূজা-পার্বণ, মেলা, নানাবিধ আনন্দ-উৎসব। বিবাহ, দীর্ঘি-পূহর-প্রতিষ্ঠাভেও জাক পড়েছে তাঁতী, কুমার, এমন কি পটুয়া-চিহ্নকরসের। আর সবকায়ের নানা প্রচাের ফলে দু-পাট ভাবসায় বৃক্করোপণ-উৎসব-পালনের ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু এই 'পাছ-প্রতিষ্ঠা' আদানের পূর্বে গ্রাম্যজীবনে একটা বড় পুণ্যের কাজ ছিল, চলনও ছিল। যে যেমন মাহতম ভেতমনি ব্যবস্থার মধ্যে ওই 'পাছ-প্রতিষ্ঠা' হোত। বৃক্ক-রোপণ পুণ্যের কাজ। বৃক্ক ফলদান, ছায়াদান করে।

এই মন্দিরটি চারদিকে প্রাচীর দিয়ে বেধা। সদর দরজা দিয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে যখন আপনি একবার মন্দিরটির চূড়ার দিকে চাইবেন তখন আপনার মনের অবস্থার কিছু পরিবর্তন হবেই। বিরাট এই মন্দির। ১৬৭৪ বকাবে এই মন্দিরের নির্মাণকাল সমাপ্ত হয়েছে। এই মন্দিরের গঠনশক্তি ঠিক কালীঘাটের মন্দিরের মতো। কিন্তু এর মধ্যে ধরেছেন করিপাথরের অনন্ত-বাহুধেব বা বিকুম্ভি। মাথার চূড়ার দিকে তাকালেই বোকা যায় এটি বিকুম্ভ-মন্দির, কারণ চূড়ার রয়েছে চক্র ও মকরমুখ—ভ্রামের দাঁড়। বড় বড় অখণ্ডের চারা উঠেছে মন্দিরের মাথায়। এখানে ভেঙে



অধিকা-কালনার দিগমণ্ডির

১৬৭৪

হুতরাং শব্দ চলতে থবি কোনোখিন কোনো পথিক কিছু কল খেয়ে কি চাষার বিলাস করে কিছু শ্যক্তি পায় ভবেই হবে এই প্রতিষ্ঠাতার আনন্দ—মহাপুণ্যের কাজ। মাহতমের ধর্মের নামে বিলাস ছিল মনে অগাধ। মনের জোর এবং সবচেয়ে বড় কথা ছিল দেবসেবার নামে মাহতমের মুখে অমরান-ব্যবহা, এবং নানা উৎসব-পার্বণের মধ্য দিয়েই তার সমাধান হোত।

এইসব দেবমন্দিরগুলি দেখতে দেখতে আপনার এসব কথা মনের মধ্যে অবতাই লাঞ্ছনা করবে।

আহুন, আমরা এখার অনন্ত-বাহুধেবের মন্দির যাই।

পড়েছে অমাত গুল, ইট বার হয়েছে দেখানে। অসংখ্য রয়েছে এতে শোভামাটির কাজ। নানা বিদ্যবস্ত সেইসব শোভা-মাজির কাছে। এই মন্দির আপনি বতই দেখবেন ততই মনে হবে তখনকার এই মন্দির-নির্মাণকারক কারিগর কি বাংলার গ্রামের লোক? এত দৃশ্য-কঠিবোধ তাদের কেন্দ্র করে হোল?

অধিকা-কালনার এই যে প্রাচীন মন্দিরসমূহ, তার প্রায় সবই মহারাধা চিত্রসেনে প্রতিষ্ঠা করেন। অবন্ত দু-একটি ছাড়া। এর পরে আহুন আমরা কালনার সবচেয়ে প্রাচীন

মন্দির অধিকাংশেরই বা শিবেশ্বরী মন্দিরে বাই। এ মন্দির বহু প্রাচীন, কারণ এর গঠনপদ্ধতি একেবারে সেই মন্দির-নির্মাণের আদিপর্বের বলা যায়। দেখতে সোচালা হয়েই মতো। এর মধ্যেও রয়েছে বহু গোড়াযাতির কাশ। তবে খুব বেশী নয়। মন্দিরের চত্বর বা প্রাঙ্গণ থেকে প্রথম মন্দির বা বাকো বারান্দা বলা যায়—এটি অনেক উচুতে। অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। বারান্দার পরে দেবীর মন্দির বা মন্দির। দেবীমূর্তি স্তম্ভ-নির্মিত। এ মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা অশুভবি বলা হয়। অধিকা-কালনার গ্রামাশেবতা বলতে এই অধিকাংশেরই বলা হয়। আরও সেই দেবীমূর্তির পূজা চলে আসছে, এবং মন্দিরটি বাংলার প্রাচীন মন্দির-শিল্পের নির্মাণ ভঙ্গি বহু বসিক-ভঙ্গি যাত্রাঘরের মনে আনন্দ দান করতে।

এখনকার আর তিনটি মন্দির, যা ভারতের আর কোথাও নেই, সেগুলি হলো পটিশচূড়া-মন্দির। যাত্রাবের বিশ্বর ভাগে এই মন্দির-নির্মাণের কথা-কৌশল দেখে। অনেক বসিক যাত্রাবের আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে এই মন্দির দেখবার জন্য। তিনটি মন্দির দেখেই মনে পড়ে এই গঠনপদ্ধতি দেখে। এই পটিশচূড়া-মন্দির আছে তিনটি। তার মধ্যে কলকাতা ও লালমোড়ার মন্দির হচ্ছে বিরাটের দিক থেকে দর্শনীয়। মন্দিরের গঠন সম্বন্ধে ঠিক লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। চাক্ষুশ দেখলে তবেই এই মন্দির সম্বন্ধে কিছুটা জানার সুযোগ পড়ে। এইসব মন্দিরের গঠন ঠিক রয়েছে মতো। প্রথম ভর, দ্বিতীয় ভর—এমনিভাবে উঠে গিয়েছে চূড়া পর্যন্ত। প্রথম ভরে বায়োট চূড়া, দ্বিতীয় ভরে আটটি চূড়া, তৃতীয় ভরে চারটি চূড়া ও চতুর্থ ভরে একটি চূড়া বিদ্যমান। এই মন্দিরের সম্মুখ-ভাগে রয়েছে বিরাট নাট্যমন্দির। এর বামের ও গঠন-সৌন্দর্যের পদ্ধতি অপূর্ব। নাট্যমন্দিরের পর বারান্দা ও তার পরে রয়েছে বেধবিগ্রহ। নাট্যমন্দিরের চারি পাশে চত্বর বা প্রাঙ্গণ, সাধারণ যাত্রাবের বসবার স্থান। একদম কলকাতা, ভাগলপাড়া, নানা উৎসবে যাত্রাবের আনাগোনা ছিল কত। আরও তার কিছু জন থাকলেও, তেমন নেই। কিন্তু না থাকলেও, প্রাচীনকালের বাংলার অপূর্ব মন্দির-শিল্পের নির্মাণ, সমাধ-ব্যবহার কথা, ও আনন্দ পরিবেশের ব্যবস্থা থাকা যায়। পূর্বের গ্রাম্যবীকন যাত্রা যেমন আর-সংস্থান করেছে, তেমনই দেশের যাত্রাবের কাছে কাব্য, সাহিত্য,

শিল্পের মাধ্যমে দৃষ্ট চরিত্র পরিচয় এবং তার উৎসর্গ-সাধনের কথাও জানিয়েছে। এবং কতকগুলি কলকাতা-বাংলার বিলাসের, কাব্যকাব্যের ছিল তা আরও বাংলার পল্লী অঞ্চলে ঘুরে এইসব প্রাচীন শিল্প-নির্মাণ দেখলে এবং প্রাচীন কাব্যগ্রন্থগুলি পাঠ করলে তার মধ্যেই গ্রাম্য পাণ্ডা যায়।

লালমোড়ার এই পটিশচূড়া-মন্দির দেখে তারপর '১০৮ শিবমন্দির'-এর পথে পড়বে একটি দেউল। আর বা-দিকে রয়েছে কলকাতার বিরাট পটিশচূড়া-মন্দির। দেউলটির বহন খুব বেশী নয়, এখনও বসন্তের কিছু বেশী হবে। বাঁকুড়ার সোনামুখীর মন্দির এর নির্মাণপদ্ধতি। এই মন্দির বা দেউল দেখে মনে হয়, উড়িষ্যার মন্দির-গঠনের কথা চিন্তা করেই হয়েছে এর নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছিল। দেখতে অনেকটা উড়িষ্যার মন্দিরের মতো। তবে এই মন্দির পাথরের নয় মাটির, মধ্যে আছে এক বিলিঙ্গ। দেউলের চারদিকে অসংখ্য গোড়াযাতির কাশ। কিন্তু এক-কাশ গুলিতে কেমন মনে একটা পান্ডাভাষা ধারার ছাপ আছে। অলঙ্কার খুবই আছে পতা, কিন্তু তবুও মনে ইংরাজ আমলের কিছুটা প্রভাব রয়েছে।

বাংলার প্রাচীন বা আপন শিল্পধারা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা সঠিক জান লাভ করতে চান তাঁদের এইসব প্রাচীন শিল্প-নির্মাণগুলি দেখতে অরোহণ করি। বাংলার শিল্পধারার সঙ্গে পরিচিত হতে হলে গ্রামে আসতে হবে, ঘুরতে হবে, দেখতে হবে। বাংলার গ্রামে গ্রামে আরও যে-সব শিল্প-নির্মাণ রয়েছে তা দেখে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করা যায়। আটমুন্দির চারদিকে বিলাত-আমেরিকা বাওরার আগে আমি এই গ্রাম্যশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য অরোহণ করি। আমাদের এই পল্লী-শিল্প যে কত হৃদয়, কত ভাবময় ছন্দোবন তা না দেখলে বোঝা যায় না।

এখনকার ১০৮-শিবমন্দিরে কোনো শিল্পকাশ না থাকলেও, বৃত্তাকারে যে মন্দিরগুলি নির্মাণ করা হয়েছে তা দেখলে প্রতিষ্ঠাতার এবং নির্মাণকার্যের প্রণালী করতেই হবে। আজকের দিনে এতগুলি মন্দির এইভাবে নির্মাণের কথা চিন্তাও করা যায় না। এই মন্দিরের সমস্তকিছতেই শিল্পিগণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একটি সাধা ও একটি কালো রঙের বিলিঙ্গ। আরও নিতাপুন্ডা হয়। তবে পূর্বে যে ব্যবস্থা ছিল আর তেমন নেই। দুই সারিতে এই ১০৮-শিব-মন্দির আছে। প্রথম সারি অগ্গম দ্বিতীয় সারির মন্দিরগুলি ছোট। ঠিক মধ্যে আছে একটা ইশারা। এই মন্দিরের নির্মাণকৌশল অপূর্ব।

এই অধিকা-কালনার আশেপাশেও রয়েছে অনেক মন্দির, সেগুলিও বেশবার মতো। এখান থেকে শান্তিপুর ও মাইল দূর। এখানে রয়েছে ভাষ্কর্য্যবাসীর বিরাট মন্দির। এ মন্দিরও কালীঘাটের মন্দিরের মতো। নিকটে গুপ্তিশাড়াও রয়েছে কৃষ্ণাবন্যস্ত্রের মন্দির। ঝাঁপবেড়িয়া বা বংশবটীতে রয়েছে

হংসেশ্বরীর মন্দির। এখান থেকে বৈকুণ্ঠপুর যেতে সাতাশ পায়ে দুটি ছোট্ট সেউল। এ সাতাশের প্রায় ৩৯ মাইল দূরে শক্তিপুন্ডর কাছে হুশারশাড়াও রয়েছে একটি মন্দির—এ মন্দির আকারে ছোট, কিন্তু বহু প্রাচীন। এর নিম্ন-নিবর্ণনগুলি আশ্চর্য বা আশ্চর্য্য তো দেখে আনন্দ এবং শিক্ষা পাওয়া যায়।

দ্বন্দ্ব রাত্রি

ঐশিকানন চট্টোপাধ্যায়

রাত্রি বেশী হয়নি। দশটার কাছাকাছি। সহস্রাকলে বা সহস্রকলিতে এত ভাড়াভাড়ি লোকে শব্দ আর আশ্রয় নেই না, কিন্তু এককড়ি বেখানে বাস করে তার আশেপাশে সবাই কারখানার কাজ করে। তাদের জোরে বেরোতে হয়। তাই একটু ভাড়াভাড়িই শুয়ে পড়ে। মেরেনের উল্লসে আঁচ দিতে হয় রাত্রি চারটের।

ছাত্রগাটা ঠাণ্ডা। বহুদূরবিদ্যুত জলাশয়ি আর বাগান। হু-হু করে ছাওয়া বর সেখানে। উর্ধ্বস্থী নারকেল পাছের শ্রেণী পাড়া হুলিয়ে সরসর শব্দ করে। তার ভাকে শাড়ি দেয় আর সব গাছেছা। ছোট ছোট বুনো চারা-গাছগুলোও কেমন একটা অসুখত আনন্দে এদিকে ওদিকে ঘোলে।

জলাশয়িতে জল ঘমে আছে। ঝাঁকুড়ের জল। বাঙালো একদল গলা মিলিয়ে ডাকে। মাঝে মাঝে সাপে ব্যাঙ খরার শব্দ শুনেতে পাওয়া যায়। কাতর একটা একঘেরে আড়ান। এমনি স্থানে বাড়ী করেছে এককড়ি।

বাড়ী ঠিক বলা যায় না। ইটের দেওয়াল বেওয়া হুশানা ঘর। ওপরে রাষ্ট্রীয় টালি দিয়ে ছাওয়া। ইটগুলো গাভ বার করেই আছে। সেখানে এখানে বালি-সিমেন্টের গলছারা পড়েনি। পড়বে কিনা তাইবা কে জানে।

একখানা ঘরে সে শোয় স্ত্রী ও ছেলেকেছের নিয়ে। আর একখানা ব্যবহার হয় ভাঁড়ার আর স্নানঘর হিসাবে। মোটাটুটি ভাড়াটে বাড়ীর চেয়ে অনেক ভালো।

প্রতিবেশীরা সকাল সকাল শুয়ে পড়লেও, তাদের ভাড়াভাড়ি চোকে না। রাত্রি বারোটাঘ বাড়ীর আলো নেড়ে। অনেক কাজ এককড়ি। অফিসে চাকরি করা, সন্সারের সমস্ত দায়বদ্ধা ফোনো, খবরের কাগজ পড়া, ছেলেকেছেরের পড়ানো, তারপর সমস্ত হলে সেবা।

লেখা অবস্ত কপাটিং হয়। বাতা কলম নিয়ে কিনোয় এককড়ি। রাত্রিতে চোখ বুজে আসে। মস্তিষ্কের চিন্তাধারা অনেক অচল হয়ে থাকতে চায়। অনেক কসরৎ কববার পরেও তার কলম দিয়ে লেখা বেরোয় না। বিরক্ত হয়ে সে বাতা মুড়ে রেখে শুয়ে পড়ে।

কিছুতেই এই ক্লাস্তিকে সে এড়াতে পাড়ছে না। অবচ লেখাই তার জীবনের একমাত্র আনন্দ। কিশোর বয়সে সে লেখার স্বপ্ন দেখেছে। প্রথম যৌবনে দিগ্বেছে প্রতাহ। তারপর যৌবনের ক্ষেতের মিকে এসে লেখাই হয়ে গাড়িয়েছে জীবনের গুলি সমস্ত।

সাহিত্য অবসারের স্ত্রী, কিন্তু তার অবসর কোথা? একার ওপরে একটি লসার, আর সেই লসারের সমস্ত দাবি মিটিয়ে রাত্রিতে একটু বস্তু তাকে লেখবার অবসর দিতে তার সেই ও মন প্রবলভাবে প্রতিবাদ করে।

রবিবারেও কিছু হয় না। সাংসারিক কামেলা, আত্মীয়-স্বজনের ভীড়, বন্ধুবান্ধবের আনাগোনা আর সারা সপ্তাহের রাত্রি ও অবশ্যই শেষ পর্বন্ত বিনটিকে নিশ্চয় করে তোলে। প্রতি রবিবার রাত্রিতে শোবার সময় একটি অস্বস্তিকর শোভ দীর্ঘনিশ্বাসের আকারে তার বুক থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে : আশ্চর্য লেখা হলো না!

অবশেষে দুঃপ্রতিজ্ঞ হয়েছ সে। সারা সপ্তাহই তো সে লসারের ক্রীড়মূল। রবিবারেও সেই লসারের কবল থেকে পরিত্রাণ নেই। কিন্তু রাত্রিগুলো তার। শনিবারের রাত্রিটা সে তো অন্যভাবে বেছে নিতে পারে লেখার ক্ষমতা? সেই অশু ও নির্জনতার তার স্বাধীন সত্তাকে কে বাধা দেবে? হৃৎ পৃথিবী অস্বস্তিকর আবরণে থাকবে আশ্রয়গোশন করে। তারার দীপ্তিতে আকাশ হয়ে উঠবে ব্রহ্মতম। উদাস বাতাসে

গাছের পাতায় পাতায় জাগবে চকলতা। দূর ধাক্কাতে উদ্ভিত হবে প্রত্যন্তের হৃদয় প্রত্যাশায়। সেই সময় সে লিখবে।

প্রতিবারে একটু কোয়ার উঠলে বিশেষ অসুবিধা হবে না।

আজ সেই পনিবার। রাত্রিতে লিখতে বাগছে এককড়ি।

স্বঘমাক বলা ছিলো, রাগাবাঙ্গা শেষে সে বেন খেঁচি, বুঁচি, পাঙ্ক, নাক্স আর শাড়কে নিয়ে তরে পড়ে। ঐতিহ্যবাহী বেন তেল ভরে রাখা হয়। এক কমদী মলও রাখবার কথা বলা ছিলো।

সুখমা একবার বলেছিলো—এই খাটুনির ওপর রাত্রি ভেগে লিখলে শরীর ধরাশয় হবে না ?

গম্ভীর হয়ে উত্তর শিরেছিলো এককড়ি—হলেও কোনো উপায় নেই। যেমন করেই হোক আনাকে লিখতে হবে।

আর কিছু বলেনি সুখমা। বললে, একটা প্রলাপ কাও বেধে বাওয়ার আশা ছিলো। এককড়ির কথানক্সা সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখে সে শুয়ে পড়ত।

নিশীথ ঘুমত। মাঝে মাঝে দুহুরের ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যায় না। কিম্বদন্তি করে কুড়ি পড়ছে। বলকের পর বলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঘর ঢুকছে।

স্নায়ু বের কেনে এলিরে পড়তে চাইছে। অক্লিষ্ট পরিভ্রম আর একটু বেশীই হচ্ছে। রাত্রি আশপাশে সে কথা তার জানা ছিলো। সেভর তৈরিও ছিলো সে।

দিয়ে ভাঙা মন্দির ব্যরকতক প্রাণপণে টেনে সে পরলে কলম। অনেকদিন পরে আয় কবিতা লিখবে।

কবিতাই লিখতো সে। সন্তোষে বছর বয়স থেকে সাতাশ বছর পর্যন্ত একটানা কবিতা লিখেছে। তারপর বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে বন্ধ করেছিলো উপন্যাস ও গল্প লেখা।

কিন্তু নিজের লেখা নিজের কাছেই ভালো লাগতো। তার মনে হলো, কই, এ লেখায় প্রাণ তো ভরে ওঠে না ? এ বেন ঢুক করে এক রাস মল বাওয়ার মতো। সলা দিরে নেনে গেলেই ফুরিয়ে গেল।

কবিতা তা নয়। শেষ হয়ে বাওয়ার পরও তার প্রবীণ হয়ে থাকে। চতুর্দিক ধবধব করে ছবির অহরণে। গল্প ও উপন্যাস বুল, কবিতা হুস্ত। বুলবস্তর একটা মোহমর পরিবেশ আছে, কিন্তু হুস্তের বহুস্তমর স্পর্শ চৈতন্যের তারগলিকে তোলে বাজিয়ে। সে কবিতার তুলনা নেই।

তবু কিছুদিন সে গল্প-উপন্যাসই লিখেছিলো। কবিতা কেউ পড়ে না। তা ছাড়া নিজের কাছে কোনো লাগলেও, তার গল্প উপন্যাস প্রশংসাই পেরেছিলো।

কিন্তু তাও বেশদিন চললো না। খেঁচি, বুঁচি, পাঙ্ক,

নাক্স, শাড়—একের পর একজনের আবির্ভাব মিন টিন অবস্থাকে ঘোরালো করে তুলেছিলো। বোনের বিয়ে বেওয়া, বাড়ী কত এইসব ব্যাপারে ভণ্ড ও পেল বেড়ে।

শেষে লেখা একরকম বন্ধই হয়ে গেল।

প্রত্যাহার বৈচিত্র্যহীন একটানা ভীষন। বিরক্তিকর মিনটালো উপাস ও অবলা। কি লিখবে সে ?

কিন্তু না লিখেও শান্তি নেই। তার অফরের অস্থূল থেকে একটা শব্দহীন কঠিন তিরস্কার হুখর হয়ে ওঠে। কে বেন অবিশ্রাম তাকে তাক্সা দিচ্ছে : লেশো, যেমন করে পারো লেশো !

মিনের কর্ণের মুহুর্তগুলো তাতে বেশ। অক্লিষ্ট, হাটে, বাজারে এককড়ি সলা প্রমুখ, কিন্তু অবসরের নির্জনতার সে জনতে পার সেই তিরস্কার। রাত্রিতে বস্ত্র বেশে ঘুম থেকে জেগে ওঠে।

অন্যোন্মাদ লিখতে হবেই।

কুড়ি জোরে নামলো। কিম্বদন্তি জানি এখন পরিপক্ব হয়েছে কবিতা শব্দ। হোয়াট আকাশে রাত্রির অন্ধকার ঢুলছে মিনকালো একটা ঘনিষ্ঠতার মতো। বাগানের মুহুর্ত রজনীগন্ধাগুলো ঠিক এই সময়েই বিকীরণ করছে সৌরভ। বাতাসের ঈতল স্পর্শে সারা বেহে ছড়িয়ে যায়।

নিশ্চিন্ত অন্ধকারের গর্ভে সন্ধ্যাহিত নিশ্চেষ্টতর পৃথিবীর আভা বেন স্পন্দিত হয়ে উঠছে ধারাবাহিক। চলে ও তালে কে বুঝি নৃত্য করে চলেছে অবিদ্রাম। অবলম্বনীয় এক আনন্দ লীলাহিত হচ্ছে সুরের ধারায়।

মুহুর্তিতে লামনে চেয়ে বসেইলো এককড়ি।

সবকা বাতাসের মতো তার অতীতের মিনগুলি বেন জানলার ধাক্সা দিচ্ছে।

হঠাৎ সে চক্কে উঠলো।

পোলা জানলার পাশেই একটা মাছ। আবছা অন্ধকারে নিঃশব্দে বসে আছে। তার বৃকটা একবার টিপ করে উঠেছিলো, কিন্তু পরক্ষণেই সে হেসে ফেললে। জানলার পাশেই আছে আয়নাখানা। সাতো চারহুট লম্বা এই আয়নাটা সে সব করে কিনেছিলো অনেকদিন আগে। সন্ধ্যার মিনিদ, তাই এখন আর স্পষ্ট দেখা যায় না।

জবে হুখার চুল বিধার কাশ জতেই চলে যায়। তার নিজের অস্ত আয়নার মরকারই হয় না। মাথার চুল বহুদিন আগেরই উঠে গেছে। আছে মল ও চকচকে টাকটা।

তবু সে আর একমুহুর্তে সেই আয়নার দিকেই চেয়ে বসে। হঠাৎ কি সে এই মুহুর্তে নিজের হোয়াখানা নির্মূল

ভাবে বেধবার ভগ্ন প্রসূত হয়ে উঠলো ? না, তা নয়। এই আয়নার সঙ্গে তার জীবনের একটা নিবিড় যোগ আছে।

বেন কোনো অপরিস্ফুট দোকান দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। হারিকেনের আলো সম্পূর্ণ সেখানে গিয়ে পৌঁছানি। চেয়ে দেখেই যনটা ছাঁৎ করে ওঠে।

মাত্রের মূর্তি নয় !

একবার ভাবতে চেষ্টা করলে এককড়ি, আয়কাল তার চেহারা কি এইরকমই হয়েছে ? কিন্তু আয়নাখানা এখন কিনেছিলো, তখন সকলে তাকে স্বপূজ্যই বলতো।

প্রথম যৌবনের সেই স্বপ্নময় মিনগুলো ! আকাশের মতো অব্যবহিত আর সন্মুখের মতো অন্তলগ্ন।

আশ্চর্য কি ? জীবনেই এখন পরিবর্তন হয় তখন চেহারায় হবে না কেন ?

টিক সেই সময় প্রেমমূর্তির মতো সেই চেহারাটা আয়নার পিছন থেকে যেসে উঠলো। লম্বা নীল হুংসিত হাসি। বললে—জীবনের ইতিহাস নদীর মতোই গতি পরিবর্তন করে। বৃত্তে ?

শিউরে উঠলো এককড়ি : একবার ভাবতে চেষ্টা করলে সে, করে নাকি ?

বলতে লাগলো মূর্তিটা—আমাকে কিনেছিলে দানবায় থেকে ফেরার সময়, যোগলসরাই প্যাসেজারে। মনে পড়ে ?

পড়বে না ? সে কথা কি ভেলেবার ? উদ্ধত যৌবন তখন বেকিরেছিলো দিঘিরে। বাধা আকীর্ণ এই পৃথিবীটাকে মনে হতো খোলাফের মতো। বাড়ি নাড়ল সে। বললে—উঃ, সে কতদিনের কথা !

—কোন্দিয়ারির চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসছিলে। সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত ডিউটি। মাত্রায়ে কিছুকণ বাওয়ার ছুটি। লজ্জ করত পায়লো না। সিঁছার সেই উম্মুক্ত প্রান্তরও, প্রকৃতি যেখানে অপরূপ, সেখানে থেকেও পালিয়ে এসে কবিতা লেখা হবে না বলে। তাই নয় ?

জড়িত এককড়ি চমুক উঠলো। অতীত উঠেছে মূত্র হয়ে। বললে—হ্যাঁ, তাই।

মূর্তি বলতে লাগলো—ছ'টা থেকে ছ'টা ডিউটি দিয়ে কিছুদিন পরে আর মাত্রয় থাকবে না, তখন তোমার এই জন্ম হয়েছিলো। এই ভেবে ছটফট করতে যে—কবিতা লিখবে কখন ? অথচ তখন তোমার লসারের কারও বাওয়ার সংখান ছিলো না।

সত্যিই ছিলো না। এককড়ির একা উদ্বোধনে আট

জনের উপস্থানের সংখান হতো। চরম মাত্রিহের সে কি বীভৎস আত্মপ্রকাশ !

—না, ছিলো না।—চোঁক সিঁদলে এককড়ি।

—তবু চাকরিটা ছেড়ে গিলে।

আত্মপ্রকাশের হাসি ফুটে উঠলো এককড়ির মুখে। সেদিনের সেই বিব্রাহ আক তার জীবনে বেন ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। বললে—হ্যাঁ।

—হাসছো যে ? চাকরি ছেড়ে কি এমন কোনো কাজ করেছিলে যাতে আত্ম তোমার মূত্র পর্বের হাসি দেখা দিচ্ছে ?

কে বেন লগাৎ করে এক-খা চাবুক মারলে তার মুখে, কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে লামলে নিয়ে সে বললে—করিনি ? সিঁছা থেকে চাকরি ছেড়ে এসে আমাকে রাখার খবরের কাগজ বিক্রি করতে হতো। তখনকার দিনে খবরের কাগজ বিক্রি করা মোটেই লম্বানের কাজ ছিলো না। এমন অবস্থান অনেক ভুললো ও-কাজ করতেন। তখনকার দিনে সম্ভবতঃ আদ্যই একমাত্র বাঙালী যে বিটল ইন্ডিয়ান স্ট্রীট থেকে 'করওয়ার্ড' আর 'বাঙলার কথা' নিয়ে ফিরি করতে বেরোত।

একমুহূর্তে চুপ করে থেকে এককড়ি বলে উঠলো—কবিতা লেখার ভগ্ন আমি এমন ভালো চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ডিউটি পারাপ হলে কি হবে ? সেখানে থাকলে ভবিষ্যতে ভালোই হতো। হক্কতা আলো আমাকে জীবন-চুকে এমন করে কত-বিকৃত হতে হতো না। তবু সে চাকরি আমি করিনি, কবিতা লেখা হবেনা বলে। পর্বের হাসি মুখে মেঝা মেঝেনা কেন ?

আয়নার ভিতরে মূর্তিটা বললল করে হাসতে লাগলো। তারপর বললে—ভেবে দেখেছো কি, আম তোমার সেই সামের কবিতা কোথায় ?

শিউরে উঠলো সে। সত্যিই তো, কোথায় কবিতা ? তখন মনে হতো পাহাড়ের মতো কল্লার কূপে থাকা সেই প্রান্তরে বাস করতে করতে সে নিজের কল্যা হয়ে যাবে। তার কবি-সত্যার আর চিহ্ন থাকবে না। প্রজিনিম সে ভাবতো, চাকরি আর ঘুম, এর মধ্যে কবিতা লিখবে কখন ? হবিবারেও ছুটি থাকতো না। এত লাজ হয়ে লজ্জতো যে, খেতে কদও দুশুনি আসতো। ডিউটি শেষে এসে কোনরকমে গুণে গড়াই ছিলো তখনকার একমাত্র প্রয়োজন। তাই জন্ম হতো এভাবে আরো কিছুদিন চাকরি করলে হক্কতা সে কবিতা লিখতেই তুলে যাবে। কিন্তু সেই কবিতা আত্ম কোথায় ? তীর জীবনসংগ্রাম আত্ম তাকে কতোদূরে ছিটকে এনে ফেলেছে !

মুর্ভিটা আবার হেসে উঠলো। বললে—তুমি বোকাযিত্তে
অধীত, তা জানো?

কুন্ড হ'ল উঠলো এককড়ি। বললে—আমাকে যা-তা
বলছো?

—খাঁক, রাগ দেখিয়ে না। রাগ দেখিয়ে করবে কি?
আমাকে চুপনাক করে ফেলবে, এই তো? তাতে কোনো
লাভ হবে না।

—তোমার কতকগুলো বাজে কথা শুনেই বৃতি লাভ
হবে?

—হবে বৈকি। আদমার মুখ দেখাত মতো একবার
নিজের দিকে চেয়ে দেখলে কত কি? জীবনে এগিয়েছে।
কি শিখিয়েছে। সেই হিসাবটা মন্বত করে নাও। তোমার
জীবনে একটা লক্ষ্য ছিলো না?

এককড়ি লাবা দেখে উঠলো রোমাঙ্কিত হয়ে। লক্ষ্যের
দিকে চেয়েই তো সে অগ্রসর হয়েছে। সেইজন্যই তার
চাকরি চাড়া, বখারের কানক তিরি করা, আরো কতো
বিচক্ষণকেই না বরণ করে নেওয়া! মুখে বললে সে—
ছিলো।

—সেই লক্ষ্য আত কোথায়?

... ঠক করে বাপটা ঠুকে যেতে সে সোজা হয়ে বসলো।
নেতের বসে যে চল্লিশকিটির ওপর খাতা রেখে সে
সিখিয়েছিলো—চুলতে চুলতে সেই চৌকিতেই মাথা ঠুকে
গেছে।

ভারী মজার বস্তুটা তো দেখেছিলো সে?

হাসতে গিয়ে সে কিছু হাসতে পারলে না। বুকের
ভিতরে খুঁজ করে উঠলো।

মজার বস্তু! পুরানো দিনের কথা। অতীতের গর্ভে
আদ্য বা ইতিহাস হয়ে গাড়িয়ে আছে। আর কারও কাছে
না হয়ে—সে কাহিনী তার নিজের কাছে উপভোগ্য,
রোমাঞ্চকর ও সংযতময়।

ভাবতে লাগলো সে আর-এক টিপ দিয়ে ভাঙ্গা নতি
দিয়ে।

সত্যিই তো তার জীবনে লক্ষ্য একটা ছিলো। জীবনে
কি করবে আর করবে না, তার একটা পরিকল্পনা অনেক
আগেই সে ছকে বেঁধেছিলো; কিন্তু সেই নক্সা আদ্য তো
একবারেই মুছে গেছে। পাড়ে আছে লাবা কানকবানা।

আজকের জীবনে কোনো সিদ্ধান্ত করবার কি অর্থ হয়?
নিজেই নিজেই প্রায় করলে এককড়ি। আবার

মনে মনে উত্তর ঠিক করলে, না, হয় না। এগিয়েছি কি
শিখিয়েছি সে-কথা কে বলবে? নিজের বিচার তো নিজে
করা যায় না।

উঠে গাড়ালো সে। একটা লাইনও দেখা হয়নি।
তব্বা এসে সব গোলমাল হয়ে গেল।

মুখে আর মাথায় হানিকটা ঠাণ্ডা বল দিলে সে।

আকাশের বুকে একটা অগ্নিশিখা লক্ষ্য করে উঠলো।
পারদূরতই কোথায় বায় পড়লো। আবার চক্কে উঠলো
সে। বুনের খোঁজে হুম্বা কি বেনে বললে।

এককড়ি চেয়ে দেখল। না, সকলোই মুছেছে।
বোধ হয় বস্তু দেখেছিলো হুম্বা।

অতীত জীবনে এখনি চুপোপের রাতি এলে সে বেরিয়ে
পড়তো পথে। কড়, জল, বহু, বিভ্রাৎ কিছুই গ্রাস
করতো না। দিক্‌দেহে বুকে বেড়াতো।

কথাটা মনে হতেই তার লাবা বেহ আর একবার
রোমাঙ্কিত হয়ে উঠলো। জাননা মিশে দূরী প্রসারিত করলে
সে। উদ্ভুক্ত প্রান্তর, জলল আর মলাত্বনি বর্ণের আবেগে
সিহরিত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘাকার নারকেল পাছগুলোর
শাখা শাখা পুনরুরে ছিলাম। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে
কারা বেনে চাপা হাসি হাসছে। কিন্তু উদ্ভাসকে কিছুতেই
সম্বত করে রাখতে পারছে না। মনে হয়, উদ্ভাস বস্তা-
প্রবাহের মতো এখনি সে-আবেগে বেরিয়ে আসবে পানিত
জরোয়ালের ঐচ্ছল্যে, প্রকাশের অনির্বচনীয়তার।

এককড়ি নেতের ভিতরে নেচে উঠলো বহুধারা।
বেরোবে সে আর-একবার তেমনি করে? পথে বিপথে,
কোণ-কোণে, জলে-জলে প্রাণকরে ছুটে আসবে? কুঠি-
খায়া বেহে এসে বিধবে খুঁজের মতো। বিভ্রাতের অস্তিত্বকে
অন্তরান্দা পর্যন্ত আভ্যন্তর জড় হয়ে বাবে। লাবা বেহ ও
মন দিয়ে আর-একবার অহুত্ব করে আসবে প্রকৃতির
জবাল প্রকাশকে? এই ভীষণ ও মূর্খের অহুত্ব সে যে
কতোদিন হলো ভুলে গেছে।

উভেজনার পা-ছুটা কাশছিলো। অরণের ছই স্নল
আলোকিত করে প্রথম বৌদনের শিখর এসে বেন তাকে স্পর্শ
করছে। সারাক্ষিনের জাতি আর নেই। নেই নতি নিয়ে
মুখ তাকানোর আগ্রহ। কোথায় চলে গেছে মূখ। কেপে
উঠেছে এককড়ি। কেপে উঠেছে দেহ, মনে ও আত্মা।

তবু সে নিজেই নতুন করলে প্রাণপন।

আদ্য তাকে শিখিয়েই হবে। যদি কেহোতে হয় তো
লোনা দেখ করে বেরোবে।

আবার বলসো এককড়ি।

আৰ একটা বাজ পড়লো।

ভয়ানকভাবে চমুক উঠলো সে। একক্ষণে সে যেন অনেকখানি দুৰ্বল হয়ে পড়েছে বলে মনে।

সত্যিই সে জীবনের লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছে? অনেকদিন আগে যে-পথে যা নিৰেছিলো, সেই পথ থেকে সে কি সারে এসেছে নিষেধ অজ্ঞাতসারে?

তাহলে সত্যি সত্যি?

তার অস্থির হাফাকার করে উঠলো। আর কিছুই তার নেই? সে নিঃশব্দ? লক্ষ্যহীন? যে জ্যোতিৰেখা দীপতিন জীবনের আকাশে উজ্জ্বল হয়ে ছিলো, তার দীপ্তি নিতে গেছে? সমস্ত কিছুই সে হারিয়ে ফেললে?

এককড়ি চিন্তাপারা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

সেই পৰ্যন্ত যে দুৰ্গত-শক্তিকে সে হারিয়ে ফেললে, সেই শক্তির অধিকারী রাজা-মহারাজারও হয় না। হয় না নাৎকরা উকিল, ব্যাংকিয়ার বা ডাক্তারেরা। রাজনৈতিক নেতা অথবা শাসনকর্তৃব্দের স্বৰ্বে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিও ইচ্ছা করে এই শক্তিকে। ধনী মোটর-বিলাসীরা করে ভয়।

সারা গুনিয়ার কণা ও বিজ্ঞানের পাজ হয়েও তাই কবি আর সাহিত্যিকেরা বুক সুদিয়ে সব চলে ব্যস্তিত্বের অভিনাশ মাথায় করে নিয়ে। এমন আন্দল-শক্তিকে লাভ করেও সে আশ পক্ষিহীন?

উঠে ঠাড়ালো এককড়ি। তার কাণা পাচ্ছে।

একটা শব্দ হলো। চেয়ে দেখলে সে। হৃদয়া উঠেছে।

—এখনো শোওনি? রাত বে শেষ হয়ে এল?

কিছু বললে না এককড়ি। ৰাশি কেন, সবই তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। সে প্রত্যক্ষ করছে একটা জীবনের অন্তিম মুহূৰ্ত্তকে। ঘড়ি দেখলে হৃদয়া। ৰাশি তিনটে। বললে—ভয়ে পড়ো। অস্থব্ব করবে।

—হ্যাঁ, এইবার শোবে।— নিজেই অনেকটা সামলে নিলে এককড়ি।

—তোমার কি ঠাণ্ডা সেগেছে? গলার আওঠায় মনে ধরা-ধরা?— প্রশ্ন করলে হৃদয়া।

এককড়ি তব্ব।

... সিঁচুয়ার ঢাকবি ছেড়ে কলকাতায় ফিরে আসা, বন্দরের কাগজ ফিরি করার যাবশা, তার পরেই তার জীবনে হৃদয়ার আবির্ভাব। ...

জীবনের গতি-পরিবর্তনের ইতিহাস চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বিশ্ব এই পরিবর্তন তো ইতিহাসের চিহ্নচিহ্নিত নীতি।

এক্স সে খাবী হবে কেন? প্রত্যেক জীবনেই বৈচিত্র্য আছে। আছে পথ থেকে পথান্তরে ভ্রমণের কাহিনী। বিয়ে কেউ করে, কেউ করে না—কিন্তু জীবনে অধ্যাবের পর অধ্যাব সফলকেই পায় হয়ে যেতে হয়। তার বেলা এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে কেন?

এককড়ির বিম্বলতা হৃদয়া লক্ষ্য করছিলো। সে বললে—কি হচ্ছে গো? দেখা হয়নি বৃষ্টি?

—আর হবেও না।— গভীর কণ্ঠে কালো এককড়ি।

—সে আবার কি কথা?— হস্তবহ হাসি হৃদয়ার টোটে। বৃষ্টিতে বিশ্বয়।

এককড়ির বোধ হয় আর শুধু চমুক ওঠবারই পালা। সে আর একবার চমুক উঠলো।

আরো হৃদয়া এই হাসি হাসতে পারে? ৰাশির অবগাঢ় অন্ধকারে, বর্ষণ-মুখের মুহূৰ্ত্তগুলির আবেগময় সজীবতা, গন্ধ-মাতাল রক্তমাগাধার শৌৰভ-সমারোহে তাহলে তার চোখেও কটাক্ষ আগে?

হৃড়ি বণ্ডের বিয়ে হয়েছে। এই দীপতিনের ইতিহাস নিঃসন্দেহে ভুলি ও বিভ্রান্তিকর। তবু আশই তার প্রথম মনে হলো, ভুলিতা ও বিভ্রান্তি ছাড়াও এর আর-একটা দিক আছে। এই হৃড়িভবনের মাদুৰ্ণও অবিদ্বন্দ্বীয়।

সে বললে—আমি হতান হয়ে পড়েছি, হৃদয়া। আর আমি স্মিততে পারবো না।

—এই কথা?— এককলক হাসি উঠে পড়লো হৃদয়ার মুখ থেকে। সে বললে—তাই বৃষ্টি মুখ গোমড়া করে রাত যেনে বলে যাচ্ছে। চলো, শোবে চলো।— তার ঠাণ্ড ধরে টানলে হৃদয়া। বললে—এত উত্তেজিত ভাবনাও ভূমি ভাবতে পারো!

তার সহায়কৃত্তিতে এককড়ির মন আরো উত্তলা হয়ে উঠলো। সে বললে—আর আমার দেখার শক্তি নেই। তা ছাড়া, আমি আশ লক্ষ্যহীন।

—এত কথা তোমাকে কে বললে? সারারাত জেগে বলে বলে এই সব জেবেছে?

হৃদয়ার দৃষ্টিতে কৌতুক না কৌতুক? এককড়ির সব-কিছুই আশ জুৰীয়া বলে মনে হচ্ছে। সে বললে—একরকম তাই।

—কথাগুলো ভূমি নিজে বিশ্বাস করো?— হঠাৎ হৃদয়ার কণ্ঠের অন্তর্যব বকমের দৃঢ় হয়ে উঠেছে।

বিস্মিত হলো এককড়ি। হৃদয়ার কণ্ঠে একটা কঠিন

প্রত্যয়। জিজ্ঞাস্য দৃষ্টান্তে চেয়ে সে গাড়ির। এককড়ির মনে
বিধার সন্ধান হলো। সে তার কথার উত্তর দিতে পারলে না।

হুম্মা বললে—ভাষা, কথাগুলো তুমি নিজেও বিবাস
করো না। নাহলে আমার কথার শ্রুতি করে উত্তর দিতে।
তবে কেন অনর্থক একটা দৃষ্টান্তের স্মৃতি করে মনে মনে নিজে
মলমলো?

—পতি কি তাই?— এককড়ি আমার চিত্তাঙ্কর হয়ে
পড়লো।

—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। তোমার সব-কিছুই আছে। আমি
আর বেঁচি, বুঁচি, পাখ, নাহ, নাহু আছে বলে তোমার
জীবনটাই একবারে বদলে গিয়ে?

লক্ষিত কর্তৃক এককড়ি বললে—ওসব কথা এল কেন?

—তেন আসবে না? কতোবার তো বলছি, আমাকে
মার হেলেনেয়েদের নিয়েই তুমি থিত। সংসারের বোকা
বটতে বটতে নাকাল হয়ে গেলে। লেখাপড়া কব্বার মোটে
সময় নেই। বেশ ছিলো তোমার সেই বহুরের-কাগজ-
দিকি-করা জীবন।

—সে কথা ছেড়ে দাও।— অপ্রতিভ কর্তৃক বললে এককড়ি।

—ছেড়ে দেব কেন?— হুম্মার কণ্ঠ তীব্র হয়ে উঠলো
—বলতে পারো, কোনটা ভালো? রাস্তার বহুরের কাগজ
বিক্রি করা, না কা-হয় একটা বাঁধা আয়ের ব্যবসা করে একটি
ইউরোর তুলে বাস করা?

ভাবছিলো এককড়ি। হুম্মার চোঁতোতেই এই বাড়ী
হয়েছে। তার সাধো বাড়ীও হতো না, বা বোনের বিয়েও সে
মিতে পারতো না। দু-একখানা অলম্বার বা হুম্মার গারে
ছিলো, সেগুলো সে এককড়ির বোনের বিয়ের সময় ন-চাইতেই
খুলে দিয়েছিলো। অথচ মাইনের চাকার সংসারবরচ চালিয়ে
সেই অলম্বার হুম্মা দিয়েই গড়িয়েছিলো। কি করে গড়িয়ে-
ছিলো, সে কথা আশো সে মাত্রে মাত্রে বিস্মিত হয়ে ভাবে।
এমন কিছু মাইনে তো সে গায় না।

তারপর আছে আছে যদি কেনা, বাড়ী করা। ওঃ,
কী অসীম নৈর হুম্মার! ওন অথচ আছে, কিন্তু সেই কণ্ঠের
বিনিময়ে সে কিছু পড়েও তুলেছে।

তার প্রেরণা না থাকলে আশ এলব থাকতো কোথায়?
সে তো কোনদিন তুলেও একটি পল্লা সঞ্চয় করেনি।

সে কি অবিচার করছে না? নিজের অক্ষমতাকে

চাকার অস্ত অনর্থক হুম্মাকে সে দায়ী করছে কেন? প্রথম
বৌবনের তাবপ্রবর্তায় কল্যাণমির চাকরি ছেড়েছিলো।
কিন্তু বাস্তবের তাগিদে সিদ্ধান্তে সবতের কাগজ বিক্রি করত।
তারপর হুম্মাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো সংসার।

আম যদি সে লিখতে না পারে, দৃষ্টি যদি তার লক্ষ্যকে
আচ্ছন্ন করে দেয় তাহলে হুম্মা অপরাধী হবে কেন? অসুতপ্ত
কর্তৃক সে বললে—এই জীবনই ভালো, হুম্মা। অনেক ভালো।
কী ভয়ঙ্কর দিনই কাটিয়েছি! এখনো ভাবতে গেলে হুম্মার
জিতর কৈশে ওঠে। কিন্তু লিখতে কি আর পারবে না?

—কে বললে পারবে না? মনে হোক আনো। দিনরাত
তুমি শুধু ভাবছো—গেলো, সব গেলো! অনবরত ঠাইকর
করে ভাবলে কি লেখা যায়? তুমি জানোনা, তোমাকে
লিখতেই হবে।

কণ্ঠটা হুম্মার কণ্ঠ থেকে বেরোল, না তার অস্তরের
অস্তব্ধল থেকে? হুম্মার দিকে চেয়ে দেখলে সে। তার
সচ-মুদ্রাটা চোখে কঠিন আশ্রয়ভাবের ছাপ।

সামনে চাইলে এককড়ি। তারা দুহনে পাশাপাশি
গাড়িরে আছে, তার অশ্রুটি প্রতিবিম্ব আঁধার ওপরে।
এবার আর তাকে সেরকম স্মৃতিত বলে মনে হচ্ছে না।
মুখের ভাব পাশ ও সমাধিত।

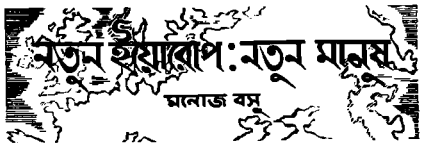
আর কিছু ভাববার অবসর সে পেলো না। হুম্মা বললে
তার হাত ধরে—চলো, পোবে চলো। একটু ঘুমিয়ে নাও,
নাহলে অসুখ করবে।

তবে পরেছে এককড়ি, কিন্তু তাহে ঘুম নেই।

হারিকেন নিতে গেছে। নিষ্কণ-কালো অন্ধকারের দিকে
চেয়ে সে ভাবছে, লক্ষ্য তো সে হারাবিনি। একদিন উত্ত-
বোদন অভাব ও অনন্দকে বীকার করে নিয়ে সেবার মত
তাকে চাকরি ছাড়তে অহুপ্রাণিত করেছিলো—নাহ সেই
বোধন মুহূর্ত্ত হলোও, সেবার মত তাকে দাতা রাত্রি জাগিয়ে
রাখে। তার লক্ষ্য তো আশ্রিত হয়।

আশ্রিত সে নতিমান। হারিকেনের গতিমি তার বেড়েছে।
সে হারিকেনকে সে অস্বীকার করে না। লেখা কন হয় হোক,
কিন্তু লিখতে তাকে হবেই।

হাইরে এখনো চলছে দুরন্ত রাত্রির বর্ণণ—কিন্তু এককড়ির
অস্তর শান্ত হয়ে এসেছে।



[পূর্ববর্ণিতের পর]

হুটি, হুটি! বেলা দশটা অবধি আকাশ পানে তাকাচ্ছি—ধরে যাবে এই প্রত্যাশায়। কোন লক্ষণ নেই। চুলোয় যাকগে, হেঁটে তো যাচ্চিনে।

গাঁয়ে যাচ্ছি চাষবাস দেখতে। সমবায়ের চাষ। এই তল্লাটে এটা হালকিল আসছে। সোবিরেতের কোলখোজ দেখে এসেছি, লিখেছিও তার কথা। সে হল বিরাট ব্যাপার। এরাও যাচ্ছে ক্রমশ সেই দিকে। আরস্তের সামান্য আয়োজন ধাঁ-ধাঁ করে বড় হয়ে উঠছে।

পূর্বমুখে ছুটেছি পোল্যাণ্ডের দিকে। ওড়ার নদী সীমানা। ঐ নদী পার হয়ে হিটলারি দল পোল্যাণ্ডে গিয়ে পড়েছিল। পোল্যাণ্ড ফতে করে রাশিয়ার। আবার তাড়া খেয়ে আর একদিন সেই ওড়ার পার হয়ে ঘরের ছেলেরা ঘরে পালিয়ে এলো। রাশিয়া ঢুকে ঢুকে পড়ল পিছু পিছু। ঠেঙাঠেঙির সেই বহুবিখ্যাত পথ।

কোন জায়গা এটা? গ্রাম? তোমাদের দেশের গ্রাম-চরিত্র মাথায় ঢোকেনা বাপু। ছোটখাট দিবাি একটি শহর। বোমা এখানেও? বিধম ঘায়েল করেছিল দেখছি। ওড়ার আর বালিনের মাঝামাঝি জনালয় আর মাঠঘাটের বাছবিচার ছিল না। লড়াই হয়েছিল প্রতি ইঞ্চি জায়গায়। উহ, ঠিক হল না—লড়াই কোথা? যা-কিছু হয়েছিল এক তরফে। কচুকাটা করতে করতে এগিয়ে আসছিল।

শহর বা গ্রাম ঘাই-বলুন, সেইটুকু শেষ করে

মাঠে নেমেছি। সোজা রাস্তা চলে গেছে, দু-ধারে দিগ-বিস্তৃত কসলের ক্ষেত। মাঝে মাঝে বন আসছে। বড় বড় গাছ ডালপালা ছড়িয়ে তলায় ছারা জমিয়ে রেখেছে। মৌবার্গ হাত বাড়াল সেইসব বনের দিকে : গাছের নিচে খুঁড়ে দেখগে। একটু খুঁড়লেই ভাঙাচুরো অস্ত্র পাবে। পাবে মানুষের কেরাটি-কল্ল। হাড় দেবে চিনতে পারো তো দেখবে সেই মানুষগুলো চোদ্দ-পনেরো বছরের কচি কিশোর কিংবা বাট-মস্তর বয়সের অপর্যবৃদ্ধ। আগে লোকে খুঁড়ে খুঁড়ে বের করত, এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খোঁড়া নিষেধ। ঐ সব দেখে মন খারাপ হয়, আর তো কোন লাভ নেই।

পোল্যাণ্ডের সীমান্ত কুড়ি মাইল এখান থেকে। আর বালিন মাইল পঁয়তাল্লিশ। কশরা ঢুকে পড়েছে—গেল গেল, সমস্ত গেল—কখনো হবে তাদের। লড়াই বিনে এক পা এগুতে দেওয়া হবে না। কিন্তু মানুষ কোথা লড়াইয়ের? বতম বেশির ভাগ। আর সব নানান দিকে ছড়িয়ে আছে। বানের জলের মতো খেয়ে আসে বিজয়ী-দল—আজেবাজে দৈমন্ত পাঠানো মানে বালির বাঁধে বান ঠেকানোর চেষ্টা। হল তাই—এবং সে বাঁধ নিত্যন্ত বালিরই বটে। মানুষ মেলনা তো ধরে আনো ইস্থলের ছেলেপুলে, কাঁধে বন্দুক দিয়ে দাঁড় করিয়ে দাও। বন্দুক তাক করতে না পারুক, মরতে তো পারবে। আর নিয়ে এসো বৃদ্ধোহাবড়া, ঘরের কোণে বসে বসে হারা জিমোয়। বন্দুক তুলতে পারবে না তো মরুক। মরবেই তো—কয়েকটা বছর

আগে আর পরে। মরে মরে কিছু সময় কাটানো, বিজয়ীদের গতি যদি প্রথ হয়। উভাবসরে বার্লিন চৈকানোর কার্যদা যদি কিছু বেরায়।

গাঙ্গা গাঙ্গা মরেছে এই উল্লসিত ভরে। বাচ্চারা এবং বুড়ারা। শিশু-বিশ্বস্ত শ্রমশানভূমি। মড়া খেয়ে খেয়ে শবুনের অকচি ধরে গেছে। শ্রমোৎসব কুণ্ডে দগ্ধবনে কেউ কেউ হাতখানেক মাটি খুঁড়ে যেনন তেমন করে মড়া চাপা দিয়েছে। আজকের উর্বর ভূমিতে কসলের সমারোহের মধ্যে দেবিনের কথা ভাবতে পারবেন ?

কংক্রিটের রাস্তা, ঠাণ্ডা হল, শেষ হয়ে গেছে কখন। পথের লোকজনও কম। দু-ধারের কসল আজুড়ে এসে পড়েছে, মোটর তার মধ্যে পথ খুঁজে পায় না। তারপর জঙ্গল। ছুটছি তো ছুটছি—যেন শেষ নেই। মনে হয়, এ অঞ্চলের খবর পায়নি ভূমিবৃহৎ মাহুঘের। কিন্তু খবর না-ই পাবে তো মোটর চলার পাকা রাস্তা বানান কারা ? মোড়ের মাথায় লটকে রেখেছে : সামলে চলো, খারাপ রাস্তা মাননে। সত্যি, আগে ভাবতাম ইরোত্রোপের নাট্য বৃক্ষি সেকলে কর্তাদের হুকোর নতাই জপোয় বাঁধানো। আমাদের মেঠো রাস্তা কোথায় লাগে মশায় ! এই স্বর্গে চড়ছি আবার এই পাতাতে নামছি। গাড়ি টলমল করে। মজবুত জাতের গাড়ি, নয়তো লোহালকড় খুলে কুলে পড়বার কথা। জঙ্গলটা ঘাই হোক কাটিয়ে এসেছি। এখন ক্ষেতখামার। হলসে কুলে ভরা রাইয়ের ক্ষেত, বালি আর গমের ক্ষেত। আবার মুশকিল, পথ হারিয়ে ফেলেছি নাকি—এককণ্ঠে পৌছে যাবার কথা। মাহুঘ একটা নজরে পড়ে না যে ‘ও মুকবির পো’ বলে পথের কথা শুধাই।

বা-ই হোক, মাঠ পায়ে গির্জার চূড়া দেখা দিয়েছে। মুরগি ডাকছে। গ্রাম পেয়ে গেছি—কী আশ্চর্য, দেবেরিন গ্রাম। পথের ধারে গ্রাম ও কবি-সমবায়ের নাম—ভুল হবার জো নেই। এই

জায়গা তাক করেই জো বালিন থেকে এত পথ ভেঙে এলাম।

গ্রামের মাতব্বররা মোটর ঘিরে দাঁড়ালেন। মেয়েও দু-তিনটি। প্রকাণ্ড ওকগাছের ছায়ায় মোটর রেখেছি। চেয়ারমান মশায়কে খবর দিতে লোক যাচ্ছে। আমরা শিহন ধরলাম। অকিস-বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। গৈয়ো অকিস, তায় চাষ-বাসের ব্যাপার। কেতাহরন্ত নয়, মনে হল এক লক্ষ্মীমন্ত চাবীর বাড়ি। মস্ত বড় উঠান, ঘোড়ার টানা ওয়ানগন এক পাশে। আস্তাবলে কয়েকটা ঘোড়া ঘাস চিবোচ্ছে। গম কেটে গাঙ্গা দিয়ে রেখেছে। ঘরের ভিতর কসলের কি একটা হিসাব-পত্র হচ্ছে, অ্যামাদের বেখে চেয়ারমান হস্তদন্ত হয়ে বেকলেন : কী আশ্চর্য, এ জায়গায় কেন ? সংস্কৃতি-ভবনে নিয়ে বসাতে হয় এঁদের !

সোজালিস্ট বেশগুলোর এক ব্যাপার—দশ-বিশ জন নিয়ে কাজ হলেই এক সংস্কৃতি-ভবন বানিয়ে বসে আছে। মাহুঘ শুধু খাওয়া-পরায় বাঁচেনা, মনের খোরাক চায়। এই নীতি ওরা সমাজের সকল স্তরে সমান ভাবে মেনে নিয়েছে। দেবেরিনের কবি-সমবায় আনকোরা প্রতিষ্ঠান—এমন-কিছু বড় জিনিস নয়। তারও এমন বৃহৎ সংস্কৃতির আয়োজন। দ্বাবধর—গান-বাজনা, তাস-ধাবা খেলা ও আড্ডা দেবার দেখার জায়গা। টেবিলের উপর খোদাই-করা দাবার ছক—কারেমি জিনিব, খুঁটি সাঙ্ঘিয়ে বসে গেলেই হল। নাচের ঘর, ছবি আঁকার ঘর। শিশু-বিবস হয়ে গেছে ক’দিন আগে—নানান জায়গার শিশুরা এসে জমায়েত হল। একসঙ্গে খাওয়াপাওয়া। নাচগান ও পালা করল তারা। ক্যাম্প হল, রাড্রে মশাল-বিহীন।

বহুন এবারে ভাল হয়ে। মানে বুকলেন তো ? এক এক বাটি চা সামনে দিয়ে বস্তুত শোনাবে। ঘুরে ঘুরে সেবারার আগে ব্যাপারটার মোটামুটি আন্দাজ দেওয়া। রূপকথ্য এই জায়গা,

একবারে ব্রু-সাইন, ওডার নদী অল্প দূর এখন থেকে। লড়াইয়ে তখনই করে দিয়েছিল, কোন-কিছু আর আস্ত ছিল না। ১৯৪৫ অব্দের পরে চাষবাস ছিল না একছটাক জমিতেও। মানুষই নেই—মরেছে, নগ্নতা পাগিয়েছে। জমি আগে ছিল সমস্ত প্রায় জমিদারের। লড়াইয়ের একটা বড় লাভ—জমিদার আর বড়লোকেরা ওরিত্তা গুটিয়ে সরে পড়ল। আর তারা কেয়েনি, পশ্চিম-জর্মানিতে রয়েছে এখন।

তার পরে মানুষজন জুটতে লাগল। বেকার মানুষ। লড়াইয়ে হৃতো দৈন্ত হয়ে গিয়েছিল—ফিরে এসে দেখে—জীবিকা, ঘরবাড়ি, আপন মানুষ সমস্ত খতম। চাষের মানুষ বলে নয়—অশু দশ রকম কাজকর্ম করত, তারাও এসে জমি চায়। ক্যাষ্টির ভেঙেচুরে পেছে, নতুন ক্যাষ্টির গড়ে তোলা সময়সাপেক্ষ, সেইসব বেকার কর্মিক চাষে এসে পড়েছে। জমিদার উৎখাত হয়ে বাওয়ায় সুবিধা হয়েছে—তাদের যাবতীয় অনিচ্ছিত তুমিহীন চাষীরা পেয়ে যাচ্ছে। পরের জমিতে চিরকাল খেটে এসেছে, এবারে নিজের জমি তাদের। নিজে যেন পাবে, চাষ করছে। জুত হয় না। ভাঙা দেশের অগণ্য সমস্তা, তার মধ্যে অল্পটা তো অতি-নিশ্চয় চাই। যতদূর সাধ্য, কৃষি নিংড়ে খাচ্চা আদায় করে নাও।

১৯৪৩ অব্দে—মাত্র ক'টা বছর আগে—সমবায়-চাষের শুরু। জমি আঠারো হেক্টর, মানুষ চার জন। একটি তার মধ্যে গাঁয়ের পুরানো লোক, বাকি তিনজন বাইরের। আর কেউ এলো না। বিশ্বাস করে না, এমনি ভাবে কাজ হবে। ক'দিন টেঁকে দেখ সমবায়, ফসলের ভাগ নিয়েই তো মাথা-কাটাকাটি লাগবে। বছর কটল, ফসল ঘরে উঠল। তাই তো রে—কম-সে-কম ডবল মুনাফা হয়েছে। সেই আঠারোর জায়গায় এখন ন'শ-কুড়ি হেক্টর জমি। তার মধ্যে আটশ হেক্টরে চাষবাস, বাদবাকি লেক ঘরবাড়ি ইত্যাদি। সমবায়

মোট পরিবার এখন পঁয়ষট্টি। আর হেক্টর করে নিম্নতম জমি প্রতি পরিবারের, সেখানে আশুটা মূলোটা আঁকায়। গাঁয়ের সাতটা পরিবার এখনো সমবায়ের বাইরে আছে, নিজের চাষ তারা নিজেরা করে। জোরজবরদস্তি নেই, ভাল বুকে তখন চলে আসবে।

যে চাষবাস, খাটনির মানুষ কম লাগে—ট্রাক্টর তো আছেই, তাছাড়া ফসল-বোন ফসল-কাটা ফসল-মড়ার যাবতীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি। দোড়া-গরুর ঘাস কেটে আনছে, গাই ইটছে—সমস্ত কলে। চেয়ারম্যান বললেন, আপনারা ভারতের মানুষ। নানান দেশের এমনি অনেক বন্ধু এসে গেছেন এই গাঁয়ে। এমন কিছু বড় আয়োজন নয়। কিন্তু খাস রপক্ষত্বের উপরে এত মানুষের উচ্চমণীল জীবন দেখতে বোধহয় ভাল লাগে। একবারে কিছু ছিল না, চারিধারে যা-কিছু দেখছেন সমস্ত নতুন। ক্লাববাড়িতে বসেছেন, সাবেক দিনেও বাড়ি ছিল এখানে। কিন্তু তিনটে বছর আগে এলেও দেখতেন রাবিশ গাদা হয়ে আছে। ভিতটুকু মাত্র পেয়েছি, তার উপরে ইমারত নতুন করে বানানো।

দূরত বেরুলান তারপরে। কী করে ফেলেছে এই চাষীর গাঁয়ে! ষটখটে পাকা গোয়ালে গরু বাঁধা আছে এক-শ'র উপর। গরু নয়, এক একটা হাতী। আর হাঁড়গুলো হামলা মিছে বাঘের মতন। কাছে যেতে ভয় করে। এই বড় বড় ছুথের কেঁড়ে। কাঁচা গম গাদা দিয়ে জেঁথছে, এদের খাওয়াবে। ইটুল বানিয়েছে, ঘর আর কতটুকু—বাগান। রকমারি ফুল ফুটেছে, বাজারা ঘেরে তার মধ্যে। হাসপাতাল ছোটখাট একটুকু—সে-ও মস্ত বড় বাগানের চিতর। এই ক'বছর আগে এত বোমা পড়েছে—সবুজ বাগান, রঙিন ফুল আর হাসিখুশি মানুষজনে সমস্ত ঢেকে দিয়েছে।

সমবায়-চাষবাস সম্পর্কে কলেজ বসিয়েছে মাইসেনে। মাইসেনে—যে জায়গায় মেদিন পোসিলেন-ক্যাষ্টির দেখে এলাম। এঁদের কর্তাদের

মধ্যে একজন সে কলেজের ডিরোনা নিয়ে এসেছেন। যত সমরায়-খামার আছে, সেখানকার কর্তব্যাক্সিয়া ছাত্র হয়ে যান সেখানে। দু-বছরের কোর্স। কৃষির সর্বাধুনিক কার্যদাকানুন শেখায়। পঞ্চ-পাশি পালন এবং সমরায়-খামার চালানোর মোটামুটি পদ্ধতিও দিলেবাসের ভিতর। খামার চালানোর কোন বাধাধরা ছক নেই অথন্ত। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে চাবীরা ঠিক করে নেয়। কোন জায়গায় সমরায়-সমিতি শুধুমাত্র কলে চাব করে; খরচাটা হারাহারি ভাগ হয়। আবার এমন আছে—জমির মালিক যাবতীয় জায়গাজমি কার্যেই তাতে দিয়ে দিয়েছে সমরায়কে।

ভারতের উন্নতি হচ্ছে, তার জ্ঞাত ঠাঁয় বড় খুশি। হলগানিন-কুশেভ ভারতে এসে বিপুল স্বর্থনা পেয়েছিলেন—সেই ডকুমেন্টার ছবি ঘুরে গেছে এই জায়গা থেকে। ছবির নম্বা দিয়ে সেই ঠাঁয় ভারত দেখলেন।

বাগিনে এসে দেখি, যে দু-জন আমাদের সঙ্গে বেরোননি, হর্ষে তাঁরা ডগমগ। সুখবর, চোকোলোভাক্সিয়াও দাওয়াত দিয়েছে। পোল্যাণ্ডের চিঠি আগেই পেয়ে গেছি। তবে আর কি, লাটসাহেবের ভোয়াজে আরও দুটো রাজ্যে ঘোরাফুরি চলবে। ফিরতি-টিকিট এরাই কেটেছে বাগিন থেকে বয়ে। আমরা তা বলে সহজে ক্ষিরহিনে—নানান দেশে চকোর মেরে যাব।

আপাতত বাগিন থেকে প্রাণ। সেখানে দিনকয়েক কাটিয়ে পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশ। ওয়ারশ থেকে পুনশ্চ প্রাণ। অতঃপর গাঁটের কড়ি ধরে অস্ত্র যতগুলো জায়গায় ঘটে ওঠে। বাইরের লিবিয়োসের সঙ্গে মোলাকাত হবে, তাঁদের মনের কথা শুনব। দুনিয়া জুড়ে খুন্সেরেরা নানান বেলা খেলাছেন, তাঁদের ঐ দাবাখেলার খুঁটি হবেনা লেখককুল। গোটা ইয়োরোপ জুড়ে অগ্রতায়ের হাওয়া। কাণে দেখে হাঁপিয়ে উঠতাম আমি

মাঝে মাঝে। আরে মশায়, বেশ আছি আমরা—ওদের চেয়ে ডের ভাল।

ভোটাভুটি আসন্ন। লাইপজিগে ভোটের সভা দেখে এসেছি। পথের দুটাছুটির ভিতরেও ভোটের বক্তৃতা কানে এসেছে। বীরা লাড়িয়েছেন, নিজ নিজ গুণপনা ও নিজ দলের আদর্শ ব্যাখ্যা করছেন মাইক্রোফোনে। মাতকবরেরা ভারি ব্যস্ত। ডাইস-প্রিমিয়ার তার ভিতরেও খবর পাঠিয়েছেন, দেখা করতে চান আমাদের সঙ্গে। আলাপ-সালাপ হবে কাছাকাছি বসে, প্রশ্ন থাকলে তার জবাব দেবেন।

টেকো-রাজা বলতাম আমরা সপ্তম এডোয়ার্ডকে—ডাইস-প্রিমিয়ারের অবিকল সেই চেহারা। হুঁচাল দাড়ি, ধবধবে ফরসা নুপুট চেহারা, মাথা-জোড়া টাক। মুবলধারে প্রশ্নবর্ষণ—প্রশ্ন বুকে নিয়ে ধীরে ধীরে তিনি জবাব দিচ্ছেন। জাঁদরেল লেখক স্টিকান হাইন তাঁর পাশে—দোভাবির কাজ করছেন। অত বড় লোকের মুখের কথা বুঝিয়ে দিতে তিলেক হাতে ভুল না হয়। হাইন পণ্ডিত মানুষ, জর্মনির সকল ব্যাপারে ওয়াকিবহাল, ইংরেজিটাও বলেন অতি চমৎকার।

বাগিনে এত কড়াকড়ি দেখ, কারণটা হল, শত্রুদলের গোপন ঘাঁটি শহরের ভিতরেও। এমনি অবস্থা, সমস্ত জেনেওনেও মূলমুহু উপড়াবার জো নেই, শুধুমাত্র কড়া রকনের নজর রাখা ছাড়া। বাগিনের চতুর্দিকে পাহারা। আন্তর্জাতিক পথের হু-ধারে পাহারা, দুই জর্মনির ভাবং সীমানা জুড়ে পাহারা। কত মানুষ লাগছে, কত খরচ। কী পরিমাণ অপব্যয় বুকে দেখ। এই সম্পদ দেশ গড়ে তোলার কাজে লাগানো যেত। দু-পক্ষেরই মানুষ এক হবার জন্তে ব্যাকুল। দু-দুটো লড়াইয়ের বা খেয়ে প্রতিটি প্রাণী বুকেছে শান্তি ছাড়া বিচবার পথ নেই। এ-জর্মনি কিংবা ও-জর্মনি বলে কথা নয়—উভয় খণ্ডেরই সর্বসাধারণ। অ্যাটম-বোমা মজুত করে রাখবে, কোন লোক সেটা চাচ্ছে না।

লেখকদের কথা উঠল। পূর্ব-জন্মনিতে লেখকদের অবস্থা কি? কলম-চালনার বাধা-নিবেধ কি পরিমাণ?

কর্তামশায় হেসে হাইনকে দেখিয়ে দেন : জিজ্ঞাসা করো ঠকে। যেমন ঠর ধারণা, বলুন। ঠদের বুদ্ধিবিবেচনা ও দেশপ্রেমের উপর সরকারের বোল আনা আস্থা। এমন কি ‘ধনতয়ে ফিরে চলে’ লিখলেও কেউ আটকাবে না। একজন ইকনমিস্ট মুক্তিযুদ্ধ দিয়ে লিখেছেও তেমনি এক বই। পড়ছে লোকে।

বললেন, এপার-ওপারের সাহিত্যিকদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা। বৈজ্ঞানিক সমাজেও তাই। ঠদের কল্যাণেই জাত বেঁচে যাবে। দেখ, পশ্চিম-জন্মনির আঠারো জন বাধা বৈজ্ঞানিক অ্যাটম-বোমার বিপক্ষে কতোয়াল দিয়েছেন। ভারতের সাহিত্যিক তোমরা এসেছ, দেখে যাচ্ছ নিজ চোখে। ভারতের উপর বড্ড ভরসা দারা ছুনিয়ার। ধংসের কিনারায় পাড়ানো মানুষের জন্য কিছু করতে পারবে কিনা, ভেবে দেখ তোমরা ভারতের সাহিত্যিক।

পরদিন প্রেস-কনকারেল। পঁচিশজন এসেছে নানা কাগজের তরফ থেকে। আকামেরি হলঘরে বসেছি। বোমো উস উপস্থাসকার শুধু নন, কাগজের সম্পাদকও। তিনি মুখবন্ধটা করলেন :

ভারত ও জর্মন সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক খুব নিবিড় হোক, এই আমাদের কামনা। সহ-অবস্থান হলেই হল না, অবস্থান করব আমরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্য নিয়ে। আমরা শান্তি চাই, ভারতেরও সেই বাণী। শান্তির সংস্কৃতি-ভূমির উপরে পাড়িয়ে আমাদের আত্মীয়তা। পণ্ডিত নেহরুকে সহস্র ধন্যবাদ, মিলনের সেতু-রচনার তিনি স্বেচ্ছাপূর্বক করে দিচ্ছেন। ঠার ইচ্ছা না হলে তোমাদের এই দল আসতে পারত না এখানে। ঠার পোষকতা বিহনে আমরাও নয়াদিমিতে এশীয় লেখক-সম্মেলনে একসঙ্গে বসতে পারতাম না।...

লিজেলের না বালিনে এসেছেন। থাকেন তিনি লওনে। লড়াইয়ের পরেই চলে গেছেন, আর আসেননি। লিজেলেও ছিল। তার ইংরেজি শেখা মায়ের কাছে থেকে। হাসে লিজেলে, আর মায়ের গল্প করে। না এযাবৎ নিজ ভূমে আসেননি দেশটা কমুনিষ্টদের হাতে চলে গেছে বলে। ভীষণ লোক তারা, টাকাকড়ি আছে বুঝলে মেরেধরে কেড়ে নেয়। লিজেলে বিলখিল করে হাসে : এত কাছাকাছি থেকেও কি রকম বিরঘুটে ধারণা দেখ। আর তোমাদের কথা বলে, ইতিয়ার লেখকগুলো পূর্ব-জন্মনি যখন দেখতে এসেছে নিশ্চয় বাধা-বাধা কমুনিষ্ট।

যাই হোক, বিস্তর ষিধা-সন্মোহ সম্বন্ধে অপত্যস্নেহের বশেই মা-জন্মনী মেয়ের সংসারধর্ম দেখতে এসেছেন। যখন এসে পড়েছেন, আমাদের হয়ে লিজেলে দাওয়াত করে দাও—ভারতীয় বাধা-বাধা লোকগুলোর সঙ্গে পাত পোড়ে একদিন খেয়ে যান। খেতে বসলো তোমার বরকেও। মুখামুখি বসার উপায় নেই তো টেলিকোনে দিনের মধ্যে অন্তত একটবার কথা বলবে—চোখে দেখতে চাই তোমার প্রেমের সেই ভাগ্যবান পুরুষটিকে।

আজকের দিনারে তাই মাকে আর বরকে নিয়ে এলো লিজেলে। মায়ের বয়স হয়েছে, কিন্তু সাজগোজে বয়স ঢাকা পড়ে গেছে। লিজেলের না—বোনের মতন যে লিজেলে এতদিন আমাদের খবরদারি করে বেড়িয়েছে, ঠার চেয়ারের কাছে উঠে উঠে গিয়ে আমরা পরিচয় করছি। মনোভাব বা-ই হোক, বাইরে বেশ ভদ্র। সন্তানের সুরে কথাবার্তা বলছেন। হাসি-ঠাট্টাও চলেছে। লিজেলের খুব স্খাতি করছি, উনি মুখ টিপে হেসে জামাইকে দেখিয়ে বললেন, থামো থামো, আমায় বেশি বোলো না। লিজেলের স্বামী ঐ যে—মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে বেচারার।

স্বামী ব্যক্তিটি হাবাগবা মানুষ অন্তত চেহারায়। বলছি, ক’টা দিন আপনার বড্ড কষ্ট পেছে।

—কেন, কেন ?

—ছাউ লিজেল আমাদের সঙ্গে পথে পথে ঘুরেছে। ঘরকন্নার কাজ, বাচ্চার দেখাশোনা সমস্ত এক হাতে করতে হয়েছে আপনাকে।

—তাতে কি ? এসব আমার অভ্যাস আছে। পাকা গিল্লি আমি। ও পারবে আমার সঙ্গে ? প্রায়ই করতে হয় কিনা।

চমকে ওঠার কথা, কি বলেন ? ঘরের মধ্যে আমরাও নানা কন্ঠ করি—দায়ে বেদায়ে, এমন কি, বাচ্চা ছেলের কাঁথা-পরিচরণ অবধি। বাইরে ভাঙব তা বলে ? দোরিওপ্রতাপে অন্তঃপুর একেবারে কেঁচো হয়ে থাকে, বাইরের কথাবার্তার এমনিতরো প্রকাশ।

আর এই মানুষটি বলছে, সাংসার তো দুজনার। ওর যখন বাইরে কাজ, আমার ঘর ঠেকাতে হয়। কাজ ভাগাভাগি আমাদের।

আর এক নতুন মানুষ এসেছে আজকের খানা-টেবিলে। সীবার্গের বউ। হাসিমুখি বউটা। বলে, চোখের নেখা দেখিনি এদিন, কিন্তু জানি তোমাদের প্রতিজনকে।

—সে কি গো ?

—যে মানুষটি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, তার মুখে সর্বদা তোমাদের কথা।

—খুব নিশ্চয় করে নিশ্চয়। খাটিয়ে-খাটিয়ে নারছি।

সীবার্গ বলে, এই বাটনিই তো চাকরি আবার। বাটব বলেই তোমাদের সঙ্গে দিয়েছে।

—চাকরির দায়ে খাটা এ বস্ত্র নয়। লাইপজিগে বই চেরেছিলাম—এ-পাড়া ও-পাড়া জুড়ে অমন করে গল্প-বোঝা করবার কোন দায়টা ছিল তোমার ? আবার ফরমাসি ছবির বোঝে গোটা বার্লিন চষে বেড়াচ্ছ, সে-ও কি ঐ চাকরি রাখার ব্যাপার ?

সীবার্গ বলে, খাটাতে জানো, তাই খাটি। নিজেও খেতে মরছ রাতদিন। হোটেলের ঘরে,

পথের উপর গাড়ির মধ্যে—কোনখানে বিরাম নেই। কি এত লেখো, তার ক্ষেত্রে লোলুপ হয়ে আছি। বই হলে পাঠাবে।

—বাংলাভাষাটা শিখে নাও তার আগে। টেগোরের ভাষা—হেলাফেলার বস্ত্র নয়। বাংলায় ভিঠি লিখে বই চাইবে, তোমাদের দেশ নিয়ে-লেখো বাংলা বই সঙ্গে সঙ্গে আমি পাঠিয়ে দেবো।

অমনি ছাড়ব আঙ। লড়াই কী ভয়ানক, চোখে তার অলস ছবি দেখে গেলাম। এই তেরো বছর পরেও। মানুষ যেন পিঁপড়ে-মশ। এ-বাড়িতে হাজারখানেক মরেছে, ওখানে শ-ছই—সিগারেটে ধোঁয়া ছেড়ে অবাধে কেনন শুনিয়ে যায়। দমে না কিন্তু মানুষ—বাচ্চারা বড় হয়, ভাঙা অটালিকার রাশি সরিয়ে ভিত থেকে আবার নতুন করে গড়ে তোলে। আর অলক্ষ্যে সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিক প্যাচ-কথাকথি হচ্ছে, কোন্ কার্যদায় এইসব ফের চুরমার হবে, নতুন মানুষদের সাবাড় করা বাবে পাইকারি হারে।

সেই কথা বলি। আজ। মানুষ তোমরা। এত উগ্রন এমন কর্ণশক্তি, শিল্পে আর বিজ্ঞানে অযতন ঘটচ্ছ—নাহুবেব যত রকমে শ্রু বিধান করা যায়। লক্ষ্যকোটি ময়দানব পাগল হয়ে খাটছ। দশ-বারোটা বছর কাটে এমনি বেশ। লড়াইয়ের দাগ নেই তো আর কোথাও—একেবারে মুছে গেছে ? দেখ ঠাইর করে। বাস, দৈত্য অমনি ক্ষেপে উঠল। ভাঙো, ভাঙো, ভাঙো। আগের চেয়ে কঠিন করে বানিয়েছে তো, কঠিনতর অগ্র লাগাও। সভ্যতার চিহ্নটুকু থাকতে দেবে না, এই যেন পণ। পড়ে রইল দিক্‌হীন নির্দানব শ্মশানক্ষেত্র। নির্জিত মল্লযুদ্ধ জুকের কৈসে উঠছে তারই নানা শ্রান্ত থেকে।

বললাম, এই কাণ্ড তোমাদের ইয়োরোপের। ইতিহাস দেখে বলা ঠিক এই কিনা। আমরা বাপু অনেক বেশি সভ্য তোমাদের চেয়ে।

যাবার দিন কত লোক আসছেন। নিরকে এলো, বাঘে থেকে আনাদের সঙ্গে যে এক-প্লেনে বেঁচে ফিরেছে। ছেলে নিয়ে এসেছে। আজকে অস্ত্র চোরা—ছেলের মা নিরকে, গমেশজ্ঞানী। ভারত খুবই ভাল লেগেছে, কিন্তু ছেলে আরও ভাল। ছেলে ছেড়ে আর সে যাবে না। বড় হোক ছেলে, সবশুদ্ধ গিয়ে থাকবে ভারতে। ছেলের কথা শতখান করে বলে, আর ছেলের বাপের কথায় হাসে টিপিটিপি।

ডিটক্লেসের ভাবী বউ এসেছে—শিউ, সেই সেনার মেয়েটা। আমরা চলে যাব, খবর পেয়েছে ডিটক্লেসের কাছে। সকালবেলা এসে পড়েছে, আমরা তখন বাজার চুঁড়ছি। পকেটে যে-ক'টি মার্ক আছে, একেবারে শেষ করে যাব। মার্ক-ধনে ধনী আরও সব আছেন—এত মানুষের পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার—ঘুরে ঘুরে নাভেহাল হয়ে অনেক বেলায় কিরলাম। হুপ্তে খাওয়াচ্ছেন খুব সাংস্কৃতিক-মন্ত্রী, সময় বেশি নেই, তড়িঘড়ি তৈরি হয়ে নেবো ভোজের জড়। কাড়া তিনটি বটো এদিকে তো বসে রয়েছে শিউ, আজ তার কলেজ হল না। কিনা, চলে যাক বিকালবেলা—মুখ দিয়ে ছোট্ট কথাটি বলে যাবে—‘বিদায়।’ হাতের সঙ্গে হোয়াটু’রি করে যাবে। সত্যি, এমন ভাল সব মানুষ—দেশে দেশে কত মা-জ্ঞানী কত বোন পেয়ে এলাম, মনে পড়লে চোখে জল এসে যায়। কাকে যেন একদিন বলেছিলাম, এই জর্মির মানুষ কখন গিয়ে বোমা কেলে আসে সেই ভয়ে ব্লাক-আউটের কত রাত্রি মশকে কাটরেছি। আজ্ঞা, এমন হাসি ভোমাদের মুখে এত স্নেহশীল মন, কেমন করে বোমা ফেলতে বলো দিকি ?

এরোডোম অবধি অনেকে চলে এসেছেন। একসঙ্গে একটা ছবি তুলে নাও। ভোমাদের সঙ্গে

বড় আনন্দে দিনগুলো কাটল, তারই এক স্মৃতি। ভিতরে নিতে দেবে না কিন্তু, যা-কিছু এই বাইরে থেকে। বোসো বলেন, কি অবস্থায় আছি, সে তো দেখে গেলে। এরোডোমের ছবি, তা সে যত বড় দিকপালই হোন, কাউকে তুলতে দেবে না। কোন্ মতলবে কে ঘুরছে, বোঝবার উপায় নেই।

সংস্কৃতি-দগুনের কেঁপেঠিই এক মহিলা এসেছেন—মারিয়া (Maria Rentmeister)। মাতৃবের স্তম্ভায় ভরা আশ্চর্য মুখ। বলেন, ভোমাদের তুলব না। কাজে-কর্মে যদি কখনো দরকার পড়ে, আবার নামে লিখো। সংস্কৃতি-মন্ত্রী কবি মানুষ—ভারী ভারী বইয়ের গাণা পাঠিয়েছেন নিজ হাতে আনাদের জন্যে-জনের নাম লিখে। আর এসেছেন লম্বা ধাঁচের মানুষটি। বৈদেশিক দগুনের একজন কর্তব্যাক্তি—কিসার হারবার্ট (Fischer Herbert)। নিরামিষ খান, উত্তম হিন্দি বলেন, গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর আশ্রমে ছিলেন কিছুদিন। বলেন, আবার ভারতে যাব।

বিবম গরম। আপাদমস্তক পশমি পোশাক, অন্তরাখা আইচাই করছে পশমের নিচে। পাখা পাবেন না কোথাও। পর্বতপ্রমাণ পাখা বানায়, কিন্তু নিষেধ দেশে রাখে না একটি। দরকার পড়েনি এতাবৎ, এমন অবস্থা কশ্মিনকালে কেউ দেখেনি। যা গতিক, খুঁতি-পোশাকের চলন হবে এর পর ইয়োরোপে। ঢিলেঢালা পোশাক। আর যেমন এদেশেও বলে থাকে, যত নষ্টের সোড়া হল অ্যাটম-বোমা। আবহাওয়া বদলে দিচ্ছে। সমস্ত উষ্টোপাটা হয়ে গেল।

বোসো উলৈ বলেন, বন্ধু লেখকগণ, দেখে-গুনে ভোমরা ফিরে চলো। হয়তো বা বইয়ে লিখবে, গ্রীষ্মপ্রধান ইয়োরোপের মধ্যে সবচেয়ে গরম দেশ হল জর্মনি।

৷ গ্রন্থ পর্ব সমাপ্ত ৷

চেনা

—সৌরীন মেন—



মুখ

পেশা ও নেশা

সমাজ-জীবনে হরের বকমের বৃত্তি আছে। এই বৃত্তি কিছুমাত্র ধাব ধারেনা প্রকৃতির। তাই নিত্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেরানীপিরি মেনে নিতে হয়। শখ ছিল ব্যাবিস্টার হওয়া; কিন্তু ব্যাটী ঘেঁচু হাত-পা চোঁড়াহুঁড়ি করে বাড়ল্যাম তো, তেড়েহুঁড়ি বড় কোর হল্যাম মানকহু। উপায় নেই। পেট বড় আশা। একটা কিছু করতেই হয়।

‘ভিন্নি ভিন্নি অফ পোয়ার’-এর মানে নেই আমাদের দেশে। ইচ্ছা-বৈচ্ছ্যন্তেরও কথা ভেঁটে বৃত্তি ধরে। কি করেন? —না, টানানো আছে, চমড়া-র কাজ করি। মস্তব্য পোনা ধাবে—আরে ছিঃ, লোকটা চামার। ছুড়ীপাড়ী চাপলেও পেট চামার। এ চামড়ার দুর্গন্ধ আতর মাখলেও যাবার নয়। বহুলা শেটেও তা ঢাকা পড়বে না। কেন? না, সেগে বেওয়া হয়েছো বৃত্তি বুকে।

তা; আমারও অবস্থা বানিকটা ঐ ধরনের। বৃত্তি একটা আছে বটে, কিন্তু তাতে কৌলীজ নেই কিছুমাত্র। এমন কি, ভগ্ন সূরীও নেই আমি। ইনসিওরেন্সের একেট। আমি যে হাংলাস।

জীবন-বীমার দালাল পরিচর্যা বেন কেমন কেমন। কিছুটা বাজিলা, সেই সঙ্গে কিছুটা উপেক্ষা, ঝঁটা লাগি মিলিয়ে নিশিয়ে আমি বেন বানিকটা প্যারে হেঁচা। ব্যবহার বা পেয়েছি প্রথমটার তাতে সেই কথাই মনে হয়।

অবশ্য এর জন্ত আমি আমার দেশের লোকের দোষ ঘেব না। সমাজের উপর অভিমানে করে, অপরের ঘাড়ে হারিহ চাপিয়ে ব্যাটীর ধাড়া ভাঙ খেতে চান তারা খান। আমি বাধা ঘেব না। আসলে দোষ কিন্তু আমাদেরই। ঘেব আমার, দোষ আপনার। আমার বাধা বীমার দালাল। আমার অভিযোগ আমাদেরই বিরুদ্ধে। দেশান্তিকে আঘাতই করেছি ভাষার।

এমন অনেক কর্মী আমার চেয়ে হামেশাই পড়ে থাকেন বাংলার বিস্ময়কর ভ্রম। নেই এই বৃত্তিতে। অল্প কোনো কিছুই জেটাতে পারেননি, উপেক্ষিত হয়েছেন সব দরজায়, তাই শেষকালে এক একেলির ছাড়পত্র নিয়ে ম্যাসিকের ঘনি হাতে শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে চলেছেন। মন পড়ে আছে বিদিশপুত্রের বেলেঙের পত্রে বা বহুলাপাটী স্ট্রীটের হিলাব-পরীকার অফিসে। একেলি নেহাত-ই একটা স্টপ-গ্যাপ। সামান্ত একটা ইশারার অপেক্ষা মাত্র। সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে তত্বনি দৌড় বেবেন সেই দিকে।

এঁদের অনেকের আকস্মিক আমার কাছে অদ্ভুত সব অহরোধ নিয়ে এসে থাকেন। আমার নাকি খুব হাত। আমি একই বলে দিলেই নাকি মাস-না-ইনেতে ইন্সপেক্টর বা অর্গেনাইজারের চাকুরি পাওয়া যায়।

তাঁদের হাতকর অভিজ্ঞতা এ লাটনে। নিজে কিছুই জানেন না, অথচ অপরকে শেখাবেন কি করে আমি বৃত্তি না। শুধু এইটুকু বৃত্তি ঠরা শুধু বুকে চান মাস-মাইনে। অনেকে আমার আমার সামনেই প্রেক্ষিকের কথা পেড়ে থাকেন।

অতি দোজা গ্রন্থ করি আমি: বদুন তো, অম্বক কোম্পানি বে নিরম্যে হাজারে তেজার টাকা নিয়ে থাকে সেখানে আপনার কোম্পানি চুয়ার দাবি করেন কি হিসাবে? এরকম গ্রন্থ কোনো পাঠি করলে কি উত্তর দেবেন?

জবাব নেই। সম্পূর্ণ নিরস্তর।

এ ধরনের কর্মীদের সেলুট টক শুনে জগদ্বাবুর বাজারের দাঁতের বাজনের ডিগ্রিওলাসের কথাই মনে হয়।

হাজার ডিগ্রিওলাসের তবু বাহবা দিতে হয়। তাদের বেলা সেভাবে পারে তারা। বাজিমাত করে

লোক জড়ো করবার ক্ষমতা আছে তাদের। ঘৃণ দিয়ে বন্ধ হুলে ভোজবাস্তি দেখানো যায়।

আমি নিজের জীবন দিয়ে বলিয়ে দেবেছি, তুমি সাংসারী বানানো করবার অপারেশন করার অপারেশন বন্ধ করে, রেজর্ভার আর সিনেমার দেখানো দাম গুলে বাক্সি জিতবেন বলে খায়া মনে করেন তারা ভুল করেন এ বৃত্তিতে।

নিজেকে সত্যি করে তুলেপের তাদের সন্ধান পাওঁরা যায় কি? সে সীনতার কারও করণার সকার হয়তো হয়, কিন্তু তাতে আর বাই হোক, ইনসিগ্লেষণ কেন্দ্র হয় না। আরো সেই স্ট্রেশীর কর্মীদের এ কথা জানা থাকে দয়াকর।

কলকাতা শহরে গাড়ী-বাড়ী, বহুবাধক আছেন, আরিক সঙ্কলতার গ্যারান্টি আছে এমন ঘরের ছেলের প্রথম জীবন এ বৃত্তিতে কিছুটা আশাপ্রদ হচ্ছে নেই। প্রথম চোটেই কয়েকটা কেন্দ্র দিয়ে অর্গানাইজারকে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন তিনি। কিন্তু বৌদির ডাই শেষ হল, বোনের বেগর বৃত্তিরে গেলে সারা কলকাতার তিনি একটি প্রাইটরও সন্ধান পান না। এমন বহু উৎসাহী কর্মীর এক্সেস-জীবনের অপমৃত্যুর কথা আধার নোট-বইয়ে লেখা আছে।

এই স্ট্রেশীর কর্মীদের হাত দিয়ে যে পরিমাণ নতুন কেন্দ্র কোম্পানির পাকা খাতায় গুঁথে তার শতকরা প্রায় পঞ্চাশটি পলিদি মুক্তিকা-গৃহেই যারা ধার। ছই-এক বেশ টাকা জমা পড়ল, তারপর সব চূপচাপ। লোকে মায়া গিয়ে নিজের পলিসির কাগজটি বাঁচিয়ে রেখে যান। কিন্তু এক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো। বেঁচে থাকেন তিনিই, পলিসির হয় অপমৃত্যু।

আমাকে খায়া চেনেন তারা অনেকেই হয়তো একই হোসে সিগারেটের ছাই খেড়ে বলবেন : বুঝ যে জান দিচ্ছেন স্ত্রীর, কালকাতা স্ত্রীরে আপনার সেই এপিসোডটি দেব নাকি ফাস করে? বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, মিল পাওঁয়েলেক ছেদীলালের সঙ্গে পরিচয় করবার জন্ত মোট কত টাকা খরচ করেছিলেন আপনি? ... রেজর্ভার খাওয়াবোঁর কথা বলছেন, কিন্তু যে পরিমাণ হইন্ডির বিল আপনি মোটান তার ক'পেগ আপনি নিজে খান? আরও গুনতে চান? জলপাইগুড়ির চা-বাগান গ্রাস করবার জন্ত সোলসোবিলি বারকড-কে ডিনার দিয়ে সুবিধা হবে না কেনে ছ'খানের মধ্যে হ'বার আপনার ভাতীর জন্তবিনের অল্পটান করেছিলেন, এ কথা কি সত্যি?

সত্যি। অভিযোগ অস্বীকার করব না। তবে সবটা

সত্যি নয়। অভিযোগ অস্বীকার। পুরোটা জানা নেই তাই হিসেবে সোলমাল দেববে। মিথ্যা নয়, তাই বলে সেটা সবচেয়ে বড় সত্যি নাও হতে পারে।

আমার শাকসোঁর এইগুলি ধারা টুপি সিকেট বলে মনে করেন তাঁদের কিন্তু ঠিকতে হবে।

চালাকির খায়া কোনো বহুৎ কাজ হয় না। ইনসিগ্লেষণ বিজ্ঞানেশ কোনো বহুৎ কাজ নয় বীকার করি, কিন্তু চালাকির খায়া যে সেটা সত্য নয় এ-বারি আমি করবোঁই।

নিজের চারিত্রিক কাঠামোকে করতে হয় ভদ্রানক বেনী অ্যাকোমোডেট। তাতে অবশ্য বেশ কিছুটা চাপ পড়ে হচ্ছে নেই। কিন্তু তবু করতেই হয়। নিজের সঙ্গে চাই পরিচয় বোকাপড়া। এগুতে হলে কতটা একথা, পিছুতে হলেই বা সত্যটা। স্বর্ণ-নরকের কিংগ্রাফিটা ভালো করে জানা থাকে চাই।

আমার বিরুদ্ধে অনেকের অনেক পিছু বক্তব্য আছে জানি। হুনাং বেইক শেরেছি, দুর্দাম কুন্ডিরেছি অনেক বেনী। আমার বিরুদ্ধে কেউ যখন চার্জশীট দাবিল করতে চান তখন আমার ভালো উকিলের কথা মনে পড়ে না, বহুং তাকে আতো কিছু পয়েট খরিয়ে দিতে ইচ্ছা করে।

নিভাত বিজ্ঞানেশও রাত জেগে আমি নিবিলবাবুর সঙ্কলভের বাতির উজ্জ্বল-সমীত গুনতে গিয়েছি সেদিন। তবলার কানি ধরে ঘরানা বৃত্তিরি বাটে, কিন্তু তেহাইএর মধ্যে ভুল করে হাতভালি দিয়ে বসিনি।

আমি নিজেকে কিছুটা শক্ত ও নিরেট লোক বলে জানি। ছবির 'ছ' বুঝিনে, কিন্তু কোনো বিশেষ মন্তব্যকে বুঝি করবার জন্ত আমার প্রশ্রীনেতে বেতে হয়। ছবির কিছুটা দুবে ঠাঁড়িয়ে গুনিয় গুনিয়ে করতে হয় : কোরায়েট, কোরায়েট—যাঃ ইম্ফুয়েন্ট বাই ভ্যান গ। প্রশংসা করতে গিয়ে স্ত্রৌক কথাটা সন্তর্পণে এড়িয়ে আসক্তো করে বলি—বিদ্যম।

এরকম অনেক, এরকম বহু ঘটনা। ছেদীলালের সঙ্গে মিল পাওঁয়েলের পরিচয়ের শিহনে তুমি টাকা নয়। বিজলী আলোতে টাকা গুনে দেখতে হয় বলে কেউ হয়তো কেঁবেঁবেছেন। কালো অন্ধকারে বায়োডোপ দেখেননি কেউ? পাগল হয়েছেন, সে কথা আমি ফাস করব।

এ এক অধ্যায়। এখানে আমি এক বক্তব্য, অস্ত্র এই আমি-ই হই হই। আমাকে দেখা দিতে হয় বহু রূপে বহু বার।

বেহালায় তায়তলায় ইজ্জত-র (ইতিহাস ছুট মিলন অ্যাপোসিগেশন) মর্ডার সাহেব পাঁচ শেস কুমেলের পর

পা' ও এলেন টেবির প্রোটোনিক প্রেমের কাচিনী যখন শেষ করেন, আমাকে তখন গর্জন রেগের এলিগো টানতে হয়। পিনাকী তার চৌম্বকীয় রেগের অর্ধ কমায়ে মুখের দাঁড়। তার অঙ্গুলি-হেলনে বর লোকের গাটা দেহটা চুম্বকীয় হয়ে বেতে পারে। তাকে ডিনারে আমি কবর আশ্রয়ময়। মিসু পাঠ্যের দীর্ঘল দেহ তার মনে কিছুমাত্র চাকলা কষ্ট করবে না। তাই আমাকে টেনে বর করতে হয়েছিল তার গোপন ভালো-লাগাটি। চিত্রশাখার পিনাকী তার চৌম্বকীয় আমিই সন্ধান দিয়েছিল: যাতিগ সম্বন্ধে জানতে চান? রজার্ণ ক্রাইতে ফুলোজ্ঞ না বৃষ্টি? সোডিয়েটে ট্যানু না থাকলে আশ্রয়কে আলোকজাওয়ার সমের বইটি পাঠিয়ে দেব।

ভাববেন না আমার সম্বন্ধে প্রকমেরও পড়াশোনা আছে। পড়াশোনা ব্যাধি করেন তাঁরা আমার হাতে তড়িৎবিদ্যুৎ বর বসতে পারবেন না। ট্রেনের সঙ্গে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের যে সম্পর্ক, বইয়ের সঙ্গে

আমার সেই বাড়ির। রেলের ইঞ্জিন বৌড়বে তেবোশো মাইল, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের দৌড় ধানবাদ পথের। চারশো পাড়ার পটের ক্রিমেন্টকু পড়ি বটে, বাকী পাড়াগুলো কু'য়ে-কু'য়ে মাই। বই শেষ করি দোড়া দাঁড়। তাই যে দেবতা যে ফুলে ছুই, সে ফুলের জোড়া রাখতে হয়। পূজার মন্ত্র আমার ব্যাগেই ভরা থাকে।

আজ দেশে ফুল-মাটিরের চেয়ে হারোগার সামাজিক মর্যাদা বেশী। দরে বাড়ন্ত মেয়ে থাকলে প্রফেসর ফলে গেজেটেড অফিসারের পেছনে ছোটেন মেয়ের বাবা। গল্প নিখে আজ সাহিত্যিক যে অর্ধ শান, স্টুডিওতে বিয়ের সিকোয়েন্সে শাণ ব্যক্তিগত বিগতবোধনা একটী তার চেয়ে অনেক বেশী হোজগার করে।

কিউবিক বা অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট না বুকলেও স্ক্রিট নেই। কিন্তু হিসাবে ভুল করলে চলবে না। পুরো নামটা জানা থাকে চারি শাব্দে লিখলেই।



যুগে যুগে সুপরিচিত...

বহুপাঠ্য কাল থেকেই 'নিম্ব' এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিষেধক গুণাবলী ভারতবাসীর কাছে সুবিদিত। নিম্বের এই সব গুণবাহিত গুণাবলী ও বৈদিত্য। নিম্ব টুথ পেস্ট-এ পূর্ণাঙ্গায় বর্তমান থাকার এর উপকারিতা অসংখ্য। জা জা জা আনন্দিক বহু-বিজ্ঞানসম্মত দাত ও বাতির উৎকর্ষগতক মোট উপকরণ-গুলিও নিম্ব টুথ পেস্টে সুবিদিত আছে, কারণই এক কোন টুথ পেস্টের গুণে নিম্ব টুথ পেস্টের তুলনাই হয় না।



শরৎচন্দ্রের 'বড়দো' হিরণ্ময়ী দেবী

মণীন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রীকর্ণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকালে তাকালে সেউলটি ঠেঁগনে যখন এসে পৌছলাম তখন বেলা দুপুর। এই সেউলটি থেকে সামতাবেড় শরৎচন্দ্রের গরীভবন খালতে প্রায় সেড় কোণ পথ অতিক্রম করতে হয়। এখন অবশ্য পিচের রাস্তা হয়েছে। বেরক অবধিই তার সীমানা শেষ হয়েছে।

বড়দর আলোকচিত্র-শিল্পী মিশু ব্যানার্জীকে সঙ্গে নিয়েই আসতে কল সামতাবেড় শরৎচন্দ্রের গরীভবন দেখতে। সাইকেন-রিকশার চেসেই এলাম। পিচের রাস্তা শেষ হলে রশ্মনারায়ণ নদের ধানের উপর দিয়ে চড়াই-উৎরাই পথ অতিক্রম করতে ডর হচ্ছিল। প্রথমে এলাম গোবিন্দপুরে রামকৃষ্ণ মঠে পাণ্ডারের বাড়ীতে। শরৎচন্দ্রের বিধি অনিলা দেবীর মেজ বেঁচেরে ছেলে তিনি। আগে থেকেই তাঁকে জানানো হয়েছিল আমাদের আগমনের কথা। আসতে পেরেছি বলে তিনি খুবই আনন্দ পেলেন। একটু ভিরিয়ে নিয়ে পাওরা-নাওরা পর্ব শেষ করে শরৎচন্দ্রের অগ্রকানিত পত্রের সন্ধান করতে দুপুর গড়িয়ে বিকল হয়ে গেল। কাশ শেষ হতে বিলম্ব দেখে রামকৃষ্ণবাবুই বললেন,—বড়দামী এখন হজতে। ঘুম থেকে উঠছেন—চলুন এবার বাওরা থাক। অমত করলাম না। হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ হয়েছিল বহু পূর্বে। চিনতে পারবেন কিনা সেই ভেবেই রামকৃষ্ণবাবুর সাহায্য চাওরা। বিকলে চা-পর্ব শেষ করে রামকৃষ্ণবাবুর সঙ্গেই থেরিয়ে পড়লাম। পথেই গড়ল শরৎচন্দ্রের বিধি অনিলা দেবীর বাসভবন। রামকৃষ্ণবাবু মেথিরে বললেন,—মা'র বাড়ীটা আগে কুঁড়েঘর ছিল। বড়দামী যখন শামতায় বাড়ী করেন, তার কয়েক বছর পরে তিনিই নিজের খরচায় এই পাকাবাড়ীটি করে দেন। এগুন এ বাড়ীতে থাকেন অনিলা দেবীর বড় মেয়ে ভোলারাণী দেবীর পুর আড়তোল বন্যোপাধ্যায়।

একটু দাঁড়িয়ে বাড়ীটা ঘুরে ফিরে দেখলাম। তারপর রামকৃষ্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম,—অনিলা দেবীকে আপনি 'মা' বলে ডাকেন কেন ?

হেসেই বললেন,—ছেটবেলায় আমার বাবার মৃত্যু হয়। শেষে অনিলা দেবীই আমাকে ছেলের মতো করে মানুষ

করেন। তাঁর কোনো ছেলে ছিল না। সব সময় তাঁর কাছেই থাকতাম।

এবনি কথাবার্তার মধ্যে এসে পৌছলাম শরৎচন্দ্রের বাসভবনে। বিড়কির দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকই রামকৃষ্ণবাবু ডাক দিলেন,—বড়দামী! আসেন ?

—কে ? ব'লে উপর থেকে নিচে যিনি তাকালেন তাঁকে চিনতে আমার একটুও কষ্ট হল না। হিরণ্ময়ী দেবী আমাদের দেখে রামকৃষ্ণবাবুকে বললেন,—এরা কারা, রাম ?

—এখন কি চিনতে পারবেন ?—ব'লে রামকৃষ্ণবাবুর পিছন পিছন দি'তি দিয়ে ওপরে উঠে এলাম।

শি'ড়ির উপরেই ছোট্ট একটু বাগান। তার উপরে একটি চৌকি পাতা আছে দেখলাম। হিরণ্ময়ী দেবী বললেন তার ওপর। আমাদেরও বসতে বললেন দরওয়ানের পাতা চৌকিটায়। কিন্তু বসি হল না। রামকৃষ্ণবাবু বললেন হাসতে-হাসতে,—এটা হল বড়দামীর রামসিংহাসন।

হিরণ্ময়ী দেবী হেসে উঠলেন। একটু পরেই শুক হল তাঁর সাথে আমার নানা কথোপকথন। মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে হিরণ্ময়ী দেবী বললেন,—রাম এসেছিল বলেই জোমাদের সঙ্গে কথা কইছি—অন্ত কেউ হলে বোঝাই করতাম না।

একই হেসেই বললাম,—তা আমি। কিন্তু যখন নাতি হয়ে এগেছি তখন আপনাকে আবার একটু আলোচন করবো।

হিরণ্ময়ী দেবীও হেসে বললেন,—তা বাণু করো, একশো-বার করে। তোমার কথার কি উত্তর দিতে হবে তাই বলো। আমি বললাম,—শরৎবাবুর সখ্যে।

হিরণ্ময়ী দেবী আমার মূখের দিকে ভালো করে তাকিয়েই বললেন,—বই লিখবে মুখি ?

বললাম,—মদি লিখতে পারি তাই একটু চেষ্টা।

সেদিন হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে দরজী শরৎচন্দ্রের মীমন দখতে যে সময় টুকটাকি কথাবার্তা হয়েছিল তার মধ্যে কিছু কিছু পাঠকদের কাছে নিবেদন করছি।—

প্রথমেই হিরণ্ময়ী দেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি রাণুবালা দেবীকে চেনেন কিনা।

দ্বিগুণী দেবী বললেন,—তা চিনেবা না ? ও তো বামের বড় বোন । তা কি অন্তে দিয়েছিলে ?

বললাম,—রেজুন থেকে শরৎকালের বাংলাদেশে আগমনের পরের কিছু ঘটনা সংগ্রহ করতে ।

আমার কথাটা শুনে দ্বিগুণী দেবী বললেন,—ই্যা বাবা, ওই রাগুই আমাদের বামেশ্বরপুত্রের বাবা জোগাড় করে বেশ ওর বড় ভাষুরসো ইহুকে দিয়ে । আর কিছু জাননি ?

বললাম,—আপনার কিয়ের কথাও জেনেছি ।

—আমাদের কিয়ের সম্বন্ধে শু কি বললে ?

—আগনি বহুদিন পূর্বে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন সেইটাই কিন্তু ঠিক মিলে গেল ।

হাসতে-হাসতেই দ্বিগুণী দেবী বললেন,—ই্যা বাবা, আমাদের রেজুনেতেই বিষে হয়েছিল । সে অনেক কালের কথা । তখন আমার বয়স ১৪।১৫... ইত্যাদি ।

আমি বললাম,—কিের কথা থাক । তবে একটা কথা জানতে চাই । শরৎকাল যে সময় ছবি ['মহাশেতা', 'রাবণ-মলোদরী'] রেজুনে অস্থস্থকালে এ'কেছিলেন, তার কি কোনো হমিস পাওয়া যায় না ?

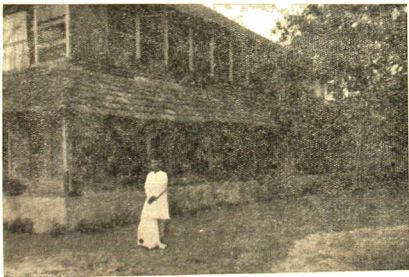
—না বাবা, ৩০খানা বাড়ী পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়ে আমাদেরও সর্বনাশ হয়েছিল । উনি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ।

যাত তখন বেশ । আগনের তাপে আমার ঘুম ভাঙতেই পাগলের মতো হয়ে ঠাট ঘুম ভাঙিরে দিয়ে বসে উঠলাম—ওগো, ওঠো ওঠো—সব যে পুড়ে গেল ! শেষে বাবা, উনি বুদ্ধি করে একটা টিনের ভোরকের মতো কাপড়-চোপড় আর ঠাট দামী দামী বইপত্র, কিছু মেথার খাতা পুতে বন্ধ করে নিচে ফেলে দিয়েই তবে কিছু রক্ষে হয়েছিল ।

এবার যে প্রায়টি গুঁকে করেছিলাম : আচ্ছা, শরৎবাবু রেজুনে মাঝি একটা চায়ের দোকান করেছিলেন ?

একপাল হেসে দ্বিগুণী দেবী বললেন,—ই্যা বাবা, তাই একটা করেছিলেন । আগনে পুড়ে বাবার পর উনি তো পাগল হয়ে গেলেন একেবারে । দামী দামী বইপত্র, মেথার খাতা, ঘর-সংসারের সাবিত্রী সবই গিয়ে একেবারে উনি মেউলে । কি করেন ! শেষে কিছু টাকা জমিয়ে বাড়তি আয়ের অন্তে শুই চায়ের দোকান একটা খোলেন । কিন্তু কি বলবো বাবা, উনি তো চিরকাল আশন-ভোলা মাছব ছিলেন । দিনকতক হিসাব-টিপস করে দোকান চালাতে-না-চালাতেই লোকে ধার-দেনা করে একেবারে দোকানটাকে কানা করে ফিলে ।

এবার মিজালা করলাম,—শরৎকালের বই কি আপনি পড়েছেন ? ভালো লেগেছে কোন্ বইগুলো ?



রামকৃষ্ণবাবুই বলে উঠলেন,—বড়বাবী লেখাপড়া কিছুই জানেন না। তবে শেখবড়দের দিকে বড়মাথা এই বাড়ীতেই অক্ষরজান কিছু করিয়েছিলেন। যাতে করে নামটা উনি শই করতে পারেন। [এ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণবাবুর কাছে শরৎচন্দ্রের বেওয়ার্থের 'মালক' থেকে লেখা একখানি পত্র দেখেছি। তাতে হিরণ্ময়ী দেবী যে চিঠি লিখতে জানতেন না, সে-কথার উল্লেখ আছে।]

আর কোনো কথার অবতারণা না করে এখার জিজ্ঞাসা করলাম,—শরৎচন্দ্রের একটা চিত্রের মধ্যে কেবতে পাই, আপনাকে নাকি তিনি গল্প গড়িয়ে শোনাতেন। আর কলকর সেনের 'মভাষী' গল্পটি শুনে আপনি নাকি একবারে কাঁধাধ ভেঙে পড় শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন—“তুমি কী ছাইশাশ গল্প দেখ। এখন কিছু গল্প লিখতে পার না?”

হিরণ্ময়ী দেবী একটু চিন্তা করেই বললেন,—তা হয়তো হবে। সে সব কত দিনের কথা! তবে বাবা, ঠর গল্প শুনতে যে আমার ভালো লাগতো না, তানব। ওই-যে চৌকিটা দেখছো—ওখানে আমি বসতাম। উনি একটা চেয়ারে বসে আমাকে গল্প শোনাতেন। আর আমার এই লম্বীছেলে রামও কিন্তু ছুপে ছুপে শুনতো। অমু আর মুহুরের মাষ্টারি-করা

তখন ওর একদমই হতো না। [অমল ও মুহুরমালা শরৎচন্দ্রের কবিতা ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্রের ভেসেমেয়ে]

রামকৃষ্ণবাবু হেসে উঠলেন। আমারও হাসলুম একটু। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ দুইই 'ভেলু'র সম্বন্ধে। হিরণ্ময়ী দেবী বললেন,—আর বলা না বাব, দুইই ছিল বটে ওই একটা! এ বাড়ীতে 'টেবি' বলে—একটা কেন অনেক কুহুরই ছিল। তবে ভেলুর দ্ব্যুত্তে ঠর মাস্তে আমারও কব কই হয়নি। উনি তো নাওয়া-খাওয়া ভুলে ভেলুর কবরের পাশে বসে ছেলেবাবুদের মতো খালি কাঁদতেন। অনেক করে বুকিরে সেদিন তাঁকে শান্ত করতে পেরেছিলাম। শিবপুরে খাঁজুরের বাগানে ওর কবর আছে, দেখে আসতে পার।

আমি বললাম,—খাঁজুরাবাবু [অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার] সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। বাবে-শিবপুরে যে বাড়ীতে আপনি থাকতেন, সেই বাড়ীতেই উনি এখন থাকেন। তবে ভেলুর কবর বলে এখন কিছুই নেই। বাড়ী উঠছে সেই আরগায়।

এখার জিজ্ঞাসা করলাম,—শরৎচন্দ্র কোলকাতা ছেড়ে এত দূরেই বা বাড়ী করলেন কেন?

হিরণ্ময়ী দেবী বললেন,—বাবে-শিবপুরের বাড়ীটাই আমি তাঁকে প্রথম কিনতে বলি। শেষে উনি ইন্ডিয়ানারসের এনে



স্বাধত্যেভর পমীতরর দাবী কোলক (কোলকাতা) আর শরৎচন্দ্রের দাবী

বাড়ীটা দেখালে, বাড়ীটা বড় পুরোনো বলেই কিনতে চাননি। শেষে অনিমা দেবী ও তাঁদের সখিক ঈশ্বরবাবারের আশ্রয়ে কিনেই এই সাহসের বাড়ীটা বেঁচী করান। তারপর কোলকাতার বাড়ীটা আবার ইচ্ছার উপরই উনি ভেঁরি করান শেষদীর্ঘনে।

এখনিভার নানা প্রসঙ্গ উত্তর শেষ হলে বললাম,—
এবার আপনার একটা কটো তুলি।

হিরণ্ময়ী দেবী বাধা দিয়ে কলসেন,—না বাবা—ও-সব থাক।

—থাক কেন?—বলেই বহুবর লীপু ক্যাথেরা রেডি করতাই হিরণ্ময়ী দেবী বলে উঠলেন,

—তুলো না। আমি বসছি—তুলো না।

লীপু ছাড়বার সময় নব। বললে,—নাতি হয়ে ও কি তুলতে পারবে না?

—তার বসি পোনো বাবা, একবার কেনে উনি ছদ্মনেই কটো তুলতে সেরেছিলেন। আমি বললাম, কটো তুলে হবে কি? উনি আবার নানা ভাবে একটা কটোগ্রামা ভেঙে আনলেন। তারপর দেখেচেন বদতেই আবার পেটের অঙ্গের ব্যথাটা মোচড় নিয়ে উঠলো। ভাকার ভাকা হবে, না কটো তোলা হবে—এই মুহুর্তের মধ্যে আর কটো তোলা হারানি। উনি ধন্য তুলতে কোনদিন পারলেন না—তোমরাই বা তা তুলবে কেন?

সত্যি কথাই তাই। হিরণ্ময়ী দেবীর পেট এখনো টিউমার আছে শুনলাম। অপারেশন করতে বুঝবলে সাহস পান না। তবু তাঁর সেহের কোনো দুর্বলতা লক্ষ্য করান না। বহুরি পূর্বে যেমন কেণ্ডিলায় আম ও তেমনি গানিধুই মনটা বেগলাম। বেগবারের মতো প্রণাম জানিয়ে বললাম,—বেগ, আপনার স্বপ্ন কটো তোলাই হল না, তখন ঈশ্বরদেবতা বলে দিন। বেশকিছু ভিতরনের বেগেরা রাখাক্ষ-মুটিরি ছবি তুলি। মত শেষে ঈশ্বরদেব টুকলাম। নানা বর্ণালতার ঘিরে সামান্যে বৃণলমুটিরি কী অপরূপই না শোভা বিস্তার করে আছে! তাঁর নির্দেশমতো অঙ্কতার বর বা হোক করে একটা ছবি তুললাম। তারপর পরৎপ্রের বাসলেন, মধ্যম ভ্রাতা স্বামী বোধনেশ্বর [প্রভাসচন্দ্র] সমাধি ও পরৎপ্রের সমাধির কটো তুলে, কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে ঘেঁষে রাখাক্ষথাবুর সঙ্গে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করতাই হিরণ্ময়ী দেবী বলে উঠলেন,—ও রাম, পোন বাবা, পোন।

—কি হলেন বন্ধু?

—আমি বাবা এখনো কিছু খেতে পারছি। তুই বাবা আনাব চাচ্ছি বেগুন আর টেঁড়ল কিনে দিল।

আবার সবাই হেসে উঠলাম। হিরণ্ময়ী দেবীও হাসতে-

হাসতে বললেন,—সত্যি বাবা, এই বেগুন টেঁড়ল বা ভালবাসি তা না খেলে কি মন জরে?

আমি বললাম,—তা হলে আপনার হাতের রাধা একদিন খেতে হবে।

—তা এসো—খাওয়াবো।

আবার নমস্কার জানিয়ে বাড়ী ছেড়ে বাইরে আসতেই হিরণ্ময়ী দেবী ওপরে সিঁড়ির পাণের ছোট বায়না থেকে ঠাড়িয়ে আমাকে বলে উঠলেন,—পোনো বাবা, পোনো।

—কসুন—ব'লে সিঁড়ন ফিরে ঠাড়াতেই হিরণ্ময়ী দেবী মুখে নর হাসি মাথিরেই বলে উঠলেন,—এবার যেদিন আসবে—আপনের কিছু আইসক্রীম দই এনো।

আমি হেসে বললাম,—আচ্ছা, আনবো। কিন্তু আনতে-আনতে যদি পরম হয়ে যায়?

—তা হোক, তুমি এনো।—হাসতে-হাসতেই বললেন হিরণ্ময়ী দেবী।

রাখার মেয়ে সিঁড়ন ফিরে শেষবারের মতো তাকালাম। দেখতে পোলাম সিঁড়ির সেই চাতালটায় ঠাড়িয়ে আমাদের বিকে চেয়ে চেয়ে হাসছেন। বড় ভালো লাগলে। পরৎপ্রের 'বড়মো' হিরণ্ময়ী দেবীর হাসিমাখা মুখটি দেখতে।

রাখার উপর এসে রাখাক্ষথাবুর বললেন,—আমাদের বাড়ী যাবেন না?

বললাম,—অনেকটা পথ, পথ থেকেই বিদায় নিচ্ছি। কিছু মনে করবেন না।

নমস্কার জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

পথ চলতে চলতে বেগতে পোলাম ঘুরে তখনরাখার নবের বুকে সন্ধ্যার আবছা অঙ্কতার দীরে দীরে মেয়ে আসছে। কী হৃদয়ই না দেখাছিল নিগন্তের ছবি! তারই কোলে একদিন গড়ে তুলেছিলেন দরদী কথানিষ্ঠী পরৎপ্রের তাঁর সায়মতার বাসলেন। বাড়ীটা থেকে-না ঘাটি আর কাঠের স্কেমে রাষ্ট্রপতির টালি ঘিরে গড়া—তবু যেন একখানি ছবি। ছাড়া-হুনিবিড় সায়মতাবেও গ্রামটিকে ফেলে আসতে মন চাইছিল না। পথ চলতে চলতে শুণু একটা কথা ভেলে আসছিল বড় কষ্টকর হবে। রাখাক্ষথাবুর মূখ থেকে একধিনি তা শুনেছিলাম। পরৎপ্রের কেন যে এগানে বাড়ী করেছিলেন, সে কথা তিনি তাঁর আত্মীয়-বন্ধনকে জুখ করে প্রার্থী বলতেন: "আমি পিছলিটে উচ্চার করতে পারিনি বটে, কিন্তু সবাই তো কিছু-না-কিছু আপ পাথ। অথচ আমি একগাছা বাঁটার মতো তুচ্ছ জিনিসও পাইনি। এ দুঃখটা আমার ভিতরালের অন্তে জেগে রইল। তা কি সহজে তোলা যায়!"



। ইংলেণ্ডের ডায়েরী ।

[লেখক : শিবনাথ শাস্ত্রী । প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স আইটেড লিমিটেড, কলিকাতা ১২ ।
ইন্সটিটিউশন লাইব্র. নৃসিংহা ২২৩ । বার : চার টাকা]

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রধানত ব্রাহ্মধর্মসাধক হ'লেও, তিনি ছিলেন বাংলারঙ্গের এক দলীয় ও সমাজ-সেবক । বাংলার নবজাগরণের হুগে তাঁর বক্তব্য এতটা স্থান ছিল । তিনি ছিলেন একাধারে পণ্ডিত, তত্ত্ববর্নী, সাধক, সাহিত্যসেবী, বাঙ্গালী ও স্বাধীনচেতা দেখহিঁউই । ১৮৮৮ ঐষ্টাংশের ১৪ই এপ্রিল শাস্ত্রী-মহাশয় বিলাত-ভ্রাতা করেন এবং সেই বছরই নভেম্বর মাসে দেশে ফিরে আসেন । ১৪ই এপ্রিল থেকে ২০-এ নভেম্বর পর্যন্ত তিনি যে রোজনামচা লিখে রাখেন তাই নিয়েই বর্তমান গ্রন্থের আশ্রয়গ্রহণ । এই ডায়েরীর মাধ্যমে ইংল্যান্ডের তৎকালীন সমাজ-জীবন সম্পর্কে পণ্ডিত শিবনাথ যে ছবি এঁকেছেন পাঠকবর্গের কাছে তা বহুক্ষেত্রে অভিনব মনে হবে । তাঁর পূর্ববেশন যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি নিম্নব । লোকালের ইংল্যান্ডের ভালো ও মন্দ ছুঁটা বিক্ষ-ই তিনি দেখেছেন এবং নিজের মনে তাঁর বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন । এই ডায়েরী থেকেই আমরা জানতে পারি যে, শাস্ত্রী-মহাশয়ের ইংল্যান্ড-পরিভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—পান্ডিত্য দেশে উপায় ধর্মমতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কতখানি তা অবধারণ করা ; সাহিত্য, হুগাপণ্ডি ও জ্ঞানিতির বিলুপ্ত সংগ্রামের অন্ত ইংরেজ জনহিতকর্মীরা যে-সব উপায় অবলম্বন করেছেন তা বিশেষভাবে জানা ; ইংল্যান্ডের নিকাশভক্তি ও তাঁর ফলাফল পর্যবেক্ষণ ; বিদেশে ভারতীয় কৃদী চালান-দেওয়া প্রথার বিলুপ্ত ইংল্যান্ডের জনবহুত্ব প্রভাবিত করা ; পান্ডিত্য একেশ্বরবাদের সঙ্গে ভারতীয় ব্রাহ্মধর্মের পার্থক্য কোথায় তা বিচার ক'রে দেখা—ইত্যাদি । তাঁর এইসব

উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সফল হয়েছিল । বিলাত-প্রবাসের অভিজ্ঞতাকে তিনি যে তাঁর পরবর্তী জীবনে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন তা সহজেই বোঝা যায় ।

বিষয়বস্তুর কথা যখন বিয়েই বলা যায় যে, শিবনাথ শাস্ত্রীর এই 'ইংলেণ্ডের ডায়েরী' বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে একখানি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ-গ্রন্থ হ'বে হইলো । ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়ে ধার্য কারবার করেন, তাঁদের কাছে এ বইয়ের বিশেষ একটা মূল্য বীকৃত হবে । শাস্ত্রী-মহাশয়ের লিখনভঙ্গি যেমন সহজ ও সরল, তেমনি সরল । ডায়েরীর হুচনাং তিনি যে প্রিয়জনবিলুপ্ত-বাখা অগ্রভব করেছেন তাঁর মধ্যে উদ্ভাস বা ভাবাবেগ থাকলেও, তা নিতান্তই আনুগতিক । নিজস্ব ধর্মমত-ব্যাক্যাত্তেও সেইরকম উদ্ভাস বা ভাবাবেগের পরিচয় পাওয়া যায়—কিন্তু তাঁর মধ্যে যে আনুগতিক্যের ভাবটি আছে তাঁর মূল্য যে অনেকখানি । শিবনাথ ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন সমুদ্রপথে—কলিকাতা, যাত্রাঙ্গ, কলকো, এডেন হ'বে, এবং সেই পথেই আবার ফিরে এসেছিলেন দেশে । এই পথের বর্ণনাও তিনি অতি স্বন্দরভাবে ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করেন ।

এই গ্রন্থ-প্রকাশে ধারা উজাগ্রি তাঁরা নিঃসন্দেহে পাঠকবর্গের ধন্যবাদভাজন । প্রধানত তাঁদের উজাগ্রিই আমরা এই হুগাবান ডায়েরী-পাঠের হুগোপ লাভ করেছি । সাংখ্যিক ও রাজনীতিক-কর্মী প্রভৃভাত্ত্বমার গুণোপাধ্যায়ের লেখা ভূমিকাটি গ্রন্থ-পরিচয়ে বিশেষ সহায়কতা করেছে ।

ইন্সটিটিউশন লাইব্র.

। মধুরে মধুর ।

[লেখক : মহাশয় ভট্টাচার্য্য । প্রকাশক : এ. সুবাসী অ্যান্ড কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড । মুদ্রা : ৪৭০ ।]

ঐন্দ্রী মহাশয়ের ভট্টাচার্য্যের স্বত-প্রকাশিত উপজাতি 'মধুরে মধুর' পড়তে মনে হল, এই লেখকের (সমালোচকের ভাষায় 'লেখিকার' শিরশ্চীরের আবার জাতিভেদ কি ?) দেবদার চোখ, ভবেকরে মন এবং লিখবার কলম আছে। আর এই তিন বঁদে অবিকারে, কাল তাঁকেই তো শিল্পীর স্বস্থান দিয়ে থাকে।

'নদী' এবং 'বন্দু-কী তীর' নামক ইতিমধ্যেই প্রকাশিত অপর দু'টি উপজাতির রচয়িতা মহাশয়ের ভট্টাচার্য্য সমালোচ্য উপজাতিতেই শিল্পিস্থির সামান্য গভেৎ করেছেন বলে আমার বিশ্বাস। অল্প দু'টির হুলনায় নিঃসন্দেহেই এটি তাঁর পরিগত রচনা।

বিশেষে বরষে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে নৃত্যনিকাহী সাধন বসিপুরের উপাধিব নৃত্যগুরু কর্তৃমণি বড়ঠাকুরের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারপর নৃত্যদক্ষতা অর্জন করে গুরুত্বপূর্ণ বসবস্তের সঙ্গে অরুণর চলে যায় ও তার নৃত্যেই বসবাস করতে থাকে। সেইখানে নৃত্যকুশলী বৃন্দার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে শিল্প-জীবন প্রকাশ পাবার ব্যবস্থা পেল। বৃন্দার সঙ্গে মিলে সাধন টুপ করে বৃন্দাকে ডাঙোবাড়ল, এবং বড় সাধনের সেই টুপ ভেঙে গেল বৃন্দার ঈর্ষান্বিত স্বামী ইন্দ্রেশ্বরির নাত্যায়নের চক্রান্তে; বৃন্দা-সাধনের মধ্যে বিশেষের পুত্রতা নামক, সাধন বন্ধা-রোগাক্রান্ত হল। রোগাক্রান্ত পর কর্তৃমণি বড়ঠাকুরের ছাত্রী বরষার সাহায্যে নতুন করে টুপ করল। এবারে কিন্তু আর টুপ ভাঙল না, ভাঙল টুপের প্রাণ অর্থাৎ সাধন। প্রাণ ভাঙল, কিন্তু জ্যোতিঃগুরু মহিমার আত্মা বৃত্তান্ত হয়ে বইল। বৃত্তান্ত মাধ্যমে সাধন অমর হয়ে বইল।

যেভাবেই এই উপজাতি আইডিয়া-প্রধান, কিংবা একই অন্তর্ভাবে বলা যায়, আইডিওলজি-প্রধান। এই আইডিওলজি একজন শিল্পীর, একজন ঘটীর, যার ডাবা হচ্ছে নাও, যার বক্তব্য হচ্ছে জীবনের—রূপ-বস-ক-সম্বন্ধের এই বৈচিত্র্যময়ক জীবনের। নিষেধকে যে প্রকাশ করতে চায় নৃত্যরূপে, অঙ্গের ব্যঙ্গনাথ। বক্তাবানি ভাবে, ততবানি বেনে পারে না। এই প্রকাশ-ব্যাকুলতা, সঙ্গিতত অকৃত্রিম তাকে মহাব দিতেছে, আর সেই মহাবকে ব্রহ্মি পূর্ণতা দিয়েছে যথা ও বৃন্দার বিদ্যার প্রেম। বহু বসবস্তের সহজাত সাধুতা ও পরোপচিকীর্ষা, কর্তৃমণি বড়ঠাকুরের শির-বেশ, নব্ব-মাক্তি-বীণা-মাল্যের গুরুত্ব, বিশেষ

ভূতা প্রসঙ্গের দেব-দয়—এককথার মানব-চরিত্রের উৎকল দিকগুলি এত সুন্দরভাবে ছুটে উঠেছে এই বইতে যে, মাহুদের আদিত মহাব ও সাধুতার বিশ্বাস ও প্রভা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে পাঠক হর্ষভ তৃপ্তি পাবে, অঙ্গের আনন্দ লাভ করে।

যে শিল্প মাহুদকে উন্নত করে, তার মনকে চুক্তি-ভা-সুহৃদার দৃষ্টি-জাল-দুক করে, তার বড়-আমিকে উদ্বোধিত করে, বন্দীযীরা তাকেই মহৎ শিল্প বলেন। এবং এই মহৎ শিল্প তার আন্তরিক সংচেতার নিচু-কল। মাহুদের প্রাণময় সত্তার উদ্বোধনের ইচ্ছিত বা চেট্টা যে শিল্প বা সাহিত্যে আছে, তার আর যে-সেই বাহুক, আমি তাকে আমার প্রজ্ঞার বরমাল্য দেব।

এত কথা বললাম, সাম্প্রতিক বাংলা উপজাতির দ্রববহার কথা ভেবে। সাম্প্রতিক বাংলা উপজাতিতে এত বেশি বিকৃতি, এত বেশি অসুহৃদার ছবি সেবি যে পড়তে পড়তে হাঁশির উঠি, মাথা ঝিম ঝিম করে। এবং যে কারণে বাংলা উপজাতি ভেঙে পড়তে হয়। নিষিদ্ধ ফল বাওনার পর থেকে মাহুদের মনে অসং বৃত্তির প্রাদুর্ভাব হয়েছে, ততবধি সেই বৃত্তিগুলিই তার জীবনকে নির্মিত করতে সর্বদা সচেষ্ট—এ তত্ত্ব কারও অজানা নয়। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যেও সেই বৃত্তিগুলির নিরন্তর দাপাদানি সঙ্গ করবে কেন? অন্তত কোন নিশ্চিত হুহ লোক তা করে না বলেই বিশ্বাস।

'মধুরে মধুর' সেদিক থেকে আকর্ষ ব্যতিক্রম। এর চরিত্রগুলি বাস্তবিক ও হুহ জীবনবর্ণনের অবিকারী, আন্তরিকতার ও আত্মপ্রত্যয়ে বর্ণার 'মানব'-নাম ধারণ-যোগ্য। এদের প্রেমে যায় সেই, ছলনা এদের কাছে অপরিচিত, নিজের আত্মবর্ণের ক্ষত এরা সর্বদা ভাগ্য করে। বসি কেটো বলেন, এরা শিল্পী তাই এবং শিল্পি এদের পক্ষে স্বাভাবিক, তবে বলব শিল্পীরা বহুবু বা বর্ণাগত কোন জীবন, তারা মাহুদ, ভালো-মন্দ প্রবৃত্তিবিমিত সামাজিক প্রাণী। হুহরাৎ অন্ত মাহুদের সোবগণ তাদের মধ্যে থাকবে না কেন? ব্যাপারটা আসলে তা নয়। আসলে এই চরিত্রগুলি এমন একজন শিল্পীর সৃষ্টি যিনি মাহুদকে ভালোবাসেন, মাহুদকে প্রভা করেন, মাহুদের বৌল মহাবে ধার বিশ্বাস অবিকল। এই কারণেই মাহুদ-পুত্রের সয়ল প্রাণ। হুহ বসবস্তের সহজাত পরোপচিকীর্ষার অবিশ্বাস্যতার

মুখ হতে হৃৎ, তার সব শেতে ইচ্ছা জাগে। এবং এই কারণেই নারায়ণ কৌশিকের সমস্ত ইর্ষা-দুঃখ-চক্কাভ সবেও পার্থক্য তার প্রতি অগ্রস্ত হয় না। বৃষ্ণা ও তার বিবাহিত প্রেমের পাঁচো বর্ষন শোকাবহভাবে চেষ্টে পড়ে, তখন পার্থক্য তার ভাগ্যের কথা ভেবে বেদনা অশ্রুভব করে, তারপর সর্বস্বান্ত হয়ে যখন সে ছুছছাড়া রাহী-জীবন গ্রহণ করে, তখন তার মস্ত সিন্ধু স্বীর্ণধাম ফেলে।

মানবিকতার হৃৎ-সুদৃঢ় এই উপজ্ঞানে শ্রীমতী ভট্টাচার্যের ডিটেনশন-জ্ঞানেরও স্বাভাবিক পরিচয় পাওয়া যায়। বৃষ্ণার মুখে ল্যাটিন কবিতা শুনে না-থোকা আনন্দে বিতবনে মাড়োয়ারীর সঙ্গশ্রেয় মাথা-নাড়া বা বৃষ্ণাকে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্ন পরা তার নিদর্শন। তাঁর পরিবেশ-সৃষ্টি-কমতারও পরিচয় ছড়িয়ে আছে উপজ্ঞানের একাধিক আয়নাঘা; প্রমাণ—বন্দবস্তের গ্রাম গচ্ছিতা-সীতমণ্ডুরের এসদ, বাজারঘরের বাঘাবর-জীবন এসদ। শ্রীমতী ভট্টাচার্যের দেখার চোখ যে কত প্রবর, বাজারঘরের জীবন-চিত্র তার পরিচয় বহন করে। সুতাপিল্লি সম্পর্কে সাময়িকভাবে এবং বিবিধ ত্রুতাংশী সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গশ্রেয় গড়ে ওঠা নবতন থাকের এই আশ্চর্য উপজ্ঞানের আর-একটি দৃষ্টাবলি বেশিষ্ট।

মানব-প্রেমের বিভিন্ন রূপাংগ। প্রেমিক-দুঃখের স্ফুটান্তি-বৃষ্ণা অশ্রুভিত্তিগুলি নিপুণ চিত্রকরের মতো রূপায়িত করে তিনি তাঁর বড়বাবী অস্তুরীতির পরিচয় দিয়েছেন। সবচাইতে বড় কথা, প্রেম সম্পর্কে তাঁর ধারণা সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম বলেই বৃষ্ণা ও সাধনের মৈহিন মিলন কাব্যনাকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমের জ্যোতিঃশর্শে হৃৎকর হয়ে উঠেছে, লোকায়ত সৃষ্টিতে তাদের এই মিলন অবৈধ হলেও জীবন-সত্যের মহাবীরতমর তা লোকোত্তর হয়ে উঠেছে। এবং প্রেমের গভীরতা ও তীব্রতার আবেগসীম, প্রমত্ততা ও হৃৎকর-হৃৎকর এবং বিধি মিলন-সুদৃঢ় সাম্প্রতিক বাংলা উপজ্ঞানে বিরলমুঠ। শ্রীমতী মহাশেতা ভট্টাচার্যের চরিত্র-চিত্রণ-কমতা এসদে বলা যায়, the aim of the novel is the knowledge of the human heart—বহিঃকায়ের এই বন্দবস্তের বাস্তব-সিদ্ধির প্রমাণ তিনি সমালোচিত এই উপজ্ঞানে দিতে সমর্থ হয়েছেন।

সার কথা, ‘বধূয়ে বধূর’ সূত্র মানব-মহাজয়ের শিল্পিত দলিল। এতে মানব-মহাজয়ের এমন এক নিরঞ্জন গুণত্বা ও দ্বিধ সৌগভ্যের স্পর্শ লাভ করা যায়, যা প্রত্যেক সৎ শিল্পীরই কাল্পিতব্য অঙ্গুদাঙ্গের।

অমৃত্যুনাথ বসু

। প্রেমের গল্প ।

[বিত্ত মুখাপাণ্ডার সম্পাদিত। প্রকাশক : রীচার্য কন্যা, ৯ নম্বর পোষ লেন, কলিকতা ৯। মূল্য : সাত টাকা আট আনা]

প্রেমের গল্পন ছাড়া কিছু না থাকলেও সোকে প্রেমে পড়ে থাকে এবং সেই গল্পনকে অবলম্বন করে সাহিত্যিকরা গল্প লিখে থাকেন। এবং আরো কথা কি, যাহূব সেই গল্প পড়তে গেলে ছাড়তে চায় না, পড়ে খুশি হয়, দুঃখিত হয়, হাসে, কাঁদে।

মনোবিজ্ঞানীরা প্রেমের রূপ-চরিত্র নিয়ে বড়ই মাথা ঘামান না কেন, কতওলো-রা প্রেমের সঙ্গে অর্ধ-নিমিত্তিক সম্বন্ধ বা প্রেমের ভবিষ্যৎ রূপ নিয়ে চিন্তার আগ-বহন বড়ই ব্যস্ত থাকেন না কেন, সাধারণ বাহ্য জেবে-চিত্তে হিংসা করে প্রেমে পড়ে না, এমন কি প্রেমে পড়েও কোনরকম হিংসা যেলাতে তার মন রাহী হয় না। কারণ প্রেম এমনই এক বীজসংকট চিত্তবৃত্তি যার তাক্কাই সে নিষেধকে প্রকাশ করতে ব্যাহুল হয়, পরিপূর্ণতার আয়োজক ভিত্তে চায় নিষেধকে, এবং তার প্রেমাম্পদকে। সাধারণ দৃশ্যের হিসেবী চোখে

তার প্রেমাম্পদ যদি সর্বগুণবিহীনও হয়, তবু সে তার প্রেমাম্পদের মধ্যে আবিষ্কার করে সর্বগুণের উৎসপাতা, সব দোষ-ত্রুতির আড়ালে সে তার এমন রূপ দেখতে পায়, যে কারণে সে প্রয়োজন হলে সমাজ-সংসারকে মিছে মানতেও বিদ্যা করে না। প্রেমের একেই এই শক্তির পরিচয় ইতিহাসে বা গল্পে কাহিনীতে তো পাওয়া যায়ই, বাস্তবেও অনেক সময় প্রত্যেক করা যায়।

কিন্তু কেহেতু কথা নিরবধি, হৃৎকর প্রেমের রূপ-চরিত্রও অপরিবর্তনীয় না। হাজার বছর আগেকার প্রেমের রূপ-চরিত্রের সঙ্গে এখনকার প্রেমের রূপ-চরিত্রের পার্থক্য নিশ্চয়ই হবে, যদিও বোল চরিত্রের ইত্তরবিশেষ দৃষ্টতা হবে না। হাসক-প্রাণ-বিভর্ত গ্রীক সমাজ ও সভ্যতা, ফিটাল সমাজ ও সভ্যতা বা বুর্জোয়া সমাজ ও সভ্যতা—এই তিন সমাজ ও সভ্যতা আশ্রী প্রেম কি একই ধরনের? নিশ্চয়ই নয়।

কারণ এই ঐক্য সমাজ-সত্যতার কাঠামোর মধ্যে এত প্রকট পার্থক্য যে, সেই কাঠামো আশ্রয় করে যাহাদের চিন্তাভাবনার প্রকাশ স্বয়ং একেবারে হতে পারে না। গুরু-কাহিনীতে তাই বিচিত্রধর্মী প্রেমের বা প্রেমের বিচিত্রধর্মিতার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তা ছাড়া আকস্মিক ব্যক্তিবিশিষ্ট বস্তুতাত্ত্বিক বিবে প্রেমের রূপবৈচিত্র্যও অবলম্বনীয়। ফলে ভাবোপ-বৃদ্ধা ওপাণ্ডিত্য বিস্তৃত প্রেমের পাশেই বসন্তপাণ্ডিত্যিক প্রেমের পূর্ণতা উপস্থিত করা হইবে নহে। দেশ-বিশেষের বৈশিষ্ট্য প্রেমের গহনকে সংকলনেই এ কথা বর্ণনা করা যায়।

বর্তমান সংকলনটির কথাই ধরা যাক। বাংলাদেশের লক্ষ্যপ্রতি লেখকদের দক্ষিণাশ্রুতি আলোচ্য সংকলনের তেইশটি গল্পে প্রেমের কি একই স্বাভাবিক রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে? অভিযাত্রীস্বরের হৃৎকল-নাগধারীর প্রেমোপাখ্যানের সঙ্গে অরঙ্গপত্রের সারী-বৃহৎ প্রেমোপাখ্যানের বা বিদ্যুতচুম্বকের নায়ক হৃৎকলের সঙ্গে বিদল দ্বিতীয় নায়ক রূপান্তরিত আপাত-মিল থাকলেও, বৈশিষ্ট্য পার্থক্যও ঘূর্ণক্য নহে। তাই বর্তমান সংকলন পাঠ করলেও এ কথা বোঝা যাবে। বাংলাদেশে লক্ষ্যপ্রতি লেখকদের দক্ষিণাশ্রুতি আলোচ্য সংকলনের তেইশটি গল্পে প্রেমের রূপ-ভেদ লক্ষ করা কঠিনসাধ্য নহে। অভিযাত্রীস্বরের হৃৎকল-নাগধারীর প্রেমোপাখ্যানের সঙ্গে অরঙ্গপত্রের সারী-বৃহৎ প্রেমোপাখ্যানের বা বিদ্যুতচুম্বকের হৃৎকলের ও বিদল দ্বিতীয় নায়ক রূপান্তরিত আপাত-মিলের অন্তরালবর্তী বৈশিষ্ট্য পার্থক্য লক্ষ করার ক্ষমতা। এখানে এখিত তেইশটি গল্পে প্রেমের যে চিত্র এঁকেছেন এদের লেখকরা, তাঁদের মানসতায় বহন পার্থক্য

হয়েছে তখন স্বভাবতঃই তাঁদের গহনকে নায়ক-নায়িকারা সর্বত্র হলেও সঙ্গায় হতে পারে না। এখানে বলা ভালো এবং বলা উচিত, লেখকের মানসতা বা সৃষ্টিভাবী প্রেমের রূপান্তরের কারণ হলেও, একমাত্র কারণ নহে; প্রতিবেশ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি, জীবনব্যাপী প্রকৃতি ও আর্থিক কারণে প্রেমের রূপান্তর-ভাবীতে বৈষম্য ঘটে থাকে, একটি প্রেমের গহনকে নায়ক-নায়িকার সঙ্গে অন্য-একটি প্রেমের গহনকে নায়ক-নায়িকার চরিত্রে ও চলনে-বলনে সহমিল হয়ে থাকে।

অভিযাত্রীস্বরের, অরঙ্গপত্রের, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, বনকল, প্রেমের মিল, অগণীশ গুপ্ত গ্রন্থ তেইশ জন লক্ষ্যপ্রতি গল্পকারের তেইশটি গল্পের সমন্বয়ে 'প্রেমের গল্প' নামক এই মনোজ্ঞ সংকলনটির আশুপ্রকাশ। অনেক লেখকের সহায়তায় এই গল্পগুলি নির্বাচন, সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন হৃৎকল-নাগধারীর সঙ্গী-বৃহৎ। সাধারণতঃ কোন সংকলনের প্রতিটি লেখাই সর্বজন-স্বগ্রাহ্য হয় না, কিন্তু আলোচ্য সংকলনের প্রায় প্রতিটি গল্পই পাঠকদের ভালো লাগবে বলে বিশ্বাস করি; এবং গল্পগুলিও ইতোমধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তিনি ইতিপূর্বে আরও কয়েকটি রচনা-সংকলন প্রকাশ করেছেন। বর্তমান সংকলনেও তাঁর সহায়তা সম্পাদন-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদূর্ত। তাঁর কৃষিকাজিও সুসিদ্ধ।

প্রত্যেক গল্পের পূর্বে গল্পকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠিত-চিত্র নৈতিক মূল্যায়ন করেছে। তবে লেখকদের প্রতিষ্ঠিত-চিত্র সম্পর্কে বক্তব্য এই, লেখকদের সঙ্গে চান্দ্র্য পরিচয় ধাঁসের আছে, ওঁরা তো পতাবনে-ই, ধাঁসের নেই তাঁরাও পতাবনে।

কল্যাণস্বরের বাণেশ্বর

। উপল উপকূলে ।

[লেখক : সিদ্দিকুল হক । প্রকাশক : শ্রীমদ্বিত্যস্বরের দ্বারা, ২-১০ রোডের দিকে, হাওড়া। মূল্য : ২'২৫ বাণী পল্লী]

স্বপ্নিকার লেখক বা বলেছেন, সে কথা সত্য। আত্মকাল এত মোক বিলম্বিত হয়েছেন ও অভিজ্ঞতার রূপবর্ণনা লিখেছেন, যে ফল হওয়া পাতাবিক, ইলাভাওর বিবর আর নতুন কি জানবার থাকতে পারে!

তু এ ঘরনের রচনা পড়বার তাগিদ পাঠক-মনে থাকে। কারণ স্বভাবতঃ, যে যাহাখতি দেখছেন, সেইভাবে মানসটি ধরা পড়ে। মানবমনের বিচিত্র গতি। একই পুত্র, একই ঘটনা

ঘটনাদের কলমে দুইরকম রূপ পরিগ্রহ করে। পাঠকর মন ঘটনাদের বিষয়েই স্থান অগ্রাহ্য।

শ্রীমদ্বিত্যস্বরের বনোয়ন দেবদাসী ও পরিচয় বর্ণনা-শৈলী স্বাভাবিক ও তাঁর সহযোগী বহু-বসতি এই বইটির উৎকর্ষের সহায়ক হয়েছে।

লেখক জানতে হ'লে সাহসের সঙ্গে পরিচয় করাব।

শ্রীমত বহুর কলমে দ্ব্যুভয় ইংল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। মিসেস্ সেনসন, তাঁ: সেশ, তানকান—এঁদের সহজেই মনে হয় অনেককিনের চেনা।

অনেক কথাই অবশ্য আমাদের কানে তপকবার মতো শোনাবে। অবাচিত্তে ভেতক কাছ দিয়ে ছাত্রদের সাহায্য করা, একটি মতান। বাসে হারিয়ে আবার কিয়ে পাওয়া, এক ইংল্যাণ্ডের অন্ততম শ্রেষ্ঠ হাসপাতালে 'ফ্রি-বেড'-এ চিকিৎসার কথা।

শ্রীমত বহুর বইখানির আকর্ষণ সেইখানেই। লেখকের পুঁজিবাদী অনাবিল ও কছ। জাতীয়-চরিত্রের যে-সব মহৎ গুণের ক্ষত্রে ইংল্যাণ্ড অন্ততম শ্রেষ্ঠ-পণ্ডি বলে পরিগণিত হয়, সেগুলি তাঁর ভালো লেগেছে, এক তাঁর বইয়ে সাধারণ মানুষগুলির ভেতর দিয়ে ইংল্যাণ্ডের জাতীয়-চরিত্রটি স্টুটে উঠেছে। বাসিটন, মিসেস্ এবং অন্ততম ডাক-কর্মীদের সত্যমত্যা যেমন ভালো লাগবে, তেমনি উল্লেখযোগ্য মনে হবে সমাজ-সুখলায় লওন-পুণিশের কৃষিকা। হাসপাতালে ডাক্তার-নাগদের ব্যবহার, এবং লেবার-পার্টির নেত্রী ডাঃ এডিস সাম্যারকিসের একটি বিদেশী ছাত্রের প্রতি পৌষত, জাতীয় সংস্কৃতি-সংরক্ষণের প্রতি ইংরেজদের সতর্ক মনোযোগ এগুলি আমাদের ভালো লাগবে। এমন নয় যে, আমাদের দেশে এ গুণগুলি বিরল। একজন বিদেশী ছাত্র বহুকাল প্রয়াসেই যে এই সৎগুণগুলি সম্পর্কে সপ্রভ হচ্ছেছেন, আমরা

সেখানেই। লেখক তাঁর বরতর স্বম্বর ভাষার বইখানি এমনভাবে লিখেছেন যে, যান হয়, বই পড়ান। বা—শোনো বন্ধুজনের আসরে বসে একটি সহজ-সরল মানুষের মুখে বিলেত-ব্রহ্মণের গল্প শুনে এলাম।

এ বইয়ে আলী-সাহেবের বিবধ পুণ্ড্রের আসর-মেলায় অথবা তখন চট্টোপাধ্যায়ের অনবদ্য কখন-ভঙ্গী মিলবেনা। ছরোয়া, সহজ ও মনোরম বিবরণীর চমকগ্রাহী আকর্ষণে এর উৎকর্ষ।

বইখানিতে শ্রীমত বহু অগ্রয়োজনে অনেক ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'পরিবার বা ফ্যামিলি', 'কার্নিশিত বা সজ্জিত', 'হেনডিল', 'হুইট', 'মাতন', 'হাওশেক', 'family festival বা পারিবারিক উৎসব'—এই ধরনের শব্দ-ব্যবহার সহজেই এড়ানো যেত। আর বড়দিনের উৎসব। বীর্ঘদিন ইংরেজবা এদেশে ছিলো। আমাদের অন্ততম প্রদেশের উৎসবগুলির চেয়ে বিলেতের বড়দিন, ইস্টার ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের অনেক জ্ঞানতে হচ্ছে। উৎসবের বর্ণনাইলু উল্লেখ্য। কামার ক্রীষ্টমাস আর ক্রীষ্টমাস ক্রী-র পরিচয়ইলু বাড়তি।

শ্রীমত বহুর মনোগ্রাহী লেখন-গুণ বইখানি বড়-ছোট সকলেরই পড়তে ভালো লাগবে। আশা করা যায়, তিনি আরো লিখবেন এবং এই একখানি বইয়েই সাহিত্য-সাধনায় যতি টানবেন না।

—কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়

১। রত্নন-সংস্কৃত ১।

[সেখিত : শ্রীমতী বীণালালি দিত্র। প্রকাশক : শ্রীকল্যাণ দিত্র, ৬০ রে স্ট্রিট। দ্ব্য : ৯,]

কোনো মানুষকে খুঁজি করতে হলে তা যে একমাত্র রশনার মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব, সে বিষয়ে মহাজনরাই অনেক কথা বলেছেন। মননকাব্যের দ্বারা অথবা শ্রীচৈতন্যের ধীকীর্তে আমরা সেভাবে পাই রসনাভিত্তির কী বিশুল আয়োজন চোখে ভক্তগুহে।

শ্রীমতী দিত্রের বইখানিতে বেশী-বিদেশী দুই বহলের রায়ার বিষয় বিবরণী পাওয়া গেল। একদুগ আসে, অবিকল বাংলায় মেলা-বিশেষে ঘরে ঘরে রত্নন-নিপুণতায় পরিচয় মিলতো। নতুন জামাইকে অভ্যর্থনা জানানো; বা নতুন কুটুম্বের চমক লাগিয়ে সেবার ভক্ত পলাশরকম খিটায় বা পলাশ-বাগানের উদাহরণ বিরল ছিলোনা।

শ্রীমতী দিত্রের বইখানি পড়ে মনে হলো, রাজাটা তাঁর হাতে শুধু কৃষিগতির আয়োজনে গভীরত নেই—উত্তীর্ণ হয়ে পৌছিয়েছে একটি শিল্পকলায়। যে-কোনও বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ বাড়ীত জানলাতে করা যায় না, একা শ্রীমতী দিত্রের বইখানি সম্পর্কে প্রয়োজ্য। তাঁর শুধু গভীর জ্ঞানই নেই, রত্ননকলায় আছে অসাধারণ আগ্রহ।

একালিনীকের অবশ্য নানা সমস্যা। স্টোভ, হীটার, বা প্রেসার-কুকারের দ্বারা। অব্যবস্থা অসাধারণ। ইচ্ছা থাকলেই নানারকম রীণা সম্ভব নয়। তা ছাড়া মেয়েরা জনেই পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে অর্থ-উপার্জনর দায়িত্ব ভাগ করে নিচ্ছেন। রায়াকরের অধ্যায়টি অপত্যা সমস্যাভাবেও

কতিপয় হতে বাধ্য। বাংলার গল্পে 'দুই নব্বই', অন্নমণ্ডলার
মহিমামণ্ডল এইসব খেতে হবে' গোড়ের কথাটা আজ
যদি খসে পোনা যায়।

তবু ভালো—রাষ্ট্রদূতের দিন চুঝেযনি। তাঁরা
বিশ্বদেশের চেয়েও বেশি অত্যাচার সহ্য পুষা পান। বিশেষতঃ
আমাদের দেশে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশের নানাব্যকম
রাস ও পোষকের বিষয়ে প্রতিষ্ঠা আছে। এতবকম বৈচিত্র্য

নাথি এদেশের অক্ষর হইল। রাগা নিয়ে এত কেউ
জায়েনা।

আমাদের দেশের সেই চমৎকার ঐতিহ্যের সমর্থক
হিসেবে বলতে পারি শ্রীমতী মিহির বট্টা ইছাম উৎসাহীদের
বিশেষ সহযোগ। বট্টায়ে অনেক বছরে মতীর মিলনো
বা এখন আর কম-টু রাগা হাতে দেখা যায়। শ্রীমতী মিহি
একটি চমৎকার উপকার সাধিত করেছেন। —শ্রীমতী

মঙ্গল সাহিত্য কৃত্তির পুজার উপহার

এবার পুজার নতুন
কই

পুজা বাসিন্দা

অন্নমণ্ডল

• দাম চার টাকা •

গান দিদির
থলে

এবার পুজার নতুন
কই

গল্প ভালো আবার বলা

দাম দু টাকা

দেব সাহিত্য কৃত্তির কলিকতা-১

এবার পুজার নতুন
কই

বরণজালা

সুনির্মল বহুর

গল্প ও কবিতা সংকলন

দাম ২

চাকুন্মন্ডাল কুলি

দাম—৭

ছোটদের গল্প-সংকলন ৪

পুজা বাসিন্দা

দেবালয়

দাম চার টাকা

পুজা বাসিন্দা

নব পত্রিকা

মূল্য ৪.

পুজার দিনের উপহার

চিত্রদীপ ৪

ইন্দ্রধনু

দাম ৫ টাকা

শিবরাত্রির
হাসির গল্প

হাত হাঙ্গি
ডডই হাজা

মূল্য ২

জয়যাত্রা

দাম ৬ টাকা

জানকী সরস্বতী পুজার সময়

পুরানো দিনের
পুরানো গল্প

৭

জন্মদিনের উপহার

দাম দু টাকা

উকতারা

দাম ৮

হাঙ্গি বর্ষ পড়বে।

বিশ্বপরিচয়

(পত্রিকা)

দাম ৮

দেব সাহিত্য কৃত্তির

মঞ্চ-দর্শন

চিত্রলোক

পদ্মনাভ

নাগিনী কঙ্কার কাহিনী

এযোজন্য : কল্লোল চিত্র প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে বি. এন. রায় ও বিজয় চট্টোপাধ্যায়। কাহিনী ও সংলাপ : ভাবানন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : দিলিপ সেন। সঙ্গীত-পরিচালনা : ববিশ্বর। নৃত্য-পরিচালনা : দেবেন্দ্রশঙ্কর। চরিত্র-চিত্রণ : চুপি বিশ্বাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, কালীন্দ্র চক্রবর্তী, দিলীপ রায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণকুমার, রসরাজ চক্রবর্তী, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, মল্লিক, শীলা দাস, সীতা দাস, ডলি ঘোষ, সিদ্ধা চক্রবর্তী, নবগণতা মল্লিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায় এবং আরো অনেকে।

চম্পাই নগরের ধারে গাঁতালী পাহাড়ে স্থতির আদিকাল থেকে শতক পুরুষের বাস বিবৈবন্ধদের। চাঁদনদাগরের সঙ্গে বিবাদ সর্বস্বকতা হা-মনসায়। বাসরে হবে লম্বিকের সর্গযাত্র। বিবৈবন্ধদের বাসর কঙ্কার ভাব দিলো চাঁদ বেনে। অন্ধকার আকাশে মেঘ জমেছে, এমন সময় গাঁতালীর সীমানার ধারে কে বেন কেঁদে ওঠে। বিবৈবন্ধদের প্রধান শিরবৈজ্ঞ এনে ভাণে ন'দশ বছরের একটি মেঘে। যখন কোসো বেন তার-ই ঘরা মেঘে। শিরবৈজ্ঞ ভুলে গেল তার মন্ত্রতন্ত্র, ভুলে গেল তার প্রতিজ্ঞার কথা। কেঁদে উঠে জড়িয়ে ধরলো ছন্দনাময়ী কালনাগিনীর কন্তে-মুতি-ধরা দেহখানি। প্রতিজ্ঞা করলো। কালনাগিনী, যেহে হরে তার ঘরে চিরকাল থাকবে। কালযুগ মেঘে এলো—লোহার বাসরে লম্বিকের হোলো সর্গযাত্র।

সেই থেকে তাদের জাত গেল, মান গেল, বাস গেল। বিবৈবন্ধ থেকে হোলো বিবৈবন্ধে। গাভের জলে নৌকো ভাসলো তাদের। ডাঙ্গীরবীর কূলে হিজল বিলের পাশে গড়ে উঠলো তাদের গাঁতালী কালনাগিনীর আদ্যে। সঙ্গে থাকে এদের নরবেহে দেবতা কালনাগিনীর প্রতিচ্ছ

নাগিনীকঙ্কা, আর থাকে সমাজের প্রধান শিরবেহে। বছরের পৌষ মাস থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত বাস করে এরা গাঁতালীতে, তারপর শ্রাবণের শেষে বেড়িয়ে পড়ে নৌকো করে শহরের উদ্দেশে। পঞ্চাশ বছর পরেও ওরা এয়েছিলো শহরে। তখন ওদের নাগিনীকঙ্কা শবলা আর শিরবেহে মহাঘেব।

নাগিনীকঙ্কা হবেও শবলায় যখন বাসনা জেগেছিলো ঘরে, যবেব। সাধারণ মানুষের মতোই তার মন উবেলিত হয়েছিলো সন্তান-সন্ততির, নারীর পুণ্ডিত্য জন্তে। হুলালের ভালোবাসার অবদান করত সাহস তার হবনি, পাণির যেতে চেয়েছিলো সে, সাতা দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু আশা তার পূর্ণ হোলো না, শিরবেহের চক্রান্তে হুলালের প্রাণ গেল। আরো বিপর্যয় এল শবলায় জীবনে। শিরবেহে মহাঘেব বড়বন্ধ করে শিবলকে নতুন নাগিনীকঙ্কা-রূপে বরণ করলো। অসম্মান ও অবমাননা থেকে মুক্তি পেতে চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করলো শবলা। শিরবেহের কূলে বিধবাটা বিধিয়ে দিলে।

নতুন নাগিনীকঙ্কা শিবলার জীবনেও দেখা দিলো শবলায় জীবন-জিজ্ঞাসা। তারও প্রাণ মুক্তি চাইলো দেবদেব খোলস থেকে। জীবনের বিশেষ লগ্নে দেখা হোলো তার নাগ ঠাঁকুরের সঙ্গে। সমস্ত সংসার ত্যাগ করে নাগ ঠাঁকুর এগিয়ে এলো বেহেদের মাঝে, শিবলার নীরব আকৃতিতে সাতা দিতে। কিন্তু শিবলার সাংসারের কাছে হার যেনে সে ধিরে গেল কামরূপ-কাম্যায়। সেখানে যোগিনী শবলায় সঙ্গে হোলো দেখা। তার উৎসাহে উজ্জীপিত হয়ে উঠলো নাগ ঠাঁকুর। এগিয়ে গেল শিবলার উজ্জারে। এগিকে সংকট ঘনিয়ে এসেছিলো শিবলার জীবনে। নিজেব জীবন দিয়ে তার মুক্তির পথ করে দিলো শবলা। পুরোনোকে ভেঙে নতুনবের প্রতিষ্ঠা করলো নাগ

সাঁহুর। নাগিনীকল্প প্রাণ খুঁজে শেল মাত্রের সমানোদের দাকে।

বাস্তবধর্মী ছবি 'নতুন ইন্দী'তে পরিচালক মণিলা দেবের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে যতাবতই 'নাগিনী কল্পার কাহিনী' দেখবার জন্যে ঊৎসাহী হয়েছিলো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, কথাশিল্পী তত্ত্বাবধানের এই বিচিত্র কাহিনীর চিত্রায়ণ দেখে হতাশ হয়েছি। ছবিটিকে দর্শকের মনের মতো করার ক্ষেত্রে অনেক-কিছুর সরিংশ করা হয়েছে বটে, হ্রস্বের বিবহ, তা সার্থকতার সীমা থেকে অনেক দূরেই থেকে গিয়েছে। পাত্র-পাত্রীর বেশভূষার মধ্যে দিয়ে অশিক্ষিত বোম্ব-বেগুনীদের আসল রূপটি স্ক্রীনে তোলায় প্রচেষ্টা সফল হোতো, যদি তাদের ভাষার মধ্যে আধুনিকতার চিহ্ন পরিস্কৃত না হোতো। অশিক্ষিত বোম্ব-বেগুনীরা যেখানে তখনই এবং নাগপুঙ্জার মধ্যে সৈন্যকিন জীবন অভিব্যাহন করে, সেখানে তাদের মুখে খাঁটি শব্দে ভাষা রীতিমতোই স্তম্ভক। বোম্ব-বেগুনীদের অসংগত নৃত্য এবং নাগ সাঁহুরের ঘোড়ার চোপ হুঙ্কার-পরিচালনা বোম্বাই-ছবির কথাই মরণ করিয়ে দেয় বার বার।

ছবিটিতে সবচেয়ে প্রশংসনীয় হয়েছে এর বহির্ভূতগুলি, বিশেষ করে ভাস্কর্যীর কূলে নৌকোযাত্রার দৃশ্য। আলোক-চিত্রে অসাধারণ ও ছবির প্রাণসম্পদ। কাটা কাটা কয়েকটি দৃষ্টের নাটকীয় মূর্ত্ত এবং সেগুলির সংযোজন বিশেষভাবেই সোলা দেয় দলকে। পিরবোবে মহাসেবের চরিত্রটি ছবি বিশাশ ভালোডাবেই স্ক্রীনে ফুটেছেন, কিন্তু খাঁটি শব্দে ভাষার সংলাপ হচ্চরার ক্ষেত্রে চরিত্রটি আন্তরিক হয়ে উঠতে পারেনি। এই একটমাত্র ক্ষুদ্র সারা ছবিটিকে কোনো সাধারণের দ্বারা ছাড়িয়ে অসাধারণের পর্বে আনতে পারেনি। এর ক্ষেত্রে দারী কাহিনীকার এবং পরিচালক উভয়েই।

নবাগত মঞ্জুলা বক্যোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায় নাগিনী-

কল্পা শব্দা এবং শিশুদের চরিত্র-চিত্রণে যথেষ্ট নিষ্ঠা দেখালেও, তা সার্থক হয়ে উঠার পথে বাধা দেখা দিয়েছে তাঁদের শব্দে তাঁদের কথাবার্তায়। হুজনেই অবশ্য বহুই দরদ দিয়ে চরিত্র স্ক্রীনে স্ক্রীনে তোলাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁদের কথাবার্তা শুনে সব সময়ই মনে হয়েছে যেন তাঁরা নবা-আলোকপ্রভা শব্দবাসিনী—শোবিন নাট্য-সম্ভারের বেগুনীর ভূমিকার অবতরণ করেছেন।

পতিশালী অভিনেতা কালী বক্যোপাধ্যায়কে নাগ সাঁহুরের ভূমিকার পরিচালক এমনই অভিনয়-নির্দেশ দিয়েছেন যে, কেবলই মনে হয়েছে 'বরষাজীর' গণনা বৃষ্টি শিব সেক্ষে দিগে এসেছে। এই চরিত্রটির প্রতি আরো একটু নজর দিলে পরিচালক হ্রস্বের পরিচয় দিতেন। অজ্ঞাত চরিত্রগুলিতে সত্য বক্যোপাধ্যায়, অশ্বপুঙ্জার, প্রবীরকুমার, দিলীপ রায়, কালীদাস চক্রবর্তী, জহর রায় প্রভৃতি স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন।

ঘোড়ার উপর 'নাগিনী কল্পার কাহিনী' ছবিটি সাধারণ ছবি হিসেবেই অস্বীকৃত হয়ে থাকবে, যদিও অসাধারণ স্বাভাবিক ও গুণ এর মধ্যে ছিলো। কলাকৌশলের বিভিন্ন দিকগুলি বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। এ ছাড়া প্রশংসনীয় হয়েছে চরিত্রদের সংশ্লিষ্ট-পরিচালনা—পরিবেশ অল্পবাহী সংশ্লিষ্ট-স্থাপনা এবং আবহমান-পরিবেশনার কাছে তিনি বিশেষভাবে সফল হয়েছেন। ছবিটিকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে চরিত্রদের সংশ্লিষ্ট-পরিচালনা। এর সঙ্গে বেবেশপত্রের নৃত্য-পরিচালনার কথা উল্লেখযোগ্য। তাঁর নৃত্য-পরিচালনা আরো সার্থক হোতো, যদি তিনি বোম্ব-বেগুনীদের দিয়ে আধুনিক কোমর-সোলানো নৃত্যের বদলে প্রামাণ্য নৃত্য পরিবেশন করতেন। সব দিক দিয়ে ছবিটিকে বিত্তীয় প্রেক্ষার উর্ধ্বে স্থান দেওয়া যেতে পারে না, এবং সংগঠনময়িত এই ছবির সার্থকতার ক্ষেত্রে একমাত্র সলাপাই দায়ী।

•

এলিজাবেথের
অভিনবদ্বৈ
ও
আধুনিকতায়



প্যারীমোহন দত্ত এও কোঃ
অ্যানুগোচ্চারিত জুয়েলস
১৮৬, বঙ্গবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

। আ পা মী আ ক র্ণ ।

লালুতু

'বাণভট্ট' (নীহাররঞ্জন ভট্ট) বিরচিত কাহিনী 'লালুতু' দৈনিকের পৃষ্ঠার প্রকাশিত হবার সময়েই মনে লাড়া বিয়েছিলো অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকার। একটি অঙ্ক ও একটি পল্লু কিশোরের এই দয়বী কাহিনী চিত্রায়িত করছেন 'অগ্রহৃত' সম্ভার। অগ্রহৃত প্রযোজিত ও পরিচালিত এই ছবির প্রধান দুটি ভূমিকা দ্বাশায়িত করছেন ঐমান রঞ্জন ও ঐমান পরেশ। অস্ত্রাচ চরিত্র কুটিয়ে তুলবেন শোভা পেন, কমলা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গুণী শিল্পীরা। ছবিটিতে সুখ-সংযোজন। করছেন হবীন চট্টোপাধ্যায়। নতুন পথের বিশারী হিসেবে অগ্রহৃত সম্ভার বাংলা চিত্রজগতে যে সুনাম অর্জন করেছেন, 'লালুতু' ছবিটি সে সম্মান আগ্রো বাড়িয়ে তুলবে বলে আশা করা যায়।

সেন এবং অস্ত্রাচ ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ, বিকাশ রায়, ডাহু বন্দ্যোপাধ্যায়, জলদী চক্রবর্তী প্রভৃতি শিল্পীকে দেখা যাবে। ছবিটিতে হরারোণ করছেন হেমন্তকুমার।

নৌকাবিলাস

রাধাকৃষ্ণের শীলাবেলায় স্বকালীন কাহিনী অবলম্বনে প্রোডাকশন সিন্ডিকেটের আগামী চিত্র 'নৌকাবিলাস' বর্তমানে মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবির তালিকার রয়েছে। প্রেন-ইতিহাসিক এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন প্রযোজক সুখীর মুখোপাধ্যায় স্বয়ং। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রক কট্টোপাধ্যায়। হরারোণ করেছেন পবিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং বৈশাখ্য গান গেয়েছেন ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারামি দেবী, মানবেন্দ্র



'অগ্রহৃত' প্রযোজিত ও পরিচালিত 'লালুতু' চিত্রের একটি দৃশ্যে মণ্ডার রঞ্জন ও পল্লু (বামদিকে পল্লু ও অঙ্ক কিশোরের ভূমিকায়) এবং শোভা পেন প্রভৃতি

সূর্য্যভোরণ

ঈভকার গৌরীপ্রসন্ন বহুবাবারের দেখা কাহিনী 'সূর্য্যভোরণ'-এর চিত্রগ্রহণ বেণ্ডার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অগ্রহৃত-গোষ্ঠীরই উপর। নতুন বধনের মুষ্টিভক্তি নিয়ে তোলা এই ছবিটি প্রযোজনা করছেন নবাগত প্রতিষ্ঠান 'নবারুণ চিত্র'। প্রধান দুটি ভূমিকায় উত্তমকুমার ও সুচিত্রা

মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং সত্যল মিত্র। বিভিন্ন চরিত্র দ্বাশায়িত করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, নিতাননী, পূর্ণিমা, অরুণকুমার, পদ্মা দেবী, নবাগত সিহিবকুমার, নবাগত অরুণা ওহ এবং আরো অনেকে। নৌকা-বিলাসের জাঁকজমকময় নৌকাবিহারের মুভাবলী বহু-চিত্র-বর্ণ-বস্ত্রিত পেডাকলারে তোলা হয়েছে। ভক্তিমূলক

ছবি হিসেবে দর্পকল্পনকে পরিচূর্ণ করতে পারলে, 'বৌক'-বিলাস' গ্রন্থে অর্জন করবে।

সংযোগ

দেশে শিক্ষা-বিভাগের অন্ত্রে একটি অতিশাধারণ চাকী তার সারা জীবনের দক্ষ কি ভাবে অকাতরে দান করে দিলো, সেই কাহিনী অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে নবগঠিত 'মহাবৌ চিত্র'র প্রথম অবলম্বন 'সংযোগ'। ছবিটি পরিচালনা করছেন 'চিত্রতত্ত্ব' নামের আড়ালে একটি কলাহুশীলী গোষ্ঠী এবং অর্থ-ব্যয়না করছেন অনিল বাগচী। বিভিন্ন চিত্রিত রূপাঙ্কিত করছেন অশুপহুমার, মলয়া সরকার, শীলা পাল, নীলিমা দাস, রাজলক্ষী, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, সজোব সিংহ প্রভৃতি শিল্পী। সম্ভ্রুতি ইন্দুপুত্রী স্টুডিওতে মধুর অঙ্কনানের পর পুরোদমে এদিকে চলছে চিত্রগ্রহণের কাজ।

। খুঁটতো খবর ।

নিউ ইয়র্ক শহরে বিশ্ব-ইতিহাস-স্মৃতিকারী বাংলা ছবি 'পথের পাঁচালী'র ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রশংসার উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে যোগ দেবার ক্ষেত্রে প্রযোজক-পরিচালক সত্যজিৎ রায় গত ১১শে আগস্ট বিমানযোগে আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করেছেন। পথে শওনে দুদিন বেগে ২৪শে আগস্ট তিনি নিউ ইয়র্কে পৌঁছবেন। সত্যজিৎকে বিহার-অভিনন্দন জানাবার ক্ষেত্রে ঐর পরিবারবর্গ ও সহকর্মীরা বিমান-বাঁচিতে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় একমাস কাল আমেরিকার কালিফোর্নিয়ায় বসে বসে ন্যাগাস 'কলগামার'-এর প্রথম প্রশংসার অনুষ্ঠানে যোগ দেবার ক্ষেত্রে তিনি কলকাতায় ফিরে আসবেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, 'অরোরা কিন্ড'-প্রযোজিত 'কলগামার' পরিচালনা করেছেন সত্যজিৎ রায়।

যাতনাদা প্রযোজক এল্. বি. কিন্ড্ ইন্টারন্যাশনাল এন্টিটাইমের অন্ততম কর্তব্য প্রযোজ সাহিড়ী তিনমাস কাল ইউরোপ সফর করে গত ১২ই আগস্ট কলকাতায় ফিরেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পথপাথর' ছবিখানি কিছুকালের মধ্যেই ফ্রান্স, ইংলণ্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড ও মারাগায়ারে প্রদর্শিত হবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে। এ ছাড়া আরো কয়েকটি দেশেও ছবিটি প্রদর্শিত হবে বলে তিনি জানান। প্রসঙ্গত

অপূর সংসার

বিববন্ধিত খাতালী পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ছবি 'অপূর সংসার' গড়ে উঠবে বিহুতিহুনের 'অপরাধিত'র পরবর্তী অংশটুকুকে ভিত্তি করে। প্রধান ভূমি চরিত্র অশু ও অশর্পর চরিত্রে দেখা যাবে নবাগত শিল্পী নৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর-কে (টুকু ঠাকুরের বিধি)। অজ্ঞাত চরিত্রগুলির রূপাযোগে দেখা যাবে অনেকগুলি নতুন মুখ। এর মধ্যে অশন মুখোপাধ্যায় (অপূর বন্ধু প্রণব), শ্রীমান অশক (অপূর ছেলে কাজল), বীরেশ মহুমদার (অশর্পর বাবা) ও শ্রীমতী শেকদিকা (অশর্পর মা) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত-পরিচালনার হাতিয়ার নিয়েছেন রবিশঙ্কর। কলকাতাশহরে বিভিন্ন দিক তত্ত্বাবধান করবেন সত্যজিৎের পুরোনো সহকর্মীরা। গত ১০ই আগস্ট থেকে ছবিখানির কাজ শুরু হয়েছে।

শ্রী সাহিড়ী জানান যে, সম্ভ্রুতি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-প্রতিযোগিতাগুলিতে ভারতীয় ছবির অসামান্য শাফল্য ইউরোপীয় চিত্র-পরিবেশকদের দৃষ্টি আকর্ষণে যথেষ্ট করেছে। বহু ইউরোপীয় প্রযোজক ভারতীয় ছবি আমদানির ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হয়েছেন। ইউরোপে ভারতীয় ছবির চাহিদা বৃদ্ধির পেছনে আছে বর্তমান ভারতীয় চিত্রশিল্পে নবধারার প্রবর্তন। এবং যে ধারার পশ্চিৎ 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাধিত'র মতো সত্যজিৎ রায়।

কম্বাচারী একটি খবরে প্রকাশ, পাকিস্তানে নতুন ছবি তৈরি হবার সংখ্যা এতো কমে গিয়েছে যে, ভারত থেকে ছবি আমদানি না করলে কিছুকালের মধ্যেই সেখানকার ছবিঘরগুলির দরজা বন্ধ হয়ে যাবে বলে জানা যায়। সম্ভ্রুতি যে কয়েকখানি ছবি পাকিস্তানে তৈরি হয়েছে সেগুলি দর্পক-শাফল্য অর্জন না করার ফলে হ'একদিনের বেশি চলতে পারেনি। চিত্র-প্রদর্শক এবং পরিবেশকরা এক অচিন্ত্যনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন বলে প্রকাশ। অধিকাংশ পাকিস্তানী চিত্র-ব্যবসায়ীরা তাই ভারত থেকে ছবি আমদানি ক'রে সেখানকার ছবিঘরগুলিকে অশুপহুমার হাত থেকে রক্ষা করার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করছেন।

অপরদিকে বোম্বাইয়ের এক বন্ধুর প্রকাশ যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলচ্চিত্রের আদান-প্রদান বিধি-আলাপ-আলোচনা কববার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র-প্রতিনিধিদের একটি দল খুব শীঘ্রই জায়ন্ত-সফর আসবেন। 'সারা পাকিস্তান চলচ্চিত্র-প্রযোজক সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক ইশমাইল নূর সজ্জতি বোম্বাইতে উপস্থিত-উক্ত ভাষ্য প্রকাশ করেন। তাঁর উক্তি-প্রকাশ যে, তিনি ভারতীয় প্রদর্শক ও পরিবেশক সংগঠনগুলির সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন। আলাপ-আলোচনার ফলে তিনি আশা পেরেছেন যে, পাকিস্তানের এই চলচ্চিত্র-সংস্কৃতির সমগ্র ভারতবর্ষ নিজের থাকবে না। উভয় রাষ্ট্রের চলচ্চিত্র-নির্মিতার আলাপ-আলোচনার ফলে ভারত-পাক চলচ্চিত্র আদান-প্রদান

রপ্তানির অচলাবস্থা দূরীভূত হবে বলে অনেকেই আশা করছেন।

•

বোম্বাইয়ের চিত্রতারকা সন্ধান এক অভিনব আয়োজন শুরু করেছেন। তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্প জাতীয়করণের দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন। তাঁর অভিমত এই যে, ভারতীয় ছবির সর্বাধিক উন্নতির একমাত্র উপায় হোলো এট শিল্পটিকে জাতীয়করণ করা। এই ভিত্তিতে এক আবেদন-পত্র রচনা করে চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং জনসাধারণের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পার্শ্বাচার সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেছেন। এই একক আয়োজন চালানোর ব্যবস্থার ব্যয় সন্ধান নিজেই গ্রহণ করেছেন বলে প্রকাশ।





—“কমরেড্‌স্‌, কো'পানি আমাদের দাবির ঝাড় ছ'আনা মেনে নিয়েছে, তোমরা এবার আমাদের দাবির প্রতীক দাড়ি হেঁটে কেসতে পারো।”

(নেপথ্যে): “কতটা? ছ'আনা, না পুসোটা?”

খেলার মেলা



যুধিষ্টির

ফুটবল :

আই.এফ.এ. ফুটবল লীগ

১৯৪৮ সালের ফুটবল লীগ শেষ হয়ে গেল। এই বৎসর তরুণ বাঙালী খেলোয়াড়-পুটে ইন্টার্ন রেলওয়ে শোর্টস ক্লাব সর্বাধিক লীগ-বিজয়ের সম্মান লাভ করল। এর পূর্বে ভারতীয় দল হিসেবে মহামেডান শোর্টস ১ বার, মোহনবাগান ১ বার ও ইস্টবেঙ্গল ৬ বার লীগ-বিজয়ের সম্মান লাভ করেছে।

রেলওয়ে দল পছন্দস্বরূপ স্বাধীন প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিশনে প্রতিযোগিতা করে থাকে। মাঝে এদের ডায়া-বিশ্ববের ক্রম দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলতে হয়েছিল। অতীতে কার্ভে-ক্লাব, ক্লাব, সানাদ, বাবা মোহ (বর্তমানে ক্লাবের ট্রেনার), এল. মন্টী, মোহিনী ব্যানার্জী, বেগমলাল প্রভৃতি বিখ্যাত খেলোয়াড়রা এই দলে খেলেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে—কয়েকটি বিখ্যাত সংবাদপত্র, হরত বা ভুল করেই, অতীতের বিখ্যাত খেলোয়াড়দের নাম করতে গিয়ে, গত ১৯১২ বৎসরের মধ্যে গ্রেট সেন্টার-করোয়ার্ড মেওলাগালের নাম কি করে বাধ দিলেন তা বোঝা গেল না। আমাদের মনে হয়, এখনও বাংলাদেশে বেগমলালের স্মরণ করা হয়েই নেই। কারণ এই বৎসরও তিনি লীগের গোপ-দাতাধর্ম শীর্ষে রয়েছেন। সত্যকার সাংবাদিক-কর্তব্য সত্যকে উন্মোচন করে সকলের সমক্ষে তা উপস্থিত করা। কিন্তু তারা যদি এই কর্তব্যপালনে অবলোম্ব করেন তবে তারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অপরাধে অশ্রাব্যী হবেন।

আবার এই বৎসরের লীগের কথাই কিংবদন্তি আসা যাক। রেল-দলের বিজয়ের মূলে যে কয়েকটি খেলোয়াড়ের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তারা হলেন—প্রদীপ ব্যানার্জী,

এন. মন্টী, পি. বসু, পি. বর্মন প্রভৃতি। কিন্তু কয়েকজন খেলোয়াড় ভালো খেললেই কোনো প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা যায় না। সত্যকার ভালো দল গঠন করতে হলে চাই দলের সংহতি। দলের কোনো খেলোয়াড় স্বার্থের কথা চিন্তা করবেন না, কেবল দলের কথাই চিন্তা করবেন। এই তরুণ, উদীচ্যমান বাঙালী খেলোয়াড়রা উৎসুক শিক্ষক বাবা মোহের তত্ত্বাবধানে যে কীড়া-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা বিশ্বব্বের। কোলকাতার বেশ কয়েক বৎসর ধরে পাঁচ-ছাত্রী, দশ-ছাত্রী খেলোয়াড় আমদানির হিড়িক পড়ে গেছে। স্বাধীন এইসব বড় বড় খেলোয়াড়দের আনছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করায় তারা বলেন—ভালো বাঙালী খেলোয়াড় কোথায়, তাই বাইরে থেকে খেলোয়াড় আনতে হয়। কিন্তু একদা ফুটবলের পীঠস্থান এই বাংলাদেশ এখনও যে মগেনি তার প্রমাণ এই বেল-বল। রেলওয়ে দল ভবিষ্যতে কি করতে পারবে আমরা জানি না, কিন্তু তারা যে আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরল তা সকলের শিক্ষণীয়। বাংলাদেশে এখনও প্রচুর প্রতিভা আছে, কেবল তারা সুযোগের অভাবে বিকাশলাভ করতে পারে না। বাবা মোহের মতো কৃতী ফুটবল-শিক্ষকের শিক্ষকতার খেলোয়াড়দের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি বিশ্বব্বভাবে লক্ষণীয়। এই দলের কোনো খেলোয়াড় হুমপান করেন না, কারণ হুমপান করলে খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা থাকে। এইসব আশ্রিত অশ্রুশ্রাবিত হয়ে অল্প সব দলগুলি যদি শিক্ষালাভ করে, তবে অল্প ভবিষ্যতে বাংলা তার পূর্বের স্থান ফিরে পাবে।

লীগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে মহাক্রমে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দল। এই দুই দলের খেলা

এ-বৎসর মোটেই আশোজস্বপ্ন হয়নি। যদিও এটাই হুট বল শ্রেণি করে একটি করে 'হাজারী' খেলোয়াড় হয়েছেন। তারা খেলোয়াড় অন্তরে যে টাকা পরচা করেন, সেই টাকা দিয়েই 'হাং' বিদেশে কোচ-এর সাহায্যে জাতীয় খেলোয়াড়দের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে পারেন। আশা করা যায়, বেল-পলের কাছ থেকে ভবিষ্যতের জন্য এটাই শিক্ষা তারা গ্রহণ করবেন।

ভারতীয় ফুটবল দলের প্রকাশন সফর

ব্রহ্মপুত্র করে একটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলার আশ-গ্রহণ করার চক্র ভারতীয় ফুটবল দল গত ১২শে আগস্ট বেতুন ঘাট করেচে। ভারতীয় দল মোটে ৪টি খেলায় অংশগ্রহণ করে। প্রথম ২টি খেলায় তারা ব্রহ্ম নিউজিয়াম একাডেমি ও বনী সেনাদলের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ১-০ ও ৩-১ গোলে জয়লাভ করে। তৃতীয় খেলায় তারা ব্রহ্ম একাডেমির নিকট ২-১ গোলে পরাজিত হয়; চতুর্থ ও পঞ্চম খেলায় তারা একটিকে পরাজিত হয় এবং অপরটিকে জয়লাভ করে।

আই.এফ.এ. শীর্ষ

গত ২৪শে আগস্ট হাতে বিখ্যাত আই.এফ.এ. শীর্ষের খেলা আরম্ভ হয়েছে। প্রথম দিনের খেলার চর্চা টেলিগ্রাফ দল ডানহাণ্ডি দলকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে। এ বছর আই.এফ.এ. শীর্ষে মোটে ৪২টি দল যোগদান করেছে। এখন থেকে আই.এফ.এ. শীর্ষের খেলাগুলি ৪৫ মিনিটের পরিবর্তে ৭০ মিনিট করে অঙ্গীকৃত হবে।

সাঁতার :

ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারের বাঙালী

পাকিস্তানের বাঙালী সাঁতারক অজেন দাস এই বছর ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারের খিতাব স্থান অধিকার করে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এই তাঁর প্রথম চেষ্টা, এবং প্রথম চেষ্টার এই সাফল্য সত্যিই পৌরবেদনক। অজেন দাস ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের পুণ্ড্রাবরণ পাঁচজন স্টার্লিং পুরস্কার পাবেন। ২১ মাইল দীর্ঘ, মোত ও তরঙ্গবিশুদ্ধ চ্যানেল অতিক্রম করতে তাঁর মোটে ১৪ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট সময় লাগে। তিনি মাটি স্পর্শ করবার ৩ ঘণ্টা পূর্বে উপকূলের গ্রাফ ৩৫ মাইল পূর্বে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু প্রতিদূল মোতের জন্য তাঁর অনেক সময় লেগে যায়। কয়েক বছর পূর্বে শ্রী দাস কোলকাতার সেন্ট্রাল হাইমিড স্নাংয়ের সমস্ত ছিলেন।

এই বছর ইংলিশ চ্যানেল প্রতিযোগিতায় ১৫টি রাষ্ট্রের ৩০ জন প্রতিযোগী যোগদান করেন। এঁদের মধ্যে ৪ জন মহিলা ছিলেন। প্রখ্যাত মার্কিন মহিলা-সাঁতারক গ্রেটা অ্যাওয়ার্ডন এ-বছর চ্যানেল-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। দীর্ঘ ২১ মাইল সমুদ্রপথে মাত্র ১১ ঘণ্টার অতিক্রম করে তিনি ১৯৪১ সালের ফুটবলের ব্যাগা শিশারের রেকর্ড—১২ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটের রান করে গিয়েছেন। এর পুরস্কার-বরণ তিনি নগদ ১,২০০ স্টার্লিং এবং ১,০০০ স্টার্লিং মূল্যের একটি ট্রিফ একবৎসরের জন্য পাবেন। চ্যানেল-সমুদ্রপথে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে বোনাস্ টার ও হাল্ভন ইমেনস।



ক্যালকাটা অপ্রটিক্যাল কোং (প্রাইভেট) লিঃ

ফোন - ৩৫ - ১৭১৭ প্রতিষ্ঠাতা: ডাঃ কার্তিক চন্দ্র বসু গুপ্ত
গ্রাম-কালসনপটিকা • ৪৫নং আম্বাহাট্ট স্ট্রট • কলিকাতা-৫

১ খেলাধুলার খুঁজেরা খবর ১

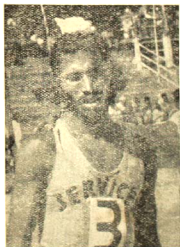
বড়পুত্রে আন্তঃরেলওয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। 'সেবা' স্টেডিয়ামে অংশগ্রহিত এইসকল খেলোয়াড় ইন্টার্ন রেল-কল, সাউথ-ইন্টার্ন রেল-কল প্রভৃতি দলইয়া ভারতের ১৪টি রেলওয়ে দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। এ-বছরের দীর্ঘ-বিষয়ী ইন্টার্ন রেলওয়ে দল বিষয়ী হওয়ার পৌরব অর্জন করেছে।

বেসরকারী খবরে প্রকাশ যে, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান দলের চারজন খ্যাতনামা খেলোয়াড়—রামাধীন, সোবার্ণ, কনকর হাট ও শিখ এই বৎসর ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান দলের সহিত ভারত-সফর করবেন। কিছুদিন পূর্বে ঘোষণা করা হয়েছিল যে উপরি-উক্ত চারজন খেলোয়াড় ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান দলের সহিত ভারত-সফরে আসতে পারছেন না।

বিশেষ সংবাদে জানা গিয়েছে যে, খ্যাতনামা টেস্ট-ক্রিকেট খেলোয়াড় এ. সি. কৃশাল সিং ও প্রকাশ ভাণ্ডারী এ-বছর কোলকাতায় খেলার রক্ত দিচ্ছন্ত গ্রহণ করছেন। কৃশাল সিং কালিঘাট দলে ও প্রকাশ ভাণ্ডারী মোহনবাগান দলে খেলবেন বলে জানা গিয়েছে।



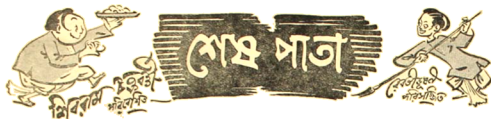
এ-বছরে সেবা খেলোয়াড়—চুপি গোহাটী



'সেবারা'র সেন্স-এ বর্ণনিক-বিভাগী ভাণ্ডারী
দৌড়ার—দিলপা সিং

এই বছর কোলকাতার ডেটরেল ক্লাব চুপি গোহাটীকে বৎসরের জ্যেষ্ঠ খেলোয়াড় বলে ঘোষণা করেছে। চুপি গোহাটীর পক্ষে এই ঘোষণা খুবই গৌরবজনক। কেননা যেখানে সব নামকরা খেলোয়াড় খেলেছেন—সেখানে তাঁর সাক্ষ্য সত্যই কতিবর্ষ। চুপি গোহাটীর এই সাক্ষ্য তাঁকে ভবিষ্যতে অহুপ্রাপিত করবে বলে আশা করি।

কোলকাতার ইন্টবেঞ্চল দলের খ্যাতনামা খেলোয়াড় বাসু কোন্ কলেজের ছাত্র এই নিয়ে এক সমস্যা দেখা গিয়েছে। ইন্সটিটুট স্ট্রেন্ডের খেলায় বাসু বিভাসাগর কলেজ দলের হয়ে খেলেন, কিন্তু চাকচক্র কলেজ দল বাসুকে তাদের কলেজের ছাত্র বলে ঘাণি ক'রে আই.এফ.এ.-র নিম্নট এক প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করে। আই.এফ.এ. এই প্রতিবাদের বিচার ক'রে বাসুকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সাসপেন্ড করেছে।



এক নাকিন-ঘেঁষা পত্রিকার মতে আমেরিকা
আণবিক অস্ত্রশস্ত্রে এখন অনেক বেশি এগিয়ে গেছে,
তার সঙ্গে পালা দিতে পারে কুশিয়ার খলিতে ভেমন
কিছুই নেই, তাই কুশিয়া সামরিক সম্বন্ধ-স্থাপনের
ভঙ্গি মরীয়া হয়ে অদৃশ্য আর হাঙ্গকর যতো প্রস্তাব
এনে পাড়ছে।

‘লাল GUN-এ NILL শূঁধ,
চাসি চাসি গছ?’

(কবি সুকুমার রায়ের মার্কনাথ)

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীদেবর ভারতনারীদের
অস্থত: বছর দশেক সোনার গয়না ব্যবহার করতে
দারণ করেছেন।



এই কি দেবরের মতো কাজ! (বৌদিরাই
বলুন!)

‘বর্ধাকালে মধু গাঁজিয়া যায়।’
গাঁজা নিশ্চয়ই তাহলে বেশ মধুর হয়?

উড়িয়ার প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীভীমসেন সাচার
এক জগন্নাথের পায়ে দশটাকার প্রণামী রাখতে
যাচ্ছেন এমন সময়ে এক পাণ্ডা তাঁর হাত থেকে
নোটখানা ছেঁে মেরে ছিনিয়ে নিয়ে উধাও হয়—তার
সে কাজে বাধা দেবার তখন সেখানে কেউ
ছিল না।

কে বাধা দেবে? প্রকৃত নিষেধই কি কোনো
হাত আছে?

মিলেটের এক মুসলমান বৌকে তালুক দিয়ে
পত্তিয়ে অবশেষে সেই তালুক না-মঞ্জুরের ক্ষেত্রে
ছন্ন মৌলানার ধারস্থ হয়। তাঁরা অশুকুল যতারা
দিয়ে তাকে বাধিত করতে নারাজ হওয়ায়, এক
কুতুলের ঘায়ে ছুটি মৌলানাকেই সে খতম করে।

As (তা) luck would have it!

চিনি থেকে তৈরি নতুন ধরনের এক সাবান
আবিষ্কারের খবর পাওয়া গেল যা শিশুরা সাধ করে
কামড়ে বেলেও অসুখ-বিভ্রমের কোনো ভয় নেই।

ধূয়ে সাক করে; আবার খেয়েও সাক করা
যায়।

জনান্তিকে শোনা:

‘ডাল ভাত ধার গছ পাজিনে যে? রান্না বুধি
চড়েনি এখনো, হ্যাগা?’

আবিকারের বিবরণী থেকে অকৃত এক নতুন জানোয়ারের খবর পাওয়া গেল যার মাথা বাইসনের মতো, দেহ আর লেজ ঘোড়ার জায়, পা আর শিং হরিণস্থলভ, ঘাড়ের সিংহের কেশর। জানোয়ারটির নাম হচ্ছে হু।

‘হুয়ো হু, মায়া হু, নতিহুয়ো হু?’

প্রকাশ যে, অল্পপ্রদেশের এক মন্ত্রী বানরের ভয়ে রাতদিন সবদিক পথ চলতে মাথায় ছাতি ব্যবহার করেন।

হুকের ছাতিতে কুলোয় না বৃষ্টি?

আধুনিক শল্য-চিকিৎসায় পীড়িতরা এখন নিজেদের পুরনো ক্ষতের বদলে নতুন ক্ষত পেতে পারে বলে জানা গেল এক ডাক্তারী প্রবন্ধে।

নতুন আর কী! পিরীত হলে ক্ষয়-বিনিময় হয়েই থাকে।

‘Best Exercise is to run, run, run.’

—জ্যোটোপেক



হ্যাঁ, তাতে যেমন রান-ও হয়, হয়রানও তেমনিই!

হাতী হাতীদের ক্ষতে ভারতীয় রেলপথে এরপর থেকে সরকার বাহাদুর শোণা-বসার সবরকম আত্মঘাতের সুব্যবস্থা করবেন বলে জানিয়েছেন।



শালগ্রামের মতো হাতীদের শোণা-বসা সব সমান। হাতী দাঁড়াতে যা জায়গা নেবে, বসতেও তাই, চিং হয়ে শুলেও সেই!

সাময়িকপক্ষে প্রকাশিত এক ফোটোয় ঠাণ্ডা-লাগা একটি হাতীকে গরম জলের বাথ-টবে পা ছুঁড়িয়ে বসে ফুট-বাথ নিতে দেখা গেল।

ফুট-বাথের জল খুব বেশি গরম হলে বেচারার হাত পুড়ে যাবার কথা। কেননা হাতী যেমন চতুষ্পদ তেমনি তাকে চতুর্হীণও বলা যায়। মানে কিনা, ওদের ফুট যেমন এক হাত, তেমনি হাত-ই আবার এক ফুট তো?

বাক্সালোরের একটি হাতী বুলগারিনের গলায় মালাদান করেছিল বলে জানা যায়।

হাতী না হাতিনী?

চোকদহ থানার অন্তর্গত এক গ্রামে জনৈক গুণেশ্বর বাড়িতে হারান বিশ্বাস নামে পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি পাট চুরি করে পালায়। পলায়নের পর এখন জানা গেছে যে, সে একজন পাকিস্তানী মুসলমান। (মফস্বল বার্তা)

হায়, হারানো বিশ্বাসকে কি আর ফিরে পাওয়া যাবে?

‘নান্দকে সারা জীবন ধরে অন্ততঃ ৬৭,০০০
হাজার মাইল হাঁটতে হয়।’ (উদ্ধৃতি)
হেঁটে হেঁটে হয়রান হয়ে শেষে সে ৬৭ দেয়!

প্রজা-স্বনাভ্যন্তরী দলের সম্মেলন এ বছর নাকি
গয়ায় অনুষ্ঠিত হবে বলে একটা খবর।
এবারেই গয়া?

‘উদ্বাস্ত-পুনর্বাগনের নামে খেলা করা যেমন
সরকারের এক পুরনো ব্যাসন, তেমনি ভোটের লোভে
তাদের বাংলার বাইরে যেতে না দিয়ে এখানেই
মজুত রেখে নজরানো। আর তাদের ঘায়ে সরকারকে
ঘায়েল করা বামপন্থী নেতাদের এক পলিটিক্যাল
মজা।’ (উদ্ধৃতি)

বাস্তবের খপ্পরে উদ্বাস্ত?

‘নতুন নতুন ট্যাঙ্ক বসিয়ে আর ট্যাঙ্ক বাড়িয়ে
পাঁচসালা পরিকল্পনার পোষকতার মানে হচ্ছে দরিদ্র
জনসাধারণকে কাপড় পরাবার ক্ষেত্রে তার গারের
চানড়া খুলে নেওয়া।’ — শ্রী এম. জি. গোরে

শেষ পর্যন্ত তারা গোরে গেলেও তাদের সেই
চামড়ায় জয়ঢাক বাজবে তো!

‘স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনের সময়
ছাত্রদের স্কুল-কলেজ ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দিতে
বলার সময়ে নেতাদের হুঁস ছিলনা এর পরিণতি
কী হতে পারে। সম্ভ্রান্তি ভারতবাসী সেই ছাত্রদের
মার-মার-কাট-কাট রূপ দেখে সেই নেতারা ই এখন
হায়-হায় করেছেন।’ (উদ্ধৃতি)

‘১০-৬’সের প্রেতাত্মা কাঁদছে?’

জনৈক পত্রদাতা:

‘বিয়ের সময় কনেকে কান্ডে দেখা যায়, কিন্তু
কই মশাট, বরকে তো কান্ডে দেখিনে? তাকে
তো বেশ হাসিখুশি-ই দেখা যায়।’

তার পর থেকে তো সারা জীবন-ই তাকে কান্ডে
হবে, তাই ঐটুকুই বা সে একটু হেসে নেয়।

বামিংছামের পত্রিকায় প্রকাশিত একটি
বিজ্ঞাপন:

“যদি আপনি নিজেই কলী করতে গিয়ে
আমাদের ‘ব্রাহ্ম কোম্পানি’র কাহুঁজ না ব্যবহার
করেন তাহলে জীবনের একটা ক্ষতি-ই আপনি
হারালেন।”

এ কাহুঁজ, কলীকে ব্রহ্ম ব্রতঃসূত করে?



আনন্দবাজার
কলিকাতা

যোগাযোগ
৪৬
৩৩২৬

লক্ষ্মী ব্রাদার্স
জুয়েলার্স
১, হিন্দুস্থান মার্গ, বামিগঞ্জ
২০৮/৮, রায়বিকারী প্রতিমিউ (পল্লিয়ার্ট জংশন) কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীচরণ ভট্টাচার্য

কে. সি. বহু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১, মহেশ গোখরাই লেন, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীকেশব রায় কর্তৃক মুদ্রিত
এবং তৎকর্তৃক ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত

শ্রীমদ

বসুধারা

ত্রিভীক্স সর্গ • প্রথম অঙ্ক • দ্বিতীয় সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩৬৫

❀ সূচীপত্র ❀

পরজন্মের ॥ প্রাচীন কথা ॥ ১ ॥	॥ স্মৃতিকথা
যাববের ॥ লম্বুকরণ ॥ ৭ ॥	॥ রস-রচনা
অজিত দত্ত ॥ পাবনপুত্রী ॥ ১২ ॥	॥ কবিতা
দরদিশু বসুধাপাধ্যায় ॥ এমন দিনে ॥ ১৩ ॥	॥ গল্প
হুতাশ বসুধাপাধ্যায় ॥ যেন না সেপি ॥ ১৮ ॥	॥ কবিতা
দৈনন্দিনিক বসুধাপাধ্যায় ॥ 'কালি-কলম' ব্যয় করলাম ॥ ১১ ॥	॥ স্মৃতিকথা
বীক্স দাস ॥ ক্যানিডের সিদ্ধি মার্জি ॥ ২৭ ॥	॥ কবিতা
নির্বলকুমার বসু ॥ আবেদিকার চিঠি ॥ ২৮ ॥	॥ পত্রাবলী
বর্তীক্সবিমল চৌধুরী ॥ দাক্ষিণাত্যে শারদোৎসব ॥ ৩১ ॥	॥ প্রবন্ধ
নীলা বসুধার ॥ কাপড়াল ॥ ৩৩ ॥	॥ উপভাস
নীলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ আবহমান ॥ ৭৪ ॥	॥ কবিতা
পরিমল সোমবাণী ॥ 'হুবে থাকতে কুতে কিলোর' ॥ ৭৫ ॥	॥ রস-রচনা
দরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ শ্রিয়ন্তম ॥ ৭৮ ॥	॥ গল্প
শিবতোষ বসুধাপাধ্যায় ॥ অ্যাখিয়া ও আদরা ॥ ৮৫ ॥	॥ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ
সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ শোক ॥ ৮৯ ॥	॥ গল্প
উমা দেবী ॥ স্বর্গাভ্যাস পথ ॥ ৯৪ ॥	॥ কবিতা
জ্যোতির্জিৎ নন্দী ॥ চোর ॥ ৯৫ ॥	॥ গল্প
শংকর ॥ রবার্ট সাহেবের গৃহত্যাগ ॥ ১০৫ ॥	॥ বড় গল্প
রূপসনা ॥ কলকাতা : নানান চোখে ॥ ১১৭ ॥	॥ সাক্ষাৎ-বিবরণী

মোট :

২৪-৪০০১, ৮২



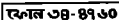
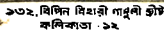
প্রাচীন :
বাইসবিংশ

পশুপতি দাস এণ্ড সন্স
প্রাইভেট লিঃ

ভারতের সর্ববিধ চাউলের প্রথম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

৪৩/২ ও ৩৭এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৪।
বাড়ীতে চাউল পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে।

८. अर्थ ५४५।



২০১৮

বহুধারা

বাঙালির প্রাণ

সম্পাদক

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রবন্ধ

প্রমোদ মিত্র

সহযোগ

বিমল মিত্র

কৃষ্ণ ৩ অক্টোবর

অভিষেক প্রকাশ

অক্টোবর, ১৯৮৮

৩০ পৃষ্ঠা

**ভারতীয় শ্রমণ (ষ্টাণ্ডার্ড) সমগ্রানুযায়ী
শ্রীশ্রীশারদোয়া মহাপূজার সময় নির্ধার্ত**

৩১শে আদিন শুক্লাবর (নি ২৫), ১৭ অক্টোবর, শম্বী দিবা ঘ ১০২৫ ।

সায়ঃকালে শ্রীশ্রীদেবীর বোধন ।

১৭৭ কাঠিক শম্বীবার (নি ২৬), ১৮ অক্টোবর, শম্বী দিবা ঘ ৮১৪৪ ।

দিবা ঘ ৮১৪৪ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর ঘটাদিকছারত্ব ।

সায়ঃকালে আনন্দ্রণ ও অধিবাস ।

২২৭ কাঠিক রবিবার (নি ২৭), ১৯ অক্টোবর, শম্বী দিবা ঘ ৭১৪৮ ।

দিবা ঘ ৭১৪৮ মধ্যে

শ্রীশ্রীদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ, স্থাপন, শম্বীমাদি কছারত্ব
ও শম্বীবিচিত্র পূজা সমাপন ।

বারি ঘ ১০৭৮ গতে ১১৪৮ মধ্যে অধরাত্রিবিচিত্র পূজা ।

৩২৭ কাঠিক শোমনার (নি ২৮), ২০ অক্টোবর, অষ্টমী দিবা ঘ ৭১৩৭ ।

দিবা ঘ ৭১৩৭ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর মহাষ্টমীবিহিত পূজা সমাপন ।

দিবা ঘ ৭১৩৩ গতে শম্বীপূজারত্ব,

দিবা ঘ ৭১৩৭ গতে ৮১২ মধ্যে বলিদান ও শম্বীপূজা সমাপন ।

৪২৭ কাঠিক শম্বীবার (নি ২৯), ২১ অক্টোবর, শম্বী দিবা ঘ ৮১১০ ।

দিবা ঘ ৮১১০ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর মহানবমীবিহিত পূজা সমাপন ।

৫২৭ কাঠিক শম্বীবার (নি ৩০), ২২ অক্টোবর, শম্বী দিবা ঘ ৯১২০ ।

দিবা ঘ ৯১২০ মধ্যে ।

শ্রীশ্রীদেবীর দশমীবিহিতপূজা সমাপন ও বিসর্জন ।

বিসর্জনান্তে অপরাহ্নিতাপূজা । বিজয়াদশমীকৃত্য ।

অজ্ঞান ও অধিমানের ভারতমা অনুসারে বিহিত কালের পূর্বোক্ত ও পূর্বোক্ত
চিত্র প্রকার হইতে পারে । যিরে ২৩৭ কাঠিক শম্বী পূজার দিনে কয়েকটি প্রসিদ্ধ
কালের পূর্বোক্ত, পূর্বোক্ত ও পূর্বোক্তকাল ষ্টাণ্ডার্ড অনুযায়ীসারে প্রদর্শিত হইল ।

গান	কলিকাতা	পুরী	কাটোয়া	শাটনা	মিলি	মৌলভী	বোম্বাই	ঢাকা
পূর্বোক্ত	৪১০০	৪১৪৬	৮১২	৪১৪৪	৮১২৮	৪১২৭	৮১৩৭	৪১৩১
পূর্বোক্ত	৪১৪	৪১১৭	৪১২৪	৪১১৫	৪১৪৪	৪১৪৮	৮১১০	৪১৪৬
পূর্বোক্ত	৮১২০	৮১৩৬	৮১৪০	৮১৪১	৮১১৩০	৮১২৪	৮১১২৮	৮১১২

• বিজয় দিবস পঞ্জিকা সহ ।

১ নি - ভারত সরকার অঙ্কিত বিজয় দিবস ।



পারদ

বসুধা



বিশেষ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, ১৩ সংখ্যা ★ আশ্বিন, ১৩৩৪

প্রাচীন কথা

পরশুরাম

[এই হল ঘটনার সংক্ষিপ্ত সারাংশ, বাক্যগুলি বিখ্যাত লেখকের কাহিনী অনুসারে সংকলিত। নামগুলি কাল্পনিক।]

১। বনোয়ারী বাড়ির দাড়ি

প্রায় সত্তর বৎসর আগেকার কথা। বেল। তিনটে, আমাদের মিডল ইংলিশ অর্থাৎ নাইনর স্কুলের খার্ড ক্লাসে পাঠ্যগণিত পড়া হচ্ছিল। ক্লাসের ছেলেরা উসখুস ফিসফিস করছে দেখে বিধু মাষ্টার বললেন, কি হয়েছে রে ?

শুধন শিক্ষককে মার বলা রীতি ছিল না, মাষ্টার মশাই বলা হত। আমাদের মুখপাত্র কেউ বলল, এইবার ছুটি দিন মাষ্টার মশাই, সবাই চান্দরাবাগ দাব।

—সেখানে কি জন্মে যাবি ?

—কলকাতা থেকে একজন বাবু এসেছেন, তাঁর দাড়ি গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা। তাই আমরা দেখতে যাব। হেই মাষ্টার মশাই ছুটি দিন।



—চারটের সময় ছুটি হলে তার পরে তো যেতে পারিস।

—অনেক দূর যেতে হবে, বেলা হয়ে যাবে। শুনেছি রোজ বিকেলে তিনি চান্দরা-মাহাবনের বাড়ি দাব। খেলতে যান। দেরি করে গেলে দেখা হবে না।

বিধু মাষ্টার বললেন, বেশ, সাড়ে তিনটেয় ছুটি দেব। আমিও তোদের সঙ্গে যাব। দাড়িবাবু কথা শুনেছি বটে।

চান্দরাবাগ অনেক দূর, আমরা প্রায় সাড়ে চারটের সময় বিকৃতিবাবুর বাড়ি পৌঁছলুম, দাড়িবাবু দেখানেনই উঠেছেন। বারান্দায় একটা মন্ডির খাটিয়ায় বসে তিনি হুকো টানছিলেন। আমাদের দলটিকে দেখে তাঁর বোধ হয় একটু আশ্চর্য হল, নিবিড় কালো দাড়ি-গোফের তিমির ভেদ করে

মাথা ধুতে একটু হামির কিলিক ফুটে উঠল।
সেকালে ত্রাঙ্করা প্রায় সকলেই দাড়ি রাখতেন,
অত্রাঙ্কদেরও অনেকের বড় বড় দাড়ি ছিল। কিন্তু
সেসব দাড়ি এই নবোদিত ভ্রলোকের দাড়ির কাছে
দাঁড়াতেই পারে না।

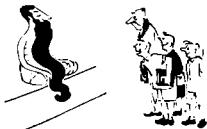
বিধু মাষ্টার নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, এই
ছেলেরা আপনাকে দেখতে এসেছে মশাই, কিছুতেই
ছাড়বে না, তাই আধ ঘণ্টা আগেই ক্লাস বন্ধ
করতে হল।

দাড়িধারী ভ্রলোকের নাম বনোয়ারী বাবু।
তিনি প্রসন্ন বদনে বললেন, বেশ বেশ, দেখবে বইকি,
দেখাবার ভজ্জই তো রেখেছি। যত ইচ্ছে হয় দেখ
বাবারা, পয়সা দিতে হবে না।

দাড়িটি বনোয়ারী বাবুর গলায় কন্ডটরের মতন
জড়ানো ছিল, এখন তিনি দাড়িয়ে উঠে আলুলায়িত
করলেন। হাঁটুর নীচে পর্বস্ত কুলে পড়ল।

সবিস্ময় আনন্দে যোনাফিত হয়ে আমরা
একযোগে বলে উঠলুম, উ রে বাবা!

বনোয়ারী বাবু বললেন, কিছু জিজ্ঞাস্ত আছে
কি? টেনে দেখতে পার, আমার দাড়ি যাত্রার
দলের মুনি-কবিদের মতন টেরিটিবাজারের নকল
দাড়ি নয়। এই বলে তিনি দাড়ি ধরে বারকতক
হেঁচক টান দিলেন।



বিধু মাষ্টার বললেন, আচ্ছা বনোয়ারী বাবু,
আপনার দাড়ির বর্তমান স্থল কত? সাড়ে তিন
ফুট হবে কি?

—ধুতনি থেকে পাকা বিশ গিরে, মানে পৌনে
চার ফুট। পরন্তু আবহুল নরজী ফিতে দিয়ে
মেপেছে।

—এতখানি গজাতে কত দিন লেগেছে?

—তা প্রায় দশ বছর। চকিশ বছর বয়সে
কামানো বন্ধ করেছিলাম, এখন বয়স হল চৌত্রিশ।

বিধু মাষ্টার তাঁর ক্লাসের উপযুক্ত গম্ভীর স্বরে
প্রশ্ন করলেন, এই ছেলেরা, চকিশ থেকে চৌত্রিশ
বছর বয়সে দাড়ি যদি পৌনে চার ফুট হয় তবে
চুয়ানিশ বছর বয়সে কত হবে?

ছেলেরের ঠোঁট নড়তে লাগল, বিভ্রিভি শব্দ
করে তারা মানস্যক কষছে। অঙ্ক আমার খুব
মাথা ছিল, সকলের আগেই বললুম, সাড়ে সাত ফুট
মাষ্টার নশাই।

বিধু মাষ্টার বললেন, করেই। আচ্ছা
বনোয়ারী বাবু, দশ বছর পরে সাড়ে সাত ফুট দাড়ি
হলে আপনি সামলাবেন কি করে?

বনোয়ারী বাবু সহাস্তে বললেন, তা তো
ভাবি নি, তখন যা হয় করা যাবে, না হয় কিছু ছোট
কেলব।

আমাদের দলের মধ্যে সব চেয়ে সপ্রতিভ ছেলে
কেটে। সে বলল, না না ছাটাবেন না, কানের পাশ
দিয়ে তুলে মাথায় পাগড়ির মতন জড়ালে বেশ হবে।

বনোয়ারী বাবু বললেন, ঠিক বলেছ হে ছোকরা,
পাগড়িই বাঁধব, পশমী শালের চাইতে গরম হবে।

একটু আমতা আমতা করে বিধু মাষ্টার বললেন,
কিছু মনে করবেন না বনোয়ারী বাবু, ইয়ে, একটা
প্রশ্ন করছি। আপনি কি বিবাহিত?

—অক কোর্স।

—তা হলে, তা হলে—

—আমার জী এই দাড়ি বরদাস্ত করেন কি
করে—এই তো আপনার প্রকলম? চিত্তার কারণ
নেই মাষ্টার মশাই। তিনি প্রসন্ন মনেই মেনে
নিয়েছেন, মিউচুয়াল টলারেশন, কুলেন বিনা।
ঊরও তো ফুট তিনেক আছে।

বিধু মাষ্টার আঁতকে উঠে বললেন, কি সর্বনাশ!

—ভাঁটটা বাড়ি নয় নশাই, মাথার চুল, যাকে বলে কেশপাশ, কুতলভার, চিকুরদাম।

আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। তার পর বনোয়ারী বাবু বাঙালী ময়রার দোকান থেকে জিলিপি আনিয়ে আমাদের সবাইকে খাওয়ালেন। আমরা খুশী হয়ে বিদায় নিলাম।

২। সত্যবতী ভৈরবী

তখন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগ, পলিটিজ নিয়ে বেশী লোক মাথা ঘামাত না। সুরেন বাবুজোর চাইতে মাদাম রাতাংকি শশধর তর্কচূড়ামণি আর পরিব্রাজক ঐক্যপ্রদায় বেশী জনপ্রিয় ছিলেন।

আমাদের বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে হরনাথ মুখুজোর আশ্রম। বিস্তর জমি, অনেক আম কাঠাল গিছুর গাছ, একতলা পাকা বাড়ি, তা থেকে কিছু দূরে একটি কালীমন্দির। হরনাথ বাবু কলকাতা থেকে কালীমাতার একটি প্রকাণ্ড অয়েল পেটিং আনিয়ে খুব ঘটা করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভেটকু তেওয়ারী নামক এক ভোজপুত্রী ব্রাহ্মণ সেই তিরমুতির নিত্য সেবা করত। বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে হরনাথ বাবু নিজেই পূজা করতেন।

শায়ে পটপুজার বিধান থাকলেও সাধারণ লোকে মাটি-পাথরের বিগ্রহেই অভ্যস্ত। হরনাথ বাবুর এই টু-ডাইমেনশন-চারিত্রী পটরূপা দেবীর উপর প্রথম প্রথম লোকের ভেমন শ্রদ্ধা হয় নি। একদিন শোনা গেল, তেওয়ারীর হাত থেকে মা-কালী খাঁড়। কেড়ে নিয়েছেন, হরনাথ বাবু স্বচক্ষে তা দেখেছেন। এর পরে আর কোনও সন্দেহ রইল না যে দেবী পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত।

হরনাথ বাবুর আশ্রমে সদাশ্রিত লেগেই আছে, সব রকম সাধুবাথাই এখানে দিন কতক বাস করতে পারেন। মন্দিরের গায়ে দুটি ছোট ছোট কুঠরি

আছে, সেখানে শুধু গৈরিকধারী কানঢাকা-টুপি-পর্য্য এক নম্বর সম্রাটী মহারাজদের থাকবার অধিকার আছে। মন্দিরের পিছনে কিছু দূরে একটা ঢালা ঘর



আছে, সেখানে জটা-কোপীন-লোটা-চিমটা-ধারী দু নম্বর সাধুবারা আশ্রয় পান। ছুই জ্যেষ্ঠীর সাধুদের মধ্যে সন্দেহ নেই। জটাধারীরা সম্রাটী মহারাজদের বলেন, বিলকুল ঐষ্ট, ভগ্ন। অপর পক্ষ বলেন, গর্জেন্দ্রী ভাংবারে মূর্খ।

আশ্রমে কোনও নানজাদা বা নতুন ধরনের সাধু এলে অনেকে দেখতে যেত। আমি, কেটে, আর তার ভাগনে কিছুও নাহে মাঝে বেহুঁম, অনেক রকম নজাও দেখতুম। একবার তর্ক করতে করতে এক বাঙালী ভাত্রিক একজন হিন্দুস্থানী বেদান্তীর কাছে চড়ে বসলেন, কিছুতেই নামবেন না। দাঙ্গা বাধবার উপক্রম হল। অবশেষে হরনাথ বাবু অতি কষ্টে সবাইকে শান্ত করলেন। আর একবার কানরূপ থেকে এক সিদ্ধপুত্র্য এসেছিলেন, সন্ধ্যার পর তিনি এক আশ্চর্য ইশ্রতাল দেখালেন। সামনে একটা আঙুটি রেখে তার কিছু দূরে একটা টাকা রাখলেন, তার পর মন্ত্রপাঠ করে মাথা নাড়তে লাগলেন। আঙুটিটা লাকতে লাকতে এগিয়ে গেল এবং টাকাকে গ্রেপতার করে নিয়ে ফিরে এল। ওভারসিয়ার নীরবধাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি ম্যাজিক জানতেন, তবুও বিশ্বাস করতেন না। খপ করে সিদ্ধবাথার কান ধরে তিনি একটা নৃশ

কালো হুতো টেনে বার করলেন। হুতোটা কানে আটকানো ছিল, আঙুলি আর টাকার সঙ্গেও তার যোগ ছিল।

একদিন খবর এল, কানী থেকে এক বাঙালিনী ভৈরবী এসেছেন, বয়স হলেও তাঁর রূপ নাকি ফেটে পড়ছে। হিন্দুস্থানীরা শুকে বলে মাতাজী সত্যাবতী, বাঙালীরা বলে তপস্বিনী ভৈরবী। কেই জিহু আর আমি দেখতে গেলুম। মন্দিরের সামনের বারান্দায় একটা বাথহালের উপর ভৈরবী বসে আছেন আর ছ হাতের মুঠোয় একটা কলকে ধরে হুশ হুশ করে তমাক টানছেন। রঙ ফরসা, মাথায় এক রাশ কালো কক্ক ঝাপানো চুল, অল্প পাক ধরেছে, কপালে ভেঁষের তিলক। সামনে একটা চকচকে ত্রিশূল পড়ে আছে।

ক্রমে ক্রমে অনেক দর্শক এল, কেউ কুমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল, কেউ খাড়া হয়েই নমস্কার করল। নানা লোক ভৈরবীকে প্রার্থনা জানাল, তিনিও সকলকে আশ্বাস দিলেন। এমন সময় মুনশী রাম-ভক্ত এসে করছোড়ে বললেন, মাতাজী, আজ মেরা কোঠিনে জানে কি বাত থি, একা লাগা।

ভৈরবী বললেন, ঠাঁ বাবা, আমার উয়াদ আছে, একটু পরেই উঠছি। মুনশীজী, এই দেখ তোমার কস্তে আমি ভয়রাম ধূপ বানিয়েছি, হস্তা খানিক এর খোঁয়া দিলে তোমার বাড়ির সব আলাই বালাই কুত প্রেত দূর হবে, তোমার জরুর উপর যে চুড়ৈল (পেতনী) তর করেছে সেও ভেগে যাবে।

রামভক্ত কৃতার্থ হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন।

এমন সময় ভিড় ঠেলে প্রাণকান্ত বাবু এলেন। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত বড় অফিসার, শহরের সকলেই এঁকে খাতির করে। প্রাণকান্ত বাবু এগিয়ে এসে কুমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে মুহুর্ৎয়ে বললেন, ভৈরবী মাতাজী, আমার প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টিতে তাকান, বড়ই সংকটে পড়েছি, আপনি ছাড়া কে উদ্ধার করবে?

ভৈরবী কৃপাদৃষ্টি নিষেক করলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ একটু কুঞ্চে গেল, মুখে সর্কোতুক হাসির রেখা ফুটে উঠল। বললেন, আরে প্রাণকান্ত যে! হরে রাম, হরে রাম! ভিমতে পেরেছ তো? ওকি, অমন হস্তভব্ব হয়ে গেলে কেন, কুত দেখলে নাকি?

প্রাণকান্ত বাবু নির্ধাক বিমুঢ় হয়ে মিটমিট করে চাইতে লাগলেন। ভৈরবী বললেন, মেকি প্রাণকান্ত, এর মধ্যেই কুলে গেলে? লক্ষ্য কেন, এখন তুমিও সাধু আমিও সাধী, দুজনেই পোড়-খাওয়া খাটা সোনা। ওকি, পালাল্য কেন, পাড়াও পাড়াও।

প্রাণকান্ত বাবু পাড়ালেন না, ভিড় ঠেলে সবগে প্রস্থান করলেন। ভৈরবী দ্বিতমুখে বললেন, একটা কুত ভেগে গেল। চল মুনশী রামভক্ত, এইবার তোমার কুঠিতে যাব।

ভৈরবী চলে গেলে দর্শকদের মধ্যে কলরব উঠল। এক দল বলল, ভৈরবী না আরও কিছু। ছিছি, এত লোকের সামনে কেলেঙ্কারি কীস করতে মাস্তির লক্ষ্যও হল না। সেই যে বলে, অঙ্গার: শতধোতেন। আর এক দল বলল, অমন কথা মুখে আনতে নেই, উনি এখন পূর্ণমাত্রায় তপসিচ্ছা, গৌতমপত্নী অহল্যার মতন পাণশূদ্ধ্যা, লক্ষ্য ভয় নিন্দা প্রশংসার বহু উল্লে' উঠে গেছেন, আগের কথাও লুপ্তে চান না। সেই লক্ষ্যেই তো সত্যাবতী নাম।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আমি কেইকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে ভাই, প্রাণকান্ত বাবু পালিয়ে গেল কেন?

কেই বলল, বুঝতে পারলি না বোকা, এই ভৈরবীর সঙ্গে প্রাণকান্ত বাবুর লভ হয়েছিল।

৩। মনু-কুন্ত-সংবাদ

সকালেও বদমাশ ছোলে ছিল, কিন্তু এখনকার মতন তারা কলকটিত অ্যাকশন নিতে জানত না। মাষ্টাররা তখন বেপরোয়া ভাবে বেত লাগাতেন,

ছেলেরা তা শিকারই অল্প মনে করত, না-বাপরাও আপত্তি করতেন না।

বেত মারায় আমাদের মধুসূদন মাষ্টারের জুড়ি ছিল না। দোষ করলে তো মারতেনই, বিনা দোষেও শুধু হাতের মুখের জন্তে মারতেন। তিনি একটি নতুন শাস্তি আবিষ্কার করেছিলেন—রসমোড়া, অর্থাৎ পেটের চামড়া খামচে ধরে নোড় দেওয়া।

মধু মাষ্টার বাঙলা পড়াতে। বয়স পঁচিশ-ছাত্তিশ, কালো রঙ, একমুখ দাড়িগোঁফ, তাতে চোখাটি বেশ ভীষণ দেখাত। তখনও তাঁর বিবাহ হয় নি, বাড়িতে শুধু বিধবা বিমাতা আর বশ-এগারো বছরের একটি আইবড় বৈমাত্ৰ ভগ্নী। শুনতুম দেশে তাঁর যথেষ্ট বিদ্যাসম্পত্তি আছে, শুধু ছেলে ঠেঙাবার লোভেই নানা জায়গায় মাষ্টারি করেছেন।

আমাদের ক্লাসের একটি ছেলের নাম কুঞ্জ। বয়স চোদ্দ-পনেরো, আমাদের চাইতে তের বছর বড়। একটু পাগলাটে, লেখাপড়ার অভ্যস্ত কাঁচা, তিন বৎসর প্রেমোশন পায় নি।

মধু মাষ্টার চাকপাঠ পড়াচ্ছেন। হঠাৎ কুঞ্জ বলল, মাষ্টার মশাই, একবার বাটরে যাব, পেছাব পেয়েছে।

ধমক দিয়ে মধু মাষ্টার বললেন, মিথ্যে কথা। রোজ এই সময় তোর বাইরে যাবার দরকার হয়। নিশ্চয় তামাক কি বাড়সাই খাস।

একটু পরে কুঞ্জ আবার বলল, উঃ, আর থাকতে পারছি না, ছুটি দিন মাষ্টার মশাই! ফিরে এলে বরং আমার মুখ গুঁথে দেখবেন তামাক খেয়েছি কিনা।

—বরষার, চুপ করে বসে থাক। ছুটি পাবি না।

মুখ কাঁচুনাচু করে কাতর কণ্ঠে কুঞ্জ বলল, উজ্জ্বল। তারপর উঠে পরজার দিকে এগিয়ে গেল। মধু মাষ্টার তাকে ধরে ফেলে একটা রসমোড়া দিলেন তার পর সপাসপ বেত মারতে লাগলেন।



কুঞ্জ চিংকার করে বলল, আমার দোষ দিতে পারবেন না কিন্তু। বেত এড়াবার জেঙ্গে সে চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল, মধু মাষ্টারও সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করে বেত চালাতে লাগলেন।

আমরা তারখের বললুম, মাষ্টার মশাই, সমস্ত ঘর ভিলে নোরা হয়ে গেল, আপনার কাপড়ও ছিটে লেগেছে। মেথর ডাকতে হবে।

মধু মাষ্টার তখনও উদ্ভত হয়ে বেত চালাচ্ছেন। হঠাৎ কুঞ্জ মাটিতে শুয়ে পড়ে গৌঁচোঁ করতে লাগল। আমরা বললুম, কুঞ্জ মরে গেছে, নিশ্চয় মরে গেছে।

কেটে তাড়াতাড়ি এক ফালি কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে কুঞ্জর নাকের কাছে ধরে বলল, এখনও মরে নি, দেখুন না কাগজটা ফরফর করছে। মারের চোটে কুঞ্জ অজ্ঞান হয়ে গেছে, আর একটু পরেই মরে যাবে। ছুটি দিন মাষ্টার মশাই, আমরা চাংদোলা করে কুজকে তার বাড়ি নিয়ে যাব, দেখানে মরাই তো ভাল। আপনি মেথর ডাকান আর চান করে কাপড়টা ছেড়ে ফেলুন।

অগত্যা মধু মাষ্টার ক্লাস বন্ধ করলেন।

পরদিন কুঞ্জ মূলে এল না। মধু মাষ্টার বললেন, আজ বিকালে ওর বাড়িতে খোঁজ নিস তো, কেমন আছে হোড়া।

ক্লাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমরা একসঙ্গে আবৃত্তি করছি—সকলের শিতা তুমি, তুমি সর্বময়। হঠাৎ কুঞ্জ তার মাকে নিয়ে উপস্থিত হল। মা খুব লম্বা চওড়া মহিলা, নাকে নথ, কানে মাকড়ির শালর, চওড়া লালপেড়ে বাড়ি কোমরে জড়িয়ে

পারছেন, মাথায় কাপড় না থাকারই মধ্যে। ধোর-গোড়ায় পাড়িয়ে নাক দাঁটকে একবার চারদিকে ঠুকি মারলেন, যেন আরসোলা কি নেংটি ইচ্ছা খুঁজছেন। তার পর আমাদের নিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, মোথো মাঠার কোনটে রে ?

একালের চাইতে তখন ছেলেনের মধ্যে শিভালরি ঢের বেশী ছিল। আমরা সকলেই সম্মুখে আস্তুল বাড়িয়ে মধু মাঠারকে শনাক্ত করলাম।

কুঞ্জর মা সোজা তাঁর কাছে গিয়ে কান ধরে বললেন, ষ্টেপটি মুখপোড়া বান্দর ! তোর বেতগাছটা কোথা রে ?

আমরা বললাম, ওই যে, চেয়ারে ঠর পাশেই রয়েছে। কুঞ্জর না কিন্তু আমাদের নিরাশ করলেন। বেতটা ধী হাতে নিলেন বটে, কিন্তু লাগালেন না, শুধু ডান হাত নিয়ে মধু মাঠারের দাড়ি-ভরা গালে গোটা চারেক খাবড়া লাগালেন। তাঁর পর বেতটা নিয়ে কুঞ্জর হাত ধরে গটগট করে চলে গেলেন।

গোলমাল শুনে মাঠাররা সবাই আমাদের ক্রাসে এলেন। রেডমাঠার মশাই বললেন, বাড়ি যা তোরা।

পরদিন থেকে মধু মাঠার গোবেচারার মতন বিনা বেতেই পড়াতে লাগলেন।

ছ মাস পরেই কুঞ্জর সঙ্গে মধু মাঠারের একটা পাকা রকম মিটমাট হয়ে গেল। রেল স্টেশনের মালবাহু যামিনী ঘোষাল ছিলেন কুঞ্জর দূর সম্পর্কের ভাই, তাঁর সঙ্গে মধু মাঠারের বৈবাহিক বোন ভূতির বিয়ে স্থির হল। মধু মাঠার বধাদাখ্য আয়োজন

করলেন, অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করলেন, কিন্তু হঠাৎ সব ওলটপালট হয়ে গেল। বিবাহ-সভায় সবাই বরের জন্তে অপেক্ষা করছে, এমন সময় বরপক্ষের একজন খবর আনল—যামিনী বলেছে, মধু চামারের বোনকে সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। কেউ আমাদের চুপিচুপি বলল, কুঞ্জই ডাঙটি দিয়েছে।

বিয়েবাড়িতে প্রচণ্ড হইচই উঠল। মধু মাঠারের বিমাতা কুঞ্জর মায়ের পায়ে পাড়ে কীদন্তে কীদন্তে বললেন, ব্রূকা কর নিদি, এখন বর কোথায় পাব, তোমার ছেলে কুজকে আশ্রয় কর।

কুঞ্জর মা বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়, বামূনের জাতধর্ম বাঁচাতে হবে বইকি। এই কুজ, তোর ময়লা কাপড়টা ছেড়ে এই ঢেলিটা পর।

কুজ বলল, ভূতি বে বিজিরি !

তার মা বললেন, আহা, কি আমার কান্তিক ছেলে রে ! ওঠ বলছি, নয়তো ঘেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।

কুঞ্জর বাবা বললেন, ছেলেটার যখন আপত্তি তখন জোর করে বিয়ে দেবার দরকার কি ?

কুঞ্জর মা বললেন, যাও যাও, তুনি আবার এর মধ্যে নাক গলাতে এলে কেন ?

কুজ তবু ইতস্তত করছে দেখে কেউ তাকে চুপিচুপি বলল, বিয়েটা করে ফেল কুজ, অনেক সুবিধে। সোনার আঙটি পাখি, ক্রপোর ঘড়ি আর ঘড়ির চেন পাখি, ক্রাসে প্রেমোশনও পেয়ে বাবি। আর, মধু মাঠার মশাই তোর কে হবেন জ্বানিস তো ? শালা।

কুজ আর আপত্তি করে নি।

লক্ষ্যকল্পণ

শাম্ভবানন্দ

দুই বর্ষের সংযোগে মক্চি। দুই নদীর সমাবেশে
সংগম। দুই নরনারীর মিলনে পরিণয়। সংগীতে
যেমন ডুরেট, রদায়েনে যেমন কম্পাউণ্ড, ব্রাজিলীতে
যেমন পি-এস-পি।

মানব-ইতিহাসে বিবাহের প্রবর্তন কবে তা
জানিনে। তার প্রলেন কেন তা অল্পমান করতে
পারি।

সৃষ্টির গোড়ার স্বর্গোচ্চানে মানুষ ছিল মাত্র
দুটি। কোনো শুভদিন-নির্ঘণ্টের সুতহিবুক যোগে
ঐক্যমতী ইভের কুশান্তিকা হয়েছিল এমন জনশ্রুতি
নেই। পুরাণে জেট-গ্লেন ও বেসে এ-আর-পি'র
অস্তিত্ব প্রমাণ করে ঐরা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট
পেয়ে থাকেন, তাঁরাও এখন পর্যন্ত আসমের বাসর-
ঘর আবিষ্কার করতে পারেননি।

ক্যাফেটারিয়ায় স্বহস্ত-পরিবেশনের মতো
ফলমূল আহরণ করে আদি জনক-জননী মোটামুটি
অনন্তনির্ভর জীবন যাপন করেছেন। শীত, আতপ
এবং বর্ষা-বালদের অকণ্ঠ্যে দ্রুত-বৃদ্ধিতে বায়ু, পিত্ত,
কফ স্তপিত হয়ে কটিং কদাচিৎ দেহকে হযতো
বিকল করেছে। কিন্তু হাতের কাছেই বত্রিশটাকা
ফিল্ম-এর বিলাতী ডিগ্রীওয়ালা ডাক্তার না থাকায়
সামান্য সর্দি-কাশি বা অগ্নিমান্দ্য প্যারোটাইটিস
বা গ্যাসট্রো-এনট্রাইটিস প্রকৃতি মারাত্মক নাম নিয়ে
প্রাণদাতিক। হয়ে ওঠেনি।



প্রথম মানব-মানবীর সম্ভাবন-সম্ভূতির সঠিক
সংখ্যা অপরিজ্ঞাত। গার্ডেন অব ইডেনে আর যাই
থাক, সেলস কমিশনার ছিলনা। তবুও সিদ্ধান্ত
করা অসম্ভব হবেনা যে, জগতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে
ক্রমশঃ জীবনযাত্রা হয়েচে জটিলতর। মানুষ দুগুণ
ছেড়ে ধরেছে ভূমিকর্ষণ। শরাসুখ থেকে হয়েচে
হলাসুখ। গৃহবাস পরিত্যাগ করে শুরু করেছে
গৃহবাস।

চুলের সঙ্গে যেমন টেড়ি এবং কানের সঙ্গে
যেমন তুল, গৃহের সঙ্গে সঙ্গে তেমনি দেখা দিয়েছেন
গৃহিণী। প্রশ্ন উঠতে পারে গৃহের তরে গৃহিণী, না



গৃহিণীর ভক্ত গৃহ। এতক শুধু অর্থহীন নয়, মহতীও বটে। খপাস করে পড়ে, না, পড়ে খপাস করে? নেতা হয়ে জেলে খাও, না, জেলে গিয়ে নেতা হয়?

অবশ্য নৈয়ায়িককে লজ্জা নিতে পারেন এমন মৃত্যুর ভাবনারও আছেন। পররাষ্ট্রনীতিতে নিরপেক্ষতা রক্ষার মতো জ্ঞান এবং কুল বজায় রাখার কৌশল তার আয়ত্তে। তিনি বলেছেন, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে,—গৃহ বলতেই বোঝায় গৃহিণী। অহুমান করি, লোকটা অকৃতদার।

আসল কথা, আদিযুগে সংসারযাত্রাটা নারী বা পুরুষ কাতুর পক্ষেই এককসাধ্য ছিল না। নেহাত প্রয়োজনের তাগিদেই দু'পক্ষকে হাত মিলাতে হয়েছে। ব্যবসা চালাতে যেমন পার্টনারশিপ। গভর্নমেন্ট দখল করতে যেমন কোয়ালিশন। কলকাতায় যেমন স্ট্রাওয়ারসনস অ্যান্ড মরগ্যানস; ঢাকায় যেমন আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তানী কংগ্রেস।

বিবাহকে কল্পনাবিলাসী কবিরা বলেন,— ফুলডোর। খুজিবাসী আইনজ্ঞেরা বলেন, সামাজিক চুক্তি। কোন্সি বা হস্তরেখা বিচারক জ্যোতিষ-শাস্ত্রীরা বলেন মৈথের নির্বন্ধ। এছাড়াও পরিণয়ের একাধিক পরিচিতি আছে। তার সবগুলিই কিছু অতিস্বন্দক নয়।

সকলেই জানি, ভগতে একজাতীয় অতিসন্দ্বিদ্ধ লোক আছে কোনো কিছুতেই ঘাসের আশ্রয় নেই।

হায়েজীতে এদের বলে, সীমিক। এরা নিম্নকের অধিক। সম্ভাপতিবের অহুনোদেধ পিছনে এরা দেখতে পায় টাঁধার খাতা, সামনে নিজের সুখ্যাতি শুনে আশঙ্কা করে ঢাকা-বারের ভূমিকা। জাশখালাইজেননের অর্থ জানে,—ইনেকিসিয়েলি; মানকে বলে,—চাকরি-সৃষ্টি এবং জনগণের নামে অশ্রু-বরিষণ দেখলে ভাবে আসন্ন টেলেকশন। অর্থপূর্ণ কৃত্রিম এদের চোখেই দেখায় অর্থশূন্য। এই সভাব-সংশয়ীরা বিবাহের আখ্যা দেয়—বেড়ি। এরা বড়কে বলে বড়োজ; উম্মাহ-বন্দনকে উম্মদন।

সংসারের বৈশিষ্ট্যহীন বাকী শতকরা নিরানব্বই-জন, বাংলা দৈনিকের সম্পাদকীয় কুন্তে ঘাসের বল। হয় আপনীর সাধারণ, এসব সৃষ্টি বিচার-বিশ্লেষণের ধার ধারেনা। সেম্মীয়র তারা পড়েনি। গোলোপের সম্ভানও বিশেষ রাখেনা। কিন্তু জানে, পৃথিবীতে নামে কিছুই যায় আসেনা। যে ট্রেনের নাম এক্সপ্রেস সেও টাইমটেবলের ভিন ঘণ্টা পরে পৌছায়। যে-দোকানী শিশিতে চিরতার আরক বেচে, সেও দোকানের মাইনবার্চে লেখে,— দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ওয়ার্কস। সুতরাং কোনো কিছুই সংজ্ঞা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। তাদের দিব্যজ্ঞান নেই, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান আছে।



বিবাহকে তারা মনে করে একটা স্টারী। পৃথিবীতে ভীক ব্যক্তিবদের আদি, অকৃত্রিম ও একমাত্র অ্যাডভেঞ্চার। তবে ডার্বি বা বেঞ্জামিনের সঙ্গে তার তফাত শুধু এই যে, হেরে গিয়ে টিকিটখানা ছিঁড়ে



ফেলা চলে। চক্রবাহের মতো উদ্বাহেরও আগমন-পথ সহজ, নির্গমন-পথ দুঃসহ। আধুনিক অভিনয়্যদের জানা থাকে ভালো যে, দাম্পত্য-নগরীর সবগুলি রাস্তাই ওঠান-ওয়ে।

মাথুয়ের জন্ম আকস্মিক, মৃত্যু অনিবার্য। এই অনিয়ন্ত্রিত উপক্রমণিকা ও উপসংহারের মধ্যপথে বিবাহ জীবনের স্বরচিত অধ্যায়। কোটনিপের তো কথাই নেই, চাক্ষুষ পরিচয় বিবাহিত বর-কনের গুরুজন নির্ধারিত সনাতন হিন্দু-বিবাহও স্বদস্ত

নয়; তার পিছনে দীর্ঘদিনব্যাপী সজ্জান আয়োজনের প্রাচুর্য আছে। বিবাহ স্থির যদি-বা হয় স্বর্গে, রেজেন্সি হয় মর্তে। সেটা যথেষ্ট চেষ্টাসাপেক্ষ। মাসিকপত্রিকার নবপর্যায়ে প্রকাশের মতো নরনারীর বিবাহিত পর্ব যুগ সম্পাদনায় জীবনের পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত সংস্কার মাত্র।

বিবাহ পুরুষকে দেয় বৈধ, নারীকে দেয় প্রতিষ্ঠা। স্বামীর বাড়ায় দায়, জীর বাড়ায় দায়। সে-দায় নারীর নিজস্ব নয়। গালের উপরে পড়িবার এবং নখের উপরে রঙের মতো সেটা প্রকৃষ্ট।

গণিতশাস্ত্রে শূন্যের নিজের কোনো সত্তা নেই। তার মূল্য নির্ধারিত হয় পার্শ্ব সংখ্যাটির গুরুত্ব। ঘরের চাইতে কুড়ির কদর বেশী। বাটের চাইতে আশীর গুণন অধিক। সমাজে নারীর মর্যাদা নিম্নপিত হয় পিতা অথবা পতির সৌরবে। নায়েব-কস্তা অপেক্ষা জমিদার-মন্দিরীর প্রতাপ প্রবল। বার্ড-মাস্টার অক্ষরবাবুর মেয়ের তুলনার ব্যারিস্টার নন্দী সাহেবের তনয়ীর নাসিকা উত্তুল। পিতৃ-পরিচয়ের চাইতেও ভৃত্যপরিচয় গুরুতর। সেকশন-অফিসর বন্ধু-গিরীর চেয়ে ডেপুটি সেক্রেটারি সেন-মহিষী অধিকতর দূর্ধ্ব। কবিতা যে নারীকে আকাশের চন্দ্রমার সঙ্গে তুলনা করেন সেটা বিশেষ

অর্থপূর্ণ। কে না জানে যে, চাঁদের আলো তার নিজের নয়,—সমস্তটাই পরাশ।

মাল্যবদলের দ্বারা নারী বদল করে পদবী। সেটা প্রকান্তে। পুরুষ পরিহার করে পদ। সেটা অলঙ্কার। সন্তপনীর পর পরিবারের কর্তৃপদ থেকে স্বামীর বহিত অপসৃতি সেবার-মুনিয়নে কমিউনিস্ট অগ্রপ্রবেশের মতোই নিঃশব্দ কিন্তু নিশ্চিত।

বিলাতী প্রবাসী বলে,—কানানের চাইতে সোনার জোর বেশী। কিন্তু সোনার চাইতেও শক্তিশালী অস্ত্র আছে ভগতে। তার নাম সোহাগ। অকারণ হাস্ত এবং অকারণ অশ্রু—এই গীড়ানি-আক্রমণ, সাময়িক পরিভাষায় থাকে বলা হয় 'শিন্দার মুভমেন্ট', দ্বারা জীরা অবলীলাক্রমে স্বামী এবং সিন্দকের চাবি আঁচলে বাঁধেন। মাল ও মালিক দুই-ই নবলে আনেন বিশ্বাসের তৎপরতায়।

প্রকৃতপক্ষে বিবাহ নারীর জীবনের আরম্ভ। আইনসভায় ডিবেটের আগে কোম্পেন-আওয়ারের ছায় তার প্রাগ-বৈবাহিক অংশটুকু বিবাহিত পরিচ্ছেদটিরই মুখবন্ধ। পালার আগে প্রস্তাবনা। কবির ভাষায় বলতে গেলে, সন্তোবেলায় প্রদীপ জ্বালার আগে দুপুরবেলায় সন্ডে পাকানো। অতি আধুনিক অভিজাতনগরীর ভাষায় ব্যাখ্যা করলে, ডিনারের আগে যেমন ডিকন। পাটিতে যাওয়ার আগে যেমন মেক-আপ। বস্ত্রতঃ, গোত্রান্তরের দ্বারা প্রত্যেক নারীরই ঘটে জন্মান্তর। কাকে বিয়ে করব সে-ভাবনায় একালের যুবকেরা যে হুচ্চিঙা-গ্রস্ত হয় সেটা একান্তই নিরর্থক। কারণ যাকেই বিয়ে করা থাক না কেন, হুঁদিন পরেই দেখা যায়, সে অস্ত্র আর কেউ।



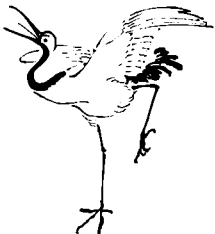
পরিণয় পুরুষের জীবনে আনে সমাপ্তি। তার বিবাহোত্তর অস্তিত্ব শুধু পূর্বজীবনের ভ্রমাবশেষ। নাটকের এপিলোগ বা বক্তৃতার পেরোরেশানের মতো সেটা মূল কর্মকাণ্ডের অকিঞ্চিৎকর অমুর্ভবন।

শুধু করণ নয়,—কৌতুকা-
বহ। আশ্চর্য নয় যে,
পৃথিবীর সকল দেশে এবং
সকল সাহিত্যেই বিবাহিত
পুরুষকে কেন্দ্র করে রচিত
হয়েছে সর্বাধিক গ্রন্থন।

দাম্পত্যে স্বামী র
প্রয়োজন প্রকট, প্রভাব
নাশ্তি। ইংরেজী ব্যাকরণে
আপমুগ্ধি চিহ্নের ক্ষয় তার
অবস্থিতি আছে, উচ্চারণ
নেই। কাঠালের বোটার
মতো রস বা রসক সংগ্রহের
দিক থেকে তার অপরি-
হার্যতা স্বীকৃত হলেও,

ভোজের খালাস সে মনোযোগের বাইরে। রাষ্ট্র-
নেতার পক্ষে বিশেষে রাষ্ট্রদূত হওয়া মানেই যেমন
মক্রিয় রাজনীতি থেকে বিদায়, তরুণের জীবনে
পত্নীযোগের অর্থ তেমনি হুঃমাহস ও হুঃমাহোর
পথ থেকে পশ্চাদপসরণ। সোনার টোপরটি
আকারে ক্ষুদ্র এবং গুঞ্জে লঘুভার। সেটি
শিরোধার্য করামাত্রই মস্তক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়
ছাত্রজীবনে উপাত্ত যত বৃহৎ কল্পনার অম্বর।
প্রতিবাণ-সভা, ইনকোলাব, ট্রামে অগ্নিসংযোগ,
পরীক্ষার গার্ভকে প্রহার ইত্যাদি প্রগতিমূলক কার্যের
সে সনাধিস্তত্ব। সেকালের মেজের বাতি নিবিয়ে
মেওয়ার চোঁড়া আর একালের ফান্স-একটিং-
গুইশারের সঙ্গে তার সাম্প্রতিক একান্ত অহেতুক নয়।

পানিগ্রহণের ফলে পুরুষ ঘরে আসে স্ত্রী,
ডাক্তারের বিল ও সেকরার ক্যাটালগ। কুইনিরের
বড়ির উপরে তিনি প্রলেপের মতো তার সঙ্গে
আসে কিছুটা যৌতুক। সেটা পাত্র-সংগ্রহের স্তম্ভ
পাত্রীপক্ষের দেওয়া ঘূষ। ফ্রেতা আকর্ষণের স্তম্ভ
সিগারেট বা চা-এর প্যাকেটের সঙ্গে যেমন
সিক্‌উ-সুপন।



পরিণয়ের দ্বারা নারীর
ঘটে বিস্তার। জায়া থেকে
জননী ভেদে প্রাপিত বের
সিদ্ধিতে একটি মাত্র ধাপ।
এমন কি একা গৃহিণীও
এক ক নন। পুরাকালে
তিনি ছিলেন একাধারে
সচিব, সখী এবং প্রিয়শিষ্যা
ললিতে কলাবিধৌ।
এ-যুগের মেয়েরা সচিব হলে
সেক্রেটারি হয়ে টে বসে,
অল্পের নয়। সখীরা মিলে
কলেজের করিডর বা
রেস্টোরাঁ এবং লসিত-
কলার ঘোড় সিনেমা বা

বড়জোর সম্মীত-সম্মেলন। কালিমাসের তালিকার
সঙ্গে একালিনীদেবের তিক্তি বেলেনা। কিন্তু গিলবার্ট-
মলিভানের গীতিনাট্য-বিশেষের মতো আধুনিক
পারিবারিক রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও সবক'টি ঘূষাপদেরই
একটি মাত্র অবিকারিণী। পত্নী-মাত্রেয়ই ধমনীতে বয়
একনায়কবের রক্ত। অন্ততঃ একজিকিউটিভ ও
জুডিশিয়ারির পৃথক অস্তিত্বে তাদের বিশ্বাস নেই।

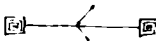
যেটি কথা, স্ত্রী হচ্ছেন সেই বস্তু দ্বার অতাবে
সংসার চলেনা এবং উপস্থিতিতে সংসার অতাবে
অচল হয়। যাকে পাওয়ার পূর্বে পুরুষেরা কবিতা
পড়ে এবং পাওয়ার পরে স্ত্রীতা। যাকে না পেয়ে
ঝোঁকে পটানিয়াম সায়ানাইড বা লেক এবং পেয়ে
সন্ধান করে গেক্সা বা ক্রডাক্স। বোধহয় তার
সম্পর্কেই লেখা হয়েছে,—যাহা চাই তাহা ভুল
করে চাই, যাহা পাই তাহা চাইনা। সম্ভবতঃ
কবিগুরুও এটি বিবাহিত জীবনেরই রচনা।

বিবাহের প্রথম ভুলানেই প্রেমের কথা আসে।
হুনিরনের নাম নিলেই যেমন ধর্মঘট। কিন্তু
প্রকৃতপক্ষে প্রেমের সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক নিয়ে তর্কের
অবকাশ আছে। প্রেম ও পরিণয়কে যারা শাফির

সঙ্গে সায়া অথবা ভোটের সঙ্গে কানভাসিং-এর মতো অবিচ্ছেদ্য জ্ঞান করেন তাঁরা পণ্ডিত হলেও সংসার-অনভিজ্ঞ।

সাগরের ওপারে বিদেশী সন্মাজের রীতি,— আগে প্রেম, পরে বিবাহ। আগে মূর-সাধা, পরে গান। সাগরের এপারে স্বদেশী শাস্ত্রের বিধান,—আগে বিবাহ পরে প্রেম। আগে অস্ত্রোপচার পরে ব্যাণ্ডেজ। প্রথম পক্ষের

ভ্রান্তি এবং দ্বিতীয় পক্ষের প্রমাদ দুই সমতুল্য। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন, রাজনীতির সঙ্গে আধ্যাতিকতা নেশাতে গেলে ইতঃ নষ্ট এবং ততঃ ভুট্ট হয়। বিবাহের সঙ্গে প্রেমের সংমিশ্রণের চেষ্টাও সুকুমার রায়ের ছড়া-বিশেষকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রেমের বাড়িতে গিয়ে বিয়ে করা, টাকা বাড়ানোর জন্ত রেস খেলার মতোই সর্বনাশা হঠকারিতা।



মহ 3/12/45-

পাথরপুরী

অজিত দত্ত

কেন্দ্র দূর রাজ্য থেকে এসে
রাক্ষসেরা হানি দিলো মস্তকের বেশে ।
শোনা-কণা দুই ক্যারি দিয়ে
সকল মাহুদ তারা বেগে গেছে পাথর বানিয়ে ।

হাতনিঃহাসনে রাজ্য নিশ্চল পাথর ।
সভাসদ কৃতান্তনিকর
বিলীকৃত হংসে মিছে অহুগ্রহ যাচে ।
সাজানো বোকান নিয়ে নিশ্চল লোকানী বলে আছে
চিরকাল খন্দরের সোভে ।
সাম দিয়ে কে বা তার পলা নেবে ? সব মূল্য কবে
মরণ-ঠাণ্ডায় ভরবে হংসে গেছে বরক-কটিন !
রাজকল্প—মেঘবর্ণিত—সাহসিন
নিখোঁট ঠাণ্ডিয়ে আছে সবাক্ষে উলস দুই খেল ।
নে-দুর্গিতে বিদ্যমাত্র নেই পুরাকালে
প্রতীক অথবা আশা । রাজপুর আসে কি না আসে
সেখো না সে ;—দুর্গি তার হীরা-মুক্তা-মানিক্যের পাশে
আরেক মানিক হয়ে ছুঁতেছে আলা ।
এই ভিড় ! শুধু রাজ্য ধ্বংসা করে—নিঃশব্দ নিরাশা ।



এখনো হৃদয় আছে বাঁঠে চাষী, ভিত্তিতে মেলেয়া
তারো দেখে অস্ত্রে বোড়া প্রতিধার ফেরা
রাজধানী গ্রামাঙ্গের উঁচু চূড়াগুলি ।
ভয়ে ভয়ে দূর থেকে বাড়াবে অস্থূলি
পরস্পর বলাবলি করে,—
জীবন্ত মাহুদ ছিল একদিন ওখানে শহরে ।
সেই যে রাক্ষস এসে কি হয় পরেছে,
রাজ্য-প্রজা সবই আছে, শুধু তারা কেউ নেই বেচে ।

এমন দিনে

শরদিন্দু হস্তাশাস্ত্র

দিনের পর দিন ঘাট-কাটা পরম ভোগ করিয়া মাহুশ যখন আশা ছাড়িয়া দিয়াছে তখন বৃষ্টি নামিল। শুষ্ক বৃষ্টি নহ, বরষা বিস্তারিত-হাওয়া। বহরের তাপমাত্রা মাহুশ-গুলাকে শীতলতার স্বপ্নসমূহে চূবাইয়া দিল।

বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে বেল। আশ্চর্য্য তিনটার সময়। মধ্যাহ্ন চাপা নাগাদ দূরবিগলিত ধারার ভিত্তিতে ভিত্তিতে বাতাসের কাণ্টা বাইতে বাইতে সমীর পুহে ফিরিল। বহরের শ্রান্তে ছোট একটি বাড়ী; দীর্ঘ বৃষ্টি বর, উপরে একটি। এইখানে সমীর তাহার বৌ ইয়াকে লইয়া থাকে। বৃষ্টি প্রাণী। মাত্র বহর বেড়েক বিবাহ হইয়াছে। এমনও কণোতকজন শেখ হয় নাই।

বাড়ীর দরজা-জানালা সব বন্ধ। সমীর ঘাবের পাশে বসি চিপিতেই ঘর খুঁসিয়া গেল। ইহা ঘাবের কাছেই পাড়াইয়া প্রতীক। করিতেছিল। চকিত ভ্রমণী করিয়া বলিল,—‘খুব ভিকছে তো?’

স মীর ভিতরে আসিয়া ঘর বন্ধ করিয়া দিল, তারপর ডিক্সা কামাকাশড় হুহু ইয়াকে দুচভাবে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। তাহার কোট-প্যাটুন হইতে নির্গলিত জল ইয়ার বেহের সমুদ্র-ভাগ জিকাইয়া দিল। সমীর বলিল,—‘কী মজা! আজ বিচুড়ি খাব।’

ইহার মাঝাটা সমীরের চিবুক পর্যন্ত পৌছায়। সে সর্বাঙ্গ দিয়া সমীরের দেহের সরসতা যেন নিজ দেহে টানিয়া লইল, তারপর ডিক্সি যারিরা তাহার চিবুকে অধর স্পর্শ করিয়া বলিল,—‘নিজেকে, আবার আশাও ভিক্সি

বিলে। ছাড়ো এবার। শীর্ষের কামাকাশড় ছেড়ে

কেলো, বাধকবে সব বেবেছি। যা তোমার খাত, এখনি গলায় ঠাণ্ডা লেগে যাবে।’

সমীর বলিল,—‘কী, আবার গলায় নিশে! শোন তবো—’ বলিয়া গান ধরিল,—‘এমন দিনে তারে বলা যায়—’

সমীরের গলা হরের খার দিয়া যায় না। ইহা তাহার বুকে হাত দিয়া নিজেই মুক্ত করিয়া লইল; বলিল,—‘বাধকবে গিরে গান খেও। কি খাবে—চানা কফি?’

সমীর তান ছাড়িল,—‘চা—চা—চা! বে চা মাত্র অতিবিশেষ জন্তে সক্ষম করা আছে, বার দার্দ সাড়ে সাত টাকা পাউণ্ড, আজ সেই চা খাব। সবিরে—এ-এ-এ—সমীর দিয়া বাধকবে ঘর বন্ধ করিল।

ইহা একই পাড়াইয়া ভাবিল। সেও শাড়ী ব্লাউজ ছাড়িয়া কেলিবে? না থাক, এ জল গারেরে গুকাইয়া থাক....

বসিবার ঘরে আলো জলিয়াছে। সমীর ও ইহা সামনাসামনি বসিয়া চা বাইতেছে। চাবের সঙ্গে ডিম-ডাক।

যা হি রে বর্ষণ চলিয়াছে। কখনও হাওয়ার দাপট বাড়িতেছে, বৃষ্টির বেগ কমিতেছে; কখনও তাহার বিপরীত। যেখের গর্জন প্রশমিত হইয়া এমন কেবল গলাব মধ্যে গুগুগু হব। জটিল বিদ্যাতের একই কৃত্ত-হাসি।

এবেলা বি আসে নাই। বাঁচা গেছে। প্রত্যহ

মধ্যাহ্ন পর সমীরের এক বহু তাহার বাঘার আসিয়া আজ্ঞা জ্বায়, সে আজ বৃষ্টিতে বাহির হয় নাই। ভালই হইয়াছে। আজ বাড়ীতে শুধু তাহারাই হ'জন। এই



জ্ঞানার্জি মগতীর লক্ষ লক্ষ যাত্রাবের মধ্যে থাকিয়াও তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক ; তুষ্টি তাহাদের নিঃসঙ্গ করিয়া দিয়াছে । পরশপরের সঙ্গ-সঙ্গ নিবিড় নিঃসঙ্গতা ।

আজ সকলে অধিন বাইবার সময় সখীরের লগ্নে ইয়ার একটু মনোহর হইয়াছিল । সখীর মূখ ভার করিয়াছিল, ইয়ার অধর একটু স্পষ্ট হইয়াছিল । তখন হুঃসহ গরম । তাৎপৰ্য—পৃথিবীর বাতাবরণ বদলাইয়া গেল । কী লইয়া মনোহর হইয়াছিল ? ইয়া অলসভাবে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু স্মরণ করিতে পারিল না ।

জাঃসহ হইলে ইয়া ট্রে লাইয়া রাখিয়া আসিয়া বসিল, সখীর সিগারেট ধরাল । হুঃসহে পরিতুষ্ট মনে কোনও কথা না বলিয়া মুখোমুখি বসিয়া রহিল ।

পৃথিবীর সকল বায়ী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল হয়না । সেখানে মিল হইয়াছে সেখানেও ঘোলাআনা মিল না হইতে পারে । দেহের ভরে, জ্বরের ভরে এবং বুদ্ধির ভরে মিল কোটিকে গুটিক মিলে । সখীর ও ইয়ার ভাগ্যক্রমে তাহাদের মধ্যে দেহ-মন ও বুদ্ধির মিল অনেকখানিই হইয়াছিল ; তাহাদের বেহু-মন পরশপরের মধ্যে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির স্বাদ পাটাইয়াছিল ; বুদ্ধির বিধ বিরাও তাহারা পরস্পরকে সাগ্রহে বুদ্ধিবার চেষ্টা করিত এবং অনেকটা বুদ্ধি-ভিলও । তবু যাকে যাকে কোন অসমতার ছিন্নপথে হুঃসহ আসিয়া উপস্থিত হইত, হুঃসহকেই ব্যাকুল করিয়া তুলিত । যোগ্যকরি দেহ-মন-বুদ্ধির অতীত একটা জ্বর আছে, হইতো তাহা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের জ্বর ; সেখানে কেহ উঠিতে পারে না । তাই নিভৃত মনের সোপান কক্ষরে একটু পুততা থাকিয়া যায় ।

কিন্তু আজ, বর্ণপরিমুখত রাত্রি, সখীর ও ইয়ার মনে কোনও পুততাবোধ ছিল না । বজ্রাঘ জলে বহন বন্যকিক জাদিয়া গিয়াছে তখন সূক্ষ্ম কতখানি জল আছে কে তাহা জানিয়া দেখিতে পারে ।

হুঃসহে সখীর মূখে কিছুক্ষণ পরশপরের গানে চাহিয়া রহিল, তারপর সখীর বলিল,—‘অত দূরে কেন, কাছে এসে বোসো ।’

ইয়া বলিল,—‘তুমি এল ।’ বলিয়া সোকা কেঁচাইল । হুঃসহে উঠিয়া গিয়া বেতের সোকার পাশাপাশি বসিল । জানালায় কাচের ভিতর কিয়া বিদ্যুৎ মুচকি ছাশিল, যেন চাশা যার গুলগু করিল । সখীর বলিল—‘কেমন লাগছে ?’

‘সখীরের সিন্ধের কিস্যোনের কাছে গাল রাখিয়া ইয়া অধনিবীণিত নেয়ে চুল করিয়া রহিল, শেষে অ’হুটকরে বলিল,—‘বলা যায় না ।’

সখীর বলিল,—‘কিন্তু কবি লিখেছেন বলা যায় ।’

‘কবি বলতে পারেন, তাই বলে কি আমরা পারি ?’

‘পারি ।’ কিছুক্ষণ চুল করিয়া থাকিয়া সখীর ইয়ারকে সুক্কেব কাছে টানিয়া লইল,—‘আজ বলব তোমাকে । তুমি বলবে ?’

অনেকক্ষণ সখীরের বাহবেইনের মধ্যে পড়িয়া থাকিয়া ইয়া চুপচুপ করিল, ‘বলব ।’

সে-রাত্রি তাড়াতাড়ি আহার দাখিয়া তাহারা খিতলের ঘরে গুইতে গেল ।...

রাতি এগাংবাটা । তুষ্টি মাঝে মাঝি গিয়াছিল, আবার ব্রহ্ম হইয়াছে । নিবিল তুষ্টি, অবসর বেদের গ্রন্থ তুষ্টি হইতে অরুণে করিয়া পড়িতেছে ।

সখীর ও ইয়া বিছানায় পাশাপাশি গুইয়া আছে । নীলাভ নৈশ বীণের ব্রহ্ম প্রভাষ বংটি সন্দাখিষ্ট । হুঃসহে চোখ বুজিয়া আসিয়া আছে ।

ইয়ার একটা হাত অলস ভূত্বিতে সখীরের গায়ে পড়িল ; সে কহিল,—‘এবার বল ।’

সখীর হাত বাড়াইয়া হুইট টিপিল, নৈশ দীপ নিভিয়া গেল । অন্ধকারে ইয়া প্রতীকা করিয়া রহিল ।

কিছুক্ষণ সখীরের লাফা না পাইয়া ইয়া আতুল নাড়িয়া তাহার পাঁজরায় ব্রহ্মহুড়ি বিল । সখীর তখন ধীরে ধীরে বসিতে আরম্ভ করিল—

হিসেব করছিলাম কতদিন আদেকার কথা । মার দাত বছর, আমার বরষ তখন তুড়ি । কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কবেকার কথা । তখন আমি কলকাতায় থেকে বার্ট ইয়ারে পড়ি আর কলেজের হোষ্টেলে থাকি ।

লখা তুষ্টিতে বাড়ী বেতায়, কিন্তু ছোটখাটো হুঃসহ যিনের তুষ্টিতে বাড়ী বাঙা হত না । ডায়বও হায়বার লাইনে আমার এক পিসেমশায় থাকতেন, তাঁর কাছে যেতাম । বেশী দূর নয়, শিখারদা থেকে খট্টা দেড়েকের রাস্তা ; আখা-পহর আখা-পাড়ারগা জায়গাটা । কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে থাকতে বেশ লাগত । গাছের ডাখ, পুতুরের মাছ, শিদিয়ার হাতের রাস্তা—

পিসেমশায়ের সংসারে ঠোকা হুঃসহ ছাড়া আর একটা বাহুর ছিল, পিসেমশায়ের ভাগনী সরলা । শিদিয়াঘের একদার ছেলে অক্ষর । নদীয়ার কলো প্রেক্ষাগৃহ করতেন, বাড়ীতে বড় একটা আসতেন না । এঁদের সংসার ছিল এই জিনজনেব নিয়ে ।

সরলা বাপ-খা-মহা মেয়ে, মামার কাছে মাহুর হয়েছিল ।

বহলে আবার চেয়ে দু'এক বছরের ছোট ; বিয়ে হয়নি।
বেণা লবা চেহারা, কালুকলে দু'টো চোখ, যেতে-যেতে
রঙ। কিন্তু সব মিলিয়ে দেখতে মন্দ নয়। একটু খেল
ভীক প্রকৃতি, সহজভাবে কাকুর সঙ্গে মিশতে পারত না।
প্রথম প্রথম আমাকে দেখে পালিয়ে বেড়াত। তারপর
'সবীরা' বলে ডাকত, কিন্তু চোখে চোখ মিলিয়ে চাইতে
পারত না।

আমার তখন যে বয়স সে-বয়সে সব মেয়েকেই ভাল
লাগে। সরলাকেও আমার ভাল লাগত। কিন্তু মনে পাপ
ছিল না। তাছাড়া আমি কি রকম আনাড়ি ছিলাম তা তো
জুনি জানো। মেয়েদের বতাই ভাল লাগত, তাদের সঙ্গে
ঘনিষ্ঠতা করবার কারণ-কানুন জানতাম না।

যাহোক, একদিন পিসিমার বাড়ীতে গিয়েছি। সেটা
জানতাম কি চৈত্র মাস টিক মনে নেই। বিকলবেলা পৌঁছে
দেখি বাড়ীতে ছে-ইহ কাণ্ড। নববীণ থেকে টেলিগ্রাম
এসেছে অজয়দার ভাষি অম্বা ; পিসেমশাই আর পিসিমা
এখনি নববীণ বাজেন। আমাকে দেখে পিসিমা বললেন—
তুই এসেছিল বাবা, ভালই হল। অজুর অম্বা, আমরা
এখনি নববীণ বাজি। ঠাকুরের দয়ার ববি অজু ভাল থাকে,
তোর পিসেমশাই কালই কিয়ে আসবেন। তুই ততক্ষণ
বাড়ী আগুলা। সরলাও রইল।

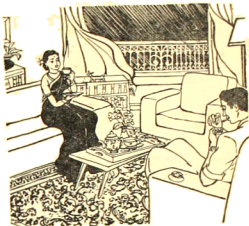
পিসিমা আর পিসেমশাই প্রায় একবছর ইন্ডিয়ানে চলে
গেলেন। বাড়ীতে রয়ে গেলাম আমি আর সরলা।

ক্রমে সন্ধ্যা হল, সন্ধ্যা থেকে রাত্রি। আমার মনে বেন
একটা কাঁটা বিঁধে আছে। সরলা রান্না করতে গেল।
থাবার তৈরি হলে বাগুয়া-বাগুয়া শেরে নিলাম। সরলার
সঙ্গে আমার তিনটে কথা হল কিনা সন্দেহ। সে আমার
পানে কেমন একরকমভাবে তাকালে, আবার তখনি চোখ
মিগিয়ে বসে। তার চাউনির বানে ধরতে পারছি না,
কিন্তু মনটা অশান্ত হয়ে উঠছে। এক বাড়ীতে আমি আর
একটি সুখী, আর কেউ নেই। আঙন আর ঘি—

হাত বাড়তে লাগল। আমি বাড়ীর দোড়তড়া বন্ধ
করে গুতে গেলাম। আমার পোষার ঘর নীচে, বৈঠকখানার
পাশে ; সরলা শেরে ওপরে।

ঘরকা ভেজিয়ে দিয়ে আলো নিভিয়ে গুয়ে পড়লাম।
খাটটা বেশ বড় ; হাত-পা ছড়িয়ে শোকা যায়। জানালা
কিয়ে খিরকিরে বাতাস আসছে। আমার মনটা বেশ শান্ত
হয়ে এল। তারপর সুখের পড়লাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল একমনের গারে হাত তৈকে।
চোখ চেয়ে দেখি সরলা আমার পাশে বিছানার গুয়ে আছে।



...তারপর—তারপর সে-রাত্রির বর্ণনা দিতে পারব না।
সারারাত্রি নিজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কারি হয়ে
বিছানার একপাশে গুয়ে কাটতে নিলাম। সরলাও
বোধহয় সারারাত্রি জেগে ছিল ; চোর হওবার সঙ্গে সঙ্গে সে
উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরের দিনটা কাটল হুঃখপের মতো। একসঙ্গে ওঠা-
বসা, সে বাঁধছে আমি বাছি, অথচ কেউ কাকুর মুখের পানে
তাকাতে পারছি না। আশ হৃদি পিসেমশাই কিয়ে
না আসেন, যদি রাত্রে আমার কালকের মতো ব্যাপার
ঘটে, তাহলে—

সরলার মনে কি ছিল জানি না। হয়তো সে ভুতের
ডরেই আমার কাছে এসে গুয়েছিল। কিন্তু আমি নিজের
কথা বলতে পারি, ভুতের চেয়েও বড় ভুত আমার কাঁধে
ভর করেছিল। সেদিন যদি পিসেমশাই না আসতেন—

ভাগ্যক্রমে পিসেমশাই বিকলবেলা কিয়ে এসেন।
অজয়দার পান-বসন্ত হয়েছে, ডয়ের কোনও কারণ নেই।
আমি সেই রাত্রেই কলকাতার চলে এলাম। তারপর
সরলাকে আর দেখিনি ; ওদিকেই আর পা বাড়াইনি।
জবে গুনেছি সরলার বিয়ে হয়ে গেছে।

সবীর নীরব হইল। ইয়াও কথা কহিল না। কিছুক্ষণ
এইভাবে কাটিবার পর সবীর জিজ্ঞাসা করিল,—‘কেন
গুনলে ?’

ইবা সবীরের নিক পাপ কিরিয়া গুইল। বলিল,—

‘অ’নাড়ি ছিলে বলেই বেঁচে গিয়েছিলে। কিন্তু তারি হোমস্কেপ আর বহুধার!’ তারার কর্ণধরে একই তরলতার আভাষ পাওয়া গেল।

সখীর প্রশ্ন করিল,—‘আর তোমার?’

‘আমার ভারি সিরিস বাপ’র হয়েছিল।’

ইব: হীরে হীরে বামিরা বামিরা বলিতে আরম্ভ করিল—

আমার তখন সত্তরো বছর বয়স, বছর চারেক আগেকার কথা। তবে ছুপ খেতে কলেকে চুকচ্ছি।

আমার প্রার্থের বন্ধু সাধনা একবছর আগে কলেকে চুক্ছে। একদিন চুপিচুপি আমার বলল, সে প্রেমে পড়েছে। এক গল্প-লেখকের সঙ্গে। তাদের মধ্যে চিঠি দেখাশোনি চলছে। আমাকে চিঠি দেখালে।

লেখকতনে আমার ভীষণ মন খাড়া হয়ে গেল। আমি যেন সব-ক’তেই পেছিয়ে আছি। কী উপায়? আমার বাপের বাড়ীতে মেয়েদের গুপ্ত তারি কড়া নজর। ঘেরে-ফলেছে পড়ি, গাড়ি চড়ে গুড়গুড় করে কলেকে রাই, গুড়গুড় করে ফিরে আসি। হোঁড়াত্যের সঙ্গে হুমোড় করার দ্বিধে নেই। বাবা জানতে পারলে কেটে কেগবেন।

সাধনার কথাবার্তা থেকে মনে হয় প্রেমে না পড়লে জীবনই বৃথা। শেষ পর্যন্ত বরীতা হয়ে প্রেমে পড়ে গেলুম। আমাদের কলেজের হিষ্টির প্রবেশের সিগন্যালবাবু সঙ্গে।

তুমি যা ভাবছ তা নয়; সিগন্যালবাবু নামটাই বুড়ো, তিনি বাহুবলী বুড়ো নয়। গ্রিন-বগ্রিন বছর বয়স, পাতলা ধারালো নুহ, ঝাঁড়ার মতো নাকের ওপর রিম্বেল চশমা। ঠার করা-বগার ভরীতে এমন একটা চাপা বিদ্রূপ থাকত যে যেহেঁরা মনে মনে ঠাঁকে ভর করত, ঠাঁর সঙ্গে প্রেমে পড়ার সাহস কাকুর ছিল না। আমিই বোধহয় প্রথম।

প্রাকসারদের মধ্যে সিগন্যালবাবু ছিলেন অবিবাহিত। আর থাঁরা ছিলেন তাঁরা আমার বাবার বরদী; কাকুর তিনটে ছেলে, কাকুর পাঁচটা ঘের।

সিগন্যালবাবু বখন ক্লাসে আসতেন আমি একদুটে তাঁর দুখের গানে চোরে থাকতুম। তাঁর নাকের কুটো ছিল ভীষণ বড় বড়, কানে খাড়া খাড়া লোখ, মাথার ঠিক মাথকনে ঘষা পরসার মতো বানিকটা জারগার চুল পাতলা হয়ে গিয়েছিল, বাবা হেঁট করলেই ঢকঢক করে উঠত। হোহের টাকের পূর্বলক্ষণ। কিন্তু তিনি পড়াতেই ভারি চমৎকার, অন্তে অন্তে বর হয়ে যেতুম।

কিছুদিন এইভাবে দুই থেকে প্রেম-নিবেদন চলল।

কিন্তু এভাবে কতদিন চলে? সাধনা প্রায় জিজ্ঞেস করে—‘প্রেম কতদূর? আমি কিছুই বলতে পারি না। সাধনার প্রেম অনেকদূর এগিয়েছে; তারি এমন সুকিয়ে সুকিয়ে একসঙ্গে দিনেরা দেখতে বাধ, পাকে বলে অনেক রানি পুষ্ট প্রেমাদাম করে। এমিকে আমার প্রেম বোঝানো ছিল দেখানোই পড়ে আছে, এক পা এগুচ্ছে না। এগুবে কোথেকে? সিগন্যালবাবু কাছে গিয়ে কথা কইবার নামেই হাত-পা ঠাঁতা হয়ে যায়।

পেবে এক চিঠি লিখলুম। দুপরের আবেগ-ভরা লম্বা চিঠি। তারপর কলেজের ঠিকানায় প্রভেসর সিগন্যাল যোমালের নামে পাঠিয়ে দিলাম। চিঠিতে সবই ছিল, কেবল একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। নিজের নাম বহুধার কতিনি।

পরদিন বিকেলগোলা হিষ্টির ক্লাস। সিগন্যালবাবু ক্লাসে এগেলেন। লেকচার আরম্ভ করবার আগে পকেট থেকে আমার চিঠিখানা বায় করে বললেন,—‘আমি আজ একটা প্রেমপত্র পেয়েছি, তোমাদের পাঠে শোনাতে চাই।’

সিগন্যালবাবু চিঠি পড়তে লাগলেন। মেয়েরা প্রথমে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তারপর মুখ-ভাকাতাকি করতে লাগল। সিগন্যালবাবু চিঠি পড়তে পড়তে চোখ ভুলে আবারের সুখের ভাষা লক্ষ্য করতে লাগলেন।

আমার অবস্থা বুঝতেই পারছি। মনে হল আমার বুকের সুবাস্য পথ সবাই অনতে পাচ্ছে। কেন যে তখনই ধরা পড়ে যাইনি তা জানি না। সিগন্যালবাবু কিন্তু চিঠির শেষে কোন মন্তব্য করলেন না, চিঠি শেষ করে একই মুচকি হেসে লেকচার আরম্ভ করলেন।

কলেকে এই নিয়ে বেশ একটু হৈ-চৈ হল। সিগন্যালবাবু অজ ক্লাসের মেয়েদেরও চিঠি পড়ে তনিবেদন। সব মেয়েরা উত্তেজিত, কে চিঠি নিয়েছে? ভাগ্যিস, চিঠিতে সেই করতে ভুলে গিয়েছিলাম, নইলে বিষ খেতে হত।

আমার প্রেম তখন সুসুস্থ, পূর্ণন জাউটা যে কী ভীষণ দুপরহীন তা বুঝতে পারিছি। কিন্তু সাধনা আমাকে বোঝাতেন যে, প্রেমের পথ কটকটাকী, গুড়ে ভর পেলে চলেবে না। আমি কিন্তু ভয়ে কাঁট হয়ে গেছি। বাবা যদি জানতে পারেন—

হুপ-বাতো দিন কেটে গেল, তারপর এক নতুন খবর কলেকে ছড়িয়ে পড়ল—সিগন্যালবাবু কলারশিপ নিয়ে বিলেত যাক্ছেন। আমার খুবই হুঃ হবার কথা, কিন্তু হুঃ মোটেই হল না। ভাবলুম এবার সুখি প্রেমের দায় থেকে নিষ্কৃতি পাব।

কিন্তু নিষ্কৃতি অস্ত সহজ নয়। বিলেত ধাবায় আগের

দিন বিগতবাবু আমাকে ক্রাস থেকে ডেকে পাঠালেন। কাপতে কাপতে তাঁর অফিস-ঘরে পেলুম। তিনি টেবিলের সামনে বসে কাগজপত্র নষ্ট করছিলেন, ঘরে আর কেউ ছিল না। আমাকে দেখে বাড় বেড়ে বললেন,—‘বোশো।’

আমি তাঁর সামনের চেয়ারে বসলুম। তিনি কাসকে নষ্ট করতে করতে বললেন,—‘চিঠিখানা ছুঁমি লিখেছি?’ আমি কেনে কেললুম।

তিনি উঠে এসে আমার চেয়ারের পাশে ঝাঁড়ালেন; নয়ন হয়ে বললেন,—‘ছুমি সতি আমায় ভালবাস?’

অত বড় উদ্ভাসময় চিঠির পর আর অস্বীকার করা চলে না। আমি বাড় বেড়ে জানালুম,—‘হ্যাঁ, ভালবাসি।’

তিনি তখন বললেন,—‘কিছু আমি যে কাগাই বিলোত চলে যাকি, বছরখানেক সেখানে থাকতে হবে। ছুমি একবছর অপেক্ষা করতে পারবে?’

আমি বাড় নাড়লুম—‘হ্যাঁ, পারব।’

তিনি হেসে পিঠি চাপড়ে দিলেন; বললেন,—‘বেশ বেশ। এমন যাও, মন দিয়ে দেখাপড়া করবে। আমি কিরে আসি, তারপর কথা বাদে।’

বিগতবাবু বিলোত চলে গেলেন। প্রথম কিছুদিন খুব আনন্দে কাটল। তারপর কমে হুঁতাবন। বতই দিন ছুঁয়িবে অর্গছে ততই ভর বাড়ছে। এইভাবে একবছর যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন বিগতবাবুর এক চিঠি পেলুম। বোধহয় কসেজ থেকে আমার ঠিকানা জোগাড় করেছিলেন।

এই তাঁর প্রথম এবং শেষ চিঠি। তিনি লিখেছেন—‘কল্যাণীয়াহ, আমি শীঘ্রই দেশে ফিরব। ছুমি তখন স্থায়ী হবে, আমি এখানে এসে একটি ইংরেজ ঘেরকে বিয়ে করেছি। তাঁর নাম নেসি। মিঠি নাম নহ? আশা করি, ছুমি মন দিয়ে দেখাপড়া করছ।’ ইতি—

কি আনন্দ যে হৃদেছিল তা আর বলতে পারি না। তারপর আর কি? আর প্রেমে পড়িনি। হুঁতবছর পরে তোমার সঙ্গে বিয়ে হল।

সমীর হাত বাড়াইয়া নৈন দীপ আলিল। হুইজনে কিছুক্ষণ মুগ্ধাশ্রি গুইয়া রহিল। তারপর অতিদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সমীর বলিল,—‘বিগতবাবু ভরলোক ছিলেন তাই বৈতে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়া, সতি যদি একটা নোয়া ব্যাপার হত? ছুমি আমাকে বলতে পারত?’

ইয়া কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিল। আজ মনকে চোপ ঠাণ্ডিবার দিন নহ; সে মনের অন্তঃস্থ পশ্চাত্ত্বিত্তি বেলিল। না, আজিকার হাতে সে সমীরের কাছে কোনও কথাই লুকাইতে পারিত না। সে চোপ খুলিয়া বলিল,—‘পারতাম।’

আবার কুষ্টির জ্বর বাড়িয়াছে। জানালার বাহিরে একটানি কতখর নন্দ। হুইজনে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে গুইয়া ভাবিতেছে। আজ তাহার: যেমন পরিপূর্ণভাবে পরস্পরকে পাইয়াছে এমন আর পূর্বে কখনও পার নাই; তাহাদের যাকখানে যেটুকু কাঁচ ছিল তাহা নিবিড়ভাবে ভরাট হইয়া গিয়াছে।

•

সেকালের সাহেবেরা সকলেই নবাবি আদব কায়দা, আহার বিহার শিক্ষা করিয়াছিল। তাহার্য সকলেই প্রায় তখন তামাক খাটত, সেইজন্য হেষ্টিংস সাহেবের নিষেধের পরে অস্ত্রান্ত ভৃত্য আনিবার বিশেষ উল্লেখ করা হইত; কিন্তু হাঁক-বদলার সহজে সেজন্য করা হইত না। কলিকাতায় তখন দশ বাইলেঘ মধ্যে মনের উটি কবিবার আশেপ দেখা হইত না। তখন কলিকাতার ইরোজেরা বিধবা গরী লাড় করিয়া বড়মাংস হইবার জন্ত যেন শুং পাতিয়া বসিয়া থাকিত। এমন কি, পান্ডরী কার্যরনাগার সাহেবও উইলির বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিয়া তাহার নগণ পাঁচ লক্ষ টাকা ও অস্ত্রান্ত সম্পত্তি লাড় করিয়াছিলেন।

—কলিকাতার কথা

যেন না দেখি

ভূভাষ সুখোপাধ্যায়

যেখানে আকাশের ছানি-পড়া চোখের নিচে
তিন মাথা এত করে আছে
লাঠি হাতে
ছুনছুন অঙ্ককার

যেখানে সারাটা রাত
সারাটা দিন
তুধু টুপ টাপ
টুপ-টাণ
মাটিতে পাতা পড়ার শব্দ

যেখানে সীমারের বালাসীর মত
শুভি
জলে রশি ফেলে ফেলে
কীবনের মাপ নেয়

আমি জানি,
ঈশ্বরের ঠাণ্ডা হাওয়া
একদিন আমাকেও সেইদিকে ঠেলেবে।



হে পৃথিবী, আমি যেন সেই
দিনের মূখ
না দেখি—

তার আগে
ভূমি
আমার কুটো চোখ
কুটো পায়ে
গুরুত্বের মত বেঁধে দিও।

‘কালি-কলম’

বার কলনাম

আগে কলোম, তার পর কালি-কলম ।

সব তখন বিয়ে করছি। নতুন বো। খত্তরবাড়িটা ভাল। আমহাস্ট’ ষ্ট্রিটের ওপর প্রকাণ্ড বাড়ি। মস্ত বড়লোক। একখানা মোটর, একটা ছুড়িগাড়ি সব সমর ঘোরে ঘাড়িয়ে, বেটা ঘুমি চড়ে বোশো, যেখানে ঘুমি চলে যাও, নতুন জামাই, কেই কিছু বলবে না ।

বাড়িতে বিত্তর লোক, টালাও ব্যবস্থা, যখন ঘুমি এসে, যখন ঘুমি হাও, বড় বড় বসবার ঘর, বড়বাড়ব নিয়ে আচ্ছা যাবো, চা মলখাবার, পান সিগারেট—ভুত্ব করডো কি এসে হামির। কারও কাছে কৈফিয়ত বোবার কিছু নেই ।

কলকাতা থেকে পালিয়েছিলাম। চলে গিয়েছিলাম কুমারভূমি সোহার কাঠখানায়। কয়েকটা মাস সেখানে চাকরি করে আবার চলে এসেই কলকাতায়। সোহা এসে উঠেছি এই আমহাস্ট’ ষ্ট্রিটের বাড়িতে ।

নরকল তখন কলকাতা ষ্ট্রিটে খুলখান সাহিত্য পত্রিকার আশিমে—মজবুর আহমদ-সাহেবের কাছে। সেইখানেই বাব বলে বেরিয়েছি, হঠাৎ পবিত্র (পবিত্র গম্বোপাখ্যায়) সঙ্গে দেখা। পবিত্র গিয়েছিল নরকলের কাছে, সেখান থেকে চলেছে আমি এসেছি কলকাতায়, টিকানাটা ও সেইখান থেকেই পেয়েছি। কিন্তু নরকলের দেওয়া টিকানা, একশো পনেরো বলতে বললে একশো পঁচিশ। বাড়ির নম্বর দেখতে-দেখতে পবিত্র পথ হটছিল, আমিই দেখতে পেয়ে তাকে ডাকলাম ।

বাড়িখান প্রবাসী আশিমে। ডালই হলো, সন্ধ্যা ছুটে গেল। প্রবাসীতে তখন আমার তিনটি গল্প ছাপা হয়েছে। চাকবাবুর একটা চিঠি পেয়েছি।—এবারে যে গল্পটি আপনি পাঠিয়েছেন তার নাম আমি বললে দিয়েছি। আপনার সম্মতি আছে কিনা দফা করে জানাবেন। নাম দিয়েছি ‘বদীবান’। আপনার গল্পের প্রশংসা না করে পারছি না। এত ভাল গল্প অনেকদিন পড়িনি ।

সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেই চাক কলোপাখ্যায়ের এই চিঠি! সেদিন সে চিঠিখানি ছিল আমার কাছে এক মন্ডলা সম্পদ। কুমারভূমি থেকে সে চিঠিখানি আমার পকেটে পকেটে কিয়ছে। থাকে-তাকে বেশিবে বেশিবে বেড়াছি ।

টিকানা-নন্দ সুখোপাখ্যায়

সেইদিনই সকালে এই চিঠির ব্যাপারে বেশ একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে গেছি, তাই ভেবেছিলাম চিঠিখানা আর কাউকে দেখাবো না। আমার খত্তরবাড়ি মানে সাত ডাইয়ের একাধরতী পরিবার। আমার সমবংশী কয়েকজন শাশা এই আমহাস্ট’ ষ্ট্রিটের বাড়িতে থেকে কলমে পড়ছে। চা খেতে খেতে কথায় কথায় বাংলা সাহিত্যের কথা উঠলো। আমি যে গল্প লিখি আর তা কাগজে ছাপা হয়—এই কথাটা তাদের জানতে চাইলাম। চাকবাবুর চিঠিখানি বের করে একজনের হাতে দিয়ে বললাম, পড়। ছোট চিঠি। পড়তে বেশিখণ সময় লাগলো না। একজনের হাতে থেকে মিলে আর-একজন। তারপর তার হাত থেকে আর-একজন। এমনি করে চার-পাঁচজন পড়ে বললে। একজন শোস্টাঙ্গিসের ছাপটা ভাল করে দেখলে। কেবেই বললে, তা বৃষ্টি মনে নয়। এইটে নিয়ে গিয়ে আর-একটা কাগজের আশিমে দেখলে কাজ হবে। নাম-ছাপা এমনি একটা শোস্টাঙ্গি হাতাতে পারলেই হলো! একজন তো শোস্টাঙ্গিটা ছুঁতে ফেলে দিয়ে বললে, ওইকম ইনিং বিমিয়ে গল্প লিখতে সবাই পারে। হাতার পালা একটা লিখে লাগাতে পারো তো আমি বাহাদুর। তাদের ভেতর একজন তখন বি-এ পাস করে আইন পড়ছে। কিন্তু আন্দর, প্রবাসী নামে যে একটা মাসিকপত্র আছে, চাক কলোপাখ্যায় যে একজন ব্যক্তমানা লেখক সে-ববরটি পর্বত কেউ রাখে না ।

এতদিন পরে একজন মাহুব পেলাম চিঠিখানি দেখাবার। চাকবাবুর চিঠিখানি পবিত্র হাতে দিলাম। চিঠিখানি পড়ে সে আনন্দে উরগিত হয়ে উঠলো। বললে, চাকবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিল ?

বললাম, না। সেইখানে বাব বলেই বেরিয়েছি। পবিত্র বললে, চল। পবিত্র কহিয়ে দিই।

সোহে গাড়ি থাকলে চড়ে বসতাম। যেখানাম, গাড়ি নেই। হেটে হেটেই বাড়ি। পবিত্র ওসিকের হুটখাখের ওপর কাকে ঘেন ঘেবে ভেঙে উঠলো, গোহুল! গোহুল!

ডল্লোলক বাখলেন। পবিত্র বললে, আর, আর-একজনের সঙ্গে পরিচয় করে দিই।

রাখা পেরিয়ে পোম হু’কনে।—গোহুল নাম, আটিক্ট ।

আমার আর পরিচয় কি ? সামান্য দু'চারটে গল্প চাণা হয়েছে আর। বলতে হয় তাই পবিত্র বলণে, ইনি নরকল ইশলামের সহপাঠী বহু।

নরকলও তখনও খুব বেশি কিছু দেখেনি। সর্বপ্রথম সে-সব গল্প নিয়ে সে তার সাহিত্য-ভীষন আরম্ভ করেছিল, সে-সব গল্প শ্রীমদ কেউ পড়েনি। তারপর 'মকীয়ার' ইজ্যাকি কয়েকটি কবিতা লিখবার পরেই তার খ্যাতি তখন দীরে দীরে ছড়াতো আরম্ভ করেছে। ডাফলাদ গল্প-লেখক বলে আমার পরিচয় না দিয়ে পবিত্র খুব ভালই করেছে। কারণ শ্রীমদ সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় করবার আগ্রহ যেমন ছিল আমার তেমনই, গল্প-লেখক বলে সাহিত্যিক মণ্ডলে নিজের পরিচয় দেবার সংকল্প ছিল তেমনই অপরিণীত। সে-সময়টি আমার বহুদিন কাটেনি।

পবিত্র কিছু চুল করে থাকবার চেষ্টাই নয়। বললে, হাফিজ একবার প্রবাসী-আদিলে। দেখা না, চাকবাবুর চিঠিখানা বের কর।

চাকবাবুর চিঠিখানি বের করলান পকেট থেকে।

চিঠিখানি পবিত্র গোহুলের হাতে দিয়ে বললে, চাকবাবু ওকে কি দিচ্ছে তাই ?

চিঠি পড়েই গোহুল শোষ্টকর্ডখানি উল্টে আমার নামটা দেখে নিলে, তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, কল্যাণদেব ?

সহিয়ে বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

গোহুল দুহাত বাড়িয়ে আমাকে ভড়িয়ে ধরলে।

মুহুর্তের মধ্যে অন্ধরস হয়ে গেলাম। গোহুল বললে, প্রবাসী-আদিল পরে হবে। আগে আব্দুল আযাযের আদানি। প্রবাসী-আদিল যাওয়া হলো না। হাটতে হাটতে সোজা একবার চপ-নয়র পটুয়াটোলা। এইটুকু সময়ের ভেতরেই 'আদিল' থেকে 'হুমি' হয়ে গেছি।

রাজার ধারেই চেঁচি ঘরখানি। একা বসে আছে সীমেশ। সীমেশরক্তন লাল।

সীমেশ আমার লেখা-টেখা তখনও পড়েনি। তার মাথায় তখন 'কল্যাণ'-এর পরিকল্পনা। এক মাসের ভেতর কাগজ বের করতে হবে। মাসিক সাহিত্যপত্র—কল্যাণ। পত্রাকাকি কিছু নেই। দশটি মাস টাকা ছিল পুঁজি। তাই দিয়ে ছাওগিল দেশে সীমেশ আর গোহুল—দুই বন্ধুতে রাজার মাথায় বিনি করে এসেছে। ছাওগিলটা দেবলান।

সীমেশ বললে, আযাযের ছিল 'কোর আটলু লাব'। আমি, গোহুল, মইনুল্লাহ বহু—

মইনুল্লাহ বহুর নাম শুনে চোমারের গুণ (কল্যাণের প্রসিদ্ধ তরকারিগোপন তখনও পড়েনি) টান টান হয়ে বললাম। সেই 'অলপ' 'গোনার হরিণ' 'রমলা'র মইনুল্লাহ ?

গোহুল বললে, হ্যাঁ। ব্যাখিষ্টার হয়ে কিরছে বিলেক থেকে।

মিলাদা কল্যাণ, যেখানে পায়ে ?

সীমেশ বললে, মিচাই পায়ে।

সেবেছিলাম। শুই কল্যাণ-আদিলেই মইনুল্লাহের দেখা পেয়েছিলাম। বিবাকান্তি সৌম্যদর্শন খুবক মইনুল্লাহ। প্রবাসনত চিত্তে আমি আমার অন্তরের অন্তিমখন আনিবেছিলাম তাঁকে—পরভোক্তার হৃদয়ের এই একক এক অন্তর গল্পের শ্রীমদ। নরনাথীর প্রণয়শীলার হুমিগুণ ভাঙবার মইনুল্লাহ খুবজনচিত্র হয় করেছিলেন তখনকার দিনে। তাঁর রচিত সাহিত্যে ছিল ভিন্ন আধার, ভিন্ন পরিমণ্ডল। তিনি শুধু প্রেমিক-প্রেমিকা, বিরহী-বিরহিণীর কানের কাছে আনন্দের বার্তা বহন করে আনেননি, তিনি তাঁর সাহিত্যদ্বারের মূল স্থায়িক সত্যের গোরবে আবিষ্কার করে কল্যাণোদ্যমে মগ্নিত করে তুলেছিলেন। তাঁর রচিত সাহিত্যে ছিল হৃদয়ের ধনি, হৃদয়ের গম্ব, হৃদয়ের মুখ, হৃদয়ের হর, হৃদয়ের বর্ষ। চিরহৃদয়ের পুঞ্জায়ী তিনি তাঁর অন্তরের আনন্দকে অন্তরের অন্তরে লুক্কায়িত করতে চেয়েছিলেন।

আযাযের তখন ছিল বৌদনকাল। বিহারের শুক কক প্রভাববীর্ণ প্রভাবের এক প্রান্তে বসে পড়েছিলাম তাঁর বহুবিচিত্র প্রেমের কাহিনী। তাঁর রচিত সাহিত্যের বাহুয় প্রত্যেক করেছিলাম বৈশাখের চুপুয়ে রাষ্ট্র-কার্যকর্মের হৃদয়ে বসে। শত সোহা আর ইশাতের রাজবে সেবেছিল হৃদয়ের সূচনা। শব্দবলের ধূসি থেকে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত—সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল আনন্দের অন্তরঙ্গ।

সীমেশ, গোহুল, মইনুল্লাহ—সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'তে যেহি হলো না। 'কল্যাণ' বেকবে। গল্প চাই! প্রবাসীর জন্য একটু গল্প লিখেছিলাম। চাকবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে গল্পটি দিয়ে আদ্যো ভেবেছিলাম। বোঝা করতে দেখলাম, দেখাও হলো, কিন্তু গল্প নিতে পারলাম না। সে গল্প তখন চলে গেছে কল্যাণে।

কল্যাণের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যার প্রথম গল্প চাণা হয়েছে সেবলান আযায 'মা'। সাহিত্যের বোঝা তখন শেষে বসেছে আযাযের। বেশ-কিছনের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার প্রথম আযায

অগেছে মনে। ইংরেজি বই কিনতে গেছি ‘বুক কোম্পানী’র নোকানে। দেখানে বেশি ইংরেজি বইয়ের অল্পাংশের ভেতর গাড়িয়ে কে একজন কমাগত বইয়ের পর বইয়ের পাতা উল্টে চলছে। উঁচু উঁচু কার্টের ব্যাকের ওপর থাকে থাকে বই সাজানো। বাঁকে শুধু একটা যাত্রাবের চলার পথ। সেই পথের ওপর গাড়িয়ে ছেসেটি বই পড়ছে। চোখে মুখে একাগ্র তন্ময়তা। সৌরবর্ণ প্রিয়বর্ন পাতলা ছিপিছিপে ছেসেটিকে বেধে বসে হলো কলেজের ছাত্র।

আমি তার পালে গাড়িয়ে বই দেখছি। ছেসেটির সেরিকে স্ক্রলস নেই। আমার হাতের কাছে সব সর্বনের বই। নাটক, নভেল, গল্পের বই বেথতে হ’লে তাকে শেরিয়ে যেতে হবে। অথচ তার খান ডক করতে ইচ্ছে করছে না। বই দেখতে এসে তাইই দিকে তাকিয়ে গাড়িয়ে আছি। মন লাগছে না।

হঠাৎ একদমর বে আমার দিকে তাকালে। বুদ্ধিবীণ ছুটি টানা-টানা গোথ, অস্বাভাবিক মাথার বড় বড় চুল কপালে এসে পড়েছে। হৃৎযানি হৃৎযর। জিজ্ঞাসা করলে, বই দেখবেন?

বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, গল্পের বই।

—এখানে নয়। আনুন এইদিকে।

ছেসেটি দেখলাম, যোকানে কোথায় কি বই আছে সব জানে।

আমাকে নিয়ে গেল সে কন্টিনেন্টের বইয়ের সাজঘরে। ঠিক যেখানে যেতে চেয়েছিলাম সেইখানে। লেখকের নাম, বইয়ের নাম, সব তার কর্তব্য।

—এইটে রাখিযা। টলস্টয়, গোলকি, গোগোল, জুস্টভিভিস, শেখর, ইগনিত—কি চাই বলুন!

চাই তো সব। ক’খানা বই-ই বা পড়েছি!

এটা দেখছি, ওটা দেখছি, তন্ময় হয়ে গেছি বই দেখতে-বেথতে, মনে হচ্ছে সবই তিনি। কিন্তু অত টাকা কোথায়? ছেসেটি হঠাৎ বলে উঠলো, পেরেছি।

বলেই সে ঘোটা ঘোটা চাফখানা বই নামিয়ে বললে, এই বইটে দিন আগামি। ইনি বোধহয় এবার নোবেল প্রাইজ পাবেন। শোলসেণের লেখক। এন্ট-রেমন্ট।

সেই ভাল। কত দাম?

ভাবলাম একখানা বইয়ের আর কত দাম হবে? বলুন।

কিন্তু দাম শুনে চমু স্থির! তিরিশ টাকা!

একখানা বই কিন্তু চার ভসুমে লেখা। শায়াব, অটাম, স্ত্রি: আর উইনটার।

বললাম, আজ অত টাকা নেই আমার কাছে। দুটো নেওয়া থাক, পরে দুটো নিয়ে যাব।

সেদিন দুখানাই নিলাম। পরে আর দুখানা নিয়েছিলাম। কিন্তু আদর্শ ছেসেটির দৃষ্টি। সে-বছর এন্ট-রেমন্ট নোবেল প্রাইজ পেরেছিলেন।

ছেসেটি আমার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে নোকান থেকে। খতাবনের কাটিয়েছি একসঙ্গে। মন লাগছে না ছেসেটিকে। দুখান চাকের যোকানে এসে বদলায়। তা পেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার নাম?

ছেসেটি বললে, নৃপেন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

আমার নাম শুনে নৃপেন্দ্রকান্ত বললে, আপনার ‘কমলাহুটি’ পড়েছি। সেদিন নতুন একটা কাগজ বেরিয়েছে—কলোদ, তাতেও পড়লাম আপনার একটি গল্প।

গল্প-ছুটা কেমন লেগেছে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করছিল। সে নিজেই বললে, মন নর। কিন্তু আরও ভাল গল্প লিপতে হবে। আরও অনেক অনেক ভাল।

বলতে বদতে সে তার বস্ত্রমিরি চোপথুটি বন্ধ করে কি যেন ভাবলে, তারপর চোপ খুলে বললে, কন্টিনেন্টের গল্পগুলো পড়ে ফেলুন। পর খুঁজে পাবেন।

নৃপেন্দ্রকান্তকে নিয়ে এলাম কলোদ-আগিলে।

কলোদের বলে আর-একজন ব্যক্তো।

আমাহার্ট স্ট্রিটের বাড়িতে পরমানন্দে থাকা চলে, কিন্তু ওই হট্টগালের মাকখানে বলে লেখা চলে না।

তার ওপর হলো আর-এক বিপদ। আমার বস্ত্র-মসাইয়ের দাসা সারাদিন কাজকর্ম সেরে বিকেলে এসে বলেন তাঁর নীচের তলার একখানি ঘরে। চাকর তামাক দিয়ে যাব। পরমানন্দে বলে বলে পড়পড়ায় তামাক টানেন আর হৃৎয ঘিরে কেউ পায় হয়ে গেলেই বলেন, কে যাবে?

প্রাণে তিনি একই কথ খেয়েন।

সেদিন দেখলাম, আমার এক শালা তাঁর ঘরের হৃৎয ঘিরে শেরিয়ে গেল, তিনি ডাকলেন, তবু সে সাড়াও দিলে না, ধামলোও না।

এ-বাড়ির ছেসেটুলো এমন বে-আসবই কটে। গুরুজন বাহুধ, ডাকলে অস্বস্ত পাতা সেওয়া উচিত। এমন অগ্রাঙ্ক করে চলে বাওয়াটা ভাল দেখায় না।

বাড়ির বাইরে যেতে হ’লে ওই পথ ঘিরে যেতেই হবে। বোধহয় তার পরের দিন। কলোদ-আগিলে যাব বলে বেরিয়েছি। সেহেঁসে ডান শুনে ঘিরে পাড়লাম।

চাটখি সাহেব বললেন, শোনো। ভেতরে এসো।

ঘরের ভেতরে বেতেই বললেন, বোসো।

খর-ঝোড়া নীচু তক্তাপোশ পাতা। তার ওপর ঢালা বিছানা। বললেন, ভাল করে চেপে বোসো।

বসতেই একখানা মোটা বই আমার হাতের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, নাও, দেখি কেমন পড়তে পারো। বের কর চতুর্থ সর্গ।

বইখানা দু'লেই ফেললাম—যোগবাশিষ্ট রামায়ণ।

গুরুজনের আদেশ। অব্যাহেলা না করে পড়তে বসলাম।

১ম পাতা পড় বেই বেমেচি, বললেন, বেশ পড় তুমি! নাও, এবার চতুর্থ সর্গ আরম্ভ কর।

বললাম, আমার একটু কাশ ছিল।

—কাশ পরে হবে। রামায়ণ ছেড়ে উঠতে নেই। গোবিন্দ, চা দিয়ে যা।

সর্বনাশ! চতুর্থের পর পঞ্চম, পঞ্চমের পর ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম।

রাহি ন'টা!

এতক্ষণ পরে তিনি দয়া করে বললেন, এবার থাক। তুমি বেশ পড়তে পার। রোজ এমনই একটু করে আমাকে শুনিবে।

পরের দিন সকালেই আবহাষ্ট প্লট থেকে সোজা ভবানীপুর।

কাচেরি আমার বাড়ি—সুক্টিয়া প্লট। ইচ্ছে করলেই যেতে পারতাম। সেখানেও অবশ্য গুরুজনের ভয়। তবে যোগবাশিষ্ট রামায়ণ নয়। সেখানে রোজ একবার করে বলবে, কাজকর্ম কিছু করবে? না এমনি চৌ-চৌ করে ঘুরে বেড়াইলেই চলবে?

গল্প লিখছি শুনলেই তো হচ্ছে! পায়ে হাত দিয়ে প্রতীজ্য করাবে।—বল—ভীষনে আর কখনও এ-অপকর্ম করবো না!

তার চেয়ে অনেক ভাল আমার সেই ডাঙা নড়কড় শাখারীশাড়ার বেলু!

আমার এক জোঠিতো ভাই থাকতো সেখানে। অ্যাটর্নী-আপিসের কেরানী। সাহিত্যের ধারও ধারে না। কাকেই কি করছি না করছি পবরও দেখে না কোনোদিন। মাসের শেষে মাসের টাকাটা কোনোরকমে চুকিয়ে দিতে পারলেই বাস, পরমানন্দে বাও যাও, সেখা আর ঘুমোও!

কিন্তু ঘুম আর হচ্ছে কই!

কেরানীদের বেলু। ন'টার ভেতর খাওনা-খাওনা খতম। দশটার সব জোড়া।

ভালোম একটু গড়িয়ে মিঠে, তারপর লিখতে বসবো। এখনি নিরিবিলি খাণ্ডোই জেয়েছিলাম যখন-যখন।

যেকের ওপর শতরক্তি পাতাই ছিল। বালিশ একটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু শুতে না শুতেই এ কি ঘরবা? অমল ছায়শোকা এসে আক্রমণ করলে। উঠ বসলাম। কিন্তু আশ্চর্য, কখন যে তারা কৌন্দলিক দিয়ে গালাগো বৃহতে পারলাম না।

চোখ বুঁজে শুয়ে আছি, ঘুম আর আসছে না! হঠাৎ অপরিস্রিত নারীকণ্ঠ!

—ও যা! এ আবার কোথেকে এলো! শুনছেন? উঠুন। ঘর ঝাঁট দেবো।

বড়মড় করে উঠে বসলাম। ঘেসের ভি। ডাকালাম তার মিকে। কিন্তু চোখ কেমনো ঘাব না—এখন চেহারা! পাবের রং ফরলা নয়, বরং কালোই বলা চলে। স্বিত যৌবন বেন মুটে বেরুচ্ছে তার দর অধ দিয়ে। যেমন যৌবন তার তেমনি বাহ্য। মাথায একমাথা মিশমিশে কালো চুল এলো খোঁপা করে বাঁধা, রঙিন শাড়ী ঝাঁটগট করে কোমরে জড়ানো। নিটোল হুটি হাতে মাজে গু'পাছা কাচের রেশমী হুঁচি, কানে হুটো সজা লাল পাখর চিক্চিক করছে। হৃদয়ের মুখে সবচেয়ে আশ্চর্য হুটি চললে চোখ। মেখে মনে হলো দু'ব গরীষ, গায়ে কান্না পড়তে নেই।

হৃদয়ের খাটখানা খালি পড়ে ছিল, সেইখানে দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ঝিঞ্জালা করলাম, কি নাম তোমার?

ঘরের থেকেই সে তখন অল ছিটোচ্ছে। আমার মিকে না তাকিয়েই বললে, বাসিনী।

—কতদিন কাশ করছো এখানে?

—দিন যায়।

বললাম, বেশ আনন্দেরই আছ তাহ'লে!

বাসিনী আপন মনেই কাশ করতে লাগলো। অব্যাসিলে না। আমি চোখ বুঁজে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এবার আর ছায়শোকের আশায় নয়, বাসিনীর আশায় চোখে ঘুম এলো না। বাবে মাঝে চোখ চেয়ে দেখছিলাম সে কি করছে। ঝাঁট পেওনা শেষ করে বালতির মলে ঘর মুছেছে ভাতা দিয়ে। মুহুর্তে মুহুর্তে আমার পাটের কাছে এসে জিজ্ঞাশা করলে, ও-কথা কেন বললেন বাবু?

—কি কথা?

—ওই যে আমনে থাকার কথা।

বললাম, ও কিছু না। এমনি।

বাসিনী বললে, বুঝেছি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি বুঝেছে? আমি খারাপ কিছু বলিনি।

এতক্ষণ পরে বাসিনী সোজা আমার ঘরের দিকে তাকালে। বললে, বাটাফেলের মেনু...

বললাম, হ্যাঁ। এখানে মরতে কি ভুলে এসেছে?

বাসিনী খুব টিপে হাসলে। হেসে আবার আশ্রমমন্ডেই কাজ করতে লাগলো। বাসিক পরে কাজ করতে করতে বললে, আপনি নতুন এসেছেন তাই জানেন না। বাসিনীকে লম্বাই জেনে।

বাসিনীর কাজ তখনও শেষ হয়নি। যেটা লাগিটি হাতে নিয়ে পোরে এসে পাড়ালো পোহুল।

আমি যে আসবো। কিন্তু এত সকাল-সকাল টিক এই সময়টিতে এসে হাজির হবে তা ভাবিনি।

পোহুল থাকে চিড়িয়াখানায়। চিড়িয়াখানার ভেতর চমৎকার বাগানো। জু-মুশারিনটেওউ পোহুলের মাথা।

খাটের ওপর ভাল করে চেপে বসলো পোহুল। ঘরের এদিক-ওদিক ভাল করে একবার তাকিয়ে দেখলে। তারপর পকেট থেকে তার সিগারেট-কেসটি বের করে একটি সিগারেট ধরিয়ে বললে, নাও, সিগ্রেট খাও, খেয়ে শুভো। দুপুরে ঘুমতে নেই।

বললাম, ঘুমেইনি।

—তা জো বুঝেই পারছি। সাবিত্রী নাকি?

উঠে বসতে হলো। বললাম, না ভাই, সত্যিপুরে মতো ভাগ্য নিয়ে জন্মাইনি। তবে সাবিত্রী না-হোক, সত্যি নিশ্চয়ই।

পোহুল বললে, অনেকগুলি বিব এখানে তপস্যা করছে। সত্যি যেচারা আগেই না দেহত্যাগ করে!

এমনি আরও কি যেন সব কথা হয়েছিল এমন আর মনে নেই।

বাসিনীর কথা এখানে অবাস্তব মনে হতে পারে, কিন্তু অবাস্তব সে নয়। বাসিনীর মতো মেয়ে স্বাক্ষর আমি খুব কমই দেখেছি। শাশুরীপাড়ার মেলে আমি অনেকদিন ছিলাম। পরে তার কথা আবার বলবো।

পরে তাল্লা বন্ধ করে পোহুলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘরের চাবি থাকে বুড়ো নিবাসন-চাকরের কাছে। পানসেই মোবি-মহলা। টেনিসা মোশানীর ঘরে দুপুরে কান্ড

ইদ্রি করে নিবারণ। নিবারণকে ঢেকে চাবিটা দিয়ে এলাম।

ভবানীপুর থেকে বাব পটুয়াটোলার, অথচ প্রেমেন সঙ্গে থাকবে না, হ’তেই পারে না।

অভিজ্ঞা না-হয় কলেজ থেকে সোজা চলে যাবে কলো-আপিস, কিন্তু প্রেমেন আমাকে বুঝতে এসে দেখা পাবে না, তার চেয়ে পোহুলকে বললাম, চল, প্রেমেনকে ঢেকে নেওয়া যাক।

পোহুল বললে, তাহ’লে এসো তোমরা; নিউ-মার্কেটের ফুলের সোফানে। আমি সেখানেই থাকবো।

নিউ মার্কেটে পোহুলের মানার ফুলের ষ্টল। সেখানে তাকে রোজ একবার করে যেতে হয়। পোহুলকে টানে চড়িয়ে দিয়ে আমি চললাম মিত্র ইন্সটিটিউশনের দিকে।

মুন্সীলা (মুন্সীপার বহু) তখন মিত্র ইন্সটিটিউশনের টিচার। মুন্সীলাকে বরটা দিয়ে আমি বাব হরিন চাটোখি ষ্ট্রীটে। প্রেমেনের বাড়ি।

প্রেমেনকে প্রথম যেদিন বুজে বের করি, সেদিনও টিক এমনি করে এই পথ দিয়েই গিয়েছিলাম। সেও এক ভাবি মহার খটনা।

মুন্সীলার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়টাও ভাবি মহার। আমি তখন বীরভূমের রূপশীপুর গ্রামে। মনের আনন্দে শিববো বলে চল সেছি বীরভূমের এই অখ্যাত গ্রামটিতে। বীরভূমের একেবারে পশ্চিম-প্রান্ত-সীমায়, পাওতাল পরগনার গায়ে। ছোট গ্রাম, উচু-নীচু তেউ-খেলানো মাটি, দক্ষিণে শাল ভাল তমাল মহা আর হরীতকীর জঙ্গল, দেওতও ভাল, নাখটও ভাল। রূপশীপুর। কিন্তু রূপশীপ দেখা কমাচিৎ ফেল।

সেখান থেকে গঙ্গ পাঠাই, কলকাতার পর-পত্রিকায় ছাপা হয়, কেউ-বা কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দেন, কেউ-বা দেন না। গ্রামে পোষ্টাশিপ নেই। জঙ্গল পার হয়ে ক্রোশ-দুই ঘুরে পোষ্টাশিপ। সেখান থেকে শিওন আসে লম্বাহে হু’দিন। কাঙ্কেই লেখা পাঠাবার জন্যে যাকে যাকে নিজেকেই বেতে হয় পোষ্টাশিপে। না গেলে মনিমর্জার পেতে পেতে হু’তিন হস্তা পেরি হয়ে যায়। ভাল ভাল পত্রিকাগুলি তো পাওরাই যায় না। আবার সেখানেও এক বিশদ। বুড়ো এক জহলোক তখন পোষ্টা-মাস্টার। সব সময়ই সেপি বরজা বন্ধ। ঘরে বিল বন্ধ করে কাছ করেন। সরকারী কাছ। কুল হবার মতো নেই। জানলার পশে কিছু বললেই খেকিয়ে ওঠেন। বলেন, কাঙ্কের সময় বিরক বোঝো না। পাড়াও।

আবদুসসার আগে কোনোদিন তিনি দরজা খুলেছেন বলে তো মনে পড়ে না।

হুপুরে এই, বিকেলে আর-এক কড়াট! প্রাণই যেমি দেবে ততো বন্ধ করে তিনি কোনোদিন যান ছাপল খুঁজতে, আবার কোনোদিন-বা সেমি কানার লায়োগার সঙ্গে হসে হসে গল্প করছেন। লড়া করে একবার আহন, বলবার উপায় নেই। তৎক্ষণাৎ জবাব দেবেন—আমি কারও বাবার চাকর নই!

প্রাণই হাই, খুঁচেনা হয়ে গেছে। হুপ করে গাড়িয়ে আছি হেবে আসেন শেষ পর্যন্ত। মোর ফুলে ঘিরে বলেন, বাটের তলায় আছে, নিগে যা। যেখিন বেন আর-কারও চিঠি যেহে লিখ না।

সেরি কতবার উপায় নেই। অল্পেরে ভেতর দিয়ে পথ। বাবের ভর না থাকলেও, বুনা মুখাবের ভাষা আছে।

এই পেন্সিণিসের আলার গ্রাম ছেড়ে পালাই পালাই করছি, এমন দিনে অপরিচিত এক ভুলসোকেই একখানি কামের চিঠি পেলাম।—আমার লেখা সব গল্পই তিনি পড়ছেন। তাঁর খুব ভাল লাগছে। ‘সংহতি’ নামে ছোট একটি মাসিকপত্রিকার সম্পাদক তিনি। একটি গল্প চেষ্টাছেন ‘সংহতি’র মস্ত। ইনিই মুরলীধর বহু।

নির্ধাক্ত অবস্থায় বাস করছি পল্লীগোমে। এ-হেন সময়ে এইরকম চিঠির দৃশ্য যে কতখানি তা আমি ভুলভাঙাই, আমি জানি। চিঠির জবাব দিলাম। গল্প পাঠালাম।

চিঠির পর চিঠি। চিঠিতেই পরিচয় খনিট হয়ে উঠলো। মুরলীধর ‘মুরলীধা’ হলেন। এ রকম সাহিত্য-রসিক, এরকম ছন্দবান নাগর আমি খুব কমই দেখেছি।

কলকাতার আসবার ভক্ত মন খুব ঢকল হয়ে উঠেছে, এমন দিনে মুরলীধার একখানি চিঠি পেলাম। লিখেছেন, গত মাসের ‘প্রবাসী’তে ‘ভদ্র কেরানী’ নামে ছোট একটি গল্প চাপা হয়েছে, গল্পটি পড়ে দেখবেন।

গল্পটি পড়লাম। একবার নয়, দু’বার।

পড়েই হটকেনেট গুহিরে কেললাম। মুরলীধাকে চিঠি লিখলাম, কলকাতায় থাকি।

মুরলীধা তখন ‘ভদ্র কেরানী’র লেখক প্রেমেন্দ্র দিওয়ের ঠিকানা পর্যন্ত সংগ্রহ করে ফেলেছেন।

হরিন মুখার্জি ব্রোড থার থাকি মুরলীধা আর আমি—প্রেমেন্দ্র দিওয়ের সন্ধানে হরিন চ্যাটার্জি স্ট্রিটে।

হরিন মুখার্জি আর হরিন চ্যাটার্জিকে আমরা পোলমাশ

করে কেলেছিলাম। হরিন মুখার্জি রোডের ওইরকম একটা নখরের বাড়িতে গিরে কড়া নাড়তেই বেহিরে এলেন এক অধিষ্ঠারসার বৃদ্ধ, গলায় ঠিক মালায় হতো একগোছা শৈতে, আর সেই শৈতেই মাথখানে সোনার একটি আংটি ফুলছে। ভিজালা করলাম, প্রেমেন্দ্রকে চেকে দিন তো?

খিড়িরে উঠলেন ভুলসোকে।—কি বললে? প্রেম? কামিল ছোকরা! ইয়ারকি হচ্ছে?

বললাম, আজ্ঞে না, প্রেম নয়, প্রেমেন্দ্র।

কিন্তু কে ভনবে লে-কথা? দরজা তখন তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন।

মুরলীধা বললে, হরিন চ্যাটার্জি স্ট্রিট একটা আছে কিন্তু গলার ধারে। চল একবার সেইখানে চেষ্টা করি।

সেইখানেই থাকি, দেখলাম কল্যাম বোস খাট রোডের ওপর ঘিরে হু’জন আসছে গল্প করতে করতে।

আমি বলে উঠলাম, ওই প্রেমেন্দ্র কিয়! ভিজালা করবো?

মুরলীধা এ-সব গছন করে না। বললে, আবার খিড়নি ধাবো।

আমার ‘কিন্তু বেশ লাগে। ‘খাই তো খাবো’ বলে এসিয়ে পেলাম।

—হরিন চ্যাটার্জি স্ট্রিট কেনেটা বলতে পারেন?

হু’জনেই গাড়িয়ে গড়েছে।

—কত নখর খুঁজছেন?

বললাম, ফিফটি-সেভেন।

—আপনার নাম?

বললাম, শৈলভানন মুখোপাধ্যায়।

—কিন্তু, আর যেতে হবে না। আমি-ই প্রেমেন্দ্র কিয়। আর-টার খাবার জমে মুরলীধা তখন একই হয়ে থাকিয়ে।

বললাম, ভব নেই মুরলীধা, এসিয়ে এসো। ইনিই প্রেমেন্দ্র কিয়।

প্রেমেন্দ্র বললে, ইনি অতিষ্ঠা সেনগুপ্ত।

মুরলীধা হাসতে হাসতে এসিয়ে এসো। বললাম, ইনি মুরলীধার বহু। ‘সংহতি’ পত্রিকার সম্পাদক। পরিচয় হোক, পরে বুঝতে পারবেন ইনি কে।

প্রেমেন্দ্র বললে, উহ, ‘আপনি’ নয়, ‘তুমি’।

বাস, সবে-সবে ‘তুমি’। একদিনেই অস্তর।

সবাই দিলে বললাম গিরে হরিন-পার্ক।

উঠলাম বাজে।

ভাষ্যর দিনের পর দিন।

এমনি করে হুগেছিল প্রেমের আর অস্তিত্বের সূত্র পরিচয়।
কল্লোলের বলে আর-এক ছোড়া মেথক বাড়লো।

কল্লোলে সেগকের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এমন হ’লো যে
দশ-নব্বার বাড়ির বাইরের ঘরে আর ঠাঁই হলো না। পাবেই
আর একখানা ঘর দেওয়া হলো। এঁদের সন্তানের কথা আমি
বলবো না। বলা সম্ভবও নয়। অস্তিত্বহুমার সে অভাব
আমাদের পূরণ করে দিয়েছে ‘কল্লোল ধূম’ লিখে।

আমি লিপাধা আমার কথা।

আমার লুকে হারা ভড়িয়ে আছে তাদের কথা।

এক এক সময় মনে হয় ভড়িয়ে নাই কে? আধুনিক
কালে হারা ঈর্ষান্বিত, হারা আপনাদের স্নিগ্ধ লেখক, সবার
সঙ্গেই তো আমার যোগাযোগ। সেমিক নিয়ে আমি সত্যিই
ভাগ্যবান। কি ভালবাসাই না তাদের আমি পেরেছি!
দেইটুই আমার ইহজীবনের সখল।

তাদের সবার কথাই বলবো। বলবো তারাপ্রবন্ধের কথা,
বলবো প্রেমের কথা, বলবো সুপ্রেমিকের কথা, বলবো
অস্তিত্বহুমার কথা। এখন বার কথা মনে পড়বে, তখন
তার কথা বলবো।

ধনম না এই অস্তিত্বহুমারকে।

বই খাড়া হাতে নিয়ে রোজ আসে কল্লোল-আগিনে।
ফটার পর ফটা আজ্ঞা মারে। গল্প লেখে, কবিতা লেখে।
ডাম্‌ডাম্‌, ছোঁড়াটা কলম পালিয়ে এইখানে এসে, গেল খাটি
হয়ে! বলডাম্‌, তুমি ডাঙা কেন? করবে অস্তিত্ব, কেন
মিছেমিছি কল্লোলের বাইনেটা বিজ্ঞ, নামটা কাটিয়ে নিয়ে
এইখানে নাই লেখাও।

এই নিয়ে কতদিন কত কথা বলেছি তাকে। অস্তিত্ব
জবাব দেয় না, শুধু হাসে।

ভাষ্যর একদিন সেখান থেকে ওই বই-খাড়া ছেলে অস্তিত্ব-
হুমার সবাইকে অতিক্রম করে একেবারে সন্তানের পুরোভাগে
এসে গাঁড়িয়েছে। এম-এ আর ল’ দুই-ই একসঙ্গে।

সেই অস্তিত্বহুমার আজ সেলম-ব্রহ্ম। কানির হুম
মিতে পারে সে।

আমকাল কিছু বললে বলে, সবই হয়েছে ঠাকুরের দয়ার।
হামকলমের পরম ভক্ত অস্তিত্বহুমার। আমাদের
সাহিত্য-সাবী শ্রবতম বন্ধু। এই আমাদের গর্ব।

‘কল্লোল’-এর চলছে তখন তৃতীয় বর্ষ। গোহুলের টি-বি
হুগেছিল। গার্ভিসি-এ গিয়েছিল। লুকে ছিল পবিত্র।
সেইখানেই হারা গেছে। দীনেস একা।

কল্লোল-আগিনে তেমনি সগরম। দ্বিতীয় সংখ্যা
অগণিত। লেখক-বন্ধুর সংখ্যাও কম নয়। তেমনি আজ্ঞা,
খাওয়া-দাওয়া, বৈঠক-সবই চলছে। অথচ এত বন্ধু-পরিচয়
হয়েও হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম দীনেস তার শ্রিত্তম বন্ধু
গোহুলকে হারিয়ে কেমন যেন নিঃশব্দ—কেমন যেন একা
হতে গেছে।

শিল্পী চিত্রকালই একা। তার ওপর দীনেস ছিল
চিত্রকুমার। বিয়ে-খা করেনি, আগে ছবি আঁকতো আর
আপনমনেই গান গাইতো। কল্লোল বের করে মনের একটা
আশ্রয় পেয়েছিল।

গোহুল চলে যেতেই সে আমদের ওপর দীনেসের তেমন
আস্থা হইল না।

আমকাল দেখছি তবু লোকমন কিছু কিছু পড়ছে। আর
তখনকার দিনে? তিন বছর কাগজ চালাবার পরেও
দীনেসকে সেমি বলতে শুনলাম, আর ভাল লাগছে না
পৈলজা, খরে-বাইরে গালাগালি আর সইতে পারছি না।

চুপ করে শুনে গেলাম। সেইদিনই প্রথম শুনলাম,
কল্লোল তখনও নিজের পায়ে দাঁড়ায়নি। অর্থাৎ মাসে
পঞ্চাশটি টাকার বেশি কল্লোল মিতে পারে না। অথচ
কল্লোলের আশিষের বরচ চাটিয়ে লেখকদের কিছু কিছু মিতে
না পারলে দীনেস যেন অস্তি পাচ্ছে না।

দীনেস বললে, কল্লোলকে আঁকড়ে ধরে আছে। তোমরা,
তাই কল্লোল চলছে। কিন্তু কল্লোল তোমাদের কি দিলে?
শেতে দিলে না পরতে দিলে না, দিলে শুধু নিকা।

‘ভারতবর্ষ’ আমার লেখা প্রাণই ছাণা হচ্ছে। হরিদাস-
বাবু ভাল টাকা সিঞ্ছেন। এত ভাল যে, এক এক সময় সবেহ
হয়েছে—এটা গ্রিক লেখার দাম নয়। আমাকে তিনি
ভালবাসেন বলেই বাজার-ছাড়া দাম বিচ্ছেন।

দীনেস একদিন ভারতবর্ষ-ছাণা আমার একটি গল্প পড়ে
বললে, এ-গল্প কল্লোল কোনদিন পাবে না তা জানি। আর
সেইকাজেই মনে হয় কাগজটা তুলে দিই।

কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি—কল্লোলে এমন-সব গল্প ছাণা
হচ্ছে—গল্প হিসাবে দামের খঁড়া দেওয়া চল না। আর
সে-সব গল্প খেয়েমের লেখা।

প্রেমেরও সেটা লক্ষ্য করেছে দেখলাম। প্রেমের বললে,
কল্লোল এবার গেল!

দীনেসকে বললাম। দীনেসের কেমন যেন উদ্ভ-উদ্ভ ভাব।
আগিলে প্রাণই থাকে না। অস্তিত্ব (ওপরলপ সেনের ছেলে)
আর পবিত্র ওপর বেখাশোনার তার দিয়ে সরে পড়ে।

প্রমোদকে সৌন্দর্য এড়িয়ে যেতে চাইলে। তারপর বললে, দিনা পদ্মার ওর চেয়ে ভাল লেখা পাওয়া যায় না।

বলল সে পাণিয়ে গেল আশিষ্ট থেকে।

মাসের পর মাস করোলে সেইরকম লেখাই ছাপা হতে লাগলো।

অভিভাবকে বললাম। অভিভাব বললে, এক বছরটা যেমন চলছে চমক, আগছে বছর থেকে আমি তার মেসো করোলের। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো।

প্রমোদ আর আমি অল্প খপ্প দেখছি। আমার পড়া-পোনা ছিল খুব কম। আর প্রমোদ ছিল ঠিক তার বিপরীত। বিশেষ সাহিত্য তখন সে অনেক কিছু পড়ে ফেলছে।

দু'জনেই হাফি জুবানীপুরে। খুব কাছাকাছি। সিনহারির প্রায় অধিকাংশ সময় একসঙ্গে কাটাই। কত কথা হয়। সব সাহিত্যের কথা। সাহিত্যই ধ্যান-জ্ঞান। সাহিত্যের আলোচনার আর চিন্তায় আমরা তখন তন্ময় হয়ে গেছি। অগুই বনে হয়, দূর ছাই! এতদিন কি-সব লিখেছি ছাইতম। আবার নতুন করে লিখি। নতুন করে জীবন আয়ত্ত করি।

তখন কতই-বা আমাদের বয়স, আর কতটুকুই-বা মেখেছি জীবনকে!

আমি লিখলাম 'মহাত্ম্যের ইতিহাস' (গ্রামকে গ্রাম), প্রমোদ লিখল 'পাক'।

'মহাত্ম্যের ইতিহাস' দিয়ে এলাম প্রবাসীতে। প্রবাসী ফেরত গিলে। জীবনে এই প্রথম আমি লেখা ফেরত পেলাম। এর আগে আমার কোনও লেখাই কোনও পত্রিকা থেকে অমনোনীত হয়ে আসেনি। তাই বলে অমনোনীত হবার মতো মন লেখা যে লিখিনি তা নয়। মনই ছাপা হচ্ছে।

মুরলীধা বললে, চিত্রচিত্রিত সাহিত্যের পথ থেকে তোনরা একটু সরে এসেছ। তোমরা স্বতন্ত্র। তোমাদের এ বিদ্রোহ যাহা সন্থকে ঝাঁকুর করে মেঝে না।

মুরলীধাই প্রজাবটা প্রণয় করলে, আমরা একখানা কাগজ বের করি এলো।

করোলে থাকতে সেটা কি সম্ভব?

মুরলীধা বললে, কেন নয়? করোলের সঙ্গে আমাদের কোনও বিরোধ নেই। তোমাদের একটু বেশি ষাটতে হবে। করোলেও লিখতে হবে।

নিশ্চয় লিখবো।

সাহিত্যের দিন-যজুরি করতে তখন আমরা নারাজ নই।

কিন্তু টাকা? কাগজ বের করতে টাকার দরকার।

বরসা এজেন্সীর শিশির নিয়োগী তখন আমার একখানি গল্পের বই বের করেছেন—'অতলী'। ততলোক শিক্ত। এম-এ বি-এল। আমাদের লেখার বিশেষ অঙ্গুষ্ঠাণি। মুরলীধা তার সঙ্গে কথা বলে তার পরের দিনই আমাদের আনিবে বলে, কাগজ বেঁকেবে। সম্পাদক হবে তোমরা দু'জন।

মুরলীধা নিজেই প্রথমে বাঁধ দিতে চেয়েছিল। আমরাই বাঁধী হলাম না। সম্পাদক থাকবে তিনজন: প্রমোদ, আমি আর মুরলীধার বহু।

এইবার চাই কাগজের নাম।

প্রমোদের মাথা এ-নব ব্যাপারে সব সময়েই পরিভাব। শুৎকশাৎ বলে বললো: কালি-কলম।

'কালি-কলম' বেছেলো।

একহাজার কপি, তিন দিন পরে বেখলাম, একখানিও নেই। সব বিক্রি হয়ে গেছে।



ক্যানিঙের সিদ্ধ মাঝি

অশীষ কায়

তুনেছি সহজে কিছু মেলে না লগাবের,
পুষ্ট কামনার খানে গবি নাকি তার
অর্থ ক'রে নিতে হয়। তাই চাবে ফসল, বনিতে
খাতু আগে বের রকে। মাগবের ঘর
আধিন অরণ্য থেকে জানের প্রেমের
কতো ভক্ত পড়ে তাতে বেজে ওঠে তাই
কঠিনেরি বনবার ভেরি।

কিন্তু কী অবিখ্যাত বৃদ্ধ যে তখন,
একা বহি কেউ তার মাটিভোবা রখে ঢাকা থ'রে
বস্ত্রকে এগিয়ে নিতে চায়।
ক্যানিঙের সিদ্ধ মাঝি নদীর উপরে
সময়ের সব অগ্র বৃকে নিয়ে তবু
বাঁচে সেই মত্ত অজীণার।

মাছেরা পেণা তার। মাল আর অসের লগতে
বোঝনে সে বুঝাস। কতো-না মোড়ল
দেখে নিয়ে গেছে তাকে সমুদ্রের নীল মোহনাঘ।
অন্ধকারে কান পেতে ব্রত বোঝা মাছের চিংকার
তুনেছে সে, মেনেছে কোথায়
কাঁকে কাঁকে ছুটে চলে মাগবের রূপালি আহার।

কিন্তু বাড়ী ফিরে তবু বছর বছর
একা তার ঈত কাটে মলিন কাণে।
ভাঙনের ভরা চাঁদ বাঁধের বাগানে হীরা জেলে
জেগে থাকে অশলক। 'কি' 'কি' তাকে মায়ের ভিতর।
মনে হয় কিছু নেই, কেউ নেই, মৃত তার ঘর।

অথচ নারী যে রয়, দুর্লভ, বিশেষ
তাদের সমাজে, তাই সম্ভাবিত ব্যক্তা স্বত্ত্বেরা
বহুরে দুয়ার তার দক্ষিণ বাড়ার।
কতো কত্না বিনে গিনে যালিকা, কিশোরী,
কিন্তু সে বখনি চোখ তুলেছে, সবাই
মাথার বোমটা তুলে চলে গেছে অস্ত্রের ডিটার।

বয়স পড়িয়ে আয়। নিজে আসে দাহ
শরীরে, অথচ তৃষ্ণা মনে, একী জালা।
এল না, এল না তার রক্তের গভীর প্রতিধ্বনি
আর কারো বৃকে বেজে। শারীরাত তাই
সঠ নাষ্টকর মতো সিদ্ধ মাঝি খোরে ঢেউয়ে ঢেউয়ে
জাল কেনে। চোখে ভাবে প্রব্রের ঝাঁচল।
এ জীবনে কঠিনের দারুণ বহনে
কী পাবে সে, জুগা না পরল!

আমেরিকার চিঠি*

শ্রীমন্তকুমার বসু

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
বার্কেলে, ১২ই অক্টোবর ১৯৭৭

প্রশান্তিপ্রসূ,

আমেরিকার এসে প্রথমেই খেতে চোখে পড়ছে সেটি হ'ল, শহর বা মাঠে পাখির সংখ্যা আমাদের দেশের চেয়ে কম। শত শত মোটরকার কচাঁয় পকান বাট মাইল বেগে চলার ধারার মতো শব্দ শিরে চলছে। অল্প এক্ষণে মোটরকার হ'ল বাজানোর বীতি নাই; নিত্যকাল আকস্মিক কারণে দরকার না হ'লে কেউই হ'ল বাজায় না। তা সবেও হু হু শব্দে গাড়ির পর গাড়ি এমনভাবে চলে যে, প্রথমে কয়েকদিন অনবরত এই শব্দটাই কানে গুলতে শোভায়। একজন বৃদ্ধ বৃত্তান্তবিশেষ সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, 'ধরাতোত নদীর ধারে ঘাড়া থাকে তারা যেমন নদীর শব্দ কুলে বায়, অকস্মাৎ কোন কারণে শব্দ বন্ধ হয়ে গেলে যেমন তাদের মনে হয়, কিসের মনে অভাব ঘটেছে, আমাদেরও হ'লতো মোটরকার শব্দ সন্ধে পেইরতম ঘটেছে। আগনি নতুন এসেছেন বলে, প্রথমে ঐ শব্দটাই কানে লাগছে।'

ছাে, মিশ্রী, শিকর, সবাই গাড়িতে কাজে বাতায়াত করেন, বাতায় দুধারে সর্বদাই কাকর না কাকর গাড়ি গাড়িয়ে আছে। গ্যারেজ বলে শব্দই নেই। সন্ধ্যও নয়। আমেরিকার সড়করা কোটি লোকের সাত কোটি গাড়ি। ক্যালিফোর্নিয়াতে আরও বেশি। বড় লোক, গাড়ির সংখ্যা তার মধ্যেকেরও বেশি। এক মহিলা বললেন, 'আমাদের "ভাতীর সমুদ্র" হ'ল গাড়ি কোথাও পার্ক করা যায়!'

রাজদিক ধর্মের চূড়ান্ত। অপরিমিত স্থানের সন্ধান

মাত্রই ছুটে চলেছে। এসেছে একটি কথা প্রচলিত আছে। 'We do not know where we are going, but we are on the way.'—'আমরা কোন্ দিকে চলেছি জানিনা, কিন্তু আমরা চলেছি।' নিষেধ দিকে আদ্য-বিজ্ঞানসার ভ্রম তাকিয়ে দেখতে বেন এসেছে ভয় হয়, কি জানি জন্ম ঘনি বন্ধ হয়ে যায়!

বায়ের মন চকচকে গাড়ি ও বাড়ির ভায়ে স্নান, গুণ্ডা অল্প একটি বাফা ধরেছেন। হুটির নির্মাণ করার স্নান মনসের কাঠ ব্যবহার করে ডাতে বন না গিয়ে কাঠের খাতাবিক বন বজায় রেখেছেন। রেড-উড নামে একটি কাঠের ব্যবহার অনেক আয়গায় দেখলাম। আবার অনেক বাহুবের হাতে গড়া মিনিসের বিল্ডিং মনে মনে বিস্ময় ক'রে গাছপালা, মাটি, পাখী, ফুলফল প্রকৃতির প্রতি বেন একটি পৃথার ভাব (oult) পড়ে তুলেছেন। আবার অস্বাভাবিক মরীচিকা আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশের সভ্যতার মধ্যে আরও অনাবিল প্রকৃতির সন্ধান করছেন—যেখানে তাদের ধারণা মাত্রই নিষেধ গড়া ঐশ্ব্যের ভায়ে চোখা পড়েনি।

বার্কেলেতে ভারতবর্ষের সন্ধ্য বয়েই অস্বাভাবিকতা দেখতে পাচ্ছি। ওয়াশিংটনে সরকারী গ্রন্থাগারের বাইরে ভারতবর্ষের সন্ধ্য এত বড় হইয়ের স-গ্রহ আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। ভারত থেকে বান হুড়ি বৈদিক সংবাদপত্র প্রত্যাহ আসে, এবং তার থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রত্যাহ সংগ্রহ ক'রে, কয়েকশাল অক্ষর এ'রা পুস্তিকা বা'র করেন।

বার্কেলে, ২০শে অক্টোবর ১৯৭৭

প্রশান্তিপ্রসূ,

সম্প্রতি একটি স্ট্রাট নিরেছি, মাসে বাট ভলার ভাড়া। পাট বিছানা, বাবার স্নান গ্যাসের উত্থন, রেফ্রিজারেটর, গ্যাসের ব্যবস্থা, আমা কাপড় ইত্যাদি করার টেবিল—সমস্ত

ব্যবস্থা এইই মতো। বেশিটাই হাইড্রোকারের বেশ হ'লেও অধিকাংশ বৃহৎ দুই বা তিনতলা বাড়িতে থাকে। বাড়ির ঘর, পাশে একটু বাগান করা—ব্রী-পুকুরে মিলে করে; এবং বাড়িকে স্থল করে গছিয়ে রাখতে সকলে মনো

* 'বকী' সাহিত্য পরিষদ'-এর সম্পাদক শ্রীশূরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে নিখিত

পরিভ্রম করে। কুলী বাড়ানো সহস্রের পক্ষে প্রায় সম্ভব নয়; কারণ বর্তমানে সাড়ে তিন ডলারের কম মজুরি দেওয়া আইন অঙ্গণারে নিষিদ্ধ। এক ডলার মানে চার টাকা ব্যয়ো খান।

রাষ্ট্রাভ্যাসের ব্যবস্থা এরা একেবারে সহজ করে ফেলেছে। তরিতরকারি থেকে মাংস পর্যন্ত চীতা, আর্থলিক বা পুরা রান্না করা অবস্থায় পাওয়া যায়। খার খেদন দরকার, সেইভাবে কিনে নেয়।

...

বিষয়বিশালকে বক্তৃতাটি আরও করেছি, কাজের চাপ কিছু নাই, নিজের সুবিধা বা কঠিনতা বক্তৃতা দেওয়া। সম্রাতি ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্যের সম্বন্ধে বলতে হ'ল। বক্তৃতা ও পরবর্তী চর্চায় প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লাগলো। তীর্থ-দর্শন, সন্ধ্যা ও বর্ণ-ব্যবহারে রান্না সারা ভারতকে একই বর্ণ ও সমাজ-বন্ধনে কি করে বাঁধা হয়েছিল, তার বিস্তারিত আলোচনা করলাম।

আজ যে ভাষাগত রাষ্ট্রা ও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে

বিবার ও সাক্ষীর্ভতা দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে বলতে হ'ল, এটা প্রধানতঃ মধ্যবিত্তদের চাহুরিগত সমস্যার সঙ্গে জড়িত। রাষ্ট্রা-সরকারি আর্থ বৈশিষ্ট্য ভাগ কাজের ভার নিজের হাতে নিচ্ছেন। দ্বিতীয় চাহুরিগতীয়রা রাষ্ট্রা-সরকারের কাছে কাজের জন্য 'পদত্যাগিক' লবিও জানাচ্ছেন। সেই সঙ্গে অবদমন করে তারা ভারতে আর্থ বণ্ড বণ্ড রাষ্ট্রো অন্তর্জাত-জাতীয়দের 'প্রবেশ নিষেধ' ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অর্থও কেন্দ্রবস্ত্র, রাজনৈরাগণ বহু, কুদ্রব, বচিষ থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকলে এক জাতি, এক গ্রাম গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

দ্বিতীয়রা 'পূর্ণাং-প্রবেশ' ও ব্রজেনদাস 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দু'বই জড়াত্যাগি পাঠ্যেতে পারেন? উন্মত্তিগত শতাব্দী সম্বন্ধে পরিচয় যে কাম করেছেন, তার বিবরণে প্রায়ই বলতে হচ্ছে। হয়তো এখানকার গ্রন্থাগার থেকে সাহিত্য-সাধক-চরিত্রমালার কলমাস হবে।

সজনী, ভাষাগতের প্রকৃতি সকলকে নবজ্ঞার সন্দেশ।

বার্সে, ২৮শে অক্টোবর ১৯৫৭

পাট্টা,

সাধারণ মানুষ এখানে স্ত্রীরের প্রয়োজনের দিক থেকে নিতান্ত স্বল্পে আছে। বাওরানগর, ফটেই পরিভ্রম করা ও অবদর বিনোদনের জন্য বেডিও, টেলিভিশনে বসে বাক্স নাচ গান বা ফুটবল খেলার ছবি দেখে, সংবাদপত্রে লোমহর্ষক সংবাদ পড়ার সময় বেশ কেটে যায়। তা ছাড়া আরও একটু দার্শনিক গোছের কাম হ'ল বাগান করা, কুদ্র পাহাড়ে বা নদুদ্রের ধারে বেড়ানো, ইত্যাদি। এই সব নিয়ে মানুষ মোটের উপরে স্বল্পে বা সন্তোষে আছে।

তরুণদের মধ্যে ছেলেমেয়েদের বোলাবোলা একটু সহজ ও শিথিল। জীবনে তাই স্রাস্তির ভাব কম। একজন সমাজতাত্ত্বিক বললেন, আমরকাল হুঁচি-পতিশ বছর বয়সের কমেও ছেলেমেয়েদের বিয়ে বেড়ে গিয়েছে। আর সন্তান-সন্তান-নির্যোগের চেষ্টাও কমে গেছে। এর মধ্যে, হুঁচকায় আমেরিকায় এটি বিশেষভাবে চোখে পড়ছে। আর এক সমাজ-দার্শনিকের লেখার পড়লাম, তাঁর মত হ'ল, কতকাল ধরে থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ এইভাবে প্রকৃতি ও প্রেমের রাজ্যে নৃতন পার্থক্যের সন্ধান করছে। হস্ত হতেও তাই।

কিন্তু এ ছাড়াও যে মানুষের মনে অন্তর্জাত ভাব বা ভয়

বর্তমান তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এদের উচ্চমানের জীবনযাত্রা এবং সুবিশুদ্ধি পাড়ে খোঁচা যায়, এ বিষয়ে দ্বন্দ্বের ভয় আছে। কমিউনিজমের সম্পর্কে মেনব্যাপী বিমুদ্রতার মূলে হয়ত এই ভাব অনেকেই বর্তমানে। এশিয়াবাসীরা সংখ্যার সংসারকে প্রাণিত করবে, এবং তখন তাদের দার্শনিকের বক্তার মধ্যে আমেরিকার সন্ধানের উচ্চ মান বজায় রাখা সম্ভব হবে না, এ ভাব বেশ ভাল ভাল অনেকের মনে আছে। আমাদের দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানেরা যেমন সংখ্যাগুরুরা আওতাধীন সত্য বা মিথ্যা ভয়ে শক্ত দানদীর্ঘা পোড়িতে পরিণত হয়েছিল, আমেরিকানরা চারিত্রিকের পৃথিবীর ব্যতিক্রমের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে সংস্কৃতির প্রতি বেন আরও গভীর অধ্যয়নকে একটা সংকীর্ণ অহমিকাকে আশ্রয় করছে।

অবশ্য একটা দেশের সকলে এরকম হতে পারে না। নানারকম মানুষের সন্ধান পাচ্ছি। এমন ছোট ছোট দলের পরিচয়লাভ হচ্ছে, ধারা অ্যাটম-বোমার বিকল্পে সত্যগ্রহ করেন; আমেরিকার সম্পদ সমগ্র বিশ্ববাসীর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার লক্ষ্যপাতি। এইরকম একটা প্রতিষ্ঠান গাঙ্কীদ্বীর সম্বন্ধে, বিশেষ করে সত্যগ্রহের নীতি ও কৌশলের বিষয়ে গায়াবাহিকভাবে বলবার জন্য আবারে নিয়ন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বার্কেল, ১২ই জ্যৈষ্ঠাবদি ১২৮৮

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন

প্রকাশ্যে—

পাইল, আপনাব পাঠ্যবো বইগুলি সাহিত্য পরিষৎ থেকে পৌছেছে। এবার বাংলাদেশের বিষয়ে বেশ-ব বক্তৃতা দিয়েছি সেগুলি লিখে ফেলোনা।

মানা দেশের সম্বন্ধে আমেরিকায় যেমন কৌতূহল আছে, মানা ভাষা শেখারও তেমনি খিট্র ব্যবস্থা আছে। ভাষা শেখার জন্য গ্রামোফোন রেকর্ডের এখানে ছড়াছড়ি। ফরাসী ভাষা ছোট্ট ছেলোমেয়েদের জন্য বড়টুই দরকার, অথবা শুধু ব্যাক্সিসের জন্য বড়টুই দরকার, বা সাহিত্যমোদীসের জন্য বেতায়ে দরকার, তার জন্য আলাদা রেকর্ড, আলাদা পুস্তিকা পাওয়া যায়। পরিব্রমের জন্য এই ধরনের দু-তিনটি ভাষা শেখার কিছু বই পাঠ্যবো। যদি কাকর খোলা হয়, তাহলে বাংলা বা হিন্দী শেখবার জন্য এইরকম বই লিখতে ফেলতে পারেন।

বাংলাদেশ ও ভারতীয় সংস্কৃতির বিষয়ে বেশ-ব বক্তৃতা লিখা, তাতে অংশগ্রহণকার পরিমাণ দেখে ভাল লেগেছে।

সমস্ত জীবনী এসের বাহুসে—অত্যন্ত বক্তৃকত্ব দ্বিনিস দিয়ে ছোট্টা থাকলেও, ভিতরে অসুস্থির আভাস নানা ভাবে দেখতে পাচ্ছি। রাজনৈতিক বিকার ত্যাগিক মধ্যেও হয়, আবার সাহিত্যিকতার মধ্যেও তাই কিছু প্রকাশ্যে ঘটে। একমিকে অপর্যাপ্তবৃত্তা, যৌন শৈথিল্য অল্প অল্প লেগা দিচ্ছে (সমগ্র জীবনব্যাপ্তের তুলনায় কথ্য পরিমাণে বেশি নয়); আবার অপর দিকে বোম্ব, বৌদ্ধ ধর্ম, ফেন, এসব দিকেও যেন বাহুসের ঘন আভ্যন্তর সম্বন্ধে অগ্রগতি হয়ে চলেছে।

পাছ বেন যাটির মধ্যে আরও পড়ার হল পাখার সন্ত শিকড় আরও নীচে প্রসারিত করে দেখতে, কোথায় রস পাওয়া যায়।

বার্কেল, ২২শে জ্যৈষ্ঠাবদি ১২৮৮

প্রকাশ্যে—

পাইল, এইবার একজন সত্যিকারের মনের বড়ন মাছেরে সম্বন্ধ পেয়েছি। বেশির ভাগ লোকের মনে একটা অহংভাব আছে—‘আমেরিকার চেয়ে সভ্য বা উন্নত বেশ আর নেই’। কিন্তু জর্জ স্ট্রাউল নামে এক জার্মান শিল্পী ও গায়ক শ্রী স্রবের সঙ্গে আলাপ হ’ল, এঁরা অল্প ধরনের মাতৃহ। জর্জ কুড়ি বৎসর আমেরিকায় রয়েছেন, রূপ জন্মাবি আমেরিকান। এরকম মরীচী লোকের পরিচয় পেয়ে মনটা খুশি হয়ে গেছে। রূপ নিয়ে ভাস্কর—এম.ডি। একটি বিখ্যাত ভাস্করী পত্রিকার পত্রিকাশিল্প। যুব ভাল লেগেন, সাহিত্যিক হিসাবে লনাম হয়েছিল এবং 20th Century Fox সিনেমা কোম্পানি মোটা সাহিত্যিকার লোক দেখিয়েছিল, প্রত্যাহার করেছিলেন।

রূপ বা বললেন তা এই : ‘আমেরিকার অন্তরে পাটোয়ারি বুদ্ধি এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে, আমি কোননা মর্যাদিত হয়ে রয়েছি। ভাস্করী শিল্পায়। বতবুর এ পথে চলা যায়, এদিয়ে বেলানাম, আদর্শবায় বা সত্যের প্রতি নিষ্ঠার চেয়ে ভাস্করদের মধ্যেও পাটোয়ারি বুদ্ধি বেশি। যে রোশির বৃত্তা অল্পদিনের মধ্যে অধ্যবিত্ত, তাকে বহু বয়স ধরে আরও হুঁসপায় অধিক গভিরে সাধারণ মধ্যে নিজের বিচার অধ্যকার ছাড়া কি আছে কলন কো? বাহুসের পরীক্ষাটাকে জড় বাসনিগের মতো মনে করায় বাহুসের যে চরম অবমাননা করা হয়, এই পক্ষ বাহুস্টু ভাস্কর্যের বিচার অধ্যকারের মনে হাবিয়ে ফেলেছে।’

তাকে নিবেদিতার *Kali: the Mother* পড়তে লিখা।

কাল রোশার পরমহংসদেবের জীবনী ও কথাবৃত্তের ইংরেজী অধ্যবায় উপহার দিয়েছি। নিবেদিতার বই পড়ে জানালেন, সমস্ত রাত দুমোতে পারেননি, ঘেপে বলে ছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে একটি। নৃতন অগ্রগতির সম্বন্ধে আবছায় পেয়ে জড়িত হয়ে গেছেন। বৃত্তাকে এমনভাবে কোনও জাত সভ্য বলে বীকার করেছে, তাতে তিনি পরম বিম্ববাসিত হয়ে গেছেন। পরমহংসদেব কালীমূর্তিকে আদ্র করে সাহিত্য-সমায়ি লাভ করেছিলেন। পরে সেই মূর্তিকে হাতের খাড়া তুলে বিদ্যা-বিত্তক করতে গিয়ে নিবিকল্পলোকে ডুবে গেলেন, এটি এর কাছে পরম বিম্ববায়ের মতো বলে হয়েছে।

বিম্ববায়ের শূন্য কাছে থেকে নেপলে যেমন নীতের অহুস্জিত্যাত হয়, ভয়ও হয়, কোননা আভাসও থাকে, এর মনেও এই অভিব্য সংস্কৃতির পরিচয় পেয়ে সেই ধরনের অহুস্জিত্য হয়েছে।

...

নীত এখানে কবে আসছে। কিন্তু নিকাগোতে ক’দিন আগে সেছলায়, বয়রও পাচ্ছি। সেখানে এমন বরফের রাজ্যা চলেছে।

সবাইকে সম্বোধন দেখেন।

নির্ভল

দাক্ষিণাত্যে শাস্ত্রদোহসন

যতীন্দ্রবিহঙ্গম ভৌদ্রী

দাক্ষিণাত্যে জননী ঐঐঐঐ লগিতাধিকা নামে বৈদ্য ভাগ স্থানেই পূজা গ্রহণ করেন। নবগারে ভারতের অস্তিত্ব স্বর্গে যেমন দেবীর পূজা হয়, তেমনি দাক্ষিণাত্যেও পূজা হয়—কিন্তু এখানকার পূজার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে—সেগুলিই এখানে উল্লেখ করবো।

নবগার বা হুগলীপূজা বা মাতৃপূজার ইতিহাস ভারতীয় সভ্যতায়ই ইতিহাস। এ ইতিহাসে এত ব্যাপক এবং রহস্য ও হুম্মাহুত্ব পরিপূর্ণ যে তার কিছুমাত্র আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়। তথ্যনি বঙ্গদেশের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সম্পর্ক অতি নিগূঢ়। বঙ্গদেশের জনবহুলি যখন ঐঐঐঐ মহাপ্রভু হুইংসের কাল দাক্ষিণাত্যেই পরিচয় করেছিলেন। ১৪১০ সালে দাদুদেউ সম্রাটের প্রতিষ্ঠাতা ব্যাসভট্টের সঙ্গে কর্ণাটকে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। উভয়ের মিলনে উভয়েই পরম পরিতুষ্ট হন, কারণ, ভবহুতি বা বলেছেন—

“সত্যঃ সত্ত্বঃ সধঃ কথমপি পুণ্যেন ভবতি” ৷

করুণ-ভাবায় জীৱন্ত বোড়স সালের প্রারম্ভে দিখিত “ব্যাস-যোগি-চরিত্রে” প্রভৃতি গ্রন্থে বঙ্গদেশের সঙ্গে কর্ণাটকের যে নিকট সম্পর্ক ছিল, তার প্রকৃত প্রমাণ রয়েছে। কলতঃ—মহাপ্রভুর নিত্য রসাবাদন-সখী হায় রামানন্দ দাক্ষিণাত্যেই লোক। তাঁর ধর্ম ও ধর্মবোধে হুগলি ভিত্তি ধর্মের রচনায় উপরে হুপ্রতিষ্ঠ, সে চারজনই দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী—রূপ, সনাতন, জীৱন্ত ও গোপাল ভট্ট। অষ্টমিকে বঙ্গদেশে আমরা বেড়াতে মঠাধিপতি দেবতাদের সঙ্গে জননী পূজা করি, গবেষণার বলে এটি প্রমাণিত হয় যে, সে পূজা-পদ্ধতি ও মঠাধিপতি মহাপ্রভুর পরবর্তী সময়ের ঘটনা। এসব দিক থেকে দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত হুগলীপূজার ধারার সঙ্গে আমাদের এখানকার হুগলীপূজার ক্রমবিকাশের ইতিহাস সুললিতভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা জাগে। কিন্তু স্থান এত কম যে, তা এখানে সম্ভব নয়। আধি এখানে কেবল দাক্ষিণাত্যের হুগলীপূজার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা মাত্র উল্লেখ করছি।

দাক্ষিণাত্যে বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে অনেকটা রক্ষা পেয়েছে বলে সেখানে অগ্ন্য-প্রচলিত ১ বৈদিক সভ্যতা অনেকটা মাথা উঠু করে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। বীর-শৈব, দাদুদেউ সম্রাটের প্রভৃতি জাতিভেদ-প্রথা প্রভৃতির বহন কিছু শিথিল করে দিয়ে ব্যাপকভাবে ধর্ম-প্রচারণার সহায়তা করেছেন সভ্যতাই—কিন্তু হিন্দুধর্মের মৌলিক আদর্শকে তাঁরা কোথাও ছুঁয় করেননি। সকলকে নিজের বন্ধু-মিত্র, ধর্ম ও ধর্মবোধের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের মধ্যে আনয়নের প্রচেষ্টা এঁদের আছে, কিন্তু বুল বৈদিক কৃষ্টি ও সভ্যতা, ধর্ম ও ধর্মবোধে এঁরা কখনও ভাগ্য করেননি। দেবীপূজার ইতিহাসের মধ্যেও এটি বিশেষ করে চোখে পড়ে।

এখানে নবগার উপলক্ষ্যে সাতজন বৈদিক ব্রাহ্মণ বর্তী হন। (১) পুরোহিত; (২) তত্ত্বাবধক; (৩) লগিতা-পারামর্শের নিমিত্ত জোত্রপার্বক ১; (৪) কথোক্ত মধ্যমুক্ত ১০৮ বার পাঠ করেন চতুর্ধ ব্রাহ্মণ; (৫) পক্ষম ব্রাহ্মণ করেন ঐঐঐ ১০৮ বার পাঠ; (৬) বর্গ ব্যক্তি মহিষভোজ পাঠ করেন; এবং (৭) সপ্তম ব্রাহ্মণ পক্ষাক্ষর শিবমন্ত্র “ও নমঃ শিবায়” চারদিনে বারো হাজার বার পাঠ করেন ৷

লগিতাধিকা দেবী বোড়স উপচারে পূজা গ্রহণ করেন। রাতিকালে পূজাবন্দনের পর ১২ জন বেদগায়ক করেন শুভিপাঠ।

দশমীর দিন ৫০ জন বৈদিক ব্রাহ্মণ এসে নিরঞ্জনকার্য সমাধা করেন।

আরো দুটি পার্থক্য এখানকার রীতিনীতির মধ্যে বিশেষভাবে চোখে পড়ে—একটি চতীপার্শ্বের অভাব, অষ্টটি বসিমানের অভাব। মহায়াট্ট থেকে দক্ষিণ ভারতের

১ আদিক ভাষায় প্রতিও বীর নামের কৃষ্টি ছিল। কিন্তু ধর্ম-প্রচারের সহায়তায় শিথিলই গ্রিপি প্রাচীন-ব্যাকরণ ও রসায়ন গ্রন্থ হতেছিলেন।

২ “লগিতা-প্রচলিত” ও “লগিতা-প্রচলিত” অর্থ্য প্র. এ সময় পাঠ করা হয়, ঐঐঐঐ।

কোথাও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বসিমানের প্রথা নেই। উৎকল দেশ ও পূর্ব-ভারতে এই প্রথা প্রচলন আছে। বিজয়নগরের রাজবাড়িতে বসি এসে একটু উল্লম্বাংগ্য উৎকলীয় ব্রাহ্মণ বসিমান করেন, ততপক্ষী ব্রাহ্মণ বসিমানের যোগদান করেন না।

বাইরের দিক থেকে এইসব ভেদবৈষম্য প্রতীত হলেও মূলতঃ আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পার্থক্য ঘীর ঘীরে সরে যেতে থাকবে। সকলেই বিভিন্ন মতপ্রসঙ্গে জননীকে জানাচ্ছেন—শরণাগতি, হে দেবি! যা হুনি, আমারে রূপা কর। যেহে দান কর—এই হচ্ছে মূল কথা। তাই বাই হোক, তাই তো সে একই।

আমরা ১৩৬৪ সালের ঐশ্বরীপূজার গুহবিনতিসিতে জননীকে প্রার্থনা জানাই :—

ও হুর্গা! শিবঃ শান্তিকরীং ব্রহ্মণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াম্।
দর্শসৌক্যপ্রণয়ীক প্রশমামি সখা শিবাম্।
ঐশানমাতরং দেবীম্ ঐশ্বরীমীশ্বরপ্রিয়াম্।
এগতোহস্মি সখা হুর্গাং সংসারার্ণব-তারিণীম্।

ও বহুধনং প্রবর শম্ভুগদাধরম্
রামম্ চাক্ষুণ্ধ্যায় সমুদ্রভক্তম্।
দ্বিধা নিশাচরপূরীং পুনরাগতম্
ভরদ্বজং ভবতু তে বিজয়ায় নিত্যম্।



বাঁপতাল

শীলা মজুমদার



টুলের ওপর চড়ে সেই অন্ন আলোতেই অলিমাসিমা বড় আলবারিটার কারিকুরি করা মাঝার শেহনে হাতড়াতে লাগলেন। তেল দি লেগে-লেগে এখনধারা ডেহারা হলে কি হবে, সত্যিকারের বেহাগেনি কাঠের আসমারি। মেশুর বাবা জগে অবধি পখনো কোনো পেলো জিনিগ কেনেননি।

দিয়েছিলও ভগবান যক্ষি ডেঠে; বাড়ি-ঘর, পাবন;র অধিয়ারি, জুড়িয়াড়ি, বংশ, রূপগণ, ব্যাংক টাকা। অটেল দিয়েছিল। তা সে প্রাণ ভরে ভোগও করে গেছে। মরবার আগে শেষ ইচ্ছে হল একটু গড়গড়াটা টানবে। সে-সময় এখন-বার তখন-বার অবস্থা, হাতের কাছে রূপোর গড়গড়া, তাই এনে বেঙরা হল। ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। একতলা থেকে নবাবী আমলের হাতীর ঠাঁতের গড়গড়া আনতে-আনতে প্রাণটা বেরিয়ে গেছিল।

টুলের ওপর থেকে অলিমাসিমা নিচু ঘরটার চারিদিক একবার চোরে দেখলেন।

এ-রকম টিনটিয়ে একটা বিমলিবাতি তখন জ্বলত না। ঐ আটা থেকেই একাত পেলদের কাড়বাতি জ্বলত। আগে গ্যালে জ্বলত, পরে পালটে কুড়িটা বিজলি আলো বসানো হয়েছিল। এক হইচে কুড়িটাই জ্বলে উঠত। এইরকম আলো তখন এ-বাড়িতে ঠাই পেলত না। ডালো করে দেখাই যায় না। ঘরের কোণে কোণে আধার জলে বাসে, কুছরধের খাবার বালাভশো পায়ে লেগে উটে ঘায়, তখন আবার ডোল-রে মোছ-রে।

এট বে বাস্‌টা হাতে ঠেকেছে। অলিমাসিমা সাবধানে একটা রচ-ওঠা মর্চে-ধরা চাকদি-পাখাবের বিছুটের টিন নামালেন। এ-রকম টিন তখন ডব্বন-ডব্বন আসত। মেশুর বাবা কিন্তু এ-বিছুট পেতেন না। ঠাঁর জন্ত আসত প্রেনোব্ল বিছুট, এতোকটা বিছুটের চারদিকে জ্বলকাটা। কংগের পেস জড়ানো থাকত।

আচমকা দরজা খুলে কেহা এসে ঘরে ঢুকল।

ওকি মাসি, টা-এ চড়ে ও আবার কি হচ্ছে?

অলিমাসিমা সাবধানে নাঃমতে গিয়ে টিনটা মাটিতে পড়ে খুলে যায়, তেত্তরকার বড় ঘর করে সংগ্রহ করা সামগ্রী ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে। কেহা হেসে আতুল হয়।

আমি তুলে দিচ্ছি, মাসি, তোমার পায়ে না ওপো মলেছিল? শাড়ি-বেড়ানো ছাড়া অস্ত কিছু করতে গেলেই না তোমার ঝাঁপ ধরে?

কেবার কথা তনলে গা-আলা করে। কিন্তু সত্যিই আজকাল নিচু হতে গেলে ঝাঁইর শেছনটা টনটন করে।

মাসি!

কেবার হাতে ছাই বড়ের পশমের ওলি। অলিমাসিমা সেটি ছিনিয়ে নিয়ে টিনের মধ্যে আবার ভরে ফেলেন, হাতটা একটু কাপতে থাকে। আজকাল এও আরেকটা উপসর্গ ছুটেছে, হাত কাশে, পা কাশে।

কেহা বলে, ও, এইজন্মই বুকি নেগুদির পশম কম পড়েছিল?

অলিমাসিমার, গলা দিয়ে কর্কশ স্বর বেহোর: সে

সাত লাঙ্গল কিনতে দিয়েছিল, তাকে সাতটা গুলি শাকিতে গুলে দিয়েছি, জিগেন করে দেখতে পারো।

কেহা হাসল।

চট্টা কেন, মাসি? বা কুপশের জাহ এরা। চল্লিশ বছর আছে, এক শরশা মাইনে বাড়ার না! বেশ কয়েক, নিচ্ছে।

অলিমসিমা উঠে পাড়ান।

মাইনে আবার কি পা? আপনার মাসি হই ৬৩, হলই বা একই দুই সম্পর্কের, ঘরের লোকের মতো থাকি, চাঁদি-বাড়ি, খাই-খাই, এত মধ্যে আবার মাইনের কথা কোথেকে ওঠে তুমি? মাস-কসবারে বুড়ি মাসিকে লস্টা টাকা হাতধর্য দেখে, সেইকি তোমার অত নজর কেন?

কেহাও উঠে পাড়ান, ছোট একটা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ছাই তোলেন, মাথার ওপর পাতলা হাত-স্থানি তুলে, নীলারদী-জড়ানো হাঙা শরীরটাকে টান করে গা ঘোড়াহুড়ি দেয়। আলগোছে বাঁধা খোঁপা থেকে একটিমার প্রকাণ্ড কপোর কাটা খসে যায়, পিঠের কালো এলো টুল ছড়িয়ে পড়ে। কাটাটা কেহা তুলে নেয়।

কেহা বলে, লক্ষী মাসি, রেগো না, জানো, আজ আমার মাইনে বেড়েছে? তোমার একটু ভাগ দিতে ইচ্ছে করে।

কেহা একটা গোটা পাঁচটাকার নোট অলিমসিমার হাতে ভাঁজে দেয়।

টাক: হল দিয়ে লক্ষী, ওর অমরীলা করতে হয় না। নোটটা কপালে ঢুকিয়ে অলিমসিমা আচলে বাঁধেন।

দিগের ফড়িতে এগারোটা বাজে। কি করে কেহা এত হাত অবধি? সেই কৌকড়াহুল ছেলেরা আবার হয়তো পৌছে দিয়ে গেল। কোথায় থাকে এতক্ষণ, ওদের আশ্রিত তো ছুটি হয় সাড়ে পাঁচটার।

জিগেন না করেও পারেন না।

কোথার ছিদ্র না, তাই বল মাসি। আনাদের কেরানীদের ইউনিয়ন হচ্ছে যে, তার মিটিং ছিল। আবার নিজেদের মধ্যেই মধ্য খেঁচাখঁচি। তা কথিউনিষ্টরা মনে ভাবি, তাদের সঙ্গে অন্তরা পারবে কেন? শেষ পর্যন্ত একটা রফা করতে হল। বাই মাসি, ঘুম পাচ্ছে।

পোতলায় ওঁঠার সিঁড়ির নিচেটা বন্ধ-কাটা কার্ট দিয়ে থেরা, সেইখানে ছোট একটা নেওয়ারের বাটে কেহা গুমোর, ধরকাটা আলগা থাকে, ও-বয়ের প্রাণে ভড়র নেই।

কি আছে আমার, মাসি, যে নিতে আসবে? আমাকে নেবে? আমার বাবাই নিল না, আমার চোখে নেবে।

অতুত খেরে কেহা। বাবীর কথা নিয়ে হেসে বেড়ায়। সে নাকি বিলেতে গিয়ে মেঘ বিয়ে করে গ্রহে আছে। কেহাও মুখে একটা রাগের কথাও শোনা যায় না। হাসে আর বলে,

বুকেল মাসি, কি লোক। তুলিয়ে আমার অমন ভালো-ভালো গরন-ভালো হাতিয়ে, বাশ-বান্দে লুকিয়ে বিলেত পালাল। আর সেখানে কিনা বিয়ে-খা করে মহা আনন্দে আছে। রবিবার-রবিবার নাকি লোক খাওয়ায়; যেমকে বাংলা রাঙা শিখিয়ে নিয়েছে। ওর জন্ত কেন সিঁহুর শরব, বল? তবে একটা ওহেডিং বিং পাই তো পরে দেখতে পারি!

অলিমসিমার মনে হয় কেহাও এখানে পড়ে থাকটা ভালো দেখার না। দেশুর বাবা না-হয় মাসুখই করেছিলেন, অমন তো কত ছেলোমেয়েই মাসুখ হয়ে দিয়েছিলেন, কই, আর কেউ তো এখানে এসে পড়ে থাকে না।

কি কবি, মাসি, বাবীই ভোগে পড়ল, এখন কি বস্তুর-বাড়িতে থাকটাই বুঝ ভালো দেখার? ওঁরা দিনরাত আমাকেই সোব দেন। তাছাড়া কি সেখানে পৌড়া বাড়ি রে বাবা! এখানে আমি টিকব কেমন করে? তার ওপর অবস্থার এমন খারাপ হয়ে গেছে। ও-কথা বলো না, মাসি।

কেহা তাকে চলে গেলে পর টিনটাকে আবার আদমারির মাথার তুলে রাখতে হয়। কিন্তু লম্বা রেশমী ঘোঁষাটাকে আর এখানে রাখা নয়। কেহাও মতো অহঙ্কারী বেরগো কখনো অবস্থি গরের জিনিসে হাত দেয় না, তবু কি স্বরকার। কোনদিন হয়তো নেপথ্যের লামনেই কি বলে সবথেকে।

ভাবি দেখাক বয়ের। থাকে এখানে কিন্তু যায় না, কোথেকে বেরে আসে ভাগ্যান জানেন। তবে প্রায়ই কিছু কিনে বাড়িতে আনে, অলিমসিমাকে খাওয়ায়। কয় গুনোর নাকি। সবচ এই অলিমসিমাই একদিন, কিছু মনে না করে, কি হুটো কথা বলেছিলেন, ভালো করে এমন মনেও পড়ে না কি কথা, আর অবনি ঘেরে এ-বাড়ির খাওয়াই বড় করে দিলে। রাগও করল না, চোঁচোনিচি কান্দাকাটি কিছুই নয়। শুধু জল ছাড়া আর এ-বাড়ির কিছু যায় না। কাউকে বলেও না কিছু, নেপু পর্যন্ত এ-বিষয় ঘুণাশ্রমেও জানে না।

বলে থেকে-থেকে পায়ে খিল ধরে যায়। অলিমসিমা

উঠে গিরে বহু বহু বহুজালোর লোহার হাড়কো পরীক্ষা করেন। বাইরে থেকে কুহরজালোকে ঘরে ছলে, নেপু কখন দোস্তলার নিবে গেছে। আর কোনো কাজ নেই। অগ্নিবাগিচা ছোট দরজাটাও বন্ধ করে দেন।

তবু তপু বাগেটা থাকে। একটা বেড়টার আগে চোখে ঘুম আসবে না, ভোর সাড়ে পাঁচটার ঘুম ছুটে যাবে। এ নিয়মের আর অস্ত্রধা হয় না। মেয়ে গুলে থাকে বড় কষ্ট।

নিচু হয়ে বড় তক্তাপোশ দুটোর ওলা দেখতে হয়। বলা যায় না, কে কখন ঘরে দেহিঘরে যদি দু'কিরে বসে থাকে। নিচু হলেই কোমরে খিচ ধরে, কষ্ট করে শোজা হতে হয়। আগে অবকম হত না।

তক্তাপোশগুলি নেপু'র ঠাণ্ডারদার আমলের। ভারি কাঠালকারের, পাখাগুলি কুঁকীর আকারের, চোরা গুপরি কেওয়া, তার মধ্যে অগ্নিবাগিচা কুহরবের সকালের খাবার কষ্ট পেড়রা বিহুট রাখেন। অস্ত্র কোনো রকম বিহুট এ বাড়িতে আর আসে না।

তক্তাপোশের ওপর রাশি রাশি টিন, বাস, কোঁটো, হাঁড়ির বুধে হাঁড়ি বসানো। তক্তাপোশের নিচে সারি সারি বোয়ের, কুড়ি, বারকোশ। তার খুলো কাড়া হয়নি কতকাল। কেয়ার মাঝে মাঝে খেয়াল হয়, এক ঘণ্টার মধ্যে বেড়েযুছে সব বসবসকে করে দেয়। কিন্তু সে তপু যেদিন খেয়াল হবে।

নেপু সব জিনিস চোখের সামনে দেখতে চায়; কিছু ছলে রাখবারও জো নেই। বড় বড় কাঠের আলমারি দুটোতেও আর ঢাবি পড়ে না। দরজা ধরে টানলেই ভেতরটার সবখানি দেখা যায়। চুরি করার লোকই নেই।

নেপু বলে, আমাকে যে ঠিকাবে সে এখনো জন্মাবনি।

মনে করে অগ্নিবাগিচার টোঁটের কোণে একটু হাদি দেগে থাকে। মোজাটা নিয়ে উঠে পড়েন, আলো নিভিয়ে, আঙে আঙে দরজার বাইরে চটিকোড়া খুলে রেখে, পাশের ঘরে বান। সেখানকার আলো জ্বলে দরজাটি বন্ধ করে দেন।

অমনি দমত ঘরবানি বেন হ' হাত বাড়িয়ে অগ্নিবাগিচাকে নু'ক জড়িয়ে ধরে। এ-ঘরের বেকও ও-ঘরের হতেই পুয়োনে দারবেল পাখরের ততরী, শাখা ফালো বড় বড় ছক কাটা, কিন্তু একে কে বেন বয় করে পালিশ করে রেখেছে।

এখানকার চণ্ডা ডাকের ওপর নেপু'র বাবার ডিক্যাটার থাকত, খাওয়া-দাওয়া হলে তার মধ্যে থেকে বিলিতি সব ঢালা হত। নীল নক্সা-কাটা কি অস্ত্র সব



কাচের বাসন ছিল। সব নেপু ওপরে নিতে গেছে। আটটার সময় খাওয়া সেয়ে নেপু আর জায়াই নেই যে দোস্তলার গঠে, আর নায়ে না। টেলিফোনটা খুলে সঙ্গে করে নিয়ে যায়; কেউ এলে দেখা করে না। শিঁড়ির মাকখানকার ভারি লোহার দরজার তালা লাগিয়ে দেয়।

নেপু'র বড় চোয়ের ডয়।

নিচোটা শুখন অগ্নিবাগিচার হাজা হয়ে যায়। তবে কেয়া থাকে। কিন্তু কেয়া না থাকলে একটু ভয়-ভয় করতে হয়তো।

পাতলা, লম্বা, গোলাপী রেশমী মোজাটি বেন মাকড়সার জাল দিয়ে বোনা। মরম, মোলায়েম, শীতল। অস্ত্রের ঝাঁক দিয়ে টানলে মনে হয় কুঁকির জলের স্রোত হাতের মধ্যে দিয়ে গলে পড়ছে।

চৌধুরি বছর আগে নেপু'র মা এ মোজাটা নিয়েছিল।

ধুবু অগ্নি, এখ হাথো টাকাটা পিকোটা জ্বিয়ে রাখিল।

বিলেতে আমাদের ল্যাওলেডি বাবত।

এইরকম মোজা পায়ে দিত নেপু'র মা, আর গোলাপী, সোনালী, কেশালী, ছাই রঙের, সাটিনের মোজা-সোনা ছুতো। চকোলেটের বায়ের ঢাকনির বিবিধের মতো দেখতে। মোজা পাটিতে যেত নেপু'র বাবার সঙ্গে।

বাড়ি-বাগানখান নিচে সাড়ে সাতটা থেকে আগে ছুড়ি-দাড়ি বাড়িয়ে থাকত। তারপর সোঁটর কেনা হয়েছিল।

কি নামডাক ছিল নেপথ্য বাবাত! সারা ভারতবর্ষ ছুঁড়ে অমন আরেকটি ব্যাবিস্টার পাণ্ডা রাখা ছিল। বিশেষতঃ থেকে, বর্ষা থেকে ডাক পড়ত। কি ধনী-দারী সব উপহার নিয়ে কিস্ত, বেশে নখর চোখ টাটাত।

গোপালার সামনের দিকের বড় ঘরটোতে নিচু আবদুল-কায়েম টেবিলে তিন হুট একটা আগাগোড়া কপোর তৈরী গোলাপধানি ছিল। সেখান বহন কপোর দান বাড়ল নেপু পেটা পের ধরে বেচে ছিল। অবিশিষ্ট কি-ই যা হতে যেন? কেউ আসেও না আর এ-বাড়িতে নেমস্তন্ন থেকে। তাছাড়া ওসব ঘরে আজ দশ বছর ধরে নেপু ভাড়াটে বসিয়েছে। বড় বড় কাছাকাছাকা পাতিশিন দিয়ে খোঁপ-খোঁপ বানিয়েছে। বড় উঠানের জল নিয়ে তারা কি খেঁচাখিঁচিটা করে বোজ, সে না-তখনে বিয়াস হয় না।

ছোট একটা কীর্ণনিখাস কোলে অলিমাসিমা আলো নিভিয়ে দেন। অমন পুবের ছোট জানলা দিয়ে হালি হালি টানের আলো চুকে ঘর ভরে দেয়। একই পোশাক গন্ধ নাকে আসে, জানলার নিচের কাঠের তক্তাটার লগ্নর ব্যাঙের ছাতার সোলা বেগছে। ছোট ছোট, গোল, লম্বা, চাপটা : কিকে সব রং : হলদে, ছাই, গোলাপী, পাটকিলে। কি রূপ তাদের! অলিমাসিমা একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন।

হাতের মোজাটা বেন পাঁচ মণ ভারি হবে ওঠে। ঝাঁক হয়ে টানের আলো সাধা, সজ বিছানার ওপর এসে পড়েছে। অলিমাসিমা সেখানে পা স্থগিয়ে বসেন, কোলের ওপর লম্বা গোলাপী বেশনী মোজাবানি পড়ে থাকে। পারের শাভাটা ঠাণ্ডা অলিমাসিমার সারা জীবনের সঞ্চয়।

পা টানটান করে। ধীরে ধীরে পা স্থানি ভুলে পাটের ওপর আদর্শি ডি হয়ে অলিমাসিমা বলে থাকেন। মনে মনে আপনা থেকেই হিসেব করা হতে থাকে। পুরোনো হিসেব, অলিমাসিমার মূবর হিসেব, তবু মোজা একবার না আঙুলেই নয়।

মাসে দশ টাকা হলে বছরে একশ হুড়ি টাকা। দশ বছরে বাতাস। হুড়ি বছরে চল্লিশ ম। চল্লিশ বছরে আটচালিশ ম। অলিমাসিমার চল্লিশ বছরের মোজাবানি। প্রথম দশ বছর অলিমাসিমাকে হাতখরচ দেবার কথা কানো মনে হয়নি।

কিন্তু মোজার আছে সাত হাজার টাকা। সত্তরটা পরিবার এক ম টাকার নোট, ছোট করে আলাদা আলাদা ঝাঁক করা। একটাও পুরোনো নয়, বারে বারে মোজাবার মোকান থেকে পালটিয়ে আনা। শেষ্ঠা কোনদিন না বলে বসে আজ থেকে বিসেজী আখদের নোট চলবে না।

কিন্তু সাত হাজারে তো হবে না। অবিশিষ্ট যাহুগির মধ্যে দিবিহার গল্পবিত্তি আছে। তাহার বড় একটা হালুনি, কালো মোটা খুতো ঘিরে গলার কোলানো। তার মধ্যে একইকরো টানের আলোর মতো গল্পবিত্তি। শুষ্কির ভেতরে বহন ছিল, তার চাইতেও অনেক বেশী নিরাপদ। ছোটবেলায় যার মুখে শোনা, ওর দাম কমপক্ষে তিন হাজার টাকা।

হয় গিরে বশ হাজার। অলিমাসিমার শিঠটা আপনা থেকেই সোজা হয়ে যায়। আর দুটী হাজার হলোই বধবানের ফালি জ্বলিতে অলিমাসিমার নিম্নের বাড়ি উঠে। আদাগাছের তলা ঝিঘিরে পাভাখোয়ার বসানো হবে।

বটকলের দালা করে দেবেন। মীল কানকে নক্সা-টক্সা ঝাঁকানো হবে গেছে, তার জুড়ই পঁচিশ টাকা লেগে গেছে। বটকলের দালা জারি সাধু লোক, কোলার-খটী মুরে এসেছেন। আর বটকল তো অলিমাসিমাকে প্রানের চেয়েও বেশী ভালোবাসে।

ভালোবাসা ছাড়া কেউ বাচতে পারে? আর বটকলের ভালোবাসার মতো ভালোবাসা কোথায় পাওয়া যাবে? ছেলেবেলাই বল, বাপ না ভাই বোন কিবা দাবীই বল, সকলের ভালোবাসার পেছনে একটা বাধ্যবাধকতা থাকে, না বাসলে শোকে নিষেধ করে। কিন্তু বটকলের ভালোবাসা গম্বাঙ্গলের মতো বয়ে চলেছে।

অলিমাসিমা উইল করে রাখবেন। বাড়িটা অমিটা বেন বটকল পার। দালা নিশ্চর কেশে যাবে। ওর বাড়ির শাখোয়া ঐ পোড়ো জ্বলিহু কাঠো কোনো কাজে লাগছিল না। শিবিয়া মরবার আগে ওটী অলিমাসিমাকে ঘিরে বেগেন তখন দালা যেনে চহুড়ক। বলে কিনা,

কি দরকারটা ছিল? এ বেন পাঁচজনকে বলে বেড়ানো যে আদার বিখা ছোট বোনকে আধি একমুঠো খেতে দিতেও পারব না। অবন বোনের মূখ বেশি তো আদার—

যা-তা বলতে লাগল দালা, ওর কন্ডার কোনো কালেই কোনো ছিবি ছিল না।

যা বাবা অনেকদিনই পত হয়েছিলেন, শেষ্ঠা অলিমাসিমা আর টকতে না গেলে ঠাঁহুরমশাইয়ের বাড়ি গিয়ে আজর নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঠাঁহুরমশাইয়ের নিম্নেরই দিন চলে না। নেপূর বাবা ঠিক সেই সব বধবান এসে, ঠাঁহুরমশাইকে কি বেন বাগেরিক দিতে হয়, তাই নিয়ে। দাকল সাহেব স্বাস্থ্য, মেজাজটিও ছিল-বরিয়া। সেই

তখনলেন অলিমাসিয়া গ্রাম সম্পর্কে নেপুথ হার কোন হন, অমনি তাঁকে ডানার তলায় আশ্রয় দিলেন।

অলিমাসিয়ার বয়স তখন পনেরো বছর। সেও আজ বোধগম্য বছর হয়ে গেছে। মনে করতেনও কেমন লাগে।

সিঁর্তের খড়িতে একটা বাঁকল। আর হাত করাটা ঠিক নয়, কাল লকাসে ছাঁটার মধ্যে নেপুথ আর জামাইয়ের চা-চৌধি দিতে হবে।

কিছু মোজাটাকে তাহলে কোথায় রাখা যায়?

আজ আর তাবা যায় না। মোজাটাকে বাসিনের ওয়াড়ের ভেতর পুত্রে, বাসিনটা মাথার দিবে অলিমাসিয়া অয়ে পড়লেন।

বেই অলেন, অমনি কানে আবার বাঁপতাল বেজে উঠল। কান কামাশালা হয়ে গেল। কানের মধ্যেই থাকে, না বাইরে কোথাও থাকে অলিমাসিয়া ঠাণ্ডর করতে পারেন না। বাঁপতাল কাকে বলে তাও জানেন না অলিমাসিয়া, ডাবেন লুকিয়ে থাকে, গোপনে থাকে, এই তাহলে বাঁপতাল।

১২।

পরদিন রাতে কাঁটার কাঁটার হাত আঁটটার সময় নেপুথ আর জামাই রোজকার হতো এগে খেতে বসে। ঘরের মাঝখানকার তেপায়া বিশাল খেতপাখরের টেবিলে অলিমাসিয়া গুয়ের খাবার বেন।

অতি পুরোনো চীনেমারটির স্ট্রেট হুঁখানি ঘরে ঘরে গার সবুজ রঙের বাড়িরয় পাদুশালা ঝাঁক। নেপুথ কোনো ঘরশা নেই এগুলির কতো দায়। এর বড় ভোজাটা অনেকদিন আলমারির নিচে গড়ে ছিল, তার ঢাকনিটা তাক গুছোতে গিয়ে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া গেল। বটকল নিয়ে গিয়ে কোথায় কোন চীনের দোকানে পঠিন টাকা দিয়ে বিক্রি করে, আঁচলে বেঁধে ঢাকাগুলি অলিমাসিয়াকে এনে দিয়েছিল। নেপুথ কিনা বলেছিল ঐ ডোডা কুত্থরের প্রকরা ঢালবার জন্ত রাখতে!

খেতে বসেই নেপুথ বলল,

বড় সোক কি তাহলে হুথ বেগুয়া বহু করে ছিল, অলিমাসিয়া? গরলাকে একবার ডাকো তো।

গরলা এসে বোরসোফার ঝাঁকায়।

বহু করেছি, মা, খোটে পাঁচ সের করে বিচ্ছে। ছোট সোক বিচ্ছে সাড়ে তিন সের। বাসবিহুলি কিনে, আপনাদের হুথটু হুথিগে আর কিছুই থাকছে না।

জামাই হুথ হুলে নয়ন হয়ে বসে, জকসায়েবের বাড়িতে আর বেগুয়া থাকে না তাহলে?

নেপুথ তীক্ গলায় বলে,

বেচে দাও ও সোক। আগে তো দশ সের দিত। বরাবর দিত।

বাক্সা বড় হয়ে থাকে, মা। তারপর তো একে-বারে বড়ই হয়ে বাবে। আবার নতুন বাড়ির হলে পর—

জামাই বলে,

জকসা হে ব হুনি থাকলে আ মা সের ই হুবিধে, দুগলে মখল? ঐ রোজ আড়াই সের হুথের জন্ত, মাসে আমার কত আড়াই শ টাকা আসে। বেশো একটু হুথ বাড়াবার কি করতে পার।

নেপুথ বলে,

অলিমাসি, রোজ যে মাসে রাঁধছে, জককল কত করে নেই?

এক পো রাবি, এগাধো আনা করে দিই। কিছুই থাক না, শরীর টিকবে কেন। জামাইকে বাটতে হয় কোটে।

নেপুথ তবু বলে, তাই বলে রোজ এগাধো আনা! বেশী দিচ্ছে, অলিমাসি, খিও হুথি বেশী দিচ্ছে। স্টু-এর মতো রেংগো, আমাদের বয়স হচ্ছে, হাডা খাওয়াই ভালো। আবার কলা কেন?

অলিমাসি বলেন, মার্কেটে মাসে তিনটাকা সের। আর কাঁচি থেকে ঐ এক ছড়াই তোবারের জন্ত কেটে রেখেছি, বাড়িটা নকুতবার নিয়ে গেছেন, কাল ভোরে বাজারে পারাবেন। কলা পুষ্টিকর, নেপুথ খাও হুজনে হুটি। গাছের কলা, তোবার মা পুতেছিল প্রথম।

এখনিথারা রোজ হয়। মনে মনে নেপুথ আর জামাই হুথটু সেরে হুথিই হুথ বোধ করি। আর হুথ থেকে, কলা থেকে অলিমাসিয়ার আর গরলারও কিছু কিছু ঘরে আসে। এই তো খোট সংসারটি। নেপুথ আর জামাই, অলিমাসিয়া আর গরলা। আর কেবা। আগে মরি মরি গুথোমখর



কাছে হুলে আনা হত। এই টেবিলটাই ছিল। ঠিক এই জায়গাতেই ছিল। আর সব বললে সেছে।

এখন যেখানে তক্তাগোশ ছাটি, সেখানে একটা ঢাকাও কাচের আলমারি ছিল, কপোর বাসনে কোকাই। রোজ সে-সব ব্যবহার হত। আর ওখারে বিশাল একটা সাইডবোর্ড ছিল, তার তাকে থাকে থাকে কাচের বাসন থাকত। আরেকটা ছোট কাচের আলমারিও ছিল, তার তাকগুলি অবধি কাচের। তাতে নানান আকারের ছোট বড় গেলান থাকত।

নেপুর মার চেহারাটি মনে পড়ে। সুন্দরী বটে, তবে বড় বেশী ঘর্দা, কেমন যেন বর্ধীনা। অবাক হয়ে চেয়েছিলেন অলিমাসিমার দিকে। নেপুর বাবা পরিচয় দিলেন।

যোগা শামসা একটি ঘেয়ে, না জানে সাজগোজ করতে, না জানে কথা কইতে। তেলচিটে চুলগুলো বেধে ঝাঁটো করে খোঁপা করা। সাফাঘাটা, নিরাপদ। তবু নেপুর মা চুপ করে থাকেন। নেপুর বাবা বলেন, তোমার এমনি একটি ঘেয়েরই ধরকার ছিল, সোমা। কাছে কাছে থাকবে, কাপড়-জামার যত করবে, সেলাই-টেলাই করে দেবে, দেখাওনা করবে।

নেপুর মা বললেন, চুল বাঁধতে জানো?

অলিমাসিমা তো অথাক। চুল বাঁধতে কে না জানে?

হাল-কাপানের খোঁপা করতে পারবে?

অলিমাসিমার গায়ে তলা থেকে মাটি সরে গেল।

তবে কি এই হুকর বাড়িতে থাক। হবে না? আর কি ঐ হুকর মাহুবটিকে দেখতে পাবে না?

হুকর মাহুবটি হেসে বললেন,

থাকত বর্ধানে, ফ্যানানের ও কি জানবে, সোমা? কিন্তু সেজস্ত ভেবো না। আমি বলে দেব, মিস গার্ডিন নিজে এসে ওকে শিখিয়ে দিয়ে যাবে।

কর্কশকর্মে সোমা বলল,

কিন্তু দরকার নেই। মিস গার্ডিন এ বাড়িতে ঢুকলে আমি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেব। আমিই ওকে শিখিয়ে নিতে পারব।

উত্তেজনার নেপুর মার নুঁহ মাঠা হয়ে উঠল। তাঁর রূপ খুলে গেল।

নেপুর বাবা হেসে বললেন, তা হোসে তো আর কোনো ভাবনা নেই।

নেপুর মা অলিমাসিমাকে কাছে ডাকলেন।

কি নাম তোমার? আমাদের গ্রামের হরিণকাচার বেয়ে ছুঁবি? হরিণকাচা আছেন কেমন?

সব কথা বলা যায় না। অলিমাসিমা ঘেয়ে ঘেয়ে বানিকটা বানিকটা উত্তর দিলেন।

আহা, নুঁহ হুলে বল। তোমার নাম অলকানন্দা? বড় বড় নাম, তোমার ডাকনাম অলি বলে, কেমন?

সেই অবধি অলিমাসিমা এ বাড়িতে থেকে গেলেন। তবু থেকে গেলেন না, এ বাড়ির স্বপ্নস্বপ্নের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেলেন যে এখানকার দরজা-জানদার মতো বাড়িটার একটা অঙ্গই হয়ে গেলেন।

বুঁহ সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন বটে।

অলিমাসিমাকে বইলে নেপুর মার এক দণ্ড চলত না। বিনয়ত অলি, অলি, অলি। এক মুহূর্ত পিত্রায় ছিল না। অলিমাসিমা একেবারে নিশ্চিন্দ্রোজনের অনাহার থেকে অতি-গ্রয়োজনের সিংহাসনে চড়ে বসেছিলেন।



অলি, আমার ফুলকাটা গায়ে কাপড়টা দে। অলি, ঘেয়ে, এই লেনের এখানটার একটু ছুঁচ চালিয়ে দিতে পারিস কিনা। অলি, আমার চকনকাঠের হাতপাখা গাছিনা। অলি, হানের জলে গোলাপগন্ধ দিয়ে দে। অলি, চুল শুকিয়ে দে। অলি, এলো খোঁপা বেঁধে দে। অলি, আমার সঙ্গে গম্বার খারে বেড়াতে চল। অলি, অলি, অলি, অলি।

হুড়ি বহন করে ঐ অগ্নির কোলেই মাথা রেখে স্বর্গে যেলেন।

অগ্নি, চোখে দেখতে পাচ্ছি না কেন। অগ্নি, একটু আলো করে কে। অগ্নি, চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসে কেন। আলো দে, অগ্নি। অগ্নি!

ঐ একটিকারই ভণ্ড অগ্নিমায়া দেপুর মার কথা রাখতে পারেননি। এই পৃথিবী বহুরে ঐ প্রথম হুজনার ছাড়াছাড়ি হয়েছিল।

ভাঙ্গার সব চুকচুক গেলে, মাথা ঘোলাপ আর রজনীগন্ধার কুলগুলিকে গুছিয়ে রেখে, অগ্নিমায়া ওপরে নেপথ্য মার লোবার ঘরে গোধিলেন। নেপথ্য তখন মার খাটে উপুড় হয়ে মূৰ গুজে চুপ করে গুয়ে ছিল। এই মিলেস দিনহার শ্যুভক্ষি, হুড়ি নিসেস সিনহা, পাশে গুয়ে ওর মাথার হাত দুদিয়ে দিচ্ছিলেন।

পাশে ছোট কাগড় চাড়বার দরবারিতে অগ্নিমায়া ছোট গাটকানি পাতা ছিল। ঘরমর কাগড়চোপড় ছড়ানো, বেগুজ খোলা, আলমারিতে চাবি দেওয়া নেই। ঘর করে প্রত্যেকটি জিনিস নিজের জায়গার ছুলে রেখে, যোগার কাগড়ের কর্ণ করে গাটবি বেঁধে, চাবিগাছি অগ্নিমায়া নেপথ্য হাতে দিয়ে বিরেছিলেন। আলমারির দেয়ালে হাজার হাজার টাকার গয়না এমনি পড়ে থাকত, তার একটিও খোঁচা যায়নি। ভণ্ড একান্ত নিজের প্রাপাইকু চাড়া, সব কিছু অগ্নিমায়া পরিগাট করে উঠিয়ে ফেলেছিলেন। প্রাচ উপলক্ষে বাড়িখানি নিকট আত্মীয়-বন্ধনে গিরগিল করছে। বাইরে কিছু ফেলে রাখাটা রিপ নয়।

বুকের মধ্যে একটা শুল্কতা বোধ হচ্ছিল। তার ওপর নোনার হাবগাছি করর করছিল। এটি অগ্নিমায়ায় একান্ত নিষ্কষ জিনিস। কতবার নেপথ্য বা বসেছিলেন, ওট ভোর এত ভালো লাগে, অগ্নি! অগ্নি! বসে ওট ভোকেই দিয়ে যাব, যা! বাব বাব ফেসে ফেসে কথাগুলি বদন্তেন। না হর হাতে করে ছুলে দিয়েই যাননি। তার সবাই বা সোলে কোথায়? সকালে মাথা ঘুরে পড়লেন, প্রপুতের মধ্যেই হয়ে গেল। মালাগাছি অগ্নি-মায়ায় নরতো সার?

ও মাদার কোনোদিনও ধোঁক হয়নি। বহু বহুর বাবে, সাড়ে তিন ম টাকা দিয়ে বটলস বেচে দিয়েছিল। যোজার ভেতর পে-টাকাটাও আছে।

তোমার মার মালা, অগ্নিমায়া? বেচতে মাথা কছে না?

মায়া? অগ্নিমায়া পরের ঘরে ঢাঙ্গি বহুর বাস করেছেন। তার আবার মাথা কি?

হ্যাঁ, তবে একটু মাথা আছে বইকি। মাথার বাড়ির লাদোয়া ঐ এককালি জমি, তার একবারে একটু আয় সাহ। অতো দিনে সেই কলমের গ্যাট্ট নিচ্ছ বোতলার লহান উঠু হয়ে উঠেছে। হিমলাগার আয়। কালো মেঘের মতো হল ধরে নিচ্ছ। মাথার পেট ভরে ধার; তা থাক সে। দোরের কাছে এমন আয় গেলে কেই বা ছেড়ে দেয়?

বেয়ামিশ বহুর অগ্নিমায়া ও-জমি চোখে দেখেননি, তবু যেন চোখের সামনে ভাসে। মাদার জমি থেকে এক লরি ফণিনলা দিয়ে আলাখা করা। মাদার বাড়ির পেছন দিকে তার কাঠা মাজ জমি। মাদার কোনো কাজে লাগে না। অথচ তাই নিয়ে মাথা, কি কাণ্ডটাই না করেছিল। হাঁহুরমশাইয়ের স্ত্রী অবিধি বলেছিলেন, সবই বোয়ের মতশায় করেছিল, কিন্তু অগ্নিমায়া তো মাথাকে ভালো করেই চেনেন। চিরটা কাল ওর ঐ এক ভাবেই গেল। এখন কেমন আছে কে জানে? বন্ধিন হাঁহুর-মশাই বেঁচে ছিলেন, মাঝে মাঝে পোষ্টকার্ডে ববর দিতেন। তিনিও মাথা সেছেন আল হুড়ি বহুরের বেশী। মায়াই বা বেঁচে আছে কিনা কে জানে?

অগ্নিমায়া আত্মলে সবর যোমেন। মায়া হল গিরে মন বহুরের বড়। অগ্নিমায়ায়ই হল গিরে সাতার বহুর। মাদার তা হলে সাতবট। সাতবট কি আর এমন বহুর? মাদার ছেলেরাও তখন প্রবছর ববর ছিল, সেই তবে এখন চুয়ামিশ বহুরের।

ভাঙ্গি আদর লাগে অগ্নিমায়ায়। সেই ছোট ছেলোটা—কি যেন বলে ডাকত মনে পড়ছে না—ওটাই ঐ অন্ত বহুর। কে জানে, তার চুলেও হয়তো পাখ ধরে গেছে।

বেয়ালে কোপানো কাগ-খরা বড় আয়নাটার দিকে অগ্নিমায়া চেয়ে বসেন। মাথা কাগড় পরা আরেকটা অগ্নিমায়া তাঁর দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। অগ্নিমায়া অবাক হয়ে তাকে বসেন। কেমন বেনে অচেনা অচেনা মনে হয়। বোটােসোটা, বেটে, শামলা রং, কানের পাশের চুলগুলি সব মাথা হয়ে গেছে, পুতনির তলাকার মাগুটা কি রকম ঢিলে দেখায়। অগ্নিমায়ায় ভাঙ্গি আদর লাগে।

হাশিও গায়। জমির কিন্তু অদলবদল হয় না হচ্ছে। যদি না তার ওপর ছোট একখানি বাড়ি জোলা যায়। প্রপাসে হুট শোবার ঘর, মাদার ঘর, মাঝখানে ছোট

হলধরখানি, পেছনে ব্রাহ্মণের, তার পাশে আরেকটা খুপরি ঘর, সামনে বাগান। বটফলের দামার নজতে সব ঠাকা আছে। আমগাছটি পড়বে বগরাকার নমুণে। তার গোড়া ঘিরে শাভাবাহারের গাছ বসানো থাকবে। অলিমাসিয়া বাগানখানি ডেক-চেয়ারে বসে বসে দেখবেন। এদিক থেকে দামার বাড়ি দেখা যাবে না, পেছন দিক দিয়ে যাওয়া আসা হবে। ও ঘরটা, জানের ঘরটা, হালধরখা ডাড়া দিয়ে, অলিমাসিয়া নিজের ঘরটা চালাবেন। খুপরি ঘরে তোলা উল্লুনে ব্রাহ্মণাড়া করবেন। কোনো কই হবে না, তোলা উল্লুনে অলিমাসিয়া আজ পনেরো বছর রেখে আসছেন।

হালধরখানের বড় চুল্লীতে আগ দেওয়া হয় না। বড় কয়লা শোড়ে। তোলা উল্লুনে কাঠকলগতে অলিমাসিয়া তিনটি প্রাণীর ব্রাহ্মণাড়া করেন। ভাড়াখাশটা বাওরা, একটা তরকাতি, একটা মাছ, আতপচালের ভাত। নেপু ডাল বন্ধ করে দিয়েছে, চার আনা সেবের ডাল তেরো আনা হয়েছে। বাতে রাসে, হাত-ভর্তি, বেগুন-ভর্তি, ঘন দুধ, এই রন্ধন। খাবার ঘরের কোনোর ইলেকট্রিক হিটার আছে, তাতেও কিছু কিছু হয়। কে এক মজল ওটা দিয়েছিল, সন্ধ্যা করে লাইন বসিয়ে দিয়েছিল। অলিমাসিয়াই স্থিতি। নেপু তো আশ্চর্য আশ্চর্য এদিকে ঐ খাবার সম্বন্ধেই ছাড়া আসেও না। কুহুদের জন্ত হাড়, হাঁট কককল এমনি দেয়; সেও হালু দিয়ে হিটারে সেদ্ধ হয়।

সায়াম্প নেপু ওদের লেভিজ কথিটির অনাধারবের জন্ত বোনে। ওরা জামা পিছু এক টাকা করে দেয় আর পশদের দাম দেয়, বলে পাড়ার মেয়েদের দিয়ে করিয়ে নিতে। তবে নেপু নিজেই অনেকগুলি বুনে কেনে, পরশাটা কিছু ফেল দেবার জিনিষ নহে। আর অলিমাসিয়া কিছু বুনে কেনে, টাকাটা তাঁরা কাছে আসে। বটকলকে দিয়েও হু-চাটবে বুনিবে নেন, সে আর ওর কাছ থেকে পরশা নেবে না, বরং কিছু করে দিতে পারলেই কৃতার্থ হয়। টাকার কথা বলে অলিমাসিয়া ওকে কখনো অশ্রয়ান করেননি। কে বুনে নেপু জিগেসও করে না, জামা পিছু এক টাকা ধরে দেয়, পশদের হিসেব বুজে দেয়। নইলে লেভিজ কথিটির কাছে লক্ষ্যার পড়তে হবে। নেপুও সবাবটি ভাবি নং। হালুধর নহে। আর সত্যি কথা বলতে কি, নিজের পরশা সে নিজে খরচ করল কি শুনে রাখল, কার ভাতে কি এল বার? কারো কাছে তো আর চেয়ে আসেনি।

ধরকা খুলে কোথা আসে। মুখখানি কেমন ত্রান দেখায়। অলিমাসিয়ার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই হেসে বলে,

এই দেখ, কেমন আমার বচাব শুধরে গেছে, বাত লাড়ে ন'টা না বাজতেই, বাড়ি এসে হাজির হয়েছি। বড় বড় হিষ্টের কতী আর আশুর দম এনেছি, মাসি, যাও আমার সঙ্গে।

শালপাতার চোঁতা হুন্দু অলিমাসির হাতে তুলে দেয়, চোখের দিকে চেয়ে হাসে। অলিমাসিয়া আর নেপুও কথাগুলি ওর কানে তোলেন না। যা যেহে, এখনি হরতো বাক গুছিয়ে অম্বকার হাতেই বেহিরে যাবে। তখন অতগুলো টাকা নিয়ে অলিমাসিয়া একতলায় একা থাকবেন কি করে?

। . .

লম্বা বেশমী বোঝাটাকে হাতে ধরে থাকতে ভাবি ডালো লাগে। রোজ নতুন কারগার লুকিয়ে রাখতে হয়। এ এক ডাবনার কারণ হয়ে উঠেছে। কোথায় পাবেন অলিমাসিয়া নিতি নিতি নতুন কারগা? কিরে কিরে আবার পুরোনো কারগাতেই রাখতে হয়। শোকাশিপে জমা দিয়ে দিলে ল্যাঠা চুকে বার। কিয়া ব্যাকে। ও বাবা, ব্যাক বহি বেশ করে। নেপুও বার পাপের বাড়ি থেকে পাওয়া পাচ হাজার টাকা ঐভাবে জলে গেলিল। নেপুও মা হেসে হেসে সে কথা অলিমাসিয়াকে জানিয়েছিল। তবে শোকাশিপ তো আর উঠে যাবে না। কিন্তু জানাজানি হবে। কেউ হয়তো জিগেস করে বদবে কোথায় গেল অলিমাসিয়া অতগুলো টাকা। চল্লিশ বছরে আটচাল্লিশ শ বার রোজগার, সে জমায় কি করে সাত হাজার? কাপড়টা, গামছাটাও তো নেপুও মা দিয়ে অবধি নিজেকে কিনতে হয়েছে; তা হলে টাকাটা না কয়ে বেড়ে গেল কি করে?

অলিমাসিয়ার মুখখানি কঠিন হয়ে ওঠে। এমনি এমনি বাড়েনি। প্রাণপাত করে বাড়িয়েছেন, এক টাকা দু টাকা পাঁচ টাকা শশ টাকা করে বাড়িয়েছেন। শু শু একবার হাতে হাতে একেবারে এক শ টাকা পেয়ে গেছিলেন লটারি জিতে। সেও বটকল টিকিট কিনে দিয়েছিল। জোয় করে অলিমাসিয়ার জয়দিন উপলক্ষে একটাকার টিকিট-খানি কিনে এনে উপহার দিয়েছিল। পাড়ার মেয়েরা সবাই কিনেছিল, যে যেমন করে পারে পরশা জোগাড় করে। কিন্তু টাকাটা উঠল অলিমাসিয়ার কপালে। বটকল সত্যি খুশি হয়েছিল। অবিশি ওর কাছেও অলিমাসিয়া কোনোরকম ভাবে নী থাকতে চাননি, তাই টিকিটের দাম একটা টাকা জোয় করে কিরিয়ে দিয়েছিলেন। বটকল

বোঝে হ'ব একটু হুঁসিটাই হয়েছিল। তাই দিখে সন্দেশ কিনে দশটিকে খাইয়েছিল। তখনকার দিনে এক আনার বেশ বড় একটা চিনি-সন্দেশ পাওয়া যেত। এই নিয়ে বিজুব বাসি-টাসিরা নাকি নানান যত্নবা করেছিল আড়ালে গিয়ে। তবে সেটা হওয়াই স্বাভাবিক, কারো ভালোটা তো লোকে সইতে পারে না।

মাহুলিটার মধ্যে থেকে গজমতিটা বের করা ভারি শক্ত। গালা দিখে মুখটা এঁটে নিয়েছেন অলিমাসিমা। মা'কে মাঝেই হুতোটা বদলাতে হ'ব, কি জানি কোনোনাম যদি ছিঁড়ে পড়ে যায়। মনে করলেও গা নিউরে ওঠে। মাহুলি খুলে ভালো করে পরীক্ষা করতে গিয়ে বেশেয় গালাটা আঁধা হয়ে এসেছে, মুখটা তিলতিল করছে। ভাগিয়া মনে হল, নইলে আরেকটু হলেই তো সর্বনাশ হয়ে যেত! বাঁধতে গিয়ে তো আঙনেই পড়ে যেতে পারত। এক নিমেষে তিন হাজার টাকা দামের গজমতি পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

আগে আগে মাহুলি খুলে মুক্তোটা হাতের চেটোর ঢাললেন অলিমাসিমা। এটা মা'র ছিল। মা'র মুক্তো ভালো মনে পড়ে না, বড়ই অকালে সেহিলেন। শুধু এইটুকু মনে পড়ে মা'ই মাহুলিতে ভরা গজমতিটা অলিমাসিমাকে দিয়েছিলেন। কাউকে কিছু বলতে মান। করেছিলেন। বাবার হাতে পড়লেই তো মন পেয়ে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতেন। অলিমাসিমাকে আর পেতে হত না। আর দাদা? অলিমাসিমার দাদি পায়।

একটুই চেয়ে থাকেন হাতের চেটোর গজমতিটার দিকে। বেন একটুকরো চাঁদের আলো। তিন হাজার টাকা দিয়ে এটাকে ধবন বেচে বিতে হবে, অলিমাসিমার মুঠো পাঁজরা ধসে যাবে। কিন্তু এ তিন হাজার না হলে তো বাড়িও হবে না।

ওকি দাদি!

দাদা চমকে ওঠেন অলিমাসিমা। মুক্তোটা হাত থেকে পড়ে তক্তাপোশের তলায় গড়িয়ে যায়। অলিমাসিমার হাত-পা হিব হয়ে যায়, বুকের দুকলুও বুরি খেয়ে যায়।

কেহা নিচু হয়ে তক্তাপোশের তলা থেকে মুক্তোটা বের করে। হু আঙলে ছুলে ধরে অম্বাক হয়ে চেয়ে থাকে। কেহা আর ছাড়াগুলি পরতুলের পাগড়ির মতো, কেহা আর চোখের কোলে গভীর ক্লান্ত ছায়া। কেহা মূখ্য কথা স্মরে না।

অলিমাসিমাও কথা বলেন।

আমার মা'র ছিল, কেহা। ঐ একটা জিনিসই রাখতে পেরেছিলেন, নইলে বাবা সব বস খেয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুরকার জমিদারির কিছু রাখেননি। মা নিজের গয়নাগুলি লুকিয়ে রেখেছিলেন; খোসাগুটি করে, ভর দেখিয়েও বদন বাবা আদার করতে পারতেন না, তখন আমাকে শূভে ছুলে ধরে নাকি ঠান ঠান করে চড় দাততেন। আমার কিছু মনে নেই, কেহা, ঠাকুরমশাইয়ের স্ত্রীর কাছে পরে শুনেছিলাম। আমার গায়ে নীল নীল দাগ পড়ে যেত, আর আমার মা'র চোখ দিয়ে বৃষ্টির দারার মতো জল পড়ত। গয়না না দিখে করেন কি! শুধু মাহুলিতে পোরা এই মুক্তোটার কথা বাবাও জানতেন না। এটা আমারই বংশের লক্ষ্মীর মাহুলি। ঠাকুমা মা'কে রাখতে দিয়েছিলেন, মা দরবার আগে আমাকে দিয়েছিলেন। কাউকে কখনো বলিনি এর কথা।

কি জানি কেন অলিমাসিমার চোখের জল বাধা মানে না। কেহা কাছে এসে বলে,

কই মাহুলী, দাদি, পাও আমার পুরে দিই।

কেহা হ্যাওখ্যাগে গালা থাকে। মোমবাতির টুকরো থাকে। দেশলাই থাকে। কেহাই মাহুলির মুখ বন্ধ করে, অলিমাসিমার হাতে বেধে। অলিমাসিমার হাত এত ঠালে যে, কেহাই মাহুলিটা গলায় গলিয়ে দেয়।

ওঠ দাদি, দিখে পেরেছে, বাবার এনেছি, একটু গরম করে দাও।

কেহা হাতমুখ ধুতে যায়। অলিমাসিমা উঠে ঠাডান। হুঁক করে মোজাটা কোল থেকে খসে মাটিতে পড়ে যায়। অলিমাসিমার সর্দাশ নিউরে পরে। ভাগিয়া কেহা'র চোখে পড়েনি। নাঃ, এখানে ওখানে না রেখে, নিজের ছোট ঘরদানির ওপরই তাকে, জিনের কোঁটার ভরে রাখাই ভালো। ঐসব পেরেক আর তার আর আসপিনের কোঁটার মধ্যে কে খুঁজতে বাবে!

অলিমাসিমা নিজের ঘরে গিয়ে, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিখে, মোজাটা লুকিয়ে রাখেন। কেহাকে অন্ততলে। কথা না বললেই হত। কি জানি কেহা'র হাতে মুক্তোটা বেধে মনের ভেতরটা হঠাৎ কেমন হুঁল হয়ে সেছিল। তবে বাবা-মা'র কথাটা না বললেই হত। কেহু'র হাতে পড়বে কোনোনাম বলেননি। কি জানি। তবে কেহা বে-রকম অসহ্যারী মেয়ে, ওকে কাউকে বলবে না সেটা ঠিক।

কেহা চীনে বাবার এনেছে। মোড়ের বাবার চীনে হোটেল থেকে। অলিমাসিমা বদাম্বার নিরামিখ মেয়ে

এসেছেন, কিন্তু এখানে কিরকম হাত-পা কিম্বদন্তি করে, বটকল বলে মাছ খাসে ডিব একটু একটু খান, নইলে কোমলিন মাথা ঘুরে পড়বেন। ডিপেলারির ভাঙারও সেই কথাই বলেছিল। বটকল আয়ো বলে, বাসবিধবা আপনি, কোমলিন মাথার ঘরই করলেন না, আপনি আসার বিধবা নাকি, অথবা আপনাকে স্মারী বলি।

বটকলরা শ্রুতান। পাঁচশুকরের শ্রুতান, তারি ভালো! ওদের চালচলন। একদিন ওদের বাড়ি গিয়ে প্রায় ডিবি গেছিলেন অলিমাসিয়া। বটকলের বৌদিদি, যে পাস-করা নার্স, সেই প্রথম বলেছিল ও কথা। তখন অলিমাসিয়ার মাথাটা এমন কিম্বদন্তি করছিল যে, ওরা কি বলছিল সবটা ঠিক ঠাণ্ডা হয়নি। এমনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলেন। তখন বটকল চামচে করে গরম গরম কিশোর স্ক্রুয়া বাইরে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল শরীরে বৃষ্টি প্রাণটা ফিরে এসে। এই অলিমাসিয়ার প্রথম আধিগ বাওয়া। ছোটবেলাকার কথা অবিশিষ্ট আলাশা, সে খাও মনে নেই।

তবু বাড়িতে নিরাশ্রয়ই যেতেন, কেমন লম্বা লম্বা করত। নেপু কথাটা ঠিক বুঝে না, এটা অলিমাসিয়া জানতেন। ডাছাড়া বরত বাড়ানোর কথাই নেপু কখনই মত দেবে না। কি সব ব্যঞ্জে কথা ভাবছেন অলিমাসিয়া, বটকলরা ক্ষোভ করে খাওয়া, তাই। নইলে কবে আর উনি আশ্রয় খেয়েছেন? ওরাই মাঝে মাঝে এটা ওটা এনে খাইয়ে যায়। পূর্ব গোপনে, কারণ হিম্মতের গোঁড়াধির কথা ওদের অজানা নয়। এমন কি বটকলের বৃদ্ধি যা কোকলা বাড়ি বের করে বলেন, অত কি গা? ছুই বরং বিচান হয়ে যা। সবাই কেন যে বিচান হয় না ডেবে পাইনে। কত সুবিধে।

বটকল ব্যাধ হয়ে ওঠে। থাক, থাক মা, তোমাকে আর এর মধ্যে নাক গলাতে হবে না।

এসব কথা অবিশিষ্ট কোয়ারও জানার নয়। কিন্তু বোধ হয় জানত। নইলে অত জোর করে চীনে খাবার খাওয়াবার সাগরটা পেল কোথায়? তবে কোয়ার সাহসের শেষ নেই।

উঠোনের কোনার কলঘর থেকে অলিমাসিয়া হাতে মুখে জল দিয়ে এসেন। দুজনার চীনে খাবার খেলেন। খোলাপুলি খাবার ঘরে বসেই খাওয়া হল। বাতে কেউ আসে না এফিক্টাতে। সব কাক অলিমাসিয়া একা করেন। শুধু শব্দর এসে হুবেলা ঘরঘোর মুছে দিয়ে যায়। আগে অলিমাসিয়া বেথরের ছেলেকে সেকার্ট মাড়াতে দিতেন না। কিন্তু বছর দুই ধরে কি যে হয়েছে, নিহু হওয়া বড় কঠ।

তবে নিজের ঘরখানিতে অলিমাসিয়া ছাড়া কেউ যার না। কেহাও না। এমনি অলিমাসিয়া বেয়ে যে বেতে চাখও না।

বেতে বলে কেহা বেশী কথা বলে না, কেমন সেন অন্তমনস্ক, অলিমাসিয়া ঠেঁচে যান। তখন ও দুর্বলতাইকু প্রকাশ না করলেই হত। যা ততো কবে মরে গেছে। মৃতাও কেমন মনের মধ্যে আবছায়া হয়ে এসেছে। এত কথা বটকলও জানে না। কেহাকে বলে কেলে অলিমাসিয়া লম্বা বোধ করেন।

কিন্তু কেহা শুধু তার আপিশের গল্পই করে। ছোট-সাথেই তাঁর পিওন দিয়ে বাড়ির কাজ করিয়ে নেন। পিওনরা কেহাকে দিয়ে তাঁর নামে বড়সাহেবের কাছে লম্বা লম্বা চিঠি লেখায়। কেহা সব কথা অবিশিষ্ট সেখে না, তা হলে আর ওদের কারো চাকরি থাকত না। ওদের গরম গরম করার সঙ্গে কেহা মুখ-চিনি মিশিয়ে বেধ। তাতে চিঠির কোনো হল বোঝা যায় না, কিন্তু চাকরিগুলো ঠিকে যায়। আপিশের গল্প শুনেও শুনেও মাঝখানে হঠাৎ অলিমাসিয়া জিজ্ঞেস করে বলেন,

ঐ পিওনরা কত করে মাইনে পায়, কেহা?

কেহা বেন অবাক হয়। মাইনে? তা এদিক ওদিক নিয়ে আশী-চাশী হবে বোধ হয়। ওখাও ইউনিয়নের মেম্বর, মাসে মাসে সব আট-আনা টাকা দেয় জাবে। বাবুদের টাকা ব্যক্তি পড়লেও, ওদের স্বখনও পড়ে না।

পিওনরাও আশী টাকা মাইনে পায়। আশীকে বায়ে দিয়ে গুল করলে কত হয়?

পাওয়া সারা হয়েছে অনেকসময়, অলিমাসিয়াকে চিন্তিত দেখে কেহাই উঠে, ঘরের কোণে হাত খোয়ার বেসিনে বাসনগুলি স্যাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলে। কাড়ন দিয়ে মুছে তাকে ছুলে রাখে।

অলিমাসিয়ার কাছে এসে বলে, চলি মাসি, কাল সকালে ছাটার বেকব, কাজ আছে, ও-পাড়া যেতে হবে। এত কি ভাব বল ততো?

অন্তমনস্ক ভাবে অলিমাসিয়া মাথা নাড়েন। অন্ধ তেমন মাথার আলো না আজকাল। কিন্তু বর্ধমানের প্রাইমারী স্কুলে অলকানন্দা সর্বদা অন্ধে কার্ট হত। চট করে মাথাতাও মনে পড়ে না আজকাল। আট-বারো ছিয়ারনকই। এক বছরে পিওনরা পায় ন শ বাট টাকা। হু হাজার ডুলতে হু বছরের একটু বেশী। অলিমাসিয়ার হলে লাগত হু বছরেরও কম।

মনটা স্ক্রু হতে ওঠে। কি জানে ঐ পিওনরা? কেহাকে দিয়ে চিঠি লেখায়। হু হাজার টাকা ডুলতে

অসিমাধিয়ার লাগে কতদিন? সাত হাজার জম্বাতে
গেগেছে চল্লিশ বছর। তবে আগের চাইতে অসিমাধিয়ার
তাড়াতাড়ি জমে। তবু হু হাজার জম্বাতে হরতো দশ
বছর লাগবে। দশ বছর। অসিমাধিয়ারও ততদিনে
সাতশত বছর বয়স হয়ে যাবে। হরতো ঝাঁপবেন না
অতদিন।

সমস্ত ঘনটা বিস্তার করে। টাকা হোজগার করা এত
সহজ, অথচ হু হাজার টাকা জম্বাতে অসিমাধিয়ার লাগবে
দশ বছর? জামাই এক একটা কেসে এক এক বার মাঝি
পাঁচ সাত শ পাঁচ। নেপুথ বাবা—না, সে আর কি দিয়ে
গেছে অসিমাধিয়ারকে!

অসিমাধিয়ার চোখ ফেটে জল আসে। বটফলের
কথা মনে হয়। বটফলের বৌদি যে নাগ, সে মাঝি যাচ্ছে
হু শ টাকা! না! তবে সে চার বছর ধরে গড়ে, শাস দিচ্ছে,
তবে না? কিন্তু বটফল নিজে? কি-ই বা তার বিত্তে?
অসিমাধিয়ার চাইতে হরতো হু চার জাল বেশী। কিন্তু
সেও শাস-টাস করেনি। কাজকর্মও অসিমাধিয়ার কাছ
থেকেই নিয়ে যায়। অথচ ক্যাঙ্কিনে সেও পঁচাত্তর টাকা
মাইনের কাজ করে। ছোট ছোটটাকে স্বাধীর কাছে
হেঁপে, হোজ কাচ্ছে যায়। নিজের একটা হোজগার
না থাকলে চলল কখনো? স্বাধীর নিয়ে, ছেলে নিয়ে বাপের
বাড়িতে থাকবে, অথচ কিছু খরচ দেবে না, তা কি হয়
কখনো?

বটফল বলে, আপনিও চলুন আমাদের ক্যাঙ্কিনে কাজ
করবেন। আপনাকে শেলে ঠায়া লুকে নেবেন। তার
নেসার জন্ত সোক খুঁজছেন, এক শ টাকা কি তার চাইতে
বেশী দেবেন।

বটফলের বা কোকলা মাড়ি বের করে বলেন, ও কাজ
করবে না, মাগো! হিজ্জা বড়লোক আখীরখানের
বাড়িতে থাকতে লক্ষা পায় না, চাকরি করতে লক্ষা পায়।
ও আধি দেবে দেখছি। বটফল বলে,

হা, ছুটি বামোতো। পরের ব্যাপারে নাক গলিও না।

কিন্তু ক্যাঙ্কিনের ঐ কাজে যথেষ্ট সম্মান আছে,
একপায়ে মাথার কাজ। বছর দুই-এর বেশী করতেও
হবে না।

তু খুটি বছর। কিন্তু তা হলে এখান থেকে চল
যেতে হবে। বেরল্লিছ বছর পর এ-বাড়ি ছাড়তে হবে।
এ বর্ষমানের সেই কালি জম্বিতে বাঙালি নয়। সেখানে
তো অসিমাধিয়ার ঘন চল্লিশ বছর ধরে বাসা বেঁধে
আছে। সে তো নতুন জায়গা নয়।

ক্যাঙ্কিনে কাজ করলে আর নেপু এখানে থাকতে
দেবে না, আর থাকবেনই বা কেন তিনি? কিন্তু
কোথার যাবেন অসিমাধিয়ার? কোথায় বাঙালি মানেই
তো থরচ। হু-বছরের জায়গার তিন বছর। তবে
থরচ দিয়ে তো বটফলের বাড়িতেও থাকা হবে, ওয়া
একটা ঘর ভাড়া দেয়। হোক না তিন বছর। তিন
বছর আর এমন কি। কালই যাবেন বটফলের বাড়ি—

কি একটা শব্দ কানে আগে, হুড়হাড় করে কে শিঙি
বেরে নামছে না? তালো খোলার শব্দ, কড়ের মতো
নেপু এসে ঢোকে—

অসিমাধি, শিগ্গির এসো, উনি কেমন কচ্ছেন।

কেয়াও উঠে এসেছে। বহরিন পরে অসিমাধিয়ার
বোতলার ওঠেন। গত তিন বছর ধরে বোতলার কারো
ওঠা নেপুথ পছন্দ নয়। সেখানকার সব কাজ সে নিজের
হাতেই করে। অবিভি গুটিতিনেক খর রেখে আর সবটা
সামনের অংশের মতো ভাড়া দেওয়া। সেখিকটার সঙ্গে
কোনো যোগাযোগই নেই। বড় শোবার ঘর, কাপড়-
ছাড়ার ঘর, কান্নের ঘর আর বাচ্চের ঘর। বড় শোবার
ঘরের পাটে জামাই অচেতন হয়ে গড়ে।

অসিমাধিয়ার মাথা বড় ঠাণ্ডা। কেয়াও যেন একই
থাবড়ে সেছিল। তবু অসিমাধিয়ার নির্দেশে সে-ই কোন
করে ডাক্তার ডাকল। অসিমাধিয়ার কামাইয়ের মাথার
জলপটি দিতে থাকলেন। নেপু খুঁ খুঁজড়ে কোনার
সোকাটায় পড়ে থাকল।

হুড়চাপের পুরোনো কষ্ট, ডাক্তার এসে ওখু-পজ,
বাওরা-দাওরা কথা বললেন। আগেই সাবধান হওয়া
উচিত ছিল, হাই হোক, সে-রকম কিছু হয়নি এবার।
পাঁচ-সাত দিনেই সবথঃ ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু
এগুলো ঘল প্রকৃতির ওয়ানিং। এখন থেকে খুব সাবধানে
চলাকেন।

নেপু ক্যালক্যাল করে চেবে থাকে, ডাক্তার চল
গেলে অসিমাধিয়ার কেসে মাথা রেখে খুব বাসিন্দা
কঁপে নেব। কেয়া ক'দিন ছুটি নেব, বাঁখোয়াড়া করে
দেব, হিটার জেলে। বলে, উইন-ইউন ঠেকাতে পারবে
না। নেপু বলে, মিটারে বেশী উঠবে। কেয়া বলে, কি
বেশী উঠবে, নেপুটি, কত বেশী উঠবে? সে গিয়ে থেওয়া
যাবে। তোমার তো মেলা টাকা।

নেপুথ ও-ধরনের কথা ভালো লাগে না। তাছাড়া
কেয়ার কোনো আচরণই বিরো-হওয়া ঘেঁষের মতো নয়।
শিহুর পরে না, মাথার কাপড় দেয় না, ডাক্তারের সঙ্গে

হেসে-হেসে কথা বলে, দোঁড়ে-দোঁড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠে-নাথে, না মুখে আসে বকে। বেন সমানে সমানে।

জামাই একই হুহু হয়ে, সাদিসে ঠেস দিয়ে উঠে বসলে, কেহা একদিন থরথর গুছিয়ে দিল। বাটের তলা থেকে বাপি-বাপি বাপি বাব্ব, টিন, হেঁড়া ছুতো বের করে, বিক্রিওয়াল ডেকে সতেরো টাকা তার জিনিস বিক্রি করে, নেপু হাতে টাকা দিল। নেপু বসলে, মোটে সতেরো টাকা না হিলেও পারতে, কেহা।

অন্ত সোকে হুতো আঝো বেনী দিত।

কেহা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

খাট থেকে জামাই হেসে বলে,

কিছু বেনী দিত না, নেপু। আজ পর্বত কোনোদিনও সতেরো টাকার রাবিশ বিক্রি করতে কাকও দেখিনি। ওর অর্ধেকটা তো আমার হতে কেহাবই আশা। এ ঘরে কি দেখছ কেহা, তোমার নেপুদার কাপড়-ছাড়ার ঘর যবি দেখে—

করুণ করে নেপু বলে,

ও-ঘরে তোমার বাবার কোনো দরকার নেই, কেহা। ছুদি সবটাকে বজ্ঞ বাড়াবাড়ি কর—

কেহা হেসে বলে, না নেপুদি, তোমার কোনো ভর নেই, তোমাকে না বলে আখি কিছু করব না।

কেহা নিচে চলে যায়।

জামাই বলে, কিছুই হয়নি নেপু, মিথি মিথি সাগারাগি করলে।

নেপু আরো বেগে যায়।

না, কিছু হয়নি। তোমার কথার মধ্যে কেহাব সামনে আমাকে ছোট করার ইচ্ছা ছিল না! ও-বকশ করে ওকে মাথায় তুলো না বলছি।

জামাইও ছাড়ে না।

কি বাক্যে কথা বল, নেপু। আযোগ্য সব কথা।

নেপু দোকা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

হ্যাঁ, আযোগ্য কথাই তো! আমি এখন আযোগ্য না তো কি!! সব পুরুষ মাহুতরা এক বকশ, হুঁড়া হলেও বদলার না! ঐ নির্ভক বেহারা মেয়েটাকে আশ্বাস দিচ্ছ কিসের আশার?

জামাই হঠাৎ বেগে যায়—না মুখে আসে তাই বল, নেপু? ও না আমাদের মেয়ের হতো, এইখানেতে মাহুত, এতটুকু মা-মরা মেয়ে এসেছিল, তোমার বাবার আদরে মাহুত হল, এখন থেকে বিয়ে হল, আবার নিষাদর হয়ে এখানেই ফিরে এল। তোমার কি ছবর

বলে কিছু নেই, নেপু? তাই ভগ্যান তোমাকে ছেলে-মেয়ে দেননি।

উত্তেজনার জামাইয়ের মাথা ভিমঝিম করে, বুক ধড়ধড় করে। অগ্নিমাগিমা ছোট্ট কালো শিশি থেকে পঁচিশ টোটা ওষু তপে থাইয়ে দেন। নেপুও থাথড়ে গিয়ে তখনকার হতো চূপ করে। পরে অগ্নিমাগিয়ার কাছে কাছাকাটি করে। অগ্নিমাগিমা বলেন,

অমন কথা কি কেউ বলে, নেপু? জামাইয়ের কেনতার হতো চরিত্র, সে কি ছুদি জানো না?

কানসলে নেপুয় চোপ তুলে বাব, নাক লাগ হয়ে ওঠে। ঢোক গিলে বলে,

সব আমার এলোমেলো হয়ে আছে, অগ্নিমাগি, কি বলতে কি বলি তার ঠিক নেই। কিন্তু ও-মেয়ের হাব-ভাব বেশলে গা আসে যায়, অগ্নিমাগি, সব সবই অমন ঢলে-ঢলে পড়ে, ও কি বুঝ ভালো মেয়ে বলতে চাও? স্বামী আরেকটা বিয়ে করে বিবেশে থেকে গেল, ওকে মিল না, তার অন্তে এতটুকু লজ্জা, এতটুকু হুংহু নেই ওর? ভালোমাহুতের মেয়েরা হয় ও-রকম? বদন-তখন আসে যায়, ছুদিই তো বলেছ। এ-বাড়িতে থাকে কেন? ওকে চলে যেতে বল।

অগ্নিমাগিয়ার বুক চিপচিপ করে। এ আলোচনা ওর কানে পোলেই তো ধরেছে। হাতে হাতে তথুনি পানের বাড়ি গিয়ে ঐ অলক বলে ছেলেটাকেই কোন করবে হুতো, নে-ই ঘর টিক করে সেবে, বাব্ব নিয়ে চলে যাবে কেহা। একতলার অগ্নিমাগিমা থাকবেন কি করে? নেপুকে বোকাতে হয়,

দেখ নেপু, অত অধৈর্য হলে চলে কখনো? ঐ সিঁড়ির নিচে গুবে থাকে, তারি সন্ধ্যা হুয় ওর, ওকে না জানিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠে সাধা কার! আখিও নিচ্ছিলে থাকি নেপু, ও একটা পাহারাওয়ালার হতো। তারপর এমন সংসারটাকে ও-ই ঠিকিয়ে রেখেছে; ও গেলে আমাকে নিচে যেতে হয়।

পাণ্ডমুখে নেপু অগ্নিমাগিয়ার হাত চেপে ধরে—না না, একা আমি ঐর কাছে থাকতে পারব না। আমার তারি ভয় করে।

মাঝে মাঝে ক্যান্ডিনের কথা মনে পড়ে। বটফলরা এসে এসে ফিরে যায়, কেহা বলেছে। বাবার বেগে যায় সোজা, অগ্নিমাগিমা কান্নার সেবা করছেন, পুত্রিকর ধাবার না হলে পারবেন কেন? কেহা হেসে বেগে অগ্নিমাগিকে সব খবর দেয়। সব কাজও করে বেদ কেহা, এত ভালো।

করে কাজ করে দেব যে, অগ্নিমানসিমা ত্যাগিত না করে
পারেন না। কিন্তু আর ওপরে যায় না।

। . .

দি'ড়ির দ্যাকখানের পরজাতে রাত ন'টার সময় রোজ
নেপু নিজের হাতে তাল। ধিরে আসে। আটটার সময়
অগ্নিমানসিমা নিচে গিয়ে ত্রৈতে শাক্তিরে নেপু'র আর
জামাইয়ের খাবার নিয়ে, ওলের খেতে বসিয়ে দেন। পরে
ওলের বাসন হাতে করে, নিজের নিচে গিয়ে বা হয়
যেয়ে আসেন। নেপু আর নামতে দেহ না। কিন্তু
রোজই অগ্নিমানসিমার মনে হয় ঐ অলক ছোঁকরা এসে
কেয়ার সঙ্গে হঠতো অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে।

দিনে দিনে কেয়ার সাহস এমনি বাড়তে যে, একদিন
রাত দশটার সময় নেপু'র কিশ-বাখার জন্ত গরম জলের
ব্যাগ নিয়ে অগ্নিমানসিমা নিচে নামেন, দেখেন খাবার
ঘরের বড় বেতশাখারের টেবিলে বসে কেয়া আর অলক
চা আর সিগাড়া খাচ্ছে আর ঘেসে ঘেসে গল্প করছে।

অগ্নিমানসিমাকে দেখে এতটুকু লক্ষ্য নেই, উঠে দাঁড়িয়ে
অলক অগ্নিমানসিমার ঘুমের দিকে চেয়ে কুহ-কুহ হাসতে
থাকে। অগ্নিমানসিমার গা জ্বলে যায়।

বগিহারি সাহস, কেয়া। নেপু জানতে পারলে আর
তোমাকে আচ্ছ রাখবে না। ওপরে মাহবুবা অস্থগ করে
পড়ে রাত্রে, তোমাদের কি গাঙ্গগল্পের সময়-অসময়
নেই, কেয়া?

এমন করে বললেন যেন অলককে বেধেতেই পাননি।
তবু বয়স গঙ্গার অলক বললে,
অস্থগ না হলে কি আর আমাকে চুকতে দিত,
নলিমা?

অগ্নিমানসিমার পিঠি জ্বলে যায়।

তোমারই বা কি রকম আকসল, বাছা! এত রাত্রে
ডহলোকের বাড়ি চুক কেউ গল্প করে?

কিন্তু কেয়া কিছুতেই রাগ করে না; হেসে বলে,

এই আগে যে ওর হুটী হয় না, বাসি। নিজের তলার
কথা বলবার পোক না পেয়ে আবিঙ তো ইপিরে
উঠি। রেগে। না লক্ষ্যটি, ও এখনি চলে যাবে। বরং
এই সিগাড়াটা খেয়ে ফেল।

ততক্ষণ জল ছুটে গেছে।

অলক উঠে সে, চলি কেয়া, কাল একবার ধবর
দেব।

কেয়াও উঠে গিয়ে বিড়কি দরজা বন্ধ করে দেয়।

ব্যাগে জল ভরতে ভরতে অগ্নিমানসিমা বলেন,
ওর সাহসে বাগলের সিগাড়ার কথাটা কি না-বললেই
হত না, কেয়া?

কেয়া অবাক হয়ে যায়।

কেন, বাসি, ও কিছু মনে করেনি, ওরা অস্ত্র ধরনের
মাহবু।

অগ্নিমানসিমা চলে যেতে যেতে বলেন,

সে তো বুঝতেই পারছি, কেয়া, নইলে রাত দশটা।
অবধি একজন বিহে-হুঙা ঘেরের লোক গল্প করে।

কেয়া চুপ করে থাকে। অগ্নিমানসিমা আদর্শ হয়ে
ওর ঘুমের দিকে তাকান। খোলা দরজা দিয়ে অস্থকার
উঠোনের দিকে কেয়া চেয়ে আছে। মাঝার ওপরের
কীণ আলোতে কেয়ার চোখের কোলে কীর্ণ পল্লবের
ছায়া পড়ে, বাইরের অস্থকারের চেয়ে আরো গাঢ় অস্থকার
সৃষ্টি করে। যেন একটা বন্ধ দরজার সাহসে এসে
অগ্নিমানসিমাকে ধামতে হয়।

তখনই ওপরে যেতে হয়, নেপু অর্ধদ্রব হয়ে গড়বে।

রাত আরো গভীর হলে, জামাইকে ঘুমের ওষুধ
নিয়ে, নেপু'র কাপড়-ছাড়ার ঘরে অগ্নিমানসিমা তাঁর
পুরোনো খাটটির ওপরে পা উঠিয়ে বলেন। ঘুম আসে না
এখানে। একতলার ঐ স্ট্যান্ডেতে সীতল নীরব ঘরখানি
নইলে অগ্নিমানসিমার ঘুম হয় না।

বেশখী বোঝাটাকে নিয়েই হয়েছ মুশকিল। দেটাকে
ওপরেও আনা যায় না, কেয়ারকেও কিছু বলা যায় না।
পেরেকের কোটোর পেছনে, টিক সেইরকম আরেকটা
কোটাতে বোঝাটা নিরাপদে মুকোনা আছে। বাইরের
খুশির জানলার খিল লাগানো, পান্না বন্ধ। এখিকের
দরজার গডরেজের তাল। মাঝ। তবু যেন বুঁতবুঁত করে।
ইচ্ছে করে আর একবার গিয়ে দেখে আসি। যাবে
যাবে ঘুম ভেঙে যাবে। সবে সবে যাবতে পারলে ভালো
হত; কিন্তু সমস্তটা এক ন' টাকার নোট এতখানি জায়গা
ছুড়ে থাকে।

ও-ঘরে আলো জ্বালা থাকলে নেপু'র ঘুম হয় না।
আবার সব আলো নিভিয়ে গিলে নেপু'র ভর-ভর করে।
ও-ঘরের আলো তাই জ্বলে রাখতে হয়। কেমন করে
ঘুম হবে অগ্নিমানসিমার?

কেয়া কি ঘুমের? নিচে একা-একা দি'ড়ির তলার
ঘরে কেয়া কেমন করে ঘুমের? ছোট্ট কেয়ারকে মনে
পড়ে অগ্নিমানসিমার। পাঁচ-ছ বছরের কেয়া, শাবলা,
পাতলা, ভাগম-ভাগম-চোখ একটা কেয়া, রাত্রে বা'র অস্থ

কান্ডত। নেপুং মা-বাবা তখন গেঁচে, নইলে কি আর এ-বাড়িতে ঠাই পেত? কোথায় গেল সেইসব দূর-দশপর্কের আত্মীয়স্বজনের দল, বাহা! বাবোবাবা এ-বাড়িতে থেকে লেখাপড়া নিয়ে মাহুং হয়ে, এখানে-ওখানে চাকরি নিয়ে চলে গেল।

মনে হয় এইতো সেদিন রাত্রাঘরের বারান্দার সারি সারি পিঁড়ে পড়ত। কাশার-বালাতে ভাত পেয়ে, হুবেলা তাহা খাচারবার সময় খালা-গোলাস খুয়ে, ঐ উঁচু জায়গাটিতে উপুড় করে বেধে যেত। বাশন-মাকার কি অবিশিষ্ট হুবেলাই আসত, রানি রানি বাশন মেজে দিত। কিন্তু ওরা সব নিজেদেরটা নিজেরা বুঝে দিয়ে যে-বার ইচ্ছা-কলেক্কে চলে যেত।

মাশ-কাবারে দুঁড়া সরকার মশাইয়ের কাছ থেকে ইচ্ছার মতিনেইহুঁ চেয়ে নিত। পুজোর সময় সব হু-জোড়া করে কাপড়-কাষা পেত। রীতি করে মিলের কোরা কাপড় আসত এই ঘরে। অসিমাশিমা কাচি দিয়ে জোড়া কেটে দিতেন। মোড়ার ওপর পা ছুঁলে নেপুং মা বলতেন; বলতেন, চারখানি কাপড় চাররকম পাড়ের দিবি, অসি। নাম দিখে নেবে ওরা, ধোণার দিলে গোলমাল হয়ে না।

কেষার জন্তও চার রঙের চারখানি জুঁক আসত। যারে কেঁধা কাঁদে শুনে, নিজের ঘরে ওর বিছানা পাতাতেন।

তাই নিয়ে নেপুং কি রাগ! ও-সব আনিখোতা কোরো না বলছি, নাই হিলে হুঁহুও মাখার চড়ে।

তবে মা'র সামনে বলার সাহস ছিল না, বত রাগ কাড়ত অসিমাশিয়ার ওপর। পাঁচ বছরের কেঁধা তখন, ত্রিশ বছরের নেপুং, বড়িশ বছরের অসিমাশিমা। মনে হয় যেন কাল। কোরা কাপড়ের গছ যেন নাকে আসে।

তারপর নেপুং মা-ও চোখ বুজলেন, অসিমাশিরও স্থান হল একতলায় ঐ ছোট ঘরখানিতে, আর কেঁধাও একতলায় দুঁড়া সরকার মশায়ের দ্বীরা কাছে শুতে গেল। কাকেও বলতে হয়নি, নিজের ছোট বাসিন্দাখানা বগলে করে হুড়হুড় করে কখন গিয়ে সরকার মশায়ের ঘরে আল্পের নিল, সরকার মশাই নিজের টেব গেলেন না। ভাবি ডালোবাসতেন ওকে।

কিন্তু অসিমাশিয়ার কাছে কেঁধা কখনো আসেনি। এলে অসিমাশিমা নিশ্চয়ই বিরক্ত হতেন। আর পাঁচটা ছেলেও তো এ-বাড়িতে মাহুং হয়ে গেছে, তবে যেয়ে শুঁ ঐ কেঁধা। পাড়ার ছুল থেকে বেবার সে মাস্ট্রিক পাস



করল, নেপুং বাবা কোনো এক বছর ছেলেসব মনে ধরচেন করে ওর বিয়ে দিয়ে দিলেন।

বরচের বছর দেখে নেপুং তখনো বেগে টং, তবে বাশের ওপরও কথা বলার সাহস ছিল না। আর মা গিয়ে অবধি বাবা যেন আবে। গম্বীর হয়ে উঠেছিলেন: কাছে এগুনোই দায়। তাড়াছাড়া জামাই তখন পাটনার গ্র্যাকটিস করত, নেপুংও অনেক সময় সেখানেই থাকত। বাবা গেলে পর ওরা এখানে এসে কারেখী হয়ে বলল।

সীর্ণবিবাস কোলে অসিমাশিমা বড় চেনা ঘরখানিকে নতুন করে চেয়ে দেখেন। নেপুং মা এখন ছিলেন এ ঘরখানি আলো-জ্বালা দক্ষিণের মতো; বলমল করত। গম্ববনের মতো হুগছে তুতুত করত। আলমারির দরজা অর্ধেক সবধ খোলা থাকত। জেডরকার থাক থাক নানান রঙের বেশখী বাড়ি দেখা যেত। তিনতলা আলনাটাতে সারি সারি গোড়ালি-তোলা ছুতো থাকত। আয়নার সামনেটাকে দেখে মনে হত গরনার সোফান। সাতাদিন কাটত অসিমাশিয়ার এই ঘরে, হুঁচ-হুতো নিয়ে, আর পাশের ঘানের দ্বিবে এনামেল-করা ছোট গামলাতে

লক্ষ-গোলা কল নিয়ে। শাকসব্দের সম্বন্ধে এমন কিছু নেই যা অগ্নিমানসিয়ার অজ্ঞান। কিছুই কোনো কাজে লাগে না এখন।

যাকে বাকে সব কিছুতে অচিরে হত নেপুর ঘা'ত, দিনের পর দিন বাড়ি থেকে কেড়ে না। এই ঘরে ফোঁড়ে তবে এটা ভটা হোঁধে অগ্নিমানসিয়ার নেপুর যাকে কুশলোভেন। নেপুর বাবা খুব বেশী বাইরে-বাইরে থাকতেন। তাঁকে নিয়েই যে এই সব অভিযান, এইসু অগ্নিমানসিয়ার দৃষ্টতেন। তার বেশী জানবার চেষ্টাও করতেন না।

নেপুর বাবা।

ঐ বকন মানুষ আর আজকাল তৈরী হয় না। সব তাঁর ছিল বিশেষ; লোহ যদি থাকত সেও ছোট নয়। নেপুর বাবার শরীর মন বড় ছাঁচে ঢালাই করা ছিল।

কালে কালে অগ্নিমানসিয়ার সঙ্গে তাঁর কেমন একটা অপ্রকাশিত ঝড় হতে পাড়িয়েছিল যেমন করে হোক নেপুর যাকে খুশি রাখতে হবে। নেপুর যাকে খুশি রাখা অগ্নিমানসিয়ার একমাত্র চিন্তা হয়ে পাড়িয়েছিল। কি মুকর ছিল এই মনিন ঘরখানি তখন! এ ঘরে পা হিলে মন আগুন থেকে ভালো হবে বেত। এ ঘরে মুকরের গুলো হত তখন, বেশিকৈ অগ্নিমানসিয়ার গোণ পড়ত, মুড় হয়ে যেতেন।

সংগঠিন একভাবে কেটে যেত।

যারে বেই আলো নিভিয়ে ছোট বাটটিতে এসে গুতেন, অমনি গোপের সামনে ভেসে উঠত বখ'মানের একপাশে, বড় একটা বাড়ির লাগোয়া ছোট এককালি জমি। সেখানে অগ্নিমানসিয়ার আসবার আগে বিষমাগর আবার একটি কলম পুতে দিয়েছিলেন। এখানে এই কালের হাটে অগ্নিমানসিয়ার নিজের বলতে এক তিল স্থান নেই বটে, কিন্তু সেই জায়গাটা তাঁর একান্ত আগমার। সেই সময় থেকে অগ্নিমানসিয়ার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এখানে ছোট একখানি বাড়ি তুলবেন, যা হবে একান্ত তাঁর নিজস্ব, যেখানে তিনিই যাবেন সজাঙ্কী।

তখনো চোখের সামনে বাড়িখানি নির্দিষ্ট একটা রূপ হয়েনি, নীল কাগজে তার মন্ডা হরনি, ছোট ছাপা বই থেকে কেউ তার বাইরের চেহারা অগ্নিমানসিয়ারকে দেখাননি, তবু সে তাঁর সমস্ত চরিত্রখানি তখন থেকেই জুড়ে ছিল।

চল্লিশ বছরে সাত হাজার টাকা জমল। মুক্তার দাম তিন হাজার টাকা, দাম ক'বা অবিবাহিত কন্যার ক'বা অগ্নিমানসিয়ার কন্যার মনেও হয় না।* আরো দু হাজার

জমাতে হবে। বাবো হাজার টাকা ধলে, সেখানে সত্তার একটি ঘর ভাড়া করে তিন বাগ থাকতে হবে। বটকলের দাম। বলেছেন বাড়ি করতে তিনমাস লাগবে। তার মত অগ্নিমানসিয়ার দশ বছর অপেক্ষা করতে পারবেন না।

মন গ্রিক করে ফেলেন। কালই একবার বটকলের ভাণ্ডানে গিয়ে কথা দিয়ে আসবেন। দু বছরে অগ্নিমানসিয়ার দু হাজার টাকা তুলবেন। আর মাত্র দুটি বছর। তবু দুটি বছর।

আলোর নিকে শিঁঠি কিরে চোখ বোজেন অগ্নিমানসিয়ার। অমনি কানে বেছে ওঠে ঝাঁপতাল, এত জোরে বাজে যে, অগ্নিমানসিয়ার ভয় হয় হুজি জামাইদের ঘুম ভেঙে যাবে।

নেপু এসে আস্তে আস্তে হাত ধরে বাড়ি দেয়।

বেথবে চল, অগ্নিমানসিয়ার মনে হাঙ্কে নিখাস পড়ছে না।

বুটটা ধড়াল করে ওঠে। নিখাস পড়ছে না আবার কি? কাছে গিয়ে কান পেতে শোনেন, বই না তো, নিখাস তো পড়ছে, ওদব নেপুর মনের ভয়। নেপু হাতটা চোপে ধরে,

তুমি ও-ঘরে যেও না, অগ্নিমানসিয়ার, পায়ের কাছের সোকাটার করে দাব, আমার ভাবি ভয় করে।

ঝাঁপতাল আর বাজে না। আস্তে আস্তে অগ্নিমানসিয়ার ঘূষিয়ে পড়েন।

পরদিন সকালে নেপু বলে, তুমি আর নিচে থেকে না, অগ্নিমানসিয়ার, ঐ ঘরটাতে এখন থেকে শোও। পরলোকে ডাকে! তোমার জিনিগর এইখানে এসে দিক। তুমি কাছে আস, বারংবার হুহুহুওলো ছাড়া থাকে, নইলে কি আমার চোপে ঘুম আসত?

কিদের ভয় নেপুর? চোরে এসে বহি অর্ধেক নিয়েই যায়, টেকও পাবে না নেপু। পরে এই সমস্ত পাবে নেপুর ছোটকা'কার ছেলে আনক। নেপুর বাবা উইল করে দিয়েছিলেন। সমস্ত নেপুর; তারপরও জামাই পেঁচে থাকলে তার; কিন্তু তারপর আনকর। জামাই বা আর কয়েক, তার ওপর অবিশি বাবার হাত ছিল না। কিন্তু সে তো আর আলাদা করে রাখাও নেই, সেখাও নেই।

কতবার নেপু জামাইকে সে বিবর বলেছে। অগ্নিমানসিয়ার নিজের কানে শোনা। এইতো কালই জামাইও বেলে বলেছে, কি হবে আলাদা করে, নেপু? সকে করে নিয়ে যাবে নাকি? সেখানে তো গুনে গিয়ে পথ-ঘাট শোনা দিয়ে বীধানো, কি হবে নিয়ে গিয়ে?

তবে নেপু রাগ করেছে। সেবে জামাই বলেছে, সতিয়া বলব, নেপু? আমার আলাদা একটা অ্যাকাউন্ট আছে,

জানো? আমার বা'র নামে এখনকার হাসপাতালে করেকটা বেড করে দিয়ে যাব মনে করছি। সেইরকম লেগাপাড়াও করে রেখেছি।

নেপু ভক্তিত হয়—কই, এতদিন তো কিছু বলনি।

কি বলব, বল। বা'র ক্ষত্রে তো কিছুই করতে পারিনি। বাবা! অল্পবয়সে গেলেম, কি জানি কেন তোমার বাবার চেখে লেগে পেলাম, ভালো ছাত্র ছিলাম, উনিই তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে, বিসেত পারিয়ে ব্যারিস্টার করে আনলেন। কিন্তু মা তো অনেকদিন ছিলেন দেশের বাড়িতে, নিজেরটা তাঁর চলে যেত। কিছু করতে হবনি তাঁর ক্ষত্রে। সেই কথা মাঝে মাঝে মনে হয়।

নেপু হাঁড়িমুর করে বলে, অস্থব্ব করে ছুপি কি রকম অন্তরকম হয়ে গেছে।

জামাই একই হাসে। জীবনটা ভারি অস্থব্ব, না নেপু?

নেপু বিজ্ঞানো ছেড়ে উঠে পড়ে, বাইরে কার পায়ের শব্দ না?

কে? কে ওখানে?

দরকার পরী সরিয়ে আনন্দ এসে ঢোকে। জামাইবাবু এমন একটা ঠাড়া দেল, একটা খবরও তো দিতে হয়, নেপুদি।

নেপু কর্কশ গলায় বলে,

কেন? এসে কি করতে শুনি? আমি বন্ধিন বেঁচে আছি, তোমার কোনো হুবিখে হলে না, আনন্দ, এই বলে রাখলাম।

জামাই ব্যস্ত হয়, আনন্দ কিন্তু হেসে বলে,

সে কি আর জানি না, নেপুদি? ক্ষম্মে অবধি তো শুনে আসছি। কিছুতেই কি তোমার স্বাক্ষো চোল যাব না? বাওঘাটা একই কমাও না কেন?

জামাইও হেসে কেলেন।

নেপু'র বৃষ রাঙা হয়ে ওঠে—তবু জুনিই না কেন এসেছে? কি মুখকিল! মাহু'র কি মাহু'রক অস্থব্বের সময় দেখতে আসে না? ছুপি যে মাহু'রই নও, নেপুদি, তাই এসব বোঝ না।

ভারি হৃক্ষর চেহারা আনন্দ'র, বছর ত্রিশ বয়স হবে, বিলেতী আশিমে ঢাকরি করে, বিয়ে-বা করেনি, ডাখন-চিন্তা নেই।

জামাই ডেকে বলে, আর আনন্দ, কাছে আর, হুটো কথা বলি তোব সঙ্গে। অলিমাসি, ওকে একই চা জলখাবার করে দাও না।

অলিমাসি নিচে বান, নেপুও সঙ্গে নায়ে। ওর সঙ্গে

এক ঘরে আখি বসতে পারিনে, অলিমাসি। কেন আসে, জানি। এত সময় যে একদিন ও পাবে, তাই আমাকে মনে করিয়ে দিতে আসে। আমার ইচ্ছে হয়, সব পুড়িয়ে দিই, কিন্তু না পাক। কিন্তু তবু জুনিটা পাবে, ব্যাডের টাকাড়লো পাবে। এক ঘনি না লেগলো পরচ করে দিই। তাও কি সব ধরে রেখে বেঙা আছে শুনেছি।

অলিমাসি বলেন, আমরা বখন থাকব না, তখন পাক না যাব খুশি, আমাদের তাত্তে কি বা এসে যাবে।

শোনে না নেপু। মরার কথা শুনেতে তার ভারি আগন্তি। বলে,

কি বলে বেঙার, জানো, অলিমাসি? সেদিন মিসেস দিনহার ওখানে ও-ও ছিল, বলে কি না, বাবার টেবিলে বসে সবাইকে শুনিবে বলে কি না, ঠাড়াও না, একবার হাতে শেলসেই হয়, সব বেচে দেব, বাগিজে নতুন বাড়ি করব, তোমাদের সব গৃহ-প্রবেশে নেমস্তর মইল।

কানে নেপু। বলে, আমাদের অবর্তমানে সব উড়িয়ে দেবে, তাই নিয়ে পর্দ করে বেঙার। চার যে আমরা শিগুরি মরি, তাই দেখতে এসেছে, কই অস্ত্র সময় তো আসে না।

হা-তা বলে যায় নেপু। কেহা নিমকি বেগতে-বেগতে অবাক হয়ে শোনে। অবাক হয়ে বলে,

সে কি নেপু'র, আনন্দ ভারি ভালো। ছেলে, ভালো মনে করয়ে দেখতে এসেছে—

নেপু জলে ওঠে—ছুমি বড়দের কথার মধ্যে কথা বল কেন, কেহা? আনন্দ আবার কি, আনন্দবাবু বলবে।

অলিমাসিরও হাসি পায়। আনন্দ আর কেহা ছোট-বেলায় এক ক্রাসে পড়ত পাড়ার প্রাইমারী স্কুলে, সাতাশকন মারশিট করতে। আনন্দও বহদিন এই বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করেছে। গ্রামাথারের সামনে কেহা'র সঙ্গে ভাত খেয়েছে।

কেহা একমনে নিমকি বলে যায়, টোটে'র কোণে একই হাসি লেগেই থাকে, সব সময় থাকে। নেপু আবার বলে,

ছুমি এই বিকেলবেলায় বড় যে বাড়িতে বসে? আশি'র নেই?

কেহা বলে, জামাইবাবু'র অস্থব্বের ক্ষত্রে দশ দিন হুটি নিয়েছিলাম, যদি কিছু নরকার হয়।

দরকার? তোমাকে দিয়ে আবার কি দরকার হতে পারে? না, না, আশি'র কামাই করাটা ঠিক নয়, ছুমি কাল থেকেই বেঙে।

কিছু, নেপুন্দি, হাঁথাবাড়ীটা তাহলে—

নেপুন্দি গলাটা একটু চড়ে বাহ—আমাদের হাঁথাবাড়ীর
মুখ তোমাকে অত ডাবতে হবে না, কেহা, কবেই বা
আমাদের হৃদ-হৃদিতের কথা চেবেছ ?

অনিমাসিমার দিকে ফিরে বলে,

হিঁটারের দাগ দু'লে ওপরে নিয়ে বেঙ। আগেও তো
কাপড় ছাড়ার ঘরে বা'র লজ্জা রেখেছ দেখেছি; আবার
তাই হবে। অন্ততঃ উনি উঠে না পাঁড়ানো অবধি।

কেহার কিছুতেই কিছু হয় না। হেসে বলে, নিচের
তলার সারাদিন কেউ না থাকলে কি চলে, নেপুন্দি ?
গহলা দিনরাত বাঙরা-আলা করে, ফকরুল আসে থাকে
আর ডিম নিয়ে, বোশা আসে, শব্দর আসে। একশ বার
ভিড়ি পুতে হু, আবার বহু করতে হয়। একজন
বাকের বাকতেই হয়।

নেপু বিরক্ত হয়ে বলে,

যেই থাকুক, নিজের কাজের স্বত্তি করে তোমাকে
থাকতে হবে না। সাহাবিন, অনিমাসিমা, হুনি বরং নিচেই
যোকা, হারে কিছু ওপরে যোবে, তখন কেহা থাকবে নিচে।
তখন তো আর কেউ আসবে না।

অনিমাসিমা চোখ তুলে কেহার দিকে তাকান, কেহাও
তার চোখের দিকে চেয়ে থাকে, ঠোঁটের কোণে একটুখানি
হাসি দেখেই থাকে।

দেখে অনিমাসিমার গা অলে যায়।

ওদিকে নেপু তাক্সা দেয়।

হাত ঢালাও, অনিমাসিমা, ঐ আনন্দকে ওরকম ভাবে
ওপরে ছেড়ে রাখাটা ঠিক নয়। বরং আদি বাই, ছুনি
একোবারে ও-ওটা ভেঙ্গে নিয়ে এসো। ঐ খিঁটেই কিছু
ওবেগার রাখাটাও ভালাবে, অনিমাসি। উনি তো জল-
বাবার করমারের করেই বালাস, তেল বি বে বিনা পরসার
আসে না, সে বেয়াস নেই।

নেপু চলে গেলে, চাকি বেদুন তুলে রেখে, কেহা
বসে,

ফিরে ওর এত ভয়, মাসি ?

অনিমাসিমা ওয়ার অলে ওঠেন,

তোমার কি পড়া কোনো লক্ষ্যস্বর নেই, কেহা ?
নিজের অবস্থাটা বোঝ না ? যারে যারে ওর সুখের ওপর
চোপা করতে একটুও বাধে না ? আদি বুড়ো বাহুব, চুপ
করে থাকি, আর তোমার অত সুখ খোলবার কি বরকারটা
তনি ?

কেহা শূত্রের দিকে চেয়ে, চুপ থেকে মোটা ভগ্যোর

কাটাটা টেনে বের করে। অবধি একখানি কালা চুল
কলত্রপাতের মতো পিঠের ছড়িয়ে পড়ে, কানের কাছে
হুলতে থাকে, কোমল কপালের ওপর নেবে আসে। মনে
পড়ে নেপুন্দি বা'র মাথার কালা কৌকড়া চুলগুলি। ইচ্ছে
করে বাইশটা স্ক্রু বসে। কাটা দিয়ে কেহার চুলগুলো
মাথার ওপর চূড়ো করে, সুইন-আদম খোঁপা বেঁধে দিতে।
কি বা-তা কথা সব মনে হয় আনন্দকে। কেহার চুল
বাঁধতে যাবেন কেন অনিমাসিমা। এত বছর এক বাড়িতে
বাস করেও কেহার লজ্জা কখনো কিছু করেছেন বলে মনে
পড়ে না অনিমাসিমার। কেহার লজ্জা ? কেহার লজ্জা
আবার কে কবে কি করেছিল ? নেপুন্দি মা-বাবা ছাড়া।
তারা তো অমন বহুজনার লজ্জা বহু করেছিলেন, টেরও
পাননি। অতল দিয়েছিল ভগবান।

খোলা চুল নিয়েই আদেপালে হুতুতু করে কেহা,
কি যেন বলি বলি করেও বলে না। ঐর ওপর নিষকি,
গেরালা গিরিচ, চারের সরস্রাম সাজিয়ে নিয়ে অনিমাসিমা
উঠে পাঁড়ান।

সিঁড়ির ওপর পর্বত পৌছে দেব, মাসি ?

অনিমাসিমা জ্বিলস করেন, কেন ? আনন্দ এসেছে
বলে ?

কেহা হাসে।

আরে, না না, তোমার পায়ে কিনা গুপো, তাই। আর
আনন্দ কি এখন এসেছে ভেবেছ নাকি ? আমার সঙ্গে
আধখট্টা বাজছে বকে, তবে ওপরে গেল। কি না বললে
নেপুন্দির বিবরণ ? হাসতে হাসতে গেটে ছিল ধরে গেল।
আহা, বাঙ না ট্রেটা, পৌছেছি বিই। নইলে কোন্‌দিন
হবে কোন্‌ ? নিজেও ঠ্যাং ভাঙবে, ওতসোও বাবে।

এ কথাটা মক বলেনি কেহা। আনন্দকাল হাত কাঁপে,
গা কাঁপে। কিন্তু কেহার অজ কথগুলি অসহ্য।

তাই দাও, কেহা। নিজের হাত-পা'র ওপর দিন দিন
বদল হারান্ছি। অথচ কি-ই বা বদল হল।

কেহা সাবনা দিয়ে বলে,

কিছু না, কিছু না, বাট বছর আবার একটা বদল নাকি ?
কেহার যেমন কথা। বাট বছর কোথায় গেল, এইতো
সবে সাডায়। বাট বছর হবে বদল, তখন আর এখানে
অনিমাসিমাকে কোথা যাবে না।

বনটা হঠাৎ ভালো হয়ে যায়।

সিঁড়ির মাথা থেকে কেহাকে বিদায় দিয়ে, ঐ নিয়ে
হবে তোমার অনিমাসিমা।

অনেকক্ষণ ছিল আনন্দ, জাহাই কিছুতেই তাকে

ছোঁতে চায় না। বাবার সময় বার বার বলে, আবার এসো আমনক, যোগকে নিচ্ছ নিবে এসো, একা একা গড়ে থাকি, কথা বলবার লোক নেই।

পরে নেপু অল্পবয়স দেখে,

কথা বলবার লোক নেই মানে? আমরা কি মানুষ না?

আমনকর কথাগুলি মনে পড়ে। কি অদ্ভুত বেখোড়া ছেলে, বাবা! গুরুজন বলে একটুও সমীহ করে না! যা মুখে আসে বলে! হুসই বা নিজের কাকার ছেলে, তাই বলে বাড়ি বয়ে অলম্যান করে বাবে, আর তুমি তাকে উঠে চা জলখাবার দেবে।

জামাই হলে বলে, বাবে একবার মনে হয়েছিল তুমি বুঝি রেগে-বেগে ওর চা-জলখাবারটা ছিনিয়ে নেবে! বুঝলে, অলিমাসি, আমনক তো কেয়ার প্রশংসায় গম্বুণ। কেয়ার বড়লাহেবের সঙ্গে নাকি কোথায় দেখা হয়েছে, সেও নাকি কেয়ার ভারি হুখাতি করেছে। ওর বামীর কথা শুনে সে অবাক, কেয়ার যে বিয়ে হয়েছে, তাই জানত না!

নেপু বলে, জানবে কি করে? এতো আর আমার কি অলিমাসিয়ার মতো ঘরের বোঁ নয়, ওর কোন্‌ ব্যবহারটা বিবাহিত মেয়ের মতো তাই বল। ত্রিশ বছর বয়স হল, ঘুরে বেড়ায় বেন কলেজের মেয়েটি!

জামাই বলে,
মনটাকে আরেকটু
উভার কর, নেপু, ঘরের
দৌলের কোনো প্রাণাই
ভগবান ওকে দেখনি,
ঘরের দৌলের মতো হবে কি করে?

জামাইয়ের পেছন থেকে অলিমাসিমা ট্রাটে তর্জনী
গেবে নেপুকে তর্ক থেকে নিবৃত্ত করেন। উত্তেজিত হলে
জামাইয়ের লেবে উঠতে দেরি লাগবে, ডাক্তার বলে
গেছে।

১ ১ ১

শি জানি, অল্পখটা হয়ে অবধি মনে হয় জামাইয়ের
দাইরে থেকে একটি বড় চেনা খোঁলস মনে পড়ছে, সম্পূর্ণ
অচেনা একটি নতুন মানুষ ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

অলিমাসিমা আশ্চর্য হয়ে ভাবেন, একটা মানুষের সঙ্গে সারা
জীবন বাস করেও তাকে চেনা যায় না।

বহু বছর ধরে মনে পড়ে জামাইকে। কবে যে প্রথম
দেখেছিলেন মনে কথা হুপকিস হয়ে পড়ে। তবে নেপু'র
কথা শ্যই মনে আছে। সেই প্রথম বেদিন এগেছিলেন
নেপু'র মা'র সঙ্গে দোতলার এই বড় শোবার ঘরটিতে,
দেদিন থেকে মনে পড়ে।

নেপু'র মা অলিমাসিমার হাতে একটা নয়ন ছোট রূপো
দিয়ে বাঁধানো বৃক্ষ দিয়ে বলেছিলেন, দেখি, তোমার
হাতখানি স্কেমন দেখি। এই বৃক্ষটা দিয়ে, একটিও হুল
না ছিড়ে, আমার চুলের জট ছাড়িয়ে পাও তো দেখি।

অলিমাসিমা তার আগে চুলের বৃক্ষ চোখে দেখেননি।
ভবে চরে বৃক্ষ নিয়ে, আত্মে আত্মে নেপু'র মা'র মা'র
ওপর তিনতলা উঁচু মাফাম-পশাচুর খোঁপা থেকে আট-
ত্রিশটা কাঁটা আর বাঁকা বাঁকা লম্বা পাঁড়রালা তিনটে
পক্ত চিকনি মুলেছিলেন। হুলগুলি তুম্বি হুডুড করে
নেমে গড়েছিল। কারো ডোমটার মতো হুল, কোঁকড়া,

বেন আহু'র গোছা,
জটে ভগা। শতীট
বৃক্ষের কর্ন নয়। বৃক্ষ
নামিয়ে রেখে, অলি-
মাসিমা আত্মে আত্মে
আত্ম দিয়ে হুল চিত্র-
চিত্র জট ছাড়িয়ে দিতে
লাগলেন। নেপু'র মা'র
চোখ বুঁজে এল। এক-
বার অলিমাসিমার হাত
হুখানি ধরে টেনে সামনে
এনে বলেছিলেন খিট্টি-
হাত দেবার হাত, বেঁচে
থাকো, অলি।

তবে অলিমাসিমার প্রাণটা বেন ছুড়িয়ে গেছিল।

কোনো সময় মনে হয়েছিল কে বেন তাঁকে দেখছে।
চোখ হুলে দেখেন, স্বরকার পর্দা হাত দিয়ে সঠিয়ে ধরে
শাড়িয়ে একটি বোণা, অহুত করসা, কটা চোখের বাতো-
তোবো বহুতের মেয়ে। দেখে হুঁৎ বাঁচালী বলে চেনা যায়
না। লম্বা লম্বা শাদা-গাল ডোরা-কাটা বেশমী ক্রক পরনে,
তার কোমরে চঙড়া শাল ফিতে বাঁধা, পায়ে কালো জুতো-
বোকা, খোলা হালচে ক্রক হুলের একশাশে শাল একটা।
গিবন হুল করে বাঁধা। মৃগটা একটু হাঁ করে অবাক হয়ে



যেইট চেষ্টা করে আছে, সামনের দাঁতগুলি উঠু, অসম্মান। তার ওপর দিয়ে একটা সোনার বেড়ি আঁটো করে পরানো। দাঁত সোকা করার জন্য সাহেব-ডাক্তার নিজের হাতে পরিচয় দিয়েছে, নেপু গরব গর্ব করে অলিম্যাসিমাকে বলেছিল।

নেপুও মা চোখ না খুলেই বললেন, কে? কুপবালা? এসো, তোমার অলিম্যাসিমার সঙ্গে আসাপ কর।

নেপু আঁতে আঁতে ঘরে ঢুকল। মাথার অলিম্যাসিমার চাইতে খানিকটা উঁচু, বহলে প্রায় সমান সমান। কোরেটোতে গড়ে; পিরানো বাক্সেতে খেঁখে, সন্ধ্যাবেলা হলঘরে মেঝের পাশে বসে। তবে হাঁকুমা সেকলে নাম রেখে দিয়েছেন কুপবালা, এই মা হুংখ।

মিসেস সমারভিলকেও অলিম্যাসিমার মনে গড়ে। এর আগে কখনো যেন দেখেননি। এখন মনে হয় হয়তো বছর পঞ্চাশেক বয়স ছিল, মোটামোটা গুঁড়নি, কালো দিঘের গোপাশ, ওপরদিকটা আঁটো, গায়ের দিকে গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা, ফুলের মতো ছড়িয়ে গড়েছে। বুকে একটা বড় সোনা-নীথানো গোলাপী পাথরের রুঁচ লাগানো থাকত, তার ওপর একজন উবেকা-বোকা বাঁধা মেঝের মূখ উঁচু উঁচু করে ঝাঁক। নাকি মেঝের মায়ের মূখ। মেঝেরের আবার মা থাকে, অলিম্যাসিমা এই প্রথম ভুলেন। রুঁচ ছাড়া একটা ঘড়িও বুকের ওপর হুলত, ছোট্ট সোনার একটা বো-বাঁধা পিন দিয়ে আটকানো। মেঝের নাকের ওপর একটা চেন-বাঁধা চিমটি-কাটা চশমা বসানো থাকত। সেটা হাতে হাতে খুলে খুলে গড়ে যেত। আবার লাগিয়ে নিতে হত। বড় বিশেষ অলিম্যাসিমা মিসেস সমারভিলকে দেখেছিল। নেপুও তার হুঁকম ছিল, বতরুপ নেপু পিড়ানো শিখবে, অলিম্যাসিমা গুণান থেকে নড়বেন না। পরে নেপুও মাকে এশে জানাবেন কেমন পিড়ানো দেখা হল, কে কে ঘরে ঢুকল, নেপুও বাবা পিড়ানো ওনতে গেলেন কিনা, এই সব।

বড় পিড়ানো কেনা হয়েছিল, রাশি রাশি টাকা বরচ হয়েছিল। সেই পুরোনো পিড়ানো কিছু পরে মাকে তিন হাজার টাকা দিয়ে বেচে দিয়েছিল। কিন্তু দু বছরের বেশী বাকানো হয়নি। নেপুও পনরো পুরে গেলেই বিচে হয়ে গেল। জামাই বিলেত গেলে পর, নেপুও বাবা অনেক করে বলা সত্ত্বেও, নেপুও আর পিড়ানো হুঁল না। যেন আসাপও বড় হল, নেপুও মা ঝাঁপ ছেড়ে ঝালেন।

বনে গড়ে জামাই বিলেত থেকে কিয়ে মাশখানেক এ বাড়িতে ছিল। ভারি ভালো চেহারখানি ছিল তখন, কিন্তু কথা হুং কন বলত। তবে কেঁট প্রায় সবলে হুংকর

করে উত্তর দিত। অলিম্যাসিমা ভুলেছিলেন জামাই ভারি পণ্ডিত বাহুব, বইটাই নিয়ে থাকতে দেখেওছিলেন, কিন্তু কথাবার্তা বলেননি কখনো।

যখন জামাই পাটনার প্রায়কটন করতে গেল, তখন শেখাতনোও একেবারেই বড় হয়ে গেল। নেপুও বাবা-মা স্বর্গে গেলে পর জামাইয়ের সঙ্গে অলিম্যাসিমার সত্যিকারের পরিচয় হয়েছিল, এক বাড়িতে প্রায় পঁচিশ বছর থাকার মধ্যে দিয়ে।

কিন্তু সেই কি সত্যিকারের পরিচয়? সেই নেপুও কথার পেছনে আড়াল-হয়ে-বাঁধা পরিচয়টাই কি জামাইয়ের স্বার্থ পরিচয়? তবে এখন তাকে অন্তরকম মনে হয় কেন?

হাতে আর ওপরে ঘন বসে না, খাবার ঘরের পাশের ঐ খালি ঘরখানির জন্য প্রায় আহুত হয়ে ওঠে। মাঝে নিরাপত্তা তো ঘরটা? সকালে অলিম্যাসিমা খান করে এসে, জানলার খিল ধরে টেনে দেখেন। মোটা সোহোর খিল, সেকালের জেলখানার এরকম থাকত, দেয়ালের ইট ঝুঁড়ে খসে কখনো, এতকাল পরেও একটুও নড়ে না।

জানলা দেখতে গিয়ে, জানলার নিচেকার তক্তাটার ওপর চোখ গড়ে। পুরোনো কার্টের পুঁক তক্তা, আগে এর ওপর মেডেন-হোয়ার কার্টের চ্যাপটা টব বসানো থাকত। কালো পোটার ওপর ছড়া ছড়া হাঙা সবুজ পাতার সে কি ব্যাধার। ভারি বড় করতে হত ওদের। নেপুও মাগী ছাড়িয়ে দেবার পর গাছগুলি সব ঘরে গেল, টবগুলি কোদুরি ভেঙে পড়ে গেল, শুঁ তক্তাটা মইল।

আঙলা-ধরা কাটা একটা কালো তক্তা, তার ফাটলে ফাটলে, ঝাজে ঝাজে সে কি রক্তের রূপের মেলা। অলিম্যাসিমা বতবার দেখেন অবাক হয়ে ভাবেন ব্যাঙের ছাতা আবার এত সুন্দর হয়।

আগে কিন্তু ওদের রুপটা অত চোখে পড়ত না। কি একটা সোঁখ-সোঁখ গছ লাগত, সাপ-খোশের গায়ের গছের কথা মনে হত। হু-একবার কেটলি করে সূঁচ জল এনে ঢাললেন ব্যাঙের ছাতার ওপর। অমনি তার। কালো হয়ে, ঝুঁকড়ে, ঘরে গেল। কিন্তু তারপরেই আবার হু-এক পলা সূঁচ পড়লে, ছোট ছোট শত শত ব্যাঙের ছাতার তক্তাখানি ঢেকে গেল। মেঝের মতো কচি মোদারেম বোঁটাগুলি, মনে হয় হুঁ সেই ভেঙে যাবে। তার মাথার কতো রকম কিকে রক্তের ফুলের মতো, টোপরেম মতো, পাতার মতো ছাতা ধরা। বেশে বেশে মন ভরে না

অগ্নিমানসিয়ার। তবেই এত রূপে দেখবার চোখ কোথায় পাই?

বাইরে থেকে গরলা ডাকে, মাছ নিয়ে এসে মস্তর বৌ ডাকে, বাসে ডিম নিয়ে ককরল ডাকে, নকুড়বাবুর বাড়ি থেকে ছোট বোড়ার করে শরবতি লেবু, আপেল, ডালিম আসে। এ বাড়ি থেকে কেউ থাকারে বাহ না, সব জিনিস আপনা থেকেই দেয়ারমোড়ার এসে পৌঁছয়। ভারি একটা গর্ব বোধ করেন অগ্নিমানসিয়ার।

আজকাল আর উঠানের ওপারে রাস্তায় ঘর না। অগ্নিমানসিয়ার, নেপু ডাকলে সেখান থেকে শোনা বাবে না। গরলা তোলা উঠুনটা ধরিয়ে এসে দেয়, অগ্নিমানসিয়ার বাবার ঘরের কোনাতে, মোড়ায় বসে, রাস্তাটা দেখে বেন। কিছু কিছু হিটানেও বসান।

আগ্নি হাবার আগে গরুও কোমারি হয়ে গাড়িয়ে গল্প করে। রোজ অগ্নিমানসিয়ার ওকে লাগান করে সেন,

ও কোমারি, নাড়ে আটটার মধ্যে দিশ্বর নিচয় কিরো কিছু। জানো তো, ন'টার মধ্যে দরকার তালো দিতে চাইবে।

কোমারি কেমন একটা তাজিল্যের মূর্তি বলে, লুকিয়ে রাখো না কেন, এক এক দিন, তালোচাকো?

এরকম কথা অগ্নিমানসিয়ার সইতে পারেন না। যে নিয়মের কার্যামোতে অগ্নিমানসিয়ার ঘনটা গড়ে উঠেছে, সেখানে এ ধরনের কথা একেবারে অচল। কিন্তু কোমারি চটতে ডয় করে। অবিশিষ্ট চটে না কখনো কোমারি, ছোটবেলা থেকে আর পর্বন্ত চটেতে ঘেঁষনি কেউ কোমারি। চটে না, নিচ্ছে কথা বলে না, নিজেকে সমর্থন করার চেষ্টা করে না, কিন্তু সম্মানও করে না কারোও। যা ইচ্ছে হয় করে। চটে না, তবে না চটেই বাজ নিয়ে ঢলে যায় এটা টুক। একতলাটা তা হলে খালি গড়ে থাকবে। নেপু হয়তো বলবে, ডেস্তর থেকে বন্ধ করে দাও, সিঁড়ির দরজাতে তালো দিয়ে দিই, থাক একতলাটা। তখন কি হবে?

ভালেও অগ্নিমানসিয়ার গা বিড়িয়ে ওঠে। যাবেন নাকি একদিন বঁটা দুইএর স্তম্ভ বাইরে? বৃহস্পতিবার বটফলের ডিউট থাকে না, ওকে সঙ্গে করে পোকোপিনে গিয়ে, টাকাকোলা একেবারে জমা দিয়ে দিলেই সব ল্যাঠা হুকে পাবে। এভাবে আর ক'দিন চলবে।

কিন্তু পোকোপিনে বাওয়া বাসেই পোকোপিনের জানবেন; যা ত্রৈণ ভক্তলোক, ওর বৌও জানবে; সে তো পাকার সমিতির একটা পাণ্ডা, অমন গল্পে ঘেঁষেমাছ

কু-ভারতে আর দুটি নেই, তাকে জানানো বাসেই চ্যাড়া পিড়িরে দেওয়া। তারপর বটফলের দাশা বলেছিলেন পোকোপিনে টাকা জমা দেওয়া সহজ, কিন্তু তোলা প্রায় অসম্ভব। নাকি পাঁচশ বছরের ক্যাঁকড়া বেগোব, সই বেলে না, দেয় চার। তা করলে তো হবে না। হাতে হাতে পরে মিটিয়ে দিতে না পারলে, তিনমাসে কখনও বাড়ি হয় না।

অগ্নিমানসিয়ার ভেবে ক্লান্ত পান না। হোজাই কোমারি আটটা বাজার আগেই এসে উপস্থিত হয়। হেসে বলে,

রোজ রোজ আগে আসা হয়েছি, বাসি, তোমাদের অভ্যাস রাখাণ করে দিছি। ওদিকে আমায় অল্পশ্রমিততে আনাদের ক্রপ উঠে রাখার জোপাও! হুটে-তিনটে আগ্নি মিলে মস্তক ইউনিয়ন হচ্ছে আমাদের, সংগঠী সাহাবা পাওয়া বাবে, তা জানো? আমায় নাড়ে তিন হাজার হুগে দিতে পারলে, সরকারের কাছ থেকে সাড়ে তিন হাজার পাওয়া বাবে।

অগ্নিমানসিয়ার অবাক হন।

সে কি! তোমরা বাসকাবারে বাসে পাও; টাকা করে ক্রাপ করছে, ইউনিয়ন করছে; নিজেই বলছ ইউনিয়ন হলে বাসে বাড়ানোর সুবিধে হবে; তার ওপর আবার সরকার কেন টাকা দেবে?

কোমারি হাসে।

জানো, বাসি, আমি হলান গিয়ে ট্রেনবার আর অলক সেক্রেটারি। খুব ভালো হল না?

কিন্তু অগ্নিমানসিয়ার ভালো লাগে না।

হুমি একজনের বিবাহিতা স্ত্রী, এ একটা বাইরের বাজে ছেলে, ওর সঙ্গে এতটা মাঝামাঝি কি খুব ভালো?

কোমারি বলে,

বাজে ছেলে হবে কেন, বাসি? খুব ভালো পরিবার ওদের, ও এম-এ পাশ জানো? চাইলের আগ্নি সে তিন শ টাকা বাসে পায়, বাড়িতে বড়ি মাকে বেবেছে, মোটেই বাজে ছেলে নয়, বাসি।

অগ্নিমানসিয়ার ছাড়েন না,

তা না-হয় না হল। কিন্তু হুমি তো একজনের বিবাহিতা স্ত্রী, তোমার সঙ্গে অত মেলামেশা আবার কেন! কোমারি বলে,

কাকে কোমারি মেলামেশা বল হুমি, বাসি? কোমারিও বাও না কিনা, বাইরের লোক মেলামেশা ডয় পাও। আর বিবাহিতা স্ত্রী? কার বিবাহিতা স্ত্রী? বরং হ্যাঁ, এটা বলতে পারো যে আবার একটা বিবাহিতা স্ত্রী আছে।

যেমন বিয়ে করে বিলেতে থাকে। কে জানে হয়তো কলকাতা পড়া দু-তিনটে ছেলে-মেয়েও আছে এতদিনে, দো-বড়া দু-তিনটে ছেলেমেয়ে!

কেহা খুব হাসে। ওকে হুকে গুঠা দায়। অগ্নিমানসিরা কণা পালায়িবে বলেন,

যাই হোক সকল সকল বে আসো, আমি ডাঙেই খুঁজি। তুমি না আসা পবন আমার হুক টিপটিপ করে।

কেহা বলে,

টিক এসে যাবে, তোমার কোনো ভয় নেই, স্নোম আসবে, যকিন বলবে। তবে এই শনিবারের পরের শনিবার নয়। সেই শনিবার আশ্বিন দল বেঁধে বর্ধমান যাচ্ছি। যত বিটিং দেখানো, ওগানকার এক-আধটা আশিষও আমাধের লস্ক বেগ পেবে। তা হল আরো বেণী সরকারী সাহায্য পাওতা যাবে।

কেহা বর্ধমান যাবে।

অগ্নিমানসিয়ার হস্তপ্রত্যত ঋতুভালে বইতে থাকে।

বর্ধমানে যাবে? সত্যি তোমরা বর্ধমানে যাবে, কেহা? কেহা বলে, তাই তো ইচ্ছে।

তারপর অগ্নিমানসিয়ার বিবর্ধ মুখের দিকে চেয়ে বলে, কি হয়েছে, মাসি? ওরকম করে চেয়ে আছো কেন? অগ্নিমানসিরা কেহা হাত চেপে ধরেন—যদি যাও বর্ধমানে, আমার একটা কাজ করে দেবে, কেহা? কিছু কই হবে না তোমার, তারি সহজ কাজ।

কেহা বলে,

নিশ্চয় দেব, মাসি, কি কাজ বল, সব্বই হলে নিশ্চয় করে দেব।

অগ্নিমানসিয়ার কঠোর হৃদয়, অস্বুটবরে বলেন, পরে বলব, কেহা। যদি সত্যি যাও, তখন বলব।

কেহা হাসে।

কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না তুমি? না মাসি, সত্যিই যাব।

তবে সে শনিবার না হলে, তার পরের শনিবার। সেই অর্ধি অগ্নিকা করতে পারবে তো?

তার পরের শনিবার অবধি? অগ্নিমানসিরা চল্লিশ বছরে ওপরে অগ্নিকা করে আছেন। এই আত্মকালই কেমন বেন অর্ধেই হয়ে উঠেছেন। আজকালই যেন হয় কি জানি, দেব পর্বত যদি না-ই হয়। হাতের বড় কাছাকাছি এসেছে কিনা, অগ্নিমানসিয়ার আত্মকাল তাই ভয় করে।

কেহা ছাড়া কার না ভয় করে। নেপুথ মাসি যেম বেশলেই ভয় হত। নেপুথ তো মাসিই বেশলেই ভয়।

কারা সব আত্মীয়স্বজন চন্দননগর থেকে এসেছিল, গুড়ের নাগবি-টাগরি নিয়ে। ছেলের বিয়েতে নেমন্ত্রণ করতে এল, তা নেপুথ রেগেই চতুর্ভুজ! কিন্তু সে সত্যিকার সাগ নয়, সে হল ভয়। আত্মীয়স্বজন কেউ এসেই নেপুথ ভয়, বলে,

কেন আসে? কি চায় ওরা, অগ্নিমানসি? কই, আমি তো বাইনে করবো। কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে। ওরা কি মনে করে আসে, সে আমার অজানা নেই, মাসি। ভাবে এত সন্ততি ভোগ করবে কে? ভাবে আমাধের ছেলেপুলে নেই, নিজেদের নামে গিথিয়ে নেওয়া নজ হবে না। ছেলেপুলে নেই তো, ওদের কি মাসি? ওরা দিয়েছিল টাকা?

পুত্রোদ্যোগ-ওঠা লাগ যখনদের চেয়ারখানাতে যেন পড়ে নেপুথ: যা মনে হয় বলে যায়,

কিন্তু ওরা কেউ জানে না কারো কিছু পাবার জো নেই। ওর টাকা সব যাবে হাসপাতালে, আর বানায় সন্ততি পাবে ঐ আনন্দ। আনন্দের কি বাধ্য বেছেছ, অগ্নিমানসি। আবার আমাধকে ধোঁড়ে। ওর মামার বংশে ছেলে বাঁচে না, জানো? সবায় যথের হুঁটা একটা জমা, পঁচিশ বছর বয়স না হতেই বতর। কাফাও তো ত্রিশ পার হবনি। আর আনন্দের শরীরটা একবার চেয়ে দেখ। লাল টকটক করছে স্বাস্থ্য। কখনো অস্থির হব না ওর জানো অগ্নিমানসি? অথচ এখানে তো ঐ রাসায়নের নামনে গাত পেড়ে যাত্রাব। কি জানি। আচ্ছা, অগ্নিমানসি, আনন্দকে তোমার কেমন লাগে, সত্যি বল তো।

আনন্দকে কেমন লাগে? অগ্নিমানসিরা অথাক হয়ে আবিষ্কার করেন কাউকে কেমন লাগাটা তাঁর জীবন থেকে একবারে বাস পড়ে গেছে। কাউকে কেমন লাগে, খুব খুঁট কখনো তো বলেনইনি, নিজের মনেও কখনো ভুলিয়ে যেবেননি।

কেমন লাগত নেপুথ বাবা? নেপুথ মাকে? নেপুথ বাবা। কি লুপ, কি শক্তি, স্বাস্থ্য হতো চোখ বলসে দিতেন—ডাঙ্গো-লাঙ্গা, বন্ধ-লাগার জারনা রাখতেন না। তাঁকে আবার ভালোমত লাগবে, অগ্নিমানসিয়ার আশা কতখানি?

নেপুথ মা। দু হাতে তাঁর সেবা করেছেন অগ্নিমানসিরা, দু হাত পেতে তাঁর প্রসাদ নিয়েছেন। অক্ষাতের দিতেন। সে দান ওর গায়েও লাগত না। এ বিধানার চারটা কেমন চকচকে হতো, গুতে আমি গুতে পারব না, নে অগ্নি।

আবার কালো চটটা আর ভালো লাগে না, অগ্নি, হুই
পরিধ। দেখ, যেমন কি হৃদয় কদাচী বোনা স্বাক্ষ
পারিয়েছেন, হুই আবার পুরোনো মাথাটা নিল, অগ্নি, ঐ
কোনোটা সেখানে করে নিল।

আরো কত কি দিতেন বা অগ্নিমানসিয়ার কোনো
কালেও কোনো কাজে লাগতে পারে না। বেশী কলম,
কাগজী হাতগাথা, অগ্নি হাও-বাগ, স্মৃতির জুতো।
সব হাত পেতে নিয়েছেন অগ্নিমানসি। এদিক কি কখনো
কিভাবে আছে? সব নিয়েছেন, পরে বটকলের বাবার
পুরোনো জিনিষের বোঝানে বেচে দিয়েছেন। বা হাম
তিনি ধরে নিয়েছেন তাতেই অগ্নিমানসি ছেড়ে দিয়েছেন,
কোনোদিনও বরদাশ করেননি।

সেই থেকেই ওদের পরিবারের সঙ্গে অগ্নিমানসিয়ার
ঘনিষ্ঠতা। হাম আছে বটকলের বাবার দ্বারা সম্বন্ধ—কি
আজ্ঞেবাজে কথাই যে হামে পড়ে অগ্নিমানসিয়ার, নিজের
চিন্তার কোনো বেই থাকে না। হ্যাঁ, নেপথ্য থাকে
অগ্নিমানসিয়ার সারাজীবন উপযুক্ত ভাবে সম্বন্ধ করে
এসেছেন। ভালো-মন্দ-লাগার কথা হামেও আসেনি।

বোধ করি উত্তর চারওনি নেপথ্য, এমনি কথাটা
বলেছিল। অগ্নিমানসিয়ার অন্তরমনভাবের ঘোরালো দিকে
চোরে ভাবেন, ভালো-লাগা-লাগির কথা ওঠে সমানে
সমানে। যেমন হিঃসেও হয় সমানে সমানে। পূর্বক কি
কেউ হিঃসে করে? আনন্দ কি আর অগ্নিমানসিয়ার সমান,
যে ভালো লাগবে, বা মন্দ লাগবে।

তবে নেপথ্য পেছনে সে যে বড় লাগে, সে কথাও
সত্য। চোখ দুটি মিটিমিটি অগ্নি, মুখে নামারকম হাজার
কথা বলে। নিষ্ঠুর সব হাজার কথা, এমন সব নির্মম কথা,
যার আঘাতে নেপথ্য হনটার গুণ থেকে সব আবরণ ছিঁড়ে
উড় যায়, ভাঙা হনটা সকলের চোখের সামনে ধরা পড়ে
যায়। চোখ ঢাকতে ইচ্ছে করে।

তবু চোখের সামনে যারে যারে ভেঙ্গে ওঠে ছোট
একজন আনন্দ; নেপথ্য বাবার ছোট ভাইএর ছেলে
আনন্দ; কদা বৎ, বোকাড়া চুল, হৃদয় একজন আনন্দ;
কিছুতেই একতলার ঘরে থাকবে না সে-আনন্দ, যারে যারে
ঘুরে ঘুরে বোতলার উঠে আসবে, বনবার ঘরে চুকবে,
নেপথ্য বাবা-ভাই অতিথির সামনে গিয়ে বসে থাকবে,
বাংলাঘরে ভাগ দেবে; সে আনন্দকে নেপথ্য বাবা বা কিছু
না বললেও, হৃদয়ে পেলেই নেপথ্য হৃদয় করে ভাড়িয়ে বিত;
ছাঁচোড় বদন্ত, ছোটলোক বদন্ত, বাবার ব্যক্তির দৈন্তব্যসা
বিরে টিকিরি বিত, এমন এক আনন্দ; নেপথ্য সম্রাটের

বরদী ছোট এক হৃদয় আনন্দ। সে আনন্দকে তখন
অগ্নিমানসিয়ার বেন দেখেও দেখতেন না। এমন সে
অগ্নিমানসিয়ার দৃষ্টিতে যারে যারে মিরে আসে, এমনকার
ঐ আনন্দকে আর সাধা চোখে দেখতে দেখে না!

নেপথ্য হৃদয় থেকে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, অগ্নিমানসিয়ার,
নারকোল গাছে কটা নারকোল হল এবার?

অগ্নিমানসিয়ার বলতে পারেন না, নারকোলের কথা
আজ্ঞেই মনেই ছিল না তাঁর, কামাইদের এত অস্বপ্ন গেল।

সে কি, অগ্নিমানসিয়ার, নিচের গরে ছুঁমি দেখানে রাখো,
তারই সামনে তো নারকোল গাছটা।

তাও সত্য। উঠোনে তো ঐ একটিমার গাছ,
আর তো কোনো গাছের সঙ্গে অগ্নিমানসিয়ার সম্পর্কই নেই।

কথাটা মনে না পড়া ঠিক হয়নি। নেপথ্য হৃদয় করে
গাছপালার সঙ্গে ঐ ছাড়া তো আলাদার কোনো

সম্পর্কই নেই। পেছনের বাগানে কি হয় না-হয় সে তো
নতুনভাবুই জানেন, তার সঙ্গে আমাদের শুঁ টাকার সম্বন্ধ।
কিন্তু ঐ গাছটা আমাদের নিজেদের, এটার কথাই ভুল
গেলে!

অগ্নিমানসিয়ার নয়ন ভুড়ে আছে আরেকটা গাছ, ভাল-
পালা মেলে, বোতলার সমান উচু একটা হিমসাগর আমার
গাছ, তাতে যেখের মতো কল ধরে নিচ্চ। সে জানে,
মাঝরাখা, না বেচে দেয়। এ বছর তো টাকার বোটে
চারটে গেল। হয়তো হু প আয় হয়েছিল, হাদা তাহলে
পঞ্চাশ টাকা পেয়েছে। সে পঞ্চাশ টাকা হাদা নেয়
কি করে, সে তো অগ্নিমানসিয়ার টাকা।

কলপাকড়ে অবিস্তি অগ্নিমানসিয়ার কোনোই পোত
নেই। কোনোদিনই ছিল না। কোনো বাবার জিনিসেই
ছিল না। এমন না খেলে বটকলার হুঃসিত হয়, হাতে
করে তৈরী জিনিস নিয়ে আসে, এমন কিছু বড়লোকও
নয় তারা, তাই নিতে হয়। নইলে কি খেলেন না-খেলেন
পেছিকে অগ্নিমানসিয়ার হনই নেই।

আর শুঁ শাওর কেন? এটোতো এককালে এ বাড়িতে
এত বিলাসিতা ছিল, তার থাকেও তো অগ্নিমানসিয়ার বাস
করেছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিলাসের জিনিস
নাড়াচাড়া করেছেন, কই কখনো তো হাতে তুলে কিছু নিয়ে
নিতে ইচ্ছে করেনি।

কদাচী পেট-ই আসত কত বরমেয়। ছোট ছোট
শিশি, সোনালী রিবন দিয়ে মালায় মতো করে গাথা,
একেকটা শিশিতে এক এক বরম স্বগন্ধ। একাও শিশির
মতো কাচের বোতল, তার মুখে একটা লাল রেশমী সূতোর

পাশ লাগানো, সেটী একই তেপে হৃদয়েই নল দিতে মিহি ঘোঁচায় হাতো হৃদয় বেগোত। নেপথ্য না বেজবায় আগে চলে দিতেন। কাপড়ের পাটে পাটে ছোট ছোট নদুখ বেগনী বলে করে দ্যাতেওর দ্যাখা থাকত, চন্দনকারের ছিলে থাকত। নেপথ্য না মিহি একটা গুগুড়ের তেউ হুলে চলাকেনা করতেন।

কড়া কিছু তাঁর মনে হবত না। ভালো জিনিষ না হলে হাত দিয়ে পূর্ণ করতেন না। মনের আগে তাঁর ক্ষমতাশাল বেটে দিতে হত। হবিবার হবিবার রিটে দিয়ে মাথা ঘরে দিতে হত। পায়ের পাতায় গোজ হাতে মুখ ঘরে ঘরে শুকিয়ে দিতে হত।



তখন এক দুহুঁত সময় হাতে থাকত না অসিমানিয়ার। তারি ভালো লাগত। সত্তাহে একদিন সন্ধ্যা করে বেতেন বটকলের বাড়ি। তখন বটকলের সঙ্গে এতটা বন্ধন বহন ছিল না, তার বহনটা বেহাত কাটা ছিল। তার ছিল বটকলের বড়িবিবির সঙ্গে। সে কিয় করে বিদেশ চলে যাবার পর থেকে বটকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। তার সঙ্গে বহনদিন হল চিরদিন লেখাও বহন।

আগে হাতে হাতে অসিমানিয়ার তারি ইচ্ছে হত, বটকলের এ-বাড়ির ঐশ্বর্যে বেবিয়ে একেবারে তাক লাগিয়ে দিতে। কিন্তু গুয়া আসতে চাইত না। বটকলের কাকা নাকি কিছুদিন এখানে থাকার-নরকারের কাজ করেছিলেন। কি সব হিসেবগত নিয়ে গোদাগাল হয়, কাকার অসিমানি আসলে কোনই ঘোষ ছিল না, বাই হোক শেষ পর্যন্ত চাকরিটি দেল। তাই বটকলের তারি লক্ষ্য করে।

কিন্তু বটকলের কেন, ওর কাকাও বহনকে আসতে পারতেন, এ-বাড়িতে কেউ কাকেও মনে রাখত না। অসিমানিয়া জানতেন, এই যে অসি মইলে নেপথ্য মাঝ এক বণ্ড চলে না, আক যদি অসি চলে যায়, অসি আরেকটি অসি এসে ছুটবে। পুরোনো অসি একইখানি ঠাকও রেখে যাবে না।

একটা দীর্ঘনিদ্রাস কেনে অসিমানিয়া। একটা সোটা মানুষ হতে হলে কি কি লাগে? তার কতটা ছুটেছিল অসিমানিয়ার কপালে?

হুনিয়াতে এমন জাহা কোথায় আছে যেখানেটা অলকানকা বলে একজন মানুষ মইলে অসদৃশ্য থাকবে, অলকানকা ছাড়া আর কিছু দিয়ে যেখানে চলেবে না? অলকানকা বলতে কই হয় বলে কেউ দেখানে অসি বলে ডাকে না?

। . ।

আছে এমন জাহা বহনমানে। বেয়াল্লিশ বছর ন-বেশা জাহাটির প্রতিটি ঘাসের ফলক মনে মনে পড়ে। তবে ওলম ঘাস হুলে ফেলতে হবে, তার জাহাঘাস হুলোঘাস লাগাতে হবে, খন নদুখ নরম হুলোঘাস। আর মন-গলোকেও রাখা চলবে না। তারের উই বেড়া দিয়ে তার ওপর ঘোমলতা উঠিয়ে দিতে হবে। বানিক আজ থাকা ভালো।

মাথা হরতো একই চটেবে; বলবে,

কেন, জাহা তাকালে কি ওর জাত যাবে নাকি?

কিন্তু ওকিটা বহন থাকাই ভালো, জাহার ছেলোবেয়ো নইলে হরতো তারি উৎপাত করবে। হরতো হাথাবাড়া করতে বেবে না। হাত পেতে থালি থালি বলবে, যে শিদি, যে। এমন কথা কেউ কখনো অসিমানিয়াকে অসনি।

নুকের ভেতর কোথায় মনে রাখা করতে থাকে অসিমানিয়ার। নারকোল গাছের শুড়ির নিকে অজ চোখে চেয়ে থাকেন, কিছু দেখতে পান না, চোখ কাপসা হয়ে ওঠে। কোনো বেয়াল থাকে না, তারের হাঁড়ি চকচক করে ওঠে। চমকে অসিমানিয়া হাঁড়ি নাযান।

কোথায় দাঁধার ছেলেরা? তারাও নিচর আবহুদ্বা হয়ে গেছে এতদিনে।

ঝোঝানি বছর কি কম সময় গ্যা? পাতলা শরীর ছিল অলিম্যাসিমায় তখন। দাঁধা যেটা যেটা মিলেই দশহাতী বান কিলে বিত, জামার স্বত্ব মার্কিন আসত। একটা ঠাঁততারা ডিক্রিও বোধি দিয়েছিল। ঠাঁকুর-মশায়ের বাড়ি দাঁধার সময় বদরের কাগজে জড়িয়ে ঐ একখানি কাগজ জাঝা ছাড়া আর কিছু নিয়ে যেতেও পারেননি।

গামছা ছিল না। তাই বেধে ঠাঁকুরমশায়ের স্ত্রী বিসত হয়েছিলেন। ঠাঁকে বোম্বও বেগম্বা বান না, নিজের গামছা অপরকে দিতে কারই বা ইচ্ছে করে? অলিম্যাসিমা কাকেও কখনো নিজের গামছা বেননি। দিতে হযনি কখনো, কেউ চাফওনি। শুু গামছা কেন, কোনো জিনিসই কেউ চায়নি। সোকে কিছু বেগম্বা মানেই অম্বা খরচ, বান করবার স্বত্ব যদি ভগবান অলিম্যাসিমাকে পঠাত, তা হলে তার ব্যবহাও করে পঠাত। বেনন পায়রেছিল নেপুয় বাফে। রাতে বিজনি বাড়ির আলোতে যদি কাগজ পড়ত হন, তো যিনের আলোর সেই কাগজ দেখেই, আর মনে মনে না। যদি পরা হয়ে গিয়ে থাকে সেই মানেই, তো আখিন উইল পড়ে। পরে কোনো আত্মীয়ের মেয়ের ওপর খুশি হলেন, তাকেই দিয়ে দিলেন। আর নতুন থাকলে সোকানে কেহও যেত। সেখান থেকে যিনের বেলোভেই গাটরি বোকাই নতুন কাগজ আসত, ইচ্ছে-মতো পড়ত করে নিতেন। একখানি কেহও গেল, তার বসনে হরতো তিনখানি রাখা হল।

তবে এলব থেকে অলিম্যাসিমার সব সময় লাভ হত না, তাঁর যে সাদা বান ছাড়া কিছু পরতে নেই। কিন্তু নেপুয় বা শৌকিন বাহুর, বিহি বান আনিবে যিতেন; চাকরি বানও পরেছেন অলিম্যাসিমা। এখন নিজের কিততে হয, অতটা ভালো কেনেন না, তবে এগুলোও শান্তিপুরে ধান। জামাওপি আখির। অলিম্যাসিমায় বড় ভর, কেউ যদি কি বলে চুল করে। সে তিনি সইতে পারবেন না। এদের আত্মীয় তিনি, তাতে এসেরকেও ছোট করা হবে।

বটকলরাও তাই জানে, বড়বাড়ির নিকট আত্মীয়া উনি, বাড়ির মাথাই একরকম বলতে সেনে। সেক্সর বম্বই সখীহও করে ওবে। যে মেয়েটা আখিনভাবে বোজদার করে ধার তাহা মনে মনে পরম্বাপেক্ষীয়ের হারান প্রভা করে, হিসেব করে। আশ্চর্য!

ফ্যাণ্ডিনের কান্ডটার কথা বটকলকে বললে, তারা ভারি

অবাক হয়ে যাবে নিশ্চয়। হরতো তাদের চোখে অলিম্যাসিমাকে একই বর্বও হয়ে যেতে হবে। এ পাড়ার মেয়েরা সবাই নিচর আশ্চর্য হবে; তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে কড়রকড়া আলোচনা করবে; ভাববে হরতো বড়বাড়ির কর্তার ঠাঁবর্ষে এতদিন বাবে ওটা পড়েছে, তাই বিখবা গুরুজনদের দিয়েও কাজ করাচ্ছে!

এটা বাসনগুলো নাহকাল চোবড়া আর সোড়ার ঠাঁড়ে দিয়ে হাজতে হাজতে অলিম্যাসিমা ভাবেন। কি জ্বনি, বাসন মাজার ক্রি-টাকে নেপু ছাড়াল কেন কে জানে।

এত কথা বটকলরা কিছুই জানে না। আজন্মাল আর তাদের এ বাড়িতে আনাগোনা অলিম্যাসিমা মোটে পছন্দ করেন না। আর তারা তো আনতেও চায় না। কিন্তু সমিতির স্বত্ব মেয়েদের ভারি কৌতূহল।

নেপুয় বাবার আমদে, বড়বিনের সময় সোফাগুলির পিওনরা ব্যাও বাড়িয়ে, এ বাড়ি থেকে কত বসনি নিয়ে গেছে, পেছনের উঠানে ঠাঁড়িয়ে চাঁ-জিলিপি মেয়ে গেছে। তাদের সুখ সোনা গর, এরা কপোর বাসনে বাঙলা-দাওরা করে; সে গর সোফাগুলোর মশায়ের গাটীর বৌলতে এখনো সকলে বসাবলি করে।

তাদের ঠাঁকানো ভারি শক্ত; জামাইয়ের ঘাড়ে বোম্ব চাপাতে হয়। নইলে তাদের আশ্চর্য আর স্বত্ব নেই।

অলিম্যাসিমা অবাক হয়ে ভাবেন বেরাল্লিশটা বছর এখনি-এখনি কেটে গেল, টেরও পেলেন না। শুবে ঠাঁকা বোকাটা মোটা হয়ে, ভারি হয়ে উঠেছে, সে তো কম কথা নয়। বা ডিল হাতের স্বখ, সেও প্রায় মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে, তাই আজকাল আর বেন ঐষ থাকে না।

কেহারা বাবে বলেছে বর্ষবান। অলিম্যাসিমা ঠাঁকানা দিয়ে বেবেন, পথ বলে বেবেন। একবার কারাগাটা দেখে আসা ভালো। অলিম্যাসিমার কাছে জামগাটার ছোট্ট একটা পেনসিলে ঠাঁকা নম্রাও আছে, ঠাঁকুরমশার করে দিয়েছিলেন। ভারি ভালো ঠাঁকার হাত ছিল ঠাঁর। ধার দিয়ে, ধার দিয়ে, মামগুলোও লিখে নিয়েছিলেন। চার কাঠার চাইতেও কয়েক ছটাক বেশী, দিখি চারকোনা ছিলমায় জামগাটা।

বেবে আহুক কথা। তবে খুঁজে পেতে হরতো একই অহবিধে হতে পারে। ঠাঁকুরমশার মেয়েবার দিখেছিলেন বাকি আপেশাপের গোড়ো জমিওলোতে সব বাড়ি উঠে গেছে। সোকেদের পছন্দও বলিহারি। ঠাঁজাকুড়ের হতো সব জমি, তার ওপরেও বাড়ি হুসেছে।

কে জানে রাজ্যটির নামও বললে গেছে কিনা, আকস্মিক ভাঙা দ্বিধা দ্বিধা হোলেও কি বেন একটা নতুন নাম হয়েছে, অসিমাশিমা গ্রিক বনে করতে পারছেন না।

তবে কেহা চালাক মেয়ে, ও গ্রিক খুঁজ বেব করবে। অসিমাশিমা সব কথা ওর বল: চলে না, নিরুত্তর অস্তরের কথা অসিমাশিমা: হু হুটে কাকোও বলতে পারেন না। বড় একটা বাড়ি, 'জ্যে' পেছনে অসিমাশিমার জমি, এটুকু অসিমাশিমা বলা চলে। নইলে কেহা হুহুতো নতুন করে দেখে আসবে না। দাদার বাড়ি নাই বললেন। শুধু নামটা বললেই হবে।

কেহা আশিমা থেকে ফিরলে তোলেদন কথাটা অসিমাশিমা।

যাচ্ছ তো গ্রিক, কেহা? এই শনিবারই যাবার কথা না? আমার কথাটা মনে আছে?

বড় বেশী আগ্রহটা চোপে রাখতে হয়, গলাটা কেমন ধস-ধসা শোনায়।

কেহা বলে,

সেইরকমই তো গ্রিক আছে, যাদি, তবে জানোই তো আশিপের সব ব্যাপার। কর্তারা যেই টের পাবেন পুটি-মাছটা কিছুতে দানব পাচ্ছে, অবনি সেট বন্ধ না। কথা অবনি তাঁদের শান্তি থাকবে না।



অসিমাশিমা বলেন,

এ ভারি অস্তর, শনিবারের বিকেলের বিকে তোমরা কি কর না-কর, ওরো তাকে কি?

নব কিছুই: এ আর কি। দিল হুহুতো অলককে এগরটা ডিউটি চাপিয়ে। কিছুই বলা যায় না।

অসিমাশিমা চিন্তিত হয়ে পড়েন।

যাচ্ছে অলোকও তোমাদের সঙ্গে?

কি মুশকিল, ও না গেলে চলবে কেন? ও-ই তো সেকেরা। বলেছিলাম না তোমাকে যাদি, ও সেকেরা আর আশিমা ট্রেকারার, হিগেলগার সব আশার হাতে। হুহুনার সই দিয়ে ব্যাচ থেকে টাকাপত্র তুলতে হয়। আর হুগিন যাদেই সবকিছু টাকটাও এসে যাবে, তখন একেবারে হাজার হাজার টাকার কারখানা হয়ে পড়াবে।

ইচ্ছে করলে হুহুনে সই দিয়ে, টাকটা তুলে, একদম ভেগে পড়তেও পারি। কেউ টেকেতে পারবে না।

কি বিশিষ্ট সব কথা কোয়ার। কোন একটা গাছের নেট। কিছু অলোক গেলে হুহুতো সবদমর কোয়ার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, টুক করে একবার গিয়ে জমিটা দেখে আসার সুবিধে হবে না।

কোয়ারে কথাটা না বললেই নয়।

আরে, না না। এতই এখন গোপন ব্যাপার, অলককে না জানিয়েই কোবে আসব। তবে খুঁজ বেব কথা মুশকিল হতে পারে। ও বর্ধমানে অনেকদিন ছিল। পথখাট ওর সব চেহারা।

বেশ, না হয় ওকে সঙ্গে নিয়েই যেনো, কিছু জমিটা যে আমার তা বেন আমার ওকে বোলো না। হাযখন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি আছে, তার পেছনেই, এখোবারে লাগোয়া চার কাঠা জমি।

কেহা একই অবাক হয়। বলে, কি এত গোপন কথা বুঝলাম না; তবে এখন ব্যাপ করছ, ওকে আর তোমার নামটা বলব না। বলব আমার এক আত্মীয়ের জমি। কেমন, তা হলে হবে তো?

অলককে ভালো লাগে না অসিমাশিমার। কি রকম একটা রক্ত-রক্ত অগোছালো জায়, বন্দরের কাপড়-কাপা পরে, চুলওলা বস্ত্র লম্বা, কেমন একটা চালাক-চালাক দে; কেবলেই অসিমাশিমার দা আসা করে।

টিক অস্তর নয়, বরং বেশ ভদ্রভাবেই কথা বলে। কিন্তু সব কথার মধ্যে এ-বাড়ির, আর শুধু এ-বাড়ির কেন, সব বনেরী বাড়ির প্রতি কেমন একটা ঘোড়া সেওয়া থাকে। বেন এরা চোটাচরিত করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করে, ভারি একটা অস্তর করেছে।

ও-ই নাকি বর্ধমানে ছিল। কোন্ বিকটার থাকত কে জানে। বর্ধমান তো আর একটুখানি জাতিগা নিয়ে নয়। তবু জাতিগা হুহুতো ওর দেখাও হতে পারে, হুহুতো বা জিহবেস কলেই বলে দিতে পারবে। কিন্তু ঐ রকম ছেলের কথাতেই বা বিশ্বাস কি। তারপর এখনি জমির কথা জানিয়ে দিলে, কোমানে যদি বর-টবর দিয়ে বসে। দাদা হুহুতো বলবে,

ও! ভারি আশার জমিদারনী হয়েছেন। ওর ঐ চারকাঠার জমিদারী দেখে আসবার জন্ত আবার চর লাগিয়েছেন।

ঐরকম কথাবার্তাই বে দাদার। অসিমাশিমা এখন আর ওসব সইতে পারছেন না। এককালে অনেক

সহেছেন। উঠতে-বসতে খেঁচা। খাওয়া নিষে খেঁচা। বিধবা ব্যস্তের দ্বারে কেন আবার বিধে পায়, তাই নিষে কি সব বিস্ত্রি খেঁচা। স্বামী ঘরে পেট ভরেনি, এইরকম সব কথা। কেবলকে বলেন,

কেহা, কথা দাও, বধুমান পৌঁছবার আগে অলককে তুমি এ-বিধে কিছু বলবে না। নেহাত যদি খুঁজে না পাও, শুধু তখন বলবে।

কেন এত ভাবো, দামি? বলেছি তো, চুপি চুপি কাউকে না জানিয়ে দেখে আস। একা খুঁজব, আবার না গেলে অলককে নিষে খুঁজব, অত কি আর সময় পাব, দামি? মিটিটো থাকবে তো। তবে পেটা লাড়োবেগার, শেষ ট্রেনে কিংব আমরা। অনেক রাত করে বাড়ি আসব। তুমি গরলকে বলে যেখো, আমি ডাকলে, এখনে বিড়কি খুলে দেব। ওকে সেজ্ঞ আট আনা পরশ দেব।

অলিহাসিমা ভাবেন, তা হলে শনিবার রাতে আর খবরটা পাব না, সেই রবিবার সকাল অবধি অপেক্ষা করতে হবে। কি করে কাটবে রাতটো কে জানে।

নেপুনের খাবার সময় হয়ে যায়। অলিহাসিমাকে উঠতে হয়। ট্রেতে বাসন লাগান, কেহা অনর্গল বকে যায়। জানো দামি, আবারের আপিসে জুজ্বন ছোটসারের আছেন? ওঁদের মধ্যে একজন আবার মহিলা।

তা হলে ছোট বেন বল।

না, ঘোটেই যেম নয়, একদম বাতালী ছোটসারের। হি'হুবাড়ির ঘরে নাকি, কাশো বলে স্বামী নেরনি, হুস্তর দেখে আবার বিধে করেছ। তাই ছোটসারেরের বাবা ধেরেকে লেখাপড়া শিখিয়ে, এম-এ পাশ করিয়ে, কেন্দ্র বজী না কাকে ধরে, দিয়েছেন আপিসে চুকিয়ে। এদিনে সে ছোটসারের হয়েছে। কি তার প্রতিপত্তি জানো না, দামি, শিওরনা বরবরি কাম্পান, বাধে গোজতে এক ঘাটে জল খায় গুয় জরে।

কেহা খুব হাসে। কেহা বলে,

আরো শোনো, দামি। শিল্পী থেকে বদলি হয়ে এল মুকন্দবাবু বলে এক কেহাদারী। ক্যাবলার একশেষ, আর এই বড়-বড় কথা, কাজে ফেলে দিনরাত তক্তাভি। আর পড়নি তো। পড় একেবারেই ছোটসারেরের সাধনে। সঙ্কলের সাধনে ছোট সাহেব দিলে তাকে ছুলা ধুনে। আর সে গুণ্ডু ভুত বেবার মতো চেয়ে বইল!—বিবাস কহবে, দামি, ঐ নাকি গুর সেই স্বামী!

অলিহাসিমা এখার সত্যি আশ্চর্য হন।

তাই নাকি? এখন স্বী বড় চাকরি করে, এতদিনে গোখ হয় মিটমাট হয়ে গেল।

মিটমাট? কি যে বল, দামি, তিনটি ঘাস ছোটসারের তাকে নাকের কলসে চোষের লসে করলে। সেখটা সে নিজেকে খেয়ে ট্রান্সফার চেয়ে চলে গেল সাহেবগঞ্জে! হয় কখনো মিটমাট? কি যে বল!

অলিহাসিমা বলেন,

কিছু সে তো জোর করতে পারত? স্বামীর তো আইনের জোর থাকে। গুর সব রোজগারটি যদি কেড়ে নিত, উনি একটু ইঁ শব্দও করতে পারতেন না। শোস্ট-মাস্টার মশায়ে স্বামীর বদমাইস স্বামী তাই করে, তার কিছু করারো উপায় নেই!

কেহা হঠাৎ গজীর হয়ে যায়।

কে বলেছে উপায় নেই? তোমার ওদম আইন পালটে গেছে। ইচ্ছে করলেই উনি ওদের বিয়ে ভেঙে বিতে পারেন। দিয়েছেনও হয়তো, কে জানে। আবারও তো তাই ইচ্ছে করে।

কেহা হাসে, কিছু খুস্টা একটু দালা মনে হয়। না, কেহাকে চটানো নয়। অলিহাসিমা বর করে ট্রে শাজিরে ওপরে চলে যান। রোজকার মতো ভারি ট্রেনি কেহা শিঁড়ি দিয়ে ছুলে দিয়ে আসে।

বাসন নিয়ে আশখটী বাবে নেমে এসে বেধেন কেহা গুয়ে গড়েছে।

খুস্টা ধড়াস করে ওঠে। এই সময় কেহায় অস্থির করলে কি হবে? শনিবার যদি বেতে না পারে?

অলিহাসিমার পাখের লখ তখন, দামিগ থেকে মাথা ছুলে কেহা বলে,

তুমি ঘরে নাও, দামি, আজ আবার বিধে নেই, ফ্রাবের কমিটি মিটিং-এ জোর চা খাইয়েছে।

সত্যি-বিখ্যা ভগদান জানেন। বাস, তবু শরীর বে ব্যাগাপ করেনি সেই স্বখেই। কে জানে কি ভাবে ও, কাউকে তো কখনো কিছু বলে না। অলিহাসিমাই বা কাকে তাঁর মনের কথা বলেছেন?

নেপুনা খেয়ে-খেয়ে সন্ধান-সন্ধান গুয়ে গড়ে। নটীর পর আর নিচে নামবার উপায় থাকে না। শিঁড়ির মাজ-ধানকার স্বরকার তালার বড় চাবিটা এইখানে, অলিহাসিমার পারের কাছে, বেখাজের ওপর থাকে। নিচে বাবার জন্ত প্রাণ আইচাই করে, তবু অলিহাসিমা নিচে থেকে নিঃশব্দে একবার ঘুরে আসার কথা মনেও করতে পারেন না।

নেপুয় মার কোনো কথাই অমরীয়া করেনি কখনো।

কাগজও জানতে চাননি। অদ্ভুত সব হুতুহু হিড়েন মাতে মাকে নেপূর যা। নিচের তলার সামনের দিক্কার বড় হলখরের পাশে নেপূর বাবার পড়বার ঘর, অনেক রাত অবধি সেখানে তিনি গড়াওনা করেন। হঠাৎ হঠাৎ অলিমাসিমার হাতে দিতে খাবার জল পাঠিয়ে দিড়েন রাত-হুতুয়ে।

নেপূর বাবা যেসে জলটি নিয়ে, জানসা দিয়ে গলিয়ে বাইরে ফেলে দিড়েন। তার পর খালি গেলাস অলিমাসিমার হাতে দিয়ে বলতেন, যাও, এবার নিশ্চিন্ত করে দাও। অলিমাসিমা খালি গেলাস নিয়ে গুটি-গুটি ওপরে এসে সব কথা বলতেন। জল ফেলে দেওয়ার কথা শুনে,



নেপূর মা-ও একই হাসতেন, কিন্তু হুহিন বাবে, আবার পড়াতেন।

এই ঘরেই ঘরে থাকতেন অলিমাসিমা, ও-ঘরে নেপূর মা-বাবা। ততেন, মাঝখানকার ভারি দরজাখানি বন্ধ থাকত, পাশের দরজা দিয়ে অলিমাসিমা বাওরা-আসা করতেন।

ঘরখানি শুধু অন্তরকম ছিল। মেঝেতে পুরু হলুদ রঙের গালচে পাতা ছিল। অলিমাসিমার বিছানার ওপরেও দিনের বেলায় মোটা হলুদ রেশমী ঢাকনি পাতা থাকত। ঘরময় কি যে একটা সুগন্ধ ছুরছুর করত, যে এসে হু হু ও-ঘরে ঝাড়িয়েছে, তারই গায়ে অনেককণ অবধি লেগে থাকত।

রাত্তে যেই আলো নিভিয়ে দিড়েন, অবনি ছায়ায় ঘরখানি যেন আরো অশুদ্ধ হয়ে উঠত। তার মাঝখানে গুরে গুরে অলিমাসিমা চোখের সামনে মেঝেতে পেতেন বর্ধমানের গলির ভেতর চারকাটা মাসের এককালি জমি, আশেপাশের শোড়ো জমি থেকে আলাদা হয়ে তাঁর জন্ত অপেক্ষা করে রয়েছে।

ঘরখানি আর তখন নীরব থাকত না, অলিমাসিমার বুকের স্পন্দনকে ছাপিয়ে কাঁপতালের স্রব বেজে উঠত। কাঁপতাল কাকে বলে জানেন না অলিমাসিমা; নিহুতে যে বাজে, তারকম সেই বুঝি কাঁপতাল। বনের ভেতরকার যে স্রব, সেই বুঝি কাঁপতাল।

২৭।

শনিবার আর আসতে চায় না। এর মধ্যে আনন্দের আরেকবার জামাইয়ের খেঁজ নিয়ে গেল। সঙ্গে করে জামাইয়ের বন্ধু ঘোষকেও নিয়ে এল। আধাবরনী আম্রবে ডহলোক, ঝং অলা, লোম-ওঠা, লাল মখমলের চেয়ার-খানিতে বসে কত কি বলে গেলেন। দোকান থেকে গরলা দিয়ে খাবার কিনে আনল, অলিমাসিমা চা করে দিলেন। মাঝখানে কোয়া এসে পড়ল, তাই তখন জামাই আনন্দের পাঠিয়ে তাকে ধরে আনাল। কোয়া হাসিমুখে এসে ঘরে ঢুকল। অলিমাসিমা তার বোম্বাক দেখে হার মানলেন, এত অহঙ্কার যে জেধ করে নিজের হার বাড়াতোও কখনো চেষ্টা করবে না।

ওদের সঙ্গে বসে চা-জলখাবারও খেল কোয়া। পরে, ঘোষ বিষায় নেবার পর, নিচের খাবার ঘরে আনন্দের সঙ্গে কোয়ার সে কি কগড়া! কোয়ার বড়সাহেবের কাছে ইউনিয়ন নিয়ে কোয়ার মাতাবাতির কথা শুনে আনন্দ রেগে চুতুর্ভুজ।

অলিমাসিমার সামনেই হুহনে হুহনকে কি সব কাটা-কাটা আলা-ধরানো কথা বলতে লাগল। তার চাইতে ছোটবেলাকার মায়শিও বেন ভালো ছিল।

অলন্দের নামে বা-তা বললে আনন্দ। তিনটে আগিলে এই সব করে নাম কাটিয়ে এখানে এসে ছুটেছে। ওর সঙ্গে এত মাখমাখি কিসের। বত রাঝোর বাজে ছেলে পাঠা হয়ে ঝাড়িয়েছে ওদের ইউনিয়নের, বড়সাহেবের নিজের মুখে শোনো। এতদিন পরে কোয়া নিজের চাকরির না অহুদিখা করে। আরও পাঁচটা মেহেও তো এ আগিলে চাকরি করে, তারাতো তো ইউনিয়নের মেহার, কই তারাতো কোয়ার মতো নাচানাচি করে না। কোয়া তো আর কচি বুকাটি নেই, ওর কত বয়স আনন্দের বুঝ জানা আছে। মোট কথা, শনিবার বর্ধমান যাওয়া কোনমতেই হয় না।

কোয়া যে কখনো রাগে না, সেও যেন আজ একই পুরম হয়ে উঠল। এতগুলো কথা আনন্দ না হয় না-ই বলত। বাস্তবিকই কোয়া বর্ধমান বার না-বার, আনন্দের ভাতো কি? কোয়ার পদা একইও উঠল না, স্রটটা কিন্তু কি রকম কাঁট-কাঁট শোনাতো লাগল। কথাতলোও ভারি নির্দম। আনন্দের আদমরমানে আঘাত-খেওলা কথা।

অলিমাসিমার বুক টিপটিপ করে। বেরকম জেদী ছেলে আনন্দ, শেখটা না বড়সাহেবকে বসে, ঐ যে কোয়া বলেছিল ভিউটি ফেলে দেয়, তাই না করে। আর হুপ করে থাকতে পারেন না অলিমাসিমা।

ও আনন্স, বধ'বানে ও তু' মিটিং-এর অন্তে থাকে না, আমায়ে একটা কাজ করে দিতে থাকে।

ওরা দুজনেই হঠাৎ খেবে গেল। আনন্স আরো কিছুক্ষণ ছিল, তার মধ্যে নেপু নেবে এল।

ওকি, তুমি এখনো যাওনি, আনন্স? কিছু দরকার আছে?

আনন্স তেমনি হেসে বলে, দরকার তো সর্বদাই আছে, নেপুহি, কিন্তু তোমার কাছে কি কিছু পাওয়া যাবে? ছোট-বেগার তো আমাদের চা থেকে চিনিটুকু বেবে দিতে।

নেপু যাগে বাক্যহার্য হয়, আনন্স হেসে বিদায় নেয়। নেপু কেয়ার দিকে কিয়ে বলে,

অত হাসির কি হল, কেহা? যত সব অভয় কথা শুনেতে খুব মজা লাগে, না? আর তুমিও কি বলে ওকে আভায়া দাও, অলিমাসি? ওর মনের ডাব কি হকম, বলিনি তোমাকে এক শ যার? উনি আসতে বলেন, ওর সঙ্গে বেধা করে চলে যাবে। যেহেদের সঙ্গে অত কি গল্প, এধিকে চুকতেও গেবে না বলে নিশাথ, মাসি। ও পোক হুবিধের নয়।

অলিমাসিমা বলেন,
তোমার আশনার গুহুতো ভাই, নেপু, আমাদের মূখে কি এমন কোনো কথা শোভা পাবে?

নেপু বলে, বেশ, তাহলে আমিই বলে দেব। তবে শুনে বলে তো মনে হয় না। বাবার একটা কোনো আঙ্কেল ছিল না, নইলে যেস কখনো এমন ছেলেকে সম্পত্তি! একটা লম্বাছাড়া, বাউতুলে। ভদ্রঘরের ছেলেদের মতো বিয়ে-বা করলো না, যা-তা করে বেড়ায় নিশ্চয়ই, মাইনে তো পায় অনেক শুনেছি। বেখো তুমি, বাচবে বহদিন, ওর কোনোদিন কিছু হবে না।

কেহা হঠাৎ ঘর ছেড়ে চলে যায়। নেপু একই বেহে কটে হেসে বলে,

ও! আনন্সর নিশা করছি, অমনি রাগ হয়ে গেল বৃহি? তোমাদের কেহাটিও কম বার না। বড়লোক আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে হারা অমনি-অমনি বাহুর হয়, তাদের ধরনই আশায়া হয়, অলিমাসি, সাগাজীবন খেটে খেলে, তুমি তার কি বুঝবে।

নেপু চলে গেলে অলিমাসিমা ভাবেন, সাগাজীবন খেটে কি বা খোলা? চল্লিশ বছরে সাত হাজার টাকা।

নিকের কোট ঘরখানিতে গিয়ে লরকা বন্ধ করে দেন। আপো না আপলে সন্ধ্যাবেগার আবেছায়াতে ঘরখানাতে কেমন বেন লাগে। যেহের আলির কথা মনে হয়। ঐ

তাকের সামনে উঠু হুসে বসে থাকত। সাহেব বতখশ বাড়িতে থাকবে, যেহের আলি সাতা শোলাক পরে শুকান খেতে নড়বে না। সাহেবের সঙ্গে কোটে সেত আসত। এসেই সাহেবের জলখাবার গুছিয়ে দিয়ে, আবার ঐখানে বসে থাকত। গলা তুলে ডাকতেও হত না, সাহেব একবার ওর নামটি উচ্চারণ করলেই হল, অমনি গিয়ে হাঙ্গিরা দেবে। কে জানে কি করে দৃতত।

খাবার ঘরের আর এ-ঘরের মাঝখানে এতখানি দেয়াল কাটা ছিল, সেই দিকে যেহের আলির চোখ থাকত। খাবার ঘরের দরজার খি-রক্তের দলের পর্দা ছিল। তার মধ্যে দিয়ে ওপারের বৈঠকখানা দেখা যেত, সে দিকে চেয়ে যেহের আলির মিন কাটত।

হঠাৎ রাতে খুব ডেকে গেলে অলিমাসিমার মনে হয়, ঐ জায়গাটাতে উঠু হুসে এখনো বৃহি যেহের আলি বসে আছে। সামনের দেয়ালের ওপাকটুকু নেপু করে ই'ট দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে, তবু সেই নীরেট দেয়ালের দিকে চেয়ে যেহের আলি বৃহি মূনিবের অপেক্ষার বসে আছে।

দীর্ঘনিশাথ বেলে অলিমাসিমা ভাবেন, খেটে খেত যেহের আলি, ওখো মাইনে সেত চল্লিশ টাকা, বাড়িতে অনেকগুলি শোয়া ছিল। নেপুর বাবা চোখ বুজবার পর-দিনই নেপু তাকে লরায় গিয়ে দিয়েছিল। যেহের আলিও তখন বুড়া হয়ে গেছে, পা হুটো খুব ক্লান্তো মনে আছে। নেপু বলেছিল, কে জানে, হয়তো হোঁচাতে কিছু, ওসল কাবেলা পুষতে নেই। দিয়েছিল এককথার হাঙ্গিরা। যেহের আলি সেলাম করে চলে গেল, আর কোনো সবরও দিল না। সেসকম কিছু তখন মনেও হয়নি অলিমাসিমার।

খেটে খেত যেহের আলি, অলিমাসিমার মতো। সে চলে বাবার বহকাল পরে বেশ থেকে তার বৈঠকদেকেটে চিঠি নিয়েছিল যেহের আলি কেন চিঠি দেয় না, খরচ পাঠায় না, তাপের বড় কষ্ট। নেপু চিঠিটা ছিঁড়ে বেলে দিয়েছিল। বলেছিল,

কোথায় মজা লুটছে কে জানে। এইসব খেটে-বাওরা লোকদের কাজই আসালা।

জামাঘরের পরী অর্ধেক ভালো। পরীর ভালো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জামাই বেন আবার তার খোলাদের মধ্যে চুকে যেতে লাগল। মাঝখানে একই এগলত হয়ে পড়েছিল, বাকে শোত তার সঙ্গে যেতে কথা বলতে চাইত। আনন্স কিন্তু সে হুযোগ ছাড়েনি। জামাইকে ডাক্তার একই বেড়াতে বলেছে। রাত-প্রেরারের কষ্টের মোটরে বেড়ালে যোগ 'বাড়ে, এই বলে নেপু মহা আশত্তি

করেছিল। আনন্স তাব নিজেব গাড়ি করে, নিজে চালিয়ে, গন্ধর খর থেকে কোক একবার করে জামাইকে বেড়িয়ে আনতে লাগল।

নেপু ডেবে সাহা, আনন্স কোথায় কোনো অনিষ্ট করে না বলে। অগ্নিমাধিমা ডাবেন আনন্সের আগ্রহের কারণটা কি শুধু জামাইয়ের প্রতি ভালোবাসা, না তার সঙ্গে নেপুকে হাদাবার ইচ্ছেও বানিকটা আছে।

রোজ খিবে এসে জামাইকে গুণে পৌছে দিবে, এদিক থেকে একবার ঘুরে বাব, কোক একবার কোকদের ইউনিয়নের খবর নেবে, কিন্তু আর কণ্ডা করে না।

এমনি করে শরিবার আসে।

দিন আর কাটতে চাব না। সকাল থেকে অগ্নি-মাধিমার উত্তেজনার পেট ব্যথা করতে থাকে। কোক নিশ্চিন্ত মনে সব গোছগাছ করে নেবে।

ভুলে যাবে না তো, কোক? এই বেস টিকানা দিয়ে শিবেছি, কে জানে রাজার নাম বহুলাস কিনা। হুরলে, গেম, হাংগন দুখাপখাওয়ার বাড়ির পেছনে লাগোয়া জমি, মাকখানে একসারি মনসার কোশ ছিল, এখনো আছে হুতো। আর এক পাশে একটা বড় হিমসাদর আয়ের গাছ।

কোক টিকানা-গেবা চিরকুটটা ভাঁজ করে ব্যাগে রাখে। কোক, এই নরগাটের সাধো, যদি খুজে পেতে মুশকিল হয়, এই বেস জমিটার নক্সা, আলেশপেরে হাঙাগুলোও নামহুজ দেওয়া আছে। ছুঁমি একাই বেশ খুঁজে নিতে পারবে, ঐ অলকের সাহায্য নিতে হবে না।

কোক ব্যাগজপত নিয়ে ব্যস্ত থাকে, মনে হয় ভালো করে বুঝি শুনল না। অগ্নিমাধিমা আবার বলেন,

ভুলো না, কোক, লক্ষী বেয়ে—

সাগর থেকে মূখ ভুলে কোক জিজ্ঞেস করে, তোমার অনেক ঝুংগের ঘর, না মাসি? তাই অমন করছ?

অগ্নিমাধিমার গম্ভীর কাছটা টানটান করে; জোর করে বলেন,

না, না, তবে নিজের বলতে ঐ এককালি জমি ছাড়। আর তো কিছু নেই আমার। সেখে এসো নিচুই, কোক, ভুলো না বেন।

বাঁধাবাড়া নিয়ে অথবা ব্যস্ত হবে পড়েন অগ্নিমাধিমা। কোক হঠাৎ হয়। বাবার আগে, সোয়াগাকে দরজা খুলে হেঙার কণা মনে করিয়ে দিতে বলে যায়।

একতলায় পড়ীর শাভি বিদ্যাক করে। নারকোল

গাছের ভাঁড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে ডাবেন অগ্নিমাধিমা, আনন্স কোক, জমিটার কথা বসুক এসে। তা হলে মনে জোর পাব। বটকলের কাছে কখাটা পাড়তে পারব। নেপুকেও বলতে হবে।

অগ্নিমাধিমার বুকের ভেতরটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আসে। নেপুকে বলা খুব সহজ হবে না। নেপু তার হসনে চোখ দিয়ে অথাক হবে চেয়ে থাকবে, হুতো কাচের মার্বেলের মতো ক্লুপ চোখে কোনো ভাবের লেপ থাকবে না। হু-তিনবার করে বলতে হবে অগ্নিমাধিমাকে, নইলে কখাটা তার বোধগম্য হবে না।

রাগ করবে নেপু। এ বাড়ি থেকে অগ্নিমাধিমা কত অশুভ্রহ শেরেছেন, সব মনে করিয়ে দেবে। বলবে গরিব আত্মীয়জনদের খরনই আলাপ, বাবা খেটে খাব তাদের জাত অন্তরকম।

অগ্নিমাধিমা কোনো কিছুই প্রতিবাদ করবেন না। জামাইয়ের কানে কখাটা ভুলবে নেপু। অগ্নিমাধিমার ভাবি লক্ষা করতে থাকে। ছি ছি, জামাই কি মনে করবে।

তার চাইতে দুজনে বদন খেতে বলবে, তখন সামন-সামনি বলাই ভালো। কিন্তু জামাই অথাক হয়ে বদন জিজ্ঞেস করবে,

কেন, অগ্নিমাধিমা, কিছু হবেছে? আমি কিছু করতে পারি না?

তখন কি বলবেন অগ্নিমাধিমা? নেপুগর গল্পনার উত্তর তো খুব সহজ, চুপ করে থাকলেই হল। কিন্তু জামাইয়ের কথার যে কি উত্তর দেবেন, অগ্নিমাধিমা ভেবে পান না। ক্যান্ডিনে কাক নেবার কারণ গ্রাণ ধরে বলতে পারবেন না। টাকার জন্ত এতকালের আশ্রয় ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, এ কথা অগ্নিমাধিমা উচ্চারণ করতে পারবেন না।

সাতাধিন কেটে যায় অগ্নিমাধিমার জেবে ডেবে। বিকলের দিকে আর থাকতে না পেরে, সকাল-সকাল রাতের রামা গেবে, নেপুকে বলে, আখণ্ডার জন্ত বেরিয়ে পড়েন।

বটকলরা ভাবি গুণি হয়। কোথায় বেন গির্বেতে কিলের জন্ত টাকা তোলা হচ্ছে, বেশা বসেছে, সেবান থেকে কিবে, ঘেহী করে সব চা খাবার তোড়ামোড় চলছিল।

বটকলের যা খুব রাসমাগ করছিলেন, কি মূলক সব বাবার-চাখা-বেগেছিল ওখানে, তা বোঝা কিলেই কিনল না। কেমন সব দৃষ্টি, আনুর দৃষ্টি, শোন-পাশড়ি।

জাত ভাবে বটকল বলল,

কেন অনুশ্রমের মতো কর, বা? ওদশ খেলের তোমার অঙ্গণ করলে। আমরাও তো কেউ খাটিনি। যদি অতটুকু ছেলে, সে কিছু বলছে না, আর তুমি এরকম করছ! ডি!

বটফলের বাঁধ কতটা আসে।

তাই তো বলছি। ও ছোট ছেলে, সারা জীবন ধরে ও খেতে পাবে। কিন্তু আমি যে শিগগিরই মরে যাব, আমি ওদশ আর কোথাও পাবি?

অলিমাসিমা ঠাণ্ডা কুশ দিয়ে বোনা জালের ব্যাগ বুঁদে, বটফলের মাকে ছোট এক শিশি মোড়ানোর হুমকি গুলি দেন।

এবেলা এক বড়ি, ওবেলা এক বড়ি পাবেন, দিদি, শরীর ভালো হয়ে যাবে।

বটফলের যা আচ্ছাদে আটগানা, তখন শিশি নিয়ে কলকল করে শোবার ঘরে চলে যেলেন।

তবে সে না ক্যান্ডিনের কথাটা পাড়া গেল। শুনে বটফল একটু সম্মতি হয়ে সেল। লোক তো ঝগড়াচাইছেনই, তবে এখন বটফলের কথা শুনেই হয়। তাছাড়া অলিমাসিমা শায়বেন কি এমন কত্তির কাজ শোনাতে, শুনে-বলে অচ্যুত তিনি।

শুনে বলে মডাড। আজ পনেরো বছরের বেশী বড়বাড়ির সব কাজ অলিমাসিমা এক হাতে করে এসেছেন। অলিমাসিমার কোনো কষ্ট হবে না। মাস-কাষারে যার মজ্ঞ এক শটাকা পাওয়া যাবে, এমন কোনো কাজই নেই যা অলিমাসিমার শক্তিতে হুসিমে উঠবে না।

তবে সব কথা কি আর মুখে বলা চলে? অলিমাসিমা বললেন, জামাইয়ের শরীর ভালো না, কামেলার কাজের মজ্ঞ লোক ওদের আরো থামতেই হবে।

ভারপর বটফলের দাবার দিকে চেয়ে একটু ব্লু হেসে বললেন, তাছাড়া দাদা তো সবই জানেন, এখন আমার পেনসনটা বেবায় সবর এসেছে, বাড়ীটাও ভুলতে হবে। বছর দুই ক্যান্ডিনে কাজ করলেই সব টাকাটা উঠে যাবে।

সন্তা তো, বটফলের এত কথা মনে হরনি। তা হলে অলিমাসিমাকে একবার নিয়ে যেতে হয় মিস্টার মওলের কাছে। একটা ভাণ্ডি সুবিধে হয়েছে যে, অলিমাসিমার বয়স হয়েছে, নইলে বা সাংগাডিক ডকুমেন্টা এ মওল নায়েবের গিরা। কম বয়সের, কিংবা ভালো দেখতে কোনো মেয়েকে খেঁজতেই দেবে না।

দ্বির হল, জামাইকে এখন কিছু বলা নয়, বটফলের সঙ্গে সোমবার দেখা করে, কথাটা পাকাশাকি করে, আসছে মাস থেকে কাজে লাগা। ততদিনে জামাইও নিশ্চয়ই

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। কি আর এমন বয়স জামাইয়ের? বাড়ি ফেরার পথে অলিমাসিমা হিসেব করতে থাকেন। কতই বা শরম জামাইয়ের? অলিমাসিমার সাতার, নেপুর্ন তা হলে পক্ষার; কবে বেন শুনেছিলেন, জামাই নেপুর্ন চাইতে মাত্র তিন বছরের বড়, ওর তা হলে আটান। আটানকে কিছু বুড়ো দলা চলে না। চাকর-বাকর নিয়ে ওদের বেশ চলে যাবে।

বিড়ির কড়া নাড়তেই গোয়ালো এসে গুলে দেয়। তাকে বেন একটু বিরক্ত-বিরক্ত মনে হয়।

কখন কেহা-দিগি কিরবেন, আর আমাকে রাত জেগে বসে থাকতে হবে?

রাত জেগে বসে থাকবি কেন, মঙ্গল? রাত্যতের দাওঘাটার ঐ কোনাটাতে খাটরা পেতে দুখিয়ে থাকিস। মাথার সামনেই দোর। কেহা-দিগির সাড়া শেলট গুলে দিস। তোকে আট আনা শরমা ঘেবে বলেছে।

পরদায় কথা শুনে খানিকটা নরম হয়ে আসে মঙ্গল। তবু বলে,

এত রাত করে আসা কেন, মাসিমা? পথে কত খাণাণ লোক—

অলিমাসিমার আর মঙ্গলের সঙ্গে বরতে ঠেছে করে না। সাংক্ষেপে বলেন,

শখ করে সে দেবী করছে না, মঙ্গল, ঐনি পৌছবেই দেবী হবে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখেন সব আটটা বেজেছে। নিজের ছোট ঘরখানিতে গিয়ে কাপড়-চোপড় ছাড়েন। বাটের ওপর চড়ে ডাক খেঁক কোঁটোটা নামান। মাঝখানে গিট বেগুতা হেশমী দোকা ভেমনি আছে।

বাটে বসে সতরটা নোট আরেকবার গুণে রাখেন। তার সঙ্গে একটা দশ টাকার নোটও রেখে দেন, এ আসের হাতখরচটুকু।

বেগমের বোনা জিনিসে গিট ধরে না। কবে এঁটে আরেকটা কাস গরিরে, বোজাটা ছুলে রাখেন। ততক্ষণে লাড়ে আটটার কাছাকাছি হয়ে যাব।

আগে ঘড়িটা বাজত। শুঁ বাজত না, বাজবার একমুহুর্ত আগে খই করে হুটো ছোট দরজা মতন গুলে বেত। তার ভেতর থেকে চমৎকার সাজগোজ করা একটা সাহেব আর একটা মেম বেরিয়ে আসত, এসে ঐ বাবান্দা-মতো জামগাটাতে ঝাঁড়িয়ে, টং টং করে বঁটা বাড়িয়ে, আবার হুদিকের হুট দরজা দিয়ে ঢুকে গড়ত।

নেপুর্ন বাবা বাবা বাবার পর থেকে কেন জানি ওটা

আর বাক্যে না। কিন্তু ঘড়িটা চলে। কে জানে তেতরে কোথায় গার; হুজুন বছরের পর বছর বসেই আছে।

১০১

নেপথ্যের খাঁসে, বাসন নিয়ে অসিমাসিমার নিচে নেমে আসেন। নেপথ্যে দু'কিধে নিচে পোষাক ব্যবস্থা করেছেন। কামাই ভালো আছে, নেপথ্যে তর গোছে। এখন বেন তারও অসিমাসিমার ওপরে থাকটা পছন্দ হচ্ছে না। বলতেই, এক কবাক্য রাকী হয়ে গেল।

অসিমাসিমার সঙ্গে সঙ্গে খিড়ির অর্ধেকটা নেমে, ভালোটা লাগিয়ে দিচ্ছে নিশ্চিন্ত হল।

অসিমাসিমার একটা বস্তির নিবাস কেনে, বাবার ঘরে পৌঁছে, বাসনগুলি খুঁতে আরম্ভ করেন। এমন সময় তেতর দিক্কার বরষা দিয়ে কেহা এসে ঘরে ঢুকল।

অসিমাসিমার এমন চমকে গেলেন যে, হাত থেকে সবুজ ঘরবাড়িওরাগা একটা স্রেট পড়ে গিয়ে বাসনখান হয়ে গেল। বিপর্যয় দেখে সেই দিকে চেয়ে রইলেন। কেহাও নিঃশব্দে ইকরোজলো তুলে নিয়ে, বিড়কি দরজা খুলে, বাইরের গলিতে ফেলে দিয়ে এসে বলল, আরেকটা বের করে নিও, মাসি, আপন গায়ে—খিটো হল না, মাসি।

অসিমাসিমার পাশের চেয়ারটাতে বসে পড়লেন।

খিটো হল না? খাওনি তা হলে বখ'হানে?

কেহা বললে,

না, না, গেছিলাম ঘটকি। সেখানে ওরা আশা করে থাকবে। খিটোটা বন্ধ করে দেবার জন্তও তো বাওরা বরকার ছিল। তবে শুধু অলক আর আমি গেলাম। বড়-সাহেবের নোটিশ দিয়ে খিটো বন্ধ করিয়েছেন।

অসিমাসিমার হিকে ফিরে একই উভেক্তিত ভাবে বলে, এ কার কাক, জানো মাসি? আনক ছাড়া আর কারো না। আনক না কাল, ওকে ফিরে বেঁধে নেব।

ফোনো কথাই অসিমাসিমার কানে ঘাে না। কিছু বলে না কেন, কেহা? জমিটা কি জে-প-টপে গেছে, কিবা ভূমিকম্প হয়ে পুঁতে গেছে? বত সব অসম্ভব কথা মনে হয় অসিমাসিমার। কেহা কিছু বলে না, বালি আনন্দর ওপর রাগে জ্বলতে থাকে। অসিমাসিমার আর পায়ের না।

বেটা কি সত্যি তুলে গেলে, কেহা?

কি তুলে গেলাম, মাসি? ও, তোমার সেই কাহাটা, না? তা, সেটা তো বুকেই গেলাম না। হু বড়ো ঘরে অলক আর আমি ঘুরে ঘুরে রাহাটাই গেলাম না। বেলা

বাড়ি-ঘর, কারখানা, বাসা এঁইসব হয়েছে ও-দিকটাতে। আবার সন্ধ্যাও হয়ে এসে, রাহাটর ভালো আলো নেই, ভালো করে খুঁজতেই পারলাম না, মাসি।

তারপর অসিমাসিমার দল্লভুত হুখের হিকে চেয়ে আবার বলে,

কেন অত ভালো, বল তো, মাসি? জমি তো আর চোরে পকেটে করে নিয়ে গালাবে না। ও থাকবেই। অলক আবার বিশু-গিরই বাবে, দিনের আলোর দেখে আসবে বলেছে।

মাক, তাও ভালো। কেনম একটা বেন বস্তির ভাব আসে অসিমাসিমার। কি সব পাগলের মতো মনে হয়েছিল। পাছোড় কিবা নলীর ধারে ছাড়া আবার মাটি কসে বার নাকি। তেমন ভূমিকম্পই বা কবে হল যে পুঁতে যাবে। আর পুঁতে গেলেও তো সেখানেটা তিন-বতন হয়ে থাকত, সবুজেই চোখে পড়ত। চেনে না, তাই খুঁজে পাননি। বোকেওনি নিশ্চয়ই তেমন করে।

কেহা বললে নাকি কোথায় বেয়ে এসেছে। শুধু পড়ল গিয়ে। তার আগে বার বার অসিমাসিমাকে দু'কিধে বলল, জমির জন্ত না ভাবতে, আলোর আলোর একদিন সেও না-হয় অলকের সঙ্গে যাবে, একটা হবিবারে, কি অত ছুটির দিনে। অমি কিছু পালিয়ে যাচ্ছে না।

হুশ যে খানিকটা হয়নি অসিমাসিমার, তা নয়। তবে হুর্ভাবনার চাইতে হুখ লভগে ভালো। বাসা চল্লিশ বছর অপেক্ষা করেছে, তাদের আর মন-পনেনো দিনে কি বা এসে যায়। তবু মনের ভেতরটা একই খচখচ করে।

শুধু শুধু হুর্ভাব একটা সরল করে কেলেম অসিমাসিমার। আরে তাইতো, এতক্ষণ মনে হয়নি কেন? কেহা নয়, অলক নয়, এবার নিজেই যাবেন। একটা হবিবার, এ বাড়ির ভার কেহাকে দিয়ে, ভোরবেলা চলে যাবেন, ঘাড়ে ফিরে আসবেন। নিজের চোখেই দেখে আসা ভালো। কারণ নজার কোনো অমলমল করত হলে, কাক গুজু হবার আগেই করতে হয়, বটকলের দাগা বলেছেন।

কিন্তু খুঁজে পেল না কেন? নিশ্চয়ই দেহকম করে বোকেনি। সারানি ৫-৫ করে, সন্ধ্যা নাগাধ একবার একই ঘুরে বেগেছে। হয়েছেও তো সন্ধ্যার গাফি, ন'টার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে গেছে। কেনম বেন বনবরা মনে হল কেহাকে। তবে অসিমাসিমার ফোনোফোনই কেহাকে তেমন মজব কর বেগেননি, এ কথাও সত্যি।

হুজতো এত সাধের-খিটোটা শেষ পর্বত হল না বলে মন পাঠাপ। কেহাও জন্ত হুশ হয় অসিমাসিমার। একটা

মিটিং হল না বলে আর মন খারাপ হয়ে যায়, তার মতো অভ্যাসকে বা আছে।

ছোট্ট কেবলকে মনে পড়ে। একটা বেঁড়া তালপাতার হাতশাখাকে বুকে জড়িয়ে, নেপূর মা'র খাটের পায়ের কাছে ঘুমাতে। বেশ বোঝা মতো দেখতে পাখাটা, অসিমাশিমা সেটাকে একদিন টেনে আঁতাকুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। অমনি জিনিগ কেউ ঘরে থাকে? বুকে নিয়ে গের? অম্বল করবে না? নেপূর মাও তাই বললেন।

কাঁধে নি কেহ। রাতে বলল পেটবাখা করছে, না গেরে শুয়ে থাকল। আঁজকের মতো অমনি করে, না খেয়ে, বাগিয়ে মুখ ওঁলে গেরে থাকল। নেপূর মা পরদিন অসিমাশিমাকে দিয়ে বোড়ের মাথা থেকে একটা লেপুগায়েবের পুতুল কিনে আনালেন। কেহা সেটাকে নিয়ে বেগত বটে, কিন্তু বুকে জড়িয়ে নিয়ে গুত না। অসুত বেয়ে, কেহা। ডারি দেখাও।

একটু একটু করে ঘুম আসে। কানে আসে আসে বাজনা বাজে।

পরদিন থেকে বাড়িটা আগাগোড়া ওলটপালট হয়। ডাক্তার কিছুদিন থেকেই বলছিল জামাইয়ের শিঁড়ি ভাঙা বন্ধ পাবে, একতলার এসে বসবাস করার কথা। ঠিক এই সময় একতলার সামনের দিক্কার মাত্রাটী ভাঙাটে দিল্লী বদলি হয়ে গেল, ঘরগুলিও খালি হল। একতলার নেমে আগাতে আর কোনো বাধা রইল না। মোতলাটা ভাঙা হিলে অনেক বেশী পাওয়া যাবে, নেপুও তারি ঘুমি।

বহুদিন পরে মাঝখানকার দরজা-জালনাগুলো খোলা হল। কেমন একটা পরিষ্কার হাওয়া বাড়ির বইতে লাগল।

আনন্দ মোতলার জন্ত কি একটা আপিসের ভাড়াটে ট্রিক করে দেখ। নেপূর ততটা গদ্বল নয়; তবে আপিস নিলে ভাড়া নিয়ে গুতগোল হয় না, তাইই সারিবে নেবে, আপত্তির কোনোই কারণ থাকে না। তবু বনটী কেমন খুঁতখুঁত করে।

অসিমাশিমার কিন্তু বনটী ঘুমি হয়, এই তো কেমন যোগাযোগ হয়ে থাকে। আর ওপর নিচু টান-ব্যাঁচড়া করা নয়, শিঁড়ির মাঝখানের দরজাতে ডালা দিতে হবে না, গোটা বাড়িটা নেপু চোখে চোখে রাখতে পারবে। তবে একটা ভালো লোক রাখতে হবে। আর জামাইয়ের কোর্টের বেরারাক্ষেও এ বাড়িতে থাকতে বলতে হবে। শব্দর না হয় সব ঘর খোয়াখোয়া করে দিল, নেপূর কোনো-দিনই কোনো বাছবিচার দিল না। নতুন লোকটা না হয়

রাঁধাবাড়ী খোয়াখালা সারল। তবু জামাইয়ের দেখা-শোনার জন্ত ঐ পুরোনো বেহারাইটা ভালো। তারি অগুণত জামাইয়ের, আছেও প্রায় পনেরো বছর, ওর বাবাও নেপূর বাবার কাছে বহুদিন কাজ করেছে। খুব দিবাশী চৌকোল পোকটা। জামাইয়ের অমনটাই দরকার।

ঘরদোর গুছাতে গুছাতে অসিমাশিমার চিন্তার আর শেষ থাকে না। আসছে মাসের পরলা থেকে মোতলার ভাড়াটে এসে যাবে, আর অসিমাশিমাও ক্যান্টিনে বহাল হবেন। বটকলের বাড়ির সেই ঘরখানিরও ব্যবস্থা করেছেন। একটু ছোট, তবে অসিমাশিমার এখানকার ঘরের চাইতে ছোট হবে না। চৌকো বলে ওরকম মনে হয়। বটখটে ওকনো, বাইরে একহাত লান-ব্যাঁধানে জমি, তার পরেই টুই বেলিং, তার পরেই বাজা; সামনে একটা শানের বোকা। সেখানে অনেক রাত পর্যন্ত আসে। অলে, হটগোল চলে। বছর দুইদিন বেশ চলে যাবে সেখানে। অত শুকনো বন, দমত পশ্চিমের রোপটা ঘরে ঢুকতে পার, বাহাও নিচুর ভালো। অন্ততঃ এখানকার চাইতে ভালো। এখানেও তো অসিমাশিমা দিবা বেলালি বহুর কাটালেন। কি এমন দম্ব বাহা? ঐ বা এক নিচু হতে গেলেই হাটুর পেছনে ঝিল ধরে, শিঁড়ী টানটান করে গুটে। তাও একটু হবে না?

তবে এক শটকা দেবে না, পঁচানজই দেবে। তাই বা দম্ব কি? বটকলের দালা বলছিলেন, আসছে মাস থেকেই কাজ শুরু করে দেবেন; সব বরত নাকি একদমে লাগে না। অসিমাশিরও এখনি সেখানে যাবার দরকার নেই। রবিবার-টবিবার বেশ গিয়ে দেখে আসতে পারবেন, কাজ কেমন এল।

যা দেখতে বছররা ওপরের সেই সব তারি তারি সাবেকি লিন্দুক আসামারি নিতে নামার। নেপু সেগুলি কিছুতেই ধাসি করে দেবে না। সবদ্রুই নামাতে হয়। তবে বাসনের আলবারি খালি করে না সেওরা পর্যন্ত একটুল নড়াণো গেল না। ভাল ভাল কপোর বাসন, গোছা গোছা খাগড়াই কাঁসা বের করতে হয়। বিরাট এক কাঠালকাঠের বাসনের লিন্দুকের তলা থেকে ছোট একটা ডামার বাজ্ঞে মোটা পাঁচেক বহাধানী ডিক্টোরিয়ার আমলের মোহর দেখায়। নেপূর আলস্য আর ধরে না।

যাবার প্রথম রোজগার, অসিমাশি। যা তো ঠাঁকু-পুছো করত না, ঠাঁকুয়ার লক্ষীর কাঁপিটা আমার ছোট-কাঁকিক দিয়ে দিষ্টেছিল। তার বদলে এই বিলিতি বাজ্ঞে

স্বাক্ষরকারীরা মুখ দেখে। মোহর কাটি রেখেছিল। বগত, সেমিল, ঐ পুরনো কাঁপাটার চাইতে এর সব কত বেশী হবে। হৃদয় ভাঙে। ছোটকাকি নটিন বহর বসে বিধবা হল, পরের বছর মল। ওর চেলে ঐ আনন্দের কতক মামার বাড়ি থেকে, কতক আনন্দের থেকে বাস্তু হল। তার আবার কত বড়ই দেখে। নতুন মোটর কিনছে নাকি এই মাসের বাড়িতে। ডাবে বোধ হয় জ্যাকার সম্পত্তি হটল, আবার আর কি ভাবনা। রোজগারের পরস্যাগুলো দিই উড়িয়ে।

নেপু ওপরে ওপরে এটা ওটা গছের আর বদতে থাকে,

কি চালাক কেবলে তো, অলিমাদি? ওপরটা কেমন সাহেব কোম্পানির মাথায হাত বুদিয়ে চমৎকার করে সারিয়ে নিচ্ছে। বাবার সময় যেমন ছিল, বরজা জানল। আগাগোড়া সব সাদা রঙের করিয়ে নিচ্ছে। কি দূর্ভ বুলে তো? আসলে নিজের বচ বাঁচাবে। কিন্তু ওকে বলে দিও, অলিমাদি, আমি সহজে বরজি না। আখো কুড়িট বছর বাঁচল।

কোথাও ছিল সঙ্গে : একা গেরে ওঠেন না, ছুটির দিন অলিমাদিমা ছেকে এনেছেন। কোথা বললে, আনন্দের এসবের ওপর কোনো টান নেই, নেপুদি, বলে নাকি হাতে গেলেই দেব হবে বেচে দেবে। গোরহানে বাস করতে পারবে না, নাকি ওর ডারি কুতের ভয়।

নেপু গছের মুখ করে বলে,

কোথা, তোমার মধ্যে বরজ হয়েছে, রোজগারপাতি কর, বাবীনভাবে থাক, আবার কিছু বদলার নেই। কিন্তু কোন্সো জাড়া হয়ে থাকে, সিঁড়ির পাশের বরজাটা খোলা হবে, ওদিক দিয়ে তামা বাওড়া-আসা করবে। সিঁড়ির তলাটা আর ছুড়ে থাকলে চলবে না।

কোথা হলে বলে, বাঁচলে, নেপুদি, আমিও কথটা কি করে ভাঙি তাই ভাবছিলাম।

নেপু জিজ্ঞেস করে, কোন্ কথটা ভাঙবে?

এই, এখান থেকে চলে যাবার কথা।

হবে কোথায় গুনি? বাবার একটা চুলো আছে তোমার?

কেন আনন্দের বদলি—

তোমার কি কোনো লক্ষ্যও নেই, কোথা? আনন্দের সঙ্গে তোমার কি?

কোথা কিছু বলে না, বুম হেসে বাস থেকে বাসনগুলি বের করতে থাকে।

অলিমাদিমা জানেন আনন্দের সঙ্গে কোয়ার কিছু নয়। কোয়ার জাব ঐ অলক চোখের সঙ্গে। যাকে দেখলেই বোঝা যায় একটা লক্ষ্যছাড়ার একশেষ। কি সব চালাক-চালাক কথা অলকের? কি রতন ঘরের ছেলে কে জানে। কোথা তো বলে বাসনের ছেলে, বনেদী ঘর, তবে অবস্থা পড়ে গেছে। কে জানে।

আনন্দের আর বড় একটা "আসে-টাসে" না। কি বরজাই বা আসবার, রোজ তো কোয়ার সঙ্গে দেখা হয়। সেখানে সেখানে একসঙ্গে চা-টা খাদ বোধ হয়। বাস্তু থেকে যে মান কিনে বাওড়ায়, এ তো অলিমাদিয়ার স্বত্বকে দেখা। আনন্দের ঠিকই বলে, একটা অতি বেশী টাইশের ছেলে। কোথা আনন্দের সঙ্গে কথা বলে না বনে হয়। রোজ আনন্দের আসে, অলিমাদিয়ার সঙ্গে কত গল্প করে যায়, কিন্তু কোথা সেখানে থাকে না। আনন্দের ওয় নাম করে না।

দুই ইটনির নিয়ে যেতেছে কোথা। বিশেষ না পড়ে। ডালা করে বনে নেই অলিমাদিয়ার, কিন্তু নেপু বাবা চৈতে থাকতে, মিস্টার সিনহাঘের আগিলের বায়ুও ঐ বরজ ইটনির-টিটনির করেছিল। তারপর সেই থেকে কি সব দোষদোষ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আসে পেছিল কয়েকজন। বলেছেনও কোথাকে। সে কারো কথা কানে তোলে না, ডাবে ওর মতো কেউ কিছু বোঝে না। অলিমাদিমা তাই নড়ে : হু! অলিমাদিমা। অলিমাদিয়ার মনে হয় কোথা আসলে অলিমাদিমাকে কোথা করে, তাই কথা কানে তোলে না। ওর বড় পরামর্শ ঐ অলকের সঙ্গে।

বলেন কথটা আনন্দের। আনন্দের বানিক চুপ করে থেকে কল, কোথা ওর স্বামীর নামে মাফলা করে বিয়েটা ভেঙে দেয় না কেন?

অলিমাদিমা আকাশ থেকে পড়েন,

কি যে বল, আনন্দের ওরহানের বৌ, তোমারও কি একটা কাওজান নেই?

আনন্দের অলিমাদিয়ার পাশে বলে পড়ে বলে,

কেন, দেবে না কেন? তুমি এখানে ওর একই আশ-স্বপ্নানের অভাব দেখি। বিয়েই পরই ওর স্বপ্নারব্ব নিয়ে গেছে চলে : সেখানে বিয়ে-বা করে স্নেহ ঘরকরা করে : তিনটে ছেলে হয়েছে, তা জানো? কোথা কেন ওকে ছেড়ে দেয় না, বল? দেখে সাহসে কুলের না বলে, পাছে কেউ কিছু বলে, সেই ওরে। নিশ্চয় ওরে।

অলিমাদিমা কাঠেহেসে বলেন,

নিশ্চয় করতে ছাড়বে না তো লোকের। তাদের দোষও কেউ বা দায় না। কারণ না থাকলে তো আর কেউ নিশ্চয় করে না।

আনন্দ বলে, করে না? কি বলে? নিশ্চয় আমার একটা কারণ থাকা চাই নাকি? আমাকে চোর বলেছিল নেপুথি, মনে নেই তোমার? জ্যাঠাইমার তামার বাস-স্থল ঘোঁর পাওয়া গাছের না, তাই আমাকে চোর বলেছিল। ঘোঁর কখনো চোরে বেরিনি, অগ্নিহাসি। জ্যাঠাইমার বাৎসরিক হজির, নেপুথি বাস্কাটা বের করে সবাইকে দেখাচ্ছিল, বলছিল খুব নাকি পর ঐ বাস্কা। আমার কিছু পর হয়নি। বিকেল থেকে বাস পাও না—

অগ্নিহাসিমার কেমন বেন অসহ্য মনে হয়। বাধা দিয়ে বলেন, আমার খুব মনে আছে, আনন্দ, বাড়ির লোকের সামনে অধন কেন্দ্রকারির কথা মনে থাকবে না? ছবি নতুন কলম এনেছিলে, বলেছিল গড়ের মাঠে কুড়িয়ে পেয়েছি। কেউ বিশ্বাস করেনি।

আনন্দ একটা ছোট ঈর্ষানিবাস কলে বলে, ছবিও না, অগ্নিহাসি, ছবি আমাকে মত এক বক্তৃতা দিয়েছিল। জু কেবা বিশ্বাস করেছিল। সকলের সামনে বলে-ছিল, ঈশ, ও নেবে বাস্কা! ওর সাহসেই কলোবে না! ওর তখন বিয়ের কথা হচ্ছিল, অগ্নিহাসিমা, তারপরই জ্যাঠাইমাই আমাকে হোস্টেলে পাঠালেন। আর এখানে থাকিনি।

ধানিক চূপ করে আনন্দ বলে, বাক সে, ওসব গুরোনা কথা আর কার কি এসে দায় বল। নিচে যেতে এলাম নেপুথির হাতে সেই বাস্কা, বাসনের সিঁচুক থেকে নাকি বেরিয়েছে।

অগ্নিহাসিমা বললেন, বাৎসরিকের দিন-ই হয়তো পুজোর বাসনের সঙ্গে ভুলে ফেলেছিল। ও বাস্কা আর খোলাই হয়নি। তোমার জ্যাঠাইমার তো আর পরের বছর ছিলেন না যে, বাৎসরিক করতেন।

আনন্দ উঠে পড়ে, একই হেসে বলে, জ্যাঠাইমাইও ঐ কথা মনে করে গেলেন, এই বা ছঃঃ। জানো, অগ্নিহাসি, নেপুথি ঘটনাটা একদম ভুল পেছে। আমাকে একুনি মধ্যপুণি হয়ে বাস্কাটা দেখান।



কেবার কিছু মনে ছিল। জ্যাঠাই তাকে বাস্কা পাওয়ার কথা বলতেই তার চোখেই আসে। আসে উঠেছিল। বাস্কা, পাওয়া গেছে? আনন্দ তাহলে সত্যি নেপুথি, নেপুথি, তখন ছবি কি-না বলেছিল।

নেপু আবার হয়ে যায়। কি বাজে বকছ, কেবা, আমি আমার কারে কি বললাম। ওটা তো বাসনের বাসের মধ্যেই ছিল।

নেপুথি সত্যি কিছু মনে নেই। অগ্নিহাসিমা কাছ কলে নিচে গিয়ে নিজের ঘরে বোরবেন। বোকাটা বের করে বোটগুলি আরেকবার গুণে দেখেন। সাত হাজার দশ টাকা। তার সঙ্গে আরো দুটি এক-টাকার নোট রাখেন, দুটো কিছু হাতে ছিল। কবে বরচ হয়ে যাবে। একবার বা বোকার ভরবেন তা মনে মনে উৎসর্গ করা হয়ে যেন, আর অল্প কেবো প্রয়োজনে তাকে প্রাণ ধরে অগ্নিহাসিমা বের করে দিতে পারবেন না।

অগ্নিহাসিমা বাড়ি কি একটা অশান্তির হাওয়া, অগ্নিহাসিমার ছোট ঘরের বন্ধ দরজা ভেদ করে, ভেতরে প্রবেশ করে, অগ্নিহাসিমাকে সান্নায়েত জাগিয়ে রাখে। বহু নিশার স্বপ্ন হুটাত মতো এসে, তবু বুকের ভেতরটা যেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈঁকে। বড় ভয় হয় যদি ঠাকুরটা সত্যি না ভরে। অন্ধকার রাত চোখের ওপর বোকার মতো ডাবি হয়ে ওঠে। কানের মধ্যে বাজনা বাজে না।

। ২ ।

আবার সকাল আসে। অগ্নিহাসিমা উঠে পড়েন, খাবার ঘরের দরজা-জানলা খুলে দেন, হিটারে চায়ের জল ঢালায়। টেবিলের ওপর চায়ের বাদন সাজান। গরলা এসে ডাক দেয়, দুধ মেনে বেন, দুগি খুলে পাউরুটি বের করেন। নেপুথি সিঁড়ির মাঝখানকার দরজার তাল খুলে খেয়। কুছর তিনটে ছুটে নেন আসে, অগ্নিহাসিমার চারপাশে নেচে-ইয়ে সারা হয়। তিনজনকে তিনটে লেডুয়া বিছুট দিতে হয়। শব্দ বিড়কি দিয়ে তাদের বেড়াতে নিয়ে যায়। বোকাই এমনি হয়, তবু সকাল থেকে এ দিনটাকে কেমন অস্বস্তিক মনে হয়।

অতঃপর হুড়ে খেঁচ করেছো, খাবার ঘরের আলো জ্বালতে হয়।

কেহা আসবে।

মাসি, বড় ভাবনাঃ অচ্চি, জানো? টাকা বড় বাতাপ ছিলিস, হাতের ঘূর নষ্ট করে দেখ, তা জানতে?

কেহা বলে,

ভাঙ যদি নিজের টাকা হত। আমার বাড়িশের তলায় সাত হাজার টাকা আছে, ভাঙতে পার? আজ সকালে অলক দিয়ে ব্যাংকে গিয়ে আসবে, তবে নিশ্চিন্তি।

পাশের চেহারা বৎস হঠাৎ কেহা বলে,

একটা নিম্ন ভক্ত, মাসি, এক পেয়ালা চা খেবে?

সংসারাত ঘুমোয়নি কেহা, চোখের কোলে কালি পড়েছে।

সাত হাজার টাকা পাওয়া এত সহজ! অলিমাসিমা বলেন,

ক'র টাকা কেহা? তোমাদের ইউনিয়নের? ব্যাংকে রাখবে না?

কেহা বলে, ব্যাংকেই তো রাখার জন্ত আনা। জাহগীর জাহগীর ছিল, অবার সরকারী সাহাবাটাও পাওয়া গেল, এখন সব এক করে তুলে রাখলেই নিশ্চিন্তি। কি যে হল কাল চারদিক দিয়ে, আর হবেই উঠল না। ঘরে আনাটা একবারে বে-আইনী।

অলিমাসিমা ব্যাংকের ব্যাপার বোঝেন না। তবু বলেন, সস্তা ঘরে আনাটা ঠিক নয়, কেহা, অতগুলো পরের টাকা। কালই তুলে দেওয়া উচিত ছিল।

কেহাকে চিন্তিত ঘনে হয়,

উচিত তো ছিলই, মাসি। কিন্তু অলক—

কেহাকে চুপ করতে দেখে, কেহার হাতে চারের পেয়ালা দিয়ে অলিমাসিমা বলেন, অলক কি?

না, কিছু না। বাক সে আজ দশটার ব্যাক তুললেই লম্বা দিয়ে আসবে, কাগজপত্র কাল সব সঠিকই করে রাখা হয়েছে। শরীরটা ভালো লাগছে না, মাসি, হাতে বোঝে হয় অসুখ এবেছিল। চা-টা খাটবে পাঁচালো, মাসি।

অলিমাসিমার ভালো লাগে না। কেহা'র কখনো অসুখ করে না, এখন আবার না কোনো ক্যান্সার বাধার। নেপু তনলেই তো বেগে বাবে, বগবে, বেতে বল, বেতে বল কোথাও হাসপাতালে-টাসপাতালে, কে জানে কি ছোঁরাতে রোগ চোকাবে শেষে। আর গায়ে বাবে চলে কেহা, বাড়ির অকল্যাণ হবে।

বাড়ি বলতেই ছোট আরেকটা বাড়ির কথা মনে

আসে, বেখানে মনের পাবিত্রা জানা। গুটির বসতে পারে। কেহাকে বলেন, আর গায়ে আশিষ হাওয়া হবে নাশি, কেহা?

কেহা বলে, ভেবেছিলাম একবার ব্যাক হয়ে, আশিষ হবে, ছুটি করিয়ে নিয়ে আসব। কিন্তু ভোরে একবার মাথা ঘুরে পড়েই সেলাম।

কশালে একটু কালসিটের দাগ। অলিমাসিমার বিরক্ত লাগে। বড় সব অবস্থার মতো কথা। বলেন,

না, কিছু গিয়ে দরকার নেই। তোমাদের ঐ অলকটির হাতে চিঠি দাও, আর ব্যাংকেও সেই দাক না। সে না সেক্রেটারি?

কেহা বলে, একটা ঘরও তো দেখে নিতে হয়।

আবার উঠে গাড়িতে বলে,

আজ বয়ঃ স্তরেই বাড়ি মাসি, কাল যাবে। শরীরটা সস্তা বড় বাতাপ করেছে।

অলিমাসিমা জিজ্ঞেস করেন, শোবে কোথায়? সাহা-দিন সিঁড়ি দিয়ে নিম্নী-যজুরতা ওঠানামা করে, আজ তো সিঁড়ির ওপানকার বেওয়ারী চাঁচা হবে শুনলাশ, ওখানে থাকা যাবে না, কেহা।

কেহা অলিমাসিমার মুখে দিকে চেয়ে থাকে। অলিমাসিমা বলেন,

কোথার দর টিক করবে ভেবেছ?

বেদি, হু'একটা মেয়েদের হোস্টেল আছে, শোজ নিয়ে দেখতে হবে।

একতলাটা গোছগাহ করে নিতে এক সস্তা লাগবে। নেপু'রা আজ মিলেস সিনহারের বাড়ি যাবে, দিন সাতের দরকারে। সকালে ঐঘরে গাড়ি এল নিয়ে বেতে। আনন্দও এসেছিল, যদি কিছু দরকার হয়। তার গাড়িতেই বন্ধমে ওরা বেতে পায়ত। কিন্তু নেপু কিছুতেই আনন্দের নতুন গাড়িতে চড়বে না। মুখের ওপর গঠাশঠি বলে দিল। আনন্দ হেসে বলল,

কেন, চড়বে না কেন? আবার কিন্তু ছোটবেলার তোমাদের বোটারে চড়বার ভাবি শব ছিল। চড়েও-ছিলাম হু'একদিন জ্যাঠামশারের সঙ্গে। কিন্তু হুপি পারলে আবার নাক ছিঁড়ে নিতে।

নেপু কোনো উত্তর না দিয়ে বিস্টার সিনহার পুরনো গাড়িমারিতে চেপে বসল।

ওরা গেলে পর, আনন্দ একবার কেহা'র কথা জিজ্ঞেস করল। জ্বরের কথা শুনে, একবার ঘড়িটা দেখল, কিছু বলল না। নেপু কেহাকে চলে যেতে বলেছে শুনে শুধু বললে,

চলি, অমিমাণি, বেশি ও-সেগা যদি আসতে পারি।
একটা ডাক্তার ডাকলে পার।

মশটার সময় অলক এসে টাকা আর চিঠি নিয়ে গেল।
অমিমাণিমা হাঁপ চেড়ে বাঁজলেন।

কিন্তু অলককে কিছুতেই ভালো লাগে না, ওকে
দেখলেই হনটা খিঁচড়ে যায়। কতই না ভালো লাগায়
লোক অমিমাণিমার জীবনে। তার ওপর আকস্মিক
আবার একে ভালো লাগে না, ওকে ভালো লাগে না।
অলকের সঙ্গে অমিমাণিমার কি?

কেনা একই খুঁতখুঁত করে, আমায়ো সঙ্গে বাওয়া উচিত
ছিল, মাদি, ওর একার ঘাড়ের দাঁড়িহটা চাপানো ঠিক
হয়নি।

মিথীয়া আসে, দিনের কাল গুরু হয়ে যায়, চারিদিকে
মিহি চুনের ভাঁড়া ওড়ে, সব কিছুই ওপর একটা নৃস
চুনের প্রলেপ পড়ে থাকে। অমিমাণিমা বারে বারে
কাড়েন।

কেনা আর গারেই তার ছড়ানো জিনিসপত্র বাসে ভালো,
বিছানাটা জড়ির রাখে। সিঁড়ির তলাটাও রং হবে,
দেয়াল টাচা হবে, গালি করে না গিলেই নয়। মশল
একবার এসে জিনিসগুলি এড়িকার গালি ঘরের একধারে
ছুঁলে দিয়ে দায়। কেনা সারাদিন চারদর জড়িয়ে, যে ঘরে
নেপূর বাবা পড়াশুনা করতেন, সেখানে কোঁচের ওপর
পড়ে থাকে। অমিমাণিমা বারে বারে সেখানে আসেন।
কেমন একটা কড়ে-ওড়া ভাব সাধা বাড়িটার। অতীতকাল
অনেকদিন এ বাড়িতে বাসা বেঁধে ছিল, সে হঠাৎ ভগ্নিতল্লা
গুটিয়ে নিয়ে বেন বিদায় নিজে।

কেনা হুটো কথা বললে ভালো লাগত। বারে বারে
কোরগোড়াঘ দিয়ে ঝাঁড়ান অমিমাণিমা। বিকলে
এক পেয়ালা চা পাইয়ে আসেন। কেনা বলে,

জানো, মাদি, এ বাড়িতে আমি কত বছর থেকেছি?
পাঁচবছর বয়সে এসেছিলাম, মা হয়ে বাবার পর। একটানা
এগারো বছর ছিলো, মাদি। বিয়ে হয়ে পাঁচবছর বয়স-
বাড়িতে থেকেছিলাম, তারপর পিসেমশাই নিজে দিয়ে
নিয়ে এসেছিলেন। আমার এখানে থেকে চারবছর কলেজে
পড়েছি; হু বছর বিদ্রোহে ট্রেনিং নিয়েছি; আবার এখানে
এসে তিনবছর চাকরি করছি। একরকম বলতে গেলে
জীবনটাই কাটানো এখানে।

দেয়ালটা নাড়িয়ে দেবে, গাপ ফিরে বলে, হু-এক
দিনের মধ্যেই চলে যাবে। আর কখনো আসবে না।

অমিমাণিমার কেন জানি শীত-শীত করে, আকাশ

বেগাজ, সারাদিন টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। এইখানে একটা
অখ্যার শেষ হয়ে যাচ্ছে। কেনা আমায় বলে,

কত লোক থেকেছে এ বাড়িতে। আশ্চর্য না মাদি,
জিনিসপত্রগুলো সব পড়ে রয়েছে, বাহুরগুলো সব চলে
গেছে। একবার বর্ষাকালে আনক আর আমি দুগ থেকে
ফিরতে ছুতো ভিজিয়েছিলাম বলে নেপুদি আমাদের
একতসার এই স্থানের ঘরে বসে করে রেখেছিল, খেতে
দেয়নি। আমায় একটা মরচে-খরা পেরেক দিয়ে দরজার
কাটাছুটি খেলেছিলাম; দেখলাম তার দাগগুলো এখনো
রয়েছে। আনককেও কেউ ভালোবাসত না। হুইও
ছিল না কম।

অমিমাণিমা হঠাৎ বলেন, কেন, সরকার নশাট তো
তোমাদের হুজরকেই ভালোবাসতেন।

কেনা খুশি হয়ে ওঠে।

ওর স্ত্রীও বাসতেন। শীতকালে আমাদের হাত-পা
কাটত বলে গুঁমোনো ঘি মাশিপ করে দিতেন। আনকর
আর আমার গা থেকে সারাদিন বোঁটকা গন্ধ বেরত।

কে কবে কোথায় কেহাকে এক কথা ভালোবাসা
দিয়েছিল, কেনা বহু করে তার হিসেব করতে বলে যায়।
অমিমাণিমার হৃকের ডেভর কেমন করতে থাকে, কি জানি
অরটর বাড়িয়ে তো; কথাগুলো বেন কেমন কেমন।
বলে থাকতে পারেন না বেশীকম, ওদিকে একটা বাহুর
নেই, বাড়িমহ মিথীয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি বেহাল হুহ,
সাহস করে একটা বিক্রিওগালা ডেকে, পাবার ঘরের
তক্তাপোশের ওপর থেকে গুরোনো গালি নিশি, বোতল, টিন
গালি গালি বেতে ফেলেন। তক্তাপোশ সরিয়ে, তলা কাঁট
দেওয়ান; বায়কোশ, হুসো তলা থেকে টেনে বের করে
ওপরে রাখান। কোথাও ময়লা রেখে যাবেন না
অমিমাণিমা।

অবধা খাটতে থাকেন অমিমাণিমা। আঠাগো বছর
ঘরে এখানে একাকার হিসেব দিয়েছে কেনা; অমিমাণিমা
থেকেছেন একটানা বোরোশি বছর। ভালোবাসার হিসেব
কবেছে দেখা; কি হবে ভালোবাসা নিয়ে? বাহুরকে
ভালোবাসা মানেই হুগ পাবার স্বপ্নমা কথা।
অমিমাণিমাকে হুগ দিতে পারে এমন কেউ নেই
হুনিয়াতে।

সন্ধ্যাবেলা শূন্য বাহার ঘরে অমিমাণিমা একা কাঁদেন
ঠাঁকে হুগ দেবার লোক নেই বলে। বহুমানের বাড়ি তো
তু নিরবজির হুগ দেবে, তবে হুগ দেবে কে?
অমিমাণিমার চোখদিয়ে অবিরল জল পড়তে থাকে।

একটা শব্দ বেন কানে আসে, চোখ দুহে অগ্নিমানসিমা কান পেতে থাকেন। কার গানের শব্দ না? অগ্নিমানসিমার সর্বাঙ্গে কাঁটা ধের। সোতলার দরজা-জানলা নিজে কাঁড়িয়ে থেকে বন্ধ করিয়েছেন। নিচের তলায়ও এদিকের দর বন্ধ, শুণু সাহনের দরজা এখনো খোলা। পিছন লাগে অগ্নিমানসিমার সারা গায়ে, কানে বেন হাজার হাজার পারের শব্দ আসে বছরের পর বছর ধরে।

দুখ টিপটিপ করে। ভাবেন গয়লাকে একবার ডাকি। নিঃশব্দ নেপুণ্ড বাবার পড়বার ঘরের দিকে এগিয়ে যান।

কেয়া!

আনন্ড ডাকে, কেয়া!

পাখর হয়ে যান অগ্নিমানসিমা। এমন করে আনন্ড কেহবে ডাকতে পারে? এখন করে কেউ কাকেও ডাকতে পারে অগ্নিমানসিমা জানতেন না।

পরের আলো খোলা জানলা দিয়ে এসে কেয়ার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। কেয়া উঠে বসে, বিস্ময়িত নগেন অণু স্তবে থাকে, কেয়ার কাশো চুল অণু কোড়ো বাতাসে উড়তে থাকে, কেয়ার মুখে কথা সরে না।

কথা? ভালোবাসার আবার কথা কি? বন্ধ থেকে বন্ধে ভালোবাসা নীরবে কথা কর। কেয়ারকে উঠে আসতে কেবলেন না অগ্নিমানসিমা, আনন্ডকে কাছে বেতেও কেবলেন না। কেবলেন অণু দুজনায় গাড় আলিঙ্গনে আনন্ড। এরই ক্ষর বুকি সমস্ত বর্ষার সছ্যটি অশেষ করে ছিল; এইবার আকাশের দুখ চিরে জলের ধারা নামল।

নিঃশব্দে অগ্নিমানসিমা ঘরে ফিরে এলেন। বহুক্ষণ খোলা জানলা দিয়ে নারকোল গাছের গুঁড়ি বেয়ে জলের ধারা নামা দেখলেন। নিজের কালি ঘরখানিতে গিয়ে আন্ধ আর দরজায় দিল ছিলেন না। দরজা খোলা রইল।

তাকের ওপর থেকে কোঁটো নামিয়ে পোলাশি পেশমী মোজাটি বের করলেন। শীতল, কোমল; ভালোবাসার হাতো আঁকড়ে ধরে না, কেবল থলে খসে যায়। নোটগুলি আরেকবার গুণে রাখলেন। দাত হাজার বারো টাকা।

আন্ধ শিশি, পোতল, বাস্ক বেচে কুড়ি টাকা পাওয়া গেছে। সংসার-খরচের টাকার সঙ্গে বেছে বেছে ছিলেন অগ্নিমানসিমা। নেপুণ্ড এসে গিয়ে দেবেন। কোবার কি বাকি রয়ে গেল ভাবতে বসেন। নেপুণ্ডের কাছে কথাটা এখনো কিছুতেই পাড়া যায়নি। কাল রাতে বাবার দরব একটু চেষ্টা করেছিলেন। একতলায় থাক, আরো দু-একটা পোক থাকলে ভালো, ওদিকে চাকরদের একটা ঘরও পাওয়া

গেল। কোটের বেঘারা এখানেই থাকুক না, সব সময় হাতের কাছে থাকবে, নিজের ঘরে রাখাযাড়া করে থাকে। জামাই খুঁশি হল, নেপুণ্ড আগতির কোনো কারণে বেবেনি।

তার বেশী আর বলা হল না। বললেই তো নেপুণ্ড রাগমাগ করবে, আগেকার দিনের কথা বলবে। নেপুণ্ড দুখে আগেকার দিনের কথা শুনেতো ভালো লাগে না অগ্নিমানসিমার। আগেকার দিনের সঙ্গে আর কি সম্বন্ধ? দুদিন বাহাই হাজারি কেটে ছেলে পড়বেন অগ্নিমানসিমা। আর এ বাড়িতে আসা হবে না।

আর কখনো যে এ বাড়িতে আসা হবে না, এ কথা অগ্নিমানসিমা নিশ্চিত জানেন। জানলার নিচের তক্তাটার ওপর ব্যাঙের ছাড়ার রূপের মেলা আর বেধা হবে না। কেউ হয়তো কোনদিন টান খেয়ে শ্যাওলা-ঢাকা তক্তাটাকে ধোবে কেলে। অগ্নিমানসিমাও বেথতেও হবে না, দুঃখ পেতেও হবে না। বেয়ামিশ বছর ধরে দুঃখ পাবার পথগুলি সব বন্ধ করে কেলেছেন অগ্নিমানসিমা। বর্ধমানে গিয়ে শেষ বয়সটা দিবসস্থির হয়ে কাটাবেন। কারো কিছু বলবার থাকবে না। টাকাগুলো সব কেড়েফুড়ে শেষ করে বেবেন; আর টাকা গুণবেন না। নতুন সব বন্ধু করবেন; বটকলের অভাবও টের পাবেন না। এতানকার কোনো কিছু আর ঠাই পাবে না অগ্নিমানসিমার জীবনে। আর এ বাড়িতে আসবেন না অগ্নিমানসিমা।

বর্ধমানে নতুন করে সকাল হবে।

আর কেয়া? আনন্ড আর কেয়া?

নেপুণ্ড বেগে অন্ধ হবে। কিন্তু জামাই হয়তো খুঁশি হবে। অগ্নিমানসিমা সেলে শেখটা জামাইয়ের কোনোরকম অগ্রবিশে হবে না তো? বেঘারাটাকে একটু বলে দিতে হবে।

আর আসবেন না অগ্নিমানসিমা এ বাড়িতে, বেগানে বেয়ামিশ বছর বাস করে, অগ্নিমানসিমা কারো হাতে দুঃখ পাবার কথা হারিয়েছেন।

তবে আনন্ড আর কেয়া মুখে বাই বন্ধুক, ওয়া আসবে। প্রথমটা আসবে না হয়তো, কিন্তু পরে নিশ্চয়ই আসবে। বেশীক্ষণ বসবে না হয়তো, কিন্তু মাঝে মাঝে এসে জামাইকে ওয়া দেখে যাবে নিশ্চয়ই। দুঃখ পাবার আশ্চর্য কথ্যতা যে ওদের। এখনো হয়তো পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরে, কেঁবে ভাসিয়ে দিচ্ছে। সারা জীবন হয়তো দুজন দুজনকে ভালোবাসবে আর কাঁদাবে। কে জানে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস কেলে ভাবেন অগ্নিমানসিমা,

উঃ, ভারি বেঁচে গেছি। বর্ধমানের একবার গিয়ে বলতে পারলেই হল। বিভ্রাম সেলেট এই হাতে পায়ে বিল-খর্য দেবে যাবে। কি একটা বাণিশ করে বেশ বটফল : লর্ডেনের ওপর তেলের বাটি বসিয়ে গরম করে, হাতে পায়ে ঘষে বেশ বটফল। ভারি আশ্রম হয়।

বটফলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলও, ওর কাছের পটী থাকবেন না শেষ পর্যন্ত। অলিমাসিমা বটফলকেই এ বাড়ি লিখে দিয়ে থাকেন। অবস্থি এখনি কিছু ঘরছেনও না অলিমাসিমা, দিদি। সাত্যন্তর বছর বেঁচে ছিলেন। আর তাই যদি কেউ বলে, ঘরতে ভর নেই অলিমাসিমার। বাচতেই যে ভর পেণ না, তার আবার ঘরার ভর! অলিমাসিমার হাসি পাঃ। এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন অলিমাসিমা। এ বাড়িটা যেন ভূনিয়া আর সব বাড়ি থেকে আলাদা। যেই বেনুয় না বাবা চোখ বুঁজল, অমনি তারা এ বাড়ি থেকে একেবারে ঘুরে মুছে গেল। ভূনিদের লজ বেনুয়া অস্ত আরগার গেছে, অমনি যেন বাড়িটা ওর গা থেকে তাদের বেঁচে থাকার চিত্তগুলো কেড়ে কলে দিয়েছে। তারা কিরে না আলা পর্যন্ত এ-বাড়ির কোথাও তাদের বুঁকে পাওয়া যাবে না।

অলিমাসিমাও চলে গেলে তাঁর বেরাল্লিশ বছরের এ বাড়িতে বাস করা অমনি করে মুছে যাবে। মাঝে মাঝে মনে হত এতদিন থেকে থেকে বৃষ্টি এখানকার দরজা-জানলায় একটা হয়ে গেছেন। সে কথা ভুল। দরজা-জানলা খুলে নিয়ে সেলে কাকা রেখে যাবে; অলিমাসিমা বেরাল্লিশ বছর এ বাড়ির ওপরে ওপরে এমনি আসগোছে বাস করেছেন, বাড়ির গারে কোথাও একটুখানি আঁচড় কাটতে পারেননি।

বাঁইরে সুখ সুখ করে বৃষ্টি পড়ে, তার মধ্যে মনে হয় কে যেন বিড়কি দরজার ওপরও করে কীল যাবে। চমকে ওঠেন অলিমাসিমা, আজ সন্ধ্যাবেলাটার কোথাও একটুখানি নন্দ হলোই মিউরে ওঠেন অলিমাসিমা। কুঁহরগুলো ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

১০১

পূর্বনো ছাড়াটা বুঁকে নিয়ে, বিড়কি দোরটা খুলতে হয়। ভাঙা আকাশ মাঝার করে অলক দাঁড়িয়ে। বিজ্ঞ এমন একটা বিভ্রান্ত বিজ্ঞ বর্ধাহত অলক, যে হঠাৎ বেতলে তেনা যাবে না। জামা-কাপড় ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে; চুল বেয়ে, মূখ বেয়ে অলের জোত বইছে, এমন একটা জলে খোঁচা মর্মান্তিক নৈরাত্তের প্রতিবৃষ্টি অলিমাসিমা জন্মে দেখেননি।

কি যেন বলতে চেষ্টা করে অলক, কথাতলি বৃষ্টির ঝাপটার সঙ্গে উড়ে যায়, অলিমাসিমার কান পবন পৌঁছয় না। তাকে কর্কশভাবে ভেতরে আসতে বলে, বিড়কি দোর বন্ধ করেন। শাবার গরের বাঁইরে উঠোনের ধারে একটুখানি ছাচ কেওরা, তার নিচে অলক দাঁড়িয়ে থাকে। বিড়কির পাঁচিলের ওপর দিয়ে পথের আলো তার সাদা মুখের ওপর পড়ে।

বলে, কেয়া?

কথা বলতে ট্রেট কাপে, হাত কাপে। খোলা দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে জল আসে, অলিমাসিমা অলককে তেঁলে ঘরে ঢুকিয়ে, দরজা বন্ধ করে যেন।

বাঁইরে ঝড়বৃষ্টির মাঝামাঝি চলে, অলক বলে, কেহাকে বসুন টাকাগতো সব গেছে।

সে কি কথা! টাকাগতো সব গেছে আবার কি? টাকা গেলে কেয়া করবে কি?

কঠিন যাবে অলিমাসিমা বলেন, সে বাড়ি নেই, আদ্যবে বল। সেল কি করে?



অলকের ভাঙা ভাঙা কথা জোড়া দিবে নিতে হয়।
যাকে দোড়া না দিয়ে, কি একটা ভুলেরী কাজে কোন বন্ধুর
কাছে যেতে হয় নাকি, একটা চ'বের দোকানে অনেকক্ষণ
অপেক্ষা করতে হয়—

অনিমাদিমা! ডাবলেশহীন মুখে অলকের দিকে চেয়ে
থাকেন। হাতের পাতা হুটী উঠে কি একটা হতাপার
ইঙ্গিত করে অলক বলে,

বিবাস করুন কেন করে গেল জানি না। বধন
খেয়াল হল, বা'গহু নেই। কেয়াকে জানাতে হবে।

অনিমাদিমার গলাটা চাপা খনখনে শোনায।

কেহ? কি করবে? তার সাত হাজার টাকা আছে?
পুনিশে ববর দিয়েছে?

কাউকে ববর দেবনি অলক। জানাকানি হলে দুজনাব
চাকরি বাবে। আর শুধু চাকরি নয়, পুনিশের হাখামা
লাগবে।

অনিমাদিমা! ধৈর্য হারান, কি রকম আবেলপুত্র ছেলে
তুমি। পত্নীক এব'র হাতে হাতবকড়া। ঠিক হবে। কিন্তু
কেহ?

অলক কবিত্ত হাতে মুখ ঢাকে। তাকে অবিবাস করার
কথা অনিমাদিমার একবারও মনে হয় না। বাবা থেকে
পা পবন্ত তাকে চেয়ে দেখেন অনিমাদিমা, কি একটা অদ্ভুত
বাতাসে তার দমক শরীর কাপছে।

বাড়ের কাছেই ফুলগুলি ছোট করে কাটা। হাতের কবির
হাড় দেখা যায়, কি রকম অসহায় একটা ভাব মনে হয়।

রাগ ধরে অনিমাদিমার। অলকের ছুতো ভগা অল,
যর ভিকে বাচ্ছে, কাপড়-চোপড় থেকে নদী বইছে। হগের
কাছে একটা শিগা ধুধুক করছে।

কক'প কর্তে বলেন,

ছুতো খোল। এসো আমার সঙ্গে। নিজের ঘরে
নিরে বান বাউগুলো ছোঁড়াটাঁকে। আলনা থেকে নিজের
তুকনো বান সেন। কাশী-সিঙের চাদরখানি সেন।
নিজের গানছাখানি সেন।

কটিন গলার বললেন, কাপড় ছাড়। ফুল-ইল মোছ।
একই উত্তরোত্তর মতো হুণ্ড।

এ ঘরে এসে চায়ের জল ঢাপান। উঠুক একই বিটানে।

অলক এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায়। চেয়ার বেধিয়ে

বলেন, বোসো।

তারপর একই চুপ করে থাকেন; অলক আর সইতে

না পেরে, ভরকটে বলে,

বসুন কি বদলবে।

অনিমাদিমা হঠাৎ বলেন,

গেটিন ব'ব'বানে গিয়ে কেয়ার সপে জায়গা দেখে

এসেছিলে?

অলক মাথা নাড়ে। ভরকম কোনো জায়গা হুঁকে
পাখনি ওয়া। ঠিকানা মিলিয়ে নক্সা মিলিয়ে ভালো করে
দেখেছিল।

অলকার হয়ে গেছিল তখন, ভালো করে দেখল কি
করে?

না, অলকারে বাধনি তো, মিনের বেলাতেই বেশে
এসেছিল।

বাজটাই হুঁকে গেলে না? নাম বখশেছে হুঁকো,
কাউকে মিজেলও করলে না? গুণ তুলে অলক বলে,

বাজার নাম বখশারনি, মাদিমা। কিন্তু জমি তো
দেখলাম না।

অনিমাদিমার মুখের স্পন্দন কবে আসে। বিরক্ত
হয়ে বলেন,

কি, চুপ করলে কেন? জমি নেই তো, কি আছে
সেখানে?

একটা বোটরগাড়ির কারখানা আছে।

অনিমাদিমা কড়কটে বলেন,
পেছনে একটা সোতলা সাবা বাড়িও নেই বলতে চাও?

অলক অস্ত্র দিকে চোব কিরিয়ে বলে,
আছে, মাদিমা। সেখানে কারখানার মালিক থাকেন।

অনিমাদিমার বাবা গরম হয়ে ওঠে। এ তো বোকাই
উচিত ছিল, দালা যে সহজে শুকনি ছেড়ে দেবে না, এ তো
জানা কথা। বলেন,

একটা হিহসাগর আয়ের গাছ দেখলে?

না মাদিমা, কোনো আমগাছ নেই ওখানে। কোনো
গাছ-ই নেই।

ছোট একটা নিবাস বেলে অনিমাদিমা বলেন, তোমরা
তুল জায়গা দেখে এসেছ, অলক, ঠিক করে চিনতে

পারোনি। কারখানার মালিকের নাম কি?

অলক বলে, নিতুজ মাইতি। সব খোঁজ নিয়ে এসে-
ছিলাম, মাদিমা।

অনুট হয়ে অনিমাদিমা বলেন, তবে কেহা যে বগলে
সমর পাওনি, সেহী হয়ে গেছিল। কেন বাজে বকছ,

অলক, ভালো করে দেখনি মোটেই। মালিকের নাম
হারাদন মুখোপাধ্যায়, মোটাগোটা কর্পা দেখতে। তুল

বাড়ি দেখে এসেছ, অলক। বাড়িটা ঐ হারাদনের, কিন্তু
জমিটা অস্ত্র লোকের। ওতে একটা হিহসাগর আয়ের

গাছ আছে।

আনুস কর্তে অলক বলে,

না না, মাদিমা, কেহা আপনাকে ইচ্ছে করে বলেনি,
তুল কথা কি অতই সহজ? ও যে আমার চেনা পথ, চেনা

বাড়ি। ও বাড়িতে আমি জমিহিলাম, মাদিমা, হারাদন
হুঁকো আমারই বাবার নাম। হুঁড়ি বছর হল তিনি বাবা

গেছেন। মা বাড়ি বেচে দিয়ে আশাশের মাছুর করেছেন।
আমি জানি না ও-বাড়ি?

মাথার সব রক্ত জুগুপিও নায়ে। জুগুপিওও তাঁটা
পড়ে। কর্কশ কর্তে বলেন, ক' ভাই তোমরা?

আমি ছাড়া কেউ নেই, মাদিমা। আমার বড় ভাই
পাঁচষড় বরষে মারা যায়, আমি তাকে চোখেও দেখিনি।
তু' মা আর আমি।

আমগাছ ছিল না কখনো ওখানে?

অলক তবুও বলে, আমগাছ নেই, মাদিমা, কিন্তু ঐ
বাড়িই ঠিক। আমগাছ বাবাই হতো কেটে কেলেছিলেন,
কাগখানাকে ডাড়া দেবার সময়। পরে ওয়াই সবটা কিনে
নিল।

কি মনে হওয়াতে অলক আমার বলে, কার বললেন
সেহনের কমিটা? তাকে জিজ্ঞাস করবেন তো মলিল-
পত্র আছে কিনা।

অলিমাদিমা চুপ করে থাকেন।

মলিলপত্র? মিসিমা বলে গেছেন; আবার মলিল-
পত্র কি? ঠাঁড়িয়ে মাগমোক করিয়ে, মনসা পুতে
দিয়েছিলেন, ঠাঁহুদমশাই নজা একে দিয়েছিলেন, আবার
মলিলপত্র কিনের?

দীর্ঘে দীর্ঘে অলিমাদিমার শিরার মধ্যে রক্ত চলাচল
বাস্তবিক হয়ে আসে। অলক। বাবার ছোট ছেলে অলক।
তু'র ক'ছটা। বেন মার মতন। মার দুখটা ভালো করে
অবিস্তি মনে পড়ে না। ছেলবেলায় মাথায় ঘাড়ের চুল
ঐ রকম খোঁচা-খোঁচা হয়ে থাকতো, দাদার ঘাড়টা ঐ রকম
সক-ছিল, দাদা তখন ভালো ছিল, ইচ্ছল থেকে বাড়ি এসেই
ডাকত,—অলকানন্দ। পকেটে পেশারিফি লজ্জকুখ আনত,
তাতে ইংরেজিতে কি সব লেখা থাকত। অলক।

অলক উঠে ঠাঁড়ায়। অলিমাদিমা বলেন, জল ফুটে গেছে,
অলক, বোসো। বৃষ্টি পড়ছে এখনো। অলক বলে, কিন্তু—

অলিমাদিমা চা ঢেলে দেন। তুলি থেকে জিনের মধ্যে
হাশা চুটো নিষিকি বের করে দেন।

কেবা কখন কিয়বে, মাদিমা? কি বে হবে ভেবে
পাইনে।

কেয়াকে তুলি কি ডালোবান? বিয়ে করতে চাও?

অন্যোক উদ্ভিত হয়, কেয়াকে বিয়ে? কি বে বলেন,
মাদিমা, কেয়ান তো কবে দিয়ে হয়ে গেছে। খুব ভালো
বেয়ে কেয়া। কিন্তু কি হবে এবার কে জানে। হুশনারই
চাকরি যাবে।

অলিমাদিমা উঠে ঠাঁড়ান। উনি বে মাথায় এতটা লম্বা,
অলক অতো লম্বা করেনি। কেমন বেন বেঁটে মনে হত।

ঠাঁড়াও, অলক।

পাশের ঘরে অলিমাদিমা, কোঁটো মাথিয়ে, মোজা
বের করেন। গিট খুলে বাবোটি টাকা বের করে কোঁটোর
বেধে, মোজার মুখে গিট বেঁধে, এ ঘরে এসে অলকের হাতে
দেন। এর মধ্যে শাত হাজার টাকা আছে, বুকে সরে
নিয়ে বাণ্ড, এল মুহুর্তের ক্ষত কাছ ছাড়া করবে না, শাল
সকালে জমা দিয়ে দেবে, অলক, এর বেন অস্ত্রা না হব।

অলকের চোখের পাতা কাশে, ট্রাট কাশে, হাত
কাশে, নিতে পারে না। জোর করে হাতের মধ্যে
মোজাটাকে গুঁজে দেন, অলিমাদিমা। ততক্ষণে বৃষ্টি ঘরে
এসেছে, দরজা খুলে তাকে একরকম ঠেলে বের করে দেন।
কর্কশ কর্তে বলেন, বাণ্ড, চলে বাণ্ড, আর এসো না
এ বাড়িতে। আনক কেয়াকে দিয়ে করবে। তুলি বাণ্ড।

কিছু পোকে না বেন অলক, বিড়কি খুলে ছুটে চলে যায়।
বাতাসে বিড়কি ধরজা হুলতে থাকে। অলিমাদিমার হাত-
হুখানি বাধা করে। অলককে একবার বুকে জড়িয়ে ধরবার
ক্ষত অলিমাদিমার হুই হাত টনটন করে। অলকের
গালের মাঝে লম্বা একটা টোল পড়ে, সেইখানে চুষে। খেতে
ইচ্ছে করে অলিমাদিমার। বুকের ভেতরটা তোলপাড়
করে অলিমাদিমার। অস্বাভাবিক ঝোরে বিড়কি ধরজা
বহু করে অলিমাদিমা ঘরে এসে পলেন।

মাথা ঝিমঝিম করে, কানের মাঝে বাজনা বাজে, কান
কালাপালা হয়ে যায়, ঘরঘর শ্রব চড়িয়ে পড়ে, ছাদের
কোনায় কোনোর দাক্তা ঝেয়ে অলিমাদিমার কানে
দিয়ে দিয়ে আসে।

বৃষ্টি থেবে গেছে, বাড়ির ছাদের কোনা থেকে,
নারকোল গাছের পাতা থেকে, ইপটাশ জল পড়ে। নানা
দিয়ে কমকল করে জল ছোটো, শিরশির সরসর করে
নারকোল গাছের পাতা নড়ে। বেঘ দরে বায়, চাঁদ
বেগিরে পড়ে, উঠোনের কোনায় কোনায় জমানে জলের
গুণর চিকচিক করে। ছোটো ঘরের মোসা জানলা দিয়ে
চাঁদের আলো ঘরে আসে। ব্যাঙের ছাত্তারা হুলতে
থাকে, কেমন একটা ডিঙ্কে ডিঙ্কে শোনা গছে ঘর
ভরে বায়।

হাত-পা-গুলোকে হাতা মনে হয়, আর বিল ধরবে না
মনে হয়।

অলিমাদিমা হুট পেরেছেন।

আবহমান

শীতকালীন কবিতা



বা গিয়ে ওই উঠানে তোরা গীড়া,
লাউমাচাটার পাশে ।
ছোট একটা ফুল ফুলছে, ফুল ফুলছে, ফুল,
সন্ধ্যার বাতাসে ।

কে এইখানে এসেছিল অনেক বছর আগে,
কে এইখানে ঘর বেঁধেছে নিবিড় অহরাসে ।
কে এইখানে হারিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে,
এই মাসিক এই হাওরকে আবার ভালবাসে ।
ফুরষ না তার কিছুই ফুরষ না,
নটেগাছটা বুড়িয়ে ওঠে, কিন্তু ফুরষ না ।

বা গিয়ে ওই উঠানে তোরা গীড়া,
লাউমাচাটার পাশে ।
ছোট একটা ফুল ফুলছে, ফুল ফুলছে, ফুল,
সন্ধ্যার বাতাসে ।

ফুরষ না তার হাওয়া এবং ফুরষ না তার আশা,
ফুরষ না সেই একধরটার দুঃখ শিখাশা ।
সারাটা দিন মাগুন যনে বাসের গন্ধ মাখে,
সারাটা রাত তারায় তারায় গল্প এঁকে রাখে ।
ফুরষ না তার কিছুই ফুরষ না,
নটেগাছটা বুড়িয়ে ওঠে, কিন্তু ফুরষ না ।

বা গিয়ে ওই উঠানে তোরা গীড়া,
লাউমাচাটার পাশে ।
ছোট একটা ফুল ফুলছে, ফুল ফুলছে, ফুল,
সন্ধ্যার বাতাসে ।

নেভে না তার বসনা বে, দুঃখ হয় না বাসী,
হারায় না তার মাগান থেকে সুন্দরুলের হাসি ।
তেমন করেই সর্গ ওঠে, তেমন করেই ছাখা
নামলে আবার ছুটে আসে শাখা নদীর হাওয়া ।
ফুরষ না তার কিছুই ফুরষ না,
নটেগাছটা বুড়িয়ে ওঠে, কিন্তু ফুরষ না ।

বা গিয়ে ওই উঠানে তোরা গীড়া,
লাউমাচাটার পাশে ।
এখনো সেই ফুল ফুলছে, ফুল ফুলছে, ফুল,
সন্ধ্যার বাতাসে ।

‘স্বপ্নে থাকতে ভূতে কিলোব’

শ্রীমন্ত গোলামী



হুগে থাকতে ভূতে কিলোব—এই প্রবাদ-
বাণীটির উৎপত্তি-ইতিহাস আমি জানি না,
কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করি যে, এটি কোনো বিজ্ঞ
লোকের কথা, নইলে আর এটি প্রবাদ-বাক্যে
পরিণত হবে কেন ?

হুগে থাকতে অথবা হারা বিপদ ভেঁকে আনে,
তাদের প্রতি বিদ্রূপ-বর্ণনাই এ প্রবাদ-বাণীটির
উদ্দেশ্য, যদিও বিদ্রূপ কতখানি সার্থক আমার
কাছে তা স্পষ্ট নয়।

ভূত কি সত্যিই মানুষকে হুগে থাকতে দেয় না ? কোনো
মানুষ হুগে আছে এটা কি ভূতের শব্দে অসম্ভব ? তাই কি
সে হুগে লোককে কিলোতে থাকে ? তাই কি সে তাকে
হুগের গতি থেকে বার করে হুগের সীমানার এনে ছেড়ে
দেয় ? অথবা এ কথাটির মানে কি এই যে, হুগে থাকতে ভাল
লাগছিল না বলেই হুগকে ভেঁকে আনা হল ?

অথবা এ ভূত সত্য ভূত নয়, মানসিক ভূত ? অর্থাৎ
মানসিক হুগের মধ্যে মানসিক ভূতকে আবার ক’রে ভেঁকে আনা ?

কিন্তু এ সব দুই প্রশ্ন আলোচনার আগে ভূত সম্পর্কে
কয়েকটি নীতিগত প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া বাঞ্ছনীয়। নীতিগত
প্রশ্ন বরাহি এমন যে, ভূত আদৌ কাউকে কিলোব কি না
(অকারণ অথবা আত্মরক্ষার্থ) —এটি খোলাখুলি ভাবে
আলোচনা হওয়াই ভাল। যার বাগতে হবে ভূতদের সমাজ
নিষ্ঠা ছোট নয়, এক গজ করে লক্ষ বছর ধরে ভূত
এ পৃথিবীপৃষ্ঠে (উল্লেখ্য নশ মাইল সীমা পর্যন্ত) তাদের কী-ব-
বাজা চালিয়ে আসছে। (স্ট্রাটোফিয়ারে ভূত আছে কিনা
তার প্রশ্নও পাওয়া যায়নি।) আরও বড় কথা হচ্ছে
ভূতের দৃষ্টি নেই। কোনো ভূতকে কেউ গাছের ডালে গলায়
ধড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখেনি, কোনো ভূতের মৃতদেহ কেউ
কোথায়ও পড়ে থাকতে দেখেনি। একবার কোনো রকমে
ভূত হতে পারলে নিশ্চিত। অন্তঃকরণের অনসংখ্য। যেমন
ক্রটিভিস বুদ্ধি পান্ধে, তেমনই ওদের মধ্যে বজাবতই সমাজ-
চেতনাও বুদ্ধি পান্ধে। বজাবতই, কারণ সব সমাজেরই
বিবর্তন আছে। এমন অবস্থায় ভালভাবে না ঘোনে
কৃতমাত্রকেই হিংস বা হিংস্রত বলা সম্ভবত ঠিক নয়।

মানুষের হুগ দেখলেই যে-ভূতের টকা হয়,
কেউ হুগে আছে দেখলে যে-ভূত কিল মারতে
আসে, সে-ভূত ভূত-সমাজে আদৌ আছে কিনা
সেই বিষয়েই আমার সন্দেহ আছে।

পৃথিবীর সব দেশেই ভূত সম্পর্কে অনেক গল্প
প্রচলিত আছে, এবং এ সব গল্প থেকে সে সব
দেশের ভূতদের চরিত্র বিষয়ে মোটামুটি একটা
ধারণা হয়। দেখা যায় সভ্যদেশ মাজেই বহু

সঙ্কল্প ভূত আছে এবং তারা মানুষকে হুগে থাকতে দেখলে
কিল মারতে আসে না।

হামলেট নাটকের ভূত হামলেটকে বা অন্য কাউকে
কিল মারেনি, কারণ সে ছিল হামলেটের পিতৃভূত, এবং
কোনো পিতৃভূতই পুত্রের পিঠে কখনো কিল মারে না।
এই নাটকে হামলেটের পিতার ভূতই বহু নিষেধ
লোকের হাতে মার খেয়ে অদৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল।—যাশাস্তি
ঘটেছিল এই : হোরশিয়োর বহু অসুযোগেও যখন রাতভূত
কোনো কথা না বলে চলে যেতে চাইল, তখন হোরশিয়ো
মারসেলাসকে বলল, শুকে ধামাও। মারসেলাস বলল, শুকে
(তা হলে) মণ্ডাখাত করি ? হোরশিয়ো বলল, কর, যদি
না গাড়ায়।

Mar. Shall I strike it with my partisan ?

Hor. Do, if it will not stand.

Ber. 'Tis here !

Hor. 'Tis here ! [Exit Ghost]

Mar. 'Tis gone !

ভূত চলে যাওয়ার পর মারসেলাস দুঃশ ক’রে এমন কথাও
বলেছিল যে—“এমন অভিজ্ঞাত ভূতের উপর হিংস আক্রমণ
চালিয়ে আমরা তার প্রতি বড়ই অগ্রাহ্য করেছি।”

এইজাতীয় সব ঘটনা থেকে প্রমাণ হয়, ভূত ও হিংস
এ দুটি কথা সমার্থক নয়। মানুষের হাতে যে ভূত মার খেয়ে
পালাতে পারে সে-ভূত কতখানি নিরীহ ভেবে দেখা উচিত
অনেক ভূতের মধ্যে আবার বাঙ্গালীজনহৃদয় ছাঃলান্দি
আছে। জৈলোক্যনাথ ঘূঃগাপাণ্যায়ের লুঃ গয়ে দেখা যা
এক ভূত বধের কাগজের সম্পাদক হতে পারবে এই লোঃ

নিজের প্লেথ থেকে তেল নিষ্কাশিত হতে দিয়েছিল। এ রকম যেকোনো দূত কখনো হিংস্র হতে পারে ?

দূত সম্বন্ধে আরো একটি হুইটম্যানের প্রবাব প্রচলিত আছে। প্রবাসটি এই—

“ট্রিক হুইট বেলো কুন্তে মারে তেলো

বলা কতই মানো খেলা।”

বলা নামক কোনো কুন্তে ছিল মারে, যদি এর এই অর্থ হয়, তা হলেও এ কথা সত্যি। নয়, কেননা যদি খঁরে ট্রিক হুইটবেলা কোনো কুন্তে অস্বাভাবিক কাউকে তিল চোড়েনি। আর এর অর্থ যদি এই হয় যে, বলা নামক কোনো ব্যক্তি এ কাজ করে, তবে তো সব জন্মের মতো পরিষ্কার। বলা যে সেক্ষেত্রে কোনো কুন্তে নয়, বলা বাহালা। কিন্তু এ সব প্রসঙ্গত।

আমল প্রঃ—‘হুথ থাকতে কুন্তে কিসোথ’ প্রবাসটির প্রসঙ্গ অর্থ কি ? এর মূল অর্থই কোনো সত্তা আছে, যদিও তাতে কুন্তের চরিত্রে কোনো কলহ স্পর্শ করে না। আমাদের বিশ্বাস হুথ থাকতে কুন্তে কিসোথ এই কারণে যে নাতথ নিজেই নিজের অন্তঃস্থ শিষ্টটি কুন্তের সামনে পোত দিয়ে বলে, “ভাই, এখানে বিলোতে থাক।” এ সোত কুন্তের পক্ষ স্বেচ্ছায় করা কর্তন, কেননা কুন্তেরা দীনতাবাধ বা inferiority complex-এ ভুগছে। ভয়ের সামনে শিষ্ট পোত দিয়ে সোত বেথোত থাকলে তাই ওরা তা সামলাতে পারে না। পক্ষে টাকা প’ড়ে থাকতে দেখলে যেমন যে-সোকটি চোর নয় সেও সাময়িক ভাবে চোর হয়, এও প্রায় তেমনি।

শিষ্ট পোত যে কোনো হুথবারীকে কিসের অস্ত্র অস্ত্রোপ জ্ঞানালে কেউ কি আত্মসংবরণ করতে পারে ? হাছার হলেও কুন্তে তো এককালে মাহুথ ছিল। কুন্তে এই কারণেই হুথি মাহুথের শিষ্টে কিল মারে। হুথি মাহুথ নিজেই এটা চায়। হুথ থাকতে কুন্তের কিল খেতে সে চায়।

কিন্তু কেন চায় ? কারণ এইটে তার স্বভাব। এ না হ’লে সে পাগল হয়ে যেত। কিন্তু হুথ থাকতে মাহুথ কুন্তের কিল খেতে কেন ভালবাসে—এই প্রশ্নের উত্তর পেলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

মাহুথ বহন ‘হুথ চাই’ প্রার্থনা করে তখন অবজ্ঞাই তার চেহারা কেনন, সে কোন্ আশার থাকে, তাকে খেতে হ’লে মনের দিক দিয়ে কোনো একান্তি ঘরকার কিনা, এ সব বিষয় সে জেবে মেখে না। বহন “আলো চাই” প্রার্থনা করে, তখনও সে আলোর স্বপ্ন না মনে প্রার্থনা করে।

এক হুথ বহন পায়, আলো বহন পায়, তখন তার আলস ভগ্নতা কি বুঝতে পারে না। বুঝতে না পারার কারণ এই যে, বিত্ত হুথ বা বিত্তহ আলো নামক কোনো বস্তু এ-বিষয়ে কেউ ভোগ করতে পারে না। হুথের মধ্যে তাই কিছুকাল বাস করলেও বোকা হাথ না যে হুথের হুথোই বাস করা হলেছে। যে-আলো সকল অন্ধকার দূর করে, সে-আলোই তো অন্ধকার জগৎ দেখা দেয়। পাশে-পাশে হুং না থাকলে কেউ হুথের বাস পোত না, পাশে-পাশে অন্ধকার না থাকলে কেউ আলোর বাস পোত না। ছাটির দুঃকতুর লেজের মতো। পোনা দিয়েছিল এই ল্যাঠা পুথিবী স্পর্শ করলে পুথিবী লঃগ হবে, অথচ বহন কখাটা তখন লোকো আতঙ্ক-এত হজিল, ট্রিক সেই সময়েই সবাই আমরা সেই ল্যামের মধ্যে বাস করছিলাম।

অতএব হুথের বোধ ভাগাতে হ’লে প্রত্যেকটি মাহুথেরই মাঝে মাঝে একবার ক’রে কুন্তের কিল খাওয়া ঘরকার হয়। বেঁচে থাকতে হ’লে যেমন খাওয়া-পরা চাই, হুথ থাকতে হ’লে তেমনি প্রত্যেকটি লোকের অন্তর একটি ক’রে ব্যক্তিগত ভূত দ্বারা চাই। মাহুথ বহন হুথের মধ্যে থেকে হুথের বোধ ছাড়া, তখনই তাকে গা থেকে জামা খুলে ব্যক্তিগত কুন্তের সামনে কিল খাবার অস্ত্র দিয়ে দাঁড়াতে হয়।

মাহুথের ইতিহাস এর প্রমাণ। মাহুথ কোনোদিনই হুথ থেকে হুথকে বুঝতে পারেনি। ইতিহাসের কথা থাক, আমরা নিজেদের জীবনে প্রতিবন্ধর দেখতে পাই, আমরা গতবছর বেশি হুথ ছিলাম, এ-বছর ভীষণ হুথ আছি। পুরনো খবরের কাগজের পুছোর সম্বন্ধকার সম্পাদকীয়তেও বেধা বাবে প্রত্যেক বছর পূর্ববছর থেকে কত খারাপ তা নিয়ে উদ্ভাসপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। আমি প্রায়-পর ১৯১৪ সালের সম্বন্ধ-ভাষ্যের একটি খেয়ালিক উদ্ধৃতি করছি :

কলিকাতা নগরে সকল বস্তুই মাহুথ। তবে ঘরিত্র লোকদিগের জীবন বদ্যার উপায় কী শাহলীয়া পুছা নিকট হইয়াছে মোকাদিন-পদারিগাও ত্র্যাসি অগ্রিমুখ্য করিয়া তুলিয়াছে। ম্যাম একর মূসের মোন ২৪০, অতঃপর মোন ২১০, মালকলাই মোন ১১০—আতপ ততুল বাহা হুগী মেবেতে রায়হার হয় তাহার মোন ২৪০ টাকা, ম্যাম একর পুত সের এক টাকা।

আজ ততুলের মোন আড়াই টাকার স্থল চল্লিশ টাকা, আতপ সেই একই প্রঃ :

মহাপুত্র,—যোকান থেকে দুটো টাকা নিয়ে হুঁপের আতপ চাউল নিয়ে আসতে আসতে ভাংতে লাগলাম কোন্‌ হুপে বাস করছি। ৪০ টাকা চাউলের দান। স্ত্রীয়া মূল্যের দোকানেও আতপ চাউল নেই কাজেই আমার মত মধ্যবিত্ত লোক ৪০ টাকা দান হবে কি করে কিনে বিধবা যা বোনদের খাওঁরাবে।

এটি আতকের (১-২-৪৮) 'অনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একখানি চিঠির অংশ।

আমি বলতে চাই যে, হুপে দখন থাকি তখন সে-কথাটা আমরা বুঝতে পারি না। হুপে থাকার অল্প কত সামাজিক বিবিধবান পড়া হয়েছে, শাস্ত্রকাররা হুপতো ভেবেছেন সমাজকে স্বাধী হুপের গতিতে আটকানো গেল, কিন্তু এ-হুপ বাতবের পক্ষ হয়নি। সে তার মধ্যে বার বার ভূত ঢেকে এনে তার সামনে পিঠ পেতে মিথছে, কেননা সে হুপে ছিল কিনা, কুন্তের কিল না-বাওবা পর্বত তা বুঝতে পারেনি।

সমাজ-জীবনের মতো ব্যক্তিচরিত্রও নানা নীতিশাস্ত্র ও মোহমুগ্ধর জাতীয় বহু মুগ্ধর বার বার ভেঙে কুন্তের কিল খেতে বেহিয়ে পড়েছে মিথিষ্ণ গতিতে, এবং চরিত্র ঠিক আছে কিনা তার বাচাই করতে এই ভাবেই। চরিত্রের পিঠে এই কারবাই কুন্তের কিল মারতে হয়। কুন্তের কি মেশ? কুন্তেরা সাধারণত হিংস্র নয় আপনাই বলেছি, এবং একথাও বলেছি তারা সমাজ-সচেতন। তাই সমাজের বা ব্যক্তির উপকার হবে মানতে পারলে তারা আর দ্বিধা থাকতে পারে না। এইতো সেনিন পথের কাগজে পড়ছিলাম বেতার-কেন্দ্রের এক ইংরেজ মহিলা বছর হুড়ি আগে গারস্টিন মেসের খাচিত কুন্তের কিল খেয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। অশুশ্চান করলে দেখা যাবে এই মহিলার চাকরি ছাড়ার স্বকর হয়েছিল বলেই কুন্ত এসেছিল, এবং

ঐ মহিলাই অহুরোপে। হুপে ছিলেন তিনি আনাউলারের চাকরিতে, কিন্তু সে-কারণে হোক তিনি কুন্তে পারেননি যে তিনি হুপে ছিলেন, তাই তিনি কুন্তের সামনে পিঠে পাতছেন। কুন্ত প্রথম বার স্ত্রীলোক বলে একটু খাতির করতে চেরছিল, কিন্তু তিনি তাকে ছাড়লেন না।

দুবার ভূত দেখা দেওয়ার কারণ এটাই। পথের কাগস থেকে জানতে পারা গেছে তিনি দুবার ভূত দেখেছেন।

আমাদের দেশে বিবাহকে একটি ফার্মিটি বিধান বলে মানা হয়েছিল, স্বাধী হুপ ও শাস্তির আগার। মেয়েরা কি হুপেই না ছিল এতদিন, এমন কি বিধবা হয়েও কি ভূপ্তি! জীবিত এবং বর্গীয় স্বামীরাও পথনিশ্চয় ছিলেন। কিন্তু বিধবাদের স্বাধী শাস্তির পিঠে কিল মারতে এলো কুন্তেরা বিজাপাগর মহাপুত্রের মধ্যস্থতার (বিধবাদের গায়ে হাত তুলতে কুন্তেরা সাহস পাননি)। আর অব্যাহিত মাংসভোর পিঠে কিল মারতে এলো বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের কুন্ত। সেনিন সুনাম তিন হাজার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘামলা সুনচে কলকাতার আশপাশে। শাস্ত্রকাররা ঠিক এইই অপেক্ষার ধান করিন করেছিলেন এককালে। তাঁরা জিকালজ ছিলেন, সবই জানতেন। তাঁদের আপা পূর্ণ হুপেই। এবনি চলতে চলতে বিবাহ-বিচ্ছেদের হুপ দখন অপরিমেয় হবে, তখন আবার মনে সন্দেহ আগবে, "হুপে আছি তো?" কুন্তেরা বলে, "আমরা প্রস্তুত আছি, আসব কি?" বিচ্ছেদ-প্রাপ্তরা বলে, "বোধ হয় আসা উচিত।" —বলে পিঠ পেতে দেবে।

অর্থাৎ আবার ধান আসবে। আবার শাসন-সাহিত্য-গুলোর নতুন সংস্করণ ছাপা হবে। তবে বোধহয় অনেক দেরি হবে এবারে।



শিক্ষণতম



শ্রীমদ্রস্কন্ধাখ্য মিত্র

নানটি যে চমৎকার তা মনে মনে নিশ্চয়ই অনেকেই স্বীকার করে। সুখীর হোকানে বলে লক্ষ্য করেছে বাবা মাঝনে ফুটপাত দিয়ে বেঁটে যায় ডাবের কারো যদি সাইনবোর্ডখানা চোপে পড়ে সে একই না একই মূহ মুচকে হাসবেই। বিশেষ করে সে যদি ঘেরে হয়, হুজুরী হয়, কুমারী আর অল্পবয়সী হয়, তার মূহখানা লক্ষ্য কর্তব্যের ইকুই করে। তারপর সেই বাঙালী মূহখানায় হোকানের একবারে ভিতরে এসে ঢোকে। সঙ্গে আর কোন পুরুষ কি মেয়ে বন্ধ থাকলে ভালোই, না থাকলে একাও আসে। এসে হঠাৎ নতুন ডিকার্টনের ড্যানিটি-ব্যাগটার হাত ধরে, কি কাচের যে ছোট আলমারিটার মধ্যে কার্টের ওপর নকশা-কাটা গরন্য বস্ত্রগুলি রয়েছে সেখানে গিয়ে মূহচোখে ঝাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েটির গায়ে গরনা নেই, বাস্তবের মধ্যেও গরনা নেই। কিন্তু হবে হবে, হুজুরেরই হবে, হুজুরেরই একদিন ভবে উঠবে।

মূহ হয়ে দেখবার মতো আস্তে অনেক জিনিস আছে ওই আলমারির তাকগুলিতে। আছে নানা আকারের, নানা ধরনের কোটা, গোল আর চ্যাপ্টা। কোনটা ঘোষের শিং দিয়ে তৈরি, কোনটা হাতির ঝাঁড়ের। সুখীর মনে মনে ভাবে, কেবল মর। বাস্তবের ঘেরে কোন জিনিসই কোন কালে লাগে না। তার সব গর্ব জু তাকাতা বেহ নিরে। ঘরে গেলে হয় ছাই, না হলে মাটি।

মনোহরণের আরো অনেক বস্তু আছে হোকানে। আছে বেতের চেয়ার, চামড়ার মোড়ার পোশাকের মোড়ার।

আছে কার্টের ক্যালেন্ডার, টেলিফোন ওপর বই সাজিয়ে রাখবার জন্তে নকশা-কাটা সেলফ। আছে নানা আকারের ফুলখানি, কুকনগরের ছোট ছোট পুতুল। মূহলম্বিত হয় আর পার্বতীর। আসলে এই মূহ-পৃথিবীরই নয় আর মায়ী। কারিগর কোন বৈরীভাব আনতে পারেনি এই মূহ মুতিতে, চোটাও করেনি। কলসে, বিয়ের বাক্সের চলত না। আজকাল দুজো শিবকে কোন্ পার্বতী পছন্দ করে? তাই শিবের চেহারাও করতে হয় কার্তিকের মতো, মধনের মতো। বাকি তিনি ভঙ্গ করেছিলেন। কারে-মনে তাকেই করী করতে হয়, অমর করতে হয়, শিবের সঙ্গে তাকে দিশিয়ে রাখতে হয়। চারটাকা-পাঁচটাকা ধানের এই মাটির মূহলম্বিতগুলি বেশ বিক্রি হয় আজকাল। কোনটি আলিঙ্গনময়, কোনটি একেবারে চূষন-উত্তত। যার বেদন পছন্দ, সে তাই নেয়।

তারপর আছে পোদনা। বিয়ের দু-তিন বছর পরে যার দরকার হবে সেই ব্যবস্থা সুখীর দাসতা আগেই করে রেখেছে। এগুলিও বেশ বিক্রি হয়। দু-তিনটি ছেলে-পুত্রের হাত ধরে প্রৌঢ় বৃদ্ধিও আসে, নতুন যে আসতে চাচ্ছে কি এসেছে তার ব্যবস্থা করবার জন্তে। আবার একেবারে বাবা গ্রন্থ বাপ-মা হাচ্ছে ডায়াও এশে ঝাঁকায়। ঋদ্ধেরকে জিনিসপত্র বিক্রি করবার ঝুঁক ঝুঁক সুখীর আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে। মায়ী কিসকিস করে কি এক একটা কথা বলে আর তরুণী গভীর মূহ লক্ষ্য কর্তব্যের লাল হয়ে ওঠে। বেগতে ভারি ভালো লাগে

স্বীয়ের। বন্ধের দেওয়া রেকবিগুলি গুণে নিতে চুল
হয়ে যায়।

বেগতে গেলে স্বীয়ের দাড়া অধীর কড়া ধমক লাগায়,
'কি চ্যালাব মতো ডাকাঙ্কিল। বুড়োগুলি ভালো করে
গুণে নে।'

স্বীয় লক্ষিত হয়ে ফের নিজের কাজে মন দেয়।
টাকা-পরশা ঘুরে নেয়, কাগজ দিয়ে প্যাক করে, বুতো
দিয়ে জড়া, যেটা হলে কাচি কি ছুরি দিয়ে কাটে, দর
হলে, ডাড়াডাড়া থাকলে ধাতেই ছিঁড়ে নেয়। তাজা
মাছের অঙ্গের সব প্রত্যঙ্গই কাজে লাগে।

বোকানটা কোঠছুতো ভাই অধীর হাসের। স্বীয়
বস্ত্রের সন্দর্ভে ভাই, কাকের সন্দর্ভে কর্মচারী। বাস
ডেলিভারি বেগুরা থেকে শুরু করে, জিনিসপত্র বিক্রি করা,
বন্ধেরদের আপ্যায়ন করা, অবসরমতো তুলি তাসিগে বের
হওয়া, আবার ভিতরে এসে বোকানটা সাকানো-গুছানো
গাড়ীপাছু করা, সন্ধ্যার সময় গুপ্তনো বেগুরা—সবই এক
হাতে করতে হয় স্বীয়কে। অবশ্য অধীরও হলে থাকেনা।
সে ক্যাপে গিয়ে বসে। হিন্সাবের খাতাপত্র ঠিক রাখে।
কেন? জিনিস কোথেকে কিনলে সন্ধ্যার পড়বে, কোন
জিনিসের দাম কত বললে বন্ধেরও চটবেনা, গুপ্তাও ঠিক
থাকবে সে ভাবনা অধীরের। মূলধন যোগাবার ভাবও
তায়। চিন্তা-ভাবনার কাজ, বাখার কাজ সব অধীরের।
আর সন্দেহের মাঝার দ্বন্দ্বই তো সবচেয়ে বেশি।

স্বীয়ের কাজ হাত-পায়ে, চোখে-মুখে। যে চোখ
বেরেদের দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে ডাকায়, সেই চোখেই
আবার বন্ধেরের কাজ অসদক হয়ে থাকে। সেই চোখ
গিড়েই বুঝতে হয় কোন বসের কোন অবস্থার বন্ধেরের
মনে কোন জিনিসটা ধরবে। আগে নয়নহরণ, তারপরে
তো বনোহরণ। স্বীয়ের যে মূণ ডরুই বেরেদের সঙ্গে
হুটো কথা বলবার জন্তে চুলবুল করতে থাকে সেই মুখই
আবার এই বোকানের জিনিসগুলির প্রশংসার পক্ষপাত
হয়ে ওঠে। কাশীপুরের কারিগরের কাজকে কান্দুরী কাজ
বলে চালায়, সাধারণ কাঠ থেকে ঘূরের কথার চমকের গল্প
বাতা করে। বা দোষ তাই গুণ করতে সিরে দোষগুলিও
গুণ-বাচক বিশেষ, নিজের কষ্টের সম্বন্ধে একদিন ত্রাসে
এ কথা বলে ধমক খেয়েছিল স্বীয়। যত কাকিলই বোক,
বাংলা আর সংস্কৃত সে-ই সব চেয়ে সেবা নয়ন পেতে।

কিন্তু সে বিত্ত কোন কাজে আসেনি। মাথা খাটাবার
কোন দরকারই এ বোকানে তার হয় না। তার কাজ
হাত-পায়ের কাজ।

কিন্তু বাখার কাজও একটোটা আছে। কেউ জাহুক
আর না জাহুক, কেউ বদুক আর না বদুক আছে। গছনার
কোটের ঢাকনির ওপরে পাতার ঢাকা ফুলটির মতো সেই
হৃদয় কাছটাই আছে বোকানের এই নাথটির মধ্যে।
'শ্রিত্তম' নামটী স্বীয়েরই রাখা।

স্বীয়ের এই বড় রাস্তার ওপরে ঘরপানি ভাড়া নিয়ে
বোকানের কি নাম রাখা যায় অধীর হু-চোরদিন তা নিয়ে
বেশ ভেবেছিল। হুগাঁ কালী লক্ষী সরস্বতীরা মাঝার
থাকুন, কিন্তু বোকানের মাঝার সাইমবোর্ডে তাঁদের নাম
আর দেওয়া যায় না। বড় পুরোন হয়ে গেছে ওদর নাম।
তারপর বেশ খানার হুঙার পর থেকে স্বয়ং স্বাধীনতা
কথাগুলিও বেন হারি হয়ে গেছে।

পছন্দমতো নাম আর মেলে না। সংসারে এত কথা
এত শব্দ এত নাম, কিন্তু কোনটাই পছন্দ হয় না।

একটিতে বড় কোমলতা আছে—চুল লতা পাতা, নদী,
এমনকি বানেরও বড় হৃদয় হৃদয় নাম আছে—বাংলা-
দেশের দান আর নদীগুলির নামই বোধহয় সব চেয়ে বেশি
মিলে—আর আর জল—যে নামগুলি মনে এসেছিল, স্বীয়
একটা একটা করে সবই তার দাঁশাকে তুলিয়েছে। কিন্তু
অধীরের পছন্দ হয়নি। সে বলেছে, 'হুগাঁ বোকানটাকে
তুই কি জলে ভাসিয়ে দিতে চান, না মাঠে ঠেলে ফেলতে
চান? বা ফেলে এসেছি তা আর নয়। স্বীয়ের এখন
এসেছি স্বীয়ের হাতে হবে। স্বীয়ের নাম ধল।'

নাগরিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সবচেয়ে জনপ্রিয়, লক্ষীর
প্রশংসাও দ্বন্দ্ব সবচেয়ে বেশি পেরে থাকে সেই দু-একজন
সিনেমা-স্টারের নাম করেছিল স্বীয়।

অধীর সঙ্গে সঙ্গে জিত কেটে বলেছিল, 'তোমার বউদি
টের সেলে একেবারে বেয়ে ফেলবে।'

স্বীয় বলেছিল, 'ভালো বউদির নামটাই রাখ।
দুচাক কথাটা তো ভালোই।'

অধীর ধমক দিয়ে উঠেছিল, 'কাজলামো হচ্ছে?
যা বেঁচে আছেন না? বোকানের ওই নাম বলে তিনি
আমাকে কী চোখে দেখবেন? একেই তো সিনরাত
খোঁটা ভনতে হয় আখি নাকি বউয়ের কথার উঠি-বসি।'

তাহলে কী নাম দেওয়া যায়। আবার ভাবতে
হয়েছিল স্বীয়। নাম-সমস্যা নিয়ে বেশ দাড়া দাবাতে
হয়েছিল। শ্রিত্ত, জিরা, সুশ্রিত্ত, সুজিরা করতে করতে
হঠাৎ নামটা মূণ থেকে বেগিয়ে এল 'শ্রিত্তম'। কথাটা
ঠিক মূণে নয়, মন থেকেই বেগিয়েছে, যে মন মাঝার মধ্যে
লুকিয়ে থাকে। নাকি কোথায় থাকে কে জানে!

হুদীর বলল, 'কখনও নয়।'

'মুতিগুলি বেশ অমূল্য।'

হুদীর মুখ বেগে চূর্ণ করে রইল।

'লাম কত?'

হুদীর বলল, 'লাম তো এককন্ডের নয়। সাইজও একরকমের নয়। ছোট আছে, বড় আছে। কোনটা আপনাদের পছন্দ, আপনি কোনটার কথা জিজ্ঞাসা করছেন—'

বলে হুদীর দু'তিনটি মুতি এনে তার সামনে রাখল।

একই অপ্রস্তুত হয়েছিল মেয়েটি। তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি ঠিক আচ্ছই কিনছি না।'

হুদীর বেন তা জানে না! হেসে বলল, 'নাই বা কিনলেন। দেখুন না।'

মেয়েটিও হাসল, 'হা সেমি তাই ভালো লাগে। বড় সেমি ততটাই ভালো লাগে। পছন্দ আমার সবই। কিন্তু এদের ডিতর থেকে একটি বেছে নিয়ে কিনব। আমার এক বন্ধুর বিয়ে আসছে। তখন কিনব। তখন থাকবে তো?'

হুদীর বলল, 'নিশ্চয়ই থাকবে।'

মেয়েটি ধীর অভিমানের ভঙ্গিতে বলল, 'কই আর থাকে। আপনি শুধু মুখেই বলেন। সেদিন দুটি লাগুয়ার-ডাল পছন্দ করে গেলাম, হুদিন পরে এসে সেমি আর নেই।'

হুদীর শিতমুখে বলল, 'আপনি একটু বলে বাবেন তাহলেই থাকবে। হু'বাস পরে এসেও পাবেন।'

মেয়েটি বলল, 'তা জানি। আপনাদের ব্যবহার এত ভালো। এমন ভদ্র ব্যবহার আর কারো কাছে আমার পাইনি। এ পাড়ার আরো তো কত দোকান আছে, রেখোঁরা আছে, কিন্তু এ দোকানের মতো কোনটাই নয়। আপনারা বর্ধনই দোকানটা খুললেন আমি তখনই বুঝতে পারছিলাম এতদিনে সত্যিই একটা পৌষ্টিক দোকান এ পাড়ার হল। একসঙ্গে এত রকমের শবের জিনিস এ পাড়ার আর কোথাও নেই। সবচেয়ে চমৎকার আর গুরুজিহাল হল দোকানের নামটি।' মেয়েটি ঝিক করে একটু হাসল, 'আচ্ছা, নামটা কে রেখেছে বন্দু তো?'

হুদীর বলল, 'অহুমান করুন।'

মেয়েটি হেসে বলল, 'আপনিই তো! আমি অনেক আগেই বুঝতে পারছি। দেখুন আমার আচ্ছা কত ঠিক। এই নিয়ে আমি একজনের সঙ্গে বাড়ি বেখে-ছিলাম। হুজনের মধ্যে যিনি দেখতে ভালো, পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন, চমৎকার ব্যবহার করেন, চমৎকার কথা বলেন, নামটা নিশ্চয়ই তিনি দিয়েছেন। বাড়িতে আমি আচ্ছা জিতে গেলাম।'

হুদীর কি বুঝতে পারেনা? কার সঙ্গে বাড়ি, কার সঙ্গে এই ছবি-জিনের মধ্য লড়াই? বুঝতে পারেনা কোন মুখে জরও যা, পরাক্রমও তাই?

কিন্তু বুঝতে পারলেও বলতে নেই। শুধু যেইহু কানে আসে সেইহুই শুনে যেতে হয়। যেইহু চোখে পড়ে সেইহু দেখে যাওয়াই ভালো। তার বেশি জানতে গেলে ঠকতে হয়। ঢেকে ঢেকে এ অভিজ্ঞতা হুদীরের দখলে হয়েছে।

তবু মেয়েটি যে তাদের হু'ভাইয়ের মধ্যে তাকেই বেশি পছন্দ করেছে, দোকানের মালিকের চেয়ে সেলম্যানট যে তার বেশি নজরে পড়েছে এইহু জানতে গেলেই হুদীর মুশি। আর দোকানের নামটা যে এখানে হুদীর ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না, তার সবচেয়ে মেয়েটির এই ধারণাতেই তার মনে আর আনন্দ ধরে না।

তারপর একটু ঘাসেই ছেলেটি এসে পড়েছিল। তবু মেয়েটিরই কানে পৌঁছায় গলার স্বরকে ততযানি না নিয়ে বলেছিল, 'Sorry.'



যেহেঁতু সবে সবেই তার হৃৎযন্ত্র হৃৎযন্ত্রিত হয়নি। তাহা করে বলেছিল, 'এত বেশি করলে কেন? তোমার যদি কোন কাওজান থাকে?'

ছেলেটি চোখের ইশারায় তাকে সঙ্গে সঙ্গে ঘানিয়ে দিয়েছিল। স্বরীর বে উপস্থিত আছে এ বোলা কি মেয়েটির নেই?

বুকেতে গেলে একই অপ্রসন্ন হয়েছিল মেয়েটি, লজ্জিত হয়েছিল।

ছেলেটি হঠাৎ সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট স্বরীরের থেকে বাড়িরে ধরে বলেছিল, 'নিম।'

স্বরীর বলেছিল, 'না না, পে-কি।'

ছেলেটি বলেছিল, 'আমি, নিম না। তারপর কিরকম ব্যবস্থা-বাগিচা চলছে আপনারা?'

স্বরীর বলেছিল, 'এই চলছে এক রকম।'

ছেলেটি বলেছিল, 'আরো ভালো চলবে। এই দু-তিন বছরের মধ্যেই বেশ কয়েক উঠেছেন আপনারা। সেবেও ভালো লাগে। Wish you good luck'.

ছেলেটি বেশ লম্বা। আর বেশ স্মিট। সাহেবি পোশাকে ভালোই মানিয়েছে। বরষ পটিল থেকে বিশেষ মধ্যে হয়ে। টিক বে কত বোকা হয় না। তবে মেয়েটির চেয়ে বরষে বেশ বড়। আর দেখে যেন হয় ঢালাক-চতুরও বেশি। কী করে গুণের আগাণ হল জানবার কো নেই। কতদিনের আগাগ কতদিনের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তাও শুধু অনুমান করেই নিতে হয়। ছেলেটি বোধহয় কোন অফিসে-টফিসে কাজ করে। এমন অফিস যেহান থেকে ইচ্ছা করলে ভর-গ্রুপেও পালানো যায়, কিংবা এমন অফিস বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ানোই যেহানকার কাজ। হয়তো কোন ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এক্সেট, হয়তো কোন গুণের কারখানার এক্সেট। এমন আরো কত আছে স্বরীর তার কী-ই বা জানে, কী-ই বা ববর হয়ে।

কিছু বাই. হোক, ছেলেজিক স্বরীরের তেমন ভালো লাগেনি। এর মধ্যে হিংসাত কিছু নেই। হিংসা সে কেন করতে পারে, করে লাভটা কি। হিংসা নয়, তার মনে হয়েছে ছেলেটি বেন আরো কতবয়সী আর বেশি রূপবান বলে ভালো হত, হানাতো। কথায়বার্তায় আরো একই ভঙ্গ, শাস্কর আর বিনয়ী।

ওর এই সিগারেট অক্ষর কতবার ধরনটা স্বরীরের ভালো লাগেনি। অবশ্য স্যাক্ষরক তার ভাগ্যে কমই কোটে। কিন্তু এত দারী সিগারেট থেকেও স্বরীরের হৃৎযন্ত্র নেই। ছেলেটির দেওয়ার ধরনটির মধ্যে কোথায় বেন

অনুসঙ্গার তাব বেশানো আছে। আছে যেন একই যুগ দেওয়ার ধরন। জিনিদগর না বিনেও মেয়েটি যে দোকানে এতকণ অশোক করছে, দারী বাহু সিগারেট কি সেই জন্মেই?

কিছু স্বরীর কি এই সিগারেটটার অপেক্ষার ছিল। সে কি ওর চোখেও বেশি কিছু পায়নি?

তারপর এই ব্যবস্থা-বাগিচা আর কোঁক বসার কথাগুলি। যে প্রবেশ পড়েছে, তার সঙ্গে প্রণয়িনী উপস্থিত আছে তার মুখের ভাষা আর কাটখোটা। হলে যেন ভালো লাগে না। স্বরীর নিজে যদিও বোকানদার, সারাদিন বেচাকেনার কথাই বলে, তবু ছেলেটির মুখ থেকে ওই ধরনের কথাবার্তা শোনবার ক্ষমতা সে তৈরি ছিল না। ছেলেটি বেন এই কথাই তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল : তুমি ব্যবসারী ছাড়া আর কিছু নয়, তুমি শুধু বোকানদার।

বেচাকেনার কাক কাক স্বরীর আরো অনেক সময় ভেবেছে যেহেঁতু বোগ্যন্তর আর কাটক পছন্দ করলে পারত। কিন্তু কে জানে ছেলেটি হয়তো সত্যিই খুব গুণবান, বিদ্বান, চাকরি করে অনেক টাকা বোদ্ধগার করে। তা যদি নাও হয় তাতেই বা তাদের মধ্যে পড়তে বাধা কি। এর চেয়ে যেহানান জোড় কি স্বরীর দেখেনি? কত দেখেছে। এ তো ঘটকালি নয় যে, টিকুজী কুঞ্জী দিলিরে ঠাণ্ডিয়াল্লার সোমানদার মতো দৃশ্যগুণের গুণন নিয়ে ব্যটীয়ার হুঁকি সমান বেশ ভবে বিল হবে। এ বিল আর এক রকমের। এতে তিলগ্রমাণ বিল থাকলেই যথেষ্ট।

বিরের মরতমে দোকানে বেশ ভীড় হয়। বিক্রি হয় জিনিদগর। ফুলদানি, গরমার বাল্ল, কোঁটো, মুগলভূতি সবই চলে। অধীর টেবিল-চাকনি, জানদায় রঙ-বেরঙের পর্গাও ঠক করতে শুরু করেছে। বিয়ে আর অরগ্রাশনের মরতম ছাড়াও সেগুলি বিক্রি হয় বেশ। মেয়েটি সবদিন যে তার বন্ধুকে নিয়ে আসে তা নয়, থাকে থাকে দু'একজন বাচ্চবীকেও আসে। সবাই মিলে শবের জিনিদগলি দেখে, নাড়োচাড়ে, দরদায় করে। আবার দু'একটা কেনেও। শবের মধ্যে মেয়েটিকে আরো বেশি হুঙ্কার দেখা যায়। ছেলেটি সঙ্গে না থাকলে স্বরীর তার সঙ্গে বসিতে আরো সহকমভাবে কথাবার্তা বলতে পারে। অল্প পাঁচজনের কাছে যে জিনিদ যেহান বিক্রি করে তার চেয়ে মেয়েটির কাছ থেকে কিংবা তার সঙ্গে দারী আসে অনেক সময় তাদের কাছ থেকেও দু'আনা এক-আনা কণ নেয়

স্বাধীন। তার এই দেওয়ার কথা মেয়েটি জানে না, জানবার উপায়ও নেই।

কিন্তু যে জানবার লে জানে। স্বাধীন হাতে হাতে টের পায়। আর টের পেলেই খবক দেয়। বলে, 'অত যে কমে দিলি, পড়তা ঠিক থাকবে?'

স্বাধীন বলে, 'থাকবে দাখা। ওরা তো অনেক জিনিস নিয়ে থাকেন। একটু সজা করে দিলে আরো বেশি আগবেন, আরো বেশি নেবেন।'

স্বাধীন বলে, 'খাপ খাপ, দুকতে পেরেছি। তোকে নিয়ে হয়েছে মহা আশা।' বেরেরা দোকানে এসে আশাকেই কাউন্টারে বসতে হবে দেখছি। নইলে তুমি সব বিনিয়ে দিয়ে আমাকে কলুর করে দিবি।'

সব! বড়কোর হু'আনা এক-আনা'ই তো ছাড়ে স্বাধীন। বোল-আনা সে বেবে কোথেকে আর নেবেই বা কে?

তারপর এই আবার মাসে আর একটা বিয়ের মরশুম এল। অনেক জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে দোকানে। বোজাই কাপট্যের ডীজ বাড়ছে। স্বাধীন আর স্বাধীন দুজনেই খুব খুশি। সেদিন স্বাধীন মাস কিনতে বেরিয়েছে, স্বাধীন এক হাতে বিক্রি করে কুণিরে উঠতে পারছে না। হঠাৎ মুখ তুলে দেখে সেই ডীজের মধ্যে মেয়েটিও আছে। খুব হাসিমুখি মুখ। পরীচা আরো ভালো হয়েছে।

স্বাধীন বলল, 'কদিন তো আসেননি এদিকে! ভালো আছেন?'

মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ।' দেখুন এবার আমার সেই পছন্দ-করা জিনিসগুলি নেব। সব আছে তো?'

স্বাধীন বলল, 'সবই আছে। কী ব্যাপার? আপনার সেই বন্ধুর বিয়ে কুণি?'

মেয়েটি হাসি-মুখানা একটু নাড়িয়ে নিল। স্বাধীনের দৃষ্টিতে ব্যক্তি হইল না, কার বিয়ে, কার সঙ্গে বিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটি ঈর্ষার কাটা বুকে গিয়ে বিঁধল।

কিন্তু স্বাধীন একমুখ হাসির মধ্যে সেই স্বপ্নপার বিন্দুকে দৃষ্টিতে ফেলল। বলল, 'ভালোই তো, ভালোই তো। আমায় নিমন্ত্রণ পাব না?'

মেয়েটি বলল, 'পাবেন বইকি। আমার দাদার সঙ্গে চিঠি পাঠিয়ে দেব। জিনিসগুলিও তিনিই এসে নেবেন। আপনি যাবেন কিন্তু।'

স্বাধীন বলল, 'নিশ্চয়ই যাব।'

স্বাধীন-ভাল, ভ্যানিটি-ব্যাগ, ফুলমুতি, আরও



কয়েকটি জিনিস মেয়েটি পছন্দ করে গেল। না করলেও পারত। স্বাধীন কি জানেন? ওর কি কি পছন্দ? এত দিনেও কি জানতে ব্যক্তি আছে? স্বাধীন ভাবল এর মধ্যে একটা জিনিসের দাম সে নেবে না, সে নিজেকে দেবে।

কিন্তু পরদিন আর মেয়েটির দামের দেখা নেই। তার পরদিনও না। বেছে বেছে জিনিসগুলি একটিকে দৃষ্টিতে রেখেছিল স্বাধীন; আর ব্যক্তি পারে না। কই তার দাম! নিজের দাদার খবকে স্বাধীন অস্থির হতে লাগল, তাপের আত্মে আত্মে বিক্রি করে দিল জিনিসগুলি। কি আর করবে? তার নিজের জিনিস তো নয়। হয়তো মেয়েটির দাম; অত কোন দোকানে গেছেন। হয়তো এই দোকান থেকেই তিনি তার নিজের পছন্দমতো বিয়ের উপহারের জিনিসগুলি নিয়ে গেছেন। স্বাধীন কী করে চিনবে। মেয়েটির দাদাকে তো কোনদিন দেখেনি।

কিন্তু মাস ঘুরে গেল, কারোইই দেখা নেই। ছেলেটিও আসে না, মেয়েটিও আসে না। না একসঙ্গে, না আলাদা আলাদা। হয়তো অত কোথাও চলে গেছে। অত কোন শহরে, কি এই শহরেরই অত কোন পাড়ায়।

তারপর মেয়েটির বান্ধবী এল একদিন একটা ফুলদানি কিনতে। দোকানে তখন ডীজ নেই। স্বাধীন ফুলদানিটি

পাখি করে তার হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'সেখুন, কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা জিজ্ঞাস্য করি—'

সে বলল, 'বলুন না।'

সুদীর সস্তুচিত হয়ে বলল, 'আপনার সেই বন্ধু কি বিয়ে হয়ে গেছে?'

সে বলল, 'তার কথা বলছেন?'

সুদীর বলল, 'সেই যে—এখানে বিনি প্রায়ই আসতেন। ডান গালে তিল আছে—'

সে বলল, 'হুজুঁহি।' সীতার কথা বলছেন তো? তার কথা আর বলবেন না। বড় হুঃখের ব্যাপার। বড় বিঃশি কাও হয়ে গেছে।'

সুদীর বলল, 'কী হল?'

সে বলল, 'বিয়ের আসরের দিন খর্য পড়ল, লোকটা একটা চাঁট। বাৎশুরে ওর আর একজন স্ত্রী আছে। চাকরি-বাকরি সব মিথো কথা। ভাগ্যে আগে থেকেই সব জানা গিয়েছিল। নইলে কি হত বদুন তো?'

জিনিস নিয়ে মেয়েটির বাস্তবী চলে গেল।

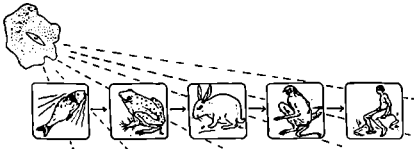
সুদীর কানিক্ষণ বড় হয়ে বইল। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে এইজন্মেই মেয়েটি আর আসে না। বোধহয় কোনদিনই আসবে না। এ সোকান এমন নিশ্চয়ই তার কাছে সব চেয়ে অশ্রিয়। বিয়ের সমান। যেখানে সে আর যোজ্ঞ আসত, সেখানে সে আর কোনদিনই আসবে না।

ছেলেটি অশু মেয়েটিকেই ঠিকারনি, গ্রিহতয়েরও বড় লোকমান করে গেছে।

সুদী উপজ্ঞান সমালোচনা করিতে আশাশ্রয় প্রকৃতি নাই, কিন্তু না করিলেও নিবৃত্তি নাই—এখন বিস্তর সুদী উপজ্ঞান প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু তাহার ভাল যক কিছুই বৃত্তিবার উপায় নাই। তাহাই আশ্রয় সমালোচনা করিতে অনিচ্ছুক। সুদী উপজ্ঞান লেখকেরা কেবল ঘটনা লেখেন। কিন্তু কেবল ঘটনার অন্তরঙ্গ করি না। বর্তমান ঘটনার সঙ্গে অন্তরের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে না পারা বার ততক্ষণ ঘটনা বৃথা।

কেবল ঘটনা-লেখক বামাধন লিখিতে গেলে হয় ত লিখিবেন :—“রাম লক্ষণ হই ডাই বিমাতার কোশলে বনে গেলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সীতা ছিলেন, একটা রাক্ষস আদিয়া সীতাকে ছুর করিল। তখন রাম চীৎকার করিয়া কাদিতে লাগিলেন আর এখানে ওখানে বৃক্ষিরা বেড়াইতে লাগিলেন। এমত সময় কতকগুলি বানর আসিয়া রামের সহায় হইল। তাহাদের সাহায্যে রাম সমুদ্র বাঁধিলেন, রাক্ষসকে মারিলেন, সীতাকে উদ্ধার করিলেন, আশোধ্যায় আসিলেন। তাহার পর একদিন সীতা সম্বন্ধে তাঁহার কি একটা সন্দেহ হইল, অমনি রাম তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন, বনে পাঠাইলেন।” বাস্তবিকি যদি এই ঘটনাক্রমি এমনকার মত সুদী উপজ্ঞান আকারে লিখিয়া ছাপাইতেন তাহা হইলে তাঁহার রামায়ণের ভূষণা বটতলার গ্রাহের মত হইত।

ঘটনা লেখক কেবল ঘটনায় মত। তাপমান যত দাঁড়াইয়া বসিতেছে এই ১৮ ডিগ্রি উত্তাপ, তাহার পর এই ১৭ হইল, তাহার পর এই ১৬ হইল তাহার পর এই আবার ১৫ হইল। ঘটনা লেখক ঠিক তাহাই বলেন, এই ঘটনা ঘটিল, তাহার পর এই ঘটিল, তাহার পর আবার এই ঘটিল। কেন ঘটিল তাহা বদিল না, কেবল ঘটনা বলিল।



অ্যামিবা ও আমবা

শিবতোষ সুখোপাধ্যায়

অধুনীকণের এলমানেডে অ্যামিবার সঙ্গে প্রায় হোজই আমার দেখা-শাক্ষ্য হয়। এখনিতে না খাঁটালে, অ্যামিবা কোনদিকেও ভ্রমণ করে না, আপনায় মনে গছাই-লতায় চালে বশুণ করে চলে যায়। কিন্তু কি বলবো, এই সেদিন যেমনি ওর সঙ্গে একই চোখাচোখি হচ্ছে-হবে বলে মনে হচ্ছে, অমনি অ্যামিবা হাত-পা ওঠিয়ে এক কারাগার কি রকম বন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর আত্মানে ইম্মিতে দিনা ডাঘায় এত কথা তুলিয়ে গেল যে, আমি তো কোন ছাত্র, তা শুনে তো-বড়-বড় সব ভাবজানীদের চোখও স্বপালে উঠে স্থির হয়ে থাকবে, আর নামবে না। বাব্বা, অ্যামিবারও পেটে পেটে এত! আমি বাই ডালে ডালে, তো ও বার পাতায় পাতায়! এই সাজলজ্জা, সাজলজ্জার মাঝে অ্যামিবাকে কোনদিনও আমার অসামান্য কিছু বলে মনে হয়নি। কিন্তু যে কথা তুলিয়ে গেল, যে কথা বুলিয়ে গেল, তারপর মনে হচ্ছে—সবেদন নীলমনি ওর ঐ একখানি কোষ মূল হোলে কি হয়, ওর ভিতরই রয়েছে জীবনের অসার অনন্ত এক ঐশ্বর-মহিমা। অ্যামিবা সেদিন যে-কথা চুপিচুপি বলে গেল তা ওইই কথায় বলতে গেলে অনেকটা এইরকম ঠাঁড়ায়—

এতদিন ধরে আমবা তোমাদের সব দেখেছি, সব বুতেছি, কিন্তু হু বুদ্ধিদি, ওম্ম বুক পেতে সব করেছি। কিন্তু বাস্তবের পান্নায় পড়ে পৃথিবীর ব্যাপার-তাপার এমন ঠাঁড়ালে যে, এখন মূখ না খুলে আর থাকবার কো-টি নেই। সবার সঠিকে তোমরা অনাস্থি করে ফুলেছ। কথায় কথায় তোমাদের এত লম্পটশু; আসলে কিছুই নয়—ওম্ম লোক-দেখানো ওপর-চামাকি। এখন কাও তোমরা বাধিয়ে ফুলেছ যে এতদিনের ক্রমবিকাশের বত

দাক্ষ্য সব বেন একনিবেশে ভেঙে দিতে গোল পাকিয়ে দেবে। এমন পৃথিবীতে শান্তি চাই—তোমাদের জন্তে, আমাদের জন্তে, বিচরাচারের সমস্ত প্রাণীদের জন্তে। আর অশান্তি নয়। আমবা এক-কোবী অ্যামিবা হ'লেও, আমবা ক্রমবিকাশের নজিরে তোমাদের চেয়ে বড়োজোড় সে কথা যদি মানো, তাহলে দেখাও, আর অশান্তি বাড়িও না বলছি। তোমাদের মতো এমন জীব-জগতের ছোট-বড়-বেজ বহুং বাবাকীকেই আমবা জন্মতে দেখেছি। আর বাবা, সঠিক আদিত বখন আমবা এই পৃথিবীতে জন্মানু, বৃহলে, তোমাদের পতিততা হিসাব করে বলে, সে নাকি ম হুই কোটি বছর আগে (চুপি চুপি বলে যদি, তোমরা বাস্তব-এ-পৃথিবীতে মূলক বছর আগে ছিলে না), তখন থেকেই তো দেখে আসছি কি করলে কি হয়। তাই ভাল চাও তো, ওম্ম গলাবাজিতে 'মানবিক' 'মানবিক' কথাটা আউড়ে না। এমন থেকে সব-কিছুর প্রমাণ চাই তোমাদের বিনয় আচরণে। কথায় চিড়ে আর ভিজবে না। বখন তোমরা বাস্তবে ক্রমশ বিপত্তি লাভ করলে, তখন দেখে মনে হয়েছিল, আমবা হয়েছিল—বাক্, এইবার বুদ্ধিবুদ্ধিওয়াল একরকম তোমাদের জীব তৈরী হলো, বাবা! নতুন করে ছুনিয়াকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখবে। কিন্তু ছাই, কার্ভত: দেখা গেল, তোমরা তোমাদের নিজের পাভের দিকেই তোল চানতে এত ব্যস্ত যে, অস্ত তার কি হলো তাই পরোয়া করো না। বার্থ ভরানক জিনিষ বৃহলে?

সবচেয়ে হারামজক ব্যাপার, বত দিন বাজছে দেখছি তোমাদেরও এই ধারণা বহুতুল হচ্ছে যে, তোমরা নাকি সব এক এক জন দেব-পুত্ৰ বিশেষ। তাই এত মাতজরি। কিন্তু আর কারও চোখে মূলো দিতে পার, আমাদের নয়। বললুম তো, তোমরা ছিলে আমাদেরই মতো সামান্য

জীব, অভিব্যক্তি তোমাদের ক্ষমতারই দ্বারা পরিচালিত করে দিশে:। কত ভোল পাঠে তবে না এই হালদিলের বাহুরের চেহারাটা সেলে। নিজের বেহের মধ্যে যে সেল-



লাইব্রেরী আছে—সে সবকে হ'নিয়ার আছে তো? সেখানে তোমাদের এই বাছ হওয়া, ব্যাড হওয়া, টিকটিকি হওয়া, খরগোশ হওয়া, বাঁদরের মতো হওয়া, তাবশর শেষে বাহুর হওয়া—এই সব-কিছু হওয়ার সব ইতিকথা সেলের মধ্যে দেখা আছে। তাই সে-পুস্তক হয়ে কোথায় পালানো চাঁদ তোমরা।

তোমাদের সেল-লাইব্রেরীতে অনেক সেল আছে। সেই হিসেবে তোমরা অনেক সেলের মালিক। তাই বোধ হয় তোমরা নিজেরের এত করিবক্ষ্য বলে মনে কর: ডাব, লাভা হুনিয়া থেকে তোমরা আলাদা। অনেক সেল আছে বলেই তোমরা উদ্ভবের? কে বলবে? আর আমরা এক-সেলের মালিক বলেই নীচু হবের? এ কথা তোমাদের ভাবতে ভাল লাগে তো ডাব। কিন্তু কথাটা সত্যি কিনা—সে কথাটা আমরা অত সহজে মানতে রাজী নই। আমরা বলবো তোমরা জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যেতে লক্ষ-কোটি সেলের প্রয়োজন বোধ কর, সেখানে আমরা নবধন বীলমনি একধানি সেল বিয়েই বাহিরায় করে দিতে পারি। এখন আর পাঁচজন বসুক—কুড়ি কার, তোমাদের না আমাদের? বাহুল্য না অনাড়বের? আমি বলবো—ওই বাহুল্যই তোমাদের কাল—অনাড়বের আমাদের ভূষণ।

তোমরা কথার কথার 'হেন করেকা' 'তেন করেকা' বল। আমরা দুখ হুটে কিছু বলি না। কিন্তু কার্যত: করে দেখাই—অনেক সেল দিয়ে নয়—একটা সেল দিয়েই। হুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপারি। তোমাদের চমকে তিরতে, যেতে বলতে অপ্রত্যক্ষের নিত্য প্রয়োজন হয়। এক একটি মনি তৈরী করতে করে কেরি করে কোরের প্রয়োজন হয়। আমাদের ব্যাপারটা আরও মজার কিছু। একের চেয়ে বেশী সেলও নেই, আলাদা অপ্রত্যক্ষও নেই—বাচতে জানলে ওই একধানি সেল দিয়েই সব বানানো করা যায়। এই সেল চমার ব্যাপারটা বলি। আমাদের আলাদা

কোন পা নেই—সেলের পাশ থেকে একটুখানি বার হয়ে হুতো পা তৈরী হয়। আর তাই বিয়ে পুস্তকের আলের মধ্যে আমরা ইক ইক করে চলে-কিরে বেড়াই। তোমরা তার টেরটিও পাও না। তোমরা নকল দাঁত, নকল পা, মার নকল চাঁদ তৈরী করতে ওজার: কিন্তু এমন হুতো পা'র হুদিগ তোমাদের কোনও শাস্ত্রের ব্রীলিমানার জানা আছে? আমরা এই হুতো পা'র সাহায্যে হানড্রেড মিটার, ই-হানড্রেড মিটার বৌড়ই না বটে—সেক্ষেত্রে এক মিনিমিটারও পা'র হুতে পারি না—ইক ইক করে ওই মিনিমিটারের তলায় আমরা আমাদের মতো করেই মিনিটারি। হুডুডু করে বকেটের সাহায্যে তোমরা উড়ে যেতে পার—কিন্তু এমন সো-য়েসে আমরাই চিরকাল লাঠী'।

তোমরা পোলাও কানিয়া সব যেতে ভালোমান এবং পরে সেটের রোগেই বেশী ভোগ। কিন্তু আমাদের মধ্যে সেটের রোগ নেই বললেই হয়। আহায়ে আমরা সাধিক না হলেও একেবারে নিষাধিক-ভোজী নই। আমাদের চেয়ে ছোট চেহারা ব্যাকটেরিয়া দিয়ে আমরা আমাদের ছুবিজোক সাধ করি—পাঁঠা কাটি না। চিবিয়ে চিবিয়ে যেটেই আমরা যেতে বলে হনিয়াকে ভুলে থাকি না। আমাদের বাওবার সময় কাটা-চামচে-চুরির হুটাই কাওরাকও হয় না। বলতে পার একরকম দিশেই আমরা যেতে থাকি। একটা আত ব্যাকটেরিয়া ঝপ, ঝপ যাড়ে ধবে নিই হুতো পায়ের সাহায্যে। হুদিক থেকে হুতো হুতো পা বার করে যখন ব্যাকটেরিয়াকে যেতে বসি—সে দৃশ দেখলে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বা বলবে, আমরা হাত হুতো 'গৌর-নিভাই' 'গৌর-নিভাই' করছি উদর-পুতির কাজে। তাবশর ব্যাকটেরিয়াকে সেলের মধ্যে এনে একটুখানি আরগার মধ্যে হুজমের উদ্রন চালিয়ে দিই।



যেইছু গ্রহণ করবার সেইহু সেলের মধ্যে গ্রহণ করি, আর সেইহু কেনে সেবার সেইহু বর্জন করি। সেল থেকে ছিড়তে পুত্ব করে বাইরে কেনে দিই। যে-কোন ব্যাকটেরিয়া

দেখলেই আমাদের নাল গড়ে না—বাওরার জন্তে আমাদের পঙ্কসই ব্যাক্তিরিয়া চাই।

তোমরা ঢুক ঢুক করে জল খাও; আমরা জল খাই কিন্তু এখন আওরার করে পাড়াপড়ীকে জানিয়ে নও। অন্যথাসে সেলের ভিতর দিয়ে জল এসে পুক জল করে দিবে বাবা। তাছাড়া সেলের মধ্যে জল সঞ্চয় করার ব্যবস্থা আমাদের আছে—সুখে জলের হতো কনট্রাক্টাইল ডাকুয়োল। জলের পরিমাণ কমাতে বা বাড়াতে কনট্রাক্টাইল ডাকুয়োল বন্ধ করতে বা খুলতে হয়। এখন এইসব ডাকুয়োল ছুটকটি ফাটে তখন তোমরা দেখলে কিজাশা করতে—অপুনে রোগী ছুটি ছুটকটি পেটে? রাঘচক্র! তা কেন হতে পারে? এ যে জলের ব্যবস্থা টিক রাখার উপায়।

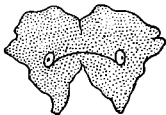
তখন বেথাকে পড়লে কোন শরী না। 'গাচা আপন গ্রাণ ঝাচা' বলে চম্পট দেব। কিন্তু তোমরা কেনে রাধ বিপদে আমরা নির্ভর। বিপদের সাহসে আপনাকে বলে ধরবার আমরা এক অবহুসকণীয় কৌশল বার করেছি। যেননি বহিঃশত্রু বা অন্ত কোন হুৰ্ণোগ আমাদের দিকে ঘনিষে আসে, আমরা আমাদের প্রত্যেকের চারপাশে আত্মরক্ষার জন্তে হুর্ন্তে প্রাচীর তুলে দিয়ে পোষনেই বলে থাকি। 'চোম ভোলা' বলি, কিন্তু স্থানীয় জল করি না। আমাদের আত্মরক্ষার এ প্রাচীর আমাদের যাক্সিনো-সিগ্জিড লাইনের চেয়ে বেশী হুর্ন্তবনীয়। সেই আত্মরক্ষার নিবিঘের অবস্থাকে আমাদের পণ্ডিতরা নাম দিয়েছেন আমাদের এনসিটমেন্টের অবস্থা। এ অবস্থার আমরা বহুদিন ধরে পূর্ণত্ব দুপাট ঘেরে বলে থাকতে পারি এবং

এমনি করে বলে থেকেই আমরা সূত্ৰকে উপহাস করি। তারপর আবার বেদিন হুগিন ঘনিষে আসে, তবুনি আমরা সিস্টের প্রাচীর ভেঙে বাইরে চলে আসি এবং আমাদের বাতাবিক কীবন-বাতা শুরু করি। মরবো না গো, মরবো না—অন্ত সবকে আমরা মরবো না। এই আমাদের ভর।

তোমরা হুতো ভাবতে পার, এই বন্ধ প্রাচীরের মধ্যে আমাদের কীবন হাঁপিয়ে ওঠে। আরে বাবা, মোটেই তা নয়। আমরা ওই আবরণের বাইরে নিজেকে অজন্ম ভাগে ভেঙে অজন্ম হুবে হুবে আখিনবতে রূপান্তরিত হয়ে বসি।



টিক রক্তবীজের ডাড়ি বের। হৃদয়ের হলেট এক থেকে বহু হয়ে বেগিয়ে আসতে পারবো। শিল্প হলো বেন আমাদের আত্মকার। এর মধ্যেই রয়েছে বাণেশ্বরের উপায়।



তোমাদের বউরা এখন কানে কানে ফিস্ফিস্ কথা কয়, সে-সব দেখলে শুনেলে আমাদের বড় হাসি পায়। কথা কয় তোমরা প্রেম, ভালবাসা, আরও কত মিষ্টিমিষ্টি কান-কানি চাও-চাচি করে দেখি। দুততে কি পারো, না পেরেও বোঝ না যে এই নির্ণয় পুথিবীতে প্রত্যেকে নিজের কাছেই পরব-প্রিয়। পরকে আপন করা তো নিজেকে ভালবাসার নামান্তর মাত্র। তোমাদের বিবে-সাদি নিয়ে বেধি এত খুঁচ-খাড়াকা। আমরা সোজা-সজি তাই দোস্তর খোঁকার পথ ফেড়ে দিয়ে অন্ত রাত্তা ধরেছি। পরের জন্তে মন কাড়াকাড়িতেও আমরা ব্যস্ত নই, আমরা আমাদের নিজেকে সেলকে ভেঙে বাণেশ্বরের খাতিয়ে হুখানা করে দিতে পারি। ওই মস্তুর পড়ে সাতপাক ঘুরিয়ে উলু দেওয়ার পরের সেন তো বাণেশ্বরিতে, তাই ওতে কিছু নেই। পরের দিকে আনমনা হয়ে চেয়ে বলে থেকে ছুড়কি বাধবার স্বপ্ন দেখি না, কোন মনচোয়ের প্রতীক্ষাও করি না। যদি বলো এ আমাদের আত্ম স্ত্রী তি—তা হ'লে তার জ্বাবে বলবো—এতেই আত্ম-তুতি, এবং এই দিয়েই আত্ম-বিস্তৃতি।

আপল কথা কি জান, আমাদের এই এক কোষের মধ্যেই এক অবিনশী শক্তি আছে, যাতে আমরা মরেও যরি না; যাতে আমরা এক এক জন একলা হলেও, আপসে প্রত্যেকে একাই একশো। আমাদের ভিতর দিয়ে, সময়ের

- সহযোগিতার ভিত্তর দিয়ে এই পৃথিবীর মহান্ গ্রাণ শত ভবিষ্যৎ ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা হচ্ছেছি অতিব্যক্তিগত। তাই বলছি, তোমরা এখন আর মানবপনা কোরো না, লক্ষ্মীটি! স্বর্গের সমস্ত ভবিষ্যৎ তোমাদের ভগবৎ। অত অকৃত হয়ে অ্যাটম ছেঁড়া ছিঁড়ে অশাবধান হচ্ছে না। স্বর্গ-কৃতি-প্রণয়ে ক্রমচক্র আছে অ্যাটমের মধ্যে, দেখে, তা না তোমাদের গলাটা কেটে ফেলে।

এত বলছি বটে, কিন্তু আমরা তোমাদের কোন অভিশপাত দিতে বসিনি এবং স্বপ্নও কখনো ভাবিনে যে, তোমরা রাতে চাঁদর গায়ে দিবে শুবে পড়লে তার পরের দিন সকালে দেখা যাবে যে, তোমরা আর সে 'তোমরা' নেই, বরং লক্ষ আমাদের মতো অ্যাথিবার রূপান্তরিত হয়ে বিছানার ঘোরাঘুরি করছে। তোমরা যা আছ বাবা

তাই থাক। শুধু এই দৃষ্টিকে আর রগাতলে পাঠিও না। এই আমাদের মিনতি। এখনও ক্রমবিকাশের শেষে তোমাদের সম্ভাবনা অকৃত, আশ্চর্যবৃত্তির পরিধি অপার, সাক্ষ্য অনাগত। কথা রাখ, এই জীবনের ডোঙ্কবাঞ্জীতে তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ডুলো না। আমাদের জ্ঞপ শোধ করার কথা স্বপ্নও ডেবো না, অ্যাথিবার চিরকাল 'অ্যাথিবার' থেকে যাবে। কিন্তু যাহ্নন কেন কখনো না 'গুন: অ্যাথিবার ডব' হয়ে বাব—তাৎপলে হ্রঃের আর শেষ থাকবে না। কথা দিছি, তোমরা লক্ষীচেনে হলে, আমাদের মাসভুতো ডাই ওই এনটামিবারের চুপি চুপি বলে যেব—তারা কেন আর তোমাদের পেটের মধ্যে মিথ্যা কামড়ানোর দক্ষবজ্ঞ না করে। এই হলো অ্যাথিবার শেষ উক্তি।



ইহাবীঃ দেখিতে পাওরা যাব সার্টিফিকেট সহসিত পুস্তক প্রকাশ করা একটা ফেলন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বুঝা আবশ্যক যে, সার্টিফিকেট দেখিলেই পাঠকের মনে সন্দেহ হয় যে এ লেখক সার্টিফিকেট ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, তাহাই সার্টিফিকেটবাতা করা করিয়া, বা অনুরোধে পড়িয়া, অথবা আশাতন হইয়া সার্টিফিকেট বিয়াছেন। মনে এই সন্দেহ হইলে আর সে রচনিত। বা রচনার প্রতি পাঠকের প্রত্যাশাকে না। অতএব তখন সার্টিফিকেট উপকার না করিয়া অপকার করে।

শোক

সন্তোষকুমার শ্যাম



ওরা সবাই হঠাৎ একসঙ্গে এভাবে
নেবে গেল কেন। আমি কিছু বুঝতে
পারছি না যে। বুকের ভিতরটা কেন
করছে।

এ ঘরে তাদের জুড়ল আঁজা হেলেনি ;
ও-ঘরে গানের আদর। হঠাৎ কে বেন
এসে পাঁড়াল। চৌকাটে পাড়িয়ে কী
বলল ; চাপা গলা, তনতে পাইনি।
কিন্তু কি করে ওরা কী বললেনি করল। তার পর
নিঃশব্দে, ব্যস্তভাবে নেবে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

আর আমি, নতুন আচরের লোতে ভাঁড়ারে চুপে
কিচের বসন্তা ছুঁয়ে কাঁপতে থাকলাম। কিছু বুঝলাম না,
কিছু শুনলাম না, ওরা আমাকে কেন কিছু বলে গেল না,
কেন একলা ওত বড় বালাটার আদাকে হেলেনি সেল।
আমি যে ভাবব, আমি যে ভাব পাল।

এই বে-মেয়ামতী বাড়িটার জ্ব-বরা কঙালো
খিটখিটে, জানালা-কবাট সব ভীতু, হাওয়ার লাড়া সেলেই
খুলে যায়, সব পাঁড়ায়, ঈর্কটক করে কাঁশে। এখন যদি
হাওয়া হানা দেব আমি কী করব। অন্ধকার পেয়ে সব খুলো ত
আমারই উপর কাঁপিয়ে পড়বে, হুঁহাতে খুঁ ঢেকে আদরকা
কি করতে পারব ? হুত মরেই বাব। কড়ের কাপটে
নয়, ভয়ে। ডাক্তার বলেছে, আমার কলকে বড় বুপুকে,
হাফু বিনোনা। বলেছে কথা কথায় ভব পেতে বেরে।

তার চেয়ে হাফাওড়ি দিয়ে দেয়ালের কাছে যেতে চেষ্টা
করি না কেন। হাত বাড়িয়ে জানালার পান্না ছুঁতে চেষ্টে
দিই, ঝিকিনি হাতে যদি না পড়ে তবে জানালায় শির
ঠেকিয়ে ত পাঁড়াতে পারব।

তা-ও যদি না পানি, তবে অস্তত বদবার ঘরের ওই বু-
কেন্দার আঁড়ালে লুকাব। ওটা হুহুত আছে, সহজে
নড়ে না। তারপর, থানিক দাপাদাপি করে হাফালাবার
হাওয়া; ধন পালিয়ে বাবে, তখন আবার হাফাওড়ি দিয়ে
ওই অন্ধকার কোণ থেকেই বেরিয়ে আসব। বেগা
চেয়ারটা তখনও হুত খুলোয় ছেয়ে থাকবে, তা হাফুক।

চেয়ারে চিত হয়ে ওবে চোপ খুঁখব।
ইপাব। জিহটাকে চোয়ালের ভিতরের
দেহালে বুদিয়ে বুদিয়ে কিংবা ঠোট চেটে
চেটেই পিনাসা বেটাব। পিনাসা যাবে,
আবার ভব বাবে। ভব ধন বাবে, আমি
তখন ডাবব।

আর কিছু ত পারি না, চলতে না,
সোজা হয়ে পাঁড়াতে না, পড়তে না,
সেতে না, বলতে না, কিন্তু ভাবতে এখনও পারি। হুখের
কথা, হুখের কথা। পুরনো হুখের কথা ভেবে ভেবে হুখ
পাই, হুখের কথা ভেবে হুখ। একটা জায়গায় পৌছে
ছুটাই এক হয়ে যায়। আলাদা করে চেনা যায় না।
যেন হুখ হুখনি।

কতদিন ভেবেছি, হুখ পাবার কুহতাইবুও বেদিন
লাকবনা, তার আগেই যেন আমার হুখ হটে। অথবা
হটেবার প্রয়োজনও বুঝি হবে না, কারণ ওই কুহতাইবু
যোয়ানোরই আরেক নাম হুহা।

হুহা আসলে আগালা কোন ঘটনাই নয়। সলতে
হুিয়ে আলো এক সময়ে নেবে। কিন্তু ঠিক তখনই কি
নেবে ? যে মুহুর্তে জলেছিল, সেই মুহুর্ত থেকেই তো
নিখোও আসছিল। সলতেটা ধন জলছিল, তখনই
পুড়ছিল, একই একই করে বিবছিলও। আদা বেধন
এক একট মুহুর্তের মধ্যে একই-একই করে বাঁচি, সেই সময়ে
তখনই একই-একই করে হরিও। আন্তে আন্তে করে
হুয়েনের পালাও এক দিন হুয়োয়। সেই পুড়তাকেই
আদা বলি নব। সব-শেষকে, সব বিয়োসের যোগকলকে
ঢেকে দিই লাফা চাকরে ; সমাযোহে সমাখি দিই।

হুহুর কথা থাক। হুখের কথা বলছিদুব, তাই বলি।
অনেক দিন ভেবেছি, শিও যাটিতে পড়েই কাঁদে কেন।
তার হুখ কী। কেউ জানে না, বড় হয়ে সে কথা কাকুর
মনে পড়ে না। বিজানীরা নানা রকম ব্যাখ্যা করেন।
কিন্তু এটা তো ঠিক, হুখের আদিয়ে বেদন অন্ধকার,
অহুহুতির আদিয়ে তেমন হুখ। বোথ হয় অন্ধেও।

আজ আমার এই চেত্নায়ে শুয়ে শুয়ে, বহন বড় বেয়ে গেছে, আমার ঘনের ভর কেটেছে, তখন আমি, মশা, অস্ত্র সব পনের কথাই ভাবা যেত। কিন্তু এখন আমাকে ভাবতে হবে—ওরা গেল কোথায়।

•

ওরা নুকেতে চেয়েছিল। কিন্তু শাবল না ত।

জানতে আমার কিছু কি বাতি হইল।

বড় বউন কিংবে এসেছিল সবায় আগে। তেবেছিল আমি ঘুরিয়ে গড়েছি। আঙে কবাট বেঁলে ঘরে চুকতে বাবে, আমি একেবারে সামনে পথ ছুড়ে পাঁড়ানুহ।

“না!” অবস্থিতে, ভয়ে ও বেন টেঁচিয়ে ওঠিল।—
“আপনি এখনও ঘুমাননি?”

সে-কথার জবাব না দিয়ে বললুম, “এত রাতে কোথায় গিয়েছিলে বউমা?”

কিছুদিন থেকেই কথা জড়িয়ে যায়, নিজের গলা নিজেদেরই বেন ভেঙে কাটে, তবু বলাসাধ্য স্পষ্ট করেই উচ্চারণ করতে চেষ্টা করলুম।—“কোথায় গিয়েছিলে, বউমা। হুইল, অনিল, এরাই বা সব কোথায় গেল।”

“সিঁতল কাকার বাড়ি।”

“সেখানে? হঠাৎ? এত রাতে?”

বউমা এবার আমার চোখের দিকে সোজা হুঁকি চাইল। চোখ নামিতেও নিল সকে সকে। দৃষ্টলুম, ইতস্তত করছে। আঙে আঙে বলল, “কাকার অস্থব।”

“ঐ অস্থব বউমা?”

“এমন কিছু নয়। মাথা ঘুরে গড়ে পেছলেন।”

দৃষ্টলুম, মিছে কথা বলছে। মিছে কথার মুস্কিলই ভই, কেমন বেন টের পাওয়া যায়। অন্তত আমি টের পাই। অনেক বহন হল ত, এখন আমি মুনমুন বুড়ি। অনেক কথা সায়া জীবন ঘরে শুনেছি, কেন্দ্রটা সত্যি কেন্দ্রটা মিথ্যা চট করে ঘরে ফেলি। বলার ভঙ্গি, শব্দের ভারতম্বা থেকেই টের পাই।

আমার কথার কোথা থেকে এত জোর এল জানি না, বলে উঠলুম, “বউমা, আমিও বাব।”

ও অবাক হয়ে চাইল। আমার পা হুটী তখন ঠকঠক করে কাঁপছে। ও বলল, “বা আপনার মাথা খাড়া হয়ে গেছে। সোজা হয়ে পাঁড়াতে পাবেন না, আপনি যাবেন অন্তত?”

জেন করে বললুম, “বাবাই।”

“বেশ, আপনার ছেলে আশ্রয়, তাকে বলবেন।”

ওর গলা ছড় শোনাল। বাপ করেছেন

আমি সেই থেকে ঘুমোইনি, অগ্নিকারেছি, ভগ্না বহন কেবে, অনিল আর হুইল। মাকে মাকে চোখ জড়িয়ে এল, তবু জেগে রইলুম। ওরা ফিরল একেবারে শেষ রাতে।

ঘউমাই হরক্যা খুলে দিয়ে থাকবে। আমি নিজেই টেনে টেনে হরক্যার কাছে নিয়ে গেলুম। ওরা ফিরল করে কথা বলছে।

“এখানেই একই আশ্রয় আস। এক ইকরা লোহাও হুইয়ে দাও...ভাগভও ত ভিজে...মাকে এখনই কিছু বলা, কই পাবেন।”

বউমাকে চাপা গলায় বলতে শুনলুম, “বা কিন্তু আমার কিংবে আসা অবধি জেগে ছিলেন। বার বার জিজ্ঞাসা করছিলেন। ওখানে যেতেও চেয়েছিলেন।”

সবই ত জানলুম।

কী ভাবে, কখন বিছানায় কিংবে এসেছি, জানি না। চোখের পাতা অল অল হয়ে হুঁকিছিল, তবু, কী আশ্রয়, ঘুরিয়ে গড়লুম। কব বহন, শব করে মাকে মাকে নাইতে নেবে জলের নীচে ছুব দিয়ে থাকলুম। হতশন পায়রা বার। এই ঘুমও তেমনই। ভোয়ে ভাঙল না, বোম উঠলেও না, ধড়মড় করে বহন উঠে বললুম, তখন বেসা অনেক হয়ে গিয়েছে।

বউমাকে বললুম, “এতখানি বেশা হয়েছে আমাদের ডেকে দাওনি?”

“আপনি যে ঘুমোছিলেন।”

“যোকা কোথায়? ডেকে দাও।”

অনিল এসে পাথরে কাছে বসল। ওর হুটী চোখই লাল। ও-ও কি বেঁয়েছে? এ-বহনের ছেলেরা কি কাঁদে। শুয়ের ত শু হালাহালি করতেই কেহি। বোধ হয় কাঁদেনি—লাল চোখ হুটিতে শ্রমানে রাত-আগার চিল।

বললুম, “যোকা নুকোমনে। আমি নব হুকেছি। কী হয়েছিল বল ত। সিঁতল ঠাকুরগো কী বোখ—”

“সোণ তেমন কিছু নয় ত। ক’দিন থেকেই বলছিলেন, হুইল লাগছে। আমাদের এখানেও আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।”

দুহু গলায় বললুম, “ঐ। ঠকে অন্তত চার দিন বেশিনি।”

“হঠাৎ মাথা ঘুরে কলভলার গড়ে গেলেন। বধাধরি করে ওরা শোবার ঘরে নিয়ে গেল। ডাক্তার এল কিন্তু আধ খরার মধ্যেই সব শেষ।”

“সব শেষ?” আবার স্বর আর্ডনাশের মতো শোনা সেন হযত, খোকা এগিয়ে এসে দিঠে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল।

“যোগদা! আসলে কিছু না। এ-বহসে, মা, বহসটাই হোগ। শরীর-মনের ঝোড় ত থাকে না, সামান্য কিছু হলোই লোকে জেতে পড়ে। অল্পখটা উপলব্ধ। তা ছাড়া দিতেশ কাকার সমস্যা হয়েছিল—একাত্তর বছরে পড়েছিলেন।”

একাত্তর? চমকে উঠলুম। আতে আতে বললুম, “এই আখিনে আবারও সমস্যা বছর পূর্ণ হবে, খোকা।”

খোকা কিছু বলল না। দিঠে হাত বুলিয়েই দিতে থাকল।

হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসে বললুম, “খোকা, আমাকে একবার নিয়ে যাবি?”

“হুঁমি? হুঁমি কী করে যাবে। গিয়েই বা কী হবে।”

“নইলে, নইলে আমি যে শান্তি পাব না।”

খোকা বলল, “ছি, মা, ছি। অতটা ব্যাকুল হতে নেই।”

এতক্ষণ সব আবেগ চাপা ছিল, এবার হাহাকার করে বলে উঠলুম, “তোরা জানিস না। দিতেশ ঠাকুরপোর সঙ্গে আমার কত দিনের চেন।”

মাথা নীচু করে খোকা বলল, “জানি মা, সব জানি।”

সব জানে? ও-কথা কেন বলল খোকা। কী জানে, কতটুকুই বা জানা ওদের সম্বন্ধ। কিছু না। হযত মন-গড়া করেচা। ধারণা নিয়ে বসে আছে। একই আগেও বলেছে—ছি, মা, ছি। ছি বলতে গেল কেন। অজান্তে আমি কী করেছি।

অনেক কথাই মনে পড়ছে।

কবে থেকে চিনতুম দিতেশ ঠাকুরপোকে। বছরের হিসেব ত নেই—সেই তের বছর বয়স থেকেই, যখন আমার বিয়ে হয়েছিল, যখন নাকে বোলক পড়তুম। শুধু আমি না, আমার বহনী সবাই পড়ত।

সেই বেকালে মনটা একটু তরল, একটু বাত্বীর পদার্থ ছিল, অল্পত সব কিছুতে বিয়াস করত। তখন জানতুম, অনেক কালো বেড়াল একসঙ্গে কড়ার ডেলে চুবিবে আল দিয়ে বিধাতা অমাবস্তার অন্ধকার তৈরি করেন। পুতুলকে তখন প্রাণহীন মনে করতে নিখিবি, তা সে বেঙ্গার পুতুলই হ’ক, কি পুজোর পুতুল হ’ক।

বিয়ের পরে শিবপুজো আর করিনি। স্বামীকে

শেখুম। শুনলুম, তিনিই আমার শিব। -বেঙ্গার পুতুলেরা পরে কোলে এস।

আর এলেন দিতেশ ঠাকুরপো। আমার স্বামীর বন্ধু—কিন্তু বহসে অনেক ছোট। প্রায় আমার সমবয়সী। বলতে তুলেছি, আমার স্বামী বহসে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। বাঙলার বাইরে ছোট একটা শহরে ঢাকরি কয়তেন—বিয়ের পর প্রথম কয়েক বছর তাঁকে দেখিইনি।

কিন্তু দিতেশ ঠাকুরপো আসতেন। খুপ থেকে জলপানি শেয়ে পাস দিলেন, কলোজে চুকলেন। তাঁর সঙ্গে গল্প করতুম, বেগতুম, শাওড়ির কাছে হমক পেয়েও ছাত থেকে সিঁড়ি দিয়ে একতলা অবধি ছুটোছুটি ছাড়িনি। পাড়িটা যদি বলে বায়-বায় হয়েয়ে, সম্মা পাউনি, আচলট। কবে কোমরে বেঁধেছি। কখনও শাড়িটার পাড় পাখে জড়িয়ে গেলে ছোট্ট খেয়েছি।

শু খেলাই না। দিতেশ ঠাকুরপোর পড়ার বইও দুকিরে পড়তে শুরু করে দিয়েছিলাম। ওর সঙ্গে কত যে বগড়া, হত, তর্ক হত। বই পড়তুম, পিছু বুকতুম, কিছুটা বুকতুম না। যানে জেনে নিয়ে কেও পড়তুম। শেষে একদিন ওর কলোজের ক্রাসের বইও পড়তে আরম্ভ করে ওকে প্রায় ধরে ফেললুম।

এরই ঠাকে ঠাকে স্বামী যখন আসতেন, অবাক হতেন। “হুঁমি এত সব শিখলে কোথায়?”

“সিছু ঠাকুরপোর কাছে।” নিঃসঙ্কেতে বলতুম।

স্বামী বললেন, “ও।”

একটিমাত্র অক্ষর, তবু মনে হত একটু যেন আহত বর, একটু-বা গভীর। তখন মস্তোচ্চ হত।

কখনও কখনও উনি রেগেছেন, মাঝার খোলা চুল, ঘোমটা নেই, দিতেশ ঠাকুরপোর সঙ্গে দিঁড়িতে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করছি। উনি লেখতেন, থমকে থাড়াতেন, মনে হত কী বৃষ্টি বলবেন, বলতেন না, নিজের ঘরে চুকতেন।

একদিন দেখি, বাসে গোছাচ্ছেন। ঠুকে দেদিন কাকের জায়গার কিরে বেতে হবে। বললুম, “আবার কবে আসবে।”

বললেন, “আর আসব না।”

“কেন?”

“হুঁমি বৃষ্টি হও না বলে।”

বলে উঠলুম, “মিছে কথা। খুব বৃষ্টি হই।”

বিরস পলার উনি বললেন, “তাঁর চিহ্ন ত বেঁধেনে।”

ছেলেমাছ হিম্বন ত, রোখ চাপলে তখন চূপ করে

যেতে পারতুম না। “কে এলে আমি খুঁশি হই, তোমার মনে হয়?”

উনি শব্দে ধরে বললেন, “নাচটা নেহাতই পি আমায় মুখে তখনই হবে? সে পি তুমি নিজের জান না?”

চলে বাবার আগে উনি কাছে এসিয়ে এসেন, আমার তিরুচ তুলে ধরে বললেন, “তুমি জান না, বৃত্তে পায় না, আমি কত হুংস পাই।”

হুংস! এই কথাটার নতুন অর্থ তখন সবে জানতে পিবেছি। আগেও হুংস ছিল—গাছে উঠে পেছারা পেড়ে খাওয়া যেদিন ব্যঙ্গ হুংস ছিল, সেদিন হুংস পেয়েছি, না ছড়িয়ে বলে কেলেছি। এই সেদিনও ত হুংস হত মনের মত পাড়ি পড়তে না গেলে। সে-ও হুংস—কিন্তু অর্ধের পোশাক বহলে আঁক ধরে এসেছে। সকলের রোগ আর হুংসের জালা যেমন এক হয়েও আলাদা।

সেদিন উনি চলে যাবার পর অনেকক্ষণ কেদেছি। আগে কান্নার পাত্রে কাঁটা ছুটলে। এখনও কাঁটা ছুটলে কাঁদি, কিন্তু সে-কাঁটা পাত্রে কোটে না, নদীরের কোথাও না।

স্বপ্নের বাস বহলে গিয়েছিল, যাঁছিল। নরম বালিশে গুরে দুমিয়ে পড়াই দেয়া স্নহ, অল্প বয়সে তাই জানতুম। কিংবা স্মৃতিতে উঠেলে কোড়োদোড়ি করে দিল স্কুলে। কিন্তু দীর্ঘ রাত জুড়ে বিছানার কেঁপে থেকে ছুটকট করা, অথবা কোন একজনের কথা অহিনিষি ভাবাও যে এক ধরনের স্নহ, সেটা অল্পকৃতির পর্যায়ে সবে একই একই গোলা দিতে শুরু করেছে। সেই স্নহ প্রিয়জন কেউ এলে থেকে থেকে হুক কাঁপে। তার আসন আমকে বুকে আসা চোখের পাতায়।

আবার বাবা কিন্তু তাঁর এখন মৌনের হুংসের স্নহে সহজেই সন্ধি করে নিতে পেরেছিলেন। কিছুদিন পরে বলকাতোতেই একটা কাক নিয়ে ফিরে এসেন। কোলে থোকা এল। সিতেপ ঠাকুরপো একটা কসকে প্রফের হয়েছিলেন, নিয়ে কখনো, রোজ বিকেলে আগলেন। কিন্তু ঠেকে কোনদিন আর অল্পযোগ করতে গুনি।

কেননা, আমাদের সম্পর্কটা তিনি তখন খরতে পেরেছিলেন। দুটি সমবয়সীর সখা; রুচির মিল। হরত তাইই উপরে আবেগের হালকা রঙের প্রলেপ। তার বেশি কিছু না।

উনি বুঝতেন। আদরা যখন পল্ল করছি, এসে

বসতেন। ইচ্ছা হলে আমাদের কথাই যোগ দিতেন। আবার উঠেও যেতেন।

কিন্তু ছেলেরা বোঝেনি। অনিল না, সুবীন্দ্রও না। আঁক যে-সময় অনিল বলেছে ‘ছি, যা, ছি’, সেই তিরতায়ের ভবিষ্যি কত দিন ওদের চোখে মুখে উঠতে কেলেছি। ওরা বহন বিশেষ তখন থেকেই।

হরত পাড়ার লোক কিছু বসত। বহুরা ঠাট্টা করত। অনিল এক একদিন হিয়ে গলায় বলেছে, “সিতেপ কাকা রোজ-রোজ কেন আসে যা, কেন আসে?”

“হা-হে, কাকা হন যে তোমার, আসবেন না?”

“কাকা না আরও কিছু। আমি সব বুঝি, সব জানি।”

মনে পাশ নেই, তবু আমার মূখ মাথা হয়ে গিয়েছিল। উনি আজলে কোথায় ছিলেন, এগিয়ে এসে ঠাম-ঠাম করে ছেলেকে করেকটা চড় খেয়েছিলেন। আমি ত মা, ছাড়িয়ে থিতে গিয়েছি, অনিল আমার হাতে টেলে সরিয়ে দিয়েছে। ঠাড়িয়ে ঠাড়িয়ে মার খেল, তবু আমার কাছে এল না, ওকে ছুঁতে দিল না।

সবই আঁক মনে পড়ছে।

সিতেপ ঠাকুরপো ঘরের একজনের বড়োই হয়ে গিয়েছিলেন, তবু তাঁকে ওরা সহজ ভাবে মনে নিতে পারেনি।

ঐম বহুরা পর সিতেপ ঠাকুরপো একদিন বলেছিলেন, “আমি আর আসব না।”

“কেন?”

“ছেলেকা হরত পছন্দ করছে না।”

দুঃ ধরে বলেছি, “বাঁচি ছেলেকে একার নয়। তোমাকে আসতেই হবে, ঠাকুরপো।”

উনি আমার বিকে খানিকক্ষণ চেয়ে বইলেন। পরে দীর গলায় বললেন, “আজ্ঞা।”

রোজই আসতেন। খান কাশড় পরে, পুঙ্খো সেয়ে ঐর কাছে গিয়ে বসতুম। তখন আলোচনার বিষয়ও থাকে গিয়েছে। আগে বেশির ভাগ কথাই হত শিরকলা বা সাহিত্য নিয়ে, এখন জানিনা কী করে বা কোথা থেকে ধর্মের প্রশ্নও এসে পড়তে লাগল। যা নিয়ে কখনও ভাবিনি, সেই বরজীবনের পর-জীবন নিয়েও কত দিন কত কথা হত। আমার কথা আলোচনা করেছি আমরা, ভক্তির কথা, হুঁজির কথা।

বহন অলক্ষ্য হাস্যরসও। আমাদের রুচিও বহলে ধরে। আমরা বেড়াতেও বেহুদ দক্ষিণেশ্বরে, বেহুড়ে। দক্ষিণে গিয়ে কথকতা শুনতুম।

বলে ধারিতের খাতায় ধানের নাম ওঠে, তাহের বৃহ্মতে
কি কেউ কাশে ?

কাশে। বৃহ্মার শোকে বৃদ্ধিহাই কাশে।

সে কামা শুধু বিচ্ছেদের নয়। প্রতিটি সমবয়সীর মরণ
তাহের স্মরণ করিয়ে দেব যে, তাহেরও বাবার দিন
এল বলে।

আমিও ধাব। তাই কাশছি। আমি মরলে কেউ ত
কাপবে না, তাই নিজেই মরণের কামা নিজেকেই কেঁপে
রাখছি।

আমার ছেলে, ছেলের বউ তুল বুকেছে। ডাবছে
আমি কাশছি পিতেশ ঠাঁহুরশোর শোকে। তা ত নয়,
আমি কাশছি আমার নিজেরই বৃহ্মা-শোকে।



সুখান্তের পথ

উষা সেনী

নিত্য সিনের শেষে পড়খ বেগার
এ ঘিণ-বিড়ক সত্তা বোধন-মর্দরে
মুহমুহ তরলিত হায়ে—
আজো কেন তোমাকেই চায়ে ?
যানি আমি তোমাকেই চায় অহঙ্কণ
একটি মেয়েলি মন।

কেন এই অশ্রুহীন—কেন এই রত্ন উত্তাপ ?
কেন বা সোভায় এক দুর্দৈব পাণ ?
কেন এই তিক্ততার দৃশ্য অভিশাপ
বিবাহ করেছে আশ সব্ব জীবন ?
—একটি মেয়েলি মন।

আমি কি করিনি তপ পায় হ'রে চলে যেতে এই নরতাকে
কঠিনের দুঃসহ বিপাকে ?
আমি কি ফেলিনি ছুঁড়ে আরাবের রত্ন রেণম
পরিশ্রমে হইনি নির্বম ?
কেন তবে লতপাকে ধানে এক অসহ্য দুঃখ
—লোকে থাকে বলে ভালোবাসা ?

আমাকে নৃহিত করে চন্দন-তরুর কোনো বিধাত সৌরভ—
আমার বাধীন সত্তা হারান হারান বৃষ্টি সমস্ত সৌরব !
জীবন-পুষ্পের দৃঢ় বৃন্ত মাঝ দিলি কোমল
ছব্বের অগ্নি করে হ'রে অশ্রুজল
—এ সমস্ত দুর্ভাগ্যের একক কারণ
—একটি মেয়েলি মন।

হয়! পালাও তুমি সুখান্তের অন্ধকার পথে
সমস্ত রত্ন মেষ—রত্নে আশায় মেষ
রত্নে বাসনা আর সুখাপার সমস্ত আবেগ
শিষ্ট ক'রে বরাহীন নিশ্চেষ্ট অরক্ষিত।
এ বন্দন ছিঁড়ে ধাবো কঠিন দুঃহাতে
ছড়াবো ভারের মণি অন্ধকার রাস্তে,
অন্ধকারে বিল হাবে উৎপাটিত চংগিওর আরক্ত মণিকা,
কয়েকটি কবিতার সমস্ত কণিকা !

চোর

জ্যোতির্বিজ্ঞান মন্ডলী

আমি যেদিন পৈশে চারটা পুঁতলা ঠিক পৈশি ও আমাদের বাড়িতে এল। তখন প্রাণ মাসের বিকেল।

তুলে দাবার সময় রাত্তার নরমার পাশে সন্মুখ কটি, আমার আঙুলের সমান, কি তার চেয়েও ছোট লিকলিকে একটা পৈশে চারা চোখে পড়েছিল। কচু আর কাটা-নটের ভঙ্গের মাঝখানে চাবোটা চূর্ণচূর্ণ দাঁড়িয়ে আছে যেন আমার তপসি লোড হজিল ওটা তুলে নিই। কিন্তু রাসে গাছটা রাখার সুবিধা হবে না, এ ও পাঁচটি ছেলে হঠাৎ ওটা হাতে নিয়ে সেত: চাইবে, বেগতে বেগতে হাতের চাপে নরম চারাটাকে চটকে ফেলবে—তা ছাড়া আমার পকেটে লুকিয়ে রাখলেও বোলা চাবটে পঞ্চম ওল-মাটি ছাড়া ওট্টুই গাছ শুকিয়ে আপদরা হয়ে বাবে তিনা করে তখন সোভা তুলে চলে গেছি। কুল ছুটি হওয়ায় অল্প কোমরটিকে না তাকিয়ে কারো লক্ষ একটা কথা না বলে আমার সোভা সেই নরমার পাশে কচু আর কাটা-নটের ভঙ্গের কাছ চলে এসেছি। তারপর হাত বাড়িয়ে টুক করে পৈশে গাছটা তুলে নিয়েছি। বর্ষাকাল। মলে ডিগে ডিগে মাটি এমনি নরম হয়েছিল। আমার খুব ভাল লাগল অল্প ভাড়াঘড়ো করে গাছটাকে মাটি থেকে উগড়ে ফেলার পরও এখন দেখলাম মন নবর সূঁচের মতন সৰু লম্বা আর কুণ্ডের মতন লামারঙের ঘূলটা আর মূলের চারপাশের মূলের মতন সৰু ছোটোলা লিকড়গুলোর একটাও ছিঁড়ে বা ভেঙে যায়নি। যেন মূল ও শিকড় সমেত চারাটা আমার হাতে উঠে আদতে তৈরী হয়েছিল।

হ্যাঁ, তখন বিকেল। আমাদের রাত্তারের পিছনে ছাই আর মজাল নিয়ে চারহাত পাঁচহাত একটুকরো ছবি দিনের পর দিন বহুরের পর বহুর এমনি পড়ে আছে। দিনরাত ছায়ার ঢাকা থাকে বলে দেখানে কোনো গাছ হয় না। এত বড় একটা বহু-ভুঁয়ের গাছ ভালোলা ছড়িয়ে

ঝমিটা অন্ধকার করে রেখেছে, দেখানে আর অল্প কিছুই চারা বা গাছ বাবা তুলতে সাহস পায় না। শীতের খোড়ার দিকে মা কি-বহুর ধনেশাক লাগতে গেছে কিন্তু হয়নি। বাবা এই পৈশিও তঁটার বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল। বীজ ফুঁড়ে মস্তগতি কুঁড়ি বেরিয়েছিল। কুঁড়িগুলো এখন হু পাতার ছোট ছোট গাছ হয়ে বড় হজিল তখন আরও আরো সব ফ্যাকাশে হু ধরে শুকিয়ে বড়কের মতন হয়ে-হয়ে মরে গেছে। দুটো-একটা ভুঁয়ের ভাল কেটে দিয়েও বাবা সুবিধা কবতে পারেনি। মুশকিল এই যে সবটা গাছ কাটা ধামনি। কাটাতে গেলে আমাদের পিছনটা একেবারে বে-আদে হয়ে পড়বে এই ভয়ে বাবা ভুঁয় গাছটা রেখেছিল।

তা হোক, আমার পৈশে গাছ বাড়বে না, ছায়ার বেগ-থেকে ফ্যাকাশে হু ধরে একদিন বড়কের মতন শুকিয়ে কাঠ হয়ে বাবে আশতা দাকা সবও আমি হু করে চারাটা পুঁতলায়। পুঁতে বেগ করে থানিকটা বাড়তি মাটি উঠ করে শুঁড়ির চারপাশে তুলে দিলাম। চৌবাড়ার ঠাণ্ডা জল মগে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে চারাটাকে প্রায় দান করিয়ে দিলাম। গিয়ে আমি বহন নৃত্ত মগ হাতে করে সোভা হয়ে দাঁড়িয়েছি তখন ও আমার পিছনে এসে দাঁড়ায়। শুকনো পাতার মচমচ শব্দ শুনে চমকে খাড়া ফিরিয়ে নেমিই কুমারদের বাড়ির সেই বে ছোকরা চাকর—নাহটা অবত তখন মনে পড়ে গেল

—মন। মিউমিই করে হাগছে।
বগলে একটা ছোট পুঁটলি।
পরনে মহলা ছেঁড়া হাক-প্যাট।
পায়ের গেজিটা আরো বেশি ছেঁড়া।
পিঠের দিকটা কেমন আছে চোখে পড়ছে না, দেখলাম বৃক্ষের দিকটা স্কুটা হয়ে-হয়ে আমাটার আর কিছু নেই।

‘হাসছিল কেন?’ আমি গভীর হয়ে সেলাম।

‘গাছ দেখছি।’ আমাকে গভীর বেশে মনও গভীর হয়ে গেল। ‘বটের চারা?’



‘তোমার মাথা !’ রাগ করে বললাম, ‘বাড়ির ভিতর কেউ বঁটাগাড় লাগায় নাকি আহোমক !’ পৌঃ চাণা। বড়ের গাটা এমন হয় ?’

কথা না বলে মনন চোখ তুলে মাথার ওপর বন্ধুত্বমূলের চূড়ানো ভালপাতার শিক চেয়ে রইল। তখন আমি লজ্জা করলাম মনটা খুব ভক্তিরে গেছে। হাত-পা কাটির মতন হচ্ছে দেখতে। কানের পাশে গলায় মহলা মনে ছাড়া পাচ্ছি। ওর মাথায় কেমন চমৎকার টেঁচি বেধেছি—তার কিছ ছিল না, বেন অর্ধেক চুল উঠে গেছে, ছোট হয়ে গেছে মাথটা। এটুটুন ছোট-ছোট চুল—তা-ও কতকাল বেন তেল-মলের মুখ দেখিনি।

একটা তোক দিলাম।

‘কোথায় ছিলি এতকাল। হুহনারের বাড়িতে তো দেখিনি ?’

‘হানো হয়েছিল। বেশে গিলাম।’ মনন আমায়ের উঠানের দিকে ঘাড় ফেরাল। ‘মা-ঠাকরুন আছেন ঘরে ?’

আমার চোখে চোখ রেখে মনন ও প্রশ্ন করল তখন হঠাৎ আমার মাথায় কথাটা এল।

‘হুহনারের বাড়িতে আর ভুই চাকরি করিনে ?’

মুখ বেতায় করে মনন ঘাড় নাড়ল।

‘না কোথায় ?’

হুঁ করে ওর রোগা হাত পা ও চেঁচা ভাষাটা আর-একবার দেখতে দেখতে পরে বললাম, ‘মার শরীর মাথাপ। সরে আঁকুড় থেকে বেরিয়েছে। শুয়ে আছে।’

‘ভাই হয়েছে বুঝি ?’

মুখ বেতায় করে আমি মাথা নাড়লাম।

‘বোন ! হাতী দৃষ্টি আমার চেয়ে করলা হয়েছে।’

মনন হুঁ করে থেকে আমার পিঁপে চারটা ভাবে।

একটা কথা মনে হল। কিন্তু ছেপে গেলাম।

‘কেন মাকে,—আমার মাকে কি সরকার ?’

মননের চোখের দিকে তাকাই।

মনন অল্প হাসল।

‘সরকার আছে।’

‘আর আমার সঙ্গে !’

কলসার দিবে হাত ও পারের কাশা বুঝে ফেলি। মুখটা বুঝে ফেললাম। হাতের পুঁটিগি তৌবাড়ার গিমেটের ওপর নাড়িয়ে রেখে মনন হাত খেঁচা পা খেঁচা তীরপর আঁজলা করে ঢকঢক করে অনেকটা ঠাটা বল খেঁচা নেয়। রোগা পেটটা ফুলে ওঠে। মাথায় আমরা দুজন সানান। আমার

বলস বেদি কি মননের বলস—চিন্তা করছিলাম। হুহতো দুজন এক বলসের দিলাম।

‘আর ইথিকে আর !’

দ্বয়ের শৈথ্যে উঠে মাকে তাকলাম।

মনন আমার পেছনে গাড়ায়।

বাঁজা বোনটাকে নিয়ে যা সব্বদত শুরু ছিল। আমার ডাক শুনে উঠে বলল। রোগা ভাষায়ে মুখখানা সরজার কাছে বাড়িয়ে নিয়ে বলল, ‘কেন, কি হয়েছে।’

‘মনন—হুহনারের বাড়ির মনন। এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে।’

মা হঠাৎ হুঁ করে রইল। মননকে ভাল করে দেখল।

‘কি হয়েছিল তোমার ?’ একটু পর মা প্রশ্ন করে।

‘ব্যানো—কালান্দর।’ মনন এক পা এগিয়ে চৌকাঠ বেঁধে গাড়ায়।

‘এখন আর ঘর হয় ?’

মনন মাথা নাড়ল।

আমায় কি ভাবল মা। তারপর :

‘ও বাড়ি গিয়েছিলি ?’

মনন এখায়ে কথা না করে ঘাড় কাঁড় করল। মানে হুহনারের বাড়ির কথা হচ্ছে। আমি হুঁ করে থাকি।

‘গিহীনার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?’

‘হয়েছে।’ মনন মার দিকে না তাকিয়ে মাটির দিকে তাকায়। ‘মা-মাকে আর রাখবে না,—গিহীমা বলল, অল্প লোক রাখা হয়ে গেছে।’

‘সে কি রে !’ অবাক হবার সরে মা বলল, ‘ভুই ওদের পুরনো লোক, এতকাল কাঁচ করলি !’ একটু খেমে মা পরে আবেত আবেত, বেন অনেকটা নিষেধ মনে বলল, ‘তা অহং-বিহীন তো মাথায়ের হবেই—অহং করল কেনে পেল, এর মধ্যে অল্প লোক রাখা হয়ে পেল ! না হয় রাখল, কিন্তু—’ আবার কি ভেবে মা মননের মুখ ভাবে।

‘মার কারো বাড়ি গিয়েছিলি ? কেউ কথা দিলে ?’

মনন মাথা নাড়ল। আর তৎক্ষণাৎ আমি বলে বললাম, ‘হুহনারের বাড়িতে “না” করে দিতে ও সোজা এখানে চলে এসেছে, জোয়ার সঙ্গে দেখা করতে !’

‘ভুবি হুঁ করে, ভুবি ধাম !’ মা আমাকে ধমক দিতে আমি হুঁ করে বললাম। হুঁ করে মননের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ও কাঁপতে আঁতর করেছে। কায়ার দশ নেই। চোখে বল আগছে আর হাতের পিঠি দিয়ে ক্রমাগত তা মুছেতে চেষ্টা করছে।

‘তা ক’র্তা আনুস—’, যা বলল, ‘একবার ঠকে জিজ্ঞাস করে দেখি।’ বাচ্চা বোনটা কেনে উঠতে যা ঘুরে বলল।

চোখ বোহো শেষ করে মনন আমার দিকে তাকায়। আমিও ওর মুখ দেখি। একটা দুখ হাদির রেখা ওর টোপের ধারে উঁকি দেয়। সম্ভবত আমার টোপের কিনারেও এমন একটা রেখা জেগেছিল। বসন্ত আমি তখনও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না অতবড় বাড়ির চাকর আমাদের বাড়িতে চাকরি করবে। তেতলা বাড়ি, বোটরগাড়ি, বেড়িও, আরও তিনটে চাকর-চাকরানী, হৈ-টৈ পাওয়া-বাওয়া—আমাদের ছোট উঠোন, টানির ঘর, কেয়ারদিনের আলো, চিমটিয়ে ঠাণ্ডা সংসার।

সন্ধ্যার দিকে বাজারের ধলে হাতে কুলিরে বাবা ঘরে ফিরল।

আমি আমার ছোট ঘরে হ্যারিকেন আলিরে পড়তে বসার উদ্দেশ্য করছি। মনন বাইরে শৈঠার অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছে। দুটা পয়সা নিয়েছিল বা ওকে। সেই সন্ধ্যারের টেনে দুটা পাখা খেয়ে বেশ খেঁকে টেনে চেপেছিল। সারাদিন খাওয়া হয়নি। তার ওপর সবে ব্যায়াম থেকে উঠে এসেছে। পরশা দিয়ে মুক্তি কিনে খেয়ে মনন অন্ধকারে বসে বিনোদিত, হাতে হাতে চড়-চাপড় নিয়ে পা থেকে মশা ছাড়াচ্ছিল। কিন্তু আমি কাশা গেতে ছিলাম বাবা কি বলে জ্ঞাত। হাত দুখ ঘুরে বাবা বিশ্বাস করতে বসে। মা উঠে চা তৈরী করে দেয়। বসন্ত এই খারাপ শরীর নিয়েই মাকে রান্না ও ঘরের আরও পাঁচটা কাজ করতে হচ্ছিল। চা খেতে-খেতে বাবা সব জ্ঞান। শুনে হাসল।

‘কেন, তিনটে লোক আছে, ভাইভার আছে, বাগানের কাজ করতে বাইরের একটা লোক রাখা হয়েছে—না হয় আর-একটা—কত বহল, আমাদের মিষ্ট রু চেষ্টে বড় হবে না—কি নাম বেন ছেলের? মনন। পুরনো লোক ওসে—এভাবে ওকে ঘুরে ওপর “না” করে দিলে?’ একটু খেমে বাবা শেষ করল, ‘বড়লোক কি আর পরীকের হুং বোকে! এমন বেচারা হয় কোথায়।’

মা বেন ও-ঘর থেকে আরও কি বলল।

বাবা চিন্তা করছে। বুকতে পারলাম বাবা চিন্তা করে দেখছিল সবটা বিষয়।

আমি আছে আছে উঠে বেরিয়ে চৌকাঠের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। মনন বাবার পারের কাছে চুপ করে বসে আছে। বলতে কি মননের মস্ত আমার বুকের ভিতর তর-তর করছিল। যদি-বা ‘না’ বলে বসে, যদি বাবা বলে যে—

‘কত মাইনে দিত ওরা বদলি?’

‘মল টাকা।’

‘আর দুবেলা ভাত দুবেলা কলপাবার?’

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে মনন ঘাড় কাত করল। বাবা আবার চিন্তা করছে। মা ছোট বোনটাকে দুখ খাওয়ায়। মার দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বাবা প্রহর করে,

‘তুমি কি ওদুটা খেয়েছিলে?’

মা মাথা নাড়ে।

‘ওদুটা ডাল। ওইটুখন পিপি। ছ’টাকা মাংস। তা ভাল মিনিস।’ খাও। নিরমিত বেতে থাকলে শরীরে হল পাবে।’ বলে বাবা আবার বনকে ডাখে। তারপর:

‘আমি গরিব। কেয়ারনী বাহুহ। অন্ত মাইনে দিতে পারব না। অথচ একটা লোকও চাই। মিষ্ট রু মার শরীর একবারে জেগে গেছে। তা বাপু—’

মা মননের মুখ লক্ষ্য করছে। আমিও তাকিয়ে আছি ওর দিকে। মনন ঘাড় হেঁটে করে নব বুটছে।

বাবা বলল, ‘দুবেলা ভাত বাবে—আর সকালে বিকালে ওই একটা চা কটি—আমাদের বা হুং—আর আর—’ হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নালিয়ে রেখে বাবা গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

অর্থাৎ বাবা ইতস্ততঃ করছিল। একটা বাড়তি লোকের খোরাক জুগিয়ে অতিরিক্ত দুটাকা একটাকা ঘর থেকে বার করে দিতেও বাবার কষ্ট হবে আমার জ্ঞানতে ব্যক্তি ছিল না। অনেক কষ্ট করে বাবা মার মস্ত একটা ওদুখ কিনে এনেছে। আমার খুশির দু মাসের মাইনে জমে গেছে। বাবা এলবই চিন্তা করছিল, মুখ দেখে বুকলাম।

মা মননের দিকে তাকাল।

‘মল টাকা মাইনে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না বাপু, —তিন টাকার বেশি পাবে না।’

অবাক হয়ে খেললাম মনন তৎক্ষণাতঃ ঘাড় কাত করেছে।

বাবা বৃশি হল।

‘তা ছাড়া কাজকর্ম আমার সংসারে আর তেমন কি—অতিথি অভ্যাগত নেই, বাইরের লোক নেই। তিনজন তো আমরা বাহুহ।’

মনন আবার ঘাড় কাত করেছে। হ্যারিকেনের আলোর চোখে পড়ল ওর মুখ হাসি ফুটেছে। মানে, তাতেই সে রাজী। মনন আমাদের বাড়িতে থেকে গেল। আমার এত ভাল লাগছিল!

বড় বড় চারটে ভুন্নুরের ভাল কেটে ফেলল মদন। আকাশটা কলা হলে গেল। আবার পোঁপে চারটা হটকটে বেগের মূখ দেখে হাসতে লাগল।

‘এইবেলা গাছটার ঘোর বাত হবে’, মদন বলল, ‘ওই ভুন্নুরের ভাল দিয়ে আমি বেড়া তৈরী করে দেব—ছাগল সৰু এসে মূখ লাগাতে পারবে না।’

‘মারো দু চার বকরের চাবাগাছ এনে পুঁতব’, আমি বললাম, ‘ভম্বিতে এখন রোজ লাগছে, এখন গাছ বাড়বে।’

‘তার ভত্তে চিন্তা কি—আমি এখন এসে গেছি আর চিন্তা নেই, আমি হারেক বকরের চাড়া এনে লাগিয়ে দেব।’ সুশি হলে মদনকে চুম্বা খাবার মতন আমার মনের অবস্থা। সকালে মাঝে বাটনা বেটে দিয়ে কল তুলে দিয়ে, ঘর বারান্দা ভাঁট দিয়ে একটু অবসর হতে ও ছুটে এসেছিল বাজারের পিছনে। পোঁপে চারটা ছায়ায় ঢাকা আছে দেখে তখন ও কাটারি হাতে করে ভুন্নুর গাছে উঠেছে। সোণা শরীর। পা ছুটো ঠকঠক করে ঝপছিল। তবু শেষে আমি নিচে ঝাড়িয়ে বলছিলাম, ‘সাকপান, দেখবি শেড়ে-উড়ে না ঘাস!’ গাছের ভালে কাটারির কোণ বসাতে বসাতে মদন বলছিল, ‘আমরা চাষীর ছেলে, হট করে কি গাছ থেকে পড়ে বাই—’ আমি আর কিছু বলিনি।

এতবড় চারটে ভাল কাটা হয়েছে দেখে বাবা চোখ কপালে তুলল। ‘এটা করনি কি মদন, বাড়ির আঁক নষ্ট করে ফেলনি!’

না শিছনে ঝাড়িয়ে মূখ ঝাঁচল চাপা দিয়ে হাসে। বাবা ঘন ভুন্নুর গাছের অবস্থা দেখে খুব একটা হায়ে আকস্মিক করতে আরম্ভ করল তখন মা মূখ থেকে ঝাঁচল সরাল। ‘আমি তো বুড়ে হতে চললাম, তোমার ছেলের বোঁ আসতে এখানে চের দেরি। অত আঁক রাখার দরকার কি—তা ছাড়া—’

দেন একটু অবাক হয়ে বাবা মায় মূখ দেখছিল।

মা বলল, ‘তা ছাড়া আমাদের পিছনেটা তো ঠাকা। পোচো নাট। নাহকের মূখ দেখা যায় না। আত্মের দরকার পড় না।’

অর্থাৎ যা যে মদনের কাছটা লক্ষ্য করল আমি বুঝে গেলাম। কেন করবে না। আমি বাগান করতে চাইছি আর মদন এ বাড়ির কাছে লাগতে না লাগতে আমাকে সাহায্য করছে যা কি সেটা ভাঙ কাঠে না দেখে পারে।

তা ছাড়া এখনও মদন মায় খুব বাধ্য হয়ে পড়ল। মা শুধু চোখের ইঙ্গিত করতে মদন এটা এনে দেয় ওটা

বাড়িরে দেয়। কলসার গুড়ো ভয়ে ছিল। মাটি এনে মদন নিজে থেকে এত এত গুল তৈরী করে ফেলল। মাঝে বলতে হল না। রোয়ে শুকিয়ে সব গুল নিজেই তুলে বাজারের কোণায় এনে মড়ো করে রাখল। বা কলস, ‘গলিঘের ছেলে পরিষের সগারেই তোকে মানিয়েছে বাবা।’

‘ও বাড়ি আমি আর ইয়ে করতেও খাব না।’ মদন একটু; খারাপ কথা বলতে বাচ্ছিল, মা খবক লিতে ও চুপ করল। তারপর মা কি জেবে হাসল : ‘কেন, ওয়া কি তোকে খেতে-টেতে দিত না?’

‘ছাই দিত।’ যেন কথাটা বলতে মদনের মূখ চুলচুল করছিল। ‘সক চালের ভাত, পাওরা দি, মাছ, ঘন দুধ—এই এতবড় টুকরো মাছের—সব ওয়া খেয়েছে। কর্তা খেয়েছে গিরা খেয়েছে খোকা। বেয়েছে—আমাদের কি-চাকরের জন্তে মোটা চালের ভাত আর ভাল আর পুঁই-চচ্চি—মাসের মধ্যে এক-আখনি বুড়া চিড়ি পেতাম চচ্চকিত—আর ভাসের কি চেহারা—গম্বাকল!’ এমনভাবে হাত নেড়ে ঠোট দেখিয়ে মদন বহুবারের বাড়ির বাওরার বর্ণনা করছিল যে আমি ও মা একসঙ্গে ছোরে ছেলে ফেললাম। বাবা এসে শিছনে ঝাড়িয়েছে কেউ দেখেছে কেউ দেখেছে কেউ দেখেছে।

বাবা খবক লাগার।

‘হয়েছে হয়েছে—একতেরটা খেয়ে এসে নিম্বে করতে নেই—বলে, দার হুন খাব তার গুল গাব—নিম্বে করা পাপ।’ অমোলের হাসি নিতে গেল। মদন চুপ করে রইল। আমি সেখান থেকে সরে দিয়ে আমার পোঁপে গাছের ওয়ারক করতে লেসে গেলাম। বাজারের পিছনে ঝাড়িয়ে আমি বাবার গলা শুনছিলাম। ‘তা অত গুল খেওখাবার কি দরকারটা ছিল—একটা কচি বাছা পেটের দায়ে নয় এখানে চাকরি করছে—তাই বলে তুমি সব কাম ওকে দিয়ে খাচ্ছ।’ বুঝলাম মাকে বলা হচ্ছে। মা বলছিল, ‘আমি কিছু বলিনি—বরং আমি না করেছি—নিম্বে থেকে ও মাটি এনে ফলে ফলে এলব দিয়েছে।’

তারপরও বাবা গুবগুব করে কি বলছিল আমি শুনতে পাইনি। না, একটা বাছা ছেলে রাতদিন বাটুক বাবা যেমন পছন্দ করে না, মা-ও তা চাহে না। আমি নিম্বের চোখে দেখতাম। কি, ঘন দুধ, বড় মাছ আমরা কেউ খেতে পেতাম না। মাসের আটপাশ দিন ভাল তরকারী শাক চচ্চি হত। কিন্তু তা হলও যদি না কোনোদিন পটলটা বেগুনটা ডাছড, কি বড়াটাকা করত, আমাকে বাবাকে তো বাটেই, মদনকেও ছুটো একটা না দিয়ে মা শান্তি পেত না, ভাত খেতে পারত না।

চোখের ওপর তো দেখলাম মনন আমাদের বাড়িতে কাছে লাগতে না লাগতে যা আমার একটা চৌকো হাফ-প্যান্ট হৃদয় করে সেলাই (ভাল বা চৌকো বলতে আমারও অভিজ্ঞিক প্যান্ট ঐ একটাই ছিল) করে গুকে পরতে বিবেচনা। বাবা আমাদের মাদে মাইনে গেলে বসন্তকে একটা পেঁচি কিনে দেবে না এখন থেকেই বলে রাখতে। যদি না অল্প ক'দিনের মধ্যে গুকে একটা আমার বয় করতে আরম্ভ না করত তো মননই কি আর এখন বাধা হয়ে পড়ত ? আর মুখে শোনা, আমি স্থলে চলে গেলে মনন শাশাটা হৃদয় মার কাছে হুদে থাকে, কাগজ জ্বলে আমার ছোট বোনের জ্ব-বার্লি গরম করে দেয়, হঠাৎ কুঠি এনে সেলে ছুটে নিয়ে উঠানের দিক থেকে জামা-কাপড় গুলো তুলে খরে এনে রাখে—'মিটু আমার চেলে, তুইও আমার চেলে।' আমি ক'দিন মাকে বলতে শুনেছি। শুনে ফাকাশে চ্যাবচ্যাবে চোখে মনন আমার হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে হাসত।

পাঁচ দিনের মাঝায় পেশে চারারটার আরো দুটো কুঁড়ি-পাতা দেখা গেল। সব মিলিয়ে ছ'টা কাঁটা, আর পুতুলের ছাতার মতো ছোট ছোট চ'টা পাতা হয়েছে। 'এখন আর চারা না, রাত্রিমতো একটা গাছ বলা চলে', ভাবতাম আমি আর অবাক হুঁই চোখে বাম্বা হাওখা ছোট ছাতার নতুন পাতাগুলোর ঝাঁপ দেখতাম। মনন ডুন্ডরের ভাল কেটে হৃদয় একটা বেড়া তৈরী করে দিচ্ছে।

'আমি আরো কিছু চারা এনে পুঁতব', মনন বলত, 'আতা, করমচা, বাতাসিন্দু, পেছারার চারা।'

'কোথা থেকে আনবি?' আমি বলতাম, 'পায়বি জোপাড় করতে? বৌবাচারে এদর চারা পাওতা হায় রথের বোলায়। এখন তো রথ শেল হয়ে গেছে।'

'আরে সেং, বথের বেলা—কিনে আনবি নাকি—এমনি সব নিয়ে আনবি।'

'কোথা থেকে গুনি?' উৎসাহে খোলা বই কেলে রেখে আমি মননের বিছানায় গিয়ে বসতাম। আমার পড়ার ঘরেই দুজনের শোবার কাছগা। পাশাপাশি বিছানা। বাবা যা খেয়ে ও-বতের পরমায় মিল এটে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ত। বেশ একটু রাত জেগে আমি পড়তাম। মনন আমার পড়া শুনতে শুনতে কোনদিন ঘুমিয়ে পড়ত, কোনদিন একটা দুটো কথা হুক করে পরে গল্প হুড়ে দিচ্ছে। বাবা যা শুনতে না পায এমনভাবে নিচু গলায় দুজন কথা বলতাম।

'তুই কি পেছারা করনচায় চারা সেং এংদিল কোথাও?'

'আমি কি এ-পাড়ার নতুন', মনন প্রশ্ন শুনে চাপা গলায় হাসত, 'কার বাড়িতে কোন গাছ আছে আমি সব জানি।'

'গুনি না কোথা থেকে করমচার চারা জোপাড় করবি?'

আমি শুধন মননের বাগিণে বাধা রেখে তার পাশে শুয়ে পড়ছি।

মনন আমার পেটের ওপর হাত রাখে, তারপর আমার কাছে মুখ এনে কথাটা বলে। শুনে আমি চুপ করে থাকি। একটু ভেবে পরে আঁতে আঁতে বলি, 'এমনি তো দেবে না গুনি, চুরি করে আনতে হবে।'

'হ্যাঁ, তাই তো—চুরি করব। হুঁময়ারের বাড়ির পিছনের পাঠিন টপকে বাগানের সব ফল আর মূল্যের চারা নিয়ে আনব। বেঙলো আনতে পারা যাবে না, ডেরে মূচুডে মঠ করে রেখে আনব।'

উদ্বেগময় মনন শুধন উঠে বসেছে।

আমি কিসকিন করে বললাম, 'চুরি করে ওসব আনলে যা রূপ করবে।'

'মাকে বলতে গেছি নাকি চুরি করে এনেছি কি সেবিরে এনেছি?' মনন আমার পেটে চিমটি কাটল। 'রাত থাকতে উঠে আমরা বথেরে পড়ব, কেমন?'

আমি হাড় নাড়ি। কি ভেবে একটু পরে বলি, 'হুঁময়ারের ওপর জোর খুব রাগ, কেমন? ওর যা তোকে আর ও-বাড়ি রাখল না কলে?'

'বয়ে গেছে ও-বাড়ির কাগ করতে।' জেংচি কেটে মনন আমার কথার উত্তর দেয়। একটু চুপ থেকে পরে : 'রাগ থাকবে না? রোজ ইতুলে বাবার সবর হুঁময়ার পায়ের দুতোটা বাড়িয়ে নিয়ে বলত, বৃশণ করে সে। লাটসংহেবের ছেলের দুতো বৃশণ করতে করতে আমার হাতে কোথা পড়ে বেত—আর আম কিনা বলে এখানে জোর হুবিগে হবে না, অল্প বাড়িতে কাগ পাশ কিনা ত্রাং পে।'

'হুঁময়ারও বলেছে এ-কথা?'

'জবে!'

যেন মননের চোখে জল এসে পড়েছিল। আলো নিভিয়ে শুয়ে শুয়ে সেদিন হুঁময়ারের চেছারাটা মনে করছিলাম। ব্যাকিলারের ছেলে। ভাল জামা-জুতা পরে স্থলে আসে। আমার সহপাঠী। কিন্তু তা হলে হবে কি—হুঁময়ার আমার সঙ্গে ভাল করে মিশবে বুঝে থাক, কথাই বলে না। আমার সঙ্গে না হাবুলের সঙ্গে না সনাতনের সঙ্গে না। ওর বন্ধু অশু

অসুখম নীহার। ওরা বহুলোক, আনন্দের গরিব। আনন্দের বাসি পায়ে ফুলে আদি, আনন্দের ভাষা প্যাট মদলা হেঁচা—
ভাল হবে খুব ভাল হবে। মননের প্রজ্ঞাবটা মাথায়
দুইছিল। ওদের বাগানের সব ফলের গাছ ফুলের গাছ যদি
হিঁড়ে ভেঙে দুমড়ে দুটুতে নষ্ট করে দেয়া যায় বেশ হয়।

অঙ্ককারে একদমর মন আনার কানের কাছে মুখ সরিয়ে
আনে।

‘মুখের পড়লি ?’

‘না।’

‘সুখমারের বাবা রোগে বাড়িতে নব খায়।’

‘শেং !’ আমি অল্প হাসলাম।

‘হ্যাঁ রে—ওদের টাঙ্গা গরদা থাকবে না। গাড়ি-বাড়ি
সব বিক্রি হয়ে যাবে।’ মনন খমখে গলায় বলল, ‘ওরা যদি
আমাদের মতন গরিব হয়ে যায় তবে খুব মজা হয়, কেমন
না ?’

অঙ্ককারে মাথা বেড়ে আমি উত্তর করলাম, ‘তা হয়
কটে।’

হুসিন আমার চোখা করলাম। কিন্তু হুসিনই বার্থ হলো।
শেষ বাড়িরের অঙ্ককারে টিপটিপে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আনন্দের
সুখমারের বাড়ির পাঠিলের কাছে গিয়ে গীতিলেহি কি অননি
মোটা লাঠি বাড়িয়ে বাগানের দানী আমাদের তাক করছে।
আর সুখমারের সুখমার! বাথের মতন লাঠির মননের
ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কোনরকমে ছুটে গালিয়ে এসেছি।

‘কত বড় এক একটা পেছারা, বেখলি তো!’ বাড়ি ফিরে
মনন আকস্মিকের গলায় বলত, ‘একবার যদি পাঠিলের ওপর
উঠত পারতাম, পাচ-সাতটা পেছারা আনা যেত।’

‘খাক শে—শেবে ধরা-টরা পড়ে—’ আমি মননকে সাহায্য
দিতাম। কিন্তু মনন চুপ থেকে মেন ও-বাড়ির বাগানের ভাঁপা
পেছারাগুলোর কথা ভাবত। নরবার পাশে একটা মাথারী-
লবার চারা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। পেশে পাড়ের গুড়ি থেকে
আমি হাত ঘুরে সরিয়ে চারটা পুঁতলাম। মননকে বললাম,
‘তুই হু মগ মল এসে তেলে সে।’ আমি একটা বাঁশের ককি
কোথাও গাই কিনা মেথি। লতাটা তরতর করে বেয়ে
উঠবে।’

বাঁশের ককি নিয়ে মনন কিয়ে এসলাম, সেখানায় মনন
তেমনি গালে হাত ঘিরে বসে আছে। কি ভাবছে।
ওখিকে না মননকে ডাকছে করলা ভেঙে মিতে। মনন
নড়ছে না, সাড়া দিচ্ছে না। এক-পা এক-পা করে যা

রাখাঘরের শিঙনে চলে আসে। ‘বেলা হচ্ছে, উনন খরতে
হবে—তোরা কি কেবল বাগানের শিঙনে লেগে থাকবি।’
কিন্তু তার কথা শুনে মনন মুখ তুলল না। ‘তোরা কি হচ্ছেছ,
ছুতে পেছোছ ?’ না হলে।

হঠ করে আমার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে পড়ল।
বুতলাম মনন অসন্তুষ্ট হল আমার কথা শুনে। আমার দিকে
কটমট করে তাকিয়েছিল একবার।

শুনে যা হাসছিল : ‘ছিং, পনের ভিনিসের ওপর লোভ
করতে নেই। এমন একটা খুব ভাল ভিনিস না পেছারা।’

তারপরও মনন মুখ নিচু করে নব গিয়ে মাটি খুঁজছিল।
উঠানে বাবার খড়মের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি উঠে মায় করলা
ডাঙতে গেছে।

না, পেছারা না, ভাবছিল সে কৃষকের কথা। সুখমারের
বাগানের দানী। ‘ওর সেবার জর হয়েছিল, আমি নিজে
হাতে করলা ভেঙে উনন লাঠিরে ওর উনন খরিয়ে দিলাম,
সাগ ভাল নিয়ে দিলাম। আর আম শালা আমায় লাঠি
নিয়ে ভেঙে মারতে আসে।’

আমি হাসি : ‘তুই তো আর এখন ওদের চাকর নস—
ও-বাড়ির কেউ না তুই—কাজেই।’

‘বটে!’ ঠাৎ কিঞ্চিৎকিরে মনন ভেঙে কাটে। ‘ওই
শালা—কৃষকের মাথাটা আমি ইট করে ভেঙে দেব।’

‘না না ওলব করতে হাবিরে—বাক্য একটা গুণগোল
সুট।’ আমি মননকে বুঝিয়ে বললাম, ‘জানতে পারলে
বাবা রাগ করবে। বাবা গুণগোল গছন করে না।
সাদাসিমে মাহু, নিরিবিলি থাকতে চায়।’ বলে আমি ফুলে
চলে গেলাম। কিন্তু মনন আমার কথা শুনে কি ? যেন
ও-বাড়ির ওপর তার আক্রোশের আর শেষ ছিল না। হ্যাঁ,
তখন বিকেল, বেগ জোরে বৃষ্টি হয়ে গেছে দুপুরে—হাতা
জল জমেছে। আনন্দের ফুল থেকে কিরছি। আমি হাবল
সনাতন শিঙনে হাঁটছি। আগে আগে চলেছে সুখমার আর
তার বন্ধুরা। হঠাৎ সেখানায়—বিপন্নত দিক থেকে আমাদের
মনন পাঁ সা করে ছুটে আসছে। সন্তুষ্ট না মুদি-দোকানে
কিছু কিনতে পাঠিয়েছে ওকে। মনন নিচব সুখমারের
একিমে আমার সঙ্গে হাবলের সঙ্গে ছু-একটা কথা বলে তবে
যোঝানের শিক বাবে। চিন্তা করলাম। কিন্তু চিন্তা করবার
সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি ব্যাপার ঘটল। ইচ্ছা করেই মনন এটা করল
সবাই বুঝল। পা বিরে হাতের জল ছিটিয়ে সুখমারের শালা
খবখে সাঠিলের শাট প্যাট নোংরা করে দিয়ে মনন ছুটে
শালাছিল। কিন্তু বাবে কোথায়। সুখমারকে বেগেওনে

বাড়ি নিয়ে যেতে একটু দূরে দূরে যে ভূষণ হাঙ্গী ও হাটছিল মন নিভয় ভেগতে পারনি। ছুটে গিয়ে ভূষণ মনকে ধরে ফেলল। হুহুনার আর তার বন্ধুতা উল্লাসে ডিংকার করে উঠল। মনকে হিড় হিড় করে ভূষণ হুহুনারের বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে চলল। আখি আর আমার বন্ধুতা শুধু গাড়িতে দেখলাম।

কথাটা না শুনল। আখি থেকে ফিরে বাবা শুনল। বিকেল গড়িয়ে শায়া হল। তারপর রাত। রাত আটটা পর্যন্ত বাবা আমাদের বাড়ির সামনে বড় কাটাল গাছটার নিচে গাড়িরে রাখার দিকে চেয়ে ছিল।

বাবা একসময় ঘরে ফিরতে যা বলল, 'তুমি কি একবার যাবে, ও বাড়ি? নিশ্চয় ছেলেটাকে ছেপেট'ে রেখেছে। এখন পর্যন্ত কেনার নাম নেই।'

'রাখুক বৈবে।' বাবা গম্ভীর গলায় বলল, 'যেমন কর্ম করেছো তার কল ভোগ করুক। কেন হান্নামহান্না কাহা ছিটোতে গেল।'

'আহা, ছেলেবাহুব, না হয় একটা অপরাধ করেছে,—আর কী তেমন অপরাধ। হয়তো ছুটে বাচ্ছিল বলে—'

আখি মার কথাই সাব সিতে বাচ্ছিলাম। কিন্তু বাবা প্রতিবাদের ভবিতে প্রবলবেগে মাথা নাড়ল।

'বড়মাহুদের বাড়ি দিয়ে আমার চাকরের হয়ে কমা চাইতে আমার—আমারও স্থানে যাবে। ওদের কাছে ওরা বড়—কিন্তু আখিও শিকিত ভয়সজান। আখিও—' ব্রহ্মাম মনকে এতটা রাত অথবা আটকে রাখা হয়েছে বলে ভিতরে ভিতরে বাবা খুব উত্তেজিত হৃদয় হয়ে আছেন।

যা আর কথা বলল না। কামকর্ম একলা হাটাই সব সারতে লাগল। বাবা বারান্দার অন্ধকারে বলে তামাক খাচ্ছিল আর ভাবছিল। আর আখি হারিকেনের সামনে বই খুলে বসনের বিছানা, দেওবাগের হাক ঝোলানো তার তালিমারা হল্লা হাক-প্যাণ্ট ও শাটটা দেখেছিলাম। আমার কেমন কাহা পাচ্ছিল।

সত্যিই মন সে রাত্রে আর এল না।

সকালে চা খেতে খেতে বাবা ও মা ট্রিক করল আমাদের একবার ও-বাড়ি পারানো হবে মননের খোঁজ নিতে।

মা বলল, 'মহলা প্যাণ্ট ছেড়ে খোঁজা প্যাণ্টটা পরে নে।'

বাবা বলল, 'অন্ত কারো সঙ্গে কথা-টখা বলে লাভ নেই—কেবল সতীশবাহুব গ্রীকে মিজেন করবি মন কাল

বাড়ি ফেরেনি কেন। শুধু তেনে আসবি। আর কিছু বলতে হবে না।'

'জিজ্ঞেস করলে বলবি বাবা পারিয়েছে।'

'না না না।' মার কথাই বাবা আমার প্রতিবাদ করে উঠল। 'বলবি মা পারিয়েছে। আখি কেন? আখি এ-ব্যাপারে নেই। হয়তো ব্যাপারটা এখনেই চুক যাবে কি গেছে। কিন্তু বাড়ির কর্তা—মানে পুষ্কমাহুব খোঁজখবর নিচ্ছে জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপার অগ্রসর হয়ে গাড়াবে, জটিল হয়ে গাড়াবে। তোমাদের মেয়েবাহুদের মধ্যেই থাক এটা—বুঝলে না? সেজন্তেই তো আখি মিটুকে হুহুনারের মার কাছে পাঠাচ্ছি।'

অন্ত হেসে মা বলল, 'আচ্ছা।'

বামে, বাবা রাগ দুঃখ চুপিস্তা অভিমান—মন মনে গা-ই পোষণ করুক না কেন, বাইরে সব বিষয়ে নিরিবিদ্য মুক থাকতে চাবে। মননের ব্যাপারে আর একবার তা প্রমাণ হয়ে গেল, বুতে যা আর উজবাচা করল না।

কেবল আখি মনন ঘর থেকে বেরিয়েছি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে—ভিকিবি বিয়ে আমার মাখার হুলটা ট্রিক করে গিল। বলল, 'হুহুনারের সঙ্গে কথা-টখা বলে কাজ নেই—কি বলতে কি বলে ফিলে তুমি আমার বগড়া-টগড়া বাণিয়ে আসবি।'

আখি বললান, 'না, বলব না।'

বাড়ির ভিতরে চুকতে হল না। হুহুনারের পেট-এর সামনে শিউলী গাছের তমার আখি থমতে গাড়াই। মনকে শেষে গেলাম। কিন্তু মনন খুব ব্যস্ত। বাসতি করে ভিতরের চৌবাচ্চা থেকে জল বয়ে আনছে। হুহুনারের গাড়ি থোয়ানো হচ্ছে। ভূষণ গাড়ি থোয়ানো। ড্রাইভার হাঙ্গাণ গাড়ির থেকে তদারক করছে। বেশ বড় বাসতি। গাড়ির ফুটবোর্ডের কাছে বাসতিটি। নামিয়ে রেখে মনন হাঁপায়। তারপর আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে, ও গিল্ক করে হাসে।

'আখি এ বাড়ির কাছে লেগে গেছি।'

'কবে থেকে?' বেশ আক্ষেপে বললাম।

'ওই কাল বিকেল থেকেই।' মননে ধাত ক'টা বার করে মনন তেবনি হাসতে থাকে, 'আমার কিছু বলল না গিহীমা—বরং ভূষণকে গালমন্দ করেছে। ছেলেবাহুব ছুটে গিয়ে জল ছিটিয়েছে—তা বলে—'

আখি ফিরে আসছিলাম।

মনন বলল, 'শোন। তোরা মাকে বলবি, আর আখি

তোমার বাড়ির কাজ করব না। এখানে লেগে গেছি। দিল্লী'র কাজ রাস্তে বলল ওরা গরিব মানুষ। নিম্নেদেরই চলে না, তো ও-বাড়িতে তুই থাকবি কি ?'

আমি কিংবো এলাম।

না তুল। বাবা তুল।

তখন তারা একটা কথাও বলল না।

আমি দু'খ ডার করে রাস্তাঘরের পিছনে গিয়ে বাড়িতে রইলাম। পোশে পাছে আরও ছুটা নতুন পাতা বেগেছে। মঙ্গল হাতের তৈরী ভুসুরের ভালের বেড়াটা কেবলিলাম। কিন্তু আমি কি তখন জানতাম, মঙ্গল সেজে—আমার পোশে চারটাও আর থাকবে না।

তিন দিন পর শেষ রাতে আবার জ্বর বধা নামল। সে কী বৃষ্টি! বেন হল ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু থাকবে না। কতকাল আর ঘরে আটক থাকা যায়। সেই বন্ধকার থাকতে কোণে বিছানার বাসে ছিলাম। হ্যাঁ, তখন যেহে আটটা নাচে-আটটা বেগে পেছে। বৃষ্টির জোরটা একটু কমেছে কি আমি বই করে হঠাৎ গুলে ছুটে বেরিয়ে পোম। রাস্তাঘরের পিছনে চলে পেলাম। আমার বাগানের অথবা কি হয়েছে দেখতে ভীষণ মন কেমন করছিল। কেননা উঠানে মল মনেছে। রাস্তাঘরের পিছনেটা ঢালু। সেখানে কত জন গাছাল, পোশেপাছ রাখা-চারা ভুবে গেল কিনা এক যদি তা-ই হয়, মলটা সরাবার কি ব্যবস্থা করা যায় ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে আমি বৃষ্টি মাথায় করে ভুদুহতলায় চুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাগানের চেহারা দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। পোশে চারটা নেই। মাথার-লগতাটা কলে কাহার দুটাপুটি থাকে। ভুসুরের ভালের বেড়াটা ভেঙে তখনই হার আছে। আমার ভুসুরের গায়ে উজ্জ্বল হল। বাগানা থেকে না ডাকছিল, বাবা ডাকছিল : 'জিহ্মনে, মর হবে, চলে যায়, চলে যায়।'

'আমার পোশে পাছটা নেই।' চিৎকার করে উঠলাম।

'হলে ভাবিয়ে নিল কি ?' না বলল, 'উঠানোয় সব মল তো নগীর হোক হয়ে থেয়ে পিছনে ছুটছিল—'

'বেড়া ভেঙে গেছে। বেন কে ভেঙে দিয়ে গেল।' বলতে বলতে আমি বাগান ছেড়ে ঘরের শৈঠায় উঠে এলাম।

'তাই বলা, বেড়াও ভাঙা, পোশে চারাও নেই।' বাবা গরীর হয়ে দু'খ থেকে হ'কো সুরিয়ে, আমার দিকে না আর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই চারামাথা পলটা নিয়ে গেছে। শেষ রাত্তিরে একটা বড়গত নব তুললাম না রাস্তাঘরের পিছনে?'

'আমি তুমি নিব না।' না আমার দিকে দু'খ ফিরাল, 'হবে ইচ্ছা, যদি মলে ভাবিয়ে নিত এদিক ভদিক কোথাও থাকত তো, এতখান পাছটা তো আশ্চর্য হয়ে যেত না। ঐ পল করই।'

'একবারে পাছাখুঁচ বেয়ে গেছে। বেন উপড়ে তুলে সবটা পাছ দু'খ নিয়ে সরে পড়েছে।' আমি কাহার হয়ে বললাম, 'একটা শেকড় পর্যন্ত রেখে রাখনি।'

মা চুপ করে বইল। বাবা আমার মুখে হ'কো তুলল। 'কত বড় করে পাছের সবটা দিয়ে মঙ্গল ভুসুরের ভাল পুঁতে বেড়া করে দিয়েছিল—' বেন নিজের মনে বললাম আমি। তখন মা একটা ছোট নিশান ফেলল। বাবা নির্বিকার। আমার ওই বাগানের সঙ্গে যে মঙ্গলের দৃষ্টি জড়িয়ে আছে বা তা বীকার করল। মার নিশান ফেলার পরে তা বুঝলাম। কিন্তু বাবা বেন কথাটাকে তেমন মামল দিচ্ছিল না।

'গা যা এখন গড়তে যা—লম্বনে পরীক্ষা।'

বাবার খন্দক খেয়ে পাছের শোক হুকে পূলে এক-পা এক-পা করে পড়ার ঘর চলে এলাম।

হ্যাঁ, তারপর ছ'মাস পেছে। পরীক্ষা-টরীক্ষা দেখ। ক্ষেতের চুপুর। হঠাৎ আবার কি করে যে হুসুমারের সঙ্গে আবার ভাব হয়ে গেল বলা শুরু। আমার মনে হয় 'জিটকটিভ' গল্পের বইটা। আমার এক মাঝাতো ভাই বড়দিনের ছুটিতে বেড়াতে এসে বইটা আমাকে দিয়ে গেছে। কি করে কি করে বেন হুসুমার জানতে পেরেছিল। একদিন হুই করে পাছের বই নিয়ে আমার পড়ার ঘরে এসে হাজির। একটু অস্বাক হলেও তৎক্ষণাত্ণ তাকে বইটা পরতে নিলাম। তারপর আর কি। ও আমায়ের বাড়িতে এসে বদন আমাকেও ততক্ষণ রাখতে ওদের বাড়ি বেতে হল। এক এটা সবাই বীকার করবে, দীর্ঘকাল কণ্ঠস্বরটি চলাব পর বদন ঐ বদনের ছুটি ছেলের মধ্যে জাব হয় তখন তা দেখতে দেখতে বড় খেলি পাড় নির্ভিত হয়ে ওঠে।

বেন হুসুমার আমাকে না দেখে থাকতে পারে না, আমি তাকে না দেখে শান্তি পাই না। ওর বাড়ির ঘর বলে দু'জন গল্প করি, ওদের প্রাণও ছায়ে উঠে বেরাই,—অথনো আমারা বাগানে বেদে বসি।

হ্যাঁ, বাগানের মতো বাগান কটে!

একবারে ফুলের গাছ, একবারে কলের গাছ।

পাতিদের এ মাথা থেকে আরম্ভ করে ও-মাথা পর্যন্ত

বাগানের আর শেষ নেই। কোন্টো কলমের চাড়া কোন্টো বীজের গাছ হুহুয়ার আমাকে আতুল দিয়ে দিয়ে দেখায়।

তারপর দুজন একটা গাছের কাছে এসে দাঁড়ায়। দীর্ঘ কাণ লম্বা ডাঁট সন্তক সবুজ ছড়ানো শাক নিয়ে একটা হুম্বর পেঁপে গাছ! ফলতে আরম্ভ করেছে। 'ওটা এনে লাগিয়েছে মদন—আমাদের চাকর—এইটুকু গাছ ছিল, দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেল!' হুহুয়ার বলছিল।

তাকিয়ে তাকিয়ে আমি গাছটা দেখলাম। যেম কি বলতে দিয়ে যেম পেলাম। হুহুয়ার আমার হাত ধরে বলল, 'চল এখন ওগানটা ঘুরে দেখা যাক।'

বাগান দেখা শেষ করে গল্প করতে করতে দুজন মদন হুহুয়ারের ঝাণানো উঠোন পার হয়ে ওর বাড়ির ঘরের দিকে এগোচ্ছি, সেখানে মদন চৌবাচ্চার ধারে বসে মাথা ঝুঁজে চাষের বাগ সেট খুঁজে। ও আমার দেখতে পায়নি। যদি মূখ তুলে তাকাত আমি নিস্তর তৎক্ষণাত মূখ ফিরিয়ে নিতাম।

বাড়ি ফিরে কথাটা বাক্যে বললাম না।

আমার মনে যে কষ্ট লেগে বইল, বাক্য আর তার ভাগ দিয়ে কি হবে ভেবে চূপ করে রইলাম।

কেবল চাকরি না, আমাদের রাস্তাঘরের গিছনের চাষাও ঢাকা সীতপেঁতে ভরির চেয়ে ও-বাড়ির রোহালা বিশাল বাগানের মাটি ওর কাছে প্রিয় হবে তাতে অবাক হবার কি আছে। কিন্তু অবাক লাগল নিজের কাছে, মদনের ওপর আমি একটুকু রাগ করতে পারলাম না। কি, তারপর মদনই হুহুয়ারের বাড়িতে গেছি আমি সরাসরি ছুটে গেছি ওদের বাগানে। সন্তক সবুজ বৌম্বনের লাগোয়া মস্তিত দীর্ঘচুম পেঁপে গাছটা আমাকে বড় বেশি টানতে লাগল। সকল নেই বিকাল নেই হুহুয়ারের হাত ধরে পেঁপে গাছটার

কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি,—এদিকে হুহুয়ারের সঙ্গে গল্প করি—কিন্তু আমার চোখ ওদিকে—যেন গাছটাকে দেশে দেশে আর আপ বিটত না।

একদিন দুপুরবেলা গাছটা দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার বুকের ভিতর কেমন ভয় চুপল। মাকখান গল্প খামিয়ে আমি হুহুয়ারকে বললাম, 'চলি রে।'

'কেন?' একটু অবাক হয়ে ও আমাকে দেখছিল। কিন্তু ওর দিকে আর না তাকিয়ে আমি তাড়াতাড়ি বাটরে ছুটে এলাম। তখনও বুকের ভয়টা ভেলা পারিয়ে আমার গলায় কাছে ঠেকে ছিল। মদন পেঁপে চাষটা ছুঁই করে নিয়ে যাইনি। আমার বার বার মনে হচ্ছিল পেঁপে চাষটাই বহনকে আমাদের বাড়ি থেকে ছুঁই করে নিয়ে গেছে—কেবল মদনকে না, আমাকেও—না হলে আমাদের চোটে উঠোন, টিনের ঘর, চান্দা-ঢাকা ভূদ্রতলার কথা তুলে দিয়ে আমি সারাক্ষণ হুহুয়ারের বাড়িতে বাগানে পড়ে থাকব কেন।

বাড়ি ফিরে মার পাথের কাছে চূপ করে বসে বইলাম।

'কি হল।' মা প্রশ্ন করছিল।

আমার চোখ বেয়ে উপটপ করে চল পড়ছিল।

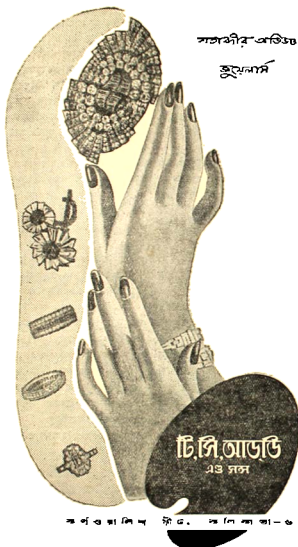
'কিচ্ছিল কেন!' ব্যস্ত হয়ে মা জবাব। 'আমি কথা বলি না। আমি কি বলতে পারতাম যেহা মদন! কাশচ পরা জোয়ার শুকনো মূখের কথা তুলে দিয়ে ও-বাড়ির বাড়ি পরা পরা প্রপন্ড-মাথা হুহুয়ারের মার দিকে তাকিয়ে থাকতাম—আর কখন তিনি মাথা পাথরের বাড়িতে করে আমাকে ও হুহুয়ারকে আগল আনারল কেটে দেবেন সেই সোনা-করা বিকলের অপেক্ষা আমি শুকিয়ে থাকতাম—খাকতে আরম্ভ করেছি?'

আর কোনোদিন আমি ও-বাড়ি যাইনি।



সত্যদীপ অতিষ্ঠ

ইন্ডাস্ট্রি



সত্যদীপ অতিষ্ঠ ইন্ডাস্ট্রি, কলিকতা-৬



স্বর্গাতি সাহেবের গ্রহণযোগ্য

শংকর



আপনাদের কাছে আমার একটা বিশেষ অহরোধ আছে। কৃষ্ণাঙ্গের সঙ্গে যদি কোথাও দেখা হয়ে যায়, বলা ক'রে আমাকে একটা টেলিগ্রাম করে যেবেন। আর যদি কিছু মনে না করেন, (ব্যাপারটা বলে রাখা ভালো) আপনার ওখানে পৌঁছিয়েই টেলিগ্রামের খরচটা আমি দিয়ে দেবো।

কৃষ্ণাঙ্গের কোনো ছবি আমার কাছে নেই। থাকলে, সেটা ছাপিয়ে বিতায়। তবে তাঁর চেহারার একটা মোটামুটি বর্ণনা দিয়ে রাখি। ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা। মাথার ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া সোনালী চুল। গায়ে লম্বা গেকো-রঙের আলখালা। বাগি পা, হাতে একতারা। থক্কের মতো নাক, আর টানা-টানা চোখ—একেবারে সাক্ষাৎ ঐক্য। তকাতের মধ্যে শুধু ঐ কাঁচা সোনার মতো গায়ের রং। আর কটা চোখ ছুটো। বহল? তা হলো বৈকি, এতোদিনে বছর পঁচিশ। তবে সংসার-তাপসের বহল ভো, সব সময় বোকা ধার না।

বুঝছি, আমার বর্ণনা থেকে আপনার মানসক্ষে কৃষ্ণাঙ্গের ছবিটা ঠিক ভেসে উঠছে না। কিন্তু সেজন্য চিন্তার কিছু নেই। কৃষ্ণাঙ্গকে দেখলেই আপনি চিন্তে পারবেন। হাজার লোকের ভিত্তর মধ্যেও আপনি তাঁকে বুঝতে পারবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কাছের পোস্টাডিস থেকে আমার নামে একটা আর্কেট টেলিগ্রাম। আপনার টেলিগ্রামটা পেলেই আমি ট্যাঙ্কি নিয়ে একবার স্রলভেনর হোমে যাবো। সেখানে যিনিট ভিনেক লাগবে, তারপর

সোমা ইন্ট্রিন। তবে আমাদের বাঁধা পর্বত কৃষ্ণাঙ্গকে যে ক'রে হোক আটকে রাখবেন।

আর একোদই যদি তা সম্ভব না হয়, তাঁকে বলবেন (তবে বলা ক'রে একটু আড়ালে থেকে বলবেন, যীরা যেন শুভতে না পায়)—মিসেস বনার আপনারকে অনেক দিন থেকে খুঁজছেন। আপনারকে বেসিক্স আটকিয়ে রাখবেন না, শুধু একটি, মাত্র একটি প্রশ্ন করবেন। তারপর...

বেশুন, লোকের সঙ্গে পরিচয় হতে না হতেই কোনো কিছু অহরোধ করে বসে যে ভক্তাবিরোধী তা আমি জানি। কিন্তু কি করবো বসুন, মিসেস বনারের ভগ্নে এই সামান্য উপকার-চুখ যদি না করতে পারি। শুধু আমি কেন, মিসেস বনার সম্বন্ধে ভারতীয় হিসেবে আপনারও রাহিব আছে।

ওঁর সম্বন্ধে আপনার যদি কিছু জানা না থাকে তবে বছর পাঁচেক আগে প্রকাশিত ভারত সংস্কৃতি সোসাইটির বিশেষ সংখ্যায় আমার লেখাটি পড়ে দেখবেন। কাকর অহরোধে নয়, আমি স্বতঃপ্রসূত হয়ে লিখেছিলাম—ভারতবর্ষের ধর্মবীর্ষনে বিশেষত্বের পান সম্বন্ধে কোনো প্রামাণিক গ্রন্থ এখনও রচিত হয়নি। যদি তা কোনোদিন রচিত হয়, তবে মিসেস বনারের নাম নিশ্চই সেখানে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সিন্ধার নিবেদিতা, মাধার, বিন্দ্ ম্যাক্সাউড-এর সঙ্গে উচ্চারিত হবে মিসেস বনারের নাম। ভারতের প্রাচীন ধর্মসাধনার প্রতি এমন জলজ ও ঐকান্তিক বিশ্বাস আমি আর কারও মধ্যে দেখিনি, শুনিনি, এমন কি পণ্ডিওনি।

এর পরেই হবার্ট সার্নেবের বটনাটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বিচলিত। এবং সর্বশেষে আমার অন্তরের স্নেহ প্রণাম জানিয়েছিলেন বিসেস বনারকে।

অন্য প্রথম বর্ষন বিসেস বনারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন... আমার ব্যক্তিগত অধ্যায়টি একটু ধুলে বলাই ভাল।

বসন্তে লক্ষ্য নেই, বিসেস বনারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের মধ্যে একই বার্ষিক গড় ছিল। তখন বয়স কম। সেখানটা গিয়ে বেকার বসে আছি। কিন্তু আমার একটি মাত্র চিন্তা—বিলেত যেতে হবে। চিত্রা গ্রাম দেশায় গিয়ে গড়িয়েছে। বিসেসের কোথায় থাকে, কেন থাকে, কি করে থাকে কিছুই জানি না। শুধু বেতে হবে, এইটুকু জানি। গিন নেই হাত নেই, কিছু শরৎ আর আমার কেবল ঐ শুধু এক চিন্তা। পড়ের মাঠে, নদীর ধারে, বাড়ার ছানে শুধু আমার ঐ এক আলোচনা। আর সে আলোচনা হতো পুরো ইন্ট্রীতে। বিলেত গেলে তো আর বাংলায় কথা বলবার সুযোগ পাওয়া যাবে না।

শরৎ আমার থেকে অনেক চালাক চতুর। সে বলেছে, “লু! না, বাংলায় হয়ে চলে যাই। নিপটন সাহেব তো বাংলায় হয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলেন।” আমি বলেছি, “সেইস দিন কি আর আছে রে ভাই। ওসব কাজে ঢোকা দূর পুরু।” পরিত্যক্তা বলতে কি বাড়ার বাস্তু ভাঙবার কথাও ভেবেছি। শুনে শরৎ বলেছে, “এই তো আইডিয়া এসে গেছে।” আমি দ্বিভীরবার ভেবে বলেছি, “না রে, বাস্তু ভেঙে বড় জোর বোঝাই পর্বত হাওয়া যায়। কিন্তু বিলেত হাওয়ার অনেক ছাড়া—পালশোটি চাই, ইষ্টকলনের সার্টিফিকেট চাই, গ্যারান্টি চাই, আরও কত কি।” এসব শুনে শরৎ কিন্তু খান্ধাঘরিনি। বলেছে, “মাঝার একটা বুদ্ধি আসবেই। Try, try, try again.”

ভায়পার একদিন হঠাৎ শরৎ এসে বললে, “লু! তোকে আজ বিসেস বনারের কাছে নিয়ে যাবে।”

“কে?”

“বিবীট বড়লোক বেমসারের। অথচ কেউ নেই।”

কি করে শরৎ বেমসারের সঙ্গে আলাপ করেছিল জানি না। কিন্তু লাইটন স্ট্রীটের একটা বাড়ার ফেটে ঢুকতেই ঘরওয়ান ওকে সেলাম করলে। তারপর বেস টিপতে চাপরাশি এসে সরদা ধুলে বিলে। বললে, “বেমসারের পুছায় অসেছেন। আপনাদের করতে ফেরছেন।”

সোকার বসে এসিক ওসিক তাকাচ্ছি। জিজ্ঞাসা করলাম, “কিসের পুছা রে? মেয়ী মাতার?”

শরৎ বললে, “খ্যাং। পুছা রে, তোর বিদ্যা বেমন করে।”

সোকার বসে আমি ততক্ষণ সেখানে টাটানো ছবিগুলো দেখছি। কি হুম্বর হুম্বর ছবি। আর কত যে রঙের বাহার, বেশির ভাগ বিলেতের ছবি। আর তারই মধ্যে ঈং অশ্রুই হয়ে ওঠে, সোনালী ফ্রেম বাধানো একটি অশ্রুপরিষ্কৃত বিশেষীর অয়েল-পেইন্টিং। ভারী সরল মুখখানি—অশ্রুগ্ন দাবায়ে ভরা। কিন্তু একেবারে সেকেন্দ্রে—হাত পর্বত আবার ঢাকা, হুকের কাছে কুঁচি বেওয়া।

“মেয়ী মাতা বুদ্ধি?”

শরৎ বললে, “খ্যাং। মেয়ী মাতা কেন হবে? বেমসারের কয় বয়সের ছবি। তখনও বেমসারেরকে ইতিহাসে প্যারিনি।”

“যানে?”

“যানে, ইতিহাস কৃত প্যারিনি। এখন তো দিনরাত শুধু বলছেন, ইতিহাসই সব। ইতিহাসই জগৎকে গুণে বেবাবে। রক্ত অশ্রু গুণিবীরকে মাথা নত করে একদিন এই প্রাচীন সভ্যতার রক্তা ভিক্ষা করতে হবে।”

“তা তুমি এসবে বিশ্বাস করিস না?”

“আমায় ভাই এসবে মাথাব্যথা করবার সময় কই? আনাকে বিলেত গিয়ে নাট-বটু তৈরী করা শিখতে হবে। তবে তো অনেক টাকা মাইনের চাকরি হবে। তখন ওসব জাকবাজি”—শরৎ বললে।

এখন সময় বেমসারের ঘরে ঢুকলেন—“হ্যালো শরৎ।”

একটুও ভাবিতা না করে শরৎ বললে, “এর কথাই বলেছিলেন। আগনার কথা শোনার পর থেকেই আগবার জন্ত হুটকট করছে। রোগ বসে, কবে মালারের কাছে নিয়ে যাবে।”

মাঝার শাখা হাললেন। শ্রানের পর কপালে চন্দের কোটা পরেছেন। কি হুম্বর যে বোঝাছিল ঠক! বললেন, “আমায় কি কপাল! মিউকাসেসেই কপা পাঠাতে হচ্ছে। অকৃতের সন্ধানের মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে তোমরা অকৃতের সন্ধান।”

ইতিমধ্যে বেবোরা চা নিয়ে এসে রাখলো। সঙ্গে প্রচুর খাবার—শ্রাওউইচ, প্যানিসি, কেক। সেগুলো আমাদের দিকে ঝেলে দিয়ে বললেন, “কত ভাগ্যবান তোমরা—You are born in the faith of robrieth.”

জাওউইচ মুখে পুরতে পুরতে শব্দ বললে, “আমি এসব আগে বিবাস করতাম না। কিন্তু এখন...”

মালাম ধৈর্যভাবে বললেন, “নো বো, মাই ডিয়ার বব, তুমি বিবাস করত। It is in your blood. তুমি হরতো বিবাসটা তোমার অর্ধচেন মনে ঘুমিয়ে ছিল।”

ওসের কথাবার্তার আমি নীরব প্রোক্তা। একমনে মাদামের দিকে তাকিয়ে গিয়াছি। কি হৃদয়ের গরুর গর্জন। যেওগালে টাঙ্গানো ওই হৃদয়ের মুষ্টির উপরই বেন শিল্পী ছই-এক শোচ অভিজ্ঞতার হঠ বুলিয়ে দিয়েছে। কল অগাধবিক বৈশ্বাচারের ঐটু হরতো মুছে গিয়েছে, কিন্তু প্রাকার আলোকে দৃষ্টি উজ্জ্বল হবে উঠেছে। মুখের প্রতিটি রেখায় দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। কি-ই বা বলল। ঠর মতো যেমলায়েবরা তে হারুগ্যাট প'রে পড়ের মাঠে টেনিস খেলেন। ঘাড়খালা টাইট কাট পরে মোটর ড্রাইভ করে ফেলেন বা।

যেমলায়েব বললেন, “স্বীতা সবগ্র মানবজাতির অল্ল্য সম্পদ। আমি বোঝ পড়ি—হার প্রোভই নতুন মনে হয়।”

প্রত্যয় যেমলায়েবের মুখের দিকে তাকাতে সাহস হলো না, পারের দিকে নজর গড়ল। পারের পাতলা স্কিনিনে ঘিয়ে-রাঙের কোষ্ঠা—এমন পাতলা—বে মনে হয় কিছুই পেরেনি। কি ভারি ভারি পা ছুটো।

যেমলায়েব ব্র্যাক-অ্যাও-হোয়াইটের টিন থেকে সিগারেট বার করলেন। বললেন, “তোমরা কিছু মনে কোতো না। এই বদ অভ্যাস বিলত থেকে এনেছি। কিছুতেই ছাড়তে পারছি না। তবে খুব চেষ্টা করছি।” কংগার লাইটারে আগুন জ্বালানেন। তারপর কত কথা হলো। তারতীয় বর্ণন সম্বন্ধে পরন্তের এতো আগ্রহ আর কখনো দেখিনি। আলোচনা করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। মাঝামাঝির দিকে তাকালেন। “আহা, অনেক বৈদ্য করিয়ে দিলাম।”

আমরা বেরোতে বাজি। আবার আটকালেন। “একটু থাড়াও, ড্রাইভারকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তোমাদের গাড়ী করে এগিয়ে দিয়ে আচ্ছ।”

গাড়ীতে কল পরন্তের মুখের দিকে তাকিয়েছি। ড্রাইভার রয়েছে, কথা বলতে পারিনি। কিন্তু গাড়ী থেকে নেমে ওকে চলে ধরেছি। ও বলেছে, “সোভা কথা ভাই। আমাকে বিলত বেতে হবে। সে যে করেই হোক।”

আমি বলেছি, “বা বলো ভাই, নবীদনী মহিলা। এসের পারের দুলা নিলেও অক্ষর পূণ্য হবে।”

অস্তুত ভাষা মেগেছিলো মিসেস বনারকে। লোভ সামলাতে পারিনি, পরন্তের সঙ্গে ঠর বাড়ীতে আবার গিয়েছি। উনি আমার করে বসিয়েছেন। কত কথা বলেছেন। কথা বলতে বলতে একটু খেমে আবার বলেছেন, “এসব কানের বলছি। এসব তো তোমাদেরই কথা। আমরাই বা জানা আছে কতটুকু? তবে জানবার চেষ্টা করছি, মাই ডিয়ার বব। এই যে বিরাট ভারতবর্ষ—এই তীর্থে তীর্থে কত হুগের সাধনা সঞ্চিত হ'য়ে রয়েছে।”

আমি বিশ্বের ঠর মুখে দিকের তাকিয়ে থেকেছি। বিশেষিনী হেরেও এত জানেন। ব্র্যাক-অ্যাও-হোয়াইটের টিন খুলে সিগারেট ধরতে ধরতে মিসেস বলেছেন, “তীব্রক জানতে হবে, নিজেকে জানতে হবে। হুখের নিলাকণ অভিজ্ঞতার মধ্য বির্যই তাঁকে আলিঙ্গন করতে হবে।”

উনি একমনে বলে চলেছেন। আর গোটা তিনেক জাওউইচ একসঙ্গে মুখে পুরে শব্দ বলছে, “অস্তুত, নবীন ভারতবর্ষ সেই সত্যকে ভুল থাকে।”

মিসেস বনার যেসে বলেছেন, “কে বলেছেন ভুলেছে? ভারত কি আশেও বৃহত্তর চরণে প্রজ্ঞাগুলি বৈ না? কশিলাকর রাজহুমার একদিন নিজের হৃদয়ক ত্যাগ করে



হুঃ ধে ভদা বিপাল পৃথিবীকে আলিঙ্গন করেছিলেন বলেই তো আত্মও তাঁর পুত্রোৎসব ।”

ইহাৎ মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, “বোধগম্য দেখেছো তোমরা ?” আদরা বাইনি শুনে মায়াং এয়ার-কন্ট্রোল ক্রাসের টিকিট কাটিয়ে এনেছেন । আমি বলছিলাম, “কাপ্ট ক্রাসের টিকিট কাটলেই হলো ।” মায়াং ঠিকত্বে উঠেছেন— “সব্দ ফরকি ! এটাই যেটে কাপ্ট ক্রাস—সেবে তোমাদের একটা অল্প বোঝে হাঃ ।”

ভারতবর্ষের লক্ষ দুহাতে টাকা খরচ করেছেন মিসেস বনার । পয়সার কোনো মায়া লগা নেই । শরৎ বলছে, “হবে না কেন ? আছে অনেক, আর থাকে কে ? না আছে দাবী, না আছে চেলা । এখন কোনো রকমে আমার একটা ঘিরে হলে হয় । একটা hint দিয়ে রেখেছি ।” একটু খেদে আমাকে বলছে, “অতো মূখ্যতারা হ’লে লাইকে কিছু করতে পারবি না । মেমসাহেব in fact তোকে আমার বেশেও বেশী গুরুত্ব করেন । মূখ্য ফুটে তোর অভাবের কথা ক’টাটার অস্তর হবে না ।”

লক্ষ্য, দ্বারা মাথা নাখির নিয়েছি আমি । বাহুরে বিদ্যাস, প্রচুর ক্রয়োগ নিয়ে তাকে প্রভাবিত্য করা । আগ্নে হুজতো পারতাম । কিন্তু মিসেস বনার আমার অন্ধকার জীবনে সত্যের শীশালোকে ছেলে নিয়েছেন ।

শরৎ একদিন এসে বললে, “ইংরেজি ভাল না জানতে পারি । কিন্তু দ্বাঃ মানোজ হয়ে গেল । আমার কথা শুনে মেমসাহেব প্রাচুরন বলেছিলেন, ‘মিলেত ? ওখানে কি পিখবে ? ওয়াই তোমাদের পারের তলার এসে পিখবে একদিন, সে দিন বেশী দূর নয় ।’ কিন্তু আমিও কম চালাক নই, দামীঘীর বুলি মূখ্য করে নিয়েছিলাম, নবীন ভারত ইউরোপকে তার বাণী শোনাক ।”

এর পর মিসেস বনার আর কথা না করেই বলেছেন, “তোমার বাঙার arrango করা । আমি টাকা দেবো । It is my duty and I will.”

টুকিট ক্রাসে শরৎ বাবে শুনে মেমসাহেব রেসে উঠেছিলেন । “আমার গোটা চরিশ পাউণ্ড বাড়িয়ে কি লাভ হবে ?” তারপর উনিই টমাস কুককে টেলিফোনে ডেকে সি. এণ্ড ও. কোম্পানীর জাহাজে কেবিন বিজার্ত করে মিলেন ।

শরৎ চলে বাঙার পর মেমসাহেবের সঙ্গে সেবা-সাফাঃ বন্ধ করে দিয়েছিলাম । কনটা ব্যাংক হবে দিয়েছি । ইচ্ছে করলে আমিও বিল্ডে যেতে পারতাম । তারপর ক্রমঃ নিজেই সাক্ষর নিয়েছি । এবং স্বাধীনতা একদিন মিলবে

মিসেস বনারের ব্যক্তিগত হাজির হয়েছি । শুধন কে জানতো ঐ দিনই রবার্ট সাহেবের সঙ্গে আমার আশাং হবে ।

মেমসাহেব সোকার বলে সীতা পড়ছিলেন । আমাকে দেখেই তিনি গীতা বন্ধ করলেন । বললেন, “কি খাপসার ? কোনো খোজখবর নেই । ভেবে মরি, ছেলেটার হলো কি ?”

বললাম, “শরীরটা ভাল ছিল না । তা আপনাদের কেমন চলছে ?” মেমসাহেব বললেন, “ভালই করছে, আজকে এসে । এতদিন রবার্টের সঙ্গে বগড়াঝাটি করে হাঁপিয়ে উঠেছি ।”

রবার্ট কে আমি জানতাম না । মেমসাহেবের মুখেই শুনলাম, মালখানকে হলো কলকাতার এসেছে । বেঙ্গল চেম্বরে ছোকরা অফিসার । এতিনব্বা থেকে বি-এ পাস করে পোতা চলে এসেছে ইতিহাসে । জাম চাকরি, তবিলঃ আরও ভাল—বড়সাহেব হয়ে বিটারার করবে ।

মেমসাহেব বললেন, “অনুত্ব ছেলে । অনার্সান্ত ফুলের মতো নিশাপ । তবে বরলটা ব্যাংক । হোম থেকে প্রথম আসবার পর একটা বছর মোটে তেজারাস । সাব্বানে না থাকলেই ঐ টাইপিষ্ট যেহেতুসোর পান্নার পড়বে । রোজ সন্ধ্যাকোলা ওল্লেসলী স্ট্রীটে পাড়ী নিয়ে গাড়িয়ে থাকবে ; তারপর একটা মেয়েকে ফুলে নিয়ে হোটেলের বাবে এসে বসবে ।

“ছেলেটা ভাল, বৃথিব্রতি আছে । কিন্তু ব্যাংক হবে যেতে কতক্ষণ ? সেই ছক্কেই ভারতের প্রতি ওর প্রচা আশাবাব চোরা করছি । ভারতবর্ষের সভ্যতাকে, তার সংস্কৃতিকে ওর জানা প্রয়োজন । কিন্তু ইতিহা সবচে কেমন একটা প্রেক্ষতিস নিয়ে এসেছে । কিছুতেই শুনতে চাই না ।”

মেমসাহেব বেছাঃকে ডেকে চা আনতে বললেন । বোঝা জিজ্ঞাসা করলে, “তিন আদবীর মতো তো ?” মেমসাহেব বললেন, “না, দু আদবীর মতো ।” আমাকে বললেন, “রবার্ট আঃ আর আসবে না । কাল বা বগড়াঝাটি হবে গেল !”

কেকের ভিটা সবেমাত্র উনি আমার থিকে এগিয়ে যিয়েছেন, এমন সময় বাইরে ঘোড়ারের শব্দ পাওয়া গেল । রবার্ট সাহেব দর দুকলেন ।

মেমসাহেব এক মূখ হেসে বললেন, “কতদিন যে বাচবে তুমি । এইবার তোমার কথা হচ্ছিল ।”

“কথা হওয়ার সঙ্গে অনেকদিন বাচবার দশকটা কি ?” সোকার বলতে বলতে রবার্ট সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন ।

"ভারতবর্ষের মুনি-ঋষিরা এ বিষয়ে নিত্য কিছু বাণী দিয়ে গিয়েছেন।"

মেমসায়েব রাগে গর্জন করে উঠলেন। "মুনি-ঋষিদের এর কথা টানছো কেন? ভারতবর্ষের সাধারণ লোকেরা যা বিশ্বাস করে আমি তুমি তাই বলছি।"

রবার্ট স্যাহেব কিছু বলতে বাজিলেন, কিন্তু আমাকে দেখে থমকে যেন। আমিও কোট প্যাট বোড়া রবার্ট স্যাহেবের ছ'ফুট তিন ইঞ্চি বেহালা জাল করে দেখে নিলাম। ক্রিকট-খেলোয়াড়ের মতো বোহারা অর্ধে খেল চেহারা। হাতের চঙড়া কচি বেহালাই বোকা দায় বে, কচির মাসিক নিত্য নবীর পুতুল নয়। দাবী সার্দের কোটের বোতামে একটা সোলাপ ফল পোঁজা।

মেমসায়েব বললেন, "ওহো, তোমাদের আশাণ করিয়েই দেওয়া হয়নি।" রবার্টের দিকে চাের কাণ এগিরে দিতে-দিতে মেমসায়েব বললেন, "শংকর কিন্তু তোমার মতো পোঁজার নয়। আবার কথা শুনেও শু কি যে ভালোবাসে।"

চ্যাক-ব্রাশ-করা সোনালী চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে রবার্ট স্যাহেব বললেন, "কেন এই ছেলেরা জীবিত নেই করছে। ইতিহাসে এখন ইতিহাস, ভাস্কর, কারিগর হরকার। নাগা স্ত্রাণী আর না বাড়লেও কোন কতি হবে না ইতিহাস।"

মেমসায়েব রাগে গর্জন করে উঠলেন, "রবার্ট, এসব আলোচনা তো কালই শেষ হবে গিয়েছিল। আচ্ছ তোমাকে আশা-ই করিনি।"

রবার্ট স্যাহেব হেসে ফেললেন, "আমার কিন্তু কিছু আশা আছে।" পকেট থেকে দু'খানা দিনেমার টিকিট বার করলেন। "বেশি সময় নেই কিন্তু। দিনেমা হলে পৌঁছতেই গনরো মিনিট লাগবে।"

মেমসায়েবের অস্থমতি নিয়ে আমি উঠে পড়লাম। আমাকে সেট পর্বত এগিরে দিতে এসে মেমসায়েব বললেন, "তুমি তো জান, দিনেমা আমি দেখি না, তুমি আচ্ছ বাহো, কারণ ওকে আমাদের মনে টানতে হবে। ভারতের বর্জন, ভারতের ধর্ম-আন্দোলন যে সকল ধর্মের শেষ কথা তা বোঝাতেই হবে।"

মিসেস কনারের ওখানেই রবার্ট স্যাহেবের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। ওরা দু'জনে জোর আলোচনা করছিলেন, সেই সময় গিরে পড়ছি।

মিসেস কনার বলছিলেন, "ইউরোপের সবচেয়ে বড় কুল তো ওইখানেই, প্রচলিত চিন্তার বিরুদ্ধে কোনো কথা তুলেই দায় করে। কেউ যদি বোঝাতে দায়, তাহলে আক্রমণ করছে। হিন্দুধর্মের আশ্রয় নিলে সব সমস্তার সমাধান হয়। ইউরোপকে, রসাতল ইউরোপকে, বাঁচাবার ঐ একমাত্র পথ।"

রবার্ট আমার উপস্থিতিতে একটু লজ্জা পেলেন—একজন ভারতীয়ের সামনে ভারতের নিন্দা করা। আশ্রয় করে আমি বললাম, "আমোচনার সময় প্রাণ খুলে কথা বলাই ভাল।"

রবার্ট সাহস শেষে বললেন, "ইতিহাস লিখে এই অস্বস্তিক প্রজ্ঞা আমার ভাল লাগে না। হাজার হাজার বছর পরে ঐ লোকের পুরো করে ভারতের কি অবস্থা হয়েছে দেখছি তো।"

মেমসায়েব রেগে উঠলেন, "এ তোমার পৌঁজামি।"

রবার্ট হাসলেন। "ইউরোপ পৌঁজা? উইলিয়ম বোল, ম্যান্ডেলার, উইলসন, উডকর এরা কি কলকাতাতে আসে-ছিলেন?"

আমার টিউনির সময় হবে আসছিল, অস্থমতি নিয়ে বিলাপ নিলাম। ওদের আলোচনা শুধন পুরোদমে চলছে।

কয়েকদিন পরে মেমসায়েবের বাড়ীতে চুকতে বাজি, দরওয়ান বললেন, "হায়েন না। রবার্ট স্যাহেবের বলদ হয়েছে। যা হোয়াটে রোগ।"

সত্তাধ্বানেক পরে আবার গিয়েছি, মেমসায়েব ভিতর নিয়ে সেলেন। রবার্ট শুবে শুবে বই পড়ছিলেন। আমাদের গায়ের দৃশ্যে বই বন্ধ করলেন, সাতা মুখে কালো কালো দাগ। মুখের সেই নিশাপ সৌন্দর্য কিন্তু নেই হয়নি। বরা-ওই কালো দাগগুলো দিয়ে থিয়েটারের মেক-আপ যান বেন প্রশান্তি এসে গিয়েছে মুখে।

মেমসায়েব রবার্টের চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাতে বললেন, "উঃ, যা অভিমতী! সেদিন তো তুমি বাবার পর ও কপড়কাটা করে বেরিয়ে গেল। তারপর



আর দেখা নেই। শেষ পর্যন্ত আমিই সেলাম পার্ক স্ট্রীটে—
মাশাম বেরিদের পেস্ট-হাউসে। গিরে দেখি এই অবস্থা।
ডাঙ্গিলা গিরে গড়ছিল। ওরা তো এথ্লেটিক পাঠাবার
জন্ত তৈরিসান করে দিরাছিল। উঃ, সেই অটুতন্ত সেখটাকে
ক্যামের হাসপাতালে পাঠালে কি বে হুতো! নেহাত নুনি-
ওবিসের আদর্শ! ”

রবার্ট এবার একটু হাসলেন। গায়ের চামড়া আরও
একটু টেনে নিলেন—“আবার খুনি গুণি ?”

মেমসাহেব বললেন, “অস্থিরের ক’দিন এইসব কথা ভুলিনি
ইচ্ছে করেই। তা বলে ডিরকালের জন্ত মুখ বন্ধ করছি না।”

ঘোড়া কলর হল দির গেল। মেমসাহেব রবার্টের
নুড়ি ধরে আঁতে আঁতে খাইয়ে দিলেন। তারপর তোমালে
গিরে মুখ নুড়িয়ে দিলেন।

রবার্ট সাহেব পা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, “টুর্কিস্টানের
শেখের মতো অনেক কিছু আছে ইতিহাসে। মন্দির,
দাপ্তর, ভাণ্ডার, বাতালী, অলম্বা, ইলোরা, সমস্ত বক্ষিণ
ভারত।”

“জু মুন্দির ? সে তো ভাবের খেলা। ভিতরের সত্য
হয়ি আদান না করলে, তাহলে কিছুই হলো না।”

অস্থিরের মধ্যে পাছে উত্তেজনা বাড়ি এই ভয়ে আমি
আর হিসেস বনার বেরিয়ে এসেছি। উনি বলছেন,
“হিন্দুধর্মের বিলম্ব ওর ফল জাতকোষ। কিন্তু আমিও
ছাড়বো না। রবার্ট আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ।
ভারতের গায়ের মাথা নত করে ছাড়বো। অস্থিরের মতোই
করসা করে ওকে কিছুটা সংকুত আর বাংলা শিবিরেছি।”

এরপর ব্যাখা উঠাবের জন্ত রবার্টকে নিয়ে হিসেস বনার
মৈনিতাল চল গিরেছেন। হাওড়া স্টেশনে পাঠাব বেলের
এয়ার কন্ট্রোল কোডে ওঁদের দুখনকে ভুলে গিরে এসেছি।

ক্রমের কামরায বাইরে এসে মেমসাহেব আমাকে
বলছেন, “মৈনিতাল দাবার কোনো ইচ্ছে ছিলনা আমার।
কিন্তু রবার্টের শরীফটা ভাল না থাকলে ধর্মে আগ্রহ স্তম্ভ করা
হবে না।”

মৈনিতাল থেকে ফিরে এসে মেমসাহেব আমাকে বেধা
করতে চিরি গিরেছেন। গিরে দেখি রবার্ট সাহেবও কল
আছেন। মেমসাহেব আমাকে কলকলসো বই উপহার
দিলেন। অষ্টমত আলমে বেড়াতে গিরেছিলাম, সেখান থেকে
আমার জন্ত কিনে এসেছেন। আমরা দু’জনে আলোচনা
করতে লাগলাম—রবার্ট সাহেব আঁতে আগ্রহ দেখালেন না।
একমুনে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চাইব কাগজ

পড়তে লাগলেন। আমারের আলোচনা চলতে লাগল।
অবশ্য মেমসাহেবই প্রধান বক্তা।

ঘড়ির বিকে তাকিয়ে রবার্ট সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন,
“তা হলে তুমি ধাবে না হুইমিং স্লাবে ?” মেমসাহেব হাসলেন,
“তুমি তো জান রবার্ট, সে মন আমার নেই। সাবে
গিরে শাঁতার কটা, ওতে আনন্দ খুঁজে পাই না। তা ছাড়া
আমাকে খুশোতে বলতে হবে।”

রবার্ট সাহেব সেদিন আমাকে ঘোঁড়ের দিকটু দিতে
চাইলেন। “আমি হুইমিং স্লাবে যাবার পথে তোমাকে
এলম্বানেতে নামিয়ে দেবো।” শুনে মেমসাহেব বললেন,
“তা হলে খুব ভাল হয়।”

রবার্ট সাহেব নিজেই ড্রাইভ করেন। আমি তাঁর পাশে
বসলাম। মেমসাহেব কললেন, “শংকর, আমার এসো।”
রবার্টকে বললেন, “কাগ কললে চলবে না কিন্তু।”

গেট পেরিয়ে যেতেই রবার্ট সাহেব আমার দিকে তাঁর
দৃষ্টিতে তাকালেন। “কত দিন আসছেন এখানে ?”

“তা বছরখানেক হলো।”

“কেন আসেন ?”

“মেমসাহেবের সঙ্গে বর্নতব আলোচনা করতে ভাল
লাগে।”

রবার্ট সাহেব এবার আমার হাতটা চেপে ধরলেন,
“Please don't take it otherwise. ঐ সরল ভব-
মন্দির মতো এইসব ধর্মের কলসার চুকিয়ে কি লাভ হচ্ছে ?”

রাগে অগমানে সেদিন আমি তাঁরই মোড়ের ওপর গাড়ী
থেকে নেমে গড়ছিলাম। এক সেই সেব। আর কোনও
দিন বাইনি লাউডন স্ট্রীটে। সেখানে আমি প্রত্যাশিত
নয়, সেখানে বাওরা আমার স্বভাববিকল।

মেমসাহেবের সঙ্গে আর সেধা-সাক্ষাৎ হয়নি। সংসারের
নানা কাজে জড়িয়ে পড়ছি। হাইকোর্টে ব্যারিস্টারের কাছে
চাকরি পেরেছি এক এক অপরিসিষ্ট বিশাল জগতের মধ্যে
ভুঁব গিরেছি।

অনেকদিন পরে হাইকোর্টের কাছেই একদিন ‘বেদল
চেয়ারে’ গিরেছিলাম। হুঠাৎ রবার্ট সাহেবের কথা মনে পড়ে
গেল। ওঁদের আরবিশিয়ান ডিপার্টমেন্টের বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা
করলাম, “রবার্ট সাহেবের এখানে কি পোষ্ট ?”

বড়বাবু আমার দিকে তাকালেন, “আপনি কি রবার্ট
সাহেবকে চিনছেন ?”

“আজ, একদমর পরিচয় ছিল।”

“তিনি তো সংসার ত্যাগ করেছেন।”

চমকে উঠেছিল। রবার্ট সারেব, সন্সার ত্যাগ করেছেন! সেই দুর্দশ কেন্দ্রস্থত, অধিবাসী রবার্ট সারেব চাকরি ছেড়ে দিয়ে, সন্সারের মাথা কাটের ঈশ্বর-লক্ষ্মী হয়েছেন।

বড়ারূ বললেন, “কার মন যে কোথায় মরে! না হলে রবার্ট সারেবের মতো সারেব। ঐ চকির-পটিল বছরের ছোকরা! কিনা হিন্দু হয়ে গেলেন। কি করে যে সম্ভব হয় তিনিই জানেন।”

চোখের সামনে তেলে উঠলো হিসেল বনার ও রবার্ট সারেবের চিহ্ন। রবার্ট সারেব হিন্দুধর্মের কথা বুঝবেন না, যেমসারেবও ছাড়বেন না। রবার্ট বলছেন—“অন্ত কেউ হলে এসব কথা কান দিয়ে শুনতামও না। নেহাত ভূমি বলাচা তাই।”

প্রমথ আমার মন ভরে উঠেছে। বাড়ী ফিরে এসেই যেমসারেবকে দীর্ঘ চিঠি লিখেছি—আপনার জন্মই এই অসম্ভব সম্ভব হলো। রবার্ট সারেবের মতো মানুষকে হিন্দু-ধর্মের পুজারী করে ছাড়লেন। আপনি আমার গ্রাম্য গ্রহণ করবেন। ভারতবর্ষ আর হাই হোক অকৃতজ্ঞ নয়। আধুনিক ভারতের নৈতিক পুনরুত্থানের ইতিহাসে দিল্লীর নিবেদিতা, মাদার এবং বিন্দ্ৰ হ্যাকলাউড-এর সঙ্গে আপনার নামও সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

যেমসারেবের কাছ থেকে কোনও উত্তর পাইনি। প্রত্যাশাও করিনি। আমি স্বতঃপ্রসঙ্গিত হয়ে ভারত সংস্কৃতি সোসাইটির বার্ষিক সংখ্যায় দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছি। গ্রাম্য জানিয়েছি সেই মহীয়সী বিদেশিনীর চরণে। আমার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ পরিচয়ের ইতিহাস লিখিবদ্ধ করে লিখেছি—আমার লেখা শেষ চিঠির উত্তর তিনি যেননি। কিন্তু কোনো খেদ নেই তার জন্য।

খবের কথাটা সেদিন অত ভেবেচিন্তে লিখিনি। তখন কি জানতাম ওর সঙ্গে দেখা না হলেই আমার ভাল হতো। শুণ্ড শুণ্ড ছুঁষ পেতে হতো না। আর আপনাদের কাছেও আমাকে আর কোনো অভাব অহরোধ করতে হতো না। দাক, গঙ্গের ঠোঁকে, ঘর করে আমার অহরোধটা কিন্তু কুলবেন না। কৃষ্ণগ্রামের সঙ্গে দেখা হলেই আমাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেবেন।

জানি মানুষের এই সংসারে সবই সম্ভব। জীবন-মৃত্যু, উত্থান-পতন, জন্ম-মরণ, কাল-বাহির মধ্য দিয়েই সংসারের স্বচ্ছ বায়বীয় আবর্তিত হয়। শুণ্ড যেদিন বিদ্রোহে



হিসেল বনারের সঙ্গে দেখা হলো, চোখের জল শূন্যমতো পারিনি।

আমার হাইকোর্টের পাল্লা চুকিয়ে তখন আমার পথে বেরিয়ে পড়েছি। খার্ডজাসের একখানা টিকিট কাটলে বিদ্রোহে উঠে বসেছি। বিদ্রোহে বহন বর্ধমান ষ্টেশনে থাকলো, তখন পাড়ী থেকে নেনে একই মাস্টারদের উপর এসে ঠাঙ্গিয়েছি। হঠাৎ জোখ পড়ে সেল খাবারওঘালার উপর। চারচাকা পাড়ীতে পুরি ভেজে বিক্রি করছে আর এক যেমসারেব সামনে ঠাঙ্গিয়ে শালপাতার চৌঃ হাতে করে পুরি খাচ্ছেন। খাবারওঘালা বললে, মিটার যেমসার? শালপাতা থেকে তরকারীটা মুছে বেতে যেতে যেমসারেব বললেন, না। আমি চমকে উঠেছি। গলা খরটা চেনা-চেনা বেনে। হিসেল বনার না?

এদিকে পাড়ীর হাইসল পড়ে গিয়েছে। ছুটে গিয়ে নিজের কামরায় উঠতে হলো। আপনসোলে বহন পাড়ী

এলা! তখন হাত অনেক। গাড়ীতে ডীফও বেঁচেছে। মেমসাহেবের খবর নেওয়া হলো না। 'অচ্চ ঐ পুত্রি কেনার দুষ্টটা মনের মতো হোলগাচ করবে লাসলো। গবর দিন ভোরবেলায় মোগলদরাই স্টেশনে গাড়ী থেকে নেমে মেমসাহেবকে খুঁতে বার করলাম। খার্ডচাপ কানদার বেকির এক কোণে উলস ভাবে বসে রয়েছেন। চুলওলার ব্য বেকিরসি হয়নি কে জানে। চোখের কোণে কালি পড়ে গিয়েছে। এই ক'বছরেই বসল বেন পনরো বছর এগিয়ে গিয়েছে। জামা-কাপড়ের দিকেও নজর পড়লো। গরুর সেই ঘাট আর নেই—অতি সজা ধরুর উত্তরে কাশড, তাও ফাট খরছে।

ভীড় মেনে গাড়ীর মধ্যে ঢোকা সম্ভব নয়। তাই চান্দা দিয়েই বললাম, "গুহু, মনিং, মায়াহ।"

মেমসাহেব আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। বললাম, "চিনতে পারছেন না? আমি শংকর। রবার্ট সাহেবের সংসার-ত্যাগের খবর পেয়ে আপনাকে শেষ চিঠি লিখেছিলাম।"

মেমসাহেব এবার চিনতে পারলেন। কিন্তু মোটেই খুশি হলেন না। দুখটা ব্যাখ্যা করে বললেন, "লক্ষা হওয়া উচিত ছিল। অমৃত্যু তোমার! তোমার বহু ও জোয়ার করে তো অনেক কিছুই করেছিলাম একদিন। চিঠি দিয়ে অপমান করবার কি অধিকার ছিল তোমার?"

গাড়ীর লোকজন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি কিছু বুঝতে না পেরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার হাপও বেড়ে উঠছিল। বললাম, "আপনার কাছে এমন ব্যবহার প্রত্যাশা করিনি। অনেক কথাই তো বলছেন। কিন্তু লক্ষার মতো কি করেছি?"

মেমসাহেব রাগে লাকিয়ে উঠলেন। "লক্ষা, লক্ষা তোমাদের আছে, যে পাবে? মাংসের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার সর্বনাশ করতে পারো তোমরা।"

অনেক কষ্টে সেদিন নিজেকে সংবৃত্ত করেছিলাম। অনেক উপকার পেয়েছে ডারবর ওর কাছে। কুজুজার বোহাই দিয়ে অনেক ঠাণ্ডা করেছি। তবু দাবার মন বললাম, "অনেক মাহুং দেখছি, অনেক দেশ ঘুরেছি, কিন্তু আপনার ক্ষুধি দেখিনি।" কথা শেষ করেই নিজেই কাশরায় উঠতে বাজি, যেখি মেমসাহেব ডাকছেন, লোকজন আমার দিকে নিউনিট করে হাসছে। কি কুক্ষণই যে ওর সঙ্গে দেখা হলো!

কিছু দিয়ে বললাম, "কি চান?" মেমসাহেবের রাগে কে যেন ইতিমধ্যে জল ঢেলে দিয়েছে। কালেন, "রাগ

করলে? I am sorry. মাথাটা ঠিক থাকে না। তার উপর খার্ডচাপের এই কষ্ট।"

কিছু উত্তর না দিয়ে চুলচাপ ঠাকুরে থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করলাম। উনি বললেন, "তুমি তো অনেক দেশ ঘুরেছো; কুজুগ্রাণকে দেখেছো কি?"

"কুজুগ্রাণ?" আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই ট্রেনের হাইসল বেজ উঠলো।

এলাহাবাদ স্টেশনে হটকেস সবচেয়ে নামদার। আমার টিকিট ঐ পর্বত। হঠাৎ দেখি মিসল বনারও তাঁর ছোট্ট ব্যাগটা নিয়ে নেমে পড়ছেন। বললেন, "ভেবেছিলাম কানপুতটা আগে খুঁজে দেখেবা। তা তুমি যখন রয়েছো চন্দা। এলাহাবাদটাই দেবে বেশি। কিছুই বলা যায় না, হযতো ও এখন জিবেই-দগনে বাস করছে।"

ওয়েটে কমে কিছুকণ বিদ্রাম করে আমরা যখন সন্মের কাছে এসে ত্রিকণ থেকে নামদার তখন প্রায় বিকল। ডাগিলস কোনো ঐধাধরা প্রোগ্রাম ছিল না, আমরা। নিজেই মনেই বেশ সেরবার ভ্রমে হাওড়া থেকে টিকিট কিনে বসেছিলাম।

মেমসাহেব আমার মুঠো হাত চেপে ধরে বললেন, "আমার উপর খুব রাগ করছে বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার মাথা ঠিক থাকে না।"

নবীর খারে একটা গাছের তলায় এসে বললাম হ'লেন। বললাম, "অকস্মিকতে পুজো দেবেন না?"

মেমসাহেব হাসলেন, "পুজো...ওসব মিথো। আমি কেন পুজো দেবো? আমার তো সব গিয়েছে।"

আমি চমকে উঠলাম। রবার্ট সাহেব—নংগাং-ত্যাগী রবার্ট সাহেব—এ কথা শুনে কি ভাবতেন। নিচইই অব্যাক হয়ে যেতেন। বললাম, "আপনার অবশ্য আর পুজোর প্রয়োজন হবে না। হাইড্র স্ট্রীটের একটা সাধারণ ইংরেজও খার শ্রদ্ব সোনা হয়ে গিয়েছেন, পুখা-উগচায়ে ওর কি প্রয়োজন?"

সাদনে ঘিরে কয়েকজন সন্ন্যাসী ঘাঙ্কিলেন। মেমসাহেব হঠাৎ মুটে দিয়ে তাঁদের মুগগুলো দেখতে লাগলেন। সন্ন্যাসীরা অব্যাক। মেমসাহেব বললেন, "আমার অপরাধ মার্জনা করবেন। আপনারা কেউ কি কুজুগ্রাণকে দেখেছেন? আগে নাম ছিল রবার্ট। ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা। মাথার ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া সোনালী চুল। গায়ে লম্বা পেল্লা-রঙের আদ্যাকা, হাতে একতারা, কাঁধে তিক্কার কুলি।"

সন্ন্যাসীদের একজন বললেন, "না হাইকী, কোনো সাহেব-মহারাষ্ট্রকে তো দেখিনি এখানে।"

কাজ যেমদায়েব আবার আবার পাশে এসে বসলেন। কেন খুঁজছেন তিনি হবার্ট সাহেবকে? হিজায়া করলাম, "হবার্ট সাহেব কেন? যিশুর সন্তানসী হয়েছেন? তার জন্যে আপনি এতটা করেছেন, তিনি আপনাকে ইচ্ছে করলেই চিঠি লিখতে পারেন। সন্তানসীদের তো চিঠি লেখা খারব নেই।"

আবার যুগের বিকে তাকিয়ে রইলেন যেমদায়েব। এমন তীর সে চাহনি যে মনে হলো আমাকে সম্বোধিত করে ফেলবেন। তারপর হঠাৎ কাঠের ডেস্কের পড়লেন। আমার কোলে মাথা রেখেই পাঠতে লাগলেন। কোনোদিন তাঁকে কাসতে দেখিনি। লাউচন স্ট্রীটের বাড়িতে উনিই আমাকে ও হবার্ট সাহেবকে বলেছিলেন, দিব্যজ্ঞানী স্বপ্নও চোখের আল ফেলেন না। স্বপ্নেও কোনো কিছুতেই অভিকূত হন না।"

অক্সর বারিবধেব নিজেকে ঝড়ল করে যিশুর বনায় ধমন উঠে বসলেন তখন সন্ধ্যার ক্রান্ত সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। ত্রিবেদী তাঁর পবিত্র সলিলে কে বেন লাল রঙ তলে দিয়েছে। সেই প্রাচ্যাকারে এলাহাবাদ কোর্টের কাছে বলে যিশুর বনায়ের যুগে সেদিন হবার্ট সাহেবের পুরো গরম শুনেছিলাম।

"তুমি তো জান ও ভগবানে বিশ্বাস করতো না।"

"সুখ আমি। আমাকেও একদিন কথা শুনিযেছিলেন, সেই জন্তেই তো আপনার কাছে বাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম"—আখি বললাম।

যেমদায়েব হাসলেন—"আমি ধবর পেয়েছিলাম। হবার্ট নিয়েই বলেছিল। হবার্ট বলেছিল, কৃষ্ণাকারে বিশ্বাস করে সময় নষ্ট করছো কেন? ঐ সময়টা পুনিবীকে বেগলে অনেক লাভ হতো।"

যেমদায়েব তখন ভব পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, "যিশুর ভগবানে বিশ্বাস না করো, ঈশ্বরের ভগবানে বিশ্বাস করো। না হলে সংগে থাকবে কি করে? ভালোহিসরি এই ছত্রছাড়া ঘেরেগুপার সঙ্গে বোখাখ ভেলে যাবে।"

হবার্ট সাহেব হেসেছেন। "স্বেরসের হাত থেকে উঠতি বরসের ছেসেনের ব্রহ্ম করবার জন্তেই কি মুনি-গবিরী পায় রচনা করেছিলেন?"

যেমদায়েব বলেছিলেন, "ঘোটেই নয়। কিন্তু জীবনের কাব্যকে ছন্দে ঠাঁধবার জন্য একটা ভাবের অবলম্বন চাই তো।"

হবার্ট সাহেব বলেছেন, "এসব বাজে আলোচনার সময় নষ্ট কিছুতেই করতাম না। নেহাত তুমি বলছো তাই।"

হবার্টের একমাস ছুটি পাওনা হয়েছিল। ঠিক নিয়ে

ভারত-কর্ণনে বেয়েবার প্রজ্ঞাব করলেন যেমদায়েব। প্রথমে রাষ্ট্রী হবনি। তখন ক্যামেরার ছবির সোত দেখিয়েছেন যেমদায়েব।

হবার্ট বলেছেন, "That's interesting. বিশ্বাস করি আর না করি, মন্দির, নদী, পাহাড়, সাধু-সন্তানসীর ছবিগুলো ইন্টারেস্টিং। ইন্টারেস্টিং লওন নিউজে খাতির করে ছাপবে।"

কেবল ছবির আকর্ষণ নয়। যেমদায়েব বলেছেন, "আর কেউ ওকে বার করতে পারতো না। কেবল আমার জন্তেই রাষ্ট্রী হয়েছিল।"

ছাত্রের সময় বস্কিপ ভারত ভ্রমণ করেছেন। অক্সাচলে ভ্রমণ মহর্ষি, আরও বস্কিপ সাই বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। যেমদায়েব প্রণাম করেছেন। হবার্ট ছবি তুলেছেন।

তারপর রামেশ্বর-সেতুবন্দ। কলকাতামারিকার বে শিলা-খণ্ডের উপর বলে রাষ্ট্রী বিরকানন্দ একদিন ভারত-চিন্তা করেছিলেন, তাও দেখেছেন। হবার্ট সাহেব বলেছেন,



"প্রাকৃতিক দৃষ্ট অশুভ !" যেমদারের বিজ্ঞানস কয়েছেন, "তুই প্রাকৃতিক দৃষ্ট, আর কিছু ?" রবার্ট বলেছেন, "কই না তো।" তারপর উত্তর ভারত। কানী, গদা, কৃষক, হরিদ্বার। রবার্ট সায়েব নাক চোখ ঘেঁষে ক্যামেরার বোতাম টিপেছেন। নূব বেরিয়ে বসেছেন, "এই ভারতবর্ষে গৃহবিবাহে পথ দেখাবে ? How silly !"

সেইবার পথে এসেছায়া। রবার্ট সায়েব বলেছেন, "হেই হেই হেই। এবার কলকাতার কিংসই হু। ছুটিটা একবারে নই হলো। হাওয়ার হাজার বছরের পুরনো ইট-কট-পাথরগুলো দেখে সময় নই না করে কানীর গেলে চোখের তুলি হতো।"

যেমদারের বলে চলেছেন, আমি তখনই।

"সময় এবার কল আমরা নৌকো করলাম। সকালের কোই গলার জলে এসে পড়েছে। রবার্ট ছবি তুললো করেকটা। তাঁরের নিকে কিয়ে আসবার সময় বেলায় একটি দুইটা দূর পর্যন্ত তলে তুলিয়ে, চোখ বন্ধ করে ইয়াকে প্রণাম জানাচ্ছে। রবার্ট ক্যামেরা তুলতে হাঙ্গিল, আমি বাধা লিলাম, মেমোরি রানের ছবি তুলতে গিয়ে একটা পোলমাল বের হাক। প্রণাম শেষ করে, চোখ খুলে আবারে বেরেই মেমোরি নূব হাঃ হরে উঠলো।

নৌকো থেকে নেমে নদীর পারে একটি নির্জন স্থানে এসে বসলাম আমরা। পা ছুটো ছুড়িয়ে রবার্ট ক্যামেরায় নতুন ফিল্ম পরাতে লাগল। এখন সময় কানে গেল—"ঠাহুর !"

রবার্ট চমকে উঠে ক্যামেরাটা মাটিতে নাকিয়ে রাখলো। ভিজে কাপড় পরে সেই মেয়েটি ঝড়িয়ে রকেছে। স্নান সেয়ে সবেনার পক্ষ থেকে উঠে এসেছে। একেবারে ঠাণ্ডা বদল—এক-বাইশের বেশি নয়। ন'হাত গেলদা কাপড় ঐ দীর্ঘ, চকল হুরর মেংখানি ঢেকে রাখা কি সম্ভব ? ভিজে কাপড় হাঁটুর কাছে উঠে এসেছে। পা ছুটো ছুড়িয়ে মতো লাগে। ছুটো-চারটে কালো রোম জলে ভিজে সেহের নকে লেপটে রয়েছে। মেয়েটি ভিজে কাপড়ে বোধনরবে উত্তর নিজের সেহটিকে কোনোক্রমে ছড়িয়ে নিয়ে ক্যামক্যাম করে রবার্টের নিকে তাকিয়ে রইল। তারি সরল মুখখানি।"

বিরক্ত হয়ে রবার্ট আবার বসলো, "একটু নিরালস্য বস তোমার নকে পল্ল করবো ভাবলাম, সেখানেও বাধা। অদৃষ্ট বেশ। Privacy বলে কোনো বস নেই।"

"এতোদিন কোথায় ছিলে ঠাহুর ?" মেয়েটি ভিজে কাপড় দূর থেকে রবার্টকে প্রণাম করল।

আমি বিজ্ঞানস করলাম, "কে তুমি ?" কি চাও ?"

মেয়েটি বিরক্ত হলো। নূব বেরিয়ে বসলো, "খাযো তুমি। আবার ঠাহুর বিজ্ঞানস করক। তাকে সব বলবো।" রবার্টের মুখের নিকে সে হা করে তাকিয়ে রইল। আমার মনে হলো তার হুটি স্থবিত চোখ দিয়ে সে বেনে রবার্টকে নিলছে। ভিতরে কিছুই পায়নি মেয়েটি, কেবল কাপড়টি জলো। সেই অবস্থায় সে রবার্টের পা শেষে এসে বসলো। "ঠাহুর ! আবার কেউঠাহুর—এতোদিন কোথায় ছিলে ?"

রবার্ট হুচকিয়ে উঠে, খানিকটা আবার নিকে সরে এস। ভাঙা ভাঙা বাংলায় রবার্ট বলল, "কে তুমি ?"

"আর ছলনা কোরোনা, ঠাহুর। আমি যে তোমার দীদা। বীরকুমের ভাঙা হুঁতেরে বস নিয়ে সেই যে তুমি লুকিয়ে পড়লো। তারপর আমার নূব নেই। অর বাতে না। স্নাত বেন শেষ হতে চায় না। কত তীর্থে খুঁজে বেড়িয়েছি তোমাকে। কত মন্দিরে তোমার মন্ত মাথা খুঁজেছি। এতোদিনে সময় হলো ঠাহুর ? তাও আমার সায়েব সেয়ে ছলনা করছো।"

স্নাগে, অগমানে ও লজ্জায় রবার্টের মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। আবারকে ইংরেজীতে বিজ্ঞানস করলো—"কি চায় ? ভিক্ষা ?"

আমি বললাম—"এরা বোটেবী। সন্সার ত্যাগ করে ভগবান রুকোর সম্মানে নূব বেড়ায়। তাঁর উৎসবে ভজন গায়, তাঁর পূজা করে। তাঁর জন্মেই নিজের সেহ খারপ করে।"

মনিব্যাগ থেকে একটা মাগুনি বের করে রবার্ট মাটিতে কেসে দিল। বোটেবী বললো, "একি ঠাহুর, অর্গেই কি হবে ? আমি ও নেবো না।"

আমি ভাবলাম পুরো টাকটিই চাইছে। রবার্টকে বলতে গেলাম তাই। বোটেবী স্নাগে আবার নিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল। "কি সব কুল খোকাছো আমার ঠাহুরকে ?" তারপর রবার্টের পা মড়িয়ে বরবর করে ঠাণ্ডতে লাগল। "আমার কপ্তর সয়ে একেবারে মিলে যাচ্ছে। সেই চোখ, সেই নাক, সেই শুভ্রকাকন বর্ণ।"

রবার্ট পা সরিয়ে নিতে চেষ্টা করতে, বোটেবী আদো হুঁকে পড়লো। "চরণে আশ্রয় লাও, ঠাহুর।"

বিরক্ত হয়ে রবার্ট বললো, "এই ভারতবর্ষে তুমি মাথায় কুলে রেখেছো। মতোসব পাগলের আড়ত।"

রবার্ট উঠতে হাঙ্গিল, বোটেবী করছোভে বললো, "ঠাহুর, আর কিছু না লাও, তোমার পায়ে হুসা লাও একটু। দাদী মাথার করে রাখবে।" হুঁকের অপেক্ষা না করে বোটেবী রবার্টের হুজোর নিকে খুঁতে লাগলো।

রবার্ট আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, “এদেশের মেয়েবাও সংসার ভোগ করে?”

আমি বললাম, “করে। বীড়ার গল্প তোমাকে বলিনি? রাজবধু বীড়ার কৃষ্ণ-অভিলাষের গল্প।”

“তা বলে এই কাঁচা বসে একা একা ঘুরে বেড়াবে? অল্প পোশাকে আলতন করবে? এখার আত্মীয়-স্বজনরা কিছু বলে না?”—রবার্ট জিজ্ঞাসা করলে।

“কৃষ্ণ থাকে ভেঁকে পারিবেছেন, সংসার তাকে বেঁধে রাখবে কি করে?”

“কেউ এতক ভেঁকে পাঠাবেনা, কেউল হালশাতালের ডাকার ছাড়া।” রবার্ট বিরক্ত হয়ে নিজের জুতোটা সত্বে নিলে।

বোঠমী পরম বয়ে রবার্টের জুতো খুলছিল। চমকে উঠে রবার্টের দিকে বড় বড় চোখ দিয়ে তাকিয়ে রইল, স্বহস্তে করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আমি আর লজ্জা করতে পারলাম না। বললাম, “তোমার পায়ের খুলো নিয়ে কেউ যদি শাস্তি পায়, তাতে বাধা নেওয়ার কোনো অধিকার নেই।”

বোঠমী কিন্তু রেগে উঠলো; আমাকে বললে, “আমার ঠাঁহুর আমার শাস্তি বিচ্ছেদ, তাতে তোমার কি?”

রবার্ট রেগে বললে, “তোমার পাল্লায় পড়ে আমার মোক্ষা পর্বত খুলতে হলো।” বোঠমী অহমতির অপেক্ষা না করে আবার রবার্টের মোক্ষা খুলতে লাগল।

রবার্ট সেই ঠাঁহুকে ক্যামেরায় ফোতাম টিপলো। দুখ তুলে বোঠমী জিজ্ঞাসা করলে, “কি করলে ঠাঁহুর?” রবার্ট হেসে বললে, “তোমার ছবি নিলাম।” নিজের ঝাঁচল দিগে রবার্টের শা দুছোতে দুছোতে বোঠমী বললে, “ছায়া নিয়ে কি করবে ঠাঁহুর?”

মজিতে যে আত্মগীটা পড়েছিল সেইটে স্ক্রিগে নিয়ে বোঠমী রবার্টের বুকপকেটে নিজেই রেখে মিল।

বোঠমীর মূগের দিকে তাকিয়ে রবার্ট কি বেন ভাবলো; আমার কানে কানে বললে, “চমৎকার একটা কিচাং হবে। লাইক কিংবা ইল্যাক্টেড লওন নিউজ স্ক্রফ নেবে—একটি কৃষ্ণ-প্রেমিকার জীবন।” বোঠমীকে বাংলায় বললাম, “পায়ের ডোমার কয়েকটা ছবি নেবেন।”

বোঠমী রেগে বললে, “আমার ঠাঁহুর আমার ছবি তুলুক, আমাকে মারুক, আমাকে জলে ফেলে দিক, তাতে তোমার কি?”

আমি হেসে ফেললাম। রবার্টও। একই ভেবে বললে,

“তুমি থাকলে অহমিগে হবে।” ক্যামেরাটা কাঁধে তুলে নিয়ে বললে, “তুমি থাক, আমি একটু পরে হোটেলে যাবি।”

রবার্ট উঠে পাড়ালো। আমি হোটেলে ফিরে এলাম।

“তারপর?”—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

মেমসাহেবের চোখে জল। “সেই আমার শেব দেখা, রবার্ট আর কেনের।”

“সারারাত রবার্টের অপেক্ষা করে বিড়ানায় চুটকট করেছি। সকালেও রবার্টের দেখা নেই। ভয় পেয়ে ঘরন পুশিয়ে ঘর দিতে বাছি, তখন খিরাট প্যাকেট হাতে এক ঘাটের পাণ্ডা দেখা করতে এলো। বললে, একজন সাংসেব আট খনো পরমা দিগছেন তাকে, আর এই প্যাকেটটা হোটেলে শৌছিগে দিতে বলেছেন।”

প্যাকেট খুলে মেমসাহেব চমকে উঠছিলেন—রবার্টের কোট প্যাণ্ট, ডামা জুতো, ক্যামেরা সব রয়েছে। সঙ্গে একটুকরো কাগজ।

নিজের ভ্যানিটি-ব্যাগ খুলে কাগজের টুকরোটা বের



করে আমার হাতে দিলেন। তাতে লেখা—“লগলাম।
সত্যিই অমৃত ভারতবর্ষ। ইতি কৃষ্ণপ্রাণ (রবার্ট)।”

কাগজটা মেমসাহেবের হাতে ফেরত দিলাম। উনি
সবের সোটা ব্যাগে পুতলেন।

“সেই খেঁচেই খুঁচেছি তাকে। কোনো ভীর্ণ, কোনো
মেলা, কোনো আশ্রম বাপ দিইনি।’ কত লোককে পরসা
সিবেছি। কৃষ্ণপ্রাণকে দেখলেই বেন আমাকে টেলিগ্রাম
করে দেয়। হরিবার থেকে টেলিগ্রাম পেলাম একবার।
কলকাতা থেকে ছুটে গিয়েছি। কিন্তু কোথায় রবার্ট ?

“অনেকে বলল, খেঁচেছি। খেঁচেছি বাটে এক সাতের-
বৈরাগীক। পরিবাসে দৈবিক, হাতে একতারা, মাথায়
বাঁকড়া-বাঁকড়া সোনালী চুল। কীথৈ তিকার সুগন্ধি। সঙ্গে
এক বোতলী, কি সরল নিশাপা মুখশ্রী। আরা বেন সাক্ষাৎ
বীরাবাই।

“কত যে খুঁচেছি রবার্টকে ! হিমালয় থেকে কস্তা-
কুমারিকা যেখানে গবর পেয়েছি, সেখানেই ছুটে গিয়েছি।”

প্রয়াগতীর্থে বসে মেমসাহেবের কথা শুনতে শুনতে
কৃষ্ণপ্রাণের ছবি আমার মানসনে রে ভেসে উঠল।
হ্যাট-কোট-গ্যাট পরা এক অবিদ্যাসী ইংরেজ তরুণ,
সংসারের সমস্ত মোহ ত্যাগ করে কৃষ্ণপ্রাণ রূপে ভারতের
তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করছেন। যে মুহূর্তে আমি তাঁর
পদ চুম্বি, ঠিক সেই মুহূর্তেই হঠাৎ কোনো অনমানবহীন
অবশ্যপক্ষে, অসমিত দুর্গের পটভূমিকায় বীরাব ভজন
শুনছেন—চোখ দিয়ে বরষার করে জল পড়ছে। আর
আমরা, পৃথিবীর মাতৃশ্রী, কামিনীকাকনের ঘোরে পুষ্পারের
মতো সঙ্গারের গাঁকে পড়াগড়ি গিছি।

মেমসাহেবের মুখের দিক তাকালাম। কীদন্তে কীদন্তে
বলছেন, “রবার্টের অন্তে আমার সব গিয়েছে। বাকী ছেড়ে
গিয়েছি, গাড়ী বিক্রি করেছি।”

মেমসাহেবের এই আকৃতি আমার ভাল লাগেনি।
মান্না দিয়ে বলছি, “যে রবার্ট-সাহেব সত্যের বাস পেয়ে,
সংসারের বন্ধন ছিন্ন করে কৃষ্ণপ্রাণ হয়েছেন, তাকে নাই বা
ফেলান আমাদের মধ্যে। খাঁচার পাখী বন্ধন খাঁচা খুলে
উড়ে গিয়েছে, শুধন তাকে কিরিরে এনে কি লাভ হবে ?”

মেমসাহেব আমার কথা কান দিলেন না। বললেন,

“আমার সর্ব্বই পেছে থাক। কিন্তু তাকে খুঁজে বার করতেই
হবে। অমৃতঃ একটীব্যারের মত তার সঙ্গে দেখা করতেই
হবে।”

“কেন ?”

মেমসাহেব একটু বতমত খেলেন। “রবার্টকে একটা
প্রাণ করবো।”

“কি প্রাণ ?”

লক্ষ্মায় লাল হয়ে উঠলো তাঁর মুখ। নিজের মনেই
বললেন, “আমাকে প্রাণ করতেই হবে। না হলে কেনোমিন
রবার্টকে কমা করতে পারবো না।” ইতস্তত করতে লাগলেন
মেমসাহেব।

“যদি কোনো অবস্থি থাকে বলবেন না। এখন তাঁর
সঙ্গে দেখা হবে মিলাসা করবেন”—আমি বললাম।

মেমসাহেব নিজের মনে ডাকতে ডাকতে বললেন, “আমায়
কি ? যদি কোনো অবস্থি থাকে সে তার। তার
সম্বন্ধেই হয়তো তোমার সব সত্য নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু
তবু বলবো। তোমাকে বলতে আমার লজা কি ?”

মেমসাহেবের ট্রোট কাগজে লাগল। চারিদিকে তাকিয়ে
কানে কানে বললেন, “তুমি শুধু জানলে। আর কেউ
জানে না। প্রয়াগতীর্থে বসে, রবার্ট বন্ধন আমাকে হোটেলে
চলে যেতে বলেছিল, ঠিক তার আগের মুহূর্তে জিন্স কাপড়
পর্য বোতলীর দিকে একটা বিশেষ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল।”

চমকে উঠে কান গরিয়ে নিলে আমি হিসেস বনারের
মুখের দিকে তাকালাম। তাঁর ট্রোট কাগজে তখনও।
ইপাতে ইপাতে বললেন, “আমাকে কমা করো। হয়তো
হঠাৎ আমার জ্ঞান। কিন্তু তবু ওকে মিলাসা করবো, শুধু
একবার মিলাসা করবো, সে দৃষ্টিতে কি ছিল ?”

আজও মেমসাহেবের সংসার-বিরাগী, মোহমুক্ত কৃষ্ণপ্রাণকে
খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমি নিজেও অনেক খোঁজ করেছি।
কিন্তু কোনো সন্ধান পাইনি। আপনাদের সঙ্গে যদি
কৃষ্ণপ্রাণের কোনোক্রমে দেখা হয়ে যায়, দয়া করে একটা
টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেবেন। আর একাত্তই যদি তাঁকে ধরে
রাখা না যায়, বলবেন—“মিলে দনার তাঁকে একটা, মায়
একটি প্রাণ করবার মত খুঁজছেন।”

দু হাঙ্গের মধ্যেই তল্লাতলা গুলির জব চারনক জাহাজ ভাঙলেন গম্বাঃ। লক্ষ্য বালেশ্বর।

পরে পড়ল সুতোহুটি গ্রাম। নামলেন। সেদিন ছিল উইটালোর পরব। হলবল নিয়ে চারনক সাহেব সেইখানেই উৎসবটা পালন করলেন। এইটাই কলকাতার প্রথম উইটাল।

এই ঘটনার প্রায় দু বছর পরে ১৯৬০ সনের ২৪শে আগস্ট আবার চারনক সাহেবের জাহাজ ডিউল সুতোহুটির ঘাটে। নানা জাহাজ ঘুরে আবার সাহেব পা মিলেন সেই এঘের ঘাটিতে। এবার শুধু পা-ই রাখলেন না, বিগাতী ট্র্যাংগ-ও পুঁতে দিলেন সেই ঘাটিতে। সেই বিকল্পী পতাকা এসে খেঁক কাপার তুলে ফেলতে ২৪ বছর সময় লাগবে, এ কথা সেদিন, জাহাজের সেই অসহ গণ্ডোট বিনটিতে, কে বুঝতে পেরেছিল?

সুতোহুটি, কলকাতা আর গোবিন্দপুর—এই তিনখানা গ্রাম ইংরেজগা ক্রিমিয়ার সার্ব্বভৌমত্বের কাছ থেকে বিনেছিলেন মাত্র ১,৩০০ টাকা। অবিশি নবাবের কাছ থেকে গ্রাম কেনার অস্বমতি নিতে সাহেবদের সেলামী দিতে হয়েছিল ১৬ হাজার টাকা। এই তিন গ্রাম মিলেই ইংরেজদের এদেশের প্রথম ক্রিমিয়ারী কলকাতা।

আজকের কলকাতা : ১৯৫৮

[আমেরিকান সাংবাদিকের চোখে]

কলিকাতা ক্রিপলিং কলকাতা সম্পর্কে লিখেছিলেন : বেভাবে ব্যাঙের ছাতা গজার সেইরকম বিশ্বকুলভাবে এই শহর ছড়িয়ে পড়েছে। শলিষার উপরে এই প্রাসাদ উঠেছে, এই উঠেছে বড়ি। হারিড্রা আর আভিজাত্য মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আর সবার উপরে, এই যিহ্নি আর মহাবাহীর লহরে লাকিয়ে পড়বার জন্ত ওং পেতে আছে দুহু। কলকাতা ক্রিপলিং-এর চোখে এই নৃতিতে দেখা দিয়েছিল ১০ বছর আগে। এই বছরও কলকাতার ২ হাজার লোক মারা গেছে শুধু কলেশ্বর। বিশ্বকুলপুঞ্জের বাবা-মাঝা কলকাতাকে বলেছে : পৃথিবীর সব থেকে অস্বাস্থ্যকর জায়গা। একলিকে হপ্পী নদীর মোলা জলের বেটনী আর একদিকে বোনা বোনা জলা আর ভেড়ি আর এরই মধ্যে গাধাগাধি করে বাস করে এই শহরের ৪০ লক্ষ লোক। বহান সব শহরের পার্শ্ব কঁটা, লেকটা আর বাজাগুলো বাস দিলে প্রতি বর্গমাইলে এখানে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার লোক বাস করে। হাজার হাজার লোক

সপরিবারে বাজার পড়ে থাকে। সেইখানেই, গাড়ী-বারাংগলের নিচে শের, বাস, রাইথ বাডে, বার আর সেইখানেই পাখানা শোকাব করে।

কলকাতার বৈভবতা, আর অগণিত ভিক্ষকের পাল চোখকে বেধন পীড়া দেয়, তেমনি আঁতকে উঠতে হয়, অনশনবত মাহেবের ক্ষুধিত শিশুদের মুখে চুপনানো জ্বন গুঁজে দিতে দেখে। আবর্জনা, হাঙ্গন, পোখাজের লম্বা, ডেজাল সর্বের ভেল আর মাহুনের বাঘের পাঁচমিষদী কাকালে। দুর্গন্ধে নাক জ্বালা ধরার। হুলাসের চাঁৎকার, ট্যালা আর গো-গাড়ীর চাকার ক্যাচক্যাচানি, বেড়েন শিখ ড্রাইভারের মাকাতা আমলের ট্যানির হর্নের অবিপ্রাঙ্গ প্যাকপ্যাকানিতে কানে তাল লাগে। মনে হয়, কলকাতার কাদী বেন শতহুত বিজ্ঞার করে তড়া করে বেড়াচ্ছেন।

বুড়া আর মাসে বেন এই শহরের নিয়তি। অশুটি, কলেশ্বর, মল্ল, মড়ক নিয়তি হানা মারে। ১৭৫৬ সালে বাংলার নবাব ১৪৬ জন ইংরেজকে অল্পকূলে বন্দী করে রাখেন, পরদিন সকলে তার মধ্যে মাত্র ২০ জনকে জীবিত অবস্থায় পাঠায় বার। শিশাহী বিহাংয়ের সূচনা হয় এইখানেই। ১৯৪৬ সালে, হিন্দুস্থান পাকিস্তান হবার ঠিক আগে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ৩,০০০ হিন্দু-মুসলমান নিহত হয়। এখনও সশস্ত্র জনতা কে-কোন মুহুর্তে চোঁচাতে চোঁচাতে ছুটে এসে হাধা মা বাধাতে পারে। যে কোন অজুহাতে। তা সে একশরসা ট্রামডাড়া বাড়ার জন্তই হোক, বা মোটর-দুর্ঘটনার জন্তই হোক, অথবা গুলবকে কেন্দ্র করেই হোক। পুলিশ লারি আর কাছনে গ্যাস দিয়ে জনতাকে ট্যাংকার। জনতা চোঁড়ে ইট-পাটকেল আর চোঁড়ে কলকাতার নিজস্ব আবিষ্কার নাইট্রিক অ্যানিড ভর্তি বিকলী বাতির বায়ু।

কলকাতার লোক বেশীর ভাগই বাঙালী। দামা মন করে না তখন গারে হুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কলকাতার এই কৈ-হৈ ভাব ভয়ের বুই ভাল লাগে। বকব করতে পারলে নাওনা-বাওনাও তুলে বার। কলকাতার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গিয়ে বাঙালীরা ভিড় বাড়ায় (জালখ্যা ৪০ হাজার), শুধিকে কলকাতার কাল চলে বার বিহারীদের হাতে। অস্ত্রাত মেনহনী কাল করে উড়িষ্যা। মাহোরাগীদের হুঁশিতে বার ব্যাঙ আর ঘাবসা। উপরের তরের কিছু বাঙালী বড় বড় সরকারী চাকরী করে। বাধবাকী মারা, তারা হয় কেরানী নয় বেকার।

কলকাতা থেকে ব্রিটিশরাজ এখন সরেছে আর কলকাতার বদল বেড়ে উঠেছে। জনসংখ্যার চাপে দল আটকে উঠেছে শহরের। এর উপর রোজ ৩০০ করে নিও জন্ম নিচ্ছে। হাজারে হাজারে বেকার কাজের সন্ধানে মলমল থেকে এসে দাঁড়িয়ে এরাই। এ জন পুরুষ নিচু বরের সংখ্যা ৩ জন। ৪ থেকে ৫ হাজার লোক মহীলা হয়ে বাস করছে কর্মব্যস্ত শিলালগ্না স্টেশনে। নোংরা নরক দু'দিকেরদানার কিচা প্রাটিকর্ষের থেকে নিচে, টিকিটপরের আনাচে কানাচে তারা ছুঁমো। পেটের আগা বাদের কখনো কখনো, সেইসব সপা-সুখার্তের দল হাজারে হাজারে রাত কাটার সূচিপাথের কঠিন বিদ্যানার, স্টেশনের প্রাটিকর্ষে, পুলের তলায়। এদের মধ্যে অনেকই সন্ধ্যার সূর্য দেখতে পাবে না। কখনো না।

কলকাতা : 'হাতের চেয়ে মোড়া বড়'

[অতিষ্ঠ পৌর-প্রতিনিধির চোখে]

কলকাতার উপর যে চাপ পড়েছে তা সঙ্গ করবার কবতা তার নেই। কলকাতার জমি, তার ড্রেন, তার পানীর জল সববরাহ ও বাস্তবজ্ঞার ব্যবস্থা, রাস্তার সহনশক্তি, তার নাগরিক সুখ-সুবিধা দেবার কোন জিনিসই এয়োজনের সঙ্গে তাল বেখে চলতে পারছে না। মাল্লব বাড়ছে। হু-হু বড়ো, বস্তার বেগে বাড়ছে। বেশ-বিভাগের গরের কথাই ধরুন, পার্টিশানের দরুন যে আন্দাজ লোকসংখ্যা বাড়ল, তার চুসনার শব্দ আর কতটুকু বেড়েছে? হু আনা পরিমাণ, কি তার কিছু বেশি। কিন্তু উচিত ছিল শহরের আয়তন অল্পত তিনগুণ বাড়।

কলকাতার অবস্থা বা ঠাড়িয়েছে, শহর-পরিচালকের দৃষ্টি নিয়ে কেবলে আঁতকে ওঠার কথা। এই শহরের পলনের বিন থেকেই কলকাতা এলোমেলোভাবে গড়ে উঠেছে। নাগরিকরা ডবলডু ভিত্তা না করেই বহুচ্ছভাবে বাড়ী-ঘর তুলেছেন। গোড়ার দিকে বসবাসও কেউ ছিল না, এ বিষয়ে ভাববার লোকও ছিল না। পূর্বপুরুষদের কৃতকর্ষের বোকা, একদিন হু'দিনের নর, ২৬৮ বছরের বোকা চেপেছে আমায়ের এ মূসের হতভাগাদের ঘাড়।

কলকাতার হুঁত্যা এই যে, তার অধিবাসীদের মধ্যে, জাতির জনক জন্মেছেন, বিশ্বকবি জন্মেছেন, ধর্ম-প্রবর্তক, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাবর্তী, বৈজ্ঞানিক, চিত্রকর, ডায়র, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, শিল্পগতি, বৈদ্যনোতাও প্রচুর জন্মেছেন। কিন্তু এ বেকারের এমন কোন নগর-স্বপ্নিত ক্রমান্বিত ধার সদ্যোচিত নির্দেশ বা পরিকল্পনা কলকাতাকে পুঁয়াদন

নগরীর খোলস ছাড়িয়ে নতুন এক আধুনিক নগরীর শোশাক পরাতে পায়ত। কলে বসাবর বা হয়েছে, আগে শহরের ঘর-বাড়ী বেড়েছে পরিকল্পনাহীনভাবে, তারপরে নাগরিক সুবিধাগুলো জোড়াতালি দিয়ে সববরাহ করা হয়েছে। কিন্তু তুঁতালি দিয়ে কি অনন্তকাল চলে?

কলকাতা ভারতে নবজাগরণের সূচনা করেছে। দীক্ষা দিয়েছে ভারতকে, নেতৃত্ব দিয়েছে। বেশব্যাপী আশোপন, উদাহরণ, উদীপনা—সব কিছুই ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতা থেকে। কিন্তু হার, কলকাতার চিত্রের নিচে যে-সব হাইড্রেট তাতে মাটি জন্মেছে, দীরে দীরে বহলাবাহী পাইপলিনের হিত হচ্ছে, পানীর জল সর-বরাহের পাইপগুলো কমজোর হয়ে আগছে, সবর থাকতে সেদিকে তেমনভাবে কারও নজরে পড়েনি। ইনপ্রজন্মেই ট্রান্স গঠিত হবার পর কলকাতার কিছু চওড়া রাস্তা কোন কোন অঙ্গনে বেরিয়েছে। কিন্তু তার শাখাও বা কতটুকু। বক্ত-অপদায়ণও তার সামর্থ্যের মধ্যে নর। অথচ কলকাতার তিনভাগের একভাগই বহি এলাকা। বহি



না সন্ধ্যাে কলকাতা থেকে ফলেরা বসন্ত সরানো বাবে না, এ পোকা কথা। কিন্তু বস্তির অপসারণ বা উন্নয়ন ঘটালেই যে কলকাতা অপরাহং হয়ে উঠবে, সে কথাও তুল।

কলকাতার প্রধান সমস্যা জনসংখ্যার চাপ। কলকাতার নাগরিক সুযোগ সুবিধা দেবার সর্বোচ্চ ক্ষমতা যা, তার থেকে নাগরিকদের সংখ্যা বেশি। ডের ডের বেশি। হাতের চেয়ে মোড়া বড়। এই সমস্যার সমাধান না হলে অর্থাৎ জনসংখ্যার চাপ কমাতে না পারলে, কোন হাতুড়ে চিকিৎসাতেই কল হবে না। কলকাতা 'হাতের বিকট হুঃখ' হয়েই থাকবে।

কলকাতা : ক্রুদ্ধ শহর

[শিক্ষিত বাতালী বেকারের চোখে]

কলকাতার আকাশে আক্রোশ, বাতাসে হতাশা। বারোলাক বেকারের বায়ে আনাই কলকাতার ঘোরে। বাবে

কোথার তারা? কোথার বাব? এমন নয় যে, সাধা দেশে চাকরির লব্ধি খোলা রয়েছে আর আমিবা দেখানো না গিয়ে কলকাতায় বসে জটলা করছি। শিলং কি পৌহাটি, কটক অথবা পাটনা কলকাতার মতো উদার নয়। শিলং-পৌহাটি অসহন্যাপন, কটক উড়িষ্যাবেশ, পাটনা বিহারীবেশ। তেমনি কলকাতা কি বাঙালীবেশ? না, কলকাতা লব্ধ। লব্ধ বলেই এই শহরে বসেই লব্ধি নিষ্কেষ কোলে কোল টানে।

আমাদের কোলও নেই, কোলও নেই। তাই বেকার-দের বেগানে মিশতুর মতো স্থলছি। হাসি পায়ে—অন্যদ্বারের সং-সেয়েনো হাসি—যখন বোঝা ব্যক্তিবদের বলতে শুনি, কলকাতায় পান-বিড়ির সোকান থেকে হাসে তিনশ টাকা আর হয়, হুঁচি-টিংড়ের সোকান থেকে কোঠাবাড়ী বানাবার মতো টাকা পাওরা যায়, ছুতো পালিশ করলে কি মোট ষোলো কি ঠাণ্ডাপাড়ী হৈলে বাঙালীদের ভাতের কষ্ট থাকে না। বাঙালী তা করে না, কেহানী হতে চায়, তাই যে বেকার, তাই তার দুর্ভাগ্য। তাঁরা বলেন, বাঙালী দুঃগেরে দৃষ্টিভীর পরিবর্তন না হলে তাঁদের দুর্ভাগ্য ঘুচে না। এ কথাই মানে কি? আমাদের ভবিষ্যৎ বদলেছে। যাতে ইহুৎ-কলছে না গিয়ে, ছুতোর বাহু হাতে নিয়ে দুটপ-থ বসে কি পানের সোকান দেয়, নরাতো ঠাণ্ডাপাড়ী হৈলে, সেই ভাবে তাদের তৈরী করতে হবে?

লেশপাড়া শিলে মানসিক অবস্থা সন্তোষ হয়। এ তো জানা কথা। বঙ্গিয়া জেলার ঐ যে ভূমার সোকানদারটি সে পদ্ধতিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে,—তিন হাত বাই হুঁহাত যে খামরার ঘরে সে সোকান দেয়, সেই ঘরেই সে কী-পূর নিয়ে শোয়, অধিকায় খিন চাছু খায়, হাজার কলে তার বই চান করে, অঙ্ককার থাকতে বাজার বসে প্রাতঃকৃত্য গারে—এই আধিম প্রবৃত্তি কি আমরা ছেড়ে আসিনি? এত সংক্ষেপে থাকতে পারে বলেই ওরা ভূমার সোকান দিয়ে টিকে আছে। বিজা আমাদের উন্নততর জীবনব্যবহার সন্ধান দিয়েছে। অলভ্যতার জর থেকে আমরা উঠে এসেছি সত্যতার পরিবেশে। আমাদের সভ্য কোন কর্তব্যবাহিনীর সন্ধান হিতে গারছেন না বলে আমাদের আবার টেলে নাশাতে চাইছেন সেই আধিম জীবনব্যবহার?

কর্ম বলি দিতে না পারেন, বরা করে উপদেশ দিতে আসবেন না। বলেন, আমাদের অযোগ্যতা রয়েছে। হয়ত তাই। এককালে বাঙালী 'ভারত' 'ভারত' করেছে, যিকোনো আশন বলে ঝড়িয়ে ধরেছে। সেই বাঙালী এখন

'বাঙালী' 'বাঙালী' করছে। এ যে এক বিরাট মানসিক অধঃপতন, তাতে আর সন্ধ্য কি? সাধা, মৈত্রী, স্বাধীনতার চিন্তায় যে বাঙালী আত্মহারা হয়েছিল, সে আত্ম ভাবতে শুরু করেছে বাংলা থেকে অবাঙালীদের তাড়াও। এ সংকীর্ণতা, লজ্জাকর সংকীর্ণতা—স্বীকার করছি। তবু, বেহেতু হৃৎকত কোন বিকল্প পন্থা দেখতে পাচ্ছি না, সেই বেহেতু এই পথ গ্রহণ করছি।

যে বিজা কেহানীগিরি ছাড়া আর কোন পার্শ্ব নিচ্ছি দেয় না, সে বিজাই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি, কারণ অল্প বিজা গ্রহণ করবার সুযোগ ছিল না। শিক্ষা-জগতের ধারা কর্ণধার তাঁরা যে স্রোতে নিয়ে গেছেন সেই পথে গিয়েছি, অদ্বৈতনী অভিব্যক্তি যে পথে চালিত করেছেন, সেই পথ ধরে চলেছি। সে স্রোতে ভাসার পরিণতি যে পত্রিরাগহীন স্থগিণাকে পড়া, সে পথে এতবার পরিণতি যে কাগাদিনিতে যোরা, তা তো আগে বুঝতে পারিনি। আর এতে আমাদের অপরাধ কি? নেতারা যেভাবে কথাবার্তা বলছেন, তাতে শঙ্কিত হচ্ছি। তাঁরা কেন সব দাবির আদায়ের ব্যাড়া চাপিয়ে মুক্ত হতে চাইছেন।

এখন দেখছি, অতীত আমাদের খোঁকা গিয়েছে, বর্তমান পায়ের নিচে থেকে জমি সরিয়ে দিচ্ছে, ভবিষ্যতের কোন চেহারা চোখে ভাসছে না। অনিশ্চিতি, আতঙ্ক আর ব্যর্থতার আঘাতে আমাদের মানসিক স্বৈর বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে, আমরা ভাবশূন্য হয়েছি। হিংস্র হয়ে উঠছি। নিজের উপর, পরিবারের উপর, পরিবেশের উপর আক্রোশ জন্মে উঠছে।

কলকাতার আমাদের ভিড় বাড়ছে তাই আক্রোশও জন্মে উঠছে।

কলকাতা : শাসন-ভাঙার শহর

[পুণিশেষ এক কর্তার চোখে]

চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, বদমায়েনদের কথা বলছি নে। গণের শায়েজা করতে পুলিশের বিলব হয় না। সাধারণ নাগরিকরা যখন আইন ভাঙতে থাকেন, পুলিশকে তখনই সব থেকে বেশি কামেলা পোষাতে হয়। আর কলকাতার সাধারণ নাগরিকেরা গত কামেলা বাধান, এখন আর পুণিবীর কোন শহরে হয় না।

কলকাতার মতো শৃঙ্খলাহীন শহর আর আছে কিনা সন্দেহ। শৃঙ্খলা ভাঙার ব্যাপারে দনী গরীব সব সমান, প্রেসিডেন্ট বার্ষা চাউশ মোটরগাড়ীর মালিকে আর ঠাণ্ডাওয়ালায় প্রায় তফাত নেই বদলেই চলে।

এত শিক্ষিত লোকের বাস কলকাতার
অবচ ইন্ডিয়ান কল সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতা
এবং ঔদাসীন্য অশিক্ষিত শ্রমীবাসীরাই
সময়। আর একটা জিনিস, খেঁচা বস্তা
কলকাতার লোক যেন এমন হারিয়েই
কেনেছে। কোথাও হস্ত দাতা 'জান'
হয়েছে, একই খেঁচা ধরণে পাঁচ মিনিটেই
পুণি রাত্তা খোলসা করে দিতে পারে।
কিন্তু কে খেঁচা ধরবে? ওইই মধ্যে 'নিজে
আগে তো বেরিয়ে ঘাই' করতে গিয়ে সনত
রাত্তাটি আটকে দিলেন এমনভাবে যে
ছুঁচি মিনিটের আগে রাত্তা লাক-ই করা
গেল না। পথ চলার ব্যাপারও তাই।
এ বিষয়ে সার্ভে করা হয়নি বটে, তবে
খাঁড়িঘরের অভিজ্ঞতার দেখা গেছে যে
অধিকাংশ শহরবাসীই, বিশেষ করে ছাত্র
ও যুব সম্ভার শাসনের বাধা গভীর বাইরে বেতেই
ডালবাসে।



কলকাতা : একপুরুষ আগের ছবি
[স্থান এক পুরবুর চোখে]

এখন এখন কলকাতার আদত—
অনেকা তখন খুব ছোট, ছোট হলেও কিছু
কিছু ছবি এখনও বেশ মনে আছে—
চিড়িয়াখানা দেখতে। ওঁতোরগাড়া থেকে
মোকোর চাপরুম আর নামভূম আহিরী-
তৌলার ঘাটে। সেগান থেকে ঘোড়ার
গাড়ী চেনে গম্বার খার দিয়ে ধার দিয়ে
বেহুম চিড়িয়াখানা। খুব থেকে বেহুম
ঘোড়ার টানা ট্রাম-গাড়ী যাচ্ছে। চিড়িনি
কখনো। তখন মেয়েদের মধ্যে পর্দার খুব
কড়াছড়ি ছিল। বাড়ীর খোঁয়ের খুব দেখবে
দোকে, সে তো সাংঘাতিক ব্যাপার।
অবচ পালা-পার্বণ লেগেই আছে। হিন্দুর

বাড়ী। গঙ্গাস্নানট চাই। তাই ঢাকা পালকি আসতো।
সেই ঢাকা পালকিহুদ বেবাহারা বউদের গম্বার চুবিয়
আনতো। তখন খুব পালকির চল ছিল। আর ঘোড়ার
গাড়ী। কত রকম সব নাম। ছুঁচি, গৌড়ি, ল্যাগো,
ক্রহাম, ফিটন। হিকে-গাড়ীও ছিল বিস্তর। মোটর কেউ
চোখেও দেখিনি।

তখনকার দিনে ঢাকার চল ছিল খুব। চাপর ছাড়।
বাইরে বেরবার কথা কেউ ভাবতেও পারত না। তখনো
বাবু সাক্ষার যুগ যাহনি। বাবু সাক্ষা মানে কি? কালো
পাড় সোজানো খুঁচি। গায়ে কামিজ। কামিজের কলার,
কম আর বুকের কাছের বোতাম লাগাবার স্টেট একবারে
কারের মতো শক্তো হয়ে থাকত। তখনও পাঞ্জাবির চল
হয়নি। হাতে হুক সোনার বোতাম আর খুব-পকেটে
চেন-খুঁচি। পায়ে চকচকে জুতো, বাঘ বা গছন্দ। তখন
তো সামাজিকতার হিড়িক। বিরে, শৈতে, জলসা, পুষো-
পার্বণ। নেমন্ত্রণ লেগেই আছে। নিজের না থাকলেও
চেয়েচিহ্নিত আনতে হবে, তবুও বাবু সাক্ষা চাই। নইলে
সবাক্ষে বদনাম। অনেক বাবুর আবার বাইরে কোঁচার
পতন, কিন্তু পকেট হুঁ-হুঁ। দুয়ের নেমন্ত্রণে যাবেন, গাড়ী
করার পরশা নেই। ঝাঁকা-মুঠের মাখার চোপেই চললেন।
এখন ওনলো তো সবাই হাসবেন।

হুদেই আশোমন এসে লোকের বাবুগিরি একবারে

বুটিন আমলে আইন-অম্বাৎ একটা আদর্শ বলে মনে
করা হত। স্বাধীন হবার পরও সে মনোভাব খুব হয়নি।
বরং একটার পর একটা বামশক্তি আন্দোলনের প্রর
সেট পুনর্জীবন পেয়েছে। তবে এই ধরনের শৃঙ্খলা জর
করার মনোবৃত্তির সঙ্গে অসংগতিবোধ বা প্রবণতা অধিকাংশ
কেজেরই জড়িত নেই। অপরূপ অহুঠানের সঙ্গে বাধা
জড়িত তাদের আবির্ভাব ঘটেছে কলকাতার ৪৬ সালের
দাঙ্গার মধ্যে। এরা বেশির ভাগই ভ্রম পরিবারের ব্র-
শিক্ষিত ভেগে। দাঙ্গার সময়ে এরা সামাজিক প্রর
সেয়ে সবারকম অপরূপ হাতে থাকিয়েছে। এখনও বিভিন্ন সময়ে
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সর্বনিম্ন জোগাড় করে খুঁচ
বেড়াচ্ছে। এরাই বাসগাড়ী ভেঙে জিনিষ লুট করে,
আন্দোলনের সময় ট্রাম বাস পোড়ায়, পাড়ার পাড়ার
গুণামি করে। এদের মূলজির কোর বেশি বলেই
এদের বিকছে পাকাপাকি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা
মুশকিল হয়ে পড়ে। এরা সংখ্যার দীর্ঘে দীর্ঘে বাড়ছে।
সমাজের লোক সচেতন হয়ে যদি এদের উৎখাত
করার লক্ষ্য এগিয়ে না আনেন তবে ভবিষ্যতে এদের
হাতে সবাক অসংখ্যভাবে তার ভাগ্য সর্বর্ণ করতে
বাধ্য হবে।



হুতিবে দিলে। মোটা মুক্তি, মোটা জামা পড়া ভুল হ'ল। বাহুর শোশাক উঠেই গেল।

তা বাই বল, তখন খুব হুতি ছিল লোকের মনে। আঘাত করে ডিবিদী হতেও যেন বাধত না। বিয়ে-ভূড়োর রোশনাই হ'ত কত রকম। একরকম ছিল তাকে বলত 'বাঁধা রোশনাই'। ছেলের বাড়ী থেকে যেতের বাড়ী পর্যন্ত পথের হাথারে হুটি পুঁতে পুঁতে তার গায়ে আলো বসিয়ে বেঙরা হ'ত। এই হ'ল বাঁধা রোশনাই। আর একরকম ছিল তার নাম 'বাস বাতি'। আর একরকম ছিল তার নাম 'হুকো শিপি'।

মহারানী জিইরিয়ার ছেলে মিল অব ওয়েলস এলে হুকো শিপি আসের হালা ঠেঠরী করা হয়েছিল। ঐ সময় আরেকটা কাণ্ড হয়। ভবানীপুরের বকুলবাগানের দুমুন্ডেশ্বর বাড়ীতে মিল অব ওয়েলসকে বরণ করা হয়। তাই নিয়ে সে সময় সমাজে কি হৈ-হৈ। কবি হেমচন্দ্র দুমুন্ডেশ্বর নামে এমন ছড়া বাঁধলেন, লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

এইরকম ছড়া নানান ব্যাপারে বাঁধা হ'ত। এলোকেশী বলে একটা বউকে তার স্বামী খুন করেছিল। অমনি এলোকেশীর নামে ছড়া, এলোকেশী শাড়ি, এলোকেশী গানের ডিবে বেঁধিয়ে। বাতকিনীকে নিয়েও সে আমলে খুব তোলপাড় হয়েছিল। সে তার স্বামীকে খুন করেছিল। তার নামেও ছড়া, গান, শাড়ি সব বেঁধিয়েছিল।

এইরকম সব হুড়ুম ছিল তখন। তখন বাই নাচ, ব্যামটা নাচ, বাত্রা-গান হ'ত খুব। একবার দুই বাইজীর নাচ দেখলাম, গান শুনলাম। তাদের নাম গহরজান বালশাকান। আর ছিল তখনকার দিনে বিয়েটার। বিয়েটার আহার খুব বেশিমান। গিগিন খোব, তারাস্বকী, বিনোদিনী—আঃ, কি তাদের অভিনয়। এখনো গোখে ভাসে। কানে এসে লাগে।

সেখানে যেখানে কতদিন পার হ'ল। আমাদের বাড়ীতে কেরোসিনের হুন্ডর হুন্ডর সব আলো ছিল।

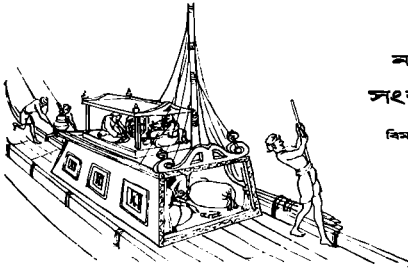
গ্যাস আগতে তারা গেল। বিজলী আগতে গ্যাসও গেল। হুটো মুন্ড গেল জীবনের উপর দিয়ে, হু-হুটো ভূমিকম্প, দাকাত। কলকাতা কত বড় হয়ে গেল। এখন তো রাজ্যের বেলাতেই ভয় করে। কলকাতা পাইনে। ঘোড়ার বাড়ী গ্রাঃ চোখেই গড়ে না, এখন মোটর। কত রকম মোটর। তিন টাকা মগ লাগাম চাল বেয়েছি, এখন মোটা চালের দামই তিরিশ টাকা। একমাত্র পটল দেখেছি আগের চাইতে সস্তা হয়েছে। তখনকার দিনেও নতুন পটলের দাম ছিল ২।২৪- টাকা দেয়। এখন নতুন পটল ১৪- টাকা দেবেই পাওয়া যায়। আর সস্তা হয়েছে টাকা। তখন মিনিট ছিল সস্তা, টাকা ছিল আঁকা, এখন হয়েছে উত্তো। টাকাই সস্তা হয়ে গিয়েছে।

জাল হয়েছে না খাওয়া, তা বলতে পারব না। তবে বা বেবচি, কলকাতার প্রাণের হস যেন শুকিয়ে আসছে। তখনকার দিনে আমোবে-হুতিতে আলোর সাথে পোশাকে কলকাতা যেমন কলম কলম করত সেই জেল্লাটো বেন নই হয়ে গেছে।

কলকাতা : লেখকের চোখে

গত ১৬ বছরে কলকাতার উপর দিয়ে যে বড়-কাণ্টা বয়ে গেছে, অষ্ট জীবনীশক্তি ছিল বশেই সে-সব হাফা সামলে এমনও টিকে আছে কলকাতা। মহানগরের পর দাঙ্গার আঘাত, দাঙ্গার পর দেশ-বিভাগের বলি উদ্বাস্তর অপরিণীত জাপ খুব খুঁজে সজ করেছে কলকাতা। এই এতও থাকে সাহসে বহুদিনের প্রতিষ্ঠা পাওয়া নতাস্বীর সাধনাতেই সস্তব।

মনে পড়ে, প্রথম দিন কলকাতার বাড়ীতে পা দিতেই পিছলে পড়েছিলাম। তখন এক ভয়লোক আমাকে ধাইয়া ভেবে উপবেশ দিয়েছিলেন : কলকাতার চলতে গেলে পা ঠিক রাখতে হয়। একটার পর একটা এতও থাকার পা আমাদের কিঞ্চিৎ খেঁচক হয়ে পড়েছে। তাই কলকাতা শব্দকে আমাদের এত হুচিৎতা। পা ঠিক করার সাধনা সর্ব্বদা শুক হয়ে কবে, সেই দিনটির জন্ত অপেক্ষা করে আছি।



নকল সংকীৰ্তন বিমল মিত্র

পাড়ার ছেলে আদর। আদরের পাড়ার সব গোকই আদরের মতন মধ্যবিত্ত। আগে এখানে এমন ছিল না শুনেছি। শুনেছি, তখন আশেপাশের এসব নাকি ঘাট ছিল। এখন বাড়ি হয়ে গেছে চারদিকে। আগে শুধু ওই একখানা বাড়িই ছিল এদিকে। চারদিকে অনেকখানি জমি নিয়ে বেশ খেসিয়ে ছড়িয়ে বাস করবার জন্তে কোন এক সোনার সেন নাকি এইখানে প্রথম বাড়ি করেন। তাঁরই বংশধর এরা। আগে বাড়ি ওই একটা বাড়িতেই হুর্গাপুন্ডো হতো। পুন্ডোর সময় আদর ঠাকুর দেখতে যেতাম এই বাড়িতে। বড়লোকের বাড়ি। বড়লোকের যে বাড়ি তা এখনও চোখা দেখলেই বোকা যায়। সামনে মস্তবড় গেট। তখন বাড়ির গেটে দরওয়ান পাহারা দিত। বিকেলবেলা সেনবাবুদের কোচানো খুঁজি, বাহারে পাঞ্জাবি পরে বাধার চুলে তেড়ি বাগিয়ে গাড়ি ছড়ে বেড়াতে যেতে দেখেছি। বাড়ির ভেতরে ঢুকতে ভয় লাগতো। প্রথম যখন আদর এলাখ তখনও অনভ্যাস ওরা বড়লোক। ওদের সঙ্গে আদরের অনেক তফাত। ওদের সমাজ আদরের থেকে আলাশ। দরওয়ান বি চাকর সরকার দুহরি কোনও কিছুই অভাব নেই বাড়িতে। কিছু কিছু দেখতে গেতার হুর্গাপুন্ডোর সময়। পশ্চের কাক-করা দেখাল। বাড়িতে সামনে বাগান মতন ছিল। হাঁস

ছিল, মূব ছিল, কাকাতুয়া পাখি ছিল। যানে, বড়লোকের বাড়িতে বা থাকতে হয় সবই ছিল।

তারপর কয়ে কয়ে সে-বাড়ির চোখা বেন জান হয়ে যেতে লাগলো। রত দিন যেতে লাগলো, দেখতাম বাড়িটা বেন আরো পুরোনো হয়ে যাচ্ছে। দেখলে রং পড়ে না। ঘোড়া যবে গেলে আর ঘোড়া কেনা হয় না। চাকর-বাকরদের কাপড় জামা কয়েই ময়লা হতে লাগলো। অর্ধ আশেপাশের অন্ত বাড়িগুলো তখন কয়েই মাথা তুলে উঠছে। সে-সব রং-বেরং-এর বাড়ি, তাদের জানাশার পরা কোলে, ভেতরে বেড়িও বাজে, নতুন মটরগাড়ি আসে গ্যারেজে।

টিক এইরকম সময়ে একটা কাণ্ড ঘটলো।

আগের দিনও দেখছি সেন-বাড়ির বড়বাবু সাধ-পাশ নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে কোথায় বেন বেহিয়ে গেল। জামা গেঁট্টা বন্ধ করে দিলে ওদের দরওয়ান ছুঁত দিং। তারপর রাত হয়েচে, সেন-বাড়ির ঘরে ঘরে আলোও জ্বলেচে, আবার মাক-রাতিরের পর সমস্ত বাড়িটা নিম্নমণ্ড হয়ে গেছে। যেমন অন্তদিন অন্ধকারে সমস্ত বাড়িটা হাঁ-হাঁ করে, সেদিনও তেমনি নিজা-নিজাণ হয়ে লাবা রাত ঠাড়িয়ে ঠাড়িয়ে বাড়িটা কেমন দীর্ঘবাস কেসেছে।

কিন্তু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সবাই অবাক হয়ে গেছে।

বাড়ির সামনে পুলিশ !

তিনি-চারটে লাশ-পাগড়ি-পরা পুলিশ, আর একজন কারোপাও আছে। পুলিশ দেখে সবাই জড়ো হলো বাড়ির সামনে।

—কী হয়েছে মশাই ?

—হ্যাঁ মশাই, কী হয়েছে এখনে ?

একজন বললে—হ্যাঁ মশুই, নতুন বলে একটা লোক থাকেন। এই বাড়িতে ?

একজন বললে—নতুন না মশাই, নতুন তার নাম,—

—ওই হলো ! ওই একই কথা, তার নাম চান-জালা তারই নাম হুঁড়ি। সেই বেটাই বোধহয় চুরি-চুরি কিছু করেছে—

—চুরি-চুরি নয়, ডাকাতি হবে, ডাকাতি না হলে এত পুলিশ আসে ?

একজন বললে—না মশাই, শুনছি গলার হুড়ি দিয়েছে—

হঠাৎ বেগা গেল গুলমোহর আলি পাড়ি চালিয়ে বাড়ির দিকেই আসছে। সবাই সরে দাঁড়াল। গাড়ির মধ্যেই বড়বাবু আছে, জগতারণ্যবাবু আছে।

আর গাড়ির বাহার ?

গাড়ির বাহার গুলমোহর আলির পাশে পা হুঁদিয়ে বসে আছে নকর, হিবি কোচানো ধুতি পরেছে, বাহারে শাফাবি পড়েছে, তেড়ি বাগিয়েছে—

আর...

কিছু পুলিশ-বারোগার ব্যাপারটা পরে বলছি। আগে নকরের সাক্ষীভূত শুন।

এ-সাক্ষীভূতেরও একটা গৌরচন্দ্রিকা আছে।

পেনসের বাড়ির স্বর্ণসেন একদিন জোর এগারোটোর সময় নিজের বিছানার ওপর আড়ামোড়া ভেঙে চোখ মেললেন। চোখ মেলতেই বাস-বরদার পাঁচ এক হাতে বোতল আর এক হাতে সিগারেটের কেঁচোটো এগিয়ে ধরতে গেল।

স্বর্ণবাবু হাই তুলতে তুলতে বললেন—হ্যাঁয়ে, নকর কোথায় থাকে রে ? নকরকে আর দেখতেই পাই নাই,— সে কি হয়ে গেছে ?

পাঁচ বললে—আমি আমি এখনি ডাকছি তাকে—

বাস-বরদার পাঁচ কাধের তোয়ালেটা শুকিয়ে নিয়ে পৌঁছল। নকরের ডাক পড়েছে। চারটিখানি কথা বল।

বাইরে দিবে-ঘোরাণো মি'ড়ি। মি'ড়িটা পোজা নিচেও বাক-মহলে নেমে গেছে। বাস-বরদার ওই মি'ড়ি দিয়ে নামবে। ওটা অপরিচি মি'ড়ি। নিমিচ্ছিত্তিনিসপর ওই মি'ড়ি দিয়ে আসবে বাবে। ভেতরের সরকাঠী মি'ড়ি গম্বাজল দিয়ে খোঁয়া-মোড়া হয়। সে-মি'ড়ি দিয়ে বা-মণির পূজার নৈবিত্তি ওঠে, পুস্ততমশাই ওঠেন বৌ-মণির ঠাকুর-পূজার। আরো অনেক ক্রিনিস দার। নারোথ-শিলা দার, ঠাকুরের প্রদাশ দার। কিন্তু স্বর্ণ-বাবুর কাউল-কারি, বোতলের ওলুখ, তার জন্তে বাইরের মি'ড়ি। এ-নিম্ন বোধহয় সেই সোলাহবাবুর আমল থেকেই চলে আসছে। এতদিন পরে আর কেউ প্রস্তও করে না, মাথাও ঘামায় না ও-দব নিয়ে।

পাঁচর সঙ্গে ঠিক বার-বাড়ির মুখেই হরি জমাদারের বেগা।

—এত ভাড়াভাড়ি কোথায় বাচ্ছে সো বাস-বরদার ?

পাঁচর তখন কথা বলবার সময় নেই। কাধের তোয়ালেটা সামলাতে সামলাতে বললে—এখন কথা বলবার সময় নেই গো, বড়বাবু নকরকে ডেকেছে—

নকরের ডাক পড়েছে ! হরি জমাদার কাঁটা নিয়ে বার-বাড়ির উঠোনের দিকে বাজিল। বললে—নকরের ডাক পড়েছে।

হরি-জমাদারের বউ-বেটা থাকে বাড়ির পেছন দিকের বাগানের কোণটার। আত্মবল-বাড়ি পেছিয়ে নোঙা আত্মবলুড় আর পচা ডোবাটার পাশে। হরি জমাদার ঘরে গিয়ে করলা ফলুমাটা পরে নিলে।

বউ বললে—কতুয়া গায়ে দিচ্ছ বে ? কোথায় বাচ্ছ ?

হরি জমাদারের কথা বলবার সময় নেই। শুধু বললে—নকরের ডাক পড়েছে, আমি চলি—

ফুলমণি বাসন বাজছিল কলতলায়। এক কাড়ি এঁটো বাসন। বার-বাড়ির বাসন বাজে ফুলমণি। কাউল-কটিলেট আর দুইশর ডিম্বের হোঁদা বাসন সব। ফুলমণি সেই বাসন দিয়ে বার-বাড়িতে রেখে দেবে। ও-বাসন ভেতরে চুপে না। ফুলমণি ভেতরের বাড়ির সিঁড়িকে হোঁবে না। সিঁড়ি বা-মণির বাস-অবয়ের বাসন বাজে।

সিঁড়ি বলে—হুঁদুনে, হুঁদুনে, সরে যা—এই ভাব, হুঁদুনে হিবি নাছি লা ?

ফুলমণি বলে—আমি কাচা কাপড় পরেছি গো, বাসনের পাট সরা। করে কাচা কাপড় পরেছি, এই ভাষা—

—বাবু, তোমার কাচা-কাপড়, তোমার জাত-জয় কিছু আছে কি না লা ?

এ-বাড়ির, এই সন্দের সেনের আদি বাড়ির ভেতরে-
বাইরে অনেক স্পৃহা-অস্পৃহা জীব আছে : তাদের জীবন-
ইতিহাস কেউ জানেনা। বাইরের বাসনই শুধু নয়,
বাইরের বাহ্যিক ভেতরে যেতে পারে না। বাহ্য-বাড়ির
বহন। থেকেই জীবনটি ডাকে—ওলো, ও সিঁছু, এক বামুটা
তেল কে তো হাতের তেলের—

সবর বহনকার ওপারে বাবার তার আদিকারও নেই,
একিয়ারও নেই। এ-পারের ডিকে কাপড়ের মল ও-পারে
ছিটোতে পারে না। এ-বিকের হাছের কাটা ও-বাড়ির
উঠানে যদি কাক নিয়ে কেল বেহ তো ও-বাড়ির উঠানে
অবস্থ হয়ে থাকে। তখন ডারি ডারি জল আসে কলগীতে।
কলগী-কলগী জল ঢালা হয় উঠানে। মা-মনি ওপরের
বাগান। থেকে তদারক করেন। বলেন—ও সিঁছু, নৈশেটা
অকুনো রইলো যে, ওপেরটা জল ঢেলে যে—

আজ কিম্ব জীবনটি সিঁছুকে দেখতে পেয়েই বললে—
ই্যা! লা সিঁছু, বড়বানু নাকি নকরকে ডেকেছে?

—কে বললে? কোথেকে শুনলি?

সিঁচুর মুখের চোখাটা নকরকে দেখে বললে গেছে।

জীবনটি বললে—জমাবাহারের মুখে শুনলুম—

সিঁছু বললে—জমাবাহারকে কে বললে?

কে বললে কেউ জানে না। কথটা কোথা থেকে
উঠলো, কে প্রথম শুনেছে, কেউই জানে না। কিম্ব
হৈ-হৈ পড়ে গেল বাড়িতে। মহলে-মহলে এক কান থেকে
আর এক কানে ছড়ালো।

—ই্যা! লা, বড়বানু নাকি আজ নকরকে ডেকেছে?

—কই, বড়বানু তো এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি।

আতাবল-বাড়িতে জলমোহর আলি ডিংপাত হয়ে
গিয়েছিল। তার বাড়ির ছিল বড়বানুর বাবার আদলে।
বাহারও ছিল। কালো আর বাগানী দুটো ঘোড়া ছিল
তখন। বাড়ি থেকে গাড়ি বেহোবার সব পাড়ার লোক
ই। কবে চেয়ে দেখতো ঘোড়া-দুটোকে। আর গাড়ির
বাহার ওলমোহর আলি জরির জামা পরে গাড়ি
ইকতো।

কেউ কেউ সেলাম করতো জলমোহর আলিকে—
সেলাম আলি সাহেব—সেলাম—

জলমোহর আলির তখন বিনকাল ভালো। কর্তা-
বানুকে নিয়ে বোনও কাছ করাতে ইলো জলমোহর
আলিকে ধরলেই কাজ হতো। একবার একটা ভালো
মরনা পাখী বেহুতে আসে একজন থেকে। ওই জলমোহর
আলি তিনগোটা টাকা পাইয়ে দিয়েছিল তাকে। মরনাটা

কথা বলে না, বোশ বলে না। গাছের পালকগুলোও ভালো
করে গজায়নি তখন।

কর্তাবানু তখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন।

বেহেটা এসে বললে—হুজুর, মরনা-পাখী গেছেন?

কর্তাবানুর বাস-বহরার তখন পীরজাদা। পীরজাদা
ইকিয়ে দিচ্ছিল বাজে স্যোক দেখে।

বেহেটা বললে—আজ্ঞে নীলগিরি পাহাড়ের মরনা, দুই
সত্তার ছেড়ে দেব—

কর্তাবানুর কী মেহাল হলো। অন্তবাহ অন্তলোক হল
ইকিয়ে মিতেন। কিম্ব মেহাল বোহর ভালো ছিল।
চেয়ে দেখলেন মরনাটার দিকে একবার।

বললেন—কত দাম? পাঁচ টাকা?

হুজুরবানু তখন কর্তাবানুর পেছনে ছিলেন। তিনিও
কর্তাবানুর সঙ্গে বাগানবাড়িতে যেতেন। তিনি বললেন
—পাঁচ টাকা? বলেন কি হুজুর, পাঁচ পরদা দাম নয়
ওর—ওর চোখপুতুর মরনা নয়—কালো শালিকপাখী
দিখাৎ—

কর্তাবানু চটে গেলেন। বললেন—বালা ঠিক! জিনি
আমাকে? বেহো—

বেহেটা বললে—না হুজুর, আসল জাত-মরনার বাচ্চ,
শালিক নয়—

হুজুরবানু বললেন—ও আসল শালিক, ওর চোখপুতুর
শালিক, মরনা চেনাচ্ছে আমাকে? আসলবানু শালিক—
শালিক না হলে কান কেটে কেলো হুজুর—

কর্তাবানুর বাগানবাড়ি বাগা হয়ে গেল। কর্তাবানু
বললেন—ডাকো মুহরিবানুকে, মুহরিবানুর বাড়ি চাকদার,
ও শালিক চেনে—

মুহরিবানু বাগানবাড়ির কাজ করছিল। কানে কলম
নিয়ে শৌদ্ধতে শৌদ্ধতে এসে হাজির।

কর্তাবানু বললেন—তোমার তো চাকদার বাড়ি
মুহরিবানু, হুপি পাখী চেনে?

—আজ্ঞে চিনতাম আগে!

—জামো তো, এটা মরনা পাখী কিনা?

মুহরিবানু চমকাটা কপালের ওপর জুলে ফেললে।
কাছে হুপি এনে দেখতে লাগলো। হিসেব-পত্তারের
খাতা দেখা তার কাজ। আদার-পত্র দেখে পাকা খাতার
তোলা তার কাজ। তারপর সেই খাতা থেকে জমা-বকেয়া
আলাদা-আলাদা জুলে আলাদা হিসেব রাখতে হয়। এই
কাজই চলিষ বছর একাদিক্রমে করছে। সেই লোককে
হঠাৎ পাখী চিনতে হবে কর্তাবানুর হুজুরে।

অনেক ভেবেচিন্তে বললে—আজ্ঞে চাকুদাতে
এরকম পাখি দেখিনি, তবে শালিখই মনে হচ্ছে—

বেলেট। বললে—তা হল মলিকবাবুর বাড়িতেই
দিয়ে গে দিয়ে হজুর—বাবুরা বেড়শো টাকা বলেছিল,
দিয়েনি—

হুর্গভাবু বললে—কান মলিকবাবু? কোথাকার
মলিকবাবু?

বেলেট। বললে—আজ্ঞে, গোয়ালুদির মলিকবাবু।

গোয়ালুদির মলিকবাবু? কথাটা কর্তাবাবুর কানে
গিরে খই করে বিধলো। গোয়ালুদির মলিকবা কি
আমার চেয়েও শাখী ভালো চেয়ে নাকি?

বললেন—গোয়ালুদির কোন্ মলিক বে হুর্গভ? কার
কথা বলছে?

হুর্গভ বললে—হজুর, আর কথা কার বলছে, আমাদের
হুলো মলিকের কথা বলছে, হুলো মলিকের যে আজকাল
পাখা গজিয়েছে—

গলমোহর আলি এতক্ষণ গাড়ির মাথায় হুপ করে
বসে ছিল। এবার নেমে এল নিচে। বললে—হজুর,
এ আসলি মরন আছে হজুর—

হুর্গভবাবু এবার বেন সরে এল সামনে। বললে—
কৈরি বে, ভালো করে দেখি তোরা শাখীটা?

বেলেট। শাখী নিয়ে হুর্গভবাবুর চোখের সামনে হুলে
বললে। হুর্গভবাবু বললে—ওখারটা একবার দেখা তো—

এখার ওখার সব ধারই দেখানো হলো। হুর্গভবাবু
অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বললে—না হজুর, এ মরনাই
মনে হচ্ছে—

কর্তাবাবু বললেন—ভালো করে বেবে বলো হুর্গভ,
হুলো মলিকের কাছে হেরে যাবো নাকি শেখকালে?

হুর্গভবাবু তখনও বেবছিল মন দিয়ে; বললে—
আমারই হুপ হয়েছিল কর্তাবাবু, এ আসল মরন—

—টিক বলছো তো।

হুর্গভবাবু বললে—হ্যাঁ হজুর, আর কোনও সন্দেহ নেই,
এ নির্বাণ মরন, এ আর দেখতে হবে না।

কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—হুলো মলিক কত বয়
দিয়েছিল?

বেলেট। বললে—হজুর, বেড়শো বলেছিল, আমি
দিয়েনি—

টিক আছে, আমি তিনশো বেব, কিন্তু হুলো মলিককে
দিয়ে বলে আসতে হবে, আমি তিনশো টাকার মরন
কিনেছি—

হুর্গভবাবু বললে—হ্যাঁ, ওমনি ছাড়া হবে না, হুলো
মলিককে তুমিই বিতে হবে হজুর, বজ্ঞ পাখা গজিয়েছে
আজকাল—

শেষ পর্যন্ত তো সেই শাখী কেনা হলো। শাখীর খাঁচা
কেনা হলো। সেই তিনশো টাকার শাখী বেবতে এলো
এ-বাড়িতে আরো খশটা গাড়ার লোক। শাখী বেবে খশ-
খশ গড়ে সেল চারদিকে। কিন্তু খশ গড়ে সেল একদিন।
শাখীটা যে শালিখ তা জানতে কারো ব্যক্তি মইল না।
একদিন শাখীকে চান কমাতে গিয়ে পাথের ব। হুয়ে মুছে
একাকার। চোখের কোণের হলুদে দাগ, গায়ের কালো বং
সব বং-কমা। সব কাকি খশ গড়লো।

কর্তাবাবুরের এরকম গল্প আরো আছে। এ-বাংলার
গল্প এই সংসার সেনের বংখহরদের গল্প এক কথাই বললে
সব বলা হয় না। শুধারেন হেট্টিলে কি তারও আসে
বে-বাংলার পশুন তার উখানের বেবন একটা ইতিহাস আছে
তেমনি আছে গতনের ইতিহাসও। গলমোহর আলির
এখন কাক বলে গেছে। এখন বড়বাবু কর্তাবাবুর মতো
রোজ বেবোরাও না, রোজ বেবোবার মতো বেজাকও নেই,
শাখ্যও নেই। সকাল থেকে দুপুরে বসে গেয়ে সব্ব কেটে
বায় গলমোহর আলির। হর্যং মায়ের মতো হয়ত একদিন



সেনাকো জুয়েলার্স প্রাইভেট লি:
হেড অফিস • ১০৬, আপার চিংপুর রোড • কলিকাতা - ৬
ব্রাঞ্চ • ১৬৮, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা - ১২
হেড অফিস • কোন • ৫৫-৩৮৪১, ব্রাঞ্চ • ৩৪-২০৮৬

বলা-নেই কওলা-নেই পাড়ি বেরোবার চকু হ'ব।
বড়বাবু ধাম-বরদার পাঁচু এসে খবর দিয়ে যায়—বড়বাবু
বেরোবে আক গুলমোহর—

তা সেই বাসামি ঘোড়াটা ঘরে দেল দেব পর্বত।
কর্তব্যাবু বড় শেরারের ঘোড়া ছিল খেটা। দেবকালে
তার এলাইজও হলো না, তব্রিৎও হলো না। আখাযল-
বাড়িতে দানা খেতে খেতে কাৎ হয়ে গড়লো। সেই থেকে
গুলমোহরও বেন ডেজে গড়েছে।

হুয়াং হুহিন আবহুল এসে বললে—চাচা, বড়বাবু
নকরকে ডেকেছে—

নকরকে ডেকেছে! গুলমোহর শুয়েই ছিল, এবার
উঠে বললো। বললে—ডেকেছে নকরকে। ঠিক আনিস?

—হ্যাঁ চাচা, ধাম-বরদার বললে যে!

গুলমোহর এবার সত্যিই উঠে দাঁড়ালো। নকরকে
বড়বাবু ডেকেছে। এখন ঘোড়া তৈরি করতে হবে।
করির আধা বের করতে হবে। ঘোড়াকে ডমাই-মলাই
করতে হবে। ঘোড়ার ল্যাংক আতর রাখতে হবে,
সাক চড়াতে হবে। বেলাঘরিয়া কি এখানে?

ধাম-বরদার শিড়ির নিচে নামতেই মুহুরিবাবু সঙ্গে
দেখা। মুহুরিবাবু অনেক দিনের লোক। মুহুরিবাবু
চাকর থেকে এসে কালের চেষ্টার একদিন রাজার রাজ্য
যোগ্যুদ্রি করেছিল। রাজার কলের জল খেয়েই কেটেছিল
ক'টা দিন। তখন কর্তব্যাবুই চেতলার প্রথম ধানের কল
করলেন। তাঁর দেখাদেখি গোয়াশাইলির ছলো মলিকের
বাবা মাতাল মলিকও ধানের কল করতে গেল।
কর্তব্যাবু ধানের কল থেকে বিনরাত চাল বেরায়। সেই
চাল চালান যায় এদেশে ওদেশে। জাভা, সুমাত্রা,
কিনিগাইন, মালয় আর চীনে। সব জাত-বোকা দেখ।

কর্তব্যাবু বলেছিলেন—গড়গড়তা খণ পিছু তার আনা
বেশ সব ছেড়ে ধাও—

ঐ চেতলার পক্ষ থেকে হাজারখুনি নৌকো বোকাই
হয়ে সব চালান বেত চাল। ঘাটের ধারে বেঙনি-কুমুদির
দোকান বসে দেল সার-সার। কলের সামনে
মণ্ডাফানানীরা এসে সলাবলো সেজ ধান সিলেক্টের উঠানে
পুকাতে দেখ। বিয়াট উঠান। এ মুড়া থেকে
ও-মুড়া খেখা যায় না। তারপর সন্ধ্যাবেলা আবার
ধানগুলো জড়ো করে করে ঢাকা গিতে হ'ব। মইসে
পারবার খেয়ে থাকে, হিম লাগবে। তারপর সেই ওকনো
ধান কল চড়াতে হ'ব। যত যত করে কল চলে। সেই
কলের শব্দে গদি-বাড়িটা কাপতো সারাক্ষণ। কর্তব্যাবু

আসতেন। মণ্ডাফানানীক দেখতেন, তারপর চলে যেতেন।
কিন্তু সেই মণ্ডাফানানীকের হাফেই সাক্ষর কিছু দেখতে
আমর বাকি থাকতো না।

তা সেই কল মুহুরিবাবু হতেও দেখেছে আবার উঠতেও
দেখেছে।

কর্তব্যাবু সারাক্ষীঘন বাগানপাড়ি করে দেবজীবনটা
বছর বেড়ের কাশীবাস করেছিলেন। ঘিরে এসে আর
বেদিনিম ঘাটেননি।

কাশিলাসবাবু এখন রাজাকি। কল-বাড়ির খবর তিনি
বিশেষ কিছু জানেন না। জানে মুহুরিবাবু। বলে—শেষ
পর্বত সেই শালিধ পাখিটার কী হলো শুহন বাসাকিবাণু।

—আরে রাখো তোমার শালিধ-পাখীর গল্প! এদিকে
যুধি আমি হিসেবের আলাহ। তুমি তো শালি জমার
হিসেব করেই থাকাস, বেক্ষা তো আমাকেই মিটাতে হবে—

তারপর খাতাটা সরিয়ে রেখে বলেন—হরিচরণ
এক মাস চা যে বাসা—

বাড়ির বাইরে রাজা। রাজাটা এখন গলির মতন।
আগে এইটেই ছিল প্রধান রাজা। তখন শোকজন গাড়ি-
ঘোড়া এই রাজা ঘিরেই বেত। বড়বাবু ঘিরে সম্বও
এই রাজাটাই ছিল একমাত্র শব। তা রাজা ছোট হলে কি
হবে। একটা চারের দোকান আছে, একটা কামা-কামুড়
খোলাই-এর বোখান আছে। টপ করে 'বেবিরে গিরে
এক মিনিটা না আনা যায়। কাশিলাসবাবু চা নুখে গিরে
বলেন—এ কী চা করেছে যে হরিচরণ, চা বাজি না চাই
বাজি—

মুহুরিবাবু বলে—কর্তব্যাবু'র আমলে চা আমলের কিনে
খেতে হতো না বাসাকিবাণু—

কাশিলাসবাবু বামিরে দেন। বলেন—হুহি খামো
মিকিনি মুহুরিবাবু, কবে পেনো সজা ছিল তার গল্প থাক।
এখন বকেহ-বাণী খতেনটা-রাও তো—

তারপর বলেন—গেলমাসে বড়বাবু'র কত টাপ
হাওলাত, বেশ তো হিবেরটা?

মুহুরিবাবু হাওলাতের হিসেবটা দিয়ে সব একই কলে
দিয়েছিল। কেবরবার পবেই ধাম-বরদার পাঁচুর সঙ্গে দেখা।
আর তারপরই একেবারে ইঁকাতে ইঁকাতে নৌড়ে
এসেছে।

—এদিকে সর্বনাশ হয়েছে বাসাকিবাণু!

—কী হলো? হাওলাত না থেকে নু খুলে
কাশিলাসবাবু তাকালেন।

—বড়বাবু নকরকে খরন করেছেন!

আবার নতুনকৈ শ্রমণ করেছেন। কাদিলাসবাবু যেন খবরটা শেয়ে খুঁড়ে পড়লেন। মাসের আঝকে চম্পি ত্রিধি, পাওনা-গণ্ডা কিছু এখনও যেদেশে, এরাই মধ্যে নতুনকৈ শ্রমণ করে বসলেন!

যেখানে সিঁড়ি দিয়ে শেখবিকৈ বার-বাড়ির দরোয়ানদের থাকবার ঘর। কিছু কিছু পুরানো বাড়ির খাতা-পত্র তাদের মাথার জ্বা করা আছে। সাত-আট-দশ পুরুষের জমা-বকেবকে খাতা, কত কবিবারি, কত ধান-কল আর নানা কারখারের হিসেব-নিকেশের খাতা-পত্র এখানে ওখানে পিতৃবকের মাথার পড়ে আছে। বছরের পর বছর ধরে খুঁধো জমছে তার গুপ্ত। দরোয়ানেরা সকালে ভরে দুধ খেয়ে, দুপুরবেলা দুধোয় আবার রাতে তুলপীসানী রানায়ণ পড়ে। তারা জানতেও পারেনা কতপুরুষ ধরে যে হিসেব-নিকেশ তাদের মাথার গুপ্ত জমে জমে এখন পড়ে ধরে থাকে, সে হিসেব-নিকেশ অনেক কষ্টের আর অনেক হারের ধন ছিল একদিন। অনেক পুরুষের পাণের আর পরিভ্রাণির সব ফল পেতসো। সেক-কল একদিনে সঞ্চিত হয়নি। দিনে রাতে নিরলস বিলাস, বিস্ত্র আর বিতৃষ্ণার সব সঞ্চ। কেউ বুঝতে পারেনা কেউ চিনতে পারেনা তা! কেউ জানতেও পারেনা সৈ-দব।

তু একজন জানে।

বা-মণি বলেন—বোঁষা?

বোঁষা এ-বাড়ির বড়বাবু-বোঁ, তাঁর যেন সব দেখা শোনা বোকা হয়ে গেছে। রাত বখন গভীর হয়, বড়বাবুর টায়ের বাগের শব্দ কয়ে কণি বেকে কণিতর হয়ে আসে, তখনও দুই আসেনা তাঁর। বলেন—সোঁয়জী, বেখে আয়তো জগজগতবাবু কি চলে সেছেন না আছেন?

জগজগতবাবু কর্তাবাবুও আশলের লোক। অ্যাটর্নীর অকিলে চাকরি করেন দিনের বেলা। কিন্তু বড়বাবু তাঁকে শ্রমণ করেন প্রায়ই। গাড়ি পারিয়ে যেন। জগজগতবাবু জামা-কাপড় বদলে পাঞ্জাবিতে আতর বেখে এসে তাকিয়া হেলান দিয়ে বলেন। আগে যোজাই আসতেন। তোজ। ওসমোহর আশির একটা বাঁধা কাজই ছিল শুটা, সোজা গাড়ি যেত কবিশটোলায়। সেখানে বতখন্দ না জগজগতবাবু জামা-কাপড়-সাজ-পোশাক গ'রে তৈরি হতেন ভতখন্দ গাড়ি ধাঁড়িয়ে থাকতো। তারপরে নিজেই বেয়াসহতো টং-বুং-কমতে কমতে আসতেন।

এখন বড়বাবু কাছেও আসেন।

এসেই বলেন—আজকে আর একজন কাং—বুতলে হে বড়বাবু, আর এক বডেল কাং হলো। "

বড়বাবু তাকিয়ায় হেলান দিলেন।

বললেন—আবার কোন্ বডেল কাং হলো মাষ্টার?

গোজ হাইকোর্ট অকলে ঘোরা-কোরা করেন। টাইকা খবরটা তিনি পান। বডেল কাং হওবার খবরে ভাবি খুঁই হন জগজগতবাবু। যে দিন কোনও বডেল কাং হয় না সেদিন ভাবি বিদ্বৎ থাকেন। কিন্তু আবার কোনও বডেলের কাং হওবার খবর পেলেই গুনিয়ে যান। সোবের সিং-এর পানীর ট্রোট যাকা ছাওলগুয়ালা পাকানো একটা ছড়ি হাতে। এসেই বলেন—দা-জাননী কেখন আছেন বড়বাবু?

বড়বাবু বলেন—ভালো।

—বাক, ভালো থাকলেই ভালো বড়বাবু, এরা সব গুণ্যাহা গোজ বড়বাবু, এরা বেঁচে থাকলেও গুণিবিটা তবু কিছু হালকা থাকে, নইলে শাপ বে-বকম বাড়ছে।—কিন্তু আককের খবর শুনেছেন?

বড়বাবু বলেন—কী খবর?

—সোবেরনি? আরে আজকে হাইকোর্ট পাড়ায় যে ঠে-ঠে পড়ে গেছে, সেই বাতাল মলিকের নাসি, খুলো মলিকের ছেলে কার্তিক মলিক কাং—

—কেন?

জগজগতবাবু বলেন—হুতি কেটেছিল কাবিশিয়ারার কাছে, এখন হুয়ে-আসলে সব ডিকি হয়ে গেল, আর বাবা খুলতে হবে না বাবাঞ্জীকে এবার—

একটা-না-একটা ক্যাপ্রেন গোজ খারেল হয় কলকাতায়, আর জগজগতবাবু তার দীর্ঘ দিকিতি যেন বড়বাবুর কাছে এসে। আগে গোজ আগতেন, এখন বড়বাবুর হাজের ডেক করে এসেছে, একটা-না-একটা অগ্রুণে কাবু হয়ে থাকেন। এসেও তেমন জমে না। একলা আর কতখন্দ জমিয়ে রাখেন। হাবার সব্ব বসেন—কই বড়বাবু, অনেকদিন তো কিছু হয়নি, পেখে কি তক্তাচার হয়ে যাবে নাকি?

বড়বাবু তাকিয়া থেকে উঠে বলেন—না, কই, এতদিন তো যেন ছিল না মাষ্টার, মনে করিয়ে দিতে হই তো—

—হ্যাঁ, তাহলে কালকেই হয়ে যাক—বুং দাঁওয়ে কিছু হইতি পাওয়া বাড়িল, কসকে সেল—

বাড়ি কেবার আগে জগজগতবাবু বার-বাড়ির সামনে একবার এসে দাঁড়ান। টাঠোনে যাক্সবাতিটা তখনও জলছে টিবিটিং বসে। দরোয়ানদের সব্বের চুপ সিং ছাত্র থাকিল। জগজগতবাবু সামনে গিয়ে বসলেন—এই যে চুপ, একবার যে বাবা তেতরে খবর পাঠাতে হবে, দা-জাননীর পারের খুলো নেং—

ভূষণ সিং সোঝা মা-জননীকে কাছে বেতে পারবে না, সে থবর বেবে পছন্দকে। পছন্দ আর-বাড়ির চাকর, সে থবর পারাবে ভেতর বাড়ির সিঁড়িকে। সিঁড়ি মা-জননীকে বলবে—মাস্টারবাবু একবার পায়ের ধুশো নিতে এসেছেন মা-মনি।

তারপর জগদ্বারবাবু পছন্দর দশে গিয়ে অক্ষরের সিঁড়ির ঘোড়ার ঠাঁড়াবে। ওপর থেকে সিঁড়ি ঘোমটা বিধে বাইরে এসে ঠাঁড়ালেই জগদ্বারবাবু ওপর দিকে চেয়ে বলবেন—মা-জননী, আপনার ছেলে এগেছে, ক'দিন আগতে পারিনি, অপরায় নেবেন না আমার—

সিঁড়ি মা-মনির বকলুয়া বলবে—থোকাকে এস্ট্রি বুঝিয়ে বলবেন মাস্টারবাবু—

—আজ্ঞে আমাকে আর বলতে হবে না মা-জননী, আমি তো তাই বোঝাতেই হোক আমি, বলি তো যে ও-সব ছাইতাম খাওয়া কি ভালো? বুকেছে, আগের থেকে অনেক বুকেছে মা-জননী, লেগেন না আমি বুঝিয়ে-বুঝিয়ে কত ঠাণ্ডা করেছি—

সিঁড়ি বলবে—আজ্ঞে কেননা আছে থোকা?

—আজ্ঞে তো বেজাক ভালোই দেখলাম মা-জননী, ঈতখানা পড়লাম আজ, চতুর্পন অধ্যায়টা শেষ করে গিলাম, ও-সব বই চিন্তা-চিন্তা যাতে না আসে আর কি। তবে একটু সময় লাগবে, অনেক দিনের নোতা ভেঙে, সঠিকে সঠিকে ছাড়াবো, তা আমি যখন আছি আপনি তখন কিছু ভাববেন না—এখন আমার হাতখন আর আপনার আশ্বিনাধ—

সিঁড়ি বলবে—আমার এক ছেলে, আপনিই ওর মাস্টার ছিলেন, আপনিই ডরসা আমার—

জগদ্বারবাবু বলবে—আমার ওপর ডার দিয়ে নিশিন্তে বাহুন মা-জননী, আপনার একটু পায়ের ধুশো পেলে আমি আর কড়িকে ভব কি না—একটু পায়ের ধুশো দিন মা-জননী, বাড়ি চলে বাই।

সিঁড়ি একটা ছোট ম্পোর বাড়িতে বানিকটা পায়ের ধুশো নিয়ে এসে সাবনে ধরে আর জগদ্বারবাবু সব ধুশাইকু রাখায় ঠেঁকিয়ে বাড়িটা একবার জিড়ে ঠেকান। তারপর সেই দেখানে ঠাঁড়িয়েই সিঁড়ির সিঁদেউর ওপর কপাল ঠেঁকিয়ে বাড়ি চলে যান।

এ-ঘটনা পছন্দের, বহু বছরের। বহু বছর ধরেই জগদ্বারবাবু এখন মা-জননীর পায়ের ধুশো-প্রাপ্তি ঘটে আসছে। পায়ের ধুশোর কোরেই জগদ্বারবাবুর নিজস্ব বাড়ি হয়েছে কবণিটোলার, নিজস্ব মোটরগাড়ি হয়েছে।

সেই গাড়ি করেই নিজের অফিসে যান। কিন্তু বড়বাবু কাছে আসতে হলেই বড়বাবু গাড়ি নিয়ে যায় গুলমোহর।

আগের দিন হাফেজ এসেছিলেন জগদ্বারবাবু। বখারীতি হাফেজ বাবু হওয়ার গল্পও করেছেন বড়বাবুর ঘরে থলে, তারপর বখারীতি মা-জননীর পায়ের ধুশো নিয়ে কপাল ঠেঁকিয়ে প্রাণমণ্ড করে গেছেন। তখনও কেউ টের পাঠনি যে পরদিন ভোরবেলাই নব্ব্বের ডাক পড়বে। নব্ব্ব নিজের কল্পনা করতে পারেনি।

বাস-বরবার পাঁচ বাব-বাড়ির ভেতরে চুকতেই একবারে সামনা-সামনি ধাক্কা লাগছিল ভূষণ সিং-এর সঙ্গে। ভূষণ সিং বহুদিনের লোক। কর্তাবাবুর আমলে বন্ধুকে নিয়ে পাহারা বিত। সে বন্ধু এমন নেই, তাই সে ভেঙেও নেই। বাহুবটাও বুফা হয়ে গেছে। একতাল আটা নিয়ে বাক্সিলা রাখতে। আর একটু হলেই ধাক্কা পেলে আটাও নষ্ট হতো, ধাক্কাও ভাঙতো। বাস-বরবার মূর্খী চোঁদ, মছলি চোঁদ—

—অজ্ঞা হ্যাঁ, না কেনা জায়?

আর দু'একটা চড়া কথা বলতেই হাতাহাতি বেধে যেতে দেখানে। এমন বেধেছে অনেকবার। ভূষণ সিং-এর লে-ভেজ নেই বটে, কিন্তু রাগটা আছে। রাগ করলে আর জান থাকে না তার।

—বামু ভুই, ডারি রাগ বেঝাচ্ছে আমাকে।

কর্তাবাবু লব্ধ সে-আমলে ভূষণ সিংকে সামলে নিয়ে চলতেন। বলতেন—ভকে চট্টিয়ে না তোমরা'র' হে, ও বাস মৈথিনী ব্রাহ্মণ, অপর রাগটা একটু বেশি হয়। আর সদরগেই—এ রাষ্ট্র লোক থাকা ভালো—

—ভুই রাগ করে তো আমার কচু কবনি—বলে বুফা আটল উঠিয়ে বেহার পাঁচ। হত আটারহু সেতলের বালান্টা পাঁচুর মুখে কুঁড়েই মারতো কুশ সিং। কুঁড়ে মারলে আর হক থাকতো না পাঁচুর। ওখানেই অজ্ঞান হয়ে একটু রক্তাক্তি কাও বেধে যেত। আর নব্ব্বকে ডাকতে যাওয়া হতো না!

—অজ্ঞা হ্যাঁ না কেনা জায়?

—বামু ভুই, এমন কথা বলবার সময় নেই আমার, বড়বাবু নব্ব্বকে ডেকেছে—নইলে সেপে নিভুয়—

নব্ব্বকে ডেকেছে! অমন যে রাষ্ট্র মৈথিনী ব্রাহ্মণ ভূষণ সিং, সেও যেন বখারী তনে কেনন বন্ধু ঠাঁড়াল।

বাহ্যাবুড়িতে নকাল থেকেই গোলমাল থাকে। গোলমাল সব সময়েই থাকে দেখানে। বাহ্যার কালি-বুল আর খোঁয়াত যথো বে-বাহ্যবুড়িয়ার জীবন এতদিন

কেটেচে, তাহা জানতে পারে না কখন কোন দিকে যুঁধ
উঠিলো, কখন হুঁশো। বড়বাবুর ধাবারের বকমারি চাই।
খাজাকিমানার খাজারের সরকারও বাটে। খাজার-খরচটা
উপর হাতে দিতে হবে। কালিদাসবাবু খাজারে গেলেই
খাজারের মেট্রিনি থেকে তুল করে আঙ্গু-পটলওলাগা
ডেকে ভরে—এই যে বাবু,
এদিকে আহুন—অঃতকে
ধলে বঃরীর লাগচক
কই—

আঙ্গু ও লা বলে—
নৈমিত্তিক আঙ্গু ছিল
বড়বাবু, আধমণ নিয়ে
হান—

সেই খাজার কিছু
বাবে নিজের বাড়ি, কিছু
আসবে এ-বাড়িতে।
তারপর উড়াতের খিঁসা
সেই অনিচ্ছা তরকারি
কুটতে বসবে। মা-মণির
জন্মে বড়-বড় আঙ্গু
কুটতে হবে। বৌ-মণির
আঙ্গু-চুঁচু। আর বড়-
বাবুর কুটো-কুটো আঙ্গু-

ডাক। ডাল হোক না-হোক, কোল হোক না-হোক,
ডালনা হোক না-হোক—আঙ্গুডাক চাই-ই বড়বাবুর।

সেতে বসে বড়বাবু বলেন—আর চাবটি আঙ্গুডাক
দিতে বশুতো পোঁচো—

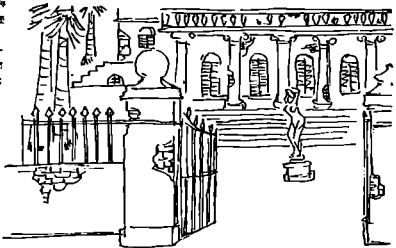
গান-বরদার পাঁচ ছুটে বার রাজাবাড়িতে। রাজাবাড়ি
শিওরনে। বাহে-বাড়ির উঁচোনে মজ একটা নির্মগাছ।
সেই নির্মগাছ খুব ঝিকুী ঘিরে অন্ধরের রাজাবাড়ির
বহর। দৌড়তে দৌড়তে সেখানে গিয়ে পাঁচ দু
থেকে হাকার।

বলে—ও শিতুর-না, আঙ্গুডাক চাইছে বড়বাবু,
আঙ্গুডাক দাও—

বঙ্গা তখন উঠবে চক্কড়ি চড়িয়েছে। নটে শাক,
হুমকো আর বাবুর খোলা দিয়ে বা-জননীর শাখের তরকারি
ধক্ষিল। ডাক বাড়ির ভঁড়োও দিতে হবে সেবে। সর্বে
বাড়ির ঘেঁষেছে শিতুর-মাকে গিয়ে। সকালবেলা করমাস
হয়েছে। শিল্প এসে রাজাবাড়িতে করমাস দিয়ে গেছে।
এখন বেলা হতে চলো, চক্কড়ি এখনও নাখলো না।

মদলা বলে—ই্যা। শিতুর-না, খাজাকিমানার লোক
এখনও যেতে এলো না ?

এখানে খাজাকিমানার লোক বাবে। তিনজন খা
রোষাকে বলে। শিতুর-না তাদের পরিবেশন করে।
তারপর বার-বাড়ির মানুষ-জন যারা হুঁএকদিনের জন্ত



আসে বাড়িতে তারা বাবে। কল থেকে ম্যানেকারবাবু
আসে বেশ। বারোটার সময়। ঠাঁকে সেতে দিতে হবে।
হকে হকে রাজা বেমন, তেমনি হকে হকে থাকে। মা-মণি,
বৌ-মণি যা বাবে তা শিল্প এসে খালা সাজিয়ে নিয়ে
বাবে সোতলায়। তারপর সকলের সেবে বাবে বড়বাবু।

—ইয়ারে, বড়বাবু কি চান করতে নেবেছে ?

খবর আসে বড়বাবু তেল মাখতে নেবেছে। বাড়ি
কামানো, তেল মাখ, পা টোপা তাইতেই বেলা পড়ে বাবার
ব্যাপার। মদলাকে ততক্ষণ বলে থাকতে হয়। বড়বাবু
না খেলে মদলাও সেতে পারে না। কিংবদন্তি পায় কি
পায় না তা বোঝবার সুত্ররত থাকে না। শিতুর-না জোপান
ধের আর মদলা বাবে।

—ইয়ারে, নফর আম কই খেলে না তো ?

শিতুর-না বলে—পারিয়ে বাপু ডেকে ডেকে ছুত
খাওয়াতে, বার গরম হবে সে এসে খেয়ে যাক না।

—আহা জাপু না, ছেলোটা না খেয়ে থাকবে গা।

এক এক দিন যেতেই আসে না, লোক পাঠিয়ে ডাকলে

তার খোঁজ পাওয়া যায় না। এ-বাড়ির প্রত্যেকটি দোকনের কাজ আছে। ওই বাজাৰিকাবু থেকে শুরু করে চাকল'র মুহুরিবাবু, ভূষণ সিং, ফুলবনি, সিদ্ধু, মা-মনি, বৌ-মনি, হরি-জমাদার, সকলে সকাল থেকে চরকির মতো ঘোরে। কাজটা থেকে কী করে তার হিসেব বেগুনা সহজ নয়, কিন্তু ব্যাধি সহ্যই। সকাল থেকেই কেন, ভোর রাত থাকতে উঠেন আঙন পড়ে রাগাবাড়িতে। তখনও পেট ঝেঁঁইনি। মল্লার তখন চান হয়ে গেছে উঠোনের কলতলার। বিধবা বাহুব, জল বেলো আফিক বেলো সব সেই সময়ের মধ্যে করতে হয়। তার চেয়ে দে-সময়টাতে আলুভাজা, চকড়ির কথা ভাবলে বেশি লাভ। মায়া বাড়ির লোক থাকে, কিন্তু বাঁধেছে যে কে তার হিসেব কেউ রাখে না।

শিঙুর-মা বাটুনা বাটতে বাটতে বলে—দিদি, অমুবাটা কবে যো?

কে জানে কার অমুবাটা। কবে অমুবাটা, কবে সূৰ্য-এক, কবে পূৰ্ণিমা, কবেই বা একাদশী কোনও খবর রাখবার সময় থাকেনা রাগাবাড়ির মধ্যে। চারটে উঠুন। হী-হী



করে জলছে বাবু-বাজার চিত্তার মতো। চিত্তা বেন আর নিভতে চার না। কবে সপোৰ সেনের আমলে এই চিত্তা জলতে শুরু হয়েছে, তার বেন আর স্মৃতি নেই। একটা উঠেন ভাত চাপিয়ে আর একটা উঠেন ডাল চাপাতে হয়। ততক্ষণে আর একটা উঠন হ-হ করে জলছে। পেটতেও ভাত চাপাতে হয়। এক ঘণ্টা চলে ভাত চড়ে রোজ। এক হাড়ি ভাত বাম্বলো তো আর এক

হাড়ি চড়িয়ে দাও। মশরকম চাল। চালের কম-বেশ আছে। বাইরের লোক বাবে মোটা লাগে চাল। বৌ-মনি মা-মনি চালের সজ্ঞা আতপ চাল। বড়বাবু বাবে বাসমতী পেছ চাল। ডালও একরকম নয়। কেউ মুগ, কেউ মুগুর, কেউ বিটলি, কেউ খেসারি। বকমারি লোকের বকমারি পাওয়া।

খেতে বলে মুহুরিবাবু বলে—বাড়ির ঘট্ট আর-একটু শিঙুর-মা!

মল্লা বলে—বাড়ির ঘট্টটা এই রেখে দিলাম বাটি ঢাকা দিয়ে, নিশ্চয় বেন, নব্বয় বাবে—

—মুহুরিবাবু চাইছে যে!

—তা চাইছে বলে কি আর কেউ বাবে না! আমার ছদ্ম পুড়ে গেল, আমি তোর সঙ্গে জগড়া করতে পারিনে বাপু—

রোজ সকাল থেকে নানান দোকানের চাহিদা: মোটাতে-মোটাতেই হিমসিম বেয়ে বার মল্লা আর শিঙুর-মা। এর মধ্যে ওপর থেকে কখনো আসে—ডালে আর মুন কম হেঁদেছে শিঙুর-মা—

কেউ বলে—কালিঘাতে আজ এত লজা দিলে কেন গা?

সব খবর খোঁছোয় না রাগাবাড়িতে। জ্ঞান গালাতে-গালাতে হাতটা পুড়ে যায় কতবার। শিঙুর-মা বলে—ওমা, হাতে তোমার কোথা কেন দিদি?

মল্লা টেরও পায়নি। বলে—ওমা, তাই তো—

—একটু হুন আর নারকোল তেল দিয়ে দেব?

চুন নারকোল-তেল দেবার সময় নেই দে-বাড়ির রাগাবাড়িতে। ভোরবেলা উঠে উঠেন বাবা চাপাবার পর সেই যে একটার পর একটা কাজের চাল আসে, তারপর থেকে রাত ব্যাটো অবধি নিখাস নেবার ছুরছুর থাকে না মল্লার।

শিঙুর-মা হু'একটা খবর এসে দিয়ে যায় বাটে, বলে—গুমেছ দিদি, ভেতর-বাড়ির দিকুর কাও?

মল্লা তখন ডালে কোড়ন দিচ্ছে। বলে—কথা রাখ, বাহা, তোর বাটুনা হলো? আমার এদিকে কখনো পুড়ে গেল—

শিঙুর-মা বলে—ফি-গিরি বহুদিল বলে তো কী বন বিকিয়ে দিইনি দিদি, যেহা ধরে গেল মাষ্টার কাও দেখে—তবু মল্লা কোনও কথা কানে নেয় না।

বলে—মা-বণির অহুৰ হয়েছিল, কেমন আছেছে জানিস?

শিখর-মা বলে—আজ তো বড় কবিগায় এগেছিল,
গাড়ি ঠাঁড়িয়ে ছিল সেইজুড়ে—

মললা বলে—একবার সময়ও শাইনা যে দেখা
করে আসি—

—কদিন কাজ হোল তোমার দিদি ?

কাজ কি অত্যন্তের ? কত বছর হবে ? বেবার
কর্তাবাবু কান্না দিয়েছিল তাঁর করতে, সেইবারই প্রথম
এ-বাড়িতে গোক মললা। ওই নিমগ্নাচটা তখন ছোট
ছিল। হাত দিয়ে ভাল চোঁবা বেত। কতদিন ওই
ভাল ভেঙে পাতন করেছে বাড়ির স্ত্রীউড়িয়া। ওইখানে
তখন ঘাট ছিল। ঘাটের কোণে হুটো লাউগাছ ছিল।
সেই লাউগাছ উঠেছিল রাস্তাবাড়ির ছায়ে। লাউ
হয়েছিল প্রথম-প্রথম। কিন্তু হুহুমান এসে সব মুড়িয়ে
থেকে গেল একদিন। শিখর-মা তখনও আশেনি। আর
নকর তখন ছোট। ফগা ফুটফুটে চেঁহাঝা।

লোকে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ রে, তোর মা কে ? বাবা
কে ?

মুহুরিবার তখন বাজাকিমানার কাজ করছে। বলতো—
আমি চোঁড়া, নাচতো বেশি, নাচ—

কানিশাসবাবু সরকারি কাজ থেকে মুগ হুগে বলতেন—
আবার ওকে পেপাচ্ছ কেন বলো দিদি—

কিন্তু নকর তখন নাচতে শুরু করে দিয়েছে। নাচ
হানে তেমন নাচ। খেই খেই করে নাচ।

—এইবার গান গা তো ?

কানিশাসবাবু বলতেন—আবার কাকের সময় গান
করতে বলতো কেন বলো তো।

নকর ততক্ষণে নাচ বামিরে গান ধরে দিয়েছে—

আমি বুঝা-

বনে বনে বনে

বাঁশী বাজাবো—

আমি বুঝা—

—খাখা বাণু, তোর গান খাখা—তোর বাণ কে রে ?
কবেব ছেলে ছুই ?

—সরকার মশাই, ওর ডিগবাঁধি খাওনা দেখবেন ?
আমি, ডিগবাঁধি খা তো ?

নকরকে বলতে হয়না বেশি। হুহুহু তামিল করতে
গারদেই বুনী। শেষকালে সামনে এসে হাত পাতে।

বলে—একটা পরমা দাওনা সরকারবাবু—

কানিশাসবাবু এক ধমক দেন। বলেন—হু, হু হু,
পরমা কেন রে, পরমা কী হয়ে ?

—ল্যাবেনুচু খাবো।

—হু হু, বেগো এখন থেকে, পরনে কানি নেই,
ল্যাবেনুচু খাবেন। হা, বেগো এখন থেকে !

বেব করে তাকিয়ে দিত বটে সরকার-মললাগা। তখন
ছোট। কেউ বলুক না কিছু, দিক না তাকিয়ে, কিছু আসে
যায় না তাতে নকরের। আবার গিছে ঠাঁড়াত দরোহানদের
ঘরে। কুশ সিং তখন ডন-বর্ষকী দিচ্ছে আর হু হু শব্দ
করছে। দেখানে গিছেও ঠাঁড়াতো বামিকল্প। তারপর
বলতো—আমিও পারি ও-রকম, দেখবে ? দেখবে
তোমরা ?

জ্যাঠো হয়ে গেই অবস্থাতেই লেগে বেত ডন-বর্ষক
করতে। হতোনা ঠিক। শুষ্ক করতো। কুলমনি দেখতে
গেয়ে বলতো—হ্যাঁয়ে, তোর কাপড় কী হলো ? জ্যাঠো
হয়ে যুঁহুনি কেন ?

কাপড় কি কোমরে থাকতো তখন নকরের। ধরে
বেঁধে কেউ একটা চোঁড়া কানি পরিয়ে দিলে তো। তাই নিয়ে
এ-পাড়া ও-পাড়া রাস্তার-ঘাটে ঘুরে বেড়াতো। কর্তাবাবু
বনে বেরোতেন, সঙ্গে অগস্ত্যগণবাবু, হুলালহরিবাবুও
বেতেন। নকর সামনে গিয়ে হাজির। কর্তাবাবু দেখলে
বলতেন—হ্যাঁয়ে, এটাকে একটা কাপড় পরিয়ে দেব না
কেন কেউ ?

অগস্ত্যগণবাবু একবার দেখে বললেন—ছেলেটা কাদের
কর্তাবাবু ?

হুলালহরিবাবু বলতেন—ক'দিন থেকে দেখছি,
কোথেকে এল ?

—এই, তোর মাঝ কী রে ?

—একটা পরমা দাওনা।

—এইইহু ছেলে আবার পরমা চার বে। পরমা
কী করবি ?

—ল্যাবেনুচু খাবো, ওই বোড়ের দোকান থেকে।

তখন কর্তাবাবু রমায় অবস্থা। সংসার সেনের
বংশের কুলতিদক। চেতলার ধানের কল করেছেন।
পোড়ার সোতার কারবার, বেলেঘাটার তেল-কল। সব
কারবারই ভালো চলছে। হুড় হুড় করে টাকাও আসছে।
টাকার বেনে ব্রুটি হয়। লাখ-লাখ টাকা জমা হয় বাজাকি-
মানার, বাতা দিখতে দিখতে হাত বাখা করে মুহুরিবাবু।
বকেয়ার খাতার তেমন কানির আঁচড় পাড় না, জমার
খাতার চারটা-পাঁচটা অম্বর খাজা সাহলানো গার হয়ে
ওঠে। রাত আটটা নটা বেজে যায় সরকার-মুহুরির সেই
ঠোঁসা সাহলানো। কর্তাবাবুর মোসারেরের দলও বাড়ি।

বাবু। বলেন—আজকে নৌকাবিলাস হোক কর্তাবাবু, অনেকদিন নৌকাবিলাস হয়নি—

তা তা-ই হয়।

বাবু। বলেন—অনেকদিন ভালো গান শুনিনি কর্তাবাবু, ঘোড়রখাই কলকাতায় এসেছে শুনিছি—

তা তা-ই হয়।

বাবু। বলেন—হুগো বল্লিক একজোড়া সাধা ওহেলার কিনেছে দেখুধু, বেশ দেখাচ্ছিল কিং—

তা তা-ই হয়।

নৌকাবিলাস হয়, ঘোড়রখাইর গান হয়, সাধা ওহেলার একজোড়া, তা-ও হয়। কোনও শব্দ অশুভ থাকে না কর্তাবাবুর বাবুদের। কোথাও ভালো পাইনি গাই-গরু এসেছে শুনে, তাই-ই কেনা হয়।

কর্তাবাবুর পোষায় ঘরে মা-মনি একদিন এলেন।

বললেন—ওরুদেব এসেছেন, জানো!

—কই জানি না তো। কেউ বলেনি তো আমাকে!

মা-মনি বলল—ওরুদেব বলছিলেন চুড়ামনি-বোণে তাঁর প্রবেশ নাকি সব পাশ কর হয়, বাবে!

—পাশ!

পাশ যে কোথায় তা তো জানা ছিল না কর্তাবাবুর। পাশ তো কিছু করেন না। কারের কোনও ক্ষতি তো করেন না তিনি। কাকো চোখের জল কেনেন না। যে আশ্রিত হয়ে থাকে তাকে যেতে দেন। কেউ হলুপ করে বলতে পারবে না সংসার সেনের বাড়িতে এসে অপমান পেরে ক্রিয়ে গেছে। দান-দ্যানও আছে কর্তাবাবু। পুরী থেকে পাওয়া এসে দক্ষিণে নিয়ে হাসিমুখেই আবার চলে যায়। নিভা দেবলেনা আছে বাড়িতে—সেখানেও ভোগ হয়, প্রসাধি বিলেনো হত। পুজোর সময় যে-সে কাপড় পায়। পাত পেতে খেয়ে বার লবাই। সরকারের খাতায় তার হিসেব আছে দস্তরখতো। তাগার ওখানে মুদ্রিক, এখানে অম্বা, সব চান্দা দেন কর্তাবাবু। কাউকে কেমন না তিনি। তবে আর পাশ কিসের?

মা-মনি বললেন—বলছো কি ভুলি, পাশ নেই? বেঁচে থাকাই তো পাশ, কত পাশ-ই যে করছি—

তা ঠিক হলো। তাঁর বাসই করতে হবে। তাঁর বাস। ওরুদেব বোকাগেলেন—ভ্রাম্যণকে দান করলে এক ক্ষমের পাশ কর হয়, কিন্তু সন্তান তাঁর বাস করলে অম্ব-অম্বাভয়ের পাশ কর হয়। আর নতিই তো, বেঁচে থেকেই তো আমরা অম্বা পাশ করছি। যবের অম্বাচারে

কত হত্যা করছি, কত নিখাচার করছি, কত অলপাচরণ করছি।

ওরুদেব মোহা পাঁচশো টাকার প্রণামী আর কাপড়, বাসন, বড়ম ইত্যাদি নান। জিনিষপত্র নিয়ে উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। তিনি কান্দিয়ে গিয়ে সব ব্যর্থ করে রাখবেন। এটিকে তোড়জোড় করতে লাগলো।

জগত্তারণবাবু তখন অ্যাটর্নিশিপ পড়ছেন। বললেন—অব্যয় পাঠ্য হতে গেছে কর্তাবাবু, সময় কাটতে চাইবে না—

কর্তাবাবু বললেন—তোমরাও চলো না—

দুলালহরিবাবু বললেন—আমরা চললে এটিকে সামলাবে কে?

বাগানবাড়িতে কর্তাবাবুর মেধোমন্ত্রের তখন খুব খাতির। পুতুলমালার বা আছে, পুতুলমালার বি আছে, পুতুলমালার চাকর, বরোহান সহ আছে। কিন্তু তবু ভয় বার না। হুগো বল্লিক নতুন বড়লোক। কোথেকে কী করে বসে, পুতুলমালার থাকে দুই করে হস্ত হাত করে নেবে, তখন এ-কূল ও-কূল উত্তরকূল বাবে। তার চেয়ে জগত্তারণবাবু থাক। দুলালহরিবাবু থাক। হুবেলা হুজুন পালা করে পাহারা দেবে।

কর্তাবাবু বললেন—জগত্তারণ ভুলি যেহে সন্ধ্যাবেলা, আর দুলালহরিবাবু তো কোনও কাজ নেই, ও বাবেখন সকালবেলার দিকটা,—কড়া নব্বয় রাখবে যেন বাইরের ঘাছিটা না মাড়ায় ওপানে—

কিন্তু সেই-যে কর্তাবাবু কান্দে গেলেন, সেই মাওরাতই কপাল ভাঙলো দম্ভলার।

মম্বা তখনও এ-বাড়িতে আসেনি। এ-বাড়ির কর্তাবাবু কান্দিয়ে যাবেন, তারই তোড়জোড় হচ্ছে। কে সঙ্গে যাবে, কে যাবে না। কী-কী যাবে, কখন যাবে, অনেক কড়াট। হু-বাস ধরে তার বিলি-বলোবৎ হলো। এ-সব অনেক দিন আগের কথা। তখন ছুধ নি-এর বয়স কম ছিল। কান্দাদাসবাবুর যৌন ছিল, মূত্রবিহার তখনও হুল পাশে। জগত্তারণবাবু তখনও অ্যাটর্নিশিপ পাশ করেনি। আর এখন তো দুলালহরিবাবুই নেই। একদিন হঠাৎ কর্তাবাবুর বাগানবাড়ির পুকুরে পাওয়া গেল দুলালহরিবাবুর বেহানা। কুল-কেশ তখন ঢোল হয়ে গেছে। দান-পুলি ব-হবার হলো। কর্তাবাবুর কাছে চিঠি গেল কান্দিয়ে। কিন্তু সে-চিঠির উত্তর আর এল না। মা-মনির তখন খুব অম্ব।

বাড়িতে বসে এসে গেছে কর্তাবাবু অস্থির হয়েছেন

কলকাতার আশবার জন্মে, কিন্তু মা-মণির জন্মে আশবার উপরে নেই। সবকিছু সরকার গেছে, বাস-বহুরা পীরক্ষা করে খান গেছে, কুজবালা গেছে। আর গেছে মনসা।

মনসাকে কে যেন এনে দিবেছিল এ-বাড়িতে। কতাবাণী কান্দিয়ায় যাবেন তাঁর করতে। তাই একটা লোক চাই বাস্তব-বাস্তব করতে। বাস্তবের মধ্যে হবে, বাস্তব-বুটবে বেশি, মনে কবাবি বলাই না।

মা-মণি আপ্যায়িতক দেখলেন। বললেন—তুমি কাক করতে পারবি?

—কাক না করলে থাকবে কি মা, বিধবা মা-মণিকে কে দিবে-বসিয়ে থাকবে।

—বলি বাস্তব-বাস্তব কাক করেছে কখনও?

—করবার তো দরকার হয়নি মা, এখন থেকে করবে।

কত আর বয়েল তখন। তেরো কি চোন্দ। ওই বয়েসেই কপাল পড়েছে। রূপ নয় তো, আগুন বললেই যেন ভাগো হয়।

মা-মণি বললেন—তোমার মারা হবে না বাপু আমার কাক। এত রূপ, সব ছাত্রপাঠ করে দিবি, এই পাঁচটা টাকা নিয়ে বিবাহ হও বাপু, অস্ত্র কার্য্যার থাকে—

মনসা মা-মণির পারের ওপর উণ্ডু হয়ে পড়েছিল। কালতে কালতে বলেছিল—মুখখানা আমার পুড়িয়ে তুমি কাপো করে হাও মা, তা-ও আমি সইতে পারবো, কিন্তু পেটের আগুন বড় জ্বালা মা—

—তাই যদি এত জ্বালা তো গলায় ঢুকতে পাত্তা না বাছা? গলায় তো জ্বলবে অভাব নেই!

—তাই-ই যদি পারবো তো তোমার পায়ে ধরছি কেন মা।

তখনকার তি ছিল কুজবালা। কুজ মারা গেছে পরে।

সে বলেছিল—কর্তাবাবুর সামনে বয়েসখনি হারান-জানি, সামনে যদি বয়েসে তো তোমার শিরদাঁড়া আঁত ভেঙে যাবে—

তা তাই-ই ঠিক হলো। কাক করবে মুখ হুঁজে। দিনরাত কাক করতে ব্যাকার হবে না, এমন দোকানই দরকার। কুজবালা বললে—বাক মা, কর্তাবাবুর সামনে গুঁকে আড়াল করে রাখবো আমি—

কুজবালার সবে একদিন মনসা করতাম কানপড় পরে ঘোমটা দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে উঠলো। আগে বাবে কি-কিউজিরা। চাকর-বাকররা। পরকার-গমজারা। জারা-বাসা ঠিক করে সব বকোবাক করে রাখবে আগে-ভাগে। তারপর কর্তা-গিন্নী যাবেন। তাঁদের বেন কোনও অসুবিধে না হয়।

শিশুর-মা এক-একদিন কথা তোলে। বলে—তুমি তো কান্দি দিয়েছিলে, না হিদি?

চাটে উঠেন হ্যাঁ-হ্যাঁ করে কথলা শোড়ে। সব কথার জবাব দেবার সময় থাকে না মনসার। সব কথা কানে নিতে নেই। কানে নিতে গেলে ভালো হুন দিতে চুলে বাবে, কানের ক্যান পাগলে হাত পুড়ে বাবে।

এখন বাজাকিছানার লোক বাবে। তিনজন বায় বোঝাকে বলে। শিশুর-মা তাদের পরিবেশন করে বটে, কিন্তু কোণার দেবে তো মনসা। তারপর খান-কলের লোক এসেছে হুঁজর, তাহা আজ এখানে থাকে। কল থেকে ম্যানেজারবাবু এসে বেলা বাবোটার ভাত চায়। মা-মণি, নৌ-মণির খাবার দিতে হবে পাঠিয়ে হুপুবেলার। হেরি হলে শিশুর মুখ-কামটা বেগে কে! তাবপর মনসাবে বেলা পুইয়ে যোগে বাবে কর্তাবাবু। তারপর যখন সকলের খেয়ে-খেয়ে কাককর সেরে চা-খাবার সময় হবে তখন ভাত নিয়ে বসবে মনসা।



DUTTA & PYNE BROTHERS.
Manufacturing Jewellers,
91/1, BOWBAZAR STREET, CALCUTTA-12

—তুমি তো কীভাবে কান্দ শব্দ করে দিয়েছ বিদ্বি, কান্নাবাস করেছ, বাবা বিশ্বনাথ দর্শন হয়ে গেছে, আমাদের শাপ আর কে পড়বে বলে!

—রোজ বিশ্বনাথ দর্শন করতে তো?

মদলা একবার উত্তর দেব না। বলে—হ্যাঁ রে, নকর যেতে এলো না আর?

শিশুর-বা বলে—ওমা, নকর থাকে কি গো, নকর বে বড়বাবু সঙ্গে বাগানবাড়িতে গেছে, সেখানে কালিখা-কোড়া থাকছে, অগভীরপাবু গেছে, নকর তোমার এই কুমড়োর ঘন্টা খেতে আসছে।

মদলা দুলিয়ে বেগেছিল একখালা ভাত। ছুটুকরো গোনা মাছ। একটু কুমড়োর ঘন্টা। গরম ভাত বাওয়া কপালে নেই। তবু বাপি কড়কড়ে ভাতটা উল্লনের পাশে বেধে দিলে তবু একটু গরম থাকে। নকরকে যেদিন ডেকে থেকে এনে মদার, রোগাকের গুণর উঁহু হয়ে বলে ভাতগুলো সোপানে খায়।

বলে—শিশুর-বা, ডালটা কে রেখেছে গো?

শিশুর-বা বলে—আর কে রাখবে, বামুনদিগি—

নকর বলে—কী ডালই রেখেছে মাইরি, একেবারে ছুঁ দিয়ে গাঁতার কাটতে ইচ্ছে করছে—

শিশুর-বা বলে—বা দিবেছি ওই দিয়ে যেতে হয় খাও, নয়তো উঠে বাও বাপু—

—কী বললে? নকর কথিয়ে ওঠে একবার।

শিশুর-বা আবার বলে—যেতে হয় খাও, নয়তো চলে যাও, হান্নাবাড়িতে এসে চোখ বাঁধবে নাকি?

নকর আরো বেগে ওঠে। বলে—ডেকে নিয়ে এসো তোমার বামুনদিকে, মাইনে-কাইনে বন বন্ধ করে দেব বড়বাবুকে বলে তখন পারে ধরতে আসবে এই পর্যায়—

শিশুর-বা কোমরে ঝাঁচলটা জড়িয়ে তেড়ে আসে। বলে—বামুনদি, খান্নাটা নিয়ে এসো তো, কীটের চোড়ার নুং ডোরে দিই—

—কী-ই-ই, ওত বড় কথা!

এঁটো হাতেই নকর ঠাঁড়িয়ে ওঠে। বলে—ভাত বিচ্ছে বলে মাথা কিলে নিয়েছে নাকি? মাছ কোথায় গুলি? ইয়ারকি পেয়েছ তোমরা? এসো, এগিয়ে এসো, ঘুবি ঘেরে বাবা কাটিয়ে দেব আজ, ঢেনো না আমাকে—

—জবেরে মিন্সের মরণ বশা হয়েছে—বলে শিশুর-বা খ্যাং-খ্যাংটাটা নিজেই নিয়ে এসেছে। নকরও তার চুলের মুঠি ধরে এক টান দিয়েছে।

শিশুর-বা তখন হাউ-মাই পরে পেঁপে উঠেছে—ওগো, মিন্সে আমাকে ঘেরে ফেললে গো—

শে চীৎকারে হান্নাবাড়িতে লোক জড়ো হয়ে গেছে। হান্নাবাড়ি থেকে বোঁড়ে এসেছে মুহুরিবাবু, বার-বাড়ি থেকে পেঁপে এসেছে কুলমনি, আতাবল-বাড়ি থেকে দাকতে দাকতে এসে হাজির গুলমোহর আলি। সিঁছু মোতলার বাতাকা থেকে কুঁচে পাড়ে বলে—কী হলো রে শিশুর-বা?

নকর তখনও চীৎকার করছে—আমি মাইকে বুন করে ফেলব আজ, বুন করেগা—জরুর বুন পরেশ!—

মুহুরিবাবু ভয় পেয়ে গেল। হরি-জমাদার ঠাঁড়িয়ে ছিল সামনে। বদলে—বা তো হরি, ছুঁষণ সিং-কে ডেকে নিয়ে আর তো—

সবাই বন উত্তেজনার চীৎকারে অস্তিত্ব, তখনও হান্না-বাড়ির ভেতরে মদলা কাঁই হয়ে ঠাঁড়িয়ে। বেন কোনও দিকে খোঁজ নেই তার।

নকর চীৎকার করছে—আও হামাদা সাব লড়েগা, কোন্ লড়েগা হামাদা সাব, আও,—তোমরা বামুন-দিকো বোলাও—বোলাও বামুন-দিকো, মাছ ছুঁবি করগা, আবার ইয়ারকি—

ততক্ষণে ছুঁষণ সিং এসে গেছে। এসেই নকরের গাড়ে এক লাঠি।

—এই উহু! নিকালো—

আর সঙ্গে সঙ্গে অসুত এক মস্তের মতো বেন কাজ হয়ে গেল। এক আঘাতেই নকর বেন পেঁচোর মতো হয়ে গেছে। একেবারে পেঁচোটি! আমত-আমত কহছে তখন। বললে—এই ভাখো ছুঁষণ সিং, ভাত-বোঁড় যেতা নেই বামুনদি, বড়বাবুকো বোল দেও—উঁস্কা নকরী বতমু কু দেও—

—আরে তুমি তো ইধার আও পরেলে—

নকরের গাড় ধরে ছুঁষণ সিং বার-বাড়ির উঠানে ছেড়ে দিলে। নকর অসহায়ের মতো চাইলে সকলের দিকে।

বললে—আমারই মোব বেগলে তুমি, আর আমাকে বে হাছ বেব না যেতে—

বলে সকলের মূখের দিকে সহায়হুতির জন্তে আবার চোরে দেখলে।

কিন্তু সবাই হাসছে তখন কাণে দেখে। মুহুরিবাবু বললে—মাছ কেন পেয়ে গুলি? কোন্ কামে তুমি আছো রে?

নকর বললে—কাজের কথা ছেড়ে দিন, তা বলে মুঠো যেতে দেবে না, আমি কেউ নই?

ওসমে'র আশিও হাসতে লাগলো। বললে—নব্বয় পাগলা হোঁ দিয়া—

হুঁরিবাবু বললে—তুমি কে হে তুমি ? কোন্ নবাবের সেওয়ান !

—জিসের সময় তাঁক্তি করবেন না, তাঁক্তি ভালো লাগছে না এখন—

—তা ভালো লাগবে কেন, বসে বসে বেতে ভালো লাগবে কেমন, কেমন ?

নব্বয় বলে—আমি বসে বসে খাই !

—বসে বসে খাও না তো, কী করো তুমি ! সাতদিন তো পড়ে পড়ে ঘুমোও !

নব্বয় বলে—তা কাজ দিন না আমাকে, কাজ না থাকলে কী করবো ? ঘুমোব না তো আপনাদের বাড়িতে হাত ধোবার ?

বলে কেন বহা হাসিকতা করেছে এখন জানে সকলের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো।

চুপ শিঃ ভেড়ে আসে আবার। বলে—কিন্ দিল্লাগি ?

—মেহো না কুসব শিঃ, শালা সাতদিন খাওয়া হোল না, পেট চোঁ-চোঁ করছে—ইয়ারকি আর ভাল্লাগে না—

কিন্ তারপরে এখন চুপটি করে ঘরের ভেতর গুয়ে থাকে, তখন কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে টের পায় না। ভেলাপোকা আর চারপোকাত ভ্রতি ঘরখানা। ঘুম ভেঙেই ঘেষে পাশে বেন একটা ভাতের বাসা। এক খালা ভাত বেন কে রেখে গেছে তার পাশে। বলেওনি কেউ, ডাকেওনি। টপ্পা করে উঠে পড়েছে নব্বয়। হাড়ও মিরেছে একটা।

বাইরের দিকে চেয়ে চোঁচালে—এই, কে রে ওখানে ?

কে বেন দাঙ্কিল উঠোন দিয়ে। তেমন খেয়াল করলে না। খেয়াল অবস্থা কেউ-ই করে না নব্বয়কে।

—কে যায় রে, কে ওদিকে যায় ?

ভাটটা কে দিরে গেল তার খোঁজ নেওয়ার সবকার ছিল। কিস্তি হুঁ হোক গে। টু টু করে ভাতগুলো খেয়ে নিয়ে আবার গুয়ে পড়লো নব্বয়। তারপর ঘুম আসতো, কিন্ পেটে কিধে থাকলে ভালো ঘুম আসে না বেন। গুয়ে গুয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বহন বহন হতো কোথাও গেলে হয়, তখনই আবার বহন হতো কোথাই বা যাবে। কোথাও গিয়েই বা কি হবে। খোঁপার কাছে একটা গেজি দিবেছিল, সেটা আনতে গেলে পরশা দিতে হবে। তার চেয়ে গুয়ে থাকাই ভালো। গুয়ে গুয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে বেগুয়াই ভালো।

আগে কিধে গেলে, রাগ হলে ওম্মি ঠে-ঠে করতে। এখন আর সে-সব করে না। আজকর দিন যায় না। ঘুমিয়েই কেটে বার বেশ। বার-বাড়ির উঠোনের এক কোণে মিখাচুটার পশ্চিম দিকে ছোট্ট একটা ঘর। ওরদেব এলে ওঠেনেই থাকেন। তা তাই-ই বা ক'দিন। বছরে একবার আসেন হয়ত। বে-ক'দিন থাকেন সে ক'দিন ঘর মোহা-মোছা হয়। খুশ-খুশে বেওয়া হয় ঘরে। পরিবার পরিষর থাকে সব। কিন্ তিনি চলে গেলেই আবার ভেলাপোকা আর উই-পোকায় ভাজ। ও-ঘরের দিকে কেউ আর হাড়াই না তখন। অন্ধকারে মোঁতার কালিহলের মধ্যে ওঠেনেই থাক থাকে নব্বয়। কেউ খোঁজ নেয় না, কেউ খবর নেয় না। শিকর-মা থাকে থাকে আসে। বলে—এই নব্বয়, খাবি নে ? খেতে বাসনি যে আজ ?

—না, খাবো না, বা।

শিকর-মা বলে—না খাবি তো বয়ে গেল তাহি, খাবি নে তো, পেটে পিল দিয়ে পড়ে থাক, মরুগে যা—আমার কী ?

—আমি মরবো, তোমার কী রে ? আমি মরবো এখানে, ডোর কী তুমি ?

রাখাবাড়িতে গিয়ে শিকর-মা বলে—এলো না বাবু, এলোনা তোমার নব্বয় !

বাসুনি বলে—হ্যাঁ রে, তা বলে ছেলেটা না খেয়ে থাকবে ? আর একবার ডাক না দিবে !

—আমি বাবু ডাকতে পারবো নি, তোমার খুশি হয় নিজে ডাকো দিবে—

এক-একদিন খবরটা য-মণির কাছেও যায়। বলে—হ্যাঁবে শিকু, রাখাবাড়িতে এত গোদমাগ কিদের রে ?

শিকু বলে—ওই নব্বয়, নব্বয় আবার ষে-টে বাসিয়েছে—

পুজোর সময় সবলের কাপড়-জামা হয়। কাপড়-জামা শু কুঁ-দিরাংসেই নয়, লকলেরই হয়। বাড়ির সুকুয়-বোলাটারও হয়। ও জগজগতবাবু, দুর্গতবাবু, হুলালহরিবাবুরও হয়। শু তাই নয় জগজগতবাবু, দুর্গতবাবু, হুলালহরিবাবুর ছেলে-বেরেহেও হয় সেই সঙ্গে সখ। জামা-জুতো-কাপড়, বোজা-গোজি সব। এ বেওয়াচ চলে আসছে সংসার সেনের আদল থেকে।

কিন্ হুঁং নব্বয়ের বেন খেয়াল হয়েছে।

জায়ে ন'ব'ং বলে গেছে বেউড়িতে। হরি-জম্মায়াস লাল গেজি পরেছে। চুপ শিঃ কাপড় হুদু দিবে হুপিবেছে। কী হলো ? পুজো এসে গেছে নাকি ?

বাজাক্সিানার গিয়ে বললে—বাজাক্সিাবাবু, পুজো এসে গেল, আমার কাপড়-জামা কই?

কালিদাসবাবু হাতা থেকে মূখ তুলে বললেন—তোরা কাপড়? কোথায় ছিপি ছুই?

—ও-সব শুনিছিনে, আমার কাপড় দিন, গেজি, পাঞ্জাবি, মূতো বোজা—সব দিতে হবে।

—ওরে বাছা, এ বে চোখ ঝাড়াই আবার, দেব না, না দিলে কী করবি ছুই তনি?

—সেবেন না যানে? আলবাৎ দিতে হবে, নইলে বড়বাবুকে বলে চাকরি খতম করে দেব সকলের।

বাঁগে লক্ষ-লক্ষ করতে লাগলো নবর।

মুহুরিবাবু বেবে শুনে এদিয়ে এস। বললে—কী বলছিল নবর ছুই? বলছিল কী?

—আজ্ঞে, যা বলছি ঠিক বলছি, সকলের পুজোর কাপড় হয়, আমার হয় না কেন শুনতে চাই।

কালিদাসবাবু বললেন—হবে না তোরা কাপড়, কী করবি ছুই করলে—

—কেন হবে না শুনি? আমি কি এ-বাড়ির কেউ নই?

কোথায় যে এত জোর পাৰ নবর কে জানে। কিসের যে এত জোর তাও জানেনা কেউ। এ-বাড়ির কেউ নয় সে, কোনও খুঁতে এ-বাড়ির সঙ্গে সে কোনওভাবে যুক্ত নয়। চাকর-কিসের মতো তার মাইনেও নেই, আবার আত্মীয়-বন্ধনবের মধ্যেও কেউ নয় সে। এ-বাড়ির কেউ জানে না, কী খুঁতে সে আছে এখানে, কিসের টানে, কাদের জোরে। তবু তার সব জিনিষে ভাগ চাই আর-সকলের সঙ্গে। ভাত বাবার সদর আর-সকলের মতো মাছ চাই, পুজোর সব কাপড়-জামাও চাই আর-সকলের মতো।

মুহুরিবাবু বললে—কোথায় ছিপি ছুই? তোরা তো বেখাই পাওয়া যায় না।

—খাতার বধন নাম আছে আমার তখন চুপি করেছ তোমরা, নির্ণাৎ চুপি করেছ।

—তবে রে, চোর বলা?

বাঁগে মুহুরিবাবু মুখি গাফিরে এদিয়ে যেতেই নবরও মুহুরিবাবুর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে।

—পালাবা চোর সব, আমার কাপড়-জামা চুপি করে আমার আমারই ওপর তুবি, বড়বাবুকে বলে সকলের চাকরি খেয়ে দেব না? আনাকে বেবেনা শাস্তা...

ঠিক সময়ে কালিদাসবাবু বেথতে শেরেছেন তাই, নইলে মুহুরিবাবুকে খেয়ে কেপতো বোথ হয় নবর।

কালিদাসবাবু চীৎকার করে উঠলেন—দুখণ সিং—দুখণ সিং—

দুখণ সিং দৌড়ে এসেই নবরকে ধরে ফেলেনে।

নবর বললে—ছাড়ো আমাকে সরোথান, ছাড়ো মাইরি, ছাড়ো বলছি, আমি বাচ্ছি বড়বাবুর কাছে! দেখাচ্ছি মজা—

দুখণ সিং বাচ্চা বেলে ফেলে বিলে নবরকে, নবর কিন্তু তাতেও থমকো না। গায়ের পুলা কেড়ে নিয়ে দৌড়লো। সেই ঘোড়ানো সিঁড়ি দিয়ে তবু তবু করে গিয়ে উঠলো একেবারে বড়বাবুর বার-বাড়ির ওরে। বেশির ভাগ দিন ওখানেই থাকেন বড়বাবু। জগত্তারণবাবু বেশী রাতে গেলে বড়বাবু আর তেতরে যেতে পারেন না। জগত্তারণবাবু যখন বড়বাবুর মাস্টারি করতেন, তখন থেকেই বড়বাবু ওই ঘরেই থাকেন।

নবর গিয়ে ডাকলো—বড়বাবু, বড়বাবু—আমি নবর—

এখন সময় অবস্র মূখ ভাঙে না। বড়বাবুর ঘুম ভাঙতে বন্ধ দেবি হয়। খাস-বরদার পাঁচু বেদা পশটা থেকেই কাঁড়িয়ে থাকে বিজ্ঞানার দিকে চেয়ে। ঘুম ভাঙলেই শিগারেরেট চিনটা কিছা বেতলটা এদিয়ে দিতে হবে। কখনও-কখনও বড়বাবুর তেতী গায়। খাস-বরদার ত-ও সব রেডি করে রাখে। আদের দিন অনেকখণ জগত্তারণবাবু গল্প করে গেছেন। বহুদিন আগে কর্তাবাবুর আমলে সেই যে জগত্তারণবাবু একদিন মাস্টারি হয়ে এলেন, তারপর লেখাপড়া বেশিখর হলো না, জগত্তারণবাবু অ্যাটর্নী হলেন, কর্তাবাবুও একদিন মারা গেলেন, বড়বাবুর বিয়ে হলো।

কর্তাবাবু গাড়িতে যেতে যেতে মাঝে-মধ্যে কখনও কখনও জিজ্ঞেস করতেন—খোকার কেমন লেখাপড়া হচ্ছে জগত্তারণবাবু?

জগত্তারণবাবু বলতেন—আজ্ঞে, বড়বাবুর ত্রেবটা ভালো, আমার চেয়েও ভালো। রেন, কিন্তু একটা দোষ, বাটতে চাইবে না মোটে—

কর্তাবাবু বলতেন—ও আমার হুভাব শেরেছে—

কান্টামায়ে বাবার আগে জগত্তারণবাবুর কোনও কাজ ছিল না। কর্তাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে দুবেতেন। কিন্তু ভিলে করে সংসার চলে না। তারপর কান্টা থেকে এসে বেবার দস্তক নিলেন, তার করেবছর পরেই ছেলের লেখাপড়ার ভারটা মিলেন জগত্তারণবাবুর ওপর। শোভপুত্র, বেশী বকা-বকা চলে না। সেই থেকেই জগত্তারণবাবু এসে পড়াবার সব গরু ঠাওরতেন।

—জানো বড়বাবু, আজকে এক মজেল কাং হলো।

ছেটিবেলা থেকে বড়বাবুকে মজেল কাং হবার পর শুনিবে এসেছেন জগন্নাথগবাবু। বড়বাবুর ধারণা হয়েছে মজেলকা কাং হবার জন্তেই দমায়। হুশো মলিকের ছেলে



কাতিক মলিকের থেকে শুরু করে কোনও মজেল আর কাং হতে বাকি হইল না কলকাতায়।

বড়বাবু বলেন—আমাদের ব্যাংক শিলের খবর কি গো মাস্টার?

জগন্নাথগবাবু বলেন—সে-ও এইবার কাং হবে বড়বাবু, আর হুতো দিন লুপ্ত করো না, তারও পাখা উঠেছে, খবর সেইছি আমি—

—আর সেই ব্যাড়া বিস্তার, সেই বে খুব কাগুনি করলে কদিন!

জগন্নাথগবাবু বলেন—আরে, সে কবে কাং হয়েছে, উড়তে-না-উড়তে কাং হয়েছে, তোমাকে তো বলেছি সে-খবর! মনে নেই তোমার?

তারপর দাবার আসে চুপি চুপি বলেন—টে'পির শরীফটা বড় খায়াশ, খবর পাওনি হুমি?

বড়বাবু বলে—শরীর খায়াশ? টে'পির? কই, শুনিতে তো?

—বোম্বের লক্ষার বলেন।

—কেন, লক্ষা কিসের?

জগন্নাথগবাবু বলেন—লক্ষা হবে না? কী বলা হুমি বড়বাবু, যেয়েমাল্লের লক্ষা হয় বৈকি! তোমারই থাকে, তোমারই পরছে, তোমার খেয়ে-পেরেই মাল্ল, কথার কথার আলাতন করতে লক্ষা হবে না! হাজার হোক যেয়েমাল্ল তো?

বড়বাবু বলেন—তাহলে কী করতে হবে মাস্টার?

জগন্নাথগবাবু বলেন—একবার যেতে হবে তোমার বড়বাবু, শরীর খায়াশ হোক আর ঘাই হোক, বাওয়া তোমার একবার উচিত—

বড়বাবু বলেন—স্টেটের অবস্থা তো তেমন ভালো নয় এখন—

—একবার শুু বাবে আর আসবে; স্টেটের ভালো-মন্দের সঙ্গে তার কী? হুমি তো থাকছো না পেদানে—!

আর অনেকদিন তো ভ-সব হু-উরনি, শেষে কি শুকাচাও হয়ে বাবে নাকি?

বড়বাবু বলেন—তা হলে নম্বরকে ডাকতে হবে—

—হ্যাঁ, নম্বরকে দিয়ে আমার আদিলে খবর চিহ্নো, আমি তৈরি হয়ে থাকবোখন।

এরকম মাঝে মাঝে ঠিক নিয়ম করে টে'পির শরীর খায়াশ হয়। স্টেটের অবস্থা খায়াশ বলে বড়বাবু একবার আপত্তিও করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরের দিন জগন্নাথগবাবুর কথার ডোরবেলাই নম্বরের ডাক পড়ে। কিন্তু দাবার সময় জগন্নাথগবাবু ভেতর-বাড়িতে গিয়ে মা-জননী'র পায়ে ধুলাও নেন।

বলেন—কই, মা-জননী কোথায়, পায়ের ধুলা একটু নিতাবে দে—

সেই ওপরে আজালে ঠাড়িছে থাকবেন মা-মদি। বাইরে যোমটা দিয়ে শিছুই বকলুয়ার কথা বলবে। বোকার কথা হবে।

শিছু বলবে—আমার এক ছেলে, আপনিই এককালে ওর মাস্টার ছিলেন, আপনিই ভগশা আমায়—

জগন্নাথগবাবু বলেন—শীতখানা তো আজও পড়ামাশ, চতুর্দশ অধ্যায়টা শেষ করে দিলাম, ভ-সব বদ চিন্তা-টিন্তা ব্যাত না-আসে আর কি। তবে একই সময় লাগবে, অনেক দিনের অব্যাস তো।—আপনি কেমন আছেন মা-জননী?

শিছু বলবে—আমার আর থাকা—

জগন্নাথগবাবু বলেন—আপনারা গুণ্যাত্মা লোক, আপনারা হুয় থাকলে পৃথিবীটা তবু একই হুয় থাকে, নইলে পাগ বে-যকম বাড়ছে—

তারপর সেই ক্রপার খাটি থেকে পায়ের ধুলা নিয়ে জিতে গুটে মাথায় ঠেকাবেন। এমনি প্রায়ই। এমনি বহদিন থেকেই চলছে। বাস-বদরার পাঁচ এসব জানে। দুম ডারবার সময় তাই পাঁচ দিগবোরেটর টিন, দেশলাই, হাবতীর জিনিশ নিয়ে পাশে ঠাড়িছে থাকে, কখন বড়বাবু উঠবে তার আশায়।

হঠাৎ বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ পেয়েই-পাঁচ দিয়ে যোয়ানো শিড়ির দরজা খোলে—কে রে?

—বড়বাবু কোথায়? আমি নম্বর।

পাঁচ বলে—নম্বর তা এখন কী? বড়বাবু তো তোকে ডাকেনি!

নম্বর বলে—বড়বাবু ডাকেনি তো কী হয়েছে, আমার কাজ আছে বড়বাবুর কাছে।

—কী কাজ?

নবম বললে—ভাপুতো পাঁচু, এই ভাপু. আমাকে যেহে একেবারে ভক্তা বানিয়ে দিয়েছে, রক্ত বেগোচ্ছে বেশছিল? পুজোর কাপড় সন্ধ্যাই শেষে, বাড়ির বি-চাকর দাসী-বানী কেউ ধাক্কা দেল না, ভই বোটা হারানজ্ঞানো মুহুরিবাবু আমার কাপড়টা ঘের...

—কে রে? কে ডুবানে?

গভীর গলার আওয়াজ শোনা গেল ভেতর থেকে। পাঁচু লাক্ষিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো।

—কে চোঁচাচ্ছে যে বাঁড়ের মতো? সন্ধ্যাবেলা নিলে ঘুমটা ভাঙিয়ে!

—আছে, ও নবম।

—ভুঁতো ঘেঁষে বের করে দে ওকে, বোটা বাঁড়ের মতো চোঁচাচ্ছে—

কালিদাসবাবু বলেন—কোথায় গেল যে নবমটা?

মুহুরিবাবু বলে—বড়বাবুর কাছে গেছলো, দিয়েছে বোটাতে দিই করে তাকিয়ে, এখন লক্ষ—

সত্যিই লক্ষ হয়ে যায় নবম। আবার এসে আছে আছে চোকে নিজের ঘরটাতে। পাশেই গুরুদেবের খালি তক্তাপাশটা। তার তলার নবমের বিছানাটা মোটানো থাকে। আবার সেইটে হুল গুণে গড়ে। হু হোক্ গে। না দিক কাপড়, না দিক জামা, না দিক খাছ—ঘুমিয়ে পড়লে আর কিছু মনে থাকবার কথা নয়। এ-বাড়ির বেখানে বা-কিছু হোক, তাতে কিছু এসে যায় না নবমের, নবম ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই এই এতগুলো বছর যদি কাটিয়ে দিয়ে থাকে তো আরও ক'টা বছর কাটিয়ে দিতে পারবে—

আজ কিন্তু খান-বরদার পাঁচুই দৌড়ে এসেছে। রোজকার মতো ঘুমিয়েই ছিল নবম।

—নবমবাবু, নবমবাবু!

নবম তড়াক করে লাক্ষিয়ে উঠেছে। বললে—কি রে পাঁচু? বড়বাবু ডেকেছে নাকি?

—ডেকেছে।

—কী বললে?

—বড়বাবু হুৎ থেকে উঠতেই সিগারেটের টিনটা এগিয়ে নিয়ে সামনে ধরেছি, বড়বাবু আড়মোড়া ভাঙতে-ভাঙতে বললেন—হ্যাঁ রে, নবম কোথায়, নবমকে যে আর দেখতে পাইনে, নবম কি ঘরে গেছে নাকি!

এর বেশি আর বলতে হয় না। এর বেশি আর বলার দরকার হয় না।

কথাটা শুনে নবমের এক গাল হাসি বেগোল।

বললে—স্বয়ং বা কানী—ব'লে বিছানাটা গুটিয়ে রেখে নবম এক পৌড়ে বাজাকিধানার সেল। কালিদাসবাবু তখন ঝাটা বেগলেন। মুহুরিবাবু হিলেবের খাতার মধ্যে চুবে আছেন।

নবম সোজা গিয়ে বললে—এই যে বাজাকিধানার, পাঁচটা টাকা ছাড়ুন তো, পাঁচটা টাকা—

কালিদাসবাবু কোণে গেলেন—আবার এসেছিল? সেদিন বড়বাবুর কাছে ভুঁতো খেয়েও জোর জ্ঞান হলো না রে?

মুহুরিবাবু বললে—বেতো এখান থেকে,—বেতো বলছি হারানজ্ঞানো!

নবম বললে—বাকি কথা বলোনা না বেশি, পাঁচটা টাকা ছাড়ুন, বড়বাবু ডেকেছে—সময় নেই আমার—

বড়বাবুর নাম শোনার পরই কালিদাসবাবুর মুখের চেহারাটা বের বললে গেল।

বললেন—বড়বাবু ডেকেছেন?

ভারপূর্ণ একটু ভেবে বললেন—মাসের শেষে এই অদমরে তোমার ডাকলে?

নবম বললে—বিন বিন, টাকা বিন মনাই, সময় নেই আমার, বড়বাবু আবার কোণে বাবে—

শুধু কালিদাসবাবুই নয়। সমস্ত বাড়িমানার চেহারাটাই বের ভারপূর্ণ একেবারে মনে বাবে। সারা বাড়িতে শব্দ রটে বাবে যে বড়বাবু নবমকে স্মরণ করছেন। ভারপূর্ণ সেই টাকা নিয়ে নবম যোগ্য বাড়ি বাবে। সেখানে থেকে কাচা জামা-কাপড় এনে চুল ঠাটবে। দাড়ি কামাবে। তখন আর চেনা যাবে না নবমকে। তখন আর নবম নয়, নবমবাবু। ভেতর-বাড়িতে মা-মনি পেজা-বাগাম বাটতে বলবে। পেজা-বাগাম বাটা হবে সকাল থেকে। মাছের



মুড়া আগবে। বাজার থেকে সেদিন নতুন করে বাজার আসবে। কৌ-মনি সেদিন নতুন করে স্থান করবে আবার। লাক্ষে গুজবে। বড়বাবুর দাড়ি কামাতে এসে অধর নানিত সেদিন মৌটা বকশিল পাবে।

দিক্ছু যদি জিজ্ঞেস করে—আজকে আবার পেঞ্চ-বাহাম
বাটো কেন মা-মনি ?

মা-মনি বলবেন—আজ যে খোকা নক্ষরকে ডেকেছে—
হাজাবাক্তিতে সেদিন হুদুদুল কাও রেখে থাকে।
হুদুদুল এমনভাবেই দেখেন বেয়ে থাকে সব সময়। ভাত
চড়াতে চড়াতে ডাল পুড়ে যায়, ডাল ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে
ভাত গলে যায়। কিন্তু সেদিন আর হুদুদুল থাকবে না
বামুনদির।

বলে—বাটনা কী হলো শিকুর-মা ?

শিকুর-মা'র সেদিন সন্ধ্যা-অক্ষর করতে-করতে পা হুটো
টানটান করে ওঠে। তারপর বড়বাবু করমণ আর
হুদুদুল ঠাণ্ডা হয়ে দালা বাড়ি ঢুকিয়ে দিতে হুততে থাকে।
নক্ষরের কী পুণ্ডে তখন! ভূষণ সিং যে ভূষণ সিং সে-ও
যেন তখন নবী'র করে কথা বলবে নক্ষরের সঙ্গে। নক্ষরকে
আর তেন-ও ব্যা না তখন। হুল ছোঁতে করলা জামা-
পাশ পরে নক্ষর হাজাবাক্তিতে গিয়ে ভাত চাইবে।
সেদিন আর মাছ নিয়ে গড়া বাথবে না শিকুর-মা'র সাথে।
শিকুর-মা'র যে অত তেজ, সেই শিকুর-মা'ই বার বার
জিজ্ঞেস করবে—আর হুটো ভাত দেব নাকি নক্ষরবাবু!

—না না।

বলতে গেলে নক্ষর সেদিন কিছুই থাকে না। ভাত
থবে পেট ভরিয়ে রাখিবার খিদেটা নষ্ট করবে না নক্ষর।
নক্ষর বলবে—এত মাছ বিশেষ কেন আজ আবার ?
আজ তো ও-বেলা মাগে থাকে।

এ-বাড়ির ইতিহাসে এরকম ঘটনা নতুনও নয়, আবার
নিজা-নৈমিত্তিকও নয়। বালের আর ক'টা দিন নক্ষরের
খোজ হাথবার প্রয়োজন মনে করে না কেউ, কিন্তু সেদিন
নক্ষরই বড়বাবুর ডান হাত সেদিন। কথায়
কথায় নানা কারণে বড়বাবু নক্ষরকে ডাকবেন। খাস-
বরদার পাঁচুকে সামনে পেয়েই থমকবেন।

বলবেন—নক্ষর কোথায় ? নক্ষরকে ডাকতে গলেছিদুন
না তোকে ?

—হুদুর, ডেকেছিদুন তো, আপনি তো বাস্টারবাবুর
সঙ্গে পায়ালেন।

—পাইলুন তো সারাদিনের মতো পাইলুন ? এলো
কিনা দেখি তো ?

আবার পৌড়তে হয় বার-বাড়িতে। নক্ষর এসে কিনা
খোজ নিতে হয়। নক্ষরের ঘরদানার কেউ তখন নেই।
বিদ্যানাটা গুলন্দোবের তক্তপাশের তলায় গুটোবো গুড়
আছে। কেউ নেই সেখানে। গুলন্দোবের আলি সেদিন

আবার পোশাক পরে ঠেঠি হয়ে নেবে। আবহুল আবার
অনেকদিন পরে গাড়ি কোড়ে। ঘোড়াটা আবার গাড়ি-
বাহাদার ঠাঁড়িয়ে পা ঠেকে। গুলন্দোবের আলি তখনও
গাড়ির মাথার ছিপ্পি নিয়ে বসে আছে। বড়বাবু এসে
উঠলেই ঠাঁড়িয়ে দেবে।

কিন্তু তখনও নক্ষরের দেখা নেই।

খাস-বরদার পাঁচু একবার খান্জাকিবান'র দিখে ঠিকি
মারে।

—কী রে ? কাকে খুঁজছিল ?

—নক্ষরকে দেখেছেন হুদুর ?

মুহুরিবাবু বলে—নক্ষর তো পাঁচটা টাকা নিয়ে পৌড়ল
খোপার বাড়ি। তারপর তো বেগলাম বাবু সেজে
কিটকটি হয়ে বেঘিরে গেল—

তারপর হাথোবানদের ঘরে।

—ভূষণ সিং, নক্ষর-বাবুকো দেখা ?

হাজাবাক্তিতে গিয়েও পোজ দেয় পাঁচু।

—হ্যাঁ গো শমীর মা, নক্ষর খেয়েছে আজ ? বামুনদিকে
জিজ্ঞেস করো তো ?

নক্ষর আজকে কান্নে ঠাকি দেবে না। আজকেই
তার আসল কাজ। অ্যাটর্নীবাবুকো কবলিটোলা থেকে
একবারে নিয়ে এসেছে। অপভ্রংশবাবু এসে সেলেন
টিক সময়ই।

মা-মনির ঘরের সামনে গিয়ে বড়বাবু ডাকলেন—মা!

বড়বাবুর আঙুলে অনেকগুলো আঙুলি নক্ষরকে
উঠলো। কোঠানো খুঁটির কোঠাটা লুটোছিল। খাস-
বরদার এসে তুলে ধরলে উঁচু করে। বড়বাবু হাতের
ছড়িটার ভর দিয়ে ঠাড়াগেলেন মা-মনির ঘরের সামনে।

দিক্ছুকে ডেকে খাস-বরদার বললেন—ওরে মা-মনির
ডেকে দে তো একবার—

মা-মনি বেঘিরে আসতেই বড়বাবু পায় মাথা ঠেকিয়ে
প্রণাম করলেন।

—বা, আসি তা হলে ?

মা-মনি বললেন—আবার বাজো খোকা ? এই সেদিন
অল্প খেয়ে উঠলে, এখনও শরীফটা সারেনি যে খোকা—
বড়বাবু বললেন—এই বাবো আর আসবো মা—

মা-মনি দিক্ছুকে জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁয়ে, পেছার
দরবতটা দিয়েছিল খোকা ?

বড়বাবু বললেন—গেয়েছি মা, সব গেয়েছি—

—দরবত মিথি হয়েছিল ?

এর পর ঝোঁ-মনি। গোমটা দিয়ে একতল ঠাঁড়িয়ে

ছিল সরজার আড়ালে। বড়বাবু ঘরে আগতেই বৌ-মনি বললে—এই শরীর খারাপ নিয়ে বাই-বা গেলে।

বড়বাবু বললেন—এই বাবা আর আসবো—

—এবার বেন আর তিন-চারদিন খেঁকোনা, তোমার শরীরের অবস্থা তো ভালো নয়।

এর পর মা-মনি জগন্নাথবাবুকে ডেকে পাঠাবেন।

জগন্নাথবাবু মিড়ি নিচের এসে ঠাঁড়মেই ওপর থেকে মা-মনির বকলুমার সিঁদ্ধ বলবে—সেখুন, আপনি উইলেন সঙ্গে, বেগবেন খোকা বেন অভ্যাচার না করে বেশি—

জগন্নাথবাবু হবারিতি বলবেন—সে কি কথা, আমি থাকতে বড়বাবুর কিছু অভ্যাচার হবে না, নেহাত বড়বাবু আবার ধরেছে তাই—নইসে—

তামর খাজাকিবাবু কাছ থেকে টাকাকড়ি নিয়ে বড়বাবু গাড়িতে উঠবেন। তার পর উঠবেন জগন্নাথবাবু, তারপর উঠবে নবর। গাড়ি ছেড়ে সেবে গুলমোহর আসি। আর জুখণ সিং বড়মড় লক করে গেট খুলে দেবে।

এমনি করেই প্রত্যেক বাদে একবার করে বড়বাবুর শরীর বাতাপ হয়। প্রত্যেক বাদে একবার করে ভোরবেলা নবরের ডাক পড়ে। এমনি করেই প্রত্যেক বাদে একবার খাজাকিবাবু থেকে করে খাজার টাকা বেহিরে যার নিঃশেষে। তারপর তিন রাত্রি কাটবার পর আবার বধন ফিরে আসেন বড়বাবু—তখন পকেটের টাকা সব খরচ হয়ে গেছে। বেনাও হয়ে গেছে প্রচুর।

বড়বাবু বাড়ি এসেই সাতায়ে মা-মনির সামনে পড়ে যান।

বলেন—মা, তোমার অধম সন্তানকে ক্ষমা করো মা—

মা-মনি বলেন—ওঠো ওঠো বাবা, এ কামিনে কী চেহারা হয়েছে—

—না, উঠবো না, ছুঁদি আগে বনো অধম সন্তানকে ক্ষমা করবে—

মা-মনি এক ধমক বেন বাস-বরমার পাঁচুকে। বলেন—হাঁ করে দেখছিস কী, ধরে তোলা, ধরে তুলে নিয়ে যা ঘরে—

প্রত্যেকবারই জগন্নাথবাবু আসেন। বলেন—মা, আসতে কি চার বড়বাবু, কী যে আটা, অনেক বাদে-করে তবে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি—

আবার নবরের গৌঁ দশ। আবার নবর গিরে ঢোকে তাম কোঁরবে। সেই তক্তপোশটার তলা থেকে আবার

ওটোনো সিঁহানটা টেনে নিয়ে চিংপাত হয়ে গুরে পড়ে। আবার কোথার তলিরে যার নবর। কেউ ববর রাখে না তার।

কিছু এবার এক পাও ঘটলে।

বিকেল নাগাদ বড়বাবুর গাড়ি বেহিরে গেল। তারপরই সব তৌঁ-তৌঁ। কারো আর কেনও কারো বন দেবার কথা নয়। সব এলিয়ে পড়ে। অন্ধরে বাইরে বেন একটা আলুসে-আলুসে তাব। হরি-জমাবার থেকে শুরু করে কুলমনি, সিঁদ্ধ, খাজাকিবাবু, দুহরিবাবু, শিত্ত-মা সবাই বেন একই ঢিলে বেশ। আর কী, বড়বাবু তো বাড়ি নেই। নবরকে নিয়ে বধন বেহিরেছেন বড়বাবু তখন তিন-চারদিনের ধাক্কা তো বটেই।

কিছু এবার এক পাও ঘটে গেল।

কাওটা ঘটলো বড় হঠাৎ।

রাতিবেলা বলা-কওয়া-নেই হঠাৎ গুরুপুত্র এসে হাজির। কাশীর দিগিরদাখর বাচপুত্রির ছেলে মা-মনির গুরুপুত্র। জুখণ গোটের পাশেই গুরে ছিল।

বললে—কোন স্থায় ?

—আমি, আমি রে, দরজা খোল।

গলা ওনেই জুখণ সিং খড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করে।

—বহুর, বড়বাবু নেই, বড়বাবু বাহার গিয়া।

দরজা খুলে গেল। জুখণ সিং ববর দিলে ডেতরে। পদমত্ত খেবে-খেয়ে শোবার বন্ধোবস্ত করছিল। সে গিরে খবর দিলে সিঁদ্ধমণিকে। সিঁদ্ধই ডেকে দিলে মা-মণিকে। মা-মনি তখনও সোননি। বললেন—হায়াবাক্তিত খবর যে, ঠাকুরমশাই এসেছেন—

ঠাকুরমশাই এমনিতে খবর না গিরে আসেন না। মা-মনি উঠে খানটা বললে নিলেন। সিঁদ্ধ থেকে পক্ষাটা টাকা বার করলেন। প্রশ্ন্য করে দক্ষিণা দিতে হবে। মিড়িতে আলো নিভে গিয়েছিল। আবার চারদিকে আলো আলো উঠলো। মা-মনি সিঁদ্ধকে বললেন—ঠাকুরমশাইকে সঙ্গে করে নিয়ে আর ওপর।

জলটোঁকি পাড়া ছিল। তার ওপর বেগবের আসন। আসনের ওপর পদ্মান কবে বসলেন গুরুপুত্র। মা-মনি প্রশ্ন্য করলেন গলবস্ত্র হয়ে। তারপর পায়ের কাছে দক্ষিণাটা রাখলেন। গুরুপুত্র বললেন—বড় বিব্রত হয়ে পড়েছি আমি—তাই অত দূর থেকে হুটে এলাম আপনাব কাছে—

—কী নিবেদন বহন।

ঠাঁহুরবাথি বললেন—আবার বাবা দেহত্যাগ করেছেন দজ্জারি—

মা-মনি ভবিত হলেন। বললেন—কবে? আমি তো ধরন শাইনি?

—বড় শীঘ্র ঘটে গেল, তাই আর সংবাদ দিতে পারিনি আপনাকে। কিন্তু আমি নিজেকে এখন আগলো ভবন পরে সংবাদ দেবার দরকার মনে করিনি—

মা-মনি বললেন—এই বিপদের সময় আপনি নিজে কষ্ট করে কেন এলেন?

—সেই বলতেই এসেছি। আপনার মনে আছে, কর্তাবাবু কান্দি গিয়েছিলেন আপনাকে নিয়ে, আপনার লাগ্ন অস্থ হয়েছিল দেখানে—প্রায় একবছর শাখাশায়ী হয়ে ছিলেন আপনি?

সে অনেকদিন আগের কথা। ওই মক্কাও গিয়েছিল সবে। তখন সিদ্ধমনি ছিল না। সুস্থবাল্য গিয়েছিল সবে। দশাধমদে ঘাটের ওপর বাড়ি কেনা হয়েছিল। শাঙ্গানা হয়েছিল বাড়ি। শাঙ্গানি গছার হাঙরা সেবন। আর সফল-সফল বিবন-ব-বর্ন। কিন্তু হঠাৎ মা-মনি অস্থ হয়ে পড়লেন। অস্থর মানে সে এক ভীষণ অস্থ। কর্তাবাবু নাকিলে পড়লেন। বিবেশে কোথার ডাক্তার, কোথার কবিরাজ কিছুই জানা নেই। ওকলেব কান্দিবাসী। তিনিই সব ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। কলকাতার টেলিগ্রাম চলে গেল। খাজকিবাবু টাকা নিয়ে নিজে চলে গেলেন। সে একদিন গেছে বাটে।

ওকপুত্র বললেন—বাবার কাছে তখনই, আপনার তখন জ্ঞান ছিল না—

—আমি যে বেঁচে উঠেছিলাম, সে তো কেবল ওকপুত্রেরই আশীর্বাদে—

ওকপুত্র বললেন—বুড়ার কয়েক ঘণ্টা আগে আমায় বাবা সমস্ত ঘটনা আমায় বলে গেছেন, আপনি যে জীবন কিংবে শেষেছেন সে বাবার আশীর্বাদে নয় মা, রান

আপনার মারক প্রেহ, নেহাত বুদ্ধপতির প্রভাবে সেদিন আপনার প্রাণহানি হয়নি, কিন্তু কেহু-মমলের প্রভাবে আপনার চরম ক্ষতি চরম স্বর্নদশ ঘটে গেছে—। সেই কারণেই বাবা সেই সময়ে আপনারের বিবনাথের চরমে নিয়ে বেতে অত পীড়াপীড়ি করেছিলেন—

—সেতো আমি জানি।

—না, সব আপনি জানেন না, কর্তাবাবু সব আপনাকে জানাননি, জানিয়েছিলেন বাবাকে, সেই কথা বলতেই আমি এসেছি আজ। কর্তাবাবু বলেছিলেন তাঁর বুদ্ধার বিশ বছর পরে আপনাকে জানানতে, আজ বিশ বছর পূর্ণ হয়েছে—

ঠাঁহুরবাথি সিদ্ধমনির দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—আগে আপনার দাগীকে চলে বেতে বলুন এখন থেকে—

রাত তখন এগারোটায় হতে পারে, বায়োটায় হতে পারে। অস্তমিন এ-সময়ে সব চূপচাপ হয়ে যায়।

সিদ্ধমনি কথটা শুনেই আড়ালে গিয়ে পাড়াল। মা-মনি না বুঝলে সিদ্ধ ও ঘুমোতে বেতে পারে না। সিদ্ধির পাশে পাড়ার দ্বিধাশক্তি একবার শাখা-বাটে উঠলো। বেচারীর চোখে আলো লেগে ঘুম আসছে না। ভেতরে অনেকক্ষণ ধরে কী বেন কথা হতে লাগলো। সমস্ত বাড়ি নিম্ন। বড়বাবুও নেই। থাকলে একই রাত হয়। তা যে বাধ-বরমারের কাছ। ভেতর-বাড়িতে তা নিয়ে কেউ জেগে থাকে না।

শিতর-মা দাওয়ার ওপরই ঘুমোচ্ছিল। অথোরে। রাত বোধহয় তখন অনেক হয়েছে। রাগাবাড়ির চারটে উত্তরই নিতে গিয়েছিল। একটার তখন আগুন দেওয়া হয়েছে আবার নতুন করে।

—ও শিতর-মা, শিতর-মা!

সারাধিন খেটেখুটে বদন-বদন ঘুমিয়েছে শিতর-মা। কোনও শাঙ্গ-শব্দ নেই। যেকোতে বাঙ্গলটা পেতে, সেই যে পড়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে মড়ার মতো কাৎ হয়ে গেছে।

এলফ্রিডের
অভিনবদর্শ
ও
আধুনিকতায়



প্যারীয়োহন দত্ত এডকো:
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
১৮৬, বঙ্কবাড়ার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

উছন-উছন সবই তো নিতে গিয়েছিল। গুপ্তপুত্রের আসার পথের পেয়ে আবার উছনে কতলা দিতে হয়েছে। শিশু-মা আঁচ দিয়ে ডাকতে গিয়েছিল হু-তু-পার। ঠুহুরমশাই-এর জন্তে চাল হাঁড়িতে চড়িয়ে দিতে হবে, তারপর তিনি নিজে নাথিয়ে যাবেন। শিতর-মা কির এসে বললে—একটু ধেরি হবে বাবুনদি—

—ওরে, আর একবার বাবা শিতর-মা!

আবার গেছে। আবার সেই একই উত্তর। শিড়ির বাইরে বসে বসে দিচ্ছি তুলছে। ভেতরে মা-মণির সঙ্গে কথা বলছেন তাঁর গুপ্তপুত্র।

একটা বেড়াল বৃষ্টি-এঁটো-কাঁটার সোতে টপ-টপনি গায়ে রাস্তাঘাড়ির ভেতরে ঢুকছিল, মশলা ভাড়িয়ে দিলে।

—বেরো, বেরো, হু-হু—

দিচ্ছননি হঠাৎ ফোড়তে ফোড়তে এল।

—বাবুনদি, মা-মণি ডাকছেন তোমায়।

আমাকে? মশলা বেনে কেনন আড়ট হয়ে উঠে দাঁড়াল।

—আমাকে? কেন রে?

মশলাও অবাক হয়ে গেল। তার তো জীণে কখনও ভেতর-বাড়িতে ডাক পড়েনি।

সেই-বে কতদিন আগে একদিন এ-বাড়িতে কানীধায়ে খাবার সময় মা-মণির সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিল অন্ধ-মহলে, সেই-ই প্রথম আর সেই-ই শেষ। তারপরে কানী থেকে এসে আর কখনও কারো মুখের দিকে চেয়ে দেখবার দরকার হয়নি। এই রাস্তাঘরের মধ্যেই তার সূর্যোদয় হয়েছে, সূর্যাস্তও হয়েছে। বর্ষা ঐশীত বসন্ত, বড়বহুর সময় পরিচয় নিঃশেষ হয়ে ফুরিয়ে গিয়েছে কবে তার ঠিক নেই। কারোই ঠিক নেই, সবাই এসে ঠিক সময় ভাত পায়, ডাল পায়, কোল পায়—তারপর কখনো চলেও যায়। এর বেশি কোনদিন তার কথা কেউ জিজ্ঞেস করেনি। উত্তরও কেউ পাঠনি।

আজকে এতদিন পরে তার উত্তর দেবার ডাক পড়লো বৃষ্টি!

রাস্তাঘাড়ির বাইরে যেতে গিয়ে মশলার পা বেনে বার বার বেধে বেটে লাগলো। অভ্যাস নেই এদিকে আসা। রায়ে গথটা বেনে আরো উঁচু-নিচু।

—আমাকে কেন ডাকছে যে দিচ্ছ, জানিন্ কিছু হুই?

ভাগ্যের পথ বোঝায় এখনি ফুটল। মশলার ভাগ্য কবে কোন্ বিঘাতাপুরুষ গড়েছিল কে জানেন। কানীধায়ে খাবার সময়ও ঠিক বৃকটা এখনি দ্রুত করে কেনে

উঠেছিল। সেদিনও বাতের একটা বেলে চড়ে যেতে হয়েছিল তাদের। আগের বাড়িতে যেটা-লটবহরের সঙ্গে গিয়েছিল সরকুর-মশাই আর বেতেরে বাড়িতে কুজবালা আর মশলা। কুজবালা পান কিনে পেয়েছিল ইষ্টানন থেকে। মশলাকেও একটা দিতে চেয়েছিল।

—পান খান না ছুই মশলা?

মশলা বলছিল—সোয়ানী খাবার পর আর পান পাইনে দিদি।

তার ওপর ইষ্টাননের পান। পত সোকেব চোঁতা-জ্ঞান। কে কোন্ জাতের লোক কে জানে? সেই ট্রেন কানী পৌছোতেই পাণ্ডুর লোক এসে তুলে নিয়ে গিয়েছিল কর্তাবাহুর নতুন-কেন্নী বাড়িতে। কেনন ভয়-ভয় করতো মশলার। একোন্ দেশ, কত বড় গঙ্গা। কোবার ছিল এক অজ্ঞ পাড়ারগয়ের বাহুব, কেনন রেলগাড়ি চড়ে কত পুর বাবা বিশ্বনাথের চরণে এসে এক দণ্ড পৌঁছে গেল।

কুজবালা দেখান ছিল বুং।

বনতো—লম্বা করে ঘোমটা বে মশলা, যেটা-ছেলে আসছে—

লম্বা ঘোমটাই ছিল মশলার। সেটা আরো লম্বা করে দিত। কর্তাবাহু আর মা-মণি খাবার পর সেই বে রাস্তাঘরে চুকলো সে, আর বার হতে পারেনি সেখান থেকে। দিন-রাত রাস্তা করা আর দরকার-না-থাকলে রাস্তাঘরের সামনে বসে থাক। কুজবালাই ছিল সব। কুজবালাই রাস্তাঘরে এসে খাবার নিয়ে যেত, পরিবেশন করতো। কর্তাবাহুর যে কেনন চেহারা তা পর্বন্ত কোনওদিন দেখেনি মশলা। কানেই ওনতো কিছু কিছু। কর্তাবাহু যেতেন বেড়াতে, লম্বা যেতেন মা-মণি। কুজবালাও এক-একদিন লম্বা যেত।

কিন্তু একদিন হঠাৎ অসুস্থ পড়লো মা-মণি।

তারপর ডাক্তার-কবিরাজ ওষু-বিষু—কিছু আর বাকি রইল না। কলকাতার বাড়ি থেকে লোকজন গেল সব। হুং থেকে শুণ্ড ওষুদের গন্ধ আর লোকজনের আসা-যাওয়ার শব্দ কানে আসতো। শেহকালে অসুস্থ বৃষ্টি বিকাবে দাঁড়ালো। তখন আত্ম-বার কাল-বার অবস্থা।

সেই সময়েরই কাণ্ডা ঘটলো।

ঠুহুরমশাই বললেন—কাণ্ডা সেই সময়েরই ঘটলো—

মা-মণি তখন দিনের পর দিন অজ্ঞান অচেতন।

ডাক্তার কবিরাজ আসছে—

কুজবালা একদিন এসে বললে—মা-মণি আর বাঁচবে না রে, কবিরাজ মশাই বলে গেছে—

মা-মনি মাতা গেলে কী হবে? চাকরিটা চলে যাবে। রাজ্যত্বের অধিকারে বসে কেবল সেই কথাটাই মনে হয়েছিল সেদিন। গম্বাও দেখা হতো না, বাবা বিশ্বনাথ দর্শনও হতো না। কেবল মারা আর মারা। কোথা দিয়ে দিন কাটতো রাত কাটতো বোকা যেত না। রাহি-তোর গম্ব জল করতে হতো কোনও কোনও দিন, গম্ব জলের ঝেঁক দিতে হতো মা-মনিকে। কৃষ্ণালা বলতো বুকে দিড়ে বাঁধা না কি চুইকট করতে মা-মনি।

একদিন বোধহয় জুপুরবেলাই হবে।

—কে ওখানে?

ডারি গম্বার আঙুলে ভেদ শেষে ঘোমটাটা আরো তেনে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল মমলা। দেখতে কিছুই পায়নি। কে কথাটা বললে, আর গলা তাক-ও বুঝতে পারেনি। ডেবেছিল ওরা চলে গেলেই আড়ালে চলে যাবে।

আর একজন বুঝি কাকে জিজ্ঞেস করলে—আমি তো চিনি, ও কে গো?

ঘরঘর করে কঁপে উঠেছিল সমস্ত শরীরটা। তারপর মনে হয়েছিল যেন ডারি হুম্ব একটা পাখর বুক থেকে আছে আছে নেনে গেল।

কৃষ্ণালা ভাড়াভাড়ি রাজ্যঘরে এসে হাজির। বসলে—হ্যাঁ মা, কী করেছিল, সর্বনাশ বাহিরে বয়েছিল?

—কেন?

—কর্তাবাবু সামনে পড়ে গিয়েছিল একবারে?

কর্তাবাবু। কর্তাবাবুর গলা তাবে ওই রকম। গলাটাই শু শু শুনেছে, আর কিছু চোখেও পড়েনি, কানেও বায়নি।

মনে হলো। এখন গিরে গম্বার ষাঁপ দিয়ে লাজ-সম্মান সব যেন ছুঁয়ে নিশ্চিন্ত হয়। এমন সর্বনাশেও মায়াব পড়ে। কর্তাবাবুর জুপুরবেলা ওরিকে বাওয়ার কথা তো নব। সাধারণত খেয়ে-মেরে তিনি জুপুরবেলা ঘুঝাতেন একটু। সেই ঘুঝের সময়টার সময় বাড়ি ঝিমঝিম করতো। গম্বার হাওয়া এসে মাঝে মাঝে কাপটা দিতে জাননা-দরজার। তখন কৃষ্ণালাও কাছে থাকতো না, কেউ-ই কাছে থাকতো না। সবত একতলাটা খাঁ-খাঁ করতো। একটা হিম্মহানী সকালে বিকেলে বাগন-কোশন ঝেঁক দিয়ে চলে যেত। তারপর সব অন্ধকার, সব কাপসা। একতলার সমস্ত আবহাওয়াটা একটা গুমোট পরবে বেন লজোপড়ে হয়ে পড়ে থাকতো চারপাশে। ভিত্তে কাপড় টাটানো থাকতো গলিটাতে। সেই ভিত্তে কাপড় এতটুকু

নড়তো না। এতটুকু হেলতে-মুলতে না। একটা টিকটিকি সারাদিন সারারাত মাঝার গুপের ঘোমাল থেকে দেখালে চরে বেড়াতো, নড়ে বেড়াতো—আর মাঝে মাঝে হুপ করে চেয়ে থাকতো নিচের দিকে কিছু। মমলায় দিকে। সব কাজ শেষ করে মমলায়ও যেমন কোনও কাজ থাকতো না, টিকটিকিটারও বুঝি কাজ থাকতো না কিছু। হু'জনে হু'জনের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতো। তারপর বিকেল হতো, কলে জল আসতো, রান্না চাশাতো উঠত। কর্তাবাবু গুপের থাকতেন। তাঁর জুতার আঙুল, কাশির আঙুল পাওতা বেত, তামাকের খোঁয়ার গম্বও নাচে এসে লাগতো। কিন্তু আর চোখে কখনও পড়েনি তিনি।

বিকেলবেলা বেলহুলওয়া আসতো। এসে হাঁকতো দরজার বাইরে—বেল-হুলওয়া—

হাঁক শুনে পীরজাদাই গিরে কর্তাবাবুর জন্তে ফুলের বগান নিয়ে আসতো। ফুলের বগানও যেমন ছিল, রাত্তির বগানও তেমনই ছিল। আর ছিল সিঁড়ির বগান। সিঁড়ি-বগনওয়ালা রোজ আসতো রাত বশটার সময়। সে-ও দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁকতো—বহোব—

আর তারপর ছিল গান। গানের কথা বোকা যেত না। হিম্মহানী মায়া কী যে গান গাইত, কোথায় বলে যে গাইত, তাও জানতো না মমলা। অর করে বল বেঁধে গান তাড়ের। সেই সকালবেলাই তাদের গান শুক হতো। কৃষ্ণালা বলতো—আটা শিবতে শিবতে ওয়া গান গায়—

আর ছিল দম্বার দিকে বাড়ীর ভিত্তি। সকালে বিকেলে গেছনের গলি দিয়ে কত লোক বে বেত। তোর-বেলাই আরম্ভ হতো। তখন রাত বেশ। রাত থাকতে-থাকতে গান গেয়ে-গেয়ে চলেতো সব—অনেক লোকের পায়ের শব্দ শোনা যেত ভেতর থেকে। আর মাঝে-মাঝে হাঁকতো—জর বাবা বিশ্বনাথ—জর বাবা বিশ্বনাথ।—

একদিন কৃষ্ণালাকে জিজ্ঞেস করেছিল—এতদিন কানীতে এলুম, একদিন বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করতে পারবো না দিদি?

কৃষ্ণালা বলেছিল—কানী তো পাগিয়ে আছে না তোরা—বাবো একদিন তোকে নিয়ে—

এখন এখন কর্তাবাবু বেশ কষ্টাছিলেন। রোজ রোজ নৌকোর বেড়াতে।

কর্তাবাবু বলেছিলেন—কানীতে এলাম, কানীর সানাই শুনাশ না—

সানাই-এর ব্যবস্থা হয়েছিল দু-একবার। তা সানাই কী রকম বোঝেছিল তা টের পাতনি মকলা। শুধু পাবার-চাবার তৈরি করে দিতে হয়েছিল মকলাকে।

কুজবালা বলছিল—নৌকোর ওপর সানাই বাজবে, সে আর কী গুনবি তুই?

কোথা থেকে সেদিন কত কে এল গেল তা জানা যায়নি। কর্তাবাবু আর মা-মনি। মা-মনিও গিয়েছিল। কুজবালা সাতদিন ধরে পান সঙ্গে সঙ্গে ডিবে ভর্তি করেছিল। সাত দের ময়দার লুচি ভেজেছিল একলা মকলা। লুচি আর আপুতাজা। সঙ্গে রাবড়ি আছে, মালাই আছে। আরো কী কী সব মিষ্টি খাবার পোকান থেকে ক্রমশঃ দিয়ে এনেছিল। সবাই রান কিরে এসেছিল তখন রাত অনেক। একলা বাড়িতে থাকতে ভয় করেছিল বুঝি।

শিতর-মা তাই মাকে মাকে জিজ্ঞেস করতো—তা একবছর ছিলে কানীতে বামুনদি, আর বাবা বিশ্বনাথের চরণ-দর্শন হলো না—?

ওদিকে লাউঘট রাসা হচ্ছে একটা উল্লে, এবিবে একটাতে ডাল আর একটাতে বড়বাবুর মাছের কাল।

—বড়বাবু আর দুটো আপুতাজা চাইছে বামুনদি—

—চাল-কলের ম্যানেজারবাবু আজ খাবেনা শিতর-মা, গেটের অস্থর হয়েছে।

—কী গো, ডাল হয়েছে? সকাল-সকাল খাবে আজকে নৌ-মনি।

একটা ডাল সামলাতে সামলাতে আরো দশটা ডাল এসে বাড়ি চোপে বেশে। একটা উল্লে সামলাতে গিয়ে আর একটা উল্লে রাসা পুড়ে যায়।

শিতর-মা'র এক-একটা ক্রমশঃ খটায় খটায় এক এক রকম।

—কালকে বজ্র কাল হয়েছিল ডালে, আজকে লজ্জা বিরোদ্ধ বামুনদি।

ভেতর-বাড়ি থেকে আবার হঠাৎ তবুনি ক্রমশঃ হয়—ডালে কাল খাল হয়নি কেন গো, বামুনদি কি লজ্জা দিতে ভুল গেছে?

—ভালো এত কাল কেন থাকে গো?

—কে তরকারি ফুটেছে গুনি আজ, আপুর খোদা ছাড়ানি।

আজ ফুটি বছর আগের সে-সব গিনের কথা ভাবতে বেশ ক্রমশঃ লাগে! সেই নৌকোর চক্রে খেড়তে পেল বাবুবা। কর্তাবাবু গেলেন, মা-মনি গেলেন। সানাই-ওগালাসা



গেল। মা-মনি গাড়িতে গিয়ে নৌকোর উঠলেন। ময়দা ভোজনা-দর-ওগালা: নৌকো। কুজবালা সঙ্গে ছিল। কুজবালার সঙ্গে পানের ডিবে ছিল। মা-মনি পান খেতে লাগলেন। নৌকো ছাড়া হলো। সেই ময়দাখার নৌকো ভাসতে-ভাসতে চললো। সানাই শুরু হয়েছে নৌকোর মাথার। কর্তাবাবু নৌকোর মাথার বসে তামাক খেতে খেতে সানাই গুনছেন। নৌকোও ভেসে চলেছে। স্রোতের মুখে নৌকো ভেসে চলেছে। একটা'র পর একটা রাগ বাজানো হচ্ছে। বেহাগটা একবার গুনলেন, পুরিয়া হু'বার, কিন্তু দরবারী কানোড়াটা বার বার—

কর্তাবাবু বললেন—বাজাও লাগাও—তিন বাজাও—

যন্ত্রের ভালে লেগেছে। সঙ্গে লুচি আছে, রাবড়ি আছে, মিষ্টি খাবার আছে। সবাই খেলে, খেয়ে-খেয়ে আবার বাজনা চলতে লাগলো। মা-মনি অত বাজনা-চাষনা হু-হু বোঝেন না।

বললেন—বেশ বাজাচ্ছে মা রে কুজবালা—

কুজবালা বললেন—খুব ভালো লাগছে মা-মনি আমার—মা-মাণ বললেন—তিনশো টাকা নগদ নিয়েছে, ভালো বাজাবে না? কর্তাবাবু বাচাই করে নিয়েছে বে—

রাত বোধ হয় তখন নটা। বেশ ছিল। কর্তাবাবুও বেশ খোশ-মেজাজে বাজনা গুনছিলেন—হঠাৎ বেধ করে এলো দক্ষিণ দিকে। দেখতে দেখতে বেধ ছড়িয়ে পড়লো

আকাশে। হুঁফোটা জল পড়ল; কর্তাব্যবহারে গারে।
তখন হ'ল হলো। চমকে উঠলেন তিনি। উঠে
পড়লেন। সানাইও বাজলো। ছাতি-টানি কিছু নেই।

বললেন—চাটে ছিটোও নৌকো—

নৌকো ঘাটের দিকে ছিটতে লাগলো। কিন্তু তখন
মূলধারের বৃষ্টি নেমেছে।

অন্যদের বৃষ্টি, কিন্তু তা বলে একটুতে বাজলো না।
একবারে হুসুল জোরে বাজলো। নৌকো তখন হঠাৎ
ঘাট থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। ছাত হুটো ছিল
নৌকোর। হুটো গিরে জল পড়তে লাগলো। মা-মনি
তব পড়ে গেলেন। নৌকো না উঠে বার। শেষ পর্যন্ত
নৌকো অবশ্য উঠেছিল। কিন্তু সে-বৃষ্টি আর বাজলো না
শে বার। সমস্ত জাম-কাপড় ডিকে অবস্থার কর্তাব্যব
হার মা-মনি ঘরন বাড়ি এলেন তখন অনেক রাত।

দলর দরজার কড়া/কড়া নড়ে উঠলো।

কর্তাব্যব বললেন—ভেতরে কে আছে কে ?

সংসারব্যব বললেন—বললো—

—মদলা কে ?

—চল, আঘাতের রাগের কাজের লোক।

দরজাটা খুলে দিচ্ছে মদলা আড়ালে সরে গিয়েছিল।

কুজালা তাকাতাকি ভেতরে চুকে হারিকেন নিয়ে এসে
সাধন ধরলো।

কিন্তু মা-মনির নরীরে তখনই কাগন ধরেছে। সেই
অত রাতে আবার জল গরম হয়। তেল গরম হয়। পাবে
দরম তেল দৈক দিয়ে মা-মনি গুবে পড়লেন। কিন্তু
পরদিন আর এসো। প্রবল আর। আরের ঠোঁকে মা-মনি
প্রদাপ বকতে শুরু করলেন।

গুরুদেব সকালবেলাই এলেন। বললেন—ডাক্তার
আছে এখানে, কিন্তু কবিরাজ ডাকাই ভালো, আমি ভালো
কবিরাজ পাঠিয়ে দেব—

হুঁড়ি বছর আগের ঘটনা। তখনও ভই দমক গ্রহণ
হয়নি। মা-মনির সব মনে আছে। মনে আছে তিনি
মাসের পর মাস তরে বাকতেন সেই বিদেশে।
সাম্প্রতিক ব্যাধি। নড়াচড়া নিষেধ। খালি কলকাতা
থেকে লোক দার আর আগে। কর্তাব্যব কানী ছেড়ে
নড়তে পারেন না।

গুরুদেব বললেন—আপনি তখন সেই রোগশয্যা,
সেই অবস্থাতেই ওই ঘটনাটা ঘটলো—

—কোন ঘটনা ?

গুরুদেব বললেন—বলছি,—এ-সব কথা বাবা হুঁড়ি
আগে সব আশায়ে বলে গেছেন—

নেহাত দৈব। দৈব-দুর্ভটনা বলা যায়। প্রথম প্রথম
কর্তাব্যব মা-মনির বিছানা ছেড়ে উঠতেন না। শেষে রোগ
পুরোনো হলো। কিন্তু দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই
অচৈতন্য অবস্থার কাটতো। ক্রমে ক্রমে কর্তাব্যব আবার
নিজের বদলার ঘরে এসে বসতে শুরু করলেন। ওপর
থেকে সামনের গকা দেখা যায়। সেই গরার ওপর
নৌকোগুলো ভেসে যায় দৃষ্টি দিকে। মাঝে মাঝে ওপ
টানতে টানতে দার বাহনগরের কোল ঘেঁষে। তারপর
কলকাতার চিঠি হুঁএকটা পড়তে লাগলেন। এতদিন
হাত ধেমনি কোনও কাজে। এবার কলকাতা বলতে
লাগলেন, খাওয়া-পাওয়ার কুচি এল। একদিন বললেন—
পীরজাদা, আজকে একটু সিঁচি বাটতে বল ওদের—

বহদিন ও-বল চলেনি। কলকাতা ছাড়ার পর বরাবর
মা-মনিই সাহেল-সাহল নিয়ে চলেছেন। এখন কেন কেন
ডাক টাকা লাগলো।

একদিন বললেন—সিঁচিটা বড় পাতলা করে ফেলে
কেন—রাখড়ি কম দিয়ে একটু মদলা বেশি দিতে
পারে না—

বেশি মদলাই পেওনা হলো। মা-মনি তখনও
অচৈতন্য।

বাবা বিশ্বনাথের মাধ্যম তখন গুলে গুলে বিপন্ন
চড়ানো হজ্জ। প্রথমে কম-কম। পাঠাংকুয় যোজ
এসে প্রশাসী নিয়ে বার। তারপর একশো আটে উঠলো।
তারপর হুঁশা বোল। হোব চললো চম্পি প্রহর ধরে।
বাতোজন পাঠাংকুয় হোমের ওদারক করতে লাগলো।
ব্রাহ্মণ-ডোজন হলো তিনশো আটচল্লিশ জনের।

কর্তাব্যব বললেন—এবার সিঁচিতে নির্ধাৎ ডোজন
যেনাচ্ছে কেউ, সে 'ডার' নেই কেন রে ?

হায়ায় কুল ধরেন। বলেন—কালিমাতে গরম-মদলা
যেহনি কেন রে ? কে রে'খেছে ?

কুজালা খাওয়ার পালে আড়ালে ঠাঁড়িয়ে ছিল।
বললো—একটু কম দিয়েছে হয়তো।

কর্তাব্যব খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লেন। বললেন—
এ রাহা খাওয়া বার না—

হাত হুঁতে হুঁতে বললেন—হায়া করে কে আজকাল ?
—মদলা।

কর্তাব্যব বরাবরের অভ্যাস খাওয়ার পরে একটু তরে
ঘুমোনো। পার চিন্তে চিন্তে তামাক খেতে খেতে একটু

দুঃখোতেন। তখন পাখা খুঁবে মাথার ওপর। কান্দির বাড়িতে তখন ইলেকট্রিক হয়নি। পাখা হাতে নিয়ে কর্তাবাবুর খাস-বরদার পীরজালা পাশে দাঁড়িয়ে হাঙরা করতো। তারপর খুব ভাতবাবর সঙ্গে সঙ্গে তামাক চাই। তখন কবিগন্ধ মশাই এলে ভেতরে আসতেন।

কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কেমন দেখলেন?

কবিগন্ধ বললেন—সাম্প্রতিক ব্যাপি, একটু সময় নেবে, সমস্ত বুকটায় কফ বাসা বেঁধেছে—

একদিন হুপুববেলা খুব থেকে কর্তাবাবু উঠলেন।

বললেন—আগে পরবতটা দে—

তামাকও তৈরি ছিল, পরবতও তৈরি ছিল। খাস-বরদার পরবত দিলে।

পরবত খেয়ে বললেন—ভুট এখন যা—

খাস-বরদার চলে গেল। খাস-বরদার এমন ছুটি কোনবিন পায় না। কিছু কাক বা থাকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কর্তাবাবু নিচে নামলেন। খাস-বরদারও পেছন পেছন এলো। আড়ালে আড়ালে পেছনে আসতে লাগলো। মাক-হুপূর, বাইরে ঐ বা করছে বোদ। মাথা কান্দি শব্দটা বুকি কিবোচ্ছে। গন্ধার ধলে বোদ সেসে সিঁচলে হাচ্ছে বার বার। কিছু ভেতরটা ঠাণ্ডা। বোটা বোটা বেয়াল। ঠাণ্ডাসেই। সোলা-সোলা গন্ধ। জ্যাপসা ডাব।

মা-মণিকে বেদানার বস বাইরে পাশে কুজবালাও একটু বিধিয়ে পড়েছে তখন।

কলখরের ভেতরে ঢুকে মাখাটার বেশ ভালো করে জল দিলেন। ঠাণ্ডা হলো মাখাটা। কেন যে এরকম হলো কে জানে। ঠাণ্ডা জল চাইলে পীরজালা এনে দিত হাতের কাছে। সিঁচিটার বোধহয় বেশি মশলা দেওয়া হয়েছিল। উঠে কলতলা থেকে বেরিয়ে আবার সিঁচি দিয়ে উঠতে বাচ্ছেন। হঠাৎ দেখলেন হাওয়াঘরের সামনে ঠাণ্ডা বেতের ওপর ঝাটলটা বিছিয়ে কে বেন শুয়ে আছে। শুয়ে আছে তো শুয়েই থাক। অতদিন হলে এমন ঘটনা দেখেও বেগতেন না। পুতুলমাথার কথা মনে পড়লো। কিন্তু হঠাৎ নম্বরে পড়লো গায়ের সোচ্চটা। হুশারের কলসা হুশুই গোছ। নেশাটা বোধহয় একটু মাঝা ছাড়িয়েছিল। অভ্যাসমতো বলে ফেললেন—কে?

পীরজালা সামনে এসিয়ে এল। বললে—হজুর, ধরবে আপনারা?

কর্তাবাবু ধমকে উঠলেন। বললেন—ও কে?

বতমত খেয়ে পীরজালা বললে—হজুর, ঈশলা।

সেই টেগোমতিতেই ততক্ষণে খুব ভেত্রে গেছে মশলার। ভাড়াভাড়ি কাপড়টা গুছিয়ে নিতে গিয়ে এবানকার কাপড় গুণাবো সবে গেল, গুণাবানকার কাপড় এখানে দূরে এল। সে এক লম্বাকর ব্যাপার! কাপড় টিক করে উঠে গাধা ঘরের ভেতর ঢুকে হুটীহাতে বুকটা চেপে ধরলো। বুকটা তখন ধড়াল ধড়াল করছে।

এসব অনেক বছর আগেকার কথা। তারপর অনেক জল অনেক জল গড়িয়ে নিয়ে গেছে। অনেক সময়ের শগ কালের নিঃশব্দে মুছে গেছে, আবার অনেক শগ নতুন শব্দও লেগেছে সময়ের বুকে। সব মনে নেই, সব মনে ছিলও না। আর একটা বছর বেন খুঁদিকড়ের মতো সমস্ত ওলেট-পালাট করে দিয়েছিল। দিয়েছিলেন এক মাসের জাজে, কিন্তু হয়ে গেল এক বছর। এক বছর পরে ফিরে এলো সবাই। এল সমস্ত বেওয়া হলো। সেই সমস্ত পুত্রের বিবাহও দেওয়া হলো। কিন্তু মশলা সেই যে এসেছিল কান্দি থেকে আর যায়নি। কুজবালা একদিন মারা গেল। কুজবালার বুড়ি-মশাই বঁধিতো। মেয়ে মারা বাবার পর বুড়ি আর থাকলো না। মশলা রাগাংরে ঢুকলে সেই থেকে।

বে দেখলে সে-ই বললে—এ কী গো, কী চেহারা হয়েছে ভোর মশলা?

জগন্নাথবাবু বললেন—কেমন কাটালেন কর্তাবাবু?

হুলালহরিবাবু বললেন—আপনি চলে গিয়েছিলেন,

একবারে স্নানও হয়ে গিয়েছিলুম আমার কর্তাবাবু—

কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—হুলা মল্লিক আর গওগোলা বঁধাযনি তো?

জগন্নাথবাবু আর হুলালহরিবাবু দুজনে পাশা করে পাধারা দিয়েছিল পুতুলমাথার বাড়িতে। পুতুল মাছিটি পৰ্বত ঢুকতে পেত না।

জগন্নাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন—বাওরা-বাওরার তেমন অগ্রবিধে হয়নি তো দেখানে?

হুলালহরিবাবু জিজ্ঞেস করলে—গরুর তো নতুন লোক নিয়ে গিয়েছিলেন—

কর্তাবাবু বললেন—হ্যাঁ—

খাস-বরদারকে জগন্নাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কি রে, কর্তাবাবু কী করতো রে দেখানে? কী করে কাটাভো ভোর কর্তাবাবু?

পীরজালা বললে—আজ্ঞে, সিঁচির পরবত খেতেন খুব—সেখা বাধার দিবে তৈরি করে দিচ্চুম—

—খুব খেতেন, না? বোদ ক' সেলাস?

—কোনও ক্রম নাই দিন তিনচারে যেনেই কইনা?

—এখানে তুমিও যেটা তো খুব খোঁজিয়া?

কিছুকাল জিজ্ঞাসা করিয়া—আমি বললাম—কি যে বলেন

আপনারা?

জানকরণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি ভাবে আসে?

আমি বললাম—আমি আসি।

জানকরণবাবু বলিলেন—তুমি যেটা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?

কতদিন যেটা আসে? একটা বছর একবারে নিবন্ধ

করিয়াছে বলতে আসে? (স্মৃতি হতে অজ্ঞপ্ত পড়ে—)

হাস্যবোধের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করিলেন—কোনও কথা

জানকরণবাবু দিয়া বার করে যেত না। যুগের পঞ্চাশিত। কিন্তু

ভেতরের কথা কিছু বলতে না। একটা একটা বলতে শুধু।

একদিন মত বলিল। আমায়ের ভেতর আসে কতবার

আমি। (স্মৃতি হতে অজ্ঞপ্ত পড়ে—)

হাস্যবোধের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করিলেন—কোনও কথা

জানকরণবাবু দিয়া বার করে যেত না। যুগের পঞ্চাশিত। কিন্তু

—কর রক্ত?

জানকরণবাবু বলিলেন—বল রক্ত কোনও কোণের

কোণেই—

আমি বললাম—কর রক্ত কোণে কোণে? সেই অর্থ

সময়ের মধ্যে কাকেই বা আমি কোণে কোণে করে বার, স্বভাব

শুধু হলেই চলবে না। (জানকরণবাবু বলিলেন—কিন্তু আমার

উদ্দেশ্যের অর্থমতি নিজে করে এসেছে—)

উদ্দেশ্যের অর্থমতি। বলিলেন—আমার উদ্দেশ্যের মধ্যে

কোনো সন্ধান করতে হবে—

কইনা? বলিলেন—আমার স্ত্রী ধনীনা, জানকরণবাবু,

জানকরণবাবু বলিলেন—আমি এখনি সব ব্যাখ্যা করে

আসছি—

জানকরণবাবু বলিলেন—কিন্তু বা কিছু সব আর্থ

ব্যাখ্যা করে দেওয়াতে হবে, বোঝার অর্থ বিশেষ ব্যাখ্যা—

উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা দেওয়াতে হবে। (জানকরণবাবু বলিলেন—)

উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা দেওয়াতে হবে। (জানকরণবাবু বলিলেন—)

উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা দেওয়াতে হবে। (জানকরণবাবু বলিলেন—)

উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা দেওয়াতে হবে। (জানকরণবাবু বলিলেন—)

উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা দেওয়াতে হবে। (জানকরণবাবু বলিলেন—)

উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা দেওয়াতে হবে। (জানকরণবাবু বলিলেন—)

উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা দেওয়াতে হবে। (জানকরণবাবু বলিলেন—)

উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা দেওয়াতে হবে। (জানকরণবাবু বলিলেন—)

বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ প্রকৃতির ঠিকানা—বৈজ্ঞানিক-প্রকৃতি-মিলন-প্রাথমিক জ্ঞান

ব্রাহ্মকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাইভেট লিমিটেড

বক্তাবাজার • কলিকাতা • ফোন ৩৬-২০০৩

আমাদের বই বিভাগের কোন গ্রন্থ নাই

ব্রাহ্মকানাই যামিনীরঞ্জন পাল

মুদ্রা ও প্রকাশনার প্রকৃতির ঠিকানা—বৈজ্ঞানিক-প্রকৃতি-মিলন-প্রাথমিক জ্ঞান

কলিকাতা-৪ (প্রকৃতির ঠিকানা—বৈজ্ঞানিক-প্রকৃতি-মিলন-প্রাথমিক জ্ঞান)

ব্রাহ্মকানাই যামিনীরঞ্জন পাল/আয়ুর্জন ও হার্ডওয়ার ডিস্ট্রিবিউট

১, মধ্যমিলাল রোড, কলিকাতা ১১০১/প্রকৃতির ঠিকানা—বৈজ্ঞানিক-প্রকৃতি-মিলন-প্রাথমিক জ্ঞান

তারপর কর্তাব্যবস্থাকে দিয়ে কানে কানে বললেন—এক-জনকে গেবেছি, ডাক্তারব্যবস্থাকে একবার দেখাতে হবে—
কর্তাব্যবস্থার বললেন—কে?

ডাক্তার চৌধুরী সেদিন অনেক রাতে বাড়ি গেলেন।
তুমি বড় দেখা নব্ব। সেই রাতে অনেক ক্রিয়াকর্ম অনেক
অনুষ্ঠান ঘটে গেল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। বা-মনি তখন
বিছানায় অজ্ঞান অচৈতন্য। অনেক আর্তনাদ, অনেক
আশঙ্কা, অনেক অশান্তির সমাধি ঘটে গেল সেই রাতেই
সেই কান্নার পুরোনো বাড়িটার চার দেয়ালের মধ্যে। কেউ
জানতে পারলো না বা-মনির জীবনদানের অস্ত্র কার
হস্তের কী সমীক্ষণ ঘটে গেল।

বা-মনি বললেন—তার পর?

সমস্ত বাড়িটার মধ্যে এখন নিব্বর নিব্বরতা। বোকাও
নেই, সে গেছে বাইরে। জগজগতবাবু সবে গেছে, নব্বও
সবে আছে। সে থাকলে অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘরে
আলো জ্বলে। বাস-বরদার পাঁচুও জেগে থাকে।
এ-মহলে ও-মহলের কোনও শব্দ কানে আসার কথা নয়।
তবু বা-মনির ঘুম আসে রাতে। রাতে শিরের কানাল্যাটা
মুখে দিলে বোকার ঘট্টার আলো জ্বলে দেখা যায়।
তারপর জগজগতবাবু এক সময়ে চলে যায়, বাস-বরদার
পাঁচু দরজা বন্ধ করে দেয়, আর তারপরে একসময়ে
আলোও নিভে যায় বোকার ঘরের।

সকালবেলা বাঁ-মনির ঘরের দরজা দিয়ে ডাকেন—
বোবা?

বাঁ-মনি এসে দাঁড়ায়। বলে—আমার ডাকছিলেন বা।

—কাল বোকা ঘরে এসেছিল?

এ প্রশ্ন আলোচনা করতে বাঁ-মনির লজ্জা হয়।
বলে—উনি তো আগলেন নি—

বা-মনি বলেন—কিছু ঘরের আলো তো সকাল-সকাল
নিভে গিয়েছিল?

বাস-বরদার পাঁচুকে ডাকেন। জিজ্ঞাস করেন—কাল
বোকা ঘুমোতে আসেনি কেন ভেতরে?

পাঁচু বলে—আমি বলেছিলাম বড়বাবুকে ভেতরে
আসতে।

বা-মনি বলেন—তা তুমি কেন ভেতরে নিয়ে এলি না
ডেকে?

পাঁচু বলে—বড়বাবু শুয়ে গড়লেন ঘরাসের ওপর,
তাই খপরি বাড়িরে গিয়ে আমি এখানেই—

বা-মনি বললেন—আজ ভেতরে ডেকে আনিবি,
কুনি? না হলে তুমি আছিস কী করতে?

তারপর বাঁ-মনিকে বললেন—বোবা, তুমি একটু শক্ত
হতে পারো না?

বাঁ-মনি মাথা নিচু করে থাকেন। শক্তদ্বীপ সামনে
কোনও কথা বলতে পারেন না মাথা তুলে।

বাঁ-মনির সমস্ত রূপ সমস্ত গুণ যেন এ-বাড়িতে এসে
দিন দিন জোঁদুহীন হয়ে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম
জেবেছিলেন রূপসী বউ, বাইরের বেশা হু'নিমেই কেটে
যাবে। হোক বংশের বেশা। তবু তো বোকার সঙ্গে
এ-বংশের হস্তের স্পর্শ নেই। কোন গ্রামের কোন এক
অখ্যাত বংশের ছেলে। বা-মনি কান্না থেকে ধীরেই বোকা
নিতে আরম্ভ করেছিলেন। বেশ ভালো সং বাপ হলোই
চলবে। এ-বংশের রক্তের বোঝ দার শরীরের হিম্মতদার
নেই। কর্তাব্যবস্থার শুধন আবার জগজগতবাবুর সঙ্গে
বাগানবাড়ি যেতে শুরু করেছেন।

একদিন রাতেই গোলাপলী কথাটা পাড়লেন বা-মনি।

বললেন—তোমাকে দেখতে হবে একবার—

কর্তাব্যবস্থার বললেন—আমি আর দেখে কী করবো?

বা-মনি বললেন—সং বাপ, বাপ-মা সং-চিহ্নিত—কোনও
খুঁৎ নেই—

কর্তাব্যবস্থার বললেন—আর কিছুদিন স্থির করো না, এত
তাড়াতাড়ি কেন? আমি তো সহ্যই না এগুনি?

বা-মনি বললেন—আমি তো মরতে পারি?

কর্তাব্যবস্থার বললেন—মহার কথা উঠছে কেন এমন?

—বাঁচা-মহার কথা কে বলতে পারে? আমি তো
মরতে বসেছিলাম সেদিন!

কর্তাব্যবস্থার বললেন—বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় এখন
বঁচেছ তখন আর কেন ও-কথা তুলছো?

বা-মনি বললেন—তবু তোমার দেখতেই হবে, আমি
মনস্থির করে কেলেছি—

কর্তাব্যবস্থার বললেন—কোথায় সে?

বা-মনি বললেন—এখানেই গেবেছি, তোমাকে দেখাবো
বলে—

কর্তাব্যবস্থার কী বেন ভাবলেন—আর কিছুদিন থাক না,
আমিই না-হয় দেখতে একটা বা-বোকা কিছু স্থির
করবো!

সকালবেলা বা-মনি ছেলেটিকে আনালেন। ছোট
ছোট্ট ছেলে। বাপ নেই। অবস্থা ব্যাপ্য। বিধবা
মায়ের তিনটি সন্তান। বা-মনি তাঁদের আনিতেছেন

নিজের শৈতক গ্রাম থেকে। দুইয় একটা সম্পর্কও আছে। তিনটি সন্ধান নিয়েই এসেছে যা। পুরোহিত-মশাই দেখেছেন। জন্ম-পত্রিকা করে পলীকাও করেছেন তিনি। কোনও আশি নেই কারো। কিন্তু কর্তাবাবু যেন কেমন ঘন-মগ্ন। সেদিন আর বাগানবাড়ি গেলেন না। জগন্নাথবাবু হুলালহরিবাবু সবাই এসে নিজের বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ বসে রইলেন।

পথমস্তকে একবার ডেকে জিজ্ঞাস করলেন জগন্নাথবাবু—
—হ্যাঁবে, কর্তাবাবু কী হলো, শরীর খারাপ ?

পথমস্তক বললেন—কর্তাবাবু মা-মণির ঘরে।

—মা-মণির ঘরে এতক্ষণ কেন যে বাবা ? কিসের এত পরামর্শ ?

ভেতরেও কি-নাশী মহলেও যেন অনেক ফিস্কা লগতে লাগলো। সে-সব অনেকদিন আগেকার কথা। তখন ওই জগন্নাথবাবুও জানতে পারেননি কিছু। ওই হুলালহরিবাবুও জানতে পারেননি কিছু। অবশ্য হুলালহরিবাবু আর বেশিদিন বাঁচেননি। একদিন গুলুপদাবার বাড়ির সামনের পুকুরে তাঁর হৃৎকলহও ভেঙ্গে উঠেছিল। কিন্তু সে অস্ত গল্প। আসলে কেউ কিছু জানতে পারেননি। কারা ছেলেপুলে নিয়ে কদিন ঘরে বাড়িতে রয়েছে। তাদের জন্তে অপায়াবন-আছোজনও প্রচুর। সবাই সজ্ঞাপ। তাদের জন্তে দিল্লী আসছে। ছোট ছেলেটির জন্তে লাবা আসছে, কাপড় আসছে।

কিন্তু বেশা যখন সেড় প্রব্র, হঠাৎ কাশী থেকে গোক এস। চুপ সিং পরজার গাড়িতে ছিল। বয়লা কাপড়, লাবা দিন রাত ট্রেনে চড়ে এসেছে। সঙ্গে একটা ছোট ছেলেও—

জগন্নাথবাবু বৈঠকখানায় বসে ছিলেন। হুলালহরিবাবুও বসেছিলেন মা-মণিতোশ করে। ভেতর থেকে কোনও খবর আসছে না। কর্তাবাবুর তখন সমস্ত নেই নিচে নামবার। মা-মণির সঙ্গে তখন কথাবার্তা হচ্ছে ঘরের ভেতর। সকাল থেকে বাঙলা নেই বাঙলা নেই। হুঁসুনেই বাজ।

বাসাবাড়িতে শিশুর-মা খাবার নিয়ে বসে আছে।

—হ্যাঁয়া বাবুদহি, আজ কর্তাবাবু যে এখনও খাবার চায়নি ?

মদলা নিজের মনেই হাঁখিল।

শিশুর-মা আবার বললেন—কর্তাবাবুতে আর মা-মণিতে কী যে কথা হচ্ছে ঘরের ভেতর, আজ খাওয়া-দাওয়া নেই নাকি কারো—

জগন্নাথবাবু বললেন—ভাদিঘে দাও, ভাদিঘে দাও ওকে চুপ—

হুলালহরিবাবুও বললেন—কোথেকে এসেছে ও ?

জগন্নাথবাবু বললেন—কোথেকে এসেছে যরতে কে জানে—তখনই এখানে বসে আছে তাই এসেছে—

চুপ সিং বলছে—না না, এখানে কিছু হবে না—ভাঙ্গো হিঁয়ালে—

নকরের সে-সব কথা মনে নেই। তখন সে ছোট। সেড়-বছর দু-বছরের ছোট ছেলেটা। এখান থেকে হাটতে-হাটতে গলার দ্বারে বাড়ীঘের বিল্লাস করবার ঘরে বসে ছিল অনেকক্ষণ। বেলা গড়িয়ে গেল। তখনও কোথায় বাবে টিক নেই, লোকটা ল্যাংবনুদুধ কিনে বিরছিল এক গরদার। চোটে চোটে জিত লাগ করে কলেছে। তারপর কিদের আলার কখন খুনিয়ও পড়েছে।

কর্তাবাবু একবার হুঁয়ার লোক পাঠিয়েছেন বাইরে। পরমস্তকে বললেন—সেগে আরতো, কাশী থেকে কেউ এসেছে কিনা—সঙ্গে একটা ছোট ছেলে আছে দেখিলু—

পথমস্তক কিংবে এসে বলছিল—কই, কেউ তো আসেনি আজ—

আরো হুঁএকবার পাঠিয়েছিলেন দেখতে। বেলা হুটে পর্যন্ত বেশা হলো, কেউ এল না।

তারপরে অহুঠান আরও হলো। কুল-পুরোহিত অহুঠান-কিতা আরও করলেন। হোম হলো বজ হলো। শ্যামজ করে শু আরস্তা হয়ে গেল। মা-মণি আর কর্তাবাবু গরবের কোড়ে পরে দস্তক সন্ধান গ্রহণ করলেন। ছোট কুটকুটে চেহারায়ে ছেলে। মাথা নেড়া করা হয়েছে। মা-মণি তাৎকে নিজের কোলে ছুলে নিজের হাতে বাঙলালেন অহুঠানের শেষে।

দলপেবে কর্তাবাবু কাজকর্ম দেয়ে বাইরে এসেছেন।

জগন্নাথবাবু হুলালহরিবাবু এতক্ষণ অসোদা কর-ছিলেন।

বললেন—ভালোই হলো কর্তাবাবু, সন্ধান না হলে কি গৃহ নানার। ভালোই করেছেন—

সন্ধানের নতুন নাম রাখা হলো হুর্নানায়াজ। কুল-পদবী সেন। হুর্নানায়াজ সেন।

জগন্নাথবাবু বললেন—এবার একদিন পতঞ্জি-ভোজন হয়ে যাক কর্তাবাবু, সেন-বংশের বংশধর হলো, ইত্তরজন কেন বাধ পড়ে যার—

টিক হলো। পরে একদিন অহুঠান হবে। সেদিন আত্মীয়-বন্ধন 'অভ্যাগত সকলকে নিমন্ত্রণ করা হবে।

দেইদিন সবাই নতুন সন্ধানের খুব দেখবে, অস্বীকার করবে।

কিছু হঠাৎ সন্ধ্যার দিকে কর্তাবাবু বাইরে আসতেই কে যেন এগিয়ে এস সামনে। ডেবেছিলেন ডিম্বিরীদের কেউ হবে। কিছু লোকটা ঠীর পায়ে দুলা নিলে।

কর্তাবাবু চেয়ে দেখলেন। বললেন—কে?

—আমি কান্টী থেকে এসেছি, যজ্ঞর।

কর্তাবাবু কথটা শুনেই যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—এসেছ?

লোকটা বলল—এই দেখুন যজ্ঞর—এই বে—নকর—

হাতে ধরে ছেলেটাকে সামনে এনে ধাঁড় করালো।

—কী নাম রেখেছ এর?

—আজ্ঞে নকর বলে ডাকি আমরা।

নকর!

কর্তাবাবু বললেন—তা এত দেহি হলো কেন আসতে?

—আজ্ঞে এসেছিলাম সকালবেলা, তখন আপনি ব্যস্ত ছিলেন। তাই একই ঘুরে এলাম।

নকর তখন কর্তাবাবুর কোর্টের বোতাম নিয়ে খেলা করছে। কর্তাবাবু ছেলেটার গাল চিপে দিলেন। বললেন—চালাক হয়েছে খুব—না?

—আজ্ঞে, খুব চালাক, ওর জালায় সবাই অস্থির, বড় হলে খুব বুদ্ধি হবে ওর দেখবেন—

কর্তাবাবু বললেন—আজ্ঞা ছুটি বাও—

বলে খাজাখিানার গিয়ে সরকারবাবুর কাছ থেকে পাঁচশো টাকা নিলেন। নিয়ে লোকটাকে দিলেন। বললেন—এই সব শোধ হয়ে গেল—

সরকারবাবু বললেন—কার নামে টাকাটা জমা করবে যজ্ঞর?

কর্তাবাবু বললেন—কান্টীতে থে-টিকানার মনি-জরদার করে টাকা পাঠানো হতো, সেই হুর্ণা-মন্দিরের নামে ধরচা লিখে দিবে—

সরকার-মশাই টাকা পাঠিয়ে আসছেন ব্যবহার মন্দিরের টিকানার। কর্তাবাবুর খরচে হুর্ণা-মন্দিরের সন্ধান হচ্ছে। সেই ধরচাতেই আবার পাঁচশো টাকা যোগ হয়ে গেল।

কর্তাবাবু বললেন—আসছে মাল থেকে আর পাঠাতে হবে না টাকা, এই শেষ কিঞ্চি শোধ হয়ে গেল সব।

এর পর আর বেশিদিন বাচেননি কর্তাবাবু। তখন নতুন সন্ধান এসেছে বাড়িতে, তার উদারকেই ব্যস্ত সবাই। মা-মনি বলতেন—বেশি, যোকার ঠাণ্ডা লাগে না যেন?

হঠাৎ হততো! কেনে উঠেছে থোকা। মা-মনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

—হ্যাঁবে সিদ্ধি, থোকা কালকে কেন?

সিদ্ধিমনি এসে বলে—নকরটা মেসেজে গকে—

—নকর? নকর কে?

সিদ্ধিমনি বলে—আজ্ঞে, ওই-বে একটা চোড়া ছুটেছে কোথেকে, বাত-বাড়িতে থাকে, আর খেলা করে থোকাবাবুর সঙ্গে?

—তা তোরা আছিল কী করতে? দেখতে পারিস না, বে-সে এসে মাঝামাঝি করে!

আর ঠিক দেই থেকেই কর্তাবাবুর শরীরটা ভেঙে গেল যেন। এখানে ওখানে যেতেন। বাড়িতে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বাগানবাড়িতেও যেতেন। কিন্তু কিছুতেই শান্তি পেতেন না। সিঁড়িটা গুরু হয়েছিল কান্টী থেকে, সেটা এখানেও এসে চলেছে। ক্রমে আবার বেড়েছে।

মা-মনি বলতেন—থোকার জন্তে লোপাশড়ার ব্যস্তবস্থা। করছে! না, দুখা হয়ে থাকবে নাশি!

কর্তাবাবু বলতেন—এই বচস থেকেই লোপাশড়া?

—এখন থেকে না করলে যে কিছুই শিখবে না, একটা ভালো মাস্টার রাখো না—

মাস্টার! বললেন—জগদ্বারবাবু পড়াতে পারে, বি-এ পাশ—

তারপর একই মেয়ে বললেন—তাঁহলে ওরা হু'জনেই একসঙ্গে পড়ুক—

—হু'জান আবার কোথার গেল? হু'জান কে?

—থোকা আর নকর।

মা-মনি বললেন—আমার ছেলের সঙ্গে নাকর পড়বে, কোথাকার কে ঠিক নেই, তার লোপাশড়া নিয়ে বত মাঝা-মাঝা—ও কে?

কর্তাবাবু সে-কথা এড়িয়ে যেতেন। বলতেন—যাচ্ছে এসে পড়েছে, যদি মাহুব হতে পারে তো হোক না—

সেই ছোটবেলা থেকেই বড় বামন করতো নকর। ঠে-ঠে বাহিরে চাঁৎকার করে একেবারে বাড়ি মাং করে ফেলতো। বলতো—ওর ক্ষুভো হয়েছে, আমার কই?

খাজাখিবাবু বলতেন—ওর যা হবে তোরও তাই হবে নাশি! ছুই কে রে!

নকর রোগে যেত। বলতো—আমি কেউ না?

কর্তাবাবুর কানে বেত সে গোলমাল।

বলতেন—ছাঁ ওকেই যা ছুতো কিনে দেখনা কেন?



উঠতে পারতেন না খেয়ের দিকে। কিন্তু কানে
আলতো। খজাতিবাবুকে ডাকতেন কাছে। বলতেন—
ও বা চাও, ওকে দিহো ছুনি, জানলে—

—আজ্ঞে হুজুর, খোকাবাবু'র সঙ্গে সমানে সমানে সব
চাইবে।

আজ্ঞে গাড়ি, কাদা খেলনা, পতঙ্গ জামা-কাপড়।
হা-খণির হাতে নহন নহন জিনিষ আসে বাজার থেকে।
খোকাবাবু'র জন্মে কোনও জিনিষ আর আসতে থাকি থাকে
না। নব্বর বেগতে পেনে কেড়ে নেয়। দিছু বলে—এই
চোঁড়া, বেহাও এখান থেকে—বেহাও—দূর হ—

নব্বরও তেমনি। বলে—বেহাও কেন?

—বেহাওবি না তো, থাকবি এখানে? এখন খোকাবাবু
থাবে!

—আমার দুই আমি থাকবো। তোর কী! আমিও
থাকে, আমার দুটি কিরে পায়না?

দিছুমি গালে হাত দেয়।

—ওমা, শোনো ঘোঁড়ার কথা! তোর কিরে পায় তো
তুই রাখাবাড়িতে শানা—

নব্বর বলতো—তাহলে খোকন এখানে থাকে কেন?

—ও হলো বাড়ির ছেলে, তুই কে বে চোঁড়া?

নব্বর বেগে গেল। বললে—তুই চোঁড়া বলছিস কেন রে
মাসী আমাকে?

বলে এক চিমটি কেটে গালিবে যেত নব্বর।

কিন্তু কর্তাবাবু বাবা ঘাব্বার পরই যেন জেদ বেড়ে
গেল নব্বরের। কথায় কথায় ব্রুগে যায়। কথায় কথায়
ক্ষেপে ওঠে। ও ইতুলে যায়, নব্বরও ইতুলে থাকে।
বড়বাবুকে কগান্তরপাবু পড়ায়, নব্বরও পড়বে। খোকাবাবু
তখন ছোট। সেই বয়সেই একদিন কগড়া বাঘলো।
হুসুল কগড়া। লাঠি নিয়ে। নব্বর খোকাবাবু'র লাঠি চুরি
করে নিয়ে গালিয়েছে। খোকাবাবু গিয়ে লাঠি চাইতেই
নব্বর এক বৃথি করেছে।

কগার বাড়ি বাড়ি থেকে বেলেছে খোকাবাবু।

—কী হলো রে, কী হলো?

বাড়িরহ লোক দৌড়ে এসেছে নব্বরের ঘরে। রক্ত
বেরোছে তখন খোকাবাবু'র নাক দিয়ে।

—কে করেছে রে? কে করেছে ওকে?

নব্বর বলে—আমি।

—তুই! এত বড় আশুখি তোর—খোকাবাবুকে
মারিস?

বলে ঠাস করে এক চড় কুথিয়ে দিয়েছে কেউ নব্বরের

গালে। তারপর আদর করে কোলে তুলে নিয়ে গিয়েছে
খোকাবাবুকে। কিন্তু নব্বর তবু কানেই চড় গেয়ে। ওম
হয়ে বসে থেকেছে কিছুক্ষণ। তারপর সোজা গিয়েছে
রায়াবাড়িতে। চোঁটপাট করেছে। বলেছে—ভাত লাও
আমাকে শিতর-মা—আমার কিপে পেয়েছে—

তার সমস্ত আঘাত বেন সে ভাত খেয়ে তুলে যেতে
চাইত।

শিতর-মা-ও হেঁকে দিত—বেহাও এখন থেকে,
সকালবেলা ভাত কিসের রে? পরে আসিস—

তারপর কবে একদিন বিয়ে হবে গিয়েছে বড়বাবু'র।
কবে নহন বউ এসেছে। বরেন বেড়েছে, শরীরও বড়বাবু'র
জারি হয়েছে। অগস্ত্যরপাবু রোজ এসেছে বড়বাবু'র সঙ্গে
গল্প করতে—নিঃশেষে নির্বিঘ্নে সব কখন ঘটে গেছে
কারোর তা মনে নেই। নব্বরেরও মনে নেই। একতমার
অঙ্ককার ঘরানার মধ্যে গুরে গুরে কখন হুটো দিবে তার
সব অধিকারের অনিবার্যতাটুকু নিঃশেষ হয়ে গেছে
তা নিয়েও আর নব্বর মাথা ঘামায় না। এখন শুই বড়বাবু
একটু ডাকলেই তুত্রি, হুজুরের মতো ল্যাজ নাড়তে নাড়তে
গিয়ে আবার পুরোনো বিনের কিছুটা অংশ কিরে পায়—

কেউ আর জিজ্ঞেস করে না—ও কে পো?

এখন আর রাখাবাড়িতে গিয়ে বসড়া করে না।

বলেনা—বাছ লাওনি কেন? আমি এ-বাড়ির কেউ
নই?

নব্বর এখন ভাত খেয়ে চুপি চুপি আবার নিজের ঘরের
দুটির ভেতর এসে গুরে পড়ে। খোকার বড়বাবু
কী জামা-কাপড় হলো, কী বেলে, কিছুই খেয়াল রাখে না।
টিকটিকিটা শুধু বাবার ওপর লাল চোখ দিয়ে তার দিকে
থাকে থাকে হাঁ করে চেয়ে থাকে, আর নিচে নব্বর তোস-
তোস করে ঘুরায়। আর ঘুম না-পেলেও ঘুমায়, পেলেও
ঘুমায়—

এ-সব ইতিহাস পুরোনো। বর্তমান সেন-বংশের বাঁধা
ইতিহাসের পাতা খুললে এমন অনেক অধ্যায় পাওয়া
থাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আসে থেকে শুরু করে এই বিংশ
শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত অনেক জ্ঞানি, অনেক কলঙ্ক
অদৃষ্ট কলকে দেখা হয়ে আছে। সে আর কেউ জানতে
পারবে না। জানা উচিতও নয়, কাম্যও নয়।

শ্রাওলা-মরা বাড়িটার সামনে থেকে তেমন কিছু বোকা
থাবে না। বধন এ-পাড়ার আর কোনও বাড়ি ছিল না,
এ-সব তখনকার কাহিনী। এখন এ-পাড়ার সামনে গেছেন

অনেক বাড়ি হয়ে গেছে। আশেপাশে আগে বাড়ি ছিল, বন-জঙ্গল ছিল। তখন এ-বাড়ির আভিজাত্য ছিল। দশজন সমীহ করতো, ডর করতো, ডঙ্কিও করতো হয়ত।

এখন এ-বাড়ি ও-বাড়ি সকাল-সন্ধ্যায় ত্রেডিও বাজে। মটর আসে, বেঠিরে যায়। তাড়াটেও এসেছে কত। ঘুড়ি উড়তে উড়তে এ-বাড়িতে চুপে পড়লে চেলেঙ্গা নিরুয়ে ভেতরে ঢুক পড়ে। দরোয়ান বিশেষ কিছু আর বলে না এখন। সবাই জানে বড়লোকের বাড়ি এটা, কিন্তু জানে না এর ভেতরে কতগুলো লোক থাকে, কী তারা করে, কী করে তারা জীবন কাটায়, কী জন্তে তারা বেঁচে আছে—

কিন্তু আজ পাড়ার লোক সব ভেত্রে পড়লো এ-বাড়ির সামনে—

এতদিন এ-বাড়ির দিকে কেউ বিশেষ নজর দিত না। বিরাট বাড়ি। সামনের দিকের জানালা বরজা সব সময় প্রায় বন্ধই থাকতো। বাড়ির সামনের গাড়ি-বারান্দার ওপর নিম্ন-গাছটা ক'কড়া মাথা নিয়ে অনেক বড় অনেক বাগল এতকাল ধরে সরে এসেছে নির্বিঘ্নে। দেয়ালের দ্বাওলাতে অনেক লতাশাড়া জ'মে ফোপ জমল হয়ে গেছে। লোকে জানতো ভেতরে বারা বাস করে তারা বনেদী ঘরের লোক—কেউ তাদের কখনও দেখতে পাবে না। চন্দ্র-দুর্ধও তাদের দেখতে চেষ্টা করলে হার মানবে।

কিন্তু আজ আর কিছু অজানা থাকবে না। আজ বোধ হয় সব জানাজানি হয়ে যাবে। সামনের চারের লোকানের হোঁড়কাও দৌড়ে এসেছে, ঘোশাশাড়া থেকেও ব্র'একজন দৌড়ে এল। একটা বালি রিক্সা যাক্ষিল সামনে দিয়ে—রিক্সাওগালাটাও থমকে দাঁড়ালো।

বললে—কেহা হযা বাবু?

আর, বাড়ির ভেতরের বারা তাদের মধ্যেও বেন আজ সব খলোট-পালোট হয়ে গেছে। বড়বাবুর ঘর খালি। বাস-বরদার গাঁহু বড়বাবুর সঙ্গে গাড়ির মাঝায় চড়ে চলে গেছে। সেদিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। জুলুমনি রাত থাকতে উঠে বার-বাড়ির বাসন বেছেছে। পরমস্ব সিঁড়ি বরজা গুলে দিয়েছে—। সিঁড়ুমনি বাসান্দার গড়ে পড়ে গুমোছিল। কলতলার বাসনের আওরাজে তার ঘুম ভেঙে গেছে। ধড়মড় করে উঠে বা-মনির ঘরে দিকে গিয়ে দেখলে—বা-মনি তখনও ওঠেনি। অতদিন সিঁড়ুমনি ভেতর-বাড়িতে সকলের আগে ওঠে—কুজবালা বড় দেহি করে উঠতো। বড় খু-কাহুরে বাহুব ছিল সে। বা-মনির কাছে অনেকে।

কানীয়ে বেবার কুজবালা গিয়েছিল, দিনরাত ঘুমোত।

একদিন কর্তাবাবুর পায়ে ধাক্কা দেগে গিয়েছিল। তারপর থেকে কুজবালা বা-মনির ঘরের ঘেঝেতে গুতো। বখন অস্বস্থ হলো বা-মনির, দিনরাত সেবা করতে হতো, তখন দিনেও আগতে হতো রাতেও আগতে হতো। একদিন কুজবালা বলেছিল—কলকাতার গিয়ে পেট ভরে ঘুমোব—

তা কুজবালার সেই ঘুমের জন্তে পোখতর গুট সর্বনাশ ঘটে গিয়েছিল।

সিঁড়ুমনি জিজ্ঞেস করেছিল—কিসের সর্বনাশ দিদি?

—সে তোমার তুনে কাজ নেই না।

—কেন, তুনে কী হয়ে দিদি?

তখন অনেক রাত। কর্তাবাবু সিঁচি চড়িয়েছেন দুপুর-বেলা। সেই শরবতের নেশাতেই তিম্ হয়ে ছিলেন সমস্ত দুপুর, সমস্ত বিকেল। বাস-বরদারও ততক্ষণ একই জিরোমিছিল। বিকেলের দিকে বা-মনি একটু ভালোই ছিলেন, কিন্তু মাঝরাতে হঠাৎ বা-মনি কেমন করতে লাগলেন। খু-চোখের ভাব দেখে ডালো মনে হলো না। কুজবালা গিয়ে বাস-বরদাকে ডাকলে—তুনছি—আই— কর্তাবাবুর বাস-বরদার উঠলো অনেক ডাকাডাকিতে। কুজবালা বললে—কর্তাবাবুকে ডাক, বা-মনি কেমন করছে—

বাস-বরদার বললে—কর্তাবাবু যে ঘুমোচ্ছে, ডাকবো কী করে?

কুজবালার হাস হয়ে গিয়েছিল।

—তুই ডাক না ঘুমোড়া। বল, বা-মনি কেমন করছে— এদিকে বা-মনি কেমন করছে, চোখের মনি বেন উটে মাঝার জোগাড়, আর পাশের ঘরে কর্তাবাবুরও পাভা নেই। ঘরে বিছানা ঠিক পাভা আছে, কিন্তু বিছানায় বাহুব নেই। বাস-বরদার এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলো। নেশার ঘোরে কোথাও কর্তাবাবু চলে গেল নাকি! দগদর দিক বরাবর বরজাটা বন্ধ ছিল—সেটা বন্ধই রয়েছে—। বাসান্দার একোণ ও-কোণ দেখা হলো। কোথাও নেই— কোথার গেলেন কর্তাবাবু?

সে-সব দিনের কথা বারা জানতো, বারা হাকির ছিল তাই জানে।

ডাকার চৌধুরী বললেন—কিন্তু দেহি করলে চলেবে না, যা করবার শিপ গির করতে হবে—

ডাকার চৌধুরী ডালো করে বরদাকে দেখলেন।

মস্তপাড়া ছায়ালের মতো ধরঘর করে কাপছিল তখন মকলা। সারা গায়ে হরষর করে ঘাম ঝরছে। পাশেই

ঘাটের ওপর মা-মণির দেহ নিক্ষেপ হয়ে পড়ে আছে।
ডাক্তার চৌধুরী ধাক্কাটা রক্ত নিয়ে পতীকা করে দেখলেন।
সী তিনি দেখলেন তিনিই জানেন।

ওকসেব কর্তব্যবাহুকে আড়ালে ডাকলেন—
বললেন—এক বাণের রক্তের সঙ্গে আর এক বাণের
রক্তের মিশ্রণে শাস্ত্রী বাবা-বিবোধ আছে, তা আগে ধর
কহতে হবে—

কর্তব্যবাহু জিজ্ঞেস করলেন—কী করে দূর হবে ?
ওকসেব বললেন—উপায় আছে—বলি আপনার
আপত্তি না থাকে—

—কী উপায় ? আমার কোনো কিছুতেই আপত্তি
নেই—

সে-রাস্তা বে গী হলো ! ডাক্তার সেই অস্বাভাবিক
নিবেশের মধ্যে ডাক্তার-বেহতার বোধহয় কোনও গভীর
উদ্বেগ ছিল। সেদিন কর্তব্যবাহুও বোধহয় করুণা করতে
পারেননি তাঁর সেই কৃতকর্মের ঘণাঙ্ক একদিন এত ভাবি
হয়ে আর এতদিন পরে তা এতবড় বিপর্যয় ঘটাবে দেখে।

সমস্ত রাতটা মা-মণির কেন্দ্র করে কেটেছে ভগবানই
জানেন।

ওকসেব বৈশিষ্ট্য রইলেন না।

ট্রেন আসার কথা ছিল সন্ধ্যাবেলা। সেই ট্রেন এলো
রাত হুগলী। তারপর ডোরবেলাই আবার রওনা দিতে
হবে। বললেন—আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না,
আমাকে ডোরবেলাই রওনা দিতে হবে—আগামী পোষবার
অধোনি-মোমে আমাকে কাশীথমে উপস্থিত থাকতেই
হবে—আবার কিয়দর্শন সব বাকি রয়েছে—

মা-মণি পায়ের কাছে ধৌবে গড়লেন।

বললেন—তার পর ?

তারপর সেই রাস্তাই কর্তব্যবাহু নতুন হুতি পরে তৈরি
হয়ে নিলেন। মল্লাও বেনারসী বাড়ি পরলে, ঘোষাটা
বিলে। বাড়ি থেকে দূরে আর-একটা বাড়িতে অহুষ্ঠানের
আয়োজন তখন সম্পূর্ণ হয়েছে। মল্লাকেও নিয়ে যাওয়া
হলো। রাত তখন অনেক।

পুণোহিত বস্ত্র গড়লেন—

ঐ বসন্তে ছন্দঃ তব তসম্ব ছন্দঃ বম্,

বসিনঃ ছন্দঃ মম তসম্ব ছন্দঃ তব।

কর্তব্যবাহু উচ্চারণ করলেন—

এটিমধ্যে প্রাপ্য সন্ধ্যামি অধিতির-
দ্বীনি বাটসর্গাদানি খণ্ডা চতুঃ।

প্রাণে প্রাণে অধিতে অধিতে মাংসে মাংসে এবং
চর্মে চর্মে এক হয়ে যাক।

মোক্তান্তর আগেই হয়েছে। তারপর বিবাহ। বিধবা-
বিবাহ। কাশীধার বেহতার ধাম। শাস্ত্রী বিধান মেনে
মা-জননী পুনর্জীবনলাভের জন্তে বিবাহ। এ চলে।
এতে অজ্ঞান নেই, এতে বেহতার নিষেধ নেই, সম্মতিই
আছে বরং। ওকসেবের সম্মতিও আছে।

কর্তব্যবাহু বললেন—কিছু কেউ বেন এ পরে জানতে
না পারে—

একরাস্তার ব্যাপার। দোকচোথের অগোচরেই সব
সমাপ্ত হয়ে গেল। কেউ-ই জানতে পারলো না। মল্লা
বেনারসীত ফিরে এল অহুষ্ঠানের শেষে। আবার বেনারসী
বাড়ি ছেড়ে ফেললেন। আবার মল্লা-চন্দ্রন মুছে ফেললেন।

ডাক্তার চৌধুরী ছুঁচ ছুঁত্রে গিলেন শরীরে। ঘোষাটার
আড়ালে মল্লা একই বেশে উঠেছিল হুতি ভরে। আর
সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সেইখানেই।

—তার পর ?

তুমু কি একদিন। তুমু কি হুনি ! কতবার রক্ত
নেওরা হলো। তখনও মা-জননী আরাগ্য হরনি।
কর্তব্যবাহু কিছু রাস্তা কোথার বেরিয়ে বান, বনন অনেক
রাস্তা। গভীর রাস্তা কর্তব্যবাহু জন্মে পাখী আসে।
আবার ভোয়ের দিকে ফিরে আসলেন। তখন ডাক্তার
আসে। মা-মণির অস্থিরে খবর বেন। তারপর হুগল-
বেলা তাঁর গভীর নিশ্রা। বেলা চারটেই সময় সে-যুগ ভাতে
—তখন তাঁর জন্মে পরবত তামাক সব তৈরি রাখে
খাল-বরদার—

কিছু দিনের বেলা কাজ করতে বেশ চুসুনি আসতো
মল্লায়।

কৃষ্ণালা জিজ্ঞেস করতো—কী হয়েছে যে তোরা,
বদে বসে চুসুনি কেন।

মল্লা সেদিন পা বাড়িয়ে ধরলো। বললেন—আমার
সম্মান্য হয়েছে, আমি আর ধাঁচবো না—

—কেন, কী হলো ?

পরের দিন থেকে মল্লাকে কোথার নিয়ে গেলেন
কর্তব্যবাহু। দুর্গা-মন্দিরের ভোগ বাঁধতে হবে, সেখানেই
মল্লা থাকবে কিছুদিন। বাড়িতে বাঁধাবার জন্মে অত
দোক এল। কাশীর হিন্দুস্থানী রাজ্য। রাস্তা ভালো, কিন্তু
বাল-মল্লার বেশি হাত।

তা তাই নিয়েই চালাতে হলো। দুর্গা-মন্দিরের ভোগ
বাঁধতে গেল মল্লা। কৃষ্ণালা তাই জানে। তাই

আনলো সখাই। তখনও মা-মণির অস্থির ভালো হবনি।
আজ্ঞে আজ্ঞে গারে একই বল শেলেন। তখন প্রায়
বছর বেড়েক কেটে গেছে।

জিঞ্জেল করলেন—কুহু?

কুহু ভাড়াভাড়ি মা-মণির মুখের কাছে মুখ নামিয়ে
জিঞ্জেল করলে—কী মা-মণি?

—কর্তাব্যাবু কোথায়?

কুহুবালা বললে—ডাকবো? কর্তাব্যাবু তামাক
খাচ্ছেন—

—একটু জল দে—

কুহুবালা জিঞ্জেল করলে—এখন কেমন আছে মা?

মা-মণি মাথা নাকুলেন। ভালো না।

একদিন মা-মণি বললেন—আর ওষুধ খেতে
পারি না—

ওষুধ খেয়ে খেয়ে তখন অকচিট খেয়ে গেছে তাঁর।
চোখা শীর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম-প্রথম লোক তিনটে
পারতেন না। কর্তাব্যাবু পাশে এসে গাঁড়ালগেও কী-সব
এলাপ বকতেন। মাথায় ঘোমটা দেবার প্রয়োজন মনে
করতেন। যে মা-মণি প্রত্যেকদিন কর্তাব্যাবুর পাশোষক
নাথের জলগ্রহণ করতেন না, সেই তাঁরই কত বড়িগ্রহণ
হতে লাগলো। মুখের কাছে ওষুধ নিয়ে গেলে গাঁত বন্ধ
করে থাকতেন, গারে জোর থাকলে ওষুধ ছুঁড়ে ফেলে
দিতেন। সমস্ত বাড়িতে তখন লোকজন ডরে গেছে।
কতকাতা থেকে আরও চাকর-কি এসে গেছে। বয়স
আসছে, কদকাতা থেকে ট্রেনে করে ডাব আসছে।
কান্দামায়ে সব ওষুধ পাওয়া যায় না। কদকাতা থেকে
আনতে হয়। ডাক্তার চৌধুরী আসতেন, তাঁর সঙ্গে
আসতেন ডাক্তার সাহায্য। কর্তাব্যাবুর হুকুম ছিল যোজ
এসে তাঁরা দেখে যাবেন।

শেষে একদিন ডাক্তার বাবার অস্থিতি ছিলেন
ডাক্তারবাবু।

বললেন—বেশ পাতলা। কোল—সিঁড়ি-মাছের কোল,
আর লক্ষ পুরোনো পেছ-চালের ডাক্তার—

প্রথম দিন ডাক্তার মুখে গিয়ে সিঁড়ি রুটি হলো না।

বললেন—মহলা এ কী রে'খেছে?

কুহুবালা বললে—মহলা নয় মা, একটা হিন্দুস্থানী বান্ধ
হয়ে গেছে—

—কেন? মহলা কোথায় গেল?

কুহুবালা বললে—মহলা নেই তো মা।

—কোথায় গেল সে?

কুহুবালা বললে—হুর্গাবাড়িতে ভোগ রাখে সে
আজ্ঞাকাশ—

—কেন? সেখানে কেন গেল?

—কর্তাব্যাবু বললেন।

মা-মণি বললেন—কর্তাব্যাবু কোথায়? ডাক্তার—
কর্তাব্যাবু আসতেই মা-মণি মাথায় ঘোমটা তোলবার
চেষ্টা করলেন।

বললেন—মহলাকে হুর্গাবাড়ির ভোগ রাখেতে পারিয়েছে
তুমি?

কর্তাব্যাবু বললেন—কেন, তোমাকে কে বললে?
হ্যাঁ কি ভালো হয় না?

—আজ্ঞেকে খেতে পারলাম না।

কর্তাব্যাবু কী বেন ভাবলেন।

মা-মণি বললেন—তুমি ওকে নিয়ে এসো, ওকে
আমি নিজে বলে বলে হ্যাঁ দিখিয়েছি—ও-ই এখানে
রাখবে।

কর্তাব্যাবু বললেন—আজ্ঞেকে কেমন আছে?

মা-মণি বললেন—ও কথা থাক—বয়স তুমি কেমন
আছে বলা!

কর্তাব্যাবু বললেন—তোমার শরীর পরাম্প, আমি
কি করে ভালো থাকবো?

মা-মণি বললেন—কান্দিতে আমিই তোমাকে আনব,ম,
আমার কষ্টেই তোমার এই কষ্ট—

কর্তাব্যাবু বললেন—কষ্ট যে সার্পক হয়েছে এইটেই
সাহস—

মা-মণির চোখ বেন চুলচুল করে উঠলো।

বললেন—একটা দিন কি একটা মাস হয় ত-ও না-হয়
সব হয়, এ একবছর ধরে শুভে শুভে আর পারি না—

—এতদিন সব করেছে আর কিছুদিন সব কবো!

মা-মণি বললেন—আর সেলেই ভালো হতো—
কর্তাব্যাবু বললেন—ও-কথা কেন বলছো?

—তোমার পায়ে মাথা রেখে মরবো, সিঁড়ির সিঁড়ির
নিরে বেতে পারবো, কান্দামায়ে মরবো, এমন গৌড়াগ্য কি
আমার হবে?

কর্তাব্যাবুর কথা বাড়ির সকলেরই মনে আছে। বাগান-
বাড়ি বেড়েন ঘটে, জগন্নাথপুর বাহালাহরিবাবু তারাগ
বেত, কুঁড়ি হতে, হাইকেলও হতো, তবু বেন কর্তাব্যাবু
কোথায় বেন ছিলেন সত্যিকারের সখারী বাহুধ।
বাগ্যানবাড়ি গিবেও কখনও বাড়ির কথা ভুলে যাননি।
সঙ্গার করেছেন, ধর্ম করেছেন, আবার বয়স থেকেছেন,

বাগানবাড়িও রেখেছেন, একজনে মা-মণির কোনও ভা ছিল না কোনওদিন, সম্বন্ধও ছিল না।

মা-মণি বলতেন—এমন বামী ক'জন পেরেছে আমার ঘাড়ে? অনেক ভগ্না কালে এমন বাহুধ বলে, বোঁধা—

এতিদিন সকালবেলার যখন কর্তাবাবু বাড়ি থাকতেন, কর্তাবাবুর পাচোদক না পান করে জলস্পর্শ করেনি তিনি।

বৌ-মণিকে বলতেন—তোমার পুত্রকে ছুঁনি বেশিদিন কেবলে পাওনি বোঁধা,—সেখানে বৃত্তে পারতে কী বাহুধ ছিলেন তিনি—সেবহুলা বাহুধ, এমন হয় না।

বৌ-মণি কিছু বলতেন না। চুপ করে শুনতেন শুধু শান্তির কথা।

মা-মণি বলতেন—এতদিন এসেছে, এখনো খোকাকে ছুঁনি বশ করতে পারলে না, আর আমি?

একই খেনে বলতেন—আমাকে না-জানিয়ে তিনি কিছু করতেন না—বাগানবাড়ি বাবার আগেও আমাকে বলে যেতেন, এমনি বাহুধ ছিলেন তিনি—যদি যেতেন তিনি, ছোটবেলার অভ্যাস, কিছু আমি বললে তা-ও বেধের চাতুতে পারতেন—

কর্তাবাবু ভোরবেলা ঘুম থেকে কেঁরি করে উঠতেন। শেখের দিকে তিনি আর গারে অন্ধরে আসতেন না। নাচগারেই রাতের শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম-প্রথম বিয়ে হবার প্রথমদিকে, একসঙ্গে এক বিছানাতেই শুতেন দু'জনে। সকালে উঠে মা-মণি রোজ কর্তাবাবুর পায়ের ধুলা নিয়ে বাবার ঠেকাতেন। তারপর বাইরে যেতেন।

একদিন বেধে কেলেছিলেন। বললেন—পায়ের ধুলা নিচ্ছ যে হঠাৎ? কী হলো?

মা-মণি বলেছিলেন—আমি তো রোজই নিই—

—কেন নাও? আর নিজে না।

মা-মণি বলেছিলেন—ছুঁনি আপত্তি কোরো না, হিন্দু স্ত্রীলোকের স্বামীই দেবতা—

কর্তাবাবু বলেছিলেন—আমি তা বলে দেবতা নই।

মা-মণি বলেছিলেন—ও কথা বোলো না, আমার কাছে ছুঁনি দেবতাই—

কর্তাবাবু বলেছিলেন—কিন্তু আমার বে অনেক বড় রোগ আছে, রাতে মাঝে মাঝে বাইরে কাটাই, ঘুম পাই, তা জানো তো।

মা মণি বলতেন—তা যা ইচ্ছে তোমার করো, ছুঁনি আমার—

বড় গর্গ করেই সেদিন মা-মণি কথাগুলো বলেছিলেন। ডেবেছিলেন, সংসারের বেধানে আর যা কিছু তাঁক থাকুক, ঐকি থাকুক, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের দূরে কোথাও কোনও এমি থাকবে না—



তাই সেদিন যখন কর্তাবাবু বললেন মঙ্গলা দুর্গাবাড়িতে ভোগ রাঁধতে গেছে, তিনি বিশ্বাসই করেছিলেন।

কিন্তু মঙ্গলা তখন আর এক আঘাতে জর্জর হয়ে রয়েছে। আর এক নিতৃত ঘরে শয়্যাগ্রস্ত। দে-কথা কেউ জানে না।

কর্তাবাবু জানিয়ে দিয়েছেন—এ বিবেও যেমন সাময়িক, এ সন্তানও তেমনি সাময়িক এয়েজনে—

কর্তাবাবুই টাকা দিয়েছেন, লেখা-গুণ্ডা করবার লোক যোগেছেন, বাড়ি ভাড়া করবার খরচ দিয়েছেন। স্ত্রীমাং আমার সব মুছে কেলেতে হয়েছে। শরীরের জ্বাতি, পেটের সন্তান, সিঁঝি সিঁহুর, সব। টাকাও দিতে চেয়েছিলেন। যেখানে খুসি চলে যাবে, তোমার সন্তান থাক তোমার কাছে, কানে। কাছে কোনো পরিচর প্রকাশ হতে পারবে না। পারলে, বাড়ি হবে সে-কথাটা আর খুলে প্রকাশ করা হয়নি।

কিন্তু সেদিন কর্তাবাবুর প্রভাবে মঙ্গলা 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলেনি। শুধু মাথা নিচু করে থেকেছে।

মঙ্গলা আমার বেধিন এস বাড়িতে, হুজুমালা চেহারা বেধে অথাক।

বললে—ওমা, কী চেহারা, ঠাকুরের ভোগ রেঁধে রেঁধে ভোর চেহারা কী দশা হয়েছে রে মঙ্গলা—

মা-মণির ঘরে গিয়ে পায়ের ধুলাও নিয়ে এস।

মা-মণি বললেন—আবার বাড়ির ভোগ কে রাঁধে তার ঠিক নেই, হুই কিনা গেছিল দুর্গাবাড়িতে—

তারপর আছে আছে সেরে উঠলেন মা-মণি। পৃথক গ্রন্থ করলেন, উঠে সন্ধ্যার বেড়াতে পারলেন। শেষকালে একদিন কান্নার পাট উঠলো।

কর্তাবাবু শেখের দিকে কেমন একই স্বাতন্ত্র্য হয়ে পড়েছিলেন।

কী যেন বলতে চাইতেন। কী যেন বলতে পারতেন

না। কান্দিবালের পর থেকেই কেমন যেন অন্তরকম।
বাগানবাড়িতে বাবার আগ্রহ তেমন ছিল না। বহু-বাহন
আসতো, জগন্নাথবাবু আসতো, অনেককণ পবর দেবার
পর তবে নিচে নামতেন।

সাড়িতে ওইবার মূখে এক-একদিন বেশতেন হেঁড়া
নোংরা জামা পরে নবর এসেছে কাছে। বলেছে—একটা
পরশা পাওনা কর্তাবাবু—

জগন্নাথবাবু তাড়িয়ে দিত। বলতো—বা বা, বেহে
এখন থেকে, পরশা কী করবি রে?

—ল্যাবেন্দু খাবে।

কর্তাবাবু মুখখানা যেন কালো হয়ে আসতো।

ডাকতেন—পরশু—

পরশু কাছে এসেই বলতেন—এই একে খেতে দেবনা
কেন বলতো—একে কেউ খেতে দেবনা কেন?

—আজ্ঞে খায় তো ও।

—তাহলে ল্যাবেন্দু খাবে বলছে কেন। আবার
খেতে দিতে বল একে—রান্নাবাড়িতে বলে দিবি একে যেন
শেট করে খেতে দেব—আর ভাখ খাঙ্কানিবাবুকে একবার
ডাকতো—

নবর ততকণে কর্তাবাবুর পাঞ্জাবিতে মরশা হাত
লাগিয়ে কালো করে দিয়েছে।

খাঙ্কানিবাবু খাতা কেসে লৌড়তে লৌড়তে এলেন।

কর্তাবাবু বললেন—এ হেঁড়া-জামা পরে থাকে কেন?
দেখতে পাও না?

কালিহাসবাবু বললেন—আজ্ঞে, বড় ইতর হোঁড়াটা,
নতুন জামা দিতে-না-দিতে...

—চুমি খাবে।

হুয়ার লিরে উঠতেন কর্তাবাবু।

বলতেন—খোকাবাবুর বধন জামা-কাপড় হবে, তখন
এক ও হবে, দেখবে যেন ভাটা হয়ে আবার নামবে
না আসে—



কর্তাবাবু চলে গেলে সবাই বলাবলি করতো—হোঁড়াটা
কে?

মুখবিবাবু বলতো—হোঁড়াটা খুব বশ করেছে তো
কর্তাবাবুকে—

কর্তাবাবু পেটে-দেয়ে নাচবার স্তর তামাক পাচ্ছেন
হুগুংবেলা, শাল-বরদারও বোধহয় সেট সমস্তা রান্না-
বাড়িতে খেতে গেছে, হুতাং কোথা থেকে এক-পা খুলো
নিরে একেবারে কর্তাবাবুর গাড়ে চড়ে বসেছে—

—আরে, ছাচ্, ছাড়ু,—

নবরের তখন অস্ত বৃত্তি। গড়গড়ার নলটা খুব থেকে
কেড়ে নিয়েছে। বলে—দেবনা—

কর্তাবাবু বিবস্ত হয়ে উঠেছেন।

—ওরে, কে আছিস, জাখ, খু একে—

—তাহলে একটা পরশা দাও—

—পরশা কি করবি তুই?

—কিবে পেয়েছে।

—তোকে কেউ খেতে দেবনা বৃত্তি?

নবর পিঠে উঠে অভ্যাচার শুরু করেছে তখন।
মাথার হাত দিয়ে চুল টানছে। এমন করে কর্তাবাবুর
কাছে যে'যতে কারো সাহস নেই। খোকাবাবু পর্যন্ত
মূরে মূরে থাকে। কেমন লেখাপড়া হচ্ছে, শরীর কেমন
আছে সব সবটাই নেন তিনি, কিন্তু সে-ও এমন করে
কর্তাবাবুর পিঠে উঠতে সাহস করে না—

চুপি চুপি জিহ্মেস করেন—হ্যাঁয়ে, ভাত পেয়েছিল?

নবর বুকের খুব কাছাকাছি গুয়ে বুকের চুলঙলো
টানছে তখন।

বললে—হ্যাঁ—

—শেট ডরেছে?

—না।

কর্তাবাবু হেসে ওঠেন। মিথ্যেকথা বলছে বুঝতে পারেন।
মিথ্যেকথা বললেই আদর পাওয়া যাবে বুঝতে পেরেছে।
জগন্নাথবাবুকে জিহ্মেস করেন—খোকায় কেমন
পড়াগুলো হচ্ছে জগন্নাথবাবু?

—আজ্ঞে বেন্ন আছে খোকাবাবু, যা বলি টপাটপ
বুকে কেসে।

—আর ও?

—কে?

বেন্ন বুঝতে পারে না জগন্নাথবাবু। বললেন—কায়
কথা বলছেন?

—ওই আমাদের নবর?

জগন্নাথবাবু খুব বেকার।

—আজ্ঞে, ও চোড়ার কিছু হবে না, মোটে খাখা
নেই, কেবল খেলার মিকে বোঁক, ওর লেখাপড়া নিখে
কিছু হবে না, ওটা গওমুখ হয়ে কাটাতে দেখবেন।

—সওন্দর্য্য হবে ?

কর্তাব্যাবুর মুখটা যেন বিম্ব হয়ে এসে। যেন বড় কষ্ট পেয়েন কথাটা শুনে। সুখ কালো করে বললেন—পড়ে না ঘোটে ?

জগজ্ঞানবাবু বললেন—পড়বে কি আছে, মাথাতেই ওর ঢোক না কিছু, মাথার পোষের পোয়া আর কি !

কর্তাব্যাবু বললেন—একটু ভালো করে চোটা করে খাখো না—এমত হতেও পারে, সকলের কি আর সমান মাথা হয় ?

জগজ্ঞানবাবু বললেন—তুচ্ছা চোটা আশনার, তবে আপনি যখন বলছেন, দেখাযো চোটা করে—

খোকাবাবু আর নবর হাজনকেই ইচ্ছলে ভর্তি করে দেওয়া হলো। খোকাবাবু গাড়ি করে ইচ্ছলে বেত। ওলমোহর আলি গাড়ি নিয়ে হাফিজ থাকতো। মা-মনি নিজেকে তদারক করে খোকাবাবুকে বাইরে-বাইরে ইচ্ছলে পারিয়ে দিতেন। চাকর-বাকররা সহজ হয়ে থাকতো সে-সময়টা। একটু যদি বেগি হয় তো মা-মনির বহুনির অস্ত থাকে না।

—সেবছিন খোকাবাবু ইচ্ছলে থাকে, তোরা খোকাবাবু থাকিস সব ?

খোকাবাবু ইচ্ছলে গিয়ে যেন সমস্ত বাড়ির লোকের মাথা কিনে নেবে।

নবর দেখতে পেয়েছে। দৌড়ে সে-ও গাড়িতে উঠতে যার। একেবারে পা-গানিতে উঠে ঠাঁড়িয়েছে।

—আমিও গাড়ি করে ইচ্ছলে যাব—

—ওরে বাম বাম !

ওলমোহর আলি আর একটু হলে গাড়ি চালিয়ে দিত। নেহাত থাকিয়ে ফেলছে ঠিক সবই। আবহুল পেছন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো।

—উতরো, উতরো তুই।

নবর বলল—না, নামাযো না—আমিও গাড়ি চড়ুবা।

ওলমোহর আলি শাসাতে লাগলো—বাবুকে বোলাও, জ্ঞানি—

কিছুতেই কিছু হলো না। জোর করে নবরকে নামিয়ে দিলে গাড়ি গড়গড় করে গড়িয়ে চলে যেল সেই দিকে। নবর রাগ করে ইচ্ছলেই গেল না। সমস্তক্ষণ বেহেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলো। তারপর কাঁদতে কাঁদতে একদমর কখন ঘুমিয়েও পড়লো।

এ-সব ছোটবেলাকার ঘটনা। তারপর কর্তাব্যাবু মাথা পেছেন। মারা মাথার আসে ক'খাস আদ নিচেও নামতে

পারেননি। নবর ওপরে উঠতে গেছে। পরমন্ত খেঁকিয়ে উঠেছে—মা, ঘোরা এখন থেকে—

কর্তাব্যাবুর তখন অস্থির বেশ। ঘরে কেউ নেই। পরমন্তকে চেঁকে বললেন—নিচে কে কাঁদছে রে ?

—কই আছে, কেউ তো কাঁদছে না—

—আমি যে ওনতে পেলুম। দেখে আঁখ দিকিনি ?

পমন্ত বাইরে গেল। বাইরে থেকে উকি দেবে নিচের কেবলে। একবার বাতাসখা গিরে গাড়া। তিন মরল বাড়ির রক্তে রক্তে বড় লোক খাসা বেঁচেছে। কত মাত্রা পুস্তকাসুত্রের অর্থ-সংস্থানের চেষ্টার এ-বাড়িতে এসে আসার নিচেয়ে হুগ হুগ হয়ে। কেউ ঠেকেছে, কেউ ঠিকিয়ে গেছে। কেউ মরেছে, কেউ বেয়েছে। তবু এ-বাড়ির ইট, কার্ট, গাছপালা, স্তম্ভশাখ মতো এ-বাড়ির সঙ্গে ভাঙা আটপুটে জড়িয়ে বেঁচেছে—তারপর সকলের কোলাহল, সকলের চীৎকার, সকলের কান্না আর হাসির শব্দ ঘনি-ঘরে রাধা বেত তো এর ইতিহাস শুনে আতঙ্কের লোক চমকে উঠতো, পিউরে উঠতো। কিন্তু কোথায় সব ভগিয়ে গেছে, কোথায় হাসিয়ে গেছে। সে আর দেখা যাবে না, সে আর হুঁচি শোনা যাবে না।

পরমন্ত বলে—না হুজু, কেউ তো কাঁদছে না—

—ওই মাত্রাবাড়ির দিকে একটু কান পেতে শোনা তো ?

মাত্রাবাড়ির দিকেও কান পেতে শুনেছে। কিন্তু সব চূপচাপ সেখানে। শিশুর-মা সেখানে শুধু তরকারি কোটে, পাটনা বাটে আর একটা-হুতো কথা বলে মরলার সঙ্গে। মরলা তার উত্তরই দেয় না।

—হ্যাঁ বিবি, জোয়ার তো ভাগিয়া ভালো, তবু বাবা খিননাখের চরম বর্পন করছে। আমাখের যে কী কপাল।

মরলা চূপ করে রাধা করে যার চারটে উঠানে একগলে। জাত ভাল কোল কোটে টগবু, করে। জল গরম হলে কেমন একটা পৌ-পৌ শব্দ হয়। হাড়ির ডেতের মাংস রাধা হলে কেমন একটা তবু তবু শব্দ শুনেতে পাওয়া যায়। আর যাকে যাকে বাইরের বোঝাকে শিশুর-মার শিপ-বোড়া খবার শব্দ। একটানা। কান্নার গদ্যর জলের পৌ-পৌ শব্দের মতো এ বর্ধন লেগেই আছে।

—ও বামুনি, ওই জামো সেই ছোঁড়াটা যেতে এসেছে, আবার আমাখের আঁখ।

নবর চীৎকার করে পেতে বলবার আসেই,—আজ যদি মাছ না মাও তো কর্তাব্যাবুর কাছে লাগাবো দিবে—

—দেবনা তোকে মাছ, কী করতে পারিল দেখি আমি!

শিশুর-না: কোমরে কাশড় জড়িয়ে মাংসমূগা হয়ে আসে।

নক্ষর বলে—মাংসে নাকি ছুঁমি?

—হ্যাঁ মাংসে,—ছোঁড়ার মুখে আগুন, শুনলে বায়ুনি ছোঁড়ার কথা, আবার মেয়েছেলের গায়ে হাত দিতে আসে—

নক্ষর বলে—আমি তোমার গায়ে হাত দিতে আদিনি, ছুঁমি বামো—

ব'লে ডাকে—বায়ুনি—

মহলার বুকের ভেতরটা ধকধক করে ওঠে।

—কানে কথা যায় না বুঝি কারো?

একবারে রাস্তাবেরে দরজার কাছে এসিয়ে আসে নক্ষর।

তারপর মহলার মুখের দিকে তাকিয়ে কী একটা বলতে গিয়ে বেয়ে যায়। বলে—তোমার চোখে কী হলো গো বায়ুনি? জল পড়ছে কেন গা?

মহলা ততক্ষণে মলটা মুছে নিয়েছে।

নক্ষর বলে—কাটা তেলে কোড়ন গিরেছিলে ছুঁমি? দেখি দেখি, চোখটা দেখি—

শিশুর-না'র আর সঙ্ক হলো না। বললে—বোহো, ছোঁয়া-লেপা কাশড় নিয়ে রাস্তাবাড়ি থেকে বেয়ে বলছি—নইলে ডাকবো ছুঁমি দরওয়ানকে দেখিনের মতো, বোহো বলছি—

হাতে একটা গোদার বেড়ি নিয়ে ডেড়ে এসেছে।

কি আমি ছুঁবের নাম শুনেই বোহুদর ভব পেলে নক্ষর। রাস্তাবাড়ি থেকে হুড়হুড় করে বেরিয়ে এল। তারপর বললে—হুড়োর তোর ডাতের নিকুটি করেছ, ডাত বিনিয়ে তো বয়ে গেল, দেখি ডাত না বয়ে থাকতে পারি কিনা—

শিশুর-না'ও পেছশাও হয়। বলে—তাই ভাণ্ড ছুঁই—আনিও দেখি, এবার খেতে এলে খ্যাখো-পেটা করবো এই বলে গেলুম—

কিন্তু আর কেউ না বুক, কর্তাবাবু বৃত্ততে পারতেন। বলতেন—ওই রাস্তাবাড়ির দিকে একই কান পেতে শোন তো?

পরমন্ত এসে বলে—কই, রাস্তাবাড়িতে তো সবাই চুপ, ওখানে তো কিছু গোলমাল নেই?

—গোলমাল নেই?

শেখের দিকে মা-মনি কাছে এগেই বেন একটা কী কথা বলতে চাইতেন। কী বেন বলতে চাইতেন, কী বেন বলতে সাহস পেতেন না।

মা-মনি বলতেন—কিন্তু বলবে ছুঁমি?

কর্তাবাবু বলতেন—খোকা কোথায়?

—নে তো নিজের ঘরে রয়েছে, ডাকবো তাকে?

—না, ছুঁমি বোসো একই।

মা-মনি অনেকক্ষণ বসে রইলেন পাশে। মাঝার হাত দিয়ে টিপতে লাগলেন।

বললেন—কই, কী বলবে বলছিলে যে?

কর্তাবাবু বললেন—জমা-বরচের খাতা কে দেখছে আজকাল?

মা-মনি বললেন—খোকা কে আমি দেখতে বলছি, মাঝে মাঝে গালাফিখানার বসে আছে—

—হুমুগুগুহের বন্ধকী সম্পত্তির মকদমটার কী হলো?

মা-মনি বললেন—ও-সব লেখবার লোক দেখেছ ছুঁমি, তুমিই দেখেছ, ছুঁমি আর ও-সব নিয়ে ভেবো না—

—ওরা কি পারবে?

—না পারলে না পারবে, তা বলে তোমাকে আর ভাবতে হবে না ও-সব।

কর্তাবাবু খেবে গেলেন। দানিক পরে বললেন—কান্না খেঁকে গুলদেবকে একবার ডাকতে হবে—

—বেন?

কর্তাবাবু বললেন—অনেকদিন আগে কান্না গিয়েছিলাম, তোমার অস্থর হয়েছিল খুব—খুব অস্থর—

মা-মনি বললেন—মনে আছে—

কর্তাবাবু বলতে লাগলেন—মনে তো থাকবেই, মনে তো থাকবেই, স্মারকও মনে আছে, মনে থেকে কিছুতেই ডাকতে পারছি না, কেবল মনে পড়ছে—

—পে-কথা না-ই বা মনে করলে। আমি যে লেখার ভালো হয়েছি সে কেবল বিশ্বনাথের দ্বারা—

কর্তাবাবু আগতি করতে লাগলেন—না গো না, বিশ্বনাথের দ্বারা নয়, বাবা বিশ্বনাথের দ্বারা নয়, সবই ভবিষ্যৎ,—

সেদিন মা-মনি বাস-বরদারকে জিজ্ঞাস করলেন—কর্তাবাবু কেন আসছেন রে?

বাস-বরদার বললে—বাবু চিঠি লিখছিলেন না—

মা-মনি ঘরে ঢুকলেন। বললেন—এই পরীরে আবার চিঠি লিখছিলে। কোথায় এমন চিঠি লেখবার স্বরকার হলো এমনি?

কর্তাব্যবস্থাপন—কানীতে—

—কানীতে কার কাছে ?

কর্তাব্যবস্থাপন—ওরফেবের কাছে—

এর পর আর বেশিদিন ধাঁচেননি কর্তাব্যবস্থাপন। এর পর থেকে যামিনী সংসারের সব চাবিকাঠি হাতে নিয়েছিলেন। স্বাক্ষরকারীর হিসেব যোগ্যকার মতো তিনি কুঁড়ে নিতেন। জগদ্বারদ্বারব্যবস্থাপন আটকানি হয়েছেন। যামিনী-মোকদ্দমার ব্যাপারটা তিনিই এসে কুঁড়ে-তুলে নিয়ে যেতেন। পড়াশোনা হলো না যাকনোয়। কিছু উপায় নেই। কিন্তু পরচটা বেঁধেছেন যামিনী। স্বাক্ষরকারীর খাতা থেকে অনেক বাক্য-পরচের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।

পুরোহিত-বাড়িতে মাসকাবারি বন্ধাবস্ত ছিল একখানা দুটি, একটা শাড়ি, আদমণ ডাল, একখানা সিঁকে, আর গামছা।

ওরফেবের নামে বাৎসরিক প্রণামী যাবৎ বরাদ্দ ছিল নগদ পাঁচশো টাকা, পাঁচখানা দুটি, ওরফেবের জন্তে তিনটে শাড়ি, একগোটা সিঁহর, তিনমণ ডাল, আর দুখানা গামছা।

তারপর দান-খরচাতেরও বরাদ্দ ছিল নানা। আরগায়। হুগু-হুগুরের জ্যাকিসের পুজোর সময় কাপড়, চাকর আর টাকা। এমনি কত অসুখো! সংসার সেনের যখন সময় ছিল, তখনকার বেওরাক সব। বংশের উন্নতি হয়েছে, ভোগ বেড়েছে আর সবে সবে দান-খরচাতের কর্তব্য সব বড় হয়েছে কবে কবে। তখন ধানকল ছিল, তেলকল ছিল বেলেঘাটার, খড়ের আধাবানি-বগুনি ছিল, তেলারতী ধাক্কানী ছিল। যখন ছিল তখন ছিল। এখন

নেই, এখন সব কদমতে হবে। ভগবান দিন দেন তো আবার হবে। আবার বড় হবে মর্গ।

যামিনী নিজে কাঁড়িয়ে কান পেতে শুনেছেন আর কানিহাসবাবু শড়ে গেছেন।

যামিনী বলেছেন—পাঁচখানার বদলে দুখানা দুটি করে করে দিন—আর নগদ টাকা একশো—ওতেই চালাতে হবে—

তারপর বললেন—বড়বাবুর হাতবরচ গেলমানে কত গিয়েছেন?

—আজ্ঞে, চক্কিরহাজার সাতশো তেরটি টাকা ন'আনা।

থোকনের আর সে যতান নেই। অনেক শুয়েছে এখন। আগের চেয়ে অনেক শুয়েছে। আগে মাসের মধ্যে চারদিন পাঁচদিন বেগোত। এখন একদিন। কোনও কোনও মাসে বড়কোর দুদিন। কিন্তু মাঝার সময় মাষ্টার জগদ্বারদ্বারব্যবস্থাপন সবে থাকে। যাবার আগে যামিনীর পারের দুসো নিয়ে যাব এখনো। বৌদ্বার সবে দেখা করে যাব। যামিনী পেছা-বাগানের পরবত তৈরি করে দেন। মাছের মুড়া সেন পাতে। বাড়ির মি।

থোকন এসে প্রণাম করে পারে।

বলে—হা, অমৃত কই, আমি তাহলে?

দিলে-সেওয়া পাখিদি পরে কোচানো শাড়িপুরে দুটি পরে এসে বারাক্ষর ওপর পশ্চত জোড়া মূলে বেখে যামিনীর মূলে আসে। নিচু হয়ে পারের দুসো নিয়ে মাঝার তৈকার থোকন।

যামিনী বললেন—এই পরীষ বাগান নিয়ে আবার কেন যাক্ক বাবা।



বড়বাবু বলেন—শরীরটা কেমন ব্যাক্‌ম্যাক্‌ করছে বড়ো—

মা-মনি বলেন—তাহলে একবার ডাক্তারবাবুকে ডাকতে পারিগে হতো—

বড়বাবু বলবেন—ও ডাক্তার-ফাক্তারের কন্ড নয়, বা—ও কিছুনিচি টাকার নই, মুখ নই—

মা-মনি তখন সাবধান করে বলেন—কিছু বেশি অভ্যাচার বেন না হয় দেখো বাবা, শরীরটা আগে—

ভক্তি করে পাথের ধুলো নিয়ে বড়বাবু তখন চলে যাবেন বৌ-মণির ঘরে।

বৌ-মনি এতক্ষণ সমস্ত শুনেছে। সকাল থেকেই শুনে আসছে। সকাল থেকেই আতঙ্কিত করেছে, সকাল থেকেই সোজাছে গুজোছে। আলবাথি থেকে ভালো লাড়িটা বের করে পরেছে। ফানের হাতের নাকের গরনাওগুলো বার করে পরেছে। সব সাজ-গোজ এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

বড়বাবু ঘরে ঢুকতেই বৌ-মনি এগিয়ে এসেছে।

বড়বাবু বলেছে—আমি চললুম, জানলে—

—আবার আতঙ্কে কেন?

—খাই একটু ঘুরে আসি।

—না গেলেই নয়? তোমার শরীরটা ঠায়াপ, এই ভাতা শরীর নিয়ে আবার কেন যাচ্ছে?

বড়বাবু বললেন—শরীরটা বড় ব্যাক্‌ম্যাক্‌ করছে আজ—খাই, কেন?

তারপর গুলমোহর আসি গাড়ি ছুতেছে। আবহুল দরজা খুলে ঝাঁড়িয়ে বেকেছে। আর নকর? বে-নকরের সারা মাসে পাতাই পাওনা বাহ না, বে-নকরের দ্বাৰ এ-বাড়িতে কানাকড়িও নেই কারো কাছে, সেই নকরেরই আবার অস্ত্র মূর্তি তখন। ভেতরে লাল সিঁড়ের সেজি, টাইক-টাইকা চুল খেঁটেছে, পাতলা পাঞ্জাবির পকেটে পরমা কনকন করছে—

চীৎকার করে ডাকে—গুলমোহর, গাড়ি লে আও—

কত কাজ তার! অ্যাটর্নীর-অফিস থেকে জগদ্বারণ-বাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে সেই। একা সমস্ত কলি নিয়েছে। শু পি জগদ্বারণবাবু! বড়বাবুর তবির-তদারক থেকেই করতে হবে। বড়বাবুর মূর্তির কৌটা যদি ঝাটিতে মূর্তির কাটা লাগে তো নকরকেই তা ছুঁলে দরতে হবে। বড়বাবুর তোমার করাই এখন কাজ নকরের।

বড়বাবুর ঘর গেলে নকর-ই তাকিটাই এগিয়ে দেয়। বড়বাবুর সিগারেট ভেটাই গেলে বেশদাই দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দেয়।

বাড়ির সামনে ঠে-ঠে বাড়িরে তোলে নকর—আই, হুই বাও সব, হুই বাও—এখন নেই হোগা—বড়বাবু বেরোচ্ছে এখন—

বাঝাকি কালিদাসবাবু, নুহরিবাবু তাকিয়ে তাকিয়ে জাণে আর মনে মনে গজ্জার।

চুপি চুপি বলে—নকর বেটার বেমাক জাণে—বেটাই বেন আজ লাট্টা না বেলাটে—

কিন্তু নকরের নুহর ওপর কারো কথা বলবার সাহস থাকে না সেদিন। কারো সাহস হয় না নকরের ব্যাণের দেখে হাসে নুহর ওপর। বড়বাবুও সেদিন কথাত কথায় নকর আর নকর।

সেদিন সকাল থেকেই বড়বাবু ডাকাডাকি করে—

হ্যাঁ, নকর কোথায়?

নকরও গিয়ে একবারে পারের ধুলো নিয়ে জিতে ঠেকিয়ে দেয়।

বলে—আমাকে অরণ করেছেন বড়বাবু।

বড়বাবুর কথা বলতে বেন কই হয়। বলেন—কোথায় থাকিস তুই, জগদ্বারণবাবুকে একবার ববর দিতে হবে যে—

—আজ্ঞে, ওস্থনি ববর দিচ্ছি বড়বাবু।

বলেই ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে তদুতর করে নেবে আসে। তখন যদি কেউ সামনে পড়তো তো মায়-মায় কাও বেখে যাবে।

—বেখতে পাননা উল্লু কোথাকার, কানা নাকি!

চল বড়বাবুর কাছে চল—শিগ্গির চল—

হাতে বোহরহ মাঝা কাটতে পারে তখন নকর।

তারপর এখন বড়বাবু মা-মণিকে প্রশাষ সেয়ে বৌ-মণির সঙ্গে দেখা করা সেয়ে নিজে নাযবে, জগদ্বারণবাবু ঝাঁড়িয়ে থাকেন, তিনি এগিয়ে যাবেন। বড়বাবু আছে আজ্ঞে জাণিতে উঠলে জগদ্বারণবাবু পেছন পেছন উঠবেন।

আবহুল হরজা বহু করে দেবে।

নকর গাড়ির মধ্যে একবার উকি মেয়ে বলবে—তা মুলে গাড়ি ছেড়ে যেব স্তার?

বড়বাবু বলবেন—চাড়, চাড়তে এত দেখি কেন তোমের?

আর কথা নেই। দুখন দিও গেই মুলে গিয়ে ঝাঁড়িয়ে ছিল। নকর জড়াক করে ওপরে গুলমোহর আসির পাশে বসে বলবে—চালাখ—চালাখ পাননী বেশদরিয়া—

বড়বাবুর সঙ্গদানাড়ি বেশদরিয়া। জগদ্বারণবাবুকে

অনেকবার বলেছিলেন মা-মনি—আপনি তো এ-বাড়ির সব জানেন, আইনের কাগজপত্রের সবই তো আপনি দেখেছেন, এস্টেটের আর সে-আর নেই, এখন একটু তৃষ্ণিত-হৃদয়ে বলবেন—

জগন্নাথবাবু বলতেন—আমি তো বলি মা-অননী, একটু একটু শুধরেছে আত্মকাল—এখন মাসে একবার করে যান, এর পর দেখবেন একবারে বন্ধ করে দেব—

মা-মনি বলেন—আর শরীরটাও তো আগের মতো নেই কিনা খোকার—

—সে তো বেশভেই পাচ্ছি, এখন এক গেলাস খেলেই টলতে থাকেন।

মা-মনি বলেন—বা ভালো যোবেন আপনি করবেন, আপনি ওর মাস্টার ছিলেন—আপনিই ওর গুরু মতন—আপনার ওপরই ভরসা—

ছোলে চলে যাবার পর মা-মনি ডাকেন—বৌমা—
বৌ-মনি এসে দাঁড়ান।

মা-মনি বলেন—খোকা দেখা করে গেল তোমার সঙ্গে?

বৌ-মনি বলেন—হ্যাঁ—

—কবে আসবে কিছু বলে গেল?

বৌ-মনি বলেন—তাড়াতাড়িই আসবেন বললেন—

এতোকবারই তাড়াতাড়ি করে অসার কথা দেন বড়বাবু। তবু প্রতিবারই দেরি হয়। তিন দিন তিন রাতের আগে কখনও ফিরতে পারেন না। বেলাঘরিয়া গিয়ে বড়বাবু পৌঁছুবার আগেই থবর পৌঁছে যায়। নকর গাড়ি থেকে নেবেই বড়বাবুকে ধরে নামিয়ে দেয়। দ্রুতির গোচাটা নিজের হাতে তুলে দেয়। তারপর বলে—আপনি নেমে আহ্নান স্নান, নেমে আহ্নান আগে—

বড়বাবু বলেন—বোতলগুলো রইল—

নকর বলে—আপনি কিছু ভাববেন না স্নান, নকর আছে—

তারপর বাড়ির চাকর-বাকর কোঁড়ে আগে। এসে বড়বাবুর পায়ের ধুলা ঠেকায় মাথার।

বলেন—তোরা আছিস কেমন সব?

লবাই বলে—আগ্রে আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি—

জগন্নাথ একশাপে নকরকে ডেকে বলে—নকর, তবগটিকে খবর দিয়েছিস তো, এখনও এসে পৌঁছল না—

নকর বলে—সব ঠিক আছে অ্যাটর্নীবাবু, আপনি ভাববেন না, নকর তোলে না কিছু—

—আর মাগা? তুলের মাগা?

নকর বলে—তুলগলা গাড়ি করে তুল নিয়ে দিয়ে যাবে, সাত টাকা যাবনা দিয়ে এসেছি—

হাঁকাতে হাঁকাতে বড়বাবু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠেন।

নকর আসে আগে গিয়ে কয়ালের ওপর চানরটা ঠিকঠাক করে কেড়ে দেয় হাত দিয়ে। তারপর তাকিয়া গোলগাল করে দিয়ে বলে—বহ্নন স্নান আরেস করে—

তারপর ডাকে—আ্যাঁ, হাখারমণ না স্নানমণ—
কী নাম তোয়?

চাকরটা খতমত ঘেবে বলে—গোকুল—

—ওই হলো, হাওলা কব্বা বেটা, দেখছিস বড়বাবু ঘামছেন—

বড়বাবু বললেন—এক গেলাস জল—

নকর লাফিয়ে উঠলো।

—আ্যাঁ, কে আছিস, বট্টী—বট্টীচরণ না বট্টীচরণ কী নাম যেন বোটার—

গোকুল বললেন—আমি বাচ্ছি—

নকর বললেন—তুই না, এই বে বট্টীচরণ, বেশ ভালো করে শ্যামল দিয়ে হাত ধুয়ে বম্ব দিয়ে জল স্নানবি এক গেলাস,—

তারপর নিচু হয়ে বড়বাবুর নুখের কাছে হুখ নামিয়ে বললেন—সোডা ঢালো স্নান?

বড়বাবু যেন বিরক্ত হলেন। বললেন—হবে, হবে, অত তাড়া কিসের, একটু হাঁক ছাড়তে যে যে বাবা—

নকর হাতের ধুলা-টুলা কেড়ে নিয়ে বললেন—আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্নান,—

জগন্নাথবাবু বললেন—নকর, তবলচি এলো কিনা জাপ তো তুই আগে—

বড়বাবু বললেন—আবার তবলচি কেন মাস্টার?

জগন্নাথবাবু বললেন—একটু গান-টান হবে না? অনেকদিন গান-টান শুনি নি কিনা, ভালো বাজার আর কি,

লহবাতো খুব নাম আছে লোকটায়—

বড়বাবু বললেন—একটু জিরিয়ে এসেছিলাম এখানে, তা-ও তুমি যাবে না দেখছি মাস্টার—

—তা তুমি যদি না চাও বড়বাবু তো থাক না, এই তবলচি এলো তাকে চলে যেতে বলবি নকর—

বড়বাবু বললেন—এই তোমার যড় ঘোষ মাস্টার, তুমি অমনি রাগ করলে—বান্নাতে এসেছে তো চলে যাবে কেন আবার। শুধাক দিতে বল নকর—

নকর বলল—এই বট্টীচরণ, বেটা জল দিয়ে চলে

যাক্সি—তামাক দে—ততক্ষণ সিগ্রেট ধান ভাব—বলে
সিগারেটের কেণ্ডা খুলে বাড়িয়ে দিলে লামনে।

হঠাৎ পানের দরজার পরণা নড়ে উঠলো।

নক্ষর কানের কাছে মুখ এনে বললে—ওই বা আসছেন
বড়বাবু—

তৎপরে কাগড়ে আগাগোড়া হুড়ে গিটীবাবি হামুখটি
ভেতরে এলেন।

লগজারপন্থাবু একই নড়ে জারগা করে দিলে। বললে
—আমুন বা, এই দেখুন কাকে ধরে নিয়ে এসেছি—

বড়বাবু বললেন—না না, আমি তো ক'দিন থেকেই
ভাবছি আসবো, খুৎ করতে পারছিলাম না তাই—

বড়বাবু পাবে হাত দিতে প্রণাম করলেন।

মহিলাটি বললেন—বাকু, বাকু, বেঁচে থাকো বাবা,
আমিও ক'দিন থেকে ভাবছিলাম ছেলে আসেনা কেন, আর
—টে'পিও তো নবীরটা ভালো নেই কিনা—

নক্ষর মুকিয়ে ছিল। বললে—কেন, বৌদিমণির আবার
কী হলো না?

—গীত কনকন করছে কাল থেকে, কিছু মুখে দিতে
পারে না—পানের নেশা আছে তো, পান না মুখে দিলে
আবার একদণ্ড থাকতে পারেনা আমার টে'পি—

নক্ষর বললে—এখন কেনন আছেন বটুদিমনি?

মহিলাটি বললেন—আজকে মুঠো পান খেবেছে,
হামানবিক্কেতে চেঁচে দিলুম। বগি, ভাত না হলেও চলবে
কিছু পান না হলে তো ভোর চলবে না—তা দে-কথা বাকু
—তোমার বা-দি কি কেনন আছেন বাবা?

বড়বাবু বললেন—ভালো—

—আহা, ভালো থাকলেই ভালো বাবা, ছুদি বা-দিকে
বেথো বাবা, সংসারে মায়ের তুল্য আর কেউ নেই বাবা
জানলে—আর আমার বৌমা কেনন আছে?

বড়বাবু বললেন—ভালো, আপনি কেনন আছেন?

—আমার আর থাকাবাকি বাবা, টে'পিকে আর
তোমাকে বেধে বেতে পারলেই হয় বাবা। টে'পিকে তাই
বগি, ছেলের আবার কোনও বক্সাট নেই, ভোর কপালেই
আমার অধন ছেলে জুটেছে—। তা তোমার নবীর
ভালো আছে তো? কী বাবে বাবা আজ রাত্তিরে?

বড়বাবু বললেন—আপনি নিজের হাতে দাড়া করে
বা সেবেন তাই থাকবে বা, আমার খাওয়ার জন্তে আপনি
ব্যস্ত হবেন না—

মহিলাটি বললেন—আজ দুইটর চণু করেছি বাবা,—
আর সব শোলোয়াবী চালের শোলোয়া—

নক্ষর বললে—তোকা তোকা,—

বড়বাবু বললেন—বামু তুই নক্ষর, অশনার এট নবীর
নিয়ে আবার এত পাটতে সেলেন কেন বা?

—বাইনি কেন বলছে বাবা, ছেলের জন্তে কি মায়ের
কট হয় বাবা? আহা, টে'পিও সকাল থেকে খুব পাটছে
আমার পেছনে—

বড়বাবু বললেন—নবীর নটে করে হাড়া-বাড়া করার কী
দরকার ছিল—

—না, তা হোক, ছেলে থাকে আর টুটো হাতে বাস
থাকবে। আমি, তা কি হয়, টে'পি বললে দুইটর চণু তুমি
খেতে ভালোবাসো, তাই— আছা বোমো! বাবা, আমি
টে'পিকে ডেকে দিচ্ছি—

টে'পি আহুত। সংসার সেনের আমল থেকে এ-বংশে
কত টে'পি কত পুতুলমালা কতবার এসেছে কতবার গেছে
তার হিসাব থাকাকিনানার নবিশর দেখলে হয়ত মিলবে।

হয়ত আরো অনেক কিছুই মিলবে দেখানো। এ-বংশের
আদে-বায়ের হিসেবের সঙ্গে সেট অন্তর আর অশবাবের
একটা ফিফিঙে মিলবে। দীর্ঘদিন ধরে একটা ধরা চলে

আসতে আসতে কীলহয়ে এসেও, তার জের দিহা-উপদিহার
যথো আদও চলছে। দুইটর চণু, সুলের মালা, তবলতি,
টে'পির পাঁতের জাখা,—কিছুই কোনদিন বাদ পড়েনি

এখানে, এখনও পড়লো না। এর পর টে'পিও আসবে।
আর তুমি টে'পি নয়, জুয়েলার্স যনহুখলাল-কোম্পানির
শেরীজীও আসবে। হীরে, পাথর, চুনী, জহরত, জড়োয়া

গরনার নমুনাজি বার করবে। দেখাবের টাকাটা এবারে
শোধ হবে। এবায়েখ জড়োয়ার নেকলেসটিও বাবু পনের
বাবো মিটলেই চলে যাবে। বড়বাবু তো নতুন অচেনা

আমনি নয়। চেনা ঘর। হাজার হাজার লাখ লাখ
জড়োয়া পড়ে বাকু না—। তামায়া করবে না জুয়েলার্স
যনহুখলাল আও কোম্পানি। আর তারপরেই

বাকাকিনানার খাতার বড়বাবুর নামে এই দিনের মোট
বরগা লেখা হবে—চম্পন হাজার সাতাশো তেইশটি টাকা
ন'আনা—

হাত তখন অনেক। বা-দির বাগানকার জানালা
থেকে বড়বাবু দেখা যায় সব জাখোয়ায় অন্ধকার। সব বাড়ির
আলো নিভে গেছে এখন। বৌ-বশির ঘরের দরজা-

জানোলা বন্ধ। বাইরে দিছুমনি অপেক্ষা করতে করতে
হুঁকি কখন ঘুরিয়ে পড়েছে।

ওকপুত্ব অনেককণ চলে গেছেন। কান্নার পতিত

নিরিপদাধর ব্যাচপতির ছেলে। অনেক চৌল, অনেক কামের ওকলের তিনি।

ওকপুত্র বাবার আগে বলেছিলেন—এই চিঠিটা বাবা আমাকে দিয়েছেন, কর্তাব্যব হুঁড়ি বছর আগে এ-চিঠিটা বাবার কাছে লিখেছিলেন—

তখনও চিঠিটা পড়ে আছি। কর্তাব্যবর হাতের লেখা চিঠি। স্মৃতির কয়েকদিন আগে চিঠি লিখেছিলেন বটে! কিন্তু সে চিঠি যে কবিত্তে ব্যাচপতি মহাপুরুষকে লিখেছিলেন তা এতদিন পরে জানা সেল।

মা-মনি বার বার চিঠিটা নিয়ে বেথতে লাগলেন।

কখনও লেখাপড়া শেখেননি তিনি। লিখতে পড়তে কেউ শেখায়নি। তবে একদিন পাচবছর বয়সে এ-বাড়ির বউ হয়ে এলেন। সে তো অনেক কাল আগেকার কথা। তুলেই গেছেন সব। এতবড় বাড়ি, এত টাকা এমের। সব তাঁর অধিকারে।

কর্তাব্যব বলতেন—এই তো নিরম—

মা-মনি বলতেন—নিরম কি আর বলার না?

—কে বললো?

মা-মনি বলতেন—কেন, ছুমি বাড়ির কর্তা, ছুমিই বললো?

কর্তাব্যব বলতেন—বললে লাভ কী? এ-বাড়িতে একটু নিরম ঘেনে ঢালই ভালো!

মা-মনি বলতেন—তা বলে বলে সব মাইনে বাবে?

কর্তাব্যব বলতেন—কিন্তু ছাড়িয়ে দিলেই বা বাবে কোথার গুণ? ও কাজ করছে এ-বাড়িতে, ওর বাবা কাজ করেছে, ওর ঠাকুরদা করেছে, ওর ঠাকুরদার বাবা কাজ করেছে, আবার ওর ছেলে হলও কাজ করবে এ-বাড়িতে—

ওদের অমাই হয়েছে আমাদের সেবা করবার ক্ষেত্রে—ছুমি ও-সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে না—

তিনি সের হুঁড়ি হতো গল্পর। সব কি খেত কেউ! ফেলা-ছড়া ক'রে-ক'রেও ফুটাত না সব। মা-মনি হতুম দিলেন—যি হবে বাকী হুঁহে, রাগাবাড়িতেও লোক রয়েছে, কিছুই অত্যাধ নেই এখন তখন নই হবে কেন?

ওহু কি হুঁহ! সেই ছোটবেলা থেকে এখন বুকতে শিখলেন, দেখলেন এখানে অত্যাধ করলে সইবে না, অত্যাচার করলেও সই হবে না। অনিয়মও সইবে না। কিন্তু বত দিন বেতে লাগলো। আচ্ছ আচ্ছ মা-মনির অনেক কিছুই সই হয়ে এলো। তবু সই হলো না মিছে-কথা।

বলতেন—মিছে-কথা বললে আমি সই করবো না কিছুতেই—

প্রথম প্রথম খোকন বড় হওবার পর হঠাৎ এক-একদিন কোথার থাকতো, সারাদিন সারায়ত্ত বাড়ি আসতো না। হুঁদিন পরে হরত আবার বাড়ি এলো।

মা-মনি জিজ্ঞেস করলেন—কোথার ছিলে এতদিন?

খোকন বলতো—আট্টিকে পড়েছিলাম মা, আসতে পারিনি—

—কোথার আট্টিকে পড়েছিলে?

এর কোনও উত্তর নেই।

মা-মনি আবার বললেন—বলো?

কিছুতেই উত্তর দেয় না।

—বলো!

খোকন বললে—বন্ধুর বাড়ি।

—কোন বন্ধুর বাড়ি?

আর বলতে পারে না।



মা-মনি জিহ্মে করলেন—সবে কে কে ছিল?

যোকন বলেছিল—মাষ্টার।

—জগদ্বারণবাবু? আর কে?

যোকন বললে—নব্বয়।

জগদ্বারণবাবুকে ডেকে পাঠানো হলো। জগদ্বারণবাবু এসে বললেন—মিছে-কথা আপনায় না আছে বলবো না মা-জননী, আমরা গিয়েছিলাম পানবাগানে—

মা-মনি বললেন—আচ্ছা আপনি যান—

তারপর ডাক পড়লো নব্বয়ের। নব্বয়ে অকথা কুখ্যা বলে ধমকালেন বুঝি। তারপর হুহু হলো নিম-গাছে বেঁধে নব্বয়েক পঁঠিণ যা ছুতো মাঝা হবে। সে কী বিন একটা। নব্বয়েক যোক্তাবাবুকে গারাপ করে মিছে। যেখানে-সেখানে নিয়ে যায়। বহু ছেলে কোথাকার! বাড়িসুদ্ধ ১৫-১৫ পড়ে গেল। সকাল থেকে আর কোনও কথা নেই কারো মুখে। এক কথা কেবল—নব্বয়েক নিম-গাছে বেঁধে পঁঠিণ যা ছুতো মাঝা হবে।

গোহার-মাল-বাঁধানো ছুতো। নিমগাছের সঙ্গে আটপুটে বাঁধা হয়েছে নব্বয়েক।

চুপ সিং ছুতো দিয়ে মারছে আর বর-বর করে বক্ত পড়ছে গা থেকে। আর নব্বয় ঐক্য করে কহছে—আর করবো না গো, আর করবো না—ছেড়ে দাও—

গুণে গুণে পঁঠিণ যা। বহন পঁঠিণ যা শেষ হলো, তখন নব্বয় প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছে। লোক-লাইন দড়িটা খুলতেই কপ-কপে খসে পড়লো মাটিতে।

মা-মনি সম্বোধনো ডেকে পাঠালেন জগদ্বারণবাবুকে।

জগদ্বারণবাবু এলেন।

গুণ থেকে মা-মনি বললেন—সংসার সেনের বংশের ছেলে পানবাগানে রাত কাটাতে এটা বড় লজ্জার কথা মাষ্টারমশাই,—

জগদ্বারণবাবুও স্বীকার করলেন—আজ্ঞে, লজ্জার কথাই তো মা-জননী—

মা-মনি বললেন—তা আপনি এতদিন কর্তাবাবুর সঙ্গে ছিলেন, আপনার এই আনন্টা হলো না? বাচ্চদের কি আর ভালো জ্ঞানো নেই? কর্তাবাবুর বেলঘরিয়ার বাগান-বাড়িটা তো পড়ে রয়েছে, সেখানে যেতে পারেন না?

জগদ্বারণবাবু বললেন—আজ্ঞে, আমি তো নিমিষ্ট মার—

মা-মনি বললেন—না, আপনি একটা ভালো-গোছের ঘরে কেয়ুন, তাকেই রাখুন বাগানে, আমি ধরচা যা লাগে দেব।

জগদ্বারণবাবু শেদিন পারের খুলো নিয়ে চলে গেলেন।

তা সেইদিনই টে'শিকে খুঁজে বার করলেন জগদ্বারণবাবু। তাৎখানানের একটা ঘরে বা'র সঙ্গে ছিল। বড় দুঃখবশা। তাকেই জগদ্বারণবাবু এনে দে-বিত্তে গেলেন মা-জননীকে। যেহেঁটি বেশ খোঁচাখোঁচা। মাজা-ঘষা যং। যেহেঁটি মা-মণিকে প্রশংসা করত গেল।

মা-মনি হুপা পেছিয়ে গেলেন। বললেন—হু'য়ানো বাচ্চা—বাৎ—

গড়ন-পেটন দেবলেন। ঘুরিয়ে কিরিয়ে নামা ডাবের পরীক্ষা করলেন। কোনও খুঁত নেই।

মা-মনি জিহ্মে করলেন—তোমার নাম কী?

যেহেঁটি বলল—টে'পি—

মা-মনি টে'পির মাকে বললেন—তোমার ঘরে বেশ বাচ্চা, এখন তোমার ঘরের বসন্ত—বাও তোমরা—

তারপর হুহু হলো—বেলঘরিয়ার বাগানের বাড়িটা বেহাষত করতে হবে। বাট বিছানা পালত সবই আছে। কিন্তু কর্তাবাবুর চলে বাবার পর কেউ আর ব্যবহার করেনি শুকলো। তেওঁক বালিশ গবি সবই পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। আলমারির কাচ ভেঙে গিয়েছিল। সব আবার সাফানো হলো। তারপর ততদিন বেধে টে'পি আর টে'পির মা এসে উঠলো।

এর পর দ্বাদশমের বিয়ে হলো, দৌ-মনি এল। কতদিন কেটে গেল। একলা হাল হয়ে চলেছিলেন মা-মনি। একলা এই সমস্ত পরিবারের জীবনব্যতীরে মাথার বশে তিনি কলকাতা নেড়ে এসেছেন এতদিন, কেউ আশক্তি করেনি। যে নিয়ম ভেঙেছে তিনি তাকে শাস্তি দিয়েছেন।

কিন্তু আজ বুঝি তাঁরই শাস্তির পালা।

মা-মনি কর্তাবাবুর হাতের লেগা চিঠিখানা আবার দেখলেন। ছোট ছোট কালির আঁচড়। কিছু বোঝা যায় না। হুড়ি বছর আগে কর্তাবাবু লিখেছিলেন তাঁর কুল-গুণসেব গিরিগাহার বাচস্পতিকে।

গুণপূর বললেন—কর্তাবাবু বলেছিলেন এ-সম্পত্তির বতখানি হুবর্ণর প্রাণ্য, ততখানিই প্রাণ্য নব্বয়ের। বাবা বললেন—ও-ও তো বিবাহিত স্ত্রীর সম্ভান—গুণ সমান অধিকার আছে।

—কিন্তু আদি যে দত্তক গ্রহণ করেছি।

—কিন্তু এই নব্বয়েকই দত্তক গ্রহণ করবেন তিনি, এ-কথা তিনি বাবাকে বলেছিলেন। কিন্তু দত্তক-গ্রহণের বিন কাশীর লোককে বাড়ির ভেতরে চুকতে দেখনি আপনায় দহাইনি!

মা-মনি বললেন—কিছু তা হলে সে পাশ কাটবে? তার জন্তে আমার খোঁজ কেন ভুলবে?

গুরুপুত্র বললেন—কানীতে যে-সত্য তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, সে-সত্য আর বলানো যায় না; আমার বাংলা ভাই বললেন।

মা-মনি বললেন—কিছু যিনি কথা দিয়েছিলেন তিনি তো এখন আর নেই?

—কিছু আপনি তাঁর ধর্মপটী, আপনি তো আছেন? তাঁর পুণ্যফল কিবা? কর্তব্য সব তো আপনাকেই গ্রহণ করতে হবে।

মা-মনি কেঁদে পড়েছিলেন তখন।

সত্যিই কী নিয়ে ব্যস্তছেন তিনি! এই বংশের বিধবা হয়ে এতই সমাধি তিনি রচনা করে যাচ্ছেন! অনেক অপরাধ হয়েছে অবস্থা, আত্মা হচ্ছে, হৃদয় আরো হবে, কিন্তু তাঁর মনে মনে হলো এতদিন পরে তিনি ধ্বংস গেলেন। কর্তব্যশূন্য বলে তাঁর ভেতর জালা ছিল না। কিন্তু আজ যেন তাঁর পায়ে তলার মাটি আছে আছে সরে যাচ্ছে। এ বাড়িতে খোঁজ নেইও বতখানি অধিকার, মকরেরও ঠিক ততখানি। সে কেমন করে হয়। আর মজলা! মনে করতে চেষ্টা করলেন তিনি। সেই মজলা! কানী বাবার আগে বার বার সন্দেশ হয়েছিল তাঁর। তার চেহারা দেখেই সন্দেশ হয়েছিল।

মনে পড়লো, তিনি সেইসঙ্গেই সেদিন খাবার করে নিয়েছিলেন—কর্তব্যবাহুর সামনে আসতে—

—কিছু আর কারো রক্ত পাওয়া গেল না?

—আপনার সঙ্গে সকলের রক্ত তো মিশবে না। তাই বা। লক্ষ্য মিসিয়ে তাকেই বেছে নিয়েছিলেন।

—কিছু বিয়ে করার কী দরকার ছিল?

—আপনার বংশের পবিত্রতা রক্ষার জন্তে।

মা-মনি বললেন—কত লোকের রক্ত কত লোককে দেওয়া হয়েছে, তাতে তো কেউ আপত্তি করে না?

—তা করে না, কিন্তু বাবা কেমন করে তা গ্রহণ করবেন? তাঁর নিজের জীবন-বংশের যেমন একটিকে, অন্যটিকে ধর্মরক্ষা!

একবার শিঁড়ি কাছে গিয়ে ডাকলেন—সিদ্ধু—

সিদ্ধুমনি সেই ছোট জায়গাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। অসোয়ে ঘুমোচ্ছে। ভোরবেলাই গুরুপুত্র চলে যাবেন। আর বেগ হবে না। কর্তার চিঠিখানা আবার মূর্ত্যের মধ্যে থেকে বার কললেন। বামীর শেষ হাতের দেখা। বাবার টেকালেন একবার। ছুঁলি এ কী করলি? আমাকে

বলোনি কেন? তোমার সমস্ত কৃতকর্মকল আদি হাসিনুনে মাথার ভুলে নিভায়। কিন্তু কেন ছুঁলি অবিবাহিত করলে? কেন ছুঁলি আমার বিশ্বাস করতে পারলে না? আমার সংসার, আমার সন্তান, আমার পুত্র-স্বামীর জন্মভূমিকে আমি কেমন করে হুঁত্যাগ করে ভোগ করলো? ছুঁলি যেখানেই থাকো, এর জবাব দাও ছুঁলি। এর উত্তর দাও। ছুঁলি ডেবেছ ছুঁলি তো মুক্তি পাবে। ছুঁলি মুক্তি পেয়েছ, কিন্তু আমাকে কী বাধনে বেঁধে রেখে গেলো? আমি কেমন করে মুক্তি পাবো? এ সমস্ত যে আমার? ছুঁলি তোমার সত্য রেখেছ, তোমার কথা রেখেছ। কিন্তু আজ মুক্তি বছর পরে আমার কাছে এ কোন বোকা চাপিয়ে দিলে? তীরের সত্য যদি মিথ্যা হয় তো সে-পাশ ছুঁলি যেখানেই থাকো তোমাকেও স্পর্শ করবে, আমাকেও করবে। ছুঁলি আমি কি আলাবা?

কর্তব্যবাহু চিঠি গিয়েছিলেন গুরুবাবকে—দে-চিঠি গুরুপুত্র গড়ে তুলিয়েছেন—

পরম ধ্যানেন বসিত ঐশ্বরীমিথিগদ্যে বাচস্পতি

মহাপর ঐতহশাস্ত্রমু—

শত সহস্র প্রণামা নিবেদনকার্যে মহাপরমের ঐতহশাস্ত্রমু সত্য সর্বদা প্রার্থনা করিতেছি।...

এমনি করেই আরম্ভ করলেন কর্তব্যবাহু। বুল্লার কবিন আগেই চিঠি। শেষ জীবনে বড় অধির হতেন তিনি মনে আছে। সেই অবস্থায় কাউকেই কোনও কথা বলতে পারেননি সাহস করে। নিজের ধর্মপটী, নিজের ঔরসজাত সন্তান থাকতে তিনি দম্বক গ্রহণ করেছেন। তাঁর নিজের সন্তান তাঁরই বাড়িতে চাকরের মতো জীবন যাপন করে। তাঁরই ধর্মপটী তাঁরই বাড়িতে দাসীর কাজ করে। এ তিনি প্রকাশ করতে পারেন না। আপনি গুরুদেব, গ্রীষ্ম জীবনরক্ষার জন্তে আপনার আদেশেই তা করছি। কিন্তু আপনি আমার জানিয়ে দিন, তাৎপরে গ্রহণ না করে আমি মহাপাতক হয়েছি কিনা। পরজন্মে আমি মুক্তি পাবো কিনা। কিন্তু কেমন করে আমি গ্রহণ করবো তাৎপরে। আমার সংসার, আমার বংশ এ-সমস্ত বিবেচনা করে আমি কেমন করে ওদের গ্রহণ করি। আমি মোক্ষলাভ, সংসার এইসবের জন্ম সন্তানকে মা'র কাছে থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি। যা জানেনো তার সন্তান তার কাছেই আছে। আজ জীবনের শেষ সন্ধিক্ষণে পৌঁছে আমি আপনার কাছে এই পর দিলাম। আমার শেষ ইচ্ছা আমার সম্পত্তি আমার অস্বাধার সমস্ত হুই সন্তানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। আমার চোখে দু'জনেই

সমান। আমার কাছে আমার হুই স্ট্রী-ই আমার ধর্মপত্নী।
আপনার আদেশ আমি যখন আর একজনকে গ্রহণ করেছি,
তাকে আমার ধর্মপত্নীর স্বাধীন দেওয়াই উচিত ছিল।
কিন্তু আমি তা করিনি। এখন আপনারা সেই আমি সব
জায় দিয়ে গেলেন। আপনার অদৃষ্ট-গণনার আশ্রয় গ্রহণ
স্বীয় জীবৎকাল আর মাত্র কুড়ি বৎসর। কুড়ি বৎসর
পরে আপনি আমার এই ইচ্ছা এই আদেশ প্রকাশ
করবেন। অস্ত্রধার পরলোকের আমার আত্মা অশান্তিময়
হয়ে বিদায় করবে—

দীর্ঘ চিঠি!

গুরুপুত্র নিচের ঘরে গিয়ে গুরুরেছেন। তাঁর পিতারও
বৃদ্ধ হইবে। নির্ধারিত সময়ই এ-সংবাদ তিনি
প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর জীবৎকাল তো পূর্ণ হইতে
এলো। কর্তাব্যবস্থার পর মাত্র কুড়ি বছর। কিন্তু কুড়ি
বছরের পরও যে তিনি বেঁচে আছেন। গুরু অদৃষ্ট-গণনা
কি ভাবে মিথ্যা!

আর একবার সিদ্ধমণির কাছে গেলেন। সিদ্ধম
নিরন্তর বাড়ি। একটা বেড়াল বুকি নিঃশব্দে এ-ঘর থেকে
ও-ঘরে বাজিল। এত রাতে কোনওদিন মা-মণি জেগে
থাকেননি।

আবার ডাকলেন—সিদ্ধ, ও সিদ্ধ—

সিদ্ধ ধড়ফড় করে উঠে বললো। বললে—মা—

—মহলাকে একবার ডাকতে পারিস?

সিদ্ধ বললে—মহলাকে? এত রাতে? রাগা করতে
হবে?

—না, হুই একবার শুধু ডেকে নিয়ে আর ডাকে।

মহলা এসেছিল অনেক রাতে। মা-মণি বলেছিলেন—
সিদ্ধ, হুই ওগো যা—তাকে আর জেগে থাকতে হবে না—

মহলা। শুধু এটাই জানে যে, মা-মণির চেহারা দেখে বেন
চমকে উঠেছিল সে। মা-মণিকে অবশ্য বেশিবার দেখেনি
মহলা। তবু সেই রাতে বেন লটাই চমকে উঠলো
চেহারা দেখে।

মা-মণি বলেছিলেন—বোল—

কখনও তো মা-মণির সামনে বসবার কথা নয়।
বসার নিয়মই বৈধ এ-বাড়িতে। এ সবাই জানে। তবু
মহলা বললো। বসে দুখ নিচু করে বসল। ঘুমোতে-
ঘুমোতে উঠে এসেছে, উঠে মা-মণি ডেকেছে ওনে আরো
অবাক হয়েছিল। কিন্তু রাগা করতে হবে। গুরুপুত্র
এসেছিলেন। তিনি খাননি। রাগার সব সোণায়্যর করে
শেষেও তিনি বেগেন না। বসবার পেয়েই সুবিয়ে গড়েছিল

আবার। শিবর-মা-ও পাশে ঘুমোছিল। কিন্তু ডাকতেই
মনে হলো কে বেন বসার মধ্যে ডাকছে ডাকে। বসাই
হেথেকে বেন সে।

—কান্নাও গিয়েছিলি আমার সঙ্গে, তোর মনে আছে?

—মনে আছে মা-মণি!

—আবার পূর্ব অস্থির হয়েছিল তা তোর মনে আছে?

—তাও মনে আছে মা-মণি!

—আমার অস্থিরের সবর কর্তব্যবস্থকে মনেছিলি হুই?

মহলা বেন চমকে উঠলো একটু। মা-মণির মুখের
গুণর দুখ হুলেই তখনই আমার নামিয়ে নিলে।

—কথা বলছিলি না যে?

মহলা আঁতকে আঁতকে দুখ নিচু করে বললে—সে
অনেক দিন আগেকার কথা, মা-মণি।

মা-মণি বলেন কিন্তু হইতে উঠলেন। বললেন—হুই
আমারই বাড়িতে বসে আমারই খেয়ে পরে আমারই
সর্বনাশ করেছিল?

মহলা কেঁদে ফেললে, হুইচোখ কেটে জল বেরিয়ে
এলো।

মা-মণি বলতে লাগলেন—আমার কত সাধের সংসার
হুই জানিনু? সেই সংসারে হুই আগুন লাগিয়ে দিলি?
আমি এখন কী করবো!

মহলার হাত-পা যেন সব আড়ট হয়ে এল। এতদিন
পরে এই কথা বলবার জন্তে এত রাতে তাকে ডাকলেন
মা-মণি?

—আমার স্বামী, আমার ছেলে, আমার ছেলের বউ—
তোরা জন্তে সবাইকে জলাঞ্জলি দিতে হবে? হুই আমার
এখন সর্বনাশ করতে পারিলি?

—মা-মণি, আমি যে—

—ধাম হুই, হুই-কলা দিয়ে আমি কালসাপ খুঁজেছিলাম
কিনা, তাই এখন করে আমার সব নষ্ট করে দিলি।
আমি এখন কী করবো! আমার যে মাথা খুঁড়ে মরতে
ইচ্ছে করছে—

মহলা মা-মণির পায়ে গুণর উপর হইতে পড়লো।

বললে—মা-মণি, বিশ্বাস করুন, আমার কোনও দোষ
নেই, আমি পেটের দায়ে আপনার বাড়িতে কাজ করতে
এসেছিলাম—

মা-মণি বললেন—তোকে আমি বলেছিলাম না যে
কর্তব্যবস্থার তোমার সামনে মা-পড়তে?

—আমি তো বরাবরই তোমার আড়ালে থাকতাম, মা!

—তবে কেন এখন সর্বনাশ ঘটালি?

—আমার মরণ-দশা হয়েছিল, মা-মণি! আমারকে আপনি তাকিয়ে দিন না এ-বাড়ি থেকে, আমি মরে বাঁচি, আমার আর বাঁচার সাধ নেই।

মা-মণি একই বেন কী ভাবলেন। বললেন—তোর ছেলেকে তুই কেবেছিলি?

মরলা হঠাৎ চেখে আঁচল দিলে। সেবকালে আর চাপতে পারলো না। চিরকালের চাপা মাছুর মরলা। নিজের সমস্ত জীবনের মুখ কই শোক সব বেন হঠাৎ ফোট বেয়েলো তার সেই মুহুর্তে।

মা-মণি চীৎকার করে উঠলেন—বেগো চতভাঙ্গী, বেগো—বেগো এখন থেকে—পারিস তো গলার দড়ি দিগে

মা—বেগো আ মা র ল'মনে থেকে—

অন্ধকার বাড়ি। তার খোঁলে খোঁলে বেন ভূত আ ভা রা হঠাৎ লজীব হয়ে উঠলো। মাকরাভের নাটকে এখানেই বৃষি বনিকা পড়বে। তার আগে শুঁ একই একমুহুর্তের ছেদ। মরলা টলতে-টলতে সিঁড়ি দিয়ে



নামলো, তারপর একবার এদিক ভদিক দেখে নিলে। ডর করতে লাগলো তার। সিঁড়ির ওপর টিমাশাখিটা একবার পাখা-কাপটিনি দিলে। যেহালাটা তার শায়ের কাছ দিয়ে কোন্ দিকে গাঙ্গিরে গিয়ে বাঁচলো বেন।

আর তারপর...

ভোর তখনও ছয়নি। বেশ রাত আছে; জগন্নাথবাবু দুব খেয়েছিলেন সেদিন। মুরগীর চণু হয়েছিল। শুঁ শুঁ মুরগীর চণুই নহ। টে'পির মা আগে চাটের শোকানের খাবার বাঁধতো। তার হাতের ঝাঁকড়ার দাড়ি দিয়ে পেরাজ-রসুনের গুঁরকারি দ্বারা খেয়েছে, সে-পাড়ায় তারা এখনও আত্মশোণ করে। বলে—আহা, টে'পির মা'র রান্নার মতো রান্না আর খেবুধ না—

তখন টে'পির মা'র অবস্থা খারাপ ছিল। তারপর জগন্নাথবাবুর দ্বারা এখন টে'পির বহাত কিতোছে। বেসুখরিয়ার ব্যাগানবাড়িতে উঠে এসেছে। টে'পির মা'র হাতের নাকছারি হয়েছে, টে'পির জড়োরা গবন হয়েছে। এখন অনেক দুঃখ।

সেই শেষরাজেই কে বেন বাইরে চীৎকার করে উঠলো।

—বড়বাবু, বড়বাবু।

তখন নফরও অঁচতুঙ। গান-বাজনা হয়েছিল অনেক রাত পর্যন্ত। অনেক দিন পরে ভালো খেয়েছে। পেট ভরে খেয়েছে। মুরগীর চণু চেয়ে-চেয়ে নিয়ে খেয়েছে। জগন্নাথবাবু পাশে বসে থাকিল।

বললে—বাও হে নফর—বাও, পেট ভরে বাও, লক্ষা কোম্বোনা—

নফর বলে—আজ লক্ষা আমার নেই, লক্ষা থাকলে আমার এই দশা—

বড়বাবু বললেন—মুরগীটা বেশ ভালো, মাষ্টার—

জগন্নাথবাবু বললে—রাহাটা বড়বাবু বজ্ঞ ভালো এহ—হোটেনে বাঁধতো তো আগে—

গুলমোহর আলি, আবহুল ওয়াও পেয়েছে পেট ভরে। শুঁ মুরগী নহ। টে'পির মা বললে—আজ রাহাটা ভেবন জুং করতে পারিনি, আদা-বাটা বেশি হয়ে গেলো—

নক্ষর বললে—গোলাঘাটাও খুব ভালো হয়েছে, বা—
পাওরা ছিল টে'শির বা। বললে—ভালো হবে কী করে
বাছা, খাটি খি কি পাওরা যায়, বেহাত ছেলে গায়ে
তাই মাখন গাশিয়ে নিয়েছিলাম—

—আঃ—ঈগজারণবাসু একটা আত্মবোধ টে'বুর তুললে।
বললে—পাওরাটা বেশ হলো বড়বাবু, কর্তাবাবু সকে
কতদিন বেলখরিয়াতে খেয়ে দিয়েছি—

পাওরা হয়েছে। পাওরার আসে আবার গান হয়েছে।
টে'পি ঠুংটিটা গায় ভালো। 'হামসে না বোল হাঙ্গা'
বলে বখন কোমল নিবাসে গিয়ে ঠাড়িয়েছে, সে কি মজা।
আর নিবাস বলে নিবাস। ওই নিবাসটার দাম-ই লাগ
টাকা।

বড়বাবু বললেন—তোমার গলা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে
বেব এবার—

নক্ষর শুনছিল। বললে—আহা, ষট্টিখনিশির গান
শুনলেই শেট ভরে যায়—

গানের মধ্যে বনহুখলাল জুয়েলার্স কোম্পানির দাশালও
এসছে। নিবাসের দাম দেখানোই উঠে গেছে বোধহয়।
টে'শির খুঁৎও হাসি বেরিয়েছিল বেকলেস্টা দেখে।

তারপর বত হাত বেড়েছে, তত মজা বেড়েছে। বড়বাবু
বত বলেছে—এই শেব, আর নয়—তত বোতল এসেছে আর
খালি হয়ে গেছে। নক্ষরও টেনেছে পুকিয়ে পুকিয়ে।
ভালো জিনিস। এ খেতে পাওরার ভাগ্য চাই।

খেতে খেতে সব বখন ধরসা, তখন সবাই খুঁষিয়ে
পড়েছে। বড়বাবু কাত হয়ে ওয়ে ছিল বিছানার ওপর।
টে'শির বা এসে টে'শিকে ভেঁকে নিয়ে গেছে। বলেছে—
আব, ঘরের ভেতরে আর বা,—আরাম করে শুবি আব—
টে'পি টে'শির-মা'র সঙ্গে আলাদা ঘরেই শুয়েছিল।
টে'শির মা'রও বেশ বেশা হয়েছিল একটু।

হঠাৎ বাইরে চাঁৎকার হতেই টে'শির মা'র বেশা কেটে
গেল বেন।

বললে—ঘটিচরণ, ঠাণ্ডা তো রে কে ডাকছে—

বাইরে তখনও কে দরজার কড়া নাড়ছে আর চাঁৎকার
করছে—বড়বাবু, ও বড়বাবু—

তা দেখিন খুব ভোয়েই ঠাকুরমশাই উঠেছিলেন।
কলতলায় গিয়ে ধূ-হাত-শা ধুয়ে ঈশ-আদিত্য করে
নিলেন। তাঁকে সকালবেলাই যেতে হবে।

পরমজ্ঞকে ডাকলেন—ওরে শুনছিল, মা-বাবকে একবার
খবর দে, আমি থাকি—

সময় বাড়ি তখন শ্রায় নিবৃত্ত। তিনি নিজের জিনিস-
পত্র গুছিয়ে নিলেন।

হঠাৎ পরমজ্ঞ দৌড়তে দৌড়তে এল।

—কী হয়েছে রে?

ভেতর থেকে হঠাৎ দিছুমশির আর্ট কামার শব্দ শোন।
গেল।

—কী হয়েছে রে?

—সকল্য হরে গেছে ঠাকুরমশাই!

এ-নব গল্প আমরা বড় হয়ে শুনেছি। আগল ব্যাপার
জানতে পেরেছি পরে। দিছু তখন কিছুই জানতাম না
আমরা।

আমরা তখন ছোট, পাড়ার সবাই বাড়িটার সামনে
জড়ো হয়েছি দেখিন। দাশ-পাগড়ি-পরা পুলিশ এসেছে
কটা, আর একজন দারোগা। এ পাড়ার মধ্যে এ-বাড়িতে
আগে কখনও পুলিশ আসতে দেখিন। তবু এ বাড়ির
সবকে কোঁতুহল আবারের বরাবর।

—কী হয়েছে মশাই?

দাশা দিয়ে চলতে চলতে লোকেরা পুলিশ বেধে ধরেন
যার। বলে—কী হয়েছে মশাই এবার? এত পুলিশ কেন?

—বাড়িতে কে গলায় বড়ি দিয়েছে শুনি!

—কে গলায় বড়ি দিয়েছে?

—কে জানে মশাই, কে? বড়লোকের বাড়ির ব্যাপার,
এ-বাড়ির খবর কে জানবে?

আজ্ঞে আজ্ঞে আরো ভিড় বেড়ে গেল। ঘোষও
বাড়ছে। পাশের বাড়ির ভট্টলোকদের ততক্ষণ আশিস
বাবা'র সম্বন্ধ হতেছে। কয়েকজন চলল সেল।

তারপরেই হঠাৎ গাড়ি চালিয়ে এল গুলবোহর আদি।

—হুই বাও, হুই বাও—

বড়বাবুর গাড়ি এসেছে। ভেতরে বড়বাবু বসে ছিলেন।
ঈগজারণবাবুও বসে ছিল। নক্ষর গাড়ির দাঁধায়।
গাড়িটা ধামতেই নক্ষর তাকাতাকি গাড়ির দরজাটা খুলে
বললে—আহন জার—বোম্ব আহন—

তারপর দাঁধাধাবার বড়বাবুর সঙ্গে ভেতরে ঢুকে
গেলেন। কোঁতুহল বেন আরো বাড়লো সকলের।
আমরা আরো সামনে এগিয়ে গেলাম।

আজ এতদিন পরে এই সংকীর্ভন যে গাইছি, তারও
একটা কারণ আছে বৈকি।

এবার পূজোর সময় কানীতে গিয়েছিলাম।

দশমবেশ ঘাটে বেশে আছি। হঠাৎ সেমি—নফর !
সেই ছোঁড়া গেলি, ময়লা কাপড়।

আমিই প্রথমে ডাকলাম।

—নফর !

নফর আমার ডাক শুনেই এগিয়ে এল। বললে—হাধা, আপনি এখানে !

বললাম—হুমি এখানে কবে এলে বলো আসে।

নফর বললে—আপনি বুঝি বাড়ি বদলেছেন ?

আপনাকে আর শাড়ার দেখতে পাইনা তাই।

বললাম—হুমি এখানে কার সঙ্গে এসেছি ?

নফর বললে—জগন্নাথগবাবু'র সঙ্গে। বড়বাবু মাঠা গোছেন কনেছেন বোধহয় ?

অবাক হলাম। বললাম—না, কবে মাঠা গেছেন—?

নফর অনেক গল্প বলে গেল। শেষকীমনটা বড়বাবুর স্বাস্থ্য নাকি খুব খারাপ হতে গিয়েছিল। গলায় কিছু চুকতানা আর।

বানিকি গবে নফর বললে—বড়বাবুর বাড়ি-টাড়ি সব সম্পত্তি-টপ্পতি জগন্নাথগবাবু কিনে নিয়েছেন তা জানেন তো ?

বললাম—সে কি ! সেই অ্যাটর্নীর জগন্নাথগবাবু ?

জগন্নাথগবাবু'র শেষ পর্বস্ত্র সব গ্রাস করবে তা অবশ্য তখনই বুঝতে পারতাম। তবু কেমন ধেন হুং হলো। মা-মনি নিক্কেল বলি দিয়ে সংসার সেনের বাপের স্বর্গদা অম্বু'র স্বাস্থ্যতে চেয়েছিলেন। সুবর্ণনিরাশ্রয় শেষের ভবিষ্যৎও নিরাশ্রয় করতে চেয়েছিলেন। কিছু পনি বে কোন্ দিক দিয়ে কখন রক্তে প্রবেশ করবে তা যদি তিনি জানতেন।

যনে আছে পুলিশ জিজ্ঞেস করেছিল সিঁদুরমণিকে—তোমার সঙ্গে শেষ কখন কথা হয়েছিল মা-মনির ?

সিঁদুরমণি উত্তর দিয়েছিল—হুদু'র, ময়লাকে ডেকে দিতে বলে তিনি আমার ক্ষত বললেন—আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম নিক্কেল বিদ্বানার, তারপর আর কিছু জানি না, সকালবেলা উঠে দেখি এই কাণ্ড—

কৌ-মনি সারারাত ভালোই ঘুমিয়েছিলেন। কিছুই টের পাননি। বড়বাবু বেলাঘরিয়ার চলে বাবার পর আর মা-মণিকে দেখেননি।

একে একে সবাইকেই প্রাণ করেছিল পুলিশ।

ময়লাকে জিজ্ঞেস করেছিল—হুমি কতদিন এ-বাড়িতে কাজ করছি ?

—মনে নেই কত বছর, ছোটবেলা থেকে। বিধবা হবার পর থেকেই।

—শেষ যখন তোমার সঙ্গে মা-মণির কথা হয়, তখন তিনি কী বলেছিলেন ?

ময়লা কী যেন ভেবেছিল বানিকেশ্বন। বলেছিল—তিনি আমার গুণের রাগ করেছিলেন—

—কেন ? তোমার স্বামী ভালো ছয়নি বলে ?

—না, তিনি বলেছিলেন আমি তাঁর ক্ষতি করেছি।

—কী ক্ষতি ?

ময়লা বলেছিল—তা জানি না।

—সংসারে আপনাদের বলতে তোমার কে আছে ?

—এক ছেলে আছে।

—কোথায় সে ?

ময়লা বলেছিল—তা জানি না—

এর পর বড়বাবু, জগন্নাথগবাবু সবলোই অযানবন্দী নিয়েছিল পুলিশ। শেষে ডাক পড়েছিল নফরের।

পুলিশ জিজ্ঞেস করেছিল—সংসারে তোমার আপনাদের বলতে কেউ আছে ?

—আজ্ঞে না, হুদু'র।

—তোমার মা-বাবা ?

—না হুদু'র, আমি কাউকেই দেখিনি। তারা কোথায় তাও জানি না।

—এ বাড়িতে তোমার কাজ কী ?

—আজ্ঞে হুদু'র, মোসাহেবী। বড়বাবুর হোদায়েব আমি। হুদু'র মরণ করলেই আমি সঙ্গে বাই।

—কোথায় বাও ?

—আজ্ঞে বেলাঘরিয়ার।

শেষে ডাক পড়েছিল ঠাকুরমশাই-এর। তাঁরও সেদিন যাওয়া হয়নি শেষ পর্বস্ত্র।

পুলিশ জিজ্ঞেস করছিল—শেষ যখন আপনাদের সঙ্গে মা-মণির কথা হয় তখন কত রাত ?

ঠাকুরমশাই বলেছিলেন—রাত বোধ হয় বিড়ী'র প্রহর—

—তিনি কী-কী কথা বলেছিলেন আপনাকে ?

—অনেক কথাই বলেছিলেন।

পুলিশ আবার জিজ্ঞেস করেছিল—তাঁর কি খুব বদ-চারাণ ছিল ?

—হ্যাঁ।

—আপনি এতদিন পরে হঠাৎ কাল রাত্রেই বা এগেছিলেন কেন ?

—আমার বাবার মুক্তা-সংবাদ দিতে। আমার বাবা
ভিলেন ঠার গুরুদেব, গুরুদেবকে তিনি খুল ভক্তি করতেন।

পুলিশ জিজ্ঞাস করলে—তুমি কি তিনি খুল বুঝে
শুভলেন?

—ভীষণ বুঝে শুভলেন। তিনি মাটিতে পুটিয়ে পড়ে
কঃহতে লাগলেন। তারপর অনেক রাত্ত হমেছে বেশে
আমিও বাইরে চলে এলাম,—

—তার পর?

ঠাকুরমশাই বললেন—তারপর খাওদা-দাওয়া সেরে
আমি নিজের ঘরে শুয়ে পড়েছি—আর কিছুই আমি না,
এনে ভোরবেলা তুমি এই কাণ্ড!

পুলিশ আরো সব কত প্রশ্ন জিজ্ঞাস করেছিল, এখন
আর সে-সব কথা মনে নেই।

হঠাৎ নকর বললে—বাই দাবা, জগজ্ঞানবাবুর জন্তে
এদিকে রাবড়ি কিনতে এনেছিলাম, তিনি আবার ঘুম

থেকে উঠে রাবড়ি না খেলে গালাগালি দিতে আরম্ভ
করবেন—

হাসি এলো। বললাম—কিন্তু তোমার আর কোনো
বদল হলো না নকর, তুমি দেউ একরকমই রয়ে গেলে—

—আর দাবা!

নকরও হাসতে লাগলো।

বললে—আর দাবা, আমি তো আর ঐদের মতো
বড়লোকের ছেলে নই—

ব'লে নকর চলে গেল।

হঠাৎ বেয়াল হলো—মহলায় কথাটা তো জিজ্ঞাস কর:
হলো না নকরকে। মহলা কি তাহলে এখন জগজ্ঞানবাবুর
বাড়ির র'পুনি! কে জানে!

কিন্তু আমার কানে যেন তখনও নকরের শেষ কথাটা
কেবল কানে বাজছে—আমি তো আর ঐদের মতো
বড়লোকের ছেলে নই—আমি তো আর ঐদের মতো
বড়লোকের ছেলে নই...





১

দন-দোর নিবিড় শ্রাব্দে
রাম কহে ডাকিয়া বাবুদে—
“ক’দু বেহ রণে,
এস আজ বাইব মিচুড়ি ;
মনোদগী হয় নাই বৃত্তি,
দুবতী সীতাপ্ত
তবে কেন রক্তে আজ ধরবী তিতাও ।”

২

বিশ চক্ৰ বিদ্যারিয়া কহিল রাবণ
ব্যাক্তগণি ছুটাইয়া লম্বাট আননে,
“প্রাবণ নামেনি সবা অশোক-কাননে,
সেখানে বাসিছে বেশ পরম রাঙ্গিষ্ট,
মনোদগী নাই নাই, হযেছে বাবিনী !
কৌপল্যা-নন্দন, ভীম-বাহো,
তথাপি মিচুড়ি যদি কুজিবারে চাহ
হাযরা করিতে পাতি তার
কাল-মেঘি ডালো পুনকায় ।
কেবল একটি লত্ন আছে বহু ইথে
লম্বাট কোড়ন বাঘি দিব নাকো দিতে ।”

বিবর্তন

অনন্তর

৩

রাম কহে, “লত্ন ভব নিদাকণ ভাই
মিচুড়িতে বশলা বে লতাই !
আকাল মিচুড়ি কতু থাওগা হায রাবু— ?
এস তবে খেলা বাক গ্রাসু ।”

৪

এ খেলা চলেছে আজও, চলেছে নির্মম
রাবণ বানর নাই এসেছে আটম্ ।



ভেকী

শিবরাম চক্রবর্তী



‘হ্যালো—সাইথ ফোর সেভেন নাইন...’

তড়িৎ টেলিফোনের হাতলটা হাতে নিয়ে ব্যতস্যায়—
দ্রুতগে তার স্বপ্নচাবার আবেজ...

‘...সাইথ ফোর সেভেন নাইন...’

নহের পরের সংখ্যাতার উচ্চারণের আগেই তার স্বপ্ন
নবছর হয়ে যায়। অপর দিক থেকে বে কঙ্কার আসে
তা কোনো বাহিত্ত রবণীয় কর্তের নয়। পল্লব গর্ভনের
এক দাপট বেন তার কানে এসে কাপটা বাবে।

‘হ্যালো...সাইথ ফোর...’ তার পুনরুক্তির মাধ্যমানেই
ঐ কঙ্কার গর্ভে: ‘কে, হ্যালো?’

‘আমি সাইথ ফোর সেভেন চেয়েছি...সাইথ ফোর
সেভেন নাইন...’

‘রিপিটার রেবে দিন। লাইনটা ছেড়ে দিন আবার
দব্বা করে।’

‘কেন বদুন তো?’

‘সিভিল-সাম্রায় দপ্তরের সঙ্গে কনেকশন চেয়েছি
আমি...’

‘তাতে আবার কি। আমিও চেয়েছি আবার
সাইথ...’

‘এখন নর্থ সাইথ দ্বাপুন। আবার বিশেষ দরকার।
একজন কর্তব্যাক্তির সঙ্গে কথা কইতে হবে। লাইনটা
ছেড়ে দিন চট করে।’

‘আপনিই ছাড়ুন না।’ তড়িৎ-ও নাছোড়।—‘আবার
দরকারও আপনায় চেয়ে কিছু কম জরুরি নয়।’

‘ভদ্রভাবে বলছি দশাই, লাইনটা ছেড়ে দিন।’ সিভিল-
সাম্রায়-পরক্ষী এবার একই সিভিলিটি দরবরাহ করে—
সিভিলিটি বজায় রেখেই—‘নইলে ভালো হবে না বলছি।’

‘আমিই কি অভদ্রভাবে বলছি আপনাকে? লাইনটা
ছাড়ুন আবার—’

ভদ্রতা-রক্ষার পাল্লায় তড়িৎ-ও কম বাধ না। সেও
কিছু হটবার নয়।

‘বস্তীর সঙ্গে কথা কইতে হবে আমাকে। পুন-পুন—
পুন জরুরি দরকার। বুঝেচেন? এখন দব্বা করে...’

‘আজ্ঞে, দাপ করতে হোলো। আমিও ঐর সঙ্গে
কথা কইতে যাচ্ছি তিনিও বস্তীর চেয়ে কোনো অংশে
কম নয়। বস্তীর তিনি কান কাটেন। অবন উল্লস-খানেক
বস্তীকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারেন তিনি।’

‘বটে? পাত্রটি কে শুনি তো?’

‘পাত্র নয়। পাত্রী।’

উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তড়িতের পাত্র বেন উছলে
ওঠে—উগড়ে পড়ে—স্বপ্নসৌরভের সোদরশে। তেবিনের
পাটির সঙ্গে আলোপিতার ছবি বেন ভেসে ওঠে তার
চোখের নৃত্যে। স্মৃতির পরে স্মৃতির রত চড়াই দৃষ্টি।

বিনকরক অগে তাদের কণ্ঠকের টি-ইউনিয়ন
উৎসবে দেখা। মেয়েটি এসেছিল এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে।
ভদ্রলোক সেই কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র। তড়িৎ-ও সেখান
থেকেই শাল করে বেধিয়েছে বহুদখানেক আগে।

কিভাবে বেন আলোপ হোলো ওদের। কিন্তু আলোপটা
ভাবে গিরে জব্বার আগেই ডেতে গেল হঠাৎ। পাটিটাই
ভেঙে গেল—রোবালের পাটিটা ভালো করে জমাই বাধার
আগেই।

ক’খটাই বা পাটি। কিন্তু কয়েকখটা-ব্যাপী এই
পাটিভলো। একেকটা মনে হয় বেন কখনই ফুরাবে না—
ফুরাবার নয় বেন—চলেছে তো। চলেছেই!

কেকোলে বতো জাবর-কাটিয়ের জব্বারত। বামূলি
কেজ্জার মালা!

আর একেকটা আবার এমন হুড়ুৎ করে উড়ে যায়—
বেন চড়াই-পানিটির মতোই। হ্রব চড়াতে না চড়াতেই

তার কাটে। ভাগে করে চাইতে না চাইতে—বেখতে না বেখতেই—অদৃষ্ট। আশ্বাসনা। কথা শেষ না হতেই বিরুদ্ধে।

সেই পার্টিগুলি আর এ কীবনে কিরে আসে না। স্মৃতিগমে আনগোনা করে—হৃদয় স্বপ্নেও এসে হানা দেয়; কিন্তু কখনো আর তুলেব এই চর্মচর্মে দেখা যায় না।

সেই পার্টিগুলিতে জনতার অরণ্য নেই—থেকেও বেনে কুয়াশার মতো মিলিয়ে গেছে কোথায়। সেখানে একের অপহিনীনা। জনতার অমনেক্য নয়—একের জনতা সেই পার্টিগুলিতে। চারিত্রিক যিরে হাত একজনের ভিড়। অনেকেব মধ্যে একের সমারোহ। চারিধারে সাধোহীন সূত্রের পাশে সে একক—সূতাকানের একটি ঠাল।

যুগে যিরে সেখানে ঘালি সেই একজনকেই দেখা। নানা পটীকোণ থেকে বেগবর সেই একটি কোণারক। অগস্ত্য তারক আর আশ্রয় বহিমা নিরে একমার। তাকেই জ্ঞাপো আর কথা বলার ফিকির বোজো তার সাথে।

কথার সঙ্গে কথার তার-বাঁধা—সেতারের সুর-বাঁধার মতোই। কালযাত্রার এই অসহীদ জনতার ভিড়ে সেই এক-জনতা এ-কীবনে বুকি আর ফিরে আসেনা।

তাহলেও এবারের উৎসব-বিনিমিকে ফেরাবার চেষ্টা করেছিল সে। চেয়েছিল—একটি পালাতেই না পালায়—আবার বেনে তার কীবনে কিরে আসে এই বিনিমি—একান্ত হয়ে—একান্তে—আবার—আবার—বারবার। জনতার নয়, জনান্তিকে। সেই খালার ঘেরটিকে সে বলেছিল—‘আলাপ হল, কিন্তু আপনি কে, কোথায় থাকেন তার কিছুই তো জানা হলো না।’

‘জেনে কী হবে! এই তো বেশ।’ কথার বিবেছিল যেহেঁট—‘কেব হরতো আরেক পার্টিতে দেখা হবে আমাদেব।’

‘আরেক পার্টিতে? না, তা আর হয়না।’ সঙ্গে-পরাণ তড়িৎ।

হাড়ি-পোকরা একাধিকবার দেখা দেয়—সত্যার সমাবেশে পূবে পূবে এসে জমা হয়—একটা ক্রেককাটিকে তো সে মতো জারগাতেই না বেবেছে। হাড়িরা কবেকটা কমা-র পরে ঠিক ঠাড়ির মতোই। একান্ত অনিবার্য। কিন্তু যার হাড়িবের মতো ঠাঁত, গালে আপেলের টোল, আর পৌরীশূণের মতোই—না, তাকে আর একজনে দেখা যায়



না। যে-তোথে সে চেয়ে যাব সে-পটী এ-মনে থাথা থাকে—চিরদিনের তরেই—কিন্তু সে আর এ পোড়া-চোখে পড় না।

‘তা কখনো হবার নয়।’ দীর্ঘনিশ্বাস বেলেছে তড়িৎ। কথাবে যেহেঁট মূখ টিপে হেসেছে কেবল।

‘নাথটা? নাথটাও যদি জানতাম আশুনায়। নাথটা যদি বলতেন অন্তত...’

‘তাহলে কি সত্যাক্ষণ সেই মধুনাম মনে মনে জপতো তড়িৎ? দিনরাতের একখানা নামাবলী বানিয়ে জড়িয়ে রাখতো নিজের গায়?’

‘মহু। মহু হায়।’

‘কিন্তু কোথায় থাকেন—’

‘না। তা আমি বলতে পারব না।’ নামের বেশি মহুয় করতে পারেনি মহু। তড়িৎের আঁচি নামহুয় হয়েছে।—‘উপায় নেই আমার বলবার।’

‘না-ই সেলাম আপনার বাড়িতে, বাইরেও তো আদর্য মিলতে পারি? মনে ককন ঘরখানে, লেকে, কি কোনো দিনেমাথ...’

‘হ্যাঁ, তা হতে পারে। পনিবার তিনটের পো-এ যাওয়া যায় হয়ত। তাহলে কিন্তু আড়াইটার মধ্যে আমার জানার সবকার...’

‘কিন্তু জানাথো যে কোথায় তাই তো জানিনে।’

তখন নিজের কোন-নম্বর দিয়েছে মহু। ঠিকানা ঠিক পাওয়া না দেলেও ঠিক-ঠিকানা পাওয়া গেছে একটা।

‘আড়াইটার আগে কোন করবেন—মতো আগে পারেন। কোনে যদি না পার আমায়—এসিটে পারেন। পো তক হবার পাঁচ বিনিমি আগে—এসিটের লবিতে পারেন আমাকে।’

সাড়ো হারোটা যাবে। সেবেগেই তৈরি হতে হবে তড়িৎকে—তার পরেই—তিনটের ঢের আগেই সে তড়িৎবেগে বেগবে—এসিটের দিকে টেলিগ্রামের মতোই—কিন্তু এদিকে, বেহেঁটর সঙ্গে হুতাবার ষোঁড়া সায়তে গিরে মাঝখান থেকে পথ আসলে দুর্ভাগার মতো এক ষৈত্যা এসে হাঝির। সাইন সীরাব যেবেনো সে কিছুতেই।

‘পাজী।’ গজরায় দৈত্যটা: ‘তা—পাক-পাজী-সংবাদেব জড়ে তো খবর-কাসক রয়েছে। টেলিফোন কেন?’

‘দিল্লি-সারাই বিভাগের জড়েও কালোবাঝার খোলা। সেখানে গিরে কালোবাতি কলেই হয়।’ জোটাট কথায়

দিয়েছে তড়িং। কবিরের স্বপ্ন তার খানখান হয়ে গেছে। হীরে তার হারিয়ে গেছে এক কলার পনিতে হঠাৎ।

‘বটে? বটে?? বটে???’ গর্গে উঠেচেন ভদ্রলোক: ‘কে যে বাপু ছুঁমি? কোথাকার লাটলাভেব? ভালো কথার বসতি—কোনটা ছাড়ো—’ বলে আবার তাঁর কণা-বিভার: ‘ছাড়বে কি ছাড়বে না? শুষ্ট আমি জানতে চাই।’

‘আগনি ছাড়ুন। আমিও দিল্লিকথার বসতি আপনাকে।’

অনেকক্ষণ চুপচাপ। সাড়া নেই কোনো পক্ষেই। লক্ষণের কল ধরার মতো কোন ধরে বসে আছে তড়িং। নাছোড়বান্দা।

‘কী হোলো? ছাড়লে?’ আধ ঘণ্টা পরে আবার এলো কন্ঠার—‘কী! ছেড়েছো কোন?’

‘ঝাজে না। কালোবোকারের বোঁধা। কাকের ক্ষত আপনাকে আমি কোন ছাড়তে পারিনে—’ জবাব দিয়েছে তড়িং।

নাথখান থেকে বাধা দিয়ে’ কে আরেকজন। গলা বাড়িয়েছে—‘টেলিফোন আগনি থেকে বন্ধি। আপনাদের দুজনকার লাইনে জড়িয়ে গেছে—সারানো হচ্ছে এখানে। দয়া করে আপনাদের একজন কোনটা ছেড়ে দিন। একটু ক্ষণের ক্ষত অন্ততঃ।’

‘উনি রাখবেন।’ তড়িং জানায়। নিজের বোঁধ বজায় রাখে।

‘আবার ধার পড়েছে।’ ত্রিভুজের অস্ত্র কোণ থেকে উত্তর আসে। নিজের পাওনা-গুণা আঘাত না করে তিনি ছাড়বেন না।

আবার কার্টে পানিকল্পণ।

ভদ্রলোক কোড়ন কার্টেন এবার—‘অতো হাঁপাকো কেন হে? তোমার কৌশলোপানি যে বেশ শোনা যাচ্ছে এখান থেকে। হয়েছে কী?’

‘আপনার হাঁপানিও শুনেতে পাচ্ছি আমি। কিন্তু সোহাই, আমার ক্ষত হাঁপাতে যাবেন না। হাঁপানি একটা শক্ত ব্যারগার মশাই।’

মতিই কি হাঁপাচ্ছিল তড়িং? পর পর তিনবার ঘণ্টা পড়লো একটার। একটা বাজলো তিনবার। সাড়ে বায়েটা—

একটার—দেড়টার—তিনবার একমেয়ে আঙুরাজ শোনা গেল দেয়লতড়ির। কিন্তু দুজনের একজনও নিজের পেয়ালা ছাড়ল না। এত ঠিকাতানের পরেও উভয়ের অমনিকা অটুট। হু পক্ষই এক লক্ষ্যে স্থির: দুজনের কেউই নিজের গো ডায়েনি—পথ চাড়াবার দামটী নেই কাতোরই। এগনো কান বাড়ী করে হাতল ধরে বাড়ী হাতির দুজনাই।

টেলিফোনের আগনি থেকে তলপ আসে আবার—

‘দেখুন, আপনাদের একজনকে লাইনটা ছাড়তে হবে। একজন অন্ততঃ ছাড়ুন দয়া করে। নইলে এখানে দেয়াঘরের অধিদা হচ্ছে।’

‘ওকে বলুন না।’ তড়িং বলে।

‘ওই হতভাগাকেই ছাড়তে হবে।’ তড়িং-শুষ্ট ভদ্রলোকের তৎক্ষণাৎ জবাব।

টং টং করে দুটো বাজলো এতক্ষণে। দুটোও বেজে গেল। কিন্তু দুটোর একটাও নড়লো না—লাইন ধরে তুলে বইলো এক তুলনাবাজার।

ছটকট করতে থাকে তড়িং। আড়াইটা বাজে-পাজো। কখন ধবর বেবে মেয়েটিকে—টেলিফোন তার শাস্তা শায়ে কখন সে?

তখন থেকে এখানে তার ফোনের নম্বরটাই পুরো অ’ওড়াতে পারল না। এর পর ডাক দিলে আর কি তাকে পাওরা বাবে? আর, তড়িতির কোনো সাড়া না পেল—না পেলও কি—নিজন্তবে সে এগিটে বাবে? মনে তো হয় না।

তড়িং চা’রিখার অস্থকার ভাবে। লাইনের এধারে, ওধারে, চারি ধারে। এধারে এতক্ষণ ধরে প্যাকেটের পর প্যাকেট উড়িয়ে নিজের চার ধারে সে দুহুজাল স্থষ্টি করেছিলো, আর ওধারে, লাইনের ও ওয়কে তো মোদ দুহুশোচন!

হাতল ধরে পাড়িয়ে থেকে তার পা ধরে গেছে। আর বৃষ্টি ঠাড়ানো যায় না। ভেঙে পড়ে তড়িং—

‘ছালো!’ কাতর হয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে তড়িং।

‘ছালো, বলুন।’

সেতারের আঙুরাজের মতোই বেন বেলে ওঠে টেলিফোনের তার। এমন দিল্লি হু সে সাতকয়ে শোনেনি।

জবাবে কিছুই সে বলতে পারে না

‘চিত্তা’পিতে মতোই শুনে যায়—



‘দহন! আমার মামা এক্ষণ ফোন ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।’ এই ধানিক আগে ক্রান্তি বোধ করে তিনি চা খেতে গেছেন। এই একম বলো। ভারী বড় লোক আমার মামা। তিনি তদে পূর্বা আগে আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।—’

‘বহন বলুন।’ তড়িৎ স্পৃষ্ট হয়।

‘মামা! না! আসা পক্ষ রিসিভার হাতে বাঁড়া থাকতে হবে আমার যাতে আপনি লাইনটা না ঠাণ্ডা পান। এই কথা বলে গেছেন তিনি। কিন্তু আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না—’

‘দহন না!’ তড়িৎ বলে: ‘একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে কথা বলুন।’

‘বসেই তো আছি। কিন্তু বসবার আমার সময় নেই।’

একনি আমার বেজতে হবে—একনিট। একজনার—আমার এক বন্ধু—ফোন আসবার কথা ছিল। কিন্তু এখন অধি ঠার কোনো বণের এসে না। বোধহয় আপনি লাইনটা আটকে রেখেছেন বলেই। কিন্তু দেখতে নথ, একনি আমার সিনেমাঘ দেখতে হবে। মনে হচ্ছে আমার বন্ধু দেখানোই আমার জন্ত অপেক্ষা করেছেন। দয়া করে আপনি যদি ফোনটা ছাড়েন—ছেড়ে দেন মামাকে—মামাকে বিষয় আমাকে—তাহলে আমি ছাড়ান পারি। আপনি ছেড়েছেন এই খোল পবটো মামাকে দিচ্ছে বেরিয়ে যেতে পারি চটপট। ছাড়বেন আপনি দয়া করে?’

তড়িৎ আর দেহি করে না। দয়া করে বেশ

তৎক্ষণাৎ।

পূজার
আভিনন্দন

উষা
সেলাই মেশিন

কল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড



মতো বলল হ'বে, এখন সে ইকলের হাত ধ'রে পালিয়ে গিয়েছিল
হ'লে।

দুবে, ঐ পর্বতের চূড়া পেরিয়ে অল্প এক ভগতে।

দুটুক থেকে দুটি বিশাল পর্বতমালায় বাহু এসে বিশেষে
এই উপত্যকার, তাদের গাঁবে। 'অন্তর্গত' গহীন অরণ্য,—
সেখানে থাকে 'কৃষ্ণা' আর 'ইকলা' নামে দুই জাতের
অরণ্যচারী মাছ। ইকলারা বহুভাষাধর, কিন্তু কৃষ্ণাদের
বিশাল নেই, তারা দাড়কর। ইকলারা মাঝে মাঝে উঠে আসে
তাদের উপত্যকার—লম্বা হরিণ বেয়ে নিয়ে। স্তম্ভ হরিণটাকে
খিকি ক'রে হত করে নিয়ে পেল একইটি দুখ, কিছু চাপ।

দুখ অরণ্য তাদের জাতের মাৎসরের কাছে অভাবের বস
নয়,—অরণ্য মহিষ তাদের, মহিষ-প্রতিপালনই তো তাদের
একমাত্র জীবিকা। হাঁড়ি কিনতে হয় প্রতিবেশী 'কোটা'দের
কাছ থেকে। আর চাল কিনতে হয় অল্প প্রতিবেশী
'বালগা'দের কাছ থেকে।

'কেনা' বলতে পর্বতচূড়ার অপর পারের রাজ্য
'উটকান্ড'-এর মতো ব্যাপার কিছু নয়। সেখানকার
মহান শলার চলন নেই এখানে, এখানকার নিচন হচ্ছে
জিনিসের বললে জিনিস।

মা মায়া ঘাবার পর আর কোনো ঝগড়ই ছিল না
মুনিয়ার। ঝ' ছিল, ডা' হচ্ছে কৌতুহল। অম্ম কৌতুহল।
ঐ অরণ্যে কী আছে?

কী আছে ঐ পর্বতমালায় ওপারে?

কিন্তু, কে সেবে উত্তর?

তারা 'টোতা',—শাকিপাত্যের এক বিশেষ উপভাষা।
ভালব লম্বা তাদের মেলে না, কী চেহারা, কী আচার-
ব্যবহারে। তাদের মাৎসরের খুব কালো নয়, হেঁটেও নয়।
লম্বা চেহারা তাদের পৃষ্ঠদেশে, খাড়া নাক, পাতলা ঠোঁট,
মাথার চুল লম্বা-লম্বা—অজস্র।

তবে, 'বালগা' বা 'কোটা'দের কুলনার তারা নাকি খুব
গরীব, খুব নিরীহ? তাদের মহিষগুলি ছোট ছোট, বেটে,—
কিন্তু তারাও তাদের লম্বা। মহিষের দুখ,—সেই দুখের তৈরী
মান, সেই দুখের তৈরী বি, সেই দুখের তৈরী হই আর খোল,
—এইই বিনিময়ে তাদের পরিষেবা, তাদের চাল আর
হাঁড়ি-কি। 'বালগা'রা কুটির কাছ করে, তারা ঘের চাল।
কোটার ঘের বাড়ির হাঁড়ি আর বালন-কোসন।

তারা, অর্থাৎ টোতার, চাষাবাদ তো করেই না,
শিকারও করে না। প্রতিদিনের সাধারণ খাদ হচ্ছে দুখ-
সিদ্ধ-করা চাল।

ইকলের লম্বা সেই ছোট বালসে অসুভাষে তার ডাব হ'লে
গিরেছিল। মাঠে মহিষদের লম্বা গিরে নিয়ে যায় পৃষ্ঠদেশে,
সেই বালকদেরও অভাব নেই। ইকল অম্মি এক বালক,
যাদের লম্বা মহিষ নিয়ে যেতো। জাতে সে-ও টোতা।
কিন্তু ভিন্ন প্রাণের।

একদিন বলছিল,—কে রে তুই, এই যেতো? একা-
একা ছুটে-ছুটে মাঠে আসিস? ইকলারা বেগলে ধ'রে নিয়ে
যাবে।

—ইন্! ধরে তো তোকে ধরবে।

এক-একদিন মহিষের গিঠে চ'ড়ে বাঁশী বাজাতে-বাজাতে
আসত।

—এই, কোথেকে গেলি রে?

মহিষের গিঠ থেকে নেমে তার কাছে চ'লে আসত,
বলতো,—বাবা এনছে 'বালগা'দের হাট থেকে। আমিও
হাটে যাব একদিন।

—আমাকে নিয়ে যাবি?

—যাবো।

তবু হাট-ই নয়, নানান কাছপাশ তারা ঘুরে ঘুরে
যেতো। দুজনেই একঘরানী, দুজনেই বাল্য ভগন ঘন।

সবথেকে কৌতুহলের স্রষ্টা করতো ঐ পাহাড়ের চূড়াটা,
যার পাশ দিয়ে ভোরবেলার পূর্ববেশ প্রথম উকি দিয়ে দেখেন
তাদের।

মনে হতো, তিন দিকের ঐ পাহাড়,—আর অন্তর্গতের
ঐ অরণ্য,—যেন মৃত্যুমান নিবেশের মতো ঝড়িয়ে আছে।
ভূতপ্রভু আর গজা-মানোরা যদি না থাকত, তাহলে সেই
কবেই তারা চ'লে যেতো ঐ পাহাড়টা পেরিয়ে।

মেঘ ডাকে, আর আকাশটা কালো হয়ে যায় মেঘ,
সরকার কখন ক'রে কুই নামে,—সে-ও নাকি ঐ ভূতপ্রভুর
কীতি।

ইকলের বাবা না-কি ইকলকে খুব মারতো। একদিন
বললে,—চল, চলে যাই।

—ল্যা।

যেন ব্যাপারটা কিছু নয়। মাঠে-মাঠে ছুটোছুটি করার
মতোই ব্যাপার। 'ল্যা' বললেই যেন চলা যায়।

অল্প সভাবের দুটি ছেলেকে,—অস্ত্রের থেকে
কৌতুহলের উগ্রভাষাও ওদের বেশী। এ বোধ হয় প্রতি দুপ
প্রতি জাবির মতোই থাকে। এক-একটি ছেলেকে—এসে
জগা,—যারা মলচ্ছাড়া, পোচ্ছাড়া, ডির প্রভৃতির।
যা করবার নয়, তা-ই ওরা ক'রে বলে,—যা ডাববার নয়,

তা-ই ওরা ভেবে বসে। শত নিষেধের উত্তর পর্বত, শত লঙ্কারের গহীন অরণ্য,—কিছুই ভয়ের পথ আটকাতে পারে না। শত প্রহারে অর্ধমৃত হ'য়ে ওরা একদিন হঠাৎ-ই বাধন ছিঁড়ে ছুটে যায় দূরে,—এ যে কোন্ নিপুণ শ্রেয়ণী, তা' কে বলবে!

শশবহুরের হুটি টোতা ছেলেমেয়ে এমনি ক'রেই একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হ'য়েছিল অরণ্য আর পর্বতের বাধা পেরিয়ে থাকিলাতোর আধুনিক বিলাসী পৈলাবাস উটকামণ্ডের প্রান্তঃশীমার,—বিশাল নীলগিরি পর্বতের উপত্যকার এক প্রান্তে। কুণ্ডিত, ভীত, সন্ত্রস্ত হুটি শিত।

হেভারের কুমারস্বামী তাদের স্থান বিবেচিলেন প্রথমে। সেখান থেকে কেমন ক'রে আবার তারা ছিটকে পড়ল,— একজন এক চা-বাগানের কর্মস্বী হ'য়ে, অপরজন আরো দূরে এক হোটেলের চাকর হ'য়ে,—সে অস্ত্র কাহিনী।

পনরো বছর পরে আবার তাদের দেখা। ইকল আর মুনিয়া। ইকলের পরনে বৃত্তি আর শাট, মুনিয়ার পাড়ী আর রাউটার।

—সুখে আছো?

মুনিয়ার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি ইকল।

—তুমি সুখে আছো?

ইকলের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে কেঁদে কেলেছিল মুনিয়া। দুহনেই ঘটনাচক্রে আবার হ'য়েছে কাছাকাছি। একজন—এক বেশী-সাহেবের বাড়ীর আর্য, অপরজন—অস্ত্র এক প্রতিবেশী সাহেবের খাস বেয়াতা।

কাজের ঠাকৈ ঠাকৈ দেখা হয় দুজনের, হহত বা পথে।

যেথ মনে হয়, দিনরাত কী বেন ডাবে ইকল গভীঃ-ডাবে। কী বেন আরও কিছু জানতে চায়, কী বেন জানবার তুফা মাথও ওর খেটেনি। মুনিয়া প্রশ্ন করলো একদিন,— কী ভাবে আছো?

চমক উঠেছিল ইকল; বললে,—কী ভাবি!

—তুমিই জানো।

আরেকদিন। মুনিয়া বললে,—আমার কিছু জানতে চাও না?

—না।

আরেকদিন। এদিনও প্রথম কথা বললে মুনিয়া,—আমি যে তোমার কথা জানতে চাই।

—জানবার মতো কিছু নেই।

—কেন? এ ক'বছর কোথায় ছিলে, কেমন ছিলে, তার কথা থেকে জানবার মতো কিছু নেই?

উত্তর দেয়নি ইকল।

আরেকদিন। ইকল বললে,—ঐ যে দূর দিল্লের উচ্চ পাহাড়টা মাথা তুলে ঠাঁড়ির আছে, ওর নাম জানো? মোদাবেতা। এই নীলগিরি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া।

ছুটি অশ্রুধা মুখ চোখ মেলে ওর চোখের দিকে তাকালো মুনিয়া।

—কী, কেবল কী?

মুনিয়া মাচ কঠে বললে,—কতো জানো তুমি!

উত্তেজিত হ'য়ে মুহূর্তে উঠে ঠাঁড়ালো ইকল; বললে,— কিছুই জানি না। জানা আমার হলো না।

—আর কী জানতে চাও?

—ঐ আকাশটা যেখানে হৃদয় পেয়ে পড়েছে পাহাড়ের ওপরে, ওর ওপারে কী আছে? আমণ্ড জানতে ইচ্ছা করে।

মুনিয়া বলেছিল,—তা' যাও না কেন চলে?

উত্তর দেয়নি সে।

আরেকদিন বলেছিল,—আমি সবে গেলে যাবে?

—না।

আশ্চর্য হ'য়ে উত্তর দিয়েছিল মুনিয়া,—কেন!

অন্য একটু হেলেছিল ইকল, কিছু বলেনি।

কেঁদে ফেলেছিল মুনিয়া,—এই কথাটা তুমি বলল!

অন্ত, তোমার অন্ত...

—হানি।—ইকল বলেছিল,—আজও আমার সঙ্গে হাঁটতে তোমার আগন্তি নেই আমি জানি। কিন্তু আমি ভাবছি অন্ত কথা। অন্ত যেনে যদি হাই ঐ পাহাড়টার চূড়াটা পেরিয়ে, তাহলে গিরে কী দেখবে? এই একই মাহুথ, একই ভাসের ধরন-ধারণ, একই ডায়ের মনের অবস্থা। যদি অন্ত কিছু না দেখতে পাই? আমার অন্ত চুরমার হয়ে যাবে। সেইজন্যই ভয় হয়।

—আজ্ঞা?

—কী?

—অন্ত কোনো বেশে কী গিয়েছিলে এই উটকামণ্ড ছেড়ে?

—হ্যাঁ, তা' গিয়েছিলাম।—ইকল বললে,—এই একই ব্যাপার। একই ছাঁচে ঢালা মাহুথ,—শুধু ভিন্ন ভাষার ভাষা কথা বলে, আর ভিন্ন গোশাক পরে।

আরেকদিন।

ইকল বললে,—এর থেকে আমাদের ঐ চৌচাচাম অনেক ভালো। আমাদের পরনে পোশাক নেই, গেট মানাহকম খাও ও যাব না, কিন্তু তবু আমরা ভালো। হা-করা কাঠাথ এতক্ষণে ভেঙে পড়ে মুনিমা।

—তবু, আমরা চুপচুপি গাশির ঘাই কেনে।

মুখের সিন্ধু কণ্ঠা ভরা চোখেই ভালো মুনিমা,—আমার সাহেব হটি মারে ?

—নারবে।

—হ্যাঁ, দাখে আমরা দিষ্ট।

ইকল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বললে,—তুই না আসা ? তোকে মারে ?

—হ্যাঁ। অল কাকর সঙ্গে ভালোভাবে কথা বললেই মায়ে।

—সাহেবের বউ নেই ?

—না।

—ও, বুকেছি। সাহেবের ডেলেশিলসের সেলিস বৃত্তি তুই ?

মুনিমা বললে,—ডেলেশিলে কই সাহেবের ?

—নেই।

—না। সাহেবের আমি চাড়া কেউ নেই।

মুনিমার মুখের সিন্ধু চুপচাপ অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ইকল। ওর সেরের বর্ষ কোনোদিনই খুব কালো নয়। আজকাল বেশ কর্গাই দেখায় ভকে। চোখদুটি—খুব বড়ো নয়—কিন্তু টানা-টানা—কু ছুটি বাক্স আর ঘন। মাথায় একরূপ চুল, পাতলা টোট, বাঁধে মতো নাক। নাকে ছোটবেলাকার সেই ছোট শাল পাখরের নেলকটি, আর ও ফুলছে।

—একটা কথা বলবে ?

—কী ?

ইকল বললে,—তোমার ডেলে হায়েছিল ?

আবার কেঁপে ফেলল মুনিমা,—সাহেব কী ওরু খাইয়েছিল,—ডেলে খায়েছি, আমিও মরতে বসেছিলাম।

চা-বই এই সময় ওর হাতটি ডেলে ধরেছিল ইকল ; বলেছিল,—এসব আমরাই মর। পাখাড পেয়েছে মতা দেশে কাদের আমরা কেবলে বেটিয়েছিলাম ?

আরেকদিন।

ইকল বললে,—সেই সন্ধ্যাসীকে মনে আছে ? হুমারখানী ? তিনি মারা গেছেন। তাঁর অনাথ-আলম থেকেই তো আমাদের নিয়ে আসে ?

—আমাকেও।

ইকল বললে,—আমেক রাত। লোকটা বললে,—এসো খোকা। সন্ধ্যাসী বললেন,—বাও এর সঙ্গে। এগনিকার দিকা তো দেব হলো। এবার টনি তোমাদের কাছ পেয়েছেন। মন-পাচ-ছব ছেলে নিয়ে ইনি বেরলেন। বললাম,—মুনিমা ?

সন্ধ্যাসী বললেন,—সে এখনে থাকবে।

বলেছিলেন,—আমি যাব না।

কিন্তু হেরে করে হিঁচড়ে টেনে আমাদের নিয়ে এসেছিল লোকটা।

মুনিমা বললে,—আমাকে নিয়ে এসেছিল একটি হেলেলাক। চা-এর বাগানে। কী ভাবে বে সেখানে বড়ো হয়েছি, কী ভাবে বে সেখানে খেয়েছি,—সে আর মনেতে চেও না। শেষকালে এই সাহেব—ওপান থেকে আমাদের আহার কাছ দেবে বলে নিয়ে এসেছিল।



ক্যালকাটা অপটিক্যাল কোং (প্রাইভেট) লিঃ

ফোন - ৩৫ - ১৭১৭ প্রতিষ্ঠাতা: ডাঃ কার্তিক চন্দ্র বসু এমবি
গ্রাম-ক্যালকাতা-৮৫ ৪৫ নং জায়াহাট স্ট্রীট - কলিকাতা - ৯

আরেকদিন।

ইকল বললে,—বাধে ?

—কোথায় ?

—আমাদের সেই ধারে। না না, তোমাকে যেতেই হবে। ঝা হয হোক, এভাবে থাকলে তুমি মর যাবে।

ওর কোলে মুখ রেখে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিল মুনীমা, বসেছিল জাই চলে !

কিন্তু, যাত্রা করার প্রাক্কালে আরেকবার থমকে দাঁড়িয়েছিল মুনীমা,—আমাদের যদি সমাজে আর স্থান না দেয় ?

—কেন !

ছুটি ভীত আতঙ্কিত চোখের দৃষ্টি ওর চোখের ওপর স্থাপিত করে মুনীমা বলেছিল,—যদি আমাদের ভিনতে না পারে !

ওর একটা হাত চেপে ধরেছিল ইকল ; বসেছিল,—পারবে রে, পারবে।

—পোশাকটা বদলে নেবে ?

—কী ? এই ধূতি আর শাট ছেড়ে, খাটো ধূতি কোমরে অড়ানো ? তা আমি পারি।

—কিন্তু, আমি ?

ওর দিকে ভালোভাবে তাকানো ইকল। সাহেবের বাড়ীতে থেকে যেমন কতকগুলো চেহারা হয়েছিল ওর, তেমনি ভয়া ওর পোশাক। মাথার চুল ঝাঁকিয়েতা সবার লালিত, বেশিবন্দ। গায়ে লাল রঙের পাটলা কাপড়ের ব্রাউজ, অস্ত্রায়াল থেকে উকি দেয় অস্ত্রধাঁস। পরনের হালকা ধোলাপী শাড়ীটা মাত্রাধী ধরনে সূচি দিয়ে পরা। গলায় লক সোনার হার, হাতে দুগছা করে চুড়ি। একবারে এক কাপড়ের বেঁধে আসা।

কিছুদূর পর্যন্ত নিশ্চুপ চলবার পর ইকল হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো ; বললে,—এইবার তোর প্রণের উত্তর দেবো। ওভাবে শাড়ী পরা চলবে না, জামাও টান দিয়ে খুলে ফেলতে হবে।

মুহূর্তে লম্বাঘাড় আরক্ত হয়ে গেল মুনীমার মুখখানা, মুখ নামিয়ে কোনরকমে বললে,—হাঃ ! তা হয নাকি ?

কীরকম কর্তার নিশ্চিন্দা চোখে যেন কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে ছিল ইকল, কিন্তু আর কিছু শে বলেনি। নীরবেই শুক করেছিল চোখ, আগে-পিছে সংকীর্ণ বন্ধুর দৃষ্টি।

সংকীর্ণ একটা গিরিবন্ধ পার হতেই অসুস্থ দৃষ্ট চোখে পড়ে। ডেউয়ের পর ডেউ জ্বল পাছাওগলি চলে গেছে,—কোন-কোন পাছাতে ওপর-নীচ করে শিঁড়ির মতো দাঁড়িয়ে চাষ করা হচ্ছে চা-এর অথবা কফি-র। তার ওপরে

নীল-আকাশে-ভেসে-বাওয়া শরতের হালকা সাদা মেঘের ছায়া পড়ছে এসে। দূরে, নীলময়,—পর্যায় এক অরণ্যরেখা দূর সিঁথির মতোই চোখে পড়ে,—তারই পরপারে আরেক পর্বতমালায় সাদাং মিলবে। চড়াই পথে সেই পর্বতে উঠে, এক চুড়া পেরিয়ে উৎরাইয়ের পথে তাদের প্রাচীর সেই উপত্যকা। নীচে, 'বাসাধা'য়ের চরিত্রকৃত, তাদের আর 'কোটাই'য়ের গ্রাম। ওপরে,—তাদের নিজেদের একান্ত নিজস্ব গ্রাম—টোতা গাঁও। মাকথানে শহরে নেবের সিঁথির মতো সমান্তরাল এক রেখা টেনে দুধারে একই গ্রামের দুই বিভিন্ন বসতি,—বাঁয়ে থাকে 'টারখারল' গোষ্ঠীর টোভারা, ভাইনে,—'টিভালিয়ল' গোষ্ঠী।

টারখারলরা টোভাদের মধ্যে উচ্চাতের মাল্লব, আর 'টিভালিয়ল'রা নীচু মাতের। দু'জাতের মধ্যে বিয়ের প্রচলন নেই। যে-জাতের ভিতরে এক মেঘের ঘিরে হয় বহু স্বামীর মধ্যে,—সকলাগ্রবের মতো ভাইরা মিলে বিয়ে করতে এক স্বীকৃতি,—যেখানে সভা মনস্তের মেঘের সব সতীত্বের সজ্জার সঙ্গে এদের সজ্জা মেলে না,—সেখানেও একই সম্ভ্রমারের দুই জাতের মধ্যে বিবাহ-বিধি নেই। 'টারখারল' মেয়ে ভাব করতে পারে 'টিভালিয়ল' ছেলের সঙ্গে, সেটা নিষেধীয় নয়, কিন্তু বিয়ে করতে পারে না।

মুনীমা 'টারখারল' আর ইকল 'টিভালিয়ল'। বিয়ে ওদের হ'তে পারে না, হলোও না। কিন্তু ওদেরও কি সে ইচ্ছা ছিল ? থাকলে, ওরা অন্ধর চলে গিয়ে একত্র থাকতে পারত, —সভ্যত্বগতে পনেরো বছর কাটিয়ে মনের দৃঢ়তা ওরা অবশ্যই অর্জন করেছে।

কিন্তু ইকলের মনের ভাব কিছুতেই বৃদ্ধিতে পারল না মুনীমা।

নীলগিরি পেরিয়ে যে নির্জনতম বন্ধুর চড়াই-উৎরাই পথ দিয়ে তারা আসছিল, যে-পথে কিছুটা অগ্রসর হ'তেই রাস্তা নেমে এসেছিল।

পিছন থেকে মুনীমা ওর হাত ধরে কেঁদেছিল ভয় পেয়ে,—কী ক'রে চলবি ? যদি বাধ-ভালুক—

অসুস্থ শরত আর দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল ইকল,—বে বাধ-ভালুকের হাত থেকে পারিয়ে এলাম, তাদের তুলনার মনের বাধ-ভালুক কিছুই নয়। তুই ডায়গনিস।

আতঙ্কের মধ্যেও একটা কৌতুকের হাসি ভেঙ্গে ওঠে মুনীমার ঠোঁটের কোণে। কখনো 'তুমি', কখনো 'তুই',—ওদের সম্মুখানে কোনো সবতা থাকছে না। আর, থাকছে না বলেই বৃষ্টি কথা বলে এতো যত্না পাওয়া থাকে।

—এই, তুই তো আসে-আসে ঘাছিল, তোর পিছন থেকে আমাকে হঠাৎ বাধে নিয়ে যায় !

গাড়িরে পড়ল ইকল। বললে,—পনরো বছর আগে এই রাস্তা দিয়েই ছুটলে চলে এসেছিলাম। সেদিন তো এ-ভর তোর মনে জাগেনি ? আর কেন ভর ? নাকি মনে-মনে তোরর ইচ্ছা নেই ?

মুখের হাসি গোপন ক'রে মূনিমা বললে,—আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা শুনতুই বা কে ?

ওর হাত চেপে ধরল ইকল,—তোর সব ইচ্ছা জন্ম, ধীরে কিংবা ঝটক তুই করিস, কিন্তু, বা-ই তুই মনে করিস, বোকে ধীরে আমি তিরিরে নিয়ে যাবই।

—কিরে ? ওসব কথাও হুতু ডালো বুঝব না। নিজেদের ভাষাও তো কুল গেছি।

ইকল বললে,—বুঝ, তা হ'ল নাকি ! এই তো কথা ছাড়ি আমরা দুজনে।

মূনিমা বললে,—এই কথাই কি সব নাকি ! আরও কতটা কথা আছে।

—কী কথা ?

—কী জানি ! থাকতেও তো পারে ? পারে কেন, আছেই। আমরা বা জানি না, বা বলতে পারছি না, এখন কথা কি সেই সংসারে ?

ইকল একথা শুনে চলা ধামিরে ঘুরে দাঁড়ালো; বললো,—তোর মাথা ব্যাথাপ হ'য়েছে।

—হ'য়েছে তো হ'য়েছে। এ অন্ধকারে জন্ম-জন্মে আর কতজন মাথা ঠিক রাখবে !

—বললাম না,—ঠিক আমার পিছন-পিছন আসতে ? এমন অন্ধকার নয় যে কাছের মাহাঘটিকে তুই দেখতে পাচ্ছিল না। 'ঐ তো কেমন চান উঠেছে !

—বুঝ চান দেখাচ্ছ বা' হোক ! ওর আলোতেও কাছের মাহাঘটকে কাছে পাচ্ছি না।

এক মুহূর্তে চুপ ক'রে থেকে ইকল বললে,—পাপলাঘি ক'রো না। এখনো অনেক পথ বাকী।

হেসে ফেলল মূনিমা,—আবার 'তুমি' কেন ? বেশ তো 'তুই' হচ্ছিল ?

ঈশৎ লজ্জিত হলো ইকল; বললে,—কেমন দেন সেই পনরো বছর আগেকার কথা মনে হচ্ছিল। সেই পনরো বছর আগের তুই আর আমি।

বলতে-না-বলতেই ব'লে পড়ল একটা পাথরের ওপর; গবেট থেকে বার করল দেশলাই আর একটা চ্যাপটা নিশি।

—কী করবি ?

—মশাল তৈরী করব। কেবোদিন তেল নিয়ে এগেছি শহর থেকে।

আমটা ঘূলে ফেলল ইকল গা থেকে। তারপরে গাছের একটা ভাল ভেঙে নিয়ে আমাটাকেই তড়াতড়াি ছিঁড়ে মশালের মতো ক'রে অজালো জা'তে।

—একী করলে !—আমটা ছিঁড়ে ফেললে ! পরবে কী ?

—আমা আর পরব না !

পরনের খুঁটিটা তালের রায়ের টোভালের মতো খাটো ক'রে পরে,—ছেড়া আবার তেল ঢেলে দেশলাই দিয়ে মশালটা আলিয়ে ফেলল ইকল। তারপরে ছুঁড়ে ফেলে ফিলো ধালি নিশিটা। কোন পাথরে লেগে দেন চুরমার হ'য়ে গেল কাঁচ,—তারাই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ভিত্তিতে লাগল কিছুক্ষণ সাহায্যের গায়ে-পায়ে।

অন্ধকারে ঘুরে ঘাটঘাট ক'রে জল উঠলো অগ্নিশিখা। তারই আলোয় অদ্ভুত বেধাছিল ইকলের মূখটা। দেন 'হুকুম'য়ের মতো কোনো অগ্ন্যগাচারী মাহাধ,—বাহু ক'রে নিয়ে চ'লেছে কোনো এক যানবীকে,—এক অগ্ন্যা থেকে আরেক অগ্ন্যো,—এক গুহা থেকে আরেক গুহায় ! এধনি বয়স হাতে লব-হস্তিণ মেরে আনতে পারে তার, এধনি সেলিহান অগ্নিশিখায় সেই নৃত পঙটাকে পুড়িয়ে দেয় তার মুখের সামনে ধরতে পারে বাগের হুকুমো, বলতে পারে,—খা, পেট ভ'রে খা।

এধনি টান মেরে ঘূলে ফেলতে পারে তার ভাষা, তার লবলয়ালিত বৈদ্য, হাত বা তার শাড়ীর আঁচলেও দিতে পারে টান।

মুহূর্তে ওর ধরা-হাতটা ছাড়িয়ে নিলো মূনিমা, অদ্ভুত আতঙ্কেই ব'লে উঠল,—ছেড়ে দে !

ছেড়ে দিয়ে অবাধ হ'য়েই ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল ইকল, কিন্তু বলনি।

যেনে যেনে চলতে চলতে একসময় ভোর হ'য়ে এলো হাতি। পাখির ভাক। উপভাষার বিকৃত সেই মাঠ। কচি কচি লব্ধ ঘাস। ঘুরে ঘুরে অদ্ভুত তালের সেই গোলাকার ঘর।

'বায়াগা' আর 'কোটা'দের অনেকেই কৌতুহলাকান্বিত হ'য়ে পিছু-পিছু এসেছিল ওদের। 'চিভালিল' শোয়ির ঝাঁপ-ঝুটো ঠিক তিনতে শেরেদিল তাদের ইলকে। কিন্তু ও-মেরেটি কে ? অমন বিচিত্র শোশাক-পর্য ?

লব্ধ আয়ের লোক ঘিরে থ'রেছিল ওদের। কারা এরা ?

পরিচয় দিতে আর অল্পো থাকবার কথা নয়। কিন্তু তবুও কতগুলি প্রশ্ন থেকে যায়। পনেরো বছর পরে ওরা যে ফিরে এসে, তাতে সমাজে ভরসে গ্রহণ করার ব্যাপারে কিছু আটকায় না। কিন্তু, আলস কথা হচ্ছে যেহেতিকে নিয়ে। ইকলের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল কি? না, তা কেমন করে হবে। তবুও এতদিন ও বাইরে ছিল, গিয়েছিল ইকলের সঙ্গে, এসেছেও ইকলের সঙ্গে। অতএব ও ইকলেরই। কিন্তু টারবারল-এর মেয়ে টিভালিয়ল-এর ঘর করবে কী রকম?

ডাকো 'নিয়াম্' অর্থাৎ পকারেং। তবু ওদের গাঁ নয়, আশেপাশের সমস্ত গাঁয়েই বিচিত্র এক উত্তরজনা। ওদের বহরের কাগজ থাকলে তার প্রথম পৃষ্ঠাতেই ওরা বড়ো-বড়ো ক'রে ছাপিয়ে দিতো এই আকর্ষণ সংখ্যা।

কিন্তু, 'নিয়াম্' ভেঁকে তার পূর্ণাঙ্গ অভিবেশন বসাতেও সময় লাগল সাতদিন। এই সাতদিন খ'রে নানান দিকে নানান গুরু-বিতর্ক, নানান আলোচনা। ততদিন সাময়িক ব্যবস্থাক্রমে 'টিভালিয়ল'দের গাঁও-বুড়োর ঘরেই রইল মেয়েটি। ইকলের বাপ নেই, কিন্তু বুড়োরা ছিল,—তার স্থান হ'লো সেখানে। মেয়েটি ছিল কড়া পাহারার, বন্ধিনীর মতো,—ইকলের সঙ্গে লাক্ষ্যাকারের কোনো অবকাশই ছিল না।

'নিয়াম্'-এরও নিয়ম আছে। 'বাসাগা'দের মত থেকে এলো একজন, 'টিভালিয়ল' থেকে এলো গাঁও-বুড়ো, আর বাকী তিনজন 'টারবারল' থেকে। রীতিমতো গুরুপন্থীর আয়োজন। 'টারবারল'দের গাঁও-বুড়ো প্রায় রাজার মতো। সম্বাদে সে সবাই থেকে কড়া।

'টারবারল'দের একজন 'হুড' অর্থাৎ প্রধান-স্থানীয় একসময় উঠে ধাঁড়ালো,—মেয়েটির সে মায়াও বাটে, শত্রুও ক্ষট। তার তিন ছেলের বউ ঐ মেয়েটি।

সমস্ত সভা মুহূর্তে স্থির হ'বে গেল।

শত্রু বসলে,—মেয়েটি যখন তিন বছরের, তখন আদি আবার বোন, অর্থাৎ ঐ মেয়েটির মাঝের কাছে দিয়ে এসেছিলাম লাল রঙের ছোট একটা শাড়ী। ওর মা নিয়েছিল। আর, 'কোটা'র একজন উকিওয়ালকে ভেঁকে আদি ঐ মেয়ের বাঘ বাঘর গোড়ার বিয়েছিলাম উকি একে,—একটা শিওয়াল। যোগ। দেখুন তো আছে কিনা?

রাজার আসনে একজন এসে ওর আবার হাতা সরিয়ে সত্যা সত্যা দেখে গেল। বললে,—হ্যাঁ, ওর কথা ঠিক।

—তবে ঐ মেয়েই।—শত্রু বসতে লাগল,—সেই ছোটবেলাতেই আমার ছেলেদের সঙ্গে ওর হয়েছিল

'ন্যাইহুনি' অর্থাৎ 'বিয়ে'। সোম-ও হবার পর ঐ মেয়ের এসে ভরবার কথা আমার ঘরে। ইতিমধ্যে মারা গেল ওর মা, ও-ও কোথায় চলে গেল। 'টিবক হ্রি' অর্থাৎ 'মেবতা'র কুশায় ও যখন ফিরে এসেছে, তখন ওকে আমার কাছে দিয়ে নেওয়া হোক।

কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি, এমন কি ইকলও না। ইকলেরের গাঁও-বুড়ো বার বার তাকাতো লাগল ইকলের মুখের দিকে। অল্পেবেশে বললে কেলেছিল,—তোমার কোনো বক্তব্য নেই?

নিষ্কণ্ঠ্য কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল ইকল,—না।

মনে-মনে চব্বক উঠেছিল মূনিরা,—তবে কি সত্যিই ওকে চায় না ইকল? তবে এমন ক'রে তারের গাঁয়ে ফিরে এলো কেন দুহর?

বার-বার প্রশ্ন করেও কেউ সহুত্তর গেলো না। তার সেই এক উত্তর,—না।

কোনো বক্তব্যই তার নেই।

'নিয়াম্'-এর নির্দেশ পোনা গেল। ইকলকে একটা মহিষ দিলেই ইকল যেহেতিকে সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে আশ্রানিকভাবে নিয়ে দিতে পারে তার শত্রুর হাতে।

ওদের গাঁও-বুড়ো তবু বিয়ের কথা ভুলেছিল। কিন্তু টারবারল-এর সঙ্গে যে টিভালিয়লদের বিয়ে হতে পারে না, এ তো নিশ্চয়ও জানে। 'টিবক হ্রি'র আসনে-বসতো তৈরী এই নিয়ম, এ কি কেউ ভাঙতে পারে?

এলো রাত, এলো দিন। যিন গেল, মাঝেও এলো রাত। এমন ক'রে ক'রে কেটে গেল আরও সাতটা দিন। গাঁয়ের উত্তরজনা ততদিনে জিহিত হ'বে এসেছে, ওকে দেখার কৌতূহলও ধীরে ধীরে পেড়ে ক'মে। এ সাতদিনে ইকলের মুখ ও একবারও স্পর্শেও পারিনি। সে কি তাকে ধীরে ধীরে পৌঁছে দিয়ে নিয়ে আবার পালিয়ে গেল পাহাড়ের হুড়া শেরিয়ে?

তিনুহ এসে সংবাদ দিলো,—ঐ পাহাড়ের কোল ঘেঁষে একটা বড়ো নাচের ছায়ায় হ'বে বাদী বাজাচ্ছে ইকল, তার মহিষ্টাকে কয়েক চরতে দিয়ে।

হনে হনে নিশ্চিন্ত যোগ করলেও বাইরে তার দেখা গেল প্রচণ্ড রাগ। ইকলের উল্লেখ হইতেই সে ক্রোধ গেল তিনুহর ওপরে,—তোমাকে শবরবারি করতে কে বলেছে! কে চায় তোমার কাছে ইকলের খবর?

অবাক হ'বে তিনুহ তাকিয়ে থাকে কউ-এর মুখের দিকে।

সবাই হাসে, ঘোরেটা তার বউ। 'বউ' বলতে ঠিক কী বোকার কে জানে, কিন্তু ভা-বী ভালো মাথে ঘোরেটিকে। সব সময় ইচ্ছা করে এমন কিছু করতে, যাতে খুশী থাকবে ঘোরেটি।

সন্ধ্যা হলেই তার দুখ যায়, পাওয়ার পালা কোনক্রমে সেরেই সে গিরে গুয়ে পড়ে তার বাশের পাশে। তারপর সাধারণত বউ কী করে কে জানে। কিন্তু দিনমানে সে তার সব চাড়ে চার না।

'মিশা' তার মেম ভাইয়ের নাম। বউকে নিয়ে দুই পাংড়ার দিকে চলে দাঁড় সে জল তুলে আনতে বনী থেকে, তার বড়ো ইচ্ছা করে, তখন সে বউ-এর সব মেম,—কিন্তু 'মিশা' তাকে তেড়ে যারতে আসে, ডরে ডরে বাওরা আর হয় না।

বড়ুতাই ভয়ানক গভীর প্রকৃতির লোক, তার মুখের দিকে তাকালে পর্বত বৃত্ত কপে। তাকে বউ-এর কাছে সেখানে দুই থেকেই ছুটে পাশায় তিস্থ। তবে সে ভয়ানক ব্যস্ত লোক। সোটা-মদেক মহিষ তাদের,—একটা ইকলকে দেবার পর আছে মাংস নব। সকালবেলা মহিষের ঘর থেকে তাদের মহিষগুলো বার করে দুখ-মোড়ার কাম করে বড়ো বাশের সঙ্গে সে একাই। তারপর মাঠে চরতে নিয়ে যাবার পালা। সে কাটটা সাধারণত ক'রে থাকে মিশা—সব কখনো-কখনো তিস্থ-ও থাকে। বিকেলে মাঠ থেকে মহিষরা নিয়ে এসে আবার দুখ-মোড়ানোর পালা। দু'বেলায় এই যে দুখ পাওরা যায়, বাবার মস্ত আলাদা করে রেখে, বাকীটা থেকে তৈরী করা হয় মাখন, মি ইত্যাদি। একাধক করে থাকে বড়ুতাই একা। বড়ো বাশ সাহায্য করে মাত্র। তারপরে সেই মাখন আর মি নিয়ে 'বালাপা'দের গ্রামে গিয়ে বসল গিরে চলে বা পরকারমতো কাশরুচাপড় নিয়ে আসে,—সে-ও বৈশিষ্ট্যগ করে থাকে ঐ বড়ুতাই,—বউ থাকে নাম দিয়েছে 'বড়ো বামী'।

মহিষের পরিচর্যা, দুখ-মোড়না বা মাখন-মি তৈরী,—এসব হলো পুরুষের কাম, ঘোরেবর ভেতে থাকতেও নেই।

চোঙ-এর মতো টানা লম্বা গুনের ঘর। সেই ঘরবানা আবার দু'ভাগে ভাগ করা। এক ভাগ ঘোরেবর সামান্যতর আর সুখবাসির মজ, অন্য ভাগ দুখ থেকে মাখন-মি তৈরীর মজ,—সে-খর ঘোরেবর প্রবেশ নিষেধ। দুটি ঘরেই কোনো জানালা নেই, ছোট্ট একটি দরজা মাত্র।

ঘর থেকে কলসীটা বার ক'রে নিয়ে এসে অত লকল-কোলেতে অদরই বনী থেকে জল আনতে চললো দুনিমা।

সব মিশা নেই : মিশা মাঠে। সে গেল একা। তিস্থ এগিয়ে এসে : বললে,—আমি দাঁড়।

তীব্রবায়ু হলে উঠল দুনিমা,—না।

আকস্মিক এ ধমক পেয়ে দুখবানা এতটুকু হয়ে গেল তিস্থর, একটা পাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। আর, বেবতে লাগল বউকে,—নাশের মতো ঝাঁকোঁধা পথ দিয়ে সে চলছে পাংড়ার দিকে, বনীর জল আনতে।

গ্রাম পেরিয়ে একটা টিলায় উঠে আবার নামতে হয়। নেমেই দেখা হ'য়ে দাঁড় তার বড়ো বামীর সঙ্গে। কতগুলি মড়িকড়া আর খড়ের আঁটি সে বাঘ নিয়ে আশাছিল 'বালাপা'দের কাছ থেকে।

—কোথায় চললি বউ ?

বউটা যেন হঠাৎ-ই চিপটিপ ক'রে উঠল ওকে বেধে। শরীরে সেই সাহেবটাকে যেন পড়ল, যে ওকে অপর পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই ঘরের ভিতরে টেনে নিয়ে এসে বেত দিরে যারতো।

একটি বাচ্চিল জল আনতে ? মিশা কোথায় ?

—মাঠে।

—একটি বাওরা তো ঠিক নয়,—বড়ো বামী বললে,—আমাদের ঘোরেবর উপরে কুকুবারে ভয়ানক চোখ। তিস্থ কোথায় ?

—গাঁয়ে।

বড়ো বামী বললে,—অবস্ত ভয় নেই। একটু এগিয়ে দেখবি, পাছতলার ব'লে ইকল বিনী সাম্মাচ্ছে। তাকে সঙ্গে নিবি।

ইকল !—যনে যনে ভয়ানক চবকে উঠল দুনিমা। তিস্থর কাছে ওর খবর শুনেই তো থাকে সে,—কিন্তু, একা সে যে ওর কাছে থাকে,—এতে কোনো দাঁড়া বোধ করছে না তার বামী ?

খড়ের আঁটিটা মাথার ওপরে উঠিয়ে নিশ্চিত যনে চ'লে গেল বড়ো বামী,—তাড়াহড়ো করগনি বউ, আমি তো চলি থাকি, তোর কাশ ক'রে রাখ'খন।

ভায়ল আর হরিং কার্ন-জাতীয় পাছ-পাছালি ভেব ক'রে কুশালী দারা বেমে এসেছে বনীর মতো নানান উপলব্ধিও প্রতিহত হ'য়ে। তারই তীব্র বেঁধে ব'লে পড়ল দুনিমা, গুঘরে-ওঠা কানার মতো ঘরে বসলে,—অসুখ ! এ কোথায় ছুঁমি নিয়ে এসে ! পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি,

তাতে ওরা বেত নিয়ে মারা তো মৃতের কথা, একটু ফিংগাও করল না!

ইকল ওর পাণ ঘেঁষে বলতে-বলতে বললে,—কেমন সংসার করছ বলে? মন বসেছে?

—না-না, আমার একেবারেই ভালো লাগে না!—
মুনিয়া কাচা-ভরা কঠে বললে,—তিলু তো একেবারেই ছোট,
তাকে ঘামী ব'লে ডাকতেও পারা যায় না। আর
যে দু'জন,—তাদের মধ্যে থাকতে হয় দু'দিন এর কাছে,
দু'দিন ওর কাছে। অলস!

—কেন!— ইকল বললে,—লোক কী ওরা খারাপ?

—খোং!— মুনিয়ার দু'গানা লম্বা হলে আরক্ত;
বললে,—বিশাকে বসেছিলাম।

—কি?

—বলেছিলাম এই, দু'জনে পালিবে বাই চলো। ঐ
পার্শ্বের চুড়া পেরিবে।

কিন্তু নিবাসে শুনছিল ইকল; বললে,—কী উত্তর দিলে সে?

—কী আর? ভয় পেয়ে গেল।

ইকল গভীর কঠে বললে,—এদব চিন্তা আর কোরো
না। এখানেই ভূমি হবে থাকবে। অস্ত্র পাটটি মেয়ে
থাকছে না?



বিভিন্ন মেয়েমাছের মন। একখায় হঠাৎই হেসে
ফেলল মুনিয়া; বললে,—বিশা একেবারে তোমারই মতো।
জানপাটে, বাড়িগুলো। তোমারই-মতো বাশি বাজায়।

—কেছি।

—কী?

ইকল বললে,—দিশার বিকেই মনটা খুঁকেছে বেশী।

মুনিয়া শীলাবিত্ত ভবীতে ওর দিকে দু'দৃষ্টিয়ে বললে,—
অস্ত্র পাটটির সঙ্গে আমার তুলনা করবে কী?

কিন্তু অস্ত্র প্রলম্ব চলে গেল ইকল। বসেই দিশায়ে
সে যেন হুৎট গ্রবীণ, যৎগট গভীর। বললে,—বাইরে যাব
নেই, বাইরে যা আছে তা বিধ। এখানকার সহস্র সরল
মীথনে তোমার মন কী পাবে।

এখন ভারী গলায় বিজের মতো কথা বলছে ইকল, টিক খে- তার বড়ো স্বামী। হঠাৎ বিলবিল করে হেসে উঠল মূনিমা। বললে,—তোমার হাতের বাঁশিটা বাজাও না ? সেখি, শিয়ার মতো স্বর ওঠে কিনা ?

একটু হেসে ইকল বললে,—পারি না তোমার শিয়ার মতো বাজাতে ?

—চাই পারো !

শিয়ার মতো মাথা কাঁকিয়ে ছুটি হুইমি-ডরা চোখে ইকল বলে উঠল,—শোনো এবার।

সত্যিই শিয়ার স্বর। তখনতে তখনতে হঠাৎ-ই অদ্ভুত অনেক ভরে গেল মূনিমার মন। একবার তার মনে হলো, পরনের প্রাইড আর অহুর্বাণ হুলে কেনে অস্ত্র টোতা-ঝেদের মতোই খাটো। ক'রে শাড়ী প'রে ওর হয়ে হুরে প্রমত্ত হ'রে নচনে আরম্ভ করবে সে !

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মনে হলো,—সব-সব মিথ্যে ! বড়ো স্বামীর গভীর স্বরের উপদেশ, শিয়ার বাঁশি,—সব। সত্যি শুধু সেই পন্থেই। বছর আগেকার যখন, সত্যি শুধু সেদিনকার সেই স্নান বছরের ইকল, সত্যি শুধু সেদিনকার স্বর, সত্যি শুধু সেদিনকার শব্দ নিয়েখের অরণ্য আর পর্বত শেরিরে দূর-দূরান্তে হুহানের হাত-খরায়ের করে ছুটে গাশিরে বাঙা !

বড়ো বড়ো অবিভক্ত মাথার চুল, বড়ো বড়ো ছুটি চোখের অদ্ভুত বিষয়,—তিস্বর দিকে তাকাতো তাকাতো বার বার সেই পন্থেই বছর আগেকার স্নান বছর বয়সের ইকলের কথাই মনে পড়ে যায়।

—একি, তোমার চোখে জল !

চক্কে তাকাভাড়ি মুখ দেখায় মূনিমা।

—কী হয়েছে !

চোখ মুছে তাকাভাড়ি উঠে ঠাড়ার মূনিমা, কনীর জল ছাঙ্কিত ভ'রে নিয়ে গাঁয়ের পথে পা বাড়াতে-বাড়াতে মুখ সিরিরে মূনিমা বলে,—তিস্বরকে আসবার সময় মিছিবিছি ব'কে এসেছি। ও হয়ত কাঁদে।

মিন যায়, রাত যায়—এমন ক'রে ক'রে তারপর কেটে গেল একটি মাস। এই একটি মাসে ক'টি বার-ই বা দেখা হয়েছে মূনিমার সঙ্গে ?

বক্তারাই দেখা হয়েছে, বুঝিয়ে কিরিয়ে সেই একই কথা,—নিরে চলে। আমাকে এখান থেকে !

তারপরই উত্তর দেয় ইকল,—উটকাশের সেই গাহেব-টার কাছে ?

মুহুর্তে আতঙ্কিত হ'রে ওঠে মূনিমা ; আতঙ্কের বলে,—না-না !

—তবে ?

—মারও দূরে, অস্ত্র কোনোখানে।

—না।—ইকল দুটকটে বললে,—বাইরের মস্ত তুমি নও। বাইরের হাওয়ার মস্ত তুমি নও। কোনো ঘেয়েই বুঝি নয়।

—ইস ! ক'টি ঘেয়ের মনের স্বর জানো তুমি !

গভীর হয়ে দাঁড় ইকল, টিক তার বড়ো স্বামীর মতোই বলতে থাকে,—না-না, ঠাট্টার কথা এ নয়। মন দিয়ে বর করো, স্বামীর তোমার খারাপ নয়।

—আর তুমি ?

—আমি ?—একটু হাসল ইকল,—বেশ তো আছি। তোমাকে যিতি করতে পারলেই আমার স্বপ্ন।

—কেন ? অতো স্বপ্ন খোঁজো কেন ?

একটুখণ্ড খেমে থেকে তারপর ইকল বললে,—শেই দশবছর বয়সে তোমাকে বাঁয়ের বাইরে—দেশের বাইরে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার পটো অপরায়।

—বেশ তো, প্রায়শ্চিত্ত করো না ? একটা মহিষ 'নিরাম্ব'কে দিলেই চলবে আশা করি।

ইকল বললে,—সে তো বাইরের। মনের ভিতরে যে অপরায়-বোখটা হুরে-হুরে বাজে, তার প্রায়শ্চিত্ত হবে কেনমন ক'রে ?

অবাক হ'য়ে ওর দিকে তাকায় মূনিমা ; বললে,—তুমি কি লেখাপড়া শিখেছিলে ?

—তা একটু-একটু। কেন ?

মূনিমা বললে,—তাই অতো বড়ো-বড়ো কথা বলতে পারো।

—না। তার মস্ত নয়। আমি ব'লে ব'লে এইসবই ভাবি।

—কী সব !

কব্ ক'রে জলে উঠল ইকলের ছুটি চোখ ; বললে,—আমার শিঠের দিকে ভালো। ক'রে তুমি তাকিয়ে থাকোনি। এই ভাগে, এখনও দাঁপ দূ'রে পাবে।

আরও কাছে প'রে এসে কাঁপিয়ে পড়ল ওর শিঠের ওপর মূনিমা ; আতঙ্কের বলে উঠল,—কী সর্বনাশ ! কী ক'রে হলো ! এতদিনে একটিবারও জানতে দাওনি !

নিম্নে বীরে বীরে ছাড়িয়ে নিয়ে স'রে বলল ইকল ; বললে,—সত্যমুখের মাছ খেয়ে পুড়িয়ে ছাঁকা দিয়েছে।

—কেন।

—বিষ্যে তোর বন্যায় সিরে মূখ বিধে চুরির কথা
কবুল করিয়ে নিতে চেয়েছিল। আমি বসিনি। আর এক
যেমনায়েবের কথা শুনে? আমি তার চাকর ছিলাম,
সাহেবের অংশবিত্তিতে আমাকে সে কানে-শোনা-বাখনা
এমন এক প্রত্যয় করেছিল। আমি রাজী হইনি। কিন্তু
সাহেবকে সে বা-তা বলে সিরে আমাকে এমন মার
খাইয়েছিল যে, আমাকে হাসপাতালে থাকতে হ'য়েছিল
কয়েকদিন।

হ-ব-করা কারায় ভেঙে পড়ল মূমিয়া; বললে,—আর
বসি না! আমারও যে কী দিন গেছে! চা-বাগানের
কতো লোক! আমাকে নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলেছিল—
পত্তর মতো।

—তবে?— ইকল বললে,—তুমি ক'রে ভাগ, এইখানেই
তোর মুক্তি। কিছুদিন কাটুক, মনে বেটুই থিরা আছে,
তা-ও কেটে যাবে।

চূপ ক'রে থাকে মূমিয়া। মনে-মনে চিন্তা ক'রে দেখে,
ইকলের মুক্তিই ঠিক। কোথায় ও যাবে এই গা ছেড়ে?
কোথায় সিরে বাঁচবে?

কিন্তু তবু কেন মনে এখানে মন বসতে চায় না,—কিসের
এক ভালো-না-লাগার অগ্রসর হ্রর বনের মধ্যে শুকন ক'রে
বিস্তারিত থাকে না।

ওরা বলে ছিল চূপচাপ, এমন সময় ঘূর থেকে হঠাৎ-ই
ভেসে এলো একটি পরিচিত বাঁশীর স্বর। চমক উঠল
মূমিয়া। শিখার বাঁশী। শিখা যদি জানতে পারে, এই
কর্মীর ধারে লুকিয়ে সে এসেছে ইকলের সঙ্গে দেখা করতে?
তা হ'লে?

চটু ক'রে উঠে পাড়িয়েছিল মূমিয়া। ওর হাত ধ'রে
ওকে আবার টেনে বসালো ইকল। বললে,—ডর করিস না,
আমার সঙ্গে খিশলে কেউ কিছু মনে করবে না।

একটু আশ্বস্ত হইয়া মূমিয়া বলে,—এটা কী ক'রে
হব বলা তো? ওরা কোনেতনেও কিছু বলে না। একটু
হিসাবও আগে না ওদের মধ্যে। আগে আগে শিখা আসত
আমার সঙ্গে কর্মীর ধারে জল আনার সময়। এখন আর
আসতে চায় না। বলে,—হা-না একা। ওখানে ইকল
আছে, কোনো ভয় নেই।

ইকল হাসলো; বললো,—আমি না বুঝি? এই-ই
নিয়ম। পরপুরুষের সঙ্গে খিশতে না যেওনাটা সবাত্তে তখনক
নিশ্চরীয় ব্যাপার। এতে ওদের একবারেই আগুতি নেই।

—সে কি!

—হ্যাঁ। আমাদের এই চোতাগের মধ্যে বেঘের সংখ্যা
ঘূর কম, তাই বেঘেরের ব্যাপারে কোনো কড়াকড়িই
এদের নেই।

হঠাৎ-ই কিছু ক'রে হেসে কেঁল মূমিয়া,—তোর সঙ্গে
যদি ভাব ক'রে সারামি এখানে কাটিয়ে যি, তাতেও না?

—না। সত্যিই না। শুণু ওরা যাতে অথবা না ভাবে,
আলমার সময় কাউকে জানিয়ে আগুতি যে, আমার
কাছে আগুতি।

—আসতে ওরা দেবে?

—কেন দেবে না! অতাবে পড়ল অনেক সময় ওরা
বউ থাখা বেশ, তা জানিস?

ঘূর টিপে হাসল মূমিয়া; বলল,—তা আমার বাবীসের
অভাবটা কিসের যে তোর কাছে বউ থাখা দিতে যাবে!

ট্রাটের কোনে হাসি টেনে এনে ইকল বলে,—বাঁখতে
আমি চাইছিই বা কই? তবে, দিনান্তে তোকে একবার
দেখলে ভালো লাগে, কথা বললে ভালো লাগে।

—তাই নাকি!— ট্রাট উলটে মূমিয়া বললে,—নতুন
ধর! তা কথা কইবার অতোই যদি শব, তো আমাদের
বাড়ী এলোই পারো।

—লাত কী? তাছাড়া, চিতানিলসরা অতো ঘন ঘন
টারবারলধের বাড়ী থাক না, যেতে নেই।

মূমিয়া বলে উঠল,—তাই বুঝি আমাকে তোমার পেতে
হবে এই নির্জন পাহাড়ের কোলে, কর্মীর ধারে?

হাসল ইকল; বললে,—টোডা ছেলের ত-ই রীতি।
তারা পাহাড়ের ওহায বা বনের অন্তরালে, কিবা এইরকম
কোনো কর্মীর ধারেই আসি আর ভালো-বালা জানতে চায়
তাদের প্রিয়াকে।

—বুঝছি!— তাছাড়াই উঠে পাড়ায় মূমিয়া,—আমার
ওভাবে যিয়ে মেওরাটা তোমার ছল,—আসল আমাকে
তুমি পেতে চাও এই ভাবে? কেন, অতোই ইচ্ছা যদি,
নিম্নে রাখতে পারোনি কাছে? এখানে, না-হয় অন্য
কোথাও? কে আসতে চেয়েছিল এখানে? কিবা এখানে
এসে কে পেতে চেয়েছিল এই অদৃষ্ট জীবন!

—এখনকার জীবনটা অদৃষ্ট?

—নয়? ছোটোটা কাছ ছাড়তে চায় না একমণ্ড,
মেছোটা স্বর্ধক এটা-ওটা হ'লে জ্বালান করে। বড়োটা
পত্তর মতো ওং পেতে থাকে রাতের আঁধারের জন্ত। এই
কি জীবন? হিঃ!

উঠে পাড়ায় ইকল : একইকল খোম খেকে তারশরে বলে,—কী ছুই চান্স বন্ড তো ?

—খোম খেকে আবার ছিটকে বেরিয়ে পড়তে চাই।

ভালো লাগে না—কিছুই ভালো লাগে না। সেই ছোটোবেলায় হুতনে ব'লে যে খন্দ খেবতাম, সে কি এই ?

চুপ ক'রে থাকে ইকল। মুনিয়া আবার বলে,—পাতো

না ? পাতো না তোর ক'রে আমাকে কাছে টেনে রাখতে ?

—রাস্‌ছিই তো !—ইকল বললে,—আমি কি বুঝে আছি ! এইতো দেখা হলো। এই ভাবেই চলুক না সারাটা জীবন।

—এই ভাবে ? এই চুরি ক'রে দেখা হওয়া ?

—চুরি কেন ?—ইকল বললে,—এই যে তুমি এসেছো আমার কাছে, এর একটা অর্থই ভরা করবে। আমি তোমাকে ভালোবাসছি। ভালোবাসায় তো ওদের আগতি নেই।

রাসে-হুগে-কোভে-অধরধমে কেন মুহুর্তে পাগল হ'য়ে সেল খেবতা ; তীর, বীজ করে বলে উঠলো,—কিন্তু আমার আগতি আছে। এভাবে দেখানোয় আর নয় ! হর আমাকে তোমার পেতে হবে একেবারে, নয় তো, আমাকে তোমার ছাড়তে হবে চিরকালের জন্য।

উত্তরের অঙ্গনা না রেখে দুইদান পা ফেলে দ্রুত গারে ঘরে ঘিরে আসে মুনিয়া।

আরও কেটে যায় কিছুদিন। গায়ের আখাটা হুলে ফেলেছে মুনিয়া। বড়ো বাঘী নীল রঙের খাটো একটা শাটী এসে সিকছে, সেটা টোতাসের মতো ক'রে প'রে নিবার সঙ্গে যায় বর্না থেকে জল তুলে আনতে।

পথের পড়ে সেই গাছটা, যার নীচে ব'লে ইকল বাগি বাছায়,—তার মোখটা সন্ডে থাকে কাছের।

কিন্তু পথ ছেড়ে যাত্র ভেঙে একই ঘুরেই যায় মুনিয়া, সঙ্গে যিগা। করীর কাছে এসে বসে সেই পাখরটারই ওপর। সিলাকে বলে,—বাছা তোর বাগি। লগা বাগের একটা বাগি। ছুটো কি তিনট মাঝ খর থাকে একঘেয়ে হয়ে। কিন্তু সেই পরই কালে যেন যু বর্ণ বর্ণ করে। যনে হয়—সিনা নয়, ইকলই যেন ব'লে আছে তার পাশে,—বাছাচ্ছে ওদের সেই চির-পরিচিত মেঠো ঘর।

ওনতে ওনতে চোখ ধরে এসে পড়ে একসবর। হাতিটা মলে জড়িত করতে করতে ভাবে,—না-হয় রাবই করল মুনিয়া, প্রাচও যোগ। কিন্তু ও কি নিশ্চিতে এমন ক'রে গাছতলাতেই বসে থাকবে ? কী ও চায় ? ওকে শেরে,

না, ছাড়তে ? পেতে চায় তো নিক ওকে টেনে, না-হয় এভাবেই নিক কোনো চতুর প্রেমিকের মতো তার বাঘীসের আড়াল ক'রে। আর না-হয় তো ছেড়ে দিক ওকে—আর কখনো কোনো অবস্থাতেই যেন সে দেখা না করে, কথা না বলে। বিনামূল্যে একবার দেখতে চায়, একটু কথা বলতে চায় ? না, এক মুহুর্তের জন্যও দেখা হবে না মুনিয়া, একটু কথা তুলেও বলবে না ! মল-ভরতি হাতিটা। মাথার তুলে নিয়ে মুনিয়া বললে,—আয়, যিগা।

আরও কিছুদিন কেটে গেল। বনটা যেন অনেকটা শান্ত হ'য়ে এসেছে মুনিয়ার। এর মধ্যে একটাবারও দেখা হয়নি ইকলের সঙ্গে। কেমন আছে কে জানে ! জানোই আছে নিশ্চয়। ওদের গাও-বুড়া কি ওকে এতদিনে একটা বট জোপাড় ক'রে বেগনি ?

তিসু'র শিছন থেকে এসে ওর গলা গড়িয়ে ধরে ; বলে,—বট ?

—কী ?

—গর বন্। ঐ পাহাড়টা পেছিয়ে—

—ঐ পাহাড়টা পেছিয়ে আছে এক বেশ। অদৃষ্ট সব বাড়ী, অদৃষ্ট সব আলো !

দুটি বিক্ষাণিত চোখ বেলে ওনতে থাকে যশ বছরের শিত।

—আচ্ছা, বট ?

—কী ?

—তিসু বলে,—বাওয়া যার না পাহাড় পেছিয়ে ?

—কেন যাবে না ? বুঝে যাবে। যেতে ইচ্ছা করে দুটি ?

—হ্যাঁ, বুঝ করে। যাবি ?

—আমি ?

—হ্যাঁ। ছুই সঙ্গে না থাকলে যাবে না।

অব্যাক হ'য়ে ওর মিকে ভাকিয়ে থাকে মুনিয়া। ঠিক যেন সেই পুরনো বছর আগেকার সেই ইকল। তেমনি অদৃষ্ট চোখের দুটি ! তেমনি দৃঢ়-নিগদেহ নেপা দেখানো দুটি বস্ত্র চোখ !

সব-কিছু মুহুর্তে বিস্ময় হ'য়ে যায়। দুটি হাতে তিসু'কে গড়িয়ে ধ'রে কাছ টেনে দেয় নিবিড় ক'রে, অদৃষ্ট করে বলতে থাকে,—ইকল—ইকল !

চক্ষু ওঠে তিসু'র বলে,—কাকে ভাবছি ? ইকল তো সেই বাঠের যাত্রী, গাছতলায় !

কিছু সাদা আসে না মনিয়ার কাছ থেকে, নিশ্চয়
পাখান-প্রতিমার মতোই ব'লে থাকে সে চূপচাপ।

তিসু'র ওর দল্য মড়িয়ে থ'রে বলে,—বউ ?

—কী ?

—ইকলকে ভেঙে আনব ?

মুহুর্তে চমকে ওঠে মনিমা। মনের কথা কেমন
ক'রে বুকতে পারে এই শিশু ! বললে,—চল্ তিসু !

—কোথায় ?

—ঐ পাছতলায়।

—ইকলের কাছে ?

—হ্যাঁ।

সত্যিই তিসু'র হাত থ'রে এগিয়ে চলে মনিমা। সারা
আকাশটা ঘন নীল। দ্রুতি একটি সাধা মেঘের টুকরো এখিক-
ওখিকে ভেসে আছে। শুধু, অরণ্য পেরিয়ে বড়তরু মূর্তি দায়,
সিগম্বের সারি সারি মেঘ চলেছে নিকশণের দিকে,—যেন
কার পৈশব-বস ! মুহুর্তে গিয়েও বা মোছেনি, জেও গিয়েও
বা ভাঙেনি।

ওদের দেখে তাদাতাড়ি উঠে ঠাডালো ইকল। বললে,—
দূর থেকে সিনতেই পারিনি যে তুমি। এতদিন দূর থেকে
তা'হলে থাকে দেখেছি, সে তুমি ? খাটো নীল শাড়ী পরে
বালি পায়ে বর্নায় যে একটি ছেদের সঙ্গে রোষ জল আনতে
দায়, সে তবে তুমি ?

জীত্ব স্বরে উত্তর দেয় মনিমা,—তুমি জানতে না ?

—কী ক'রে জানব !

অকারণ কোয়ে যেন অন্ধ হয়ে যায় মনিমা ; ব'লে ওঠে,—
তুমি কি চাও, আমি সেইরকম জামা আর শাড়ী পরে
শহরে ঘেরে হ'রে ঘুরে বেড়াবো ?

—না-না, সে আমি চাইব কেন !

—হ্যাঁ, তুমি তা-ই চাও !— উত্তরের যতো বলতে থাকে
মনিমা,—তুমি বা চাও, মূহুর্তে তা বলতে পারো না, কাজে তা
করতে পারো না বলেই মনে মনে জলে মরছ, আবারকেও
জালিয়ে মারছ !

বলতে বলতে, কী আশ্চর্য, একেবারে কেঁদেই ফেলে
মনিমা, তারপর তিসু'র হাতটা। শব্দ-ক'রে ধরে,—চল্
তিসু !

তা'হলে সত্যিই কি কোনো কল করল ইকল ? ও কি
এভাবে স্থবী হবে না ?— গাও পেরিয়ে, 'বাধাগা'য়ের উগাও
মাঠও পেরিয়ে, পাহাড়ের গুহে উঠে কিছুদূর চলবার পর এক

অতি সংকীর্ণ বাংকের মূখে ঠাডিয়ে সোজা-নেমে যাওয়া
নীচেকার ভরাবহ বাংলের দিকে তাকিয়ে নানান শ্রম আগে
ইকলের মনে। এখান থেকে পা কসকে সেদেই পাথরে
ঘাতা সেগে-সেগে হাড়-গোড় ভেঙে কোথায় যে মুহুর্তে তলিয়ে
যাবে এই যেহটা, তার কেউ খোঁজ পারে না। কিছু শেব
ক'রে বেওহাতেই কি সব-কিছুর শেষ ?

এই সংকীর্ণ বন্ধুর পথ থ'রেই সে আর মনিমা; আর থেকে
পনরো বছর আগে পালিয়ে গিয়েছিল দূর সত্যজগতে,
আবার পনরো বছর পরে এই পাথর-ছড়ানো পথ ধরেই
কিরে এসেছে তারা দুজনে। বিকলের দিকে মাঝে মাঝে
সে আসে এখিক অস্ত্রযন্ত্র উদাসী মন নিয়ে। বিশম্মক
এই ঝাঁকটার মূখে লাল চ্যাপটা শাখরটার ওপর চূপচাপ সে
ব'লে থাকে। পাখী ডাকে মাথার ওপর, পাহাড়ের কোনো
এক নাম-না-মানা গাছের ডালে ব'লে ছালশালের অস্থায়
থেকে,—কোথায় যেন কোন্ রোপের আড়ালে কাঠবিড়ানী
নেমে এসে খেলা করে। সসুন্দ সসুন্দ হাওয়া এসে
লাগে কোথাকার কোন্ বেগুনে,—হৃদিত হৃদিত নাড়া
মিয়ে কোথায় বৃষ্টি কোন্ কনীর রক্তধারা সশোপনে সখীতে
ক'কার জোলে !

গাও-বুড়া তেহ করে ইকলকে। বলে,—তোরা একটা
বউ এনে দি'।

হেসে বলে ইকল,—কোথেকে ?

—তা আমি পারি। আমি তোরা লক্ষ্যে রাখা হই।

কাকর বউকে যোগাড় ক'রে বেবো।

—কাক বউ ?

বুড়া হেসে বলে,—আমাদের টিভালিয়ল সোজীর।
টারবারলমের থেকে পায়হ না বাপু। সে আমায় তুমি
ক'রো না। অনেক গরীব আছে, একটা মোহ মিলে, ফলে
বউ মিরে বেবো'বন।

ইকল গরীব হ'রে বনেছিল,—এসব কথা তুমি কখনো
জুতো না। এসব আমার ভালো লাগে না। বার বউ
নিহে আসব, তার মনের অবস্থাটা ভেবে দেখো ?

বুড়া অবাক হয়,—মনের আবার কী অবস্থা হবে !
কিছুই হবে না।

আর কিছু কথা বলেনি ইকল, বুড়ার কাছ থেকে উঠে
গিয়েছিল। সত্যিই সে ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখেছে,
ওদের কাছে এসব কোনো সমস্যাই নয়। বহুদিনের অভ্যাসে
ব্যাপারটা এমন সহজ ওঠা করে দেখেছে যে, সভা বাহুরের
গলক এসব জিনিষ কল্পনারও বাইরে।

এবের 'সভা' ক'রে ভুললে কেনন হয়? লেখাপড়া শিখিয়ে, কাপড়চোপড় পরিচো, ঘোড়সের এক-পতিষের ব্যবস্থা করে?

কিন্তু করবে কে? বহু টিফেক-কি দেবীর এ ব্যবস্থা। এর বাইরে হাবে এমন কে সংস্কারবিহীন ব্যক্তি আছে এই টোডা-পায়ে?

হসিই-বা বিবব আনো বাহ, যদি উটকাযও, থেকে পাতী সাহেবের নিরে আপা দায় পূব দেবিষে,—এবের সমায়ে আদুল পরিবর্তন এনে লাভ কী হবে শেব পর্যন্ত? আত্ম এলের পয়দার সরকার হয় না, বৈশ্বিন প্রয়োজনীয়তাও কম,—কিন্তু সেদিন সব কিছুই বাড়বে। স্নান বস্ত্রও চলবে না, বস্ত্র বিহারেও চলবে না। টোডাবের মধ্যে মাহুব খুন করা নিষিদ্ধ, চুরি করা কাকে বলে এরা আত্মও জানে না, একের দু'বার কথাকেই বেসবাক্যের মতো বিশ্বাস করে অগরে। 'সভাভা' এসে এসব কি থাকবে? না-না,—সে বিভীষিকার প্রকার নেই,—নিষেধ শিষ্টের ঙ্গাকাপড়া লাগের ওপরে হাত বুলোতে চেষ্টা করে ইকল,—বেশ আছে, বেশ আছে ওয়া!

মুনিমাকে এ-পায়ে না ফিরিয়ে আনা পর্যন্ত তার মন স্থির হচ্ছিল না। তাকে নিয়ে সে উটকাযও, থেকে পালিয়ে বেতে পারতো। অস্ত্র দিকে, অস্ত্র শহরে,—মুনিমার 'কালো সাহেব' টেরও শোভা না। কিন্তু তারা? দারিসহোয় প্রহায়ে প্রহায়ে সজর্জিত হ'য়ে কোন্ বসন্তালে যে তলিয়ে যেতো কে জানে!

সবথেকে বড়ো কথা, 'সভাভাগ' সম্পর্কে এমন এক বিতৃষ্ণা ভেগেছে ইকলের মনে যে, সেখানে ফিরে যেতে পারতো। অস্ত্র দিকে, অস্ত্র শহরে,—মুনিমার 'কালো সাহেব' টেরও শোভা না। কিন্তু তারা? দারিসহোয় প্রহায়ে প্রহায়ে সজর্জিত হ'য়ে কোন্ বসন্তালে যে তলিয়ে যেতো কে জানে!

যেলে না বলেই যেন এখানকার ব্যাভালে বুক ভ'রে নিশ্বাস নিতে পারা যাচ্ছে।

কেটে গেল আরও কিছুদিন। বড়ো বাবী এতদিন মুনিমাকে আশ্রয় করতে করতে বলে,—ইকলের সঙ্গে যোগ্য করো না কেন? যোগ্য না কেন ওর সঙ্গে?

মুনিমা বিরক্ত হয়েই উত্তর দেয়,—ভালো লাগে না নিশ্বাসে।
—কেন?

এ 'কেন'র উত্তর মুনিমাই কি জানে? ভালো লাগে না আর ইকলকে। যেন কর্নার যোত কলসীর মধ্যে থরা পড়ে আছে। সেই ইকল, তার মুখ মনে পড়তেই মনে হতো,—ছুরন্ত বেশে সে ছুটে চলছে। 'আব তার হাত ধ'রে বার বার ডাকছে,—আব, চলে আব।

গত পনেরো বছর ধ'রে এই একান্ত এক স্বপ্ন দেখেছে মুনিমা। কালো সাহেবের অভ্যাচারে যখন কাজা পেতো, জেডে হেতো বুকুর ভিতরটা, তখন কল্পনা করত সে ইকলকে। যেন তার হাত ধ'রেছে সে এসে। বলছে,—ভয় কী? আর, চল হাই। ছুটে চল হাই এখানে থেকে। কে জানে, ক্রমাগত ছুটে চলার দেনা এমন করে তার মস্তে ঢেলে দিয়েছিল কে? সেই দশবছর বয়সে, যা কান্নার করার কথা নয়, তাই তারা ক'রে বলেছিল। সমস্ত ডহ আর শালিন উপেক্ষা ক'রে উর্ধ্বাঙ্গে ছুটে চলা!

আব আত্ম? বড়ো বাবীর বাহুবন্ধনে বরকর ক'রে কেনে কেনে সে একশয়। চমুক ওঠে বড়ো বাবী,—একি! কী হলো?

বিরক্ত হ'য়ে ওর হাতটা গরিরে দেয় মুনিমা। ঠিক যেন ইকল। বিতৃষ্ণ, প্রবীণ ইকল। উপদেশ অমরোথ আর



অবাচিত ঘেঁহি দিয়ে তার অশান্ত মনটাকে মিহিমিছি শান্ত করতে চায়, কিন্তু পারে না।

পরদিন ছুটি বাথ রুম ভোরবেলায় সে শিশুর সঙ্গে—একবারে টেনে নিয়ে সেই পাহাড়ের পথে। নীচে ভরাবহ বাথ,—আখার ওপরে উল্লুখ শাহাড়। বলে,—বাঁশি বাজা তুই, আমি নাচি।

কিন্তু পারের অমায়িক বলে বাটো ক'রে শাটী পড়লই কি খাটি টোড়া-মেয়ে হওয়া যায়? রেডারের কুমারখানী সামগ্র্য দেখাওড়া শিবিরেছিলেন, চা-বাগানে আর উটকাবড়ের নানান সোজের সঙ্গে শিশুর ফলবত্ব নানান অভিজ্ঞতার আভ্যন্তরে নিচে কোথায় চাপা পড়ে গেছে তার মধ্যে সেই টোড়া-মেয়ের আশিষ মন, তার সম্মান কে দেবে?

সেই একই একথেরে হুরে বাঁশি বাজাবি দিমা; বলে,—কই, নাচ?

—পাওছি কই?

—আর তোকে শিবিরে দি'। সামনে আমাদের পরব। সেদিন মোব মারা হবে, বাবাগারা আদবে, কোটারা আসবে, ইকলারাও আসবে সবর-হরিণ কাঁধে নিয়ে, সারায়াক চলাবে বাঙাল-লাওয়া, গানবাঝনা আর নাচ। নাচবে গানের সব বেহেরা। তোকেও নাচতে হবে।

কিন্তু, কতকণ? পাহাড়ের সেই বিশালক বাকটা ছেড়ে দিয়ে ওরা দুজনে চলে গেল সেই কর্নার বায়ে। গানও শুনে না, নাচও শুনে না। শিশাকেও মনে হচ্ছে ইকলের মতো—যে কিছু হাবি করতে জানে না, আর ক'রে কিছু পেতে চায় না, শুধু একই সম্মানেই যে খুঁশি। 'মিনাতে একবার চোখের দেখা পেলেই হলো',—শিশাকে দেখতে-দেখতে মনে হচ্ছিল, এতুনি সে ইকলের প্রতিমনি ক'রে ঐ কথাই বলে বহুবে। হঠাৎ-ই উঠে পড়ল মূনিমা।

—কী হ'লো?

বিরম মুখে মূনিমা বললে,—ঘর চল।

পরবের আয়োজন শুরু হয়ে গেল টোড়া-পারে। সারায়াক ঘ'রে গান-বাঝনা-নাচের বরষ্ম পড়ল বলে। কিন্তু কিছুতেই উৎসাহিত হয় না মূনিমা। বড়ো স্বামীকেও ভালো লাগে না, শিশাকেও না। ওরা বেন দুজনেই ইকল। ইকলের দুটি বিভিন্ন রূপ। ভালো লাগে—তার সত্যার প্রতিটি অণুপরবাহু দিয়ে ভালো লাগে—আম্বকাল ছোট তিসুকে। ছোট তিসুও ইকলের আর এক রূপ,—সেই ছোটো-বসন্তের দশবছরের ইকল বে ও!

ওকে কোলে নিয়ে এক এক সময় আলোর-আলোর অস্থির ক'রে তোলে মূনিমা; বলে,—আমি মরে যাবো তিসু!

ছুটি শিশাশ শিশুচোব তুলে তার দিকে বড়ো-বড়ো ক'রে তাকায় তিসু; বলে,—কেন?

—আমো 'কেন-কেন' করিস না! তুই-ও ওদের মতো 'কেন-কেন' করবি?

কী ভেবে বেন হেসে কেনে তিসু, তারপরে হ'হাতে ওর গলা ছড়িয়ে ঘ'রে বলে,—বউ!

সমস্ত শরীরটা বেন শিরশির ক'রে ওঠে ওর এই মিস্তি ক'রে 'বউ' বলে ডেকে ওঠায়। ওকে প্রাণপণে হ'হাতে জড়িয়ে ঘ'রে মূনিমা বলে,—আবার ডাক!

—বউ?

—আরো—আরো। অনেক বার।

ও বেন তিসুই নয়,—ও বেন তার সেই হারিবে-বাওয়া দশবছর বয়সের বস্তু।

কিসকিস ক'রে তিসু বলে,—বাবি?

কিসকিস-ক'রা ঘরেই লাড়া বের মূনিমা,—কোথায়?

সেই একই পরে তিসু বলে,—ঐ বাড়ি পাহাড়ের চূড়োটা পেরিয়ে—

—তারপর?

তিসু বলে,—বাবাগাদের মাঠ পেরিয়ে পাহাড়ের সত্যার উঠে অনেক উল্লুকে, সত্যার একটা বাক,—সেই যে নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে বাহ,—সেখানে একটা চাপ্টা লাল পাখরের ওপরে রোম বিকলে গিরে একা-একা বলে থাকে ইকল।

রুদ্ধবাসে প্রায় করে মূনিমা,—তুই কী ক'রে জানলি?

—যেনেছি।

—কী ক'রে? আমায় বলবি না?

ওর কানের কাছে ঘূষ নিয়ে কিসকিস ক'রে তিসু বলে,—কাউকে বলবি না তো?

—না।

—তাহলে শোন। আমি-না, পরভূমি লুকিয়ে-লুকিয়ে ইকলের শিহন-শিহন দিয়েছিলাম! কেউ আমাকে খেতে পায়নি।

—ইকলও না?

—না।

—শিশাও না?

—দাধারা কুঁটে না, বাবাও না।

—যেখানে কী হতো?

—তানিস্ না ?

—না।

—টিয়েক-স্ত্রীর কাছে পুতঃ মিতে হতো। ছোটোদের পাছোড়ে বাঁজা বাঁধ।

—কে বললে ?

—আমি জানি। ঐনিক বাসঃপালের গাঁও পথের আমরা যেতে পারি, তার বেশি পেলসই পাশ হবে।

পনেরো বছর আগেকার দিনগুলিকে মনে পড়ল মুনিসার। পাশ যে হয়, সে তো তারাও জানতো। তবু বেঁচে চাইতো।

ইকল বলতে,—আর আর, চল !

আমরও হাতে, দুইয়ের ঘোরে চমকে-চমকে ওঠে মুনিসা। সেই চমকবরের ছেলেমাগ্নব ইকল বেন আমরও থাকছে,—আর আর, চল !

কিন্তু, এক এক সময় নিজেই ওপর অসীম বিরক্তিতে ঘন ডরে ঘাব। কেন ? এতো ছুটে-চলার নেপাই বা কেন ? মেরে হ'য়ে—এক দসারের বউ হ'য়ে—কেন তার এই পতীর বাইরে বাবার নিষিদ্ধ আকর্ষণ ? এ কী অমৃত ঘন তার ! এ কী জালায় জ্বলছে সে অহঙ্ক ! আর কোনো মেরে তো এমন করে না ! হাসিমুখেই তো ঘর করছে তারা। তবে ? তার কেন এমনটি হল ? কে বলে সেবে ? বে বলতে পরিত, তার কাছে বাঁজা তো হুতের কথা, তার মুখখানাও সেখানে ইচ্ছা করে না ! সেই পনেরো বছর আগেকার ছোট ছেলেটিকে সে বেন গ্রাস করে বলে আছে !

—বউ !

দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল এসে তিসুহ।

যাকে সে মতো ভালোবাসে, যাকে না দেখলে তার মনটা শহির-শহির করে, হঠাৎ সেই তিসুহকেই দু'হাতে তেলে দেয় মুনিসা ; বলে,—সবের বা। এমন বিরক্ত করিস না।

চূপাচপ কিছুক্ষণ অধুরে গাড়িয়ে থাকে তিসুহ পাথরের খণ্ডের মতো। তারপরে এক সময় পায়ে-পায়ে আবার কাছে আসে সে মুনিসার ; বলে,—আমি জানি।

—কী ?

হঠাৎ-ই তিসুহ বলে কেল,—ইকলের সঙ্গে বেধা না হ'লে তোমার মন ভালো থাকে না।

অচ্ছিন্নশ্রুতির মতো তাড়াতাড়ি উঠে পাঁচায় মুনিসা,—কে বললে রে তোকে ?

কৌতুক হাসি-হাসি মুখে বলতে থাকে তিসুহ,—আমি জানি। গাখাখা বলাবলি করছিল নিজেদের মতো।

—কী বলছিল ?

—ইকলকে ঘর ভেঙে আনবার কথা।

বলতে-বলতে ওর খুব কাছে এসে পাঁচায় তিসুহ, ওর হাতটা ধরে বলে,—বউ ?

মুগ্ধাখিতের মতো বলে ওঠে মুনিসা,—উ ?

—আমি ভেঙে আনবো ইকলকে ? বিকেল হয়ে এলো।

ঐ জাম্ না, পাছোড়ে-পাছোড়ে বনে-বনে কেমন ছাড়া প'ড়ে এসেছে। ও নিকরই গেছে সেই পাছোড়া বাতায়, সেই বাতায় খারে চাপাটা লাল পাখরটার কাছে। ঘাব ?

দু'হাতে ওঁকে মুহূর্তে জড়িয়ে ধরে মুনিসা, বলে প'ড়ে টেনে নেয় কোলের কাছে, কান্নায় অবলম্ব কণ্ঠে কোনোক্রমে বলে,—কাকে ডাকবি ? সে কি আর বেঁচে আছে ? মরে গেছে রে, একেবারে মরে গেছে !

ওর কথা কিছুই বুঝতে পারে না তিসুহ, তার অবা-হওয়া বড়ো-বড়ো দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে মুনিসার দিকে। তাকে,—বউ ? তুই কাঁদছিল !

—না !—চোখ মুহূর্তে-মুহূর্তে মুনিসা বলে,—কাল পরব, না-রে ?

—হ্যাঁ।—পরবেই কথায় মুহূর্তে উৎসাহিত হ'য়ে ওঠে তিসুহ বলে,—কাল রাতে কতো গান, কতো নাচ ! তুই নাচবি তো ?

—আমি নাচলে তুই খুঁই হবি ?

—হ্যাঁ।

—না।—মুনিসা বলল,—খাড়া খুঁই হবার হোক, তুই হোস না। তোমার বউ কাকর সঙ্গে নাচবে না, কাকর সঙ্গে কথা বলবে না, শুধু গল্প করবে সাথারাত তোমার সঙ্গে। তোকে আমি ঐ পাছোড়ের গল্প করব। ঐ পাছোড়ের চুড়োটা পেরিয়ে—

—মুনিসা !—বেন মুহূর্তে বজ্রপাত হলো শ্রবের মধ্যে। প্রচণ্ড চমকে কেঁপে উঠল মুনিসা। ধরবা পেরিয়ে একেবারে শ্রবের মধ্যে এসে পড়েছে ইকল।

—বিনা আমাকে ভেঙে নিয়ে এলো।

—কেন !

অম একটু হেসে ইকল বলল,—তোমার নাকি মন ভালো নেই, তুই নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে থাকিস !

—কে বললে !—মুনিসা বলে,—আমার মনের ববর জানালো কে এতো ?

—কেন ? তোমার বাবীরা ?

—খুব জেনেছে তারা।—মুনিসা বলে,—কিন্তু তুমি এসে কেন ? এমন করে ?

—সেবা করত। বেবা তো পাই-ই না।

জীৱকর বসে উঠল মুনিমা,—গেতে হবে না বেবা।
বাও এখন থেকে। এখনি বাও!

—তাড়িয়ে গিচ্ছিন?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই নিচ্ছি।—মুনিমার কণ্ঠ আবেগে কঁপ
হ'য়ে যায়,—তুমি যাবে কিনা?

কঁদবার চূপচাপ কিছুকণ পাড়িয়ে থাকে ইকল, তারপর
বীর কণ্ঠে বলে,—খাচ্ছি।

ব'লেই আর পাড়ায় না, দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে
আসে ভাতাভাড়া ইকল।

—বউ?

হ'হাত বাড়িয়ে ওকে কুঁকে টেনে নেয় মুনিমা; বলে,—
তিসু! তুই কিন্তু ভর মতো বড়ো বসে এককম বাবা
প'ড়ে থাকবি না। যে দতই মাক্ক, তুই কুঁক টান ক'রে
সোমা হাটবি। চলে যাবি ঐ পাহাড়টা শেরিয়ে—দুববি
এ-দেগ থেকে ও-দেগ—

ওকে থাকিয়ে দিগে তিসু বললে,—টিক বসছ?

—কী?

—পাহাড়ের ওপারে ভালো বেশ আছে?

—আছে। ভালো মাহুও আছে। আমি খুঁজে
পেলায় না। কিন্তু তুই তো খুঁজবি ইকল! তোর কি
এভাবে চূপ ক'রে এক মাফগার ব'লে থাকা সাজে! আমি
যে তোকে এখন ভাবে দেখতে চাই না,—কোনোদিন
চাইওনি!

তিসু অবাক হ'য়ে বসলে,—আমাকে ইকল বলছ কেন?
একটুকু ভর দিকে একদুট্টা তাকিয়ে থেকে মুনিমা
বলে,—তাইতো রে! বস্তু কুল হ'য়ে যায়!

পরবের দিন। দ্রুত বেলা প'ড়ে আসে, উৎসবের
তত ঘটা প'ড়ে যায়। আর সমস্ত বিধিনিষেধ শিথিল।
টিভাডিলল—টারখারল,—সব একাকার! অরপোর দিক
থেকে দু'একজন ইকলা গভিয়ার আসে সখর-দুখির বিক্রি
করতে। আর আসে কোটাটা, বাবাগারা।

লাল-টকটকে একটা শাড়ী তাকে এসে দিচ্ছে বড়ো
খুসী। শিশা বললে,—এই কাগড প'রে আর তোকে
আমার সঙ্গে সারারাত নাচতে হবে বউ, বুকি?

ওদেরও বেশী প্রণয় ভৈরী কন্ডা'র ঘর আছে। সেই
মতপান মধ্যাহ্ন থেকেই চলছে সারা গাঁয়ে। তিসু
বললে,—বাবি বউ?

নাক টিপে কোনোভাবে তা পান করে মুনিমা। পলা
দিগে যেন এক অগ্নিস্রোত নেমে যায়। শিশা দ্রুটে আসে,
বলে,—একবারে অমন ক'রে খেতে নেই, জীৱন বেশা
হবে।

মুনিমা তিসুকে অভিরে খ'রে বার বার বলতে থাকে,
—ইকল—আমার ইকল! তুই বা, পাহাড় শেরিয়ে তুই
চ'লে বা। কিংরে এসে মন্তব্য: এই খবরটি আবার দিল
যে, ভালো লোক এখনো সংসারে আছে! সেই কালো
সাহেব আর চা-বাগানের সেই শক্তগুলো চাড়াও লোক আছে
দেশে, দারো আফগাণ্ড মাহুগাং রেহ করতে জানে, ভালোবাসতে
জানে, অংশী বলে কুঁকে টেনে রাখতে চায় না, বা অংশী
বলেই টোতায়া যে মাহুও নয়, একখাটা বিশ্বাস করতে চায়
না। ওরা আমার ওপর অনেক অভ্যাচার করেছে যে,
আমার বাক্য ছেলেটিকে লুপ্ত মাটির মুখ দেখতে দেয়নি!

শিশা এসে ওকে তুলে ধরে,—টপ! ভয়ানক মেধা
হচ্ছে দেখছি! আয়, নাচের আসরে আর, বেহেস্তের সঙ্গে
নাচবি।

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মশল জ্বলে উঠেছে সারি সারি।
লখা-খরসের ঢোলর মতো বাজনা আর বাঁশি, আর বিভিন্ন
লতাগাটা, পাখির পালক আর বেঘেরে শিং মাথায়ে কাগড
দিগে বাবা গোলাকের মাহুওগুলো। সত্যই অদৃষ্ট মেগায়
যেন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে মুনিমাকে। তিসুকে অভিরে
খ'রে বলে,—ইকল—ইকল কই?

সারা আসরে ইকলকে কেউ দেখতে পায়নি। তিসু
বলে,—আমি দেখছি বউ।

—না, তুই বাস না!—মুনিমা ওর হাতটা চেপে ধরে,
তারপরে ওর গালে নিম্নের গাল দুটোকে সংলগ্ন করে
আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলতে থাকে,—এই তো, এই তো
আমার ইকল!

কিন্তু তিসুর যেন আর জাগে মন্ত এক ভাব।
বার বার তার আর মনে হয়, বউ তাকে ভালোবাসেনা—
কোনওদিন ভালোবাসেনি। বউ চায় ইকলকে—ওধু ইকল
আর ইকল!

টোতাডের দশবছরের ছেলের মনেও অতুত ভাব আগে,
—আচ্ছ না ইকল। বউ ভালোবাসুক না ইকলকে, তাতে
হবেছে কী? আগলে বউ তো রইল তামেরি হয়ে, তামেরি
হবে?

নাচতে নাচতে গভিয়ার আগে অদৃষ্ট প্রমত্ততা। আখিন

টোতা-নাটীই যেন ভেসে ওঠে মুনিয়ার মধ্যে। টোতাদের নিঃশব্দ অরণ্যের মাত্র তিন-চার বছর বয়সেই শিশুকালে বাপের হয়ে যায় 'ম্যাট্রিনি' অর্থাৎ বিয়ে—তোমার পা দিয়েই যারা আসে পূর্ব-নির্ধারিত স্বামীঘর করতে, বহুপতিত্বের বন্ধনে নিজেকে বিসিয়ে দিয়ে সহজভাবেই জীবন কাটিয়ে বেধে, মানসিক ভেদন রক্তের কোনো সন্দর্ভাই বোধ করে না,—দাম্পত্যজীবনের কোনো বিধারক মানসিক দৃষ্টান্তই বাজে না বাসের মধ্যে—তবু করে, হাসে, ক্রোদে,—পরব উপলক্ষে নিশিত ভূতাসভায় উদ্ভাব হয়ে নাচে!

হৃদ্যতে নিশাকে টেনে নিয়ে একটা টিলার আড়ালে গিয়ে বসে মুনিয়া। পূর্ণিমা-রাতের উদ্ভাসিত জ্যোৎস্নার নীলগিরির টোতা-উপভাষা এক অশ্রুপূর্ণ স্বপ্নরাজ্যের মতোই প্রতিভাত হয়।

কতো শল, অশ্রুশল, ১০ কেটে যায় কে জানে, হঠাৎ চৈতন্য হয় সমস্ত টোতা-পল্লীর। নিজে থেকে বাবাগানেরই একটি লোক এসে দিবে যায় দুঃসংবাদটা। সেই পাহাড়ী পাথর বিশালমত ধাক্কাের মূহে সেই যে চ্যাপ্টা লাল পাথর, তারই কাছে ঘটেছে এই শোচনীয় দৃষ্টটনা। আকস্মিক, অভাবনীয় শোকে নিবর-নিবর হয়ে যায় মুহূর্তে সমস্ত টোতা-গাঁওয়ের লোকেরা।

ওরা দুজনে বৃষ্টি টের পায়নি, টিলার বৃকে মাথা এলিয়ে ছুটলে চূর্ণচাপ ক্ষুরে ছিল পাশাপাশি।

পূঁজতে পূঁজতে সমস্ত ললটা এসে গাঁড়ার ওদের মুখোমুখি। শত-শত টোতা। সেই চ্যাপ্টা লাল পাথরের তলাকার ঘানের নীচ থেকে বকানুত নিশ্রাণ বেহেটা হৃদ্যতে ব'য়ে নিয়ে এসে ওদের দুজনের সামনে বসে গাঁড়ার বড়ো স্বামী,—মুনিয়া উঠে গাড়িয়ে সব-কিছু লম্বা ক'রে কেমন বেন বিকল হয়ে যায়,—এ বেন অবিস্মৃত কোনো এক নিরাক্ষর ভূঃকল্প নৃত্যমান হয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়েছে! একি কখনো হ'তে পারে। অসম্ভব। তার সামনে অনবরক একটা বিতীভিকার স্বপ্ন ক'রে টিরেক-জি বেবী তাকে ভর দেখাচ্ছেন।

তার সামনে কান্দু-মোড়া বৃত্তসংহটা শাঙ্কিয়ে বেখে হাঁটু গেড়ে ব'লে আছে বড়ো স্বামী। হাঁটু গেড়ে আশেপাশে ব'লে আছে আরও কে-কে যেন। আর সমস্ত লোক চিরায়িতের মতো গাড়িয়ে আছে—নিঃশব্দ—নিঃশব্দ! কত দূরে কোথায় যেন একটা ব্যত-মাগা পাখি ডাকছে—কোথা থেকে বেন ভেসে আসছে কোনো এক গিরিনন্দিনী কন্যার কলধর। কিন্তু কী হলো মুনিয়ার? তার বনে হচ্ছে, দূরত্ব বেশার সে এখনও আচ্ছন্ন, দূরত্ব বেশা-ই তার সোথে এঁকে

সিঁদে বিতীভিকা,—প্রস ও ভীতি—মূর্ণময়ী আতঙ্ক! অকস্মাৎ তীর তীক্ষ্ণ একটা চাঁৎকার ক'রে সেই বৃত্তসংহের ওপরে ক'ণিগে পড়ে মুনিয়া, বৃক্ষাটো আর্জমান ক'রে ওঠে,—ইকল—আমার ইকল!

মুহূর্তে ওজন ওঠে সমস্ত দলে। কোথায় ইকল? কাকে ও ডাকছে ইকল বলে? ভিত্তি ঠেলে এতক্ষণে পড়িয়ে সামনে এসে গাঁড়ার ইকল,—কোথায় সে বে ছিল সারা সন্ধ্যা কে জানে!

—এই যে আমি।

ধীরে ধীরে তার দিকে মূখ তুলে তাকালো মুনিয়া, তারপরে উঠে গড়ালো এক প্রেতিভীর মতো, কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বলে উঠলো,—কে ঘেরছে আমার ইকলকে! —ইকল নয়, ও তিস্রু।

ওদের গাঁও-বুড়োই যোধবীর উত্তর দেয়,—ঘেরেছেন স্বয়ং টিরেক-জি। ছোটো ছেলেরের পাহাত শেকনো বারণ।

বাবাগানের বে-লোকটি এনেছিল দুঃসংবাদ ব'য়ে, সে প্রতিবাদ ক'রে বলে ওঠে,—না-না, পা শিঁদেলে পড়ে সেছল ধায়ের মধ্যে।

—কিন্তু ওখানে ও একা গিয়েছিল কেন?

—সহত্যানের ডাকে।

—না!—বহুক্ষণে চাঁৎকার করে ওঠে ইকল; বলে,—কেউ জানে না, আমি ওকে ঘেরছি!

সমস্ত দলের মধ্যে সেখা ঘেঘ মুহূর্তে তীর এক উত্তেজনা। লম্ব গাঁড়ার মুনিয়ার বৃদ্ধ শত্রু, লম্ব গাঁড়ার বড়ো স্বামী,—হারমুখো হয়ে ভেঙে যায় বিশা।

গাঁও-বুড়ো ঘামিয়ে দেয় সকলকে। মাথুহ খুন করা টোতাদের গীতি নয়।

টিভালিয়ালের গাঁও-বুড়ো বলে,—সব মিথ্যে। ইকল সারাটা বিকাল থেকে চূর্ণচাপ তার ঘরে ব'লে। ও আম বাইরেই বেরোয়নি।

অল্প সবাই সরুঘেই সেটা বিশ্বাস করে, কিন্তু মুনিয়া নয়। তাকে কেউ ঠেকাতে পারে না। হিংস্র আদিম নারীর মতোই সে দিগে ক'ণিগে পড়ল ইকলের ওপর, দ্বিটি দৃঢ় হাতে ওর গলা চিগ ধরে উল্লসের মতো বলতে থাকে,—কেন যারগি আমার ইকলকে—কেন যারগি!

বড়ো স্বামী আরু বিশা ছিলে কোনোক্রমে জড়িয়ে নিয়ে আসে বেপাক্ষর নারীকে। আচ্ছন্ন হয়ে সে কীমতে থাকে, পাগলের মতো সে নিজেই মাথা হুঁকতে থাকে টিলার পাথরের ওপরে।

আমিন, ১০৬৫]

টিভাসিলনের গাও-বুড়ো ইকলকে একান্তে ভেঁকে দিয়ে দিয়ে বলে,—কেন মিছিমিছি নিছের খাড়ে টেনে নিলি সব সোব!

—মিছিমিছি নয়!—ইকল দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দেয়,—আমি যোম বিকেলে ওখানে গিয়ে বসি, অনেক রাত অবধি ওখানেই এক-এক দিন আবার কেটে যায়। তিসু তা জানতো। ও বোধ হয় আমাকেই আম ওখানে খুঁজতে গিয়েছিল একা-একা। আমি যদি রোজকার মতো আম ও ওখানে থাকতাম, তাহলে এ দুর্ঘটনা ঘটতো না।

ও তোকে একা-একা খুঁজতে গিয়েছিল কেন? কেউ কি ওকে পাঠিয়েছিল?

—না।

—কবে?

—ও নিজেই গিয়েছিল।

—কেন?

এই 'কেন'র উত্তর দিল না ইকল। সে জানে তার হিসাবে ভুল হয়ে গেছে। পনেরো বছর পরে 'সত্য' বেরকে তার পুঁথির সন্ধানের সীমান্তে কিরির আনা যায়,—মিলিয়ে দেওয়া যায় না, মিলিয়ে দেওয়া যায় না।

কিন্তু এটাও কি সত্য? কিছুদিন পরে, অলপেরে বুধু ও উঠে আবার মিলিয়ে বাবার মতো সব-কিছু বধন স্থির হয়ে

সীমান্ত

পেল আশেপাশের মতো, তখন একদিন সকালে হঠাৎ-ই মূনিয়ার ঘরে এলো ইকল। জড়িত পুস্তিকার মতো চুপচাপ বসে ছিল মূনিমা একা। ইকল বললে,—বাঘে? ঐ শাহাডটা পেঠিয়ে—যেন ইকল নব, তিসুই কথা বলছে। সবাসে পিউরে উঠে মূনিয় বললে,—কোথায়?

—শহরে। আবার পাগিয়ে। দুজনে।

অড়িম্পুত্রের মতো উঠে পাড়ালো মূনিমা, পার-কাছে কেউ আছে কিনা লক্ষ্য করে লাগ্রহে ঠেং চাপাথরে প্রর করল,—কখন?

—টিক সন্ধ্যায় আসব। তৈরি থেকো।

জরপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ইকল। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বড় ওঠে মূনিমার মনে,—কিন্তু সে কোথায়? তিসু? কোথায় তার যেমন করে হুঁহাতে গলা জড়িয়ে ডাকা: বউ?...বউ?...বউ?

তাই, সন্ধ্যায় এসে মূনিমার কোনো সন্ধানই পায় না ইকল। শুধু, পথ চলাতে-চলাতে সেই কর্মীর কাছ থেকে শুনে পায় নিশার সেই পরিচিত বস্ত্রিত হর, আর কর্মীর-ই মতো কেনে রত্নময়ী নারীর প্রমত্ত কলকলি।

শৈলশিখরের অঙ্গ সীমান্তের দিকে লক্ষ্য রেখে একাই এবার পথ চলাতে থাকে ইকল, একটা ভিজাসের গুহনকে বাহা-বাহ এড়িয়ে বাবার চোঁটা করে। এবারও কি তার বুঝার কল হতো মূনিমার মনকে?...



দ্র বেঙ্গল ডেকরেটর

২২৫-চিওরজ্ঞন এভিনিউ • কলিকাতা - ৬

বক্তব্য

কল্পপ্রসাদ মিত্র

পাখিটা উড়ছে শূন্যে শূন্যে
মেঘের তেউ-বাত বিধু,—
নীচে বাতায় হাঁকে তেজিওলা
বাতায়ে উড়ছে পদা,—
আর, অদরদ বাতুলগলা,
ইচ্ছে, ইচ্ছে, ইচ্ছে—
মাটি ভিক-ভিক, গাছটা সবুজ,
—এই শুধু বক্তব্য !

ঘোড়াটা পকেছে সাতনরী হাত,
মেখেটি কুলের প্যাপড়ি,
খুঁটেছুদুনীরা পুড়েছে এখনো,
হাতপুতুর চলছে—
তেপাহারের সীমানা ছাড়িয়ে,
সাতসমুদ্র পেরিয়ে ।

নেপা কেটে যায,—
তঃ ধরে তাই অদেয়ান্ত গর্বে ।

প্রবীণ চোখেতে পুরোনো দুঃখ :
পাখিটা উড়ছে শূন্যে !
সত্যও নয়, মিথ্যেও নয়,
কবিতা প্রাণের কথায় ।
জীবন হৃদয়ে বন্দি সীতা
পৃথিবী-বর্ণলহার !

পাখিটা উড়ছে শূন্যে শূন্যে
—এই শুধু বক্তব্য !



রক্ত ও স্নানী

মহাশয়তা ভট্টাচার্য



মাঝা রক্ত, ছোটখাটো বাহুব। কালো চোখে আগুনের
হুল ফুটে ওঠে। আর সেই আগুনে পুড়ে যবে গোপাল।
তবু ঘরের মাহু। পরের নয়। বিবে-করা বৌ।
হুলহুমারী নাম। গোপাল বলে ফুল্কি।

গোয়ালির ফোর্ট। জমি চেড়ে আশ্বাসনে বসত করছে
মাহু। অনেক বাড়ী-ঘর। আবার অনেক ঠাকা।
ফুল্কির ঘর একেবারে পূব কোণাভে। বড় বড় নিমগাছের
ছায়াতে আড়াল করা। একটু নেমে বেতেও হয়।
ঘরবানি বেন হুল-বাবাখ। তারপরে আর কিছু নেই।
সব ঠাকা। ভাগ্যে গোহার রেলিং দিয়ে আড়াল করা,
নরতো ভরে মরেই বেতো ফুল্কি। দোজপঙ্কের বৌ।
পারে তো চোখের মণিতে রাখে বৌকে গোপাল। কি
জাগ্য যে, বুঝানা তার মত চণ্ডা। ঐ গুজারীমহলের
চণ্ডা। কপাটখানার মতো। সেই বুকে বিলিয়ে দিয়ে তবে
কিছু ভরসা পায় ফুল্কি। সেও এক গুজারী মেয়ে।
গোপাল যদিও ঠাকা নয়, তবু পুরুষের মতো পুরুষ তো।
ফোর্টের প্রহরীর শোশাকে মানারও তাকে চমৎকার।
ফুল্কির কাছে একটু পাক ধরেছে অবশ্য। বুকের লোমও
কাচাপাকা বেলানো। তাতে ফুল্কির এতটুকু হুস নেই।
সেই বুকে মাথা রেখে নিজেই তার অনেক রানীর থেকে
অনেক হুসী মনে হয়। এই মুহুর্তে গোপাল অনেক হুসের
কথা বলতে পারে না। শুধু বলে,

—বড় বুদা হয়ে পেলাম রে ফুল্কি।

—কে বলেছে?

—সবাই বলে।

—তোমার ঐ ছতী তো? কি কানে ছতী?

অম অম ফুল্কি ছিটকে ওঠে কথার আর চোখে।
হা-কা করে হাসে গোপাল। বলে,

—না যে, না। পরমাহুসকে ছুই দোষ দিলনা ফুল্কি।

ঐ আমাইই কথা।

—তুই অমন দুর্দ-কথা বলিস কেন?

—বলবো না।

—না, বলিস না।

—কোন আশ্বাসন চাপ ফুল্কি।

সত্যিই চমৎকার। কাটা জানলার ঠাক দিয়ে বেন
আকাশখানাই এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। তার-ভরা
আকাশ। কালো শালের গুণ্ডা সপ্তাহি আর সালপুরুষের
নক্সা-কাটা বকী ঘুরাঘের দীর্ঘবাসে করণ আকাশ।

ঘরই বেন আকাশ। আর ফুল্কি বেন বর্ণালীতে উজ্জল
হুসের একটি ছোট্ট পাখি। সেই পাখিকে এই রাতে দুর্ভোগ
ধরেছে গোপাল। ফুল্কির লাল মাগরা, হলুদ গুড়নী আর
জর্জা চোলা-ও রাতের রক্তে রক্তমাখা দেখায়। পায়ার
মতো অলে ছুটি চোখের তারা। বুতো হুল মাথা দুখান।
ভাখে গোপাল। গোপালের চোখ অনিবিধ। ফুল্কি কি
সে চোখের ভাষা বোঝে? বোঝে যে, এখনি মনে মনে

গোপাল তাকে আশ্রয় কোনো রাস্তাচর্য্য পাখি বানিয়েছে আর নিক পক্ষপাত টাকা দান-বাইনের পাহারাধার হয়েও এতখানা তাম-ডরা আকাশের ঘাসিওনা দিয়ে বিয়েছে তাকে? হয়তো বোকেনা। অথবা ফুলকির মনে হয় এত আকাশ এত হাওয়া—সে বুকি হাড়িয়েই শেল। তাই ছুটকট করে ওঠে এতই নদীম জলবাগার হয়ে। বলে,
—খানি আকাশ আর বাতাস! কতদিন আমিইন
বাইনি বসুতো? মনটা আমার বড় প্রথার।

—নিচে বস। নিচে বস।

—তোর আশ্রয়না ভালো লাগে। আমি বুঝিয়ে বুঝিয়ে সেই বজ্র-কোষের বাস পাই নাকে। পাখির হেঁটে হেঁটে পা-প্রথানা আমার বাসা হয়ে গেল। মাঝে মাঝে মন হয় যে চিরদিন জলে পা ডুবিয়ে বলে থাকি।

—আর কি মন হয় ফুলকি?

—মন হয় চাচার ঘরের বেনদেবর সঙ্গে এককোঠ হয়ে বিয়ের গান গাইতে বাই চিরদিন ওপায়ে। এর ঘরে তার ঘরে পরেই ভাল ভাঙি, বদোশী বিই বরজার আশ্রিনায়।

—না, ফুলকি। এখন আর ছবি নেহেঁকীপালের ম-বাগ-মরা ভাইয়ের বেটী নও। এর তার বাড়ী বদোশী দিতে হবেনা তোমাঝে। ভাল ভাঙতে হবেনা।

গোপালের গলা গভীর হ'লে ফুলকি চুপ করে। ই্যা, এখন তার সম্মান বেড়েছে। গভীর পর থেকে বাতনি বটে চাচার ঘরে। চাচার ঘরে একবার বসি বাব, তো আমার হয় পাবে। বকাছাদের মেয়ে তার চাচী। সেই পদমর্য্যাদার গর্বে বিয়ের আগে ফুলকিকে বাহন বলে পুঁছতো না। সেই চাচী-ই বড় অব্যাক হলো। এমন বিয়ে হলো ফুলকির! সেই কোয়ার ওপরে আশ্রয়ানের বুক কোয়ারটার। সরকারের তত্ত্বাবধায় বাঘী আর নন্দ ভোজা-এর কাটাবিহীন চমৎকার সমোয়। বর্য্যার লড়াই কেবল ছাঁটাই বাঘী গোপাল দি। জ্বাঘানো টাকা দিয়ে গরবা গড়িয়ে গা শাকিয়ে ঘরে আনলো বৌ। বাঘীর গর্বে মোহাশী কবুতরের মতো ফুলতে বাকি ফুলকির মন। ভাবে বাঘী যে একরোখা। নইলে তাকে বহি একবার নিচে যেতে পারে আশ্রিন, তো দশকালের ঘরে উৎসব পড়ে যাবে। তার চাচী হয়তো জামাইয়ের বাড়িতে তোলা আসনগুলো বের করবে।

ডাক্তার, ডাকঘরের যাবু, এমনিথারা খ'খরে ফুলকি তোলা কাক করে বের। ডাক্তারবাণু চেসেমায়াব। ঘরে বৌ আসেনি। ঐটিপাট বিয়ে বদলা পিয়ে দিতে দিতে ফুলকি শুষ্ট নুস্তে পারে ডাক্তারের চোখ-ইট তাকে

অহুসরণ করে কিয়ছে। পুরুষের চোখের প্রশংসা ফুলকি এখন চমৎকার গড়তে জানে। আর বাহুবকে নাচাতে বড় ভালো লাগে তার। কোনো সময় কাছে এসে বলে,
—কাল রাতে মাথার দরবে খুয়োতে পারিনি, সাব।

হাতটা কেবলে?

ডাক্তার বেশাই ফুলকির বাহু-নতেন্স মুখানার দিকে চেয়ে হাসে। বলে,

—তোর মাথার দরবে হলো? খুব বাঁধ তো দরবের? গোপালকে ভর করে না?

ফুলকিও হাসে। কান্নে চিল দিয়ে মাথার বিছিয়ে বলে পড়ে বাড়িতে। বলে,

—বোঝ শহরে বান, সাব—একদিন আমিও বাব। ঘুমে আসব।

—মাধব আছে?

—ইস—পাহারাধারকে ভর করি আমি? শহরে আমারও চেনা-জানা বাহন আছে, জানসেন সাব?

এমনি সময় সোপালের অস্থির ডাক শোনা যায়,—
ফুলকি? ফুলকি?

কুঝির ঘোষ প্রকাশ করে উঠে পড়ে ফুলকি। বলে,
—আমায় ঐ ফুলকি বাবুজী, কোথাও বসতে পারিনি এতইহু।

ঘরে বেতে গোপাল বলে,
—ইলি এলো কেমনা কেবতে। আমার ভিউট। চুই বা ফুলকি—

এই কাল খুব গড়ন ফুলকির। চুই করে খুশ বেজে নেব। পারসার মেয়ে ওড়না বুঝিয়ে নেব। মাথার ওড়না টেনে মুখানাকে স্নান কর। পায়ে প'য়ে নেব পাভসা। নাগরা। বাগা গাড়ী করে এসেন তাঁদের বকা আলোবা। হাঁটা-পথে বাবতে বড় ভালো লাগে ফুলকির। বিশাল হুর্প। বেবে গেছে মোহানো রাখা। কটকে কটকে পাহারাধারদের পাশ ঘেঁষিয়ে লাকিয়ে লাকিয়ে নায়ে ফুলকি। ট্রান্সিটের সেলান জানিয়ে কেমনা দেখাতে-দেখাতে ওপরে ওঠে। অনভ্যন্ত বর্ণকজন ইঁপিয়ে ওঠেন। ফুলকি বেশ নিশ্চিন্ত নিখাসে আছে আছে ওঠে। বিটা গলায় হুশব বোপিতে বলে এসে,
—এই সাব, বানবল—জামাইবল। আসনি যেখানে ইঁপিয়ে সাব, ঐখানে সাব, তানসেনের কলসা হলো। ...এই সাব, জৈন জৈনদের হুটি যেহুন। ...এই হয়ে বাপসা মুহা-ক কেবর করলো। এই শিকলে হাত-বাঁধা মুহা-... নিখাস কেলে যেহুন সাব—এমনো কেবন শব জানাবো।

রাজহানী ওকারী ঘেরের গোশায়ে ফুলকিকে বেধতে ভালোই লাগে নরকজনের। এইসব কিংবদন্তীর গিনের সকে তার বেন দিল পাওয়া যায়। বদশিখ বেন হাত জরে কেউ। ইহৎ বিচু হয়ে নীকার করে শিতহাতে কাড়িয়ে থাকে ফুলকি। বাইরের জগতের মাছুষ সম্পর্কে তার আশ্চর্য বোধ আছে। তাদের প্রগ্রসে চোখে নিজেকে বেধে নিজেরই প্রেমে পড়ে যায় ফুলকি এখনি সব মূর্ত্তে। সে বোধ তার কাটতে চায়না। ঘরে কিরে সেইসব সময়ে বেলা গড়িয়ে গেলেও চৌকা জালাতে ইচ্ছে যায়না। গোশাল বলে,

—আশ্চর্য নেই?

—ভালো লাগছে না—

কিদের মুখে পুরনো কোঁজী বেকাজটা ঢাড়া দিরে গুঠে। কোনদিন হু'ধা বসিয়েও দেয় গোশাল। চেষ্টিরে ঠাণ্ডে ফুলকি। ফুলকির হুংবে হুংবী হবার অনেকজন আছে। তাগের ওনিরে চাঁৎকার ক'রে বিলাপ করে ফুলকি। বলে,—এখনি বুচার হাতে পড়ে জান-টা আমার বরদায় হয়ে গেল।

লছন বা ফুরৎ—কেলার শিরনী-আর্দাঙ্গীরা ফুলকিকে সহায়চুতি জানাতে চায়। তাদেরকে উল্টে কথা ওনিরে দেয় ফুলকি। বলে,

—বেরেছে, আবার গরবে মাছুষ বেরেছে। তাতে তোমের কি?

বাগ পড়লে গোশাল-ই কথা চায়। ফুলকির গায়ে হাত স্থণিরে দেয়। বলে,

—বাগ কত ফুলকি। বাগ বড় স্থখন আবার।

—আমি আখীন চলে বাব। আমি খর করতে পারব না।

—আমি কোথায় যাব ফুলকি?

সে একটা যত কথা। আর যামীকে ছোড়ে তেজ করে চলে গেলে তাকে হু'বেলা হু'মুঠো খেতে বেবে কেউ? সে ভয়সা নেই।

গোশালের সেই নিয়ে বাইনে বিতে দিতে স্থশায় সাহেব-ও এক এক দিন ঠাট্টা করেন। গলায় পরিহাস কোটেনা। চোখ কোঁচুকে ঝিলিক দেয়। বলেন,

—গোশাল, তোমার ঘরের হল্লা যে সকলের কানে পৌঁছে গেল।

—আগরৎ বড় বে-চায়ন, হচ্ছ।

—মাঝে মাঝে নিরে গেলেই পায়ো শহরে।

—শহর বড় ব্যাঘাণ জায়াগ, হচ্ছ।

অনেক-সহর-গোড়া বাহুব গোশালের মুখে এই কথা শুনে আশ্চর্য বেনেছে ফুলকি। বলেচে,

—কেন?

—মাছুষ ব্যাঘাণ হয়ে যায়। এ ওর গিরে চাকু বেরে দেয়। এক বড়ু আর একজনের ঘরে চুকে বৈঠকানি করে।

তু শহরে নামবার কথাই নয়। ফুলকিকে চোখের আড়াল করতেও যাগে গোশালের। রাতে উঠে কোনদিন হু'কে পড়ে স্থখনা সেবে গোশাল। এই মাছুষটা যে একাডুই তার, সেই বোখটা আদর করে তাকে। ফুলকি তাকে ঠাট্টা করে। বলে,

—এত ভয় তোমার?

—হুই কি বুঝি ফুলকি? কোনদিন কিছু ছিলনা নিজের বলে। এখানে বেন বিশ্বাস হ'তে চায়না।

—কেন?

—হুই তো আমার সব কথা জানিনা না ফুলকি!

সত্যিই জানেনা। আর এইসব স্মৃতিচারণার মূর্ত্তে ফুলকির মনে হয় যামী বেন তার একাডুই অজানা। কি-ই বা জানে সে। চাচার বাড়ী চাচার লাহনা ঘেরে দিন বাড়িলো। আঠারো বছরের মেয়ে গলায় নিয়ে মরছিলো মেহেখীলাস। নেহাত মফারার। অজ মাছুষ হলে পকারেতে ঠৈলতো। তবু কথাবার্তা হতো বইকি। আর সে-কথা শুনে ঘরে এসে কাকা তাকে মারতো। রাজপুতের ঘরে সেই কবে বেন মেয়ে হ'লে মেয়ে কেলার প্রথা ছিলো? পাতলে, এগাও হরতো মেয়ে কেলতো একদিন ফুলকিকে। কুট, ডর্ড। আর আচারের অণ শোধ করতো ফুলকি গভরে খেটে। ছোবান খুটো মোহের বড়-বিচালি কাটা, চিরখি খেকে জল বয়ে আনা ঝেকে কবে, আর বাগা করা। শিত-গ্রায় যানেনি ফুলকি। বৌবনের শরীর। ডাই দে-পরিপ্রয়ের চাপ পড়েনি।

সে-জীবন থেকে তাকে উদ্ধার করলো গোশাল।

গোয়ালির কেলার সিঁজিরা-ফুলের এক পাহারাধার বে। ঘরম হুয়েছে। পরমা বৌ নেই। ঘরবসত করতে একটা জোয়ান মেয়ে চাই।

গোশালও সব কথা বলেনি। বলেনি যে, জীবনে সে ব্যাবহার-ই ঠেকেছে। বলেনি যে, তাকে বক্তিত করে তার বাগ সংখা আর ভাইবের নিয়ে সংসার পেতেছে। বলেনি যে, পরমা বৌ পাগিয়ে গিরে আর একজনের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলো। গোশাল তখন বুড়ে। বলেনি যে, এই প্রথম একজনকে নিজের মতো করে পেয়েছে গোশাল। বলেনি এক কাগজে যে, সে-সব হুংখের কাহিনী এনে

নিষ্কেষে এই হৃদয়ের স্নেহের চাক্ষুস্যে চাহতে চাহতে গোপাল। এই ছোট ঘরখানাতে যেন হুনিবার হত ভালো সব এসে বাসা বেঁধেছে। গোপাল তাঁই সদাঙ্গপ্রভ ইঁদার এই ঘরখানাতে বাঁচিয়ে চলে। কুলকিৎ তোষের আড়াল হতে দেখেনা। এত ভালবাসা নিয়ে-নিয়ে আর পারেনা কুলকি। হাঁপিয়ে ওঠে। সে আর নিতে পারেনা।

এতেই বসি ভরভোতা তবু কথা ছিলনা। এখন সময় গোপাল আর কুলকির সেই আকাশে কোলাহল ঘরখানার সব ভাঙা-ভব: বর্ণালীর হতে নতুন জালীয়ার এসে ছুটলো। গোপালের-ই এক জীবনের বন্ধু আনোথী। বে-গতোয়া হিল্লার মাহুঘ। সরস্বতী এক হারবোনিয়ায়। গোপালের অনেক মুখের বিনের বন্ধু। হাকারি বাহুঘ। হানিহুই চেহারা। পৌষিন গোপালকে।

গোপাল যেন হাতে চাঁদ পেল। কুলকিৎ বললো,

—তুং আর-বহু করবি। শুনেনা তুং।

আজগোয়ালির কোষ সাথেন-যেম হুইট এসেছেন। শহরের দাঙ্গ অতিথি। গাইডের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে কুলকি। কুলকি সঙ্গে থাকলে কেবলো মোড়া হয়। এ কথাটা বুঝেছেন থেকে আর আগন্তি ভরাননি কেউ। কালোর ওপর লালকুল-চাপা পুরোহাতা মাঝা, সবুজ ওড়নী আর লাল বাথরা। পায়ে নাগরা। সব চুল টেনে জুসে বেগী বাধা। হাতে বেহেজী। চোখে হুয়া। কে বলবে কোনো গুফারি মেরে? যেন এই কোমরে পুরনো কোন্ বানিলা চলছেন মঞ্চ দেখতে।

বৌকে দেখে শত্রুপনে চোখে তারিক করলো গোপাল। আর কুলকি হেনে হারবোনিয়ায় একটা বেসোয়াবী হুয় জুসে ছেড়ে দিলো আনোথী। বললো,

—গোপাল, তুং ভাগ্য তোমার।

একদিন আনোথী গোপালের সত্যিই বন্ধু ছিলো। বঁধিও সে পাঁচছরের কথা। তখন গোপাল ছিলো বিষ, গভীর আর আয়তকেন্দ্রিক একটা মাহুঘ। নিষ্কেষ যেন কাজ করে যেতো। কথা কইতে, জানত না। সময় নিলেন স্নানার্থ পড়তো খসে। আনোথী হারবোনিয়ায় ছোট ছোট হুয়ের কুলকির তুলতে তুলতে গোপালকে ঠাণ্ড করলো। যেন হলো মাহুঘটা আগের চেয়ে ত'রে উঠেছে। ভালো লাগলো। একেবারে পথ-সদতি মাহুঘের শব্দ আর আনোথীর। তেমনিই দরখী আর প্রেমিক। তাই পরিস্থিতি আকর্ষিতার সে বললো,

—হলো গোপাল, তোমার কথা বলো।

অধির ভিনটে আঙুলে কুলকির হতো হারবোনিয়ায়

ছোট ছোট হুয়ের কাপন জাপিয়ে ঘণ্টার প্রভাতী আবহাওয়া হুবেলো করলো আনোথী। তারপর হুয় বামিয়ে ঘাড় কাত করে চাইলো। বললো,

—বলো?

এখানে সন্ধ্যা বোধ করেছিলো গোপাল, তারপর আকর্ষ হাবে সেখানে। কুলকির কথা কুতূহলের কাছে বলতে বুঝে ভালো লাগছে তার। বললো,

—তুং হুইয়ারী মেরে। চাচার ঘরে পড়ে ছিলো।

সেই সময়...

বিয়ের আভ্যোপাত্ত কথা বললো গোপাল। বললো,

—তুবি থাকো হু'গারবিন। একলা থাকে ও।

—বড় হুয় ঘরখানা তোমার। ঘর হুয় সাক্ষরেছে তাহী।

—খওদিন চাও থাকো।

আনোথী হাসলো; বললো,—না, গোপাল। আমি দুর্ভাগ্য-কিরতি মাহুঘ। এইরকম একখানা ঘরে কৌতুহিন থাকলে আমি হাঁপিয়ে উঠবো।

ডিউটি-তে চলতে চলতে গোপাল ভাবলো কুলকিও সেই কথাই বলে। কুলকি আর আনোথী। কুলকি চার বছর বাঁকার, পাঁয়ের মাটি—আর আনোথী? কুলকি নয় সে জীবনের ক্রান্তি আনেনি। কিছু হাজার বাটের গোড়-বাওয়া মাহুঘ আনোথী-ই বা কেন বাওয়া ঘর আর নিলাস আশ্রয়ের নামে নাক সিঁটকোর? নাকি পথঘাটের হাথী জীবনটা গোপালের একদার কাছেই ক্রান্তিকর? তাকেই তুং ভয়ের মুখোশটা দেখিয়েছে হুনিয়া। আর আনোথীর হতো ভবতুরের কাছে নিষ্কেষ রূপ-মত্তের ঝোঁটা গুলে ধরেছে, হাতে বেশা ধরে বাস আনোথীর? বুকতে গিরে হাঁপিয়ে গেল গোপালের মন।

পাঁচটাকা বখশিশ নিয়ে ঘরে ফিরতে বেলা গড়িয়ে গেল কুলকির। ঘরে ঢুকতে যেন হলো বেহুমান আছে ঘরে। গোপালের ওপর ভ্রাস হলো। জামার খুলো, ময়লা দাগড়ী—কি-একটা মাহুঘকে ঘরে জুসলো গোপাল। ঘরে এসে চৌকা ধরিয়ে কাণ্ড খুলে জল আনতে যাবে ডাক্তার-সাবের কুয়ো বেসে, এখন সময় চমৎকার হুয়ের একটা কথার কানে গেল। তার-ই হুয়ের সামনে নিক-গাছতলার যেন হুয় জুসলেছে আনোথী। মাহুঘটার ওপ আছে তো? সামনে গিরে পাঁড়ালো কুলকি। তার দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসলো আনোথী। বললো,

—বহন ভাবী। শুধু...—

বালনাগুহাণার জীবনের সংগ্রহ মাদুলী গল্প-গান।
যার কথা-সম্পদ হচ্ছে তাঁর ও মূলত্বের প্রেম আর
স্বাভাবিক স্বাভাবিক মনের বেগনা—

‘যেহে ইয়াহু’ হু’ হু’ ন আত্ম বহানা

ন দীপ অলানা

যোহে তুল বানা...’

হারমোনিয়াসটার ব্যাঘ্র জাতীয় কোথায় তা ঠিক
জানো না। এই পুরনো প্রেমের মর্মে ঠিক-ঠিক
যা দিয়ে ঠিক তান-নয়ে কাঁপিয়ে তুললো তাকে আনোবী।
আর মূলকি মুক্ত হয়ে গেল। এমনিথারা কিছু সে
শোনেনি কীবনে। আনোবী থেকে ঘর করতেন এসেছিলো।
কেন্দ্রের ওপর এসে উঠেছে। এমনি একটা মাস্তুলও সে
দেখেনি আর হাতের মাদুলী পাঁচটা আঙুলের এমন বাহু
জানা থাকে সে-ও তার অজানা।

সেই হাতে যখন কাটা জানাল দিয়ে আকাশটা নেমে
এসেছে ঘরের মূখোবী, রাতটা হয়ে হয়ে তুললো
আনোবী। ঘাটটার বসলো আনোবী আর সামী-ব্রী
বসলো মাটিতে। মূলকির চোখ দূর গুনতে গুনতে
ঘন সবুজ কোনো ফুল পাছার মতো দেখালো, আর তার
মুখ বসোনিবেশ বেবে ঝেং হেসে আনোবী আরো অনেক
দূর তুললো। সিনেমা দেখে যে-সব প্রেমের গল্প শিখেছে,
তার-ই সঙ্গে গান গেঁথে গেঁথে বেশ ঘন-ডোলানো পরিবেশ
তৈরি করলো। বললো,

—শুধু ভাবী, লায়লা-মজহুব কিংবা। যখন কিংবা
মুজবকে হৃদিকে ঠোঁটের লাগিয়ে দিলো, লায়লী মজহুব
মনে গাইলো কি—

‘আশব’ ওয়ালে তেরী হুনিয়া হায়ে’ বরবার কিয়া

সায়ে হুনিয়ায়ে’ ঠাকবী মেহী লিয়ে আগ হো গিয়া।’

চট করে এই গল্পের স্বর তুললো আনোবী আর মুক্ত
হয়ে মূলকি গোপালের দিকে চেয়ে হাসলো। বললো,

—কী চমৎকার!

গোপালও হুঁই হলো। তার মূলকির মুখে এমন
চমৎকার হাসি এমন দিয়েছে আনোবী! এখন কেন্দ্র
দুখের দেখাচ্ছে মূলকিকে। বললো,

—আনোবী, ভাবী তোমার বাজা দুই পলক করলো।

হয়ে গেল আনোবী।

তার চোখেরা, কথাবার্তা, আশব-কায়দা সব-কিছু
সবসময় তারিক করবার একজন ওশী মাস্তুল পেয়ে মূলকি



অনেক উচ্ছ্বস হয়ে উঠলো। মূলকির সম্পর্কে গোপাল
এমনিতে কতো সজাগ। কিন্তু এইখানে সে বে-হিসেবী
হলো। তার এক কারণ বোধহয় আনোবীর স্বভাব।
মূলকির সম্পর্কে তার বিশেষ আগ্রহ দুই বেশী দেখা
যায়না। আর মূলকিও আচর-অচরণে কখনো আশোভন
নয়। গোপাল মনে করলো—একলা একলা থাকে মূলকি,
নয় একই আশোব করলো। একই উচ্ছ্বস হলো, তাতে
দোষ কি। আর আনোবীর সঙ্গে বিশেষ বিশেষ মূলকির
মধ্যে যেন আরো অনেক নতুন রং জাহির হয়েছে। যাক
যুগিয়ে যখন ডাকায়—গোপালের মনে হয় স্যালায়ারি
ছবিতে বা দেখেছে; সেই যোগল রাজপুত্রের হাতে বসানো
মানারতা পাখির মতো স্বাক্ষর মূলকি। ‘বেশক’, ‘কি’উ
নহী’, ‘শায়ের’ এইসব স্বাক্ষর কবার বুঝনি দিতে শিখেছে।
তাতে এই মাদুলী মাস্তুলটার কথাও যেন হয়েছে মজল।
চেনা মূলকি একই একই করে নতুন হচ্ছে, আর বেশে মুক্ত
হচ্ছে গোপাল।

একটা রক্তমাংসের মাস্তুল, তার মনে যে এখন করেই
কোনো নতুন ডাব আসতে পারে, সে সত্যাবতার কথা
জাবেনি কোনদিন গোপাল। গোপাল, মূলকি আর

আনোখীর সেই দিন ক'টা ছিলো একাক্ষই নিশিষ্ক নির্ভর।

যে তালো লাগিয়ে ফুলকি আর আনোখি চলে আসে 'শাসবহু বন্ধির' বা 'তৈলী বন্ধির'-এ। এতদিনকার চেনা জায়গা। তবু আনোখি যখন বলে,

—কী ফুলকি যেন হয়—যেন এমন আর কোথাও দেখিনি।

তখন ফুলকিরও মনে হয়, সত্যিই তো। বোজ্জকার দেখা জায়গাগুলো যে এমন চমৎকার তা তো জানতেন। সে। 'শাসবহু'র সামনের অলিঙ্কতে ঝাড়িয়ে গোয়ালিঘর পথের জামে তারা। ফুলকির চুলগুলো গুড়ে, রঙীন গুড়না বাতাসে কাপ্তিয়ার। যৌবন-হ্রাস শরীরের হেঁচাগুলো পাই হয়। আনোখীর অনেক বেশ আর অনেক ঘেঁষে দেখা দৃষ্টিও মুগ্ধ হয়। ফুলকি বলে,

—কত কিস্তা জানো ছুঁমি, কত দেশের—শোনোও।

—যে কাক নেই ভারী?

—বোজ্জ ভালো লাগেনা।

হাসে আনোখি। বলে,—একটা কথা বলি?

—বলো।

—বত কিস্তা জানি আমি, তাদের সবায়ের চেয়ে ছুঁমি অনেক ফুলকি।

—ঠাঁট্টা কবছো।

—ঠাঁট্টা কবছি? না, ভারী।

ঈষৎ গভীর হলো আনোখি। এই কথা বলা উচিত হচ্ছেনা তার। তবু বলতে ভালো লাগছে, আর এই নতুন যেন বিস্মিতও করছে তাকে, এখনই গভীর ও পরিহাস-বাক্তি করে সে বললো,

—ঠাঁট্টা নয়, ফুলকি। হুঁদনের জায়গায় ধপসনি থেকে গেলাম, সে কিসের জন্তে ছুঁমি বোজ্জনা?

—না! তা হবনা আনোখি—বলে চুটে বেহিরে গেল ফুলকি। চুটে চললো জুত পায়ে। নিজের ঘরে ঘোর ঘিরে থাকিয়া বসে মুখ ঢাকলো সে। কান বাধা মুখ গরম হয়ে উঠেছে। 'ছুঁমি অনেক ফুলকি'—এই কথাটি তার কানে বেজে উঠলো যিস্মিত করে। আর এই প্রথম যেন নিজের মনের কোথা গতিও বুঝলো ফুলকি।

তার কথায় কি চটে গেল ফুলকি? ভাবতে ভাবতে এলো আনোখি। কিন্তু ফুলকির ভাবগতিক কেমন। থিা থিা গেলনা। তেমনিই সহজ।

সত্যবোধো গোপাল রসন কিনতে গেল পথেরে। হ্রবেগ ছিলো। তবু সেলা ফুলকি। বললো, বাঁধা ধরো।

মাথা-ধরা যে ফুলকির অছিলা মাত, তা জানতো আনোখি। তাই আজ বাইরেই বসে ছিল। আধারের সবইহু রহস্ত গারে বেখে এসে ঝাঁড়ালো ফুলকি। বসলো আনোখীর পাশে। তত্ব করে, ভরসাও হয়। আনোখি বললো,

—ফুলকি, ঘরে যাও।

—যাব না।

—ফুলকি! ছুঁমি সত্যিই আগুন। আমার ডগ করে। আহি-ই চলে যাব।

—আমাকে নিয়ে যাবে আনোখি?

—তোমাকে?

—হ্যাঁ, আনোখি।

হাসলোনা আনোখি। নিরীক্স করে দেখল। বললো,—কতইহু জানো আমাকে ফুলকি? গোপালের কথা জানো।

ফুলকি যখন এত কাছে তখন আনোখি বে-পরোয়া হতো কিনা বলা যায় না। শুঁ কাকেরে তখন গাড়ী ধামবার শঙ্ক হলো। এক নিমিষে ঘরে বাড়ি আলিয়ে ঘিরে টেঁচিরে বকবক হুক করলো ফুলকি।

—বোজ্জ বোজ্জ এত বেহী! আটা নেই, মি নেই। পারবো না আমি সেলায় করতে।

কাঁধে বজা ফুলিরে নেবে এল গোপাল। বললো,

—নে তোর জিনিসপত্র।— আনোখিকে বললো,

—ঘিরে কয়েনি ভালো আহ। দেখছ তো?

আনোখীর গলায় হাসিটা কেমন শুকনো শোনালো। আনোখি বললো,

—গোপাল, কাল আমি চলে যাব তাই।

—কোথায় যাবে? যেলা লাগবে কাল থেকে। যেলা দেখে যাও।

—বেলাতেই তো যাব। বাজা বাজিয়ে পারি তো হু'পরদা কাষাই করে নেব। দেখা হবে সেখানেই।

তার যাবার কথা শুনে ফুলকি বড় আনন্দিত হলো। হাসতে হাসতে বেহিরে এলো। বললো,

—সত্যিই তো। কতদিন আর ভালো লাগে বলুন।

তা যাবার আগে আজ একটা কিস্তা হোক।

গোপালের গা ঘেঁষে ঝাঁড়ালো ফুলকি। ফুলকির হাসি দেখে গা অলে গেল আনোখি। বললো,

—বাজাবো ঘেঁষি।

যাবার আগের দিনে কি আনোখীর ঘাড়ে ছুত চাপলো? আজ শুঁ বে-পরম বে-পরমী সব পাখরের

দিলের কথাই বাজালো সে। সিন্দার ভাবের কথাই বললো, যারা পতনের যতো রূপের আভনের দিকে ছুটে যায়। আর তাদের আগিরে দিয়ে আনন্দ করে আগুন।

বেলায় বাবার দিনে খুব সাজলো ফুল্কি। বড় ডাঁড় বেলাতে। বাহুরের গারে পা দিয়ে চলতে-চলতে এমন দিঠি হানলো এ-পাশে ও-পাশে যে, বাহুর না তাকিয়ে পারলোনা। গোপাল বধন দোকানের সামনে ঠাঁড়িয়ে ডাই-পাহারাধারের সঙ্গে কথা কহিতে বাত—ফুল্কি বললো,

—ই-বে মাস্টার-মাসেবের বোন আর আগরৎ। আমি আসছি।

পাশ কাটিয়ে এসে ছুটে চললো ফুল্কি। এদিকে, ওদিকে, কোন্‌দিকে রয়েছে আনোন্‌শী? হঠাৎ পাশ থেকে কানে বাজনা এলো। ঘুরে তাকাই এঁততা। লাবলীর সেই গান বাজাচ্ছে আনোন্‌শী :

—‘আসন্ন’এখানে তেরী...’

ফুল্কির চোখে চোখ পড়তে যে অল্পস্বল্প কলকে উঠলো আনোন্‌শীর চোখে, তাতে মনে হলো—না, আপনানের মালিকের অবিচারের আক্ষেপ এই সন্ধ্যার তার ছুরিরা একেবারে বরষা হযনি। কন্‌রমিরে বাজনা তুলে মুখ প্রোভার হাত থেকে ক্রমাগৎ-বোকাই পরল। নিয়ে পকেটে রাখলো আনোন্‌শী। বললো,

—চলো।

এগিরে এসে ঠাঁড়ালো হুমন একটা গাছের কাছে। আনোন্‌শী বললো,—এত ঘেরী করলে কেন? কখন থেকে ফুল্কি তোমাকে?...আর...

—কি?

—এত সেক্ষেত্র কেন ফুল্কি?

—ভালো দেখাচ্ছে?

—কলিজা ফুলে দেখাবো? দেখবে?

—না।

হুমনেই একই দামছে, একই হাসছে। উজ্জ্বল্যায় হুমনের মুখ-ই চিপটিপ করছে। আনোন্‌শী বললো,

—চলো দেখা। চুড়ি পরবে?

—তুমি আমার হাতে কাঁচের চুড়ি পরাবে? বাহুর কি বলবে?

—বলবে, তার মনের বাহুরকে আনোন্‌শী দোহাঙ্গ-চুড়ি পরাচ্ছে।

কাঁচের চুড়ি পরলো ফুল্কি। পান’বেল। ফুলের

গন্ধা পরলো মাথার। তারপর গোপালকে ফুল্‌জবার কথা মনে পড়লো। আনোন্‌শী ফুল্কির হাত চেপে ধ’রে বললো,—কাগকে-ও এলো। ওখানেই থাকবো আমি।

—এত ভীড়ে যদি দেখতে না পাই?

—তোমার ক্ষেত্রে ঐ লালীর দ্বিত বাজাবো।

গোপালকে দেখে হুমনেই হেসে এগিরে এলো। ফুল্কি বললো,

—খুব খুঁকছে? আনোন্‌শীর সঙ্গে দেখা হলো।

—গোপাল, চলো মিঠাই খাওগাং। অনেক পরস কামাই করেছে।

গোপাল আর ফুল্কিকে শেট ভরে মিঠাই পুরী বাইরে দিলো আনোন্‌শী। ফুল্কি বললো,

—আনোন্‌শী আমাকে কত-কি কিনে দিলো গুণো।

পরদিন গোপাল এগোন। তার বদলী ডিউট পড়েছে। ফুল্কিকে পাঠিয়ে দিলো। বললো,—রাত আটটার গাড়ী আসবে, তুই চলে আসি।

আজকে গোপাল সঙ্গে ছিলোনা বলেই হয়তো ফুল্কি এখন থেকেই বে-পরোয়া হলো। আনোন্‌শী বললো,—মারলীর গান বাজিয়ে আর ফুল্‌জ আখার বাধা হবে সেল ফুল্কি!

হুমনে চলে এলো বেলায় পিছনে। চালাঘরগুলির পিছনে উঠে আর বাহাল-গাড়ী। সেখানে ঠাঁড়ালো আনোন্‌শী। বললো :

—তার পর?

—কাল ঘরে ঘিরে মনটা এমন হলো! একি হলো বলো তো আনোন্‌শী?

—তুমি আমার মারলে ফুল্কি! গরীব বাজাওহাল, তাকে বতন করলে!

—আধিও মরলাম।

—চলো ফুল্কি, কোথাও চলে যাই।

—দিয়ে কি করবো?

ভীক গলা ফুল্কির। আর আনোন্‌শীর কথাগুলি বেন হুমাশার গুনগুন গান :

—চলে যাবো বিল্লী-আজ্ঞা-কলকাতা। আমি বাজা বাজাবো, তুমি গান করবে ফুল্কি...পথে যুঁঘাব, চানা-মকাই খাব, বেশ-দেখ ঘুঁঘ।

—বাব...বাব আনোন্‌শী! কিছ তোমার বহু?

—সব ঠিক হবে যাবে ফুল্কি, দু’দিনে জবাব শুকিয়ে যাবে।

—ঠিক বলছো?

বলতে-বলতে কুলুকি সঠিঠি করে কণ্ঠে। মনের
মতো টলমল করে কুলুকি। বলে,

—আমার দিন-রাত তোমার বাজার গুরে গুরে গিয়েছে,
আনোই—ভ-বর থেকে মন আমার চুটে গিয়েছে!

—সঠি বলছো?

—সঠি।

আনোইর ঘরেরে রক্তে নীতির শাসন বড় কম। সে
বড় সহজেই চকল হলো। কুলুকির মন কী কথা বললো?
গুজারী মেয়ের মুগ্ধ মৌলন। নিষিদ্ধ বাঁলেই প্রেম আরো
মধুর মনে হলো। আনোইর কাঁধে মাথা রাখলো
কুলুকি। বললো,

—হাব। গেলে সবশেষ হবে। তবু হাব।

চমক ভাঙলো বহন, তখন অনেক রাত। ঘেলার
ভোলু নিভে এসেছে। তবে ধড়মড়িয়ে উঠে বললো
কুলুকি। বললো,

—কটা বাজে?

চা-চা করে এগারোটা বাজলো। কুলুকি বললো,

—সর্বনাশ হলো আনোই, কেজার বাস তো চলে
গিয়েছে। কি হবে?

ঘেলার কোলান দিয়েছে ব্যাং, তাদের পরগণায় হবে
কুলুকি? আনোই বললো,

—আমি পৌছে দেব তোমায়?

—না না, গোপাল জানলে পরে...

—গোপাল জানলেও কিছু হবে না। সোনো কুলুকি...

কুলুকির নাম ধরে ডাকছে গোপাল।

—আনোই, কার আমি আসবো...

বলে চুটে চলে গেল কুলুকি। এগিয়ে গিয়ে আনোই

ছায়ে গোপালের হাত ধরে কুলতে কুলতে যাচ্ছে
কুলুকি।

দুর্দিন-ই মেলা শেষ হবে। সববড় আকর্ষণ চলে
যাবে আনোই। আর কুলুকি বাবে তার লক্ষে।
গোপাল তো জানেনা, যে এই ঘরে শুয়ে আশমানের তারা
বেখার দিন কুটিয়েছে কুলুকির। গোপাল হরতো
ডাকতেও পারেনা যে, কুলুকি থাকে ছেড়ে যেতে পারে।
গোপালের এই বিশ্বাসের ভুলভার-ই তো কুলুকির পায়ে
বেড়ি হয়েছে। পারোদিন মনটা শয্যায় করলো।

সন্ধ্যাবেলা লেজেরে বেকবায় হয়ে গোপালের সামনে
পাড়ালো কুলুকি। বললো,

—ভাখো—

—ভাঙা-খেলার দিনে রুটি আগুন আসাতে বাজিল?

—না?

মাথা নাড়লো কুলুকি। বললো,—একলা ছেড়ে নিছ,
বপি কিরে না আসি?

—না-ই বা এছি।

—কী বললো?

ভীত গলা কুলুকির। গোপাল হাসে। বলে,—যেতে
হব ঘানা! বেখানে মন চার থাকিবি—ভুই বৃষ্টি থাকলেই
হলো।

এই কথাতে খুব রাগ করতে চাইলো কুলুকি। কিন্তু
রাগ হলো কই? গোপালের মুখের দিকে চেয়ে বুকটা তার
ফেন কেমন করে উঠলো। হাজার হলেও তিন বছরের
সম্পর্ক তো?

ঘেলার অপেক্ষা করছিলো আনোই। উত্তেজনার প্যাণ্ড
মুখ, অলসে চোখ, কুলুকি এসে পাশে পড়ালো। বললো,

হিমকল্যাণ

ডেপুটি বিশেষ নগরস্বাস্থ্য কর্মীর

আয়ুর্বেদাত
কেশতল



হিমকল্যাণ ওয়ার্কস • কলিকাতা-৪

—চলো আনোন্দি!

—গোশাল?

—এখনো গোশালের কথা ভাবছ? চলো!

চালা চলছে। যোগাতের গাভার হ'শাপে গাছের চাষা। আনোন্দি বলে,

—কিছু বললো না গোশাল?

আখারের ফুলকির উদ্ধৃতিত হাসির কথা ছড়িয়ে পড়লো।

—কিছু বললো না।

ফুলকির মুখ দেখা গেল না, কিন্তু হাসির স্রবট। এমন চমৎকার ভাবে হাসিকটা অল্প হ্র জড়িয়ে বেছে উঠলো যে, অবাক হয়ে গেল আনোন্দি। হাসতে-হাসতেই ফুলকি বললো,

—যু আঙ্কব লোক। দুরলে আনোন্দি? বলে কিনা, বেথানে খুঁই বা ছুই। ছুই খুঁই থাকলেই হলো!

—ঠাঁট্টা করে বলছে।

—ঠাঁট্টাই তো! এ-সব কথা ওর কাছে ভীষণ ঠাঁট্টা। মনে ভাবে আশ্রমবানের গুণর থর দিয়ে একেবারে বেঁচে কেলেছে আশ্রমকে... মনে ভাবে কোনদিনও ফুলকি চলে যেতে পারবে না! কিন্তু সে-সব কথা থাক। ছুনি অল্প দেখের কথা বলো আনোন্দি... আগে তো আমরা আশ্রো যাবো, তাই না? তাক দেখবো আমরা, আনোন্দি?

—হী পিয়াহী, তাক তো দেখাবোই... আশ্রো কত কি। নিয়ে যাবো কলকাতা, বোম্বাই।

—সেখানে আমি কি করবো?

—আমি বাজা বাজাবো পিয়াহী, ছুনি গাইবে নাচবে। হাসতে হাসতে হঠাৎ গভীর হয়ে গেল ফুলকি। পৌছে গেল স্টেশন।

ট্রেন আসবে। টিকিট বরিশের বঁটা পড়ছে। কোয়ার উপরের আসাওলি জলে উঠেছে। কী চমৎকার দেখাচ্ছে! তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফুলকি বলে,

—আনোন্দি, ঐ সীত একবার বাজাও।

—এখন?

—হ্যাঁ, আনোন্দি।

ফুলকির মুখের দিকে চার আনোন্দি। বলে,

—বো বহুয়।

—আর কিস্তা-ও তরাও।

—গোনো। রসগুণালী—ঐই সীত পাইল বজ্র! এখন যক্ষুনি ধরে উঠের কারোরা চলে যাচ্ছে দারলীকে নিয়ে।

—মজলুর সীত নর, দারলী সীত—

হারমোনিয়াবে হালক: ঠেকা কেত আনোন্দি। নীল আলো পড়ে ফুলকিকে আরো আশ্রয় দেখায়। সত্যিই রসগুণালী। এক এক সময় এক এক রং। মেলাতে এলো অলতে-অলতে, বেন ফুলফরি। এখন আশ্রো কেমন উদাস। আনোন্দি হ্র তোলো,

'আশ্রম! ওখানে তেরি ছুনিয়া হার্মে বহবাণে কিং!...'

ফুলকি কাছে গেঁথে আসে। বলে,

—কেমন করে ছুনি বাজাও আনোন্দি? সব সময়ের হ্র নিভেই নাও!

আনোন্দি অল্প হাসে। বলে,—দুরলাম।— তারপর বাজার—'সারে ছুনিয়ামে' ঠান্দী, হেরে লিয়ে বাকল হো গদা...'

অনেক হ্রে ট্রেনের চইল শোন: শায়। ফুলকি বলে, —ট্রেন এসে গেল, আনোন্দি।

—তবু ডি তো হুঁ লো!... আনোন্দি বাজায়, 'এ মালিক, ইয়ে তামাশা মুককো: কিউ দিল্য দিবা?'

আনোন্দির বাজনা শানে না। তারপর চলে যায় অল্প গানে।

—ঐই সীতে আমরও মরম নিভেই দিলাম, কিস্তাওদালী!

ফুলকির চোখ ভরে অল্প নামে। প্রেবের কিস্তা ফেরী ক'রে কেবের বে-আনোন্দি সে বলে,

'আহ কো লহকো হুঁ আশো কা প্যানি ম্য' লহকো'রো মোতি কী লড়িরা!...'

তোর আশ্র-তরা চোখ ছুই আমাকে দেখাস্ না ফুলকি। ঐ ত'থু. আশ্রদের ট্রেন চলে এলো।

বাজাওদালী আনোন্দি আর সীত-নাগল ফুলকি মুখোমুখি ঠাঁড়ায়। ফুলকি হঠাৎ ফুলিয়ে কেঁদে উঠে আনোন্দিকে জড়িয়ে ধরে বলে,

—আমার মন বাঁধা আছে আনোন্দি, আমি আসে ছুনি, —আমি যাবো! না!

পাঁচ আলো হারমোনিয়াবে গলা টিপে হ্র বামিরে বের আনোন্দি। ট্রেনের ভীত ছইলিলের সঙ্গে সে বেন তারই আর্দ্রান্দ শোনে। কণিকের জন্মে ভাবে, নির্মম একটানে ছিঁড়ে নিয়ে গেলে কেমন হ্র ফুলকিকে! কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ্র কিস্তাওদালার, কিস্তার তাতে অপমান হবে। বাজাওদালার বাজার আর গান জঘবে না।

—আনোন্দি!

কথার জীবন না করে ট্রেনে লাকিরে ওঠে আনোন্দি।

টোনের বাম্বার কাছে কোশলে না দাঙ্গিয়ে কঁকে লড়ে
সম্মানে। পাঁচ আঙুলে হাতের নিখামে ছর তুলে বলে,—
ভালোই হলো।

—আনোঁকি!

—তুই জামিন্দা, এ খুব ভালো কিস্মা হলো। তোরা
কাছে সেলাম কিস্মা ওখালী, তুইও আনোঁকিও দেখালি।

—তুই চলে যাচ্ছিস, তোরা জড়ো মনটা আমার
হুগাছে আনোঁকি, তুই বিবাস কর।

—অবিবাস তো করিনি।

আনোঁকি হাসতে-হাসতে ঘাড়ী চড়ে। হাত নাড়ে
আনোঁকি। আনোঁকির হাসিটার ওপর অনেক রঙের
আলো কল্কাত রাউটারের কাঁচের খে-কেস খেঁক, আর
ফুলকির দুকটা সবলে নিভড়ে যায়। গোপ মুছে বেরিয়ে
আসে ফুলকি।

ঘরে এসে ফুলকি আঁক কেন এমন লাগল হলো
বোঝে না গোপাল। গোপালকে ফুলকি বলে,

—তুই আমায় ধরে রাখ। কেন ছেড়ে-ছেড়ে দিস আমায়?

—ছেড়ে দিলাম কোথায়? তুই তো রক্তিলী নাজ্জী
সেজে মেলো দেখতে গেলি।

মাথা চুলকায় গোপাল। ফুলকি বলে ওঠে,

—তাঁই বলে তুই আমায় ছেড়ে-ছেড়ে দিবি? যা
চাইবো তাঁই করতে দিবি? কেন? তোকে আত ভাঙ্গো
হাত কে বলেছে?

বাগ করতে-করতেই অঝোরে কাঁদে ফুলকি। গোপাল
চাখে তার ভালবাসার ফুলকি কড়ো-কাপটে বিগলিত হয়ে
পড়েছে। কাছের টেনে নেয় গোপাল। গায়ে মাখায় হাত
মাগটে দেয়। বলে,—তুই কাঁদলি কেন ফুলকি?

—বেশ করেছি।

গোপাল বলে,—তুই কিস্মা ভালবাসিস, ঐত
জানব মিল—তোরা ঘুরতে-ঘিরতে ইচ্ছে করে...

—না! তুই কিছু বুঝিস না।

ফুলকি চুপ করে থাকে। কিছুক্ষণ পরে ফুলকি বলে,—
আমার এই ঘরখানারও একটা কিস্মা আছে।

—কে বললো?

—আমি বলবো তোকে। আমি কিস্মা ওখালী...

—গরে বলিস।

গোপালের বুকে মিলিয়ে ফুলকি চুপ করে থাকে আর
তারের ফুলকি দেখতে তারার নজ-কাটা আঁধার লুটিয়ে
আকাশখানা নাহতে থাকে সেই ঘরের ভেতরে।
আজকের রাতটায় অনেক ঐত আর অনেক কিস্মার গা
পায় ফুলকি।

ফোন
৩৪-৪৬৬৮

প্ৰথম সৌন্দর্য ও
পরিচরমায়
অতুলন



স্নেহকো জুয়েলারী
ফোর্স নিমিটেড
মানিকার ও বর্ণ শিল্পী

১৮৭, বহু বাজার স্ট্রীট ৯ কলিকাতা-২২

আস্তিক

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

জেবেছি যে ভাব, সেই ভাবনা
শুকনো ভাব।
কবেছি যে কাত, সেই কামনা
ভয় ভাব।
বলেছি যে কথা, উছ ঢীক।
অপূর্ণতা।

চেষ্টেছি যে বিবি, হয়নি নিকা।
ভয়ল ডিবি
মনের মাটির; গছ উড়েচে
শুভ্র ঠাটির : চড়িয়ে পড়েচে
গমলা ঘষা।

তবু সে আকাশ-নিকমে কথা
দূর রহিত
অনিক বিনিক
চেতনাস্থিক
চির নমস্ত।

কল্পনা

আনন্দ বাগচী

রূপকথায় ছিলে তুমি কিংবদন্তী এমন শুনিনি,
ছিলোনা প্রেমের পল্লব, লাভরত্ন পরম্ব যৌবনে
বেগনি মাথার খেলা, প্রথমদর্পনে থাকে চিনি
সে নারিকা তুমি নও, স্ত্রিহিনিবাগনে পেছ বনে
এমন-ও উল্লস নেই, বইয়ের পাতায় মূখ ঢেকে
নিকেকে সূঁচিয়ে রাখলে আত্মবন, কেউ কাছে জেকে
শোনেনি তোমার গল্প অথবা গহীন গাঙ জেবে
অছ বাসনায ছুঁবে মরতে চাহনি, বেগনা কি হবে !

একাধিক। হুড়ে তুমি একা আছো, বুকের সহনে
যে মাতা মর্পণ জলছে তাতে ছাড়া গড়ে অন্তরঙ্গ,
বেগন রয়েছে ভেদনি থাকো, ছলি হুঁসে চন্দনে
কাজ কি, গোলাপে কাটা, টপেও কলত অপভ্রম
জেনে মিথো বাধা পেয়ে, অন্ধরের কমা চিরকাল !
তুমি তো। হৃদয় নও, চারাত্মক দুয়ের বেগাল।

আমার যজ্ঞা তুমি, রাজরাজেশ্বরী অন্ধকারে
পরমে কোষেছি বাসি, যদিও পৃথিবী বন্ধকারে।

অভিগমন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শাশা শাতায় যাত্রা শাল
ফুলের ছবি থাকে,
পটভূমির একটু সসুত
কিঃবা উৎস নীল—
তাহি মণ্ডে শুভ মনের
অপ্রতিষে যাবে,
ভালের সঙ্গে আনার গানের
বাংলো ছিলো মিল।

তবন আমি তরল ছিলাম ...
আত্মকে আমার গোপে
বেত কপোতের আলোয় ওজার
নেইকো বন্ধ মানে ;
এখন গভীর অন্ধকারে
সত্য আমি : কালো
পটভূমির আবছা ছবিট
কথা বলতে ভারে।

কল্পনা

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

আমার কল্পনার দরতে
শুধু ধূ-ধূ বায়ু,
আর কল বাবলার গাছ,
হত বাই পায়ে কোটে ভীত কাটা।
অসহ উত্তপ্ত হাওয়া,
তুফান বুক ফেটে যায়।
তবু—মাকে মাঝে চলছে উটের দল,
উৎসট হুতপ ভীত,
বাগির পাহাড়ে নৃপ গৌড়ে,
লক্ষ্যে নব,
জলের সন্ধানে।
শাল নীল হলবে সবুজ
বিভিন্ন বর্ণের যাত্রা বুঝিয়ে
রাজপুত মেয়েরা চলে
গামগ্রী মাথার নিধে—
‘এক ভাঁক ময়ূরকল্পি পাবী,
তুমি কি তাগেরি একজন !

একটি হৃদয়ের প্রেম

বীতেন্দ্রকুমার গুপ্ত

কখন কোথায় যেন একদিকে চূপচাপ থাকি
একো-একো, চম্পক কোণে নিঃশব্দে নিঃশব্দে,
তখন হৃদয় কুঁচি, এলোমেলো বাতাসের বহ
হামলা শিশুর মতো একো-একো, তারার জোনাকী
মুখে হাসি মেখে-মেখে, সে খেলায় নেই পরিচয়
কখন কী হয়, কেন তৎসনার মতো নিশাচল
এক নব জলে ওঠে অচেনা বিদ্যতে আশ্রয়,
কে জানে—হৃদয়ের পাই অপরূপ একটি চমক।

কিছুই খেলে নেই। শুধু মন জলধক নিয়ে
অবলীল যন্ত্রে বেন, কৃৎসনের হৃদয়ের ভিতরে
যেমন মোমাড়ি প্রাণ ভুব দেখে বিহবলতা ভরে,
তেমনি বাসনা শুধু একদল সৌরভে হারিয়ে
বিত্তার বেষ্টন থাকি, নীচমাটি—পৃথিবীর মনে
গাইনা ফেলতে চান পুনরায় আর পথটানে।

আজ এলে পরে

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

যে বনে একলা ফাটন এলে নানা রঙে ছবি আঁকতো
বসন্ত এলো গানের কুসিত, আশ্রয় এলে পরে জানবে
মধু-প্রভাশি সেই রাঙা মন কী দাম্পত্য লবণাক্ত।
জানি জানি ভূমি এরপর রাঙা ঠোঁটের ভগ্নায় আনবে
কলঙ্ককার উজ্জ্বলতা-করা বানানো কথার অর্থ্য,
এবং হয়তো অভ্যাসবশে খেলি ডাঙা মানবে।
এক আশ্রয় হয়তো তখন পুরোনো কুলের বর্গ
অগ্নির চেয়ে বলবো : 'ফেহু নিঃসীম মীলকাত
কথার আকাশে প্রেম হুঁকে যায় সার্থক অপরূপ,
আজো তাই দুটি চমক কালের বহুরার দুই প্রান্ত,
যেন বেগে বাসে, চিরজীবী সেই প্রণয়ের সেতুবন্ধ,
তায়গারে ভূমি সে-সেতু ভেঙেই চলে যাবে, উৎসাহ
উদাস আখ্যারে ভাববো তখন, প্রেম কি সত্যি অচ
না কি অচিরে ছলনা করে সে? কিংবা কাটার বস
লাবণ্যে বেগে চমক?—কুলের ভীষ নির্জন গছ
শিশিরের গানে তিক্ত সান্না আনবে আখ্যার ভগ্ন,
মনে মনে তাই বলবো তখন : 'সেহনের কথা থাক গে,
তোবার জোহানো ভালোবাসা শেষে আশি যে হয়েছি গল্প ;
প্রথম জন্মে পৃথিবী পেয়েবো?—মাক গে সে কৃপা থাক গে,
অন্ত চায়ের জ্যোৎস্না আমার অনেকখানি যে ভাগ্যে।'

মেঘের তব

মহাশয় মাইতি

সকাল বেলায় কেবল মেঘের চায়ায় আকাশ ঢাক।
কেমন অলস স্নান এখন তব,
কী মহা কৃষ্ণ জোঁঠ ফিনের বীধ মাঠের প্রান্ত
মৃত্যুর মতো সমাধিতে নিঃশব্দ।
হৃৎ-বেধতা ঢেকেছে আপন মূখ
তনু-মুহুরিকা তারি শানে উৎসব।
হঠাৎ আকাশে বহা বারার পূজা হ'ল আরম্ভ।

সারা পৃথিবীর এই ধ্যানমগ্ন ভেঙোনা এখন ভেঙোনা,
নতুন শুভুর তপস্বী হোক পূর্ণ,
কাঠের ঢকা মদ্য হয়েছিল যে মাঠের কাটা কুঁক
বধন-ধারা সেবা পড়ে হোক পূর্ণ।
সদৃশ হাসের স্মৃতি বহিতার গানে।
প্রান্তরে হুত ভরে থাক সবখানে,
ভামল প্রাণের বিজয় ঘোষণা আশি বেন হুত পূর্ণ।

আকাশে মেঘতে মাঠেতে নদীতে নিবিড় শালের বনে
ফরেতে দুয়েতে প্রান্তে,
কী বেন পড়ীর ধ্যানের আগনে বসেছে পৃথিবী আশ
জীবনের কোনো দর্পনবাঈ জানতে।
যত কোলাহলে খামাও খামাও শোনে,
জন্মে কোথাও বেজেছে বেধনা কোনো?।
এই সকালের ঘনকালো মেঘে কি বেন হারিয়ে গেছে
কীহনে বা আজো পারিনি কাছেরে আনতে।

বৃষ্টির দিন

অসিতকুমার

সারাদিন বৃষ্টি পড়ে অন্ধকার শহরের গায়ে।
কখনো বা শুঁকিগুঁকি, কখনো বা ভাড়াই হাওয়ায়
ডর করে ছুটে আসে। কাঁধায় পাথরে পথে পথে
যেন এক বোঁগিষ্টের স্রাব্ধিম বিধর অগতে
পুরে পুরে কাক খোঁজে : তারপর দূরে চলে যায়
যেন দুঃ ইতিহাসে, দূরতর বঙ্গচেতনায়
দূরে কেনে আমাদের চাওয়াপাওয়া হাওয়ায় হাওয়ায়।
এখন আমাকে আর কোনো হাওয়া নেবেনা'ক ভেবে
দরোকা ভেঙিয়ে দুঃ প্রসারিত পৃথিবীর থেকে
মিলেজে নিষেধি কাছে। তব যেথ থাকে যদি থাক
এখানে আশ্রয় নেই হাওয়া নেই শুধু থেকে থেকে
তনি কেন শূন্যতার ভেদে ওঠে সঙ্গীতীন কাক?

বাংলা ছবির নাস্তিক

প্রিয়তম গুপ্ত

বাংলা ছবি চিত্র-জগতে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করেছে।

প্রায় বহু চরিত্র আগে ১৯১১ সন নাসাদ ম্যাডান বিরেটার প্রযোজিত ও স্কোটিভ বন্যোপাখ্যার পরিচালিত প্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলা নির্মিত ছবি 'নিখমল' আত্মপ্রকাশ করে। তারপর দু'সের সঙ্গে তাল রেখে বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে বাংলা ছবি অগ্রগতির পথে চলেছে।

অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক, প্রযোজক, চিত্রশিল্পী, লক্ষ্যব্রী, চিত্রনাট্যকার প্রভৃতি আরো অনেকের সহযেত প্রচেষ্টায় ফলে বাংলা ছবির এককম বিস্ময়কর উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে। তার ভেতর প্রধান অভিনেত্রী বা চিত্র-তারকার অবদান বড় কম নয়। প্রকৃতপক্ষে, চিত্র-তারকার আকর্ষণ দর্শকের কাছে সবচেয়ে বেশী। চিত্র-তারকার অভিনয়-নৈপুণ্যের ওপর ছবির সাফল্য বহু অংশে নির্ভর করে।

সেকালের প্রধান চিত্র-তারকাদের মধ্যে সাধনা বসু, কানন দেবী, চন্দ্রাবতী, রাণীমালা, উমানন্দী ও ছায়া দেবীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



এই কবজ

চিত্র - তারকাদের মধ্যে রাণীমালা ইহলোকে নেই।

সাধনা বসু এবং উমানন্দী অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। চন্দ্রাবতী ও ছায়া দেবীকে চোটোখাটো ছবিতে ব্যবহারে দেখতে পাওয়া যায়। কানন দেবী ছেড়ে প্রবোজক হয়েছেন।

একদা অভিজাত-বংশীয়া সাধনা বসুর জ্যোতিতে বাংলার দ্বন্দ্বাঙ্গী পদা উদ্ভাসিত হয়ে ঐ একটি বিশেষ গুণের জোরে তিনি অশেষকৃত্য করতের বাংলা চিত্র-জগতের পুরোভাগে নিজেকে করত সন্মম হয়েছিলেন। সে তাঁর নৃত্য-পাঠার অভিনয় ছিল চুইল, নিম্ন সাবলীল ও নৃত্য-পটভূমী সাধনা বসুর অভিনয়-সাক্ষ্যের প্রা 'আদিবাণী'। এ ছাড়া তাঁর প্রধান আর দুটি 'রাজবর্তনী' ও 'অভিনয়'।

কানন দেবীর বৈশিষ্ট্য অগ্রপ্রকার। নিজের চেষ্টা ও অভিনয়ের প্রতি মনোযোগ—এই দুটি তিনি বহু বাধা-বিঘ্ন পার হয়ে সাফল্যের সর্বাঙ্গ এসে পৌঁছেছিলেন। অভিনয়-সাক্ষ্য অর্জন করবেন-সব জগৎ দরবার, প্রথমে তাঁর তা সম্পূর্ণ না। কিন্তু নৃত্য, শব্দ ও শিকার ভেতর দিয়ে আয়ত্ত করতে সক্ষম হন। তাঁর অভিনয়ের সর্বাঙ্গ—মিলনাঙ্ক ও বিবেচনাঙ্ক—উভয়বিধ ছবিতে কৃত্তিম। 'মুক্তি', 'বিদ্যাপতি', 'সাপুড়ে', 'ক' 'বিদ্যুৎ', 'মানবী গার্লস স্কুল', 'প্রভাস-বিলন' বহু ছবিতেই তিনি অভিনয় করেছেন।





চন্দ্রাবতীর প্রতিভা প্রধানত গুরুত্বপূর্ণ চুম্বিকায়,—
হালকা, চট্টল চরিত্রে তাঁর প্রতিভা-স্বরণ হয়নি। নৃত্য বা
স্নেহে দখল না থাকলেও, নারিকার চুম্বিকায় তাঁর বসিত
অভিনয় যিনি একবার দেখেছেন, তিনি তা কোনোদিনই
ভুলতে পারবেন না। তাঁর কয়েকটি প্রধান ছবির নাম,—
'দক্ষদত্ত', 'দিবী', 'দেশের ঘাটি', 'সীমাবাসী', 'প্রতিজ্ঞাতি',
'দেবদাস', 'বিজয়া', 'প্রিয়দাসী'।

ছাত্রা দেবী মধ্যবিত্ত ঘরের নারিকার-চরিত্রে বিশেষ
কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর কয়েকখানি প্রধান ছবির নাম,
—'ঘাট-বৌ', 'সোনার সঙ্গার', 'প্রিজ'।

সবরকম চুম্বিকার সম্বন্ধে অভিনয়-পর্যায়টি
দেখিয়েছেন রাষ্ট্রবালা। রাষ্ট্রবালার শেষ অভিনয় সত্যজিৎ
রায়ের 'পরশপাখর'—এ একটি বিশিষ্ট চুম্বিকায়। তাঁর
আরো কয়েকখানি ছবির নাম,—'তরুণী', 'তটিনীর
বিচার', 'অমূল্য', 'অপরাজিত'।

উমানন্দী দেবকী বহু পরিচালিত 'চতুর্দশ' চিত্রে
রাষ্ট্রীয় চুম্বিকার নিম্নেই বাংলার চিত্র-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত
করেছিলেন,—কিন্তু এটি অভিনেত্রী বৈশিষ্ট্যের পূর্ণাঙ্গ অভিনয়
করেননি। সাংসারিক জীবনে প্রবেশ কখনো পর পর্দার
পাশে আর দেখা যাননি। তাঁর আরেকখানি ছবির নাম
—'দেশের ঘাটি'।

এ ছাড়া সেকালের আরো যে-সব চিত্র-তারকা
নারিকারূপে ঘন অর্জন করতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে
লীলা দেশাই—এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

একালের চিত্র-নারিকার মধ্যে সর্বাঙ্গে নাম কবতে হয়
সুচিত্রা সেনের।

সুচিত্রা সেনের অভিনয়-বৈশিষ্ট্য—মিলনাত্মক, বিরোপাত্ত,
চট্টল ও হালকা চুম্বিকা এবং রোমাঞ্চিক চুম্বিকায় তাঁর
ভাবাত্মক অভিনয়-নৈপুণ্য। ক্ষেত্রবিশেষে বড় বড়
চিত্র-তারকাদের অভিনয়ও আত্মনয়-হুট হুট। এ বিষয়ে
সুচিত্রা সেন দৃষ্ট। যেখানে দটুইই প্রকাশভঙ্গী বা
ভাবাবেগ প্রকাশ্য, ঠিক ততটুইই তিনি পর্দার একপাশে

করেন। তার কবও নয়, বেশীও নয়। কাজেই দেবী
বহু পরিচালিত 'ভগবান ঐকমতকল্প' চিত্রে বিজুশিখার
চুম্বিকা ত্রিনি বেরকম অভিনয়-নৈশুণ্যের পরিচয়
দিয়েছেন, তেহুনি 'জীবন-ভুকা' চিত্রে অতি-আধুনিক-
চরিত্রেও সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর প্রথম ছবি
'কাজলী'; অল্পাত্ত কয়েকখানি ছবির নাম,—'ভগা খাংক
ওধারে', 'সাজে চুয়াত্তর', 'অমি-পরীকা', 'সাগরিকা',
'বলয়গ্রাম', 'চুলী', 'একটি হাত', 'হারানো হর',
'বাকলক্ষী ও ঐকান্ত', 'চেনাব'।

সুমিত্রা দেবী বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠা রূপসী অভিনেত্রী।
সুমিত্রা দেবীর প্রথম চিত্র 'সজ্জি'। তারপর বাংলাদেশের
কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করার পর তিনি বোম্বাই-এর
বিনী চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু 'সাহেব-বিবি-
গোলাম'-এ 'পটেশরা'-চরিত্রে অভিনয়সূত্রেই তিনি আবার
বাংলা ছবির জগতে প্রত্যাবর্তন করেন। 'সাহেব-বিবি-
গোলাম'-এ তাঁর অভিনয়-নৈশুণ্যের জন্ত তিনি সমস্ত
বাঙালী দর্শকের অভিনন্দন পান নতুন করে। বিশেষ
এক-জাতীয় চরিত্রের অভিনয়ে তিনি প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী।
তাঁর অল্পাত্ত ছবি,—'একদিন যাত্রে', 'ঈশ্বারে আলো',
'নীলচলে মহাপ্রভু' প্রভৃতি।

দ্ব্যরোশি বহু বাংলা ছবিতে নারিকার চুম্বিকা রূপায়িত



করেছেন। কিছুকাল বাংলার পর্দায় অভিনয়-নিশুণ্য
নারিকার অতাব তিনি একাই প্রায় পূরণ করেছেন বললে
চলে। এক অতি-আধুনিক শব্দে মেয়ের চরিত্র ছাড়া
অল্প সব চরিত্রেই তিনি অনবদ্য অভিনয় করেছেন,—বিশেষ
ক'রে পল্লীভূর চরিত্রে। তাঁর কয়েকখানি ছবির নাম,—
'পরিণীতা', 'অরুণীক', 'পতিভমশাই', 'নিচুতি',
'কক্যাবতীর ঘাট', 'দয়শক্তি', 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র',
'মহানিশা'।

উচ্চশিক্ষিতা চিত্র-তারকারের মধ্যে অল্পাত্ত
মুখোপাধ্যায়ের স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। স্বীকৃত-
সংগীতে পারদর্শিনী এই উচ্চশিক্ষিতা অভিজাতবংশীয়



চিত্র-তারকা আধুনিক-চরিত্রে ও
মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রাভিনয়ে
সাম্প্রদায়িক অভিনয়শৈলীকে
করেছেন। তাঁর প্রথম ছবি
'মহাপ্রতাপের পথে'। তাঁর
অন্তিম কয়েকখানি ছবির নাম,
—'সত্য', 'ছেলে কার', 'বা',

'গোহাঁড়ি', 'প্রহ', 'চলচ্চিত্র', 'পঞ্চতন্ত্র'।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় নৃত্য ও ইতে পারঙ্গমিনী।
অভিনয়-নৈপুণ্যেও তিনি প্রথমশ্রেণীর অভিনেত্রী।
চিত্র-তারকা না বলে অভিনেত্রী বললাম এইজন্যে যে,
মঞ্চাভিনয়েও তিনি প্রচুর খ্যাতিলাভ করেছেন। প্রকৃত-
পক্ষে পর্দায় আত্মপ্রকাশ করার পূর্বে তিনি স্বর্গের নাট্য-
সম্রাজ্ঞী হয়ে অভিনয় করতেন। পর্দায় তাঁর অভিনয় দেখে
যাকে তাঁর অভিনয় দেখলে মনে হ'বে—মুগ্ধন স্বতন্ত্র সাবিত্রী
চট্টোপাধ্যায় 'অভিনয়' করছেন। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।
এ থেকে মনে হয়, অভিনয়ে যেন তাঁর অক্ষয় অধিকার।



তাঁর প্রথম ছবি 'আলাদীন ও আশু'র প্রদীপ'। অন্ত
কয়েকখানি বিদিত ছবির নাম,—'পাশের বাড়ি', 'মজুম
ইন্দ্র', 'বিধিলিপি', 'ছাই বোন', 'বহু পরিবার', 'পর্যায়',
'ভাঙা-গড়া', 'ধানের মর্গা', 'ডাক-হুকুম'।

এই প্রসঙ্গে মনসা বসুচ্যাগাধ্যায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায়
ও কাবেরী বসু নামও উল্লেখযোগ্য।



মেমোরি ও একটি সকাল

মতি মন্ডল



স্নানে মেয়েরা বসে ছিল। বেগারা এগে জানাল এসেক্সর আসবেন না। সবাই খুশি হল কেন-না এটা লাস্ট পিরিয়ড।

স্নানঘর থেকে বেরিয়ে মেয়েরা ঠাঁড়াল দোতলার করিডরে। করিডরের এক কোণায় এসেক্সরের ঘর, তার সামনেই প্রিন্সিপ্যালের, তার পাশে সিঁড়ি।

সিঁড়ি দিয়ে মেয়েরা নিচের করিডরে নেমে এল। সেখান থেকে রান্নাঘর। ছোট ছোট হল করে ওয়া এয়ার-ওয়ার ডিটকে গেল। শুণু একটামাত্র বেয়ে ঠাঁড়িয়ে থাকল। ঠাঁড়িয়ে থেকে সে চারপাশে তাকাল, তারপর ঘুর ভুলে দেখল আকাশটাকে।

রোদকটা আন্ধ ভাবি মিঠি। ভাবি হুন্দর। বিকেলে ঘুম-ভাতার পর হাই স্কুলে শরীরটা এখন লাগে। আমার ভাল লাগছে এই সময়টা। এখন সব সাড়ে ম'টা। বাড়ি পৌঁছনের কথা সাড়ে দশটায়। একঘণ্টা সময় এখন আমার। শুণু আমার। এখন আমি কি করব! বাড়ি কিবে ঘাব? রান্নাটা পার হতে হবে ওই ওম্বের মোকানটার সামনে দিয়ে। তারপর একটা গলি। গলিটা মজা লম্বা, সেটা শেষ করে আবার বড় রাস্তা। তাই ধরে কিছুটা গিয়ে আবার পায় হব, তারপর সড় গলিটা। গলিটা এশান-ওপান করে অনেকদূর। আর একটা সড় গলিতে ঢুকে শেষ বাড়ির কড়াটা খন নাড়ব, ওখন দোতলার জানলার এসে ঠাঁড়াবে ডোয়ল। শব্দ করে থুণু কেলবে। বরজা খুলে দিয়ে মা গম্ভীর ভাবে বলবে, আদতে এত দেবী হল বে, ছুটি তো হয়েছে শশনটার? না, আন্ধ মা বলবে, এত ভাড়াভাড়ি বে।

ওই একঘণ্টে রাস্তা ধরে রোজ-রোজ বাড়ি কিরি। আন্ধ কিরতে ইচ্ছে করছে না। একঘণ্টা সময় হাতে রয়েছে। নতুন একটা রাস্তা দিয়ে বদি ইটি। ঠিক একঘণ্টা পরে বাড়ি কিরব। মা কিছু জানতে পারবে না। রোজকার মতো চান করব, খাব, ঘুমায়ে।

মাঝে মাঝে, স্টেট-বাসের জানলাগুলো এখন অন্ধুত, চললেই নাকি কন্ডম্ শব্দ হয়, চোখ বুজে ওনলে মনে

হয় বৃষ্টি পড়ছে। ওই বাসটার কচকচে বহ। ওটা নতুন তৈরী হয়েছে নিশ্চয়। ওর জানলাগুলো নড়বড়ে নয়। ওর মখোর লোকগুলো বৃষ্টি-পড়ার মজা পাচ্ছে না। আমার বৃষ্টি ভাল লাগে। এই রোদকটাও ভাল লাগছে। শীতকালের রোদ সন্ধ্যারের ভাল লাগে। শিশু আমি এখানে ঠাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছি কেন? হাঁটসেই তো পারি, কে-দিকে খুশি, যে-দিকে ইচ্ছে। পুণদিকে হাঁটলে কেমন হয়, ও-দিকে অনেক সোফান, অনেক বাহুব।

যেহেঁচো ছোট ছোট পা কলে পুণদিকে হাঁটতে লাগল। হাত বোলাল। কমাগে নু নুহল। একইখন ঠাঁড়িয়ে আকাশ দেখল। আবার হাত বোলাল। তারপর এসে গেল পাঁচবাখার মোড়ে।

এখন অক্লিষ ঘাবার সময়। ট্রান্স-বাসে এই-বে ভিড় শুরু হল, কখন বে ঘাববে ভগবান জানেন। শীতার ঘুণ যোজই কাঁদ-কাঁদ হয়ে যায়। বাসের লোকেরা নাকি নানান কথা বলে এ-সময়ে মেয়েরা উঠে। শীতা মেহেটা বজ্র ভীহু। ভিড় দেখলে বাসে ওঠে না। জোড়াগাকো না জোড়াবাগান পর্যন্ত হেঁটে যায়। ও শিশীমার বাড়িতে থাকে। শিশীটা দারুণ পাজি। একই জিহোবার পর্যন্ত সময় বেশ না। বেশে মা, বাবা, আসো কে-কে যেন আছে। শীতা বলেছে চাকরি করবে, বিয়ে করবে না।

ওই যেহেঁচো এমন কচকচ করে পান চিবাচ্ছে যেন হুণুয়ে সিনেমা দেখতে বেরিয়েছে। ও কোথায় যাবে এখন। জামাটা কী শাতল! লোকগুলো তাকিয়ে যাচ্ছে। ওর পাশের যেহেঁচোর দিকে কিছু কেউ নজর দিচ্ছে না। কী ঘন আর লম্বা চুল! ব্যাগটাকে বুকের কাছে এমন ভাবে আঁকড়ে বরছে যেন এখনো ফুলে পড়ে। ঘুখানা শীতার মতো কাঁদ-কাঁদ। বোধহয় অনেকক্ষণ বাসে উঠতে পারেনি। বজ্র যোগা, চাকরি করার মতো বাধ্য নয়। বাবা অক্লিষ থেকে ফিরেই কিছুক্ষণ তব্ব থাকে। অক্লিষে থুণু বাহুনি।

একটা বায় আসছে। লোকগুলোর কোন হাঁশ নেই।

গুকে যে দাঁড়া গিয়ে সরিয়ে দিল। আচ্ছা রে! পান-
চিবেনো! যেহেতু কি হুলে-হুলে বাবে অমন করে। পড়ে
যাবে রে!

বোণা! যেহেতু এ-বাসে উঠতে পারলো না। পরেরটাকেও
হয়ত পারবে না। দেরী করে পৌঁছে নিশ্চয় বহুনি
ধাবে। আবার তেয়ার সমস্যা এখন করে অনেকগুলো
বাস হয়ে বাড়ি পৌঁছবে। এমনি করে ও রোজ বাবে
আর আসবে, বাবে আর আসবে। তাহপন? কতদিন
ও এমনি করে চাকরি করবে? ও কি সীতার মতো।
টিক করছে বিয়ে করবে না!

আজকের সকালটা ভারি সুন্দর, ভারি ভাল।
আমি ওর কথা ভেবে মন বাসান করব না। রোজ বটা
ভারি মিষ্টি। রোজে যা লাগিয়ে চলব। সোকারগুলো
সকলকে। সোকার দেখতে দেখতে যাব। কী সুন্দর
আপেল স্লিগের বেগেছে। টাইকহেড থেকে পুঁজার পর
যাবা কবিন আপেল এনেছিল। কবিন কেন, তিন
কি তার। ছেসেয়ের সঙ্গে গড়তে কেনন লাগে! ওই
যেহেতু নিশ্চয় এখন বলজ যাচ্ছে। ও কি কঠিনে গড়ে?
ও দেখা গড়া গিয়ে কি করবে, চাকরি করবে? ওর
গোড়াগি দেখ আসব মতো। নিশ্চয় বাড়ির কাজ
করে না। করলে কাটা-কাটা দেখাত। ও নিশ্চয় বিয়ে
করবে।

জাপনদিনের গছটা বেশ লাগে। আমার গা ঘেঁষে
লোকটা গেল। ওর গরম পাছাঘি থেকে গছটা এস।
পাছাঘির গছটা সুন্দর।

ডিম-ডাকার গছ আমার ভাল লাগে। কোথায়
যেন ডাকছে। এইতো এই সোকারটার। ওমা, রেবার
সঙ্গে ওই ছেলোটাকে যে একদিন দেখেছি। রেবা ওর
সঙ্গে গিয়েছিল। কী ওর নাম, সুরত কি? কাল
হেবারে বলব, আমি সুরতকে দেখেছি সোকারে চা
বাচ্ছিল।

আমার দেখে কি সুরত চিনতে পেরেছে আমি রেবার
বহু? এখন যদি ওর সঙ্গে কথা বলি তাহলে নিশ্চয়
অব্যাক হয়ে যাবে। কোথাকর করে? না থাক।
তার চেয়ে মাহুং দেখি, রাজা দেখি। চটির শব্দ তনতে
বেশ লাগছে। সুরতকে বোঝা বিয়ে করবে। নিশ্চয়
করবে, করুক, তাতে আমার কি। সুরত চাকরি করে
কোথায় যেন। সেই যেহেতু একজনকে নিশ্চয় বাসে উঠেছে।

আহ, সেই ছেলোটার সঙ্গে যদি এখন হঠাৎ দেখা হয়ে
যায়। নিজস্বার প্রশ্ন করতে বাসে কর বাচ্ছিল।

নামানীর বাড়ি। বাসে ভিড় ছিল। আমার হাঁটুতে
ইটি টেকতেই মূখ লাগ করে ছেলোট। গাড়িয়ে ছিল। দুব
লাজুক। একবারও আর মূখ তুলে তাকাননি। একই
কালা হতেই সরে গাড়িয়েছিল। দুব ভত্র। এখন যদি
কঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে? তা হলে আমি
কি করব? হু-মানেট কি সে আমার মূখ তুলে বাবে?
নিশ্চয়ই চিনতে পারবে, আমিও পারব। ও যদি বলে,
ইচ্ছে করে আমি আপনাকে হুইনি, বাসে ভীষণ ভিড় ছিল
তাঁই। তখন আমি কি বলব! একটা কথাও বলতে
পারব না। জানি, আমি জানি আমি দুব লাজুক।
ও অবাক হয়ে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে চলে
যাবে। ও চলে যাবে। এই রাজার মাহুংগুলোও চলে
যাচ্ছে। ও অবাক হয়ে চলবে, যেন যেন একই হু-ং গেয়ে
চলবে, কিংবা কিছুক্ষণ রাগ করে যাববে। এই মাহুং-
গুলোও কি অবাক হয়ে, হু-ং গেয়ে, রাগ করে চলেছে?
এত, এত মাহুং! কি আছে ওদের মনে। আহ! আমি
যদি ভগবান হতুম, তা হলে জানতে পারতুম। কিছু
জেনেই বা কি হবে। এত মাহুংয়ের মনের কথা আমি
কোথায় রাখব। তার চেয়ে এই ভাল—এই সুন্দর সকাল,
এই মিষ্টি রোজ, হুই, বাস, শব্দ, আলো, মাহুং!

কি সুন্দর, কি সুন্দর রঙগুলো! থোকো থোকো কুল
চুটে আছে যেন। যদি উলের বলগুলো নিয়ে খাটি, বেড়াল-
বাচ্চার মতো খাটি, তা হলে সোকারি কি কিছু বলবে?
নিশ্চয় বলবে না। বেড়াল তো নাড়াতার করে দেখবেই।
তাহপন ও জিজ্ঞেস করবে কোন্ হঠেহটা আমার দরকার।
তখন আমি কি বলব? বলব, সব, সব রঙের আমার
দরকার। ও বিশ্বাস করবে না। তখন কি আমি ওকে
বিশ্বাস করাব? কি করে করাব, আমি তো কিনব না।
আমার কাছে কেনবার মতো পরস নেই। একটা পিকি
আছে যার। পুরনো কাগজ বিক্রি করেও পয়সা
আমার। এ বিয়ে কি উল বোঝা না?

আমার একটা উলের জামা দরকার। ডোবরেলার
কলেজে আসতে কষ্ট হয়। গলির মধ্যে ততটা বোকা
যাব না, কিন্তু বড়বাজার গুলেই চামড়া আলা করে।
মুদ্রাপার চোখ আলা করে। হুয়ের মাহুং দেখা যাব না।
আর কত হুং থেকেও বাসের শব্দ শোনা যাবে। যেন হয়
একটা হুহুং অনেকখানি হয়ে টুটতে টুটতে হাঁপাচ্ছে আর
ভাকছে। তখন ভয় করে। একলা রাজার গা শির-শির
করে। মুদ্রাপা হুঁড়ে হুড়তে মতো যে মাহুংগুলো বেরিয়ে
আলে তাহেরে বিশেষ যেন ছমছম করে। অথচ কী ভাল

লাগছে এখন। ভোরবেলার হাছবগুলো আর এখন ছুত নয়। একলা থাকলেই ভর করে। পৈতা বিয়ে করতে না, ও সারা জীবন ভরে ভরে থাকবে। বেবা এখনকার মতোই ডানদিকে থাকবে সারা জীবন। আমি কেমন থাকব? লাভুক, মৃৎচোর, ডীতু। কেন আমি কথা বলতে পারি না, মনের কথা বলতে পারি না। সেটা কি অভ্যাস না থাকার জন্ত? কেমন করে অভ্যাস করব, কার সঙ্গে কথা বলব! আমার মনে কী এখন কথা আছে বা বলতে হবে। আমি জানি না, আমার মনের কথা কিছু জানি না। শুধু ভাল লাগছে। এই সকালটা, এই বোদ্ধা রটা, এই রাস্তাটা।

মেয়েটি একটুখানি ঠাঁড়াল। চট থেকে পা বার ক'বে, সিবেরের ফুটপাথ বেখানে ভাঙা, যেখানে বাটি বেহিষে রয়েছে, সেখানে রাখল। ঠাঁকি দিয়ে বিহুনিটাকে বোলাল। তার পাশ দিয়ে বত হাছব দেল, সকলের দিকে সে ডাকাল। তারপর মূঠা উপর দিকে তুলে হাসল। হেসে মাথা নামিয়ে হাঁটতে শুরু করল। আবার খামল সে। ক্রমাল থেকে একটা সিকি তুলে দিয়ে হাতের মূঠোর রাখল। রেখে হাসল। হেসে চলতে শুরু করল। এখনি ভাবে খেমে খেমে, এয়ার-ওয়ার তাকাতে তাকাতে সে হাঁটতে লাগল।

ঘড়ির দোকানের লোকটাকে ঠিক বাবার মতো দেখতে। ঘড়ির দোকান দেখলে হাসি পায়। কিন্তু লোকটাকে দেখে নয়। ওকে বাবার মতো দেখতে। অকস্মিকের হুটি পাওনা থাকলেও বাবা নেয় না। বলে, ওতে নাকি ধারণা খারাপ হবে। কিন্তু শৈশুগির তো বিচার্য্য করবে, তবু এত ভর কেন। এতকাল ভরে ভরে চাকরি করে এগেছে। কিসের ভর, কাকে ভর করে? বাবা খুব দরকার না হলে পরস্যা বরত করে না। সবাই দিকে করে, কিশ্টে বলে। সকালে ঋটি বেয়ে কসকে আসি, হুটির সম্বন্ধ জীখন বিদে পায়। বাবা অকস্মিকের ঋটি নিয়ে যায়। হুটির সম্বন্ধ নিশ্চর খিদে পায়। বাবা কিছু বলে না। আমি জানি বাবা পরস্যা জখাচ্ছে। হুকে, তসুকে, ইকিসোনাকে হাছব করার জন্ত। আবার বিয়ের জন্তে পরস্যা জখাচ্ছে। আমাদের জন্তে বাবা ডীতু হয়ে পড়ছে। বাঁ ঘিটঘিট করে, বিচ্ছিন্নি দখেই করে। যদি এখন হঠাৎ বড়লোক হয়ে বাই। বাবা প্রত্যেক বাসে লটারির টিকিট কেনে। হঠাৎ যদি জিতে যায় তা হলে কি সাধী হবে? কিন্তু এত বাস চলে গেল বাবা কিছু শায়নি। তবু আশা, ক'রে প্রত্যেক



বার কেনে। এমন কত হাজার হাজার লোক কেনে। অথচ টাকা পণ্য একজন। বাবা ভাবে এবার ঠিক পাবে। হাজার হাজার লোক ভাবে এবার তারা পাবে। এখনিভাবে বাসের পর বাস শুধু আশা করে থাকে। তারপর বাবা একদিন মারা যাবে, হাজার হাজার লোক একদিন মারা যাবে। তারপর আবার হাজার হাজার লোক লটারির টিকিট কিনবে। প্রত্যেকবার টিকিট কিনে, মৃৎখানাকে কেমন করে বাবা বলে, কতোদিকে তো কত পরস্যা যায়, হুটো তো ঘোটে ঢাকা, যদি লেগে যায় একবার। এই যে লোকগুলো, ঠামে বাসে চলছে, আমার পা হুঁরে চলছে, এরাও তো এমন করে বলে। হাছবের দিকে তাকাতে আমার কই হচ্ছে। হাছবের মনে কি মনে হয়েছে, না হলে ডীতু হয়ে পড়ছে কেন, লটারির টিকিট কিনছে কেন।

আমর সকলটা আদার ভাল লাগছে। কোন কষ্টের কথা আমি ভাবব না। মাহুদ তীক্ষ্ণ হবে কেন? আদারের ভালবাসে বলেই বাবা তীক্ষ্ণ হয়ে গড়ছে। এই মাহুদ-ভুলোও ভালবাসে। ঘড়ির সোকান কেলে আদার হাসি পায়। এক গাধা ঘড়ি আর এক এক রকম সময়। কলেক্টর তিনটে ঘড়ি কিছুতেই এক সময় দেয় না। চিত্রা মাঝে মাঝে পুরবীর ঘড়িটা হাতে লাগিয়ে চাল ঘেয়ে বেড়ায়। পুরবীর দিদি বিলেতে ডাকারি গড়তে বাবে। ও বলেছে দিদির একটিন কেবাবে। ওর দিদির ছবি নাকি কোন এক কষ্টের সোকানে টাঙিয়ে রেখে দিয়েছে। ওই সোকানটার আছে কি?

এমন উঠ করে তোলা: ছবি বাইরে টাঙিয়ে রাখে কেন! আর বাবা তোমার তপসেও কি লক্ষ্য করে না! ঘেরটা কি সত্যিই এত কথার। খুব আলো দিয়ে তুললে নাকি কালোকেও ফরসা দেখায়। শিবুদা আদার কটোটা হুপুয়ে ছাচে তুলেছিল। একসম কাপসা হয়ে গেছিল। খুব লক্ষ্য শেয়েছিল। পাবেই তো, তোমার আগের কত কারিগুরি! মূখ তোমো, পাশ কেতো, হুদ ছড়াও, গালে হাত দিয়ে ডাবু-ডাবু হও। যেয়ে কেলেছিলাম। খুব বেগে গেছিল শিবুদা। হাসাটা কি খুব দোবের হয়েছিল? আর যদি হয়েই থাকে, তাই বলে এমন হাস দেখাবার কি দরকার ছিল। তিন চার দিন আর আসেনি। অথচ যোজ সন্ধ্যাবেলার আসত। বিচ্ছিরি লেগেছিল ওই তিনটে দিন। তারপর যেদিন এল কথা বলিনি। তার কদিন পরেই তো মা দেখে ফেলল। কি হয়েছিল সেদিন ওর কে জানে, হঠাৎ হাতটা চেপে ধরল। অবাক হয়েছিলুম। আদার প্র'হাতে কড়িয়ে ধরল। হুপচাপ হাঁড়ির হইলুম। মূখটা ওর ঝুঁকে পড়ল, আমি মূখ সরানুম না। শিবুদার ঠোঁট আদার গলিল হুঁয়েছিল আর তখনই মা দেখে ফেলল। ন'দিলীকে মা চিঠি লিখেছিল, তোমার দেওর বেন আর আদারের বাড়িতে না আসে। শিবুদা আর আসেনি। এখন যদি হঠাৎ শিবুদার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তাহলে কি হবে? ও মূখ কিরিয়ে চলে যাবে? কিবা বলবে, তোমার মা আদার হ-তা বলে অপমান করেছে। অপমান মা করেছে, আমি তো করিনি। তবে আদার সঙ্গে কথা বলবে না কেন! যদি বলে তাহলে আন্ধি কি বলব! বলব, আদারের বাড়িতে এসো। কিন্তু আমি বললে শিবুদা আগবে কেন, বাড়ি কি আদার। তাহলে পি বলব? ইস, এককক্ষ বোন্ধুরে হাঁটছি। এবার গরব লাগছে।

ক'টা ব্যকে এখন? শিবুদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে কি বলব জানি না। আদার গরব লাগছে। উঠোনে এখন যোজ এসে গেছে। বাগিনের ওয়াড়গুলো আর বাবার গামছাটা শেখ করে কাটতে হবে। উঠোনেটা এত ছোট, অতগুলো মিনি কিছতেই তারে ধরবে না। যদি এই হাতটা উঠোন হত, তাহলে বত কাপড় আছে সবগুলো কেচে শুকাতে কিছুম টাকের তারে। কতদূর গেছে টাকের তার? ধর্মতলা, তারপর ভবানীপুর, তারপর বাগিনগঞ্জ। বাগিনগঞ্জের সেকে পরও এতিবা বেড়াতে গেছল। এতিবা একা একা বেড়ায়। তার বাড়িতে কেউ বকে না। এখন যদি আমি বাসে উঠে সেকে চলে বাই তাহলে কি হয়। বাস থেকে নেমে হাঁটব আর হাঁটব। আর যদি বাড়ি না কিরি তাহলে কি হবে? বাবা অকিস থেকে দিয়ে সব ওনে পুণিশে বরব দেবে, হাসপাতালে থোজ নেবে। শবরকা একদিন অমন কাও করেছিল। অকিস থেকে আর বাড়ি ফেরনি। কাকীমা কৈনে-কেটে একসা। মাঝাগুলোর কাছা চোখে দেখা দাব না। শবরকা কাছা ওবের বাড়ি দ্বিতীয় পুত্র মাহুদ আর কেউ নেই। আমি যদি না কিরি তা হলে টুসিগোনা কাববে। দিদি না বাইরে ফিলে ওর ঝাওয়া হয় না। কিন্তু আমি বাড়ি কিরব না কেন। শবরকারা বডো চাকরি থেকে হাঁটাটের বরব কি আমি শেয়েছি? তবে কি শেয়েছি।

এই আলো, এই রঙ, এই শব্দ, আর মাহুদ আর মাহুদ! আদার ভাল লাগছে না বাড়ি ফিরতে। সেই একঘেয়ে গদি দিয়ে, ইলুর-কাটা কাগজের গম্বুলা ঘরটার দিবে যেতে ইচ্ছে করছে না। আমি হাঁটব, যেদিকে হুতোষ দাব চলে দাব। আদারের ঘরে শীতে রোদ, গরমে হাওয়া ঢোকে না। বসু ছায়ে উঠতে পারে না। কড়িকাঠগুলো কবেকার বেন, কবে কবে লক হয়ে গেছে। প্রণদাপ করলেই বালি থলে পড়ে। আনান্দা বন্ধ করলেও বুরিতে ঘর ভেলে দাব। উঠোনটা শুকনো থাকে শুবার ঐচ্ছকালে। ঘরের সেই আঁকিলালের বাটটা আর কাঁদয়া বলতে কিছু থাকেনি। নড়াচড়া করলেই হাঁটতে লাগে।

এমন কত সহজেই হাঁটছি। বতক্ষ ইচ্ছে এমন করে হাঁটতে পারি। দেখাল নেই, বাট নেই, শেখল উঠোন নেই। ইচ্ছে করলে বাসে উঠতে পারি। শিকিটা ভাঙিয়ে জাড়া দোব। হু'আদার বতদূর ঝাওয়া দাব, দাব। দেখান থেকে আদার হাঁটব। হাঁটব, হাঁটব, হাঁটব।

যেবেট কন্যাস দিবে মূখ মূদল জোরে জোরে। কাঁচটা

শিচ্ছেন তাঁলে শিঠি বোতাম। হঠাৎ আত্মল দিয়ে খসখস করে মাথা চুলকাল। চট্ট বম্বো গুঁড়ো-গুঁড়ো মাটি চুকেছে তাই পা ফুঁকে মাটি বাড়ল।

এবার সে মাথা নামিয়ে চলছিল। হঠাৎ চম্কে উঠল হঠাৎ শব্দ শুনে। হুটপাথ থেকে নেমে ছোট্ট রাজাটা পার হাঙ্গিল, এখন সময় ট্যাঙ্কিটা বোঝে কিরকি। খতমত খেয়ে কেশে উঠল মেয়েটি। মুঠো থেকে সিকিটা গড়ে গেল। জোরে হেসে উঠল ট্যাঙ্কিওয়াল। ওর পাশের লোকটা গলা বাড়িয়ে কি খেন বলল। সিকিটা হুড়িয়ে নিয়ে যেয়েটি হুটে রাজা পার হয়ে গেল।

আমার দেখে হেসে গেল। আমি দেখতে পাইনি ট্যাঙ্কিটা। আবার বোঝে ছিল। এমন করে বেরপের মতো পথচলা অভ্যাস। কিন্তু লোকটা বলল কেন যে, এটা কোলকাতার রাজা। স্বাভাবিক দুই সাধারণ, আমি তা জানি। কিন্তু লোকটার বলার মধ্যে কি বেন ছিল। আমার রাগ হচ্ছে, লজ্জা করছে, পরীক্ষা জালা করছে। যা আমার বলেছিল, হাফায়জাবী, গলায় হাড়ি জোটে না? ময়গে বা, তা হলে হাড়ি বাতাস লাগবে। সেদিন আমার এই স্বপ্ন অবকা হয়েছিল। তবু হচ্ছে, শিবুয়ার সাহনে যা কথাগুলো বলেনি। সেদিন বয়স কথা জেবেছিলুম। সাধারণত যুগেইহি। দেখতেও কেবেছিলুম। তারপর দিনগুলো কেমন ভাবে বেন কেটে বেতে লাগল। যরা আর হ'ল না।

আজ মরতে পারতুম। ট্যাঙ্কিওলা যদি চাপা দিত, তা হলে ওর কোন দোষ থাকত না। কিন্তু ও আমার বাঁচিয়ে বিল। ওর ওপর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তা হলে আমি রাগ করছি কেন! যা, কী স্বপ্নের স্বপ্নের ক্রমাল! একটা কিনব কি? ওই সবুজ বর্ডার কেওয়াটা। কত করে বলল? গাড়ে ছ'আনা। না, কেনা হ'ল না। একটা দিকি দাড় বয়েছে। তাছাড়া কাঁক চালাবার মতো একটা তো রয়েছে। গাড়ে ছ'আনার কি ভাল ক্রমাল হ'ল? ভাল ক্রমাল হুটপাথে ন'ল, দোকানে বিক্রি হয়। সে ক্রমালের অনেক দাম। বীবা একটা কিনেছে যেই টাকা দিয়ে। আমি পরে কিনব। শিবুবা বলেছিল, কাপড় কিনে আনব, একটা ক্রমাল করে বিক্রি। ওর সঙ্গে যদি বোঝা হয়, তা হলে মনে করিয়ে দিব।

প্রতিমা সে ছাপা পাড়ির বোকারের কথা বলে, এইটেই বোধ হয়। এমন স্বপ্নের করে শাখিয়ে রাখে কি করে! বাবা কিনতে আসে পছন্দ করে কি করে। দেখলে সব-ক'টাই তো কিনতে ইচ্ছে করবে। আদ্যাবু যদি কেউ পছন্দ

করতে বলে তা হলে কোনটি করব? কিন্তু এমন হাঁ করে শাখির দিকে তাকিয়ে থাকলে সোকে কি ভাববে। আশ্চর্য, কেউ কিন্তু আমার দিকে তাকান্দে না। বোধহয় ভেবেছে কিনব বলে পছন্দ করছি। ট্যাঙ্কিওলা ঠিক বলেছে, এটা কোলকাতার রাজা। কিন্তু আমাদের বাড়িটা কেন রাজার মতো হয় না। রাজার মায়ের গুঁচু চলছে তো চলছেই, অন্তের সম্পর্কে কৌতূহল নেই। এখানে মনের বৃষ্টিতে হাঁটা হয়। কেউ চাপ দেবে না, জোর করবে না আমার মনের মধ্যে এমন কী কথা জন্ম হয়েচে জানবার মত। ওরা ব্যস্ত নিজেদের ভাবনা নিয়ে, আমি আছি আমার ভাবনা নিয়ে। ওরা একবার গুঁচু আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, তাও সবাই নয়। আমিও বেগুনি ওপের, তাও সবাইকে নয়। এমনি ভাবে আমাদের সময়টা, গলিটা, বাড়িটা আমার ঘূর্ণি মিক না। আমি ভাবব, অনেক অনেক কথা ভাবব। মায়ের যেমন সব সময় চলছে তেমনই আমার ভাবনাগুলোও চলবে। মনের মধ্যে আলো, রঙ, গন্ধ ফুটবে। আমার মন এই সকালটার মতো, বোদ্ধার মতো, রাজার মতো হয়ে যাবে।

কিন্তু বাড়ি কিরলেই বা বলবে, এত বেরী হল যে! বা নকশে করে। হুসুরের কলেজে আমার ভর্তি হতে দেখিনি। তা হলে নাকি আমি নই হয়ে যাব। বাবা বাবা কবার ওপর কথা বলে না। ভীতু-ভীতু মায়ের আমার ভাল লাগে না। পতরকাকারের কগড়া ভাল লাগে না। ওর ছেলেদের খ্যানখ্যান আর ছাংলামি দেখলে রাগ হয়। ডোয়ল দিনরাত আধারের কদমরের দিকে তাকিয়ে থাকে। জানলার ঝাড়ালে, উঠোনে গেলে বা রাগ করে। আমি নড়াচড়া করতে পারি না, আমি হাঁক ছাড়তে পারি না, আমি স্বপ্নের হতে পারি না।

এখন কটা থাকে? হাঁটাই বাহুল্য, যদি দেখব না। আমি এখন হাঁটব। বড়ুর বাবা গেছে ততবুর হাঁটব। লাগি লাগি জুতোয় দোকান, আমি প্রত্যেকটা দোকানের সাহনে হাঁড়াব। প্রত্যেকটা জুতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখব। বেরী হয় হোক, আমি দেখব।

জুতোয় সঙ্গে দাম লিখে রাখেনা কেন? বাবার সঙ্গে জুতো কিনতে এসে ঠেকেছিলুম। দর জানা থাকলে চুকতুম না। আমার লজ্জা করেছিল, যখন দোকানি বাবাকে বলেছিল, বহাতি-হুটপাথে চল, এখানে এক দাম। বাবা তেবেছিল চার-পাঁচ টাকাতেই চটি কেনা যায়। শেষকালে রাজার দোকান থেকেই চটি কিনেছিলুম। এটা ছিঁড়ে গেছে। বাবা মরতো আমার হুটপাথ থেকেই আর একজোড়া

কিনে দেবে। আমার পাঁচ করিয়ে লোকানির সঙ্গে একঘণ্টা পরেই করবে। আমার ভাল লাগে না এমন করে ভিন্ন মনেতে। আমার যদি টাকা দিয়ে দেব, তাহলে পাচকমতো নিজেই ছুতো কিনতে পারি। কিন্তু আমার পাচকমতো কিনতে পারবে না, বাবা টাকা দেবে না। তাহলে ওই সাধারণ ছবি-বাজার-করাটা কিন্তুম।

লোকটা আমার ভিতরে এসে ছুতো দেখতে বলছে। গিয়ে কি চাবে, আমি তো কিনব না। ওর জামার কলার ছোট্ট গেছে। বোম্বের ওর ছোট্ট বোন নেই, খালি বলাচটা উঠে সেলাই করে দিত।

এক জায়গায় আর বেশিকিছু ঠাণ্ডান ঘাচ্ছে না। কোমর চড়ছে। অস্বস্তি করছে শরীর। আমি যদি গাড়ি-বাগানের ওপর পাড়ায় তাহলে লোক ভাববে, হয়তো কলার জল বেশকিছু বর্ষা। কিন্তু সত্যিই তো তা নয়।

এই বাঁহুড়ায় ভরানক বিশিষ্ট। নিরীহের মতো ঠাণ্ডিয়ে থাকলেও শিঙালা দেখলে ভয় করে।

লোকটা বাগের জল টুটছে। পারবে কি ধরতে! পেরেছে। একটা ঠোঁট-মন্দির ফেলে এসেছে। মনে মনে এখন প্রণাম করলে দেখে হবে না। কী ঠোঁটের ছিল? সেহল, শনি, না বাধাকটে?

সুপকলির সিঁচায় লিখে এমন ভাবে উঠিয়ে রেখেছে মনে হয় যেন সরকী-শুকো এসে গেছে। বনু বলছিল এবারও শাড়াই জলসা হবে।

মুগ্ধের সিঁচায় টাইল দেখে কি এইখানে? টাইল জানলে ঠিকইতে সত্যিই হয়। কিন্তু লব্ধবাক্যও টাইল জানে।

হঠাতের লোকটার লিখেছে। কলেক্টে একদিন হয়েছিল। বাবা বলেছিল জোর করে চুকবি। নব্বিতাদিয়া

শিঙিতে হাত-খরাদরি করে দাঁড়িয়েছিল। চুকতে পারিনি তখন বাবা ভয় পেয়েছিল, বকেছিল।

জিকে চাইতে। বিকিতি এদের বডাব। মেয়েদের দেখলে আরো বেশি আনন্দান করে। যদি চাষ তো এক পরসাদে দেব না।

চাষনি। বোধ হয় লক্ষ্য করেনি। ডানট করেছি ওপাশ দিয়ে যাবে এসে। ত্রিখিটলের তাড়াতে লক্ষ্য করে, যা কিছু খুব লক্ষ্যে, লক্ষ্য করে পরসাদে বন্ধ করে দেবে।

এইবার হাতটা বেধে পার হতে হবে। হিন্দুটোর আগে কি পার হবে? না, ওটা চলে যাক।

আমার মতো নিশ্চয় হাতের সব লোক হিন্দুটার দিকে তাকাবে। তাকিয়ে হাসবে। এমন করে আমিও অষ্টমীর রাত্রে হিন্দু মা'র কোলে বসে বাড়ি এসেছিলাম। সেদিন হাতের ভিড় ছিল। কেউ হয়তো লক্ষ্য করেনি। কলেক্ট হাসত নিশ্চয়। যা বলেছিল একটা গাড়ি করতে।

টুকিনোমাকে কোলে নিয়ে হাঁটতে আমায়ও কষ্ট হচ্ছিল। বনু অনেকক্ষণ ছুতোটা হাতে নিয়েছে। মোজা না পরলে নতুন ছুতোর কোমর তো পড়বেই। ডেবেছিলাম বাবা একটা ট্যান্ডি করবে, করেনি। বাড়ি ফিরে হু'আনার জল বাবা অনেকক্ষণ হিন্দুগলার সঙ্গে কগড়া করেছিল। দেখটার হিন্দুগলা হয়ে গেছিল। বাবার সমস্ত বা-তা কথা বলেছিল। ট্যান্ডির ডাড়া মিটারে দেখা থাকে। কগড়া হবার কোন উদ্যম নেই। আমার হিন্দুগর থেকে ট্যান্ডি ভাল লাগে।

ওখানে লোকগুলো ভিড় করে কি দেখছে? কোলকাতার হাতের আরো ভিড় জমে। একই জোরে কথা বললেই লোক জড়ো হয়ে যায়। সিনেবার জল দেখলে ছবি আঁকে। আমার ছবি-আঁকা দেখতে বেশ লাগে। লিখুন! যেমন করে পেলিন দিয়ে রাউকে মূল একে দিয়েছিল, ঠিক



দেশীয় শিল্পের মূর্ণ বিকাশ...

রাজলক্ষ্মী শিল্প মন্দির

শ্রীমতী প্রমীলা দেবী ও প্রমীলা দেবী

১০১, বিপিন বিহারী গঙ্গুলি স্ট্রীট, বহুবাজার, কলীকাতা • ফোন-৩৪ ৫৪২

তেমনি করে বেয়ালে দুখ খাওয়া। ওর ওপর রক্ত করা হবে। পেলিলের দুখ ভরাট হয়ে বাবে। এক-একটা কুটির আচড় পড়বে আর অল্প অল্প করে একটা জ্বিলিশ ঠেতরী হবে। কী ভাস লাগত বনন রাউন্ডে ফুলগলো কুটে উঠত। আর ফুল কুটে না। শিবুলা আর আসবে না। দুপুরবেলায় আমি কি করব? ঘুমাও। চুপ করে শুয়ে শায়া-রাউন্ড-ওলায় ডাক ওনব! উঠোনের এঁটো বাসন কাক কিংবা পাখিরা বনন কেসে দেবে, তখন উঠে গিয়ে দেখে আসতে হবে চোর এসেছে কিনা। আর কি করব দুপুরে, পড়তে বসব! সন্ধ্যাবেলায় শিবু। ক'দিন পড়িয়েছিল। শিবুলা আসবে না আর, সন্ধ্যাবেলায় কি করব তাহলে।

আমি কি করব কিছু জানি না। এমন করে কতক্ষণ আর হাঁটব! এই সিনেমা-বাড়িটা আমারেই কলেজের মতো দেখতে। ভেতরে কটো সাকানো আছে, গিয়ে দেখলে হয়। কিন্তু যেহে কি করব, এ ছবিটা তো কোনদিনই দেখতে পার না। বাবা পছন্দ করে না, বা পছন্দ করে না সিনেমা-দেখা। রেবা গল্প করছিল এই বইটার। ও দেখে এসেছে হরতর সঙ্গে। সিনেমার নামলে নাকি অনেক টাকা পাওয়া যায়। বয়েতে লাখ টাকা করে দেয়। এত টাকা নিয়ে ওরা কি করে! আমি যদি একখানা বইতে নামি, তাহলে সারাজীবন আর কিছু করতে হবে না। অত টাকা নিয়ে আমি কি করব! জীবিয়ে রাখব? বাবা টাকা কমাংর, বাবা ভীতু হয়ে গেছে। আমি জন্মাব না। কি রাখব বাসন বাজার কল্প। পূর্ববীর বাবা তাঁকর নিয়ে বাজার যায়, পাঁচ টাকাই বাজার করে। ফুদু-মাসির বিয়েতে যা একটা রূপোর শিঁহুর-কৌটো দিয়েছে। পূর্ববীর ঘড়িটা, জন্মদিনে ওর মাসিবা দিয়েছে। ও যদি জন্মদিনে আমার নেবজ্বর করে তাহলে অনেক মাছি জ্বিনিস পোষ। আর কি করব? এই গলি থেকে উঠে যাব। সুন্দর একটা বাড়ি ভাড়া নোব। ছায়ে ওঠা যাবে। যা বলে বলে শুধু বড়ি দেবে। রমুকে বিলেত পাঠাব। রমু ববাব-দেওয়ান একটা পেলিল চেয়ে থমক খেয়েছে বাবার কাছে। ওকে শেকাশ কিনে দোষ। ছাপা-শাড়ির দোকানটার একদিন যাব। উলের পোকানে গিয়ে বত বুনি খাঁটব।

সিনেমার ডিরেক্টররা কি কানো চুপা পরে? ফুলকি রাখে না? সাধা প্যাট পরে? সাধা ছুতো পরে? রেবা বসেছিল ওরা নাকি দুখ বাবুগিরি করে, দুখ দিলারেট যায়। ও সোফুটা কি সিনেমা-ডিরেক্টর? যদি ও এসে বলে আপনাবার নাম কি, বাড়ির ঠিকানা কি, আমি একটা বই ফুলব, আপনি নামবেন? তাহলে কি-বলব। রেবা

বলেছিল কাকে বেন এমন করে রাজা থেকে নিয়ে গেছল বইতে নামাবার কল্প। সে এখন তিনখানা পাড়ি কিনেছে। রেবা পাড়ির নখর পথক জ্বানে। কিন্তু লোকটা এসে যদি জিগ্যেস করে, তাহলে কি বলব!

লোকটা আমার দেখতে পারনি। ওর পাশ দিয়ে যদি আমি হাঁটেতে থাকি, আর হাঁটবার সময় শিকটা কেসে দিই! নিশ্চয় ও শিকটা ফুড়িয়ে দেবে, তখন আমার দিকে তাকাবে। তাকিয়ে অবাক হয়ে যাবে। কিছু একটা জাববে। তারপরে আমার বলবে। আমি জানি কি বলবে, তখন আমি কি বলব!

হঠাৎ মেয়েটি জোরে হাঁটেতে শুরু করল। গগলুস-দরা লোকটি ছুটপাখের ভিড় এড়াবার কল্প রাজ্যায় নাখল। মেয়েটিও রাজ্যায় নামল। ইলেকট্রিক কোম্পানীর কলাপ রাজ্যা বুঁদছে। লোকটি আমার ছুটপাখে উঠল, মেয়েটিও উঠল। কিন্তু ওদের ব্যবধান বেশি কমল না।

ছুটপাখের অর্ধেক ফুড়ে কেউওলায়া বসেছে। চলবার রাজ্যাটা শুরু হয়ে গেছে। মেয়েটি করেকজনকে ধাক্কা দিল। তারা দুখ কিংবিয়ে ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাল। মেয়েটি কিছুই অক্ষপ করল না। জোরে, জোরে জোরে সে হাঁটেতে লাগল।

ওদের ব্যবধান বয়ে এসেছে। লোকটিকে প্রায় ধরে কেসেছে। হাতের মুঠো ফুল শিকিটা একবার সেপল। তারপর হাতটা একটু বোলাল। আর সেট সময়ট মেয়েটির চটির স্ট্রাপ ছিঁড়ে গেল।

আমার চলা বন্ধ হয়ে গেল। লোকটা চলে যাচ্ছে। বেঘন ভাবে হাঁটছিল, এখনো ট্রিক তেমনি ডায়েই হেঁটে যাচ্ছে। ও কি সত্যই সিনেমার ডিরেক্টর? আমি তখন ফুল করতে পারি। কেন, কেন এমন ফুল হল! এখন চটিটা সারতে হবে।

কোথার মুচি? ও-ছুটে লোকটা বসে, ও কে? না, একটা পুরনো বইওলা। ও-খারের লোকটা কে? নাপিত! আন্ডর, মুচি কেন নেই? আর একটু এগিয়ে গেলে হতো পার।

রাজ্যায় লোক এইবার তাকান্দে আমার দিকে। ওরা কি জাবছে? বুজতে পেরেছে আমার বিশদটা। কেউ হাসছে না তো।

কি বলল বুড়া ডহ্রপোক? মুচি বুঁজছি কিনা। নিশ্চয়! ওই কোণের শিকটার পাব?

বুড়ো চলে গেল অথচ ধস্তাবার দিলুম না। ধস্তাবার কথটা বলতে কেমন লজ্জা করে। কোনদিন তো বলা অভ্যাস নেই।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছি, আর সব লোক কত জোরে বেঁটে চলছে। লোকটাকে ধরায জন্তু যদি আত জোরে না হাঁটতুম তাহলে চটি ছিঁড়ত না। কেন আমি জোরে হাঁটতে গেলুম? কেন আমার মনে অনেক টাকার জন্তু লোভ তৈরী হল। এত, এত মানুষ আগের থেকেও বেন জোরে হুটে চলছে। সত্যিই কি চলছে, না আমি আগের থেকে আছে হাঁটছি বলে এমন মনে হচ্ছে! চাঁদ একজামনাতেই থাকে, মেঘগুলো ভেসে যার বলেই মনে হয় চাঁদটাও ভেসে যাচ্ছে।

এই তো একটা মুঠি!

মেয়েটি একশাট চটি পুতে দিল। কোন কথা না-বলে মুঠি তুলে নিল চটিটা। চামড়া কেটে দেলাই করে সে শেরক বসাল। তারপর মেয়েটির পায়ের কাছে এগিয়ে বসিল।

মেয়েটির হাতের মুঠোর সিকি ছিল। মুঠির হাতে দিয়ে হাঁড়িয়ে হইল ব্যক্তি পরসর জন্তু।

মুঠি সিকিটা খুঁড়িয়ে-কিঁড়িয়ে দেখে হুটশাখে বাজাল, তারপর হাতের তালুতে গবে কিঁড়িয়ে দিল।

অমুঠি পক করে মেয়েটি নিজের তালুতে সিকিটা গবল। কালো-কালো ধাগ ফুটল। তারপর তাকিয়ে হইল সে মুঠির মুখের নিকে। মুঠি হাসল। মেয়ে হাত নেড়ে ওকে চলে যেতে বলে নতুন কাজে মন দিল।

আমার সেরী হয়ে গেছে বাড়ি কিঁরতে। না আম অনেক কথা শোনায়ে, সেরীর কারণ জানতে চাইবে। তখন আমি কি বলব। আমি জানি না, আমি জানি না।

বাড়ি থেকে অনেকখুঁ চল এসেছি। এখন অনেক পথ আমার চলতে হবে। আমার জোরে হেঁটে বাড়ি পৌঁছতে হবে।

আমি ঠকে গেছি। এই আকাশ, আলো, বোন্ধবের রক্ত দবা পীসের মতো হয়ে যাচ্ছে। কী পরকার ছিল এই সকালটার আমাকে জোলাবার?

আমি কি পেদুম, কি পেদুম? এই হাঁটার কথা দিয়ে? আনন্দ পেদুম, কতইহু পেদুম, কতকনের জন্ত

পেদুম? কেন এই সকালের মতো: মন আমার সারাক্ষণ হইল না?

এই আকাশটা আমার ঠকিয়েছে। পরন্তু ইকিনোনার হুধ কেটে গেছিল। কাটা-ছেঁড়া মেঘ আকাশে বেড়াচ্ছে। না বাকছিল আমার। যেদিন ইকিনোনা হুধ খেতে পারনি। আমার বিজিরি লাগছিল।

আমার বিজিরি লাগছে এই বোন্ধব। সকালের সেই নিপ্তিভাবটা আর নেই। আদর্শ, সকালটাই তো আর নেই! বেলা বেড়ে গেছে, ক'টা বাজে এখন? বাবা অফিস চলে গেছে। চমু ইকুল চলে গেছে। তমু একা-বোকা বেলছে। ইকিনোনা হুধতো মাটি থেকে ফুঁড়িয়ে কিছ-একটা বাজে।

আমার সেরী হয়ে গেছে। আমার এখন হুটে বাড়ি পৌঁছতে হবে। এই সকালটা আমার ভুলিয়ে অনেকখুঁ নিয়ে এসেছে। মুঠিটা খুব ভালো লোক। ওকে কাল পরশা শোধ করে শোব।

কিন্তু এই রাজাটা দিয়েই আমার আগতে হবে। হুধর সকাল, বোন্ধব, বোন্ধব, মাহুধ, গাড়ি আমার জোলাবে। আমি নিজেই তুলে যাব। তারপর হুঠাং মনে পড়বে বাড়ি কিঁরতে হবে। কেন, কেন এমন হয়। কেন আমাদের বাড়িটা এই সকালের বাজার মতো হয় না। আমি আসব না। মুঠিটা আমার সম্পর্কে ব্যাধন ধারণ করবে, কলক। আমি আর আসব না।

আমি এখন খুব জোরে হাঁটছি। কিন্তু কত জোরে? সকালটা আমার ছাড়িয়ে হুধুরের নিকে চলছে। আমি পিঁড়িয়ে গেছি কি? হুধুরটা বিকল হুধে, বিকলটা হাতিব হুধে। দিনটা শেষ হুধে ঠিক একটা মাহুধের জীবনের মতো। আমার কি হুধে? আমি কোথায়, কেমন করে শেষ হুধে? এই বোন্ধবের জালা কতকনে ছুড়েবে। আমি না, আমি কিছু জানি না। আমি কিছু জানি না।

বাথার কাঁকুনি দিল না, হাত বোলাল না—তমু বাথার নামিরে মেয়েটি প্রায় হুটে চলল।

একবার হুঠাং, নে, হাঁতাল। হুধ তুলল আকাশে। আচল দিয়ে হুধ হুধল। হুটশাখের ধারের নরনার পিকিটা আসতো করে কেসে দিল।

তার পর মেয়েটি আমার প্রায় হুটে চলল।

মহাদ্বীপের কাহিনী

শ্রী অজিতরত্ন কব্



মহাদ্বীপের অনেক কাহিনী আছে; তাহেই একটি আঙ্গ বলছি।

কিন্তু তার আগে মহাদ্বীপ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। মহাদ্বীপ দ্বীপও বটে, মহাও বটে, এ কথা একবারে মীকার করেন। এমন লোক বেশি নেই। দু-চারজন আছে, তাদের কেউ গ্রাস করে না। এর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন ভৌগোলিকের বিভিন্ন মত। কেউ বলেন, কোনো এক হুদু অতীতে জলের উপর ভেসে উঠেছিল মহাদ্বীপ; সেই হুদু কতক তা নিয়ে অনেক দ্বন-কষাকষি হয়ে গেছে। কেউ বলেন, জলের বুকে মহাদ্বীপ জেগেছিল এ ধারণা নিতান্ত অসম্ভব; প্রকৃতপক্ষে এমন যে ক্ষুদ্র ভূখণ্ড মহাদ্বীপ রূপে জনবহুল বিদ্যমান, এককালে তা মহাকুসুমের লগ্নেই ফুক ছিল, তারপর জলের তলায় গিয়েছিল তার চারিদিকের ভাঙা তলিরা। এই তলিরা হাওয়ার ব্যাণারটা কখন এবং কেন কয়ে গটেছিল, তাই নিয়ে বহু গবেষণা-এর রচিত হয়েছে। হজ্ঞেও।

ক্ষুদ্র ভূখণ্ড 'মহা' কেন, এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে অনেক কথা বলতে হয়। তাতে কাহিনী শিখিয়ে যাবে; হুতর্য কাহিনীই শুরু করি।

কথুরাজের দুবরাজ যখন হঠাৎ অসুখে পড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠলেন, তখন পথম চিন্তিত হয়ে কথুরাজ বললেন, "মন্ত্রী!"

মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ!"

কথুরাজ বললেন, "এখন কর্তব্য কি?"

মন্ত্রী বললেন, "কথুরাজকুমারকে অবিগলবে মহাদ্বীপে প্রেরণ করা, যেন তার শেখনিবাস মহাদ্বীপেই পরিত্যক্ত

হয়। তা না হলে কথুরাজের কাছে কথুরাজোদু বাধা চিরদিন হেঁট হয়ে থাকবে।"

তবে জ্ঞ হকিত করে কথুরাজ বললেন, "এ কথার অর্থ?"

মন্ত্রী সঙ্গ্রামে বাধা নত করে বললেন, "মহা-রাজ সম্ভবত জানেন, কথুরাজের রাজকুমারেরও—বিধাতার কি বিচিত্র বিধান, কি বিস্ময়কর যোগাযোগ!—এখন প্রায় অস্তিত্ব অবস্থা। যে-কোনও মুহূর্তে শটল ভুলতে পারেন। সে রাজ্যের সেবা সেবা বড়িরা একযোগে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। তাই সাক্ষাৎ সমভিব্যাহারে রাজকুমারকে পাঠানো হয়েছে মহাদ্বীপে। মহাদ্বীপের দক্ষিণ সমুদ্রতীরে দক্ষিণ-তীর্ণ নামে যে মহাব্যবসায়িক হোটেল, সেটি সম্পূর্ণ ভাড়া নিয়ে ধলন করে আছেন কথুরাজকুমার। ব্যতরন থেকে তিনি সমুদ্র দেখছেন আর অস্তিত্ব দলের প্রতীক্ষা করছেন। হোটেল-ভাড়া দিচ্ছেন বৈদিক হুই সহজ স্বর্ণমুদ্রা। তার গুণের অন্তর্য বরচা তো আছেই। ধরাশূর্তে সবচেয়ে ব্যয়-সাশ্রয়িক স্থান এই মহাদ্বীপ।"

কথুরাজ শুধালেন, "তাতে কথুরাজের কাছে আমায়ের বাধা হেঁট হয়ে থাকবে কেন মন্ত্রী?"

মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, ঈশ্বর না করুন, আমায়ের কথুরাজ যদি কথুরাজোই চক্রে বোলে, আর কথুরাজ মহা কাগানী করে হুনিয়ার পরল-নবর বরুতে জাগরা মহাদ্বীপে দৈনিক দু-চারক স্বর্ণমুদ্রা ভাড়ার হোটলে গল্প প্রাণ্ড হন, তাহলে বিশ্বব্রহ্মের কাছে আমরা হুই সেবাব কেমন করে? নিরিপ বিশ্ব কি বলবে না আমরা প্রায়-কিন্তে দিল-তৌবাক; দরিদ্রা হবার মতো দিল আমায়ের নেই। বা আছে কথুরাজের? মহারাজ, মহাদ্বীপের

উত্তর সমুদ্রতীরে উত্তর-তীর্থ নামে যে হোটেল আছে, আধাশের কর্তব্য হচ্ছে সেটি অবিলম্বে ভাড়া নিয়ে সেখানে আমাদের যুগ্মসভা পাঠানো। জুহুবাঙ্ক হোটেল-ভাড়া দিচ্ছে বৈদিক ব্রহ্মারাজ বর্দুহা; আমরা দেখা আড়াই হাজার। জুহুবাঙ্কসুয়ারের সঙ্গে সাধোপাশক সেজে সবস্বচ্ছ একশো ছাত্র। আমরাও যুবরাজের সঙ্গে বাবে হুগো ছাত্র। হানে, জুহুবাঙ্কের ওপর সবরকমে টেকা দিতে হবে; জুহুবাঙ্কের কাছে মান খেঁরনো কোনোঘডেই চলবে না।”

তখন জুহুবাঙ্কের লগাটের ওপর চিত্তার রেখা দেখা দিল। তিনি ভেবে দেখলেন মন্ত্রী বা বলেছেন তা বর্ণাধ। জুহুবাঙ্কের সঙ্গে জুহুবাঙ্কের খোলাখুলি কোনো কণ্ডা নেই, কিন্তু বদলেরই জুহুবাঙ্কের ওপর টেকা মারবার দিকে জুহুবাঙ্কের অগ্রাণ চেষ্টা। পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে গত ঐকবছরে জুহুবাঙ্কের লোকসংখ্যার যে বৃদ্ধি ঘটেছে, জুহুবাঙ্কের লোক তার দিক্ভাগও বাড়েনি। মহাপ্রাচ্য ভোজন-ঐতিহ্যগোষ্ঠীর জুহুবাঙ্কের প্রতিনিধি জুহুবাঙ্কের প্রতিনিধির চাইতে পরভাষিণ্যানা। (!!!) বেশী লুটি খেয়ে চ্যাম্পিয়ন শব্দ শেখেনি, সে পরভাষের বাধা জুহুবাঙ্ক আঁকও ভুলতে পারেনি। এ ছাড়া আরো বহু বিভিন্ন বকমে জুহুবাঙ্কের ওপর টেকা যেতেছে জুহুবাঙ্ক। সেই‘রকম’-গুলো একে একে যেন পড়তে লাগল জুহুবাঙ্কের।

মন্ত্রী বললেন, “মহাবাঙ্ক, আমি সন্বেধ করি জুহুবাঙ্কের কাছে জুহুবাঙ্কের মাথা হেঁট করাবার মতলবেই বিখ্যাত। একই সময়ে ওদের আর আধাশের যুবরাজকে মরো-মরো বানিয়েছেন। আনাশের কচ্ছ করবার ক্ষেত্রেই জুহু-যুবরাজকে তিনি ধ’ করে পারিয়ে দিয়েছেন মহাবাঙ্কে বর্দুহার ছিনি-মিনি খেলতে। ছিনিমিনি খেলতে আমরাও জানি, এইটে বেশ কণ্ডাও করে দেখাতেই হবে, মহাবাঙ্ক। বিখ্যাতকে কচ্ছ করতেই হবে, খচার ভর পেলে চলবে না।”

মহাবাঙ্ক মাথা চুলকে বললেন, “কিন্তু অত লম্বা টান শালদাবার মুরোয় কি জুহুবাঙ্কের বাজকোষের আছে মন্ত্রী?”

মন্ত্রী বললেন, “মহাবাঙ্ক, ‘লাগে ঢাকা দেবে গোয়ী সেন’ এ তো প্রবাদেই বলে, আমি আর নতুন করে কি বলব? বাজকোষে বাজত হলে নতুন ট্যাক্সো বজাতে হবে।”

“কিন্তু প্রজাতি-... বলতে গেলে জুহুবাঙ্ক।

“এরিতে তারা বাবা না বললে তখন ওঁতোর চোটে বলতে হবে, মহাবাঙ্ক। জুহুবাঙ্কের কাছে মাথা হেঁট করা কোনোঘডেই চলবে না।

জুহুবাঙ্ক ভেবে বললেন, “বর্ণাধ বলছে, মন্ত্রী।”

মহাবাঙ্কের উত্তর সমুদ্রতীরে উত্তর-তীর্থ হোটেল এসেছেন জুহুবাঙ্কের যুগ্ম-রাজপুত্র। শগো হুগো-ছাত্র-জন সাধোপাশ। তার ভেতর আছে মন্ত্রী; তিনি এসেছেন দেখান করে হোক বিখ্যাতক কচ্ছ করে জুহুবাঙ্কের মান রাখতে। মহাবাঙ্কের আনন্দে কান্নাও, হাটে বাটে হাটে নবাই জেনেছে জুহুবাঙ্কসুয়ার হোটেল-ভাড়া দিচ্ছেন জুহুবাঙ্কসুয়ারের চাইতে বৈদিক পাঁচশো বর্দুহা বেশী, আর জুহুবাঙ্কসুয়ারের সাধোপাশের সাখা থেকে জুহুবাঙ্ক-সুয়ারের সাধোপাশদের সাখা বাধ দিলে হয় একশো। এ খবরের হাওরা পৌঁছেছে বর্ণি-তীর্থে, সাড়া জেগেছে জুহুবাঙ্কসুয়ারের সাধোপাশ-বহলে। জুহুবাঙ্কের মহা-অঘাত্য (যুবরাজের সঙ্গে এসেছেন তিনি, আমার কাহিনীর শ্রোতা) হস্ততা আগেই আশঙ্ক করে নিয়েছেন। বলেছেন, “আজ্ঞা।” অর্থাৎ দেখান করে হোক এর পাড়া অঘাঘ দিতে হবে জুহুবাঙ্কের দলকে।

মহাবাঙ্কের ইতিহাসে এমন ঐতিহাসিক পরিস্থিতি আর কখনো উপস্থিত হয়নি। যৌগত্ব নবাই পরম উত্তেজনার সঙ্গে অস্তিত্ব করছে বিখ্যাত বর্ণ এই মহাবাঙ্কের সম্মুখে এক অসাধারণ তাহাশা দেখবার আর দেখাবার ক্ষেত্রে কোমর বেঁধে লেগেছেন। ছিনিমির সেবা সেবা ধনযুগের এবং কাহ্নানের বল শেখনিশাস ত্যাগ করতে আসেন এই মহাবাঙ্কে, কিন্তু অস্তিত্ব অস্তিত্বের এমন এলাহি সড়াই এই প্রথম। সারা মহাবাঙ্ক জুড়ে কোঁতুল আর উত্তেজনার সাড়া লাগল।

বর্ণি-তীর্থে জুহুবাঙ্কসুয়ার মরো-মরো, আর উত্তর-তীর্থে মরো-মরো জুহুবাঙ্কসুয়ার। যে-কোনো মুহূর্ত যে-কোনো রাজসুয়ারের শেখমুহূর্ত হতে পারে। মুহূর্তের জীবন-প্রাণের তেল ক্রতবেগে ফুরিয়ে আসছে। নতুন তেল দেবার ক্ষমতা রাজবৈভব আর নেই।

পরলোক-ভারতীর দ্রব্যবৎ-বস্ত্র শগো আচ্ছান-ধনি লাগল। প্রথম পরিচালক ব্রহ্মাধর্মীর প্রবীণ কানে লাগিয়ে বললেন, “অহো। পরলোক-ভারতীর প্রধান পরিচালক বলছি। আপনি? “বর্ণি-তীর্থ থেকে জুহুবাঙ্কসুয়ারের সূচ্য তথ্যবাহ্যক বলছেন???? বিনীত হওৎৎ এবং ককন। কি আজ্ঞা হয়? জুহুবাঙ্কের অস্তিত্ব আসর? মহামুদ্রা অতুলনীর শবাধার চান? কি আতর্ষ বোগাবোগ দেখুন, সম্পূর্ণ লোকচাটের তৈরী একটি অপরূপ শবাধার সংগ্রহ করছি, তার ওপর আগাগোড়া বহু বিভিন্ন নকশা

খোদাই করে দিয়েছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কাঠ-ডাঙর দক্ষসেবর শর্মা। খোদাই শেষ করেই তিনি বিগত হয়েছেন, হুতরাং এত শব্দাধারের ছুড়ি আর কখনো মিলবে না। এ অশ্রুশা।”

দক্ষিণ-তীর্থে থেকে দ্ব্যভাবন-পথে কী বাণী এলো তা ডালো করে বুঝবার আগেই সহসা—বোধ করি কোনো-প্রথম বাহিরিক সোললোগের ফলেই—যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পরলোক-ভারতীর প্রধান পরিচালক বারকসেবর বধারীতি “অহো! অহো!” করলেন। সাড়া পেলেন না।

কিছুক্ষণ বাধে দ্ব্যভাবন-পথে বাণী এল উত্তর-তীর্থে থেকে। বাণী দিলেন কথুরাকোয় মন্ত্রী। অদ্বিতীয় শিরীর ডাক্তর-সম্বরিত চন্দনকারের শব্দাধারটির কথা শুনে তিনি হুসুম করলেন, “ওটি আমার নিশ্চয়ই চাই।...না না, কিছু-টিষ্ট নহ। বত কর্ণমুদ্রা চার পরলোক-ভারতী, বেবো। ঐ একমেবাবিতীয়ম শব্দাধারটি কথুরব্রাজের জন্তে চাই-ই। ওটিকে ভালো মতন সাজিয়ে-ওজিরে পরিচার করে মজুর বাধুন।”

“কিছু ওটার বে আরেকজন বন্ধের—”

“আরো হ-হাকার বাক, হু-হাখ বাক, হুহু-পরোয়া নেই। বে ওর জন্তে বত ধাম দিতে চাইবে আমরা তার চাইতে একশো কর্ণমুদ্রা বেশী দেব।”

বো-টানার পাড়ে গেল পরলোক-ভারতী। জরুরী গোপন-সভা বলল পরলোক-ভারতীর পরিচালক-মণ্ডলীর। সভার মীমাংসা অহুসারে পরলোক-ভারতীর পরিচালক একই সঙ্গে দক্ষিণ-তীর্থে এবং উত্তর-তীর্থে পরম বিনীত বাণী প্রেরণ করলেন: “কথুরাক। এবং কথুরাক—উভয় রাজ্যই মহাশীশের সমান শ্রিয় বহুভাষ্ট। হুজনের কাহারকেও ক্ষর, বর্ষ বা অপবন কথা মহাশীশের আদি ও একমাত্র এধেন প্রতিষ্ঠান পরলোক-ভারতীর পক্ষে সম্ভব বা বাঞ্ছনীয় নহে। অথচ একটিমাত্র শাবাধার হুই হুব্রাজকে ধেওয়াও অসম্ভব। হুতরাং হুই হুব্রাজের মধ্যে যিনি আগে পটল ছুসিনেব, শব্দাধারটির প্রাপক তিনিই হইবেন।”

এ মীমাংসা পরম সুজিগুণ। হু-পক্ষই যেনে নিলেন।

কাহিনীর বাকী অংশই হু বেধন ঙ্রত তেযনি কতল, লিপতে কলম অগ্রসর হতে চায় না, হু-চোখ অক্লান্তে ডরে ওঠে।

কথুরাকোয় মন্ত্রী ‘উত্তর-তীর্থে’ হোটেলের একটি নিভৃত কক্ষে হুব্রাজের বৈঠক উপগ্রকে বললেন, “বৈঠকবর,

আশ্বিনাবের চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে হুব্রাজের আর কতকাল ধাঁচবার সম্ভাবনা আছে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে?”

উপগ্রক লবা এককালি কাগজ ব্যর করে সেধিরে বললেন, “মহিবর! হুব্রাজের শোণিতবিন্দু, পুরীষ, নিরীধন, ভ্রংবন ইত্যাদি পরীক্ষার ফলে নির্ধারিত হয়েছে, হুব্রাজ এহুশীমিপ্রিত মহাশীলমক রোগের চরম অবস্থায় উপনীত। বৃদ্ধা অবধারিত। কিন্তু এ-রোগের একটা নির্দিষ্ট গতি আছে, সে অহুসারে নিশ্চিত বলা যায় আসল পুণিমা-রজনীর আগে হুব্রাজের তেযনিম্মল পতন অসম্ভব। এবং পুণিমা-রজনীর অবদানের সঙ্গে সঙ্গে হুব্রাজের জীবন-লীল-নির্ধাষণ কেউ রোধ করতে পারবে না।”

মন্ত্রী বললেন, “পুণিমার এখনো ছুসিন বাকী। ওমিবে দক্ষিণ-তীর্থে কথুরব্রাজ হয়েছে। আজকের দিনটাও টিকবে না। তার আগেই আমাদের হুব্রাজ পটল না হুসলে অহুসলীর শব্দাধারটি কসকে যাবে। তাই যদি ছুসিন যাবে যে মরবেই, সে এটি মুহুর্তে মরবে কি কতি বধন তার আশু মৃত্যুতে কথুরাকোয় এতবড় গৌরব! আপনি আপনার সুচিকিৎসক-পথে আশ্বিনাব সেই অমোর অস্ত্রিম দাওরাইটি অদিলবে গোপনে হুব্রাজের বেহে গ্রবি করে সিন, বাড—”

বৈঠক উপগ্রক সিহরিত হলেন। কিন্তু মন্ত্রীর কর্তব্য আবেশ অবাক করতে পারলেন না। সাহসও ছিল না উপগ্রহও ছিল না। তা ছাড়া ডেবে সেবলেন সেই বধন ছুসিন যাবে মরবেনই হুব্রাজ, তখন কথুরাককে জখ



ক'রে আগে মরাই ভালো। তখন যোগানে তিনি স্থিতিক-
ভরণ-বস্ত্রে যা করবার তা করলেন, এবং ফলে যা হবার
তা হলো। সেইদিন কিংহরেই বেতারবস্ত্রে বিশ্বমর যোগিত
হল কবুরাজ্যের সুবরাজ সনসা জুৎবস্ত্রের কিংবা বন্ধ হইবে
অনন্তধানে বাত্মা করেছেন।

যেটা সুবধ্যাধের সঙ্গে বিরাট পোতাধারা করে চকম-
কাঠের সেই অল্পলম্বী শব্দাধারটি হক্ষিণ-তীর্থে পাশ দিয়ে
দুরিতে উত্তর-তীর্থে আনা হল। সেই শব্দাধারে শবন করে
কবুরাজ্যের সুবরাজ্য যাবেন মহাশীপের মহাসমাদি-ক্ষেত্রে।
হক্ষিণ-তীর্থে সে সংযাধ শ্রবণ করে পরাজয়ের প্রানিতে
জুৎবুৎবরাজ্যও সঙ্গে সঙ্গে জুৎবললন বন্ধ করে মারা গেলেন।
কিন্তু হায়! মিনিট পনেরো আগে মারা গেলেও পরাজয়ের
এ প্রানি তাঁকে শইতে হত না।---

ঠিক সেইক্ষেণে সুব-বার্তা এলো কবুরাজ্যের রাজপ্রাসাদ
বেশে। রাজ্যের প্রধান ডিহগাচারের বার্তা। তিনি
জানিয়েছেন, "সুবরাজ্যের যোগ-নির্ণয়ে একটি মহা ভুল হইয়া
গিয়াছে। সুবরাজ্যের ব্যাধিতে এহুটি বা হলীষকের
আভাসমাত্র নাই। অচিরে মৃত্যুযুগ কোনো সম্ভাবনা নাই।
সুবরাজ্য দীর্ঘায়ু হইয়া আরও বহুদিন কবুরাজ্যাবাসিনের
আনন্দ বিধান করিবেন। অস্তান্ত সমস্ত ঐশ্বর্য বন্ধ করিয়া
সুবরাজ্যকে অজ্ঞানুহ অল্পমাত্রাধ সেবন করাইতে থাকে।
তাঁহা হইলেই সম্রাটকাল যথো তিনি স্নহ হইয়া উঠিবেন।"

যত্নী ফেরত ডাকেই সুব-বার্তা পাঠালেন। জানালেন,
অজ্ঞানুহ সুবরাজ্যকে সেবন করানো আর সম্ভব নয়।
কবুরাজ্যকে বিজয়গৌরব দিয়ে সুবরাজ্য অনন্তধামে যওনা
হবে গেছেন।



পরিপাটি মুদ্রণ

কাল

নিখুঁত ব্লক-তৈরির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

। কালার ষ্টুডিও ।

৪২, মহেন্দ্র গোবামী লেন, কলিকাতা ৬

ফোন : ৫৫-৪৬০৭

ছুপি ছুপি আসে

শ্রেণীবদ্ধ নিবন্ধ

কাজের মাঝামাঝি। কিন্তু কয়েকদিন ধরে নাগাদে ডুপল কড্ডি হাথ একেবারে ঈতের কাপুনি বেন পরিয়ে দিচ্ছে হাওথায়।

কালো রঙের মিলিটারি গোড়ের ওয়াটারপ্রুফে আপাত-মস্তক দুড়ি দিয়ে একটি লোক দিগ্নি মাতি সেনের একটি বাড়ির সরঞ্জাম এসে কড়া নাড়িল। মাথায় গাল পর্ব্ব ঢাকা বগাভি টুপিতে মুখের অধিকাংশ আড়াল, তার ওপরে আবার চোখে কালো রঙের গগ্গল্‌স্‌। এই যেমনা সন্ধ্যার অন্ধকারে চোখে গগ্গল্‌স্‌ কেউ সাধ করে পরে, ভাবা শক্ত।

ভেতরে কলতলায় বাসন-কোলন নাড়ারই বেন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু কান্নার ঘরঝা খোলবার নাম নেই।

লোকটি আবার সম্বোধে কড়া নাড়িলে।

এবার ভেতর থেকে গলগলানি পোনা গেল। —“ভালো জালা হয়েছে আমার। সাহায্য করুন খুব ঘটন ঘটার কড়া নাড়ার আর কামাই নেই। রব্বা খেলো আর ঘরঝা বন্ধ করো।”

ওপর থেকে বরিসদী কোন মহিলার বিরক্ত গলাও পোনা গেল,—“ও হরির মা! বাইরে কে মড়া নাড়ছে শুনেতে পাচ্ছিল না? ঘরঝাটা কি আমি খুলে দেব!”

“দিক্‌ছি গো: দিক্‌ছি! আর তো কান্না-কান্না নেই,—ঘরঝা খুলতে বন্ধ করতেই তু আছি।”

হরির মা বিরক্ত মুখে এসে সরঝাটা খুলে একটু-বুজি চমকেই গেল। ঠিক এই চেহারা দেখবার আশা সে নিশ্চয় করেনি।

গলার কন্ঠার তাই একটু দুইই শোনাল,—“কাকে চাই গো?”

“মোফসা ঠাকরন আছেন?”—লোকটি ধরা গলায় প্রায় বেন ছুপিছুপিই জিজ্ঞাসা করলে।

“আছেন! ওই ওপরে উঠে বু দিল্লের ঘর।”—বলে হরির মা আর সম্ব নেই না করে তার কাছে গেল।

বাসন মাঝা উঠন ধরানো সব শেষ করে ঘরে বাবার জন্তে বধন সে তৈরী তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে বেশ রাত হয়েছে।

নিত্যকার নিয়মমত সে নিচে থেকে হাঁক দিলে,—“আমি চন্‌হ গো সিদি-ঠাকরন। ঘরঝাটা বন্ধ করে দিও হাও।”



ওপর থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

এমন অনেকদিনই বাধ না, হুতরাং হরির মার তাকে ভাবনা করবার কিছু নেই। বাইরে বেরিয়ে ঘরঝাটা ডেজিয়ে দিয়ে সিউটিটে কুঠীতে মাথায় কাচেলটা ঢাকা দিয়ে সে চলে গেল।

সে সরঝা সাবানত বে আর বন্ধ হবে না তা সে জানবে কি করে?

খানসে অনেকা লোকটাকে হরত আর একটু ভালো করে লক্ষ্য করত।

খানার দারোগা সাহেব মি: চৌধুরী সেই কথাই জিজ্ঞাসা

করছিলেন তাঁর কামরায় বসে,—“লোকটাকে আশনারা ডালো করে লক্ষ্যও করেন নি ?”

হারোয়া সাংস্বেব চেয়ারের শাপে সার্কেট গুপ্ত সমগ্রদে ধাক্কিয়ে। সামনের দ্বিটি চেয়ারে যে ছুজন বসে—তাঁদের চেয়ার। গোপালকে সাধারণ কেরানী বলে মনে হয় না। আশাততঃ হাতে ধরে বাধা সেলার টুপি ও শাট হাকপ্যাট ছুতো থেকে বোকা ধার চেয়ারে বসে আশ তাঁদের অন্নই করতে হয়।

“আজ লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলেও ত পারতাম না।”—মাঝার টাকে ও কাঁচা পাকা নৌকে আর প্রবীণতা পরিচুতি তিনিই বলেন,—“বুটী পড়ছে স্থপস্থ করবে, সম্ভব হয়ে এসেছে, তার ওপর প্রায় সর্বস্বই তার ওয়াটারপ্রফ আর স্বাতি টিপতে ঢাক।” চেয়ারের গপ্পুটাই বা একটু অনুত লেগেছিল—না রাশেণ ?

রাশেশের বদল অন্ন, রোগা পাকানো চেয়ার। তারও পরনে থাকি হাকপ্যাট ও শাট, কিন্তু এমন কলকলে যে মনে হয় যেন কাকুর কাছ থেকে ধার করে আনা। ধানার এসে একটু যে খাচ্ছে গেছে তা তার ঘন ঘন ঢোক সেলা থেকেই বোকা ধার।

প্রায়টার চট করে অথবা সে গিতে পারে না। “আজ্ঞে হ্যাঁ!” নম্রতা ধার করতেই তার চোক সেলার সম্মে কঠোর টেলে-প্তা ভেলাটা দ্বিভিন্ন বার ওঠা-নানা করে।

মি: চৌধুরী ইতিহাসই বুঝে নিয়েছেন যে এঁদের নিজস্বের ওপর ছেড়ে দিলে সমস্ত কাহিনী টেনে বার করতে কটা কাহার হয়ে বাবে। সাক্ষাৎসারটা তাই তিনি সক্ষিপ্ত করবার ব্যবস্থা করেন। ঘটনাটার যেটুকু জানা গেছে হুঁশধার ভাব বিবরণ দিয়ে আসল প্রায়ে গিয়ে ওঠেন।

“আচ্ছা ব্যাপারটা তাহলে এই। আশনারা বিনয় সরকার স্ট্রীট আর গিগি বাড়ি সেনের ঘোড়ে ইলেকট্রিক লাইনটা বেরানত করছিলেন। সিগারেট ধরতে গিয়ে বেধেন যে বেশলাই-এর কাটি সেই...”

মি: চৌধুরীর বিবরণ সাক্ষেপ করা আর হয়ে উঠল না।

প্রবীণ ভুললোক বাধা দিয়ে বললেন,—“রাশেশের কাছে বেশলাই চেয়ে নিয়ে দেখি তারও একটি কাটি মাত্র সম্বল। বুটীতে এমন শ্রান্তদীপ্ত হয়ে গিয়েছে যে ধরানই সেল না। ঠিক তখন ওয়াটারপ্রফ-ঢাকা এক ভুললোক গিগি বাড়ি সেন থেকে বেড়িয়ে আসছেন। পায়ে বখন ওরকম দামী ওয়াটারপ্রফ তখন তাঁর পকেট একটা বেশলাই থাকবে না হতে পারে! আশাবের পাণ দিয়েই ভুললোক শিল দিতে দিতে থাকছেন, আমি তখন...”

মি: চৌধুরী এহার বেশ গুচতার সঙ্গেই বাধা দিয়ে বললেন,—“খামুর খামুর! ঘটনাটা সম্বই আশাবের জানা আছে। আশনি বেশলাই চাইতে তিনি বেশলাই বার করে দিলেন। আশনি সিগারেট ধরিয়ে তাঁকে কেরত দিতে গিয়ে বেধেন, বেশলাই না নিয়েই তিনি চলে গেছেন। বুটী আর সজ্জার অঙ্ককারের দরুন আশনারা তাঁর পায়ে ওয়াটারপ্রফ, মাথা-ঢাকা টুপি আর চেয়ারের গপ্পুট ছাড়া কিছু লক্ষ্য করেন নি...”

“লক্ষ্য করবার কথা যে মনেই হয়নি চাই!”—টাক-মাধা ভুললোককে আর বুঝি ধামান খাবে না।—“বেশলাই শেষেই তখন হতে গেছি। সিগারেট ধরতে গিয়ে নম্র ত আর তাঁর দিকে নেই। তিনি যে বেশলাইটা ফেলেই চলে যাবেন জানতেই পারিনি। তখন এই রাশেণটাও দ্বিটি একবার বলে...”

মি: চৌধুরী একটু হেসে বলেন,—“রাশেণই বা জানবে কি করে বসুর যে লোকটির চেয়ারটা লক্ষ্য করা সম্ভব। শুধুন—চেহারা আশনারা লক্ষ্য করেন নি বদন, তখন তার আর চারা নেই। কিন্তু লোকটি কি শিল দিতে দিতে হাঞ্চিল কিছু মনে আছে? কোন স্বর-টুকি...?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠাকান ঠাকান!”—টাক-মাধা চুলকে ভুললোক বলেন,—“খুব একটা চেনা স্বর! কি বলে একটা দিলের গানই হবে বেন।” কি যে রাশেণ, মনে পড়ছে?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ!”—রাশেণ বেন অত্যন্ত লক্ষিত ভাবে শীকার করে।

মি: চৌধুরী ও সার্কেট গুপ্ত উগ্রীব হয়ে ওঠেন। টাক-মাধা ভুললোক আবার কি বেন বলতে থাকিলেন। তাঁকে প্রায় ধমক দিয়ে বাধিয়ে মি: চৌধুরী রাশেপকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন,—“কি স্বর আশনার মনে আছে?”

রাশেণ বেশ কয়েকবার চোক গিলে হঠাৎ ওকনি:খালে বলে ফেলেন,—“আজ্ঞে হ্যাঁ, সে স্বর সবার জানে।”

“সবার জানে মানে!”—মি: চৌধুরী অবাক।

“আজ্ঞে, ‘মনের মাধুর’ ভবির পানের স্বর কি-না! ও গান কে না শুনেছে!”—রাশেণ এককণে একটু সহজভাবেই কথা বলে।

মি: চৌধুরী নিকের অজতার লক্ষিত হ’ল মনে হয়। গান শোনা দূরে থাক, ‘মনের মাধুর’ ভবিতার নামটাও তাঁর জানা নেই। সার্কেট গুপ্তর দিকে চেয়ে কিন্তু তাঁর কেমন সম্বন্ধ হয়, এ ছবি তার অব্যব না। গভীর হয়েই জিজ্ঞাসা করেন—“কি যে গুপ্ত, ‘মনের মাধুর’ না ‘বনের মাধুর’ গোছের কোন ছবি দেখেছ নাকি?”

সার্কট গুপ্ত খোদস্বয় বিরাগের ভান করে বল—“হ্যাঁ ভ্রাতা, একটা চুপি খেন দেখেছিলাম ঘনে হচ্ছে। কিন্তু তাতে ত আগাগোড়াই গান।”

মি: চৌধুরী আবার রাধেশের দিকে ফেরেন,—“কোন গান কিছু বলতে পারেন?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই হিরোইনের সুখের ব্যর্থ পানটী।”—রাধেশের সাহস অনেকখানি বেড়েছে বোকা বাবু,—“ওই যে পানটীর ফাল্ট লাইন হ’ল, ‘সে যে চুপি চুপি খালে’।”

“সে যে চুপি চুপি খালে!”—মি: চৌধুরী ক’ সেকেণ্ড কি বেন ভেবে নিয়ে বলেন,—“আজ্ঞা আপনাদের অনেক ধন্যবাদ! থবরের কাগজে গিরি মাঝি সেনের বখর পড়ে আপনারা নিয়ে থেকে এই ব্যাপারটুকু যে জানাতে এসেছেন তার ক্ষণে সত্যিই আমরা কৃতজ্ঞ।”

টাক-মাথা ভরলোক একজন রাধেশের একটু পেছনে পড়ে গেছেন, এবার সুযোগ পেয়ে তিনি নিঃশব্দে আবার একটু জাতির করেন,—“আজ্ঞে রাধেশ ত ভয়ে আগতেই চার না। আমি মোর করে নিয়ে এলাম। যেমন যেমন ব্যাপার ত বর, থাকে বসল বুন। তাই আমি...”

মি: চৌধুরী ব্যর্থ হয়ে উঠে বলেন,—“তাই আপনি ঠিক উচিত কাহ্ন করেছেন। আজ্ঞা নমস্কার!”

টাক-মাথাকে নমস্কার করে এবার উঠে পাড়তে হয়। কিন্তু শেখ বাহাদুরীটা তিনি না নিয়ে ছাড়েন না।

পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটা জিনিস বার করে টেকিলের ওপর রেখে বলেন,—“এটিও আপনারদের কাছে লাগতে পারে বলে নিয়ে এসেছি।”

মি: চৌধুরী সবিম্বদে বলেন,—“কি ওটা?”

“আজ্ঞে সেই সেনলাইয়ের বাজটা! অপরাধ নেবেন না, না খেনে ওর কটা কাঠি খরচ করে কেনেছি।”

মি: চৌধুরী হাসি চেপে বলেন,—“না, না, তাতে কি হচ্ছে। কিন্তু কাগজে মোড়া কেন?”

“আজ্ঞে, আপনারদের ওই যে কি বলে ফিক্স-ব্রিট-ট্রিউ যদি কিছু থাকে। তাই ওই কাগজটাতেই নুড়ে নিয়ে এলাম। কাগজটাও সে লোকটার পকেট থেকে পড়েছিল কিনা।”

“কোন কাগজটা!”—মি: চৌধুরী সত্যিই একটু স্তম্ভ হয়ে পড়েছিলেন। এক মুহূর্তে তিনি টান হয়ে বসলেন।

“আজ্ঞে ওই যে-কাগজটা নুড়ে এনেছি। সেনলাই বার করতে গিয়ে সে লোকটার পকেট থেকে পড়ে গার। আমি সেখিনি। রাধেশ সিনেমার বিশাশন-জিহাশন জেবে হুড়িয়ে নিয়েছিল।”

মি: চৌধুরী ততক্ষণ কাগজের মোড়কটা খুলে ফেলছেন। খুলে উকে হস্তাশই হতে হয় বোধহয়। ডেকের একটা টোকা মার্কী সেনলাইয়ের বাস্তব, আর কাগজটা সত্যিই একটা সাধারণ ছাওবিল।

ভবু রাধেশকেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—“কাগজটা সেই লোকটার পকেট থেকে পড়েছিল ঠিক দেখেছিলেন?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, সেনলাই বার করতে গিয়ে কাগজটা পড়ে গেল। পছন্দা তখন দিগারেট ধরাজেন আর আমি রূপান্তি-জলো ব্যাগে ভরছি। লোকটা অমন হঠাৎ চলে দাখার পর...”

টাক-মাথা পছন্দা মুখ-গায়েনের পন আর রাধেশকে ছেড়ে দিতে রাষ্ট্রী নন। তিনিই আবার শুরু করলেন,—“আমি বললাম,—আরে সেনলাইটা না নিয়েই চলে গেল যে। রাধেশ তখন কাগজটা হুড়িয়ে নিয়ে বেগছে। বললাম,—‘কেউ’। পকেটটা ত ভিয়ে গেছে। শুকনো কাগজটার নুড়ে রাখি। ভাগ্যিস বেখেছিলাম।”

পছন্দার আগেকার সঙ্গে এখনকার বিবরণের তুলনাটুকু মি: চৌধুরী আর ধরিয়ে দেন না, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন,—“আজ্ঞে হ্যাঁ, বুদ্ধি করে যে বেখেছিলেন, তার ক্ষণে ক্ষণেই ধন্যবাদ। আজ্ঞা নমস্কার।”

নমস্কার করে পছন্দা ও গুঁর সাক্ষরেন বিহার নেবার পর চেয়ারে একটু স্তম্ভ ভাবে হেলান দিয়ে মি: চৌধুরী বলেন,—“হাই হোক একটা জিনিস কিছু জানা গেল। শিস-এর হরটা। গিরি মাঝি সেনের সেই বাড়ির কি হরির না-ও শিস শোনার কথা বলেছে। গোলাকটা যে ভাবে মিলে যাচ্ছে দুজন্যর বর্ণনার, তাতে একই লোককে যে একা দেখেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমি শুধু আশ্চর্য হচ্ছি এই শিস নিয়ে গানের হর ভাঁজার। সবমাত্র ওই বরফ একটা ঐশাণিক খুন করে এনে শিস দিয়ে কেউ গানের হর ভাঁজতে পারে? তাও একটা সজা ফিল্মের গানের হর?”

“ভেবে দেখুন ভ্রাতা, সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন আশ্চর্য।”—সার্কট গুপ্ত মাথা চুলকে বলে,—“মোক্ষনা ঠাকরুন বলে থাকে গলায় ওয়াটারপ্রুফের বেশটির ঠাল দিয়ে হত্যা করা হয়েছে তাঁর সমস্ত বখরই নেওয়া হয়েছে। কোনও শব্দ কোথাও তাঁর ছিল বলে কেউ অজ্ঞত: জানে না। ডহনহিলার সেকালের শিক্ষিত পরিবারের নয়। বস্ত্রের জানা পিছেই তাঁর বাসী এককালে একটি অন্যোক্ত্রয় চালাতেন। বাসীর যত্নের পর সে কাহ্ন বহগিন ছেড়ে দিয়ে এই বাড়িটি নিজ নিয়ে দিবার বেলা একটা সেলাই-টোলাই-এর ফুল চালান। আশী বা বেখে সেছেন তার সঙ্গে এই আয়ে তাঁর একরকম

মল যায়। নেহাত উদ্বাহ না হলে কেউ এ ভাবে তাঁকে মাঝতে পারে—এটা কখনো কথা ধরা না।”

মি: চৌধুরী ধানিক চূপ করে কি ঘেন ভাবছেন যেন হ'ল। তারপর তিনি মাথা নেড়ে বলেন—“না, উদ্বাহ হলেও সাধারণ উদ্বাহ নয়। সমস্ত ব্যাপারটা বেশ ভেবেচিন্তে করা হয়েছে বলেই যেন হয়। মোকদ্দমা দেখি যে সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ ওপরে একবারে একা থাকেন, নিচে কি ছাড়া আর কেউ যে তখন বাজিত থাকে না, এ-সব যেন হয় খুনি আগে থাকতেই বরং নিশ্চয়। তার পোশাক ও চালচলন বেটুই মনে গেছে তার মধ্যেও কোন পাগলামী ধরা পড়েনি। তা ছাড়া বহু উদ্বাহ হলেও তার একটা হৃদয় এ দুদিনে নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। কোন উদ্বাহপ্রবণ থেকে ওরকম কেউ গালিয়েছে বলে এখনও ত জানা যায়নি।”

“আমি সে রকম উদ্বাহের কথা বলছি না ত্রার! সাধারণ স্বাভাবিক চেহারায মাগনের চেতনই স্বপ্ননা। কখনো ওরকম উদ্বাহের দৃশ্য ত প্রকাশ পায়।”—সার্কট গুপ্ত একটু সম্বৃত্তি ভাবে নিজের মতটা জানায়,—“অকারণে থাকে-তাকে খুন করা এখন নেবার মত হয়ে পড়ায়।”

মি: চৌধুরী একটু হেসে বলেন,—“ও রকম খুন বারানো গল্পই বেধা যায়। তা ছাড়া আগেই বা বললাম,—খুনি-মারের একরকম পাপল হলেও, there is method in his madness—বেশ প্রাণ কথা ব্যাখ্যা। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার কোন খেই যে পাওয়া যাচ্ছে না!”

হঠাৎ কি জেবে তিনি যেন একটু চকল হয়ে ওঠেন,—“ধাঁড়াও ধাঁড়াও। বেগলাই মোকদ্দমার কাগজটা হাতে নিয়ে তিনি আবার বলেন—“এই কাগজটা লোকটার পকেট থেকে পড়ে পেলে বললে না?”

“হ্যা ত্রার! কিন্তু ওটা একটা সাধারণ ছাওকিল!”

“হ্যা সাধারণ ছাওকিলই বুঝলাম, কিন্তু এটা সে বর করে পকেটে রেখেছিল কেন?”

“বর করে যে রেখেছে তাই বা কি করে বুঝি!”—সার্কট গুপ্ত সবিনয়ে হলেও প্রতিবাদ না করে পারে না,—“হাত আঘাত সবাই যেমন করি তেমনই ভাতায় কাবর হাতে গেবে অস্ত্রমত ভাবে পকেটে রেখে দিয়েছে।”

হুকিটা অগ্রাহ্য করবার নয়। তবু মি: চৌধুরী কাগজটা আর একবার ভালো করে পড়ে বলেন,—“বিজ্ঞাপনটা কিসের দেখেছ?”

“শান্ত হ্যা ত্রার, একটা হোটেলের ছাওকিল। কোথায় বাইরে কোন স্বাস্থ্যনিবাসের বিজ্ঞাপন।”

মি: চৌধুরী ভিত্তি ভাবে বলেন,—“সেই ছাওকি ওই লোকের পকেট থেকে পাওয়া একটু অস্বস্তি লাগতে না?”

বিজ্ঞাপনটা তিনি ঘোরে ঘোরে পড়েন এবার,—“কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাস। মনোবহু পরিবেশ ব্যাকর নদীর তীরে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থানে বৈজ্ঞানিক আলো টেলিফোন ইত্যাদি সমস্ত মানসিক সুখবোধ সমস্ত সামুদ্রিক হোটেল। মনোবিকের সুবর্ণ-সুযোগ। স্বাস্থ্যোচ্চাের সঙ্গ বালাহেলের বাহিরে বাইবার প্রয়োজন নাই। নিম্নব গাড়িতে স্টেশন হইতে হোটেলের আলো-বাওয়ার ব্যবস্থা।”

বিজ্ঞাপনটা পড়ে মি: চৌধুরী সার্কট গুপ্তর দিকে লগ্নর দৃষ্টিতে তাকান।

“এ ছাওকিলের কোন তাৎপর্য নেই বলছ?”

“কিন্তু হুত থাকতে পারে?”—সার্কট গুপ্তকেও একটু ভেবে বলতে হয়,—“হুত কেনো? দিন এই লোকটি দেখানে ছিল, কিংবা হুত এ খুনের পর গ: ঢাকা দেবার ছাওকি এই বিজ্ঞাপন বেধে মাগলটার কথা জেবেছে। কিন্তু দেখানেই যে সে বাবে বা কখনো সিংহিল তার ঠিক কি? এ বিজ্ঞাপন থেকে কোন সুবিধে আমাদের হচ্ছে কি এখন?”

“না, তা হচ্ছে না।”—বলে কাগজটা আবার টেলিফনের ওপর রাখতে গিয়ে হঠাৎ চৌধুরী চমক ওঠেন। বিজ্ঞাপনের উন্টোবিকের সারা শিটটা চোখের কাছে এনে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ধানিকটা বেধে হঠাৎ ব্যস্তভাবে বলেন,—“ঈগুসির বরাকর পুঞ্জি স্টেশনকে ফোনে ধরো। আর বেধো তিনি ইংল্যান্ড সাহেবকেই কোথাও পাও কিনা!”

সার্কট গুপ্ত হঠাৎ এই অবশেষে একটু হতভম্ব হয়ে বলে,—“কেন, কি হ'ল ত্রার?”

চৌধুরী অগেধের সঙ্গে বলেন,—“আগে তুমি কোনটা লাগাও ত, পরে বলছি।”

বিজ্ঞাপনে অতিসংযুক্তি বোধের ধানিকটা মার্জনীয়। বিজ্ঞাপনের বিশেষণের সঙ্গে আসল জিনিসের পরিচয় অনেক সময়ই বেলে না এটা আঘাত ধরই নিই। কিন্তু কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাসের বেধা এই সাধারণ নিয়মের গতিই একটু ব্যতিক্রম বোধের বোধ্যায়। বিজ্ঞাপন যে-ই গিলে বাহুক, স্বাস্থ্যনিবাসটির পরিচয় হিতে বাড়াবাড়ি অত্যন্ত: কোথাও করেনি।

বরাকর নদীর ধারেই গতিই অত্যন্ত মনোবহু পরিবেশে এখন ই:রেখা আমলের ধামওয়ালা বেশ বড় একটি বাড়ি। ডেউ-বেলানো বাগানটির বেশ। হুত ছোট-পাট পাখাও

সেবা যায়। ভাড়াটিয়াটির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ তার নির্ভরতা।
ধার-কাছে সাত-আট মাইলের মধ্যে একটা-দুটো। চান্দীদের
কুঁড়ে ছাড়া কোনো বসতি নেই।

স্বাস্থ্যনিবাসটির মনোরম পরিবেশ আপাততঃ অব্যক্ত
আবিষ্কার করা। এছাড়া শুল্ক হাফে গাড়িচ্ছে। পাঁচ দিন ধরে
নাগাড়ে বড়-বুড়ি চলছে। ঘাটখাট জলে অলমস।
অবিভ্রান্ত ভূমিতে চারিদিক এমন ঝাণসা যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য
তার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত। একটিমাত্র যে পাকা রাস্তা
হুজুর বরাকর শহর থেকে স্বাস্থ্যনিবাসটির সংযোগ রক্ষা করে,
তা ইতিমধ্যেই নানা ভাড়াপায় বণায় বলের স্রোতে গ্রাথ
অঙ্গল হয়ে গাড়িচ্ছে। বরাকর নদীর অলম তার ওপর
যে বকম বেড়ে কুল ছাণাবার উপক্রম হচ্ছে, তাতে বস্তা
হলেই নরনাশ।

বরাকর থেকে ভাড়া-করা মোটরে স্বাস্থ্যনিবাসে আগতে-
আগতে কণিকা সেই কথাই ভাবছিল। রাস্তার এর মধ্যেই
দু ভাড়াপায় আটকে যেতে হয়েছে। মোটর অলম নদীর
স্রোতের দত্ত রাস্তার ওপর দিয়ে বইছে। মোটরের ভেতর
পর্বত অলম উঠে ইজিন পেছা বন্ধ হয়ে। কোনো রকমে টেনে-
কুল মোটরটাকে সেই অলমের স্রোত পার করে নিয়ে দিয়ে
আবার চালাতে বেম বেগ পেতে হচ্ছে ড্রাইভারকে। নেহাত
যেহেতু বসেই সবচেয়ে সে নিজে বিকিৎ বোধহয় প্রকাশ
করেনি। কিন্তু স্নায়ুসংকটের সঙ্গে ভূমিতে ভিজে লগলগে
হয়ে এক-কোণের অলম মোটর টেনেবার সময় বসে বসে
ভাড়াপাকে অভিসম্পাত দিয়েছে নিভর, এমন দিনে এই বকম
ভাড়া ভূমিতে বেওয়ার অস্ত্র।

হোটেলের এতক্ষণ কি হচ্ছে তাই বাকি জানে! ভোর-
বেলাতেই স্বামী স্টেশন-ওয়াগন নিয়ে কুলটি চলে গেছেন
স্টেশন থেকে গোটাকতক পার্শ্বাল খালাস করে আনবার
জন্তে। কলটার ট্রেনে একজন বোর্ডারের আগবার কথা।
ভাঁকেও সেই সন্ধ নিয়ে আগবে।

বেলা দুটা পর্বত স্বামীর জন্তে অপেক্ষা করে কণিকা।
নিজেই কোন করে বরাকর থেকে ভাড়াটে গাড়ি আনিবে
বরাকর গিয়েছিল কয়েকটা অভ্যস্ত বরাকরী জিনিষ কেনার
সঙ্গে বাজারটাও সেয়ে আসবার জন্তে। তখন ভূমিটা বেন
একটু ধরবার আশা দেখা দিয়েছিল। বাইরের পথঘাটের
চেহারা যে কি হচ্ছে তাও গ্রিক আশ্রয় করতে পারে নি।

বেলাপার পর থেকে বড় ও বুড়ি দুই-ই প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে।
বরাকরকে কি কষ্টে যে বাজার সেয়েছে সেই জানে! দুই
নির্ভর স্বাস্থ্যনিবাস খোলায় স্থিতি যেমন, হাফ ও তেমন



বাকশ। এখন হোটেলের প্রত্যেকটি জিনিষ বয়ে এনে মজুত
না রাখলে নয়। বস্তা শুধুরের সময় তেমন কোনো কামেলা
নেই। কোন করে দিনেও দু-একটা বড় লোকান সব
জিনিষপত্র গাড়িতে গাড়িয়ে দিয়ে উপরি ভাড়া শুধু ধরে নেই।
কিন্তু এই দুর্ঘটনায় সে বাবির নিজে কেউ রাষ্ট্রী নয়।
কণিকাকে তাই নিজেই আগতে হয়েছে।

নিজেই আর কোন কাছটা না তাকে বেপারত হয়।
স্বামী অলম কি অনিচ্ছুক নয়, কিন্তু তেমন একটু অগোছালো
অগ্রসরত। কাজের তার দিয়ে নিশ্চিত থাক। যায় না। এই
আজকেই স্টেশন-ওয়াগন নিয়ে বেরিয়ে কি গেল বাবিরজেন
কে জানে!

কিন্তু এই জুরোপ এইভাবে চললে তাদের ব্যবসার যে
দকা রক্ষা। পুরো পর এই সময়টাই এ-ধরনের স্বাস্থ্যনিবাসের
মরশুম। এখনো পর্বত মাত্র ভিন্নর্জন বোর্ডার এসেছেন।
আর অন-কয়েক স্বাস্থ্যকের মধ্যে আসবার কথা। ওঁরা
কেউ এসে পৌঁছোতে-পারবেন বলে শু ভরসা হয় না।

যে ভিন্নজন ইতিমধ্যে এসেছেন তাঁদের হুজুর ভ্রটি অব্যক্ত
হাতে না হয় তাঁর ব্যবস্থা সে প্রাণপণে করতে প্রস্তুত। এই

কড়-কুট্টি মাখা করে নীলে বস্ত্রেরে বস্ত্রের করতে আভাসে বেকত না। কিন্তু তাতেই কি গানের সজ্জা করা যাবে ? প্রথম নতুন স্বাধীনবাসে এসে তারা খুব ভালো পারণা নিয়ে এসেন বলে হন হন না।

অবশ্য বাইরের বিশ্বেষণের চেয়ে গার নিম্নেরা থেকে গেছেন তাঁদের নতুনদের হামই যে এ বাসার কৌতুহা কবিকা ভালো করেই যাবে।

এখানে স্বাধীনবাস করবার পরিকল্পনাটা। তাই। লাহিড়ী প্রথমে ত কথাতাকে মামলই দিতে চাই নি। “তুমি পাগল হয়েছ কবিকা ! স্বাধীনবাস মানে হোটেল করা কি চারটি-বাঁচি কথা ! বিশেষ করে বাংলার ভেতরে ওই কোণটি ভাষণের সৌক্য পছন্দ খরচ করে থাকতে যাবে কেন ? হাঁচি হাজারিবাগ পুরী না থাক, তারা অস্ত্র : মধুপুর হসিডি যাবে।”

“তেন স্বাধীনবাস করলে এখানেও যাবে। আর বাংলার ভেতরে বলই ত আরো হাওয়া উচিত।”—কবিকা মুক্তি চেহিবেছে,—“বাংলার ভেতরে ভালো স্বাধীনবাস কেউ কোথাও করেছে ! আছে ত বাবার মাছা ওই এক মীষা। সেখানেও আমাদের মত সুবিধে পাবে কোথায় ?...”

কবিকা যে সুবিধের কথা বলেছে সেটা একমু কামগার একটু দূর্গত সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের এক ভিনেই কলার পনির ইংরেজ ম্যানেজারের প্রাণে একটু কবিত্ব ছিল বোধহয়। এই নির্জন ভাষণের ছোটখাট একটি বিলিটী ধরনের বাড়ি তিনি কোম্পানির পল্লভাতেই বানিয়েছিলেন, কোম্পানির বাবা ম্যানেজার হবে তাদের থাকবার জগে। তখন কলার খনিতে হুলানুঠো গেলো হচ্ছে। দৌরীন ম্যানেজার বাড়িটিতে বিলিটী-বাঁচি টেলিফোনের ব্যবস্থাও ত করেই ছিলেন, তার ওপর বড় ভাষা থেকে বাড়িতে আসবার একটা নিম্নক মাছাও তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন। কিছুকাল আগে নানা অবস্থা-বিপর্গের সে কোম্পানি লার্টে উঠেছে। কোম্পানির পাতাটি গুটোবার তার বাসের হাতে ভাষা কোম্পানির অস্ত্র সপ্ততির সঙ্গে বাড়িটি বিক্রি চেষ্টা করেছে। কিন্তু হাকার হাল-চাল ও-মকলে তখন বলে গেছে। তবু কবিত্বের বাড়ির অতঃপর অতঃপর বাড়ি কেনবার প্রথম কার্য হয়নি। নতুন সুকসিসের বাধ্য হয়েই তারপর বাড়িটি ভাঙা সেবার জগে বিশ্বেষণ দিতে হয়েছে। সে বিশ্বেষণে তখন কোনো লাভ পাওয়া হয়নি। বাড়ি ভাঙার পরমাণুও তাই অদ্যব কমে এসেছে। এই সময় কবিকার স্বামী প্রবীর লাহিড়ীর-ই একদিন বিশ্বেষণটা চোখে পড়ে।

“হেথেক কবিকা, ছাটা পরের জগে মাঝরা হা-শিতোশ করে মরছি, আর বড় বড় শান্তানা পোষা-পর হল বৈঠকখানা রাগারগির নিয়ে গোট। একটা বাড়ি খালি পড়ে আছে।”

“কোথায়, কোথায় ?”—বলে কবিকা উল্লসিত হয়ে স্বামীর হাতের কাগজটার দিকে হাত বাড়িয়েছে।

একটু মজা করবার জগেই প্রবীর কথাটা বলেছিল। কবিকার কণ ব্যাহুলতা থেকে কিন্তু মায়া হয়েছে তার। ভাষাতাতি হেসে বলেছে,—“আরে না, ঠাট্টা করছিলাম। এ-বাড়ি হ’ল অনমানবহীন ভেপাঙ্করে। নীলে অত বড় বাড়ি মানে একশ টাকা ভাড়া হিসেবে দীর্ঘ দিতে চাই !”

কবিকার আগ্রহ কিন্তু তাতেও কমে নি। প্রবীরের হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিয়ে বিশ্বেষণটার ওপর চোখ ফুটিয়ে গে বানিকস্বন গম্বীরভাবে কি কেবলে, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছে,—“তুমি চিঠি লেখ এছনি। ও-বাড়ি আমবাই ইমারা দেবো।”

“মানে !”—কলকাতা পহরে বাসার খোঁজ হয়মান হয়ে স্ত্রীর মাথা খাণাপ হয়েছে বলেই প্রবীরের সম্বোধ হয়েছে।

“মানে ওই বাড়িতেই আমরা থাকব—আর, আর—” কবিকা একটু থিগ করে, তারপর অতিরিক্ত মোর দিয়েই বলেছে,—“ওখানে হোটেল—মানে একটা স্বাধীনবাস করব নতুন বরনের।”

তারপর যে তর্ক হয়েছে তার আভাস আগেই কিছুটা কেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কবিকা কিন্তু প্রবীরকে এ-পরিকল্পনার সার দিতে বাধ্য করেছে নানো দৃষ্টিতে।

হুটিগুলো তাদের তখনকার অবস্থার সঙ্গই অকাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রবীরের পক্ষে।

প্রথমতঃ, গ্রাম বেড় বছর আগে আকস্মিকভাবে বোঝাই পহরে বিয়ে হবার পর থেকে তারা দুজনে যেনে কিরে এভদিনেও একটা মনের মত বাসা সংগ্রহ করতে পারেনি। কোনো একটি হোটেলের ভাষা সেই কারণে একটা কামরা নিয়ে আছে। দ্বিতীয়তঃ, বিয়ের পর কবিকার কথাই মার্টে-নেভির চাকরি ছাড়া সুখি-এগে প্রবীর কোনো কাগ গোপাড করতে পারে নি। প্রবীরের অবস্থা এমনিতে অবত ভালো। বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে। যা ছেলেবেলা মায়া গেছেন। কিছুদিন আগে লগারগি মাছায়ে অস্ট্রেলিয়ার থাকার সময়ই পিতার হুজুর দাবির সে পেয়েছে। অত কিছু না বেখে যান প্রবীরের বাবা, ‘মোট। একটা ইনসিওরেন্সের টাকা ছেলের

নায়ে লিখে গিয়ে গেছেন। চাকরি না থাকলে স্ত্রীরাঃ তার আর্থিক দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই। এর ওপর অপ্রত্যাশিতভাবে ধনী এক মাতাঃহর উল্লে সম্রাতি কনিকার বেশ ভালোরকম একটা ম্যানেজার ব্যবস্থা হওয়ায় এমিক দিয়ে তুলেই নিশ্চিত। কিন্তু কাজ না করে হুপি করে বসে থাকা যে পুরুষের পক্ষে অসম্ভব এটা কনিকা কিছুদিন পরে ভালো করেই বুঝতে পারছে। বরাকরের দ্বারে গিয়ে একটা স্বাধ্যনিবাস-গোছের পড়ে তুললে তারের রথ-বেশা কলা-বেশা দুই-ই হ'লে অনেক সমস্যাই এক সঙ্গে মিটে যায়। নিজেদের চমৎকার ব্যবহার ভাঙা ত বোলেই, সেই সঙ্গে প্রবীণও করবার মত কাজ শেষ, আর এগুন-একা অত দূরে থাকা হাতে একদমের না হয় সেই জেজেই এমন কিছু সস্তার ব্যবস্থা হয়, বাকি নিজেদের পেশা পরত করে সব লিখে আগবে।

না, সবত সমস্যা আর চেয়ে ভালো সমাধান আর হতে পারে না। কনিকার আগ্রহে হাস-জুজেকের মধ্যে বাড়ি নীর নেওয়া থেকে স্বাধ্যনিবাসের অল্প সময় ব্যবস্থা হয়ে যায়, বিজ্ঞান দ্বাণ্ডবিল পর্যন্ত ছাড়া হয়ে গেছে।

তারপর কনিকাকে পরীক্ষা করবার জেজেই যেন বাধ্য-নিবাস ঠিক খোঁজার দিন থেকেই এই দুঃখ।

কল্যাণেশ্বরী স্বাধ্যনিবাসের একটি বিশেষ নিয়ম কনিকা এই করেছিল যে, সাধারণ হোটেলের মত আল এসে কাল সেবান থেকে চলে যাওয়া যাবে না। অন্ততঃ সাত দিনের কম কোনো বোর্ডারের সেবানে থাকবার নিয়ম নেই। যেটা বোর্ডারের সংখ্যাও পরিমিত। তিনটি সিগল-সীটেড ও তিনটি ভবল-সীটেড খার সবসুখ ন'বনের বেশী বোর্ডার কখনও নেওয়া হবে না—এই কনিকার ব্যবস্থা।

কনিকার পরিকল্পনা যে খুব আশ্চর্য নয়, বিজ্ঞান ও দ্বাণ্ডবিল দ্বাণ্ডার কিছুদিন বাসেই তা টের পাওয়া গেছে। তিনজন চিঠি লিখে এক মাসের অল্প ঘর রিবার্ড করেছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনে আবার অগ্রিমও টাকা পাঠিয়েছেন বনি-অর্ডারে। ঠাণ্ডা চিঠি লিখে বিচারিত খোঁজখবর নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে চারজন শেষ পর্যন্ত আসছেন বলে জানিয়েছেন।

প্রথম বোর্ডার এসেছেন পত প্রমত্ত-বিন। বয়স মইলা। এককালে বৃষ্টি বৃষ্টি-ইলাপেক্ট্রন ছিলেন। বিদ্যে-বা করেন নি, কিন্তু সাম-শোণাকে এখনো একই বাড়িবাড়ি আছে। কথাবাদী চাললেন দুনিয়া কেউই যেন তাঁর সমকক্ষ নয় এমন একটা অধ্যায়ের আভাস।

দ্বিতীয় তখন দুদিন ধরে পড়ছে। টেনশন-ওমাগনে অত্যন্ত

সময়ের করে নিয়ে আসা সবও বাড়ির গেটের ভেতর ঢুকেই তিনি কিছু সবালোচনা শুরু করেছেন,—“ছিঃ ছিঃ, এমন জামলে আমি আগান টাকা পাঠিয়ে এখানে আসি! জন্মেছিল নীর দ্বারে বাড়ি। সারা রাত্তাই ত দেখলাম নীর আর মালা!”

কনিকা কোনো রকমে তাঁকে ঠাণ্ডা করে তাঁর মস্তে বরাদ্দ করে নিয়ে গেছে। ঘরের চেহারা দেখে পুঁত ধরবার মত তখনি কিন্তু না শেষে তিনি বলেছেন,—“বেশুনে, একটা কথা আগানদের আগেই জানিয়ে দিই। বাবার-মামার বা বাঁহায়েম তা ত এই তেপানবুর মাকপানে ফেলপানা দেখেই বুঝতে পারছি, কিন্তু প্রত্যেক দিন চারবার করে আবার তা দিতে যেন তুল না হয়। একবার ভোর পাঁচটায়, তারপর সাতাল সাতটায়, তারপর বিকেল ফিনটেব, আবার সন্ধ্যা ছ'টায়। বান, টুকে রাগুন গিয়ে, পাঁচটা সাতটা তিনটে ছ'টায়।”

“আজ্ঞা তাই হবে!”—বলে কনিকা চলে আসবার ভজ্ঞে ফিরতেই আবার শিখন থেকে ডাক পড়েছে,—“গোনা!”

কনিকা একই বিরক্ত মুখেই ফিরে পাড়ালেও সেদিকে দ্রষ্টব্য না করে উত্থমিলা বলেছেন,—“তোমার মত ওই বয়সের বেকের আগনি আজ্ঞে আমি বলতে পারব না। তবে তোমাদের পরিচর্যা একই সরকার। তোমার নাহটা কি?”

“কনিকা!”

“গাড়িতে যিনি নিয়ে এসেন তিনি তোমার কে হ'ন!”—বিরক্তির সঙ্গে হাসিও গেরেছে এবার কনিকার এই জেরার ধরনে। একবার ইচ্ছে হয়েছে বলে,—“কেউ নয়, বন্ধু আর এই হোটেলের অংশীদার।” তারপর অস্থানে রনিকতার মোত সবরণ করে বলেছে,—“আমি ঠা হ'।”

“ওঃ—উত্থমিলা যেন অল্প কিছু আগা করেছিলেন, এই ভাবে বলেছেন,—“কত যিনি গিয়ে হয়েছে?”

“বেশী যিনি নয়”—বলে কথাটা এজাবার তেজেই কনিকা বলেছে,—“আগনার হানের পরর মল যদি লাগে ত বলুন, আমি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

কিন্তু তবুও তখনি নিশ্চিৎ মেলেনি।

“কি মিত, কি গ্রীষ্ম আমি ঠাণ্ডা বলে যান করি।”—বলে কনিকাকে যেন খাঁচা-নীতি শিকা গিরে উত্থমিলা বলেছেন,—“আমার নাহটাও তোমাদের জানা সহকার। আমি মিস্ ধর, এক্স হুপি-ইলাপেক্ট্রন, মমঃকম্পুর। আমায় মিস্ ধর বলেই ডাকবে।”

“বে আচ্ছা!”—হলে কণিকা সিঁড়ি গিরে হৃদয়স্থল জ্বালাতনিত নৈমে আসতে আসতে স্বাভাবিক চালানোর প্রথম অভিজ্ঞতার বেশ একটু চিহ্নিতই হয়েচে।

মিস্ ধরের পর লছোবেলা নিকট ট্যাঙ্কি ভাড়া করে এসেছেন ভাঃ বাজপেয়ী। যতনে চরিত্রের চেয়ে পূর্ণাঙ্গের কাছাকাছি হলেও বেশ শক্তসদৃশ ভোধান পুঙ্খ। একটু বেকী গম্ভীর। কথাবার্তা মনে হয় বেহাশ দরকারে চাড়া হলেন না। এমন হলেন তখন একটু অস্থিরই পোনায়।

প্রবীরই তাঁকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেছে। কিছু চাই কিনা জিজ্ঞাসা করার সুখের পাইশটা নাহিরে যা বলেছেন, তাতে প্রবীর প্রথমটা চমকেই গেছে।

ভাঃ বাজপেয়ী এক রাসে বল চাওয়ার নত বলেছেন,—
“একটু—পারি!”

প্রবীর একটু বিবুধ ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে তারপর সেলে ঘেলেছে। বলেছে,—“আশা করি তা এখানে পাবেন।”

ভাঃ বাজপেয়ীর মুখে কিছু হাসির কোনো আভাস দেখা যায়নি। গম্ভীর ভাবে বলেছেন,—“আশনার কথাই নত্যা হোক।”

নৈমে এসে প্রবীর কণিকাকে সবিচারে সব ভুলিয়ে বলেছে,—“বাহ্যানিবাসের বলে উল্লাসপ্রম নাম দেওয়াই বোধ হয় আমাদের উচিত ছিল। যা সব নমুনার আনবানি হচ্ছে!”

কিন্তু আরো এক নমুনা তখনও সেগত বাকী।

তিনি এসেন রাত প্রায় নটার পর।

সারাক্ষণ সবানো বুঁই পড়ছে।

মিস্ ধরের শরীর ব্যাথা হলো তাঁর বাবার তাঁর ঘরেই পাঠিরে কেঁদা হয়েচে। ভাঃ বাজপেয়ী, প্রবীর ও কণিকা তিনজনে নিচের ঘাবার ঘরে একসঙ্গে বলে খেয়েছেন। বাঙলা নামেই এক সঙ্গে, নইলে প্রত্যেকেই যেন নিজের নিজের খোলসের মধ্যে ঢাকা। কান্নার সঙ্গে কান্নার কোনো কথা হয়নি। নিঃশব্দ বাকসে কণিকা ও প্রবীর অবত এভাবে চুপ করে নিশ্চই থাকত না, কিন্তু ভাঃ বাজপেয়ীর গম্ভীর নিরবতার মর্দাশ বাধবার জগেই তাদেরও মূহ বন্ধ করে থাকতে হয়েচে তাঁর পাঙ্কির বাহানা জেঁতোতে।

বাঙলা-নাওয়ার পর ভাঃ বাজপেয়ী বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর ঘরে উঠে গেছেন। স্বাক্ষরবককে টেলিফোনিকার করবার সুখ গিয়ে কণিকা ও প্রবীর তাঁদের নিজের ঘরে গিরে রয়েছে।

এ ঘরটা নিচের তলায় তারা ইচ্ছে করাই নিঃস্বপনের জগে

রেখেছে। বামা ও ভাঁড়ার ঘর কাছে হৃদয়স্থল নকশ শুধু কাজের সুবিধে হয় বলেই নয়, এখানে থেকে সেট পার হয়ে বাইরের বাজা অনেকদূর পথের দেখা যায় বলে।

এই বর্ষার রাতে অবত দেখানে সেন্ধার কিছু নেই।

কাঁদের পাণি বৃষ্টির জলের ডিটেতে জাপলা। পাঙ্কি-বাসাখ্যে বাতিটার আলোর ঝিকমিক করে বাইরে নিরবজির বৃষ্টির একটা পদা যেন শুধু হলে হলে নৈমে গাছে ঘনে হচ্ছে।

আরাম-কোথাবাটাও পা এগিয়ে গিরে সিগারেটটার টান গিরে প্রবীর কি যেন বলতে বাচ্ছিল। হঠাৎ চমকে উঠে বলে সে বলেছে—“কে যেন আসছে না?”

জাপলা পাণির ভেতর গিরে যেটুকু দেখা গেছে তাতে বাইরের বৃষ্টির ঝিকমিক পদার গণর গিরে কিছু একটা সরে গেল কলই মনে হয়েছিল—।

কণিকা তাড়াতাড়ি উঠে আনবার ঘরে গিরে পাঙ্কিকেছে কিছু দেখান থেকে আর কিছু দেখা যায়নি।

পরক্ষণেই বাইরের দরজার ভারী কড়া সম্মোরে নাড়ার শব্দ পাওয়া গেছে।

সুড়িই কেউ তাহলে এই দুর্ভাগের মধ্যে এত রাতে এসে বাচ্ছির হয়েচে। কণিকা আনবার কাছে বাবার আগেই পাঙ্কি-বাসাখ্যের তলায় সে পৌছে গেছে বলে বোধহয় কিছু দেখা যায়নি।

কিন্তু পাঙ্কিটাটির কোনো শব্দ ও পাওয়া যায়নি! মাত্রঘটা এই অন্ধকার বড়বৃষ্টির রাতে এরকম দুর্ঘম পথে এল কি করে?

এই কথাই ডাকতে ডাকতে কণিকা প্রবীরের সঙ্গে বাইরের হলে গিরে পাঙ্কিয়েছে।

প্রবীর ভারী সোহার বিলটা নাহিরে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের কোড়ো হাওয়ার একটা দমক বৃষ্টির ছাটে ভেতরের হলর অনেকখানি পর্বত ভিত্তিরে গিরেছে।

আগন্তুক ভেতরে পা গিরে হাতের স্ট্রিকেসটা নাহিরেই—প্রবীরের সঙ্গে দরজা বন্ধ করবার ভূগাথে ব্যাপারে নিজে থেকে যোগ গিরেছে। প্রবল কোড়ো হাওয়ার বিকটে দরজা বন্ধ করা সোমো ব্যাপাট নয়। দুখন জোহান পুঙ্খকে বেশ নায়েহাল হতে হয় তা বন্ধ করে ফিলটা লাগাতে।

কণিকা লোকটিকে একদল ঘরে লক্য করয়েছে। হোহারা চেহারা, মাফাকি গোছের লম্বা। প্রায় প্রবীরেরই সমান। নাথার কান-চাকা বর্ণাতি টুপি, পায়ে বেশ দামী লম্বা ওয়াটার-প্রক্স, পায়ে গাম-ইটু।

দরজা বন্ধ হবার পর মাথার টুপিটা খুলতেই একরাশ এলোথলো ঝড় কটা চুল—যেন ছাড়া পেয়ে শক্তিয়ে ওঠে। সেই টুপিটা নাটকীয় ভঙ্গিতে এক হাতে ছুঁয়ে আগন্তুক বলেছে,—“এই অলমারে আপনাদের জ্বালান করবার জন্তে রাখা চাইছি।” অধীনের নাম মধুসূদন হস্ত।”

গুণু বলায় ধরনে নয়, নামটা শুনেও কণিকার হাসি পেলোছে। গুণু ডাকিতেই নয়, চেহারাও গলাভেও মধুসূদনের ছেলেমাছবীটা এখন বরা পড়ে যায়। মুখটা টুপিতে ঢাকা থাকার মকনই গোড়ায় বোধহয় কেমন একটু অস্বস্ত লেগেছিল।

কেউ কিছু বলবার আগেই মধুসূদন একগাল হেসে বলেছে,—“নামটা শুনে মেঘনাখণ-কাব্য যদি আপনাদের মনে পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমি নাচায়। বাণ-নার নামকরণের তুলে সব জাযগায় এই লজ্জাই আশ্রয় পেতে হয়। তাঁরা অনেক আশা করে হরত ও-নাম রেখেছিলেন, কিন্তু

“এক রকম উড়েই এসেছি চেঁচিয়ে মিতে পারেন!”—বলে নিজেই রসিকতায় নিজেই মধুসূদন সজোরে হেসেছে।

রসিকতাটা ঠিক উপভোগ না করে প্রবীর আবার গম্ভীর ভাবে বলেছে,—“আপনার গাড়িটাটির আওতাধীন পাইনি কিনা, তাই ভিজ্ঞাসা করছি।”

“না, আপনার রহস্তের মধ্যে রাখা আর উচিত নয়। গাড়িতেই আমি এসেছি। তবে মাইলখানেক দূরে গাড়িটা হঠাৎ থেকে বলল কি-না, তাই হটকেন্সটা নিয়ে ছোট্ট আশা ছাড়া আর উপায় হইল না।”

“আপনার আর সব জিনিস কি গাড়িতেই পড়ে হইল!”

“আর সব জিনিস।”—প্রবীরের প্রশ্নে যেন একটু অবাক হোরেই মধুসূদন বলেছে,—“আর সব জিনিস আমার কোথা থেকে আসবে! আমার বা কিছু সব এই হটকেন্সে।”

অবাক হয়ে প্রবীর কিছু বলবার আগেই কণিকা বলেছে—



ওঁদের পুরুরয়টি যে একটা ছড়া কাটতেও শিখবে না তা তাঁরা কি করে জানবেন। হ্যা, আলল কথাই তুলে গেছি ভিজ্ঞাসা করতে। আমি ঠিক জাযগায় এসেছি ত? এইটিই ত কল্যাণেশ্বরী বাঘানিবাস—যায়েআর বালাদেশই বকন—যার দুখ! কড়কুটি অন্ধকারে সাইনবোর্ড-টোর্ড কিছু দেখতে পাইনি কিনা!”

“না দেখতে পেলেন তুল জাযগায় বাওরা বোধহয় লজব ছিল না।”—কণিকা হেসে বলেছে,—“কারণ এ স্তরাটে বন মাইলের মধ্যে আর কোঠাবাড়ি নেই।”

“তার মানে চোখ বুঁকেও চলে আসতে পারতাম বলছেন? তা একরকম তাই এসেছি!”—বলে মধুসূদন হেসেছে।

প্রবীর এতকণ কোণো কথা বলেনি। এবার যেন একটু অগ্রসরভাবেই ভিজ্ঞাসা করেছে,—“কিন্তু আপনি এসে কি করে?”

“কিন্তু এই বরষার গাড়িরে কতকণ এমন আশা করবেন! আহুন, আপনাকে আপনার ঘর মেবিয়ে দিই।”

“ধন্যবাদ!”—বলে হটকেন্সটা তুলে নিয়ে মধুসূদন কণিকার পিছপিছ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে হঠাৎ যেন প্রবীরের দিকে চেয়ে হেসে বলেছে,—“এখনি যেন ঘুমাতে যাবেন না। হটকেন্সটা রেখেই আপনাকে আবার বিরক্ত করতে আসছি।”

প্রবীর কিছু উত্তর করেনি, কিন্তু হঠাৎ লোকটার প্রতি কেন বলা বাব না কেমন একটা কিংবদন্তি যেন অস্থির করেছে।

মধুসূদন তারপর সে রাতে কিছু বিরক্ত করতে আর আসেনি। কণিকা খানিক বাসে যেনে আসবার পর প্রবীর তার অগ্রসরভাবেই না লুকিয়েই ভিজ্ঞাসা করেছে,—“কি, তোমার সিনেমা-হিরো কি হ'ল?”

“আমার সিনেমা-হিরো!”—কণিকা ঢুক ঝুঁক প্রবীরের দিকে তাকিয়েছে, তারপর হেসে বলে বলেছে,—“ও।

মধুসূদনের কথা বলছ! বলা—মহাকাবি, সিনেমা-হিরো বলছ কেন ?”

“সিনেমা-হিরোর charming personality দেখে বলছি! তা তিনি হিরক করতে নামেন না যে বড়?”

“না, আমিই বাধে করলাম। বললাম, এই কড়কুটীতে এতখানি টোট এসেছেন। আজ রাতটা বিশ্রাম করুন। আগমার খাবার ওপরে দিয়ে থাকি।”

হাতের সিগারেটটার শেষ টান দিয়ে সেটা অ্যান-ট্রেতে ঝেঁ মেডাতে মেডাতে একটু বেনে তিক্ত করে প্রবীর বলেছে—
—“তুমি আমার ওপরে বাধে রাখার নিতে! এটা শক্তিশি-
লসংস্কারের একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?”

“কিছু উপায় কি বলা! চাকর-বাকরদের ত তুমি দিয়ে দিয়েছি। তারা ষাওয়া-হাওয়া দেবার চলে গেছে। এখন এটুকুতে বাধ্যন দিয়ে তাদের কোয়ার্টারের তাকতে ষাওয়ার চেয়ে নিজে দিয়ে আশাই সুবিধের নয় কি!”

“কিন্তু তিনি নিজে নেমে এসে খেয়ে খেসেই বা তোম কি ছিল।”—প্রবীর কণিকার তুচ্ছ মানতে না পেরে বলেছে।

“সেই ছিল এই যে, এখন এসে বকবক করে আমাদের কতকল ভাগিরে রাবত কে জানে! কী বকবক করতে পারবে দেখেছ ত?”

“হঃ”—বলে প্রবীর এবার হুপ করেছে।

কণিকা নিজে বেকেই বলেছে,—“হেলেটা কিন্তু ভারী আমুদে ভাঙোনাহু, বাপু। নিজে বেকেই বললে,—“এত রাত্রে আমার ষাওয়ার কত খেদ বাক হবেন না, কালিমা-গোলাও বা হোক তুমি দিয়ে খান, তাতেই আমার চলবে।”—
বললাম—“অত সত্য তিনিস আমরা রাখিনা, তার বললে খানিকটা কট মাখন আর জ্যাম দিয়ে থাকি, হবে ত?”
বলে—“খুব হবে!” আমি—“...”

হঠাৎ একটু সন্ধির হবে কণিকা খেমে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে,—“কি গো, সুমিরে পড়লে এরই মধ্যে!...”

পরের দিন মধুসূদনের আরো নতুন পরিচয় পাওয়া গেছে। সকালবেলাই একটা গা-আমা পাগাবি দরে নিচে নেমে একেবারে রাস্তাঘরে এসে হাজির।—“কি রাখছেন কণিকা দেবী, আমি একটু সাহায্য করতে পারি?”

প্রবীর স্টেশন-ওগারন দিয়ে বেকারের আগে তখন কণিকার কাছে হুটুটি খেকে আরো কিছু আনবার আছে কি-না জানতে এসেছে।

বিরক্তিতা গোপন না করেই সে বলেছে,—“সাহায্য করবার

কমি অত আগ্রহ থাকে তাহলে আমার সঙ্গে আসুন না। কুসুটি পর্যন্ত থাকি। পাতা হাতা অনেককিছু সাহায্য করতে পারবেন।”

মধুসূদন প্রবীরের সেই বেনে টেরই পাননি। হানিমুখে বলেছে,—“ওরে বাবা, এই তুমিই সেই কুসুটি! গাতি হুত মাতগাথেই কোথায় বিপদে আটকে থাকবে! আমি ওসব বীরবের মতো নেই। আর আমি শুধু রাস্তার সাহায্য করতেই ভালোবাসি।”

“কুসুটি!”—প্রবীর বেশ একটু বিস্ময়ের মতোই বলেছে,—
—“আগমার বীরত্ব শুধু হেসেলেই আপনি দেখাতে পারেন! আচ্ছা, আমি চললাম কথা, তোমার হেসেলের কাছে ত বত সাহায্য দেখেছ। রাস্তাবাহাওগুলো আজ ভালোই হবে আপা করি।”

প্রবীর বেকিরে যেতে মধুসূদন হেসে বলেছে,—“আগমার হানীর অত বেকার ইচ্ছা ছিল না বলে মনে হয়।”

কথাটা কণিকার কেমন বেন অবশ্যের মনে হয়েছে।

মধুসূদন ষাওয়া-বাওয়ার সব পর্যন্ত প্রবীর খেয়েনি।

কণিকাকে আর সকলের সঙ্গে খেতে বসতে হয়েছে।

টেবিলে তারা চার জন। মিসু ধর আশে অহুগ্রহ করে সকলের সঙ্গে খেতে বসেই হয়েছেন। ষাওয়ার টেবিলে একাই মাং করে রেখেছে মধুসূদন। এমনিতে তার আমুদে পড়াব ভালোই লেগেছে কণিকার, কিন্তু এক-এক সময়ে সে বেন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় বলে মনে হয়েছে।

খাবার টেবিলের সেই ব্যাপারটাই কেমন বেন একটু বাড়াবাড়ি।

কথাটা মিসু ধরই তুলেছেন,—“এ রকম কুসুতে বাড়িতে হোটেল খোলার কোনো মানে হয় না।”

“কুসুতে বাড়ি!”—কণিকা অবাক হয়ে বলেছে।

চিন-নাথর জা: বাহুশেরীও গ্রেট খেকে মূখ তুলে তাকিয়েছেন।

মধুসূদন সত্যীর স্বভাব জান করে জিজ্ঞাসা করেছে,—
—“কুত-কুত কিছু দেখেছেন মাকি সতি! ও, তাহলে ত এ বাড়ির তুলনা নেই।”

মধুসূদনের নিকে ত্রুটি করে মিসু ধর কলছেন,—“না, কুত-কুত এখনো দেখিনি। কিন্তু সারাসার অহুত সব ষাওয়ার ভনেছি। একবার ত মনে হ'ল কে বেন আমার দরখাটা বোলবার চেষ্টা করেছে।”

কণিকা একটু হেসে বলেছে,—“কড়কুটীতে ওরকম ষাওয়ার ত বাড়াবিক। আর এ-বাড়ির বা সব মজুত দরখা, কুতের হাতে কুসুল না থাকলে খোলা সম্ভব নয়।”

“কিন্তু স্কুল দিয়েই যদি কেউ ধোলে!”—মিসু ধর তর্কে হারতে রাখী হননি,—“হা! মন-মনিষিহীন ঝাংগা, এখানে এক হল ডাকাত এসে আবার খুন করে রেখে গেলেই বা কখন হবে!”

“আমি ত অসহ্য: নহ!”—মধুসূদনের কথাই ধরেন কনিকা হেসে কেলছে।

মিসু ধর আরো বিরক্ত হয়ে বলেছেন,—“এ দাসি-ঠাট্টার ব্যাধির নয়। এখানে ডাকাত পড়া কি এমন অসম্ভব? এই ত কলকাতা শহরেই কদিন আগে সন্ধ্যাবেলা ভিত্তরে একজনকে খুন করেছে, গুড়ুছ।”

কনিকা আগেই দিন কাগজে খবরটা পড়েছিল। বলে, —“সে ত কোনো গাঙ্গলের কার। নইলে ওই নিরীহ প্রৌঢ়কে অমন গলায় ঝাঁপ দিয়ে কেউ অকারণে মারতে পারে?”

“অকারণে কেন বলছেন!”—মধুসূদন বলেছে,—“হতত হুড়ীর ঘরে মোহরের বড়া লুকানো ছিল।”

“না, পুলিশ সে বন্ধন কোনো প্রমাণ পায়নি।”— জা: বাগশেখী তাঁর নীরবতা ভেঙে দখল্য করার সবাই অধাক হয়েচে।

“পুলিশ কি করেছে তা কি সবাইকে জানায়!”— মধুসূদন হাসকা হয়ে বলেছে,—“নির্বাং বড়ীর লুকোনো পদ্যাকড়ি ছিল, আর নহ বড়ী কোনো চোরাই ব্যবসার মালিক, নাম ঝড়িয়ে ওই গিরি মাঠি সেবে ছিল। শত্রুপক্ষের কেউ এসে দিয়েছে লাড়াই করে। বাক, বড়ী বেশ আরায়েই গেছে।”

মিসু ধর চটে উঠে কলছেন—“গলায় ঝাঁপ দিয়ে তাকে মারল, আর বলছ আরায়ে গেছে!”

“হ্যা, ঝাঁপ দিয়ে মারার মজা জানেন না বুড়ি! ভারী আরাহ!”—কল মধুসূদন বেজামে হেসেছে কনিকার কাছে তা একটু অস্বস্তি বিসদৃশী লেগেছে।

মিসু ধর বিরক্ত হয়ে টেবিল ছেড়েই উঠে গেছেন। জা: বাগশেখী পর্বত সন্নিহরে তার দিকে তাকিয়েছেন।

•

বড়জলের ভেতর নানা আংগার ঘোটার গ্রার নৌকায় মত চলে কনিকাকে কখন বাহানিবারে পৌছে দিল তখন গ্রার সন্ধ্যা।

এখনও গ্রাবীর ফেরনি দেখে কনিকা বেশ একটু চিন্তিতই হ'ল। কোনো কারণে আটকে গেলে গ্রাবীরও কোন করাও উচিত ছিল। কেন যে সে তা করেনি কে-জানি! উত্তির

হয়ে কনিকা স্কুলটির একটি বড় সোকানে নিচ্ছেই কোন করে খোঁজ নিলে। কিন্তু সেখানেও কোন হুশি পাওয়া গেল না। গ্রাবীর সেখানে দিয়েছিল ট্রিকট, কিন্তু বেলা এগারোটাতেই মোকান থেকে মিসিনশর নিয়ে যে খেলির গেছে।

ঘোড়ারসের চা খাওয়া হয়ে গেছে। মিসু ধর ও জা: বাগশেখী নিজের নিজের ঘরে চলে গেছেন। মধুসূদনও আতর্কভাবে কোথায় বেন আশ্বাসোশন করেছে। মধুসূদনের পক্ষে সেটা একটু অব্যাহতিক-ই বাটে।

কনিকা হারের রাগাংগার ব্যবস্থা রামসেবককে বলে দিয়ে নিজের ঘরে গিরে পুরানো ববরের কাগজটা নিয়েই গিরে বসল। পড়ায় কিন্তু মন বসতে চায় না। কড়কুটি বেন জন্মশ:ই আতো ভূমল হয়ে উঠছে। সেবপর্ব সতিই বজা হবে নাকি! রামসেবক এ অকলেরই লোক, তার কাছে বছর-পাচিল আগের তরফর এক বজার গল্প লে উল্লেখ। বরাকরের ভল কুল ছাপিয়ে এসে সমস্ত এলেকাটাই নাকি ভাণিয়ে নিয়েছিল। সেই লম্বরের মধ্যে এই বাড়িটিই নাকি ছিল একা বাড়িরে।

তাই যদি হয় আবার! মত কোনো তব না থাক, এতগুলো মাহুরের খাওয়ার ব্যবসার কথাও ভাবতে হবে। কতদিনে জল নেমে পথঘাট খুলবে কে জানে! তার ডাকার অবত সে ভর্তি করেই খাওয়ার ব্যবসা করেছে। কিছু না-হোক, চালে জালে বিচুড়ি করে দিতে পারবে। কিন্তু বাহানিবারের ত তাহলে ডবিত্য ঝাঁকরা। শুকতেই যে বদনায় তাহলে হটবে, সে কি আর কখনো কাটানো যাবে?

হঠাৎ চমকে কনিকা কান খাড়া করে রাখল। বেন একটা গাড়ির আওরাম পাওয়া যাচ্ছে না! কড়কুরির পথ যা বেজেছে তাতে অবত বোকা শক্ত। কিন্তু স্টেশন-ওরাগন এসে ত তার আলো দেখা দেত দূর থেকেই।

কনিকা আবার তার হারের কাগজটা মন বেবার চেষ্টা করলে। খবরগুলো সবই গ্রাখ পড়া হয়ে গেছে। কলকাতার সেই খুনের খবরটাই আর একবার পড়ে বেললে। সতিই অস্বস্তি ব্যাধার। অকারণে এরকম খুন কি কেউ করে! মোকটার বা বর্না দিয়েছে, তাতে ত অল্পবয়সী ভললোক বলেই মনে হয়। বাধার বধাতি টুপি, গায়ে ওয়াটারপ্রুফ, বর্গার বিনে যে কোনো ভললোকেরই ত এই শোশাক। সেই শোশাকের জ্বায় উমাং এক পুনী ল্যাকেরা করেছে কে ভাবতে পারে!

না, কি বন্ধম অস্বস্তি লাগছে। মধুসূদন এ-সময়টায় থাকলেও হুটী,গল্প করে সমস্ত কাটানো দেত। মাহুটা বকবক

করে বেশী। হৃদিকতাগুলোও বেড়াই, জু বেস হাসিমুখি বলে সব হিসেবে ভালোই লাগে।

“কি!”—আগুন থেকেই কণিকার গলা দিয়ে চীৎকারটা বেরিয়ে গেল।

বুড়ির কাপটীটা অল্প দিকে বলে তখনকার শাদি দিয়ে গাড়ি-বাগানার ফিকর হাওয়াটা ধামিকটা ভালোই দেখা যাচ্ছে। আগুনোড়া ঢাকা একটা মূর্তি বেন সেখানে থিয়ে চলে গেল।

পরমুহুর্তে বাইরের দরজার কড়া নড়ে উঠতে ভণিকার হাসি গেল নিঃশব্দে আকস্মিক ভাবে। খবরের কাগজের কাহিনীটা পড়তেই বনটা অমন হরোছিল।

এ ত শাই প্রবীরের কড়া-নাড়া। তার কড়া-নাড়ার ধরনই আগুন।

কিন্তু প্রবীর এল কিসে! তার গাড়ির শব্দ বা আগুন কিছুই ত বেগুত পায়নি!

তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলতে খুলতে সে সেই কথাই ভাবছিল।

ধরনা খুলতে প্রবীর ভেতরে না ঢুকতেই ব্যাচ হয়ে বললে,—“শুগুন কি, ছাড়াটা নিয়ে এসো শীগগির।”

“ছাড়া!”—কণিকা বেশ অবাক।—“প্রবীরের ত বাবার বর্গাতি টুপি, পায়ে ম্যাকিন্টস্! বাবার ছাড়া কি হবে!”

“হা করে ঝড়েরে আছে কেন? যাও, ছাড়াটা নিয়ে এসো। অভিযানের গাড়ি থেকে নামিয়ে আনতে হবে ত!”

কণিকা একটু বিমূঢ় ভাবেই ছুটে গিয়ে দর থেকে ছাড়াটা নিয়ে এসে প্রবীরের হাতে দিলে। প্রবীট কিন্ত সেই সঙ্গে না করে পারলে না,—“অভিযান নিয়ে ভূমি এসে কিসে?”

“এগুন গাড়িতে, আবার কিসে? ঠিক ব্যাডির কাছে এসেই মোটরটা একেবারে গেল বিগড়ে। আর তার এমন অনুরোধই বা কি! একরকম অন্ধের মত ভাগতে ভাগতেই ত এসেছি। হেলসাইট পর্যন্ত গিয়েছে নিভে!”

প্রবীর ছাড়া নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অভিযানের আনবার কথা বলছে ধন, তখন একজনের বেশী নিভর এসেছেন। এই দুর্ঘটনগেও তাহলে ওয়া এসেন! হেলসাইট নিভে গেছে বলেই কণিকা গাড়ির আগুন টের পায়নি। কিন্ত এত বেরীতে ভাগতে ভাগতে আগুর বানে কি? বস্তা কি সত্যিই তাহলে শুকিয়েছে?

অভিযান এসে বে-বার করে বাবার পর আনা গেল কণিকার আগুন। সম্পূর্ণভাবে সত্য।

প্রবীরের কাছে খবর পাওয়া গেল যে, বস্তার জল ইতিমধ্যেই জারিধিক জুড়ির দিতে শুরু করেছে। আগুন-হাওয়ার বা গতিক, তাতে সে জল আনো বাড়বে বলেই মনে হয়।

“সেই ভয়েই কি তোমার এত বেরী হল?”—কিঙ্গালা করলে কণিকা।

“তবু সেই ভয়ে নয়। প্রথমতঃ, ট্রেন গ্রাফ তিনখণ্ডটা পেট বলে স্টেশনেই বাধ্য হয়ে থাকতে হ’ল বিবেক অবনি। বেষ্টবাবু এই ট্রেনে আগুন মিশেছিলেন। তাকে ছেড়ে ত আর আগুন হয় না। তারপর হাজার আবার নিঃবীহবাযীকে উদ্ধার করতে বেশ ধানিকটা সময় গেল।”

“উদ্ধার করতে কি রকম? নামটাও বদল বীরবাযী। উনি বাঙালী নন?”

“না, বেশ দক্ষিণ ভারতে কোথাও ছিল, তবে তখনাম বাংলায়পৌঁছে বহুকাল ধরে আছেন বলে বাংলাটা মাতৃভাষার মতই হয়ে গেছে।”

“কিন্ত ঠিক উদ্ধার করতে হ’ল কেন?”—কণিকার কাছে ব্যাশাটটা বেন কেন আশঙ্কি মনে হচ্ছিল।

“উদ্ধার করতে হ’ল—ওর গাড়ি বানের জলে অচল হয়ে যাওয়ার মকন উনি একেবারে ডেপুটিজের মাফখানে সত্যিই ফুল পাচ্ছিলেন না বলে। অন্ধকারে কড়কুরি মাফে মূরে একটা আলো জ্বলতে-নিভতে বেশেই আমাদের প্রথম কেনন অদুত লাগে। তারপর মোটরের হর্ন শুনে সেদিকে গিয়ে দেখি ড্রলোকের ওই অবস্থা। ঠকে ভুলতে গিয়ে আমাদের গাড়িই ত খানায় পড়ে গ্রাফ উল্টে গেছল আর কি!”

“কিন্ত ড্রলোক কড়কুরিতে এদিকে পাচ্ছিলেন কোথায়?”

—কণিকা প্রশ্ন না করে পারল না।

“অত কথা কিঙ্গালা করিনি।”—প্রবীর একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বললে,—“কেউ বিগলে পড়লে কি অত বেরী ক’রে তবে তাকে সাহায্য করতে হয়!”

“না, তা হয় না। তবে কোথায় দেখ, বাংলা ভাষার কি ক’রে এত দখল, এত কথা ধন মেয়েছ, তখন ওই কথাটাও কিঙ্গালা করতে পারা যেত না!”

“তোমার কি কিছু সম্বন্ধ হচ্ছে নাকি?”—অবাক হয়ে কিঙ্গালা করলে প্রবীর।

“নামি না, কিন্ত আবার কেনন ভালোও লাগছে না! একে এই দুর্ঘটনগে ঠিক হোটেল খোঁজার পরই, তার ওপর আমাদের বোর্ডাররাও কেনন বেন সব অদুত জুটেছে আমাদের মনে হচ্ছে।”

প্রবীর হেসে ফেলে বললে,—“বোঁটার শু আর নিজেরা বাছাই করে নেওয়া যায় না। তাহলে তোমার ওই দিনেমা-হীয়ে, খুঁড়ি, মহাকাব্যিক আপেই বিষের করতাম।”

এবার কণিকা হেসে ফেলেছে,—“তোমাদের সত্যি কৃষ্ণেণ হেঁচা হয়েছে। নইলে মধুবন ছেলেটা সত্যি খারাপ নয়। একটু মাজোজান কম, এটী যা।”

প্রবীর কি বলতে থাকিল, হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। “এখন আবার কোন করে কে?”—বলে কণিকাই গিয়ে ফোনটা ধরলে।

“হ্যাঁশো!”—একটু অশ্রু ভাবে শোনা গেল,— “কম্প্যানেবরী বাসানিবাস?”

কণিকা ‘হ্যাঁ’ বলবার আগেই ওধার থেকে আবার প্রশ্ন হল,—“বাসেনজারের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?” —উজারনে একটু রাত শেষের টান।

“হা বলতে চান আমাকেই বলতে পারেন!”—কণিকা হাসালে।

“কে আগনি?”—আবার প্রশ্ন হল।

“আমি—মানে—এ বাসানিবাস আমরাই খুঁলেছি। আমি মিসেস লাহিড়ী।”

“ও, আগনি মিসেস লাহিড়ী! আচ্ছা তখন,—আগওয়াটা এবার বেশ গভীর হয়ে এসে,—আমি বরাবর থানা থেকে ইগমাইল সাহেব বসছি।”

নিষেধ অম্বায়েই কণিকা বুকি একটু চমকে উঠল,— “ও, থানা থেকে বসছেন! কি ব্যাপার বলুন তা?”

“সেহুন একটা বিশেষ দরকারে সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর যোগাযোগে আপনাদের এখানে পাঠিয়েছি। কোনে বেসীকিছু আর বলতে চাই না। যা বলবার তিনিই গিয়ে বলবেন। তাঁর পৌছোতে বিশেষ সেরী হবে না।”

“কিন্তু—কিন্তু এখানে আসবার শু কোনো উপায় নেই। রাতঘাট সব বন্ধার জলে ডুবে গেছে বৈ। বজা কখনোই বাড়েছে।”—কণিকার আশঙ্কাতা বেন আশার মতই শোনাগল।

ওধার থেকে একটু বেনে কড়া গলাতেই শোনা গেল,— “প্রলভ হলেও তিনি ঠিকই পৌছোবেন। আপনাদের ভাবনা নেই। আর তখন, আপনার স্বামী মি: লাহিড়ীকে তাঁর সব কথা ভালো করে শুনে তাঁর নির্দেশ মত সবকিছু করতে বলবেন। কোনো ক্রটি কেন না হয়।”

“কিন্তু ইগমাইল সাহেব!...” কণিকা আরো কিছু জিজ্ঞাসা করতে থাকিল, কিন্তু ওধারে লাইন কেটে দেবার আওরান পাওয়া গেল।

কণিকার দিকের একতরফা কথা শুনেই টিকিত মুখে প্রবীর তখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। উদ্বিগ্ন ভাবে সে জিজ্ঞাসা করলে,—“কি, ব্যাপার কি? কি বলছে বরাকর থানা থেকে?”

কণিকা তখনও নিঃশব্দে ডানো করে সামলাতে পারেনি। ধরা-গলায় বললে,—“কে একজন সি-আই-ডি অফিসার না ইন্সপেক্টরকে এখানে পাঠিয়েছে।”

“সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর!”—প্রবীরের চোখ বড় হয়ে উঠল,—“কেন?”

“জানি না। ইন্সপেক্টরই এসে আমাদের জুনায়ে বললে।”—কণিকা অসহায় ভাবে প্রবীরের দিকে তাকালে।

“কিন্তু পুলিশ আসবার একটা কারণ শু চাই!”—প্রবীর যেন নিঃশব্দেই প্রশ্ন করলে,—“এখানে কিছ ত হয় নি?”

“কি করে তা জানছ!”—কণিকা কাতর ভাবে বললে, “আমরা—আমরা কোনো অস্ত্র কি করেছি?—কোনো আইন জেয়েছি কি তুলে? যেদিন ওধার থেকে গুলুগাণ্ডিত চাল আসছিল। একটু সত্কা বলে তাই কবেক বজা কিনেছিলাম। কিন্তু তা শু বে-আইনী নয় আমরকাল।”

“কি বাজে বকছ!”—প্রবীর একটু বিরক্ত হয়েই বললে,—“বে-আইনীও যদি হয়, যদি চোরাই মালও কিনে থাকে, তার অস্ত্র এই বজার মধ্যে সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর আসে নাকি?”

“তাহলে? তাহলে?—” কণিকা উৎসাহের সঙ্গে বললে,—“আমাদের এখানে এমন কোনো লোক কি এসেছে পুলিশ থাকে খুঁজছে? আমরা কিন্তু তা কি করে বুঝব?”

“নিশ্চয়ই—আমাদের কি দেখে! তুমি মিছিমিছি ভেবোনা!”—বলে প্রবীর কণিকাকে কাছে টেনে একটু আদর করে শান্ত করার চেষ্টা করলে।

কিন্তু কণিকার মন এত সহজে শান্ত হবার নয়। স্বামীর বাহুবন্ধন ছাড়িয়ে সে অত্মশোচনার সঙ্গে বললে,—“এখন মনে হচ্ছে এ বাসানিবাস না খুঁলেই হত। গোড়াতেই এই দুর্বোধ্য, তার ওপর কুি হাশামা এখন হবে কে জানে!”

হাশামা যে তাদের করনাকেও ছাড়িয়ে গাবে কে জানত। পরের দিন সকালেই আনা গেল বজার জল খীপের মত তাদের বাড়িটাকে ঘিরে প্রায় নিচের তলার ঘরগুলোতে ঢোকবার



উপস্থিত করছে। কিন্তু বোহাত উচু বনেই এখানে তাই। চক্রে
পেয়েছে। এ হল কতদিনে নাথবে কে জানে!

ডোরে উঠে বোর্ডারের ঘরে চা পাঠাবার ব্যবস্থা করে
শিক্ষকের ঘরেই বসে প্রবীর ও কলিকা এই সমস্তাই আলোচনা
করছিল,—এমন সময় ঘরের আব-ডেজানো দরজাটার এবার
টোকা সোনা গেল।

কলিকা ‘আছেন’ বলার আগেই মিলি খর বেশ একটু
অগ্রসর মুখে ঘরে ঢুকতেই গলা ছাড়লেন।

“এই যে তোমরা এখানে! বলি পরস্পর-কতি ত কিছু
কম নেবে না, কিন্তু সাধারণ সুবিধাগুলোও না কি যে কি ভাড়া
কাজ দেবে এমন করে?”

“কি, হয়েছে কি?”—প্রবীর একটু ভুড়িয়েই জিজ্ঞাসা
করলেন।

“কি হয়েছে? ওপরের বাথরুমে এক ফোটা জল নেই।
ওপরে ঘর নিয়ে তলের গল্লি কি নিচ-ওপরে করব না কি
হাটবিন।”

প্রবীরের ইচ্ছে হ’ল বলে,—“জলের অভাব কি? বাইরে
বানের জলে ত জুবে মরতেও পারেন!”—কিন্তু নিজেকে
সাবলে সে দৃষ্টিতে ভাবলে,—“আজ্ঞা, আমি দেখছি।”

প্রবীর বেগিয়ে দাবার পর মিলি খর কলিকাকে নিয়ে
পড়লেন,—“দেখো বাপু, কিছু মনে না করো ত বলি। ওই
ছোকরার বকম-সকম আমার ভালো লাগছে না।”

ছোকরা বলতে যে মধুসূদনের কথাই বলছেন, তা বুকেও
কলিকা জিজ্ঞাসা করলে ঈশং হাসবার চেষ্টা করে—“কার কথা
বলছেন?”

“ওই যে তোমার কাজিল অগা ছোকরা—চললো যার
কানের বাসা হয়ে আছে। চলললোও ঝাড়াতে পারে না?”

চল না ঝাড়াতেওটা কত বড় অপ্রিয় বৃত্তে না পেরেই
বোধহয় কলিকা চুপ করে হইল। মিলি খর আবার কালেন,—
“ওর নামটাও আমার বেন ভাঁড়ানো মনে হয়। কোথায়
মহাকবি মধুসূদন দত্ত, আর কোথায় এই বকাটে একটা
বাউতুলে!”

মনে মনে চটলেও বাইরে হাসকাতাবে কলিকা মিলি খরকে
ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করলে,—“কানা ছেলের নামও
পদ্যসোচন হয় ত?”

“হয়, কিন্তু এ ছোকরাকে সেবেই মনে হয় ওর ভেতর
গণসোচ আছে। কি জানো ভূমি ওর সবছে?”

এবার আর কলিকা বিরক্তিতা চাপতে পারলে না, একটু
কঠিন হয়েই বললে,—“এই, আপনার সবছেও বড়টুই জানি

বড়টুই। আপনি একমাসের মধ্যে, আর মধুসূদন লাভ
দিনের মধ্যে খানানিবারে খসতে এসেছেন। আপনারা
বা নাম হিচ্ছেন তাই আমাদের খাতার লেখা হয়েছে।
তার মধ্যে পুস্টিকে খবর নিতে বাইনি। আপনারা এখানে
কে কি, তা ত আমার জানবার দরকার নেই। আমার
প্রাণে পাওনা শুধু চুকির দিয়ে এখানে অত গোলমাল না
করে যে খুশি আপনারা থাকুন না! আপনারদের ত্রি-
কৃষ্টিতে আমার কি দরকার?”

মিলি খর একটু বেন জ্বল হেলেন, কিন্তু গলায় বাঁধ
তাতে স’মল না।—“তোমাদের বচল কম, দুনিয়ার কিছুই
জানো না, তাই ভালো ছুটা পরাবণই নিতে এসেছিলাম।
পছন্দ না হয় নিওনা। এই যে, কোথেকে উঠতো একজন
লোক না-বলে-করে কাল রায়ে এসে উঠেছে এখানে।
বাড়ালীও নয়। কি মতলবে কে জ্ঞান এসেছে তাই বা
কে জানে?”

এই ধরনের প্রশ্ন নিম্নেই কাল রায়ে করেছে মনে ক’রে
কলিকার গলায় বিরক্তিতা এবার আর প্রকাশ পেল না।
বাতবিক গলাতে প্রবীরের কথাগুলোই সে বললে,—“কিন্তু
আমাদের উপায় কি হলু। বস্তার জলে খোটর ধারণ
হবে ভুললোক বিপদে পড়েছিলেন। তাঁকে আশ্রয় না নিয়ে
কেনে আশা ধার?”

“কিন্তু বাই বলো, ওই বীরস্বামী না কী নাম নিয়ে যে
এসেছে, আমার ত মনে হয়—”

“ব’লে কেলু বা মনে হয়, ব’লে ফেলু।”—আসামীর
নাম করতেই সে হাসিল।

মিলি খর ও কলিকা দুজনেই চমকে সে-দিকে তাকাল।
মিঃ বীরস্বামী কখন নিঃশব্দে যে পেছনে এসে গাড়িয়েছেন
টেরও পারনি তারা।

“ও—একবারে চমকে গেছলাম।”—মিলি খর ক্রুদ্ধ
দৃষ্টিতে বীরস্বামীর দিকে তাকালেন,—“কখন এসেছেন টেরও
পাইনি!”

“হ্যাঁ, আমি একবারে হুপি হুপি আসি!—এমন করে
পা টিপে টিপে।”—বীরস্বামী একটু হেঁটে হুপি হুপি অসোটা
যেথায়ও গিয়েন।—“কেউ কিছু টের পার না ব’লে কত
মজার কথা শুনেতে পাই। আর বা শুনি, আমি কখনো
ভুলি না।”

মিলি খর কেমন বেন একটু ভুড়কে গেছেন মনে হ’ল।
—“বাই বাথরুমে কি হল আবার দেখি।”—বলে আর তিনি
নেপানে গাড়লেন না।

বীরশ্রাবী তার পেছনে হো-হো করে হেসে উঠলেন, ডারশন কবিতার থিকে ভরে একটু সেকোভুজ সেহের সুরেই বললেন,—“আমাদের পৃথিবী মেবী একটু বেন ভাবনার পড়েছেন বনে হচ্ছে।”

চেহারা ভাবিত্তি এক মাথার চুল পাকা হ'লে কি হয়, বীরশ্রাবীর ধরন-ধারণ কেমন একটু ভাঁড়ের মত। চলন-বলনও ঠিক বয়সের উপযোগী নয়,—বেন বুড়ে। খোকা ধরনের।

এবীরের বেঘন মধুঘরনকে, কবিতার তেমনি সোঁকটাকে গ্রন্থন দুইতেই ভালো লাগেনি। তবু জবাব একটা না দিলে নয়, কবিতা তাই একটু হেসে বললে,—“ভাবনার আর অপরাধ কি বলুন! এই বয়সে কি যে হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।”

“তা ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে!”—ব'লে বীরশ্রাবী আবার হো-হো ক'রে হাসলেন।

বিদ্রুত ভাবে তাঁর থিকে ভাকিয়ে কবিতা বললে,—“বুঝতে পারলাম না আপনার কথা।”

“পারলেন না বুঝি!”—বীরশ্রাবীর চোখে বেন চুইমির হাসি,—এখন না পারুন, পরে হয়ত পারবেন। তবে অনেককিছুই আপনি বোঝেন না তা বোঝতেই পাচ্ছি।”

“যেমন?”—কবিতা এবার একটু উক।

“যেমন অতি সরল হওয়া ভালো নয়।”

“আমি যে অতি সরল তা এত মনোই বুঝে বেলেছেন?”

—কবিতা বিদ্রূপের ঘরে বলবার চেষ্টা করলে।

“তা আর বুঝিনি? এই ভারতবর্ষের সাতঘাটের জল এই বহন পৰ্ব্বত কি খেয়ে বেড়াচ্ছি মিছিমিছি?”

“আপনি সাতা ভারতবর্ষই ঘুরে বেড়ান বুঝি?”

“ঘরকরা হলেই বেড়াই, আবার ঘাপটি ঘেরেও থাকি কখনো কখনো।”—কল বীরশ্রাবী আবার হাসলেন।

বীরশ্রাবীর দাবার কোনো নাম নেই। তাই নেহাত আলাপ চালাবার মত্রেই কবিতা বললে,—“বাংলাটা বেশ ভালো বলতে পারেন ত দেখছি?”

“আপনি তারিক করছেন তা হলে। বাংলা কিন্তু আমার স্বাভাৱ্য নয়।”

“তা ত নাম শুনেই বুঝি!”—হুঁপে বললেও কবিতার কেমন হঠাৎ সন্দেহ হ'ল, হয়ত বীরশ্রাবী নাবটাই খিচো।

তার সন্দেহটা ফে বুঝতে পেরেই বীরশ্রাবী বললেন,—“অব্রত আমি বলছি বলছি যেন সব কথা বিশ্বাস করে বলবেন না। বিশ্বাস কাজকেই করবেন না, অতি আপন জনকেও।”

“আপনার উপদেশের অন্তে ধন্যবাদ!”—কবিতার পদাটা কিন্তু অগ্রসরই গেলো।

“কখাটা আপনার ভালো লাগলো না বুঝতে পারছি।”—বীরশ্রাবী তার থিকে কেমন অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে হাসলেন,—“কিন্তু হুমিয়ার এত চেয়ে খাটি কথা নেই।”

একটা আনন্দের ছিটকিনি বুঝি একটু আগগা ছিল। হঠাৎ বোভো! হাওধার পাঠা হুটো সপক্ষে খুলে গিরে দুইর ছাটে ঘর ভিত্ত গেল।

কবিতা বন্ধ করতে বাজিল। তার আগেই বীরশ্রাবী “ধাক্কা! আমিই বন্ধ করছি!”—ব'লে সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

এবারেও কবিতা লক্ষ্য করলে যে বয়সের তুলনায় বীরশ্রাবীর স্নায়কেরা বেশ চটপট বুঝকের মত।

জানলাটা বন্ধ ক'রে বীরশ্রাবী পাশের টেবিলের একটা বই হাতে নিয়ে দেখছিলেন, এমন সময় যিনি ঘরে ঢুকলেন ঠোকে দেখে কবিতা সত্যিই অবাক! হু'বেলা খাওয়ার তুমহুটে চাচা। নিজের ঘর থেকে যিনি বার হননা, সেই তা: বাজপেটী নিয়ে থেকে এ ঘরে নেমে আসবেন, কবিতা ভাবতেই পারেনি।

তা: বাজপেটীর সল-পজীর মুখে সাধারণত: কোনো ডাক-চাক বিশেষ কোটে বলে মনে হয় না। এখনও তিনি ঘরে ঢুকে সেই কাঠের দুর্ভির মত চেহারা নিয়েই উদ্ভলহীন ভারী গলায় বললেন,—“বাক করবেন। মি: লাহিড়ীকে দেখতে পেলাম না। ভগবতের ইলেকট্রিক লাইন খারাপ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। আবার ঘরের আলো জ্বলছে না।”

“সিনের বেলায় আলো নিয়ে কি করবেন!”—কবিতা হয়ত বলতে পারত। কিন্তু সিনের পর রাত ত আলবে। কোনো মিষ্টী পারার যেখানে আসা নেই দেখানে ইলেকট্রিক লাইন খারাপ হলে অবস্থা কি হবে করনা করে সে উদ্বির হয়ে উঠল।

“কি বিপদ বেঘুন ত! এদিকে বজা, ওদিকে পুষ্টিপ আসছে, তার উপর আবার এই ইলেকট্রিক লাইন খারাপ হওয়া!”—তার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল।

কাকর কাছে কোনো সহায়কুতি পারার আশার কবিতা কখাটা বলেনি, কিন্তু ওই ক'টা কথার অমন ফল হবে সে জানত না।

বীরশ্রাবীর হাতের বইটা সপক্ষে পড়ে গেল। তা: বাজপেটীর ভাবলেনহীর বুখানাতোও কেমন বেন একটা বিদ্রুততার চেহারাও ফুটে উঠল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি প্রায় ধরা-গলায় বললেন,—“কি বললেন? পুষ্টিপ আগছে!”

তা: বাজপেশীর দুখোশের মত দুখের পেচনেও একটা কিছু আবেগের আলোড়ন যে চলছে তা কবিকার অগোচর হইল না। সেটা লক্ষ্যে, না ভাব, না উত্তেজনা, তা গ্রিক যোকা নত। কবিকার হঠাৎ যেন হ'ল এই নিরীহ চেহারাটির গভীর লোকটির ভেতরে গভীর কোনো রহস্য নিহতই আছে।

কবিকারকে চুপ করে থাকতে দেখে তা: বাজপেশী প্রায় ব্যস্তবিক সন্দেহেই আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—“পুলিশ আসছে বললেন না? কি ব্যাপার?”

“হ্যাঁ, বড়াকর বান্দা থেকে কাল রাতে কোন করেছিল। কে একজন সি-আই-ডি অফিসারকে ধরা এখানে পারিয়েছেন বললেন।”—জানলার ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে কবিকা একটু আশার হুরেই বললে,—“এখনও পর্যন্ত দখল আসেনি, তখন এই বজ্রাঘাত আর আসতে পারবে কল যেন হয় না।”

“কিন্তু পুলিশ আসছে কেন?”—তা: বাজপেশী কবিকাকেই বেন জেরা করলেন।

কবিকা কিছু বলবার আসেই, “ককযাত্রী হয়েছে হোটেল খোলা।”—বলে প্রবীর ঘরে ঢুকল। তারপর বোর্ডার ক্লককে ঘরে দেখে ও তারের দুখের তাব লক্ষ্য করে অধিক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—“কি, হয়েছে কি?”

তা: বাজপেশী-ই তার দিকে এগিয়ে গেলেন,—“ওনলাম সি-আই-ডি পুলিশ এখানে আসছে। কেন বলুন ত?”

“কে জানে কেন!”—প্রবীর বিরক্তির সঙ্গে বললে,—“কিন্তু আসছে বললেই ত হয় না। ওপর থেকে যা দেখলাম, চারিয়ার একবারে সমুদ্র হয়ে গেছে। বিবিসিক চেনবার উপায় নেই। পুলিশ কেন খিনিটারী হলোও আত আর আসবার উপায় নেই।”

হঠাৎ জানলার সম্মুখে শক্ত-কিছুর চুবাব যা বেগমার শব্দ শুনে চারজনই চমক পেথিরে করে তাকিয়ে একেবারে জড়িত হয়ে গেল।

খানিটা বৃত্তির ছাটে প্রায় ব্যাপসা। কিন্তু তারই ভেতর

অশ্রুত একটা মূর্তি যেন মূর্তি থেকে একে নিরুৎসাহ। হাতে তার একটা বেন দুখের বলসই যেন হল।

কবিক মূর্তি হতভম্ব হয়ে থেকে তা: বাজপেশী-ই প্রথম জানলার দিকে ছুটে গেলেন। কিন্তু হাতে জানলা খুলতেই মূর্তি আঁকা মূর্তির রহস্য বানিকটা পরিহার হয়ে গেল। ওখানে একটি লোক ছোট একটি অগাধো রবারের ভেলায় ওপর দাঁড়িয়ে জানলার একটা পরাণে থরে আছে। তার অঙ্গ হাতে ছোট একটা বৈঠা। বজ্রার জল প্রায় জানলার তলা পর্যন্ত পৌছোবার লক্ষ্যই নৌকোর ওপর গাড়ানো অধমার তাহে গ্রিক মূর্তি ভাসছে বলে যেন হচ্ছিল।

তা: বাজপেশী জানলা খুলতেই সে একটু মাথা হুইয়ে হেসে বললে,—“গল্পবাস! আপনাদের দরজাটা একটু খুলি খুলে দেন। আমি ইন্সপেক্টর খোষাল।”

“ইন্সপেক্টর খোষাল!” তা: বাজপেশী সবিস্ময়ে আপনা থেকেই বলে উঠলেন।

অন্ত সবাইও তখন জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রবীর নিম্নেই এবার এগিয়ে গিয়ে বললে,—“বাইবের লরজা তা ওদিকে। অতদূর ঘুরে আপনাকে খেতে হবে না। এর পরেরটা ক্রেক-উইন্ডো। আমি খুলে দিচ্ছি, গাড়ান।”

‘ক্রেক-উইন্ডো’-টা খোলবার পর খোষাল নৌকো নিয়ে সেখানে গিয়েই ভেতরে ঢুকলেন। রবারের ভেলায় ড্যান্ডুটা তারপর খুলে গিয়ে বললেন,—“দরজাটা এখন বন্ধ করে দিতে পারেন। আর আমার এই অফিসের কাঠাবীড়িকে রাখবার একটা জায়গা যদি দেখিয়ে দেন।”

ক্রেক-উইন্ডোর পালা ছুটো বন্ধ করে প্রবীর বললে,—“আহ্নে আবার দেখে।” হাওতা ঘেরিয়ে ভেলাটা তখন চুপসে একটুই হয়ে গেছে। একহাতে সেটা তুলে নিয়ে খোষাল প্রবীরের পেছনে বাড়িলেন।

কিন্তু বাবার আগে একটু বাধা পড়ল। নিম্ন খর ইতিমধ্যে সেখানে এসে হাথির হয়েছেন। তিনি বেশ একটু উত্তোজিত ভাবেই বললেন,—“আপনি ইন্সপেক্টর খোষাল? রবারের

আলফার
বৈচিত্র্য

খ্রিষ্টাব্দ
৪৬
৩৬২৬

লাজ্জী ব্রাদার্স
জুয়েলার্স
১, হিন্দুস্থান স্ট্রাট, বালিগঞ্জ
২০৪/৮, রাসবিহারী প্রকির্ভি (পট্টিয়াহাট জংগন) কলিকাতা

নৌকো কেনে এই জুর্গাপের মধ্যে আগতে হয়, এমন কি ব্যাপার এখানে হয়েছে?"

যোথাল একটু হেসে বললেন,—“একটু দূর করলেই সব জানতে পারবেন।”

“আচ্ছা, কি জানান দেখি! পুলিশের সবকিছুতেই বাড়িবাড়ি। হেসে ধরতে পারেনা কেউটে ধরতে যায়। আর পারিলেছে কিনা আপনার মত এক ছোকরাকে! এই বরষে ইন্সপেক্টর! কোনো খুঁটির জোরে বোধহয় প্রমোশন পেয়েছেন!”

“তা হরত পেয়েছি!”—যোথাল আবার হাসলেন,—“কিন্তু আমার বরষ বত কম ভাবছেন তত নয়।”

যোথাল প্রবীরের সঙ্গে বেরিয়ে বাবার পর বীরস্বামী-ই প্রথম কণিকার কাছে এলে তীর ঘরে জিজ্ঞাসা করলেন,—“পুলিশ কেন ডাকিয়েছেন মিসেস লাহিড়ী?”

এ বেন আরেক বীরস্বামী। চোখ পেলে ভয় করে। কণিকা ভাতাভাতি বললে,—“আমরা তাকিনি বিধাস কখন। ওই ত ভুললেন কি হাতে এসেছে খানিক বাসে জানাবে।”

হঠাৎ ময়কা হাওয়ার হত মধুসূদন এসে ঘরে ঢুকল, বেন গাল মচায় ব্যাপার, এই ভাবে সোলাসে থেে বলে উঠল,—“আরে, নবক ও একবারে গুলজার! গুলশা, গুলশা কেন দেখলাম, পুলিশ এসেছে রবারের ভেলার জেসে। হাকপ একটা-কিছু জায়েলে ঘটছেই। একবারে রোমাঞ্চকর উপভোগ!”

তার স্মৃতিতে কিন্তু আর কাকর সাথ দেখা গেল না।

ডাঃ বাজপেয়ী তার দিকে একবার জুটুটি করে বললেন,—“আপনার কোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি, মিসেস লাহিড়ী?”

“নিচরই পারেন।”

ডাঃ বাজপেয়ী ফোন করতে বাবার পর মধুসূদন আর একবার স্মৃতির ঘরটা ধরাবার চেষ্টা করলে,—“ইন্সপেক্টর কিন্তু বেশ বেথতে! আজকাল বাঙালী পুলিশ-অফিসারদের মধ্যে বেশ ভালো ভালো চেহারা দেখা যাচ্ছে। আমার ছেলেবেলা পুলিশ সার্কেট হবার খুব লব ছিল...”

তার কথায় মাঝখানে ডাঃ বাজপেয়ীর উত্তর স্বর পোনা গেল।—“কোনো বে কোনো আওতাধীন নই, মিসেস লাহিড়ী! একবারে খরিপ হতে গেছে।”

“দে কি!”—কণিকা ডাঃ বাজপেয়ীর কাছে ছুটে গেল।—“এই খানিক আগেই ত ঠিক ছিল, উনি বরাকরের একটা সোকায়ে কোন করে বস্তার খবর নিলেন।”

হঠাৎ মধুসূদনের উচ্চহাসিতে সবাই চমকে উঠল।

“কোনটাও পেছে জায়ে! বাস্, দুনিয়ার সব সম্পর্ক পড়ম। এই থই-থই জল, এই বাড়ি আর আমরা ক’জন। তারমধ্যে আমার একজন টিকটিকি অফিসার। বাঃ, নাটক যা লমবে!”—আবার মধুসূদনের হাসি আর খামতে চায় না।

“হাভুন!”—বীরস্বামী-ই ধমক নিলেন,—“এটা হাঙ্গির ব্যাপার নয়।”

মিস্ ধর লক্ষিত ভাবে এসিক-ভসিক চেয়ে বললেন,—“কোনের লাইন কেউ নিচ্চ ইচ্ছে করে কেটে দিয়েছে। তুমি, তুমি মধুসূদন কোথায় ছিলে এতক্ষণ?”

“আমার লমবেই করছেন!”—মধুসূদন আবার হেসে উঠল,—“কাটতে চাইলেও আমার খাড়া ও-কাণ্ডি হ’ত না। ও ইয়েকটি ক-লিগেরকটিতে আমার বস্ত্র ভয়। কখন কোথায় লব্ খেয়ে ঘরি আর কি? কিন্তু আপনি?”—হঠাৎ মূগু পড়ীর করে মধুসূদন বললে,—“আপনাকে পেছনের দিক দিয়ে স্বেচ্ছা-কাপড়ে বেন আসতে কেবলম গুণর থেকে! আমি ছিলে ছাচ থেকে বস্তার দূর দেখছিলাম কিনা!”

“আমি!”—মিস্ ধর একবারে আগ্রহ—“আমি ত আমার—আমি, একটা মিলিস জানতে পেছলাম। গুণর থেকে জানলো-মি, পড়ে গেছে।”

“কি পড়ে গেছে?”—বীরস্বামী-ই জিজ্ঞাসা করলেন।

“ভাতো আপনারদের কি বরকার?”—মিস্ ধর রেগে ঘর থেকেই বেরিয়ে বাড়িলেন। প্রবীর ও ইন্সপেক্টর যোথালকে কিরতে সেধে তাকে খামতে হ’ল।

যোথাল মিস্ ধরের মূগু সেধেই কিছু একটা হয়েছো অহুয়ান করে জিজ্ঞাসা করলেন,—“ব্যাপার কি,—কি বলে...?”

“আমার নাম মিস্ ধর।”—মিস্ ধর নিজেই ঠাঁকালো। গুলশা জানালেন।

“তা, মিস্ ধর, হঠাৎ এত চটেছেন কেন?”—একটু মধুসূদন ভাবেই যোথাল জিজ্ঞাসা করলেন।

“উইব না! এত বড় আশংকা! বলে কিনা আমি কোনের তার কেটেছি!”

“তা ত বলিনি মিস্ ধর...”—মধুসূদন আরো কি বলতে বাড়িল, যোথাল বাধা দিয়ে বললেন,—“কোনের তার কি কাটা নাকি!”

“কাটা কিনা জানি না।”—ডাঃ বাজপেয়ী বুকিয়ে গিলেন,—“কিন্তু কোন সাটা পাওয়া যাচ্ছে না।”

“আন্দর হ’—যোথাল এগিয়ে গিয়ে কোনের রিসিভারটা

তুলে নিলেন। খানিক নাড়াচাড়া পর হতাশ মুখ করে ফিরে এসে বললেন,—“না, একদম dead! হাজার লক্ষ অবশ্য বাতাল হতে পারে। কিন্তু তা এখ বসেই পক্ষে হ'চ্ছে।”

একটু চুপ করে কি যেন ভেবে নিয়ে খোঁসাল পকেট থেকে একটা মোটরটাই বার করলেন। তারপর সকলের দৃষ্ণের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন,—“চাকর-বাকর বাসে এখানে ত আপনারা সর্থাই উপস্থিত?”

কণিকা জানালে,—“না, বেস্টবানু বলে আর একজন আছেন। তিনি বুদ্ধ লোক, কাল এই দুঃখের মধ্যে এসে পড়বে হয়ে থাকে আছেন।”

“আচ্ছা, তিনি চাড়া আপনারা সর্থাই এখানে আছেন। মিঃ লাইডী ও কণিকা সেরীর কাছে করেচেন। কথা আমার ভানকর আছে। সেটা সেরেই আমি আসছি। আপনারা ততক্ষণ অগ্রহ করে এখানে থাকলে ভালো হয়।”

টুং-পেট্টেই খোঁসালের অগ্রহাথে প্রবীর ও কণিকা পানের ছোট্ট লাটব্রেস্টী-খোঁসেরে খরটিতে গিয়ে বসল।

খোঁসাল সরলটো ভালো করে বড় করার পর কণিকা আতুল ভাবে জিজ্ঞাসা করল,—“তি ব্যাপার হলু, মিঃ খোঁসাল! কিন্তু অস্ত্র কি আমেরা করেছি?”

“কত্থার করেছেন!—খোঁসাল সবিস্ময়ে খানিক কণিকার দিকে তাকিয়ে ঠিকৎ হেসে বললেন,—“না, না, দে-সব কিছু নয়। আপনারা তুল বুকেছেন বলে আমি দুঃখিত। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা, আপনাদের বিক্ষে কোনো অভিযোগ নিয়ে আমি আসিনি, আপনাদের বিপদ যাতে না হয় সেই জন্তেই আমাকে পাঠানো হয়েছে।”

“বিপদ?—আমাদের কি বিপদ?”—প্রবীর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

“বিপদ মোক্ষা সেরীর খুন হওয়ার ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত। কলকাতার গিরি বাড়ি সেনের দে ঘটনার কথা পড়েছেন নিশ্চয় কাগজে?”—খোঁসাল দুহানের দিকেই চাইলেন।

“হ্যাঁ পড়েছি!”—বীকার করলে কণিকা,—“কে না পড়েছে?”

“প্রথমে আমি জানতে চাই যে সেই মোক্ষা সেরীর সঙ্গে আপনাদের কাকর পরিচয় ছিল কি-না?”

“নাও কখনও শুনিমি।”—বললে প্রবীর। কণিকাও সাহা দিলে।

“আমিও তাই ভেবেছিলাম।”—খোঁসাল একটু থেমে

বললে,—“কারণ গিরি বাড়ি সেনে আসবার আগে মোক্ষা ঠাকুরপা নায়ে তিনি পরিচিত ছিলেন না। তখন সর্থাই তাঁকে মিসেস এম. ডি. বলেই জানত। ওইটাই তাঁর চলতি নাম হয়ে গিয়েছিল। তাঁর আসল নাম যে মোক্ষামনি হাল, তা অনেকে জানতই না। তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে একটা অনাধারসের মানেকারী করতেন। ‘চাপাখোলা’ অনাধারসের কথা শুনেছেন বোধ হয়? অনাধারসের কেদুটা নিয়ে কাগজে তখন খুব হেঁট হ'য়েছিল। সাম্প্রদায়িক লাকার হারা অন্যথ হ'য়েছিল, এমন অনেকগুলি ছেলোবেরে সেখানে থাকত। তাঁর মধ্যে তিনটি ভাই-বোন ছিল। অনাধারসের ছেলে-মেদের ওপর ম্যানেজার ও তাঁর স্ত্রী মিসেস এম. ডি. অত্যন্ত অত্যাচার করতেন। তিন ভাই-বোন সেই অত্যাচারের একমির পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে। ম্যানেজার ও তাঁর স্ত্রী তাদের অত্যন্ত মার-খোর করেন। একটি ভাই তাতেই অধম হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা পড়ে। মিসেস এম. ডি.-র কথা সাধারণে জানতে পারেনি, কিন্তু তাঁর স্বামীর বিক্ষে এই ব্যাপার নিয়ে পুলিশ কেন্দ্র করে। বিচারের সময়ই মিসেস এম. ডি.-র স্বামী কেমন করে গপিয়ে যান। কিন্তু তাহবের বিচার এতিয়েও কিম্বাতার বিচারকে তাকি দিতে পারতেন। তাঁর কয়েকদিন বাসেই মোটর-অ্যাক্সিডেন্টে তিনি মারা যান। কেদুটা তাতে চাপা পড়ে যায়। মিসেস এম. ডি.-ও অনাধারস হেঁটে গিয়ে একটু ভালো পাটে ওই গিরি বাড়ি সেনে এসে ওঠেন।”

বিবরণ শেষ করে খোঁসাল একটু খামলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন,—“এই মিসেস এম. ডি.-কে কেউ আপনারা ডিনতেন, না, এই অনাধারসের সঙ্গে কোন সংস্রব আপনাদের ছিল?”

প্রবীর ও কণিকা দুজনেই দৃঢ় ভাবে মাথা নাড়ল।

কণিকা তারপর জিজ্ঞাসা করল,—“কিন্তু আমাদের এদম কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?”

“করছি আপনারা বিপদ বলে।”

“আমরা! আমরা কেন বিপদ হয়?”—কণিকা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

“বিপদ ত হ'য়েই আছেন, শুধু কেন হ'য়েছেন সেইটাই বোঝবার চেষ্টা করছি।”—খোঁসাল একটু হেসে আবার বললেন,—“জানেন বোধ হয় যে, স্বামীর পকেটের জুটো ছাওবিল পুলিশ পেয়েছে? সে ছাওবিলে আপনাদের এই স্বাম্যনিবাসেরই বিজ্ঞাপন।”

“শুধু সেই ছাওবিল স্বামীর পকেটে ছিল ব'লেই এই স্বাম্য-নিবাসে সে হানা দেবে, বৃকতে হবে?”—প্রবীরের খরটা অবিশ্বাসের।

“না, শুধু তাই ভজত নব। সে ছাওবিলের পেছনে পেলিসে করেছটা কথাও সেবা ছিল। পুলিশের পক্ষে সে সেবা অগ্রাহ্য করা সম্ভব নব।”

“কি সেবা ছিল? কারুর নাম?”—উদ্গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলে কনিকা।

“না, নাম নব। সেবা ছিল—‘সিবি মাঝি লেনে তক, বাহানিবায়ে সেবা’। সেই ভজতই জানতে চাইছি মিসেস এম. ডি.-র বা তাঁর সেই ‘চাপাখোলা’ অমাখাভ্রমের সঙ্গে আপনাদের কোন সংগ্রহ ছিল কি-না। আপনাদের না থাক, বোর্ডারদের আর কারুর ছিল নিশ্চয়। নইলে খুঁদীর ও-সেবার কোনো মানে হয় না।”

“যানে হয়ত সত্যিই নেই!”—প্রবীর তার সম্বন্ধটা জানালে।

যোথাল হেসে বললে,—“অত সহজে পুলিশ ত আর ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারে না।”

“তার মানে এখানেও কেউ খুন হবে, বলতে চান!”—কনিকা সজব জিজ্ঞাসা করলে।

একটু চুপ করে থেকে যোথাল বীরে বীরে বললেন,—“আপনাদের আমি ভয় পাওখাতে চাইনি, কিন্তু আখাদের অহুমান তাই। খুঁদীর অভিশপ্তি যাতে ব্যর্থ করা যায় সেই ভজতই আনাকে পাঠানো হয়েছে। আপনাদের আত্মবিক সাহায্য পেলে আশা করি আমি বিফল হব না।”—যোথালের গলায় ঘরে একটু আবহমানের সুই পাওখা গেল।

“কিন্তু, এই মুহুর্তে খুঁদীর পক্ষে এখানে আর আদা সম্ভব?”—প্রবীর তার মনের সম্বন্ধটা ব্যক্ত করলে।

ইনস্পেক্টর যোথাল একটু বেন অহুশ্পাত্তর বললেন,—“আপনি তাই ভেবে আনন্দে আছেন বৃথি? কিন্তু খুঁদীর আর আদাবার বরকার নেই, এমনও ত হতে পারে।”

“তার মানে?”—কনিকা অবাক হয়ে যোথালের দিকে তাকাল।

“তার মানে, সে হয়ত আপনাই এখানে এসে বলে আছে।”

“তা কি করে হতে পারে! এক বীরখারী ছাড়া বোর্ডাররা সবাই আপন থাকতে চিঠি দিয়ে ঘর বিভার্ড করে এসেছেন—”

“আপন থাকতে চিঠি দেওয়ার মত এই খুনের ব্যাপারও সব আপন থাকতে প্রায় করা। তা ছাড়া আর একটা কথা ভুলবেন না। গত শুক্রবার সিবি মাঝি লেনে মোক্ষা সেবী খুন হয়েছে। আপনাদের সমস্ত বোর্ডার-ই এসেছেন তার পরে।”

“তাহলে—তাহলে কি বলতে চান, সেই ‘চাপাখোলা’ অমাখাভ্রমের সেই ভিটটি ভাইবোনেরই কেউ এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত? তারা ত নেহারে বাছা!”

“বাছা তখন ছিল। শান্ত এত বছর বাড়ে কি আর তাই আছে?”

“কিন্তু একজন ত মারা গেছে।”

“হ্যাঁ, যে মারা গেছে সে ছিল সবচেয়ে ছোটো। বরদ তখন তার বন মাত্র। তার বড় ভাই-এর বরদ তখন পনহো-বোলো, আর বোনের বাতো; বড় ভাই কিছুকাল আগে কোথায় একটা চাকরি নিয়ে চলে বাছ। বোনটি কোনো একটা ভাষা পরিবারে জাখ্যা পায়। কিন্তু সে পরিবারের কর্তা-গিরী দুজনেই হঠাৎ পর পর মারা গেলে কোথায় যে বাছ, কোনোও খোঁজ পাওখা যায়নি।”

“সেই বড় ভাই-ই এ সবের ফুল আছে লম্বা করছেন? কিন্তু বরদের মিক দিয়ে তাহলে ও একমাত্র—” এই পর্যন্ত বলেই কনিকা চুপ করে গেল। কনিকা কি বেন একটা কথা চেনে গেল বুঝেও যোথাল তা জানবার চেষ্টা করলেন না।

শুধু তার দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,—“বলত ত তাঁরান দায় নিলেস লাহিড়ী!”

“হ্যাঁ, তা বাছ।”—বলে কেনম বেন একটু বিরত ভাবে কনিকা হাছাখাটার ব্যাপারটা একটু তরারক করবার ভজত একবার রাতাছর দাবার অহুমতি চাইলে।

“না না, এব আবার অহুমতি চাইবার কি আছে!”—বলে কনিকাকে ছেড়ে দিয়ে যোথাল প্রবীরকে ও বোর্ডারদের কাছে দিয়ে তাদের প্রত্যেকের কয়েকটা বিবরণ একটা কাগজে টুক রাখতে বললেন।

“আপনি এই সাধারণ খবরগুলো নিয়ে রাখুন। আমি খানিক বাসেই যাচ্ছি।”—বলে যোথাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

যোথাল ওপরের তলাটা একবার ঘুরে এসে প্রথমে রায়দরই গেলেন। সেকেন্সে বিগিতি কাছদার রায়দর। জাখ্যা প্রচুর।

“আপনার কাজ কি হ’বে গেছে, মিসেস লাহিড়ী?”—একটু সন্তুষ্ট ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন যোথাল।

“হ্যাঁ, এই ঘরে গেল ব’লে! রায়দরকে একটু মদদা বাটতে পাঠিয়েছি, চাকরটাও ওপরে সব পরিচর করতে গেছে। এই ভালটা না দেখলে পুড়ে বাবে।”—একটু

লজিত ভাবে কবিকা বললে,—“হা শওগা আজ খাওগা, গোয়েন্দাগিরি তুলে ধায়েন।”

“আমার খেতে দেবেন বলছেন, এই শু আমার ভাগ্য।”
—বলে খোখাল হাসলেন।



ভালটা নাড়তে নাড়তে কবিকা বললে,—“কিছু দেখুন, হত ভাবছি, আমার কেমন সব আজগুবি মনে হচ্ছে।”

“আজগুবি নয় নিশেধ লাহিড়ী, একবারে খাটি সত্যি।”
—খোখাল হঠাৎ করে পাতা একটা ছোট ছোটকিতে গিয়ে বসলেন।—“কাগজে দুইর পোশাকের বর্ণনা শু পড়ছেন। আপনাদের এখানে তিনটি ঘরেই শু সেরকম ওয়াটারপ্রুফ আর বর্ত্তি টুপি টাঙানো হয়েছে দেখলাম। ভিন্নভাবে কেউই হয়ত সেদিন কলকাতার ছিলেন।”

“কিছু ধানের ওয়াটারপ্রুফ দেখছেন, তাঁদের কেউই কলকাতার লোক নয়। একটা বীরবাহীর। তিনি শু পরেই এসেছেন। আর দুটো মনুষ্যন আর আমার বামীর। আমার বামী শু এখানেই থাকেন, আর মনুষ্যন পাটনা থেকে এসেছে।”

খোখাল একটু হেসে বললেন,—“তবু এখানকার কেউ যে ঘরের দিন গত শুক্রবারে কলকাতার গেছেন, তার শু শট প্রমাণ রয়েছে।”

“প্রমাণ! কি প্রমাণ?”—কবিকার ভাল-নাড়া খেতে গেল।

যেতে থেকে থবরের কাগজের একটা পাতা তুলে নিয়ে খোখাল বললেন,—“এই কাগজটা।”

“কিছু ওটা শু আনন্দবাজার। আহার্য শু গ্রাহক।”—
কবিকা ভালের হাঁড়িটা মানিয়ে কাছে এসে গাডাল।

কাগজের পাতার মাঝার নিকট গেলিখে খোখাল বললেন,
—“হ্যাঁ, আপনারা গ্রাহক হিসেবে যে কাগজ পান সেটা জাক এন্ট্রিশন, মানে মকবল-সংরক্ষণ। কিছু এ কাগজটা কলকাতার। সেখানেই কেনা হয়েছে।”

“কিছু শু কাগজ—ও কাগজ কোথা থেকে এল!”—

কবিকা ভাববার চেষ্টা করলে।—“পুরোনো কাগজ বলে আমি হল থেকে ওটা হাওয়াঘরের কাছে লাগাতে নিয়ে এসেছিলাম।”

“মনে করতে চেষ্টা করুন, যে কাগজটা এনেছিল?”—
খোখাল কবিকাকে উৎসাহ দিলেন।

“না, মনে পড়েও পড়ছে না।”—বলে কবিকা হতানভাবে খোখালের নিকে চাইল।

“চেষ্টা করুন। এক সময়ের ঠিক মনে পড়ে যাবে।”

“তাহলে?”—কবিকা সবচেয়ে প্রমত্তা আর শেষ করতে পারলে না।

“হ্যাঁ, তাহলে একটা ঘুরে অস্তর: পাওয়া যেতে পারে এ সহজের।”—খোখাল উঠে গাড়ি নিয়ে বললেন,—“এখন বুকেই পারছেন কল্যাণেশ্বরী বাহানিবাস ঘুরে নিরাপদ আশ্রয় আর নয়। আচ্ছা, আপনারা শু মনে এটা ধুলেছেন। এ-বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা আছে?”

“হোটেলের থাকবার অভিজ্ঞতা আছে, চান্সাবার নয়। বিষের পর বাসার অভাবে হোটেলের বেশিরভাগ কাটিয়েছি কি-না।”

“বিরে আপনাদের কতদিন হয়েছে? কিছু যদি মনে না করেন অবশ—”—খোখাল একটু হুঁটিত।

“এই শেখবছর মায়।”

একবার মনে উত্থিত: ক’রে খোখাল ভিজালা করলেন,—
“জানামোনা অনেক দিনের?”

কবিকা লজ্জিতভাবে বললে,—“না, একরকম হঠাৎ। উনি তখন সলাগরী আহায়ে কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ান, আমি এয়ার-হোটেলের কাজ করি। যোগেতে ক’দিনের দেখা। তারপরই বিয়ে। আমি এক মাসের কিছু টাকা পেয়ে চাকরি ছেড়ে নিলাম, ওকেও ছাড়ালাম। তারপর ঘেসে ফিরে হা-ঘর কো-ঘর করে সেখ বছর কাটিয়ে এই বাহানিবাস খোলা।”

“আপনার বামী কি কলকাতার লোক?”

“না, ওটা প্রবাসী বাঙালী। আগাতেই বুকি ছা-তিন পুঙ্খ কেটেছে।”—বলতে বলতে কবিকার মনে হ’ল বামীর আগের স্বীকরণে কথা কতটুকুই বা সে জানে। প্রবাসী সে বিষয়ে কখনো নিশেধ কিছু বলেনি। সে-ও আগ্রহ প্রকাশ করেনি। অতীত নিয়ে মাথা-খাখাবার দরকারই বা কি, বর্ত্তমান যদি মূরু হয়।

“কিছু যদি মনে না করেন শু বলি,—খোখাল একটু হাসলেন,—“হোটেল চান্সাবার মত বহুদ আপনাদের হয়নি। আপনি শু কলতে গেলেন—”

কনিকা একটু হাসল,—“তা বরষ কম কি? এই ত ভেইশ হ’ল আমার, আর—”

কনিকার কথা শেষ হবার আগেই প্রবীর ঘরে ঢুকল।

“ওরে ত বা-বা বলেছেন মুকিয়ার দিয়ে মোটামুটি খবর দিয়েছি। এবার চলুন।”

“হ্যাঁ, আহ্নন মিসেস দাখিড়ী!”—ব’লে ঘোষাল এগিয়ে গেলেন।

প্রবীর ও কনিকার সঙ্গে ঘোষাল ঘরে ঢুকতেই সেখানকার গুরুন খেমে গেল।

তারপর প্রথমেই পোনা গেল মিস্ থরের কাঁকালো গলা—“বা জানতে চান চটপট মিষ্টিমা স্কন্ধ। ভালো হোটেলসেই এসেছিলাম। একহও এসে অর্থনি খতি পেলাম না। শেষ পুসিনের! কোথার কলকাতার কি হয়েছে তার খোঁজ নিতে এসেছে এবারে? সব অকর্মার বাড়ি। নইলে এতদিনে একটা ঘুরে কিনারা হয় না!”—

মিস্ থরের মুখের তোড় বোণহর সমানে চলত, কিন্তু ঘোষাল হাত তুলে তাঁকে থামালেন।

“আপনারা ব্যাপারটা মোটামুটি শুনেছেন। এখন শুধু একটি প্রশ্ন আমার করবার আছে।”—ঘোষাল সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন,—“‘টাগাথোনা’ অনাধারত্বের সঙ্গে আপনারা কে কে ভড়িত ছিলেন?”

ঘর একেবারে নিষড়। সবাই একসুটে ঘোষালের দিকে তাকিয়ে।

“আমার কথাটার মানে ভালো করে নিচয় বুকেছেন।”—ঘোষাল আবার বললেন,—“আপনাদের একজনের বিপর একেবারে আসন্ন। কার মাথায় সেই খাঁড়া জ্বলছে আনি জানতে চাই।”

তবুও কান্নর মুখে কোনো কথা নেই।

ঘোষালের সন্টার ঘরে এবার একটু ঝঞ্ঝাট প্রকাশ পেল।

—“আজ্ঞা আনি এক এক জন করে সকলকে মিষ্টিমা স্কন্ধ।

আপনি...”—ঘোষাল প্রবীরের দেওনা কাগজটা একবার দেখে বললেন,—“আপনি বসুন, মি: বীরস্বামী।”

“আমি!”—বীরস্বামীর মুখে একটু হুপি হুপি আভাস খেলল,—“আমি ও এদিকের লোক নই। নানা জায়গা ঘুরে বেড়াই। কলকাতার ওই ব্যাপারের কথা জ্ঞানিনি পর্যন্ত।”

ঘোষাল মিস্ থরের দিকে কিললেন,—“আপনি।”

“আমি,—আমি?”—মিস্ থর একটু বেন বতবত বেয়ে

বললেন,—“এসব প্রশ্নের কোনো মানেই হয় না। আমার কোনোও সম্পর্ক নেই শু-ব্যাপারের সঙ্গে।”

“মধুসূদনবাবু?”

১. “আমাকে মিষ্টিমা স্কন্ধ।

“হ্যাঁ, আপনাকে ছাড়া আর কারো?”—ঘোষাল একটু হেসে বললেন,—“আপনার নামই শু মধুসূদন দত্ত।”

“হ্যাঁ,—জব আমি শু তখন নেহাত চোটে।”—মধুসূদন বেন অশোচনার সঙ্গে বললেন,—“এমন একটা দারুণ ব্যাপার জানবার বরষই হয়নি। তা যদি...”

“তা: বাবশেরী!”—মধুসূদনকে কথা বাড়াতে না দিয়ে ঘোষাল তা: বাবশেরীর দিকে কিললেন।

তা: বাবশেরীর উত্তর দিতে একটু বেন তেরী হ’ল।

“আমি—ধিড়ান বেন কতি—হ্যাঁ, আমি তখন ক্যাশালোরে একটা লকস্টিমিতে কাজ করি।”

“তাহলে কেউই আপনারা অনাধারত্বের সঙ্গে সন্ধ্য বীকার করছেন না?”—ঘোষাল হতান ভাবে মিষ্টিমা স্কন্ধ বললেন,—“তাহলে কেউ যদি আপনারা খুন হ’ল, তার অস্ত্রে নিষেই দাবী করেন।”

কথাটা ব’লে ঘোষাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েক মুহূর্ত সবাই হুপি। তারপর মধুসূদন হেসে উঠে বললেন,—“ব্যাপারটা খুব রোমাক্কর হচ্ছে কিন্তু। এই আমরা ক’জন। এর মধ্যে একজন মারা পড়বো!”

“হুপি করে কামিল হোক?”—মিস্ থর থমকে উঠলেন।

কিন্তু মধুসূদন অত সহজে থামবার ছেলে নয়। মিস্ থরের দিকে কিল সে বলল,—“থখন, হুপিহুপি ঠিক আপনাদের পেছনে গিয়ে আমি হাঝির হয়েছি। আপনি কিহুতে-না-কিহুতেই গলায় একটি ঠান। বাস!”

“ধামুন মধুসূদনবাবু!”—প্রবীর সরোবে বেন গর্জন করে উঠল,—“রসিকতার একটা সীমা আছে!”

“কিন্তু এটা যে সীমা-ছাড়ানো রসিকতা। আর রসিক



সেই খুনে আমাদের মধ্যেই যে লুকিয়ে আছে!”—হঠাৎ লজ্জাবে হেসে উঠে সে সকলের দিকে চেয়ে বলল,—“নিজেরে মূখণ্ডো যদি আপনারা দেখতে পেতেন।”

হাসতে হাসতেই মধুসূদন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

“অন্য ভাষা মক্ট!”—মিস্ ধর ভিত্তরের বললেন,
—“পাশা-পাশা কে রেখে ওর ডিক্‌শনারি ব্যবহার!”

“ডিক্‌শনারি হুত আমাদের অনেকেরই ব্যবহার, মিস্ ধর!”

—কণিকা মধুসূদনের পক্ষ নিয়ে না বলে পারলেন না।—

“মধুসূদনের একটু মাফিয়ার কথা। কিন্তু তার কারণও আছে। শুনলাম, একবার টেন-আক্সিডেন্টে পড়ে ও নাকি বাজো ঘটা গাড়ির তলায় চাপা পড়ে ছিল। নেহাত তগোগার ভোরে উদ্ধার পাব। তাইতেই একটু কেমন হয়ে গেছে।”

“বিশেষ পড়লেই যদি মাথা ব্যথা পড়ত, তাহলে এমন নবীর পুতুলের দুনিয়ায় বাস করাই উচিত নয়। লোকের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা আহার হয়েছে...”

হঠাৎ মিস্ ধরকে খাতির তাকে বাজপেটী কঠিন করে বললেন,—“আপনি—গাভান। গ্রিক লোকের সময় আমিও কলকাতায় এসেছিলাম। আপনার ছবি যেন তখন কলকাতায় কাগজে দেখেছি। গোভা থেকেই তাই আমি ভাবছিলাম কেন আপনারকে কেনো-কেনো লাগছে।”

“আপনার বৃত্তপত্র ত খুব!”—বীরবাহী একটু বিচলিত হয়ে বললেন,—“খবরের কাগজের ছবি এতদিন আপনি মনে করে রেখেছেন।”

“মনে রাখবার একটু কারণও যে আছে।”—ডাঃ বাজপেটী নিজে সাবাই পিলেন,—“ওর বিকৃতি যে হুত ক’রে ছবিবৃত্ত কাগজে যেহিঁকেছিল। আর সে বিকৃতি একটু অসাধারণ। ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না।”

“হ্যাঁ!”—মিস্ ধর একটু গর্বভরেই বীকার করলেন,—“আমি বিনতিন হুতর পাগাং একটা জোবাচ্চার মধ্যে পড়ে ছিলাম। তিনদিন বাসে উদ্ধার এখন হয়, তখন যে বাড়িতে ভাড়া ছিলাম, তাদের...”

হঠাৎ মিস্ ধর থেমে গেলেন।

“গানলেন কেন? কলুন, মিস্ ধর!”—ডাঃ বাজপেটীর হর বেশ চড়।

“না, বলছিলাম,—তিন দিন বাসে উদ্ধার শেষে আবার একটা মাল্লায় নিয়ে যাব।”

“সাধারণ আংগা নয়, সেটা ‘টাগাখোলা’ আংগা!”—ডাঃ বাজপেটী কাছে এসে ধাক্কা দিলেন।

“হ্যাঁ, ‘টাগাখোলা’ অমাবাভবই হ’ল! তাতে হয়েছে কি?”—মিস্ ধরের বাঁকটা যেন আর নেই।

“হয়েছে এই যে, ওই তিনটি ভাইবোন আপনার বাড়িওয়াসারই ছেলেমেয়ে। আপনার সঙ্গেই তারা ওই আশ্রমে আশ্রয় পায়। তাদের আপনি চিন্তেন।”

“হ্যাঁ, চিন্তাও, কিন্তু তাই হ’লে তাদের ভার নিতে বললে আমি নেব কোথা থেকে! আমি এতলা মাল্লা। ও-লব কাবেলা আমার পোষা!”—মিস্ ধর যেন কাণ্ডর তাতে কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করলেন।

“তাহলে ওই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আপনারও সম্বন্ধ ছিল?” আপনারকে অগ্রোধ করা সত্ত্বেও আপনি ওদের ভার নেন নি?”

—প্রবীরই এবার জিজ্ঞাসা করলেন।

“না, নিই নি, নিই নি!”—মিস্ ধরের গলা তীক্ষ্ণ হ’য়ে উঠল,—“তখন কি করে জানব যে ওই অম্বা তাদের ওখানে হবে? আমি ত জেনেতেন তাদের কতি করিনি!”

“কিন্তু ইন্সপেক্টর বোবালাকে একথা তাহলে জানলেন না কেন?”—ডাঃ বাজপেটী জিজ্ঞাসা করলেন।

মিস্ ধর এবার নিজেই খানিকটা সামলে নিলেন,—“জানাতে বাবই বা কেন? হুতলব বাজে প্রব। পুলিশ কি-ই বা কল্পতে পারে। তাদের সাহায্য না হ’লেও আমার চলবে।”

“কিন্তু তুমি কখনো জানালে ভালো করতেন।”—বলে ডাঃ বাজপেটী চলে যাচ্ছিলেন। বীরবাহীর কথাও ঠাণ্ডে বাজতে হ’ল।

“আপনি কিন্তু এত কথা জানলেন কি করে, ডাঃ বাজপেটী? শুধু খবরের কাগজের ছবি দেখে আর বিগৃতি পড়ে ত এত জানবার বেতাবার কথা নয়!”

“আমি—যানে—” ডাঃ বাজপেটীকে এই প্রথম একটু অপ্রস্তুত দেখা গেল,—“আমার জানা-বোকাটা খানিকটা মরুপণ্ডিত, খানিকটা অস্থান থেকে বলে দরে নিতে পারেন।”

ডাঃ বাজপেটী আর করে ধাক্কা দেন না।

কণিকা এতক্ষণ মিস্ ধরকে একটু বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল। এবার সে বলল,—“হ্যাঁ, আমারও মনে পড়েছে। আপনি ‘টাগাখোলা’ অমাবাভব অনেক দিন ছিলেন।”

“ভূমি! ভূমি কি করে জানলে কণিকা!”—প্রবীর তীক্ষ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

কণিকা কিছু বললেন না। আগেই বীরবাহীর হাণি তখন সবাই চক্ষু উঠল। বীরবাহী নিজের মনেই থুৎ থুৎ করে হাসছেন। তার দিকে দৃষ্টিতে চাইতে দেখে তিনি অপরায়ী মত বললেন,—“আমার মাক করবেন। মধুসূদনবাবুর মত আমায়ও বাতাজান হাণিয়ে গেছে। সমস্ত ব্যাপারটা হুত ঠকবর, হুত সম্ভার লাগছে আমায়।”

“ও! আপনার মজার লাগছে বুঝি!”—যোথাল তীক্ষ্ণ হাসের স্বরে বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন।

“যাক করবেন, ইন্সপেক্টর সাহেব। যাক করবেন। আমি অত্যন্ত গুণ্ধিত ও গম্ভীর। মাক-কান-মলা থেবে আমি চলে যাইছি।”

বীরস্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু বাওরার খবর যোট্টেই লজ্জা পাওরার লক্ষণ দেখা গেল না। বেন ভেতরে-ভেতরে একটা মধ্য উণ্ডোপ করছেন, এইভাবে চল গেলেন। এবারও কবিকার ঘনে হ'ল চটপটে চলার ভণিটা মোটেই পাকা-চুলের সঙ্গে খাপ খায় না।

“এক কিছুতকিয়াকার!”—মন্তব্য করেন প্রবীর।

“ভেতরে পড়শাল আছে নিশ্চয়। চেছারাটাই কেমন পতানোর মত।”—যোথালও হানের কথাটা প্রকাশ করে ফেললেন,—“ওরকম মোককে এক-চুক বিখাপ করতে নেই।”

কবিকা হঠাৎ বলে উঠল,—“আপনারও তাই ঘনে হচ্ছে তাহলে। কিন্তু ওর মত ত অনেক বেশি—তবে সত্যিই কি তাই? ভুল্লোক ঘনে ঠিক দেখে থাকেন ঘনে হয়। হাটেন কিছু জোয়ান পুকুরের মত। হরত বুড়োর ছত্ৰবেশ করে থাকেন। আপনার কি ঘনে হয় মি: যোথাল?”

যোথাল একটু বেন হুড় ডাবেই কবিকাকে ঘামিয়ে ফিলে,—“আম্বে-বায়ে রক্তন করে কোনো লাভ আছে কবিকা কেবী? অহুমান নয়, আহাশের প্রমাণ সবকার। আপাতত: ফোনটা মেয়ামত করবার ব্যবস্থা না কর্ত্তে নয়। আহ্ন মি: লাহিড়ী, দেখি কি করা যায়।”

প্রবীরকে নিয়ে যোথাল বেরিয়ে গেলেন।

দুপুরের বাওরা-বাওরার পর যোথাল টেলিফোনের তারটা বাড়িতে বেধান দিয়ে গেছে, দেখতে দেখতে বাড়িলেন। লগ্নে প্রবীর।

“ওপরে Estention Line গেছে না?”—প্রবীরকে জিজ্ঞাসা করলেন যোথাল।

“হ্যাঁ, ওপরের হলে একটা টেলিফোন আছে।”

“আজ্ঞা দেখে আসি।”—ব'লে যোথাল সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন।

সেই সময়টাতে বীরস্বামীকে এদিক একটু ঘুরে ওপরের হল-ঘরে ঢুকতে দেখা গেল।

হল-ঘরের এক কোণে বড় একটা অর্গ্যান আগেকার দিনের চিহ্নরূপ পড়ে আছে। ওপরের-চাকরানটা সরিয়ে

বীরস্বামী এক আলুসে ক'টা চাবি টিপে একটু বাজাবার চেষ্টা করলেন।

না, অর্গ্যানটা একেবারে ধারণ হয়ে যায়নি। একটু বেহরো হ'লেও এখনো আওরার বার হয়।

বীরস্বামী বাজাবার চরকি-টুলটার ব'লে এক-আলুসে একটা পানের দূর বাজাতে লাগলেন। গানটা বার ভানো সে হুকে পায়ত, সেটা হাসকিল হুজুক-তোলা একটা ফিনের গান—“সে যে চুপি চুপি আসে!”

যুগ্মস্বন তার নিম্নের শোবার ঘরে শিল দিতে-দিতে পারচারি করছিল। হঠাৎ শিল ঘামিয়ে সে বিভ্রানার ঘারে ব'লে হু-হাতের মধ্যে হু হুতে হতাপ ডাবে বেন অশুট আর্ভনাল করে উঠল,—“গারব না, আমি গারব না!”

তারপর নিজকে বুঝি সে শামলে নিলে। উঠে বাড়িয়ে সে নিম্নেই বেন উৎসাহ দিলে,—“না, শক্ত-আমার হতেই হবে।”

প্রবীর নীচের ঘরে টেলিফোনটা পরীক্ষা করছিল। হঠাৎ টেলিফনের ঢাকনার নিচে একটা মাথখানা-বেরিং-মালা কাপড় তার চোখে পড়ল। কাপড়টা বার করে দেখে তার ঘুরে চেছারা একেবারে বললে গেল। কাপড়টা কলকাতার এক নাম-করা বৈশালি সোকারির হসিন।

হসিনের তারিখ এই মডেবর।

এই মডেবরই ত সেই শুক্রবার। সেদিন নিজে সে বাধ্য-নিবাসে ছিল না। সকালে বেরিয়ে রায়ে ফিরেছিল।

কবিকা তাহলে কলকাতাতেই পেছল তারই মধ্যে!

কবিকা রাত্রাঘরে বিভ্রালের লগ্নাখাবারের ব্যবস্থা করছিল। ভাগ্যে সেদিন বরাকের গিরে গাড়ি-ভর্তি জিনিশপত্র এনেছিল তাই। নইলে এতগুলো মাড়ফকে ত উপাস করে মরতে হ'ত। কিন্তু লগ্নাখাবারের কিছু অমল-বমল করা ত অসম্ভব।

যা জিনিশপত্র তাঁড়ারে আছে তা গিরে লগ্নাখাবারের কী নতুন কিছু করা যায়—ভাবতে-ভাবতে প্রথমে গবরের কাগজের নতুন বাহার নির্দেশ, এবং তা থেকে সেদিনের সেই আনন্দখাকার গম্ভীর কথা ঘনে পড়ল।

কায় হাতে কাগজটা সেদিন বেন ধেবেছিল, কিছুতেই ঘনে পড়ছে না। হল-ঘরে ভা: বাজগেই কি?—না না, বাজগেই নয়, কাগজটা কে বেন এনে এক কোণে ফেলে—

হঠাৎ কবিকার মুখটা ক্যাকাশে হয়ে গিয়ে ঘনে হ'ল বেন
নিশাসটা বন্ধ হয়ে থাকে।

না, না—এ হতে পারে না! কখনো হতে পারে না।

বেশ কিছুকণ অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে বীরে বীরে
রাধাপথ থেকে বার হ'ল।

সমস্ত বাড়িটা নিঃশব্দ। না, নিঃশব্দ ঠিক নয়। কোথা
থেকে অস্পষ্ট ভাবে পিস শোনা যাচ্ছে। সেই হতজ্ঞাড়া
ঝিনের গ্যানটার ছর।

না, আপাততঃ তার আবার রাধাপথেরই ফিরে যাওয়া
ডালো। সেখানে অস্বস্তঃ খানিকটা একা-একা সমস্ত
ব্যাপারটা ভাবা যাবে।

তাঃ বাতপেশী ওপরে নিম্নের ঘর থেকে বেরিয়ে আর
একটিঘরে ঢুকলেন।

“কেমন আছেন আর বেকীবাবু?”

বিছানার গলা পর্যন্ত সাশ চামর ঢাকা ফিরে বুদ্ধ বেকীবাবু
ওয়ে-ওয়ে একটা বই পড়ছেন। বইটা মুড়ে রেখে হাসিমুখে
বললেন,—“ভালো, বেশ ভালো।”

বাথানো হাতগুলো খোলা থাকার দরুন কথাগুলো অত্যন্ত
অস্পষ্ট।

“তা ভালো হলেও বিছানার ওয়ে-ওয়েই কাটাবেন?
একটু উঠে ঘেঁটে বেরাবেন না!”

বেকীবাবু ফোকলা মুখে বললেন,—“বেড়াবার জালা কি
কোথাও রেখেছেন?”—তারপর নিম্নেই আবার বললেন,—
“আমার এই ওয়ে-ওয়ে বিশ্রাম করবার জগ্রেই আলা।
আমার জগ্রে ডাববেন না।”

“আচ্ছা, তাহলে বিছানায়ই করুন।”—ব'লে ঘর থেকে
বেরিয়ে এমিক-ওমিক একবার চেয়ে তাঃ বাতপেশী হঠাৎ
মেঘবনের শিঁকি দিয়ে ডাড়াডাড়ি নিচে নেমে গেলেন।

নিচে নেমে আবার তাঁকে সতর্কভাবে এমিক-ওমিক
চাইতে দেখা গেল। না, কেউ এমিকে নেই।

এবার তিনি সতর্কপণে শেছনের দিকের একটা বড় ঘরের
সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঘরের সরষাটা বন্ধ, তবে জালা-সেওয়া নয়। একটা মড়ি
দিয়ে কড়া-ছুটে বাধা।

যা করতে চান, এই তার ঠিক সময়।

তাঃ বাতপেশী দ্বিপ্র নিপুণ হাতে মড়ির বাঁধন খুলে
ঘরটার ভেতরে ঢুকলেন।

দ্বি প্র নিম্নের ঘরে ব'লে রেডিওটা চালিয়ে ছিলেন।
নিচের হল-ঘর থেকে ভেন করে এটা তিনি নিম্নের ঘরে
আনিরেছেন। রেডিও শোনবার জগ্রে নিচ-ওপরে তিনি কহতে
পারছেন না, আর অস্ত কালর বখন আগ্রহ নেই তখন তাঁর
ঘরে এটা থাকলে সোব কি! ওপরের ইলেকট্রিক লাইনের
নতুন ফিউজটা লাগাবার সবচেয়ে প্রবীরকে দিবেই তিনি
এ কাষটা করিয়ে নিরেছেন।

প্রথম চাঘি ঘোরাতেই কি একটা বকবকানি শোনা
গেল। বিরক্ত হ'য়ে চাঘিটা আর একটু ঘোরাতেই একটা
গান ভেসে এল।

কি ছাই গান! যেমন গানের কথা, তেমনি ছর!

“সে যে চুপি চুপি আসে:

মানি না কখন এল, কাছে এসে হাসে।”

.বাদুর

রাড় এও কোহ

শ্রমিকদের উন্নতিসকল করুন বনরজী

১০/১, কানন টাউন



সুন্দর ও
মজবুত

ফোন:

৩৪-২৪১২

জলিকাতা-৩২

পানটাত বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পেছনের দরজাটা খোলাব শব্দ চমকে দিলে ডাকলেন।—“আরে, আমি ভাবলাম...”

কি ভাবলেন তা আর না বলে মিস্ বর বেড়িও নিয়ে পড়লেন,—“কি সব আছে-বাথে গান বে বেছে চাই! শুনেলা গা আলা করে।”

“শুনে আর কি হবে!”

“কিছু না শুনে কি কঠি কি? আগে জানলে এমন মেলাবার আসভায়! চারিদিকে জল, আর তার যাকথানে হুঁটো হয়ে কোন্ এক খুনে বসবাসের সঙ্গে দিন কাটানো। আমার অবস্থা ওদন আঙণবি কথায় বিশ্বাস নেই।”

“বিশ্বাস দ্বিষ্টা নেই?”

“ভাব যান? কি,—কি ব্যাপার—” মিস্ বর চীৎকার করে উঠলেন।

মিস্ বরের চীৎকার যাকথানে বেয়ে গেল। ওঠাটা-প্রশ্নের কেউটা মিশ্রণ হাতে ছুঁতে পলায় লাগিলে তখন ঈশ টেনে শেষ করে কেঁধা হচ্ছে।

যেতিয় চাবিটা আর একটু হুরিয়ে দিতেই, ‘চুপি চুপি আসা’র পানটা গাং-গাং করে বেছে উঠল।

অন্ত কোনো আওরাম আর কিংব শোনা গেল না।

খুশী আনাড়ি নয়।

নিচের হল-খরে একটা গুঃসহ বন্ধঘরে আঁহাওয়া। বৃদ্ধ বেষ্টীবাবুও তাঁর বিছানা ছেড়ে নেমে এসেছেন।

কবিকার মুখ এখনো একেবারে ছাই-এর মত সাদা। এবার তাকে কয়েক কোটা ত্র্যাণ্ডি খেতে দিলেছে। কিন্তু সত্য শরীর তার বেন থেকে-থেকে কেঁপে উঠেছে।

মিস্ বরকে চা দিতে দিয়ে দে-ই প্রথম তাঁর মুক্তবেহ আবিষ্কার করে।

“আচ্ছা, আগনি ভালো করে আর একবার ভেবে দেখুন, মিস্ বরের করে বাবার সময় আগনি কাউকে দেখতে বা কোনো কিছু শুনতে গান নি?”—খোশাল বতখানি সঙ্ঘব ব্যাভাবিক পলায় বিজ্ঞাসা করলেন।

“হ্যাঁ, একটা শিসের শব্দ! না—না, সেটা অনেক আগে।

আমি যেন একটা মরলা-বন্ধ-করাব শব্দ শুনলাম।”

“কোথায়?”

কবিকা একটু জেবে বললে,—“আন্দর্প, আওরাজটা বেন নিচে বাড়ির পেছনে যেন হয়েছিল।”

“ভালো করে মনে করবার চেষ্টা করুন মিসেস লাহিড়ী, আপনার মনে করার ওপর অনেককিছু নির্ভর করছে।”

“না, না—আমি কিছু মনে করতে পারছি না!”—কবিকা কাতর ভাবে মাথা নাড়লে।

“কেন শুকে নিছিনিছি কষ্ট দিলেহন?”—প্রবীণ তাঁর প্রতিবাদা জানাল।

খোশাল একটু হেসে বললেন,—“কষ্ট আমি ইচ্ছে করে দিছি না, মিঃ লাহিড়ী। কিন্তু খুনের তত্ত্ব খুব মধুর কি হয়?”

একটু চুপ করে থেকে খোশাল আবার বললেন,—“মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এখনও কত গুরুতর, আপনারা দখাই বুঝতে পারেননি। মিস্ বর আমার কাছে সত্য কথা বলেননি। তার বল কি হচ্ছে আপনারা জানেন। এখনও সব কথা ধরি জানা না বার, তাহলে আর কাউকে হেড জীবন খিয়ে তার প্রারচিত্ত করতে হবে।”

“আরো একজনকে? কেন?”—বৃদ্ধ বেষ্টীবাবু বিজ্ঞাসা করলেন। বাঁধানো ষাঁত প’রে তাঁর কথাগুলো এখন অন্ততঃ শব্দ।

“কেন? তা আমি ঠিক জানি না, তবে মনে হয় জিন ভাইবোনের নামে জিনজনের গ্রাণ নেওয়াই খুশীর উদ্দেশ্য। তা ছাড়া সেই ছাওবিলের পেছনে যে কথাটা দেখিলে দেখা ছিল সেটাও মনে রাখা বরকার।—‘গিরি হাবি সেনে শুক, হাখানিবায়ে শেষ।’ সে শেষ হয়ে দিয়ে থাকলে আরও খুশিই হ’ব, কিন্তু তবু সাবধান হওয়াই উচিত।”

“কিছু সাবধান কি ভাবে ছরন? বাইরে থেকে কারুর আসবার উপায় নেই। স্তরবাঃ আমাদের একজন যে খুশী এ-বিষয়ে সত্বেহ নেই। সেই একজন যে কে তা বোরবার কোনো উপায় আছে কি?”—বীরখাশীর পলায় বরে পুলিশের কবতার একটু অসহায় প্রকাশ গেল।

খোশাল একটু জুড়খরে বললেন,—“সেই উপায়ই বার করতে হবে। আচ্ছা, আপনারা প্রত্যেকে যে বিবরণ আমায় দিলেহন, আমি আর একবার তা পড়ে শোনাই।”

নোট-বইটা বার করে খোশাল এক-এক করে পড়ে শোনালেন।

“মুখুখনবাবু!” আগনি বললেন যে খর থেকে বার ফানি?”

“না!”—মুখুখনবাবু যেন কেমন বকলে দিলেছে। তার সে স্মৃতির উজ্জল কোথায় দিলেছে উবে।

"বেটাবাবু!—না, আপনি ত বিদ্বান। থেকে ডরেননি আমি। আপনি প্রবীরবাবু! টেলিকোন্ট। পরীক্ষা করছিলেন?"

"হ্যাঁ।"—বললে প্রবীর।

"বীরবাবু! ওপরের হল-ঘরে অর্গ্যান বাজাচ্ছিলেন?"

"তাকে বাজানো বলে না।" বীরবাবুই শুধু যেন এই ঘটনার পরও সমান তাম। আছেন।—"এক আঙুলে একটা গান বাজাবার চেষ্টা করছিলাম।"

"কি গান?"

"আপনারে বালাকেলের এখনকার সবচেয়ে চাপু গান। বিড়িওয়ালা থেকে গল্প শাড়ির গাড়োয়ানরাও যে গান গায়।"

"কি দে গান?"—যোবাল একটু অইয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন।

"আপনি জানেন না হুঁজি?—সেই—সে যে 'চুপি চুপি আসে'! গানের ঘরে মধুসূদনবাবুও ও এই গানের হুই শিল মিলিয়ে।"

যোবাল ভূ-ভূতে মধুসূদনের হিকে তাকাতো সে যেন একটু বিরত হয়ে বললে,—"টিক ভেমনভাবে ও হুই ডাঙিনি। নিঃসঙ্গ অরণ্যেই এসে গেছে।"

ডাঃ বাজপেয়ী এত নাচে জিজ্ঞাসা করলেন,—"আচ্ছা, টেলিকোন্টের বাইন কি আপনা থেকেই খারাপ হয়ে গেছে, না কেউ কেউ দিয়েছে? কিছু জানতে পারলেন?"

"পেরছি। নিঃসঙ্গ খাবার ঘরের বাইরের মেঝেতেই ভাঙটা কাটা। আমি সেই কাটা লাফাটা তখন সবে দু'বে বাজ করেছি, এমন সময় চীৎকার শুনলাম। কিন্তু চীৎকারটা যেন যাকপথেই থেমে গেল মনে হ'ল। কিন্তু আপনি ডাঃ বাজপেয়ী! আপনি বলছেন বেসীবাবুর ঘরে গেছেন?"

"হ্যাঁ।—মানে—তার ঘরেই থাকিনি।"—ডাঃ বাজপেয়ী বেসীবাবুর হিকে চেয়েই যেন একটু বেশী বিরত হয়ে গ'ড়ে বললেন,—"আমি আবার নিজের ঘরে কিরে গিয়েছিলাম।"

"তা হলে নিশু ঘরের চীৎকার ত আপনার শোনার কথা। চীৎকারটা হঠাৎ যাকপথে বন্ধ হয়ে গেছে কি?"—যোবাল ভীত দৃষ্টিতে ডাঃ বাজপেয়ীর হিকে তাকালেন।

"হ্যাঁ।—মানে—সেই রকমই যেন মনে পড়ছে।"

"এ ত যেন-বদির কথা নয় ডাঃ বাজপেয়ী!"—যোবালের ঘর বেশ কঠিন,—"বৃত্তিপতি ত আপনার ভাসোই বলে শুনেছি।"

"আপনি মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন মি: যোবাল!"—শুধু যোবাল নয় আর সবলেও প্রবীরের আচমকা এই কথার একবারে চমক উঠল।

যোবালের মুখ-চোখ আশ্চর্যবশত চোঁসলেও লাল হয়ে উঠেছে তখন।

"কোন্ট। মিছিমিছি করছি বলুন?"—ভরতাবে বলার চোঁসলেও যোবালের গলার ঘর একটু অস্বাভাবিকই শোনা।

"আপল কাজ না করে আর ঘাই কখন, তাতে মিছিমিছি সময় নষ্ট।"—প্রবীর দৃঢ় ডাবে জানাল।

"আপল কাজটা কি?"—এতকণে যোবালের মুখে হাসি ফুটল।

"আপল কাজ, সবকিছু গ্রহণ থাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিবে হিকে, তাকে এখুনি প্রেষ্টার ক'বে সমস্ত ব্যাপারটার নিশ্চিন্তি করা।"

"সে কে?"—যোবালের মুখ আবার কঠিন হয়ে গেল।

নাটকীয় ভাবে আঙুল দিয়ে দেখাতেই মধুসূদন কাতর ভাবে চীৎকার করে উঠল,—"না, না—আমি না, আমি কিছু জানি না—এ সব আবার বিকটে বড়বড়! সবাই আমার বিকটে আমি জানি..."

"শান্ত হোন মধুসূদনবাবু!"—বুড় বেসীবাবুই বলে উঠলেন।

"কিছু ভয় নেই মধু!"—কদিকা তার কাছে এসে তার হাতটা ধরে ধাক্কা।—"কেউ তোমার বিকটে নয়, তোমার কোনো ভয় নেই।"

যোবালের হিকে ফিরে কবিকা ব্যাঙল ডাবে বললে,—
"বলুন মি: যোবাল, কলুন ওকে প্রেষ্টার করবেন না।"

যোবাল নিকেই যেন একটু বিমূঢ় হয়ে গেছেন হঠাৎ এই নাটকীয় ব্যাপারে। তিনি হেসে বললেন,—"আমি কাউকেই প্রেষ্টার করছি না। প্রেষ্টার করার ক্ষেত্রে আমার গ্রহণ বরকার—এমন কোনো গ্রহণ আমি এখনো পাই নি।"

"কখনো শেতেছেন!"—প্রবীর তীব্র স্বরে বললে,—
"কদিকার মাথা ব্যাঙল হয়ে গেছে, আর আপনারও বোধহয় সফল। সেই ভিন্ন ভাই-বোনের একজন যদি এঁখানে সত্যিই আছে হুন করেন, তাহলে সে মধুসূদন ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। ওর বয়স যেহুন, ওর ছেলেবোনের কথা জিজ্ঞাসা করুন..."

"তুমি একটু ধামবে!"—কদিকার চোখে এমন একটা দীপ্তি যে প্রবীরকে বামতে হ'ল।

কবিতা ঘোষালের দিকে ফিরে শান্ত ঘরে বসলে,—
“আপনার সঙ্গে আমার গোপনে একটা কথা আসোচনা
করবার আছে।”

“বেশ ত।”—ব’লে ঘোষাল সতলের দিকে চাইলেন।

“আমরা যাচ্ছি।”—ব’লে আর সবাই বেবিবে গেলেও
প্রবীর ধড়িয়ে রইল।

“তোমাকেও যেতে হবে।”—কবিতা দৃঢ় স্বরে বললে।

কবিতার দিকে অসন্ত দৃষ্টি হেনে প্রবীর এবার
বেগিয়ে গেল।

“কি বলতে চান, বলুন।”—ঘোষাল উৎসাহ দৃষ্টিতে
কবিতার দিকে চাইলেন।

“গুহম মি: ঘোষাল, আপনারা সবাই ধরে নিয়েছেন যে
সেই তিন ভাই-বোনের যে বড়, সেই এসব ব্যাপরের
মূলে আছে।”

“সেই রকম অনেকগুলো প্রমাণ যে পাওয়া গেছে।”

“কি পাওয়া গেছে।”—কবিতা উত্তেজিত ভাবে বললে,
—“গিরি মাঝি সেনের দুবীর মূখ কেউ দেখেনি। গুয়াটা-
প্রকের তলায় কে কম-বাহী, কে বুড়ো কিছু বোকা বাহ না,
নেহাত কেউবাব্ মত অর্থ যদি না হয়। এখানেও
নিম্ন ধরতে যে খুন করেছে—সে বুঝ না গ্রোট
কে বলতে পারে।”

“কিন্তু গ্রোট হ’লে তার এসব খুন করার একটা কারণ
ত চাই।”—ঘোষাল বললে।

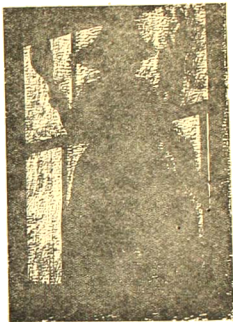
“কারণ কি কিছু থাকতে পারে না? আপনারা সেই
ভিত্তি চেলেমেয়ের কথাই জানেন। তাদের কোনো কাকা
কি মামা কি থাকতে পারে না, যে হয়ত সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নয়?
সেই অনাথালয়ের অভ্যাচারের যে প্রতিশোধ নিতে
কোঁ করছে?”

“কাকা মামা কেউ ছিল কিনা ঠিক জানি না। কিন্তু
এরকম সমস্যা আপনার হ’ল কেন?”

“হ’ল ভা: বাজপেরীকে দেখে। তাঁর অনেকগুলো চাল-
চলন কেমন অদ্ভুত। তা ছাড়া পুলিশ আসছে শুনে তাঁর
মুখের ভাব কিরকম বললে গিয়েছিল, আমি স্পষ্ট তাতে
লক্ষ্য করছি।”

ঘোষাল এককণে সত্যি কোঁহুলাই হয়ে উঠলেন,—“পুলিশ
আসছে শুনে মুখের ভাব বললে গিয়েছিল,—সত্যি।”

“হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট দেখছি। ওই মুখোশের মত মুখ ত
দেখাচ্ছেন। সেই মুখের চেহারাও অত রকম হয়ে
গিয়েছিল।”



“হঁ।”—ঘোষাল একটু চুপ করে থেকে বললেন,—“এটা
ভাববার কথা। ব্যাপার কি জানেন মিসেস লাহিড়ী, এসব
ব্যাপারে অভ্যস্ত লাবথানে অনেক দিক বিচার করে আমাদের
কাজ করতে হয়। কার ভেতর যে কি আছে আমরা কিছুই
বাইরে থেকে জানি না। অভ্যস্ত আপনার লোকের
বেলাতেও না।”

কথাটা বলে বেন একটু অস্বস্তি বোধ করেই ঘোষাল চলে
গেলেন। কবিতার মূখ-চোখ তখন দাল হয়ে উঠেছে। যে
কথাটা মনের ভেতর সে চোপে রাখতে চাইছে, ঘোষাল
সেই কথাটাই তাকে স্পষ্ট করে শুনিবে দিয়েছেন বলেই কি
তার এই অস্বস্তি অস্বস্তি?

“অভ্যস্ত আপনার লোকের বেলাতেও না।”—গান্ধের
দুয়ার মত কথাটা কেবলই বেন তার কানে বাজছে।

বস্তা, ভূমিকম্প, হুজু, হত্যা—বা-ই কেন ঘটক না,
মানুষকে আহারের চিন্তা তবু করতে হয়। আর তার দাবির
গুণু বেলেসের।

চাকর-বাকেরগাও এই সব ব্যাপারে কেমন বেন

ভাষাভাষা হয়ে গেছে। কদিকাকেই তাই রামায়ণের কাম নিরঞ্জেই দেখতে হয়।

রামায়ণের উঠানে ভাতের হাড়ি গাশির সে একাই তখন ভরভারির মশলা বাটছিল, এমন সময় হাফাতে হাফাতে মধুসূদন সেখানে চুকল।

“প্রনেছেন কদিকা ঘেঁষী, শুনেছেন।”

কদিকা চমকে উঠে গাউল,—“আবার কি হয়েছে।”

“ইন্স্পেক্টর সাহেবের রবারের ভেলাটা চুরি গেছে।

ইন্স্পেক্টরের কি রাগ, যদি দেখতেন।”

“কিসে সে রবারের ভেলা চুরি বাবে কেন? তাতে কার কি লাভ?”—কদিকা অঝাৎ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

“খামিও ত তাই ভাবছি। ইন্স্পেক্টর যদি হার বেলে রবারের ভেলা করে চলেই যান, তাহলে ত খুনীরই হবিধে। ইন্স্পেক্টর হাতে বেতে না পারেন সে কাহিনী সে করবে কেন? সত্যি বেনে বার্নে হয় না কোনোচিছুর।”

কদিকাকে চুপ করে থাকতে দেখে মধুসূদন আবার জিজ্ঞাসা করলে,—“কি ভাবছেন বলুন ত?”

“ভাবছি, যানে হয়।”

“কি যানে?”

“খুনী ঐ রবারের ভেলা লুকিয়েছে নিজে পালাবার জন্তে। আল রাহের মশাই যদি সে ধরা না পড়ে, তাহলে তাকে আর পাওয়া বাবে না।”

“বাহবা রে, বাহবা! শেষ পর্যন্ত খুনী ধরাই পড়বে না।”

—মধুসূদন হস্তাংশর মুখভঙ্গি করে বললে,—“কিন্তু তাহলে ত ভিটেকটিজ গল্প হ’ল না?”

“কোনটা ভিটেকটিজ গল্প নয় মধু!”—কদিকা গভীর-

ভাবে বললে,—“এখানে অনেক গল্পই মাঝপথে ছিঁড়ে যায়।”

কদিকার দিকে খানিক একটু অঝাৎ হয়ে চেয়ে থেকে মধুসূদন বললে,—“না, আগনি বড় গভীর হয়ে উঠেছেন, আমি পালাই।”

“না, যেয়ো না।”—কদিকা বাধা দিলে।

মধুসূদন সত্যিই যেন বিচুড়,—“আগনি চান না যে আমি যাই। সত্যি বলছেন?”

“হ্যাঁ, একা থাকতে আবার ভালো লাগছে না।”

“কিন্তু আমার সঙ্গে একা থাকতে ভয় করছে না? আমি যদি—আমি যদি সেই খুনে ছই?”—মধুসূদন দ্বির দৃষ্টিতে কদিকার দিকে তাকাল।

“তাহলে আমার কুল বিশ্বাসের প্রায়শ্চিত্ত করব গ্রাণ দিয়েই!”—ব’লে কদিকা হাসল। তারপর অকারনেই

চোখ-দুটো মুছে বলল,—“না, পোন, তোমার অত্যন্ত ভয়কী কথা আমার বলবার আছে।”

“কি?”—মধুসূদন একটু যেন অশক্তির সঙ্গে চোখটা ফিরিয়ে নিলে।

“তোমার নাম সত্যি মধুসূদন নয় নহ।”

অনেকক্ষণ মধুসূদনের মুখে কথা নেই। তারপর দীর্ঘে দীর্ঘে গ্রাণ অশ্রুত করে সে বললে,—“না, কিন্তু তুমি কি করে জানেন।”

“জানিনি, কিন্তু সম্ভব হয়েছে। কি তোমার আসল নাম?”

“কি হবে বলে?”—ব’লে মধুসূদন কাতরভাবে কদিকার দিকে তাকাল।

“তবু একজনকে বিশ্বাস করে তুমি সত্যি পাবে! বলে।”—কদিকার ঘরে কোমল অশ্রুদয়।

“না, আমার নাম মধুসূদন সত্যি নয়।”—দীর্ঘে দীর্ঘে অন্তরিকে মুখ ফিরিয়ে বললে মধুসূদন,—“আবার আসল নাম পাবি রাব। আমি—আমি পাটনা থেকেও আগিনি, এদেশি কলকাতা থেকেই পালিয়ে। আমার চিঠির পায়টা তোমরা লক্ষ্য করোনি নিচ্চ, তার পোকোপিসের ছাপ কেবলেই বুঝতে পারতে। ভেতরের আমি খিঁচো করে পাটনার টিকানা চিঠির ওপর সিয়েছিলাম।”

“কিন্তু কেন এসব করেছিলে?”

“এখানে কিছুদিন লুকিয়ে থেকে বিশেষে কোথাও পালাব যবে। ভেবেছিলাম এই নির্জন বায়ানিখাসে কেউ আমার খোঁজ পাবে না, খোঁজ করবার কথা ভাববেও না। গোলমাল ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আমি নিঃশেষে সরে পড়তে পারব।”

“কিসের গোলমাল সেইটেই ত বুঝতে পারছি না।”—কদিকা বললে।

“এখনি বুঝতে পারবে। আমি শুধু একটা হটকেন নিয়েই এসেছি, কিন্তু ওই হটকেন নোটের তাকার ভর্তি।”

“তুমি! তুমি চুরি করছ!”—কদিকা তড়িত।

“হ্যাঁ, চুরিই করতে গায়ে। আমার বাবার টাকা-ই চুরি করেছি। আমাদের বড়লোক বোধহয় বলা যায়। বাবার অনেক রকম ব্যবসা স্নাচ্ছে। তিনি আমাকে সেই ব্যবসাতে বসাতে চান, কিন্তু আমার ভালো লাগে না। বিশ্বাস করো, আমার কাছে সে-সব দ্বিধ। আমি পড়তে চাই, বৈজ্ঞানিক হ’তে চাই, কবিতা আমার কতদূর আমি জানি না, কিন্তু সে-ই আমার দ্বন্দ্ব। বাবা অত্যন্ত রাগভারী ঘেঁষী লোক, তবু

নিমেষে মতেই ‘চলেন। আর কারুর ইচ্ছে-অনিচ্ছে গ্রাষই

করেন না। একবার ভাবার বলতে গিয়ে থমক খেয়ে আখি ভরে চুপ করে গেছি। কিন্তু অসহ্য সোপেছে আমার ওই ব্যবসায়ীর পাখ। তাই দেখ পর্শন অনেক বুদ্ধি খাতিয়ে পরিকল্পনা করে আগে থাকতে এখানে চিঠি দিয়ে একদিন একটি ব্যবসায়র সিন্ধুকের সমস্ত নগদ টাকা নিয়ে গালিয়ে এসেছি। এই বস্তার সব বন্ধ না হলে হুজুর খবরের কাগজে আমার ছবিবুধ বিজ্ঞানন দেখতে পেতে। বাবা নিজের চোখ বড় হয়েছেন, তাঁর কাছে এরকম অপরাধের মার্জনা নেই।—মধুসূদন একমিথাসে এত কথা বলে একবারে খের জেরে পড়ল। একটা চৌকির ওপর বসে পড়ে হুজুরের মধ্যে মাথা ঝুঁকে আবার বললে,—এখন তোমার দুপা হচ্ছে? বসো, সতি্য করে বসো।”

“না মধু! একটুই দুপা হচ্ছে না।—তনিকার বর অত্যন্ত বিধ,—কিন্তু তোমাকে কিব বেতে হবে। গালিয়ে ষাওয়ার চেয়ে কাপুরুষতা কিছু নেই। তুমি তোমার বাবাকে শেষবার গিয়ে বসো, তাঁর ব্যবসায়র কাম তোমার দ্বারা হবে না। তাতে তোমার সিদ্ধির ইচ্ছেনত কাঙ্ক্ষ যদি তিনি না করতেন বেন, সব ক্ষেত্রে তুমি চলে এসো। খীখানে যদি তারপর বিক্ষোভ হও, তবু বাবা তোমার উই থাকবে। বসো, বাবে?”

“বাবো কদিকা সেরী?”

“কদিকা সেরী ভারী বিদ্রী পোনাথ।—কদিকা হাসল,—“ওটা বোলো না।”

“কি বলব তা হলে?”—নরল ভাবে জিজ্ঞাসা করলে মধুসূদন।

“কি বলবে জান না?”—কদিকা কণ্ঠ রাগ দেখালে।

একটু বিমূঢ় হয়ে থেকে মধুসূদন হেসে ফেললে,—“না, এখন হঠাৎ লজ্জা করছে।”

“একটু বসন্ত করছি বোধহয়।”

হুজুরেই চমক কিয়ে তাকাল। প্রবীর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে। তার মূখের চেহারা তার গলার দ্বারের মতই কঠিন।

পরমুহূর্তেই সে রাগে ফেটে পড়ল,—“এ হুজুর কি জন্তে তুমি এসেছ? আমার ব্রীদ সকে-সেগেনে কি এত তোমার বন্ধুত্ব?”

মধুসূদন প্রথমটার সতি্যই হুজুরকিয়ে গেল। এবার নিজেকে সাহসে হেসে বললে,—“আমি রাজা শিবহিলায়।”

“বেহিয়ে বাও এখান থেকে!”—প্রবীর পর্শন করে উঠল,—“এখনি, এই মুহূর্তে!”

কদিকা এতদংশ কঠি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার শান্ত দৃঢ় হয়ে বলল,—“বাও, মধু।”

“আজ্ঞা, যাচ্ছি তাহলে!”—একটু হেসে মরমা পর্শন গিয়ে মধুসূদন আবার বিরল,—“আমি কিন্তু কাঁচাকাঁচিই থাকব।”

“বেহিয়ে বাও বলছি!”—প্রবীরের এ বৃতি কদিকা কখনো দেখেনি।

“যাচ্ছি! যাচ্ছি!”—ব’লে মধুসূদন চলে যাবার পরই প্রবীর দুপাত্তর কদিকার দিকে ফিরল,—“মধু!” লজ্জা না থাক, তোমার ভয়ও করেনা ওই উগ্রাথ খুঁসেটার সঙ্গে একঘরে থাকতে! ওকে তুমি এখানে চিনতে পারোমি।”

কদিকা অমৃতভাবে প্রবীরের দিকে চেয়ে থেকে বললে,—“না গালিয়া। কাকে কতটুই আমরা ডিনি! তিনি মনে করাই কল।”

“কি তুমি বলতে চাচ্ছ?”

“কিছু না।—ব’লে কদিকা মুখ কিরিয়ে গিলে।

হঠাৎ বেশ একটু লবলই তাকে হাত ধরে নিঃশব্দে দিকে কিরিয়ে প্রবীর বললে,—“আমি তোমার দু-চক্ষের বিধ হয়ে উঠেছি হঠাৎ, না? এই মধুসূদনের সঙ্গে বোমা হবার পরই, কেমন?”

কদিকা কোনো উত্তর দিলে না। তার চোখদুটো তখন জলছে।

প্রবীর আবার বললে,—“কিন্তু মধুসূদনের সঙ্গে নতুন আলাপ ত মনে হচ্ছে না! মনে হচ্ছে, পুরোনো প্রেম আবার হঠাৎ দেখা হয়ে উপলে উঠেছে। কোথায় প্রথম দেখা হল? কলকাতায়?”

কদিকার চোখের নুই হঠাৎ বললে গেল। আলার বললে সেখানে কেমন বেন একটা ভা আর বিমূঢ়তা।

অশ্রুধর সে বললে,—“কলকাতায়।”

“হ্যাঁ, কলকাতায় তুমি যাওনি গত বছরবে, সারাসিন আমি বদন বাড়ি ছিলাম না দেই হুজুরে? কি, চুপ করে আচ্ছ কেন? পেছলে কি-না বসো!”—পকেট থেকে হঠাৎ মোকনের রসিদটা বার করে প্রবীর তার সামনে ধরলে,—“মনে যদি না থাকে ত তারিখটা প’ড়ে দেখো রসিদের।”

কদিকার মুখ আবার কঠিন হয়ে উঠল। বীরে বীরে বললে,—“হ্যাঁ দেখলাম। হুজুর তোমার সঙ্গেও দেখানে দেখা হয়ে বেতে পীরত!”

“আমার সঙ্গে!”—প্রবীর তীব্র গুটিতে কদিকার দিকে তাকাল।

“হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে!”—কদিকা চৌকির ওপর থেকে

বহুর কাগজটা তুলে এনে প্রবীরের সামনে ধরে বললে,—
“কিছুই ভালো সাবধানীতেও একটু তুল হতে হবে আরেক-
বারে। এই কাগজটা যে কলকাতা থেকে কিনেছিলে সেটা
তুল দিয়েই সত্য করে এনেছিলে। কাগজটা যে তুমি এনেছ
সেটাও আগে আমি মনে করতে পারছিলাম না। মি: ঘোষাল
কাগজটা দেখিয়ে না শিল ভারতের পত্রতাম না বা মনে
করবার চেষ্টাও করতাম না।”

মি: ঘোষালের সত্য এই নিয়ে তুমি আলোচনা করেছ ?
—প্রবীর উত্তেজিতভাবে কবিরাজ সিক এগিয়ে এল।

“দাম্পত্য আলাপ বড় মধুর।”—চাপা গলায় একটু হাসির
সঙ্গে কথাগুলো শুনে দুজনেই হিরে তাকাল। বীরবাহী যে
কখন নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢুকেছেন, তারা টেরই পারিল।

“কিছু গরম বড় বোকাই!”—বীরবাহী আবার বললেন,
—“ইন্সপেক্টর সাহেব একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছেন।
আমাদের সকলকে এছুরি তাঁর কাছে দেওয়ার বেতে
হবে।”

“কেন?”—প্রবীর অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

“কেন, সেইটাই ত মম্বা! পুলিশ যে আমকাল আবার
নাটক হয়ে উঠেছে তা জানতাম না। মিস্ ধর পুনঃ ইবার
সময় আমরা যে বেখানে যেভাবে ছিলাম তিনি তারই আবার,
কি বলে, পুনরাবৃত্তি চান। তাই থেকেই নাকি খুনীকে তিনি
ঘরে ফেলবেন।”

“এসব পাগলামির কোনো মানে হয় না!”—প্রবীর ভিত্ত
বলে বলে উঠল,—“আসল খুনীকে ছেড়ে রেখে দিয়ে উনি



অভিনয়ের ছেলেবেলা করেছেন! এই অভিনয় করতে দিয়েই
কোনো সাংঘাতিক কিছু একটা হবে।”

“সেটা আমাকেও ব্যাধ।”—বীরবাহী অস্বস্তি
করলেন,—“কিন্তু আসল খুনীটা কে? ওই মধুরেন?”

“তা ছাড়া কে? চন্দ্র!”—বলে প্রবীর এগিয়ে গেল।

কদিনা কিছু আপত্তি জানিয়ে বললে,—“আমি কিছু
বাড়ি না। আমার রাতারাতি আসছে। আমি না গেলেও
মি: ঘোষাল কিছু মনে করবেন না।”

“আমিও তাহলে থাকি আপনাকে সাহায্য করতে?”—
বলে বীরবাহী গাড়িতে পড়লেন।

“না না, চন্দ্র, সবাইকেই বেতে হবে।”—প্রবীর দ্বিধে
গাড়িতে গঠন করে বললে।

বীরবাহী আবার সেই অস্বস্তি ভাবে খুঁক খুঁক করে
হেসে বললেন,—“সেখানেই মিসেস লাহিড়ী, আপনার সঙ্গে
মি: লাহিড়ী আমার একা থাকতে দিতে চান না। আমাকেও
ওর ঠিক বিশ্বাস দেই।”

নিজের বসিকতার নিচেই তিনি শুধু হাসলেন।

ওপরে বাবার পুর আর একবার সমস্ত ব্যাপারটা বৃত্তি
দিয়ে ঘোষাল বললেন,—“আগে যেখানে যে রকম বা
হয়েছিল তাই আবার সকলকে করতে হবে বটে, কিন্তু একটু
অন্ত ভাবে। প্রত্যেকের আলাপ এবার বল হবে বাবে।
যেমন—নিজের ঘরে টেলিফোনের কাছে থাকবেন এবার
জন্ম বাজপেয়ী, আর ঠাকুর ঘরে আসবেন মি: লাহিড়ী।
বীরবাহী যাবেন রাতারাতি, আর তাঁর আলাপের অর্গ্যান
বাতাবেন মিসেস লাহিড়ী।”

“এ অবল-বল কেন?”—তা: বাজপেয়ী বিস্মিত ভাবে
জিজ্ঞাসা করলেন।

“কারণ, তাহলে আমাদের মধ্যে যিনি সত্য কথা বলেননি
তাঁর ঠাকি বরা পড়বে।”

“কেনম করে আমি তা বুঝতে পারি না!”—হৃৎ কৌতুক
বললেন।

ঘোষাল হেসে বললেন,—“বোকার ভয়টা আবার ওপরই
ছেড়ে যিন-না, আর তা ছাড়া আপনাকে কলি কোথাও বেতে
হবে না। আপনি নিজের ঘরে যেমন শুয়ে ছিলেন তাই
থাকবেন।”

“তাহলে আর রোঁ কেন? শুভ্র শ্রীমু।”—হলে
বীরবাহী উঠে পড়লেন।

“শ্রীমদ বীরবাহী!”—ঘোষাল তাঁকে ধাক্কা দিলে,
—“আপনি শুধু মিসেস লাহিড়ীকে একবার দেখিয়ে দিয়ে যান,
কি ভাবে য’লে আপনি কি বাড়িয়েছিলেন।”

“তাও দেখাতে হবে! কেন!”—বীরবাহী কোণের
অর্গ্যানটার কাছে গিয়ে টুকের ওপর বসলেন, তারপর বড়
বাগিষের মত সর্বলকে একবার সাধা হুইয়ে নমস্কার জানিয়ে

গভীর ভাবে ঘোষণার মত বললেন,—“এইবার—এইবার আপনারা সুবিখ্যাত অর্গ্যান-বাক্স স্ট্রামাথ্রজ বীরস্বামীর আদর্শ অর্গ্যান-বাক্স শুনতে পাবেন।”

প্রবীর চাপন-গলায় ঘোষালকে বললে,—“অসহ্য ঠাণ্ডামি!”
“ওই ঠাণ্ডামিটাও একটা সুখাল, মি: লাহিড়ী!”—বলে ঘোষাল হাসলেন,—“ওই সুখালগুলোই ভেব করতে হবে।”

বীরস্বামী তখন এক-আঙুলে তাঁর বাজনা শুরু করেছেন। সে বাজনাও মূর্বে কণিকার কৃষ্ণের ডেবটটা পর্যন্ত কেমন শিউরে উঠলো।



ঘোষাল তার দিকেই চেয়ে ছিলেন; ভিজালা করলেন,—“শারবেন মিসেস লাহিড়ী এই ভাবে বাজাতে?”

ধাতো ধাতো ছেপে কণিকা বললেন,—“পারব!”—অনুভূত একটা অনুভূতি তার মগ্নে আগ্রহে। জাণ্ডাকসের মত একটা জ্বর বেন বীরের বীরের তাকে ছেপে ধরছে। মুক্তি নেই, কিছুতেই মুক্তি নেই!

“তাহলে আপনি নিয়ে কথামানে বহন। আপনারাও চলুন যে ঘর নতুন বাড়িগার।”—বলে ঘোষাল আর সকলের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে গিয়ে সরঞ্জাম একটু খেয়ে আবার নির্দেশ দিলেন,—“ট্রিক এক মিনিট বাসে আপনি বাজনা শুরু করবেন। ট্রিক এক মিনিট। মনে মনে খাট ভুগুতেও পাবেন।”

ঘোষাল চলল গেলেন।

এক—দুই—তিন—চার...

খনিকটা গুপাই কণিকা খেয়ে গেল। কিরকম হঠাৎ বেন তার ভয়-ভয় করছে। এ-বাড়িতে সে ও একলাও খোকছে কত দিন! এরকম ত কখনো মনে হয়নি।

হঠাৎ দূর থেকে শিলের শব্দ সে শুনেতে পেল। কে দিন দিচ্ছে যথুৎসবের আয়গার? তা: বাজশেরী নাকি? তা: বাজশেরী শিশু গিয়ে গানের স্বর তুলতেও পাবেন তাহলে!

না—সময় ত হয়ে বিরুদ্ধে। সে এক-আঙুলে দ্বিটো বাজাতে লাগল। চাবিতে আঙুল লেগে স্বর গঠার লক্ষ্যে তার সনত পরীরের ভেতরটা বেন একটা কবের শিহরণ উঠল।

ওই ত দিল্লী দরর দরর বেতিঙটাও বেতে উঠল! মি: ঘোষালই নিজের চাপিয়ে দিকেছেন।

ঘাড়ো বেন মোলো হাওগার শর্শ পেয়ে কণিকা চমকে দিরে তাকাল। ওখিকে কেউ দরগা খুলেছে নিচর।

দরর পরীর দরন ওখিকটা ভালো দেখা যায় না। সন্ধ্যাও হয়ে এসেছে। কিন্তু কই না, কেউ ত ঘরে আসে নি!

হঠাৎ বুকেটা কণিকার কিরকম কেনে উঠল! যদি—যদি বীরস্বামীই নিঃশেষে পদা সবিরে কাছে এসে পড়ান!

চুপি চুপি বললেন,—“কি বাজাচ্ছেন মিসেস লাহিড়ী, আপনারা—কি বেল—অস্বাভাবিক-সবীত?”

জোর করে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে কণিকা এই বিশিষ্ট নবের ভাবটা কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে।

কিন্তু—কিন্তু—একটা কথা হঠাৎ তার মনে হ'ল।

বীরস্বামী যে অর্গ্যান বাজিয়েছেন তা ত কেউ শুনেছে বলেনি। বীরস্বামীর অর্গ্যান বাজাবার পরটাই কি বানামো? তিনি কি অর্গ্যান না বাজিয়ে মিল্ল দরর দররই গেলেন! ঘোষাল কি এই ভাবেই তাঁর ঠাকিটা ধরতে চেয়েছেন! অর্গ্যান অবত খুব আবেগ আছে বাজাতে বলা হয়েছে। কিন্তু তবু এখানে যদি বাইরে সে আওয়াজ শোনা যায় তাহলেই বোকা ধাবে বীরস্বামীর কথা মতো।

দরর দরগাটা খুলে গেল। বীরস্বামীই এসেছেন ভেবে কণিকা চাঁৎকার করতে থাকিল। কি ভাবি, সবমত সামলে নিতে ধেরেছে নিজেকে। ঘোষাল কি ভাবতেন তাহলে!

ঘোষালই দরর চুকছেন। কাছে এসে বললেন,—“গল্পবাহ মিসেস লাহিড়ী!”

ঘোষালকে এত খুশি কণিকা এগরত সেদিন।

“বা চাইছিলেন তা পেয়েছেন তাহলে?”—কণিকা হেসে ভিজালা করলে বাজনা থামিয়ে।

“হ্যাঁ!”—ঘোষালের মূর্বে বেশ একটু গর্বের আনন্দ,—“ট্রিক বা আশা করছিলাম তাই।”

“কে মি: ঘোষাল?”—কণিকা আগ্রহে অনীর তরে ভিজালা করলে।

“বা:—কে আপনি জানেন না! এখানে বসতে পাবেন নি?”—ঘোষাল হাসলেন,—“আপনার মত বুদ্ধিবত্তী মেয়ের এককণে বোকা উচিত ছিল।”

“কিন্তু আমি ত ট্রিক...” কণিকা মনে মনে ভেবে নিলে যে বীরস্বামীর কথাটা নিয়ে থেকে বসটা ট্রিক হবে না।

“না, মত বুদ্ধিবত্তী আপনাকে ভেবেছিলাম, আপনি তা নন! হ্যাঁ, তা বলতে গেলে আপনি বেশ বোকামির পরিচয় দিয়েছেন আপনাই।”

“কিনে!”—কণিকা দূর হয়ে ভিজালা করলে।

“খুবী কুজীহ দিকার কে হতে পারে তা আমাব কুজতে
নেনি। সেই কতে আপনার বিপদও বেড়েছে।”

“কিন্তু আমিও আপনার কথা কুজতে পারছি না!”—
কবিকা সত্যিই বিদ্রু।

“কুজতে পারছেন না? তবে তখন। আপনি আমার
কাছে কথা কুজিয়েছিলেন মিস্ হলের মত।”

“আমি এখনও কুজতে পারছি না, আপনি কি বলছেন।”

“খুব পড়েছেন!”—যোবালা একই বেন বড় হলেন,—
‘গাপাথোলা’ অনাথালয়ের সঙ্গে আপনার সংঘর্ষে যে ছিল তা
আপনি প্রথমে আমার কাছে বাক্যের করেমনি। কিন্তু
শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লেন। মিস্ হলের আপনি সিনতেন,
‘গাপাথোলা’ অনাথালয়ও আপনার জন্য। তবে কেন আমার
কাছে বিখ্যাৎ হলেন?”

জ্যেষ্ঠ একই সর্গবাস কোন কবিকা বললে,—“তা
আপনাকে বোঝাতে পারব না। আমি হন থেকে
ও জাপোথার স্ত্রী সত্যি মূর্ত্তে কেন্দ্রে চেয়েছিলাম।”

“হ্যাঁ, আমি কেন? আপনার নাম তখন কবিকা
ছিলনা, কেন?”

“হ্যাঁ, আমার নাম ছিল তপস্বী।”

“তিনি, আপনার বসে যা বলছেন তাও সত্য নয়।
তখনই আপনার বসে উনিশ-বৃদ্ধি, আপনি ওই অনাথালয়ে
মিসেস এম.ডি.-র টাবেলারিতে হোসেলের কাজ করতেন।”

“না।”

“আমি বলছি হ্যাঁ।”

“না, না—বিবাস তখন আমার।”

“বিবাসের বেগা আপনি নন। যে ডাই-বোন-জিনটি
আনাথালয় থেকে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে, তারো তুধু
আপনাকেই বিবাস করে তাদের পালাবার কথা জানিয়েছিল,
আর আপনি ম্যানেজার ও মিসেস এম. ডি.-কে তা জানিয়ে
হেন।”

“এসব মিথ্যা! সব মিথ্যা!”—কবিকা কাতর ভাবে
বলে উঠল,—“হোসেলের কাজ করতাম আমি নন, আমার
মিসি। আমারও দপ্তার নিরাপত্তার হয়ে ওখানে জায়গা
পেয়েছিলেন। ম্যানেজার মিঃ হাল আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন
পিপাচের মত নির্ব্ব। তাঁরা ছেলেকেরদের বেতে পর্ব্ব
নিতেননা। তিনি তখন বড় কল তাকে হোসেলের কাজ
করতে হ’ত, আমাকেও সাহায্য করতে হ’ত লেগানে।
ছেলেকেরদের হুগ বেতে না পেরে মিসি ও আমি চুরি
করে বাকে বাকে তাদের বাবার এনে দিলাম। তার

মতে ধরা পড়ে আর বেতে পিঠের চামড়াও উঠে গেছে।
ছেলেকেরে জিনটি পালাবার সময় মিসি তাদের বুকিয়ে প্রথমে
বারণ করবার চেষ্টা করেছিল, তারো কিছুতেই না পোনা
তাদের সাহায্যও করেছিল বাবার আর পরমা দিয়ে। কিন্তু
মিসি নন, হোসেলের আরেকজন চাকরানী তাদের পালাবার
কথা কেন্দ্র করে হেনে কলে মিসেস এম. ডি.-কে বুদ্ধি
করবার আশার বলে দেয়। সেই ছেলেকেরে জিনটি ও
ধরা পড়েই, মিসিরও শাস্তির শেষ থাকে না। তুধু সেই
ছেলেকের মাতা হাওবার কথাই লকলে জানে, আমার মিসিও
যে সেই নির্ব্বাতনের পর বীরে বীরে বিছানার লক মিসিরে
গিরে মারা যাবে...”

কবিকা কুপিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর দুখ তুলে
বললে,—“সে-সব দিনের কথা আমি সত্যি কুল বেতে
চাই। আমি এই ক’বছরের জীবনে অনেক হয়েছি, অনেক
বেয়েছি, অনেক পেয়েছিও। আমি তাই অশেষকর সে-সব
দুঃখের দিন একবারে মুছে কেনে একই শাস্তি চাই।”

“শাস্তিই এবার পাবেন!”—যোবালা তখন অন্ততভাবে
হেসে উঠলেন,—“আপনি নন, আপনার মিসিই হোসেলের কাজ
করতেন তাহলে। গ্রিক আপনার মতই অনেকটা চেহারা।
আপনি কিছু হতে কানেনি, কিন্তু সেই অনাথালয়ের লক
আপনিও ভড়িত। যে অনাথালয়ের সবকিছু নোংরা
হুংসিং অপবিত্র। পৃথিবী থেকে সেই অনাথালয়ের সবকিছু
শেষ করে দেওয়া হরকার।”

“ওকি! ওকি করছেন মিঃ যোবালা?”—কবিকা কাপরে
উঠল।

পকেট থেকে পাকানো হুড়টি বার করে সামনে ধোলাতে-
হোলাতে যোবালা বললেন,—“আমি যোবালা নই, ইন্সপেক্টর
নই, কিছুই নই—আমি সেই পায়, ‘গাপাথোলা’ অনাথালয়ের
সেই পায়, আমাকে বড় হয়ে সমস্ত অত্যাচার অবিচার
নির্ব্বাতনের যে পোষ নিতে এসেছে। পুলিশ আমার হরবার
মতে জাল পেতেছে, আমি পুলিশ হয়েই তাদের গুণের
কী টোকা দিয়েছি বেতেই পাচ্ছেন। মি-আই-ডি ইন্সপেক্টর
যোবালা আলগে হলে নিজে কোন করছি। নিজে তারপর
হরবারে ডেলার এসে সুপুল টেবিলফানের লাইন কেটেছি।
মিসেস এম. ডি.-কে যেমন, মিস্ হরকে তেমনই এই গাল
দিয়ে শেষ করেছি। কেউ কিছু সম্বন্ধ কানেনি, করতে
পারেনি। আমার ডেলাটা কে চুরি করেছে। আপনাকে শেষ
করেই এখনি নইলে পালাতাম। তুধু আমি পালাবই, আর
মিসি ধরাও পড়ি হুংস নেই, তারো হুগা পেয়েছি। আমায়

শাপল বলে শাপলা-পারসে ধরে রেখেছিল। সেইখানে বলে-বলে আদি সব কপি করেছি, তারপর একদিন পালিয়েছি। শাপলা-পারসের ভাতারতা এখন দেখুক, শাপলের বুদ্ধি কত !” —যোথাল একটি খেয়ে বললে,—“ভর পাবেন না, এই কাপ লাগাবার আগে শুধু ভর, নইলে টেরও পাবেন না।”— যোথাল কাঁপটা তুলল।

হঠাৎ শেছন বিকে কি শব্দ শুনে একটি চমকে দিলেই একটি সোকার শেছন থেকে তা: বাজগেরী যোথালের ওপর কাঁপিয়ে পড়লেন। কখন মিশেছে তিনি সোকার শেছনে এসে মুকিয়েছেন কণিকা টেরও পড়েন।

যোথাল-বৈশী সাহু জোথান ছোকা, কিন্তু তা: বাজগেরী যেন লোহা দিয়ে তৈরী। একটি গুহাগুহির পরই দেখা গেল তাকে শিছুমোড়া করে তা: বাজগেরী তারই কাঁপের দড়িতে বেঁধে কেলেছেন। চারিদিক থেকে অস্ত্র সবাইও তখন ঘরে ছুটে এগিয়েছে। তার মধ্যে বৃদ্ধ বৈশীবাবুও। কিন্তু এ কি-রকম তাঁর চেহারা! কোথায় সেই অর্ধ পুরু বৃদ্ধ, তার আঁপাঘ সোজা পত-সমর্থ পুরু।

বৈশীবাবু ঘরে ঢুকতেই তা: বাজগেরী উঠে গাড়ির সেলাম করে বললেন,—“বিশ্ব সময়েই বরা গেছে তার! আমি গোড়া থেকেই নম্বর রেখেছিলাম, পুলিশ আগছে বলে ফোন আমার কথা শোনার পর থেকেই আমি সম্মান আছি। ওর রবারের ডেলাটা ছুরি করে পলাবার পথ আগেই বন্ধ করেছি তাই। তবে আগনি নিজেও আসবেন, আশা করিনি।”

“কিন্তু এসেও ত মিন্‌খরের মতুচাটা ঠেকাতে পারলাম না! আচ্ছা, আমাকেই বোঝার আমায়ের খোঁজে দুটা নৌকো আসবে। না আশা পর্বত ওকে একটা ঘরে ঠেকে রাখো।”

বীরবাহী দুকনের বিকে চেয়ে সেই অশ্রুত মূখভি করে বললেন,—“ভালো আগনারাই আসল পুলিশের লোক! কেহা তাক্‌ব! কেহা তাক্‌ব! কিন্তু তা: বাজগেরী আগনার নাম নিচ্চ নয়?”

তা: বাজগেরী বলে গরিষ্ঠিত পুলিশের লোকটি হেসে বললেন,—“না, আমি দাবরখি যোথ। ইন্‌স্পেক্টর যোথ বলতে পারেন।”

“আর উনি?”

“উনি ইসরাইল সাহেব, এগারকার জি-সি।”

তা: বীরবাহী খুক খুক করে হেসে উঠলেন,—“এখানে সবাই তাহলে একরকম নাম ঠাড়িয়েছে যোথ বাজ্‌, আদি। বাসে।”

“আদিও নয়। আমার নাম প্রবীর সাহিতী। আগ্রা

মিউনিশিয়ালিটি অফিসে গিয়ে বার্খ-হেভিকারে নাম আছে দেখে আগতে পারেন।”

“আদি একটা অস্ত্রোপ করতে পারি?”—এতক্ষণে মধুসূদনের গলা শোনা গেল,—“আমার এই হুটকেনটার সঙ্গে আগনারের নৌকোয় আমায় একটা আখণ্ড সেবেন? আমার কলকাতার বাওরা অভ্যন্তর করী সরকার।”



ইসরাইল সাহেব ঠাট্টা করে বললেন,—“তু খুটকেন-টাকে আখণ্ডা দিলে হবে না?”

“না, বিশ্বাস করে আগনারের পুলিশের হাতেও এটা ছাড়তে পারব না।”—মধুসূদনও পবিত্র হেসে বললে,—“হুটকেন-ভর্তি নোটের তাক-কি-না?”

ঠাট্টা ভেবে সবাই হেসে উঠল।

পবিত্র তারপর এমিক-ওমিক হেসে বললে,—“হোটেলের মালিকরা গেলেন কোথায়?”

“বোকাপড়া করতে নিচ্চ! বস্তার ভলে সব ঘুলিয়ে”

দিয়েছে কিনা!—বলে বীরবাহী হেসে উঠলেন।

মধুসূদন-ও পবিত্র আর তখন সেখানে নেই।

নিকে নিজের ঘরে বামী-হীর সতিই তখন বোকাপড়া চলছিল। কণিকা অভ্যন্তর অপরায়ীর মত বললে,—“আমার কথা করো, আদি তোমাকে পর্বত লনহ করেছিলাম। সতি, সেদিন জুদি যে কলকাতায় গেছে আমায় জানাওনি কেন?”

“জানাইনি তোমায় একটা অবাক করে দেব বলে। তোমার কর্মদিনে একটা উপহার কিনতে গেছলাম মুকিয়ে। কিন্তু জুদিও ত আমায় কলকাতা বাওরার কথা মুকিয়েছে!”

কবিতা হেলে বললে,—“তুমি অন্ত বেগে না থাকলে রসিকটা পড়লই আমার দাঁড়বার কারণ বৃত্তান্তে পারতে। রসিকটা একটা ডাউটেনশনের, বুকেছ ? তোমারই জন্তে কেনা।”

হঠাৎ লজ্জাটা খুলেই মধুসূদন ওরকে পবিত্র বললে,—“তবু, আমার ঠিকানা আপনাকে দিতে এলাম কবিতা-বি ! বাবার সৎ যদি বহিষনাও হয়, তাহলে আমি চিঠি দিলে তেনে উত্তর পাই।”

“তা ত বুঝলাম ! কিন্তু হঠাৎ কবিতা-বি এল কোথা থেকে ?”—প্রবীর এখনও মধুসূদনের ওপর খুব প্রসন্ন হতে পেরেছে মনে হ’ল না।

কিন্তু মধুসূদন-ওপী পবিত্রের সেদিকে অক্ষপে নেই, একটু হেসে সে বললে,—“মাগেই উনি বলবার অর্থমতি বিস-ডিলেট, কিন্তু আমার কেমন লজ্জা করছিল।”

কিছুদিন বাদেই লাহিড়ীদের নামে স্বাস্থ্যনিবাসে একসঙ্গে একটি চিঠি ও একটি পার্শেল এল।

চিঠিটা মধুসূদন ওরকে পবিত্রর। লিখেছে : বাবা মত

পাণ্টেছেন, পাণ্টেছেন বোম্বের লুটফেল-ভর্তি নোটের তাদা ফেরত পাওয়ার বিষয়ে। সে ইউরোপ যাচ্ছে শীগ্গিরই পড়তে। বাবার আগে দেখা করবে নিশ্চয়।

আর প্যাকেটটি পাঠিয়েছেন বীরধামী। তেতরে একটা অন্তঃস্থ সখী ও হুপ্রাণ্য বিচ্ছেদে ডাউটেনশন ও পেলিসের ডেভ-সেট আর তার চেয়েও জর্জ ও সখী মেয়েদের একটা হাতখড়ি। তাহাই সঙ্গে ছোটো একটি কার্ডে লেখা—‘বীরধামীর স্বপ্নশোধ’।

ভিনিসঙসা দেখে প্রবীর ও কবিতা হতভয়। এদের ভিনিস ত আতঙ্কাল পরলা দিলেও পাওয়া যায় না।

“বীরধামী কি চোখাই মালের করণারী নাকি ?”—প্রবীর বলে ওঠে বিমূঢ় ভাবে।

কবিতা আতুল হুলে তাকে শাসিয়ে বলে,—“জাযো, দা বিকা আমাদের হয়েছে, তার পর কাউকে সন্দেহ করবো না, বিষাদও না।”

• বিশেষ ছাড়া



॥ ‘বসুধারা’র নিয়মাবলী ॥

॥ গ্রাহকদের সম্পর্কে ॥

বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ২৫শে তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে সন্ধান লইয়া ডাকঘরের উত্তরসহ আমাদের জানাইতে হইবে। নচেৎ উক্ত সংখ্যা বিনামূল্যে যেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে যথাসময়ে জানাইতে হইবে। ভিটাপরে এবং মনি-অর্ডার-রূপে গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১ টাকা। গ্রাহক হইলে চাঁদার হার—বার্ষিক (সভাক) ১২ টাকা এবং বাৎসরিক (সভাক) ৯ টাকা। ভিঃ-পিঃ-যোগে পত্রিকার গ্রাহক হইলে, গ্রাহকদেরই ভিঃ-পিঃ খরচ বহন করিতে হয়। মনি-অর্ডার-যোগে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হইলে এই অতিরিক্ত খরচ আর দিতে হয় না। বৎসরের যে-কোনো দ্ব্যস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। শরৎ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না। ভারতের বাইরে পত্রিকার চাঁদার হার পরযোগে জ্ঞাতব্য।

চলচ্চিত্র

শ্রীচাক্ষুঃ ভাট্টাচার্য



১৯৪৭ সাল : ৬ই বছরের ১৭ আগস্ট তারিখটা ধরব না, ৬টা ঘড়ী পোয়াসময়ে দিন ; ওদিন পাকিস্তান ভারত থেকে আলাদা হয়ে বাণীন হল, কিন্তু ভারত হল না ; ভারত বাণীন হল তার পরের দিন, ১৪ আগস্ট। ১৩ আগস্ট থকা থাক। অনেক করা থাক, সেদিন পাশ্চাত্যের কোনো এক দেশের রণতরী চট্টগ্রামে উপস্থিত হয়ে চট্টগ্রাম আক্রমণ করল। সেদিন চট্টগ্রাম ভারতের অন্তর্ভুক্ত ; ভারত আমার স্বদেশ ; দেশ আক্রমণ, স্বর্গাশ্রিত গরীবনী আমার দেশজননী। রণতরী '৭'রে, 'বম্বে মাতরম্' বলতে বলতে চুটপুৎ চট্টগ্রামের দিকে, বিশাখা অন্ধভূমিকে কল্লের কবল হতে থকা করবার অগ্রে। গোয়ালন্দে সকাল হল ; চন্দ্রসূন, চট্টগ্রামে মায় গোয়ালন্দে অবধি জাফা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ফিরে চল, ফিরে চল ; চট্টগ্রাম আর আমার জননী অন্ধভূমি নয় ; জাহাঙ্গিরে থাক চট্টগ্রাম ; এখন ঘোড় পে, দরত নামগোষ্ঠী চাইবে, সপের টাকাকড়ি কেড়ে নেবে। উপর থেকে কর্তারা অন্ধভূমির চৌহদ্দি বাংলা দিলেন, আমিও টকাস্ করে আমার মনোভাব বললে ফেলসুম।

আজ্ঞে, ১৫, ১৬, ১৭ আগস্ট মূর্খিলাবাহ মেলা পাকিস্তানের মধ্যে ছিল, তিন দিন পরে ভারতে ফিরে এল। ৬ই তিন দিন দ্বারা মূর্খিলাবাহ মেলায় স্বয়ং দ্বারা কার বন্দনপিত্ত গাইবে—পাকিস্তানের, না, ভারতের ?

ভারত না বাংলা, কাকে আমার স্বদেশ বলে ধরব ?

বহিঃজগৎ তাঁর 'বম্বে মাতরম্' পাকিস্তানকেছেন—

সম্রাটকর্তৃক কলকাতার—করা—

এই 'বম্বে মাতরম্' সংগীত জাতীয় সংগীতের স্বধা লাভ করেছে। সম্রাটকর্তৃক বাংলায়, ভারতের হতে পারে না। স্বভাব্য বাংলাই আমার স্বদেশ, ভারত নয়।

বিশেষজ্ঞগণও বলেছেন—

যে আমার জননী আমার বাণী আমার—আমার দেশ।

বলেছেন—

সম্রাটকর্তৃক নির্দিষ্ট কর্তৃক করে আমার দেশ।

কিন্তু বাংলাকে যে আমার দেশ বলছি, এ কোন বাংলা ? বহিঃজগতের বাংলার উপর যোগ-বিযোগ হচ্ছে অনেকবার, আর এখনও তার বিরাম নেই। প্রথম ১৯৪৭ সাল। সে সময়ে স্বতন্ত্রতা তাঁর বক্তৃতার বলতেন—বঙ্গমাতা বিখ্যিতা হইয়াছেন, আমাদের অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে। —অশৌচ গ্রহণ করলুম ; ৩০ আশ্বিন দুপুরে পান্ডাভাত খেলুম ; বিকেলে গাইলুম—

বাংলার মাটি,	বাংলার চল,
বাংলার বায়ু,	আমার বল,
মুগ্ধ হোক	মুগ্ধ হোক
মুগ্ধ হোক	হে ভগবান !

কয়েক বছর চলে গেল। ১৯১১ সাল এল, জাতি বাংলা ছোড়া লাগল। স্বতন্ত্রতা তাঁর A Nation in Making-এ লিখাছেন—

I was summoned back to the telephone and heard the news that the partition had been modified. There was quite a crowd at the Rengalee office at the time. The news spread like wild fire. People came in throngs to the office. A huge gathering had assembled in College Square, and I was seized by my friends, put in a carriage and literally carried by force to College Square. There I witnessed a wild scene of excitement. It was quite dark, there were no lights. We could not see one another, but we could hear voices shouting with joy and occasionally interjecting questions. A voice

from the crowd cried out,—What do you think of the transfer of the capital to Delhi? I said at once,—We are not likely to lose very much by it. Subsequent events have demonstrated that I was substantially right in my impromptu answer.

প্রত্নীতি অসংলোভ করব না। যেরূপে নেহ, রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লী চলে যাওয়ার বাংলার কোনো ক্ষতি হইলি। কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনীর কথা ভাবছি। আগেরকার বাংলা কি আমরা ফিরে পেলুম? যে বাংলা পেলুম তাতে কি উন্নতি হইল না? ভবিষ্যতের ভারত-বিভাগের বিষয়?

১৮৫৭ সালে যে হত-বল হইল তাতে আমাদের দেশ-মন্ডলকে আর চেনা গেল না, কর্তারা লজ্জার তাকে বাংলা না বলে গণিতমূলক আখ্যা দিলেন। কোথায় সন্তোষটি! তা আড়াই কোটিতে এসে পড়িল। কিছু কিছু বোম্ব ও হাফে; পুরুষিয়ার পুনিয়ার ছিটে-কোটে এসে গিয়েছে; আর আমাদের হুগ কি? সম্ভ্রুতি বেহেদ-হুগ এক বৈঠকখানায় বলে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের কথা হানে হানে বললে গিয়েছেন। সন্নিহিত বালিস্থানের বসন্ত-হুগ—তোহা যেমন আছে তেমন থাক। এ উপদেশটা বড়ই মূল্যবান। কারণ বাস্তবতার দিকে বহু ভাবনা; পক্ষান্তরে সহজেই মা বল করা চলে। পক্ষান্তরে বড়ই ত্রি-বর্গ পতাকাকে সন্ত-বর্গ করা যায়। যা হোক, আমাদের দেশতটিকে তুলে অবস্থায় রেখে দিতে হবে, কর্তারা যেমন নাচাবেন তেমনি নাচবে, বেশভূষিত চকু-সীমা কখনো বাড়াবো, কখনো কমাবো। হস্ত নিকট-ভবিষ্যতে কাশীর বিধিত হইবে, ভারতের মানচিত্রকে আবার নতুন করে বং লাগাতে হবে।

এই সব চেয়েও উন্নত ঠিক করেছিলাম, আমার চলিত পরগনাকে সেনাবাহিনী বলব। কিন্তু তাও হল না। শুধু, আমাদের অশৌচ গ্রহণ করতে হবে, চলিত-পরগনা-বাড়াও বিধিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় চলিত-পরগনার এক ইতিহাস লেখবার আয়োজন করছে। সেদিন তাকে বলুন, বাপু যে, ছদ্মি সন্ত-বর্গ কর, তেরা চলিত-পরগনার যে ভাগে কৃষি পড়বে সেই ভাগের ইতিহাস লিখো, কাছটা অর্থক হয়ে যাবে।

দুটিকে আরো সংকুচিত করি। যে বাতুলদের জন্মে-ছিলাম সেই আমার জন্মস্থান। তাও চলে না। পঁচাত্তর বছর আগেকার বাতুলদের তো বহুদিন আগে বুলিগাং হয়েছে, সে বাতুলগাটা এখন বাড়ির বাতুল। তাকে সকল দেশের হানী বলতে হচ্ছে চল-না।

দিশেদারা হাং বতুলনাথের লেখা হাতড়াতে লাগলুম, দশি তার থেকে কোনো ছদ্মি মেলে। এক দ্বাণ্ডাণ্ড আছে যেহুদু—বেশ বড়ই নয়, সে চিত্র। তিনি আরো বলেছেন—সেই বার মধ্যে আপন ভাষা-বান প্রকাশ অল্পতব করে তাকে সর্বদা সহজে নিজের বলে চিহ্নিত করবার উপলক্ষ ঘটনা করতে চাই। যেদিন তাই করে, যেদিন কোনো দ্বাণ্ডাণ্ডকে আদর্শের সঙ্গে সে বীকর করে, সেই দিনই মাটির কোল থেকে দেশের কোলে সেই দ্বাণ্ডাণ্ডের জন্ম।

সব কথা বুঝলুম না। এ নিয়ে আর মাথা ঘামাব না। সকলে যা করে তাই করে যাব। সভা-সমিতিতে 'অনুগমন-অধিনায়ক' গান বদন হবে উঠে পড়ান; ১৫ আগষ্ট ব্যক্তিগত জাতীয় পতাকা ওড়াবে, গ্রামোফোনে গান বেধে—'ও আমার দেশের মাটি তোমার পদে ঠেকাই মাথা'। বাপু, এই অবধি। মনে মনে কিন্তু 'সেনাবাহিনী' 'ক্যাংগি পলীহানী' এইসব হেঁচো কথা ছেড়ে দেব; তার বললে ভাবব—

গমন-অনুগমন-অনুগমন হু-হু-বাণিত গানী—

সেই মানববাহিনীকে আমার প্রগতি জানাব।

বাঙালির গড় আয় এখন কিছু বেড়েছে। ঠিক কততে বাড়িয়েছে জানিনি। ৭০ টাকা, ৮০ টাকা। আমি পার করে দিলুম তিন পঁচাত্তর পঁচাত্তর। বরাদ্দগর বলে, আমার পঁচাত্তরের মধ্যে অনেক শিশুসন্তা বড়ছে, নতুন গড় মান পঁচিপ বহুবার থাকে কি করে। বুঝলুম; আর সেখানে আমি ছুঁবিত। কিন্তু এতে আমার কি হাত আছে বলুন।

সে থাক। এই পঁচাত্তর বছর ধরে আমার চোখের উপর কত মানববাহিনীকে আসতে কেতে দেখলুম। এই চলিত অশ্রু হইবে আসছে, বহু মান একেবারে মুছে গেছে। যা আছে তার কিছু কিছু পরা কেলি।

আমার শেখবাহিনীর বর্তমান আমার গ্রন্থবাহিনীর বর্তমানকে অনেক দূরে কোলে এসেছে। পুরানো বা গেছে, আর নতুন বা সব দেশটি, তাদের মধ্যে আসমান-অমিন কতক। এত তফাত আগে আর কোনো মুখে ঘটেনি। তবে অনেক ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়; নতুন এসেছে বটে, কিন্তু 'পুরানোকে একেবারে অস্বস্তি করতে পারেনি। বুঝে চাই শ্রীকৃষ্ণনাথেরও দেখছি, সোম্বর গাফিও দেখছি; বহুবার সন্তোষোদার কন্টেন্ট-পার্টিতে যোগ দিচ্ছে, আবার বহুবার সন্তোষ তুলসীতলায় প্রাণ পড়ছে। বতুলনাথের কলিতা মনে পড়ে আছে।—

উল্লেখ্যে সঙ্গীতকর, চিত্রশাণ্ডী দ্বিধি কুক
 করে গভীর ভিত্তি-বল্লভা;
 নৃত্য করে তাল তালে, প্রাণী-বস্ত্র তাল তালে
 নবীন পাঠা খন-ভাষন-পরি।
 পুরানো সেই দিবসে প্রেম, নৃত্য করে এলো বেসে
 হৃদয়তা ধর্মি ইয়ার অধ,
 প্রেমি করে সারাকল্যাণ, চলতে লুকচুপি কোল
 নৃত্য-পুরাণের চিরমল।

বড়ো বন্দীর এই রস!

[১]

আমার পিতামহ যৌবনে প্রতি সোমবার বাড়ি থেকে কলকাতার আসতেন, আমার পরিবার কিংবে যেতেন, বাওবা-আমা ছোট্টই চলত, ওসিক তখন বেল খোলেনি; নৃত্য হল বারো মাইল। তার কাছে শুনেছি আমার পাপের গ্রামের এক প্রাথমিক ভবানীপুরে এক ভবিষ্যতের বাড়ি নিত্য নারায়ণ-পূজা করতেন। তিনি সকালবেলা আসতেন, পূজা দেবে ওখানে আহোরাহি করে বিজ্ঞান করতেন, সন্ধ্যারতি করে গেলে ফিরতেন। কিন্তু একটা অসুখিগা হতে লাগল। লেগে দুপুর থেকে জোর পাশা-খেলা চলত, সেটা বাহ সেন কি করে! সেবে তিনি ভবানীপুরে দুপুরবেলা আহোরাহি করেই গেলে ফিরতেন, পাশা খেলে আমার ভবানীপুর যেতেন, সন্ধ্যারতি দিবে পুনশ্চ নিম্ন গ্রামে ফিরতেন। অর্থাৎ প্রতিদিন পথ চলতেন ৪ x ৮ = ৩২ মাইল; পাশা-খেলার জং ১৬ মাইল।

হরীন্দ্র ভট্টাচার্য আমার আত্মীয়, তার প্রপিতামহের কথা বলছি। তাকে আমি জেগেছি। আমাদের গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে বাকইপুরে ফুলে তিনি প্রাধান পণ্ডিত ছিলেন। একদিন ফুলের পর মেগে ফিরবেন এমন সময় অমিদার চৌধুরী-বাড়ির একজন ঘোড়ার গাড়ি থেকে বললেন—পণ্ডিতমশায়, গাড়িতে আসুন, আমরা ওই বিকেই বাছি। পণ্ডিতমশায় বললেন—না বাবা, আর থাক, আর আমার একটু তাজা মাছে।

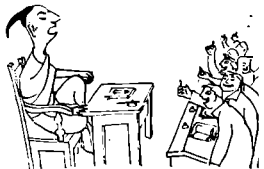
স্বতন্ত্র এতে তখনকার দিনে বাহুরেই হাটের দ্রুততা বা ঘোড়ার চলার দ্রুততা কোন্টী প্রদানিত হয় বলতে পারিলে।

আমি বাল্যকাল থেকেই কলকাতা আসবার ট্রেন সেজেছি। তবে পাঁচ-ছ' বছর বসলে যখন বাহুরেই আমার

বাড়ি হাই তখন হানীগরে নেমে নদী পার হয়ে সমস্ত রাত যেকার গাড়ি ছেচ বাহুরেই পৌঁছই। প্রথমবার যখন দাখিলি: হাই, বাহুরেই নেমে ট্রিমারে পড়া পার করে লাভাতে আমার ট্রেন দ'রে শিলিগড়ি পৌঁছই। সেতুবন্ধ-রামেশ্বর যাবার সময় ভাঙতের স্বলভানের দেবপ্রাস্তা বাতাপাশমে এসে নৌকাই পার হয়ে রামেশ্বর বীণের পাশামে পৌঁছই; ওপানকার শোল তখনও চলি।

আট দিনে পঠিপাল-কীরণ বেশ করে হারকানাপথ বিভাঞ্জন প্রতিষ্ঠিত চরিনাতি এ-এস ফুলে ভর্তি চলুম। এই সময় ওই ফুল নিয়ে অনেক গল্পগোলে হুতুয়া হানীর অমিদার ওই ফুলের খুবই কাছে আর এক ফুল স্থাপন করলেন। আমি নতুন ফুল চলে এসুম।

নতুন ফুলের উপর-স্বানের চাহুরের একটা মল ছিল বাসের দুটামির কথা আরও অনেক আছে। এই মলের নেতা ছিল আমার শিলকৃতো ভাই—কোচো-লাল। চাককীরনে অনেক ছেলের সংসর্গে এসেছি, শিক্ষকতার কালে অনেক চাহু নাভাচাভা করেছি, পরংজনের ইপ্রদায়ের কথাও শেজি, কিন্তু দুটামিতে আমার কোচো-লালকে কেউ শহাৎ করতে পারেনি। পূর্ববাহু বলে একজন শিক্ষক এই ফুল এসেন, কি এক অপরায়ের ভল্ল দখক দেওয়ার কোচো-লাল গিয়ে তার পা হুটো ভাপটে ধরল, তারপর 'স্বার কবব না' বলে আর কপালে হুঁকে পূর্ববাহুর পা-এর আতুলভলো ব্যাঙলাতে থাকে। পূর্ববাহু হাক সেন,—চাচ্ছ, ছাচ্ছ, হজ্জেছ হজ্জেছ। কোচো-লাল বলে,—না ভ্রাতা, আপনরে পায়ে পড়েছি ভ্রাতা; বলে, আর আতুলের উপর বাধা চোকে। একদিন ছেচ-পণ্ডিত স্রাসে হাই ফুললেন, কোচো-দাদার ইকিতে স্রাস-হজ্জে ছেলে হু'হাতে ছুটি দিতে আরম্ভ



কল। পণ্ডিত বলেন,—খাদ্য, খাদ্য; কোচো-পালা বলে,—সে হ'ল না; জাহ, আশনার বে আত্মকর হবে, চাপাও ভাই-সহ। চারক বাই কলক, শিক্কনের কিছু বলবার জো ছিল না, বললেই হেসেবা চোখ রাড়িয়ে বলত,—ও কুলে চলে বাবা।

প্রাণে সত্ত্ব বহুর চলে দিতেছে, ভাবি, বাগ্যেরটা কি আজও সেইভাবে চলছে না? কিছুদিন আগে কলকাতার এক বড়ো কলেজের একজন অধ্যাপক কলেজের অধ্যক্ষকে জানালেন,—অমুক ছেলেটি কলেজ দিগারেট খাঙ্কিল, মিথ্যে কহলুম, শুনে না। অধ্যক্ষবশ্যই একই চিন্তা ক'রে বললেন,—সেহু, ও যেতে দিন, এমনি ছেলেরা স্ট্রাইক করবে, ওদের আবার সব ইউনিয়ন আছে, অল্প কলেজের ছেলেরাও লসে লসে এসে হাতিব হবে, হরতার কি ওল ক্যাপাসে; আর দিগারেট খাঙ্কটাকে তো আজবাল লোখ বলে বজা হয়ে না। অধ্যাপকবশ্যই মুখটি নিচু করে চলে গেলেন। আর লোকলের একটা ঘটনা এইরকম ছিল। টবরজ্ঞ বিদ্যালয়ের একজন শ্রমিকের ঠাণ্ডা কলেজের ছাত্ররা একজন অধ্যাপকের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করেছে; যেমন শোনা অমনি তিনি কলকাতা জালা নিয়ে ট্রুটে হুটে কলেজে হাঙ্কিল হলেন; বললেন,—বেয়ো ব্যাটার! এমনি বেয়ো, আমি আজই কলেজ কুলে দেব। ছাত্ররা নতমাহ হইয়ে অধ্যাপকর কাছে কমা চোরে নিত্বি গেল।

পটীগ্রামে একটা কুলের ঘর কাছে আর একটা কুল আকিলিহেদন গেল না, কলের তিন বছর পরে নতুন কুল উঠে গেল। আমরা পুরানো কুলে থিরে গেলুম না, কলকাতার চলে এলুম। সেটা ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ সাল, আর এখানেই আমার কলকাতা-জীবন আরম্ভ হল। কলকাতার আমদের বাদ্য হল চাপাডালার—দস্তর বোয়ের লেনে। পাণে সিংহবৎ চলে লেনে মট্টপলিটান ইন্সটিটিউশন বইবাজার ব্যাঙ্ক, সেই কুলে ভর্তি হলুম। আমদের বাড়িতে বহিষজ্ঞ হুটে:পাধ্যায় সম্পাদিত বহির্দর্শন ছিল; অকর তা আমাদের হাতে পৌঁছত না, আর তা পড়বার বসলও হবনি। কিন্তু বহির্দর্শনের প্রতিভার কথা কর্তাস্থে কাছে শুনেছি। কলকাতার এসে জানলুম বহিষজ্ঞ বাস করেন আমাদের বাদ্য থেকে বেশি দূরে নর। কলকাতার পথ-বাট ভালো ক'রে চেনা থেকে, একদিন ওকে দূর থেকে দেখে আসল। কিন্তু তা আর হল না। একদিন মাসের গোড়ার দিক, কুলে দিগেছি, হঠাৎ কুল বন্ধ হল, বহিষজ্ঞ পরলোপকরণ করেছেন। কি মনস্তাপ যে গেলুম!

চাপাডালার আমদের বাসার কাছে ছিল ছোটো গোলদীঘি। বিকালে ঘিঁহির ধারে যে বেড়াব তার উপায়

ছিল না; দীঘির ধারে পথ বলে কিছু ছিল না, আর পুতুরের জলটা ছিল মোড়া। ছোটো গোলদীঘি ভিনতে পাহলেন কি? পাহলেন না! আজ্ঞা, বলছি। সেই দীঘি বোঝানো হল, জাপোটার নাম হল চাপাডালার ঘাট; পরে তার নামকরণ হল ব্রহ্মানন্দ ঘাট। এই ছোটো গোলদীঘি কিছু একদিন আমাদের শিশুর উপকার করেছিল। সেটা বোধহয় ১৯০০ সাল। পুজার কিছু আগে; চ'পাডা তিন ধরে মূলধারায় বৃষ্টি হল; কলকাতার এক বৃষ্টি এই আটার বছরের মধ্যে আর কোনো সময় হয়নি; বাজাঘাট লব জলে ডুবে গেল; শেষ ক'দিন বাজার বলল না; হুপুরে বিচুড়ি আলুসে, রাত্তিরে বিচুড়ি আলুসে। কোচো-পালা বলল, আর আমার লকে। গেলুম। ছোটো গোলদীঘির পাশে আমহার্টে স্ট্রিটে এক-কোষের কলের মধ্যে আমরা পুহুছি। কোচো-পালা বলল, হুহুহুহু। এক কই মাছ বেঘন পায়ে খাঙ্ক-সেওয়া—কোচো-পালা বসু করে তাকে ধরে কোল। যেদিন আর আলুলেখ নর, বিচুড়ি আর মাছভাঙা।

কলকাতার এসে বসবাস করবার পর কর্মওয়ালিন স্ট্রিটে হাউ বেললুম। শ্রামবাজার থেকে ছাত্রল, হুটা বোড়া টানতে লাগল, কলেকার বোড়া, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কোয়ার, রাতি একখানা। শুকলাল চাটুজোর সোঝান এখন বেথানে, সেখানে একটা বড়ো আশ্রমাল ছিল, সেখানে ঘোড়া বলল হল। মেডিক্যাল কলেজের পুখে, বাজার গণপে, আর একটা আশ্রমাল ছিল, সেখানে আর একবার বলল হল, এবার এম্মানোভে পৌছিল। এম্মানোভে থেকে বিদ্যাপুর অর্থনি একটা লাইন পাড়া ছিল, তার উপর দিয়ে একজন ট্রামপাড়ি টানত; এখন রাত্তর কোলার টানবার হুটে যে ধরনের একজন ব্যাবহার করা হয় অনেকটা সেই রকমের একজন, বেগ আর একটু বেশি।

আমাদের মাছ তরকারি কেনা হত মাঘবাবুর বাজার থেকে। মাঘবাবুর বাজার হল এখন বেথানে আশুতোষ বিল্ডিংস। বড়ো ইয়ারত হলে কি হয়, কেনোকেটা ঠিক চলতে; একলাইর বামা কাপড় ও হোতলায় হেতলায় জান বিক্রি হচ্ছে।

বাবারের কোকানে একপরশবার হুখানা কুহুরি পাওয়া ফেত, একটু হালুয়া কাউ। পাঁচ আনার এক সের পুরি ও আট আনার একসের সেজিকেনি মিলত। তিন আনা সের দই ও আট আনা সের রাবড়ি তো দ্বিতীয় মহাহুজের আগে অবধি কিলেছি। তখন একজোড়া ধনহাটী ভালো হুতি একটাকো দল আনা এগার আনার বিকত, তের আনা চৌদ আনার একটা পাট পাওয়া ফেত। হুজির উপর পাট পরা বেওয়াল ছিল।

তখন লোকের বাড়িতেই পূজা হত, প্রতিমা স্থাপিত হত ঠাকুর-লাগানে চণ্ডীমণ্ডপে। পুরোহিতই ঠাকুরের উদ্দেশন করতেন; পুরোহিত ছব অঙ্গসারে কবীর মূর্তি পড়া হত; ঢাক তোল বাজত। অতিথিদের প্রধান ও অগ্রধান ভূষণ ভাগ করা হত না; বিশর্জন্যের বিন-ই বিশর্জন্য হত; প্রতিমা বিশর্জন্য দিয়ে যে কিমান দেখা দিত তা মাইকেল প্রকাশ করে দিয়েছেন অথানাবথ-কাথো; বিশৃঙ্খল প্রতিমা বেন দলদী বিশ্বলে।

এখন পূজা প্রায় সবই সর্বজনীন; বায়না দেবার সময় বলা হয় দেবীর মূখ যেন স্বচিহ্না নারিদণ প্যাটার্নের হয়; দেবীকে কানো হয় ছুঁপাথে ভ্রুনের ধারে; পূজামণ্ডপের খানোম্যাটন করেন ডিক-স্টা, আবুল কাশেম বা রশ্মি দেবী; পূজার সময় মাইকের উদ্ভাবন ও সোডাখামের বুড়োর বীতভংগ দেবীর মূখ কিরকম রক্তিম হয়ে ওঠে তা দেখা না গেলেও অস্থান করা যায়।

তখন জীবনমাত্রা মূখ কটিল ছিল, এখন তা সহজ সরল হয়ে এসেছে। এখন হোটেল দিয়ে ছ'মানা পরমা দিন, একটা চিংড়িমাছের কাউসেট পাবেন; কলকবের বোঝানে দিয়ে শুধু কলু—‘অরপ্রান’, বা বা হরকার তারা সব দিয়ে দেবে; জনহি, এবার থেকে প্রতি বান্ধেবে তারা ‘বীজ-মহাষ্টা’ বিভাগ খুলবে। ৩৬-০ আনা দিন—পিতলের কলসি, একখানা আমন, একটা চৌকি, চৌকির উপরকার টেলি-রথ, আলপনা-বেঙা শিডি, রত্নলীলতার কাড় দিয়ে দেবে; আর ১২ টাকা হিসে সেদিন ছজন সন্ধ্যায় আপনাদের প্যাণ্ডেলে দিয়ে বই-প্র-সংগীত গুরে আসবে, আর ৩ ৬ টাকা হিসে ছ'জন গুরে নাচবে; এর উপর যদি ৫০-০ আনা দেন, তারা আপনাদের সভাপতি ও প্রধান অতিথি জোগাড় করে দেবে।

তখন কলকাতায় মেয়াজ-বাড়িতে খাবারের ডাকে ছাতে উঠতে গিয়ে জনহুৎ,—এ ছাতে বাসুন। এখন হেলেরা হোটেল মূর্গি খেয়ে মূখ মুছে বাড়ি ফেরে, বাপ-মা শক্সা বেন।

তখন বকলা চৌকির বক্তৃতা করত, গাইয়েরা গলা ছেড়ে গাইত; মাইক ওঠেনি।

তখন বিবাহের আগে পূর্বভাগ ছিল না, বিনমানে দুবসের স্ত্রীর সূচ্য কথা বলা চলত না; তখন কুড়িটাই হত শিত, হাসপাতালে বা নারিংহোমে টেলিফ হত না। এখন মেয়েদের পায়ে মুজা ও স্টেট বিয়ে ছিল না; তারা হাতের বেরতী, যে খোড়ার গাড়ি ক'রে সেত তার কানলা বহু থাকত। সেদিন অম্বি-সংখের দলের থিয়েটারে সোব্লা পাবের ছেলে পৌফ কামির ‘প্রাণেশ্বর’ বলে সর্জন করত; হালে ভাড়াটে মেয়েরা আসেছে।

আমি সেকাল ও একাল তুলনা করছি, এই যাত্রা; কোনো

কালের উপর বোঝ দিয়ে কথা বলছি। সেকালও ভালো, একালও ভালো, তবে হুহুয়ার বার বা বসে দিয়েছেন—স্বপ্নের চাইতে ভালো পাউক্টি আর কোলা-ভুত।

এখন কলকাতায় এসে প্রবীণের আলোতে পড়ুন, তারপর কেরোসিন-তেল-বেঙা ছুয়েল-ল্যাম্পের আলোয়, হিকু-হেল্পে থাকাকালীন গালের আলোয়। এর পর ইলেকট্রিক আলো আপনাকে প্রতিরিত করল। আমাদের মূল বন্ধন বইভাষার স্ট্রিট উঠে এসে, তখন শিতক পড়াতেন, আর হেলেরা কানলা দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রাম চলা দেবত।

১৮২২ সালে আমি এক্ট্রাল পরীক্ষা দিই; সেবার পরীক্ষার সংখ্যা ছিল চার হাজার। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিল বরদান কালের পতিমহা, পূর্ববঙ্গ, আসাম, বর্না, উড়িষ্যা ও বিহার। এ-বছর এক পতিমহা থেকে মূল কইনাল পরীক্ষা দিয়েছে একলাখ একহাজার চার-চাম্বী।

কলকাতায় আমার পর আমাকে সংবাদপত্র রাখা হত দু'পানি; দু'পানিই সাপ্তাহিক—হিতবাসী ও বঙ্গবাসী। বৈদিক কাগজ নেওয়া হতে লাগল বহুই আম্বালনের সময় হতে। এখন আম্বি যাত্রি ন'টা অম্বি কোনো সত্তা থেকে বাড়ি ফিরেলে, পরদিন ভোরে পাঠ্যের খবরের কাগজ দেখবেন আপনাদের ছবি বেরিয়েছে। সেকালের সাপ্তাহিকও মাসে মাসে ছবি থাকত। এসময়ে একটা গল্প বা ত্রুটি ছিল। কোনো এক কাগজের বখাটিকারী আপিসে নিঃসর ঘরে বসে আছেন, একজন কন্বী এসে ফিরেলে করল,—লালমোহন খোষা মারা গেছেন, তাঁর জীবনী লেখা হয়েছে, ছবি নেওয়া হবে কি? বখাটিকারী একটু চিন্তা করে বললেন,—পাও, fourth side। Fourth side-এর অর্থ ছিল এই। রূক ছিল একটি মাত্র—কাঠের; তিন দিক তিনটি ছবি খোশাই-করা; ছবি তিনটি হল—মহারানী জিন্টাবিহা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল-ভাগান মৃত; চতুর্থ দিকটা একমুখ কাঠ, তাতে কোনো কিছু খোশাই ছিল না। ওই তিন দিকের বাইরে কোনো ছবি দিত হলে, তা মাহেশের মূর্তি হোক বা বাড়ো ইমরত হোক, ওই fourth side কালি মাখিয়ে ছাপা হত। কিন্তু ছবি বাই হোক, কি জোরালো ছিল ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিহার, বোসেন্দ্রনাথ বহু, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির দেখা। হাট বছর ছিল দিয়েছে, একটা প্রবন্ধের কথা মাত্র ও কুড়ি। প্রবন্ধটার নাম,—মহা জনশীল। মঙ্গলীপত্র বহু তাঁর আবিষ্কৃত পাঠ্যতা বেশে কিরকম বণেরী হয়েছেন ভারী কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মঙ্গলীপত্র বহুকে কোনো দলান সেন্নি বসে কী দেবে!

